৮ম বর্ষ] ১৩৩৬ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী

৮ম বর্ষ]   বৈশাখ, ১৩৩৬   [১ম সংখ্যা

নববর্ষ

এস এস নববর্ষ,
আসিবার তব পেয়েছি নিশান,—
কোকিলের মুখে কুহু কুহু গান,
অযুত কুসুমে অলি-মধু-পান,
সমীর সুখদ-স্পর্শ !

শ্যামলপল্লবে সজ্জিত শাখী,
সমাগত নানা বর্ণের পাখী,
নবতৃণদল প্রান্তর ঢাকি'
করিয়াছে শোভাময়,
আকাশ-সলিলে প্রকাশ নীলিমা —
সবে যেন কথা কয় ;
চরাচরে যেন দিল কে আনিয়া
সহসা অতুল-হর্ষ !

এসেছ নূতন,—অথচ এনেছ
নূতন কিছুই নয়,
বহু পুরাতন সেই দৃশ্যপট,
পুরাণ সে অভিনয় !
সেই গ্রীষ্ম—সেই ঘর্ম্ম দরদর,
সেই বর্ষা—সেই ধারা ঝরঝর,
সেই শীত—সেই কম্প থরথর,
এখনো হৃদয়ে জাগে,
চির-পরিচিত সেই দুঃখ-সুখ,
সেই রোগ শোক আনন্দ কৌতুক
বিরুদ্ধ ভাবের এনেছ যৌতুক
শুধু নব অনুরাগে ।
কিছু ভোলো নাই—
কিছু ছাড়ো নাই
পুরাতন সে আদর্শ !

অনন্ত কালের নাহি ত বিচ্ছেদ,
ভেবে হই মুহ্যমান,
তার মাঝে তুমি আনি পরিচ্ছেদ ভুলাও মানব-প্রাণ।
আশা কুহকিনী আনিয়াছ সাথ,
সে দেখায় শুধু নবীন প্রভাত্—
নবীন অরুণ-কিরণে শুধুই রঞ্জিত দশ দিক্,
ফোটে ফুল, অলি গুঞ্জে কুঞ্জে,
কুহরিয়া উঠে পিক;
কিছু ভোলো নাই—কিছু ছাড়ো নাই
পুরাতন সে আদর্শ!

এক বর্ষ বটে বাড়িনু নিশ্চয়,
পরমায়ু হলো এক বর্ষ ক্ষয়,
জীবনের কাজে কি পুণ্যসঞ্চয়
করিলাম তাই ভাবি,
তব আগমনে শুধু মোর মনে,
জাগে এই কথা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
নাহি কি এ ছার মানব-জীবনে
জগতের কোনো দাবী!
তাই মনে উঠে জানি না কিসের
হর্ষ কি বিমর্ষ!

যাই হোক্, যবে অতিথির বেশে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পড়িয়াছ এসে,
করিব না অনাদর—
স্বাগত হে বর্ষবর;
বল মোরে বন্ধু কিবা প্রয়োজন,
করিব তা দিয়ে বাসনা পূরণ,
কিছু ভয় নাই করিতে বরণ
মরণ-শীতল স্পর্শ।
এক বর্ষ করি রবি-প্রদক্ষিণ,
কাল-গর্ভে হবে তুমিও বিলীন,
আসিবে নূতন—চির-পুরাতন—
পুরাতন সে আদর্শ—
এস এস নববর্ষ!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক-সঙ্ঘে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রামের স্থান অতি উচ্চে। দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যানে যখন এই অপার্থিব কুসুম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতেছিল, হৃদয়ের অনন্যসাধারণ একনিষ্ঠ সেবা ও যত্ন তাহার গৌণ সহায়। ভাগিনেয় ও মাতুল প্রায় সমবয়স্ক এবং পরস্পরের পরম প্রীতিপাত্র। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার প্রধান কারণ চাকরীর সন্ধান। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝিলে বুঝা যায় যে, তাহার দেবালয়ে আগমন ও তথা হইতে তাহার নিষ্ক্রমণ উভয়ই শ্রীশ্রীজগন্মাতার মঙ্গলময় বিধান।

ঠাকুর ও হৃদয়রাম

শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন এই সাধকাগ্রগণ্যের ভাব-সিন্ধুতে অনুরাগের তুমুল তুফান উঠে; যখন তিনি আহার-নিদ্রা ও সর্ব্বপ্রকার শারীর চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন; দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞানহারা; যখন তাঁহার মুখে কেবল 'মা-মা' রব, বুকে আকুল ক্রন্দন, চোখে দুকূল-প্লাবিনী ধারা, যখন অদর্শনের ব্যাকুলতায় তিনি ক্ষণে ক্ষণে বালিতে মুখ ঘষিতেছেন; কণ্টক-ক্ষেত্রে আছাড় খাইয়া পড়িয়া যখন রুধির-ধারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিতেছে, সে সময় হৃদয়ের পরিচর্য্যার কথা ভাবিলে মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে যথাবিধানে রক্ষা করিতেছেন। তার পর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, হৃদয় তখনও মাতুলের অনুচর। কিন্তু এই সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত যে পরম সত্য ও যত মত তত পথ এই তথ্য লাভ করিয়াছিলেন, লোকহিতার্থে তাহা প্রচার করিবার সময় হইতে হৃদয়ের মনে কাম-কাঞ্চনপিপাসা ক্ষুধিত শার্দ্দূলের রুধির-তৃষ্ণার ন্যায় লেলিহান করাল জিহ্বা

বিস্তার করিল। তাহার বিকট দশন, ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের ভিড় যতই বাড়িতে লাগিল, হৃদয়ের চিত্ত ততই বিরূপ হইয়া উঠিল। শম্ভু মল্লিক, যদু মল্লিক প্রভৃতি ধনকুবেরগণ আসিতেছে, উপদেশ শুনিতেছে, শ্রীভবতারিণীর প্রসাদ খাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এ কি হইতেছে! অর্থোপার্জ্জনের এই সকল চরম সুযোগ চলিয়া গেলে আর কি ফিরিবে? দুইবার দুই সুযোগ মাতুল হেলায় হারাইয়াছেন। মথুর এক-খানা তালুক লিখিয়া দিতে চাহিল, মামা তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি-লেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী অর্থ দিতে চাহিল, কাঁদিয়া হাট বসাইলেন। কথায় বলে, বার বার তিন বার। সৌভাগ্যকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিলে লক্ষ্মী বিমুখ হ'ন। বিমুখ আর বেশী কি হবেন? লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য ত অনেক দিন আগে প্রত্যাখ্যান করে-ছেন। টাকা—মাটী, মাটি—টাকা বলে মাকে ত জল-সই করা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে তক্তাপোষের উপর ব'সে আছেন যেন রাজ-রাজেশ্বর, ও দিকে কামারপুকুরে ও আত্মীয়-স্বজনের মুখে হা-অন্ন যো-অন্ন—নিত্য হাহাকার!

শ্রীশ্রীভবতারিণী

হৃদয় স্থূল জগতের লোক। সাংসারিক উন্নতির প্রতি তাহার প্রখর দৃষ্টি। মাতুলের ভাবগতিক দেখিয়া শম্ভুচরণ মল্লিকের কাছে সে অর্থপ্রার্থী হয়। শম্ভু বলিয়াছিলেন, তোমাকে কেন টাকা দোব? তোমার খেটে খাবার গতর আছে। রোজগারও যা-হয় কিছু করছ। তোমাকে দিতে যাব কি জন্যে? তবে গরীব, কি কাণা-খোঁড়া-পঙ্গু হ'তে, সে এক কথা।

হৃদয় প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, আমার কায নেই, মশাই, আপনার টাকায়। ঈশ্বর করুন, টাকা পাবার জন্যে আমাকে কাণা-খোঁড়া-দরিদ্দির না হতে হয়। আপনারও টাকা দিয়ে কায নেই, আমারও নিয়ে কায নেই।

সকল সুযোগ ত চলিয়া গিয়াছে। এখন এই যে সব ধনী, নির্দ্ধন, গৃহস্থ আসিতেছে, ইহাদের কাছে নাচিয়া গাহিয়া, বেদ-বেদান্ত বকিয়া কি ফল হইতেছে? মাতুলের ঘটে যদি এতটুকু সংসার-বুদ্ধি থাকে! লোকের কাছে স্পষ্টবাক্যে বলিয়া দেন, ঐখানকার যাত্রায় পেলা দিতে হয় না। যাহার উপর বড় অনুগ্রহ, তাহাকে বলেন, দেবতা কি সাধু-স্থানে শুধু হাতে আসতে নাই। এক পয়সার না-হ'ক কিছু এনো। এক পয়সার বাতাসা আন্‌লে বলেন, তুমি এক পয়সার সুপারি কিনে কুচিয়ে রেখ, আস্-বার সময় তাই দু-এক কুচি হাতে ক'রে আন্‌বে। বস্! একেবারে নেয়াল ক'রে দিলে! ওঁর তত কথা বলিতে দরকার কি? উনি আসনে ব'সে থাকুন, লোকে প্রণামী দিয়ে দর্শন করুক। বলা-কওয়া যা করতে হয়, আমরা করব। বেদ-বেদান্ত শুনে দুনিয়া শুদ্ধ সাধু হয়ে গেল আর কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, হৃদে শালা মনে করেছিল, আমাকে ফেরি ক'রে বেচ্‌বে।

হৃদয় প্রথম-প্রথম মাতুলকে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল। বলিত, বোকা! আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি থাকত কোথা! ক্রমে রাগ, উষ্মা, বকাবকি। যতই দিন যাইতেছে, হৃদয় ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে মথুর-মোহনের সহধর্ম্মিণী জগদম্বাদাসী অনন্তধামে গমন করিলেন। অভাব-আবদার শুনিবার মত যাহারা, তাহারা একে-একে সংসার হইতে সরিয়া পড়িতেছে, আর এদিকে তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতুল নিশ্চিন্তমনে লোকের পরকাল চিন্তা করিতেছেন ব'লে গ্রাহ্য নাই, চেতাইয়া দিলে হুঁস নাই, মুখে সেই এক কথা—আমার মা আছেন।

শম্ভুচরণ মল্লিক

যে আপনার হইতে আপনার, পরম স্নেহের পাত্র, সে অবাধ্য হইলে লোক যেমন ক্ষোভে রোষে দিগ্‌-দিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া শাসন করে, হৃদয় তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পীড়ন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হইয়া এক এক দিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাইতেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

জগদম্বাদাসীর পরলোকগমনের প্রায় ছয় মাস পরে হৃদয় এক দিন শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করিতেছিল, ঐ সময় মথুরমোহনের একটি বালিকা পৌত্রী পূজা দেখিবার জন্য মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হৃদয় ভাবুকতার বিশেষ ধার ধারিত না। কিন্তু সে দিন শ্রীমন্দিরে কুমারীকে দেখিয়া তাহার মনে

কেশবচন্দ্র সেন

মথুরমোহন

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

হইল, সাক্ষাৎ জগন্মাতা চেতন শরীরে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত। অন্তরের কি একটা অনিবার্য্য প্রেরণায় হৃদয় বালিকার পায় সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল। অতঃপর কন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে বালিকার চরণে চন্দন-চিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতা প্রশ্ন করিলেন, তোর পায় চন্দনের দাগ কেন রে?

কন্যা কহিল, পূজারী ঠাকুর আমার পায় ফুল-চন্দন দিয়ে পূজ করেছে।

কি সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণ শূদ্রের পদপূজা করিয়াছে! অমঙ্গল আশঙ্কায় অন্তঃপুরে একটা মহা হৈচৈ-গণ্ডগোল উঠিল এবং তাহা কন্যার পিতা ত্রৈলোক্যনাথের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। ত্রৈলোক্যের স্বভাব ছিল অনেকটা পিতার ন্যায়। ঘটনা শুনিবামাত্র হঠাৎ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হৃদয়কে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, ছোট ভট্চাযেরও আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। মন্তব্য শুনিবামাত্র শ্রীরাম-কৃষ্ণ হাসিমুখে গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া উদ্যানের ফটকের দিকে চলিলেন।

এ দিকে ত্রৈলোক্যনাথেরও সহসা চৈতন্যোদয় হইল। যাঁহার মুখের কথায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব এক সময় নরহত্যা অভিযোগে মুক্তি পাইয়াছিলেন, মাতা শমনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে অসম্ভব কি?

ত্রৈলোক্য শ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি হাসমুখে উত্তর দিলেন, তোমরা যে যেতে বল্‌লে গো!

ত্রৈলোক্য কাতর অনুনয়ে কহিলেন, আপনি ফিরে আসুন। আশীর্ব্বাদ করুন, মেয়েটির কোন অমঙ্গল না হয়।

মায়ের ইচ্ছায় কোন অমঙ্গল হবে না বলিয়া নিরভিমান সাধু হাসিতে হাসিতে আবার নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

অতঃপর মায়ের ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। সুদীর্ঘ সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সর্ব্বসাধারণে এই সময় হইতে তাহার প্রচার আরম্ভ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহার প্রথম প্রচারক।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী যোগানন্দ

তাঁহার সম্পাদিত ‘সুলভ সমাচার’ দক্ষিণেশ্বরের ভগবদ্বাণী প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মপিপাসুদিগকে এই অমৃত-নির্ঝরের সন্ধান প্রদান করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাতে কোনরূপ কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। তিনি বলিতেন, ফুল ফুটিলে ভ্রমরকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইতে হয় না। সুধার সৌরভে সে আপনি আকৃষ্ট হয়।

হৃদয় নিষ্কান্ত হইবার পরেই দক্ষিণেশ্বর পুণ্যতীর্থে পরিণত হইল। শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল আগ্রহ, অদম্য

স্বামী প্রেমানন্দ

অধ্যবসায় ও উৎকট সাধনা প্রত্যক্ষ করিয়াও হৃদয় তাহা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, বাজীকরের বাজী তার ঘরের লোক দেখে না।

হৃদয় দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিবার অল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবকগণ তাঁহার সকাশে আসিতে সুরু করিয়াছেন। এখন তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) যোগীন (যোগানন্দ), নিত্য-নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ),

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী শিবানন্দ

বাবুরাম (প্রেমানন্দ), শশি (রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), লাটু (অদ্ভুতানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), তারক (শিবানন্দ), হরি (তুরীয়ানন্দ), গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) প্রভৃতির তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্য দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সকল তরুণ যুবক উত্তরকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তাঁহার ভাব-প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে তিনি তদনুসারে গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আন্তরিক ধর্ম্মপিপাসায় যে কেহ দক্ষিণেশ্বরে আসিত, এই দেব-মানব তাহাকে তাঁহার উদার অভয়বাণী শুনাইতে বিরত হইতেন না। সংসারী জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রদর্শিত সাধনার পথ—শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য-সখ্য-মধুর—কালক্রমে যখন ব্যভিচারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-প্রয়োজনে সেই পঞ্চবিধ ভাবকে পূর্ণতা দান করিয়া তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের সাধনা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেন। ব'লতেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব। তাঁহার মুখে কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ শ্রবণে পাছে গৃহস্থগণের মনে নৈরাশ্যের উদয় হয়, এ জন্য বলিতেন, সংসারে থেকে সাধনা—কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা। ক্ষিদে-তেষ্টা-কামাদির সঙ্গে লড়াই করতে হবে যেকালে, তখন সংসারে থেকেই করা ভাল। কোন লোক তার পরিবারকে বল্লে, আমি সংসার ত্যাগ ক'রে সাধন-ভজন করতে যাব। পরিবার তাতে জবাব দিলে, ঘরে বেড়াবার দরকার কি? পেটের জন্যে যদি এ-দোর সে-দোর না ঘুরতে হয়, তা হ'লে যাও। আর তা যদি হয় ত এক ঘরই ভাল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

এক জন প্রশ্ন করিল, জীবনের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ঈশ্বরলাভ।

কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যায়?

ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকো। বিষয়লাভ হ'ল না, ছেলে-পুলে হ'ল না ব'লে লোকে ঘটি ঘটি কাঁদে। ঈশ্বরলাভ হ'ল না বলে কার চোখে এক ফোঁটা জল পড়ছে? যেমন সতীর পতির উপর, বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর টান, এই তিন টান এক হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে হবে।

প্রশ্ন হইল, ঈশ্বর ত নিরাকার, তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায় কি ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার হয়ে দেখা দেন। কি রকম জান? যেমন অনন্ত সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কূল-কিনারা নাই, কিন্তু ভক্তি-হিমে কোনখানে জল বরফ হয়ে জমাট বাঁধে। ভগবান্ সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ হন। জমীদার তাঁর কাছারীর সকল স্থানে থাকতে পারেন, তবে কোন একটা বৈঠকখানায় সর্ব্বদাই থাকেন।
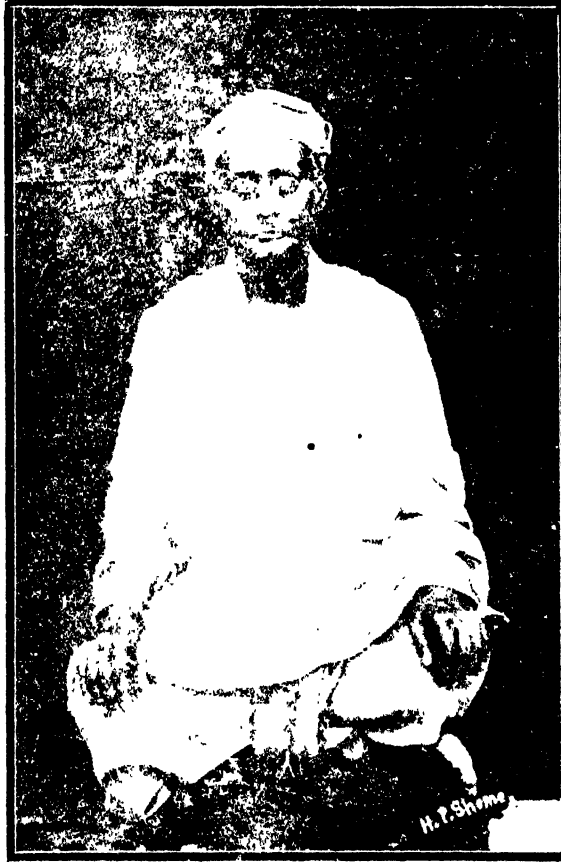
শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠের প্রসঙ্গ হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, শুধু শাস্ত্র পড়াতে কিছু হয় না। বাজনার বোল মুখে বেশ বলতে পারা যায়, কিন্তু হাতে আনা শক্ত। শাস্ত্রের দরকার কতটুকু? শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার পথ ব'লে দেয় মাত্র।
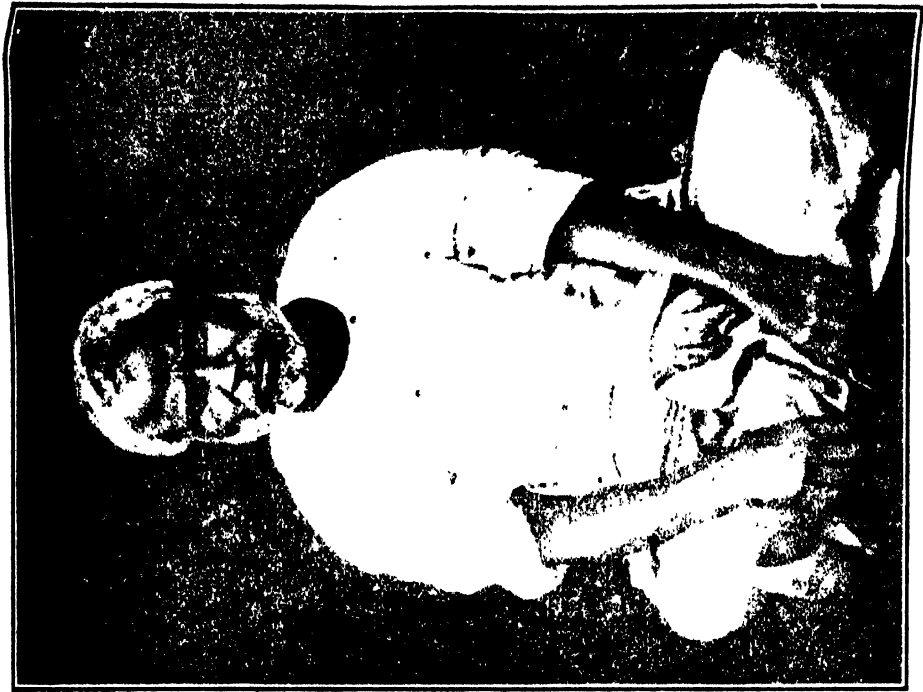
স্বামী সারদানন্দ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

স্বামী যোগানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দ
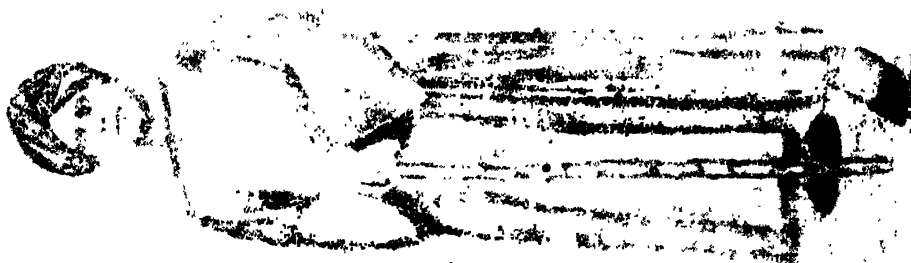
পথ জেনে তার পর কায করতে হয়। এক জন একখানা চিঠি পেয়েছিল, আত্মীয়বাড়ী তত্ত্ব করতে হবে। কর্ত্তা যখন জিনিষ কিনে পাঠিয়ে দেবেন মনে করলেন, তখন চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কি কি জিনিষ পাঠাতে হবে, চিঠিতে তাই লেখা ছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলেন। ক্রমে খোঁজ করতে করতে চিঠিখানা বেরুল। দেখা গেল, তাতে লেখা আছে, সন্দেশ কাপড় এই সব পাঠাবে। তার পর এত ক'রে যে চিঠি খোঁজ করছিলেন, সেখানা ফেলে দিয়ে কর্ত্তা জিনিষ কিনতে বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ না সন্দেশ-কাপড়ের বিষয় জানা যায়। তার পর পাবার চেষ্টা। কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করতে হবে, শাস্ত্রে তার উপায় বলা আছে। সেই সব জেনে কায করলে তবে ত বস্তুলাভ হবে। পাঁজীতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু নেংড়ালে এক ফোঁটা পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্! তা নয়!

প্রশ্ন হইল, সাধন-ভজন করলে কি তাঁর দর্শনলাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না। দেশলাইয়ের কাঠা যদি ভিজে থাকে, যতই ঘষো, কিছুতেই জ্বলবে না। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

আবার প্রশ্ন হইল, ঈশ্বর-দর্শন কেমন ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে। কাদা-মাখা ছুঁচ কি চুম্বকে টানে? ফটোগ্রাফের কাচে কালী মাখানো থাকলে কি ছবি উঠে?

কি জানো? মন নিয়েই কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন নিয়েই সব। এক পাশে স্ত্রী, এক পাশে ছেলে; এক জনকে এক ভাবে, ছেলেকে আর এক ভাবে আদর করে।

মানুষ কি স্বাধীন?

যার চৈতন্য হয়েছে, সে দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। এক সময় একটি সাধু ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখলে যে, জমীদারের লোক একটি লোককে মারছে। সাধু দয়ালু, লোকদের মারতে বারণ করলে। তারা তখন ভারি রেগেছে। সাধু নিষেধ করাতে যাকে মারছিল, তাকে ছেড়ে সাধুকে মারতে আরম্ভ করলে। মার খেতে খেতে সাধু অচেতন হয়ে প'ড়ে গেল। তখন এক জন লোক গিয়ে সাধুর মঠে খবর দিলে। মঠের সাধুরা অচৈতন্য সাধুকে তুলে নিয়ে গিয়ে মঠের এক ঘরে শোয়ালে। তার পর শুশ্রূষা করতে করতে সাধুর একটু চৈতন্য হ'ল। তখন এক জন বললে, ওহে দেখ দিকি, লোক চিনতে পারে কি না। যে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে, বল দিকি তোমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে কে? সাধু উত্তর দিলে, যিনি মেরেছিলেন—তিনি।

ব্রহ্ম কি?

ব্রহ্ম কি, মুখে বলা যায় না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে। কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। ব্রহ্ম কি, এ পর্য্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই। একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। সেই স্বামী আর সব সমবয়সী ছোকরাদের সঙ্গে বৈঠকখানাঘরে বসেছে। এ দিকে মেয়েটি আর তার সমবয়সী মেয়েরা জানলা দিয়ে দেখছে। তারা মেয়ের স্বামীকে পূর্ব্বে দেখেনি। জিজ্ঞাসা করলে, ঐটি তোর বর? মেয়েটি হেসে বললে, না। তখন আর এক জনকে দেখিয়ে বললে ঐটি? মেয়েটি বললে,—না। আর এক জনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ঐ ও? না। শেষ যখন তার স্বামীকে দেখিয়ে বললে, ঐটি? মেয়েটি তখন হাঁও বললে না, না ও বললে না। কেবল একটু ফিক্ ক'রে হেসে চুপ ক'রে রইল। যেখানে ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান, সেখানে চুপ।

দক্ষিণেশ্বর পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিলে মনে হয়, বাতাস এখনও যেন সেই দেব-মানবের পুণ্যস্পর্শ বহন করিয়া আনিতেছে; ভাগীরথী কলনাদে এখনও তাঁহার পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছেন; আর তাঁহার অমৃতময়ী অভয়বাণী এখনও যেন বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতে মর্ম্মরিত হইতেছে। কিন্তু যে অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় প্রেম-প্রীতিদানে শ্রীরামকৃষ্ণ জন-মন হরণ করিতেন, কোথায় তাহার নিদর্শন?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

১২

পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের খাপ খাইয়ে নিতে। বিষ্ণু যখন প্রথম গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন—নিশ্চয়ই তখন আরাম পান নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না; কারণ, একে আমরা মর্ত্ত্য মানুষ, তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার ক'রে নিয়েচি। গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঝগড়া নেই—কিন্তু আমাদের এই কলের জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ। ঠেলাঠেলি মারামারি ক'রে তাকে চলতে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাসফাঁস ক'রে মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের সর্ব্ব-শরীরকে উতলা ক'রে তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকাতে আমাদের এত দুঃখ। জাপানিদের যুযুৎসু ব্যায়ামের কায়দা হচ্চে এই যে, বাধাকে আপনার অনুকূল ক'রে তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় ক'রে নেওয়া, শত্রুর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা। পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার আকাশ-বিহারকে সুখময় সৌন্দর্য্যময় করতে পারে। মানুষের যন্ত্র প্রকৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি, এই জন্যে সে যতটা শক্তি ব্যবহার করে, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির অপচয় করে। যন্ত্র কেবলি বলচে, আমি জোর ক'রে বাধা কাটিয়ে যাব। যন্ত্রের এই ঔদ্ধত্যে সমস্ত পৃথিবী তাপিত। প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের অসামঞ্জস্যে যন্ত্রকে এত কুৎসিত ক'রে তুলেচে। বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন থেকে কলবাহনকে অবলম্বন করেচেন, তখন থেকে তাঁর শ্রী নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্ষ্মীর মুখ দেখা বন্ধ। যন্ত্রের জবরদস্তি যে সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে, সেই তার আপন সন্তান, সেই জটিল জঞ্জালই তার সর্ব্বনাশ করে। আধুনিক কালের পলিটিক্স সেই যন্ত্র—বিশেষত: বিদেশী রাজ্যশাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে চলবার শক্তি এর নেই, উগ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা কেবলি বাধা ভেদ ক'রে চলবার জন্যে এর উদ্যম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দৃপ্ত কিন্তু শ্রীহীন। শ্রী হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি; চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে যখন লীলাময় সহজতা জন্মে, তখন দেখা দেয় শ্রী;—শক্তি তখনি সুন্দরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—বিরোধের ভয়ঙ্কর অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে যায়। এই নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব এক দিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্চে যেন সেই হিসাব তলব হয়েচে। পলিটিক্সের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাই ত পশ্চিম-গগনে ধূমকেতুর মত দেবলোকের ঝাঁটা দেখা দিয়েচে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠ্‌ল।

জাহাজ ত চল্‌চে সমুদ্রের উপর দিয়ে—এ দিকে আমাদের মনও চলেচে কালসমুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন চিন্তার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে এমন বাধা আর কিছুই নেই। অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব, সেখানে বাধা অতি সামান্য—কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম্ম প'রে থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। এই জিনিসটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, এ একটা কঠোর জিনিষ, এ অদৃশ্যভাবে ঠেলা দেয়;—বিশেষত: যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন জাহাজের আকাশটাও শূন্য নয়—সে যেন কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভরা। আমি স্বভাবত অবকাশবিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাঁকায় মানুষ হয়েচি—আমার চারিদিকের আকাশ যখন ঠেলাঠেলিতে ভ'রে যায়, তার মধ্যে যখন প্রকৃতির শান্তি বা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে না, তখন আমার সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি আমার সেই শান্তিনিকেতনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি চ'লে যেতুম। কিন্তু পূর্ব্বে বলেছি, আমি কলিযুগের ধার-করা বাহনে চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্যেই দেবতার প্রতি ঈর্ষা হয়—আলাদিনের প্রদীপের স্বপ্ন দেখি।

কিসের জন্যে যাচ্চি, সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয়—সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে, সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে, সেটি হচ্চে এই;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে, তাতে

সেখানকার যাঁরা মনীষী—যাঁরা ভাবুক, তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের দেখ্‌তে পাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখতে পাওয়া নয়—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন—সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। এ কথা মনে করা ভুল, তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন, তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায়, তখন এ কথা বুঝতে হবে, সেই দুঃখের মূলে সর্ব্বমানবের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এ দুঃখের প্রতিকার হ'তে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে দুঃখ বহন করচি, তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক ক'রে দেখচি বলেই মনে ভাবচি, মণ্টেগু্য ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্ম্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘটবে।

* * * *

আলোয়ারের মহারাজা আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন। এঁর বেশভূষা আদবকায়দা সমস্তই দেশী ধরণের। পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করবার সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে—আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন ক'রে তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সম্মান করে, তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অবজ্ঞা এবং উপহাস ক'রে থাকে। সেই কারণে, যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ, এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি, সেখানে নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে ইংরেজি ধরণ-ধারণের সুবিধে আছে, তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের দিকে? এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লজ্জা বহন করি কি ক'রে?

এ সম্বন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্ব্বে মাঝে মাঝে শোনা যেত। সে হচ্চে এই যে, বাঙ্গালীর বেশভূষা ধুতিচাদর, কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ চলে না। এ কথা সত্য যে, বাঙ্গালী সুদীর্ঘকাল লোকসভার আড়ালে ছিল,—আপনার গ্রামে আপনার চণ্ডীমণ্ডপেই তার দিন কেটেচে। এই জন্যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত বেশি আটপহুরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যোগ্য আমাদের কোন আদবকায়দা নেই। এই জন্যে বাঙ্গালী স্বভাবতঃ উদ্ধত না হলেও বিনয়প্রকাশে সে অনভ্যস্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। এ সমস্তই মানি, তবু কিছুতেই মানিনে যে, আগাগোড়া ইংরেজ সাজ্‌লেই সমস্যা মেটে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিয়ে নেওয়াই হচ্চে প্রাণের লক্ষণ। বাহিরের পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব, আর সেই পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি এবং সৃজনীশক্তির সাহায্যে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নেওয়াই হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা। পূর্ব্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব যদি থাকে, তবে সেটাতে আমাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে, তবু তাতে তেমন বেশি লজ্জা নেই, কিন্তু কোনোকালেই সে অভাব আমাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে মেটাবার ভরসা যদি না থাকে, তবে সেই চির-অক্ষমতার অগৌরবই দুঃসহ। এক দিন আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি সঙ্কীর্ণ ছিল; কারণ, সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা গ্রামের ভাষা ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত, তারা অবজ্ঞা ক'রে বলেছিল, বাংলা চিরকাল প্রাকৃতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্ আর নির্ব্বিচারে ইংরেজি ভাষাকেই বিশিষ্টসাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সেই অবজ্ঞা বাংলা ভাষা স্বীকার করে নি। বাংলা ভাষা বিদ্যার ভাষা—সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ল। কেমন ক'রে হ'ল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ক'রে নয়; নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিদায় না ক'রে দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথ্যদান করবার উপযুক্ত আয়োজন ক'রে—অর্থাৎ নিজের প্রাণশক্তির বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সামঞ্জস্য-সাধন করে। বীণায় সুর বাধবার সময় বেসুর অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাতেও বোঝা যায়, সুর বাধবার ওস্তাদটি বেঁচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা। তেমনি আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নানা অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দেবেই, কিন্তু তাতেও বোঝা যায়, সজীব ওস্তাদের কাজ চল্‌চে,

সেই ওস্তাদ সমস্ত বিকৃতিকে ক্রমশঃই প্রকৃতির অনুগত ক'রে নেবেন। অতএব এই সকল উপদ্রবকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই ; কেন না, এ হ'ল প্রাণের উপদ্রব। ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জড়তা। সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্ব্ব করুক—তবুও তা জড়তা। যতক্ষণ নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে সৃজন করচে, ততক্ষণ অন্যের তৈরী জিনিষ সেই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে,—সেই রকম গ্রহণ করাকে ভিক্ষা করা—ধার করা বলে না। তাকেই বলে অর্জ্জন-করা। সমস্ত মহৎ এবং প্রাণবান্ সভ্যতা বাহির থেকে সেই রকম অর্জ্জন করে এবং করেচে। প্রাচীনকালে ভারতও তাই করেচে, যদি না করত—তবে লজ্জা বোধ করতেম। শক্তিস্বাতন্ত্র্য অভাবাত্মক জিনিষ নয়—অর্থাৎ প্রাণপণে পরের পন্থা বাঁচিয়ে চলাই ওরিজিন্যালিটি নয়—উপকরণ ঘরের হোক্ আর বাইরের হোক্, সমস্তই নিজের প্রকৃতিসঙ্গত ক'রে নেবার শক্তিকেই বলে শক্তিস্বাতন্ত্র্য। বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে নকল করাও যেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করাও তেমনি দীনতা। দুইয়েতেই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, আজকের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের যে সম্বন্ধস্থাপনের কাজ চলচে, তার প্রত্যেক অঙ্গেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাগ্রত সৃজনীশক্তির পরিচয় থাকা চাই। এই সৃজনের মানেই হচ্চে বাহ্য উপকরণকে নিজের আন্তরিক নিয়মের অনুগত করা, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাই এই জাহাজে যখন কোনো বাঙ্গালী সাহেবকে সগর্ব্বে পদচারণ করতে দেখি, তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি—আবার যদি দেখতুম, কোনো বাঙ্গালী খালি গায়ে কাঁধের উপর একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্‌ফিনে ধুতি প'রে অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যে ডেকের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুচ্চস্বরে হাই তুলচেন, তা হলেও সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করতুম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলন

তোমারে পেয়েছি বধূ আজ
যাইতে দিব না তোমা আর।
বাঁধিয়া রাখিব হৃদে, হে হৃদয়রাজ
রুদ্ধ করি হৃদয়ের দ্বার॥

বুক রাখি তব বুকে, মুখে মুখ দিয়া
প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয়।
এক দেহ, এক আত্মা, হবে এক হিয়া
ঘুচে যাবে বিচ্ছেদের ভয়॥

কত আরাধনা ক'রে পেয়েছি দরশন
সার্থক করিব তাহা আজ।
তোমার নয়নে রাখি তৃষিত নয়ন
অপলক, জুড়াইব স্বামী॥

বিরহের অশ্রুধারে গাঁথিয়াছি মালা
গলে পরাইব সখা এই শুভক্ষণে।
ভুলে গেছি আজি সব বিচ্ছেদের জ্বালা
তৃপ্ত হিয়া আনন্দ-মিলনে॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ

স্বপ্ন-মঙ্গল

সে দিন পৌষ মাসেই হঠাৎ সকাল হইতে আকাশ ধূম্র মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে শীতের প্রকোপের প্রখরতা কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। কেরাসিন-কাঠের টেবলের উপর টাইমপীস্‌টা যদিও অনেকক্ষণ হইল জানাইয়া গিয়াছে যে, ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, তবুও পটলডাঙ্গার 'দি গ্রাণ্ড ক্যালকাটা লজের' ৭ নম্বর ঘরের চারি জন অধিবাসীর বিছানা হইতে উঠিবার কোন লক্ষণ নাই। নীচের কয়লার উনুন হইতে খোলা দরজা দিয়া যখন রাশি রাশি ধোঁয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, উৎপল পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিয়া উঠিল, "হরি হে, রাক্ষা কর।" তার পর লেপটা মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিল। ও পাশের চৌকি হইতে গোপেশ্বর বাবু হাঁকিলেন, "মধু, চা লাও!"

অন্য দুই তক্তপোষের অধিকারী তখনও নীরব।

বাহিরে বেশ অন্ধকার। সূর্য্যদেব কলিকাতার আকাশে হাজিরা দিবার ভরসা পান নাই পাশের ৮ নম্বর ঘরের হরেকৃষ্ণ বাবু সুর করিয়া নবগ্রহ-স্তোত্র জপিতেছেন—তাহার একটু একটু রেশ এ ঘরেও ভাসিয়া আসিতেছে—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

এমনই করিয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—অবশেষে—'দুত্তোর' বলিয়া উৎপল উঠিয়া বসিল—একবার সশব্দে হাই তুলিল, তার পর এ-দিক ও-দিক চাহিয়া পঞ্চমে সুর ধরিল—

"আ-আ-আরে পিয়া বিনা আরে বিনা নাহি কাটে
রাতি ই-ই-আ-আরে পিয়া বিনা—"

"দেখ, উৎপল, রাত ত কাটল, এখন তুই তোর গান থামা! কেয়া মজার এক স্বপ্ন দেখছিলাম—তোর জন্য সব মাটী হয়ে গেল!"

তৃতীয় তক্তপোষ হইতে এই আক্ষেপোক্তি শ্রুত হইল।

উৎপল রসভঙ্গ হওয়ায় চটিয়া বলিল, "তুই স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটাবি, প্রদীপ!—কি স্বপ্ন দেখছিলি, শুনি?"

প্রদীপ বলিয়া উঠিল, "আ হা-হা! তুই এমন স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিলি! আমি যেন রেড রোডে চমৎকার জোছনার আলোয় হাওয়া খাচ্ছি, আর অনেক কোকিল ডাকছে—"

"কোকিল?—রেড রোডে কোকিল কি রে?"

"আরে দূর—স্বপ্নে যে, তখন বসন্তকাল—কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুল ধরেছে—চুপ—নতুন বৌয়ের মত রাঙ্গা চেলি প'রে দাঁড়িয়ে—কুণ্ঠিতা—অবগুণ্ঠিতা—"

"রেড রোডে কৃষ্ণচূড়ার গাছ! স্বপ্ন ব'লে না হয় মানলাম; কিন্তু তোর ও অলঙ্কার রাখ্।"

"উঁহু, ভাব দিয়ে না বল্লে বর্ণনা ঠিক হয় না! আমি ত সেখানে হাওয়া খাচ্ছি—এমন সময় একখানা প্রকাণ্ড মোটার এসে পাশে দাঁড়াল!"

"কি—তোর চবরলেট ত?"

"দূর—দূর—হয় ওকল্যাণ্ড—নয় জুবিলি মডেল বুইক। ঠিক নজর পড়ল না কি না। গাড়ীর ভেতর থেকে কে মিষ্টি গলায় বল্লে—'লেকে যাবার রাস্তাটা চেনেন কি?' চেয়ে দেখি ভাই—কি বল্‌ব, একটি তন্বী! তাঁর রূপবর্ণনার চেষ্টা কোরব না—তোর মত অরসিক তা বুঝবে না।"

"তবু চেষ্টা কর না? 'অচঞ্চল দীপ-শিখা?' 'ষোড়শী পল্লবিনী লতেব'? না তোর সেই 'কালো মেয়ে' আর তার কালো হরিণ চ'খ?"

"এক কথায় যদি বুঝতে পারিস—সে আমার মানসী কল্পনা-রাণী! তাঁকে বল্লাম, চিনি—খুব চিনি! তরুণী বল্লেন, 'পৌছে দেবেন আমায় কৃপা ক'রে?' আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম, তিনিও আমায় ঘেঁসে বসলেন—সেই চাঁদের আলোয়—"

"আর কোকিলের কল-গীতে—"

"ঠাট্টা পরে করিস। সে চাঁদের আলোয় ইচ্ছে হচ্ছিল, তাঁর পায়ে লুটিয়ে বলি—'ত্বং হি মম জীবনম্'—"

"আঃ—উচ্ছ্বাস রাখ—কি হ'ল, তাই বল না?"

"কখন্ যে লেকে এলাম, তা বুঝতে পারি নি।"

"তুই লেক চিন্‌লি কি কোরে? সেখানে ত কখনও যাসনি?"

"আরে স্বপ্নে—শোন্ ত; তার পর সেখানে একটা গাছের নীচে বস্‌লাম গিয়ে হু'জনায়—হু'জনায় মুখোমুখি—আকাশে চাঁদ—হ্রদের জলে তারি আলো ঝিলি-মিলি করছে—তাঁর হাতখানা সোহাগে ধ'রে বল্লাম—'ওগো—

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!'

সে কিছু না ব'লে তার মুখখানা আমার বুকে রাখলে—আর কথা কইবার ক্ষমতা আমার ছিল না! যেন সে আমার কত কালের প্রেয়সী! যেন তাকেই শত জনমে শত শত রূপে ভালবেসে এসেছি। যুগ যুগ ধ'রে সেই ছিল যেন আমার একমাত্র প্রিয়া! অস্ফুট স্বরে প্রিয়া বল্লে, 'আমি ত তোমায় চিনি! যুগ যুগ ধ'রে তোমায় আমায় জানা শোনা—

আমরা হু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে—
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা হু'জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন মধুর লাজে।'

আমিও কি একটা মিষ্টি কবিতা বলতে যাব, এমন সময় তুই হেঁড়ে গলায় গান ধরলি!"

প্রদীপ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আবার শুইয়া পড়িল—মনটা বোধ হয় তাহার স্বপ্নপ্রিয়ার অন্বেষণে ছুটিতেছিল—স্বপ্ন-সায়রের তীরে তীরে।

এই কাব্য এবং দীর্ঘনিশ্বাসের চাপে পড়িয়া উৎপলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রদীপ বলে কি? কাল রাত্রিতে নেশা করিয়াছিল না কি?

চতুর্থ তক্তপোষ হইতে একটি সুগম্ভীর গলা তাহার দুশ্চিন্তা বন্ধ করিল,

"বলি, মশায় স্বপ্নে বিশ্বাস করেন কি?"

প্রদীপ বলিল, "ঠিক অবিশ্বাস করি না—তবে—"

শ্যামাচরণ বাবু কম্বল হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিলেন, "ওই ত হ'ল আজকালকার ছেলেদের দোষ। তারা কিছুই বিশ্বাস করবে না! মশায় বিশ্বাস করেন এই পৃথিবীটা—গোল?"

"তা করি—তবে—"

"আবার তবে? যদি বলেন, পৃথিবী গোল, তবে স্বপ্নে অবিশ্বাস করেন কেন?"

উৎপল বলিল, "পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন পৃথিবী গোল।"

তড়াক করিয়া শ্যামাচরণ বাবু উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "আমি প্রমাণ ক'রে দেব, প্রত্যেক স্বপ্নের একটা ফলাফল আছে। আচ্ছা, আপনি যখন এ স্বপ্ন দেখেন, তখন ক'টা বেজেছিল বলতে পারেন?"

"তা কি ক'রে বলি?—ওঃ হাঁ, এখন সাড়ে আটটা—বোধ হয়, স্বপ্ন দেখতে সুরু করি সাড়ে সাতটায়।"

"বাস!" বলিয়া তিনি আঙ্গুল গণিতে সুরু করিলেন, তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, কোন্ কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন, বলুন ত?"

"তা ঠিক মনে হচ্ছে না।"

সক্রোধে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "স্বপ্ন দেখতে পারেন, আর কোন্ কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন, বলতে পারেন না?"

উৎপল বলিল, "দাঁড়ান বল্‌ছি—প্রদীপ, তুই বোধ হয়, বাঁ কাৎ হয়ে শুয়েছিলি, শুনেছি বাঁ কাতে শুলে স্বপ্ন দেখে।"

"না, আমার মনে হচ্ছে ডান কাৎ—"

"না নিশ্চয়ই বাঁ কাৎ।"

"তবে তাই—"

"বাঁ কাৎ?—বেশ, আচ্ছা, ডান হাতটা কোথায় রেখে-ছিলেন? বুকে না বিছানায়?"

উৎপল বলিল,—"এর সঙ্গে স্বপ্নের সম্বন্ধটা কি? তার চেয়ে মোটরকারের নম্বরটা জিজ্ঞাসা করুন না? জান্‌লে—ওর যুগ-যুগান্তরের প্রিয়ার কলিযুগের ঠিকানাটা পাই!"

চটিয়া শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "ক্যালকুলেট করতে হ'লে 'ডাটার' দরকার হয় না?—এগুলো হচ্ছে তাই!"

প্রদীপ তাড়াতাড়ি বলিল, "হাতটা বুকের উপরেই ছিল বোধ হচ্ছে।"

"বোধ হয় টোধ হয় চলবে না—নিশ্চিত হওয়া চাই—নইলে গণনা ভুল হবে।"

পুনরায় গোলমালের আশঙ্কায় গম্ভীর হইয়া প্রদীপ বলিল, "হ্যাঁ—এবার মনে হচ্ছে বটে, স্বপ্ন দেখবার সময় হাতটা বুকের ওপরই রেখেছিলাম!"

"বেশ—আজ হচ্ছে তোমার গিয়ে শুক্কুর বার—তা হ'লে হ'ল গিয়ে তোমার—সোমে এক পা—বুধে তিন পা—আর আজ শুক্কুরে পাঁচ পা—"

উৎপল আর প্রদীপ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—শ্যামা পণ্ডিত বলে কি? এক পা—দু'পা—এ সবের অর্থ কি?

শ্যামাচরণ বাবুর গণনা চলিল—"রবি রাজা বুধো মন্ত্রী জলানাম্ অধিপতিঃ শনি—নক্ষত্র স্বাতি—গ্রহদোষ—তবে দিবাস্বপ্ন—বারদোষ হয় না—"

আবার গণনা চলিল। তখন বাহিরে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—পৌষের আঙ্গিনায় আষাঢ়ের লীলা সুরু হইল।

"মশায়, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যদি আজও অস্তিত্ব থাকে, তবে আপনার স্বপ্ন সফল হবেই হবে। গণনা আমার অভ্রান্ত!"

"বলেন কি!"

প্রদীপ শ্যামা পণ্ডিতের পা অতি ভক্তিভরে ছুঁইয়া প্রণাম করিল।

গোপেশ্বর বাবু লেপের নিম্ন হইতেই হাঁকিলেন, "ওরে বেটাচ্ছেলে মাধু, চা নিয়ে আয় না রে?"

* * *

'দি গ্র্যাণ্ড ক্যালকাটা লজের' অধিবাসিবর্গের জীবন-যাত্রা এখনও গতানুগতিক ভাবেই চলিতেছে। 'রোপ্‌স এণ্ড লেদার' কোম্পানীর লেজার-কিপার গোপেশ্বর বাবু দশটা-পাঁচটা আফিস করেন, আর বাকি সময়টুকু ঘুমাইয়া কাটান। শ্যামাচরণ পণ্ডিত কোন একটা স্কুলে পণ্ডিতী করেন এবং "নীতিমালা" নামক একটা উপাদেয় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিতেছেন। উৎপল পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে খাতা লইয়া যায় আসে। প্রদীপের স্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই—কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, সফল হইবেই এক দিন। হিন্দুধর্ম্মের উপরেও টানটা যেন বাড়িয়াছে একটু।

ল' কলেজ হইতে সে দিন সকালে বাহিরে আসিয়াই প্রদীপ দেখিল, 'আশুতোষ বিল্ডিং'এর গায় প্রকাণ্ড এক সুরঞ্জিত প্রাচীর-বিজ্ঞাপনী। বিজ্ঞাপনের বাঁ-দিকে তরুণী নারীর চিত্র—তাহার হাতে লীলা-কমল—কর্ণে শিরীষফুল, মেখলাতে 'নবনীপের মালা'। অজন্তার গুহা হইতে কোন একটি মেয়ে আসিয়া যেন সেখানে দাঁড়াইয়াছে! প্রাচীন যুগের অনুকরণে তাহার দেহে সাড়ীর আবেষ্টন। পার্শ্বে লালনীল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা—

"এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে,
(সেবা-সংসদের সাহায্যকল্পে)
সুমধুর গীতি-নাট্য
মায়া-জাল!
রবিবার, ম্যাটিনী ৫টায়।

অতি সম্ভ্রান্ত বংশের বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক! কুমারী সেবা দাস—ও চিত্রা রায়ের রূপ-নৃত্য! কুমারী সরমা সেন, মালবিকা সাহা, মন্দ গুহ, সুগুণা দে ইত্যাদি সুগায়িকাগণ সুরের জাল বুনিবেন!

টিকেট-প্রাপ্তির স্থান—ধর এণ্ড সেহানবীশ!"

প্রদীপের সহসা মনে হইল, 'দেশ-বল' কাগজে সে প্রায়ই চিত্রা রায় এবং সেবা দাস সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়ে! ইহাদের প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা না কি আধুনিক নৃত্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে—হ্যাঁ, 'নৃত্য-নিকুঞ্জ' কাগজও ত সে দিন উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছে—আমরা আমাদের সম্মুখে শ্রীমতী সেবা দাসের 'মরণ-নৃত্য' এখনও দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার নৃত্যের অনবদ্য রূপলহরী—তাঁহার অনুপম দেহপল্লবের নিরুপম ভঙ্গিমাটি—আমাদের চোখের সম্মুখে ট্রামে, ট্রেণে, মাঠে-ঘাটে নিয়তই ভাসিতেছে! মরি মরি—আমাদের তুচ্ছ লেখনীর সাধ্য কি তাহা বর্ণনা করে! ইত্যাদি ইত্যাদি। বটে!— 'মায়াজালে' ইহাদের নৃত্য তাহার দেখিতেই হইবে—নহিলে জীবনে একটা মহা আপশোষ থাকিয়া যাইবে যে!

* * *

নাটাশালা লোকারণ্য—তিল ধরিবার স্থান নাই। বিচিত্র বেশভূষায় কত রস-পিপাসু নরনারী এই উপাদেয় গীতি-নাটকটি দেখিবে বলিয়া আসিয়াছে। 'ফিস্‌-ফিস্‌', 'কানা-কানি' ইত্যাদি অবিরাম চলিতেছে। বক্সগুলার দিকে

চাহিলে আর দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা করে না! দিল্-দরিয়াবাদের মহারাজা বাহাদুর বসিয়াছেন ষ্টেট্ বক্সে, পাশে দ্য'লুকেস সার ঝুনঝুনওয়ালা চশমখোর।—প্রদীপও 'পিট'এ একটি স্থান সংগ্রহ করিয়াছে।—এত আলো—এত হাসি—এত রূপ—বুঝি বা কিন্নরলোকেই আসিয়াছে সে! সাধারণ থিয়েটারে কৈ এমনটি ত সে দেখে নাই!

সহসা ঘণ্টা বাজিল—যবনিকা উঠিল। রঙ্গমঞ্চ অতি মৃদুনীল আলোকপ্লাবিত—সম্মুখে নন্দন-কানন। ক্রমে উদ্যানের তরুলতাগুলির পশ্চাতে এক একটি করিয়া মায়া-বালিকা আবির্ভূতা হইল—রঙ্গমঞ্চের নীল আলোক সহসা অগ্নিবর্ণে রূপান্তরিত হইল! তাহার পর সুরু হইল মৃদু সঙ্গীতের সঙ্গে তাহাদের লীলায়িত অলস নৃত্য। নৃত্যের তালে তালে—নমনীয় অঙ্গের ললিত গতিভঙ্গীতে সমগ্র চিত্ত কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে! প্রধানা মায়া-বালিকারূপে নাচিতেছে মাঝখানে ওই না চিত্রা রায়? কি সহজ সাবলীল ভঙ্গীটি—যেন গানের সুরের সঙ্গে হাওয়ায় হাওয়ায় দুলিতেছে!

দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইতে লাগিল। করতালি-ধ্বনিতে নাট্যশালা মুখরিত হইল। রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রদীপ দেখিল, ওই উর্ব্বশীরূপে সেবা দাস চঞ্চলকুমারকে মর্ত্ত্যে আসিয়া ভুলাইল। কি বিচিত্র সে নৃত্য—তনুর তনিমা কি অপূর্ব্ব! শ্যাম দূর্ব্বাদলে চেলাঞ্চল খসিয়া পড়িল—কুরুবকের কবরী টুটিয়া কেশদাম বক্ষোদেশে এলাইয়া পড়িল—তাহার লীলায়িত দেহ-লতার প্রত্যেক হিল্লোল প্রদীপের শিরায় শিরায় অগ্নিপ্রবাহের ন্যায় বহিয়া চলিল। চটুল চঞ্চল চরণের গতিচ্ছন্দে নূপুরের রিণিকি ঝিনিকি বাজিতেছিল। তাহার অধরে কি মর্ম্মঘাতী হাসি! তাহাকে মর্ত্ত্যভূমি হইতে কোন কল্পলোকে লইয়া চলিয়াছে!

উর্ব্বশী রাজপুত্র চঞ্চলকে মায়াজালে বাঁধিল, কিন্তু আপনাকে ধরা দিল না। নিষ্ঠুর ব্যাধের মত চঞ্চলের মর্ম্মান্তিক যাতনা হাস্যলাস্যে উপভোগ করিল! উঃ, কি নিষ্ঠুর! পাষাণী—এইটুকু মমতাও নাই? প্রদীপের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল।

আবার বনদেবীরূপে সুগুণা দে আসিয়া একটি বকুল-তরুতলে দাঁড়াইয়া গাহিল—সখা ফের—ফের! মর্ত্ত্যের তরুণীরা তোমার পথ চাহিয়া রহিয়াছে, ও মায়া-বালিকা—প্রেম জানে না—করুণা জানে না—উষর-কঠিন হৃদয়। হৃদয় লইতে পারে, দিতে জানে না—ব্যথা দিতেই পারে, ব্যথা বুঝে না! ওগো পথিভ্রান্ত পথিক, সোনার মায়া-হরিণের ছলনায় ভুলিও না—ফের ফের! রাজকন্যা সুচন্দ্রার মালা যে শুকায়! সে করুণ সুরলহরী নাট্যশালার মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—সকলের হৃদয় গলিয়া গেল!

কিন্তু চঞ্চলের মোহ ত ভাঙ্গিল না! মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, জয়া, মঞ্জুলিকা প্রভৃতি সুরবালারা হাতে হাত বাঁধিয়া চঞ্চলকে ঘিরিয়া আবেগে বিলাসে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। চঞ্চলের কি ব্যাকুল দৃষ্টি—কি মৌন আবেগ! কিন্তু পিশাচীর দল হাসিয়া লুটিয়া পুটিয়া শুধু কটাক্ষ-বাণের প্রহরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চঞ্চলের করুণ দৃষ্টি দেখিয়াও সেই নিষ্ঠুর নির্লজ্জ লীলা সাঙ্গ হইল না।

* * * *

অভিনয় শেষ হইলে অভিভূতের মত নিশ্বাস ফেলিয়া প্রদীপ রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার বুকেও বুঝি 'চঞ্চলের' ব্যথাটা খচ্ করিয়া আসিয়া বিঁধিয়াছে! ময়দানে গিয়া একটা বেঞ্চে সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল—বাহ্য-জগৎ তাহার কাছে যেন একবারে বিলুপ্ত। খানিকক্ষণ পরে আবার সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল—যে রাস্তা সম্মুখে পড়িল—তাহা ধরিয়াই সে চলিল। মস্তিষ্ক তখন ফেনিলোচ্ছ্বসিত রঙ্গীন নেশায় পরিপূর্ণ—উর্ব্বশী—মেনকা—সেবা—চিত্রা—যেন প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমতী অচঞ্চল বিদ্যুৎশিখা! চক্ষু—হৃদয় সবই যেন বিমূঢ়, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

এ পথ হইতে সে পথ—সে পথ হইতে এ পথ—পথের আর অন্ত নাই—মায়া-জাল হইতেও যেন আর মুক্তি নাই!

লোকচলাচল একবারেই নাই—রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোকগুলি হাসিতেছে—যেন নিষ্ঠুর দানবের মত! চারিদিকে একটা বিরাট অবসাদ-ভরা স্তব্ধতা।

'পী—প্' 'পী-প্'!—তীব্র বস্-হর্ণের আর্ত্তনাদে প্রদীপ চমকাইয়া উঠিল—দেখিল, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক খানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী—একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে বুঝিল, সেখানা—জুবিলী মডেল বুইক্—সিক্স!—ছ সিলিণ্ডার এঞ্জিন রুদ্ধ-রোষে গর্জ্জন করিতেছে!

"সেবা, এ ভদ্রলোককে জিগেস কর না—ইনি বলে পারবেন বোধ হয়।"

সবিস্ময়ে প্রদীপ দেখিল, গাড়ীর মধ্যে অপরূপ সাজে সজ্জিতা কতকগুলি তরুণী—একটু চাহিতেই সে ইহাদিগকে চিনিতে পারিল—এই ত' পাষাণী উর্ব্বশী সেবা দাস—ওই ত মমতাময়ী বনদেবী সুগুণা দে! অন্যান্য সখীকেও চিনিতে বিলম্ব হইল না।

"সতের বাই দুইয়ের এ লেক্ রোডএর বাড়ীটা কোন্ দিকে হবে জানেন কি?"—কথাটা বলিল সুগুণা।

লেক্ রোড্!

ইহারা বলেন কি? পটলডাঙ্গা যাইতে কি তবে সে এতক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে দক্ষিণ-কলিকাতার জনবিরল অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে!

"সুগুণা—তুই কিন্তু বেশ মেয়ে যা হ'ক! নিজের বাড়ীটাও চিনিস না?"

"কি কোরে চিনব? সবে ত' দু তিন দিন হ'ল এই মাঠের মধ্যে উঠে এসেছি। তার ওপর এই শীতের রাত্তিরে যা কুয়াশা হয়েছে! কিছুই চিনতে পারছি না!"

"এসেছিলি কোন্ গাড়ীতে?"

"এসেছিলাম ত' বাড়ীর গাড়ীতেই—বাড়ীর সবাই অ্যাক্‌টিংএর শেষে ফিরে গেল—আমি ভাবলাম, তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরব—তাই ত এলাম। তখন ত আর ভাবিনি যে, বাড়ী চিনতে পারব না—নতুন রাস্তা—তোর ভাইও যে চেনে না।"

তাহার পর সুগুণা বিস্মিত নির্ব্বাক্ প্রদীপকে বলিল, "আপনি চেনেন কি সেভেন্টিন্ বাই টু এ লেক্ রোড্? এটর্ণী এস্ সি দের বাড়ী?"

"হাঁ—খুব চিনি—খুব চিনি!"

"আসুন না তবে আমাদের সঙ্গে? আসবেন কি?"

কি করিয়া যে হঠাৎ প্রদীপ বলিয়া বসিল, 'হাঁ চিনি'—তাহা সে নিজেই জানে না! যে তন্বীটির নাম সুগুণা, তাহার মুখে তখন বিজলী আলোর একটা ঝলক আসিয়া পড়িয়াছিল।—সেই আলোকে প্রদীপ বনদেবীরূপে বনফুলে সজ্জিতা সুগুণাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইল! সুগুণার শ্যাম রূপটি তাহার সমগ্র চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সেই স্বপ্নের কথা! এই ত' বুইক সিকস্! আর তাহার মানসী সুন্দরী যিনি—তিনিও ত' এই গাড়ীর মধ্যেই রহিয়াছেন। ঠিক লেকের ধার না হইলেও লেক্ রোডের ঠিকানাই ত। তা লেক্ আর লেক্ রোড্, একই কথা! স্বপ্ন ত' প্রায় এ পর্য্যন্ত মিলিয়াছে। তবে—বাকিটুকু—সেই মিলন পর্ব্বটুকু বাস্তবে পরিণত হইবে না কি?

আনন্দ দোলায় তাহার মন দুলিয়া উঠিল—এই বনদেবীই বুঝি সেই যুগ-যুগান্তরের প্রিয়া—আজ মূর্ত্তি ধরিয়া ধরা দিতে আসিয়াছে! অপলক নেত্রে প্রদীপ তাহার 'প্রিয়াকে' দেখিতে লাগিল।

প্রদীপকে নীরব নিশ্চল দেখিয়া সুগুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"চলুন না একটু আমাদের সঙ্গে—আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি—যদি যান ত' বড় সুখী হব।"

প্রদীপ শুধু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

"অরুণ—গাড়ীর দরজাটা খুলে দাও না, ভাই। ওঁকে আসতে দাও। আপনি উঠুন না—রাত সাড়ে দশটা বাজে যে—নিরুপায়, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি।—আমাদের পৌছে দিন—তার পর আপনি যেখানে যেতে চান—আমাদের বাড়ীর গাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাবে—এ সাহায্যটুকু করবেন না?"

সেবার ছোট ভাই অরুণ,—গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "আসুন না মশাই—মুস্কিলে পড়েছি—এ দিকে কখনও আমি আসিনি—তাই কিছু চিনি না।"

প্রদীপ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল—বলিল—"চলুন।"

অরুণ বলিল, "কোন্ দিকে যাব—সোজা?"

তাই ত! যাইবে কোন দিকে? এটর্ণি এস, সি, দের নামও ত' কোন দিন সে শোনে নাই—বাড়ী জানা ত' দূরের কথা। এখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, চিনি না, এ কথা সে কি করিয়া বলে! এ কি করিল সে! আর ত' ফিরিবার উপায় নাই—বলিল—"সোজা চলুন।"

তবে রাস্তায় যদি কাহাকেও দেখিতে পায়, তাহা হইলেই পরিত্রাণ!—গাড়ী থামাইয়া খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে।

গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়াছে—প্রায় এক মাইল রাস্তা পিছনে ফেলিবার পর গাড়ী আর একটি রাস্তায় পড়িল—এ রাস্তায় গ্যাসের আলো—পথ অপেক্ষাকৃত অন্ধকার।

এ দিকে গাড়ীর পশ্চাতের সিটে মঙ্গলিকা নাম্নী সখীটি 'জয়া' নাম্নী আর একটি সখীকে অস্ফুট স্বরে বলিল—"ভাই,

আমার বড় ভয় করছে, এত রাত হ'ল—কেউ কোথাও নেই—লোকটা যদি বদমাস হয় ?"

জয়া বলিল—"দূর, তা কেন হবে—দেখছিস না ভদ্রলোকের ছেলে ?"

"না ভাই, আজকাল শুনেছি, গুণ্ডারা ভদ্রলোকের মত কাপড়-চোপড় প'রে বেড়ায়—লোকে তাদের বিশ্বাস করে। আর দেখলি না, সুগুণাদি' যখন ওকে গাড়ীতে উঠতে বলছিলেন—ও কি রকম ক'রে আমাদের দেখছিল ? যেন গিলে ফেলে আর কি ! ওর চেহারাটা দেখেছিস ত' ?"

সেবা সব কথা শুনিতেছিল—বলিল, "তা হতেও পারে কিন্তু, আমরা এত গয়না প'রে সেজে গুজে আ'ছ—সুগুণা—এই লোকটাকে কিন্তু মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার !" সুগুণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার মনেও একটা খটকা লাগিয়াছে—তাহাদের বাড়ী যাইতে ত কোন দিন এত সময় লাগে না ! তাহাদের বাড়ী এত দূরেও ত' নহে ! তাহারা যাইতেছে কোথায় ? কিন্তু বলিল, "না—এমনি ভদ্রলোকের ছেলে। আমরা বোধ হয় অনেক দূরে চ'লে এসেছিলাম, তাই যেতে দেরী হচ্ছে। আর গুণ্ডা হলেই বা কি ! আমরা এতগুলি—অরুণও আছে, ও ত' একা—আমাদের করবে কি ?"

"হ্যাঁ—'আমরা' ত' ভারী বীর—কটি মেয়ে—গুণ্ডার নাম শুনলেই মূর্চ্ছা যাই !—আর অরুণ—ও ত' ছেলেমানুষ ! তুই কি মনে করিস, ও যদি গুণ্ডা হয়, তবে ও একা ?—কখখনো নয়—ওর দলের লোক নিশ্চয়ই কোথাও তৈরী হয়ে আছে।"

সুগুণা শঙ্কিত হইলেও—জোর করিয়া বলিল, "যাঃ ! তোরা যা ভাবছিস—সব বাজে। তোরা খালি ছ' পেনী সিরিজের ডিটেক্টিভ্ নভেল গিলিস্—তাই যাকে তাকে খুনী—গুণ্ডা এই সব ভাবিস !"

মেয়েরা কিন্তু প্রবোধ মানিল না। তাহাদের বক্ষোদেশ শঙ্কায় কম্পিত হইতে লাগিল।

গাড়ীখানা একটা চৌরাস্তায় আসিয়া পৌছিল—অরুণ বলিল—"কোন্ দিকে যাব ?"

সেই মাঘের দুরন্ত শীতেও প্রদীপ ঘামিয়া উঠিল। কোনমতে সে বলিল—"ডান দিকে।"

অরুণ ক্লাচ ছাড়িয়া এক্সিলারেটর চাপিয়া ধরিল—ছয় সিলিণ্ডার গাড়ী ডানদিকের অন্ধকারাবৃত ঢাকুরিয়া রোড দিয়া ছুটিতে লাগিল। মেয়েদের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

সুগুণার মনে হইল, এ সব রাস্তা সে কখনও দেখে নাই।—আর তাহারা যে নগর ছাড়িয়া পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, এ রাস্তায় একটিও আলোকস্তম্ভ নাই।—নাঃ,একটা গুণ্ডাই তাহাদের সঙ্গ লইয়াছে। বিষম শঙ্কার কথা ! প্রথম হইতেই লোকটার চালচলন সন্দেহজনক। তার পর 'লেক রোড' চিনি বলিয়া তাহাদিগকে অন্ততঃ চারি পাঁচ মাইল দূরে অন্ধকার প্রান্তরে কোথায় আনিয়াছে ? তাহাদের সঙ্গেও বিস্তর অলঙ্কার—সাধের চুড়ী ব্রেসলেট ! এগুলি যদি ছুরা দেখাইয়া চাহিয়া বসে ? সবই দিতে হইবে না কি ?—মা গো ! কণ্ঠ ঠেলিয়া তাহার কান্না আসিতে চাহিল।

সহসা একটা ভয়ানক কথা তাহার মনে পড়িল, তাহারা সকলেই তরুণী, সুন্দরী—তাহার উপর এই অপরূপ সাজে সজ্জিতা। না জানি তাহারা এই দানবের কাছে কত লোভনীয়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে !

তবে—তবে উপায় ? এ রকম নারীহরণের কথা প্রায়ই ত কাগজে দেখা যায় ! হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

সাঁ সাঁ করিয়া ক্রুবিলী বুইক্ ছুটিতেছে।—পথ উন্মুক্ত বাধাবন্ধবিহীন। স্পিডো-মিটারের কাঁটা একসট্টির ঘরে দুলিতেছে। অরুণ তাহার ড্রাইভিং নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ, বিশেষতঃ শ্রেয় নারীজাতির সম্মুখে—সে ছাড়িবার পাত্র নহে। সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ তুলিবার এই ত' সুযোগ। রাস্তার দুই দিকে অন্ধকার যেন প্রাচীর তুলিয়াছে—বড় গাছগুলিও সেই অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে।

প্রদীপের মনের অবস্থাও অবর্ণনীয় ! সে যে কোথায় ছুটিয়াছে—ভগবান্ জানেন। এ পল্লীতে সে কোনও দিন আসে নাই, গায়ের পাঞ্জাবী ঘামে ভিজিয়া গেল—এই তরুণীদিগকে কি কৈফিয়ৎ সে দিবে। না জানি, ইহারা তাহাকে কি ভাবিতেছে—মাতাল বা পাগল। হরি হে, এ কি করিলে তুমি !

মেয়েরা নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ—'মঞ্জুলিকা' সেবার হাতখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—'জয়া' সুগুণাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিল ! একটা কিছু যে এখনই করা উচিত, তাহা সকলেই বুঝিল—কিন্তু কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি নাই !

হঠাৎ হেড্ লাইটের সুতীব্র আলোকচ্ছটায় দেখা গেল—দূরে রাস্তার উপর অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া। মা গো!—তাহাদের হাতে বাঁশ এবং অন্যান্য ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র। মেয়েদের মাথার চুল খাড়া হইল—সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল! আর রক্ষা নাই—এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাহারা এতক্ষণে ডাকাতের হাতে পরিচালিত হইয়া আসিল!—দুই দিকে জনহীন প্রান্তর—চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও কেহ শুনিতে পাইবে না!

শঙ্কাকুল কণ্ঠে সুগুণা বলিল—"অরুণ, এক্ষুণি গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চল—এক্ষুণি ঘোরাও!"

সুগুণার চীৎকারে অরুণ থতমত খাইয়া 'দোর হুইল' ব্রেক কসিয়া ধরিল। গাড়ী 'ঘস্—ঘস্' করিয়া উঠিল—তার পর থামিয়া গেল।

"অরুণ—ষ্টার্টিং হ্যাণ্ডলটা দাও—শীগ্‌গির দাও।"

বিনা বাক্যব্যয়ে অরুণ সুগুণাকে হ্যাণ্ডল দিল।

সকলে ভয়ে—বিস্ময়ে নির্ব্বাক!

"নাম—নাম—নাম—তুমি! এক্ষুণি নাম, হতভাগা গুণ্ডা কাথাকার—নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব—নাম এক্ষুণি—"

সুগুণা অস্থির হইয়া উঠিল। দলের গুণ্ডারা বুঝি আসিয়া পড়ে! সে নিজেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিল, "ভাবছ মেয়েমানুষ—তোমায় মারব না—না? এই হাণ্ডেলের এক ঘায়ে তোমায় রক্তগঙ্গা কোরে দেব এক্ষুণি—নাম—পাজী গুণ্ডা কাথাকার!"

মন্ত্রচালিতের মত প্রদীপ গাড়ী হইতে নামিয়া অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়াইল। কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ওগো—এ কি নিদারুণ ভুল বুঝিলে তুমি—এ কি মর্মান্তিক অভিযোগ! আমি যে তোমার পরম হিতৈষী—যুগযুগান্তর হইতেই যে তোমায় আমায় চেনা-শোনা। এ কি ছলনা!

যে কথা বুকে গুমরিয়া উঠিল—দারুণ অভিমানে তাহা মুখে ফুটিল না!

একরাশ ধূলা উড়াইয়া জুবিলি বুইক যে পথ দিয়া আসিয়াছিল—সেই পথ দিয়া ফিরিয়া গেল!

সেবা বলিল—"ধন্যি মেয়ে তুই সুগুণা—ধন্যি তোর উপস্থিত বুদ্ধি!"

'মঞ্জুলিকা' বলিল, "ভাগ্যি সুগুণা-দি' ছিলে তুমি—নইলে—মা গো—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!"

গাড়ীর কুশানে মাথাটা এলাইয়া দিয়া সুগুণা চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল।

মায়া-বালারা মায়াতেই মিলাইল!

* * * *

সেই অন্ধকার রাত্রিতে স্তম্ভিত—বজ্রাহত প্রদীপ কি করিয়া যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকালে পটলডাঙ্গার 'গ্রাণ্ড লজে' ফিরিয়া আসিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রায় সিকি মাইল হাঁটিয়া যাওয়ার পর কতকগুলি ই, বি, রেলের পার্মানেণ্ট ওয়ে বিভাগের কুলীর সঙ্গে তাহার দেখা হয়—তাহারা সাবল ইত্যাদি লইয়া বজবজ সেকসন লাইন মেরামত করিতে চলিয়াছিল।

সকালে উৎপল বলিল, "কি হে, সারারাত কার নিকুঞ্জে কাটিয়ে এলে? সত্যযুগের প্রিয়া?—স্বপ্ন বুঝি তা হ'লে সার্থক হয়েছে?"

বিরস মুখে প্রদীপ চুপ করিয়া রহিল।

গোপেশ্বর বাবু চায়ের বাটিতে সজোরে চুমুক দিয়া বলিলেন, "ছাঃ মশাই, স্বপ্ন আবার না কি সফল হয়—আপনিও পাগল হয়েছেন।"

চটিয়া উঠিয়া শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "আপনারা ঘোর নাস্তিক—ধর্ম্মে আপনাদের বিশ্বাস নাই—রৌরবেও স্থান হবে না যে!"

এবার প্রদীপ বলিল—"আপনার হবে ত'? আপনাকে রৌরব নরকে দেখলেই আমরা সুখী হব—আমাদের জন্য আর নাই বা মন খারাপ করলেন?"

উৎপল বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রদীপ, হঠাৎ ভক্তি চটল কেন?—ব্যাপার কি?"

"হাঁ হাঁ, ব্যাপার কি?"—সবাই চাপিয়া ধরিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন? স্বপ্ন সফল হবেই হবে।"

"ছাই হয়েছে!"—কোন রকমে সমস্ত ঘটনা প্রদীপ খুলিয়া বলিল।

উল্লসিত হইয়া শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "কি মশায়, বড় যে বলছিলেন স্বপ্ন সফল হয় নি?"

"কৈ হ'ল ? আমার মাথাটি ফাটতে শুধু বাকি ছিল ! বিস্তর কষ্ট কপালে লেখা ছিল—কাল যা ভুগেছি—বাপ্ !"

"সেটা হ'ল গিয়ে আপনার অন্য কারণে—কার্য্য-কারণে একটা সম্বন্ধ আছে বৈ কি ! নইলে যে জগৎ মিথ্যে !"

তাহার পর এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন, "হুঁ—গোড়াতেই ভুল হয়েছে—আপনার হাতটা কখনই বুকের ওপর ছিল না। আপনি তখন স্বপ্ন দেখছিলেন,—কি কোরে বল্লেন, 'হাতটা বুকের ওপর রেখেছিলাম ?' স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেউ আবার বলতে পারে নাকি, হাতটা কোথায় ছিল ?—বিশেষতঃ ডান হাত ? হাত আপনার বিছানাতেই ছিল—তবে ডান পাশে—তাতে সন্দেহ নাই—তাই ত' বিপরীত ফল হয়েছে—কিন্তু গণনা অভ্রান্ত !"

হায় রে হাত !

বুক এবং বিছানাটুকু ব্যবধানের জন্য এমন একটি উৎকৃষ্ট স্বপ্ন—স্বপ্নই রহিয়া গেল !

শ্রীঅতুলপ্রসাদ চন্দ।

ছায়া-চিত্র

নিদ্রাহীন আজি এই নিশীথ-শয়নে,
নেবা দীপ অন্ধকারে, এ মোর নয়নে
বারবার আসে, জল আসে !
উচ্ছ্বসিয়া দীর্ঘশ্বাসে উঠে সারা বুক ;
বুক-ভরা দুখ
বুক ফেটে মরে যে ব্যথায়—
সঙ্গিহীন স্তব্ধতায়,
চোখ বুজে মুখ চেপে চুপ ক'রে কাঁদে
আমার এ অন্তরের একান্ত ব্যর্থতা—
তর্জ্জনীর তলে তার ঠোঁট-কাঁপা কথা
মূর্চ্ছিত গভীর বিষাদে।

কত কথা মনে পড়ে,
হারানো দিনের ব্যথা, কত পুরাতনী,
জেগে উঠে কত ভোলা অতীত স্মরণী,
কত দিন, কত রাত্রি—পরে, পরে, পরে,
থরে-থরে মোর কল্পনায়,
কত সুখে, কত দুখে হায় !

কবে এল আমার শৈশব বিচিত্র বৈভব
লয়ে তার,—মুঠি-ভরা প্রত্যুষের ঝরে'-পড়া শেফালি-বকুল,
পায়ে তার পথে-চলা ধূল,
ক্রীড়া-শীল—কৌতুক-চঞ্চল—
ওষ্ঠে নবস্ফুট, শতদল,
প্রাণে বাজে 'ভৈরবী'র বাঁশী মুখর উদাসী,
মুখে মধু মাতৃ-স্তন্য-গন্ধ,
বুক-ভরা সরল আনন্দ !—
আঁখি মাগি' উদয়-আলোকে
ধেয়ে চলে শিশু-সাথী সাথে
লঘু পদ-পাতে
পথে পথে অশ্রান্ত পুলকে ;
গাছে উঠে ফল পাড়ে,
কুসুম কুড়ায়,
বালি নিয়ে খেলা করে নদীটির ধারে,
জলে প'ড়ে সাঁতারিয়া যায় !—
চিন্তাহীন অমল অন্তর,
কোথা গেল সে আমার শৈশব সুন্দর !

তার পর, আমার যৌবন—
অপূর্ব্ব জীবন,
অপরূপ স্বপন লয়ে তার কবে এসে খুলিল দুয়ার,
গোলাপের মালা দোলে গলে,
চোখে জ্বলে বাসনা-বিলাস, মুখে মুগ্ধ হাস,
শক্তি-ভরা বাহু দুটি, প্রাণ-ভরা বুক প্রমোদ-উৎসুক,
এক হাতে মিলনের রাখী,
আর হাতে পেয়ালা—কি
রক্তিম সিরাজী দিয়ে ভরা—
সে পেয়ালা হর্ষে নিয়ে মুখে ধরি, হায়,
ভেঙে যায়—হাত কেঁপে পড়িয়া ধূলায় ,
অতৃপ্ত পিয়াসে শুধু মাথা কুটে মরা !

তার পর এল কে সে দীনহীন বেশে
শিরে লিপ্ত শীতের তুষার—শুভ্র কেশরাশি
ক্রন্দনের বাড়া মুখে মৌন ম্লান হাসি,
চিন্তা-রাশি কুঞ্চিত ললাট, শুষ্ক কণ্ঠ শুকাইয়া কাঠ,
চক্ষে গাঢ় বিরক্তির রাগ—
প্রাণভরা বিরাগ, হস্তে শূন্য ভগ্ন খাদ্যস্থালী,
বক্ষে ক্ষুধা, কপোলে অশ্রুতে মাখা বেদনার কালী,
শ্রম-ক্লান্ত গা'য়—
কে এল সে, হায় !
নিদ্রাহীন আজি এই নিশীথ-শয়নে
বারবার অশ্রু আসে আমার নয়নে—
উপধান ভাসে ।
ভাবি—হায়, তার পর ?—তার পর কে আসিবে আর ?
আমার সময় বুঝি তার
ধীরে ধীরে হয়ে আসে, আসে—
মোর দীর্ঘশ্বাসে
ডানার কাঁপন তার পাই যে আভাসে ;
টিপ্ টিপ্-করা বুকে আমি যেন কার
শব্দ পাই পা'র !
নেবা-দীপ অন্ধকারে মোর আশে-পাশে
কারা যেন করে কাণাকাণি—ঐ, ঐ, আসে, আসে, আসে !—
আসে,—আসে,—কত দূর আর ?
পার না কি তার বুকে স্থান জুড়াবার—ফুরাবার ?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

৺কেদার-বদরী
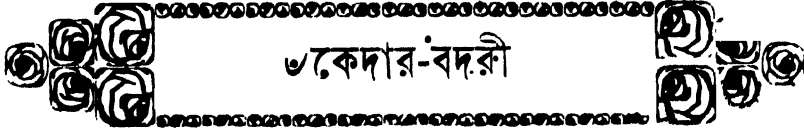
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনগর হইতে হরিদ্বার—৭৬ মাইল

(পুরাতন পথে—নূতন বাহক-স্কন্ধে)

২৭শ দিন—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৩০এ মে, বুধবার

প্রাতঃ ৫টায় শ্রীনগর হইতে রওনা,
১১০টায় রাণীবাগ (১১ মাইল) রাত্রিযাপন।

বৈকাল ৪টায় রাণীবাগ হইতে রওনা,
রাত্রি ৮টায় সৌরীচটী (৩॥০ মাইল) রাত্রিযাপন।

দশহরার গঙ্গাস্নান কার্য্যগতিকে শ্রীনগরে অলকনন্দায় সারিতে হইল। কিন্তু স্নানযাত্রায় তথা গ্রহণ-উপলক্ষে গঙ্গাস্নান হরিদ্বারে করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া পরম উৎসাহে প্রাতঃ ৫টায় 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া শ্রীনগর হইতে,পুরাতন পথে, কিন্তু নূতন বাহক-স্কন্ধে, যাত্রা করা গেল। যাত্রাকালেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল; এবারকার বাহকেরা অস্পৃশ্য জাতি, সে জন্য তাহারা ধর্ম্মশালার ভিতর প্রবেশ করিতে পাইল না; পরন্তু হাতমুখ ধুইবার বা শৌচের প্রয়োজনে ক্যানে যে জল লইয়াছিলাম, তাহা পর্য্যন্ত রতনমণি (৺বদরীনারায়ণের পাণ্ডার গোমস্তা) ফেলিয়া দিল। (শৌচও কি তাহাদের স্পৃষ্ট জলে চলে না ?) এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আন্দোলনের দিনে ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য।

এবারকার বাহকদিগের বেশভূষা পূর্ব্বের বাহকদিগের অপেক্ষা পরিপাটী, ছেঁড়া জামাকাপড় নহে, (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২০ পৃঃ); চাল-চলনও একটু ছিমছাম্, বোধ হয় সহরের উপকণ্ঠে বাস বলিয়া। সহর-ঘেঁষা বলিয়া ইহারা তেমন সুশীল ও সংস্বভাব নহে, সভ্যতার ছোঁয়া লাগিয়া প্রকৃতি একটু বিকৃত। এক স্থানে পাহাড়ী সুন্দরী-দিগকে দেখিয়া ইহারা গান ধরিয়া দিল, সুন্দরীগণ লজ্জায় মুখ এদিক্-ওদিক্ করিতে লাগিল। যদিও গানের এক বর্ণও বুঝিলাম না, তথাপি নারীগণের আচরণে অনুমান করিলাম, গানটি আদিরসাশ্রিত—'টপ্পা' বা পচা খেঁউড়। বাহকগণকে একবার ধমক দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বিদেশে ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। ইহারা খুব দ্রুত চলিত, একেবারে উড়াইয়া লইয়া যাইত (তাহাতে কিন্তু jerking ঝাঁকুনি বেশী লাগিত), এবং ২।১ মাইল অন্তরই দম লইত, সুতরাং দরে-দরে সময় সমানই পড়িয়া যাইত। ইহাদের কাঁধ-বদলের কায়দাটাও একটু অন্য রকমের, তবে তাহা লেখনীর সাহায্যে বুঝান যাইবে না, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্ব্বের বেহারারা লোক সরাইবার জন্য বলিত, 'ভিতর বাছো' 'এক বগল'(কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২০পৃঃ), ইহাদের বুলি 'এক বাজু' (এক দিক্)।

শ্রীনগরের এক মাইল পরেই ইহাদিগের বস্তি; এই পর্য্যন্ত আসিয়াই ইহারা ডাণ্ডী নামাইয়া গৃহাভিমুখে আবার নূতন করিয়া বিদায় লইতে গেল; তবে 'যেতে নাহি দিব'র মত করুণ ব্যাপার ঘটে নাই; কেন না, অল্পসময় পরেই সকলে ফিরিল; কিন্তু এক জন শীঘ্র ফিরিল না। অনেক-ক্ষণ পরে সে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বুড়া বাপও আসিল; বুঝিলাম, অন্নসংস্থানের জন্য যুবক-পুত্রকে গৃহ হইতে প্রবাসে যাইতে দিতে বৃদ্ধ পিতার মনে কতখানি লাগিয়াছে; অথচ ৭।৮ দিনের জন্য ত অদর্শন ঘটিবে। যাহা হউক, পিতা একটু পরে বিষণ্ণবদনে শূন্যপ্রাণে গৃহে ফিরিয়া গেল। এ দৃশ্য, লেখকের পুত্র সারাপথ ধরিয়া সহচর থাকিলেও, হৃদয়ে একটা গভীর ছাপ দিল।

শ্রীনগর হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমি, অলক-নন্দা রাস্তার সহিত প্রায় সমতল অর্থাৎ সমান levelএ, (যদিও সহরের ভিতর অনেক নীচে); রাস্তা বেশ চওড়া, দু'ধারে চাষের জমি; পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের তেমন বাহারও নাই; জংলী সিদ্ধি ও সেজ্ গাছ, কলাবাগান, আমবাগান, (প্রথমে ২।৪টি আমগাছ অগ্রদূত-স্বরূপ), কিন্তু গাছে আম নাই, বোধ হয় অফলা। বেদী-বাঁধান অশ্বত্থ-গাছ, এক স্থানে অশ্বত্থ ও বট পাশাপাশি এক বেদীতে—প্রবেশের সময়ে (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, ২৫৪পৃঃ) ইহা লক্ষ্য করি নাই। আমবাগানে কোকিল ডাকিতেছে, প্রাতঃকালে রমণীয় দৃশ্য ও শ্রাব্য নেত্রশ্রোত্রের তৃপ্তিসাধন করিল। পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে (কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২৪ পৃঃ) বলিয়াছি, প্রথম প্রথম নূতন অপরিচিতের সহিত সংস্পর্শে অভিভূত ও দুর্লভ দেব-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত অস্থিরচিত্ত থাকাতে

প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমন লক্ষ্য করিতে পারি নাই, এক্ষণে সুস্থিরচিত্ত হওয়াতে উপভোগক্ষম ও বিশ্লেষণপটু হইয়াছি, সুতরাং পূর্ব্ব-পরিচিত হইলেও এ সব দৃশ্য এখন যেন নূতন করিয়া চোখে পড়িল। জানি না, বাহ্যপ্রকৃতির, গাছপালার বর্ণনাবাহুল্য দেখিয়া পাঠকবর্গ বিরক্তিবোধ করিবেন কি না। হয় ত লেখকের এই তরুলতাপ্রীতি দেখিয়া কেহ কেহ ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—বৃক্ষচারী শাখামৃগ হইতে মানবের উৎপত্তির কথা স্মরণ করিবেন। যাঁহারা লেখকের 'হাঁড়ীর খবর' রাখেন, তাঁহারা হয় ত বলিয়া বসিবেন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কলেজে যাঁহার বহু বৎসর ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্র, তাঁহার পক্ষে এই গাছপালার প্রতি ঝোঁক হইবারই ত কথা! কিন্তু পাঠকবর্গকে আশ্বাস দিতেছি যে, লেখকের এই প্রীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে. ইহা সহরবাসী পল্লীসন্তানের আবাল্য অভ্যস্ত সংস্কারেরই নূতন বিকাশ। এই ভাবুকতা যদি কাহারও ভাল না লাগে, তাহা হইলে একটু বস্তুতন্ত্রতা দিয়াই কথাটা চাপা দিই—পথের ধারে আশশেওড়া গাছ দেখিয়া কয়েকটি ভাঙ্গিয়া লইলাম, এবং দাঁতনের যতটা না হউক, হারান জিভ-ছোলার অভাব (শ্রাবণ-সংখ্যা ৬৪৭পৃঃ) ২।৪ দিনের জন্য পূরণ করিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে বিল্বকেদার পৌঁছিলাম। এখানেও জমি সমতল, পাহাড় দূরে—তবে পাহাড়ের শ্রী একটু ফিরিয়াছে। আম জাম অশ্বত্থ আমলকী গাছ, খানিক পথ আমগাছের সারগাছি (avenue of trees)। মন্দির ও দেবতার প্রসঙ্গ আর নূতন করিয়া তুলিব না। (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) অলকনন্দা একটু নীচে পড়িয়াছেন। এখান হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে রাস্তা, পাহাড়ে আবার চীরগাছ, রাস্তার পাশেও ২।৪টি। এক স্থানে নীচে বস্তি ও শতরঞ্চির মত বিছান সুন্দর পাইট করা চাষ-জমি। আর এক স্থানে উপরে বস্তি ও আম অশ্বত্থগাছ। পথে এক নারী যায় অবগুণ্ঠে দেখিলাম ('ধায়' নহে, বীরনারীও নহে—হেমচন্দ্রের কবিতা স্মর্ত্তব্য)। এখান হইতে উতরাই নামিয়া রামপুরচটী—বড় অশ্বত্থগাছ; যাইবার সময় এই চটীতে ছিলাম, (অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, ২৫৩পৃঃ), এবার একটু বিশ্রাম করিলাম। ছেলেরাও এখানে জলযোগ করিল। দিল্লীতে একাউন্ট্যান্ট জেনারালের আফিসে চাকুরী করেন, একটি খুলনা জেলার যুবক ৺কেদার-বদরী-অভিমুখে যাইতেছেন—তাঁহার সহিত একটু আলাপ হইল। (এখন বাঙ্গালী যাত্রী খুব কমই যাইতেছে, অন্য প্রদেশের লোকই বেশী)।

রামপুর ছাড়াইয়া উলঙ্গ পাহাড়ের পাশ দিয়া রাস্তা, ডাহিনে আলশে গাঁথা, নীচে গভীর খদ্। খানিক পরে উপরে বস্তি, নীচে আবাদী জমি, ফসল কাটা হইয়াছে। আবার খানিক পথ সারগাছি, ছায়াতরু-স্নিগ্ধ। তাহার পর চড়াই-উতরাই ভাঙ্গিয়া বেলা ৯৷৹টায় রাণীবাগ পৌঁছিলাম এবং এইখানেই আড্ডা লইলাম—এ বেলার মত। এখানেও কলাবাগান দেখিলাম (প্রায় সকল চটীতেই লক্ষ্য করিয়াছি)। সরকারী পূর্ত্তবিভাগের যত্নে দুইটি ঝরণা বাঁধান (তবে রামপুর চটীর মত জলের সুখ নাই), তাহারই একটির পার্শ্বস্থ দোকানে বাসা লইলাম। চটীটি বেশ বড়। মধ্যাহ্নভোজন হইল—ভাত আলুভাতে উচ্ছে-চড়চড়ি ও আলু বেগুন কপি বড়ির নিরামিষ 'ঝালের' ঝোল। পেড়া লাড্ডু জেলাপি কিছুই মিলিল না। এখানে মাছির উৎপাত কম। বিধবাটির অদ্য একাদশী। তবে তিনিই রন্ধন করিলেন। এখানে দুধ পাওয়া গেল না।

বৈকালে ৪টায় রাণীবাগ হইতে রওনা হওয়া গেল। প্রথমে কয়েকটি আমগাছের ছায়া, পরে 'ঠিকা' রৌদ্র। পথের ধারে নদীর পাড়ে মাঝে মাঝে চীরগাছ, জামগাছ, কুলগাছ ও নেড়া আমড়া ? গাছ দেখিলাম। ১ মাইল পরেই মাঠের মাঝে বটচ্ছায়ায় বিশ্রাম করা গেল, বহুলোক বিশ্রাম করিতেছে ও সুশীতল জলে তৃষ্ণা দূর করিতেছে; কেন না, তরুতলে জলসত্র ('পিয়াও') রহিয়াছে।

এখানে আসিয়াই কিন্তু একটি ব্যাপার দেখিয়া চক্ষুঃস্থির হইল। দেখিলাম, ঘোড়ার পিঠের মালপত্র সব খুলিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে, ও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। একটি কথা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়াছি। বিল্বকেদারে পৌঁছিয়া শ্রীনগরের ঘোড়াওয়ালা অন্য এক জন ঘোড়াওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমাদের সহিত চুক্তির টাকার উপর কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া সরিয়া পড়িল। এই জন্যই পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বলিয়াছি, এ অঞ্চলের লোক (shrewd at driving a hard bargain) দরদস্তুর করিতে একেবারে ঝুনো (চৈত্র সংখ্যা, ৮৭৭ পৃঃ,। নূতন ঘোড়াওয়ালার ঘোড়াটি বড়সড়, তাহার ভাষায় 'ডবল ঘোড়া', আগের ঘোড়াটি ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়—গাধার মত। সে কতক মাল ঘোড়ার পিঠে ও কতক নিজের পিঠে চাপাইয়া ঘোড়ার

সহিত একটা রফা-বন্দোবস্ত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ঘোটকরাজ বোধ হয় গররাজি ছিলেন। তাই এই বিভ্রাট্। ষ্টিভ্‌ন্‌সনের "Travels with a Donkey"-নামক সরস ভ্রমণবৃত্তান্তে গর্দ্দভীপৃষ্ঠে মাল বোঝাই করিয়া বার বার তিনবার মালপত্র ছড়াইয়া পড়াতে তিনি কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, সেই নাকালের বিবরণটা খুব উপভোগ করিয়াছিলাম এবং মনে মনে তাঁহাকেও দ্বিতীয় গর্দ্দভ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম! তখন জানিতাম না যে, বিধাতা পুরুষ অদৃশ্যে আমার হাসি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। তবে এই আশ্বাস যে, আমার বেলায় 'মেমসাহেবকা মাফিক গাধা নহে',—'ডবল ঘোড়া'; আর মালপত্র নূতন করিয়া গুছাইবার ও নিজের স্কন্ধে অর্দ্ধেক বোঝা বহার হাঙ্গামা সাহেবপুঙ্গবের মত আমাকে পোহাইতে হয় নাই। * যাহা হউক, ঘোড়াওয়ালা আবার নূতন করিয়া মালপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া লইল।

আবার এক মাইল গিয়া দম লওয়া গেল। রৌদ্রে বটতলায় এবারও আশ্রয় পাওয়া গেল। এখানে উলঙ্গ পাহাড় ও পাশে আলশে গাঁথা, নীচে গভীর খদ্। এইখানে আমার ডাণ্ডীর চামড়া ছিঁড়িয়া 'পপাত ধরণীতলে', কি ভাগ্যে চোট লাগে নাই, গড়াইয়া খদেও পড়ি নাই। দয়াময়ের লীলা! প্রত্যুৎপন্নমতি বাহকেরা তখনই দড়ী দিয়া সে জায়গাটা বাঁধিয়া কাযচলা-গোছ করিয়া লইল। দুর্ব্বল শরীরে হাঁটিতে হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সে আশঙ্কা দূর হইল। সবই নারায়ণের কৃপা। আর এক মাইল গিয়া বেহারারা আবার দম লইল। এখানে ঝরণা হইতে সরুধারে জল পড়িতেছে, পুল পার হইয়া চটীতে সকলে মিলিত হইলাম। জংলী গাছে শাদা ফুল ও হলদে ফুল (সোঁদাল) ফুটিয়া আছে। চতুর্থ মাইলে বেহারারা দম লইল না, পঞ্চম মাইলে লইল। এখানে নদীর ধারে গাছ সতেজ, পাহাড়ের গায়ে তাজা ও রোদে পোড়া দুই রকম গাছই আছে। ঢালু পাহাড়ের ধারে চাষ-জমি, ও ২।১ ঘর লোকের বসতি। স্থানটির নাম আনন্দচটী—সার্থকনামা। কদলীবন, বটবৃক্ষযুগল, অশ্বত্থবৃক্ষযুগল স্থানটিকে সুস্নিগ্ধ সুন্দর করিয়াছে। ৺সত্যনারায়ণের মন্দির রহিয়াছে, মন্দিরচত্বরে আমগাছ, কাঁঠালগাছ, লিচুগাছ প্রভৃতির বাগিচা, তথা মল্লিকা-ফুলগাছ। যেন একটি উদ্যানবাটিকা। দেবদর্শনান্তে সুশীতল জল পূজারীর নিকট চাহিয়া খাইলাম।

দুই মাইল পরে কলাবাগান, আমগাছ, পেঁপেগাছ, কলিকা-ফলের গাছ। ক্রমে দেবপ্রয়াগের নিকটবর্ত্তী হওয়া গেল; এখানেও অনেক আমগাছ ও বটগাছ নদীর ধারে; রীতিমত আমবাগানও দেখিলাম। এবার আর দেবপ্রয়াগে থাকা হইল না, নদী অনেক নীচে বলিয়া রাত্রিকালে জল সংগ্রহ করা অসুবিধা। এখানে বাসা পাওয়াও কঠিন। ফিরতির মুখে আর ত পাণ্ডাজীর কাছে খাতির পাওয়া যাইবে না, আর তিনি অনুপস্থিত। (৺বদরীধাম হইতে আমাদের ফিরিবার সময় তিনি উক্তধামে যাইতেছেন। চৈত্র-সংখ্যা, ৮৬৫ পৃঃ।) এখানে বেহারারা অনেকক্ষণ দম লইল—আর চলিবার বড় মন নহে। সুতরাং 'গয়ংগচ্ছ' করিতে করিতে বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেল। অন্ধকারে সঙ্গমস্থল অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। যাহা হউক, আর একবার বেহারারা কাঁধে তুলিল এবং হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল। এই অল্প পথেও মাঝে মাঝে চড়াই উতরাই ছিল। সৌরীচটী পৌঁছিবার একটু আগে বড় বটগাছ ও আমগাছ, পরে আমবাগান।

রাত্রি আটটায় সৌরীচটীতে পৌঁছিয়া দেখা গেল, সেখানেও আমবাগান; কাছেই ঝরণা, গঙ্গাও নিকট। যে একতলায় বাসা

* And at last, saddle and all, the whole hypothec turned round and grovelled in the dust below the donkey's belly. She, none better pleased, incontinently drew up and seemed to smile; and a party of one man, two women, and two children came up, and standing round me in a half-circle encouraged her by their example. I had the devil's own trouble to get the thing righted, and the instant I had done so, without hesitation, it toppled and fell down again on the other side....I must take the following items for my own share of the portage: a cane, a quart flask, a pilot-jacket heavily weighted in the pockets, two pounds of blackbread, and an open basket full of meats and bottles. I believe I may say I am not devoid of greatness of soul; for I did not recoil from this infamous burden. (Chapter 2) (পহেলা কিস্তি।) Suddenly in the midst of my toil, the load once more bit the dust, and as by enchantment, all the cords were simultaneously loosened, and the roads scattered with my dear possessions. The packing was to begin again from the beginning. (Chapter 2.) (দোসরা কিস্তি।) I saw the fable rapidly approaching, when I should have to carry *Modestine*. Aesop was the man to know the world! (Chapter 5.) (তেসরা কিস্তি।) (*Modestine* গর্দ্দভীরত্নের ষ্টিভ্‌ন্‌সন্-প্রদত্ত নাম)।

লওয়া হইল, শুনিলাম সেটি ধর্ম্মশালা, অথচ ৫ জনের বেশী লোক ধরে না। (অযোধ্যাবাসী এক ব্রাহ্মণও পূর্ব্ব হইতে সেই-খানে বাসা লইয়াছিলেন। রাত্রিকালে তাঁহার একাদশীর আহার হইল—দুধ-সুজীর পায়স।) এ বেলা দুধ পাওয়া গেল—।৵০ সের। আমাদের অনেক দিনের সাধ ছিল, পাণ্ডার গোমস্তার হাতের তৈয়ারি রুটি-তরকারী খাওয়া, সে সাধ আজ পূর্ণ করা গেল। তবে আটা খারাপ বলিয়া রুটী তেমন ভাল হয় নাই। ছেলেরা দেবপ্রয়াগ হইতে পেড়া কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহাতে রুটীর ত্রুটি কাটিয়া গেল। অনেক রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া ছাট লাগিয়া কিছু অসুবিধা হইয়াছিল (তবে ছাঁদ দিয়া জল পড়ে নাই)। পরে একটু গুমটও হইয়াছিল। ২।১টি মশা দেখা দিয়াছিল (আর কোথাও মশা দেখি নাই)।

২৮-শ দিন—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১এ মে, বৃহস্পতিবার

প্রাতঃ ৫॥০টায় সৌরীচটী হইতে রওনা,
১০॥০টায় কাণ্ডীচটী (১১॥০ মাইল)—মধ্যাহ্নযাপন।

বৈকালে ৪টায় কাণ্ডীচটী হইতে রওনা,
রাত্রি ৮।০টায় বন্দরভেল (১০ মাইল)—রাত্রিযাপন।

পূর্ব্বদিন আমার ডাণ্ডীর চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, বেহারারা তখনকার মত দড়ী দিয়া বাঁধিয়া কাযচলা-গোছ করিয়া লইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালে রওনা হইবার পূর্ব্বে চটীতে চড়াদরে (চারি আনায়) দড়ী কিনিয়া লইয়া বেশ মজবুত করিয়া বাঁধিয়া লইল। এ নিরামিষ দেশে চামড়া মিলিবে কোথায় ? সুতরাং চামড়ার অনুকল্পে দড়ী। দড়ীর বদলে যে লতা বা সোটা দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় নাই, এই যথেষ্ট। প্রাতঃ ৫॥০টায় রওনা হইলাম। দু'ধারে খানিক দূর জংলীগাছ, পরে উলঙ্গ পাহাড়, খদের পাশে আলশে গাঁথা। পথে ২।১টা ঝরণা আছে, কুলগাছ ও ছোট বটগাছ, পরে পাহাড়ে বড় বটগাছ। ১॥০ মাইল পরে ওপারে বস্তি ও কলাবাগান, স্তরে স্তরে চাষ-জমি, ফসল হইয়াছে। উমরাসু চটীতে বেহারারা দম লইল; ছেলেরা জলযোগ করিয়া লইল; চটীটি বেশ বড়, বট অশ্বত্থ ও আমগাছ অনেকগুলি আছে; গঙ্গা নিকটে; সরকারী পূর্ত্তবিভাগ-কর্ত্তৃক বাঁধান একটি বড় ঝরণা আছে; আর একটি হইতে সরুধারে জল পড়িতেছে। আবার দু'ধারে জংলী গাছ, ছোট মাঝারী বেল-গাছ একেবারে নেড়া, কিন্তু ছোট ছোট শ্রীফল ঝুলিতেছে। পরে আবার উলঙ্গ পাহাড়। ফলতঃ দুই মাইল ধরিয়া একরূপ দৃশ্য নহে—মাইলে মাইলে বৈচিত্র্য।

চতুর্থ মাইলে ছাণ্ডোরি চটী; এখানে বেহারারা ২য় বার দম লইল; এখানে চড়াই উতরাই আছে। জংলীগাছে শাদা শাদা ফুল, বন্য হইলেও শোভা আছে, যেন শিবের মাথায় ধুতুরা। এখানে বেশ জঙ্গল, শাদা ও মুখপোড়া দুই প্রকার বানর দেখিলাম। আরও দুই মাইল পরে রামঘাট, বিস্তৃত কলাবাগান এবং অশ্বত্থ আম ও লেবুগাছ। এখানে ২টি ঝরণা আছে। আরও দুই মাইল পরে পাকা পুল পার হইয়া ব্যাসঘাট। ব্যাসগঙ্গার সবুজ জল ও গঙ্গার ঘোলা জলের সঙ্গম বেশ সুস্পষ্ট দেখা গেল। যাইবার সময় এই চটীতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম; এবার চটী ছাড়াইয়া অল্পক্ষণ দম লওয়া হইল। বেহারারা ইহার পূর্ব্বেই এক স্থানে দম লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সর্দ্দারগোছের এক জন বেহারা দম লইতে দেয় নাই। যাইবার সময় এইখানে গৃহিণীর গায়ের কাপড় ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছিল (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৬ পৃঃ); ছেলেরা দোকানার কাছে খোঁজ লইয়া কোনও হদিশ পাইল না। প্রায় সব চটীতেই অশ্বত্থ ও আম-গাছ দেখিয়াছি, এখানে দেখিলাম না। ব্যাসঘাটের নিকট গরুর পাল ও ছাগলের পাল যাইতেছে, গরুগুলি অধরকান্তি নহে, ছাগলও লোমশ নহে, পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুরও ছিল।

ঝুলান সাঁকো ছাড়াইয়াও ব্যাসগঙ্গা খানিক সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এখান হইতে চড়াই খুব। সুতরাং খানিক পরে আবার বেহারারা দম লইল; তাহার মাইল খানেক পরে আবার; রওনা হইয়া অবধি দশ মাইল পথে ৫ বার দম লইল! গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। দু'ধারে বড় বড় আম-গাছ; 'চোখ গেল' পাখীর ডাক শুনিলাম। চড়াইএর পর উতরাই অনেকখানি। তাহার পর বেলা ১০টায় কাণ্ডীচটী পৌছান গেল ও এইখানেই এবেলার মত স্থিতি হইল। নীচে আবাদ, কলাবাগান ও আমগাছ। এখানে একটি ছোট ও একটি প্রকাণ্ড ঝরণা, বড়টির সম্মুখেই দোতলা ঘরে বাসা লওয়া গেল। স্নানের খুব সুখ, আর বিশেষ ঠাণ্ডা না থাকাতে আরামে স্নান করা গেল, তবে এবার আর গতবারের মত (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৯ পৃঃ ও কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২৫ পৃঃ) উপরে উঠিয়া নীচের জল নোংরা (contaminate) করা গেল না—কেহ কেহ নিষেধ করাতে। যথারীতি রন্ধন-ভোজন

হইল, এখানে মাছি কম। যদিও ব্যাসঘাট ছাড়াইয়া চটীর সীমানার বাহিরে একবার নিরিবিলিতে শৌচে গিয়াছিলাম, তথাপি বরাবরকার বদ অভ্যাসবশতঃ আহারের পর আবার যাইতে হইল ও 'ভাঙ্গী' (মেথরের) তাড়া খাইতে হইল। আমিও তাহার তর্জ্জনের উপর এক পর্দ্দা চড়াইয়া গর্জ্জন করিলাম—'আমার কায আমি করিয়াছি, তোমার কায তুমি করিবে !'

বৈকালে ৪টায় রওনা হওয়া গেল। গঙ্গা দূরে অদৃশ্য হইলেন। চটীর শেষ অংশে ৪।৫টা অশ্বত্থগাছ ও পরে ২টা ছোট ছোট আমগাছ। ১ মাইল গিয়া দেখিলাম, একটি চটী ছিল, এক্ষণে পরিত্যক্ত, সরকারী পূর্ত্তবিভাগের প্রস্তুত একটি ঝরণার পাইপ হইতে ক্ষীণধারায় জল ঝরিতেছে। তথাপি স্থানটি উর্ব্বর; আমগাছ, নীচে কলাবাগান, দু'ধারে জংলী গাছ, পথ ছায়া-শীতল, মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। এ পথেও পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় শুকনা নেড়া বেলগাছে শ্রীফল ঝুলিতেছে এবং জংলী গাছে শাদা ফুল ও হলদে ফুল ফুটিয়াছে দেখিলাম। দুই মাইল চলিয়া বেহারারা দম লইল। এখানে শ্যামল বা সাস্তালু চটী, বাঁধান ঝরণা আছে, কিন্তু জল রৌদ্রতপ্ত। যাহা হউক, পার্ব্বত্য পথের একটি বাঁকে ভাঙ্গা পাহাড়ের পাশে ঝরণার সুশীতল জল পাওয়া গেল; এই ছায়া-স্নিগ্ধ স্থানটি যেন মরুভূমির মধ্যে মরুনন্দন (oasis), মৃত্যুর মধ্যে জীবন। এখানেও ছোট ছোট জংলীগাছে শাদা শাদা ফুল ফুটিয়া আছে। পথে স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে স্বভাবজ কুলুঙ্গীতে ৺গরুড়-ভগবানের বিগ্রহ—আধলা পাই পয়সা ভেট পড়িতেছে। দুই মাইল পরে বেহারারা আবার দম লইল, এখানে কালী-কমলীওয়ালীর ('পিয়াও') জলসত্র আছে, ঠাণ্ডা জল বিতরণ করিতেছে।

গঙ্গা আবার দক্ষিণে দর্শন দিলেন। পথ খুব চড়াই উতরাই; ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড়—যেন মাথার উপর পড়িতেছে, বারান্দার মত ঝুলিয়া ঝুঁকিয়া আছে, অপর পার্শ্বে খদের উপর আলসে গাঁথা। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, বালক যেমন মাটীর পুতুল বা বালির ঘর খেয়াল-মত গড়ে ও ভাঙ্গে, বিধাতাপুরুষও যেন পাহাড় লইয়া সেইরূপ লীলা করিতেছেন। কাণ্ডীচটীর ৭ মাইল দূরে মহাদেবচটী। এখানে খুব চড়াই। তথাপি বেহারারা অবলীলাক্রমে ডাণ্ডী কাঁধে করিয়া দ্রুতবেগে স্থানটি অতিক্রম করিল, পরন্তু ('short cut') পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য বিষম চড়াই ভাঙ্গিয়া ডাণ্ডী নামাইল। বলা বাহুল্য, এবার বেশ খানিকটা দম লইল। গঙ্গা এখানে খুব নিকটে, ঝরণাও আছে। যাইবার সময় একটি টিলায় স্থাপিত মহাদেবের ক্ষুদ্র মন্দিরে গিয়াছিলাম, এবার আর যাওয়া হইল না। এখানে অনেকগুলি আমগাছ ও পরে অশ্বত্থগাছ আছে; আরও পরে খুব বড় একটি আমগাছ, পরে চারাগাছ, কোনও গাছেই কিন্তু আম নাই। আবার বেশ জঙ্গল। এক স্থানে রাস্তা মেরামত হইতেছে; রাস্তাটি সঙ্কীর্ণ, অথচ সেখান দিয়া মহিষ, মানুষ, অশ্বারোহী, পদাতিক, ডাণ্ডী-কাণ্ডী, সব একসঙ্গে পার হইতেছে। এক মাইল পরে বেহারারা আবার (চতুর্থবার) দম লইল। আর দুই মাইল পথ খুব চড়াই উতরাই, বিশেষ বন্দরভেলের কাছে ৩।৪ স্থানে আখোলা পাথরের উপর দিয়া পদে পদে বাধা পাইয়া চলিতে হইল, তাহার উপর অন্ধকারে চলিতে বিশেষ অসুবিধা হইল। যাহা হউক, বহুকষ্টে বেহারারা রাত্রি ৮॥০টায় বন্দরভেলে পৌঁছাইয়া দিল। (ছেলেরা অবশ্য আগে পৌঁছিয়াছিল)। গঙ্গার ধারে (পূর্ব্ববারের মত) একটি একতালা দোকানে বাসা লওয়া গেল। যথারীতি 'পুরী'-তরকারী বানান হইল। দুধও মিলিল। আহারান্তে নিদ্রা।

২৯শ দিন—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন, শুক্রবার

শেষরাত্রি ৪।০টায় বন্দরভেল হইতে রওনা,
বেলা ৯॥০টায় মোহনচটী (৯ মাইল) মধ্যাহ্নযাপন।
বৈকাল ৪।০টায় মোহনচটী হইতে রওনা,
সন্ধ্যা ৭॥০টায় গরুড়চটী (৭ মাইল) রাত্রিযাপন।

সম্মুখের রাস্তায় খুব চড়াই-উতরাই আছে বলিয়া যাহাতে রৌদ্রের তেজ হইবার পূর্ব্বে কঠিন পথটা অতিক্রম করা যায়, সে জন্য ভোর ৪।০টায় রওনা হওয়া গেল। ডাণ্ডী উঠাইবার সময় কিন্তু কে কাহাকে লইবে, ইহা লইয়া বেহারাদের মধ্যে মহা গোলমাল লাগিয়া গেল। আমাদিগের তিন জনের মধ্যে কেহ হাল্‌কা, কেহ ভারী, এই জন্য প্রথম হইতেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, দিনের পর দিন তাহারা বদলাবদলি করিয়া লইবে, নতুবা যাহারা হাল্‌কা বোঝা বরাবর বহিবে, তাহাদিগকে ২।৪ টাকা কম লইতে হইবে। এই নিয়মে দুই দিন কাযও হইয়াছিল। কিন্তু অদ্য তিন দলই বাঁকিয়া বসিল, স্থূলকায়া বিধবাটির ডাণ্ডী কেহই বহিতে চাহে

না। শেষে ভাগিনেয় বাপাজী ধমক-ধামক দিতে তাহারা সোজা হইল। তবে মাইলে মাইলে দম লইয়া কোনও প্রকারে কষ্টের লাঘব করিতে লাগিল।

১ম মাইলে পথ খুব চড়াই, এই পথে ৪।৫টা বটগাছ দেখিলাম, তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড, বহুদূর পর্য্যন্ত 'বোয়া' নাবাইয়াছে। ২য় মাইলের আরম্ভেই ২।১টা বটগাছ, ১টার গুঁড়ি রাস্তার একধারে, 'বোয়া'গুলি অপরধারে, মাঝ-পথটিতে নাই। এখানে গঙ্গা দক্ষিণ হইতে বামে গেলেন; অমনি মনে খটকা হইল, মা বুঝি সন্তানের প্রতি বাম হইলেন; আবার একটুখানির জন্য দক্ষিণে আসিলেন, কিন্তু সে ক্ষণিক। তাহার পরেই কপাল ভাঙ্গিল, একেবারে অদর্শন—এবং সারা দিনের মত। তৎপরিবর্ত্তে একটি নালার মত (নর্দ্দমার মত বলিয়া ভগবানের করুণাধারার অবমাননা করিব না) সঙ্কীর্ণ নদী বামে দেখা দিল। চড়াই পথ চলিতেছে, কুণ্ডাচটীতে উপস্থিত হইয়া দম লওয়া গেল। যাইবার সময়কার বিবরণে (কার্ত্তিক-সংখ্যা ১২২-২৩ পৃঃ) এখানকার ঘেরের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত চারাগাছ ও ঠাণ্ডা জলের কথা বলিয়াছি। এত সকালে কুণ্ডার ঠাণ্ডা জল খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তবে দন্তধাবনান্তে মিছরি খাইয়া সামান্য একটু জল গলাধঃকরণ করিলাম। এখানে গরম দুধও ঘনঘন হাঁকিতেছে, কিন্তু খালিপেটে তাহাও খাইতে সাহস হইল না। চা-খোরদের কি সুবর্ণসুযোগ! যাইবার সময়ে এখানে উভয়েই হাঁটিয়াছিলাম, এবং গৃহিণী উৎসাহে উৎরাই পথ উৎরাইয়াছিলেন; আর এখন? উভয়েই দুর্ব্বল, প্রায় চলৎশক্তিরহিত। এ যেন সেই পশ্চিমা দরওয়ানের সুবিদিত কাহিনী। 'পশ্চিম' হইতে বাঙ্গালা দেশে দরওয়ানী করিতে যাইবার সময় বৃষভবিনিন্দী স্বরে পথের লোককে বলিয়াছে, 'বাঙ্গালা মুল্লুকমে যাতা হ্যায়।' আর ফিরিবার সময় ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে ক্ষীণস্বরে 'চিঁ চিঁ' করিয়া বলিতেছে, "ঘর যাতা হ্যায়!"

পরের মাইলে বেহারারা দম লইলে শৌচক্রিয়া সমাধা করিলাম—নিঝ্ঝাটে, কেন না, কোনও চটীর এলাকায় নহে। তাহার পরের মাইলে আর দম লইল না। আর এক মাইল গিয়া ছোট-বিজনী চটী; পথে একটা প্রকাণ্ড জামগাছ দেখিলাম। এখানে বেহারারা দম লইল ও আমি দোকানে ধোয়া (খোসা-ফেলা) কলাই-এর ডা'ল দেখিতে পাইয়া কিনিয়া লইলাম। এখানেও বটগাছ। একটির বেশ বড় বড় 'বোয়া'; অশ্বত্থগাছও দেখিলাম। দুই ধারে জংলী গাছ, কতকগুলিতে শাদা শাদা ফুল। পূর্ত্ত-বিভাগের বাঁধান ঝরণা আছে। পথটা এখানে উতরাই।

বাকী পথটুকুতে বিখ্যাত বিজনী চড়াই এখন উতরাই হইয়াছে, গরুড়-ভগবানের দয়া। পথে বেলগাছে শ্রীফল ও 'চোখ গেল' পাখীর ডাক নেত্রশ্রোত্রের তৃপ্তি সাধন করিল। এই পথে বেহারারা কয়েকটি পাহাড়ী সুন্দরীকে দেখিয়া গান ধরিল, তাহারা লজ্জায় মুখ এ-দিক্ ও-দিক্ করিতে লাগিল। গানের একবর্ণও বুঝিলাম না, তবু অনুমান হইল 'টপ্পা' বা পচা খেউড়। তাহার পর, বেহারাদের এক জন অপর সকলকে বেশ বাহাদুরীর ভাবে কি একটা ঝগড়ার ইতিহাস শুনাইতে লাগিল, যেন মনে হইল, তাহার ভিতর যথেষ্ট 'শকার-বকার' উচ্চারণ করিল। এক স্থানে দেখা গেল, দুই জন 'সাধু'তে বিষম কলহ বাধিয়াছে, এক জন অপরের বিরুদ্ধে (allegation) দোষারোপ করিতেছে যে, অপর 'সাধু' সদাব্রতের কার্য্যাধ্যক্ষের উপর তাহার যে সুপারিশ-পত্র ছিল, তাহা চুরি করিয়াছে; এই বলিয়া নিজেই অভিযোক্তা হইয়া আবার নিজেই পুলিস সাজিয়া তাহার কাপড়-জামা ও ঝোলা খানাতল্লাসী করিল, কিন্তু চিঠি মিলিল না। তাহার পর বকাবকি হইতে ধাকাধাকি; শেষে দলের অপর ২।১ জন 'সাধু' অনেক করিয়া উভয়কে নিরস্ত করিল।

১ মাইল পরে ঝরণা দেখিয়া বেহারারা দম লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সদ্দারের ভ্রুকুটীতে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যাহা হউক, বন্দরভেল হইতে ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া মোহনচটীতে বেলা ৯।০টায় পৌঁছিলাম এবং একটি একতালা দোকান-ঘরে এ বেলার মত আড্ডা লইলাম। এখানকার ঘরগুলি নিতান্ত 'রথো'গোছের; বিশেষতঃ দোতলাগুলি। এখানে কাঠপাথর দেখিলাম না, ঘরগুলি খড়ের ছাওয়া। অথচ নাম মোহন-চটী! কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন! পথে নালার মত যে ক্ষুদ্র নদীটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম, তিনি এখানে বিরাজিত—তিনিই হিজলী নদী। দেখিয়া অভক্তি হইল। ইহা ছাড়া পূর্ত্ত-বিভাগের বাঁধান ঝরণাও আছে। অনেক যাত্রী ও যাত্রিণী এই চটীতে আশ্রয় লইয়াছে, বাঙ্গালী এক জনও দেখিলাম না। আর অধিকাংশই যাইতেছে, ফেরত যাত্রী কম।

নালার মত নদী দেখিয়া অভক্তি হইয়াছিল, কিন্তু স্নান করিয়া বড় আরাম পাইলাম। প্রথম-দর্শনে অনেক স্থলে মানুষের এমনি ভুল ধারণা হয়। জল অগভীর, কিন্তু তরতরে, পরিষ্কার, যাহাকে বলে 'কাকচক্ষুঃ' জল। অল্প দূরে একটি ঘাটে এক জন ভাটিয়া সুন্দরী অৰ্দ্ধনগ্নভাবে সাবান মাখিয়া বেশ আয়েসে গাত্রমার্জ্জন ও স্নান করিতেছে চোখে পড়িল। সে ঘাটে পুরুষেরও অপ্রতুল নাই। আবার ২।১ ঘণ্টা পরে এই সুন্দরীকেই ঝরণার ধারে বাসন মাজিতে দেখিলাম। কথায় বলে, যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? নারীজাতির কথা যদি উঠিল, তবে একটি বীভৎস ব্যাপারের কথাও বলি। এক জন হিন্দুস্থানী প্রবীণা কাহার সহিত ঝগড়া লাগাইল; সে স্বর, সে ভাষা, সে ভঙ্গী, বাঙ্গালা দেশের ডাকসাইটে ঝগড়াটে স্ত্রীলোকদিগকেও পরাভূত করে। যথারীতি রন্ধন-ভোজন হইল। এখানে মাছি কম। এই দোকানে এক জন দেবপ্রয়াগের পাণ্ডাও বাসা লইয়াছিল। পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য বেশ, সৌখীন লোক, খুব (up-to-date) হাল ফ্যাশানের, (attache-case) চর্ম্মপেটিকা পর্য্যন্ত আছে। তাহারও স্বপাক রন্ধন হইল। এক জন অসভ্য 'পশ্চিমা' ধূলামুক্তপায়ে আমাদের কম্বলে সপ্রতিভভাবে বসিল ও খৈনীর জন্য 'চূণা' ও পরে রন্ধনের মশলা চাহিল।

দুপুর হইতে অত্যন্ত গরম হইল, অথচ স্থানটির এক দিকে ঘন জঙ্গল, অন্য দিকে ক্ষুদ্র নদী। এক জন এই দেশের পুণ্যার্থী লোক ঘড়ায় করিয়া ঠাণ্ডা জল আনিয়া যাত্রীদিগকে যোগাইল —তবে দূর হইতে অনেক তোয়াজে ঠাণ্ডা জল আনিয়াছে বলিয়া মেহনত-আনা-হিসাবে ২।১টি পয়সার প্রত্যাশা করিল। এই গরমে সুশীতল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার আরামের জন্য ২।১ পয়সা দান সার্থক। এই প্রখর রৌদ্রেও কিন্তু কাণ্ড-জ্ঞানহীন বহু হিন্দুস্থানী যাত্রি-যাত্রিণী (শিশু-সন্তান পর্য্যন্ত সঙ্গে) বেলা ২টা-৩টায় বাহির হইয়া পড়িল। আবার খানিক গিয়াই ছায়া-শীতল স্থান ও ঝরণা যেখানে—এমন স্থানে অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িবে।

বিশ্রামান্তে বৈকালে ৪।০টার সময় বাহির হওয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে ঘোড়াওয়ালা আসিয়া পৌঁছিল। তবে অন্য চটীতে আহার ও বিশ্রাম করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু দম লইয়াই সে রওনা হইবে. এই আশ্বাস দিল। যথা-নিয়মে ১ মাইল চলিয়াই ঝরণার ধারে বেহারারা দম লইল। ইহার পরেই দুইটি অশ্বত্থ ও ১টি বড় জামগাছ দেখিলাম। আবার এক মাইল না হইতেই দ্বিতীয় কিস্তি দম লইল—হিজলী নদীর পুল পার হইবার পূর্ব্বে। (এখন আর নদীটি পূর্ব্বের ন্যায় নালার মত সঙ্কীর্ণ নহে)। এক জন বেহারা পুলের আগে জুতা খুলিয়াছিল, পুল পার হইয়া জুতা পায়ে দিবার জন্য দম লইল, সুতরাং অন্য সকলেও লইল। পুলের দুই মাইল পরে হিজলী নদীর ওপারে পথের বাঁকে সুস্নিগ্ধ ছায়া, তাহার আগেই দুইটি অশ্বত্থগাছ আছে। এই পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল জমি, দক্ষিণে হিজলী নদী, ক্রমে নদী দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল; বিস্তৃত চাষের জমি, কোথাও জমি পাইট করিতেছে, কোথাও কচি কচি চারা বাহির হইয়াছে, কোথাও ফসল উঠিয়াছে। ৩ মাইল গিয়া গুলাবচটী—সতেজ চারা মাঠে শোভা পাইতেছে; নদী, ঝরণা, নালা, একেবারে জলের দানসাগর; নালা দিয়া জল জমিতে চালান দিতেছে। এই চটীতে অশ্বত্থ, সোঁদালগাছ, সজিনাগাছ, আমগাছ ও নীচে কলাবাগান দেখিলাম। এমন সুশোভন সুস্নিগ্ধ স্থানে অবশ্য রীতিমত বিশ্রাম করা গেল; সন্ধ্যাকালে গরুড়চটী পৌঁছিব, এরূপ সঙ্কল্প না থাকিলে এই চটীতে রাত্রিবাসের জন্য থাকিয়া যাইতাম, এতই লোভনীয় ও রমণীয় স্থান। যাইবার সময় এই সৌন্দর্য্য একেবারেই লক্ষ্য করি নাই, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এখানে ৺কেদার-বদরীনাথদর্শনার্থী বহু যাত্রীর সহিত দেখা হইল (কেহই বাঙ্গালী নহে)। অশ্বারোহিণী নারীও ২।১ জন চোখে পড়িল। আমরা দেব-দর্শনে ধন্য হইয়াছি শুনিয়া তাহারা পরম ভক্তিভরে আমাদিগকে বারবার নমস্কার করিল (বিশেষতঃ নারীগণ), যেন দেবসামীপ্যলাভ করিয়া আমরাও দেবভাবাপন্ন হইয়াছি! এক জন যাত্রিণী আমাদের সঙ্গিনী বিধবাটির গেরুয়া বস্ত্রের অঞ্চলভাগ স্পর্শ করিয়া কর-পুটে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া যেন কৃতার্থ হইল। সে কি ভক্তিগদ্গদ, আনন্দপূরিত ভাব! আমরা মনে মনে নিজেদের অযোগ্যতা, ভক্তির অল্পতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলাম।

গুলাবচটীর পরে বেশ জঙ্গল, একরকম জংলী গাছে শাদা শাদা ফুল ফুটিয়াছে। শুষ্ক নদীগর্ভে (ellipse) বৃত্তাভাস-আকারের অনেকখানি জমিতে নধর সবুজ চারা গজাইয়াছে, জমিটা পাথর সাজাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ ভাগ করা—বিভিন্ন অধিকারীর সীমানা-নির্দ্দেশের জন্য। এই দৃশ্যটি অতি

সুন্দর লাগিল। জ্যামিতির অদ্ভুত আকারের (figure) ক্ষেত্রের যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য থাকিতে পারে, তাহা দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইলাম। পথটা উতরাই; হিজলী নদী কখনও দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, কখনও দূরে পড়িতেছে, বা নদীর বাঁকের জন্য অন্তর্হিত হইতেছে। ইহার একটু পরে ডাণ্ডী হইতে নামিয়া অনেকখানি নদী পার হইতে হইল; জল যদিও এক হাঁটু, কিন্তু নদীগর্ভে এবড়োখেবড়ো পাথর বিছান, তাহাও আবার পিছল, অতি কষ্টে বেহারাদের হাত ধরিয়া ধরিয়া যাইতে হইল। যাইবার সময়ও এই কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২২ পৃঃ)। ডাণ্ডীতে উঠিবার সময় অসাবধানে ছাতাটির উপর বসিতে গিয়া কিরূপ জোর লাগিয়া ছাতাটি ভাঙ্গিয়া গেল। এই দ্বিতীয় ছত্রভঙ্গ। (পূর্ব্বে ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে ফিরিবার সময় শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরের নিকট পুত্রের ছাতাটি ভাঙ্গিয়াছিল, পৌষ-সংখ্যা, ৩১৯ পৃঃ)। পথ প্রায় শেষ হইয়াছে, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

আর খানিক পথ গিয়া ফুলবাড়ী চটী পৌঁছিলাম; ইহার আগে একটি চটী ছাড়াইলাম, সেটির নাম জানি না। ফুল-বাড়ীতে সুন্দর একটি ধর্ম্মশালা আছে। আর তদপেক্ষাও সুন্দর—গঙ্গার এখানে পুনরাবির্ভাব; কি সুন্দর তরঙ্গভঙ্গ, কি সুন্দর স্রোতঃপ্রবাহ! আয়তনও প্রশস্ত। মা কতক্ষণ সন্তানের উপর বিরূপ থাকিতে পারেন? এ যেন মায়ের লুকোচুরি খেলা; কয়েক দণ্ড অদর্শন হইয়া সন্তানের মনোহরণের জন্য, দুঃখদূরীকরণের জন্য লীলাচঞ্চল রহস্য। ফুলবাড়ীই বটে—এ ফুল যেন স্বর্গের পারিজাত, মন্দাকিনীকূল হইতে ভূপতিত। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, গঙ্গা যেন এইরূপ বরাবর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর যেন ছাড়াছাড়ি না হয়; আর 'অন্তিমকালে সুপবিত্র সলিলে প্রাণ যেন যায় মা তব তরঙ্গে'। তবে ফিরিবার পথে কিছুদিন লক্ষ্ণৌ সহরে আত্মীয়ভবনে থাকিবার বাসনা আছে (ভাদ্র-সংখ্যা, ৭৯৮পৃঃ দ্রষ্টব্য), তৎস্মরণে প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল—শেষে ৺কাশী, কলিকাতা, উভয়ত্র গঙ্গা থাকিতে 'মরণং গোমতী-তীরে' হইবে না ত?

গঙ্গার উপর বহু বহু চেরা তক্তা ভাসিয়া যাইতেছে, এ ব্যাপারের কথা দেবপ্রয়াগ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলিয়াছি (কার্ত্তিক-সংখ্যা, ১২৮ পৃঃ)। তীরে দুইটি অশ্বত্থগাছ (একটি বড়, একটি মাঝারী), স্থানটিকে আরও সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। এখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। যদিও গরুড়চটী পৌঁছিবার আগ্রহ প্রবল, তথাপি এই গঙ্গাপ্রবাহপূত তীরভূমি শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। গঙ্গাতীরে সায়ংসন্ধ্যা সারিলাম। দুঃখের বিষয়, এখানেও তীরভূমি মানবের অনাচারে অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় হইয়াছে।

সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আবার রওনা হওয়া গেল। তখন প্রায় প্রদোষকাল। কিন্তু গরুড়-চটী না পৌঁছিলে মনস্তুষ্টি হইবে না; কেন না, তথায় রাত্রিতে আড্ডা লইলে পরদিন একবেলার মধ্যেই, জোর বৈকালে, হরিদ্বারে পৌঁছিয়া যাইব। এ পথ-টায় সামান্য চড়াই উতরাই আছে। পাহাড়ের গায়ে অপ্রশস্ত রাস্তা, বামে পাহাড়, জঙ্গল, দক্ষিণে গঙ্গা, গঙ্গায় পরপারে পাহাড়ে অসংখ্য সতেজ চীরগাছ। গরুড়চটীর এক মাইল থাকিতে বেহারারা আবার দম লইল, অন্ধকার হইয়া আসি-তেছে দেখিয়াও ত্বরা করিল না। এখানে তাহারা একরকম গাছে উঠিয়া বড় বড় পাতা (শালপাতা বা পলাশপাতা নহে) সংগ্রহ করিল—ভোজনপাত্রের জন্য; আমারও সাধ হইল, আজ রাতে এই পাতায় 'পুরী'-তরকারী খাইব, তাহাদিগের নিকট কয়েকখানি চাহিয়া লইলাম। সন্ধ্যা ৭॥০টায় একটি ঝরণা পার হইয়া (ঝরণার আগে পূর্ব্বের সেই বেহারা জুতা খুলিল ও পার হইয়া আবার পায়ে দিল।) গরুড়-চটী পৌঁছিলাম। * ছেলেরা কিছু আগেই পৌঁছিয়াছিল।

চটীতে অর্থাৎ ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া দেখি, মহা ভিড়। এত লোক যে এখানকার এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থান ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইবে, এক মাইল গিয়া লছমণঝোলা পার হইয়া আড্ডা গাড়িবে না, ইহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলাম। (ইহারা অবশ্য বেলাবেলিই পৌঁছিয়াছিল।) বহুকষ্টে দোতালায়

---

* এখানে মাইল খানেক ধরিয়া ফল-ফুলের বাগান আছে, যাই-বার সময়কার বিবরণে বলিয়াছি (আশ্বিন-সংখ্যা ৯৭১ পৃঃ), আর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিব না। লম্বা বর্ণনা দিয়া বিলম্ব করিবারও অধিকার নাই।

> 'Tis mine to tell an onward tale,
> Hurrying, as best, as I can along,
> Like traveller when approaching home,
> Who sees the shades of evening come,
> And must not now his course delay,
>
> * * * *
>
> Where o'er his head the wildings bend,
> To bless the breeze that cools his brow,
> Or snatch a blossom from the bough.
>
> SCOTT'S ROKEBY, Canto VI, St. 26.

বারান্দার এক পার্শ্বে ছেলেরা স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল, আশে-পাশে চারিধারে হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য অঞ্চলের যাত্রী ও যাত্রিণী। গা মেলার কেন, পা ফেলার স্থান নাই। যাইবার সময়ে বেশ নিরিবিলিতে কাটাইয়াছিলাম। (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৭ পৃঃ।) পার্শ্বেই ঝরণা ও নিকটেই গঙ্গা। ছেলেরা রাত্রির অন্ধকারেও গঙ্গা হইতে জল আনিল। এবারও গরুড়-ভগবানের মন্দিরে গেলাম এবং কল্য যেন তিনি উড়াইয়া লইয়া গিয়া হৃষীকেশে তথা হরিদ্বারে পৌছাইয়া দেন, প্রণতি-পুরঃসর এই প্রার্থনা করিলাম। ধর্ম্মশালার প্রশস্ত আঙ্গিনায় সারি সারি উনান (হোমকুণ্ডের ন্যায়) জ্বলিতেছে—যাত্রীরা রুটি 'পুরী' তরকারী বানাইতেছে। আমরা আর ও হাঙ্গামা না করিয়া নিম্নতলস্থ দোকানীর নিকট 'পুরী'-তরকারী কিনিলাম। বহু খরিদদার যুটিয়াছে (আমাদের মত বুদ্ধিমানের অভাব নাই), সুতরাং গরম গরম তাজা মালই পাওয়া গেল। সংগৃহীত ঢাল ঢাল পাতায় আহার সমাধা করা গেল। আহারান্তে নিদ্রা ও মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গে গঙ্গাজল-পান।

৩০শ দিন—১৯এ জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন, শনিবার

প্রাতঃ ৫টায় গরুড়চটী হইতে রওনা,
বেলা ৭টায় হৃষীকেশ, বেলা ৯৷৷০টায় হরিদ্বার।

কল্য পূর্ণিমা, স্নানযাত্রা, তথা গ্রহণস্নান; হরিদ্বারে উভয় পর্ব্ব-উপলক্ষেই গঙ্গাস্নান করিব, কয়েক দিন হইতে সঙ্কল্প আছে; অদ্য সেই সঙ্কল্প-পূরণের পথ উন্মুক্ত, কেন না, অদ্য পূর্ব্বাহ্নে যদিই না পারা যায়—অপরাহ্নে হরিদ্বারে পৌছিয়া যাইব, অত্র সন্দেহো নাস্তি; অর্থাৎ স্নানকালের এক দিন পূর্ব্বেই ঠিকানায় দাখিল হইব। মহা-উৎসাহে ভোরে উঠিয়া পথের দুই ধারের তরুরাজির সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে শৌচক্রিয়া সমাধা করিয়া (এই দীর্ঘ তীর্থপথের শেষ অনাচার সাধন করিয়া) ভোর ৫টায় রওনা হইলাম। শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ এমন স্নিগ্ধ সুন্দর প্রভাতেও যানারোহণ করিতে হইল। পথ সামান্য চড়াই উতরাই ও পূর্ব্ববৎ গঙ্গার ধারে ধারে। গরুড়চটীর চৌহদ্দী ছাড়াইয়া পথের ধারে জঙ্গল, বাঁশবনও আছে; অনেক স্থানেই বাঁশ লাঠীর মত সরু, কোথাও খুঁটীর মত মোটা, হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশের পথেও এইরূপ। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বের পথে পাহাড়ের গায়ে কঞ্চির মত সরু বাঁশ দেখিয়াছি, ২।১ জায়গায় সেই বাঁশ চিরিয়া তাহা হইতে ঝুড়ি ঝোড়া চুপড়ি সাজি বুনিয়া পথের ধারে পাহাড়ীরা বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছে, এ কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। মাইল খানেক পরে নেড়া পাহাড়, তাহার পর বেলে রাস্তা।

ক্রমে লছমণঝোলায় পৌছিলাম। এখানে নূতন পুলের জন্য পোস্তা গাঁথা হইতেছে দেখিলাম; পূর্ব্ব-বৎসরে তাহাও দেখি নাই, শুধু মাল-মশলা আসিতেছে দেখিয়াছিলাম; এক বৎসরে কার্য্য কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে; জানি না, কবে আবার লোহার ঝুলান সেতু (Iron suspension-bridge) এখানে বিরাজ করিবে। এখানে বোঝা-সমেত ঘোড়াওয়ালার পারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমরা এই পারস্থিত 'স্বর্গাশ্রম'-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, কেন না, পূর্ব্ব-বৎসর এবং এ বৎসরও যাইবার সময় 'স্বর্গাশ্রম'-দর্শনের সময় পাওয়া যায় নাই (আশ্বিন-সংখ্যা, ৯৫৫ পৃঃ); এবার সেই ত্রুটি পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; এ অঞ্চলে আবার কত দিনে আসা হইবে, কে জানে? পথে (লছমণঝোলার কাছেই) প্রথমেই 'মহর্ষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' দৃষ্টিগোচর হইল—খুব গালভরা নাম বটে, তবে ভিতরের ব্যাপারও তদনুরূপ কি না, তাহা দেখিবার অবকাশ মিলিল না। কাছেই একটি অশ্বত্থগাছ ও 'বোয়া'-নামা বটগাছ—এখানে বেহারারা প্রথম দম লইল—এত সকালেই।

তাহার পর খানিক গিয়াই 'স্বর্গাশ্রম' পৌছিলাম; দু'ধারে সারগাছি, বহু আমগাছ (এক একটি বেশ বড়), কিন্তু অফলা, জামগাছও ২।৪টা, সোঁদাল গাছ ২।১টি, কলাবাগান ও ফল-ফুলের গাছের বাগান; করবী ও সজিনা গাছ লক্ষ্য করিলাম। সমতল পথ ত বটেই—দুই পার্শ্বে অনেকখানি সমতল স্থান, এক স্থানে একটু চড়াই আছে। 'সাধু'দিগের বাসের জন্য অনেকগুলি দু'কামরা একতলা ঘর রহিয়াছে, বড় বাড়ীও আছে—বোধ হয় সদাব্রত। অসংখ্য-তরুশোভিত ছায়া-শীতল রমণীয় স্থান। 'স্বর্গাশ্রম' নামের উপযুক্ত বটে! হরিদ্বার হৃষীকেশ এখন জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এই নিরালা ও সুদৃশ্য স্থানে চিরদিনের মত না হইলেও, ছুটীতে ছুটীতে গ্রীষ্মযাপন করিতে এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট, ব্যবসায়গত কার্য্যের তাগিদ তথা বাজে আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া বিশ্বনাথের নীরব সাধনায় কালাতিপাত করিতে আমাদের মত সাংসারিক জীবেরও প্রবল বাসনা হয়, এমনই স্থানের প্রভাব। জানি না,

কি জন্য মহাত্মা গন্ধী স্থানটির নিন্দা করিয়াছেন (Young India, June 7, 1928)। সম্ভবতঃ তিনি যে সময় আসিয়াছিলেন, তখন স্থানটির সবেমাত্র পত্তন হইতেছে, সুতরাং এখনকার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তার তখন উদ্ভব হয় নাই। *

ক্রমে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলাম। সুন্দর বাঁধাঘাট, তাহার উপর সুরম্য শিব-মন্দির—উচ্চ ও প্রশস্ত। দেব-দর্শনে নেত্র ও গঙ্গার পুণ্যবারিতে অবগাহন-স্নানে গাত্র পবিত্র হইল—তবে অত্যন্ত সকাল ও জলও শীতল বলিয়া বেশ আরাম পাইলাম না। (হৃষীকেশে বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া আগেভাগেই স্নানাহ্নিক সারা গেল।) এখানে লছ্মণঝোলার মত পারাপারের বন্দোবস্ত আছে এবং এখানেও পারাণীর পয়সা লাগে না। ডাণ্ডী ডাণ্ডীওয়ালা-সমেত সকলে পার হইলাম। এই সময়ে ডাণ্ডীওয়ালাদিগের মেজাজ একটু গরম হইল; জানি না, এই মনোহর স্থানে এ বেলার মত তাহাদের দম লওয়ার মতলব ছিল কি না। ডাণ্ডী ও আরোহী পুরাতন (যদিও বাহক নূতন) বলিয়া পরপারস্থিত টৌল্-আফিসে মাশুল লাগিল না। কিন্তু হৃষীকেশের কাছাকাছি গেলে এক জন কর্ম্মচারী এই গলদটুকু ধরিয়া ফেলিল ও ডাণ্ডী-পিছু চারি আনা করিয়া মাশুল আদায় করিল। যাঁহারা এই পথে ফিরিতে চাহেন, তাঁহারা যাত্রাকালে টৌল্-আফিসে বেহারাদিগের সহিত চুক্তিপত্রে এই পথে ফিরিবার কথা লেখাইয়া লইলে শ্রীনগরে নূতন বাহক-নিয়োগের হাঙ্গামাও পোহাইতে হইবে না, এই বাড়্তী মাশুলও লাগিবে না।

বেলা ৭টায় হৃষীকেশে পৌঁছিলাম (পথের পরিচয় যাত্রাকালে দিয়াছি, আশ্বিন-সংখ্যা, ৯২৫ পৃঃ)। এবারও কালীকমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইলাম—কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। ছেলেদের ঝোঁক হইল, যখন বেলা বেশী হয় নাই, তখন আর বিলম্ব না করিয়া এখনই মোটর-বাসে হরিদ্বার-অভিমুখে রওনা হওয়া যাউক। এখানে রন্ধনাদিতে বিলম্ব না করিয়া ঠিকানায় পৌঁছিয়া ও সব করাই ভাল। হৃষীকেশে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় লোকের ভিড়ের জন্য রন্ধনের অসুবিধা ও মাছির উৎপাতও বেশী, নোংরাও বটে। পরামর্শ সমীচীন বটে। সুতরাং সেই মতই বাহাল রহিল। ডাণ্ডীওয়ালাদিগের ও ঘোড়াওয়ালার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, ডাণ্ডী তিনখানি (খরিদদার-সত্ত্বেও) ধর্ম্মশালায় দাতব্য করিয়া (বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেন 'সাধুসন্ত'-সেবায় ব্যয় হয় এই সর্ত্তে) মালপত্র ধর্ম্মশালার দ্বারস্থিত মোটর-বাসে বোঝাই করিয়া সকলে 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া উঠিয়া পড়া গেল। সময় নষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেরা, বারবার বলাতেও, জলযোগ পর্য্যন্ত করিল না। (পরে ৺সত্যনারায়ণ-নামক আড্ডায় মোটর-বাস্ দম লইলে গরম জেলাপি-যোগে সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল।) আমি 'স্বর্গাশ্রমে' স্নানাহ্নিকের পর এক কিস্তি ও হৃষীকেশে আর এক কিস্তি পকেট-স্থিত মিছরি-ভোগ লাগাইয়াছিলাম। 'বাস্' লোকে বোঝাই হইয়া গেল। অধিকাংশই স্ত্রীলোক—বৃদ্ধা, প্রবীণা, যুবতী, বালিকা, সব বয়সেরই আছে, সকলে এক-পরিবারস্থও নহে, অথচ সঙ্গে পুরুষের বালাইও নাই। এই স্বাবলম্বন, নির্ভীকতা, আত্মরক্ষাসামর্থ্য, বাঙ্গালা 'অবলা সরলা কুলবালা'র শিক্ষার বস্তু। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর উক্তি 'আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ,' তথা ভগবান্ মনুর বচনটি এ ক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।—'অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥'

অর্দ্ধপথে ৺সত্যনারায়ণ-মন্দিরে 'বস্' দম লইল। আমরা দেবদর্শন করিলাম, ছেলেদের জলযোগের কথা পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে বলিয়াছি। জৈন স্ত্রীলোকগণ মন্দির-চত্বরে খুব জলের সুখ বলিয়া স্নান করিয়া লইয়া দেবদর্শন করিল। এটি শুধু হিন্দুর দেবস্থান নহে, জৈন তীর্থঙ্করের পুণ্যপীঠ।

বেলা ৯৷৷৹টায় হরিদ্বারে পৌঁছিয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্-ভোলানন্দ গিরির ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী প্রথমে বলিল, 'স্থান নাই, সব ঘর ভর্ত্তি।' পূর্ব্ববারেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল। এটা কিন্তু চালাকি, ছেলেরা একটু তোয়াজ করিলে প্রথমে ১টি ঘর (দোতালায়) পাওয়া গেল; ঘণ্টাখানেক পরে আর এক দল চলিয়া গেলে পাশের ঘরটিও পাওয়া গেল। এ জন্য অবশ্য বিদায় লইবার সময় বৃদ্ধকে খুসী করিয়াছিলাম।

যদিও কলিকাতা হইতে ৺কাশী, ৺কাশী হইতে লক্ষ্ণৌ হইয়া (যাইবার সময় তথায় যাত্রাভঙ্গ—break journey করি নাই) হরিদ্বার আসিয়া ৺কেদার-বদরী যাত্রা করিয়াছি, তথাপি প্রকৃত যাত্রা হরিদ্বার হইতে। অতএব পাঠকবর্গকে এত দিনে হরিদ্বারে ফিরাইয়া আনিয়া দায়িত্বমুক্ত হইলাম। তবে যদি কোনও পাঠকের লক্ষ্ণৌ ও ৺কাশী হইয়া কলিকাতার ঠিকানায় পৌঁছানর বিবরণ শুনিবার কৌতূহল থাকে, তাঁহাকে পর মাস পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তারিখে প্রবন্ধের এই অংশ ভাল করিয়া (fair copy) লিখিলাম, সেই তারিখেই ফরওয়ার্ড পত্রে (৯ই এপ্রেল, ১৯২৯) এক জন পত্রপ্রেরক 'স্বর্গাশ্রমে'র শান্তিময় সৌন্দর্য্যের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যেন আমার মন্তব্যটির সমর্থন করিবার জন্যই বিধাতা এইটি ঘটাইয়াছেন। বিস্তৃতিভয়ে পত্রখানি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

প্রত্যাবর্ত্তন

১

সমস্ত দিন কাযের পর ক্লান্ত দেহে ও শ্রান্তচিত্তে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দিলীপ গৃহে ফিরিল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই বাগানের দিক্‌টা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল। ঘরের ভিতর না গিয়া দিলীপ কৌতূহলবশে বাগানে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোন কথা আসিল না। সকালে সে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, তখনও সে শিউলী গাছটিকে শ্যামল ও সতেজ দেখিয়া গিয়াছিল, তখনও বাতাসে তাহার ফুলভরা বৃন্তগুলি মৃদুমন্দ দুলিতেছিল, আর ইহারই মধ্যে কে এমন নির্ম্মমভাবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিল!

যেখানে গাছটি হয় ত কিছুক্ষণ আগেও দাঁড়াইয়া ছিল, দিলীপ সেখানে আসিল। গাছের কাণ্ডের শেষাংশটি তখনও সেখানে বর্ত্তমান—যেন মুখ বাড়াইয়া বলিতেছে, দেখ, তুমি না থাকায় আমার কি দশা করিয়াছে। চারিদিকে তখনও শিউলী-ফুল ছড়ানো—তাহারা যেন বলিতে চাহে, আমরাই তাহার শেষ চিহ্ন।

দিলীপের চোখে জল আসিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সে সেই তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, কে এমন কায করিল - কেন এমন করিল?

দিলীপ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাগানের সব আগাছা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহারা বাগান পরিষ্কার করিয়াছে, তাহারা কি অপ্রিয় ও অপ্রয়োজনীয় গাছের সঙ্গে ভুল করিয়া সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রিয় গাছটিকেও কাটিয়া ফেলিল? না কি ইচ্ছা করিয়া কেহ এ কায করাইয়াছে! কিন্তু তাহাই বা কে করিবে? সে কি সম্ভব?

কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, শেফালীর সে গাছটি কাটা গিয়াছে; যেখানে সে তাহার তরুণ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পুষ্পসম্ভার লইয়া বিরাজ করিত, সেখানে সে আর নাই।

দিলীপ সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুঃখকে ঘিরিয়া তাহার মনে ক্রমশঃ ক্রোধের উদয় হইল। কি করিয়া ইহা ঘটিল, জানিবার জন্য সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল-'মা!'

মা তখন ঠাকুর-ঘরের দীপদানের ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, 'যাই বাবা! এই ভাবছিলাম, আজ এত দেরী হচ্চে কেন। মুখখানা অত শুকনো কেন, দিলু?'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রশ্নের জোরটা কমিয়া গেল, যেন আপনা হইতে উত্তর মনে পড়িয়া প্রশ্ন অনাবশ্যক হইয়া পড়িল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল—'মা, শিউলী গাছটা কে কাটলে?'

সারা দুপুর ধরিয়া মা এই প্রশ্নটিকেই ভয় করিতেছিলেন, কি করিয়া ইহার একটি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহাও ভাবিয়াছেন; কিন্তু কোনই কূল-কিনারা পান নাই। মা ম্লানমুখে বলিলেন, 'জঙ্গলগুলো কাটবার জন্যে একটা লোক লাগান হয়েছিল। তাকে এত ক'রে ব'লে দেওয়া হ'ল যে, এ গাছটা যেন কাটিস্‌নে—এই ধারের জঙ্গলগুলো সাফ ক'রে দিবি। খানিক পরেই এসে দেখি, শিউলী গাছটাই সে আগে কেটেছে। তখন আর কি করব? তোর দাদা এসে কত বকলেন, বৌমা কত রাগ করলেন। আমি ত সেই থেকে ব'কে মরছি। আর সেই থেকেই ভাবছি, তুই এসে কি বল্‌বি।'

'সবাই মিলে পরে এত বকাবকি না ক'রে আর না ভেবে যদি গাছটা কাটা যাবার আগে একটু ভাবতে বা কেউ একটু ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে, তা হ'লে ত এমন হ'ত না।'

বলিয়া দিলীপ ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল।

ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। একে একে সব কক্ষে

আলো জলিয়া উঠিল—কেবল তাহারই কক্ষ অন্ধকার রহিল। ভৃত্য আলোক জালিয়া দিবার জন্ত দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—দিলীপ হস্তসঙ্কেতে নিবারণ করিল। সে ধীরে চলিয়া গেল। উঠিয়া দিলীপ কক্ষের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

অন্ধকারাবৃত কক্ষে দিলীপ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জানালা দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল। মুক্ত নীল আকাশে একে একে অনেকগুলি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। শরতের সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস বাহিরের স্বল্প শীতলতা বহিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া বাতাসের স্পর্শে দিলীপের মনে হইতেছিল, শেফালীর গাছ যদি আজ বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত—এই বাগানের স্পর্শে নক্ষত্রের মতই অগণিত ফুলে তাহার তলদেশ ভরিয়া যাইত।

রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া দিলীপের প্রাণ যেন বিদীর্ণ শেফালীর তলে কাঁদিয়া লুটাইতে লাগিল।

এই শেফালী-গাছের একটি ইতিহাস আছে। একটি শিশুর করুণ স্মৃতি ইহার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

দিলীপের দাদা প্রতাপের স্ত্রী চার বৎসরের একটি শিশু পুত্র রাখিয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন। প্রতাপ প্রথম হইতেই একটু কবি-ধরণের ছিল। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাহার কবিত্ব আরও প্রখর হইয়া উঠিল। বিলাত হইতে খরচ করিয়া স্ত্রীর আলোকচিত্র বড় করাইয়া আনিল ও আপনার শয়ন-কক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিল, তেলমাখা ছাড়িয়া দিয়া মাথার চুলগুলিকে রুক্ষ করিয়া তুলিল। এমন কি, শেষটা একবেলা খাওয়া ধরিল। মা কাঁদিলেন, প্রবীণরা বিবাহের জন্ত ধরিলেন। প্রতাপ অটল রহিল। এই শিশু পুত্রের নাম অরুণ। এ নামটি দিলীপেরই দেওয়া। প্রতাপ যখন স্ত্রীর শোক লইয়া সর্ব্বক্ষণ বিব্রত হইয়া পড়িল, দিলীপ তখন ধীরে ধীরে শিশুকে আপনার কাছে টানিয়া লইল। ছেলে কাছে গেলেই ঠাকুরমার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত আর কাকা দুঃখ দমন করিয়া তাহাকে হাসিমুখে ভুলাইয়া রাখিত; সে জন্ত ধীরে ধীরে শিশু কাকারই অনুগত হইয়া পড়িল।

ইহারই মধ্যে প্রতাপ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া কিছু দিনের জন্ত দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। কোথায় সে গেল, তাহার খবর পর্য্যন্ত কয়েক মাস সকলের অজ্ঞাত রহিল।

প্রতাপদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, সে জন্ত সখের ওকালতী ছাড়িয়া যাইতে তাহার কোন দুঃখ বা ক্ষতি হয় নাই।

মাস ছয়েক পরে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রতাপের একখানি পত্র আসিল। তাহা হইতে জানা গেল যে, সেখানে দূর-সম্পর্কে এক ভগিনীপতির বাড়ীতে কিছু দিন সে ছিল ও তাঁহাদের অনুরোধে সেখানকারই এক প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করিয়াছে এবং শীঘ্রই স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে।

আসিবার দিন স্থির করিয়া প্রতাপ দ্বিতীয় পত্র লিখিল এবং ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে স্ত্রীকে লইয়া পৌঁছিল।

পাড়ার দুই এক জন অসাক্ষাতে বলিল, বটে! অত বৈরাগ্য দেখাইয়া লক্ষ্ণৌ গিয়া বিবাহ না করিয়া আসিয়া এখানে বিবাহ করিলেই চলিত। কিন্তু বাড়ীতে সকলেই যথাসাধ্য প্রসন্ন মুখে বধূকে গ্রহণ করিল। মনের মধ্যে যেটুকু অসন্তোষের মেঘ উঠিয়াছিল, নব বধূ সুনীতির ব্যবহারে তাহাও মিলাইয়া গেল।

প্রথম দুই এক দিন অরুণ সুনীতির কাছে ঘেঁসে নাই, কিন্তু সুনীতি খেলানা দিয়া, তাহার সঙ্গে খেলিয়া, আপনার হাতে পশ্চিমের খাদ্য তৈয়ার করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া ধীরে ধীরে তাহার চিত্ত বশ করিয়া লইল। সুনীতিকে সে মা বলিতে ও মায়ের মত ভালবাসিতে শিখিল।

বাড়ীর ভিতর সুনীতি ও বাড়ীর বাহিরে দিলীপ তাহার সঙ্গী।

দিলীপের সহিত তাহার বন্ধুর বাড়ী এক দিন বেড়াইতে গিয়া অরুণ শেফালীর একটি চারা তুলিয়া আনিল এবং বাড়ী ফিরিবার পথে কোথায় সে গাছটি লাগাইতে হইবে, তাহাও কাকার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিল। বাড়ী আসিয়া মহাসমারোহে কাকাকে সঙ্গে লইয়া সে গাছ পুতিল এবং সে গাছটি যেন কেহ নষ্ট করিয়া না ফেলে, সে সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিল।

২।৩ বৎসরে সেই গাছে ফুল ধরিল এবং শরতের প্রভাতে সেই ফুল যখন চারিদিকে গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া নীচে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তখন সেই ফুলের মতই কোমল ও স্নিগ্ধ হাস্তে অরুণের মুখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমনই করিয়া শেফালী-গাছ, পাঁচটি শরৎকে পুষ্প, গন্ধ ও

সৌন্দর্য্যসম্ভারে আহ্বান করিয়া আনিল। অরুণের বয়স তখন ৯ বৎসর হইল।

এই অরুণ যে সংসারের আনন্দ—সকলের প্রাণ ছিল, স্বর্গের দেবতার মুখে হাসি ফুটাইতে সংসার হইতে সহসা চলিয়া গেল।

সংসারের আনন্দ-দীপ নিভিল। ঠাকুরমার নয়নের জলের বিরাম রহিল না। বাপের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সুনীতি কাতর হইল।

দিলীপ একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য দিলীপ রাগ করিয়া নিজে বিবাহ করিল না। লেখাপড়া ভাল রকম শিখিয়াই সে কৃষিকার্য্য লইয়া রহিল। অরুণের মৃত্যুতে সে সংসারে একবারে বীতরাগ হইয়া পড়িল। মা'র মুখ চাহিয়া সে কোথাও চলিয়া গেল না। সমস্ত দিন গ্রামের বাহিরে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান লইয়া থাকিত। সকলে উঠিবার আগে অতি প্রত্যূষে একবার সেই শেফালীর তলে গিয়া দাঁড়াইত, তাহারই প্রসারিত শাখা-প্রশাখা ও নীহারসম্পৃক্ত পত্রদলের পানে চাহিয়া থাকিত, তার পর আবার সেখান হইতে চলিয়া যাইত। সন্ধ্যায় ফিরিয়া শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সেখানে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিত, সেই শেফালীর মধ্যে অরুণের যেটুকু স্মৃতি বাঁচিয়াছিল, সে কিছুক্ষণের জন্য তাহার ধ্যান করিয়া যেন সান্ত্বনা লাভ করিত।

আজ সেই শেষ স্মৃতিটুকুও যখন চলিয়া গেল, সে আর কি লইয়া থাকিবে?—অন্ধকার ঘরে একা বসিয়া বসিয়া দিলীপ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

৩

দিলীপ স্থির করিল, কিছু দিন সে বাড়ী ছাড়িবে—বাড়ী আর ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু বিপদ্ মাকে লইয়া। মাকে ফেলিয়া বিদেশে গেলেও যে কেবলই মনে হইবে, মা চোখের জল ফেলিতেছেন। সে-ও যে বড় দুঃখের কথা। তার চেয়ে মাকে লইয়া যাইতে পারিলে মন্দ হয় না।

সকালে উঠিয়াই সে মাকে বলিল, "মা, তুমি ত অনেক দিন থেকে বলছিলে কাশী গিয়ে কিছু দিন থাক্‌বে, তা এখন যাবে?"

"তা আর যাব না কেন, বাবা? আমার সঙ্গে তুই যাবি?"

"তা যেতে পারি, কিন্তু কিছু দিন থাক্‌তে হবে, মা। দু'দিন বাদেই যে বলবে, চ দিলু, আমায় বাড়ী রেখে আসবি, সে হবে না কিন্তু।"

"তা কেন বল্‌ব বাবা? এখন এ বয়সে কি আমার মত লোকের সংসার নিয়ে থাকা উচিত? এখন যদি বাবা বিশ্বনাথ শ্রীচরণে স্থান দেন, তার চেয়ে আর ভাগ্যি কি আছে বল্। আর ফিরে আসতে চাইব না বাবা, সেইখানেই মণিকর্ণিকার ঘাটে আমায় রেখে আসিস্।"

দুই দিনের মধ্যে কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক হইয়া গেল। কাশীতে দিলীপের এক বন্ধু ছিল, তাহাকে লিখিয়া দিলীপ একটি ছোট বাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিল। তাহার পরদিন সন্ধ্যায় দাদাকে জানাইল যে, কাল সে কিছু দিনের জন্য কাশী যাইবে, মাও সঙ্গে যাইবেন। প্রতাপ এ ব্যবস্থার আভাস পূর্ব্বেই কিছু পাইয়াছিল। সে রুষ্ট হইয়া বলিল, "একটা গাছ কাটা গেলে মানুষে সংসার ত্যাগ করে না। তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

দিলীপ শুধু বলিল, "আমি ত সে সব কথা কিছু বলিনি।"

"বল নি! কিন্তু বল্‌লে হয় ত এর চেয়ে ভাল হ'ত। কেউ ইচ্ছে ক'রে কাটেনি, কেউ কাট্‌তে বলেনি—তবু তোমার এ রাগ অন্যায়।"

দিলীপ কোন প্রতিবাদ না করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। প্রতাপ আপন মনে বলিল, চিরকাল একভাবে গেল, কিছু বল্‌বে না, মনে মনে রাগ ক'রে থাকবে।

সুনীতি আসিয়া বলিল—"হাঁ গো, মা ও ঠাকুরপো যে কালই চ'লে যেতে চান্—একটা ব্যবস্থা কর।"

প্রতাপ একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—"কি কর্‌ব যেতে চাইলে? ধ'রে রাখ্‌ব, না বেঁধে রাখব?"

"তাই কি বলছি!—একটু ব'লে দেখ, যদি শোনেন।"

"হাঁ, বলতে বাকি রেখেছি কি না? আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছি, আমি কি মানুষ যে, আমার কথা শুনবে?"

কথাটা সুনীতিকে আঘাত করিল। ঐ কথাটাই প্রকাশ্যে না হউক, কাণাঘুষায় বিবাহের সময় আসিয়াই সে অনেকের মুখে শুনিয়াছিল। সে অন্তরের স্নেহ দিয়া মাতৃহীন শিশুকে জয় করিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আজ সে নাই—আজ কে তাহার হইয়া সাক্ষ্য দিবে? সে যে বিমাতা না

হইয়া সত্যকার মা হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল, এ কথাটা আজ লোককে বুঝাইবার যে উপায় পর্য্যন্ত নাই!

স্বামীর কথাগুলি যে তাহাকে আঘাত করিবার জন্য নহে, তাহা যে স্বামীর হৃদয়ের ক্ষোভ ও দুঃখপ্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

অরুণকে যে সে সত্যই ভালবাসিত—অরুণও যে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, সে বিমাতা বলিয়াই এ কথার প্রমাণ না দিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহার চোখের জলও বোধ হয় সকলে অকপট বলিয়া মনে করিবে না।

তথাপি সুনীতির চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অশ্রু মুছিয়া সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি একবার ঠাকুরপোকে ব'লে দেখ্‌ব?"

"অনর্থক কেন বলবে? সে কবে কার কথামত কায করেছে?"

"তবু আমার ইচ্ছে হচ্ছে, একবার ব'লে দেখি।"

"না, তাতে কায নেই। আমি জেনে শুনে তোমাকে অপমান করাতে চাইনে।" সুনীতি আর কিছু বলিল না।

প্রতাপ একটু পরে আবার বলিল, "অরুণকে দিলীপ ভালবাসত বটে, কিন্তু তাই ব'লে আমি বিয়ে করেছি ব'লে আমার সে কেউ নয়, আমার কোনই দুঃখ হয় নি, এ ভাবা তার উচিত নয়।"

সুনীতি বলিল, "গাছটা কাটা যাওয়ায় আমারই কি দুঃখ হয় নি, বাগানের দিকে সত্যই আমি চাইতে পারছিনে।"

প্রতাপ বলিল, "সে কথা কেউ এখন বিশ্বাস করবে বল?"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই কথাই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। সে রাত্রিতে কাহারও মুখে অন্ন রুচিল না।

প্রভাত হইতেই দিলীপ মাকে লইয়া যাত্রার জন্য সজ্জিত হইল। প্রতাপ গম্ভীর মুখে মাকে প্রণাম করিল। সুনীতি সাশ্রুনেত্রে শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "কি অপরাধে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, মা?" মায়ের চোখে জল আসিল। বধূর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "ছেড়ে যাব কেন মা, আবার আস্‌ব, তোমার কোলে একটি খোকা হোক, আবার এসে তাকে বুকে ক'রে বুক জুড়োব। দিলীপের মনটাও খারাপ হয়েছে, দিন কতক ঘুরে আসুক্।"

দিলীপ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুনীতি বলিল, "আবার এস ঠাকুরপো, রাগ ক'রে থেক না।"

সুনীতির কথার স্বরে এমন একটি কারুণ্যের ভাব ছিল যে, দিলীপ ফিরিয়া আসিবে, এ কথা না বলিয়া পারিল না।

দরজার সম্মুখেই ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত ছিল। মাতা-পুত্রে গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মাতা-পুত্রে যখন ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল, তখনও অরুণের স্মৃতি যেন পিছন হইতে তাহাদের বাড়ীর দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

৪

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দিলীপ মাকে লইয়া উত্তর-ভারতের দুই চারিটি তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীতেই বাস করিতেছে।

এক দিন সুনীতির পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে—"মা, আপনার আশীর্ব্বাদে খোকা কোলে পাইয়াছি। কিন্তু তাহাকে বুঝি বাঁচাইতে পারি না। আমি রোগশয্যায়, কে তাহাকে দেখিবে, কে বাঁচাইবে? আপনি যদি এখন না আসেন, তাহা হইলে পরে আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ঠাকুরপোকে সঙ্গে লইয়া আসুন্।"

মায়ের প্রাণ আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। দিলীপও বলিল, "মা, তুমি যাও।"

মা বলিলেন, "তুই যাবিনে?"

"আমার এখনও দেরী আছে, মা! আমার মন এখনও পাপে ভরা—অরুণের যায়গায় আর এক জন এসেছে, আমার তার উপর রাগই হচ্ছে মা, স্নেহ ত আসছে না। তুমি যাও, কারণ, যাওয়া একান্ত উচিত। আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

তাহাদের গ্রামের ও গ্রামের কাছাকাছি দুই চারি জন কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের পরদিনই দেশে ফিরিবার কথা। দিলীপ তাহার সঙ্গে মাকে দেশে পাঠাইয়া দিল।

দিলীপ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এবার আর তাহার কোন বন্ধন নাই। যৌবনে সে যোগী হইল। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার সঙ্গ করিতে লাগিল। সংস্কৃতে তাহার পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগ ছিল। এক সন্ন্যাসীর উপদেশে শাস্ত্রাধ্যয়নে

মনোনিবেশ করিল। সংসার ভুলিয়া দিলীপ অনন্যমনে শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হইল।

তাহার জ্ঞান ও জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া এক সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি চিরকুমার ও ব্রহ্মচারী—গুরুকুলে অধ্যাপনা করিবে?"

গুরুকুলের নাম সে অনেক দিন হইতে জানিত। তপোবনের মত সে স্থান, বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় বসিয়া সেই বেদাধ্যয়ন, সম্মিলিত কণ্ঠে সেই সামগান, সেই সর্ব্বকল্যাণহেতু ব্রহ্মচর্য্যপালন, এ সকল তাহার মনোমধ্যে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এক অপরূপ আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ সেইখানে সে অধ্যয়নের প্রস্তাব পাইয়া তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মত হইল।

সেই সন্ন্যাসী গুরুকুলের অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষীয় লোক। তিনি দিলীপকে সঙ্গে করিয়া হরিদ্বারে লইয়া আসিয়া তাহাকে কার্য্যে ব্রতী করিয়া গেলেন।

তপস্যার মত দিলীপ কার্য্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আনন্দে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্পাপ সরল শিশুগুলির চিত্ত-শতদল জ্ঞানালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল।

তিনটি বৎসর কোথা দিয়া চলিয়া গেল। এক দিন দিলীপ মায়ের পত্র পাইল।

"বাবা, তোর জন্যে আমরা সবাই পথ চেয়ে ব'সে আছি। তুই ফিরে আয়।

"যেখানে তোদের পোতা শেফালীর গাছ ছিল, সেই কাটা গাছের শিকড় হইতে আবার গাছ বাহির হইয়া ততখানিই বড় হয়েছে। তাতে ফুল ধরেছে—ঠিক যেন অরুণ ফিরে এসেছে।"

আবার সেই অরুণ! যে অরুণকে হারাইয়া সে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী হইয়াছিল, যাহার অভাবে সে পরিশেষে সংসার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহারই স্মৃতি কি তাহাকে সংসারে ফিরাইবে?

অনেক দিনের বিবাগী চিত্ত আবার সংসারের দিকে ফিরিল এবং যখন ফিরিতে চাহিল, তখন তাহার বেগ সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যেমন অতর্কিতে সে গুরুকুলে আসিয়াছিল, তেমনই অতর্কিতে আবার সে গুরুকুল ছাড়িয়া গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইল।

৫

তখন শরতের প্রারম্ভ। গুরুকুলের অধ্যাপকের পরিচ্ছদ—গৈরিকবসনেই যখন সে গৃহে ফিরিল—তখন প্রভাত। চোখের জলের মাঝে মা সন্ন্যাসিপুত্রকে বুকে তুলিয়া লইলেন। মুখে একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উদ্যানে লইয়া আসিলেন।

দিলীপ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, যেখানে সে আর অরুণ মিলিয়া শেফালী-গাছ রোপিয়াছিল, যেখান হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্ঠুর কুঠারের ঘায়ে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইখানটিতে আবার ঠিক যেন সেই শেফালীই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাহার শাখা-প্রশাখা ও মূল বিস্তার করিয়া আকাশ হইতে আলো ও বাতাস এবং মাটী হইতে রস গ্রহণ করিতেছে। বিস্ময়ে, হর্ষে ও বিষাদে দিলীপ গাছের পানে চাহিয়া রহিল। সহসা বাতাস আসিয়া শাখা দুলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শিশিরসিক্ত ফুল দিলীপের কণ্ঠে, বাহুতে, বসনে, চরণে ঝরিয়া পড়িল। সে যেন সেই কতকাল হারাইয়া যাওয়া অরুণের মধুর স্পর্শ; সে স্পর্শের যেন শব্দ আছে—যাহা তাহার কাণে যেন অরুণেরই স্বরে বলিয়া গেল—আমায় ফেলিয়া কেন চলিয়া গিয়াছিলে?

দিলীপের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ঠিক সেই সময়ে একটি পাঁচ বৎসরের বালক আসিয়া তাহার অপরূপ বেশ ও শোকস্নিগ্ধ মুখের পানে পরম কৌতূহলে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার কাকা হও! আমায় কোলে নেবে?"

দিলীপ মুখ ফিরাইয়া অগাধ বিস্ময়ে দেখিল, ঠিক পাঁচ বৎসরের অরুণ তাহারই রোপিত গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কোলে উঠিবার জন্য তাহার পানে হাত দুইটি বাড়াইয়া আছে!

দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া দিলীপ শিশুকে তাহার তৃষিত বক্ষে তুলিয়া লইল। আশীর্ব্বাদের অশ্রু তাহার শিরে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

১২

কালিদাসের দশরথ

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তেষট্টি সর্গের চতুর্দ্দশ শ্লোকে দেখিতে পাই যে,—দশরথ যখন যুবরাজ এবং অবিবাহিত, সেই সময়ে মৃগয়া করিতে গিয়া শব্দ-ভেদী বাণে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে বধ করেন এবং তাহারই ফলে নিহত বালকের পিতা কর্ত্তৃক তিনি অভিশপ্ত হন যে, পুত্রশোকে দশরথেরও প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা ঘটিবে। (রামা, ৬৫ সর্গ, ৫৬ শ্লোক)।

কালিদাস কিন্তু আদি কবির এ অংশের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। দশরথ যখন অযোধ্যার রাজা ও কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এই তিন মহিষী তাঁহার বিদ্যমান, তখন তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া ঐ অপকার্য্য করিয়া বসিয়াছেন। আদিকবির রামায়ণ উপজীব্য করিয়া রঘুবংশ লিখিত হইলেও, অনেক স্থলে এই প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। শুধু রঘুবংশেই নহে, শকুন্তলাতেও কালিদাস ব্যাস-বর্ণিত ঘটনাবলীর বিলক্ষণ অদল-বদল করিয়াছেন। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশীতে ত কথাই নাই। কেন যে এই সব পরিবর্ত্তন, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের কেন যে এই প্রয়াস, তাহা বারান্তরে আলোচ্য। আজ দশরথের বিষয়ই দেখা যাউক।

তরুণী ভার্য্যা কৈকেয়ীর জিদ বজায় রাখিতে গিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দশরথ রামকে নির্ব্বাসিত করিবেন,—এই ঘটনার অবতারণা কালিদাস রঘুবংশে হঠাৎ করেন নাই। এত বড় একটা আঘাত, তাঁহার প্রিয় পাঠকদিগের হৃদয়ে হঠাৎ দিতে, প্রেমিক কবির হাত সরে নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, প্রথমতঃ পাঠকের চিত্ত ঐ অত বড় আঘাত সহিবার মত শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, এবং পরে, পাঠক যখন দশরথকে খুব ভালো করিয়া চিনিয়াছেন, দশরথের দ্বারা কতদূর কি সম্ভব-অসম্ভব,—এটা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সেই হৃদয়ে, কালিদাস, সেই তীব্র যাতনার আগুন জ্বালাইয়াছেন। যাহাতে ছবি আঁকিতে হইবে, সেই "জমিন" আগে অঙ্কনীয় চিত্রের উপযুক্ত করিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া, ঠিকমত তৈরী করিয়া, তবে তাহাতে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

মৃগয়া করিতে যাইবার পূর্ব্বে, দশরথ মহিষীদিগের সহিত, উপভোগক্ষম বসন্তকালকে, যতটা সম্ভব ততটা, অথবা তাহারও অনেক বেশী রকমে উপভোগ করিতেছেন। ভোগী দশরথ ভোগের কোন সাধই অপূর্ণ রাখিতেছেন না। ভোগের পর মৃগয়ায় সাধ হইল। এই সময়ে কবি, তাঁহার একটি বিশেষণ দিয়াছেন—"বিলাসবতী-সখ" (রঘু, ৯ম, ৪৮)। ইতিপূর্ব্বে দিলীপ, রঘু এবং অজ—এই তিন জন রাজার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি, এক্ষণে দশরথের পরিচয় পাইলাম। ঐ তিন জন এবং দশরথ—ইহার মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ ভোগ-তৃষ্ণার পরিচয় পাই নাই, এইবার পাইলাম। দেখিলাম, দশরথ বিলাসিনীদের পরম সখা। মধুময় বসন্তকালের এই সম্ভোগবৃত্তান্ত বর্ণনে এবং "বিলাসবতী-সখ" এই বিশেষণে, কালিদাস অতি সতর্কহস্তে দশরথ-চরিত্রের একটা দিক্ একটু দেখাইলেন। এই দিকটা বুঝি একটু দুর্ব্বল ছিল এবং এই দৌর্ব্বল্যেরই চরম ফল তাঁহার রামের বনবাস ও অপমৃত্যু।

দশরথ বসন্তোপভোগের পরই মৃগয়ায় গেলেন। প্রবৃত্তি-রূপ দুর্দ্দম অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে ছুটিয়া চলিল। একবার যিনি ভোগের হাতে পড়িয়াছেন, তাঁহার হঠাৎ ফিরিয়া আসা, প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করা বড়ই কঠিন। দশরথ প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ একবারে যেন নুইয়া পড়িল।

মৃগয়া করিতে গিয়াও দশরথ স্বীয় হৃদয়ের এই কোমলতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মৃগয়াকারী ব্যক্তি যদি কোন কারণে লক্ষ্যকৃত শরব্যে বাণক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হন, কিংবা শরব্যই যদি কোন কারণে তাহার বধকর্ত্তার অব্যর্থ-সন্ধান বাণ ব্যর্থ করিতে পারে, তবে তাহাতে যে মৃগয়াকারীর কতদূর মনঃক্লেশ জন্মে, তাহা যাঁহারা শিকারপ্রিয়, তাঁহারাই জানেন। শিকারী তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। দশরথ কিন্তু তাহা হন না। তিনি লক্ষ্যকৃত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিতে করিতেও করেন না, ছাড়িয়া দেন। হরিণ রাজার বাণে নিহত হয় হয়—দেখিতে পাইয়া, তাড়াতাড়ি যেমন কাতর হৃদয়া হরিণী আসিয়া নিজের দেহে তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, অমনই

প্রেমিক দশরথ সেই হরিণ-দম্পতিকে মুক্তি দেন। অমন প্রণয়ে আঘাত করিতে প্রণয়ী দশরথের হাত সরে না, (রঘু, ৯ম, ৫৭)। এইরূপ এক একটি চিত্রে কবিচূড়ামণি ধীরে ধীরে রাজ-হৃদয়ের এক একটি স্তর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঠকদিগকে দেখাইতেছেন।

বাণক্ষেপে উদ্যত দশরথের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণভয়ে আকুল হইয়া মৃগ ছুটিতেছে। রাজা এই বাণ মারেন আর কি। এমন সময়ে সেই পলায়মান মৃগের ভয়-চকিত নয়নের দিকে রাজার দৃষ্টি পড়িল, আর অমনই তাঁহার হৃদয়ে তদীয় মৃগাক্ষী মহিষীর চঞ্চল ও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন ভাসিয়া উঠিল, সে মৃগ আর হনন করা হইল না। এতই প্রেমার্দ্র রাজার হৃদয় (রঘু, ৯ম, ৫৮)।

কালিদাস বহির্জগতের প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য যেমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন এবং অপরকেও দেখাইতেন, অন্তর্জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিও তদ্রূপ নিজে যেমন দেখিতেন, অন্যকেও তেমনই দেখাইতেন। মহারাজ দশরথের হৃদয়-বৃত্তি যে কিরূপ মৃদু, কীদৃশ নবনীতবৎ কোমল ছিল, তাহা কবি উপরিস্থিত ঐ দুইটি চিত্রের দ্বারা (৫৭, ৫৮) অতি-স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন। হৃদয়ে এতাদৃশ মৃদুত্বের অতি-প্রভাব পরাক্রান্ত নৃপতির পক্ষে অপ্রশংসনীয় না হইলেও স্থল-বিশেষে ইহাতে অনেক কুফল ফলিয়া থাকে। এই অতি-মৃদুত্বরূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়াই অনিন্দ্যসুন্দরী কৈকেয়ী রাজ-হৃদয় অবনমিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিদায় দেওয়াইয়াছিলেন।

উপরিস্থিত আটান্ন শ্লোকে কালিদাস এমনই একটি ক্রিয়া-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা দশরথের হৃদয়ের অন্তঃ-কক্ষটা যেন একবারে খুলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রিয়তমার সতত-চকিত নয়ন মনে পড়ায়, বাণক্ষেপোদ্যত রাজার হাতের মুষ্টি "বিভিদে" অর্থাৎ আপনিই শিথিল হইল। এই স্থলে "ভিদ" ধাতু কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। হরিণের ত্রাস-চঞ্চল নয়ন-দর্শনে যেমন প্রেয়সীর সতত-চঞ্চল অক্ষিদ্বয় মানস-দর্পণে ভাসিয়া উঠিল, অমনই রাজার অজ্ঞাতসারে যেন তদীয় কর্ণান্তকৃষ্ট দৃঢ়মুষ্টি আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল। এ স্থলেও দেখিতেছি, রাজা অপেক্ষা রাজ-হৃদয় বলবত্তর। অদূর-ভবিষ্যতে দশরথের যে চিত্র কবি উপস্থাপিত করিবেন, এখন হইতেই তাহার "ব্যাক গ্রাউণ্ড" প্রস্তুত করিতেছেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া রাজা চলিয়াছেন। আশে-পাশের বন-ময়ূরগুলি উড়িয়া পলাইতেছে। ইচ্ছা করিলেই রাজা মারিতে পারেন। একটু ইচ্ছা হইয়াছিলও বটে, কিন্তু ময়ূর আর মারা হইল না। তাহাদের সহস্র-চন্দ্রক সুন্দর পুচ্ছভার দর্শনে, পরিতৃপ্তির স্পৃহণীয় তন্দ্রায় অলস-কায়া আলুলায়িত-কুন্তলা প্রিয়তমার শিথিল কেশপাশ এবং কবরীগলিত নানাবর্ণ কুসুমের মালা প্রভৃতি কত কি সম্ভোগের ছবি রাজার মনে জাগিয়া, তাঁহাকে একান্ত বিমনা করিয়া তুলিল। সব যেন ভুলিয়া গেলেন। (৯ম ৬৭)। ময়ূর আর মারা হইল না। এই সমুদায় বর্ণনায়, কবি বুঝাইতেছেন যে, কি উপাদানে দশরথ-হৃদয় গঠিত। কোন অবস্থাতেই তাহা মৃদুত্বের, প্রণয়ের, মোহের হাত এড়াইতে পারে না। প্রাণিবধের সময়ে বধ-কর্ত্তার চিত্তে যে রসের আবির্ভাব আবশ্যক, মৃগয়া-রত দশরথের এই "গতমনস্কতা" তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি আরও একটু খুলিয়া ধরিয়া কৈকেয়ী-বল্লভ দশরথের হৃদয়ের আরও দুই একটি স্তর দেখাইলেন।

এই ভাবে দর্শকদিগের হৃদয় ক্রমে দশরথ-চিত্তের প্রকৃত স্বরূপবোধের অনেকটা উপযোগী করিয়া, কবি, উনসত্তর শ্লোকে দশরথ-মূর্ত্তির অভ্যন্তরভাগ যেন অতি সতর্ক হস্তে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর আমরা দশরথের সেই ব্যবচ্ছিন্ন আন্তর দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকা দেখিতে পাইতেছি এবং তাহাদের কোন্‌টির কোথায় কোন্ রক্তের স্রোত কি ভাবে বহিতেছে, তাহা বুঝিতেছি। চতুরা কামিনী যেমন পুরুষের অনুরক্তির মাত্রা বুঝিয়া, ধীরে ধীরে তাহাকে একবারে তন্ময়, কামিনীময় করিয়া তোলে এবং পরে ক্রীড়া-কন্দুকের মত সেই পুরুষরূপী প্রাণীটিকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করে, মৃগয়াও দশরথকে সেইরূপ করিয়া তুলিল। মৃগয়াকারী সাজিয়া তিনি রাজার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন। (৯ম ৬৯)। দিলীপ-রঘু-অজের সুরাসুর-স্পৃহণীয় পবিত্র সিংহাসনের কথা বিস্মৃত হইলেন। ইহাও তাঁহার চিত্তের ঘোর অধঃপতনের চিত্র। তাঁহার কোমলহৃদয় এতই ভাব-প্রধান যে, অতি অল্পেই তাহা ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইত, স্রোতের প্রতিকূলে ফিরিবার বা ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য দশরথের ছিল না। রাজরাজেশ্বর হইয়াও এ অংশে তিনি মুগ্ধা ললনার ন্যায় ছিলেন এবং ইহার কুফলও তাঁহাকেই পদে পদে ভুগিতে হইয়াছে।

এই ভাবে, কবি, দশরথের পরিচয় ও তদীয় হৃদয়ের স্বরূপ দর্শকদিগকে সবিস্তর বুঝাইয়া দিয়া, ঐ প্রকার হৃদয়ের পতনের প্রারম্ভভাগ এক্ষণে দেখাইতেছেন। দশরথের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। কোনরূপ ব্যসনের যে অধীন, তাহার যে গতি হয়, দশরথেরও সেই গতি হইল। ভ্রান্তি বশতঃ তিনি ঘোর অকার্য্য করিয়া বসিলেন। হস্তীর নিধন রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ, এ কথা তিনি জানিয়াও ভুলিয়া গেলেন এবং হস্তী বধ করিতে গিয়া এক ঋষিপুত্রকে বধ করিয়া বসিলেন। (৯ম, ৭৪)। হস্তি-বধে যে অপকর্ম্ম হইত, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল। কুকর্ম্মের দস্তুরই এই। এক আনা করিতে গেলে হইয়া বসে ষোল আনা। এ স্থলেও তাহাই হইল। তাই কবি, "তিনি অপথে পদার্পণ করিলেন" (৯ম, ৭৪) বলিয়াই তদীয় ভাবী জীবনের ধারা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন।

দশরথের শব্দভেদী বাণে বেতস-লতাবৃত বালক সিন্ধু যখন "হা তাত" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন তমসার তটোত্থিত সেই আর্ত্তরবে আদিকবি বাল্মীকির ন্যায় সূর্য্যবংশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর হৃদয়ও বুঝি ব্যথায় কম্পিত হইল। ইন্দুমতীর অকাল-মরণে এবং পত্নীপ্রাণ ইন্দুমতীবল্লভ অজের প্রায়োপবেশনে অযোধ্যার রাজ-সংসারে যে অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছিল, এবার দশরথ-কৃত এই ঋষিপুত্র-হত্যায় সেই ছায়া আরও গাঢ়তর হইল। বুঝা গেল যে, সূর্য্যবংশের সুগঠিত ও বিরাট্ প্রাসাদের গাত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে ও ক্রমেই বাড়িতেছে। অজের শোকাশ্রুদিগ্ধ সিংহাসনে সজল নয়নে অভিষিক্ত হওয়াতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, দশরথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নহে, আবার এখন এই দুর্ঘটনায় আরও বুঝা গেল যে, দশরথ অতিশয় দুরদৃষ্ট ব্যক্তি এবং সূর্য্যবংশের ভবিষ্যৎ বড়ই তমসাচ্ছন্ন। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সূর্য্য-বংশীয় নৃপতির কর্ম্মদোষে আজ পবিত্র কুলে পাপস্পর্শ হইল।

এই ভাবে দশরথকে লোকসমক্ষে পরিচিত করিয়া কবি-কেশরী কালিদাস তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিলেন। ইন্দুমতী-বিনাশের পর পিতা অজ একটা বিষম অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালা বক্ষে লইয়া উদ্যান-বাটিকা হইতে রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধুমুনি-হত্যার পর, পুত্র দশরথ একটা বিরাট্ অভিসম্পাতের সন্তপ্তবাহিনী তীব্র জ্বালা বক্ষে লইয়া অরণ্য হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, বহিঃ-প্রশান্ত বারিধির বক্ষঃ যেমন বাড়বানলে পুড়িয়া যায়, অন্তর্লীন-বহ্নি শমীবৃক্ষ যেমন অন্যের অগোচরে পুড়িতে থাকে, অভিশপ্ত দশ-রথের হৃদয়ও তদ্রূপ নিশিদিন ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিল।

রঘুবংশের আদ্যন্ত কালিদাস একটা সত্যের সংরক্ষণ করিয়াছেন। যে বিষয় বাল্মীকি কর্ত্তৃক সবিস্তর বর্ণিত, তাহা যেমন কালিদাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনই আবার যাহা বাল্মীকি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, কালি-দাস কর্ত্তৃক তাহা অতি বিস্তৃতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য কবিতার সহিত কোন স্থলেই অনার্য কবিতার তুলনায় সমালোচনার সুযোগ ঘটে নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

নারী-স্তুতি

ওগো নারী, প্রীতিময়ী, মায়াময়ী তুমি
বিধাতার শুভাশীষ সনে—
বেদনা-যাতনা হোক্ যতই অসহ—
সহিতে তা পারো অকাতরে !
দুঃখ-দৈন্য-ঝড় তুলি আসিলে গর্জিয়া
অচপলা—পারো রুখিবারে—
ছোট-বড় অভিযোগ-অশান্তি লাঞ্ছনা
চিত্ত তব পরশিতে নারে।
রোগে রাত্রি-জাগরণ সংসারের কাযে
দেহ-মনে ধরো কত বল !
শত তুচ্ছ কাযে আর সহস্র ফরমাসে
হাস্যময়ী থাকো অবিচল !…
কিন্তু হায়, আরশুলায় দ্যাখো যদি ফরফরিয়া ওড়ে—
চীৎকারিয়া মূর্চ্ছা যাও আলুথালু—বৃক্ষসম ঝড়ে !

ওগো নারী চির সান্ত্বনা দায়িনী—
শান্তি ঢালো অশান্ত চিতে।
মানুষ গড়িতে পারো, অমানুষে গড়ো
মমতায় ঘেরি চারিভিতে।
বাজারের মন্দ হাতে চাকরের চুরি ধরো,
ভ্রূক্ষেপ করো না তবু তায়—
মুখে নাহি রোষ-চিহ্ন, কটু তার তিরস্কার—
এত ধৈর্য্য—তুলনা কোথায় !
দুরন্ত স্বামীর রোষ, ক্রূর অবহেলা
থাকিতে পারো তা' বেশ সয়ে—
দুষ্ট ছেলে, চোর ভৃত্য, দাসী নিদ্রাতুরা—
অচপল আছো সবে লয়ে !
কিন্তু যদি কোনো কালে ছল ধরি স্বামী তর্ক তোলে—
জ্বালাময়ী ঝঞ্ঝাময়ী, ধরণীরে দাও রসাতলে !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাস

ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, লেখার উদ্যোগ চলিতেছে। প্রাচীনকালের—এমন কি, মুসলমান যুগের প্রাদেশিক ইতিহাসের মাল-মসলা এত অল্প বা এমনভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহার সাহায্যে লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু ইংরাজী আমলের কাগজ-পত্র এখনও নষ্ট হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন জমীদারবর্গের কাগজ-পত্র হয় ত এখনও পাওয়া যাইতে পারে। সরকারী দপ্তরেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান্ উপাদান এখনও মজুদ আছে। অনেকের ধারণা যে, ইংরাজী আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কিছুই নাই, জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ধারণা একবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। রাজ-দরবারের বড় বড় ঘটনার কথা হয় ত আমরা জানি, কিন্তু রাজ-দরবারের ইতিহাসই দেশের ইতিহাস নহে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা, হাট-বাজারের অবস্থা, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এক প্রকার অজ্ঞ বলিলেই হয়। এক সময়ে আমাদের ধারণা ছিল যে, বক্তিয়ার-পুত্র মহম্মদ সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর সঙ্গে যেমন লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, অমনই সমস্ত বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি বিনা যুদ্ধে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। পশ্চিম-বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার বহু পরেও যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল, তাহা এখন বিদ্যালয়ের বালকরাও জানে। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর অতি অল্প আয়াসেই ইংরাজরা বঙ্গদেশে তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। মীরকাশিমের ক্ষণিক প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালী জাতি এক রকম বিনা আপত্তিতে ইংরাজের রাজত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্টরের মহাফেজখানায় এখনও যে সমস্ত চিঠি-পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পলাশীর পরাজয়ের—এমন কি, মীরকাশিমের পতনের পরও বাঙ্গালী জমীদাররা ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। আমরা কখনও জাতি হিসাবে দলবদ্ধ হইয়া বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি নাই। জাতীয়তার ভাব ও দেশাত্মবোধ এ দেশে জন্মিয়াছে ইংরাজী শাসনের ফলে। যত দিন জমীদারের নিজের স্বার্থ আহত হয় নাই, তত দিন মুর্শিদাবাদের মসনদ কে দখল করিল, অথবা বাঙ্গালার সুবেদারী ফার্ম্মান কাহার নিকট পৌছিল, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার খোঁজ-খবর রাখা সুদূর মফঃস্বলের জমীদাররা আবশ্যক মনে করেন নাই; কিন্তু যখনই তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছে, তখনই তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৭৮১ ও ৮২ খৃষ্টাব্দের কয়েকখানি অপ্রকাশিত ইংরাজী পত্র হইতে এই সময়কার কয়েকটি জমীদার কিরূপ দুর্দ্দম ছিলেন, তাহা বুঝা যাইবে।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ মিঃ হল্যাণ্ড ঢাকা হইতে বাখরগঞ্জের আদালতের জজ রৌটনকে দুই জন চৌধুরীর সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ:—"গঙ্গাপ্রসাদ এবং রাজচন্দ্র চৌধুরীর মত দুর্দ্দান্ত লোকের কথা আমি জানি। বহু দিবস পর্য্যন্ত তাহারা একটি ডিক্রী অমান্য করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনতাই অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বন্দোবস্তের সময় ঢাকায় উপস্থিত না হওয়ায় তাহাদের চৌধুরাই বেচারাম চাটার্জ্জিকে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু সে এখনও ঐ সম্পত্তিব দখল লইতে পারে নাই। উহারা মফঃস্বলে থাকিলে নানারূপ হাঙ্গামা করিবে বিবেচনা করিয়া আমি উহাদিগকে ঢাকায় আনিতে এক জন হাবিলদার ও চারি জন সিপাহী পাঠাই। কিন্তু উহারা অনেক লোক জমায়েত করিয়াছে শুনিয়া স্থানীয় আমীনকে তাহার লোকজন সহ হাবিলদারকে সাহায্য করিতে বলি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন যে, দুই শত রায়বাঁশের সাহায্য লইয়াও উহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" গঙ্গাপ্রসাদ ও রাজচন্দ্র যে খুব টাকাওয়ালা লোক ছিলেন, তাহা নহে। মিঃ হল্যাণ্ডের পত্রেই প্রকাশ যে, তাঁহাদের সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার ৯ শত ২৪ টাকা মাত্র। কিন্তু তখনও ইংরাজের শাসন বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আইনের ভয় তখনও মফঃস্বলবাসীর অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় নাই, তখনও

বাঙ্গালী হিন্দুরা লাঠি ধরিতে জানিত, তাই বার্ষিক ৩ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক দুই জন চৌধুরী ইংরাজ সরকারের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইয়াছিল।

মিঃ হল্যাণ্ডের আর একখানি চিঠিতে প্রকাশ যে, ভুলুয়ার জমীদাররাও সরকারী শাসনকে মোটেই ভয় করিতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মিঃ হল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিটীর সভাপতির নিকট লিখিয়াছিলেন, "জগাদিয়া-সংলগ্ন এক খণ্ড জমী লইয়া ভুলুয়ার নরনারায়ণ চৌধুরী ও জগাদিয়ার রামগোবিন্দ চৌধুরীর বিবাদ সম্বন্ধে আপনাদের আদেশপত্র পাইয়াছি। রামগোবিন্দের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। কিন্তু নরনারায়ণ যে নামজাদা ডাকাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ৫০।৬০ জন সিপাহী পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় নাই। সরকারের বিবেচনায় সে বহু দিন পর্য্যন্তই বিদ্রোহী (outlaw) বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি সে ভুলুয়া পরগণার কিছু জমী দখল করিতেছে এবং সেখানে তাহার প্রতিপত্তিও খুব বেশী। ঢাকায় সৈন্য এত কম যে, তাহাকে আক্রমণ করিতে পাঠাইবার মত লোক আমার নাই। প্রয়োজনীয় লোক আসিলেও সে অনায়াসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই জন্য আমি ভুলুয়ার ইজারাদারের নিকট নরনারায়ণকে প্রতারণা পূর্ব্বক গ্রেপ্তার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছি।"

নরনারায়ণ কেবল ইংরাজ সরকারের ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভুলুয়া পরগণার আর এক জন জমীদার শিবচাঁদ ইংরাজ সরকারের দুইখানি খাজানার নৌকা লুঠ করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ড এতৎসম্পর্কে তাঁহার উপরিওয়ালাদিগকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুঃসাহসী দস্যুরাও গরীব ও নিঃসম্বল লোকের ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু সরকারী রাজস্বে হাত দিতে সাহস করে নাই ; কারণ, তাহাদের ভয় ছিল যে, তাহা হইলে খুব জোর তদন্ত চলিবে।—এই পরগণার আর এক জন জমীদার নরনারায়ণও দস্যু বলিয়া পরিচিত। তাহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে দখল ছাড়ে নাই।

ঐ বৎসরেই ২৪শে এপ্রিল হল্যাণ্ড তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে লিখিয়াছিলেন যে, "ঢাকা জেলার অনেক পরগণায় জমীদার ও অধিবাসিগণ এরূপ দুরন্ত ও অবাধ্য এবং সদা-সর্ব্বদাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যে, পরগণায় পরগণায় সিপাহী না বসাইলে খাজানা আদায় হইবে না।"

ঢাকার মহাফেজখানায় এ রকমের চিঠিপত্র আরও অনেক পাওয়া যাইবে, কিন্তু একখানি চিঠি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, পলাশীর যুদ্ধের ২৫ বৎসর পরেও পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারগণ ঢাকার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। জমীদারদিগের সহিত ইংরাজ সরকারের এই সংঘর্ষের ইতিহাস আজিও লেখা হয় নাই। অথচ এই ইতিহাসই ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রকৃত ইতিহাস।

কালেক্টরী মহাফেজখানার কাগজ-পত্রে কেবল যে জমীদার-দমনের ইতিহাসই পাওয়া যাইবে, তাহা নহে, নাওসরা মহলের শেষ পরিণাম, সেকালের বাজার দর, বিবিধ প্রকারের আলোচনা, স্বদেশী শিল্পের কিছু কিছু বিবরণও এই সকল কাগজে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঢাকার চিফ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের বাজার দরের যে তালিকা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা বোধ হয় একবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চাউল—বাখরগঞ্জ, টাকায় ২ মণ ; আজিমগঞ্জ, টাকায় ২॥০ মণ ; কিশোরগঞ্জ, টাকায় ২ মণ।

কলাই—টাকায় ২॥০ মণ ; খেসারি ডাল—টাকায় ২ মণ।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের প্রচলিত দামের তুলনায় এখন আহার্য্য বস্তুর দাম কিরূপ চড়িয়াছে, তাহা হিসাব করা কঠিন নহে।

বড় লাট হেষ্টিংসের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের ক্ষমতা লইয়া বিরোধের কথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ঐ বিরোধেরই ছোট-খাট অভিনয় যে জেলায় জেলায় চলিতেছিল, তাহা সকলের জানা না থাকিতেও পারে। ঢাকার কর্ত্তা হল্যাণ্ডের সঙ্গে বাখরগঞ্জের জজ রৌটনের যে বিবাদ হয়, তাহার ফলে রামচন্দ্র চাটার্জ্জি নামক এক জন আমীনকে অনেক হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই আমীন মহাশয় ঢাকার হুকুম অনুসারে বাহাদুরপুর পরগণা বাটোয়ারা করিতে যান। বাখরগঞ্জের জজ রৌটন ইহাতে তাঁহার

আদালতের ক্ষমতার অপমান করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া চাটুর্য্যে মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দেন। সেখানে সরকারী এটর্ণী চাটার্জ্জির পক্ষে ওকালতী করিয়াছিলেন। চাটার্জ্জি খালাস পাইলেও তাহার পরবর্ত্তী আমীনকে আবার জজ রৌটন গ্রেপ্তার করিয়া বাখরগঞ্জে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বিচার ও শাসন বিভাগের বর্ত্তমান সম্বন্ধ সম্পর্কে এই পূর্ব্ব-ইতিহাস নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সরকারী দপ্তরখানার ও মহাফেজখানার কাগজ-পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হইল। আশা করি, এই দিকে ইতিহাসানুরাগী সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। কাগজ চিরস্থায়ী নহে। অনেক কাগজ-পত্র পোকায় নষ্ট করিয়াছে। অনেক কাগজের লেখা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইতেছে। জেলায় জেলায় এই সকল কাগজ বিক্ষিপ্ত। অতএব এই সকল কাগজ-পত্র হইতে বাঙ্গালা দেশের আধুনিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

(অধ্যাপক) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (পি, এচ, ডি)।

নববর্ষ

হে জননি বসুন্ধরে আজি পুন বর্ষ পরে
পূর্ণ তব মণ্ডল-ভ্রমণ—
বেড়িয়া তপন।
পুন সেই ঋতু মাস, শীত-গ্রীষ্ম সুপ্রকাশ,
অভিনব চির-পুরাতন।
বিকচ বসন্ত-হাসি, বরিষার অশ্রুরাশি—
ক্রমে ক্রমে হিমে জমে তুষার-পতন,
কভু শরতের শশী হাসায় গগন।

প্রেমের পুলকভরে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ক'রে
সৃজি সতী দিবাপতি স্থাপিল তোমায়—
নভ নীলিমায়।
তরুণ অরুণ কর চুম্বি তব বিম্বাধর
অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধে কায়;
উন্মাদিনী সম ধাও, জুড়াতে না স্থান পাও,
কি ভাষে কি গাথা গাও মূক বেদনায়,
গণিতেছ অনুদিন কাহার আশায়?
অন্তরে বাহিরে জ্বালা হেরি, ঘেরি মেঘমালা
তাপ তব করিতে নির্ব্বাণ—
করে বারিদান।
সাগর ভূধররাজি শোভিল তুষারে সাজি,
আনন্দে নির্ঝর তোলে তান;
ক্রমে এল তৃণ শাখী, দীর্ঘকায় পশুপাখী,
হে জীব-জননী তব আদিম সন্তান—
তবু শান্ত নহে তব অশান্ত পরাণ।

ক্রমে কত দিন পর শাখামৃগ রূপান্তর—
বসে নরনারী সনে বাঁধা করে কর—
সজ্জিত বাসর।
প্রকাশিতে ভালবাসা শিখাইলে প্রেমভাষা,
তব মূক প্রেম দেখি হইল মুখর;
হেরি মুগ্ধ প্রেম-ছবি গায় পাখী বন-কবি
কোমল কঠোর কণ্ঠ ঝরে সুধা-স্বর,
নববর্ষ হর্ষভরে এল ধরা'পর।

ফিরিল সময়-ধারা, আনন্দে আপন-হারা
ফুল ফল তরুলতাচয়—
নব কথা কয়।
সেই সে স্বভাব-ছবি, জল স্থল শশী রবি—
মনে হয় এ যেন সে নয়!
লভিয়ে প্রেমের স্পর্শ সমুদিত নববর্ষ,
জরা দেহে প্রেমে পুনঃ যৌবন উদয়,
প্রেমের প্রভাবে ধরা হ'ল মধুময়।
ভাব-রস সম্মিলনে বিচিত্র মানব-মনে
ক্রমে হ'ল অভিনব জগৎ সৃজন—
অনন্ত ভুবন।
এল ষড়্ঋতু স্থলে ষড়্‌রিপু মহাবলে,
জটিল স্বার্থের ছলে কুটিল মিলন।
নাহি সে সত্যের মেলা কলিতে পাশব খেলা
নববর্ষ কর নর-পশুত্ব হরণ—
সার্থক হউক তব শুভ আগমন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শশী সরকারের শুভ-বিবাহ

(গল্প)
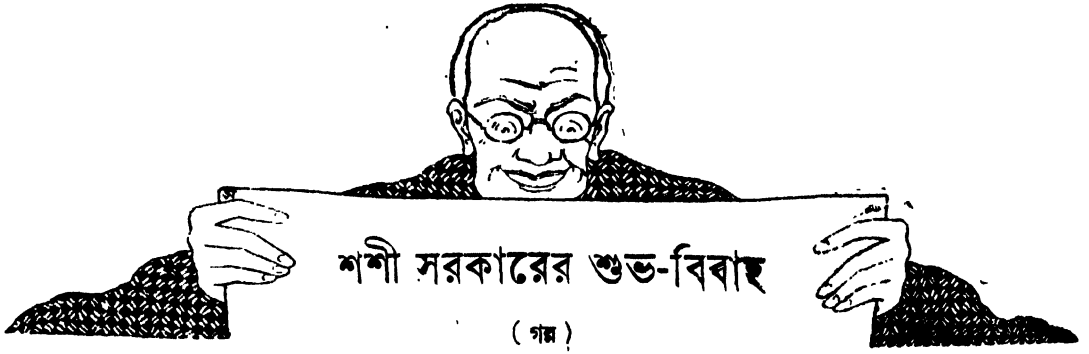
প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের অপরাহ্নে শশী সরকার তাহার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এক হাতে শটকার নল ধরিয়া তামাক খাইতেছিল আর এক হাত মস্তকের প্রকাণ্ড টাকটির উপর ধীরে ধীরে বুলাইতেছিল।

টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইহাই ভাবিতেছিল যে, তাহার অবর্ত্তমানে ছোঁড়াটা—অর্থাৎ শ্যালিকাপুত্র হাবু—বিষয়-আশয় কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না, যেহেতু, প্রায় ঘণ্টা দুইয়েকের উপর কাছারী-বাগানের আমকয়টা পাড়াইয়া আনিতে গিয়া এখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরিল না। বাড়ী হয় ত এক সময়ে সে ফিরিবে, কিন্তু, ছোঁড়ার যে রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি, হয় ত শূন্যহাতেই ফিরিবে, আমগুলা আর ঘরেই আসিয়া পৌঁছিবে না, পথেতেই সব বিতরণ হইয়া যাইবে।

কলিকার আগুন টানে টানে যেমন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, হাবুর কথা ভাবিতে গিয়া তাহার প্রতি তাহার অন্তরও তেমনই অল্প অল্প জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ তামাকের টানে ও হাবুর চিন্তায় বাধা জন্মাইয়া দিয়া যে লোকটি দরজা ঠেলিয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে চাহিয়া শশী সরকার বলিয়া উঠিল,—"কি হে, বলাইচন্দর যে! বাড়ী এলে কবে?"

"এসেছি ত আজ তিন চার দিন হয়ে গেল, খোঁজ-খবর ত আর নেন না, বাড়ী থেকেও বা'র হ'ন না,—তবু যদি দাদার আমার ঘরে বৌদি থাকতো!"

"আরে ভায়া, বৌদি তোমার নেই বলেই ত হাত-পা-ভাঙ্গা হয়ে প'ড়ে রয়িছি। ঘরে তোমার বৌদি থাকলে কি আর এই রকম—জবু-থবু হোয়ে থাকতুম, তা হ'লে তোমাদের মতই—চরকী ঘুরতুম, ভায়া, চরকী ঘুরতুম।"

"সত্যি দাদা, বাড়ী থেকে বুঝি আর বার-টার হন না?"

"বেরুব কি,—আর পারি না। একটু ঘোরাঘুরি করলেই হাঁফ ধ'রে আসে। নানান্ রোগে ধরেছে শরীরকে চেপে! আর তা ছাড়া, কি জান ভায়া, ঘরে মেয়েছেলে কেউ থাকলে শরীরের তবু একটু তোয়াজ হয়, আমার হ'ল একেবারে নিরিমিষ সংসার!"

"আচ্ছা দাদা, সেবার এসে শুনে গেলুম, বিয়ের জন্যে চেষ্টা-চরিত্তির কচ্ছেন, তা তা'র কি হ'ল দাদা?"

"ওরে ভাই, ছেড়ে দাও ও সব কথা। এ গাঁয়ের মত দুষ্টু গাঁ কি আর আছে! নেহাৎ বাপ-ঠাকুদ্দার আমলের বাস, তাই এ গাঁয়ে প'ড়ে থাকা, নইলে ঝাঁটা মেরে কবে এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যেতুম। নীলমণি বাঁড়ুয্যে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে ক'রে আনলে, তা'র মাথার বেঠিক হ'ল না; কেন না, সে হ'ল আধখানা গাঁয়ের মালিক, আর আমরা হলুম গরীব; তাই কথায় কথায় আমাদের মাথার দোষ হয়ে যায়, আমরা হই পাগল।"

"আচ্ছা দাদা, আপনারও ত চল্লিশের ওপর হয়েছে?"

শটকার নলটাকে ঠেলিয়া রাখিয়া, উত্তেজিত স্বরে শশী সরকার বলিয়া উঠিল,—"আরে, তাতে কি? আসুক দেখি নীলু বাঁড়ুয্যে একবার আমার সঙ্গে গায়ের জোরে? ঐ অত বড় হাতীর মত শরীর যদি আমি তুলে আছাড় দিতে না পারি ত আমার নামই——। সে দিন, আমার খিড়কীর অত বড় জামগাছটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চেলিয়ে কাঠ ক'রে——উঃ—হু—হু! বলাই! বলাই!"

হঠাৎ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া শশী সরকার সেই-খানেই কাত হইয়া ঢলিয়া পড়িল। বলাই ব্যস্ত হইয়া একবারে তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—"কি হ'ল দাদা?"

মিনিটখানেক চোখ বুজিয়া নীরবে তেমনই ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর একটু সুস্থ হইয়া শশী সরকার উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"জোরে কথা কইতে গিয়ে হঠাৎ বুকের ভেতর একটা ব্যথা——ব'স ভাই, একটু দম নি। অনেক কথা আছে, যেও না।"

শশী সরকার—একটু সুস্থ হইলে বলাই তাহার সঙ্গে আরও দুই একটা কথা কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, শশী জিজ্ঞাসা করিল,—"হাতে ও কি বই, ভায়া? যুদ্ধের খবর টবর কিছু আছে না কি?"

বলাই কহিল—"না দাদা, যুদ্ধের খবর-টপর এতে নেই, এটা একটা মাসিকপত্র—গল্প আছে, পড়বেন?"

"আরে, একটু বোসোই না ভায়া! কি গল্প, একটা তুমিই পড়, শোনা যাক।"

বলাই আবার বসিল এবং তাহার হাতের পত্রিকাখানি খুলিয়া একটি গল্প পড়িবার উপক্রম করিলে শশী কহিল,—"একটু দাঁড়াও ভায়া, কল্‌কেটাতে একটু আগুন দিয়ে আনি।"

তাহার পর বলাই গল্প পড়িতে লাগিল, আর শশী সরকার শটকা টানিতে টানিতে সেই গল্প শুনিতে লাগিল।

এক স্থানে শশী কহিল,—"এইখানটা আর একবার পড় ত, ভাল ক'রে শুনি নি।"

বলাই পড়িতে লাগিল—"সপ্তদশবর্ষীয়া মন্দাকিনী স্বামি-গৃহে আসিয়া তাহার বৃদ্ধ স্বামীর জর্জ্জরিত অন্তরের উপর যেন শান্তির চন্দন-প্রলেপ মাখাইয়া দিল। মন্দার সাহচর্য্যে গঙ্গা-চরণ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল। তাহার বাহান্ন বৎসরের দেহ ও মনের উপর দিয়া যৌবন-তরঙ্গ যেন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।

মন্দা খায় দায়, হাসে খেলে, বেড়ায়; হার্ম্মোনিয়ম লইয়া দক্ষিণের জানালা খুলিয়া—গান গায় আর গঙ্গাচরণ চব্বিশ ঘণ্টাই তাহার কাছে কাছে ফেরে। কখন বা গঙ্গাচরণের হাত ধরিয়া মন্দা কহে,—'ওগো অমুকচরণ মশাই, ওই চরণে স্থান দেবে?' গঙ্গাচরণ অমনি মন্দাকে তাহার বুকের হাড়ের মধ্যে টানিয়া কহে—'তোমার স্থান এইখানে মন্দা'!"

তামাক শুধু শুধুই পুড়িয়া যাইতেছিল। গল্পটি শেষ হইলে, শশী সরকার আবার শট্‌কাটি হাতে করিয়া একান্তমনে টানিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া যখন চাহিল, তখন বলাই সদর-দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শশী সরকার তাড়াতাড়ি রাস্তায় আসিয়া বলাইকে ডাকিয়া ফিরাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"এ বই কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, ভায়া? বড় চমৎকার গল্প। আমাকে একখানা আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু। যা দাম হয়, এখন না হয় নিয়ে রাখ।"

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাঁওতালপাড়ায় সুদের তাগাদা করিয়া বেলা প্রায় প্রহরেকের সময় শশী সরকার গৃহে ফিরিয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল,—"বেরুবার সময়ই বুঝেছিলুম যে, আজ আর হাত চিৎ করতে হবে না! কোন হারামজাদার কাছ থেকে আজ আর একটা পয়সা আদায় করতে পাল্লুম না। সুরো বষ্টুমের মকদ্দমার দিন আজ, তা চুঁচড়োয় যে যাবো, তা' ট্রেণ-ভাড়াটি গাঁট থেকে বা'র ক'রে তবে আজ যেতে হবে। বেটাদের অসময় হ'লে ছুটে আসবে,—সরকার মশাই—সরকার মশাই ক'রে, আর আমার দরকারের সময় গেলেই সব ব্যাটাই ঢোক গিলতে সুরু করবে,—কারও অসুখ, কারও জেনানা পালিয়েছে, কারও গরু গেছে থানায়।"

গদাইয়ের মা শশী সরকারের বাড়ী রাঁধিত। সে রান্না-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল,—"আদায়-পত্তর কিছু হ'ল না বুঝি, ঠাকুরপো?"

"ছাই হ'ল। ১২টার ট্রেণে চুঁচড়ো যেতে হবে, সকাল সকাল দুটি চাপিয়ে দিও বউ। স্নানটাও সকাল সকাল ক'রে ফেলি। সমস্ত রাত কাল আর চোখে-পাতায় করতে পারি নি!"

"কেন ঠাকুরপো, শরীরটা কি ভাল নেই?"

"বউ, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায় যে,—আদায়-পত্তরও তার হয় না, শরীরও তার ভাল থাকে না! অপরাধের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বলাইয়ের বইয়ের সেই গল্পটা পড়তে একটু রাত হয়ে গেছলো। তার পর আর সমস্ত রাত ঘুম এলোই না! মাঝে মাঝে একটু-আধটু তন্দ্রার মত যদি বা এল, ত খালি তা স্বপ্নেতেই ভরা। সারাটা রাত ধ'রে খালি স্বপ্নই দেখিছি। এ বিড়ম্বনা ভগবানের আমাকে দেওয়া কেন?"

"কোন কুস্বপ্ন কি, ঠাকুরপো?"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া—শশী সরকার বরাবর দালানে উঠিয়া গেল এবং পাইচারি করিতে করিতে কহিল,—"আমার পক্ষে কু ছাড়া আর কি বলবো!—আ মলো, ঐ কাল বেড়ালটা আবার কাদের এসে জুটলো?"

গদাইয়ের মা কহিল,—"ও যে আমাদেরই 'সুন্দরী', ঠাকুরপো! হাবু একটা শিশি থেকে কালি মাখিয়ে মাখিয়ে ঐ রকম কালো ক'রে দিলে!"

"অ্যাঁ!" বলিয়া শশী সরকার তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়া চাৎকার করিয়া উঠিল,—"লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! এক শিশি কলপ একেবারে নষ্ট করেছে!"

"সাম্‌নে ত তোমার চুল নেই, ঠাকুরপো, পেছনের পাকা চুলে লাগাবার জন্যে কলপ আনিয়েছিলে বুঝি? তা'—আহা—হা! হেবোটা কি গো? ব'সে ব'সে বেড়ালটাকে ঐ কলপ মাথাচ্ছিল? আমি ভাবলুম, দোয়াতের কালি শিশিতে ঢেলে নিয়ে বুঝি মাথাচ্ছে! আচ্ছা ঠাকুরপো, 'পেছনের চুল-গুলোয় মাখালে সুন্দরীর মত ঐ রকম কালো হয়ে যাবে?"

ক্রুদ্ধ হইয়া শশী সরকার কহিল,—"হেবোরও যেমন বুদ্ধি, তোমারও বউ তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা, চুল কালো হয় বটে, কিন্তু আমি কি চুল কালো করবার জন্যে কলপ আনিয়ে রেখেছি?—উদ্ধেগ উঠে ম'রে যাই রোজ,—আর ঐ উদ্ধেগের জন্যেই ত সামনেকার চুলগুলো সব উঠেই গেল। ভাবলুম, হপ্তায় হপ্তায় কলপটা লাগালে উদ্ধেগ ওঠার হাত থেকে বাঁচবো—আমার কি আর সখের জন্যে—ছোঁড়া গেল কোথায়? সর্ব্ব-রকমে আমায় জ্বালাতন ক'রে মারলে! একে আমার এই জ্বালাতনের দেহ—নাঃ, ওকে বাড়ী থেকে বিদেয় না করলে আর আমার কিছুতেই ভাল নেই" বলিয়া কলপের শিশিটি হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুরো বষ্টুমের আজ মোকদ্দমার দিন। আহারাদির পর বাটী হইতে বাহির হইবার সময় শশী সরকার ভাঁড়ারের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া গদাইয়ের মাকে কহিল,—"আজ তা হ'লে গেনীর মাকে একবার—বুঝেছ ত? বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—যেমন ব'লে দিয়েছি। বলবে, ওর নামেই না হয় সব লিখে প'ড়ে দোবো, বুঝলে? ফিরে এসে যেন খবরটা জানতে পারি।"

তাহার পর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, হাতের সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগটি মাটীতে নামাইয়া রাখিল এবং ঊর্দ্ধমুখে যোড় হাত মাথায় ঠেকাইয়া স্বর্গের দেব-দেবীর কাছে বহুক্ষণ ধরিয়া মনোবাঞ্ছা জানাইবার পর ধীরে ধীরে ষ্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া যাইবার অনেক পরে শশী সরকার চুঁচুড়া হইতে বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গদাইয়ের মা'র দিকে চাহিয়া কি-একটা ইঙ্গিত করিতেই গদাইয়ের মা ডালের হাতা মালসার উপর রাখিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল,—"নাঃ, সে হবে না, ঠাকুর-পো! ওরে বাবা, গেনীর মা একেবারে ফোঁস্ ক'রে এলো! বলে—মেয়েকে আমার শ্মশানের পোড়া কাঠের সঙ্গে বে দিতে হয়—সে-ও ভাল। সে কত কথাই যে ফট ফট ক'রে শুনিয়ে দিলে!"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চাপা গলায় শশী সরকার কহিল,—"ভাল—ভাল—ভাল। ফোঁস্-ফোঁসানির দফা খেয়ে এসেছি! মত এবার না ক'রে আর উপায় নেই! একটি কায খালি, বউ, তোমাকে করতে হবে। এটা হোলে, আমারও যেমন ভাল, তোমারও আমি তেমনই ভাল করবো বউ, এ তুমি ঠিক জেনো। খালি, আর একটা কায—"

"কি করতে হবে, ঠাকুরপো?"

পিরাণের বুক-পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি জবা-ফুলের ছোট্ট কুঁড়ি বাহির করিয়া গদাইয়ের মাকে দেখাইয়া সরকার কহিল,—"আর কিছু নয়,—সোঁ-কাপড়ে, সোঁ-চুলে এইটি গেনীর মা'র মাথা ডিঙ্গিয়ে ফেলে দিতে হবে। ব্যস্! দেখি, মেয়ের হাত ধ'রে বয়ে এনে হাতে গচিয়ে দিয়ে যেতে হয় কি না!—হাঁ ক'রে দেখছো কি, বউ? শশী সরকার বাজে যোগাড়ে ঘোরে না! খাস কামরূপের জিনিষ! সবে মাস-খানেক হ'ল তিনি সেখান থেকে বিদ্যে শিখে—" বলিতে বলিতে সরকারের বিষম এক কাসি আসিল এবং কাসিতে কাসিতে চোখের তারা ঠিক্‌রাইয়া, চক্ষু তাহার কপালে উঠিল, মুখখানা নীলবর্ণ হইয়া গেল এবং দুহাতে বুক চাপিয়া সেদিনের মত সটান সেই ধূলার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভাঙ্গা পাখাখানা লইয়া গদাইয়ের মা জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুঁচুড়ার আদালত হইতে যে রাস্তাটা নয়া-বাজারের ভিতর দিয়া বরাবর গঙ্গার তীরে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই রাস্তারই উপর বাজারের কাছে একখানি টীনের দোতালা হইতে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া শশী সরকার নীচে নামিতেছিল। ছোট্ট বাড়ী-খানির টানা কাঠের বারান্দা জুড়িয়া প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল—কামাখ্যা-প্রত্যাগত যাদুকর জ্যোতিষী যুগলানন্দ স্বামী।

সেই ভগ্ন, দোদুল্যমান কাঠের সিঁড়ির তখনও দু'একটা ধাপ নামিতে বাকী আছে, উপরের বারাণ্ডা হইতে গলা বাড়াইয়া বোধ হয় যুগল বাবাই ডাকিলেন,—"সরকার মশাই, আর একটা কথা শুনে যাবেন।"

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেই দ্বিতীয় লক্ষ্মণঝোলা, দ্বিতীয়বার পারাপার হইতে হইবে ভাবিয়া ক্লান্ত শশী সরকার সেই সিঁড়িরই উপর বসিয়া পড়িয়া একটু দম লইবার পর আবার সন্তর্পণে তাহা আরোহণ করিতে সুরু করিল।

যুগলানন্দ স্বামী তাঁহার গৈরিক চাদরে মুখটা একবার মুছিয়া লইয়া কহিলেন,—"আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না। আপনার হস্ত-রেখায় যখন ধনুক-চিহ্ন বর্ত্তমান, তখন তা থেকে বাণ নির্গত হয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে লাগবেই। তার ওপর রইল আমার ক্রিয়া। সুতরাং ভার্য্যালাভ আপনার পুনরায় যে হবেই, তার আর কোনই সন্দেহ নেই। তবে গ্রামের মেয়েটি যে হ'ল না কেন, সেইটেই আমি ধ্যানে চিন্তা ক'রে দেখে আবার আপনাকে ফেরালুম।"

শশী সরকার কহিল,—"কি দেখলেন ধ্যানে?"

"দেখলুম, আপনার ধনুকের টানাটি যেরূপ বৃহৎ, ক্ষেপণ দূরগামী হবে; সুতরাং শরবদ্ধ হয়ে যিনি আসবেন, তাঁর স্থান একটু দূরান্তরেই হবে, নিকটে হবে না। যা'ক, চিন্তার কিছুই নেই, তবে ঐ যা ব'লে দিলুম, ক্রিয়াটি করবার জন্যে বাকী ঐ সতেরটি টাকা শীগ্‌গীরই দিয়ে যাবেন, যাতে বিষ্যুৎবার রাত্রেই আমি আপনার জন্যে বসতে পারি।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর শশী সরকার যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার চক্ষু লাল, নিশ্বাসে আগুনের হল্কা, জ্বরে দেহ পুড়িয়া যাইতেছিল, সুতরাং গৃহে ফিরিয়াই শশী শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সাত দিনের মধ্যে শশী সরকার আরোগ্যলাভ করিল। তবুও প্রত্যহ ডাক্তার আসিতে লাগিল। সে দিন সকালে ডাক্তার আসিয়া কহিল,—"পরশু গরম জলে স্নান করেছেন, আজ পুকুরের জলে বেশ ক'রে স্নান করুন গে। আর আমার আসবার দরকার নেই, সেরে গেলেন, তবে টনিকটা দু'বেলা যেমন খাচ্ছেন—খেয়ে যাবেন।"

শশী সরকার জিজ্ঞাসা করিল,—"সকালেই যে সেজে-গুজে বেরিয়েছ ডাক্তার, ভিন্ গাঁয়ে ডাকে যেতে হবে কি?"

"হ্যাঁ, চাঁদপুরের নবীন রায় যে যায়-যায়!—বুড়োর শরীরটা বেশ ছিল, কোত্থেকে এই বয়সে এক ধেড়ে মেয়ে বিয়ে ক'রে এনে নিজের মরণ নিজেই ডেকে নিয়ে এল! নইলে——"

"হ্যাঁ হাঁ, নবীন রায়ের অবস্থা শুনলুম খুবই খারাপ! তার অসুখটা কি ডাক্তার?"

"বুড়ো বয়সে অনিয়ম অত্যাচারে যা হয়,—সমস্ত নার্ভস্ shattered—প্রায় Paralised! ঐ ফুলপুরের আশু বৈরিগীও ত মোলো ওইতে। অত বিষয়-সম্পত্তি—একটা কোন ভাল কাযে দান ক'রে গেলেই হ'ত। তা নয়, পঞ্চাশ বছর বয়সে এক উপসর্গ জুটিয়ে চক্ষু মুদলে! সকল কাযেরই একটা সময় অসময় আছে ত? এই মনে করুন, সরকার মশাই, আপনিই যদি এই বয়সে একটা——"

"আচ্ছা, কচি চাল্‌তার টক বা একটু-আধটু আম্‌সীর গুড় অম্বল খেতে পারা যাবে, ডাক্তার? কেন না, ওষুধ যখন খাচ্ছি, তখন তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে খাওয়াই——"

"খাবেন—খাবেন, তবে বেশী খাবেন না, অল্প একটু খাবেন" বলিয়া ডাক্তার তাহার ষ্টেথেস্‌কোপটি কোটের পকেটে পুরিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে শশী সরকার তৈল মাখিয়া বেণে পুকুরের ঘাটে গিয়া দেখিল, পাড়ার দুই চারি জন স্নান করিতে করিতে বিশেষ উৎসাহের সহিত কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। শশী সরকার জলে নামিয়া কহিল,—"কে উচ্ছন্ন গেল, গাঙ্গুলী মশাই? কার কথা হচ্ছে?"

"এই আমাদের বড় ঘরের কথা হে।"

বিধু দৈবক ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"নীলু বাড়ুয্যে—নীলু বাড়ুয্যে! শেষ বয়সে এক কাণ্ড বাধিয়ে পিত্যহই হাড়ি-কিচ্-কিচির আর অন্ত নেই। পাপ! পাপ! মহাপাপ! আমাদের খনার বচনেই ত রয়েছে—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা আপৎকালে ঝুপস্থিতে" বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বিধু দৈবক উঠিয়া চলিয়া গেল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে শশী সরকার কহিল,—"ঠিক ঠিক, খুবই ঠিক। বিধু যা বল্লে—খাঁটি কথা, মহাপাপই বটে!"

গেনীর মা'র গেনী জল লইতে আসিয়া, মুখটি নীচু করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। শশী তাহার উদ্দেশে কহিল,—"চ'লে যাস্ কেন, দিদি? তোর লজ্জা করবার এখানে আর কে

আছে ? আয়—আয়, এক পাশ দিয়ে নেমে এসে জল নিয়ে যা। একরত্তি দিদিটি আমার, ওর আবার লজ্জা !"

স্নানান্তে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিয়া শশী সরকার বরাবর রান্না-ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল,—"ঠিক বলেছে বিধু! অধর্ম্মের ভোগ বই কি! নইলে খনার বচনে পর্য্যন্ত———জানলে বৌ, ভারি বেঁচে গিয়েছি—ভারি বেঁচে গিয়েছি, নইলে——ওঃ! ভগবান্ রক্ষে করেছেন!"

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গদাইয়ের মা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ঠাকুরপো ?" কিন্তু প্রশ্ন বোধ হয় শশীর কাণেই পৌঁছিল না, অন্যমনস্ক হইয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ দিন কয়টাও কাটিয়া আসিবার মত হইল, তথাপি আকাশের একটি ফোঁটা জলও ধরিত্রীর বক্ষে গড়াইল না। উত্তাপের আর অন্ত নাই। দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া আকাশের পানে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া পৃথিবী যে একটুখানি জলের জন্য নিত্য নিত্য তাহার প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে, তাহা পায় নাই বলিয়াই আজ যেন অভিমানে তাহার অন্তর-সঞ্চিত সমস্ত উত্তাপ তাহার তপ্ত বক্ষকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া, দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি ঘর হইতে বাহির হইবার সাধ্য কাহারও নাই। এমনই সময়ে শশী সরকারের অন্দরের দরজা ঠেলিয়া কাহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"বাড়ীতে কারা আছেন গা ?"

ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া গদাইয়ের মা শুইয়া ছিল, মাথা তুলিয়া দেখিল, একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কোত্থেকে আসছ বাছা ?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"নবাই চণ্ডীর মেলা দেখতে গিয়েছিলুম মা, ঘরে ফিরছি। যা রোদ্দুর, তেষ্টায় সারা হয়ে গেলুম মা। আসতে আসতে তিন যায়গায় জল খেয়েছি। একটু ঠাণ্ডা জল দেবে মা আমাদের ? তোমরা—আপনারা ব্রাহ্মণ কি ?"

"না বাছা, এ কায়েতের বাড়ী। তোমরা ?"

"আমরাও কায়েত। এক ঘটী জল দাও মা-লক্ষ্মী।"

খুব বড় এক ঘটী জল আনিয়া গদাইয়ের মা জিজ্ঞাসা করিল,—"মেয়েটি ?"

"উটি আমার নাত্‌নী। ঐটিকে নিয়েই ত ওর বাপ ভাবনায় পড়েছে। পনের বছরে পা দিলে, এখনো মেয়েটার কিছু কিনারা করতে পারলে না !"

"নাত্‌নী তোমার খাসা মেয়ে, বাছা !"

শশী সরকার ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল এবং মেয়েটির দিকে দেখিতে দেখিতে কহিল,- "আপনাদের বাড়ী কোন গাঁয়ে গা ?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"মাকালপুর। মাকালপুরে গোঁসাই-বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী। আমার ছেলে গাঁয়েরই স্কুলে পণ্ডিতী করে কি না !"

"ছেলের আপনার নাম কি ?"

"আমার ছেলের নাম ভৈরব। ভৈরব দত্ত।"

শশী সরকার দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক টুকরা সাদা কাগজ হাতে লইয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল, —"ছোঁড়াটার জ্বালায় আমার কিছু থাকবে না! ওর জন্যে দোয়াতে ত এক বিন্দু কালি থাকবে না। তার পর পেন-শিলটাও দেখছি মুখপোড়া নিয়ে কি করেছে!" বলিতে বলিতে আবার বাহিরে আসিল এবং নিজের মনে বার দুই কহিল—'মহাদেব—মহাদেব', তার পর স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া কহিল,—"দত্ত বল্‌লেন না ?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"হাঁ বাবা, দত্ত। দত্ত হ'ল পদবী, আর ছেলের নাম আমার মহাদেব ত নয়—ভৈরব।"

শশী সরকার কহিল,—"হাঁ ; ঐ মহাদেব মনে থাকলেই ভৈরব মনে পড়বে, যে মহাদেব, সেই ভৈরব।"

"তা ত বটেই বাবা" বলিয়া স্ত্রীলোকটি জলের ঘটীটি রোয়াকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল,—"ভৈরব দত্ত ব'লে স্কুলে গেলেও হবে। ছেলে যদি ওর কাছেই ভর্ত্তি ক'রে দাও বাবা, ত এমন যত্ন ক'রে পড়াবে যে, তা আর বলবার নয়। নিজের পেটের ছেলে হ'লে হবে কি, সত্যি কথা বলতে গেলে, বিদ্যেতে ত আর ওর মত কেউ নেই। আয় দিদি, বেলা প'ড়ে আসছে" বলিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল।

ইহার দিন সাতেক পরে এক দিন প্রাতঃকালে শশী সরকার কাঁধে চাদর ফেলিয়া, ছাতা ও লাঠি লইয়া গদাইয়ের মাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মাকালপুরে কার বাড়ী সে দিন তারা ব'লে গেল,—শিবু দত্ত,—না ?"

গদাইয়ের মা কহিল,—"কি জানি ঠাকুরপো, আমার ত মনে নেই।"

অতঃপর দুর্গা দুর্গা বলিয়া শশী সরকার বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং গদাইয়ের মাকে বলিয়া গেল যে, যেহেতু তাহাকে জমীদারের কাছারীতে যাইতে হইতেছে, ফিরিতে তাহার একটু বিলম্ব হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাকালপুরের সখের থিয়েটারের আকড়াঘরে বসিয়া যে কয় জন আকড়াধারী কোন এক জনের বিষয়ে শলা-পরামর্শ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে এক জন কহিল,—"আহা, বেচারাকে নিয়ে কেন আর—"

ফোঁস্ করিয়া বাধা দিয়া এক জন কহিল,—"না—না, বুড়োকে নিয়ে মজা একটু কর্ত্তেই হবে" বলিয়া অনন্ত নামে একটি যুবকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অন্তা, পারবি ত ? তোকেই কিন্তু সব করতে হবে।"

অনন্ত কহিল,—"এর আর কি,—আমি ত কালই আবার চন্দননগর যাচ্ছি। পারুলের মাকে গড়েপিটে ঠিক ক'রে আসব এখন। মাগী গোটা দশেক টাকা পেলেই আর অমত করবে না, তবে পারুলের বাবুকে একবার জানিয়ে রাখতে হবে।"

"পারুলকে এখন রেখেছে কে ?"

অনন্ত কহিল,—"সে এক মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ দেবতা বল্লেও হয়—খাস কামাখ্যার ফেরত।"

ইহার পাঁচ সাত দিন পরে এক দিন বৈকালে—মাকালপুরের অনন্ত শশী সরকারের বাড়ী খুঁজিয়া খুঁজিয়া আসিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে আলাপ করিয়া শেষে অনন্ত কহিল,—"গরীব বিধবার মেয়ে তাই, নইলে এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ের সন্ধান পেলে রাজাধিরাজ মহারাজও মালা হাতে ছুটে আসে। নিজের চোখেই ত কাল দেখবেন ? দেখবেন, যা ব'লে গেলুম, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। আর স্বভাব-চরিত্রের কথা আপনাকে আর কি বলবো, কখনো বেটা-ছেলের পা ছাড়া মুখের দিকে চেয়ে কথা কয় না ; শিষ্ট, শান্ত, নম্র—— তবে গরীবের মেয়ে ব'লে ঠিক সময় বিয়েটা হচ্ছে না, একটু বড় হয়ে গেছে ;—তবে আজকাল এ রকম বেশী বয়স চল্ হয়ে গেছে।"

"বেশ বেশ ! দেখুন, আপনাকে আর কি বলবো ; আমাদের এ গ্রাম হয়েছে পাজির একশেষ, নইলে——। বেশ ; কালই তা হ'লে চলুন, মেয়েটিকে দেখে আসা যা'ক, আমি বড় নিরাশ্রয়েই প'ড়েছি, কি আর আপনাকে———"

"কিছু আর আপনাকে বলতে হবে না। চার হাত এক ক'রে দেওয়ার মত কায জগতে আর কিছুই নেই সরকার মশাই ! এতে আপনারও একটু উপকার করা হবে, গরীব বিধবারও——"

"কিন্তু আপনার ভৈরব দত্তের ছেলের কাণ্ডটা দেখলেন ত একবার। বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে থাকলেই লোকে গিয়ে থাকে, তা ব'লে ঐ রকম ক'রে কেউ কারুকে অপমান করে ? শুনিছি, ছোকরাটি থিয়েটারের আড্ডার আড্ডাধারী।"

"ছেড়ে দিন—— ছেড়ে দিন। ও সব হ'ল নিরেট, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মুখ্যু, ওদের কথাই আলাদা, তবে ভগবান্ যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যেই। ঐ সূত্রে মাকালপুর যাতায়াত করেছিলেন বলেই ত আজ মধ্যে থেকে এই যোগাযোগের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। যা'ক,—আমি উঠলুম এখন সরকার মশাই, কাল সকালেই আসা যাবে তা' হ'লে।"

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে কহিল,—"শুধু ঐ একশটা টাকা পাকা দেখার দিন দিয়ে দেবেন। গরীব অনাথা বিধবা, বিয়ের খরচাটা——"

বাধা দিয়া শশী সরকার কহিল,—"সে ত বটেই। সে আমি দিয়ে দোবো এখন। আপনার হাতেই দেবো, আপনিই দিয়ে দেবেন। তবে কথা হচ্ছে, অনন্ত বাবু, এ গ্রাম আমার অতি জঘন্য, শুভ কায হয়ে যাবার আগে, এ কথা যেন আর কারও কাণে——বুঝেছেন ত ?"

"সে আর আপনাকে বলতে হবে না" বলিয়া নমস্কার করিয়া মাকালপুরের অনন্ত রায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেয়ে দেখা হইতেছে।

অপরূপ রূপের ছটায় টিনের ঘরখানি আলো করিয়া কন্যা হেঁটমুখে বসিয়া ছিল।

এ রূপের দেখিবারই বা কি আছে, দেখাইবারই বা কি আছে? কবিই বা ইহার কি বর্ণনা করিবে, চিত্রকরই বা ইহার কতটুকু তাহার তুলির মুখে ফুটাইয়া তুলিবে! লোক যে বলে, রূপ! রূপ! রূপ!—কিন্তু ছাই রূপ। ইহার কাছে আবার রূপ? মানুষের চোখ যদি হয়, তবে এ রূপ দেখিয়া সে চোখ কি আবার কখন অন্য দিকে ফিরাইয়া লইতে পারা যায়! কিন্তু তবুও শশী সরকার চক্ষু নামাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

কোমল গান্ধারে যেন বাঁশী বাজিয়া গেল—"শ্রীমতী পারুলবালা দাসী।"

"লিখতে পড়তে জান?"

"ভাল জানি না, মা'র কাছে একটু একটু শিখেছি।"

আহা—হা! কণ্ঠের বালাই লইয়া মরি রে! এর পরও আবার প্রশ্ন?

"বানান্ কর দেখি—উল্লম্ফন?"

অনন্ত গোঁফে তা দিতে দিতে কহিল,—"বানান্ কর—দ্বিতীয় ভাগ ত তোমার সারা হয়ে গেছে।"

পারুল, প্রস্ফুটিত পারুলের মত নতমুখে বসিয়া রহিল। শুধু সুবর্ণমণ্ডিত পান্নার দুল দুইটি কর্ণমূলে ঈষৎ দুলিয়া উঠিল। অনন্ত কহিল,—"ছেলেমানুষ, বালক, তাতে চেষ্টা ত তেমন নেই, যা পড়ে, সব ঠিক মনে ক'রে রাখতে পারে না। আচ্ছা, বানান্ তোমায় করতে হবে না পারুল, একটি গান তুমি শশী বাবুকে শুনিয়ে দাও,—দিয়ে তুমি যাও।" তার পর শশী সরকারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি রকম গলা একবার দেখুন শশী বাবু, বাঁশী ফেলে দিতে হবে। তা'ও শেখবার তেমন সুবিধে ত পায় নি, গরীব গেরস্তর মেয়ে, এর তার কাছে শুনে শুনে যা' একটু আধটু শেখা! গাও, একখানা ঠাকুরের গান গাও। সেই গানখানা গাও পারুল, সেই 'আমার এ ঘরে'।"

মাথা তেমনই নত করিয়া পারুল গান ধরিল,—

'আমার এ ঘরে আপনার করে—
গৃহ-দীপখানি জ্বাল হে।
সব দুঃখ-শোক (আমার) সার্থক হোক
লভিয়া তোমার আলো হে।'

পর্দ্দায় পর্দ্দায় গানের সুর উঠিয়া, নামিয়া, ঢেউ তুলিয়া যখন তাহার শেষ রেশটুকু কাণের মধ্যে মৃদু কম্পনে মিলাইয়া গেল, তখন বুঝা গেল, শশী সরকার সজীব, কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ হইতে কথা আর কিছু বাহির হইল না। কথা যখন বাহির হইল, তখন ইহাই বাহির হইল,—"তা' হ'লে এই মাসের মধ্যেই দিন একটা স্থির করে——"

বাহিরে বন্ধ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া যে দুই চারিটি যুবতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দ হাসিতে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল, এইবার তাহারা মুখে আঁচল চাপা দিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে পাকলের মা'র হাত ধরিয়া টানিয়া ওদিককার বারান্দার দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

"বউ!"

"কে, ঠাকুরপো? দেখে শুনে এলে?"

"চুপ চুপ! হেবো কোথায়?"

"সে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই এতক্ষণ আমায় বকিয়ে মারছিল। বলে,—মেসো মশাই কোথা গিয়েছে বল্, নিশ্চয় বিয়ে করতে গেছে।"

"চুপ—চুপ! আস্তে কথা কও।"

গদাইয়ের মা গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল,—"এমনি বোকা ছেলে, বলে কি না—'মেসো মশায়ের বিয়েতে আমি ঠিক নিতবর সাজবো'!—শুনে ত আর হেসে বাঁচি না। আচ্ছা, ঠাকুরপো, অত বড় ছেলে হ'ল, জ্ঞান-বুদ্ধি একটু—"

"ছাই—ছাই!—খবরদার, হেবো যেন এ-সবের বিন্দ-বিসর্গও না জানতে পারে, তা হ'লে পাড়ায় ঢি-ঢি হ'তে আর বাকী থাকবে না।—যা'ক্, গরদের থান তুমি, বউ, এইবার আমার কাছ থেকে আদায় করবে বটে!"

"কেমন দেখলে, ঠাকুরপো?"

"সে কথা আর এখন কিছু বলব না। ক'টা দিন এ রকম ক'রে কাটিয়ে দাও, তার পর ত দেখতেই পাবে। বলি হারি কিন্তু কামাখ্যার স্বামীজীকে। বলেছিল যে ধনুকের তীর আপনার ফুলের গায়ে গিয়ে বিঁধবে, তা ফুলই বটে! ফুটন্ত পদ্ম, বউ, ফুটন্ত পদ্ম! কিন্তু খুব সাবধান, বউ, খু-উ-ব সাবধান, যেন কেউ না এ সব শুনতে পায়!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সে দিনের আকাশের সে অগ্নিময় রুদ্রমূর্ত্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। সারা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের অর্দ্ধেক দিন মানুষ হা-জল জো-জল করিয়া যে কাতরতা জানাইয়া আসিয়াছে, এত দিন পরে আজ দেবতার কর্ণে তাহা পৌছাইয়াছে।

কাল সারাদিন ধরিয়া আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বের অগ্নিময় ধরণী আজ শীতলতায় ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইবার বহু পূর্ব্বেই চারিদিক্ আঁধার করিয়া আসিয়াছিল। অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করিয়া সজোরে বাতাসও বহিতেছিল।

কালিকার দিন বাদে পরশ্ব শশী সরকারের শুভ বিবাহ। আজ নির্জ্জন সায়াহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে একাকী বসিয়া বাহিরের অজস্র বর্ষণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া শশী সরকার তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল।

সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে, ভীষণ দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গেনীর মা আসিয়া শশী সরকারের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "গেনী ত আমার চল্‌লো ভাইপো! জানি না, তুমি তাকে কিছু শাপ দিয়েছিলে কি না! আর একটিবার গিয়ে তার নাড়ীটা দেখে আসবে চল, ভাইপো!"

ভোর-রাত্রি হইতে জ্ঞানদার ভেদ-বমি সুরু হইয়াছিল। ইহার আগেও দুইবার গিয়া শশী তাহার নাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে তাহার মত নাড়ীজ্ঞান কাহারও ছিল না।

তখনই যাইয়া শশী সরকার গেনীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামাইয়া রাখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। নাড়ী দেখিবে কাহার?

গেনীর মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শশী সরকার আবার তাহার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিল। মড়া ছুঁইয়া কাপড় ছাড়িবার কথা বা মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিবার কথা তাহার আর মনেই হইল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকী শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে সব কথা তাহার মনে কোন দিনই উদয় হয় নাই, আজ এই দুর্য্যোগের সন্ধ্যায় সেই সব কথারই চিন্তা তাহার অন্তরকে ভরাইয়া দিল। শশী ভাবিল, এই গেনীকেই সে বিবাহ করিবার জন্য কত না ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই বিবাহ যদি হইয়া যাইত, যদি গেনী আজ তাহারই স্ত্রী হইয়া তাহার ঘরেই তাহার এই মৃত্যুশয্যা বিছাইত, তাহা হইলে আজ তাহার কি বিপদের দিন হইত, কত বেদনাই না আজ তাহাকে সহ্য করিতে হইত! কিন্তু গেনী তাহার স্ত্রী হয় নাই, আর এক জন, এক দিন পরেই তাহার স্ত্রী হইয়া আসিবে। তেমন রূপসী সর্ব্বগুণময়ী স্ত্রী কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? কিন্তু—কিন্তু—সে-ও যদি গেনীর মত হঠাৎ এক দিন—

সহসা ফটাস্ করিয়া ছাতা বন্ধ করার শব্দ হইল এবং এক হাতে এক বোচকা ঝুলাইয়া একটি আগন্তুক চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"কি হে শশী, কোন খবর-টবর আর নেই, বলি, ভাল আছ ত সব?"

শশী সরকার চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া সেই অন্ধকারেই চিনিল, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেদার। কেদার শশীরই সমবয়সী। পার্শ্বের গ্রামেই তাহার বাড়ী, তবে কেদার দেশে থাকিত না। বিপত্নীক হইবার পর, ছেলেদের উপর সংসার ফেলিয়া দিয়া কয় বৎসর হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতেছে। বৎসরে একবার করিয়া আসিয়া ছেলেদের দেখিয়া শুনিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়।

কেদার কহিল,—"আজ পাঁচ ছ' দিন হল এসেছিলুম। ভোরের ট্রেণেই যেতে হবে। এই দুর্য্যোগ, রাত থাকতে উঠে, বাড়ী থেকে ট্রেণ ধরতে পারব না, তাই ভাবলুম, শশীর ওখানে গিয়ে রাতটা থেকে, ভোরে উঠে ট্রেণ ধরবো!—তার পর, আছ ত ভাল?"

"আমার আর ভাল আর মন্দ, তুমি কেমন আছ, তাই বল, ছেলেপুলে সব ভাল ত? কালই বৃন্দাবন যেতে হবে?"

"হাঁ ভাই, কালই যাবো। রাধারাণীর পায়ের তলা ছাড়া অন্য কোথাও আর মন টেঁকে না।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাই হইল। কেদার তাহার বাড়ীর কথা, বৃন্দাবনের কথা, সেখানকার অনাবিল আনন্দ ও প্রাণভরা শান্তির কথা, তাহার প্রতি রাধারাণীর অপার কৃপার কথা, একটির পর একটি করিয়া বলিতে লাগিল, আর শশী একান্তমনে নির্ব্বাক্ হইয়া সেই সব কথা শুনিতে লাগিল। শেষে কেদার কহিল,—"ভাই রে, কি দীন-দরিদ্র নিঃস্ব ছিলুম আমি, আর কি পেয়ে গেলুম, তাই শুধু ভাবি! আমি ত সেই কেদার, দুষ্টু, বদমায়েস, স্বার্থপর, মহাপাপী, আমার কি-ই বা সম্বল, কিসেরই বা আশা ছিল ভাই যে, আজ আমি রাধাকৃষ্ণের চরণতলে এমন ক'রে স্থান

পাবার অধিকারী হব ? এতটুকু চাইতে গিয়ে যে এতটা পাব, এ ত ভাই কোন দিন ভাবি নি ! দয়া—দয়া—সকলই তাঁর দয়া রে ভাই !" একটুখানি থামিয়া আবার কেদার কহিতে লাগিল,—"কি অসার মিথ্যে নিয়েই যে পড়েছিলুম ! বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মকর্দ্দমা, রোগ-ভোগ, ছুটোছুটীতে যেন হাঁফিয়ে উঠে প্রাণান্ত হবার যো হয়েছিল ! তার পর দয়াল ঠাকুর তাঁর হাতের কলটি ঘুরিয়ে দিলেন আর অমনি আসল বস্তুটি দেখতে পেলুম ! এই আসল, সত্য, নিত্য বস্তুটি ঠাকুর আমার সকলকেই ঠিক দেখিয়ে দেন, আমরা কেউ দেখি না, কাণা হয়ে ব'সে থাকি, ভাই রে, কাণা হোয়ে ব'সে থাকি ! দয়া তিনি সকলকেই করেন, তাঁর দয়াকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে রাখি, এম্‌নি আমরা অধম ! মিথ্যা যেটা—সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে এতই আমরা ভালবাসি যে, তা আর কি বলবো। চোখের সামনে তার অসারতা দেখ্‌ছি, তবুও আমাদের ঘোর কাটে না, শশী। তাই বলি, ভাই রে, তাঁর দয়াতে ঘোর ছুটে এ যেন এক নবজীবন পেয়ে গেছি," বলিয়া কেদার তাহার যোড়হাত সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকাইল।

খানিক পরেই ভিতর হইতে আহারের ডাক আসিতে দুই বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

আহারাদি হইয়া গেলে কেদার কিছুতেই বাড়ীর মধ্যে শুইতে চাহিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপেই তাহার শয্যার ব্যবস্থা হইল। তখনও বৃষ্টি থামে নাই, তবে বাতাসের বেগ তখন কমিয়া আসিয়াছিল।

শশী সরকার আসিয়াও শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুমাইল না। শয্যায় শুইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিল। সারা রাত্রি ধরিয়া সহস্র রকমের চিন্তা করিয়া, শেষ রাত্রিতে শশী সরকার বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাহিরে তখনও টিপি টিপি বৃষ্টির শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

দেওয়ালে বুদ্ধের গৃহত্যাগের যে ছবিখানা ঝুলিতেছিল, হেরিকেনের ক্ষীণ আলোটা তাহারই উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। শশী ছবিখানির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল—রাজ্য, এমন স্ত্রী, পদ্মের মত সন্তান, সব ত্যাগ ক'রে রাজার ছেলে যেতে পারলে, আর আমার কেউ-ই নেই, আমি——। শশী আসিয়া আবার বিছানার উপর বসিল। তখনও রাত্রি-শেষের অনেক বিলম্ব ছিল। কিন্তু সহসা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিল। হাবু বাহ্যে-বমি করিতে সুরু করিল ! শশী সরকার শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল।

এমন অবস্থায় কেদারের আর সে দিন যাওয়া হইল না। শশী ও কেদার উভয়ে প্রাণপণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন সুফলই হইল না, বেলা যত বাড়িতে লাগিল, হাবুর রোগও তত বাড়িতে লাগিল। শেষে শশী একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ; তথাপি চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, বেলা-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই হাবুর একরত্তি প্রাণ অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মেসো মশায়ের কোলের উপরই ছোট মাথাটি রাখিয়া হাবু চিরদিনের মত চক্ষু বুজিল।

* * * *

রাত থাকিতে কেদার ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিল এবং এক হাতে ছাতা ও আর এক হাতে পোঁটলা লইয়া নিঃশব্দে সদর-দরজা খুলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে শশী সরকার আসিয়া কহিল,—"যাচ্ছ ? দাঁড়াও, আমিও যাব।"

পিছন ফিরিয়া থতমত খাইয়া কেদার কহিল,—"কে ? শশী ?—কোথায় যাবে ?"

"বৃন্দাবন। একটু দাঁড়াও, গদাইয়ের মাকে আর একটা কথা ব'লে আসি," বলিয়া হাতের কেম্বিসের ব্যাগটা মাটীর উপর রাখিতেই গদাইয়ের মা চোখ মুছিতে মুছিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শশী তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বউ, আজ একুশে, আমার শুভ বিবাহের দিন। অনন্ত এলে বোলো, এক বড় বিয়ের সন্ধান পেয়েছি, সেই উদ্দেশেই আমি চল্লুম" বলিয়া ব্যাগটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অভিভাষণ

মাজু হইতে বঙ্গের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি বেশী দূরবর্ত্তী নহে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত হইতেছে। বঙ্গীয় কবিতাক্ষেত্রে ভারত-চন্দ্র ছিলেন এক জন যথার্থ শিল্পী। এ দেশের তন্তুবায়গণ মসলিন তৈয়ারী করিয়া অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া-ছিলেন; এ দেশে নব্য-ন্যায়ের যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই নৈয়ায়িক-গণ যেরূপ ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তির সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাকে ন্যায়শাস্ত্রের 'শিল্প' বলিয়া অভিহিত করা চলে। মাগধ ভাস্করবা বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ভাস্কর্য্যের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়া-ছেন, সেই শিল্প পাথরের গায়ে চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েরা বাগানের পরিপাটি বাড়ানে শিল্পীর ন্যায় যে পটুতা দেখাইয়াছেন, তাহা অসা-মান্য; তাঁহাদের হাতের পিঠায়ে, কন্থাসীবনে ও আলি-পনার শ্রীতে কোমল চারু শিল্প লীলায়িত হইয়া উঠি-য়াছে। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যাকল্পে রূপ গোস্বামী ৩৬০ শত ৬৫ প্রকার নায়িকা-ভেদ দেখাইয়া যে "উজ্জ্বল-নীলমণি" গ্রন্থ প্রণ-য়ন করিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় আধ্যাত্মিক শিল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ দেশের নানাদিক্ দিয়া আমরা যে সূক্ষ্ম কারু ও শিল্পের পরিচয় পাই, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের কবিতাও সেই চারুশিল্পের নিদর্শন দিয়াছে। এ জন্য কোন সমালোচক বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র এ দেশে তাজমহল রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা পাথরে নহে, ভাষায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

জয়দেব দেব-ভাষাকে যে ললিত কলায় শোভিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালায় সেই কোমলতার শ্রী আরও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে তিনি যে সাতনরি দোলাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে দামী পাথর ও মণিমাণিক্যের প্রভা স্পষ্ট। আজ তাঁহার কাব্য-সমালোচনার অবকাশ নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের একখানি চালচিত্র আঁকিয়া কবি-সম্রাটের স্থান প্রদর্শন করার প্রয়োজন হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে যে সকল তরুণ মনস্বী যুবক আছেন, তাঁহাদের কেহ এই ভার লইতে পারেন। অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর সেই লেখকের ভারত-চন্দ্রকে লইয়া তপস্যা করিতে হইবে, তবেই চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। আমরা চাহি না যে, ভারতচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আজ শুধু বাক্যব্যয়ে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই ভক্তি যদি খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষণেকের জন্য কতকটা ধোঁয়া রাখিয়া নির্ব্বাপিত হয়, তবে আমাদের কার্য কিছু হইল বলিয়া মনে করিব না। আজ কতকগুলি ধোঁয়ার মত কথায় যাহা আরম্ভ করা হইল, তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে সার্থক করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে আহি-তাগ্নিক কে আছেন, যিনি জ্বালাইয়া নিবাইতে দেন না,—তেমন পুরুষ চাই, এই যজ্ঞ—এই হোমের জন্য।

এমন দিন গিয়াছে—যখন ভারতচন্দ্রের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শিক্ষিত যুবক দশ হাত দূরে সরিয়া যাইতেন। এখন আমাদের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়াছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের মত কবি দুর্লভ, তাঁহার জোড়া মিলা সহজ নহে। সে দিন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীও প্রকাশ্য সভায় ভারতচন্দ্রকে এইরূপ উচ্চ প্রশংসা দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের জীবন বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল। এই বিচিত্র জীবনের ধাপে ধাপে তাঁহার প্রতিভা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতির কোপে পড়িয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কতক দিনের জন্য কারাবাস পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলেন। কেশরকুনি কুলে বিবাহ করার অপবাধে তিনি পেঁড়ো গ্রামের বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রাম-দেব নাগ নামক জনৈক ভূস্বামী কবির ব্রহ্মোত্তর জমীর উপর দৌরাত্ম্য করাতে তিনি বিষম ক্ষোভে নাগাষ্টক লিখিয়া মনের জ্বালা অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খেজুর গাছে খোঁচা মারিলে যেরূপ রস পাওয়া যায়, নাগ মহাশয়ের দৌরাত্ম্যের জন্য আমরা সেইরূপ এই অম্লমধুর কবিতাটি

পাইয়াছি। চাষীদের গান হইতে তিনি অন্নদামঙ্গলের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চাষীরা শিবঠাকুরের কাঠামো তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে একমেটে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভারতচন্দ্র শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, গোরক্ষের পালা গান, রামেশ্বরের শিবায়ন—পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিচিত্র উপকরণের উপর তাঁহার অসামান্য নির্ম্মাণ-কৌশল দেখাইয়া রং ফলাইয়া জীবন্ত শিবঠাকুর গড়িয়াছেন। কোন স্থানে এই দেবতাটি বেদের বেশে কেঁদো বাঘের ছাল পরিয়া ষাঁড়ের উপর চলিয়াছেন,—কোথাও তিনি কোপন-স্বভাব বৃদ্ধ গৃহস্থ, তাঁহার চোখ হইতে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে—সেই দৃষ্টির অগ্নি-বৃষ্টিতে অনশনক্লিষ্ট হতভাগ্য ব্যাস ঋষি বাতগ্রস্ত হইয়া ভয়ে থরহরি কাঁপিতেছেন,—কখনও তিনি তরুণী ভার্য্যার বৃদ্ধ স্বামী—দাম্পত্য-সুখে আকণ্ঠ ডুবিয়া মাতোয়ারা হইয়া ললিত ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিতেছেন; কখনও তিনি রুদ্রমূর্ত্তি, ভুজঙ্গপ্রয়াতের ছন্দোবদ্ধ গাম্ভীর্য্যে তাণ্ডব-নৃত্যের দ্বারা জগৎ প্রকম্পিত করিতেছেন। গোরক্ষবিজয়ের ভিক্ষুক শিব, রামেশ্বরের চাষী শিব, বহু পল্লী কবি অঙ্কিত দাম্পত্য-দোষদুষ্ট বৃদ্ধ শিব—এই ভাবে নব চিত্রপটে—নব বর্ণে—নব ঔজ্জ্বল্যে, ছন্দের অপরূপ পারিপাট্যে জীবন্ত হইয়া দাড়াইয়াছেন। ভারতের অপূর্ব্ব শিল্পকলায় চাষীর রূপ ফিরিয়া গিয়াছে; চাষীর বেশের মধ্যে শিবের দেবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমারের হাতের সদ্য তৈয়ারী বিগ্রহের মত তাঁহার রং, সাজসজ্জা যেন ঝলমল্ করিতেছে। ভারতচন্দ্র তোটক, মন্দাক্রান্তা ও ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি ছন্দকে নূতন গড়ন দিয়াছেন। প্রাচীনরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া হিমসিম খাইয়াছেন, সেখানে ভারত মিত্রাক্ষরের মঞ্জীর পরাইয়া স্বচ্ছন্দগতি ভাষায় যে চমৎকার কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষায় যে ঐ সকল ছন্দে লিখিত কবিতা হইতে পারে, তাহা সে যুগে বিশ্বাসের বস্তু ছিল না, এই ভাষায় লঘু-গুরু উচ্চারণের অভাব, তার উপর আবার তিনি স্বেচ্ছাকৃত উপসর্গ—মিত্রাক্ষর জুড়িয়া দিয়া অসামান্য সাফল্যকে আরও অসামান্য করিয়া সংস্কৃতের কবিগণের উপর টেক্কা দিয়াছেন এবং আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য্য অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আপনারা কি জানেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিরচিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় চিৎসাহীর নীলমণি কণ্ঠাভরণ গায়েন কর্ত্তৃক তাহা সর্ব্বপ্রথম গীত হয়? সেই নীলমণি কণ্ঠাভরণের কোন বংশধর বিদ্যমান আছেন কি?

পেঁড়ো বসন্তপুর হইতে বসন্তকালের ফুলের হাওয়া আসিতেছে। আপনারা যদি কবিবরের জীবন-কাহিনী লিখিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রেরণার অভাব হইবে না। এখানকার আকাশে বাতাসে, ফুলের নিশ্বাসে কবির স্মৃতি ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই দেশের হাওয়ায় তাঁহার কথা আছে, আপনারা প্রচুর পরিমাণে সে প্রেরণা পাইবেন। আজ রুচির কথা উত্থাপন করা অনাবশ্যক। এক যুগ আসিয়াছিল, যাহা সমস্ত সভ্য দেশেই আসিয়া থাকে—তখন লোক শ্লীলতার আইনকানুন মানিয়া চলিত না। সে যুগ গিয়াছে, তখন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বেশী ছিল না। যে সাহিত্য শুধু পুরুষরা পড়িতেন, তাহাতে সাবধানতার বেশী প্রয়োজন ছিল না। তার পর এক যুগ আসিল, যখন স্ত্রীলোকরা বই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সাহিত্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে নির্ব্বিচারে ছড়াইয়া পড়িল। মেয়ে-পুরুষরা একত্র হইয়া যাহা পড়িবেন—তাহাতে শ্লীলতার অভাব অসহ্য। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই একটা লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় রুচিবাদী হইয়া পড়িলেন। যে ভাব নূতন আসে, কিছু দিন তাহার একটা বন্যা বহিয়া যায়—ভারতচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, সেই যুগের 'তত্ত্ববোধিনীর' ফাইল পড়িলে বুঝিবেন, নব্যবঙ্গ বৈষ্ণব কবিদের প্রতিও কিরূপ খড়্গহস্ত ছিলেন।

রুচিভেদ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে মানুষের মতিগতির যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা এখন পদ্মার ভাঙ্গনি পারে অবস্থিত। অতি দৃঢ় অট্টালিকার পুরাতন ভিত ধ্বসিয়া পড়িতেছে। যেখানে পুরাতন ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যাইতেছে, সেখানে নূতন চর পড়িতেছে ও তাহাতে পলি পড়িয়া অভিনব স্বর্ণ-ফসলের স্বপ্ন দেখাইতেছে। আমাদের সাহিত্য ও সমাজের এখন এই অবস্থা।

আমাদের সমাজ ও সাহিত্য এখন নূতন চোখে দেখিতে হইবে। যে সকল পুরাতন পুঁথি-পত্র আবর্জ্জনা বলিয়া আমরা পূর্ব্ব-যুগে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলাম এবং বঙ্গজননী যাহা বটতলার শতচ্ছিন্ন শাড়ীর আঁচলে কাঁদিতে কাঁদিতে কতক কতক কুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার আবার আদর হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-যুগের লোকরা সেগুলি যে চোখে দেখিতেন, এখন আর তাহা সেভাবে দেখা সম্ভবপর হইবে না। এখন ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিৎ, সাহিত্যিক, কবি, ভক্ত প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক সেগুলি নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে দাঁড়াইয়াছেন। যাহা পূর্ব্বে পূজামণ্ডপের নৈবেদ্য ছিল, এখন তাহা মিউজিয়ম ও পাবলিক লাইব্রেরীতে সাধারণের সেবা হইয়াছে।

এই রুচি-পরিবর্ত্তন যুগে যুগে নানা কারণে ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে মুসলমান আগমনে একবার আমাদের রুচি ও চিন্তার ধারার উপর একটা ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল। প্রাক্-মুসলমান-সাহিত্য মূলতঃ শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া; এই দুই ধর্ম্মের মিশ্রণে যে ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিল, পণ্ডিতরা তাহার নাম দিয়াছেন, নাথধর্ম্ম। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, হাড়িপা, চৌরঙ্গী, কানুপা প্রভৃতি ব্যক্তি ছিলেন এই ধর্ম্মের নেতা। তখন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এ দেশে খুব প্রবলবেগে চলিতেছিল। সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পুরুষ ও রমণীরা 'মহাজ্ঞান' লাভ করিতেন। 'মহাজ্ঞান' পাওয়ার পর তাঁহাদের আসন দেবতাদের অপেক্ষা উচ্চে হইত। তাহাতে নাকি অসাধ্যসাধন করা—এমন কি, অমর হইতে পারা যাইত। হাড়িপা ও ময়নামতী সিদ্ধিলাভ করিয়া যাবতীয় দেবতাকে পরাস্ত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জীবই শিব, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদটা অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। এই ভেদ অতিক্রম করার পর যে অবস্থা হয়, তাহাই স্মরণ করিয়া চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন, "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" চৈতন্য-সম্প্রদায় যখন "হরি" "হরি" রবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের অদ্বৈতবাদীরা বিষম রাগিয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবই শিব—মানুষ স্বয়ং ভগবান্, তবে এ ডাকাডাকি কাহাকে?" এ কথা চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে।

শিব অতি নিশ্চেষ্ট দেবতা, তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, সুতরাং তিনি তাঁহাদের কি সহায়তা করিবেন ? চাঁদসদাগরের কষ্টে তাঁহার মন টলে নাই ; চন্দ্রকেতু রাজা তাঁহার আশ্রয়-বঞ্চিত ; ধনপতি তাঁহার এত গোঁড়া, তাঁহার বিপদে শিব একটা আশ্বাসের বাক্য বলেন নাই। শিবভক্ত সে আশ্রয় বা আশ্বাসের প্রত্যাশা করে না। কারণ, সে জানে, স্বয়ং চেষ্টা করিয়া তাহাকে উঠিতে হইবে। সূর্য্যের সঙ্গে রৌদ্রের, অগ্নির সঙ্গে তাপের যে সম্বন্ধ, জীবের সঙ্গে শিবের তাহাই। কিন্তু জনসাধারণ দুঃখে বিপদে পড়িয়া সহায়তা চাহে, “আমিই শিব” এই কথা তাহাদিগকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাহাদের মনে একটা অভাব রহিয়া যাইত।

মুসলমান আসিয়া দ্বৈতভাবের প্রচণ্ড মহিমা অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন, তাঁহাদের ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে। তাঁহারা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন ও “আল্লাহু আকবর” শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার মহিমা ঘোষণা করেন। এই দ্বৈতবাদীদের জ্বলন্ত বিশ্বাসের নিকট শৈবধর্ম্মের নিশ্চেষ্ট তরণীটি বানচাল হইয়া ভাসিয়া যাইতে উদ্যত। সুতরাং হিন্দুরা মোসলিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইবার জন্য শাক্তধর্ম্মের উপর জোর দিলেন। চণ্ডী, মনসাদেবী, শীতলা দেবী প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তি যে আকারেই দেখা দিয়াছেন, সেই আকারেই তাহারা আশ্রিতদের রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, তাহাদের প্রচেষ্টা অনেক সময়েই শোভন হয় নাই। তাঁহারা কোনও সময়ে হনুমানকে ডাকিয়া আকাশে ঝড় উঠাইতেছেন,—অবিশ্বাসীকে দলন করিবার জন্য। কখনও বা অবিশ্বাসীর ত্রিকালজ্ঞ তণ্ডুলকণা ধ্বংস করিবার জন্য গণদেবের ইন্দুরটিকে চাহিয়া লইয়াছেন। এই সকল অশোভন ক্রিয়া সত্ত্বেও শাক্তধর্ম্মে মাতৃমূর্ত্তি অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে সন্তান বিপদে পড়িয়া ‘মা’ বলিয়া কাঁদিয়াছে, সেইখানেই মূর্ত্তিমতী করুণার মত তিনি মধুর হাসিতে মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লইতে বাহু প্রসারণ করিতেছেন। মুসলমানদের দ্বৈতভাবটি বঙ্গের জনসাধারণ তাহাদের ধর্ম্মের এইভাবে অঙ্গীভূত করিয়া লইল। “আল্লাহু আকবরের” উত্তর হইল “জয়কালী”, কিন্তু এই দ্বৈতভাবের পূর্ণতা বৈষ্ণবরা দেখাইলেন, তাঁহারা খড়্গ, অসি, চর্ম্ম ও ভল্লের পরিবর্ত্তে বিশ্বাসের অপর দিক্‌টা দেখাইলেন—তাহা পরিপূর্ণ দয়া, পরিপূর্ণ ত্যাগ স্বীকার।

এক দিকে শাক্তধর্ম্মের অনিবার্য্য, দুর্জ্জয় তেজ, অপর দিকে বৈষ্ণবদের প্রবল ভাবের বন্যা—এই দুই উপাদান দিয়া হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বৈতভাবের উত্তর গড়িল।

দ্বৈতভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য বঙ্গদেশে আঁধারে পড়িয়া গেল। শৈলসম উচ্চ বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মের প্রাচীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে আঁধার করিয়া দাঁড়াইল। চৈতন্য-পূর্ব্ব যে এক বিরাট সাহিত্য ছিল, এক যুগের জন্য বাঙ্গালী তাহা বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। শুধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস—এই দুই কবির পদাবলী চৈতন্য দিবা-রাত্রি গান করিতেন, এ জন্য ইঁহারা সাদরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু এক বিশাল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল,—চৈতন্য-ভাগবতকার তাহার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সেই সাহিত্যের অস্তিত্বেরই প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপালের গীত, যাহাদের কথা লিখিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রমত্ত হইয়া এই সকল গান শুনিত—যে গান না হইলে সমস্ত উৎসব মাটী হইয়া যাইত, সেই সকল গান কোথায় গেল ?

আমরা অষ্টম শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপিতে পাইতেছি, রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে যে পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল—তাহা বনচারী রাখালরা, গ্রামোপকণ্ঠে ক্রীড়াশীল বালকরা, দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত বিপণি-স্বামীরা এবং আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা গান করিত, এমন কি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গদিগকেও সেই গান শিখান হইত, তাহারা ললিত কাকলী দ্বারা মহারাজ ধর্ম্মপালের কীর্ত্তিকথা উচ্চারণ করিত। দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাণগড়ের মহীপালের তাম্রশাসনে মহারাজ রাজ্যপাল সম্বন্ধেও সেইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ আছে। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে ঐ ভাবের গীতিকার কথা চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্র “রাজমালায়” আমরা “লক্ষ্মণমাণিক্যের” উল্লেখ পাই, এই “লক্ষ্মণমাণিক্য”ও লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে কোন গীতিকা বলিয়াই মনে হয়। সেক শুভোদয়া পুস্তকে আমরা রামপালদেব সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ পাইয়াছি। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং ইনিই পরদার-অপহারক একমাত্র পুত্রকে শূলে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিয়া ন্যায়ের অবতার বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে ধন্যমাণিক্য ও তৎপত্নী কমলা দেবী এবং পরবর্ত্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত হইতে নর্ত্তক ও গায়ক আনাইয়া এই সকল গান কি ভাবে গাহিতে হইবে, তাহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে বিখ্যাত দস্যুপতি সমসের গাজি ত্রিপুরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েক বৎসরের জন্য ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার হত্যার অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্ধীয় পালাগান আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ঈসা খাঁ মসনদ আলি যিনি আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে কয়েকবার পরাভূত করিয়া বারভূঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও অনেক পালাগানের প্রধান নায়ক,—তাঁহার বংশধর মনুয়ার খাঁ দেওয়ান ও ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সম্বন্ধে বহু পালাগান প্রচলিত আছে। তাহার কতক কতক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। আরঙ্গজীবের ভ্রাতা শাহ সুজা সম্বন্ধে অনেক পল্লী-গীতি চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা জেলার পরাক্রান্ত ভূস্বামী পৈলান খাঁর সহিত শাহ সুজার বান্ধবতা হইয়াছিল, কিন্তু পরে উক্ত খাঁ সাহেব শাহ সুজার ঘোর শত্রু হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধীয় পালাগানের কতক কতক সংগৃহীত হইয়াছে। শাহ সুজা-পত্নী পরীবানু সম্বন্ধে একটি গীতিকা শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে জানাইয়াছেন। শাহ সুজার কন্যা আরাকানে মগ-রাজার হাতে পড়িয়া ব্রহ্মদেশের প্রচলিত খাদ্য নাপ্‌তি খাইতে যাইয়া যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, পল্লী-কবি সাশ্রুচোখে অথচ একটু পরিহাস-রসের অবতারণা করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,

আমরা সেই ছোট পালাগানটি প্রকাশিত করিয়াছি। মৈমনসিংহ সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাণী কমলা দেবীর অপূর্ব্ব ত্যাগ ও তৎপুত্র রঘুরাজার বৃত্তান্ত করুণার উৎসস্বরূপ—আমরা তাহার একটি ইতিপূর্ব্বেই ছাপাইয়াছি, চতুর্থ খণ্ডে শীঘ্র অপরটি প্রকাশিত হইবে। রাজা রঘু জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। এই সকল পালাগান একটা বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে! তাহা ছাড়া বাঙ্গালার রূপ-কথা ও গীতি-কথা অসামান্য ভাব-প্রবণতা, আদর্শ প্রেম এবং অতি সূক্ষ্ম সাহিত্যিক শিল্পের পরিচয় দিতেছে। নিরক্ষর চাষীদের মধ্যে এই সাহিত্যের ধারা এখনও বহিয়া যাইতেছে। এখনও মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ মুসলমানরা সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া হৃদয়গ্রাহী পালাগান রচনা করিয়া থাকে।

কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর একটা বিরাট সাহিত্য বিদ্যমান ছিল—আমরা বিস্ময়ের সহিত এখন তাহার পরিচয় পাইতেছি। এই পালাগানগুলি পর্য্যালোচনা করিলে একটা কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের দেশের রাজারাজড়াদের রীতিমত ইতিহাস ছিল। তাঁহাদের সভাসদ্ পণ্ডিতরা শুধু তাম্রশাসনে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক রাজগণ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহারা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতেন। বৌদ্ধযুগের "নীল পীত" নামক ইতিহাসের আমরা সামান্য উল্লেখ মাত্র পাইয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ত্রিপুরার রাজমালা দৃষ্টে এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত থাকার ধ্রুব ও নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি। ইতিহাসলক্ষ্মীর লীলা শুধু রাজসভায় অবসান হইত না, সেই ইতিহাসের ধারা পল্লীর কুটীরে কুটীরে প্রবাহিত হইয়া আদর্শ ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের কীর্ত্তি-গাথা অমর করিয়া রাখিত। আমার বিশ্বাস, বঙ্গদেশের পল্লী-সাহিত্যে যে প্রভূত ঐতিহাসিক উপকরণাদি পাইতেছি, নিকটবর্ত্তী আর কোন প্রদেশে সেরূপ নাই। আমরা পল্লী-সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিয়া এই মূল্যবান্ উপকরণ হারাইয়া ফেলিতেছি। সত্য বটে, এই উপকরণগুলির মধ্যে কতক কতক আবর্জ্জনা আছে, কিন্তু কোন্ দেশের পল্লী-সাহিত্যেই বা তাহা নাই? আর্থারের লিজেণ্ড, হলেন সিয়াডের ক্রনিকল, রবিন হুডের ছড়া—এ সমস্তের মধ্যেই অনেক সত্য কথা আছে, পণ্ডিতরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালা পালাগানগুলির মধ্যে যে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রথম দুই এক অধ্যায় বাদ দিলে রাজমালায় যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য। কহ্লনের রাজ-তরঙ্গিণী হইতেও এই বাঙ্গালা পুস্তকখানি মূল্যবান গ্রন্থ। "সমসের গাজির গান"ও একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক চিত্রপট। চাষীরা রাজারাজড়াদের সম্বন্ধে যে সকল গান রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে উদ্ভট কল্পনা ও অতিরঞ্জনের বিকৃতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক রহস্যের অনেকটা সমাধান করিবার উপকরণ বহন করিতেছে।

আমাদের উত্তরে হিমাচল দাঁড়াইয়া আছেন,—উত্তর-মেরুর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ সামলাইয়া লইয়া মহাগিরি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, শিবের জটাজূটের মত জটিল ও দুর্গম জঙ্গল কন্দর বাহিয়া গিরিরাজের মহাদান গঙ্গা আমাদের দেশকে শ্যামল শস্য ও সুবর্ণ-ফসলমণ্ডিত করিতেছে! হিমালয় স্বর্ণসৌধ-কিরীটিনী ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ গৌরব, কে তাহা অস্বীকার করিবে? অপর দিকে এই গিরিরাজ চীন, মহাচীন, উত্তর-তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যকে আমাদিগের দেশ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মঙ্গল জাতি, টিবেটোবর্ম্মন ও অহোমাদি কত পাহাড়িয়া জাতি আমাদিগের পর হইয়া গিয়াছে।

সেইরূপ মহাপুরুষদের অভ্যুদয়ে এক দিকে অমৃতের সন্ধান পাইয়া লোকরা নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হয়, অপর দিকে তাঁহারা আসেন—পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে। তাঁহারা ইতিহাসের একটা দিক্ আড়াল করিয়া দাঁড়ান। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গীয় পল্লী-গীতিকার সমৃদ্ধ সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল। একতারা, ডুগডুগী ও খঞ্জনীর স্থান বেহালা, মৃদঙ্গ ও মন্দিরা দখল করিয়া লইল। পালাগান শিক্ষিত সমাজ হইতে অপসৃত হইয়া বঙ্গের সুদূর জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর চাষীদের কুটীরে আশ্রয় লইল। পাল-রাজাদের গান, গোরক্ষ-বিজয়, মালঞ্চমালা ও কাঞ্চনমালা প্রভৃতি অপূর্ব্ব গীতি-কথার আসর ভাঙ্গিয়া গেল। কীর্ত্তনে দেশ ছাইয়া পড়িল। মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্ম্মপাল ও রামপালের সম্বন্ধীয় গানগুলির স্থানে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর—শুনিবার জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র হইল। মানুষের কথা অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হইল, যত কীর্ত্তিমানই হউন না কেন—মানুষের লীলা আর কেহ শুনিতে চাহিল না। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের উজ্জ্বল সামরিক অভিযানের কথা আর ভাল লাগিল না। সতীদের অসামান্য প্রেম ও ত্যাগের কথা লোক বিস্মৃত হইল। ইঁহাদের স্থানে হরি-ভক্তগণ জুড়িয়া বসিল! প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, অম্বরীষের উপাখ্যান এবং শত শত পৌরাণিক গানে আসর জমকিয়া উঠিল। এক দিকে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া কীর্ত্তনীয়াগণ অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করিল—অপর দিকে কথক ঠাকুর গদ্য-পদ্য-মিশ্র কথা ও গানে পৌরাণিক তত্ত্বের বিবৃতি করিয়া পল্লী-গীতিকাগুলিকে একবারে রঙ্গালয়, নগর ও প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারা মুসলমানপাড়া আশ্রয় করিয়া কোনক্রমে টিকিয়া রহিল; এখন আবার মোল্লারা সেই নিভৃত স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়া করিতেছেন।

সোনার মানুষ চৈতন্য যে দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দিকে সোনা ফলিয়া উঠিল। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গান গাহিতেন, তাই তাহা শত কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল। মনুষ্যলীলা-সম্বলিত পালাগানের দিকে তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এ জন্য সে আসর ভাঙ্গিয়া গেল। কেবল হরিলীলা, কেবলই হরিকথা! পরম বৈষ্ণব কাশীদাস লিখিয়াছেন, একবার হরিনাম লইলে যত পাপ নষ্ট হয়, মানুষের সাধ্য নাই যে, এক জন্মে তত পাপ করিতে পারে! এই কথার পর আর কে দেবলীলার কথা ছাড়িয়া মালঞ্চমালা ও মহুয়ার কথা শুনিবে? মহাপ্রভু হিমগিরির মত বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে দিক্ সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার কৃপামধুর দৃষ্টিতে সে দিক্ ধন-ধান্যে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হইয়া হাসিয়া উঠিল। তাঁহার পশ্চাতের দিকে যেন প্রদীপ নিবিয়া গেল। রূপকথা, গীতি-কথা,

পালাগান আঁধারে পড়িয়া গেল। বিষহরী দেবীর গান ও চণ্ডীর গান—যাহাদের কথা বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা শাক্তদের চেষ্টায় পাড়াগাঁয়ে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া টিকিয়া রহিল। পালাগানগুলি এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র মানুষের লীলা বর্ণনা করিয়া আদর লাভ করিয়াছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৃহে তাহারা হতাদৃত হইয়া যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, এমন কি, ১০।১২বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যসেবীরাও তাহার খোঁজ জানিতেন না।

কিন্তু এই পালাগান ও গীতিকথা যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী, তাহা এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও অবগত নহেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া যদি কবিত্বের দিক্ দিয়াও ইহাদিগকে দেখি, তবুও ইহাদের অসামান্য সম্পদ্ ও অপূর্ব্বত্ব প্রতীয়মান হইবে। শাপ-গ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, বিলয়োন্মুখ ইন্দ্রধনুর ন্যায় অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া—প্রবল ঝটিকা-বিতাড়িত তরণীর সহিত মলুয়া নদীর জলে নিমজ্জিত হইলেন, সেই দৃশ্য যিনি একবার দেখিবেন, তিনি ভুলিতে পারিবেন না। উহা হৃদয়ের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য দাগ কাটিয়া যাইবে। মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া শুভ পরিণয়ের প্রাক্কালে জয়চন্দ্র নামক ব্রাহ্মণ বটু যে দিন ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিল, সে দিন শুভ্র মর্ম্মর-গঠিত, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় চন্দ্রাবতী সহসা যেন স্বর্গের দেবী হইয়া উঠিলেন। দিল্লীর বিরাট্ বাহিনীর সম্মুখীন পুরুষের ছদ্মবেশধারিণী, পক্ক-বিম্বাধরা সখিনার যোদ্ধ্‌বেশ দেখুন, তিনি কত শেল-শূলের আঘাত সহ্য করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন—একটিবার তাঁহার প্রদীপ্ত উৎসাহ শিথিল হয় নাই। স্বামীর প্রেম ছিল তাঁহার বক্ষের বর্ম্ম, দাম্পত্যের উপর বিশ্বাস ছিল তাঁহার রক্ষা-কবচ ও বাহুর বল—তৃতীয় দিন যুদ্ধাবসানে তিনি বিজয়ী হইতে উদ্যত—মোগলবাহিনী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, এমন সময় ফিরোজ সাহার তালাক-নামা তাঁহার হাতে পড়িল,—এই স্বামীর জন্য তাঁহার পিতা শত্রু হইয়াছিলেন এবং তিনি এত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এ হেন স্বামী তাঁহাকে তালাক দিয়া দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব চালাইয়াছেন। সেই অনবদ্যসুন্দরী, অনিবার্য্য পরাক্রমশালিনী স্বামিগতপ্রাণা রমণীর হৃদয় এই নির্দ্দয়তা সহ্য করিতে পারিল না। যে হৃদয় শত্রুর অস্ত্র বিদীর্ণ করিতে পারে নাই—সেই তালাক-নামা তাহা বিদীর্ণ করিল। স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিতে দেখিতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন,—কেল্লা তাজপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ ঘোটক হইতে পড়িয়া গেল। স্বামী জয়ী হইয়া আসিবেন আশা করিয়া যে সখিনা এক দিন বিকশিত পদ্মটির মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দরিয়াকে বলিয়াছিলেন, 'দরিয়া, বাগান হইতে টগর, মালতী ও চাঁপা তুলিয়া আন, আমি নিজ হাতে তাঁহার গলায় জয়মাল্য পরাইব, পাঁচ পীরের দরগা হইতে ধূলি লইয়া আয়, আমি নিজহাতে তাঁহার কপালে টিপ দিব,—আঁবের পাখা লইয়া আয়, রণশ্রান্ত স্বামীকে আমি নিজ হাতে বাতাস করিব, সুগন্ধি আতর দিয়া সরবৎ প্রস্তুত কর, আমি নিজ হাতে তাঁহাকে পান করিতে দিব'—সেই স্বামি-প্রেমের এই প্রতিদান, এই পরিণাম! কি আশ্চর্য্য সখিনার প্রেম! কৃষক-পল্লীর বুক-ভরা মধু। যাঁহারা এই চিত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের কাছে আমার এ সমালোচনার মূল্য কি? সাপুড়ে মনিবের প্রেম, কফিল-চোরার অনুশোচনা, কাজীর অত্যাচার, জাহাঙ্গীর দেওয়ানের ধলাই বিলের পদ্মবনে মাঝিদের হাতে মার খাওয়া, ধোপার পাটের কাঞ্চনের অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগ, অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার একগাছি মাল্যের ন্যায় লীলার প্রেম, গর্গের ব্রাহ্মণ্য তেজ, কেনারাম দস্যুর জীবনে আশ্চর্য্য বিপ্লব, সোনাইয়ের করুণ মৃত্যু-কাহিনী, কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, বীণার সুরে প্রণয়িনীর নামকীর্ত্তন প্রভৃতি কত কাহিনীর উল্লেখ করিব! এই রত্নভাণ্ডারে কত কৌস্তুভ, কত কহিনুর—তাহা কি বলিব! কমলারাণী জলোদ্ধারের জন্য পুষ্করিণীর জলে প্রাণ উৎসর্গ করিতেছেন, তাঁহার পাগল স্বামী শেষ রাত্রিতে তাঁহার পট্টাম্বরের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এই দৃশ্যের প্রত্যেকটি হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত থাকিবে! যে দিন প্রথম কুন্দনন্দিনীর কথা পড়িয়াছিলাম, যে দিন প্রথমে রজনী, সূর্য্যমুখী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির অমর চরিত্র দেখিয়াছিলাম, যে দিন সর্ব্বপ্রথম কবিবরের নিজের মুখে নৌকাডুবি ও চোখের বালির আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম, যে দিন আমাদের সাহিত্যিক-গগনের পূর্ণচন্দ্র শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি" পড়িয়াছিলাম ও অবনীন্দ্রনাথের কবিত্বময়, পাড়াগাঁয়ের ছন্দে লীলায়িত "রাজপুত-কাহিনী" "ক্ষীরের পুতুল" প্রভৃতি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় গল্প পড়িয়াছিলাম—সেই সকল স্মরণীয় দিনের কথা আমার মনে থাকিবে। এই পল্লী-গীতিকাগুলির সম্মোহিনী শক্তি আমার পক্ষে ততোধিক হইয়াছে, যেহেতু, ইহাদের প্রত্যেকটি খাটি বাঙ্গালার জিনিষ। আমি এই গানগুলির প্রশংসা ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতরা যখন অকুণ্ঠিতভাবে আমার প্রশংসাবাদের সায় দিয়াছেন, তখন আমি বুঝিয়াছি, আমার রসাস্বাদনে কোন ভুল হয় নাই। লর্ড রোণাল্ডসেকে আমি লিখিয়াছিলাম, 'পল্লী-গীতিকাগুলি যদি আপনার ভাল লাগে, তবে একটি ছত্রে আপনার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।' তিনি লিখিলেন "এগুলি আমার এত ভাল ও চমৎকার লাগিয়াছে যে, আমি ইহাদের জন্য একটি নাতিক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিতে সাহসী হইলাম।" ফ্রান্সের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক রোমান রোঁলা লিখিলেন, "যে দেশের কৃষক সখিনার মত চরিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, তাহাদের গুণগরিমার পক্ষে কোন প্রশংসাই অতিরিক্ত হইবে না। এমন সাহিত্যিক শিল্পের পরিচয় আমি অন্য কোন দেশের গ্রাম্য-সাহিত্যে পাই নাই।" সিলভান লেভি লিখিলেন, "এই কৃষকদের সাহিত্য-রসে আমি ডুবিয়া আছি—ইঁহাদের প্রসাদে আমি ফরাসী দেশের শীতল আবহাওয়ায় বাস করিয়া আপনাদের নির্ম্মল রৌদ্রোজ্জ্বল, শ্যামল দেশ এবং প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে দাম্পত্য-জীবনের কবিত্বপূর্ণ লীলার মাধুরী অনুভব করিতেছি ও বাঙ্গালা দেশ আমার চোখে নবশ্রী ধারণ করিয়াছে।" রদনষ্টাইন লিখিলেন "এই পল্লীগানের রমণী-চরিত্রগুলি অজান্তাগুহার চিত্রাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইতে পারে।" গুড্‌লে লিখিলেন—"আপনার ভূমিকার প্রশংসাবাদ পড়িয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বদেশ-প্রেমের ঝোঁকে আপনি কতকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; কিন্তু গীতি কথাটা পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, আপনার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" ডিরেক্টর ওটেন ইংলিশম্যানে লিখিলেন—"কলের ধোঁয়া ও গাড়ীর

নিরন্তর বিকট ঘর্ঘরের জ্বালায় অস্থির হইয়া পরিশ্রান্ত পর্য্যটক যদি পাথার অবাধ হাওয়া ও বিশাল দৃশ্য উপভোগ করে, তবে সে যেরূপ আনন্দ পায়, বর্ত্তমান কালের কৃত্রিম সাহিত্যপাঠের পর এই পল্লী-সাহিত্যে পৌছিলে পাঠকের মনে সেই ভাব আসিবে।" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ষ্টেলা ক্রোমরিস্ কোন একটি গীতিকা সম্বন্ধে লিখিলেন, "সমস্ত ভারতীয়-সাহিত্যে ইহার জোড়া নাই।" ইহা ছাড়া গ্রীয়ারসন, ব্লক, ক্রাইন প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্বের পণ্ডিতদিগের অজস্র প্রশংসোক্তির কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গটি বাড়াইবার এখানে অবকাশ নাই। আমি মজুরের মত এই ভাণ্ডার বহিয়া আনিয়াছি মাত্র—তাহারও যশের ভাগী অনেকটা চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি সংগ্রাহকগণ। ইহাতে আমার বিশেষ কৃতিত্ব কিছুই নাই। উদ্ধৃত প্রশংসাবাদ আত্মস্তুতির বাহানা মাত্র,এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। য়ুরোপীয়দের কথার একটা দাম আছে—তাহা এক কালে এত ছিল যে, তাঁহারা যদি আমাদের দেশের একটি মোহর হাতে লইয়া বলিতেন, এটা কাণা কড়ি, আমরা তাহাই প্রতিবাদ না করিয়া মানিয়া লইতাম, আর তাঁহারা যদি কাণা কড়িটাকে মোহর বলিতেন, তবে আমরা শামুকের মধ্যে রত্ন আবিষ্কার করিয়া বসিতাম! এখনও সেই যুগের অবসান হয় নাই, এ জন্য তাঁহাদের মতামত উল্লেখ করিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বিরাট্ পল্লী-সাহিত্যের সঙ্গে এ দেশের বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের আদৌ পরিচয় হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকগুলির দাম অত্যধিক করিয়া ইহাদিগকে সাধারণের একরূপ অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আজকাল সকলেই স্বদেশ-প্রেমিক সাজিয়াছি। খুব সস্তা দরে যে আমরা এ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছি, তাহাও বলা চলে না; কারণ,স্বদেশীদের প্রতি পাদক্ষেপের উপর পাহারাওয়ালার সতর্ক দৃষ্টি আছে, ইহাতে তাহাদের গৃহ-সুখ ও জীবনযাত্রা যে শুধু কণ্টকিত হইতেছে, তাহা নহে, তাহাদের ভাগ্যে দীর্ঘ কারাবাস, এমন কি, মৃত্যুদণ্ডও অনেকবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পথটা যে অনেক সময় ঠিক পথ, তাহা আমি স্বীকার করি না। অনেক সময় তাঁহারা ভুল করিয়া দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের স্বদেশটা কোথায়? হয় ত প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ করিয়া টেমস বা সীননদীর ধারে অবস্থিত নগরগুলিকে প্রকৃত আদর্শ কেন্দ্র মনে করিতেছি। আমাদের নিবৃত্তির রাজ্য স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় অলীক মনে করিয়া মোহান্ধ হইয়া জড়বাদীদের সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইতেছি। নেপোলিয়নকে দেখিয়া নেংটা সন্ন্যাসীকে অপদার্থ মনে করিতেছি, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দের আসনে ডি ভেলোরাকে বসাইতেছি। আমি শেষোক্ত ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা করিয়া এ কথা বলিতেছি না—যুগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের পূজনীয়দিগের প্রতি আমরা অশ্রদ্ধ হইতেছি—ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। "কাঠুরে এক মাণিক পেল, পাথর ব'লে ফেলে দিল—অভিমানে কাঁদছে মালিক মহাজনে টের পেল না।"

আমাদের স্বদেশ কোথায়, তাহার কি খোঁজ আমরা লইতেছি? সাচের নামক ফরিদপুর জেলায় একটা স্থান আছে, তথায় পাটী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এখনও ৫ শত টাকা মূল্যের এক একখানি পাটী তথায় পাওয়া যাইতে পারে। সেই পল্লীটির নাম স্বদেশ-প্রেমিকদের কয় জন জানেন? আমরা কি নেস্লসের চকোলেট ছাড়িয়া জনাইএর মনোহরা বা কৃষ্ণনগরের সরভাজার খোঁজ করিয়া থাকি—সেই চকোলেট যতখানি চারি আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে, তাহার দশগুণ পরিমাণে কদমা বা টানা গুড় ঐ মূল্যে পাওয়া যাইবে—অথচ চকোলেটের সঙ্গে তাহাদের স্বাদের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। আমাদের স্বদেশের সেই আনন্দবাজার—যেখানে মহিলারা কতশত প্রকারের ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের শতমুখে উৎসারিত হৃদয়ের প্রেমের সন্ধান দিতেন, সেই সকল সুখাদ্য এক্ষণে কোথায় গিয়াছে? চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, যদুনাথের কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য, লবেথার পালাগান প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে সেই উপাদেয় সামগ্রীগুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন পান্থাবাস বা রেষ্টুরাঁতে কোন বাঙ্গালী সেইগুলি কেমন হয়, তাহা প্রস্তুত করিয়া পরখ করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালার হোটেলগুলি দেখুন, তাহাতে একটা নেংড়া আম, ফজলী কি বোম্বাই পাইবেন না, একখানি সন্দেশ পাইবেন না। কারণ, বিলাতে যাহা জন্মায় না, তাহা বাঙ্গালাদেশের হোটেলে কেন থাকিবে? অনুকৃতি বা রুচি-বিকৃতি আর কাহাকে বলে? পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি। কারি, কাটলেট ও ডেভিলের গন্ধে মাতুয়ারা হইয়া আছি। রান্নাঘরে এখন গৃহিণীর প্রবেশ-নিষেধ, নারীমর্য্যাদার পাঠ তাঁহাকে শিখাইয়া পোষাকী করিয়া তুলিতেছি। পূর্ব্বে গৃহটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধিকারে ছিল—প্রকৃতপক্ষে এখন কোন স্থানে তাঁহার অধিকার নাই, সারাদিন যিনি আলস্যে কাটাইবেন, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা কিছুতেই থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার কোন স্থানেই সুবিধা পাইতেছেন না—তালাকনামা পাইবার অধিকারটা হইলেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের সফলতা হয়। যেখানে বাগান শত শত বেলা যূঁই, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, বকুল, রজনীগন্ধা, মালতী ও কুন্দে ভরপূর ছিল—এখন সেখানে কচুগাছের মত কতকগুলি চারা টবের মধ্যে পূরিয়া ল্যাটিন নামে তাহাদের পরিচয় দিয়া রুচির উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছি। সহরে খাওয়া-দাওয়া একটা বিড়ম্বনায় দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরে লবণাম্বুতীরবাসী উৎকল ব্রাহ্মণ লবণের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জন তৈয়ারী করিতেছে, সেই বিস্বাদ খাদ্য দ্বারা আমরা কথঞ্চিৎ জীবনরক্ষা করিতেছি এবং মাঝে মাঝে লোলুপনেত্রে বাবুর্চ্চির রান্নার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। কোথায় কে কবে হাতীর দাঁতের শিল্পের উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, কে কবে কৃষ্ণনগরের পুতুলকে এরূপ সুন্দর করিয়া গড়িবার প্রেরণা দিয়াছিল,—সেই সকল শিল্পীর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কাহারা, কাহারা বিশ্ব-বিশ্রুত মসলিন তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বঙ্গের দক্ষিণ বিভাগে কাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া নৌবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ধীমান্ ও বীতপালের মত কত ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া বঙ্গশিল্পরাজ্যের বিস্তৃতিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন খোঁজখবর কি আমরা রাখি? এ দেশে এখনও কত অপরিজ্ঞাত শিল্পী অপূর্ব্ব প্রতিভা লইয়া কোন নিভৃত পল্লীনিকেতনে দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও উৎসাহের অভাবে অশ্রুপাত করিয়া বিফলে জীবন কাটাইয়া দিতেছেন,

তাঁহাদের খবর কি আমরা রাখি? বাঙ্গালা দেশে এখনও অন্যূন অর্দ্ধশত ধর্ম্মগুরু আছেন, হয় ত তাঁহাদের কেহ কেহ অল্প দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যদিও কোন কোন স্থানে অনেকটা বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদের মত প্রাচীন উপনিষৎ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও তান্ত্রিকতার ধারা কে বজায় রাখিয়াছে? সম্প্রতি পাগলা কানাই, হরনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জনের তিরোধান হইয়াছে;—ইহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যসংখ্যা পঞ্চাশ সহস্র, তাঁহাদের মধ্যে ধনবান্, বিদ্বান্ ও গণ্যমান্য লোকের অভাব নাই—ইহাদের কাহারও কাহারও শিষ্য সমস্ত ভারতবর্ষময়। আমরা পাড়াগেঁয়ে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সহস্র সহস্র লোক একত্র হইয়া যাহা করিতেছে, তাহা কি—এ কথাটা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত হয় নাই—স্বদেশের প্রতি আমাদের এমনই অনুরাগ!

এ দেশে কতগুলি মেলা আছে। কি উপলক্ষে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কোন্ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে তাহাদের আবির্ভাব ও উন্নতি হইয়াছিল—তাহা জানিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। দেশীয় শিল্প এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে পূর্ব্বে উন্নতি লাভ করিত। এখন জার্ম্মাণী ও জাপান আমাদিগকে সস্তা দরের খেলনা দিয়া ভুলাইয়া ধীরে ধীরে সেই মেলাগুলি গ্রাস করিতেছে। বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব—কীর্ত্তন। সে দিনও গৌরদাসের মত কীর্ত্তনীয়া জীবিত ছিলেন, তাঁহার গান শুনিয়া পাখী চুপ করিয়া ডালে বসিত এবং তৃণাঙ্কুর রোমন্থ করিতে করিতে গাভী করুণনেত্রে অশ্রুপাত করিত, তাঁহার নাম এবং দুই এক জন কীর্ত্তনীয়া যাঁহারা এখনও বঙ্গদেশের কীর্ত্তনকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি আমরা জানি? যে কথকতা দ্বারা বাঙ্গালী এক সময়ে জনসাধারণের চিত্ত-বিজয় করিয়াছিল, যাহাদের গান ও আবৃত্তিতে উপনিষদের তত্ত্ব ও ভাগবত যেন জীবন্ত হইয়া কুটীরবাসীদের নিকট ধরা দিত, তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা কি আমরা করিতেছি? সে দিনও কৃষ্ণ কথক ও ক্ষেত্র চূড়ামণি জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্বন্ধে কোন পত্রিকায় কি একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে? অন্য কি কথা, বঙ্গদেশের কিরীট-রত্ন চৈতন্য-ধর্ম্ম কি করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল, কি করিয়া তাহা মধ্যভারতে ছত্রপুর ও রাজপুতনায় জয়পুর এবং উড়িষ্যায় ধানকেনাল, ময়ূরভঞ্জ, পূর্ব্বদেশে ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল,—কান্দাহারেও নাকি চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী এক সম্প্রদায় আছেন এবং দাক্ষিণাত্যেও মহাপ্রভুর প্রভাব কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে এখনও বিস্তৃত রহিয়াছে—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপুল বিস্তৃতি সম্বন্ধে একখানি ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। আমরা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, শচীমায়ের শোকগাথা ও নিমাই-সন্ন্যাস গাহিয়া গাহিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের জ্ঞান ও চর্চ্চা শেষ করিয়া ফেলিতেছি। ভক্তগণ প্রতি বৎসর ধূলটে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু সেই ইতিহাস রক্ষার কোনই চেষ্টা হইতেছে না। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের হাতের লেখা সংস্কৃত-মহাভারতের নকলখানি অনেকেই দেখিয়াছেন, হয় ত আর কয়েক বৎসর পরে তাহা বিলুপ্ত হইবে। আমাদের দেশের বালকরা, যাঁহারা কিং লুই এবং প্রথম চার্লসের হত্যার কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম জগতের কোন্ কোন্ স্থানে—এমন কি, ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা কোথায় সেই সকল আশ্রমে কি ভাবে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহার খবর রাখেন না। বাঙ্গালার পল্লীতে শত শত বাঙ্গালা পুঁথি—যাহাতে এ দেশের ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে—যাহা না পাইলে আমরা কখনও এ দেশের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিতে পারিব না—প্রতি বৎসর কীটদষ্ট হইয়া তাহারা বিলুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

এই বাঙ্গালাদেশের কত স্থানে যে কত বিরাট দীঘি, ভগ্ন-রাজপ্রাসাদ, স্তূপ ও মন্দিরাদি আছে, কত প্রবাদ ও গীতিকথা আছে; চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে—বাঙ্গালী বিজয়ী সৈন্যের নৌ-যানের অভিযান-কাহিনী গীতিকবিতায় লিপিবদ্ধ আছে, বাঙ্গালীরা সফর করিতে বঙ্গোপসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপে যাইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গীতিকা আছে—এমন কি, তাঁহারা যে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত যাইতেন এবং পর্ত্তুগীজ-দস্যু যাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় হার্ম্মাদ বলিত, তাহাদের সঙ্গে সেই দ্বীপবাসীদের সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইত, সে কথাও লিপিবদ্ধ আছে। এই বিপুল উপকরণ কালে বিলয়প্রাপ্ত হইবে, আমরা পশ্চিমমুখী দৃষ্টি কবে পূর্ব্বমুখে ফিরাইয়া আনিব? এখন আমাদের একটা কূপ খনন করিবার শক্তি নাই, মহীপাল দীঘি, রামপালের দীঘি, রাজদীঘি, ধর্ম্মসাগর প্রভৃতি হ্রদোপম বিপুলায়তন দীর্ঘিকা খনন করিয়া যাঁহারা রাজধানীর পত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল মহামনা নৃপতির কীর্ত্তি-কাহিনী উদ্ধার করিবার কি কোন প্রয়োজন নাই? বাঙ্গালা দেশটা কি ছিল, তাহা জানিতে চাহিলে এমন একখানা ইতিহাস বা বিবরণী নাই, যাহা আমাদিগকে এ দেশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিবে। এখন কি সময় হয় নাই—যখন তরুণের দল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ক্যামেরা লইয়া পর্য্যটন করিবেন? বঙ্গের বহু মূল্যবান্ উপকরণ বৎসর বৎসর নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, আমরা স্বদেশসম্বন্ধে এত গান বাঁধিয়াও এ দেশের খোঁজ-খবর লইতে একেবারে পরাঙ্মুখ হইয়া আছি। আজ এক দল তরুণ চাই—যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া জানিবেন, আমাদের কোন্ শিল্প এখনও কি উপায়ে রক্ষা করা যাইতে পারে; যাঁহারা প্রতিভাবান্ শিল্পীদের উৎসাহ দিয়া তাঁহাদের নাম দিবালোকে আনয়ন করিবেন; যাঁহারা পল্লীগুলির প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন। কত ভগ্নস্তূপে ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দীর্ঘিকার অন্তরালে লুকাইয়া আমাদের রাজলক্ষ্মী অভিশপ্তা হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহার অঞ্চলে এখনও অনেক মহার্ঘ রত্ন রক্ষিত আছে, পূজারী ভক্তিপূর্ব্বক চাহিলে তিনি তাঁহার প্রতি বিমুখ হইবেন না।

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (রায় বাহাদুর, ডি, লিট)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপ ও প্রণয়

অন্য দিক্ দিয়া বিচার করিলে সেই একই কথা আসিয়া পড়ে। হৃদয়-গুহাশায়ী শ্রীভগবান্ই আমাদিগকে অবিরাম আহ্বান করিতেছেন। তিনি হৃদয়-গুহায় আছেন, আমি সাত মহল ঘুরিয়াও তাঁহার সন্ধান পাই না। সন্ধান পাই না—কারণ, সন্ধান করি না বলিয়া, ডাকার মত ডাকি না বলিয়া,—চোখ কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া। তিনি হৃদয়-মন্দিরে আছেন। আমি অন্ধতায়, জড়তায়, অজ্ঞানে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। প্রতিনিয়ত এই বন্ধ দুয়ার খুলিবার জন্য তিনি স্বয়ং শত সহস্র-রূপে অজস্র করাঘাত করিতেছেন। আমি দেখি শুনি, অথচ মন অসাড় নিস্পন্দ। কাযেই দুয়ার খোলে না। পথে, ঘাটে, ঘরে, বাহিরে, শয়নে, স্বপনে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে-ফিরিতে অবিরাম তিনি আসিয়া দুয়ারে, আমারই হৃদয়-দুয়ারে, পাষাণের নির্ম্মিত দুয়ারে, করাঘাত করিতেছেন—আমি বধির, আমি অন্ধ, তাই দেখি না যে, তিনি ভিক্ষুকরূপে আমারই কাছে ভিক্ষা করিতে আসেন। তিনি কখন রোগরূপে, কখন বিপদ্রূপে, (ইহারাই শ্রীভগবানের স্নেহের দান) কখন ভাল, কখন মন্দ-রূপে, কখন দয়াপ্রার্থিরূপে, কখন প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, সেবা, প্রীতি, বৈরাগ্য, ভক্তি, করুণা, প্রণয় ইত্যাদি রূপে আসেন যান। আমার মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হয় না। সেটা যে অসাড়, নিস্পন্দ, মৃত। তাই অনুভব করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ॥
ও পথে যেও না, ফিরে এস ব'লে কাণে কাণে কত কহেছ।
তবু ছুটে গেছি ফিরায়ে আনিতে, পাছু পাছু তুমি গিয়েছ॥
চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির-অবহেলা পেয়েছ।
চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি-মুখে তুমি বয়েছ।" আবার
"নিজ হাতে গড়া করম-প্রাচীরে তোমারে আবরি রেখেছি"।

এই মৃত্যুই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছি বলিয়া আজ এই দশা। এখন এই যে পরশ-মণির অনুসন্ধান, এই যে অতৃপ্ত জীবন, ইহা কি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে না যে, আমরা পথিভ্রষ্ট হইয়া, দিশাহারা হইয়া রহিয়াছি? রূপ কি আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত পথের সংবাদ দেয় না? প্রেম প্রীতি কি আমাদের সেই স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে না? তাহা না হইলে প্রেমিক কবি কি সুধুই গাহিয়াছেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥
বচন অমিয় রস অনুখণ শুনলু
শ্রুতিপথ পরশ না ভেল।"

ইহা প্রত্যেক মানুষের কাছে জীবন্ত সত্য। সেই অজ্ঞাত দেশের সংবাদ এই রূপের অনুসন্ধানই দেয়। ইহাই প্রতিনিয়ত আমাদের মনের দ্বারে আঘাত দিতেছে—আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যাখ্যান করিতেছি। ব্যষ্টি বাদ দিয়া রূপই অরূপে পৌছাই-বার পথ। সমষ্টিভাবে রূপই অরূপ। তাই কবি গাহিয়াছেন—

আমি রূপ-সাগরে ডুব দিয়াছি অরূপরতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ-তরী॥
(রবীন্দ্রনাথ)

তন্ত্রে আছে—সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি।
(সাকার বিনা নিরাকার দেখা যায় না)

যাঁহারা রূপের ভিতর দিয়া অরূপের সন্ধান পাইতে চাহেন, তাঁহারাই যথার্থ রূপের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। নহিলে এই তৃষা কি ছার শরীরের ক্ষুধা মিটাইলেই মিটিবে? বরং তৃষা আরও বাড়ে। এই যে

"ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ"

অর্থাৎ ভক্তের চিত্ত অনুসারে জন্মরহিত হইয়াও, ভগবান্ জন্ম-গ্রহণ করেন, * এই যে অরূপের রূপ-গ্রহণ, ইহা ভক্তের বিশেষ সুবিধারই জন্য। তাঁহাদের অবলম্বন দিবার জন্য। এই রূপই রজ্জু, প্রণয়কে বাঁধিবার জন্য। এইজন্যই রূপের মধ্য দিয়া ভগবান্কে প্রেমের ডোরে বাঁধিতে হয়। এ কৌশল কি, তাহা সাধকমাত্রেই জানেন, ভক্তমাত্রেই চাহেন। এ কথাটা আজ হিন্দুর ছেলে ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকারে গোলমাল করিয়া ফেলিতেছেন। এ জন্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। আবার শাস্ত্রের দোহাই একবারেই পছন্দ নহে, কাযেই ইংরাজের কথা আনিতে হয়। সার জি, এ গ্রিয়ার্সন বলেন—"জীবাত্মার সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ, নারীর সহিত তাহার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির সহিত তুলনা করা হয়। আত্মার সহিত শ্রীরাধার একত্ব স্থাপন করা হয়, এবং এই আত্মা স্বধর্ম্মবশে আপনার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীভগবান্কে প্রেমাঞ্জলি দেয়। এ জন্য আত্মার শ্রীভগবানের উপর ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের সহিত তুলনা করা হয়। যেমন উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার সমস্ত সত্তা দ্বারা উপভোগ করিতে চাহে, সেইরূপ

* "If we have to apprehend God at all, it must be anthropomorphic"—Sir Olliver Lodge. Reason and belief.—p. 125.

জীবাত্মা এক প্রচণ্ড জলপ্রপাতেরই মত সেই অসীম সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি প্রেম ও প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিতে চাহে। কারণ, প্রেমের ভগবান্ দুই বাহু বাড়াইয়া ভক্তকে বক্ষে লইয়া তাহাকে এই অপার ভবসমুদ্রের পারে লইয়া যান। যে নর-নারীর মিলনাত্মক আদর্শে এই সম্বন্ধ রচিত হইয়াছে, তাহারই ন্যায় এই জীবাত্মা এবং শ্রীভগবানের মিলন রহস্যময়। স্বভাবের শিশু ভিন্ন অপর কেহ এই সম্বন্ধ ধারণা করিতে পারে না। যদিও আমরা দেখি যে, নর-নারীর অতি গোপনীয় সম্পর্ক ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তথাপি যাঁহারা এই বিষয়ে জ্বালাময়ী বাক্য সকল রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে কুভাবের লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই।" সার এডুইন আর্ণল্ডও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

এই যে সাধনার কথা বলা হইল, ইহাকেই পরকীয়া ভজন কহে। ইহা জগতে যত প্রকার মাধুর্য্য-রস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্মাদনাকর। আত্মবিস্মৃত করে বলিয়াই এই প্রকার সাধন-পদ্ধতি। সত্তার নিঃশেষ আত্মদান, সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া এই পরকীয়াতে যে ভাবে হয়, অন্য কোন সাধারণ মনোবৃত্তিতে তাহা হয় না। এই জন্যই ভক্ত এইভাবে শ্রীভগবান্‌কে পাইতে চাহেন। ইহাই "পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর। ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।" কিন্তু পূর্ব্বকথা ভুলিলে চলিবে না। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়। মদনের যাগ-যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥" মদনের যাগ-যজ্ঞ যদি ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় অর্পণ করা না হয়, তবে কালী কালী বলিয়া অজপা শেষ হইতেই পারে না। কামদহন না হইলে, কামের গতি উর্দ্ধদিকে প্রেরণ না করিলে, প্রণয় সার্থক হয় না। এই ভাবই শরৎবাবু প্রকারান্তরে তাঁহার "পণ্ডিত মহাশয়" গ্রন্থে অপূর্ব্ব ভাবে ফুটাইয়াছেন। একমাত্র পুত্রের দেহ চিতায় ভস্মসাৎ করিয়া ফিরিবার সময় যখন পণ্ডিত মহাশয় সেইরূপ আর একটি ছেলেকে বুকে লইয়া তৃপ্ত হইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, একমাত্র ছেলের মৃত্যুতেও সংসারে প্রয়োজন আছে, কারণ, বিশ্বপ্রেমে পৌছিতে গেলে কামনা ভস্ম হওয়া চাই। সেইরূপ মদন-দহন না করিয়া কেহ বিশ্বপ্রেমে বা ভগবৎ-প্রেমে পৌছিতে পারে না। * "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" সে জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিয়া অভিসার করিতে জানে। এই সমস্ত প্রকারেই রূপ এবং প্রণয়ের সহিত সতীত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং যথার্থ সার্থকতা মিলে। নচেৎ ইহাতে গরল উঠিবেই। ইহা সাপের মাথার মণি। সার্থক করিয়া, সাধনা করিয়া, আহরণ কর—অমৃত উপভোগ করিবে, নচেৎ সর্পদংশনে প্রাণ হারাইবেই। অনুরাগে ভজনের ক্রম এই—"ছাড় অন্য অভিলাষ, কৃষ্ণপদে কর আশ, রিপু মন শান্ত কর আগে। তবে রহে পঞ্চ প্রাণ, কৃষ্ণপদে দেহ দান, গোবিন্দ ভজহ অনুরাগে॥" ধ্রুব কামনা করিয়াই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু যখন হরি মিলিল, তখন আর কামনা রহিল না। একমাত্র হরিই কাম্য হইলেন।

এ দিকে এই পরকীয়ার বিষয়ে নবীন বলেন—"Not only poetic creation but other forms of genius are intimately connected with the sexual function (Metchnikoff. op: cit: p. 277) অর্থাৎ শুধু কবিতা সৃষ্টি নহে, অন্যান্য প্রকারের প্রতিভার সহিতও নর-নারীর যৌন সম্বন্ধ জড়িত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গেটে, ইবসেন, ভিক্টর হিউগো, সোপেন্ হাউয়ার, মিরাবউ, বায়রন্ প্রভৃতির উল্লেখ করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই পরকীয়া-প্রণয় করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই পরকীয়াই তাঁহাদের প্রতিভাকে রসসিক্ত করিয়া প্রেরণা দিয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু প্রতিভা সর্ব্বত্রই যে এরূপ, তাহা নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস পরকীয়াতেই জগতে শীর্ষস্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু এই পরকীয়ার লক্ষ্য শ্রীভগবানের দিকে। পাশ্চাত্যদের পরকীয়া শরীর-সম্বন্ধ-জ্ঞাপক। জীবনেও তাঁহারা শরীর লইয়াই পরকীয়া করিয়াছেন। এ দেশের পরকীয়ায় যাঁহারা নমস্য, তাঁহারা কামভাবকে বিগলিত করিয়া শুধু প্রেমটুকুকে ঈশ্বরমুখী করিবার চেষ্টাতেই জীবন কাটাইয়াছেন। এইমাত্র প্রভেদ বটে, কিন্তু ইহাতে আকাশ ও পাতালের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাই বুঝা যায়। সার উইলিয়াম জোন্স এক স্থানে বলিয়াছেন যে, এই দাম্পত্য-প্রেমকে ঈশ্বরমুখী করার চেষ্টা যেমন ভারতে হইয়াছে, এমন কোথাও দেখা যায় না। (Works vol. II P. 311) Richard Schmidt জার্ম্মাণ দার্শনিক বলেন যে, ভারতের এই ভাব আমাদের ধারণার অতীত। এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার বলেন যে, তিনিই জীবনের গুরুস্বরূপ (master of life)—যিনি মনের ইতর বৃত্তিগুলিকে অপূর্ব্ব সুন্দর এবং সুগন্ধি করিয়া গঠিত করিতে পারেন [Who can transform them into the most rare and fragrant flowers of emotion (Love's coming of Age P. 11.)] বলা বাহুল্য যে, এই সব কথা নর এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সতীত্বের দিক্ দিয়া এই সব কথা।

আর এক দিক্ দিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রূপের ধারণা দেশকালভেদে পৃথক্। ইহাতেও সূচিত হয় যে, রূপ অনন্ত, প্রেমও অনন্ত। তাই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়—"গর গর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে। যার যৈছে মনোভাব সে তৈছে শুনে।" ভিন্ন রুচি আছে বলিয়াই এক জনকে সকলের মনে না ধরিতে পারে। চীনদেশে পা ছোট হওয়াই নারীর রূপের লক্ষণ। কটিদেশ ক্ষীণ হওয়া রূপের লক্ষণ বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহা অতিমাত্রায় ছোট করা হইত। অধিকাংশ সভ্য সমাজে চোখ, মুখ, নাক, লাবণ্যই পছন্দ; তাহার মধ্যেও কাল ও কটা চুল বা চক্ষু, মরাল-গ্রীবা, কম্বু-কণ্ঠ প্রভৃতির পছন্দ-অপছন্দ আছে। যেখানে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া নারীকে দিনপাত করিতে হয়, সেখানে বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ হস্তপদাদিই রূপ; আর যেখানে খাটিয়া খাইতে হয় না, সেখানে পাতলা চেহারা, ভাল চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদিই পছন্দ (Ross OH. cit. P. 134), কিন্তু এত পছন্দের পার্থক্য সত্ত্বেও রূপের একটা সংজ্ঞা আছে। "চরিত্রহীনে" রূপের ব্যাখ্যা এই প্রকার:—"সন্তান-ধারণের উপযুক্ত যে সমস্ত লক্ষণ সব চেয়ে উপযোগী, তাহাকেই রূপ বলা হয়।" (ছোট ছেলে-মেয়ের রূপ আছে, কিন্তু তাহা উন্মাদকর নহে), "যতক্ষণ মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার রূপ। প্রতি অণুপরমাণু নিয়ত আপনাকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন ক'রে সে বিকাশ করবে,

---

* R. W. Emerson on "Love" দ্রষ্টব্য।

কোথায় গেলে কার সঙ্গে মিশলে কি ক'রে আরও সবল, আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে তাই এ নিত্য পরিবর্ত্তন। এ জন্যই নারীর মধ্যে যখন পুরুষ দেখতে পায়, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যে সেখানে আপনাকে আরও সুন্দর, আরও সার্থক ক'রে তুলতে পারে, সে লোভ সে কোনমতেই সামলাতে পারে না। রূপের আকর্ষণে তার এই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম, একেই সৌখীন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসে নিখুঁত ভালবাসা হয়। জীবের প্রতি অণুপরমাণু, প্রতি রক্তকণা, নিজেকে উৎকৃষ্ট পরিণতির মধ্যে বিকাশ করবার লোভ কোনমতেই সংবরণ করতে পারে না। যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দ্দিষ্ট সীমা শেষ হয়—তখন তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্য দেহ-সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য তাহার শিরায় উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাহাকেই পণ্ডিতের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলিয়া গ্লানি করা হয়। এর তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরেও হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস ব'লে সান্ত্বনা লাভ করে।… কিন্তু আজ তোমায় আমি নিশ্চয় বলছি ঠাকুর-পো, যে, এত বড় আকর্ষণ কোনমতেই এমন হেয়—এমন ছোট হ'তে পারে না। এ সত্য। সূর্য্যের আলোর মত সত্য। কোন প্রেমই কোন দিন ঘৃণার বস্তু হ'তে পারে না…পাপকে যত দিন না সংসার থেকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাবে, তত দিন এ সংসারে ভুল-ভ্রান্তি থেকেই যাবে এবং তাকে ক্ষমা ক'রে প্রশ্রয়ও দিতে হবে।" ইহা সুন্দর, ইহা চমৎকার।

আবার "দাবী-দাওয়া" নামে একখানি পুস্তকে দেখি যে, এই পরম রমণীয় কথাগুলি কিরূপভাবে কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। পুস্তকের নায়িকা আভাকে তাহার স্বামী অনাহার আশ্রয়হীন অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে। ৫।৭ বৎসর ঘর করিয়া স্বামীর নিকট আদর-সোহাগ সে পায় নাই; কারণ, স্বামী তাহার ডাক্তারী লেখাপড়া লইয়াই মসগুল। স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপের সময় বা ইচ্ছা তাহার নাই। আভা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গেল তাহার কুমারীকালের পরিচিত এক বন্ধুর সহিত। যাইবার কালে স্বামীকে লিখিতেছে—"আজ এ বাড়ী ছেড়ে আমি চল্লুম। যেখানে আমার বিয়ের মন্ত্রের দাবী ছাড়া অন্য কোন দাবী-দাওয়া নাই, সেখানে থাকা আমার পোষাল না। …ভরসা আছে, বিয়ের মন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাঁকে না পেলেও যে দাবীতে তাঁর সঙ্গ নিয়েছি, তার তিনি কোন অমর্য্যাদা করিবেন না।" আবার অবিবাহিতা সরযূ তাহার বিবাহিত বন্ধু প্রকাশকে লিখিতেছে, "প্রিয়তম! তুমি হয় ত ভাববে, কিসের দাবীতে আমি তোমাকে এই ভাবে চিঠি লিখছি। আমি বলিব ভালবাসার দাবী, অন্য দাবী আমার কিছুই নাই। বিয়ের মন্ত্রের দাবী হয় ত তোমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান্, কিন্তু আমি তা মানতে পারলাম না।" বাঙ্গালা উপন্যাস, গল্পের ধারাই আজকাল অনেক স্থানে এইরূপ। আজকাল এই ধারার লেখাই হয় ত এক শ্রেণীর লোকের পছন্দ বলিয়া মনে হয়। ভাল-মন্দ বিচার নিজ নিজ মনের উপর। কিন্তু আজ আমরা যে সব পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদের শিষ্য হইয়াছি, তাঁহারাও কি বলিতেছেন না যে, প্রকৃত সভ্যতার গতি ঊর্দ্ধদিকে? Tuny প্রভৃতি মহারথগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, যদি মানুষের পশুবৃত্তিগুলাকে স্ববশে আনাই মানুষ, সমাজ এবং জগতের মঙ্গলের কারণ হয় (অন্যথা সভ্যতা ইহা মানিবে কেন?), তবে এত রমণীয় সাজে ইতরবৃত্তিগুলাকে লোকলোচনের গোচর করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক্‌টাও না দেখান যে কত অনিষ্টকর, তাহা সহজে ধারণা করা যায়। যাহাদের তাড়নায় মানুষ সদাই অস্থির, সহস্র দিক্ হইতে যাহাদিগকে দমনের চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বদাই মানুষ যাহাদের কাছে পরাস্ত হইতেছে, তাহাদের সোজাসুজিভাবে দেখান ভাল, নচেৎ এত মনোরঞ্জন করিয়া অপর পক্ষকে অযথা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা অহিতকর।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে,আজ পাশ্চাত্যগণ (আমরা যাঁহাদের বিনা বাক্যব্যয়ে মহাগুরু করিয়া লইয়াছি) প্রকৃতি দেবীর জঠরে যাহা কিছু ছিল, তাহা স্বকীয় বুদ্ধিপ্রভাবে আদায় করিয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দাসীরূপে রাখিতে কৃতসংকল্প। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখান যায় যে, মানুষ উড়িতে পারে না, বিমান-পোতের সাহায্যে তাহা সাধিত হইতেছে। রেল, ষ্টীমার, টেলি-গ্রাফ, বেতার-যন্ত্র প্রভৃতি জগতে দূরত্ব সংহার করিয়াছে। জীব-বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি রোগ-মড়ক হইতে মানুষকে রক্ষা করিতেছে। এইরূপে অশেষ প্রকারে মানুষ প্রকৃতিদেবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রকৃতিদেবীকে জয় করিতেছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন এবং এই প্রকৃতি-বিজয়কে সভ্যতার উদ্দেশ্য বলিয়া বড় গলায় ঘোষণা করেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে সব বিষয়ে প্রকৃতিকে দাসী করিব আর কেবল মানব-প্রকৃতির বেলা তাহাকে আধিপত্যে প্রশ্রয় দিব, অবাধ স্বাধীনতা দিব, ইহার অর্থ কি? কোন্ বিচারে ইহা হয়? সব বিষয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করিব, কেবল শরীরের যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে এবং ঐ জাতীয় ইন্দ্রিয়-সুখটিকে বাদ দিব, ইহার সার্থকতা কোথায়?

প্রকৃত কথা এই যে, যাহা মুখরোচক বলিয়া মনে হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। স্বার্থ এবং ইন্দ্রিয়সুখই কাম্য, সুতরাং তাহার জন্য অন্য পন্থা। পরন্তু সতীত্ব-ধারণা গোঁড়ামী এবং বাড়াবাড়ি, এত বাঁধাবাঁধি করিয়া মানুষকে তাহার অবাধ উন্নতির পথ বন্ধ করা হইয়াছে। গায়ের জোরে, সমাজের শাসনে, শাস্ত্রের বা নীতির বচনে নারী-প্রকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা নর করিয়াছে। রোধ করিতে গেলে তাহা দ্বিগুণ জোর করে, ইহা স্বাভাবিক ইত্যাদি। এই জাতীয় বিচার আ… মানুষ কামবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই বলিতেছে। যা… সহজেই প্রবল, তাহাকে আবার আরাধনা করিয়া বড় করা কেন? সে ত গায়ের জোরে আদায় করিতেছে, করিবে। তাহাকে প্রশ্রয় দিলে যে লোক, সমাজ এবং জগৎ ক্রমশঃ রসাতলে যাইবেই, এটুকু কি ভাবিবার কথা নহে? রূপ এবং প্রণয় সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি ঠিক? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষু… আমাদের এ ধৃষ্টতা কেন, তাহা এই প্রবন্ধের মধ্যে আগাগোড়া বুঝিবার চেষ্টা। আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন মানুষের মধ্যে ইতরবৃত্তি আছে, তেমনই দেবভাবও আছে। ইতর জীবের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। প্রভুভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতির বিকা…

পশুদের মধ্যেও যথেষ্ট। আবার প্রণয় জন্ম আহার-নিদ্রা ত্যাগ ও শেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও জন্তুদের মধ্যেও দেখা যায়। এই পশু এবং দেবভাব ইহার কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। তবে পশু অপেক্ষা দেবভাবই জীবের যথার্থ কল্যাণকর, এজন্য তাহাকেই প্রাধান্য এ যাবৎ দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি নবীন আজ দেবভাব আর মানিতে চান না, কিন্তু বাস্তবিকই কি মানুষের উচ্চ প্রকৃতি নাই? পশুপ্রকৃতির কি মোড় ফিরান যায় না? এ পশুপ্রকৃতির মোড় ফিরাইতে পারিলে যে মাধুর্য্য সঞ্চিত হয়, তাহা যে কামজ মাধুর্য্য হইতে সহস্র গুণে মধুর, তাহা কৃতকর্ম্মা ভিন্ন কে জানিবে? ইহাই, অর্থাৎ মোড় ফিরানই যে পশুবৃত্তির চরম সার্থকতা, এ কথা নিজ জীবনে যিনি অনুভব না করিয়াছেন, তাঁহার কাছে এ কথার অস্তিত্ব নাই। এই পশুপ্রবৃত্তিই যে জীবনের মাধুর্য্য সংগ্রহ করিবার চরম পথ নহে, সেখানে পৌঁছিবার সোপান মাত্র, এইটি ভুল হওয়াতেই যত গোলযোগ। নদীকে রুদ্ধ করা যায় না, তাহার গতি-পরিবর্ত্তনই করা যায়, ইহাই উদ্দেশ্য—ইহাই সার্থকতা। Causeকে effect (পথকে লক্ষ্য) ভাবাই ভুল। বাস্তবিক বিশুদ্ধ প্রেমই আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির দোষে তাহা প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে। এই প্রণয় প্রেমের ছায়া মাত্র এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়া আছে। বারংবার আমরা নানারূপে এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। কারণ, যে বিশ্বব্যাপী ভ্রমে এইরূপ ধারণা আজ হইয়াছে, তাহা সহস্র সহস্রবার সংশোধনের চেষ্টায় পুনরুক্তি দোষ হওয়া উচিত নহে। "নেতি নেতি" বারংবার বিচার সত্ত্বেও মায়ার নিবৃত্তি হয় না। আজ বিশ্বময় এই ভুলের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কারণ, যে সব মহারথী আজ জগতে শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি কেবল শরীর এবং তাহার অমানুষিক ব্যাপারে আবদ্ধ। আজ সকলেই আমরা জড়শক্তির উপাসক। চৈতন্যশক্তি যেটুকু জড়শক্তি বিকাশের জন্য আবশ্যক, সেইটুকুমাত্র লইয়া বাকীটুকুর উদ্দেশ লওয়া অধুনা অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই ইন্দ্রিয়ে বদ্ধ জীব যে ইন্দ্রিয়াতীত একটা কিছু আছে, তাহা মানিতে চাহে না। এই সীমাবদ্ধতায় সব গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। আমাদের চারিদিকে, ভিতরে-বাহিরে যে একটা অসীম অতীন্দ্রিয় জগৎ অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারও দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়াতীত জগৎটাই আমাদের মধুচক্র। যাহা কিছু মাধুর্য্য জীবনে আহরণ করা হয়, সবটাই এই শরীরের উপরের জগৎ হইতে। নবীনের এই যে উপেক্ষা, ইহা গোটাকতক মুখরোচক কথায় বেশ পরিস্ফুট। যেমন "সার্থকতা", "অবাধ চিন্তা", "মুক্ত আলো ও বাতাস" ইত্যাদি। "সত্য" এই কথাটার তথ্য আবিষ্কার করিতে যদি কেহ প্রাণপাত করেন, তবে দেখিবেন যে, "সত্য" একমাত্র শ্রীভগবান্। অপর কেহ বা কিছু সত্য হইতে পারে না। তবে আংশিকভাবে সত্য অনেক থাকিতে পারে। তাহাদেরই সত্য বলা প্রচলিত। "সূর্য্যের আলোর মত সত্য" এ কথাটাও আংশিক সত্য। কারণ, সূর্য্যও সব কালে এবং সব দেশে ছিলেন না। সূর্য্য হয় পৃথক্‌ভাবে সৃষ্ট নয়, Evolution-বাদীদের মতে ক্রমবিকাশে জন্মিয়াছেন। কাযেই দেশ এবং কাল হিসাবে তিনিও সত্য নহেন। এইরূপে "স্বাধীনতা" অর্থে যথেচ্ছাচার নহে। প্রাণিতত্ত্ব (Biology) হিসাবে যাহা ভাল বা ঠিক, সমাজতত্ত্ব হিসাবে তাহা ঠিক না হওয়াই অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব। শরীরতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব ব্যতীত একটা অধ্যাত্মতত্ত্বও আছে। এই সব কথাতে কি সে দিক্ দিয়া দেখার কোনই প্রয়োজন নাই? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত না হইলে এ সব মতামতের বিরোধ কখন যাইতে পারে না। দেহ-সর্ব্বস্ব করিয়া জীবনযাপন করাই যদি জীবনের সার্থকতা হয়, তবে নবীন যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক, কিন্তু মানুষের জীবনে তাহাকে "অক্লান্ত উদ্যমে" উচ্চ গতির দিকে টানিতেছে, এ কথা শরৎবাবুও স্বীকার করেন। "জীবন আমার বৃথায় গেল" এ কথাটা কি সময়ে সময়ে অধিকাংশ লোকই অনুভব করেন না? মধ্যে মধ্যে মনে কি সকলেরই হয় না যে—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম, সুতমিত রমণীসমাজে।
তোঁতে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু, অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময় তোঁহারি পদে বিশোয়াসা॥

এই দেহ কি সদাই মনের খেদ মিটাইতে পারে? প্রণয়ে, রূপেও কি, শরীর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, অবসাদ আসে না? যখন মানুষ "কোথা কূল" "কোথা কূল" করিয়া বেড়ায়, কে তাহার মনে শান্তি দিতে পারে? মধ্যে মধ্যে কি সকলেরই মনে আসে না, "যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা ত চাহে না আমারে" এ আকিঞ্চনের অর্থ কি? ইন্দ্রিয় বাহিরে অনুসন্ধান ভিন্ন এ আকুলি-বিকুলি কিছুতে কি মিটিতে পারে? Metchnikoff প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, রোগ, শোক, ক্ষয়, মৃত্যু জগতে অহোরাত্র বিচরণ করিতেছে। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ইহা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই জগতে যত দুঃখ, ফলে মানুষ কোন রকমেই শান্তি পাইতেছে না, ইহা অনেকটা সত্য। ত্রিবিধ তাপ মানুষকে তাড়না করিতেছে। তাপ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ মনের দুঃখাদি। আধিভৌতিক তাপ জীবজন্তু হইতে উৎপন্ন—যেমন কীটাণুঘটিত রোগ। আধিদৈবিক তাপ—যেমন জলপ্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। কোন মানুষই এই সব তাপ হইতে একবারে পরিত্রাণ পায় না। কাযেই বৈরাগ্য করিবার, সংযমী হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এই রোগ-শোক-নিষ্পেষণ চারিদিকে বলিয়াই জীবনে অনাস্থা আসে এবং মানুষের গতি-মতি ঊর্দ্ধদিকে টানে। কাযেই প্রাণ সদাই শান্তি-সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত। তাই "বৃথা বৃথা" রব। তাই বলি,—

"কবে পরশমণি করি পরশন।
এ লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন॥
কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম,
হব সুখে দুখে আমি নির্ব্বিকার—
কত দিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার?"

এই তাপ, এই ঊর্দ্ধদিকে সদাই প্রেরণার, আরও সূক্ষ্ম কারণ আমরা পরে মোটামুটি দেখিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

১

কুমুদিনী বল্‌লেন, আজ পিসীমা আসবেন।

কুমুদিনী বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী। বিশ্বনাথ একটা আফিসের বড়বাবু। কুমুদিনীর বয়স বছর পঁইত্রিশ হবে, রং গড়ন মাঝামাঝি, মুখখানি হাসি হাসি, শরীর গোলগাল, ধরণ-ধারণ বেশ গিন্নীবান্নীর মতন। তাঁর কাছে পাড়ার রাম মিত্রের স্ত্রী বসেছিলেন। বয়স কুমুদিনীর চেয়ে কিছু কম। নাম হেমলতা।

হেমলতা বল্‌লেন, কে? পদ্ম পিসী?

—আমাদের আর ত কোন পিসী নেই। উনি ছয় মাসে বছরে একবার ক'রে আসেন।

পদ্ম পিসীর কথা হ'তে লাগ্‌ল। তিনি রাণাঘাটের কাছে একটি গ্রামে থাকেন। বিধবা, ছেলেপুলে নেই, স্বামী কিছু টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন, তাইতে তাঁর চলে, কারুর কাছে হাত পাত্‌তে হয় না, বরং পূজার সময় ভাইঝিকে, তাঁর ছেলেমেয়েকে কাপড়-চোপড় কিনে দেন। বয়স তেমন বেশী নয়, এখনো পঞ্চাশ পার হয় নি। খুব যে বেশী সেকেলে, তাও নয়, পড়াশুনা বেশ আছে, বেশ আমোদে-আহ্লাদে আর কথার ভারি চটক।

হেমলতা বল্‌লেন, পিসীমা মানুষ বেশ, কিন্তু কার সাধ্য তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায়!

—কিন্তু মনে কিছু নেই, একেবারে গঙ্গাজল। শুন্‌তে পাই, ছেলেবেলা থেকে নাকি ওঁর খুব মুখের ধার। এ দিকে দয়ামায়া কেমন, তা ত তুমি দেখেছ?

—সে কথা আর বলতে। অমন আর একটি মানুষ মেলা ভার। এখন উঠি ভাই, তিনি এলে আবার আস্‌ব।

হেমলতা বাড়ী গেলেন। পিসীমা বিকেলবেলা এলেন। তাঁর জন্য বাড়ীর গাড়ী পাঠান হয়েছিল, বাড়ীর এক ছেলে তাঁকে আন্‌তে গিয়েছিল। তিনি বাড়ীতে ঢুকতেই চার দিক্ দিয়ে তাঁকে নমস্কার কর্‌বার ধুম প'ড়ে গেল। কুমুদিনী দরজা-নমস্কার করলেন। পিসীমা তাঁর থুঁতি ধ'রে নিজের হ'তে চুমো খেলেন। বল্‌লেন, কুমি, ভাল আছিস্ ত? কত দিন তোদের দেখি নি।

পিসীমা বারান্দায় উঠ্‌তে তাঁকে প্রণাম করবার জন্ম কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। কুমুদিনীর দুই ছেলে,দুই মেয়ে; বড় মেয়ের বয়স উনিশ বছর, শ্বশুরবাড়ী থেকে সম্প্রতি এসেছে। তার পর ছেলে সতের বছরের, কলেজে পড়ে। তার পর আর একটি চোদ্দ বছরের ছেলে, ছোট মেয়েটি এগার বছরের। আবার গুটিকতক ভাসুরপো-ভাসুরঝিও আছে। মা ষষ্ঠীর কল্যাণে বাড়ীতে ছেলেমেয়ের অভাব নেই। তারা যদি ছাড় লে,—তার পর ঝি-চাকরের পালা। চাঁপা পুরানো ঝি, মাটীতে ঢিপ্ ক'রে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লে, পিসীমা, গড় করি।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলেমেয়েরা আবার ছাঁকাবাকা ক'রে ধর্‌লে, দিদিমা, আমাদের জন্য কি এনেছ?

কুমুদিনী বল্‌লেন, আঃ, তোরা এমন ব্যস্ত করিস্ কেন? এই ত সবে বাড়ীতে পা দিয়েছেন, রেলের কাপড় ছাড়ুন, মুখে হাতে একটু জল দিন, তার পর না হয় আসিস্।

পিসীমা বল্‌লেন, না রে না, তোরা থাক্। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কি আর এমন জিনিষ পাওয়া যায় যে, আমি তোদের জন্য নিয়ে আস্‌ব? তা শুধু হাতে ত আসতে নেই, যা পেয়েছি, নিয়ে এসেছি।

পিসীমার সঙ্গে ছিল একটি প্যাটরা আর একটা পুঁটুলী। সেই দুটো খুলে সকলের হাতে খাবার দিলেন, ছোটদের পুতুল, আর গোটাকতক ঝুনা নারিকেল কুমুদিনীর হাতে দিলেন। পুঁটুলীর ভিতর গোটাকয়েক চাল্‌তা ছিল, তা-ও বেরুল। জিনিষ ত ভারি, কিন্তু তাই পেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোকের আহ্লাদ দেখে কে!

সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ আফিস থেকে এসে পিসীমাকে প্রণাম করলেন। পিসীমা বল্‌লেন, বাবা, ভাল আছ ত?

রাত্রি হতেই ছেলেমেয়ের দল পিসীমাকে ঘিরে বস্‌ল। কুমুদিনী হেসে বল্‌লেন, ছেলেরা সব পিসীমাকে পেয়ে বসেছে।

পিসীমা বলিলেন, ওরা ত রোজ রোজ আর আমাকে পায় না, কত দিন পরে এসেছি, একটু গল্পগুজব করবে না?

কুমুদিনী সংসারের কাযে গেলেন। পিসীমার কাছে ব'সে ছেলেমেয়েরা তাঁর দেশের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল। অধিকাংশই শোনা কথা; কেন না, দু'চারজন বড় ছেলেমেয়ে ছাড়া তারা কেউ কখনো পিসীমাদের দেশে যায় নি। তবু জিজ্ঞাসা করা ফুরোয় না। গ্রামে রাসের মেলা কেমন হয়েছিল, পিসীমার বাগানে এ বছর আম হয়েছিল কি না, চৌধুরীদের পুকুরে মাছ কি রকম, পরাণ ঘোষের নতুন বাড়ী কতদূর হ'ল, এই রকম কত কথা। তার পর সকলে পিসীমাকে নিজেদের খবর শোনাতে আরম্ভ করলে। মেয়েদের কার কার নতুন বন্ধু হয়েছে, সে কথা হ'ল; স্কুলে যে সব মেয়েরা পড়ে, তাদের মধ্যে কার কার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কে নতুন মাষ্টার এসেছে, এবার স্বদেশী মেলা কেমন হয়েছিল, এই সব কত কি পরিচয় দেওয়া হল।

কুমুদিনীর বড় ছেলে ব্রজনাথ—ডাকনাম ভোঁদা—কলেজে পড়ে কি না, তাই তিনি একটু চালাক। মাঝখান থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল, হাঁ দিদিমা, তোমার নাম পদ্ম হ'ল কেন? তুমি বুঝি দেখ্‌তে পদ্ম-ফুলের মত ছিলে?

ছেলেবেলা পিসীমা দেখতে কেমন ছিলেন, তা ত আমরা জানি না, তবে সুন্দরী যে ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায়। এখনো চুল তেমন পাকে নি, এখনো মুখখানি ঢলঢলে, চোখ ভাসা ভাসা, এখনো হাসলে গালে টোল খায়। পিসীমা বল্‌লেন, বাপ-মা ত আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে আমার নাম রাখে নি! আমি আর যাই হই—আফিংখোর কমলাকান্তের পদী পিসী ত নই! আর তোর নাম ভোঁদা হ'ল কেন?

ঘরশুদ্ধ ছেলেমেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। ব্রজনাথ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ও ত আমার ভাল নাম নয়।

—রেখে দে তোর ভাল নাম! কাচের আলমারীতে তোর কি নাম তোলা আছে—তার কে খোঁজ রাখে রে! দেশ-সুদ্ধ লোক তোকে কি ব'লে ডাকে? আ মরি, নামের কি ছবরা! ভোঁদা, ভোঁদা, ভোঁদা! গোঁড়া নেবুর মত টক জোঁদা! আর আমার নাম? কথায় বলে আহা, পদ্ম-ফুলের মত দেখতে!

সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। ব্রজনাথের বড় বোন্ উমা বল্‌লে, কেমন, দিদিমার সঙ্গে আবার লাগবি? কলেজে দু'খানা ইংরিজি বই পড়লেই হয় না। দিদিমার কথায় কেউ এঁটে ওঠে না, তুই ওঁর সঙ্গে পারবি?

আর এক মেয়ে বল্‌লে, একটা নতুন ছড়া শিখলাম—

ভোঁদা, ভোঁদা, ভোঁদা,

গোঁড়া নেবুর মত টক জোঁদা!

ভোঁদা ত পালাবার পথ পায় না। সে রাত্রের পালা সায় হ'ল।

২

তার পরদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীমা কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ রে, হিমুরা সব ভাল আছে ত?

হিমু হলেন হেমলতা। কুমুদিনী বল্‌লেন, হাঁ, পিসীমা, তারা সব ভাল আছে। হিমু কাল এসেছিল, তোমার আস-বার কথা সে জানে।

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় হেমলতা এসে উপস্থিত। পিসীমাকে নমস্কার করতেই তিনি বল্‌লেন, এই যে হিমু, এই-মাত্র তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি চিরজীবী হয়ে থাকবে।

—পিসীমা, মেয়েমানুষের পক্ষে এমন কথা কি আশীর্ব্বাদ? বরং আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওঁকে আর ছেলেদের রেখে যেতে পারি।

—তা মা, সত্যি কথা। সাজান সংসার রেখে যাওয়া মেয়েমানুষের বড় ভাগ্যির কথা। তুমি ভাগ্যবতী, পাকা চুলে সিঁদুর পরবে।

—পিসীমা, খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তোমাদের দেশের কাছে কোথায় না—কি দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। বড় জাগ্রত দেবতা। সত্যি কি?

—সত্যি বই কি! সব কথা বুঝি তোমরা শোন নি? গ্রামে একঘর বামুন আছে, তার স্বপন হ'ল যে, দেবী তার ঘরে আসবেন। স্বপনে দেখে অন্নপূর্ণার রূপ, রূপে ঘর আলো ক'রে মা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, দেখ, তুই বড় দুঃখী, আমি এলে তোর দুঃখ ঘুচে যাবে। পঞ্চাননতলা দিয়ে যে পথ গাঁয়ের বাইরে গিয়েছে, সেই পথে অশ্বথ-গাছের উত্তর ধারে আমি আছি। আমাকে তুলে নিয়ে

এসে ঘরে রাখ, তার পর আলাদা মন্দিরে রাখ্‌বি। স্বপন পেয়ে বামন সেই গাছতলায় খুঁড়ে দেখে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর রয়েছেন! তুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখ্‌লে, আর দেখতে দেখতে চারিদিকে কথা রাষ্ট হয়ে গেল। আশপাশের গ্রাম থেকে, দূরের গ্রাম থেকে কত লোক মানত্‌ ক'রে আস্‌তে লাগল, কত লোক হত্যা দিতে আসতে আরম্ভ করলে। ভারি জাগ্রত দেবতা। কত লোকের রোগ-বালাই সেরে গিয়েছে, কত লোক ঠাকুরকে সোনার গহনা গড়িয়ে দিয়েছে। বামুনের বড় কষ্ট ছিল, এখন বেশ সচ্ছল সংসার। ঠাকুরের মন্দির হয়েছে, বামুন প্রায় মন্দিরেই থাকে, মা'র আরতি করে, ভোগ দেয়, এমন ভক্তি দেখি নি। সাধে কি মানুষে ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে?

কুমুদিনী আর হেমলতা ব'লে উঠলেন, পিসীমা, এক দিন আমরা দর্শন করতে যাব।

—যাবে বই কি। এত লোক যাচ্ছে, তোমরা যাবে না কেন? আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

—তা ত যাবেই, তোমাকে কি আমরা ছেড়ে যাব?

অন্য কথাবার্ত্তা হ'তে লাগল। পিসীমা বল্‌লেন, আগে আগে সহরে আর পাড়াগাঁয়ের লোক একটু আলাদা আলাদা রকম হ'ত। সহরে খরচপত্র বেশী, সকলে নিজের নিজের ধন্ধা নিয়ে থাকে, কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। পাশের বাড়ীতে কে থাকে, হয় ত তার নামই জানে না। পাড়াগাঁয়ে তবু ঢের ভাল, পাড়াপড়শীর খোঁজ-খবর রাখে, বিপদ-আপদে বুক দিয়ে পড়ে। কিন্তু সেটাও ক'মে যাচ্ছে। এখন দেশে বসেও কেবল সহরের কথা। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা সহরে পড়তে আসে, বাবুরা চাকরী করতে আসে। মনে করলেই এখানে আসা যায়, রেলের পথ, নৌকাতে আর ক'জন যাওয়া-আসা করে? যা এখানে হবে, পাড়াগাঁয়েও তাই, সব যেন এক হয়ে গিয়েছে।

হেমলতা বল্‌লেন, তুমি ত পিসীমা অনেক দেখেছ শুনেছ, আমরা ত কিছুই দেখি নি, তবু মনে হয়, সব যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে।

কথার মাঝখানে চাঁপা ঝি এসে খবর দিলে, পিসীমা, তাল-তলার দাদাবাবু এসেছে।

দাদাবাবু পিসীমার ভাসুরপো বিপিন, বছর কুড়ি বয়স, ঝি-র্ণ পাসা বাজরোজে। পিসীমা বললেন, ডেকে নিয়ে আয় না।

হেমলতা বললেন, আমি উঠে ঘরের ভিতর যাই। আমি ত কখনো ওঁর সুমুখে বেরুই নি।

পিসীমা বললেন, তায় আর কি হয়েছে? তোমার ছেলের বয়সী, ওর কাছে আবার লজ্জা কি?

হেমলতা ব'সে রইলেন। বিপিন এসে আগে পিসীমাকে প্রণাম করলে, তার পর কুমুদিনী আর হেমলতাকে। বাড়ীর কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা ক'রে পিসীমা বললেন, হ্যাঁ রে, আজকাল তোদের কি যে সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারি নে!

—কেই বা বুঝতে পারে? এই দু' মাস রাজবাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে কাটিয়ে এলাম। ঠিক রাজভোগ নয়, মোটা চাল আর কলাইয়ের ডাল, তবু ত ঘরের ভাত বেঁচে গেল! আগে লোকে বলত হরিণবাড়ী, এখন বলে রাজবাড়ী।

—শুনলে ছেলের কথা! জেলে যাওয়া কি বড় পৌরুষের কথা?

—বড় লজ্জার কথা, যদি দুষ্কর্ম্ম ক'রে জেলে যেতে হয়। আমরা এই যে হাজার হাজার লোক, আমরা কি চুরী-ডাকাতী করেছি, না খুন-খারাপি করেছি? কোনখানে যদি সভা হয়, আর কেউ যদি সভায় যায় ত তার জেল হবে! ভাল কথা! রাজার মর্জ্জি! এইবার যদি পথে হাঁটতে কেউ হাঁচে কিংবা কাসে ত তার বেত-পেটা হবে!

—এ আবার কোন্‌দেশী আইন? যা তা আইন করলেই হ'ল?

—তা না হ'লে সরকারী ব্যবস্থার বাহাদুরী কি? এ রকম জেলে যেতে আর অপমান কি? যারা বেরিয়ে আসে, তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে যায়। এই দেখ না—কত বড় বড় লোক জেলে গেল।

—তা হ'লে তুইও বড়লোক হলি?

—না-ই বা হলাম! বড়লোকের সঙ্গে ত জেলে ছিলাম।

পিসীমা চুপ ক'রে একটু ভাবলেন, তার পর বল্‌লেন, দেশের অদৃষ্টে কি যে আছে, ভেবে পাই নে।

বিপিন বললে, যাই থাক্‌, লোকের একটু চৈতন্য হয়েছে। একটু ঘা না খেলে কি মানুষের মনে লাগে? এখন তবু লোকে বুঝতে পারছে যে, অনেক কষ্ট স্বীকার না করলে দেশের মঙ্গল হবে না।

—তাও ত বটে। জননী জন্মভূমি বলেছে ত। তা যাঁকে মা বল্‌ছে, তাঁর জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়।

কুমুদিনী বিপিনের জন্য রেকাবি ক'রে জলখাবার এনে তার হাতে দিলেন।

পিসীমা বললেন, হাঁ রে বিপিন, তুই ত তিনটে পাশ করেছিস, এখন কি করবি ?

—কি আর করব ? এখনো ত কর্ম্মভোগ ফুরায় নি, এখন এম এ পড়ব।

—ও আবার কোন্‌দেশী কথা! লেখাপড়া শেখা কি কর্ম্মভোগ ?

—তা কেন ? তবে পাশ করা ত আর লেখাপড়া নয়!

—তোর সবই অনাছিষ্টির কথা! আবার লেখাপড়া কাকে বলে ?

—একজামিন পাশ করা কেবল কতকগুলো বই গেলা। হজমও হয় না, বিদ্যাও হয় না। বিদ্যা শিখতে হ'লে তার পর শিখতে হয়।

—কেন, পাশ ক'রে ছেলেরা ত রোজগারে হ'ত।

—সে কাল আর নেই। এখন পাশ কর—তার পর ভেরেণ্ডা ভাজ!

—সে কথাও ত সত্যি। কত পাশ-করা ছেলে সব ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও কিছু পায় না।

—কোত্থেকে পাবে ? উকীল ডাক্তার কেরাণী কত জন হবে ? আমরা শুধু মার্কা-মারা মাল, তা বাজারে এ মাল চলে না। যেখানেই যাই, পাবার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র! মাড়োয়ারীরা স্কুলেও যায় না, পাশও করে না, এ দিকে অর্দ্ধেক কলকেতা সহর দখল ক'রে নিয়েছে। যে টাকাটা আমরা কলেজের পাদপদ্মে ঢালি, সেই টাকা দিয়ে মুদির দোকান করলে তবু পেট চলত।

পিসীমা বল্‌লেন, তাই ত, এ সব ত ভাববারই কথা। তোরা সব এই বয়সে এত রকম ভাবছিস্‌, আগে কারুর কোন ভাবনা ছিল না, দু' বেলা দু' মুঠো ভাত পেলেই নিশ্চিন্তি।

—সে কাল গেছে, আর ফিরবে না।

চাঁপা এসে হেমলতাকে বললে, বউ-দিদি, তোমার গাড়ী এয়েছে; সইস বল্‌ছে, ঘোড়া দাঁড়াচ্ছে নি।

পিসীমা হেসে বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পা ব্যথা হয়ে থাকে ত একটু বসতে বল্‌ না!

হাসির রোল উঠল। হেমলতা চ'লে গেলেন। আর একটু পরে বিপিনও উঠে গেল।

৩

পৌষ মাস। পৌষ মাসে কলিকাতায় দুটি তীর্থস্থানে খুব ভিড় হয়, এক ভবানীপুর কালীঘাটে কালীর মন্দিরে, আর এক খিদিরপুর ঘোড়দৌড়ের মাঠে। ট্রাম, মোটর, বস্‌ খিদিরপুরের দিকে বেশী; কেন না, রেস-খেলায় সকল জাতের সমন্বয়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের কোন ভেদ নেই, কালা-গোরার বিচার নেই। ট্রামে গুজরাটী, মাড়ওয়ারী, পঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আছে, সকলের কাছে টিপ্‌ আছে, ট্রামে ব'সে বসেই বাজী রাখ্‌ছে। এক জন হয় ত হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, কেৎনা খাওগে ? আর এক জন তার হাতে তালি দিয়ে বল্‌লে, দশ রুপইয়া। অমনি বাজী হয়ে গেল। এরা এক রকম যাত্রী, আর কালীঘাটের যাত্রী অনেকেই গরীব, অনেকে হেঁটে চলেছে, বড় জোর না হয় ট্রামে ক'রে।

কলিকাতায় আস্‌বার দু' চার দিন পরে পিসীমা কুমুদিনীকে বল্‌লেন, এক দিন পোষ-কালী দর্শন করতে যেতে হবে।

—যে দিন ইচ্ছে গেলেই হ'ল, পিসীমা। বাড়ীর গাড়ী রয়েছে, যে দিন বল্‌বে, তোমার জন্য গাড়ী থাকবে। অমাবস্যার দিন যাবে ?

—না বাছা, অত ভিড়ের দিন গিয়ে কায নেই। চ না, এরি মধ্যে এক দিন দর্শন ক'রে আসি!

—কবে যাবে, বল ?

—গাড়ীর যদি সুবিধা হয় ত কাল গেলেই হয়।

—গাড়ীর আবার সুবিধা-অসুবিধা কি ? তোমার জন্য গাড়ী চাই—তার আবার কথা!

বিশ্বনাথ খেতে বসেছেন, পিসীমা পাখা-হাতে মাছি তাড়াচ্ছেন। কুমুদিনী বল্‌লেন, কাল পিসীমা কালীঘাটে যাবেন, গাড়ী চাই। পিসীমা বল্‌ছিলেন, গাড়ীর সুবিধা হবে কি ?

হেসে বিশ্বনাথ বল্‌লেন, গাড়ীর কথা আমি ব'লে দিচ্ছি। আমি ট্রামে কি ঠিকা গাড়ী ক'রে আফিস যাব। পিসীমার সঙ্গে তুমি যেও, আর ছেলে-মেয়েদের যাকে ইচ্ছে হয়, নিয়ে যেও!

রাত পোহাতেই কালীঘাটে যাবার ধুম প'ড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা—যাদের স্কুল-কলেজ নেই, তারা পিসীমাকে চেপে ধর্‌লে, তারাও যাবে। পিসীমা কুমুদিনীকে বললেন, ওদেরই বা মনে দুঃখ থাকে কেন? আর একখানা গাড়ী ডাকতে বল।

দু'খানা গাড়ী ক'রে সকলে কালীঘাটে গেলেন। চাঁপা ঝি পিসীমার গাড়ীর পিছনে বসেছিল।

বিশ্বনাথ যাদের যজমান—সেই হালদারদের বাড়ীতে নেমে পিসীমা কুমুদিনীকে সঙ্গে ক'রে ধুলাপায়ে কালীদর্শন করতে গেলেন। ছেলেরা গরম গরম বেগুনী কিন্‌তে ছুটল।

পিসীমা বললেন, এ যে পথ-ঘাট অনেক বদ্‌লে গিয়েছে! মন্দিরের আশে-পাশে ভেঙ্গে চুরে বড় রাস্তা হয়েছে।

কুমুদিনী বললেন, মিউনিসিপালিটী থেকে সব পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে, চারদিকে আর তেমন ঘিঞ্জি নেই।

পিসীমা মন্দিরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। মন্দিরের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে নানা রকম বিজ্ঞাপন লেখা। পিসীমা বললেন, এ আবার কি? কালীর মন্দির কি বড় রাস্তা, না কারুর কেনা বাড়ী? মন্দিরের চারিদিকের দেয়ালে সব দোকানওয়ালাদের বিজ্ঞাপন! এর নাম কি ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি? মন্দিরের ভিতর এত টাকা পড়ছে, হালদাররা বড়মানুষ হয়ে গেল, চারদিকে বড় বড় ইমারত, এতে কি হয় না? আবার ঠাকুরের মন্দিরের দেয়াল-ভাড়া টাকা তুলছে! আমরা হিঁদু, হিঁদুয়ানীর এত ডবডবা দেখাই, আর এমনতর দেখে কারুর মুখে একটি কথা নেই? মুসলমানের মসজীদে কি খৃষ্টানদের গির্জ্জের দেওয়ালে কেউ এমন ক'রে লিখুক দেখি, কেমন তার মাথা থাকে! ওরা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল!

কুমুদিনী ত অবাক্। বললেন, সত্যিই ত পিসীমা, এত লোকের কারুর নজরে ঠেকে না! তুমি ত ঠিক কথাই বলেছ! চারিদিকে ত এত হই-চই, এটা কারুর চোখে পড়ল না!

চাঁপা পিছন থেকে বললে, বলবে নি, পিসীমা বল্‌বে নি ত কে বলবে? সউরে লোক ত চোখ থাক্‌তে কাণা, পিসীমা এসেই দেখছে! ও মা, কোথা যাব! কালী-ঠাকরুণের মন্দিরের দেওয়াল কি ভাড়া দিতে আছে?

কালীঘাট থেকে ফিরতে বেলা প্রায় তিনটে হ'ল। চৌরঙ্গীতে এসে এক যায়গায় খানিকক্ষণ গাড়ী দাঁড় করাতে হ'ল, সামনে পাশে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, রেসের জন্য ভিড়। পিসীমা দেখলেন, তাঁদের গাড়ীর একটু দূরে একখানা বড় মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোটর খোলা, ভিতরে এক জন স্ত্রীলোক ব'সে। বয়স অল্প, বেশ সুন্দরী, কাপড়-চোপড় খুব দামী, চোখে নাকটেপা চসমা, মাথার চুল বব করা। পিসীমা ঠাহর ক'রে দেখে বললেন, ওকে যে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! কুমু, তুই চিনিস্ ওকে?

কুমুদিনী বললেন, চিনি বই কি পিসীমা! ও যে ইন্দু-বালা, এখন মিসেস মল্লিক, ওরা চৌরঙ্গীতে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকে।

—তবে বুঝি আমার চোখের দোষ হয়েছে! ইন্দু ত ভাজনঘাটের মেয়ে, আইবুড়ো বেলা কতবার দেখেছি, কতবার আমাদের বাড়ী আস্‌ত, ওর মা'র সঙ্গে কত নক্স খেলেছি। তবে ওকে দেখেই চিন্‌তে পারলুম না কেন বল ত?

কুমুদিনী একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন, পিসীমা, চুল কেটে ফেললে হয় ত মানুষের মুখ একটু বদলে যায়!

—এইবার বুঝতে পেরেছি! তাই ভাবছিলুম, চিনি চিনি কর্‌ছি—অথচ চিনতে পারছি নে কেন? চুল কেটে ফেললে মুখ আর এক রকম হয়ে যায় কি না! আর ওর এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চুলের মধ্যে মুখখানি যেন ছবিখানি আঁটা। আহা, ইন্দুর বুঝি বড় অসুখ করেছিল, অনেক দিন জ্বর হয়েছিল, তাই বুঝি ডাক্তারে চুল কেটে দিয়েছে? ডেকে জিজ্ঞাসা করব?

কুমুদিনী তাড়াতাড়ি বললেন, না পিসীমা, রাস্তার মাঝখানে কায নেই; ওরা ত আমাদের মত নয়, কি জানি কি মনে করবে।

কুমুদিনীর মনে হচ্ছিল, তাঁর আর পিসীমার কপালে মস্ত ফোঁটা, সদ্য কালীঘাটের ফেরত; মিসেস মল্লিক রেসে যাবার জন্য ব্যস্ত, হাতের ছাতা ঘোরাচ্ছেন, আর মুখ তুলে দেখ্‌ছেন, কতক্ষণে পাহারাওয়ালা আর সার্জ্জন হাত নামায়। এমন সময় তাঁকে সম্ভাষণ না করাই ভাল। আর চুলের কথা? সেটা পিসীমাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

তাই কুমুদিনী আবার বললেন, পিসীমা, মিসেস মল্লিকের কোন অসুখ করে নি। চুল আপনি কেটেছে।

—বলিস্ কি রে! সধবা মেয়েমানুষ, অমন সুন্দর চুল, পাগল ত আর হয় নি যে, সাধ ক'রে চুল কেটে ফেল্‌বে!

— হ্যাঁ পিসীমা, মেয়েরা এখন ঐ রকম চুল রাখে, তাই দেখাদেখি আমাদেরও কেউ কেউ—

—এইবারে বুঝেছি। ফ্যাসান, হাল ফ্যাসান! এক-খানা ছবিতে দেখেছিলুম বটে, তা আমার মনে হ'ল, মেম-সাহেবের একজন্মী হয়ে থাক্‌বে, তাই চুল কেটে দিয়েছে। আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্‌খু মানুষ, আমরা অত-শত কি জানি! আর ছাখ্, ছবিতে দেখলুম মেমের ঘাগরার নীচেও খানিকটা কাটা, আধখানা পা বেরিয়ে আছে। সেটাও কি ফ্যাসান?

—হ্যাঁ পিসীমা।

—তা হ'লে আমাদের মেয়েদের মেম সাজতে হলে ত ঠ্যাঙে ওঠা কাপড় পরতে হবে! উপরেও ফ্যাসান, নীচেও ফ্যাসান!

সার্জ্জনের হাত নেমেছে, মিসেস মল্লিকের মোটর বেরিয়ে গিয়েছে, কুমুদিনীদের গাড়ী আবার চ'লেছে। কুমুদিনী ত হেসে অস্থির, বল্‌লেন, ও পিসীমা, তোমার সঙ্গে কেউ কখনো পারবে না। কালীঘাটের পাণ্ডা, সাহেব, মেম, উকীল, জজ সব হেরে যাবে।

পিসীমা অন্য কথা পাড়লেন।

৪

সন্ধ্যার সময় পিসীমার দরবার বস্‌ল। ছেলে বড় সকলেই হাজির, সকলের ডাক পড়েছে। বিশ্বনাথ এসে এক পাশে বস্‌লেন। পিসীমা বল্‌লেন, দেখ বাবা, আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, একে মুখখু সুখখু মানুষ, তার পর সহরের কিছু জানিনে, চোখে কিছু নতুন ঠেক্‌লে জিজ্ঞাসা করতে হয়। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, কত দেখেছ শুনেছ, আমরা যেটা বুঝতে পারি নে, সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবে। আজ এই কালীঘাটে গিয়ে একটা দেখলুম, কুমুদিনীকে বলেছি।

বিশ্বনাথ বল্‌লেন, কি দেখলেন, পিসীমা?

—মন্দিরের বাইরে দেয়ালে দেয়ালে কি সব বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে, দোকানদারদের জিনিষ-পত্তরের। আচ্ছা, একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, এই কলকেতা সহরে মোছোল-মানদের কত মসজীদ আছে, সাহেবদের গির্জ্জে আছে, ইহুদী-দের গির্জ্জে আছে, জৈনদের মন্দির আছে, ব্রাহ্মসমাজের মন্দির আছে, আর্য্য সমাজের মন্দির আছে, শীখদের গুরুদোয়ারা আছে। কোনও জাতের দেবতার মন্দিরে এ রকম দোকানী-পসারীর বিজ্ঞাপন লিখতে দেয়? কালীঘাট পীঠস্থান, দেশ-দেশান্তর থেকে কত লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে, মা-র মন্দিরে কি এ রকম বিজ্ঞাপন লিখতে আছে? একবার আমি কাশীতে ছিলাম, দেখি, রেলে করে অনেক খোট্টা কলকেতায় আসছে। তারা সব যাত্রী, গাড়ীতে ওঠবার সময় সব চেঁচিয়ে উঠল, কালী কলকত্তেওয়ালী! কালী মাঈকি জয়! সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে আর সেই পঞ্জাব পর্য্যন্ত, কোথা থেকে লোক কালী দর্শন করতে না আসে! তা মন্দিরে এ রকম করা কি ভাল?

—না, পিসীমা, ভাল আর কিসে?

—আর কোন জাত তাদের দেবতার যায়গায় এ রকম করতে দেয়?

—কার সাধ্য এ রকম করে!

—তবেই হ'ল যে, আমরা আমাদের দেবতার সম্মান করতে জানি নে। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।

—আমি আর কি বলব, পিসীমা, বলবার ত কিছু নেই! আপনার চোখে পড়েছে, এত লোক দেখেও দেখে না।

—আর একটা দেখলাম। আমরা সেকেলে মানুষ, ঠাকুর-দেবতা দর্শন করতে যাই, আর আজকালের মেয়েরা কেউ কেউ রেস খেল্‌তে যায়। তা যাক্, যার যেমন অভি-রুচি। চিরকাল ত আর এক রকম যায় না। কিন্তু এই যে সব নতুন হচ্ছে, এ ত আর আপনা-আপনি হচ্ছে না, পরের দেখে। সাহেবরা হ'ল রাজার জাত, ওরা যা করবে, তাই আমাদেরও করতে হবে! ওরা অখাদ্য খায়, আমাদেরও তাই খেতে হবে। ওরা কাটা পোষাক পরে, আমাদের পুরুষদেরও তাই পরতে হবে! ওরা ধুচুনী মাথায় দেয়, আমাদেরও তা না হ'লে চলবে না। মেমেরা চুল কেটে যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের মত বেড়ায়, আমাদের মেয়েরাও চুল কেটে ফেলবে, যেন কতকেলে রোগী। আগে পৈরাগে গিয়ে মাথার চুল দিত, এখন ফ্যাসানের পায়ের তলায় চুল দেয়। এ সব দেখাদেখি ত?

—তা নয় ত আর কি?

—আর ওদিকে দেখ, সাহেব-মেমেরা এ দেশে এসে ত্রিশ চল্লিশ বছর ক'রে বাস ক'রে মাছের ঝোল ভাত খেতে শেখে

না, কোঁচা ক'রে ধুতিও পরে না। আর ওদের মেয়েরাও কপালে উল্কি প'রে নাকে নোলক দোলায় না। ওদের বাপ-পিতামহ চোদ্দ পুরুষ যেমন করত—তেমনি করে। ফ্যাসান বদলায়—সেও ওদের নিজের দেশের। না হয় মানলুম যে, সাহেবদের সব ভাল, ওদের মত থাকায় আমাদের লাভ আছে। কিন্তু বাঙ্গালী সাহেব সাজলে ত আর সাহেব হবে না। পোষাক পরতে, খানা খেতে সকলেই পারে। শুধু কি তাইতে সাহেবরা এত বড় জাত হয়েছে? কাটা কোটের সঙ্গে সাহেবদের বুকের পাটা তোমরা পেয়েছ? এই ত দেখলে, লড়াইয়ের সময় কেমন লক্ষ লক্ষ ইংরাজ দেশের জন্য অম্লানমুখে প্রাণ দিলে। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল, ছেলেরা সব যুদ্ধে ছুটেছে। মেয়েরা কোমর বেঁধে লেগে গেল,—কতক যুদ্ধে সেবা করতে, কতক মোটর ট্রাম চালাতে, কতক মুটেগিরি করতে। সে কি এক অদ্ভুত ব্রত! যেই যুদ্ধের আগুন জ্ব'লে উঠল, অমনি হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি প'ড়ে গেল, কে আগে সে আগুনে ঝাঁপ দেবে! খাবার জিনিষ অর্দ্ধেক নেই, সহরে আকাশ থেকে বোমা পড়ছে, ওদিকে কাতারে কাতারে সব যুদ্ধে চলেছে। এমন জাতের পোষাক নিয়ে কি হবে যদি সেই সঙ্গে তাদের প্রাণ না পাওয়া যায়?

—কেন, পিসীমা, বাঙ্গালীর ছেলেরাও ত যুদ্ধে গিয়াছিল।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! এবার রাজার জন্য গেল, কোন দিন হয় ত দেশের জন্য যাবে। এ ত কারুর কাছে শিখতে হয় না, কারুর নকল করতে হয় না। বাঙ্গালী ভয় পায়—এ কলঙ্ক দেশের কর্ত্তারাই রটিয়েছেন। সেকালে যখন বাড়ীতে ডাকাত পড়ত, তখন কি পুলিস পল্টন এসে রক্ষা করত? বাড়ীর পুরুষরা ডাকাতের মোয়াড়া নিত, বউ-ঝি সড়কি চালাত, ছাদ থেকে ইট ছুড়ত, কখন কখন খাঁড়া হাতে কালীর মত রণরঙ্গিণী হয়ে বেরুত। তখন কি কেউ সাহেবিয়ানা না মেমসাহেবিয়ানা জানত? তাঁতের মোটা কাপড় আর ডাল-ভাত খেয়ে কি দেশের কাব করা যায় না, না চোর ডাকাত শত্রুর সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না? সেবার সেই ত্রিবেণীর কাছে বান ডেকে আমাদের নৌকা যায় যায়, আমাদের সামনে একটা ডিঙ্গী উল্টে গেল, শিবু মাঝি একা জলে প'ড়ে সকলকে তুললে। সে-ও ত ভীরু, কাপুরুষ বাঙ্গালী!

দরজা-গোড়া থেকে চাঁপা ঝি বললে, ওগো, আমিও ছিনু।

উমা ধমক দিয়ে বললে, থাম্ তুই!

চাঁপা থেমে গেল।

পিসীমা বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এখন যারা সাহেবের মত থাকে, তাদের মত কাপড় চোপড় পরে, খাওয়া-দাওয়া করে, কেন করে?

বিশ্বনাথ বললেন, ওরা রাজার জাত ব'লে একটা কারণ হ'তে পারে, তার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘর-দোর বেশ সাজানো, সাহেবের মত থাকলে লোকে খাতির করে, এই রকম নানা কারণ হ'তে পারে।

—সাহেবরা এ দেশের লোকদের কি রকম তাচ্ছীল্য করে, সেটাও কি একটা কারণ?

—সেটা যদি মনে করে, তা হ'লে সাহেব-সাজা মুস্কিল হয়।

—হ্যা দ্যাখ কুমু, তোকে যদি ঝি-চাকর মেমসাহেব বলে, তা হ'লে তোর কি খুব আহ্লাদ হয় না?

—রক্ষে কর, পিসীমা, আমাকে আর অমন আশীর্ব্বাদ করতে হবে না!

এক চোট খুব হাসি হ'ল। এতক্ষণ ঘরশুদ্ধ স্তব্ধ হয়েছিল।

পিসীমা আবার বিশ্বনাথকে বললেন, আর একটা কথা ভেবে দেখেছ? আজ যেন ইংরেজ রাজা, কিন্তু ওরা ত চিরকাল এ দেশের রাজা ছিল না, চিরকাল থাকবেও না। সাহেবী ধরণ-ধারণ কত দিন হয়েছে বল দেখি? তার আগে কি রকম ছিল? মাথায় শামলা আর বুককাটা চাপকানেরও ত অনেক ছবি দেখেছি। ধর, কিছু দিন পরে এখানে চীন রাজা হ'ল, ইংরাজদের ত ঘরবাড়ী এখানে কিছু নেই, তল্পিতাল্লা বেঁধে তারা নিজের মুলুকে চ'লে গেল। তখন কি হবে? তখন কসাইটোলা গলির চীনে মুচিগুলো যে রাজার কুটুম হবে! কালেজে তাদের ভাষা পড়াবে, তাদের ভাষায় খবরের কাগজ ছাপা হবে, কলম ছেড়ে সব তুলি ধরবে। তখন আর সাহেব সাজবে কে? তখন সব চীনে কোট আর চীনে পায়জামা পরবে, ছুরী-কাঁটা ছেড়ে ছুটো কাঠি ধরবে, সৌখীন বাঙ্গালীর মেয়ে চীনে খোঁপা বেঁধে চীনেদের মেয়ের মত সাজবে! আর চীনেদের রান্না অমৃত লাগবে।

—ও পিসীমা, ওদের রান্নার কথাটা আর বলো না!

ছেলেরা সব ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে লাগল।

পিসীমার কথা বন্ধ হ'ল। উমা বড় মেয়ে, বাপের আদুরে, শ্বশুর-ঘর করে, একটু মুচকে হেসে বল্‌লে, দিদিমা বাবার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েছেন, আর কিছু বাকী নেই!

বিশ্বনাথ বল্‌লেন, ওঁর মুখেই আমরা কত কথা শিখি, ওঁকে আবার কে কি শেখাবে?

বিশ্বনাথ উঠে গেলেন। তখন চারদিকে কথার ফোয়ারা ছুটল। ব্রজনাথ বল্‌লে, লেকচার শুন্‌তে হয় ত দিদিমার! আর সব লেক্‌চারে কি সব আজে-বাজে বকে!

পিসীমা বল্লেন, নে, তুই আর জ্বালাস্ নে!

অন্য ছেলেরা বল্‌লে, দিদিমা, তুমি আর দেশে যেও না, এইখানে থাক।

—এখন দেশে যাব না। পোষ মাসের শেষে পৈরাগে যাব। মাঘ-মাসটা সেইখানে থাক্‌ব।

উমা বল্‌লে, মাঘে প্রয়াগে কল্পবাসে—

ব্রজনাথ বল্‌লে, মাঘে প্রয়াগে থরহরি কম্প লাগে।

পিসীমা বলিলেন, দুই কথাই ঠিক, দু'টি ভাই-বোন যেন মাণিকজোড়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কণ্ঠ-হারা

গীতিহারা আমি আজি, কণ্ঠে আর কোন গান নাই,
বিলায়ে দিয়েছি সবি, গাহিবার শক্তি নাই ভাই!
আমার প্রেমের গান যদি কেউ নিতে চাও শিখে,
চ'লে যেয়ো ফুলবনে, জিজ্ঞাসিও প্রেমিক অলিকে!
চ'লে যেয়ো নির্ঝরের প্রাণ-ঢালা সাগর-সঙ্গমে,
কুলুকুলু প্রেম-গীতি শুনিতেছে স্থাবর-জঙ্গমে!
ভেসে যেয়ো বসন্তের ঝুরু ঝুরু মলয় বহিয়া,
শুনিও কি গান শুনি গুরু গুরু কাঁপে কলি-হিয়া!

বিরহের গীতি যদি শুনিবারে সাধ কারো যায়,
নিরালা নিশীথ পানে চেয়ে রয়ো ঘন বরষায়।
কাণ পেতে শুনিও সে বিরহের উচ্ছ্বাস গভীর,
ধারাস্বন্ ঝন্ ঝন্ শোঁ শোঁ স্বন্ স্বনিছে সমীর!
চ'লে যেয়ো হিমাদ্রির গুহাতলে শৈল কারাগারে—
নির্ঝর কলুলু কুলু সিন্ধু মাগি' যেথায় ফুকারে।

প্রলয়-সঙ্গীত সম গীতি যদি ভাল লাগে কার,
শুনিও ঝঞ্ঝার দিনে বজ্রনাদে রাগিণী মল্লার।
কল হাস্ত-মুখরিত দাঁড়াইয়া 'পম্পি'র প্রাঙ্গণে,
শুনো 'বিসুবিয়সের' বুক-ফাটা ক্ষুভিত গর্জ্জনে।

উদাত্ত স্বরিত মোর অনাহত প্রণব-সঙ্গীত—
প্রাণের মাঝারে যদি আনে কভু আকুল ইঙ্গিত—
সারা প্রাণ এক করি চেয়ে র'য়ো নিঝুম নিশায়
শুনিবে বাজিছে গীতি গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়!
শুনিবে তুলিছে তান মহা ঊর্দ্ধ শূন্যে সূর্য্য সোম—
বাজিতেছে ব্যোমে ব্যোমে মহাগীতি—'ওম্—ওম্—ওম্।'

আরো যত গান আছে শুনো তাহা থাকে যদি কাণ,—
পার যদি শিখে নিও রাগিণীর তাল লয় মান।
পত্রের মর্ম্মরে আর বসন্তের পিকের কূজনে,—
ঝিল্লীর সে ঝিম্ ঝিম্ সাহানায় পল্লীর অঙ্গনে,
বাসক-শয়ন-মাঝে লাজ-ভীতা বালিকা বধূর—
শত-সন্তর্পণ-মাঝে বেজে ওঠা কঙ্কণে মধুর—
যে তান উছলি উঠে সন্ধি-মাঝে দিবসে নিশায়,
পার যদি সুর তার বেঁধে রেখো মরম-বীণায়!
ভাষা-হারা, কণ্ঠহারা আমি ব'সে উদাস পরাণ—
গগনে পবনে শুনি বাজে মোর পরাণের গান!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (সাহিত্য-সরস্বতী বি, এ)।

নকল সিল্ক

সিল্ক বা রেশমের ব্যবহার আজকাল খুবই প্রচলিত। আদ্দির রুমাল ও আদ্দির পাঞ্জাবীকে টেক্কা দিতে হইলে একমাত্র সিল্কের শরণাপন্ন হইতে হয়। তাহা ছাড়া সিল্কের চাদর ত আছেই। গুটিপোকার তন্তু-আবরণের ভিতরকার লূতারাশিকে প্রচলিত বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি দ্বারা ধৌত, শুষ্ক ও রঞ্জিত করার পর যে নয়নাভিরাম বর্ণময় রেশমগুচ্ছ পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে আমাদের সর্ব্ববিদিত সিল্ক। তসরও কতকটা ঐ উপায়ে পাওয়া যায়। গুটিপোকার বিভিন্নতার উপরই লূতার তারতম্য নির্ভর করে।

আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম জিনিষ তৈয়ারী করাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। কৃত্রিম স্বর্ণ, কৃত্রিম চিনি, কৃত্রিম নীল রং ও এনিলীন (Anilyne) ডাই নামক কৃত্রিম বর্ণসম্ভার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বর্ণের ন্যায় আকরিক জিনিষকে ঘরে বসিয়া তৈয়ারী করা এত ব্যয়সাধ্য ও শ্রমবহুল যে, স্বর্ণের জন্য মেক্সিকোর খনির উদ্দেশে জাহাজে চড়া বরং ভাল, তথাপি ব্যবসায় হিসাবে ইহার কৃত্রিম রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে কোন বৈজ্ঞানিকই কোন ব্যবসায়ীকে উপদেশ দেন না। নীলের চাষে এক কালে নীলকুঠীর মালিকদের ধন-ভাণ্ডার স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক জন্ বেয়ার (Johny Bayer) যে দিন পরীক্ষাগারে বসিয়া নকল নীলের রচনা-উপায় আবিষ্কার করেন, তাহার পর হইতেই প্রাচীন নীলকুঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষ সমবেত চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা নীলকুঠীর মালিকদিগকে একবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাকে সুলভ বৈজ্ঞানিকপ্রণালী দ্বারা নীলের কৃত্রিম রচনার বিজয়ধ্বনি ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। নীলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষের লড়াই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। টেকচাঁদ ঠাকুরের বঙ্গাভিনয়ে নীলকরের দারুণ অত্যাচার সত্য কি মিথ্যা—তাহার বিচার এ স্থলে নহে, তখন যে প্রবল প্রতিকূলতায় নীলকুঠীর মালিকদের লড়াই করিতে হইয়াছিল, তাহারই মর্ম্মন্তুদ ইতিহাসের উদাহরণ আমি এ স্থলে উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইহার মূলে বেয়ারের নবনীলের নবাবিষ্কার।

ইহা ধ্রুব সত্য যে, কৃত্রিম জিনিষের রচনামাত্রই ভীষণ—ট্রেডমার্ক না দেখিয়া জিনিষ কেনা তজ্জন্যই ভ্রমাত্মক। মরুভূমির মাঝে কৃত্রিম জলাশয় দেখিয়া তৃষিত পথিক অনেক সময় প্রাণ হারাইতেও পারে—মরুভূমিতে এই নকল দেখাটিকে মরীচিকা বলা হয়। কৃত্রিম রেশম যে মরীচিকা নহে, তাহার উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

কৃত্রিম রেশমের প্রচলন সত্যই আধুনিক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিতেছে। ইহাতে আসল রেশমের আদর কমিবে কি না, তাহা এখন বলা শক্ত। কারণ, এখন সবে ইহার গোড়াপত্তন—আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ইহা সাফল্যে ও গৌরবে মণ্ডিত হইবে। নকল সিল্ক সত্যই আজ ভারতের বস্ত্রাভাবের বৃহৎ একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার সমস্তটাই বিদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া আসে। নিজ ভারতে কৃত্রিম সিল্ক আজিও প্রস্তুত হয় নাই। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে হয় ত ভারতের বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইবেন।

সিল্কের ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীর উপর সিল্কের ফিন্‌ফিনে চাদর আধুনিক কালের পরিচ্ছদ-সৌষ্ঠবকে পরম শোভন করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম-পূর্ব্বাহ্ণে একটি পাবনা বা বেলেঘাটা জাতীয় নরম গেঞ্জি টানিয়া তাহার উপর সিল্কের পাঞ্জাবী ও চাদর এবং হাতে হাল্কা রকমের একটা ছোট ষ্টিক্—আধুনিক সান্ধ্য-ভ্রমণের যে একটি সুখকর ও মনোরম পরিচ্ছদ, তাহা সকলেই জানেন। বৈজ্ঞানিকরাও বলেন, গ্রীষ্মকালে গাত্রে ভারি বা গরম জামা দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নহে। কি উপায়ে নকল সিল্ক জিনিষটা তৈয়ারী হয়, এখন তাহারই একটু আলোচনা করিব।

তুলা বা Cellulose হইতে অনায়াসে নকল সিল্ক তৈয়ারী করিতে পারা যায়। প্রথমে তুলা জিনিসটাকে ঝাঁঝালো এসিডযোগেই সিল্কে রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হয়। এই রূপান্তর-করণকে ইংরাজীতে 'নাইট্রেসন্' বলা হয়। কারণ, সাধারণতঃ তীব্র নাইট্রিক ও তীব্র সাল্‌ফিউরিক নামক দুইটা এসিড এক-যোগে ব্যবহৃত হইবার পর উক্ত তুলাস্তূপের 'নাইট্রেসন' ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। রূপান্তর করিবার পর তুলাস্তূপকে সুরাসার (Alcohol) ও ইথার (Ether) নামক প্রচলিত দ্রাবক পদার্থদ্বয়ে ফেলিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। পরিষ্কার-পদ্ধতির শেষভাগটা হইতেছে—উক্ত সিল্ক বা তথাকথিত তুলারাশিকে ষ্টীম বয়লারের ছোট ছোট ছিদ্রময় অগ্নিপটহের অনুরূপ ছোট ছোট কাচনল-বহুল একটি যন্ত্রের প্রবেশপথে সজোরে ঢালিয়া দেওয়া। ইহাতে জড়িত-বিজড়িত ও স্তূপীকৃত নবনির্ম্মিত সিল্ক পলকের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে যন্ত্রের অপর দ্বারপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। রেশমের দৈর্ঘ্য বলিতে আমরা এই গুচ্ছাকারে প্রাপ্ত কৃত্রিম রেশমের দৈর্ঘ্যকেই বুঝিয়া থাকি। ইহাই হইল কৃত্রিম রেশম বা সিল্ক প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত ব্যাপার।

বিদেশ হইতে ইদানীং ভারতে যে পরিমাণে কৃত্রিম রেশমের রপ্তানী সুরু হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার কৃত্রিম রেশমের উপর রপ্তানী-শুল্ক ধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত শুল্কের হার শতকরা ১৫ হইতে ৭ পাউণ্ড

নামাইয়া দেওয়া হয়। গত ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ইটালীর রপ্তানী কৃত্রিম রেশম সের প্রতি ৩৲ ও বৃটিশ রাজ্য হইতে রপ্তানী কৃত্রিম রেশম সের প্রতি ৪৶০ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। বিলাতী বা বৃটিশজাত কৃত্রিম রেশমের দাম ইটালী-জাত কৃত্রিম রেশম হইতে সের প্রতি ১৶০ বেশী। ইহার এক-মাত্র কারণ, বিলাতী কৃত্রিম রেশমই উহার চরমোৎকর্ষ। ইটালী আজও ইংলণ্ডের ন্যায় অমন সুন্দর জিনিষ ভারতে সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। নিম্নে ভারত সরকারের প্রকাশিত "ভারতে বাণিজ্য-বিবরণী" (১৯২৭-২৮) নামক পুস্তক হইতে কৃত্রিম রেশম বিষয়ে ৫টি তালিকা প্রদত্ত হইল। *

দৈর্ঘ্য হিসাবে

১৯২৭-২৮ খৃঃ অব্দের ভারতের রপ্তানী কৃত্রিম রেশম

সুইজারল্যাণ্ড	১১	লক্ষ	৫৫	হাঃ	গজ
জার্ম্মাণী	৪৬	"	৯৬	"	"
অষ্ট্রিয়া	৩৪	"	১৩	"	"
জাপান	১১	"	৩৪	"	"
চেকোশ্লোভোকিয়া	১০	"	৭৬	"	"

* * * *

১৯২৬-১৯২৭ খৃষ্টাব্দে

সুইজারল্যাণ্ড	৬৬	লক্ষ	৯৮	হাঃ	গজ
জার্ম্মাণী	২৪	"	৮৮	"	"
অষ্ট্রিয়া	৮৪	"	৬০	"	"
জাপান	০	লক্ষ	৪০	হাঃ	"
চেকোশ্লোভোকিয়া †	৪	"	৯২	"	"

* * * *

ওজন হিসাবে

১৯২৭—২৮ খৃঃ অব্দের ভারতের রপ্তানী কৃত্রিম রেশম

ইটালী	৩৪	লক্ষ	৩২	হাঃ	পাউণ্ড
আমেরিকা (যুঃ রাজ্য)	২২	"	৭৭	"	"
জার্ম্মাণী	১	"	৩১	"	"
সুইজারল্যাণ্ড	২	"	৮৩	"	"
ফরাসী রাজ্য	৫	"	৮১	"	"
কানাডা	১	"	৪৫	"	"

* * * *

১৯২৬—২৭ খৃঃ অব্দের ওজন

ইটালী	৩৮	লক্ষ	৪৩	হাঃ	পাউণ্ড
আমেরিকা (যুঃ রাজ্য)	৬	"	৫৫	"	
জার্ম্মাণী	২	"	৩২	"	
বেলজিয়ম্	০	"	৫৮	"	

* * * *

কৃত্রিম রেশমের তৈয়ারী জিনিষ রপ্তানীর শতকরা হিসাব

১৯২৬—২৭		১৯২৭—২৮
৩৮	বৃটিশ	৩৭
৩৩	ইটালী	৩০

উপরের তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, ইটালী, আমেরিকা ও বৃটিশ রাজ্যসমূহই ভারতে বেশীর ভাগ কৃত্রিম রেশম ও কৃত্রিম রেশমের তৈয়ারী জিনিষ সরবরাহ করিয়া থাকে। জার্ম্মাণীও ইহাতে কম অংশ গ্রহণ করে না। ১৯২৭ ও ১৯২৮ খৃঃ অব্দের হিসাবে দেখা যায়, ওজন হিসাবে ভারতে জার্ম্মাণীর রপ্তানী মাল ২ লক্ষ ৩২ হাজার পাউণ্ড হইতে ১ লক্ষ ৩১ হাজার পাউণ্ডে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং কৃত্রিম রেশমে জার্ম্মাণীর আধিপত্য ভারতবর্ষে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণীর ন্যায় ইটালীর কৃত্রিম রেশমও পরিমাণে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। উপরের শতকরা হিসাবে যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ভারতে বৃটিশের রপ্তানী মাল যে খুব বেশী, তাহা বলা চলে না। ১৯২৭ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শত-করা হিসাবে দেখা যায়, বৃটিশজাত কৃত্রিম রেশম ভারতে ৩৮ হইতে ৩৭ সংখ্যায় নামিয়া আসিয়াছে; টাকার হিসাবে দেখা যায়, গত ১৯২৭—২৮ খৃঃ অব্দের ভারতজাত কৃত্রিম রেশমের মোট মূল্য হইতেছে ১৪৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আমেরিকার (যুক্তরাজ্য) অংশ হইল ৪৭ লক্ষ ও ইটালীর অংশ হইল ৬৬৷০ লক্ষ টাকা। ইহাদের যোগফল ১১৩৷০ লক্ষ, সুতরাং বাদ-বাকি যে ৩৫৷০ লক্ষ টাকার হিসাবটা খতিয়ানে ধরা পড়ে, তাহা বৃটিশ-রাজ্যের রপ্তানী মালের মূল্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবটা খুবই মোটামুটি। কৃত্রিম রেশম বা নকল সিল্ক বি'য়ে বিশদভাবে আলোচনা করিবার মত কিছু নাই। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহা এখন সবে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে—এই ব্যবসায়ের পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বভাগে যতটুকু পারা যায়, আমরা ইহার ততটুকু তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় (বি, এস-সি)।

* "Review of the Trade of India in 1927—28."
Publsd. by ord:r Governor-General in Council.
"ভারতের বাণিজ্য-বিবরণী" (১৯২৭-২৮ খৃঃ অঃ) নামক ভারত সরকার-প্রকাশিত পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠার "কৃত্রিম-রেশম" শীর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† 'শ্লোভোকিয়া' সংজ্ঞা অন্তে রাখিয়া য়ুরোপে Czecho ও yugo নামধারী দুইটি প্রদেশ দেখা যায়। প্রথমটির উচ্চারণ চেকোশ্লোভোকিয়া ও ২য়টির উচ্চারণ যুগোশ্লোভোকিয়া। প্রবন্ধের তালিকায় ১ম প্রদেশটিকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

ছেলেমেয়েদের ফ্রক প্রস্তুত

ফ্রক ঃ—ফ্রক ছেলে-মেয়েদের আরামদায়ক জামা। এই ফ্রক সিল্কের কাপড়ে জরির ইন্‌সেসন বসাইলে অতীব সুন্দর দেখায়।

ফ্রকের মাপ ঃ—লম্বা ১৮ইঞ্চি, ছাতি ২০ইঞ্চি, পুট ৪৷০ ইঞ্চি, পুটহাতা ৮ ইঞ্চি, মোহরী ৬ ইঞ্চি।

ফ্রক কাটিবার নিয়ম ঃ—প্রথমতঃ কাপড়কে লম্বা মাপের ২ ইঞ্চি বেশী কাপড় রাখিয়া এড়ো দিকে ভাঁজ করিতে হইবে। মনে করুন, ক খ লম্বা মাপ ১৮ ইঞ্চি+২=২০ ইঞ্চি। ক গ ছাতির মাপের সিকি অংশ ৫ ইঞ্চি+১৷০=৬৷০ ইঞ্চি ঘ হইতে ট ৩৷০ ইঞ্চি নীচে ট হইতে ঠ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ১৷০ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় রাখিয়া ঠ ড সংযোগ করিয়া ড ঘ নীচের অংশে চিত্রের ন্যায় সমান অংশে দাগিতে হইবে। ড বিন্দু খ বিন্দু হইতে ১৷০ ইঞ্চি উপরে সেইপ হইতে থাকিবে। হাতের অংশ ফ্রকের সঙ্গেই কাটা হইতেছে,পৃথক্ করা হয় নাই। ক ছ পুট মাপ ৪৷০ ইঞ্চি ক জ পুটহাতার মাপ ৮ ইঞ্চি তদতিরিক্ত ১৷০ ইঞ্চি ৮+১=৯ ইঞ্চি পুটহাতার মাপ। জ ঝ মোহুরী মাপ ৬+১৷০=৭৷০ইঞ্চি মোহুরী জ ও ঝ স্থানে নীচের অংশের চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইয়া তৎপরে ঝ ও ঘ চিত্রের ন্যায় সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। স্কোয়ার গলার অংশ দাগিবার সময় ক চ পুটের মাপের ।০ অর্দ্ধ অংশ অর্থাৎ ২৷০ ইঞ্চি ক চ ১ ইঞ্চি নীচে সোজাভাবে চিত্র করিয়া ঢ ত সংযোগ করিতে হইবে। ফ্রকের পেছনের দিকে বোতাম-ঘর বসান হইয়া থাকে। কারণ,
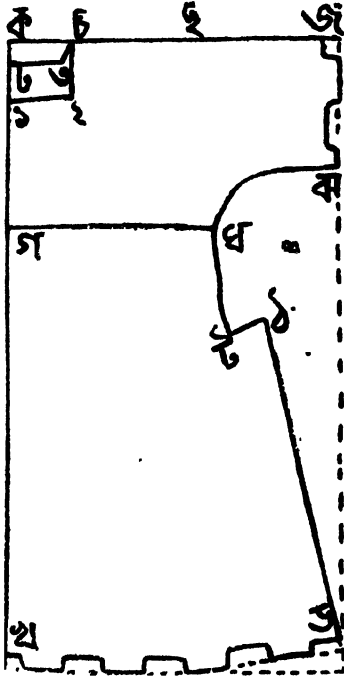
১নং চিত্র

ছেলে-মেয়েরা জামা গায়ে রাখিতে চাহে না। সামনে বোতাম বসান হইলে হয় ত খুলিয়া ফেলিতে পারে, এ জন্যই ফ্রক পেনী জাতীয় জামায় পেছনের অংশে বোতাম বসান হইয়া থাকে। ছাতির মাপের লাইন গ বিন্দু পর্য্যন্ত কাটিয়া লইতে হইবে।

এখন ঢ, ত, চ দাগে কাটিয়া লইয়া জ, ঝ, ঘ, ট, ঠ, ড ও খ বিন্দুতে যে দাগ দেওয়া হইয়াছে, চিত্রের দাগানুযায়ী কাটিয়া লইলে ফ্রক কাটা হইল। এখানে কাঁধের অংশ কাটা হইবে না, সামনের গলার অংশ কাটিবার সময় ঢ বিন্দু হইতে প্রায় ১৷০ ইঞ্চি কি ২ ইঞ্চি পরিমাণ নীচে ১ বিন্দু ১ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ১ বিন্দু হইতে ২ বিন্দু পর্য্যন্ত সোজা দাগিয়া চ ও ২ বিন্দু সংযোগ করিয়া কাটিয়া লইলে সম্পূর্ণ ফ্রক কাটা হইল।

ফ্রক সেলাই প্রণালী ঃ—প্রথমতঃ গলার অংশে বোতাম-পটী ও বোতাম-ঘরের পটী বসাইয়া গলার অংশে জরির সরু ইন্‌সেসন বসাইয়া লইতে হইবে। হাতের মোহুরীতে জরির ইনসেসন বসাইয়া নীচের অংশে ইনসেসন বসাইতে হইবে। ইন্‌সেসন বসাইবার সময় দেখিতে হইবে, কি প্রকারে বসাইলে ভাল হয়; এখানে একটু নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে হয়, ইন্‌সেসন প্রায় হাতের তেরছাই দ্বারা বসাইয়া লইতে হয়। দুই ধারের পাশ সেলাই করিয়া ট ঠ স্থানে যে অতিরিক্ত কাপড় রাখা হইয়াছে, তাহাকে সমান অংশে কুচি দিয়া তাহার উপর চওড়া রঙ্গীন টেইপ বসাইতে হইবে। টেইপের মুখে ৪টি বোতামকে রঙ্গিন কাপড় মুড়িয়া প্রত্যেকটি কোমর-পটীর মুখে বসাইয়া লইলে সেলাই হইল।
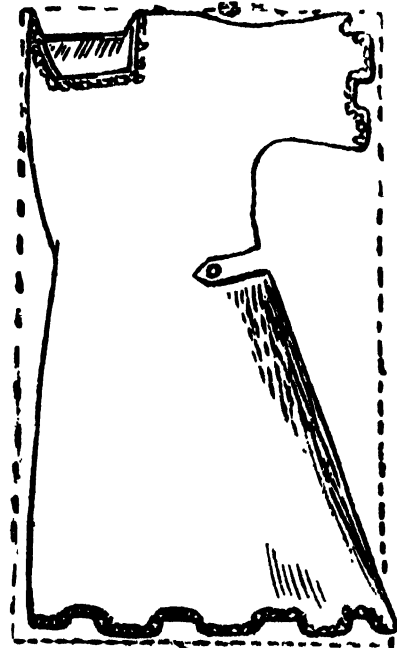
২নং চিত্র

এখন কাষ-ঘরের পটীতে কাষ-ঘর করিয়া সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "ফ্রক" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আমার কন্যাদায়

১

কি কুক্ষণেই যে গৃহিণী কন্যারত্ন প্রসব করেছিলেন! আজ দু'বচ্ছর ধ'রে চেষ্টা নেই—যা ক'র্‌'ন এই রত্নটিকে কাউকে গতিয়ে দেবার জন্যে। রত্নই বটে; ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—

"ন রত্নম্‌ম্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ।"

রত্নকে গ্রাহক খুঁজতে হয় না; গ্রাহক রত্নকে খোঁজে। কন্যা-রত্ন এমন রত্ন যে, কেউ একবার ফিরেও তাকায় না; তাও রত্নর পিছনে হাজারই দি আর দু'হাজারই দি! তাই বা দি কোথা থেকে?

মেয়েটি আমার মন্দ নয়। মা লক্ষ্মী আমার দিন দিন গতরে বাড়ছেন। বাপের অবস্থা বুঝে ত আর কেউ বাড়ে কমে না। যেমন বাড়ছে, তেমনই চেহারাও বেশ খুল্‌ছে। সকলেই ভাল বলে। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেরা একবারে পণ ক'রে বসেছে যে, তাদের কেউ কোনও পুরুষে আর বে-থা করবে না। স্বরাজ! স্বরাজ—আরে মলো, স্বরাজ কাদের জন্য? যদি ছোঁড়ার দল বিয়ে না ক'রে কেবল রাতদিন স্বরাজ স্বরাজ ক'রে ক্ষেপে বেড়ায়, ত স্বরাজ ভোগ করবে কে রে বাপু?

ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম। রাতে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকি; কিন্তু কোথা হ'তে এতটুকু আলো আসে না। মাথায় কোনও মতে এমন একটা প্ল্যান আসে না, যাতে মেয়েটার একটা গতি হয়। হে ভগবান্!

বাড়ী আমার হুগলী জেলায়। হাওড়া আমতা রেলের ধারে ডোমজুড় থেকে আধ পোয়াটাক্ রাস্তা। স্কুল-মাষ্টারী ক'রে কোনও মতে দু'বেলা সংসার চালাই। মেয়ের বিয়ে রাজসূয় ব্যাপার। কি যে উপায় হবে, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারি নে। গৃহিণী বলেন, ভেবে কি হবে? ভগবান্ উপায় করবেন। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনাই কোনও দিক্ থেকে দেখতে পাওয়া গেল না। গৃহিণীর বিশ্বাসকে বলি হারি!

পাড়া গাঁ; বড় মেয়ে দেখলেই একটু টিট্‌কারী না দিয়ে কেউ থাক্‌তে পারে না। কেউ হাসে, কেউ ঠাট্টা করে, কেউ বা দু'কথা শক্ত শুনিয়ে দেয়। ও পাড়ার ভদি মাসী বল্‌ছিলেন সে দিন, "ও মা! বাপ কি চোখের মাথা খেয়েছে না কি? মেয়েটার দিকে যে তাকানো যায় না—" ইত্যাদি।

গৌরী মা আমার মাথাটি নীচু ক'রে সেখান থেকে আস্তে আস্তে স'রে গেল। কি যে করি, কিছুই বুঝতে পারি নে। মনে মনে গয়ায় মাসীর পিণ্ডদানের শুভ সংকল্প ক'রে নিশ্চিন্ত হই।

শেষকালে ভেবে ভেবে স্থির করলাম যে, স্কুল থেকে কিছু-দিন বিনা বেতনে ছুটী নিয়ে একবার কল্‌কাতা যেতে হবে এবং যে কোনও উপায়েই হোক কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। বলে Beg, borrow or steal; আরে বাপু ভিক্ষেই বা কে দিচ্ছে, আর ধারই বা কে দিচ্ছে। অতএব—; না, অত বড় গুরুতর কথা ভেবে কায নেই। ও কথাটি যে সময়ে প্রচলত হয়েছিল, তখন বোধ হয় জেলখানার সৃষ্টি হয় নি।

২

এক দিন দুর্গানাম স্মরণ ক'রে নাকে কাণে পুনঃ পুনঃ হাত দিয়ে পা বাড়ানো গেল। হাঁচি টিকটিকি কিছুই পড়লো না, গাড়ী late হলো না, নানা শুভলক্ষণ দেখে বুকে খানিকটে আশা বাসা বাঁধতে লাগলো।

হাওড়া থেকে নেমে সটান হ্যারিসন রোড ধ'রে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি। হেয়ার স্কুলের ছুটীর

ঘণ্টা হলো, হিন্দু স্কুলের ছুটীর ঘণ্টা হলো, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ছেলের দল বেরুতে লাগলো। হায়! হায়! এত ছেলে। গিস্ গিস্ করছে ছেলের পাল। অথচ বিবাহের গন্ধ পেলে এর কোনও বেটার টিকিটি দেখবার যো নেই। কি আশ্চর্য্য দেশ!

কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে ছেলেদের দেখছি। এমন সময় দু'টি ছেলে আমার পাশ দিয়ে গেল। একটি ছেলে বেশ মোটা-সোটা, ধোপদস্ত ডবলব্রেষ্ট শার্ট গায়ে, সোনার বোতাম, পাম্পশু—দেখলে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ব'লে বোধ হয়। আর একটি ছেলে কিছু ঢ্যাঙা, পাঞ্জাবীর পকেটে কোঁচা গুঁজে হন্ হন্ ক'রে চলেছে। তাদের কথাবার্ত্তা শুনে, তাদের দিকে মন দিতে হলো; নয় ত অত লোকের মাঝে কে কাকে দেখে?

ঢ্যাঙা ছেলেটি মোটা ছেলেটিকে বল্‌ছে—"ওরে ক্যাবলা, বে করবি?"

মোটা ছেলেটি বল্‌লে, "আ মলো, তুই আবার ঘটকালী সুরু করলি কবে থেকে? মারবো মাথায় এক চাঁটি—"

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন কাণে প্রবেশ করলো। আমি, তাদের পিছনে পা চালিয়ে দিলুম।

প্রথমটি বলিল, "না রে, Seriously. আমাকে সৌরীন্ বড্ড ধরেছে। তার আপনার মাসতুতো বোন্ কি না—যদি করিস্ ত বল্!"

"দাঁড়া, আগে ম্যা ট্রিক্‌টে পাশ ক'রে নি।"

"আরে সে চট্ ক'রে হবে না! মাঝে থেকে বে-টাও ফস্‌কে যাবে। মেয়েটা খুব ভাল—বুঝলি?"

"তুই দেখেছিস্ নাকি?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ। নয় ত আর আমি তোকে বল্‌ছি?—সৌরীনের মেসো খুব লোক ভাল। পাড়াগাঁয়ে থাকে। খরচপত্র করবে। মেয়েটি খু—উ—উব চমৎকার! যদি রাজি থাকিস্ ত বল্।"

"তুই ক'রে ফেল না—"

"না রে না। তারা অবস্থা ভাল চায়, রঙ ফরসা চায়—দেখ যদি করিস্ ত বল্; সৌরীনকে বলি।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা ক'রে বলবো—"

"তুই নিজেই ত মালিক। তুই আবার কি জিজ্ঞেস করতে যাবি? মেয়ে মনে ধরে, করবি; নয় ত কেউ ত আর তোর গলায় গেঁথে দেবে না। মাঝখান থেকে, এক দিন বাইরে গিয়ে মহা ফুরতিসে পিক্‌নিক্ করে আসা যাবে—"

"পিক্‌নিক্ আবার কোথা রে—"

"কেন? তারা কি না খাইয়ে ছাড়বে নাকি? পাড়াগাঁয়ের লোক, বাবা; এ তোমার কলকাতা পাও নি।"

"কত দূরে? তাই বল্—"

"বেশী দূরে নয়। সে সৌরীন সব ঠিক ক'রে নেবে'খন। আসছে গুড্‌ফ্রাইডেতে যাচ্ছি। হাওড়ায় গিয়ে তিনখানা ইণ্টার ক্লাশ টিকিট কেটে নেব'খনি। ডোমজুড় ষ্টেশনে নেমে ১০ মিনিট যেতে হবে। সে সব ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না।"

মোটাগোছের ছেলেটি ভাবতে ভাবতে একটি বাড়ীর ফটকে ঢুক্‌লেন। একবার ডাক্‌লেন,

"আসবি না?"

"না, না! আর এক দিন—" বলিয়া বন্ধুটি জোরে পা চালাইয়া দিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটু ফাঁকা পাইয়া বলিলাম—

"দেখুন, মশায়, কেবলরামবাবুর সঙ্গে কার বিবাহের কথা কইছিলেন?"

বাবুটি আমার দিকে নিতান্ত উদাসভাবে চেয়ে বল্‌লেন, "কে কেবলরাম, আমি চিনি না—"

"আপনার ঐ বন্ধুটি; যাঁর সঙ্গে এতক্ষণ বে'র কথা হচ্ছিল? আমার বাড়ী ডোমজুড়ের কাছেই, তাই সুধোচ্ছিলাম—"

"ওঃ, আপনি কি নাগেশ্বর দত্তকে জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি বই কি। আমাদেরই স্বজাতি। আমার বাড়ীর কাছেই তাঁদের বাড়ী। আমিও কন্যাদায়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?"

ছেলেটি একটু হাসিল; জবাব দিল না। কাজেই সুযোগ পেয়ে বল্‌লাম, "আমার মেয়েটি বয়স্থা; দেখতে শুনতেও ভাল—"

হতভাগা ছেলেটা করলে কি—আমার দাড়ির কাছে হাত নিয়ে এসে রাস্তার মাঝে সটান গান ধরলে—

"কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ।"

কি বেহায়া! আমি কোনও কিছু বলবার আগেই সে কালীতলায় মোড়ে 'বাসে' লাফিয়ে উঠ্‌লো! হাত একটু

ফস্‌কে গেলেই বাছাধন গিয়েছিলেন আর কি! আমি মা কালীর দিকে হাত যোড় ক'রে বল্‌লাম—

"হায় মা, এমনি ক'রে যমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার চেয়েও কি বিয়ে করাটা শক্ত, মা? হলো কি ছেলেদের! এমনই ভাবে যদি সংসার চলে মা, ত আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি যে, বছর কুড়ি পঁচিশের মধ্যে বাঙ্গালী জাতটা—বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ কুলীন বংশ extinct হয়ে যাবে।"

৩

ভগ্নমনোরথ হয়ে অনির্দ্দিষ্টভাবে পথ চল্‌তে লাগলাম। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, বড় বড় অক্ষরে লেখা 'প্রজাপতি আফিস।' মনটা আশ্বস্ত হলো, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে ত এইবারে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হবে। একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক্। সেক্রেটারী মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। নাম বল্‌লেন—কি নাম 'কুমার।' মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, প্রজাপতি আফিসের সম্পাদক কুমার!—ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারী জনমেজয় ঋষি আর কি! বিরক্ত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলাম।

আরও কিছু দূর এগিয়ে ষ্টার থিয়েটারে এসে পড়া গেল। তখন সন্ধ্যার আলো সবে জ্বলতে সুরু হয়েছে। 'খাস-দখল' মোটা মোটা অক্ষরে জ্ব'লে উঠ্‌লো; দলে দলে লোক আস্‌ছে। আমি দরোয়ানকে ব'লে বাইরের কামরায় ঢুকে দেখি, এক জন প্রবীণ ভদ্রলোক গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। বয়েস কিছু হয়েছে, কিন্তু মুখখানি যেন বালকের প্রফুল্লতা-ভরা। চেহারা দেখে আশা হ'লো। আরও অম্বরী দেওয়া তামাকের গন্ধে দেল খোস হয়ে গেল। শুন্‌লাম, তিনিই অমৃতবাবু, তাঁরই খাস খল। তাঁর নিকটে যাবা-মাত্র তিনি আমাকে আপ্যায়িত রলেন। অতি মহাশয় লোক।

"আসুন। বসুন! তামাক ইচ্ছে করুন। কি জন্যে াগমন?" হাতে স্বর্গ পেলাম। ভাবলাম এখানে উদ্দেশ্য দ্ধ না হয়ে যায় না। বল্‌লাম, "মশায়, আমি কন্যাদায়-গ্র। অর্থ নাই। আপনার থিয়েটার থেকে যদি আমায় ছু সাহায্য করতে পারেন। এই বেনিফিট টেনিফিট ব্যবস্থা 'রে—"

বেশী দূর অগ্রসর হ'তে হলো না। তিনি অতি বিনয়ের ঙ্গে বল্‌লেন, "ব্যবস্থা অবশ্যই হ'তে পারতো যদি গিয়ে ইয়ে—র নাম কি?" ম্যানেজমেণ্ট আমার দখলে থাক্‌তো।

আমি তাঁকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। হায়! এর মানে 'খাস দখল'? আমার ভাগ্যে খাস দখলও বে-দখল হয়ে গেল!

দশ দিন থেকে কলকাতা চ'ষে ফেল্‌লাম। খবরের কাগজে লোকের চাঁদার লিষ্ট দেখে দেখে প্রতিদিন প্রাতে ৪টি পয়সা চাদরের খুঁটে বেঁধে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়ি। কেউ গঙ্গারাম পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ১২ শত টাকা দিয়েছেন, কেউ দমদমার বাগানে পিকনিকের খরচ অর্থাৎ ৮ শত ৫৩ টাকা একাই বহন করেছেন, কেউ বুলান্দ সহরে ধর্ম্মশালার জন্য ১ লাখ ৭৩ হাজার টাকা খরচ করেছেন। সকলের বাড়ীতেই অভিযান করি। দরওয়ানদের খোসামোদে একটি বেলা পুরাপুরি কাটে, তার পর রাস্তার কলে স্নান ক'রে ৪ পয়সার জিবেগজা কিনে খেয়ে আবার চেষ্টা করি। কিন্তু কর্ম্মচারীদের কোঠা পার হওয়া কোনমতেই যায় না। সন্ধ্যার পরে ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে শুধু ফিরে আসি।

এক দিন কাগজে দেখলাম, ভারি একটা চ্যারিটি ম্যাচ হবে। চ্যারিটির কথা শুনেই মনটা উল্লাসে ভরপুর হয়ে উঠলো। আহা, ছেলেরা না দেবতা! নিজেদের হাড়গোড় ভেঙ্গে পরের উপকার করে। বুঝলাম, এই জন্যেই মোহন-বাগানের এত নাম। খুঁজে খুঁজে গ্রে ষ্ট্রীটে সেক্রেটরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। ফুটবলের সেক্রেটরী সার্থক পদ পেয়েছেন। ফুটবল খেলে ফুটবলেরই মত চেহারাখানি হয়েছে। আহা, সুখে থাকুন। ফুটবলের ফাটলে ফাটলে ফুল-চন্দন পড়ুক। তিনি আমায় সে দিন বিকেলে মাঠে যেতে ব'লে দিলেন। আমি গিয়ে দেখি, টাকার ভাগ-যোগ চল্‌ছে। এক জন আমার খুব কাছে ঘেঁসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোন্ সোসাইটী থেকে আসছেন?" আমি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লাম, "S. P. C. M. G. থেকে।"

"ওঃ। তার মানে—"

"মানে সহজ! Society for the prevention of cruelty to marriagable girls"—অরক্ষণীয়া কন্যার প্রতি অবিচার নিবারণ সমিতি।" অরক্ষণীয়া কথাটার ঠিক ইংরেজী কথাটা মনে এল না। এলেও যে কিছু হতো, তা বলা যায় না। কারণ, আমার কথা শুনে বাবুটি যে অদৃশ্য হলেন, তার পরে তাঁর বা অন্য কোনও ফুটবলের কর্ণধারের টীক দেখা গেল না।

ইস্কুলের ছুটী প্রায় ফুরিয়ে এল; কন্যাদায়ের কোনও

প্রতীকার কিছুই করতে পারা গেল না। মাথায় যত দুশ্চিন্তার জাল বেঁধে পাগল ক'রে তুলবার যোগাড় করলে। হায় রে, সমাজ!

যে দিন ফিরব, ঠিক তার আগের দিন ল্যান্সডাউন রোডের একটি বড় বাড়ী দেখে ফটকের ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করছি। সঙ্গীন চড়ানো বন্দুকধারী শান্ত্রী পাহারা তার দোস্তের সঙ্গে আলাপে রত ছিল, আমার প্রবেশে কোনও বাধা দিলে না। মনটা খুশী হলো। একটু এগিয়ে দেখি, এক জন বৃদ্ধ চাকর ঠিক দৌড়তে না পারলেও সেই রকম ভাবে অন্ততঃ চলেছে। আমি পা চালিয়ে তার কাছে ঘেঁসে বললাম—

"তোমার নামটি কি, বাবা?"

"মেরা নাম খুবলাল।"

ও বাবা! দেখতে বাঙালীর মত, অথচ খুবলাল। খুব যা হোক্। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলাম—

"বাবা, হুজুর কখন্ বেরুবেন?"

"মহারাজ আবভি বাহার যায়েঙ্গে।"

দেখলাম, গাড়ী-বারান্দায় প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী খাড়া রয়েছে। সেখানে যে রকম সব সাজ-পরা চোগোঁপ্পা চাপরাশী পায়চারী করছে, তাতে ওদিকে না ঘেঁসাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে ক'রে সেখানেই মহারাজের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, মহারাজ গাড়ীতে উঠছেন। মহারাজ বটে! এত দিন এত বড় লোককে দেখলাম, এমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা কখনও দেখি নি। হাসি হাসি মুখখানি দেখে ভরসায় আমার বুক ভ'রে উঠলো।

মোটর গাড়ী আসতেই আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম। বোধ হয়, বেগটা কিছু অতিরিক্ত হয়েছিল; কেন না, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ী রাস্তা ছেড়ে সুন্দর দূর্ব্বামণ্ডিত মাঠের ভিতর খানিকটা ঢুকতে বাধ্য হলো। আমি দুই হাত যোড় ক'রে মহারাজকে প্রণাম করলাম। তিনি হস্তসঙ্কেতে গাড়ী থামাতে ব'লে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কোথা থেকে আসছেন?"

আমি সংক্ষেপে নিজ প্রয়োজন জ্ঞাপন করতেই তিনি একটু ভাবিত হলেন। আহা, এমন না হ'লে কি বিধাতা এত উচ্চপদ দেন!

"আপনি কি করেন?"

"আমি স্কুল-মাষ্টার, মহারাজ।"

মহারাজ দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। স্কুল-মাষ্টারের প্রতি এত সম্মান! এই প্রথম দেখলাম। তাঁর সঙ্গীকে বললেন—

"সুবোধ বাবু, একটা চুরুট দাও ত।"

চুরুট খেতে খেতে ভাবতে লাগলেন। শেষে বললেন, "কাল সন্ধ্যার পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বুঝলেন?"

আমি করযোড়ে উভয়কে প্রণাম করলাম। সুবোধ বাবুটি বেশ পরিহাসপ্রিয় দেখলাম। তিনি আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি কি তেল মাখেন মাষ্টার-মশায়? নবকুসুম বোধ হয়?"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি বললেন,

"তেলটা মুখে না মেখে এই অবধি মাথায় ভাল ক'রে মাখবেন।"

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমার মাথায় কেশ কিছু অল্প অর্থাৎ টাক ও মুখভরা দাড়ি, এই নিয়ে তিনি পরিহাস করলেন। মহারাজ উচ্চ হাস্য করলেন। আমার মন আশায় ভ'রে উঠলো।

হতোও খুব সুবিধে। কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।

অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়তেই এক সাহেবের কুকুরে আমাকে তাড়া করলে। সাহেবরা যে প্রকার কুকুরের ভক্ত, তাতে কুকুরকে কিছু বলা সঙ্গত হবে না বুঝে প্রাণ নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলাম। কোনও দিকে দৃক্-পাত নেই। হঠাৎ একখানা বাস্ এসে ঘাড়ের উপর পড়লো। ব্যস্! সেইখানেই অজ্ঞান।

পরে যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখি, আমি হাঁসপাতালে। আঘাত বেশী লাগে নি, ত্রাসেই আত্মারাম প্রয়াণ করবার জোগাড় করেছিলেন। মনে করলাম, কন্যাদায়ের জন্য যখন জীবন পর্য্যন্ত যেতে বসেছিল, তখন আর নয়। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আর এ ভিক্ষাবৃত্তি করবো না, তা ভাগ্যে যাই থাক্।

দিন তিনেক বাদে ডাক্তাররা জবাব দিলেন, অর্থাৎ ঘরের ছেলে ঘরে যেতে অনুমতি করলেন। আমিও শুধু শুধু আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকবার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। আর হাঁস-পাতালের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার বড়ই কেমন কেমন

ঠেকছিল। অবশ্য আমি ইংরাজী ইস্কুলের মাষ্টার, ইংরাজী পড়াই, পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষপাতী বটে। কিন্তু বাড়াবাড়িটে কোনও মতে সমর্থন করতে পারি নে। এই যে অসুস্থ লোকের মাঝে বয়স্থা মেয়েদের শুশ্রূষা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এতে রোগ বাড়ে না ক'মে? আমি স্কুল-মাষ্টার মানুষ, আমার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ লোকের কথা ধরতে গেলে, এরূপভাবে প্রকৃতি-সম্ভাষণ যে অতি বড় গর্হিত, সে কথা আমাকে বলতেই হবে।

হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে যাত্রা করা গেল।

৪

মাঘ ফাল্গুন দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল। পাঁজি হাতে ক'রে সকালে সন্ধ্যায় ব'সে ব'সে ভাবি, একটা শুভদিন ত চ'লে গেল! আবার কবে বে'র দিন আছে! শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে দেখে চোখ ঝাপসা মেরে গেল, কিন্তু একটি শুভদিনও আসতে আর বাকী রইল না। কিন্তু কোনও শুভদিনেই আমার ভাগ্যে একটিও সু-লগ্ন মিল্‌ল না। মেয়েটার জন্যে ভাবনা ক্রমে বাড়তে লাগলো, কিন্তু পাঁজিতে তার কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া গেল না। মনে মনে স্থির করলাম, নতুন বছরে পাঁজির সাত আনার পয়সা বাঁচানো যাবে। শুধু শুধু ও একখানা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর-বিড়ম্বিত অকেযো বই কিনে কোনও লাভ নেই।

পিসীমা এলেন। বল্‌লেন, "ভাবিস নে, বাছা। ভগবান্ একটা গতি করবেনই করবেন।"—বুঝলাম, ইনিও আমার স্ত্রীর মত ভগবানের উপর সব বোঝা চাপাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু আমার কন্যাদায় যে ভগবান্ স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেবেন, সেরূপ আশা করা কোনও মতেই চলে না। তিনি পরম নির্ব্বিকার! আমার মেয়ের আট বছরই হোক আর আঠারোই হোক, ভগবান্ তাতে বিচলিত হ'তে যাবেন কেন? এই সোজা কথাটাও অস্মদ্দেশের মেয়েরা বোঝে না। ঘোর কুসংস্কার!

গুডফ্রাইডের ছুটীতে সেই ছেলেরা নাগেশ্বরবাবুর বাড়ীতে আসবে বলেছিল। কথাটা মনে পড়ল। একবার ভাবলাম, ঐ সব বকাট ছোঁড়ারা আবার কথা ঠিক রাখবে! ওরা যা খুশী বকে, যা খুশী করে। সতের বছর ধ'রে ছেলে ঠেঙিয়ে এই অভিজ্ঞতাটা ভাল করেই অর্জ্জন করা গেছে।

যা হোক, গুডফ্রাইডের দিন দুপুরবেলা লাঠিগাছটা হাতে নিয়ে গেঞ্জি গায়েই বেরিয়ে পড়া গেল। নাগেশ্বর দত্তর বাড়ী গিয়ে দেখি, খাওয়া-দাওয়ার ধূম প'ড়ে গেছে; তারা এসেছে। তিন বন্ধুতে বৈঠকখানায় ব'সে খুব তাস পিটছে। কালো ব'লে পাড়ার একটা বয়াটে ছোঁড়াকেও দলে জুটিয়ে নিয়েছে।

ওদের মধ্যে লম্বা মত ছেলেটি হাত দু'টো মাথায় ঠেকিয়ে বল্‌লে, "এই যে মশায়, নমস্কার। আপনাকে কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না? রাধাবাজারে, বাগবাজারে, গঙ্গার ঘাটে কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে কোথায়ও দেখেছি। লাগাও টেক্কা তুরুপ!"

মনে মনে ভারি চ'টে গেলুম। কিন্তু তবু ছেলেটা যে নমস্কার করলে, এই মান-রক্ষে। কালো বল্‌লে, "উনি ঠাকুরদা—দা—দাসবাবু। ইস্কুলের থা—থা—থার্ড মাষ্টার।"

যে ছেলেটির নাম সৌরীন—সে একটা বালিস থপ ক'রে ছুড়ে দিয়ে বল্‌লে, "বসুন, বসুন, ঠাকুরদা। এক হাত খেল্‌তে রাজি আছেন ত? একবারটি আমার খেড়ু হয়ে বসুন ত ঠাকুরদা। ব্যোম না হয়ে যায় না!"

"ব্যোম কি রে! ব্যোম ছক্কা।"

তাসখেলায় যে আমি অ-পটু, তা নয়। কিন্তু এই ইস্কুলের ছেলেগুলোর সঙ্গে তাস খেল্‌তে হবে না কি? আমি মাষ্টারোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌লাম, "আমি তাস খেলি না।"

ছেলে তিনটে ত হেসেই খুন। বাস্তবিক, আমি এমন অসভ্য ছেলে দেখি নি।

খাবারের ডাক হলো। ছেলেরা গিয়ে খেতে বস্‌লো। নাগেশ্বরবাবু আমাকে বল্‌লেন, "ঠাকুরদা, আপনি একটু এদের দেখবেন আসুন। আজকালকার ছেলেদের রুচি সম্বন্ধে আপনি যেমন জানেন, এমন ত আর কেউই নয়।"

কম্প্লিমেণ্টটা ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে গ্রহণ করলাম; কেন না, ছেলেদের সঙ্গে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে ওদের হালচাল বুঝতে আর কিছু আমার বাকী নেই। নাগেশ্বরবাবু একটু আড়ালে ডেকে বললেন, "আমার মেয়েটিকে দেখতে এসেছে। পটাশপুরের জমীদার। লাখ টাকার মালিক। নিজেই কর্ত্তা, বুঝলেন?"

আমি মস্তকসঞ্চালনের দ্বারা বুঝাইলাম যে, আমার বুঝতে কিছু বাকী নেই। ছেলেদের ভার আমার দিয়ে নাগেশ্বরবাবু স'রে গেলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়, এমন সময়ে তিনি

অলকাকে সাজিয়ে নিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। অলঙ্কারে মেয়েটির গা একেবারে মুড়ে দিয়েছে। অলকা একটু মোটা-সোটা গোলগাল ধরণের মেয়ে। বাবুটির যোগ্য বটে। রং দু'জনেরই টুকটুকে। ভাল অবস্থায় থাকে কি না। আমার গৌরী যদি গরীবের ঘরে না জন্মাতো, ত তার ছিরি আর এক রকমের হতো।

যে ছেলেটির সঙ্গে অলকার সম্বন্ধ হচ্ছিল, তার নাম রঞ্জিন-লাল। রঞ্জিন বাবুটি অলকার দিকে যেরূপ সতৃষ্ণভাবে পুনঃ পুনঃ চাইছিল, তাতে আমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। বন্ধুরা সব চাপা হাসি হাসতে লেগেছে। অলকা ক্ষণে ক্ষণে রাঙ্গিয়ে উঠছে। আমি বুঝলাম যে, বোশেখ মাসে এ কাষ না হয়ে যায় না।

ঢ্যাঙা পানা ছেলেটি আমার অবস্থা দেখে 'বিষম' খেয়ে ফেললো। হাসতেও পারে না, চাপতেও পারে না। আমি এক পায় দু' পায় সে স্থান থেকে স'রে পড়লাম। এ ছেলেটার নাম রাখহরি। সেদিন ওদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝেছিলাম যে, এরও বে' হয় নি এবং এ-ও কায়স্থ। তাই হলেই হলো। আমি ত আর কুল করতে চাচ্ছি নে; কায়স্থ হলেই হ'লো, আর আমার সগোত্র না হলেই হ'লো। একবার দেখলে হতো না? ছেলেটা কিছু ইয়ার, তা হোক, চটপটে আছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে, আমি কথায় কথায় ওকে কাঁঠালতলায় নিয়ে এলাম। তার পরে আমি ব'লে ফেললাম, "একবার আমার বাড়ীটে দেখে যাবেন না?"

"নাঃ, সে আর এ যাত্রা হয়ে উঠবে না। সাড়ে চারটের ট্রেণ, বুঝলেন?"

"তা হোক্, এই ত বাড়ী। ঐ যে হোথা, পেয়ারা গাছ ক'টা পেরিয়ে—"

বলতে বলতে পা চালিয়ে দিলাম। বাছাধন আর 'না' বলতে পারলেন না। মেয়েটাকে দেখিয়ে ত দি। নিজে বে না করে, একটা সম্বন্ধ জুটিয়ে দিতেও ত পারে। এই ত নাগেশ্বর দত্তর মেয়ের সম্বন্ধ ঐ ত ক'রে দিলে।

"ও, এই আপনার বাড়ী? খুব কাছে ত!"

'হ্যাঁ, বাবা, এই পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে আছি। তা যথাসাধ্য আমি দিতে থুতে রাজি আছি—পিসীমা, ও পিসীমা! ছাই এই সময় নাক ডেকে ঘুমুতে হয়? ওরে ও হতভাগা মেয়েটা, দৌড়ে আয়—না! তোকে যে দেখতে এসেছে। সব মাটী করলে!"

গৌরী একবার চোখ দু'টা তুলে আমার দিকে চাইলে, আর একবার ছোঁড়াটার দিকে চাইলে, তার পরে কি মনে ক'রে ছুটে পালালো।

আমি একটা ভাব কেটে বাবুকে দিলাম। বললাম, "একটু যদি অপেক্ষা করেন, মেয়েটাকে একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে দেখিয়ে দি।"

"কিছু দরকার নেই। আপনার ঐ গাছটায় খুব আম হয় বোধ হয়?"

পিসীমা উঠে এসে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াতেই সে গড় হয়ে একটা নমস্কার করেই দিলে ছুট। পিসীমা জিজ্ঞেসা করলেন, "হ্যাঁ রে, কাকে মেয়ে দেখাবি?"

আর কাকে মেয়ে দেখাবি! আমি আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝলাম, ভেবে কোনও ফল নেই।

নাগেশ্বর দত্তর মেয়ের বিয়ে অবশ্য খুব ধুমধামেই হলো। ঘটা দেখবার জন্যে গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে এল, এল না শুধু গৌরী। বললে মাথা ধরেছে। কি যে দিন-কাল পড়েছে! কচি কচি মেয়েগুলোর মাথায় কি সব পোকা জমতে সুরু করেছে, কথায় কথায় তারা ধ'রে বসে।

আমায় যেতেই হলো। সন্ধ্যার পর থেকে লোক খাওয়ান, কিন্তু কাল-বোশেখীর জন্ম বড়ই গোলযোগ হয়ে গেল। সেকালে বোধ হয় বোশেখ মাসে ঝড় উঠতো না। তা যদি হোতো, তবে বোশেখ মাসের বদলে কার্ত্তিক মাস নিশ্চয়ই বিবাহের জন্ম প্রশস্ত ব'লে নির্দ্দিষ্ট হোতো। এখনও এ বিষয় সংস্কার আবশ্যক। যা হোক, সন্ধ্যার পরে এমন ঝড় উঠলো যে, যে যেখানে পারলে, উর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিলে। আমি তখন লুচির ঝাঁকা নিয়ে ছুটোছুটি করছি। বরযাত্রীরা খেতে বসেছিল। তাদের কোনও রূপে খাইয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো।

অতি কষ্টে চটি জুতোটা খুঁজে নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলাম। ঝড়ের বেগ তখন একটু কমেছে। পিয়ারাতলায় এসে শুনি, আমার বাড়ীতে শাঁখ বাজছে। ভাবলাম, ভূমিকম্প নয় ত? বাড়ীতে ঢুকে দেখি, বাইরের ঘরে সৌরীন আর রাখহরি ব'সে আছে। ভিতরে গিয়ে শুধোতেই সকলে একসঙ্গে কি যে বলতে লাগল, আমার মাথা একেবারে গুলিয়ে দিলে। তাদের গোলমাল থেকে এইটুকু অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম

যে, গৌরীর বিয়ে, আজ রাতে, এখনই, এই দণ্ডে। আমার মাথা আর মুণ্ডু! ছোট ছেলে-মেয়েরা গোটা তিন চার শাঁখ নিয়ে মুখগুলোকে বাতাবী লেবুর মত ফুলিয়ে ফুঁক লাগাচ্ছে। কে কার কথা শোনে?

"পিসীমা! ও পিসীমা! আরে ছাই। আমি কি বাড়ীর কেউ নই নাকি?"

কে কার কথা শোনে?

পিসীমা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কেঁদে ফেললেন। সুতরাং অপেক্ষা না ক'রে আর উপায় নেই। তিনি আঁচলে চোখের জল আর নাক-মুখ মুছতে মুছতে প্রায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাবার ক'রে দেবার গতিক করলেন। তার পরে বললেন, "ওরে বাবা, কি ছেলে গো! কি ছেলে! সেই সে দিন এক নজর দেখেছিলাম। আমায় গড় ক'রে সেই ছুট্টে পালিয়ে গেল। আজ ঝড়ের মধ্যে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে এসে একেবারে বাড়ীর ভেতর হাজির। আমি তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে আলো জ্বেলে দিলুম। ছেলে দুটি দিদিমা দিদিমা ক'রে আমায় গড় করলে, পায়ের ধুলো নিল। আহা, ভাল হোক্ ভাল হোক্।"

"তা হোক্, তোমার গিয়ে ভাল হোক্। তার পরে কি হলো, বল না—"

পিসীমা কঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন,—"কি আর হবে? বললে 'আমি বে করতে এসেছি। সারাদিন শুধু একটু দুধ ও গণ্ডা চারেক সন্দেশ খেয়ে আছি। আজ দিন খুব ভাল। বে দিতে কিছু আপত্তি আছে?'

"আমি বললুম—'এস ভাই। ব'স ভাই। আমার মাথায় যত চুল, তত বছর পরমায়ু হোক্'।"

"দূর হোক্, তার পরে কি হলো, তাই বল না ছাই—"

তার পরে ঝড় থেমে এল। আর ছেলেমেয়েগুলো শাঁখ বাজাতে সুরু করলে। আর কি?"

"না, তোমার সঙ্গে কিছুতেই পারবার যো নেই—" ব'লে পা চালিয়ে বাইরে এলাম।

সৌরীন আর তার বন্ধু উঠে আমায় নমস্কার করলো। আমি জিজ্ঞেসা করলাম, "এ সব কি বাপু? আমি ত কিছু বুঝতে পারছি নে—"

সৌরীন বললে—"আজ রাত্রি ১টার পরে বিবাহের একটি শুভলগ্ন আছে। বরও উপস্থিত। এখন আপনার ইচ্ছা হ'লে শুভকার্য্য শুভলগ্নে সুসম্পন্ন হ'তে পারে।"

"আজই?"

"হাঁ, আজই।"

"বাবা সৌরীন! নাগেশ্বর বাবু আমার পরম বন্ধু। তিনি তোমার মেসো মশায়। বাবা, আমিও সেই মতে তোমার গুরুজন। আমার সঙ্গে এই মর্ম্মান্তিক ঠাট্টা করা উচিত হয় না—"

সৌরীন এই কথা শুনে জিভ কেটে উঠে দাঁড়ালো। রাখহরি উত্তর করলো—"মোটেই ঠাট্টা নয়। আপনি সে কথা কেন ভাবছেন? তবে অন্যত্র যদি আপনার মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে থাকে, তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।"

আমি বললাম, "না না, কোথাও সম্বন্ধ হয় নি। তোমার মত পাত্র পেলে আমি পরম সৌভাগ্য ব'লে গণনা করি।— কিন্তু বাবা, আজ ত হ'তে পারে না—"

"কেন? আজ কি মেয়ের জন্মবার?"

"না না, তা নয়! কিন্তু বাবা, আমি যে প্রস্তুত নই।"

সৌরীন ব'লে উঠলো, "সে আপনার কিছু ভাবতে হবে না। আমরা সব ঠিক ক'রে নেব এখন।"

"অন্ততঃ পুরুত, নাপিত চাই ত?"

"সে সব ওবাড়ী থেকে ব্যবস্থা হবে।"

"আমি যে কিছুই জোগাড় করতে পারিনি বাবা—"

সৌরীন বললে, "সে জন্যে আপনার কোনও ভাবনা নেই। গয়না কাপড়—এমন কি, ফুলের মালা টোপর পর্য্যন্ত আমরা নিয়ে এসেছি। এখনই রাখহরির কাকা সে সব নিয়ে আসছেন।"

আমাকে একেবারে অবাক্ ক'রে দিলে। এরা কে গো!—

* * * *

ঝড়-বাদল থেমে গিয়ে ফুটফুটে জ্যোছনা দেখা দিল। দত্তবাড়ী থেকে পুরুত এলো, বাজনা এলো। ভারে ভারে খাবার এলো, বাসর থেকে তাদের জামাইও পালিয়ে এলো। কিছুরই আর অভাব রইল না। বিবাহের ভোজটা নাগেশ্বর দত্তর বাড়ীতেই যা হয়েছিল। সুতরাং আমাকে পরে ঐ বাবতে কিছু খরচ করতেই হোলো।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ)।

"শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও বিচার

উপসংহার

আমার "শাস্ত্র-সমস্যা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ যে ভাবে হইতেছে, তদনুসারে বিচার চালাইলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি যে অনিবার্য্য, তাহা প্রতিবাদকর্ত্তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ অপ্রাসঙ্গিক নিতান্ত 'বাজে কথা'র অবতারণা করিয়া স্বকৃত প্রবন্ধের বিস্তার করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। ছলে ও বলে আমারই উপর মিথ্যাবাদিতার ও লোকপ্রতারণার আরোপ করিয়া, তিনি নিজের সত্যপরতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য যে অতিশয় আগ্রহান্বিত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বহুবার দেখাইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা বলিবার আর পৃথক্ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ করি না।

তিনি নিজ প্রবন্ধে যে সকল গালি আমার উপর বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার উত্তররূপে—তাঁহারই প্রদর্শিত নীতি অনুসারে, তাঁহাকে গালি দিবার যথেষ্ট অধিকার আমার থাকিলেও, সে কার্য্য হইতে আমি বিরত আছি ও থাকিব। কারণ, এইরূপ গালি দিয়া ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রয়োজন আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার যে মতভেদ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এ পর্য্যন্ত তিনি এমন কোন প্রমাণেরই উপন্যাস করিতে পারেন নাই, যাহাতে আমার নিজ মতের অল্পমাত্রও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। প্রত্যুত, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, তিনি নিজ মত-সংস্থাপনের জন্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সকলই সারহীন, ইহাই আমার এই প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইতেছে।

তিনি প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছেন, মহাভারতের পূর্ব্বে, মহাভারতের সময় ও মহাভারত-রচনার পরবর্ত্তী কালে পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে 'পুরাণ' এই শব্দটি আছে, ইহা বলিয়াছেন। আমি দেখাইয়াছি যে, 'পুরাণ' এই শব্দটি রামায়ণেই আছে, তাহা নহে, শ্রুতির মধ্যেও 'পুরাণ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া এখন পুরাণ বলিয়া প্রচলিত যে পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সকল পুরাণ ও উপপুরাণ যে মহাভারত-রচনার পূর্ব্বেও ছিল, তাহার কোন প্রমাণই প্রতিবাদকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, কখনও যে করিবেন, সে আশাও সুদূরপরাহত, যেহেতু, বেদব্যাস-রচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও বহুসংখ্যক উপপুরাণ বেদব্যাসের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এ কথা তিনি শপথ করিয়া বলিলেও কেহ মানিবে না।

মহাভারতের পূর্ব্বে 'পুরাণ' নামে প্রথিত কোনও গ্রন্থ ছিল, ইহা আমিও মানি, কিন্তু সেই পুরাণ বর্ত্তমান সময়ে একখানিও নাই, ইহাই হইল আমার বক্তব্য। সুতরাং 'শাস্ত্র সমস্যায়' শাস্ত্র ও সময়ভেদে পরিবর্ত্তিত ও নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একালেও হইবে, ইহা দেখাইতে যাইয়া আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার কোনটিরই প্রতিবাদকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই, ইহা বিজ্ঞ পাঠকগণই দেখিবেন, সুতরাং আমি এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

রামায়ণ সম্বন্ধেও আমি বলিয়াছি যে, এখন যে রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই রামায়ণই যে মহাভারতের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বুদ্ধের নাম স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, বর্ত্তমানে প্রচলিত রামায়ণ বুদ্ধদেবের পরেই লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা যে সকল তাঁহার মনগড়া যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসার ও উপহাসাস্পদ। বুদ্ধদেব বলিলে যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ ব্যতিরিক্ত আর কোন বুদ্ধকে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট নাই, অমরসিংহের কোষেও বুদ্ধদেবের যে কয়টি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, অমর সিংহও ঐ সকল নাম শাক্যসিংহ বুদ্ধেরই নাম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বুদ্ধদেব যে অনেক ছিলেন, তাহা অমরসিংহও নির্দ্দেশ করেন নাই। বুদ্ধের বহুত্বের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কেহই স্বীকার করেন নাই, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ রামায়ণে বুদ্ধের নাম দেখিলে ঐ বুদ্ধ যে শাক্যসিংহ ছাড়া আর কেহই হইতে পারেন না, তাহা হিন্দুমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন, বা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বুঝিয়াও আসিতেছেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত প্রতিবাদকর্ত্তার সম্পাদিত রামায়ণের অনুবাদে আমরা প্রথম দেখিতে পাই যে

এই বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধ,—শাক্যসিংহ নহেন। এ উদ্ভট কল্পনা প্রতিবাদকর্ত্তাই প্রথমে করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন মূল প্রমাণ কিংবা কোন টীকাকারের সম্মতিসূচক কোন প্রমাণই প্রতিবাদকর্ত্তা তৎকৃত রামায়ণের অনুবাদে উল্লেখ করেন নাই, এখন দায়ে পড়িয়া নিজের এই অদ্ভুত কল্পনাকে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে এ সকলই সম্ভবপর, কারণ, 'গরজ বড় বালাই'।

তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, তিনি বঙ্গবাসীর পুরাণসমূহের অনুবাদকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন, অথচ রামায়ণ সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্রে যে কি লেখা আছে, তাহা তিনি যে জানেন নাই, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? লোককে ঠকাইবার জন্য শাস্ত্রের বহু প্রমাণ আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক উদ্ধৃত করি নাই বলিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ তিনি তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধেই করিয়াছেন, কিন্তু, নিজের মতের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া, তাঁহার নিজের সম্পাদিত পুরাণ গ্রন্থনিচয়ে রামায়ণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, ইহা চাতুরী বা লোকবঞ্চনা অথবা সত্যের গোপন ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে, তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

আমি বলিয়াছি, এই রামায়ণখানি যে মহাভারতের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আমার এই প্রকার উক্তির কারণ হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণ-সমূহের মধ্যেই বহু রামায়ণ ও বহু বাল্মীকির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ২৪শ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভৃগুবংশীয় সুমতি নামে এক বিপ্র ছিলেন। কৌশিকী নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র হয়। অনাবৃষ্টির সময় বিপদ্‌গ্রস্ত সুমতি ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে কাননে গিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। সেইখানে আভীর দস্যুগণের সহিত অগ্নিশর্ম্মার সঙ্গ হয়, তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। কোন সময়ে সপ্তর্ষিগণ ঐ পথে উপস্থিত হন। ঐ সপ্তর্ষির মধ্যে মহর্ষি অত্রি অগ্নিশর্ম্মাকে উপদেশ দিয়া দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। অগ্নিশর্ম্মা অত্রির উপদেশে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, এই তপস্যাকালে তাঁহার দেহের উপর বল্মীক উৎপন্ন হইয়াছিল, ঋষিগণ আসিয়া পরে তাঁহাকে বল্মীকমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'তুমি বল্মীকের মধ্যে ছিলে বলিয়া বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হইবে।' ঋষিগণের প্রস্থানের পর বাল্মীকি কুশস্থলীতে গমন পূর্ব্বক অতি মনোহর রামায়ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ রামায়ণই প্রথম কাব্য।

২। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড বৈশাখমাস-মাহাত্ম্যে ২১শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কৃণু-নামা জনৈক মুনি এক সরোবর-তীরে তপস্যা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল তপস্যায় তাঁহার দেহ বল্মীক-মৃত্তিকায় আবৃত ছিল। এই কারণে ঐ মুনি বাল্মীক নামে অভিহিত হন। তাঁহার ঔরসে এক শৈলূষীর উদরে এক বনেচর ব্যাধ জন্মগ্রহণ করে, ঐ বনেচর ব্যাধই ভূতলে বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হয়, এই বাল্মীকি দিব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে ১২৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মহামুনি বাল্মীকি পূর্ব্বে চৌর ছিলেন। পূর্ব্বকালে চমৎকারপুরের মাণ্ডব্যবংশে লৌহজঙ্ঘ নামে জনৈক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। আনর্ত্তদেশে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় দ্বিজ লৌহজঙ্ঘ মহাকষ্টে পতিত হইলেন। তখন তিনি ফলার্থী হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চৌর্য্যকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিলেন। দুর্ভিক্ষ দূর হইলেও পর অভ্যাস বশতঃ কিন্তু তিনি চৌর্য্যবৃত্তি হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। একদা মরীচি-প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ লৌহজঙ্ঘের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সপ্তর্ষিগণের অন্যতম পুলহ নামে ঋষি কহিলেন, 'তুমি আলস্য পরিহার পূর্ব্বক আমার প্রদত্ত এই মন্ত্র জপ কর।' তদনুসারে লৌহজঙ্ঘ সমাধিস্থ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই দীর্ঘকাল তপস্যাচরণে লৌহজঙ্ঘের চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ সঞ্চিত হইয়া তাঁহার দেহকে আবৃত করিয়াছিল, পরে লৌহজঙ্ঘ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ নামক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

৪। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে ২৭৮ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে শমীমুখ নামে এক দ্বিজ ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বৈশাখ। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করিবার জন্য বৈশাখ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। একদা সপ্তর্ষিগণকে ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে লগুড় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষির মধ্যে অঙ্গিরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি ক্ষণকাল অবস্থিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর।' তাঁহাদের নিকট পাপকর্ম্মের পরিণাম অতি ভীষণ, ইহা অবগত হইয়া, তিনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং মুনিগণের উপদেশানুসারে মন্ত্র জপ করেন। ক্রমে বল্মীকে তাঁহার গাত্র আবৃত হইল, তখন ঋষিগণ আবার আসিয়া বলিলেন যে, 'হে মুনে! তুমি একাগ্রতা সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া বল্মীকময় হইয়া পড়িয়াছ, এই কারণে জগতে তোমার বাল্মীকি এই নাম হইবে এবং তুমি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করিয়া মুক্ত হইবে।'

৫। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ২০৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, অসিত, দেবল, মহাতপা, বাল্মীকি এবং মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন।

৬। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ১২৪ সর্গে এইরূপ লিখিত আছে, প্রচেতা-নন্দন বাল্মীকি ভবিষ্য ও উত্তরের সহিত এই আয়ুষ্য আখ্যান রচনা করিলে ইহা পিতামহ কর্ত্তৃকও অনুমত হয়।

৭। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভার্গবশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি রামচন্দ্র-চরিত রচনা করেন।

৮। শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বল্মীক-সম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকিও বরুণের পুত্র।

৯। বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—চতুর্ব্বিংশে ভার্গববংশজাত ঋক্ষ বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হয়েন।

এই সকল পৌরাণিক ও মহাভারত-কথার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, বাল্মীকি নামে বহু ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতে বাল্মীকির নাম আছে বলিয়া বাল্মীকি-প্রণীত বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, এইরূপ প্রতিবাদকর্ত্তার যে সিদ্ধান্ত, তাহার অনুকূল নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদকর্ত্তা দেখাইতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রামায়ণ যে মহাভারত রচনার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই ইত্যাদি, তাহা যে অবিসম্বাদিত সত্য, সুতরাং প্রতিবাদকর্ত্তা এই মদীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইবার স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব। আমি বলিয়াছি, মীমাংসকগণ স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী। এই স্বতঃ প্রামাণ্য শব্দের অর্থ এই যে, জ্ঞান যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারাই সেই জ্ঞানগত প্রামাণ্যও গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞান যদি স্বয়ং প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সে যখনই আপনাকে প্রকাশ করে, তখনই তাহা স্বগত প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাভাকরগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন, এই কারণে তাঁহাদের মতে প্রত্যেক জ্ঞানগত প্রামাণ্য প্রত্যেক জ্ঞানের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভট্টমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে, তাহা জ্ঞাততালিঙ্গক যে জ্ঞানানুমান, তাহার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানগত প্রামাণ্য জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানবিষয়ক অনুমানের দ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহাই হইল ভট্টমতে স্বতঃপ্রামাণ্য। মুরারি মিশ্রের মতে জ্ঞান অনুব্যবসায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সুতরাং সে মতেও জ্ঞানবিষয়ক যে অনুব্যবসায়, তাহার দ্বারাই জ্ঞানগত প্রামাণ্যও প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের স্বপ্রকাশকত্ব সম্বন্ধে মীমাংসকগণের মতভেদ থাকিলেও স্বতঃপ্রামাণ্য বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই স্বতঃপ্রামাণ্য বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক মীমাংসকের মত উদ্ধৃত না করিয়া অনায়াসে বুঝা যাইবে বলিয়া আমি প্রভাকরের মতই উদ্ধৃত করিয়াছি, কুমারিলভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মত অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করি নাই। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে গেলে প্রামাণ্যের যে স্বতস্ত্ব, তাহা "স্বাশ্রয়গ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্ব", অর্থাৎ জ্ঞান যাহা দ্বারা গৃহীত হয় জ্ঞানগত প্রামাণ্য তাহার দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী, তাঁহাদের সকলের মতই এইরূপ উক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, কঠিন হইবে বলিয়া এই নৈয়ায়িক পরিষ্কৃত স্বতঃপ্রামাণ্য আমি মাসিক বসুমতীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উল্লেখ করি নাই। এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য বেদ হইতে উৎপন্ন যে শাব্দবোধাত্মক জ্ঞান, তাহাতেও বিদ্যমান আছে, ইহাই আমি উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আমার উক্তির অর্থ অনুধাবন না করিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা পৌষ মাসের মাসিক বসুমতীতে লিখিয়াছেন—

"অতএব দেখা গেল—মাসিক বসুমতীর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ মীমাংসকগণের কাহারো সম্মত নয়, প্রাভাকরেরও নহে।"

আমার কথা না বুঝিয়াই যে এইরূপ উক্তি হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি "শাস্ত্র-সমন্বয়ে" কি বলিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"জ্ঞান যে স্বভাব অনুসারে নিজের বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই স্বভাব অনুসারেই সে নিজের স্বরূপকেও প্রকাশ করে এবং নিজের উপর যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই হইল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রকাশরূপ জ্ঞান একসঙ্গে ত্রিবিধ বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সে ঘটপটাদি বিষয়কে প্রকাশ করে, আপনাকেও প্রকাশ করে এবং আত্মগত যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করে। ইহার নাম জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

মীমাংসকগণের মধ্যে গুরু বা প্রাভাকর নামে প্রসিদ্ধ যে দার্শনিক, তাঁহারা এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিক দার্শনিকগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, মহর্ষি কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মানিয়া লইয়াছেন।"

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, আমি স্পষ্টই বলিয়াছি যে, মীমাংসকগণের মধ্যে প্রাভাকর মতে আমার ব্যাখ্যাত স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, ভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মতে

এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয়, এ কথা আমি বলি নাই। প্রাভাকর মতেই এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয়, আমি ইহাই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। প্রতিবাদকর্ত্তা কিন্তু বলিতেছেন যে, এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ প্রাভাকরেরও অঙ্গীকৃত নহে। কেন নহে—তাহার কোন কারণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য মীমাংসক প্রাভাকর-সম্মত নহে,—ইহা তিনি মুখেই বলিয়াছেন, কিন্তু, ইহার সাধক কোন প্রমাণেরই উপন্যাস তিনি করেন নাই, সুতরাং তাঁহার এইরূপ যে উক্তি, তাহা অপ্রমাণ ও উপেক্ষণীয়। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আমার বর্ণিত এই স্বতঃপ্রামাণ্য প্রাভাকররূপ মীমাংসকগণের সর্ব্বথা সম্মত, প্রাভাকর মীমাংসকের মত তিনি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়াছেন, তাঁহার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ মতের খণ্ডন করিবার প্রয়াস করুন, 'কস্যং' 'খস্যং' জাতীয় অসভ্যতাসূচক কটূক্তির দ্বারা তাঁহার নিজ পাণ্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা বৃথা বাগাড়ম্বরমাত্র, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

পৌষের মাসিক বসুমতীতে তিনি লিখিয়াছেন, "বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্য ও জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য যে এক নহে, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল।"

আমি বলিতেছি, মীমাংসকগণের মতে বেদবাক্য-জনিত জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য হইতে অন্যবিধ-প্রমাণজনিত জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য যে পৃথক্ পদার্থ, ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত, তাহা যে একইরূপ বস্তু, তাহাতে কোন মীমাংসকের মতভেদ নাই। প্রতিবাদ-কর্ত্তার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই উক্তির যদি খণ্ডন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার এই বৃথা আস্ফালন শোভা পায়, নচেৎ নহে।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য না মানিলে জ্ঞানের প্রামাণ্য-নির্ণয়ে অনবস্থার আপত্তি হয় বলিয়া আমি নৈয়ায়িক মতের দোষ উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসক মতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছি, এবং সেই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের মতের প্রতি মীমাংসকমতাবলম্বনে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদকর্ত্তা কিছুই বলিতে পারেন নাই, সে দিক্ দিয়াও তিনি যান নাই। আমি এখনও তাঁহাকে বলিতেছি, ঐ সকল দোষের খণ্ডন না করিয়া বাঙ্গালা দেশে নৈয়ায়িকের প্রাধান্যের আড়ম্বর দেখাইয়া আমাকে গালি দিলে কোন ফলই হইবে না, প্রত্যুত ঐরূপ গালিদাতা যে প্রাসঙ্গিক বিচারে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, তাহাই বুঝা যাইবে।

প্রতিবাদকর্ত্তা আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"এই যে স্বতঃ-প্রামাণ্য, ইহা জ্ঞানেই বিদ্যমান, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য ইহা নহে।"

প্রতিবাদকর্ত্তা এ স্থলে প্রমাণ শব্দটি 'প্রমা'-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা কেবল যে প্রমিতিই বুঝায়, তাহা নহে, কিন্তু, প্রমিতির করণকেও 'প্রমাণ' বলা যায়। সুতরাং শব্দাত্মক বেদে যখন 'স্বতঃপ্রামাণ্য' এই শব্দের ব্যবহার হয়, তখন তাহার অর্থ হয় 'স্বতঃ-প্রমিতিকরণত্ব', এই স্বতঃ-প্রমিতিকরণত্বরূপ স্বতঃ-প্রামাণ্য বেদেও বিদ্যমান আছে, এবং মীমাংসকগণও যেখানে বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহারা স্বতঃপ্রমিতিকরণত্বরূপ স্বতঃপ্রামাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং আমি বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া যে কোন মীমাংসক-মতবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছি, তাহা নহে।

স্বতঃ-প্রমিতিকরণত্বরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যের মধ্যে স্বতস্ত্বরূপ যে বিশেষণ, তাহা প্রমিতিতেই অন্বিত হইয়া থাকে। প্রতিবাদ-কর্ত্তা পৌষের মাসিক বসুমতীতে একটি নিতান্ত আজগুবী কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বেদ যে স্বতঃপ্রমাণ সংজ্ঞায় অভিহিত, তাহার কারণ, বেদ স্বকৃত বিধিনিষেধের জন্য অন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না" ইত্যাদি।

মীমাংসাশাস্ত্রে যাঁহার যৎসামান্য জ্ঞানও আছে—তিনি কখনও এরূপ অসার কথা বলিতে পারেন না, "বেদ স্বকৃত বিধি-নিষেধের জন্য" ইহার অর্থ কি? 'বিধি ও নিষেধ' বেদকৃত নহে, কিন্তু তাহা বেদেরই স্বরূপ, ইহাই মীমাংসক-সিদ্ধান্ত। এ কথাও যে সর্ব্বদর্শনপরমাচার্য্য প্রতিবাদকর্ত্তা জানেন না, অথচ তিনিই আবার বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর কলমের খোঁচা লাগাইয়া বাজীমাৎ করিতে পশ্চাৎপদ হন না, ইহা তাঁহাতেই শোভা পায়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু ইহা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসিই হাসিয়া থাকেন। মীমাংসান্যায়প্রকাশ নামক মীমাংসার প্রথম পাঠ্য পুস্তকেও লিখিত হইয়াছে—"স চ বেদো বিধিমন্ত্র-নামধেয়-নিষেধার্থবাদাত্মকঃ।" অর্থাৎ সেই বেদ-বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদস্বরূপ হইয়া থাকে,

ইহাই মীমাংসকের সিদ্ধান্ত, তাহা না জানিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা বলিয়া বসিয়াছেন, "বেদ স্বকৃত বিধি-নিষেধের জন্ত অন্ত শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না।" বিধি-নিষেধ যাহার স্বরূপ, সেই বেদ বিধি-নিষেধ করিয়া থাকে, এইরূপ যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার দার্শনিকতা যে অনন্তসাধারণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ-বিচার প্রসঙ্গে তিনি আমার প্রতি দোষারোপ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় যে "স্বতঃপরতঃ কথা ব্যবহৃত হয়, স্বতঃপ্রমাণ স্থলেও সেই প্রকার অর্থই প্রবেশ করান হইয়াছে। স্বতঃ যে স্বকীয়েভ্যঃ, এই দার্শনিক ব্যাখ্যার সমাবেশ ইহাতে নাই। এখানে স্বতঃর 'সহজ' অর্থ খাটিতে পারে না, তাহার কারণ, দার্শনিকগণ জ্ঞাত আছেন" ইত্যাদি। প্রতিবাদকর্ত্তার এই উক্তি সাধারণের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিবার জন্তই কৃত হইয়াছে। স্বতঃ শব্দের যে 'সহজ' এইরূপ অর্থ বাঙ্গালায় চলিত, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন ? এবং আমি ঐরূপ অর্থে তাহা কোন স্থানেও ব্যবহার করিয়াছি, তাহা যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদকর্ত্তা না দেখাইবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার এই উক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রমার স্বতস্ত্ব শব্দের অর্থ স্বাশ্রয়গ্রাহক-সামগ্রীগ্রাহ্যত্ব, ইহা নৈয়ায়িকগণও দেখাইয়াছেন, এই নৈয়ায়িকসম্মত অর্থ গ্রহণ করিয়াই আমি মীমাংসকমতসিদ্ধ স্বতঃ-প্রামাণ্যের স্বরূপ অগ্রহায়ণ মাসের বসুমতীতে দেখাইয়াছি। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাতেই যে স্বতঃ শব্দের অর্থ সহজ, ইহাই বা প্রতিবাদকর্ত্তা কোথায় পাইলেন ? স্বতঃ শব্দের সহজ অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা প্রতিবাদকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। বাঙ্গালা ভাষায় যাহার জ্ঞান আছে, এরূপ কথা সে কিছুতেই বলিতে পারে না।

প্রতিবাদকর্ত্তা ঐ পৌষের বসুমতীতেই বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞতা দ্বিবিধ, সাতিশয় ও নিরতিশয়। যে সর্ব্বজ্ঞতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বজ্ঞতা অপর কাহারো থাকে, সেই সর্ব্বজ্ঞতা সাতিশয়। যে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই নিরতিশয়। ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা সাতিশয় এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিরতিশয়। কারণ, ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা (ইহজন্মেরই হউক বা পূর্ব্বজন্মেরই হউক) তপস্তা দ্বারা অর্জ্জিত। তপঃসিদ্ধির পূর্ব্বে এই সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কোনও কার্য্যবিশেষের ফল নহে, ইহাই সাতিশয় ও নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার প্রভেদ।"

প্রতিবাদকর্ত্তার মতে সর্ব্বজ্ঞতার অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের যে নিত্যতা, তাহাই নিরতিশয়ত্ব, আর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের যে অনিত্যত্ব বা জন্তত্ব তাহাই সাতিশয়ত্ব। ইহাও সর্ব্বদর্শন-পরমাচার্য্যের অদ্ভুত দার্শনিকত্বের পরিচয় দিতেছে। কোন দার্শনিকই কিন্তু এরূপ নিরতিশয়ত্ব বা সাতিশয়ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যুত ইহা যোগসূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাসের অনভিমত। কারণ, "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, "যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তি-র্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষঃ।" যে পুরুষবিশেষে জ্ঞানের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর তিনিই পুরুষবিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর। এই ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ লিখিয়াছেন, "নমু সন্তি বহবস্তীর্থকরা বুদ্ধার্হতকপিলর্ষি-প্রভৃতয়ঃ। তৎ কস্মাৎ ত এব সর্ব্বজ্ঞা ন ভবন্তি, অস্মাদনুমানাৎ। ইত্যত আহ সামান্যেতি।"

ইহার অর্থ এই যে, "যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতেছে, সেই অনুমানের দ্বারাই বহু শাস্ত্ররচয়িতা বুদ্ধ, আর্হত, কপিলঋষি প্রভৃতি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে না কেন ? এইরূপ শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য ভাষ্যে 'সামান্য' ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।" বাচস্পতি মিশ্রের এই লেখার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অপর কোন মানবেরই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপর নহে। ইহাই সূত্র ও ভাষ্যকর্ত্তার অভিপ্রায়। সুতরাং জ্ঞানের সর্ব্ব-বিষয়কত্বই নিরতিশয়ত্ব এবং তদ্‌ভিন্নত্বই অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ক ভিন্নত্বই জ্ঞানের সাতিশয়ত্ব। ইহা যোগসূত্রে ব্যাসভাষ্যে এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকায় স্পষ্ট প্রতি-পাদিত হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের নিত্যত্বই যে নিরতি-শয়ত্ব এবং অনিত্যত্বই যে সাতিশয়ত্ব, এই প্রকার আজগুবী সিদ্ধান্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার গৃহজাত মধুবিদ্যার ন্যায় তাঁহারই উষ্ণমস্তিষ্ক-প্রসূত ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং আর এ বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক বোধ করি।

আর একটি কথা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ শব্দের প্রয়োগ ঋষিগণকে লক্ষ্য করিয়াও শাস্ত্রে বহু স্থানে আছে, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা যে শ্রীভগবানের জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ক নহে, ইহাই আমার বক্তব্য। সর্ব্বজ্ঞতা শব্দের অর্থ যে লোকজ্ঞতা, তাহাও আমরা শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। চাণক্যসূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—"সর্ব্বজ্ঞতা লোকজ্ঞতা" ৪৮ সূত্র। এই সূত্রানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, ঋষিগণকে যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা লোকজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং শাস্ত্রেও ঋষিগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞশব্দের এইরূপ অর্থই করিতে হইবে।

প্রাচীন ঋষিগণের ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা তপস্যা বা যোগের প্রভাবে অনেক অলৌকিক বস্তু বুঝিতে সমর্থ হইতেন, ইহাই তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রবাদের হেতু। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান কেবল ঈশ্বরেরই আছে, এবং তাহা অনুমানগম্য নহে। কিন্তু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাক, শ্রুতিতে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনেও কোন জীবেরই সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হয় নাই। বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিবার জন্য কুমারিলভট্ট যে যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা জীবমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুমারিলভট্টও সর্ব্বজ্ঞতার খণ্ডন করেন নাই। কারণ, তিনি শ্রুতি মানিতেন। শ্রুতিতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই তিনি তাহা খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু জীবমাত্রেই যে অসর্ব্বজ্ঞ; তাহা তাঁহার উক্তির দ্বারা এবং বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা-নিরাকরণ যুক্তি সমূহের দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা কুমারিলভট্টের অভিপ্রেত নহে, ইহাই আমি এখনও বলিতেছি। প্রতিবাদকর্ত্তাও মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতাসাধক কুমারিলভট্টের কোন উক্তিই উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া তিনি কুমারিলভট্টের দোহাই দিয়া মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়াছে। কুমারিলভট্টের মতানুযায়িগণ মীমাংসক হইয়াও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, এ কথা আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। সুতরাং আমি মীমাংসকমতাবলম্বী, অথচ ঈশ্বরও মানিতেছি, এইরূপ প্রতিবাদকর্ত্তার যে আমার প্রতি দোষারোপ, তাহা তাঁহার মীমাংসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

শাস্ত্রসমস্যা প্রবন্ধে আমি যে কয়টি কথা বলিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনটিরই সযুক্তিক প্রতিবাদ করিতে প্রতিবাদকর্ত্তা পারেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে তিনি নিজেই ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমান, তাঁহার মতের অনুসরণ যে না করে, সে 'অধার্ম্মিক' 'অশাস্ত্রজ্ঞ' ও 'মতলববাজ প্রবঞ্চক' এইরূপ গালাগালি তাঁহার প্রবন্ধের সার হইয়াছে।

প্রতিবাদকর্ত্তার সহিত বিচারের উদ্দেশ্যে আমি "শাস্ত্রসমস্যা" প্রবন্ধের সূত্রপাত করি নাই। আধুনিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি ভাবে, বাহ্যতঃ বহুবার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মূলতঃ অপরিবর্ত্তিত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বর্ত্তমান বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুসমাজে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে, তাহার উপায় অন্বেষণ ও নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যেই আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রতিবাদকর্ত্তা উপযাচক হইয়া সে সঙ্কল্পে বাধাদান করিলে অগত্যা আমাকে তাঁহার সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে লিপ্ত হইতে হয়। বিচার ও প্রতিবাদ আমার প্রতিপাদ্যের অনীপ্সিত অবান্তর প্রসঙ্গ মাত্র। বোধ করি, পাঠকবর্গেরও তাহা অনীপ্সিত। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষিত সমাজ এই বাদ-প্রতিবাদ বিষয়ে উদাসীন—এবং ক্রমে ইহা যে ভাবে দাঁড়াইতেছে,তাহাতে অধীর হইয়া পড়িতেছেন। অথচ এ বিচারে আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হইল কি না—তাহা নিরূপণ করিবার ভার তাঁহাদিগেরই উপর ন্যস্ত। কারণ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থনিরপেক্ষ শিক্ষিত সমাজই এই আলোচনার মর্ম্ম ও পরিণতি বুঝিতে অধিকারী। আজ আস্তিক হিন্দুমাত্রের মনে সর্ব্বোপরি এই প্রশ্নই জাগিতেছে—ব্রহ্মণ্য সভ্যতা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কি না? রাষ্ট্রে ও অর্থসামর্থ্যে পরাভূত হিন্দুস্থান আদর্শ এবং ভাব-সম্পদেও প্রতীচীর প্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করিবে কি না—প্রশ্ন আজ তাহাই। পৃথিবীময় যে ভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ করাল হইতে করালতর দাঁড়াইতেছে, তাহার মধ্যে আর্য্য সভ্যতাকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের মহনীয় ও মনোহর, সত্য ও সুন্দর রূপ লোক-লোচনসমক্ষে ফুটাইয়া তুলা প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের নানা খুঁটিনাটির তলে সাধারণ ধর্ম্মের যে শাশ্বত ভিত্তি—তাহাকে সুদৃঢ় করাই সমাজের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। সে ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া বিশেষ ধর্ম্মের প্রপঞ্চকে বজায় রাখার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ চেষ্টায় উদ্যত হইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা সনাতন ধর্ম্মের অন্যতম উদ্ধারক কুমারিলভট্টকে প্রৌঢ়বাক্যনিপুণ অর্থাৎ সরল ভাষায় ধাপ্পাবাজ সাজাইতে প্রাণপণ করিয়াছেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাই" ইহাই যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী অদ্বৈতাচার্য্য

কর্ত্তৃক ভক্ত হরিদাসকে পাত্রান্ন-প্রদান ধর্ম্মধ্বজী কপটাচারের দৃষ্টান্তে পরিণত করিয়াছেন। যেন সনাতন ধর্ম্মসেবী মহাপুরুষগণ প্রতিবাদকর্ত্তারই প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া শুধু চাতুরী দ্বারা যুগে যুগে ইহার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণের এই সকল কল্পিত বিকৃত চিত্র উপস্থাপনের ফলে হিন্দুসমাজ "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের" মহিমায় অভিভূত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে, ইহা মনে করা মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। সমাজের পিতামহগণের অবমাননার অর্থ পিতৃপুরুষানুসৃত পন্থাবলম্বন নহে। হিন্দু সমাজ ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াছে বা হইবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নামমাহাত্ম্যে ধর্ম্মনেতৃত্বের স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের বাক্যে ও কর্ম্মে, বিচারে ও আচারে প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাইতে সমাজ আজও আগ্রহান্বিত। সমগ্র সমাজের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ইহাই যোগসূত্র নাড়ীর বন্ধন। তাহা ছিন্ন করিয়া, মাত্র শুষ্ক তর্কের জালে সমাজকে বাঁধিবার প্রয়াস বৃথা। অথচ প্রতিবাদকর্ত্তার বিচারশৈলী দেখিয়া মনে পড়ে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের' সেই প্রথিত চরণটি—"স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্তি তে পণ্ডিতাঃ।" বর্ত্তমান লোকশিক্ষার যুগে, নবজাগ্রত সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ হিন্দুসমাজে এ জাতীয় পাণ্ডিত্যের দিন আর নাই—ইহা প্রতিবাদকর্ত্তা বুঝিবেন না কি?

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

দিবা দ্বিপ্রহরে—

চুড়ীওয়ালা বা "বে-পর্দ্দা"

মলয় দেশে
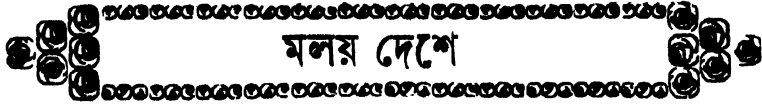
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দুইটা খাড়ি পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুণ্ডাপুর পৌছিলাম। খাড়ি দুইটার মধ্যে "বাস" ছিল না, সুতরাং ক্রোশ দুই রাস্তা পদব্রজে সারিতে হইল, পথে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে লাল রঙের নারিকেল কিনিয়া খাইলাম। প্রচণ্ড গরম, মনে হইল, বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি, ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে, কিন্তু উপায় নাই; কারণ, এ দেশে গোযান অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পথে এক কাফ্রির দোকানে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ ব্রাহ্মণের দোকান দেখিয়া "কহা" হুকুম করিয়া ভর্জ্জিত চিপিটক ধ্বংস করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সন্তান পিকডারো ও গোবিন্দা মারুতি "চহার" ডবল অর্ডার দিয়া শিবরামের অনতিদূরে বসিয়া গেল। এইবার শিবরামের ব্রহ্মণ্যদেব জ্বলিয়া উঠিলেন, কারণ, গোবিন্দা সন্তানের পকেট হইতে কচ্ছপ-ডিম্ব বাহির করিয়া মুখে পুরিয়াছিল। ভুক্তাবশিষ্ট "পোহে" অর্থাৎ ভর্জ্জিত চিপিটক ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ মিশ্র কানাড়া ও মরাটা ভাষায় গোবিন্দের চতুর্দ্দশ পুরুষ যথোপযুক্তস্থানে বিনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। ম্লেচ্ছ ইংরাজের আমলে মরাটারা কেবল ব্রাহ্মণের সম্মান রাখে না, তাহা নহে, একবারে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং খৃষ্টানের ছোঁয়া অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে সকল ব্রাহ্মণ "দক্ষিণী", কেবল শূদ্ররা "মরাটা।" ব্রাহ্মণকে "মরাটা" বলিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে প্রথম বড়ই অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম। মুণ্ডিতশীর্ষ দীর্ঘশিখা মলয়দেশীয় ব্রাহ্মণরা শিবরামের দুষ্ট মরাটা চরিত্র-বিশ্লেষণের কানাড়ি অংশ বুঝিয়া ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন করিতেছিল। আমাদের দেশে একবার মাথা নাড়িলে সম্মতি বুঝায়, কিন্তু দুই দিকে মাথা নাড়িলে অসম্মতি বুঝিতে হয়; মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। দুই দিকে মাথা নাড়িলে তবে সম্মতি বুঝিতে হয়। দূর হইতে বন্ধু শিবরামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি স্বেদসিক্ত-কলেবর হইয়া ভর্জ্জিত "বই" মৎস্যের আশায় দ্রুতপদে চলিতেছিলাম, কাফির দোকানে আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া হতভম্ভ হইয়া গেলাম। অনেক কষ্টে দলের লোক সংগ্রহ করিয়া চলিলাম। তালের ডোঙ্গায় খাড়ি পার হইয়া যখন পারে পৌছিলাম, তখন "বাস" ছাড়-ছাড়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুণ্ডাপুর নগরে পৌছিলাম। নগরটি সমৃদ্ধ, অনেক শিক্ষিত লোকের বাস, দলের সকল লোকেরই ইচ্ছা যে, এক রাত্রি সেইখানে বাস করা হয়। কিন্তু আমার মন টিকিল না, তিন দিনে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ আসিয়াছি, এখনও শত ক্রোশ চলিলে তবে আবার রেলে পৌছিব। সকলের আপত্তি খণ্ডন করিয়া যাত্রা করিলাম। মালোর হইতে "বস" কুণ্ডাপুর পর্য্যন্ত চলে। খাড়ি পার হইয়া গোযানের সন্ধান করিতে হইবে। খাড়িটি সমুদ্র-বিশেষ, জল লবণাক্ত, দুইখানি তালের ডোঙ্গা একত্র বাহিয়া খেয়ার নৌকা করা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে বেশ জোরে বাতাস বহিতেছে। ঈষৎ তালীরস-সম্পৃক্ত গোবিন্দ ডোঙ্গায় উঠিতে গিয়া জলে পড়িল এবং তাহা দেখিয়া বন্ধুবর শিবরাম বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। গোবিন্দ মারুতিকে সকলে মিলিয়া জল হইতে তুলিয়া ডোঙ্গা ছাড়া হইল। এত দিন যে কয়টা খাড়ি পার হইয়াছি, তাহার মধ্যে কুণ্ডাপুরের খাড়ি সকলের চাইতে বড়। ইহার নাম গঙ্গোলী খাড়ি, ডায়মণ্ডহারবারের নীচে গঙ্গা যতটা চওড়া, তাহা অপেক্ষা অধিক চওড়া। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উঠিল, বাঙ্গালা-দেশের শ্রীমন্তের মশান যাত্রার পালা মনে পড়িয়া গেল। ঈশান কোণে মেঘ উঠে নাই বটে, কিন্তু বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়িতেছে। তালীরসের তাড়নায় গোবিন্দ-সন্তান মনিবের সম্মান ভুলিয়া গান জুড়িয়া দিয়াছে। বাতাস পশ্চিম দিক্ হইতে আসিতেছে অথচ মাঝিরা পাল তুলিয়া উত্তরদিকে চলিয়াছে। কুণ্ডাপুরের তীর ছাড়িয়া দুই শত হাত আসিতে আসিতে ডোঙ্গা দুইখানি নাচিতে আরম্ভ করিল। প্রবল ঢেউ উঠিতেছে, সে ঢেউ পুরীর সমুদ্রের শান্তভাবের ঢেউ অপেক্ষা বড়, জলের ছিটায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। বর্ষাতি খুলিয়া ন্যামেরা চাপা দিলাম। ফোটো তুলিবার প্লেট বিছানার মধ্যে বাঁধিলাম। সঙ্গী শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ সকলের আগে কাৎ হইলেন। ক্রমাগত বমনের চোটে ব্রাহ্মণকে ডোঙ্গার তলায় জলের উপর চিৎ হইতে হইল। তখনও পর্য্যন্ত আমার মনে ভয় হয় নাই। দেখিতে দেখিতে গোবিন্দ সন্তানের উদর হইতে কচ্ছপ-ডিম্ব-মিশ্রিত তালীরস নির্গত হইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ সহস্র বজ্রের মত শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। শব্দের

দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, পর্ব্বত-শৃঙ্গের মত উচ্চ জলরাশি সমুদ্রের দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ভাবিলাম, এ যাত্রার লীলা-খেলা ফুরাইল, কিন্তু মাঝিদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহারা হাসিতেছে। আবার হাজার বজ্রের শব্দ হইল। মাঝিরা জাতিতে 'তুলু', তাহাদের ভাষা 'তুলুব', আমাদের দলে কেহই তাহা বোঝে না। দ্বিতীয়বার শব্দ শুনিয়া শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ ভয়ে উঠিয়া বসিয়াছে। গোবিন্দ ও সন্তানের তালীরসের প্রভাব ছুটিয়া আসিয়াছে। আমাদের ভয় দেখিয়া চারি জন মাঝি চারিখানা দাঁড় লইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে, সমুদ্র হইতে বড় বড় ঢেউ আসিতেছে বটে, কিন্তু খাড়ির জল বাড়িতেছে না। খাড়ির মুখে চড়ার উপরে ঢেউ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে বলিয়া শব্দ হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে নির্ব্বিঘ্নে খাড়ি পার হইয়া গেলাম। পাঁচ জন মাঝি জিনিষ-পত্র নামাইয়া দিয়া গ্রাম হইতে গরুর গাড়ী ডাকিয়া দিল। কাপড়-চোপড় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল, তিনখানি গরুর গাড়ীর চালে তাহা শুখাইতে দিয়া যাত্রা করিলাম। সমস্ত রাত্রি চলিয়া সকাল বেলায় বৈন্দুরে আর একটা খাড়ি পার হইতে হইবে। বিছানা-পত্র সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং গরুর গাড়ীর ভিতরে বিচালির উপর শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি আন্দাজ ১১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, গাড়োয়ানরা গাড়ী থামাইয়া গরু খুলিয়া দিয়াছে। দূরে সমুদ্র-গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। সমুদ্রের অদূরে একটা বড় গাছ এবং তাহার তলে একটা কূয়া। কূয়ার কাছে একটা মাটীর চৌবাচ্ছা, গাড়োয়ানরা তাহাতে জল ভরিয়া ছয়টা বলদকে খাওয়াইতেছে। সঙ্গীদের কাহাকেও দেখিলাম না। অনেকক্ষণ পরে ঠাওর হইল—দূরে ক্ষেতের আলের উপরে অনেকগুলা সজিনা গাছ হইয়াছে এবং তিন জন লোক তাহার ডাল ভাঙ্গিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, তাহারা আমাদের দলেরই লোক। শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ বলিল যে, এইগুলি চন্দনের গাছ, ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা আইন-বিরুদ্ধ। মলয় দেশের সমুদ্রতীর হইতে অনেকগুলা চন্দনের ডাল সংগ্রহ করা হইল, তাহার দুই একটা এখনও পর্য্যন্ত আছে। কাঁচা চন্দনের গন্ধ অনেকটা মহুয়ার মত তীব্র এবং কবিরা যতই বলুন—মোটেই স্নিগ্ধ নহে।

বলদকে জল খাওয়ান হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম, আমরা চারি জনে সমুদ্রের ধারে ধারে ঝিনুক কুড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দূরে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র শান্ত, অচঞ্চল; সমুদ্রবক্ষঃ হইতে শীতল নৈশবায়ু বহিতেছে; অন্য দিকে সুষুপ্তিমগ্ন বৃক্ষচ্ছায়াঘন মোপলা বা মাপিল্লা গ্রাম; উপরে নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝিনুক কুড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে আসিয়া শুইবামাত্র যেন রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, রৌদ্র উঠিয়াছে, বৈন্দুরের খাড়ির কাছে শুইয়া আছি।

আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম; কারণ, রৌদ্রে পথ চলিতে পারা যাইবে না। খাড়িটি বড় নহে, পার হওয়া বড় বিপজ্জনক; কারণ, সামুদ্রিক হাঙ্গর অনেক বেশী, জলে নামিলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া লইয়া যায়। কথা শুনিয়া সুন্দরবনের কাছে চিংড়ীহাটার খালের 'কামঠে'র কথা মনে পড়িল। তখন খাড়ি পার হওয়া হইল না। ভাঁটার সময়ে জল অল্প, তখন 'কামঠে' গরু বলদ তাড়া করিয়া থাকে; কারণ, খেয়ার ডোঙ্গা দুইখানা সে সময়ে ঘাট অবধি আসে না। ভাঁটা সবে শেষ হইয়াছে, জোয়ার আসিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে জানিয়া 'কামঠ' ধরা দেখিতে গেলাম। দূরে খাড়ির উপরে একখানা পুরাতন বাড়ী ছিল, তাহার দুই তিনটা পাথরের থাম জলের কাছে পড়িয়া আছে। মোটা নারিকেলের সূতায় প্রকাণ্ড বঁড়শীতে রক্তাক্ত মাংসের টুকরা অথবা জীবন্ত পাখী গাঁথিয়া জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 'কামঠ' তাহা ধরিলে ঘণ্টাখানেক খেলাইয়া তবে তাহাকে তুলিতে পারা যায়। আমাদের সৌভাগ্যে জোয়ার আরম্ভ হইবার আগেই একটা বড় 'কামঠ' টোপ গিলিল। বঁড়শী বিঁধিতেই সে প্রায় হাজার হাত কাছি বা সূতা টানিয়া লইয়া গেল, তখন তাহাকে চারি পাঁচ জনে মিলিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। যতটা কাছি ওঠে, তাহার সমস্তটাই একটা পাথরে বাঁধিয়া ফেলা হয়। এইবার একটা সুবিধা হইয়াছে, প্রায় কর্ণাট দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, সুতরাং সন্তান এবং শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ দুই জনই এ দেশের ভাষা বুঝে। শুনিতে পাওয়া গেল যে, কামঠটা প্রকাণ্ড, এক জন লোক আরও লোক ডাকিতে গেল। অল্পক্ষণ পরে তাহারা একটা মোটা সূতার বেড়জাল ও দুইখানা প্রকাণ্ড কুড়াল আনিল। জোয়ারের জল যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া

উঠিল, তখন গাড়ী ও জিনিষপত্র পার করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু আমরা এ-পারেই রহিয়া গেলাম। কামঠ ডাঙ্গার কাছে আসিতেই পাঁচ সাত জন লোক বেড়াজাল দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। দুই জন বঁড়্শী-বাঁধা কাছি ধরিল এবং বাকী পনের ষোল জন জাল টানিতে আরম্ভ করিল। জালের মধ্যে বঁড়্শীতে গাঁথা কামঠ এমন লাফাইতে আরম্ভ করিল যে, জাল তোলা শক্ত হইয়া উঠিল। তখন দুই জন লোক লম্বা বাঁশে কুড়াল বাঁধিয়া জালের ভিতর হাঙ্গরটাকে কাটিয়া ফেলিল। হাঙ্গর বা কামঠটি সাত আট ফুট লম্বা ও তাহার উদরের ব্যাস দুই ফুট। পেট চিরিয়া ফেলায় কতকগুলি কাচের চুড়ি এবং অনেকটা অর্দ্ধজীর্ণ মৎস্য পাওয়া গেল। কামঠের গায়ের ছাল চিতা বাঘের মত রঙীন্।

কামঠ তৎক্ষণাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া বিক্রয় হইয়া গেল, আমরা শেষ জোয়ারের মুখে খাড়ি পার হইয়া ও-পারে চলিলাম। দূর দূর দুইটি গাছতলায় নিরামিষাশী ও মৎস্য-ভোজীদের আড্ডা পড়িয়াছে। দূরে একটি গাছতলায় পরিষ্কার করিয়া নিকান জমীর উপরে শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গের গদী, সেখানে তাহার স্বপাক হইবে। ব্রাহ্মণের আজ প্রথম স্বপাক; কারণ, উডিপীতে ব্রাহ্মণের হোটেলে ব্যবস্থা হইয়াছিল। একটি অজ্ঞাত-জাতীয়া হিন্দু রমণী রাশি-প্রমাণ ঘুঁটে, গোটা দুই বেগুন, একমুঠা কাঁচা লঙ্কা, এক গোছা কচুর শাক আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। শিবরাম নিজের হাতে কূয়া হইতে জল তুলিয়া স্নান করিল, সম্বলের মধ্যে একটি পিতলের টিফিন্-ক্যারিয়ারের চারিটি বাটি ও একটি ঘটী। ঘটীটিতে পলাণ্ডু, লঙ্কা ও লবণসংযোগে মসুর ডাল চড়াইল। এক বাটিতে ভাত ও আর একটিতে কচুর শাক ও বেগুনের তরকারী চড়িল। শিবরামের গৃহিণী নিত্য প্রাতে মাখন তুলিয়া যে ঘৃত তৈয়ারী করিতেন, তাহারই এক অংশ স্বামীর জন্য সঞ্চিত হইত, আবশ্যক হইলে আমিও তাহা ভিক্ষা করিয়া খাইতাম। প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রতিদিন প্রাতে সদ্য ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে; এমন সুন্দর ঘৃত স্বর্গীয়া মাতামহী ঠাকুরাণী তাঁহার যশোহরের আবাস ছাড়িয়া কাশীবাস করার পরে আর পাই নাই। শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গের প্রথমা পত্নী স্বর্গবাস করিয়াছেন এবং বন্ধু শিবরাম এখন দারান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মলয়-ভ্রমণের পরে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গের পত্নীর প্রস্তুত ঘৃত আজও ভুলিতে পারি নাই।

নিজেদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ভূরি-ভোজনের আয়োজন। তিন জন গাড়োয়ান রাশি রাশি গাছের ডাল কাটিয়া আনিয়া তিনটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। দূরে এক প্রাচীন তেঁতুলতলায় আমার শয়ন-ঘর, আমগাছের পাতার মত বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের ডাল দিয়া ছাওয়া এবং বেতের লতা দিয়া বাঁধা ঘরের চারিদিকে খাড়ির চড়ার টাটকা সবুজ কবাড়ের বেড়া, মাঝে মাঝে বাতাস আসিবার জন্য ফাঁক। দূরে একটি আমতলায় আরও দুইখানি কুটীর, একটিতে রান্না, অপরটিতে গোবিন্দ ও সন্তানের আড্ডা। মৎস্য-মাংস, দধি-দুগ্ধ, ফল—কিছুরই অভাব নাই। সামুদ্রিক চিংড়ী (lobster) ও ইলিশ, অজমাংস, ফলের মধ্যে কলা ও আনারস। মহিষের দুগ্ধ টাকায় আট সের ও দধি দুই সের। এক পয়সায় মর্ত্তমান কলা আটটা ও একটা আনারস দুই পয়সা। দ্বিপ্রহর বেলায় কূয়ার জলে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া আহারান্তে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আজ আর পথে বিশেষ কষ্ট নাই। আর অল্প দূর পরে মান্দ্রাজ প্রদেশ ছাড়াইয়া নিজের এলাকা বোম্বাই প্রদেশে পড়িব। গন্তব্য স্থান ভটকল, বোম্বাই প্রদেশের শেষ নগর। সূর্য্যাস্তের একটু আগে জিনিষ-পত্র বোঝাই করিয়া রওনা হইলাম। আজিও সমুদ্রের ধারে ধারে পথ, সুন্দর জ্যোৎস্না, দূরে আলে আলে চন্দনের বন আর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মলয়-সমীরণ! ধীরে ধীরে চলিয়াছি, কারণ, বালিয়াড়ির উপরের পথ বন্ধুর। আমাদের বাঙ্গালা দেশের পরে এমন সুন্দর দেশ আর দেখি নাই। পথে অসংখ্য ছোট-খাটো নদী, দেশে কাঠেরও অভাব নাই, সকলের উপরেই কাঠের সেতু। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা মলয় দেশের সমতলভূমি ছাড়িয়া পার্ব্বত্য উপত্যকায় উঠিতেছি। গাড়োয়ানরা যখন বৈন্দুরে বলিয়াছিল যে, দিনের বেলায় পথ চলা যাইবে না, তখন মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলি নাই, কারণ, তাহারা ত কথা বুঝিবে না। রাত্রি ১০টার সময় বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল, জামা গায়ে দিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া সবে শুইয়াছি, এমন সময় গাড়ী থামিল। গাড়োয়ানরা গাড়ী খুলিয়া বলদকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেল। দূরে উচ্চ পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে, ঐ দিকে গৈর সোপ্পা জলপ্রপাত ও নগর এবং তাহার পিছনে কর্ণাটের প্রাচীন উপত্যকা। রাত্রি ১টার সময় গাড়ী ছাড়িলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ (অধ্যাপক)।

তপোবালা

বৈদ্যনাথের মন্দির হইতে তপোবন পাহাড় ৬ মাইল পথ। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে পাহাড়-পাদমূলে মেলা বসে। বহু সাঁওতাল ও স্থানীয় দরিদ্র ব্যক্তি বেশভূষা করিয়া মেলা উপলক্ষে তথায় সমবেত হয়। কেহ বেচিতে আসে, কেহ বা কিনিতে আসে, আবার কেহ বা তামাসা দেখিতে আসে। পণ্য-দ্রব্য যাহা আসে, তাহা দরিদ্রের উপযোগী। ঘুণসী, চিরুণী, ফিতে, কাঁটা, টিনেমোড়া আয়না, ফুলুরী-বেগুনী এই সবই বেশী আসে; তথাপি এই মেলার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। বাঙ্গালী বাবুরা এই মেলায় কিছু কেনা-বেচা করেন না, তবুও তাঁহারা দলে দলে মেলায় আসেন।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মোটর-গমনোপযোগী পাকা রাস্তা হয় নাই—কাঁচা পথ বহিয়া গোযানে বা অশ্ব-যানে তপোবনে যাইতে হইত। এ পথেও আবার পাহাড় পর্য্যন্ত ছিল না—কিছু পথ হাঁটিয়া যাইতে হইত। সে সময় সাঁওতাল, সাঁওতাল ছিল—পাদরীর কৃপায় খৃষ্টান হয় নাই, বেশভূষা করিতে বড় একটা শিখে নাই। তখন মেয়েরা নিভৃত ঝরণার ধারে বসিয়া নগ্নদেহে গায়ে মাথায় মাটী মাখিত, অনাবৃত বক্ষের উপর বনফুলের মালা দোলাইয়া লজ্জা নিবারণ করিত—হাসিত নাচিত গাহিত—যেমন আকাশে পাখী গায়—ভূতলে ময়ূর নাচিয়া যায়—বালক যেমন হাসিয়া বেড়ায়, তাহারাও তেমনই উন্মুক্ত আকাশতলে, পাহাড়ের উপত্যকায় জলঝড়, নিদাঘ-তাপ মাথায় ধরিয়া প্রফুল্লমনে হাসিয়া নাচিয়া বেড়াইত। সে হাসি তাহাদের লুকাইল—যখন তাহারা আমাদের সংসর্গে পড়িয়া অনুকরণ করিতে শিখিল।

সে যাহাই হউক, এখন গল্পটা বলি। তপোবন পাহাড়ের পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকেই সে পাহাড় দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া বুঝিয়া থাকিবেন, এক একখানি পাথর এক একটি দৈত্যের মৃতদেহ। বৃত্ররাজের সহিত সুরপতির শেষ যুদ্ধে বহু দৈত্য নিহত হইয়াছিল, আর যুদ্ধটা হইয়াছিল স্বর্গে ঠিক তপোবনের মাথার উপর। তখন তপোবন অবশ্য প্রান্তরমাত্র ছিল। বৃত্রের দেহ পড়িল অন্যান্য দানবের দেহের উপর। পাহাড়ের শিরোদেশে যে স্থান এক্ষণে বালানন্দ স্বামীর তপোভূমি, সেই স্থানেই বৃত্রের দেহ পড়িয়াছিল—বৃত্রের নাসারন্ধ্রই হইতেছে স্বামীজীর বিখ্যাত গুহা। উপরে উঠিবার সিঁড়ি হইতেছে দৈত্যের বক্ষঃপঞ্জর। অনেকেই হয় ত এ সব শাস্ত্রীয় কথা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রমাণ,—কুণ্ডা গ্রাম হইয়া তপোবনে আসিতে পথের ধারে একটি সুন্দর সমতল প্রান্তর আছে। সেই প্রান্তরে দেবতারা বৃত্রসংহারের পর তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করণান্তে ভোজনে বসিয়াছিলেন। প্রান্তরময় সারি সারি থালাবাটি আজও পড়িয়া রহিয়াছে; তবে সেগুলি পাথরের। পাথরের ত হইবেই, দেবতারা যে তখনও এনামেল বা এলুমিনিয়ামের পাত্র গড়িতে শিখেন নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ, দেবগিরি—চলিত ভাষায় দিগ্রিয়া। এই পাহাড়ের মাথায় দেবতারা সভা করিয়া রম্ভা-মেনকার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন। পাহাড়ের শিরোদেশ সুন্দর ও সমতল; দেখিলেই বুঝা যায়, এখানে একটা বড় গোছের সভা এক দিন বসিয়াছিল। তৃতীয় প্রমাণ, দেবঘর-নাথ শম্ভু স্বয়ং। তিনিও এই শ্রাদ্ধবাসরে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজনে যোগদান করেন নাই; কেন না, বৃত্র ছিল তাঁহার এক জন বড় গোছের ভক্ত, যথা রাবণ, হিরণ্যকশিপু, সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধে শঙ্কর আসন পাড়িতে পারেন না। পাতা পাড়া দূরে থাক্, বৃত্রের মৃত-দেহ দেখিতে দেখিতে তিনি শোকে এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। সেই ধারা হইল বর্ত্তমান ধারোয়া নদী। এই সব অকাট্য প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু

যাঁহারা অসাধারণ অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা বুঝিবেন, এই সব প্রমাণের মূল্য কত।

গল্প ছাড়িয়া আবার বাজে কথা আনিয়া ফেলিয়াছি। এটা বয়সের দোষ। সে যাহাই হউক, এখন একটি সত্য ঘটনা সকলকে বলি, তবে খাঁটী সত্য বলিয়া কেহ এ আখ্যান গ্রহণ করিবেন না। অনেক দিন আগে এক বৎসর সূর্য্যদেব যখন মকরে যাইবার অভিপ্রায়ে রথ সাজাইতে আদেশ দিয়াছেন, তখন তপোবন-পাদমূলে মেলা বসিয়াছিল। মেলায় সাঁওতালের সমাগমটাই বেশী। তাদের পুরুষদের হাতে বাঁশী, পিঠে মাদল, কাণে ফুল; মেয়েদের মাথায় ফুল, কাণে ফুল, বুকে ফুলমালা। পুরুষদের কাপড় উরুর নীচে নামে নাই, মেয়েদের কাপড় হাঁটুর নীচে যায় নাই। গায়ের বর্ণ কোকিলবিনিন্দিত, তার উপর বিবিধ বর্ণের ফুলমালা—অতি সুন্দর দৃশ্য; সুবর্ণহারও এত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না। সুঠাম সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ, সরল সত্যবাদী সদা হাস্যমুখ—সে জাতের সাঁওতাল এখন বড় একটা দেখা যায় না। তখন সাঁওতাল ছিল কৃষ্ণ-প্রস্তর-ক্ষোদিত সুন্দর মূর্ত্তি, এখন সাঁওতাল হইয়াছে স্বাস্থ্যশূন্য ভ্রষ্টশ্রী বিবর্ণবদন। তখন সাঁওতাল মেলায় আসিত গান গাহিতে, নাচিতে, হাসিতে, আমোদ করিতে, এখন সাঁওতাল আসে ভাল কাপড়-জামা কিনিতে, দেখাইতে, খাবার খাইতে।

সেই বৎসর মেলার সময় এক দল সাঁওতাল মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে ছিল। মেয়েটি বড় সুন্দর; তাহার বর্ণ কোকিলের ন্যায় বটে, কিন্তু মুখখানি ভগবতীর মত। টানা চোখ দুইটি, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবার অভিলাষে ছুটিয়াছে, ঠোঁট দুইখানি সদাই হাসিতেছে, ক্ষুদ্র ললাট বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল। মেয়েটির বয়স তিন চারি বৎসর। মা-বাপের পিছনে সে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল; কিন্তু তাহার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাহার বাপ-মা মহুয়া খাইয়া সত্বর মাতোয়ারা হইয়া পড়িল। নাচ-গানে এতই মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, কন্যার কথা তাহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতেছিল; সে দলে বালক-বালিকা বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার স্থান নাই।—স্থান ছিল শুধু ভোগের, স্পৃহার, রসের। ফলে বালিকাকে তাহার বাপ-মা বিস্মৃত হইল। সে বেচারী ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে একটু দূরে গিয়া পড়িল, ক্রমে জন-স্রোতে বাহিত হইয়া বহুদূরে নীত হইল।

একটি বাঙ্গালী-পরিবার মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। এই পরিবারের কর্ত্তা রঘুনাথ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখ।"

স্ত্রী ভগবতী কহিলেন, "কি দেখ্‌ব ?"

"ঐ যে মেয়েটি ভয় পেয়ে চারিদিকে ব্যাকুল নেত্রে চাইছে।"

"ও মা, তাই ত! বাপ-মাকে হারিয়ে ফেলেছে বুঝি? বেশ মেয়েটি—ডাক না।"

"এখন ডাকব না—আগে দেখি, ওর বাপ-মা আসে কি না।"

"কিছু খেতে দেও না।"

"এখন ও খাবে না।"

যেখানে রঘুনাথ সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে স্থানটি খুব ফাঁকা। একটা সমতল পাথরের উপর বসিয়া সকলে জলযোগ করিতেছিলেন। বালিকা তাঁহাদেরই নিকটে একটা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ব্যগ্রনয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিতেছিল, পরিচিত কোন মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল না। বালিকার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। এ দিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। বালিকার অঙ্গে সামান্য বস্ত্র ছিল, তাহা ভেদ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বালিকাকে পীড়া দিতে লাগিল। রঘুনাথ তাহাকে ডাকিলেন; বালিকা নড়িল না। ভগবতী উঠিয়া তাহাকে খাবার দিলেন, সে খাইল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া স্বামীকে কহিলেন, "এখন কি করা যায়?"

"কি করতে চাও?"

"মেয়েটি যে একা দাঁড়িয়ে রইল—"

"উপায় কি?"

"ওকে গাড়ীতে তুলে নেও। আহা! কাঁদতে কাঁদতে ব'সে পড়ল!"

"নিয়ে গিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়্‌ব?"

"পড়ি পড়ব, তাই ব'লে মেয়েটিকে বাঘের মুখে রেখে যেতে পারব না।"

"এখানে বাঘ আছে, কে বললে?"

"কাউকে বলতে হবে না, আমি বাঘের বিষ্ঠা দেখেছি।"

"বটে! তা হ'লে কি করা যায়? মেয়েটা যে ডাক্‌লে আসে না।"

"কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এস না; নোংরা কাপড় ব'লে বুঝি তোমার ঘেন্না হচ্ছে?"

বারো বছরের ছেলে হেম কহিল, "আমি কোলে ক'রে নিয়ে আসব, মা?"

"তুই পারবি? আহা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি শুয়ে পড়ল, যা হেম, নিয়ে আয়।"

দশ বছরের বোন্ রাধা কহিল, "তুমি ওকে ছুঁয়ো না দাদা, ও বড় নোংরা।"

হেম সে কথা কাণে না তুলিয়া বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইল, বালিকা বড় বেশী আপত্তি করিল না। গাড়ীতে শুইয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া ক্লান্ত দেহ ভগবতীর ক্রোড়ের উপর ছাড়িয়া দিল এবং সত্বর নিদ্রিত হইল।

পরদিবস রঘুনাথ সাঁওতাল জনক-জননীর সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। থানায় ডায়েরী করাইলেন, কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহাকে লইয়া নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২

রঘুনাথের সংসারে সাঁওতাল-বালিকা রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে দূরে রাখা হইল। তাহার নূতন নাম দেওয়া হইল, নূতন সাবান আনিয়া তাহাকে স্নান করান হইল, নূতন কাপড়-জামা পরান হইল; কিন্তু তাহাকে অনেকে স্পর্শ করিল না। কেন না, সে অস্পৃশ্য। কোন্ স্থানটা তাহার অস্পৃশ্য, তাহা কেহ খুঁজিয়া পাইল না, তবু তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখা হইল। তাহার দেহ তোমার আমার দেহ যেমন পঞ্চভূতে গঠিত, তাহারও দেহ—বুঝি তেমনই গঠিত—অস্পৃশ্য নহে। তাহার মন অস্পৃশ্য নহে, তবে কোন্ স্থানটা অস্পৃশ্য? আত্মা? তাহাই হইবে—তাহার আত্মাই অস্পৃশ্য। তাহার আত্মা ব্রহ্মের বাহিরে, আর তোমার আমার আত্মা ব্রহ্মের ভিতরে—ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মকে, ভগবান্‌কে আমরা ঠিক বুঝিয়াছি—তিনি যে সর্ব্বব্যাপী নহেন, তাহা আমরা এত দিন পরে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

আমরা বেশ্যা-দাসী গৃহে রাখিয়া তাহার হাতের জল, বাটনা লইব, কিন্তু এই অস্পৃশ্যকে আমরা রান্নামহলে উঠিতে দিব না। কুৎসিত রোগগ্রস্তা বৃদ্ধা বেশ্যার তৈরী পাণ পথের ধারে কিনিয়া আমরা বিনাসঙ্কোচে খাইব, কিন্তু এই ব্যাধিশূন্য পাপশূন্য মেয়েটিকে আমরা পাণের ধারে আসিতে দিব না—ওর অপবিত্র আত্মা যদি এই সুযোগে বাহির হইয়া আমার পাণ কলুষিত করে! ঘৃণিতচরিত্র ভ্রূণঘাতককে নিঃসঙ্কোচে আমার শয্যা রচনা করিতে দিব, কিন্তু এই অপাপবিদ্ধা নির্ম্মল-হৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকাকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দিব না। ইহাই আমাদের বিচার, বিবেচনা, শাস্ত্রজ্ঞান! এই দুর্ল্লভ জ্ঞান শুধু আমরাই পাইয়াছি, জগতের আর কেহ পায় নাই।

এখন সাঁওতালের মেয়েকে ঘরে আনাতে পাড়ার লোকরা রঘুনাথের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মাতব্বর কয়েক ব্যক্তি একদা রাত্রি এক প্রহরের সময় রঘুনাথের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দর্শন দিলেন। মিত্র মহাশয় কহিলেন, "তুমি করেছ কি রঘুনাথ? রাম রাম!"

রঘুনাথ। কি করব বলুন মিত্তির মশাই, মেয়েটিকে ত আর বাঘের মুখে রেখে আসতে পারি না।

"রেখে এলেও তোমার বিশেষ কোন অপরাধ হ'ত না; ও-সব জাতের থাকাই কি আর যাওয়াই কি।"

হলধর চাটুয্যে। ঠিক কথাই ত—ওদের বাঁচা না বাঁচা সমান।

রঘুনাথ। তাই ব'লে একটা জীব চোখের সামনে বাঘের পেটে যাবে—

হরি মুখুয্যে। যায় যাক্; তুমি তাই ব'লে ধর্ম্ম নষ্ট, জাতি নষ্ট করতে পার না।

রঘুনাথ। দেখুন মুখুয্যে মশাই, আপনি এক জন পণ্ডিত লোক—বুঝে দেখুন—

মুখুয্যে। আমি ঢের বুঝেছি, তুমি আর আমাকে বুঝিও না। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র—শূদ্রের মুখে শাস্ত্রকথা শোনা পার না।

বাঁড়ুয্যে। তা বই কি। আমাদের মুখে তোমরা শাস্ত্র-কথা শুনবে, তোমাদের শাস্ত্রচর্চ্চার অধিকার কি?

গোবিন্দ শিরোমণি সহসা সভায় আসিয়া দর্শন দিলেন, নমস্কার-প্রণামাদি দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। একটু বিশ্রাম লইয়া কহিলেন, "তা হ'লে রঘুনাথ কবে প্রায়শ্চিত্ত করছ?"

"প্রায়শ্চিত্ত? কেন?"

"কেন আবার কি? তুমি যে কাম করেছ, তজ্জন্য গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন—দুইটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী—"

"বুঝতে পারছি না, কি জন্তে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?"

"তুমি বাড়ীতে একটা ডোমের মেয়ে এনেছ কি না ?"

"ডোম নয়, সাঁওতাল।"

"ও একই কথা। তুমি কি মনে করেছ, হিন্দু সমাজ ম'রে গেছে ? গোবিন্দ শিরোমণি বেঁচে থাকৃতে মরতে দেবে না।"

তিনি মরিতে দিলেন না। তবে রঘুনাথকে দেশ ছাড়িতে হইল। ধোপা, নাপিত, হুঁকা বন্ধ হইলে কত দিন দেশে বাস করা যায় ?

৩

তার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। রঘুনাথ সপরিবারে বিদেশে। তাঁহার কিছু তালুক ও নগদ পয়সা ছিল ; সুতরাং অর্থাভাব ঘটে নাই, তবে শান্তি ও স্বাস্থ্যের সবিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল।

তপোবালা বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়াইয়াছে। যৌবন বিকশিত-প্রায়। লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যকে রতিদেবী পাঠাইয়া দিয়াছেন তপোবালার কৃষ্ণবরণ দেহখানি সাজাইতে। সাজাইল তাহারা এমন করিয়া যে, রতিদেবীর নিজেরই ভয় হইল, পাছে কন্দর্প-দেব তাহাকে দেখিয়া ফেলেন। তখন তাহাকে অন্দরের পর্দ্দার ভিতর লুকাইয়া ফেলিলেন ; বালিকা আর হরিণ-শিশুর ন্যায় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত না—পিঞ্জরাবদ্ধ হইল।

পিঞ্জরের রক্ষক রঘুনাথ এক দিন স্ত্রী ভগবতীকে কহিলেন, "তপুকে নিয়ে কি করি বল দেখি ?"

স্ত্রী। হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

স্বা। তার রূপ যে দিন দিন উথলে উঠছে।

স্ত্রী। ভালই ত।

স্বা। বড় ভাল নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ না, হেম কতটা তপুকে ভালবাসে।

স্ত্রী। ভালবাসে কি আজ ? যখন হেম প্রথম পাশ দেয়, তখন সে এক দিন তপুকে বলেছিল, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না। তপু তখন খুব ছোট—মোটে আট বছরের—

স্বা। তপু কি উত্তর দিয়াছিল ?

স্ত্রী। সে খুব হেসেছিল, কিছু বলে নি।

স্বা। তবেই ত ? আমি ভাবছি কি, তপুকে কোন ছোট জাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দি।

স্ত্রী। না, তা হ'তে পারে না।

স্বা। তবে হবে কি ?

স্ত্রী। হেমের সঙ্গে বিয়ে দাও।

স্বা। অসম্ভব। আমি ধর্ম্মের উপর, সমাজের উপর অত্যাচার করতে পারব না।

স্ত্রী। অত্যাচারটা হ'ল কোথা ?

স্বা। সে তর্ক তোমার সঙ্গে করতে চাই না। মুনি-ঋষিরা যা ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের বাপ-পিতামহ যা এতকাল মেনে চলেছেন, তা আমাকেও মেনে চলতে হবে। তাঁরা তোমার আমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ছিলেন।

স্ত্রী। তবে ছেলেটাকে মেরে ফেল, আর একটা ডোম-বাগদী ধ'রে তপুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেও।

স্বামী বিরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হেম আসিয়া কহিল, "বাবা, আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী পেয়েছি।"

"হুকুম এসেছে ?"

"ঠিক হুকুম না এলেও আমি এই মাত্র 'তার' পেয়েছি—এই দেখ না টেলিগ্রাম।"

জননী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। একটু স্থির হইয়া কোথায় কোন্ ঠাকুরকে পূজা দিবেন, তাহার ফর্দ্দ আঁটিতে বসিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "তপুকে আগে খবরটা দেও।"

তপু আসিয়া কহিল, "আমি শুনিছি বাবা।"

রঘু। তুমি ঠাকুরের দোরে যে মাথাটা কুটেছ—

তপু। আমি ত চাকরীর জন্তে মাথা কুটি নি বাবা—

রঘু। তবে কি জন্তে মা ?

তপু। আমি তাঁর দ্বারে চেয়েছি তোমার রোগমুক্তি ; তুমি যে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছ বাবা।

রঘু। আর আমি সেরেছি মা, কোন ঠাকুর আমাকে সারাতে পারবেন না।

আনন্দের মধ্যে কান্নার সুর বাজিয়া উঠিল। রঘুনাথ কহিলেন, "তুমি আমাকে তুলসীদাসের রামায়ণ প'ড়ে শোনাও ত মা। তোমার মুখে বেশ লাগে।"

তপু রামায়ণ খুলিয়া আরম্ভ করিল,—

"না, এখানে বিয়ে হবে না, বালাও এখানে বেচা হবে না।"

"তবে কি করবে ?"

"চল, আমরা গুরুদেবের আশ্রমে যাই, তিনি আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন, বালাও সেখানে বেচব।"

"আমাদের এখানে ফিরতে সপ্তাহখানেক বিলম্ব হবে দেখছি।"

"না, এ দেশে আর ফিরব না।"

"সে কি ! এই ঘর-দোর—"

"এক দিন তুমি একা এসে বেচে দিও—এ দেশে আর না।"

"আমরা থাকব কোথা ? খাব কি ?"

"আমি গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে তোমাকে খাওয়াব ; আশ্রয় না পাই—গাছতলায় প'ড়ে থাকব।"

"গুরুদেবের কৃপায় শেষ বয়সে আমি তোমা হেন রত্ন—"

"চুপ কর। বাজে কথা ছেড়ে কাযের কথা শোন। তা হ'লে আমি রাত দুপুরে আসছি—তুমি প্রস্তুত থেকো।"

"রাত দুপুরে ত আমরা খেয়া পাব না, নদী পার হব কি ক'রে ?"

"সাঁতরে পার হওয়া যায় না ?"

"ওরে বাপ রে ! হাঙ্গর-কুমীরে খেয়ে ফেলবে।"

"তা হ'লে কি করা যায় ?"

"তুমি শেষ রাতে এসো।"

"তখন আকাশে চাঁদ উঠবে না ? আজ কোন্ তিথি হ'ল ?"

"আজ কৃষ্ণাষ্টমী। সে সময় চাঁদের আলো থাকবে।"

"আমি অন্ধকারে যেতে চাই।"

"অন্ধকারটা আমি মোটেই পছন্দ করি না, অন্ধকারে কোথায় খানা-ডোবায় পড়ব—"

"তুমি যে বুড়ো হয়েছ।"

"আমার মত ভাগ্যবান্ বুড়ো ক'টা আছে ? আচ্ছা তপোবালা, তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাস ?"

"ভালবাসি ? তোমাকে ? বাসি বৈ কি একটু আধটু।"

"বড় একটু-আধটু নয় ; তুমি আমার জন্তে সব ত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি নিতে উদ্যত হয়েছ—"

"এখন আমি যাই, শেষ রাতে আসব—প্রস্তুত থেকো।"

বালিকা প্রস্থান করিল।

৯

গ্রীষ্মকাল—কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ আকাশে। তখনও উষাদেবী শয্যা ত্যাগ করেন নাই। বাবাজী তপোবালাকে লইয়া কুটীর ত্যাগ করিল। পৃষ্ঠে একটা পুঁটলী, হাতে একতারা। উভয়ে নদীর দিকে চলিল। নদী বড় বেশী দূর নয়—দশ মিনিটের পথ হইবে। উভয়ে নীরবে পথ চলিয়াছে ; তপোবালা মাঝে মাঝে ব্যগ্র কণ্ঠে কহিতেছে, "চলো, চলো।"

উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া পৌছিল। খেয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু মাঝি নাই। মাঝির ঘর কোথা, বাবাজী তা জানে না। তপু ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তুমি খুঁজে দেখ না—"

"কোথা খুঁজব ? কেউ যে কোথাও নেই।"

"তবে চেঁচিয়ে ডাকো।"

বাবাজী চীৎকার ছাড়িল, পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল। কোন উত্তর নাই। তপু উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল, তার পর কহিল, "তুমি নৌকো চালাতে পার না ?"

"আমার বাপ-পিতাম' কখন নৌকা চালায় নি ; তারা তাঁত বুনতে—"

"চুলোয় যাক্ তোমার তাঁত, এখন আমরা পার হব কি ক'রে ?"

"চল, আমি পারে নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া এক ব্যক্তি অগ্রসর হইল। তপোবালা কাঁপিয়া উঠিল, উত্তর করিতে পারিল না। হেম কহিল, "কোথা যেতে চাও তপু ?"

উত্তর নাই।

"যাতে তুমি সুখী হও, তাই করব। বল, কোথায় যাবে ?"

তপোবালা নিরুত্তর। বাবাজী হাকিম বাবুকে চিনিল। সে কহিল, "তপোবালা এ দেশ ছেড়ে যেতে চায়—"

"এ দেশ ছেড়ে ! কোথা যেতে চায় ?"

"তা এখনও ঠিক হয় নি।"

"ঠিক না করেই তোমরা যাচ্ছ ?"

"আমার সঙ্গে কণ্ঠীবদল হ'লে সেটা ঠিক হবে।"

"তোমার সঙ্গে কণ্ঠীবদল। তুমি ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ—আমি তোমাকে পুলিসে দেব।"

"না হাকিম বাবা, আমার কোন অপরাধ নেই, আমাকেই তপু ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘর-দোর ছেড়ে যেতে চাই নি; ও বল্লে, না, রাতারাতি পালিয়ে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ তপু, সত্যি?"

উত্তর নাই। হেম কহিল, "বল তপু, তুমি কি স্বেচ্ছায় আমাদের ত্যাগ ক'রে চলেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি স্বেচ্ছায় এই বৃদ্ধ চিররুগ্ন ভিক্ষুককে বিয়ে করতে লুকিয়ে পালাচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

বাবাজী। দেখলেন হুজুর, কে কা'কে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? ও যে আমাকে ভালবাসে, হলেমই বা আমি বৃদ্ধ রুগ্ন ভিক্ষুক—

"চুপ কর্ বর্ব্বর, আমার সামনে থেকে তুই স'রে যা—"

বাবাজী ভয়ে সরিয়া গেল। ক্রোধ দমন করিয়া তপোবালার দিকে ফিরিয়া শান্ত কণ্ঠে হেম কহিল, "বুঝেছি তপোবালা, তুমি আমার নিকট হ'তে পালাচ্ছিলে।"

তপু মাথা হেঁট করিল।

"কিন্তু তপোবালা, আমি ত তোমার উপর কোন পীড়ন করি নাই, তবে কেন তুমি পালাচ্ছিলে?"

"আমি তা বলতে পারব না।"

"বলতেই হবে তোমাকে; আমার উপর এতটা অত্যাচার করবে, আর তা'র একটা কৈফেৎও দেবে না?"

"আমি আর পারছিলাম না!"

"কি পারছিলে না?"

"যুঝতে।"

"যুঝতে? ওঃ, বুঝেছি। তপু, তপু, আমি গোড়া হ'তেই জানি, তপু আমাকে খুব ভালবাসে; কিন্তু এই এক বৎসর হ'তে—"

"এখন আমাকে ছেড়ে দেও—"

"দিচ্ছি, নৌকায় উঠ।"

তপোবালা একটু ইতস্ততঃ করিয়া নৌকায় উঠিল। হেমের ভাব-ভঙ্গী তপুর ভাল লাগিল না; সতর্ক নয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাবাজী নৌকায় উঠিতে যাইতেছিল, হেম লগি উঠাইয়া বাবাজীকে মারিতে উদ্যত হইল। বাবাজী তল্পি-তল্পা ফেলিয়া ছুট মারিল। হেম নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা যখন মাঝ-গাঙ্গে, তখন হেম কহিল, "আজ আমি যদি ম'রে যাই তপু"—

"ও কথা বলছ কেন, হেমদা?"

"বলছি কেন, শুনবে?—আজ আমি মরব।"

"ও রকম কথা বলো না, আমার ভয় করছে!"

হেম হাসিয়া উঠিল। সে হাস্য দেখিয়া তপোবালা শিহরিয়া উঠিল।

"চল, আমরা ফিরে যাই।"

"কেন ফিরব? তুমি আমাদের আশ্রয় ছেড়ে একটা বুড়োর সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে যাচ্ছ, আর আমাকে ঘরে ফিরতে বলছ?"

"আমাকে ক্ষমা কর—"

"কেউ আমাকে ক্ষমা করে নি, দয়া করে নি, আমিও কাউকে ক্ষমা করতে পারব না। বিয়ে না হয় তুমি নাই করতে, তাই ব'লে এমন ভাবে তুমি চ'লে যাবে? আর আমাকে তাই সয়ে থাকতে হবে? দেহের মিলনই কি সর্ব্বস্ব? না হয় এ জীবনে সেটা বাকিই থেকে গেল!"

"আমি অবোধ, বুঝতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর। চল ফিরে যাই। আর কোথাও আমি যাব না।"

তখন পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে উষার প্রথম পদক্ষেপের রেখা অন্ধকারের বুক চিরিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল।

"এখন তবে ফিরি?"

তপু উত্তর না করিয়া হেমের পায়ের উপর মাথা রাখিল। নৌকা অচিরে ঘাটে আসিয়া লাগিল। একতারা ঘাটের উপর পড়িয়া ছিল, তপুর পদতলে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সে যেন একবার শেষ ঝঙ্কার তুলিল,—ওগো, তুমি এস হে—

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জোতিষ্মান্ পদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগ

কিছুদিবস পূর্ব্বে কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হানস্ মলিস্ সজীব আলোক সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করেন। আমাদিগের সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'প্রকৃতি'তে উহার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মলিস্ প্রধানতঃ জীর্ণায়মান উদ্ভিদ অথবা প্রাণি-দেহাংশের ভাস্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, দীপ্যমান অংশে বিশেষ প্রকার জীবাণু অথবা ছত্রকের (Fungus) আবির্ভাব হইলে উক্তপ্রকার ভাস্বরতা প্রকাশ পায়। গলিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থপুষ্ট প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ ব্যতীত অন্য কতকগুলি প্রাণীও আলোকদানক্ষম—যেমন খদ্যোত-জাতীয় কীট। স্বচ্ছপাত্রে অধ্যাপক মলিস্-বর্ণিত জীবাণু ও ছত্রকের চাষ করিলে এবং সমপ্রকার পাত্রে খদ্যোত আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উহারা এরূপ পরিমাণ আলোক বিকিরণ করে, যদ্দ্বারা ঘড়িতে সময় দেখা যায় অথবা বড় বড় অক্ষর পড়া যায়। এবম্বিধ আলোকদান-ক্ষমতা উদ্ভিদ্ কিম্বা প্রাণীর কেবলমাত্র জীবিত অবস্থাতেই থাকে। মৃত দেহের দীপ্তিদান করিবার শক্তি আদৌ নাই; আপাতদৃষ্টিতে যে স্থলে আছে বোধ হয়, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে সে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত দেহ অবলম্বন করিয়া অন্য প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ জন্মিতেছে এবং আলোক তাহারই সম্পত্তি। সজীব আলোকের কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই।

পক্ষান্তরে, এরূপ কতকগুলি অজৈব পদার্থ আছে, যাহাদিগের জ্যোতিষ্মত্তা কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়। ফস্ফরাস্ এরূপ একটি মূল পদার্থ। বহু পুরাকাল হইতে মানব ইহার জ্যোতিষ্মত্তা আবিষ্কার করিয়াছে এবং ফস্ফরাস্-যৌগিকমিশ্রিত রংও অনেক দিন হইতে কতিপয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যদিও উক্তরূপ ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। ফস্ফরাসের জ্যোতিষ্মত্তাকে রাসায়নিকগণ Photo luminescence শ্রেণীর ভাস্বরতার অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা এ স্থলে কিন্তু ফস্ফরাসের কথা বলিতেছি না। অগ্রে আমরা Radio-luminescence শ্রেণীর জ্যোতিষ্মত্তার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ইটালীর বোলোনা সহরের ঐন্দ্রজালিক রসায়নবিৎ কেসিয়ারোটস্ (Casciarotus) ব্রাইট নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করেন—যাহা অন্ধকারে স্বতঃই দীপ্যমান হয়। তৎপরবর্ত্তী সময়ে কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ঝিনুকের খোলা ও গন্ধক একত্র করিলে তাহাও ভাস্বরগুণবিশিষ্ট হয়। কিন্তু উক্ত পরীক্ষাসমূহের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা না থাকায় এবং নানা স্থানে সম্পাদিত হওয়ায় দীপ্তিমান অজৈব (inorganic) পদার্থের ভাস্বরতার স্বরূপ ঠিক বুঝা যায় নাই। রেডিয়ম আবিষ্কারের সময় হইতেই এই প্রকার ভাস্বরতার উপর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

কুরি-দম্পতি রেডিয়ম আবিষ্কার দ্বারা শুধুই যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাই নহে। তাঁহাদিগের গবেষণা অন্যান্য বৈজ্ঞানিককে জ্যোতিষ্মত্তার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। এই সমুদয় গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সমস্ত বিকিরণশীল (Radio active) মূল পদার্থ অবিরত পরিবর্ত্তনের (constant conversion) বশবর্ত্তী এবং উক্ত পরিবর্ত্তনের জন্য উহারা লঘুতর মূল পদার্থে পরিণত হয়। অদৃশ্য রশ্মি-বিকিরণ এইরূপ

পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার সহগামী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক রেডিয়ম-অণুর কিম্বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রেডিয়ম-যুক্ত দ্রব্যের সামান্য ভগ্নাংশ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিযুক্ত হইয়া রশ্মি বিকিরণ করিবে এবং তৎসহ প্রত্যেক অণু হইতেই একটি পরমাণু—alpha particle—তীব্র তেজে ও প্রচণ্ড গতিতে বিক্ষিপ্ত হইবে। যদি এইরূপ একটি পরমাণুর অন্য ধাতুর, যথা—দস্তার সহিত সংঘর্ষণ হয়, তাহা হইলে আলোক-স্ফুরণ হইয়া থাকে। আমরা যে শ্রেণীর জ্যোতিষ্মত্তাকে পূর্ব্বে Radio-luminescence নামে অভিহিত করিয়াছি, তাহা প্রায় যুগপৎভাবে উৎপাদিত এইরূপ আলোকস্ফুরণের সমষ্টিমাত্র। বিকিরণশীল পদার্থের উক্তরূপ গুণের সুবিধা গ্রহণ করিয়া মেধাবী ব্যবসায়িগণ উহাকে ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অবসর পাইয়াছেন। তাঁহারা দুইটি দ্রব্যের সহযোগে ভাস্বর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি সক্রিয় বিকিরণশীল পদার্থ ও অন্যটি কোন প্রকার উদ্দীপনাগ্রাহী (sensitive) পদার্থ। এতদুভয়কে সাক্ষাৎ-ভাবে সংমিশ্রণ করিলেই দীপ্যমান পদার্থ উৎপাদিত হয়। সাধারণ ফস্‌ফরাসের সহিত বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এইরূপ মিশ্র পদার্থকে সচরাচর Radio-phosphorus বলা হইয়া থাকে। ভাস্বর দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় রেডিয়ম্, মেসোথোরিয়ম, কিম্বা রেডিও-থোরিয়ম, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে তিনটারই সংমিশ্রণ পূর্ব্বোক্ত বিকিরণশীল পদার্থের কার্য্য করে এবং উদ্দীপনাগ্রাহী পদার্থের জন্য সল্‌ফাইড্ অব্ জিঙ্ক (Sulphide of zinc) ব্যবহৃত হয়। এই দুই প্রকার পদার্থ মিশ্রিত করিয়া যে কোন রকমের দীপ্যমান দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বলা আবশ্যক যে, কোন রকমের দীপ্যমান দ্রব্য সক্রিয় বিকিরণশীল পদার্থ হইতে উৎক্ষিপ্ত রশ্মি নিজে অদৃশ্য হইলেও দস্তা-যৌগিকের সংস্পর্শে আসিয়া উহা দৃষ্টিগোচর হয় এবং যতক্ষণ উক্ত অদৃশ্য রশ্মি-বিকিরণ নিঃশেষ না হয়, ততক্ষণ দস্তা-যৌগিকেরও ভাস্বরতা অটুট থাকে।

নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত মিশ্র জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সহযোগে ইতিমধ্যেই কয়েক প্রকার আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ দীপ্যমান দ্রব্যাদির মধ্যে অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ ঘড়ির ডায়েলের (Dial) সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। কিন্তু তদ্ভিন্নও উক্ত শ্রেণীর বহুবিধ দ্রব্য সভ্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় এতদ্দেশে আসে নাই। এ স্থলে তদ্রূপ দুই চারিটি জ্যোতিষ্মান্ দ্রব্যের উল্লেখ করা হইল :—

(১) বড় আকারের প্লাকার্ড (Placard); এগুলি বর্ণ-বৈচিত্র্যে দেখিতে সুন্দর। ইহাদের রৌদ্র-বৃষ্টিতে অবিকৃত থাকার ক্ষমতাও সেইরূপ সুস্পষ্ট।

(২) গৃহের নম্বর প্লেট; রাস্তার ক্ষীণালোকে রাত্রিকালে বাড়ীর নম্বর ঠিক করা যে কত অসুবিধাজনক ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ভাস্বর নম্বর প্লেটে সংখ্যাগুলি জাজ্বল্যমানভাবে দেখা যায়, অনেক দিবস ধরিয়া পরীক্ষার পর আজকাল কতিপয় বড় বড় পাশ্চাত্য সহরে গৃহস্বামিগণকে এইরূপ জ্যোতিষ্মান্ নম্বর প্লেট রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

(৩) বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ; বৈদ্যুতিক আলোকের অনেক সুবিধা আছে বটে, কিন্তু অন্ধকারে সুইচ কোন্ স্থলে আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে সময়ে সময়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সুইচ দীপ্যমান হইলেও সেরূপ স্থলে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, অনেক দূর হইতে সুইচগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) সুইচ-শিকলির বিলম্বিত হাতল (Pull-switch chain suspender); কয়েক প্রকার বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালাইতে হইলে সুইচ টিপিবার পরিবর্ত্তে সুইচের শিকলি টানিতে হয়, যথা—সাধারণ বৈদ্যুতিক টেবল ল্যাম্প। যদি উক্ত প্রকার আলোকের সুইচ-শিকলির হাতল দেদীপ্যমান হয়, তাহা হইলে অন্ধকারেও সহজে আলো জ্বালাইয়া লওয়া যায়। এই প্রকার বিলম্বিত ভাস্বর হাতলের কাটতি শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিতেছে। মার্কিণে ইহার চাহিদা খুব অধিক।

অন্ধকারে স্বতোদীপ্যমান অন্যান্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বোধ হয়, স্বল্পকালের মধ্যেই ইহাদের ব্যবহার পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। রেডিয়ম প্রভৃতি বিকিরণশীল পদার্থের মূল্য খুবই উচ্চ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞান সাহায্যে প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়া ব্যবহারিক ভাস্বর দ্রব্যাদি এত সুলভ মূল্যে উৎপাদিত হইতেছে যে, ঐ সমুদয়ের ব্যবহার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষেও সম্ভবপর হইয়াছে। দ্রব্যগুলিও ক্ষণিক আমোদপ্রদানকল্পে

রচিত হয় নাই। বরং এগুলি যে বাস্তবিকই কার্য্যকর, তাহা এইমাত্র বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্রব্যবিশেষে নির্মাতৃগণ—এমন কি, দশ বৎসর পর্য্যন্তও নিষ্প্রভ না হইবার গ্যারান্টি দিতেছেন।

আমরা এতক্ষণ Radio-luminescence শ্রেণীর ভাস্বরতার আলোচনা করিলাম। এক্ষণে অন্য শ্রেণীর ভাস্বরতার উল্লেখ করা হইতেছে। কতকগুলি পদার্থ এরূপ গুণসম্পন্ন যে, উহাদিগের উপর কিয়ৎকালের জন্য স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম আলোকের রশ্মি নিপতিত হইলে উহারা অন্ধকারে অল্পবিস্তর কাল জ্যোতিষ্মান্ থাকে। এরূপ ভাস্বরতা পূর্ব্বকথিত photo-luminescence শ্রেণীর। বলা বাহুল্য যে, আলোকদান করিবার কাল দ্রব্যবিশেষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কতকগুলি পদার্থ এত অধিক আলোকধারণক্ষম যে, উহাদিগকে ১২ সেকেণ্ড আলোকের সংস্পর্শে রাখিলে উহারা ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাস্বর থাকিতে পারে। উহাদিগকে একপ্রকার আলোকসঞ্চয়কারক (light acumulators) বলিতে পারা যায়। ফলতঃ বৈদ্যুতিক সঞ্চয়কারী যন্ত্রের ন্যায় এইরূপ আলোকসঞ্চয়কারী পদার্থ হইতে একই সময়ে প্রভূত পরিমাণে আলোক পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ রং হিসাবেই এইরূপ পদার্থের বহুল ব্যবহার হয়। অদ্যাবধি প্রায় ২শত প্রকার নানাভাযুক্ত (shades) ভাস্বর রং প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেগুলি নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যদি কোন গৃহের প্রাচীরসমূহ কিম্বা সমুদয় অভ্যন্তরভাগ ভাস্বর রং দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে উহা অন্ধকারে দেদীপ্যমান হইবে। অবশ্য তৎপূর্ব্বে সামান্য সময়ের জন্য উহাতে কৃত্রিম কিম্বা স্বাভাবিক আলোক লাগিতে দেওয়া আবশ্যক। এরূপ রংও প্রস্তুত হইয়াছে—যাহা দিবসে ও রাত্রিকালে বিভিন্ন প্রকার আভাযুক্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠখণ্ডে ও দস্তা অথবা অন্য ধাতুর চাদরে ভাস্বর রং প্রয়োগ করিয়া এবং তৎসমুদয়ে বারম্বার সূর্য্যালোক কিম্বা কৃত্রিম আলোক নিপাতিত করিয়া বহু পরিমাণ আলোক সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায়। পরে অন্ধকারে যে কোন স্থানে উক্ত দ্রব্যাদি রাখিলে উহারা আলোক বিকিরণ করিতে থাকে।

প্রচারকার্য্যের জন্য বৈদ্যুতিক আলোক সমভিব্যাহারে ভাস্বর বর্ণে চিত্রিত প্লাকার্ড ক্রমশঃ খুবই জনপ্রিয় হইয়া ব্যবহৃত প্রাচীরগাত্রেও প্রয়োগ করা হয়। বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা প্লাকার্ড অথবা প্রাচীরগাত্র একবার আলোকিত করিয়া লইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলে চিত্র ও অক্ষরগুলি আপনা আপনিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নানাবিধ আভাযুক্ত বর্ণের সংমিশ্রণে প্লাকার্ড অথবা প্রাচীরগাত্র বিচিত্র হওয়ায় বারম্বার বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বালিত ও নির্ব্বাপিত করিলে এরূপ বর্ণলীলা উৎপাদিত হয় যে, দর্শকবর্গ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়। ভাস্বর রংএর মূল্য এত সুলভ করা হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক আলোর খরচ এত কম যে, ভাস্বরবর্ণসমূহ প্রায় সর্ব্ববিধ প্রচারকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রকার রংএর প্রয়োগ প্রসারলাভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে চিঠির কাগজে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইরূপ চিঠির কাগজ অন্যান্য কাগজের Type writerএ ব্যবহার করা চলে ও type করা চিঠি অনায়াসে অন্ধকারে পাঠ করা যায়। চিত্রাঙ্কনেও ভাস্বর বর্ণের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ ১২টি বিভিন্ন বর্ণ সমেত রংএর বাক্স বাজারে আসিয়াছে। পেশাদার চিত্রকর ব্যতীত বালক-বালিকাগণের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ চিত্রাঙ্কন-কার্য্যে অনুরাগ জন্মাইবার জন্য এইরূপ ভাস্বর বর্ণ বিশেষ ফলদায়ক। যে সমস্ত বর্ণ তৈল-সহযোগে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সেরূপ শ্রেণীরও ভাস্বরবর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে।

সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে; কালক্রমে ঐ সমুদয় ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করে। পূর্ব্বকালে কোন আবিষ্ক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতে বিলম্ব ঘটিত; কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। বৈজ্ঞানিকমাত্রেই জানেন যে, সক্রিয় বিকিরণশীলতার প্রকৃত স্বরূপ বড় অধিক দিন নহে জানিতে পারা গিয়াছে। বিকিরণশীল পদার্থ-সমূহও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য। কিন্তু এত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আজকালকার পাশ্চাত্য ব্যবসায়িগণ এরূপ জাগ্রত ও অধ্যবসায়শীল যে, ইতিমধ্যেই তাঁহারা যাহা কেবল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের হিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক ছিল, তাহাকে মানবের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অদূর-ভবিষ্যতে বিকিরণশীল পদার্থসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।
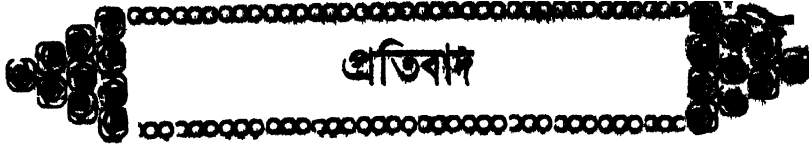
প্রতিবাদ

গত চৈত্র সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীতে' রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু মহাশয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের জীবনী প্রসঙ্গে—কলিকাতা মেডিকাল স্কুলের যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন,তাহাতে কয়েকটি কথার উল্লেখ করেন নাই। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তৎসম্বন্ধে লিখিতেছি—ডাক্তার আর, জি, কর এই স্কুল যে ভাবে স্থাপনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই স্কুলে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ এই তিনটি বিভাগ খুলিবার উদ্দেশ্য স্থির করেন ও এ সম্বন্ধে ডাক্তার কর মহাশয়, আমার পিতৃদেব ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে আসেন, এবং তাঁহাকে স্কুল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, স্কুলে তিনটি বিভাগ করিলে কোনটিই স্থায়ী হইবে না, তজ্জন্য হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ বাদ দিয়া কেবল এলোপ্যাথি থাকুক। অনেক বাদানুবাদের পর তাঁহার পরামর্শই গৃহীত হয় ও তিনি স্কুল কমিটীর প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েন। ডাক্তার কর কোথায় খোলার ঘরে ৮।১০টি ছাত্র লইয়া স্কুল খুলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম যখন ঐ স্কুল খুলিবার প্রস্তাব হয়—তখন এই স্কুলের নাম "Calcutta School of Medicine" বলিয়া খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু যখন মাত্র এলোপ্যাথিক বিভাগ খোলাই স্থির হইল, তখন এই স্কুলের নাম "Calcutta Medical School" রাখা হইল। এই স্কুল প্রথমে বউবাজার ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয় ও আমার পিতৃদেব ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু, এম, ডি, এই স্কুলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হয়েন। এই স্কুল অপার সারকিউলার রোডে উঠিয়া যাইবার পরও আমার পিতৃদেব ঐ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ৪।৫ বৎসর প্রেসিডেণ্ট থাকিবার পর তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলে ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ডাক্তার রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু যে ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম প্রেসিডেণ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে ঐ স্কুল কমিটীর অধিবেশন প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদিগের বাটীতেই হইত ও কমিটীর মেম্বর মহাশয়রা ঐ অধিবেশনে যোগদান করিতেন। উক্ত স্কুলের উন্নতির জন্য আমার পিতৃদেব যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন এবং স্কুলে অধ্যাপনা প্রত্যহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; ঐ স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও চাঁদা আদায় করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়ই মধুপুরে থাকিতে হইত। স্কুলের কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে কি কোনরূপ পরামর্শ আবশ্যক হইলে কমিটীর ডাক্তারদের মধ্যে কেহ তাঁহার নিকট যাইয়া পরামর্শ লইয়া আসিতেন। এ সম্বন্ধে সার নীলরতন সরকার মহাশয়কে ২।১ বার মধুপুরে যাইতে দেখিয়াছি। এই স্কুল স্থাপিত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান কারমাইকেল কলেজ হওয়া পর্য্যন্ত ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয় ঐ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ইহার সহকারী সম্পাদক ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ডাক্তার নীরদবিহারী বসু ইহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণিলাল বসু মহাশয় মদীয় পিতৃদেবের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট ও এই স্কুল-সম্বন্ধীয় পুরাতন রিপোর্ট ইত্যাদি দেখিলে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার বসু।

মায়ের ডাক

তিরিশ বছর পরে, ফিরে কি এলি রে ঘরে,
মনে প'লো দুখিনীরে—দুখিনীর ধন।
কি আর দেখিবি ছাই, যা ছিল কিছুই নাই,
এবে তোর মা'র শুধু জীবন্তে মরণ!

[illegible]লাভরা ধান নেই, গোয়ালে সে গরু নেই,
পুকুরে সে জল আর নেই—টল্ টল্।
[illegible] নেই সে ফসল, গাছে ফলে না ত ফল,
[illegible]নে রে নিয়ে গেছে হরিয়া সকল।

দেখ [illegible] বাড়ী-ঘর খালি প'ড়ে নিরন্তর
জন-মানবের সাড়া নাহি কোনোখানে।
জানালা-কপাটগুলি কতক পড়েছে খুলি'
কতক বা ঝুলিতেছে মমতার টানে।

এক দিন ছিল সব, কত হাসি, কি বিভব,
[illegible]লারাতি উৎসবে মুখরিত কত।
কত সুখে চাঁদমুখ, কি আমোদ, কত সুখ,
ঐ সব বাড়ী-ঘরে আছিল সতত।

কাল-সর্প চামচিকা শৃগাল ও শৃগালিকা,
এখন মনের সুখে লইয়াছে বাসা।
সাঁঝের প্রদীপ আর জ্বলে নাকো অন্ধকার
গ্রাস করিয়াছে এই অভাগীর আশা।

গোধূলিতে নাহি আসে আর ত বাড়ীর পাশে
গোচর হইতে ফিরি গোধনের পাল।
সারাদিন কত খাটি' গায়ে মাখি' ধুলো-মাটি
আসে না রে হাসিমুখে চাষী নিয়ে হাল।

[illegible] যা দু'চার জন আমার দুখের ধন
[illegible]রো রাখিতে বুঝি নারিলাম আর।
রোগ-শোক-অনাহারে যায় বঙ্গ ছারেখারে
ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে করিল উজাড়।

[illegible] যদি ও রে, ঘুরি' ভাখ ঘরে ঘরে,
জ্বলিবার আগে দীপ নিভিতেছে কত।
না ফুটিতে ফুল ঝরে বাঙ্গালার প্রতি ঘরে,
শিশুর মড়ক বল্ কোন্ দেশে এত।

কি দেখিয়া গিয়াছিলি, এবে এসে কি দেখিলি
তিরিশ বছর পরে দশা পাড়াগাঁর।
কি করিয়া তোরে কি দিয়া ভুলিব ঘরে,
ঘর কোথা? শুধু ভিটা করে হাহাকার।

পথঘাট সমুদায় জঙ্গলে ঘিরেছে হায়
সাড়া নাই, শব্দ নাই, সব চুপ-চাপ।
ভয়ে দিনে দু'পহরে, দেহ ছম্ ছম্ করে
জানি না বাংলার 'পরে কা'র অভিশাপ।

যদিও বা কোনো কোণে এখনো দু'এক জনে
বাপ-পিতোমোর ভিটে আগালিয়া রহে।
রোগে আর ভাবনায়, বিশীর্ণ শিথিল-কায়,
নীরবে সহিছে সব কথাটি না কহে।

দেখ চেয়ে চারিধার, কিছু নাই আগেকার
পাড়ায় পাড়ায় সেই খেলা-ধুলো কত।
সে গোষ্ঠীবন্ধন নেই, সে আপনভাব নেই,
বারো মাসে তেরো পূজো হইয়াছে গত।

এবে সব যা'র য'ার প্রাণ নিয়ে সার সার,
কি যেন কিসের ত্রাসে সব টলমল্।
দিনরাত হা-হুতাশ, কিছুতে মেটে না আশ,
সোনার বাঙ্গালা হায় গেল রসাতল।

ভগবান্ রাম-কৃষ্ণ কলিতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ-
রূপে অবতরি' ধন্য করিলা যে দেশ।
বৃন্দাবনে ননীচোরা কাঙালের ধন গোরা
ভাসালো যে দেশ আনি' প্রেমের আবেশ।

যেথা দুহিতার বেশে নৃ-মুণ্ডমালিনী এসে
"প্রসাদের" গানে ভুলি' বেড়া বাঁধি দিলা।
পাষাণী "যশোরেশ্বরী" প্রতাপের ক্ষেমঙ্করী
যা'র গান শুনিবারে ঘুরি দাঁড়াইলা।

যেখানে জনম লভি' অমর হইলা কবি
জয়দেব—পদ্মাবতী-পদ্ম-মধুকর।
যাহার পীযূষ-পানে নিরখিলা দিব্যজ্ঞানে
রূপ-সনাতন-আদি সাধক-নিকর।

এখনও আশে-পাশে যে দেশে বাতাসে ভাসে
পাগল করিয়া প্রাণ বাউলের গান।
জাগ্রতে স্বপনাবেশে এখনও সেই দেশে—
সারি গেয়ে দাঁড়ী-মাঝি দাঁড়ে দেয় টান।

শ্যামা দোয়েলের গীতি, এখনও নিতি নিতি
যে দেশের বন-কুঞ্জ করে মুখরিত।
অনন্ত অমৃতখনি, বাণীর মুকুটমণি,
যাহার রবির তেজে বিশ্ব আলোকিত।

স্মরিলে ঝরে নয়ন হায় রে সে মহাজন—
চণ্ডিদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দের "পদ"।
যাহার কণ্ঠের হার, তুলনা মেলে না যার—
বাছা রে, ভূতলে যার অতুল সম্পদ।

তাহার বুকের ক্ষীরে, তাহার স্নেহের নীরে,
ননীর পুতুলি তোরা লালিত-পালিত।
আজি এ দুর্গতি কেন, কেন রে দুর্গতি হেন,
আমার সন্তান হ'য়ে কেন বিড়ম্বিত!

এখনো সময় আছে আয় ফিরে আয় কাছে
এখনো রয়েছে পড়ি' সাজানো বাগান।
পল্লী-মা'র কোলে এসে হেসে খেলে মিলেমিশে
আন রে আবার বঙ্গে আনন্দের বান।

হালী চাষী ছোট যারা, তোদের সোদর তারা
তারাও তোদের মত সন্তান আমার।
এক মাতা এক বাড়ী, তবু এত ছাড়াছাড়ি,
ঘটে ঘটে এত ভেদ এ কি অনাচার।

বিদেশী গৌরব-মদে ধার-করা পরিচ্ছদে
আমার সন্তান ভোলে, এ কি রে প্রমাদ!
খুদ-কুড়ো যা' বা আছে, ঘরে তোর মার কাছে,
তার কাছে মিঠে কি রে পরের প্রসাদ!

বাড়ীঘরে ফিরে এসে আবার আনন্দে ভেসে
মুখর করিয়া তোল পল্লী বাঙ্গালার।
এখনো মায়ের ডাকে ফিরিলে পাইবি মা'কে
নতুবা যা আছে, তাও হবে ছারখার।

দু' হাতে আঁকড়ি ধরি' রেখেছি রে বুকে করি
এখনো তোদের লাগি কত কি বাছনি!
ভদ্র ভিখারীর বেশে অর্দ্ধাশনে দেশে দেশে
ঘুরিয়া মরিস আর কেন যাদুমণি?

খুলিয়া নকল সাজ সাজা রে রাখাল-রাজ,
আয় কোলে আয় ও রে দুখিনীর ধন!
একবার আয় ফিরে দেখাই এ বুক চিরে,
পুত্রহারা মা'র প্রাণে কি ঘোর বেদন।

এখনো আমার বুকে আসিলে রহিবি সুখে,
আবার জাগিবে বঙ্গে সেই পূর্ব্বভাব।
যদিও কিছু না আছে, তবু তোর মা'র কাছে
মোটা ভাত কাপড়ের হবে না অভাব।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

...র

"মাসিক বসুমতীর" পাঠক-পাঠিকা প্রতীচ্য দেশের নানাবিধ কুকুরের ইতিহাস ও নাম অবগত হইয়াছেন। কুকুরের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের জনগণের আকর্ষণ যে অধিক এবং তাহাদের উৎকর্ষসাধনের জন্য সে দেশের প্রচেষ্টা যে অসাধারণ, এ কথাও 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকাগণ ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কতিপয় শ্রেণীর কুকুরের বহুবর্ণ চিত্র ও তাহাদের মোটামুটি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা গেল।

পীরেনীয়ান্ সিপ্‌ডগ

জগতের মধ্যে এই জাতীয় কুকুর দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। কুকুরের মধ্যে এমন প্রিয়দর্শন জীব আর নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর কুকুরবংশ নির্ব্বংশ-প্রায় হইয়াছে। এই তুষারশুভ্র-দেহ কুকুর মাষ্টিফ্‌ জাতীয় কুকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। দেহের গঠন, রোমাবলী প্রভৃতি বিষয়ে তিব্বতীয় মাষ্টিফ্‌ কুকুরের সহিত ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। তবে তিব্বতীয় মাষ্টিফের চরণগুলি ইহাদের মত দীর্ঘ নহে, এবং ইহাদের বর্ণও পীরেনীয়ান সিপ্‌ডগের ন্যায় নহে। উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিব্বতীয় মাষ্টিফের গাত্রবর্ণ মখমলের ন্যায় কোমল ও কৃষ্ণবর্ণের।

পীরেনীয়ান সিপ্‌ডগ জাতীয় কুকুরগুলি যদি কলি-জাতীয় কুকুরের অনুরূপ হইত, তাহা হইলে আজ উহাদের সংখ্যা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারিত। কিন্তু স্পানিয়ার্ডরা ও পরবর্ত্তী যুগে ফরাসী মেষপালকগণ 'পীরেনীয়ান্ সিপ্‌ডগ' কুকুরের সাহায্যে মেষপাল চরাইত। ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের আক্রমণ হইতে ইহারা মেষপালকে রক্ষা করিত।

ক্রমশঃ যখন পীরেনীয়ান্ পর্ব্বতমালায় নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুক বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই জাতীয় সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ কুকুরের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে লাগিল। কেহ আর যত্নপূর্ব্বক তাহাদের বংশবৃদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা উপায় অবলম্বন করিল না, সুতরাং বর্ত্তমানে তা... সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকা... আর ইহাদের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা না হয়, তাহা হই... জাতীয় কুকুর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

অধুনা সেণ্টবার্ণার্ড বলিয়া যে জাতীয় কুকুর আছে, উহাদের বংশবৃদ্ধিকল্পে পীরেনীয়ান সি... উপযোগিতা অধিক। কোন কোন পশুতত্ত্ববিদ্ মনে... যে, পুরাতন হস্‌পিস্ জাতীয় কুকুর (আল্‌প্‌স পর্ব্বতে বিসর্পিত পথ ও রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে) এই পীরেনীয়ান জাতীয় কুকুরের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ছিল।

অত্যন্ত বৃহদাকার হইলেও পীরেনীয়ান্ সিপ্‌ডগ, সেণ্ট বার্ণার্ডের ন্যায় বৃহদায়তন নহে। সেণ্ট বার্ণার্ডের শরীরের ওজন প্রায় তিন মণ হইবে, কিন্তু প্রথমোক্ত একটা কুকুরের দৈহিক ওজন সওয়া মণ বা তাহার কিছু অধিক হ... থাকে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতীয় কুকুরের ন্যায় ইহাদের শুভ্রবর্ণ রোমে আবৃত। পার্থক্য শুধু রোমের পরিমাণে। ... জাতীয় কুকুর আমেরিকা বা ইংলণ্ডে কদাচিৎ দে... পাওয়া যাইত। মেষ-রক্ষাকল্পেই ইহাদের প্রয়োজনীয়... অধিক। নেকড়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হই... ইহারা অনায়াসে মেষপালকে রক্ষা করিবার শক্তি ধারণ ক... বর্ণনা দ্বারা এই কুকুরের স্বরূপ বিবৃত করা সম্ভবপর নে... চিত্র দেখিয়া অনেকটা অনুমান করা বরং সম্ভবপর

মাষ্টিফ্‌

পীরেনীয়ান কুকুর যেমন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপে... রমণীয়দর্শন, মাষ্টিফ্‌ কুকুর তেমনই প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডজ কুকুরসমূহের মধ্যে মাষ্টিফ্‌ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা...

পীরেনিয়ান্ সিপ্ ডগ্

শ্যাগল পুড্‌ল   টয় পুড্‌ল্   জটাধারী পুড্‌ল

পমিরানিয়ান   মাল্টাই টেরিয়ার

র্ব্বপুরুষগণ—বড় বড় জন্তু শিকার কালে আসীরীয়গণ াহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিত।

খৃষ্টজন্মের ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে এই বৃহদাকার, শক্তিশালী কুর ইংলণ্ডে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল বলিয়া প্রাণিতত্ত্ব-দেগণের ধারণা।

ফিনীসীয় ব্যবসায়িগণ ঐ জাতীয় কুকুর ইংলণ্ডে আম-নী করিয়াছিল। পরে বৃটনগণ শিকারকালে ও যুদ্ধক্ষেত্রে াদিগকে ব্যবহার করিত। খৃষ্টজন্মের ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে রোমকগণ যখন ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিল, তখন মাষ্টিফ্ কুকুর দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। রোমক-গণের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে মাষ্টিফ্ কুকুরের সমাদর ছিল। উহা-দের অসাধারণ সাহস ও দেহের আয়তনে রোমকগণ উহাদিগের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

আরও পরবর্ত্তী কালে এই জাতীয় কুকুর বিপুল দেহ-ভারে তেমন ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতে পারিত না। তখন মানবের সঙ্গী ও সম্পত্তি রক্ষা এই দুই কার্য্যে উহারা ব্যবহৃত হইত। চেসায়ারে মাষ্টিফ্ কুকুরের প্রাদুর্ভাব অধিক। পঞ্চ-দশ শতাব্দী হইতে ধারাবাহিকভাবে এই কুকুরের বংশধর-গণ বিদ্যমান।

মাষ্টিফ্ কুকুরের বিবরণ পূর্ব্বে 'বসুমতীতে' বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

এয়ারডেল্ টেরিয়ার

এই কুকুরের মধ্যে এয়ারডেলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। এই কুকুর কখনও পরাজয় স্বীকার করে না। মাটীর উপর যে সকল প্রাণী বিচরণ করে, এয়ারডেল টেরিয়ার তাহাদের কাহাকেও ভয় করে না। ইহারা জলও ভালবাসে। জলে শিকার করিতেও অটার হাউণ্ডের ন্যায় ইহার দক্ষতা দৃষ্ট হয়। এ জন্য অটার হাউণ্ডের রক্তধারা ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান, ইহা প্রমাণিত হয়।

স্বভাবতঃ এয়ারডেল কলহপরায়ণ নহে, কিন্তু সে আপনার শক্তির অতিরিক্ত কোন কাযও করিতে যায় না। এয়ারডেল জাতীয় কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, এ জন্য যুদ্ধের সময় ইহাদিগকে রণক্ষেত্রে দলে দলে লইয়া যাওয়া হয়।

এই কুকুরের চাহিদা এখন অত্যন্ত বেশী। সকলেই ইহার ভক্ত। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়র অঞ্চল ছাড়া এয়ারডেল টেরিয়ার কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইত না। তখন ইহাদের প্রতি তেমন যত্নও কেহ করিত না। কিন্তু ৩০ বৎসর ধরিয়া এয়ারডেল টেরিয়ারকে যত্নপূর্ব্বক পালন করার পর এখন দেখা যাইতেছে যে, হাউণ্ড জাতীয় কুকুরগুলি ইহাদের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। এখন এই কুকুর সর্ব্বত্রই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

ভাল এয়ারডেল কুকুরের ওজন ১৭ সের হইতে ২২ সের পর্য্যন্ত। ইহার উচ্চতা ২২ ইঞ্চ, গাত্রবর্ণ চিত্রে বর্ণিত হইল। উহার পৃষ্ঠদেশ ঋজু এবং দৃঢ়, চরণচতুষ্টয় অস্থি-বহুল, ঋজু এবং পেশী-সম্বলিত।

টেরিয়ার জাতীয় কুকুরগুলির মধ্যে এয়ারডেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা এই কুকুর পুষিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই কখনও ইহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে পারেন না। শৈশবে ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, তখন সম্মুখের দ্রব্যাদি নষ্ট করিবার দিকে ইহাদের ঝোঁক থাকে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন আর ইহাদের প্রকৃতিতে সেরূপ চঞ্চলতা দেখা যায় না—ক্রমেই গম্ভীর হয় এবং প্রভুর সমভিব্যাহারে শান্তভাবে গমনাগমন করে। এই কুকুরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায়। শিকারেও ইহারা বেশ দক্ষতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের রোমরাজি দীর্ঘ এবং কঠিন, কুঞ্চিত নহে।

বেড্লিংটন্ টেরিয়ার

বেড্লিংটন টেরিয়ার কুকুরের চেহারা দেখিয়া ইহার গুণ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না। উহার আকৃতিতে আকর্ষণ-যোগ্য কিছু না থাকায়, কোন দিন উহা জনপ্রিয় হয় নাই।

ইহার রোমরাজি পশমের মত। হাসি, মেরীর প্রিয় মেষ-শাবকের ন্যায়। যাহারা এই কুকুরের প্রকৃতির সহিত পরিচিত নহে, তাহারা কখনও কল্পনা করিতে পারিবে না, রোমবহুল এই অপ্রিয়দর্শন কুকুরের হৃদয় কি গভীর এবং একনিষ্ঠ। শিকারে ইহার অভ্রান্ত লক্ষ্য। বন্য বিড়াল দেখিতে পাইলে এই কুকুর কখনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। তাহার প্রাণসংহার না করিয়া বেড্লিংটন টেরিয়ার কখনই নিরস্ত হইবে না।

আমেরিকা সকল প্রকার কুকুরের চাষ করিয়া থাকে; কিন্তু বেড্‌লিংটন টেরিয়ার কোনও দিন জনসাধারণের প্রীতিলাভ করে নাই। এই কুকুর সকল বিষয়েই অন্য কুকুর হইতে স্বতন্ত্র। অন্য কুকুরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই।

এয়ারডেল কুকুরের ন্যায় বেড্‌লিংটন টেরিয়ার অত বড় হয় না। ইহার গায়ের রোম এবং মেষাকৃতি মুখমণ্ডল ইহার বৈশিষ্ট্য। টেরিয়ার জাতীয় কুকুরের গুণাবলী ইহাতে বিদ্যমান। ডাণ্ডি ডিন্‌মণ্ট নামক এক জাতীয় কুকুর আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের সহিত বেড্‌লিংটন টেরিয়ারের অনেকটা সাদৃশ্য কোন কোন বিষয়ে আছে।

মাল্‌টাইজ টেরিয়ার

শুভ্রবর্ণের মালটাইজ টেরিয়ার খুব প্রাচীন জাতীয় কুকুর। প্রাচীন যুগে রোমের মহিলারা এই কুকুরকে খুব ভালবাসিতেন। এই কুকুরের আপাদমস্তক রেশমবৎ কোমল লোমে আবৃত। ইহার চক্ষু-যুগল ঘনকৃষ্ণ—দেখিলেই মনে হইবে, এই কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও ক্ষিপ্র।

এই জাতীয় কোন কোন কুকুরের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল—প্রকৃতি কৌতূহলোদ্দীপক এবং ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাপূর্ণ। আবার ইহাদের মধ্যে কোন কোন কুকুর এমন কোমল ও দুঃখ-কষ্ট-সহনশক্তিবঞ্চিত যে, তাহাদিগকে কাচের আলমারীতে বন্ধ করিয়া না রাখিলে যেন চলে না—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই যেন তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

ইয়র্কশায়রের স্কাই জাতীয় কুকুরের ন্যায় রোমাবলীর মধ্যে মালটাইজ টেরিয়ারের দেহ যেন আবৃত হইয়া থাকে। ওজনে ইহারা কখনও ৫ সেরের অধিক হয় না।

পমিরেনিয়ান্‌

অনেক যত্নে খেলার পুতুলের ন্যায় ছোট জাতীয় কুকুরের উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রকার কুকুর শুধু তাহার মনিবেরই আনন্দ বৰ্দ্ধন করিয়া থাকে। ইহারা কখনও কোন প্রকার অনিষ্ট করে না।

যে সকল মানুষ সঙ্গী হিসাবে বিড়াল বা কুকুর প্রতিপালন করে, তাহাদের কাছে এই কুকুরই অধিক শ্রেয়ঃ। পমিরেনিয়ান্‌ কুকুর তাহার মনিবকে প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসে—কোন প্রতিদান চাহে না। মার্জ্জারের কাছে কিন্তু এইরূপ ভালবাসা প্রত্যাশা করা যায় না। পমিরেনিয়ান্‌ কুকুর কখনও পাখী বধ করে না; কিন্তু মার্জ্জার সুবিধা পাইলেই পাখী মারিয়া ফেলিবে। এইরূপে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে মার্জ্জারের দ্বারা প্রতি বৎসর মানুষের প্রয়োজনীয় অসংখ্য পক্ষীর জীবনান্ত হইয়া থাকে। সঙ্গীর হিসাবে কোনও জীব প্রতিপালন করিতে হইলে এই জাতীয় কুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার পমিরেনিয়ান্‌ কুকুরই সর্ব্বজনপ্রিয়। সযত্ন প্রতিপালনফলে দেখা গিয়াছে যে, পমিরেনিয়ান্‌ কুকুরের ওজন আড়াই সেরের অধিক নহে। শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যতিরেকেও অন্যান্য বর্ণের কুকুর ইদানীং নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পমিরেনিয়ান্‌ কুকুরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহাদের এক একটির ওজন ৪ সেরের মধ্যে। ইহাদের গাত্রস্থ রোমরাজি কোমল, দীর্ঘ এবং প্রচুর। ইহাদের চোলগুলি ঋজু এবং অদৃঢ়।

ডাক্‌স্‌হুণ্ড

এই জাতীয় কুকুরে, হাউণ্ড ও টেরিয়ারের গুণসমবায় লক্ষিত হইবে। সম্ভবতঃ এই দুই জাতীয় কুকুর হইতে ডাক্‌স্‌হুণ্ড কুকুরের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাদের খর্ব্ব চরণ কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বুঝা কঠিন। এই কুকুর জার্ম্মাণগণের প্রিয়। শিকারের সময় ইহারা গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্তুকে বিব্রত করে। শিকারী তখন তাহাকে শিকার করিবার অবকাশ পায়। জার্ম্মাণীতে শৃগালের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার নিশাচর জন্তু আছে। ইহারা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত উৎপাত ও ক্ষতি করিয়া থাকে। মাটীতে গর্ত্ত করিয়া উহারা এত দ্রুতপদে তন্মধ্য দিয়া পলায়ন করে যে, খননকারীরা মাটী কাটিয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। এ জন্য কুকুরের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সাংঘাতিক নিশাচর জীবকে দমন করিবার জন্য অত্যন্ত সাহসী কুকুরের প্রয়োজন। শুধু সাহস থাকিলেও হইবে না। সেই কুকুর নির্ব্বন্ধপরায়ণ প্রকৃতির হওয়া দরকার। তাহার দীর্ঘ দেহ, খর্ব্ব চরণ এবং বড় উল্‌টান সম্মুখের থাবার জন্য সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করে। কথিত আছে, জার্ম্মাণীতে গজে মাপিয়া এই কুকুর বিক্রীত হইয়া থাকে।

গঠিত-দেহ ডাক্‌সুণ্ড কুকুরের দৈর্ঘ্য নাসিকা হইতে ...সর গোড়া পর্য্যন্ত মাপিলে উহার উচ্চতার তিন গুণ। মস্তক দীর্ঘ এবং ক্ষীণ, কর্ণ হাউণ্ডের ন্যায়। দেহ কণ্ঠদেশ লম্বিত, কিন্তু পেশীবহুল, লাঙ্গুল ঋজু।

...হার চরণ ও থাবার বৈশিষ্ট্য আছে। চরণ খর্ব্ব হইলেও ... সুদৃঢ় ও অস্থিবহুল, এই জাতীয় কুকুর সাধারণতঃ ...র্ণ। হাউণ্ড ও টেরিয়ার তাহার পূর্ব্বপুরুষ। এ জন্য ...ণ্ড কুকুর উভয়ের গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছে। হাউণ্ডের স্নেহপ্রবণ, টেরিয়ারের ন্যায় সাহসী ও অধ্যবসায়- ...।

চিহুয়াহুয়া

...কো দেশে এই ক্ষুদ্রকায় কুকুরের জন্ম। কোন কোন ইহাদের ইতিহাস লিখিবার সময় বলিয়াছেন যে, কাঠ-...লর সহিত এই কুকুরের পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধ আছে।

...ই ক্ষুদ্র জীবটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং দয়ার্দ্রচেতা। ...স্ক চিহুয়াহুয়ার ওজন তিন পোয়া হইয়া থাকে। কর-...সারিত করিলে তাহাতেই উহার সমগ্র দেহ স্থান পায়। ...কখনও কখনও এই কুকুরের ওজন প্রায় দুই সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

স্কিপার্ক

...লজিয়মের খালসমূহে যে সকল নৌকা থাকে, তাহা-...দের সংশ্রব হইতে এই কুকুরের নামের উৎপত্তি ...ছ। উহারা নৌকা চৌকী দেয় এবং ইন্দুর বিতাড়নে

...ধ্য-য়ুরোপের নেকড়ে বাঘ হইতে জাত এক শ্রেণীর ...জাতীয় জীব হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে, প্রাণি-...গণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ...ও কুকুরের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য নাই।

...হাদের বর্ণ সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; মস্তকটি বাঘের মাথার ... ইহাদের চক্ষু অত্যন্ত দীপ্তিশালী এবং বুদ্ধিমত্তাসূচক। ...র কণ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থলের রোমাবলী দীর্ঘ ও সমুন্নত। স্কিপার্ক কুকুরের স্কন্ধদেশ ও বক্ষ যেমন দৃঢ়—তেমনই গভীর। ইহার কর্ণযুগল খাড়া হইয়া থাকে—সমগ্র দেহ অত্যন্ত সুদৃঢ়। জন্মকালে ইহার লাঙ্গুল থাকে না। বড় হইলেও অনেকের লাঙ্গুলোদ্গম দৃষ্ট হয় না।

স্কিপার বেলজিয়ম ও হলাণ্ডের নৌকায় থাকিতে ভাল-বাসে। সেখানেই সাধারণতঃ ইহাদিগের গৃহ। এই কুকুরের ওজন প্রায় ৬ সের হয়।

পুডল্‌স্

কুকুর জাতির মধ্যে পুডল্‌স্ কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। ইহাদের আকৃতিও চমৎকার। পুডল্‌স্ অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঝুঁটি যদি লালফিতা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া যায়, দেখিলে মনে হইবে, ছোট ছোট মেয়েরা যেন সাজিয়া গুজিয়া সমাজে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতেছে।

শ্মশ্রুল পুডল্‌স্, খেলার পুডল্‌স্, জটাধারী পুডল্‌স্, এমন কত রকমের পুডল্‌স্ কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। তিন শ্রেণীর পুডল্‌স্ কুকুর দেখিলেই ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

নানা বর্ণের পুডল্‌স্ আছে। কালো, কটা, লাল, শাদা নানাবর্ণের এই জাতীয় কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পশমের ন্যায় কেশরাজি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মেক্সিকান্ হেয়ারলেস্

মেক্সিকো দেশে এই কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দেহে রোম নাই বলিলেই চলে, সে জন্য অত্যন্ত অপ্রিয়দর্শন। তথাপি ইহার বন্ধুর অভাব নাই। এই কুকুর অত্যন্ত প্রভু-ভক্ত। যত্ন করিয়া পালন করিলে এই কুকুর মনিবের বিশেষ প্রয়োজনে লাগে।

মাঝারি আকারের টেরিয়ারের ন্যায় ইহাদের দেহ। রোমবিহীন বলিয়া ঋতুর পরিবর্ত্তনে ইহারা সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ে। এ জন্য শীতপ্রধান দেশে ইহাদিগকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। উত্তর-আমেরিকাতেও এই কুকুর নাই বলিলেই চলে। কুকুর হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
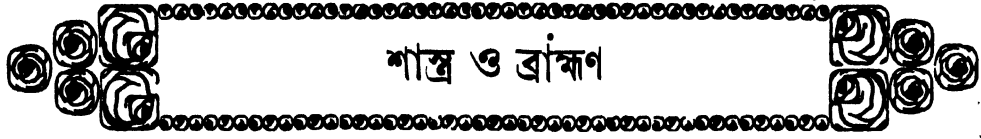
বিচার-সমাপ্তি

বড় দুঃখেই বিচার শেষ করিতেছি। এখন মানুন আর না-ই মানুন—বড় পরিশ্রমে যাঁহাকে 'অভূন্‌ পঃ' হইতে শিখাইয়াছিলাম, ৩২ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন যাঁহার বিরুদ্ধে 'হিতবাদী'র সমালোচনায় মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম, এবং তাহার কয়েক বৎসর পরেই যাঁহার যশঃ প্রচারে সুখী হইয়াছিলাম,—তাঁহার যে এইরূপ পরিণতি হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই পণ্ডিতের বায়ুরোগ হইয়াছিল। অনিদ্রার দারুণ ক্লেশ প্রায় ২ বৎসর ভোগ হয়। বিদ্যাসাগর কলেজের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক (সাধুপ্রকৃতি) শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অসামান্য যত্নে অনিদ্রা-ক্লেশ দূর হয়। তাহাতে ভাবিয়াছিলাম, পণ্ডিতের বায়ুরোগ সারিয়াছে। এই যে ভাবা, ইহা ভ্রম। 'বায়োর্বিচিত্রা গতিঃ'—অনিদ্রা উৎপাদনে বাধা পাইয়া এই বায়ুরোগ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক অন্যরূপে আক্রমণ করিয়াছে,—ইহাতে আমি দুঃখিত; বায়ুরোগীর সহিত বিচার করা অসঙ্গত বলিয়া বিচার শেষ করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রতিবারেই দেখিতেছি, 'বিচার' প্রবন্ধে অসঙ্গত কথা ও অসত্য আক্রমণ। মনে করিতাম, 'সমস্যা' ও 'বিচার' লেখকের ইহা কৌশল,—এবারে বুঝিলাম কৌশল নহে,—বায়ুবিকৃতি। সুখের বিষয়, এই বিকৃতি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই।

বায়ুবিকৃতি বুঝিলাম কেন, তাহা না বলিলে সাধারণের বিশ্বাস হইবে না, সেই জন্য তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। সেই পণ্ডিত মহাশয়ের আমার প্রতি যে অজ্ঞতার তিরস্কার আছে, তাহার উত্তর দিব না,—সত্যই ত আমি অজ্ঞ, অসীম জ্ঞানসাগরের এক বিন্দু জলও ত আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, অভিজ্ঞতার অভিমান করিব কিরূপে? যদি পূর্ব্বে আমার কোন লেখায় এইরূপ অভিমান সূচিত হইয়া থাকে ত তাহা আমার অনিচ্ছাকৃত; শ্রীশ্রী৺ভগবৎশ্রীচরণারবিন্দে আমার সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

আর প্রতিপক্ষের প্রতি যে অজ্ঞতার উপন্যাস করিয়াছি, তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য। আশীর্ব্বাদ করি—শ্রীমান্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, অখণ্ড আয়ুঃ প্রাপ্ত হউন,—আমি কিন্তু চলিষ্ণু, হস্তসুখ আর অধিক দিন আমার ঘটিবে না; আজ কিন্তু সেরূপ নহে, আজ দুঃখিত হইয়াই তাঁহার রোগের কথাটা ব্যক্ত করিতেছি, সত্যনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার বন্ধুর এই রোগের অপনয়নে পূর্ব্বাপেক্ষা সাবধানতার সহিত যত্ন করুন।

সর্ব্বত্র দেখা যায়, বায়ুরোগগ্রস্তের বাক্যে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না, অপরের কথা বুঝিবার শক্তি কমিয়া যায়, কথা ও কার্য্যের একতা থাকে না,—লজ্জা থাকে না, অকারণ ক্রোধ প্রকাশ, এবং অকারণ কটূক্তি প্রয়োগ হইয়া যায়; অর্থাৎ এইগুলি বায়ুরোগের লক্ষণ।

গত চৈত্রমাসের বসুমতীতে ৮৮৫ পৃঃ হইতে যে 'প্রতিবাদ ও বিচার' প্রবন্ধ আছে—তাহাতে ঐরূপ লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

১। বৈষ্ণব-দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা সনাতন গোস্বামীর মত বলিয়া প্রতিবাদকারী প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই উক্তির খণ্ডনপ্রসঙ্গে যাহা বলি, তাহার ভাবার্থ এই—

"সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব-দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছেন, সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ-জাতীয় বৈষ্ণব সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন, ক্ষত্রিয়-জাতীয় বৈষ্ণব ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের, বৈশ্য-জাতীয় বৈষ্ণব বৈশ্য-শূদ্রের এবং শূদ্র-জাতীয় বৈষ্ণব কেবল শূদ্রের দীক্ষাগুরু হইবেন, নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের দীক্ষাগুরু হইবেন না।' বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলে সকলেই যদি সনাতনের মতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে বৈষ্ণব-দীক্ষাপ্রাপ্তগণের ক্ষত্রিয়াদিরূপে নির্দ্দেশ তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইত, তাহারা সকলেই ত ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। পুরশ্চরণে দীক্ষাপ্রাপ্তেরই অধিকার, সেই পুরশ্চরণের হোমানুকল্প জপে ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদের বিশেষ যে ব্যবস্থা সনাতন গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত হইত—বৈষ্ণব-দীক্ষায় সকলেই ত ব্রাহ্মণ।"

আমার এই সব যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-লেখকের উক্তি শ্রবণ করুন,—

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, অন্য কোন বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও হইতে পারেন না, এমন কোন উক্তি আমার অভিভাষণ বা শাস্ত্র-সমস্যায় নাই।"

আমিও ত তাই বলি, যিনি বলেন, 'বৈষ্ণব-দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই সকলে ব্রাহ্মণ হইবে; অন্যবর্ণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন না'—এ কথা তিনি কি বলিতে পারেন? 'প্রতিবাদ-লেখক ঐরূপ কথা বলিয়াছেন,' এ কথা আমিও বলি নাই; তবে প্রমাণস্বরূপে তাঁহারই উদ্ধৃত যে হরিভক্তিবিলাস, তাহার মূল বচন এবং টীকাকার সনাতন গোস্বামীর ঐ সব কথা দেখাইয়া দিয়াছি। তথাপি 'প্রতিবাদ'-লেখক ইহাকে 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। ইহা ১ নং লক্ষণ।

২। 'প্রতিবাদ'-লেখক বলেন, "আমাদিগের দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দীক্ষাদাতা গুরু ব্রাহ্মণেতর বর্ণও যে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের পর হইতেই হইয়া আসিতেছেন, তাহা কি প্রতিবাদ-কর্ত্তা এখনও শুনেন নাই? শ্রীখণ্ডের পরম ভাগবত বৈদ্য গোস্বামিগণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু কায়স্থগুরু এখনও বহু কুলীন (ব্রাহ্মণ) বংশের দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন।"

এমনভাবে অনাচার যে চলিয়াছে, তাহা শুনিয়াছি। তাহার কারণও শুনিয়াছি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন সম্প্রদায় যে সময় বিবাহকে জীবিকার্জ্জনের উপায় মনে করিতে লাগিলেন ও বিদ্যার্জ্জনে বিমুখ হইলেন, সেই সময় হইতে শূদ্র ভূস্বামীর আশ্রিত বিবাহজীবী কতিপয় নিরক্ষর কুলীন, ভূস্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতরের শিষ্য হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ নাই। এখনও অনেক অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গৈরিকধারী নাপিত, তিলি বা গোয়ালার শিষ্য হইতেছেন। এই সব গুরু গৌড়ীয় বৈষ্ণবও নহেন, দশনামী সন্ন্যাসীর ভোলে ইঁহারা ফিরিয়া থাকেন। এরূপ আচারকে 'শিষ্ট'সম্মত বলা অনুচিত।

'প্রতিবাদ'-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের পর হইতেই এইরূপ গুরুগিরি চলিয়াছে। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার দলের কত রকম যে ওলট-পালট হইয়াছে, তাহার খবর ত বায়ুগ্রস্তের কর্ণে প্রবেশ করে না। 'নেড়া-নেড়ীর' কথাটাও—না! যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ঐরূপই হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব থাকিতে ঐরূপ কার্য্য হইল না কেন? 'প্রতিবাদ'-লেখক অধিকন্তু এই অনাচারকে 'শিষ্ট'সম্মত বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছেন, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে রচিত হরিভক্তিবিলাসকে যে না মানে, সনাতন গোস্বামীর উপদেশকে যে অগ্রাহ্য করে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহাকেই 'শিষ্ট' বলিতে হয়; কারণ, হরিভক্তিবিলাস মূল ও সনাতন-কৃত তদীয় টীকায় ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব প্রতিবাদ-লেখকের এই যে বিচার—ইহা ২ নং লক্ষণ।

৩। "প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন আমাদের ধর্ম্ম-সাধন।" আমার এই উক্তি অবলম্বনে প্রতিবাদ-লেখক খুব বড় বিচার করিয়াছেন, প্রকৃতি শব্দের অর্থঘটিত বিচারও আছে। এই বিচারেই তাঁহার রোগ পূর্ণভাবে ধরিতে পারিয়াছি।

আমি লিখিয়াছি, "সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া" প্রকৃতি। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইহা গীতার উপদেশ, প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার আশা থাকে না।" (বসুমতী, পৌষসংখ্যা ৪৪২ পৃঃ ১ কলম) সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণা প্রকৃতি যে আমার অভিপ্রেত, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? অর্জ্জুন, প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের অধিকারী, গৃহস্থ; তাঁহাকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হইবার উপদেশ ভগবান্ দিতেছেন—ত্রৈগুণ্যের অনুগামী থাকিয়া 'নিস্ত্রৈগুণ্য' লাভ হয় না। ত্রিগুণাতীত যে আত্মতত্ত্ব, তদনুগামীই নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে পারে, তাহাই প্রকৃতির প্রতিকূলগমন। গৃহস্থের ত তাহা করণীয়, ইহা বুঝা যায়। সে সাধনা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট আছে, সাধনার বিস্তৃত উপদেশ সে প্রবন্ধে অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রদত্ত হয় নাই। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অগাধ-পণ্ডিত ভাগবত-ধর্ম্মব্যাখ্যাতা প্রতিবাদ-লেখকের মত-স্থিত ব্যক্তিগণের দিগ্‌দর্শনের জন্য সেই প্রমাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোক-মোহৌ ভয়ং মদঃ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ॥ ৪৩॥
রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্তেবমাদয়ঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ, সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ কচিৎ॥ ৪৪॥

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শণাৎ।
আন্বীক্ষিক্যা শোক-মোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া।
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া।
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥ ২২-২৫॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭ স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়)।

ভাবার্থ;—রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি, শত্রু; রজ ও তমোগুণ ইহাদিগের প্রকৃতি। সত্ত্বগুণ যাহাদিগের প্রকৃতি, এমন শত্রুও অবস্থাবিশেষে আছে। এই শত্রুগণের জয়ের উপায় যথা,—রাগ বা কামের জয় সঙ্কল্প বর্জ্জন দ্বারা করিতে হয়, কামবর্জ্জন দ্বারা দ্বেষ বা ক্রোধ জয় করিতে হয়—অর্থে অনর্থবোধ দ্বারা লোভ জয় করিতে হয়, তত্ত্বানুসন্ধান—অদ্বৈতানুশীলন দ্বারা ভয় জয় করিতে হয়। আত্মা এবং অনাত্মার বিবেক-বিচার দ্বারা শোক ও মোহকে জয় করিতে হয়, সাধুসেবা দ্বারা দম্ভ জয় করিতে হয়, লোকবার্ত্তাদি যোগবিঘ্ন ব্যাপারসমূহকে মৌন দ্বারা জয় করিতে হয়, আধিভৌতিক দুঃখ প্রাণীদিগকে কৃপা করিয়া জয় করিতে হয়। আধিদৈবিক দুঃখ সমাধি দ্বারা, আধ্যাত্মিক দুঃখ যোগবলে এবং নিদ্রাকে সাত্ত্বিক আহারে জয় করিতে হয়। সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে, উপশম দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিতে হয়। এতৎসমস্ত জয়ের মূল গুরুভক্তি।

শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ স্থলে রাগ দ্বেষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে—শেষে আছে—"ইত্যেবমাদয়ঃ" অর্থাৎ ইত্যাদি।

জয় করিবার উপায়নির্দ্দেশ স্থলে,—জেতব্যমধ্যে রাগ-দ্বেষাদির কথা ত আছেই—তাহার উপাদানস্বরূপ রজঃ তমঃ এবং সত্ত্বগুণের উল্লেখও আছে। অতএব 'ইত্যাদি'র মধ্যে সেই ত্রিগুণ ও (মূল প্রকৃতিও) ধর্ত্তব্য; উহাও জেতব্য শত্রু। যাহারা শত্রু—যাহারা জেতব্য, তাহাদিগের অনুবর্ত্তন চিরকাল করা চলে না,—প্রতিকূলে গমন করিতেই হয়, কিন্তু এই প্রতিকূলগমন উপায়-অবলম্বনে শনৈঃ শনৈঃ করিতে হয়। প্রকৃতিরই একটি পক্ষকে আশ্রয় করিয়া অপর পক্ষকে দূর করিতে হয়। পরে সেই আশ্রয়স্বরূপ পক্ষকেও জয় করিতে হয়। প্রকৃতির দলবল সকলে পরাভূত হইলে, একাবশিষ্ট সত্ত্বকে উপশমের দ্বারা পরাজিত করিতে হয়। গুরুভক্তিই এই প্রকৃতিজয়ের প্রধান অবলম্বন। ইহাই হইল তাৎপর্য্য। পরমপুরুষার্থ-পথে ক্রমে সকলকেই অগ্রসর করিবার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ। সেই পরমপুরুষার্থ মুক্তি, প্রকৃতির প্রতিকূল গতি না হইলে হয় না। গীতায় একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে এই তথ্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

অসংযমীর জাগরণ ও নিদ্রা প্রকৃতির অনুবর্ত্তন, সংযমী মুনির জাগরণ ও নিদ্রা প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিকূল গতি।

ধর্ম্ম যে দ্বিবিধ, তাহা এই অজ্ঞ ব্যক্তিরও অবিদিত নহে, সেই জন্যই লিখিয়াছি—'সাধারণতঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রধান ইত্যাদি'—(বসুমতী ৪৪০ পৃঃ শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য) তাহা হইলেও—সনাতন ধর্ম্ম নিবৃত্তি-প্রধান, নিবৃত্তিরই ইহাতে প্রাধান্য, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের হেতু হয়, আর এই নিবৃত্তি-ধর্ম্ম হইতেই পরমপুরুষার্থ মুক্তি হয়,—সাক্ষাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম হইতে মুক্তি হয় না; "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।" ইহাই শ্রুতিস্মৃতির চরম সিদ্ধান্ত; এই জন্যই সনাতন ধর্ম্মে নিবৃত্তির প্রাধান্য। প্রাচীন মীমাংসক শবরস্বামী কুমারিল প্রভৃতি ইহার ব্যতি-ক্রমে বিচার করিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন,—নিরীশ্বরতার জন্যও নিন্দিত হইয়াছেন; নব্য মীমাংসক তাহার পরিহারে যত্ন করিয়াছেন, এ সব আলোচনা বায়ু-বিকৃত মস্তিষ্কে স্থান পায় না। সনাতন ধর্ম্ম যে নিবৃত্তিপ্রধান, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ—

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্॥" ৭।১৫।৪৭

বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ; (১) প্রবৃত্ত বা প্রবৃত্তিলক্ষণ, (২) নিবৃত্ত বা নিবৃত্তিলক্ষণ। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মে সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিতে হয়, নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম হইতেই অমৃত-(মুক্তি) প্রাপ্তি হয়।

"ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ॥" ৭।১৫।২৮

প্রবৃত্তিধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমের বা চিত্তশুদ্ধির জন্যই বিহিত। তৎপর্য্যন্ত হইলেও তাহা হইতে যদি 'যোগ' না হয়—তাহা হইলে উহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

এতদেব দৃষ্টান্তেনাহ (শ্রীধর)—

"যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেযুঃ স্ম পূর্ত্তমিষ্টং তথাসতঃ॥" ২৯

বার্ত্তাদয়ঃ কৃষ্যাদয়ঃ অর্থাৎ তৎফলানি চ যোগস্যার্থং মোক্ষং ন সাধয়ন্তি প্রত্যুতানর্থায় সংসারায়; অসতো বহির্মুখস্য ইষ্টাপূর্ত্তান্যপি তথা। (শ্রীধর) অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে প্রস্থান না করিলে ইষ্টাপূর্ত্ত অনর্থহেতু হয়।

বেদান্তদর্শনে ৩ অঃ ৪ পাদ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে—এই সিদ্ধান্ত উদেঘাষিত ;—

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ।" ২৬ সূত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

"অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্ব্বাণি আশ্রমকর্ম্মাণি। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে। উৎপত্তিং প্রতি তু অপেক্ষতে।"

নিবৃত্তিধর্ম্ম যে বিদ্যা—(আত্মতত্ত্বজ্ঞান) তাহা, যজ্ঞাদি আশ্রমধর্ম্ম (প্রবৃত্তিধর্ম্ম) হইতে উৎপন্ন হয়,—আর একমাত্র বিদ্যাই মুক্তির হেতু। বিদ্যারই চরমাবস্থা নিবৃত্তিধর্ম্ম।

প্রবৃত্তিধর্ম্মের যে ঈশ্বরার্পণ—সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ, তাহা তাহার সংশোধক, ভাগবত, গীতা সর্ব্বত্রই এই তত্ত্ব প্রচারিত।

"যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণম্।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াযোগং তদুচ্যতে॥" ৭,১৫।৬৪
'সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।'—গীতা।

এইরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্মও নিবৃত্তিপ্রধান হইয়া থাকে, বৌদ্ধমতে প্রবৃত্তিধর্ম্মের এমন ভাবে সংশোধন নাই, নিবৃত্তিধর্ম্মের হেতু বলিয়াও তাহা স্বীকৃত হয় নাই। বৈদিক মতের সহিত বৌদ্ধমতের এই প্রকার ভেদ আছে। নিবৃত্তিধর্ম্মকে প্রধান বলিলেই যে, বৌদ্ধমত হইয়া গেল, এমন অলীকভীতি সুস্থ ব্যক্তির হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—

"অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্।"

যোগজ আত্মসাক্ষাৎকারই পরমধর্ম্ম। ইহার নামান্তর নিবৃত্তিধর্ম্ম।

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥"

'প্রতিবাদ'-লেখকের উদ্ধৃত এই গীতাবাক্যে তাঁহার কথাই খণ্ডিত হইয়াছে, কারণ, ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা। তুমি প্রকৃতির ষোল আনা অনুবর্ত্তন করিতেছ, অহঙ্কারে আত্মহারা, আত্মস্বরূপে দৃষ্টিশূন্য ;—তোমাকে তোমার প্রকৃতি ঘাড় ধরিয়া যুদ্ধ করাইবে,—

"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।"
আর-তত্ত্ববিত্তু...গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।"
(গীতা)।

আত্মতত্ত্ববিৎ যিনি, তাঁহার এ ভীতি নাই, তাঁহাকে দিয়া প্রকৃতি কিছুই করাইতে পারে না। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণই আপনা আপনি 'ঝটাপটি' করে। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' এই একটি কথা যাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, বিবেচকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। অতএব এতৎপ্রসঙ্গে প্রতিবাদ-লেখকের যে সক্রোধ বে-ছুট বকাবকি, তাহা ৩ নং।

৪। কুমারিল যে বুদ্ধ প্রভৃতিরই সর্ব্বজ্ঞতাখণ্ডন করিয়াছেন, আমি গত মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে তাহার প্রমাণ দিয়াছি, (৬০৬ পৃঃ ১ কলম দ্রষ্টব্য)।

"বুদ্ধাদীনামসার্ব্বজ্ঞ্যং ইতি সত্যং বচো মম।
মদুক্তত্বাদ্ যথৈবাগ্নিরুষ্ণো ভাস্বর ইত্যদঃ॥ ১৩০॥
ন চাপি স্মৃত্যবিচ্ছেদাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ পরিকল্প্যতে।
বিগানাচ্ছিন্নমূলত্বাৎ কৈশ্চিদেব পরিগ্রহাৎ॥" ১৩৩॥

ইহা কুমারিল ভট্টেরই কারিকা। এই কারিকার পর হইতেই প্রতিবাদ-লেখক কুমারিলেরই কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবারে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, তবে আম্তা আম্তা করিয়া বলিয়াছেন, "কুমারিলভট্ট এই কয়টি শ্লোকে বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যুক্তিরই সাহায্যে মন্বাদিরও সর্ব্বজ্ঞতা কেন খণ্ডিত হইবে না, তাহার উত্তর প্রতিবাদ-কর্ত্তা কিছুই বলেন নাই।" আহা, রোগটা এতই প্রবল যে, নিজের কথাও মনে থাকে না, পরের কথা ত নয়ই। প্রতিবাদ-লেখকের কথা,—"মানুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, ইহাই হইল মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বজ্ঞোঽসাবিত্যাদি" (মাসিক বসুমতী পৌষসংখ্যা ৩৮০ পৃঃ ২ কলম শাস্ত্র-সমস্যা)।

মানুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্ত কুমারিল কিছুই বলেন নাই। বুদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্তই বলিয়াছেন। তাঁহারই প্রতিজ্ঞা-বাক্য 'বুদ্ধাদীনামসার্ব্বজ্ঞ্যং' বুদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। এবারে প্রতিবাদ-লেখক সে কথা ভুলিয়া গিয়া বলিতেছেন, "মন্বাদিরও সর্ব্বজ্ঞতা কেন খণ্ডিত হইবে না"—তাহার উত্তর আমিও দিয়াছি, কুমারিলও দিয়াছেন, তথাপি বলি, তাহা না হয় তর্কের বিষয় হইতে পারে, 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া ঘোষণা করা কি সুস্থ ব্যক্তির কর্ম্ম?

উহা যে মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনার্থ প্রযুক্ত নহে,—তাহার কারণ, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "বিগানাৎ কৈশ্চিদেব পরিগ্রহাৎ।" অর্থাৎ অবিগীতত্ব ও শিষ্টপরিগৃহীতত্ব হেতু দ্বারা মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতার অনুমান করা যাইতে পারে, বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতার অনুমানে সেই প্রকার হেতু নাই। অবিগীতত্ব অনিন্দিতত্ব—শিষ্ট সম্প্রদায়ে মন্বাদির প্রতারক বলিয়া নিন্দা নাই, বুদ্ধাদির তাহা ছিল, শিষ্টগণ বা মহাজনগণ মন্বাদিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আদর করিয়াছেন, বুদ্ধাদিকে তাহা করেন নাই। ইহাই কুমারিলের অভিপ্রায়।

কুমারিলের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমিও তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি (বসুমতী ১৩৩৫ মাঘ-সংখ্যা ১৮০ পৃঃ)। আরও বলিয়াছি; "কুমারিল ভট্ট ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা একটি কারিকায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, যথা,—

'বচনাদৃত ইত্যেবমপবাদো হি সংশ্রিতঃ।
যদি ষড়্ভিঃ প্রমাণৈঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ কেন বার্য্যতে॥'

ভট্টমতে প্রমাণ ষড়্বিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। এই ষট্ প্রমাণের যথাযথ প্রয়োগে যদি সর্ব্বজ্ঞতা হয়, তাহার নিবারণ হয় না।"

"মীমাংসক-কেশরী পার্থসারথি মিশ্র এই কারিকার টীকায় লিখিয়াছেন,—

'অনিরাকরণীয়ত্বাদপি সর্ব্বজ্ঞস্য ন
তন্নিরাকরণপরং শাস্ত্রমিত্যাহ যদীতি।'

সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন অকরণীয়, এই হেতু তাহার খণ্ডনার্থ ভাষ্যের সন্দর্ভ নহে।"

সুতরাং যে স্থলে বার্ত্তিকাদিতে সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন আছে, বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডনই সে স্থলে স্পষ্টভাবে কথিত; কারণ, তাঁহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকার না করায় যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, ইহাই মীমাংসকাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। (বসুমতী ফাল্গুন-সংখ্যা ৭৬৮।৬৯ পৃঃ শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রবন্ধ)। তথাপি "মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা কেন খণ্ডিত হইবে না, তাহার উত্তর প্রতিবাদকর্ত্তা কিছুই বলেন নাই" মদীয় প্রতিবাদ-লেখকের এই উক্তি কি নির্লজ্জতার জ্ঞাপক নহে? অতএব ইহা ৪নং।

৫। "সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্ববেদজ্ঞতা মন্বাদির ছিল না, কুমারিলের এই মত যদি কেহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও জ্ঞানপূর্ব্বকই আমি তাহা মানিব না; কারণ, ঋষি অপেক্ষা কুমারিলের কথা অধিক মান্য নহে।" ইত্যাদি—আমার কথা উদ্ধৃত করিয়া 'প্রতিবাদ-লেখক' বলিয়াছেন, "ইহা জিদ ছাড়া কি হইতে পারে? কুমারিলের এই মনুষ্যমাত্রের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন কোন্ ঋষিবাক্যের বিরোধ করিতেছে, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই।" আমি বলি, এমন ভুল কি প্রকৃতিস্থের হয়? আমি যথাস্থানেই দেখাইয়াছি, "ঋষিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ শক্তির পরিচয় বৈদিক মন্ত্রে এবং ব্রাহ্মণভাগে নানা স্থানে আছে। ঋগ্বেদ চতুর্থ মণ্ডল ১৮ সূক্তে বামদেব ঋষির সমিধাগ্নিং দুবস্যত এই যজুর্মন্ত্রের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পরুচ্ছেপ ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান ও শ্বেতাশ্বতর ষষ্ঠ অধ্যায় ও বেদপ্রস্থানে বহু স্থলে সর্ব্বজ্ঞতার নিদর্শন আছে।"

"সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা"
"সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।"

ইত্যাদি মনুস্মৃতি মহাভারত এবং অন্যান্য স্মৃতি-পুরাণাদিতেও ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা উজ্জ্বলাক্ষরে বর্ণিত। পতঞ্জলির সূত্রও দেখাইয়াছি—

"ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যসংযমাৎ। প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্"

(গত পৌষের বসুমতী ৪৪৫ পৃঃ) এই সব লিখিয়াছি। কুমারিল অতীন্দ্রিয় দর্শন অস্বীকার করিলে বা সর্ব্বজ্ঞতা অস্বীকার করিলে, ঐ সকল শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হয়। ইহা ত পুরাতন কথা। তবে মহাভারতের বচন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর অনায়াসে দিতাম, যথা—

"তস্মৈ প্রোবাচ তৎ সর্ব্বং পিতা পুত্রায় পৃচ্ছতে।
অতীতানাগতে বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥"—

প্রতিবাদ-লেখক তাহা না করিয়া স্বীয় বিস্মৃতিরই পরিচয় দিয়াছেন। আর কুমারিলের যে সকল উক্তি তাঁহার অনুকূল, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই, সেই সকল উক্তির জয়ন্ত-ভট্ট, বল্লভাচার্য্য, আচার্য্য উদয়ন, গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতির কৃত খণ্ডন আমি আর দেখাইব কেন? আমি নৈয়ায়িকাচার্য্যগণের শিষ্যপরম্পরাস্থিত ও সূত্রকার অক্ষপাদের বংশধর, সুতরাং নৈয়ায়িকাচার্য্যখণ্ডিত কুমারিলমত মান্য না করা আমার জিদ নহে, আমার ধর্ম্ম। অতএব এই প্রসঙ্গের যে উক্তি, তাহা প্রতিবাদ-লেখকের ৫ নং লক্ষণ।

৬। ষট্‌প্রমাণ প্রয়োগে সর্ব্বজ্ঞতা কুমারিল প্রভৃতি মীমাংসাচার্য্যগণ মানেন, তাহা দেখাইয়াছি; কিন্তু আগম-নিরপেক্ষ সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহারা মানেন না, কাযেই ঈশ্বর তাঁহা-দিগের সম্মত নহেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার কারিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—আগম (বেদ) পাঠ করিয়া তাহার সহায়তায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ যিনি করেন, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। ঈশ্বরাস্তিত্ববাদীর ইহাই মত। কারণ, স্বতঃ সর্ব্বজ্ঞতা ঈশ্বরের আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্ববিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান।

"আগমস্য চ নিত্যত্বে সিদ্ধে তৎকল্পনা বৃথা।
যতস্তং প্রতিপদ্যন্তে ধর্ম্মমেব ততো নরাঃ॥"

শ্লোকবার্ত্তিক চোদনা-সূত্র ১২০।

আগমনিত্যত্বেঙ্গীকৃতে বৃথৈব সর্ব্বজ্ঞ-কল্পনেত্যাহ। যেনৈবা-গমেন সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদ্যং তেন ধর্ম্ম এব প্রতিপাদ্যতাং কিমন্তর্গড়ুনা সর্ব্বজ্ঞেন।

(পার্থসারথি মিশ্রকৃত টীকা)।

আগম নিত্য, ইহা স্বীকার করিলে, সর্ব্বজ্ঞ-কল্পনা নিরর্থক; কারণ, যে নিত্য আগমপ্রমাণে সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ করিবে, সেই আগম হইতেই ত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পার, মাঝে এক জন সর্ব্বজ্ঞ মানিয়া লাভ কি? অতএব সিদ্ধান্ত এই—

মীমাংসক, বেদকে নিত্য বলেন, সেই বেদই ধর্ম্মের উপ-দেশক, সেই মতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর মানিবার কোন কারণ নাই। মীমাংসকের এই নিরীশ্বর মত ভগবান্ উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে নিরাকরণ করিয়াছেন। জরন্নৈয়ায়িক নামে প্রসিদ্ধ জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে কুমারিলের মত তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাতেও সর্ব্বজ্ঞেশ্বরবাদ স্থাপিত হইয়াছে, যোগজ প্রত্যক্ষে সর্ব্বজ্ঞতাও সাধিত হইয়াছে, বুদ্ধমতের অপ্রমাণ্যও স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহার বায়ুপূর্ণ মস্তকে মীমাংসা বা ন্যায়মত স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাঁহার নিকট এ সব তথ্য একেবারেই নূতন। কাযেই শবরস্বামী, কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতির সিদ্ধান্ত না মানিয়া অর্ব্বাচীন আপোদেবের চটির সহায়তায় 'ঈশ্বর' নাম দেখাইতে হইয়াছে। আপোদেবের কথিত ঈশ্বর কেমন, তাহা 'প্রতিবাদ'-লেখকের উদ্ধৃত অংশ হইতেই প্রমাণিত,

"ঈশ্বরো গতকল্পীয়ং বেদার্থং স্মৃত্বা উপদিশতি"

(বসুমতী চৈত্র ৮৯১ পৃঃ ২ কলম)

আপোদেবের মতের এই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞতা মুনি-ঋষির সর্ব্বজ্ঞতার ন্যায়। ইনি পূর্ব্বকল্পে যে বেদার্থ অনুভব করেন, তাহাই স্মরণ করিয়া পরকল্পে উপদেশ প্রদান করেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অধীতবিদ্য গুরু, ছাত্রকে স্বীয় অনুভূত অর্থ স্মরণ করিয়া উপদেশ দেন—সেইরূপ। যাঁহার স্মরণ করিতে হয়, তিনি মনুষ্যবৎ মন ও শরীরবিশিষ্ট, ইহা মানিতেই হয়। শরীরাবচ্ছেদে আত্মমনঃসংযোগ ব্যতীত স্মরণ হওয়ার দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য। ন্যায়, পাতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি বর্ণিত সর্ব্বকারণ ঈশ্বর স্মরণকর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, মীমাংসক সম্প্রদায়ের শিশু আপোদেব সিংহপরিত্রস্ত যূথভ্রষ্ট হরিণ-শাবকের ন্যায় নৈয়ায়িক পরাক্রমে কাতর হইয়া অস্বাভাবিক শব্দও করিয়াছেন, মীমাংসক মত ত্যাগ করিতেও বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষস্বরূপ এবং সেই জ্ঞানের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। আপোদেব বলিতেছেন, ঈশ্বর স্মরণ করেন, স্মরণ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার উৎপত্তি আছে, নাশ আছে, ইহাই হইল আপোদেবের অস্বাভাবিক শব্দ। তবে এই ঈশ্বর যদি কার্য্যস্বরূপ হন, অর্থাৎ যজ্ঞফলে কোন জীব ব্রহ্মার গদি পাইয়া ব্রাহ্ম একশ' বৎসর তাহা ভোগ করত ঈশ্বর নামে পরিচিত হয়েন ত সে কথা পৃথক্, সেরূপ স্বর্গবাসী জীব মীমাংসকের স্বীকৃত; তিনি কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর নহেন।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত, ইহা ন্যায়মত। মীমাংসা-দর্শন-ভাষ্যকার শবরস্বামী জৈমিনি-সূত্রাবলম্বনে বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কাহারও কৃত নহে।

"সম্বন্ধুরভাবাৎ, কথং সংবন্ধা নাস্তি প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্য অভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাদ ইতরেষাম্।" উক্ত সম্বন্ধের কর্ত্তা কেহই নাই, কারণ, তাঁহার অস্তিত্বে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই। ন্যায়মতে ঈশ্বরাস্তিত্বে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডনার্থ কুমারিল বলেন, "কর্ম্মভিঃ সর্ব্বজীবানাং তৎসিদ্ধেঃ সিদ্ধসাধনম্" (শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপ ৭৫) অর্থাৎ কর্ম্ম অচেতন হইলেও জীব সকল চেতন, তাহাদের সম্বন্ধ বশতঃই কর্ম্ম ফল উৎপাদন করিবে, অতএব কর্ম্ম-ফলদাতৃত্বরূপে ঈশ্বরস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। কাযেই নৈয়ায়িকের ঐ প্রকার অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ত নাই-ই। এইরূপ ঈশ্বরখণ্ডন শ্লোকবার্ত্তিকে সাধিত। (শ্লোকবার্ত্তিক—সম্বন্ধাক্ষেপ দ্রষ্টব্য) কুসুমাঞ্জলির প্রকাশে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'মীমাংসকানীশ্বর-সাংখ্যমতে নেশ্বরে সম্প্রতিপত্তিঃ' অর্থাৎ মীমাংসক এবং নিরীশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আরও আছে, কুমারিল প্রভৃতি প্রকৃত মীমাংসকগণ সৃষ্টি ও প্রলয় মানেন না, যথা—

"তস্মাদদ্যবদেবাত্র সর্গপ্রলয়কল্পনা।
সমস্তক্ষয়জন্মভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা॥"
(শ্লো, বা, সম্বন্ধাক্ষেপ ১১২)

অর্থাৎ আজও যেমন জগৎ আছে, পূর্ব্বেও তেমন ছিল, পরেও থাকিবে, সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংস কখনই হয় না, সুতরাং সৃষ্টি ও প্রলয়ের কল্পনা অপ্রমাণ। সৃষ্টি ও প্রলয় না মানিলে কল্লান্তরের সম্ভাবনাই হয় না। কিন্তু আপোদেব বেচারা, ভয়ে কুমারিলকে ছাড়িয়া উদয়নাচার্য্যের যুক্তিই মানিয়াছেন—'যঃ কল্পঃ স কল্পপূর্ব্বকঃ"। এ হেন আপোদেব প্রতিবাদ-লেখকের মুরুব্বী। এখন শবরস্বামী, কুমারিল কোথায় রহিলেন? এইরূপ নির্লজ্জ বিরুদ্ধভাষণ কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি করিতে পারে না। ইহা হইল ৬ নং।

৭। গত ফাল্গুন সংখ্যার বসুমতী ৭৭৯ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, 'প্রতিবাদ'-লেখক 'হিন্দু কি চাহে' প্রবন্ধে গীতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে--

"কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

বসুমতীর গত চৈত্র সংখ্যায় সেই লেখকেরই 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধ পাঠ করুন (৮৮৫) 'কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া' 'আমি সব চেয়ে বড়' এই ভাব কত স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব' বলিতে যাঁহার হৃদয় প্রেমার্দ্র,—তিনি ভগবানের—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' এ উপদেশ কেমন পালন করিতেছেন—উক্তি ও কার্য্যের এই যে অসামঞ্জস্য, ইহা ৭নং লক্ষণ। এই সপ্তস্কন্ধের প্রত্যেক স্কন্ধকেও ৭ দিয়া ভাগ করা যায়, ইতি ৪৯। কেবল, বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম, সুধী পাঠকের উপর বিশ্লেষণ-ভার অর্পিত হইল।

বিচার আরম্ভ করিয়া অবধি 'সমস্যা' ও 'প্রতিবাদ'-লেখকের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছি, তবে রোগ ধরিতে পারি নাই, এবারে ধরিতে পারিয়াছি, তাই দুঃখিত চিত্তে 'বিচার' সমাপ্ত করিলাম।

এখন সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি,—মদীয় 'প্রতিবাদ'-লেখকের হিন্দু সমাজ সম্মেলনের সভাপতি পদ-ত্যাগও এই রোগবশেই হইয়া গিয়াছে, অতএব সম্মেলনের কল্যাণকামিগণ নিরাশ হইবেন না। সুস্থ হইলেই তিনি তাঁহার কথা ও কার্য্যে ঐক্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া আশা করি।

হিন্দু মহাসভা ও হিন্দুসমাজ সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, সম্মেলনের কোন উদ্যোক্তা তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বজাতির ব্রাহ্মণ্য ঘোষণা করেন,—কিন্তু সভাপতি না কি তাহাতেই পদত্যাগ করেন।

তিনি অভিভাষণেও নানাস্থানে বলিয়াছেন, "স্মরণাদপি কচিৎ শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে—" ইহার উপর তাঁহার গুরুমুখী "সনাতন কৃত দুর্গম সঙ্গমনী" (?) সহায়। সুতরাং একবার হরিনামেই ব্রাহ্মণ হওয়া ত আছেই, তবে সে ব্রাহ্মণ্যের জলুষ হয় দীক্ষায়। তাঁহার কথা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের সন্তান যেমন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত হাতে কলমে যজ্ঞ করিতে পারে না, সেইরূপ সকৃৎ হরিনাম স্মরণে দুর্জাতির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত নরনারী,—অনুপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানের ন্যায় থাকে, ভাগবত-দীক্ষা তাহার উপনয়ন-স্থানীয়। সভায় একবার হরিধ্বনি করিয়া সকলকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইলেই ত হইত। তাহা হইল না কেবল রোগে; অমন যে সর্ব্বংসহ সৌম্য পুরুষ, তিনিও অস্থির হইলেন—ইহা রোগেরই পূর্ণ লক্ষণ।

অনেক দিন দেখা-শুনা নাই, আলাপও নাই,—ঠিক যে কি, তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন—তথাপি ইহা নিশ্চয় যে,

পণ্ডিতের মস্তিষ্কটা ঠিক নাই। ক্রমাগতই মতপরিবর্ত্তন হইতেছে। এ অবস্থায় তাঁহার বাক্য ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য অসম্ভব নহে।

আমি হৃদয়ের সহিত কামনা করিতেছি, প্রতিবাদ-লেখকের মস্তিষ্ক শীতল হউক, সম্মেলনের সভাপতি পদ পুনর্গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ সম্মেলনকে অবশ্যই তিনি কৃতার্থ করিবেন।

আর যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, তাঁহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি, ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে এই ৩৬ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত আমার যে যে প্রবন্ধ বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া—প্রতিবাদ-লেখকের অতীত ও ভবিষ্যৎ উক্তি সমূহ প্রণিধান সহকারে বিচার করিলেই বুঝিবেন, প্রতিবাদ-লেখকের সকল উক্তিই অসার ও অসঙ্গত। প্রতিবাদ-লেখকের শক্তি পরীক্ষা বহু-দিন ধরিয়া করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছি। তবে শাস্ত্রার্থ-প্রমাণশূন্য গালাগালিতে যদি জয়মাল্য অর্জ্জন করা যায় ত তাহা প্রতিবাদ-লেখকের প্রাপ্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। ইত্যলম্—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।

অনুপম

(ইংরাজী কবিতা Agnesএর ভাব লইয়া লিখিত)

প্রভাত-শিশির-সিক্ত কমল-কলিকা,
হেলে দুলে খেলে যথা স্নিগ্ধ সরোবরে ;—
দেখিনু মায়ের কোলে খেলিছে বালিকা
অমিয় ক্ষরিছে তার আধ আধ স্বরে।

গেছে কত দিন—তারে দেখিনু আবার
প্লাবন-উন্মুখ যেন পূর্ণ স্রোতস্বিনী ;—
উল্লাসে নাচিয়া চলে গর্ব্বে আপনার,
ঢল ঢল অঙ্গে তার ধরে না লাবণি।

প্রস্ফুট-কমল-মুখী সতত চঞ্চলা,
হরিণীর মত দুটি নীল আঁখি-তার ;—
চলিতে চরণ-ভঙ্গে দুলিছে মেখলা,
ভাবিলাম সার সৃষ্টি এই বিধাতার।

বয়স গিয়াছে বহি, আর এক দিন
বসি' আছে রুগ্ন দেহে শিশু লয়ে ক্রোড়ে ;—
প্রভাতের চন্দ্র যেন নিষ্প্রভ মলিন
বিতরি আপন স্নিগ্ধ জ্যোতি চরাচরে।

দিয়াছে শিশুরে সঁপি দেহের গরিমা,
ক্ষীণ ছায়া অবশেষ আছে মাত্র তার ;—
দেখিনু মহিমময়ী ত্যাগের প্রতিমা,
ধন্য সেই শিল্পী এই রচনা যাহার।

কিন্তু যেই দিন তার জীবন-সন্ধ্যায়
দেখিলাম শেষ দৃশ্য ভরিয়া নয়ন ;—
শুয়েছে অনিন্দ্যরূপা শ্মশান-শয্যায়,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মতন !

তৃণ-শয্যা'পরে পড়ি' স্থির অচঞ্চল,
অনিন্দ্য সে দেহলতা অপূর্ব্ব গঠন ;—
স্বচ্ছ-সরোবর-বুকে যেন শতদল
নিষ্প্রভ, দিবস-শেষে মুদিছে নয়ন।

সে দিন বুঝিনু কিবা শোভা অনুপম,
কি মাধুরী নিরন্তর বহে শতধারে ;—
চ'লে যাবে ক্লান্ত পান্থ নিষ্কাম নির্ম্মম
অনন্ত আনন্দ-ধামে তমোরাশি-পারে !

শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ ঘোষ।
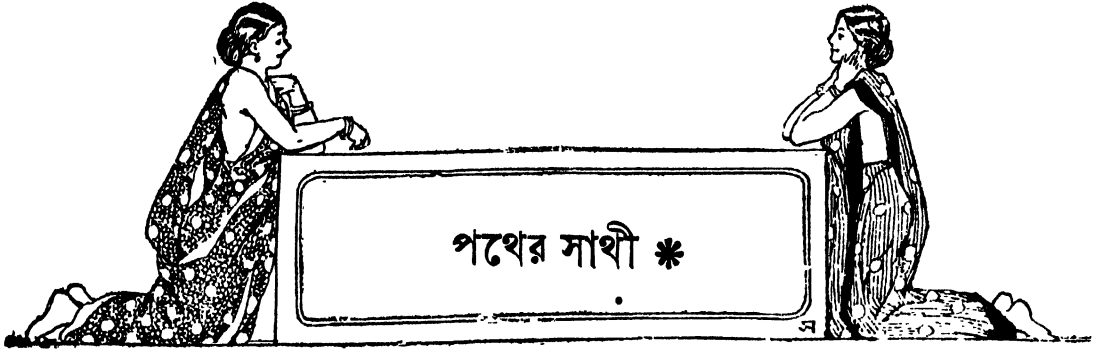
(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালিকাবিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত বোর্ডিং বাড়ীর একটি ত্রিতলস্থ কক্ষে দুইটি পরীক্ষার্থিনী বালিকা খাতা-পেন্সিল লইয়া অঙ্ক কষিতেছিল।

এক জন উহারই ভিতর দুই একবার অসহিষ্ণু হইয়া লেখা বন্ধ করিয়া বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া উঠিল, এবং অঙ্কটির আগাগোড়া ভুল হইয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ উহা সংশোধিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটু পরেই একবার বিরক্ত হইয়া পেন্সিলটা ছুড়িয়া ফেলিল এবং মুখখানা অন্ধকার করিয়া কুঞ্চিত নয়নে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকিল, তার পর আবার পেন্সিল কুড়াইয়া লইয়া অঙ্কটির প্রতি পুনঃ মনোনিবেশ করিল। অপর বালিকাটি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য সহ নিজ কার্য্যেই রত ছিল; সঙ্গিনীর এই অসহিষ্ণু কার্য্য-কলাপগুলি লক্ষ্য করিলেও সে যেন এ সব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমনই ভাবেই যথাকার্য্যে নিরত থাকিল।

প্রথমা বালিকা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের দু'একটা কষা বাকি রাখিয়াই উঠিয়া পড়িল। সখীটির দিকে ফিরিয়া দেখিল, সে আবার একটা নূতন অঙ্কের পত্তন করিতেছে। ইহা দেখিয়া ক্ষিপ্রচরণে সে আসিয়া তার হাত হইতে খাতাখানা ফস্ করিয়া টানিয়া লইল, বলিল, "বাঃ রে বাঃ; আরও এখনও বুঝি পারা যায়? আয় না ভাই; একটু গল্প-সল্প করি! কবে যে এ ছায়ের এগ্‌জামিন শেষ হবে! বাপ্ রে বাপ! হাঁপিয়ে উঠতে হয়। শেষ ক'রে উঠবি? ইস্! তা' আর নয়! তা হ'লে সেই সঙ্গে আমাদেরও শেষ হয়ে যাবে। আয় আয়, একটুখানি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়া যাক্ গে, আয়!"

"তোমার সঙ্গে পারা যাবে না ত রুবি! তুমি যেন একটি জীবন্ত ঝড়!"

প্রথমা মেয়েটি এই মন্তব্যে মৃদু হাসিয়া দ্বিতীয়ার গাল টিপিয়া ধরিল, বলিল, "তাই ত ময়লাটুকুকে যখন-তখন উড়িয়ে নিই! ওরে, তুই যে বেঁচে গেলি, তা বুঝি বুঝতে পারলিনে? নিশ্চয়ই তোর আঙ্গুল ব্যথা আর ঘাড় টন্ টন্ করছিল। আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল্, করছিল কি না?"

সঙ্গিনীর জবরদস্তিতে মলয়া হাসিয়া ফেলিয়া ইহা স্বীকার করিয়া লইল। তার পর একখানা খাটেই দুই জনে পাশাপাশি শুইয়া পড়িয়া কহিল, "করলেই বা কি? পাশটা ত কোন রকমে ক'রে ওঠা চাই! আর ত বেশী দেরীও নেই ভাই, বেশী ক'রে না পরিশ্রম করলে হবে কেন?"

রুবির আসল নাম করবী। করবী তার সূক্ষ্ম ও সুললিত ভ্রূযুগল উর্দ্ধে টানিয়া তার বিশাল ও ঘন-তারক চোখ দুইটাকে বিস্তৃত করিয়া অবজ্ঞাসূচক স্বরে উত্তর করিল, "তা ব'লে ত আর প'ড়ে প'ড়ে মারা যেতেও পারিনে!"

মলয়া হাসিল, হাসিয়া বলিল,—"মেয়ে ত বড়ই পড়েন কি না, তাই প'ড়ে প'ড়ে মারা যাচ্ছেন! ভাগ্যিস্ ভগবান্ মাথাটা অমন তর্‌তরে দিয়েছিলেন, তাই, নইলে তোর যে কি দশা হতো। যা তুই চঞ্চল!"

করবী ঠোঁট ফুলাইয়া উত্তর করিল, "ওঃ ভারী ত! কি আর মন্দ দশাটা হতো? যা হাজার হাজার বাঙ্গালী-মেয়েদের হয়, না হয় তাই-ই হতো আর কি? এত দিনে একটা বর জুটে যেত, শ্বশুরবাড়ী যেতুম, একরাশ গয়না হতো, ভাল ভাল বেনারসী পার্শী, ঢাকাই কাশ্মিরী বোম্বাই শাড়ীর গাদা, এবেলা একখানা আর ওবেলা একখানা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পরতুম—"

বাধা দিয়া মলয়া সলজ্জ তিরস্কারে বলিয়া উঠিল—"যাঃ, যাঃ, ভারী ত লাভ দেখাচ্ছেন! আর শ্বশুরবাড়ীতে যে ঘোমটা টেনে বড়াই বুড়ী হয়ে বেড়াতে হতো। গাদা গাদা পাণ সাজা, সুপুরী কাটা, কুটনো কোটা, হয় ত ভাত রান্না, সখড়ী পাড়া, না পারলে শাশুড়ীর হাতের ঠোনাটা-ঠানাটা—"

* এই উপন্যাসখানি "ভারতী"তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতে আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরেই 'ভারতী' পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহা সংশোধিত হইয়া এবার "বসুমতী"তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। 'ভারতীতে' যাঁহারা ইহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার অকাল-গতিরোধ হেতু দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন জানিয়াই এই পুনরুদ্যম। বলা বাহুল্য, উপন্যাসখানির অতি সামান্য অংশই 'ভারতীতে' বাহির হইতে অবসর পাইয়াছিল। 'ভারতী'তে প্রকাশিত অংশ অনেকেই পড়েন নাই—পড়িলেও এত দিন তাহা স্মরণ থাকিতে পারে না। পাঠকগণকে সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি পড়িবার সুযোগ দিবার জন্য ভারতীতে প্রকাশিত অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে, পরবর্ত্তী সংখ্যায় নূতন অংশ সাধারণ অক্ষরে মুদ্রিত হইবে।—লেখিকা।

"হুঁ:! আর ওর ভালর দিক্‌টাই বুঝি বাদ প'ড়ে যাবে? সেটা যে একবারও বল্লিনে বড়?"

মলয়া ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল,—"যা ভালই নয়, তার আবার ভাল কি!—কি ভালটা শুনি?"

করবী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "কেন, বর? বরটির কথা বেমালুম চেপে গেলি যে বড়? বরের মতন ভাল আর জগতে কি আছে? বল ত?"

মলয়া আঁৎকাইয়া উঠার অভিনয় করিয়া সত্রাসে কহিল, "ও বাবা! ওই জিনিষটার কথা মনে হলেই আমার ত ভাই, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!"

এই কথা শুনিয়া করবী একবাবে উচ্চ মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া মলয়ার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং হাসির ধমকে বেদম হইয়া পড়িয়াও কহিতে লাগিল, "আমি কিন্তু ভাই, বর জিনিষটাকে বড্ডই পছন্দ করি। সত্যি ক'রে বল্‌ছি তোকে, মনের মতন পেলে একটাকে এখ্‌নি আমি নিতে রাজী আছি।"

মলয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া সবেগে উহাকে ঠেলিয়া দিল, সকোপে কহিল—"দূর হ!"

করবী উহাকে জড়াইয়া থাকিয়া ক্রমাগতই হাসিতে লাগিল —কহিল, "কেন, ভাই! কি মন্দটা? একটা জলজ্যান্ত জোয়ান পুরুষমানুষ আমার দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে থাক্‌বে, আমার কথায় ওঠ-বোস্ করবে, তার চিরদিনের সকল শ্রম সকল চেষ্টায় উপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব আমারই এই পায়ের তলায় ইচ্ছাসুখে সমর্পণ ক'রে দেবে। আচ্ছা, ভেবে দেখ দেখি, এর চেয়ে আর কি সুখের আছে? মজার আছে?"

মলয়া একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি ত ভাই ও কথা ভাবতেও পারলুম না। আমার ঐজন্যে নভেল পড়্‌তেই ভাল লাগে না। প্রত্যেক নভেলের মধ্যেই দেখতে পাই যে, সেখানে এক একটা নায়িকার প্রায়ই দু দুটো ক'রে লাভার জুটেছে। আর তাদের মধ্যে একটা না একটা 'ডুয়েলে' প্রাণ দিচ্ছে, না হয় বিবাগী হয়ে চ'লে গেল, না হয় 'সুইসাইড' করলে; কিছু না কিছু একটা বিশ্রী বিভ্রাট না ঘটিয়ে ছাড়েই না। অথচ মেয়েটা দেখি যে, দিব্যি স্ফুর্ত্তি ক'রে অপরটাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে নেচে কুঁদে বেড়াতে লাগল। বাপ রে বাপ! আমি ওসব ভালবাসিনে বাপু! পুরুষমানুষের মধ্যে বাবা, কাকা আর ঠাকুরদা মশাই-ই যা ভাল। তাও ছোট ঠাকুদ্দা আমায় যা ঠাট্টা করে, সে কিন্তু ভাই মোটে ভাল নয়। বাইরের পুরুষদের আমি দু'চক্ষে প'ড়ে দেখতে পারিনে। একটা মেয়ে দেখলে তারা যেন হাঁ ক'রে গিলতে আসে। কেন রে বাবা! আমরা কি সন্দেশ? না মোণ্ডা?"

করবী বলিল, "কে তোর নাম মলয়া রেখেছিল রে? তোর নাম রাখা উচিত ছিল, জগদম্বা না হয় ত আর-না-কালী! আমার জন্য যদি কেউ 'ডুয়েল' লড়ে মরে, আমি ত মনে করবো, আমার মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোটাই সফল হলো! যে নভেল-গুলোয় ঐ রকম সব নায়কদের কথা থাকে, আমি সেইগুলোই বেছে বেছে নিয়ে পড়ি। যতই বল বাপু, এটা কিন্তু সবাইকেই স্বীকার করতে হবে যে, যখন থেকে জগতে নর এবং নারীর সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই সুন্দরী নারীর রূপের জন্য পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে একটা মহা সংঘাত বরাবরই চ'লে আসছে। পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় বড় যুদ্ধগুলো, অবশ্য আধুনিক রুস-জাপান বা এবারকার জার্ম্মাণ-যুদ্ধ নয়; পুরাতন কালের,—সমস্তই নারী-সৌন্দর্য্যের অধিকার নিয়েই ঘটেছিল। ট্রয়ের যুদ্ধ, রামায়ণের, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর, রুক্মিণী, সুভদ্রা আর সেদিনও ওই দেবলাদেবী, পদ্মিনী নিয়ে এ সবই দেখ রূপসীর রূপের জন্য! আহা, আমি যদি সেই সব স্বর্ণ-যুগে জন্মাতুম, আর তেমনি একটা রূপসী হতুম! অন্ততঃ পদ্মিনী বা নুরজাহানের মতনও—যদি কোন আলাউদ্দীন বা জাহাঙ্গীর আমার জন্য কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়ে মারকাট-ধ্বংস ক'রে আমায় পেতে চাইতো! তা না কি এক ছায়ের দিন এ বল দেখি?"—

মলয়া এবার বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "তুই কি ভাই? না না, ওসব কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাও ভাল না, ভাই, থাম। বাব্বা, আমার জন্যে—এই চ্যাপসা কালো চেহারার জন্যে—কেউ অবশ্য কোন দিনই কাটাকাটি মারামারি ক'রে মরেওনি, আর কোনও দিনই তা মরবেও না জানি, তবু এমনি একটা কথার কথায় বলছি, যদি তা' মরতো, তা হ'লে আমি ত কোন মতেই একটা দিনও আর বাঁচতে পারতুম না। উঃ, মনে হলেও যেন গা কেঁপে যায়। না ভাই রুবি, তুই ভাই, যখন-তখন সবতাতেই ওসব বাজে কল্পনা মনে আনিস্‌নে। যতই হোক, আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে।"

করবী তার পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট গভীরভাবে উল্টাইয়া ক্রোধাভি-নয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিল, "এ মেয়েটাকে কেউ শূলে চড়ায় না! দেখ মলি! ঐ ক'রে করেই তোরা এই জাতটাকে উঠতে দিবিনে। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, আর ওরা সব বাঙ্গালীর ছেলে, —অতএব আমাদের এক একখানি ফুলের বিছানা বা সাঙ্ঘাতিক রোগীর মতন হাওয়ার গদী পেড়ে শুয়ে থাকাই শ্রেয়, আর চারটি চারটি পোরের ভাত বা সাবুদানা চুক্ চুক্ চুক্ চুক্ ক'রে খেলুম, ভাজা মাছখানিকে যদি কেউ উল্টে খেয়েছি ত অমনি গেছি!

মলয়া বাধা দিয়া বলিল, থাম রুবি। মুখে বক্তৃতার ঝড় বইলে আর থাম্‌তে চায় না।"

করবী থামিল না, গম্ভীরভাবে বলিয়া চলিল, "এমন ক'রে জীবনপাত করলে সমাজের চিরবদ্ধ ডিসিপ্লিন নষ্ট না হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাতে ক'রে কখন কারু জীবন গড়ে না। যাদের প্রাণধারণ কররার জন্যই আহার, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্যই স্ত্রী-পুত্র, চাকরী করবার জন্যই বিদ্যালাভ, তাদের সমস্ত শক্তি, সকল কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাই ত ছেলেবেলা থেকে বাড়ীর মধ্যে ঘেরা হয়ে গেছে, তার বাইরে ইহলোকে তাদের কোন বড় কায করবার অধিকারই বা কোথায়? আর পরলোক? পরলোকের সুখটা যদি অতই সহজ সত্য হোত যে, যথানিয়মে একবার কেউ চোখ বুজে নিরাকারকে চিন্তা করলেন বা বা ডাকলেন, কেউ বা কোনমতে অবসর ক'রে নিয়ে দুটো শুকনো বেলপাতা আর তাজা ফুল ঝুপ-ঝাপ ক'রে সাকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কায সারলেন, তাতেই সে দিকের পথটা সাফ হয়ে রইলো, তা হ'লে এ পৃথিবীটায় এত দিনে মানুষের বদলে কেবল গোটাকতক ফড়িং চ'রে বেড়াতে দেখা যেত। মানুষগুলো সব ভগবানের ঘরের মধ্যে জটলা পাকিয়ে তাঁরই মূর্ত্তি ধ'রে ধ'রে ব'সে থাকতো। তা' নয় গো তা' নয়—প্রথম ভাগের

গোপালের মতন ভাল ছেলে হ'লে বাঙ্গালী মা-বাপদের বিস্তর সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাতে জাতির ইহকালের বা পরকালের বিশেষ সুবিধা হয় না।"

"তা হ'লেই কি দ্বিতীয়ভাগের বেণীর মত দুরন্ত বালকরাই তোমার মতে জাতির উদ্ধার-কর্ত্তা!" মলয়ার মুখখানি পরম গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত হইয়া আসিল।

করবী বলিল, "তা আমার মনে হয় কতকটা তাই বটে। গোটাকতক দৃষ্টান্তও দিচ্ছি, মিলিয়ে নে, গুণে যা,—এক তৈমুরলঙ্গ, দুই নাদিরশা, তিন সেরশাহ; অপরপক্ষে দেখ লর্ড ক্লাইব—যার দুরন্তপনার জ্বালায় অস্থির হয়ে যাকে সাতসমুদ্র তের নদী পারে তার আত্মীয়রা মিলে ঠেলে দিলে যে, ওটা মরে মরুক, বাঁচে বাঁচুক, ম'রে যা হোক একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যায় যাক, সেই অশান্ত দুরন্ত ছেলে এসে কি না এতবড় সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যটাই স্থাপন ক'রে বসলো।"

"তা হোক ভাই, ঐ শোন ত,—চারুদির জুতোর শব্দ না? এক্ষণি এসে কতকগুলো বকুনি দেবেন. তোর ভরসা থাকে, তুই শুয়ে থাক, আমি কিন্তু উঠে পড়লুম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোর্ডিং বাড়ীটির উঁচু পাঁচীলের ভিতরদিকে কয়েকটা দেবদারু, ঝাউ, ফলসা প্রভৃতির বড় বড় গাছ ছিল। তেতলার যে ঘরখানায় করবী ও মলয়া বাস করিত, তাহার জানালার সামনে একটি ঋজুদেহ দেবদারু সন্নত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া সম্মুখের অনন্তবিস্তার নীলসমুদ্রের মত শূন্যপটে একটি সুন্দর রেখা চিত্রিত করিয়াছিল। তার সরু সরু ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের, জ্যোৎস্নার, সূর্য্যালোকের ও বৃষ্টিধারার ক্রীড়া-গতি অনেক সময়েই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত ও তাহাদের দিকে মেয়ে দুইটির চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া লইত। তবে এ সব শান্ত সৌন্দর্য্যের উপভোক্তা ছিল মলয়াই। করবীর চোখে তার ক্ষীণদেহের সহিত ঝড়ের তাণ্ডবের লীলাই সমধিক আকর্ষণীয়।

আজও মলয়া নিজেদের সেই ঘরখানার জানালার ধারে বসিয়া ছিল। মৃদু বাতাসে দেবদারুর পাতাগুলি সির্ সির্ ঝির্ ঝির্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কখনও তারা বায়ুর সহিত যোগ দিয়া পুলকে নৃত্য করিতেছিল, সে সেই দৃশ্য শান্ত তৃপ্ত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল।

ঘরের সামনে টানা লম্বা দালান, সেখানে জুতার শব্দের সঙ্গে মৃদু মৃদু গানের শব্দ শুনা গেল, "আমি একলা চলেছি এ ভবে।"

করবী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তার পোষাক একটু অদ্ভুত! গলায়, কাণে, হাতে তার ঘেঁচি কড়ি দিয়া গাঁথা মালা, পরণে একখানা চেক সাড়ী—আপন মনেই সে তার অত্যন্ত মিষ্ট মধুর গলায় গাহিতে গাহিতে আসিল—

"আমার পথের সাথী কে হবে?"

মলয়া উহাকে দেখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। করবী গান বন্ধ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। সে হাসির অর্থ মলয়া জানিত, তাই তার গাল দুইটা একটুখানি লজ্জার রক্তিমাভায় লাল হইয়া উঠিল। অর্থাৎ কি না, ভাবুক মানুষ ভাব-রাজ্যের ভাবনা লইয়া বসিয়া গিয়াছে!

মলয়া নিজের সেই লজ্জা-বিব্রত ভাবটা চাপা দিয়া ঈষৎ বিস্ময় দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি!"

করবী নিজের সেই অভূত-পূর্ব্ব বেশ-বিন্যাসের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—

"কেন, চিন্‌তে পারছিস নে?"

মলয়া বলিল, "অপর্ণা?"

করবী কহিল, "হুঁ।"

তার পর লোহার খাটের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

"আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমার পথের সাথী কে হবে?"

মলয়া প্রশংসা-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "ভগবানের কি বিচিত্র দান এই রূপ! একে যা ক'রে সাজাও, তাতেই এ অপরূপ।"

করবী গাহিতে গাহিতে চোখ তুলিয়া সখীর সপ্রশংসোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতির সহিত হাসিল। তার পর গান থামাইয়া হাসিয়া বলিল, "নয়ন দিয়ে যদি আহার করা যেত, সতের বছরের জ্যান্ত মেয়ে না ভাই! 'তা হ'লে হতভাগী ফেলত খেয়ে', না?"

মলয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "যাঃ। কিন্তু দেখ, রুবি! তুই এই যে অপর্ণার পাঠ নিয়ে এক্ট করবি, এতে আমাদের একটিংটার খুব নাম বেরিয়ে যাবে দেখিস। নাঃ, কি সুন্দর যে তোকে দেখাচ্ছে, আর ঐ গলা!"

করবী আলতাপরা পা দোলাইতে দোলাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, কহিল—"আচ্ছা, দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ আমার সঙ্গে লভে পড়বে না? আচ্ছা, ক'জন পড়বে বল্‌তে পারিস?"

মলয়া সবেগে কহিয়া উঠিল—"ছিঃ!"

করবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "এক জন, দু' জন, তিন জন?"

মলয়া কহিল, "আচ্ছা, তাদের মধ্যে যদি এক জন হয় রাজা, আর এক জন হাইকোর্টের জজ, আর এক জন—আচ্ছা দাঁড়াও, আর এক জন কি হয়—খুব বড় নামজাদা ব্যারিষ্টার? মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্‌কম? কেমন হয়?"

মলয়ার এই সুন্দর ব্যবস্থায় স্মিতমুখে করবী কহিল, "আচ্ছা, ধরো তাই—তা হ'লে আমি এদের মধ্যে কোন্ জনকে বিয়ে করব বল্ ত?"

মলয়া চট্ করিয়া জবাব দিল, "তিন জনকেই—"

করবী ছিটকাইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "ধেৎ পলি অ্যাণ্ড্রী!"

মলয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ'লই বা, পুরুষদেরও ত এক সময় শতকরা হিসাবেও হ'ত। নৈলে আর এদের মধ্যে কা'কে বাদ দেবে? সবাই যে লোভনীয়।"

করবী খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তার পর যথাস্থানে আসন গ্রহণপূর্ব্বক মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে উত্তর করিল, "হ'লে অবশ্য মন্দ হয় না, একমাস ক'রে পালা খাটা যায়। এক মাস রাজবাড়ীতে রইলুম, ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গাবার সানাই বাজবে, তাঞ্জামে চ'ড়ে বরকন্দাজ ঘিরে বাজনা বাজিয়ে মন্দিরে চল্লুম, সন্ধ্যাবেলা চৌদ্দটা সখীতে ঢোল পিটিয়ে গান হেঁকে দিলে, গোলাপের পিচকারী নিয়ে তাদের সঙ্গে হোলী খেলছি। পরের মাসে আঁচলে চাবির তাড়া বেঁধে প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ঘর-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আশ্রিতে, আত্মীয়ে বাড়ী ভ'রে আছে, এর ছেলের অন্নপ্রাশন, তার মেয়ের বিয়ে, সবাই আসছে মা'ঠাকরুণের পরামর্শ নিতে, আবার ঠিক পরের মাসে ব্যারিষ্টার-প্রাসাদে পার্টিতে লাট-বেলাটের সঙ্গে ফারপোর বাড়ীর ডিস্ নিয়ে ব'সে গেছি, সন্ধ্যেবেলা মটর হাঁকিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে চল্লুম, মন্দ মজা কি?"

মলয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "মন্দ ত মোটেই নয়। খুব চমৎকার, কিন্তু—"

করবী বাধা দিয়া উঠিল, "ঐ কিন্তু! আমিও তাই বলি, কিন্তু সে ত আর হবে না, পুরুষদের হ'লে হ'ত, আমাদের যে তারা মেরে রেখেছে। আমাদের জন্যে কি কোন সুযোগ রেখেছে।"

মলয়া বলিল, "নজীর কিন্তু এর পাওয়া যায়। দ্রৌপদী যখন পাঁচ জনের স্ত্রী ছিলেন, তখন তোমার তিন জনে আপত্তি কি? তারা-মন্দোদরীর নজীরে যদি বিধবা-বিয়ে চলে, তবে দ্রৌপদীতে পলি অ্যাণ্ড্রী চল্‌বে না কেন? তোমরা অনুগ্রহ ক'রে চালিয়ে নিলেই চলবে।"

করবী গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা যাই হোক ভাই, একসঙ্গে তিন জনকে অবশ্য বিয়ে করা চলে না। তবে এটা ঠিক যে, আমি যদি বিধবা হই, তা হ'লে নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করব। বিধবা হয়ে আমি থাকতে পারব না। বাপ রে! আমার সে মনে হলেই ভয় হয়। থান পরেছি, হাত দুটো শুধু, মাথাটা বেটা-ছেলের মতন ক'রে ছাঁটা, তাও সবটা আবার সমান, আধুনিক ধাঁচে বব্ করা নয়—একবেলা নিরামিষ্য ভাত খাওয়া, খালি গা, গায়ে একটু সাবান নেই, গন্ধ তেলটুকু মাথায় দিলুম ত পড়সীতে চোখ ঠেরে একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে নিলেন! বাপ, সে আমি সইতে পারব না বাপু! পুরুষরা যদি তিনবার পাঁচবার পারে, তখন আমরা মোটে দু'বারই বা পারব না কেন? আমি করব।"

"তা করিস, এখন রাম না হ'তে রামায়ণই বা কেন? আচ্ছা, কে কি পার্ট নিলি বল? জয়সিংহ কে হ'ল?"

"জয়সিংহের পার্ট ভাই জুয়েলকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে পারল না ব'লে আবার ফিরিয়ে নিয়ে বিউটিকে দিলেন। বিউটি খুব সুন্দর করলে। আর তাকে মানিয়েও ছিল বড্ড!"

"তা ত মানাবেই, বেশ লম্বা ছিপছিপে কি না। আচ্ছা— গুণবতী?"

"গুণবতী হ'ল অচলা,—যেমন ঢিপির মত চেহারা, তেমনই উপযুক্ত পার্ট, নক্ষত্র রায়ের পার্ট জুয়েল নিলে, গোবিন্দ মাণিক্য ত সুরমা দি'র ভাগ্যেই নাচছিল, অমন জাঁকালো চেহারা আর কোথায় কে পাবে? তার পর ইন্দুলেখা হয়েছেন রঘুপতি। কিন্তু ভাই, আমার কিছু ভাল লাগছে না, এ কি আর অ্যাক্টিং! ও সব জুয়েল-ফুয়েলের কি এ সব কর্ম্ম! যদি সত্যিকারের জয়সিংহ রঘুপতিকে আনা যেত। নাঃ, আমাদের মত একঘেয়ে বাস্তব মানুষের চাইতে কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা হওয়া ঢের—ঢের ভাল! হাসিস্ নি বাপু, যা! তুই যেমন আছিকেলে বদ্যিবুড়ী; তুই কি বুঝবি! পাছে কোন পার্ট-টার্ট ঘাড়ে চেপে বসে, পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছিস, তোর কাছে দুঃখ করাও যা, আর অরণ্যে রোদন করাও তা। তার চেয়ে গান গাই;—

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমার পথের সাথী কে হবে?"

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে। সুবৃহৎ স্কুলবাটী এবং তাহার সংলগ্ন অনতিবৃহৎ বোর্ডিং এখন জনশূন্য স্তব্ধ। গ্রীষ্মের উষ্ণশ্বাসে ঋজু-দেহ দেবদারুর উন্নত শীর্ষ বারবারই যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে নত হইতেছিল, কিন্তু তাহার কোন পর্য্যবেক্ষণপরায়ণ দ্রষ্টা সে দিন উপস্থিত ছিল না।

মলয়া ও করবী দুই জনেই গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী উভয়েরই একদেশে, খুবই কাছাকাছি। উভয় পরিবারে সেই হেতু কিছু ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বিশেষতঃ মলয়া কোন এক সুদূর সম্পর্কে করবীর মায়ের মাসতুত বোনঝিও না কি হইত।

করবী ও মলয়ার অন্তরের প্রকৃতিতে ও বাহিরের রূপে যেমন আগাগোড়াই মিল ছিল না, দুই জনের সাংসারিক অবস্থাতেও তাহা-দের তেমনই অমিল। মলয়ার পিতা কালীকুমার বাবু সহরের মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা উকীল। সময়াভাব বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। অর্থাগম তাঁর প্রচুর এবং সেই অর্থরাশির সার্থকতাও তাঁর হাতে যে না হইতেছিল, তাহাও নহে। যেখানে যত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, কালীবাবু তার খবর পাই-লেই সর্ব্বত্র জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অল্প-বিস্তর দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য চাঁদা, কংগ্রেস আফিসে সাহায্য, কোন দেশপ্রাণ দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকায্যে মোটা রকম দান, এ সকলই তিনি আনন্দের সহিত করিয়া থাকেন। আবার ছেলেমেয়েদের লালনপালনে, শিক্ষায় ও তাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সর্ব্বত্রই তাঁহার চিত্ত ও বিত্তকে তিনি সমভাবে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। মলয়া তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। পাঁচ ছেলের পর সর্ব্বশেষের সন্তান, তাই মা-বাপের বড় স্নেহের। বিশেষ চরিত্র-গুণেও সে নিজেকে সেই স্নেহ-প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। স্নিগ্ধ শান্ত স্বভাব, কর্ত্তব্যপরায়ণা অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না এই মেয়েটিকে ঘরে পরে সকলেই প্রাণ খুলিয়া ভাল-বাসিত।

মলয়ার পিতা স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী। তিনি তাঁহার বাল্য-বিবাহের পত্নীকে নিজেই লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন। পত্নী সুমতি চলনসই ইংরাজী বাঙ্গালা জানেন, ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষাটা তিনিই দিয়া থাকেন। তবে কালধর্ম্মে এখন মেয়ের বিবাহের

বয়সটা বৃদ্ধি পাইতেছে, জীবন-যাপনের পদ্ধতিও অনিশ্চিত, তাই মেয়েকে নিজের চেয়ে লেখাপড়াটা কিছু বেশী শেখান দরকার মনে করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইতেছিলেন, কিন্তু বৎসর দুই হইতে মলয়ার একান্ত ইচ্ছায় তাহাকে তাঁদের প্রতিবেশিকন্যা করবীর সহিত কলিকাতার কোন বিখ্যাত মেয়েস্কুলের বোর্ডিংএ বোর্ডার রাখিয়া পড়ানর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

করবীর পিতা অমরেশ্বর গুপ্ত সেইখানকার জেলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। করবীরা তিন বোন্। বড় সুরভি বহুদিন হইল এক রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হইয়া শ্বশুরঘরে ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। বাপের বাড়ীর আধুনিকত্বের সহিত সে বাড়ীর কিছুই খাপ খায় না বলিয়া এ বাড়ীতে সে বাড়ীর বধূটি বড় একটা আসা-যাওয়া করিতে পায় না। গুটিকয়েক পুত্রকন্যা লইয়া সে মেয়েটি সংসারে এমন জটিলভাবেই জড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, বাল্য-কৈশোরের স্নেহনীড়ের বিচ্যুতির বিরহানুভব করিবার মত অবসরও তার বড় বেশী ছিল না। বরং কখন কদাচ দুই চারি দিনের জন্য আসিলে তাহার রুগ্ন ও আবদারে ছেলেমেয়েদের লইয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া পলাইয়া যায়। 'ঠাকুমা দাদুর' অদর্শনে তাহারা এমনই গোলমাল বাধাইয়া বসে যে, তাদের লইয়া দূরে থাকে কার সাধ্য। বিশেষ সুরভিদের মা নর্ম্মদা দেবী যখন নাতি-নাতিনীদের মনোরঞ্জনে সমর্থাই নহেন।

অমরেশ্বরের মেজ মেয়ে করবী আমাদের পরিচিতা। রূপের খ্যাতিতে, বিদ্যার গৌরবে ইনি তাঁর চারিদিকে এমন একটি মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া থাকেন যে, তাহা চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের মতই তাঁহাকে শোভনীয় করিয়া তুলে। চিত্রে, সঙ্গীতে, বেহালা-বাদনে রুবির প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলে ত কেহ ছিলই না, অন্যত্রও খুব সুলভ নহে। রূপেও সে তেমনই উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়ী।

গ্রীষ্মের ছুটীর আধাআধি প্রায় অতীত হইয়া গিয়াছে, গরমটা বেশ চাপিয়া পড়িয়াছিল; তথাপি বিকালের দিকে গুমোটকাটা একটুখানি ফুরফুরে হাওয়া উঠিয়া সর্ব্বজনের সমস্ত দিনের তাপ-দাহ জুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহার সে চেষ্টাও কতকাংশে সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সুমতি ও মলয়া অমরেশ্বরের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা কিম্বা ছয়টাও হইতে পারে। মা ও মেয়ে বাহিরের ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসিল। সেখানেও কৈ কাহাকেও দেখা যায় না!

না ওই যে, ওধারে একটা কোণের ঘরে খুন্তি নাড়ার শব্দ হইতেছে না? ঐটেই ত এ বাড়ীর রান্নাঘর।

সুমতি ও মলয়া অগ্রসর হইয়া দ্বারের কাছে গিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে উনান জ্বলিতেছে। এক জন নেপালী পাচক সেখানে একখানা টুলে বসিয়া এলুমিনিয়মের কড়ায় ডিমের চপ ভাজিতেছে আর অদূরে বসিয়া বাড়ীর গৃহিণী ডিসে করিয়া তাই গরম গরম খাইতেছেন। সুমতি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, এবং যেন দেখিতে পান নাই, এমনইভাবে আর এক দিকে মুখ রাখিয়া সেইখান হইতেই ডাকিয়া বলিলেন, "কৈ গো! কে কোথায়? নর্ম্মদা রুবি কোথায় রে?"

নর্ম্মদা রুবির মায়েরই নাম। নর্ম্মদা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উহাদের উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিলেন—

"ও কি দিদি! দাঁড়ালেন কেন? আসুন না? কে, মলি? এস এস, মা এস!"

বলিতে বলিতে নিজে উঠিয়া পড়িলেন—

"এইখানেই বসুন না, দিদি! আপনি ত আর আমার বাড়ী খাবেন না, তা মলিকে দুখানা গরম গরম চপ ভেজে দিক। বসো মা, এই পিঁড়িতে এসে বসো।"

সুমতির পূর্ব্বেই মলয়া বলিয়া উঠিল—"না মাসীমা! আমি এইমাত্র বাড়ী থেকে জল খেয়ে আসছি, এক্ষণি ত আর খেতে পারবো না। রুবি কোথায় বলুন, আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

নর্ম্মদা একবার নিজের পরিত্যক্ত অর্দ্ধভুক্ত চপখানার দিকে দৃষ্টি করিলেন, তার পর বাঁ হাতে সুমতির পায়ের ধুলা লইতে লইতে কহিলেন—

"একখানা খেলে হতো, তা না হয় যাবার সময় খেয়ে যেও। এস, রুবি বোধ হয় ওপরে শুয়ে বই পড়ছে, সেখানে নিয়ে যাই।"

সুমতি কহিলেন,—"থাক না ভাই! রোজ রোজ কি আবার পায়ের ধূলো নিতে হয় না কি?" বলিয়া একটু পিছাইয়া গিয়াছিলেন, তারপর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—

"না না, তা কি হয়—খেতে খেতে তুমি খাওয়া ফেলে উঠে যাবে, সে আবার কি রকম কথা! না ভাই, সে হবে না,—আমার মাথা খাও, আবার তুমি খেতে বসো। আমরা কি পথ চিনিনে ওপরে যাবার, তাই আমাদের সঙ্গে তোমার যেতে হবে? না ভাই! না বসলে কিন্তু বড় রাগ করবো। দেখ দেখি, এমন ক'রে এসে প'ড়ে তোমার খাওয়াটি নষ্ট ক'রে দিলুম। ছি ছি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে!"

নর্ম্মদা দুই চারিটা ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিয়া সুমতির প্রবল প্রতিবাদে তাহাদের বিঘোরে মরিয়া যাইতে দেখিয়া অগত্যা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ফিরিয়া গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং কিছু লজ্জা-বিপন্নভাবে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া একটু ব্যস্তভাবেই কার্য্য-সমাধানের দিকে মনোযোগী হইলেন। তিনি বলিলেন—

"এ সব জিনিষ ভাই, জুড়িয়ে খেলে আমার একবারেই হজম হয় না কি না, তাই অর্জ্জুন বাহাদুর ভাজবার সময়েই আমায় রোজ ডেকে এনে খাওয়ায়। ওঁর আর মেয়েদের একসঙ্গে চায়ের সময়ে খাবার জন্য রেখে দিয়ে আবার এই উননেই রান্না চড়াবে কিনা।"

অর্জ্জুন বাহাদুর এ দিকে মাছের পূরে ডিমের গোলা মাখাইয়া কড়ার ঘিয়ে খানকয়েক ছাড়িয়া দিতে দিতে সদ্য ভাজা খান চারেক চপ তুলিয়া ধপাস্ করিয়া গৃহিণীর পাতের উপর ফেলিয়া দিতেই নর্ম্মদা ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল— "এ কি করলে অর্জ্জুন বাহাদুর, এই আমি তুলতে পারছিনে, আবার এই এতগুলো! কি বিপদ বল দেখি—"

সুমতির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

"দেখুন ত অন্যায়! আমি উঠেই পড়ি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন—"

বাধা দিয়া সুমতি চলনোন্মুখী হইয়া কহিলেন—

"না ভাই! আর দাঁড়াচ্ছি না ত, এই যে আমরা উপরে যাচ্ছি।"

উপরে উঠিয়াই মলয়া ডাকিল—"রুবি!" একটা ঘরের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—"উঁ?"

"কোথায় তুই? কি করছিস?"—

বলিয়া মলয়া সেই ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। তাহার পশ্চাদনুসরণে সুমতিও আসিলেন।

ঘরটা এ বাড়ীর সব ঘরের মতই নাতিবৃহৎ। ঘরের মধ্যে এক একখানা নেয়ার ছাওয়া খাটে এলো-মেলো বিছানা পাতা, তারই উপর করবী তার মেঘপুঞ্জ কেশভার এলাইয়া দিয়া শিথিলদেহে শুইয়া শুইয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল। ঘরের মধ্যে এ ছাড়া একটা ড্রেসিং টেবিল, একখানা চেয়ার, দেওয়ালে আঁটা আনলায় রুবিরই পরা একখানা চাঁদের আলো গোলের কোঁচান শাড়ী ও সেই রকমেরই ব্লাউজ, একটা লেশ-লাগান ফ্রিল দেওয়া পেটিকোট, বডি ও আর এক খানা আটপৌরে লালপেড়ে সাদা শাড়ী ঝুলিতেছিল। রুবির বোর্ডিংএ থাকার ষ্টীল ট্রাঙ্কটা ও চামড়ার ছোট্ট রাইটিং কেসটাও একধারে উপরি উপরি করা রহিয়াছে।

রুবি নভেলের পাতায় বদ্ধদৃষ্টি থাকিয়াই নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিয়া উঠিল, "মলয় হাওয়ায় হঠাৎ আজ ঝড় বইলো যে, রে? আয় না ভাই! এইখানে এসে ব'সে পড় না—"

সুমতি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, "ভাল আছিস্ রুবি! ক'দিন যাস্নি কেন, মা?"

করবী তখন খুব খানিকটা জিব কাটিয়া তাড়াতাড়ি হাতের নভেলখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তড়াং করিয়া এক লাফে খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া আঁচল সাম্লাইতে সাম্লাইতে লঘু ত্রস্ত পদে ছুটিয়া আসিয়া সুমতির পায়ের ধূলা লইতে লইতে অপ্রতিভের একশেষ হইয়া বলিতে লাগিল—"মা গো! মাসীমা এয়েছেন, আমি যদি তা একটুও বুঝতে পেরে থাকি! মলি! তুই কেন বল্লি না বল ত? ইউ নটি গার্ল! আসুন মাসীমা! মায়ের ঘরে বস্বেন আসুন, এখানে কোথায় বা বসবেন।"

নর্ম্মদার ঘরখানি আয়তনে একটু সামান্যই বড়, তবে সেখানির সাজসজ্জা এক রকম চলনসই মন্দ নহে। ঘরের মাঝখানে জোড়া খাট, দুই কোণে দুইটি আলমারী, তার একটিতে কাচ দেওয়া—তাহাতে আরও নানান্ টুকিটাকির সঙ্গে একরাশি কাচের পুতুল, আর একটিতে কাঠের কবাট দেওয়া, ভিতরে খুবই সম্ভব নর্ম্মদা দেবীর ব্লাউস ও সাড়ীগুলি সাজান আছে। একটা ছোট টিপয়, একটা মাঝারি ড্রেসিং টেবল, আলনা, আর তা ছাড়া মেঝেয় একখানা তিন রংয়ের ডোরাটানা সতরঞ্চি বিছানো ছিল। সুমতিরা সেইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

"এখনও চুল বাঁধো নি কেন, মা? গরম হচ্ছে না?"

সুমতির প্রশ্নে রুবি তার চামরের মত কোঁকড়া ও থোপা করা চুলের রাশি হাত দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমি ত সন্ধ্যে ক'রে চুল বাঁধি, মাসীমা! চুল খোলা থাকলে আমার গরম হয় না। হ্যাঁ, মাসীমা! মলির চুল বুঝি আপনি বেঁধে দিয়েছেন? তাই অত চক্‌চকে হয়েছে! ওর দ্বারা আর অত হ'তে হয় না! মলু, তুই যে এমব্রয়ডারিটা মাসীমার কাছে শিখছিলি, সেটা কতদূর হ'ল রে? শেষ হয়ে গেছে?"

মলয়া কহিল, "কালকেই সবে শেষ হয়েছে ভাই, তুই কিছু করছিস্?"

শিহরিয়া উঠিবার ভাণ করিয়া রুবি জবাব দিল, "ওরে বাবা! আমি অত খাটতে গেলে মারাই যাব! না ভাই! আমি খান তিনেক নভেল যোগাড় করেছি, সে ক'খানা শেষ না হ'লে আমার আর আহার-নিদ্রা নেই।"

মলয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি বই রে?"

রুবি একটু খাটো সুরে জবাব দিল, "ও ভাই, এ তিনখানা তিন দেশের। একখানা এখনকার বিখ্যাত লেখকদের মাথার মণি আনাতোল ফ্রাঁসের রেড লিলি, একখানা ভার্জ্জিন সয়েল, আর একখানা নরেশবাবুর শাস্তি। তুই বোধ হয় এর মধ্যে একখানাও পড়িস নি?"

মলয়া না পড়ার কুণ্ঠায় ঈষৎ লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িল; কিন্তু সুমতি ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "এ সব বই তোমাদের বয়সের মেয়েদের পড়তে নেই, মা! সব ক'খানার কথা জানিনে, তবে ওর দু' একখানি জানি, ও আর পড়ো না।"

রুবি ঈষৎ আশ্চর্য্যের স্বরে কহিল, "কেন মাসীমা? আমি অনেক বড় লেখকদের সমালোচনায় ত দেখেছি, তাঁরা এদের আর্ট সম্বন্ধে খুব তারিফ করেছেন ত!"

সুমতি কহিলেন, "সব আর্ট ত আর সবার জন্য নয় মা! খেমটা নাচের মধ্যে যে আর্ট আছে, তা উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের চেয়ে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতরাই উপভোগ ক'রে থাকে। তোমরা এখন আর্টের চেয়ে আদর্শের অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে।"

তার পর রুবিকে কিছু প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিলেন—

"একটা গান গাও তো রুবি! তোমার গান আমার বড্ড মিষ্টি লাগে। হ্যাঁ রে, অতসীকে দেখছি না যে? সে কোথায় গেল?"

রুবি কহিল, "সে মাসীমা! বিমলদের বাড়ী বেড়াতে গেছে। তা' গান শুনবেন মাসীমা! তা হ'লে ত নীচেয় যেতে হয়। অর্গানটা ত নীচেই আছে।"

সুমতি বলিলেন, "আমার বাজনার চাইতে শুধু গলার গান বেশী মিষ্টি লাগে, তাই গাও।"

"তা গাচ্ছি" বলিয়া রুবি সুমতির কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, "কোন্‌টা গাইবো বলে দিন না, মাসীমা! কি আপনার ভাল লাগে?" সুমতি তার চিক্কণ কালো চুলের রাশি আদরভরে নাড়িতে নাড়িতে হাস্যস্মিত মুখে সস্নেহে কহিলেন—

"তুই যা' গাস্, তাই ভাল লাগে, অপর্ণার গানই একটা গা' না হয়।"

করবী গাহিতে লাগিল—

"আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমার পথের সাথী কে হবে?"

নর্ম্মদা সদ্য-ধৌত মুখে পাউডার লেপিয়া, রঞ্জমাখা ঠোঁট দু'টি পাণের রংয়ে রাঙ্গাইয়া তাহার উপর হাসির প্রলেপ মাখাইয়া পাণের ডিবা হাতে, আসিয়া বলিলেন—

"উনি এলেন কি না, তাই চা-টা দিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না, দিদি! এই নিন্, পাণ খান। রুবি! তুই যখন-তখন ঐ গানটাই বা গাস্ কেন? তার চেয়ে 'ওরে পাগল হাওয়াটা' গাইলেই হতো।"

গান থামাইয়া করবী আবদার-ভরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বাহা রে! মাসীমা যে অপর্ণার গান গাইতে বল্লেন।"

"তা আরও ত গান ছিল, তুই যে ঐটাকেই সার করেছিস্!"

সুমতি রুবির মাথার চুলগুলি নাড়িতেছিলেন, তাহাই করিতে থাকিয়া সাগ্রহে বলিলেন—

"না মা, তুমি এই গানটাই গাও, আমার খুব ভাল লাগে। মা'র কাছে তখন 'ঝড়ের হাওয়া' 'পাগল হওয়া'র গানটান গেও। আমাদের এখন সব শেষ হ'তে চলেছে কি না, পথের সাথীর ভাবনাটাই বেশী।"

"ও কথা বলবেন না দিদি! আপনার এরই মধ্যে পথ শেষ হ'তে গেল কি জন্যে! ছেলে ঘরে ফিরুক, বউ নিয়ে আসুন। এই ত সংসার করবার সময়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় কালী বাবুর মক্কেলকুল বিদায় লইলে তিনি অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীচের তলার একটি ঘরে তাঁর জন্য আহারের স্থান প্রস্তুত করা ছিল, গৃহিণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত একখানি কার্পেটের আসন (এখন সেখানি অনেকটা পুরাতন হইয়া আসিয়াছে) পাতা, রূপা-মিশ্রিত ভাল খাগড়াই কাঁসার সুমার্জ্জিত গ্লাসে খাবার জল, ঢাকনি দিয়া তাহার মুখটি ঢাকা, সাম্‌নেই একটি দেয়ালগিরিতে আলো জ্বলিতেছে, মাথার উপর একখানা সরু কাঠির বোনা মাদুর-আঁটা টানা পাখা। পাখার দড়ি ধরিয়া একটা চাকর বারান্দায় বসিয়া আস্তে আস্তে টানিতেছিল এবং এই পাখার দড়ির অনিবার্য্য স্পর্শশক্তির অমোঘফলে এই সন্ধ্যা-রাত্রিতেই ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই ঘরেরই এক ধারে দুইখানা আসন পাতিয়া সুমতি ও মলয়া তাদের হাতের সেলাই দুইটা লইয়া বসিয়া গিয়াছিলেন। সুমতির এই নিয়মটি বরাবরের। যতক্ষণ স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, চুপ করিয়া শুইয়া বসিয়া সেই সময়টুকুর অপব্যয় করা তাঁর নিয়ম নহে। অনলস-প্রকৃতি সুমতি তাঁহার সকল কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকেই শিল্প ও সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া সময়কে চিরদিনই সার্থক করিয়া থাকেন।

মলয়া আজই নূতন করিয়া একটা চওড়া প্যাটার্ণের ড্রনথেডের কায মায়ের কাছে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নিজে সূচ চালাইয়া কোথাও ভুল করিয়া, কোথাও ভুলের সন্দেহে সে মায়ের কাছে বারম্বার উহা দেখাইয়া লইতেছিল। সুমতিও সস্নেহ সহিষ্ণুতার সহিত মেয়েকে শিখাইয়া দিতেছিলেন। নিজেও তিনি একটা কুড়ি নং সূতার বড় টেবলক্লথ বুনিতেছিলেন। সুমতির বড় ছেলে হিরণ্ময় বিলাতে সিবিল-সার্ব্বিস্ দিতে গিয়াছে, তারই ভবিষ্যৎ নূতন বাসার ড্রইংরুমের টেবলে পাতার উদ্দেশ্য লইয়া মা তাঁর প্রাণের ঐকান্তিক কামনা-মিশ্র আশীর্ব্বাদের সহিত এই সব টুকিটাকি এখন হইতেই তৈরি করিতে বসিয়া গিয়াছেন। শুধু কি তাই! আবার গোপনে গোপনে তাহার ভবিষ্য বধূর জন্যও এটা সেটা কেনা-কাটাই কি না হইতেছিল?

কালীকুমার বাবুর ভিতরে আসার সাড়া পাইয়াই মলয়া ডাকিল—

"ঠাকুর!"

একটু পরেই একটা দরজা দিয়া কালীবাবু এবং আর একটা দিয়া বামুন ঠাকুর খাবারের থালা হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তরকারী সব গরম আছে?"

বিষ্ণু ঠাকুর থালা নামাইয়া তার উপরকার বাটীগুলি সাজাইয়া দিতেছিল। সুমতির প্রশ্নে যেন একটু আহতভাবে উত্তর করিল—

"আজ্ঞে মাঠাকরুণ! একবারের তরে যে আজ্ঞে করেছেন, বিষ্ণুঠাকুরের কোন কাযে কি তার চুক হ'তে দেখলেন কখন?"

সুমতি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কালীবাবু একটুখানি হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

আহারে বসিয়া কালীবাবু কহিলেন—

"কৈ রে মলু! তোর একজামিনের খবর বেরুলো? মৃণুদের ত বেরিয়ে গেছে, জ্যোতিদেরও কাল বেরুবে ব'লে শোনা যাচ্ছে, তোদের কি হলো?"

মলয়া ঈষৎ হাসিয়া হাস্যস্মিত মুখে উত্তর করিল, "আমাদের বাবা! সব্বাইকার শেষকালে ফাউ দেবে।"

পিতা হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—

"অথচ তোদেরই সকলের আগে পরীক্ষা হয়ে গ্যাছে! যা হোক; পাশ ত হয়ে যাবি?"

মলয়া একটু ম্লান হইয়া উত্তর দিল, "কি জানি বাবা!"

কালীবাবু পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন—

"ঐ ত তোদের দোষ! ঐ দেখ্ দেখি বিষ্ণু ঠাকুরকে, নিজের উপর ওর কত বড় শ্রদ্ধা! ঐ রকম সেল্‌ফরেসপেক্ট না থাকলে কখন উন্নতি হয়?"

মেয়ে এ কথার উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করিল না, কিন্তু স্ত্রী করিলেন। তিনি সেলাইএর লাইন হইতে চোখ তুলিয়া সেই হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে ইহার জবাব দিলেন।

"হ্যাঁ, তাই জন্যেই ত ওর অত আত্মোন্নতি হয়েছে, তোমার বাড়ী ভাত রাঁধছে! ও সব আধুনিক আত্মম্ভরিতা, ওর থেকে কি সুফল হয় জানিনে, কুফল যে যথেষ্ট হয়, তা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি। ভগবান্ আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ওটা যতই কম দেন, ওদের ও আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।"

কালীবাবু নতমুখে আহার করিতে করিতে উত্তর করিলেন—"তা ঠিক।"

সুমতি কহিতে লাগিলেন—

"ওদের ভিতর এ জিনিষটা একটু কমই ছিল মনে হ'তো। তবে এখন সব বড় হচ্ছে, এখন কে কেমনটি হবে, তার কিছুই ঠিকানা

নেই। আত্ম-প্রত্যয় আর আত্মগর্ব্বেমী দুটো যে ঠিক এক নয়, এই সূক্ষ্ম বোধটুকু থাকলে আর কোন গোলই ঘটে না। তা' যা হোক সে; দেখ, হীরুর একজামিনের খবর বেরুতে আর ত মোটে একটি মাস দেরী আছে, যদি পাশটা করতে পারে, কাষ পায়, তা হ'লে ফিরতে ত আর খুব বেশী দেরী হবে না? আমার ইচ্ছে, ফিরে এলেই তার বিয়েটি দিই।"

কালীবাবু স্ত্রীর কথায় তাঁহার অন্তরের বার্ত্তার সন্ধান পাইয়া মনের মধ্যে নিজেও একটু উদ্বেগ অনুভব করিলেন। মা-বাপের মনের ভিতরটায় এখন তাঁহাদের প্রবাসী ছেলেটির জন্যই সকল প্রকার সম্ভাব্য ভয় ও সন্দেহ প্রচুর হইয়াই জাগিয়া আছে। একটার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা দেখা দেয়। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল পিতা-মাতা, আত্মীয়-বান্ধব, এমন কি, দেশভূমি—সমুদয় চির-পরিচিতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, কোন্ সে সুদূরে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দলের মধ্যে যে আত্ম-নির্ব্বাসন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজন্মের সকল সাহচর্য্য হইতে, অভ্যাস হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একবারে ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রীতির মধ্যে মিলিয়া যাইতে হইয়াছে, না জানি সেই সকল লোক এবং তাহাদের রীতি-নীতি ঐ তরুণ-চিত্তে কতটাই প্রভাব, কতই না মায়া-জাল বিস্তৃত করিয়া বসিল! যেমন অম্লান প্রভাত পদ্মটিকে তাঁহারা তাঁদের হৃদয়-সরোবর হইতে উৎপাটিত করিয়া সেই সুদূর দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ঠিক তেমনটিকে কি আর তাঁহারা ফিরাইয়া পাইতে পারিবেন?

স্ত্রীর বাক্যে তাই স্বামীরও চিত্তনিহিত গূঢ় সন্দেহজাল ঈষৎ ছিন্ন হইয়া পড়িল। হৃদয়োত্থিত ঈষৎ আবেগকে সচেষ্টায় নিরোধপূর্ব্বক তিনি ঈষৎ উত্তেজনা দেখাইয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"তা ত দেবেই জানা আছে, সে আর নূতন কি? তা এর মধ্যে থেকে কনেটনেও ঠিক করা হচ্ছে না কি?"

সুমতি হাসিয়া কহিলেন—"সে একরকম আমি মনে মনে ঠিকই ক'রে রেখেছি।"

কালীবাবুও হাসিয়া কহিলেন—

"তবে ত আর কথাই নেই"—তার পর সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়া সংশয়ের সহিত কি যেন মনে মনে চিন্তা করিলেন ও পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

"কিন্তু সবটা ভেবে দেখে কাষ করো সুমু; হঠাৎ যেন কোথাও কথা দিয়ে ফেলো না। ছেলে ফিরে এসে কি বলে, কি করে, সেটা না দেখে ত আর কিছুই স্থির করা যায় না। সে যদি তোমার পছন্দর মেয়েকে পছন্দ না করে, সে যদি বিয়েই না করে, সে যদি, সে যদি—কি জানো? ভালমন্দ সকল ঘটনারই জন্য আমাদের মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত ক'রে রাখাই সঙ্গত। তাতে ক'রে যদি সত্য সত্যই কোন অমঙ্গল, কোন অনাচারই কোন দিন দৈবাৎ ঘটে যায়, তা হ'লে তেমন ক'রে আর আকস্মিকতার বিহ্বলতায় ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যেতে হয় না। সয়বার বয়বার ধৈর্য্য মনের মধ্যে জমা করা থাকে—তাই বলছিলাম—কি যে, সে যদি,ধ'রেই রাখ, সেখান থেকে একটা মেমকেই বা বিয়ে ক'রে নিয়ে আসে? তা' এমন ত কতই হয়। আর তারাও ত এই তোমার আমার মতই মা-বাপেরই সন্তান।"

এই একান্ত অপ্রীতিকর ও অশুভ আলোচনায় সুমতির যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল, তাঁর বোধ হইল, তাঁর চির-প্রেমময়, সহৃদয় স্বামী যেন হঠাৎ তাঁর গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তাঁর স্বামীর হৃদয় জানিতেন, তাঁর পত্নী-প্রীতি, সন্তানবাৎসল্য ইহার কোনখানেই ত এ জীবনে কোন সংশয়ের ছায়াটুকুও তিনি কোন দিনই দেখিতে পান নাই। তাই বুঝিলেন, কত দুর্ভাবনা সন্দেহেই এমন সম্ভাবনারও সংশয় তাঁহার স্নেহ-প্রবণ পিতৃ-চিত্তকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। ক্ষণকাল নীরব, স্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে তিনি কহিলেন,—"না আমি কারুকে কথা দিই নি, এমন কি, আভাসও কিছু জানাই নি, তা হ'লে কি আগেই তোমাকে জানাতুম না? তা ছাড়া সমাজের দিক্ থেকেও তাতে একটু বাধা আছে। তারা ঠিক আমাদের সমান ঘরও নয়। অনেকে সে রকম বিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যের কেউ দেয় নি, সেই জন্য আমি এতে লুব্ধ হলেও খুব বেশী ভরসা করি নি। সে ফিরে এলে তার মত নিয়ে তবেই এ কথা কইবো"—এই বলিয়া অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

কালীবাবুর আহার সমাধা হইয়াছিল, প্রতীক্ষাকারী ভৃত্য আসিয়া চিলমচি ও জলের ঘটী আচমনার্থ জোগাইয়া দিল, তিনি হাত ধুইতে ধুইতে জবাব দিলেন—

"অবশ্য এটা একটা যদির কথা। হয় ত সে এসে তোমার মতেই মত দেবে ও তোমার দেওয়া মেয়েকেই বিয়ে করতে সম্মত হবে, তা যদি হয়, তা হ'লে ত চুকেই যাবে, আচ্ছা, তোমরা খেয়ে এস, আমি যাচ্ছি।"

মলয়ার খাওয়া ভাইদের সঙ্গেই হইয়া গিয়াছিল, সুমতি স্বামীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন, মলয়া কাছে বসিয়া মাকে কি কি দেওয়া হইল কি হইল না, তাহারই তদারক করিতেছিল। পিতা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কৌতূহল দমনে রাখিতে না পারিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—

"কে কনে মা?"

সুমতি এই প্রশ্নে প্রথমতঃ উত্তর না দিয়া নীরবে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়ে তাঁহাকে ছাড়িল না, সে নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনশ্চ ঐ প্রশ্নই করিল—

"বলো না মা! দাদার জন্য কাকে পছন্দ করেছ?"

তখন অগত্যা অনিচ্ছুক-শ্লথ-স্বরে সুমতি উত্তর করিলেন, "কারুকে কিন্তু ব'লে ফেলো না যেন! রুবি মেয়েটিকে আমার বড্ড পছন্দ। বউ হ'লে ঘর আলো করবে।"

মলয়া অকস্মাৎ যেন কোথায় বেত খাইল, এমনই করিয়া সে চমকাইয়া মুখ তুলিল এবং তার কণ্ঠ হইতে অকস্মাৎ একটা বিস্ময়াপ্লুত স্বর নির্গত হইয়া আসিল—

"মা!"

সুমতি নতমুখে আহার করিতেছিলেন, তিনি মেয়ের মুখটা দেখিতে পাইলেন না, তবু তার গলার স্বরে কিছু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিলেন—

"কেন রে? রুবিকে কি তোর পছন্দ নয়? কেন, চমৎকার মেয়ে ত! যেমন রূপ, তেম্নি সরল!"

মলয়ার স্বভাবতঃই শান্ত প্রকৃতি, বিশেষতঃ পরের নিন্দা

করা তার স্বভাবই নয়। তাই সে অর্দ্ধ-সন্দেহের ছাড়া ছাড়া ভাবে জবাব দিল, "পছন্দ নয়, তা' ত বলছি না, কিন্তু—"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ?"

এবার মলয়া নিজের অন্তরস্থ দ্বিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া সজোরে কহিল—

"ও যে সব ছাই-পাঁশ কথা বলে, মা! সে সব শুনলে কি ক'রে দাদার বউ হয়, ইচ্ছে করবে বল ?"

মেয়ের মন্তব্য শুনিয়া সুমতি একটু-খানি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তার পর তাঁর মুখ আবার মেঘমুক্ত হইয়া গেল, তিনি কহিলেন—

"মেয়েটা ভালই,—তবে শিক্ষায় কিছু গলদ আছে। মা-বাপ বড্ড বেশী আধুনিক। তার উপর নিজেদের নিয়েও একটু বেশী ব্যস্ত। মেয়েদের কোন বড় আদর্শ দেখিয়ে মানুষ করছে না। ইচ্ছামতন চলছে ও ওকেও তাই চলতে দিচ্ছে। ও দোষ শুধরে নেওয়া যায়। যাক্, সে এখন অনেক দূরের কথা। আগে আমার হিরণ ফিরেই আসুক। কিন্তু মেয়েটা বড় সুন্দর, আর গায় যা' মিষ্টি! আমার কেবলই ওর সেই গানটাই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে—

আমার পথের সাথী কে' হবে ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মলয়ার পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, দ্বিতীয় বিভাগেরও অনেকখানি নীচে তাহার স্থান হইয়াছে, আর শ্রীমতী করবী দেবীর নামটা প্রথম বিভাগের খুব উপরের দিকেই ছাপা হইয়া গিয়াছে। এটা দেখিয়া মনে মনে সে যেন একটু বিস্ময়ানুভব না করিয়া পারিল না। এই পরীক্ষার জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টাই করিয়াছে, একটুও কিছু ত্রুটি সে করে নাই, অথচ সে অত নীচু হইয়া পাশ করিল। আর যে রুবি পড়ার বই কদাচিৎ ছুঁইত, সে হইল সসম্মানে উত্তীর্ণ! কিন্তু ইহার জন্য সে একটু ও দুঃখিত বা ঈর্ষ্যান্বিত হইল না। রুবি যে কত বড় শক্তিময়ী, সে কথা সে ভাল করিয়াই জানিত। তদ্ভিন্ন নিজের ক্ষতিতে ব্যথিত হইতে পারে, কিন্তু পরের ভালয় দুঃখিত হইবার মত মেয়ে সে মোটেই নহে। বরং সে ভাল না হোক, তবু যে রুবি হইয়াছে, ইহাতেও সে অনেকখানি সুখী হইল।

রুবির কিন্তু কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। সে তখন এখানকার মেয়ে স্কুলের আগতপ্রায় প্রাইজ-দিনের জন্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের অনুরোধে তাদের লইয়া মাতিয়া বেড়াইতেছিল। অলকা, অপরাজিতা, কাঞ্চনমালা, সরস্বতী, ঊষা, কালী, যোগমায়া ও সুরেশ্বরীকে মহোৎসাহে

"জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে—
ভারত ভাগ্য বিধাতা!"

ইত্যাদি গাহিতে শিখাইতেছিল এবং ইহার কোরাসে "জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে"—ইত্যাদিতে আরও প্রায় জন পনেরো মেয়েকে যোগ দেওয়াইয়া, তাদের লইয়া মহা ব্যতিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বাইশ জন মেয়ের গলা প্রায় বাইশ ভুবনে পৌঁছিতেছিল। চীৎকারটাই খুব ভাল রকম জমিতেছিল, কিন্তু সঙ্গীতের অংশটাতেই ঐ জিনিষটার বদলে জমা হইতেছিল কোলাহল। রুবি বেচারী এই দলটিকে লইয়া মহা বিপদেই পড়িয়াছিল। তার ইচ্ছা ছিল, এত বড় একটা দলকে সামলানোর বৃথা চেষ্টা না করিয়া জন পাঁচ ছয় মাত্র বাছাই করা মেয়ে লইয়া সে এই গানটি শেখায়, কিন্তু সে ইচ্ছাটা প্রকাশ করা মাত্রে স্কুলময় এমনি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া উঠিল যে, নালিস-ফরিয়াদের জ্বালায় অস্থির অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া হেড মিষ্ট্রেস স্বয়ং রুবিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি একটি মেয়েকে গান গাইবার জন্য নিলে রুবি! এ দিকে মেয়েরা এবং মেয়ের মা'রা, এমন কি, কোথাও কোথাও দু এক জন বাপরা শুদ্ধ এর জন্য আমার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। সাধারণের স্কুলে সকল মেয়েই কেন সমানভাবে তাদের গুণপনা দেখাবার অধিকার পাবে না ?" ইত্যাদি সে অনেক কথা! এর মধ্যে আবার নাকি সুন্দর চেহারা দেখেও বড় মানুষদের মেয়ে দেখে দেখে বাছাই করাও হয়েছে! যাক্ গে, এখন যে কটাকে পাবো, যারাই যোগ দিতে চায়, ওর মধ্যে টেনে টুনে নিয়ে নাও বাবা! আমার প্রাণটা বাঁচুক।"

অগত্যা রুবি এই মহাভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকের স্বাতন্ত্রিকতার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর আবার ছোট রকম একটা অ্যাক্টিং শেখানোর ভারও সে লইয়াছিল। জেলায় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিবেন, তাই মেয়েদের দিয়া একটি ইংরেজী অভিনয় করানো হইবে, ম্যাকবেথের একটি দৃশ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ইহারও অনেকখানিই ভার পড়িয়াছিল রুবির ঘাড়ে। যে ঘাড় পাতিয়া লয়, তাহারই উপর ভারটি গিয়া চৌচাপটে পড়ে, এ বিধান সর্ব্বত্র আছে। রুবিরও এ সকল খাটুনীতে আলস্য ছিল না। তবে মুস্কিল বাধিয়াছিল এই যে, মেয়েগুলির সখের অনুপাতে তাদের অভিনয়-শক্তির ও কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট অভাব, অথচ তারা সেটা একবারেই বুঝিতে চাহে না। ইহার সহিত "পথভোলা পথিকে"র অভিনয়টিকেও জুড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। সব মেয়েই চাহে যে, সে-ই "করবী" "মঞ্জরী" ইত্যাদি সাজে, অথচ মোটে এক একটি করিয়া মাত্র গুটি পাঁচেকের দরকার! কাযেই রুবি ভাবিয়া পায় না যে, সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে "জয় জয় জয় জয় জয় হে"র মত ইহাতেও থলো থলো আমের মঞ্জরী এবং মালতী-মাধবী-করবীর গুচ্ছ তৈরি করিয়া দিলে চলে কিনা? "পথভোলা পথিক" সাজিয়াছিল তৃপ্তি। সে একটি শান্ত-স্বভাবা ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ-শ্রীযুক্তা ফার্ষ্ট ক্লাসের মেয়ে। মেয়েটি এই প্রস্তাব শুনিয়াই ত ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। সভয়ে সে বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে আমি কিন্তু পথিক সাজতে পারবো না, রুবিদি! বাব্বা! ওই অতগুলি আমের থলো আর ফুলের বোঝা যদি আমার গলা ধ'রে ঝুলতে আরম্ভ করে, তা হ'লে সেইখানেই ত আমার দফা নিকেশ! না ভাই, তোমরা তা হ'লে ষণ্ডা দেখে একটি পথিক খোঁজ।" এখন 'ষণ্ডা পথিক' কোথা হইতে মেলে? এ যুগের পড়ো ছেলে-মেয়েদের ভিতর ষণ্ডা-চেহারা কি দেখা যায়? সে বরং ত্রিশ পার হওয়ার পর যাহারা টিঁকিয়া আছে, তাদের ভিতর পাওয়া যাইতে পারে। এখন তারাই বা 'পথভোলা পথিক' সাজিতে রাজী হইবে কেন? আর সাজিলেও ত আর সেটা স্কুলের মেয়েদের সাজা হইবে না।

কাযেই অভিনয়টি বদলাইয়া দিতে হইল। অনেক প্রকার ভাঙ্গা-গড়া হইতে হইতে সেই চিরন্তনী লক্ষ্মীর পরীক্ষায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রোগ্রামটি এই রকম দাঁড়াইল।

প্রথমে ঐ কোরাসে গীত গানটি, তার পর ইংরেজী অভিনয়। তার পর স্কুলের রিপোর্ট পাঠ, তৎপরে প্রাইজ বিতরণ। এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া গেলে বাঙ্গালা অভিনয়। মেমসাহেবেরা যে ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, সে আশা ত বড় একটা নাই, কাযেই সব কায সারিয়া নিশ্চিন্তমনে দেখা-শোনার জন্যই লক্ষ্মীর পরীক্ষা সর্ব্বশেষে স্থান পাইয়াছিল। এই লক্ষ্মীর পরীক্ষার আগে, মধ্যে ও শেষে গোটাকতক গান ও নাচ জুড়িয়া দিয়া ইহাকে সাধারণের পক্ষে একটু উপাদেয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। নাট্যালয়ের সকল অভিনয়েই যেমন স্থান-কাল-পাত্রাদি নির্ব্বিচারে নাচের ব্যবস্থা আছে এবং তা' না থাকিলে দর্শক-দর্শিকাদলের মনঃপূতও হয় না, তখন এই বেচারা-দলের অভিনয়কেও সর্ব্বজনের মনোমত করিবার জন্য একটুখানি নাচের ব্যবস্থা না করিলেই বা চলে কিরূপে? এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপেই রুবির মস্তিষ্ক-প্রসূত। ক্ষীরো-রাণীর রাণী-সভায় জন আষ্টেক মেয়েকে নাচনী সাজাইয়া তাদের মুখে "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।"—গানটি গাওয়াইয়া, তার পর আবার "কর্ণার্জ্জুন" থিয়েটার হইতে টানিয়া আনিয়া নিয়তি-দেবীকে একবার প্রস্তাবনায়, একবার লক্ষ্মীর পরীক্ষার প্রারম্ভে এবং আরও একবার রাণী-কল্যাণীর ক্ষীরো-রাণীর নিকট সাহায্য লাভাশায় আগমনের পূর্ব্বে সেই কর্ণার্জ্জুনেরই হলদে রঙ্গে ফিতার পাড়ের সাড়ীটি পরাইয়া দিয়া এলোচুলের রাশি এলাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেজের উপর পরিক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গানগুলি অবশ্য যে নিয়তির মুখের গানগুলি ঠিক ঠিক স্মরণ না থাকায় অগত্যা নিজেরাই যা' তা করিয়া তৈরী করিয়া দিতে হইয়াছিল এবং সুর সংযোগও রুবি নিজেই করিয়া-ছিল। যা হোক করিয়া আর সব ত এক রকম তৈরী হইল, কিন্তু ঐ নিয়তির পার্টটি লইবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। গানের ভাষা ও সুর যদি ভাল হয়, সে গান যেমন হোক করিয়া গাহিয়া গেলেও এক রকম শোনায়, কিন্তু কাঁচা লেখকের লেখা জোড়া-তাড়া দেওয়া গানকে বেসুরে গাহিলে তাহা অত্যন্তই শ্রুতিকটু হইয়া দাঁড়ায়।

> আমি নিয়তি এসেছি তোমার পাশে,
> দেখি ভাগ্য তোমারে কিবা দিতে পারে,
> ওগো দেখিতে এসেছি সেই আশে;
> দেখি বাঁধা পড়ো কি না পড়ো এই ফাঁসে।—

এই যে রুবির তৈরী করা গান, এ রুবি ছাড়া অপর কাহারও গাহিবার সাধ্য হইল না। তার গলাটি ভাল, শিক্ষাও আছে, কাযেই সে নিজেই এই নিয়তি সাজিল। আর স্কুলের শ্রেষ্ঠ মেয়ে তৃপ্তি সাজিল মা-লক্ষ্মী। তৃপ্তিকে দেখিতেও ভাল, স্বভাবটিও লক্ষ্মীর মতন শান্ত, আর তার গলাটিও মন্দ নহে। এ স্থলে বলা দরকার, এই অভিনয়ে মা-লক্ষ্মীও গায়িকার আসন পাইয়া-ছিলেন। তাঁকেও দুইবারে দুইটি গান গাহিতে হইবে।

মলয়া যে দিন নিজেদের পরীক্ষার খবর পাইয়া তাহার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হওয়ায় দুঃখে মুখ ভার করিয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছিল, রুবি তখন একটার স্থলে দশটা হইয়া মেয়েদের লইয়া মাতিয়া রহিয়াছিল! অভিনয়-শিক্ষা একরকম হইয়া গিয়াছে, এখন নিত্য নিত্য রিহার্সেল চলিতেছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি পায়ে কেহ ঘুঙুর, কেহ পাইজোর, কেহ ঘুঙুর-গাঁথা মল যার যা জুটিয়াছিল পরিয়া, আঁচল ধরিয়া, কাঁকালে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল, আবার খানিক পরেই কোরাসে যোগ দিয়া স্কুলবাড়ী ফাটাইয়া চীৎকার তুলিতেছিল, "জয় হে জয় হে জয় হে—জয় জয় জয় জয় জয় হে।"

রুবির সব কায-কর্ম্মের ভিতর হইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, মা-লক্ষ্মীর জন্য একখানা মুকুট সংগ্রহ করা তখনও ঘটিয়া উঠে নাই। আবার রাণী কল্যাণীর জন্যও একখানা হলে ভাল হয়। যেহেতু, রাজারাণীর মাথায় মুকুট না থাকিলে তাদের সাধারণের সঙ্গে আর তফাৎটা কি রহিল?

মাকে আসিয়া ধরিলে নর্ম্মদা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মাকে ত আর তোর বাবা মুকুট পরিয়ে রাণী ক'রে রাখেনি, আমি মুকুট কোথায় পাব? দেখ্‌গে যা তোর মাসীমাদের বাড়ী যদি কিছু পাস।"

রুবি আসিয়া মলয়াকে মুরুব্বী ধরিল, মলয়া বলিল—"মুকুট ত নেই ভাই, তবে টায়রা আছে। মা যদি দেন, ব'লে দেখি।"

রুবি চিন্তিত হইয়া কহিল—"টায়রায় হবে না ত! 'মাথায় এটা কি?—সোনার টোপর!' সোনার টোপরের বদলে কি টায়রা হ'লে চল্‌বে?"

সমস্যার কথাই বটে! অগত্যা সুমতিকেই মধ্যস্থ মানা হইল। তিনি বলিলেন—"টায়রায় ঠিক হবে না, মুকুটই চাই। কিন্তু মুকুট ত আমাদের বাড়ী নেই, বসন্তবাবুর বাড়ী তাঁর বড় বউএর হীরের মুকুট আছে, সে কি আর তারা দেবে? তাঁর মেয়ে শোভার মুক্তোর মুকুটও আছে দেখেছি। আর কারু বাড়ী কৈ মুকুট দেখিনি। আগে বল্লে না হয় রাংতার মুকুট তৈরি করিয়ে দিতুম, এখন ত আর সময়ও নেই।"

রুবি প্রোৎসাহিত হইয়া লাফ দিয়া উঠিল—"আচ্ছা, ঐ বসন্তবাবুর বাড়ীর মুকুটই আমি আদায় ক'রে আনাচ্ছি, দাঁড়ান না।"

সুমতি এই মন্তব্যে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—"না বে বাছা, ও কায করিস নি, ও কায করিস নি। কোথায় হারিয়ে ফেল্‌বি। মুক্তোপাথরের জিনিষ, ও যেন সদাসর্ব্বদা ঝরেই আছে। দুটো-চারটে পড়েও যেতে পারে, তা ছাড়া তারা দেবেই বা কেন?"

রুবির মনটা এই কথায় একান্তই দমিয়া গেল। লক্ষ্মী ও রাণীর মাথায় মুকুট না থাকিলে যে তার এতখানি চেষ্টা সমস্তই মাটী হইয়া যাইবে! সে তখন নিতান্ত সংশয়াকুল মিনতির সহিত সুমতিকে বলিল—"তা হ'লে কি হবে, মাসীমা! মুকুট না হ'লে যে অভিনয়টাই সব মাটী হয়ে যাবে?"

সুমতিও এই কথায় একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আহা, ছেলেমানুষ এতটা কষ্ট করিয়া চেষ্টা করিয়া পাঁচ জনের জন্য একটু-খানি আমোদের জোগাড় করিল, আর এই সামান্য জিনিষটার জন্য সেটা নষ্ট হইবে? রুবির উদ্বেগ-ম্লানমুখের দৃষ্টি তাঁহার মাতৃহৃদয়ের গোপন-সঞ্চিত স্নেহের সিন্ধু আলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—"তার জন্যে অত

ভাবছিস্ কেন মা! আমি তোকে একখানা পিজবোর্টের উপর সল্‌মা আর রঙ্গীন চুম্‌কি দিয়ে লক্ষ্মীর মুকুট তৈরি ক'রে দোব, আর রাণীর জন্যে একটা ভাল টায়রা দিলেই বেশ হবে। এখানকার রাণীরা মুকুট প'রে বেড়ায় না ত, বিশেষ তাদের ঘরের মধ্যে।"

রুবি এ আশ্বাসে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়া আহ্লাদে হাততালি দিয়া উঠিল,—"ও মাসীমা! আপনি কি রকম ভাল! মলি! তুই মাসীমার মেয়ে হয়েও কি রকম ম্যাদামারা। দেখ ত মাসীমা এখনও কত উৎসাহী।"

কৃতজ্ঞতায় সে সুমতির গলা জড়াইয়া ধরিল।

সুমতির এই মনখোলা সরলা মেয়েটির উপর স্নেহ যেন দিন দিন দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া তার মুখে চুম্বন করিয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন,—"দেশে ত কোন আমোদ-আহ্লাদই নেই, যদিই বা কিছু তোরা করছিস, তাতেও একটু উৎসাহ দোব না? মানুষ কি একটু আমোদ স্ফূর্ত্তি না পেলে এম্‌নি চুপটি ক'রে বারো মাস থাকতে পারে? না তাতে তাদের স্বাস্থ্যই ভাল থাকে?"

সুমতি জরির মুকুট তৈরি করিতে বসিয়া গেলেন। কিন্তু শিল্প সূক্ষ্ম, তাঁর সংসারের যথেষ্ট কাযকর্ম্মও আছে, কাযেই দেখা গেল, যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও সেই অভিনয়-দিনের পূর্ব্বে তা' শেষ হইবার আশা নাই। চঞ্চলা রুবির ইহাতেও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল, যদিই বা শেষ পর্য্যন্ত এটা না হয়ে ওঠে!

ইতিমধ্যে একটা সুযোগও আসিয়া হঠাৎ দেখা দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জমীদার বসন্ত বাবুর জমীদারী—কোন্ সেই সুদূর রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলে থাকিলেও তিনি এখানে দু'তিন পুরুষের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। কবে যে কি উপলক্ষে তাঁ'দের এ দেশে আগমন, তাহা এখন ঠিক জানা যায় না, তবে রঙ্গপুরের ব্যাঘ্রভীতিই ইহার মূল কারণ, এইরূপই গুজব আছে। এক সময়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য বিখ্যাত স্থানগুলি তদানীন্তন কালে শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজনারণ্যের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ঐ সময়ে উহাদের দ্বারা বিশেষভাবেই উৎপীড়িত হইতে বাধ্য হইত।

বসন্ত বাবু নিজে পুরাদস্তুর জমীদারের ঘরের ছেলে। তাঁর কার্য্যে অশক্ত স্থূলদেহ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, গৌরবর্ণ, মাথাজোড়া টাক, অহিফেনের নেশায় ঝিমাইয়া থাকা—এতৎসমুদয়ই তাঁহার ধনবত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। মস্ত মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া ফুরসীর নলে একটু একটু টান দেওয়া, আর সন্ধ্যা-বেলা একটুখানি ছোট-খাট মজলিস করা, এ ছাড়া তাঁর নিয়মিত কার্য্য আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত না। তবে জমীদারী সেরেস্তার কাযকর্ম্ম মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বসিয়া দৈবাৎ কখন কদাচ দেখিতে হইত বৈ কি।

বসন্ত বাবুর দুইটি স্ত্রী। দুজনেই বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠা বিন্দু-বাসিনীর ষোড়শোত্তীর্ণাবস্থায় সন্তান না হওয়ায় তদীয় স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতা তাঁহাকে অবিলম্বে একটি সপত্নীরত্ন উপহার প্রদান করেন। বসন্ত বাবুও এ দেশীয় পুত্রগণের মাতৃভক্তির আদর্শানুযায়ী শুদ্ধ মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থেই ঐ দিনাজপুর অঞ্চলের তাঁহারই কোন কর্ম্মচারীর নিকট-আত্মীয়াকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিলেন। এই দ্বিতীয়া বধূটি পরমা সুন্দরী। বিন্দুবাসিনী বড়লোকের মেয়ে, তাঁর বাপের টাকার তিনিই উত্তরাধিকারিণী। এই সকল কারণেই তাঁকে ঘরে আনা হয়, কিন্তু তাঁর রূপহীনতার জন্য বসন্ত বাবু তাঁর প্রতি আদৌ অনুরক্ত হইতে পারেন নাই এবং এ ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব, তাহাও ঘটিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁর মায়ের বিশেষ চেষ্টায় এবারকার বধূটি পয়সার থলের বদলে রূপের পসরাখানি লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তা' রূপ তিনি গায়ে করিয়া যথেষ্টই আনিলেন বটে, তবে তারই জোরে স্বামীর স্বভাবখানিকে যে শোধরাইয়া তুলিতে পারিলেন, তা'ও বলা যায় না। বরং সে কতকটা বড় বধূ বিন্দুবাসিনীই তাঁহাকে সংযত রাখিতে পারিতেন। কারণ, বিন্দুবাসিনী বড় ঘরের মেয়ে, তাঁর সব রকমই জানাশোনা আছে। শিক্ষা-সহবতও ভাল। যে শাশুড়ী পুত্রের রূপতৃষ্ণা ও নিজের পৌত্রসাধ মিটাইবার আশায় ইঁহার সপত্নী-যন্ত্রণা ঘটাইয়া দিয়াছিলেন, এই বিবাহের পরেই ইঁহাকে সন্তান-সম্ভবা জানিয়া সেই তিনিই আবার কনিষ্ঠার অপেক্ষা ইঁহারই সমধিক পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। উত্তরকালে দেখা গেল, ছোট বধূ গৃহের শোভাদায়িনী এবং স্বামীর সোহাগভাগিনী মাত্র হইয়া রহিলেন, গৃহিণী যিনি ছিলেন, তিনিই থাকিলেন। ছোট বউ পল্লীগ্রামের গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনি একটা কোন কথা বলিতে গেলেই স্বামীও বলেন,—এমন কি, দাসদাসীরাও শুদ্ধ বলে যে, "এ সব বড় বউ বোঝে, তুমি এর কি বুঝবে?"

আগাগোড়া সকলকারই মুখে-মুখে এই কথাটা শুনিয়া শুনিয়া সরযূরও এমনই অভ্যাস ও বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, নিজের ছেলেমেয়েদেরও কোন ভালমন্দর খবরে সে থাকিতে জানিত না, তাহারা মা'র কাছে আব্দার করিয়া কিছু চাহিলেও সে জবাব দিত, "যা তোদের বড়মায়ের কাছে, আমি ওসব কিছু বুঝিনে বাপু, দেবার হয়, সেই দেবে।"

সতীনের প্রতি বিন্দুবাসিনী মনে মনে অবশ্য খুবই যে প্রসন্ন ছিলেন, তা' নয়, কিন্তু তার নিরীহত্বে তাহাকেও তাঁর পোষ্যের মধ্যেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ সরযূর ছেলেমেয়ে তাদের মায়ের চেয়ে বিমাতারই সমধিক বশীভূত ছিল। বিন্দু-বাসিনীও তাঁর নিজের ছেলে শরদিন্দুর সঙ্গে সতীনের ছেলে শশাঙ্ককে একটুও তফাৎ করিতেন না। সূতিকাগৃহে সরযূর কঠিন পীড়া হইলে বিন্দুবাসিনীই এটিকে নিজের দুধ দিয়া পালন করিয়াছিলেন এবং সেই হইতেই শশাঙ্ক তার বড়মায়ের ঘর ছাড়ে নাই। শশাঙ্কের চেয়ে পাঁচ বছর পরে জন্মিয়াও সরযূর মেয়ে শোভা তার দাদারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিল।

দুই ছেলেই এখন বড় হইয়াছে। শরদিন্দু আই-এ ফেল করিয়া পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করিয়াছিল, সম্প্রতি একটি খাসা ফুটফুটে নববধূ পাইয়া সে সম্পূর্ণরূপেই তাহার প্রতি মন দিয়াছে। নূতন ফটো তুলিতে শিখিতেছে, সে তার বউটিকে দাঁড় করাইয়া, বসাইয়া, শোয়াইয়া, পিছন ফিরাইয়া, পাশ কাটা-ইয়া, হাঁটু গাড়াইয়া এবং আরও যতরকমে পারা যায়, মনের সাধে

তাহার ফটো তুলিতেছিল। কোথাও তার হাতে বাঁদিপোতার গামছা দিয়া এলোচুলে তাহার স্নানান্তমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, কোথাও কলসীকক্ষে স্নানার্থিনী, কোথাও বিবশা, কোথাও অলসা, কোথাও বিরহিণী—আবার কোথাও বা সোহাগিনী। ইচ্ছা আছে, ছবিগুলি ক্রমশঃ বাঙ্গালা মাসিকে হরির লুট দেওয়া হইবে; এখনই দেওয়া হইত, কেবল মায়ের ভয়ে পারিয়া উঠিতেছিল না।

শোভারও মাস কতক আগে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তার বরটি মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র হইলে কি হয়, ছেলেটির রসবোধ আছে, এখনও ডাক্তারীর প্যাঁচে পড়িয়া মনটা ভোঁতা মারিয়া যায় নাই। সে অন্যান্য নিত্যকর্ম্মের সহিত মিলাইয়া প্রত্যহ দুটি ঘণ্টা ধরিয়া একখানি আট পৃষ্ঠার চিঠি লিখিত এবং সেটি তার কিশোরী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়া উত্তরাশায় ঘণ্টা গণিত, তা' উত্তরও নেহাৎ মন্দ মিলিত না। শোভার এই চৌদ্দ বছর বয়স যাইতেছে বটে, তবে নভেল এবং মাসিক-পত্রিকার ছোট বড় গল্প উপন্যাস সে এই বয়সেই যথেষ্ট পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তার হাতের লেখার ছাঁদ ভাল না হইলে কি এমন বেশী আসে যায়? রঙ্গীন ও মীনাকরা চিঠির সুগন্ধি কাগজে সে যে কবিতাগুলি লিখিয়া পাঠাইত,সেগুলি ভাল লেখকদেরই কাছে কর্জ্জ করা। তার মধ্যে বসন্ত, ভ্রমর, মলয় এবং বিরহ প্রচুর পরিমাণেই ভরা থাকিত, বিরহী জনের সান্ত্বনাদায়ক, কবিপ্রাণের উম্মাভরা হা-হুতাশেরও কিছুমাত্র তাহাতে অভাব থাকিত না।

অতএব এই দরবারের মধ্যে শ্রীমান্ শশাঙ্ককুমারই একমাত্র 'হংসমধ্যে বকো যথা' গোছ হইয়া একটি পাশে একখানি পড়ার বই হাতে করিয়া দিনপাত করিতেছিল। বি-এ পাশ করিয়া সে এখনও আইন পড়ে, বড়মার ইচ্ছা সে পাশ করিয়া উকীল হয়, কিন্তু তার নিজের মায়ের সে ইচ্ছা নহে। সরযূ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মুখ ভার করিয়া মনে মনে এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছে যে, এ বড় মন্দ নয়! নিজের পেটের ছেলেকে সাতসকালে পড়ার মেহনত ছাড়িয়ে বউ এনে দিয়ে আয়েস করতে দেওয়া হলো, আর এ আমার ছেলে কি না, তাই এর জন্য সবই ভিন্ন ব্যবস্থা! আমি বরাবরই জানি, কথায় বলে—"মার চেয়ে যে দরদী, তারে বলে ডান", তা সৎমা আর কতই আপন হবে? প্রকাশ্যে কিন্তু বেশী কিছু বলিবার ভরসা রাখে নাই, তবুও একটি দিন সাহসে ভর করিয়া মুখ খুলিয়াছিল। পাড়ার আন্নাকালীই এই কথাটি তুলিলেন। তিনি বিন্দুবাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শরতের ত খাসা বউটি এনেছ, তা হাঁ বড় বৌ! শশীর আমাদের বউটি কবে আনবে?"

বিন্দুবাসিনী শোভার চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, বিনুনী করিতে করিতে উত্তর করিলেন, "শরতের চাইতে শশাঙ্ক দু' বছরের ছোট, তা ছাড়া সে এখন পড়াশুনা করবে, এখন আর তার বিয়ে দিচ্ছি নে।"

এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেই সরযূর ঔৎসুক্য-স্মিত মুখ একবারে অন্ধকার হইয়া গেল। আন্নাকালীও এই কথা শুনিয়া যেন বিস্ময়ের রসসমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন, তিনি সরযূর মুখের দিকে একটি চোরা কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, "তা বড় বৌ! তাও বলি ভাই, বয়েসে শশী শরতের চাইতে দু'বছরের ছোট না হয় হলোই, তা হলেও সে আর নেহাৎ কচিটি ত নয়? তোমার পুতের বউটি এলো—ছোট বউএরও ত ভাই, মনের মধ্যে সাধ যায় যে, ওরও একটি বউ এসে অমনই ক'রে ঘুরে বেড়ায়। আর পড়াশুনো যদি শরতের না করলে চলে, তবে শশীরই বা তার এত কি দরকার? বাপের বিষয় দুই জনেই ত সমান ভাবেই পাবে।"

সরযূ আগ্রহজড়িত চিত্তে ব্যগ্রনয়নে সপত্নীর মুখের দিকে চাহিল, বিন্দুবাসিনী তাঁর গম্ভীর দৃষ্টি তুলিয়া এক লহমার জন্য সেই দিকে চাহিয়াছিলেন; চোখে চোখে মিলিতেই তিনি যেন তাহারই সেই দৃষ্টির প্রশ্নোত্তর দিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "তা বেশ ত, ছোট বউএর সাধ যায় ত ছোট বউ দিক না ছেলের বিয়ে, আমি ত ভাই, তাতে মানা করিনি, ছেলের মত করাক, ছেলের বাপকে বলুক।"

এই বলিয়াই তিনি শোভার চুলের বিনানী দিয়া কবরী রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। আন্নাকালী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সরযূ চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

শোভা এই সময় বলিয়া উঠিল—"ছোড়দা বলছে, এখন সে বিয়ে করবে না, আর বৌদির মত মুখ্যু মেয়েও বিয়ে করবে না। পাশ-করা মেয়ে তার চাই-ই চাই। বড়মাকে সে দিন ত ঐ নিয়ে কি রকম দিক্ করছিল। বড়মা বলেছে, যদি এম-এতে ফাষ্ট হ'তে পারে, তবেই পাশকরা মেয়ে খোঁজা হবে, না হ'লে মুখ্যু ধরেই দেবেন।"

আন্নাকালী অবাক্ হইয়া গিয়া কহিলেন,—"ও মা! তাই নাকি? কালে কালে আরও কতই দেখতে হবে! পাশকরা মেয়ে নিয়ে কি হবে গো! সে কি চাকরী ক'রে পয়সা এনে খাওয়াবে নাকি? তা' তোদের ঘরে ত বাপু পয়সারও অভাব নেই যে, রোজগেরে বউ না এলে সংসার অচল হয়ে পড়বে।"

শোভার চুল বাঁধা হইয়াছিল, বড়মার হাত দিয়া সিঁদুর পরিতে পরিতে সে হাসিয়া কহিল,—"না গো! চাকরী ক'রে পয়সা এনে দেবে কেন? সে ছোড়দার ইংরিজী-বাঙ্গালা সব কাব্য কবিতা বুঝতে পারবে, নিজেও সেই সব তৈরী করবে। এই সব সাধ ওর।"

আন্নাকালী তাঁর বাঁ হাতের উল্টা পিঠখানা নিজের বাঁ গালে দিয়া বলিলেন,—"কে জানে মা! বউ এসে ঘর-করনার কায করে, ব্যাটা-বেটীর মা হয়, ঘরের গিন্নী হয়, চেরোকাল ধ'রে তাই ত জেনে আসছি। তা' না, ইঙ্গিরী কাব্যি বুঝবে, শোলোক বানাবে, এর জন্যে ছেলের মতন বিদ্যে প'ড়ে যে বউ আসবে, সে ত বাপকালে কখন শুনিনি। তা ত হ্যাঁ গা মা! বলি সে বউ কি ঘর-করনা দেখা, কি ছেলে-পুলে মানুষ করা এ সব কিছুই করবে না? মেমেদের মতন পিছনের চুল ছেঁটে, কাণের পাশে জুলপি কেটে আধখানা বুক খুলে অমনি হট্ হট্ ক'রে ঠ্যাং বার ক'রে চলবে ত?"

শোভা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—"তা কেন, ছোড়দা বলে, তার পাশকরা বউ ঘরের কায ও কাব্যালোচনা একসঙ্গে সবই করবে, সে তখন সবাই দেখবে কি না, আগে সে তৈরী হোক্।"

আন্নাকালী সনিশ্বাসে—"দেখাস মা! কক্ষনো ত দেখি নি,

"সুরের কবর"

বসুমতী চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।
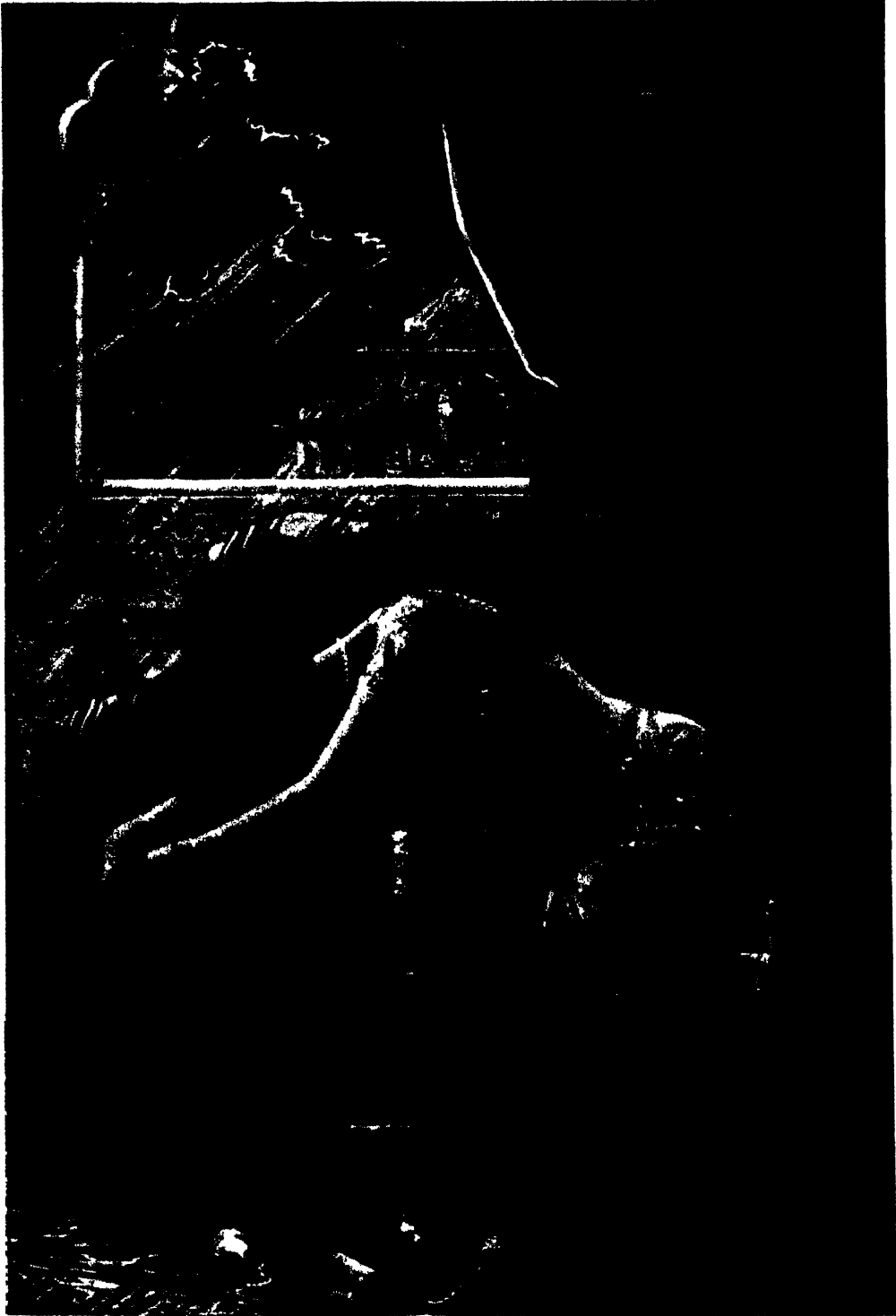
নতুন জিনিষ তখন এসে দেখে যাব।"—বলিয়া উঠিয়া চলিলেন।

শোভার কাণের পাশ হইতে ঘাড়ের গোড়া পর্য্যন্ত বড়মার হাতের গামছার ঘর্ষণে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, পিঠখানা তখনও বাকি। বড়মাকে পৃষ্ঠদান করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া বলিল,—"কেন দেখবে না আনি-পিসী! ঐ ত ওপাড়ার কালী বাবুর মেয়ে আর করবী গুপ্তা এরাও ত এ বছর পাশ করেছে, তাদের দেখনি ?"

আন্নাকালী আবার ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—"অমন কথা বলিসনে শোভা! কালীবাবু (নাম করিতে পারিনে, আমার জ্যেঠ-শ্বশুরের নামে বাধে) তা কালী বাবুর গিন্নী খাসা নোক বাবু! একেবারে নোকোমরী যাকে বলে। মেয়েটাও বেশ শান্ত-শিষ্ট। তা ও পাশ করতে যাবে কেন? ও কি তেমনই ধীঙ্গি নাচনে মেয়ে।"

শোভা এ কথায় কাণ দেয় নাই, সে তখন একটা নূতন আবিষ্কারের আনন্দে সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। সাগ্রহে মুখ ফিরাইয়া স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা হ্যাঁ বড় মা! তুমি ওদের দুজনকে দেখেছ? করবিকে দেখতে যেন ঠিক একখানা পটের আঁকা ছবি! আচ্ছা, ওর সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে কেন দাও না? হ্যাঁ বড় মা! তা কি হয় না?"

বিন্দুবাসিনীর মুখ দিয়া উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই চটিজুতার ফট্‌ ফট্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক আসিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইল—

"এই শুভি! কি হয় না রে?—"

শোভা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "এই তোমার বিয়ে।"

শশাঙ্ক তাহাকে একটা কিল দেখাইয়া মুখ ভেঙ্গাইল—"না, হয় না। তোর নিজের চরকায় তুই তেল দি গে ত! তোদের পছন্দয় আমি বিয়ে করতে যাব কেন শুনি? তোর সঙ্গে কি আমি সমান? আমি আপনি খুঁজে বার ক'রে মনের মত দেখে বিয়ে করবো! তখন পুট্‌ পুট্‌ ক'রে চেয়ে দেখিস্‌।"

বিন্দুবাসিনীর ওষ্ঠে এই কথায় একটুখানি চাপা হাসি মাত্র ব্যক্ত হইল, তাহাতে বিরক্তির লেশ ছিল না। ছেলের এই নির্লজ্জতায় সরযূর মুখ কিন্তু অপ্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। আর আন্নাকালী ত মনের ধিক্কারে সেখান হইতে উঠিয়াই গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা তখনও অনুত্তীর্ণ। উন্মুক্ত আকাশতলে সবেমাত্র গুটি-কতক সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়াছে, সন্ধ্যার বাতাসে শান্ত নীরবতা বিরাজ করিতেছে এবং প্রকৃতির সুষমা যেন দিকে-বিদিকে নানা ভাবে ছড়ান রহিয়াছে। পশ্চিমের প্রান্তটুকু ঈষৎ রক্তিমায় ক্ষীণভাবে অনুরঞ্জিত এবং পূর্ব্বাকাশের ধূসরতা গাঢ় নীলিমায় পরিবর্ত্তিতপ্রায়, সেই নির্ম্মল নীলের মধ্যে মধ্যে সদ্যফোটা যুঁইএর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলি দেখিতে দেখিতে দ্রুতবেগে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বসন্তবাবুর বাড়ীর মধ্যের একখানা ঘরে টেবলের উপর আলো রাখিয়া তাঁহার মেয়ে শোভা ত্বরিতহস্তে একখানা রঙ্গীন কাগজে চিঠি লিখিতেছিল। কাগজখানি শুধুই রঙ্গীন নহে, তাহা চিত্রিতও বটে। একটি হলদে রংয়ের তরুণী মেয়ে, লাল রঙ্গের একখানি সাড়ী পরা, যথাস্থানে সোনালী হলকরা বালা বাজু হার তাও আছে, সে নিজের রাঙ্গা আঁচল উড়াইয়া দিয়া আড়ভাবে পড়িয়া আছে। এক হাতের উপর একটা পাখীর বাচ্চা, আর এক হাতে খামে-আঁটা চিঠি। আঁচলখানির গায়ে লেখা আছে—

"যাও পাখী বলো তারে, সে যেন ভুলে না মোরে—"

শোভার চিঠিখানি এই গোলাপী কাগজটির দুই পৃষ্ঠা ছাড়াইয়া গিয়াছে, এমন সময় একটা প্রচণ্ড বাধা পড়িল। জোর কলমের খোঁচায় পাতলা কাগজখানি ছিঁড়িয়া গেল। বিরক্তচিত্তে সেইখানটাকে একটু সাবিয়া গুরিয়া লইতে গিয়া সেটাকে সে আরও একটুখানি বাড়াইয়া ফেলিল।—এই আকস্মিক দুর্ঘটনার বশে তখন মনটা তার অত্যন্তই বিগড়াইয়া যাইবার মত অবস্থায় পৌছিবার উপক্রম করিতেছে,—ঠিক এমনই সময়েই তার ছোড়দার আহ্বান তার কাণে আসিয়া ঢুকিল—

"এই শুভি! পোড়ারমুখী, সন্ধ্যাবেলা কোণে ব'সে ব'সে হচ্ছে কি রে শুনি?"

ত্রস্তে আধলেখা চিঠিখানাকে টেবলক্লথের তলায় লুকাইয়া ফেলিয়া শোভা মুখ ফিরাইল—

"ভর সন্ধ্যেবেলায় আমায় যে বড় পোড়ারমুখী বলা হলো? দাঁড়াও না, বড়মাকে ব'লে দিচ্ছি।"

"দি গে যা"—বলিয়া শশাঙ্ক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। উৎসুক নেত্রে টেবলের উপরটা নীচেটা পাশগুলায় চকিত দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে শোভার কাঁধ ধরিয়া টান দিল—

"এইও!—ব'লে দিবি বল্লি যে! কৈ, বলে দিতে গেলি নে? যা না, শীগ গির ওঠ্‌, ততক্ষণ আমি এইখানে একটু ব'সে ব'সে—হুঃ—তা' তোকে বল্‌বো কেন, যে কি কবি!—এই, উঠে যা—শীগ্‌গির যা!"

শোভা ভাইএর দুরভিসন্ধি বুঝিয়াছিল, তাই তার চোরাই মাল ফেলিয়া সে উঠিতেও ভরসা করিল না, বরং ভাল করিয়া চাপিয়া বসিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"সে যখন আমার খুসী হবে, তখন আমি বলবো। তোমার হুকুমে এক্ষুণি ছুটতে হবে নাকি আমায়?"

"বেশ, তবে না যাস্‌—একবার উঠে দাঁড়া দেখি, আমি এইখানটায় বসি। দেখ্‌, আমার কথা শোন্‌, ত হ'লে তোকে একটা মজার জিনিষ দেখাবো।—দেখবি?"

শোভা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব করিল—"না, আমি তোমার মজার জিনিষ দেখতে চাই নে! সেই ত সেই রকম ক'রে ঠকাবে! তোমায় আবার আমি চিনিনে? বাব্বাঃ। তুমি কি না ছেলেটি বড় কম! সে দিন বল্লুম, আজ তোমার জন্মদিন, তোমাদের জন্মতিথি পুজো হয়, কত কি হয়, আমাদের কিছু হয় না। স্কুলে দেখেছি, অনেক বাড়ীর মেয়েরাও জন্মদিনে কত কি পায়। আমি কিন্তু কিছুই পাই না। বড়মাকে বল্লুম, তাতে তিনি বল্লেন, 'মেয়েমানুষের আবার জন্মদিন কি? ওসব খৃষ্টানী'—তা তুমি বল্লে, 'তার জন্যে আবার দুঃখ কি! আজ তুই আমার কাছে যা চাইবি, আমি তাই দোব।' আমি বল্লুম, 'ইস্‌, তা' আর দিতে হয় না গো'। বল্লে যে, 'চেয়েই দেখ না

কেন? দিই কি না।' যেই একটা সেলাইএর বাক্স চেয়েছি, অমনি কি না হাতে তালি দিয়ে উঠলে! আমি বল্লুম, 'বাঃ, এখন ফাঁকি দিলে শুনছিনে। কেন নিজেই বলেছিলে যে, যা' চাইবো, তাই দেবে। দাও।' তুমি কি জবাব দিলে মনে আছে ত? বল্লে—'তাই ত, তাই দিলুম, আর কি চাইবি চা' না, আবারও তাই দোব'—বাব্বাঃ! তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ! তোমায় আমি খুব চিনি!"

শশাঙ্ক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোকে সেলাইর বাক্স কিনে কি দিই নি? বেইমান কোথাকার!"

শোভা ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "সে ত পরে দিলে! খোঁটা দিয়ে দিয়ে আদায় করলুম ব'লে, না? অমনি দিয়েছিলে?"

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বলিল—"যাই ক'রে হোক দিলুম ত? পেলেই হোল! তা এ কিন্তু সে রকম নয়। এটা একটা ম্যাজিক! খুব মজার! না দেখিস্, নাই দেখ্‌বি, বড় ত আমার বয়েই গেল। যাই তা হ'লে বৌদিকে দেখাই গে; বেশী ক'রে পাণ খেতে পাবো। তোকে দেখিয়ে আমার লাভটা কি? এখন ত বৌদি এসে পাণ সাজাও ছেড়ে দিয়ে শুধু দিনরাত ব'সে ব'সে প্রবোধকে চিঠিই লিখছিস্"—বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

তখন শোভা একটুখানি বিপন্ন বোধ করিল। ছোড়দা মিথ্যা করিয়াও অনেক রকম ক্ষ্যাপায় বটে, আবার সত্য করিয়াও সায়েন্সের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ যে না করায়—তাও না। যেমন একবার এ্যাকোয়া রিজিয়া দিয়া তার একটা সোনার আংটীকে সোনার জলে পরিণত করিয়া দিয়াছিল, আর একবার পারা মাখাইয়া সোনার পাশী মাকড়ী জোড়াটা কোটিং ধরাইয়া সেইটাকে অব্যবহার্য্যাবস্থায় পরিত্যক্ত করাইয়াছে। এমনই আরও কত কিই সে করিয়া বসিয়াছে, যাহাতে তাহাকে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও তাহাতে সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেও ছাড়ে নাই। তাই তার মন মজাটাকে ঠিক ছাড়িয়া দিতেও খুব ইচ্ছুক হইতেছিল না, অথচ একটু ভীতও হইতেছিল। সে অর্দ্ধ অবিশ্বাসে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আমি কিন্তু এই-খানেই উঠে দাঁড়াবো, এখান থেকে নড়বো না, আর আমার গহনা-গাঁটী কিন্তু কিচ্ছু দোব না, তা'ও ব'লে রাখলুম। তা'তে যদি হয় ত হলো, না হ'লে আর হয়ে কায নেই।"

শশাঙ্ক অমনই হাসি মুখে ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে ঘাড় দোলাইয়া জানাইল, "খুব হবে, তুই দাঁড়ালেই হলো।"

শোভা তখনই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্ক পাশে আসিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—"দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে কিন্তু দেখিস্‌নে যেন চুরি ক'রে। আচ্ছা, হয়েছে। এখন ভাল ক'রে এই দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখছিস্?—এই দেখ্, এখানে ত কিছুই ছিল না? এখন দেখ্‌ছিস্ ত এই পাখী ফুল মানুষ সব এসেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে গ্যাছে, 'যাও পাখী বলো তারে'—"

"ও মা গো! কি দুষ্টু বদ্ ছেলে তুমি! ছোড়দা! ছোড়দা, শীগ্‌গির দাও—দাও শীগ্‌গির! ভাল হবে না বলছি। হ্যাঁ! আর যদি তোমায় আমি জন্মে কখনো বিশ্বাস করি"—শোভা রাগিয়া কাঁপিয়া চিঠি কাড়াকাড়ি করিয়া তার যতখানি পারিল ছিঁড়িয়া লইল। তার পর সেই ছেঁড়া অংশগুলা টুকরা টুকরা করিয়া কুচাইতে কুচাইতে তার নাক দিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া বড় বড় নিশ্বাস ও টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"যাঃ, ছিঁচ কাঁদুনি-মেয়ে কোথাকার! এই নি গে যা তোর চিঠি"—বলিয়া শশাঙ্ক তখন ছেঁড়া চিঠির বাকি অংশটাকে তার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল। শোভা সেটাও লইয়া সমান বেগে কুচি কুচি করিতে লাগিল।

এতবড় কাণ্ডই যে হঠাৎ ঘটিয়া যাইবে, শশাঙ্ক সে সন্দেহ আদৌ করিতে পারে নাই। তাই সেও যেন এ ঘটনায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ভাবটাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া নিজেকে পরাজিত করিতে তায় প্রবৃত্তি হইল না, তাই সে উহাকে ভুলাইয়া ফেলিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা, আমার ওপর রাগ ক'রে চিঠি ছিঁড়ে ফেলা! মজা দেখাব কি না, যখন আমার বউএর চিঠি আসবে। আসিস দেখি তখন, কাণ কেটে দোব না এই ছুরি দিয়ে। ঐ দেখ, কি রকম ওর ধার দেখলি ত?"

শোভার মন তখন তার অত সাধের যত্ন করিয়া লেখা চিঠি-খানির অকালমরণে বিষম শোকাহত হইয়া রহিয়াছে, দাদার কথায় তাই তার রাগ ভাঙ্গিল না, সে মাটীর দিকে চোখ রাখিয়াই চোখের জল পড়াটাকে কোনমতে রোধ করিয়া মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিল—

"বউএর চিঠি যখন আসবে! বউই এলো ত বড়, তা বউএর চিঠি আসবে!—ভা—রি ত ভয় দেখাচ্ছেন। চাই নে তোমার বউএর চিঠি পড়তে,—যাও!"

শশাঙ্ক বলিল, "হুঁ, আচ্ছা, মনে থাকে যেন। চাস্ নে ত আমার বউএর চিঠি পড়তে! বেশ, খবরদার। তখন যদি হ্যাংলামী ক'রে চাস্ ত টেরটি পাবি।"

শোভা এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে কহিল, "আগে বউই হোক ত তখন তার কথা। রাম না হ'তেই রামায়ণ যে!"

শশাঙ্ক বলিল, "বউ না হ'লে কি আর বউএর চিঠি আসতে পাবে না নাকি? হুঁ, তেমনি পেয়েছিস, না? দেখিস, আমার তাই আসবে। সে আরও কত মজা! বউও নয়, অথচ বউও বটে, সে সব কিন্তু তোকে দেখতে দোব না দেখিস! দূর থেকে খালি খামটা দেখিয়ে ঠিক এমনি ক'রে গট গট চ'লে যাব।"

শোভার মনে এবার একটুখানি ভয় দেখা দিল, তথাপি সে তাহাকে চাপা দিয়া সগর্ব্বে কহিল, "সে রকম না কি আবার হয়? বিয়ে না হ'লে আবার বউ হবে কি ক'রে শুনি?"

শশাঙ্ক হাসিয়া বলিল, "কেন, সাহেবদের শুনিস নি কোর্টশিপ হয়? আমাদেরও তাই হবে। সেই সময় সে আমায় চিঠি লিখবে। সে সব কি রকম ছবিওয়ালা রঙ্গীন রঙ্গীন কাগজ! আমিই সব তাকে কিনে দোব কি না।—তার একটায় মটো থাকবে—'ভুলিও না ভালবাসা', আর একটায় 'শিশিরে কি ফলে ধান বিনা বরিষণে? চিঠিতে কি ভরে প্রাণ বিনা দরশনে?' আর একটায় তোর মতন ঐ পাখীর পদ্যটা, আর—"

শোভা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "যাও—"

এই সবগুলিই যে তার বাক্সে আছে, তার ছোড়দা নিশ্চয়ই

তাহা দেখিয়া থাকিবে! কেমন করিয়া? হয় ত সে দিন সে এই কাগজগুলি পছন্দ করিয়া যার কাছে কিনিয়াছিল, তারই কাছে তার বাকিগুলি দেখিয়া রাখিয়াছে। যা ছেলে—আশ্চর্য্য নয়! তার ভারী লজ্জা করিতে লাগিল বলিয়া রাগও বাড়িয়া গেল।

তখন শশাঙ্ক তাহাকে শান্ত করিবার জন্য উপায়ান্তরের অবতারণা করিল।

"আচ্ছা শুভি! তুই এত অ-মিশুক কেন বল ত? দেশে এত সব যে ভাল ভাল মেয়ে আছে; তা' কারু সঙ্গেই মিশতে চাস্ না। লোকে বলে, জমীদারের মেয়ে ব'লে শোভার বড় অহঙ্কার।"

শোভা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার মিথ্যে কথা! কক্ষনো কেউ তা' বলে না। আচ্ছা, কে বলেছে, তার নাম করো?"

শশাঙ্ক একটুখানি ভাবিয়া জবাব দিল, "বলছি দাঁড়া, এই—অতুলবাবুর মেয়ে—কি যে তার নামটা?"

"অতসী? এককোঁটা মেয়ে, তার আবার এত কথা!"

শশাঙ্ক তখন বিপন্নভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল—"এককোঁটা কি দুফোঁটা, তা ত আমি জানিনে, এইবার যে ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাশ করলে না, কি যে তার নামটা? ভাল রুমনো না, ঝুমনো,—"

শোভা এবার আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে বলিতে লাগিল—"রুমনো না ঝুমনো না উমনো! না? রুবি গো! তার নাম করবী, ডাকে রুবি ব'লে। তা দাদা! সত্যি, সে যেন সত্যিকার একখানা চকচকে টুকটুকে রাঙ্গা চুণি! হ্যাঁ, সে কি বলেছে?"

"ঐ যে কি বলেছে? হ্যাঁ, এই তুই তাদের কখন আসতেও বলিস নে, বড় লোক কি না, তাই তাদের মতন গরীবদের সঙ্গে মিশতে চাইবি কেন,—এই সবই নাকি, কি কি বলেছে শুনলুম। অবশ্য লেকচারটা ঠিক কি হয়েছিল, তা' শুনিনি। এক দিন আসতে বল্লেই ত চুকে যায় তাকে। মিথ্যে বদনামের ভাগী হ'তে হয় না আর।"

শোভা এই প্রস্তাবে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সাগ্রহে সম্মত হইয়া বলিল, "বেশ ত, আমি আজই বড়মার মত করিয়ে কালই তাকে ব'লে পাঠাবো এখন। আমি যার বলে—তারা অত বিদ্বান্ ব'লে ভয়েই লুকিয়ে থাকি। নৈলে তাকে কি আমার সোজা ভাল লাগে! দেখতে ত অত সুন্দর! আবার এমন আমুদে, হাসি ত ঠোঁটে লেগেই আছে, আর সেই ঠোঁট দুখানাই যে কি চমৎকার! বেশ দুটো—"

"পাকা রম্ভা! 'উপমা কালিদাসস্য'!—বা রে! এই দেখ ত! তুই ত একজন মস্ত কবি হয়ে উঠেছিস! তবু যদি ঐ রুবি তোর ছোট বৌদি হতো।"

শোভা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ঐ জন্যেই ত তোমার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে যায় না। কলার মতন ঠোঁট বুঝি আমি বলছিলুম? এত তা' ব'লে বাঁদর নই!"

শশাঙ্ক ভাল মানুষটি সাজিয়া জবাব দিল, "তা বুঝি বলিস্ নি? তবে কি বলছিলি, বল ত?"

শোভা বর্দ্ধিত রোষে "যাও, বলবো না" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইহার ঠিক পরের দিনের দুপুর বেলা ছুটীর দিনের দীর্ঘ নিদ্রা সারিয়া সবেমাত্র যেমনই শশাঙ্ক বাড়ীর ভিতরে পা দিয়াছে, অমনই তার চটি জুতার শব্দে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া পাশের একটা ঘরের মধ্য হইতে শোভা ডাকিয়া উঠিল—"হ্যাঁ ছোড়দা!"

শশাঙ্ক গতি রুদ্ধ করিয়া বলিল, "কি রে, তুই যে একেবারে যুদ্ধ-ঘোষণার সুরেই কথা আরম্ভ করলি!"

শোভা ভিতর হইতে দ্বার-সান্নিধ্যে আসিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল—"করবো না বৈ কি? কাল তুমি থামকা কতকগুলি মিথ্যে কথা বল্লে কেন বল ত?"

শশাঙ্ক ঠোঁট টিপিয়া বলিল, "ওঃ, সে কাল যদি ব'লে থাকি, তার আজ কি? তা' ছাড়া আমি বলিইনি।"

"বলোনি বৈ কি? তুমি যে বল্লে রুবিদি বলেছে, আমি ভারী অহঙ্কারী—ওদের সঙ্গে মিশি না, কৈ, রুবিদি ত সে কথা বলে নি। শুধু শুধু আমার বদনাম করা? হুঁ?"

শোভার পিছন দিক্ হইতে তার এই তীব্র প্রতিবাদকে সমর্থন করিয়া একটি অপরিচিত স্বর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "সত্যি আমি কিছু বলি নি, কে আপনাকে এ কথা বলেছিল? ভারি অন্যায় ত?"

শশাঙ্ক চাহিয়া দেখিল, খাটো মানুষ শোভাকে ছাড়াইয়া তাহার মাথার খানিকটা উপরে সদ্য ফোটা পদ্মের মতই একখানা অত্যন্ত সুন্দর মুখ ফুটিয়া যেন ঢল ঢল করিতেছে। শোভার কালো চুলের উপর তার শ্বেতাভ গোলাপী রংয়ের বাহার যেন বেশী করিয়াই খুলিয়াছিল। ঠিক নীল জলে শ্বেত পদ্মটি! সে মুগ্ধ বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "ও, আপনি বলেন নি বুঝি? তা' হলে আর কেউ ব'লে থাকবে বোধ হয়।"

শোভা এবার ক্রুদ্ধ হইল। তবু আর কেউ!—কেউই বলে নাই। ও শুধু তাহাকে ক্ষেপাইবার ফন্দি।

শশাঙ্ক গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কায নেই, তাই তোকে ক্ষ্যাপাবার ফন্দি নিয়েই আছি।"

শোভা ভ্রূকুটী করিয়া সবেগে কহিল, "ভারি ত তোমার কায! কি কায আছে? বউও হয়নি যে চিঠি লিখবে।"

শশাঙ্ক নরমস্বরে বলিল, "ঠিক ধরেছিস, দরদী নৈলে দুঃখ বোঝে?" তার পর রুবিকে হাসিতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "দেখুন, ওটা একটা ভয়ানক চিঠি-পাগলা। রাত্রিদিনই চিঠি লেখে। ওকে আপনার দলে একটুক যদি টেনে নেন, তা হ'লে আমাদের অনেকগুলো খাম-কাগজের পয়সা বাঁচে, আর পোষ্টাফিসেরও একটু আয় কমে। আর ওটারও চোখের ব্যারাম হয় না। আর সব চেয়ে বেশী উপকার হয় সেই ভদ্র ব্যক্তির, যাকে ঐ কাগের ছা, বকের ছা, সাত পাতা ক'রে রোজ রোজই পড়তে হয়।"

"উঃ, কি মিথ্যুক রে!" বলিয়া শোভা চলিয়া যাইবার জন্য সবেগে ফিরিল। রুবি ইহাদের কথায় অত্যন্ত হাসিতেছিল। এবার হাসিয়া শোভার পথ আগলাইয়া বলিল, "সত্যি শোভা! আমায় একখানা চিঠি দেখাও না।"

তার ঘরের মধ্যে তাহাকে অনুসরণ করিয়া শশাঙ্কের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "আপনিও আসুন না।"

শশাঙ্ককে না ডাকিলেই সে যে না যাইত, তা' কিছু নয়; তথাপি সে আহ্বানে সে আনন্দের সহিতই ঘরে ঢুকিল। তবে সে এই সঙ্গে ঈষৎ বিস্ময়ানুভবও করিয়াছিল। রুবির বয়সী মেয়ের পক্ষে এক জন সম্পূর্ণ অজানা যুবাকে প্রথম দর্শনেই এই-ভাবে আমন্ত্রণ সে কখনও কল্পনাও করিতে পারিত না। মনে মনে মীমাংসা করিল, এ ত আর অশিক্ষিতা মেয়ে নয়। পাশ-করা শিক্ষিতা মেয়ে, তাই এমন স্বাধীনচিত্ত।

রুবি মুকুট লইয়া সানন্দে বাড়ী ফিরিল। মুকুটখানা তাহার মাথায় পরাইয়া দিয়া শোভা আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল, "মা গো, রুবিদি'কে কি ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে! আহা গো! রুবিদি' যদি আমার ছোট বৌদি হতো! তবে রুবিদি?"

রুবির বসোরা-গোলাপের মত গালদুইটা উজ্জ্বলতর দেখাইল, তার চঞ্চল চটুল কাল চোখে একটা তড়িৎস্ফূর্ত্তি খেলিয়া গেল. সে মুখ ফিরাইয়া শশাঙ্কের বিস্ময়-স্মিত মুগ্ধ মুখে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ নত করিল।

শশাঙ্ক একটুখানি নিকটস্থ হইয়া মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"মনে থাকে যেন, এ মৌনকে আমি আপনার সম্মতি ব'লে ধ'রে নিলুম।"

রুবি তার মুনি-মন-ভুলান হাসিভরা দৃষ্টি তুলিয়া শশাঙ্কের আবেগ-রক্তিম সুগৌর মুখের উপর তাহা আর এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থাপন করিয়া পুনশ্চ তেমনই করিয়াই শুধু হাসিল।

শশাঙ্কের রূপ, তার সহজ অমায়িকতা, তার ঐশ্বর্য্য তাহাকে কেনই বা তার প্রতি আকৃষ্ট করিবে না? বিশেষতঃ সে নিজেই যখন উপযাচক।

সে দিন রুবি বাড়ী ফিরিবার পর রুবির মা নর্ম্মদা রুবিকে একা পাইতেই কাছে আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা রে, তোকে যে বড় ওরা হঠাৎ গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে গেল, মতলবটা কিছু বুঝতে পারলি?"

রুবির মনটা তখন একটা আনন্দে ভরাই ছিল। সে বসন্ত বাবুর প্রাসাদ-ভবনের বিশালত্ব, তার বহুমূল্য সাজসজ্জার কথা বারম্বার করিয়া মনে করিতেছিল। বিশেষতঃ শোভা যখন তাহাকে মুকুট দিবার জন্য বড়মাকে বলিয়া লোহার আলমারি খোলাইয়াছিল, তখন তার মধ্যের হীরা, চুণি, পান্না ও সুবর্ণের রাশি দেখিয়া তার চোখ ও মন যেন ঝলসাইয়া গিয়াছে। জগতে এত ঐশ্বর্য্যও জমা করা আছে! আর তাদের জন্য তার মধ্যের কতটুকুই বা জুটিয়াছে! তার এই চারু চিক্কণ চুলের রাশি—এতে দুইটা হাড়ের ক্লিপ ভিন্ন কিছুই জুটে নাই, আর শোভার হীরা মুক্তা এবং তা ছাড়া আট পৌরের সোনার ক্লিপ আছে। রুবির এই মোমবাতীর মতন সাদা হাতে মরাসোনার চুড়ি ক'গাছা ভাল করিয়া দেখাও যায় না, তাও আবার ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, ও বাড়ীর বড় বৌয়ের সেই স্থূল ও সুডৌল মুক্তার তাগা দুখানি হাতে পরিলে এই হাতের বাহার কতই না খুলিয়া যাইত। অথচ যার জিনিষ, তার হাত দুটি কি কৃশ! একটি ছেলে হইয়াই বৌটিকে সূতিকায় ধরিয়াছে, সব গহনাই গায়ে ঢলকাইয়া গিয়াছে। রূপই বা এমন বেশী কি? অমন ত অনেকই দেখা যায়! কিন্তু কি বিপুল ঐশ্বর্য্যই সম্ভোগ করিতেছে! মায়ের প্রশ্নে সে ঈষৎ অন্যমনে জবাব দিল—"কি মতলব?"

নর্ম্মদা বলিলেন, "কেন, ওদের একটা আইবড় ছেলে আছে না? তাকে দেখলি? শুনেছি, দেখতেও বেশ সুন্দর।"

এবার শশাঙ্কের কথা উঠিতেই রুবি হঠাৎ বসন্তবাবুর ঐশ্বর্য্যের ধ্যান ভুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহস্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা, শশাঙ্কবাবুকে বেশ দেখতে মা, আমার ওঁকে কিন্তু বড় ভাল লেগেছে!"

মা হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তা ত লাগবেই, তার লেগেছে কি না বুঝলি কিছু?"

রুবির মধ্যে কপটতা জিনিষটা মোটেই ছিল না, সে কথা গোপন করিতে জানে না, সরলস্বভাবা স্মিতহাস্যে জানাইল যে, বুঝিয়াছে।

নর্ম্মদার কৌতূহল প্রবল হইল, তিনি যখন একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কে কি বলিল? শশাঙ্ক নিজে কিছু বলিয়াছে কি না। বলিয়া থাকে ত তাহা কি? ইত্যাদি।

রুবি সব কথাই বলিল; বাড়ীর অন্যলোক কেহ কিছুই বলে নাই, শুধু শোভাই বার বার করিয়া বলিয়াছে, আর বলিয়াছে শশাঙ্ক নিজে এবং সে যাহা বলিয়াছিল, তাও বলিল।

শুনিয়া নর্ম্মদা একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আর ভাবনা নেই। সে নিজে যখন পছন্দ করেছে, তখন মা বাপে আর না বলতে পারবে না। তবে দেখা-শোনাটা যাতে মধ্যে মধ্যে হয়, তার একটা কোন ব্যবস্থা করতে হবে।"

রুবির মনের মধ্যেও এইরকমই একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া রহিয়াছিল। সে একটু ব্যগ্র হইয়াই বলিয়া উঠিল—

"হ্যাঁ মা, সে হ'লে বেশ হবে। তিনি এমন মজা ক'রে কথা বলেন, আমার শুনতে ভারি লাগে"—বলিতে বলিতে শশাঙ্কদের ভাই-বোনের ঝগড়া মনে করিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আলোকাধারের অন্তর্গত পাখা

বিজলী আলোকদীপ্ত ঝাড়ের নিম্নে বৈদ্যুতিক পাখা সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় ইদানীং অধিক বাতাস পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় কম হইয়া থাকে। পাখাগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, উহা যখন চলিতে থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল প্রবাহধারা কক্ষমধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। পাখার নীচে বসিলে কাগজ-পত্র উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনাও ইহাতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়।

আলোকাধারের সংলগ্ন বিজলী পাখা

স্বয়ংচালিত প্রাচীর-চিত্রের যন্ত্র

জনৈক জাম্মাণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহার সাহায্যে গৃহ-প্রাচীরে নানাপ্রকার চিত্র স্বল্প সময়ে অঙ্কিত করা যায়। এই যন্ত্রের এমনই গুণ যে, যে কার্য্য দুই দিনে সম্পন্ন হয়, তাহা দুই ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হইবে। প্রাচীরের চিত্রগুলিও বেশ সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গৃহশোভা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

প্রাচীর-চিত্রের অভিনব ব্যবস্থা

মোটর-গাড়ীতে রিভলভারের গুপ্ত কক্ষ

পুলিসের সুবিধার জন্য মোটরগাড়ী-চালকের পার্শ্বে পিস্তল রাখিবার গুপ্তকক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা এমনভাবে নির্ম্মিত যে, ইচ্ছামাত্রেই চালক উহা টানিয়া বাহির করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। পিস্তল যখন কক্ষমধ্যে সংগুপ্ত থাকে, বাহির হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।
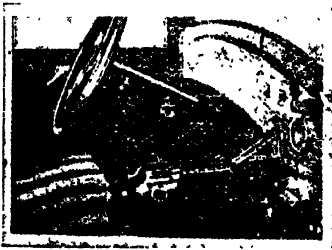
মোটরগাড়ীতে পিস্তলের গুপ্তকক্ষ

বিজ্ঞানের কৌশল

চিঠিপত্র ছাপিবার অক্ষর যন্ত্রে কোন কিছু অধিক সংখ্যায় ছাপিবার প্রয়োজন হইলে, 'কার্ব্বন' কাগজ দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি কাগজের উপর সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। ইহাতে অনেকটা সময়ের বৃথা অপব্যয় হয়, বিরক্তিও জন্মে। কিন্তু অধুনা এমন কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে এ সকল উপদ্রব সহ্য করিতে

টাইপরাইটার যন্ত্রে কার্ব্বন কাগজ সংলগ্ন করার কৌশল

হয় না। আপনা হইতেই এক একখানি কাগজের উপরে বা নিম্নে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

ভাসমান জীবনরক্ষক পাত্র

এলুমিনিয়ম-নির্ম্মিত একপ্রকার 'বোয়া' বা ভাসমান পাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা সন্তরণকারীর পৃষ্ঠদেশে এমনভাবে সংলগ্ন থাকে যে, ঘটনাক্রমে সন্তরণকারী শ্রান্ত হইয়া যদি জল-নিমজ্জিত হয়, তখন উক্ত এলুমিনিয়ম পাত্রটি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। দেহের

সন্তরণকারীর পৃষ্ঠ-বিলম্বিত এলুমিনিয়ম পাত্র

ভারে ডুবিয়া যায় না। যাহারা সন্তরণকারীদিগকে দৈব-দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিবার মানসে উহাদের অনুগমন করে, দূর হইতে সেই ভাসমান 'বোয়া' দেখিতে পাইয়া অনতিবিলম্বে জলমগ্ন সন্তরণকারীকে উদ্ধার করিতে পারে। উক্ত এলুমিনিয়ম পাত্রটির সংলগ্ন একটা রজ্জু থাকে। উহা আকর্ষণ করিলেই দেহটিকে টানিয়া তুলা যায়। বোয়াটি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। দূর হইতে উহা প্রাণরক্ষাকারীদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বিপদ্-নিবারণের পন্থা

পথে চলিতে চলিতে সহসা মোটর-গাড়ীর চাকা হইতে বায়ু নির্গত হইয়া যায়। তখন হয় চাকা পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, অথবা

বায়ুপূর্ণ চাকা হইতে শূন্য চক্রে বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে

বায়ু পুনরায় পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। অধুনা হাত-পাম্পের পরিবর্ত্তে এক প্রকার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে পাম্প বা বায়ু ভরিবার জন্য অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। গাড়ীর সহিত যে অতিরিক্ত বায়ুপূর্ণ চাকা থাকে, তাহা হইতে নলের সাহায্যে, শূন্য চাকা বায়ু-পরিপূর্ণ করিতে পারা যায়। চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে।

দ্রুতগামী মোটর-যান

ক্যাপ্টেন ম্যালকলম্ ক্যাম্বেল যে নূতন মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ
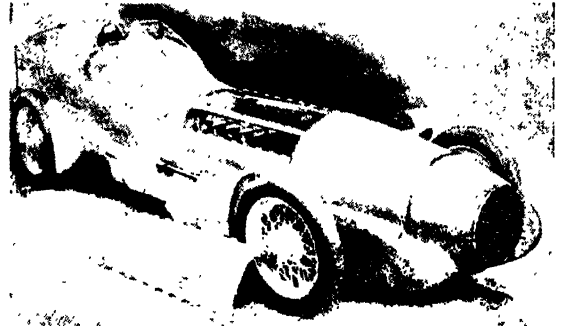
দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী

করাইয়াছেন, তাহার নাম "ব্লু বার্ড" বা নীল পাখী। ইহার সাহায্যে তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ করিবার আশা রাখেন। গাড়ীখানির নির্ম্মাণকার্য্য সম্প্রতি ইংলণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

বিচিত্র প্যারাসুট

বিমানপোত বিভাগে ব্যবহারের জন্য একপ্রকার প্যারাসুট নির্ম্মিত হইয়াছে। চিকাগোর জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ উহার উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিমানপোতের পার্শ্বে উহা আবদ্ধ থাকে। বন্ধনরজ্জু আকর্ষণ করিবামাত্র উহা মুক্ত হয়। মুক্ত হইবামাত্র প্যারাসুট ছত্রাকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহাতে ১২টি ধাতু-নির্ম্মিত শিক আছে। শিকগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত এবং প্যারাসুট-সংশ্লিষ্ট থাকে যে, কোনমতেই উহা কোন দিকে হেলিয়া ঢুলিয়া কাৎ হইয়া পড়িবে না। পোতারোহী যদি প্যারাসুট সাহায্যে সমুদ্র বা নদীজলে অবতরণ করে, তখন উহা ঠিক ভেলার কার্য্য করিয়া থাকে। সমগ্র প্যারাসুটের ওজন ১২ সের মাত্র। স্বল্পায়াসে এই প্যারাসুট বদ্ধ করিবার কৌশলও আছে।
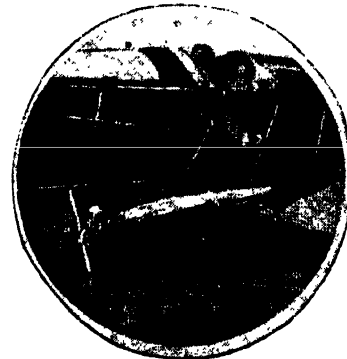
বিমানপোত-সংলগ্ন প্যারাসুট

অভিনব ইষ্টক

ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার জর্জ্জ বোল্ নবপ্রণালীতে নির্ম্মিত এক প্রকার ইষ্টক দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, এই-রূপ ইষ্টকের সাহায্যে পরিণামে শত তল, আকাশ-চুম্বী সৌধ নির্ম্মাণ আর অসম্ভব হইবে না। সাধারণতঃ একখানি ইষ্টকের যে ওজন, এই নূতন ইষ্টকের ওজন তাহার একষষ্ঠাংশ। কিন্তু এই ইষ্টকের সহন-শক্তি অনেক অধিক এবং অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। যদি উত্তাপের মাত্রা ৩ হাজার ২ শত ৫০ ডিগ্রি হয়, তবে এই ইষ্টক ১৫ ঘণ্টাকাল তাহার দহন-বেগকে প্রতিহত করিয়া রাখিতে পারিবে।

নূতন ইষ্টক

টেলিফোন্ যন্ত্রের অভিনব ব্যবস্থা

যাহাতে একসঙ্গে দুই ব্যক্তি একই স্থলে বসিয়া একই সময়ে টেলিফোন যন্ত্রে কার্য্য করিতে পারে, সম্প্রতি এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'রিসিভার' বা শব্দ-সংগ্রাহক যন্ত্রে দুই জনের শ্রবণের উপযোগী যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। অথবা একই ব্যক্তি দুই কর্ণে উহা সংলগ্ন করিয়া হস্তের দ্বারা লেখার কায করিতে পারে। দুই কর্ণে যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিলে ভাল শোনা যায়। উহা পকেটে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াও চলে, এমনই আকারে উহা নির্ম্মিত; তবে একসঙ্গে দুই ব্যক্তির কথা বলিবার কোন উপায় অবশ্য নাই।

টেলিফোন যন্ত্রে দুই জন একসঙ্গে শ্রবণ করিতেছে

ভাঁজকরা দর্পণ ও ক্ষুর

পর্য্যটক প্রভৃতির সুবিধার জন্য দর্পণসংযুক্ত ক্ষুর বাজারে বাহির হইয়াছে। এই ক্ষুর বা 'সেফটি রেজর' নলযুক্ত হইয়া দর্পণের নিম্নে সংশ্লিষ্ট থাকে। উহা এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, ক্ষৌরকার্য্যকালে দর্পণ সম্মুখে অবস্থিত থাকে, ক্ষৌরকার্য্যও নিরাপদে সম্পন্ন হয়। সমগ্র যন্ত্রের ওজন দুই আউন্স মাত্র। উহাকে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়।

ভাঁজকরা দর্পণ ও ক্ষুর

মোটরচালিত 'স্কী'

সুইজরল্যাণ্ডে সেণ্ট মরিস্ নামক স্থানে শীতকালে নানাবিধ ক্রীড়া হইয়া থাকে। সেণ্ট মরিস্ যখন তুষারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তখন উহার উপর দিয়া মোটর-যুক্ত স্কী সাহায্যে ক্রীড়ার্থীরা পরম আনন্দ উপভোগ করে। আরোহী দুইখানা স্কী দুই চরণে সংলগ্ন করিয়া, মোটরযুক্ত তৃতীয় 'স্কী'র উপর বসিয়া থাকে। মোটরের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার যন্ত্র আরোহীর হাতের কাছেই থাকে। দুই পায়ের স্কী সাহায্যে আরোহী সোজাভাবে বসিয়া থাকে।

মোটর-চালিত 'স্কী'

পুলিসের বর্ম্মাধার

পুলিসের বর্ম্মাধার ও বর্ম্ম

সাধারণ বেশে প্যারীর পুলিস-প্রহরীরা পথে ভ্রমণ করে। উহাদের সঙ্গে একটি আধার থাকে। তন্মধ্যে ভাঁজ করা বর্ম্ম ও ঢাল থাকে। প্রয়োজনকালে পুলিস-কর্ম্মচারী উহা আধার হইতে বাহির করিয়া অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। ইস্পাত-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ এবং ইস্পাতের ঢাল ছাড়া পুলিস-কর্ম্মচারী অঙ্গাবরণের নিম্নভাগে গুলী-নিবারক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে ইস্পাতের ঢালের সাহায্যে অস্ত্রাঘাত নিবারণ করা যায়।

বিচিত্র আধার

বিচিত্র আধার

হংস শিকার উপলক্ষে যাহারা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, অথবা বস্ত্রাবাসে জীবন-যাপনে যাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্ত বর্ত্তমানে এক প্রকার আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আধার জলনিবারক বস্ত্রের দ্বারা মণ্ডিত। আধার-মধ্যে চারিটি স্বতন্ত্র খোপ আছে। আহার্য্য দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি ইহাতে রাখিয়া, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত করিয়া শিকারী বা পর্য্যটক দীর্ঘপথ অতিবাহন করিতে পারেন।

বাষ্পপ্রবাহসাহায্যে অগ্নিনির্ব্বাণ

অগ্নিনির্ব্বাণকারী বিভাগের সুবিধার জন্য এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে 'কার্ব্বন ডাই অক্সাইড' গ্যাস ব্যবহার করিলে অগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। আধার হইতে নির্গত হইবার পরই এই বাষ্পপ্রবাহ তুষার-শীতল জমাট অবস্থা প্রাপ্ত

বাষ্পপ্রবাহসাহায্যে অগ্নি-নির্ব্বাণ

হয়; তাহার ফলে চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়। অক্সিজেন প্রবাহও তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাযেই অতি সহজে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। তুষারের অবস্থা যখন অন্তর্হিত হয়, অর্থাৎ যখন উহা গলিয়া যায়, তখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, কোন দাগ পর্য্যন্ত থাকে না। মাল-গুদাম প্রভৃতি স্থানে এই উপায়ে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে কোন পদার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জলধারায় অনেক সময় অন্যান্য জিনিষের ক্ষতি হইয়া থাকে।

টেনিস্ ক্রীড়ার নূতন ব্যবস্থা

যন্ত্রসাহায্যে টেনিস্ বল নিক্ষেপ

প্রতিপক্ষের অভাবে টেনিস্ খেলা যায় না। এজন্য সম্প্রতি এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা হইতে বল নিক্ষিপ্ত হয়। যন্ত্রের কাছে শিক্ষক দাঁড়াইয়া শিক্ষার্থীর নিকট যন্ত্রসাহায্যে বল নিক্ষেপ করেন। বল জাল অতিক্রম করিয়া

শিক্ষার্থীর কাছে পৌছে। মুহুর্মুহুঃ বল ছুটিতে থাকে। শিক্ষার্থীও বলগুলি ব্যাটের সাহায্যে প্রতিহত করিয়া ক্ষিপ্রকারিতা ও খেলার কৌশল শিখিতে থাকে। যদি খেলার কোন ত্রুটি ঘটে, শিক্ষক তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান এবং শিক্ষার্থীকে ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে পারেন।

প্রসাধনে অঙ্গুরীয়

বাজারে এক প্রকার অঙ্গুরীয় বাহির হইয়াছে। উহার ডালার নিম্নভাগে ওষ্ঠরাগ করিবার উপযুক্ত পদার্থ রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ডালার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দর্পণও সন্নিবিষ্ট আছে। বিলাসিনী বা প্রয়োজনকালে অঙ্গুরীয়কের ডালা মুক্ত করিয়া ওষ্ঠ-রাগক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন।

বিচিত্র অঙ্গুরীয়

হাজার গাড়ী রাখিবার গ্যারেজ

নিউইয়র্ক সহরে মোটর-গাড়ী রাখিবার জন্য একটি হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হোটেল ২৫ তল উচ্চ। ১ হাজার গাড়ী রাখিবার স্থান এখানে আছে। ভিন্ন ভিন্ন তলে গাড়ী-গুলিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হাজার গাড়ী রাখিবার হোটেল

স্প্রীং-নির্ম্মিত সন্না

সাধারণ সন্নার পরিবর্ত্তে বাজারে স্প্রীং-যুক্ত এক প্রকার সন্নার প্রচলন হইয়াছে। একটা বোতাম উহাতে সংলগ্ন থাকে। সেই বোতাম টিপিবামাত্র নির্দ্দিষ্ট কেশটি সহজে উৎপাটিত করা যায়, কোন কষ্ট হয় না। হস্তের সাহায্যে কেশ উৎপাটন করিতে অনেক সময় সামান্য বেদনা অনুভূত হয়, এই স্প্রীংযুক্ত সন্নার তাহা আদৌ অনুভূত হইবে না। এক হাতের সাহায্যেই কেশোৎপাটন কার্য্য সম্পন্ন করা যায়।

স্প্রীংযুক্ত সন্না

অভিনব কুলুপ

জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খল-সংযুক্ত এক প্রকার কুলুপ উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই চেন বা শৃঙ্খলের মধ্যে এক প্রকার বাষ্প সঞ্চিত থাকে। নির্দ্দিষ্ট চাবীর সাহায্যে এই তালা না খুলিয়া অসদভিপ্রায়ে যদি কেহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে তন্মধ্য হইতে এমন বাষ্পপ্রবাহ নির্গত হইবে যে, তাহার প্রভাবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অভিভূত হইয়া পড়িবে। দস্যু-তস্করের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যই এইরূপ কৌশল-নির্ম্মিত তালার উদ্ভাবন হইয়াছে।

দস্যু-বিতাড়নকারী বাষ্পপূর্ণ তালা

সোনার পাহাড়

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রারম্ভ

অরণ্যচর দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির সহিত যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করিতে কিরূপ শোণিতক্ষয় করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের কেহ না কেহ এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এ জন্য যুদ্ধাবসানে প্রত্যেক গৃহে রোদনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সমগ্র গ্রাম বিষাদান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইলে সমগ্র গ্রাম বিধ্বস্ত হইত, দস্যুরা বালিকা ও যুবতীগণকে বাঁধিয়া লইয়া যাইত, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই নিহত হইত, এ কথা চিন্তা করিয়া, এবং দস্যুরা আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না—বুঝিয়া সেই গভীর শোকেও হতাবশিষ্ট গ্রামবাসীরা শান্তি লাভ করিল।

আমাদের দলের মধ্যে বার্ণি ফ্যাগানই সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের বর্শার আঘাতে তাহার মাথা ফুটা হইয়াছিল। আমাদের পাদরী মহাশয় ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল; অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার পারদর্শিতাও অল্প ছিল না। তিনি বার্ণির মস্তকের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া আরোগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন; কিন্তু নসিস্‌কা তাহার প্রণয়ীর জীবন রক্ষার জন্য দিবা-রাত্রি যেন যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল! আহতের সেরূপ পরিচর্য্যা আমি জীবনে কখন দেখি নাই। সে যে ভাবে বার্ণির শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কোন সেবাপরায়ণা সাধ্বী নারী তাহার অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ ও যত্নের সহিত রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পারিত না। নসিস্‌কার আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম, মনে হইল—সে নারী নহে, দেবী।

যাহা হউক, বার্ণির আরোগ্য সম্বন্ধে আমরা হতাশ হইলেও সে শীঘ্র মরিবে বলিয়া মনে হইল না। তাহার দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ছিল, তাহার উপর পাদরীপ্রবরের চিকিৎসা-কৌশল এবং নসিস্‌কার অশ্রান্ত সেবা—সকল মিলিয়া কিছু দিনের জন্য মৃত্যুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল। অবশেষে যুদ্ধের তিন সপ্তাহ পরে পাদরী মহাশয় বলিলেন, "বার্ণি বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল; তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু সে যে শীঘ্র কোন শ্রমসাধ্য কায করিতে পারিবে বা দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহার দীর্ঘকাল বিশ্রামের প্রয়োজন।"

পাদরীর কথা শুনিয়া বার্ণির মুখ ম্লান হইল, সে আমাকে সম্বোধন করিয়া সবিষাদে বলিল, "ফেল্‌জি, প্রিয়বন্ধু, আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি, আবার যে কত দিন পরে ভাসিতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়াছ; কিন্তু আমি সাংঘাতিক আহত হওয়াতেই তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছ না। আমার জন্য তোমরা অনির্দ্দিষ্ট কাল এখানে পড়িয়া থাকিবে, তোমাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিবে, ইহা সঙ্গত নহে।"

বার্ণির কথা শুনিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—সেখানে বিলম্ব করায় আমাদের যতই ক্ষতি ও অসুবিধা হউক, তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে

আমাদের কাহারও ইচ্ছা নাই, এবং যত দিন পর্য্যন্ত সে চলিবার শক্তি ফিরিয়া না পাইবে, তত দিন আমরা সেখানে প্রতীক্ষা করিব। বিলম্বের জন্ম আমরা ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইব না।

কিন্তু বার্ণি আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে সম্মত হইল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ও কাযের কথা নয়; কোন্ কালে আমি চলিবার শক্তি, পরিশ্রমের সামর্থ্য ফিরিয়া পাইব, তাহার স্থিরতা নাই, তত দিন তোমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া এখানে বসিয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। ঐ কথা চিন্তা করিয়া আমার মন সর্ব্বদা এরূপ চঞ্চল থাকিবে যে, মানসিক উৎকণ্ঠায় আমি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না। তোমরা নিশ্চিন্ত-মনে আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার; কারণ, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আশ্রয় আমি আর কোথায় পাইতাম? আর ঐ যে বালিকাটি সেবা-শুশ্রূষার জোরে আমাকে বাঁচাইয়া তুলিল, ও কি নারী?—না ভাই, ও পরী; অভাবের মধ্যে কেবল উহার দু'খানি পাখা নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া নসিস্‌কাকে লইয়া তোমাদের অনুসরণ করিব; তোমরা আর বিলম্ব না করিয়া এ স্থান ত্যাগ কর।"

আমি বলিলাম—তাহার অঙ্গীকারে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহারা দুই জনে নানা বিপৎসঙ্কুল আরণ্যপথে আমাদের অনুসরণ করিলে যদি বিপদে পড়ে—তাহা হইলে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করা তাহাদের অসাধ্য হইবে; বিশেষতঃ আমরা কোন্ পথে যাইব, আমাদিগকে কত দূর যাইতে হইবে, তাহা আমাদেরও অজ্ঞাত; এ অবস্থায় তাহারা কিরূপে আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? আমরা যে দিকে যাইব—সে দিকে না গিয়া তাহারা অন্য দিকে যাইলে জীবনে আর তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাতের আশা থাকিবে না। যদি তাহারা ভবিষ্যতে পাদরী মহোদয়ের কোন কোন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া আমাদের অনুসরণের চেষ্টা করে, তাহাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, যুদ্ধে গ্রামের অনেক অধিবাসী নিহত হইয়াছিল, এ অবস্থায় তাহাদের দুই চারি জনের সাহায্য গ্রহণ করিলে গ্রামবাসীদের অনিষ্ট হইবে। এ সময় গ্রামের কোন লোকের গ্রাম ত্যাগ করা উচিত নহে।

আমার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত, প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া বার্ণি অত্যন্ত কাতর হইল। সে কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আমরা তোমাদের সঙ্গেই যাইব। তোমরা আমাদের দু'জনকে ফেলিয়া যাইও না।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম—ও কাযের কথা নয়। পথশ্রমে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে,—সুতরাং তাহার প্রস্তাবে আমরা কর্ণপাত করিতে পারি না। কিন্তু সে আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, হয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, না হয় তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে; তাহার জন্য আমরা আর সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিব না। তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম—নসিস্‌কা ও অন্যান্য সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় তাহার গোচর করিব। সেই সঙ্গে আমাদের পরম হিতৈষী পাদরী মহোদয়ের উপদেশ শুনিবার জন্যও আমার আগ্রহ হইল। তবে তাঁহার উপদেশ আমার মনঃপূত হইবে কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সেই দিন সময়ান্তরে পাদরী মহাশয়কে আমাদের সঙ্কল্পের কথা বলিলাম। আমরা সোনার পাহাড়ের সন্ধানে যাত্রা করিব শুনিয়া তিনি আমাদিগকে এই পাগলামী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমরা আকাশ-কুসুম চয়ন করিতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি,—তাহা হইলে আমরা পিটার ডন্‌কুম ও তাহার সঙ্গীদের মত পথিমধ্যে প্রাণ হারাইব, আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য।

আমি বলিলাম, "ধর্ম্মাত্মা, আমরা আকাশ-কুসুম চয়ন করিতে যাইতেছি—আপনার এই ধারণা সঙ্গত নহে; আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, এবং অসংশয়ে বিশ্বাস করি—সোনার পাহাড় কাল্পনিক পদার্থ নহে, সত্যই তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে।"

পাদরী মহাত্মা আমার কথা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "না হয় আমি স্বীকার করিলাম—সোনার পাহাড় সত্যই কোথাও বর্ত্তমান আছে; মানিয়া লইলাম—সেখানে হাজার হাজার মণ সোনা সঞ্চিত আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোনার কুঁদা সোনার পাহাড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিতে গিয়া পথিমধ্যেই যদি তোমরা অক্কা লাভ কর—তাহা হইলে সেই পাহাড়ে সোনা থাকায় তোমাদের কি লাভ হইবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার, বাপু?

এই অতি লোভ যে তোমাদের মৃত্যুর হেতু, ইহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না কেন ?"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "ধর্ম্মাত্মা, আমরা সাংসারিক লোক, লোভ আমাদের একটু বেশী; কিন্তু কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়-বলে যাহা আয়ত্ত হইতে পারে—তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করাই মৃত্যুর হেতু, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। জীবনের যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা নিন্দনীয় নহে। মানব-সমাজ যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথে ধাবিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর উন্নতি-স্রোত অবরুদ্ধ হইত। মানব-সমাজ বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। আমরা আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হই নাই; যাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান,—তাহাই হস্তগত করিবার জন্য আমাদের এই জয়যাত্রা। সংসারী মাত্রেরই চরম লক্ষ্য অর্থ, সুতরাং আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই। কুপথেও পদার্পণ করি নাই। আপনি হয় ত ইহা বিপথ বলিবেন। কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই ভোগের আশায় উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে, এরূপ দৈববাণী করা আপনারও অসাধ্য। ভবিষ্যতে আমরা কৃতকার্য্য হইতেও পারি। আর যদি এই চেষ্টায় আমাদের মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা কি ?—এই ত সে দিন যুদ্ধে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইল, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কি তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন ? উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ জীবন বহন করা অপেক্ষা সঙ্কল্পসিদ্ধির চেষ্টায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই জীবনের সার্থকতার পরিচায়ক।"

পাদরী-পুঙ্গব পার্থিব অর্থের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু তিনি 'বেণাবনে মুক্তা' ছড়াইতেছেন—ইহা বুঝিতে পারিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন, "আকাশ-কুসুমকে সহজলভ্য পদার্থ বলিয়া তোমাদের ধারণা হইয়াছে; মরীচিকার সন্ধানে ধাবিত হইয়া নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তোমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ; আমার উপদেশ তোমাদের অপ্রীতিকর, এ অবস্থায় তোমাদের বিদায় দান করা ভিন্ন আর উপায় কি ? অগত্যা আমাকে বলিতে হইতেছে—তোমরা যাও। পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এক দিন তোমরা আমার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অনুতপ্ত হইবে। তথাপি সদা-প্রভুর নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, আমার আশীর্ব্বাদ যেন ব্যর্থ না হয়, যেন তোমাদিগকে এই অতি-লোভের জন্য অনুতপ্ত হইতে না হয়। তোমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, আমার এই গুণবতী মেয়েটির জীবন বিপন্ন করা, তাহার অনিষ্ট করা তোমাদের উচিত হইবে না।"

তাঁহার 'গুণবতী মেয়ে' নসিস্কা তাঁহার কথা শুনিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া, সবেগে মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। আত্মাভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। পাদরী-পুঙ্গব তাহাকে দুর্ব্বলা নারী মনে করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন বুঝিয়া তাহার দম্ভে আঘাত লাগিল; সে সতেজে বলিল, "পিতা, আমি নারী বলিয়া আমার প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তাহা আমার পক্ষে সম্মানজনকও নহে, সঙ্গতও নহে। আমি ইহাতে সুখী হই নাই, হৃদয়ে আঘাতই পাইয়াছি। আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি স্বাধীন, আমার সঙ্গী বন্ধুগণের ন্যায় স্বাধীন, আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা কি আপনি অস্বীকার করিবেন ? আমি আমার স্বদেশের অরণ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতেছি—ইহা কি আপনার অজ্ঞাত ? যিনি আমার প্রণয়ী, এবং আমি শীঘ্রই যাঁহার পরিণীতা পত্নী হইব, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তাঁহার অনুসরণ করা ভিন্ন আমার অন্য কোনও কর্ত্তব্য আছে—ইহা কি আপনার ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—দেখাইতে পারেন ? স্বামীই রমণীর রক্ষক, তিনি আমাকে যে পথে পরিচালিত করিবেন, সেই পথ ভিন্ন আমার কি অন্য কোন পথ আছে, ধর্ম্মাত্মা ? পতিই যে সাধ্বীর একমাত্র গতি। যদি তিনি আমাকে যাইতে বলেন—আমি যাইব, জলে জঙ্গলে, গিরিগুহায়, মরুভূমে যেখানে তিনি যাইতে বলিবেন—সেই স্থানে যাইব, যদি থাকিতে বলেন—থাকিব। যদি আপনি ইহা দাস্যভাব বলিয়া অবজ্ঞা করেন—তাহা হইলে আমি বলিব, যে প্রেমের জন্য আপনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া আমেরিকার এই জঙ্গলে আসিয়াছেন—সেই ঈশ্বর-প্রেম কি বস্তু, তাহা এখনও আপনার বুঝিতে বিলম্ব আছে, ধর্ম্মাত্মা ! আমি এই মাত্র বলিতে পারি—স্বামীর সঙ্গে কোন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে আমি ভীত হইব না।"

নসিস্কার সাহস এবং আত্মত্যাগের গৌরব-পরিপূত কথাগুলি শুনিয়া আনন্দে উৎসাহে আমরা হুঙ্কার করিলাম;

নসিস্কার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। পাদরী মহাশয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মা, তোমার যাহা ভাল মনে হইবে—তাহাই করিও, কিন্তু স্মরণ রাখিও, অন্য কেহ তোমার ভাগ্য পরিচালিত করিবে না। 'আপনারে রক্ষা করে—আপনার বাহু।' আশা করি, তুমি আত্মরক্ষায় সমর্থা হইবে।"

অতঃপর তর্ক বিতর্কে সময় নষ্ট করিতে আমাদের কাহারও আগ্রহ হইল না; নসিস্কাও আমাদিগকে গমনে উৎসাহিত করিল। আমরা বার্ণির শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহাকে বলিলাম, আমাদের সেখানে অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করায় তাহার আপত্তি থাকিলে আমরা এক সর্ত্তে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছি। সেই সর্ত্ত এই যে, আমাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে সে সেই গ্রাম ত্যাগ করিবে না।

বার্ণি বলিল, "কিন্তু আমারও একটি সর্ত্ত আছে,—সেই সর্ত্তে তোমরা রাজী হইলে আমি তোমাদের প্রস্তাবে আপত্তি করিব না। যদি ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাদের সংবাদ না পাই, তাহা হইলে তোমাদের সন্ধানে বাহির হইব।"

আমরা তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব বলিয়াই বিশ্বাস এবং তাহার পর কোনও কালা 'নেটিভকে' দিয়া এখানে সংবাদ পাঠাইবারও অসুবিধা হইবে না। কারণ, এই সকল দুর্গম অরণ্যে নেটিভগুলাই 'হরকরার' কায ভাল করিতে পারিবে; তাহাদের বিপদের আশঙ্কা অল্প, বিশেষতঃ, তাহারা একমুঠা 'মাস্কা' ও এক টুকরা 'কাসাভা' মূলা চিবাইয়া গাধার মত পরিশ্রম করিবে। আমরা সোনার পাহাড়ের সন্ধান পাইলেই তোমাকে সংবাদ পাঠাইব, বার্ণি!"

কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া আমরা যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের সঙ্গে যে সকল দেশীয় ভৃত্য ছিল—তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া বারো জনে দাঁড়াইয়াছিল। অবশিষ্ট দস্যুদের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ভৃত্যরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সোনার পাহাড়ের সন্ধানে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। বার্ণিকে বাদ দিয়া আমরা তিন জন শ্বেতাঙ্গ ও দ্বাদশ জন দেশীয় ভৃত্য—মোট পনের জন যাত্রী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাদের দলপতি যাশোটোয়ারোকে হারাইয়া যদিও আমরা নিরুৎসাহ ও পরিচালকহীন হইয়াছিলাম, তথাপি আমাদের শেষ চেষ্টা সফল হইবে—এ আশা ত্যাগ করি নাই। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বন্দুক, গুলী-বারুদ এবং অন্যান্য অস্ত্র সঞ্চিত ছিল। এতদ্ভিন্ন যাশোটোয়ারো যে সকল সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের কাছে ছিল। আমাদের গাঁটরীগুলি বহন করিবার জন্য গ্রাম হইতে ছয়টি অশ্বতর সংগ্রহ করিলাম। আমাদের সঙ্গে কার্য্যোপযোগী রজ্জু না থাকায় লিয়ানা লতা দ্বারা প্রায় দুই শত গজ রজ্জু প্রস্তুত করিলাম, এবং একখানি পাতলা ডোঙ্গাও প্রস্তুত করিলাম, তাহা কুলীর মাথায় বা অশ্বতরের পিঠে চাপাইয়া লইয়া যাইবার অসুবিধা ছিল না।

ভবিষ্যতে আমাদিগকে কোন অসুবিধা সহ্য করিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে আমরা সকল আয়োজন শেষ করিয়া লইলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা স্থানীয় বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলে একটি সভায় সমবেত হইয়া করুণ সঙ্গীতে ও হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায় তাহাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। পাদরী মহোদয় একটি সুন্দর স্তোত্র পাঠ করিলেন; তাহার পর এরূপ করুণ ভাষায় আমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন যে, আমাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাঁহাদের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিতে দুঃখে, কষ্টে ও বেদনায় আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আমাদের বিদায়ের সময় বার্ণিকে শয্যা হইতে তুলিয়া আমাদের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। নসিস্কা তাহার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। আমরা আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদের উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া গ্রামবাসিগণের আনন্দধ্বনি শুনিতে শুনিতে গ্রাম ত্যাগ করিলাম, এবং স্বর্ণখনির সন্ধানে ধাবিত হইলাম। অতীত জীবনের সুখ-দুঃখ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'অজগরে'র আলিঙ্গনে

আমরা কয়েক দিন আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলাম। সেই সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। আমরা পূর্ব্বে যেরূপ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার

আমাদিগকে সেইরূপ ভয়ানক পথেই চলিতে হইল। গভীর অরণ্য নানা জাতীয় বৃক্ষলতায় পূর্ণ। মধ্যাহ্নকালেও নিবিড় শাখাপল্লব ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এজন্য সুবিস্তীর্ণ অরণ্য সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় ছায়াময়। বিশালকায় বৃক্ষ-সমূহে নানা-জাতীয় পরগাছা, তাহাদের পত্রগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত; তাহারা অরণ্যের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছিল। শুষ্ক বৃক্ষপত্র-রাশি আমাদের পদতলে পুঞ্জীভূতভাবে প্রসারিত। নানা-জাতীয় কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ তাহাদের অন্তরালে বাস করিতেছিল। বস্তুতঃ, এই সকল অরণ্যে নূতন নূতন জাতীয় বৃক্ষের সংখ্যা অধিক, কি বিভিন্ন জাতীয় পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের সংখ্যা অধিক—তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

আমরা এই অরণ্য ভেদ করিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিলাম। অরণ্যের কোন অংশেই বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ এবং হিংস্র জন্তুর অভাব না থাকায় আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে পদক্ষেপণ করিতে হইল। মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণকায়া তরঙ্গিণী আমাদের পথ রোধ করিতে লাগিল। আমরা যে ক্ষুদ্র ডোঙ্গাখানি সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে সেই সকল নদী পার হইয়া চলিতে লাগি-লাম। সেই সকল নদী সুপ্রশস্ত না হইলেও দেখিলাম, 'মরা নদী—কুমীরে ভরা!'—কতকগুলি কুমীর ও খড়িয়ালের আকার এরূপ বৃহৎ যে, তাহারা আস্ত মানুষ অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে! অরণ্যে যে কত নূতন পক্ষী দেখিলাম, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। অদ্ভুত তাহাদের গঠন, তাহাদের বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়! এক জাতীয় পাখীর আকার অতি অদ্ভুত মনে হইল। তাহার পা ছয় ফুট দীর্ঘ, পাকাটীর মত সরু ও সোজা; অথচ তাহার দেহটি 'বিয়ার'-মদের জালার মত! তাহার দেহের বর্ণ ধূসর, কিন্তু পুচ্ছের ও ডানাদ্বয়ের অগ্রভাগ সবুজ রেখার পাশে গাঢ় পীতবর্ণ পালক-শোভিত। তাহার কণ্ঠ গাঢ় লোহিত চক্রবেষ্টিত। তাহার মস্তক সজারুর মস্তকের অনুরূপ। সুগোল চক্ষু দুটি বৃহৎ—ড্যাবা ড্যাবা! এই পাখী পাখা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিলে তাহার পক্ষ-দ্বয়ের বিস্তার ১৫ ফুট অপেক্ষা অল্প বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহারা বৃক্ষ-চূড়ার অধিক ঊর্দ্ধে উড়িতে পারে না। উড়িবার সময় ইহারা পা দু'খানি পশ্চাতে প্রসারিত করে, এবং গলাটি সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাদের পাখা হইতে সন্ সন্ শব্দ উত্থিত হয়, এবং তাহারা 'গ্রক্' 'গ্রক' শব্দে চীৎকার করে। উড়িতে উড়িতে ইহারা সশব্দে বৃক্ষশাখায় বসিয়া পড়িয়া কাঠের পুতুলের মত অচঞ্চল ভাব ধারণ করে। আমাদের অনুচরা বলিল, এই পাখীগুলি সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপভোজী। এই সকল আহার্য্য-দ্রব্যের সন্ধানেই তাহারা অরণ্যে বিচরণ করে। ইহারা এরূপ বলবান্ যে, প্রকাণ্ডকায় ভুজঙ্গগুলিকে আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই নিহত করে, এবং কয়েক মিনিটেই গ্রাস করে। সর্প-বিষে ইহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। বৃহৎ বৃহৎ সর্পগুলি ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দংশনোদ্যত হইলে ইহারা তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা তাহা-দিগকে এভাবে চাপিয়া ধরে যে, সাপগুলা আর মাথা তুলিতে পারে না। ইহাদের নখরাঘাতে সাপের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। সাপ ইহাদের নখরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে পাখী মনের আনন্দে কয়েক মিনিট 'গ্রক্ গ্রক্' শব্দ করে—তাহার পর সর্পের সেই বিশাল দেহ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ অনুচররা বলিল, এই পাখীর নাম 'কোয়ারী রুমনো'।—এক দিন আমি অরণ্য মধ্যে এই জাতীয় একটি বৃহদাকার পক্ষীর মাথায় গুলী মারিয়া-ছিলাম। সেই গুলীতে তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ হইয়াছিল; সে মাটীতে পড়িলে, আমি তাহার নিকট গিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু আমার এরূপ ঘৃণা হইল যে, তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। শ্বাপদ জন্তুর ক্ষুন্নিবারণের জন্য পাখীটাকে বনের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া আমরা গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলাম। অতঃপর এক দিন আমিই শিকার হইলাম। সে দিন আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিরূপে আমার জীবন রক্ষা হইল, তাহা ভাবিলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। মনে হয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সে দিন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

এক দিন প্রভাতে আমরা তাম্বু তুলিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমি শিকারের জন্য একাকী অরণ্যের গভীরতর অংশে প্রবেশ করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল—মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য কিছু শিকার সংগ্রহ করিব। একটি বন্দুক ও একখানি তর-বারি আমার সঙ্গে ছিল। শিকারের সন্ধানে বহুদূর পরিভ্রমণের

য় আমি শ্রান্তদেহে একটি গাছের গুঁড়ির উপর সিয়া পড়িলাম। সেই গুঁড়িটি শুষ্ক ও বিবর্ণ; মনে ইল—বহুদিন হইতেই তাহা সেখানে পড়িয়া ছিল; কতক-গুলি লতাগুল্মে সেই গুঁড়িটির অধিকাংশ আবৃত। আমি ন্দুকটি হাত হইতে নামাইয়া, তাহার নলটি সেই গুঁড়িতে ঠস্ দিয়া খাড়া করিয়া রাখিলাম। তাহার পর আমার পিটি মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া, রুমাল দিয়া কপালের াম মুছিতেছি, সেই সময় হঠাৎ কাঠের গুঁড়িটা নড়িয়া ঠিল! আমি তৎক্ষণাৎ গুঁড়ি হইতে লাফাইয়া নীচে ড়িলাম, এবং তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সভয়ে দেখিলাম, সটি কাঠের গুঁড়ি নহে,—একটি বিশালকায় 'অজগর' অর্থাৎ 'পাইথন' নামক সর্প! তাহার দেহ আন্দোলিত ইবামাত্র আমার বন্দুকটা মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি াহা তুলিয়া লইবার পূর্ব্বেই সাপটা বিদ্যুদ্বেগে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া লাঙ্গুলাগ্র দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিল! আমি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার লাঙ্গুলের প্যাঁচের ভিতর আবদ্ধ ইলাম।

আমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ বহু দূরদেশে ভ্রমণ করিয়াছি, বহুবার বহু বিপদেও পড়িয়াছি, এবং অনেকবার আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। অতি-কষ্টে সেই সকল বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়াও আমি কখনও আতঙ্কে অভিভূত হই নাই, মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হই নাই। এত দিন পরে বিরাট্‌দেহ 'অজগরে'র লাঙ্গুল-নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া আমি আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। এরূপ বিপদের কথা পূর্ব্বে আমি কোন দিন কল্পনাও করি নাই। সাপটা আমাকে তিন প্যাঁচে জড়াইয়া ধরিয়া এভাবে চাপ দিতে লাগিল যে, আমার বিশ্বাস হইল—কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইবে,—এবং সে আমাকে গ্রাস করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিবে! আমি সুদৃঢ়কায় বলবান্ পুরুষ; কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহ বা নরভুক্ দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের বলের তুলনায় আমার শক্তি-সামর্থ্য কত সামান্য! ঐ সকল সিংহ বা ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করিলে কেবল বাহুবলে আত্মরক্ষা করা আমার অসাধ্য। এই সকল 'পাইথন' সর্প পূর্ণবয়স্ক সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ প্রভৃতি বলবান্ জন্তুকে আক্রমণ করিয়া দেহ দ্বারা তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে—এবং এ ভাবে কষিতে থাকে যে, তাহাদের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া যায়, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করে। এই 'অজগর' পাইথনের কবলে পড়িলে পরাক্রান্ত সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতির অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় হয়, তখন আমার অবস্থা কিরূপ হইবে—ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। বস্তুতঃ সেই পাইথনের দেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, এবং আমার দেহের ও উভয় বাহুর অস্থি হইতে 'মট-মট' শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল! সাপটা আমার উভয় বাহু দেহের সহিত এভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করিবারও সুযোগ পাইলাম না। আমি তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আড়ষ্টদেহে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।—সেই সময় কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ আমার মনে হইতে-ছিল যে, যদি পাইথনটা আমাকে গ্রাস করে—তাহা হইলে সেই অরণ্যে আমার চিহ্নমাত্র থাকিবে না, আমি কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হইলাম—তাহা অনুমান করাও আমার সঙ্গীদের পক্ষে দুরূহ হইবে! হায় স্বর্ণের লোভ! সোনার পাহাড় এখন কোথায় রহিল? পৃথিবীর সমগ্র সুবর্ণরাশি এখন আমার নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক! এবার বুঝি মরিলাম!

হতাশ-হৃদয়ে আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি—সেই সময় পাইথনটা কয়েক প্যাঁচে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া আমার ললাটের উপর মুখ উদ্যত করিল, এবং ফোঁস্ করিয়া এরূপ তীব্র নিশ্বাস ছাড়িল যে, তাহা আগুনের হল্কার মত আমার চোখে মুখে লাগিল; মনে হইল—আমার মুখ পুড়িয়া গেল! তাহার পর সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিতে লাগিল! তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল—তাহার চক্ষুনিঃসৃত বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে সত্যই যেন আমার মোহ উপস্থিত হইল; প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বাহ্যজ্ঞান হ্রাস হইতে লাগিল; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম—সে আমাকে ক্রমশঃ নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আমার বক্ষঃস্থলের অস্থিগুলি মট্‌-মট্ শব্দ করিতে লাগিল—তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম; মনে হইল—কেহ লোহার শিক লাল করিয়া পুড়াইয়া তদ্দ্বারা আমার

দেহ বিদ্ধ করিতেছে এবং আমার দেহের ভিতর হইতে শিরগুলি সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে !

সেই সময় কেহ যে আমার প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে—এ আশা আমার মনে স্থান পাইল না ; এমন কি, সেই নিস্তব্ধ মহারণ্যে আমি কোন মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইলাম না। আমার প্রাণরক্ষার আশা নাই বুঝিয়া সেই স্থানে হঠাৎ চিত হইয়া পড়িলাম, মুহূর্ত্তে ধরাশয্যা অবলম্বন করিলাম।

আমি সেই স্থানে নিপতিত হইবামাত্র আমার দেহের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। হাত দুইখানি একটু আল্‌গা হইবামাত্র আমি পাইথনের বন্ধন-পাশ হইতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়া লইলাম, এবং চক্ষুর নিমেষে আমার তরবারি কোষমুক্ত করিলাম।

সেই সময় সাপটা মাটীতে পড়িয়া পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন করিল ; আমি চিত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া দেখিলাম—সে আমার মুখের তিন ফুট উর্দ্ধে মস্তক আন্দোলিত করিতেছিল। বোধ হয়, মুহূর্ত্ত পরেই সে মুখব্যাদান করিয়া আমার মস্তকটি গ্রাস করিত ; কিন্তু আমি তাহার মস্তক আন্দোলিত হইতে দেখিয়া তাহার কণ্ঠে সবেগে তরবারির আঘাত করিলাম। সেই তীক্ষ্ণধার তরবারির অব্যর্থ আঘাতে কদলীবৃক্ষ যে ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়, সেই ভাবে তাহার কণ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হইয়া কেবল তাহার খোলসের চর্ম্মে বাধিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

সাপটা মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া সবেগে দেহ সঙ্কুচিত করিল। ইহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ এ ভাবে কষিয়া গেল যে, আমার বক্ষের শোণিতরাশি সবেগে আমার মাথায় উঠিতে লাগিল ; আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি বিলুপ্ত হইল। আমি মূর্চ্ছিত হইলাম।

সেই অবস্থায় কতক্ষণ আমি সেখানে পড়িয়া ছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। চেতনা-সঞ্চার হইলে আমি চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম ; কিন্তু তখন আমি কোথায়, অথবা আমার কিরূপ বিপদ্ ঘটিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি কোনও প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি নাই ; কিন্তু তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ অবসন্ন যে, আমি গড়াইতে গড়াইতে দূরে সরিয়া যাইব, অথবা সেই স্থানেই উঠিয়া বসিব—এ জন্ম সামান্ত চেষ্টা করাও আমার অসাধ্য হইল। কেবল দেহ নহে, মনও যেন সম্পূর্ণ অসাড়, এবং নিষ্ক্রিয়।

অতঃপর কি হইল, জানিতে পারিলাম না ; হয় ত পুনর্ব্বার আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল, না হয় আমি নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইলাম। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিলে নেশার আধিক্যে মাতালের অবস্থা যেরূপ হয়, সে যেভাবে বে-হুঁস হইয়া পড়ে, আমারও সেরূপ অবস্থা হইল। এই অবস্থায় কতক্ষণ কাটাইয়াছিলাম, তাহাও বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু তাহার পর আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন আমার মোহ দূর হইয়াছিল ; মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হওয়ায় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বকথা ধীরে ধীরে সকলই মনে পড়িল। আমি মাথা তুলিয়া দেখি, আমার সর্ব্বাঙ্গ তখনও সেই পাইথনের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ! কিন্তু আমার দেহের উপর মৃত সর্পের ভার ভিন্ন বিন্দুমাত্র চাপ ছিল না। আমি অতি কষ্টে সেই নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম ; কিন্তু পদদ্বয় দেহের ভার বহন করিতে পারিল না। আমি তৎক্ষণাৎ মাতালের মত টলিতে টলিতে পুনর্ব্বার ধরাশায়ী হইলাম। আমার মনে হইল—সেই বিশাল অরণ্য আমার চতুর্দ্দিকে সবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে ! আমি চক্ষু খুলিয়া সভয়ে সেই মৃত পাইথনের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম ; অনুমান হইল, সাপটা প্রায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ ! প্রায় চৌদ্দ হাত দীর্ঘ এবং খেজুরগাছের গুঁড়ির মত স্থূল সর্পটি কিরূপ বিকটাকার প্রাণী, তাহা বোধ হয় সকলেই কল্পনা করিতে পারিবেন ; তাহারই কবলে পড়িয়া মুক্তিলাভ করা কি পুনর্জ্জন্ম নহে ?

অতঃপর আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। সেই নিবিড় অরণ্যে পথ খুঁজিয়া আমার সঙ্গিগণের নিকট উপস্থিত হওয়া অসাধ্য মনে হইল। তখন আমার চলিবারও শক্তি ছিল না। হঠাৎ অদূরবর্ত্তী বন্দুকটি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি তাহা তুলিয়া লইয়া আওয়াজ করিলাম। সেই শব্দ আমার সঙ্গীরা শুনিতে পাইল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; কারণ, বন্দুক আওয়াজ করিবার পরই বন্দুকটা আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার আমার মূর্চ্ছা হইল।

যাহা হউক, আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গীরা সেই

বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল। আমাকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত দেখিয়া তাহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই গভীর অরণ্যে তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই; অবশেষে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আমার অনুচরবর্গ চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; এবং আমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ও ছিন্নশির বিশাল দেহ পাইথনটাকে অদূরে নিপতিত দেখিয়া, সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার অনুচরবর্গ আমার দেহ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, আমার সর্ব্বাঙ্গে সর্পরাজের আলিঙ্গনচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিলেও আমার কোন অস্থি চূর্ণ হয় নাই। সেই 'অজগরের' আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়াও আমার বক্ষঃস্থলের অস্থি ও পঞ্জর কিরূপে অক্ষুণ্ণ রহিল—তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই; তবে এ কথা সত্য যে, যদি আমি তরবারি দ্বারা তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না; এমন কি, সেই অরণ্যে আমার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। যে সিংহ-ব্যাঘ্রগুলিকে অবলীলাক্রমে গ্রাস করে—একটা মানুষ ত তাহার পক্ষে এক টুকরা মাংসমাত্র! পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আমি মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম।

অতঃপর সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে আমার তিন চারি দিন সময় লাগিল। সেই অরণ্যেই শিবির স্থাপন করিয়া আমরা সেখানে চারি দিন বাস করিলাম। পঞ্চম দিন আমি চলৎশক্তি লাভ করিয়া সঙ্গিগণসহ স্বর্ণভূমির সন্ধানে ধাবিত হইলাম। কিন্তু তখনও জানিতাম না—আমাদিগকে ভীষণতর বিপদে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে! হায় রে সোনার নেশা!

পাঠক আগামী সংখ্যায় 'সোনার পাহাড়' দেখিবেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভরার মেয়ে

আমি যে এসেছি ধরণীর ঘাটে আঁধারে তরণী বেয়ে,
পরিচয়-হীনা চির-অভাগিনী দুঃখিনী ভরার মেয়ে।
ভরায় ভরিয়া এনেছে আমারে মানুষের ব্যবসায়ী,
বেচে গেছে মোরে উচ্চ মূল্যে সে ত নহে মোর দায়ী।
কেবা পিতা মোর—সে কি লম্পট—নরপশুব্যভিচারী,
অথবা গরীব—পেটের দায়েতে দিতেছে আমারে ছাড়ি?
কোন্ অভাগিনী জননী আমার কোন্ রাক্ষসী হায়,
ফেলে দেছে মোরে আঁস্তাকুড়েতে ভগ্ন হাঁড়ীর প্রায়।
তার সনে মোর নাহি পরিচয় সে ত মোর নহে কেহ,
তবু প্রাণ কাঁদে—গর্ভে ধরেছে সে যে মোর ছার দেহ।
কাঁদে না কি হায় মরম তার এক দিনও মোর তরে?
নিমেষেরও তরে নয়নে তাহার অশ্রু নাহিক ঝরে?
কোন্ নদীকূলে—কোন্ গ্রামমাঝে ছিল সে কুটীরতলে,
সে কি আছে বেঁচে কিম্বা মরেছে কে দেবে আমারে ব'লে?
পণ্যের মত কিনিয়াছে স্বামি ভাবে ক্রীতদাসী প্রায়,
হাজার পীড়ন চুপ ক'রে সই আমি যে গো নিরুপায়।
জুড়াব দুদিন কোথা হেন ঠাঁই? নাহি ত বাপের বাড়ী—
আমি মানহীনা কুণ্ঠিতা দীনা চিরলাঞ্ছিতা নারী।
বিফল আমার মানব-জীবন ক্ষোভ রয়ে গেল মনে,
ঢেকে দাও প্রভু সব ক্ষোভ মোর মরণের আবরণে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

[পূর্ব্বে ভরায় (নৌকায়) ভরিয়া একশ্রেণীর লোকরা পরিচয়হীনা মেয়েদের বিক্রয় করিত। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহাদের কন্যা-পণ আছে, তাঁহারা উক্ত মেয়েদিগকে ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন। এমন একটি ভরার মেয়েকে লেখকও বধূরূপে দেখিয়াছেন।]

কাউন্সিল-ভঙ্গ

বাঙ্গালার শাসক সার ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় নানাদলের সদস্যসংখ্যা যেরূপভাবে বিন্যস্ত, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাসভাজন দুই ব্যক্তিকে বাছিয়া মন্ত্রিপদ প্রদান অসম্ভব। অগত্যা তিনি ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে আইন অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, দেশের লোকের নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভা গঠিত ছিল। উহাতে দেশের জনমতই প্রতিবিম্বিত হইত, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বাচনের পরে আবার একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে ভাবে এই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছে এবং যে ভাবে এই ব্যবস্থাপক পরিষদ লোকমত প্রতিবিম্বিত করিতেছে, তাহাতে বঙ্গীয় শাসকের পক্ষে উহার সাহায্যে বিধিপ্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী পরিচালিত করা সম্ভব হইতেছিল না। কারণ, তিনি এই ব্যবস্থাপক সভায় যে কোন নির্ব্বাচিত সদস্যকেই মন্ত্রিপদ প্রদান করুন না কেন, তিনি অধিক দিন ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। স্বরাজ্যপন্থী দল তাঁহার বিরুদ্ধে আস্থাহীনতার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াই তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ হইতে সরাইয়া দিতে পারিবেন। অথচ বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে অন্ততঃ ২ জন মন্ত্রীর নিতান্তই প্রয়োজন। নতুবা দ্বৈতশাসন চালানই অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় গভর্ণরের পক্ষে আইন অনুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবার তিনটি উপায় আছে। যথা :—

(১) প্রচলিত ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আবার নূতন ব্যবস্থাপক সভা সংগঠন। ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ, ইহাতে কার্য্যতঃ জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। যে দলের চেষ্টায় মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হইয়াছে, পুনর্নির্ব্বাচনে যদি আবার সেই দল প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহাই এই প্রদেশের জনমত। কারণ, যাঁহারা মন্ত্রীদিগের উপর এই অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য যদি নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিতই সেই দলের লোকদিগকে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন। আর যদি সেই কার্য্য দেশের অধিকাংশ নির্ব্বাচকের মতানুযায়ী না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই দলের লোককে কখনই নির্ব্বাচিত করিবেন না। ইহাই হইল এই বিধানের মূলতত্ত্ব। সকল সভ্যদেশের গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানেই এই ব্যবস্থা আছে যে, যখন শাসনযন্ত্র পরিচালনে কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, এবং ব্যবস্থাপক সভা শাসনযন্ত্র পরিচালকদিগের নূতন নীতির সমর্থন না করেন, সেই সম্বন্ধে লোকমত জানিবার জন্য শাসকবর্গ অথবা রাজা সেই ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং সেই সম্বন্ধে জনমত কি, তাহা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিবিম্বিত করিবার জন্য নূতন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচন করিতে বলেন। সেই জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহাতে জনমতের সম্মান রক্ষা করা হয়।

(২) মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলে আর নূতন মন্ত্রী নিয়োগ না করিয়া গভর্ণর স্বয়ং হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে কার্য্যতঃ দ্বৈত-শাসন পরিহার করিয়া স্বৈর-শাসন প্রবর্ত্তিত করা হয় এবং হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনকার্য্য জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ না করিয়া ব্যুরোক্রেশীর হস্তেই সমর্পণ করা হয়। এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত নহে, পরন্তু স্বৈরিতাসূচক।

(৩) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদের অনাস্থাভাজন মন্ত্রীদিগকে ছয় মাসকাল স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীদিগের পক্ষে এইরূপ অবস্থায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। সেই জন্য যাঁহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তাঁহাদের উপর ব্যবস্থাপক সভার আস্থা নাই, ইহা ব্যক্ত হইলে তাঁহারা আর মন্ত্রিপদে থাকিতে সম্মত হয়েন না। কাযেই মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের ভোটে গ্রাহ্য হইলেই মন্ত্রীরা ইচ্ছা থাকিলেও আর লজ্জার খাতিরে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হয়েন না। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ছয় মাসকাল মন্ত্রিপদে রাখিতে পারেন।

ইহার মধ্যে বঙ্গীয় সরকার ইতঃপূর্ব্বে কখনই প্রথমোক্ত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থাসূচক মত এইবার ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম গৃহীত হয় নাই। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বারের পূর্ব্বে বঙ্গীয় লাট কখনই ব্যবস্থাপক সভাকে বিদায় দিয়া আবার নূতন করিয়া নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ প্রচার করেন নাই। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহাদের ঐরূপ করা উচিত ছিল। সে সময় অনেকে আশা করিয়াছিল যে, সরকার তাহাই করিবেন। সরকার তাহা করেন নাই দেখিয়া কেহ কেহ সেবার বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহার পরও কয়েকবার ব্যবস্থাপক সভার ভোটে মন্ত্রী না থাকিলেও বঙ্গীয় লাট হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য্য স্বহস্তেই রাখিয়াছিলেন। পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কাউন্সিলকে বিদায় করিয়া দেন নাই। এই ব্যাপার যে কেবল বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, মধ্য-প্রদেশেও এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। সেখানেও ব্যবস্থাপক সভাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই। সরকার ব্যবস্থাপক সভাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলি খাসে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কার্য্যের যে কিছু ক্ষতি হয় নাই, তাহা মনে হয় না।

কিন্তু এবার সরকার তাহা করেন নাই। এবার গভর্ণর কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এবার বঙ্গীয় সরকার এই বিষয়ের পথিপ্রদর্শক হয়েন নাই। এবার আসাম প্রদেশের শাসকই এই বিষয়ের পথ দেখাইয়াছেন। আসামের গভর্ণর সার এগবার্ট লরি লুকাস হ্যামণ্ডই মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট তথাকার

ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হওয়ায় তথাকার কাউন্সিলকে প্রথমে বিদায় করিয়া দেন।

কিন্তু যে অবস্থায় বাঙ্গালায় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, আসামে ঠিক সেই অবস্থায় তথাকার ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। আসামের মন্ত্রী রেভারেণ্ড নিকোলাস রায় যেভাবে অহিফেন-নীতি পরিচালিত করেন, তাহা তথাকার জনসাধারণের প্রীতিজনক হয় নাই। সেই জন্য আসামের লোক উক্ত মন্ত্রীর উপর আস্থাহীনতার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্য সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। অর্থাৎ সেই আস্থাহীনতার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে আসামের জনসাধারণ এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্য দ্বৈত-শাসন ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া কোন কার্য্য করেন নাই। আসামের গভর্ণর সার এগবার্ট লরি লুকাস হ্যামণ্ড রেভারেণ্ড জেমস্ জয়মোহন নিকলাস রায়ের স্থানে উক্ত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যমণ্ডলী হইতে এক জনও মন্ত্রিত্ব করিবার যোগ্যপাত্র পাইলেন না বলিয়া ঐ ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আসামের নির্ব্বাচন সাক্ষাৎভাবে দ্বৈত-শাসন লইয়া নহে, আসাম সরকারের অহিফেন-নীতি লইয়া। আসামের জনসাধারণ আসামী সরকারের অহিফেন-নীতির সমর্থন করেন কি না, এই নির্ব্বাচনে তাহাই দেখা হইবে। হিসাবমত উহাই আসাম সরকারের পুনর্নির্ব্বাচন করিবার ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, আসাম সরকার এই নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া ঐ অঞ্চলে স্বরাজপন্থীদিগের বলাবল কিরূপ, অর্থাৎ দেশমধ্যে তাহাদের প্রভাব হ্রাস পাইতেছে কি বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিবার সুবিধা পাইবেন এবং তদনুসারে তাঁহাদের নীতি পরিচালিত করিবেন। সাধারণের এই বিশ্বাস যে অনেকটা অনুমানমূলক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশের এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সে কথা কোনমতেই বলা চলে না। বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল দ্বৈত-শাসন ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বার বার মন্ত্রিনিয়োগ ব্যাপারের প্রতিকূলতা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা যাঁহাদিগকেই মন্ত্রিপদ প্রদান করিতেছেন, সেই প্রতিকূলতার ফলে তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে স্থায়ী মন্ত্রীর নিয়োগ বিষয়ে যেন অনেকটা নিরুপায় হইয়াই বঙ্গীয় লাট লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল দি রাইট অনারেবল সার ফ্রান্সিস ষ্ট্যান্লী জ্যাকসন বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে দ্বৈত-শাসন রাখা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে জনমত জানাই যেন সার ষ্ট্যান্লী জ্যাকসনের উদ্দেশ্য, ইহাই বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ আগামী নির্ব্বাচনে যদি দেখা যায় যে, স্বরাজীদলের লোকই অধিক সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, স্থায়ী মন্ত্রিনিয়োগ এবং দ্বৈত-শাসন বাঙ্গালার জনসাধারণের অভিপ্রেত নহে। অর্থাৎ আসামের নির্ব্বাচনে যে ভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত, বাঙ্গালার নির্ব্বাচনে সেই ভাবটি খরস্রোতা ব্যক্তসলিলা পদ্মার ন্যায় পরিদৃশ্যমান।

বলা বাহুল্য, দেশের লোক যে দ্বৈত-শাসন চাহে না, ইহা জানিবার জন্য সরকারের এইরূপ আয়োজনের কোন প্রয়োজনই নাই। ইহা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মুডিম্যান কমিটীর রিপোর্টে আপনার যে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও বলিয়াছিলেন যে, তিনি দ্বৈত-শাসনের ভক্ত নহেন। এ দেশের সরকারের সহিত সহযোগকামী মডারেড বা উদারনৈতিক দলও কখন এমন কথা বলেন নাই যে, তাঁহারা দ্বৈত-শাসনের সমর্থন করেন। এবারকার এই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে যে স্বাধীন জাতীয় দল নাম লইয়া এক অভিনব রাজনীতিক দল গজাইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্বৈত-শাসনের পক্ষপাতী নহেন, উহা স্বীকার করিয়া লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ। এমন কি, যে লর্ড বার্কেণহেড ভারত-সচিবের তক্তে বসিয়া ভারতীয় রাজনীতি লইয়া এত খেলা খেলিলেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, "তিনি দ্বৈত-শাসন পদ্ধতিতে চিরকালই অবিশ্বাসী। ইহাতে কতকটা পণ্ডিতী এবং গোঁড়ামীর ভাব আছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন সমাজ ইহা কোনকালেই পসন্দ করে নাই। রাজনীতিক বিষয়ে সেই অ্যাংলো-স্যাক্সনদিগের অনুকরণকারী ভারতীয় রাজনীতিকরা যে উহা পসন্দ করিবে না, তাহা জানা কথা।" সুতরাং সরকার পক্ষের হোমরা-চোমরা দলও এই দ্বৈত-শাসনের সমর্থন করিতে সাহস পান না। লর্ড বার্কেণহেডের উক্তিতে বেশ একটু খোঁচা ছিল। এত দিন পরে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

ফলে ভারতবাসী দ্বৈত-শাসন চাহে না, ইহা জানিবার জন্য কোনরূপ আয়োজনের প্রয়োজন নাই। প্রধানতঃ মেকলের প্রসাদাৎ ভারতবাসীরা অন্ধবৎ অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির আদর্শের অনুসরণ করে, এ কথা সত্যই হউক বা না হউক, এ কথা খুবই সত্য যে, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে বৃটিশ জাতি যে দ্বৈত-শাসনের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" উহাতে দুইটি পরস্পর ঘোর বিরোধী ভাবাক্রান্ত ব্যাপারের সংমিশ্রণ করিবার মত চেষ্টা করা হইয়াছিল। সে দুইটি বিরোধী ভাবাক্রান্ত শাসনপ্রণালী এই;—(১) জনতন্ত্র-প্রণালীসম্মত শাসনব্যবস্থা এবং (২) ব্যুরোক্রেশীর স্বৈরিতাসূচক শাসনপদ্ধতি। এই দুইটির সংমিশ্রণ কখনই সম্ভবে না। সুতরাং কার্য্যতঃ উহা নিরঙ্কুশ ব্যুরোক্রেশীর তথাকথিত মা-বাপ শাসন বা স্বৈরশাসনের উপর গণতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর একটা অতি পাতলা আস্তরণ দেওয়া হইয়াছে। একটু টিপিলেই উহার সেই ভিতরের কুলিশ-কঠোর স্বৈরশাসনের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই শাসনযন্ত্রের কাঠামোতে চালচিত্রে মন্ত্রী আছে; কিন্তু সে মন্ত্রী উহার শোভাসম্বর্দ্ধক। কিন্তু সেই মন্ত্রীর নিম্নেই জনমতের উপর বামচরণ প্রদান করিয়া দশ দিকে দশ হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক সিভিলিয়ান সেক্রেটারী বিরাজমান। তিনি মন্ত্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বয়ং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সহিত সলা-পরামর্শ করিয়া বিভাগীয় কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। মন্ত্রী তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীববিশেষের মত কেবল ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকেন।

এইরূপভাবে কার্য্য করিতে কোন স্বাধীনচেতা এবং আত্ম-সম্মানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। এ ব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে, তবে হাজা-শুকা, ফৌত-ফেরারীবর্জ্জিত বার্ষিক চৌষট্টি হাজারী পদ এই দরিদ্রের দেশে নিতান্ত অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে। ইহা এ দেশে একটা বড় জমীদারের বা ব্যবসাদারের আয় অপেক্ষা অনেক অধিক। এ দিকে বাহিরে জনসাধারণের নিকট একটা সম্মান (আন্তরিক না হইলেও মৌখিক) আছে। যাত্রার দলে বা সখের থিয়েটার পার্টিতেই যখন মন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণের জন্য একাধিক ব্যক্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এবং সেই প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ফলে যখন একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সময়ে সময়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আত্মপ্রকাশ করে, তখন এই মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির জন্য বহু লোকের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। ইহা ভিন্ন আরও একটা বড় কথা এই যে, মন্ত্রিত্ব পাইলে অনেক বড় বড় রাজপুরুষের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও সহিত হয় ত ঘনিষ্ঠতাও জন্মিতে পারে। এরূপ অবস্থায় কোন কোন অল্পবুদ্ধি লোক হয় ত মনে করিতে পারেন যে, সেই আলাপের ফলে হয় ত তাঁহার পুত্রের বা জামাতার ডেপুটীগিরি না হউক, অন্ততঃ একটা বড় চাকুরী রাজসরকারে বা সওদাগরদিগের নিকট হইতে যোগাড় করা যাইতে পারে। কার্য্যতঃ সে আশা সফল হউক বা না হউক, অনেকে সেরূপ আশা যে মনে মনে পোষণ করেন না, তাহা মনে হয় না। এই চাকুরী-কাঙ্গালের দেশে ইহা নিতান্ত অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে। কেহ কেহ অবশ্য এ কথা অবগত আছেন যে, সাধারণভাবে চাকুরীর চেষ্টা করিলে হয় ত তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে তাঁহার পক্ষে হয় ত মাসিক চারি পাঁচ শত টাকা বেতনের কার্য্য করা অসম্ভব হইত, তিনি যদি অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনের চাকুরী ও সম্মানজনক পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা নিতান্ত মন্দ হয় না। এরূপ অবস্থায় ভিতরে সেক্রেটারী ও ব্যুরোক্রেশীর প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, কয়েক জন লোক মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন,—তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে ?

স্বরাজী দল যে এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত, ইহাও তাঁহাদের জনপ্রিয়তার একটি অতি প্রবল কারণ। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, সাধারণ লোকের ধারণা, মন্ত্রীরা সাধারণভাবে তাঁহাদের সেক্রেটারীর দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন, সেক্রেটারীরা তাঁহাদের মন্ত্রীর দ্বারা চালিত হয়েন না। অবশ্য সকলের পক্ষে এ কথা খাটে না। স্বর্গীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিন বৎসরকাল দৃঢ়তার সহিত মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেক্রেটারীর দ্বারা চালিত হইতেন না, তাঁহার সেক্রেটারীরাই তাঁহার দ্বারা চালিত হইতেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফল। এইরূপ আরও কয়েক জনের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু সকলের সে শক্তি নাই। কার্য্যকুশলতায় ও অভিজ্ঞতায় অনেক সেক্রেটারীই গভর্ণরের মনোনীত কোন কোন মন্ত্রী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কাযেই কোন কোন সিভিলিয়ান সেক্রেটারী যে দুর্ব্বল মন্ত্রীকে পাইলে তাঁহাকে চাকে মাত করিয়া অথবা ব্যুরোক্রেশীর অশ্বচক্র ঘুরাইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। মুডিম্যান কমিটীর সমক্ষে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকটা আভাসে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যত দিন সেক্রেটারীরা সরাসরিভাবে তাহাদের বিভাগীয় বিষয় সম্বন্ধে খোদ শাসনকর্ত্তার সহিত আলোচনা করিতে পারিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত মন্ত্রীদিগের প্রাধান্য কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বরাজীদল মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত, এই জন্য তাঁহারা জনসাধারণের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা মন্ত্রিত্ব ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর বলিয়া তাঁহাদের উপর বহুলোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট। ইঁহারা ৬৪ হাজারী পদের মোহে মুগ্ধ নহেন, ইহাই ইঁহাদের জনপ্রিয়তার কারণ। সাধারণ লোক যে প্রলোভনে সহজেই পতিত হয়েন, সেই প্রলোভন যাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন, সাধারণ লোক নির্ব্বিচারে যে তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এ কথা সত্য যে, সাধারণ লোক ইহা স্পষ্টই দেখিতেছে যে, ইঁহারা যে কেবল মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অসম্মত, তাহা নহে, পরন্তু ইঁহারা সাক্ষিগোপাল মন্ত্রীর পদ রাখিতেই অসম্মত। কেহ কেহ অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ধারণার প্রভাবে মনে করিয়া থাকেন যে, এই সাক্ষিগোপাল মন্ত্রীর পদ জাতির অবমাননাজনক। এ ধারণা যে নিশ্চিতই ভুল, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। মুডি-ম্যান কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় যেমন লালা হরকিষণ লাল বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তেমনই সার সুরেন্দ্রনাথও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন আদেশই বঙ্গীয় লাট নাকচ করেন নাই। লর্ড রোণাল্ডসের সৌজন্যও ইহার কিঞ্চিৎ কারণ হইতে পারে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গভীর রাজনীতিক জ্ঞান, চিত্তের দৃঢ়তা এবং সমুন্নত ব্যক্তিত্বই যে তাহার প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সার চিমনলাল শীতলবাদ স্পষ্টাক্ষরেই ঐ কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রী যদি দৃঢ়চেতা হয়েন, তাহা হইলে প্রাদেশিক শাসকগণ তাঁহাকে পদে পদে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কিন্তু কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার হস্তেই যখন মন্ত্রীর মনোনয়ন-ভার ন্যস্ত, তখন শাসনকর্ত্তা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি দৃঢ়চিত্ত লোককে মন্ত্রিত্ব দান না করিয়া দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে পারেন। সেই জন্য লোক এইরূপ মন্ত্রী চাহে না।

মন্ত্রীর কার্য্য সুখজনক নহে। কারণ, স্বীয় অধীনস্থ সেক্রেটারী মন্ত্রীর সঙ্কল্পিত নীতি উল্টাইয়া দিয়া তাহার বিপরীত নীতি সেই বিভাগে প্রবর্ত্তিত করিলেও ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীকে সেই পরিবর্ত্তিত নীতিরই সমর্থন করিতে হয়। অথচ তিনি মনে প্রাণে সেই নীতির সমর্থন না করিতেও পারেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিকূল ও তীব্র সমালোচনার সম্মুখে এরূপ কার্য্য করা যে অত্যন্ত কঠিন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি সরকারী নীতির সমর্থক না হইলেও সেই নীতির সমর্থন করিতে বাধ্য; কারণ, তিনি সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে বা উহার প্রতিকূলে ভোট দিতে পায়েন না। সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অবস্থায় কোন

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নির্ব্বিকারচিত্তে মন্ত্রীর পদগ্রহণ করিতে পারেন কি? সম্ভবতঃ স্বরাজপন্থীরা এই জন্যই মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত।

মন্ত্রিপদে কার্য্য করিতে হইলে আর একটি গুরু অসুবিধা বিদ্যমান। হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কিত নিয়মে (Devolution Rules) মন্ত্রীদিগের বিভাগীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র কোন রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মোট রাজস্ব হইতেই খাস এবং হস্তান্তরিত উভয় বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিচার বিভাগ, পুলিস বিভাগ এবং সরকারী চাকুরীর নিয়ন্ত্রণ বিভাগগুলি প্রাদেশিক সরকারের খাস বিভাগ। এই বিভাগগুলির যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্ততঃ ব্যুরোক্রেশীর দৃষ্টিতে উহার প্রয়োজনীতা অত্যন্ত অধিক। ইহার ব্যয় একরূপ নির্দ্ধারিত আছে। সেই ব্যয় বরাদ্দ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই হস্তান্তরিত বিভাগগুলিকে দেওয়া হয়। অথচ জাতির পক্ষে হিতকর সমস্ত বিভাগগুলিই—যথা, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগগুলি—মন্ত্রীদিগের হস্তে প্রদত্ত; ঐ বিভাগগুলিই জাতিগঠনের হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। খাস বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলি ভাল ভাবে পরিচালিত করা যায় না। এরূপ অবস্থায় সাধারণে স্বতঃই মনে করিয়া থাকে যে, সরকার দেশের হিতকর হস্তান্তরিত বিষয়গুলি তাঁহাদের খাস বিভাগের ন্যায় প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এরূপ অবস্থায় এই দেশের লোক কখনই এই শাসন-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাঁহারা যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে, এইরূপ আশা করাই অস্বাভাবিক। সুতরাং যাঁহারাই এই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন, দেশের অধিকাংশ লোক যে,তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? স্বরাজপন্থীদিগের জনপ্রিয়তার ইহাই একটা প্রবল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

• দুই জন মন্ত্রীর মধ্যে একজন মন্ত্রীর উপর অনাস্থাজ্ঞাপন প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হওয়াতে এবার মন্ত্রিদ্বয়কে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। কারণ, উভয় মন্ত্রীর দায়িত্ব একই। সেই জন্য দ্বৈত-শাসন অচল হইল দেখিয়া সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ অবস্থায় উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে আদেশ দিয়াছেন। তিনি এই ব্যাপারে যে বিশেষ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। কারণ, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ব্যবস্থাপক সভায় একজন মন্ত্রীর উপরে যে অভিযোগের আরোপ করা হইয়াছিল, তাহাতে এবারকার এই অনাস্থাজ্ঞাপক ভোটের সহিত সাধারণের সহানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। যিনি মন্ত্রী হইবেন, তাঁহার সর্ব্বসন্দেহের অতীত হওয়া উচিত। তাঁহাকে এমন ভাবে চলিতে হইবে যে, মিথ্যা সন্দেহও যেন তাঁহাতে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান না পায়। এবার কেবল স্বরাজীরাই মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে ভোট দেন নাই, অন্য দলের লোকও উহাতে ভোট দিয়াছেন। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এবার কাউন্সিল ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর স্বরাজীদিগের উপর ইহার সমস্ত দায়িত্ব নিক্ষেপ করা চলে না। যাঁহারা কাউন্সিলভঙ্গে আগ্রহবান্ নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এবার এই অনাস্থাজ্ঞাপক ভোটের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন।

এই অবস্থায় এই ব্যাপার লইয়া কাউন্সিল ভঙ্গ করিয়া দেওয়াতে বঙ্গীয় লাট স্বরাজপন্থীদলের হস্ত কতকটা দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। স্বরাজী দলও এবারকার এই নির্ব্বাচনে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। কারণ, ইহা তাঁহাদের কতটা মৌখিক এবং কতটা আন্তরিক, তাহা বলা ও বুঝা কঠিন। অবশ্য তাঁহারা ধ্বংসমূলক কার্য্যে যতটা কৃতিত্ব ও সাফল্য প্রকটিত করিয়াছেন, গঠনমূলক কার্য্যে ততটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, ধ্বংসমূলক কার্য্যের উদ্দেশ্য সফল হইলেই গঠনমূলক কার্য্য করা সহজ হইবে। সেই জন্য মনে হয়, এবার নির্ব্বাচনে স্বরাজী দল জয়লাভ করিতে পারেন।

এই শাসনপ্রণালীর স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুঝা যায় যে, উহার উপর যে গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির পলস্তারা বা আবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। উহার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ স্বৈর-শাসনের দার্দ্দ-মূর্ত্তি বিরাজিত। গণতন্ত্রমূলক ব্যবস্থায় যেরূপভাবে দল গঠন করা হয়, এ দেশে এই ব্যবস্থা অনুসারে তাহা হইতে পারে না। এ দেশে সরকারের শাসননীতি কি, তাহা তাঁহারা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না, আইনে তাঁহাদের তাহা করিবার কোন উপায় করা হয় নাই। কারণ, সরকারের জনসাধারণের নিকট যাইয়া ভোট ভিক্ষা করিতে হয় না। সরকার পক্ষের শাসননীতি যাহাই হউক, তাঁহারাই যে শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকিবেন, তাহাতে কাহারও উচ্চ-বাচ্য করিবার অধিকার নাই। সকল ব্যবস্থাপক সভাতেই সরকার পক্ষের এক দল লোক থাকেন, তাঁহারা সকলে একজোট্টা হইয়া সরকারের পক্ষে ভোট দিয়া থাকেন। ইহা যে স্বৈর-শাসনের (autocracy র) প্রকট মূর্ত্তি, তাহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এই দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থায় যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের (autocracy র) সহিত গণতন্ত্রের সম্মেলনসাধন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ব্যর্থ হইয়াছে। উহা তেলে-জলে মিশানর মত পরস্পর বিচ্ছিন্নই রহিয়াছে। একটু ঝড়-ঝাপটা লাগিলেই এই স্বৈর-শাসনের মূর্ত্তি হইতে ইহার অঙ্গমণ্ডন আঙ্গির পাঞ্জাবী উড়িয়া যায়, আর স্বৈর-শাসনের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন অর্ডিনান্স জারি ও সার্টিফিকেট করিয়া এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলি খাসে লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করা হইয়া থাকে। আইনে এই স্বৈর-শাসন-মূর্ত্তিকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ রাখিবার যতদূর ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে; কেবল একটিমাত্র রন্ধ্র ছিল, সেই একমাত্র রন্ধ্র ধরিয়া সাতালী পর্ব্বতে লখীন্দরের লোহার বাসর-ঘরে যেরূপ বিষহরির চর প্রবেশ করিয়াছিলেন, স্বরাজপন্থীরা সেইরূপ ভাবে প্রবেশ করিয়া বার বার এই দ্বৈত-শাসন ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইতেছেন। ছিদ্রটি এই যে, মন্ত্রীদিগের বেতন না-মঞ্জুর করিয়া বা তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া দ্বৈত-শাসনযন্ত্র অচল করা যায়। যাঁহারা এই সংস্কৃত ভারত-শাসনের আইন রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ছিদ্রটি দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা বুঝা কঠিন। কারণ, এই ছিদ্রটির বিলোপসাধন অত্যন্ত দুরূহ। ঐ ছিদ্র রোধ করিতে গেলে গণতন্ত্রের পলস্তারাটি আর থাকে না।

যাহা হউক, এই ভাবে দ্বৈত-শাসন ভাঙ্গিয়া দিলেই যে সরকার

বা বিলাতের পার্লামেণ্ট আমাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবেন, ইহা কোনমতেই আশা করা যায় না। ইতঃপূর্ব্বে স্বরাজী দল এই প্রকারে দ্বৈত-শাসন অচল করিলে, সরকার হস্তান্তরিত বিষয় খাসে লইয়া কাজ চালাইয়াছিলেন, তাহার ফলে হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে, যে সামান্ত কাযটুকু হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও হয় নাই। ঐ বিভাগের যে কাজগুলি না করিলে নিতান্তই চলে না, গভর্ণর হস্তান্তরিত বিভাগ খাসে আনিয়া কেবল তাহাই করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষতি যদি কাহারও হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণেরই তাহা হইয়াছে। সরকারের তহবিলে বরং কিছু অর্থ বাঁচিয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন, যদি এই দ্বৈত-শাসনভঙ্গের ফলে পরিণামে কিছু সুবিধা হয়, দ্বৈত-শাসন তুলিয়া দিয়া জনসাধারণের হস্তে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে লাভ আছে। কিন্তু তাহা হইবে কি? সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে বুঝা গিয়াছে যে, সরকারের এ বিষয়ে একটা বিশেষ মতলব আছে। এবার নির্ব্বাচনের জন্ত অতি অল্প সময় দেওয়া হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন-কার্য্য সমাধা করিয়া সরকার দেখিতে চাহেন যে, স্বরাজপন্থীরা কিরূপ সংখ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া আসিতে পারেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা এই বিষয়ে তাঁহাদের নীতি পরিচালিত করিবেন। সে নীতি কি, তাহা অবশ্য তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। তবে ব্যবস্থাপক সভায় পাবলিক সেফটি বিলখানি সম্বন্ধে মিষ্টার ভি, জে, প্যাটেলের সহিত মতভেদ হওয়াতে লর্ড আরউইন যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার মত কোন নেতাই বাঙ্গালায় নাই। এই সময়ে স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় অথবা সার সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী জননায়ক থাকিলে বড়ই ভাল হইত। সত্য বটে, সুরেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থার সহিত আপনাকে সমঞ্জসীভূত করিতে পারেন নাই; উহা তাঁহার বয়সের দোষ। যাহা হউক, এখন বাঙ্গালায় একমাত্র স্বরাজী দল ভিন্ন আর সকল দল ছিন্ন ভিন্ন। শুনিতেছি, স্বরাজীদলেও মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা ভুল ক্ষণ বলিতে হইবে।

এই সময়ে আর একটি রাজনীতিক দল দেখা দিয়াছে। ইহা স্বাধীন জাতীয় দল। এ দলে কোন বিচক্ষণ রাজনীতিককে দেখা যাইতেছে না। আমরা এবার এই দল সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা বলিতে পারিলাম না। বারান্তরে তাঁহাদের কথা বলিব, ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিভারত্ন)।

শোক-অর্ঘ্য

বঙ্গবাসী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী জগত্তারিণী দেবী গত ১৮ই বৈশাখ বুধবার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামি পুত্রসহ বহু তীর্থ দর্শন করিয়া বিগত বৎসর বৈশাখ মাসে তিনি ৺কেদার বদরী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যেই তিনি জ্বর-কাসিতে আক্রান্ত হন। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিকিৎসা সত্ত্বেও ক্রমশঃ রোগ ক্ষয়কাসে পরিণত হয়। ৩।৪ মাস রোগের ভীষণ যন্ত্রণা-ভোগের পর হিন্দু নারী যন্ত্রণা-মুক্ত হইয়া সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ইনি যেমন সুশীলা, তেমনই দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার গাঢ় অনুরক্তি ছিল। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতকে পরিচর্য্যা করিতে পারিলে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার স্নেহশীতল মধুর আলাপে আত্মীয়-পরিজন প্রীতিলাভ করিতেন। একাধিক পুত্র-কন্যার মৃত্যুজনিত শোকে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে একটি মাত্র উপযুক্ত পুত্র, ও একটি সধবা কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং শোকার্ত্ত স্বামীকে রাখিয়া তিনি চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা সন্তপ্তচিত্তে সপুত্র ললিত বাবুকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জগত্তারিণী দেবী

সাইমন কমিশন

সাইমন-সপ্তক ভারতের লীলা সাঙ্গ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সেখানেও তাঁহাদের 'অভ্যর্থনার' ত্রুটি হয় নাই। সেখানেও কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার সদস্যরা লণ্ডনের রেল-ষ্টেশনে এমন 'অভ্যর্থনার' আয়োজন করিয়াছিলেন যে, পুলিসকে সেখানেও তাঁহাদের উপর বলপ্রকাশ করিয়া সাম্রাজ্যকে 'নিরাপদ' করিতে হইয়াছিল, পরন্তু সাইমন সপ্তককে নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া গোপনে পর্দ্দার আড়ালে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ভারতবাসীর নিকটে সাইমন-সপ্তক কি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন! কেবল ইহাই নহে, খাস পার্লামেণ্ট মহাসভাতেও সাইমন-সপ্তকের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল, সেখানেও গোলযোগ বড় কম হয় নাই। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কমিশন বসাইয়া ফল ইহাই হইয়াছে।

ভারতে ও বিলাতে এই 'অভ্যর্থনায়' সাইমন-সপ্তক যে আদৌ সন্তোষ ও মনের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা 'পাইওনীয়ারের' লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে, সার জন সাইমন ও মিঃ হার্টসরণ এ দেশে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা অভদ্র ইতরোচিত চীৎকারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই—সে অভদ্রতার জন্য ভারতের প্রতি ন্যায়-বিচার করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না,—তথাপি এই বিশেষ সংবাদদাতাই বলিয়াছেন যে, সাইমন-সপ্তকের অন্যতম সদস্য তাঁহাকে বলিয়াছেন,—"আমরা যেটুকু সহযোগ পাইয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমাদিগকে কায করিতে হইবে। আমাদের বিরুদ্ধে বর্জ্জন আন্দোলন সত্যই ভীষণ (really intense) হইয়াছিল। আমরা সে জন্য বস্তুতঃ বড়ই নিরুৎসাহ (discouraging) হইয়াছিলাম।"

সুতরাং সরকারীভাবে যাহাই বলা হউক, এই কথাটাই যে আসল সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'পাইওনীয়ারের' এই সংবাদদাতা বলিতেছেন,—কমিশন এইভাবে নিরুৎসাহ ও হতাশাস হওয়ায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে উপদেশ দিবেন, যেন তাঁহারা জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ভারতের এক সকল-দল-সম্মেলনকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যতক্ষণ ভারতের স্বরাজী ও অন্যান্য দল সহযোগ করিতে প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ ভারতের কোন উন্নতি সম্ভবপর হইবে না।

অবশ্য সংবাদদাতার সকল কথাই যে সত্য, এমন কথা বোধ হয় 'পাইওনিয়ারও' জোর করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যদি ইহা আংশিকও সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বর্জ্জন আন্দোলন বিফল হয় নাই। সরকারপক্ষ হইতে যতই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করা হউক, সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

স্যর জন সাইমন ক্রোধের বশে বর্জ্জন আন্দোলনকারীদিগকে অভদ্র, ইতর, ইত্যাদি যাহাই বলিয়া গালি পাড়ন, তাহারা তাঁহার কমিশনকে বর্জ্জন করিয়া বিন্দুমাত্র অন্যায় করে নাই। যে কমিশনে ভারতবাসীকে লওয়া হয় নাই, যে কমিশনকে জোর করিয়া ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ভারতবাসী সেই কমিশনকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে, এতটা আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন তাহারা হইতে পারে কি? সে কথা বুঝিয়া সার জনের বা মিঃ হার্টসরণের কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহাদের প্রতি ভারতবাসীর ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ, বিদ্বেষ বা ক্রোধ ছিল না। তবে তাহারা 'সাইমন ফিরিয়া যাও বলিয়া' কৃষ্ণপতাকা হস্তে শোভাযাত্রা করিয়াছিল কেন? ইহাতে তাহারা সার জন বা মিঃ হার্টসরণ অথবা অন্য কোনও সদস্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোনও অসম্মান প্রদর্শন করে নাই, তাহারা যে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাইমন কমিশনকে গ্রহণ করিতে সম্মত নহে, ইহাতে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছিল। এ জন্য সার জন বা তাঁহার সহকর্ম্মীরা নিরুৎসাহ বা হতাশ্বাস হইবার দাবী করিতে পারেন না।

পার্লামেণ্ট ভাগ্যনিয়ন্তৃরূপে যে কমিশনকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কমিশন যে ভারতবাসীকে তাহার ঈপ্সিত ফল দান করিতে পারিবেন না, ইহা ভারতবাসী জানিত বলিয়াই বর্জ্জন আন্দোলন করিয়াছিল। পার্লামেণ্ট যে বাঁধাধরা 'ক্রমোন্নতির' পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য সাইমন কমিশনের নাই। তবে কি জন্য ভারতবাসী সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগ করিবে?

সাইমন কমিশন কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তাহার একটা ভবিষ্যদ্বাণীও 'পাইওনিয়ারের' বিশেষ সংবাদদাতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি যতটা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সাইমন কমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কারের পরামর্শ দিবেন :—

(১) প্রদেশসমূহে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে; তবে রাজনীতিক ও পুলিস বিভাগে কিছু কিছু বাঁধন-কষণ থাকিবে।

(২) কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যাপারে বৈদেশিক ও রাজনীতিক বিভাগ এখন কিছুকাল সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে।

(৩) বর্ত্তমানে কতকগুলি শাসনবিভাগ হস্তান্তরিত করা একবারে অসম্ভব।

(৪) ক্রমশঃ সকল বিভাগই ভারতীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হইতে থাকিবে; এইভাবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিভাগই ভারতীয়দিগের হস্তগত হইবে।

অর্থাৎ 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া স্বরাজের পথে ভারতবাসীকে অগ্রসর হইতে হইবে! ইহার অধিক অধিকার দিবার পরামর্শ সাইমন কমিশন দিতে পারিবেন না, দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের

নাই। অথচ আইনের মুখবন্ধেই 'পার্লামেন্টের ক্ষমতা', 'ভারতীয়দিগের যোগ্যতার পরীক্ষা', 'ক্রমশঃ অধিকারদান' প্রভৃতি ব্যবস্থা করাই আছে; সাইমন কমিশন সেই ব্যবস্থা ছাপাইয়া নিজের মন-গড়া পরামর্শ দিবেন কিরূপে? সুতরাং এই সোনার পাথরবাটি বর্জ্জন করিয়া ভারতবাসী বিন্দুমাত্র অন্যায় করে নাই।

অবশ্য বৃটিশ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পক্ষ হইতে এজন্য ভারতবাসীকে ভয়প্রদর্শনের ত্রুটি হইতেছে না। একখানা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র লিখিয়াছেন,—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাহারা জানী শত্রু, তাহাদিগকে কোনও সুবিধা বা অধিকার দেওয়া হইবে না। যে সকল প্রদেশ সহযোগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আর এক দফা সংস্কার দেওয়া হইবে। যে সকল প্রদেশ অসহযোগ করিয়াছে, তাহাদিগের জন্য পূর্ব্বের মা-বাপ শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হইবে।" অর্থাৎ সহযোগের পুরস্কারস্বরূপ ভারতকে সংস্কার দেওয়া হইবে, ভারত সংস্কার অধিকার পাইবার যোগ্য বলিয়া নহে। এই সর্ত্তে কোনও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয় 'সংস্কার' চাহিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

আর বৃটিশ পার্লামেণ্ট ইহার অধিক অধিকার ভারতকে দিতে পারেন না। কেন পারেন না, তাহা লর্ড অলিভিয়ার পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন:—"যে কোন জাতির উপনিবেশ বা বাহিরে অধীন রাজ্য আছে এবং যে কোন জাতি নিজের প্রজার উপকারের জন্য সেই উপনিবেশ বা অধীন রাজ্য শাসন করে, ও তথায় নিজের জাতির প্রজাকে ব্যবসায়ী, প্রবাসী বা ধনী মূলধন-নিয়োগিরূপে প্রেরণ করে,—সেই জাতি নিজের নাগরিকের উন্নতিকে মূল লক্ষ্য রাখিয়া সেই সকল উপনিবেশ বা অধীন রাজ্য শাসন করিবেই।"

ইহার পর এ বিষয়ে আর কিছু ব্যাখ্যা করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

স্বামী ভোলানন্দগিরির দেহত্যাগ

গত ২৫শে বৈশাখ বুধবার পুণ্যক্ষেত্র মায়াপুরে (হরিদ্বারে) নিজ আশ্রম লালতারাবাগে স্বামী ভোলানন্দগিরি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বেদবিদ্যাবিশারদ দার্শনিক সন্ন্যাসী একালে দুর্লভ। পতিতের উদ্ধারে তিনি আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন, সে সাধনায় তিনি আশানুরূপ সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালার অসংখ্য হিন্দু নরনারী এই সাধু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবী সাধু এ কালে বিরল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১ শত ২৫ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রমিক-চাঞ্চল্য

ভারতবর্ষে অধুনা শ্রমিকদিগের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যত দিন দেশে কুটীর-শিল্প বিদ্যমান ছিল, যত দিন আমাদের জাতিভেদের অনুরূপ পেশাভেদের সুব্যবস্থা ছিল, তত দিন দেশে এই অনর্থ দেখা দেয় নাই। প্রতীচ্যের কলের আমদানীর পর হইতে যখন শ্রমিকগণ অপরিমিত সংখ্যায় গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বা নগরোপকণ্ঠে কলে কায করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তত দিন হইতে শ্রমিকগণের মধ্যে একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহা হইতে বহুর সম্মিলিত দাবী উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থনীতিক পেষণ এ দেশে প্রবল হইয়াছে, উদরান্ন সংস্থানের প্রশ্ন জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় মানুষ সহজেই একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতার আশ্রয়ে আপনাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিবেই। বিশেষতঃ

স্বামী ভোলানন্দগিরি
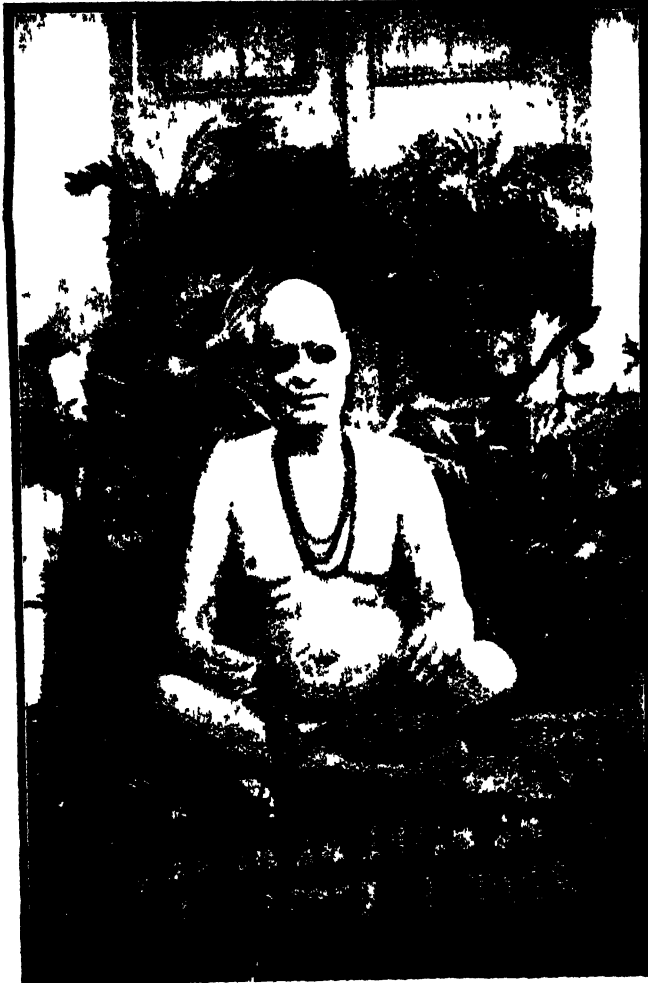
পৃথিবীতে যে আবহাওয়ার তরঙ্গ চলিতেছে, তাহার প্রভাব অন্নবিক্লব এ দেশেও পৌঁছিয়াছে। প্রতীচ্যে শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধতা ও ধর্ম্মঘট নূতন নহে। তাহার প্রভাব এ দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাই এই দেশে শ্রমিকের ধর্ম্মঘট যেন ক্রমে নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম্মঘট ঘন ঘন দেখা দিতেছে। সম্প্রতি বোম্বাইএর ৮৪টি কলের মধ্যে ৭৬টিতে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিক এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছিল। আবও ভীষণ সংবাদ, এতদুপলক্ষে বোম্বাই সহরে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়াছিল।

কেন এমন হয়? যে সকল কাবণে এমন বিরাট ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে অর্থনীতিক পেষণ যে একটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। জিদ যে আর একটি কারণ, তাহাও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবারেব ধর্ম্মঘটের মূলে কি কি কাবণ বিদ্যমান, তাহা এখনও বিশদরূপে প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু যে কাবণেই ধর্ম্মঘট হউক, উহা যে কোনও শান্তিকামী মানবেব পক্ষে স্পৃহণীয় নহে, এ কথা আমবা মুক্তকণ্ঠে বলিব। কেহ কেহ বলেন, এই প্রকার সংঘর্ষ ও চঞ্চলতা জীবনীশক্তির লক্ষণ। কিন্তু অবস্থা ও কালভেদে এমন সংঘর্ষ ও চঞ্চলতা যে সমাজের অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পাবে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সুতবাং এই ধর্ম্মঘটেব জড় মারিবার চেষ্টা কবা যে আশু প্রয়োজন, তাহা সমাজ-হিতৈষিমাত্রেই বলিবেন।

ধর্ম্মঘট যে কত অনিষ্টকাবী, তাহা সকলেই জানেন। প্রথমতঃ যাহারা ধর্ম্মঘট কবে, তাহাবা পরিবাববর্গসহ নানারূপ অসুবিধা ভোগ করে। এই দবিদ্র দেশে তাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কলেব দেশীয় মালিকগণও ইহাতে আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিয়া থাকেন,—দেশেব বাণিজ্য-শিল্পও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যাহাতে দেশ ও দেশবাসীর অনিষ্ট হয়, এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে দেওয়া কোন দেশপ্রেমিকেবই কর্ত্তব্য নহে।

আমবা ধনিক ও শ্রমিকেব মধ্যে বিরোধকে দেশেব উন্নতি ও অগ্রগতির প্রবল অন্তরায় বলিয়া মনে কবি। ধনিকের পক্ষে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনিবার্য্য, শ্রমিকের পক্ষেও ধনিকের প্রয়োজনীয়তা তদ্রূপ অনিবার্য্য। উভয়ের সহযোগ ও সম্প্রীতির উপর দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিব উন্নতি নির্ভর করে। শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত দাবী বক্ষা করা বা অভাব-অভিযোগেব প্রতীকার করা যেমন ধনিকেব অবশ্য কর্ত্তব্য, ধনিক যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বচ্ছন্দে শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তাহার সহায়তা কবাও শ্রমিক দলপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উভয়ের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, তাহা কেহ অস্বীকাব করিতে পারেন না।

উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উভয় পক্ষকেই অন্যায় জিদ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এ কথাটা তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই জিদই সকল অনর্থের মূল। উভয় পক্ষই বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকার করিতে চাহেন না। অভিমানী কৌরব এক দিন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে অসম্মত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ত্যাগ-স্বীকারে যে পুণ্য [illegible] তাহা সকল ক্ষেত্রে সকল পক্ষ যদি সঞ্চয় করেন, তাহা হইলে এ দেশে শ্রমিক-চাঞ্চল্যের নামগন্ধও আর শুনা যাইবে না। এ বিষয়ে ধনিক সম্প্রদায় ও শ্রমিক-নেতৃগণ যদি অবহিত হন, তবেই ধর্ম্মঘটের জড় মরিবে, অন্যথা নহে।

আসাম মহিলা-সম্মেলন

বিগত ৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ জোড়হাটে আসাম মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। আসামের শেষ রাজবংশের রাজকুমারী শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী এতদুপলক্ষে সভানেত্রীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ অসমিয়া ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান নারী-জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। এ দেশেব নারীও যে ক্রমশঃ দেশেব সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানে তাঁহাদের অংশ গ্রহণে সমুৎসুক হইতেছেন, তাহা ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী

সভানেত্রী মহাশয়া বলিয়াছেন,—"আসামের তথা ভারতের নারী যেন অতীতের উজ্জ্বল ও মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগশীলতা ও সেবাপরায়ণতার মধ্য দিয়া, শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে অতীত ভারতের নারীত্বের উপযুক্ততা লাভ করিয়া, বিশ্ব-নারী-জাগরণের সহিত তাল মিলাইয়া, পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, অবশ অর্দ্ধাঙ্গকে সতেজ ও সবল

করিয়া তাহার ধর্ম্মে-কর্ম্মে সহায়তা করেন।" সভানেত্রীর এই আকুল আহ্বান যথাস্থানে পৌঁছিলে দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। নারী-জাগরণের গতিপথের সর্ব্ববিধ বাধা ও সমস্ত কুসংস্কার দূরীকরণের জন্ত সভানেত্রী স্থায়-ধর্ম্মানুমোদিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নারীর হিতকর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সকল প্রকার সম্ভবপর উপায় উদ্ভাবনের আলোচনাতেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলতঃ তাঁহার অভিভাষণ হৃদয়গ্রাহী ও সদ্যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল এবং উহা আসামের নারী-সমাজের মধ্যে এক নূতন ভাবের প্রেরণা, এক নূতন উদ্যম, এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রত্নকুমারী রাজখোয়া মহাশয়ার অভিভাষণেও অনেক জানিবার ও বুঝিবার কথা ছিল।

শ্রীমতী রত্নকুমারী রাজখোয়া

এই মহিলা-সম্মেলনের আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। বর্ত্তমানে আসামের বিখ্যাত হিন্দু-ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক শ্রীশ্রীগরমুড়িয়া গোস্বামী এই সভায় যোগদান করিয়া নারীশিক্ষা বিস্তার, নারী-সমাজ-সংস্কার ও নারীশিল্পের উন্নতিতে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "জাতির এই দুর্দ্দিনে মাতৃজাতি জাগ্রত হইয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের কথা। তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের সংযম এবং বিশেষ বিবেচনা তাঁহাদের উন্নতির পথে পরম সহায় হইবে এবং দেশের পুরুষকে উহাতে অনুপ্রাণিত করিবে।" যাঁহারা দেশের মেরুদণ্ড—সেই মহৎ ক্ষমতাশালী ধর্ম্মগুরুগণের এইভাবে দেশের কাযে নারীর উন্নতির প্রতি সহানুভূতিসূচক সমর্থন দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।

এই মহিলা-সম্মেলনে গৃহীত গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহের সারাংশ এই স্থানে প্রদান করিতেছি, পাঠক ইহা হইতে বুঝিবেন, বর্ত্তমানে দেশের নারীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা কত দূরবিসারী হইয়াছে :—

(১) যথাসম্ভবভাবে গ্রামে গ্রামে নিম্ন প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা,

(২) বালিকাগণেরও জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে মিউনিসিপ্যালিটী ও লোক্যাল বোর্ডের নিকট দাবী করা,

(৩) প্রতি নগরে এক একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দাবী করা,

(৪) আসামে মহিলাগণের জন্য একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা,

(৫) ঐ কলেজে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করা,

(৬) বর্ত্তমান কটন কলেজে মহিলা ছাত্রী ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করা,

(৭) প্রতি জেলা, বিভাগ, নগর ও অন্যান্য কেন্দ্রে মহিলা-সম্মেলনের শাখা প্রতিষ্ঠা করা,

(৮) কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটী ও লোক্যাল বোর্ডে অন্ততঃ এক জন করিয়া মহিলা সদস্য নির্ব্বাচনের দাবী করা,

(৯) ডাক্তার গৌরের সহবাস-সম্মতি বিলের সংশোধন—বালিকা-বিবাহের বয়স ১৬, অবিবাহিতার সহবাস-সম্মতির বয়স ১৮ এবং বালকের বিবাহের বয়স ২৫বৎসর স্থির করিয়া বিল আইনে পরিণত করিতে সম্মতি প্রদান ও সরদা বিলের সমর্থন করা,

(১০) রেল ও ষ্টীমারের ৩য় ও মধ্যম শ্রেণীর নারী যাত্রীদের বর্ত্তমান অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করা।

অবশ্য ইহার সমস্তই যে অনুমোদনযোগ্য, এমন কথা আমরা বলি না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যতটুকু সংস্কার প্রয়োজনীয়, তাহাই হওয়া শোভন, সময়ের অগ্রগামী হইয়া চলিতে গেলে আমাদিগকে প্রতীচ্যের দশায় পড়িতে হইবে। কাল তাহার কার্য্য করিয়া যাইবে, তাহার জন্য আমাদের বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না।

মোটের উপর গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি যাহা গৃহীত হইয়াছে, তাহা অশেষ কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে হয়। মাতৃজাতি যদি এইভাবে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে জাতির মুক্তি সুদূরপরাহত হইবে না।

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

[**পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক**—দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ পল্লীবাসী কৈলাস ভট্টাচার্য্যের একমাত্র সন্তান নবদুর্গার পনেরো বৎসর বয়স হইয়াছে। সে অসাধারণ সুন্দরী। পিতার অর্থাভাব জন্যও বটে, আর অতি-সুন্দরী কন্যা দুর্ভাগা হইয়া থাকে, সাধারণের এই বিশ্বাসবশতঃ বটে, নবদুর্গা আজিও অবিবাহিতা। হঠাৎ কিঞ্চিৎ অর্থ ও আট ভরি সোনা পাইয়া ভট্টাচার্য্য সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, উদ্দেশ্য ঘটক লাগাইয়া মেয়ের পাত্র স্থির করিবেন। পথে বিখ্যাত কেদারেশ্বর তীর্থ। দেবদর্শন মানসে সেখানে গিয়াছিলেন। পূজাদি অন্তে সুফললাভের জন্য মোহান্তের গদিতে গেলে লম্পট মোহান্ত নবদুর্গাকে দেখিয়া পাগল হইল। ভট্টাচার্য্যকে বহু অর্থদানে বশীভূত করিতে মোহান্ত চেষ্টা করিল। অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ আশঙ্কায় ভট্টাচার্য্য মৌখিক সম্মতি দিয়া রাতারাতি স্ত্রী-কন্যাসহ কেদারেশ্বর হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতা কালীঘাটে আসিয়া যাত্রিবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। মোহান্তের কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারী নিমাই মণ্ডল ও কেদারেশ্বর হইতে প্রেরিত বিপিন সরকার ইহা আবিষ্কার করিয়াছে। মোহান্ত তাহার অপর কর্ম্মচারী অধর মুখোপাধ্যায়কে কালীঘাটে পাঠাইয়াছে। সে ছদ্মপরিচয়ে বিনা পণে নবদুর্গাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নব-বিবাহিতা পত্নীকে আনিয়া মোহান্তের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য যে যাত্রিবাড়ীতে আছেন, বিপিনও ছদ্মপরিচয়ে সেই বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে এবং ভট্টাচার্য্যের পরম হিতৈষী সাজিয়াছে।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান পর্ব্ব।

বাসায় ফিরিবার পথে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বিপিন ভায়া, কেমন বুঝছ বল দেখি?"

বিপিন বলিল, "আমার আর বোঝাবুঝি কি? মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ! আপনি কেমন বুঝছেন, তাই বলুন।"

"আমার ত ভাল বলেই মনে হচ্ছে—তবে তুমিই যে আমায় মনে খট্‌কা ধরিয়ে দিয়েছ। আসল কি জোচ্চোর—তাই বা কে জানে।"

"ঐ অধর বাবু যা যা সব বল্লে, তাই যদি ঠিক হয়, তা হ'লে বিয়ে দেওয়া আপনার মত ত?"

"মত ত বটেই। আমি ত তখনি পাকাপাকি কথাই দিয়ে ফেল্‌ছিলাম, কিন্তু তুমি চোখ টিপ্‌লে বলেই আমি সামলে গেলাম—বল্লাম, গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওবেলা এসে যেমন হয় ব'লে যাব। আচ্ছা, চোখ টিপেছিলে কেন?"

"চোখ টিপেছিলাম এই জন্যে যে, একটু খোঁজ-খবর না নিয়ে—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "খোঁজ-খবর নেওয়াই ত উচিত, কিন্তু সময় কৈ? আর দশটি দিন মাত্র এখানে ও আছে। শুনলে ত, এই দশ দিনের মধ্যেই বিয়ে শেষ করতে চায়—তা আমার মেয়ের সঙ্গেই হোক বা অপর কোনও মেয়ের সঙ্গেই হোক।"

বলিতে বলিতে দুই জনে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহিণীকে সকল কথা সংক্ষেপে জানাইয়া, অন্ন প্রস্তুত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে জানিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাক সাজিতে বসিলেন। বিপিন তাঁহার হাত হইতে কলিকা কাড়িয়া লইয়া, নিজেই তামাক সাজিল। বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া, ধূমপান করিতে করিতে, নিম্নস্বরে উভয়ের পরামর্শ চলিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "ভট্‌চায দাদা, আপনি এক কায করুন না হয়।"

"কি বল দেখি?"

"ওবেলা, আপনি গিয়ে পাকা কথা ব'লে আসবেন কথা আছে ত,—তা পাকা কথাই ব'লে আসুন। তার পর, রাত্রের ট্রেণে আপনি চট্ ক'রে ফরিদপুর চ'লে যান। ফরিদপুর জেলায় কুণ্ডুপুকুর গ্রামে ওর বাড়ী বল্লে ত।—

সেই কুণ্ডুপুকুর গ্রামে গিয়ে একটু চালাকি ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই, সব খবরই পেয়ে যাবেন। সত্যি ও সেই গ্রামের বাসিন্দা কি না, সত্যি ও তারাপুরের অন্নদা জ্যোতির্ভূষণের জামাই কি না, সত্যি ওর পরিবার ক্ষয়কাস রোগে মরণাপন্ন কি না, সত্যি ও ডুমরাওন রাজার এষ্টেটে চাকরী করে কি না, সব খবরই ত পেতে পারবেন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ফরিদপুর ? সে কোন্ দিক্ দিয়ে যেতে হয় ?"

"সে আর শক্ত কি ? শিয়ালদ' ষ্টেশনে গাড়ী চড়বেন, তার পর রাজবাড়ী ষ্টেশনে নেমে—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা না হয় নামলাম। কিন্তু কুণ্ডুপুকুর গ্রাম বা কোথায়, কত দূর, কোন্ দিক্ দিয়ে যেতে হয়, এ সব কিছুই ত আমার জানা নেই ! আচ্ছা, ওদিকে তোমার যাওয়া আসা আছে ?"

"আছে বৈ কি। ফরিদপুরে আমাদের একঘর কুটুম্ব রয়েছে কি না !—আমার মামাতো বোনের শ্বশুরবাড়ী যে !"

ভট্টাচার্য্য বিপিনের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "তবে ভায়া, তুমি নিজে গিয়েই খোঁজ-খবরটা নিয়ে এস—খরচপত্র যা লাগে,আমি দিচ্ছি। হাইকোর্টে তোমার আপীলের এখনও ১০।১২ দিন দেরী আছে বলছিলে—এখানে ব'সে থাকবে বৈ ত নয়। দেখ, আমি বুড়ো মানুষ,শরীর অপটু, দৌড়ঝাঁপ করতে পারবো না, তায় চালাক-চতুর নই, অপরিচিত স্থান, কোন্ গাড়ীতে উঠতে কোন্ গাড়ীতে উঠবো, কোথায় নামতে কোথায় নামবো, কোথায় কুণ্ডুপুকুর গ্রাম খুঁজে বেড়াব ? তার চেয়ে ভায়া, তুমিই যাও। এ গরীবকে যখন দাদা বলেছ, তখন দাদার একটা উপকার কর।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাকুলভাবে বিপিনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিপিন কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাকেই যেতে বলেন ?"

"হ্যাঁ ভায়া ! তোমার বয়স কম, এ দিকে বেশ চালাক-চতুর আছ, তুমি গেলেই কাযটি সহজে হাঁসিল হয়। খরচপত্র কি লাগবে, বল দেখি ?"

কলিকাতা হইতে ফরিদপুরের থার্ড ক্লাস ভাড়া তিন টাকা মাত্র। কিন্তু বিপিন ত ছেলেমানুষ, তাহার পিতাও কখনও ফরিদপুরে যায় নাই। তথাপি সে তন্মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, "ফরিদপুরের ভাড়া এখান থেকে বুঝি সাড়ে চার টাকা না কত। যেতে আসতে ন' টাকা দশ টাকাই ধরুন। ফরিদপুরে অবিশ্যি খাই-খরচ আমার লাগবে না, কুটুম্ব রয়েছে কি না ! তবে কুণ্ডুপুকুরে যাবার পথ-খরচ, যেতে আসতে, গোটা দুতিন টাকা লাগতে পারে। কুটুম বাড়ী যাচ্ছি,—ভাগ্নে ভাগ্নীদের জন্যে কিছু মিষ্টান্নও ত নিয়ে যাওয়া দরকার !—তা হলেই, গোটা চৌদ্দ পনের টাকার ধাক্কা !"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা লাগুক্—সব খবর-টবরগুলো পেলে মনটা ত নিশ্চিন্ত হবে ! আজ রাত্রের ট্রেণেই তুমি তা হ'লে বেরিয়ে পড়, ভায়া।"

"আপনি বিকেলে গিয়ে পাত্রকে কি বলবেন ?"

"বলবো,—হ্যাঁ, আমরা রাজি আছি, বিয়ের একটা শুভ-দিনও ক'রে ফেলবো। যে দিন বিয়ে, সেই দিনই করবো গায়েহলুদের তারিখ।"

"যদি কুণ্ডুপুকুরে গিয়ে শুনি, সেখানে অধর মুখুয্যে ব'লে কেউ বাস করে না, যদি চন্দনা ব'লে কোনও কাণা নদীই না থাকে, তার ওপারে তারাপুর গ্রামই না থাকে—যদি ঐ লোক-টার সব কথা মিথ্যে বলেই প্রমাণ হয়—তখন কি করবেন আপনি ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বিয়ে তখন ভেঙ্গে দিলেই হবে। সেই জন্যেই ত গায়েহলুদটা বিয়ের দিনই রাখছি। তখন আমি ওর মুখের উপর স্পষ্ট করেই বলবো, বাপু হে, তুমি নিজের পরিচয়ে যা যা বলেছ, সে সবই যে মিথ্যে, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। তুমি একটি ঠগ্, জোচ্চোর, তোমায় মেয়ে ত দেবোই না, পুলিসে দেবো স্থির করেছি।"

বিপিন উৎসাহের সহিত বলিল, "ভ্যালা মোর দাদা রে ! কে বলে আপনি পাঁড়াগেঁয়ে সরল মানুষ !—ঠিক কথাই ত ! তা হ'লে ওকে পুলিসে ত দিতেই হবে ! অন্ততঃ পুলিসে দেবার ভয় দেখিয়ে একটা মোটা রকম টাকা ওর কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে হবে—চাই কি মেয়ের বিয়ের খরচটাও উঠে যেতে পারে।"

ভট্টাচার্য্য নিজ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিপিনের মত চালাক লোকের কাছে এই সার্টিফিকেট পাইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। হুঁকাটি হাতে করিয়া মুচ্কি মুচ্কি হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলি-লেন, "তা হ'লে ভায়া: তোমার আজকে রওয়ানা হওয়াই স্থির ত ?"

বিপিন বলিল, "হ্যাঁ, তা স্থির বৈ কি !"

সেই দিন বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকাশ হালদারকে সঙ্গে লইয়া অধরের নিকট গিয়া তাহাকে পাকা কথা দিলেন। বিপিনও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট টাকা লইয়া, একটা পুঁটুলি হস্তে ট্রামযোগে রওয়ানা হইল। আগামী কল্য "আশীর্ব্বাদি" হইবে।

বিপিন কিন্তু ট্রামে উঠিয়া শিয়ালদহের টিকিট না কিনিয়া, কিনিল বৌবাজারের। বৌবাজারে মোহান্তের অন্যতম কর্ম্মচারী নিমাই মণ্ডলের বাসা। ইহা মেসের বাসা, অধিকাংশই দোকানদার শ্রেণীর লোক এখানে বাস করে। বাসায় পৌছিয়া দেখিল, নিমাই গামছা পরিয়া চৌবাচ্চার ধারে বসিয়া গাড়ু মাজিতেছে। বিপিনকে দেখিয়া সে বলিল, "কি হে,হঠাৎ যে ?"

বিপিন বলিল, "একটু দরকারে এসেছি।"

"আচ্ছা যাও, আমার ঘরে গিয়ে বোসো।"

নিমাইয়ের ঘর বিপিন চিনিত। তাহার 'সীট' ও চিনিত। সেই ঘরে বসিয়া বিপিন অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের অন্যান্য বাবুরা তখন সেখানে কেহই ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই আসিয়া. গামছা ছাড়িয়া কাপড় পরিয়া বিপিনের পাশে বসিয়া বলিল, "তার পর, এ ক'দিনের খবর কি বল দেখি!"

বিপিন একে একে সবিস্তারে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া কহিল, "দিন তিন চার এখন এইখানেই আমায় থাক্‌তে হবে। ফরিদপুর জেলার কুণ্ডুপুকুর গ্রামে যাওয়া আসা—ধর, তিন চার দিনের কম হয় কি ক'রে?"—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নিমাইও হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে ত বটেই। তা, এইখানেই তুমি লুকিয়ে থাক। কিন্তু ভট্‌চায্যির ঐ টাকা পনেরোটা, তুমি পকেটস্থ করবে মনে করেছ না কি হে?"

বিপিন বলিল, "কেন, তোমার কি প্রস্তাব বল দেখি?"

"আমি বলি কি, চল না, দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বিপিন, নিমাইয়ের এ ইঙ্গিত বুঝিল। বলিল, "বেশ ত, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

নিমাই বলিল, "তা হ'লে সকালে সকালে ভাত দিতে বলি।"—বলিয়া সে বামুন ঠাকুরকে ডাকাইয়া যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিল।

আহারাদি শেষ করিয়া রাত্রি ৯টার পর দুই জনে বাহির হইয়া হাড়কাটার গলিতে প্রবেশ করিল। গরীব ভট্টাচার্য্যের টাকাগুলি এই ভাবে সদ্ব্যয় করিয়া, রাত্রি দুইটার পর মাতাল অবস্থায় দুই জনে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ দিন প্রভাতে বিপিন কালীঘাটে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইল, পাত্রের সমস্ত কথাই যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণ্ডুপুকুর গিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে না, কুণ্ডুপুকুর অবধি যেতে হয় নি। রাত্রে গাড়ীতে ব'সে ব'সেই আমার হঠাৎ মনে হ'ল, নিজ ফরিদপুর সহরে অধরের ভগ্নীপোতের বাবা, জজের পেস্কার আনন্দ চাটুয্যে রয়েছেন, তাঁর কাছে আগে খোঁজ-খবরটা নেওয়াই যাক্ না। বোনের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে খাওয়া-দাওয়া ক'রে ঘুম দেওয়া গেল। ট্রেণে সমস্ত রাত্রি ত ঘুমুতে পাইনি! যে ভিড়, বাপ রে! সন্ধ্যেবেলা আনন্দ চাটুয্যের বাসা খুঁজে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। বৈঠকখানায় তিনি ব'সে আছেন, নামাবলী গায়ে ন্যাড়া মাথা এক বুড়ো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে ব'সে তিনি কথাবার্ত্তা কইছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আনন্দ চাটুয্যে মশাই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। আমি কুটুম্বদের পরিচয়ে পরিচিত হলাম। চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কাছে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে? আমি বল্লাম,—অনেক দিন থেকে একটা চাকরী-বাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি,—এমনি বাজার পড়েছে, কোথাও কিছু সুবিধে করতে পারিনি। শুনলাম, আপনার এক আত্মীয় পশ্চিমে কোন্ রাজসরকারে মোটা মাইনের চাকরী করেন—আপনি যদি তাঁর নামে একখানা সুপারিশ চিঠি দেন ত সেখানে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি! আনন্দ বাবু ভুরু কুঁচকে বল্লেন, আমার আত্মীয়, পশ্চিমে রাজার এষ্টেটে চাকরী করে—সে আবার কে? বুড়ো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বল্লেন,—বোধ হয়, অধরের কথা বলছেন ইনি। আনন্দ বাবু বল্লেন,—হাঁ হাঁ—আমার ছেলের শালা—অধর মুখুয্যে—সে ডুমরাওন এষ্টেটে চাকরী করে বটে। বুড়োটি বল্লেন, 'বড় চাকরী না ছাই। তশিলদারী করে, পাঁচিশটি টাকা মাইনে পায়। তবে হাঁ, দু পয়সা উপরি পাওনা আছে বটে। আমারই ত জামাই।' আনন্দ বাবু বল্লেন, 'এঁর নাম শুনেছেন বোধ হয়। ইনি মস্ত পণ্ডিত, তারাপুরের অন্নদা জ্যোতির্ভূষণ মশাই। এখানে এসেছেন একটা মোকর্দ্দমার সাক্ষী দিতে। সুপারিশ চিঠি যদি নিতে হয় ত এঁরই কাছে নিন।'

...দার। পাত্র

...নন্দরের মেয়েটি

...মাসখানেকও টেঁকে

...যেতে হয়েছে। আদালতের

...দেখুন,"—বলিয়া বিপিন

...করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিল।

...বৌবাজারের বাসায় বসিয়া নিমাই মণ্ডল

...।

...পত্র পড়িয়া মুচকি হাসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা বিপিনকে ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখিন, ভাগ্যিস্ তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। আমি নিজে গেলে কি এ রকম চালাকি ক'রে কার্য্য উদ্ধার ক'রে আসতে পারতাম! আশীর্ব্বাদ করি ভায়া, তুমি সাত বেটার বাপ হও, রাজরাজেশ্বর হও, আমার যা উপকার করলে, আমি জীবনে তা কখনও ভুলবো না।"—বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বিপিন বলিল, "রাজরাজেশ্বর হয়ে কায নেই আমার,—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপীলটিতে আমার জয় হয়, তা হলেই আমি এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যেতে পারবো।"

"জয় হবে বৈ কি, অবিশ্যিই হবে। তুমি এমন ভাল লোক, এমন পর উপকারী, কোনও দিন তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না, এ তুমি স্থির জেনে রেখো, ভায়া।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শুভ-বিবাহের পূর্ব্বদিন

আগামী কল্য নবদুর্গার বিবাহ। পাত্র প্রকাশ হালদার মহাশয়ের বাড়ীতেই বিবাহ হইবে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কন্যাকে লইয়া অপরাহ্নকালে হালদার মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন।

হালদার মহাশয়ের আত্মীয়-কুটুম্ব—যাঁহারা কালীঘাটে বা কাছাকাছি বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারাই বরযাত্র ও কন্যাযাত্র দুই-ই। ভোজনাদির ব্যয় পাত্র অধর বাবুই নির্ব্বাহ করিবেন। কনের জন্য তিনি একযোড়া সোনার শাঁখা, এক যোড়া পার্শী মাকড়ি এবং আড়াই ভরির একছড়া মটর-মালা দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছেন। বস্ত্রাদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই ক্রয় করিয়াছেন। বৈবাহিক সেই আট ভরি সোনা তিনি রাখিয়া দিয়াছেন; মেয়ের সাধের সময় তাহাকে অলঙ্কার গড়াইয়া দিবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অধর বাবুর বাসায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রকাশ হালদার সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তাই ত বাবাজী, পশু কার ট্রেণে তোমার কি রওয়ানা না হলেই নয়?"

অধর বলিল, "আজ্ঞে, সে ত আপনাকে বলেইছি। ঠিক যে দিন কাযে আমার জয়েন করবার কথা, সে দিন জয়েন না করলে, এই এক মাসের ছুটীর সমস্ত মাইনেটা কেটে নেবে। খোট্টা রাজা কি না, ওদের আইন-কানুন বড়ই শক্ত।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ফুলশয্যেটা এখানে সেরে গেলেই ভাল হ'ত বাবাজী। সে বিদেশ বিভুঁই, সেখানে আচার-আচরণগুলি কেমন করেই যে পালন হবে, তা ত আমি ভেবে পাচ্ছিনে।"

বিপিন বলিল, "আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আর কেউ বাঙ্গালী পরিবার নিয়ে থাকেন কি?"

অধর বলিল, "না, ঠিক সেখানে আর কেউ বাঙ্গালী নেই বটে; কিন্তু আমাদের সদরে, ডুমরাওনে, ১০।১২ ঘর বাঙ্গালী আছেন। সদরে আমি ৩।৪ দিন থেকে, তার পর বিন্দৌসী যাব—আমার কাছারী যেখানে। ফুলশয্যে-টয্যে ডুমরাওনেই সেরে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া আর উপায় কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বিপিন বলিল, "কোন্ ট্রেণে চড়তে হবে আপনাকে?"

অধর বলিল, "পশু এখানে কুসুমডিঙে সেরে নিয়ে, সন্ধ্যা ৮টার গাড়ীতে রওয়ানা হ'তে হবে। তার পরদিন সকালে ডুমরাওনে নামবো।"

বিপিন বলিল, "কালরাত্রিটা ত ট্রেণেই কাটবে দেখছি। কিন্তু এক কামরায় বর-কনেকে সে রাত্রে থাকতে আছে কি? ভট্চায দাদা কি বলেন?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিবার পূর্ব্বেই অধর বলিল, "তা, যদি বলেন, আপনাদের মেয়েকে জেনানা গাড়ীতে তুলে দেবো এখন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না না, তার কোনও দরকার নেই। ছেলেমানুষ জেনানা গাড়ীতে একলাটি থাকতে ভয় পাবে। বিশেষ, জীবনে এই প্রথম মা-বাপ ছেড়ে যাচ্ছে,

এমনিই ত কেঁদে কেটে আকুল হবে। তাতে কায নেই, নিজের গাড়ীতেই তুমি ওকে রেখো। এক গৃহেই শয়ন নিষেধ। ট্রেণ ত আর গৃহ নয়,—ট্রেণে কোনও বাধাই নেই।"

বিপিন বলিল, "হ্যাঁ, সঙ্গে রাখাই ভাল। বিশেষ, রাত্তির কাল, ছেলেমানুষ কি একলা থাকতে পারে!"

অধর বলিল, "তা, আপনারা যা আদেশ করবেন, তাই করবো আমি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ, আর একটা কথা। ব্রাহ্মণী বলছিলেন, তুমি যদি মত কর বাবা, তবে হপ্তাখানেক বাদে আমি গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসি। বড্ড ছেলেমানুষ, পাছে কাঁদাকাটা করে, এই ভয়। বিয়ের পর, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আট দিন থেকে মেয়ে আবার পিত্রালয়ে আসে, এই নিয়মই ত প্রাচীনকাল থেকে চ'লে আসছে কি না।"

বিপিন বলিল, "প্রাচীন নিয়ম প্রতিপালন করতে চান ত করুন ভট্‌চায দাদা, কিন্তু ঐ যে আপনি বল্লেন যে, মেয়ে গিয়ে সেখানে কাঁদাকাটা করবে, ওটা আপনার ভুল। ওটা সে কালের কথা—যখন আট নয় দশ বছরের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'ত। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আর কাঁদে কাটে না, দু'দিনেই স্বামীর ঘর চিনে নেয়।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ বিপিন ভায়া, তা ঠিক। তা হলেও, ধর—"

অধর বাধা দিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, মাসখানেক অন্ততঃ সেখানে থাকার পর, আপনি গিয়ে আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এ—ক—মা—স!—এ কথা শুনে, গিন্নীই যে কেঁদে কেটে অস্থির হবেন।"

বিপিন বলিল, "তা হবেন বটে। বিশেষ তাঁর যখন ঐ একমাত্র মেয়ে। দাঁড়ান, আমি এ কথার মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি—ও এক হপ্তাও নয়, এক মাসও নয়। আধাআধি। পনেরো দিন পরে, ভট্‌চায দাদা গিয়ে মেয়ে নিয়ে আসবেন। কি বল বাবাজী, তুমি রাজি ত?"

ভট্টাচার্য্য নত-মস্তকে তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। অধর সলজ্জভাবে বলিল, "কৈ, ইনি ত কিছু বলছেন না।"

বিপিন বলিল, "আহা, উনি নেই বা বল্লেন। আমি ত মেয়ের খুড়ো, আমি বলছি। ঐ পনেরো দিনই ঠিক রইল।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন, "তা বেশ, তাই যদি তোমাদের মত হয়, সেই রকমই হবে।"

অধর বলিল, "আর একটা কথা। আমি ত ধরুন, এই এক মাস ছুটী ভোগ করলাম। এখন, দু বছরের মধ্যে আর যে ছুটী পাই, এমন সম্ভাবনা কম। খোট্টা রাজার এষ্টেট, বুঝতেই ত পারছেন! আমি ত নিজে গিয়ে—"

বিপিন বলিল, "তুমি নিজে এসে আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে না, এই কথাই বলছ ত?—তা বেশ ত, দাদা যেমন এনেছিলেন, তেমনি উনিই গিয়ে তোমার বউকে মাসেক দু'মাস পরে তোমার কাছে পৌঁছে দেবেন এখন। সে জন্তে আর ভাবনা কি?"

অধর বলিল, "বেশী দেরী না হয়। ওদিকে আমার সংসারের অবস্থা সবই ত আপনাদের জানিয়েছি।"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডুমরাওনের ভাড়া কত এখান থেকে?"

"সওয়া সাত টাকা।"

"সহর থেকে, তোমার কর্ম্মস্থান—কি নামটা বল্লে—সে কত দূর?"

"বিন্দোসী। ডুমরাওন থেকে ৯ ক্রোশ। ডুলিতে যাবেন। আমি বিন্দোসী থেকেই ডুলি কাহার সব পাঠিয়ে দেবো। আপনি আগে আমায় চিঠি লিখলে আমি মনিঅর্ডার ক'রে আপনার পথখরচের টাকাও পাঠিয়ে দেবো। ও সবই আমার খরচ, আপনার এক পয়সাও ব্যয় নেই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সেখানে দু'পয়সা রোজগার করি ত!"

"আমার অবস্থা সবই ত তুমি জান, বাবাজী! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার দিন দিন আরও বাড়বাড়ন্ত হোক। এখন তুমিই ত আমার ভরসা—আমার মেয়ে বলতেও ঐ—ছেলে বলতেও ঐ। আমার আর কে আছে বল?"

"হ্যাঁ, সে ত ঠিক কথা"—বলিয়া অধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদায় লইতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় প্রকাশ হালদার সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাড়ীতে ওঁরা বলছিলেন, কাল ভোরে দধিমঙ্গলের ব্যবস্থাটা আমাদের ওখানেই গিয়ে সারতে হবে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা ভিন্ন আর উপায় কি? আমি বরং ভোর রাত্রে এসে বাবাজী তোমায় জাগিয়ে দেবো, তুমি

মুখ হাত এখানেই ধুয়ে নিয়ে, আমার সঙ্গে হালদার মশাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দধিমঙ্গলটি করবে।"

অধর বলিল, "যে আজ্ঞে।"

অতঃপর প্রকাশ হালদার সহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্থান করিলেন। বিপিন রহিল, কারণ, সে নিজ বাসায় যাইবে।

নিরিবিলি পাইয়া বিপিন চুপি চুপি বলিল, "ছিলে ভাই—হ'লে জামাই! মজা কিন্তু মন্দ নয়।"

অধর সেইরূপ নিম্নস্বরে বলিল, "আমার কিন্তু এখন আর তেমন মজা লাগছে না, সরকার মশাই। কিন্তু কি করি, নাচতে নেমে আর ঘোমটা দিয়ে ফল কি? সদর থেকে কোনও হুকুম এল?"

"হাঁ, এসেছে। নিমাই মণ্ডলের নামে এই চিঠি এসেছে।"—বলিয়া বিপিন, অধরের হস্তে একখানি পত্র দিল।

অধর সেখানি খুলিয়া পাঠ করিল—

"রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবে—আগামী কল্য এখান হইতে হরিশের মা রওয়ানা হইয়া দ্বিপ্রহর নাগাইদ তোমার বাসায় পৌঁছিবে। রেলে উঠিবার সময় হইতে, ঐ হরিশের মা দিবারাত্র বালিকার সঙ্গে রহিবে। উহারা একত্র স্নানাহার করিবে, একত্র শয়ন করিবে, ফল কথা, হরিশের মা এক মুহূর্ত্তও মেয়েটিকে চোখের আড়াল করিবে না, এইরূপ হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সকলকে কার্য্য করিতে বলিবে, নচেৎ মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। সুশৃঙ্খলে কার্য্যসিদ্ধি হইলে পুরস্কারে কৃপণতা হইবে না। অপরাপর হুকুম ঐ ঝির নিকট মৌখিক শুনিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিবে। ইতি"

কাহারও স্বাক্ষর নাই। পত্র পড়িয়া অধর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হরিশের মা আবার মরতে আসছে কেন?"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "বুঝলে না ভায়া, যে ভোগ দেবতার জন্যে রান্না হচ্ছে, তা পাছে কেউ চেখে অপবিত্র ক'রে দেয়, তাই এ বন্দোবস্ত।"

অধর বলিল, "এ ভোগ দেবতার জন্যে নয়, রাক্ষসের জন্যেই রান্না হচ্ছে। তা রাক্ষসদের আবার এত বাছ-বিচার কেন?"

বিপিন বলিল, "হলেই বা রাক্ষস! তা ব'লে কি এক দিন দেবতার ভোগ খাবার তার সখ হয় না? আজ রাত হ'ল, আমি উঠি তা হ'লে।"

"আর একবার তামাক খেয়ে যাবেন না, সরকার মশাই?"

"না,—যাই—ক্ষিদে পেয়েছে, বাসায় গিয়ে দুটি আলু-ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই গে।"—বলিয়া বিপিন প্রস্থান করিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাব্যে অশ্লীলতা

আলঙ্কারিক মত

১

সাহিত্য-সমাজ, মানুষের আর পাঁচ রকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী নয়। এ সমাজেও দলাদলি আছে, বকাবকি আছে, যুদ্ধ বিগ্রহ আছে, জয়-পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of existence.

সাহিত্যের হাটে এ নুণের কারবার আমরা সবাই করি।

যখন কোন জাতির অন্তরে কাব্যরস শুকিয়ে আসে, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, সাহিত্যিকদের পিত্ত সেই সঙ্গে প্রকুপিত হয়ে ওঠে, আর তখন সাহিত্য কি হওয়া উচিত, তাই নিয়ে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। গত বর্ষের গ্রীষ্ম-কালে এ দেশের সাহিত্য-সমাজ অকস্মাৎ মহা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সাহিত্যের একটি গুণ কিম্বা অগুণের বিচার নিয়ে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কি গুণ, এই সমস্যার মীমাংসা করতে অনেকেই বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আমি এ বাগ্‌যুদ্ধে যোগ দিই নি; কারণ, এ লড়াই য়ুরোপের খৃষ্টান সমাজ যুগ যুগ ধ'রে ক'রে এসেছে; অথচ তার ফলে সাহিত্যের বিশেষ কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে ব'লে মনে হয় না। অনেকে এ জাতীয় যুদ্ধকে সাহিত্যজগতের ধর্ম্মযুদ্ধ মনে করেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, religious warএর প্রসাদে ধর্ম্মরক্ষা হয় না।

সে যাই হোক্— কাব্য-জগতে এই শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার আবহমানকাল যে চ'লে আস্‌ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়। এমন

কি, গত শতাব্দীর ইংরাজী মতে তা ঘোর অশ্লীল। Hall নামক জনৈক ইংরাজ Orientalist "বাসবদত্তার" যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকার প্রতি নজর দিলেই সমগ্র সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সেকালের ইংরাজী ওয়ফে খৃষ্টানী সাধু মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় সকলেই পাবেন।

২

সংস্কৃত সাহিত্য শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক্, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বোধ হয় সকলেই একমত। বোধ হয় বলছি এই কারণে যে, অলঙ্কারশাস্ত্রের সকল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সুতরাং এমনও হ'তে পারে যে, কোন আলঙ্কারিক এ বিষয়ে বিপরীত মতাবলম্বী। চার্ব্বাক যদি অলঙ্কারশাস্ত্র লিখতেন, তা' হ'লে এ বিষয়ে অনেক পিলে-চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম। তবে আমার বিশ্বাস, অশ্লীলতা যে কাব্য-দেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মতভেদ নাই।

আমি দু-একটি আলঙ্কারিকের দু-চারটি কথা ধ'রে, সে কালের বিদগ্ধমণ্ডলীর এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতা—অশ্লীলতা, সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।

কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য ফর্দ্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাব্যাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক্। দণ্ডি বলেছেন,—

কামং সর্ব্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা॥"

অর্থাৎ—যদিও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডির মতে অলঙ্কারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা-সূত্রে বলেছেন, "সালঙ্কারতয়া রসব্যঞ্জকোঽর্থো মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্"। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে "বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ"। অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য্য অলঙ্কারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হয়।

৩

আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডি গ্রাম্য বল্‌তে তাই যে বুঝতেন, তার প্রমাণ তাঁর উদাহৃত কোন কোনও শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরাজীতে যাকে indecent বলে, তাকে vulgar বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কেন? আলঙ্কারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক, তাই দোষ এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষরূপে রসের প্রতিবন্ধক, সে কারণ তা কাব্যের বিশেষ দোষ।

রসের স্থিতি বস্তুতে কি মানুষের মনে? কাব্যরস অলঙ্কারের সংযোগে ফুটে উঠে কি চেপে যায়, অশ্লীলতা রসের প্রতিবন্ধক কি সহায়ক? এ সব দার্শনিক তর্ক এ স্থলে তোলবার প্রয়োজন নেই। কারণ, আলঙ্কারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁদের মতে অশ্লীলতা দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ—অপর কোন বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার poetics অন্তর্ভূত, ethicsএর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে Hall প্রমুখ ইংরাজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল ব'লে গণ্য, সে কাব্য আলঙ্কারিকদের কাছে সরস ব'লে মান্য হয়ে'ছ। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাব্য-বিচারের মার্গ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী—

'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।'

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তাঁরা যে কবি-প্রতিভাকে মানুষের হাত গড়া সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ব'লে স্বীকার করবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত; সত্য অথবা শিবের হাত ধ'রে নয়।

৪

গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। এ কালের মত সেকালেও ভাষা—সাধুভাষা ও ইতরভাষা—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বল্লেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণদোষ বিচার না ক'রে, আলঙ্কারিকদের মতে শব্দের অর্থগত গ্রাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ এ কালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডির মতে—

"কণ্ঠে কামায়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।"

উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে—

"কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি বামাক্ষি নির্দ্দয়।"

এই উক্তিটি শুধু "অগ্রাম্যোঽর্থঃ" নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক্। কেন না, বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দুয়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব ছুট। তার পর দুটিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজি ভাবে বললে তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই, তা শুধু অগ্রাম্য নয়—রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর chordlineই গ্রাম্য এবং loop অগ্রাম্য। যেমন বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন কালের রুচি বিভিন্ন। একালে অনেকে হয় ত উক্ত প্রথম পদটিই বেশী পছন্দ করবেন; কারণ, তার ভিতর আর কিছু না থাক্, স্পষ্ট passion আছে, আর শেষ পদটির ভিতর যা আছে, সে শুধু সে কালের সাহিত্যিক fastion মাত্র। সে যাই হোক, সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হ'ল, তাতে বিচলিত হতেন না, কি ক'রে বলা হ'ল, তাই ছিল তাঁদের কাছে বড় জিনিষ। একালের ভাষায়, contentএর চাইতে formকে তাঁরা বেশী মর্য্যাদা দিতেন। বিশেষ ক'রে এ দুটি উদাহরণের উল্লেখ করলুম এই জন্তে যে, দণ্ডি না ব'লে দিলে এর কোন্‌টি গ্রাম্য ও কোন্‌টি অগ্রাম্য, তা আমরা চট ক'রে ধরতে পারতুম না।

৫

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ দোষ ব'লে গণ্য হয়। দণ্ডির পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন এই উভয়বিধ দোষের উল্লেখ করেছেন—বামনের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা তাঁর মতই অনুসরণ করেছেন।

এখন দেখা যাক্, এ দুই দোষের মূলে কি আছে। বামন বলেন—"লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্"

অর্থাৎ যে কথা শুধু জন-সাধারণের মুখে শোনা যায়—কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না,—সেই কথাই গ্রাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁরা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা ব'লে গণ্য করতেন। অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চলবে না,—আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এ রকমের মত এ কালের অনেক বঙ্গ আলঙ্কারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে গ্রাম্য পদের ন্যায় 'অপ্রতীত' পদ কাব্যে অব্যবহার্য্য। অপ্রতীত শব্দের অর্থ কি?

"শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তম প্রতীতম্"

অর্থাৎ "শাস্ত্রে এব প্রযুক্তং, যন্ন লোকে, তদপ্রতীতং পদম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতী শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কাব্যর কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের সঙ্গে ফরাসী দেশের classical আলঙ্কারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তাঁরাও সাহিত্য-রাজ্য থেকে, pedantic ও vulgar শব্দ সকল বহিষ্কৃত ক'রে দেবার জন্য বন্দুক ধারণ করেছিলেন। আমরাও যখন চলতি ভাষার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করি—তখন আমরাও সে ভাষাকে ইতর ভাষার কোঠাতে ফেলে দেই, যদিচ চলতি কথার সঙ্গে ইতর কথার প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। আর যিনি তা না জানেন, তাঁর পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

৬

এর থেকে বোঝা গেল, বামন প্রমুখ আলঙ্কারিকদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। বামন এই সূত্রে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বাক্য অশ্লীল না হয়েও গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হ'তে পারে—

"কষ্টং কথং রোদিতি ফুৎকৃতেয়ম্"।

এ উক্তিতে অশ্লীলতার নামগন্ধও নেই, কিন্তু ঐ "ফুৎকৃতি" শব্দই রোদনের রসভঙ্গ করেছে। অবশ্য বাঙলা ভাষায় ফুৎকার ইতর শব্দ নয়, তবুও "ফোঁ ফোঁ ক'রে কাঁদছে"—কথাটা আমাদের কাণে করুণ রসাবহ নয়।

অপর পক্ষে অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেও যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়। সুতরাং অশ্লীলতা দোষ কাকে বলে, তা আলঙ্কারিকদের মুখে শোনা যায়। বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা "ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী।" অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নামজাদা অলঙ্কারশাস্ত্রের অর্ব্বাচীন গ্রন্থ সকলে, ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে, এবং আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিম্বা জুগুপ্সার জন্ম দেয়—তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলঙ্কারিকদের মতে সামাজিকদের মনে। তাঁরা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক—যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় Cultured society। দেশভেদে ও যুগভেদে Cultured societyরও রুচি বিভিন্ন। Anatole Franceএর কথা ইংরাজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসীদের

রুচিতে নয়। আলঙ্কারিকরা অবশ্য স্বদেশী সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশী সামাজিকদের নয়।

৭

শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের সেকেলে মতামত একালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন ত আর সেকালের মন নেই! যুগে যুগে লোকের মনের পরিবর্ত্তন ঘটে, সুতরাং সে কালের বিধি-নিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সে মনোভাব কস্মিন্‌কালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্ত্তমান মনের চাইতে এক্‌ধাপ উঁচুতে উঠেছিল। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচিত "কাব্য জিজ্ঞাসায়" প্রমাণ করেছেন যে, যে-সমাজের মনে কাব্যজিজ্ঞাসা নেই, সে-সমাজ কখনো কাব্যমীমাংসায় উপনীত হ'তে পারে না। এই কারণেই আমাদের কাব্যবিচার প্রায়ই বাজে ও এড়ো হয়। আলঙ্কারিকদের কাব্যবিচারের আর যাই ত্রুটি থাক্, সে বিচার কখনো ভুল পথে যায় নি, বেশী দূর যেতে না পারে, কিন্তু ঠিক পথেই গিয়েছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নূতন কথার আবির্ভাব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"। এখন এ কথা জোর ক'রে বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, তাঁরা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী। এই রূপের বিচার করাই সমালোচকের একমাত্র কর্ত্তব্য।

৮

আলঙ্কারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেন না, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে; কারণ, ব্রীড়া,জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়;—একটি বদ্-সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়। কারণ, শ্রোতার কাণে তা বেসুরা লাগে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বে-সুর তার কাণেই সুধু ধরা পড়ে—যার কাণে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ; কেন না,তা সামাজিক লোকের রুচিতে বে-খাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলঙ্কারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক। মানুষের ভিতর কাব্য-রসিক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত-রসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমোক্রাসিও দূর করতে পারবে না! আলঙ্কারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিক সমাজের রুচি।

এখন সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জার্ম্মাণদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসেবে ইংরাজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসীদের তেমনই খ্যাতি আছে। ফরাসীদের সুরুচি সম্বন্ধে Keyserlingএর মত অবাধে গ্রাহ্য করা যেতে পারে; কারণ, তিনি একাধারে ঘোর দার্শনিক ও পুরো জার্ম্মাণ। তাঁর কথা এই, "The French taste is in itself so good that the *on* of Paris—that impersonal anonymous they has a surer judgment than any save the most unusual individual."—

(Europe)

অথচ ফরাসী রুচি ইংরাজী রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরাজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না ব'লে যে তা নিকৃষ্ট,এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈতিক কিম্বা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলঙ্কারিকরা বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিলেন!

৯

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিষটি কি এবং কোন্ কোন্ বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্য্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন ব'লে আমি জানিনে। আর যদিই ধ'রে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য ব'লে একটা গুণ আছে, তা হ'লে সে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে? পুলিস ও সমালোচক, সাহিত্যের উপর কড়া শাসনের বলে? বলা বাহুল্য, যাঁরা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী, তাঁরা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।

আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা—তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাঁদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজরক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক্ আর অসুস্থই হোক্, তা যেমন আছে, সেই ভাবেই টিঁকে থাক্, এই হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক কামনা; এবং এ জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান, কারণ, তাঁদের ধারণা, সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষতঃ সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়! পলিটিসিয়ানরা যখন সমাজের উপরে খড়্গহস্ত হন, তখন এই দল বিশেষ বিচলিত হন না; কারণ, তাঁরা জানেন, ও হচ্ছে কাযের কথা, কবির উক্তিই তাঁদের কাছে অসহ্য; কেন না, এ হচ্ছে ভাবের কথা। আর ভাবের স্পর্শেই মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারে, তেল নুণ লকড়ীর কথা তে পারে না; কারণ, সে কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্য সামাজিক লোকদের মনে এই জাতীয় আশঙ্কার উদ্রেক করে, সে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক কি না।

১০

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা, ইংরাজীতে যাকে বলে morality, তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের moral senseকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাঁদের মতে কাব্যে বর্জ্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন,—

"অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্যম্ ইত্যপরে।"

অর্থাৎ অপর আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে "অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বেন"। অর্থাৎ অসাধূপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে, বিধি হিসাবে নয়। রাজশেখরের সঙ্গে অপর আলঙ্কারিকদের মতের প্রভেদ কোথায়, বোঝা কঠিন। বোধ হয়, অপর আলঙ্কারিকদের মতে অসদুপদেশ কাব্যে একেবারে বর্জ্জনীয়, কিন্তু রাজশেখরের মতে কাব্যে সে উপদেশ থাকতে পারে, কবি যদি সে উপদেশকে অসৎ বলেই উল্লেখ করেন। কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাঁদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন "কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা" "সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।" এর বাঙ্গালা—লোকের জীবনযাত্রা কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরাজীতে যাকে বলে virtue, welfare। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, morality হচ্ছে জীবনযাত্রার মূল, তাঁদের মতে কাব্যের ফুল সে মূল হ'তে বিচ্ছিন্ন নয় এবং সে মূলের সংস্কার কাব্য-কুসুমের অন্তর্নিহিত। এর থেকে দেখা যায়, অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সেকালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল; তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এইমাত্র যে, তাঁরা অসৎ বাক্যকে aesthetic emotionএর প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত; আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

১১

আমরা যে "aesthetic emotionsকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমি পূর্ব্বে বলেছি, ইংরাজ জাতি ঘোর নৈতিক ব'লে গণ্য, তবে moralityকে তারা utilityতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর অসুন্দর, সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যার জ্ঞান, ইংরাজীজ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি—ইংরাজী অরুচির তরজমা মাত্র। আমি এ প্রবন্ধ সুরু করেছি Hall সাহেবের সংস্কৃত কাব্যে অরুচির উল্লেখ ক'রে। আর শেষ করছি এই বিংশ শতাব্দীর একটি ইংরাজ Orientalistএর কথা দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর এ বিষয়ে মতামত বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ বিদ্বন্মণ্ডলীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী মতের দাসত্ব হ'তে মুক্তি লাভ করেনি। এখন বাসবদত্তা সম্বন্ধে Keithএর কথা শোনা যাক্।

It would be quite unjust to accuse Subandhu of indecency or savagery as one distinguished editor did. To apply mid-victorian conceptions of propriety to India is obviously absurd and wholly misleading. Indian writers, not excluding Kalidasa, indulge habitually *con amore* in minute descriptions of the beauty of women and the delights of love which are not in accord with western conventions of taste. But the same condemnation was applied by contemporaries to Swinburne and Shakespeare's frankness is more resented by English than by German taste. What is essential is to repell the connexion of such description with immorality and to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds alone. There is all the world of difference between what we find in the great poets of India and the frank delight of Martial and Petronius in descriptions of immoral scenes."

(A History of Sanscrit Literature. p. 310)

সেকালের আলঙ্কারিকরা যদি একালে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং ইংরাজী ভাষা জানতেন, তা হ'লে Keith সাহেবের কথায় তাঁরা সম্পূর্ণ সায় দিতেন, বিশেষতঃ তাঁর বক্ষ্যমাণ উক্তিটি তাঁদের কাছে ষোল আনা গ্রাহ্য হ'ত। Keith সাহেব বলেছেন যে:—What is essential is to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds alone"

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মতের সঙ্গে যে হিন্দু যুগের ভারতবর্ষীয় মতের ঐক্য থাকবে, এটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মানুষ এক কালে যে সত্যের সন্ধান পায়, তা চিরকালের সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তা অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা পড়ে, আবার কালক্রমে সে আবরণ মুক্ত হয়, তখন লোকে মনে ভাবে যে, সেটি নূতন আবিষ্কৃত সত্য।

আমি এ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা নামক দোষ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম এই কারণে যে, সে মত প্রাচীন হলেও অ-নবীন নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬　　[২য় সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

১৩

জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয়, সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারে জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন্ এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েচি, কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েচে বাম হাতের ভাগে, তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐ দিককার ডেকের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়,যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপানির ব্যামো, যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠ্‌তে পারচে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে—যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সমবায়ী যুগ। রেলগাড়ী বল, ষ্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল, আর পাগলা গারদ বল—সমস্তই পিণ্ডপাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সঙ্কুচিত হ'তে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখানকার সভ্যতা বলচে, বহুকে দলন ক'রে যে পিণ্ড হয়, সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পূরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপূজা ও সমাজপূজাকে একটা ধর্ম্ম ক'রে তুলেচে। সেই ধর্ম্ম যারা মান্‌চে এবং দুঃখ সহ্য করচে, মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন ক'রে পুরস্কৃত করচে, যারা মানচে না, তাদের বল্‌চে বিদ্রোহী, তাদের দিচ্চে নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ড। এমনি ক'রে প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন এক দিন আস্‌চে, যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না; যখন ব্যষ্টি আপন পূরা মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ

রাষ্ট্রতে ক্রটি করচে না, এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্চে; বল্‌চে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর, তা হ'লে দেশের ক্ষতি হবে, অন্য দেশের বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু শ্রমিক এ দোহাই আজ মান্‌তে চাচ্চে না; বলচে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেব না, আমার যা পুরা মূল্য, তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসে, এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মীরা সমষ্টিদেবতার রথযাত্রার রথ টান্‌তে টান্‌তে তার চাকার তলায় প'ড়ে প'ড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তিদেবতার কণ্ঠহার রচনায় রক্তে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ ক'রে পুণ্যলাভ হ'ল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল ধরবলি দাবী ক'রে এসেচি;—শূদ্রকে ব'লে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও; কেন না, সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ, অতএব এই তোমার ধর্ম্ম; নারীকে ব'লে এসেচি, কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও; তা হ'লেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম-রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্ব্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জ'মে উঠ্‌চে, এমনি ক'রে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠবে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে এক দিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ ক'রে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে, সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিক্‌তে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি, কিন্তু এমন কত বলিরক্তলোলুপ ধর্ম্ম বহুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি ক'রে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ ক'রে বেদনা দিচ্চে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্দ গমনে চল্‌চে ব'লে যাত্রীরা দুঃখ বোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের—সেই হতভাগ্য "ষ্টোকার" দল (Stoker) নূতন ব্রতী, তারা পুরা দমে কায করতে পেরে উঠ্‌চে না। শোনা গেছে, বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্ম্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিক্ত কায করানো হয়েছিল। এক জন ষ্টোকার হাওয়ার অভাব নিয়ে দারুণ শ্রান্তি ও অসহ উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে প'ড়ে ম'রে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্ম্মঘটের আগেই পৌঁছেছিল, খনি-কামারের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়া-ঘাটে পৌঁছয় না—এই জন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করা অনাবশ্যক;—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে, তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি, কিন্তু এও মান্‌তে হবে যে, যত সুবিধা যত সুখই হোক্‌ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাততঃ মরে, কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো, গ্রীস রোম ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেচে আর ভারতবর্ষও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এ নিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হ'তে পারে না—আমাদের শাস্ত্রে বলে, ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠুর সমষ্টিদেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম। ১৯মে, ১৯২০।

* * * *

এডেন পার হয়ে লোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এ দিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত—পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডা-গরমেই মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেচে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক্‌ থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত-প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক ঊনপঞ্চাশ পবনের রুদ্র নৃত্য রচনা ক'রে চলেচে, সেও এই ঠাণ্ডাগরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডাগরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক, একভাবে চিন্তা করব, কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে; আমাদের জিনিষ ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের

হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে, এ কোনো দিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে, সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেন না, জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি অল্পকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে, কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত ক'রে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে ক'রে পৃথিবীর এক ভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তি-বৈচিত্র্য, সে কথাটা ভারত-সমুদ্র থেকে মধ্যধরণী সাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীরমন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার এ কথা শুনে তোমরা হয় ত বলবে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠতে পারিনে?" এ কথার উত্তর হচ্চে, নিশ্চেষ্ট হ'তে হবে, এমন কথা বলা চল্‌বে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েচে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে; কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই। তা হ'লে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়া গেছে—সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল ক'রে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন ক'রে নিতে পারে, কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ ব'লে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তি-হীনের কাজ। উপনিষদে বলেচেন, যিনি এক, তিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তি দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেচে, সেই জাতিই সার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে, বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্‌ঘাটিত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা ক'রে চুরি ক'রে পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হ'তে পারে না, কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে জাতও যায়, পেটও ভরে না। ইতি ২৪শে মে, ১৯২০।

* * * *

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেচি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন ঈর্ষ্যাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মত পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষ-পাত করচে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েচে, সেই সমুদ্র যেন দিতি মাতার দুই হননোন্মুখ ভাইয়ের মাঝখানে প'ড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাৎ ক'রে রেখেচে।

বামের তীর শব্দহীন নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূরঙ্গমঞ্চে মানব-ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে, আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা ক'রে দেখচি। ইজিপ্টে যে মানব-সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল, সে বহুদিনের এবং সে বহু সম্পৎশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্তে এই দুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর আরব আপন দুর্দ্দমনীয় বেগে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল, দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীল নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ; অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করে নি। সম্বলসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন, তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত ক'রে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ

বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বশিষ্ঠ ধেনুপালন করেন, আর বিশ্বামিত্র ধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হাতে অস্ত্র দেন। বশিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বন-পথের নেতা।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত; আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনো দিন প্রেমে মিল্‌বেন? আর যদি মিল্‌তে পারেন, তা হ'লে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা কর যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যে দিন মারা যাবেন, সেই দিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেন না, জগতে বশিষ্ঠও অমর, বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস, এক দিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্র মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিব্‌বে না। এশিয়া য়ুরোপ যদি কোনো দিন সত্যে মিল্‌তে পারে, তা হ'লেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হ'তে থাকবে। ২৪শে মে, ১৯৩০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদনা ও সৃষ্টি

কুট্মলে নিবদ্ধ ব্যথা গুল্মলতা বনবিটপীর
ফলের জনম দেয় গন্ধরসে কুসুমে ফুটায়,
শিলাপঞ্জরের ব্যথা অন্তর্গূঢ় সহিষ্ণু-গিরির,
কল কল গীতিময় প্রীতিময় নির্ঝরে ছুটায়।

বারিদের বজ্রব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাড়িত-তাড়না
বসুন্ধরা সঞ্জীবন ধারাসারে ঢালে শান্তিজল,
জীবজরায়ুর ব্যথা শঙ্কাতুর প্রসববেদনা
আনন্দ-নন্দনে অঙ্ক শশিসম করে সমুজ্জ্বল।

তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বশিল্পিরাজ
জ্বলিছে অনন্ত জ্বালা বহ্নিকুণ্ড তোমার অন্তরে,
অনাদি অনন্তকাল ব্যাপি তাই তব সৃষ্টিকাম
চলিতেছে নব নব অহরহঃ এই বিশ্বপরে।

হে কারুণ্যবিগলিত দীনবন্ধু নিত্য নব ব্যথা
বক্ষে তব হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট
অপূর্ণে করিতে পূর্ণ অভিব্যক্ত তব ব্যাকুলতা,
যুগে যুগে মুছে মুছে আঁকিতেছ বিশ্বদৃশ্যপট।

অতন্দ্রিত শিল্পিরাজ ওগো স্রষ্টা, বিশ্বের নিদান,
শিক্ষা দাও শিষ্যে তব পুত্রে তব পিতৃব্যবসায়,
তব বিশ্বশিল্পাগারে এক প্রান্তে দাও মোরে স্থান,
দীক্ষা দাও সৃষ্টিকাম-বেদনার শোণিত-টীকায়।

দাও ব্যথা অফুরন্ত রুদ্রপিতা নিত্য নব নব
আনন্দস্বরূপ দিব আমি তার শিল্পমহিমায়
ব্যথার পাষাণে গড়ি শ্রীমন্দির, পুরোহিত হবো,
সৃজিতে সৃজিতে স্রষ্টা এক দিন লভিব তোমায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাচীন ভারতে পরিব্রাজকগণ

হিন্দু ঋষিগণ মানবের নিমিত্ত চারিটি আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন:—(১) ব্রহ্মচর্য্য—জীবনের প্রারম্ভে শিক্ষা ও সংযম লাভ; (২) গার্হস্থ্য—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) পরিব্রজ্যা মোক্ষলাভের জন্য ভ্রমণ (মনু—৬ষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য, ৪র্থ অঃ)। ধর্ম্মপ্রাণ গৃহীরা যখন সত্যই উপলব্ধি করেন যে, সাংসারিক জীবন দুঃখময় এবং সংসারের সকল দ্রব্যই বিনাশ-শীল, তখন তাঁহারা সংসার হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসেন। তখন তাঁহারা সংসারের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া, সংযমের সহিত নির্জ্জনে বাস করিয়া সন্ন্যাস অভ্যাস করিতেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা আত্ম-দমন করিতেন। যশ বা নিন্দা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, যদিও তাঁহাদের যশ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল এবং তাঁহারা দারিদ্র্যকে বরণ করা অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন না। রাজারা তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদিগের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইত না (Watters on Yuan Chwang, Vol. I. pp. 160-168)।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মতে ভ্রমণকারী ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীই 'পরিব্রাজক' নামে অভিহিত। পালি বৌদ্ধ-সাহিত্যে দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকের উল্লেখ আছে—(১) ব্রাহ্মণ ও (২) অন্যতিত্থিয় পরিব্রাজক। ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ভ্রমণকারী ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হন ও অপর বর্ণের পরিব্রাজকেরা অন্যতিত্থিয় নামে পরিচিত হন। ইঁহারা চেতন জীব বধ করিতে পারিতেন না। অহিংসা, সততা, সংযম, অপ্রতিগ্রাহিতা, মানসিক পবিত্রতা, তৃপ্তি, সরলতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, অপক্ষপাতিতা, সহনশীলতা, মৃদুতা, গুরুসেবা, ভক্তি, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়তা, ধ্যান, অধ্যাত্মজ্ঞান, অল্পে সন্তোষ, প্রাণায়াম, প্রার্থনা ও কর্ম্মফলে অনাসক্তিই পরিব্রাজকদিগের গুণাবলীর নিদর্শন। যে পরিব্রাজক সংসারে অনাসক্ত, তিনিই নির্ব্বাণলাভের অধিকারী।

পরিব্রাজক ও ভিক্ষুর মধ্যে পার্থক্য আছে। বিনয়পিটক-বর্ণিত শীলানুষ্ঠান ভিক্ষুদিগের অবশ্য-করণীয়; কিন্তু পরিব্রাজকদিগের নিকট তাহা নহে। পরিব্রাজকদিগকে সন্ন্যাসীদের অভ্যস্ত কর্ম্ম সকল করিতে হয় (তাঁহাদের কথা বলা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তাঁহারা এক মুষ্টি অন্ন ও ফলমূল-পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, মস্তক-মুণ্ডন ও ক্ষৌরকার্য্য করিতেন, ইত্যাদি)। ভিক্ষুদিগকে এ সকল অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস ও সুখভোগে জীবন যাপন করার মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হয়। পরিব্রাজকদিগের সময় ধর্ম্মালোচনা, আলোচনা কিংবা ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত হয়। মস্তকমুণ্ডন করা বা শ্মশ্রু ক্ষৌর করা পরিব্রাজকদিগের অবশ্যকরণীয় নহে। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ ভিক্ষুদিগের পরিচ্ছদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিব্রাজকদিগের নানারূপ পরিচ্ছদ ধারণের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ভিক্ষুদিগের কেবলমাত্র তিন প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

সার চার্লস্ এলিয়টের সহিত আমরাও বলি, পরিব্রাজকরা গৃহী নহেন, তাঁহারা অকৃতদার পর্য্যটক। তাঁহারা প্রায়ই সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করেন ও আত্ম-নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়দমন করিয়া থাকেন ও তাঁহারা ত্যাগী পুরুষ; কিন্তু সার চার্লস্ যখন বলেন যে, ইঁহারা বেদপাঠ করেন না, তখন আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না, কারণ, আমরা মহাবস্তু হইতে জানিতে পারি যে, অগ্নিসেন নামক এক জন পরিব্রাজক বেদপাঠ করিয়াছিলেন ও পরিব্রাজকদিগের শাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

সংযুক্ত-নিকায় (২য় ভাগ, পৃঃ ১১৯) হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের সময়ে অন্যতিত্থিয় পরিব্রাজকরা জনসাধারণের নিকট হইতে সম্মান ও তাঁহাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি পাইতেন না। বুদ্ধদেবের সহিত বহু পরিব্রাজক চরিত্র, নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, সে সকলের বিবরণ পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

মল্লিকারাম—আশ্রমে পোট্ঠপাদ নামক জনৈক পরিব্রাজক তিন শত পরিব্রাজকের সহিত বাস করিতেন। এক দিন পূর্ব্বাহ্নে ভগবান্ বুদ্ধদেব ভিক্ষার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তখন পোট্ঠপাদ শিষ্যদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখিয়া শিষ্যদিগকে নিস্তব্ধ হইতে বলিয়াছিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন, বুদ্ধদেব গোলমাল ভালবাসেন না। তিনি বুদ্ধদেবকে

সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকটে অন্যধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুরা অনুভূতির নিবৃত্তি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা বিবৃত করেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "অনুভূতির উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ আছে। শীল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলে অনুভূতির উৎপত্তি ও নিবৃত্তি বুঝা যায়। তৎপরে তিনি সমাধি ও তাহার বিভিন্ন অবস্থার কথা বলেন এবং নিরোধসমাপত্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেন (দীঘনিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭৮ ইত্যাদি)।

অনুপিয়া নগরে ভগ্গবগোত্ত নামে এক জন পরিব্রাজক বাস করিতেন। বুদ্ধদেব তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, লিচ্ছবিপুত্র সুলক্ষত্ত তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন যে, সে আর বুদ্ধদেবের শিষ্য নহে, তাঁহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে। উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, সে আমাকে সত্যই ত্যাগ করিয়াছে। সুলক্ষত্ত বলিয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহাকে অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখান নাই বা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই (দীঘনিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১ ইত্যাদি)।

ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে এক সময় বাস করিতেন। তখন নিগ্রোধ নামক এক জন পরিব্রাজক আশ্রমে বাস করিতেন। এক দিন দ্বিপ্রহরে 'সন্ধান' নামক জনৈক গৃহী বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। তাঁহার সাক্ষাতের সময়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ভাবিয়া সে নিগ্রোধের আশ্রমে যায়। পরিব্রাজক গৌতম-শিষ্য সন্ধানকে আসিতে দেখিয়া শিষ্যদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। সন্ধান নিগ্রোধশিষ্যদিগকে বলিল, "এই বনের নির্জ্জন প্রান্তে ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন ধ্যানধারণায় নিমগ্ন, তখন তোমরা বৃথা বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করিতেছ কেন?" নিগ্রোধ তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"শ্রমণ কাহার সহিত আলোচনা করেন? তাঁহার জ্ঞান শূন্য গৃহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তিনি কোন সমিতিতে উপস্থিত হন না, তিনি কথা কহিতে জানেন না। তিনি একাকী বাস করেন।" নিগ্রোধ গৃহীকে বলিয়াছিলেন যে, গৌতম যদি তাঁহার নিকট আসেন, তাহা হইলে তিনি একটি প্রশ্ন করিয়াই গৌতমকে পরাজিত করিবেন। এই কথা বুদ্ধের দেবকর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি নিগ্রোধের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নিগ্রোধ প্রশ্ন করিল—"গৌতম যে ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং যাহা শ্রবণ করিয়া লোকে শান্তি পায়, সে ধর্ম্ম কি?" বুদ্ধ বলিলেন যে, নিগ্রোধের ন্যায় বিধর্ম্মী তথাগতের ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। বুদ্ধ নিগ্রোধকে তাঁহার নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বলেন। নিগ্রোধ প্রশ্ন করিল—"সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কি উপায়ে সাধন করা যায় এবং কি উপায়ে যায় না?" বুদ্ধ বিভিন্ন প্রকারের সন্ন্যাসের ব্যাখ্যা করেন এবং এগুলি নিগ্রোধ গ্রহণ করেন। তিনি আরও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাস পাপের ভার বর্দ্ধিত করে। পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে মানবকে শীলের অনুষ্ঠান, সমাধি এবং প্রজ্ঞার অনুশীলন করিতে হইবে (দীর্ঘনিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৩৬ ইত্যাদি)

বুদ্ধদেবের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পিলোতিক নামক পরিব্রাজকের সহিত জাণুস্সোণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। তিনি পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করেন, "তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" উত্তরে পরিব্রাজক বলেন যে, তিনি শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধদেবের জ্ঞানের পরিধি কত, তাহা তিনি বলিতে পারেন না, কারণ,তাঁহার নিজের জ্ঞান বুদ্ধদেবের ন্যায় বিস্তৃত নহে। তৎপরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি তাঁহাকে এত প্রশংসা করিতেছেন কেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "শ্রমণ গৌতমের চারিটি গুণ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনিই ভগবান্ বুদ্ধদেব।" ক্ষত্রিয় পণ্ডিতরা বুদ্ধদেবের পূজার্চ্চনা করিত, এমতে ব্রাহ্মণ গৃহীও পূজা করিল, শ্রমণ পণ্ডিতরাও পূজা করিতে আরম্ভ করিল।—(মজ্‌ঝিম্-নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭৫-১৭৭)।

ভগবান্ তথাগত এক সময়ে বৈশালীর কূটাগারশালায় বাস করিতেছিলেন। বচ্ছগোত্ত নামক এক জন পরিব্রাজক একপুণ্ডরিক নামক স্থানের অন্তর্গত পরিব্রাজকারামে বাস করিতেন। এক দিন পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষা করিবার সময় বুদ্ধদেব ঐ আরামে উপস্থিত হন। পরিব্রাজক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রমণ গৌতম কি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী এবং অশেষজ্ঞানী? বুদ্ধদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। শ্রমণ গৌতম তিন প্রকার জ্ঞানের অধিকারী।" তাহার পর পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জগতে এমন কেহ আছেন কি না, যিনি দেহের বিনাশের সহিত বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দুঃখ ও যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান।

উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। তৎপরে তিনি আবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সংসারের বন্ধন ছিন্ন না করিয়া কেহ কি স্বর্গে গিয়াছেন? বুদ্ধদেব উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ।" ইহার পরেও তিনি প্রশ্ন করেন, "গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন না করিয়া কোন আজীবিক কি দেহের বিনাশের সহিত দুঃখ-যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি করিতে পারিয়াছেন?" বুদ্ধদেব উত্তরে 'না' বলিয়াছিলেন। তিনি আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কোনও পরিব্রাজক মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়াছেন কি না? উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, যতদূর তাঁহার স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারেন যে, কেবলমাত্র এক জন আজীবিক আজি হইতে ৯১ কল্পের পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছিলেন; কারণ, তিনি কর্ম্মবাদী ছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, তিত্থিয়দিগের ধর্ম্ম অসার। পরিব্রাজক এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন (মজ্ঝিম-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৩)।

সংযুক্ত-নিকায় হইতে জানিতে পারা যায় যে, বচ্ছগোও পুনরায় বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং জগতে কেন ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে? এই জগৎ নিত্য না অনিত্য? দেহ ও আত্মা বিভিন্ন না এক? মৃত্যুর পর জীব পুনরায় দেহ ধারণ করে কি না?—এইরূপ অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, রূপের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি এবং রূপের বিনাশের পথগুলি জানা না থাকায় ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ তাঁহাকে বেদনা, অনুভূতি, সংস্কার এবং জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন (সংযুক্ত-নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৫৭ ইত্যাদি)।

আর একবার পরিব্রাজক বচ্ছগোও বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে বিধর্ম্মী গুরুরা কূটাগারশালায় উপস্থিত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন যে, জনৈক গুরুপূরণ কশ্যপ তাঁহার শিষ্য মৃত্যুর পর কোথায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, সে সম্বন্ধে বলিতে পারেন। মক্ষলি গোশাল ও অন্যান্য বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ এরূপ বলেন; শ্রমণ গৌতম ও তাঁহার এক জন শিষ্যের পুনর্জ্জন্মের কথা বলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণসমন্বিত শীলপরায়ণ শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম কোথায় হইয়াছে, তাহা বলেন না। শ্রমণ গৌতম বলিতেন যে, তিনি বাসনা ও দুঃখের অন্ত করিয়াছেন এবং সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। বচ্ছগোও বুদ্ধদেবের ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তাঁহার সংশয়ের প্রকৃত কারণ ছিল। বাসনা না থাকিলে পুনরায় জন্ম হয় না (সংযুক্ত-নিকায়, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩৯৮-৪০০)। বচ্ছগোও বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আত্মা কোথায় থাকে?" বুদ্ধ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। (ঐ, পৃঃ ৪০০)।

অগ্গিবচ্ছগোও নামক এক জন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের নিকট প্রশ্ন করেন, আপনি সংসারকে নিত্য না অনিত্য বলেন? সংসার অসীম না সসীম? দেহই কি আত্মা? আত্মা দেহ হইতে কি পৃথক্? মৃত্যুর পর মানব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না? বুদ্ধদেব নেতি-মূলক উত্তর দিয়াছিলেন। পরিব্রাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা হইল? বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, এই সকল ভ্রান্তধারণা দুঃখকষ্ট ও মানসিক উদ্বেগের কারণ এবং নির্ব্বাণলাভের অন্তরায়। পুনরায় পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করেন, "যে ভিক্ষু এই সকল ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না, তাঁহার কি পুনরায় জন্ম হয়?" বুদ্ধ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। পরিব্রাজক বুদ্ধের উত্তর সকল শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন (মজ্ঝিম্-নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৮৩-৪৮৯)।

মহাবচ্ছগোও নামক এক জন পরিব্রাজক বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া 'কুশল ও অকুশল কি, জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, লোভ, দোষ ও মোহ এইগুলি অকুশল এবং অলোভ, অদোষ ও অমোহ এইগুলি কুশল। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, জীবহত্যা, অপরের সম্পত্তি হরণ, কাম-পরিতৃপ্তি, মিথ্যাভাষণ, পরোক্ষে নিন্দা, পরুষ বচন-প্রয়োগ, বৃথা বাক্য-প্রয়োগ, এইগুলি অকুশল; ইহা না করাই কুশল। হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যামত পোষণ, এইগুলিই অকুশল এবং ইহাদের বিপরীতই কুশল (মজ্ঝিম-নিকায় ১ম ভাগ, ৪৮৯-৪৯৭)।

দীঘনখ নামক জনৈক পরিব্রাজক বুদ্ধকে এক সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হয় যে, তিনি সকলই সহ্য করিতে পারেন। উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "এ আপনার অলীক বিশ্বাস। যখন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার এই অলীক বিশ্বাস বিবাদ, আঘাত ও বিরক্তি আনয়ন করে, তখনই আপনার এ বিশ্বাস অপনোদন হইবে।" তিনি বলেন, তিন রকম বেদনা আছে, সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ। এক

বেদনার অনুভূতিতে অন্য বেদনার অনুভূতি জানা যায় না, এগুলি অনিত্য। এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন নিষ্পাপ হইয়াছিল। পরিব্রাজক উত্তর সকল শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৯৭-৫০১)।

বুদ্ধদেব যখন কুরুদিগের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন মাগন্দীয় নামক এক জন পরিব্রাজক তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি বুদ্ধদেবের নিন্দা করেন, কারণ, তিনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রের অগ্নিকুণ্ডের নিকট বুদ্ধদেবের তৃণশয্যা দেখিতে পান। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বুদ্ধদেবের নিন্দা হইতে বিরত হইতে বলেন, কারণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গৃহী ও সন্ন্যাসী কর্তৃক তিনি সম্মানিত। পরিব্রাজক এ কথা শুনিয়া বলেন, তাঁহাদের শাস্ত্রানুসারে বুদ্ধ ভ্রূণহত্যাকারী। বুদ্ধ দিব্য কর্ণের সাহায্যে এ কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন ও বলেন, চক্ষু রূপ দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু তথাগতের নয়ন সংযত। তথাগত সকলকে নয়ন সংযত করিতে উপদেশ দেন। এই জন্যই বোধ হয়, তথাগতকে ভূনহু (ভ্রূণহত্যাকারী) বলা যায়। তথাগত তাঁহার অন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শিষ্যদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা দেন। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর তিনি ইন্দ্রিয়সেবা ত্যাগ করিয়াছেন। বাসনা বিসর্জন দিবার পর তিনি সুখে ও শান্তিতে আছেন। যাহাতে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মানন্দিয় বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। মানন্দিয় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন।

কালে তিনি 'অর্হত্ব' লাভ করিয়াছিলেন (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫০১-৫১৩)।

কোশাম্বীর নিকট 'আরামে' পরিব্রাজক সন্দক বৃথা আলোচনায় সময় যাপন করিতেছিলেন। সন্দক আনন্দকে তাঁহার গুরুর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ বিবৃত করিতে অনুরোধ করেন।

আনন্দ চারি প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিয়াছিলেন, যাহা জ্ঞানী লোকের অভ্যাস করা উচিত নহে, (মজ্‌ঝিম্-নিকায় ১ম ভাগ, ৫১৩-৫২৪)।

পোত্তলিপুত্ত নামে এক জন পরিব্রাজক বুদ্ধের এক জন শিষ্য সমিদ্ধি নিকট গিয়াছিলেন এবং তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের মতে দৈহিক এবং বাচনিক কার্য্য সারশূন্য। কেবলমাত্র মানসিক কার্য্যই সত্য এবং আর একটি বস্তু আছে, যাহার নাম সমাপত্তি, যাহার দ্বারা কেহ কোন অভাব অনুভব করে না। পরিব্রাজক সমিদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি উপসম্পদা কবে লাভ করিয়াছেন? সমিদ্ধি বলিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে।" পরিব্রাজক সমিদ্ধিকে প্রশ্ন করিলেন যে, দৈহিক, বাচনিক এবং মানসিক কার্য্য জ্ঞানতঃ করিলে কর্ত্তা কি অনুভব করে? সমিদ্ধি উত্তর করিলেন যে, সজ্ঞানে যদি কেহ দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্য করে, তজ্জন্য তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। এই উত্তরে পরিব্রাজক সন্তুষ্ট না হইয়া সমিদ্ধির নিকট হইতে চলিয়া গেলেন (মজ্‌ঝিম্-নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৭)। অন্য কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক, যথা,—অন্নভার, সকুলদায়ী প্রভৃতি বুদ্ধের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং চারিটি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই চারিটি ধর্ম্ম, যথা—লোভ-শূন্যতা, ঈর্ষ্যা-শূন্যতা, সম্যক্ ধ্যান, এবং সম্যক্ সমাধি। প্রত্যেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণমাত্রেরই এই চারিটি ধর্ম্ম থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। বুদ্ধ পরিব্রাজকগণকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের চারিটি সত্য তিনি সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত জীব প্রকৃত জ্ঞানশূন্য এবং জগতের সমস্ত সুখ অস্থায়ী, দুঃখপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল। কেহই আমার নহে এবং আমিও কাহার নহি। (মজ্‌ঝিম্ নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৭৬-১৭৭)। একটি সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক সকুলদায়ী কোন এক দিন বুদ্ধদেবের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে, বহু আচার্য্যের মধ্যে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যের দ্বারা অত্যন্ত পূজিত হন। তিনি মিতাচারী এবং মিতভোজী। তিনি সামান্য বস্ত্র পরিধানে সন্তুষ্ট, সামান্য ভিক্ষায় এবং সামান্য বাসস্থানে আনন্দলাভ করেন। তিনি একাকী থাকেন এবং অপরকেও থাকিতে বলেন। বুদ্ধদেব এই সকল বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। (মজ্‌ঝিম্-নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১-২২) অন্য কোন এক সময়ে বুদ্ধদেবকে সকুলদায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করেন; এবং বলেন যে, পরমানন্দলাভের যে পথ আছে, তাহা মানবের নিকট পরিলক্ষিত। বুদ্ধ বলিলেন যে, আপনি যে পথের কথা বলিতেছেন, তাহা ধ্যানের পাঁচটি সোপান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান্, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য নহে। সকুলদায়ী বুদ্ধের এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন (মজ্‌ঝিম্-নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯-৩০)।

বুদ্ধদেব বেখনস নামক এক জন পরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নাস্তিক, তুমি কাম এবং কর্ম্ম বুঝিতে পার না। প্রথমে বুদ্ধের এই বাক্য শুনিয়া তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন। পরে যখন বুদ্ধদেব তাঁহার দোষ তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, (মজ্‌ঝিম্-নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০-৪৪)।

সরভ নামে এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের ধর্ম্ম জানিয়াও আর ভিক্ষু রহিলেন না, পরিব্রাজক হইয়াছিলেন। ভিক্ষুরা এই কথা শুনিয়া গৌতম বুদ্ধকে সংবাদ দিয়াছিলেন। বুদ্ধ নিজে সরভের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পান নাই। ইহার পর বুদ্ধদেব সরভের শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, বুদ্ধের ধর্ম্মের মধ্যে কেহ কোন দোষ বাহির করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ধর্ম্ম যিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারই আশা ফলবতী হইবে। বুদ্ধের এই বাণী শুনিয়া সরভ নিজ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৫-১৮৮)। পোতলিয়া নামক এক জন পরিব্রাজক পুদ্‌গল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের নিকট আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। বুদ্ধ চারি প্রকার পুদ্‌গলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনি চতুর্থ পুদ্‌গল, যথার্থ পুদ্‌গল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের এই মত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০০-১০১)। পরিব্রাজক মোলিয়-সীবক বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কি প্রকারে ধর্ম্মকে উপলব্ধি করা যায়? বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিলেন যে, যখন জীবের লোভ থাকে, তখন কি করিয়া মানব উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহার লোভ আছে এবং যখন লোভ থাকে না, তখন কি করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহার লোভ নাই? কি প্রকারে ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা বুদ্ধদেব বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মোলিয়সীবক ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৩য় ভাগ, ৩৫৬-৩৫৭)।

সংযুক্ত-নিকায়ে আমরা দেখি যে, এই পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহার অতীত কর্ম্মের জন্য তিন প্রকারের বেদনা অনুভব করিতে পারে কি না? বুদ্ধদেব বলিলেন যে, এই সব বেদনা অতীত কর্ম্মের জন্য নহে, কর্ম্মফলের নিমিত্ত। পরিব্রাজক এই কথা শুনিয়া বুদ্ধদেবের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের এক জন প্রধান শিষ্য সারিপুত্র সামন্তক নামক এক জন পরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, জন্মই দুঃখ এবং জন্ম-নিরোধই সুখ। পরিব্রাজক এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১২০-১২২)। উত্তির এবং কোকনুদ নামক দুই জন পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই পৃথিবী অনন্ত কি না? মৃত্যুর পর জন্ম হয় কি না? বুদ্ধ এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সেই ধর্ম্ম আমি আমার শিষ্যদের নিকট প্রচার করিয়াছি এবং এই প্রচারিত ধর্ম্মই জীবকে পবিত্র করিবে, তাহাদের দুঃখ, শোক ও কষ্ট দূরীভূত করিবে এবং নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইবে (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৯৩-১৯৩)। উত্তির পরিব্রাজক বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া শুনিলেন যে, গৌতমের মতে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, অর্থ এবং অনর্থ ভিক্ষুদিগের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এবং এই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদিগের যথার্থ ধর্ম্ম যে কি, তাহাই অভ্যাস করা উচিত এবং যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, তাহাই করা উচিত (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম ভাগ, ২২৯-৩১)।

সংযুক্ত-নিকায়ে লিখিত আছে যে, তিম্বরুক নামে এক জন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সুখ এবং দুঃখ লোক নিজে সৃষ্টি করে কিম্বা আপনা আপনি তাহারা সৃষ্ট হয়? বুদ্ধ বলিলেন যে, না, তাহা নহে। সুখ এবং দুঃখ জগতে আছে এবং তিনি মধ্যপথের (Middle path) বিষয় বহু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (২য় ভাগ, পৃঃ ২২-২৩)।

বুদ্ধদেব সুসীম নামে এক জন পরিব্রাজককে প্রজ্ঞাবিমুক্তি সম্বন্ধে বহু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই সুসীম পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন তিনি বুদ্ধের ব্যাখ্যা শুনিয়া নিজের অসদ্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন (সংযুক্ত-নিঃ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৯-২৮)

সংযুক্ত-নিকায়ে সূচিমুখী নামক পরিব্রাজকের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সারিপুত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন

এবং সারিপুত্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মস্তক অবনত করিয়া কিম্বা উত্তোলন করিয়া অথবা সমস্ত দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিম্বা কেবল চারি কোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আহার করেন। সারিপুত্র উত্তর করিয়াছিলেন 'না'। সারিপুত্র বলিলেন যে, যে সকল শ্রমণ, হর্ম্ম্যের ভিত্তির ভাল এবং মন্দ ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই তাহাদের মস্তক অবনত অবস্থাতে আহার করে। যাহারা জ্যোতিষীর কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা তাহাদের মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আহার করে। যাহারা দূতের কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খাদ্য খায়, এবং যাহারা শরীরের চিহ্ন দেখিয়া ভাল কিম্বা মন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা চারিটি কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আহার করে।

সারিপুত্র বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ভাবে তিনি জীবন ধারণ করেন না। সুচিমুখী সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ-শ্রমণরা ভাল উপায়েই জীবন ধারণ করে এবং সেই জন্য তাহাদের দান দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য (সংযুক্ত-নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃ ২৩৮-৪০)। বুদ্ধদেব বেন্দিঢ় নামে পরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, আট প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি বিশেষ করিয়া চিন্তা করা যায়, তাহা হইলেই নির্ব্বাণ-লাভের বিশেষ সুবিধা হয় (সংযুক্ত-নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১১)।

কুণ্ডলিয়া নামে পরিব্রাজক গৌতম বুদ্ধের নিকট হইতে বিদ্যা, বিমুক্তি ও ফল সম্বন্ধে বহু ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা ও বিমুক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধেও তিনি বুদ্ধের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন (সংযুক্ত-নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭৩-৭৫)।

থেরগাথায় বর্ণিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে সামন্তকাণী নামে এক জন পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি পরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সামন্তকাণী কাতিয়ান নামে এক জন পরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, মুক্তির একমাত্র উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ (থেরগাথা, ৩৬ শ্লোক)।

গৌতম বুদ্ধের সময়ে মালুঙ্কপুত্ত নামে কোশলরাজের মূল্যনির্দ্ধারকের পুত্র শ্রাবস্তীতে বাস করিত। মালুঙ্কপুত্র পরে পরিব্রাজক হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্ম শুনিয়া তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন (থেরগাথা, মালুঙ্কথের, Psalms of the Brethren, p. 212) রাজগৃহে সঞ্জয় নামে এক জন পরিব্রাজক বাস করিতেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। কোলিত এবং উপতিস্স সংসার-জীবনে বিরক্ত হইয়া সঞ্জয়ের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুই জনেই বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং এই কোলিত এবং উপতিস্স বৌদ্ধ ইতিহাসে সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লান নামে খ্যাত (ধম্মপদ ভাষ্য, ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৮-৯০)

সুত্তনিপাত ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সবত্থিতে পসুর নামে এক জন পরিব্রাজক বাস করিতেন। তর্কে তিনি খুব সুনিপুণ ছিলেন। তিনি সারিপুত্রের সহিত কামসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং এই আলোচনার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পসুর পরিব্রাজক সারিপুত্রের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য এবং বাদশাস্ত্র (তর্কশাস্ত্র) শিক্ষা করিবার জন্য জেতবনে গিয়াছিলেন। পসুর পরিব্রাজক বুদ্ধের সহিত তর্ক করিবার জন্য সাবত্থিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ কর্ত্তৃক তর্কে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই পরাজয়ের ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন (সুত্তনিপাত ভাষ্য, ২য় ভাগ পৃঃ ৫৩৮ ইত্যাদি)।

জাতকে পরিব্রাজক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক জৈনের কন্যারা পরিব্রাজিকা হইয়াছিল। তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, যদি কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক তর্কে পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্ত্রী হইতে অনিচ্ছুক হইবে না এবং যদি কোন ভিক্ষু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে। সারিপুত্র ইহাদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিল; এবং উপ্পল-বন্নার কর্ত্তৃত্বে তাহারা ভিক্ষুণী হইয়াছিল। (জাতক, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১-২)

পলায়ি নামক এক জন পরিব্রাজক জেতবনে বুদ্ধের সহিত তর্ক করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন (জাতক, ২য় ভাগ, পৃঃ ২১৬)। পুনর্ব্বার কোন এক সময়ে বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এই ভাবিয়া পলায়ন করেন যে,

তিনি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক তর্কে পরাজিত হইবেন। (জাতক, ২য় ভাগ, পৃঃ ২১৯)।

তিব্বতীয় দুল্‌ভে বর্ণিত আছে যে, সুভদ্র নামে এক পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের সময়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, বুদ্ধদেবের দেহ রাখিবার সময় হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পূরণ কশ্যপ, মক্কলি খোশাল প্রভৃতি শিক্ষকগণের ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

বুদ্ধ উত্তর করিয়াছিলেন যে, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে প্রকৃত শ্রমণ হইতে পারে নাই। এই সুভদ্র পরিব্রাজক পরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন (Rocvhill, life the Buddha, p. 138)

মহাবস্তু নামে মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৈরাটির পুত্র সঞ্জয়ি পাঁচ শত শিষ্য লইয়া পরিব্রাজকারামে বাস করিয়াছিলেন। সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয়ির নিকট পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সারিপুত্র পরিব্রাজক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মৌদ্গল্যায়ন দুই সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা করিয়াছিলেন (৩য় ভাগ, পৃঃ ৫৯)। মহাবস্তু গ্রন্থে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বারাণসীতে পুরোহিতপুত্র অস্থিসেন যুবরাজের বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই বেদ ও পরিব্রাজক শাস্ত্রে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যুবরাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অস্থিসেনকে কোন কিছু দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি কোন কিছু প্রার্থনা করেন নাই। (মহাবস্তু, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৪১৯)।

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা
(এম, এ; বি, এল; পি, এইচ, ডি)।

নিদাঘে

অগ্নিবীণা করে লয়ে যেন রুদ্ররাজ,
উদ্দীপ্ত দীপক রাগ বাজাইছে আজ;
তাই তীব্র আলোকের ধৈবত নিখাদে,
জ্বালাময়ী নিদাঘের সঙ্গীত নিনাদে।

কর্ক্কশ বায়সকণ্ঠে বিকট চীৎকার
উঠিতেছে থাকি' থাকি', যেন সাহারার—
হাহাকার উঠিতেছে বক্ষে প্রকৃতির।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করে শ্যামা ধরণীর—

শুষ্ক লতা-তৃণ-গুল্ম-পত্র-পুষ্প-দল,
তৃষার্ত্ত মৃত্তিকা মাগে পিপাসার জল।
ধুঁকিছে কুক্কুর-দল পথে সারি সারি
রসহীন লেলিহান রসনা বিস্তারি।

তপ্ত বিশ্ব চেয়ে আছে ব্যাকুল নয়নে
সজল জলদ আশে মরুভূ গগনে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১

তরুণীর নীলোৎপল নয়ন দুইটি দৃপ্তরোষে অরুণাভ হইল,—অপমান! পদে পদে অপমান! নারী কি সমাজে এতই ক্ষুদ্র?

দারুণ ঘৃণা ও ব্যর্থ ক্রোধে অতসীর সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠিল। এমন শক্তি কাহারও নাই কি—এই ঘৃণিত কুক্কুরের ধৃষ্টতায় সমুচিত শাস্তিবিধান করিতে পারে?

কোন্ সাহসে এই স্কুলের সেক্রেটারীটা তাহার মত শিক্ষিতা ভদ্র মহিলাকে ইতর প্রস্তাব করিল? আজ দুই মাস হইল, সে এই সুদূর মসলন্দপুরের বালিকা-বিদ্যালয়ে চাকুরী লইয়া আসিয়াছে—এখানেও কি অপমানের হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই? সে যেখানেই যায়, এই ভাবে উৎপীড়িতা হয়। কেন, পুরুষও যেমন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যথা ইচ্ছা নির্ভয়ে যাইতে পারে, নারীও তেমনই পারে না কেন? বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা, বিচক্ষণতা,—কিসে নারী ক্ষুদ্র? পুরুষের ত কোথাও রক্ষকের প্রয়োজন হয় না। তবে কি নারী সত্যই—

নারীত্বের সম্মানে এত বড় আঘাত—অতসী সত্যই সহ্য করিতে পারিল না। ছি, ছি, এ বৈষম্য কি সত্যই তাহাকে এত দিনে স্বীকার করিয়া লইতে হইল? অপমানে, ক্ষোভে, রোষে অতসী কাঁদিয়া ফেলিল।

এ কান্নার ত নিবৃত্তি হয় না। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া রহিয়া রহিয়া অতসী অনেকক্ষণ কাঁদিল। অন্তরে তাহার এ কি কান্নার সপ্তসমুদ্র তুফান তুলিল? এমন ত হয় না—তাহার প্রকৃতি ত এ ধাতুতে গঠিত নহে। তবে এ কিসের অভাব ও অতৃপ্ত বাসনার হাহাকার তাহার অন্তরের অন্তস্তলে গুমরিয়া উঠিতেছে? অতসী নিজেই বুঝিতে পারিল না।

ছিঃ ছিঃ, এ কি দুর্ব্বলতা? না হয় স্থান ত্যাগ করিয়াই যাইবে সে, এমন ত একের পর একে অনেক স্থানই সে ত্যাগ করিয়াছে—ক্ষিপ্ত গ্রহের প্রায় সে ত এমন করিয়া দুই বৎসরের উপর সারা বাঙ্গালা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; কিন্তু শান্তি ত কোথাও পায় নাই। দুষ্ট গ্রহের মত রূপ ও যৌবন সর্ব্বত্রই প্রায় তাহার সুখ-শান্তির হন্তারক হইয়াছে। এ কি বিড়ম্বিত অশান্ত জীবন!

অতসী অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষণেক কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। একবার গবাক্ষসান্নিধ্যে গিয়া দাঁড়াইল—বাহিরে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে তৃতীয়ার চন্দ্রমা হাসিতেছিল। সে হাসি অতসীর ভাল লাগিল না—তাহার প্রাণ যেন আরও হু হু করিতে লাগিল—কি একটা অতৃপ্তি বিকট দৈত্যের মত যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল, সে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রালোক হইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

'গুরুমা'!—অতসী চমকিয়া উঠিল। কক্ষদ্বার রুদ্ধ ছিল। বাহির হইতে বাসার ঝি বলিল, "বামুনদিকে ভাত পরশাতে বলব কি? ও ঘরের গুরুমারা খেতে বসেছেন।"

অতসী গম্ভীরস্বরে বলিল, "না, এ বেলা কিছু খাব না, মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

ঝি চলিয়া গেল। অতসী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে ট্রাঙ্কের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল—একখানা চিঠি। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে আলোকটা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া আকুল আগ্রহে পত্র পাঠ করিতে লাগিল। স্কুল হইতে আসিয়া সে সরাসরি সেক্রেটারী জমীদারবাবুর কন্যাকে পড়াইতে গিয়াছিল, পত্র ত তাহার নজরে পড়ে নাই।

কলিকাতা হইতে পত্র আসিতেছে, পত্র লিখিতেছেন তাহার 'ওবাড়ীর দাদা'। পত্রে এই কয়টি কথা লিখিত ছিল,—

"মাই ডিয়ার মিসেস লেডী টিচার, বোধ হয়, আবার চিঠি লিখে জ্বালাতন করছি ব'লে এই বেহায়া দাদাকে মনে মনে অভিসম্পাত করবে। কিন্তু কি করব, নাচার। স্বয়ং হার ম্যাজেষ্টির হুকুম। তা, তাঁর হুকুম অগ্রাহ্য ক'রে একটা ডোমেষ্টিক ট্র্যাজিডি ঘটানর চেয়ে ছোট বোন্‌টির অভিসম্পাত

কুড়ুনো ভাল মনে ক'রে দুচার ছত্র লিখতে সাহস করলুম। দোহাই তোমার, মাই ডিয়ার, সবটা না প'ড়ে অভিসম্পাত দিও না।

কথাটা কি জান, এখানে তোমায় এনে একটা স্থিত-স্থিত করতে না পারলে আমার ডোমেষ্টিক লাইফ্ ত আর তিষ্ঠুতে পাচ্ছে না। কেন না,—তোমার বৌদি—অর্থাৎ আমার গার্জেন—যত রকম অস্ত্র তাঁর আরমারিতে আছে, আমার প্রয়োগ করেছেন।

এ দু'বছরের মধ্যে অনেকবার অনেক পিটিশন করেছি, কিন্তু মাইডিয়ারের মাথার ফুল এ পর্য্যন্ত পড়ল না। কি পাপই যে করেছিলুম আর জন্মে! বার বার দরখাস্ত রিজেক্ট হয়েছে। কিন্তু কি জান, তোমার দাদা দু'কাণ-কাটা—তার উপর কার্টেন লেকচার, ফোঁস-ফোঁসানি, প্যানপ্যানিনি, অগত্যা রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল, আবার হুজুরের সকাশে আরজি নিয়ে হাজির হতে হ'ল।

বলি, এত দিন ত সব রকম ক'রে দেখলে, এখন দু'দিন এইখেনে এসোই না! সুবিধেও হয়েছে, তোমার বৌদির আঁচল ধ'রে থাকতে হবে না, এই তালতলায়ই গার্ল হাই স্কুলের বড় গুরুমার পদটা ভেক্যাণ্ট হয়েছে—চাকরীটাও আমার হাতে—চট্ ক'রে একখানা দরখাস্ত লিখে পাঠাও না। মসলন্দপুরেই থাক, আর কলকাতাতেই থাক,—তোমার ইণ্ডে-পেণ্ডেন্স কেউ ঘোচাবে না, বুঝলে মাই-ডিয়ার!

ভাল আছ নিশ্চয়ই, না হ'লে খবর পেতুম। এখানে ধাড়ী রুইটি পোনাগুলি চরিয়ে কিছু কাহিল হয়ে পড়েছেন। আমি সেভেন্থ হেভেনে আছি তাঁর দয়ায়। ইতি।

আঃ তোমার দাদা (ওরফে বিমলচন্দ্র)

তাং............ সন ১৩........."

পত্র পড়িতে পড়িতে অতসীর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। এমন করিয়া আপনার বলিয়া কেহ ত তাহাকে কাছে ডাকে না! সে যখন এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনাকে বড় একা বলিয়া মনে একটা দারুণ শূন্যতা অনুভব করিতেছিল, তখন কেহ ত এমন স্নেহের আহ্বানে তাহার তৃপ্তির বীণায় ঝঙ্কার দেয় নাই। অন্তরের বিকট শূন্যতা—বুকফাটা হাহা-কার—সেই সুরের ঝঙ্কারে কোথায় অন্তর্হিত হইল! এ কি তৃপ্তি—এ কি শান্তি—এ কি অনাবিল অপরিমেয় আনন্দ! তবে কি মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তি, পরনির্ভরতার—পরের উপর আপনার চিন্তাকে ফেলিয়া দিয়া মুক্তিলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে গোপনে প্রশ্রয় দিয়া থাকে? অতসী ভাবিয়া চিন্তার কূল-কিনারা পাইল না।

২

উৎপলা কলাইশুঁটির কচুরী ভাজিতেছিল। নাতিদূরে বিমল-বাবু একখানি আসনে বসিয়া কটাহের দিকে ভর্জ্জিত মৎস্যের প্রতি মার্জ্জারীর মত লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

গরম গরম একখানা কচুরীর নধর অঙ্গে দশন সংলগ্ন করিয়া অপরূপ শব্দবিন্যাসের সহিত বিমলবাবু বলিলেন,—"দূর তোর ইকোয়াল ইকোয়াল! এ দেবভোগ্য কচুরীর যোগাযোগে যে ইকোয়ালিটি দেখা দেয়, তার কাছে তোর যৌন-সম্বন্ধের মনস্তত্ত্ব, না মেয়ে-মদ্দর রাইটের ইকোয়ালিটি? দূর তোর নে-কিছু করেছে! এ যে বাবা, প্র্যাকৃটিক্যাল ইকোয়ালিটি।"

উৎপলা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—"কি যে বল মাথামুণ্ডু! যেন মেয়েমানুষে লেখাপড়া করলেই রেঁধে খাওয়াতে চায় না!"

"আলবাৎ না! আমি বেট রাখতে পারি, যারা ইকোয়া-লিটি ইকোয়ালিটি ক'রে কোমর বেঁধে লড়াই করে, তারা ইকোয়াল সাজবার জন্যেও অন্ততঃ হাতা-বেড়ী ধরতে চায় না—ওটা ত মিনিয়ালদের কায! অশোক ছোঁড়া যদি আমার কথা শুনতো, তা হ'লে কি মাইডিয়ারের ইকোয়ালিটির দ'য়ে প'ড়ে নাকানিচোবানি খেয়ে অকালে প্রাণটা খোয়াত?"

"ঘেন্নার কথা বোলো না বলছি! লাখো মেয়ের মধ্যে অতসীর মত একটা বের কর দিকি?—কেবল নিন্দে করলেই হয় না।"

"আহা-হা! সে কথা কে না বলছে? তর্কোটা যে তুমি গোলমেলে ক'রে ফেলছ! মিসেস লেডী টিচারের—আমার মাইডিয়ারের গুণের কমতি আছে কে বলছে? তবে কি জান, ওর ঐ মাথার পোকাটাই ত যত গোল বাধি-য়াছে। ইকোয়ালিটি!—সেক্স ইকোয়ালিটি!—গুষ্টীর পিণ্ডি কোয়ালিটি!"

"তা, যাই বল তুমি, অতসীর মনটা কিন্তু খুব ভাল। তা ছাড়া ও কি ঘর-সংসার দেখত না? না, রাঁধতো-বাড়তো না? নাও, রাধাবল্লভীখানা ধর দিকি, জুড়ুলো এতক্ষণে।"

ততক্ষণ বিমলবাবু ষষ্ঠাধিক কচুরী উদরস্থ করিয়াছেন। রাধাবল্লভীর প্রায় একার্দ্ধ এক গ্রাসে গ্রহণান্তে কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে চর্ব্বণসুখ উপভোগ করিবার পর বলিলেন,—"ঘর-সংসার করে না কে বল ত? পাড়ার গোমেজ সাহেবের মেমও ত ঘর-সংসার করে। কিন্তু মাসকাবারেই দেনা। মাইনে ত সবে সাহেবের ১শ ৬০টি টাকা—তা মেম সাহেবের খাবরার দাম, সাবান এসেন্সের দাম, শনিবারে শনিবারে অপেরা বায়স্কোপ,—কি থাকে? মুদির দেনা, কসাইএর দেনা, দরজীর দেনা, দুধের দেনা, রুটী-মাখনের দেনা—দেনার উপর দেনা চড়বে না কেন?"

"বা রে, অশোক ঠাকুরপোদের দেনাও বুঝি ঐ জন্তে হয়েছিল?—সে না—"

বিমলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "পাঁচশ'বার! ছোঁড়ার রোজগার ত গোড়ায় কম ছিল না—কয়লার দালালিটাতে—আরে এ কে গো, মাইডিয়ার?" বিমলবাবু লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এক হাতে রাধাবল্লভীর ছেঁড়া অংশ, মুখে অর্দ্ধচর্ব্বিত অন্ত অংশ, চীৎকার করিতে গিয়া সেখানি অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় গড়াইয়া পড়িল—সে চমৎকার দৃশ্য!

অতসী—যাহার কথা হইতেছিল—সত্য সত্যই বহুদূরের সেই অতসী একবারে সম্মুখে উপস্থিত! সে ছোট একটি নমস্কার করিয়া আপনার কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, রহস্য করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"হ্যাঁ, আপনার মাইডিয়ারই বটে। তা এমন ধারা ডোমেষ্টিক রোমান্স চলছিল মশাইদের, তা ত জানতুম না—ব্যাঘাত দিলুম না বোধ হয়।"

বিমলবাবু কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই উৎপলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখী! তার পর? পথ ভুলে নাকি?—এ গরীবদের এত ডাকেও ত সাড়া দিলিনি এদ্দিন—কিছু ঘটেছে বুঝি—আয় আয়, বসবি আয়। কিছু টের পাইনি, দিদি! গাড়ী দরজায় লাগলো না—কেউ খবর দিলে না, না পেলুম তোর একখানা চিঠি—একবারে হুপ ক'রে—"

অতসী আসনে উপবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হুপ ক'রে এসেছি ব'লে তাড়িয়ে দেবে না কি, দিদি? না বৌদিদি, সত্যি বলছি, সময় পাই নি—"

বিমলবাবু মুখ-হাত ধুইয়া এক গ্রাসে গুটি চারেক পাণ গালে চিবাইতেছিলেন, এবার বলিলেন,—"উৎপলা!"

স্বর গম্ভীর, কিন্তু চোখমুখ হাস্যোজ্জ্বল।

অতসী বলিল, "আপনি যে বড় আমার সামনে দিদির নাম ধরলেন?"

বিমলবাবু পত্নীকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যারা আমাদের চিঠির পর চিঠির জবাব দেয় না, যারা আমাদের এখানে আসবে ব'লে জানতে দিয়ে আহ্লাদের স্বাদ দিতে চায় না, যারা হুপ ক'রে এসে আমাদের দাম্পত্যপ্রণয়ে রসভঙ্গ ক'রে দেয়—"

উৎপলা হাসিয়া বলিল, "আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—"

বিমলবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যারা আমাদের পর ব'লে মনে করে—তাদের সঙ্গে আমাদের আড়ি—তাদের সঙ্গে আমরা ত কথা কইব না।"

অতসী নিতান্ত অপমানিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "গেরস্ত যদি কথা না কয়, তা হ'লে আমরাই বা তার বাড়ী থাকি কেন,—ধূলো পায়েই—"

বিমলবাবু তাড়াতাড়ি দ্বার আটক করিয়া যেন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, "দোহাই মাইডিয়ার! তোমায় আমি লেডী টিচার বলা ছেড়ে দোবো, যদি তুমি ঐ যাওয়া কথাটা না বল। দাও না গো অতসীকে খেতে—যেন অবুঝবু! আমি চল্লুম, ওর মালপত্তর কি এলো, দেখি গিয়ে ততক্ষণ—"

বিমলবাবু ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

উৎপলা অতসীর হাত ধরিয়া বলিল, "আয়, কাপড়-চোপড় কেচে দু'খানা গরম গরম কচুরী-সিঙ্গাড়া খাবি আয়—এর পর তোর মাষ্টারীর খবর শুনবো।"

অতসী যাইতে যাইতে বলিল, "সত্যি দিদি, সময় পাই নি—যেমন মন হ'ল, অমনই চ'লে এলুম।"

"বেশ করিছিস—তা একবারে কাম ছেড়ে দিয়ে এইছিস ত?" উত্তরে কলতলার দিকে চলিয়া গেল।

৩

পাহাড়-পর্ব্বতের মত বাধাবিঘ্ন না মানিয়া, অগ্রজাধিক সুহৃদ বিমলচন্দ্রের পরামর্শ না শুনিয়া যখন অশোকনাথ পাড়ার অজানা খৃষ্টান স্কুলের মাষ্টার রাখালবাবুর ভগিনী অতসীকে

বিবাহ করিয়া ফেলিল, তখন তাহার সবেমাত্র পাঠ্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশোকনাথের সংসারে আপনার বলিতে কেহ ছিল না, কেবল তাহার স্বগ্রামের অতি নিকট-জ্ঞাতি বিমলচন্দ্র বয়সে তাহার অপেক্ষা মাত্র দুই এক বৎসরের বড় হইলেও তাহার একমাত্র বন্ধু বা অভিভাবক, যাহাই বলা যাউক, তাহাই ছিলেন। রাখাল হিন্দু কি খৃষ্টান, কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না, তবে ভাই-ভগিনীতে খৃষ্টান বা ব্রাহ্মদের মত বসবাস করিত। তাহারা বছর দুই তিন বিমলবাবুদের পাড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। ভাই ইটিলির মিশন স্কুলে মাষ্টারী করিত, আর ভগিনী অতসী এলোচুলে জুতা-মোজা পায়ে দাদার স্কুলে প'ড়িতে যাইত। পাড়ার লোকের সহিত তাহারা মিশিত না, বা পাড়ার লোকও তাহাদের ত্রিসীমায় যাইত না। কূর্ম্মের মত তাহারা আপনাদের মধ্যেই আপনারা মিশিয়া থাকিত।

বিমলচন্দ্রের প্রকৃতির লোকের নিকট প্রতিবেশী হইয়া বসবাস করিয়া কাহারও অপরিচিত থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ, বিমলচন্দ্র যাচিয়া জবরদস্তি করিয়া সকল প্রতিবাসীরই সহিত আলাপ করিত। সেই আলাপের সূত্রে রাখালদের বাসায় বিমল ও অশোকের যাতায়াতের সূত্রপাত। বিমলবাবু কেবল এইটুকু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারা নাম-লেখানো খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম নহে, তবে তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত। বিমলবাবু শুনিয়াছিলেন, রাখালের প্রতিজ্ঞা ছিল, ভগিনীকে এমন লেখাপড়া শিখাইবে, যাহাতে সে স্বয়ং আপনার উদরান্ন আপনিই সংগ্রহ করিতে পারিবে, কাহারও গলগ্রহ হইয়া তাহাকে কখনও জীবন যাপন করিতে হইবে না। এই প্রতিজ্ঞার একটা মস্ত কারণও ছিল। রাখালের মা স্বামীর মৃত্যুর পর দুইটি অনাথ শিশুকে লইয়া পরের দ্বারস্থ হইয়া নানা লাঞ্ছনা-কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা রাখাল জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই, পরন্তু ভগিনী অতসীকেও আপনার মতে দীক্ষিত করিয়া স্বাবলম্বন-বৃত্তিতে অভ্যস্ত করিয়াছিল।

অশোক শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া নিকট-সম্পর্কীয় খুল্লতাতের কলিকাতার বাটীতেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি পুত্র বিমল হইতে জ্ঞাতি-পুত্র অশোককে কখনও পৃথক্‌ভাবে পালন করেন নাই, বিমল ও অশোক ঠিক যেন পরস্পর সহোদরের মতই প্রতিপালিত হইয়াছিল। যে বৎসর বিমল ডাক্তারী পরীক্ষার ফাইনাল দেয় এবং অশোক মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিবে, সেই বৎসরেই বিমলবাবু পিতৃহীন হন। তৎপূর্ব্বেই বিমলবাবুর পিতা পুত্রের বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে বিপত্নীক বৃদ্ধ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূর সেবা-যত্ন লাভ করিবার সুযোগ উপভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। বধূ উৎপলা পিতৃগৃহে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, পরে শ্বশুরালয়ে পিতৃতুল্য স্নেহময় শ্বশুরের যত্নে সে শিক্ষার উন্নতিসাধন করিয়াছিল। তাহার দেবরতুল্য অশোকনাথ তাহার শিক্ষালাভে পরম সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিল।

কিন্তু বৃদ্ধ, পুত্রতুল্য অশোকনাথের বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি না থাকিলেও অশোকনাথের নির্ব্বন্ধপরায়ণতা তাঁহাকে সে সময়ে মনের সাধ মিটাইতে বাধা প্রদান করিয়াছিল। অশোকনাথ নিজেই সে কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ এক দিন বজ্রাঘাতের মত বৃদ্ধের কর্ণে পৌঁছিল, অশোকনাথ পাড়ার খৃষ্টান তরুণীকে বিবাহ করিয়াছে। বৃদ্ধ শয্যা গ্রহণ করি'লন, তাঁহার বুকে তখন যে ব্যথা বাজিল, তাহাই কি পরে তাঁহার মৃত্যুর দিন সমীপবর্ত্তী করিয়াছিল? বৃদ্ধ উইল পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা কি আকার ধারণ করিল, তাহা বাড়ীর কেহ জানিল না।

তাঁহার দেহান্তের পর প্রায় বৎসরেক কাল বিমল ও উৎপলা বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও অশোকের সহিত পূর্ব্ব-স্নেহের সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বিবাহের পর হইতে সেই পর্য্যন্ত তাহারা স্বতন্ত্র বাসায় (অতসীদের বাসায়) বাস করিতেছিল। অতসীর অভিভাবক স্নেহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাদের বিবাহের পরে হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন অশোক ও অতসীর সংসারে আপনার বলিতে কেহ ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বে অতসী মিশন স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাওসেসান কলেজে আই, এ পাঠ করিতেছিল। বিবাহকালে সে আই, এ পরীক্ষায়ও সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিবাহের পর স্বামি-স্ত্রীতে এক বিষম মনান্তর উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু শেষে অতসীরই জয় হইয়াছিল, অশোককে অবনতমস্তকে পত্নীর অদম্য ইচ্ছাশক্তির নিকট

পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতসী আই, এ পাশ করিয়া ইটালির মিশন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। অশোক বিবাহের পরে তাহাকে কিছুতেই সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সেই দিন অশোক বুঝিয়াছিল, অতসী কিরূপ আত্মনির্ভরশীলা তেজস্বিনী নারী।

অশোক যে দুর্ব্বলচিত্ত—সে যে তাহার পত্নীর ইচ্ছাশক্তি অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, এ কথা বিমলবাবু বা তাঁহার পত্নী উৎপলার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তাই তাঁহারা উভয়ে নানারূপে অতসীর মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া অশোক ও অতসীর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের পাঁচ বৎসরের বিবাহিত জীবনে অশোকের অপেক্ষা অতসী ডাক্তার বাবু বা তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে কম স্থান অধিকার করিয়া বসে নাই। অতসীর যে ত্রুটিই থাকুক, এই আকর্ষণী শক্তি যে তাহার অত্যধিক পরিমাণে ছিল, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে অতসীর সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে কখনও কখনও ডাক্তার বাবু অশোকের পক্ষ গ্রহণ করিয়া অতসীর নির্ব্বন্ধপরায়ণতা ও অমিতব্যয়িতার কথা তুলিয়া অপ্রিয় সমালোচনা করিলে পত্নী উৎপলা যখন অনুযোগ করিতেন, —'তুমি ওকে দেখতে পার না'—তখন বিমলবাবু যদিও কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "চোপ রও! দেখতে পারি নি? জান, এখনই তোমার নামে ডিফামেশান স্যুট ফাইল ক'রে দোবো? যত বড় কথা নয় তত বড় কথা?' —তথাপি তাঁহার রঙ্গের অন্তরাল হইতেও অতসীর প্রতি ভ্রাতৃস্নেহের একটি গুপ্ত উৎস যে স্বতঃই উৎসারিত হইত, তাহা বুঝিতে পতিগতপ্রাণা উৎপলার বাকী থাকিত না।

তাই যখন এবারও অতসী মাত্র দুই দিন তাঁহাদের আলয়ে থাকিয়া গার্ল স্কুলের কাছে ভাড়া বাড়ীর ঘর লইয়া বাস করিতে গেল—তাঁহাদের কোন অনুরোধ উপরোধ শুনিল না, তখন বিমলবাবু ক্ষোভে ও দুঃখে দুই চারি দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না, তাহার কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না। কিন্তু উৎপলার চোখের জলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার নিজের মনের সহিত অহর্নিশি যুদ্ধ করিয়াও তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনের নিভৃত কোণে অশোক ও অতসীর জন্য প্রবল আকর্ষণের যে রেশটুকু ছিল, তাহাকেও দমন করিতে তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি সমর্থ হইল না।

এক দিন বিমলবাবু পত্নীর সহিত অতসীর বাসা-বাড়ীতে হঠাৎ হাজির হইলেন। অতসী তাঁহাদিগকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "এ কি?"

উৎপলা অভিমানভরে বলিল, "কেন, তাড়িয়ে দিবি না কি? নিজে ত যাসই না, আবার আমরা সেধে এলে—"

ডাক্তার বাবু কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "যদি পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না যায়,—"

উৎপলা বাধা দিয়া বলিল, "থাম, থাম, ওর সঙ্গে বোঝা-পাড়া ক'রে নিচ্ছি—রস না। তেজে মট্ মট্ করছেন পোড়ার-মুখী! হাঁ লা, তোদের সঙ্গে কি আজকের সম্বন্ধ? না,—"

ডাক্তার বাবু আবার বাধা দিয়া বলিলেন,—"আজকের? আ রে বাপ রে! সে কবে? সে যে আজ ৮ বছর হ'তে চল্‌লো—ঐ তখন সবে তোমার আমার কোর্টসিপ চল্‌ছিলো, মনে নেই?"

অতসী হাসিয়া ফেলিল, উৎপলাও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "যাও! কি যে রঙ্গ কর বুড়ো বয়েসে! হাড় জ্ব'লে যায়।"

ডাক্তার বাবু মহা আনন্দ লাভ করিলেন, অতসীর গম্ভীর মুখে হাসির রেখা! সহজ কথা নহে ত! কিন্তু প্রকাশ্যে মহা অপরাধীর ন্যায় কাঁচু-মাচু মুখে বলিলেন, "কি বিপদ্! না হয় আমি চলেই যাচ্ছি গো—তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে আমার অসাক্ষাতে যত পার প্লট করতে থাক, রাত ১টার পর এসে নিয়ে যাব'খন।"

অতসী তাঁহাকে যাইতে বাধা দিল বটে, কিন্তু ডাক্তার বাবু ততক্ষণ দেউড়ী পার হইয়াছেন, পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "মশাইদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা দেবার এ অধীনের মোটেই ইচ্ছে নেই।"

বিমলবাবু চলিয়া গেলে উৎপলা বলিল, "ওঁর ঐ কেমন এক রোগ, লোকের হাড়মাস জ্বালিয়ে খান একবারে। পুরুষ-মানুষ কি না, কিছু বলবার যো নেই।"

হঠাৎ অতসীর মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল, সে পরুষ কণ্ঠে বলিল,—"দিদি, তোমাদের ঐ কথাটা কেমন বুঝতে পারিনি। পুরুষ হলেই সাত খুন মাপ! কেন বল দিকি? মেয়েমানুষের দোষের কথা বাতাসেরও তর সয় না। আর পুরুষ? বাপ রে!"

উৎপলা হাসিয়া বলিল, "থাক্ গে ভাই, মুখ্যু-সুখ্যু মনিষ্যি—

অতসী বাধা দিয়া বলিল, "না, না, কথা চাপা দিও না। তোমরাই ত ওদের জাতকে বড় বড় ক'রে এতটা বাড়িয়েছ।"

উৎপলা বলিল, "নাও কথা! তা হ'লে সব বিষয়ে চুল চিরে ভাগ ক'রে নিস নি কেন? থুবড়ী হলি—তবু পেটে ত ধরতে হয় নি তোকে, না হ'লে হয় ত ঠাকুরপোর ঘাড়ে ও ভারটার একটা সমান চুলচেরা ভাগ চাপিয়ে দিতিস—কি বলিস?"

অতসী সে কথার কোন জবাব দিল না। অকস্মাৎ গম্ভীরভাবে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষে কি এমন পাপ করেছে—যার জন্যে পুরুষদের মত এই লক্ষীছাড়া দায়টা থেকে নিস্কৃতি পায় নি!"

উৎপলা তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "ঘেন্নার কথা বলিস নি! পাপ? ছেলে কোলে ধরা পাপ? ও মা, বলে কি গো? মাথায় পোকা-টোকা আছে না কি?"

অতসী বলিল, "পোকা তোমাদেরই আছে বরং! না হ'লে স্বার্থপর পুরুষরা যেটা নিয়ে বড়াই ক'রে তোমাদের মাথা হেঁট ক'রে দেবার সুবিধে পেয়েছে, সেইটেকেই তোমরা নারী-জন্মের সার্থকতা ব'লে মনে কর?"

উৎপলা বলিল, "অবাক্! ছেলে গর্ভে ধরলে পাপ হয়, মাথা হেঁট হয়? ওটা যে আমাদের নারীজন্মের সব চেয়ে বড় জিনিষ রে!"

অতসী বলিল, "তোমরা ঐ বড় নিয়ে থাক গে। যাতে ক'রে পুরুষদের চোখে আমরা ছোট হয়েছি, তাই তোমার বড় হ'ল? বেশ!"

উৎপলা কৃত্রিম ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর আবাগী! ছোট বড় কি রে? সদরে ওরা যাই হোক না, অন্দরে ওরা কে?"

অতসী অনুযোগের সুরে বলিল, "ছি দিদি, আর যে যা বলে বলুক, তুমি ও কথা বোলো না! তুমি ত লেখাপড়া শিখেছ, তুমিও রামী শ্যামীর মত অন্দরের বড়াই করছো? সেটা ত দাসীপনা! জান দিদি, অনেক দিনের একটা পুরোনো কথা মনে পড়লো। তখন সবে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তা ব'লে ভেবো না যে, দাসী-বাঁদী হব, এই সর্ত্তে বিয়ে করেছিলুম। স্বামী স্ত্রী—দুজনেই সমান,—এটা আমাদের মধ্যে ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম। আর বললে হয় ত বিশ্বেস করবে না, এটাও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম যে, মেয়েমানুষে যে জন্যে পুরুষের কাছে মাথা হেঁট করে, তার সম্ভাবনাও হতে দেবো না।"

উৎপলা উৎসুকনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'তে দিবিনি?"

অতসী জবাব দিল, "তোমাদের মত যাতে আমাকেও ফাঁদে পড়তে না হয়—"

উৎপলা বাধা দিয়া বলিল, "আ মরণ! যাতে ছেলে কোলে করতে না হয়?—"

"হাঁ, তাই কড়ার ক'রে নিয়েছিলুম।"

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উৎপলা ক্ষণেক নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "ধন্যি মেয়ে বটে! তোর লজ্জা হ'ল না একটুকু? তাই বুঝি বুড়ো বয়েস—"

অতসী বলিল, "সবটা শোন আগে। ও কড়ার-টড়ার কিছু না! বিধাতার ছিষ্টিছাড়া কি আইন বাপু—অত করেও—তোমায় বলতে লজ্জা করে দিদি—এক দিনের কি এক অসাবধান মুহূর্ত্তে—"

উৎপলা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ? ছেলে কোলে পেয়েছিলি?—তার পর—"

"সব বলছি, শোন না। যা ভয় করেছিলুম, তাই হ'ল, ঘেন্নায় লজ্জায় গলায় দড়ী দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়েছিল। জ্ঞান হবামাত্র সেটাকে তফাতে নিয়ে যেতে ব'লে দিলুম—"

উৎপলা বলিল, "এ্যাঁ, বলিস কি? পেটের ছেলেকে বুকে তুলে নিলি নি? এমন রাক্ষুসী—"

অতসীর নয়নপল্লব আপনিই নত হইল—ঈষৎ কাঁপিলও বুঝি! উৎপলার মনে হইল, যেন তাহার প্রান্ত অতি অস্পষ্ট অশ্রুর রেখায় সিক্ত হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি অতসী[illegible] টানিয়া লইয়া স্নেহমাখা স্বরে একটা সান্ত্বনা-বাক্য [illegible] যাইতেছিল—কিন্তু কথা তাহার শেষ হইল না, [illegible] শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, 'মা'! অমনই উৎপলা উ[illegible] মত সকল ভুলিয়া আলুথালুবেশে ছুটিয়া বাহিরে [illegible] কোথায় রহিল গল্প, কোথায় রহিল অতসী! স্কুলের [illegible] তাহার পুত্রকে লইয়া এখানে আসিয়াছে, মা কি এখন বা[illegible] যাইবেন? উৎপলার বাৎসল্যরসসিক্ত কম্র কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িল শুধু অমৃতধারা—'বাবা!'

অতসী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই দিকে নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। উৎপলার নয়নে তখন সে যে অনির্ব্বচনীয় অনন্নভূতপূর্ব্ব অপার আকুল বাৎসল্য-প্রেমের আগ্রহ ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, তাহার তুলনা ত ইহজীবনে আর কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই!

৪

দিন আর কাটে না। নিঃসঙ্গ জীবন—মোটেই ভাল লাগে না। আপনার বলিতে স্কুলের কায ছাড়া আর দুই চারিখানা কেতাব পড়া ছাড়া কেহ নাই। বিবাহিত জীবনের এবং বর্ত্তমানের অমিতব্যয়িতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বিমলবাবু প্রায়ই মিষ্ট কথার মোড়কে তিক্ত কথা শুনাইয়া দেন,—অতসী ইহা সহ্য করিতে পারিত না। উৎপলা আপনার সংসার ও ছেলেপুলে লইয়াই ব্যস্ত। স্কুলের কায যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অতসী যেন সমাধিমগ্না হইয়া থাকে—তাহার পর অনুক্ষণ তাহার প্রাণ হুহু করে।

বিদেশেও যেমন, কলিকাতাতেও তেমন, কোথাও তৃপ্তি নাই, সর্ব্বদাই মনে হয়,—কোথাও চলিয়া যাই। মাঝে মাঝে সে আপন মনে বলিয়া উঠে, কি লইয়া থাকি?

এই ভাবেই দুই তিন মাস কাটিল। ইহার মধ্যে বিমলবাবু একাধিকবার তাহাকে চাকুরী ছাড়িয়া উৎপলার কাছে বাস করিতে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে খোঁজ লইয়া এটা সেটা অতসীকে কিনিয়া দিয়াছিলেন, অতসী তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল। বিমলবাবু দুই একবার অর্থসাহায্য করিতে গিয়াও অপমানিত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি এ বিষয়ে অতসীর সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন নাই।

হঠাৎ এক দিন অতসী আসিয়া উৎপলার নিকট হাত পাতিল, মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "দিদি, গোটা পচিশ টাকা থাকিয়া ত পার, মাইনে পেলেই দিয়ে দোবো।"

উৎপলা বিস্মিত হইল। এমন ত অতসী কখনও চাহে না, তথাৎপলা কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ২৫টি টাকা সহিত দিল। এমন আরও তিন চারিবার হইল,—আজ খরশু কাল ৩০্, পরশ ৫০্ টাকা। শেষে এক দিন বিমলবাবু পত্নীকে পরুষ কণ্ঠে বলিয়া দিলেন, এই শেষ—ইহার পর তিনি এমন করিয়া ওড়নচোড়ের অর্থ যোগান দিতে পারিবেন না।

কথাটা কোনরূপে অতসীর কাণে উঠিল। সেই দিন হইতে সে 'ষ্টেটসম্যানে'র চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল।

এক দিন বিমলবাবু হঠাৎ শুনিলেন, অতসী পশ্চিমে চাকুরী লইয়াছে। যখন তিনি অতসীর বাসায় উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, বিদেশ-যাত্রার গোছগাছ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি?"

অতসী বলিল, "লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। এ কি, দাদা, আজ যে আমায় মাই ডিয়ার ব'লে ডাকলেন না!"

বিমলবাবুর মুখ অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল, তিনি গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "তামাসা না, এ পাগলামী ছেড়ে দাও, ভদ্দর লোকের মত তোমার দিদির ওখানে চল বলছি। যতটা রয় সয়—"

অতসী বলিল, "ভদ্দর লোকের মতই ত চলছি—ভদ্দর-লোক নিজের উপায় নিজে করে, পরের গলগ্রহ হয় না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "হুঁ। তার পর? এখানকার দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে যাচ্ছ তা হ'লে?"

অতসী বলিল, "না, আপনার টাকাটা দেওয়া হয় নি বটে। তা প্রথম মাসের মাইনে পেলেই—"

বিমলবাবু আর কিছু বলিলেন না, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "ওঃ, তা হ'লে সমস্ত বন্দোবস্তই ক'রে ফেলেছ? এ গরীবদের পরামর্শ তা হ'লে আর দরকার হবে না বোধ হয়? তা, যাবার আগে উৎপলাকে একবার দর্শন দেবার সুবিধে হবে কি? মাগী বড় বেহায়া, কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, এখানে তার এক জন আপনার জন রয়েছে!"

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই ডাক্তারবাবু হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

এ জন্য অতসীর লক্ষ্ণৌ যাওয়ায় বাধা পড়িল না। অতীত জীবনের লীলাক্ষেত্র বলিতে যাহা কিছু—তাহার বন্ধন কাটাইয়া সে এইবার চিরদিনের জন্য নূতন পথের যাত্রী হইল।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা। এই নূতন পথেও ত তৃপ্তি নাই, স্বস্তি নাই,—মন ত সদাই তেমনই হু হু করে! নিঃসঙ্গ অনাদৃত জীবন, কি সুখ ইহাতে? কিন্তু—কিন্তু—এ অনুযোগ সে ত করিতে পারে না—সে ত কাহারও উপর নির্ভর করিতে চাহে নাই। তবু, তবু,—একটু নির্ভর—একটু অবলম্বন, ছি! ছি! ধিক্ তাহার নারীত্বে!

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া বিমলবাবু একখানা চিঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, আর আপন মনে বলিতেছিলেন, এও কি সম্ভব, অতসী তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে! যে সংসারে কাহাকেও চাহে না, তাহার কি এমন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর? তবে উৎপলা যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক—নারীজাতি একটা না একটা আশ্রয় অথবা অবলম্বন না পাইলে জগতে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। বাহিরে একখানি গাড়ী লাগিল। হঠাৎ কিছু পরেই এক অতি পরিচিত স্বরে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, "দাদা কি বড় ব্যস্ত আছেন?" এ কি, এও কি সম্ভব?

বিমলবাবু লাফাইয়া উঠিয়া দ্বারপথে অগ্রসর হইয়া বিস্ময়-প্লুত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"অতসী, তুমি? এ কি, এমন বিশ্রী হয়ে গেছ কেন? উৎপলা, উৎপলা, দেখে যাও দৌড়ে এসে, কে এসেছে!"

অতসী ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—"কি দেখছেন দাদা—এই শীর্ণ হাতখানা, এই বিবর্ণ মুখখানা? মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি—অমনি ছুটে আপনাদের দেখতে এসেছি। একবার শেষ দেখতে এলুম—শেষ একবার জ্বালাতন করতে এলুম।"

বিমলবাবু অতসীর হাত দু'খানা ধরিয়া একরূপ জোর করিয়া অন্তঃপুরে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন, "বলি, এঁরা সব গেলেন কোথায়? চল, চল, উৎপলার আজ যে কি আনন্দ হবে—"

উৎপলা অতসীকে দেখিবামাত্র হর্ষ-বিস্ময়ে একটা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতসীর প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল! যাহারা তাহার আপন হইতেও আপন, তাহাদিগকে সে কোথায় দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল! দুর্ব্বল শরীরে এত আনন্দ বুঝি সহ্য হইল না, সে একরূপ মূর্চ্ছিত হইয়াই উৎপলার অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল। উৎপলা স্বামীর সাহায্যে তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। বিমলবাবু তাহার নাড়ী ধরিয়া রহিলেন, উৎপলা সামান্য জলের ছিটা দিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দিল। তাহার চৈতন্যের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়া বিমলবাবু কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অতসী নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিল,—দুইখানি কোমল মৃণাল-বাহু তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, আর দুইটি নীলোৎপল-নয়ন হইতে তাহার উপর অপার স্নেহ-করুণার অমিয়ধারা ঝরঝর ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। তখনও সে আপনার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"দিদি, মানুষ কি ভ্রান্ত! সামনে শীতল স্বাদু জল থাকতে দূরে তেষ্টার জলের জন্য হাতড়ে মরে!"

হঠাৎ সে উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে উৎপলাকে জড়াইয়া আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দিদি, আমায় তোমরা ক্ষমা কর। এ রাক্ষসীর মান-অভিমানের পাখা ভেঙ্গে গেছে, আর সে অধিকার নিয়ে ঝগড়া করবে না, আর সে স্বপ্নরাজ্যের আকাশে উড়তে চাইবে না, ক্ষমা কর দিদি, ক্ষমা কর।"

রুদ্ধ অশ্রুর জমাট বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতসী খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল—সে কান্নার সংস্পর্শ উৎপলাকেও কান্না হইতে অব্যাহতি দিল না।

"এ কি, তোমরা ক্ষেপে গেলে না কি? আজ ত আমোদের দিন! ওঠ, ওঠ, সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করা যাক গে একসঙ্গে"—বলিতে বলিতে বিমলবাবু একটি বালকের হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বালকটিকে অতসীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, "যা না রে ছোঁড়া, তোর যে কাকী রে! জান, মাই-ডিয়ার, চিঠিতে একটা নির্ভর করবার জিনিষের কথা তুলেছিলে, তাই ওকে তোমার শ্বশুরের ভিটে থেকে আনিয়ে এখানে রেখেছি। যা, যা, অমিয়, যা, ছুটে যা।"

অতসী বালককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! না, না, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? অস্ফুটস্বরে ডাকিল,—"দাদা!"

বিমলবাবু বলিলেন, "এঃ, পেছু ডাকলি আবার! ভাল জ্বালা, যা না রে ছোঁড়া, লজ্জা হ'ল না কি?"

অতসী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "দাদা, ছেলেটি কে?"

"কে, অমিয়? ও যে অশোকের দেশের জ্ঞাতি ভায়ের ছেলে। ওকে তোমার কাছেই এখন থেকে—হাঁ, ভাল কথা, অশোকের একখানা চিঠি অনেক দিন থেকে প'ড়ে রয়েছে আমার কাছে। প'ড়ে দেখো এর পর। এস গো, মাই-ডিয়ারের খাবার-দাবার উদ্যুগ করবে গিয়ে।"

বিমলবাবু পত্নীকে লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

অতসীর বিশ্রাম লওয়া হইল না। বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে তাহার মুখ-চক্ষু চুম্বনে ভরাইয়া দিল। এ কি চন্দন-স্পর্শ? না, তাহা হইতেও শীতল? বালক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হঠাৎ অতসী প্রকৃতিস্থ হইয়া বালককে কাছে বসাইল। তাহার পর পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। পড়িবার আগ্রহ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়! এ কি আশ্চর্য্য পত্র—বহুদিনের জীর্ণ প্রাচীন পত্র, কিন্তু এমন পত্র ত সে জীবনে পাঠ করে নাই :—

"অতসী, পত্র যখন পড়বে, তখন আমি আর ইহজগতে থাক্‌বো না; কেন না, আমার মৃত্যুর পর সময় বুঝে বিমল-দাকে এই পত্র তোমায় দিতে ব'লে দিয়ে যাচ্ছি।

জীবনে মস্ত ভুল করেছিলুম আমরা, বিধির বিধান মান্‌তে চাই নি। এখন মরণ ঘনিয়ে আসছে, দিব্য দৃষ্টি পেয়েছি, দেখছি, কম-বেশী উঁচু-নীচু বিধাতার বিধান, সৃষ্টির নিয়ম। না হ'লে সৃষ্টি হ'ত না, সৃষ্টি থাক্‌ত না। এখন বেশ বুঝছি, সংসারের ধূলো-কাদার ভার নেবার মত এক জন শক্তিমান পুরুষের উপর নির্ভর না করলে তোমাদের চলতেই পারে না।

এ জন্মে সংসার করতে শিখলুম না, তুমিও না, আমিও না। তাই তার ভার বিমল দাদাদের উপর দিয়ে গেলুম। যখন সংসার বড় একা একা ঠেকবে, যখন সংসার-সাগরের অকূল পাথারে থৈ পাবে না, তখন তাঁরা এসে হাত ধ'রে দাঁড়াবেন,—এ বিশ্বাস আছে। তাই তাঁদের হাতেই তোমার ভার দিয়ে গেলুম।

একটা কথা ব'লে শেষ করব। তুমি সমান অধিকারের দাবী ক'রে সংসারে যা চাওনি—যাকে আঁতুড়েই বিদেয় ক'রে দিয়েছিলে, সে সত্যিই মরে নি, তাকে আমি অন্ত যায়গায় রেখে ছয় বছর মানুষ করেছি। যে মা ছেলে চায় না, তার কোলে জোর ক'রে ছেলে দিয়ে কেন মা ও ছেলে দুজনকেই কষ্টে ফেলি! তুমি রাগ করবে ব'লে এ কথা এত দিন তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি।

যদি পরে কখনও ছেলের অভাব বুঝতে পার, যদি কখনও তাকে অবলম্বন ক'রে বাঁচবার সাধ কর, তা হ'লে বিমল-দা'ই সে কথা বুঝে তোমার কোলে তাকে এনে দেবে। সে আকুল আগ্রহ দেখলেই বিমল দা সে বন্দোবস্ত করবে, আর তখনই তোমায় এই চিঠি দেবে। তোমরা যাতে কখনও কষ্টে না পড়, তার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি, বিমলদা দরকার হ'লে সে বন্দোবস্তও ক'রে দেবে।

বড় ভালবেসেছিলুম তোমায়, কিন্তু কখনও তোমার সমস্তটা পাই নি। যেন পরজন্মে পাই। ইতি, তোমার স্বামী অশোকনাথ। সন ১৩ ··তাঃ······।"

* * *

যখন বিমলবাবু পত্নীকে লইয়া চুপি চুপি সেই কক্ষের দ্বারসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, অতসী দুই হাতে অমিয়কে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিতেছে, আর অস্ফুট গুঞ্জনে বলিতেছে,—"ও আমার সোনা, ও আমার মাণিক, আমার গোপাল, আমার বুকজুড়ানো ধন—তোমায় আমি এদ্দিন বনবাস দিয়েছিলুম! জানিনী না যে তোমার আমি মা!" তাহার দুই নয়নে মাতৃত্বগর্ব্বের পুণ্য মন্দাকিনীধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে!

বিমলবাবু যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই পত্নীকে লইয়া চুপি চুপি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদেরও নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

অভিভাষণ

মহাপ্রভুর পর প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর অতীত হইলে রাজা রামমোহনের অভ্যুদয় হয়। তিনি বৈষ্ণব আদর্শ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, যেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন চৈতন্যদেব পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে। বঙ্গের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও পদাবলী এক যুগের জন্য হতমান হইয়া পল্লীর নিভৃত নিকেতনে আশ্রয় লইল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা অবিরত বংশীধারীর নিন্দা করিতে লাগিয়া গেলেন। রামমোহনের সম্মুখে নূতন যুগ, নূতন সাধনা ও নূতন ভাবপ্রণালী। সেই নূতন চিন্তা ও ভাবের তাড়নায় আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন সর্ব্ব-সমন্বয়ের যুগ আসিয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে, কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। এখন বুঝিতে হইবে, যাহা আপাততঃ মূল্যহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, প্রকৃত জহুরী আসিলে তাহার অভাবনীয় মূল্য আবিষ্কার করিয়া তিনি হয় ত আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবেন। এখন সংগ্রহের দিন, কুড়াইয়া রাখিবার দিন। এখন কালের ধ্বংসলীলা হইতে প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন কথা রক্ষা করার দিন। এখনকার মন্দিরে হয় ত পূর্ব্ব-যুগের আগ্রহ ও উদ্যম-সহকারে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও মন্দিরের শিল্প, মন্দিরের উপকরণ, এমন কি, পূজার নৈবেদ্যটি পর্য্যন্ত আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গীয় চিন্তার ক্রমোন্নতিশীল, বর্দ্ধিষ্ণু ধারার আদি ও বিকাশ আমাদের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট করিতে হইবে। সমগ্রভাবে আমাদের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনা করিতে হইবে। ধরুন, বাঙ্গালার রামায়ণগুলি—ইহাদের কোনটিই বাল্মীকি হইতে অনূদিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কত উপাখ্যান ও প্রবাদ আছে, যাহাদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি, জগতের দূর-দূরান্তর স্থানেরও প্রচলিত আখ্যানের একটা যোগ আছে। কোন কোন উপাখ্যান আবার বাল্মীকির পূর্ব্বযুগের। এ কথা হয় ত অনেকেই জানেন যে, বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে দেশ-প্রচলিত বহু উপাখ্যান আছে—যাহা মূলে নাই। চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতাব্দীর কবি, তিনি কৈকেয়ী-কন্যা কুকুয়ার কথা তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন। গ্রীয়ারসন বলিতেছেন, কাশ্মীরী রামায়ণে কৈকেয়ীর এই দুহিতার কথা আছে। সীতার জন্ম সম্বন্ধে বঙ্গীয় বিভিন্ন রামায়ণে যে সকল কাহিনী পাওয়া যায়, জনৈক জার্ম্মাণ পণ্ডিত আমাকে জানাইয়াছেন, জাবা দ্বীপের কবি-ভাষায় প্রচলিত রামায়ণে সেই সকল কাহিনীর অনেক কথা আছে। ইহা ছাড়া বৌদ্ধজাতক ও প্রাচীন জৈন-রামায়ণের অনেক কথা আমরা বাঙ্গালা রামায়ণগুলিতে পাই—বৃদ্ধ বাল্মীকির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কবিচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীতে যে রামায়ণ লিখিয়াছেন—তাহাতে তরণীসেন, বীরবাহু ও অতিকায়ের ভক্তির কথায় লঙ্কাকাণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, রণ-প্রাঙ্গণ সঙ্কীর্ত্তন-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পুথি-লেখকরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে উহা জুড়িয়া দিয়াছেন—চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ছায়া এই কবিচন্দ্রী রামায়ণে অতি স্পষ্টভাবে রাম-লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছে। রঘুনন্দনের রাম্-রসায়নে রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পরম রমণীয়ভাবে রাম-সীতার দাম্পত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বইখানি যেন ফুল-পল্লবে সুশোভিত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির স্তূপে যে অর্দ্ধ-শত ভিন্ন ভিন্ন লেখক-বিরচিত রামায়ণ কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহা বাঙ্গালা সমাজের এক এক সময়ের ইতিহাসের এক একখানি পৃষ্ঠা আঁকিয়া দেখাইতেছে। কে বলে, সেগুলি ত্রেতা যুগের কথা ? কে বলে, সেগুলি বাল্মীকির লেখার অনুকৃতি বা উত্তর-কোশলের কথা ? সেই রামায়ণগুলিতে বাঙ্গালা দেশেরই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্বর্ণলঙ্কা গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, তাহাদের পঞ্চবটী বঙ্গের নীপকুঞ্জ, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র নবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তনভূমি। কেবল তাহাই নহে, এই সকল বাঙ্গালা পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে অনেক য়ুরোপীয় আখ্যানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। গ্যালিক উপাখ্যানের ব্যালর বাঙ্গালা রামায়ণের ভস্মলোচন। বৃদ্ধ বাল্মীকি এমন চরিত্র স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। মহীরাবণের কথা ও ধর্ম্ম-মঙ্গলের ইঁদাচোরের যাদুবিদ্যা, ড্রুইড পুরোহিতদের মন্ত্র-শক্তির অনুরূপ। এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, কোন সন্দেহ নাই যে, দূর প্রাচ্যদেশের সঙ্গে প্রতীচ্যের এক সময় ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল। ময়নামতীর গানে বৃদ্ধা রাণীর রূপ-পরিবর্ত্তন কখনও শ্যেনরূপে, কখনও পানকৌড়ী বা কপোতে পরিণতি গ্যালিক উপাখ্যানগুলির সঙ্গে আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যায়।

এতগুলি সুবৃহৎ মনসা-মঙ্গল আমরা পাইয়াছি—যদিও মূল বিষয়টি একরূপ, তথাপি তাহাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পুস্তক। ষোড়শ শতাব্দীর বংশীদাস যখন ময়মনসিংহে বসিয়া তদীয় পদ্মপুরাণ রচনা করেন, তখনও সমুদ্রযাত্রা তদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত হয় নাই। তৎকৃত মনসা-মঙ্গলে জাহাজ নির্ম্মাণের বিস্তারিত বিবরণ ও বাণিজ্যাদির কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজয়গুপ্তের সময় হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম সংঘর্ষ। এই দুই শ্রেণীর বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক কলহ তাঁহার কাব্যের অনেকটা যায়গা জুড়িয়া আছে। জয়নারায়ণের হরিলীলায় মুসলমান রাজত্বকালে ডিটেক্‌টিভ পুলিস কি ভাবে কার্য্য করিত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় দেশের মানচিত্র আঁকিয়া সদাগরদিগের বাণিজ্যের অভিযানের মধ্যে তৎসময়ের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক তত্ত্বের আভাস দিতেছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি নানা উদ্ভট-কল্পনার লীলাভূমি হইলেও তাহাতে হিন্দু-রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ দিয়া যাইতেছে। এখনও লাউসেনের ময়নাগড় ও ইছাই ঘোষের শ্যামরূপা দেবীর মন্দির বিদ্যমান। বারভূঞারা সম্রাটের সভায় কি কি কায করিতেন, মাণিক গাঙ্গুলী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীকদিগের ডডনপ্লাস ও হিন্দুর দ্বাদশমণ্ডল আর্য্য-সভ্যতার আদিযুগের এই ব্যাপক প্রথার পরিচায়ক। বাঙ্গালার বারভূঞা আকবরের সময়ের সৃষ্টি নহে। এখনও ত্রিপুরা ও রাজপুতানার কোন কোন স্থানে এই বহু প্রাচীন প্রথার শেষ চিহ্ন বিদ্যমান। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে হিন্দু-সৈনিকের বেশভূষা ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে নানা বিবরণ আছে।

ডোম ও নমঃশূদ্র সেনারাই হিন্দু-রাজাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহারা সাধারণতঃ রায়বাঁশ লইয়া যুদ্ধে যাইত। এই রায়বাঁশই বাঙ্গালার ইতিহাস-বিশ্রুত লাঠী, বর্ত্তমান কালের রেগুলেশন লাঠী ভয় দেখাইবার একটা মুখোস মাত্র। রায়বাঁশে বন্দুকের গুলী ফিরাইয়া দিত। নিম্নশ্রেণীর সৈন্য-সংখ্যাই বেশী ছিল। কিন্তু বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণও পদাতিক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতেন। সেই শার্দ্দূল-বিক্রান্ত যোদ্ধাদের বিবরণ পড়িলে বাঙ্গালীর বীর্য্যবত্তার কথা স্বতই মনে হয়। দুই ছত্রে এক একটি চিত্র, কিন্তু তাহা পাষাণের লেখা—

"সেনার প্রধান চলে সীতারাম ভুঞে।
যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুঞে।

প্রমত্ত কুঞ্জর যার ভরে মুঞে পড়িত, সেইরূপ বীরদের বংশধরেরা এখন কোথায়? গৌরদ্বারের রাজা চাঁদ রায় মুসলমান সম্রাটের বিশাল হস্তীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহার শুণ্ড ধরিয়া এমনই ঘুরপাক খাওয়াইয়াছিলেন যে, মাহুতের পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশ-আঘাত সত্ত্বেও সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। নরোত্তম-বিলাসে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেই সকল বীরের বংশ এখন বঙ্গদেশে কোথায়?

এ দেশের নানাদিক্ দিয়া আমাদের জানিবার বিষয় আছে। আমরা কি হইব, জানিবার পূর্ব্বে কি ছিলাম, তাহা জানা দরকার। সুখের বিষয়, আমরা অনেকটা কিছুই ছিলাম, দুঃখের বিষয় এই যে, সে অনেক কিছুর কণিকা জ্ঞানও আমাদের নাই। প্রকৃত স্বদেশী হইবার চেষ্টা তখনই সফল হইবে, যখন স্বদেশের সমস্ত পরিচয় আমরা জানিব। যখন স্বদেশের প্রাণ কোথায়, তাহা আবিষ্কার করিতে পারিব এবং প্রকৃত অনুরাগ আমাদের নয়নে এমন অঞ্জন পরাইবে—যাহাতে এ দেশের ধূলি-মাটীরও একটা যথার্থ মূল্য আমরা বুঝিতে পারিব। যখন আমাদের দেশে যাহা নাই, এবং বিদেশের যাহা আছে—মিছামিছি সেই মিথ্যা ভূষণ আমাদের দেশকে পরাইয়া ডাকের সাজ দিয়া মাতৃমূর্ত্তি বাহির করিব না; যাহা আমাদের আছে, বিদেশের যাহা নাই,—তাহার দর কষিয়া বিদেশীরা আদর না করিলেও আমরা আমাদের ঠাকুরকে মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিব না; যখন দেবদারু জন্মিল না বলিয়া গোলাপের মাতৃভূমি বসোরা বিলাপ করিবে না, কিংবা দেবদারুর শিরস্ত্রাণ পরিয়া হিমাদ্রি জবাপুষ্পের অভাব-জনিত শোকে অধীর হইবে না। আমাদের যাহা ছিল, তাহার বিস্তর পরিচয় আছে। হরিভক্ত যেরূপ লুটের বাতাসার জন্য আঙ্গিনার কানাচ হাতড়াইয়া দেখে, আমরাও আজ এই দেশের গৌরবের স্বর্ণরেণু কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ দীঘির জলে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহাদের জন্য তেমনই আগ্রহে প্রাণান্ত চেষ্টায় খুঁজিব।

যে জাতির পৈতৃক ভাণ্ডারের কোহিনূর ভাগাড়ে পড়িয়া আছে, কেহ দেখে না, সে জাতির চক্ষু ফুটাইবার উপায় কি? যে জাতি দ্রবময়ী গঙ্গাকে কঠিন করিয়া পণ্ডিতের স্পর্শ হইতে দূরে নামাবলীর মোড়কে পুরিয়া শিবের জটায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—সে জাতির পবিত্রতা কিসে হইবে? যাঁহাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বৃত্ত শব্দচতুষ্টয়কে রক্ষা করিবার জন্য নানা সমস্যা লইয়া পক্ষিরূপী যে ধর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিলেন, পঞ্চানন বড়াননের দল তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্যম করিয়াছে, সে জাতিকে ধ্বংস হইতে কে উদ্ধার করিবে? যাহাদের নিরপরাধ কোন তথাকথিত হীন বর্ণের লোকের মুমূর্ষু শয্যা যদি কোন উচ্চ বর্ণের লোক স্পর্শ করে, তবে তাহার আত্মীয়স্বজন গোবর-জলের কলসী লইয়া তাহার বাড়ীর দরজা আগুলিয়া রাখে—এমন নিষ্ঠুর জাতি ভগবানের দয়া পাইবে কিরূপে?

তরুণদলের নিকট আমার এই নিবেদন, আপনারাই আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ। বাঙ্গালী জাতি জগতে টিকিয়া থাকিবে কি না, যে দারুণ সংঘর্ষ আসিতেছে, তাহাতে আমরা জয়ী হইব কি না—সে সমস্যার সমাধান আপনাদেরই করিতে হইবে। আমরা বৃদ্ধ, আমরা যতই হুকমী দেখাই না কেন, পুত্ররূপে, কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে, জামাতারূপে আপনারাই আমাদের উত্তরাধিকারী ও গৃহের প্রকৃত স্বামী। আমরা ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু আপনারা পরিণামে যে পথে যাইবেন, আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। আপনাদের দুর্জ্জয় শক্তি স্বীকার করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা যদি অত্যাচারী, অমিতব্যয়ী, কুসংস্কারশীল, স্বার্থান্ধ ও সমাজ-দ্রোহী হই, আপনারা বয়কট করিলেই আমরা সোজা হইব। বণিক্‌রাজ ধনপতি সদাগরকে যখন তাঁহার সমাজ বয়কট করিতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি সম্রাটের সহায়তার দর্প করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতিরা উত্তরে বলিয়াছিল—

"জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে;
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।"

সমাজের চাপ এমনই বেশী, ফলে ধনপতিকে গলবস্ত্র হইয়া জ্ঞাতিদের মনস্তুষ্টি করিতে হইয়াছিল। সে দিন পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে সমাজ-নিগ্রহের সেইরূপ আতঙ্ক ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সমাজ বিশৃঙ্খল,—কে কাহার কথা শুনে? যদি অন্যায়কারীকে আমরা একঘরে করিতে পারি, তবে কি সাধ্য তাঁহার, অন্যায় কার্য্য করিবেন? তিনি যত বড়ই হউন না কেন, কন্যা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে বারংবার সমাজের দ্বারে আসিতে হইবে। আজ যদি তরুণের দল সংঘবদ্ধ হইতে পারেন—তবে তাঁহাদের হস্ত দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করিবে। যুদ্ধ আসিতেছে, হে তরুণ যোদ্ধার দল, আপনারা প্রস্তুত হউন। এই যুদ্ধে আপনাদের জীবন-মৃত্যু সমস্যার সমাধান হইবে। এ যুদ্ধ গোলাগুলী-অসি-ভল্লের নহে—সে পাশবিক যুদ্ধের যুগ অতীত হইয়াছে। আপনাদের অস্ত্র হইবে সঙ্ঘশক্তি, সংযম, ধর্ম্মভয় ও সহিষ্ণুতা; আপনাদের অস্ত্র হইবে—দেশের প্রতি অটল অনুরাগ, ত্যাগ ও প্রীতি; আপনাদের অস্ত্র হইবে—নির্ভীকতা, দুঃখসহনক্ষমতা, শরীরকে তুচ্ছ করিয়া আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও অপরাজেয় সাহস। এই সকল অস্ত্র লইয়া সংঘশক্তি অর্জ্জন করুন—পুরাকালে এই সংঘশক্তি সমাজের ছিল, পাছে জাতি যায়, এই ভয়ে রাজা উজীর সকলেরই হৃৎকম্প হইত। এখনও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে সমাজের সেই শক্তি আছে। সংঘশক্তি—এই যুগে সাফল্যের একমাত্র মন্ত্র। শত শত লোক—

কিন্তু এককণ্ঠ,—শত শত বাহু, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এক ব্যক্তির ন্যায়। সামরিক রীতির অনুযায়ী দলপতি বা গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি এবং নিজের মত ডুবাইয়া সংঘের বাণী দৈববাণীর মত স্বীকার করিয়া লওয়া—ইহাই এখনকার যুগধর্ম্ম। আপনারা শতধা ভগ্ন হীরকখণ্ডের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছেন, কোন একটি খণ্ডের দীপ্তি দেখিয়া জগৎ হয় ত আপনাদিগকে উচ্চ মূল্য দিতেছে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানিবেন, খণ্ড প্রতিভা আর ভারতকে আলোকিত করিতে পারিবে না। শতখণ্ড জোড়া না লাগিলে আত্মদ্রোহ ও ভেদবুদ্ধি আপনাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিবে। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে জ্যোতিষ্মান্ প্রতিভার আলোক চিরকালই এ দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঐক্যের সাধনাই এ যুগের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। যাঁহারা ঐক্যের পথে আসিবেন না—আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দূরে থাকিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলুন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র ঔষধ।

আপনাদের সম্মুখে কর্ম্মতালিকা বিরাট। সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, দেশের সঙ্গে পরিচয়স্থাপন। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে কুক্ষণে মেকলে বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মন্দির হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজী মোহান্ধ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় তৎকালে মাতৃভাষার এই অপমান শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮০০ অব্দে ওয়েলেস্‌লি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ দেশীয় ভাষা অনুশীলনের একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই কলেজ হইতে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত তাঁহার প্রবোধচন্দ্রিকা, রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য-চরিত, রাজীবলোচন কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত এবং কেরী তাঁহার বহু বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত করেন। এমন কি, এই কেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা লেখার হাতে খড়ি হয়। অল্পসময়ের মধ্যে প্রধানতঃ কেরীর চেষ্টায় বঙ্গভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় দ্বিসহস্র বাঙ্গালা পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল। ইতিহাস, সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, স্থপতিবিদ্যা, পাটীগণিত, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন, ভূগোল, শরীর-স্থান, মস্তিষ্কতত্ত্ব, চিকিৎসা, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে তখন বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বাঙ্গালা বহির অনেকগুলি য়ুরোপীয়রা লিখিয়াছিলেন। তার পর এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধ কাল চলিয়া গিয়াছে—সেই প্রাচীন বাঙ্গালা অবশ্য এখন কতকটা উদ্ভট বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে সর্ব্ববিষয়ে বই লেখা চলে, একশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী লেখকরা তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসর হইল, যখন বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় কি না, এই বিষয়টি গোলদীঘির পণ্ডিতদের বৈঠকে উঠিয়াছিল, তখন ঘন ঘন প্রশ্ন হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় কি ঐ সকল বিষয়ের পুস্তক লিখিত হইতে পারে? মাতৃভাষায় যাঁহাদের একরূপ হাতে খড়ি পড়ে নাই, অথচ ইংরাজীতে যাঁহারা মহাপ্রাজ্ঞ, এইরূপ অনেক পণ্ডিত সেই প্রশ্নের উত্তরে অবিশ্বাসের ভাবে ঘাড় নাড়িয়াছিলেন। এক শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইল, যাহা বাঙ্গালাভাষায় অনায়াসসিদ্ধ ছিল—এই শতাধিক বৎসরের পরে এবং এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বজনস্বীকৃত অত্যাশ্চর্য্য, দ্রুত উন্নতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভাষা সেই কার্য্যের জন্য অনুপযোগী বিবেচিত হইয়াছিল! কিমাশ্চর্য্যং অতঃ পরম্। যদি মেকলের হাতে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া বাঙ্গালাভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমা হইতে তাড়িত না হইত, তবে এই ভাষায় যে শত শত মৌলিক পুস্তক বিরচিত হইত—তাহার কি সন্দেহ আছে? তাহা হইতে অনেক অল্প-সময়ের মধ্যে জাপানীভাষার এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, উহা সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্য ভাষাগুলির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। প্রত্যেক সিভিলিয়ানকে দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হইত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাৎসরিক সভায় তাঁহাদের দেশীয়ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হইত। সেই পরীক্ষার ফলের উপর তাঁহাদের চাকুরীর উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। বহু সম্ভ্রান্ত টোলের অধ্যাপক, দেশীয় রাজা, মহারাজা, গণ্যমান্য লেখক ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী একত্র হইয়া সিভিলিয়ানদের বিচার বিচার করিতে বসিয়া যাইতেন। এই মহাসভায় য়ুরোপীয় সিভিলিয়ানদের কোন গুরুতর দার্শনিক, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা করিতে হইত। মোট কথায় দেশীয় ভাষায় তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণের মতই বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে না পারিলে তাঁহাদের চাকুরী থাকিত না এবং চাকুরীর উন্নতি হইত না।

মেকলে দেশীয় ভাষাকে বিসর্জ্জন করার পর এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে মুষ্টিমেয় ইংরাজ-বিচারকের অজ্ঞতার জন্য শত শত উকীল-মোক্তারকে ইংরাজী শিখিতে হইতেছে—অনুবাদ করিবার জন্য মতরজ্জম ও ইণ্টারপ্রেটারের বহর বসিয়া গিয়াছে। ৮।১০ বৎসর কাল গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ভারতবাসীকে ইংরাজী বলা-কওয়া শিক্ষার জন্য কত যে পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এ কথা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব যে, এক আধ জন ইংরাজের সুবিধার জন্য আদালতে ইংরাজীর কাক-কোলাহল চলিতেছে। সরকার বাহাদুর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে অজস্র টাকার শ্রাদ্ধের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোটি কোটি লোকের ভাষা না জানিয়া তাহাদিগের বিচার করিবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আমাদের দেশ জগৎকে দেখাইতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে—স্বদেশী ভাষাকে জীবনক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে হারাইয়া। আমাদের দেশের সঙ্গে এখন আমাদের নাড়ীচ্ছেদ হইয়াছে—এই দেশীয় ভাষাকে অগ্রাহ্য করার ফলে। এখন আণ্টামাসের চৌদ্দপুরুষের নাম ও অষ্টম হেনরীর রাজ্ঞীদের নাম মুখস্থ করিতে করিতে আমরা নিজেদের বংশপরিচয় ভুলিয়া গিয়াছি। দেশীয় আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে বিষ হইয়াছে, দেশীয় ধর্ম্মকে রাজনীতির চালে বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু তাহার উপর ভক্তি-বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। নিবৃত্তিমূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে হেয় মনে করিতেছি, মার্টিন লুথারকে চৈতন্য হইতে অনেক উচ্চে আসন দিতেছি এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্যের

অসামান্য সম্পদকে কাণা কড়ির মূল্য দিতেছি। ঝুটা পয়সার লোভে মোহরের মূল্য দিতে ভুলিয়াছি, দেশের ঠাকুরের গোঁপের চাড়া হইতে এখন বিদেশী কুকুরের লেজ নাড়াই বেশী প্রশংসা পাইয়া থাকে। দেশীয় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত আদর্শচ্যুত হইয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে তরুণ সম্প্রদায়, আপনারা দেশের এই যুগ ফিরাইয়া আনুন। আপনাদের সাহিত্য, শিল্প, ও ধর্ম্মের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করুন। প্রকৃত স্বদেশী হইবার কতকগুলি প্রধান লক্ষণ আছে—তাহার সর্ব্বপ্রধান দেশীয় জিনিষের প্রতি অনুরাগ। শীতপ্রধান দেশের পক্ষে আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালের তাপ অসহ্য—তথাপি য়ুরোপীয়রা এ দেশে সার্জ্জের কোট ছাড়িবেন না। দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগ অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনুরাগ-যোগ্য এত উপকরণ আছে, যাহা বহু দেশের ভাগ্যে নাই। তবে যে অনুরাগ নাই, তাহা ভাণ্ডারের অভাব বলিয়া নহে—আমাদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া। আমরা পশ্চিম-মুখো হইয়া আসিয়াছি। সূর্য্যোদয় কি প্রকারে দেখিব? কিন্তু সূর্য্যোদয় রোজই হইতেছে—আপনারা একটিবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখুন—কত মঠ-মন্দিরে, গোষ্ঠের শ্যামলক্ষেত্রে, বৈষ্ণব-গীতে, আগমনী গানে, ন্যায়ের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম অনুশীলনে, স্মৃতি-শ্রুতি-কাব্যের মহিমায় এই বঙ্গমায়ের চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, পূজারীর যদি ভক্তি থাকে, তবে পূজার জন্য বিগ্রহের অভাব হইবে না। একবার ফিরিয়া এ দেশের গৌরবের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন। তিনি বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন, এই রত্নখনি তিনি মূঢ়তাবশতঃ অগ্রাহ্য করিয়া কতটা ভুল করিয়াছিলেন। পশ্চিমের উপাসনা ত বহুদিন করিয়াছেন, একবার পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া বসুন। তাহা হইলে দেখিবেন, আমাদের হ্রদে, তড়াগে, দীর্ঘিকায় যে শতদল প্রস্ফুটিত হয়, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। ডেইজি ও ওয়াটার লিলির মায়া কাটাইয়া একবার দেখুন দেখি।

বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনের পর যে অনুরাগের সৃষ্টি হইবে, তাহাই স্বরাজের ভিত্তি। নতুবা এখনকার উৎসাহের কতটা আসল ও কতটা ভেল, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

বঙ্গীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যেও কতকটা অবজ্ঞাত, তথাপি তাহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। এই দেশের সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, সকল দিক্ দিয়া সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে রসের সন্ধান দিয়াছে, জগতের অন্য কোন জাতি তাহা দিতে পারে নাই। আমরা পথহারা পথিকের মত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে সত্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—তাহা হয় ত আমাদের অতি নিকটেই আছে, আমরা মোহান্ধ হইয়া তাহা দেখিতে পাইতেছি না।

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ভগবানকে বাঙ্গালী যতটা অন্তরঙ্গ করিতে পারিয়াছে, এই ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক তাঁহার সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমাদের সাহিত্যের আদিম অধ্যায়গুলিতে কয়েকটি সৌর সংগীত আছে, তাহাতে সূর্য্যঠাকুর অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে বিবাহ করিয়া কিরূপে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই গৌরী মাতৃস্নেহে ভরপূর বঙ্গের দুহিতা;—অতটুকু মেয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে। যে ভাই-বোনের সঙ্গে সে দণ্ডে দশবার ঝগড়া করিয়াছে, আজ আসন্ন বিরহের দিনে সেই ছোট ভগিনীর জন্য তাহাদের কি কান্না! গৌরী কাঁদিয়া বলিতেছে, "আমি যাব না, মা, তুমি আমায় লুকাইয়া রাখিয়া দাও।'—মা বলিতেছেন—"পণের টাকা খাইয়া বিবাহ দিয়াছি, কেমন করিয়া তোমায় রাখিব?" নৌকায় গৌরী যাইতেছেন, মায়ের ক্ষীণ কান্নার সুর বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া মেয়ের কাণে বাজিতেছে—তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সে বলিতেছে, "ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা, চলকে উঠে পানী। ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি ভাই, আমি মায়ের কান্না শুনি।" তার পর পিত্রালয় দূর-দূরান্তরে পড়িয়া রহিল, গৌরী অকূলে ভাসিতেছে। গৌরী সূর্য্যঠাকুরকে বলিতেছে—"আমি তোমার সঙ্গে যাব, ঠাকুর, ক্ষুধা পাইলে আমি ভাত কোথায় পাইব?" স্বামী বলিতেছেন, "আমার নগরগুলিতে শত শত হেলে কৈবর্ত্ত চাষ চষিতেছে, সুগন্ধি শালিধান্য তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—তোমার ভাতের অভাব হইবে না।" অশ্রু-গদগদকণ্ঠে গৌরী বলিতেছে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু পরিবার শাড়ী আমায় কে দেবে?" উত্তর,—"আমার নগরে নগরে তাঁতিরা তাঁত চালাইয়া তোমার জন্য কত রঙ্গের ডুরে শাড়ী তৈরী করিতেছে।" পুনরায় গৌরী শাঁখার কথা বলিতেছেন, উত্তরে সূর্য্যঠাকুর বলিতেছেন—"তোমার জন্য আমি শাঁখারী আনাইয়াছি, বাড়ীতে যাইয়া দেখিবে, তোমার ছোট্ট ছুইখানি হাতে শাঁখা কিরূপ সুন্দর মানাইবে।"

কিন্তু এ সকল কথা ত কথা নয়; যে ব্যথা তাহার মনে গুমরিয়া উঠিতেছে—যাহা মনের অতি গোপনীয় কথা—লজ্জায় চোখের জল সামলানো যায় না—সূর্য্যঠাকুরের বুকে মাথা লুকাইয়া লাল শাড়ী-পরা বিয়ের কনেটি সেই মর্ম্মের কথাটি বলিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল:—"তোমার দেশে যাব ঠাকুর, আমি মা বলিব কারে?"

সূর্য্য কত স্নেহে কত আদরে সোহাগ করিয়া গৌরীর চুল গুছাইতে গুছাইতে বলিতেছেন—"কেন? আমার যে মা আছে, মা বলিবে তারে!"

সাহিত্যের সৌরমণ্ডল হইতে গৌরীর নাম ধুইয়া মুছিয়া গেল। শৈব-সাহিত্যে তিনি হইলেন শিব-সোহাগিনী উমা। এখানেও সেই স্নেহময়ী দুহিতা-মূর্ত্তি। নারদ মেনকাকে বলিয়া গেলেন—"কৈলাসে দেখিলাম, ভাঙ খাইয়া ভোলানাথ দিগম্বর হইয়া গৌরীকে কত গালাগালি দিতেছেন, শিব দিনরাত্রি ভাঙ খাইয়া বেহাল আছেন, বিয়ের সময় আপনারা গৌরীকে যে বসনভূষণ দিয়াছিলেন,—তাহা পর্য্যন্ত বেচিয়া তিনি ভাঙ খাইয়াছেন।" নারদ আরও বলিলেন—"আমি দেখিয়া আসিলাম, গৌরী 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতেছে।"

এই গৌরী সৌর লোকের নহে, কৈলাসেরও নহে—গৌরী বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের দুধপোষা দুহিতা। তাহাকে স্বামিগৃহে

পাঠাইয়া মায়ের মনে যে ব্যথা শেলের মত বিঁধিয়া থাকিত, সেই ব্যথা এই সকল গীতের সূতিকাগার। এই জন্য আগমনী গানে বাঙ্গালী মেয়েদের মর্ম্মকথা এমন করিয়া স্নেহার্দ্র বেদনার সৃষ্টি করিত। মেনকা রাজ-রাণী—শিবানী ভিখারীর গৃহিণী,—যে খাদ্য মেনকা তাঁহার গৃহে ফেলাইয়া ছড়াইয়া দেন,—সেই খাদ্যের অভাবে শিশুদের লইয়া গৌরী কত কষ্ট পান,—ইহা শুনিলে মায়ের মন কিরূপ আকুলি-ব্যাকুলি করিবার কথা! তিনি চোখের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে গিরিরাজকে বলিতেছেন—"তুমি যে কতদিন, গিরিরাজ, আমায় কহিয়াছ কত কথা। সে কথা শেলসম আছে আমার হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত। হয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক ধূলায় প'ড়ে লুটাত।" এই আগমনী গান বাঙ্গালার মেয়েদের মনের জীবন্ত বাৎসল্য-রসের উৎস। দশভুজার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির ছদ্মবেশে বঙ্গমায়ের এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুহিতার পূজা লইয়া আমাদের দুর্গোৎসব। মেয়েরা ভগবতীকে বিদায় দেওয়ার পূর্ব্বে যে ভাবে বরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর মহিমার কোন কথা মনে হয় না। বাঙ্গালার দুহিতা বাঙ্গালী মায়ের কত সোহাগ ও আদরের দ্রব্য, তাহাই মনে হইয়া থাকে। উমা দুহিতা-বেশে আমাদের বুকের ধন,—এ দিকে তিনি যে অন্নপূর্ণা জগৎপালিনী, বঙ্গের নিরক্ষর ভক্তগণ এক দিনের জন্যও তাহা ভোলে নাই। শিবায়নে তিনি স্বামিপুত্র প্রভৃতি গৃহের সকলকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিতেছেন,—সে মূর্ত্তি—মাতৃমূর্ত্তি, তাহাতে জগজ্জননী ভগবতীর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। অন্নদা-মঙ্গলে সেই মাতৃহৃদয়ের যে করুণার ছবি পড়িয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা জগজ্জননীরই মূর্ত্ত ছবি। শিবের সঙ্গে ব্যাস শত্রুতা করিতেছেন, কিন্তু সেই স্বামি-শত্রু অনাহারে ক্লিষ্ট, এ কথা শোনা মাত্র তাঁহার মাতৃহৃদয় করুণায় ভরপূর হইল, যিনি শিবনিন্দা শুনিয়া পূর্ব্বজন্মে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এ জন্মে স্বামি-নিন্দককে অনাহার-ক্লিষ্ট দেখিয়া তাঁহার মন ব্যথায় ভরিয়া যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া শিশুর মত যত্নে খাওয়াইতেছেন—মাতৃভাবের নিকট এখন অন্য সমস্ত বৃত্তি পরাজিত, এক পটে তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে, আদরিণী, সোহাগিনী, গৃহের সকলের—নয়ন-পুত্তলি; অপর পটে সমগ্র দ্বিধাসংস্কার-বিরোধ অতিক্রম করিয়া তিনি মহিমময়ী জগজ্জননী; যে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, সে যত অপরাধই করুক না কেন, শাস্তির গণ্ডী এড়াইয়া গিয়াছে। একটি পার্থিব আর একটি অপার্থিব রূপ।

শিব ঠাকুরের চাষার বেশ। তিনি ইন্দ্রের নিকট ত্রিশূলটি বাঁধা দিয়া কতকটা জমী মৌরসী পাট্টা লইয়া দখল করিয়াছেন। ভৃত্য ভীমের সাহায্যে শত শত আগাছা ফেলিয়া দিয়া ভূঁই চষিয়া ফেলিয়াছেন, ক্ষেতের আইল প্রস্তুত করিতেছেন, জোঁকের উৎপাত হইলে চূণের জল ছড়াইতেছেন। শিবায়ন পড়িয়া দেখুন, উহা একখানি বঙ্গের কৃষি-বিষয়ক manual বা পাঠ্যপুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গের চাষীরা কি ভাবে লাঙ্গল চালায়, আগাছাগুলির নাশ, মশা-মাছি তাড়াইবার উপায়, পোকার কাটা নিবারণের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ ধান কি ভাবে কোন্ ঋতুতে রোপণ করিতে হইবে, তাহার সকল কথা তাহাতে আছে। উপরি উপরি—ভাসা ভাসা-রূপে পড়িলে মনে হইবে, এ হেন শিবঠাকুরের মধ্যে শ্রদ্ধা করিবার কিছু নাই। কবি বলিতেছেন, বুড়ো শিব সারারাত্রি জাগিয়া বাঘের মত ক্ষেতে পাহারা দিতেছেন।

মেনকা বলিলেন, গিরিরাজ, তুমি বেতো রোগী—একরূপ অচল, চলাফেরা তোমার পক্ষে সহজ নহে, উমাকে বৎসর বৎসর আনতে যাওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর, অথচ উমাকে ছাড়া থাকতে দিন-রাত আমার প্রাণে কেমন একটা হাহাকার হয়। তুমি এবার শিবের সঙ্গে উমাকে লইয়া আইস, আমি তাহাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিব। সে একটু রাগী, কিন্তু ভোলানাথের মস্ত বড় গুণ এই যে, একটা জবা, ধুতুরা-ফুল কিংবা বিল্বপত্র পাইলে অমনি খুসী হইয়া যান। তাঁহার রাগ যত সহজে জ্বলিয়া উঠে, আবার তত সহজেই নিভিয়া যায়।

যখন এই সকল আখ্যানের ভিতর দিয়া গ্রাম্য-গৃহস্থালী, কৃষকের জীবন-যাত্রা, বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তরুণী ভার্য্যার দাম্পত্য-কলহের চিত্র, এই সকল আলোচনা করিবেন, তখন মনে পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নটি হওয়া স্বাভাবিক, এই কি শিবঠাকুর? এই কি শৈব ধর্ম্ম? কিন্তু ইহা যে ধর্ম্ম, ইহা যে অত্যুন্নত শৈবাদর্শ, তাহাতে একটুও ভুল হইবে না—উপসংহারকালে মেনকা শিবঠাকুরকে ঘরজামাই করিতে চাহিলে, কবি বলিতেছেন, যাঁহার কুবের ভাণ্ডারী, তাঁহাকে তুমি তোমার রাজধানীর লোভ দেখাইয়া এখানে আনিতেছ! যিনি সোনার পুরী কৈলাস ছাড়িয়া শ্মশানে-মশানে বেড়ান,—যাঁহার কাছে পাঁক পঙ্কজ,—ছাই ও চন্দনের এক দর, তাঁ'কে তুমি সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে আসক্ত করিতে চাও! এই দারিদ্র্য যে তাঁহার লীলা,—তিনি ভিখারীর পর নহেন, বরঞ্চ ভিখারী তাঁহার কত অন্তরঙ্গ, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার এই ভিখারীর সাজ। কাশীদাস লিখিলেন, সকলে যাহাকে ঘৃণা করে, শিব তাহাকেই প্রাণের বস্তু বলিয়া তুলিয়া লন; এই জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ছাড়িয়া ছাইকে এত আদর; রত্ন-পট্টাম্বর ছাড়িয়া তিনি বাঘছাল পরেন,—নির্গুণ শিব বুড়ো বলদটিকে বাহন করিয়াছেন এবং নন্দী-ভৃঙ্গীকে আদরে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন। এই শৈব-বিভূতি—শৈব-লীলার মহিমা চাষরাও অনায়াসে বুঝিতেছে। জগৎ যখন বিষের প্লাবনে ভাসিয়া যায়, তখন তিনি স্বয়ং তাহা পান করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থনের সারদ্রব্য—ঐরাবত কুঞ্জর, উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গ এবং পারিজাতপুষ্প দেবরাজ লুটিয়া লইলেন, দেবাদিদেব মহাদেব লইলেন বিষ—জগৎরক্ষার জন্য। তাহা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়া চিরকালের জন্য নীলকণ্ঠ হইয়া রহিলেন।

চাষীদের গানের শিব চাষী হইয়া চাষীর অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। এ দিকে তিনি কত বড়, সে অপূর্ব্ব শৈব-মহিমাও চাষীদের অবিদিত নাই। শিব মহান্ হইতেও মহান্—তাহাও এই চাষীর সাহিত্যে তেমনই ভাবে পাওয়া যায়, যে ভাবে তিনি অণুরণী অণীয়ান্, এই সত্য তাঁহার কৃষি-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি পরাৎপর, এ কথাও তাহারা যেমনই বুঝাইয়াছে, তিনি ক্ষুদ্রেরও আপনার হইতে আপনার, এ কথাও তেমনই প্রমাণ করিয়াছে।

ভগবানকে যে এই ভাবে আপনার করিয়া দেখা, তাহা বঙ্গের

বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেরূপ পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহার তুলনা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বৈষ্ণব-ধর্মে বাঙ্গালার দান পঞ্চতত্ত্ব, যাহা রাম রায়ের মুখ দিয়া মহাপ্রভু কহাইয়াছেন। এই যে শিশুটিকে আমরা আঙ্গিনায় খেলিতে দেখি, ইহার মত আশ্চর্য্য, জগতে আর কিছুই নাই। মায়ের কালো কুৎসিত ছেলেটি তাঁহার নয়নের মণি। সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া তিনি সেই ছেলেটির মুখ দেখেন, তবু সেই মুখের শোভা—কুৎসিতের রূপ, ফুরায় না। বাঘের মত নির্ম্মম কোন জীবজন্তু নাই, তবুও সেই বাঘের দৃষ্টিতে শাবকটি মমতার উৎস-স্বরূপ। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন, যাহা কুৎসিত, তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্য লাভ করে কিসে? যে স্বভাবে নির্ম্মম, তাহার মন এরূপ নবনীত-কোমল হইয়া যায় কিসে? উত্তরে তাঁহারা বলেন, ভগবান্ স্বয়ং জীব-রক্ষার জন্ত মাতার নয়নে বাৎ-অঞ্জন পরাইয়া শিশুরূপে দেখা দেন; প্রতি বার তিনি মায়ের বুকের সমস্ত সুধা আহরণ করিয়া মূর্ত্ত হইয়া শিশুরূপে পুনঃ পুনঃ জগতে আসিতেছেন; তাঁহার পালনীশক্তি এই ভাবে জগৎ রক্ষা করিতেছে। বাৎসল্যে যে লীলা, দাম্পত্যেও সেই লীলা, সখ্যেও তাহাই। আমাদের গৃহের আঙ্গিনায় যে ক্ষুদ্র জীবটি খেলিয়া বেড়াইয়া যায়, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন, সে যখন কুন্দ-দন্ত বিকাশ করিয়া হাসে, তখন তাহার মুখে ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব দেখিতে পাইবেন—কুরূপের রূপের অন্ত নাই। একদা কৃষ্ণ হাঁ করিলে যশোদা সেই মুখে অনন্তের আভাস পাইয়াছিলেন। তিনি সখ্যে, বাৎসল্যে এবং দাম্পত্যে ক্ষুদ্র উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বয়ং নয়ন-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ান এবং কুরূপকে রূপ-মণ্ডিত করেন ও দুর্ব্বলকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দেখান। একটি হিংস্রজন্তুপূর্ণ জঙ্গলে শীর্ণা মাতা তাঁহার শিশুটিকে কোলে লইয়া যাইতেছেন; মায়ের মন ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে, কিন্তু শিশু তাঁহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া অসীম নির্ভরের সহিত চলিতেছে, তাহাকে যদি ক্রমওয়েল্ তাঁহার সমস্ত 'আয়রন্ সাইড্' লইয়া আশ্রয় দিতে উপস্থিত হন, তবুও সে মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না। ক্ষীণ-শরীরা মাতার উপর তাহার এই অনন্ত বিশ্বাসের কারণ কি? আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের স্নেহ-ভালবাসার মধ্য দিয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগের দৃষ্টিতে এই ভাবে বারংবার ধরা দেন, এজন্তই এত বিশ্বাস, এত রূপের আবিষ্কার, এত ত্যাগস্বীকার জগতে সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা বৈষ্ণবী মায়ায় ঠেকিয়া তাঁহাকে দেখি না, দেখি শুধু মানুষকে। তাঁহাকে এই ভাবে চেনার পর দারাপুত্র-পরিবার কেউ নয় কেউ নয় বলিয়া বিরাগের চীৎকার করার কোন মূল্য নাই। সকল রূপের মধ্যে তাঁহার রূপ, সকল লীলার মধ্যে তাঁহারই লীলা। বৈষ্ণবদের গোষ্ঠে সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া, যশোদার বাৎসল্যে ও রাধার মহা-ভাবে বাঙ্গালী গৃহ-আঙ্গিনা ও স্বীয় বাসস্থানের সীমানার মধ্যে ভগবান্‌কে আনিয়া যেমন ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। ইহাই তাঁহার মহা দান। অন্য সকল সম্প্রদায় কর্ত্তব্যের মধ্যে, সাংসারিক কার্য্যের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ভগবানের আদেশ-বাণী আবিষ্কার করিয়াছেন। জীব তাঁহার দাস, শুধু আজ্ঞা প্রতি-পালন করিবে। মানুষ শুধু কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছে, ইহার উপর আর কিছু নাই। বাইবেলে বলেন, মানুষ জীবনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে মহা-বিচারের দিনে তিনি ভাল লোকদের বলিবেন, Well done, ভাল কায করিয়াছে। ইহাই তাহার চূড়ান্ত পুরস্কার। কিন্তু কর্ম্মশালার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যে স্থানের নাগাল পায় না, বৈষ্ণবের রসের বৈকুণ্ঠ সেই ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত। এখানে কর্ম্মশীলতার শেষ নাই, কর্ত্তব্যের কোন গণ্ডী নাই, এখানে এটায় ছুটী হয় না। জননী, প্রণয়িনী এবং সখার কি সেবার অবধি আছে? সে সেবা উৎকটতম অথচ তাহাতে শ্রম-বোধ নাই। প্রেমের দায়ে আত্মহারা হইয়া যাঁহারা কায করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সমস্ত কার্য্যের সার, তাহাতে প্রাণান্ত কষ্টেও পরমানন্দ, তাহা সংগীতের সার, সামবেদ।

ভগবান্‌কে ইঁহারা এতই আপনার জন মনে করিয়াছেন যে, আপনার জনের যে পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য থাকে, তাহাই তাঁহারা ভগবানের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। যে তাঁহাকে চায়, আর কিছু চায় না, তাহার কাছে জগৎস্বামীর হা'র হইয়া গিয়াছে, তিনি কিছু দিয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিলেন না। তাহার জোর তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইবেই, তাহার মান ভাঙ্গিতে তিনি তাহার পায়ে হাত দিয়া মিনতি করিয়া থাকেন, ইহা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্ত কেহ ধারণাই করিতে পারিবে না। বাঙ্গালার ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রভেদ একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, অন্যত্র ব্যবধান খুব বেশী। ভগবান্‌কে যে ভালবাসা যায়, তাহা বাঙ্গালী যেমন করিয়া দেখাইয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্ত্রী-পুত্রের জন্ত মানুষ যাহা করে, মহাপ্রভু তাহাপেক্ষা বেশী আকুতি-কাকুতি করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ভগবান্‌কে যত ভাল-বাসা যায়, পৃথিবীতে অন্ত কিছুকে তাহার শতাংশের একাংশ ভালবাসা যায় না। এজন্ত গৌরাঙ্গদেব এ দেশের চাষী হইতে রাজ-রাজন্ত পর্য্যন্ত সকলের নয়নের মণি হইয়াছেন। অন্যত্র কোন ভক্ত বা মহাজনের জীবনী লইয়া বড় বড় পুস্তক লিখিতে হয়, তাহা শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য। মহাপ্রভুরও সেরূপ জীবন-চরিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশের চাষীরা জীবনী গানে গানে আঁকিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গানের পূর্ব্বে গৌর-চন্দ্রিকা গাহিয়া তাহারা চৈতন্য-লীলার আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এই সকল গানের অবধি নাই। বাঙ্গালার যত-গুলি কুন্দফুল, গৌরচন্দ্রিকাও সংখ্যায় তাহার কম নহে। এরূপ গানে গানে জীবনী আর কাহার আছে? বৈষ্ণব সাহিত্য, জগতের সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। একাধারে রূপ ও অরূপকে,—পার্থিব ও অপার্থিবকে আর কোন সাহিত্য এমন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। পদাবলী পড়িয়া দেখুন, যেমন কোন পর্য্যটক নদীর দুই ধারে পুষ্পরেণু-মণ্ডিত—ভ্রমরগুঞ্জরিত রমণীয় উদ্যান ও জনশালিনী অভ্র-কিরীটিনী নগরী দেখিতে দেখিতে যাইয়া যখন সমুদ্রের মোহানায় উপস্থিত হন, তখন পশ্চাদ্ভাগের যত কিছু দৃশ্য ও শব্দ, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া সম্মুখের অকূল অফুরন্ত বিশাল জলধি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিমূঢ় করিয়া ফেলে, তেমনই এই সাহিত্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের শত দৃশ্য, সখ্য ও বাৎসল্যের শতচিত্র, গৃহ-প্রাঙ্গণ ও গোষ্ঠলীলার শত লীলা দেখিতে দেখিতে পাঠক আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবেন—যেখানে রূপের শেষ রেখা বিলীন হইয়াছে ও অরূপ তাহার আভাস দিতেছে। যেখানে পার্থিব রসের অপার্থিবে পরিণতি ও যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও উপভোগ্য, তাহা

আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদের এক দিকে জন-কোলাহল অপর এক দিকে দৈববাণী,—এক দিকে বাঁশীর সুরে গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অপর দিকে মানুষকে তাহার একমাত্র অন্তরঙ্গের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জগতের কোন সাহিত্যে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মকে এতটা মনোবুদ্ধির গোচর করে নাই। যদি শ্রদ্ধার সহিত কোন ভাল কীর্ত্তনীয়ার গান শোনেন, তবে এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বীজ ভারতে ছড়ান ছিল। পরমহংসদেব এই যুগে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস গ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, "যত মত তত পথ।" ভিন্ন মত হইলে তাহা অশ্রদ্ধেয় হয় না, বরং আর একটা পথের সন্ধান দেয় মাত্র। কেশব যখন নববিধান প্রচার করেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি করিলে কেশব? পুকুরের চারটা ঘাট ছিল, তিনটে ভেঙ্গে একটা রাখলে?" এমন উদার কথা এই যুগে বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কোন স্থানে উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। তুমি ব্রাহ্ম হও, শাক্ত হও, নববিধানই হও, হিন্দু হও, খৃষ্টান বা মুসলমান হও, প্রত্যেকটি ঘাট পুকুরের জল আনার পক্ষে দরকারী এবং সে কাযের উপযোগী—সমস্তই বজায় থাকুক। বাঙ্গালার মহাপুরুষ নিজের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মের তপস্যা করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন। নিজে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিচ্ছেদের আর একটা রেখা টানেন নাই। এই সার্ব্বজনীন উদারতা, এই অমৃতফল বাঙ্গালার। ভগবানকে, পুত্র, সখা ও প্রণয়িণীর শত লীলার মধ্যে বাঙ্গালী যেরূপ অন্তরঙ্গরূপে পাইয়াছে, তাহাও অন্যত্র দুর্লভ।

বাঙ্গালার শিল্পেও সেই বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন হরগৌরী, বুদ্ধ ও বাসুদেব-মূর্ত্তিতে তাহা স্পষ্ট—তাহাতে একটা অপার্থিব আনন্দ আছে—যাহা শুধু বাঙ্গালী শিল্পীই আঁকিতে জানেন। হরগৌরীর একখানি প্রস্তরমূর্ত্তি আমার নিকট আছে, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর। শিব গৌরীর চিবুক ধরিয়া তাঁহার মুখখানি দেখিতেছেন,—সেই স্নেহমধুর দৃষ্টিতে যে আনন্দ আছে, তাহা পার্থিব আনন্দ নয়,—পুকুরের জলের সঙ্গে বারিধির জলের যে প্রভেদ, খণ্ড আকাশের সঙ্গে সীমাহীন বৃহৎ আকাশের যে প্রভেদ, পার্থিব সুখের সঙ্গে এই আনন্দের সেই প্রভেদ। শিব গৌরীর চিবুকখানি ধরিয়া আছেন, তাঁহার হস্তের অঙ্গুলীর প্রত্যেকটি দিয়া শতধারায় সেই অপার্থিব স্নেহ-সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সেই আনন্দ-জাত স্নেহ ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই আনন্দ শরীর অতিক্রম করিয়া মূর্ত্তিটিকে চিন্ময় করিয়া তুলিয়াছে। যে বাঙ্গালী দ্বারা এই হরগৌরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব। আপনাদিগকে আমি ৫৫নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বলাইলাল মল্লিকের বাড়ীতে রক্ষিত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের ছবিখানি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি। যে সময় র‍্যাফেল্ ইটালীতে বসিয়া ম্যাডোনা আঁকিয়াছিলেন, অপরিজ্ঞাত-গোত্র-নামা বাঙ্গালী চিত্রকর সেই সময় এই চিত্র আঁকিয়াছিলেন, উহা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের অঙ্কিত। বলাইবাবু এই অপূর্ব্ব চিত্রের ইতিহাস বলিতে পারিবেন। বাঙ্গালীর হাতে ডঙ্কা নাই, তাহা হইলে জগতের নিকট এই চিত্রের মহিমা প্রচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম, এইখানি ভাল কি ম্যাডোনার চিত্রখানি ভাল? গঙ্গাতীর, প্রায় শতাধিক লোক একত্র হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, সমস্ত চিত্রে যে আনন্দ পরিব্যাপ্ত, তাহার ছটায় উহা বৈকুণ্ঠলোকের সামগ্রী বলিয়া মনে হইবে। পথিক নৌকাযোগে চলিয়াছেন, তাঁহার হাত হইতে হুঁকার কলিকা খসিয়া পড়িয়াছে, জ্ঞান নাই; নির্নিমেষ-নেত্রে তিনি তীরস্থ মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন। সেই মাধুরী দর্শনে মাঝিরা বৈঠা উঁচুতে তুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েরা তাঁহাকে দেখিতেছে, লজ্জা-সরম ছাড়িয়া—কলসী গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। এই চিত্রখানি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তখনও মহাপ্রভুর গায়ের হাওয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যায় নাই, নতুবা ইহা তাঁহার ব্রহ্মানন্দের এরূপ আভাস কি করিয়া দিবে? হায় স্বদেশী! আপনাদের কাহারও কি এই চিত্র দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? স্বদেশের কোহিনুর যে অতলে তলাইয়া যাইতেছে। এই চিত্রখানিও যে নষ্ট হইবার মধ্যে। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রেঞ্চ এই চিত্রখানি এক ঘণ্টা বসিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও সন্ধান রাখেন, আমাদেরই শুধু চোখ নাই।

আর বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন, জগতের ইতিহাসে অনন্যসুলভ মহিমামণ্ডিত নব্য ন্যায় আপনারা কত জনে পড়িয়াছেন? বহুবার য়ুরোপীয়রা চেষ্টা করিয়া হটিয়া গিয়াছেন। সেই অতি সূক্ষ্মতর্ক বিশ্লেষণের জটিল গতিবিধি অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহারা হারিয়া গিয়াছেন। এই ন্যায়শাস্ত্র, যাহা উচ্চশিক্ষার উচ্চতম কোঠায় অবস্থিত, তাহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এতটা প্রচার ও আদর লাভ করিয়াছিল যে, আমাদের গ্রামে গ্রামে ন্যায়-পঞ্চানন, তর্কচঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য এ দেশে এখন যে ব্যবস্থা, কিছুদিন পূর্ব্বে এ দেশে তাহার অনেক বেশী ছিল। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ের এক টুলো পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর টোলে ৫ শত পড়ুয়া পড়িত। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলের আহারাদির ব্যয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরবরাহ করিতেন।

যদিও প্রাচীন-সাহিত্য, শিল্প ও সমাজের ইতিহাস অনুশীলনের জন্য আমি আপনাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমি বঙ্গীয় সভ্যতার কোন স্থানে দাঁড়ি টানিয়া তাহাকে 'স্থিরো ভব' বলিয়া নিশ্চল হইতে পরামর্শ দিতেছি না। বঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বাধীনতা। বঙ্গের পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে ন্যায়শাস্ত্রকে ধর্ম্মের অনুশাসন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। যখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" শব্দে ভারতের দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ, তখন ভারতের ছোট ছোট ভূস্বামীরা পর্য্যন্ত "প্রাণ দেব, তথাপি দিল্লীর রাজকোষে কর দিব না"—এই বিদ্রোহী সুর তুলিয়াছিলেন। শুধু প্রতাপ, ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায় এইভাবে জলন্ত অগ্নির সমক্ষে পতঙ্গের ন্যায় সম্মুখীন হন নাই। পালাগানে ক্ষুদ্র ভূস্বামী ফিরোজ খাঁর নির্ভীক উক্তি পাঠ করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যখন অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী যাহার "দন্ত মুকুতা গঞ্জতন" তাহাকে পিতামাতা "বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দর্শন" এমন লোকের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করাই নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন—সে সময়ে বাঙ্গালীর কৃষক কবি উচ্চকণ্ঠে

বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের মনোনয়ন দ্বারা যে বিবাহ হয়—তাহাই তাহার স্বর্গ—নারীজীবনের তদপেক্ষা কাম্য আর কিছু নাই। যেখানে সতীধর্ম্মকে ব্রাহ্মণরা সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেখানে সহজিয়ারা নির্ভীকভাবে বলিয়াছেন, যে প্রেম কুল বিসর্জ্জন দেয়, যাহা পরনিন্দাকে পুষ্পচন্দন বলিয়া মনে করে, যাহাতে পিতৃকুল, স্বামিকুল পরিত্যাগ করে এবং নারীর নিকট স্বর্গ তেমন কাম্য হয় না, যেমন প্রিয়জনের মুখদর্শন,—সেই প্রেমদেবতার একনিষ্ঠ সেবিকা, সেই কুলকলঙ্কিনীই সতী-শিরোমণি। পরকীয়াই তাহাদের আদর্শ। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র এই স্বাধীন চিন্তার বিকাশ—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য খুঁজিতে গিয়া এই চিন্তার স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথমে চোখে পড়িবে। আতিথ্য করিতে হইবে, পিতা স্বয়ং করাত ধরিয়া পুত্রের মস্তক কাটিতেছেন, মাতা পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে ভক্ষণ করাইতেছেন—বাঙ্গালার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আদর্শ অবাধ, তাহার কোন স্থানে বিরাম-চিহ্ন নাই। বাঙ্গালার এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে যেইখানে ছিলাম, সেইখানে গিয়া স্থির হইব। বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা-প্রণালী আমাদের দৃষ্টিতে নানা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বতন চিন্তার ধারাকে নব-প্রবর্ত্তিত নানা খাদে বহাইয়া দিতে হইবে। তবে উন্নতি করিতে হইলে নিজের জিনিষ কড়া-ক্রান্তির হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে বৈ কি?

আমার এখন জীবনাবসানের সময়। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যাস্তের শেষ-রেখা দিনান্তের দিগ্বলয় হইতে মুছিয়া যাইতেছে। ভগবানের নিকট জীবনসন্ধ্যার আমার এই প্রার্থনা, যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন বঙ্গমায়ের অঙ্কেই জন্মগ্রহণ করি। আমি লণ্ডন, প্যারী, সেণ্টপিটার্সবর্গ, মস্কো, ভিয়ানা, বোষ্টন, বার্লিন, এমন কি, টকিওর রাজপ্রাসাদে বিধি অনুগৃহীত কোন শ্বেতাঙ্গ বা পীতাঙ্গ রাজকুলে জন্মিতে চাহি না। আমি সে বিজয় চাই না, যাহাতে পরের পরাজয়—আমি সে গৌরবস্তম্ভ চাহি না, যাহা অন্য জাতির ভগ্ন ও চূর্ণ মনোরথের ইট-সুরকীর উপাদানে গঠিত, সে রাজকোষ চাহি না, যাহা নির্ম্মম পরকীয় উদরান্ন লুণ্ঠনের গৌরবে দর্পিত। হউক না দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট, বঙ্গের পল্লীই আমার শ্রেষ্ঠতম শান্তি ও আনন্দের উৎস। কবে দীর্ঘ-বিলম্বিত দুঃখ-রজনীর অবসানে সেই নিগৃহীত পল্লীর দুর্দ্দশা ঘুচিবে—তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। কবে আমাদের স্নেহ-শীতল শত স্মৃতি-জড়িত আম, জাম, কাঁঠালের শীর্ষে স্বর্ণচ্ছটা দান করিয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় হইবে? নিদারুণ ব্যাধি-যন্ত্রণাকাতর মাতার রোগের শয্যা ত্যাগ করিয়া যেমন সন্তান অন্য স্থানে গেলে ক্ষণমাত্র সোয়াস্তি পায় না, আমার আত্মা সেইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার চিরদুঃখময়ী বঙ্গভূমির পার্শ্বেই থাকিতে চায়। ইঁহার পবিত্র পরম শান্তিপ্রদ অঙ্ক ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও যাইতে আমার সাধ নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হৃদয়-বীণা

আমার বীণাখান
দিবানিশি শুধুই গাহে করুণ সুরের গান!
যতই বলি, বাজ রে বীণা বাজ—
ধরার 'পরে ছড়িয়ে দে রে দীপক সুরের ঝাঁজ;
শতেক বাঁধন যাক্ না টুটে,
উধাও হয়ে পালাই ছুটে
কোন্ সুদূরের পার;—
ঝঙ্কারিয়া অমনি বীণার তার,
মেঘ-মল্লার ঝরণা ঝরায়,—সব ভাষা যায় ভেসে,—
সুরের মাঝে লুটিয়ে পড়ি উদাস হাসি হেসে!

বীণায় বলে ভাই,
উপায় ত আর নাই,—
আমার বুকের পর্দ্দাগুলি ঐ সুরে যে বাঁধা,
তার 'পরে যে আঙুল খেলে ঐ সুরে সে সাধা;
নিত্য ব্যথার বোঝাই ব'য়ে,
নিত্য ব্যথার কথাই ক'য়ে,
অভিনয়টাই সত্য হ'ল আজ—
পাগল সেজে পাগল হ'লে,—আজকে প'রে তাজ
কেমন ক'রে সাজবে মহারাজ!

কইনু আমি বীণায় ডেকে,—
এমনি মাঝে থেকে থেকে,
আর ফেলো না সুরের নিশ্বাস হতাশ-করা মন,
স্তব্ধ কর অনর্থকর এ ব্যর্থ আলাপন।
হায় রে আমার বীণা
হয়ে কণ্ঠহীনা
কইলে,—তবে বুকের 'পরের পরশ কর মানা,
ছিন্ন কর তার,
শূন্যে পাখী উড়বে না আর কাটলে পরে ডানা,
গাইবে নাক আর!
চূর্ণ কর তূর্ণ মোরে, পূর্ণ কর সাধ
ঘুচুক পরমাদ।
উচ্ছ্বাসে তায় বক্ষে ধ'রে,
কইনু বীণায়—আমার ওরে,
এমনি সুরেই থাক্ রে বাঁধা এমনি গাহি' গান
এমনি ব্যথার বোঝাই লয়ে বাইব জীবন-যান।
তুমিই থাক—তুমিই থাক,
আর ত কিছুই চাইব নাক,
শতেক জনম থাকবো আমি নিঃস্ব অতি দীন,
একটি পলক চাই না হ'তে হৃদয়-বীণা-হীন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আফ্রিকার কুম্ভীর-দেবতা

(রহস্যমূলক সত্য ঘটনা)

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বুয়ার যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ সৈন্যদলের অন্যতম অধিনায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল সার আর, এস্‌, বাডেন-পাওয়েল দক্ষিণ-আফ্রিকায় শান্তিরক্ষার জন্য যে সৈন্যদল নিয়োজিত করিয়াছিলেন, হেনরী কুর্টিস নামক এক জন সৈনিক-যুবক সেই দলের কর্পোরালের কার্য্য করিতেন; পরে তিনি পুলিস বিভাগে সার্জ্জেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্জ্জেণ্ট কুর্টিস অল্পদিনের মধ্যেই পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় সেই নগণ্য 'পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর' এখন দক্ষিণ-আফ্রিকার ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের প্রধান ও যশস্বী কর্ম্মচারিগণের অন্যতম এবং 'লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলে'র উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।

লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল কুর্টিস্‌ অল্পদিন পূর্ব্বে কোন চন্দ্রালোকিত রজনীতে কঙ্গো রাজ্যের সাবি গ্রামের নিকট তাঁহার তাম্বুতে বসিয়া অদূরবর্ত্তী লিম্‌পোপো নদীর কুম্ভীর-দহের প্রসঙ্গে তাঁহার কোন বন্ধুকে যে গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়াবহ, সেইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক; এরূপ অদ্ভুত কাহিনী উপন্যাসেও বিরল। বর্ত্তমান মাসে লণ্ডনের কোন শ্রেষ্ঠ মাসিকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের নিজের কথায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সৈন্যবিভাগে তিন বৎসর চাকরী করিবার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই প্রিটোরিয়ার সদরে আমার বদলীর হুকুম হইল। লিডেনবার্গ ও সাবি এই গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী লিম্‌পোপো থানায় আমার কাযের ভার পড়িল। এক জন কর্পোরাল, তিন জন য়ুরোপীয় সাধারণ সৈন্য এবং চারি জন সাধারণ কনষ্টেবল এই থানায় চাকরী করিত।

এ দেশের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বহুদিন হইতে আমার আগ্রহ ছিল; এ জন্য আমি অবসর পাইলেই বাণ্টু, বিশেষতঃ স্বাহিলী ভাষা শিক্ষা করিতাম, সেকুকুনা জিলায় স্বাহিলীই প্রধান ভাষা।

থানার ভার আমারই হাতে পড়িয়াছিল; সুতরাং রোঁদে বাহির হওয়া আমার কর্ত্তব্য-বহির্ভূত। তথাপি আমি নিয়মিতভাবে রোঁদে বাহির হইতাম, এবং আমার এলাকামধ্যে যে সকল বস্তী, খামার প্রভৃতি দেখিতাম, সেই সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিন ঘটনাচক্রে এরূপ লোমহর্ষণ দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিলাম যে, মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় আমার প্রাণবিয়োগের আশঙ্কা ছিল।

আমি এখানে বদলী হইয়া আসিবার দশ দিন পরে জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে, লিম্‌পোপো নদীর বাঁ-ধারে ঘুরিতে ঘুরিতে এক ছোট গোলাবাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই গোলা-বাড়ীটি নিবিড় 'মোপানী'-বনে পরিবেষ্টিত থাকায় হঠাৎ তাহা দূর হইতে দেখা যাইত না। ইহার প্রায় দুই শত গজ দূরেই নদী। আমি অশ্বারোহণে গোলাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া একটি প্রৌঢ় ('ডচম্যান') ওলন্দাজকে দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার জাতীয় প্রথা অনুসারে আমার নাম, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, তিনি বলিলেন—তাঁহার নাম পিট ভ্যান্‌ এণ্টওয়ার্প। যুদ্ধের পর তিনি লিডেনবার্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ (এক কন্যার বয়স তখন তিন বৎসর মাত্র) এই নদীর তীরে বাস করিতেছেন; কারণ, তাঁহার চিরপ্রিয় জাতীয় পতাকা 'ভিরক্লু'র পরিবর্ত্তে (ট্রান্সভাল সাধারণ-তন্ত্রের পতাকা) 'ইউনিয়ন জ্যাক' লিডেনবার্গের দুর্গ-শিরে উড়িতেছে, এ দৃশ্য তাঁহার অসহ্য। আমি ইংরাজ, ইহা জানিয়াও প্রাচীন ওলন্দাজটি তাঁহার জাতীয় বিশিষ্টতা আতিথেয়তায় বিমুখ হইলেন না, আমাকে ঘোড়া হইতে নামিয়া, তাঁহার ঘরের 'ষ্টোপে' (বারান্দা) উঠিয়া বসিয়া এক পেয়ালা কফি পানের জন্য অনুরোধ করিলেন।

কিছু কাল পরে তাঁহার স্ত্রী এবং পনের ষোল বৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন; অতঃপর আমি নৈশ-ভোজনেও নিমন্ত্রিত হইলাম।

সন্ধ্যার পর আহারে বসিয়া আমরা নির্ব্বাক্‌ভাবেই আহার করিতেছিলাম। সেই সময় নদীর দিক্‌ হইতে একটা অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইল; কিন্তু তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। গৃহস্বামীর কন্যা কাট্রিনাও সেই শব্দ শুনিতে পাইল। সে তাহার মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া 'টাল' (কেপ ডচ্‌) ভাষায় বলিল, "আজ পূর্ণিমার রাত্রি কি না, আজ রাত্রিতে কুমীরগুলা ভারী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মা! আমি ভাবিতেছি, কাল সকালে গ্রামের ভিতর কাহার ছোট মেয়ে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!"

বালিকার কথাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিয়া আমার কেমন-কেমন মনে হইল! আমি তাহাকে তাহার কথার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলাম।

কাট্রিনা আমাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহার পিতা আমাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মন গভীর চিন্তায় পূর্ণ হইল।

ভ্যান্‌ এণ্টওয়ার্প আমাকে যাহা বলিলেন—তাহার মর্ম্ম এই যে, স্থানীয় আসোবঙ্গো সম্প্রদায়ের 'নেটিভ' শাসনকর্ত্তাটি তাঁহার গোলা-বাড়ীর অর্দ্ধ-মাইল দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে বাস করিত; কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে গ্রামের মোড়লদের ('ইণ্ডুনা') ডাকাইয়া, মৃত্যুর পর তাহার আত্মার কল্যাণজনক কোন অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছিল।

সেই সকল উপদেশ বা আদেশের মর্ম্ম ভ্যান্‌ এণ্টওয়ার্প কোনও দিন জানিতে পারেন নাই; তিনি এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতি মাসেই পূর্ণিমার

রাত্রিতে গ্রাম্য-রোজারা লিম্‌পোপো নদীর 'কুম্ভীর-দহ' নামক দহের নিকট সমবেত হইয়া কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পন্ন করে। তাহার পরদিনই গ্রামের অধিবাসিগণের কাহারও না কাহারও একটি ছোট মেয়েকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তিনি আরও বলিলেন, 'আমি এই অসোবঙ্গো-গুলার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চেহারার কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি না; সকলগুলিই দেখিতে ঠিক একই রকম! কিন্তু কাট্রিনা তাহাদের সকলকেই চেনে; দিবসের অধিকাংশ সময় সে গ্রামের ভিতর কাটাইয়া আসে।"

ঠিক সেই সময় একটি শিশুর রোদনধ্বনিতে সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল; বিবি ভ্যান এণ্টওয়ার্প তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার তিন বৎসর বয়স্কা মোটা-সোটা ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কাট্রিনা যখন গ্রাম হইতে ছোট ছোট মেয়েদের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিতেছিল, সেই সময় আমি বিবি ভ্যান এণ্টওয়ার্পের চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলাম; এতক্ষণ পরে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম।

সেই রাত্রিতেই কুম্ভীর-দহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার সঙ্কল্প করিলাম, পূর্ণিমার রাত্রিতে সেখানে কিরূপ ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিব; তাহার পর যে ব্যবস্থা কর্ত্তব্য মনে হইবে, সুযোগ বুঝিয়া আর এক দিন তদনুসারে কায করিব। আমি সদর ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম; এখানে যেরূপ আতঙ্ক-জনক নিষ্ঠুর কার্য্য সংঘটিত হউক, তাহাতে আমার বাধা দানের শক্তি নাই; সে জন্য চেষ্টা করিলে হয় ত আমাকে বিপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু স্বয়ং তাহা দেখিবার সুযোগ ত্যাগ করিলাম না।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। আমি আসোবঙ্গোদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্য 'মোপানী' বনের আড়ালে বসিয়া রহিলাম। আমার আশঙ্কা হইল, যে সকল আসোবঙ্গো চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের কেহ হয় ত আমাকে দেখিয়া ফেলিবে; কিন্তু আমি সতর্ক ছিলাম, কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, কেবল দহের জলে ভীষণাকার বিশালদেহ কুম্ভীরগুলির আস্ফালনের শব্দ! দহের গভীর জলরাশি তাহারা আন্দোলিত আলোড়িত করিতেছিল। এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর পূর্ব্বে কোন দিন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তাহার পর হঠাৎ গ্রামবাসীদের ঢক্কাধ্বনি শুনিতে পাইলাম, বিরক্তিকর একঘেয়ে শব্দ, অত্যন্ত অবসাদজনক; কিন্তু আফ্রিকার অরণ্যে সেই শব্দ যে একবার শুনিয়াছে এবং সেই বাদ্যধ্বনির কারণ জানিতে পারিয়াছে, সে সেই শব্দ জীবনে কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।

আমি সেই বনের আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া চন্দ্রালোকিত গ্রাম্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই পথ গ্রাম হইতে দহের ধার পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে গ্রামবাসীরা যতই আমার নিকটে আসিল, শব্দ ততই অধিক গম্ভীর হইতে লাগিল। সেই শব্দে কুমীরগুলা যেন ক্ষেপিয়া উঠিল! তাহারা মুখব্যাদান করিয়া লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে করিতে প্রচণ্ডবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দহের জলরাশি সঘন আবর্ত্তিত ও আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইল, দহের ভিতর তুফান আরম্ভ হইয়াছে।

পথ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। চন্দ্রালোকিত পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে খালি পায়ের 'থপ্ থপ্' শব্দ শুনিতে পাইলাম; তাহার পর গ্রামবাসীদের শোভাযাত্রা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের অন্তরাল হইতে উৎসব-মত্ত লোকগুলা আলোকোজ্জ্বল পথে আসিল। সেরূপ ভীষণ বীভৎস দৃশ্য আমি পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

প্রথমেই গ্রাম্য রোজা। তাহার দীর্ঘ দেহ ক্ষীণ। তাহার কণ্ঠে সাপের খোলসের ও মানুষের হাড়ের মালা! তাহার মাথায় কুমীরের মুখের মত একটা মুখোস, যেন কুমীরটা হাঁ করিয়া দুই-পাটী সুদীর্ঘ দাঁত বাহির করিয়া শিকার ধরিতে উদ্যত হইয়াছে! আমার স্মরণ হইল, কিছু দিন পূর্ব্বে দেশীয় সব্-কমিশনার প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাদের কুম্ভীর-দেবতার কথা বলিয়াছিল। আমার মনে হইল—এই কি সেই দেবতা, না দেবতার পুরোহিত? তাহার আকার-প্রকার দেখিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইল।

রোজার পশ্চাতে আর এক মূর্ত্তি, তাহাও ঐরূপ ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার মুখোস ছিল না। তাহার ক্রোড়ে একটি শিশু; কিন্তু শিশুটি নিদ্রিত কি মৃত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

দীর্ঘ-দেহ বৃদ্ধ রোজা দহের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের ভিতর ভীষণাকার জানোয়ারগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতে দেখিলাম; কিন্তু কুমীরগুলার আস্ফালনের শব্দে তাহার কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না, তবে বুঝিতে পারিলাম, সে কিছু বলিতেছিল।

রোজার পঞ্চাশ জন উলঙ্গ অনুচর শ্রেণীবদ্ধভাবে দহের নিকট দণ্ডায়মান হইলে, রোজা জলের ধারে আসিয়া কি ইঙ্গিত করিল; সেই ইঙ্গিতে কুমীরগুলার আস্ফালন বন্ধ হইল, দহের জলরাশিও স্থির হইল। তখন রোজা কুম্ভীর-দেবতাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিল, তাহা আমি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। আমি স্বাহিলি ভাষা জানিতাম বলিয়াই রোজার কথাগুলি বুঝিতে আমার কোনরূপ কষ্ট হইল না। প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাত্রিতে তাহাদের গ্রাম হইতে এক একটি মেয়ে কি জন্য অদৃশ্য হয় এবং কোথায় যায়, তাহাও তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম; সহসা যেন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্ধকারের যবনিকা অপসারিত হইল।

রোজা জলের ধারে দাঁড়াইয়া কুমীরগুলিকে লক্ষ্য করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তাহা সর্দ্দার ঔসোলুর আদেশের প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে।—ঔসোলুর সেই আদেশের মর্ম্ম এই যে, পরলোকে তাহার আত্মাকে একাকী নির্জ্জনে বাস করিয়া কষ্ট পাইতে না হয়, তাহার আত্মা স্বদেশীয় সঙ্গিগণের সহবাসে কাল-যাপন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাত্রিতে অসোবঙ্গো জাতির এক একটি বালিকাকে আনিয়া দহের কুম্ভীর-দেবতাগণের নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে!

রোজা দহের ধারে দাঁড়াইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহার পর পূর্ণচন্দ্র যখন ঠিক

মধ্যাকাশে আসিল, সেই সময়, রোজার যে অনুচর শিশুটিকে লইয়া আসিয়াছিল সে, জলের কিনারায় সরিয়া গিয়া মেয়েটিকে দুই হাতে উর্দ্ধে তুলিল, এবং সবেগে দহের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করিল। বালিকাটি ঘুমাইতেছিল, উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রবল ঝাঁকুনীতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে জলে পড়িল—তাহার কণ্ঠ চির-নীরব হইল; সঙ্গে সঙ্গে কুমীরগুলা তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইল। কুমীরগুলার আস্ফালনে পুনর্ব্বার জলরাশি তোলপাড় হইতে লাগিল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল; আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে আর একটি শোচনীয় দৃশ্যে আমার মন বেদনাপ্লুত হইল। গ্রামবাসীরা কুম্ভীর-দেবতার পূজার জন্য যে পথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা সেই পথেই গ্রামে প্রত্যাগমন করিলে একটি অসোবঙ্গো নারী করুণ বিলাপে অরণ্যপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অরণ্য ভেদ করিয়া সেই দহের দিকে অগ্রসর হইল। আফ্রিকার স্তব্ধ অরণ্যে সেই চন্দ্রমাশালিনী গভীর নিশায় কন্যাহারা সেই শোকার্ত্তা নারীর যে মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলাম, সেরূপ করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি জীবনে আর কখন আমার কর্ণগোচর হয় নাই। কি হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ!

গ্রামবাসীদের অজ্ঞাতসারে আমি থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পরদিন আমি অশ্বারোহণে লিডেনবার্গে উপস্থিত হইয়া আমার উপরওয়ালার নিকট সকল ঘটনার কথা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন,—ইহা পুলিস-তদন্তের বিষয় নহে; স্থানীয় নেটিভ কমিশনারই এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতে পারেন। নেটিভ কমিশনার প্রিটোরিয়ায় গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে সকল কথা বলিবার জন্য আদিষ্ট হইলাম। তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল!

সিকুকুনাল্যাণ্ডের কমিশনার মিঃ ভ্যান্ এস্—তাঁহার গ্রাম্য আফিসে ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি যে ভীষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সবিস্তারে তাঁহার গোচর করিয়া প্রতীকার-প্রার্থী হইলে, তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম!

কমিশনার ভ্যান্ এস্ বলিলেন,—'কর্পোরাল, তুমি যে এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সকল বিবরণ আমার গোচর করিলে, এ জন্য আমি বাধিত হইলাম। বস্তুতঃ, দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে মধ্যে মধ্যে এইভাবে শিশুহত্যা হয়, এ সংবাদ যে আমাদের অবিদিত, এরূপ মনে করিও না; কিন্তু এই নিষ্ঠুরাচার রহিত করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই মনে হয়। এই সকল কায দেশীয়দের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ; যদি আমরা তাহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানে বাধা দান করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, এবং শান্তিভঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু নেটিভদের সঙ্গে বিরোধ করা নানা কারণে সঙ্গত মনে হয় না। তাহারা আমাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া যথানিয়মে খাজনা ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে। তাহাদের নিকট নিয়মিতভাবে খাজনা ট্যাক্স আদায় হইলেই আমরা খুসী; তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে বা সামাজিক কুসংস্কারে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি?—তবে যদি কোন শ্বেতাঙ্গ শিশু এইভাবে নিহত হইত—তাহা হইলে এ বিষয়ে উদাসীন থাকা সঙ্গত হইত না; আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না'—ইত্যাদি।

আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে বাদানুবাদ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। ক্ষুব্ধ-চিত্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, এবং এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য সারারাত্রি ধরিয়া নানা প্রকার ফন্দী-ফিকিরের কথা চিন্তা করিয়া পরদিন পুনর্ব্বার কমিশনারের আফিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কমিশনারের হেড্ ক্লার্ক মিঃ স্কটের সঙ্গে আমার দেখা হইল। তিনি আমাকে স্থানীয় অধিবাসিবর্গের পরলোকগত সর্দ্দার ঔসোলু ও তাহার অনুচরবর্গ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাইলেন।

তাঁহার নিকট শুনিতে পাইলাম—স্থানীয় আসোবঙ্গো সর্দ্দার ঔসোলু যত দিন জীবিত ছিল—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই অবসরকাল যাপন করিত, এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মৃত্যুকালে তাহার সহচরদের বলিয়াছিল—তাহার একমাত্র ভয়—মৃত্যুর পর সে যেখানে যাইবে—সেখানে সে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখিতে পাইবে না; তাহাকে সেখানে একাকী নিঃসঙ্গভাবে কালযাপন করিতে হইবে—ইহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

ঔসোলু তাহার এই কষ্ট-লাঘবের উপায়ও তাহার অনুচরদের জানাইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিল—তাহার মৃত্যুর পর যদি তাহারা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে এক একটি শিশুকে কুম্ভীরদহের কুম্ভীর-দেবতাদের নিকট নিক্ষেপ করে—তাহা হইলে সেই সকল শিশু পরলোকে তাহার সঙ্গী হইতে পারিবে, এবং তাহার আত্মা সঙ্গী লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। বালক অপেক্ষা বালিকার জীবন মূল্যহীন—এই জন্য ঔসোলু কুম্ভীর-দহে প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে এক একটি বালিকাকেই নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছিল।

মিঃ স্কটের নিকট ঔসোলুর চেহারার বর্ণনা শুনিলাম, এবং তাঁহাদের আফিসে ঔসোলুর যে 'ফটো' ছিল, তাহাও তাঁহার নিকট সংগ্রহ করিলাম। ঔসোলুর দেহ ছয় ফিট দীর্ঘ ছিল; আমিও ছয় ফিট দীর্ঘ, এবং আমার দেহের সহিত তাহার দেহের গঠন-ভঙ্গীরও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল। আমি আরও জানিতে পারিলাম—ঔসোলু তাহার প্রতিবেশী কোন দুর্দ্দান্ত জাতির সহিত যুদ্ধে একবার আহত হইয়াছিল; ইহাতে তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে খোঁড়াইয়া হাঁটিত।

সারাদিন ধরিয়া আমার মাথায় একটা ফন্দী ঘুরিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—এই নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বর্ব্বর প্রথা রহিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি বা সহায়তা লাভের আশা নাই; এ বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন! অথচ কোন কৌশলে শিশুহত্যাপ্রথা নিবারণ করিতেই হইবে। স্থির করিলাম—বলে যাহা পারিব না, ছলে কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিব। আমার ফিকিরে বিন্দুমাত্র জটিলতা ছিল না; আমার চেষ্টা সফল হইবে বলিয়াই বিশ্বাস হইল।

আমি জানিতাম—আফ্রিকার অসভ্য জাতিগুলা অত্যন্ত কুসংস্কারান্ধ; রোজারা তাহাদের 'মোড়ল' বটে, কিন্তু তাহাদেরও কুসংস্কার অল্প নহে। তাহারা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে জনসাধারণের মন ভুলাইয়া তাহাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেও,

তাহারা যে সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে, ভণ্ডামী মনে করে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার ফন্দী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিলাম। ইহা শেষ করিতে আমার প্রায় এক মাস সময় লাগিল। জানিতাম—পূর্ণিমার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার শিশুহত্যা হইবে না, এ জন্য এক মাস বিলম্বে ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল না।

আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য টিনের কৌটার দুই কৌটা 'ফস্‌ফরাস্'-মিশ্রিত রঙ সংগ্রহ করিলাম; জানিতাম, তাহা দেহে মর্দ্দন করিলে দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইবে। তাহার পর আসোবঙ্গো ভাষায় একটি অনতিবৃহৎ অভিভাষণ লিখিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিলাম। লিডেনবার্গের পুলিস-আফিসের ভাঁড়ার হইতেই উক্ত রঙ দুই কৌটা সংগ্রহ করিতে পারিলাম। পুলিসের গুদামে উহা সঞ্চিত থাকিত।

এই এক মাসের মধ্যে আমি ভ্যান এণ্টওয়ার্পের সঙ্গে দুইবার দেখা করিলাম। সেই গ্রামের পথ-ঘাট, বিশেষতঃ, ঘটনাস্থল কুমীর-দহটি আমি একাধিকবার পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া রাখিলাম। ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের কন্যা কাটি্‌নার নিকট জানিতে পারিলাম—কুমীরের মুখোসধারী গ্রাম্য রোজার নাম টম্‌বিলি; কিন্তু যে কারণেই হউক—গ্রামের সর্দ্দার ওঁগোলু তাহাকে 'টোমাসো' বলিয়া ডাকিত।—এই সংবাদটি জানিতে পারায় আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল।

ভ্যান্ এণ্টোয়ার্পের সহায়তা ব্যতীত আমার গুপ্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইবে বুঝিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি সোৎসাহে আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন; কিন্তু বলিলেন—এ সকল কথা মেয়েদের নিকট প্রকাশ করা হইবে না; কারণ, তাহাদের পেটে কথা থাকে না।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিন অপরাহ্নে আমি গোপনে ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের গৃহে উপস্থিত হইলাম। আসোবঙ্গোরা আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি যে সেই গ্রামে আসিয়াছি—এ সংবাদও গ্রামবাসীরা জানিতে পারিল না।

আমি ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জন-প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। বাড়ীতে কেহই উপস্থিত নাই। ব্যাপার কি?—একটু দুশ্চিন্তা হইল। আমি চর্ম্মাচ্ছাদিত এক-খানি কৌচে বসিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রীকন্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পর ভ্যান্ এণ্টওয়ার্প, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা কাটি্‌না গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বিবি এণ্টওয়ার্প ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছিলেন; কাটি্‌নার চক্ষু দু'টিও জলে ভাসিতেছিল! আমি জানিতাম—বুয়োর রমণীরা সামান্য কারণে রোদন করে না।—ব্যাপার কি?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহাদের বিপদের কথা জানিতে পারিলাম। শুনিলাম—সেই দিন মধ্যাহ্নকালে আহারের পর বিবি এণ্টওয়ার্প তাঁহার শিশুকন্যা সানাকে বাহিরের ঘরের সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়াছিলেন; কিছু কাল পরে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই! সানা খেলা করিতে করিতে অদূরবর্ত্তী বনে প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া বিবি এণ্টওয়ার্প তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন দিকে তাহার সাড়া পাই-লেন না।

ভ্যান্ এণ্টওয়ার্প মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ঘুমাইয়াছিলেন, স্ত্রীর আহ্বানে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলেন, সানাকে পাওয়া যাইতেছে না! তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দুক লইয়া স্ত্রী-কন্যাসহ সানাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুঁজিয়াও সানার সন্ধান মিলিল না।

সে দিন পূর্ণিমা; সেই রাত্রিতে কুম্ভীরদহে একটি বালিকার বিসর্জ্জনের কথা। সানার সন্ধান নাই!—তাহার নিরুদ্দেশের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। ভাবিলাম, রাত্রিকালে কি সানারই শোচনীয় মৃত্যু দেখিতে হইবে?

রাত্রি ১১টার পর আমি সাজসজ্জা আরম্ভ করিলাম।—আমি 'ফস্‌ফরাস্'-মিশ্রিত রঙ্গের সেই কৌটা দুইটি সেখানে লইয়া গিয়াছিলাম; এতদ্ভিন্ন একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। স্থানীয় সর্দ্দার ও তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্ররা দরবার উপলক্ষে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধান করিত—তাহা জানিতাম।

আমি আমার পোষাক ছাড়িয়া, ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের সাহায্যে আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে সেই ফস্‌ফরাসের রঙ্গ মাখাইলাম। তাহার পর, সর্দ্দাররা যে ভাবে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে—সেই ভাবে সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া তাহার ভিতর পিস্তলটি লুকাইয়া রাখিলাম।

অতঃপর আমার সামরিক পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, একখানি কাল রুমালে মাথা ঢাকিয়া গোপনে ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের ঘর হইতে বাহির হইলাম, এবং নিভৃত পথ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কুম্ভীর-দহের অদূরে উপস্থিত হইলাম। পূর্ণিমার রাত্রি; সেই দহ, এবং তাহার সন্নিহিত প্রান্তর, পথ, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। এইরূপ জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রতিকূল বুঝিয়া একটু উৎকণ্ঠিত হইলাম। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে আমার অঙ্গের আভা উজ্জ্বল হইত, ভূত দেখান সহজ হইত; কিন্তু উপায় কি? যেরূপেই হউক, আমাকে চেষ্টা সফল করিতে হইবে। আমি দহের সন্নিহিত একটি গুল্মের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় গ্রামের পথে পূর্ব্ববৎ উৎসবের বাজনা বাজিতে লাগিল; বুঝিলাম, শোভাযাত্রা দহের দিকে আসিতেছে। ক্রমশঃ সেই রাক্ষসের দল দহের নিকট আসিল। যে বালিকাকে দহে নিক্ষেপ করা হইবে—সে আজ নিদ্রিত নহে। বাদ্যধ্বনি তাহার তীব্র আর্ত্তনাদে ডুবিয়া গেল। রোজার পশ্চাতে একটি লোকের ক্রোড়ে বালিকাকে দেখিতে পাইলাম; বালিকা কৃষ্ণাঙ্গী নহে, শ্বেতাঙ্গী। দেখিয়াই চিনিলাম—সে ভ্যান্ এণ্ট-ওয়ার্পের তিন বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যা সানা!—আমি ঘামিয়া উঠিলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া গেল। সানা কুমীরের মুখে নিক্ষিপ্ত হইবে? উঃ!

আমি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখোসধারী রোজার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে পূর্ব্ববৎ দহের নিকট উপস্থিত হইল; দহের কুমীরগুলি লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া দহের জলরাশি তোলপাড় করিয়া তুলিল।

রোজা টম্‌বিলি অর্থাৎ 'টোমাসো' পূর্ব্ববৎ কুম্ভীরগুলিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত; আমি কি কৌশলে ওঁসোলুর প্রেতাত্মার মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইব—স্থির করিতে না পারিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম। চন্দ্রালোক উজ্জ্বল।

কিন্তু প্রায় পনের মিনিট পরে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল,—সে যেন ঐন্দ্রজালিক ঘটনা!—কোথা হইতে এক খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সেই মেঘে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমি আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলাম—'এরূপ সুযোগ আর পাইব না। এইবার!'

ওভার-কোটটা খুলিয়া ফেলিলাম, কালো রুমালখানিও মাথার উপর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত দেহে পরলোকগত ওঁসোলুর মত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রোজা টম্‌বিলির ও তাহার অনুচরবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অন্ধকারে আকস্মিক আবির্ভাব!

আমাকে সম্মুখে দেখিয়া সেই বর্ব্বর নেটিভগুলা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। রোজা টম্‌বিলি ভিন্ন কেহই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। রোজাটাও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমার ছদ্মবেশ বোধ হয় নিখুঁত হইয়াছিল; কারণ, টম্‌বিলিরও বিশ্বাস হইল—আমি তাহাদের পরলোকগত সর্দ্দারের প্রেতাত্মা!—সে কম্পিতস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে ওঁসোলু, হে আসোবঙ্গো সর্দ্দার! তুমি মনুষ্যদেহে তোমার অনুচরদের নিকট ফিরিয়া আসিলে,—ইহার কারণ কি? প্রেত-লোকে কি তোমার কোনও কষ্ট হইয়াছিল?'

আমি স্বাহিলি ভাষায় বলিলাম, 'না টোমাসো! আমার 'তুপ্তি' (আত্মা) যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই স্থানে আমার কোন অসুবিধা নাই; কিন্তু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, আমার জীবিত অবস্থায় তাহা জানিবার উপায় ছিল না। সেখানে গিয়া একটি প্রধান কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই যে, আসোবঙ্গোরা যে বড় কর্ত্তার ঐ সকল 'টোগাটি'-(প্রতিনিধি) বর্গের নিকট জীবিত মনুষ্য উৎসর্গ করিবে—ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে; এই কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট নহেন।'—সঙ্গে সঙ্গে আমি দহের কুম্ভীরগুলার দিকে আমার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলাম; ফস্‌ফরাস্-মিশ্রিত রঙ্গে আমার হাত হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

চিরপরিচিত সম্বোধন শুনিয়া রোজাটি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সন্দেহ বা অবিশ্বাস তাহার মনে স্থান পাইল না। আমি সেই ভাষায় দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলাম, "শোন টোমাসো, আমি মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে যে আদেশ করিয়া-ছিলাম—তাহা ফেরত লইতেছি; তাহার পরিবর্ত্তে আমার এই আদেশ হইল যে, আসোবঙ্গো জাতির কোন শিশু—বালক হউক আর বালিকাই হউক—কুম্ভীর-দেবতার মুখে নিক্ষিপ্ত হইবে না। কিন্তু অনেক দিনের প্রচলিত প্রথা রহিত করা হইবে না; এ জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ছাগল বা বাছুর তাহার পরিবর্ত্তে উৎসর্গ করা হইবে।—শোন টোমাসো, আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি—জঙ্গলের ভিতর যে 'উম্‌লঙ্গো' (শ্বেতাঙ্গ পুরুষ) বাস করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহার আত্মীয়গণের কোন ক্ষতি না হয়—তাহা লক্ষ্য করিবে; কারণ, সেই ব্যক্তি আমার 'দোস্ত।' তুমি তাঁহার যে মেয়েটিকে আজ লইয়া আসিয়াছ, তাহা 'ইনকো-সানা'কে (শ্বেতাঙ্গ রমণী) অক্ষত দেহে ফেরত দিয়া আসিবে।"

অনন্তর আমি সবেগে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিলাম। আমার হাত হইতে ঘর্ম্মমিশ্রিত 'ফস্‌ফরাস্' (Sweat-impregnated phosphorous) তরল অগ্নিস্রোতের ন্যায় বাহুমূলে প্রবাহিত হইল। আমার দীপ্তিশীল উভয় হস্ত মস্তকের উপর আন্দোলিত করিয়া বলিলাম, 'আরও শোন টোমাসো, যদি আমার আদেশ পালন কর, তাহা হইলে তোমরা আমাকে আর কখন রক্ত-মাংসের দেহে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু যদি তুমি বা তোমার কোন অনুচর আমার আদেশ অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার আসোবঙ্গোদের মধ্যে ফিরিয়া আসিব; কিন্তু টোমাসো, তোমরা স্মরণ রাখিও—সে দিন ঐ কুম্ভীর-দহের জল রক্তে লাল হইয়া যাইবে; সেই রক্ত ছাগলের বা তোমাদের শিশুগণের রক্ত নহে। বুঝিয়াছ? বৎসগণ, এখন তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে চলিলাম।'

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘরাশি চন্দ্রমণ্ডল হইতে অপসারিত হইল; আতঙ্কাভিভূত, স্তম্ভিত টোমাসো তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। আমি সেই সুযোগে 'মোপানী' কুঞ্জের অন্তরালে অন্তর্হিত হইলাম। সেখান হইতে আমার রুমাল ও কোট তুলিয়া লইয়া বনপথে গোপনে ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। পনের মিনিটের মধ্যে আমি নিজের বেশে তাঁহাদের বারান্দায় আসিয়া আমার অদ্ভুত কীর্ত্তি তাঁহাদের গোচর করিলাম। কিন্তু আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি আসোবঙ্গো রমণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সানা তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

আমি লিডেনবার্গে প্রত্যাগমন করিয়া আমার উপরওয়ালাকে বা স্থানীয় কমিশনারকে কোন কথা জানাইলাম না, কেবল হেড্ ক্লার্ক মিঃ স্কটকে আমার কৌশলের কথা বলিলাম।

কয়েক মাস পরে আর এক পূর্ণিমার রাত্রিতে আমি ভ্যান্ এণ্টওয়ার্পের অতিথি হইয়াছিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত 'মোপানী' কুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া তৃতীয়বার গ্রামবাসীদের উৎসব দেখিয়াছিলাম। সে দিন তাহারা পূর্ব্ববৎ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল বটে, কিন্তু মানব-শিশুর পরিবর্ত্তে তাহারা একটি ছাগ-শিশুকে কুম্ভীর-দহের কুম্ভীরগুলির নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আফ্রিকার এই 'কুম্ভীর-দেবতা'র ন্যায় মানব-শিশু দ্বারা সর্প-দেবতারও পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল হতভাগ্য শিশুকে সর্পদেবতার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য একবার কি অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল—'আফ্রিকার সর্প-দেবতা'য় তাহার কৌতুকাবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; আশা করি, অতঃপর তাহা কাল্পনিক গল্প বলিয়া কাহারও সন্দেহ হইবে না।*

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

* "আফ্রিকার সর্পদেবতা"—মূল্য বার আনা।—'বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে' প্রাপ্তব্য।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

(শেষের অংশ)

যাত্রা বন্ধের আদেশ কেন প্রচারিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ ছিল না। নুরবাঈ, আক্রম জমান্, গোলাপী, আনন্দরাম ও পদ্মিনী প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের কতলের হুকুম আসিল না।

যাত্রা আরম্ভ হইল। সারি দিয়া হাজার হাজার সওয়ার উত্তরদিকে চলিল। তাহাদের পরে দিল্লীর লুঠের মাল-বোঝাই হাতী ও উট, তাহার পরে বন্দী ও বন্দিনীগণ, তাহার পরে কামান এবং সকলের শেষে পদাতিক। এত সাবধান হইয়াও শাহান শাহ নাদির শাহ বন্দীর পলায়ন রোধ করিতে পারিলেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত ঝড়ের মত গুর্জ্জর ও জাঠ এই বিশাল বাহিনীর কোন না কোন স্থানে পড়িত এবং যাহা পাইত, তাহাই লুঠিয়া পলাইত। কোনও কোনও দিন একসঙ্গে মাল ও বন্দিনীদিগের উপরে আক্রমণ হইত। হয় ত দশ জন যুদ্ধ করিত—বাকী এক শত জন মাল অথবা বন্দিনী লইয়া পলাইত। বহু চেষ্টা করিয়াও নাদির শাহ লুঠ বন্ধ করিতে পারিলেন না। যাহারা লুঠ করিতে আসিত, তাহারা মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিত এবং ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিত। চেহারা দেখিয়া বোধ হইত, তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান। তাহাদের বীরত্ব দেখিয়া ইরাণীরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহের ফৌজে যদি এমন লোক থাকিত, তাহা হইলে কর্ণাল হইতে ইরাণীদের ইরাণে ফিরিয়া যাইতে হইত।

যাত্রার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় নুরবাঈ ও জগবাঈএর তলব পড়িল। যন্ত্রী ও বাদক লইয়া তাহারা যখন মজলিসের তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন চৌকীর সিপাহীরা তাহাদের জানাইল যে, মজুরা হইবে না, কেবল দুই জন তওয়াইফের তলব হইয়াছে, যন্ত্রী ও বাদকরা নজরবন্দী থাকিবে। নুরবাঈএর মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু জগবাঈ হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে চলিল। আনন্দরাম ও আক্রম জমান্ যন্ত্রীদের ভিতরে ছিলেন, তাঁহাদের মুখ শুকাইল। আক্রম জমান্ বুকের ভিতর হইতে একখানা বড় ছোরা বাহির করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আনন্দরাম তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র আছে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামপ্রান্তে যে দিন সন্ধ্যায় শাহান শাহের মজলিসের তাঁবুতে নুরবাঈ ও জগবাঈএর তলব হইয়াছিল, সেই দিন শাহান শাহের তাঁবুর নিকটে একটি জনশূন্য গণ্ডগ্রামে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন অশ্বারোহী উপস্থিত হইল। সকলেরই ঘোড়া ছোট, কিন্তু বলবান্, সকল অশ্বারোহী হৃষ্ট-পুষ্ট, কিন্তু তাহাদের শুভ্র শুভ্র বসনের অন্তরাল হইতে ধাতুর শব্দ হইতেছিল। প্রত্যেকের হাতে বল্লম ও ঢাল, পৃষ্ঠে বন্দুক ও কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃক্ষের ছায়ার মত লুকাইয়া একে একে গ্রামটিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

গ্রাম জনশূন্য, কিন্তু নীরব নহে। সমস্ত দিন হতভাগ্য গ্রামবাসীদের শব লইয়া টানাটানি করিয়াও শৃগাল ও শকুনির ক্ষুধা তৃপ্ত হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে জীবন্ত মনুষ্য দেখিয়াও তাহারা সরিল না। আগন্তুকরা শুষ্কমুখে দেখিল যে, ঘরের দুয়ারে ছিন্নশীর্ষ শিশুর শব আলিঙ্গন করিয়া ভল্লবিদ্ধা মাতা লুটাইয়া আছে, বেণিয়ার দোকানে আটা, দাল ও চাউল পথে নররক্তের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। মস্‌জিদের সম্মুখে ছিন্ন কোর্-আন্ বুকে লইয়া ছিন্ন-শির পেশ-ইমাম্ লুটাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মস্তক কোর্-আনের পরিবর্ত্তে বেদীর উপর রক্ষিত। আগন্তুকের মুখের পেশী দৃঢ় হইয়া উঠিল, কেহ বলিল, "ইন্‌শা আল্লাহ," কেহ বা বলিল, হে "ভগবান্!"

তখন ইরাণের শাহান্ শাহের মজলিসের তাঁবুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া দুইটি রূপসী ভারতীয়া মহিলা ভারত-বিজেতা নাদির শাহকে কুর্ণিশ করিতেছিল। আজ আর কেহ নুরবাঈকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল না, গুলাবের পিচ্‌কারী ছুটিল না, রাশি রাশি ফুল আসিল না, শাহান্ শাহও হাসিলেন না। দুইটি নর্ত্তকী তাঁবুর দুয়ারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্কশকণ্ঠে নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোজ আমার লস্কর লুঠিতে আসে কে ?" আবার তস্‌লিন করিয়া নুরবাঈ বলিল, "হিন্দুস্তানের মরদ।" নাদির শাহের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া বলিলেন, "বাঁদী, বড় সাফ্ সাফ্ জবাব দিচ্ছিস্।"

"বাঁদী, শাহান শাহের বাঁদী, বরাবর সত্যকথাই ব'লে আস্‌ছে।"

"যারা লুঠ কর্‌তে আসে, তারা কি কেবল হিন্দু ?"

"না, জাঁহাপনাহ, হিন্দু ও মুসলমান সব জাতই এক হয়ে গিয়েছে।"

"জানিস্ আমি কে ?"

"জাঁহাপনাহ, ইরাণ, তুরাণ, শাম্ ও রূমের শাহান শাহ, আর আমি দিল্লীর সামান্য কশ্‌বী।"

"তুই সমস্ত জানিস্ ?"

"জানি।"

"সকল কথা খুলে বল্, তা হ'লে মাফ্ হবে।"

"জাঁহানপনাহ, আমি জানি, কিন্তু বল্‌ব না। আমার গর্দান্, শাহান শাহের,—কিন্তু মন শাহান শাহের উপর যে সকলের বড় এক জন শাহান শাহ আছে—তার।"

নুরবাঈ মস্‌নদের কাছে আসিয়া মাথা পাতিয়া দিল। নাদির শাহ হাসিয়া বলিলেন, "এত সহজে নয়, বিলম্ব আছে। ওঠ।"

নুরবাঈ উঠিল।

নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি জানিস্, তবে কেন বল্‌বি না ?"

নুরবাঈ নাদির শাহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, শাহানশাহ, বাদশাহ হয়ে কেহ দুনিয়ায় আসে না। তোমার কি কোনও দিন মা বহিন্ বা মেয়ে ছিল না ? আমি কশবী বটে ; কিন্তু আমারও এক দিন মা বোন্ ছিল। সেই জন্য বল্‌ব না।"

"জবাব বুঝ্‌তে পারলাম না ?"

নুরবাঈ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে শব্দ শুনিয়া জগবাঈ শিহরিল। নুরবাঈ বলিল, "শাহান শাহ, মোগল বাদশাহ ক্লীব ব'লে হিন্দুস্থানের হিন্দু ও মুসলমান কি স্নেহ-মমতা ভুলে গিয়েছে ? যাদের মা বহিন্ ধ'রে এনে ইরাণে নিয়ে যাচ্ছ, তারাই তোমার লস্কর লুঠ করছে।"

"তুই তাদের জানিস্ ?"

"সকলকে না জানি, অনেককেই জানি।"

"নাম বল্।"

"বিশ্বাসঘাতক হব না শাহান শাহ।"

"এখনই তোর জিভ্‌টা উপড়ে ফেলে দোবো।"

নুরবাঈ বাদশাহের তক্তের সম্মুখে আবার মাথা পাতিয়া বলিল, "হুকুম শাহান শাহ।" তখন তহমাস্ব খাঁ-জলের উঠিয়া নাদির শাহকে শান্ত করিলেন। নসকচীরা রমণীদ্বয়কে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে দূরে ইরাণী সেনানিবাসের এক প্রান্তে কোলাহল উঠিল। চারিদিক্ হইতে বন্দিনীগণের শিবির আক্রান্ত হইল। ইরাণীরা সে দিন প্রস্তুত হইয়া ছিল, সুতরাং ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। লস্করের চারিদিক্ হইতে ইরাণী সৈন্য বন্দী রক্ষা করিতে ছুটিল। সে দিন যাহারা ইরাণী শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা লুঠ করিতে আসিল। হতভাগ্য ভারতবাসী নর-নারীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। তখনকার ইতিহাস আছে ; হিন্দুরও আছে—মুসলমানেরও আছে। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় হিন্দু ও মুসলমান বীর ভারতীয়া মহিলার সম্মান রক্ষা করিতে আসিয়া রক্তের অক্ষরে তাহাদের ভগবান্ বা খোদার ইতিহাসের প্রতিপত্রে নিজ নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছে, আজ আসমুদ্র হিমানীমেখলামণ্ডিত ভারতে তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাইবে না।

ক্রমে হাজার হাজার মশাল জ্বলিয়া উঠিল। দূরে দু' একটা ছোট-খাট কামানের শব্দ হইল, আক্রম জমান্ ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল সাহেবজাদা ?"

আক্রম জমান্ বলিয়া উঠিলেন, "এই সময়ে আমরা এখানে প'ড়ে রইলাম আনন্দরাম ?" আনন্দরাম হাসিয়া বলিল, "তোমার খোদা এবং আমার ভগবান্ যার বরাতে যা মাপিয়েছেন।" ক্রমে মশাল নিভিয়া আসিল, গোলমাল দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আরও সেই দিকে লোক

ছুটিতেছে। হঠাৎ দুইখানা বারুদের গাড়ী ফাটিয়া গেল। দিগন্তপ্রসারী লেলিহান অনলের লোহিত শিখায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আনন্দরাম সানন্দে বলিয়া উঠিল, "সাবাস, খতম্, সাহেবজাদা সব শেষ। ঐ দেখ, বন্দীদের তাঁবু জ্বলছে।"

রাত্রি কাটিয়া গেল, সে দিনও যাত্রা স্থগিত রহিল। প্রভাতে আনন্দরাম সংবাদ পাইল যে, সমস্ত বন্দী ও বন্দিনী মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জন্য প্রায় দুই হাজার হিন্দু ও মুসলমান সেই উত্তর-মালবের জলহীন মরুবৎ প্রান্তরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ আক্রম জমান্ পাগল হইয়া উঠিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুইটি উপরে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালার হতভাগ্য নবাবপুত্র বলিয়া উঠিল, "অয় খোদা, তোমারই মেহেরবাণী! এই দুই হাজার ভদ্রসন্তান তোমার কোরবানি হয়ে হিন্দুস্থানী মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেল, অয়্ খোদা, তুমি করিম্, তুমি রহিম্! এখন কেবল আমাদের ডেকে নাও।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি

শাহান্ শাহ নাদির শাহ যখন শুনিলেন যে, রাত্রিতে যাহারা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বন্দী ও বন্দিনীদের সকলকেই লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি নুরবাঈকে আনিতে আদেশ করিলেন। নূরবাঈ তখনও মজলিশের পোষাক পরিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে আনা হইয়াছিল। নুরবাঈ হাসিতে হাসিতে মাথা নোয়াইয়া শাহান শাহকে অভিবাদন করিল। ভ্রূভঙ্গী করিয়া নাদির শাহ বলিয়া উঠিলেন, "এখনও যদি না বলিস্, তা হ'লে তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।" নুরবাঈ আবার হাসিয়া শির নোয়াইয়া উত্তর দিল, "জান্ ও গর্দ্দান শাহান্ শাহের।"

তখন নাদির শাহ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার দলের সমস্ত লোককে বাঁধিয়া আনিতে হুকুম করিলেন। সকলে আসিলে নাদিরশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সব সয়তান আমার গোলাম আর বাঁদি নিয়ে পালাচ্ছে, তাদের নাম কেউ জানিস্?" প্রথমে কেহ উত্তর দিল না। তখন হুকুম হইল, "সকলের আগে এই তওয়াইফকে কুত্তা দিয়ে খিলাও।" হুকুম শুনিয়া একসঙ্গে আক্রম জমান্ ও আনন্দরাম আগে দাঁড়াইয়া কহিল, "শাহান্ শাহ, দীন্ ও দুনিয়ার মালিক, নুরবাঈ নিরপরাধা, প্রকৃত অপরাধী আমরা দুজনে।" নাদির শাহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" আক্রম জমান্ কহিলেন, "আমি সুবা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব নাজিম সুজা উদ্দীন খাঁর পুত্র।" আনন্দরাম কহিল, "জাঁহান্‌পনাহ, আমি সেই বাঙ্গালী বহুরূপী।" অধিকতর বিস্মিত হইয়া নাদিরশাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেই বহুরূপী? প্রমাণ কর্‌তে পার?"

"হুকুম করুন, হাত খুলে দিন।"

শাহান শাহের হুকুমে আনন্দরাম মুক্ত হইয়া পাগড়ী, পরচুলা ও দাড়ী খুলিয়া ফেলিল, অনেকেই তাহাকে চিনিত, তাহারা বলিয়া উঠিল, "সত্যই ত, এই সেই বহুরূপী।" নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন হাওয়া হয়ে উড়ে যেতে পার?" আনন্দরাম উত্তর দিল, "পারি, কিন্তু আর প্রয়োজন নেই শাহান শাহ।"

"আগে কি প্রয়োজন ছিল?"

"হিন্দুস্থানের কুল-মহিলাদের বন্ধন-মুক্তি।"

"সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রের মূল তুমি?"

"শাহান শাহ ঠিক বলেছেন।"

"যদি উড়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে, তা হ'লে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাচ্ছ না কেন?"

"প্রাণে আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। শাহান শাহ, এই দলের সমস্ত লোক নিরপরাধ, প্রধান দোষী আমি। দিল্লীর প্রধান বাঈ নুরবাঈ হিন্দুস্থানের কুল-মহিলাদের সম্মান বাঁচাবার জন্য আমার অনুরোধে সর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে শেষে নিজের ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে ইরাণে চলেছিলেন। সাহেবজাদা আক্রম জমান্ খাঁ আমারই প্ররোচনায় এ দলে মিশেছেন। এ দলে কেহ দোষী নয়, কেবল দোষী আমি। যে শাস্তি দেবেন, সমস্তই আমাকে দিন। শাহান শাহ দুনিয়ার বিচারক, ন্যায্য বিচার করুন।" তখন জগবাঈরূপী পদ্মিনী ছুটিয়া গিয়া নাদির শাহের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সে বলিয়া উঠিল, "রাজা, সকল দোষের মূল আমি, আমাকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আমার স্বামী আপনার চরণে অপরাধী হয়েছেন।" আক্রম্ জমান্ বলিয়া উঠিলেন, "শাহান শাহ, আপনি মুসলমান—আমিও মুসলমান, খোদার পবিত্র নামে কসম্ ক'রে বলছি,

প্রকৃত দোষী আমি, যে শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দিন, নির্দ্দোষের প্রতি অবিচার করবেন না।" গোলাপী কথা খুঁজিয়া না পাইয়া আক্রম জমানের কণ্ঠলগ্না হইল। নূরবাঈ পাগলের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "খোদার মহিমা কি সুন্দর! আল্লার কৃপা অপার! চল সব একসঙ্গে যাই, একসঙ্গে যাই।"

তাহমাস্ব খাঁ-জলের, নাদির শাহের কাণে কাণে কি বলিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া নাদির শাহ হাসিলেন। তিনি নূরবাঈকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে একসঙ্গে যেতে চাও তওয়াইফ?" নূরবাঈ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে তস্‌লীন্ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "শাহান শাহের কেরামেৎ।"

নাদির শাহের হুকুমে পনের জন জল্লাদ আসিল, সমস্ত বন্দী শাহান শাহের সম্মুখে মাথা পাতিয়া দিল। সকলের আগে নূরবাঈ, তাহার পশ্চাতে এক শ্রেণীতে আনন্দরাম ও পদ্মিনী এবং আক্রম জমান্ ও গোলাপী। আর সকলে তৃতীয় শ্রেণীতে বসিল। পনেরখানা তরবারি আকাশে ঝলকিয়া উঠিল। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিল। নূরবাঈ-এর মস্তকে একটা প্রকাণ্ড গোলাপের মালা আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে পনের জন নসকচী পনেরখানা তরবারি ধরিয়া ফেলিল। নাদির শাহ হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু বন্দীদের কেহই মাথা তুলিল না। তখন শাহান শাহ নাদির শাহ নামিয়া আসিয়া নূরবাঈএর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "তওয়াইফ, এমন কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত কণ্ঠে আমার হুকুমে তলোয়ার পড়তে পারে না। দেশে ফিরে যাও। সকলে মুক্ত।"

অসম্ভাবিত করুণায় সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপ্লুত-হৃদয়ে বিজেতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ)।

সমাপ্ত

অন্বেষণ

যে দিন হ'তে বুঝ্‌নু প্রভু, তুমি বড় আপন জন,
সে দিন হ'তে তোমায় প্রিয় করছি কেবল অন্বেষণ।
শাঁখ-কাঁসরের শব্দে ভুলে
যাই ছুটে যাই দেব-দেউলে—
বিগ্রহেরই চরণ-মূলে
লুটিয়ে পড়ি অকিঞ্চন!—
তবু তোমায় পাই না দেখা—পাই না কোনই নিদর্শন!

ছুটে গেছি গির্জ্জা-ঘরে ছুটে গেছি মসজেদে—
ছুটে গেছি বৌদ্ধ-বিহার ভক্তি-ডোরে মন বেঁধে।
দাঁড়ায়েছি একটি কোণায়,
যোগ দিয়েছি উপাসনায়—
কোনই দ্বিধা নাহি মানি
আমার সম্বল ধন;—
তবু তোমায় পাই না দেখা—পাই না কোনই নিদর্শন!

চাই না যেতে গৃহ ছাড়ি বিজন গিরি-কন্দরে—
চাই হে শুধু তোমায় প্রভু পেতে আমার অন্তরে।
চাই হে শুধু চাই হে হরি
পেতে তোমায় জীবন ভরি',
তোমার লোকালয়ের মাঝে—
করতে তোমায় আকর্ষণ!—
দয়া করি পুরাও হরি কাঙাল কবির আকিঞ্চন।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

ন্যায়-পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন

শিষ্য—ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন না বুঝিলে উহার শ্রবণে প্রবৃত্তি হয় না।

গুরু—সত্যই বলিয়াছ, প্রয়োজন না বুঝিলে কোন শাস্ত্রেরই শ্রবণে এবং কোন কর্ম্মেই কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত ভট্টকুমারিলও এই বিশ্বজনীন সত্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে?॥
জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"

শ্লোকবার্ত্তিক ১২শ—১৭শ শ্লোক॥

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেরই এবং যে কোন কর্ম্মেরই যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন কথিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা কেহই গ্রহণ করে না। যাহার প্রয়োজন ও সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই শ্রবণ করিতে শ্রোতা প্রবৃত্ত হন। অতএব শাস্ত্রের প্রারম্ভে সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তাহার সহিত সেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা বক্তব্য।

সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার প্রয়োজন এবং তাহার সহিত ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য। তাই ন্যায়শাস্ত্রের প্রকাশক মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রেরই শেষে বলিয়াছেন, "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" ইহার দ্বারা নিঃশ্রেয়সলাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বা ফল, ইহা সূচিত হইয়াছে।

এখন ঐ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। "নিঃশ্রেয়স" শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহার অর্থ বুঝা যায়—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ। মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, ইহা বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই মুক্তি অর্থে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। সুতরাং ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রোক্ত ঐ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মুক্তি অর্থ অবশ্যই বুঝা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মুক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায়, মুক্তিলাভই ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, ঐ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মুক্তির ন্যায় অন্যান্য নিঃশ্রেয়সও অর্থাৎ ইষ্টমাত্রই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনরূপে সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রেও সর্ব্বত্র মুক্তি প্রকাশ করিতে "অপবর্গ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের কি কোন উদ্দেশ্য নাই? পরন্তু "নিঃশ্রেয়স" শব্দের যেমন মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতেও উক্ত দ্বিবিধ অর্থেই নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (১)। সুতরাং মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ করায় সর্ব্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সই উহার দ্বারা তাঁহার বিবক্ষিত, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি।

ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারাও আমরা ইহা বুঝিতে পারি। কারণ, তিনি ঐ নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, (২) নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। তন্মধ্যে প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ নিঃশ্রেয়সের মধ্যে চরম নিঃশ্রেয়স মুক্তিই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। তদ্ভিন্ন সমস্ত নিঃশ্রেয়সই দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে যে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়সলাভ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুক্তিরূপ চরম নিঃশ্রেয়স লাভে চরম কারণ। কিন্তু প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তাহা হইলে ঐ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞানও যে, আত্মাদি

১। কচ্চিৎ সহস্রৈর্ম্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং পরম্॥ মহাভারত—সভা-৫।৩৫।
নিঃশ্রেয়সং কল্যাণম্।—নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা।
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। গীতা-৫।৩।
"নিঃশ্রেয়সকরৌ" নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে।—শাঙ্কর ভাষ্য।

২। নিঃশ্রেয়সং পুনর্দৃষ্টাদৃষ্টভেদাদ্ দ্বেধা ভবতি। তত্র প্রমাণাদি-পদার্থতত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং দৃষ্টং, নহি কশ্চিৎ পদার্থো জ্ঞায়মানো হানো-পাদানোপেক্ষাবুদ্ধিনিমিত্তং ন ভবতীতি, এবঞ্চ কৃত্বা সর্ব্বে পদার্থা জ্ঞেয়-তয়া উপক্ষিপ্যন্তে ইতি।
পরন্তু নিঃশ্রেয়সমাত্মাদেস্তত্ত্ব-জ্ঞানাদ্ ভবতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

প্রমেয় পদার্থের শ্রবণ-মননাদি কার্য্যের সম্পাদন করিয়া এবং মুক্তিলাভার্থ অত্যাবশ্যক আরও অনেক দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স সম্পাদন করিয়া মুক্তিলাভের প্রযোজক হয়, ইহাও উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভেও গৌতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা তিনিও যে গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

পরন্তু গৌতমের প্রথমসূত্রের ভাষ্যশেষে যেখানে বাৎস্যায়ন ন্যায়শাস্ত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় ও সর্ব্ব-ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, সেখানে বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, (১) সূত্রকার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স-লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়াছেন, কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের এমন কোন প্রয়োজনই নাই, যাহাতে ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধিতেই ন্যায়শাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। কারণ, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের প্রদীপ। ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে বিচার না করিলে কোন শাস্ত্রেরই গূঢ়ার্থ প্রকাশ হয় না। সুতরাং যে কোন শাস্ত্রসাহায্যে যে কোন অভীষ্ট লাভ করিতে হইলেই তাহাতে প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক। পরন্তু যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সকল লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, গণিত বল, রাজনীতি বল,—সর্ব্বত্রই যে অনুমান-প্রমাণ প্রধান অবলম্বন, সেই অনুমান-প্রমাণের তত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথার্থরূপে অনুমান করিতে হইলে যে, হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ন্যায়শাস্ত্র ব্যতীত হইতেই পারে না, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র সর্ব্বকর্ম্মের উপায় অর্থাৎ অপরিহার্য্য অবলম্বন। ফল কথা, ভাষ্যকার বাৎ-স্যায়নের মতে যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বাচস্পতি মিশ্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহা হইলে বাৎস্যায়নও যে গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারাও সর্ব্ব-প্রকার নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করেন নাই, ইহা আমরা কিরূপে বুঝিব?

অবশ্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের প্রথম সূত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন, "ইহ ত্বধ্যাত্ম-বিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তিঃ।" অর্থাৎ অধ্যাত্ম-বিদ্যা এই ন্যায়শাস্ত্রে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানই তত্ত্ব-জ্ঞান এবং মোক্ষপ্রাপ্তিই নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি। কিন্তু ইহার দ্বারা আর কোন নিঃশ্রেয়স যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনই নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, উক্তস্থলে ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যাতেই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব-জ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুক্তির উপযোগী আত্মাদি পদার্থেরও বর্ণন হওয়ায় ইহা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া ইহাতে আত্মাদি পদার্থের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং মুক্তিই নিঃশ্রেয়স। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া সেখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি বিদ্যা হইতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অধ্যাত্ম অংশেই তত্ত্ব-জ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সের ভেদ ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাত্ম অংশ গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। উহার দ্বারা তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রকে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাই বলিয়াছেন এবং কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই ন্যায়শাস্ত্রে অন্যান্য বিদ্যা হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সের ঐরূপ ভেদ সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ বলিয়াও আবার পৃথক্ করিয়া সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের উল্লেখ কেন হইয়াছে, ইহা বুঝাইতে তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী, এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আছে। "প্রস্থান" বলিতে অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বা-ভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এবং চতুর্দ্দশ পদার্থ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থান। প্রস্থানের ভেদ প্রযুক্তই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। সুতরাং আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় পৃথক্ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংশয় প্রভৃতি পদা-র্থের উল্লেখ না করিলে উহা উপনিষদের ন্যায় অধ্যাত্মবিদ্যা মাত্র হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে সংশয় প্রভৃতি পদার্থের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ হইয়াছে (১)। ভাষ্যকারের এই

১। সূত্রকারেণ শাস্ত্রস্যাত্যন্তিকদুঃখোপরমরূপনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ প্রয়োজনমুক্তম্, ভাষ্যকারস্তু নাস্ত্যেব তৎ প্রেক্ষাবতাং প্রয়োজনং যত্রান্বীক্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ 'সেয়মান্বীক্ষিকীতি। তাৎপর্য্য টীকা।

১। তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্ম-বিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাদ্ যথোপ-নিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে।—প্রথম সূত্রের ভাষ্য।

কথার দ্বারা তাঁহার মতেও ন্যায়শাস্ত্র যে কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় এবং তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং ভাষ্যকার পরে যে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাত্ম অংশ গ্রহণ করিয়াই তাহাতে মুক্তিই নিঃশ্রেয়স বলিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম অংশে ইহা অধ্যাত্মবিদ্যা। সুতরাং সেই অংশে মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সই ইহার প্রয়োজন এবং তাহাই ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন, ইহাই পরে ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের আর কোন প্রয়োজন নাই, অথবা মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা তাহা সূচিত করেন নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, ন্যায়শাস্ত্র যেমন অধ্যাত্ম অংশে অধ্যাত্ম-বিদ্যা, তদ্রূপ অন্য অংশে ইহা হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা। তাই ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বলা যায়। ভাষ্যকার যে তাহাই বলিয়াছেন, ইহা বাচস্পতিমিশ্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন। তবে মুক্তিই যে ন্যায়শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রেরই মুখ্য প্রয়োজন মুক্তি। শাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ সেই মুক্তিলাভের সহায়তার জন্যই অধিকারিভেদে শাস্ত্রে নানারূপ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। মুক্তিই চরম নিঃশ্রেয়স। আর কোন নিঃশ্রেয়সলাভেই কাহারও চিরশান্তি হয় না। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রেরও মুক্তিই মুখ্য প্রয়োজন। অন্যান্য সম্পত্ নিঃশ্রেয়স মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও প্রয়োজন। মুক্তি প্রভৃতি প্রয়োজন, ন্যায়শাস্ত্রের প্রযোজ্য বা সম্পাদ্য, ন্যায়শাস্ত্র তাহার প্রয়োজক বা সম্পাদক। সুতরাং মুক্তি প্রভৃতি প্রয়োজনের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রযোজ্য-প্রয়োজকভাব-সম্বন্ধ।

ন্যায়দর্শনোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে মতভেদ

শিষ্য—গোতমের মতে মুক্তির স্বরূপ কি? এবং সে বিষয়ে কণাদেরই বা মত কি?

গুরু—ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম মুক্তির লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন—"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" ১।১।২২)। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুঃখের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন, "বাধনালক্ষণং দুঃখম্"। সুতরাং শেষোক্ত মুক্তির লক্ষণ সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত দুঃখই গৃহীত হইয়াছে, বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, দুঃখ হইতে যে অত্যন্ত বিমোক্ষ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি। প্রলয়াদিকালেও জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাহা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নহে। কারণ, পরে পুনঃ সৃষ্টিতে আবার জীবের জন্ম বা শরীরাদি পরিগ্রহ হওয়ায় দুঃখ জন্মে। সুতরাং প্রলয়াদিকালীন দুঃখনিবৃত্তি সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি হওয়ায় উহা মুক্তি নহে। তাই মহর্ষি গোতম উক্ত সূত্রে "অত্যন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যে দুঃখের নিবৃত্তি হইলে আর কখনও কোনরূপ দুঃখ জন্মে না, সেই চরম দুঃখনিবৃত্তিই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" এই শ্রুতিবাক্যেও "অত্যন্ত" শব্দের দ্বারা উহাই প্রকটিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন, "তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ" (৫।২।১৮)। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অদৃষ্টের উল্লেখ থাকায় উক্তসূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টই গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে কণাদের ঐ সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সমস্ত অদৃষ্টের অভাব হইলে তৎপ্রযুক্ত আত্মার যে সেই শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সংযোগের অভাব এবং পুনর্ব্বার তাহার অন্য শরীরাদির অপ্রাদুর্ভাব অর্থাৎ অনুৎপত্তি, তাহা মোক্ষ। প্রলয়কালেও আত্মার শরীরাদি থাকে না। কিন্তু তখনও পুনর্জ্জন্মজনক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট থাকায় পুনঃ সৃষ্টিতে আবার শরীরাদি পরিগ্রহ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়। সুতরাং প্রলয়কালীন ঐ অবস্থা মুক্তি নহে। তাই কণাদ ঐ সূত্রে পরে বলিয়াছেন, "অপ্রাদুর্ভাবশ্চ"। অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মজনক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা ধ্বংস হইলে আর কখনও সেই আত্মার শরীরাদির প্রাদুর্ভাব হয় না। সুতরাং আর কখনও তাহার কোনরূপ দুঃখ জন্মিতে পারে না। তখন তাঁহার যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি। ঐ অবস্থায় সেই মুক্ত আত্মার শরীরাদি কিছুই থাকে না এবং আর কখনও তাহা জন্মে না। কারণের অভাবে তাহা জন্মিতেই পারে না।

শিষ্য—তবে কি মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্তপুরুষের কোন সুখভোগ হয় না? এবং কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞানও থাকে না? তাহা হইলে ত উহা মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য। সুতরাং উহা পুরুষার্থ হইবে কিরূপে? কেহ কি নিজের মূর্চ্ছাবস্থাকে

প্রার্থনা করে এবং তাহার জন্ম কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজের মূর্চ্ছাদি জড়াবস্থা লাভের জন্ম প্রবৃত্ত হয় না। "ন হি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ।"

উত্তর—বড় কঠিন প্রশ্ন। মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত-পুরুষের কোন সুখভোগও হয় কি না? এ বিষয়ে চিরকাল হইতেই মতভেদ আছে এবং তাহা থাকিবে। এখন সেই মতভেদ বলিতেছি। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং তন্মতানুবর্ত্তী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যগণের মতেই মুক্তি হইলেও তখন তাঁহার কোন সুখ-ভোগ হয় না এবং কোন বিষয়ে কোন জ্ঞানও থাকে না। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের "ব্যোমবতীবৃত্তি"কার প্রাচীন ব্যোম শিবাচার্য্য আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা ও সুখদুঃখ প্রভৃতি সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদকেই মুক্তি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং উক্তমতে তখন আত্মার আকাশের ন্যায় জড়ভাবেই স্থিতি হয়। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের "কিরণাবলী" টীকাকার উদয়নাচার্য্য এবং "ন্যায়কন্দলী" টীকাকার শ্রীধরভট্ট এবং বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কার"-কর্ত্তা শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি সকলেই উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তুমি যে বলিয়াছ, পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তি পুরুষার্থই হইতে পারে না, তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, সুখের ন্যায় কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষার্থ। সুখ এবং দুঃখ-নিবৃত্তি এই উভয়ই স্বতঃ পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, ঐ উভয়ই পুরুষের স্বতঃ কাম্য। সুখের ন্যায় কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের সুখলিপ্সা থাকে না। বিশেষতঃ যাহা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, যাহা হইলে আর কখনও কোন প্রকার দুঃখের সম্ভাবনাই নাই, তাহা যে পরম পুরুষার্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উক্তরূপ মুক্তি যে মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য, ইহাও কখনই বলা যায় না। কারণ, মূর্চ্ছাবস্থার অবসানে আবার পূর্ব্ববৎ দুঃখভোগ হয়। আর ঐ মূর্চ্ছাবস্থাও যে কোন ব্যক্তিই কখনও প্রার্থনা করেন না, ইহাও বলিতে পার না। অসহ্য গুরুতর দুঃখের নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অনেকে নিদ্রা বা মূর্চ্ছাও কামনা করে। পীড়া-বিশেষের চিকিৎসায় অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে তখন দুঃখভয়ে মূর্চ্ছাবস্থাও কাম্য হয়। অবশ্য অনেক স্থলে পরে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাও থাকে। কিন্তু সুখভোগ করিতে হইলে দুঃখভোগও অনিবার্য্য। কারণ, সুখমাত্রই দুঃখানুষক্ত। সর্ব্বথা দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন সুখভোগ হইতে পারে না। পরন্তু সুখভোগ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, উহা বিনশ্বর পদার্থ। ঐ বিনশ্বর সুখ-ভোগে কামনা থাকিলে নানা দুঃখভোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে কখনই মুক্তি হইতে পারে না। কারণ, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি না হইলে কাহারও মতেই মুক্তি হয় না। এ জন্য যাঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু, তাঁহারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখভোগেরই কামনা পরিত্যাগ করেন। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই তাঁহাদিগের কাম্য হয়। সুতরাং উহাই পরমপুরুষার্থ, উহাই মুক্তি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

পথের স্মৃতি

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের লেবেল্ দিয়া আজ যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা গত জীবনের দুই একটি অতি সামান্য এবং নগণ্য ঘটনার স্মৃতিমাত্র, তাহাও ম্লান এবং বিশৃঙ্খল। আজ দিনান্তে পথের এই সীমান্তে আসিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইলে, অতীতের কত কথা—কত ব্যথার, কত সুখের কত দুঃখের স্মৃতিই যে একটির পর একটি আসিয়া মনের পটে ফুটিয়া উঠে আর মনকে দোলাইয়া দিয়া মিলাইয়া যায়, তাহার অন্তও নাই—হিসাবও নাই। তাই, উপন্যাসের চিত্রচাতুর্য্য বা ধারা-বাহিকতা কিছুই ইহাতে না থাকিলেও, জীবন-যাত্রা পথের এই যে স্মৃতি—ইহার যতটুকুর পারি, ততটুকুরই হিসাব লিপির ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্যই এই প্রয়াস। কিন্তু ইহাও বুঝিতেছি যে, এ কাহিনীর সহিত বাহিরের কোন সংস্রবই নাই; ইহা নিছক ব্যক্তিগত—একান্ত আমারই। অথচ ইহাই বলিবার জন্য কেন যে এই আয়োজন আর কেনই বা এত মনের আগ্রহ, তাহা মনের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ছাড়া আর কে বলিবেন ?

অতীতের এই যে কাহিনী, ইহা যেমন সাধারণ, তেমনি পুরাতন,—একেবারে সেকালের কথা। কিন্তু এই সেকালই বা আর কত কাল ? বিক্রমাদিত্যের রাজত্বও নহে, বক্তিয়ার খিলিজীর আমলও নহে, অথবা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ও নহে। ইহা আমার বাল্য, যৌবন এবং প্রৌঢ়কালের কাহিনী, নিছক সেকালের।

বড় জোর বছর চল্লিশ আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বছর দশ কি বার। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে ! তখন এই কালীঘাট ছিল ঠিক একটি পাড়া-গাঁ। এখন এই কালীঘাটের যে অংশটা আজ সুন্দর ছবির মত ছোট বড় নানা আকারের ও গঠনের বাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সহরবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই 'লেক্-রোড' পল্লীটাই তখন ছিল নিছক ধানের ক্ষেত। পৌষ মাসে 'বাউনি' বাঁধিবার জন্য ধানের শীষ আনিতে আমরা দলে দলে আসিয়া এই সব ক্ষেত হইতে ধানশুদ্ধ শীষ ছিঁড়িয়া আনিয়া ঘর ভরাইয়া ফেলিতাম।

তখন যে কয় ঘর এখানে থাকিতেন, পরস্পর সকলেই আমরা পরস্পরকে চিনিতাম। কয় ঘর বাসিন্দাকে আঙুলের পর্ব্বেই গণিয়া ফেলা যাইত। তখন 'গ্যাস' ছিল না, 'ড্রেণ' ছিল না, জলের কল ছিল না। এত বড় বড় রাস্তা-ঘাটও ছিল না, রং-বেরংয়ের এত 'পার্ক-স্কোয়ার'ও ছিল না, আর হরেক রকমের এত যান-বাহনও ছিল না। পুরাতন রসা রোডটির বুক চিরিয়া তখন সবেমাত্র ট্রামের লাইন বসিয়াছিল। ছোট একখানি এঞ্জিন, তদনুরূপ ছোট একজোড়া ট্রামগাড়ী আপনার অঙ্গে জুড়িয়া, ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে সুরু করিয়াছিল। আগে আগে তার ছুটিত এক জন ঘোড়-সওয়ার। সে ঘোড়া ছুটাইয়া পথের লোক সরাইতে সরাইতে যাইত, কেউ না এঞ্জিন-চাপা পড়ে। কিন্তু তবুও লোক চাপা পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই এক করিয়া, ঘোড়সওয়ারকে ফাঁকি দিয়া ট্রামের এই এঞ্জিনের চাকার তলায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তখন বিদেশী কোম্পানী ঠিক করিল— এ রাস্তায় এঞ্জিন চলিবে না। এঞ্জিন খুলিয়া তার যায়গায় তখন জুড়িয়া দেওয়া হইল এক জোড়া করিয়া ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য গাড়ীও একখানি কমাইয়া দিয়া একখানি করিয়া গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আর এঞ্জিনকে পাঠান হইল তখন খিদিরপুরে যাইবার মাঠের পথে। এই

ট্রাম দেখিতেই তখন কাতারে কাতারে পথের দুই পাশে কি লোকেরই না ভীড় হইত। চল্লিশ বৎসর আগে এমনই ছিল এই কালীঘাটের অবস্থা। কিন্তু পুরানো দিনের যে কথাটা বলিতে যাইয়া এই সব কথা আজ মনে পড়িতেছে, সেই কথাটাই বলি।

ছেলেবেলাকার এই কথাটা সে দিন বাঙ্গালা স্কুলে দৌহিত্রকে ভর্ত্তি করিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, তখন,—যখন দেখিতে পাইলাম যে, নীচের ক্লাশের একটি ছোট ছেলেকে, তাহার বাড়ীর লোক চ্যাংদোলা করিয়া স্কুলের ফটকে ঢুকিতেছে আর স্কুলে আসিতে অনিচ্ছুক সেই দুষ্টু ছেলেটি চীৎকারে গগন-পবন ফাটাইয়া তুলিতেছে। ইহা দেখিয়াই অতীতের ৪০ বছরের ঝাপসা দিনগুলি ভেদ করিয়া আমার মনশ্চক্ষুর সামনে আসিয়া পড়িল—আমাদের সেই হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালা।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিঘেখানেক ভদ্রাসনের উপর খান চারি পাঁচ গোলপাতার ঘর। তাহারই বাহিরের দিকের একখানি হেলে-পড়া জীর্ণ ঘরে আমাদের পাঠশালা বসিত। সকালে বিকালে দুই বেলা করিয়া পাঠশালা বসিলেও সকালের পাঠশালাটাই জমিত ভাল।

আমি আর আমার জ্যাঠামশায়ের ছেলে বিনু'দা একবাড়ী হইতে এই দুই জন আমরা পাঠশালায় যাইতাম। বিনুদা' আমার চেয়ে সামান্য দুই এক মাসের বড় হইলেও, সাংসারিক অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে বিনোদদা' ছিল অনেক বড়—এমন কি, লাফিয়েও তাঁর নাগাল পাওয়া আমার শক্তি-সামর্থ্যের বাহিরে ছিল। এই জন্যই প্রায় সকল কাযেই আমি তাঁর শিষ্যত্বই করিতাম। তাঁহাকে ভয়ও করিতাম যেমন—তেমনই ভালও বাসিতাম।

মাঘ মাস। কন্‌-কনে শীত পড়িয়াছে। তখন জুতা-মোজাও আমাদের ছিল না, উলের সোয়েটার র‍্যাপারও চোখে দেখি নাই। ছিল শুধু সকলের একখানি করিয়া সূতির চার-হাত লম্বা ছাপা দোলাই। তাহাই গায়ে ফেরতা দিয়া জড়াইয়া গলার কাছে ঠাকুমা গেরো দিয়া বাঁধিয়া দিয়া, কাপড়ের কোঁচড়ে দু'টি মুড়ি, গোটা দুই চার নারকোল নাড়ু, মুটো-খানেক ছাড়ানো বেদানার দানা দিয়া আমাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। এক জন কাবুলী প্রত্যহ বৈকালে আমাদের বাড়ী বেদানার দানা দিয়া যাইত। যেমন দুধের 'রোজ'—তেমনই এই কাবুলীর কাছে আমাদের বেদানার 'রোজ' ছিল। তাহার কাঁধের প্রকাণ্ড ঝুলির ভিতর আখরোট, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুরের বাক্স, আস্ত বেদানা, খোবানী প্রভৃতি সবই থাকিত। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে অন্য মেওয়াও কিনিতেন বটে, কিন্তু এই ছাড়ানো বেদানার দানা তাহার কাছ হইতে প্রত্যহই লওয়া হইত। তখন যে কয় জন সামান্য কাবুলী কলিকাতায় থাকিত, তাহারা সকলেই পাড়ায় পাড়ায় এই রকম মেওয়া বেচিয়া বেড়াইত। এত অসংখ্য কাবুলীরও তখন এখানে আমদানী হয় নাই আর জার্ম্মেনীর তৈরী গায়ের কাপড় বিক্রী কিম্বা পরোপকারার্থে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার কার্য্যটাও তখনও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। তখনকার দিনের মত তেমন বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার, বিরাট্ কাবুলীও আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের কাবুলীটির ভীষণ চেহারা আজও আমি বেশ স্পষ্ট মনে করিতে পারি। বাড়ীর আরও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভূত বলিয়া তাহার সামনে কেহ আসিতে ভরসাই করিত না। আমরা একটু বড় হইয়া উঠিয়াছিলাম—অল্পে অল্পে ভরসাও একটু একটু বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই আমরা তাহার কাছেও যাইতাম, তার লাঠিতেও হাত দিতাম, দোতলার বারান্দার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসাও করিতাম,—"খাঁ সাহেব, ওই হাঁদিবাবুকে তোমার ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে যাবে?" কোন কোন দিন পিছন হইতে তাহার প্রকাণ্ড পাগড়ীটি হেঁচকা টানে খুলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার দুঃসাহসও করিয়া বসিতাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাগ করিত না, বরঞ্চ এ সব সে ভালই বাসিত। কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহার রাগ ছিল না, তাহা নহে। কোন কারণে কোথাও সে যদি রাগিয়া যাইত, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। তখন আর তাহার জ্ঞান থাকিত না। তখন সে মত্ত হস্তীর ন্যায় ভীষণ হইয়া পড়িত। তাহার সেই একটা দেহ ফুলিয়া যেন দুইটা হইয়া পড়িত এবং তাহার নাক, মুখ, চোখ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুনের ফুলকী চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে থাকিত।

এমনই এক দিন আমি তাহার রাগ দেখিয়াছিলাম, এবং সে রাগের কারণ আমার বিনোদদা'। সে কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিতেছিলাম—

শীতকাল। মাঘ মাস। পাঠশালায় যাবার মোটেই ইচ্ছা নেই। ঠাকু'মা জোর করিয়া দোলাই গায়ে বাঁধিয়া

দিয়া, ঠেলিয়া ঠুলিয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, বিনোদদা' ফিরিয়া দাঁড়াইল—কহিল,—"পাঠশালায় যাব না।"

আমি বলিলাম,—"না ভাই। তা'হলে 'পোন্‌শাই' মারবে নিশ্চয়ই।"

পণ্ডিত মশাইকে সংক্ষেপে আমরা 'পোন্‌শাই' বলিয়া ডাকিতাম।

বিনোদদা' মুখে জিভ দিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিল,—"মারলেই হ'ল আর কি!" তার পর সেলেট-পেন্‌সিল রাখিবার জন্ম কাগজের ছোট থলিটির মধ্য হইতে কি বাহির করিতে করিতে বলিল,—"একটা জিনিষ দেখবি—এই ভাখ।"

দেখিলাম, একটা সিকি। আমাদের কাছে তখন অমূল্য জিনিষ। কারণ, অন্ত বাড়ীর ছেলেদের মত আমরা কখনও একটি পয়সাও হাতে পাইতাম না। ছেলেদের হাতে কাঁচা পয়সা দেওয়া কর্ত্তাদের কড়া নিষেধ ছিল। মধ্যে মধ্যে পালে-পার্ব্বণে, ঠাকুমা এক আধটা করিয়া পয়সা সকলকে দিতেন বটে, কিন্তু একবারে একটা রূপার সিকি পাওয়া আমাদের কাছে স্বপ্ন ছিল।

সিকি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথা পেলে ভাই? আদ্ধেক আমাকে দেবে?"

"ইস্, কত সুখ রে!"

"না দেবে—নাই দেবে। আমি পাঠশালায় যাই।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া বিনুদা' কহিল,—"আচ্ছা দোব। কারেও বলবিনি বল্।"

"না, সত্যি বোলব না। কোথায় পেলে বল।"

"ঠাকুমা বিছানায় ঢেলে গুণছিল, আমি হাতে চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছি, দেখতে পায় নি। চ, কিছু কিনে খাই গে।"

"কি খাবে?"

"পাঁচকড়ি বেণের দোকান থেকে 'বিলিতী-জল' খাই গে চ'।"

"কি গো! এই শীতে—সকাল বেলা—'বিলিতী-জল'?"

"দূর গাধা, তাতে কি? আয়।" বলিয়া বিনুদা পাঁচ-কড়ি বেণের দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। সুতরাং আমারও আর পাঠশালায় যাওয়া হইল না।

দুই আনা দিয়া দুই বোতল বিলিতী-জল (লেমনেড) দুই জনের খাওয়া হইল। বাকি পয়সা দুই আনা রাখিয়া দিয়া বিনুদা কহিল,—"থাক্, বিকেলে আবার কিছু খাওয়া যাবে।" কিন্তু পথে আসিতে আসিতে পদীর মার দোকানে গরম্-গরম্ ফুলুরী-বেগুনী ভাজা দেখিয়া বিনুদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"পয়সা আর রেখে কি হবে, গরম বেগুনী খাওয়া যাক্ আয়।" দুই পয়সা দুই পয়সা—একুনে চার পয়সা বেগুনীও খাওয়া হইল। আমি কহিলাম,—"আর চার পয়সায় কি খাবে?"

সম্মুখেই একটি উড়িয়ার একখানি পাণের দোকান ছিল। একখানি থালায় সে ছাঁচী পাণের খিলি করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল। বিনুদা আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"আয়, পাণ খাই।"

আমি তিন হাত সরিয়া গিয়া বলিলাম,—"না ভাই, পাণ খাব না, বাড়ীতে জান্‌তে পারবে।"

"দূর বোকাকান্ত! মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ফেল্‌লে জান্‌তে পারবে কি ক'রে?"

যাহা হউক, দুই পয়সার ছাঁচী পাণও খাওয়া হইল। বাকী রহিল আর দুইটি পয়সা। পাণ চিবাইতে চিবাইতে আমি বলিলাম,—"চল ভাই, পাঠশালায় যাওয়া যাক্—এখনও বেশী বেলা হয় নি।"

একটি যাত্রীর পিছনে পিছনে একটি ভিখারী বুড়ী পয়সা চাহিতে চাহিতে ছুটিতেছিল। বিনোদদা' তাহাকে ডাকিল,—"এই বুড়ী, পয়সা নিবি?" বুড়ী কাছে আসিলে বিনোদদা' পয়সা দুইটি তাহার হাতে দিয়া দিল।

আহার, পান, মুখশুদ্ধি ও দান সব রকম কার্য্যই যখন সমাধা হইয়া গেল, তখন পুনরায় আমি বলিলাম,—"চল ভাই, এইবার পাঠশালায় যাই।"

"তুই যা; আমার এই বইগুলোও নিয়ে যা। আমি বেলা বোষ্টুমের খিড়কীর কুলগাছে রইলুম। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাবি,—বুঝলি? নইলে মজা টের পাবি।"

সুতরাং একাই পাঠশালায় যাইলাম। কিন্তু যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই হইল। পাঠশালা-ঘরে প্রবেশ করিতেই পণ্ডিত মশাই জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পঞ্চু, বিনে কৈ রে?"

আমি বলিলাম,—"তার বড্ড পেটের অসুখ করেছে পোন্‌শাই।"

কে একটা ছেলে দাঁড়াইয়া বলিল,—"না পোন্‌শাই,

মিছে কথা। আমি আসবার সময় দেখে এলুম, বেন্দা বোষ্টমের কুলগাছে চ'ড়ে ব'সে রয়েছে।"

"না পোন্‌শাই, মিছে কথা। কাল রাত থেকে তার পেটের অসুখ করেছে, তাই ঠাকুমা আস্‌তে বারণ কল্লে।" বিনুদার শিষ্যত্বগুণে মিছে কথা বলিতে কিছুতেই বাধিত না।

হরিশ পণ্ডিত মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাই ঠাকুমা আস্‌তে বারণ কল্লে?"

—"হ্যাঁ পোন্‌শাই।"

—"আর তাই, তার বদলে ঠাকুমা তার বইগুলো বুঝি তোকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে? ওগুলো ত বিনের বই দেখছি।"

যে ছেলেটা কুলগাছের কথা বলিয়া দিয়াছিল, সে পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিল,—"মিছে কথা পোন্‌শাই। কুলগাছে ব'সে কুল খেতে দেখে এলুম পোন্‌শাই।"

তখন পণ্ডিত মশায়ের হুকুমে পাঁচ সাত জন কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া বাহির হইল বিনুদা'কে ধরিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু এ অভিযান যে একবারেই বৃথা, তাহা আমিও যেমন জানিতাম, ইহাদের মধ্যে কেহ তদপেক্ষা কম জানিত না। বিনুদা'কে জোর করিয়া পাঠশালায় ধরিয়া আনিতে পারে, এমন ক্ষমতা ছেলেদের মধ্যে ত কাহারই ছিল না—এমন কি, স্বয়ং হরিশ পণ্ডিতেরও না। তবে বর্দ্ধমানের পণ্ডিতদের খ্যাতির কথা শুনিয়াছি। তেমন পণ্ডিত হইলে কি রকম হইত, বলিতে পারি না। তবে হরিশ পণ্ডিতও নেহাৎ ফেলা যান না। বর্দ্ধমান না হইলেও, শুনিয়াছি বহুপূর্ব্বে, নবাবের আমলে, ইঁহাদের হুগলী জেলায় বাস ছিল। বর্দ্ধমানের প্রতিবাসী বটে।

যাই হউক, পাঁচ সাত জন ত কোমর বাঁধিয়া বিনুদা'কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটিল। মজা দেখিবার জন্য আমিও সেই ফাঁকে তাহাদের সঙ্গে দৌড় দিলাম।

আমি মনে করিতেছিলাম, দূর হইতেই শত্রুসৈন্য দেখিয়া বিনুদা গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাজনবাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিবে। কিন্তু ছেলের দলকে দেখিতে পাইয়াও সে কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া কুলভক্ষণ কার্য্যেই রত রহিল। ছেলেরা যাইয়া গাছ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে বিনুদা' গোটা দুই তিন কুলের আঁটি এক জনের মাথায় সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"ধরতে এসেছিস্, দাঁড়া, ধরাচ্ছি" বলিয়া দুই হাতে কুল ছিঁড়িতে লাগিল, আর সেই কুল সজোরে ছুড়িয়া তাহাদের মারিতে লাগিল। সে যেন কুলগাছরূপ বন্দুক হইতে কুলের গুলী সকলের মাথায়, বুকে, পিঠে, পায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সৈন্যগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পাঠশালার দিকে পলাইতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"বিনুদা', এইবার নেমে এসে শীগ্‌গির পালাও।"

বিনুদা' নিরুদ্বেগে জবাব দিল,—"থাম্ থাম্, তুই যেমন ভীরু! কে ধরে—আসুক না একবার।"

"গোটাকতক ভাল দেখে কুল ফেলে দাও না ভাই,খাই।"

—"আর বড় পাচ্ছি না রে! বেটাদের মারতে গিয়ে গাছ একেবারে সাবাড় হয়ে গেছে।"

হঠাৎ দেখা গেল, পাঠশালা শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া কুলতলার দিকে আসিতেছে—সঙ্গে স্বয়ং হরিশ পণ্ডিত। বলিলাম,—"বিনুদা, শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও।" বলিলাম বটে, কিন্তু পলাইবারও উপায় রহিল না; কারণ, পণ্ডিত মশাই সৈন্য-সামন্ত সমেত তখন একবারে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে।

বেন্দা বোষ্টমের খিড়কীর পুকুরের উচ্চ পাড়ের উপর এই বৃহৎ কুলগাছটি ছিল। গাছটির মূল যদিও পাড়ের উপর ছিল, কিন্তু তাহার শাখা-প্রশাখা জলের উপর হেলিয়া পড়িয়াছিল।

পণ্ডিত মশাই কুলতলায় আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিনে, ভাল চাস্ ত শীগ্‌গির নেমে আয়।"

বিনুদার ভ্রূক্ষেপও নাই। যেমন ডালের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল। পণ্ডিত মশায়ের কথার উত্তরও করিল না বা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তখন পণ্ডিত মশাই গর্জ্জাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"নাম্‌বি কি না বল্? নইলে এই কাঁটা শুদ্ধ কুলের ডাল তোর পিঠে ভাঙ্গবো, তা ব'লে রাখছি কিন্তু।"

কে যেন কাহাকে বলিতেছে! বিনুদা' যেমন পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চুপ-চাপ বসিয়া রহিল। একটি কথা কহিল না, একটুখানি নড়িল না বা কাহারও দিকে চাহিল না।

তখন পণ্ডিত মশাই হাঁক দিয়া বলিলেন,—"হাবু, ওঠ্ ত গাছে।"

হাবু—ওরফে হাবুলচন্দ্র ছিল সর্দ্দার পোড়ো।

পণ্ডিত মশায়ের হুকুম হইয়া যাওয়া মাত্র হাবু মালকোঁচা বাঁধিয়া কুলগাছে উঠিয়া পড়িল। মস্ত বড় গাছটির যে উঁচুকার ডালটিতে বিমুদা' আমার পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, হাবু এ-ডাল সে-ডাল বাহিয়া, সেই ডালটির কাছে আসিয়া পড়িতেই যেন গাছের উপর কোথা হইতে কাল-বৈশাখীর ঝড় আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ডালটি ভয়ানক রকম হেলিতে দুলিতে ও নড়িতে আরম্ভ করিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি যে, বিমুদা' প্রাণপণ শক্তিতে সেই ডালটা ধরিয়া নাড়া দিতেছে। সে কি ভীষণ ঝাঁকানি! দেখিতে দেখিতে ঝপ্-ঝপাং করিয়া জলের উপর এক প্রচণ্ড শব্দ হইয়া উপর হইতে কি আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি,—সর্দ্দার পোড়ো হাবু, গাছের উপর হইতে গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। হাবুডুবু খাইতেছে; কারণ, সে সাঁতার জানিত না। ব্যাপার দেখিয়া পণ্ডিত মশাই নিমেষমধ্যে মালকোঁচা বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ছেলের দল তখন সকলেই একটা কলরব করিয়া উঠিল। গাছের উপর চাহিয়া দেখি, বিমুদা' আর গাছে নাই। এই শুভ অবসরে কখন্ গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়া বোষ্টমদের পাঁদাড় দিয়া ছুটিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে দিনকার কুলগাছের পালার উপলক্ষ করিয়া আমাদের পাঠশালার পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। বিমুদা' বাটী আসিয়া ঠাকুমাকে সত্য ও মিথ্যায় মিলাইয়া হরিশ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। ঠাকুমা বলিলেন,—"লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্তেই ছেলেকে পাঠশালায় দিয়েছি—মেরে ফেলতে দিইনি।" ঠাকুমার প্ররোচনায় সেই দিনই সন্ধ্যার পর জ্যেঠা মহাশয় হরিশ পণ্ডিতকে তলব করিলেন। বিমুদা' বোধ হয় মনে মনে নিশ্চিতই জানিয়াছিল যে, পাঠশালায় আর আমাদের যাইতে হইবে না। সুতরাং জ্যেঠামহাশয়ের নিকট আসিয়া হরিশ পণ্ডিত সে দিন বিমুদার সম্বন্ধে যত দোষ দিতে লাগিল, বিমুদাও দরজার পাশে দাঁড়াইয়া হরিশ পণ্ডিতের সম্বন্ধে তত দোষ দিতে লাগিল। বিমুদা যে নির্ভীক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি কিন্তু, পাঠশালায় আর পড়িতে যাইতে হইবে না, জানিতে পারিলেও হরিশ পণ্ডিতের সামনে কখনও তাঁর দোষের কথা এমনভাবে উল্লেখ করিতে সাহস করিতাম না।

জ্যেঠামশাই বলিলেন,—"তুই বরাবর বাড়ী ফিরে না এসে বোষ্টমদের কুলগাছে উঠ্‌তে গেলি কেন?"—বিমুদা' কিছুমাত্র না থামিয়া উত্তর করিল,—"তামাক চুরি ক'রে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম ব'লে পোন্‌শাই বেত নিয়ে তেড়ে মারতে এলেন, তাই দৌড়ে পালিয়ে এলুম। পেছন পেছন ছেলেদের সব তাড়া দিয়ে ধর্ত্তে পাঠালেন। আর দৌড়তে পাল্লুম না, তাই কুলগাছে উঠে পড়লুম।" তামাক চুরি ক'রে নিয়ে আসার কথাটা যে একবারেই মিথ্যা, তাহা আমরা তিন জন ছাড়া, জ্যেঠামশাই হয় ত বুঝিতে পারিলেন না। তখন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কি করিয়া হরিশ পণ্ডিতের সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এত বড় একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা বিমুদা' বলিতে পারিয়াছিল। বাটী হইতে তামাক আনিতে হরিশ পণ্ডিত বলিতেন বটে। এমন কি, চাহিয়া না পাইলে, চুরী করিয়া আনিতেও তাঁহার আদেশ ছিল, কিন্তু সে আমাদের প্রতি নয়,—অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর যে সমস্ত ছেলে পড়িত,—তাহাদেরই প্রতি তাঁহার এই ধরণের আদেশ হইত।

জ্যেঠামহাশয়ের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, বিমুদার তামাকের কথাটায় খুব কায হইয়াছে। হরিশ পণ্ডিত বলিলেন, "হ্যাঁ রে বিমু, বাবা, এত বড় ঘরের ছেলে হয়ে মিথ্যাকথা,—আচ্ছা পঞ্চু কৈ, তাকে ডাক দেখি একবার, সে কখনও মিছে কথা বলবে না।" পোন্‌শাই 'ডায়াগনসিস্' করিতে ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিলেন। পঞ্চুও যে দাদার ধারে ধারে যায়, ইহা তিনি একবারেই জানিতে পারেন নাই। বিমুদার পাশেই দেওয়ালের আড়ালে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বিমুদা' আমার গায়ে একটা টিপ দিতেই, আমি দরজার সামনে যাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"হ্যাঁ, তামাক ত আপনি রোজ আমাদের নিয়ে যেতে বলেন!" সঙ্গে সঙ্গে বিমুদা' কহিল,—"আর পড়া ত একবারে কিছুই হয় না বাবা। অঙ্ক-টঙ্ক সব ত ভুলেই যাচ্ছি। পোন্‌শাই খালি ঘুমুবে, আর আমাদের তার পিঠে পায়ে সুড় সুড়ি দিতে হবে।"

সেই সময় আমি হরিশ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। অত বড় দুর্জ্জয় হরিশ পণ্ডিত লজ্জায়, ঘৃণায় এবং কতকটা বা ভয়েও যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেলেন। স্বপক্ষসমর্থনের জন্ত একটিমাত্র কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। প্রায় মিনিট তিন চার ধরিয়া সকলেই নীরব থাকিবার পর জ্যেঠামহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা হরিশ, তুমি এস;—ওরা

আর পাঠশালে যাবে না। বড় হয়ে উঠেছে, এখন স্কুলেই ভর্ত্তি ক'রে দোব ভাবছি।"

ইহারও কোন জবাব হরিশ পণ্ডিতের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি নীরবে জ্যেঠামশাইকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই সময় এমন জোরে বিনুদা' আমার হাত টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, তার ব্যথাটা তার পরের দিন পর্য্যন্তও হাতে আমার অল্প অল্প ছিল।

দিন পাঁচ সাত পরে শুনিলাম যে, বেচারা হরিশ পণ্ডিত জ্যেঠামশায়ের কাছ থেকে, আমাদের বেতন বাবদ, মাসে মাসে যে দুইটি করিয়া টাকা পাঠশালার সাহায্যের জন্য পাইতেন, জ্যেঠামশাই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তখনকার দিনে দুইটি টাকার দাম ছিল দশ টাকা। সুতরাং হরিশ পণ্ডিতের ক্ষতি নেহাৎ সামান্য হইল না। বিনুদা'কে ডাকিয়া বলিলাম, —"কেন মিথ্যে ক'রে অত সব বল্লে ?" বিনুদা' কহিল, —"বলবে না ত কি! বেটা ভারি দুষ্টু। আর আমি ত শুধু একলা বলিনি, তুইও ত বলেছিস্!"—"তুমি আগে বলেছ, তার পর ত আমি বলেছি।" সে বয়সে বোধ হয় এইটাই মনে করিতাম যে, পরে বলিলে বুঝি কোন দোষ হয় না।

যাহা হউক, পাঠশালার পাঠ ত উঠিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবারও কাহারও চাড় হইল না। চাড় হইবার মধ্যে এক জ্যেঠামশাইয়ের. বাবার এ সব বালাই ছিল না। বাবা এত বড় বড় কাযে ব্যস্ত থাকিতেন যে, আমাদের লেখাপড়ার মত সামান্য কাযে মনোযোগ দিবার তাঁহার সময় হইত না। জ্যেঠামশাইয়ের কোনই কায ছিল না; সেই জন্য তিনিই এই সব ছোট-খাটো কাযে দৃষ্টি রাখিতেন। এই কারণে আমরা সকলেই বাবার উপর সন্তুষ্ট এবং জ্যেঠামশাইয়ের উপর অসন্তুষ্ট ছিলাম।

জ্যেঠামশাই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, সকালে দুপুরে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা আর অঙ্ক কষিতে। আমরা কিন্তু সে দিক্ দিয়াও যাইলাম না। না করি হাতের লেখা, না কষি অঙ্ক। চব্বিশ ঘণ্টা তখন আমাদের গুলী খেলিবার ধুম পড়িয়া গেল। জ্যেঠামশাই রোজই জিজ্ঞাসা করিয়া যান যে, লেখা-অঙ্ক হইতেছে কি না। আর আমরাও দুই জনে ঘাড় নাড়িয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া যাই। কিন্তু এক জন, যাঁহার কাছে আমাদের ফাঁকি কিছুতেই চলিত না—সে ঠাকুমা। তাঁহার লিখিবার জন্য তাগাদায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার মুখের বুলিই ছিল,—"ওরে, হাতের লেখা পাকা, তবে ত সাহেবের চাকরী পাবি!"

এক দিন বৈকালে গুলীর থলেটি লইয়া বাহির হইতেছি, ঠাকুমা হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। বরাবর দোতলার বারান্দায় গিয়া, মেজের উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "উদয় অস্ত, খালি খেলা—খালি খেলা; পোড়ারমুখো ছেলে কোথাকার! ব'স এইখানে। দুধের বাটি আ-ঢাকা রইলো, দেখিস্ যেন বেড়ালে না খেয়ে যায়। আমি কাপড় কেচে আসি। বৈঁচীর বৌ ওপরে এলে পরে তাকে দুধের কথা ব'লে তবে খেল্‌তে যাবি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি গুলীর থলে হাতে করিয়া বসিয়া বসিয়া দুধ চৌকী দিতেছি। না ফিরিলেন ঠাকুমা, না আসিল তাঁর বৈঁচীর বৌ। এমন সময় বিনুদা' আসিয়া বলিল, "ওরে শীগ্‌গির, শীগ্‌গির,—'ঘর-পার' খেলবি ত গুলী নিয়ে আয়।" 'ঘর-পার' অর্থাৎ মাটীতে খুব বড় একটি ঘর আঁকিয়া এক রকম গুলী খেলা। 'ঘর-পার' খেলায়, সঙ্গীদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। সুতরাং তখনই ছুটিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা হইল, কিন্তু ঠাকুমার দুধ চৌকী দিতেছি—যাইবার উপায়ও নাই। বিড়ালটাকে দেখিতে পাইলে না হয় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতাম।

বিনুদা'কে এ কথা বলাতে, বিনুদা কহিল, "তুই একেবারে আস্ত গাধা! একটা বেড়ালকে বাঁধবি, আর একটা এসে যদি খেয়ে যায়?"

"তবে কি করবো?"

"তবে কি করবি? কৈ দুধের বাটি?" বলিয়া বিনুদা' চোঁ চোঁ করিয়া বার আনা রকম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিল এবং বাকী দুধটুকু আমার সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "খেয়ে ফেল্—ফেলে বাটিটা উপুড় ক'রে রেখে দিয়ে চল্। এখন বেড়াল এসে কচু খাবে!"

সে দিন সন্ধ্যার পর বাবা, জ্যেঠামশাই, ঠাকুমা প্রভৃতি বসিয়া আমাদের বৈকালের কাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সকলেই খুব একটা হাসির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মনে মনে নিশ্চিন্ত হইলাম যে, ব্যাপারটা শেষে হাসির সঙ্গেই শেষ হইল। কিন্তু কে জানিত যে, এত হাসির পরেও আবার আমাদের চোখের জলের সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সে রাত্রিতে জ্যেঠামশাই ও বাবা আমাদের দুই জনের কি দুর্দ্দশা যে করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে আজও মন লজ্জায় ভরিয়া আসে। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

৺কেদার-বদরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরিদ্বারে দুই দিন

৩০শ দিন—১৯এ জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন, শনিবার।

৺কেদার-বদরী হইতে হরিদ্বারের পথে ফিরিবার উদ্দেশ্য শুধু স্নানযাত্রার স্নান ও গ্রহণস্নানের সঙ্কল্প নহে (সে সঙ্কল্প ত ৺কাশীতেও সিদ্ধ হইতে পারিত), প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই নাতিশীতোষ্ণ স্থানে এক পক্ষকাল কাটাইয়া সকলে সুস্থ ও সবল হইব, নতুবা শীতপ্রধান প্রদেশ হইতে ফিরিয়া একেবারে এই জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে লক্ষ্ণৌ বা ৺কাশীতে বিশ্রাম করিতে গেলে কিছুমাত্র আরামবোধ হইবে না। মহাতীর্থগমনে বিলম্ব করা উচিত নহে বলিয়া যাইবার সময় এখানে বেশী দিন থাকা হয় নাই। যে দুই দিন থাকা হইয়াছিল, সেও কার্য্যগতিকে। পূর্ব্ব-বৎসরে ৫।৬ দিন ছিলাম, তাহাতে তৃপ্তি হয় নাই; সে বৎসর সঙ্গে যে ভাগিনেয়টি ছিলেন, তাঁহার কার্য্যক্ষতি হইবে বলিয়া আর বেশী দিন থাকা হয় নাই। এবার সেই খেদ মিটাইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল; বিশেষতঃ গৃহিণীর হরিদ্বার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল. এ যাত্রা সাধ মিটাইয়া অন্ততঃ এক পক্ষকাল এখানে বাস করিবেন, আরামও হইবে, তীর্থবাসের পুণ্যও হইবে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, এ কথাটা যতই বয়স হইতেছে, ততই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। বিধাতার বা নিয়তির হাতে আমরা ক্রীড়নক মাত্র। 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।' 'Man proposes, God disposes.'

বুড়াকে এত তোয়াজ করিয়া ত ঘর দখল করা গেল; কিন্তু ধর্ম্মশালায় ২।৩ জন তীর্থবাসীর সহিত দেখা হইতেই শুনা গেল যে, একটি ঘরে পূর্ব্বদিন এক জন লোক কলেরায় মারা গিয়াছে, সে ঘরে গুঁড়া চুণ খুব ছড়ান হইয়াছে ও হইতেছে, মেথরেরা বারান্দা উঠান প্রভৃতি ঘন ঘন ঝাঁটপাট দিতেছে, কোথাও একটু জঞ্জাল থাকিতে পাইতেছে না। এমন কি, পায়খানা ভাল করিয়া সাফ করার অজুহতে ঘণ্টাখানেক তথায় প্রবেশ-নিষেধ হইয়া গেল। আসিয়াই এই বিভ্রাট্—তীর্থপথে 'জঙ্গল যাওয়া'ও যে ইহার চেয়ে ছিল ভাল। (এখানেও অবশ্য 'জঙ্গল যাওয়া' চলিত আছে, কিন্তু এত বেলায় একটু অসুবিধা, দূরও বটে।) যাহা হউক, সংবাদ শুনিয়া মনটা বিগড়াইয়া গেল বটে, তবে একেবারে ঘাবড়াইয়া গেলাম না। ধীরে-সুস্থে শৌচক্রিয়া, স্নানাহ্নিক, রন্ধন, ভোজন সবই হইল, বিধবাটি সুন্দর হালুয়া প্রস্তুত করিলেন এবং বাজারের দুধ, দধি, তরকারী, পাঁপর আসিল—যদিও এ বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

তখনও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝি নাই। এ দিকে গৃহিণীর আমাশয়ভাব দেখা দিল, সারা তীর্থপথে তাঁহার অন্য অসুখ হইলেও পেটের দোষ হয় নাই, এখানে আসিয়া তাহাও হইল। এই কারণে ও দুর্ব্বলতার জন্য ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত ও বাঁধান গঙ্গাতীরভূমিতে তাঁহার আর বৈকালে ভ্রমণে যাওয়া হইল না। আমরাও না গেলে ভাল হইত; কেন না, এইটুকু লাভ করিয়া আসিলাম—স্বাস্থ্য-কার্য্যালয় (Health Office) হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিলাম যে, দশহরার সময় বহু যাত্রিসমাগম হওয়াতে তাহার পর হইতে কলেরা রীতিমত সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, এমন দিনও গিয়াছে যে, রোজ ১৮।১৯ জন মারা গিয়াছে। অদ্য ৬।৭ জন। বেড়ান মাথায় উঠিল, কল্যই লক্ষ্ণৌ প্রস্থান করা যাইবে স্থির হইল; সম্ভব হইলে অদ্যই হইত, কিন্তু ভাগিনেয় বাপাজীর একটি চর্ম্ম-পেটিকা (attache-case) হরিদ্বারের পাণ্ডার জিম্মায় রাখিয়া যাওয়া গিয়াছিল, পাণ্ডাজীর খোঁজ করিতে কিঞ্চিৎ সময় আবশ্যক, নতুবা সেটি উদ্ধার হইবে না। অগত্যা অদ্য আর যাওয়া চলে না। ভোরে কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিলে পাণ্ডাজী অবশ্যই 'যাত্রী' পাকড়াইতে ষ্টেশনে যাইবেন, সেই সময়ে ছেলেরা তথায় গেলে তাঁহার 'হদিশ' পাইবে। ব্রহ্মকুণ্ডের ধার হইতে ফিরিবার সময় বাজারের খাবার কেনা বন্ধ হইল, তৎপরিবর্ত্তে নেংড়া আম ও লিচু কেনা গেল। রাত্রির আহার হইল দুধ ও ঘরে প্রস্তুত লুচী-তরকারী। ভাগিনেয়ের জ্যেঠামহাশয়ের 'চূরণে' গৃহিণীর আমাশয়-ভাবের উপশম হইল।

৺জগত্তারিণী দেবী

(শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী)

৩১শ দিন—২০এ জ্যৈষ্ঠ, ৩রা জুন, রবিবার।

প্রাতঃকালে পুত্র ষ্টেশনে পাণ্ডার সন্ধান করিয়া তাঁহার বাসা হইতে চর্ম্মপেটিকা আনিলেন। লক্ষ্ণৌএর যে আত্মীয়-* ভবনে যাইব, তিনি সস্ত্রীক হরিদ্বারে মাসখানেক বাস করিতেছিলেন, বাজারে একটি ঘিয়ের দোকানে পুত্রের তাঁহার সহিত দেখা হইল। বিধাতার লীলা! তিনি পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোকামে আসিলেন। খানিক পরে তাঁহার স্ত্রীও আসিলেন, (আমার মাতুলকন্যা)। প্রায় এক বৎসর পরে দেখা, বড়ই আনন্দ হইল। কলেরার সংবাদ তাঁহাদিগকেও বিচলিত করিয়াছিল। সুতরাং উভয় দলেরই অদ্য বৈকালে লক্ষ্ণৌ যাত্রা হইবে, স্থির হইল। (একটু বাধা ছিল—ধোপাবাড়ীর কাপড় পাইবেন কি না, কিন্তু শুভাদৃষ্টক্রমে যথাকালে তাহা পাইয়াছিলেন।) হরিদ্বার-তীর্থে স্নানযাত্রার স্নান হইবে, কিন্তু গ্রহণস্নান হইবে না. সে পুণ্যসঞ্চয় করিতে গেলে ট্রেণ ধরা যাইবে না। সুতরাং এ যাত্রা ষোল আনা পুণ্যলাভ অদৃষ্টে নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। শুনিলাম, আত্মীয়প্রবরের এখানে এক মাস থাকিয়া আহারে অত্যন্ত অরুচি ধরিয়াছে, কনখল হইতে থোড়-মোচা আমদানী করিয়াও সে অরুচি সারিতেছে না। তিনি দোষ দিলেন, এখানকার চাউলের। পরে লক্ষ্ণৌএ কয়েক দিন বাস করিয়া বুঝিয়াছিলাম, নিরামিষ আহারের দরুণ এই দারুণ অরুচি ঘটিয়াছিল। কেন না, তিনি মৎস্যভোজনে চিরাভ্যস্ত, লক্ষ্ণৌএ মাছও অসম্ভব সস্তা, ৵০-।০ আনা সের। যাক, বৈকালে ষ্টেশনে উভয় দলের মিলন হইল, সকলেই একটি কামরা দখল করা গেল—স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে। অবশ্য সে কামরায় অন্য লোকও ছিল, ট্রেণে বেশ ভিড় দেখিলাম। বোধ হয়, অনেকেই আমাদের মত 'প্রাণভয়াৎ পলায়মানাঃ।'

লক্ষ্ণৌযাত্রার পূর্ব্বে দুইটি কর্ত্তব্য সমাধা করা গেল। প্রথম, ৺কেদারনাথের পাণ্ডার খোঁজ করিয়া তাঁহাকে এক শত টাকা সুফলের জন্য দক্ষিণা দেওয়া। পাণ্ডাজীকে তাঁহার ভ্রাতার ব্যবহারের কথা বলিলাম। শতমুদ্রা পাইয়া তিনি অপ্রসন্ন হইলেন না, বুঝা গেল। (৺কেদারধামে ও পরে ফিরিবার পথে কি কারণে তাঁহার ভ্রাতাকে টাকা দেওয়া হয় নাই, তদ্‌বিবরণ বহু পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি। পৌষ সংখ্যা, ৪০৪ পৃঃ ও মাঘ সংখ্যা, ৫৩১ পৃঃ)। দ্বিতীয় কর্ত্তব্যপালন, হরিদ্বারের পাণ্ডাজীকে নিজের পক্ষ হইতে ও বিধবাটির পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ প্রণামী-প্রদান। পাণ্ডাজী প্রথমে অভিমান করিয়া প্রণামী-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন; কেন না, আমরা তীর্থকৃত্য শ্রাদ্ধভোজ্য-উৎসর্গ প্রভৃতি কিছুই করিলাম না, মহাতীর্থ-যাত্রাকালেও করি নাই—আসিয়া করিব এই আশায়। এবারও তাড়াতাড়িতে হইল না। এই জন্যই শাস্ত্রের নিদেশ—'শ্বঃকার্য্যমদ্যকর্ত্তব্যম্।' মনটা চঞ্চল ছিল বলিয়া এবং বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারা গেল না বলিয়াও বিধবাটির কনখলে দক্ষযজ্ঞভূমি প্রভৃতি দর্শন হইল না, ইহাও অত্যন্ত আপশোষের কথা; কেন না, এত দূরদেশে বহু ব্যয়ে আবার আসিবার সম্ভাবনা কম। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এই নীতিবাক্য আওড়াইয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। তবে এ জন্য তাঁহার নিকট বড়ই লজ্জিত আছি।

ট্রেণে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া সারারাত থাকিতে হইয়াছিল, শয়ন ও নিদ্রার সুবিধা কোনও প্রকারে পাওয়া গিয়াছিল। পথে ভোরবেলায় শাণ্ডিলা-নামক ষ্টেশনে এক প্রকার 'লাড্ডু' পাওয়া যায়, অতি সুন্দর। আত্মীয়প্রবর কয়েক সের (কয়েক ভাঁড়) কিনিয়া লইলেন। আমরা আর আলাদা কিনিয়া অনাত্মীয়তা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলাম না। হরিদ্বারে ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম বার যাই, তখন আমরা ইহার স্বাদ পাইয়াছিলাম। এবার লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া পরখ করিয়া দেখা গেল, জিনিশটা নিরেশ হইয়া গিয়াছে—বোধ হয়, ভেজাল মিশান চলিয়াছে। (বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা ত এখন অখাদ্য হইয়াছে।) প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম।

লক্ষ্ণৌয়ে এক পক্ষ কাল স্থিতি

২১এ জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা জুন হইতে ৫ই আষাঢ়, ১৯এ জুন পর্য্যন্ত।

২১এ জ্যৈষ্ঠ ৪ঠা জুন সোমবার প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে (আবরুরক্ষার জন্য) দুইখানি বন্ধগাড়ী অর্থাৎ পাল্কীগাড়ী ভাড়া করা গেল। এই যান এখানে কম, অধিকাংশই খোলা-গাড়ী অর্থাৎ টঙ্গা (টম্‌টমের ভদ্র-সংস্করণ; সেগুলি খুব

* শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, আমার মাতুল মহাশয়ের জামাতা। বহুকাল তিনি লক্ষ্ণৌপ্রবাসী, প্রথমে একটি মিশনারী কলেজে, পরে ক্যানিং কলেজে এবং এক্ষণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের প্রোফেসার।

সুন্দর; ৺কাশীতেও আজকাল চল হইয়াছে।) পূর্ব্ব-বৎসরে আত্মীয়-প্রবরের বাসাবাটীতে উঠিয়াছিলাম, এবার উঠিলাম তাঁহার নিজস্ব নব-নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ও সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকায়! মহল্লাটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরিবারস্থ বালক-বালিকা হইতে বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যথাযোগ্য নমস্কার-আশীর্ব্বাদাদির পর কুশল-প্রশ্ন ও তীর্থভ্রমণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তদুত্তর চলিতে লাগিল। আমাদের কঠিন তীর্থভ্রমণের বাসনা সফল হইয়াছে বলিয়া সকলেই আনন্দিত, কিন্তু আমাদের, বিশেষতঃ গৃহিণীর, শরীরের হাল দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন।

লক্ষ্ণৌ তথা ৺কাশী এই দারুণ গ্রীষ্মে মোটেই বাসের, বিশেষতঃ বহু শ্রমে দেশ-পর্য্যটনের পর বিশ্রামের উপযোগী স্থান নহে; সেই জন্যই হরিদ্বারে এক পক্ষ কাল বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল; কি কারণে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, এখানে পৌঁছিয়া কেবল প্রথম দিন গুমটের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় অনেক কম। তাহার পর হইতে হয় বৃষ্টি, না হয় 'আঁধি' (dust-storm), না হয় জলো হাওয়া প্রায় রোজই ছিল। দুই দিন ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গেল। শেষ কয় দিন দিনের বেলায় এক এক দিন গরম হাওয়ায় (তবে রীতিমত 'লু' নহে) ও জানালা-দরজা বন্ধ করিলে গুমটে কষ্ট হইত, কিন্তু রাত্রিকালে দ্বিতলের ছাদে শুইয়া বেশ হাওয়া পাওয়া যাইত। তবে প্রথম প্রথম তাহার প্রয়োজন হয় নাই, দোতালার খোলা বারান্দায় পড়িয়া থাকিতাম, সেখানেই সুনিদ্রা হইত। * দোতালার ছাদে শুইতে আত্মীয়টি সহসা সাহস পান নাই; কেন না, দুই দিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে ছাদ ভিজিয়াছিল, পাছে সে জন্য সেঁতসেঁতে ছাদে শুইলে ঠাণ্ডা লাগে, এই ভয়ে। কিন্তু শেষে অসহ্য হওয়াতে মত-পরিবর্ত্তন করিতে হইল; 'গরজ বড় বালাই'। 'Necessity is the mother of invention', প্রয়োজন উদ্ভাবনের জননী (?), সুতরাং এই আশঙ্কা-নিবারণের উপায়ও উদ্ভাবিত হইল; পুত্রের পরামর্শে অয়েল-ক্লথ ও কম্বল পাতিয়া (এ সব ত তীর্থপথে সঙ্গেই ছিল) তাহার উপর বিছানা করা হইত, ভিজিতে হয় কম্বল ও অয়েল-ক্লথ ভিজিবে। 'যা' শত্রু পরে পরে।' ঠাণ্ডাটা বিছানা তথা গাত্রের চর্ম্ম ও অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিবে না।

আত্মীয়টির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দৌহিত্রীগণ দুপুরে ফল্‌সার সরবৎ অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া কলিজা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন; দুই এক দিন জাম খাইয়াও মুখটা জুড়াইয়াছিল, আর এক দিন ফল্‌সা, লেবু ও মালাই তিন রকমের কুল্‌পী (Ice-cream) কলে তৈয়ার করিয়া খাওয়াইয়াও আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; তৃতীয়টি ভয়ে ভয়ে অল্প-স্বল্প খাইয়াছিলাম; কেন না, গুরুপাক, পেটের অবস্থাও ভাল ছিল না (তীর্থপথের জের), এবং গরমের জন্য সাবধান হইতেও হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধ 'সফেদা' ও 'দশেরী' আমের স্বাদও গ্রহণ করিয়াছিলাম। গৃহে মিষ্টান্নও মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত হইত; কেন না, আত্মীয়-গৃহে (কতকটা হিন্দুয়ানীর জন্যও বটে এবং কতকটা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বটে) বাজারের খাবার আসা নিষিদ্ধ। ইহা ছাড়া বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মাছ এখানে প্রচুর ও সুলভ। সুস্বাদুও বটে, ৺কাশীর মত স্বাদহীন নহে। দীর্ঘকাল তীর্থপথে নিরামিষ-ভোজনের পারণা সুচারুরূপেই অনুষ্ঠিত হইত। গৃহিণীর রন্ধনের সাধ এতই প্রবল যে, দুর্ব্বল দেহেও মাছের ২।১ রকম তরকারী ও ২।১ প্রকার মিষ্টান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত না করিয়া ছাড়েন নাই।

ফল কথা, দীর্ঘ তীর্থ-পথের শ্রম ও অনিয়ম-জনিত কষ্টের পর এই এক পক্ষ কালের বিশ্রাম ও আত্মীয়-পরিবারের যত্ন-আদর বড়ই প্রাণে লাগিয়াছিল ও খুব কাযেও আসিয়াছিল। শরীর কাহারও ভাল ছিল না। গৃহিণীর অবস্থা অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ। এখানকার বিশ্রাম ও যত্ন সেবায় এবং আত্মীয়-প্রবরের গুরুদেবের নির্দ্ধারিত বায়োকেমিক্ ঔষধে গৃহিণীর অনেক কালের 'বাস্তু' কাসী (যাহা ৺বদরীনারায়ণের পথে নূতন করিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল) অনেক পরিমাণে দমন হইয়াছিল। এই পনর দিন এখানে না থাকিয়া বরাবর ৺কাশী বা কলিকাতায় গেলে অথবা হরিদ্বারে কাটাইলে তাঁহার অবস্থার এই উন্নতি ও শরীরে বলাধান হইত না। ৺কাশী গেলে রুগ্ণ ও দুর্ব্বলদেহে মন্দিরে মন্দিরে "টো টো" করিয়া ঘুরিলে হিতে বিপরীত হইত। সুতরাং

---

* সুনিদ্রার একটা ব্যাঘাতও কিন্তু ঘটিত। এক জন ধনী প্রতিবেশীর চৌকীদার সারা রাত অত্যন্ত চড়া ও কর্কশকণ্ঠে পাহারা দিত। লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর দেশে এরূপ কর্কশ কণ্ঠ তাজ্জব ব্যাপার বটে!

পুণ্যের খাতায় জমার অঙ্কে একটু কম পড়িলেও ইহা শাপে বর বলিতে হইবে।

সঙ্গের বিধবাটির শরীরও ভাল ছিল না। পথে অনেক স্থানে তিনি আমাশয় বা রক্ত-আমাশয়ে ভুগিয়াছিলেন, ভাগিনেয়-প্রদত্ত 'চূরণে' রোগের অনেকটা উপশম হইত। ইহা ছাড়া, দন্তশূল তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী; অত্যন্ত শীতলপ্রদেশে এ রোগের খুব বৃদ্ধি হইয়াছিল; কত দিন রান্নাবান্না সমস্ত করিয়া শেষে আহারের বেলায় এক গ্রাসও মুখে তুলিতে পারিলেন না, এমন বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইত। এখানে আসিয়া তাঁহার আমাশয় কয়েক দিন খুব প্রবল হইল; আত্মীয়টির প্রদত্ত ঔষধে ক্রমে উপশম হইল। তীর্থপথে ভাগিনেয় বাপাজী মধ্যে মধ্যে অজীর্ণরোগে (dyspepsia) ভুগিতেন, ইহা অনেক দিনের রোগ; এখানেও এক এক দিন ইহার পুনরুদ্ভব হইত। নিজেরও এক এক দিন পেটের গোলযোগ, পেট কামড়ানি, পেট গড় গড় করা, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর প্রভৃতি ঘটিত এবং ঔষধের জন্য আত্মীয়টির শরণাপন্ন হইতে হইত। ইহার জন্য কতকটা দায়ী আহারে, বিশেষতঃ আমিষভোজনে অসংযম, কিন্তু প্রধানতঃ দায়ী লক্ষ্ণৌএর জল। গোমতীর জল কলে পরিশোধিত (refine) হইলেও হজমের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে; এ অংশে কাশীর গঙ্গাজল অনেক ভাল। আত্মীয়বর আশ্বাস দিলেন, সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্ম্মাণের জন্য যে প্রভূত অর্থব্যয় হইয়াছে, সেই দায়মুক্ত হইয়া একটু মাথা তুলিতে পারিলেই গৃহপ্রাঙ্গণে নলকূপ (Tube-well) বসাইবেন; আগামী বর্ষে আসিলে জলের দোষে আর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছি। দেখা যাউক, এই মিয়াদের মধ্যে তিনি কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারেন।

শ্রীভগবানের কৃপায় দীর্ঘ তীর্থ-পথে পুত্রটিই কেবল সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, এখানে আসিয়া তাহারও ব্যতিক্রম হইল; ভাল হজম হয় না, দুই এক দিন এইরূপ মন্তব্য করার পরেই এক দিন সান্ধ্যভ্রমণের পর গৃহে ফিরিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একেবারে উপরি উপরি ৫।৬ বার ভেদবমি; লক্ষ্ণৌএ তখন ২।৪টা কলেরা হইতেছে, পূর্ব্বে বেশীও হইয়াছিল; সুতরাং ব্যাপার দেখিয়া চক্ষুঃস্থির হইল, সাংঘাতিক বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া গৃহিণী ও আমি মুহ্যমান হইলাম; সৌভাগ্যক্রমে আত্মীয়-প্রবর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ পরিবারের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক্ ও বায়োকেমিক্ চিকিৎসা করিয়া সিদ্ধহস্ত ও বিলক্ষণ ভূয়োদর্শী হইয়াছিলেন, সারারাত্রি বিনিদ্রভাবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াইয়া রোগ উপশম করিলেন; পরদিনও চিকিৎসা চলিল, ক্রমে রোগী সুস্থ হইল। ৺কাশীতে বা কলিকাতায় হইলে কে এরূপ যত্ন লইত? হয় ত এক রাত্রিতে জলের মত একরাশি টাকা খরচ হইয়া যাইত, আর হোমরা-চোমরা বিশেষজ্ঞগণের গুণে ফল কি দাঁড়াইত, ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। এ বিষয়ে যে বারবার ভুক্তভোগী হইয়া হাড়েনাড়ে জ্বলিয়া গিয়াছি। করুণাময়ের অনন্ত করুণায় এবং আত্মীয়টির একাগ্র যত্নে পঞ্চপুত্রের অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল। ভগবান্ আত্মীয়-প্রবরকে চিরসুখী করুন, তাঁহার নিকট এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

লক্ষ্ণৌ সহরে এক পক্ষ কাল বাস করিলাম, এখানকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্যরাজি * ও সুন্দর পার্কগুলি দেখিলাম কি না, (লক্ষ্ণৌকে City of parks বলে) পাঠক-সম্প্রদায়ের মনে স্বতঃই এই কৌতূহলের উদ্ভব হইতে পারে। সন্ধ্যাকালে আত্মীয়টির সঙ্গে কয়েক দিন নিকটবর্ত্তী আমীনাবাদ পার্ক ও আমীনুদ্দৌলা পার্ক (দুইটি পাশাপাশি) অথবা অদূরবর্ত্তী কেশরীবাগ, বাটলার পার্ক (উহারই এক অংশ), চাঁদবাগ প্রভৃতি পার্কে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিয়াছিলাম; এক দিন উইংফিল্ড পার্কে গিয়া বায়ুসেবনও করা গিয়াছিল এবং তত্রত্য বিস্তৃত পশুশালায় সিংহ-ব্যাঘ্রের গর্জ্জনও শোনা গিয়াছিল। ভিক্টোরিয়া পার্ক, সেকন্দরবাগ প্রভৃতি অনেক দূরে বলিয়া এত গরমে যাওয়ার সুবিধা হয় নাই। কেশরীবাগের অদূরে গোমতীর একটি পুলের পাশে সুন্দর রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ ও শিবলিঙ্গ বিরাজমান; গোমতী-তীরবর্ত্তী মন্দির-চত্বর সন্ধ্যাকালে বায়ুসেবনের পক্ষে আরামদায়ক স্থান। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেবদর্শন ভালরূপে হয় নাই; মনে করিয়াছিলাম, এক দিন প্রাতঃকালে গিয়া দর্শন ও পূজা করিব, কিন্তু একটু রৌদ্র উঠিলে আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইত না। ভোরে ভোরে গেলে দেবতার তখন 'শয়ান' অবস্থা। শেষটা আত্মীয়বর জামা গায়ে দেওয়ার ভয়ে সান্ধ্যভ্রমণ ত্যাগ করিলেন; আমিও পথ চিনিতে পারিব না

* লক্ষ্ণৌএ আরও দুইবার আসিয়াছি এবং তখন এগুলি ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। এবার আর ক্লান্ত দুর্ব্বলদেহে ও দারুণ গ্রীষ্মে পা করিয়া দেখি নাই। পাঠকবর্গ এগুলির বিবরণ পাইলেন না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। তবে একাধিক ভ্রমণকারীর পুস্তক-প্রবন্ধে এগুলির বিবরণ সুলভ।

বলিয়া একা বাহির হইতে সাহস করিতাম না! তাঁহার গৃহ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র সবজীবাগে সন্ধ্যাযাপন ও কথোপকথন চলিত, পরিবারস্থ আরও কেহ কেহ যোগদান করিতেন। এইরূপ গল্পে গল্পে সন্ধ্যা কাটিত। প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ডায়েরী হইতে এই ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী ভাল করিয়া [fair copy] লিখিতাম, প্রথম দুই তিন মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ এইখানেই লিখিত হইয়াছিল। 'স্বভাব যায় না ম'লে'; সুতরাং এই বিশ্রামকালেও ২।৪ খানি ইংরেজী কেতাব ও (ম্যাগাজিন্) মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়াছি, ২।১ খানি ভাল লাগাতে কলিকাতায় ফিরিয়া নিজেদের কলেজ লাইব্রেরীতেও আমদানী করিয়াছি। পেশাদার শিক্ষক ও পাঠকের স্বভাব যাইবে কোথায়?

এখানে আত্মীয়বর্গের নিরন্তর সাহচর্য্য ও জনৈক জ্ঞাতি ও জনৈক কুটুম্বের সাক্ষাৎকার-লাভ, তথা ২।৪ জন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ ও পুনরালাপ ছাড়া আর একটি আনন্দজনক মিলন ঘটিয়াছিল। ছাত্র-জীবনের একটি সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ * বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বেরিলিতে থাকেন। বৎসরে ২।১বার কলিকাতায় গেলে প্রীতিপূর্ব্বক একটিবার করিয়া দর্শন দেন। অথচ আমি উপরি-উপরি দুই বৎসর হরিদ্বার গেলাম, তাঁহার দুয়ার দিয়া যাতায়াত করিলাম, কিন্তু তাঁহার গৃহে অতিথি হইলাম না। গতবারে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিন ধার্য্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সে পত্র বিলম্বে পাওয়াতে আমাদের হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময়ে তিনিও ষ্টেশনে হাজির হইতে পারেন নাই, আমিও গভীর রাত্রে অপরিচিত স্থানে নামিয়া পড়িতে সাহস পাই নাই। উভয় পক্ষেরই পরিতাপের বিষয়। এবার ফিরিবার সময় নামিবার নানা অসুবিধা ছিল। যাহা হউক, তিনি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আমার এই ত্রুটি সারিয়া লইলেন। আমাদের লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের সংবাদ পাইয়া নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আত্মীয়টির সহিতও তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। সমস্ত দিন তিন জনে কথাবার্ত্তায় আনন্দে কাটাইলাম। সন্ধ্যার পর আহারান্তে তিনি বিদায় লইলেন। এবারকার লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের ইহা অন্যতম সুখস্মৃতি।

এইরূপে আত্মীয়বর্গের আদর যত্নে, প্রীতি-শ্রদ্ধায়, পরম সুখে ও পরম আরামে ছিলাম। তাঁহারা আরও কয়েক দিন এইভাবে থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন—কেন না, তখনও অফুরন্ত গ্রীষ্মাবকাশের দিন কতক বাকী ছিল। আরও কয়েক দিন থাকিলে গৃহিণীর শরীরটা সুস্থ ও সবল হইত, ইহা উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে একটা প্রবল প্রলোভন বটে। কিন্তু কিছুদিন আরামে থাকিয়া আমাদের আসন টলিল, সকলেরই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার ঝোঁক হইল। আমার পুঁথি-পত্র গুছানর প্রয়োজন, গৃহিণীর গৃহস্থালীর দ্রব্যজাত গুছানর প্রয়োজন, বিধবাটির ভ্রাতৃ-জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কলিকাতায় গিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখাশুনার প্রয়োজন। পুত্রের আদালতে প্রবেশ (bar join) করিবার সময় আগতপ্রায়, আর ভাগিনেয় বাপাজী ত কয়েকদিন থাকিয়াই ৺কাশীতে মাতাপিতৃসন্নিধানে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা রওনা হইয়াছিলেন। ফল কথা, সকলেই আবার সেই বহু বৎসরের পরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিতে ব্যগ্র—ইহা যে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমন কি, আমার চিরপ্রিয় ৺কাশীতেও এ যাত্রা বেশী দিন থাকিতে ইচ্ছা হইল না। দারুণ গ্রীষ্মে ৺কাশীবাস আরামপ্রদও নহে।

আত্মীয়-প্রবরের অনুরোধে দিনক্ষণ দেখিয়া ৫ই আষাঢ় (১৯এ জুন : রথযাত্রার দিন প্রাতরাশের পরে পেশোয়ার মেলে রওনা হওয়া গেল। একটি ভাগিনেয় ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন, স্ত্রী-পুরুষ সকলে একত্রই যাওয়া গেল। আমাদের কামরায় কেবল একটিমাত্র অপর লোক ছিল। ভাল দিন না থাকাতে রথের পূর্ব্বে যাত্রা করা হইল না। সুতরাং এক বেলার বিলম্বে রথ দেখা ও গঙ্গাস্নান কোনওটাই হইল না। তবে বৈকালে ৺কাশী পৌঁছিয়া রথতলার কাছ দিয়া ঘোড়ার গাড়ী যাওয়াতে রথের ধ্বজাটা দেখিতে পাইলাম, 'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে',—এ দুর্লভ পুণ্যসঞ্চয় অবশ্য হইল না। (৺বদরীনারায়ণের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি দর্শনে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।) ট্রেণে থাকিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল—৺কাশী অঞ্চলে এই প্রথম বর্ষণ, আমরা পৌঁছিলে সে দিন আর হয় নাই। পরে মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল।

৺কাশীধামে ৫ দিন

৫ই আষাঢ়, ১৯এ জুন, মঙ্গলবার হইতে ১০ই আষাঢ়, ২৪এ জুন, রবিবার পর্য্যন্ত।

৺কাশীধামে আসিয়া নিত্যকর্ম্ম ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-ঢুণ্ঢিরাজ-সাক্ষিবিনায়ক-কেদারগৌরী প্রভৃতি দেবদর্শন, দশাশ্বমেধ

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, রেলওয়ের অডিট আফিসের এক জন উচ্চ,কর্ম্মচারী।

বা অন্য ঘাটে প্রাতঃস্নান যথানিয়মে অনুষ্ঠান করা গেল; কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য দুর্গাবাড়ী, সঙ্কটা প্রভৃতি দর্শনের সুবিধা হইল না। এমন কি, দুর্গম তীর্থ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া ৺সঙ্কটার পূজা দেওয়ার মানস ছিল, গৃহিণী তাহাও পারিলেন না। তবে যাত্রার পূর্ব্বে পূজা দেওয়া হইয়াছিল, এইমাত্র সান্ত্বনা। ইহা ছাড়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাট, অহল্যাবাঈএর ঘাট, কেদারঘাট প্রভৃতি ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ, বন্ধুবর্গের সহিত দেখাশুনা করা ও তীর্থদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা, ইত্যাদি চলিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পদ্মনাথ বাবুর সহিত দেখা করিতে পারিলাম না, পথে ঘাটে কোন দিন দৈবাৎ দর্শনও হইল না, বাসা ঠিক চিনি না বলিয়া তাঁহার নিকট যাওয়াও ঘটিল না। তাঁহার সহিত তীর্থপথের বিবরণ মিলাইবার বড় ইচ্ছা ছিল। (তিনি ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন ও তদ্‌বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ১৪।১৫ বৎসর হইল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সে কথার উল্লেখ আষাঢ়-সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠায় করিয়াছি।) আর দেখা হইল না, যে সদাশয় ডাক্তার বাবু (রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী) পূর্ব্ব-বৎসর হইতেই আমাকে এই তীর্থযাত্রায় উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহার সহিত। (তাঁহার উল্লেখ ভাদ্রসংখ্যা ৭৯৮ পৃষ্ঠায় করিয়াছি।) তিনি এক্ষণে ৺কাশীর দারুণ গরমের ভয়ে রাঁচি গিয়াছেন।

এখানেও আত্মীয়ভবনে আদর-যত্নে ৫।৬ দিন থাকিয়া তাঁহাদের ও ৺কাশীর নেংড়া আমের মায়া কাটাইয়া এবং আরও কয়েকদিন থাকার অনুরোধ এড়াইয়া অম্বুবাচীর শেষ দিনে (যাত্রিক দিন না হইলেও—'স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ', 'মন সরে ত যা') দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হইলাম এবং পরদিন প্রাতঃকালে (১১ই আষাঢ় ২৫এ জুন)—ঠিক দুই মাস পরে কলিকাতায় পৌঁছিলাম। যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল! ঘরে ফিরিয়া আবার সেই 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।'

কলিকাতার কথা

যথাসময়ে কলেজ খুলিলে নিজের চিরাভ্যস্ত কার্য্যে লাগিয়া গেলাম, আর গৃহিণী ত কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহার সাধের গৃহস্থালীর সমগ্র ভার লইলেন—রুগ্‌ণ ও দুর্ব্বল দেহে। পুত্রবধূটি তখনও পিত্রালয়ে, সুতরাং পরিশ্রমের মাত্রা পুরাপুরিই রহিল। ইহার ফলে তাঁহার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। আশ্বিন মাসে বধূমাতা আসিলেও গৃহিণীর শ্রমের লাঘব হইল না; কেন না, নবীনা জননী শিশুপুত্র ও নবজাতা কন্যা এই দুইটিকে লইয়া বিব্রত। তাহার উপর তিনি দুই দুই বার জ্বরে পড়িলেন, তাহাতে গৃহকর্ত্রীর পরিশ্রম ও ঝঞ্ঝাট আরও বাড়িয়া গেল, ভগ্নদেহ আরও ভাঙ্গিল। তিনি চিরদিনই নিজের শরীরকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন; যখন অটুট স্বাস্থ্য ছিল, রক্তের জোর ছিল, তখন তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এখন এই অবহেলার ও অতিরিক্ত খাটুনীর ফলে শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; তথাপি শ্রমের নিবৃত্তি নাই। ডাক্তার দেখাইতে, ঔষধ খাইতে, সম্পূর্ণ অসম্মত। বহু অনুরোধে তাঁহার একই উত্তর, আপনিই সারিয়া যাইবে। কিন্তু সারা দূরে থাকুক, শীতের প্রকোপে রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইল। এই অবস্থায় চিকিৎসকও আসিল, ঔষধও পড়িল; কিন্তু তখন রোগ চরমে দাঁড়াইয়াছে, শিবের অসাধ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। মাঘ মাস হইতে চারি মাস কাল অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়া গত ১৮ই বৈশাখ * রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি যন্ত্রণামুক্ত হইয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন; শেষ জীবনে গুরুতর শোকতাপ পাইয়াছিলেন, এতদিনে শান্তিলাভ করিয়াছেন। ৺কেদার-বদরী-দর্শনের বিমল আনন্দের এই শোচনীয় পরিণাম বড়ই মর্ম্মান্তিক। তবে শাস্ত্রের বাণী যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ৺বদরীনারায়ণের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি-দর্শনের পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না, (ফাল্গুন-সংখ্যা, ৪২৮ পৃঃ), সেই জন্য বিষম শারীরিক যন্ত্রণা তাঁহার দেহধারণের শেষ ভোগ, এই কথা মনে করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছি।

তথাপি এ জন্য পাঠকবর্গের হৃদয় বিষাদময় করিতে চাহি না, পুণ্যসঞ্চয়ে তাঁহাদিগের উৎসাহ-ভঙ্গও করিতে চাহি না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের উভয়ের প্রাক্তনের ফল; ৺বদরীধামের পথে জোষী মঠে ঠাণ্ডা লাগা (মাঘ-সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ, ফাল্গুন-সংখ্যা ৭২৩-২৬ পৃঃ) 'নিমিত্তমাত্র', অথবা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ইহা exciting cause উত্তেজক কারণ-মাত্র, রোগের বীজ পূর্ব্ব হইতেই দেহে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, এই সূত্রে প্রকট হইল। এই বিরুদ্ধ ঘটনায় নিরুৎসাহ না হইয়া পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদিগের অর্থ, সামর্থ্য ও পুণ্যলাভের স্পৃহা আছে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে নির্ভয়ে এই কঠিন তীর্থভ্রমণ করিবেন, এমন কি, 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপত্নী-সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা করিবেন, দীন লেখকের এই অনুরোধ। মাসাধিক কালের ভ্রমণবৃত্তান্ত পুরা এক বৎসরে শেষ করিলাম, এই অত্যাচারের জন্য সহিষ্ণু পাঠকবর্গের নিকট আর এক বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* গত বর্ষে ঠিক এই ১৮ই বৈশাখ ১লা মে ৺কাশীধাম হইতে ৺কেদার-বদরী-দর্শনোদ্দেশ্যে হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছিলাম। 'যদৃবিধের্মনসি স্থিতম্।' এ বৎসর ঠিক ঐ দিন কঠিন তীর্থদর্শন-ব্রতের কঠোর উদ্‌যাপন হইল। জানি না, অকালে নারায়ণ-দর্শনে যাত্রা করিবার জন্য আমাকে এই শাস্তিভোগ করিতে হইল কি না।
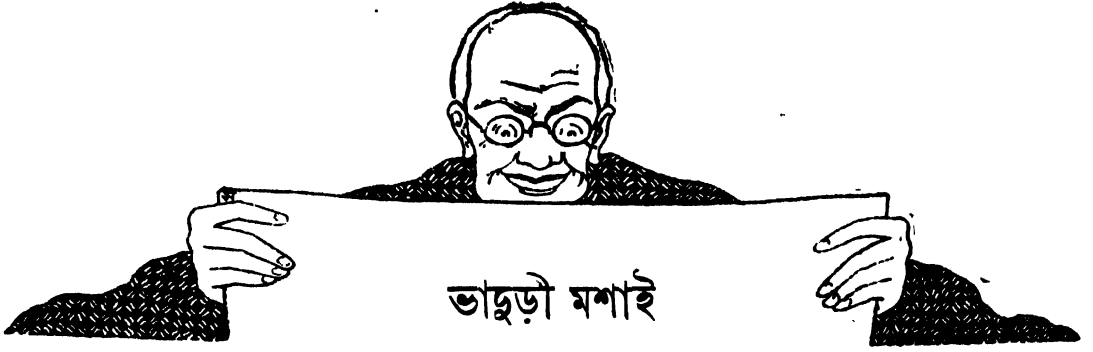
সমাপ্ত

২১

কিংশুকের কিনারা না ক'রে মন্দাকিনী দেবীর নিদ্রা ছিল না। রোগটি ছোঁয়াচে, সুতরাং সুবর্ণ বাবুকে দিনের বেলা বারান্দায় ব'সে ঢুলতে হতো।

দেবীর দুর্ভাবনা—"কেউ দেখবার নেই ব'লে একটি অসহায় ছেলে স্নেহ-যত্নের অভাবে ভেসে যাবে!"

ইরাণী আর সইতে পারলে না, বল্‌লে—"ওগো, ভাসবে না, ভাসবে না,—ভেব না। পেছনে সোনার নোঙর আছে…"

"তেমনি পাঁচ হাঙ্গরেও হাঁ ক'রে আছে, কেটে হাল্‌কা করতে কতক্ষণ! ঐ ত হাবা ছেলে—"

"হাবা-কালাদের জন্তেই কি তোমার যত মাথাব্যথা মা! শেষ কি একটা হাবা-কালার আশ্রম বানাবে না কি! তায় বাবার আবার বুদ্ধি কম। তাড়ালে দেখছি!"

ইরাণী বলে,—যাঁরা মৃদু হাসে। মায়ের দয়ার শরীর—দুর্ভাবনা ত্যাগ হয় না। তিনি ভাবেন, আর সুবর্ণ বাবুকে বলেন—

"বেড়াতে আসা বই ত নয়—কোথায় কবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, মনের ত ঠিক নেই! কালই যেতে পারে,—বাঁধন ত নেই। যদি আজ রাতের ট্রেণেই –"

আর বলতে পারেন না, চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

—"পোড়ারমুখোরা ত তাই চায়। আমি নিশ্বাস্ বলতে পারি,—ওর ক'খানা বাড়ী আছে, ও তাই জানে না। ওর বাড়ী-ভাড়ার ত ভারি খোঁজ!"

—"মাথা খেলে, ব্যাঙ্কের বই বাছার নিজের কাছে আছে ত? হ্যাঁ গা, কথা কও না কেন,—আমি কি—"

সুবর্ণবাবুর আহারে আর সুখ নেই—উঠতে পারলে বাঁচেন!

এই বাঁধা-মার আর সহ্য করতে না পেরে, কিংশুককে হাজির ক'রে দিয়ে তিনি পরিত্রাণ পেলেন।

মন্দাকিনীর মৃদু মধুর কলস্বনে, আর একটি দিনের স্নেহ-যত্নেই কিংশুকের স্নেহ-পিপাসী হৃদয় সত্যই যেন ঈপ্সিত বস্তুর আস্বাদ পেলে। এই অভাবটাই তাকে সুখের সন্ধানে অসুখী ক'রে রেখেছিল।

তার বেশ মিষ্টি লাগলো।

দেবী বৃথাই বিয়াল্লিশ বছর ব্যয় করেন নি। পুরুষ-সাইকলজির সিনিয়র গ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিলেন, আর—সেইটিই ছিল তাঁর সবার বড় গর্ব্ব। সুবর্ণ বাবুকে তাই খুব সমঝে চলতে হতো,—অনেক কসরতে মুখখানাকে পাথরে কোঁদা জিনিষে পরিণত করতে হয়েছিল। ফাল্‌তু টান্‌টোন্ বা রেখাপাতে অনর্থপাতের শঙ্কায়—আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।

কিংশুকের ব্যথার স্থানটি বুঝে নিতে দেবীর বিলম্ব হয় নি। তার অব্যর্থ প্রলেপও তাঁর জানা ছিল। কিংশুকের উদাস ভাবটাকে সহজেই আশার বাতাসে বেমালুম উড়িয়ে দিলেন।

—"আমার ছেলে নেই, ভগবান্ যদি দিলেন, যে-ক'দিন পাই, আমি ছাড়ছি না বাবা। রোজ একবার দেখা দিতেই হবে,—আমার মাথার দিব্যি রইল। মা বললে ত না বলতে পারতে না বাবা! আমিই না হয়"—

কিংশুক সলজ্জ বিনয়ে বাধা দিলে বল্‌লে—"না হয়, বলছেন কেন মা,"—ইত্যাদি।

কিংশুক কি যেন নেশায় টলতে টলতে বাসায় ফিরলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। যারা গাইতে জানে—তাদের কণ্ঠে নাকি অসাধিতে ইমন-কল্যাণ সুর দেয়, তাই—"তোমারি রাগিণী হৃদয়-কুঞ্জে" বাসা পর্য্যন্ত ধাওয়া করলে।

* * *

"এমন রূপ তো দেখিনি"……

"মতির চেয়েও?……

মন্দাকিনী দেবী বিরক্তভাবে বললেন-—"যা বলছি, শোন না ;—তোমাকে আর কি বলবো ! এই ছেলের কি না এই অবস্থা ! আর—"

"আর কি করতে বলো ?"

"ওই বলবে তা জানি।—ছন্নছাড়া হয়ে বেড়াক, আর তোমরা দ্যাখো ! যার ধন তার ধন নয়—এই বুঝি আইন ! পটলডাঙ্গায় মণি পিসী তোমাদের চেয়ে ঢের বোঝেন। সেখানে কারো চালাকি চলে না,—একবার যাও দিকি তার কাছে।—ছেলে উকীল,—আমার নাম কোরো, এক পয়সা লাগবে না। পিসীর কোনো তীর্থি-ধম্ম বাকি নেই—পাণ্ডারা সব জোড়হাত। সোনা-বাঁধানো রুদ্রাক্ষী,—মটকা প'রে মাছ কোটেন। তাঁর জলপড়া—ডাক্ শোনে, একবার যাও দিকি।"

ইরাণী বাপের জন্যে পাণ এনে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে—"তোমারও মাথা খারাপ হ'ল নাকি, মা ! এত বড় কাযে বাবাকে বিশ্বাস করছ যে বড় ? উনি আমাদের কলকেতায় বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছেন, সেই সুযোগে তোমার 'কোপ'গুলো সেরে এসো।—আজ রাতে আর ট্রেণ নেই মা, খেতে ত দিলেই না, বাবাকে একটু শুতেও দেবে না কি ?"

"তুই যা ত এখান থেকে ! হ্যাঁ গা—সত্যি খাওয়া হয় নি ?"

সে দিন এর বেশী আর বাড়ল না,—এইখানেই শেষ হ'ল।

*　　*　　*　　*

তৃতীয় দিনে মন্দাকিনী দেবী কিংশুকের জলযোগে চারটি মিঠে পোলাও যোগ করলেন।—"দেখ ত বাবা—কি করলে,—ইরাণী এই সবই করতে পারে ভালো ; শরীর ভালো নয়—তেমন হয় নি বোধ হয়।"

—"হ্যাঁ, সে দিন কি নাম বললে,—কামিখ্যে মণ্ডল না ? উনি বলেন,—পয়সা বড় পাজি জিনিষ, ওর লোভ সামলাতে কা'কেও দেখলুম না। কলকেতা ত অট্টালিকার আড়োৎ—ইট-কাঠের হাট ;—কোন্‌টা কার বাড়ী—কেউ কি বলতে পারে ? আর বললেই ত নিজের হয় না—প্রমাণ করতে হয়। সবারই ত মশলা—ইট কাঠ চুণ সুরকি।"

—"সত্যিই ত। শুনে সারারাত ঘুম হ'ল না। বাপ-মা নেই,—কার মনে কি আছে ! কামিখ্যের হাতে রক্ষে পেলে হয়। টেক্সোগুলো কার নামে জমা দিচ্ছে,—রসিদ কার নামে নিচ্ছে, দেখতেও ত হয়, বাবা। না ব'লে যে থাকতে পারি না কিংশু।"

ইত্যাদি কথার পর অবিনাশবাবুর বৃষোৎসর্গের প্রসঙ্গ পেড়ে মন্দাকিনী দেবী সহাস্যে বললেন—"ইরাণী ওর বাপকে বলছিল—'ও সব সমাজের তৃপ্তির জন্যে বাইরের ব্যাপার মাত্র।' শুনে আমি অবাক্ ! আমার গুরুদেব সিদ্ধ পুরুষ (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে) তিনিও বলেন—বাপ-মায়ের তৃপ্তি আর কিসে ? স্বর্গে গেলে তাঁদের আত্মা আর চান কি ? ছেলের আত্মার মধ্যে থেকে তার সুখ সম্পদ আনন্দ ঐশ্বর্য্য তাঁরা ভোগ করেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা তাই,—তৃপ্তি তাইতে'।"

এই ব'লে—বালিগঞ্জের খালি যায়গায় বাড়ী-বাগান ফেঁদে ঘর দোর ফার্ণিচারে ফিট্ ক'রে সাজিয়ে, ফটকে—ষ্টিম দেওয়া প্রতীক্ষাপন্ন মোটর সমেত এক রঙিন্ ছবি কিংশুকের চক্ষুর সামনে খাড়া ক'রে বললেন—"ছেলে ত তাঁদেরি আত্মা,—এতেই তাঁদের আত্মা সুখী হয়। শুনছি, বংশ-লোপ হ'লে তাঁদের কষ্টের সীমা থাকে না—আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়ান। তাই পুত্র আর তার যোগ্য একটি সাজন্ত পুত্রবধূকে সুখের সংসার পেতে আনন্দে ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে দেখলেই তাঁদের তৃপ্তি।"

সহাস্যে বললেন—"ঐ বৃষোৎসর্গের কথাটা মাথায় রয়েছে কি না, তাই গুরুদেবের কথাগুলো ব'কে চলেছি,—আমার ওই রোগ বাবা।"

কিংশুক বললে—"সিদ্ধ পুরুষের কথা, আমার খুব ভাল লাগছে মা !"

"আমার আর কোন্ কাযে লাগবে, বাবা ! তবে যদি কারুর——আচ্ছা কিংশুক, তুমি কেন বাবা, এমন ক'রে বেড়াবে ? তোমার কিসের অভাব, তাঁরা যা রেখে গেছেন——

যাক্ তোমার মনের ভাব না জেনে শুনে ও সব কথা শুনিয়ে তো ভাল করলুম না বাবা,—অশান্তি আসতে পারে যে।"

"আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন,—মন্দ ত কিছু বলেন নি, মা।"

"তবে তুমি কেন অমন ক'রে বেড়াও বাবা, তোমার

কিসের অভাব তাঁরা রেখে গেছেন,—দেখলে যে প্রাণ ফেটে যায়, কিংশু। ধর্ম্মের দিকে তোমার যখন অতটা টান রয়েছে,—তখন সংসার-ধর্ম্ম না ক'রে এগুবার ত তোমার পথ নেই। তা না ত বাপ মায়ের ঋণ যে শোধ হয় না বাবা।"

আচার্য্য মশাইও বলছিলেন,—"ছেড়ে-যাওয়া ঐশ্বর্য্যের পূরোপূরি উপভোগ করার নামই বাপ-মার শ্রাদ্ধ করা,—আত্মার মধ্যে থেকে তাঁরাই সেটা ভোগ করেন।—পণ্ডিত লোকদের একই কথা, বাবা।"

ইত্যাদি ধর্ম্মকথার ফাঁকে মন্দাকিনী দেবী ডাকলেন—"ইরা, পাণ নিয়ে আয় ত মা, আর কাশীর জরদার কৌটাটা।"

দুই ভগিনী ঘরের বারাণ্ডাতেই ছিলেন।

"দিতে হয় তুমি দাও গে দিদি,—আমি কারো ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারব না। ওঁরা সাধু-ঘেঁষা মানুষ, কতটা এগিয়েছেন শুনেছ ত? চোখের মধ্যে রংছোড় ঘুরছেন,—বাপ রে।"

ইরাণীর কথাগুলো ঘরে ঢুকে কিংশুকের মুখে সলজ্জ নিঃশব্দ হাসির আঁকা-বাঁকা রেখা টান্‌ছিল। চোখে উপভোগের আভাস উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

মন্দাকিনী দেবী অলক্ষ্যে সবটুকুই লক্ষ্য করছিলেন। বললেন—

"ওর কথায় কাণ দিও না, বাবা। যেমন কাযে-কর্ম্মে, তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনায়। কারুর ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট দেখতে পারে না,—সময়-অসময় নেই, হাসি-খুসী আনন্দ ওর চাই। কাকেও বিষণ্ণ থাকতে দেবে না,—এ দোষ ওর গেল না। গুরুদেব বলেন—'ভাগ্যবান্ ভিন্ন এ লক্ষ্মীলাভ কেউ করতে পারবে না।'—ভগবান্‌ই জানেন।"

একটু অন্যমনস্ক থেকে, নিশ্বাস ফেলে বললেন—"ওর একটুতে লাগে কি না,—ওর কাছেই ত তোমার শুনলুম, বাবা। 'সংসারে আর কেউ নেই' বলতে ওর চোখ ছলছলিয়ে এলো। মা নেই—শুনেই না—না ডাকিয়ে থাকতে পারিনি বাবা। দু'দিনের তরে এসে—এখন—"

কিংশুক ব্যগ্রভাবে ব'লে উঠলো—"শীগ্‌গির চ'লে যাচ্ছেন নাকি?"

"ওঁর ছুটী ফুরুলেই ত যেতে হবে বাবা। তার ওপর ঐ ছুটির দুর্ভাবনাও ত মাথার ওপর ঝুলছে। ভগবান্ যদি দয়া করেন, সে সময় যেন দেখতে পাই, কিংশু। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি,···তোমার ভাল দেখে যেন মরতে পারি।"

কিংশুক আর্দ্র। কথা যোগাল না। মাত্র—"আবার আসবো মা" ব'লে, পা ঘষতে ঘষতে, নতনেত্রে বিদায় নিলে।

ভাবতে ভাবতে ফিরলো.—জগতে আর চাই কি? বাকি যা—তা ত বাবা রেখেই গেছেন।—কি রেখে গেছেন, কামিখ্যেই জানে, যা ভিক্ষে দেয়, তাই পাই। পুরনো লোক, তার স্নেহই দেহ জুড়িয়ে দেয়,—উদিকে কতটা উড়িয়ে দেয় কে জানে। দোল-দুর্গোৎসব আর বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী থেকে মাসী-পিসীর শ্রাদ্ধ বারমাসই চলছে! তার কাছে তিথি তারিখ লিপিবদ্ধ; বাবা নাকি তার কাছে ফর্দ্দ সোপর্দ্দ ক'রে গেছেন,—সবই আদ্য-শ্রাদ্ধের অনুপাতে!—

—"কামিখ্যে বলে—আর যা কর' না কর', পুণ্যকর্ম্মে কুণ্ঠা কোর না,—তাতে বাড়ে বই কমে না।"

—"মা ঠিক্ ধরেছেন, শুনে বললেন—'কামিখ্যে মিছে বলেনি, বাড়ে ঠিক্, কিন্তু তোমার ঘরে নয় বাবা—ঐ কামিখ্যের ঘরে!' এখন বাড়ী ক'খানা কোন্ দিকে বাড়লো, খোঁজ নিতে হয়েছে···"

কিংশুক চঞ্চল হয়ে উঠলো,—সর্ব্বনাশ করেছে দেখছি! যদি——

সে আর ভাবতে পারলে না,—মাথা ঘোরে।—"এদের বে'র সময় যেন দেখা পাই,—তবে কি,—না—এখনো—"

কিংশুক ব'সে পড়লো। চিন্তা যে দিকে ঝোঁকে—চোট খায়!

—"ইরা দেবীকে আমি নিজেই জানাবো। আমার বেদনা তাঁর মত কেউ বোঝে নি। তিনি যদি না—তা' হলে,—চুলোয় যাক্ বিষয়।"

কিংশুক বাতি জ্বেলে পত্র লিখতে বসলো।

২২

সকালে শয্যা ত্যাগ করেই—বাগানে একবার ঘুরে, নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ, ইরাণীর করা চাই। এটি তার নিত্যকর্ম্ম। প্রভাতবায়ু আর ফুলের সুবাস তার স্বভাব-সরস চিত্তকে সারাদিনের বিত্ত দান করে।

আজ তার চোখে অন্য দিনের আনন্দ-চঞ্চল তরঙ্গ-লীলা ছিল না। একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক।

সুবর্ণবাবু কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'খানা হাতে ক'রে বারান্দায় এসে বসতেই, ইরাণী সপল্লব একটি আধ-ফোটা

মার্শেল-নীল তুলে, ছুটে এসে বাপের হাতে দিয়ে বললে—“এর চেয়ে ভালো আর কিছুই নয়।”

সুবর্ণবাবু প্রফুল্ল মুখে বললেন—“ঠিক্ তোমার মত।”

ইরা মৃদু হাস্যে বললে—“একটু টক্ রস আছে,—না বাবা?—তাই বুঝি বললে?”

“অম্ল-মধুরকেই ত সুমধুর বলে, সেই ত স্বাদু। লোকে মধু কতটুকু আর কতক্ষণইবা উপভোগ করে।”

ইরাণী কথাটা চাপা দিয়ে বললে,—“এ মাসে রবিবাবুর কবিতা আছে বাবা? দেখি—”

প্রবাসী খুলেই—“এই যে।”

“শোনাও ত মা।”

ইরাণী চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগলো।

সাড়ে সাত লাইনে পৌঁছুতেই,—সাক্ষাৎ-ছন্দ-নিপাতন-আমাদের প্রবন্ধশার্দ্দূল অবিনাশবাবু দেখা দিলেন।—মের রিলিফ হিসাবে ধপধপে একখানি টোয়ালে কাঁধে,—ক তাড়া কাগজ হাতে।

—“একটু কষ্ট দিতে এলুম। না না, তুমি যেও না মা,—তোমার শোনা চাই। ওঃ ‘প্রবাসী’ পড়ছিলে? আর সে প্রবাসী নেই! বেদান্তবাগীশ মশার লেখা আর বড় দেখতে পাই না—”

অকস্মাৎ আচার্য্য মশাইকে আসতে দেখে “আসুন—আসুন” প'ড়ে গেল।

ইরাণী প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে।

—“এ দেনা কি ক'রে শুধবো মা!”

অবিনাশবাবু বললেন—“বড় সময়েই আপনাকে পেয়েছি—”

“ওঃ, সাক্ষী হ'তে হবে বুঝি,—হাতে ত দলিল দেখছি—”

—“আপনাদের ‘মণ্ডল’ হয়ে এলুম। ঋষিরা এখনো প্রলম্বাসনে। কেবল কিংশুক ব্রহ্মচারী কাঁচি কালাপেড়ে পরে, সোয়েটার চড়িয়ে শুচি হয়ে, ঔব্যাসনে চা চাক্‌ছিলো।

—“মুখের দুরবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—‘আমশোলা চিবুলে না কি?’

—“প্রণাম ক'রে মৃদু হাস্যে বললে,—“মাটী ক'রে ফেলেছি মশাই, কাশীর চিনি ভেবে আটা দিয়ে ফেলেছি;—দানা নেই কি না, নানা গোল—’

ইরাণীর অঞ্চল চঞ্চল হয়ে মুখে পৌঁছুলো।

বললুম—‘তাতে কি হয়েছে,—ওটা নারায়ণের ইচ্ছা। তোমার মতি-গতিটা সাত্ত্বিক কি না। বেশ, এইবার চিনি দিলেই কাঁচাসিন্নি,—দুটো কলা চটকে দিতে পারলেই তোফা,—নারায়ণকে নিবেদনটা চলে,—নেই? অধুনা ওইটাই যে তাঁর প্রিয় প্রাপ্য। পুণ্য ও প্রসাদ দুই এসে যাবে,—ফেলো না।”

“বললে—‘না মশাই, জিহ্বা জয় এখনো সম্পূর্ণ হয় নি,—আমি পারলেও ওঁরা পারবেন না,—আবার চড়াতেই হবে। আপনি একটু বসুন।’

—“হ্যাঁ মশাই, স্বদেশী আলপিন্ কোথায় পাই বলুন দিকি?”

বললুম—“কেন—বাবলা গাছে যথেষ্ট। আমাদের সামর্থ্য বুঝে ভগবান্ গাছ বসিয়ে দিয়েছেন—ডাঁটায় ডাঁটায় কাঁটা। অভাব কি,—কেবল রুচি আর সভ্যতায় না ফুটলেই হ'ল।”

“কিংশুক আবার চা চড়িয়েছে। অমন সরল প্রকৃতির সুন্দর প্রিয়-দর্শন ছেলে দেখিনি! না ভালবেসে থাকবার যো নেই। ভাগ্যে ঢোঁড়ায় ধরেছিল, তাই রক্ষে!”

ইরাণীর প্রতি—“শুভ্রার কুশল ত মা! শিন্নিটে ফেলা যাবে—”

ইরাণীর মুখে তখন ফিকে গোলাপীর আর চোখে হাসির আমেজ দিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললে “সে এবার মরবে।”

“কেনো মা—পীড়িতা?”

“চা শুঁকেই চ'লে যায়—মুখে করে না। ও আবার ঐ শিন্নি খাবে! ‘লিপটন্’ না হ'লে রোচে না,—এক ঢোক্ গিলে দেখুক, তাও না। দিদি বলেন—‘স্বদেশী করতে গিয়ে জীব-হত্যে করা কেন? যাও তাঁর তরফে’।”

“ইস—সংসারে বড় অশান্তি যাচ্ছে বলো—”

সুবর্ণবাবুর প্রতি—“আপনি কোন্ দিকে?”

তিনি বললেন—“সরকারের চাকরি,—blend (ব্লেণ্ড্) ক'রে দু'দিক্ বজায় করতে হচ্ছে। লিপটনের পোড়ো বাড়ীতে ‘ভট্টাচার্য্য’ ঢুকেছেন।”

“হাকিম কি না—ধর্ম্ম রক্ষার ধারা ঠিক্ রেখেছেন—বাঃ। ভগবানের বাক্য—স্বধর্ম্মে নিধনং বি আচ্ছা।”

*   *   *   *

অবিনাশবাবু অতিষ্ঠ,—হালকা কথা সইতে পারেন না। বলেন—দেশের দুর্দশার জড়ই ওইখানে। ভারী জিনিব

ভাঁজতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার! ব্রেন্‌কে 'ব্রেন্' করা চাই—তবে না বাধাগুলোকে সরিয়ে পথ করা যাবে।

তিনি ঘন ঘন ভ্রূ কুঁচকে—কাগজের তাড়াটা নাড়াচাড়া করছিলেন।

আচার্য্য মশাই বললেন—"ওটা কি? নথিপত্র না কি? তবে আমরা এখন—"

"না—ও একটা ঔর্দ্ধদেহিক ব্যবস্থা-বিষয়ক গবেষণামূলক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ,—অধুনা বিরল—সৎ-সাহিত্য।"

"হাকিম্-বাড়ী?"

"এঁরাই 'জষ্টিস্' করতে পারবেন,—সকলেই উচ্চশিক্ষিত। ভাগ্যক্রমে আপনিও এসে গেছেন"—

সহাস্যে,—"জানলে কি আসতুম! শুনেছি, শোনার প্রস্তাবেই শরৎ বাবুর স্বেদকম্প দেখা দেয়—জ্বর হয়!"

"তিনি যে ঔপন্যাসিক—কাহিল মানুষ, হাল্কা কল্পনা নিয়ে কারবার। শাস্ত্র-প্রমাণের ক্যাঁসাদ নেই। বাহাদুরী কাঠ ভাঁজতে হ'লে বুঝতেন!"

—"এই দেখুন না, বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরে;—মনের মত একটা যা তা নাম বসিয়ে দিলে ত চলবে না,—কি ভীষণ ভাবতে হয়, নামটা মনেই আসছে না। না এলেও ত আপনারা ছাড়বেন না! প্রাচীন নামকরণ, সুরেন সুরেশ নয় ত,—যুগ-যুগান্ত পেছু হটে পাত্তা পেতে হবে—"

—"ঐ যে যিনি দেবতাদের স্বর্গোদ্ধারকল্পে অস্থি উৎসর্গ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন। আহা—ঋষি না মুনি ছিলেন গো,—আসছে আসছে আসছে না,—নধিজি"—

"বাঃ, এই ত কাছিয়ে পড়েছেন।"

"কি বলুন দিকি?"

"মাঝে কত জন্ম গেছে—তবুও যে সূত্র ঠিক আছে,—আশ্চর্য্য! বোধ করি দধীচিকে খুঁজছেন?"

"Exactly, উঃ—আমি কি ক'রে—এখন বলুন দিকি—এ আদর্শ এই ভারত ছাড়া আর কুত্রাপি পাবেন কি? সাধে ভুলে যেতে হয়!"

"ভোলবার কারণই তাই। তবে মাপ করবেন—ওটা বহুৎ প্রাচীনকালের কথা, তখন দুর্লভ হলেও অধুনা খুবই সুলভ। এখন স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে—ও কাম পশু-পক্ষীতেও করছে। মানুষের রসনার তৃপ্তি আর রক্তবৃদ্ধির জন্যে তারা দেহত্যাগ ক'রে—হাড় মাস রক্ত তিনই দিচ্ছে,—সকল দেশেই। এই ত্যাগের চোটে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দুধ জুটছে না।"

সামলাইয়া—"আজ আপনার ঐ অতবড় উচ্চাঙ্গের আত্মত্যাগের প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ সাধারণে বুঝবে আর কি ক'রে বলুন। আমরা গেলেই—খতম্। যিনি এই আপৎ-কালে আমাদের ওই কীর্ত্তিস্তম্ভটি অক্ষরে গেঁথে অক্ষয় ক'রে রেখে যাবেন, তিনিই ভারতমাতার প্রকৃত grand son—তবে ও মহত্ত্বের মার্ নেই অবিনেশ বাবু, উটি স্বয়ংসিদ্ধ,—প্রতি বজ্রনির্ঘোষ স্মরণ করিয়ে দেবে।"

অবিনাশবাবু ভয়ঙ্কর ভড়কে গিয়েছিলেন,—যেন বিশ হাত জল ফুঁড়ে ভেসে উঠলেন।

—"তাই ত বলি! এই হ'ল বলার কায়দা, পণ্ডিতরা সব কথাই 'মধুরেণ' সমাপ্ত করেন কি না।"

—"থাক্, ভগবান্ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন; ওটা ছিল একটা আদর্শবাদ, কিন্তু আমি এসেছি বিচারপ্রার্থী হয়ে। মাও আছেন, সুবর্ণবাবুও রয়েছেন, এমন সুযোগ আর পাব না।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি "চা নিয়ে আসি বাবা" বলেই উঠে পড়লো।

আচার্য্য মশাই বললেন,—"হাঁ মা—সেই ভালো,—নিতান্ত আবশ্যকও। কামটি দেখছি—ঠাণ্ডা মাথার। বাড়ীতে কাশীর চিনি চলছে না ত!"

ইরাণী মুখময় সহাস অরুণাভাস নিয়ে দ্রুত চ'লে গেল!

* * * *

চা-পানান্তে আচার্য্য মশাই ইরাণীকে বললেন—"তুমিও চট্ ক'রে সেরে এস মা,—শুনতে হবে।—হ্যাঁ, বিষয়টা কি?"

"বৃষোৎসর্গ।"

"বাঃ, একদম সাময়িক। কার শ্রাদ্ধে, বঙ্গ-মাতার!—যদিও তা-বড় তা-বড়গুলি নির্ব্বাচিত হয়ে বেহাত হয়ে গেছে, তা হলেও বহুৎ পাবেন, ধর্ম্মকর্ম্মে অভাব হবে না। পড়ুন—পড়ুন—"

"না, আমার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীন যুগের এই ব্যবস্থাটি মধ্যে বিজ্ঞানের কি সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে, সেইটি উদ্ধার ক'রে দেশকে দেখিয়ে দেওয়া।

"হ্যাঁ—আবার আবশ্যক হয়েছে;—খুব সাধু উদ্দেশ্য—একেই বলে দেশের কায। অতি-বৃদ্ধ যুগেও মনীষীরা ওটা বুঝেছিলেন। তখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'ত না, তাঁরা কেবল দেগে ছেড়ে দিতেন, উদ্দেশ্য—চিনে রাখো—দশ হস্তেন বাড়িয়ে চলো;—দেবতার প্রিয়বাহন—বাপ রে! তবে, তখনকার দশ হস্তেন—এ progressive যুগে কতটা, তা বুঝেছেন ত? ওইটে একটু খুলে লিখে দেবেন।"

অবিনাশবাবু বললেন,—"আমার কথাটা হচ্ছে,—প্রবন্ধ-গৌরব নব্যভারতের, এই প্রবন্ধটা তাতেই পাঠাই। কি ব'লে ফেরৎ দিয়েছেন জানেন? একটু সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ক'রে দেবেন, বিষয়টি বড় দরকারি, কিন্তু সমাসবাহুল্যে আজকালকার দুর্ব্বল পাঠকদের শ্বাসরোধক। তাঁদের পক্ষে 'খুনে' বলা চলে। তাঁরা—'বণিক্-বধূকে' 'বেণে বউ' দেখতে চান।"—

—"শুনলেন! বিষয়োপযোগী ভাষা চান না। 'মেঘনাদ-বধ' শুনতে চান 'বিদ্যাসুন্দরের' ভাষায়!"

"আপনি একটু শোনান ত।"

অবিনাশ বাবু দু'তিনবার গলা শানিয়ে গুরুগর্জ্জনে আরম্ভ করলেন—

"যুগান্তব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধন-মন্থনের আলোড়ন-বিলোড়নে মস্তিষ্কগুহা বিনিষ্ক্রান্ত, ভূর্জ্জপত্রে ছত্রে ছত্রে সংরক্ষিত বৈদূর্য্যরাজি অদ্যাপি যে মার্ত্তণ্ডজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের ঈক্ষণ বাঁধিয়া বাকরোধ করিয়া দেয়। বৈদগ্ধ সমাজ সম্ভ্রমসন্নত হয়। আজ সেই রত্নবহুল জলধিগর্ভ নিমজ্জিত, একটিমাত্র সুদুষ্প্রাপ্য রত্ন বাসনার প্রবল-বেগবিতাড়নে আপনাদের উপহার দিবার সৌভাগ্য-লিপ্সু হইয়াছি।"

আচার্য্য বলিলেন—"বাঃ, এ ত মহিম্নস্তবের মতই সরল সুললিত ঠেকছে! তার পর?"

"বৃষ ধূর্জ্জটির প্রিয় ধুর্দ্ধর। ধনদাত্মজ নৈকষের পিতৃশ্রাদ্ধে কামধেনু নিষিদ্ধ নিবন্ধন,—কাম-ষণ্ড উৎসর্গ করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। সে সুধা-বিধ্বংসী গুহ্যতত্ত্ব প্রসঙ্গনে ধূমদর্শী বয়োবৃদ্ধ ঘৃতকৌশিক ঋষিদেরও জিহ্বাতঙ্ক ঘটে, আজ সেই সুদুর্ল্লভ সুপ্রাবর্ষ বৃষোৎসর্গের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সুস্বাদ আপনাদের উপভোগ-সুলভ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।"

পরে মুখে তুলে—"কেমন? এর চেয়ে আর কি সরল হবে মশাই!"

আচার্য্য বললেন—"আমি ত অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! আমাদের মাতৃভাষা যে এত সহজ আর মধুর, সেটা কোন দিন ভাবিনি। বরং ভাবতুম—দেশের ছেলেরা বাঙ্গালা পরীক্ষায় এত ফেল্ হয় কেন,—লজ্জাও পেতুম। এটা আমার চিন্তার বিষয়ও ছিল, আজ আমার সে সন্দেহ আপনি সাফ্ ক'রে দিলেন। অত বড় কঠিন বিষয়টিকে এমন কায়দায় মধ্যে এনে যেন কীচক-বধ করলেন। দেখিয়ে দিলেন,—এতে সব রকম গড়ন চলে এবং তা অবাধেও।—আপনি মিথ্যা ক্ষুণ্ণ হবেন না। ডিপুটী বাবুও ত শুনলেন, ওঁরা বিচারের বিদ্‌-চিকা বললে হয়—রক্ত জল ক'রে দেন——"

সুবর্ণ বাবু বললেন—"শোনাই আমাদের কায বটে, তবে কদাচ এমনটি শোনা যায়। ১৭ বছর সার্ভিসের মধ্যে এর জোড়া মাত্র একটিবার মিলেছিল: আমি তন্ময় হয়ে যেন সেই জবানবন্দী শুনছিলুম! বগুড়ার এক বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে আগুন লাগে। সেই পাড়ায় একটি দুরন্ত ষাঁড় থাকতো,—বাচস্পতির সন্দেহ তারই ওপর!—'এ তারই কায।' আবার তাঁর সন্দেহের ওপর গ্রামের কারো সন্দেহের কারণ ছিল না। সুতরাং তাঁর কথাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল।—সন্দেহের হেতুরূপে তিনি যে শাস্ত্রীয় বর্ণনা দিয়েছিলেন, অবিনাশ বাবুর রচনার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল পাচ্ছিলুম।"

ইরাণী বাপকে বললে—"ওঁর সঙ্গে সম্পাদকের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বুঝি, তা থাকলে আর অমন—"

অবিনাশ বাবু সোৎসাহে বললেন—"ঠিক বলেছ মা,—লেখার চেয়ে দেখার মূল্যই বেশি। 'বিভীষিকা' প্রবন্ধটি নিজে নিয়ে যাই; দেবী বাবু কত আদর ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—লেখার মধ্যে লেখককে দেখতে পাওয়া যায়।—

—"তবে সেই কথাই ভাল মা, নিজেই নিয়ে যাব।"

অবিনাশ বাবু প্রবন্ধ গুটুলেন। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আচার্য্য মশার অন্দরে ডাক পড়লো। অবিনাশ বাবু উঠলেন।

সুবর্ণ বাবু একা ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন,—এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়!

মন্দাকিনী দেবী আচার্য্য মশাইকে বললেন—"তা বাবা, বাপ-মা নেই ব'লে কি—"

"আপনার দয়ার শরীর, তাই এত ভাবছেন,—কে ভাবে মা? কি করবো—মস্ত বিষয়ের মালিক, লোকে সন্দেহ করবে যে মা। ওঁর গোমস্তা অমন সস্তা মালিককে সহজে হাত-ছাড়া করবে না, এক হাকিমে হাত দিতে পারেন। তা উনি ত—"

"ওঁর কথা আর কবেন না। তাই যদি হবে, তবে আর—"

"আমি ভাবছি অন্য কথা, বিষয় ত এখন বিশ হাতে,—বেচারা না চট্ নজরে প'ড়ে যায়। বাঘে ছুঁলে—"

"অমন ছেলে কার না নজরে পড়ে, বাবা!"

নজরে পড়বার কথা মুখ থেকে বার করেই দেবী অন্তরে শিউরে উঠলেন।—যদি কেউ—

সুবর্ণ বাবুর নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বেগ ভাব তাঁর উদ্বেগ প্রবল ক'রে তুললে।

—"তা বাঘের কথা কেন বাবা,—এক কামিখ্যে ত রয়েইছে।"

"একে বি-এস্-সি পড়েছে, তায় যুবা—আবার অবিবাহিত! এ তিনটি একত্র হ'লে না কি নানা অনর্থের সম্ভাবনা থাকে,—তার ওপর যদি সাধু-সঙ্গে ঝোঁক্ থাকে, সে যে শিবের অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়! সোঁদা ছেলের ওপর খর দৃষ্টিটে থাকে মা। বিবাহটি হয়ে গেলে আর ভয়-ভাবনা থাকে না। ওইটিই যে বাঙ্গালীর ছেলেদের নৃসিংহ-কবচ। আগেকার বাপ-মায়েরা সেটি বুঝতেন।"

"ও বাবা, আমি আর বলছি কি! বাছার যে বাপ-মা-ই নেই। বে'টি হ'লে বিষয়েও মন পড়বে। কি ক'রে তা হবে, বাবা?"

"হাকিমকে দিয়ে—"

"উনি মানুষ হ'লে আর এত ধড়ফড় ক'রে মরছি কেন।"

"তা বটে। তা আপনি এত দিন—আপনি যে একেবারে সেকেলে ধাতের! সুবর্ণবাবু অমন সদাশিব, তবু কিছু করতে পারেন নি মা! যাতে এক জনের ভাল হয়—জেনে শুনে তা না করাও যে পাপ।"

"তা ত বুঝি বাবা,—পারি কই! পড়তেন—ও সব মানুষের—তা হলেই ঠিক হ'ত।"

"আচ্ছা মা—আমাকে একবার নবনীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দিন। তারো ত ঐ একই বিপদ! বুদ্ধিটা তার ধীর, তার ওপর এঞ্জিনিয়ার কি না,—রাস্তা বানাতে সিদ্ধহস্ত।"

"নবনীকে আনলে না কেন বাবা! আপনি আছেন ব'লে—আমি নিশ্চিন্ত রয়েছি,—তার জন্যে যেমন ভাবছেন, এ ছেলেটির ভারও আপনাকেই নিতে হবে বাবা। নবনীকে দু'দিন না দেখলে যে—"

"কিংশুক তাকে চা খাওয়াচ্ছে মা—ছাড়লে না। দু'জনে যে ভারি ভাব!"

দোরের ওপিঠ থেকে আওয়াজ এলো—"বাঁচলুম—শিম্নিটের উপায় হ'ল!"

"তুমি ভাববে বই কি মা—পয়সার জিনিষ,—অপচো হ'তে দেবে কেন! এই ত চাই,—লক্ষ্মীর জাত।"

আচার্য্য মশাই মীরার বিনম্র হাসিমুখ দেখতে পেলেন, ইরাণীর রংটা দেখা হ'ল না।

শুনতে পেলেন—"আমার কি!"

"তা ব'ল না মা,—তোমরা কি অপচো দেখতে পারো।"

মন্দাকিনী দেবী বললেন—"ঠিক্ বলেছেন—আমার ত গা কর্‌কর্ করে।"

"করবেই ত,—কমলা কি ফেলা-ছড়া সইতে পারেন!"

"দেখুন, কিংশুককে উদাস দেখে আমার বড় লাগতো, আজ নবনীকে পেয়ে তার আনন্দ দেখে তেমনি খুসি হয়েছি। দু'জনে যে এত ভাব কখন কি ক'রে হ'ল জানি না। দাদা দাদা আর ভায়া ভায়া ছাড়া কথা নেই। তাই তাদের দাদা আর ভায়ায় বাধা না দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ব'লে এলুম—দেখি—ও-বাসায় যদি বাবলা কাঁটা পাই।"

নীরব হাসিতে মন্দাকিনী দেবীর মুখ চোখ ভেসে উঠলো। পরে তিনি ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে ঠাকুরকে অনেক কিছু বললেন আর অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন। শোনা গেল না, কেবল বোঝা গেল,—বাছারা না ভেসে যায়,—মন্দাকিনীর কূলে ঠ্যাকে!

আচার্য্য মশাই সহসা ব'লে উঠলেন—"ইস্, করছি কি! এতক্ষণ বোধ হয় অবিনাশবাবু সেখানে তাঁর সেই ঘুঁতস্তে বৃষোৎসর্গ আরম্ভ ক'রে তাদের আনন্দ-সর্গ তছনছ করছেন।"

ইরাণীর তখনো মুখের বাড়তি রংটা মিলায়নি, সে বললে—"ওটা তিনি নিজে নিয়ে গেলে সমাস-বাহুল্যের কারণটাও বুঝতে সম্পাদকের বিলম্ব হবে না।"

"আচ্ছা, তাঁকে বলব মা—ইরাণীদেবী বলেছেন।"

"আমি কিন্তু বলিনি বলছি।"

"তাও বলবো"—বলতে বলতে আচার্য্য মশাই হাসিমুখে বেরিয়ে পড়লেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্সিলোনা

বার্সিলোনা, স্পেনের প্রসিদ্ধ বন্দর

বার্সিলোনা নগর স্পেনের পূর্ব্ব-উত্তর প্রান্তবর্ত্তী একটি নগর। এল্ টিবিডাবো নামক গিরিশৃঙ্গ বার্সিলোনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এখান হইতে উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী, সুদূরে অবস্থিত পিরিনিজ অদ্রিমালার সমগ্র ভাগই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বার্সিলোনার অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক, উহাদিগকে কাটালান্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্পানিয়ার্ড-দিগের সহিত ইহাদের ভাষাগত ও রক্তগত বৈসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই নগরের কারখানা, শ্রমশিল্প-কর্ম্মালয়ে সমগ্র দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কাষ করিয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে গ্যালিনীয়, মধ্য-মালভূমি হইতে কাষ্টিলীয়, দক্ষিণাঞ্চল হইতে আণ্ডালুসীয়, সীমান্ত প্রদেশের এষ্ট্রীমাডুরীয় প্রভৃতিকে এইখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বার্সিলোনার ধীবর ও ধীবর-পত্নী

নগরের ধনী অধিবাসীদিগের শিশু-পুত্র-কন্যার জন্য যে সকল ধাত্রী কাষ করিয়া থাকে, তাহারা প্রায়শই অষ্টুরীয় নারী—তাহাদের কর্ণে সোনার দুল শোভমান, দেহে প্রচুর শক্তি। আরগোনীয়রা গাড়ী চালাইয়া থাকে। বার্সিলোনা নগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত বলিয়া, এতদঞ্চলে সকল শ্রেণীর লোকই বসবাস করিতেছে। এ দেশের কাটালোনীয়গণ ব্যবসায়-কার্য্য

ভালই বুঝে। সমুদ্র ভ্রমণে ইহারা নির্ভীক এবং যুদ্ধে অপরাজেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ-ফ্রান্সের অধিবাসীদিগের সহিত, কাটালোনীয়গণের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটালোনিয়ার প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী অত্যন্ত প্রাচীন। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ভাগে ফিনিসীয় বা আইওনীয়গণের প্রথম অর্ণবপোত যখন দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই যুগের বহু নিদর্শন বার্সিলোনায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল দুর্গ বার্সিলোনায় এখনও বিদ্যমান, তাহার প্রস্তরগাত্রে আইবিরীয় জাতির তীর এবং প্রস্তরনির্ম্মিত বল্লমাদির চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বার্সিলোনার মিউনিসিপ্যাল পুলিস

পূর্ব্বভাগে সমুদ্রপথে, অথবা পর্ব্বতপ্রাচীরের পরপার হইতে ফিনিসীয়, গ্রীক, কার্থেজীয়, রোমক ভাণ্ডাল, ভিসিগথ এতদঞ্চলে আপতিত হইয়া বার্সিলোনা আক্রমণ করিয়াছিল। দক্ষিণ-দিক্ হইতে মুসলমান, বর্ব্বর, আরব ও সিরীয়গণ এ দেশকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছিল। মধ্য-যুগে কাটালান্ যোদ্ধবৃন্দ ভ্যালেনসিয়া ও মাজোর্কা মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল, সার্ডিনিয়া, সিসিলি ও নেপলস জয় করিয়া এথেন্স পর্য্যন্ত তাহাদের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল।

বার্সিলোনা সে যুগে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিশালীর গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। ভিনিস, জেনোয়া ও পিসা সকলেই তাহার কাছে হতমান হইয়াছিল। সে যুগে বার্সিলোনাবাসীরা মিশর হইতে উত্তর-সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত।

বার্সিলোনার পুরাতন রাজপ্রাসাদে অধুনা আরাগন-রাজের দলিলপত্রের দপ্তরখানা বিরাজিত। তথায় প্রায় ৪০ লক্ষ দলিল আছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমুদ্রযাত্রা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী দেখা যাইবে। কাটালানদিগের প্রসিদ্ধ নরপতি প্রথম জেমির দ্বারা ঐ সকল বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথম জেমিকে লোক দিগ্বিজয়ী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অঞ্চল স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। সেই সময় আরাগণের রাজা ফার্দিনান্দ কাষ্টাইলের রাজকন্যা ইসাবেলাকে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতে উহা স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রায় এক শত বৎসর হইল, স্পেনের ত্রয়োদশটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রদেশ ৪৭টি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ত্রিকোণাকৃতি কাটালোনিয়া নামক ভূভাগ জেরোনা বার্সিলোনা, টারাগোনা ও লেরিজ এই ৪টি প্রদেশে বিভক্ত হয়। লেরিজ ব্যতীত আর তিনটি প্রদেশই সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিদ্যমান। কিন্তু দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রাচীন নামমাহাত্ম্য

জনপূর্ণ রাজপথ

বিলুপ্ত হয় নাই—"গিরিপুত্র, অদ্রিমালার সারক, কাটালোনিয়ার সন্তান—অনন্তকালের জন্য কাটালোনিয়া !"

এই দেশ গিরি-পরিশোভিত; ওক, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষপরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ অরণ্য। বিচিত্র পুষ্পরাজিপূর্ণ মনোরম উদ্যান, বিবিধ ফলের গাছ, সলিলপূর্ণ খাল, সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শী, পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতির দ্বারা অধ্যুষিত এই দেশ, এই নগর সমগ্র পৃথিবীর সুবৃহৎ নগরের সমকক্ষ। এই নগরে প্রাচীনের সহিত নবীনের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রামব্লার প্রাচীন উৎস

উহার স্থাপয়িতা। বার্কা হইতে বার্সিলোনার উৎপত্তি সম্ভবপর। কারণ, তিনি কোন প্রসিদ্ধ কাটালান্ ঐতিহাসিকের নিকট হইতে এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নগরের পুরাতন অংশ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী। প্রাচীন যুগে নগরের চারি পার্শ্বে উচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল, মাবেন-মানেন প্রহরি-রক্ষিত তোরণ। রাজপথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ—উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ সৌধমালা। রাজপথগুলি এমন সঙ্কীর্ণ যে, পাশাপাশি দুইখানি গাড়ী চলিতে পারে না। অপরাহ্ণকালে ক্ষুদ্র পথসমূহে শ্রমিকগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে। পাশাপাশি দুই জনের পক্ষে সে সকল গলিতে চলা অসম্ভব।

বার্সিলোনা সহরের কারখানাসমূহ বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, এ জন্য নগরে ধূমের চিহ্ন অত্যন্ত অল্প। সহরের উপকণ্ঠস্থিত কারখানাসমূহও বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত হয়।

কাটালান ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন সহর সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র জনপদ। তথায় গীর্জ্জার চূড়াসমূহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন, বাস্কসগণ ঐ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কাহারও কাহারও মতে ফিনিসীয়গণই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মার্কিণ ঐতিহাসিক এইচ সি আডাম্স্ বলেন যে, হানিবলের পিতা হামিলকার বার্কাই

এখানকার নারীদিগের সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ—মস্তক অবগুণ্ঠনহীন। পুরুষদের অধিকাংশেরই নীলবর্ণের নাবিকের পরিচ্ছদ, মাথায় নীল ক্যাপ, পায় কাপড়ের জুতা। ভ্রমণযষ্টি শুধু দরিদ্রগণই ব্যবহার করিয়া থাকে।

অশ্বারোহী পুলিস-প্রহরী

দোকানঘরগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু সকল প্রকার দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়। কয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া হীরা-জহরৎ পর্য্যন্ত একই দোকানে তরমুজ, গন্ধদ্রব্য, পনীর ও পাউডারের সহিত সারি সারি সজ্জিত থাকা য়ুরোপ বা মার্কিণ দেশে দুর্লভ।

প্রত্যেক পথের নাম মোড়ে মোড়ে দুই ভাষায় লিখিত থাকে—কাষ্টিলীয় ও কাটালোনীয় ভাষায়। এই দুই ভাষায় যাহার অধিকার নাই, সে ছবি দেখিয়া সেই পথে কোন্ শ্রেণীর গাড়ী গতায়াত করিবে, তাহার পরিচয় পাইতে পারে। প্রত্যেক মোড়ে এইরূপ ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্পেনের ইতিহাসে অশ্ব প্রয়োজনীয় ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল। এব্রোর উপত্যকা-ভূমি খননকালে আইবিরীয় যুগের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশ্বমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। নগরের আধুনিক অংশকে 'এল্ এনস্যাঙ্ক' বলিয়া থাকে। এই অংশের স্থানে স্থানে মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষবীথিসুশোভিত রাজপথসমূহ বিদ্যমান। য়ুরোপের মধ্যে
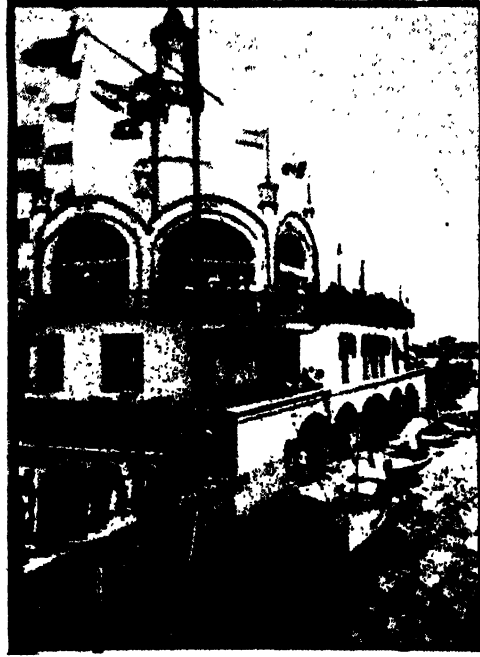
স্পেনের নৌবিহারের ক্লাব

এমন বৃক্ষবীথি-সুশোভিত রাজ-পথের সংখ্যা অল্পই আছে বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গ্রাসিয়া পথটি ৫ ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে প্রশস্ত বাঁধান মসৃণ পথ ঘোটক ও গাড়ী চলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। উহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ-সুশোভিত প্রশস্ত স্থান দিয়া পথচারীরা গমনাগমন করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য লৌহ-আসনও রক্ষিত আছে। পথচারীদিগের চলিবার পথের এক দিক্ ট্রাম চলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, অপরটি দিয়া মাল-বোঝাই গাড়ীসমূহ গতায়াত করিয়া থাকে।

এই বৃক্ষবীথি-সুশোভিত রাজপথের উভয় পার্শ্বে ৫ হইতে

কলম্বসের স্মৃতিসৌধ

সপ্ততল অট্টালিকাসমূহ দণ্ডায়মান। বার্সিলোনার অট্টালিকাগুলি এমন উচ্চ যে, তত্রত্য একটি পাঁচতল গৃহের সহিত আমেরিকার একটি ৮ তল গৃহের উচ্চতা সমান।

নগরের মধ্যে যে সকল প্রাচীন অট্টালিকা বিদ্যমান, তাহাতে গথিকযুগের ভাস্কর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আধুনিক যুগের যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার স্থাপত্য-শিল্প বিভিন্ন আদর্শের।

'সাগ্রাডা ফ্যা মি লি য়া' নামক যে আধুনিক মন্দির সম্প্রতি নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার ভাস্কর্য্য এমন বিচিত্র ও চমৎকার যে, তাহার মত চমৎকার শিল্প-চাতুর্য্য য়ুরোপের অন্যত্র দৃষ্ট হইবে না।

লোহিত-টুপীধারী ভৃত্য—স্কন্ধে রজ্জু বিলম্বিত

নূতন সহরের যে যে স্থানে বিভিন্ন রাজপথের সংযোগস্থল, তথায় অশ্বারোহী পুলিসপ্রহরী স্থিরভাবে—ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকে।

গ্রাসিয়া বা বিস্তৃত রাজপথটি পর্ব্বতসানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্লাজা ডি কাটালুনা পর্য্যন্ত প্রসৃত। এই শেষোক্ত স্থানটি মুক্ত প্রান্তর। প্রত্যহ রবিবারের প্রভাতে গ্রামবাসিগণ হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য করিয়া থাকে। এই নৃত্যপদ্ধতি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রী ক গ ণ এ খা নে প্রচলিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই উন্মুক্ত স্থান সুবৃহৎ প্রমোদোদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

বার্সিলোনা পাদচারীর পক্ষে স্বর্গোদ্যান বলিয়া অনুমিত

রাম্ব্লার রাজপথ

বার্সিলোনার নূতন গির্জ্জা

সঙ্গীতমুগ্ধ করিবার জন্ম লাস্ রাম্‌ব্লারে সমাগত হয়। লোহিত টুপী ধারী "মোজেডি কুয়েরডা" বা রজ্জুধারী ভৃত্যগণ এখানকার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের স্কন্ধে একগাছি করিয়া রজ্জু বিলম্বিত থাকে।

বার্সিলোনার বাজারে স্পেন দেশজাত দ্রব্যের বাহুল্য। জলপাই এ দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়; পৃথিবীর কুত্রাপি এত অধিক জন্মে না। প্রচুর মৎস্য, কর্কট বার্সিলোনার বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে খাদ্যদ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাদামের বরফী এবং মধু স্পেনের বিশিষ্ট খাদ্য। বাদাম হইতে বার্সিলোনায় নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্পেন দেশে প্রাতরাশের সময় কফি বা চকোলেট প্রদত্ত হয়, সেই সঙ্গে রুটীও থাকে। মধ্যাহ্নকালে কাটালানরা ৬।৭ প্রকার খাদ্য ভোজন করিয়া থাকে। অপরাহ্নকালে চা না হইলে স্পানিয়ার্ডদিগের চলে না। এ দেশের কৃষকগণ পরিমিতাহারী, এ জন্ম তাহাদের স্বাস্থ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

হইবে। লাস্ রাম্‌ব্লার নামক স্থানটি যেন অপূর্ব্ব উপভোগের ক্ষেত্র। ইহার সম্মুখে রঙ্গালয়, বিপণি, ক্লবগৃহ, রেস্তোরাঁ এবং কাফিখানাসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। এক প্রান্তে পুষ্প-বিক্রেতারা নানাবিধ সদ্যশ্চয়িত কুসুমরাজি বিক্রয় করিবার জন্ম দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে। এইখানে গ্রামের মধুবিক্রেতারা নানা প্রকারের মধু বিক্রয় করিবার জন্ম আগমন করিয়া থাকে। সাধারণ পুষ্প-মধু, বাদামের মধু, কমলা-লেবুর মধু—কত প্রকারের মধু যে এখানে আসিয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক এইচ, সি, এডামস্ বলেন যে, তাঁহার দীর্ঘকাল-ব্যাপী স্পেন-ভ্রমণকালে তিনি কদাচিৎ কোন মাতালের দেখা পাইয়াছিলেন।

রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বার্সিলোনার থিয়েটার বা বায়স্কোপের অভিনয় আরম্ভ হইয়া থাকে। মার্কিণ চিত্রই নগরবাসিগণের প্রিয়। যতক্ষণ অভিনয় আরম্ভ না হয়, কাটালান্‌রা রঙ্গালয়ে ততক্ষণ মাথা হইতে টুপী নামায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখানে যথেষ্ট। কোন মহিলা ইচ্ছা করিলে অভিনয়কালে মাথা হইতে টুপী না নামাইতেও পারেন। খর্ব্ব ঘাঘরা ও ছোট করিয়া চুল ছাঁটাও নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

রাম্‌ব্লার অধিবাসিগণের শতকরা ৭০ জন কাটালান্ ভাষাভাষী। রাজ-পুরুষ, ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যালয় এবং জাতীয় ব্যবসায়ে কাষ্টিলীয় ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কাটালান্ ভাষাই জনগণের মধ্যে প্রচলিত। কাষ্টিলিয়ানরা বলে যে, কাটালান্ ভাষার সাহিত্য বিলুপ্ত হইতেছে, পুরাতন সাহিত্য ব্যতীত ঐ ভাষায় নূতন সাহিত্য নাই। কিন্তু কাটালান্‌রা ভিন্ন কথা বলিয়া থাকে।

পাম-গাছ-সুশোভিত রাজপথ

দেশীয় ভাষায় দুইখানি দৈনিক, অনেকগুলি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহা ছাড়া পুস্তকের দোকানে কাটালান্ ভাষার আধুনিক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্সিলোনায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা সমগ্র স্পেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থপ্রকাশকগণের পুস্তকালয় বার্সিলোনায় বিদ্যমান।
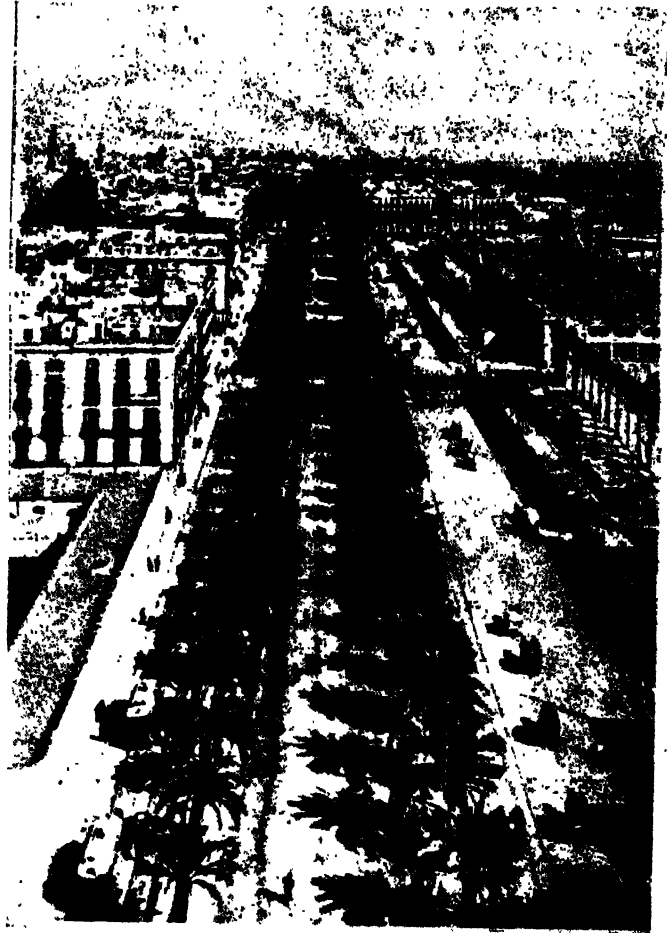
পাসেওডিগ্রাসিয়া—পথের উভয় পার্শ্বে বসিবার আসন

সমগ্র স্পেন দেশের মধ্যে মাদ্রিদ্ নগর ব্যতীত শিক্ষা-বিষয়ে বার্সিলোনার সমকক্ষ অন্য কোন নগর নহে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত আছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সঙ্গীত ও নাটক স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উৎকৃষ্ট চিত্র-শিল্পালয় এবং প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত 'মিউজিয়ম' দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। প্রাচীন যুগের গ্রীক ও রোমক চিত্রশিল্পের বিবিধ সংগ্রহ এখানে বিদ্যমান। এ দেশের নারী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক। মার্শাল জোফ্রে কাটালান্ রক্তের সংস্রবযুক্ত। যুরোপীয় মহাসমরের সময় কাটালান্রা বহু স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিল। বার্সিলোনা শুধু সমগ্র স্পেনের শ্রেষ্ঠ বন্দর নহে, ভূমধ্যসাগরের বন্দর-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বার্সিলোনার সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বাজারের একাংশ

শান্তিতোরণের সম্মুখে কলম্বসের স্মৃতিসৌধ বিরাজিত। প্যা লোস্ হইতে এই দেশবিখ্যাত এডমিরাল বার্সিলোনায় আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলা কাটালোনীয় সহরে বাস করিতেছিলেন। কলম্বস যখন নূতন জগৎ আবিষ্কার করেন, তখন রাণী ইসাবেলা এই বিধান জারী করেন যে, কোন কাটালান্ নূতন জগতে গমন করিতে পারিবে না। নিজ প্রজাবৃন্দের প্রতি অতিরিক্ত মমতাবশতঃ হয় ত তিনি তাহাদিগকে বিদেশে যাইতে দেন নাই। কাষ্টিলিয়ান ও আণ্ডালুসিয়ানগণ আমেরিকায় দলে দলে যাত্রা করিয়াছিল। তখন কাডিজ ও সেভিল প্রধান স্পেনীয় বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে বার্সিলোনার অধিবাসীরা কলম্বসের আবিষ্কৃত দেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিল।

বার্সিলোনার হ্রদ

নগর-বিস্তারের প্রাবল্যবশতঃ বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসপথে যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু কাটালান্রা অতীত কীর্ত্তির অত্যন্ত ভক্ত। সে জন্য তাহারা পুরাতন বার্সিলোনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ভূগর্ভে তার প্রোথিত করিবার সময় আগষ্টসের সমসাময়িক রোমক অধিকারের অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্লাজা ডেলরেতে প্রাচীন সহরের অত্যাশ্চর্য্য স্মো:

পক্ষি-বিক্রেতা

অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জুলিয়া ফাবেন্টিয়ার অধিকারকালে হার্কুলিস মন্দিরে এই স্তম্ভগুলি এককালে বিদ্যমান ছিল।

বার্সিলোনার সৌধমালার মধ্যে গির্জ্জা বা মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক মন্দির এখানে বিদ্যমান ছিল। হামিল্‌কার ও হানিবল এই মন্দিরযুক্ত টৈবার গিরির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও ফিনিসীয় ও গ্রীক নাবিকগণ এই গিরিশৃঙ্গের বিষয় জানিত। গিরিশৃঙ্গস্থিত এই মন্দিরে নবীন সিপিও আফ্রিকেনস্ আসিয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রের তরবারির সাহায্যে আইবেরিয়া রোমের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৫ শত বৎসর ইহা রোমের অধিকারভুক্ত ছিল। ভিনিসের মন্দির সময়ক্রমে খৃষ্টানদিগের আরাধনার মন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আবার মুসলমানগণ যখন জয়ধ্বজা উড়াইয়া এখানে আগমন করিয়াছিল, তখন উহা মসজেদে রূপান্তরিত হয়।

তাহার পর খৃষ্টানগণ যখন আবার এই স্থান অধিকার করিয়া মুসলমানগণকে বিতাড়িত করে, তখন এই স্থানে সুবৃহৎ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। সমগ্র স্পেনের মধ্যে এত বড় ধর্ম্মমন্দির আর নাই। ইহার স্থাপত্যশিল্প বার্গোস্, টোলেডো ও সেভিল ধর্ম্মমন্দিরসমূহের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ষাঁড়ের লড়াই এখানে প্রচলিত। গ্রীষ্মকালে এই ক্রীড়া আরম্ভ হইয়া থাকে। গত বৎসর স্পেনের রাজার বিধান অনুসারে ষাঁড়ের সহিত যুদ্ধকালে অশ্বগুলিকে বর্ম্মাচ্ছাদিত করিতে হয়। রণক্ষেত্রে ষণ্ড নিহত হইলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ উহার মাংস সংগ্রহ করে। কারণ, অন্য মাংসের তুলনায় উহা সস্তা।

সার্ডানা নৃত্য বার্সিলোনার বৈশিষ্ট্য। কাটালোনীয় কৃষককুল অগ্রে জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে দীর্ঘ পাজামা বা প্যান্টালুন পরিধান করে। স্কন্ধদেশ শাল দ্বারা আবৃত করিয়া থাকে। এখনও হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে নরনারী নৃত্য করিয়া থাকে। বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোট, যষ্টি, শাল, মুদ্রাধার স্তূপীকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তাল ও ছন্দ বজায় রাখিয়া এই নৃত্য যখন চলিতে থাকে, দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া উহা দেখিতে থাকে।

মধ্যযুগে স্পেন-দেশে যে সকল নৃত্য প্রচলিত ছিল,
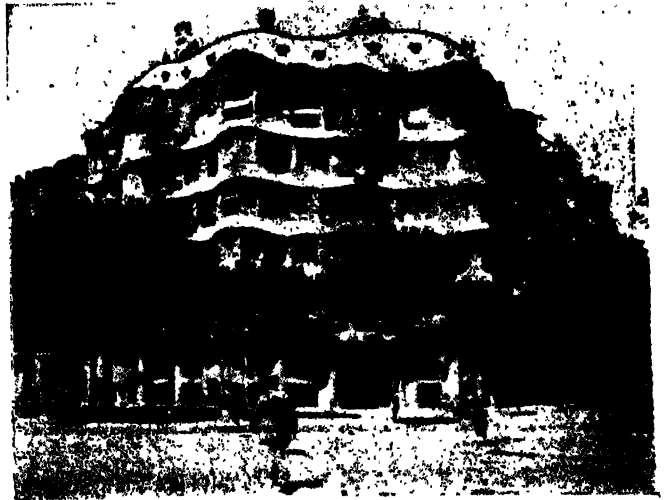
বা।সলোনার আধুনিক স্থাপত্যশিল্প

তন্মধ্যে এই যষ্টিনৃত্য বিদ্যমান আছে, ভূমধ্যে দুইখানি যষ্টি বা বেত্রদণ্ড রক্ষা করিয়া উহার চারি পার্শ্বে দুই জন নৃত্য করিতে থাকে। বেত্রদণ্ড অস্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। নৃত্য শেষ হইলে একটা ভোজের উৎসব হয়।

কাটালোনীয়গণ যেমন পরিশ্রমী, তেমনই মিতাচারী ও অল্পে সন্তুষ্ট জাতি। বহু পরিশ্রম করিয়া কৃষকগণ জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতি স্বল্পব্যয়ে তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বার্সিলোনায় ভৃত্য-সমস্যা নাই। স্পেন দেশের ভৃত্যগণ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। সর্ব্বরকমে বার্সিলোনা স্পেনের প্রসিদ্ধ নগর।

সাগ্রদা ফ্যামিলিয়া গির্জ্জার স্থপতিশিল্প

বার্সিলোনায় বহু প্রমোদোদ্যান আছে। সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী শৈলের সানুদেশে মন্ট-জুইক নামক স্থানে যে প্রমোদোদ্যান সম্প্রতি রচিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উল্লিখিত গিরি-শিরোদেশ হইতে বন্দর ও নগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। এ জন্য বার্সিলোনা বন্দর কাটালান্‌দিগের গর্ব্বের স্থান বলিয়া পরিগণিত।

বার্সিলোনার একটি উদ্যানের একাংশ

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

দপ্তর
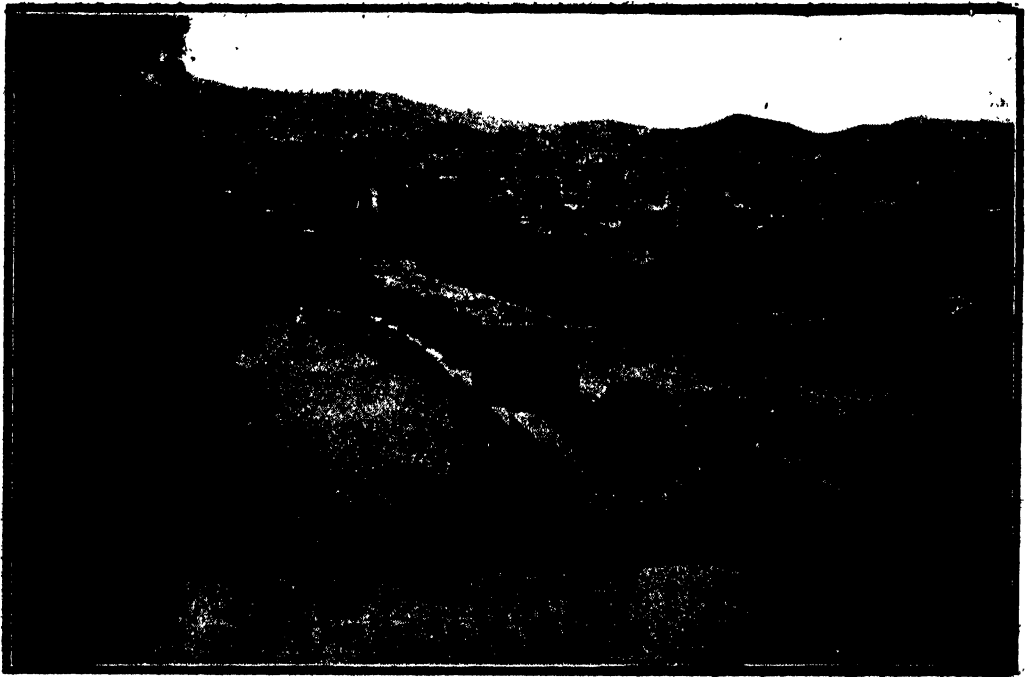
আশ্রম

অনাথাশ্রম আমার বাল্যের আকাশকুসুম, চিরজীবনের কল্পনার ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ইহার সৃষ্টি আমার মনো-জগতে আজিকার নয়, পুনা বিধবাশ্রমের আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা বহুদিনাবধিই মনে মনে করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সুযোগ পূর্ণরূপে কখনও ঘটাইতে পারি নাই; অন্যের প্রচেষ্টার মধ্যে যেটুকু পারি, সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময়ী দেবী ও কৃষ্ণভাবিনী দাসীর মহিলাশ্রম ও ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের সহিত সহানুভূতি আমার সম্পূর্ণরূপেই ছিল। আজ এই ক্ষুদ্রতম মহিলাশ্রমটির বিশেষরূপ সংস্রবে আসিয়া অন্তরের সেই চির-পোষিত আশা পুনর্জ্জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ এই কাশী-ধামেই আমাদের পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উত্থান ও পতনের মতই অস্থায়ী বুদ্‌বুদ্ বোধে ইহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু ইহার সম্পাদিকা শ্রীমতী বিনোদিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ও নিশ্চয়ই সর্ব্বনিয়ামক নিয়ন্ত্রী শক্তিরই প্রেরণায় এই আশ্রম-নিবাসিনী অনাথাগণের সংস্রবে আসিয়া সহসা আবার আমার চিত্তের ক্ষীণ আশা-দীপটি সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। যেহেতু, ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে একটুখানি জীবনীশক্তির সন্ধান যেন আমি পাইয়াছি বলিয়াই আমার মনে হইল। আর জীবিত বস্তুর ধর্ম্মই যে বর্দ্ধিত হওয়া, ইহাও বৈজ্ঞানিক সত্য। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, প্রাণবন্ত বস্তু নিজের ক্ষুদ্রত্ব লইয়া কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতে চাওয়া তাহার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। তাই আশা হয়, এত দিনের সুবিপুল অভাবের বাধা ঠেলিয়া যে ক্ষুদ্রশক্তি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এক দিন কালধর্ম্ম-প্রভাবেই সে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে পরিহার পূর্ব্বক স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হইতে পারিবে। সব জিনিষই ছোট হইতেই ক্রমশঃ বড় হয়।

তাই আজ আমাদের এই সভার প্রয়োজন। নবাগতকে স্বাগত জানাইতে আমাদের তাহার সূতিকাগৃহাবধি কতই না আয়োজন করিতে হয়, তবেই না জগদ্বাসী তাহার অভ্যাগমন-সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারে। প্রসূতি যদি তাহার নব-প্রসূতকে নিজের আঁচলে ঢাকিয়া কোলের মধ্যে চাপিয়া ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া রাখিল, তবে দুনিয়ার লোক তাহার জন্ম-সংবাদ ত জানিতেই পারে না, পরন্তু প্রকৃতি দেবীও তাহার অঙ্গের পুষ্টি-সাধনে অসমর্থা হন। তাই তাহাকে বিশ্ব-সংসারের মধ্যে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে, দেহ-মনের পুষ্টিলাভেচ্ছা থাকিলে বিশ্বের মুক্ত আকাশ এবং খোলা বাতাসে বাহির হইয়া আসিতেই হইবে, ইহার মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচের কোনই স্থান নাই। মানুষ যখন বাঁচিতে চায়, তখন তাকে জীবিত থাকার সমস্ত নিয়ম পালন করিয়াই বাঁচিতে হয় এবং যে কোন ছোটরই বড় হওয়ার কালে তাহার অনন্যসহায় হইয়া থাকা কোনমতেই চলিতে পারে না।

আমি এই কথা বলিয়াই নিজেদের ক্ষুদ্রত্বে সঙ্কোচকুণ্ঠিতা এই আশ্রমের সম্পাদিকাকে আজিকার এই সভা আহ্বানে প্রস্তুত করিয়াছি। দেখুন, সকল জিনিষই ত এক দিন ছোট থাকে, আবার তারাই ক্রমে বড় হয়। সুবৃহৎ বিটপিরাজ বটও ত এক দিন বীজগর্ভে অঙ্কুরাবস্থাতেই ছিল। সদ্যো-মাতৃ-গর্ভ-প্রসূত অসহায় মানব-শিশুই এক দিন লোকপাল পুরুষসিংহরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। পর্ব্বত-কুমারী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীরা সখী তরঙ্গিণীর সম্মিলনে মহাকায় স্রোতস্বতীরূপে প্রবহমানা হইতেছেন, এমন কি, এই অসীম ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই নাকি একদা ধ্বনিমাত্রাবস্থা হইতে ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুর সহযোগে এই বিশাল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই বলি, ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও তুচ্ছ করিবার নাই। ক্ষুদ্রের মধ্যেই মহানের উদ্ভব, ক্ষুদ্রের মধ্যেই জগতের সমুদয় কঠিনতম এবং জটিলতর ভবিষ্য-শক্তি সুনিহিত। যিনি "অণোরণীয়ান্", তিনিই আবার "মহতো মহীয়ান্"—কার মধ্যে কি আছে, কেহই বলিতে পারে না। তাই কবি বলিয়াছেন,—

> "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখো তাই,—
> পেলেও পাইতে পার লুকানো রতন।"

শুধু আমাদের এইটুকুই দেখা প্রয়োজন, সেই ক্ষুদ্রতম বস্তু প্রাণবন্ত কি মৃত এবং তাহাকে সুপথে পরিচালনা করা হইতেছে কি না? যদি করা হয়—তবে যত ছোটই সে এখন থাক, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মহত্তর পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিয়াছে।

তার পর একটি প্রয়োজনীয় কথা—অনাথাশ্রম বা বিধবাশ্রম প্রভৃতি এ দেশের আদর্শ নহে এবং এই সকলের দ্বারা ভারতীয় আদর্শকে খর্ব্ব করা হইতেছে, ইহার ফলে ঘরে ঘরে বিধবা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আমি কাহাকে কাহাকেও করিতে শুনিয়াছি এবং করাও খুব অসঙ্গত নহে। কিন্তু ইহার কিছু অংশ সত্য হইলেও এই আশঙ্কাটির সম্পূর্ণরূপ সত্য হইবার যে কারণ নাই, তাহা একটুখানি স্থিরচিত্তে প্রণিধান-পূর্ব্বক দেখিলেই জানা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুমতে বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিয়া কয় জন হিন্দু-বিধবার বিবাহ ঘটাইতে পারিয়াছিলেন?

নিতান্ত অভাবগ্রস্তা ও নিঃসহায়া না হইলে হিন্দু-সংসারের বিধবা মা-ভগিনীগণ কখনই তাঁহাদের স্নেহাস্পদ আত্মীয়জনকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আশ্রমবাসিনী হইতে আসিবেন না। যদি কোন কোন স্থলে তেমনও ঘটিতে দেখা যায়, তবে মানিয়া লইতেই হইবে যে, সেই কু-পুত্রবতী জননী অথবা কু-ভ্রাতৃবতী ভগিনীগণের জন্যও এরূপ আশ্রমের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাধারণতঃ নিরাত্মীয়া সঙ্গতিহীনা বিধবা এবং এমন কি, পাষণ্ড নির্দ্দয় স্বামীর হস্তে নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা (যেমন এ আশ্রমে আপাততঃ দুইটি আছে) বিতাড়িতা সধবারও সংখ্যা এ দেশে মোটেই বিরল নহে (কোন দেশেই নহে), ইহাদের মধ্যে অনেক সময়ে আশ্রয় ও সৎশিক্ষার অভাবে অনেকেই হীন-পথাবলম্বনে বাধ্য হইয়া পড়ে, কেহ কেহ অতি দুর্দ্দশাগ্রস্তভাবে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনাতিপাত করিয়া যায়। অথচ ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সৎসঙ্গলাভ ঘটিলে হয় ত ইহাদেরই দ্বারা কতই না মঙ্গল-কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। হিন্দু-সমাজ আজিকার দিনে নামে যতখানি হিন্দু, কাযে আর এখন তার অর্দ্ধেকখানিও নহে।

নব্য শিক্ষিতের সংসারে বিধবা আত্মীয়া আজকাল আর দেবীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা নহেন, অধিকন্তু বহুস্থলে মাসী, পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী, বড় বোন্, এমন কি, কোথাও বা জননী পর্য্যন্ত (বউমার কাছে) সংসারের ভার বা গলগ্রহস্বরূপ অনাদৃতা। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়াগণ কদাচিৎ যে রক্ষকের দ্বারা ভক্ষিতাও হইয়া থাকেন, এমন কথাও অপ্রামাণ্য নহে। তাই বলি, বিধবাশ্রমের—অনাথাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আজ আমাদের অস্বীকার করিবার অধিকার আমরা রাখি নাই। নিঃস্ব নারীর পবিত্রতা-রত্ন যাহাতে কদাচারী দস্যু-তস্করের লুণ্ঠন-বস্তু না হইতে পারে, তার জন্য সুপবিত্রভাবে সুপরিচালিত শত শত অনাথার রক্ষাকেন্দ্র যাহাতে আমাদের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করা হয়,—যে কয়টিমাত্র হইয়াছে, সেগুলি অর্থাভাবে ও পরিচালক ব্যক্তির সাহায্যাভাবে নষ্ট হইয়া না যায়, এ সব বিষয়ে আমাদের নিতান্ত মনোযোগী হওবার কাল দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আর নিজের জাতির দুর্দ্দশা-মোচনে নিরপেক্ষ থাকা আমাদের পক্ষে শোভন হয় না। আমরা বিবিয়ানী খোঁপা বাঁধি, (আজকাল আবার খোঁপা বাঁধার কালও ফুরাইল ! এখন বলা উচিত, বিবিয়ানী মাথা মুড়াই !) হালফ্যাসানের অর্দ্ধাবৃত বক্ষ ও উন্মুক্ত-হস্ত ব্লাউজ পরি, সেমিজ পেটিকোট গায়ের চামড়ার রঙ্গের মোজা, সাড়ে বার ইঞ্চি উঁচু হিলের (ছাগলের খুরের মত) জুতা, স্বদেশের শিল্প ও শিল্পীর অন্নকষ্ট করিয়া ফিন্‌ফিনে পাতলা বৈদেশিক সাড়ী অভিনেত্রীদেরও লজ্জাকে লজ্জা দিয়া রুজ পাউডার সেন্টের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে তাঁহাদের অনুকরণেই কোন-রূপ দ্বিধা করি না ; মায় চুরুট পর্য্যন্ত মেয়ের মুখে উঠিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মত স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিকে কেন অনুকরণ করিতে পারি না ? তাঁহাদের মত সঙ্ঘশক্তির উপাসনায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক একপ্রাণ একমন হইয়া সমাজের সেবাব্রত গ্রহণে আমরা আত্মসমর্পণ না করি কেন ? অনুকরণ যদি করিতে হয়, তবে সেটা কেবলমাত্র তুচ্ছতার না করিয়া মহত্ত্বের ও মনুষ্যত্বের করাতেই মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব। এ কথাটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আজ জগতের নারী-সমাজ আমাদের প্রতি করুণ-দৃষ্টিতে চাহিতেছে, তার অর্থ এ নয় যে, আমাদের মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই, সধবার বিবাহ-বিচ্ছেদ অপ্রচলিত ; তার প্রকৃত অর্থ এই যে, আমরা নিজেদের অক্ষম ও অবলা বলিয়া মনের মধ্যে সগৌরবে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি এবং যতটুকু সম্ভব প্রাণপণে পরদেশীর বিলাসিতা-টুকুকেই অনুসরণ পূর্ব্বক নিজেদের ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছি। যেন আমাদের এই মানব-জীবনে যৎকিঞ্চিৎ সংসারের কায (তাও পারি না, পারি না, করিয়া) এবং তৎসহ আহার-নিদ্রাদি ব্যতীত আর কিছুই এ জন্মে করিবার নাই, অথবা কোন বড় কথা লইয়া মাথা ঘামান আমাদের কর্ত্তব্যের গণ্ডীতে আসে না। আমরা আলস্যকে আধ্যাত্মিকতার আরোপ করিতে, গর্ব্ব করিতে দ্বিধা করি না, অথচ আমাদের অবসরকালে কোন্ বিধবা শীতের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া জামা গায়ে দেয়, কোন্ বিধবা চিরদিনের অভ্যাস ছাড়িতে না পারিয়া সেমিজ পরে, কোন্ সুন্দরী বিধবা তাহার কোন দুঃস্থ আত্মীয়ার সাহায্যার্থ তাহার সহিত বিদেশ-গমন করিয়াছে—সে আত্মীয়ার স্বামীও অবশ্য সঙ্গে আছেন ; কোন্ রোগিণী বিধবা একাদশীতে জলগ্রহণ করিতেছে, এ সকলের অতি তীব্র ও বিশদরূপ আলোচনা করিতে পারি এবং এর চেয়েও আরও অনেক কঠিনতর তীব্রতর সমালোচনাও অতি অল্প প্রমাণে বা বিনা প্রমাণেই আমরা সেই হতভাগিনীদের সম্বন্ধে অবলীলাক্রমেই করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যারা অরক্ষিতা, কু-রক্ষিতা, তাদের রক্ষার উপায়-চিন্তা, নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করা, উপায়হীনার জীবনযাত্রার যাত্রা-পথের অনুসন্ধান করা,—এই সকল নারীর অবশ্য-চিন্তনীয় বিষয়কে আমাদের সুকুমার মনোরাজ্যে প্রবেশাধিকার আমরা সাধ্যানুসারে দিই না। উপরে দিলেও পূর্ব্বে প্রাণপণে বাধা দিতাম, এখন ক্রমশঃ সেইটুকুই কমিয়া আসিতেছে, এইটুকুই যা আশার কথা !

কিন্তু হে আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণ ! এ কার্য্য আমাদেরই—নারীর অভাবমোচনের সহায়তা নারীরই অবশ্য-করণীয় ব্রত। নারীর শিক্ষার উপায় নারীকেই ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে—করিতে হইবে। এ কার্য্য আমাদেরই কার্য্য, পুরুষের নহে ; পুরুষ এ কার্য্যের জন্য আমাদের মত একান্তভাবে দায়ী নহে,—নারীর অভাব বুঝিতে নারী নিজের মন দিয়া যেমন পারিবে, পুরুষের সাধ্য কি যে তাহা পারে ? নারীর প্রকৃত শুভাশুভ নির্ণয়ে নারী-চিত্তই সমধিক সমবেদনাবলে সুপারগ, ইহা নিঃসন্দেহ। এর জন্য—হে আমার স্বদেশবাসিনী কন্যা, ভগিনীগণ ! আমার বিশ্বাস, নারী বাস্তবিকই এত অ-বলা নহেন যে অসমর্থা হইবেন। নারীশক্তি তুচ্ছ ক্ষুদ্র অবলা বা নির্ব্বলা শক্তি নহে, পরন্তু ইহা জগতের প্রধানতম—শ্রেষ্ঠতম মহত্তম—মহাশক্তি—মাতৃশক্তি ! আমরা জগদ্ধাত্রী বিশ্বমাতার মহতী শক্তি হইতে সমুদ্ভূতা। এই মহেশ্বরীর মহাশক্তি যুগ-যুগান্তরে—শত সহস্রবার পাশবশক্তিকে পরাভব পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য-নিবাসী দেব-মানবের মহাভয় নিবারণ করিয়াছিল। আজও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে, সুপরিচালিত করিতে পারিলে এই নারীশক্তি দ্বারা অনেক কিছুই সংঘটিত এবং সংগঠিত হইতে পারিবে। "স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্য-সাধিকা।"

এই আশ্রমের অনাথাগণের দ্বারায় চরকা ও তাঁতের বহুল

প্রচলনে দেশের অন্ন-বস্ত্রসমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান-চেষ্টাও ঘটিতে পারিবে, সেও বড় মন্দ লাভ নহে। এইরূপে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সমন্বয়ে দেশের ও দশের সেবায় নিজ নিজ জীবন সার্থক এবং শ্রীভগবানের করুণালাভ—এই উভয়বিধ মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনে আপনারা যত্নবতী হউন, এই আমার সর্ব্বসমীপে একান্ত বিনীত নিবেদন। যার যতটুকু সাধ্য, এই আশ্রমটিকে বাঁচাইয়া রাখা এবং ইহাকে একটি আদর্শ-আশ্রমে পরিণত করার চেষ্টায় তাহা প্রয়োগ করা হয়, এই প্রার্থনা।

স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্নিময়ী বাণী আপনারা স্মরণ করুন—

"লক্ষ লক্ষ নর-নারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপবর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

নীতি-শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ।" *

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বিবাহকালে সীতার বয়স কত ?

বিগত আষাঢ় মাসের বসুমতীতে সীতার বিবাহকালে বয়স কত ছিল, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে তিনি কতকগুলি শ্লোক—যাহা তিনি অসামঞ্জস্য মনে করেন—তুলিয়া দেন ও সেই শ্লোকগুলির যে অর্থ তিনি করিতে চাহেন, তাহাও দেন। সেই শ্লোকগুলির যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহাদের সেই অর্থ ধরিলে সীতাকে তৎকালে প্রাপ্তযৌবনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—সুতরাং হয় অন্য অংশে যেখানে সীতা নিজের মুখে বিবাহকালে তাঁহার বয়স ৬ বা ৭ ছিল বলিয়াছেন—রামের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। যাহা দশরথ বলিয়াছেন—বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কাকপক্ষধর দেখিয়াছিলেন, আর অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়, না হয় বৃদ্ধ বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়নকালে ভীমরতি হইয়াছিল, তিনি অসম্বদ্ধপ্রলাপী—অসংলগ্ন কথা বলেন, প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিতে হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুখে অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঐ অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলার তিনি পক্ষপাতী নহেন, বরং ঘোর বিরোধী। আমি গত মাঘ মাসের বসুমতীতে দেখাইয়া দিই যে, তিনি যে কথাগুলির যে অর্থ হইতে সীতা বিবাহকালে প্রাপ্তযৌবনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বলিয়াছেন, সে কথাগুলির সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং কোন অংশকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয় না, মহর্ষি বাল্মীকিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয় না। আমি যে যে স্থলের যে যে অর্থ করিয়াছি, তাহাতে কোন ব্যাকরণ দোষ আছে বা অভিধানে সেই সেই অর্থ পাওয়া যায় না বা সেখানে অন্য কোন দোষ হয়, তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঘুণাক্ষরেও বলিলেন না। কেবল সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া কোন কালে কোন পণ্ডিত তাঁহারই মত 'বর্দ্ধমানা' কথার 'প্রাপ্তযৌবনা' অর্থ করিয়াছেন—কোন কালে কোন দেশে কোন পণ্ডিত 'পতিসংযোগ-সুলভং বয়ঃ' ইহার অর্থ 'পতিসংযোগ বিনা থাকিতে অসমর্থ যে যৌবনাবস্থা, তৎযুক্ত বয়ঃক্রম' করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া আমি যে "বর্দ্ধমানা" শব্দের সোজাসুজি অর্থ যাহা অভিধানেও পাওয়া যায় ও ব্যাকরণ হইতেও সিদ্ধ হয়, (অর্থাৎ যে বাড়িতেছে) এবং 'পতিসংযোগ-সুলভ বয়ঃ' ইহার অর্থ যে বয়সে পতিসংযোগ (বিবাহ) সুলভ হয়, সহজে লাভ হয়—সেই দেশে ও কালে সচরাচর হয়—(এ কালেও জনক রাজার দেশে ৫, ৬, ৭ বৎসরে বিবাহ সচরাচর হয়, তাহা Census Report হইতে দেখাই, সুতরাং ৬ বৎসর বয়সে সীতাকে তৎকালে পতিসংযোগ-সুলভ বয়ঃপ্রাপ্ত বলায় অসঙ্গত হয় না) এ যাহা আমি করিয়াছি, সেই সহজ অভিধান ও ব্যাকরণসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা আমার মত মূর্খের ভয়ানক প্রগল্ভতা ও তাঁহাদের মত অগাধ পণ্ডিতদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত অর্থ লওয়াই উচিত, এইরূপ উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিতদের বোধ হয় ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক নাই বলিয়াই কোন্ অভিধানে 'বর্দ্ধমানা' শব্দের 'প্রাপ্তযৌবনা' অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা দেখাইলেন না এবং 'পতিসংযোগ-সুলভং বয়ঃ' কথার কিরূপ সমাস করিলে 'পতিসংযোগং বিনা স্থাতুমশক্যযৌবনবং' অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা দেখাইলেন না. বা দেখাইবার চেষ্টাও করিলেন না। আমি তাঁহার মত পণ্ডিত নহি বলিয়াই ব্যাকরণ অভিধান মানিতে বাধ্য, সেই জন্য তাঁহার দত্ত-কল্পিত অর্থ লইয়া রামায়ণের অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত বলিতে বা মহর্ষি বাল্মীকিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে সাহস হয় না। তজ্জন্য সেই সকল অর্থ লইতে পারিলাম না, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ গুণে সেই দোষ ক্ষমা করিবেন, পাঠকবর্গের যাঁহাদের সেরূপ সাহস আছে, তাঁহারা লইতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি রামায়ণের বহু স্থল প্রক্ষিপ্ত বলার বিরোধী, তবে কি তিনি বৃদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকিকে ভীমরতিগ্রস্ত অসম্বদ্ধপ্রলাপী বলিতে চাহেন? এ সকল কথার এইরূপ অর্থ করিলে এইরূপ বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাহা তিনি দেখিয়াছেন এবং তৎসত্ত্বেও তিনি এবারও সেই কথা পুনরায় জোর গলায় বলিলেন এবং—

অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বা রাজসুতাস্তদা।
রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।

এ স্থলেও তিনি 'রেমিরে' এই শব্দটির রতিক্রীড়াত্মক অর্থ-ই লইলেন—এবং আমি যে সচরাচর ক্রীড়াত্মক অর্থ লইয়াছি, তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন এবং রম্ ধাতু যে রতিক্রীড়াত্মক অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহা আমার মত মূর্খদের বুঝাইবার জন্য চারি পাতা প্রবন্ধের ভিতর এক পাতায়, কালিদাস মাঘ-নৈষধে, রামায়ণ-মহাভারতে, অসংখ্য পুরাণাদিতে যে রম্ ধাতু ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমাকে জানাইয়া দিলেন।

---

* কাশী হিন্দু-মহিলাশ্রমের বিশেষ অধিবেশনে লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

তিনি লিখিলেন, "মিত্র মহাশয় শব্দকল্পদ্রুমে রম্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়াই পাইয়াছেন, রতিক্রীড়া পান নাই, সুতরাং তাঁহার মতে রাজকন্যারা নির্জ্জনে স্ব স্ব অল্পবয়স্ক পতিদের সহিত খেলা-ধূলা করিলেন।" আমি সংস্কৃত-সাহিত্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত পণ্ডিত নহি, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু আমি যে রম্ ধাতুর রতিক্রীড়াত্মক অর্থও জানি না, আমাকে অত বড় গণ্ডমূর্খ ধরিয়া শ্লেষ করা "বিদ্যাভূষণ" মহাশয়ের কতটা সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। বিশেষতঃ যখন আমি সেই প্রবন্ধের সেইখানেই (৫২৪ ও ৫২৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছি—"যদি 'রেমিরে' এই কথার অর্থ রতিক্রীড়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য অসামঞ্জস্য দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত 'রম্' ধাতুর প্রধান অর্থ ক্রীড়া করা, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি দেখিলেই পাঠকবর্গ তাহা দেখিতে পাইবেন। যদি সীতা প্রভৃতি তাহাদের অল্পবয়স্ক পতিদের সহিত খেলাধূলা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন অসামঞ্জস্যই হয় না। এখানে যে কেবল খেলাধূলা বুঝাইতেছে, তাহা ধরিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। 'রেমিরে' যদি রতিক্রীড়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকি এ কালের অশ্লীল নাটক-উপন্যাস-লেখকদিগের ন্যায় অকারণে অশ্লীলতা বর্ণনা অবতারণকারী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। কারণ, এখানে এইরূপ রতিক্রীড়া কথা বলিয়া কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রবিকাশের কোন সহায়তাই করিলেন না।............সুতরাং এখানে রমণ অর্থে খেলাধূলাই বুঝি এবং তাহা হইলে সীতার বয়স সম্বন্ধে কোন অসামঞ্জস্যই থাকে না।" সুতরাং রম্ ধাতুর রতিক্রীড়াত্মক অর্থও যে হয়, তাহা আমি জানি, কিন্তু শুধু ক্রীড়াই যে ইহার প্রধান অর্থ, তাহা দেখাইবার জন্য শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধানের কথা উল্লেখ করি। আমি এ স্থলে রম্ ধাতুর যাহা প্রধান অর্থ, তাহাই গ্রহণীয় বলি, কারণ, তাহা না লইলে সবে বিবাহের পর সীতা ও তাহার ভগিনীরা গৃহে আসিয়াই শাশুড়ী প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়াই স্বামীদের সহিত রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপ বর্ণনা কত অশ্লীল, কত অসঙ্গত, তাহা দেখাই। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা মোটেই দেখিতে পান না। আমি তাঁহার মত পণ্ডিত নহি, সুতরাং আমাদের ব্যাকরণ অভিধান দেখিতে হয়, সেই জন্য এখানেও আবার ব্যাকরণের কথা তুলিতেছি। 'রেমিরে' কথাটি বহুবচন—এখানে 'স্ব' 'স্ব' কথাগুলিও নাই; সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে নির্জ্জনে অবস্থানসূচক কোন কথাও নাই, সুতরাং 'রেমিরে' কথার রতিক্রীড়াত্মক অ লইলে এই স্থলের এই অর্থ হয় যে, সীতা প্রভৃতি এবং রাম ও তাঁহার ভ্রাতারা একত্রই বা পরস্পরের সম্মুখেই রতিক্রীড়া করিলেন—ইহাতেও বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোন অশ্লীলতা দেখেন না এবং—

"স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।
রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূনৃতূন্।"

এখানেও নিম্নলিখিত যুক্তিবলে 'বিজহার' শব্দের রতিক্রীড়াত্মক অর্থ করিতে চান :—(ব্রহ্মা যেরূপ সকল প্রাণীর অপেক্ষা গুণবান্ রামও সেইরূপ তাঁহার ভ্রাতাদের অপেক্ষা গুণবান্) এবং তিনি সীতার সহিত বার (বহু) বৎসর বিহার করিলেন। মিত্র মহাশয়ের মতে ৬ বৎসর বয়সে সীতার বিবাহ হয়, এ স্থলে বিহার মানে খেলা-ধূলা না প্রথমার্দ্ধ খেলা-ধূলা আর তার বাকীটা বিহার শব্দের শক্তিলভ্য অর্থ?" এবং অন্য অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিতে পান না এবং বলিতে চান যে, রাম সমধিক গুণবান্ বলিয়াই এই বার বৎসরের ভিতর এইরূপ বিহারের এক-দিনও বিরাম ছিল না। যদি "বিজহার বহূনৃতূন্"—এই কথার ব্যবহার সত্ত্বেও এই বার বৎসরের ভিতর এইরূপ বিহারের মধ্যে মধ্যে বিরাম থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এককালীন কিছুকাল বিরাম থাকা সম্ভব হয়, তাহাতে কোন দোষ হয় না—কেন না, এই দুই প্রকারের বিরামের প্রভেদসূচক এখানে কোন কথার ব্যবহার নাই। সুতরাং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দত্ত যুক্তি হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তিনি বলিতে চান যে, এই বার বৎসরের ভিতর কোন বিরামই ছিল না। যখন পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এইরূপ সকল স্থানেই কেবল রতি-ক্রীড়াত্মক অর্থ করিতে চাহেন, অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন না, রতি-ক্রীড়াত্মক অর্থ লইলে যে অসংলগ্নতা ও অশ্লীলতা দোষ হয়—তাহা দেখিতে পান না, তখন আমাদের মত মূর্খদের ভিন্নরুচির্হি লোকঃ বলিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত অত বড় পণ্ডিত যখন সমস্ত রামায়ণ মন্থন করিয়া এইরূপ দুই একটি স্থানের অসংলগ্নতা, অশ্লীলতা, ব্যাকরণ অভিধানের প্রতি দৃষ্টিহীনতা দোষযুক্ত অর্থ করিয়া সীতা বিবাহকালে প্রাপ্তযৌবনা ছিলেন, ইহা সাব্যস্ত করিতে চান এবং হয় বৃদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকিকে অসংলগ্ন কথা ও অকারণ অশ্লীলতা-বর্ণনাকারী, না হয় রামায়ণের অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইয়াও সেইরূপ অর্থই প্রকৃষ্ট অর্থ বলিতে চান, তখন তাঁহাকে একালের 'অশনে বসনে বিলাসে রুচিতে হাসিতে কাসিতে পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ-প্রিয় সংস্কার-ধ্বজীদের' মুখপাত্র বিবেচনা করা অন্যায় হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। এ বিষয় লইয়া আর বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণি-এট-ল)।"

নব-আবিষ্কৃত প্রাচীন পদসংগ্রহ

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে আসামের প্রবীণ সাহিত্যিক স্বর্গীয় হেমচন্দ্র গোস্বামীর প্রযত্নে আসাম উপত্যকার কমিশনার আফিসে বহুসংখ্যক প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথি সংগৃহীত হয়। খৃঃ ১৯১৯ অব্দে আমার একবার সেগুলি দেখিবার সুবিধা হয়।

এই পুথিসমূহের কয়েকখানির পরিচয় ১৩২৭ (বঙ্গাব্দ) সনের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় দিয়াছিলাম। পরে হেমবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আসামীয় সাহিত্যের চানেকী নামে একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহাতে অনেক আসামীয় কবির রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ঐ সংগ্রহমধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা প্রকাশিত হইলে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানিও তাহাদের অন্যতম।

এখানির স্বত্বাধিকারী আসামের সুপ্রসিদ্ধ আওনিয়াটি সনের অধিকারী গোস্বামী। পুথির নাম—"গীতর পুথি।"

গ্রন্থে কোথাও সঙ্কলনকর্ত্তার নাম, সঙ্কলন-সময়,—লিপিকারের নাম বা হস্তলিপির সময়—পাই নাই। দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। প্রাচীন তুলট কাগজে ইহা লিখিত।

পুথিখানির আকার ১৫×৩৷০ ইঞ্চ; পত্রসংখ্যা ১১২; প্রতি পত্র উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত।

পুথিতে প্রায় ৪৬০টি পদ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রায় ৪০০· টিতে পদকর্ত্তার ভণিতা আছে। এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ-রচয়িতার সংখ্যা প্রায় ৯০। এই পদ-কর্ত্তাদের কয়েক জন আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত, যথা:—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় রামানন্দ, সনাতন গোস্বামী, নৃসিংহ দেব ইত্যাদি। পরিচিত পদ-কর্ত্তা ১০।১২ জনের অধিক হইবে না। অবশিষ্ট সমস্তই নূতন। পদ সম্পন্ন হইতে ইহাদের অধিকাংশেরই কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাঁহাদের পরিচয় পাইয়াছি, যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছি।

কেবল কয়েকটি মাত্র পদ আমরা আলোচ্য পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি,—উদ্দেশ্য,পুথিখানির সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া মাত্র; কিন্তু পুথিখানির সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

পুথির ভাষা—পুথিখানির একটি বিশেষত্ব এই, আসামে পাওয়া গেলেও ইহাতে আসামীয় ভাষায় লিখিত পদের বড়ই অসদ্ভাব। প্রায় সমস্তই তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালায় লিখিত। কতকগুলি পদ সংস্কৃতে ও দুই একটি হিন্দীতে। প্রসিদ্ধ আহোম রাজা রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহের পদও এই পুথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলিও ঐরূপ বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে রচিত।

অধ্যায়-বিভাগ—পুথিখানি চতুর্দ্দশ ভাগ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক প্রকার গানের জন্য এক এক অধ্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নামগুলির অর্থ বা সার্থকতা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। নিম্নে অধ্যায়গুলির নাম প্রদত্ত হইল।—

১ম অধ্যায়	দি জৌসি পরিয়া গীত	পদসংখ্যা	২৮
২য় "	কলংসি পরিয়া গীত	"	২৯
৩য় "	চুণ সলিয়া গীত	"	২০
৪র্থ "	ভটিয়া পরিয়া গীত	"	৬৭
৫ম "	নাওহলিয়া গীত	"	১০০
৬ষ্ঠ "	রাধাদাসর গীত	"	২৮
৭ম "	বড়কপার গীত	"	১২
৮ম "	জ‍ইতার বঙ্গালায় গীত	"	২৪
৯ম "	ওড়িয়া চোরারি চুট	"	১৭
১০ম "	(কোন নাম নাই)	"	৫২
১১শ "	"	"	৩৪
১২শ "	"	"	৩
১৩শ "	সনাতনী গীত	"	২০
১৪শ "	ভট্টাচার্য্যর গীত	"	২৫
		মোট পদসংখ্যা	৪৫৯

পদকর্ত্তার নাম ও পদসংখ্যা।—নিম্নে পদকর্ত্তাদের নাম ও তাঁহাদের রচিত পদসংখ্যা দেওয়া হইল। যে পদগুলি সংস্কৃত বা হিন্দী, তাহাদের পার্শ্বে সং বা হি লেখা হইল।

পদকর্ত্তা কবি	অধ্যায়	পদসংখ্যা (ক্রমিক)
রামকান্ত	১	১
রমাকান্ত	১ম	২।৪।৫।৯।১১।২৩।২৪।২৮ সং
	৩য়	১৬
রামচন্দ্র	১ম	৬
	৫ম	৪৪
রাজা রামজীবন	১ম	৭।৮।১২
	২য়	২৪
	১৪শ	১১।১৭
শ্যামানন্দ	১ম	২০
শচীপতি	১ম	১৩।১৬।১৭।২৬
	২য়	৩।৬।২০
	৫ম	১৮সং।২১সং।২৩-২৬সং।৩৩ সং ৫৩।৫৫।৬০।৯০সং।৯১।৯৫
	৮ম	৫
	৯ম	১৫
	১০ম	৪১
	১৩শ	১১
রামানন্দ	১ম	১৪।২৭
	২য়	৭।২৩।২৮।২৯
	১২শ	৩
দ্বিজরাম	১ম	১৫
মুকুন্দ	১ম	১৮সং।১৯-২২
	৫ম	৮৮ সং হিঃ
	১৩শ	১২ সং
গঙ্গাধর	২য়	১।২।৫।৮।৯।১২।১৩।১৫।১৭।১৯।২১।২২
দ্বিজ রামনারায়ণ	২য়	১০।২৫।২৭
	৫ম	৩।৯।১৪।২৭।৩০।৩১।৩৪।৪৯।৫৭।৫৯ ৬৪।৭৫
শিবরাম	২য়	১১
	৩য়	১৭
	৪র্থ	৫৭
	৫ম	৪১।৭২
	৮ম	৬।১৮
কৈলাস	৩য়	৭।৮
রামানন্দ	৩য়	৯
	৮ম	৪
	৫ম	৮৭
অনন্তদাস	৪র্থ	৬।৯
	৫ম	২৩।[illegible]
কাশীদাস	৪র্থ	[illegible]
সুলোচন	৪র্থ	[illegible]

পদকর্ত্তা কবি	অধ্যায়	পদসংখ্যা (ক্রমিক)
বংশীবদন	৪র্থ	২২
	৬ষ্ঠ	২৩
জ্ঞানদাস	৪র্থ	২৪।৩৪।৬০
	৫ম	১১
রামানন্দ বসু	৪র্থ	২৭
	৬ষ্ঠ	২০
যাদু	৪র্থ	২৯
রামদাস }	৪র্থ	৩০।৪৩
বীরসিংহ কবি }	৫ম	১৫
গোপালচন্দ্র	৪র্থ	৩৮।৪১।৪২।৪৪।৫২
লক্ষ্মীদেব	৪র্থ	৩৯
ভৈরবানন্দ	৪র্থ	৪০
শ্যামদাস	৪র্থ	৫০।৬৪
রামানন্দ রায়	৪র্থ	৫১সং
বলরাম দাস	৪র্থ	৫৬
মনোহর দাস	৪র্থ	:৬১
গোবিন্দদাস	৪র্থ	৬২
	৫ম	৩৬।৩৮।৪৩।৫৮।৬৩।৬৬।৮০।৮১
	৬ষ্ঠ	১-১৭
	৭ম	২
	১৩শ	১৩।১৬
হরানন্দ	৫ম	৬
জগন্নাথ	৫ম	৮।৩২
জয়কৃষ্ণ দাস	৫ম	১০
উমাপতি	৫ম	১২
সুরদাস প্রভু	৫ম	৪০।৫১।৬৫
সৈয়দ মর্ত্তুজা	৫ম	৪২
মাধবদাস জগন্নাথগিরি	১৩শ	১৮
সনাতন	৫ম	৪৬ সং। ৭১ সং
	১৩শ	২-৮ সং
বসন্তদাস	৫ম	৪৭ সং
শিবদাস	৫ম	৪৮ "
দ্বিজ দামোদর	৫ম	৫০
মিরা	৫ম	৫২
খগেশ্বর দাস	৫ম	৭৩
নবসিংহ	৫ম	৭৪
রামদেব	৫ম	৭৮
	৯ম	১৭:
প্রসাদদাস	৫ম	৮৩ (রামচন্দ্র বিষয়ক)
তুলসীদাস প্রভু	৫ম	৮৪
গোপালদাস	৫ম	৮৫
বাচস্পতি	৫ম	৮৬
বিদ্যানন্দ	৫ম	৮৯
রঘূত্তম	৫ম	৯৩
মল্ল নরপতি	৫ম	৯৪
রাজা শিবসিংহ	৫ম	৯৮
বিদ্যাপতি	৫ম	৯৯
বিদ্যাপতি	৬ষ্ঠ	২১।২২।২৭।২৮
	৯ম	১৫
শচীদয়িত	৫ম	৯৭
দ্বিজ গোপাল	৬ষ্ঠ	২৫
কালুদাস	৭ম	৮
লোচনদাস	৭ম	৯
যোগেন্দ্র	৭ম	১২
কামদেব	৮ম	১
দ্বিজ রঘুনাথ	৮ম	২।৩
পরমানন্দ	৮ম	৭
	২৩শ	১৯
বিদ্যাগিরিবর	৮ম	৮
সনক সনাতন	১৩শ	১ সং। ১৫ সং
ভবানন্দ	৮ম	১১
দ্বিজ হরিচরণ	৮ম	১৬ সং
কবীন্দ্র	৮ম	১৭
কবিশেখর	৮ম	২০
জয়ানন্দ	৮ম	২৪
দ্বিজ কবিচন্দ্র (১)	৯ম	১।২
	১০ম	১।৩।৮।১৬
ধরণীশূর কবিরাজ চক্রবর্ত্তী (২)		
	৯ম	৩।৯।১১
দ্বিজবর (৩)	৯ম	৮ সং
	১০ম	৪।৬।৭।১৭ সং।৩৮সং।১৯সং
		২০ বাং সং। ২১-৩৪ সং। ৪১-৪৮ সং
		১১শ ১-২ সং। ৫-৯ সং
	১৬শ	১।২ সং। ৫।২ সং
		১১।১৯ সং। ২০।৪৩ সং
	১৩শ	৯।১০ সং
রাজা রুদ্রসিংহ	৯ম	৪-৭
	১০ম	৪৯।৫০সং।৫১।৫২।৫৩
শিবনাথ যোগীন্দ্র	৯ম	১৪
কৃষ্ণরাম	৮ম	২৪
নবনায়ক	১০ম	৫
রঘুনন্দন	১১শ	৩।৪।১০
হরিহর	১২শ	১।২
	১৪শ	৬
দ্বিজাদিত্য	১৩শ	২০
রঘুরাম	১৪শ	২
দ্বিজ আনন্দরাম	১৪শ	১০।১৪
হরিশ	১৪শ	১২

১, ২ ও ৩ সংখ্যাঙ্কিত কবি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

পুঁথিতে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব-পদাবলী সম-উদারতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পুঁথিখানির অপর বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। গৌরাঙ্গ-স্তুতিও ইহাতে আছে। এতদ্ব্যতীত আসামের প্রসিদ্ধ আহোম রাজা রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহের স্তুতিও ইহাতে বাদ যায় নাই।

রাজা রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহের একটি পণ্ডিত-সভা ছিল। তাহার মধ্যে অনেক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতও ছিলেন। পণ্ডিতরা উভয় রাজার অভিপ্রায় অনুসারে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজারা নিজে উঁহাদের সহিত অনেক পদ রচনা করেন। বর্ত্তমান পুথির অনেক পদ রাজা শিবসিংহ ও রুদ্রসিংহের রচিত এবং পণ্ডিত-সভার কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত অনেক পদে এই রাজাদের নাম আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, রাজা রুদ্রসিংহ ও তৎপুত্র শিবসিংহের অভিপ্রায়ে ও তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদনের জন্য, তাঁহাদেরই কোন সভাসদ কর্ত্তৃক এই পুথিখানি সঙ্কলিত হয়।

রাজা রুদ্রসিংহের রচিত পদ শক্তি ও রাধাকৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে লিখিত ও শিবসিংহের পদে রাধা-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে হয় ত উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা কখনও স্থান পায় নাই। সুতরাং রাজাদের এই রাধাকৃষ্ণ-প্রীতি তাঁহাদের উপর বঙ্গীয় কবিগণের অসাধারণ প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

এই গ্রন্থের মূল্য সম্যক্ বুঝিতে হইলে আসামের তদানীন্তন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

উত্তর-ব্রহ্মের সান জাতির একটি শাখা আহোম নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে আহোমগণ উত্তর-পূর্ব্ব আসামে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ইঁহারা রাজ্য বিস্তার করিয়া সমস্ত আসাম জয় করেন। পরে ইঁহারা বঙ্গীয় সাধু ও পণ্ডিতগণের প্রভাবাধীন হইয়া ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হন।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহোম রাজা চুহুম্মুং সর্ব্বপ্রথম 'স্বর্গ-নারায়ণ' এই হিন্দুনাম গ্রহণ করেন। চুতাম্লা বা জয়ধ্বজ সিংহ ১৬৫৫ খৃঃ অঃ রাজা হন। ইনি নিরঞ্জন গোস্বামী নামক এক জন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে চুলিকফা রাজ্যলাভ করেন; ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া আসাম ইতিহাসে লরা রাজা নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পরেই ইনি সিংহাসনের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারগণকে বন্দী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করেন। অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমার গদাপাণি নাগা পাহাড়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। লরা রাজা তখন গদাপাণির স্ত্রী—কুমারী জয়মতীকে বন্দী করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গদাপাণির সন্ধান পাইবার চেষ্টা করেন। জয়মতী কিছুতেই সন্ধান না দেওয়ায় তাঁহাকে অনাহারে রাখা হয় ও ১৬ দিন ধরিয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হয়। এই অত্যাচার-ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গদাপাণি শীঘ্রই এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লন। লরা রাজা তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন ও ১৬৮১ খৃঃ অব্দে গদাপাণি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গদাপাণি পরে গদাধর সিংহ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী ও চরিত্রবান্ রাজা জগতে অতি বিরল।

লরা রাজার রাজত্বকালে আহোম রাজ্য অতিশয় দুর্ব্বল ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। অধীন সামন্ত-রাজগণ প্রায় সকলেই আহোমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গদাধর রাজ্য লাভ করিয়া অতি দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত অতি শীঘ্রই রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনরানয়ন করেন। তাঁহার সময়েই কামরূপ সম্পূর্ণভাবে আহোমের অধীনে আইসে ও মুসলমান-প্রভাব সম্পূর্ণরূপে আসাম হইতে বিদূরিত হয়।

জয়মতীর গর্ভে গদাধর সিংহের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। গদাধরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চুখ্রুংফা সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি পরে হিন্দু নাম রুদ্রসিংহ গ্রহণ করেন। ইনি অসাধারণ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। Assam District Gazetterএ ইঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

রুদ্রসিংহের সময় আহোমের প্রতাপ চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি রংপুরে তাঁহার নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঘনশ্যাম নামক জনৈক বাঙ্গালী তাঁহার প্রাসাদ ও নগর নির্ম্মাণ করেন। রুদ্রসিংহ দুই বিপুল সেনাবাহিনী কাছাড় ও জয়ন্তীপুরের নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নৃপতিযুগলকে তিনি আসামে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। মিরী ও দাফলাগণ তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। এই সময় আহোম জাতি শুধু সমগ্র ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-ভূমির উপর আধিপত্য বিস্তার করে নাই, তাহাদের প্রতাপ বাহিরের গিরিমালার উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৯০২-৩ সালের Report of the Archeological Survey, Bengal Circle. নামক পুস্তকে রঙ্গপুর নগর ও তাহার ভগ্নাবশেষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মে রুদ্রসিংহের অসাধারণ আনুরক্তি ছিল। দীক্ষা-গ্রহণের জন্য তিনি শান্তিপুরের নিকটস্থ সিমলা মালিপোতা গ্রাম হইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে তাঁহার রাজধানীতে আনয়ন করেন। তিনি অনেক সরোবর ও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয়া মাতা জয়দেবীর স্মরণার্থে তাঁহার নৃশংস হত্যাস্থানে প্রতিষ্ঠিত জয়সাগর সরোবর ও তৎ-সম্মুখে জয়দোল মন্দির অন্যতম। শিবসাগরের মাজোদোল (মাধব-মন্দির), দেবীঘর, ভোগঘর, রঙ্গনাথ দোল, ফাগুয়া দোল ঘর, পূজা-ঘর হরগৌরী-দেবালয় ইত্যাদিও তাঁহার কীর্ত্তি।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রুদ্রসিংহ বঙ্গদেশ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। পথিমধ্যে গৌহাটিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে ফল কি হইত বলা যায় না; হয় ত বর্ত্তমান ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

রুদ্রসিংহ শৌর্য্য ও বীর্য্যে যেরূপ অতুলনীয় ছিলেন, হৃদয়ের কোমলতা, বিদ্যোৎসাহ ও গুণগ্রহণেও তদ্রূপ অনন্যসাধারণ ছিলেন। নানা দিগ্দেশ হইতে গুণিগণ তাঁহার সভায় আগমন করিতেন ও গুণের যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। রঙ্গপুর নগর-নির্ম্মাণে ঘনশ্যাম নামক বঙ্গীয় স্থপতির নিয়োগ তাহার অন্যতম প্রমাণ। আমাদের পুথির অন্যতম বিশিষ্ট পদকর্ত্তা ধরণীশূর কবিচক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রুদ্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ইন্দ্রের বংশত রুদ্রসিংহ নরপতি।
সৌমার দেশর-পতি ভৈলা মহামতি।
যার শুদ্ধ যশে পূরি আছে বসুমতী।
হর-হরি দুর্গা পায়ে জার সদা মতি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বিন্দু তাঁর গৃহিণী এবং সচিব, আর বাকিটা পড়িয়াছিল সরযূর অংশে।

কিন্তু সরযূ তার সপত্নীকে মনের মধ্য হইতে বেশ সহ করিতে পারিতেছিল না,—প্রথমাবধি কোন দিনই সে তাহা করিতে পারে নাই।

বিবাহের সময় সে শুনিয়াছিল, তার সতীনই সব, সে শুধু সন্তানের জননী হইবার জন্তই এ ঘরে আসিতেছে। শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ প্রথম সে এই বলিয়াই লাভ করিল যে,— "দেখ মা! মুখ রেখ। যার জন্তে আমার সতী লক্ষ্মী সোনার বউমার মনে এত বড় দাগা দিতে হলো, সেটি যেন তোমার দ্বারা সিদ্ধ হয়, না হ'লে ত তোমার আনার কোনই দরকার ছিল না।"

স্বামীর মুখেও যখন তখন সে শুনিতে পায়, "তুমি ব'লে তাই অমন করলে, বড় বউ হ'লে করতো না।" কোন কোন সময় রাগের মুখে তিনি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন,—"তোমার জন্তেই আমি তাকে এক রকম হারিয়েছি, তার সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয়? সে কি, আর তুমি কি!"

তীব্র একটা অক্ষমণীয় বিদ্বেষে সরযূর সারাচিত্ত ভিতরে ভিতরে বিন্দুর বিরুদ্ধে জলিতে পুড়িতে থাকে, অথচ বাহিরে নীরব স্তব্ধ বাধ্যতায় তাহাকে ইহাকেই সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে হয়। এমনই করিয়াই তিন জনের জীবনের দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল, অবস্থার কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গেল না। কেবল সরযূ দেখিল, তার সতীন, তার স্বামী, পুত্র, কন্তা, জামাতা—তার এ পৃথিবীর সকলকার উপরেই নিজের যাদু-মন্ত্রের অব্যর্থ প্রভাব কিরূপ দৃঢ় হইতে দৃঢ় করিয়াই বিস্তৃত করিয়া তাহাদের সকলকেই তাহার আপন আয়ত্তগত করিয়া লইতেছিল। এতখানি, এত সব থাকিতেও অভাগী সরযূ যেন সর্ব্বহারা নিঃস্ব একটা ভিখারিণী, আর সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী রাজরাজেন্দ্রাণীরূপে বিন্দুই সমস্ত দখল করিয়া বসিয়া আছে।

তীব্র বিদ্বেষে মন তার বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়া উঠে, কিন্তু চিরদিনের অসহায় ভীরুতা নিজেকে প্রচার করিতে ভরসা পায় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আনন্দরূপমমৃতম্

১

নিখিলাকাশের তিমির-বীণার তারে,
চঞ্চল বারে বারে
খেলাইয়া ফেরো তুমি দীপকের শিখা—
তুমি রাগিণীর দামিনী;
বার বার লাগি' সে সুর-লীলার লহরী,
চমকিয়া উঠে শিহরি',
বুকের পাথারে বরিষার বিভীষিকা—
বেদনার অমা-যামিনী।

২

মরণের মায়া-তীরে
আতুর-আঁখির অন্ধতা কাঁদি' ফিরে;
তুমি আসি' বার বার,
আকুল আঁখিতে তার
বুলাইয়া দাও কি যে অ-মৃতের কজ্জল
শুভ্র-উজ্জ্বল
কোথা হ'তে ধীরে ধীরে,
মায়ার কুয়াসা চিরে'
ফুটে' উঠে সেথা সত্য-সাগরসরণি—
সমুখে পারের তরণী!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

ভদ্রসন্তানোপযোগী কৃষি

যে সকল সুবিধা থাকিলে কোন জাতি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে, বাঙ্গালী সে সমুদয় ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা, লাভজনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর—এ সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালীর হীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ অবশ্য অনেক; সেগুলির আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; বরং এইরূপ অবস্থার প্রতীকারকল্পে কি করিতে পারা যায়, তাহাই বিবেচনা-যোগ্য। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে সমুদয় শ্রেণীর আর্থিক দুরবস্থার জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই প্রধান। সাধারণ ভদ্রসন্তানগণের অভিভাবকরা তাঁহাদিগকে তথা-কথিত শিক্ষা প্রদানের জন্য জীবনের উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করেন; তাঁহাদিগকে সংসারে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সামান্যই রাখেন অথবা রাখিতে পারেন না। লেখাপড়া ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে অভিজ্ঞ না হওয়ায় এবং রুচিও না থাকায়, শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, উপার্জ্জনের অধিকাংশ দ্বারই তাঁহাদের পক্ষে অর্গলাবদ্ধ। শিক্ষিত তরুণগণই জাতির আশা-ভরসা; কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কত শত বাঙ্গালী যুবক যে উদ্দেশ্যবিহীন, অনুপার্জ্জক জীবনে অতিবাহিত করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তাই নাই। অন্য দিকে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে দেশের কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, যাহা ধনাগমের মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে অথবা অন্য দেশীয় লোকের করতলগত হইতেছে। সুখের বিষয় যে, তরুণগণের মধ্যে এখন জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রকৃত দেশোন্নতির কার্য্যের সহিত তাঁহা-দিগের সম্বন্ধ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যত দিন না তাঁহারা চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া দেশের মাটী, দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং দেশীয় শ্রমিকের কার্য্যপটুতার সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবেন, তত দিন আমাদিগের আর্থিক উন্নতির কোন আশাই নাই।

ভদ্র ব্যক্তির জন্য কৃষিকার্য্য

বঙ্গদেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধ সাড়ে চারি কোটি লোকের মধ্যে তিন কোটি লোকের জীবন একবারে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন আরও অন্ততঃ অর্দ্ধ কোটি লোক আংশিকভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহির হইতে দেখিতে গেলে বাঙ্গালায় কৃষির অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে কৃষিকার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ জমীদারগণের আয়ের সমষ্টি করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অংশে মাত্র সাত টাকা 'নেট' লাভ থাকে। নানা কারণে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; বিগত কৃষি-কমিশন দ্বারা এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; এ স্থলে সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। স্থূলতঃ কথা এই যে, কৃষিকার্য্য শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য লাভজনক করিতে হইলে কৃষিকার্য্যের প্রণালী (System of farming) পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভদ্র-সন্তানগণকে কৃষিকার্য্যে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার চেষ্টা হইয়াছে। কতিপয় কারণে সেগুলি সফল হয় নাই; তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, সেগুলি বৃহদায়তনের পরিকল্পনা (Scheme)। দেশের লোক এখনও ব্যক্তিগত কিম্বা সমবেত চেষ্টায় বৃহৎ কৃষি অনুষ্ঠানের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে শিখে নাই। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান হইলেও, ইহা ক্ষুদ্র কৃষির দেশ। সরকারী কাগজ-পত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ কৃষকের চাষের জমী ৩ হইতে ৭ বিঘার অধিক নহে। এতদ্দেশে প্রথমতঃ উন্নত উপায়ে ক্ষুদ্র কৃষির উপরই লোকের অনুরাগ জন্মিতে পারে। আর ইহাও স্থির যে, ভদ্রব্যক্তি যদি কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রথায় ক্ষুদ্র ক্ষেত্র চাষ করাই যুক্তিযুক্ত। আরও একটি বিষয় এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। সাধারণ ভদ্রব্যক্তিগণের মূলধন কম এবং উন্মুক্ত মাঠে জলবৃষ্টি, রৌদ্র ও কাদায় তাঁহারা শ্রম করিতে অপটু; তাঁহাদিগের পক্ষে ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি বড় বড়

পথের সাথী

নবম পরিচ্ছেদ

বসন্ত বাবুর প্রথমবারের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী যে বড়-ঘরের মেয়ে, সে কথা আমরা অনেক আগেই বলিয়াছি। বড়লোকের মেয়ে হইলেই যে তাহাকে চাঁপা-চামেলীর মত গৌরোজ্জ্বল সুবর্ণ-গৌরী এবং পদ্মপলাশাক্ষী হইয়াই জন্মিতে হইবে, এ নীতি সাহিত্য-সংসারের প্রায়শঃই অখণ্ডনীয় হইয়া উঠিলেও বিশ্ব-সংসারের স্রষ্টা যিনি, সেই বিশ্বকর্ম্মার হাত কিন্তু এটাকে পেটেণ্ট করিয়া রাখিতে পারেন নাই, অবশ্য কাযটা যে খুব বেশী অন্যায়, তাও জোর গলায় বলা যায় না। রূপার বোঝা এবং রূপের বোঝা একসঙ্গে জোগান তিনি যখন দেন, সেই-টাকেই বরঞ্চ তেলা মাথায় তেল ঢালার মত অনাবশ্যক দান বলিয়া মনে করা যায়। তা এ ক্ষেত্রে বিন্দুবাসিনীকে গড়িয়া তুলিতে তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা এই রকম একটা ভুল করিতে না পারায়, এই মেয়েটির বিবাহ-সম্বন্ধে কোনই বাধা-বিঘ্ন অবশ্য পড়িতে পারে নাই, যেহেতু, তাঁর বাপ চকচকে ঝকঝকে নিখাদ চাঁদি রূপা দিয়া তাঁর ঐ মেয়েটিকে আগাপাশতলা পর্য্যন্ত মুড়িয়া ফেলিতে পারা যায়, তার তিন গুণ দামের রূপার যোগ্য দাম ধরিয়া দিয়া কন্যাদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহ যখন কুদৃষ্টি করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখে, তখন বিধাতার বিধানকেও সে উল্টাইয়া ফেলে। ঐ মেয়েটির ভাগ্যস্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুখ তার ভাগ্যস্থাননিবাসী দুষ্টগ্রহ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তার অপ্রতিহত ফলস্বরূপ এক সুন্দরী সপত্নী পাঠা-ইয়া দিয়া বসিল। এর রদ-বদল করার সাধ্য স্বয়ং বিধাতারই যখন নাই, তখন মানুষে আর কি করিবে?

তা বিন্দুবাসিনী এর জন্য খুবই বেশী দুঃখ পান নাই। কেন, তা' বলিতেছি।

বিন্দুর বাবা হরমোহন রায় খুব সামান্য অবস্থা হইতে আপনার চেষ্টায় উঠিয়া প্রথমে মুন্সেফ এবং বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার বলে ক্রমশঃ বৎসর দশেক ধরিয়াই ডিষ্ট্রিক্ট জজের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সরকারের দৃষ্টিটাকে অপ্রসন্ন না করিয়া দশের চক্ষুতে মানুষের সম্মান পাওয়া—এটা বড় কম তপস্যা নহে। হরমোহন কিন্তু সেটা পাইয়াছিলেন।

একবার একটা রাজার মোকর্দ্দমায় সরকার পক্ষের অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়ায় তাঁর রায়টাও বেশ তীব্র হইয়াছিল; কিন্তু সরকার বাহাদুরের মন তাহাতে কিছু তিক্ত হইয়া উঠিলেও এই সাবধানী ও জনপ্রিয় হাকিমকে তাঁহারা "লেট হিম গো" গোছের বাহ্য ঔদাস্যের সহিতই যাইতে দিয়াছিলেন।

বিন্দুবাসিনী হরমোহনের দ্বিতীয় সন্তান। বড়টিও অবশ্য মেয়ে। ছেলে তাঁর হয় নাই। বিন্দুর স্বামী যখন তাঁর মেয়ের ষোল বৎসর বয়স পার হওয়ার পর আর একটি দিনও দেরী না করিয়া হঠাৎ আর একটা বিবাহ করিয়া বসিল, হর-মোহন অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বিন্দুকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। মেয়ে আনার সময় বেহাইনকে ও জামাইকে দস্তুর করিয়াই বলিয়া আসিলেন যে, 'তাঁর মেয়ে আর কখনও এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে না।' কিন্তু এই কথাটা তাঁর মুখ দিয়া যখন বাহির হইতেছিল, তখনই অলক্ষ্যে থাকিয়া বিন্দু-বাসিনীর চতুর্থগত শুভ গ্রহটি মনে মনে মাথা নাড়িতেছিল। মাসখানেকের মধ্যেই বিন্দুর বাবা বিন্দুকে নূতন ধরণের এক সুট চুণি ও মতি বসান ভারি দামের গহনা পরাইয়া জামাইয়ের জন্য সদ্য-আবিষ্কৃত আনকোরা দামী সুইস্ ঘড়ী, গ্রামোফোন, তার একরাশ বাছাই করা রেকর্ড, বেহাইনের গরদের নামাবলী এবং জামাইএর নূতন বধূর জন্যও একছড়া পান্নামতির নেকলেশ ও বেনারসী সাড়ী সঙ্গে দিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ীর সব চেয়ে পুরাতন দাসী হরিমতিও সঙ্গে আসিল। হরি বলিল, "বাবুর মোটে ইচ্ছে ছিল না, তা' পিসীমা কিছুতেই মত করলেন না, বল্লেন, সে কি কথা, জোড়া মাসে এসেছে,

ফিরতেই হবে। না হলে যদিই পেটেরটির কোন অকল্যেণ হয়, তখন আর কারুই আপশোষের শেষ থাকবে না।"

একসঙ্গেই সুগভীর বিস্ময়যুক্ত উল্লাসে এবং সুনিবিড় লজ্জার আঘাতে ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়া বিন্দুর শাশুড়ী উচ্চারণ করিলেন, "জোড়া মাস! তা হলে কি বউমা—"

হরিমতি যেন অবাক্ হইয়া গিয়া উত্তর করিল,—"বলেন কি মা!—আপনার কাছেই ত ছিল,—তাও আপনি জানেন না কি? কেমনধারা শাশুড়ী আপনি গা?"

এমনই করিয়া বিন্দুবাসিনীর ভাগ্য-বিধাতা বা ভাগ্যাধিষ্ঠাতা শুভাশুভ গ্রহসমষ্টি তার ভাগ্যটাকে ঘোর প্যাঁচ দিয়া বেশ ঘোরালো করিয়া তুলিতে তুলিতেও হঠাৎ কি ভাবিয়া আবার তাহাকে তার সরল রেখায় মিলাইয়া দিয়া গেল। তবে কথা এই যে, যেটা ভাঙ্গার পর জোড়া লাগে, সেটা আর ঠিক তার আগের মত জোড় খায় না। বিশেষ যদি ঐ ভাঙ্গনের মধ্য হইতে এক টুক্‌রা এদিক্ ওদিক্ হইয়া যায়।

বিন্দু যে বাপের যুক্তিকে মানিয়া লইয়া নিজেকে খাটো করিয়া আবার সুড়সুড় করিয়া স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসিল, এর অর্থ এ নয় যে, সে তার বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে ক্ষমা করিয়াছিল। তা' সে আদৌ করে নাই, স্বামীকে সে প্রাণের মধ্য হইতে ভালবাসিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাঁর এ কৃতঘ্নতায় প্রাণে তার বাজিয়াছিল খুব বেশীই। কিন্তু সে যে তার নিজের এত বড় অবমাননাকে এমন অবলীলাক্রমে সহিয়া লইতে পারিয়াছিল, এ শুধু তার ভিতরকার ত্যাগে মণ্ডিতা সর্ব্বংসহা মাতৃত্বের প্রভাবেই। যে সন্তান তার আগতপ্রায় জন্মোৎসবের জন্য তার গর্ভে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাকে পিতৃস্নেহ, পিতৈশ্বর্য্য এ সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিয়া দূরে সরাইয়া রাখা যে তাহার পক্ষে ঠিক সঙ্গত না হইতেও পারে, বাপের কথায় বিন্দুবাসিনীর নিজের মনও এই যুক্তিটাতে খুব জোর করিয়াই সায় দিয়াছিল। তার অনাগত সন্তানের মুখদর্শনের আশায় প্রলুব্ধ মা যে প্রবল স্নেহের অসহ্য প্রসবব্যথা সহ্য করিয়া লইয়া থাকেন, সেই স্নেহেই এত বড় অসহনীয় বেদনাকেও ঐ অত কম বয়সেই বিন্দু মুখ বুজিয়া সহিয়া লইতে রাজী হইল। যত বড়ই মাতামহ হউন, আর যতখানিই তাঁর স্নেহ সম্পদ প্রতিষ্ঠা হউক, তবু ত লোক মাতামহালয়ের পিতৃগৃহবঞ্চিত ছেলেকে একটুখানি 'আহার' চোখেই দেখিবে।

ক্রমে সপত্নীকে বিন্দুর সহ্য হইয়া গেল; তাহাকে একটু একটু করিয়া এক রকমে সে একটুখানি যেন ভালও বাসিল, কিন্তু সহিল না আর কোনমতেই সপত্নীর স্বামীকে। তাঁহার সংস্রব, সম্পর্ক সবই যেন তার বদলাইয়া গিয়াছিল। এ যেন আর তার সেই নিজের জনটি নয়, আর এক জন কেহ সতীনের বর, এই যেন এ লোকটির সমস্ত পরিচয়ে গিয়া ঠেকিয়াছিল। ইহাকে দেখিলেই মন তার কি একটা যেন বিদ্বেষের বিষে বিষাক্ত হইয়া উঠিতে থাকে, অভিমানের স্রোতঃ বুকের মধ্যে ফেনিল হইয়া ফেনাইয়া উঠে।

আহত অবমানিত প্রেম যেন অন্তরেরও মধ্য হইতে গভীরবেগে উথলিয়া উঠে। দলিতা ফণিনীর মতই তাহা গুমরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, বিন্দুবাসিনী এই অভিমানের আগুনকে তার শিক্ষিত ভদ্রচিত্ত হইতে কোন সারবান্ সুসঙ্গত যুক্তি দিয়াই আর নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। অপরাধী স্বামীর সংসারে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর পদ সম্পূর্ণভাবেই দখল করিয়া রহিল, সেখানে সপত্নীকে সে সূচ্যগ্রভূমি ছাড়িয়া দিল না, কিন্তু পত্নীত্বের সকল সর্ত্তই সে তাহাকে প্রদান করিয়া সেখানে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া রাখিল। তার স্বামী অবশ্য তার এ ব্যবস্থা নীরবে মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই, কিন্তু তাঁর পক্ষের অপরাধের গুরুত্ব তাঁহাকে বিন্দুর কাছে নত থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাই তার সকল ব্যবস্থাই তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া সহিয়া লইতে হইয়াছে। সংসারের সমস্ত দায়ভার হইতে মুক্তি পাইয়া একান্তভাবেই সুন্দরী তরুণী পত্নীর সঙ্গসুখে বিভোর থাকার শান্তিটুকুও তাঁর পক্ষে নিতান্তই যে অরুচিকর হয় নাই, তাহা বোধ করি বিশেষভাবে না বলিয়া দিলেও চলে! মাঝে মাঝে নির্জ্জন পাইলে দুঃখের ভাণ করিয়া অবশ্য তিনি বলিয়া যাইতেন—"আমায় তুমি একেবারেই ঠেলে ফেল্লে, বিন্দু?"

মনের মধ্যে কিন্তু তাঁর সে জন্য খুবই বেশী দুঃখ ছিল, তাহা মনে হয় না।

সরযূ গৃহিণীর পক্ষে, বিশেষতঃ এত বড় বাড়ীর গৃহিণীর পক্ষে বেশ উপযোগী না হইলেও তার রূপ এবং যৌবন এ দুইএর ত আদৌ অভাব ছিল না, কাযেই কপালে-পুরুষ বসন্ত বাবুর জীবনটা এই দুই পত্নীর সাহায্যে মন্দ কাটিতেছিল না। গৃহিণী এবং ঘরণী দুইয়ে মিলিয়া তাঁর জীবনটাকে নির্ব্বিঘ্ন এবং মধুময় করিয়াই তুলিয়াছিল।

ক্ষেত্রজ ফসল চাষে অনেক অসুবিধা আছে; কিছু দিবস ধরিয়া প্রথমতঃ কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত না হইলে এরূপ বিস্তৃত চাষে নামিতে পারা যায় না। বহুল পরিমাণে এক ফসল উৎপাদনের চেষ্টাও সামান্য ধনীর পক্ষে নিরাপদ নহে। ফলতঃ extensive cultivation যাহাতে অধিক পরিমাণ জমী চাষ করা হয় এবং উৎপাদনের হার কম হইলেও চাষের জমীর আধিক্য বশতঃ লাভ সম্ভবপর হয়, সেরূপ প্রকার চাষ বর্ত্তমান সময়ে ভদ্রব্যক্তির পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। তাঁহাদের পক্ষে intensive cultivation যদ্দারা স্বল্প পরিমাণ জমীতে উন্নত সার, বীজ ও যন্ত্রাদির সাহায্যে ফসলের হার বৃদ্ধি করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়, সেইরূপ চাষই উপযুক্ত। সাধারণ কৃষক কৃষিকার্য্যে নিজের শ্রম ও কৃষিযন্ত্রাদি, ঘরের সার ও বীজ প্রভৃতি নিয়োগ করিতে পারে এবং অভাব অল্প বলিয়াই সে যৎসামান্য লাভ করিতে পারে, পক্ষান্তরে, ভদ্রব্যক্তি শ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র তত্ত্বাবধান কিম্বা চাষের সহজ পাইটগুলি করিতে সমর্থ, মজুরীর জন্য তাঁহার ব্যয় অনেক; সর্ব্বোপরি তাঁহার অভাব কৃষকাপেক্ষা খুবই বেশী; এই সমুদয় কারণে তাঁহার পক্ষে ছোট ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ মুখ্য খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্য ফসল এবং বিভিন্ন প্রকার উপাদানপ্রণালী প্রশস্ত।

বাজার ফসল চাষ

কলিকাতার বাজারে ফল-মূল, তরকারী ইত্যাদি বহুদূর হইতে আমদানী হয়। সময়ে সময়ে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে উক্তরূপ দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইলেও, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে এ প্রকার দ্রব্য সুলভ ও সহজ-প্রাপ্য। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব হইতেই সহরের মহাজনরা দাদন দিয়া ফসল হস্তগত করে অথবা ক্ষেত্রের সমস্ত ফসল কুরাণ করিয়া ক্রয় করিয়া লয় এবং ঐ সমুদয় আনিয়া সহরে বিক্রয় করে। কলিকাতার পক্ষে যাহা সত্য, অন্যান্য ক্ষুদ্র সহর ও বড় বড় গঞ্জের পক্ষেও তাহাই সত্য। সেই জন্য কতিপয় জাতীয় ফসলের চাষ সহরের নিকট করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভ আছে। এরূপ ফসলকে ইংরাজীতে market garden crop অথবা বাজার ফসল বলে। সাধারণ ক্ষেত্রজ ফসল চাষের সহিত কয়েকটি বিষয়ে এই প্রকার ফসল চাষের বিভিন্নতা আছে:—

যথা, ইহাদের জন্য ক্ষেত্রের পরিসর অনেক কম; ফসলের পাইট ও চাষের যন্ত্রাদি অপর প্রকার; ফসলের সংখ্যা অনেক অধিক; জমী কখনও পতিত রাখা হয় না, সমস্ত বৎসরই একই জমীতে পর্য্যায়ক্রমে একের পর অন্য ফসল হইতে থাকে এবং জল্‌দি ও বিশেষগুণযুক্ত ফসলের উপর অধিক নজর রাখা যায়। এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ ফসল চাষ সহরের উপকণ্ঠে 'মালী' শ্রেণীর লোকের হস্তে এবং পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র চাষীর হস্তে ন্যস্ত আছে। অবশ্য আজকালকার দিনে বাজারে কোন দ্রব্য অবিক্রীত থাকিয়া যায় না; কিন্তু বৎসরের যে সময়ে, যে ফসল, যেরূপভাবে উৎপাদন করিলে ক্রেতাগণ সেগুলি স্বেচ্ছায় ও সাদরে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারেন, তাহার উপর উক্ত শ্রেণীর লোক লক্ষ্য রাখে না অথবা রাখিতে পারে না। অন্যান্য দেশের বাজার ফসল-চাষিগণ খুবই জাগ্রত এবং উদ্যমশীল। অসময়ে এবং সম-শ্রেণীর ক্ষেত্রজাত ফসল বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদিগের বিশেষ প্রণালীতে উৎপন্ন ফসল ক্রেতার নিকট উপস্থিত করে এবং মূল্যও সেই অনুপাতে অধিক পায়। বস্তুতঃ ক্ষেত্র-চাষীরা ৫ বিঘা চাষ করিয়া যে লাভ করে, বাজার ফসল-চাষীরা অর্দ্ধ বিঘা চাষে সেই লাভ করিবার চেষ্টা করে। জল্‌দি ফসল ভিন্ন বর্ণে, গন্ধে, আকারে, স্বাদে, ওজনে অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট গুণে চিত্তাকর্ষক ফসল উৎপাদন করাও বাজার ফসল-চাষীর অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ লোকে দ্রব্যের উৎকর্ষতা অপেক্ষা পরিমাণাধিক্য অধিক বুঝিয়া থাকে, তবুও ইদানীন্তনকালে দেখা যাইতেছে যে, অন্ততঃ খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আশা করিতে পারা যায় যে, ক্রমশঃ বাজারে উৎকৃষ্ট ফলমূল ও শাক-সব্জীর যথাযোগ্য আদর হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাজার ফসল চাষ করিতে হইলে অবশ্য অল্প-বিস্তর শিক্ষা এবং বুদ্ধিপ্রয়োগক্ষমতা থাকা আবশ্যক। মালী শ্রেণীর লোকের তাহা নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বয়ং এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের দৈনন্দিন খাদ্যের যেমন উন্নতিসাধন হইতে পারে, তাঁহারা নিজেও সেইরূপ লাভবান্ হইতে পারেন। সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিলে উৎপাদক (producer) এবং ভোক্তার (consumer) মধ্যে আজ যে সকল মধ্য-লাভগ্রাহী (middlemen) লোক আছে, সেগুলিও অপসৃত হইয়া দ্রব্যাদি সুলভও হইতে পারে।

সম্প্রতি কলিকাতার নিকটে ও অন্যান্য দুই এক স্থলে কতিপয় ভদ্রব্যক্তি এই প্রকার চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমাদিগের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্যে অনুরাগী তরুণবৃন্দের পক্ষে বাজার ফসল চাষ জীবিকা-অর্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

সফলতা-লাভের উপায়

বাজার ফসল চাষের জন্য বাগান-জমী যে একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। সাধারণ ডাঙ্গা-জমী, যাহা বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় না, তাহাতেও অধিকাংশ বাজার ফসল চাষ করিতে পারা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হইয়া ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। অবশ্য মূলধন এবং বাসস্থান হইতে ক্ষেত্র দূরে হইলে সে অঞ্চল নিজ স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কি না, তাহা প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। উক্ত বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, পরে ক্ষেত্র সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি জানা দরকার:—(১) জমী পতিত হইলে উহাতে স্বভাবতঃ—কি কি আগাছা জন্মায়, কতকগুলি আগাছা জমীর উর্ব্বরতা ও সহজ কর্ষণোপযোগিতা এবং অন্য কতকগুলি তাহার ঠিক বিপরীত গুণ সূচনা করে; জমী কর্ষিত হইলে উহাতে কি কি ফসল জন্মায় এবং তৎসমুদয়ের ফলনের হার। (২) জমী কোন্ দিকে ঢালু এবং তাহাতে জলনিকাশের অসুবিধা হয় কি না। (৩) স্থানীয় বারিপাতের পরিমাণ; জলসঞ্চয়ের জন্য পুষ্করিণী, কূপ অথবা অন্য কি ব্যবস্থা আছে। (৪) নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যথেষ্ট মজুর পাওয়া যায় কি না; তাহাদিগের মজুরী ও সাধারণ আহার্য্য-দ্রব্যাদির দর কিরূপ। (৫) ক্ষেত্র হইতে সহর অথবা বড় গঞ্জ কত দূরে এবং ত্বরিত বহনাবহনের ব্যবস্থা সহজে হইতে পারে কি না। (৬) জমীতে ক্ষুদ্র গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান আছে কি না। (৭) ফসল উৎপাদনের স্থানীয় অন্তরায় কি কি—যথা বন্য জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব, কীট ও ছত্রক-জনিত রোগ, মাটীতে লোণা ফোটা ইত্যাদি। এই সমুদয় বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে খুবই ভাল। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ক্ষেত্র যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা আশা করা বৃথা। জল, জমী ও ফসল বিক্রয়ের স্থানের সুবিধা থাকিলে অন্য দোষ ক্রমশঃ শুধরাইয়া লইতে পারা যায়, যদিও প্রথমতঃ তাহাতে খরচ কিছু বেশী পড়ে।

জমী নির্ব্বাচনের পর ফসল-নির্ব্বাচন অন্যতম কার্য্য। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, নানা জাতীয় ফসল বাজার ফসলের অন্তর্ভুক্ত। নিত্য ব্যবহারের জন্য যে সকল উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হাটে বাজারে সচরাচর বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে সব্জী, শাক, ফল, মসলা ও ফুল রহিয়াছে; ফুলের কাটতি তত অধিক নয় বলিয়া উহা বাদ দিতে পারা যায়। তাহার পরিবর্ত্তে চাষীর উপকারী দুই একটি বৃক্ষ জন্মাইলে অনেক সময় উহাদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর বাজার ফসলের একটি মোটামুটি তালিকা এ স্থলে প্রদত্ত হইল:—

সবজী

পেঁয়াজ, বরবটি, মানকচু, ঢেঁড়স, ওল, রাঙ্গা আলু, চাল কুমড়া, লাউ, বিলাতী কুমড়া, ঝিঙ্গা, ফুলকপি, ধুঁধুল, ওলকপি, বিলাতী বেগুন, বাঁধাকপি, উচ্ছে, মাখম শিম, করলা, দেশী শিম, সজিনা, ফরাস শিম, মূলা, কচু, শশা, পটল, কাঁকুড়, চিচিঙ্গা, মেটে আলু, মটর, গাঁজর, বীট পালং।

মসলা

লঙ্কা, আম-আদা, ধনে, পুদিনা, মৌরী, শুল্‌ফা, আদা, মেথী।

ফল

টেপারি, গোলাপ-জাম, পেয়ারা, জামরুল, বিলাতী আমড়া, ফলসা, দেশী আমড়া, পেঁপে, কুল, করমচা, আম, লেবু, কলা, নারাঙ্গী, জলপাই, বাতাবী লেবু, চালতা, বেল, লকেট, কাঁটাল, নারিকেল, আনারস।

শাক

ডেঙ্গো, পালং, নটে, চুকা পালং, পুঁই, সরিষা।

আয়করী গাছ

বাবলা, মেদী, বাঁশ, ধঞ্চে।

উপরি-উক্ত তালিকাভুক্ত সমস্তগুলি ফসলের চাষ করা অথবা কিয়দংশের চাষ করা মূলধনের উপর নির্ভর করে। পাঁচ বিঘার কম পরিমাণ জমীতে চাষ করিলে ভদ্র ব্যক্তির যথেষ্ট লাভ হওয়া সম্ভব নহে। অন্য দিকে জমী ১৫ বিঘার অধিক হইলে এক জনের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা শক্ত হইবে। অধিক মূলধন না থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় এই যে, একত্র সংলগ্ন ১৫ বিঘা জমী লইয়া জলাশয়ের পার্শ্বে, বেড়ার

ধারে, কুটীর প্রভৃতির জন্ত নির্বাচিত স্থানের চতুর্দ্দিকে, অর্থাৎ যে সমুদয় স্থানে বড় গাছ থাকিলে ভবিষ্যতে সাধারণ চাষের কোন বিঘ্ন হইবে না, সেই সকল স্থলে বৃক্ষ রোপণ করা। ফল-বৃক্ষগুলি এরূপ জাতীয় হওয়া দরকার—যাহার কিছু বিশেষত্ব আছে। যথা—আম লাগাইতে হইলে দোকলা এবং কাঁচা-মিঠে আম লাগানই ভাল। বাজারে সেরূপ ফলের দর স্বতন্ত্র। বাজার ফসল চাষীর পক্ষে বোম্বাই ও অন্যান্ত আম লাগাইয়া বাগানওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া অসমী-চীন। অন্য ফলবৃক্ষসমূহ সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। সেগুলি সংখ্যায় যথাসম্ভব কম হইবে, কিন্তু তাহাদিগের ফল কোন না কোনরূপ বিশিষ্টতার জন্ত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে। এইরূপ বিশিষ্ট ফলবৃক্ষ সংগ্রহ করা আদৌ কঠিন নহে। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অনায়াসেই দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এরূপ গাছ পাইতে পারিবেন। অন্যান্ত গাছ সম্বন্ধে স্মরণ রাখা দরকার যে, বাঁশঝাড় ক্ষেত্রের পশ্চাদ্দিকে দুই কোণে রোপণ করা উচিত। সার প্রস্তুতের জন্ত যে বড় বড় গর্ত্ত করিতে হইবে, সেগুলি বাঁশঝাড়ের নিকটেই করা ভাল। মেদী গাছ বিভিন্ন প্রকার ফসলের জমীর সীমানায় দিলে সুদৃশ্য বেড়া হইবে; ইহাদের ফুলের গন্ধ মনোরম এবং পাতাও বাজারে বিক্রয় হয়। বাবলার গাছ ক্ষেত্রের সীমানায় দেওয়াই সুবিধা-জনক, বিশেষতঃ পার্শ্বে যদি জলনালী থাকে। বাবলা গাছ মাটী বাঁধিতে অত্যুৎকৃষ্ট, ইহার পাতা ও ফল পশুখাদ্য এবং কাঠ কৃষকের নানা কার্য্যে আবশ্যক হয়। ধঞ্চে গাছ ক্ষেত্রের নিম্নাংশে আইলের গায়ে দুই এক সারি করিয়া দিতে পারা যায়। সবুজ সাররূপে ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

গড় গাছ সমস্ত রোপণ, রাস্তা, আবশ্যকীয় কুটীরাদি এবং জলসেচনালী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রের সম্মুখভাগ হইতে চাষ আরম্ভ করিতে পারা যায়। চাষের জমী ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়াইয়া পাঁচ বৎসরে যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া যায়, এরূপ প্রণালীতে অগ্রসর হইলে ভদ্র ব্যক্তিগণ ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন, একসঙ্গে অধিক মূলধন আবশ্যক হইবে না এবং চাষেও লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকিবে। আমরা বাজার ফসল চাষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে উক্তরূপ কার্য্যের মোটামুটি একটা ধারণা হইতে পারিবে; এ সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। স্থানাভাবে সেগুলির এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মনোহারিকা

গীতি-চন্দনে প্রীতি-অঙ্গনে সাজালে সুরের ডালিয়া।
বনে বনে গান, নূপুরের তান তুলে গেলে সুরা ঢালিয়া!
লীলা-উচ্ছলা রূপসী!
বন-কিশোরের বাঁশরী-স্বপনে তুমি যে শ্রেয়সী, প্রেয়সী!

থল-কমলের দোদুল-দুলিকা কানে দুটি তোর দিল কে?
ললাট-ললিত আঁকিল মধুর চন্দন-চারু-তিলকে!
বন্দনা গাহে বেণুকা!
যূথিকার গলে হয় যে আকুল অশোক-কুসুম-রেণুকা!

উৎপল-নীল ঢল-পরিমল অঙ্কিত দুটি আঁখিয়া।
কুন্তল ওড়ে অঞ্চল-কোলে আদুরী-মাধুরী মাখিয়া!
মাধবীর মন-সখী গো!
নয়ন-সেতারে শয়ন-করানো বেঁধেছ রাগিণী ও কি গো!

আদর-মাখানো অধরে লিখেছ রামধনু-রঙা গীতালী!
মঞ্জীর-মধু-শিঞ্জিনী সাথে নিতি যে তাহারই মিতালী!
এস গো স্বপনচারিকা!
তনু-কুহকের মায়া-পুলকের যাদুকরী মনোহারিকা!

কুঙ্কুম-মাখা অঞ্চল তব অঞ্জলি দেয় কবিতা।
রঙের আগুন জ্বালে কি ফাগুন যূথী-বনে-বনে লভি' তা?
কুসুম-সুষম ললিতা!
ধরার ধূলাতে আলোক-কমল তোমার চরণে নমিতা!

শ্রীভারতকুমার বসু।

নবম পরিচ্ছেদ

লজ্জা ও সংযম

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আদিম মানব দৈহিক শক্তির বলে সব অধিকার করিত। তাহার স্ত্রীগণকেও সে গায়ের জোরে কাড়িয়া বা চুরি করিয়া আনিয়া ভোগদখল করিত। পরে সমাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। এ অবস্থায় তাহার পশুবৃত্তিগুলি খোলাখুলিভাবেই কার্য্য করিত। আজিও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে ইহা দেখা যায়। এই পশুভাব চারিপ্রকার বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা,—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। তাহার সহিত কামক্রোধাদি রিপুগণও আছে। আজও মানুষ যে পশু—সেই পশুই রহিয়াছে। তবে নানা শাসনে, শিক্ষায়, অবস্থার গুণে কতকটা বা কতক সময়ে সে এই পশুবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পশুভাব বিদ্রোহী হয়। আদিমকালে যখন বল্কল ধারণ করিয়া মানুষ শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করিত, সেই যুগের নারী পুরুষের হস্ত হইতে নিজের শরীর রক্ষাব এবং ভাবী সন্তানের কল্যাণকামনায়, ঋতুমতী বা গর্ভবতী হইলে পুরুষের নিকট হইতে পলাইয়া নির্জ্জনে বা নিভৃতে আত্মগোপন করিত। ইহাই লজ্জার উৎপত্তিরূপে কথিত হইয়াছে। নারী-দেহে যখন যৌবনোদ্গম হইত, তখন নারীরা দেহ আচ্ছাদন করিয়া পুরুষের কামকলুষিত দৃষ্টিপথ হইতে আপনাকে যথাসম্ভব রক্ষা করিত। Westermarck বলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, নিজ নিজ সংসারের মধ্যে কেহ স্ত্রী ব্যতীত অন্যের প্রতি গর্হিত কামজভাব পোষণ করে না। এইরূপে সংসারমধ্যে সর্ব্বত্র প্রথম ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার স্থান না পাওয়াতেই উহা নীতিবিরুদ্ধ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। Northcote বলেন, লজ্জার কারণ এই যে, আদিম মানুষ যখন এ কার্য্য করিত, তাহার প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাহার বিপদাশঙ্কা বেশী থাকায় তাহাকে গোপনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইত। ইহাই লজ্জার সৃষ্টি। "Man is by nature a Polygamous animal" অর্থাৎ পুরুষের মনোবৃত্তি একাধিক নারীর প্রতি ধাবিত হয়। এ কথাও তাঁহারা বলেন।

কোন কোন অসভ্য সমাজে নারী সন্তান ধারণ করিবার পর পুরুষের নিকট হইতে পৃথক্ স্থানে বাস করে। আজিও বেলুচিস্থানে ব্রাহুই জাতীয় নারীগণ গর্ভের সাত মাস হইতে স্বামিসঙ্গ ত্যাগ করে। মান্দ্রাজে কাদির জাতীয় নারী গর্ভাবস্থার প্রথম হইতেই স্বামীর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। তথায় রেডী জাতিদের প্রথা আছে যে, প্রথম সন্তানের বিবাহ হইলে আর পিতামাতা একত্র শয়ন করে না। তলিমুদ, কোরাণ এবং সুশ্রুতেরও মত এই যে, গর্ভাবস্থার সূচনা হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত সংযমের প্রয়োজন। চীনদেরও এই মত। পাশ্চাত্যগণ বলেন যে, সহবাসমূলক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া নারীর মনে দেহকে পুরুষের অনাচার হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাজাত স্বাভাবিক যে ভয় এবং দেহকে আবৃত রাখিবার যে ইচ্ছা, তাহাই লজ্জা। এই লজ্জা অপরকে অসন্তুষ্ট করিবার ভয় এবং অনিচ্ছা হইতে জাত। অথবা নিজের ক্ষুদ্রতা বা দোষের জন্য অন্যের কাছে অবজ্ঞেয় হইবার ভয় হইতে উৎপন্ন। এই লজ্জার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার।

অনেক অসভ্য সমাজের মধ্যে পুরুষ অথবা নারী সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে; কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিলেও ইহাদের মধ্যে কুভাব দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক এই নগ্ন বা প্রায়-নগ্ন জাতিদের মধ্যে লজ্জাশীলতা এত অধিক যে, অনেক সভ্য সমাজেও তাহা দুর্লভ। আবার কোথাও আপাদমস্তক আবৃত করিয়াও লজ্জার শেষ হয় না—পর্দ্দার আড়ালে রাখার ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য—যাহাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া লোভ উৎপাদন না করে।

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে দেহ আবৃত করিবার ব্যবস্থা এক প্রকার নহে। গারো এবং অন্যান্য দুই এক জাতির মধ্যে শুধু বক্ষোদেশই আবৃত রাখিবার ব্যবস্থা আছে। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে নিতম্ব-প্রদেশ আবৃত করা হয়। কোন কোন জাতির নারীর মধ্যে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিবার প্রথা হইতে বুঝা যায় যে, এই মুখও পুরুষের নিকট নগ্ন করা সঙ্গত নহে। সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদনও তাহাই। কেহ কেহ সর্ব্বসমক্ষে আহার করে না। ব্রাজীলে এইরূপ এক জাতি আছে। ইহারা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকে, কিন্তু লুকাইয়া আহার করে। ঘোমটা দেওয়ার প্রথা এবং স্বামীকে মুখ না দেখানর প্রথা চীন, ব্রহ্ম, কোরিয়া, রুসিয়া, বুলগেরিয়া, ম্যাঞ্চুরিয়া, পারস্য প্রভৃতি স্থানে আছে। লজ্জার লক্ষণ মুখ রাঙা হওয়া (blushing), মুখ অবনত করা, চোখে চোখে চাহিতে না পারা, অপ্রস্তুতভাব হওয়া, পলায়নের ইচ্ছা ইত্যাদি। পাশ্চাত্যদেশের মতে এইগুলি মদনের ভাবব্যঞ্জক। পুরুষও কালক্রমে নারীর সংস্পর্শে থাকিয়া কম বেশী এ সব সংস্কার পাইয়াছে।

কতকগুলি জিনিষ আছে, তাহাদের প্রতি ভালরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে গোপন বা আবৃত করা হয়। এ জন্য Westermarck এক স্থানে বলিয়াছেন যে, ইহা নিঃসন্দেহ, অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি প্রথমে নারীর গাত্র আচ্ছাদন করিবার বা রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই; বরং যাহাতে

নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হয়, সেই জন্যই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সূক্ষ্ম বা স্বল্পপরিমাণ বস্ত্র যে অতিরিক্ত মাত্রায় চিত্তাকর্ষক, তাহা আজও সভ্যসমাজ দেখিতেছে। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় যাহারা থাকে, তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য হয় না (History of human Marrage Chap IX)। Burton এক স্থানে বলিয়াছেন যে, পরিচ্ছদই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রলুব্ধ করে (Anatomy of Melancholy. Part III. S c III, sub sec 3)। যদি মনের মধ্যে বিকার রুদ্ধ করাই শ্রেয়: মনে হয়, তবে বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি দূর করিয়া দিয়া নগ্ন থাকাই ভাল। কারণ, নগ্ন মনুষ্যদেহের যে সঞ্জীবনী শক্তি (tonic) আছে, তাহা সকলেই জানে। কোন কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

পাশ্চাত্যগণ ইহাও বলেন যে, এক সভ্য মানুষ ছাড়া, ভগবানের সৃষ্ট সকল জীবেরই সহবাসকাল নির্দ্ধারিত আছে। পশুপক্ষীরাও গর্ভাবস্থায় সংযত থাকে। এই স্বাভাবিক নিয়মে থাকিলে প্রসূতি এবং সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিকের ইহাই সিদ্ধান্ত। এ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষকে একত্র থাকিতে দেওয়া হয় না, এরূপ পরিবার এ দেশে এখনও আছে। কোন কোন সংসারে দিবাভাগে এবং রাত্রির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুবক-যুবতী স্ত্রী-পুরুষ একত্র থাকিতে পান না। এ প্রথার মূলে যে মনুষ্যচরিত্রজ্ঞান কতখানি নিহিত রহিয়াছে, তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝা যায়। কারণ, মানুষের স্বভাবই এই যে, অনুসন্ধিৎসা কামনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মানুষ যাহা অদৃষ্ট বা অৰ্দ্ধদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অননুভূত ইত্যাদি মনে করে, তাহাদের উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। লজ্জা যে শুধু নারীকে পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া তাহাকে লোভনীয় করিয়া তুলে, তাহা নহে, তাহার যতটুকু প্রকৃত মাধুর্য্য আছে, তাহা অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া, রমণীয় করে বলিয়া। যাহা প্রকৃতপক্ষে নাই—অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাহা আছে, এই ভ্রম দর্শকের মনে জন্মাইয়া দেয়। ইহা পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে নারী যাহারা—তাহারা নরকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারই আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেন পলাইতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে পলায়ন করে না। প্রাকৃতিক নিয়মই এই। কোর্টশিপ ইহার দৃষ্টান্ত। ইহাতে নরনারী উভয়েই উভয়ের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়। অন্যদিকে নর, নারীর প্রসাদ লাভ করিতে বীরত্ব প্রকাশ করে, বিপদ আলিঙ্গন করে। ময়ূর ময়ূরীকে মুগ্ধ করিবার জন্য পেখম বিস্তার করিয়া নৃত্য করে। কোকিল কোকিলাকে মুগ্ধ করিবার জন্য গান গাহে। নরকে প্রলুব্ধ করিবার স্বাভাবিক শক্তি স্ত্রীজাতির আছে। সে বেশ জানে, কোন্ কায কি ভাবে কখন্ করিলে নরকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। জোনাকীপোকার নারীগুলারই আলো আছে, নরের নাই। (Darwin) ইহাতে নরকে আকৃষ্ট করে।

প্রকৃতি বা সংস্কারবশেই হউক বা শিক্ষার বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই হউক, নারীর লজ্জারূপ ভূষণ তাহাকে অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তির অধিকারিণী করিয়াছে। এই কারণে যে নর ও নারী সর্ব্বদা একত্র বাস করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পরস্পরের প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শারীরিক মিলন এই নরনারীর প্রণয়াকর্ষণের বিরোধী। ইহা সহজেই পরীক্ষা করা যায়। অবাধ মেলামেশার যাহারা পক্ষপাতী, তাহাদের মধ্যে যত দিন পর্য্যন্ত না শারীরিক মিলন হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা অতিরিক্ত আকর্ষণের মধ্যে থাকে, পরে আর সে ভাব থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কারণ, শরীরমধ্যস্থ শুক্র-শোণিতই এই ভাব পরিপুষ্ট করে। ইহার ক্ষয়ে মনের প্রসার বা প্রণয় নষ্ট হইতে বাধ্য। ইহারাই প্রণয়ের মূল। ভোগের পরে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, তবুও সংযমী হইয়া প্রণয়ের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন না, কেবল অবসাদের সৃষ্টি করেন। এই পরস্পরের অতিরিক্ত মিলনের অন্যতম দৃষ্টান্ত ডাইভোর্স। উপভোগ করিতে গেলেও যে রীতিমত সংযম আবশ্যক, এ কথা কি বলিয়া দিতে হইবে?

মেরী ষ্টোপস্ এক স্থানে বলিয়াছেন, যদি নর ও নারী দাম্পত্য আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তবে যেন মধ্যে মধ্যে তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া কিছুকাল বাস করে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ক্লব প্রভৃতিতে গিয়া দিন কাটান ভাল। দম্পতির মধ্যে অমিল হইবার অন্যতম কারণ বেশী মেলামেশা। ইহার ফলে পরস্পর পরস্পরের কাছে অবজ্ঞেয় হইয়া পড়ে। পরিশেষে ঘৃণা বা বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। যে আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানজ মিলনকে শারীরিক মিলনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ মিলন বা প্রণয় নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন এই প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে যে, অবাধ মিলনে এরূপ ভাব থাকিতে পারে কি না।

লজ্জাই রমণীর ভূষণস্বরূপ। ইহা এ দেশের চলিত কথা। লজ্জার উৎপত্তি যাহাই হউক, ইহার ফল যে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার দেহ হেলা-ফেলার জিনিষ নহে। তাহার মনও তাহাই। দেহ এবং মনের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্য, পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়াস এই লজ্জা এবং উপায়ও এই লজ্জা। ইহাদের কলুষিত করিবার অধিকার নরকে জোর করিয়া আদায় করিতে হয়। ইহার জন্য নরকেই সাধারণতঃ নারীর অবনতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই লজ্জার হানি করা আইনতঃ দোষাবহ।

আবার বিবাহের পূর্ব্বে অবাধ মেলামেশার ফল এই যে, যত দিন প্রণয় থাকে, তত দিন পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। একটা অতিরঞ্জিত বিকৃতির মধ্য দিয়া পরস্পরের কাছে পরস্পর প্রকাশ পায়। সুতরাং বিবাহ যদি তাহাদের মধ্যে ঘটে, তাহা এই বিকৃতির ভিতর দিয়াই হইবে। কালে বিবাহিত জীবনে যখন এই নেশা ছুটিয়া যায়, তখন পরস্পরের কাছে পরস্পরের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের ধারণায় পরিবর্ত্তন ঘটে। ছয়টির মধ্যে পাঁচটি ক্ষেত্রে (Bourget বলেন) এইরূপে এক বৎসর বা এমন কি এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারে। ইহার ফলে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি ঘটে বা ডাইভোর্সের দ্বারা দাম্পত্য-জীবনের অবসান হয়। এই অবাধ মেলামেশার (বিবাহের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক) আর একটি ফল এই যে, ইহাতে দৈহিক সম্বন্ধ না হইলেও চিত্তবিকার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সে

ক্ষেত্রে যদি বিবাহ না হয়, অন্তের সহিত সাহচর্য্যের ফল পাপদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিবাহিত জীবনে পরের প্রতি আসক্তিও ব্যভিচার। যাহারা চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে চাহে, তাহাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, অবাধ মেলামেশা করিতে গেলে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। যদি ঠিক কথা বলিতে হয়, তবে ইহাও বলা চলে যে, গোড়ায় সম্বন্ধ স্থির করিয়া নামিলে বিপদের সম্ভাবনা কম। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে—"বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" তুলসীদাস বলেন—

কামিনীকা সঙ্গমে কুছ কাম জাগে পর জাগে।
কয়লাকি ঘরমে কুছ দাগ লাগে পর লাগে।

"লালসা এক রাক্ষসবিশেষ, তাহাকে তন্দ্রাভিভূত করিতে অসীম কষ্ট পাইতে হয়, একটি সামান্য ছুঁচ ফুটা বা একটি সামান্য আওয়াজেই তাহা জাগিয়া উঠে।" (Ross. op: act p. 126) এ জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও মানিতে বাধ্য হন যে, সভ্যতার বৃদ্ধি সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সার এডোয়ার্ড গেট আমাদের দেশের আধুনিক সভ্যতার বৃদ্ধি সম্বন্ধে বলেন,—"ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নারী-স্বাধীনতামূলক পাশ্চাত্য মতের প্রসার হওয়াতে কখন কখন অবৈধ প্রণয়ের সুবিধা সৃষ্টি করে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের আইন-কানুন, যাহা লোভ দেখাইয়া বা ভুলাইয়া বাহির করিলে নারীকে আইনতঃ দণ্ডনীয় করে না, তাহা পূর্ব্বে যে শাস্তির ভয়ে নারী সতী থাকিত, সেই ভয় কমাইয়া দিয়াছে।" (Census Report, 1911, P. 249.) ফলে অবৈধ প্রণয় এই পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গিবন বলেন,—"যদিও সভ্যতা মানুষের অনেক দুর্ব্বার রিপুকে বশ করিয়াছে, কিন্তু সতীত্ব বিষয়ের অনুকূলে যাইতে পারে নাই। নর-নারীর অবৈধ সম্বন্ধ সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে।" (Ellis, P. 150) ইহার ফল "সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্তঃ শরীরে রোগঃ। যদ্যপি লোকে মরণং শরণম্, তদপি নো মুঞ্চতি পাপাচরণম্" (শঙ্করাচার্য্য) কারণ, "যখনই আমরা কোন রিপুর দ্বারা তাড়িত হই, তখনই আমরা শরীরের অনিষ্ট করি (Patterson. Op ; act 24)।" টলষ্টয়ের উক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের হৃদয় দেখিতে পাইত, তবে মারামারি কাটাকাটি করিয়া সংসার লোপ পাইত। মনের মধ্যে আমরা এতই পাপ সর্ব্বদা করিতেছি যে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিনা সংযমে আমরা অতি সাধারণভাবেও জীবনযাপন করিতে পারি না। স্বাধীন জাতিরাও সমাজের আইন, রাজার আইন মানিয়া চলে। বিনা সংযমে আমরা এক দিনও চলিতে পারি না। আমরা এত দূর শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়াছি যে, এ সব কথা ভাবিয়া দেখি না। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা উপলব্ধি করিতেই পারি না; কারণ, ব্রহ্মচর্য্য করাই হয় না। এ আদর্শ দেশে আজ নিতান্ত বিরল। ইহার কারণ, আমাদের আধুনিক গুরুগণ এই ব্রহ্মচর্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, ইহা শরীরের অপকারক। আমরা ইংরাজী শিক্ষা, ভাব, আদর্শ সব আত্মসাৎ করিয়াছি। মন্ত্রমুগ্ধবৎ পরিচালিত হইয়াই চলিয়াছি—যতই কেন ইংরাজকে গালাগালি দিই না। আমাদের এই অবস্থা চিন্তা করিলে একটা ব্যাপার মনে পড়ে। যখন পোলাণ্ড-বিজয় হয়, তখন রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণী উহা বিভাগ করিয়া লয়েন। জার্ম্মাণের ভাগে যে অংশ পড়ে, তাহা সাইলিসিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বিসমার্ক তখন জার্ম্মাণীর হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা। পোলরা সম্প্রতি স্বাধীনতা হারাইয়া তখনও মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিধিমত চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিসমার্ক দেখিলেন যে, পোলরা যদি এরূপ থাকে, তবে ইহারা জার্ম্মাণীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে। অতএব যাহাতে তাহাদের জাতীয়তা-শক্তির হ্রাস হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। পরামর্শ করিয়া ইহা স্থির হইল যে, যে সকল স্থানে পোলরা একসঙ্গে অনেকে বাস করে, তাহাদের মাঝখানে জোর করিয়া জার্ম্মাণ প্রজার বসতি স্থাপন করা হউক এবং এই উপায়ে তাহাদের জমাট ভাব তরল করা হউক। কিন্তু ইহা সামান্য। পোলদের জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক। তাহারা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করুক। উদ্দেশ্য, কিছুকাল-মধ্যে তাহারা জার্ম্মাণদের মত ভাবিতে শিখিবে। চালচলন, আদর্শ সবই জার্ম্মাণদের মত হইবে। আমাদেরও কি ঠিক তাহাই হয় নাই? আমরা বহুকাল ধরিয়া পরাধীন, আমরা মেরুদণ্ড-বিহীন, অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছি। এই অবস্থায় বিজেতার অনুকরণ, তাহার ভাব আদর্শ আয়ত্ত করা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের যাহা কিছু বিশেষত্ব ছিল—ত্যাগ, তপস্যা, সরলতা অর্থাৎ সাদাসিদে ভাবে থাকিয়া জগৎ জুড়িয়া চিন্তার কায, ভগবানে অটুট বিশ্বাস, সব আজ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। এতই অজ্ঞাতসারে আমরা য়ুরোপীয় হইয়া পড়িয়াছি যে, পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিয়া পার্থক্য না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। চামড়াটা এবং পোষাক, সামাজিক ব্যাপারে কতক কতক বাঙ্গালী বটে। কিন্তু আদর্শ, মনের ভাব আজ য়ুরোপীয়। য়ুরোপীয়দিগের মন্দটা ছাড়িয়া যদি ভালটা লইতে পারিতাম, হয় ত কাযে লাগিত। কিন্তু হীনবীর্য্য, অধঃপতিত জাতি আমরা, ইংরাজের দোষটা পূর্ণমাত্রায় লইয়াছি, গুণ আদায় করিতে পারি নাই। বিলাস, ব্যসন, পশুভাব লইয়াছি, তাহার জাতীয়তা, সততা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, বীর্য্য এ সব পাই নাই।

এ সমস্ত অবান্তর কথা নহে। অসতীত্বের দোষ না দেখাইলে সতীত্বের গুণ আজ নবীনের কাছে প্রমাণ হইবে না। খোলাখুলি অনেক কথা এ জন্য বলিতে হইয়াছে। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, যদি আমরা বাছিয়া না লই, তবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে কিরূপে? বিগত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। ভবিষ্যৎ নবীনের হস্তে, সেই জন্যই এত কথা এত রকমে বলিতে হয়। আজ যে আদর্শে—যে ভাবে নরনারী সতীত্বকে মর্য্যাদা দিবে, হৃদয়ে স্থান দিবে, ভবিষ্যৎ সতীত্ব তাহার অংশ পাইবে। আজ সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রবল, লজ্জা বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজ তাহার মূর্ত্তির অনেক প্রভেদ। কিন্তু এই নবকলেবরে তাহার আগমন কল্যাণকর কি অকল্যাণকর, তাহা নির্ণয় কে করিবে? পূর্ব্বকালে জ্ঞানালোক, সূর্য্যের আলোকের মত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িত, এখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতেছে, এটি যে অনুকরণ-প্রিয়তার লক্ষণ নহে, তাহা কে বলিবে? [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যজ্ঞান !

জল-ধারা :—

উপর থেকে কে ফেলে জল চোখের মাথা খেয়ে।
কেমনে যাই আফিস?—গেলাম গোটাটা যে নেয়ে!

পান-দোক্তার পিচ :—

আঃ, কি কল্লি কাণী, ধারেক দেখে থা' না মাগি।
দোক্তা খেয়ে পিচ্‌ ফেলেছিস্‌—পিকদানি কি আমি?

থুথু-বৃষ্টি ঃ—

একটু কথা থামাও ভায়া, মলেম কথার চোটে।
যেমন মুখের খোসবয় আর তেমনি থুথু ছোটে॥

চায়ের বক্তৃতা ঃ—

করতে করতে চা-পান, বক্তিমেতে হতজ্ঞান।
উল্টে প'ড়ে চায়ের ভাণ্ড, পায়ের উপর লঙ্কাকাণ্ড।

মটরু-বিহার ঃ—

হাঁকিয়ে মটর দিব্যি বেটা যাচ্ছে পরিপাটী।
ছিটকে কাদা জামা কাপড় সব করে মাটী॥

নস্যির হাঁচি ঃ—

যাচ্ছো কোথা যাও না বাবু, কিয়লে আমায় বে ?
দোষ নাইকো এতে কিছু, নস্যির হাঁচি এ॥

সিগারেটে অগ্নিকাণ্ড :

পিরাণ পুড়ুক পরাণ পুড়ুক নাইক ক্ষতির লেশ ।
দেখুন ভাবের অভিব্যক্তি করছি কেমন ফেস্ ॥

নমস্কার মশাই :—

ছড়ি, ছাতি, আস্ত মাছ, আর যা-ই বা থাকুক হাতে
নমস্কারটা কত্তে হবেই তাই ঠেকিয়ে মাথে ॥

ছত্র-মহিমা :—

ওহে বাপু, বাসে উঠে কিনেছ কার মাথা ?

পপাত ধরণীতল :—

কলা খেয়ে ফেলে খোসা ফুটপাথেতে কে ?

লম্বুরামের বধূ-প্রীতি

(রঙ্গময় চিত্র)

পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে লম্বুরামের বধূ-প্রীতির পরিচয় কেহ এক দিনও পায় নাই। কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগের পর বধূর জন্য তাহার শোকসিন্ধু এমনভাবে উথলিয়া উঠিল যে, লম্বুরামকে সান্ত্বনা দেওয়া দায় হইয়া পড়িল! দাহ-শেষে বাড়ী ফিরিয়া সেই যে "লম্বুরাম" শয়নকক্ষে উপুড় হইয়া পড়িয়া সানুনাসিক ক্রন্দনের সুরতরঙ্গ উদারা হইতে তারায় তুলিয়া পাড়া প্রতিবেশীকে পর্য্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা থামিল দুই দিন দুইরাত্রি পরে।

রামবিষ্ণু সরকার ওরফে আমাদের "লম্বুরামের" প্রথমপক্ষের বিবাহ-ব্যাপারটিকে রীতিমত রোমাঞ্চকর বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। আশৈশব পিতৃ-মাতৃহীন রামবিষ্ণুর একমাত্র অভিভাবক নবীন দত্ত (ডাক-নাম "ঝন্টু-নবীন") পুত্রোপম ভাগিনেয়ের পিতৃ-পরিত্যক্ত কয়েক বিঘা জমী-জমা উদরজাত করিবার মানসে ভগিনীপতি নিধু সরকারের মৃত্যুর পর বেলপুকুরে স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাবালক রামবিষ্ণুর তরফ হইতে তাহার যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া তিনি পরম সমাদরে রামবিষ্ণুকে এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ নিজগ্রাম মেহেরপুরে নিজের ভিটাতে রাখিয়া "মানুষ" করিয়া আসিতেছেন।

ঝন্টু-নবীনের দূর-সম্পর্কীয়া এক শ্যালিকার একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। বর্দ্ধমান জেলায় এক সুদূর পল্লীগ্রামে অসহায়া বিধবা ঐ কন্যাটিকে লইয়া বাস করিতেন। বিধবার নগদ টাকা-কড়ি যৎসামান্য কিছু ছিল, তাহাতে মায়ে-ঝিয়ের একরকম স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত। ক্রমে কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে একটি সুপাত্রের অন্বেষণে বিধবা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে আপনার বলিতে তাঁহার কেহই ছিল না। খুঁজিয়া-পাতিয়া ঝন্টু-নবীনের বাড়ীতে সকন্যা এক দিন উপস্থিত হইয়া বিধবা তাঁহার দূরসম্পর্কীয় ভগিনীপতিকে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিয়া ধরিলেন, কোন উপায়ে একটি সুপাত্রে তাঁহার তরুকে এখন দান না করিলে ধর্ম্ম ও জাতি যাইবে।

তরু মেয়েটি খুব সুশ্রী না হইলেও নিতান্ত বিশ্রী নহে। সহরে একটু ডাক্তারের উপর থাকিলে বয়সকালে নিতান্ত মন্দ দেখাইবে না। পল্লীগ্রামে প্রতি বৎসর সাত মাস ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া ঈশ্বরদত্ত যেটুকু রূপ তরঙ্গিণীর ছিল, তাহাও মলিন হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য বিধবা দুই এক হাজার নগদ টাকা দিতে চাহিলেও কন্যার জন্য তেমন মনোমত সুপাত্র এত দিন জুটাইতে পারেন নাই।

তরুকে দেখিয়া রামবিষ্ণু কিন্তু মজিয়া গিয়াছিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা, তরুকে সে পত্নীরূপে লাভ করে। রামবিষ্ণুর প্রকৃত বয়স তখন প্রায় ত্রিশ,—মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইলেও সাহস করিয়া রামবিষ্ণু মামা-মামীকে এ কথা বলিতে পারিল না। চারিদিকে তরুর সুপাত্রের জন্য মামা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া এক দিন বেলা দ্বিপ্রহরে—ঝন্টু-নবীন যখন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, রামবিষ্ণু সেই সময় মামাকে নিভৃতে পাইয়া অত্যন্ত করুণসুরে বলিল, "মামা! আমার সঙ্গে হয় না?"

ঝন্টু-নবীন দাঁতন-কাঠীটি মুখ হইতে বাহির করিয়া, দুইবার উপর্য্যুপরি পিক্ ফেলিয়া হাঁ করিয়া অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাগিনেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর সঙ্গে কি হবে?"

ঘাড় হেঁট করিয়া রামবিষ্ণু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তরুর বিয়ে!"

"বলিস্ কি! তোর সঙ্গে দেবে তরুর বিয়ে! পাগল! একে তোর ঐ চেহারা—তায় আবার বয়েস হয়েছে, তার ওপোর লেখাপড়াটা-ও শিখলিনি,—হুঁঃ!"

ঝন্টু-নবীন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে নামিলেন। যবনিকার অন্তরালে মামা ও ভাগিনেয়ের মধ্যে কোন চুক্তি হইয়াছিল কি না, অথবা মামার উদারচিত্ত সহসা পরোপকারের জন্য উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই। তবে দেখা গেল যে, উল্লিখিত আলোচনার পর ঝন্টু-নবীন রামবিষ্ণুর সহিত তরুর বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।

ঝন্টু-নবীন শ্যালিকাকে পাকে-প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, রামবিষ্ণু তেমন লেখাপড়া না শিখিলেও তাহার চরিত্রটি গঙ্গাজলের মত পবিত্র—এতটুকু ভেজাল নাই। এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাহার অতি-বড় শত্রুও এ কথা বলিতে পারিবে না যে, সে সিগারেট, বিড়ি কি তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। চব্বিশ বৎসরের নব-যুবার পক্ষে ইহা কি প্রশংসার কথা নহে? তরুর মা অবাক্ বিস্ময়ে ভগিনীপতির মুখপানে চাহিয়া কথাগুলি কেবল শুনিতেন, নিজে কিছুই বলিতেন না।

তরুর মা লম্বুরামকে দেখিয়া ঘোমটা দিতেন। এক দিন ভগিনীপতির পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তিনি ভাল করিয়া রামবিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। কালীমাথা লম্বা বাঁশের মত দেহ; তাহার উপর সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে—সম্মুখের দুইটি দন্ত একবারে ছুরীর ফলার মত বাহির হইয়া রহিয়াছে! সেই দন্তপাটি বিকসিত করিয়া রামবিষ্ণু ভাবী শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর দিকে

চাহিয়া সলজ্জ হাসি হাসিতেছিল ! দিনের আলোকে রামবিষ্ণুর ঐ অপরূপ চেহারা দেখিয়া বিধবা মুখে অঞ্চল চাপিয়া দ্রুতপদে রামবিষ্ণুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন ।

* * * * *

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ! তরুর বিবাহের সমস্তই উদ্যোগ-আয়োজন হইয়াছিল। তথাপি বর আসিতেছে না কেন ? হাজার টাকা নগদ এবং ২ হাজার টাকা গহনা বাবদ, একুনে ৩ হাজার টাকায় রফা হইয়া বর্দ্ধমানের নামজাদা ডাক্তারের দুইটি পাশ-করা মধ্যম-পুত্রের সহিত তরঙ্গিণীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। ঝন্টু-নবীন কন্যাকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তরুর মা নগদ চারি হাজার টাকা ভগিনীপতির হাতে দিয়া যাহাতে শুভকর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিবাহ-কার্য্যটা ঝন্টু-নবীনের বাটীতেই সম্পন্ন হইবে, এইরূপই স্থির হইয়াছিল। হরিশ ডাক্তার নিজে মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন। পাকা-দেখার দিন বরপক্ষীয় যাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও একবাক্যে মেয়ে দেখিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ-রাত্রিতে বর আসে না,—ব্যাপার কি ?

"গায়ে-হলুদ" লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা তরুকে দেখিয়া আদৌ সন্তুষ্ট হয় নাই। অথচ ডাক্তার বাবু চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেছেন, "অপ্সরার মত বৌ ঘরে আনছি !" তরুকে দেখিয়া ঝি-চাকর লোকজন সকলেই অত্যন্ত ঘৃণাভরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—"মা গো ! এই কি পরীর মত মেয়ে গা ? পেট গ্যাঁড়্-গ্যাঁড়্ কচ্ছে, তামাটে রং, হাত-পা সরু সরু নলির মত, মাথায় কটা চুল, তাও নেই বল্লেই চলে ! ছ্যাঃ ! অমন সোনার চাঁদ ছেলে, দুটো পাশ-করা—"

মন্তব্যটা ডাক্তার-বাবুর কর্ণে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি স্বয়ং তদ্বির করিয়া জানিলেন, ঝন্টু-নবীন তাঁহার সহিত ভীষণ প্রতারণা করিয়াছে। তাহারই এক জন কৈবর্ত্ত-জাতীয় প্রজার অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যাকে তরঙ্গিণী বলিয়া "পাত্রী" দেখাইয়া বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হরিশ ডাক্তার ক'নের বাড়ীতে কোন সংবাদ না পাঠাইয়াই পুত্রের অন্য স্থানে বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন, সেই রাত্রিতেই বিবাহ।

ঝন্টু-নবীনের বিশেষ দোস দেওয়া যায় না। কেন না, নামমাত্র খরচ লইয়া তরুর মত "পাঁচ্-পাঁচি" রকমের চলনসই মেয়ে কেহই লইতে চাহে না। তরুর মা-ঠাকুরাণী ত মোটে চারি হাজার টাকা দিয়াছেন। বরকর্ত্তাকে খুব কম দিলেও চার পাঁচশ টাকার কম দেওয়াও যায় না অথবা তাহার কমে কোনও বরকর্ত্তা ঘাড়ই পাতিবে না। তাহার উপরে বিবাহ-রাত্রিতে লোকজন, অন্ততঃ বরযাত্রীগুলিকে খাওয়ানো আছে ; ববাহ, ফুলশয্যা, অধিবাস ইত্যাদি,—এ সবেরও কিছু কিছু খরচ না দিলে নিস্তার নাই। চারি হাজার টাকার ভিতর হাজার টাকাই যদি খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঝন্টু-নবীনের থাকে কি ?

লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি বর আসে না দেখিয়া কন্যা-যাত্রী, পাড়ার লোকজন, দুই পাঁচটি আত্মীয়স্বজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন,—"হরিশ ডাক্তারের সম্বন্ধে যা হয় পরে করা যাবে ! এখন বিধবার 'জাতরক্ষা' করা ত কর্ত্তব্য।"

প্রজাপতির ইচ্ছায় বিধবার 'জাতরক্ষা' করিতে, অত রাত্রিতে সুপাত্র অভাবে অগত্যা লম্বুরাম বর সাজিয়া, লাল চেলি পরিয়া, অগ্নিদগ্ধ ছিঁচকের রূপ ধারণ করিয়া যেমন অন্দরে প্রবেশ করিল, অমনই পুরবাসিনীদের জোড়া জোড়া শঙ্খধ্বনি ছাপাইয়া তরুর মাতাঠাকুরাণীর বিকট ক্রন্দনধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইল।

* * * * * *

লম্বুরামের মত পাত্রের হস্তে একমাত্র কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া নগদ চারি হাজার টাকা ঝন্টু-নবীনের গর্ভে জলাঞ্জলি দিয়া তরুর জননী এক বৎসরমধ্যেই সর্ব্বযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন। উহার মাস তিনেক পরে তরুও মাতার অনুগামিনী হইয়া "লম্বুরামের" কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

লম্বুরাম যথার্থই বধূর শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। শোক থামিল তখন, যখন মামার মুখে প্রতিশ্রুতি-বাক্য শুনিল যে, যেমনটি গিয়াছে, তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দরী আর একটি বধূর ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন।

* * * * *

ঝন্টু-নবীন কলিকাতার এক জন এটর্ণীর কেরাণী। যেমন এটর্ণী, তাঁহার কর্ম্মচারীও তদ্রূপ। এটর্ণী-প্রবরের নাম চরণদাস বসু ! বাজারে তাঁহার নাম শুনিলে সকলেই শঙ্কিত হইত। কাপ্তেন-ধরা, হ্যাণ্ডনোট কাটানো, জাল-জালিয়াতি প্রভৃতি নামজাদা উৎকৃষ্ট কার্য্যেই তাঁহার ভীষণ প্রভাব ! তিনি দুইবার মক্কেলের টাকা ভাঙ্গিয়া জেল যাইতে যাইতে কোনওরূপে নিস্তার পাইয়াছিলেন। এ হেন এটর্ণী-প্রবরের ঝন্টু-নবীন দত্ত ভিন্ন কে আর পেয়ারের কর্ম্মচারী হইবে ? এটর্ণী বাবু ঝন্টুকে কুড়ি টাকা মাহিনা দিতেন। ঝন্টুর কিন্তু সকল মাসে মাহিনা লইবার আবশ্যকও হইত না।

যাঁহারা না বলিয়া অপরের দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন, বুদ্ধির কৌশলে অপরের দ্রব্যকে আপনার করিয়া লইতে যাঁহারা পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, বোতলবাহিনীর যাঁহারা একনিষ্ঠ সেবক, রূপোপজীবিণীদিগের গৃহে যাঁহাদের তিন শত পঁয়ষট্টি দিন যাপন না করিলে চলে না, দক্ষতার সহিত যাঁহারা অন্যের নাম বেমালুম নকল করিতে দক্ষ, পৈতৃক সম্পত্তি যাঁহারা ধূলিমুষ্টির ন্যায় উড়াইয়া দিতে অভ্যস্ত, এমন উচ্চদরের মক্কেল এই এটর্ণী-প্রবরের কাছে আসিয়া অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিতেন না। সুতরাং মনিবের উপার্জ্জনের অংশে ভাগ না বসাইয়াও ঝন্টু-নবীনের উপার্জ্জন মাসিক দুই তিন শত টাকা ছিল।

ঝন্টু-নবীন আদর-যত্ন দেখাইয়া ভাগিনেয় লম্বুরামের যথা-সর্ব্বস্ব পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইদানীং মাছের মুড়া ঘন দুগ্ধের বাটির সহিত লম্বুরামের আর সাক্ষাৎ ঘটিত না। কিন্তু মৌখিক সমস্তই বজায় রাখিতে হইয়াছে। কারণ, ঝন্টু ভাবিতেন, কি জানি, যদি ভাগিনেয় অন্য কোন ঝন্টুর সঙ্গে মিশিয়া পৈতৃক বিষয় উদ্ধারের চেষ্টা করে। লম্বুরামকে নিজের বাসা হইতে বিদায় করা ঝন্টু-নবীন আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু নিজের তহবিল হইতে পয়সা খরচ

করিয়া প্রত্যহ ভাগিনেয়কে দুই বেলা [illegible] জলখাবার ত দেওয়া চলে না। অতএব লম্বুরামের একটা চাকুরীর প্রয়োজন।

অনেক সুপারিস ধরিয়া বড় বড় বাবুদের খোসামোদ করিয়া অবশেষে ঝনটু-নবীন লম্বুরামের জন্য কোনও সওদাগরী আফিসে বাইশ টাকা বেতনে এক জেটী-সরকারী চাকরীর যোগাড় করিয়া দিলেন। লম্বুরাম মহা খুসী! দেবী ভারতীর সহিত যাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সে যে জীবনে কখনও শ্বেতাঙ্গ সওদাগরের আফিসে চাকুরী পাইবে, ইহা তাহার পক্ষে "নিশার স্বপন সম" ছিল!

চাকুরীর মাহিনা আনিয়া "লম্বুরাম" মামার হাতেই দিত। মামা তাহা হইতে তাহাকে পাঁচটি টাকা হাতখরচ বাবদ দিতেন। লম্বুরাম তাহাতেই মহা সন্তুষ্ট। তাহার উপর ট্রামভাড়া, ডিঙ্গীভাড়া, নাইট ডিউটি ইত্যাদি বাবদেও প্রতি মাসে লম্বুরাম পাঁচ সাত টাকা উপরি পাইত। এই দশ পনের টাকা হাতখরচে লম্বুরামের বেশ বাবুয়ানী করা চলিত।

লম্বুরাম এখন কলিকাতা সহরে বেশ এক জন "জানটুম্যান।" কিন্তু যতই "বাবু" সাজুন আর তেড়ি কাটুন, চেহারাখানি দেখিলে রাস্তার পথিকরা খানিকক্ষণ লম্বুরামের সেই বিচিত্র দেহের দিকে চাহিয়া থাকিত। রামবিষ্ণু ওরফে "লম্বুরাম" যে দিন দেশলাই অভাবে রাস্তার ধারে গ্যাস-পোষ্ট-শিখরে অবস্থিত লণ্ঠন খুলিয়া সিগারেট ধরাইয়াছিল, সেই দিন সে পল্লীতে রীতিমত একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতে রামবিষ্ণুর নূতন নামকরণ হইয়াছিল "লম্বুরাম।"

"দুই পয়সা" রোজগার করিতেছে, বয়স এমন কিছু বেশী নহে, এখনও ত্রিশের "কোটা" পার হয় নাই, সুতরাং লম্বুরামের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের বড়ই বাসনা হইল। যে বড় বাবুটি "লম্বুরামের" চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন, ঝনটু-নবীন তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলেন, "লম্বুরাম" বেশ কায-কর্ম্ম করিতেছে। শীঘ্রই তাহার বেতনবৃদ্ধি হইবে। সুতরাং এ হেন ভাগিনেয়কে অবহেলা করিয়া হাত-ছাড়া করা ত কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। ইহার শীঘ্রই একটি বিবাহের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ঝনটু-নবীন লম্বুরামের জন্ম পুনরায় পাত্রীর অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন।

কলিকাতার সন্নিকটে বন-হুগলী গ্রামে বিধুভূষণ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। এক সময় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্টই ছিল। ভদ্রলোক শুধু সরিকদের সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে ভীষণ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিধু বাবুর পুত্রকন্যা অনেকগুলি। একে ত সংসার অচল, তাহার উপর নানা দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ এক দিন আত্মহত্যা করিয়া তিনি সংসারের সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। বিধু বাবুর সমস্ত সম্পত্তি মায় ভদ্রাসনখানিও "চোরা" এটর্ণী চরণদাস বসুর নিকটে বন্ধক ছিল। বিধু বাবুর মৃত্যুর পর দুই মাস না যাইতে যাইতে নালিশ করিয়া "ধূর্ত্ত এটর্ণী" তাঁহার বাড়ী-বাগান জমী-জমা ক্রোক করিয়া বসিলেন।

বিধু বাবুর পত্নী হরসুন্দরী বড় আশা করিয়া স্বামীর বন্ধুর কাছে সাহায্যের জন্ম আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!" তিনি বন্ধু-পত্নীকে স্পষ্টই বলিলেন, "তোমার স্বামীর কাছে আমার এত টাকা পাওনা যে, তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেও অর্দ্ধেক টাকা আমার উশুল হবে না। আর তোমাদের এই বৃহৎ গোষ্ঠীকে মাসে মাসে সাহায্য করি, এমন অবস্থাও আমার নয়। তবে, চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি অল্প-স্বল্প টাকায় তোমার মেয়েটির কোথাও বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারি।"

হরসুন্দরী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সত্য সত্যই ধনবান্ বিধু ঘোষের পত্নী হরসুন্দরী পুত্র-কন্যাদের হাত ধরিয়া পথে বসিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারের মাঝখানে ঝনটু-নবীন একটি কাণ্ড করিয়া ফেলিল। "চোরা" মনিবকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া ধরিয়া বসিল, বিধু বাবুর ঐ মেয়েটির সঙ্গে তাঁহার ভাগিনেয় রামবিষ্ণুর বিবাহ দিয়া দিতে হইবে। তিনি মনিবকে বুঝাইয়া দিলেন, এ বিবাহ না হইলে তাঁহার ভাগিনেয়রূপ রত্নটি বিবাগী হইয়া যাইবে।

মনিব ঝনটুকে বাস্তবিক স্নেহ করিতেন। তাহার উপর "লম্বুরাম" যখন শুনিল যে, মামার মনিব ইচ্ছা করিলেই একটি সুন্দরী মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইতে পারেন, তখন "লম্বুরাম" সকাল ও সন্ধ্যা এবং ছুটী পাইলেই সমস্ত দিনরাত্রি "চোরা" বাবুর কাছে গিয়া রীতিমত তাঁহার মোসায়েবী করিতে সুরু করিল। "লম্বুরাম" পয়সা হাতে পাইলেই "চোরা" বাবুর জন্ম একটা না একটা জিনিষ কিনিয়া স্বয়ং উহা লইয়া বাবুর বাড়ীতে বাবুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইত। কখনও মাছ, কখনও দধি, কখনও ভাল সন্দেশ, আমের সময় আম, বাবুর ছেলেদের জন্ম রকমারি খেলানা—লম্বুরাম মাতুল-প্রভুর মনস্তুষ্টির কোন ত্রুটি করিল না।

হরসুন্দরী নিজের বাড়ী-ঘর, জমী-জমা, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত "চোরা" এটর্ণীর গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বন-হুগলীতেই একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। অনাহারে চিরদিন কাহাকেও ভগবান্ রাখেন না। বিধু বাবুর বড় ছেলে আর মেজ ছেলে কোন উপায়ে বরাহনগরের "চটকলে" চাকরী জোগাড় করিয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিল। অল্প টাকায় এক বেলা আধবেলা না খাইয়া সংসারটা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ত আর বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলে না। হরসুন্দরী কন্যা শোভনার বিবাহের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না।

এই সুযোগে ঝনটু-নবীন এবং তস্য ভাগিনেয় "লম্বুরাম" একটি চাল চালিয়া বসিল। এক জন ঘটককে দুই টাকা ঘুষ খাওয়াইয়া হরসুন্দরীর কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইল, বৌবাজারে একটি ভাল পাত্র আছে। দেশে তাহার খুব জমীজমা বিষয়-আশয় আছে। ছেলেটি অমুক আফিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পায়। শীঘ্রই একশ টাকা হইবে। মামার কাছে থাকে। মামারও সন্তানাদি নাই। বিষয় সমস্তই ঐ ভাগিনেয়কে দানপত্র দ্বারা অর্পণ করিয়াছে। পাত্রটির বন্ধুকভাজা পণ, মেয়ের বাড়ী হইতে এক পয়সার দ্রব্যও সে গ্রহণ করিবে না।

হরসুন্দরী সম্বন্ধ শুনিয়া আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিলেন। ঘটক ঠাকুরের দুইটি হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "দাও ঘটক ঠাকুর—এই সম্বন্ধটি ঠিক ক'রে দাও—আমি চিরদিন তোমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকব।"

গম্ভীর হইয়া ঝনটুর ঘটক মহাশয় শ্রীকলাকার "টাকপড়া" মাথাটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এক উপায় আছে।

তুমি যদি মা কষ্ট ক'রে একবার চরণ বাবু টুর্ণীকে গিয়ে ধরতে পার,তা হ'লে রাজার বেটা বিষ্ণু হ'লেও ঐ পাত্রে তোমার মেয়ের বিয়ে কেউ বন্ধ করতে পারে না। পাত্রটি চরণ বাবুর কথায় ওঠেন বসেন। চরণ বাবুও পাত্রটিকে ছেলের চেয়েও ভালবাসেন।"

* * * * *

আবার বলি—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঙ্গালী সমাজে, বাঙ্গালী সংসারে, বিশেষতঃ গৃহস্থ গরীবের ঘরে এই রকম ভাবেই কন্যার বিবাহ হইতেছে, আবহমানকাল এই ভাবেই "কন্যা-বলি" চলিতেছে! বুনিয়াদী বংশজাত ধনবান্ বিধু ঘোষের শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা শোভনা আজ অর্থাভাবে রাম-বিষ্ণুর মত নিরক্ষর, কুৎসিত,-নিঃস্ব, সামান্য "জেটি-সরকারী চাকুরী-জীবী" পাত্রের গলায় মালা দিয়া নারী-জন্মটাই সার্থক করিল।

"লম্বুরামের" সহিত শোভনা গাঁটছড়া বাঁধিয়া ঝন্টু-নবীনের বৌবাজারের বাসায় কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। কাঁদিল সবাই! মা কাঁদিল, ভাইয়েরা কাঁদিল, বোনেরা কাঁদিল, পাড়া-প্রতি-বাসীরাও কাঁদিল, বিজাতীয়রাও না কাঁদিয়া পারিল না! কাঁদিল না শুধু বাঙ্গালী সমাজ! সে হাসিয়া বলিল, "কাঁদো কেন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! তোমরা কাঁদিয়া কি করিবে?"

যথার্থ ই হরসুন্দরীর কন্যার বিবাহে একটি পয়সা ব্যয় হয় নাই। ঝন্টু-নবীন বিবাহের খরচের জন্য হরসুন্দরীকে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিবাহ-রাত্রিতে আরও কিছু নগদ টাকা হরসুন্দরীর পুত্রদের হাতে গোপনে দিয়াছিলেন।

"বৌয়ের মত বৌ" পাইয়া লম্বুরামের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বড় বাবুকে বিস্তর খোসামোদ করিয়া সে সাত দিন ছুটী পাইয়াছিল, কিন্তু হায়—"টুকটুকে বৌয়ের" মুখ দেখিতে দেখিতে লম্বুরাম এমন বিভোর হইয়া পড়িল যে, সাত দিন যেন সাতটা মুহূর্ত্তে চলিয়া গেল। কিন্তু বধূর মুখখানি যে এখনও তাহার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই!

লম্বুরাম ছুটিয়া বড়বাবুর বাড়ী গেল। বড়বাবু তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হে—ব্যাপার কি? কোন বিপদ্-আপদ্ হয়েছে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! না—না—দয়া ক'রে আর—আর সাতটা দিন—" বলিয়া লম্বুরাম বড়বাবুর ঘরের চৌকাঠের বাহির হইতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বড়বাবুর ঘরের তক্তাপোষের মধ্যস্থলে অবহেলে মাথাটিকে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার পদতলে আত্ম-সমর্পণ করিল।

বড়বাবু কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ত সাত দিন ছুটী নিলে। বিয়ে চুকে গেছে,—আবার মিছিমিছি সাত দিন ছুটী কেন?"

"আজ্ঞে—বড়বাবু, আমাদের একটা কুলধর্ম্ম বংশ-পরম্পরায় চ'লে আসছে—বিয়ের পর অন্ততঃ এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ীতে জোড়ে গিয়ে থাকতে হয়!"

কি সর্ব্বনাশ! নূতন জামাই—বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতে এক সপ্তাহ অবস্থান! বড়বাবু লম্বুরামের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

লম্বুরাম "নাছোড়বান্দা" হইয়া বড়বাবুর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল, "আজ্ঞে—কি করবো হুজুর! নেহাৎ কুলধর্ম্ম!—এটা ত লঙ্ঘন করতে পারি না!"

বড়বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এ রকম কুলধর্ম্ম মাঝে মাঝে চালালে,—সাহেবদের কুলধর্ম্ম কিন্তু চাকরী রাখবে না। এটা মনে রেখো। আচ্ছা—যাও। আরও সাত দিন ছুটী দিলুম!"

ঝন্টু-নবীন "লম্বুরামকে" চুপি চুপি অন্য ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর ব্যাপার কি? তুই কি চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিবি না কি?"

লম্বুরাম বলিল, "কেন?"

"সাত দিন আফিস কামাই ক'রে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে থাকবি কি?"

লম্বুরাম বলিল, "থাকবো না? কুলধর্ম্ম দেখতে হবে না? বাঃ!"

ঝন্টু বলিলেন, কুলধর্ম্ম করবি সাত দিন সাত রাত শ্বশুরবাড়ীর ভাত মেরে!"

মামার কথা শুনিয়া লম্বুরাম ভারী চটিয়া গেল। বেশী কিছু বলিতে পারিল না বটে,—তবে একটু রূঢ়ভাবে বলিতেও ছাড়িল না—"মামার বাড়ীতে থাকি ব'লে বাপ-ঠাকুদ্দার ধর্ম্ম খোয়াব?"

ঝন্টু-নবীন দেখিলেন, ভাগিনেয় ভয়ঙ্কর চটিয়াছে। তথাপি বলিলেন, "প্রথম বিয়ের সময় এ 'টোপা'-কুলের ধর্ম্ম কোথায় ছিল, বাবা? তোমার বাপও ত আমার বোন্‌কে বিয়ে করেছিলেন,—কৈ,—এ রকম কুলধর্ম্ম তিনি ত কখনও বজায় করেন নি, তাঁর মুখে এ কুলধর্ম্মের কথাও ত কখনও শুনিনি।"

লম্বুরাম দেখিল—জেরায় ক্রমশঃ জব্দ হইয়া পড়িতেছে। একটু সুর নামাইয়া মামাকে বলিল,—"বিয়ের পরদিন শাশুড়ী ঠাকরুণ, শালা-সম্বন্ধীরা, পাড়ার লোকজন বিশেষ ক'রে বৌয়ের সঙ্গে জোড়ে যেতে আমায় ব'লে দিয়েছে—বুঝলেন না মামা! দু' পাঁচ দিন একটু হাওয়া বদ্‌লে আসি। যে রকম চাকরী করি,—আর ত শ্বশুরবাড়ীমুখো কখনও হতেই পারব না।"

ঝন্টু বুঝিলেন, ভাগিনেয় "টুকটুকে বৌ" পাইয়া একবারে পাগল হইবার উপক্রম। যাহা হউক—লম্বুরাম যখন যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে—তখন তাহাকে নিরস্ত করা বড় সহজ হইবে না।

লম্বুরামের সহিত শোভনার বেশ আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। "লম্বুরাম" যে প্রকারে শোভনার চাটুকারিতা করে, তাহাতে বনের পশু হইলেও, শোভনা তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইত।

শোভনা কিন্তু বিশেষ রকম চিন্তিতা, শঙ্কিতা, লজ্জিতা হইয়া পড়িল, যখন সে শুনিল, বিবাহের সাত দিন না যাইতে যাইতেই স্বামী তাহার সহগামী হইয়া তাহার বাপের বাড়ীতে সুদীর্ঘ সাত দিন যাপন করিবে। কিন্তু উপায় কি? লম্বুরাম বলিতেছে, ইহা তাহার কুলধর্ম্ম।

শোভনা চুপ করিয়া রহিল। লম্বুরাম আশ্বাস দিয়া পত্নীকে বুঝাইল, "কিছু ভয় নেই, নতুন বৌ! তোমার বাপের বাড়ীর অবস্থা আমি জানি। জামাই নিয়ে গেলে তোমার মা-ভাইদের এক পয়সা আমি খরচ করাবো না। আমি যখনি যাব—দস্তুর-মত সঙ্গে টাকা নিয়ে যাব।"

* * * * *

প্রত্যেক শনিবার "লম্বুরাম" শ্বশুরবাড়ীতে যাইতই; মাঝে মাঝে বুধবারও তাহার যাওয়া বাদ যায় না! মাসখানেকের মধ্যেই এক দিন লম্বুরাম একবারে সটান বন-হুগলী গিয়া উপস্থিত। শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার অসুখ শুনলুম,—কেমন আছেন—তাই একবার দেখতে এলুম।"

শাশুড়ী বলিলেন—"কে বল্লে আমার অসুখ? আমি ত বেশ আছি, বাবা!"

লম্বুরাম অম্লান-বদনে বলিল—"আপনাদেরই পাড়ার একটি ভদ্রলোক আফিসের পথে দেখা হতেই বল্লেন—ঠিক নামটি তাঁর জানি না।"

শাশুড়ী জামাতার মনোভাব বুঝিয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে বলিলেন—"তা এসেছ—এসেছ—বেশ করেছ! পেটের ছেলের সামিল তুমি! তুমি আমার অসুখ শুনে দেখতে ত আসবেই! তা বাবা—কাপড়-চোপড় ছাড়ো,—জিরোও—"

"না, আমি এখনই চ'লে যাব! বাড়ীতে ব'লে কয়ে আসিনি" —বলিয়াই লম্বুরাম যেন তখনই চলিয়া যাইবে, এই ভাব দেখাইল। শাশুড়ী বলিলেন—"তাও কি হয় বাবা? নিদেন একটু জলটল খেয়ে যাও!"

শাশুড়ীর অনুরোধ ত ঠেলিতে পারা যায় না! লম্বুরাম জামা-চাদর ছাড়িয়া শোবার ঘরে জাঁকিয়া বসিল। "জল-টল" খাওয়া হইল,—শোভনার সহিত গল্প করিতে করিতে ঘণ্টা তিন চার কাটিয়া গেল,—তথাপি "লম্বুরাম" বাড়ী যাইবার নামও করে না। শোভনা কেবল তাড়া দিয়া বলে—"অনেক রাত্রি হ'ল—বাড়ী যাও—"

"এই যাই—" বলিয়া লম্বুরাম আরও জাঁকিয়া বসিয়া ক্রমাগত "খুক্ খুক" করিয়া বিড়ি টানিতে লাগিল! রাত্রি ১২টার পর বড় সম্বন্ধী আহারের জন্য ডাকিতে আসিল। লম্বুরাম বলিল—"না না—খেতে টেতে আমি পারব না! বাড়ীর খাবার আমার নষ্ট হবে—"

দুই চার কথার পর আহার শেষ করিয়া লম্বুরাম শয়ন করিল। শনিবার রবিবার ত বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্ত, তাহা ছাড়া অন্য দিনও মাঝে মাঝে যাহা হউক একটা "ছুতো" করিয়া লম্বুরাম শ্বশুরবাড়ী যাইতে লাগিল। বাড়ী শুদ্ধ লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! অন্য কিছু অসুবিধা হউক আর নাই হউক, শুইবার ঘরের বড় বেশী রকমের অভাব। ছোট বাড়ী—

শোভনা অনেক বুঝাইয়াছে, বলিয়াছে, কাকুতি-মিনতি করিয়াছে—কিছুতেই ফল হয় নাই। শোভনা বলে, "আমাকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও।" লম্বুরাম বলে—"আরে বাপ রে, এক বছর না হ'লে কি ঘর-বসতি করতে যেতে আছে? কুলধর্ম্ম খোয়াব?"

লম্বুরামের অত্যাচারের সীমা নাই! রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর জেটীতে কায-কর্ম্ম সারিয়া লম্বুরাম সোজা শ্বশুরবাড়ী হাজির! আসিয়া প্রথমে মৃদুকণ্ঠে—পরে আরও একটু উচ্চকণ্ঠে—ক্রমে কর্কশকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—"বিজয় বাবু!" বিজয় তাহার বড় সম্বন্ধীর নাম। বিজয় এবং তাহার দুইটি ভাই বৈঠকখানার ঘরেই শয়ন করে। সকলেই বুঝিল, "লম্বুরাম" উপস্থিত! বুঝিয়া ছেলেরা কেহই সাড়া দিল না। কড়া-নাড়ার চোটে, "বিজয় বাবু—বিজয় বাবু" বলিয়া চীৎকারের ধমকে পাড়াশুদ্ধ লোক জাগিয়া উঠিল। উঠিল না বা সাড়া দিল না কেবল বিজয় বাবু বা তাহার সহোদরগণ। অগত্যা হরসুন্দরী নিজে আসিয়া জামাইকে দরজা খুলিয়া দিলেন। হরসুন্দরী বলিলেন, "এত রাত্রে কোথা থেকে, বাছা?"

লম্বুরাম বলিল, "ও-পাড়ায় নেমন্তন্নে এসেছিলুম, তা এত রাত্রিতে ত আর বাড়ী ফিরতে পাল্লুম না। একখানা ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা ট্যাক্সি দেখতে পাওয়া গেল না। তাই ভাবলুম—রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে যাই!"

বিজয় তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া রীতিমত রাগ প্রকাশ করিয়া বলিল, "যেখানে নেমন্তন্নে গিয়েছিলে, সেখানে কি একটু শোবার যায়গা দিলে না, তাই এত রাত্রিতে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোককে জালাতে এলে! হুঁ—বলে কি না, গাড়ী পেলুম না—ট্যাক্সি পেলুম না! চল দিকি আমার সঙ্গে, কখানা গাড়ী—কত ট্যাক্সি চাই তোমার?"

হরসুন্দরী ধমক দিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিয়া জামাতাকে বলিলেন, "চল বাবা, অনেক রাত্রি হয়েছে—শোবে চল! কাল সকালে ত আফিস আছে—"

লম্বুরাম বলিল, "না!—বাড়ীই যাওয়া যাক্, সম্বন্ধী ভায়ারা যখন রাগ কচ্ছেন, তখন আমার না আসাই উচিত।"

হরসুন্দরী অনেক বুঝাইয়া জামাতাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

লম্বুরামের সত্য সত্যই আজ মহাবিপদ্! সেই বেলা ৮টার সময় ভাত খাইয়া খিদিরপুরের "ডকে" কায করিতে গিয়াছিল, টিফিনের সময় পয়সা চারেকের কচুরী আর দুই কাপ চা খাইয়াছে। রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল, এখনও পেটে কিছু পড়ে নাই। বেচারা চারিদিক্ আঁধার দেখিতে লাগিল। তাহার উপর ঘরে আসিয়া দেখিল, শোভনা এক পাশে মুড়ি-সুড়ি দিয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। লম্বুরামের মুখে কথাটি সরিল না। দুই এক বার শোভনাকে ডাকিল, শোভনা সাড়া দিল না। যেমন গায়ে হাত দিয়া সোহাগ করিয়া মান ভাঙ্গাইতে যাইবে—শোভনা তৎক্ষণাৎ দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "এ রকম ক'রে যদি তুমি যখন-তখন অসময়ে আমাদের বাড়ীতে আসো, তা হ'লে তোমার সামনেই আমি গলায় দড়ি দিয়ে—নয় ত গায়ে কেরাসিন-তেল ঢেলে আগুন জালিয়ে পুড়ে মরব! তখন টের পাবে মজা!"

নূতন টুকটুকে বৌয়ের কাছে ভৎ‍র্সিত হইয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত লম্বুরাম ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! শোভনা অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। এতটা সে ভাবে নাই। তখন আবার শোভনা নিজেই স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে মিষ্ট কথায় আদরে সোহাগে ভুলাইতে পথ পায় না!

লম্বুরাম মাস কয়েক হইল অহিফেন-সেবন অভ্যাস করিয়াছে। জেটীতে কায করিতে হয়, জাহাজে যাইতে হয়; অন্যান্য সহকর্ম্মীদের উপদেশে এবং পরামর্শে লম্বুরাম অবশেষে "গাঁজাও" ধরিয়াছিল। কিন্তু গাঁজাতেও সানে না দেখিয়া কোনও

বন্ধুলোকের পরামর্শে "লম্বুরাম" সকাল-বিকাল "পায়রা-মটর-ভোর" দুইবার অহিফেন সেবন করিতে সুরু করিল। একে স্বভাবতঃই "লম্বুরাম" একটু খাম্-খেয়ালী গোছের লোক, তাহার উপর অহিফেনসেবী হওয়াতে তাহার খেয়ালের মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পাইল। অহিফেনের নেশার খেয়ালে লম্বুরাম লাজ-লজ্জা, মান-অপমান সমস্ত ভুলিয়া—সময় নাই, অসময় নাই, যখন তখন শ্বশুরবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া শোভনা স্বামীকে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে যে দিন তোমার আসিবার ইচ্ছা হইবে, তার আগে আমাকে একখানি পত্র দিও এবং একটু বেশী রাত্রি করিয়া বাড়ীতে আহারাদি সারিয়া এখানে আসিও। আমি তোমার জন্ত জাগিয়া বসিয়া থাকিব। তুমি দরজার আস্তে আস্তে কড়া নাড়িলেই আমি তোমাকে দরজা খুলিয়া দিব। আর তোমার পত্রখানা আমার ছোট বোনেদের হাত দিয়ে মায়ের কাছে দিলেই মা বুঝতে পারবে—তুমি আসবে।"

এ বন্দোবস্তে লম্বুরামও যথেষ্ট খুসী হইল। কিন্তু এভাবে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ায় লম্বুরামের বিস্তর খরচ বাড়িয়া গেল। প্রথমতঃ—প্রতি সপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিতে দুই আনা খরচ। তাহার উপর শোভনা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে—"যদি নিতান্তই মান-অপমান গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে হঠাৎ রাত্রিতে যখন শ্বশুরবাড়ীতে আসিবে, তখন বাড়ী থেকে আহারাদি শেষ করিয়া আসিও। গরীবদের অনর্থক পয়সা খরচ করাইয়া কষ্ট দিও না।" কিন্তু জেটীতে কায-কর্ম্ম সারিতে অনেক রাত্রি হইয়া যায়। তাহার পর বাড়ী গিয়া আহারাদি সারিয়া বাহির হইতেও বিলক্ষণ সময় যায়। তাহার পর এতটা পথ বৌবাজার হইতে "হাঁটাপাড়ী" দেওয়া চলে না। "বাসে" যাইতে হইবে। লম্বুরাম ভাবিল—"এত অসুবিধা ভোগ না করিয়া কোন দোকানে কিছু আহারাদি করিয়া সটান আফিস-ফেরত শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যদিও ইহাতে যথেষ্ট খরচ আছে, কিন্তু লম্বুরাম ইহাতেও রাজী। ঝন্টু-নবীন ভাগিনেয় ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী যাওয়াতে অসন্তুষ্ট নয়, বরং খুবই সন্তুষ্ট; কারণ, মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন তাহার খোরাক বাঁচিয়া যায়। কিন্তু যখন দেখিল যে, "লম্বুরাম" রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে যায়, আবার পরদিন ভোর না হইতে হইতেই বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। এক দিন ঝন্টু স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন,—"বলি হ্যাঁ রে বিষ্টে! পিত্যহ রাত্রে খেয়ে-দেয়ে কোথায় যাস্ বল্ ত?"

লম্বুরাম বিস্মিত হইয়া বলিল,—"পিত্যহ যাই? কি বল্‌ছ, মামা?"

ঝন্টু বলিলেন,—"ঐ একই কথা যে বাবা, পিত্যহ না হোক্, এক দিন দুদিন অন্তর রাতে দেখি কি না, এক পেট খেয়ে দেয়ে জামাজুতো প'রে মস্ মস্ ক'রে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছিস্!"

"মাঝে মাঝে নাইট ডিউটী কর্‌তে যেতে হয়, জাহাজে রাতে গিয়ে থাকতে হয়—জান না? নিজে না জানো ত কাউকে জিজ্ঞাসা কোরো—" বলিয়া লম্বুরাম ঝন্টু মামার সম্মুখ হইতে ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মামা ঝন্টু-নবীন। তিনিও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"জানি আমি সবই যে বাবু—খবর রাখি আমি সব! নাইট ডিউটী কি বিয়ের পর থেকে তোর এতই বেড়ে উঠলো? আগে ত মাসে এক ক্ষেপ দুক্ষেপও ছিল না! ছ্যা-ছ্যা, গুরুজনের সাম্‌নে মিছে কথা কইতে তোর একটু বাধলো না রে? নরকের ভয়ও হ'ল না?"

"মিছে কথা? মিছে কথা কি আবার?" বলিয়া লম্বুরাম উত্তেজিতভাবে মামার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ঝন্টু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "বেশ ত, শ্বশুরবাড়ীর খুব ন্যাওটো হয়ে পড়েছিস্—ভাল কথাই ত! এক দিন দুদিন অন্তর কেন, তুই রোজই যা না! কিন্তু এ কোন্‌দিশি কথা যে, বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাস্? বলি—শ্বশুরবাড়ীটা কি তোমার গিয়ে 'ইয়ের' বাড়ী? আর তারাই বা কি ভদ্রলোক? জামাইকে খেতে দেয় না?"

মামার সহিত এই রকম বচসার পর লম্বুরাম সেই দিন হইতে সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা করিল, শ্বশুরবাড়ী যাইবার রাত্রিতে বাড়ীতেও খাইবে না, শ্বশুরবাড়ীতেও খাইবে না। বাজার হইতে খাবার কিনিয়া লুকাইয়া লইয়া যাইবে, সেখানে গিয়া ঘরে খিল দিয়া বসিয়া খাইবে। অবশ্য স্ত্রীকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে।

শীতকাল। জাহাজের কায-কর্ম্ম সারিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। লম্বুরাম একটি হোটেল হইতে গণ্ডা আষ্টেক পয়সার চপ, কাটলেট এবং ময়রার দোকান হইতে আট আনার রাবড়ী-সন্দেশ গায়ের কাপড়ের ভিতর যত্নপূর্ব্বক লুকাইয়া লইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার সময় আফিংএর নেশায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে শ্বশুরবাড়ীর দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত। বন্দোবস্তমত সন্তর্পণে সদর দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। কড়া নাড়িবার পূর্ব্বে মনে মনে বিচার করিয়া লইল—যদি শোভনার পরিবর্ত্তে শাশুড়ী বা সম্বন্ধী দরজা খুলিতে আসে, তাহা হইলে ত খাবারের ঠোঙ্গা দেখিতে পাইবে! সে বড় লজ্জার কথা, জামাইকে নিজের বাড়ীতেও খাইতে দেয় না—শ্বশুরবাড়ীতেও আহার জোটে না। লম্বুরাম বুদ্ধি করিয়া সম্মুখের ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থ গাঁদাগাছের ঝোপের তলদেশে খাবারের ঠোঙ্গা ও রাবড়ীর ভাঁড় রাখিয়া দিল। অবস্থা বুঝিয়া পরে লইলেই চলিবে!

সকালবেলা পত্র পাইয়া শোভনা পাপের ভোগ ভুগিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনিবামাত্রই অতি সন্তর্পণে আসিয়া সে সদর দরজার খিল খুলিয়া দিল।

"এই যে তুমিই দরজা খুলেছ—ব্যস্" বলিয়া লম্বুরাম ফিরিয়া গিয়া আফিংএর ঝোঁকে বাগানের চারিদিকে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শোভনা দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীকে বাগানের চতুর্দ্দিকে ঘুরপাক খাইতে দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতেই পারিল না। গলা ছাড়িয়া ডাকিবার উপায় নাই,—পাশের বৈঠকখানায় ভ্রাতা শুইয়া আছে। খাবারের ঠোঙ্গা, রাবড়ীর ভাঁড় কোথায় রাখিয়াছে, লম্বুরাম খুঁজিয়া পাইতেছে না। অগত্যা শোভনা অন্ধকারে

স্বামীর কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইবামাত্রই লম্বুরাম অত্যুচ্চকণ্ঠে আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে পেয়েছি। চল।"

শোভনা বুঝিল, বুদ্ধিমান্ স্বামী খাবার আনিয়া বাগানের ভিতর রাখিয়াছিল, অহিফেনের খেয়ালে এতক্ষণ খুঁজিয়া পায় নাই।

ক্ষুধার্ত্ত লম্বুরাম ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় রাখিয়া জামা খুলিয়া পত্নীকে বলিল—"বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু মনে কোরো না, একটু জল গড়াও—তাড়াতাড়ি খাবারটা খেয়ে নেই"—বলিয়া ঠোঙ্গা এবং রাবড়ীর ভাঁড় লইয়া শয্যায় বসিয়া খাইবার উপক্রম করিল। শোভনা জলের গেলাস হাতে লইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—ক্ষুধার্ত্ত লম্বুরাম বিষণ্ণ-মুখে খাবারের ঠোঙ্গা আর রাবড়ীর ভাঁড় লইয়া বসিয়া আছে। মুখে তাহার কথাটি নাই।

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া শোভনা ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

"নেই!" বলিয়া কাতর নেত্রে লম্বুরাম ঠোঙ্গা ও ভাঁড় হাতে লইয়া শোভনার দিকে চাহিয়া রহিল।

"খাবার নেই না কি?"

"কিছু না। ফাঁকতালে গরম গরম চপ-কাটলেট পেয়ে শালার শেয়ালে সব মেরে দিয়েছে।"—ক্ষুধার্ত্ত লম্বুরাম অহিফেনের ঝোঁকে সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

কোমলপ্রাণা শোভনা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! কেন তুমি খাবারগুলো ফাঁকা নোংরা যায়গায় বাগানের ধুলা-কাদায় আল্‌গা ফেলে রাখলে বল দিকি? এমন দুর্ব্বুদ্ধি তোমার?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লম্বুরাম বলিল—"শ্বশুরবাড়ীতে খাবারের ঠোঙ্গা হাতে ক'রে ঢুকবো,—নতুন জামাই! কেউ দেখলে ভারি লজ্জা পাব যে!"

শোভনা রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—"নতুন জামাই রোজ রোজ ছুট ছুট ক'রে শ্বশুরবাড়ীতে আসতে লজ্জা হয় না? চুলোয় যাক্ সে কথা, এখন খাবে কি এত রাতে?"

"তাই ত ভাবছি—খাই কি এত রাতে? নগদ এক টাকা খরচ ক'রে খাবার আন্‌লুম! ছ্যাঃ—তোমাদের বন-জঙ্গলীতে এমন অধর্ম্মে সব শ্যাল-কুকুর? শালাদের একটু বিবেচনা হ'ল না? একেবারে কিছু খাবার রাখে নি?"

স্বামীর কথা শুনিয়া শোভনা হাসিবে কি কাঁদিবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

লম্বুরাম অহিফেনের ঝোঁকে বলিতে লাগিল, "এই শীতকালের রাত্রি! কোন্ সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি! উঃ—এমন ক্ষিদে পেয়েছে, ঘরে তোমাদের কিছু খাবার নেই? নিদেন ভাত-ডাল, দুখানা শুকনো রুটী—"

শোভনা বলিল—"এক কাষ করো দিকি,—আমি ছোঁবো না—ঐ গামছাখানা প'রে আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস দিকি! কতকগুলো মাছ ভাজা আছে। আজ রাতে মাসীমার বাড়ী থেকে এসেছে, কালকের জন্যে মা ভেজে রেখেছে দেখেছি! খুব ভাল ভেটকী মাছ!"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি গামছা পরিতে পরিতে লম্বুরাম বলিল—"ভেটকী মাছ ভাজা! তোফা জিনিষ! দুটি ভাত যদি হাঁড়ীতে থাকে দেখি গে চল! আর হ্যাঁ গা, একটু দুধ—"

প্রদীপ হাতে লইয়া, কোন কথা না বলিয়া, শোভনা অতি সন্তর্পণে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া স্বামীকে বলিল—"দেখো, যেন হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙ্গো না! ঐ কোণের দিকে কুলুঙ্গীতে বড় মাটীর হাঁড়ীটা—"

ভিজে গামছা পরিয়া অনাবৃতগাত্রে শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষুধার্ত্ত লম্বুরাম অহিফেনের নেশায় চোখে যেন কিছুই দেখিতে পাইল না। "কৈ কৈ" বলিয়া চারিদিক্ হাতড়াইতে হাতড়াইতে "পেতেনের" উপর হইতে অন্যান্য হাঁড়ি-কুড়ি হুড়মুড় করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া একটা বিশ্রী কাণ্ড করিয়া বসিল।

শব্দ শুনিয়া সম্বন্ধীরা সব "কে—রে কে—রে" বলিয়া জাগিয়া উঠিতেই শোভনা লজ্জায়, ভয়ে আলোটা ভূতলে ফেলিয়া শয়নঘরের ভিতর পলাইয়া গেল। লম্বুরাম সম্বন্ধীদের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি যেমন পত্নীর অনুসরণ করিতে যাইবে, অমনই বিকট অন্ধকারে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া রান্নাঘরের ভিতরই "বাপ রে" বলিয়া শুইয়া পড়িল।

সম্বন্ধীরা "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাড়ার লোকজন ডাকিয়া, আলো লাঠি-সোঁটা লইয়া রান্নাঘরের ভিতর আসিয়া দেখিল, গুণধর নূতন জামাতা গামছা পরিধানে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় "দেহ-বংশ" রান্নাঘরের মেঝের উপরে রক্ষা করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন।

* * * *

জামাতার অত্যাচারে হরসুন্দরী জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? "মেয়ে-জামাই" ত ত্যাগ করিবার নহে। অভাগী পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "যত দূর বুঝছি, রামবিষ্ণু এখানে "ঘরজামাই" হয়েই থাকবে। যা অদৃষ্টে ছিল, তা হয়েছে! ভগবান্ যখন সকল দিকেই মেরেছেন, তাঁর দেওয়া, সকল দুঃখ—সকল কষ্ট যখন সইতেই হচ্ছে এবং আরও হবে, তখন মুখ বুজে এটাও স'য়ে যাও। মা'র পেটের বোন্ শোভনা, তার মুখ চেয়ে রামবিষ্ণুকে কিছু বলো না।"

হরসুন্দরীর ছেলেগুলি অসৎ নহে। দুরদৃষ্ট দুঃসময় বুঝিয়া মাতার উপদেশমত লম্বুরামের অত্যাচার তাহারাও নীরবে সহিতে লাগিল। শোভনা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৎসর ত ঘুরতে যায়, আমাকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে কবে?"

মানুষ অহিফেনসেবী হইলেই মুখে খুব "লম্বা-চওড়া" কথা কহিয়া থাকে, উপরন্তু মেজাজও তাহার খুব রুক্ষ হয়। স্ত্রীর কথায় লম্বুরাম ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল, "নিয়ে যাব না ত কি চিরদিন নিজের স্ত্রীকে পরের বাড়ী ফেলে রাখব? এই বোশেখ মাস পড়তেই নিয়ে যাব। তোমাকে এখানে রেখে আমার কি রকম ক্ষতি হচ্ছে, তা জানো? রোজ রোজ কত পয়সা খরচ হচ্ছে, তার হিসেব রাখো?"

শোভনা বলিল, "আমিও ত তাই বলছি, পুরুষমানুষ, রোজগারপাতি করছ, দেশভুঁই আছে, কলকেতায় বাসা আছে, স্ত্রীকে চিরদিন বাপের বাড়ীতে রাখলে তোমারই ত বদনাম!"

লখুরাম বলিল, "বাসা একটা ঠিক কর্‌বার জন্ত ত উঠে প'ড়ে লেগেছি,—তেমন মনের মত বাড়ী পাচ্ছি না যে—"

শোভনা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? বৌবাজারে তোমার মামার বাসায় ?"

লখুরাম স্বভাবতঃ ঈশ্বরদত্ত বিকৃত মুখখানা আরও বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "খ্যাংরা মারি মামাবাড়ীর কপালে ! ব্যাটারা সব চোর-জোচ্চোর ! আমার সর্ব্বস্ব গ্যাঁড়া ক'রে ফাঁক ক'রে দিয়েছে ! করেছে কি জানো ?"

শোভনা ভয়ে ভয়ে বলিল, "কি করেছেন তাঁরা ?"

লখুরাম খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমায় বলে কি না, বৌ এনে এ বাড়ীতে রাখবে কোথায় ?"

"সে কি ?" বলিয়া শোভনা যেন আকাশ হইতে পড়িল !

"আর সে কি ? আমি বরাবরই জানি, মামাবেটা মহাচোর ! বাসায় আমি যে ঘরটায় শুতুম, সেটাকে ভাড়া দিয়েছে !"

"তা হ'লে তুমি থাকো কোথায় ?"

"আমি রাত্তিরটা হ'য়ে স্যাক্‌রার দোকানে এক পাশে শুয়ে থাকি ! সেখানে মুহুর্ম্মুহুঃ তামাকটা মিনি পয়সায় পাওয়া যায় ! স্যাক্‌রা আমায় খাতির করে খুব !" বলিয়া লখুরাম যেন একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। শোভনা বুঝিল, অবস্থা চরমে দাঁড়াইয়াছে ! অভাগিনীর মুখে কথা সরিল না। ঘাড় হেঁট করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

"কোন চিন্তে নেই ! বড়বাবু বলেছে, এবার পাঁচ টাকা নিয্যস্ মাইনে বাড়বে। তা হ'লে হবে পুরোপুরি পঁয়ত্রিশ টাকা ! দশ টাকায় তোফা একটা একতলার পাকাঘর ভাড়া ক'রে ফেল্‌বো ! তা হ'লে বাকী থাকে পঁচিশ টাকা আর "পেটীর" দরুণ পাই ৮ টাকা, এই হোলো ৩৩ টাকা ! আমার নিজের খরচের ভিতর ত রোজ চার আনার আফিং—আর চার আনার দুধ ! ব্যস্—বাকীটা নিয়ে তুমি মজাসে সংসার চালাও ! দু'জনের রাজার হালে সংসার চ'লে যাবে, কি বল ?"

শোভনার চক্ষু বহিয়া বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। অহিফেনের ঝোঁকে লখুরাম কিছুই দেখিল না বা বুঝিল না !

শোভনা আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ভগ্নস্বরে স্বামীকে বলিল, "এক কায কর, আমাকে বেলপুকুরে তোমার দেশের বাড়ীতে রেখে এসো। শনিবার শনিবার তুমি যাবে। এখানে সস্তায় একটা মেসের ঘর ভাড়া নিয়ে তুমি থাকো। দেশে নিজের বাড়ীতে আমায় রাখলে অল্প খরচে তোমার সংসার চল্‌বে !"

বিড়ি টানিতে টানিতে চক্ষু মুদিয়া ঈষৎ হাসিয়া লখুরাম বলিল, "হুঁ, বলে—দেশের বাড়ী ? জোচ্চোর মামার কৃপায় সে সব কি আর কিছু আছে না কি ?"

"বল কি ? দেশেরও সব খুইয়েছ ?" বলিয়া শোভনা কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া উঠিল।

"আরে, কাঁদছ কেন ? দেখ না, মামা বেটার নামে কি রকম মামলা জুড়ে দিই। নগদ হাজার দেড়েক টাকা দিয়ে—বেটা জুচ্চোরী ক'রে আমার যথাসর্ব্বস্ব লিখিয়ে নিয়েছে,—মনে করেছে, আমি কি অম্নে ছাড়বো ? হাইকোর্ট—হাইকোর্ট কর্‌ব ! বেটাকে জেলে দেবো ! শুধু কি বিষয়-আশয় নিয়েছে গা ? নগদ টাকাগুলো বেটার কাছে জমা রেখেছিলাম। কতকগুলো বাজে হিসেব দেখিয়ে তা শুদ্ধ ঝন্টু বেটা গাপ করেছে ! বলে 'তোর দু'দুবার বিয়েতে আমার গাঁট থেকে পয়সা খরচ হয়েছে' !"

শোভনা কেবলই কাঁদে, কোনও কথা কহে না।

"তবুও মা, আমার সেই আগেকার শাশুড়ীর চার-চার হাজার টাকা বেটা নিজে গেঁড়া ক'রে মাগীকে দিলে আমার কাছে লেলিয়ে। আমি বলি, ভাল রে ভাল, আমি টাকা পাব কোথায় ? বেটা বেমালুম সে চার হাজার টাকা গাপ্ করলে, আবার আমার বিয়ের বাবদে আমার টাকারও সব হজম করলে ! এমন চোর দেখেছ কখনও ?"

কোন রকমে আত্মসম্বরণ করিয়া শোভনা বলিল, "তোমাকে ত চরণদাস কাকা খুব ভালবাসেন শুনেছি। এ সব কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল না।"

হো হো করিয়া উচ্চহাস্যের রোল তুলিয়া লখুরাম বলিল, "আরে, সেই চোরা এটর্ণী শালার কথা বলছ ? সে শালা আমার ঝন্টু মামার বাবা ! মামার সঙ্গে যোগসাজস্ করেই ত সেই বেটা আমাকে পথে বসালে ! হুঁঃ, বলে 'চোরা টুর্ণী আমায় ভালবাসে !' বাসবে না কেন, রোজ রোজ বেটাকে সওগাৎ ঝাড়তে পারি, তা হ'লে বেটা মুখে খুব ভালবাসা দেখাতে পারে ! বেটা হ'ল নামজাদা 'চোরা !' টাকা রোজগার কর্‌বার জন্তে দরকার হ'লে ও বেটা নিজের মাগ-ছেলেকে কাটতে পারে ! ও এমন জাত। বলি, তোমাদের হালটা কে এমন করেছে, জান না ?"

শোভনা খুবই জানিত। সেই "চোরা" এটর্ণী শুধু তাহার বাপ-মা'র সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লখুরামের মত স্বামী জুটাইয়া দিয়া অভাগিনী শোভনারও ইহকাল পরকাল খাইয়াছেন।

লখুরামের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত শোভনার মুখে শুনিয়া হর-সুন্দরী বলিলেন, "ভদ্রলোকের ছেলে, স্যাক্‌রার দোকানে শুয়ে আর হোটেলে খেয়ে ক'দিন বাঁচবে বাবা ? তুমি আর বিজয় কি ভিন্ন ? থাক, আমার কাছে থাক ! যে ক'টা দিন আমি আছি—তোমার কষ্ট ত দেখতে শুন্‌তে পার্‌ব না ! আমার যতটুকু ক্ষমতা, তোমাকে সেইমত দেখব শুনব !"

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ! লখুরাম ঘরজামাই হইয়া শ্বশুরালয়ে জাঁকিয়া বসিলেন। সকল ঝঞ্ঝাট চুকিল !

ত্রিশ টাকা মাহিনা লখুরামের। অহিফেন, দুগ্ধ, মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন আহার, বাস ভাড়া ইত্যাদিতে তাহার নিজেরই কুড়ি টাকার উপর খরচ পড়িতে লাগিল। শোভনা কোনও মাসে দশ টাকার বেশী সংসার-খরচের জন্ত মা'কে দিয়া সাহায্য করিতে পারে না। দুধের মাত্রা না বাড়াইলে লখুরামের ত আর চলে না। বন্ধুবান্ধব সকলেই বলে, "একটা গরু তোমাকে পুষতেই হইবে।" কিন্তু ছয় মাস গেল—মনের মত গরু আর লখুরাম খুঁজিয়া পাইল না।

শ্রাবণ মাস। তিন চারি দিন অনবরত খুবই বৃষ্টি হইতেছে। খিদিরপুর ডক্ হইতে রাত্রি ৯টার সময় লখুরাম ফিরিয়া আসিতে ছিল। সে দিন মাস্কাবার—লখুরাম মাহিনা পাইয়াছে

রোডে একটা গাড়ী-বারান্দার তলায় দাঁড়াইয়া লম্বুরাম ভাবিতেছে—"বৃষ্টিতে একখানা রিক্সা কিম্বা গাড়ী ভাড়া না করিলে ত আর চলা যায় না! ট্রাম বাস ত বন্ধ দেখছি!" গাড়ী যদিও বা একখানা মিলিল, সে ভাড়া হাঁকিল "তিন রুপেয়া!"

তাই ত—তিন টাকা ছ'সের খাঁটি দুধের দাম, একটু আরামের জন্য ছ'সের খাঁটি দুধ নষ্ট করিবে? লম্বুরাম রাজী হইতে পারিল না! বৃষ্টিটা একটু ধরিলেই এইটুকু পথ (বন-হুগলী পর্য্যন্ত) চক্ষু বুজিয়া "মারিয়া দেওয়া যাইবে!"

সেই গাড়ী-বারান্দার তলায় একটি মুসলমান লম্বুরামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। লম্বুরাম দেখিল, মুসলমান একটি দড়িতে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া এক হৃষ্টপুষ্ট কালো গরু লইয়া আসিয়াছে। একখানি ছেঁড়া চটে গরুর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা—কেবল মাথাটি বাহির হইয়া আছে। নেশার ঝোঁকে লম্বুরাম ভাবিতে লাগিল—"এমন চমৎকার গরু—তাহার উপর রংটি কালো! অন্ততঃ এ গরুটি পাঁচ ছয় সের দুধ নিশ্চয়ই দেয়, আর কালো গরুর দুধ,—আহা, যেন অমৃত!"

লম্বুরাম মুসলমানকে বলিল,—"কেৎনা করকে এ গরু রোজ দুধ দেতা, মিয়া?"

মুসলমান দাড়ি নাড়িয়া বাবুর কাছে ঘেঁসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সাত সের আট সের দুধ দেতা, বাবু!"

"সা—ত সের আ—ট সের! বল কি মিয়া? এমন গরু ত কভি দেখা নেই! ভারি চমৎকার গরু হ্যায় ত তোমারা! তোম কি দুধের কারবার কর্‌তা হ্যায়?"

মুসলমান বলিল—"হামারা গরু কিননে-বেচনেকো কারবার হ্যায়! হাম দুধ নেহি বেচতা!"

"এ গরু তোম্ বিক্রী করেগা?" বলিয়া লম্বুরাম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত চক্ষু চাহিল।

"হ্যাঁ। জরুর। এহি ত আমরা কাম্ হ্যায়। তোম্ লেও গে?"

"আলবৎ লেগা। দরমে যদি সুবিধা হয়, তা হ'লে এই দণ্ডেই লেগা। হামারা একঠো গরুকা বড্ড দরকার হুয়া। বুঝলে মিয়া—" বলিয়া লম্বুরাম গরুর মাথায় এবং চট-ঢাকা গাত্রে আদরে হাত বুলাইতে লাগিল।

"আচ্ছা, লে লেও! সুবিস্তামে দেগা।" বলিয়া গরুর দড়িগাছটি মুসলমান সওদাগরপ্রবর লম্বুরামের হাতে দিল।

দড়ি লইয়া লম্বুরাম বলিল, "কেৎনা দিতে হোগা—আগাড়ী বোলো! নইলে শুধু শুধু দড়ি লেকে কি নিজের গলায় বাঁধে গা!

মুসলমান বাবুর রসিকতায় অত্যন্ত "খোস" হইয়া বলিল,—"আপ ভদ্দর আদ্‌মী! আপকো খোস্ করনে লিয়ে উস্‌কো হাম খুব সস্তামে ছোড়েগা! দশঠো আজ হামারা চালান্ আয়া থা নয়ঠো বিক্ গিয়া—এইঠো এক সাহেবকো বাস্তে হম্ লে চল্‌তা!"

"আরে জল্‌দি—জল্‌দি দাম বোলো না! এ-দিকে বৃষ্টি থোড়া ধরকে আতা! হাম্ বহুৎ দূর যায়েগা!"

মুসলমান কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "বিশ রুপেয়া—"

"তব্ নেহি হোগা—এই লেও তোমারা দড়ি!" বলিয়া লম্বুরাম দড়ি ফিরাইয়া দিতে গেল।

"তোম্ কেৎনা দেগা বোলো, বাবু! হামার ত দর বোল দিয়া, তোমারা দর বোলো!"

"হামারা অত দরকা গরু দরকার নেহি হ্যায়—হাম্—হাম্ আট টাকা দিতে পারতা হ্যায়!" বলিয়া লম্বুরাম মুসলমানের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আচ্ছা—আউর দোঠো, দোঠো রুপেয়া—বাস্"—তাড়াতাড়ি মুসলমান কথাগুলি বাবুকে বলিয়া ফেলিল।

"আর এক পয়সা বাস্তি নেহি দেগা! ইচ্ছে হয় দেও, না ইচ্ছে হয়, নেহি দেও!" বলিয়া আবার দড়িগাছটি মুসলমানকে ফিরাইয়া দিতে হাত বাড়াইল।

"আচ্ছা লেও! ভদ্দর আদ্‌মি!—হাম্ এইসা গৌ—কাল বিশঠো ফিন্ বেচকে নাফা করেঙ্গা!" ভিতরের জামা হইতে আটটি টাকা বাহির করিয়া লম্বুরাম মুসলমানের হাতে দিতেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জলে ভিজিতে ভিজিতে গরু তাড়াইতে তাড়াইতে শ্বশুরবাড়ী বন-হুগলী আসিতে লম্বুরামের রাত্রি ৩টা হইল। অন্ধকারে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবার পথে গরুকে রাখিয়া লম্বুরাম শাশুড়ীকে, স্ত্রীকে, সম্বন্ধীদিগকে ডাকিয়া বলিল—"এত দিন পরে ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন। আট সেরি দুধওলা গরু—পঞ্চাশ টাকায় এনেছি! উঃ—দিতে কি চায়? জোর-জবরদস্তি করেই আন্‌লুম। তাইতেই ত এত রাত্তির হ'ল!" পরে সম্বন্ধীদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"এত রাত্রে খোল্ ভুষি ত পাওয়া যাবে না! চট্ ক'রে চারটি ঘাস এনে গরুকে খাওয়াও দিকি, ভায়ারা!"

সম্বন্ধীরা ঘাস কাটিতে ছুটিল। ক্লান্ত হইয়া শয্যায় আড় হইয়া পড়িয়া লম্বুরাম স্ত্রীকে আদেশ করিল—"যাও দিকি, চট্ ক'রে একটু দুধ দুয়ে গরম ক'রে নিয়ে এস দিকি! এত রাতে অন্ন কিছু মুখে রুচ্‌বে না!"

স্বামীর আদেশ পালন করিতে শোভনা ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া মাকে বলিল—"চল না মা, গরুটাকে একটু ধরবে—আমি এক ঘটি দুধ দুয়ে আনি।"

মা বলিলেন—"দুধ দুইতে কি তুই জানিস্ মা? তার চেয়ে বরং পাশের বাড়ী থেকে বামুনদের বিন্নু চাকরকে ডেকে আনি।"

শয্যায় আড় হইয়া পড়িয়া লম্বুরাম বিড়ি টানিতে টানিতে আফিংএর নেশায় খেয়াল দেখিতে লাগিল—"সের আড়াই দুধ নিজে খাইবে, দেড় সের খাইবে শোভনা, বাকী ৩৪ সের শ্বশুরবাড়ীর গুষ্টীরা খাক্! কোন দিন ঘরে ছানা তৈরি হ'ল, কোন দিন মাখন—কোন দিন ঘি—"

হি—হি—হি—হা—হা—হা! বাহিরে একটা বিকট অট্টহাসির রোল উঠিতেই লম্বুরামের কল্পনা-স্রোতে বাধা পড়িল!

হাসিতে হাসিতে সম্বন্ধী বিজয় ঘরে আসিয়া ডাকিল—"ও জামাই বাবু!"

চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া লম্বুরাম বলিল—"কি—কি—ব্যাপার কি?"

"বাঁট কৈ? হা—হা—হা!"

"কিসের বাঁট?"

"গরুর বাঁট! হা—হা—হা!"

"এঁ্যা বাঁট নেই ? সে কি কথা ! গরুর বাঁট নেই ! এ ত হ'তেই পারে না !"

অন্যান্য সম্বন্ধী আসিয়া বলিল—"আরে, কোথা থেকে একটা গাড়ী-টানা বলদ কিনে নিয়ে এলে ? বলদের কি বাঁট থাকে ? হা—হা—হা—"

"অমন সুন্দর আটসেরি দুধের গাই আনলুম, তার বাঁট নেই, এ হতেই পারে না।"

মহা খাপ্পা হইয়া লম্বুরাম চীৎকার করিতে করিতে গরু দেখিতে চলিল। সকলে হাসিতে হাসিতে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে করিতে লম্বুরামের পশ্চাদগামী হইল। ইতিমধ্যে সকাল হইয়া গিয়াছিল। গোলমাল শুনিয়া দুই চারি জন প্রতিবেশীও বহির্ব্বাটীতে জমা হইয়াছেন। "বাঁট নেই—বাঁট নেই ! এ কি সম্ভব—" বলিতে বলিতে সম্বন্ধিপরিবৃত লম্বুরাম গরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল !

শাশুড়ী বলিলেন—"হাবা ছেলে ! একটু দেখে নিলে না ! টাকাগুলো চোরের গর্ভে দিয়ে এলে।"

লম্বুরাম অন্য কথায় কাণই দেয় না কেবল আপন মনে বলে "বাঁট নেই ? কি রকমটা হোলো, এমন গরু কিনে আনলুম—বাঁট নেই ?"

লম্বুরামের কথা শুনিয়া, রকম-সকম দেখিয়া সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ! লজ্জায় হরসুন্দরী তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

উপুড় হইয়া বসিয়া বসিয়া লম্বুরাম গরুর তলপেটের নীচে মাথা লইয়া উপর দিকে চাহিয়া হাত দিয়া বাঁট আছে কি না অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া শেষে অত্যন্ত হতাশভাবে বলিল—"তাই ত—এ ত দেখছি—সত্যিই বাঁট নেই ! কিন্তু সত্যি বলছি—কেনবার সময় দেখেছি—দিব্যি পুরুষ্ট বাঁট ছিল—"

আবার সকলে "হা-হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল। লম্বুরাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোন কথা না বলিয়া যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়নকক্ষ অভিমুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, অমনই পশ্চাদ্দিকে কচ্ছদেশে ভীষণ জোরে টান পড়িতেই বেচারা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, "শ্যালকগণ গরুর দড়িটা তাহার অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাহার কচ্ছের সহিত মজবুৎ করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে—আর সেই 'আটসেরি' দুগ্ধবান্ বলদটি বাটীর বাহিরে গিয়া সদর-দরজার দিকে ফিরিয়া মাথা নীচু করিয়া পাছু হটিতে হটিতে দড়িসহ বদ্ধ লম্বুরামকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিমা

সে এক রূপের স্বপ্ন ভূপচিত্তহারী,
মঞ্জুমাধবিকামালা মধুপমোদিত,
তরুগুল্মে পরিব্যাপ্ত, পাষাণে ক্ষোদিত
প্রেম-বেদনায় মূর্ত্তি কে কিশোরী নারী ?

দেখিয়াছে সে প্রতিমা কবি ও অকবি
দিয়ে গেছে পুষ্প-গুচ্ছ কত নাগরিক
মুগ্ধ আঁখি চেয়ে গেছে সৌন্দর্য্য-প্রেমিক
তবু স্থির অবিচল সে ব্যথার ছবি।

কোন গূঢ় অতীতের একটি বেদনা
শিল্পী ফুটায়েছে শুভ্র শোভন পাষাণে
একটি করুণ ব্যথা ধরিয়াছে ধ্যানে
অচল কুহক মন্ত্রে একটি বেদনা।

ভাবমুগ্ধ প্রাণে কত জেগেছে কামনা
দুখে যে সুন্দর, সুখে কিবা পদ্মাননা !

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুন্দরবনে শিকার

"পাতা দেওয়া।"—হরিণ শিকারের এই কৌশলও বিশেষ সুবিধাজনক। তবে এই উপায়ে হরিণ শিকার করিতে হইলে, ফাল্গুন চৈত্র মাসেই বিশেষ সুবিধা। শিকারিগণ অনেক সময় বসন্তকালে এইরূপ ভাবে হরিণ শিকার করিয়া থাকে। অন্য সময় এই কৌশল অবলম্বনে যে মৃগয়া করা যায় না, তাহা নহে। তবে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহাতে সুবিধা বেশী; কারণ, এ সময় বৃক্ষ-সকল নূতন পল্লবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই কচি কিশলয়গুলি হরিণের পক্ষে অত্যন্ত লোভ-নীয়। এ সময়ে ঝড় হয় না বলিয়া ডাল-পাতা স্থানচ্যুত হয় না। তাহার উপর সূর্য্যের তেজ প্রবল হওয়ায় পত্রগুলি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই কারণে ফাল্গুন চৈত্র মাসে 'পাতা দেওয়া' কৌশল সহকারে হরিণ শিকার করি-বার সুবিধা অধিক। আর একটি সুবিধা এই যে, এই সময় সাধারণত: বৃক্ষে ফল ধরে না। বৃক্ষে ফল থাকিলে অনেক সময় হরিণের দল ফলের লোভে সেই ফল-ভারাবনত বৃক্ষমূলে ভ্রমণ করিতে থাকে।

হরিণ শিকার করি-বার জন্য "পাতা দেওয়া" কৌশল অবলম্বন করিতে হইলে, প্রথমতঃ জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিষ্কার স্থান মনোনীত করিয়া লইতে হইবে। অবশ্য উহা হরিণ চলিবার পথের নিকটেই হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জঙ্গলের মধ্যে হরিণ চরিবার নির্দ্দিষ্ট রাস্তা আছে। উল্লিখিত স্থান-নির্ব্বাচন সেইরূপ পথের নিকটে হওয়া চাই। আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শিকারীর সেই স্থানে গমন করিবার সুবিধা আছে কি না। কারণ, 'নালিছুলা' প্রণালীতে শিকার করিবার সময় শিকারীকে খালের মধ্য দিয়া যেরূপ প্রণালীতে অগ্রসর হইতে হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যবস্থা। নচেৎ ডাঙ্গার উপর এরূপ স্থান দিয়া দিয়া যাইতে হইবে যে, সম্মুখে কোনরূপ ঝোপ কিম্বা ছোট জঙ্গল না পড়ে। কারণ, তাহা হইলে ঝোপের উপর পায়ের শব্দ নিশ্চয়ই হইবে, তাহার ফলে হরিণ পলায়ন করিবে। আর একটা কথা, সম্মুখে ঝোপ-জঙ্গল বর্ত্তমান থাকিলে, দূর হইতে হরিণ দৃষ্টিগোচর হইবে না।

স্থান-নির্দ্দেশের উপর এইরূপ প্রণা-লীতে শিকারের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। জঙ্গ-লের মধ্যে প্রথমে উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া যে গাছের ডালে কচি কচি পাতা হইয়াছে, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। অবশ্য সেই পাতা হরিণের খাদ্যের উপযুক্ত হওয়া চাই। কচি পল্লবযুক্ত শাখা কাটিবার সময় যদি পরগাছার ফুল-যুক্ত ডাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়, নচেৎ পশুরের কচিপাতা সমেত ডাল কিম্বা খলসে, বাণ এবং কেওড়ার কচি পাতা সমেত ডাল হইলে চলিতে পারে। এইরূপ ডালসকল কাটিয়া পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত পরিষ্কার স্থানে জমা করিতে হইবে। সঞ্চিত শাখার স্তূপে মানুষ দণ্ডায়মান হইলে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত যেন উচ্চ না হয়। কারণ, দূর হইতে গুলী করিবার সময় যেন বাধা না পড়ে। এইরূপ ভাবে পত্রপল্লব-বিশিষ্ট শাখা
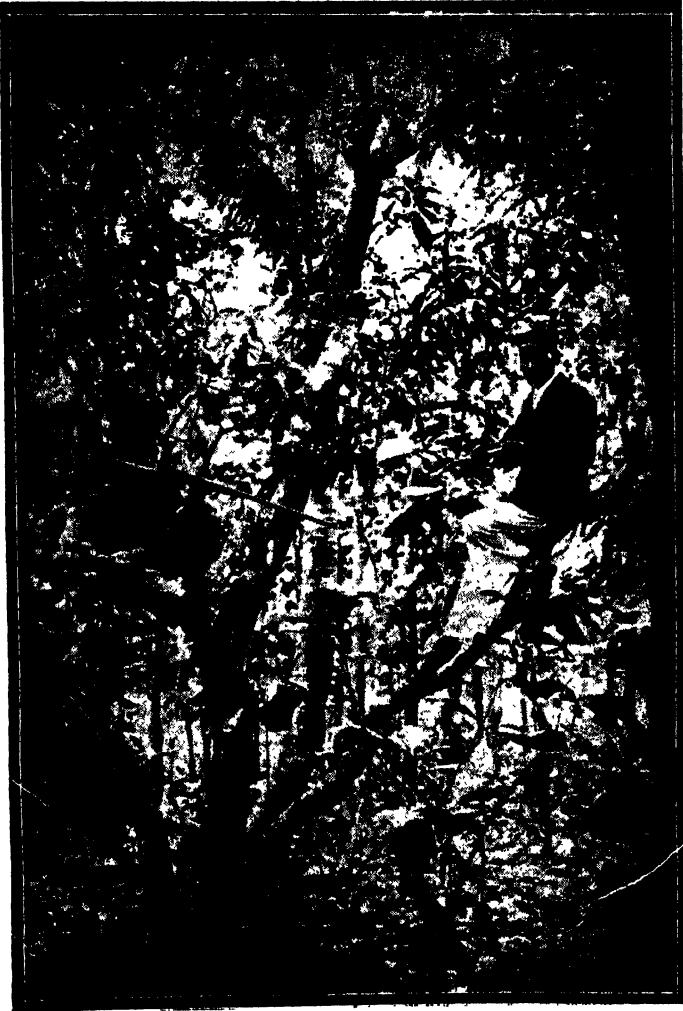
গাছাল মাছ

সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিলে, উহা দুই তিন দিবসের পর কিঞ্চিৎ শুষ্ক হয়। তখন হরিণ সকল ঐ পাতা খাইবার লোভে তথায় আসিতে আরম্ভ করে।

ডাল কিঞ্চিৎ শুষ্ক না হইলে উহাতে হরিণ লাগিবে না অর্থাৎ হরিণ পাতা খাইতে আরম্ভ করিবে না। পাতা যতক্ষণ কাঁচা থাকিবে, ততক্ষণ কদাচ হরিণ তাহাতে মুখ দিবে না। তবে বেশী শুষ্ক হইয়া গেলেও হরিণ উহা স্পর্শ করিবে না। যাহা হউক, ঐ পাতা হরিণের খাদ্যোপযোগী হইলে প্রত্যুষে কিম্বা অপরাহ্নকালে তথায় গমন করিলে হরিণ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

পত্র-পল্লব সহ বৃক্ষশাখা সঞ্চিত করিবার পর প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যাইয়া দেখিয়া আসিতে হইবে, হরিণ আসিয়া পাতা খাইয়া যাইতেছে কি না। যখন দেখা যাইবে, হরিণ আসিয়া পাতা খাইয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, কয়েক দিন ধরিয়া এখান হইতে হরিণ অন্যত্র যাইবে না।

তখন প্রত্যুষে কিম্বা সন্ধ্যায় সেই স্থানে শিকারার্থ যাইতে হইবে। নৌকাযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়া উহার কিছু দূরে নৌকা বাঁধিতে হইবে। এমন স্থানে নৌকা রাখিতে হইবে যে, সেখান হইতে কোন শব্দ করিলে লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছায়। নৌকা হইতে নামিয়া স্থলপথে পূর্ব্ববর্ণিত 'মাল হাঁটার' নিয়ম অনুসারে অতি সন্তর্পণে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

দূর হইতে দেখা যাইবে যে, হরিণ সেখানে পাতা খাইতেছে। তখনই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিতে হইবে। 'মাল হাঁটা' নিয়মে যদি চলিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে নিকটস্থ খালের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গুলী করিতে হইবে। এরূপ স্থলে শিকারীকে নিজের বুদ্ধিমত কার্য্য করিতে হইবে।

সময় সময় এমনও দেখা যায় যে, হরিণ হয় ত তখন পাতা খাইতেছে না। সে অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। শিকারী যেন এ অবস্থা দর্শনে নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া না পড়েন। এরূপ অবস্থায় শিকারী লক্ষ্য করিবেন, কোন্ দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছে। যে দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত কোন গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিলে দেখা যাইবে, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হরিণ আসিতেছে। লেখকের ঠিক একবার এইরূপ হইয়াছিল।

একবার জঙ্গলে এইরূপ 'পাতা দেওয়া' হইয়াছিল। স্থানীয় শিকারী দুই দিন জঙ্গলে যাইয়া দেখিয়া আসিল যে, পাতায় হরিণ লাগে নাই। তৃতীয় দিন আসিয়া বলিল যে, অদ্য বোধ হয় হরিণ লাগিয়াছে, পাতা খাইয়া গিয়াছে। চতুর্থ দিন বৈকালে সেই শিকারীকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে যাওয়া গেল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব। কোন হরিণ নাই! কিছুক্ষণ দুই জনে নীরবে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু হরিণের দেখা নাই। তখন আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'বৃথা পরিশ্রম, হরিণ বোধ হয় আর আসিবে না।' তখন শিকারী বলিল যে, 'না বাবু, হরিণ নিশ্চয় আসিবে। আসুন, আমরা একটি গাছের উপর উঠিয়া বসি।'

তাহার প্রস্তাবানুসারে আমরা একটি গাছের উপর উঠিয়া দুই জনে বসিয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল, হরিণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন বৃক্ষের উপর বসিয়া হরিণকে গুলী করা গেল। এরূপ ভাবে হরিণ মারিতে হইলে, এক দিনে একটি কিম্বা দুইটির বেশী হরিণ মারা যায় না। কারণ, যে দিন হরিণ মারা পড়ে, সে দিন আর হরিণ বড় একটা সেই স্থানে আগমন করে না। তাহার পরদিবস পুনরায় হরিণকে আগমন করিতে দেখা যায়। আর একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, ঐ পাতা দেওয়ার পর কদাচ সেই পাতা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; কারণ, মানুষের হাতের গন্ধ থাকিলে হরিণ তাহার আঘ্রাণ পাইয়া পলায়ন করিলে আর সেখানে সহসা আসিবে না।

সেই জন্য সেই পাতা দেওয়া স্থানের অতি নিকটে গমন করার প্রয়োজন নাই। সেখান হইতে মৃত হরিণ যত দূর সম্ভব সন্তর্পণে লইয়া আসা উচিত। হরিণের তীব্র ঘ্রাণশক্তির কথা শিকারীকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির বলে হরিণ মনুষ্য ও ব্যাঘ্রের গন্ধ বহু দূর হইতে অনুভব করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে।

অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, জঙ্গলে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে হরিণের কোন চিহ্ন নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলে শিকারী দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বে সেই পথে ব্যাঘ্র চলিয়া গিয়াছে। তাহার পায়ের দাগ কর্দ্দমে সুস্পষ্ট অঙ্কিত। লেখকের একবার ঠিক এরূপ অবস্থা হইয়াছিল। স্থানীয় শিকারীরা সন্ধান দিয়াছিল, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে হরিণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। স্থানটি তেরবাঁকি নদীর উপর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জঙ্গলের সব স্থানে হরিণ অবস্থান করে না। এমন স্থান আছে, সেখানে হরিণ আদৌ থাকে না। আবার এমন কতকগুলি স্থান আছে, সেখানে সর্ব্বদাই হরিণ বাস করে। তেরবাঁকি নদীর উপর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া গেল। সেখানে তীরে উঠিয়া গাছে বসিয়া 'কুই' দেওয়া গেল। কিছুতেই হরিণের সন্ধান মিলিল না। তখন নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বৃদ্ধ মাঝি বলিল, 'বাবু' দেখুন দেখি, এখানে বাঘ আসিয়াছিল কি না?' তখন সেই অবস্থায় আহারাদি না করিয়াই পুনরায় জঙ্গলে উঠা গেল। অল্প অনুসন্ধানেই দেখা গেল যে, তথায় মাটীর উপর বাঘের টাট্‌কা পায়ের দাগ পড়িয়া রহিয়াছে। তখন বুঝা গেল যে, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রিতে এই স্থান দিয়া ব্যাঘ্র চলিয়া গিয়াছে, তাই এখানকার সমস্ত হরিণ পলায়ন করিয়াছে।

যদি জঙ্গলের ভিতর এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, হরিণ কোন্ দিকে গিয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গিয়াছে। হরিণের টাট্‌কা চরণ-চিহ্ন যে দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পথে অগ্রসর হইলেই হরিণ পাওয়া যাইবে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হরিণ যে দিকে গিয়াছে, ব্যাঘ্র সেই দিকে যায় নাই। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা তখন হরিণের টাট্‌কা চরণ-চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। অল্প অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলাম, মৃগযূথ উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে। তখন নদীতে ভাটা। উত্তরে যাইতে হইলে জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তখন আমরা নৌকায় আসিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। তাহার পর

নদীতে জোয়ার আসিলে আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিয়া উত্তরমুখে রওনা হইলাম এবং সমস্ত পথই আমরা নদীর তীরে তীরে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলাম, পথে কোন স্থানে হরিণ দেখা যায় কি না।

সেখান হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে যাইয়া তবে আমরা হরিণের সন্ধান পাইলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা গাছে বসিয়া কুই দিয়া হরিণ মারিলাম। কিন্তু এই সকল হরিণ যে চিরকাল এই নূতন স্থানে থাকিবে, তাহা নহে। তাহারা পুনর্ব্বার তাহাদের পুরাতন বন-ভবনে ফিরিয়া যাইবে। তবে যত দিন ব্যাঘ্রবর তাহাদের দীর্ঘকালের বাসস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, তত দিন তাহারা কখনই সে দিকে যাইবে না। শিকারের সন্ধানে হরিণদিগের নবাগত স্থানে ব্যাঘ্র আসিলে তখন তাহারা আবার তাহাদের পুরাতন স্থানে চলিয়া আসিবে। ব্যাঘ্র সকল যে পথ দিয়া চলিয়া যায়, আবার ঠিক সেই পথ ধরিয়াই ফিরিয়া আসে এবং যেখানেই থাক্, ১৫ হইতে ২০ দিবসের মধ্যে ঠিক সেই পথে ফিরিয়া আসিবে। ইহা তাহাদের স্বভাব।

জঙ্গলের ভিতর দেখা যায়, হরিণ এবং বন্য বরাহ এক স্থানে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য কিম্বা ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইলে হরিণ কদাচ সেখানে থাকিবে না। তবে এমনও দেখা যায় যে, সুন্দরবনের খুব নিম্নভাগে অর্থাৎ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে হরিণ সকল মানুষ দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ভয় পাইয়া পলায়ন করে না।

হরিণ মারিবার আর একটি উপায় আছে, কিন্তু সব স্থানে সেই উপায় অবলম্বন করা যায় না। জঙ্গলের ভিতর সেরূপ স্থানও সব যায়গায় নাই। সেই জন্য সাধারণে সেরূপভাবে হরিণ শিকার করিতে পারে না। জঙ্গলের ভিতর স্থানে স্থানে জল খুব মিষ্ট। সুন্দরবনের নদীতে খালে কিম্বা যেখানে যেরূপ জলই থাকুক, তাহা অত্যন্ত লবণাক্ত; মিষ্ট জল প্রায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য নিয়ম, চারিদিকে লবণাক্ত হইলেও মাঝে মাঝে মিষ্ট জলপূর্ণ জলাশয় পাওয়া যায়। সুন্দরবনের জঙ্গলের ভিতর অনেক স্থানে পুরাতন বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু অট্টালিকা নহে, মন্দিরও আছে। সোপান ও চত্বর-সম্বলিত জলাশয় প্রশস্ত রাজপথের অবশেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। পথের দুই ধারে বকুলগাছের বীথি, আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি মনুষ্যের ব্যবহারযোগ্য ফলের বাগান প্রভৃতিও দুর্লভদর্শন নহে। কিন্তু এ সমস্ত যে কাহার রচিত কিম্বা কোন্ যুগে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সে অঞ্চলের কেহ বলিতে পারে না।

যে সব স্থান পরিষ্কৃত হইয়া কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার ভিতর এইরূপ কত কি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে বোধ হয় নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, সুন্দরবনের ভিতর বেদকাশী বলিয়া একটি আবাদ আছে। উহার বর্ত্তমান মালিক তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের মল্লিক বাবুরা। এই আবাদের ভিতর পুরাতন দুর্গের সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। দুর্গ যে চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, তাহা বেশ বোধগম্য হয়। তাহার মধ্যস্থলে অর্থাৎ যেখানে প্রাসাদাদি ছিল, তাহা বেশ জানা যায়। তাহার মাঝখানে একটি ছোট গোলাকার পুষ্করিণী এখনও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি বৃহৎ দীঘি তথায় বিদ্যমান। উহার জল অতি সুমিষ্ট।

ঐ দীর্ঘিকা দুইটির একটি যে হিন্দুর দ্বারা খনিত এবং অপরটি যে মুসলমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, একটি দীঘি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত, অপরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে। হিন্দু কখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে পুষ্করিণী খনন করিবে না। মুসলমানও কখনই উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘিকা খনন করায় না। সেই জন্যই অনুমান হয়, এই স্থানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই কীর্ত্তি বিদ্যমান। আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, সেখানে যত ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার একখানিতেও কোন লোণা ধরে নাই। অথচ বর্ত্তমানে সেই সেই স্থানের মাটী লইয়া যাহারা তদ্দ্বারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করে, তাহাতে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে লোণা ধরিয়া যায়। উল্লিখিত দীর্ঘিকা দুইটির জল সুমিষ্ট। বিশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোক উহাদের জল পানের জন্য লইয়া যায়; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ দীঘির পার্শ্বে পুষ্করিণী খনন করিলে তাহার জল অতি লবণাক্ত হয়। ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিয়া নির্ণয় করা যায় না। ঐ স্থানে এখনও অনেক পাথরের কারুকার্য্যসম্বলিত থাম পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিকটে নানা স্থানে মনুষ্যবাসের চিহ্নও বিদ্যমান। খুলনা-যশোহরের ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ইহাকে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আবার অনেকে বলেন, সুন্দরবনের সব কীর্ত্তি যে কেবলমাত্র প্রতাপাদিত্যের, তাহা নহে।

যাহা হউক, ঐতিহাসিকগণ সে বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। শিকার উপলক্ষে লেখক এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র। এখন হরিণ শিকারের সম্বন্ধে মিষ্ট জলের উল্লেখের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইতেছি। জঙ্গলের ভিতর যে স্থানে ঐরূপ মিষ্ট জল আছে, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু ঐ সব জলাশয়ে জল পান করিতে আইসে। হরিণের জলপানের নির্দ্দিষ্ট সময় বেলা ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে। কারণ, উহারা চরা করিয়া তাহার পর জল পান করিয়া যায় এবং বৈকালে তিনটা চারিটার সময়েও একবার তৃষ্ণানিবারণ করিতে আইসে। ব্যাঘ্রের জলপানের সময় প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে। সেই সময় অর্থাৎ বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে হরিণের আগমনপথের ধারে কোন একটি গাছের উপর বসিয়া থাকিতে হইবে। যখন হরিণ সকল জল পান করিতে আসিবে, তখন তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারার খুব সুবিধা।

উক্তরূপ হরিণযূথে ৪০।৫০টি অবধি হরিণ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, দলে হরিণের সংখ্যা আরও অধিক হয়, কিন্তু লেখক ৫০টির অধিক দেখেন নাই। এরূপভাবে ব্যাঘ্র শিকার করাও যায়। অনেকে এই প্রণালীতে ব্যাঘ্রও শিকার করিয়াছে। তবে ইহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

রাজা আমানুল্লার ভাগ্য-বিপর্য্যয়

আজ যে আমীর, কাল সে পথের ফকির, সৃষ্টির ইহাই বৈচিত্র্য। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আফগানিস্থানের শক্তিশালী স্বাধীন নৃপতি আমানুল্লা খাঁ আজ সপরিবারে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইটালীর আফগান-দূতের আশ্রয়ে সামান্ত গৃহস্থের স্থায় বসবাস করিতে যাইতেছেন, ইহা কি বিধাতার আশ্চর্য্য খেলার নিদর্শন নহে?

মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজা আমানুল্লা ও রাণী সৌরিয়া প্রতীচ্যের প্রবল স্বাধীন জাতিসমূহের নিকটে রাজোচিত সম্মান-সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া এসিয়ার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র আফগান রাজ্যের অজানা আফগান জাতিকে জগতের শীর্ষস্থানীয় জাতিগণের মধ্যে আদান-প্রদানে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। আজ তিনি রাজ্যহারা দীনহীন ভিখারীর মত পত্নী সৌরিয়ার ভগিনীপতি ইটালীর আফগান দূতের আশ্রয়ে পলাতকরূপে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া যাইতেছেন, ভাগ্যচক্রের কি সুন্দর আবর্ত্তন!

ইহা যেন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। তাঁহার পলায়নের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কেহ স্বপ্নে ভাবে নাই যে, তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া, পিতৃসিংহাসনের আশা ত্যাগ করিয়া, দস্যু-সর্দ্দার বাচ্চার দণ্ডবিধান না করিয়া ইংরাজের রাজ্যের এলাকার মধ্যে পলায়ন করিবেন। তাহার পূর্ব্বে মাত্র এইটুকু শুনা গিয়াছিল যে, গজনির সান্নিধ্যে বাচ্চার সেনাপতির হস্তে তাঁহার বিষম পরাজয় হইয়াছে। কেহ বলিল, তাহার ২ হাজার ৫ শত সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, কেহ বলিল, ২৫ হাজার। আরও শুনা গেল, রাজা আমানুল্লা পরাজিত হইয়া কান্দাহার অভিমুখে পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছেন।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! তিনি যে এমন পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে, তাহা কেহ ভ্রমেও অনুমান করিতে পারে নাই। তাহার পর রটিল, পরাজিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম না করিয়া তিনি শেষ রাত্রিতে কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন এবং সেই স্থান হইতে উড়োকল-যোগে রাণী সৌরিয়া, আমীর এনায়েতুল্লা, রাজপরিবারের অন্যান্য নরনারী ও বালকবালিকা এবং মহম্মদ তরজী বেগের (সৌরিয়ার পিতা) পরিবারবর্গকে লইয়া বেলুচিস্থানের দিকে যাত্রা করিয়াছেন,—বিস্তর আমীর-ওমরা-পাত্র-মিত্র বিস্তর ধনরত্ন লইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। তাহার পর প্রকৃত সংবাদ পাওয়া গেল যে, উড়োকল নহে, তিনি ২০খানি মোটরগাড়ী করিয়া লোকজন ও ধনরত্ন লইয়া বেলুচিস্থানের চামান সহরে উপনীত হইয়াছেন। সেখান হইতে কোয়েটা এবং কোয়েটা হইতে দিল্লী ও বোম্বাই যাত্রা পরের ঘটনা।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, কাবুলের কোন সংবাদে আস্থাস্থাপন করা যায় না। তিনি উড়োকলে পলায়ন করেন নাই, মোটরে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, সে সংবাদের সম্বন্ধেও স্থিরনিশ্চয়তা কি?

তৎপূর্ব্বে বাচ্চা ও আমানুল্লা সম্বন্ধে এবং গজনি সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অনেক সংবাদই পেশোয়ার হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। গত ৫ই মে তারিখে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুসলমান গ্র্যাজুয়েট কাবুলে চুক্তিমত শিক্ষাবিভাগে ৮ বৎসরকাল রাজকার্য্য সমাপ্ত করিয়া সপরিবারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সপ্তাহ পরে পেশোয়ারে পৌঁছেন। তিনি কোন সাংবাদিককে বলিয়াছেন,—

"আমীর হবিবুল্লার (বাচ্চার) ৩০।৪০ হাজার সুশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্য আছে। তাহারা বীরত্বে ও সাহসে কাহারও ন্যূন নহে। তাহাদিগের প্রত্যেককে মাসিক ২০৲ টাকা (কাবুলী মুদ্রা) বেতন দেওয়া হয় এবং ৪ সের করিয়া খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। আমানুল্লার আমলে সৈন্যরা মাসিক ৮৲ (কাবুলী মুদ্রা) বেতন পাইত। সেই বেতনও সকল সময়ে তাহারা নিয়মিতরূপে পাইত না; বেতন বাকী পড়িয়া থাকিত।

"কাবুল সহর যেন সর্ব্বদা সামরিক সাজে সাজিয়া আছে। সহরে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় নাই, পরন্তু সামরিক শাসন প্রচলিত, এই জন্য সহরবাসী সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করে। বাচ্চার শাসন অতি কঠোর। কাবুলের এক দরগার ফকীর এক দিন আমানুল্লার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল বলিয়া বাচ্চা প্রকাশ্য স্থানে তাহাকে ফাঁসী দিয়াছিল এবং তিন দিন তাহার দেহ ঐ ভাবেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল।

"কাবুলে খাদ্যদ্রব্য ভয়ঙ্কর মহার্ঘ্য হইয়াছে। এখন আর সহরে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ দেখা যায় না, রাণী সৌরিয়ার আমদানী করা সৌখীন বিদেশী পোষাক আর কাবুলে দেখা যায় না। এমন কি, পুরাতন বিদেশী মোজাও নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সহরবাসী তথাপি অন্তরে প্রতিদিন আমানুল্লার প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করে। কিন্তু উহা হইবার নহে; কারণ, বাচ্চা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন কাবুল হইতে তাহাকে তাড়ান সহজ কথা নহে।

"কাবুলে এখনও ৩।৪টি বিদেশী দূত বাস করিতেছেন। আমানুল্লার সংবাদপত্র 'আমান-ই আফগানের' এখন নামকরণ হইয়াছে 'হবিব-উল ইসলাম'। কাবুল ও দার-উল-আমানের (এখন দার-উল হবিব) মধ্যে যে মিটর গেজ রেল ছিল, এখন উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পেট্রোলের অভাবে মোটর গাড়ী এখন আর কাবুলে চলে না, কেবল ২০খানি গাড়ী বাচ্চা ও তাহার বড় বড় রাজপুরুষরা ব্যবহার করে।

"যে সোরবাজারের হজরৎ সাহেব, আমানুল্লার পতনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তিনি এখন নির্জ্জন-বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"বাচ্চা সাদাসিধা লোক। তাহার জীবনযাত্রাও সাধারণ ধরণের, পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ রকমের। তবে সে সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া থাকে। কাবুলে প্রত্যেকে তাহাকে আমীর বলিয়া সম্বোধন করে, না করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। বাচ্চা অনুক্ষণ 'আর্ক' দুর্গে আটক আসামীর মত বাস করে, কেবল শুক্রবার মসজেদে উপাসনা করিতে যায়। সে অত্যন্ত সাহসী ও বীর, পরন্ত সে বীরের সম্মান করিতে জানে। কিন্তু সে আমানুল্লা ও নাদীর খাঁর নাম শুনিলে রাগে জ্বলিয়া উঠে।

"এইরূপ নানা কারণে কাবুলের লোক তাহাকে ভালবাসে না, তাহারা আমানুল্লার প্রত্যাবর্ত্তনে সন্তোষ লাভ করিবে। কিন্তু সে আশা দুরাশামাত্র। কারণ, সকলের বিশ্বাস, আমানুল্লার সৈন্য নাই, সাজসরঞ্জাম নাই। অর্থও নাই।

"আমানুল্লার সেনা গজনির যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। গজনি এখন বাচ্চার হস্তগত। আমানুল্লা ও নাদীর খাঁকে জীবিত অবস্থায় ধরাই বাচ্চার একান্ত ইচ্ছা। তবে ধরিবার পর তাঁহাদিগকে লইয়া সে কি করিবে, তাহা প্রকাশ করে না। নাদীরের উপরে তাহার রাগ এই জন্য যে, সে তাঁহাকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছিল, কিন্তু নাদীর তাহাকে সাহায্য করিতে কাবুলে যান নাই।

"বাচ্চার তিনটি স্ত্রী বর্ত্তমান। এই তিনটির মধ্যে পরলোকগত আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর নিকটাত্মীয়া একটি। তিনিই হারেমের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা। বাচ্চা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু হারেমের 'আলোক' হইতেছেন এক কোহিস্থানী বালিকা। বাচ্চা কোহিস্তান জয় করিবার সময়ে ইহাকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছে। তিনি অশিক্ষিতা হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি গুরু রাজকার্য্যে বাচ্চার পরামর্শদাত্রী।

"বাচ্চা ৩ বৎসরকাল কাবুলে জিয়াউদ্দীনের নিকট সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। জিয়াউদ্দীন তুর্ক সেনানী। এই শিক্ষা হেতু বাচ্চা রীতিমত রণকুশলী হইয়াছে।

"সৈন্য-সামন্তকে নিয়মিত বেতন দিয়াও এখনও কাবুলের কোষাগারে বাচ্চার ৪ ক্রোর টাকা (কাবুলী মুদ্রা) মজুত আছে। ইহা ছাড়া জবলুলসরাজে বাচ্চা আরও অনেক টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছে। যদি কাবুল হইতে পলায়ন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় বাচ্চা এই ব্যবস্থা করিয়াছে। এ দিকে কাবুলের ওয়ালি, সওদাগরদিগের নিকট কড়াকড়ি শুল্কাদি আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিতেছেন। এ জন্য বাচ্চার কোষাগার সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিতেছে।"

ইহা হইল এক ভাবের সংবাদ। আবার অন্য সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বাচ্চার শাসনে প্রজা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, বাচ্চার অবস্থা সাংঘাতিক, তাহার পতন অনিবার্য্য, তাহার রাজধানীতে অরাজকতা উপস্থিত, ইত্যাদি। এক ইহুদী ব্যবসায়ী ২০শে মে তারিখে কাবুল হইতে পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল,—

"বাচ্চা দুই একটা যুদ্ধ জয় করিতেছে বলিয়া সংবাদ রটিতেছে বটে, কিন্তু তাহার রাজ্যের স্থায়িত্ব আর অধিক দিন নহে। রাজদ্রোহের বা রাজা আমানুল্লার পক্ষপাতিতা করার ফলে প্রত্যহ কাবুলে দুই তিন জন অধিবাসীকে গুলী করিয়া মারা হইতেছে। কাবুলের বর্ত্তমান শাসন পূর্ণমাত্রায় নিষ্ঠুর অমানুষিক স্বেচ্ছাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, ইচ্ছামত কাহারও মনোভাব প্রকাশ করাও দণ্ডনীয়।

"খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তথায় অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেরোসিন ও পেট্রোল তথায় ২০৲ টাকায় এক গ্যালন বিক্রয় হইতেছে। ঘৃত দুষ্প্রাপ্য। তবে মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বন্দুক ও বারুদের আমদানী একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। টাকা বাজারে পাওয়াই যায় না। বাচ্চা অনবরত হেথা সেথা সমরাভিযান প্রেরণ করিয়া কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। বলপূর্ব্বক ব্যবসায়ীদিগের নিকট টাকা কাড়িয়া লওয়া সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে সৈন্যগণের বেতন কোথা হইতে দেওয়া হইবে, ইহা এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৈন্যরা বেতন না পাইয়া তাহাদের কার্ত্তুজ আদি বিক্রয় করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। তথাপি নূতন সেনা ভর্ত্তি করার কামাই নাই!

"আমানুল্লার সমর্থন করা হেতু কাজী আবদুল রহমান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে এক মোটর গাড়ীতে বাঁধিয়া সমস্ত কাবুল সহরে দেখাইয়া লইয়া বেড়ান হইয়াছিল। শেষে তাঁহার উপর লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল এবং তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল।

"অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কাবুল হইতে জালালাবাদ যাইবার পথ আদৌ নিরাপদ্ নহে। সেখানে অষ্টপ্রহর উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে।

"বাচ্চা সর্ব্বদা প্রাণভয়ে ভীত। সে কোথাও বড় একটা যায় না। এমন কি, শুক্রবারে মসজেদে নমাজ পড়িতেও যায় না। সে 'অন্ধকূপের' মধ্যেই বাস করে। তাহার বাস-কক্ষের আশে-পাশে গুপ্তভাবে বোমা রক্ষিত থাকে। অজানা লোক তথায় প্রবেশ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ বোমার সংস্পর্শে তাহার মৃত্যু ঘটিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা আছে।"

পাঠক পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে এই বিবরণের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। একটিতে বাচ্চা কাবুলে বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিতেছেন, তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ, তাঁহার সৈন্যরা নিয়মিত বেতন পাইতেছে, তিনি নির্ভীক ও বীর, আমানুল্লার আর কাবুল জয়ের আশা নাই,—ইত্যাদি বলা হইতেছে। অপরটিতে, রাজকোষ শূন্য, সৈন্যরা বেতন পায় না বলিয়া সরঞ্জাম বিক্রয় করিতেছে, কাবুলে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে, বাচ্চা ভীরু, সদাই প্রাণভয়ে ভীত, বাচ্চা নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও বর্ব্বর, দণ্ডদানের পক্ষপাতী,—ইত্যাদি বলা হইতেছে। কোন্‌টা সত্য? আমাদের এখানে থাকিয়া তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই, যাহা পেশোয়ার বা অন্য স্থান হইতে রটিত হইতেছে, তাহাই আমরা পাইতেছি, প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার আমাদের উপায় নাই।

এই ভাবে উভয় পক্ষে জয়-পরাজয়ের কথাও সম্ভবতঃ রটিত হইয়াছিল। কখনও শুনা গিয়াছিল, আমানুল্লা গজনি আক্রমণ

ও অধিকার করিয়াছেন, বাচ্চা তিন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে, আমানুল্লার আর কাবুল-সিংহাসন অধিকারের বিলম্ব নাই। আবার অন্য খবরে জানা গিয়াছিল, বাচ্চার সেনাপতি গজনি অধিকার করিয়া কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, বাচ্চা তাঁহার সাহায্যে প্রবলবাহিনী প্রেরণ করিতেছেন, আমানুল্লার আর জয়াশা নাই, নাদীর ও অন্যান্য সেনাপতিরও আর কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, ইত্যাদি। ইহারও কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহা আমাদের জানিবার উপায় ছিল না।

তাই যখন প্রথমে পঞ্জাবের 'সিবিল মিলিটারী গেজেট' পত্রে প্রচারিত হইল, আমানুল্লা বৃটিশ বেলুচিস্থানে পলাইয়া আসিয়াছেন, তখন সহসা এ সংবাদে আস্থাস্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। গেজেটের সংবাদদাতা লিখিলেন,—গত ২২শে মে তারিখে গজনির নিকটে বাচ্চার সৈন্যের হস্তে আমানুল্লার বিষম পরাজয় ঘটিয়াছে, তাঁহার ২ হাজার ৫ শত সৈন্য নিহত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং তখন কালাটি ঘিলজাই নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া ঐ দিন রাত্রি ৩টার সময়ে কান্দাহারে উপস্থিত হন। সেখানে রাণী সৌরিয়া ও সর্দ্দার এনায়েতুল্লা, রাজপরিবারবর্গ ও রাণীর পিতা মহম্মদ তরজী বেগের পরিবারবর্গসহ মোটরযোগে তৎপরদিন প্রভাতে বেলুচিস্থানের দিকে অগ্রসর হন এবং ২৩শে মে বেলা ৩টার সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে চামান সহরে উপস্থিত হন। এক জন প্রহরী প্রথমে লক্ষ্য করে যে, কান্দাহারের দিক্ হইতে কয়খানি মোটর গাড়ী দ্রুতবেগে সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখনই কয় জন বৃটিশ সেনানী পথের দিকে দৌড়িয়া যান। তাঁহারা দেখেন, ২০খানি মোটরগাড়ী লোক বোঝাই লইয়া সহরের দিকে আসিতেছে। একখানা গাড়ীতে টাকা বোঝাই ২০টি থলিয়া ছিল। অন্য মালপত্র সঙ্গে ছিল না। তাহার কারণ এই যে, বাচ্চার সৈন্যরা আমানুল্লাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ৮০ খানা মোটর লরি অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাই মাল আনিবার সুবিধা হয় নাই।

এই সংবাদেরও কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সর্ব্বপ্রথমে শুনা গিয়াছিল, রাজা আমানুল্লা গজনিতে পরাজিত হইয়া উড়োকলযোগে কান্দাহারে পলায়ন করিয়াছেন। এ সংবাদও যেমন মিথ্যা, তাঁহার পরাজয়ের কথাও তেমনই মিথ্যা। তিনি মোটরযোগে বৃটিশ এলাকায় চলিয়া আসিয়াছেন, উড়ো কলে নহে। তাঁহার সঙ্গে যে সকল পাত্র-মিত্র আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার বাণিজ্য-সচিব ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, গজনির নিকট রাজা আমানুল্লার সহিত বাচ্চার কোন যুদ্ধ হয় নাই, আর যুদ্ধে ২ হাজার ৫ শত সৈন্যও নিহত হয় নাই। যখন রাজা দেখিলেন যে, তাঁহারই ঘিলজাই প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং কান্দাহারেও তাঁহার অধীনস্থ উপজাতিরা পরস্পর প্রাধান্য লইয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি আর কাবুল সিংহাসনের প্রার্থী হইতে অভিলাষী হইলেন না। তাঁহাকে যাহারা চাহে না, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি বলপূর্ব্বক রাজপদ অধিকার করিতে চাহেন না।

যাহা হউক, চামান হইতে রেলযোগে রাজপরিবার পাত্র-মিত্র সহ করাচী পৌছেন এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। এখন সেখানেই তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন। রাণী সৌরীয়া এখন অন্তঃস্বত্বা, তাই আপাততঃ তাঁহারা য়ুরোপ যাত্রা করিবেন না বলিয়াই মনে হয়। হয় ত তাঁহাকে ও অন্যান্য কাহাকেও কাহাকেও এখানে রাখিয়া রাজা আমানুল্লা ইটালী যাত্রা করিবেন, এমনও হইতে পারে। ফল কথা, আপাততঃ স্বদেশের সহিত,কাবুলের সিংহাসনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের অবসান হইল!

ভাগ্যনেমির আবর্ত্তনে ভবিষ্যতে আফগানিস্থানে কি ঘটিতে পারে, তাহা এখন বলিতে পারা যায় না। তবে আমানুল্লার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই দুইটি কথা স্বতঃই মনে হয়। তিনি থাকিতে বাচ্চাই হউক, আর নাদীর হউক বা আলি আমেদ খানই হউক,—কেহই সমগ্র আফগান প্রজার সমর্থন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আফগানিস্থানের গৃহযুদ্ধ আরও প্রবল তেজে চলিবে বলিয়া মনে হয়; পরন্তু অশান্তি ও অরাজকতা তথায় অতীব প্রবল ভাবেই চাপিয়া বসিবে। আমানুল্লা ব্যতীত কাবুল রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই, ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

একটা কথা মনে পড়িলে হৃদয় ভাবাবেশে উদ্বেল হইয়া উঠে, বিষাদে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। ভাগ্যহত রাজা আমানুল্লা এবং তাহার পত্নী সৌরীয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা মনে পড়িলে মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা একটা শক্তিশালী জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, আজ তাঁহারাই দীনাতিদীন ভিখারীর ন্যায় পরের আশ্রয়প্রার্থী!

রাজা আমানুল্লা এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিশেষ বিবৃতি প্রদান করিয়া আফগানিস্থানের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর একটা সুসংবদ্ধ বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আমার সৈন্যগণের পরাজয়ের জন্য আমি আফগানিস্থান ত্যাগ করিয়াছি,এই মর্ম্মে যে জনরব রটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; আমি সেরূপ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আন্দেরী, তারাক, ওটাকা ও টোখি সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজভক্তির অভাবের জন্যই আমি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি।

"শিনোয়ারী বিদ্রোহের প্রথম অবস্থা হইতে সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর আফগানিস্থানে বিদ্রোহের বিস্তার লাভ পর্য্যন্ত আমি যে আমার সৈন্যদিগকে কোথাও আক্রমণ করিবার আদেশ দিই নাই, পক্ষান্তরে বিদ্রোহীদের নিকট অনবরত প্রতিনিধি পাঠাইয়া ব্যাপারটা শান্তির মধ্যেই মিটাইয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এ কথা সকলেই জানেন। বিদ্রোহ খুব ভাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিদ্রোহীরা আমার আদর্শের বিরোধী। তাহারা সেগুলিকে তাহাদের নৈতিক আদর্শের ও জাতীয় প্রথার প্রতিকূল বলিয়া মনে করে।

"সমগ্র আফগানিস্থানে ১১০৭ প্রতিনিধি লইয়া যে জীর্গা অধিবেশন বসে, তাহাতে ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইয়া প্রা[illegible] সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু যাহারা প্রথমে স্বার্থসিদ্ধি[illegible] প্রলোভনে চক্রান্ত করিয়াছিল এবং পরে সে সকলের জন্য শাস্তি ভোগের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল, আমার নানারূপ পরাম[illegible] ও দয়াপ্রকাশের ঘোষণা সত্ত্বেও তাহাদের ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। এই জন্য আফগানিস্থানে আর রক্তপাত না করিয়া আমি আমা[illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েতুল্লা খাঁর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করা[illegible] কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

"আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুকূলে অন্যান্য রাজভক্ত আফগান উপজাতিদিগকে লওয়াইবার জন্য কান্দাহারে আসি এবং কান্দাহারে সমগ্র অধিবাসীর আগ্রহাতিশয্যে ও আফগানিস্থান ও আফগান জাতির মঙ্গলকামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমি আবার রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। তখন পূর্ব্ব-আফগানিস্থানের অধিকাংশ স্থানেরই অধিবাসীরা তাহাদের কৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত, তাহারা আবার রাজভক্ত হইয়া পড়ে। আমি বাচ্চাই সাক্কাও ও তাহার দস্যুদলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সঙ্কল্প করি। কান্দাহার ও কাবুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানের অধিকাংশ উপজাতির সর্দ্দাররা আমার এ সঙ্কল্প অনুমোদন করেন।

"কাজেই আমি কাবুল আক্রমণের জন্য আমার সৈন্যদল ঠিক করিয়া লই। আমার সৈন্যদলে এমন সব লোক ছিল, যাহারা আমার পিতার আমলে সৈন্যদলে কায করিয়াছিল। তাহারা আমার রাজত্বকালেও ঐরূপ কায করিয়াছে। কাযেই সাক্কাওকে পরাজিত ও তাহার সৈন্যদল লণ্ডভণ্ড করিবার পক্ষে আমার সৈন্যদল পর্য্যাপ্ত ছিল।

"আমার সৈন্যরা যখন মুকুরে আসে, তখন তথায় অবস্থিত বাচ্চার সৈন্যরা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এমন কি, আমার পক্ষে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ইচ্ছা জানায়।

"কান্দাহার ও গজনির মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের উপজাতিরা যেরূপ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ও আমাকে যেরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাতে আমি আশান্বিত হৃদয়ে গজনির দিকে অগ্রসর হই। গজনিতে সাক্কাওর এক হাজারের অধিক সৈন্য ছিল না। কিন্তু আমরা গজনীতে পৌছিবামাত্র আন্দেরী এবং টারাক, ওটক ও টোথি উপজাতিদের নূতন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে আবার সদর মুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। আমি শান্তিপূর্ণ উপায়ে লোকের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু তখন তাহা কালাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ঐ অঞ্চলের ছোটখাট উপজাতিরাও ঐ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া গিয়াছে। কাযেই অবস্থার প্রতীকারের জন্য আমাকে কালাতে ফিরিয়া যাইতে হয়। আমি সেখানেও লোকজনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমার আশঙ্কা হয়, বুঝি বা এই উপলক্ষে সমগ্র ঘিলজাই ও দুরাণী সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। আমার নিজের জন্য সিংহাসনলাভের নিমিত্ত আমি এরূপ ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিতে দিব, এমন ইচ্ছা কোন দিনই আমার মনে ছিল না। এই নীতির জন্য আমি সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া আফগানিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি।

"যুদ্ধস্থলে কোন দিনই আমার সৈন্যরা এমন শত্রুসৈন্যদলের সম্মুখীন হয় নাই, যাহারা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে। কাযেই আমার সৈন্যরা যে পরাজিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কোন যুদ্ধেই আমার সৈন্যরা প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই বা পিছু হটে নাই। আমি আবার বলিতেছি, আমি কেবল আমার নীতি ও যুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষের জন্যই আমার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আমার স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়াছি। আমার সুবিধার জন্য আফগান জাতি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়, এরূপ কদর্য্য কল্পনা কোন দিন আমার মনে উদিত হয় নাই। এই জন্যই হঠাৎ আমি চামানে আসি।

"আমি নিজে সাফল্যলাভ না করিতে পারি, কিন্তু আমার নীতি আফগানিস্থানে জয়যুক্ত হইবেই। আফগান জাতির কল্যাণসাধনের জন্য গত ১০ বৎসরকাল আমি যে কঠিন পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার ফলে আফগানিস্থানে এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার জন্য আফগানরা এ অবস্থায় বেশী দিন থাকিতে পারিবে না।

"সকলেই কাবুলের এবং তথাকার ধর্ম্মের অবস্থা অবগত আছেন। শীঘ্রই ইহা সকলে জানিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান গোলযোগের পশ্চাতে আত্মস্বার্থসিদ্ধি করা ছাড়া-অন্য উদ্দেশ্য এবং অজ্ঞতা ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্মভাব নাই। কারণ, আফগানিস্থানে বর্ত্তমান যে অবস্থা চলিতেছে, ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই।"

বস্তুতঃ যৌবনের প্রারম্ভে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার পর তাঁহার একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা হইয়াছিল জন্মভূমির উন্নতিসাধন। কিসে আফগানিস্থান জগতে অন্যান্য স্বাধীন শক্তিশালী দেশের মত সকলের নিকট মান্য হইবে, কিসে পুত্রতুল্য আফগান প্রজা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়-ভব্যতায় ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হইবে, কিসে আফগান রাজ্য কৃষি-বাণিজ্যে, শিল্প-সাহিত্যে অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের সমকক্ষতা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে, অহরহঃ ইহাই ছিল আমানুল্লার চিন্তা। ইহারই জন্য এক দিন তিনি প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সরকারের সহিত শক্তিপরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি তাহার ফলে ক্ষুদ্র আফগানিস্থানকে জগতে মহৎ বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আফগান প্রজার উন্নতিসাধনের জন্য তিনি সস্ত্রীক য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বহির্জ্জগতের নানা সভ্য উন্নত জাতির শিক্ষা-সভ্যতা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আফগানিস্থানে সংস্কারকার্য্য সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র অপরাধ, তিনি কালের গতির সহিত চলিতে পারেন নাই—কিছু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অজ্ঞ নিরক্ষর প্রজার মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল; আজ তাহারই ফলে তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি। রাজা আমানুল্লা জীবনের মধ্যপথে কর্ত্তব্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, এমন ত মনে হয় না। ভবিষ্যতে ভাগ্যবিধাতা তাঁহার জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে যত দিন জগতে দেশপ্রেমিকের এবং প্রজাপালকের সম্মান থাকিবে, তত দিন রাজা আমানুল্লার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে, তাঁহার নাম লুপ্ত হইবার নহে।

আগামী যুদ্ধ

কোথায়?—প্রশান্ত মহাসাগরে, না আটলান্টিকে?—চীনে, না আফগান-রুস সীমানায়?—আগামী যুদ্ধের কথা শুনিলেই স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে।

কোনও এক প্রতীচ্য দেশবাসী মনীষী রাজনীতিক বলিয়াছেন, জার্ম্মাণ-যুদ্ধ জগতে সকল যুদ্ধের অবসান করিয়াছে, এ কথা দূরে থাকুক, বরং জগৎকে নিত্য আর এক মহা সংঘর্ষের দিকে লইয়া যাইতেছে। জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ (Mandate of the League of Nations) এবং সাম্রাজ্যবাদিতা (Imperialism) পরসম্পদ্ ও পররাজ্যলিপ্সাকে দ্বিগুণ তেজে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং জগৎ শীঘ্রই এক মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এ যুদ্ধ কোথায়, কাহার কাহার মধ্যে হইবে,—ইহাই এখন প্রশ্ন। কেহ বলেন, জাপানে মার্কিণে, চীন ও ফিলিপাইনের স্বার্থসম্পর্কে প্রশান্ত মহাসাগরে রণদামামা বাজিয়া উঠিবে। কেহ বলেন, না, তাহা নহে, আটলান্টিকের দুই পারে অবস্থিত দুই অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির—ইংরাজ ও মার্কিণের বাণিজ্য-স্বার্থ ও সমুদ্রে প্রাধান্য লইয়াই সংঘর্ষ বাধিবে। অপর রাজনীতিক বলেন, চীনদেশের গৃহযুদ্ধ উপলক্ষে যখন শেষে অরাজকতা ও লুণ্ঠনব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তখন শক্তিপুঞ্জ স্ব স্ব স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে চীনের আসরে অবতীর্ণ হইবেন। আর এক দল বলেন, বলশেভিক চক্রান্তের ফলে আফগান-সীমান্তে সোভিয়েট রুসিয়ার কম্যুনিষ্টদিগের সহিত ইংরাজ ইম্পিরিয়ালিষ্টদিগের সংঘর্ষ বাধিবে। কোন্‌টা অধিক সম্ভব? মিঃ উইকহাম ষ্টীড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, শেষেরটাই সংঘটিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

কেন তিনি এ কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া ইংরাজ ও জার্ম্মাণের মধ্যে যে মনের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাব বর্ত্তমানে ইংরাজ ও মার্কিণের মধ্যে দাঁড়াইতেছে, নানা লক্ষণ দেখিয়া তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এই ভাব কেন দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটু ইতিহাস আছে।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর আড়াই বৎসরের মধ্যে মার্কিণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংরাজের সহিত মার্কিণের মনোমালিন্য খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মার্কিণের নিরপেক্ষতায় ইংরাজ হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে যখন মার্কিণ মিত্রশক্তি-পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করেন, তখন হইতে উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সদ্ভাব আবার অন্তর্হিত হইল কেন?

ইহার কারণ এই যে, মার্কিণ য়ুরোপের শান্তি-সম্পর্কিত সন্ধি-সমূহে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হয় নাই, প্রেসিডেণ্ট উইলসন জাতি-সঙ্ঘের যে কভেন্যাণ্ট প্রস্তুত করেন, তাহা সন্ধিপত্রের অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইংরাজ তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাই হইল মনোমালিন্যের প্রথম সূত্রপাত।

মার্কিণ দুইটি বিষয়ে ইংরাজের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে চাহিয়াছিলেন (১) একটি আইরিশ সমস্যা, (২) অপরটি সাগরে স্বাধীনতা। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের বহু অধিবাসী আইরিশ জাতীয়; সিনেটের সদস্য-নির্ব্বাচনে তাহাদের ভোটের মূল্য বড় সাধারণ নহে, এই হেতু আয়র্ল্যাণ্ডের সিনফিন আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে ইংরাজ শেষ কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিয়া মার্কিণের ইংরাজের প্রতি মনোভাব প্রভাবিত হইবে, এইরূপ অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। আর প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪ পয়েণ্টের দ্বিতীয় পয়েণ্টে এইরূপ সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল:—

"সকল দেশের উপকূলের সন্নিহিত সমুদ্র ব্যতীত জগতের সমস্ত সমুদ্রে সকল জাতির জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। ইহা শান্তির সময়েও যেমন প্রযোজ্য হইবে, যুদ্ধের সময়েও তেমনই হইবে।"

এই দ্বিতীয় পয়েণ্ট লইয়া মিত্রশক্তিগণের সহিত মার্কিণের ভীষণ মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধের কথা। জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার বন্দোবস্ত (Armistice) উইলসনের ১৪ পয়েণ্টের উপর নির্ভর করিবে কি না, তাহা লইয়া মহা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। মিঃ লয়েড জর্জ্জ তখন বিলাতের কর্ত্তা, তিনি এই সর্ত্তে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, উইলসনের ১৪ পয়েণ্ট, বিশেষতঃ ২য় পয়েণ্ট (যাহাতে সমুদ্রে স্বাধীনতার সর্ত্ত আছে) বৃটিশ স্বার্থের প্রতিকূল। বৃটেন সমুদ্র-পথে প্রধান শক্তি, শত্রুপক্ষকে সমুদ্র-পথে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার ক্ষমতা বৃটেন কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

মার্কিণের পক্ষ হইতে কর্ণেল হাউস বৃটিশ প্রতিনিধিকে বলেন, "যদি মিঃ লয়েড জর্জ্জ সমুদ্রে স্বাধীনতা সম্পর্কে অন্যান্য জাতিকে কিছু সুবিধা করিয়া দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ইংরাজের সহিত মার্কিণের মিলনের কোন আশা নাই। কেন না, এই সমুদ্রে স্বাধীনতার সমস্যা লইয়াই মার্কিণ ইংরাজের বিপক্ষে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছিল, এই সমুদ্রে স্বাধীনতার জন্য মার্কিণ জার্ম্মাণীর বিপক্ষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মিত্র-পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। মার্কিণ কি সর্ত্তে তাহার জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিবে, তাহা বৃটিশ বা অন্য কোন শক্তিকেই নির্দ্ধারণ করিতে দিবে না।"

ইহাই হইল বিবাদের সূত্রপাত। এই সমুদ্রে স্বাধীনতা সম্পর্কে যে বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহার ফলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জেনিভার নেভাল কনফারেন্স বিফল হইল; পরন্তু মার্কিণ ইঙ্গ-ফরাসী-নেভাল কম্প্যাক্টের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং নিজের দেশে ক্রুইজার জাহাজ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন। যদিও মার্কিণ জানিতেন, এই ক্রুইজারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বৃটেনের ঘোর আপত্তি ছিল, তথাপি মার্কিণ ইংরাজের অপ্রীতির ভয় না রাখিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন।

ইংরাজ রাজনীতিকরা বলিলেন,—"সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৌ-বাহিনী রাখা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু মার্কিণের পক্ষে উহা সখের জিনিষ। সমুদ্রবেষ্টিত জাতি আমরা, আমাদের বহুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য রক্ষা করিতে আমাদের নৌ-বল শ্রেষ্ঠ রাখা আমাদের পক্ষে সখের কথা নহে, জীবন-মরণের কথা। আমরা অন্য জাতির সম্পর্কে 'সমুদ্রে স্বাধীনতার' সর্ত্তে সম্মত হইতে পারি না। অপর জাতিকে জলপথে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আমরা কিছুতেই পরিহার করিতে পারি না।"

ইহার উত্তরে মার্কিণ রাজনীতিকরা বলিলেন,—"আমরা তোমাদের য়ুরোপের ঝগড়া-ঝাঁটিতে থাকিতে চাহি না। আমরা য়ুরোপ হইতে ৩ হাজার মাইল দূরে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আছি— ৩ হাজার মাইল সমুদ্রের ব্যবধান সামান্য নহে। যদি আত্মরক্ষার

ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে ইংরাজ বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে জার্ম্মাণীর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিতেন না। জার্ম্মাণীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার এবং জার্ম্মাণ-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ভয় না থাকিলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ২০ মাইল সমুদ্রের ব্যবধান যথেষ্ট মনে করিয়া ইংলণ্ড জার্ম্মাণ-যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতেন। অন্ততঃ যতক্ষণ জার্ম্মাণরা ফরাসীকে রণে পরাস্ত করিতে না পারিত, ততক্ষণ ইংরাজের কোন ভয় থাকিত না। ইংরাজ প্রথমে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল এবং মুখে বলিয়াছিল, জগতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছে। আমরাও প্রথমে আমাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাই বুঝিয়াছিলাম, যে বিবাদে আমাদের কোন স্বার্থহানি হয় নাই, সে বিবাদের সম্পর্কে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন নাই। এ কথা সত্য যে, আমাদের মধ্যে কতক লোক মিত্রশক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাদের সহায়তা করিতে ভলান্টিয়ার সেনারূপে য়ুরোপের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তেমনই আমাদের অনেক লোক মিত্রশক্তিগণের 'জগতের স্বাধীনতা রক্ষা করার' আদর্শ প্রচারে বিশ্বাস করে নাই। বিশেষতঃ জার-শাসিত রুসিয়া মিত্রদিগের পক্ষে ছিল। রুসিয়া কি কখনও মানুষের স্বাধীনতার পরিপোষকরূপে দেখা দিয়াছে? কাযেই মার্কিণের সন্দেহ অমূলক ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সমুদ্রে স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, যে মুহূর্ত্তে জার্ম্মাণ সাবমেরিণ শত্রু মিত্র কিছু না বাছিয়া সকল জাতির পণ্যবাহী জাহাজও ডুবাইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তে আমরা মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিলাম। ইহার এক মাস পূর্ব্বে রুসিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও জারের শাসনের অবসান হয়। কাযেই আর আমাদের মিত্রপক্ষে যোগদানে কোন বাধা ছিল না।

"যুদ্ধজয়ের পর আমরা দেখিলাম, যে আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া মিত্রশক্তিরা জার্ম্মাণ যুদ্ধে নামিয়াছিলেন, সন্ধি-শান্তির সময়ে সেই আদর্শ অনাদৃত হইতে লাগিল। আমাদের সরল-প্রকৃতি প্রেসিডেন্ট উইলসন য়ুরোপের কূট-রাজনীতিকগণের কথার মারপ্যাচে প্রতারিত হইলেন। তখন আমরা য়ুরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

"যে সমুদ্রে স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা জার্ম্মাণদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে—য়ুরোপের জটিল রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পশ্চাৎপদ হই নাই, এখন সেই সমুদ্রের স্বাধীনতা দানে বৃটেন অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের সহিত আমাদের মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী। আমরা জগতে কাহারও নির্দ্দেশ অনুসারে সমুদ্রে আমাদের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিব না। সে জন্য আমরা আমাদের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

"তাহার পর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু যেমন জার্ম্মাণীর সহিত বৃটেনের মনোমালিন্য হইয়াছিল, বর্ত্তমানে আমাদেরও সহিত তেমনই হইতেছে। আমাদের বাণিজ্য এখন বহুদূর-বিসারী হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহ আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেছে না। হয় ত এই সূত্রে উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ অচির-ভবিষ্যতে ঘনীভূত হইবে।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহু বিচক্ষণ রাজনীতিক মনে করিতেছেন, জগতের আগামী যুদ্ধ আটলান্টিকের বক্ষেই অভিনীত হইবে।

কামনা

সেথা যেতে আমি চাহিনে স্বামি,
যেথা সবে মরে আপন লাগি;
যেথায় আঁধারে আলোর উৎস
নিয়ে চল সেথা, করুণা মাগি!

অসীম যেথায় স-সীমেতে ধরা
চলো গো সেথায় নিয়ে মোরে ত্বরা,
মৃত্যুর সাথে জনম যেথায়
কাটায় বাসর—যামিনী জাগি'!

গরল যেথায় লভে পদ্মিণতি—
মধুর মহান্ অমৃতের নদী,
রাজা যেথা হায় নিঃস্বের সখা
সুখ হয় যেথা দুখের ভাগী।

সেথা যেতে চায় মোর এই প্রাণ
আপনার মনে গাব বসি' গান,
থাকিবে সদাই আমারে ঘেরিয়া
তুমি হয়ে মম চিরানুরাগী।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

সন্তান

শ্রান্তিহীন এক বর্ষা-রজনীতে এক গ্রাম্য অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে, একই শয্যায় সত্যেন বারকয়েক এপাশ-ওপাশ করিয়া আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "সবাই বৌয়ের নাম জানে—আমিই জানিনে! কেউ যদি বলে!"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই অভিযোগ ও নিবেদন, সে তাহার স্ত্রী—বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শুইয়া। বিবাহের পর সবে আজ বৈকালে সে এই বাড়ী আসিয়াছে, এই প্রথম।

জবাব আসিল না। সত্যেন পাশ ফিরিল।

নিস্তব্ধতা অধিকতর জমাট বাঁধিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একবার ওপাশ-এপাশ করিয়া যেন অনির্দ্দিষ্ট কায়াহীন এক মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া সত্যেন তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌বো যে 'সরস্বতী'—

তত্রাপি অপর পক্ষ নিঃশব্দ।

সহ্যের সীমা আর কতটা! সত্যেন এবার পাশের লোকটির সঙ্গে যেন চিরকালের ন্যায় সম্পর্ক-সম্বন্ধ একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ, প্রব্‌লেম্ কষ্‌তে হবে।" সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। সত্যেন গ্রাম্য স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অবশ্য সে হিসাবে বয়স তাহার একটু বেশীই ছিল।

প্রদীপ রাখিবার পিলসুজ খাটের নীচে ছিল, তাহার পা লাগিয়া উহা উল্‌টিয়া পড়িল। সুতরাং তাহার বিরক্ত হইবারই কথা। গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কাল থেকে বাইরের ঘরে শোবো—এখানে পিলসুজ পড়ে' যায়, আলো জ্বালা যায় না, পড়া হয় না।"

"সরস্বতী!"

সত্যেন শিহরিয়া উঠিল। বিহ্বল, নিস্তেজ, অবশ হইয়া সে শয্যার দিকে তাকাইল। দেখিল—এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু আবছায়ার মত, মানবীদেহ ধরিয়া শুইয়া আছে—যাহারই কণ্ঠ এমন-এক উপহার দিয়াছে, যাহার প্রার্থনা সে যুগ-যুগ ধরিয়াই করিয়া আসিতেছে! ভাবিল, মহিমায় কায়া যতই বড় হউক না, তাহাকে বিশ্লেষণ করিবার ভিতরকার ভাষা না থাকিলে উহা সম্পদে ব্যর্থ হইয়া যায়! তাহাই বলিয়া জড়ের আদর এত লঘু, আর প্রয়োজনে সচেতন এতই শ্রেষ্ঠ!

আত্মহারা হইয়া সত্যেন খাটের উপর উঠিয়া পড়িল। তার পর একটু, এতটুকু—আর একটু সরিয়া গিয়া বিহ্বল-কণ্ঠে কহিল, "কথা কইলে—তুমি?"

"আস্তে—"

শাসন! সত্যেনের কণ্ঠে যেন তুফান উঠিয়াছিল, কিন্তু ওই তীব্র শাসনে উহা ভিতরেই ভাঙ্গিয়া পড়িল! শুধু বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিল, সরস্বতী পাশ ফিরিয়াছে।

মাথায় ও বয়সে সত্যেন সরস্বতীর অপেক্ষা বেশী বড় ছিল না। মাথায় দুই চারি আঙ্গুল, বয়সে দুই এক বৎসর। তাহাদের নিভৃত-মিলনের অধিকাংশ সময়টাই খোঁপা খোলা-খুলি, টেরি ভাঙ্গাভাঙ্গিতেই কাটিত। যখন সরস্বতী কলহ অভিনয়ে হাঁপাইয়া পড়িত, তখন বসিয়া পড়িয়া খোঁপায় হাত চাপা দিয়া বলিত—"ভারি দুষ্টু তুমি!" বিপদে পড়িয়া সত্যেনও লাফ মারিয়া জানালায় উঠিয়া বলিত—"এই বাইরে চল্‌লাম!"

এইরূপে দুইটি জীবনের দুই প্রবাহিণী একই ধারায় মিশিয়া একটি বৎসর বহিয়া গিয়াছে। এখন সত্যেন প্রথম শ্রেণীতে—শেষ পরীক্ষার তিনটি মাস বাকী। বাড়ীতে সত্যেনের পড়িবার ঘর বাহিরে ছিল। এক দিন রাত্রিতে সত্যেন পড়া সারিয়া ভিতরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই সরস্বতী ঈষৎ অভিমানের ভাণ করিয়া বলিল, "অত রাত কোরে এস কেন, বল ত? যে ছোটো রা-ত?"

সত্যেন যুক্তি দেখাইয়া জবাব দিল, "সুমুখে এক্‌জামিন যে!"

"এই ক'দিন রাত কাটিয়ে এলেই পণ্ডিত হবে, না? এত দিন কি করছিলে? তারি ত—"

"সত্যেন, অসুখে পড়বি বুঝি? আলো নিবো—" সত্যেনের মা দুয়ারের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। সতর্ক করিয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও লজ্জায় জিব্ কাটিয়া আলো নিবাইয়া নিঃশব্দ হইয়া গেল।

সৃষ্টির দিন হইতে সুরু করিয়া নরনারী যদি নিছক নিজের খেয়ালে গা ভাসাইয়া চলিতে পাইত, তাহা হইলে, মৃত্যুর দিন তাহাদের ভালো-মন্দের খাতায় কোন্ জমাটা বেশী করিয়া উঠিত, তাহা কল্পনা করা কঠিন, নিষ্ফলই। কিন্তু সৃষ্টির প্রকৃতি হয় ত বা বৈচিত্র্যের ছাঁচে উঠিবে বলিয়াই লোকালয়ে নিষেধ ও আটকের আইন চলন হইয়াছে। এক পক্ষ ভাবে—সৃষ্টি রক্ষা পাইল; অপর পক্ষ রায় দেয়—সৃষ্টি রসাতলে গেল!

এই কাণ্ডের পর হইতেই সরস্বতীর মনে এক ছাপ পড়িল। উচ্ছ্বসিত যে অনুভূতি তাহার কোমল অন্তরটিকে এত কাল পৃথিবীর বিরুদ্ধে সংশয়হীন, নিষ্পাপ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ উহাই নীচতার সঙ্কোচে তাহার মানবী-চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। ভাবিয়া ঠিক করিল—যে বস্তুকে তাহারা এত দিন একান্ত সহজ ও সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার মূলে ত ভিত্তি নাই! নির্দ্দেশ ইহাই ত যে, স্বামি-স্ত্রী উভয়েরই এতাদৃশ এক শক্তির প্রয়োজন, যাহারই আত্মোৎকর্ষে অপরের শাসন ও নিজেদের লজ্জার হেতু ব্যর্থ হইয়া পড়ে! ঝর্ণার যে উচ্ছ্বাস পুলকে সারা হয়, তাহারই উৎস-মূলে পাহাড় চাপিবে—ইহাই ত নিয়ম!

এক দিন রাত্রিতে যথাসময়ে সত্যেন ঘরে আসিতেই সরস্বতী বলিল, "একটা কথা রাখ্‌বে?—এই ত ক'টা দিন!"

সত্যেন বিস্ময়ে সরস্বতীর মুখের পানে তাকাইতেই, সে বলিল, "তুমি বাইরের ঘরেই শুয়ো! সুমুখে এক্‌জামিন—বুঝ্‌লে?"

"এই কথা!"—সত্যেন যেন স্ত্রীর সমগ্র আবেদনই ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "হঠাৎ এমন?"

"হঠাৎ? তোমার একটু আক্কেল নেই?" বলিয়া সরস্বতী অত্যন্ত গম্ভীর হইল।

সত্যেন একটু দমিয়া গেল। স্ত্রীর এমন দাবী আর কোনও দিন সে শুনে নাই, মুখের এরূপ বিচিত্র ভঙ্গী আর কোন মুহূর্ত্তে সে দেখে নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ভাবছ, যদি ফেল্ করি? কিন্তু, আমায় বিশ্বাস কর—তোমার মুখ আমি রাখ্‌বোই!"

"প্রমাণ আছে? আগে রাখো, তার পর মনে করব—আক্কেল আমারই ছিল না!" বলিয়াই সরস্বতী এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল! আবার সুরু করিল, "দেখ, মাথার ওপর তোমার বাবা নেই, শাসনে রাখবার বড়-ভাইও নেই। আছেন শুধু মা, তিনি অতশত বোঝেন না—সেই সুযোগটাই নিতে চাও তুমি?"

সত্যেন মাথা হেঁট করিল।

সরস্বতী তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত দুইটা ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মনে করো না কিছু! আমি তোমারই আছি—তোমারই থাকবো! শুধু এই—তিনটি মাস—"

যে বস্তুর মূল্য লইয়া পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই মারামারি চলিতেছে, সেই নারী-কুহক সত্যেনের উপর দিয়া যাচাই হইয়া গেল। প্রতিবাদে এক অক্ষর—একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না—তেমনই নতমুখে, তেমনই নিঃশব্দে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মায়ের ঘরের জানালার কাছ দিয়া সত্যেনের যাইবার রাস্তা। জুতার শব্দ পাইয়াই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যেন? কোথায় চল্‌লি?"

সহজভাবেই সত্যেন জবাব দিয়া গেল, "বাইরের ঘরে। এ ক'মাস একটু খাট্‌তে হবে কি না?"

মা ভাবিলেন—সত্যিই ত!

নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতে লাগিল। সরস্বতী ঠিক করিয়া লইল—তাহার প্রার্থনা সার্থক হইয়াছে, সত্যেন ভাবিল—তাই হোক্।

পরীক্ষার আর দিন পনের আছে—এক দিন রাত্রিতে বৃষ্টি সুরু হইল—তখন প্রায় দেড়টা। সত্যেন জ্যামিতিখানায় একবার চোখ বুলাইয়া, সীতাহরণ ধরিয়াছে। দুই চারিটি শ্লোক পড়িতে না পড়িতেই আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তেমনই দমকা হাওয়া! একে শীতকালের দুর্য্যোগ, তদুপরি চম্‌চমে রাত্রি! সত্যেনের বিরহি-প্রাণ অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। এই আড়াই মাসকাল নিষ্ফল নিশা তাহার কাটিয়াছে, তা কাটুক—কিন্তু আজ? তাহার সমগ্র

অন্তর উদ্দাম হইয়া উঠিল। মন আজ আর কোন শাসন মানিয়া চলিতে সম্মত নহে। গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়া খালিপায়ে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ভিতরে আসিল ও শয়ন-কক্ষের জানালার কাছে চোরের মত একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া গলা চাপিয়া ডাকিল, "শুনছ ? ওগো—"

মুহূর্ত্তেই সাড়া আসিল, "এই বুঝি তোমার পড়া ?"

"খোল না খিলটা।"

সরস্বতী আস্তে আস্তে জানালা খুলিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "কেন বল ত ?"

"আমার পেন্সিল আছে—"

"আমি দিচ্ছি, কোথায় ?"

"পেন্সিল নয়—বই—আচ্ছা, খোলোই না।"

"ও মিথ্যুক ! যাও—" বলিয়াই সরস্বতী সরিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনের গালে যেন এক চড় পড়িল। আর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—রাগে, ক্ষোভে ও অপরিসীম লজ্জায় তৎক্ষণাৎ বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন হইতে দেখা গেল—কেহ কাহারও পানে মুখ তুলিতেছে না, সত্যেনও না, সরস্বতীও না—যেন উহারা প্ল্যাটফরমের যাত্রী, ট্রেণ আসিবামাত্র ছাড়াছাড়ি হইবে !

দেখিতে দেখিতে পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিল। সত্যেন পরীক্ষা দিতে সহরে চলিয়া গেল। দুই এক দিন পরেই, মায়ের অসুখ বলিয়া পিত্রালয় হইতে সরস্বতীকেও লইতে পাল্কী আসিল।

* * * *

প্রেম বস্তুটা এমন একটি স্থানে অবস্থান করে, যেখানে তরুণের অনুভূতি পঁহুছে না। হাতের কাছে সে যাহা পায়, তাহা প্রেম নহে—প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির ঝোঁকে ঘা লাগিলেই উহার ভৌতিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

সত্যেন বাড়ী ফিরিয়া সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সরস্বতীর অদর্শনটা তাহাকে আঘাতই করে নাই।

এক দিন মা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সত্যেনের এক অদ্ভুত-মূর্ত্তি তাঁহার চোখে পড়িল। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি রে—গায়ে কম্বল, পায়ে খড়ম ?"

বুঝি বা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াই সত্যেন আসরে নামিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে সহজ, মৃদু, তরল হাস্যতরঙ্গ তাহার আননে উদ্ভাসিত হইল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

মা মুখখানা ভার করিয়া আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন. "যত অনাছিষ্টি ছেলের !" তাঁহার কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, যেন মনের কোণে এক গোপন কাঁটা খচ্ করিয়া উঠিয়াছে !

সে দিন আর কোন উৎপাত ঘটিল না। পরদিন সকাল হইতেই মা বাক্স খুলিয়া একখানা শাল বাহির করিলেন, এবং উহা লইয়াই সত্যেনের ঘরে ঢুকিতেই আবার যে দৃশ্যটা তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাঁহার মুখখানা শাকমূর্ত্তি ধারণ করিল। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "এই ঠাণ্ডায় মেঝেয় শোওয়া হয়েছে কম্বল পেতে !—ওঃ মা ! মাথায় ইট ! সন্ন্যিসী হবি নাকি ?"

এক চাপা-লজ্জার বেগ হাসির আঘাতে হঠাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে সত্যেন কহিল, "কত গরম হয় জান ?"

"না, তোমার পেটে আমি—জানবো কি ক'রে বল !—শালখানা গায়ে দে দিকিন, পোকায় কেটে সব নষ্ট করলে !" বলিয়াই মা গাত্রবস্ত্রখানা সত্যেনের গায়ে ফেলিয়া দিলেন।

সত্যেন তৎক্ষণাৎ উহাকে আলনায় রাখিয়া বলিল, "কম্বলের কাছে শাল ?"

"যা হয় করো, বাবা"—অন্ধকার-মুখে মা চলিয়া গেলেন। কিন্তু, বেশীক্ষণ নহে। ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া মূর্ত্তিমানের আর এক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে ও আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেলি কি ও ?"

মুখের ভিতরটা পূর্ণ ছিল, কথা কহিতে গিয়া মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। প্রাণপণে সে ভাবটা চাপিতে চাপিতে সত্যেন জবাব দিল, "নিমপাতা।"

মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা গো, মা ! নি—ম পাতা খেলি তুই ? ক্ষেপলি না কি ?"

"শরীর ভালো থাকে !"

"তা থাকবে বৈ কি ! পাশ দিয়ে এসেছ !" বলিয়াই মা ছেলের দিকে এক প্রকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। সংসারীর পক্ষে এ সকল যে শোভন নহে, তাহা জননীর দৃষ্টিতে অব্যক্ত রহিল না। একটু পরেই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, একবার দু'লেপাড়ায় যা দিকিন—"

"কেন ?"

"পাল্কী করতে—কাল দিন হয়েছে বৌমাকে আনবার।"

"বেশ রাঁধতে শিখিছি, মা! আমিই তোমাকে রেঁধে দোবো।" বলিয়াই সত্যেন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরেই একখানা পাল্কী আসিয়া নামিল। সত্যেন তখন বাহিরে গিয়াছিল, অঙ্গে কম্বল, সঙ্গে লোটা। সে ফিরিতেই মা বলিলেন, "শীগগির খেয়ে নে—শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে। শাশুড়ী তোর মর-মর।"

সত্যেন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "কি করব আমি? ডাক্তার নই ত!"

মা যেন রাগিয়া উঠিয়াছেন, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুব পণ্ডিত! মাগী মরছে—শোনো কথা! ছেলে আছে তার, না, আর ঝি-জামাই আছে?" বাস্তবিক সরস্বতীই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান।

সত্যেন এবার হটিয়া গেল। খানিক কি ভাবিয়া বলিল, "তবে হেঁটে যাবো আমি—পাল্কী ফেরৎ দাও! ভারি ত রাস্তা!"

মা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পাল্কী ফেরৎই গেল।

আহারান্তে নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সত্যেন শ্বশুরবাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল—সেই পোষাক, সেই বেশ—পায়ে খড়ম, গায়ে কম্বল। ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক—শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় পাড়ার মেয়েদের বাড়ীতে ভিড় হয়—তাহারা মুখে কাপড় দিল! মায়ের ত হাড় জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য করিলেন না, পাছে ছেলে আবার বাঁকিয়া বসে! সত্যেন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অতঃপর ঊর্দ্ধনেত্রেই যাত্রা করিতে যেমন উদ্যত হইবে, বউদিদি-সম্পর্কীয়া দুইটি প্রগল্‌ভা তরুণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো—এ দু'টো?"

মুখ নামাইতেই সত্যেনের চোখে পড়িল—এক জনের হাতে এক 'লোটা', অপরের হাতে এক চিম্‌টা!

সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হাসির উচ্চরোল সত্যেনকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিল।

* * * *

মাইল চারেক রাস্তা অতিক্রম করিতে সত্যেনের বেশীক্ষণ সময় লাগে নাই। বলা বাহুল্য, রাস্তায় তাহাকে খালি-পায়ে হাঁটিতে হইয়াছিল। গ্রামে প্রবেশ করিবার মুখে সে খড়ম-জোড়াটাকে কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ধূলায় চুবাইয়া পায়ে দিল।

প্রথমেই মুসলমানপাড়া। রাস্তার উপর একটা 'মসজিদে' 'নেটোর' গানের মহলা চলিতেছিল। সত্যেনের মূর্ত্তিটা চোখে পড়িতেই এক পাকা-দাড়ি পাশের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়, আল্লারাখা?"

আল্লারাখা ঠাওরাইয়া-ঠাওরাইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও বিদ্রূপকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওনাদের জামাই গো, চাচা—বামুনদের!"

"তোবা, তোবা! আল্লার চিড়িয়া!"

সত্যেন পায়ে জোর দিল। কিন্তু খানিক গিয়াই তাহার গতি মন্দ হইয়া পড়িল, পায়ের আঙ্গুলগুলা খড়মের গুলোয় কাটিয়া পড়িতেছে।

তার পর দুলেপাড়া। রাস্তার উপরেই কতকগুলা দুলে এক রমণীকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার রসিকতা করিতেছিল। সত্যেনকে দেখিয়াই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দূরে দাঁড়াইয়া দু'এক জন সবিস্ময়ে পরস্পরের ভিতর বলাবলি করিল, "ও কোম্বলটা কে?"

একান্ত হইতে আর এক জন বলিল, "পায়ে খটম্ দেখছিস্ নে? ও বৈরিগী।"

কতকগুলো লোক হাতে যেন স্বর্গ পাইল। ব্যাকুলোত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, "ঠাকুর, হাদে এসো ত আপনি, একটা বিচের করবে—" বলিয়া ছুটিয়া কাছে আসিতেই লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সত্যেন দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই জিব কাটিয়া বলিল, "জামাই বাবু যে—কাকে কি বলনু!"

এইবার শ্বশুরবাড়ী! এতক্ষণ বে-পরোয়াভাবে নবীন সন্ন্যাসী পথ চলিতেছিল; কিন্তু শ্বশুরালয়ে প্রবেশের মুখে সত্যেনের বুকের ভিতরটা একবার দুলিয়া উঠিল। পরক্ষণে মুখ নামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া গায়ের কম্বলখানাকে সগর্ব্বদৃষ্টিতে একবার দেখিয়াই খড়মের এক অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া দ্বার-পথে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই শাশুড়ী ঠাকুরাণী—তিনি উঠান দিয়া একটি চালের ঝুড়ি কাঁখে করিয়া ও-ঘরে যাইতেছিলেন। বাবাজীবনকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি ঝুড়ি নামাইয়া ঈষৎ মুখ আড়াল করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "এস বাবা!"

"জামাই" আসিবার সময় হইয়াছে—অদূরে রান্নাঘরের দুয়ারে পাড়ার মেয়েরা জমা হইয়াছিল। তাহাদের কেহ কাসিল, কেহ হাঁচিল, কেহ বা সশব্দে হাই তুলিল—বিমুখ হইয়া!

সত্যেন যথারীতি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ত খুব অসুখ—বাড়াবাড়ি! কেমন আছেন?"

শ্বশ্রূমাতা মাথার কাপড়ের এক প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া বলিলেন, "তোমার মুখটি দেখ্‌লে অসুখ কি থাকে, বাবা! উঠে এসো—"

রোয়াকে উঠিয়া খড়ম খুলিয়া সত্যেন যেমনই দালানে ঢুকিবে, পশ্চাৎ হইতে কে এক জন পায়ে এক ঘড়া জল ঢালিয়া দিল। চমকিয়া সত্যেন মুখ ফিরাইতেই একটি তরুণী খিল্‌-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "পুণ্যি করলাম, ঠাকুর-জামাই—সন্নিসীর পাদপদ্ম!"

সত্যেনের তরফে দাঁড়াইলেন শাশুড়ী ঠাকুরাণী। মুখখানা ভারী করিয়া বলিলেন, "অত কি, বাছা, খোয়ার! ছেলে আমার ত সত্যিই বনে যায় নি!" বলিয়াই মুখে কাপড় চাপিয়া গা-ঢাকা দিলেন।

সত্যেন খোকাটি নহে। স্পষ্টই টের পাইল, আজ আর তাহার নিস্তার নাই। সুতরাং বেগতিক বুঝিয়া সম্মুখের একটি ঘরে সটান ঢুকিয়া পড়িল—তাহারই নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষ। কিন্তু, সেখানেও আবার লোমহর্ষণ বিভীষিকা! দেখিল—মেঝেয় পাতা একখানা বাঘ-ছাল, এক পাশে এক ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে কাঠের আঙ্‌রা, আর এক ধারে গাঁজার একটি কলিকা!

পশ্চাৎ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, "বোসো—"

সত্যেন আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—হাঁচি-টিক্‌টিকিতে দালান ভরিয়া গিয়াছে! দুঃসহ লজ্জায় তাহার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কি করিবে, কোথায় লুকাইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া শয্যার উপরই নিজেকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। ফলে জিৎ হইল তাহারই—একতরফা আসর বেশীক্ষণ টিকিল না। শত্রুপক্ষ সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে রণস্থল ছাড়িয়া গেল।

কিন্তু, গ্রহের জের এখনও কাটে নাই। রাত্রিতে আহার-পর্ব্বে আর এক বিভ্রাট বাধিল। শ্বশুর-জামাই উভয়েরই পাশা-পাশি আসন হইয়াছে—উভয়েই উপবিষ্ট। শাশুড়ী ঠাকুরাণী খাবারের পাত্রটা যেমন তাহার সম্মুখে রাখিয়াছেন, অমনই বাবাজীবন রবারের বলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সব মাছ?—মাছ ত খাইনে!"

শ্বশ্রূমাতাও কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "খাও না? কেন, শুনি?"

সত্যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। কোনও রকমে বলিয়া ফেলিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছ, আবার ধরিয়ে দিচ্ছি" বলিয়াই তিনি তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া পুনশ্চ বসাইতে গেলেন। এরূপ প্রায়ই হইত—নূতন নহে। সত্যেনকে তিনি প্রায়ই খাওয়াইয়া দিতেন। গ্রামের লোক বলিত—সত্যেন সরস্বতীর মায়ের ছেলে!

কিন্তু, সত্যেনের মাথায় ভূত চাপিয়াছে। প্রবলবেগে মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "বমি হয়ে যাবে!"

শ্বশুর মশাই নিরীহ-প্রকৃতির সে-কেলে লোক। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা, খেলে যদি বমিই হয়, বিরক্ত করা কেন?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী হাত ছাড়িয়া দিলেন। মিনিটখানেক স্থিরদৃষ্টিতে সত্যেনের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "খাবে না?"

"না।"

"খাবে না?"

"না—না!"

"আচ্ছা, কালই পুকুর বেচে ফেল্‌বো—কি করতে ও সব!" এক ঝলকে কথাগুলা বলিয়াই শাশুড়ী ঠাকুরাণী আগুনের হল্‌কার ন্যায় রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও এক-কড়া মাছ টান মারিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমিও মাছ ছাড়লাম!" পাশের ঘরে সরস্বতী ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুইও, সরস্বতি, কাল থেকে হবিষ্যি করিস্—যার সোয়ামী ও-রকম, তার আবার সাধ-আহ্লাদ কি?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুর্য্যোগ দেখিয়া সত্যেন ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রির ঘর-সারা মেয়েদের এক বিরাট্ ব্যাপার। কিন্তু এ-বাড়ীতে আজ আর বেশী ঘটা হইল না। মা মেয়েকে দালানে খিল দিতে বলিয়া ও-বাড়ীতে শুইতে গেলেন। সরস্বতী আদেশ পালন করিয়া দালানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; অতঃপর অকারণে দুই একবার চুড়ির আওয়াজ ও সাড়ীর খস্‌খস্ শব্দ করিয়া যেমন ঘরে ঢুকিবে, দেখিল—স্বামি-দেবতা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া মেঝের পদ্মাসনে সোজাভাবে বসিয়া রহিয়াছে—সম্মুখে লণ্ঠনে ঠেসানো একখানা কালীর পট!

রোগের উৎপত্তি কোথায়, সরস্বতীর অবিদিত ছিল না। বিশেষ করিয়া এই একটু পূর্ব্বেকার বিশ্রীকাণ্ডে তাহার মনটা বিষিয়াছিল। রাগে তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। খিলটা আঁটিয়া দিয়াই, এক হাতে ছোঁ মারিয়া পটখানাকে উঠাইয়া লইল ও অপর হাতে কম্বলখানাকে টান মারিতেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়া উহা প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল। সরস্বতীও ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল। অতঃপর এক মারাত্মক কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ছাড়ো বল্‌ছি—"

সেই সরস্বতী! সেই ভুবন-বিজয়িনী মূর্ত্তি—মুখ, চোখ—সব, সব! সত্যেনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল—সেই সে!

"আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ? ছাড়ো—"

"দেখ, দেখ—"

ধমক দিয়া সরস্বতী কহিল, "দেখ্‌বো কি?"

"অনেকটা এগিয়ে পড়েছি"—সত্যেনের দুইটা হাতই ঝুলিয়া পড়িল।

সরস্বতী হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "নইলে আর নিমপাতা ধরেছ—চম্‌কে উঠ্‌লে?" পরক্ষণেই কণ্ঠ তীক্ষ্ণ করিয়া সুরু করিল, "পুরুষমানুষ নও তুমি? লজ্জা হয় নি তোমার? কেন, সরস্বতী কি পালিয়ে গিয়েছিল? স্কুলের ছেলে—তিনটে মাস আর সবুর সয় না?" বলিয়াই বাধাহীন কম্বলখানাকে ছাড়াইয়া লইয়া জানালা খুলিয়া ফেলিয়া দিল।

সত্যেন একটা হাই তুলিয়া বলিল, "যে ঘুম পেয়েছে আমার!"

সরস্বতী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, "এসো, খাবে এসো—মা একবার মুর্চ্ছো গেছে, জানো?"

সত্যেন যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "সর্ব্বনাশ!"

সরস্বতী মুখ নাড়িয়া বলিল, "খোকা! এক দণ্ড আমাকে নইলে ওঁর চলে না!" বলিয়া আড়-চোখের একটু আঁচ ফেলিয়াই খিল খুলিয়া মাকে খাবার দিতে ডাকিয়া আনিল।

তুফান কাটিয়াছে! পুরা পাত্রই তোলা ছিল, সত্যেনকে ধরিয়া দেওয়া হইল—বাবাজীও বিনা-বাক্যব্যয়ে সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী একটু ঠোকা মারিলেন, "ভাগ্যি সরস্বতী হয়েছিল, তাই ত এ সোয়াস্তি!"

* * * *

মাস দু'য়েক পরে সত্যেন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিল। সংশয়ের ভিতর দিয়া দিন কাটিতে কাটিতে এক দিন খবর আসিল, সত্যেন পাশ করিয়াছে—প্রথম বিভাগে! সত্যেন ও সরস্বতী উভয়েই মনে করিল—এ উহাকে জিতিয়াছে। কিন্তু, রেষারেষির এই উৎসব অচিরেই নিবিয়া গেল—সত্যেন কলেজে পড়িবে—কলিকাতায় যাইবে!

আজ দুঃসহ রাত্রি; সকাল হইলেই এক জন এক জনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—এক জন এক জনকে ছাড়িয়া পড়িয়া থাকিবে। * * * রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সত্যেন দেখিল, জানালায় মুখ রাখিয়া সরস্বতী অনাবৃত-মস্তকে বাহিরের দিকে নেত্র পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—যেন সে প্রতিমা! অদূর—দূর—দূরান্তরের গাছপালা, মাঠ, প্রান্তর ভেদ করিয়া দৃষ্টি কোথায় গিয়া কেন পড়িয়াছে, কে জানে? সত্যেন আস্তে-আস্তে উঠিয়া আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল, তবুও তাহার চেতনা নাই। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ডাকিল—'সরস্বতী!'

সরস্বতী দৃষ্টি ফিরাইল—সে দৃষ্টি আকৃতিহীন, অর্থহীন—পৃথিবীর কোনও কাযে আসিবে না! তবুও—

"সরস্বতী—"

"কোন্ দিকে বল্‌তে পার?"

সত্যেন বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কি?" বলিয়াই হাত ধরিল।

সরস্বতীর এইবার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া সরিয়া আসিল।

"বল?" সত্যেন ধরিয়া বসিল।

নিষ্ফল প্রশ্নের যে উত্তরই থাক্ না, শুনিবার এই ত সময়! অবসর আর ত মিলিবে না! সরস্বতী আবার বিহ্বল হইয়া পড়িল! বলিল, "কলকাতা কোন্ দিকে?"

ও ঘরে মা রহিয়াছেন, জোরে হাসিবার সুযোগ নাই। সরস্বতীর হাতে চাপ দিয়া, হাসির বেগ স্তিমিত করিয়া সত্যেন বিদ্রূপভরাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি ঘরে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখ্‌ছিলে?"

"যাও—" সরস্বতী রাগিয়া হাত ছাড়াইয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন এক সময় উভয়েই টের পাইল—তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে! পৃথিবীর এক প্রান্তে এক জন, অপর প্রান্তে আর এক জন, মাঝে—অন্তহীন ব্যবধান!

কিন্তু প্রেমের মূল্য দেয় বিরহই, নতুবা প্রভাস-উপকূল তীর্থ বলিয়া আজিও বাঁচিয়া থাকিত না! পূজার ছুটী আসিল—সত্যেন বাড়ী আসিবে! তাহার অফুরন্ত আশা, সীমাহীন আশ্বাস! তাহার মনে হইতে লাগিল—বুকে সরস্বতীর ছবি যেন মুহুর্ম্মুহুঃ ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! এত পাওনা তাহার ত ছিল না! ওদিকে সরস্বতীরও দিন কাটে না—কিন্তু, এমন দিন কি আর আসিবে? তাহার মনে হইতে লাগিল—সমস্ত ব্যর্থ হউক, এইটুকুই আজ থাক না—সে আসিবে!

মিলন হইল। সেই মুহূর্ত্ত, সেই দিন, সেই মাস দুইটি প্রাণী ভোর হইয়া রহিল। তার পর আবার সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রা!

ছুটী ফুরাইল। আবার সেই বিদায়ের শোকোৎসব! ফের ছুটী আসিল, আবার—সব সেই, সেই সব!

এইরূপে প্রায় বছর পাঁচেক অতিবাহিত হইয়াছে, তখন সত্যেন বি, এ পাশ করিয়া এম, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছে। এমনই সময়ে তাহার চোখে মুখে এক প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল, যেন ঈষৎ লজ্জা, এতটুকু দুশ্চিন্তা তাহার গায়ে ছায়া ফেলিয়াছে, যেন কখন্ কোন্ ফাঁকে চরাচরের সমস্ত বিদ্রূপ, সারা সর্ব্বনাশ তাহাকে দেখিয়া হাততালি দিয়া উঠিবে!

অতঃপর এক দিন এক পরিষ্কার দিবসের অতি স্পষ্ট সন্ধ্যায় মায়ের একখানি চিঠি আসিল—তাহার একটি খোকা হইয়াছে; যাহার মুখে তাহারই মুখ, চোখে তাহারই চোখ, হাসিতে তাহারই অবিকল হাসিটি!

নিশীথ রজনীতে সত্যেন হঠাৎ উঠিয়া আলো জ্বালিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবারই চিঠিখানা পড়িল। তার পর ক্ষণেক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ছাদে উঠিয়া গেল। তার পর, অর্দ্ধমৌন শ্বেতরাত্রির অন্তিম কিনারায় অবলোকন করিল—এক অতি তরুণ হাসি-খেলায় সবেমাত্র প্রাণ সঁপিয়াছে, অকস্মাৎ এক শিশু আসিয়া বুকে পড়িল! সত্যেন তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল, মনে মনে বলিল—ছিঃ!

ঠিক এই সময়ে বর্ম্মায় রেলওয়ে কন্‌ষ্ট্রাক্‌সনে বিস্তর কেরাণী প্রয়োজন হয়—যোগ্যতা অনুসারে বেতনও লোভের। কলেজ ছাড়িয়া, সত্যেনের অনেক সতীর্থই চাকরী লইয়া বর্ম্মা যাত্রা করিল। সত্যেনও কি মনে করিয়া তদনুসরণ করিল—গোপনে! বাড়ীর লোক যখন খবর পাইল, তখন সে বর্ম্মায় পৌঁছিয়াছে। শুনিবামাত্র মা কান্নাকাটি করিলেন, সরস্বতী নির্জ্জনে সরিয়া গেল। কিয়দ্দিন পরেই সত্যেনের চিঠি আসিল, তখন সকলে একটু আশ্বস্ত হইল। তার পর, ক্রমশঃ ব্যাপারটা সাধারণ পুরাতন ইতিহাসের মতই সকলের কাছে ঠেকিতে লাগিল।

চিঠিপত্র সত্যেন নিয়মিতই দিতে সুরু করিল, এবং ছুটী হইলেই বাড়ী ফিরিবে, এই আশ্বাস সে প্রত্যেক চিঠিতেই দিতে লাগিল। কিন্তু, বছর ঘুরিয়া গেল, সে আসিল না। জানাইল—কাযটা প্রায় শেষ হইয়াছে, হইলেই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। দেখিতে দেখিতে, এক, দুই—তিন বৎসর অতিবাহিত হইল, তত্রাপি তাহার দেখা নাই। মা কান্নাকাটি করিয়া পত্র দিলেন, ভয় দেখাইলেন—নিজে গিয়া পড়িবেন। সত্যেন বুঝাইয়া পত্র দিল—দৈবদুর্ব্বিপাকে কাযটা একটু পিছাইয়া পড়িয়াছে, আর বছর দুয়েক লাগিবে; ইতিমধ্যে ফিরিবার উপায় নাই—এগ্রিমেণ্ট দিতে হইয়াছে। কি করিবেন—মা নিরস্ত হইলেন।

দিন, মাস, বৎসর করিয়া মেয়াদটা ফুরাইয়া গেল। সত্যেনের চিঠি আসিল—এইবার তাহারা দেশে ফিরিবে! মা অত্যধিক হর্ষে কাঁদিয়া ফেলিলেন, সরস্বতী ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিল! পলাতক দেশে ফিরিবে!

তবুও দেরি! এমাস ওমাস করিয়া প্রায় ছ'মাস কাটিয়া গিয়াছে, এক দিন এক গ্রীষ্মের প্রথম রাত্রিতে বাড়ীর দরজায় একখানা গরুর গাড়ী আসিয়া থামিল। মা আলো লইয়া ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার হারানিধি ফিরিয়া আসিয়াছে! সরস্বতী ওবাড়ীতে ছুট দিল।

সত্যেন বাড়ী প্রবেশ করিল—সেই বাড়ী! ঢুকিল—সেই নিশ্বাস! * * * বসিবার যায়গা দিয়াই মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "খাটে কে শুয়ে, দেখলি?"

সরস্বতী চোরা পায়ে আসিয়া বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, একটানে একহাত ঘোমটা টানিয়াই তড়িদ্বেগে ঘরে আসিয়াই 'মায়ের' কাণে কাণে কি বলিয়াই তেমনই খরবেগে আবার বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে এক তৃপ্তির বর্ণ-প্রলেপে মায়ের মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখখানা অসম্ভব ভারি করিয়া বাণিয়া

উঠিলেন, "সত্যি বাছা—আমি পারবো না ও ছেলেকে! অত বদ্ তোর ছেলে—সারাদিন রোদে বেড়াবে, আর জলে গিয়ে 'ছত্রিশটে' ডুব দেবে টুপ্-টুপ্ কোরে!"

"মা, আমায় খাবার দাও—" সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় খাটের দিকে একবার তাকাইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া গেলেন, "ঘুমিয়ে পড়লো—পেটটা প'ড়ে রয়েছে! ও কি কথা শোনে কারুর!"

আহারে বসিয়াই সত্যেন প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আহারান্তে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন যেন নূতন করিয়াই সে দেখিল—সর্ব্ববাদি-সম্মত তাহারই বিছানাটি এক কচি দেহ অধিকার করিয়া রহিয়াছে—উহার ভ্রূক্ষেপও নাই! ভাবিল, ও আবার কে? অবিলম্বেই কে যেন তাহার কাণে কাণে জবাব দিয়া গেল—'সন্তান!'

ঘরের এক কোণে একটা মাদুর ছিল—সত্যেন টানিয়া লইয়া মেঝেয় পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরেই সরস্বতী আসিল—তাহার পরিধানে এক খানা অর্দ্ধমলিন শাড়ী, হাতে একটি পাত্রে খান চারেক লুচি ও দুইটি সন্দেশ। স্বামীকে ওরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া খাটের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিল, "এখন কি খাবে—ঘুমিয়ে কাদা হয়েছে! থাক্—" বলিয়া মাথার জানালায় খাবারটা রাখিয়া ঘরে খিল দিয়া ছেলের কাছে শুইয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে এক অযাচিত রোষ ও অভিমানে সত্যেনের সর্ব্বদেহ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। ভাবিল—এই কি তাহার প্রাপ্য? এত দিন পরে বিশ্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে যে বাড়ী আসিল, এই কি তাহার প্রতিদান? এমন ত এক দিন ছিল না! সেই ত সে—সেই ত ও! ঘরে আসিয়াই, যাহার বুকে ও ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহারা হইত—তাহাকেই আজ এত অবহেলা? একটা কথা বলিয়াও বড়লোক করিল না? ছেলে?—এমনই ও কি জিনিষ—

সত্যেনের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। কাহার উদ্দেশে কি এক অস্ত্র ধরিয়াছিল, আঘাতে নিজেরই একটা অঙ্গ খসিয়া গেল। ঘরে আর তিষ্ঠিতে পারিল না—খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ বেড়াইল, কিন্তু সোয়াস্তি কোথায়? আবার ফিরিল।

ঘরে ঢুকিতেই সরস্বতী বলিল, "বাইরে গেলে? গরম বড্ডো?"

মাত্র এই? এত দিনের পর এইটুকুই পুরস্কার? সত্যেন তাড়াতাড়ি বলিল, "না! হাঁ্যা, তাই!"

"খোকাকে দেখলে না—"

"মা! বাপি এয়েছে?"—ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়্-মড় করিয়া খোকা উঠিয়া বসিল।

মাথার গোড়ায় প্রদীপ ছিল, সরস্বতী আলো আনিয়া স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া খোকাকে দেখাইল—"ওই দেখ্—দেখছিস্?"

খোকা চোখ নামাইল, যেন কত লজ্জায়!

"লজ্জা হয়েছে তোমাকে দেখে! সন্ধ্যে থেকে কেবল বলেছে 'মা, এলো না' 'মা, এলো না?' কিচ্ছুটি খায়নি—'সঙ্গে খাবো'!"—সরস্বতী স্বামীর পানে তাকাইল।

সত্যেনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—সরস্বতীর এ কি রূপ? কাহাকে সে প্রবৃত্তির ঝোঁকে দেখিতে চাহিয়াছিল, পশুর মত? ও যে আজ ছেলের মা—পুরুষের খোরাক নহে ত!

সরস্বতী চোখ নামাইয়া খোকার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আদরে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে রে?"

"বাপি—"

"এঁ্যা—?"

"বা—পি—"

"একবার কোলে নাও! এসো—" সরস্বতী খোকাকে একটু আগাইয়া দিল। কেন জানে না, সত্যেন অগ্রসর হইল। তবে স্পষ্ট বুঝিল—বিছানায় উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সে হাত বাড়াইল। বিস্তৃত বাহুর সাহায্যে সে সম্মুখের বিস্ময়-পুলকিত, নবনীত-কোমল দেহকে বুকের উপর টানিয়া আনিল। এ কি বিচিত্র অনুভূতি! এ কি ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ! এ অভিজ্ঞতা ত তাহার কখনও ছিল না! বাস্তব জগতে তাহার চিত্ত ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল, অধীর বেষ্টনে তাহার হৃৎপিণ্ডকে সে বুকে ধরিয়া রহিয়াছে।

শ্রীচরণদাস ঘোষ।

সোনার পাহাড়

চতুর্স্রিংশ পরিচ্ছেদ
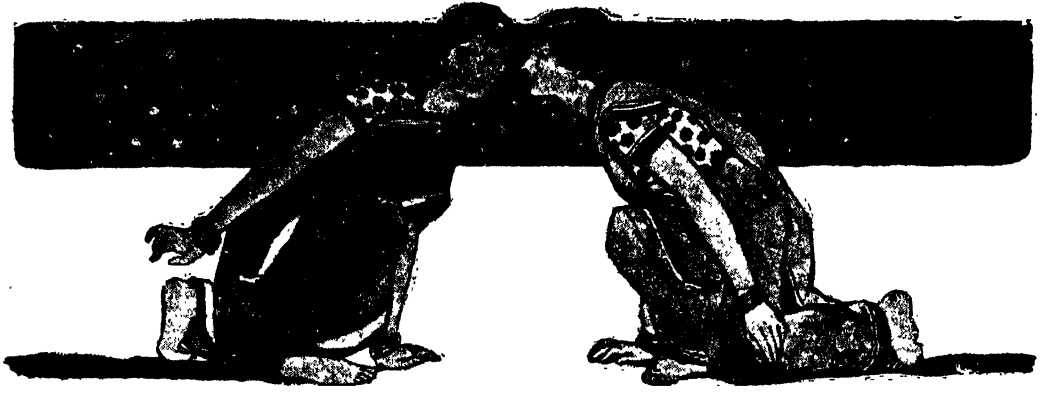
সোনার পাহাড়ে

দুই সপ্তাহ পরে এক দিন সায়ংকালে আমরা একটি সুবৃহৎ নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম; আমার কৃষ্ণাঙ্গ অনুচররা বলিল—এই নদীর নাম আইকা। এই নাম শুনিয়া আমরা আনন্দে বিহ্বল হইলাম; কারণ, আমরা জানিতাম, আইকা নদী পার হইয়া কিছু দূর যাইলেই সোনার পাহাড়ের সন্ধান মিলিবে, আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইবে। আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ অসংখ্য বিপদ্ অতিক্রম করিয়া আইকা নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছি—আর কয়েক দিন পরেই আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব, আমাদের সকল শ্রম সফল হইবে। সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া কিরূপ দৃশ্য আমাদের নয়ন-গোচর হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইল। মনে হইল, যদি আমরা সেখানে বিপুল স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও দেশে ফিরিতে পারিব; জীবনের যুদ্ধে আমরা জয়ী হইব।

আইকা নদীর বিস্তার অত্যন্ত অধিক। আমরা নদীতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ইহা প্রবল বেগে ঠিক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার উভয় তীরে গভীর অরণ্যশ্রেণী বিরাজিত; লিয়ানা ও অন্যান্য লতা আরণ্য বৃক্ষগুলিকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে প্রসারিত; কতকগুলি লতা জলে পড়িয়া ভাসিতেছিল। এই অরণ্যের গম্ভীর শ্রী ও শ্যামল শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই সকল অরণ্যে অসংখ্য পশু-পক্ষী বিরাজিত। যদি আমরা পূর্ব্বে বিভিন্ন অরণ্যে এইরূপ বহু জাতীয় পশু-পক্ষী না দেখিতাম—তাহা হইলে এই অরণ্যশ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইতাম। যাহারা এই সকল বিশাল অরণ্যের শোভা দর্শনে অভ্যস্ত, নগরের শোভা তাহাদের নয়নমন পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল অরণ্য সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু যাহারা বিধাতার সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী এবং মহা-সমুদ্রের অকূল বিস্তার না দেখিয়াছে, হৃদয় দিয়া সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ না পাইয়াছে—তাহাদের জীবন বিফল হইয়াছে। তাহারা কৃপার পাত্র।

নদীতীরে কর্দ্দমপূর্ণ অনেক ডোবা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল ডোবার কর্দ্দমরাশিতে বিশালদেহ কুম্ভীরের দল পড়িয়া আছে; বোধ হয়, তাহারা দিবাভাগে সেখানে পড়িয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল। কুম্ভীরগুলির আকার দেখিয়া মনে হইল, তাহারা আস্ত মানুষ অনায়াসে গিলিতে পারে, যেন এক একটা লম্বা কালো কাঠের গুঁড়ি! সন্ধ্যা-সমাগমে নানা জাতীয় বানর বৃক্ষের শাখায় শাখায় লাফাইয়া বেড়াইতেছিল এবং তাহাদের বিচিত্র চীৎকারধ্বনিতে নদীতীর মুখরিত হইতেছিল। সহস্র সহস্র পক্ষী অরণ্য-সন্নিকটে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কি সুন্দর তাহাদের বর্ণ! আমার মনে হইল, সহস্র সহস্র উজ্জ্বল রত্ন পক্ষলাভ করিয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে!

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে অরণ্যমধ্যে দলে দলে পশুরা গর্জ্জন আরম্ভ করিল, অন্য দিক্ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র জলদগম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিতে লাগিল, তাহাদের বিকট

গর্জনে আমাদের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। ইহার উপর নানা জাতীয় সরীসৃপ চারিদিকে কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প যে কত, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা অসাধ্য। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যরা অরণ্য হইতে যে কাঠের সুদীর্ঘ লাঠী সংগ্রহ করিয়াছিল—তাহার আঘাতে আমরা বহু সর্প নিহত করিয়া সেই সকল লাঠীর সাহায্যেই নদীতে নিক্ষেপ করিলাম। শুনিলাম, নদীতে এক জাতীয় সর্পভোজী মৎস্য আছে, তাহারা সেই সকল সর্প পরমানন্দে ভোজন করিবে।

রাত্রিকালে নদীতীরে তাম্বু খাটাইয়া সেখানেই আমরা রাত্রিবাস করিলাম; নদী পার হইবার জন্য আমাদের এতই আগ্রহ হইয়াছিল যে, কখন্ প্রভাত হইবে—এই চিন্তায় সুনিদ্রা হইল না; অর্দ্ধ-নিদ্রায় অর্দ্ধ-জাগরণে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পূর্ব্বাকাশ উষালোকে আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই নদী পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ আমাদের সুপ্রভাত, আজ আমাদের দীর্ঘকালের স্বপ্ন সফল হইবে, আমরা সোনার পাহাড়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিব; এই আশায় মহা উৎসাহে সেই প্রশস্ত নদী পার হইলাম। নদী প্রশস্ত এবং স্রোতঃ প্রখর হইলেও আমরা যে পাত্‌লা নৌকাখানি সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে নদী পার হইতে কষ্ট বা অসুবিধা হইল না, তবে নৌকায় অধিক লোকের স্থান না থাকায় আমাদের সকলের অপর পারে যাইতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হইল; কিন্তু উপায় কি? পিটার ডনকুমের নির্দেশ অনুসারে নদী পার হইয়া আমরা উত্তরমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের আশা ছিল—[illegible] দূরেই আমরা কোকোয়েটা নদী দেখিতে পাইব। কোকো[illegible] আইকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নদী এবং ইহা আইকারই একটি শাখা[illegible]

নদী পার হইয়া আমরা অরণ্যে প্রবেশ করিলাম; অরণ্যের নিম্নভাগ কণ্টকপূর্ণ গুল্মে ও লতায় এরূপ সম[illegible] যে, প্রতি পদক্ষেপে আমরা বাধা পাইতে লাগিলাম। [illegible] সকল গুল্ম ও জটিল লতাজাল অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করিয়া [illegible] দিগকে পথ করিতে হইল; এই কার্য্য এরূপ কষ্টস[illegible] সময়সাপেক্ষ যে, আমরা অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হইতে [illegible] হইলাম। আমরা সেই অরণ্যের ভিতর পথ খুঁজিয়া [illegible] করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোন দিকে পথের [illegible] পাইলাম না। আমার মনে হইল, সৃষ্টির আদিযুগ [illegible]

এ কাল পর্য্যন্ত কোন মনুষ্য এই অরণ্যে প্রবেশ করে নাই; আমরাই সর্ব্বপ্রথম সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের পরে আর কখন কেহ এই মহারণ্যে প্রবেশ করিবে কি না, একমাত্র মহাকালই তাহা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে এরূপ দুরূহ হইল যে, মধ্যাহ্নকালেও আমরা অদূরবর্ত্তী কোকোয়েটা নদীতীরে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমরা চলিতে চলিতে একটি মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একটি বিল ছিল। এই বিলের জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। বিলের ধারে উপস্থিত হইয়া একটি অদ্ভুত দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম। এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনের সুযোগ জীবনে কদাচিৎ পাওয়া [illegible] আমরা একটি দীর্ঘশৃঙ্গ সুদৃশ্য হরিণকে সেই বিলে [illegible] জলপান করিতে দেখিলাম; তাহার পর [illegible] উপর চাহিতেই দেখি, লম্বা ঘাসের [illegible] বসিয়া আছেন—এক বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্র [illegible] বিশালদেহ বলবান্ ব্যাঘ্র জী[illegible] বাঘ-টার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হই[illegible] জলপাননিরত হরিণটার উপর লাফ[illegible] ভীষণ দৃশ্য এরূপ সুন্দর যে, আমরা [illegible] সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, দৃষ্টি [illegible]ল না। চিত্রে এরূপ দৃশ্য অনেক [illegible]জীবন্ত দৃশ্যের সহিত তাহার [illegible] তুলিকায় সেই ভঙ্গী, সেই মাধুর্য্য [illegible]

[illegible] দেখা যায়, বলবান্ চিরদিনই দুর্ব্বলকে [illegible] করিয়া জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে; প্রবলের [illegible] নিপতিত হইয়া দুর্ব্বলের মৃত্যু যেন বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। বলবান্ সর্প দুর্ব্বল ভেককে আক্রমণ করিয়া গ্রাস [illegible]তেছে; আবার সর্পভোজী প্রকাণ্ডকায় বনবিহঙ্গ সেই [illegible]বান্ সর্পকে তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে নিহত করিয়া ভক্ষণ [illegible]তেছে। প্রাণধারণের জন্য আদিকাল হইতে প্রাণি[illegible]র মধ্যে এইরূপ সংগ্রাম অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। এই [illegible]র অরণ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলাম না। [illegible]বিলাম, হরিণটারই বা অপরাধ কি, আর বাঘটাই বা কি [illegible]ক্ষয় করিয়াছে? এক জন আর এক জনের ভক্ষ্য কেন? [illegible]যাহা হউক, এই সকল তত্ত্বকথা দীর্ঘকাল আমার মনে [illegible]পাইল না; আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই চতুর ব্যাঘ্রের

শিকারকৌশল দেখিতে লাগিলাম। সে তাহার দীর্ঘ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু হরিণ তাহার বিপদের কথা জানিতে পারিল না, সে নত-মস্তকে বিলের জলে মুখ নামাইয়া জলপান করিতে লাগিল। হরিণটিকে দেখিয়া লোভে আমাদের কয়েক জন শ্বেতাঙ্গের জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল, এবং আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ অনুচরগণ সেই বাঘটি দেখিয়া সেইরূপই লুব্ধ হইল; কারণ, হরিণের মাংস আমাদের যেরূপ সুখাদ্য, এই সকল কৃষ্ণাঙ্গ, ব্যাঘ্রের মাংসও সেইরূপ মুখ-রোচক মনে করে। এরূপ [illegible]লাসের খাদ্য তাহাদের আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ বাঘের [illegible]রম টাট্‌কা রক্ত পানের জন্য তাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত [illegible] তাহারা মনে করে—বাঘের টাট্‌কা রক্ত পান করিলে [illegible]ই সাহসী ও বলবান্ হইয়া থাকে। অতএব [illegible]—সেই ব্যাঘ্র ও হরিণ উভয়কেই আমরা বধ ক[illegible] আমরা বন্দুক তুলিয়া উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া এক[illegible]। কয়েকটা গুলী হরিণের দেহে বিদ্ধ হইল [illegible]ই শূন্যে লাফ দিল, এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী [illegible]ইল। বাঘটাও গুলী খাইয়া সম্মুখে লাফাইয়া [illegible]দিগকে আক্রমণ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল; [illegible]নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া তাহার সামর্থ্যে কু[illegible]-পথেই ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু তখনই মরিল [illegible]ার লাফ দিয়া আমাদিগকে আক্রমণোদ্যত [illegible] র্ব্বার গুলী খাইয়া আমাদের কিছু দূরে থা[illegible] পড়িয়া গেল। সেই সময় সে এরূপ গম্ভীর স্বরে[illegible] করিল যে, তাহার সেই গর্জ্জনধ্বনিতে অরণ্য প্রান্তর [illegible] কাঁপিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া গাছে গাছে পাখীগুলি কলরব করিয়া চঞ্চলভাবে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, বানরগুলা ভয় পাইয়া কিচ্‌ মিচ্‌ শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় লাফালাফি করি[illegible] লাগিল, কতকগুলি বা এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পলা[illegible] করিল। এমন কি, কয়েকটা বৃহদাকার কুম্ভীরও জলের ভি[illegible] হইতে মাথা তুলিয়া মুখব্যাদান করিতে লাগিল। আ[illegible] ব্যাঘ্র কয়েক মিনিট অনবরত ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ক্লান্ত হ[illegible] পড়িল, তাহার আর্ত্তনাদে হৃদয়ভেদী গভীর যন্ত্রণা পরি[illegible] হইয়া উঠিল; কিন্তু মরণাহত ব্যাঘ্রের ক্রোধের লাঘব[illegible] না। মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে সবেগে লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে লাগিল, তাহার চক্ষু দুটি অগ্নিময় ভাঁটার মত জ্বলিতে লাগিল। সে তাহার অন্তিম শক্তিতে নির্ভর করিয়া পুনর্ব্বার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আমাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে তৃণপুঞ্জের ন্যায় আমরা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইলাম। সে আমাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া আমাদের একটি কৃষ্ণাঙ্গ অনুচরকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার মস্তকটি মুখে পুরিল; তাহার পর সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণদন্ত দ্বারা এরূপ চাপ দিল যে, সেই হতভাগ্যের মস্তক ডিম্বের খোলার মত চূর্ণ হইল। চক্ষুর নিমেষে আচম্বিতে এই দুর্ঘটনা ঘটিল; তাহা এতই আকস্মিক যে, আমরা সেই হতভাগ্য অনুচরের জীবন-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমরা অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলাম, এবং আর এক গুলীতেই তাহাকে নিহত করিলাম। আমাদের বিশ্বস্ত অনুচরের তখনও শ্বাস বহিতেছিল, কিন্তু তাহার মস্তক চূর্ণ হওয়ায় জীবনের আশা ছিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইল, এত অল্পসময়ে এরূপ ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিবে, ইহা আমরা মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা করিতে পারি নাই। তবে সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু ছিল যে, সেই হতভাগ্য অনুচরকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; কারণ, তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ হওয়ায় তাহার যন্ত্রণাবোধের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার স্বদেশীয় সহচরগণ তাহার [illegible]ত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া তাহার ভূলুণ্ঠিত [illegible]হের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে বসিয়া পড়িল, এবং এরূপ [illegible]ভেদী শোক-সঙ্গীতে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল [illegible] আমাদের অশ্রু সংবরণ করা দুরূহ হইল। দশ মিনিট [illegible] অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হইল। মুহূর্ত্তের [illegible]ও তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই।

[illegible]হচরের মৃত্যুর পর তাহার স্বদেশবাসীরা তাহার অন্ত্যেষ্টি-[illegible]র ব্যবস্থা করিল। তার পর তাহার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া [illegible]রিতে লাগিল, ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারই একটি অপরিহার্য্য [illegible] এই সকল কার্য্য শেষ হইলে তাহারা কিঞ্চিৎ শান্ত ও [illegible]হইল এবং বাঘটার চামড়া ছুলিতে লাগিল। এই সময় [illegible]া বাঘটাকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া কতকটা তৃপ্তি-[illegible] করিল। বাঘের চামড়া ছুলিয়া সেই চামড়া দিয়া

তাহারা তাহাদের সহচরের মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিল, এবং তাহার বর্শা ও কুঠার মৃতদেহের পাশে রাখিল; পরে কিছু খাদ্য ও কয়েকখানি তালপাতা সঙ্গে দিয়া নদীতীরে তাহাকে সমাহিত করিল। আমাদের হতভাগ্য অনুচরের কোন দ্রব্যই আমাদের নিকট থাকিল না, থাকিল কেবল তাহার স্মৃতি। তাহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইল। আমার মনে হইতে লাগিল, মনুষ্যের জীবন এইরূপ অস্থায়ী; কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে সুস্থ ও সবল ছিল, তাহার আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান রহিল না। বস্তুতঃ এই মহারণ্যে আমরা প্রতিপদে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছি; আমাদের কাহার কখন্ মৃত্যু হইবে, তাহা অল্পকাল পূর্ব্বেও জানিবার উপায় নাই!

অনুচরের মৃতদেহ সমাহিত হইলে আমরা হরিণটির চর্ম্মোৎপাটনে মনঃসংযোগ করিলাম। অতঃপর হরিণের দেহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাংস আমরা আহারের জন্য সংগ্রহ করিলাম। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে বেলা অনেক অধিক হইল, এ জন্য আমরা সেই স্থানেই তাঁবু ফেলিয়া রাত্রিবাসের সঙ্কল্প করিলাম। আমরা একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিতে অনেকখানি মাংসের 'শিক-কাবাব' করিলাম। দেশীয় ভৃত্যেরা ব্যাঘ্রের মাংসেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিল। তাহারা ব্যাঘ্রমাংস দগ্ধ করিয়া প্রত্যেকে এত অধিক পরিমাণে ভোজন করিল যে, আমার আশঙ্কা হইল, তাহারা পেট ফুলিয়া মরিয়া যাইবে। সেই অর্দ্ধদগ্ধ মাংসগুলি তাহারা মহানন্দে রাক্ষসের [illegible] গিলিতে লাগিল। কিন্তু অপরিমিত মাংসভোজনে [illegible] অসুস্থ হইল না। ভোজনাবসানে তাহারা এরূপ গ[illegible]র নিদ্রায় অভিভূত হইল যে, সারারাত্রির মধ্যে তা[illegible] কাহারও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। পরদিন [illegible] সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে তাহাদের নিদ্রাত্যাগ হইল, মাংসভো[illegible]র ফলে তাহাদের উৎসাহ-উদ্যম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।

প্রভাতেই আমরা পুনর্ব্বার গন্তব্যপথে যাত্রা [illegible] করিলাম, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সেই সময় সমস্ত [illegible] আচ্ছন্ন হইল। তাহার পর আমরা কিছু দূর অগ্রসর [illegible] প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা আরম্ভ হইল; সেরূপ ভীষণ ঝটি[illegible] এই প্রকার গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলেরই বিশেষত্ব। ঝটিকার বিরাম না হইতেই এরূপ প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, মনে হইল, বৃষ্টির তোড়ে আমরা ভাসিয়া যাইব; আমরা সেই বর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার আশায় তালপাতা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিলাম। দুই ঘণ্টার পর ঝড়-বৃষ্টির নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু অতিবর্ষণে সেই বিস্তৃত বনভূমি এরূপ সিক্ত ও দুর্গম হইল যে, চলিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

এক ঘণ্টা পরে আমরা কোকোয়েটা নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এত দিনে আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমণের এক পর্ব্ব শেষ হইল। কোকোয়েটা নদীর বিস্তার তেমন অধি[illegible] না হইলেও বৃষ্টির জলে তাহার উভয় কূল ভাসিয়া গি[illegible] এবং জলরাশি গভীর গর্জ্জনে প্রচণ্ডবেগে [illegible] হইতেছিল। ডনকুমের নির্দ্দেশানুসারে [illegible] দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে এই নদীর অনুসর[illegible] হইবে। তাহার পর 'সূর্য্যোদয়ের দিকে' [illegible] যাইতে হইবে। আমরা সারাদিন নদী[illegible]লাম, অবশেষে সন্ধ্যা অতীত হইল; কিন্তু ন[illegible]নে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে উপ[illegible] পারিলাম না। আমরা চলিতে চলিতে [illegible]র মৃত্তিকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। মৃ[illegible] প্রচুর প্রস্তর মিশ্রিত দেখিলাম; অনেক [illegible] কাটিয়া চৌচির হইয়াছিল, এবং তৃণ ও ল[illegible] বিরল হইয়া আসিয়াছিল। সেই রাত্রিতে আ[illegible] পার্ব্বত্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বর্ষার [illegible] নদীর অশ্রান্ত গর্জ্জন সারা রাত্রি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই প্রদেশের মৃত্তিকায় প্রচুর প্রস্তর মিশ্রিত দেখিয়া আমাদের আশা হইল, আমরা শীঘ্রই সোনার পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইতে পারিব। আমাদের এইরূপ আশা করিবার কারণও ছিল; আমরা কয়েকখণ্ড প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া তাহাতে স্বর্ণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

অতঃপর আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমার কৌতূহল ও বিস্ময় ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধিকতর আগ্রহে সেই বক্রগামিনী নদীর অনুসরণ করিলাম। পরদিন অপরাহ্ণকালে আমরা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে, একটি ধারা দক্ষিণে গিয়াছে, আর একটি ঠিক পূর্ব্বে '[illegible]র্য্যোদয়ের দিকে' গিয়াছে!

এই দৃশ্য দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইল; আশা হইল, এত দিনে আমাদের সকল চেষ্টা সফল হইবে, সকল কষ্টের অবসান হইবে। সেই রাত্রিতে আমরা সেই 'ত্রিমোহনার' কূলে তাম্বু ফেলিয়া নিশাযাপনের ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু অন্য সকলে নিদ্রিত হইলেও সেই রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে ঘুমাইতে পারিলাম না। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে ডনকুমের ভেলার সন্ধান পাইবার পর হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আমাদিগকে যে সকল বিপজ্জালে বিজড়িত [illegible]তে হইয়াছিল, একে একে সমস্তই আমার মনে পড়িতে [illegible]। এত দিনে পিটার ডনকুমের নির্দ্দিষ্ট কোকোয়েটা [illegible]মোহনায় উপস্থিত হইয়াছি; তাহার সেই সজ্জিপ্ত [illegible] আমাদের সন্দেহের কোন কারণ নাই, এইবার নদীর [illegible] মোহনা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আমরা সোনার [illegible] দেখিতে পাইব।

উষালোকে [illegible] আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা নদীর কূলে কূলে পূর্ব্ব[illegible] চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা 'এল্ ডোরাডো' অর্থাৎ [illegible] সীমাসন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, এই বিশ্বাসে আমাদের মন [illegible] উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা[illegible] প্রবল হইল। সত্যই কি সোনার পাহাড়ে উপস্থিত [illegible] সুবিশাল স্বর্ণক্ষেত্র দেখিতে পাইব, এবং আমাদের সা[illegible] বিপুল স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতে পারিব, পৃথিবীর কোটি-পতিগণের অপেক্ষা অধিক ধনবান্ হইতে পারিব? না, হতভাগ্য ডনকুম ও তাহার সহচরবর্গের ন্যায় বিপন্ন হইয়া পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইব?

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পাহাড়-পর্ব্বতের সংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বৃক্ষলতাদিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল। আমরা নদীর কূলে কূলে চলিলেও ক্রমে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম, নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের অনেক নিম্নে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনে হইল, নদী পর্ব্বত ভেদ করিয়া ধাবিত হইয়াছে, তাহার প্রস্তরময় উভয় তীর নদীগর্ভ অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমাদিগকে প্রতি পদে স্থূল প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করিতে হইল, এ জন্য আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলাম। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের উত্তাপ দুঃসহ হইয়া উঠিল, পাহাড় প্রখর রৌদ্রে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়াছিল, অথচ কোন স্থানে এমন একটি বৃক্ষ নাই, যাহার ছায়ায় কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া আমরা উত্তপ্ত ও শ্রান্ত দেহ শীতল করি। ঘর্ম্মধারায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল। রৌদ্রের উত্তাপে আমাদের চোখ-মুখ লাল হইয়া ফোস্কা উঠিবার উপক্রম হইল। ইহার উপর নানা জাতীয় বিষধর সর্প, বৃশ্চিক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাকড়সা পাহাড়ের ফাটল হইতে বাহির হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। আমরা কতকগুলিকে হত্যা করিলাম, কতকগুলি দূরে পলায়ন করিল। এক জাতীয় কদাকার গিরগিটি দেখিলাম, প্রত্যেকটি আধ হাত দীর্ঘ। তাহাদের অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু সবুজ; ললাটে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রচিহ্ন। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যেরা বলিল, এই গিরগিটিগুলির বিষ অত্যন্ত তীব্র। ইহারা দংশন করিলে মানুষ বিষের জ্বালায় ক্ষেপিয়া উঠে, তাহার পর সেই বিষ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া রক্ত দূষিত করে, এবং দষ্ট ব্যক্তি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই গিরগিটিগুলি তাড়াইয়া আসিয়া দংশন করে না, এবং ইহারা মনুষ্যের পদশব্দে বা লাঠীর ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া পলায়ন করে। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা খালি পায়ে ইহাদিগকে পদদলিত করিলে বা হঠাৎ ধরিবার চেষ্টা করিলে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা তাহাদিগকে দংশন করে। আমরা এই সকল বিষধর সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও লক্ষ লক্ষ মশকের আক্রমণে আমাদিগকে অত্যন্ত বিব্রত ও বিপন্ন হইতে হইল। স্থানে স্থানে ইহারা এভাবে দলবদ্ধ হইয়া মস্তকের ঊর্দ্ধে ঘুরিয়া ঘুরিয়া [illegible]তে লাগিল যে, সূর্য্যকিরণও অবরুদ্ধ হইল! মনে হইতে লাগিল—মাথার উপর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আবির্ভাব হইয়াছে। [illegible] উড়িতে উড়িতে নামিয়া আসিয়া আমাদের দেহের [illegible] অংশে দংশন করিতে লাগিল। আমরা কয়েক জন [illegible] ইহাদের দংশনজ্বালায় অধীর ও ক্ষিপ্তবৎ হইলাম; [illegible] দৌড়াইয়া পলায়ন করিয়াও ইহাদের কবল হইতে আত্ম[illegible] করিবার উপায় ছিল না। দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেও [illegible]নৃঘন্ শব্দে আমাদের অনুসরণ করিয়া কপালে, গালে, [illegible] হুল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের হুলগুলি তীক্ষাগ্র [illegible]র ন্যায় ভয়াবহ। আমরা এই সকল মশকের দংশনে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম, তাহা দেখিয়া আমাদের

কৃষ্ণাঙ্গ সহচররা পাহাড়ের ফাটল হইতে এক জাতীয় ক্ষুদ্র লতা ছিঁড়িয়া আনিল, এবং তাহা বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা নিষ্পেষিত করিল, এইরূপ নিষ্পেষণের ফলে তাহা হইতে সবুজ রস নিঃসারিত হইল। সেই রসের গন্ধ যেমন উগ্র—সেইরূপ বমনোদ্দীপক। সেই রস হুলবিদ্ধ অঙ্গে মর্দন করায় শীঘ্রই জ্বালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইল এবং সেই তীব্র গন্ধে মশকের দল অতঃপর আমাদের দেহ স্পর্শ করিল না। সেই লতারসের গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও তাহা মশক-দংশনের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক নহে; সুতরাং দেহের অনাবৃত অংশে সেই রস লেপন করিতে আমরা আপত্তি করিলাম না।

এইভাবে আমরা কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া একটি পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; আমরা আশ্বস্ত চিত্তে ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর আরোহণের পর আমরা সম্মুখেই একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকা নিম্নাভিমুখে প্রসারিত দেখিলাম; তাহা দর্শনমাত্র আমরা সকলে সমস্বরে সোৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আসিয়াছি, আসিয়াছি!—সোনার পাহাড়ে আসিয়াছি।"

সেই উপত্যকাটি প্রস্তরের পরিবর্ত্তে স্বর্ণস্তূপে পরিপূর্ণ। যতদূর দৃষ্টি যায়, পীতবর্ণ পাকা সোনার অসংখ্য চেঙ্গড় উপত্যকা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পাগলা ছুতোর

কথিত আছে, এক জন নিঃসম্বল দরিদ্র হঠাৎ বিপুল অর্থ লাভ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; সেই আকস্মিক আনন্দের বেগ সে সংবরণ করিতে পারে নাই। আমি দরিদ্রের সন্তান, জাহাজের মাল্লাগিরি আমার পেশা, হঠাৎ কখন লক্ষ মুদ্রা আমার ভাগ্যে জুটিয়া যায় নাই; সুতরাং দরিদ্র হঠাৎ বিপুল অর্থ পাইলে ক্ষেপিয়া উঠে, ইহা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু সোনার পাহাড়ে উঠিয়া যে দৃশ্য সম্মুখে দেখিলাম, তাহা দেখিয়া মানুষের মাথা ঠাণ্ডা থাকে, সে ধীর ভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমরা যত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, যত প্রাণান্তকর বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৃহবাসী সাধারণ মানব এই সকল বিপদের কল্পনা করিতেও পারে না, এবং এইরূপ অসংখ্য বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করাও লক্ষ জনের মধ্যে এক জনেরও সাধ্য কি না, জানি না; কিন্তু আমরা কয়েক বন্ধু সকল বিপদ্ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাদের কার্য্য-স্থলে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; আপাততঃ আর কোন নূতন বিপদের আশঙ্কা নাই—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া যদি আমাদের মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমরা আমাদের সম্মুখে বিপুল স্বর্ণের স্তূপ দেখিয়া আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হইলাম, এবং সকল সংযম হারাইয়া ক্ষিপ্তবৎ সেই স্বর্ণরাশিসমাচ্ছন্ন উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম, আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা অদৃশ্য হইল; চারিদিকে হুড়ামুড়ি, দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে কোন কোন লোক এই সোনার উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিলাম। কারণ, সেই উপত্যকার স্থানে স্থানে গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম; সেই সকল গর্ত্তের পাশে মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তূপীভূত ছিল। চারিদিকে যত দূর দৃষ্টি চলিল, কেবলই সোনা; সর্ব্বত্রই সোনা ছড়ান আছে দেখিলাম। তথাপি স্থানে স্থানে গর্ত্ত করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহের কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারিলাম না। স্বর্ণের স্তর উপত্যকার নিম্নে কতদূর পর্য্যন্ত গভীর, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য কি কেহ এই ভাবে গর্ত্ত কাটিয়াছিল? আমরা যে সকল প্রস্তর দেখিতে পাইলাম, তাহাই হরিদ্রাভ, তাহা স্বর্ণপূর্ণ বলিয়াই আমাদের ধারণা হইল। আমরা দুই এক স্থানে পদাঘাত করিয়া মাটী আল্‌গা করিলাম, আর তাহার তলা হইতে মুঠা মুঠা খাঁটি সোনা বাহির হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র মটরের দানার মত হইতে হাঁসের ডিম্বের মত সোনার দলা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। এই কল্পনাতীত বিপুল স্বর্ণ-রাশি দেখিয়া আমার ধারণা হইল—তাহাদের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ মণ ত সামান্য কথা—কোটি কোটি মণেরও অধিক হইতে পারে! ছোট ছোট ছেলেরা এক থালা সন্দেশ সম্মুখে দেখিলে যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহা লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি করে, আমরাও সেই স্বর্ণরাশি দেখিয়া সেই ভাবে কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলাম। কেহ দুইটি দলা কুড়াইয়া লইয়াছে, আর এক জন ছোঁ মারিয়া

তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ পকেটে পুরিল; ইহা বোধ হয় মানুষের অপরিমিত লোভেরই নিদর্শন, নতুবা সেই স্বর্ণক্ষেত্রে এই ভাবে কাড়াকাড়ি করিবার প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোনার দলায় আমাদের সকলেরই পকেট পূর্ণ হইল; তাহার পর আমরা রুমাল বাহির করিয়া রুমালে যত সোনা ধরে, তাহাও সঞ্চয় করিলাম। বস্তুতঃ আমরা আধ ঘণ্টার পূর্ব্বেই যে স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিলাম, তাহার সাহায্যে আমরা সকলেই জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম; রাজার হালে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সেই স্বর্ণভূমি যে কাল্পনিক নহে, পৃথিবীতে যে তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান—এই সত্য আবিষ্কার করিয়া আমরা সকল কষ্ট ভুলিলাম; আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইল। মনে হইল—এরূপ দৃশ্য জগতে দুর্লভ। জগতের কয় জন লোক এরূপ বিস্ময়াবহ দৃশ্য দেখিতে পায়? যত দূর দৃষ্টি যায়, সর্ব্বত্র কোটি কোটি পাউণ্ডের স্বর্ণ অযত্নবিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহার একটি চাঙ্গড়া তুলিয়া লইয়া দেশে আনিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে অভাবের কষ্ট চিরজীবনের জন্য দূর হইতে পারে—ইহা কি অসাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নহে? মানুষ যত সোনা বহিতে পারে—তাহা যদি সে এই স্থান হইতে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়—তাহা হইলে সে মানব সমাজকে অনায়াসে পদানত করিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং আমরা কি অসীম শক্তির অধিকারী হইয়াছি, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মনে মোহ উপস্থিত হইল। মনে হইল, যদি আমরা একখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া সোনা লইয়া যাই, তাহা হইলে এই স্বর্ণরাশির এক তিল পরিমাণও ক্ষয় হইবে না; অথচ আমাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণসঞ্চয়ে বাধা দেওয়ার কেহই নাই!

সেই উপত্যকার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার ধারণা হইল—তাহা পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল প্রশস্ত; সমগ্র পৃথিবীর অবশিষ্টাংশে যত স্বর্ণ আছে, এই সোনার পাহাড়ের সঞ্চিত স্বর্ণরাশি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

যাহা হউক, এই বিপুল স্বর্ণরাশি দর্শনে আমাদের মন যে দারুণ লোভ ও উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম; আমাদের সেই প্রাথমিক অধীরতা অপসারিত হইলে আমাদের নিদারুণ লোভ ও অসংযত ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জা অনুভব করিলাম। ভাবিলাম, আমাদের ঐরূপ লোভাতুর হইয়া 'হ্যাংলামি' করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই পাঁচ মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত স্বর্ণক্ষেত্রে যে পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চিত আছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশও ত বহিয়া লইয়া যাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই। শর্করার পাহাড়ে উঠিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার অবস্থা যেরূপ হয়, আমাদের অবস্থাও তখন সেইরূপ! পিপীলিকা লোভান্ধ হইয়া মনে করে—সে সেই চিনির পাহাড় মুখে করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু সে কতটুকু চিনি বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? সেই বৃহৎ উপত্যকা যে বিশুদ্ধ স্বর্ণরাশিতে পূর্ণ, সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন স্বর্ণ কে স্থানান্তরিত করিবে? মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে এত দুঃখ-দৈন্য, সোনার জন্য জগতের লোক নিত্য মারামারি কাটাকাটি করিতেছে—আর এই কোটি কোটি টন স্বর্ণ এখানে মনুষ্য সমাজের অগোচরে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া আছে! ইহা কাহারও ভোগে লাগিতেছে না; যাহারা দিগ্বিজয়ে বৃথা শোণিতপাত করিতেছে, দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তাহারা এখানে আসিয়া জাহাজ-বোঝাই স্বর্ণ দেশে লইয়া যাইতে পারে; মনুষ্য-সমাজের দুঃখ-দুর্গতি দূর হইতে পারে। এই স্বর্ণরাশি মানব-সমাজের ভোগে লাগে, ইহা কি বিধাতার ইচ্ছা নহে?

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহার পর উঠিতে গিয়া দেখি, সোনার ভারে আমাদের উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে! সোনার ভার দুঃসহ মনে হওয়ায় আমরা আমাদের সংগৃহীত স্বর্ণরাশি বাহির করিয়া এক এক স্থানে স্তূপীকৃত করিলাম; কিন্তু আমাদের ছুতোর বন্ধু হঠাৎ উঠিয়া গিয়া পাগলের মত চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল, এবং রাশি রাশি স্বর্ণ কুড়াইয়া লইয়া তাহার কোটের পকেট, সার্টের পকেট পূর্ণ করিল, এবং পকেটে স্থানাভাব হইলে সে স্বর্ণ দ্বারা তাহার টুপী পূর্ণ করিয়া অবশেষে মুখেও পুরিতে উদ্যত হইল! আমি তাহাকে ঐ রকম পাগ্‌লামী করিতে নিষেধ করিলে সে উন্মুকের মত চীৎকার করিয়া আমাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, এবং নেকড়ে বাঘের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করিতে পারে ভাবিয়া আমি একটু দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমি উঠিবার পূর্ব্বেই সে আমার উপর লাফাইয়া পড়িয়া আমাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর স্বর্ণমিশ্রিত একখানি প্রকাণ্ড পাথর তুলিয়া আমার মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া জিম স্মিথ ও আমাদের একটি কৃষ্ণাঙ্গ অনুচর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই ক্ষ্যাপা ছুতোর প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক লাফে দূরে সরিয়া গেল।

আমি জিম স্মিথ ও কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যের সাহায্যে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে আমাদিগকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে দিতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল, তাহার পর কি ভাবিয়া, পর্ব্বতের যে অংশে আমাদের খচ্চর ও গাঁটরিগুলি এবং বন্দুক, গুলী-বারুদ প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই দিকে ধাবিত হইল।

আমরা সোনার উপত্যকা দেখিয়া আনন্দে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলাম যে, এই উপত্যকায় প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদের অশ্বতর ও গাঁটরিগুলি কিছু দূরে সেই পাহাড়ের মোড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। সেই স্থান এই উপত্যকা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পাগ্‌লা ছুতোর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের গাঁটরিগুলি প্রাচীরের মত সাজাইয়া আমাদের বন্দুক, গুলী, বারুদ প্রভৃতি জিনিষগুলি তাহার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতেছিল।

তাহার এই অদ্ভুত কায দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল, পাগল আমাদের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে—আমাদিগকে সদলে হত্যা করিয়া সোনার পাহাড়ের সমুদয় স্বর্ণ সে একাকী আত্মসাৎ করিবে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি সর্ব্বাগ্রে আমাদের হস্তগত করা প্রয়োজন।

এইরূপ স্থির করিয়া আমি আমার অন্যান্য সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "বন্ধুগণ, যে উপায়ে হউক, ঐ ছুতোর বেটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা আমাদের মঙ্গল নাই।"

আমার কথা শুনিয়া আমার সঙ্গীরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিল; এবং পাগ্‌লা ছুতোরকে ধরিবার জন্য আমার সঙ্গে সেই উপত্যকার মোড়ের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আমরা পাগলের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এক ঝাঁক গুলী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল। সেই গুলীর আঘাতে চারি জন কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য সাংঘাতিক আহত হইয়া মুখ গুঁজিয়া পাহাড়ের উপর পড়িয়া গেল; একটা গুলী জিম স্মিথের স্কন্ধে বিদ্ধ হইয়া তাহাকেও আহত করিল।

আমরা পাগ্‌লা ছুতোরের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ে স্তম্ভিত হইলাম। যদিও সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া এই কায করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ফল কি ভীষণ শোচনীয় হইল! আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানে একটিও বৃক্ষ, এমন কি, ক্ষুদ্র গুল্ম পর্য্যন্ত ছিল না; এমন কোন আড়াল ছিল না, যেখানে আশ্রয় লইয়া আমরা সেই গুলীবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। পাগ্‌লা ছুতোর আমাদের প্রায় দেড়শত গজ দূরে একটি উচ্চ অংশে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায় দুই ডজন পিস্তল ও বন্দুক ছিল, গুলী-বারুদও প্রচুর ছিল, পাগ্‌লা ছুতোর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেগুলি সমস্তই একাকী অধিকার করিয়াছে এবং আমাদের গাঁটরিগুলি এক বুক উঁচু করিয়া সাজাইয়া তাহার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করায় সম্পূর্ণরূপ সুরক্ষিত ছিল। তাহার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, যে অশ্বতরের পিঠে আমাদের খাদ্যসামগ্রী ছিল—সেটা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তাহা দেখিয়া অন্যগুলিও কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

পাগ্‌লা ছুতোরের কাণ্ড দেখিয়া আমাদের ভয় ও দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। সে সকল দিকেই সুবিধা করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে আক্রমণ করা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল। আমাদের বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া সে হো হো শব্দে হাসিয়া আমাদিগকে গালি দিতে লাগিল। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ অনুচর-চতুষ্টয়ের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তাহারা পাহাড়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। দুই জনের নড়িবারও শক্তি ছিল না; বুঝিলাম, তাহাদের জীবনের আশা নাই; আর দুই জনেরও আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল।

আমরা হতাশভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভাসমান বিমানপোতবন্দর

"আরমষ্ট্রং সিড্রোম ডেভেলপমেণ্ট" কোম্পানী হেনরী জে, গিলো নামক জাহাজের সুপ্রসিদ্ধ নক্সা প্রস্তুতকারককে ভাসমান বিমানপোত-বন্দর নির্ম্মাণের নক্সা করিবার জন্য রাখিয়াছেন। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য, সমুদ্রমধ্যে বিমানপোত-সমূহের জন্য ভাসমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করিবেন। উক্ত কোম্পানীর প্রধান পরিচালক মিঃ আরমষ্ট্রং দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রমধ্যস্থ একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া মিঃ গিলোর সাহায্যে ভাসমান বন্দরের অনুকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। নক্সা অনুসারে এই বন্দর দৈর্ঘ্যে ১২ শত ফুট এবং প্রস্থে ৪ শত ফুট হইবে। সমুদ্রতরঙ্গের এক শত ফুট ঊর্দ্ধে বন্দরের প্লাটফরম বা পাটাতন অবস্থিত
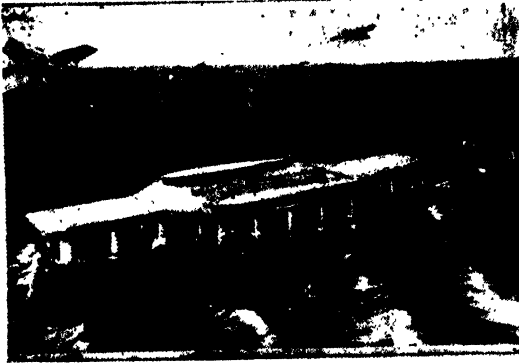
ভাসমান বিমানপোতবন্দরের দৃশ্য

থাকিবে। ২১ হাজার ১ শত ৫০ ফুট দীর্ঘ ছয়টি দৃঢ় শৃঙ্খলের সাহায্যে এই বন্দর নোঙ্গর করা থাকিবে। ৪৩ জন নাবিক সর্ব্বক্ষণের জন্য বন্দরে অবস্থান করিবে। হোটেল, যন্ত্রের ঘর, রেস্তোরাঁ এবং রেডিও প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে। এই বন্দর নির্ম্মাণে প্রায় ৫৫ হাজার মণ ইস্পাত লাগিবে। স্থির হইয়াছে, নিউইয়র্ক ও বার্মুডার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই বিমানপোতবন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি পরীক্ষার ফলে বুঝা যায়, এই বন্দরের স্থায়িত্ব হইবে, তাহা হইলে নিউইয়র্ক ও য়ুরোপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে আরও ৮টি অনুরূপ ভাসমান বন্দর নির্ম্মিত হইবে। একটি বন্দর নির্ম্মাণে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

ইস্পাতের বিচিত্র মোটর বোট

জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক শিল্পী মোটর-চালিত এক প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার আকার বিমানপোতের ন্যায়।

ইস্পাতনির্ম্মিত বিচিত্র মোটর বোট

এই জলযান যেমন দ্রুতগামী, তেমনই দৃঢ়। তরঙ্গাঘাতে এই নৌকার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না এবং পক্ষীর ন্যায় অনায়াস গতিতে তরঙ্গের উপর দিয়া দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া থাকে।

মোটরচালিত 'টুথ ব্রস্'

দন্ত-চিকিৎসকদিগের নির্দ্দেশে সম্প্রতি এক প্রকার মোটর-চালিত টুথ-ব্রস্ বাজারে বাহির হইয়াছে। এই ব্রস্ দন্তপাতির চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্লেদমুক্ত করিয়া দেয়। ব্রস্-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মোটর যন্ত্র আছে। একটা কল টিপিবামাত্র উহা দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই দন্তধাবন-যন্ত্র এত ক্ষুদ্র যে, পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া চলে। উহার সাহায্যে দন্তপাতি ও মাঢ়ী বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

মোটরচালিত টুথ-ব্রস্

টেলিফোন যন্ত্র-সংলগ্ন ঘটিকাযন্ত্র

টেলিফোন্ যন্ত্রে কথা বলিতে কত সময় ব্যয় হয়, তাহার হিসাব রাখিবার জন্য একপ্রকার ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঘটিকাযন্ত্র টেলিফোন যন্ত্রের পার্শ্বদেশে রাখিয়া উহার সংলগ্ন একটা 'লিভার' চাপিয়া ধরিলেই চলিতে আরম্ভ করিবে। ছয় মিনিট এই ঘটিকার পরমায়ু। তিন মিনিট অতীত হইবামাত্র উহা হইতে একবার ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং ৬ মিনিট হইলেই আবার ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইবে। ঘড়ীর সম্মুখের চাক্তি বেশ বড়। টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহারকালে উহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার বিশেষ সুবিধা। সুতরাং কতক্ষণ পর্য্যন্ত টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই ঘটিকাযন্ত্র এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, উহা যথাযথভাবে চলিয়া থাকে।

টেলিফোন যন্ত্র-সংলগ্ন ঘড়ী

জীবনরক্ষক তরণী

ইংলণ্ডে দীর্ঘাকৃতি জীবনরক্ষক তরণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নৌকা কখনই জলনিমজ্জিত হইতে পারে না বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ প্রকাশ করিতেছেন। এই তরণীতে ৮টি কক্ষ আছে।

জীবনরক্ষক তরণী

প্রত্যেক কক্ষ এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, জল কোনমতেই একটিরও মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এই নৌকায় ১ শত ৫০ জন লোক অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে। পরীক্ষাকালে এই জীবনরক্ষক তরণীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই নৌকা অবশ্য মোটর-চালিত।

চিকাগো বিশ্বমেলার নক্সা

আগামী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো নগরে বিশ্বমেলার অধিবেশন হইবে। বিগত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশ্বমেলার তুলনায় আগামীবারে এই মেলায় স্থপতি-শিল্পের বৈচিত্র্য উপভোগ্য হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে আমেরিকায় নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। প্রসিদ্ধ স্থপতি-শিল্পীরা আগামী মেলাক্ষেত্র কি ভাবে রচিত হইবে, তাহার নক্সা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার্থ বিশেষজ্ঞগণের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আধুনিক প্রণালীতে এই মেলাক্ষেত্রে একটি ইস্পাতনির্ম্মিত বিজ্ঞানভবন নির্ম্মিত হইবে। অত্যুচ্চ গম্বুজকিরীটী স্তম্ভ, সুদৃশ্য রাজপথ প্রভৃতি কি ভাবে রচিত হইবে, এই নক্সায় তাহা পরিকল্পিত হইয়াছে। আলোকমালার বিশেষ ব্যবস্থায় মেলাক্ষেত্র যে নন্দনের অমরাবতীর শোভা ধারণ করিবে, অনেকে এমন অনুমান করিতেছেন। মেলাক্ষেত্রের গৃহগুলি কাচনির্ম্মিত হইবে।
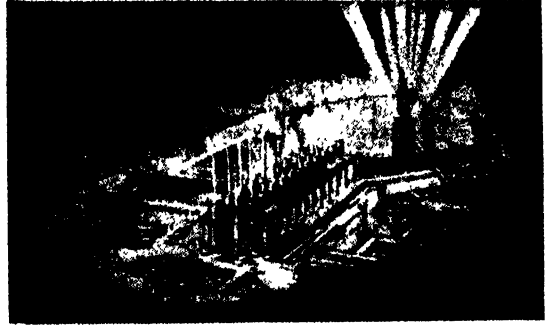
ভাবী চিকাগো মেলার নক্সা

ধনুর্ব্বিদ্যা

অধুনা প্রতীচ্য দেশের নারীরা ধনুর্ব্বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা করিতেছেন। সম্প্রতি এক জন মার্কিণ মহিলা এই বিদ্যায় এমন দক্ষতা লাভ করিয়াছেন যে, চারিটি খোলা কাঠের পিপার ভিতর দিয়া ৬ বার চেষ্টা করিয়া পাঁচবার লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন। কাঠের পিপাগুলির পরিধি অধিক নহে এবং নিক্ষিপ্ত শর অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে লক্ষ্য ভেদ করায় মহিলার শিক্ষা-নৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই লক্ষ্যভেদ-কৌশল ফ্লোরিডায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

নারীর ধনুর্ব্বিদ্যার কৌশল

ডাঙ্গায় নৌবিদ্যা শিক্ষা

জর্জ্জিয়ার "টেক্‌নোলজি" বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগকে ডাঙ্গার উপর নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জমীর উপর জাহাজের

ডাঙ্গায় নৌবিদ্যা শিক্ষা

সেতুর আকারবিশিষ্ট চলমান যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জাহাজ চালাইবার চাকা প্রভৃতির সন্নিবেশ আছে। শিক্ষার্থীরা জাহাজ কখন্ কোন্ দিকে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা এই যন্ত্র সাহায্যে শিক্ষা করিয়া থাকে। ডাঙ্গার উপর হইলেও এই ভাবে জাহাজ পরিচালন শিক্ষার যথাযথ জ্ঞান শিক্ষার্থীরা লাভ করিয়া থাকে।

গাছ ছাঁটিবার বিচিত্র কৌশল

অত্যুচ্চ বৃক্ষশাখাপল্লব ছাঁটিবার জন্য অধুনা দীর্ঘ আরোহণী-সংযুক্ত মোটর-বাহিত "ট্রাক্" বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এই অবরোহণীকে যে কোন দিকে ইচ্ছামত সন্নিবিষ্ট করা যায়। উচ্চতাও প্রয়োজনানুসারে নিয়মিত করিবার ব্যবস্থা আছে। অবরোহণীর প্রান্তদেশে দাঁড়াইবার জন্য একটি মঞ্চ আছে। এই মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া নিরাপদে কায করা যায়—পড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। এই অবরোহণীর নিম্ন দিয়া অন্যান্য গাড়ী অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, সুতরাং রাজপথে যানবাহন চলাচলের কোন অসুবিধা হয় না।
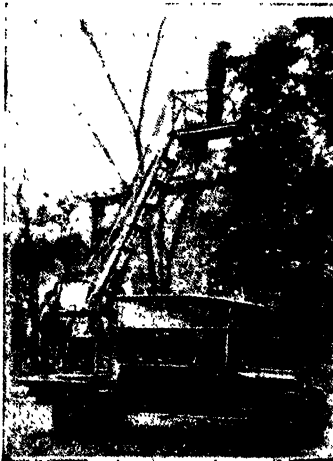
গাছ ছাঁটিবার অভিনব ব্যবস্থা
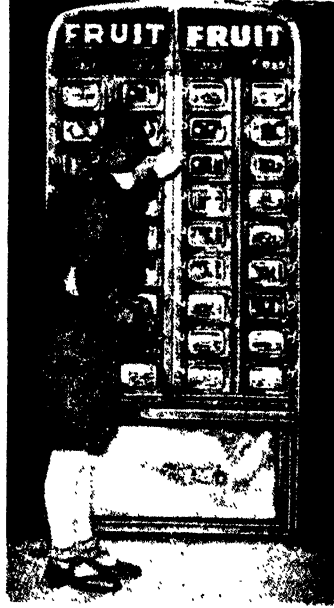
ফলপূর্ণ আধার

বিজ্ঞানের কৌশল

লণ্ডনের রেল-ষ্টেশনসমূহে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য নানাবিধ ফল যাহাতে সুপ্রাপ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটি ছিদ্রপথে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা নিক্ষেপ করিলেই অভীপ্সিত পাত্রপূর্ণ ফল বাহির হইয়া আসিবে। ইহাতে যাত্রিগণের অসুবিধা দূরীভূত হইয়া থাকে।

মালবাহী ত্রিচক্র মোটর গাড়ী

লণ্ডন সহরে ত্রিচক্রবিশিষ্ট মালবাহী মোটর গাড়ীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই গাড়ী যানবাহন ও জনসমাকীর্ণ রাজপথে পরিচালিত করিবার বিশেষ সুবিধা বলিয়া শুনা যাইতেছে। চারি চক্রের পরিবর্ত্তে ত্রিচক্রবিশিষ্ট বলিয়া অতি সহজে এই মালবাহী গাড়ীকে রাজপথে ঘুরাইয়া লইবারও বিশেষ সুবিধা হয়; ইহার মালবহনক্ষমতাও অধিক।
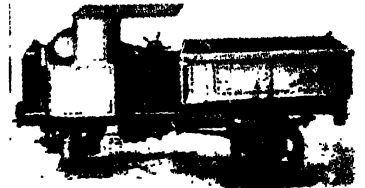
মালবাহী ত্রিচক্র মোটর গাড়ী

অপূর্ব্ব সাঁড়াশী

ওয়াশিংটনের অগ্নিনির্ব্বাপক বিভাগের জন্য এক প্রকার সাঁড়াশী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, দৃঢ় পুরু লৌহদণ্ডকে ঈষৎ চাপ দিবামাত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে, কোনও লৌহ-দণ্ড বেষ্টিত

অপূর্ব্ব সাঁড়াশী সাহায্যে লৌহদণ্ড কর্ত্তন

গৃহমধ্যে মানুষ থাকা অবস্থায় যদি সেই বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং অন্য পথে বাহির হইবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে এই সাঁড়াশীর আকারবিশিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে লৌহদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া মানুষের উদ্ধারসাধন সহজে নিষ্পন্ন হয়।

শ্রমিকের মুখোস

শ্রমিকের মুখোস

শ্রমিকদিগের জন্য বাজারে এক প্রকার মুখোস ও চশমা বাহির হইয়াছে। কায করিবার সময় এই মুখোস বা চশমা ব্যবহার করিলে ধূলা, আলোক-দীপ্তি অথবা কাষ্ঠ বা লৌহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে আহত বা বিরক্ত করিতে পারে না। যখন চশমা ধারণের প্রয়োজন হয়, সেই সময় শিরোদেশস্থিত মুখোস মুখের উপর নামাইয়া দিলেই হইল।

অভিনব জুতা

জুতার মধ্যে যদি বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও আরাম উভয়ই লাভ করা যায়, ইহাই অভিজ্ঞগণের মত। অধুনা এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জুতা নির্ম্মিত হইতেছে। এই বিনামা পায় দিয়া যখন কেহ পাদচারণ করিবে, তখনই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার ন্যায় জুতা হইতেই বায়ুর আগম-নির্গমের কায চলিতে থাকিবে। ইহার ফলে চরণের নানাপ্রকার ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে।

নব-নির্ম্মিত জুতার মধ্যে বায়ুর আগম-নির্গম পরীক্ষিত হইতেছে

ক্রন্দনরত শিশুমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত এ, চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক আলোক-চিত্রকর আলোচ্য চিত্রখানির ফটো লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক নামক

ক্রন্দনরত শিশু-মূর্ত্তি

ভাস্কর এই ক্রন্দনরত শিশু-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চিত্র-বর্ণিত শিশু-মূর্ত্তিটির অবয়বে ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইবে।

ডাকটিকিট-শোভিত কক্ষ

৮০ লক্ষাধিক ডাকটিকিট সংগ্রহ করিয়া জনৈক পল্লীবাসী মার্কিণে তাঁহার একটি ঘর সুসজ্জিত করিয়াছেন, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংগৃহীত টিকিটগুলির মূল্য ১২ লক্ষ মুদ্রা। ঘরের মধ্যে মার্কিণ-ভদ্রলোক এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

ডাকটিকিট-সজ্জিত গৃহ

কল্কে পুরাণ

(কস্তুচিৎ ড্যাস-রচিত গ্রন্থ-অবলম্বনে)

মঙ্গলাচরণ
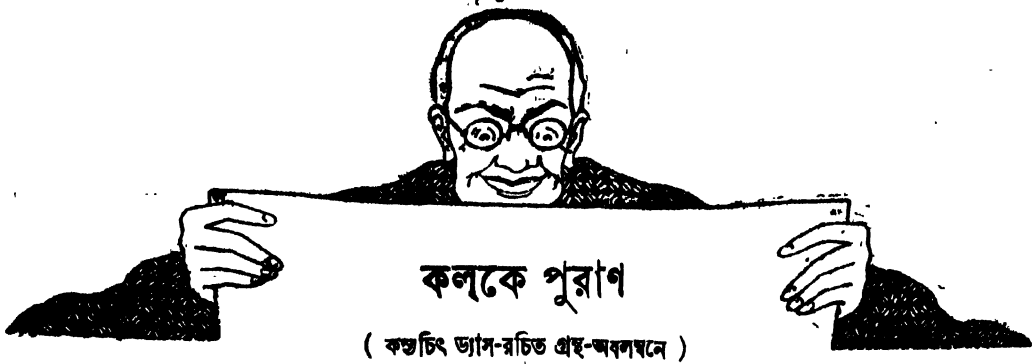
আদম-সুমারির ভিত্তিপত্তন করিবার নিমিত্ত জন্ম-মৃত্যুর রেজিষ্ট্রী অফিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। ঐ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন, সরকার বাহাদুরের জনৈক খয়েরখাঁ। নিয়োগপত্র আসিবামাত্র সাহেব এক বিশাল ভোজের আয়োজন করিলেন। তার পর বল্‌-নাচ। অবশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

মেলা ও রেলা যখন শেষ হইল, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। আজ সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিজের পদদ্বয় আজ একান্ত অবাধ্য হইয়া বিষম বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে! একটা কোন রকমে যদি শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হয় ত অপরটা পিছু হটে। দক্ষিণপদ বামকে বলিতেছে, চলা আও, ভেইয়া!

বাম বলিতেছে, হাম নেহি যায়েগা, দুস্‌রে কোইকো কহো।

সাহেব তখন উরুৎ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বামপদকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, Come on, my boy!

সে চাকরীতে জবাব দিল।

সাহেবের উদ্ভাবনী শক্তি তখন এক অভিনব উপায় কল্পনা করিল। হাঁকিলেন, বেয়ারা!

তৎক্ষণাৎ চাপকান-পাগড়ী-তখ্‌মা-আঁটা এক ওড্রপুঙ্গব সেলাম করিয়া বলিল, সাব!

সাহেব কিছুক্ষণ তাহার আগুল্ফ-লম্বিত চাপকানের পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমকো পাও হায়?

বেয়ারা অপরিসীম বিস্ময়ে কহিল, কঁড়? গোড়? অছি—

কাঁহা?

মোর পাশ অছি—

সাহেব বলিলেন, ঝুট!

ঝুট! মু কঁড় মিথ্যা কোউচি?

তব্‌ দেখলাও।

বেয়ারা চাপকান্‌ গুটাইয়া পদদ্বয় প্রদর্শন করিল।

সাহেব কহিলেন, বহুত আচ্ছা! হামকো দেও।

ওড্র মনে মনে কহিল, শড়া মত্তাড় হোউচি।

সাহেব ধমক্‌ দিলেন, ড্যাম্‌ ইউ! দেরি কর্‌টা কাহে? জল্‌ডি করো। তোমারা পাও নিকলো।

বেয়ারা কহিল, কাঁই?

হামকো দেও!

মু কেমতি চলিব, সাব?

That's your look out, my lad! পাও নিকলো।

গোড় কেমতি খুড়িব?

য্যায়সে বুট খোল্‌টা, ইউ ইডিয়ট! খোলো।

মু সে পারিবে না, সাব! মু চলিব কেমতি?

হামারা পাও লেও। খোড়া গড়্‌কা ওয়াষ্টে মাঙ্‌টা। হাওলাট দেও, বলিয়া সাহেব পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন।

বিপন্ন বেয়ারা কহিল, হে প্রভু জগড়নাথ! কি জঞ্জাড় করিড়া! এ খান্‌সামা! এটি আস ধাঁইকিড়ি!

দিগ্‌গজ শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত এক খান্‌সামার প্রবেশ।

বেয়ারা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, সাব মতে কৌচি গোড় দিবাকু।

সাহেব কহিলেন, Now, don't make a row! বাখেড়া মট্‌ উঠাও! খান্‌সামা, গোড়া বোলাও।

কাহে হুজুর?

শোটে যায়েঙ্গে।

ঘোড়ে পর সওয়ার হোকে !

আলবট্ ! কোন্ রোখে গা ?

খান্সামা দীর্ঘ সেলাম জানাইয়া কহিল, হুজুর মালেখ্ ! রোখেগা কোন্ ?

টিম্ ?

খান্সামাটি বুদ্ধিমান্। কহিল, ঘোড়া ত আবি নেহি হায়।

কাঁহা গিয়া ?

মাঠপর শয়ের করনে।

কোন্ উস্‌কো ছুটি ডিয়া ?

কোই নেই, হুজুর !

টিম্ ?

আপ্‌সে চলা গিয়া।

টুম্ রোখা নেই কাহে ?

তাঁবেদার জরুর রোখাথা, হুজুর !

কেয়া বোলা ?

কুছ্ নেই, হুজুর ! তাঁবেদারকো দাঁত দেখ্‌লায়কে বোলা—চিঁ হিঁ হিঁ।

আচ্ছা কিয়া ! কুছ্ পরোয়া নেহি ! বেয়ারা—

সাব !

গোড়া হো যাও। হাম্ সওয়ার হোকে শোটে যাগা।

বিপন্ন দাস-পো কহিল, শড়া মত্তাড়কু কেত্তে খেয়াড় হোউচি পরা ! যাক্, যদি অল্পে অল্পে গোল মিটিয়া যায়, দাস-পো দুই হাঁটু ও দুই করতলে ভর করিয়া ঘোড়া হইয়া বলিল, আউ, শড়া, আউ !

সাহেব সওয়ার হইলেন। খান্সামা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। রসিক খান্সামা কহিল, তোমার বক্ত ভালো ! চিহিঁ কর, বাই, চিহিঁ কর।

দাস-পো ডাকিল, চিহিঁ—

চিহিঁ ডাকায় সাহেবের স্মরণ হইল, চাবুক্ কাঁহা ? চাবুক লে আও !

ওরে বাবা, চাবুক্ ! চাবুক্ কি রে ! দাস-পো সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মু কাম করিব না বলিয়া ছুটিল।

সাহেব হাঁকিলেন, মেরা গোড়া বাগটা হায়, পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো !

একটা অছিলা পাইয়া খাভা হায় হুজুর বলিয়া খানসামা দাস-পোর পশ্চাৎ নিক্রান্ত।

একা দাঁড়াইয়া এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিতে চাহিতে সাহেবের দৃষ্টি পড়িল, দেয়ালে প্রলম্বিত আয়নার উপর। তিনি কিছুক্ষণ চোখ পাকাইয়া সেই আয়নার পানে চাহিয়া কহিলেন, who're you ? টোম্ কোন্ ?

প্রতিমূর্ত্তি কেবল ঠোঁট নাড়িল, কি কহিল, শুনা গেল না।

সাহেব মুখভঙ্গী করিলেন। সে-ও ভ্যাংচাইল।

সাহেব ঘুষি বাগাইলেন। সে-ও বাগাইল।

কিছুক্ষণ এই মূক অভিনয়ের পর সাহেব হাঁকিলেন, খান্সামা, বেয়ারা !

উভয়েই ছুটিয়া আসিল।

সাহেব খান্সামাকে প্রশ্ন করিলেন, উও আডমি কোন্ হায় ?

খান্সামা প্রতিপ্রশ্ন করিল, কাঁহা সাব ?

Damn your eyes ! উস্ কামরাকা অণ্ডর। কোন্ ঘুসা ?

খান্সামা বিস্মিত হইয়া বলিল, আয়নাকা অন্দর ?

জরুর। ইউ উল্লু !

উ তো আপ-ই হায়, হুজুর।

বদ্-বখত ! হাম ডোনো বন্ গিয়া ?

জরুর, হুজুর।

কভি নেহি। উস্‌কো নিকাল্ ডেও।

খান্সামা উপায়ান্তর না পাইয়া আয়নার উপর আবরণ টানিয়া দিল।

Ah, dearie, dearie, মেরি পিয়ারি বলিয়া সাহেব তখন প্রগাঢ় অনুরাগে খান্সামার মুখচুম্বন করিলেন।

কি জানি যদি দংশন করে ! খান্সামা পলাইবার প্রয়াস করিল। কিন্তু সাহেব তখন তাহার আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু সজোরে ধরিয়াছেন।

বাই জোভ ! What magnificent beard ! what luxuriant growth ; L's have a waltz—

Humty dumty tomty tom—

দাস-পো বৈতগান সূচনা করিল—

তমকু মুণ্ড খাউক যম।

হা-হা ! যম I know—Pluto ! go on, go on ! চালাও, চালাও !

কিন্তু চালাইবে কে! সাহেব নাচিতে নাচিতে পপাত এবং নিদ্রাগত।

—

স্বর্গ-খণ্ড

তখন তাঁহার মনে হইল, সেই ভোজন-কক্ষের ছাদটা সহসা ফুঁ'কাক হইয়া গেল এবং তিনি উর্দ্ধে উঠিতেছেন। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, নিম্নে গ্যাসমালা-শোভিত কলিকাতা নগরী। উর্দ্ধে—উর্দ্ধে—আরও উর্দ্ধে। অন্ত নাই। ক্রমে মনে হইল, পৃথিবী যেন একটা বিলিয়ার্ড বল্ আর যে নক্ষত্রটার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহা যেন ক্রমশঃই বড় হইতেছে। কি তেজ! কিন্তু সে তেজে চক্ষু পীড়িত হয় না, অতি শান্ত, শীতল! নক্ষত্রটি কিরণ-গঠিত। তথাপি সেই শূন্য-সঞ্চরণ-কারীর মনে ভয় হইল, যদি উহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া মাথাটা ফাটিয়া যায়!

কিন্তু তাহা হইল না। মাছ যেমন জলের ভিতর অনায়াসে চলাচল করে, সাহেবও তেমনি সেই কিরণ-গোলকের ভিতর অনায়াসে গলিয়া গিয়া এক প্রকাণ্ড হল্-ঘরে উপস্থিত হইলেন।

ওঃ, সেখানে কত লোক, আর কত রকমের চেহারা! কারুর হাতিমুখ (হস্তি-মূর্খের অপভ্রংশ), কারুর ছুঁচা মুখ। তাহাকে দেখিয়া সাহেব মনে মনে খুব খুশী হইলেন, ওঃ, ভোজের সময় মস্ত সুবিধা! কিন্তু এক ডজন হাত চাই। আজ কি এখানে ডিনার পার্টি? খুব সময় এসে পড়া গেছে! কিন্তু সিংহাসনে ও কে? ঐ বোধ হয়, মহামান্য অতিথি! বাই জোভ! লোকটার গা-ময় চোখ! সাহেব ডাকিলেন, Hear, mister, all eyes! হাম্‌কো একঠো কুর্সি ডেনে বোলো। মাই গড, ডেক! কালা আডমি হায়! হিয়ার, শুন্‌টা নেহি? কুর্সি, কুর্সি—

তখন সাহেব দেখিলেন, সিংহাসনস্থ পুরুষের সম্মুখে এক বিচিত্রাভরণা নারী দণ্ডায়মানা। তাহার দুই কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে—দুই সদ্যোজাত শিশু। আর একটি শিশু নাকের নোলকরূপে ঝুলিতেছে! কেবল তাহাই নহে, রমণীর বলয়, তাগা, তাবিজ, কণ্ঠহার, সবই শিশুময়, তাহাও মৃত নয়, জীবিত! যেমন অদ্ভুত অলঙ্কার, তেমনি বাহন কোন্ আদিম যুগের এক ভীমকায় মার্জ্জার!

উহার সম্মুখে আবার কে? পুরুষ! আকার যেন জমাট-বাঁধা অন্ধকার! ইহারও অলঙ্কার বিচিত্র! গলায় ঝোলান মড়ার মাথাগুলো যেন হাসছে! সর্ব্বাঙ্গে অস্থিভূষণ! দু'টি চোখ জ্বল্‌ছে যেন রেলপথের ডেঞ্জার সিগ্যাল! বাহন এক প্রকাণ্ড মহিষ— শিং দু'টি যেন কাঞ্চন-জঙ্ঘার চুড়ো। তাহাকে দেখিয়া সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন।

সভার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা গুরুগম্ভীর মেঘধ্বনি হইল। সিংহাসনস্থ চক্ষুষ্মান্ পুরুষ শিশুভূষণা রমণী ও অস্থি-ভূষণ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ষষ্ঠীদেবি, হে মৃত্যুপতে, দেবলোকে জন্ম-মৃত্যু নাই, সুতরাং তোমাদের প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয়ের বিচার এখানে হইতে পারে না। তোমাদের উভয়েরই অধিকার মানব-জাতির উপর। ষষ্ঠী দেবী সূতিকার অধিষ্ঠাত্রী, শমন শ্মশানের। এক জন আমদানী বিভাগের কর্ত্রী, এক জন রপ্তানী-বিভাগের কর্ত্তা।

ষষ্ঠী দেবী বলিলেন, যমকে ফাঁকি দিয়া বাঁচিয়া আছে, এমন কি নাই?

সভাপতি বলিলেন, সেই জন্যই ত বলিতেছি, রেওয়া মিল ব্যতীত আমদানী-রপ্তানীর তারতম্য বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। তোমরা ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। সম্প্রতি বঙ্গদেশে আমদানী-রপ্তানীর হিসাব-নিকাশের নিমিত্ত জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রী অফিস্ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। সেই হিসাব দৃষ্টে তোমাদের পুরস্কার ঘোষণা করা যাইবে।

ষষ্ঠী দেবী কহিলেন, হরিবোল হরি! বঙ্গদেশ? সেখানে বহুল পরিমাণে চিত্রগুপ্তের ব্রাত্য বংশধরগণ বাস করে। তারা সব বুনিয়াদি মুহুরি। হিসাব-নিকাশের ভার তারাই ত পাবে? কথায় বলে, কায়েতের হাতে কলম। বংশের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্তকে স্মরণ করিয়া তারা ত ওর মুনিব ঐ মিনুষের দিকে টানিবে?

শমনের পশ্চাৎ হইতে চিত্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, লাইবেল্, লাইবেল্, আমার বংশধরগণের বিরুদ্ধে ভয়ানক লাইবেল্।

দেবী মাখাল বলিলেন, সেটা আবার কি? মর্ত্ত্যে ত দুই জাতীয় বেল জন্মে—মিষ্ট বেল ও কয়েৎ বেল। লাই-বেল্ কি রকম ফল? মিষ্ট না তিক্ত? কটু না ঝাল?

সভাপতি বলিলেন, দেবি, উহাতে কটু, তিক্ত, ঝাল, মিষ্ট, সকল রসই আছে। পরন্তু উহা তোমার দুষ্ট ফলের ন্যায় বাহিরে সুন্দর, ভিতরে কুৎসিত।

কোথায় উহার জন্ম ?

সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে। উকীল, অ্যাটর্ণী, ব্যারিষ্টার বহুযত্নে, অনেক বকাবকি করিয়া ফলটিকে পরিপক্ক করেন।

একটি পাকা ফলের মূল্য কত ?

তার স্থিরতা নাই। ব্যক্তিবিশেষে এক আনা হইতে লক্ষ, দ্বিলক্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়। দেশীয় ভাষায় এই লাইবেল্ ফলকে মানহানিও বলিয়া থাকে।

কিন্তু এত দাম দিয়া মানহানি কেনায় লাভ কি ?

লাভ ? কচু লাভ—অবশ্য উকীল-ব্যারিষ্টারের পারিশ্রমিক বাদে। তবে যারা এ ফল আবাদ করে, তারা এক দিক্ দিয়া কিছু লাভবান্ হয় বটে। একটু পসার বাড়ে।

চিত্রগুপ্ত তখন দারুণ চটিয়া বলিলেন, তা হ'ক। মানহানিতে কচু লাভ হ'ক আর যা-ই হ'ক, আমি একবার ঐ ঠাকুরুণকে দেখিয়া লইব।

ষষ্ঠী দেবী বলিলেন, কি আর দেখিবে! এই ত আমি দাঁড়াইয়া আছি, দেখ না।

সভাপতি বলিলেন, ষষ্ঠী দেবি, ক্রোধ পরিহার করুন। যাহাতে কায়েতের হাতে কলম না পড়ে, সে ব্যবস্থা করা যাইবে। এখন সভাভঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গে দুন্দুভিনাদ হইল। সাহেব চমকিয়া দেখিলেন, মর্ত্ত্যে মেঝের উপর শুইয়া আছেন।

মর্ত্ত্য-খণ্ড

সেকালের কথা

কলিকাতার উত্তর বিভাগে প্রথম জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রী আফিস খোলা হইল, আর তাহার প্রথম রেজিষ্ট্রার হইলেন আফতাফ মিঞা এবং তথায় প্রথম এত্তেলা দিতে আসিলেন চন্দ্রমোহন ন্যায়ালঙ্কার। শূলবেদনার জন্ম ব্রাহ্মণ তারকনাথের দাঁড়ী-গোঁফ রাখিয়াছেন। বড় ভাল কাম করেন নাই। তাহাতে মুখখানি দেখিতে হইয়াছে ঠিক মিঞা সাহেবের মত।

আফিস-ঘরে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই আফতাফ বলিয়া উঠিলেন, আরে আসেন চাঁদ মিয়া! আদাব! বসেন, বসেন! মেজাজ শরীফ্!

চাঁদ মিয়া! যা-ই হ'ক, হাকিম খাতির করিতেছে, চন্দ্রমোহন বিনা প্রতিবাদে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

আফতাফ বলিলেন, ওঃ, কত কালের পর মুলাকাত! মিয়া, মনে আছে, একসঙ্গে জলপান খেতে খেতে দোনো দোস্ত মৌলবীর কাছে পড়তে যেতাম ?

চন্দ্র শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলে কি—একসঙ্গে জলপান! বেটা জাতি মারিবার মৎলব করিতেছে।

আফতাফ বলিলেন, আর সেই হানিফ সেখের বাড়ী মুর্গী চুরি ?

ওঃ, অসহ্য! তথাপি চন্দ্র কিছু বলিলেন না। কেবল দরজা-জানালাগুলা ভাল করিয়া দেখিলেন, কেহ আছে কি না!

আফতাফ বলিলেন, তুমি ত মিয়া মুর্গী নিয়ে সট্‌কালে, তার পর আমার যে নাকাল! হাঁ, ভাল কথা! তুমি পুরানা দোস্তের কোন খবর রাখ না, লেকেন আমি সব রাখি।

চন্দ্র মনে মনে বলিলেন, তোমার গুষ্ঠীর পিণ্ডি আর আমার মুণ্ডু রাখ!

আফতাফ বলিলেন,—শোন্‌লাম তোমার পরিবার—

চন্দ্রমোহনের প্রিয়া অতিশয় কলহপ্রিয়া ও দজ্জাল বলিয়া পাড়ায় খ্যাতি। কিন্তু সে খ্যাতি যে সরকারী আপিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আমার পরিবার কি ?

বড় আফশোষের বাত, মিয়া!

চন্দ্র কঠোরতর স্বরে কহিলেন, কি আপশোষ ? কিসের আপশোষ ? সে ঝগড়া ক'রে বেড়ায় তার পাড়ায়। তার সঙ্গে সরকারী আপিসের কি ?

বেচারী শোকে বাউরা হইয়া গিয়াছে! আফতাফ বলিলেন, শোন্‌ছিলাম, তিনি মারা গিছেন—

গেলে হ'ত ভাল। অনেকের হাড় জুড়ুত!

তাই পুছ করছি, তিনি ভাল আছেন ত, মিয়া ?

খুব ভাল, কিন্তু আপনি মিয়া বল্‌ছেন কা'কে ?

মিয়া বলছি কা'কে ? তোমাকে। তুমি চাঁদ মিয়া নও ?

কস্মিন কালে নয়।

আফতাফ মহা চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কে তুমি ?

আমি চন্দ্রমোহন ন্যায়ালঙ্কার। ভাটপাড়া হ'তে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত আমার খ্যাতি। আমায় আপনি বলছেন মিয়া ?

আফতাক তখনও অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, ঝুট। তুমি চাঁদ মিয়া, নইলে চাঁদ মিয়ার মুখ তোমার ঘাড়ের ওপর এল কোথা থেকে? আমারে ঠকাবার জন্ম নিশ্চয় তুমি তার কাছ থেকে হাওলাৎ ক'রে এনেছ।

চন্দ্রমোহন বড় বড় চক্ষু আরও বড় করিয়া বলিলেন, মশাই, এ কি মুখস যে, ধার ক'রে আন্‌ব?

নিশ্চয়।

কেন?

আমাকে ঠকাবার জন্যে। জান, আমি তোমাকে চিটিং চার্জ্জে ফেল্‌তে পারি? কুর্সিতে বসেছ কোন্ সাহসে—আমি হাকিম, আমার সামনে? বেয়াদব্।

চন্দ্রমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতেও নিস্তার নাই। আফতাক বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে যে।

চন্দ্রমোহন বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

আফতাক হুঙ্কার দিলেন, খবরদার, বেতমিজ! এডা তোমার বাগিচা পাইচ?

কি বিপদ! বসিলে বিরক্ত হয়, দাঁড়াইলে চটে, বেড়াইলে গালি দেয়! ওড়া ত অভ্যাস নাই!

আফতাক সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করতে আসছ?

খবর দিতে।

কি খবর?

কাল রাত্রে আমার স্ত্রী একটি মৃত-সন্তান প্রসব করেছে।

চালাকি পাইচ? জন্মাল না আর ম'রে গেল!

চন্দ্রমোহন ন্যায়ালঙ্কার কখন মিছে কথা কয় না। ভাটপাড়া নবদ্বীপ জানে।

কি জানে? ছেলে হয়েছে না মেয়ে?

ছেলে।

কেমন ক'রে জান্‌লে?

আমি ন্যায়ালঙ্কার, ছেলে-মেয়ের প্রভেদ জানি না?

না, জানো না। আমি বিশ্বাস করি না। তোমার সব ঝুট! বদমাস্! ঠগ! চাপ্‌রাশি, ইস্‌কো নিকালো!

চন্দ্রমোহন প্রস্থান করিলে আফতাক অফিস-ঘরে নোটিস লটকাইয়া দিলেন—

যে কেহ অপর কাহারও মুখ লইয়া বা অনুকরণ করিয়া অফিস-ঘরে প্রবেশ করিবে, তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই এক ভদ্রলোক কাচা গলায় দিয়া থানার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার পিতার গঙ্গালাভ হয়েছে।

আফতাকের মেজাজ তখনও বিষম গরম, বলিলেন, বয়ে গেল! তোমার বাবার লাভের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

পিতৃহীন বলিল, হুজুর, তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে, তাই জানাতে এসেছি।

ফের ঐ কথা! লাভ হয়েছে, হয়েছে, তার আমার কি? আমি সিকি পাই ত ভাগ চাইনি।

আজ্ঞে, লাভ কি? তাঁর ৺কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে।

রেজিষ্ট্রার হাঁকিলেন, চাপ্‌রাশি, ইস্‌কোভি নিকাল্ দেও! সরকারি আপিসে হাকিমের সামনে এসেছ দম্‌বাজি করতে? এক মুখে তিন রকম কথা! নিক্‌লো হিঁয়াসে। বজ্জাৎ! বদ্‌বখ্‌ত্! বদ্‌মাস্! বাটপাড়!

হুজুর, খামকা গাল দেন কেন? আমার বাপ মারা গেছেন, তাই রেজেষ্টরি করতে এসেছি।

মারা গিছেন! তিনবার তিন রকম কইলে! তোমার কথা বিশ্বাস করিনে। প্রমাণ কি তোমার বাপ মারা গিছেন?

ইনি সাক্ষী, বলিয়া পিতৃহীন তাহার সঙ্গীকে দেখাইয়া দিল।

রেজিষ্ট্রার তাহার মুখের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন। তাহার গলা শুকাইয়া গেল। বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। লোকটি তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, হুজুর, শমনের ওপর যদি শমনজারি করেন—

হুজুর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, শমন! সে ব্যাটা আবার কে?

আজ্ঞে, তাঁর সঙ্গে সকলকেই একবার আলাপ-পরিচয়-মোলাকাত করতে হবে।

হুজুর বলিলেন, আমি যাব তার সঙ্গে মুলাকাত করতে! তুমি হাকিমেরে বে-ইজ্জৎ কর! তুমি জানো, এর বাপ মারা গিছে?

জানি বৈ কি।

কি রকম ক'রে জান্‌লে? তুমি ডাক্তার?

আজ্ঞে না।

তোমার সাক্ষী চল্‌বে না। কোন ডাক্তার দেখেছিল?

পিতৃহীন বলিল, মশাই। আমরা গরীব, ডাক্তার পাব কোথা?

ডাক্তার দেখেনি ? ডাক্তারের সার্টিফিকেট না হ'লে মরা সাব্যস্ত হ'তে পারে না।

সে কি, মশাই! আমার বাপ মরেছে, আমার চেয়ে ডাক্তার বেশি জানবে ?

চোপরাও, বে-অকুব! তুমি কিছুই জান না। নয় ত ইচ্ছে ক'রে বদমাসী করতে এসেছ! এটা হাকিমের এজলাস জানো ? চাপরাশি!

ভদ্রলোক দুইটি দৌড়িয়া পলাইয়া মান রক্ষা করিলেন।

বৎসর শেষ হইয়া গেলে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সাহেব জন্ম-মৃত্যুর একটা সাল-তামামি করিতে বসিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক কর্ম্মচারী। তথাপি এক বছরের হিসাব-নিকাশ করিতে সাত বছর কাটিয়া গেল। তৎপরে কর্ত্তা রিপোর্ট লিখিলেন—

দয়ালু, সদাশয় ও মহানুভব সরকারের সুশাসন-ফলে প্রজাগণ এখন নিবিষ্ট চিত্তে সন্তানোৎপাদন করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু বিভাগ প্রথম খোলা হইতেই সাত হাজার শিশু প্রজারূপে সরবরাহ হইয়াছে। ইহার দৈনিক হার বিশ, অর্থাৎ প্রতিদিন কুড়িটি করিয়া শিশু জন্মিতেছে। কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ ধরিলে শিশুজন্মের অনুপাত প্রতিদিন প্রতি লোক পিছু $\frac{১}{২৫০০০}$, অর্থাৎ কলিকাতার নর-নারী নির্ব্বিশেষে প্রতি ব্যক্তি একটি আস্ত শিশুর পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগকে জন্মদান করিতেছে। ইহা কম উন্নতির পরিচয় নহে।

এক্ষণে মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করিয়া দেখা যাউক: আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ হাজার সাত শত সাড়ে তিরানব্বই। অর্দ্ধভাগ হইবার কারণ, এ দেশে অনেকেই আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহার জন্য জঙ্গলের মশা এবং আকাশের অনাবৃষ্টি দায়ী। মশা যদি ম্যালেরিয়া সরবরাহ না করিত এবং অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ না হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর হার এত অধিক না হইলেও না হইতে পারিত। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য তথ্য জানিতে পারা যায়। যথা—

শিশু-জন্ম—————— ৭,০০০

বালক, যুবা, বৃদ্ধ মৃত্যু——২৫,৭৯৩॥

এই তালিকা হইতে আপাত-দৃষ্টে দেখা যায়, আমদানী হইতে রপ্তানী অনেক বেশী। কিন্তু বুদ্ধিমান্, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার হইতে হইবে যে, জন্ম মৃত্যু রেজেষ্ট্রী খাতায় যে সকল শিশু জন্মিয়াছে, তাহারা কখনই এক বর্ষের ভিতর বালক, যুবা ও বৃদ্ধ হইয়া মরিতে পারে না। সুতরাং যাহারা মরিয়াছে, তাহারা আদৌ জন্মে নাই। আশ্চর্য্য তথ্য এই যে, এ দেশের লোক না জন্মিয়াই মরে। জাতীয় শয়তানির আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে ? পরন্ত এ দেশের লোক যেমন অসভ্য, তেমনি নির্লজ্জ। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বস্ত্রের ভিতর ইহারা সবাই উলঙ্গ থাকে।

সংবাদপত্র সকল একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

জন্ম-মৃত্যু রেজেষ্ট্রী আফিস খোলা হইলে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণমধ্যে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। একটু নিশ্চিন্তে মরিবার জন্য অনেকে সহর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু দেশে গিয়াও দেখে সেই বিপদ। সরকার আইন করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর বৈতরণীতে খেয়া দিবার পূর্ব্বে এই বিভাগে এত্তেলা দিয়া যাইতে হইবে। কোনরূপে যমদূতের বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া যদি নিজের মৃত্যু রেজেষ্ট্রী করিতে না পারে, তাহা হইলে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ বড় বড় সম্পাদকীয় স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন যে, এ নিয়মের ব্যভিচার আছে। শবদাহ করিয়া আত্মীয় বা উত্তরাধিকারিগণ সাক্ষী-সাবুদ বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ মৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিলেও চলিবে। কিন্তু তাহাতেও শঙ্কার নিবৃত্তি হইল না। শত্রুতা করিয়া বা কোন গুপ্ত কারণে যদি রেজেষ্ট্রী না করে! ধর, মৃতের অর্দ্ধাঙ্গিনীই যদি সতী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা না রাখিয়া, মৎস্য-মাংসের প্রলোভন ত্যাগ বা একাদশীর কঠোরতা স্বীকার না করে। অনেকেই স্থির করিয়া ফেলিল, মরিয়া ভূত হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এই রিপোর্টের ফলে সাহেবের পুনরায় পদোন্নতি হইল।

পাতাল খণ্ড

একালের কথা

কথায় বলে, 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।' জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রী আফিস্ খোলা হইয়াছে, এইবার আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতাপুরুষ সভ্য-বিবাহ রেজিষ্ট্রী আফিস প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার অনেকগুলি কারণও ছিল। একটিমাত্র উল্লেখ করিলেই ধীমান্ পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

এক দিন এক অধ্যাপক তাঁহার মৃতা পত্নীর শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। পুরোহিত 'ভরদ্বাজগোত্রীয়া' উচ্চারণ করিবামাত্র অধ্যাপক আগুন হইয়া বলিলেন, কি বেল্লিক্! আমি সগোত্রে বিবাহ করেছি? শ্রাদ্ধ করাতে বসেছ?—প্রচণ্ড চড়!

পুরোহিত আসন হইতে উঠিয়া বলিয়া গেলেন, আগে তোর শ্রাদ্ধ করি, তার পর তোর পরিবারের পিণ্ডি দোব।

অনন্তর পুলিস কেস্। অধ্যাপকের জরিমানা। আপীল্। সেখানেও নিম্ন আদালতের রায় বাহাল। অবশেষে বিলাত-আপীলের প্রচেষ্টা। কিন্তু চড় যে হনুমানের ন্যায় সাগর ডিঙ্গাইতে পারে, কোন উকীল, ব্যারিষ্টার এরূপ নজীর খুঁজিয়া পাইলেন না। ভগ্নমনোরথ অধ্যাপক অভিসম্পাত দিলেন, হে নারায়ণ, হে ধর্ম্ম, আর্য্যভূমিতে ম্লেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত হ'ক! গেল ত সবই যাক্!

তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হাটে, মাঠে, ঘাটে বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন—হায়—হায়, এ হইল কি! ভদ্র মহোদয়গণ! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কথা ছাড়িয়া দিন। এই সসাগরা ধরিত্রীর স্তরের পর স্তর পড়িল। প্লিয়োসিন্ (Pliocene) গেল, মিয়োসিন্ (Miocene) গেল, ইয়োসিন্‌ও (Eocene) গেল। তার পর আসিল যুরাসিক্ (Jurassic), ট্রায়াসিক্ (Triassic), তার পর পেলিয়োযোয়িক্ (Palæozoic), সর্ব্বশেষে প্রি-কাম্‌ব্রিয়ান্ (Pre-cambrian)। কিন্তু এ হইল কি! হায়—হায়! কেবল বাঙ্গালী-জীবনই অসাড় থাকিবে? কোন সাড়া পড়িবে না?—(করতালি)

অপর এক বক্তা আরম্ভ করিলেন—ভদ্র-মহোদয়গণ, বানর নর হইল, ম্যাষ্টোডন্ (Mastodon) হাতী হইল, তন্ত্রা-পোষক, রক্ত-শোষক ভ্যাম্পায়ার (Vampire) কলাবাদুড় হইল; জলের শাঁখ শামুক হইয়া স্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; ভগ্নস্তূপ দিল্লী ভারতের রাজধানী হইল, অতি অন্তজ 'বামী-বোষ্টমী'র গলি 'রাণী-রজকিনী' লেন্ (lane) হইয়া গেল; কেবল বাঙ্গালীই যেমন ছিল, তেমনি রহিল!—(করতালি) পুনঃ পুনঃ করতালির মধ্যে জনৈক জনপ্রিয় বক্তা বলিলেন, প্রিয় বন্ধুগণ! পৃথিবীতে কি না হয়? বরুণালয় হিমালয় হয়, মহাদেশ সাগরে বিলীন হয়; ব্যাঙাচি ব্যাং হয়, নদী—নালা হয়, ফুল—মালা হয়, এমন কি, শালার বেটাও—শালা হয়; পদোন্নতির প্রভাবে দ্বিপদ চতুষ্পদ হয়, ভোটের জোরে মানুষ কমিশনার হয়, মরিয়া ভূত হয়—অবশ্য ভোটের প্রভাবে নয়, কর্ম্মফলে—কিন্তু হয়! হায়, কেবল আমরাই কি যেমন আছি, তেমনি রহিব?—(আবার করতালি)

অনন্তর অপর এক বক্তা উঠিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ, (করতালি) আমি আপনাদের অধিকক্ষণ আটক রাখিব না। আপনারা অবশ্য শুনিয়াছেন যে, আম পাকে, জাম পাকে, গোলাপজাম পাকে, জামরুল পাকে, আবার কোন কোন ছেলে ইঁচড়ে পাকে; ফোড়া পাকে, পাঁচড়া পাকে; কুল পাকে, মাথার চুল পাকে, গোঁফ পাকে; দাড়ি পাকে; এমন কি, মক্স করিতে করিতে হাত পাকে; অপিচ, কারু কারু বুদ্ধিও পাকে। হায়, এ অধম জাতি কি পাকিবে না? কেবল বাঙ্গালীই কি চিরদিন কাঁচা থাকিবে? ধান পাকে, আপনারাও পাকা করিয়া প্রণিধান করুন। বাঙ্গালীও কি অন্ততঃ একটু ডাঁসাইবে না? চিরকাল কাঁচা থাকিবে? পুনঃ পুনঃ ঘন ঘন করতালি ও 'না—না' শব্দমধ্যে বক্তা নিঃশব্দ হইলেন। তার পর বলিলেন, আর এক কথা। বাঙ্গালীর কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। বিশেষ, বিবাহ-প্রথার। জাতি, বর্ণ, কুল, গোত্র—এ-সকল সম্বন্ধে এত দিন ধরিয়া এত বিচার হইয়াছে যে, আর না করিলেও চলে। তবে কি একেবারেই বিচার করিব না? করিব, কিন্তু উদারভাবে। বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ নয়। সে কিরূপ? যেমন, গো-জাতি, বানর-জাতি, মনুষ্য জাতি। আমরা মনুষ্য-জাতি মানিব। হাতী বিবাহ করিব না। তার পর বর্ণ? তা'ও বিধাতা মানুষের গায় মাখাইয়া দিয়াছেন। কেহ কৃষ্ণ, কেহ শ্বেত। আর কুল? গাছে ফলে। যাহার ইচ্ছা পাড়িয়া খাউন!

এইখানে হাসিতে হাসিতে এক জনের ফিট্ হইবার উপক্রম হইল।

বক্তা বলিলেন, তার পর, বন্ধুগণ, বাকী রহিল গোত্র। গোত্র! এই গোত্র আর কিছুই নয়—গোত্ব। যত দিন না এই গোত্ব দূর হইবে, তত দিন আমাদের গোয়ালে থাকা অবশ্যম্ভাবী। যদি মানব-সমাজে বাস করিতে চা'ন, ওটাকে পরিত্যাগ করুন।

এই বিশাল আন্দোলনের ফলে সিভিল্ ম্যারেজ আইন পাস্ এবং রেজিষ্ট্রেশন আফিসও প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু জন্মগত সংস্কার কি সহজে যায় ? এক দিন এক দম্পতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের উভয়েরই বয়স অর্দ্ধ শতাব্দীর ও-পার বৈ এ-পার নয়। রেজিষ্ট্রার পুরুষপ্রবরকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিবাহ করবেন ?

পাত্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভাবী স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন, শুধু আমি নয়, উনিও করবেন।

রেজিষ্ট্রার পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, উনি করবেন কা'কে ?

আমাকে।

আপনি করবেন কা'কে ?

পাত্রী বলিলেন, ওঁকে।

অর্থাৎ, আপনারা পরস্পরে পরস্পরকে বিবাহ করবেন ?

পাত্রী বলিল, আজ্ঞে না।

তবে ?

উভয়ে উভয়:কে।

ভয়ে ভয়ে !

রেজিষ্ট্রার সাহেবটি বাঙ্গালা ভাষায় এক জন বিশেষজ্ঞ। প্রশ্ন করিলেন, ভয়ে ভয়ে কেন ?

আমার আর একটি স্বামী আছে কি না ! তার মাঝে মাঝে হার্ট ফেল্ হয়।

মাঝে মাঝে হার্ট ফেল্ ! হার্ট ফেল্ ত একবারই হয়, আর হলেই ম'রে যায়।

কৈ মরে !

তা হ'লে সে হার্ট ফেল্ নয়।

প্রত্যক্ষ দেখছি, তবু বল্‌বেন—নয় ?

তিনি বুঝি বার বার মরেন আর বাঁচেন ?

হাঁ। বেজায় ছ্যাঁচড়া !

আপনার আর স্বামী আছেন ?

ছিল চার-পাঁচটি। সব মরেছে।

আপদ্ গেছে। কিন্তু তাঁরা কি ক'রে মরেছেন ? হার্ট ফেল্ ক'রে ?

সব—সব।

গলায় দড়ি দিয়ে, কি জলে ডুবে, কি বিষ খেয়ে কেউ নয় ?

কেউ না, কেউ না। তা হ'লে ত খবরের কাগজে নাম উঠ্‌ত। সে আমার বরাতে নেই।

আপনার জীবন ত বড় একঘেয়ে।

অতঃপর রেজিষ্ট্রার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি ?

পরিণয় শর্ম্মা।

মিষ্টার পরিণয় শর্ম্মা, আপনি একটু এর স্বাদ বদ্‌লে দেবেন না ? ভেবে দেখুন, খবরের কাগজে নাম উঠবে।

কিন্তু ম'রে ভূত হ'তে হবে।

পাত্রী বলিল, তাতে আমি রাজি আছি। ও ভূত হ'ক্, আমিও পেত্নী হব। জীবনে মরণে আমাদের প্রণয় বন্ধন ছিন্ন হবে না।

রেজিষ্ট্রার সাহেব বলিলেন, ঠিক্, খুব ঠিক্। আপনার নাম কি ?

পাত্রী বলিল, বিবাহ-প্রবাহিণী-মালা। এ নাম আমি নিজে বেছে নিয়েছি স্ত্রীলোকদের ভিতর বহু-বিবাহ প্রচার করবার জন্য। কেন ! পুরুষদের বহু বিবাহ করবার অধিকার আছে, আর স্ত্রীলোকদের নেই ?

নিশ্চয়। মিষ্টার পরিণয় শর্ম্মা, আপনি হিন্দু ?

না।

ইস্‌লাম-ধর্ম্মী ?

না।

খৃষ্টান্ ?

রাম রাম !

আপনি ত ব্রাহ্মণ ?

কতকটা।

কতকটা কি রকম ?

কি জানেন ! ওঁর জন্য আমি জাত ছেড়েছি। কিন্তু তার নিদর্শন রেখেছি এই থলির ভিতর। বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁর গল-বিলম্বিত থলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ওতে কি আছে ?

পৈতা আর শালগ্রামশিলা।

পাত্রীর প্রতি প্রশ্ন হইল, কেমন, আপনি এতে রাজি ?

সম্পূর্ণ। ও দড়ি-কলসী ঝোলাক না কেন, যখন ধরেছি, আমি ছাড়ছি নি।

খাতায় সই করা হইল। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন আফিসে এরূপ দম্পতি কখন আসে নাই। আসিবে কি না সন্দেহ। সাহেব পাদরীর পুত্র। দণ্ডায়মান হইয়া দুই কর ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন—

Now, shake, hand and Kiss Eternal bliss
Depart in peace!

দম্পতি নিস্ক্রান্ত। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া পড়িয়া গেল। এ বিবাহে নিরক্ষর পুরোহিত নাই! অসভ্য, উলঙ্গ, হস্ত-পদহীন শালগ্রাম নাই। বরপণ আছে কি নাই, বলা যায় না। তবে বরযাত্রি-ভোজন (বরযাত্রীদিগকে খাওয়া নয়—খাওয়ানো) নাই। অশ্লীল বাসরঘর নাই। আছে কেবল বন্ধন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিতে লাগিলেন, জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এ বন্ধন, না, উদ্বন্ধন? ক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের দিনে কোন সম্পাদক লিখিলেন, বিবাহের জন্যই বা কেন আমরা রাজদ্বারে প্রার্থী হইব? চাণক্য-বাক্য—'রাজদ্বারে শ্মশানে চ'—অর্থাৎ রাজদ্বার শ্মশান সমান। শ্মশানে পরিণয়! চিরশ্মশানবাসী হর-পার্ব্বতীও যে বিবাহ করিয়াছিলেন হিমাচলে। ইহার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না?

সভা আহূত হইল। এক জন বক্তা বলিলেন, মাংসভক্ষণ ব্যতীত শরীরের পুষ্টি হয় না, কি ইহলোকে, কি পরলোকে। এই জন্যই আমাদের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছেন। তাহাও এক রকম নয়, অষ্টকা—আট রকম মাংস। ব্যষ্টির পক্ষে যে নিয়ম, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই। এক জাতি অপর জাতি কর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলে জাতির পুষ্টি হয় না। হিন্দু খৃষ্টান হইতে পারে, ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। কিন্তু ইহারা হিন্দু হইতে পারে না। কেন? এ ত বড় বিপদ হ'ল দেখছি! এক ফোঁটা জর্ডান নদীর জল মাথায় দিয়া যদি খৃষ্টান হওয়া যায়, খৃষ্টান আমাদের গঙ্গায় অবগাহন বা গণ্ডূষ পান করিয়া হিন্দু হইবে না কেন? ইস্লাম ধর্ম্মের উদারনীতি দেখুন! বলিতেছে, জাতি-নির্ব্বিশেষে—

বিচার ক'রে নর কি মাদী,
কল্মা প'ড়ে করবা সাদি!

কিন্তু আমাদের ধর্ম্মে কল্মার কি অনুকল্প নাই?

দূর হইতে কে এক জন বলিল, থাকবে না কেন?—বকল্মা।

সে দিন হাস্যরোলে সভাভঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু অতি ত্বরায় শুদ্ধিপদ্ধতির প্রচলনও হইল। সহরে সহরে তাহার প্রচারকও ছুটিল।

এমনি শুদ্ধি-পরিণয়প্রার্থী এক দম্পতি পল্লী হইতে গঙ্গা-কূলস্থ কোন সহরে আসিতেছিল। পাত্রটি ইস্লাম-ধর্ম্মা-বলম্বী; পাত্রী পুরোহিত-কন্যা। কয়েক ঘর যজমান আছে, স্ত্রীলোক যাজকতা করিতে পারেন না। প্রতিনিধি পাঠাইলে ভাগ দিতে হয়। ব্রাহ্মণী তাহাকে প্রথমে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিল। দ্বিজবর বলিলেন, দেখ, ঠাকরুণ! আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বংশধর হয়ে আমি অশাস্ত্রীয় কায করতে পারব না। পোষ মাসে ত আমার জন্ম নয়, আমি পোষ্যপুত্র হই কেমন ক'রে? তার ওপর একটা বোঙা নিয়ে তুমি যে মারামারি কর! সেটা যদি আমার জিব চাটতে চাটতে হঠাৎ হড়্কাস্ ক'রে আমার পেটের ভিতর ঢুকে যায়, অমনি তোমার রাগ!

আচ্ছা, বামুন, পৈতে ছুঁয়ে বল্ দিকি, সে তোর জিব চাটে, না, তুই তার গা চাটিস?

সে মা বোঙাই জানেন!

তার বেলা মা বোঙাই জানে!

জানেন না! আমার পেটের খবর রাখেন, তা জানো? উনি বিলিতী শালগ্রাম, তাই সাদা। অন্তর্য্যামী!

শালগ্রাম অমনি তোর পেটের ভেতর ঢুকে গেল!

সাপ গর্ত্তে ঢোকে না? উনি হচ্ছেন অনন্তদেব।

এবার অনন্তদেব তোর পেটে সেঁধুক দিকি! আঁকশী দিয়ে টেনে বার করব। আমার অনন্তদেব আমার গর্ত্তে না সেঁধিয়ে তোর গর্ত্তে ঢুকবে কেন রে বিটলে বামুন?

সে প্রভুর ইচ্ছা! তোমার গর্ত্তে অনন্তদেব ঢুকলে পাড়ায় নিন্দে হবে!

পুরোহিত-দুহিতা ভাবিলেন, বলেছে বড় মিছে নয়। একেই ত মুখপোড়ারা আমার নামে আর রহিমের নামে কত কথা রটায়!

প্রতিনিধি তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, ঠাকরুণ, শাস্ত্র-কথা বোঝাতে গেলেই ঝগড়া কর।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ-কন্যা মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তা'লে এক কায কর্ না কেন? যত বোঙা সব তুই খাবি।

লোভার্ত্ত প্রতিনিধি অদম্য কৌতূহলে কহিল, কি?

পুরোহিত-কন্যা একটু নড়িয়া চড়িয়া, বসন সংযত করিয়া,

ঘোমটাটা আরও একটু বাড়াইয়া বলিল, বিয়ে আর না কেন?

কাকে ?

ব্রাহ্মণী নথ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, আমাকে।

প্রতিনিধি শিহরিয়া উঠিল—ওরে বাপ রে! ঐ লম্বা চওড়া দিগ্‌গজ মূর্ত্তি! পেটটি ঢাক, খাঁদা নাক, মাথায় টাক! তার পশ্চাতে চুল নয়—টিকি! কি সর্ব্বনাশ! ও কি মেয়েমানুষ, না, কাল-ভৈরব! কহিল, দেখ, ঠাকৃরুণ! তুমি যদি না বয়সে বড় হ'তে, আর—আর—

উত্তেজনায় ব্রাহ্মণীর ঘোমটা খুলিয়া গেল। দুচল চক্ষু পাকাইয়া কহিল, আর কি ?

আর দেখতে-শুনতে একটু চলন্‌সৈ হ'তে! আর—

ব্রাহ্মণী ঝাঁটাগাছটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, আর কি বল্—

ব্রাহ্মণও চাল-কলার পুঁটুলীটা আঁটিয়া ধরিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া বলিল, অন্ধকারে যদি তোমায় চেনা যেত, ছেলে-পুলে আঁৎকে না উঠত—

বটে রে মিন্‌ষে! তবু যদি তোর মোচের আধখানা ছাগলে খাবলে না খেত!

মিন্‌ষে কে রে মাগি! বলিয়াই প্রতিনিধি পুঁটলীসহ দাওয়ার উপর হইতে এক লাফ—মিন্‌ষে!

ঝাঁটার সুরে—মাগি!

দু'ট কথাই অশ্লীল। লেখক নিরুপায়। মূলগ্রন্থে যেমন আছে, তেমনি বিবৃত করিতে বাধ্য। এ-পালা এইখানেই শেষ। পরদিন রহিমের প্রবেশ। তৎক্ষণাৎ শুদ্ধির প্রস্তাব। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রহিমের ভাব এবং মুখ দিয়া অজস্র লালা স্রাব।

পুরোহিত-সুতা অভিমানের সুরে বলিল, শুনছ, রহিম! আমায় বলে মাগি।

কেডা ?

ঐ মিন্‌ষে।

রহিমের যে কয়টা দাঁত অবশিষ্ট ছিল, কড়মড় করিয়া বলিল, মুণ্ডুটা চাবায়ে খাব না!

তুমি খাবে মুণ্ডু, আমি খাব মোণ্ডা—কেমন রহিম ?

দু'ট্যা আমারেও দিয়ো, বিবি!

ও-মা, তা দেব না, তোমারই সব!

অতঃপর শুদ্ধি-যাত্রা। পল্লীর মাঠে এই দম্পতির সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। অনন্তর শুদ্ধ হইলে রহিম প্রশ্ন করিল, মুই ত শুদ্ধি হলাম ? এখন বিবিও যে জাত, মুইও তাই।

শুদ্ধি-পুরোহিত কহিলেন, হাঁ, মিয়া।

আর মিয়া কেন ? এখন ঠাকুর কও।

পুরোহিত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, হাঁ, রহিম ঠাকুর।

শুটকি মাছ খাবার পারুম ?

বধূ কহিল, শুটকি মাছ! রাম—রাম, থু—থু! নাম শুনেই গা গুলিয়ে উঠছে।

বাগুনের সাথে বড় মজে গো, বিবি!

শুদ্ধিদাতা বলিলেন, ও, বেগুনের সঙ্গে! তা হ'লে কোন দোষ হবে না। কিন্তু আর বিবি কেন, রহিম ঠাকুর ?

তবে কি কব ?

বলবে—ঠাকৃরুণ। তুমি রহিম ঠাকুর, উনি ঠাকৃরুণ।

রহিম সোল্লাসে কহিল, তা হ'লে আমরা হাঁছুর ঠাকুর-ঠাকৃরুণ হলাম ?

নিশ্চয়।

এ দিকে শিক্ষায়-দীক্ষায় দেশ অতি দ্রুতগতি উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু ইহার গন্তব্যস্থান কোথায় ? এই বিষম সমস্যায় এক দল বলিলেন, হিমাচল-শিখরে, এক দল বলিলেন, সাগরে। এই লইয়া মহা দ্বন্দ্ব। প্রথমে বাগ্-যুদ্ধ। তার পর চাঁটি, অনন্তর লাঠি, অবশেষে মাথা ফাটাফাটি। তথাপি কোন মীমাংসা হইল না। মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অমানব সিদ্ধান্তের প্রত্যাশায় কয়েক জন থিয়োসফিষ্ট প্রেতাত্মার শরণাপন্ন হইলেন।

ঘর অর্দ্ধান্ধকার। একটি তেপায়া টেবল ঘেরিয়া কয়েক ব্যক্তি ঘোর সমাধিমগ্ন। বহুক্ষণ পরে—ঠক্—ঠক্—ঠক্। দোহাই পাঠক, ঠক্ মানে এখানে প্রতারক নয়—শব্দ-বিশেষ। বার কতক ঐরূপ শব্দের পর টেবলটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কক্ষের এক কোণে গিয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে নৃত্য আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে এক জন আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তিনিও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে টেবলের কাছে গিয়া উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যে সকলকে শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। এই আসরে যেরূপ প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

কে আপনি ?

গাধার মড়া।

আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন ?

আমার ছিল লম্বা ঠ্যাং। এক চিতায় পোড়বার সময় এক বেটে বজ্জাৎ তার একখানা নিয়ে স'রে পড়েছে।

এমন সময় আবিষ্ট ব্যক্তি ভীষণ ক্রোধাবেশে লম্ফঝম্প করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিজ্ঞ থিয়োসফিষ্টগণ বুঝিলেন, অপর এক প্রেত আসিয়াছে। প্রশ্ন হইল, আপনি কে ?

আবিষ্টের কণ্ঠে একটা অত্যন্ত মোটা গলা বলিল, আমিও গাদার মড়া।

আজ দেখছি গাদার মড়ার পালা! তা আপনি অত রেগেছেন কেন ?

আরে মশাই, এই চাঁপদাড়ী বেটা আমার একখানা ঠ্যাং নিয়ে পালিয়ে এসেছে। দে, বেটা, আমার ঠ্যাং দে!

টেবলের উপর দুই হাতে মিডিয়ামের (আবিষ্টের) দমাদম কিল।

প্রবীণ থিয়োসফিষ্ট এরূপ অনেক প্রেতাসরে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। তিনি কেবল অভিজ্ঞ নন, বিশেষজ্ঞ। বলিলেন, আ-হা-হা, করেন কি, করেন কি! এখানে কিলোকিলি করছেন কেন ?

দুই জনেই কহিল, তবে কোথা করব ?

বড় শক্ত সমস্যা! সহসা একটা স্থান নির্ব্বাচন ও নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া থিয়োসফিষ্টপ্রবর বলিলেন—চুলোয়।

দুর্গা! দুর্গা! চুলোয় ত একবার চুলোচুলি হয়ে গিয়েছে।

বিস্মিত থিয়োসফিষ্টগণ বলিলেন, চুলোয় চুলোচুলি!

হরি বল! আপনারা কিছুই জানেন না বুঝি ?

কেমন ক'রে জানব! চুলোয় ত কখন পুড়িনি!

কখন না ?

এ জন্মে ত নয়। আর জন্মে কবর দিয়েছিল কি পুড়িয়েছিল, তা মনে নাই।

ও, তাই! কি জানেন, মশাই! চির জীবন দুঃখ পেয়ে হাঁসপাতালে ভুগে আমরা গাদায় পোড়বার অধিকার পাই। সেখানে একটু ফূর্ত্তি করব না? তাই পোড়বার সময় এ ওর চুল ধরে, সে তাকে চিম্‌টি কাটে।

এ সব কি আপনাদের রসিকতা ?

উভয় মড়াই বলিল, নিশ্চয়।

ঠ্যাং নিয়ে স'রে পড়া ?

ও-টাও।

তবে কিলোকিলি করলেন কেন ?

মড়াযুগল হাসিল—হা-হা-হা! কহিল কোর্টশিপ, কোর্টশিপ।

বলিতে বলিতে মিডিয়াম্ হঠাৎ আসিয়া থিয়োসফিষ্ট-প্রবরের মুখচুম্বন ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনান্তে গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, প্রিয়ে!

আরে ছাড়, ছাড়! এ ত ভারি বিপদ হ'ল দেখছি! কে আপনি ?

গাদার মড়া।

হরি হরি! এ যে একেবারে পালে পাল।

মোটা গলা বলিল, ও কে, চিন্‌তে পারছেন না? ওই ত এর মুখ নিয়ে পালিয়েছিল। দেখ, ভাল চাও ত ওর মুখ ফিরে দাও।

তুই আগে ঠ্যাং ফিরে দে।

দেখছেন, মশাই, আমি বল্‌লাম তুমি, ও বল্‌ছে তুই। ছোট লোক কি না!

যাক্ মশাই, যেতে দিন আপনা-আপনি!

আপোষে মিটিয়ে নিন্। উঃ, এই কায ক'রে ক'রে বুড়িয়ে গেলুম, এমন বিপদে ত কখন পড়িনি!

পড়বেন কেন মশাই! সেকালে গাদার মড়া গঙ্গাতীরে পুড়ে সব মুক্ত হয়ে যেত। এখন আপনারাই ত উঠে পড়ে লেগে আমাদের সদ্‌গতি করেছেন।

থিয়সফিষ্ট-নেতা বলিলেন, কাযটা বড় ভাল হয় নি। গঙ্গাকূলই ছিল ভাল।

প্রথমাগতা মড়া বলিল, আপনি কোন্ যুগের লোক, মশাই? গঙ্গা গঙ্গা করছেন ?

কেন, গঙ্গার দোষ কি ?

দ্বিতীয়াগত মড়া ব'লিল, মনে রাখবেন, এটা ফ্রয়েডের যুগ। কামতন্ত্রে কামমন্ত্রে দীক্ষা। এখন গঙ্গাকূলের পরিবর্ত্তে প্রেয়সী বিদ্যাধরীর কোল চাই।

শুনেছি, গঙ্গাকূলে পুড়ে গাদার মড়ারা স্বর্গে যেতেন। মশাইরা এখন যান কোথা ?

বলিরাজার রাজ্যে—পাতালে।

পাতালে! সেখানে কি করেন সব? মাটীর নীচে নিশ্বাস ফেলেন কি ক'রে ?

নিশ্বাস ফেলবার অবসর কোথা মশাই ?

কেন? সেখানে কি করেন, সবাই ?

কেবল সভা-সমিতি, দেশোন্নতি, বক্তৃতা আর কোর্টশিপ।

খাওয়া-দাওয়া কি হয়?

খালি তপসিমাছ ভাজা—তাও এগাওয়ালা।

নেতা বলিলেন, পাতালে অগ্নি আছে শুনেছি, কিন্তু সে ত গন্ধকের। তপসিমাছ ভাজায় গন্ধকের গন্ধ হয় না?

হরিবোল হরি! আপনারা মনে করেন কি? সেখানে সব বিদ্যুৎ। আগে গঙ্গাকূলে দাউ দাউ ক'রে মড়ারা সব জলত। এখন বিদ্যুৎ আমাদের তপসিমাছ ভাজা ক'রে ভূত হয়ে সেখানে নিয়ে যায়। তার পর সেখানে পৌঁছে দেখি, আলোয় আলোয় অন্ধকার!

চমৎকার! আচ্ছা, মশাইরা, নমস্কার।

নমস্কার কি? আগে আমাদের বিচার করুন, কে ওকে পেতে পারে, কার দাবির জোর বেশী।

তা হ'লে গুণাগুণ জানা চাই। ঠ্যাং মশাই, আপনার গুণ কি?

আমি চাট ছুড়ি। পরখ করুন, বলিয়া মিডিয়াম্ নেতাকে পদাঘাত! সঙ্গে সঙ্গে নেতা ভূমিসাৎ।

মুখ বলিল, আমি কামড়াই—প্রচণ্ড কামড়।

কোর্টশিপের পাত্রী বলিল, আর আমার অস্ত্র নখাঘাত। তৎক্ষণাৎ মিডিয়াম কর্তৃক নেতার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত।

রক্তাক্তকলেবর থিয়োসফিষ্টপ্রবর বহুকষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, দাঁতগুলো সহজে পোড়ে না আমার জানা ছিল। কিন্তু নখও কি ভস্ম হয় না?

তিন মড়াই বলিল, কেন, সূক্ষ্মশরীর। হোমিয়োপ্যাথিক ডাইলিউসনের মত সব অস্ত্রেরই ধার বাড়ে।

সে ত প্রত্যক্ষ দেখলুম। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের নখ-দন্তাঘাত যে স্থূলশরীরে জ্বালা উৎপাদন করে, সে ধারণা আমার ছিল না।

এখন আমাদের বিচার করুন।

নেতা বলিলেন, এক কায করা হ'ক না কেন? পাত্রী দু'জনকেই বিবাহ করুন।

দুই পাত্র সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, হরি হরি, ঠিক বিচার হয়েছে। অতঃপর মিডিয়াম্ দুই বাহুতে উভয় পাত্রের কণ্ঠ-বেষ্টনের অভিনয় করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন। থিয়োসফিষ্ট প্রশ্ন করিলেন, দেশের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, মশাইরা বলতে পারেন, আমাদের গতি কোথায়? দূর হইতে সমস্বরে উত্তর আসিল—ঐ গাদায়।

এ দিকে মিডিয়াম্ ঘরের বাহির হইয়াই পতন ও মূর্চ্ছা। বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্য ফিরিল।

প্রেতবাসরের সভাপতি নিদারুণ উদ্বিগ্নচিত্তে এক জনকে প্রশ্ন করিলেন, ওহে ডাক্তার, মড়ার নখ-দাঁত সেপ্টিক্ হবে না ত?

আরে, না না। তুমি নিশ্চিন্ত হও! বিদ্যুতে পুড়ে সব শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ওতে আর বিষ নেই।

দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা! আঃ, বাঁচলুম! কিন্তু—

কিন্তু কি?

দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিলে মিডিয়াম্ অত্যন্ত আপত্তি করবে। কিন্তু নখগুলো কালই কাটিয়ে দেব।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

মানসী

ওগো, কল্পলোক-সুন্দরি
বিজন মম জীবন-পথে
সুদূর হ'তে
আস যখন গুঞ্জরি
দু পাশে তব, গোলাপ সব
প্রলাপ মম
গন্ধে ওঠে মুঞ্জরি।

সুন্দরি যখন তুমি চলিয়া যাও
কল্পলোক-পথ ধরি'
তোমার খোঁজে বাসনা মম
সুষমা সম
সমুখ হ'তে সমুখ পানে
আশার টানে
বেড়ায় শুধু সঞ্চারি'।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ...

স্বৈর-নীতি

এ দেশের শাসক জাতি প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা নিয়মানুগ পথে ভারতের শাসন-রথ চালাইয়া থাকেন ; পরন্তু এ দেশের লোকের এখনও দায়িত্ব-জ্ঞান হয় নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের হস্ত হইতে শাসন-ক্ষমতা তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু তাঁহাদের কিরূপ দায়িত্বজ্ঞান, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

সকলেই জানেন, সরকার বাঙ্গালা ও আসামের কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উভয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। আবার তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পঞ্জাব ও মাদ্রাজ সরকার ইস্তাহার দিয়াছেন যে, তাঁহারাও এবার যথানিয়মে এবং যথাসময়ে তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভাকে বিদায় দিয়া নূতন করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন না। পঞ্জাব ও মাদ্রাজ ব্যতীত যুক্ত-প্রদেশের এবং বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক-সভাগুলিকেও রক্ষা করা হইবে, এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এবার বাঙ্গালা ও আসাম ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে ব্যবস্থাপক সভা-সমূহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রক্ষা করা হইবে।

দেখিতে হইবে, কোন্ আইন বা নিয়ম অনুসারে সরকার এই ব্যবস্থা করিতেছেন। অবশ্য ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনের ৬৩ঘ ধারা অনুসারে বড়লাট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। এই অনির্দ্দিষ্ট কাল কতটুকু, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে ব্যবস্থাপক সভার নিয়মিত আয়ু যখন ৩ বৎসর, তখন তিনি ৩ বৎসরের অধিক পরিষদের আয়ু বাড়াইয়া দিতে পারেন না, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। প্রাদেশিক গভর্ণররা শাসন-সংস্কার আইনের ৭২ঘ ধারা অনুসারে "বিশেষ অবস্থা সংঘটিত হইলে" প্রাদেশিক সরকারী গেজেটে ইস্তাহার প্রচার করিয়া এক বৎসরের অনধিককাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। বড়লাটও যদি "আবশ্যক ও কর্ত্তব্য মনে করেন," তাহা হইলে ৩ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা-পরিষদটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। ইহাই আইন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এমন কি "আবশ্যকতা বা কর্ত্তব্য" উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার জন্য বড়লাট এমন ব্যবস্থা করিলেন ; পরন্তু প্রাদেশিক গভর্ণররা এমন কি বিশেষ অবস্থা সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহ বাঁচাইয়া রাখিলেন ? আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মন্ত্রীদিগের পক্ষ হইতে কাউন্সিলসমূহ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারাও সেই সুরে পোঁ ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে ৬৪ হাজারী চাকুরী বজায় রাখিবার এই প্রচেষ্টা স্বাভাবিক।

এই সম্পর্কে সাইমন কমিশনের কথা আসিয়া পড়ে। সাইমন কমিশনের সহিত যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের অধিকাংশ ভোটদাতার বিরাগভাজন হইয়াছেন। সুতরাং কাউন্সিল সেপ্টেম্বরের শেষে ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহাদের মন্ত্রিগিরি ত খসিয়া যাইতই, পরন্তু পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ইহাই তাঁহাদের আবদারের কারণ। বাঙ্গালায় যে ভাবে কাউন্সিল-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, অধিকাংশ লোকের মনের ভাব কিরূপ।

তাঁহারা যাহাই আবদার করুন, সরকার এই অন্যায় আবদার ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে শুনিতে পারেন না, এ ধারণা হওয়া লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। ভোটদাতাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পরিচালনা করিতে বঞ্চিত করিলে উহাতে সরকারের স্বৈরনীতির পরিচয় প্রকট হইয়া উঠিবে, ইহাই অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যে তাহাদের সেই ধারণা দূর করিয়া দিয়াছেন, দেশের ভোটদাতাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পরিচালনা করিতে না দিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহ বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে কি সরকারের স্বৈর-নীতির পরিচয় প্রকট হইয়া উঠে নাই ?

নিয়মানুগ পথে "বিশেষ অবস্থা" বা "বিশেষ প্রয়োজন" উপস্থিত হইলে সরকার এই ব্যবস্থা করিতে পারেন বটে, কিন্তু এই বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ প্রয়োজন কি উপস্থিত হইয়াছে, দেশের লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সত্য বটে, যদি যথাসময়ে কাউন্সিলগুলি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন কাউন্সিল নির্ব্বাচিত করিতে বলা যাইত, তাহা হইলে সেই নির্ব্বাচনকালের মধ্যে সাইমন কমিশনের ও বহু প্রাদেশিক কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইত না। কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষ অবস্থা কি সৃষ্টি হইত, তাহা ত বুঝা যায় না। সাইমন কমিশনের উপর লোকের আস্থা নাই, ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, বিলাতে ফিরিয়া মিঃ হার্টসূরণ প্রকারান্তরে তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। সুতরাং সাইমন কমিশনের রিপোর্টের জন্য লোক মাথা ঘামাইতেছে না। তবে হয় ত তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে যদি উহা নেহেরু রিপোর্ট হইতে সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে লোকের বিচলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং 'বিশেষ অবস্থার' অভ্যুদয় কোথায় হইল ?

তবে বাঙ্গালার কাউন্সিল-নির্ব্বাচন-ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, দেশের লোক দ্বৈতশাসন-সমর্থক দলকে সমর্থন করিতেছে

না। ইহাই কি 'বিশেষ অবস্থা'? যদি ইহাই বিশেষ অবস্থা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, দেশের অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধে এসেমব্লি ও কাউন্সিলের আয়ুকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উহাই স্বৈরনীতির পরিচায়ক।

দেশের লাভ

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুকাল বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বড়লাট লর্ড আরউইন দেশের একটা মস্ত উপকার করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার এই স্বৈরনীতি অনুসরণের ফলে দেশে অসহযোগকামী দলের ভাঙ্গন এবার জুড়িয়া যাইবে। কেন, তাহা বলিতেছি।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদলের নেতা, পরন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। স্বরাজ্যদল মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত, এ কথা সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা অসহযোগ নীতির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহারা কাউন্সিল-কামী। কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া হয় দ্বৈতশাসনের সংস্কার করিবেন, না হয়, উহা ভাঙ্গিয়া দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প সফল হয় নাই। তবে তাঁহারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাউন্সিল ও দ্বৈত-শাসন অসার। কাউন্সিলের কার্য্যে তাঁহারা এতটা তন্ময় হইয়াছিলেন যে, জাতি ও গ্রাম গঠন-কার্য্যের যে পদ্ধতি মহাত্মা গন্ধী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকটা অমনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে দেশের পল্লীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দেশের গঠনের কায অনেকটা পিছাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও চরকা ও খদ্দরের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করিতেও শুনা গিয়াছে। ইহাতে অসহযোগকামীদের মধ্যে দুইটি দলের ভিতর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। বোধ হয়, সরকারের স্বৈর-নীতি অবলম্বনের ফলে এত দিন পরে সেই মনোমালিন্যের অবসান হইবে। ইহা দেশের পক্ষে পরম আশার কথা সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি-রূপে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের কংগ্রেস-দলভুক্ত সদস্যদিগকে এক পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"আপনি অবশ্যই পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আয়ুকাল বৃদ্ধি সম্বন্ধে বড়লাট ও গভর্ণরদের ঘোষণা পাঠ করিয়াছেন। আপনি নিশ্চিতই অবগত আছেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও উহার কার্য্যকরী সমিতি এই সকল ঘোষণার মর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্যগণকে পুনরায় নোটীশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে নিষেধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব তাঁহাদের অধিকাংশ সময় কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

সামান্য আঘাত পাইয়া কাউন্সিল-কামী স্বরাজ্য দলপতি এই কথা বলেন নাই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা-পরিষদে সাইমন কমিশনের সহিত সংস্রব বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ব্যবস্থা-পরিষদ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বাজেটে সাইমন কমিশন বাবদ ব্যয় বরাদ্দ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ে কাউন্সিল-কামী কংগ্রেস-সদস্যরা বার বার ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা কাউন্সিল ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এইবার পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভাগুলির আয়ুকাল বৃদ্ধি করার ফলে তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, এত পরেও যে তাঁহাদের মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাও দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বস্তুতঃ ইহা বড়ই আনন্দের কথা যে, পণ্ডিত মতিলাল বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বাহিরে কায দ্বারাই জাতির প্রকৃত শক্তি বৃদ্ধি হয়।" কাউন্সিল-কামী স্বরাজ্য-দলের দলপতির মুখের এই কথাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

বস্ত্র-বর্জ্জন

আমাদের দেশেরই কোন কোন নামজাদা লোক মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত এবং কংগ্রেস-অনুমোদিত বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনের প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। চরকা ও খদ্দরের প্রতি শ্লেষাত্মক উক্তি ব্যবহার করিয়া কেহ কেহ 'সোজা কথা' বলার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। অথচ নিরস্ত্র দুর্ব্বল জাতি কিরূপে দেশনিয়ন্ত্রণের ভার না পাইয়া দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবে, তাহার সদুপায়ও তাঁহারা বলিয়া দিতে অগ্রসর হন না, কেবল কথার বাণ-বর্ষণে দেশের শ্রদ্ধার পাত্রদিগকে অপমানিত করিতে ব্যস্ত হন। কোন এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রে এ দেশীয় এক চিন্তাশীল লেখক এইভাবে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনের প্রতি বক্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উহার অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলন অতি অল্পদিনে ল্যাঙ্কাসায়ার বস্ত্র-ব্যবসায়ের কি সমূহ ক্ষতি করিয়াছে এবং উহার ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ঘরে সূতা কাটিয়া ও তাঁত চালাইয়া কি ভাবে দুই পয়সা অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহা এই শ্রেণীর ভাবুক ও লেখক একটু শ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারেন। অধিক দিনের কথা নহে, গত মে মাসের শেষাশেষি কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র লিখিয়াছিলেন,—"ম্যাঞ্চেষ্টারের কায-কর্ম্ম একরূপ বন্ধ, এই হেতু কাপড়ের বাজারে দর কিরূপ, তাহা অবধারণ করিবার সুযোগ নাই। ভারতবর্ষের সহিত বিলাতের বা অন্যান্য দেশের কাপড়ের কোন কার-কারবার সম্প্রতি হয় নাই। আগামী মাসের শেষে (অর্থাৎ জুন মাসের শেষে) হয় ত কিছু কায-কর্ম্ম হইতে পারে।" অর্থাৎ ঐ সময় হইতে শারদীয়া পূজার চাহিদা আরম্ভ হইবে। অতএব ঐ সময়ে হয় ত ভারতের ব্যবসায়ীরা ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত কিছু কার-কারবার করিবে। তাই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র বিলাতের ব্যবসায়ীদিগকে এখন হইতে প্রাণপণ উদ্যোগ করিতে বলিতেছেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনে মাত্র কিছু কালের মধ্যে কি ফল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" পত্র লিখিয়াছিলেন, "ভারতের বস্ত্রবর্জ্জন আন্দোলনের ফলে

ব্ল্যাকবার্ণের ২৯টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এতদঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ৬ হাজার হইতে ১৪ হাজারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।” ‘ট্যাটরস্তাল’ নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন বিশিষ্ট লেখক ল্যাঙ্কাসায়ার বস্ত্র-ব্যবসায়ের সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন,—“ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয়, কলিকাতায় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের অর্ডারের অভাব। তাঁহাদের এই মনোবৃত্তির ফল যতটা ভয়াবহ বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভয়াবহই হইয়াছে। বোম্বাই হইতেও অর্ডারের সংখ্যাও সন্তোষজনক নহে। তবে করাচী ও দিল্লী-কানপুরের চাহিদা মন্দের ভাল।” এই লেখক কোন সংবাদ-সংগ্রাহককে বলিয়াছেন,—“এ দেশের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ভারতের চাহিদার অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। ভারতের চাহিদার অভাবে ম্যাঞ্চেষ্টার একরূপ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।” গত এপ্রেল মাসের প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারের রিপোর্ট এইরূপ :—“চীন ও মলয় উপদ্বীপ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার বস্ত্রের চাহিদা মন্দ নহে। কিন্তু ভারত এ বিষয়ে বড়ই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে (lagging behind), ইহা ভারতের বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনের ফল।” বিখ্যাত বৃটিশ ব্যবসায়-অভিজ্ঞ সার জিলবার্ট ভাইল “ইংলিশ রিভিউ” পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, “বৃটিশ ভারতের বাজার আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে (lost market)।” তিনি এই জন্য ভারতের দেশীয় রাজ্য-সমূহের সহিত বিলাতের বস্ত্র-ব্যবসায়ের সম্পর্ক এখন হইতে নিবিড় করিতে উপদেশ দিয়াছেন, বলিয়াছেন, এ জন্য দেশীয় রাজ্য-সমূহের সহিত বৃটিশ সরকারের বর্ত্তমান সন্ধিসর্ত্তের আমূল সংস্কার করিতে হইবে, নানা বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিতে হইবে।

অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। উপরে উক্ত তথ্য হইতে জানা যায়, বিদেশী-বস্ত্র-আন্দোলন যে দিন হইতে বিশেষ কঠোর আকার ধারণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে হাহাকার উঠিয়াছে। এই আন্দোলন যদি বৎসরাধিক কাল সফল করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দেশের যে সকল চিন্তাশীল লোক এই আন্দোলনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারা কি ইহার পরেও বলিতে চাহিবেন যে, এই আন্দোলন ‘অসহযোগ আন্দোলনের মত’ বিফল হইবে? তাহা হইলে তাঁহারা যে সত্যের অপলাপ করিবেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এবার লেবার পার্টি শাসন-পাটে বসিয়াছেন। ল্যাঙ্কাসায়ারের শ্রমিকদিগের ভোট তাঁহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিবেই। ল্যাঙ্কাসায়ারের শ্রমিক ও ধনিক প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে লেবার পার্টির মন্ত্রিমণ্ডলকে তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা অহরহঃ স্মরণ করাইয়া দিবেন, ইহাও নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলন সুফল প্রসব করিবে না, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি?

রাজনীতির দিক্ ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের দিক্ হইতেও এই আন্দোলনের একটা সার্থকতা আছে, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সে দিকেও ত এই আন্দোলন আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

সরকারের মনোবৃত্তি

এত দিন সরকার পক্ষ তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে কংগ্রেস-কনফারেন্স-সমূহের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে অনুজ্ঞা দিয়া আসিয়াছেন, এইবার এই সকল প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত কৃষিশিল্প-বাণিজ্য-প্রদর্শনী-সমূহের সংস্রবে গমন করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এ দেশে য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশানসমূহ কেবল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নহে, উহাতে রাজনীতি-চর্চ্চাও হইয়া থাকে। সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনার উৎসব স্কটদিগের ধর্ম্মোৎসব বটে, কিন্তু সেখানে রাজনীতিচর্চ্চা হইয়া থাকে। এ সব উৎসবে স্বয়ং লাট-বেলাট যোগদান করিয়া থাকেন, অন্য পরে কা কথা! তাহাতে সরকারের জাতি যায় না—আর কংগ্রেস-কনফারেন্সে সরকারী কর্ম্মচারীরা যোগদান করিলেই একবারে জাহান্নামে যাইবেন। এমন ন্যায়-যুক্তির তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এবার বাঙ্গালার কাউন্সিল-নির্ব্বাচন-ব্যাপারেও সরকার পক্ষের কর্ম্মচারীদের কাহারও কাহারও অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ‘দৈনিক বসুমতী’ পত্র কোনও য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত দুইখানি পত্র হস্তগত করিয়া তাহার কতক কতক অংশ প্রকাশিত করিয়াছেন। একখানি পত্রে আছে,—“চৌকীদার, তুমি—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে গিয়া কি করিতে হইবে জানিয়া কায করিবে ও তাঁহার কথামত তোমার বিটের ভোটারগণকে ঐ সময় একত্র করিবে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিবে। ইতি।” আর একখানি পত্রে আছে,—“আপনি চৌকীদারদিগের সাহায্যে ভোটার কয়জনকে ঐ সময় একত্র করিবেন।” নির্ব্বাচনের প্রেম-নদীতে কত গুপ্ত তুফান বহে, তাহার খবর কয় জন রাখেন?

হুইটলে কমিশন

ভারত সরকার এ যাবৎ কত কমিশন কমিটী বসাইয়াছেন এবং তদর্থে এ যাবৎ সরকারী তহবিল হইতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব বাহির করিলে মন্দ হয় না। অথচ এ সকল কমিশন কমিটীর ফল কি হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এ সকল ক্ষেত্রে পর্ব্বত মূষিকই প্রসব করিয়া থাকে। শ্রমিক সমস্যা-সমাধানের জন্য এই যে হুইটলে কমিশন বসান হইতেছে, যে ভাবে ইহার সদস্য সমূহ মনোনীত হইয়াছেন, তাহাতে ইহাও যে মূষিক প্রসব করিবে, এমন মনে করা বিচিত্র নহে। কমিশনের গঠনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই একটি ‘ধনিক কমিশনই’ হইতেছে, তবে ইহার মধ্যে ৩টি বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি ও ১টি মাত্র খাঁটি ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি (শ্রীযুক্ত যোশী) থাকিবেন, এ কথা সত্য। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী রাজনীতির দিক্ হইতে শ্রমিক সমস্যার কথায় মস্তিষ্ক নিয়োগ করিতে পারিবেন, সরকার এ ব্যবস্থাও করিয়াছেন বটে। শ্রীযুক্ত যোশী, মিঃ বিরলা ও দেওয়ান চমনলালের কতকটা সাহায্য পাইতেও

পারেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দক্ষিণ-আফরিকায় ভারতীয়ের স্বার্থ-সংরক্ষণে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এ কথা সত্য হইলেও তিনি যে তথায় য়ুরোপীয় প্রবাসীর জীবনযাত্রার পরিমাপে ভারতীয় প্রবাসীর জীবনযাত্রাকে নিয়াসন দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ভারতীয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, এ কথা ত অস্বীকার করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তিনি যাহাই করুন, সরকারের দিক্ দিয়া যে সমস্যার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ বিরলা ও দেওয়ান চমনলালের সাহায্য পাইলেও শ্রীযুক্ত যোশী বড় বেশী সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কমিশনের সভাপতি ব্যতীত লেবার দলের মিঃ জন ক্লিফ ও মিঃ ক্লোই বলুন আর বিলাতের ট্রেড বোর্ডের ডেপুটি চিফ ইনস্পেক্টর কুমারী বেরিলই বলুন,—কেহই ভারতের শ্রমিক সমস্যার বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন না। মিঃ কবীরুদ্দীন আমেদ হইতে মিঃ দাযুদ কমিশনের সদস্য হইলেও তবু কথা ছিল না; কিন্তু মিঃ দাযুদকে মনোনীত করা হইল না কেন? ফল কথা, যে ভাবে কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার ফল সন্তোষজনক হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসী ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডের নাম শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকটে অপরিচিত নহে। তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' গ্রন্থখানি বহু ভারতবাসীই পাঠ করিয়াছেন। বোধ হয়, ৬।৭ মাসকাল পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। হঠাৎ স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিস এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রের সম্পাদক রামানন্দ বাবুর বাসভবন ও আফিস খানাতল্লাস করিয়াছে, কয়খানি 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' গ্রন্থ লইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহার পর সজনী বাবু জামিনে খালাস পাইয়াছেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুকেও গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সরকারের এই রুদ্রমূর্ত্তি কেন? যে প্রবন্ধ প্রায় ৩ বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ ৬ মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া বাজারে চলিয়াছে, তাহাতে যদি রাজদ্রোহের গন্ধ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বেই ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন নাই কেন? তাহা হইলে ত এই গ্রন্থ সম্পর্কে খানাতল্লাস বা মামলা করিতে হইত না। এই বুদ্ধিহীনতার জন্য দায়ী কে? রাজনীতিক মামলায় যে খরচা হয়, তাহা ত সরকারী তহবিল হইতেই দেওয়া হয়। সরকারী অর্থের এরূপ অপব্যয় করিবার কি প্রয়োজন আছে? যাহা হউক, মামলার ফলে গ্রন্থকারের একটা কায হইয়াছে। শুনিয়াছি, দুই দিনে ঐ গ্রন্থ কলিকাতায় বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় বিমানবিদ্

যে দেশে কালিদাসের দুষ্মন্ত মাতলির রথে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবার কালে "শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী,"—ইত্যাদি শ্লোকের সাহায্যে ব্যোমপথ হইতে ভূতলে বিমানে অবতরণের অভিজ্ঞতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যে দেশে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার রাম-লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতিকে ব্যোমপথে বিমানযোগে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী হইতে অযোধ্যায় উড়াইয়া আনিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক যে বহু-বিসারী অন্ধকার যুগের পর আবার বিমান-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে, ইহা সত্যই আনন্দের কথা। এই সম্পর্কে আমরা প্রথমেই বাঙ্গালী জে, পি, গাঙ্গুলীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি সম্প্রতি বিমান পরিচালনা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহা আমাদের বাঙ্গালার পক্ষে গৌরবের কথা। আমাদের এই বাঙ্গালা হইতেও কালে কর্ণেল লিণ্ডবার্গের মত তরুণ নির্ভীক উৎসাহী বিমানবিদের উদ্ভব হইবে এবং তাঁহারাও লিণ্ডবার্গের মত অনন্ত সাগর একাকী পার হইয়া জগতের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জ্জন করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে কোন্ কাযে পশ্চাৎপদ হয়? আর একটি বিমানবিদের নাম মিঃ পি, এম কাবালি। ইনি য়ুরোপে নানা স্থানে বিমান-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাইলটের সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। অচির-ভবিষ্যতে তাঁহার একাকী এক ক্ষুদ্রকায় বিশেষ বিমানে বিলাত হইতে ভারতে যাত্রা করিবার কথা আছে। তাঁহার পন্থা শুভ হউক, ইহাই প্রার্থনা। তিনি কচ্ছদেশের অধিবাসী, হিন্দু-সন্তান। কচ্ছপ্রদেশের মছিয়ারাডারা কিরূপ সুন্দর নাবিক, তাহা যাঁহারা প্রভাসে বা দ্বারকায় গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া আসিয়াছেন। আমাদের দেশের ভড়ের মত নৌকায় করিয়া তাহারা অকুতোভয়ে সাগরে পাড়ি দেয় এবং ঝড়ের সময়ে অতি ক্ষিপ্রগতি বাত্যাকে চাপিয়া পাইলের দড়ী ঠিক করিয়া দেয়, তাহাদের পতনের আশঙ্কা আদৌ থাকে না, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা সমুদ্রেরই জীব, সমুদ্রে নির্ভয়ে পাড়ি দিতে তাহারা এত অভ্যস্ত! মিঃ কাবালি যে স্ব-প্রদেশের অধিবাসীর এই নির্ভীকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবসরের বাণী

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কানাডায় 'অবসর' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় অনেক কিছু বুঝিবার ও শিখিবার আছে। আমরা তাঁহার সেই বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু অংশের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিতেছি:—

"আধুনিক মানুষ সময় ও অর্থের ব্যবহারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা বিস্মৃত হই যে, অবসরই মানব-জীবনের শক্তি উৎপাদন করে। সময় ও অর্থের ব্যবহারে ব্যস্ততা দ্বারা ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত হয়, সংগঠন ও নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুতভাবে অগ্রসর হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু উহাতে মানবের পৃথিবীকে দান করিবার প্রতিভার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্যস্ততা লক্ষ্যহীন মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারে বটে, কিন্তু অবসরকালে চিন্তাশক্তির ফলে প্রতিভার যে স্ফুরণ সম্ভব হয়, তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। আত্ম-প্রতারণার ফলে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবগুলি বিস্মৃত হই। জড়-জগতের বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ের পশ্চাতে যখন আমরা ব্যস্ততা-অহঙ্কারে ছুটিতে থাকি, তখন কাযের পর কায আসিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের

পথে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। তখন অবসরের অবকাশ রাখা সম্ভবপর হয় না। জীবন্ত সত্যের প্রকাশ নিরুদ্বেগ অবসরের প্রতীক্ষা করে। মন অনুক্ষণ উন্মত্ত ব্যস্ততার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইলে, তাহার ফল হয় মানসিক বিকার। সে ক্ষেত্রে জগতের প্রকৃত স্বরূপকে গ্রহণ করিবার উদারতা মনের থাকে না।

প্রাচীর-বেষ্টিত টাকার বাজারে আবদ্ধ সময়ের পরিধির মধ্যে স্থান আছে—রাজা-রাজড়ার ও সওদাগর দলের। কিন্তু তাহার বাহিরে নক্ষত্রখচিত এক বিরাট জগৎ আছে। সে রাজ্যে কোন বাধা-বন্ধন নাই, সে রাজ্যের সময়ের মধ্যে কোন ছেদ নাই। সেই অনন্তে আনন্দরস পান করিয়া আমরা অসীমত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। যাহারা অনুক্ষণ প্রয়োজন লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের কাছে এই উদার বিশালতার কোন মূল্য নাই। তাহাদের কাছে অনন্তের বাণী উপহাসের বিষয়।"

ইহাই ভারতের চিরন্তন ভাবধারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জড়বাদী প্রতীচ্যের কর্ণকুহরে বৃথাই এই বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যেখানে ব্যস্ততাই জীবনের লক্ষণ, সেখানে এই উপদেশের সার্থকতা কোথায়? তাই বোধ হয়,—কবীন্দ্র কবির কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন,—"অরসিকেষু নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ!"

—

মীরাট মামলার আসামী

স্বাধীন সভ্য দেশমাত্রেরই নিয়ম আছে, আসামীর অপরাধের বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যতক্ষণ অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিয়া বিচারের প্রতীক্ষা করে বা হাজতের আসামীরূপে বিচারার্থ হাজত হইতে আদালতে এবং আদালত হইতে হাজতে যাতায়াত করে, ততক্ষণ তাহার প্রতি নির্দ্দোষের মত ব্যবহার করা হয়। পরন্তু ভদ্র শিক্ষিত রাজনীতিক আসামীর প্রতি ভদ্র ব্যবহার করার নিয়ম আছে।

কিন্তু এ দেশের সবই বিপরীত। মিঃ সৌকৎ ওসমানি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। তিনি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। বিলাতের স্পেন ভ্যালি কেন্দ্র হইতে তিনি সার জন সাইমনের বিপক্ষে কম্যুনিষ্ট দলের পক্ষ হইতে গত সাধারণ নির্ব্বাচনে সদস্য-পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মীরাটের ষড়যন্ত্র মামলা-পরিচালন কমিটী হইতে তাঁহার কথা ইণ্ডিয়া আফিসে জানান হয়। গত ২৩শে মে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কমিটীর সেক্রেটারীকে তার করিয়াছিলেন,—"ইণ্ডিয়া আফিসের সুপারিশ লইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, মিঃ সৌকৎ ওসমানি যাহাতে স্পেন ভ্যালি হইতে নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ পান, সে পক্ষে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। এতদর্থে তিনি বিচারকের নিকট মুক্তির জন্য আবেদন করুন।" ইহা হইতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের অন্ততঃ তাঁহাকে নির্ব্বাচন আন্দোলন চালাইবার উপযোগী সময়ে হাজত হইতে মুক্তি দিবার ইচ্ছা ছিল, ইহা বুঝা যায়। বিচারক তাঁহাকে অব্যাহতি দেন নাই, তিনিও সুযোগ লাভ করিতে পান নাই।

এই শ্রেণীর রাজনীতির আসামীর প্রতি এ দেশে কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। দুই মাসের অধিক কাল হইল, পুলিস মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদিগকে ধৃত করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল তাহারা কেবল প্রমাণই সংগ্রহ করিতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। গত ১৮ই মে তারিখে যখন মামলার শুনানী হয়, তখন পুলিস আবার হাজতের কাল বাড়াইয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। অর্থাৎ আসামীদের বিপক্ষে পুলিস দুই মাসের অধিক কালের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে নাই—যাহার জোরে তাহারা মামলা চালাইতে পারে। এই দারুণ গ্রীষ্মে মীরাটের মত স্থানে শিক্ষিত সুখে লালিত-পালিত ভদ্র গৃহস্থ সন্তানের পক্ষে বিনা প্রমাণে হাজতে আটক থাকা কেমন ন্যায়সঙ্গত? ইহার উপর জেলের কদর্য্য আহার, নির্জ্জন-বাস, হাতে হাতকড়া, অপমান, লাঞ্ছনা,—এ সকলও আছে।

চৌধুরী ধর্ম্মবীর সিং এই মামলার এক জন আসামী। তিনি যুক্তপ্রদেশের কৌন্সিলের সদস্য। এ হেন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত আসামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তাঁহাকে মীরাটে স্থানান্তরিত করিবার ৩ দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রবল জ্বর হইয়াছিল, তিনি অনাহারে ছিলেন। ঐ অবস্থায় যাহাতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা না হয়, তাহার জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সকাশে আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। আর তাঁহার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহার হাতে হাতকড়া দেওয়া হইয়াছিল।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধিকে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"আসামীদিগকে সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর ন্যায় জেলে বাস করিতেছে। একে মীরাটের গরম, তাহার উপর নির্জ্জন-বাস, অপমান ও লাঞ্ছনা। আসামীদের জন্য সরকার সামান্য খরচ করিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে মামলা চালাইবার জন্য মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিবার সময়ে মুক্ত-হস্ত।" বস্তুতঃ সরকার এই মামলা চালাইবার জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। সরকার পক্ষের কৌন্সিলি মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমসই একা গত মাসে ৩৪ হাজার টাকা পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুইটি বিলে ১৪ হাজার ও ৯ হাজার টাকা প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অথচ আসামীদের খাদ্যের জন্য প্রত্যেকের দৈনিক ⁄৫ পয়সা বরাদ্দ আছে!

মীরাট মামলা ছাড়া আর এক রাজনীতিক আসামীকে উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি কাশীর গন্ধী আশ্রমের শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহাকে পুলিস ধৃত করিবার পর মুখ আচ্ছাদন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোতোয়ালীতে এক অন্ধকার কক্ষে বাস করিতে দিয়াছিল। খোঁটার সহিত অথবা খাটিয়ার সহিত তাঁহার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ। ভাগ্যে হাইকোর্ট ছিল, তাই পুলিসের ও সরকারী কৌন্সিলের অন্যায় আবদার না-মঞ্জুর হইয়াছে, অনিলচন্দ্র উকীলের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিচারাধীন আসামীর প্রতি এই ভাবের ব্যবহার বিসদৃশ। ইহাতে সরকারেরই দুর্নাম রটে।

ভোলানন্দ গিরি ও শিষ্য অচলনাথ

স্বামী ভোলানন্দ গিরি পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে দেহত্যাগ করিয়াছেন; এ কথা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই অবগত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্ত আছেন। তাঁহার ন্যায় যোগসিদ্ধ সাধকের সংস্পর্শে আসিয়া বহু সংসারী বাঙ্গালী অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ইহা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অচলনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিগত ৩১শে জানুয়ারী অচলনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

বসিরহাট মহকুমার বিষ্ণুপুর গ্রামের মিত্র-বংশে অচলনাথের জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি এটর্ণীর ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কিন্তু তিনি ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। এই হেতু মাত্র ৪।৫ বৎসর ব্যবসায় চালাইয়া ক্রমে উহাতে বীতরাগ হন এবং বৎসরে মাত্র ২।৩ মাস ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট কাল ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহার ভবানীপুরের আবাস-ভবন সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব মহাজনে পূর্ণ হইয়া থাকিত। ভগবৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু বহিত। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি সস্ত্রীক পদব্রজে গঙ্গোত্রী যাত্রা করিয়াছিলেন। পর-বৎসরে একটিমাত্র সাথীর সঙ্গে কম্বলমাত্র সহায় করিয়া তিনি বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন এবং হৃষীকেশের নিকটে 'স্বর্গাশ্রমে' এক সাধুর সঙ্গলাভে ধন্য হন। তাঁহার প্রভাব অচলনাথের ধর্ম্মপ্রাণ হৃদয়ের উপর বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সাধু তদবধি তাঁহার কলিকাতার ভবনে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। ইহাই অচলনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল,—সাধুমোহান্ত একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিলে গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।
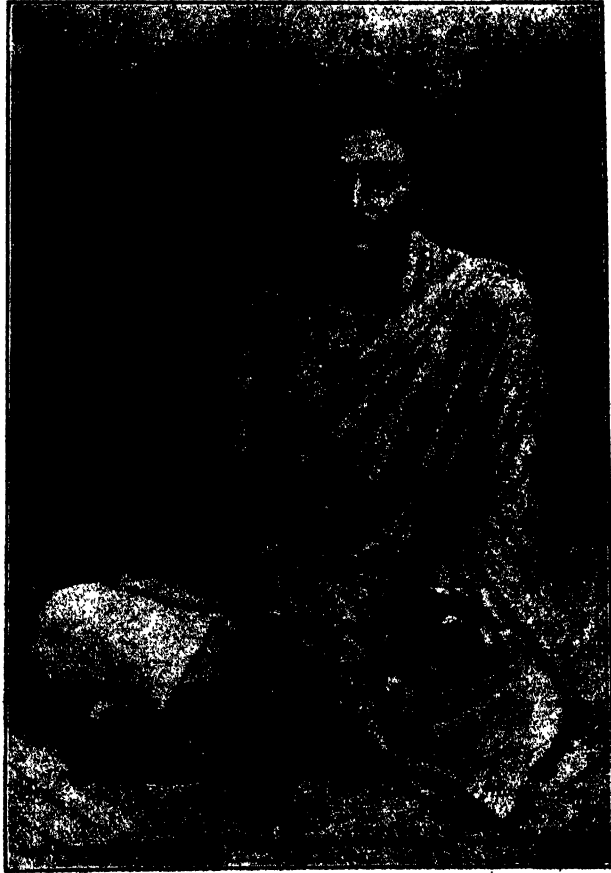
ইহার ২ বৎসর পরে যখন অচলনাথ সস্ত্রীক কেদার-বদরী যাত্রা করেন; তখন পথে হরিদ্বারে ভোলাশ্রমে তাঁহার সহিত ভোলানন্দ গিরির সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই ভাবী গুরু-শিষ্য পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ পরে জীবনব্যাপী হইয়াছিল। তীর্থদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য দেখা দেয়। সেই দিন হইতে তিনি স্বভবনে কীর্ত্তন, কথা, ভগবৎ-প্রসঙ্গ ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। অচলনাথ অসুস্থ অবস্থাতেও গুরুর সাক্ষাৎ-লাভের জন্য মাঝে মাঝে হরিদ্বার যাত্রা করিতেন, স্বামীজীও তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেন। একবার মুমূর্ষু অবস্থাতেও তিনি গুরুর আহ্বানে হরিদ্বারে না গিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ভোলানন্দের শিষ্য অচলনাথ

পরলোকযাত্রার পূর্ব্ব-বৎসর অচলনাথ হরিদ্বারের জাহ্নবীতীরে ৪০ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে 'গুরুধাম ভবন' নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দিরে স্বামীজী-স্থাপিত অচলেশ্বর মহাদেবের নিত্য পূজার্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ১ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

অচলনাথ স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ ১০ বৎসর যাবৎ ন্যূনাধিক ২ শত ৫০টি অনাথা বিধবা, দরিদ্র ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। স্বর্গীয়া আরাধ্যা মাতৃদেবীর স্মৃতি-সম্মান রক্ষার্থ কাশীর রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে ন্যূনাধিক ১০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার নিত্যপূজার জন্য কিছু সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কেদারনাথ তীর্থে একটি ধর্ম্মশালা-প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি।

অচলনাথের ভিতরে এমন একটা জিনিষ ছিল, যাহার ফলে তিনি এই জীবনে সদ্গুরু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মার মঙ্গল হউক, ইহাই কামনা।

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির

বর্ত্তমানে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিকল্পে দেশের চিন্তাশীল মনীষীমাত্রেই তাঁহাদের চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। দূর পল্লী-অঞ্চলেও নারীর শিক্ষার জন্য বালিকা-বিদ্যালয়, মহিলাসমাজের উন্নতির জন্য মহিলা-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় অনেককে যত্ন লইতে দেখা যাইতেছে। এখন নারীর শিক্ষার ধারা ও বিষয় কি হওয়া উচিত এবং কি উপায়ে তাহা সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মকোলাহলময় মহানগরী হইতে দূরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শুদ্ধ পল্লীমাতার স্নিগ্ধ-ক্রোড়ে অবস্থিত, একটি নারী-শিক্ষার কেন্দ্র, তাহার নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থা ও ধারা লইয়া কিরূপে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধ হয় এখনকার সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কথা বলিতেছি, উহা চন্দননগরের নব-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির। তিন বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনই সময়ে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই মন্দিরের উদ্দেশ্য, শিক্ষা দ্বারা মাতৃজাতির জীবন উন্নত ও মধুময় করিয়া তোলা। নারী যাহাতে একাধারে মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া, নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ও জ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করিয়া, পূর্ণ নারীত্বলাভ দ্বারা গৃহলক্ষ্মী ও সমাজলক্ষ্মীরূপে সংসারের কল্যাণময়ী হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা। পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন ও মন্দিরের সকল দিকে সকল বিষয় ব্যবস্থা করিবার সময় এখানে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীর সহিত এখানকার সাধারণ বিভাগে কোন শ্রেণীবিশেষের তুলনা হইতে পারে না। একটি ৭।৮ বৎসরের বালিকা বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং গণিত শাস্ত্রের প্রথম দুইটি নিয়মের ব্যবহার জানিয়া এই মন্দিরে ছাত্রীরূপে আসিলে বিবাহযোগ্য-বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার জন্য ছয়টি শ্রেণী আছে। প্রাথমিক শ্রেণীগুলি নাই।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির—চন্দননগর

পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন এখানকার নিজস্ব। শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্য

শিক্ষয়িত্রীদের বাসভবন
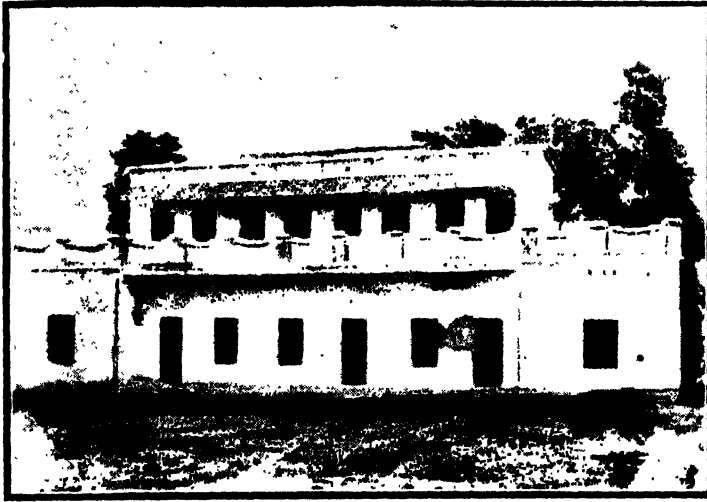
পুস্তক নির্ব্বাচন করা হয়। অনেক বিষয়ে উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে শিক্ষয়িত্রীরা পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়া শিক্ষা দেন। এখানকার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিলে অধিকাংশ বিষয়েই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রীর সমান মোটামুটি জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তুলির কায, মাটীর কায, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সেলাই, কাটছাট, রন্ধনও এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়; উপরন্ত রোগিপরিচর্য্যা, দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান, সন্তানপালন, গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, নগরপরিচালননীতি (civics), ভব্যতা, দেহতত্ত্ব, স্বাবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে আবশ্যকমত যে শ্রেণীতে যাহা বিধেয়, তাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রীর জীবন-সংগ্রামে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে।

মন্দিরের উদ্যানে ছাত্রীগণ শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে খেলা ও গল্প করিতেছে

গত ২৭ৎসর হইতে চরকায় সুতাকাটা, বেতের কায এবং চিত্রাঙ্কন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্ম একটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খুলিবার সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীর অভাবে তাহার সূচনা হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখনও কোন বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও নিয়মিত নৈতিক শিক্ষা ও স্তোত্র আবৃত্তির ব্যবস্থা প্রত্যেক শ্রেণীতেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করান এখানকার লক্ষ্য না হইলেও ছাত্রীর অভিভাবক ইচ্ছা জানাইলে ম্যাট্রিক্ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে এইরূপ চারিটি ছাত্রীকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রস্তুত করান হইতেছে এবং সে জন্য উল্লিখিত ছয়টি ভিন্ন আরও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সকল শ্রেণীতেই ইংরাজী ব্যতীত সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিষয় ও শ্রেণীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও

মন্দির

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইতেছে। চিত্রাঙ্কনের বিশেষ শ্রেণীর জন্য ও বেতের কায শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র দুই জন পুরুষ শিক্ষক ভিন্ন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারাই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে তিন জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ পরীক্ষোত্তীর্ণা। শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই মন্দির-সংলগ্ন আবাসে বাস করিয়া থাকেন এবং ছাত্রী-নিবাসের ছাত্রীরা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ প্রকার ব্লাউস, ফ্রক ইত্যাদি

ছাত্রীদের জ্ঞানস্পৃহা উদ্রেক ও উহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে শিক্ষা-মন্দিরে একটি সুন্দর পাঠাগার আছে। ইহাতে ছাত্রীদের ও নারী-শিক্ষার উপযোগী পুস্তক ও তদ্রূপ সাময়িক পত্রিকা ভিন্ন অন্য গ্রন্থ রাখা হয় না। প্রত্যেক শ্রেণীতেই পাঠাগারে যাইয়া পড়িবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সময় ছাত্রীরা কোন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার নির্দ্দেশমত পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাদের মধ্যে আলোচনা করে। উপরের

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দিরে ফরাসী ভারতের গবর্ণর মসিয়ে দে গীজ

ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত বেতের কায

ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত টেবল ক্লথ, রুমাল, চিকণের কায, বালিসের ঢাকা প্রভৃতি

শ্রেণীর ছাত্রীরা বাড়ীতে পুস্তক লইয়া যাইয়া নিয়মিতভাবে তাহা পড়ে কি না, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

যাহাতে আনন্দের মধ্য দিয়া ছাত্রীরা সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ পায়, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে শিক্ষয়িত্রী ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে ঐতিহাসিক ও অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে লইয়া যাওয়া হয়। আলোকচিত্র সহযোগে নৈতিক শিক্ষা, ইতিহাসের গল্প এবং স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিবার এখানে ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রীরা যাহাতে দয়া ও সেবাপরায়ণা হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এ জন্য তাহাদের দ্বারা একটি দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা-বিষয়ে সাহায্য করা হয়। মেয়েদের স্বহস্ত-প্রস্তুত বহুবিধ সূচীশিল্প ও বেতের কায প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা অনেক অংশে এই ভাণ্ডার পুষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহারা আপনাদের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থও এই ভাণ্ডারে দিয়া থাকে। সেবাবৃত্তি উদ্রেক ও চরিতার্থ করিবার জন্য অন্নপূর্ণা পূজার দিন শিবমন্দিরে তাহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত

ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত সূচীশিল্পের বিবিধ প্রকার চিত্র

বহুবিধ ভোজ্যাদির দ্বারা এবং তাহাদের নিজ পরিবেষণে বহুসংখ্যক কাঙ্গালীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়।

ছাত্রীদের আনন্দবর্দ্ধন ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সরস্বতী-পূজাতেও কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য পূজাবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি শরৎ-সম্মিলন এবং পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। এ সময় তাহারা আবৃত্তি, সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত এবং সুনির্ব্বাচিত কোন কোন ছোট নাটকাদি-প্রদর্শন দ্বারা উপস্থিত অভিভাবক, অভিভাবিকা ও অন্যান্য জনমণ্ডলীকে প্রীত করিয়া থাকে। সকল সময়েই ছাত্রীদিগকে প্রীতিভোজ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়া থাকে।

ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত মৃৎশিল্প

ছাত্রীদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ব্যায়াম-সম্বন্ধে এখনও বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারা যাইলেও এখানে মন্দির-সংলগ্ন সুরচিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের খেলা করিবার ও দৌড়াদৌড়ি করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষান্তে মেয়েদের উপযোগী একটি স্পোর্ট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে স্থানীয় ও বাহিরের অন্যান্য বিদ্যালয় হইতেও অনেক বালিকা যোগদান করিয়া থাকে। এ জন্য পারিতোষিক দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষামন্দিরে নিজস্ব মোটর-বাস থাকায় বিধবা ও বিবাহিতা এবং দূরের ছাত্রীদেরও আসিবার সুবিধা হয়। স্থানীয় অক্ষম বিবাহিতা ও বিধবা ছাত্রীদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যককে বিনা বেতনে ও বিনা বাস-ভাড়ায় লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রী লইবারও নিয়ম আছে। ছাত্রীদের লইয়া আসিবার জন্য পরিচারিকাও আছে। শিক্ষা-মন্দিরের বেতন ও ছাত্রী-নিবাসের খরচ তুলনায় এখানে অনেক কম দিতে হয়। সহরের মধ্যে একটি সুন্দর স্থানে সুন্দর ও মনোরম উদ্যানমধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সুবৃহৎ ভবনে এই শিক্ষামন্দির ও ছাত্রী-নিবাস অবস্থিত থাকায় এখানকার মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালই থাকে।

ছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাল্মীকি-প্রতিভায় সরস্বতী ও বাল্মীকি

এই নারীশিক্ষা-মন্দিরে পুরমহিলাদের শিক্ষার জন্য পুরস্ত্রী-বিভাগ নামে আর একটি বিভাগ খুলিবার সঙ্কল্প

প্রথম হইতেই আছে। এ বিভাগে ছাত্রী অভাবে এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এই বিভাগে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ব্যতীত স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান, সূচীকার্য্য ও কাটছাট শিক্ষা দেওয়া হইবে।

রবিবার দিন শিক্ষালয় বন্ধ থাকে, বৃহস্পতিবার দিন সাধারণ শিক্ষাবিষয় বন্ধ থাকে, ঐ দিন রন্ধনশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নারীশিক্ষা-মন্দিরের এই স্বল্পজীবনে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও ইহা উন্নতির যে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানে মেয়েদের সাধারণ ছাত্রীরূপে পাঠাইয়া বা ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া যে নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায়, তাহা অনেক স্থানে সুলভ নহে। প্রদর্শনীকক্ষে রক্ষিত ছাত্রীদের প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য দেখিলে তাহাদের শিক্ষার অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহাদের প্রস্তুত কার্য্যের কয়েকখানি চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

আমরা এই নারী-শিক্ষামন্দিরের আরও অধিক উন্নতি কামনা করি। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় না।

ছাত্রীদের দ্বারা যন্ত্র-সঙ্গীত

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কনের ঝি।

যথাসময় দধিমঙ্গল-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণ্ডা-ঠাকুরের বসতবাটীর বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, অন্তঃপুরে উত্থিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ইহা জানিতে পারিয়া যুক্তকরদ্বয় ললাটে স্পর্শ করিয়া অনুচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় বাবা সত্যনারায়ণ! তোমারই শ্রীচরণকৃপায় এই যোগাযোগটি ঘটলো। দেখো বাবা, শুভকার্য্যে যেন কোন রকম বিঘ্ন না হয়। অনাথের নাথ তুমি, তোমার উপরেই সমস্ত ভার। সকল বিষয়ে মঙ্গল কোরো বাবা—দোহাই বাবা, সাত দোহাই তোমার!"—বলিতে বলিতে চক্ষু তাঁহার সজল হইয়া আসিল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রকাশ হালদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুতা-বাঁধা হাতে জাঁতি লইয়া অধর বাহির হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এস বাবা, বোস। চিঁড়ে দই সন্দেশ-টন্দেশ পেট ভ'রে খেয়েছ ত? সারাদিন ত উপবাস—বিয়ে শেষ হয়ে জলযোগ করতে যার নাম সেই রাত ১০টা!"

অধর বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, খেয়েছি বৈ কি! কিন্তু ঐ যা বল্লেন, প্রথম লগ্নে কি হয়ে উঠবে?"

সে রাত্রিতে বিবাহের দুইটি লগ্ন ছিল - একটি গোধূলি-সময়ে, অপরটি রাত্রি ১১টা হইতে ২টার মধ্যে। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রথম লগ্নে সেরে ফেল্‌তে পারলেই ত ভাল। নইলে আবার অত রাত্রে—তোমার যে বড় কষ্ট হবে বাবা! আর বরযাত্রী কন্তেযাত্রীরা—"

প্রকাশ হালদার বলিলেন, "সে জন্তে কিছু আটকাবে না, ভট্‌চায মশাই। বিয়ে না হয়ে গেলে বরযাত্রী-কন্তেযাত্রীরা খেতে বসবে কি ক'রে, এই ভেবেই আপনি ও কথা বল্‌ছেন ত? তা' কলকাতায় সে সব বাঁধাবাঁধি নেই। সন্ধ্যে হ'লেই পাতা প'ড়ে থাকে। তবে বাবাজীর কষ্ট হবে বটে! হয়েই বা উঠবে না কেন? সবই ত প্রস্তুত। আমি ফর্দ্দ ক'রে রেখেছি, বেলা ১০টার মধ্যেই বাজার-টাজার শেষ ক'রে ফেলা যাবে। আপনি বরং স্নান-আহ্নিকগুলো এই বেলা সেরে ফেলুন। আমিও এ দিকে দেখি, আমার যাত্রী-টাত্রী কেউ আসে কি না। ৮টার পরই একসঙ্গে বাজারে বেরুনো যাবে।"

এখন বেশ ফর্শা হইয়াছে। আর একবার তামাক সাজা হইল। হালদার ও ভট্টাচার্য্য উহা পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে লাগিলেন। "আচ্ছা, আমি তা হ'লে এখন বাসায় যাই—৮টার পরেই আপনারা আস্‌বেন।"—বলিয়া অধর উঠিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য বলিয়া দিলেন, "দেখো বাবা, জাঁতিখানি দেহ-ছাড়া করো না। হাতে ক'রে থাকতে কষ্টবোধ হয়, কোমরের কাপড়ে গুঁজে রাখবে।"

অধর বাসায় গিয়া দেখিল, নিমাই মণ্ডল বসিয়া আছে। নিমাই, মোহান্ত মহারাজের শেষ আদেশপত্র অধরকে দেখাইল। মোহান্ত কয়দিনের করণীয় কার্য্য-তালিকা সূক্ষ্ম-ভাবে ছকিয়া দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, 'সাবধান, সকল কার্য্য এই তালিকা মোতাবেক হওয়া চাই—উহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয়।' চুপে চুপে কিছুক্ষণ পরামর্শের পর নিমাই প্রস্থান করিল।

৮টার অল্পক্ষণ পরেই বিপিন সরকারকে সঙ্গে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধরের বাসায় আসিয়া হালদারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা, হালদার ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া বলিলেন, "এই বিপিন বাবুও এসেছেন, ভালই হয়েছে! আপনারা বেরিয়ে পড়ুন—বেরিয়ে পড়ুন। কাঁচা বাজারগুলো ততক্ষণ কিনে ফেলুন। এই নিন ফর্দ্দখানা।"

অধর বলিল, "আপনি জানেন না? আপনি এখানকার স্থায়ী লোক, আমরা সবাই বিদেশী।"

হালদার বলিলেন, "তিন বামুনে কি বেরুতে আছে? আপনারা এগিয়ে চলুন। জন কয়েক যাত্রী আমার এসেছে, তাদের দর্শন করিয়ে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আসছি।"

ভট্টাচার্য্য নিজ হাতের হুঁকাটি হালদারের দিকে অগ্রসর করিয়া বলিলেন, "দু'টান খেয়ে যান।"

"থাক্ থাক্—সময় নেই"—বলিয়া হুঁকায় গোটাকতক টান দিয়া, হালদার ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন।

ইঁহারা তিন জনে তখন বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিলেন। ফর্দ্দ মিলাইয়া, অনেক দর-দস্তর করিয়া মাছ, তরকারী প্রভৃতি কেনা আরম্ভ হইল। ঘণ্টাখানেক পরে হালদার মহাশয়ও আসিয়া জুটিলেন। ফর্দ্দ চাহিয়া লইয়া দেখিলেন, কাঁচা বাজার প্রায় শেষ হইয়াছে। বলিলেন, "যাক্, কাঁচা বাজার ত হয়েই গেছে। পাকা বাজার করতে আর কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। টাইম কত এখন?"

অধর নিজ পকেট ঘড়ী দেখিয়া বলিল, "পৌনে ১০টা।"

কাঁচা বাজার মাথায় ঝাঁকা-মুটিয়াগণ বিলম্বের জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল পাণগুলা কিনিতে বাকি ছিল। উহা কিনিয়া হালদার বলিলেন, "বিপিন বাবু, আপনি এদের নিয়ে বাড়ী যান। আমরা ততক্ষণ ঘি ময়দা-টয়দাগুলো কিনি গে।"

বিপিন মুটিয়াদের লইয়া প্রস্থান করিল। ইঁহারা তিন জনে মহাদেব শীল মুদির দোকানে গিয়া উঠিলেন। গলায় কণ্ঠীর মালা, স্থূলোদর, নগ্নগাত্র শীল মহাশয় হাতবাক্স সম্মুখে লইয়া বিজলী পাখার নিম্নে বসিয়া আছেন। হালদার মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ফর্দ্দ অনুসারে দোকানের কর্ম্মচারিগণ জিনিষপত্র ওজন করিতে লাগিল। দাম মিটাইয়া দিয়া, দুই জন মুটিয়া-সহ ইঁহারা বাহির হইলেন।

মন্দিরের কাছাকাছি আসিলে, মন্দির-প্রত্যাগত স্ত্রী-পুরুষের একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়িয়া, দাঁতে মিশি, কপালে উল্কি, আধ ময়লা কস্তাপাড় শাড়ী পরিহিতা শ্যামবর্ণা প্রৌঢ়বয়স্কা এক রমণী অগ্রসর হইয়া আসিয়া অধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দাদা বাবু যে! তুমি এখনও ডুমরাওন যাও নি?"—সঙ্গে সঙ্গে সে নত হইয়া অধরের পদধূলি গ্রহণ করিল।

অধর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "হরিশের মা! তুই এখানে কোথা থেকে এলি? কবে এলি?"

প্রৌঢ়া বলিল, "আজই ভোরের টেরেণে এসে পৌছেছি।"

"গাঁয়ের আর কেউ এসেছে না কি?"

"হাঁ,—কেষ্টা তাঁতি, তার বউ, মেয়ে,—সারদার মা, তবে গিয়ে তোমার হারু ঘোষ, তার দুই বেটা, তাদের বউয়েরা, এই দশ জন আমরা তিথি করতে বেরিয়েছি। এখানে দিন পাঁচ সাত থেকে, কলকাতা দেখে, যদি কপালে থাকে, আমরা তারকেশ্বর যাবো, সেখান থেকে গয়া যাব, গয়া থেকে কাশী যাব, কাশী থেকে মথুরা, বিন্দাবন, পুষ্কর-টুষ্কর দেখে তবে ফিরবো। তা, তুমি যে দাদা বাবু ডুমরাওন যাওনি।"

অধর বলিল, "যাইনি, এখানে একটু বিশেষ কাযে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তা, তোরা আছিস্ কোথা?"

"গঙ্গার ঘাটে যাবার ঐ রাস্তায়, দীনু চকোত্তির যাত্রি-বাড়ীতে। তুমি কোথায় আছ, দাদা বাবু?"

অধর, নিজ বাসা অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীর খবর কি, হরিশের মা?"

হরিশের মা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আর সবাই ত ভালই আছে দাদা বাবু! কিন্তু বউ ঠাকরুণের অবস্থা দিন দিন মন্দই হচ্ছে। আমার দলের লোক সব চ'লে যাচ্ছে, আমি তবে এখন আসি, দাদা বাবু।" বলিয়া সে অধরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

হরিশের মা বাসার দিকে চলিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে স্ত্রীলোকটি?"

অধর বলিল, "সদ্‌গোপের মেয়ে। আমাদের প্রজা, খুব অনুগত লোক। অনেক দিন আমাদের বাড়ীতে ঝিয়ের কায করেছিল। ওর স্বামী, গ্রামের চৌকিদারী চাকরী পাবার পর, ও আমাদের কায ছেড়ে দেয়।"

প্রকাশ হালদার মুটিয়াগণকে লইয়া নিজ বাটীতে গেলেন। ভট্টাচার্য্য অধরের সঙ্গে গিয়া তাহার বাসায় উঠিলেন। তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "একটা কায করলে হয় না, বাবাজী?"

"আজ্ঞে, কি বলুন।"

"ঐ যে তোমাদের পুরাণো ঝি ঐ হরিশের মা, ওকে তুমি দিন কয়েকের জন্যে আটকাও না কেন! ওকে সঙ্গে ক'রে

তুমি ডুমরাওনে নিয়ে যাও। ওর দলের লোক যারা, তারা এখান থেকে যাবে তারকেশ্বরে, তারকেশ্বর থেকে যাবে গয়া, গয়া থেকে যাবে কাশী। যেমন ক'রে হোক, দিন দশ বারোর ধাক্কা। ওদের দলে এক জন চালাক-চতুর লোক আছে নিশ্চয়ই, যে ওদের চরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। সে তোমায় চিঠি লিখে খবর দিতে পারবে। ডুমরাওন ইষ্টিশানে, ওদের দলের সঙ্গে ওকে রেলগাড়ীতে তুলে দিলেই ত হ'তে পারে। এ কথা কেন বলছি জান? বিয়ের পর ক'নে-বউ শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়, এক জন ঝি সঙ্গে থাকাই প্রথা। বউ অনেক বিষয় যা হয় ত তোমায় লজ্জায় বলতে পারবে না, এক জন ঝি সঙ্গে থাকলে তাকে বলতে পারবে। হাজার হোক্ ছেলেমানুষ ত! তোমার কি মত?"

অধর স্বয়ং এই প্রস্তাব করিবে, এইরূপ আদেশই মোহান্ত মহারাজ তাহাকে দিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্যের তরফ হইতে এ প্রস্তাব হওয়ায় অধর মনে মনে খুসী হইল। কিন্তু মৌখিক প্রকাশ করিল অন্যরূপ। মাথা চুলকাইয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কেন, কোনও বাধা আছে না কি?"

অধর বলিল, "যতক্ষণ ওর সঙ্গে আমি কথা কইছিলাম, সুতো-বাঁধা হাতটা চাদরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আপনি অতটা নজর করেননি বোধ হয়। আমি আবার বিয়ে করেছি, ও মাগী জানতে পারলে, দেশে গিয়ে সে কথা ঢাক পিটিয়ে দেবে। আমার পরিবার একে মরণাপন্ন, তার উপর ঐ কথা শুনলে", বলিয়া অধর মুখ নত করিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,"তা, ওকে যদি সব কথা বুঝিয়ে সুজিয়ে, সাবধান ক'রে দেওয়া যায়, তা হলেও কি প্রকাশ করবে?"

"হয় ত এখন বলবে, না, আমি প্রকাশ করবো না, তার পর দেশে গিয়ে,—স্ত্রীলোক বৈ ত নয়!"

"আমি যদি এই তীর্থস্থানে, আমার পায়ে হাত দিয়ে ওকে দিব্যি করিয়ে নিই, ব্রহ্মশাপের ভয় কি ও রাখবে না?"

অধর নতবদনে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা যাতে ভাল হয়, তাই করুন।"

"তা হ'লে বাবাজী, তুমি একবার ওঠ। দীনু চক্কোত্তির যাত্রি-বাড়ীতে তারা উঠেছে বল্লে। সে যাত্রি-বাড়ী আমি চিনি, আমরা যেখানে আছি, তার দু'তিনখানা বাড়ীর পরেই। তাকে একবার ডেকে আন এখানে।"

"যে আজ্ঞে, ডেকে আনি।"—বলিয়া অধর প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হরিশের মাকে ডেকে এনেছি। সে নীচে ব'সে রয়েছে।"

"তাকে কোনও কথা বলেছ?"

"আজ্ঞে না। আমার কি রকম লজ্জা করতে লাগলো। তাকে এইখানে আনি, আপনিই সব কথা বুঝিয়ে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মতিক্রমে অধর হরিশের মাকে ডাকিয়া আনিল।

হরিশের মা আসিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিয়া গলায় আঁচল দিয়া, কপট ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অত্যন্ত সঙ্কুচিত-ভাবে একপাশে বসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথোপযুক্ত ভণিতা পূর্ব্বক সমস্ত কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। "দাদা বাবু" বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া হরিশের মা আনন্দে যেন বিহ্বল হইয়া উঠিল। ক'নের ঝি-স্বরূপ ডুমরাওন যাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "ডুমরাওন, গয়া ছাড়িয়ে, কাশীর এ দিকে ত? গয়া তা হ'লে আমার দেখা হবে না। তা হোক্ গে, হরিশের বাবা ত ও বছর গয়ায় গিয়ে পিণ্ডিটিণ্ডি সেরে এসেছে। ওরা কাশী যাবার সময় আমায় ওদের সঙ্গে জুটিয়ে দিও দাদা বাবু, তা হলেই হবে। হারু ঘোষের ছেলেরা লেকাপড়া জানে, ইংরাজী পর্য্যন্ত পড়েছে, ওরাই তোমার চিঠি লিকে খবর দিবে এখন।"

দেশে ফিরিয়া, "দাদা বাবুর" কাল্পনিক স্ত্রীর স্বল্প জীবিত-কালমধ্যে কথাটা গোপন রাখিতেও হরিশের মা প্রতিশ্রুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে তাহাকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন এবং তাঁহার পদস্পর্শপূর্ব্বক ৺কালীমন্দিরের পানে মুখ করাইয়া শপথও করাইয়া লইলেন। অধর বাক্স খুলিয়া একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া, তাহাতে নিজ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিল, "এইখানা হারু ঘোষকে দিয়ে যাস্ তা হ'লে।"

হরিশের মা তখন কনেকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি এখন হালদার মশাইয়ের বাড়ীতেই যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে এস তা হ'লে।"

হরিশের মাকে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হালদার-ভবনে গিয়া, নিজ গৃহিণীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিয়া, হরিশের

মাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। হরিশের মা ক'নে দেখিয়া বলিতে লাগিল—"ও মা, এই ক'নে! এ ত দেবকন্যে, সাক্ষেৎ মা ভগবতী! আহা, দাদা বাবু বোধ হয় আর জন্মে অনেক তপিস্যে করেছিল গো। নইলে এমন সোনার পিতিমে লাভ করে?"

হরিশের মা তাহার কাল্পনিক তীর্থসঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের নিকট বিদায় গ্রহণের ছলে প্রস্থান করিল। হালদার-গৃহিণী তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দুপুরবেলা এইখানে এসেই তুমি প্রসাদ পাবে, বুঝেছ বাছা!"

"আস্‌বো বৈ কি মা।"—বলিয়া হরিশের মা প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

অধর যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই হইল। গো-ধূলি লগ্নে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়া উঠিল না। হালদার মহাশয়ের যে লোক, অধর অথবা মোহান্তের অর্থে "দানসামগ্রী" কিনিবার জন্য বড়বাজারে গিয়াছিল, সে যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা ৭টা।

রাত্রি ১০টার মধ্যেই বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা আহার সমাপন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। রাত্রি ১১টায় বিবাহ আরম্ভ হইল।

অধর এই কালীঘাটে নিজ বাসার বারান্দায় দাঁড়াইয়া, পিতামাতাসহ মন্দিরপথে নবদুর্গাকে দেখিয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় তার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, এই স্বর্ণপ্রতিমাকে, যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া, অর্থলোভে লম্পটশিরোমণি নরপিশাচ মোহান্তের হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে?—তার চেয়ে, ইহার গলায় ছুরি দেওয়াও বোধ হয় লঘুপাপ হইতে পারে।

কন্যা-সম্প্রদান-ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল। বর-কন্যা জলযোগান্তে বাসরঘরে চলিল। রাত্রি তখন প্রায় ১টা। অধর আশা করিয়াছিল, এত রাত্রিতে বাসরঘরে তেমন ভিড় হইবে না;—এবং যাহারা আসিবে, তাহারাও অধিকক্ষণ থাকিবে না। হয় ত নববধূর সঙ্গে আলাপ করিবার অবসর সে পাইবে। কিন্তু বাসরে প্রবেশ করিয়া অধর দেখিল, অনেকগুলি যুবতী বিচিত্র সাজসজ্জা করিয়া বাসর জাগিতে আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, খোদ হরিশের মা-ও একপাশে বসিয়া, বরকন্যাকে দেখিয়া দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে। উপস্থিত যুবতীগণ অধিকাংশই কালীঘাটের হালদারগণের পরিবারভুক্ত। "কি ভাই, ক'নে পছন্দ হয়েছে ত?" প্রভৃতি প্রচলিত পরিহাসের পালা শেষ হইলে, গান গাহিবার জন্য বরকে যথারীতি পীড়াপীড়ি চলিল। অধর সঙ্গীত-বিদ্যায় নিজের নিতান্ত অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে তাহারা বলিল, "খোট্টার দেশে থাক ভাই, বাঙ্গালা গান হয় ত ভুলেই গেছ। সেঁইয়া-বেঁইয়া ক'রে একটা হিন্দী গানই না হয় গাও।"

বর হিন্দী গান গাহিতেও অপারগ শুনিয়া মেয়েরা নিজেরাই আসর রাখিবার ভার গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ নিজেদের বিদ্যা জাহির করিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ে যে পরিমাণ আগ্রহ গোপনে বিরাজ করিতেছিল, বরের গান শুনিবার আগ্রহ তাহার সিকি ভাগও ছিল না। তখনই কক্ষান্তর হইতে হার্ম্মোনিয়ম-যন্ত্র আনীত হইল এবং রাত্রি আড়াইটা অবধি তাহাদের সঙ্গীতচর্চ্চা চলিল।

ক'নে ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েদের মধ্যেও যাহারা গান শুনিতেছিল, গাহিতেছিল না, তাহারাও ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হরিশের মা-ও নিজ স্থানে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া ছিল। বাসর-সঙ্গিনীগণ তখন "অনেক রাত হ'ল ভাই, অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম, এখন আমরা আসি" বলিয়া বিদায় চাহিল। যাইবার সময় কেহ কেহ হরিশের মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে এ মাগী কে ঘুমুচ্চে?" এক জন উত্তর দিল, "ও ক'নের ঝি।" দুই এক জন তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হরিশের মার "গভীর নিদ্রা" কিছুতেই ভঙ্গ হইল না! যুবতীগণ তখন প্রস্থান করিল। অধর উঠিয়া দ্বারটি ভেজাইয়া দিয়া, শয়নের উদ্যোগ করিতেই, হরিশের মা উঠিয়া বসিয়া একটা হাই তুলিয়া, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া, চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা সব কখন্ চ'লে গেল, দাদা বাবু?"

"এই অল্পক্ষণ হ'ল।"

"রাত কত হ'ল?"

অধর বলিল, "রাত প্রায় কাবার।"

"তাই হবে। উঃ, কি ঘুমটাই ঘুমিয়েছি আমি! কাল

সারা রাত রেলে ত চোখের দু'টি পাতা এক করতে পাইনি! এখন আর তা হ'লে কোথায় যাই? এইখানে বসেই বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিই, কি আর করবো?"

অধর বিরক্তিভরে বলিল, "কাযে কাযেই।"—বলিয়া সে আলো নিবাইবার উদ্যোগ করিতেই হরিশের মা বলিয়া উঠিল, "না—না—আলো নিবিওনি দাদা বাবু, তা হ'লে আমার বড্ড ভয় করবে। অচেনা যায়গা কি না!"

"আচ্ছা বেশ।"—বলিয়া অধর শয়ন করিল।

পরদিন কুশণ্ডিকা শেষ হইতে বেলা ৩টা বাজিল। জলযোগান্তে প্রকাশ হালদারের বৈঠকখানায় বসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রাত্রের গাড়ীতে তোমার রওয়ানা না হলেই কি নয়, বাবাজী?"

অধর বলিল, "আজ্ঞে, আজই আমার ছুটীর শেষ দিন কি না। আজ না বেরুলে কাল ত জয়েন করতে পারবো না।"

"গাড়ী ক'টার সময়?"

"আটটা ছাব্বিশ মিনিট।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। বিপিন সরকারও সেখানে বসিয়া ছিল। অধর বলিল, "আপনাকে একটু কষ্ট দেবো ভাবছি।"

বিপিন বলিল, "কি, বল বাবাজী।"

"গাড়ীর সময় টিকিট-ঘরে ভয়ানক ভিড় হয়। আগে থাকতে টিকিটগুলো কিনে রাখতে পারলেই সুবিধে। আপনি যদি ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে টিকিটগুলো কিনে রাখেন, তা হ'লে ভাল হয়।"

"তা বেশ, আমি টিকিট কিনে, ইষ্টিশানে দাঁড়িয়ে থাকবো এখন।"

"ইণ্টার কেলাসের তিনখানা টিকিট কিনবেন। ডুমরাওন —মনে থাকবে ত? না হয় একটা কাগজে লিখে নিন।"

"লিখতে হবে না, মনে থাকবে। রোজই ত শুনছি।"

তিনখানা টিকিট কিনিতে কত টাকা লাগিবে, তাহা হিসাব করিয়া অধর বিপিনকে টাকা দিল।

বিপিন যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিল, কিন্তু ডুমরাওনের নহে—কাশীর। মোহান্ত-মহারাজের তাহাই হুকুম ছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসময়ে কন্যা-জামাতা ও হরিশের মাকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলেন। বিপিন উপস্থিত ছিল। টিকিটগুলি বিপিন অধরের হাতে দিল।

মেয়ে-কামরায় নব-বধূ ও হরিশের মাকে তুলিয়া দিয়া অধর ভিন্ন কামরায় গিয়া উঠিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিপিনের সঙ্গে কালীঘাটে ফিরিয়া গেলেন।

ট্রেণ ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র অধর নামিয়া পড়িল। কেদারেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ কাশী-দর্শন মানসে নৈহাটী হইয়া এখানে ট্রেণ ধরিতে আসিয়াছেন—তাঁহার খাস খানসামা দীননাথ, পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি সহ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন। অধর গিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, সব ঠিক ত?"

অধর করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর।"

"ওরা কোথায়?"

"ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে-কামরায়।"

"হরিশের মা সঙ্গে আছে ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কাল সকালে, দানাপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌছুলে, তুমি আমার কামরায় আসবে—কাশী সম্বন্ধে আমার হুকুম নিয়ে যাবে।"

"যে আজ্ঞে হুজুর"—বলিয়া অধর পুনরায় মোহান্তের পদধূলি লইল। মোহান্ত তাঁহার রিজার্ভ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়া উঠিলেন। অধরও নিজ কামরায় ফিরিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বড়লাট ও ব্যবস্থা-পরিষদ

সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং আসাম ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, এ সংবাদ আমরা গত মাসেই দিয়াছি। গত ৪ঠা জুন এবং ৫ই জুন (বাঙ্গালা ২১শে এবং ২২শে জ্যৈষ্ঠ) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সে কথা আমরা পরে বলিব। ইতোমধ্যে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থায়িত্বকাল কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কত দিনের জন্য এই এসেম্ব্লির আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন, তাহা তিনি এখনও প্রকাশ করেন নাই। সরকারের এই দুইটি ব্যবস্থার মূলনীতি পরস্পর ঘোর বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। সরকার আসাম এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা যে কারণে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তাহার কথা আমি গত মাসেই বলিয়াছি, এবার তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদ কেন ভাঙ্গিয়া দিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচন কথার আলোচনা করিব। এ দেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ একই নিয়মে পরিচালিত এবং এক নীতির দ্বারা নিয়মিত, আমাদের ইহাই ধারণা। আপাতদৃষ্টিতে সেই ধারণা অনুসারে এই ব্যাপার যেন অনেকটা বিসদৃশ মনে হয়। সেই জন্য আমি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকাল-বৃদ্ধির কথা সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব।

এই ব্যবস্থা-পরিষদকে নিয়মিত সময়ে কেন ভঙ্গ করা হইল না, লর্ড আরউইন তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিগত ২০শে মে বাঙ্গালা ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় তিনি তাঁহার ঐ স্বৈরিতাপূর্ণ কার্য্যের এই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"যাহাতে যথাসময়ে সদস্য-নির্ব্বাচন হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন হইতে পারে, তাহার জন্য সাধারণ অবস্থায় সেপ্টেম্বর মাসেই আমার এসেম্ব্লিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল।

"কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতি-ক্ষেত্রে যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি যেরূপ পরামর্শ পাইয়াছি, তাহাতে আমি এই এসেম্ব্লি ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প করিতেছি না, কেন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সে কথা আমার এইখানে বলা উচিত।

"যে সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যথাকালে ভারতের শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন-সাধনের কথা নিয়মানুগভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া কথা আছে, সেই সময়ে ভারতের ভবিষ্য শাসন-পদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, সেই রাজনৈতিক স্বার্থ-বুদ্ধি এই সময়ে ভারতবাসীর মানসক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিবে; সেই জন্য সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন উপস্থিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

"যদিও কয়েকটি প্রাদেশিক কমিটীর রিপোর্ট কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে পারে সত্য, তাহা হইলেও সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয় কেন্দ্রী কমিটীর রিপোর্ট এবং সম্ভবতঃ আর কতকগুলি প্রাদেশিক কমিটীর রিপোর্ট বর্ত্তমান বৎসরের অবসান হইবার পূর্ব্বে অথবা আগামী বর্ষ আরব্ধ হইলেই যে প্রকাশিত হইবে, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

"অতএব যে সময়ে যথানিয়মে নির্ব্বাচন হইবার কথা, সেই সময়ে কমিশন এবং কমিটীগুলি কিরূপ পরামর্শ দিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে নানারূপ অনুমান এবং আন্দাজ হইবেই হইবে, সেই অনুমান এবং আন্দাজের অধিকাংশগুলিই ভিত্তিহীন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই অনুমানের এবং আন্দাজের কথাই বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইবে। তাহার ফলে যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইবে, তাহা সদস্য-পদপ্রার্থী এবং ভোটদাতা উভয় পক্ষের পক্ষেই বিড়ম্বনাজনক না হইয়া পারে না। অথচ এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে সদস্য-পদপ্রার্থী এবং ভোটদাতা উভয় পক্ষকেই বিশেষ দায়িত্বজনক কার্য্য করিতে হইবে।"

"অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে আমার হস্তে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ক্ষমতা পরিচালনপূর্ব্বক আমার পক্ষে কত দিনের জন্য এই ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করা উচিত।

"আমার নিকট এইরূপ অনেক বলবৎ আবেদন উপস্থিত হইয়াছে যে, যত দিন পর্য্যন্ত শাসন-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন-সাধনকার্য্য আরব্ধ না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত এই নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা উচিত। আমি এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সাইমন কমিশনের এই অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইবার পরে কবে কি হইবে, তাহার নিশ্চয়তা না থাকায়, উপস্থিত ঠিক কত দিনের জন্য এই ব্যবস্থা-পরিষদের স্থায়িত্বকাল বর্দ্ধিত করা হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। অতএব ব্যবস্থা-পরিষদের নিয়মিত স্থিতিকালের অধিক কত দিনের জন্য উহার স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করা হইবে, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যথা-নিয়মে সে সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিব।"

ইহাই লর্ড আরউইনের স্থূল কথা। তিনি এই ইস্তাহার দ্বারা সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, এবার যথাসময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকাল শেষ করা হইবে না, উহার আয়ুষ্কাল স্বৈরিতাবলে কিছু কাল বর্দ্ধিত করা হইবে। তিনি কেন এই ব্যবস্থা-পরিষদকে বজায় রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই কৈফিয়ৎ দানের প্রবৃত্তি, তাঁহার ভারতীয় জনমতের প্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি প্রকটনের ভাব সূচিত করে। তিনি ইচ্ছা করিলে কোন হেতু নির্দ্দেশ না করিয়া এই ব্যবস্থা-পরিষদ রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহার সে সঙ্কল্পে কেহ বাধা দিতে পারিতেন না। অবশ্য ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ উপস্থিত হইলে বড়লাট ব্যবস্থা-পরিষদ যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া না দিয়া উহা কিছু অধিক দিন রক্ষা করিতে পারেন। লর্ড আরউইন যদি বলিতেন যে, তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন বলিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা

হইলে তাঁহার নিকট ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কেহই কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিতেন না, আর কৈফিয়ৎ চাহিলেও তিনি উহা দিতে বাধ্য হইতেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি যে জনমতের প্রতি সম্মান-বুদ্ধি প্রদর্শনের জন্য এই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ কথা মনে করিলে কোন ক্ষতি নাই।

লর্ড আরউইন উপস্থিত কিছুদিনের জন্য এই ব্যবস্থা-পরিষদকে রক্ষা করিবার যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধারণের মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান বৎসরের শেষ হইবার পূর্ব্বে, অথবা আগামী বৎসরের প্রথমেই সাইমন কমিশন ও অন্যান্য কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। এই সময়ে সাইমন কমিশন প্রভৃতির রিপোর্টে কি থাকিবে, তাহা লইয়া লোকের পক্ষে অনেক অলীক জল্পনা-কল্পনা করাই স্বাভাবিক। নির্ব্বাচনের সময় সেই মিথ্যা জল্পনার বহুল প্রচার নিবন্ধন যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইবে, তাহা সকল পক্ষেরই বিড়ম্বনার বিষয় হইবে। অতএব এই সময়ে নির্ব্বাচন না করাই ভাল।" ইহাই হইল লর্ড আরউইনের যুক্তির ফলিতার্থ। এ ক্ষেত্রে লর্ড আরউইন স্বয়ং বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি পরোক্ষভাবে এই কথাই বলিতে চাহেন, লোক সাইমন কমিশনকে মুখে ও কাযে বর্জ্জন করিলেও মনে মনে উহাকে বর্জ্জন করে নাই। কমিশন কি করিবেন না করিবেন, তাহার কথা লইয়া লোক বহুলভাবে আলোচনা করিয়া থাকে। ইহাই তাঁহার বিষম ভুল। তিনি জানেন যে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ সংবাদপত্রই কমিশনের কার্য্যাবলীও প্রকাশিত করেন নাই। দেশের লোক যদি মনে মনে সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন না করিত, তাহা হইলে সংবাদপত্রের পরিচালকগণ কখনই ঐ কমিশনের কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোক যাহা জানিতে চাহে, সংবাদপত্রসেবীরা তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কাযেই সাইমন কমিশনের রিপোর্টে কি বলা হইবে না হইবে, তাহা লইয়া এ দেশের জনসাধারণের যে কোনরূপ শিরোবেদনা উপস্থিত হইবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। বিশেষতঃ বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশের সরকার কমিশনের নিকট যেরূপ মন্তব্যলিপি দাখিল করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই এ দেশের বিবেচনাক্ষম জনসাধারণের মনে একটা ধারণাই জন্মিয়াছে যে, কমিশনের নিকট তাহাদের কিছু প্রাপ্তির আশা নাই। সেইজন্য তাহারা মন হইতেও কমিশনকে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তবে এ ভাবের লোকের যে ব্যতিক্রম নাই, তাহা নহে। তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প এবং সাধারণ লোকের উপর তাহাদের বিশেষ প্রভাব নাই।

আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে 'পাইয়োনীয়ার' যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা সত্য। 'পাইয়োনীয়ার' বলিয়াছেন—এখন লোক ঐ কমিশনের বা কমিটীর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিবে না; কিন্তু যখন রিপোর্ট বাহির হইবে, তখন লোক ঐ কথা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিবে। তখন ঐ ব্যাপার লইয়া একটা ঘোর বিক্ষোভও উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, তখন লোক দেখিবে যে, তাহারা যাহা পাইবার আশা করে, তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য লোক মনে মনে বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহারা যাহা চাহে, তাহা তাহারা পাইবে না। তাহাদের দাবী যেরূপ, তাহা অপেক্ষা তাহাদিগকে অনেক অল্প দিবার প্রস্তাব করা হইবে। তাহা তাহারা জানিলেও সেই সময় তাহারা যে তাহা লইয়া একটা বিরাট হৈ-চৈ না করিবে, তাহা নহে। অনেক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াই বুঝিতে পারে যে, তাহারা যে ভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পাশ না হইয়া ফেল হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। কিন্তু যখন পরীক্ষার ফল বাহির হয়, তখন তাহাদের মনে স্বতঃই কেমন একটা চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াই থাকে। পুত্র কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। পিতামাতা বুঝিতেছে যে, তাহার জীবনের আর কোন আশাই নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পুত্রের প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার শোকাবেগ যেন অনেকটা উথলিয়া উঠে। সে তখন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দেশীয়দিগের মনোভাব য়ুরোপীয়দিগের মনোভাব হইতে কিছু স্বতন্ত্র বলিয়াই যেন মনে হয়। সুতরাং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পর এ দেশের লোকের মনে কতকটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। সে চাঞ্চল্যের তীব্রতা কতখানি হইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। সুতরাং বড়লাট যাহাই কেন বলুন না, কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে কাউন্সিলগুলি ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিলে যতটা অনিষ্ট হইত, রিপোর্ট বাহির হইবার পরে যদি ঐ রিপোর্ট দেশের লোকের আশানুরূপ না হয়, তাহা হইলে লোকের মন অধিক চঞ্চল হইয়া উঠিবে,—ফলে তাহাতে যেন অনিষ্ট অধিক হইবে। এ ক্ষেত্রে বড়লাট যেন হিসাবে ভুল করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

বড়লাটকে যাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদকে জিয়াইয়া রাখিবার পরামর্শ দিয়াছেন,—তাঁহারাও যে বিশেষ ভুল করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহাদের নাম সাধারণে জানিতে পারে নাই। তবে তাঁহারা যে দেশের সর্ব্বসাধারণের মনোভাব, বুঝেন না, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে—তাহাতে মনে হয়, ব্যবস্থাপক সভাগুলির মন্ত্রিগণ সেণ্ট্রাল এবং প্রাদেশিক কমিটীর সদস্যগণ সরকারকে ঐ কুপরামর্শ দিয়াছেন। ইঁহাদের এই বিষয়ে বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়াই মনে হইতে পারে। ইঁহারা যদি এই সময়ে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন, তাহা হইলে ইঁহাদের নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প—ইহাই অনেকের ধারণা। ইঁহারা স্বয়ং ত ঐরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্য ইঁহারা এই নির্ব্বাচন যত বিলম্বে ঘটে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে বিলম্ব ঘটিলেই লোকের প্রতিকূলতার তীব্রতা হ্রাস পাইবে। ইঁহাদের এ ধারণা ভুল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের জনসাধারণের মনোভাব রাজনীতিক বিষয়ে যেরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, যাঁহারা রাজনীতিক বিষয়ে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যে তাঁহারা সহজে বিস্মিত হইবেন না। ইহা তাঁহারা পরে বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুত হরিসিং গৌর বা

মিষ্টার জিন্নার মত লোকের পরামর্শেই যে লর্ড আরউইন ইহা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার ঐরূপ করিবার অন্ত কারণ নিশ্চিতই আছে। বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার শাসনকালেই দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড ভারতবাসীকে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করিয়া কেবল সাত জন শ্বেতাঙ্গকে লইয়া ভারতের এই শাসন-সংস্কার কমিশন বসাইয়াছেন। তিনি তাহা জানিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ কয়েক জন ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া ভারতের রাজনীতিক অবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ঐ কমিশনের কথাও তিনি তাঁহাদের সহিত বলিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ বিষয়ে রাজনীতিক ভারতের মনোভাব কি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া ভারতীয় রাজনীতিকদিগের চিন্তার ধারা কিরূপ খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ করিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। এ দিকে বিলাতী নির্ব্বাচন হইয়া গেল। শ্রমিক দল এবার অধিক সংখ্যায় পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছেন। অবশ্য ভারত সম্বন্ধে শ্রমিক ও রক্ষণশীলদল একমত,—ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলেও উভয় পক্ষের কার্য্য-পদ্ধতি যে একরূপ হইবে, ইহা মনে হয় না। প্রত্যেক দলেরই তাঁহাদের মূলনীতির সহিত বাহ্য কার্য্যপদ্ধতির একটা লোক-দেখান সঙ্গতি রাখা একান্তই আবশ্যক। তাহা না রাখিলে স্থূলদৃষ্টিতে সেই দলের ভণ্ডামী ধরা পড়ে। লর্ড আরউইন যে সময়ে এই ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ২৩শে মে(৯ই জ্যৈষ্ঠ) তারিখে বিলাতের নির্ব্বাচন-ফল কিরূপ হইবে, তাহা জানা যায় নাই। কারণ, তখন নির্ব্বাচনই আরব্ধ হয় নাই। সুতরাং তখন কোন্ দলের সংখ্যা কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। এরূপ অবস্থায় লর্ড আরউইন বিশেষ একটি কূট রাজনীতিক চা'ল চালিয়াছেন। বিগত এসেমব্লি নির্ব্বাচিত হইবার পর এ দেশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে,—তৎসম্বন্ধে কলমের এক খোঁচায় তিনি এ দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে তাঁহাদের মতামত প্রকাশে বঞ্চিত করিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বড়লাট কত দিনের জন্য এই এসেমব্লির স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তিনি প্রয়োজন মনে করিলে শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে যত দিন ইচ্ছা তত দিন এই এসেমব্লির স্থিতিকাল বাড়াইয়া দিতে পাবেন। তাঁহার ইস্তাহারের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে নূতন শাসনপদ্ধতি অর্থাৎ এই দ্বিতীয়বার সংস্কৃত শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সময় পর্য্যন্ত এই এসেমব্লিকে জিয়াইয়া রাখিবেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রশ্ন লোকের মনকে আলোকিত করিতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি ভোটদাতাদিগকে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে দিবেন না। যখন নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন লোকের পক্ষে আর বিশেষ কিছু করণীয়ই থাকিবে না। তখন যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া লোক সেই অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করিবে। অবশ্য তাহাতে লোকের মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইবে, কিন্তু বৃটিশ সিংহ তাঁহার পরাজিত মেষপালের অসন্তোষকে যে অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতোমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং লর্ড আরউইন ঐরূপ স্বৈরাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন কি না, তাহা বলা যায় না। যদি লর্ড আরউইনের ইহাই অভিপ্রেত হয় যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেই কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এখন সেণ্ট্রাল কমিটীর সদস্যগণ বিলাতে রহিয়াছেন। সরকার তাঁহাদিগকে ভারতীয় জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি বলিয়া বিলাতের সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতেছেন। কিন্তু এই সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে যদি এসেমব্লি ভাঙ্গা হইত, তাহা হইলে দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ত হইল না। ফলে ইহাতে সরকারের কোন গতিকে মানে মানে মানরক্ষা হইয়া গেল।

এই উপলক্ষে আর একটি বিষম ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যে সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় স্থিতিকাল-বৃদ্ধির গুজব শুনা গিয়াছিল, সেই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু উক্ত পরিষদে উহার স্থিতিকাল-বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ভি, জে, প্যাটেলের সহিত লর্ড আরউইনের এই বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা হয়। লর্ড আরউইন বলেন যে, তাঁহার এই কাউন্সিলের স্থিতিকাল-বৃদ্ধি করিবার কোন মতলব নাই। সুতরাং ঐরূপ প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদে নিতান্ত জরুরীভাবে উপস্থিত করিবার কোন হেতুই নাই। তবে যদি তাঁহার অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে তিনি সময় থাকিতে সে কথা মিষ্টার প্যাটেলের মারফতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গোচর করিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল বলিতেছেন যে, তিনি সেই জন্য ঐ প্রস্তাব আর পরিষদে উপস্থাপিত করেন নাই। যত দিন পরিষদের বৈঠক বসিতেছিল, তত দিন মিষ্টার প্যাটেল সে সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলেন নাই। পণ্ডিত মতিলালও মনে করিয়াছিলেন যে, বড়লাট তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্পে অবিচলিত রহিয়াছেন। তাহার পর শুনা যাইতেছে যে, লর্ড আরউইনের সহিত মিষ্টার প্যাটেলের আর এক সময়ে নানা কথার আলোচনার সহিত এই কথা হইয়াছিল যে, ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকাল-বৃদ্ধির সম্বন্ধে লর্ড আরউইনের তখনও কোন মতের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই,—তবে ভবিষ্যতে উহা ঘটিবে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না; অতএব সে কথা যেন মিষ্টার প্যাটেল পণ্ডিত মতিলালকে জানাইয়া দেন। নতুবা পণ্ডিত তাঁহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন। মিষ্টার প্যাটেল বলিতেছেন যে, তাঁহার সে সকল কথা কিছুই স্মরণ নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেই জন্য লর্ড আরউইনকে সত্যভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, লর্ড আরউইন অথবা মিষ্টার প্যাটেল কেহই মিথ্যা কথা বলেন নাই। নানা কথা-প্রসঙ্গেই লর্ড আরউইন বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থায়িত্বকাল বাড়াইয়া দিবার তখনও তাঁহার কোন মতলব হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে উহা হইবে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। যদি কেবল এই মাত্র কথা

হইত, তাহা হইলে এই ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কোন কারণ ছিল না। কারণ, ব্যবস্থা-পরিষদের স্থিতিকালের বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার তখনও মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহা ঠিক। সুতরাং মিষ্টার প্যাটেল সে কথা মনে রাখিবার এবং পণ্ডিত মতিলালকে জানাইবার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা মনে না করিতে পারেন। কিন্তু লর্ড আরউইন সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও বলিয়াছিলেন। সে কথাটি এই,—"ব্যবস্থা-পরিষদের বৈঠক শেষ হইবার পরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না, অতএব এই কথাটিও পণ্ডিত মতিলালকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।" এই কথাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মিষ্টার প্যাটেলের ন্যায় সুচতুর ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। এ কথাগুলি তাঁহার কাণের ভিতর প্রবেশ করিলেই তিনি তাহা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারিতেন না। সুতরাং ইহাতে স্বতঃই মনে হইতেছে যে, হয় তিনি কথাগুলি শুনিতে পায়েন নাই, অথবা ও বিষয়ে কোন খেয়াল করেন নাই। তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, লর্ড আরউইনের যখন তখনও মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তখন উহার আর পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এই মনে করিয়াই তিনি হয় ত কথাটার উপর কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই, অথবা বড়লাটের সহিত ঐ সময়ে কোন অতি গুরু বিষয়ের কথা হইতেছিল এবং সেই বিষয়টি তিনি মনে মনে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং কথাটা তাঁহার খেয়ালে আসে নাই। এরূপ ব্যাপার যে ঘটে না, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। যে কারণেই হউক, কথাটা মিষ্টার প্যাটেলের কাণে প্রবেশ করে নাই, ইহা নিশ্চিত। এরূপ ক্ষেত্রে মিষ্টার প্যাটেলের পক্ষে বিস্মৃতি ঘটা অসম্ভব নহে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এরূপ ঘটনা যে সময়ে সময়ে না ঘটে, তাহা নহে। কিন্তু মিষ্টার প্যাটেলের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটা বড়ই দুঃখের বিষয়।

মিষ্টার প্যাটেলের পক্ষে যেমন এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, লর্ড আরউইনের পক্ষেও সেইরূপ ভ্রম হইতে পারে। যখন ঐ সময়ে অনেক গুরু বিষয়ের কথাই হইতেছিল, তখন লর্ড আরউইনও কোন একটা বিশেষ কথা চিন্তা করিতেছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। তিনি হয় ত শেষোক্ত কথাটি বলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্য সে কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা আছে যে, তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন। এরূপ ঘটনাও যে না হয়, তাহা নহে। দ্রোণাচার্য্যকে ভীমসেন 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন' এই কথা বলেন। সে কথা শুনিয়া দ্রোণের মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি জানিতেন, অশ্বত্থামা তখন মরিবেন না। সেই জন্য তিনি বলেন যে, যদি যুধিষ্ঠির বলেন, অশ্বত্থামা মরিয়াছে, তাহা হইলে তিনি সে কথা বিশ্বাস করিবেন। কারণ, যুধিষ্ঠির যে মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, ইহা তিনি জানিতেন। সেই জন্য যুধিষ্ঠির যখন বলিলেন, অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ, তখন ভীমবাক্য শ্রবণে বিমনস্কতাহেতুই দ্রোণ আর "ইতি গজঃ" অংশটুকু শুনিতে পায়েন নাই। সেইরূপ বিমনস্কতাহেতু মিষ্টার প্যাটেলের পক্ষে ঐ কথা না শুনা যেমন সম্ভব, তেমনই লর্ড আরউইনের পক্ষেও বিমনস্কতাহেতু ঐ কথা না বলাও সম্ভব। তিনি বলিবেন মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা আছে যে, তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে। যখন উভয় পক্ষের কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না,—তখন এইরূপ একটা কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাস্য, ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন শেষ হইবার পরে লর্ড আরউইনের মতের ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? ২০শে মে তারিখে তিনি এসেমব্লির স্থায়িত্ব-বৃদ্ধির জন্য যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে নূতন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই কখন কল্পনা করেন নাই। সুতরাং সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কমিটীগুলির রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে লোক ঐ বিষয় লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা করিবে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের তাহা মনে করিবার হেতু ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। সুতরাং সে কারণ নূতন উদ্ভূত হয় নাই যে, তদ্দ্বারা পরে লর্ড আরউইনের মতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কাজেই লর্ড আরউইনের প্রদর্শিত হেতুবাদে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তবে এ কথা সত্য যে, কতকগুলি লোক বড়লাটকে এই এসেমব্লির স্থায়িত্বকাল-বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়াছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যতম সদস্য মিষ্টার এম, কে, আচারিয়া মাদ্রাজ মেলের জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি এবং আর ২৯ জন পরিষদের সদস্য পরিষদের স্থায়িত্বকাল বর্দ্ধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন কংগ্রেসের দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের দলের ঐরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনরূপ আদেশ ছিল না, সেই জন্যই তাঁহারা ঐ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, মার্চ্চ মাসের শেষভাগে এবং এপ্রিল মাসের প্রথমে ব্যবস্থা-পরিষদে ৯৫—৯৬ জনের অধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। তন্মধ্যে বে-সরকারী সদস্য-সংখ্যা ৬৫ জন ছিলেন। তন্মধ্যে যে ৩০ জন পরিষদের স্থায়িত্বকাল-বৃদ্ধির প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ৪৫ জন সদস্য কাউন্সিলের স্থিতিকাল-বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং পণ্ডিত মতিলালের পক্ষে ২০ জনের অধিক লোক ছিলেন না, সেই জন্য তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদের স্থায়িত্বকাল-বৃদ্ধির প্রতিকূল প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেসী দলের কোন সভাই আহূত হয় নাই, কোন প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। এই কথাটি বড় গুরু বলিয়া মনে হইতেছে। ফলে ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, কতকগুলি লোক পরিষদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য।

কিন্তু তাহা হইলেও বড়লাটের এই কার্য্য করা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, বিগত পরিষদ গঠিত হইবার পর ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর, বিশেষতঃ ভোটদাতাদিগের মতামত জানা আবশ্যক। যাঁহারা এসেমব্লির

এবং কতকগুলি প্রাদেশিক কাউন্সিলের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করিয়া সেই মতামত প্রকাশে বাধা দিয়াছেন, তাঁহারা যে ডেমক্রেশীর বা গণতন্ত্রবাদের মর্ম্ম বুঝেন না, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মিষ্টার জিনার ন্যায় সাম্প্রদায়িকভাবে প্রভাবিত ব্যক্তির পক্ষে অথবা মিষ্টার আচারিয়ার ন্যায় চলচ্চিত্ত, ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু লর্ড আরউইনের ন্যায় এক জন কুশাগ্র-বুদ্ধি রাজনীতিক সে কথা শুনিলেন কেন? এ জন্য আমরা লর্ড আরউইনকেই দায়ী মনে করি।

যাহা হউক, লর্ড আরউইনের এই কার্য্যের পাণ্টা জবাবে স্বরাজ্যদলের দলপতি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর মারফতে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেস-দলভুক্ত সদস্যদিগের উপর এইরূপ আদেশ দিয়াছেন :—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বঙ্গীয় ও আসামী ব্যবস্থাপক সভা ভিন্ন অন্য সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল কংগ্রেসের সদস্য, সদস্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা কেহ উক্ত ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে অথবা তাঁহাদের কোন কমিটীতে কিম্বা সরকারের গঠিত কোন কমিটীতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া না লইতেছেন, অথবা ইহার কোন পরিবর্ত্তন না করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্তই এই নিয়ম বলবৎ থাকিবে। কংগ্রেসের যে সকল সদস্য ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহারা অতঃপর এসেমব্লির ও ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা অনুসারে কার্য্য করিতে আত্মনিয়োগ করিবেন।

বাঙ্গালার এবং আসামের ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ঐ দুই কাউন্সিলের সদস্যগণ একটিমাত্র সভায় উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাদের নাম রেজিষ্টারী করিয়া লইবেন। তাহার পর তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় আর উপস্থিত হইবেন না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এখন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া দেশের গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্যদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। এখন কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের ভারকেন্দ্র দেশের উপর যাইয়া পতিত হইতে চলিল। ফলে এখন সকলে কার্য্যতঃ মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ নীতির দিকে আবার কতকটা চলিয়া পড়িলেন। ইঁহারা হাতে কলমে বুঝিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে সরকার কার্য্যতঃ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সুতরাং ব্যবস্থা-পরিষদে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া যে কাযই করা যাউক না কেন, সরকার তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন না বা তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন না। এরূপ অবস্থায় কাউন্সিল বর্জ্জন করা বিধেয়। তবে আমাদের দেশের কতকগুলি লোকের দাসোচিত মনোবৃত্তি যে কত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এ দেশের লোক কর্ত্তৃক এসেমব্লি ও কাউন্সিলগুলি স্থিতিকাল-বৃদ্ধির জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করাতেই বুঝা যায়। ইহাতে যে বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণকে মত প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং জনমতের ঘোর প্রতিকূলতা করা হইল, ইহাও তাঁহারা বুঝিতেছেন না। মিষ্টার চিন্তামণি যথার্থই বলিয়াছেন যে, বিলাতে সম্রাটের এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর এক ঘণ্টার জন্যও পার্লামেণ্টের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা নাই। ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনে বড়লাটের হস্তে এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের ঐরূপ স্বৈর-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা শাসকবর্গকে ঐ স্বৈরতা অবলম্বন করিতে বলেন, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম কিরূপ দুর্ব্বল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

দেশে যখন ঐরূপ লোক আছে, তখন স্বদেশ-প্রেমিক লোকরা কাউন্সিল প্রভৃতিতে প্রবেশ না করিলেও, যাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী, তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিবেনই। সুতরাং বঙ্গীয় কাউন্সিলে যদি স্বরাজীদলের সদস্যরা কেবল নাম রেজিষ্টারী করিয়া কাউন্সিলে অনুপস্থিত হইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাই মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিয়া কাউন্সিলে দ্বৈতশাসন বজায় রাখিবেন। তাহা হইলে স্বরাজ্য-পন্থীদিগের এত আড়ম্বর সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

স্মৃতির সুখ

জানি আমি জানি সখা জানি প্রিয়তম !
জীবনের কায মোর ফুরাইবে যবে,—
নিশান্তের ঝরা ওই শেফালিকা সম
আমিও ঝরিয়া যাব নিঃশব্দে নীরবে !
আমি চলি' গেলেও ত' উঠিবে ও রবি ;
কুসুম ফুটিবে নিতি প্রভাতে ও সাঁঝে ;
শরৎ বসন্ত পুন আসিবে ত' সবি ;—
আমি শুধু ফিরিব না এই ধরা-মাঝে।

মোর তরে কোন দিন কাঁদিবে না কেহ !
মোর স্মৃতি কারো বুকে আনিবে না দুখ !
ভুলিবে তুমিও মোর ভালবাসা স্নেহ ;—
তবু ওগো নাহি তাহে ক্ষতি এতটুক !
তুমি মোরে এক দিন বেসেছিলে ভালো—
সেই স্মৃতি প্রাণে মোর জ্বালাইবে আলো।

শ্রীবিমল মিত্র।

সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন *

সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার আহিরীটোলাস্থিত ভবনে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৪৯ সালে আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার গুণগ্রামের কথা সঙ্গীত-পিপাসুদিগের নিকট প্রচারিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্যভাবে পাইকপাড়া রাজ-বাড়ীতে "রত্নাবলীর" ভূমিকা অভিনয় করিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত দর্শকবর্গের পরিতৃপ্তিসাধন করেন।

পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালীপ্রসন্নের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হন। তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করেন।

১৮৭১ খৃঃঅব্দে তিনি রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন, বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে কোন সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বাড়ীতে এক এক জন কণ্ঠ-সঙ্গীতজ্ঞ অথবা যন্ত্র-সঙ্গীতজ্ঞ রাখিতেন। সঙ্গীত-শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ ঐ সকল সঙ্গীত-আচার্য্য বা ওস্তাদজীর নিকট সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে দেশের বহুলোক সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারিবে, এই আশায় তিনি এই স্কুলে আত্ম-বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিদর্শনাদি করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না। তাঁহার অসাধারণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বঙ্গদেশে সঙ্গীতের স্বরলিপিপদ্ধতির যাহাতে বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামিকৃত 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণকালে আমাদের দেশ-প্রচলিত প্রায় সমুদায় রাগ-রাগিণী স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্মতি লইয়া সঙ্গীতসারে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-কৃত "যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা" নামক সেতারের গৎ-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থে মাত্রা অর্থাৎ স্বরের স্থিতিকাল এবং স্বরের নানারূপ অলঙ্কার ও সংযোগ সম্বন্ধে তথ্য বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতের রাগ-রাগিণী বিষয়ে নানা মতভেদ দেখা যাইত এবং যেখানে সঙ্গীত আলোচনা হইত, সেখানে উহার মীমাংসা করিতে যাইলে তাহার ফল খুবই খারাপ হইত এবং শেষে বিতণ্ডায় পরিণত হইত।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থ এবং কালীপ্রসন্নের চেষ্টায় মহা সমারোহে এক জলসা আহূত হইয়াছিল, নানা দেশ হইতে সঙ্গীত-অভিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতগণ উহাতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মত লইয়া "সঙ্গীতসারে" সমস্ত রাগ-রাগিণী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃঃঅব্দে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি সম্মানপত্র, ১৮৮০ খৃঃঅব্দে বার্লিন হইতে, ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইটালী, ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্যারী মহানগরী হইতে কালীপ্রসন্ন সঙ্গীত-বিদ্যা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাপত্র ও সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গ সঙ্গীত-বিদ্যালয় হইতে "সঙ্গীত-উপাধ্যায়" পদবী ও একখানি সুবর্ণপদক

---

* স্মৃতিসভায় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের অভিভাষণ।

প্রাপ্ত হন। সঙ্গীত-ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের নাম চিরদিন বিরাজিত থাকিবে।

তিনি সুরবাহার ও জলতরঙ্গ যন্ত্রের অদ্বিতীয় বাদক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তিনি অযোধ্যার সঙ্গীত-প্রিয় শেষ নবাব ওয়াজীদ আলি শা, ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেলগাছিয়া ভিলায় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডএর সম্মুখে জলতরঙ্গ বাজাইয়া ইংলণ্ডের সম্রাট-পুত্রের এবং সমবেত রাজন্যবর্গের তিনি প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

লা মার্টিন কলেজের প্রধানাচার্য্য মিঃ এলডিস্ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

This and many other things prove that the Hindus have long been practically familiar with the acoustic phenomena of resonance of which the Greeks and Mediæval Europeans knew nothing. But it seems clear on the whole that the Hindus were far in advance of the Greeks and indeed that up to the down of the Modern European Art in the fourteenth or fifteenth century, Hindusthan was, without doubt, in music, the mistress of the world.

প্রতীচ্যের সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ হাঙ্গেরীয়ান জাতীয় মিঃ রেমেণ্ডি বলিয়াছিলেন—

Babu Kali Prasanna Banerjee accompanied Raja like a superb, virtuous and as I guessed at once he was improvising in his accompaniments the most intricate counterpoint. Yes counterpoint and good counterpoint it was too.

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ও লর্ড রিপণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এ দেশের 'ইংলিশমান' এবং বিলাতের 'ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

পরলোকে সরসীবালা বসু

কথা-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধা সরসীবালা দেবীর অকালে ইহলোক-ত্যাগের সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কিছু দিন হইতে পীড়িতা হইয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহাকে প্রায় শয্যাশায়িনী করিয়া রাখিয়াছিল। সরসীবালা বহু প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের লেখিকা ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক গল্প ও উপন্যাস পাঠক-পাঠিকা-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। বহু সন্তানের প্রতি জননীর সুকঠোর কর্ত্তব্যপালনের অবকাশে ইনি নিষ্ঠাভরে সাহিত্যসেবা করিয়া আসিয়াছেন। জীবনের অনেক সময় গিরিডির ভবনে তাঁহাকে সাহিত্য-সাধনায় যাপন করিতে দেখা গিয়াছিল। সরসীবালার রচনায় একটা প্রসাদ-গুণ ছিল, ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ও অনুরাগ ছিল। চরকা-সংক্রান্ত তাঁহার উপন্যাসখানি পাঠক-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। দেশ-জননীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ তাঁহার অনেক রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে না হইলে তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গভাষা আরও অনেক রত্ন লাভ করিতে পারিত। সরসীবালার অকাল-বিয়োগে তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী ও সন্তানগণের প্রতি সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করিবে।

২৩
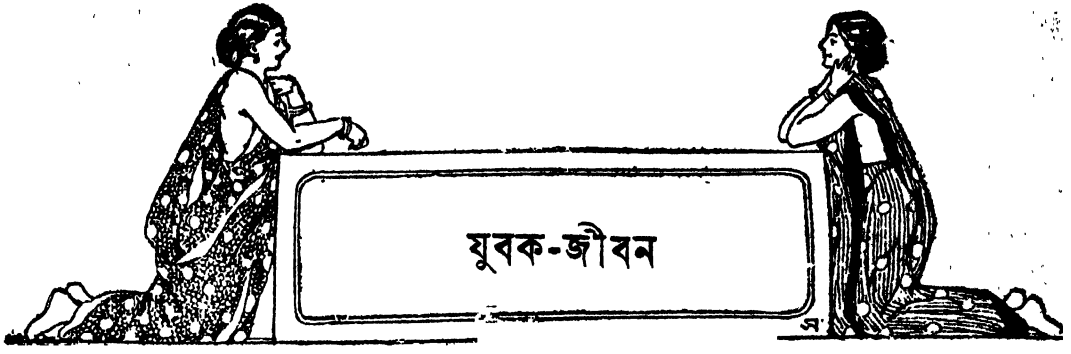
অর্থই যে রাজ্যের উপাস্য দেবতা, নিত্য নূতন নূতন আইন প্রণয়ন যেখানে মুখ্য রাজকার্য্য, সেই সকল আইনের জোট পাকাইবার ও খুলিবার জন্য যখন দেবী বাগ্‌বাদিনীকে বীণা তুলিয়া রাখিয়া বর্ষে বর্ষে শত শত উকীল প্রস্তুত করিতে হয়, তখন সেখানে যে আদালতের কলেবর ও সংখ্যা দিন দিন সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেকালে কলিকাতার লালবাজারে পুলিসের বড় আড্ডার হাতার মধ্যেই একটি পুলিস-আদালত ছিল। বৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন দুই জন; লালবাজারের উত্তর বিভাগের মামলার বিচার করিতেন এক জন, অন্য জনের ভার ছিল দক্ষিণ বিভাগের মামলা শোনা। উকীলের সংখ্যা বাড়িয়া বাড়িয়াও ২০।২২ জনের অধিক হয় নাই। আগেকার উকীলদের পাশ-ফাসের হাঙ্গাম ছিল না, বোধ হয়, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরীতেই তাঁহারা ওকালতী করিতেন। বাঙ্গালী অপেক্ষা ফিরিঙ্গী উকীলের সংখ্যা অধিক ছিল। সেকালের এল, এল, ডিগ্রী লইয়া আহিরীটোলার বাবু গোপালচন্দ্র শীল প্রথম পাশকরা উকীল পুলিসকোর্টে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেন; তিনি ১০ টাকা ফি-এর কমে কোন মকদ্দমায় দাঁড়াইতেন না। ইহার পরে এম-এ, বি, এল, ডিগ্রীধারী হাইকোর্টের তালিকাভুক্ত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুলিসে নিয়মিত প্র্যাক্‌টিশ করিতে আরম্ভ করেন; ১৬ টাকাই ছিল তাঁহার ফিয়ের নিম্নসীমা। ভারি রকম মকদ্দমা হইলে হাইকোর্টের এটর্ণী বা ব্যারিষ্টার কেহ কেহ আনিতেন। স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কার্য্যের প্রসার এটর্ণীগিরিতেও যেরূপ বিস্তৃত ছিল, পুলিসকোর্টেও সেইরূপ ছিল; উৎকৃষ্ট এডভোকেটের খ্যাতি তিনি আজীবন বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ সেই কলিকাতায় দু'দুটো বড় বড় পুলিস-আদালত, একটি ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে, অপরটি নিমতলা ষ্ট্রীটে জোড়াবাগানে। ৫টি বেতনভোগী ম্যাজিষ্ট্রেট এই দুটি আদালতে বসেন, তা ছাড়া অনারারীরাও আছেন। আলিপুর বাদ দিয়া শিয়ালদহ পুলিস-কোর্টকে কলিকাতার সামিল বলিলে অন্যায় হয় না।

যতদূর স্মরণ হয়, অন্ততঃ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত বি, এল্-রা সাধারণতঃ ছোট আদালতে বা পুলিসকোর্টে ড্যারা-ডাণ্ডা গাড়িয়া প্র্যাকৃটিশ করাটা মর্য্যাদাহানিকর মনে করিতেন। এখন এই দুইটি পুলিসকোর্টের প্রত্যেকটির উকীলের সংখ্যা শতকের পারে পৌছিয়াছে, মোটর ট্যাক্সির খেয়া বড় বড় উকীলদের এ ঘাট ও ঘাট—দুঘাটেই পিণ্ডদানের মন্ত্র পড়িতে লইয়া যায়। অনেকেই বিদ্যা ও পদের মর্য্যাদা বেশ সতেজে রক্ষা করিয়া চলেন। বসনে, ভাষণে এবং অশনে-ও অনেককে স্বকৃতভঙ্গ ব্যারিষ্টার বলিয়া-ই মনে হয়। হাই-কোর্টের বার-লাইব্রেরী হইতে সেকালের টিফিনের ধূম এক-রকম উঠিয়া-ই গিয়াছে; পীপের পানীয়ের পরিবর্ত্তে সেখানে কৌন্সিলীরা এক্ষণে প্রায় পেঁপে খান, কিন্তু পুলিসের সবুজেরা ল্যঞ্চের সময় উড়িয়া পড়েন ফিরপো প্যাটিসীর-টেবিলের আলোর ঝলকে।

কিন্তু সেকালের সোমবারের সকালে পুলিসে যে একটা মজার হাট বসিত, তাহা এক্ষণে প্রায় কাণা হইয়া গিয়াছে।

"কি মজার শনিবার" "কি মজার রবিবার" কথা দুইটি যখন সৌখীন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন ঐ দুই মজার বারে ধৃত মাতালের দলকে একত্র "কি দুঃখের সোমবারে" পুলিস-কোর্টের লীলাক্ষেত্রে হাজির করা হইত। গোরা সেলারের দল দক্ষিণা দিত উপরকার আদালতে, নেটিভদের বিদায়ের বন্দোবস্ত ছিল নীচের আদালতে। সেলিং শিপ উঠিয়া যাই-বার সঙ্গে সঙ্গে গোরার উৎপাত কমিয়াছে; ভদ্র-পেয় সম্মান পাইয়া সুরা বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গৃহব্যবহার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং সেই কাঁচা ছেলেটি ও দেদার গোছ লোক ভিন্ন রাস্তায় মাতলামী করিয়া পাহারাওয়ালা সাহেবদের

বীরত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত বিপদ অধুনা কলিকাতায় প্রায় অভাব।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, একসঙ্গে সপ্ত পদ মাত্র গমন করিলে-ই লোকের সঙ্গে লোকের বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়। সত্য-ই মানুষে মানুষে সখ্য এত সহজে স্বল্প সময়ে জন্মিয়া যায় যে, কোন্ প্রেতের তাড়নায় আমরা যে পরস্পরে কলহ করিয়া মরি, মধ্যে মধ্যে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। গারদ-ঘরের কুৎসিত কঠোর ঘৃণিত কোটরে-ও ত্রিদিবাগত এ দরদ প্রাণের ভিতর পৌঁছিয়া যায়। সোমবারের সকালে পুলিসের প্রহরীরা যখন বন্দীদিগকে আদালতে লইয়া যাইতে আসিল, তখন শ্যামাপদর মন যেন সেই কক্ষ ত্যাগে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। দেদারের পিঠে হাত দিয়া শ্যামাপদ বলিল, "তবে আসি ভাই, আবার কখন দেখা হবে কি না, কে জানে!"

এবার দেদারের চোখে একেবারে জল গড়াইয়া পড়িল। সে সেলাম করিল না, একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্যামাপদর পায়ের ধূলি আপনার মাথায় তুলিয়া লইল। কষ্টে বাক্য নিঃসরণ করিয়া কহিল, "আপনি অত বড় বাবু হয়ে আমার মতন মুখ্যুকে ভাই ব'লে ডাকলে, খোদা তোমায় বড় লোক ক'রে দেবে, নইলে আমি মোছলমানের ছাওয়াল নই।"

ছোকরাটি দু'হাত যোড় ক'রে শ্যামাপদকে প্রণাম করলে। এমন কি, চক্কোত্তি ঠাকুর-ও যেন একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে, "কিছু মনে কর না বাবু, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এই ব্যবসায়ে পিরবিত্তি হয়েছি; যা হোক, দু' রাত্তির একসঙ্গে সহবাস করা গেল, সৎসঙ্গে কাশীবাস বলতে হবে।"

পাহারাওয়ালা অন্যান্য আসামীকে নিয়ে গেল জোড়াবাগানের আদালতে, কেবল পার্ক ষ্ট্রীট থানার আসামী শ্যামাপদকে যেতে হ'ল ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে।

ফরিয়াদী ইংরাজ, শ্যামাপদর মামলা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে। সেখানে ভীড় অপেক্ষাকৃত কম। একটা আফিসের তবিল-তছরুপাতের মামলা; পোর্ট-মিটের গুদামের মাল সরিয়ে গোটা দুই ঘোষের গাড়ীর গাড়োয়ান ও কুলী ধরা পড়েছে; ধর্ম্মতলা অঞ্চলের মেম সাহেবদের স্বামীর বিরুদ্ধে খোর-পোষের নালিশ গোটা চারেক; এই রকম। খবরের কাগজের খোরাকের উপযুক্ত একটা মকদ্দমা আছে মাত্র, তাতে হগসাহেবের বাজারের ধর্ম্মান্ধ এক কসাই কামমন্ত্র প্রয়োগে এক হিন্দু বিধবা ফলওয়ালীকে সবলে স্বধর্ম্মে আনবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু থানা-কেশ ব'লে শ্যামাপদর ডাক আগেই হ'ল। ইতিপূর্ব্বে দুই একটি ছোকরা উকীল শ্যামাপদকে দেখে সে আসামী না ফরিয়াদী, কেস্‌টা কি, এই সব প্রশ্ন করেছিলেন; শ্যামাপদ ঘাড় হেঁট করে-ই ছিল. সঙ্গের জমাদার উত্তর দিয়েছিল যে, "সাহেবের সঙ্গে মারপিট, ভিতরে মেম-ও জড়ান আছে, সঙ্গীন মামলা।" উকীল বাবু বলিলেন, "তাই ত, বড় সিরিয়াল কেস, হয় ত পাবলিক প্রসিকিউটার নিজে দাঁড়াতে পারেন; একটু ভাল রকম তেজী দেখে উকীল দেবেন; আমাদের এই সৌরীন বাবু স্বদেশী কেসে এক রকম সিদ্ধহস্ত, আর আমার—সে কথায় আর কায নেই; সিডিসন কেসে আসামী ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমি ত একেবারে কর্ত্তাদের বিষ-নজরে প'ড়ে গেছি; অত বড় প্র্যাকটিসটা একেবারেই মাটী বললেই হয়।" জমাদার বল্লেন, "উকীল আর কো'থেকে হবে, ফেরিস সাহেব এত বল্লে, তা বাবু জামিনই দিতে পাল্লে না, দু'রাত হাজতেই কাটিয়েছে।" বাঙ্গালী যুবা সাহেব মেরেছে, হাজতে রাত কাটিয়েছে, বাস্, আর রক্ষা নাই, একেবারে ৩।৪ জন ছোকরা রিপোর্টার থরপদে চ'লে এসে শ্যামাপদকে আক্রমণ করলে। "আপনার নাম?" "বাড়ী?" "কোন্ কলেজ?" "সাহেবটা অফিসিয়াল, না, সাব এসিষ্টেণ্ট?" "আপনার সঙ্গে ফটোগ্রাফ আছে?" "আপনি পোসপোণ্ড চাবেন, আজকে কেসটা হ'তে দেবেন না।" "আমরা ভাল ক'রে তদ্বির করব। আমরাই উকীলের বন্দোবস্ত করব।" "এজিটেশন, প্রোপাগাণ্ডা, ফটোগ্রাফ—সমস্ত ইণ্ডিয়া টের পাবে, আপনি কি দুঃসাহসের কায করেছেন।" এ দিকে "দুঃসাহস" যাঁর, তিনি ত মনে মনে বলছেন, "মা বসুমতি! তুমি দু' ফাঁক হও, আমি ভিতরে প্রবেশ ক'রে এ লজ্জা লুকুই।" ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন, আদালতে ডাক উঠল—"ফরিয়াদী মাল্‌বেরি সাহেব, আসামী শ্যামাপদ লাহিড়ী।"

মাল্‌বেরি সাহেব এসে এজাহার দিলেন, তিনি খাঁটি ইংরাজ, ব্ল্যাকমেল আউট ল' কোম্পানীর দোকানে হ্যাবার ড্যাসারি ডিপার্টমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট; মেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সাহেব উত্তর দিলেন, "তিনি এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে অনিচ্ছুক।" যে বাঙ্গালী বাবুটি সাহেবের কাছে ফি নিয়ে তাঁর উকীল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মুর্গী যেমন ডিম পাড়বার

আগে তানা বাড়া দিয়ে নেয়, তেমনি ক'রে গাউনটা ঝাড়া দিয়ে নিলেন। তার পর একটু মুচকে হেসে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—

Your Honour, I appear for the plaintiff in this case. My client, Sir, is a highly respectable gentleman in whose venomous veins flow the white blood of William the Conqueror, like Isar rolling rapidly, without any adminixture of alum, chlorine or sewage-oozing as is the case with the Calcutta filtered water.

একটি চালাক চটপটে চক্‌চকে্‌-চোখ ছোক্‌রা উকীল আর স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারেন না, নিযুক্ত না হ'লেও উঠে বল্লেন :—

Yes yes, the Court appreciates the man's respectability, anything else?

১ম উঃ। Your Honor, I object. My learned young friend must apologise.

ম্যাজিষ্ট্রেট। For what?

১ম উঃ। For calling my client a "man" that's a libel.

২য় উঃ। I thought the person belonged to the human species

১ম উঃ। He is more than a man.

২য় উঃ। Not Hanuman;

১ম উঃ। Your Honor, learned friend calls my client a monkey.

ম্যাজিষ্ট্রেট। I can't allow that.

২য় উঃ। Sir, I refer to a Hero-God whom all Hindusthan worship; let my friend deny it if he can.

১ম উঃ। Why do you speak in this case? You have no locust standi, you have received no fee.

২য় উঃ। What, if I choose to waive the question of fee and stand up to defend a brother?

১ম উঃ। Then every "brother" in the world will show you plantain and you will never get a motor of your own. Now sit down and don't disturb me; I will forget my speech.

ম্যাজিঃ। Yes, the Court is not going to wait.

১ম উঃ। Your Honor, The gravityful seriousness of this criminal case is very fatal. As a Brahmin myself I can vouch and accouch for the verbal veracity of my statement, when I say that in the fabulous Laws of Hindu dominion if a Sudra dared to raise his dirty hand against a Brahmin the accused would be burnt alive. At present every white man is a Brahmin in this country; so it is not only section 355 that is mere assaulting applies here, but sec. 121A I. P. C. high treason is the charge that I humbly—

২য় উঃ। In the meantime you yourself need a change of air at Ranchee.

১ম উঃ। Stop; shut the door.

২য় উঃ। The people at the asylum there will do that after putting you in.

১ম উঃ। আমি পাগল! Call me mad?

২য় উঃ। In charity; traitor is a more true name.

১ম উঃ। I am a hundred times more parrotical patriot than you; but here I come not as a citizen, but as the logarithmous luminary of legal gullability. In identifying myself with my clients I have to become a murderer, forgerer, perjurer, burglar ——

২য় উঃ। Pick-pocket.

১ম উঃ। Sir, he is calling me names.

২য় উঃ। Only one; you were having the run for plurals.

ম্যাজিঃ। Go on with the case please. What has the complainant to say.?

১ম উঃ। What is your name?

ফরিয়াদী। Timothy Wales Mullberry.

১ম উঃ। Any connection of Ellen Terry?

ফরিঃ। No. My great grand-uncle was in Cromwell's army; we hate stage-people.

১ম উঃ। I may take it then, that Dogbery was of—

ফরিঃ। No none, with all respects to the Police.

১ম উঃ। But surely the Earl of Canterbury—

করিঃ। One of my aunts was connected with the late Countess—

২য় উঃ। Through the laundry.

করিঃ। I ask the protection of the court. This person is insulting me.

২য় উঃ। Why, arn't you now serving a tailor ? And a laundry woman is only his next door neighbour.

১ম উঃ। Do you know the accused ?

করিঃ। Think I remember his ugly face.

২য় উঃ। Thank you, my beauty.

১ম উঃ। Did the accused assault you ?

করিঃ। Yes.

১ম উঃ। Did you give any provocation ?

করি। Don't remember.

২য় উঃ। You never gave a kick, the first thing ?

করিঃ। Can't remember.

২য় উঃ। A convenient memory. Do you serve at the counter ?

করিঃ। Occasionally.

১ম উঃ। In these days of democracy, even Russian Counts are seen behind counters, waiting at tables and and—

ম্যাজিঃ। (শ্যামাপদর প্রতি) What have you to say ?

শ্যামা। I didn't want to hit hard.

ম্যাজিঃ। You used your fist ?

শ্যামা। I did your Honor, only fist ; a kick would have been the correct payment, coin for coin.

ম্যাজিঃ। But you had no business to take the law in your hand,

শ্যামা। As an Englishman, would your Honor think me a gentleman if I didn't ?

ম্যাজিঃ। No matter what I think.

১ম উঃ। Sir in assaulting Mullberry, the sweet simple innocent as a lamb, docile as an ass, conjugal as a dove ; this Juscious luscious Mr. Mullberry, this disloyal revolutionary young fellow has assaulted the gregarian glory of British commerce and thereby with the force of a florescencial rhododendron shaken the very plinth pillar and plaster of the—

ম্যাজিঃ। Wait please. (শ্যামাপদর প্রতি) Have you got any witness ?

শ্যামা। No Sir, 'Im rather a stranger in Calcutta, been two nights in the lockup.

ম্যাজিঃ। Lock up। why ?

শ্যামা। None to stand bail,

ম্যাজিঃ। Sorry. But I must be guided by procedure and sentence you—

এই সময়ে দ্বারের কাছের ভিড় হঠাৎ সরিয়া যেন কাহার জন্ম পথ করিয়া দিল এবং একটি ভদ্র-মূর্ত্তি ইংরাজ দ্রুতপদে ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—

I am a witness in this Case.

একে গোদ—তার উপর বিষ-ফোড়া, একা মলবেরিতেই রক্ষা ছিল না, তার উপর আবার এক জন জাঁকালো সাহেব হঠাৎ সাক্ষিরূপে উপস্থিত ; সকলেই বুঝিল, শ্যামাপদর জেল বৈ আর গতি নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন ? আগন্তুক উত্তর দিলেন, অভিযুক্তের পক্ষে।

ইংরাজদের আদালত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া তদুপরি কৌপীনধারী গন্ধী মহাত্মা রাজা হইয়া বসিয়াছেন, এক পাশে মতিলাল নেহেরু, অপর পাশে জে, এম, সেনগুপ্ত চামর ব্যজন করিতেছেন, পশ্চাতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার খদ্দরের ছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান, ইহা দেখিলেও লোকে তত আশ্চর্য্য হইত না ; এক জন সম্রান্ত ইংরাজকে একটি বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে অযাচিত সাক্ষিরূপে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলে যেরূপ বিস্ময়াপন্ন হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক সাহেবটি বলিলেন ;— তাঁহার নাম জেমস্ ম্যাক্‌মিলভার, পেশা—মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারী, আপাততঃ টাটা কোম্পানীর অধীনে ঝরিয়া অঞ্চলের কোনো কয়লার খনির ম্যানেজার। কার্য্যোপলক্ষে স্বল্প কয়েক দিনের জন্ম কলিকাতায় আসিয়া চৌরঙ্গীর কনটিনেণ্টাল হোটেলে বাস লইয়াছেন। ঘটনার দিবস তিনি বাহিরে যাইবার পূর্বে তাঁহার বেয়ারা ডাকঘর হইতে ফিরিতে কেন বিলম্ব করিতেছে. এই ভাবিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে

দেখিতেছিলেন। অই সময় রাস্তায় যেমন মোটার-ট্যাক্সির ভিড়, ফুটপাতের উপর-ও তেমনি নানাবিধ লোকের চলাচল। ম্যাক-সিলভার সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন, এক জন য়ুরোপীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক রাস্তা হইতে যেমন ফুট-পাতের উপর উঠিলেন, অমনি সেই দিকে দ্রুতগমনশীল এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীলোকটির অঙ্গের অম যেন একটু ধাক্কা লাগিল। (সাহেব য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে 'উওম্যান' এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্বন্ধে 'জেণ্টলম্যান' কথা দুইটি ব্যবহার করেন।) য়ুরোপীয় পুরুষটি সজোরে বাঙ্গালী ভদ্রলোককে এমন একটি লাথি মারেন, যাহাতে বাঙ্গালীকে চার পাঁচ হাত পিছু হটিয়া গিয়া পতন সামলাইতে হয়; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, তাঁহার শরীরের পর্ব্বে পর্ব্বে জেণ্টেলম্যানের পরিচয় অঙ্কিত। যাঁহাকে আমি সম্মুখে দেখিতেছি, এই লোকটি-ই সেই উদ্ধতপ্রকৃতি ইংলণ্ডবাসী। আজিকার এই অপরাধী যুবা উহার কর্ণমূলে এমন তিন চারিটি মুষ্ট্যাঘাত দিয়াছিল—

১ম উঃ। That my poor British-born client fell flat sprawling on the footpath with four legs up in the air like a comic mule in the circus.

ম্যাকসিলভার সাহেব শ্রীবাহেলনে এ কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, তার পর দুই জন গোরা সার্জ্জেণ্ট আসিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে গ্রেপ্তার করে। অতি জরুরী কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইল, নইলে তিনি সেই সময়েই থানায় যাইতেন। তিনি সংবাদ লইয়াছিলেন, আজ সকালেই মকদ্দমার শুনানী হইবে, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

এই সাক্ষ্য শ্রবণের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের ভাব যেন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিন্তু মল্‌বেরির মুখখানার উপর কে যেন খানিকটা লাল কালি ঢালিয়া দিল। সে ম্যাক-সিলভার সাহেবের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া কহিল :—

—And you saw all these with your own eyes?

ম্যাক্। Yes; I've been trained never to borrow eyes; you know my place is in a coal-pit.

মল্। You think it possible for an Englishman fresh from his Christian home would—would—

ম্যাক্। That depends.

মল্। You come from the other side of the Tweed; I am a trueborn Englishman and—

ম্যাক্। And ought to have been sent away to the wilds of Africa.

মল্। I speak the King's English more correctly than any babu.

ম্যাক্। No wonder, the horse neighs, dog barks, ass brays, there is grammar for you.

মল্। An Englishman's prerogative—

ম্যাক্। Is to be polite even to his inferior, (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) your Honor, in the early days of John company every man coming out to this country had to give an under-taking that he will never ill use a native, on penalty of being taken and shipped back home.

১ম উঃ। I want to cross-examine the gentleman.

ম্যাজিঃ। Go on

১ম উঃ। You were looking from the verandah?

ম্যাক্। Yes.

১ম উঃ। When was your eye-sight last tested?

ম্যাক্। Why?

১ম উঃ। Suppose I say you are color-blind.

ম্যাক্। Say on.

১ম উঃ। That you have no reverence for the white color.

ম্যাক্। You have enough for a dozen like me.

১ম উঃ। You are a coal-mine manager?

ম্যাক্। Yes.

১ম উঃ। What is your salary?

ম্যাক্। Hope you are no agent of the Incometax people?

১ম উঃ। No, I curse them every day.

ম্যাক্। Then don't help them in their tricks.

১ম উঃ। But you receive your pay from Messrs Tata & Co ?

ম্যাজিঃ। Yes, and Heaven bless them.

১ম উঃ। I pray Your Honor will make a note of this blessing.

ম্যাক্। Why—What is in that ?

১ম উঃ। I am coming to that. Is not this Tata company a native concern ?

ম্যাক্। Yes; Indian.

১ম উঃ। You can't say it is a Bengali business, for though there are many Toa Toa companies in Bengal—

ম্যাক্। Tata is run by Bombay people.

১ম উঃ। Your Honor, the case is as clear as ising-glass. It lies merely in a bomb-shell. The witness is an interested party, being in pay of an Indian firm, he is pro-Indian. May be he expects a rise in his pay —

২য় উঃ। Mr. P. You are going too far ; for the sake of your own character—

১ম উঃ। Character ! The Court knows Prasarna Hazra is Cæsar's wife, Your Honor please order Sauin not to interpreter,— I mean interrupt me, Mr. McSilver is a Scotch, that is the Marwari of Great Britain and it is no libel to tell they love rupee ; his very name is Silver. But I have another prayer to submit, and that is to order that this witness be placed under European medical observation to find out whether he is actually mad or suffering under a temporary hallucination.

ম্যাজিঃ। Have you done ?

১ম উঃ। If your honour in all mercy send this case up to the sessions—

ম্যাজিঃ। Sit down please.

১ম উঃ। But the foundation of the British Empire rests on this case, and Mr. Mullberry has paid half of my fee in advance—

ম্যাজিঃ। Sit down.

রায়ে হাকিম প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মামলার বিষয় বেশ বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসামী ঘুসী মারিয়াছিল, এ কথাও সত্য ; সুতরাং আমাকে আইন দেখিয়া চলিতে হইবে, আমি উহার ২ টাকা মাত্র জরিমানা করিলাম। প্রথম লাথি মারার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মলবেরীর নামে শমন প্রার্থনা করিতে পারে।

শ্যামাপদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন করিয়া উত্তর দিল, এক দোষে দুইবার শাস্তি হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা নয়।

* * * *

জরিমানার টাকা জমা দিয়া শ্যামাপদ বাহিরে আসিয়া দেখে যে, বারান্দায় ফেরিস সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর ইন্‌স্‌পেক্টার নয়, তিনি বন্ধুভাবে শ্যামাপদর সহিত সেকহ্যাণ্ড করিলেন ; বৈকালে তাঁহাদের একটা বড় রকম হকি ম্যাচ, তাহা দেখিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ; কথাপ্রসঙ্গে শ্যামাপদ বুঝিতে পারিল যে, ম্যাকসিলভারের পুলিসে সাক্ষ্য দিতে আসার ব্যাপারে ফেরিসের-ও একটু হাত ছিল। এমন সময় সেই দ্বিতীয় উকীলটিকে আসিতে দেখিয়া শ্যামাপদ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহার নিকটে গিয়া অযাচিত উপকারের চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। ধন্যবাদের জবাব দিতে না দিতে হাজরা উকীল মুখখানা হাঁড়ী করিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ সৌরীন, ও ওকালতী-ফোকালতী তোমার হবে না ; গাউন বেচে ফেলে রিম দু'তিন কাগজ কিনে বাড়ীতে টুক্‌টুকে বৌ আছে, তার পায়ের কাছে ব'সে গল্প লেখ গে।" ফুটপাথে পৌঁছিয়া শ্যামাপদ চাহিয়া দেখে যে, ছোট আদালতের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাকসিলভার সাহেব তাহাকে আহ্বানের ইঙ্গিত করিতেছেন। নিকটে যাইতেই সাহেব বলিলেন, Well, Mr. Pluck, don't mind two dishes ?

শ্যামা। No Sir, but my debt of gratitude—

ম্যাক্। Will be due four days hence; place Continental Hotel,—time 2 P. M Here is my card. Tonight I leave for Asansole.

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের কথাটা সাহেব কি ভাবে লইলেন, এবং উত্তরের মর্ম্মটাই বা কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা মনে মনে করিতে করিতে শ্যামাপদ হেয়ার ষ্ট্রীটে একখানা ট্রামে উঠিয়া পড়িল। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

৮ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৬ [৩য় সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

১৪

দক্ষিণ-ফ্রান্স

Cap Martin,
Alpes Maritimes.

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম ক'রে চিন্তা করচেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'লে মন মুক্তি লাভ করে। কেন না, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে স্বার্থ-লোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধ'রে রাখতে পারে না, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকাল-বিহারী, তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেন না, মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান। এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত, যত নৈরাশ্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ ক'রে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রাঃ," মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি, তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়,—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর ক'রে বেঁধে রাখে, সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে, কিন্তু আঙিনা নেই। আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে, বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চে না, ঋণের প্রত্যাশায়

সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে ব'সে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প, সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায় —আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি, ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এই জন্যেই আমাদের মন বড় ক'রে ভাবতে পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ, তার কারণ হচ্চে, মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে, আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে সকল পরিবার থেকে এই সব ছাত্র আসে, তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয়, তা হ'লে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বী" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায়, তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারে না, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখ-দুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে, সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চ'লে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাব-মাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে যে, আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" —আমরা দিব্যধামবাসী। কি ক'রে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ করতে পারে—এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহু লোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে, তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখচি। যতই দেখচি, ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে, মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা—ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফম বিল্ আমাদের দুঃখ-সমুদ্র পার করাতে পারবে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগুসাহেব তাকে বাঁচাবে কি ক'রে?

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

রুদ্ধবাণী

জানি না তোমার কণ্ঠে কোন্ সুর বাজে
ভাষার ঝঙ্কারে ফুটে কি প্রেম-সঙ্গীত
আঁখির নীরব গীতি করে যে ইঙ্গিত
লুকায়ে রেখ না তারে আজি প্রেমলাজে
কি আশায় অরুণিত হৃদয় তোমার
কিশোর মরমে জাগে কোন্ সে স্বপন
কাহারে চাহিছ আজি করিতে আপন
শুনিয়াছ কোন বার্ত্তা প্রেম-দেবতার।
গীতি প্রীতি অর্ঘ্য লয়ে আছি প্রতীক্ষায়
এ পূজা কর না ব্যর্থ রহিও না দূরে
কি কাজ মিথ্যার স্তবে স্বপ্নময় পুরে
কহ কথা দীর্ণ বক্ষ—দীর্ঘ ছলনায়।
রূপ-প্রপঞ্চের ছায়া মুগ্ধ করে প্রাণ—
কণ্ঠস্বরে মিলে প্রিয়া প্রেমের সন্ধান।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
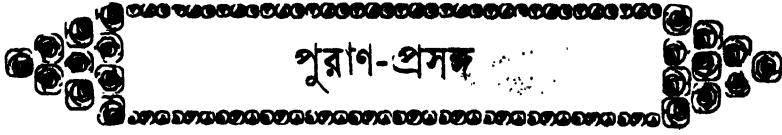
পুরাণ-প্রসঙ্গ

পুরাণ আলোচনার আবশ্যকতা

পুরাণ-সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় যে, এই পুরাণ সকল কিসের জন্য প্রণীত হইয়াছিল এবং ইহা দ্বারা আমরা কি কি জানিতে পারি, ইহা না থাকিলে বা বিকলাঙ্গ হইলে, আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতে পারে। ইহার উত্তর মহাভারতে ও বায়ু, পদ্ম, শিব-পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে যে, "যিনি সাঙ্গ চারি বেদ জানেন, অথচ পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ নহেন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে বর্দ্ধিত করিবে, অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বেদ ভয় প্রাপ্ত হয়েন যে, এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে, (অর্থাৎ আমার কদর্থ করিবে)।" *

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে শাস্ত্ররূপ শরীরের নয়নরূপে শ্রুতি-স্মৃতি ও হৃদয়রূপে পুরাণ বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ না জানিলে তাহাকে হৃদয়হীন বলা যায়। †

সুতরাং বিচক্ষণতা-লাভের জন্য এবং শাস্ত্রের হৃদয় অর্থাৎ মর্ম্ম বুঝিবার জন্য এবং বেদের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যেও পুরাণ জানা আবশ্যক। পুরাণ মানবকে উদার ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ করে, সাধু-দৃষ্টান্ত দ্বারা কুপথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং প্রবল-শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা প্রদান করে, মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, এক কথায় পুরাণ মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া দেয়। স্ত্রীজাতি, শূদ্র ও মূর্খ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের বেদ জানিবার উপায় না থাকায়, মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণ-রচনা করেন, সুতরাং ইহাদের জন্যই প্রধানতঃ পুরাণের আবশ্যকতা।

বেদের সহিত পুরাণের সম্বন্ধ

'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' ইহার অর্থে এই বলা যায় যে, রামায়ণে মারীচ-বধাদি দ্বারা "বধ্যতাং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়া-বধীতি," এই মন্ত্রাবয়ব যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" এই মন্ত্রের অর্থ যেমন পুরাণে বামনাবতার বর্ণনা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেইরূপ বেদার্থজিজ্ঞাসু ব্যক্তিই পুরাণ ও মহাভারত পাঠ করিবেন।

পুরাণের প্রয়োজন

পুরাণ আমাদের হৃদয়ে আদর্শ-চরিত্র পুরুষের ছায়া প্রতি-বিম্বিত করিয়া দেয়, সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিলে যশস্বী হইতে পারা যায়, দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্তি ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল এইরূপ আদর্শ-চরিত্র পাঠেই সম্ভব হয় এবং শোকের লাঘব, কর্ম্মে প্রোৎসাহ ঘটে। অনেক সময়ে নিজকৃত কার্য্য ঠিক হইল কি না, ইহা বুঝিতে না পারিয়া পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ মানব বড়ই উদ্বেগ ভোগ করে। সে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি সেই সন্দিগ্ধ বিষয়ে কি করিয়াছিলেন জানিতে পারে, তবে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারে। ভারতের "পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ" ইহা দ্বারাও পূর্ব্বোক্তার্থই প্রকাশ পাইয়াছে। বেদার্থ-প্রকাশই যে ভারত ও পুরাণের উদ্দেশ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদ বুঝিবার জন্যই দশ বা চতুর্দ্দশ বিদ্যার প্রয়োজন; এই বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত পুরাণ। ইতিহাস পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ গণিত হয় নাই। পুরাণ-পাঠে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থলাভ হয়, ইহা পুরাণে বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরাণের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য

বেদে পুরাণের নাম আছে, 'পুরাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে পুরা-ণাভিমানিনী দেবতার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আহুতির বিধান বেদে দেখা যায়। পুরাণের নাম বেদে আছে বলিয়াই বেদ পুরাণের পরে রচিত, এইরূপ কল্পনা আধুনিক শিক্ষিতগণ করিলেও উহা যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, ইহা পরে বিস্তৃতভাবে দেখা হইবে। পার্জিটার সাহেবের লিখিত 'প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক জন-প্রবাদপরম্পরা' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। তিনি প্রথমাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বেদে ধর্ম্মনীতি ও সৎকর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণের সম্মাননাকারী রাজ-গণের কথা থাকিলেও উহা ইতিহাস নহে। পরন্তু ঐ গাথা-সকল ব্রাহ্মণরা রচনা করিয়া কণ্ঠ-পরম্পরায় উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, উহার নাম 'পুরাণ'। ঐ বেদের

---

* যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥
বায়ু, পদ্ম, শিব-পুরাণ ও মহাভারত।

† শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্।—কাশীখণ্ড।

নির্ম্মাতৃ ব্রাহ্মণগণ বেদকে অনাদি ও নিত্য প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহাদের নাম প্রদান করেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ সকল গাথা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। বেদে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে, যে সকল রাজা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহাদের নামই বেদে আছে। ব্রাহ্মণরা যে সকল রাজার নিকট প্রভূত ধন পাইতেন, তাঁহাদের নামই বেদে নিবিষ্ট করিয়াছেন। যে সকল ঋষির পরম্পরা বেদে পাওয়া যায়, উহা পুত্রাদিক্রমে নহে—শিষ্যপরম্পরা মাত্র। বীর ক্ষত্রিয়গণ-সম্বন্ধীয় গাথা সকলই পরবর্ত্তী কালে পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুরাণের সকল কথাই অবিশ্বাস্য নহে, ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে। (১)

ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম হাণ্টার নিজকৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' পুরাণ সকলকে আধুনিক বলিয়াছেন। (২)

ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার নিজকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, "নব্য য়ুরোপীয় লেখকগণ পুরাণ সকলের প্রামাণ্য হ্রাস করিতে যত্নবান্ হইয়া আছেন, কিন্তু নিপুণ-ভাবে অনুশীলন করিলে, পুরাণের মধ্যে বহুলপরিমাণে সত্য এবং বহুমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য সকল পাওয়া যাইবে। (৩)

---

(1) The kings who are lauded in the Rigveda are hardly known to Kshatriya fame......................The explanation of this difference is that the hymns celebrate not the really great kings but those who specially favoured and enriched poetical Rishis. The praise is no measure of the kings, greatness or fame, but rather the Rishi's grateful laudation of the king's dignity and generosity. A king though un-distinguished who secured the services of a poetical Rishi and rewarded him liberally, might naturally obtain such praise. Page 7-8. Ancient Indian Historical Tradition by F. E. Pargiter.

(2) The Vishnu Purana dates from 1045. A D and probably represents, as indeed its name implies, 'ancient tradition of Vishnu which had co-existed with Saivaism and Budhism for centuries'. It derived its doctrines from Vedas, not however in direct channel, but filtered through the two great epic poems—Hunter's History of India.

(3) Modern European writers have been included to disparage unduly the authority of the Puranic lists, but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition.— 'Early History of India' V. Smith.

অপ্রামাণ্য-খণ্ডন

এই সকল বৈদেশিক মতবাদ পাঠ করিয়া ও নিজেদের অমূল্য সম্পদের খবর না রাখিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-স্রোতের প্রভাবে যুবকগণ পুরাণকে 'রূপকথা', বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করিয়া থাকেন। আবার এমন এক দলও আছেন, যাঁহারা বেদে যাহাদের নাম নাই, তাহাই অপ্রমাণ, এ কথা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বেদে উল্লেখ না থাকিলেই অপ্রমাণ হইবে, এই কথা বলার পূর্ব্বে তাঁহাদের একবার বুঝা উচিত যে, বেদে সন্নিবিষ্ট বিষয়ের উপযোগী না হইলে তাহার উল্লেখ থাকিবে কেন? অথবা কালক্রমে লুপ্তপ্রায় অসমগ্র বেদমধ্যেই বা কিরূপে সকল কথা পাওয়া যাইতে পারে? কালক্রমে সংস্কার, স্মরণশক্তি, আয়ুঃ ও ব্রহ্মচর্য্যাদির হ্রাসের সহিত বেদও বিলোপ হইয়াছে, এই কথা উদয়নাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। (১)

"আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, বল, শ্রদ্ধা, শম, দম, গ্রহণধারণাদি শক্তি প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হওয়ায় ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন ও অভ্যাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও বর্ণাশ্রমিমাত্রেরই পরিগৃহীত বলিয়া সহসা (বেদের) সর্ব্বোচ্ছেদ হইবে না, এইরূপে বেদ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে লোকের শঙ্কাকলুষিত চিত্তে অনাশ্বাস আসিবে, সেই অবিশ্বাসের শঙ্কা করিয়াই মহর্ষিগণ তাহার প্রতিবিধানকল্পে সংহিতা (স্মৃতি) প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহার ফলে এই সম্প্রদায় ও আচার সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে না। বেদের এইরূপে উচ্ছেদ জ্ঞানপূর্ব্বক নহে, সেই জন্যই উহা শ্লাঘার বিষয় নহে, পরন্তু অনবধানতা, মত্ততা, অভিমান, আলস্য ও নাস্তিক্যভাবের পরিপোষণ করায় সংঘটিত হইয়াছে। সরস্বতী নদীর স্রোতের ন্যায় উচ্ছেদের পর প্রবাহ, পুনরায় উচ্ছেদ ঘটিবে। (২)

বেদনির্ম্মাতা ব্রাহ্মণগণ ধনলোভে রাজাদের প্রশংসা

---

(১) তস্মাদায়ুরারোগ্যবলবীর্য্যশ্রদ্ধাশমদমগ্রহণ-ধারণাদিশক্তে-রহরহরপচীয়মানত্বাৎ স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানে শীর্য্যমাণে কথঞ্চিদনুবর্ত্ততে। বিশ্ব-পরিগ্রাহচ্চ ন সহসা সর্ব্বোচ্ছেদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।

(২) এনমেব চ কালভাবিনমনাশ্বাসমাশঙ্কমানৈর্ম্মহর্ষিভিঃ প্রতিবিহিতমিতি নোক্তদোষোঽপি। ন চায়মুচ্ছেদো জ্ঞানক্রমেণ যেন শ্লাঘ্য স্যাৎ, অপি তু প্রমাদ-মদ-মানালস্য-নাস্তিক্য-পরিপাকক্রমেণ, ততশ্চোচ্ছেদানন্তরং পুনঃ প্রবাহঃ তদনন্তরঞ্চ পুনরুচ্ছেদ ইতি সারস্বতমিব স্রোতঃ অন্যথা কৃতহানপ্রসঙ্গাৎ।—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক।

করিয়াছেন, কিংবা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, বৈদিক আচার, ধূর্ত্তের প্রবর্ত্তিত কিংবা বালকের ধূলা-খেলার ন্যায় নিষ্প্রয়োজনক ইত্যাদি শঙ্কা হওয়া উচিত নহে। কারণ, স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদিক ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, এই পরম্পরা নিষ্ফল নহে। অর্থাৎ বালকগণ যেমন নিষ্প্রয়োজনে ধূলার ঘর নির্ম্মাণ করে ও পরক্ষণেই আবার ভাঙ্গিয়া দেয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তদ্রূপ নহে। ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান না থাকিলে কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং নিখিল পরলোকহিতার্থীদিগের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখিয়া বুঝিতে হইবে, উহা নিষ্ফল নহে এবং উন্মত্ত ব্যতীত কেহই কেবল দুঃখভোগার্থ কার্য্য করিতে পারে না।

সম্মানাদি-কামনায় এই বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাও কল্পনা করা যায় না, তাহা হইলে অরণ্যে মুনি-ঋষিগণ সম্মান ও ধনের আশা না রাখিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেন না। ফল কথা, খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য বা পরপ্রতারণার জন্য নিঃস্বার্থভাবে অনাদিকাল হইতে একটি অন্ধ পরম্পরা চলিয়া আসিতে পারে না। যে ঋষিগণের গ্রন্থ পড়িয়া মানব-সমাজ সভ্য, শিক্ষিত ও পশুত্বমুক্ত হয়, তাঁহারা অন্ধ বা উন্মত্ত, এরূপ কল্পনা তাহারাই করিতে পারে,—যাহারা নিজেই অন্ধ, জড় বা উন্মত্ত। যাহারা পরের উপকারের জন্য অকাতরে অস্থিদান, সমগ্র জীবনের কঠোর সাধনার ফল সাদরে দান করিতে পারেন, তাঁহারা অন্যকে প্রতারিত করিবার জন্য এইরূপ সুখশূন্য দুঃখবহুল ক্রিয়া-কলাপের প্রবর্ত্তক, ইহা কল্পনা করাও বিচিত্র ব্যাপার।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ, বৈদিক আচার ও বেদকে মহাজন-(অভ্রান্ত আদর্শ-পুরুষ) পরিগৃহীত বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও বেদ অনাদি সর্ব্বজ্ঞ-প্রবর্ত্তিত অভ্রান্ত, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাঁহারা অর্ব্বাচীনকালের মানবগণের নাম বেদে দেখিলেও বেদকে তাহার পরবর্ত্তী কালের রচিত বলিতে অপারগ। কারণ, তাঁহারা অতীত ও বর্ত্তমান কালজ্ঞের ন্যায় আর্ষ-বিজ্ঞান বা যোগপ্রভাবে ত্রিকালজ্ঞতা স্বীকার করেন, তাই বেদ পৌরুষেয় হইলেও তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া—অপৌরুষেয় হইলে নিত্যত্ব নিবন্ধন বেদে ত্রিকালের কথা থাকিবে, এমন কি, পুরাণাদির ভবিষ্যাংশগুলিও ঐরূপ আর্ষ বিজ্ঞান বা যোগপ্রভাবে জানিয়া লেখা হইয়াছে। অসীম অনবধি মহাকালবক্ষে বুদ্‌বুদবৎ উদীয়মান ও বিলীয়মান নিখিল পদার্থ সমাহিতচিত্তে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত ছায়ার ন্যায় নির্ম্মল রবিকরোদ্ভাসিত নয়ন-সন্নিকৃষ্ট মনঃসংযোগে প্রতীয়মান পুত্র-কন্যার দেহ-কান্তির ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে, ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য পুরাণে বহু স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে নৈমিষীয় ঋষিগণের প্রশ্নোত্তরে সূত বলিয়াছেন—'পুরাণ-সংহিতা ত্রিকালের কথা বলে', সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। (১)

আধুনিক সভ্যসমাজ এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা অকৃতব্রহ্মচর্য্য ও যোগপ্রভাব দর্শন করেন নাই এবং বাল্যাবধি অনাচার ও অসৎসঙ্গে তাঁহাদের চিত্ত শ্রদ্ধা-বিশ্বাসহীন হইয়াছে এবং নিজেদের পূর্ব্ব-পুরুষপরম্পরা, যাহাকে মাথার মণি করিয়া হৃদয়ের অস্থির মত যতনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সেই সম্পদের অধিকারী হইতে পারেন নাই,—তাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন অনার্য্যসেবিত মতের;—যাঁহারা এ দেশ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, সংস্কৃত বর্ণবোধ পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাই, কেবল কয়েকখানি অনুবাদমাত্র পড়িয়াই যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, সেই দৃপ্ত পরোৎকর্ষাসহিষ্ণু বৈদেশিক অনার্য্য অধ্যাপকের প্রদত্ত ভ্রমপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞাননামধেয় অজ্ঞানের। সুতরাং শাস্ত্র ও সজ্জনসঙ্গ না থাকায় তাঁহাদের এই বুদ্ধিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, আমরা সে জন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত নহি।

পুরাণ কিরূপে গ্রথিত হইল ?

পুরাণসকল লোকপরম্পরাক্রমে আগত 'গাথা'-সমূহ ও ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত বা সংগৃহীত হয়। পূর্ব্বকালে লেখার প্রথা ছিল না, তখন মুখে মুখেই বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র চলিয়া আসিতেছিল। এই জন্য বেদের একটি নাম 'অনুশ্রব।' ইহার অর্থ বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ব-কৌমুদী গ্রন্থে করিয়াছেন যে, 'গুরুমুখাদনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদঃ' অর্থাৎ গুরুর মুখ হইতে শুনা যায় বলিয়া অনুশ্রব বেদ। পুরাণ সকলে ও মহাভারতে অনেক স্থানে 'ইতি নঃ শ্রুতং', 'অনুশুশ্রুম', 'ইতি শ্রুতিঃ', এইরূপ দেখা যায়, ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, পুরাণ

(১) "পুরাণ-সংহিতা তাত ব্রূতে ত্রৈকালিকীং কথাম্" ইত্যাদি। —কাশীখণ্ড।

সঙ্কলনের পূর্ব্বে এই ঘটনাপরম্পরা শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়া কোন জাতির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। পরে পুরাণ সকল ঐ গাথাসমূহের অবলম্বনে সংগৃহীত হইলে ঐরূপ সংগৃহীত পুরাণও কিছু দিন উঁহাদের দ্বারা জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ঠিক এই ভাবেই পরবর্ত্তী কালে রাজস্থানের ক্ষাত্র বীরগণের কার্য্যকলাপ চারণগণের কণ্ঠে শুনা যাইত, সেই চারণ-গাথা অবলম্বনে টড সাহেব কর্ত্তৃক রাজস্থানের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা দেশেও বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা কবিতাকারে 'ভাট'-নামধেয় ব্রাহ্মণগণ-মুখে আমরাও শুনিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে বেদও ব্রাহ্মণগণের গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রবণ ও অভ্যাসের সাহায্যে মুখেই ছিল, সেই বেদকে শাখা-ভেদে গান, মন্ত্র, ঋক্‌, ব্রাহ্মণ এই সকল বিভাগে বিভক্ত করিয়া দিবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষিসমাজে বেদব্যাস উপাধি লাভ করেন। বেদবিভাগের পর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের যে ইতিহাস শ্লোক-নিবদ্ধ হইয়া লোকপরম্পরা-ক্রমে সমাজমধ্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, উহারও তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংগ্রহ ও কোন কোন ঘটনাবিশেষ নিজে রচনা করিয়া অষ্টাদশপুরাণ নামে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্ববিশ্রুত ঘটনাবলী একই পুরাণ নামে একটি জাতিবিশেষের মুখে শুনা যাইত। এই সংগ্রহও রচনা করিবার পর মহর্ষি বেদব্যাস ঐ 'পুরাণকর্ত্তা বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। 'অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ। সূতাগ্রে কথয়ামাস কথাং পরমপাবনীম্‌॥'—কাশীখণ্ড।

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পযুক্তিভিঃ। পুরাণ-সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ড	২।৩৪।২১
বায়ু	৩০।২১
বিষ্ণু	৩।৬।১৬

পুরাণার্থবিশারদ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-যুক্তি দ্বারা পুরাণ-সংহিতা নির্ম্মাণ করেন। আখ্যান ও উপাখ্যান শব্দে ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত বুঝায়। ইহাদের পরস্পর যেটুকু ভেদ ছিল, এখন তাহা ধরিবার উপায় নাই। কল্প-যুক্তি-পদে সময় ও যুক্তি, অথবা কালানুরূপ যুক্তি। এই কথা পরে বিচারিত হইবে।

পুরাণের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ

পুরাণসংগ্রহের পর পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস সকলই একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমে ইতিহাস ও পুরাণ বিভিন্ন ছিল। লিঙ্গ-পুরাণ, শিবপুরাণকে ইতিহাস বলিয়াছেন। পুরাণ-সংগ্রহের পর ভারত-নামক ইতিহাস বেদব্যাস নির্ম্মাণ করেন।

কাশীরাজবংশের, মৈথিলরাজগণের, অযোধ্যার রাজগণের, যাদব, কৌরব প্রভৃতি রাজগণের ইতিহাস পুরাণমধ্যে পাওয়া যায়। এইরূপ অনেক ব্রাহ্মণেরও ইতিহাস আছে। ইতি হ আস এই অর্থে ইতিহাস নিষ্পন্ন হইয়াছে। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইতি ঐতিহাসিকাঃ যাস্ক নিরুক্তে এই ঐতিহাসিক শব্দে পৌরাণিক-গণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও পুরাণ ইতিহাস বিভিন্ন ছিল না। ইহা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র পাঠে জানা যায়। ১-৫।

পুরাণ-পদের নিরুক্তি

পুরাণ শব্দের নিরুক্তে পুরাণং কস্মাৎ- 'পুরা নবং ভবতি' পুরাণ কেন বলে, পূর্ব্বে নূতন হয় বলিয়া— পুরাপি নবমিব, অতিশয় পূর্ব্বের হইলেও নূতনের ন্যায় এই অর্থ পৌরাণিকগণ করেন।

পুরাণের প্রাচীনতা

অথর্ব্ববেদে ১১।৭।২৪, ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।৪।১ পুরাণের নাম ও তৎসম্বন্ধীয় কথা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মধু ও দেব-ভোগ্য বলা হইয়াছে এবং মৎস্যাবতারের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে এবং পুরাণপাঠ বেদতুল্য, সুতরাং নিত্যপাঠ্য ও ধর্ম্মযাজকগণের অত্যুপাদেয় গ্রন্থ বলা হইয়াছে, ১১।৫।৬।৮ এবং ১৩।৪।৩।১২—১৩।

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে রাজাকে পুরাণ ও ইতিবৃত্ত শুনাইয়া সুপথে আনিবার কথা আছে—এবং ইতি বেদ বলা হইয়াছে। ইতিহাস শব্দে পুরাণ, ইতিবৃত্ত,আখ্যায়িকা,উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র বুঝায়, ইহা—ঐ পুস্তকের ১।৫।১০ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ঐ সময়ে পুরাণ খুব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত। আপস্তম্ব-সূত্রের তিন স্থানে পুরাণের কথা আছে ও পুরাণের বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। বোম্বে মুদ্রিত 'আপস্তম্ব-সূত্রের' ১।৬।১৯।১৩—১।১০।২৯।৭।

১। "অযাচিতভাবে পাপীর প্রদত্ত আহার্য্যও উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিবে, পরিত্যাগে পিতৃলোকের ১৫ বৎসর

অতৃপ্তি হয়" পুরাণে এই কথা আছে বলিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন। মনুতেও ঠিক এই কথাই আছে। (১)

২। যো হিংসার্থমভিক্রান্তং হন্তি মন্যুরেব মন্যুং স্পৃশতি ন তস্মিন্ দোষ ইতি পুরাণে—ইহার সমানার্থ কথা মৎস্যপুরাণে —২২৭ অধ্যায় ১১৫—১১৯ শ্লোকে আছে।

৩। আপস্তম্ব ২।৯।২৩।৩।৫—২।৯।২৪।৩—৬ এই কথা—বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য ও বিষ্ণুপুরাণে আছে।

বুইলর আপস্তম্বকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর ১৫০—২ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন। মনুসংহিতায় ৭—৪০—৪২ শ্লোকে বিনয় ও অবিনয়ের সুফল ও কুফলবর্ণনপ্রসঙ্গে বেণ, নহুষ, পৃথু, সুদাস, নিমি প্রভৃতির কথা আছে।

সাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে—১৬।১।সাং।১০।৭ আং ইতিহাস ও পুরাণকে বেদতুল্য বলা হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিণীতে জলৌক নামে কাশ্মীরের রাজা ব্যাসশিষ্যের নিকট নন্দীপুরাণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। (২)

জলৌকের পুত্র দামোদর বুদ্ধদেবের ১৫০ বৎসর পরে কাশ্মীরে রাজা ছিলেন। (৩)

৬২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হর্ষচরিতের ৩য়াধ্যায়ে বায়ুপুরাণের উল্লেখ থাকায় ঐ পুরাণ উক্ত সময়ের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং ৪৭৫ খৃষ্টাব্দের সময় হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনাদিতে ভূমিদানের ফলশ্রুতিবোধক পদ্ম, ভবিষ্য ও ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

পুরাণের কাল-নির্ণয়

বৈদেশিক পণ্ডিতগণ ও দেশীয় পণ্ডিতগণ পুরাণ-রচয়িতার বা রচয়িতৃগণের এবং পুরাণের সময় সম্বন্ধে অতিশয় বিভিন্নমতাবলম্বী।

১ম। এক জন রচয়িতার রচনা একরূপই হইত, বিভিন্ন হইতে পারে না।

২য়। এক ব্যক্তি এক বিষয়ে বহু গ্রন্থ লেখে না।

৩য়। এক জনের লেখা হইলে পুরাণ সকলে এত বিরোধ থাকিত না।

৪র্থ। বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে, অগ্নি ও বায়ুপুরাণে আছে—ব্যাসশিষ্য ত্রয্যারুণি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ—পৌরাণিক ও সংহিতাকর্ত্তা।

ইহার খণ্ডন 'পুরাণের রচয়িতা' অংশে দেওয়া হইবে, এক জনের যে বিভিন্ন রকমের রচনা হয়, তাহা ব্যাসসূত্রে, পতঞ্জলিভাষ্যে ও মহাভারতে ব্যাসেরই দেখা যায়।

কালিদাস অনেক কাব্য অনেক নাটক লিখিয়াছেন।

পুরাণ রচনার কাল সম্বন্ধেও বৈদেশিকগণ ইহাকে অত্যাধুনিক প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে উইলসনের পুরাণ সম্বন্ধে সময়-নিরূপণ দেওয়া যাইতেছে—

ব্রহ্মপুরাণ ১৩ বা ১৪শ শতাব্দী, পদ্ম ১৩—১৬শ, বিষ্ণু ১০ম, বায়ু প্রাচীন, ভাগবত ১৩শ, নারদ ১৬।১৭শ, মার্কণ্ডেয় ৯।১০ম, অগ্নি অত্যাধুনিক, ভবিষ্য অনিশ্চিত, লিঙ্গ ৮।৯ম, বরাহ ১২শ, স্কন্দ বিভিন্ন সময়ের, বামন ৩।৪ শত বৎসরের, কূর্ম্ম অপ্রাচীন, গারুড়ের মূল পুরাণ নাই, মৎস্য পদ্মের পর ইত্যাদি। ফল কথা, হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কোন পুরাণই স্বীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকই উত্তর, অর্থাৎ ৫ শতাব্দীতে লিখিত স্কন্দপুরাণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুরাণ কোন কোন য়ুরোপীয় ১০ম শতাব্দীর বলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা শঙ্করাচার্য্যের ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে। ইহা খণ্ডনের প্রয়াস নিষ্ফল, প্রাচীন সিদ্ধান্ত দেখিলেই ইহার অসারতা বুঝা যাইবে। আর এক উপায়ে পুরাণের কালনির্ণয় করা হয়, যেমন বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে লিখিয়াছে, নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিম্বসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান, শকরাজগণ, অন্ধ্ররাজগণ ইত্যাদি। ইহার পরে আছে, নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। এই গুপ্তবংশ ৩য় শতাব্দীতে রাজত্ব আরম্ভ করেন, সুতরাং তৎপরবর্ত্তী কালে বিষ্ণুপুরাণ লেখা হইয়াছে, এইরূপ লিপি মৎস্যপুরাণেও আছে, তাহার সম্বন্ধেও এই বিচার করিতে হইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্ক-পঞ্চানন,
(কাশীরাজের সভাপণ্ডিত)।

---

(১) আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্। মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥ নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ। হব্যং কব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে।—মনু-৪-২৪৮-৪৯

(২) শ্রুতনন্দীপুরাণঃ স ব্যাসান্তেবাসিনো নৃপঃ।
রাজতরঙ্গিণী—১—১২৩।

(৩) তদা ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পরনির্ব্বৃতেঃ।
অস্মিন্ মহীলোকপতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ॥
রাজতরঙ্গিণী—১।১৭২।

কৃতজ্ঞ

১

বাল্যকাল হইতেই বাড়ীর সকলেরই মুখে শুনিয়া আসিয়াছিলাম, আমার বুদ্ধিটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ঘোরালো। প্রত্যেক ব্যাপারেরই দুইটা দিক আছে। একটা বাহ্য, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি-গোচর ; অপরটি গুহ্য—অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহ-ধারার মত, তাহার প্রকাশ দৃষ্টির অগোচর। আত্মীয়-স্বজন আমার বুদ্ধিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ধারার সহিত তুলনা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, যুক্তিতর্কের সহিত পরিচয় ঘটায়,আমি বুদ্ধির প্রাধান্যকেই বরণ ও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। যাহারা ভাবপ্রবণ, আমি তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিতাম—ভাবপ্রবণতার কোন মূল্য আছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে রাজি কখনও ছিলাম না, এখনও নহি।

কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দেবী ভারতীর বীণাধ্বনির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিমের যশোভাতি বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনকে আলোক-প্লাবনে সমুজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার বন্দনা-গানে আকৃষ্ট করিতেছিল। সাহিত্যরসিক সুধীগণের উক্তিতে দেখিতে পাইতাম, বন্ধুরাও বলিত,—কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া যে সকল পূজারী দেবীর চরণে পরম নিষ্ঠাভরে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ নিবেদন করে, ভাবপ্রবণতার বিশেষ প্রকাশ তাহাদের মধ্যে থাকা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। আমার মন তাহা মানিতে চাহিত না, তর্ক উপস্থিত হইলে আমার কণ্ঠস্বরও তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আমি বলিতাম, ও সব বাজে কথা। বুদ্ধি যাহাদের তীক্ষ্ণ ও প্রবল, তাহারা অনায়াসে কাব্য, সাহিত্য—গল্প ও উপন্যাসে জয়মাল্য লাভ করিতে পারে। শুধু বাগ্দেবীর পূজা-প্রাঙ্গণে নহে, ইন্দিরার স্বর্ণ-দেউলেও বটে। জ্ঞান ও কর্ম্ম—ধর্ম্মকে কোনও দিনই স্বীকার করি নাই, সুতরাং সে আজগুবী পদার্থের কথা বাদই দেওয়া গেল। এই উভয় ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে শ্রী ও হ্রী, নাম ও যশঃ অর্জ্জন করা যায়, অন্য কোন শক্তির দ্বারা অর্চ্চনায় তাহা সম্ভবপর নহে।

তরুণ বয়সেই আমার বুদ্ধিশক্তির অব্যর্থ, অমোঘ প্রয়োগে শুধু বন্ধুবর্গ চমৎকৃত হন নাই, অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র "কল্পনার" সুযোগ্য সম্পাদকপ্রবরের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। এই বিরাট্ দেহ, সুপণ্ডিত মানুষটি আমার অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। অসাধারণ প্রতিভা ও অনুভূতিশক্তির প্রভাবে সম্পাদক মহাশয় লেখক তৈয়ার করিয়া লইতে পারিতেন জানিতাম। দেখিয়াছি, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী বহু ব্যক্তির অচল রচনাকে তিনি সচল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিপি-চাতুর্য্যবিদ্যা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তির ফলে, খোল এবং নলিচার পরিবর্ত্তনসাধন হইলেও বহু কবি ও সাহিত্যিক বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ প্রচার দ্বারা যশোলাভ করিতেছিলেন। আমিও সেই দলের এক জন হইলাম, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ থাকিতে পারে কি ?

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চার অজুহতেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দুই বৎসর এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে চারিবার আবদ্ধ থাকিতে হইল। পরীক্ষার সাগর উত্তীর্ণ হইতে বার কয়েক নৌকাডুবি হইলেও, কবিতা ও কথাসাহিত্যের স্তূপ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। বন্ধুবর "কল্পনা"-সম্পাদক সহায় ছিলেন, মাজিয়া ঘষিয়া প্রসাধনাগার হইতে তিনি যখন সেগুলিকে 'কল্পনার' বক্ষোদেশে সাজাইয়া দিতেন, তখন পরীক্ষার অসাফল্য আমাকে দুঃখ দিতে পারিত না।

বন্ধুবর বলিতেন, আভিজাত্যসম্বন্ধে আমার একটা স[illegible] ধারণা আছে। কথাটা মিথ্যা নহে। পিতামহের আ[illegible] হইতে—মহারাজ-পরিবারের সহিত আমাদের বংশানুক্রমিক একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। দুষ্ট লোক তাহা লইয়া [illegible]

রহস্য করিত, তাহা অবশ্য উপেক্ষণীয় ; তবে পিতামহ এই আত্মীয়তা-সূত্রে কিছু তালুক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য গ্রামের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে আমরা জমীদারের সম্মান আদায় করিয়া লইতাম। এ কথাটা খুবই সত্য যে, আভিজাত্যসম্বন্ধে দৃঢ় ও সবল ধারণা প্রকাশ করিতে না পারিলে, বাহিরে ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা দুর্ঘট। আমার মুখের হাসি যে স্বচ্ছন্দ-সরলতার অভিব্যক্তি, এ অপবাদ কেহই দিতে পারে নাই। কল্পনা-সম্পাদকের সহিত এ বিষয়ে আমার প্রচণ্ড মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হয় নাই ; বরং তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে আমি অন্যতম ছিলাম।

আভিজাত্যের আর একটা বিশিষ্ট গুণ আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। কলম্বসের নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের ন্যায় সে গৌরব আমারই প্রাপ্য। আভিজাতসম্প্রদায়ের কোন তীক্ষবুদ্ধিজীবী বংশধর কখনই অপরের প্রশংসা করিবে না—যদি প্রশংসা একান্তই করিতে হয়, তবে তাহা শুধু নিজের। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সহজ সরলভাবে আত্মপ্রশংসা না করিয়া, বক্রপথে সে কার্য্য সমাধা করিবে। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে হউক, এক দল লোককে পক্ষভুক্ত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে দামামা-ধ্বনি সহকারে প্রচারকার্য্য চালাইতে হয়। যাহারা সরলভাবে 'অস্মদ্' শব্দের ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কখনই বুদ্ধিজীবী বলা চলে না।

কিন্তু ইহার ফলে কল্পনা-সম্পাদক আমার নামের পূর্ব্বে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন। যেখানে সেখানে, এমন কি, আমার সমক্ষেও তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। কথাটা আমি ভুলি নাই। আমি মনে করিতাম, এই "বিশ্বনিন্দুক" উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে লোকসানের তুলনায় লাভ বেশী। তবে এজন্য বন্ধুবর সম্পাদককে শিক্ষা দিতে আমি ভুলি নাই। সেরূপ দুর্ব্বলতার অপবাদ আমাকে কেহ দিতে পারিবে না।

২

আষাঢ়ের মেঘমেদুর আকাশ ; অপরাহ্নকালে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। শূন্য চায়ের পেয়ালা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছি, এমন সময় চন্দ্রশেখর বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সংবাদপত্র-সেবকরূপে এই ব্রাহ্মণ-সন্তান বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একখানি ছোট ইংরাজী দৈনিকের তিনি কর্ণধার। 'কল্পনা-সম্পাদক'ও তাঁহার পাণ্ডিত্য-গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। আমি চন্দ্রশেখর বাবুর সাহায্যে তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী দৈনিকেও হাত মক্স করিতাম। ভদ্রলোক অতি সরল প্রকৃতি ও বন্ধুবৎসল।

চন্দ্রশেখর বাবুর সাহায্যে আমার কর্ম্ম-পদ্ধতির কল্পনাকে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। সমাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইলাম। গত মাসে 'কল্পনা'-সম্পাদক আমার গল্পের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশ করেন নাই। যত্ন করিয়া গল্পটি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অনায়াসে তাহা না মুদ্রিত করিয়া আমারই সমসাময়িক আর এক জনের গল্প ছাপিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত গল্পটির পাণ্ডুলিপি পড়িবার সময় আমি মুগ্ধভাবে তাহার প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এ অপমান নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তিরও রক্তধারাকে চঞ্চল ও উষ্ণ করিয়া তুলে। বিশেষতঃ গত দুই বৎসর এই "কল্পনা" পত্রিকাখানির জন্য নিজের তহবিল হইতে অনেকগুলি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও ত কর্ত্তব্য।

সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, নূতন একখানি মাসিক বাহির করিয়া দেখাইয়া দিব, আমাকে উপেক্ষা করিয়া সম্পাদক মহাশয় কিরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আমার তরফ হইতে অনেকগুলি অভিযোগ জমিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবুকে মনের এ অভিযোগগুলি জানাইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহায়তা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন।

আমার প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর বাবু প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। অকারণে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, ইহা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আমার সঙ্কল্প অটল। বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা,—ও সকল দুর্ব্বলতা কাপুরুষের, ক্লীবের অস্ত্র হইতে পারে, বলবানের নহে।

চন্দ্রশেখর বাবু স্পষ্টভাষী ; তিনি বলিলেন, "হীরালাল বাবু, কাযটা কিন্তু ভাল হবে না। অকৃতজ্ঞতার পঙ্ক-তিলক আপনার ললাটে লিপ্ত হবে—সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন।"

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "সে জন্য দুর্ভাবনা করি না ; কিন্তু আপনার সাহায্য—প্রবন্ধ পাব ত ?"

চন্দ্রশেখর বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন জানিতাম। তিনি স্বীকার করিবেন, তাহাও আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু কথাটা ভুলিলাম না। এই সকল নীতিবিদের ন্যাকামি আমার অসহ্য। আচ্ছা, উহা আপাততঃ তোলা রহিল। হীরালাল মিত্র প্রতিজ্ঞা কখনও বিস্মৃত হয় না। কৃতজ্ঞতা! এ সকল অসার ভাবপ্রবণতা 'স্কুল-মাষ্টারের' দাসমনোবৃত্তির হেতু হইতে পারে ; শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ কখনই এমন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া অপরের বিদ্রূপভাজন হইবে না।

এখন চন্দ্রশেখর বাবুকে হাতে রাখা দরকার। সুতরাং মুখে বিশেষ কোন প্রকার আভাস দিলাম না। তিনি প্রবন্ধ লিখিতে সম্মত আছেন।

গৃহের দ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। অন্তঃপুরের দিকে কাহারা চলিয়া গেল। আমাদের উভয়ের আলোচনা তখন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

এক পশলা বৃষ্টির পর একটা শীতল বাতাসের দমকা আসিল। চন্দ্রশেখর বাবু বিদায় লইলেন। কল্পনা-সম্পাদককে একটু আঘাত করিবার আনন্দে আমি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল।

সিঁড়ির মাথায় সুলোচনার সহিত দেখা হইল সর্ব্ব-কনিষ্ঠা শ্যালিকা বৎসর দুই হইল স্বামিহারা। এখনও তাহার যৌবননিকুঞ্জ শ্যামায়মান শোভায় মনোরম। কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিপাতের পর বলিলাম, "তুমি এসেছ দেখে সুখী হলাম।"

গৃহিণী শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া বলিলেন, "সারা দিনই তোমার কায ত আছে দেখছি। সন্ধ্যার সময়ও এত ব্যস্ত যে, বাড়ীতে কুটুম এলে দেখবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত হয় না।"

দুইটি সন্তানের জননী হইয়াও পত্নীর প্রসাধনের পারিপাট্য পূর্ব্ববৎই আছে, বরং ইদানীং আরও কিছু মাত্রাধিক্য হইয়াছে বুঝিতেছি। তা হইতে পারে, এখনও ত্রিশের কোটা তিনি ত অতিক্রম করেন নাই।

গৃহিণীর মৃদু ভৎর্সনার অন্তরালে প্রচণ্ড অভিমানের ধূমায়মান অগ্নি দেখিয়া সতর্ক হইতে হইল। তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "তুমি যখন আছ, আমি ত সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ, 'গৃহিণী সচিবঃ সখী'—"

সুলোচনা তাহার কুন্দ দন্তে অধর চাপিয়া একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিল। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "দিদি, জামাই বাবু সাহিত্যিক মানুষ, তুমি ওঁর সঙ্গে পারবে না। চল, আমরা ও ঘরে বসি গে।"

ললিত ভঙ্গী সহকারে তরুণী বিধবা, দিদির হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত চলিয়া গেল।

মেঘময় আকাশে দীর্ঘ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই কি সুলোচনা মনোহারিণী নহে ?

৩

কয়মাস ধরিয়া "কল্পলতা" বাহির হইতেছে। সম্পাদক হইবার জন্য যে উদগ্র কামনা এত দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় মনো-মন্দিরে বাষ্পের মত সঞ্চিত হইতেছিল, অধুনা প্রকাশের পথ পাইয়া তাহা বিপুল উদ্যমে কল্পলতার আশ্রয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে সাহিত্যের যাত্রী সহ অনির্দ্দেশ পথে যাত্রা করিয়াছে।

"কল্পনার" অনেকগুলি লেখককে নানা উপায়ে আমার কাগজে টানিয়া আনিয়াছি। সম্পাদকের সহিত সম্প্রতি সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক এবং সমালোচক হীরালাল এখন স্বয়ং একখানি মাসিকের সম্পাদক। এখন অবশ্যই উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারা যায় "আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে ?"

কিন্তু নানা খেয়ালে অর্থের বিশেষ অনাটন আরম্ভ হইয়াছে। তালুকের উপার্জ্জনে সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করা চলে না, দেনা বাড়িয়া চলিয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু এক-খানি প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের সম্পাদক হইয়া মোটা টাকা পাইতেছিলেন। প্রবন্ধ লিখিয়া দিলে তথা হইতে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আজ প্রায় এক যুগ ধরিয়া সাহিত্য-সেবা করিতেছি, সকলেই ত আমাকে চিনে ; না হইবার কোন সঙ্গত কারণ ত দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। আজ মনটাও নানা কারণে বিক্ষিপ্ত আছে।

আলমারী খুলিয়া গোপন স্থান হইতে "রাজা"কে বাহির করিলাম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই স্বর্ণ-কান্তি, বোতলমধ্যগত তরল পদার্থটিকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। ওয়

সেবনের মত প্রতিদিন এক পেগ হইলেই আর প্রয়োজন হইত না। দোষ বলিয়া আমি কোন দিনই উহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলাম না। তবে দেখিতাম, মানুষ প্রকাশ্যে ব্যবহার করিলে একটা অপ্রিয় সমালোচনা হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সমালোচনাকে পরিহার করিয়াই চলিবে। বাহিরে সুনাম বজায় থাকিলে ব্যবসা চলে ভাল, এই কারণেই আমি সুনামের পক্ষপাতী ছিলাম। নচেৎ পাপপুণ্য, সুনাম-দুর্নাম ও সকল ব্যাপারের কৌলিক মূল্য আমি স্বীকার করি না।

'রাজা' মনের অপ্রসন্ন ভাবটিকে একটু সরাইয়া দিল। কিন্তু তথাপি গৃহিণীর ক্রোধকম্পিত স্ফুরিতাধর—বহ্নিজ্বালা-পূর্ণ নয়নের ভীষণ দৃষ্টি তখনও যেন আমাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। সুলোচনার তদানীন্তন অসহায় চিত্তটিও ভুলিতে পারিতেছিলাম না। মানুষ কেন যে মানুষকে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা করে? প্রকৃতির প্রভাব নরনারীকে ত অবশ্যই অভিভূত করিবে, ইহাতে বিস্ময় অথবা ক্রোধের উত্তেজনা অন্যের মনে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গত কারণ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা, সভ্যতার আবরণে ব্যাপারটা লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে পারিলে অনর্থক সমালোচনার অগ্নিবর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

রন্ধনাগারের মধ্য হইতে 'মটন-কারির' লোভনীয় ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল। এই উপাদেয় পদার্থটি আমার নিত্য প্রয়োজন। "রাজার" অনুগ্রহলাভের পর মনটা যখন কল্পলোকের কোনও উপবনে বিচরণ করিতে থাকে, তখন বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারিলে ভৌতিক দেহও চরিতার্থ হয় এবং সেই আধারের অন্তর্নিহিত সত্তাও পুলকিত হইয়া উঠে।

আলোক ও ছায়া যখন পর্য্যায়ক্রমে দেহ ও মনকে লইয়া খেলা করিতেছিল, দেওয়ালের ঘড়ীতে টং টং করিয়া ৮টা বাজিয়া গেল। অন্তঃপুরের দিক্ হইতে পদশব্দ শ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানি ট্যাক্সির ভেঁপুর শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

আমারই গৃহদ্বার হইতে মোটর-গাড়ী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, বুঝিলাম। কিন্তু উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন ছিল না। শুধু একবার বুকের মধ্যটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। দুর্ব্বলতাকে কোন দিন স্বীকার করি নাই, অতীতকে কোন দিন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া জমাখরচের কৈফিয়ৎ কাটিবার প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তির সহিত আমার পরিচয় নাই।

"এই যে চন্দ্রশেখর বাবু, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

দ্বারপথে বন্ধুবরের বিশাল বপু কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

অর্থের প্রবল প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিয়া কাহারও কাছে দীনতা স্বীকার করা মূর্খতা। শুধু অর্থ বলিয়া নহে, সংসারের যাবতীয় বিষয়ের অভাব সম্বন্ধেই আত্মগোপন করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সুতরাং বাক্যজাল বিস্তার করিয়া কাযের কথাটাই পড়িলাম। সরলহৃদয়, বন্ধুবৎসল ব্রাহ্মণ শুভ-সংবাদই জ্ঞাপন করিলেন। স্বত্বাধিকারী আমার রচিত প্রবন্ধ প্রত্যহই প্রকাশ করিতে সম্মত—যদি সম্পাদকের অনভিপ্রেত না হয়।

মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একবার স্নান করিয়া লইতে পারিলে হয়। তার পর বুদ্ধির লীলাখেলা দেখাইবার প্রচুর অবকাশ পাওয়া যাইবে। একখানা সংবাদপত্র হাতে আসিলে কেমন করিয়া অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করিতে হয়, হীরালাল নিশ্চয়ই তাহার পরিচয় দিতে পারিবে।

চন্দ্রশেখর বাবু বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছেন, সহসা অন্তঃপুর হইতে একটা চীৎকার উঠিল। তাঁহাকে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম।

দ্বিতলে আমার শয়নকক্ষের সম্মুখে কন্যা রেণু—৭ বৎসরের বালিকা কাঁদিতেছে, মা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যাপার কি?

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পত্নী সুহাসিনী শয্যার উপর শায়িতা। তাঁহার চাঁপা-ফুলের মত মুখের কান্তি যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। একটা তীব্র যন্ত্রণার আতিশয্যে সর্ব্বদেহ আকুঞ্চিত, প্রসারিত হইতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, টেবলের উপর মরফিয়ার লেবেল আঁটা শিশিটা অনেকটা খালি। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন প্রয়োজনে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী উহা আমিই কিনিয়া আনিয়াছিলাম।

সর্ব্বনাশ!—দ্রুতপদে বাহিরে ছুটিয়া গিয়া চন্দ্রশেখর বাবুকে কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "একটা উপকার করুন। স্ত্রী হঠাৎ মরফিয়া সেবন করেছেন। বিমল ডাক্তার আপনারও বন্ধু, আমারও সতীর্থ। গোপনে তাঁকে যন্ত্র-পাতি ও ঔষধ সহ ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে আসুন। আমি উপরে চল্লুম।"

চন্দ্রশেখর বাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি ব্যাপারটা তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। মাকে বলিলাম, রেণুকে লইয়া তিনি অন্য ঘরে গিয়া সান্ত্বনা দিন। কোন ভয় নাই। চাকর-চাকরাণীকে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কায নাই। মা বলিলেন, সুলোচনা খানিক আগে অকস্মাৎ পিত্রালয়ে, শ্যামবাজারে চলিয়া যাইবার পরেই সুহাসিনীর এই অবস্থা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

সমস্ত দৃশ্যটা বায়স্কোপের ছবির মত নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিল।

কিন্তু চিন্তা করিবার সময় নাই। শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একবার পত্নীর সমস্ত দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, চৈতন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আমার করস্পর্শে অত্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়া, তিনি অতি কষ্টে আমার দিকে চাহিলেন। উঃ! দৃষ্টিতে কি গভীর ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই অবস্থায় তিনি আমার হাত ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন।

পর-মুহূর্ত্তে বাহিরে করাঘাত হইল। বিমল তাহার ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। চন্দ্রশেখর বাবু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে বলিলেন, "বাহিরের ঘরে তিনি প্রতীক্ষা করিবেন। এ অবস্থায় চলিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না।"

বিমল কোন কথা না বলিয়াই রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সুহাসিনীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিত। আমাদের গৃহচিকিৎসার ভার তাহারই উপর ছিল।

দুই ঘণ্টা পরে বিমল স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ যাত্রা দিদি বাঁচিয়া গেলেন।"

সুহাসিনীকে তখন চেয়ারের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার নয়নে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছিল।

আমার দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত হইবা-মাত্র তাঁহার নয়ন যুগল আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বিবর্ণ-মুখে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভণ্ড! শয়তান!"

বিমল চমকিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "মরফিয়ার ক্রিয়া কি এখনও আছে, ডাক্তার? ওতে একটু নেশা হয় না?"

সুহাসিনীর অধর কম্পিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পশু!—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নেই! বিধবা—"

"ডাক্তার, মরফিয়ার প্রভাবে মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? দেখ ভাল ক'রে। না হয় একটু ঘুমের ঔষধ দাও।"

বিমল আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "হীরালাল, তোমারই মাথা দেখছি খারাপ হয়ে গেছে। এ রোগীকে সারারাত্রি জাগাইয়া রাখাই দরকার। দিদি, আপনি স্থির হোন্।"

সুহাসিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তবে ওকে এখান থেকে স'রে যেতে বলুন। ওর মুখ দেখতেও ঘৃণা হয়।"

বিমল বলিল, "হীরালাল, এক কায কর। মাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বাইরে যাও। বিষক্রিয়ার পর অনেক সময় রোগী নানা বেফাঁস কথা বলে। ও-সব ধরতে নেই।"

বিমলের সম্মুখে অপ্রকাশ্য ব্যাপারের আভাস ব্যক্ত হইতে আর বাকী কি থাকিল? তবু—আচ্ছা, ব্যাখ্যা অন্যরূপে করা যায় না?

মৃদু হাসিয়া সহজভাবে বলিলাম, "মাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একবার চন্দ্রশেখর বাবুর কাছে যাচ্ছি। দরকার হ'লে ডেকে পাঠিও।"

৪

স্বত্বাধিকারীকে পরামর্শ দিয়া সাপ্তাহিকখানাকে দৈনিকে রূপান্তরিত করায় পথটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বিমল ডাক্তার নেহাৎ নাবালক। এই জয়যাত্রার মুখে সে হঠাৎ নালিশ ও ডিক্রী করিয়া বসিল কেন? মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ কোন বুদ্ধিমান্ লোক করে না। আবার সে টাকাটাও তাহার নিজের নহে, বিধবা শাশুড়ীর। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া সময়মত সুদটা ত ঠিকই দিয়া আসিতেছিলাম। বড় প্রয়োজনে সে টাকাটা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাই মাত্র এক বৎসর আর সুদটা দেওয়া হয় নাই। এই সামান্য অর্থের জন্য বাঙ্গালা' এক জন বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সাংবাদিকের নামে—না, কাযটা তাহার ভাল হয় নাই।

সে আমার পত্নীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল; গোপন কথাটা অবশ্য প্রকাশও করে নাই। কিন্তু সে চিকিৎসা

অজুহতে, আমার পত্নীর রোগের দুর্ব্বলতার সুযোগে সে কথাটা না শুনিলেই ত পারিত! তাহার শাশুড়ীর শেষ সম্বল দশ হাজার টাকাটা অবশ্য বিশ্বাস করিয়া সে জমা দিবার জন্য আমার কাছেই দিয়াছিল। জমা নিজের নামে দিয়া টাকাটাকে আরও নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু "কল্পনা"-সম্পাদকের বন্ধু হঠাৎ যদি ব্যাঙ্কের জাল চেকের ব্যাপারে আমাকে না জড়াইয়া ফেলিত, তাহা হইলেও টাকাটা ত থাকিয়া যাইত। সেই সাংঘাতিক জালিয়াতের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই বিমলের শাশুড়ীর টাকাটা নষ্ট করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এই উপস্থিত অশোভন ব্যাপারটা কিরূপে এড়ান যায়? বিমল ডাক্তার ডিক্রী করিয়া বেলিফের সাহায্যে আমাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধরিয়া আনিয়াছে। অল্পান্ধকার গৃহ-কোণে বসিয়া মশকের দংশনজ্বালায় বুদ্ধিশক্তিকে ঠিক আয়ত্তে আনিতে পারিতেছি না। স্ত্রীর কাছে টাকাও আছে, গহনাও আছে। কিন্তু সেই ঘটনার পর হইতে তিনি আমার মুখদর্শনও করেন না। এ বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইয়া কোন লাভ নাই।

ও কে?, চন্দ্রশেখর বাবু এবং দৈনিকের স্বত্বাধিকারী প্রভাতকিরণ না?

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "বিমল ডাক্তারকে অনেক ব'লে ক'য়ে রাজি করা গেছে, হীরালাল বাবু। তিনি ডিক্রীজারী উপস্থিত বন্ধ করেছেন। তবে প্রভাতকিরণ বাবুকে উপস্থিত ২ হাজার টাকা গ'ণে দিতে হয়েছে। সব ব্যবস্থা করেছি। কাগজওয়ালারা সংবাদটা ছাপবে না। এখন আসুন আমাদের সঙ্গে।"

কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ঈষৎ উদ্বেল হইয়া উঠিল, সে কথা অস্বীকার করিব না। বলিলাম, "আপনাদের দু'জনার কাছে- –"

কথাটা তাঁহারা শেষ করিতে দিলেন না। ভালই।

মোটরে করিয়া তাঁহারা বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেলেন। বড় ক্লান্ত। নির্জ্জন হইলেই, আলমারী খুলিয়া "রাজার" প্রসাদ লইয়া একটু তাজা হইলাম। মাংসের পরিচিত সুবাস রন্ধনাগার হইতে বাতাসে ভর করিয়া বাহিরে ভাসিয়া আসিল।

* * * * *

তিন মাস পরে আমার বিজয়রথ গম্ভীর চক্র-নির্ঘোষে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। স্বত্বাধিকারী প্রভাতকিরণকে জয় করিয়াছি। চন্দ্রশেখর পরাজিত, বিধ্বস্ত। সম্পাদকের আসন শূন্য রহিল না। বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সযত্ন-রচিত সুন্দর তথ্যপূর্ণ নির্ভীক রচনাগুলি তিনি আমার কাছে দিয়া কার্য্যান্তরে গেলে আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতাম না। কোন কোন দিন তাঁহার রচনার কিয়দংশ এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাপিতে দিতাম যে, পরদিবস তাহা পড়িয়া স্বত্বাধিকারীও বিস্মিত হইয়া বলিতেন, বয়োবৃদ্ধির ফলে চন্দ্রশেখর বাবুর ভীমরতি হইয়াছে।

প্রচার-কার্য্যের ফল ফলিতে লাগিল। খান দুই ক্ষুদ্রকায় সাময়িক পত্রে চন্দ্রশেখর বাবুর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত। আমি যে তাহার লেখক, ইহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সেবিত অরণ্যে চন্দ্রশেখর বাবুর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। সুতরাং বেচারা নির্ভরশীল ব্রাহ্মণ তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার লাভ করিলেন। এত দিনের সিংহাসন হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হইল। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিলেন না, কোন্ অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিল।

আমি আসনে জাঁকিয়া বসিলাম। চন্দ্রশেখর বাবুর জন্য দুঃখ হয়। তিনি কেন বুঝেন নাই, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধি-কুশলতাই জীবন-সংগ্রামের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

বিদায়কালে চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "হীরালাল বাবু, পেটের কষ্ট পড়েছেন ত? আপনার মঙ্গল কামনা করি, তাই স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

ভদ্রলোক কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন?

৫

প্রভাতকিরণকে মুগ্ধ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। অল্পবয়স্ক, কল্পনাপ্রবণ এবং গভীর বিশ্বাসী যুবকের দৃষ্টিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। চন্দ্রশেখর বাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ আমার কাছে ছিল। প্রকাশিত, অপ্রকাশিত উভয় প্রকার প্রবন্ধের সমবায়ে দৈনিকের প্রবন্ধ-রচনা বিশেষ কষ্টকর নহে।

দিকে দিকে আমার জয় বিঘোষিত হইতে লাগিল। অর্থ উপার্জ্জনের ইহাই ত পরম সুযোগ। গাছের ও তলদেশের ফল পাড়িবার ও কুড়াইবার কৌশল জানা থাকিলে একটিও অপরে দখল করিতে পারে না।

দৈনিকের জয়যাত্রা অমোঘ। পদমর্য্যাদায় প্রায় সমতুল্য কয়েক জন সহকর্ম্মী জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত নহেন। পাঠক-সমাজ তাঁহাদের গুণ-মুগ্ধ ছিল। সহকর্ম্মীরা অনবদ্য ভাষা, ভাব ও যুক্তির সহায়তায় যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, পাঠক-সমাজ তাহা পড়িয়া আমাকেই অভিনন্দিত করিত। আমি জানিতাম, সে রচনা-গুলি আমার নহে; কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরু। সুতরাং বন্ধুজনকেও বুঝিতে দিতাম, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রচনাই আমার।

স্বত্বাধিকারী আদর করিতেন, যত্ন করিতেন—প্রত্যহ সন্দেশের পাত্র পরিপূর্ণভাবেই আমার কাছে আত্মনিবেদন করিত। বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, চালাকীর দ্বারা কোন ভাল কায হয় না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, তাই সংসারের অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিলেন। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিতাম, চালাকীর দ্বারা অসাধ্যও সাধন করা যায়।

কয় বৎসর ধরিয়া চালাকীর দ্বারা শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষকেই চালাইতে লাগিলাম। ফলে ইন্দিরার স্বর্ণঝাঁপি হইতে আশীর্ব্বাদ ধারায় ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল।

পরলোক কি, তাহা জানি না, জানিতে চাহি না বিশ্বাসও নাই; কিন্তু ইহলোকের ভোগকে আয়ত্ত করা যায়, অনুভব করিতে হয় না। নাম ও যশঃ চন্দ্রের ষোল কলায় বিকসিত হইয়া উঠিল।

দেশাত্মবোধের ভেরী-নিনাদ আকাশ ও বাতাসকে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি কল্পনাশ্রয়ীকে সহ্য করিতে পারিতাম না; কিন্তু আমার সহকর্ম্মীরা দেশাত্মবোধে উজ্জীবিতপ্রাণ হওয়ায় একটা সুবিধা ছিল, কাগজখানা জাতীয়তার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দশের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই সূত্রে দল ও বেদলের মূর্খগুলিকে আয়ত্ত করার চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছিল।

কাগজখানির আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রযোজন দেখিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় চন্দ্রশেখর বাবুকে পুনরায় আনিবার প্রস্তাব করিলেন। তখন এক জন প্রবল সহকর্ম্মীর সহিত কাগজের নীতি লইয়া আমার মতভেদ চলিতেছিল। ভদ্রলোককে একহাত চালাকীর খেলা দেখাইবার সুযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং মত দিলাম। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, যাঁহার অধীনে কিছু কাল সাক্‌রেদী করিয়াছি, তাঁহাকে সাক্‌রেদী করিবার বাহু অবস্থায় আনিতে পারিলে মন্দ হয় না।

এক দিন যে সিংহাসন তাঁহারই অধিকৃত ছিল, তাহারই পার্শ্বে আসিয়া স্বতন্ত্র আসনে তাঁহাকে বসিতে হইল। প্রকৃতির প্রতিশোধ ইহাকেই বলে।

কিন্তু আমার দক্ষিণ হস্তটি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনায় স্বত্বাধিকারী মুগ্ধ, সহকর্ম্মীর দল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু সম্পাদকের লেখনী অব্যর্থ, অমোঘ। কি করিয়া মানুষের অহংজ্ঞানকে আঘাত করিতে হয়, সে বিদ্যায় আমাকে কেহই শিক্ষানবীশ বলিবে না। ভদ্রলোক অবশেষে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার উপায় গ্রহণ করিলেন। ফল এইরূপই হইবে অনুমান করিয়াছিলাম। বুদ্ধির জয়যাত্রাকে কেহ এ পর্য্যন্ত বাধা দিতে পারে নাই।

কিন্তু স্বত্বাধিকারী পদে পদে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। তাহার উদ্ধত স্পর্দ্ধা সহ্য করিয়া যাইতে হইবে? অস্ত্রপ্রয়োগবিদ্যা মেঘনাদের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে শরাহত করিবার উপায়ও বর্ণিত আছে। শিখণ্ডীর অভাব ছিল না। অন্তরালে থাকিয়া বাণবর্ষণ-ক্রিয়া আরব্ধ হইল। কৌশল ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য জানা থাকিলে কোন শরাঘাতই ব্যর্থ হয় না। উভয়ের প্রতি, তাঁহাদের অতি প্রিয়জন উপলক্ষে যে সকল ভাষা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, তাহা নাম স্বাক্ষর করিয়া হীরালাল মিত্র সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে পারে না।

নানা কৌশলে কয়েক বার স্বত্বাধিকারীকে বাধ্য করিয়া উপার্জ্জনের মাত্রা বাড়াইয়া লইয়াছিলাম। কেন করিব না? সঙ্গত দাবী কি নাই? এবারও মনে করিয়াছিলাম, ভিন্ন কৌশলে আয় বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। আমার নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে সংবাদপত্রের এমন প্রচার, তাহার নামের মর্য্যাদার উপযুক্ত মূল্য না দিলে চলিবে কেন? প্রভাতকিরণ বিমল ডাক্তারকে যে দুই হাজার টাকা

দিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনেকগুলি গ্রন্থ দিতে হইয়াছে। সে টাকার দশ গুণ উপার্জ্জন অবশ্য করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অন্তর পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। কৃতজ্ঞতার বিনিময় মূল্য-স্বরূপ উহা খরচ লিখিয়া লইলেই শোভন হইত।

৬

অর্থ উপার্জ্জনের নেশা বড় চমৎকার। এই নেশা যখন পরিপক্ক হয়, তখন সুযোগগুলিও এমন অনায়াসগতিতে উপস্থিত হয়! কায়দা করিয়া কয়েক হাজার ৫ দিনের মধ্যেই তহবিলজাত করিলাম। অর্থ আসিতেছিল, কিন্তু গৃহে তৃপ্তির অবকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুলোচনাকে লইয়া গৃহিণী যে কাণ্ডটি বাধাইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে তিনি পূজাগৃহেই সময় যাপন করিতেন, মুখদর্শনের অবকাশ কোন পক্ষেরই ছিল না। কিন্তু মানুষের মন দেহের ক্ষুধার আধার অন্বেষণে বিরত ছিল না।

বাহিরে সুনাম বজায় রাখিয়া অনেক কিছু করা শুধু বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতার উপর নির্ভর করে। দেশের তপোবন বিরূপ, বিদেশের প্রমোদোদ্যান তোরণ মুক্ত করিয়া সাদরে আহ্বান করিল। অর্থের মোহিনী শক্তিকে তারিফ করিতে হয়।

সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় সমগ্র শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইল। দেশবিশ্রুত সম্পাদককে ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ চাহে না, বিজ্ঞাপনদাতাও নহে। বিশ্বাসের সীমা নির্দ্দেশ করাও কঠিন। বিবেক বলিয়া একটা শব্দ কেন যে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ব্যবহার করে! যাহার অস্তিত্ব শুধু মানুষের কল্পনায়, তাহাকে লইয়া আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করার মত মূর্খতা আছে কি?

মনটা সে দিন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। আর একটা মোটা টাকা এক দল যাচিয়া দিয়া গিয়াছে। কায়দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম। দুই নৌকায় পা রাখিয়া চলিতেছি, সেটা বুঝিতে দিবার যেন কোন ছিদ্রপথ না থাকে।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, স্বত্বাধিকারীর খাস-কামরায় ডাক পড়িয়াছে। জরুরী প্রয়োজন। এমন ত বড় হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার ঘরে আসিয়া দেখা করেন,—আজ সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল কেন?

তাঁহার তরুণ মুখে একটু যেন অন্ধকারের ছায়া।

"বসুন হীরালাল বাবু।"

ঘরের মধ্যে তখন কেহ ছিল না। সম্মুখে প্রাচীর-বিলম্বিত পরমহংসদেবের আলেখ্য দুলিতেছিল। স্বত্বাধিকারী চিত্রের প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

বিরক্তিবোধ হইল। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী বলিয়া মানুষ যাঁহাকে পূজা করে, শ্রদ্ধা করে, ভগবানের আসনে বসায়, সে সকল ব্যক্তি যে কৃপার পাত্র, এ বিশ্বাস আমার অন্তরের। তবে বাহিরের মুখোসে তাহা আবৃত করিয়া রাখিতাম--বুদ্ধিমানের নিয়মই এইরূপ।

"দেখুন হীরালাল বাবু, আর চলে না!"

"কি চলে না?"

"বুঝতে পাচ্ছেন না? আপনি যে আমার কণ্ঠরোধ ক'রে মেরে ফেলতে যাচ্ছেন!"

হাসিয়া বলিলাম, "শরীরটা ভাল আছে ত?"

প্রভাতকিরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম নিন; আমিও একটু নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হই।"

ব্যাপারটা হঠাৎ এমন ভাবে মোড় ফিরিল, ইহার অর্থ কি?

"দেখুন, কাগজখানা দেশের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেই আসছে, কিন্তু কিছু দিন হ'তে দেশের মর্ম্মদেশেই অস্ত্রোপচার চলতে আরম্ভ হয়েছে।"

"মিথ্যা কথা, প্রভাত বাবু--"

বাধা দিয়া স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "শুধু শুধু অভিনয় ক'রে লাভ কি? একবার ৪ হাজার, আর একবার ২ হাজার টাকার চেকমুড়ি আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ২।৫শ টাকার ছোট ছোট চেকগুলির কথা বাদই দিলুম।"

না, লোকটা এবার নির্ব্বাক্ করিয়া দিল দেখিতেছি।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "ও সব জাল। কিন্তু লেখার কথা—তা আপনি আমাকে বলেই দিন না, কি ভাবে লিখলে—"

"থামুন, হীরালাল বাবু, যাঁর প্রাণে দেশপ্রেম নেই, ইন্‌জেক্‌সন ক'রে তাঁর প্রাণে কি ওটা দেওয়া চলে? আপনিই বলুন না!"

এত টাকা উপার্জ্জনের পথ, এমন মোটা মাহিনা, এমন যশঃ, পদগৌরব!—উঃ, পাগল হইয়া যাইব না কি?

"আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। তখন যদি—"

অসহিষ্ণুভাবে প্রভাতকিরণ বলিলেন, "না, আপনাকে আর সহ্য করা সম্ভবপর নয়। শিখণ্ডীর অন্তরাল হ'তে আপনি ভদ্রলোকদের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে যে ইতরের মত মিথ্যা কথা রটাচ্ছেন,—আমাকেও বাদ দেন নি, তা থেকে—সুতরাং আপনি কাল থেকে আর আস্‌বেন না।"

ঘণ্টার শব্দে ভৃত্য আসিল। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

"আপনি ভুল শুনেছেন।"

"কিছুই ভুল নয়। ভুল শুধু, আপনাকে এত দিন বিশ্বাস করেছি ব'লে।"

বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! কেন করিব না? স্বার্থের জন্য আমি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য কোন দিন মানি নাই।

রুদ্ধদ্বার খুলিয়া চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিলেন। প্রভাতকিরণ বলিলেন, "আপনি কাল থেকে আবার সম্পাদক হলেন। হীরালাল বাবুকে আমি কর্ম্মচ্যুত করেছি।"

আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন মিথ্যাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করি নাই।

ক্রোধে সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু এর প্রতিফল পেতে হবে।"

প্রভাতকিরণ হাসিয়া বলিলেন, "কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের চেষ্টার ত ত্রুটি করেন নি, মায় বিজ্ঞাপনের টাকাও সই দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। গালাগালি?—তা ত দিচ্ছেন, না হয় আরও দিবেন।"

"চন্দ্রশেখর বাবু, সাবধান—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন, আমিও আপনাকে ক্ষমা কর্‌ব না।"

হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ। আপনিই এক দিন আমাকে বিতাড়িত করেছিলেন। ভগবান্ আছেন, যদিও আপনার দুর্ভাগ্য, আপনি তা বিশ্বাস করেন না।"

ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। বনের শার্দ্দূল, ভল্লুক আমার সহায় হও। আমি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিব! আত্মরক্ষার জন্য, শত্রুদমনের জন্য বুদ্ধিমান্ অমেধ্য বস্তু মাথায় তুলিয়া লয়। আমি স্কুল-মাষ্টার নহি, তাহা ইহাদিগকে অবশ্যই বুঝাইয়া দিব।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দীপা

দীপা, তুমি দীপ নিয়ে চল মোর আগে
জীবনের গতি-গীতিরাগে;
আমি চলি অনুগামী ছন্দটির মত,
প্রদীপের পাদছায়া—স্পন্দটি নিয়ত
তোমার পশ্চাতে
এক সাথে।

দুইটি রাত্রির যাত্রী—বিসর্পিত সুদূর সরণী—
ঊর্দ্ধে অভিনব
নক্ষত্র-রহস্যময় মৌন মহানভ,
নিম্নে মৃত্যু-মায়াঘন আঁধার ধরণী।—

দুইটি রাত্রির যাত্রী—দীপ নিয়ে চল তুমি দীপা!
হোক্ রাত্রি,—তুমি রবে সঙ্গে মোর মূর্ত্তিমতী দিবা
তোমার দীপের আলো দিবে না তিমির শুধু দূরি'
সাধারণ দীপালোক সম,—
আঁধারেরে তুলিবে সে অপরূপ বর্ণরূপে পূরি'
কেন্দ্র-উষা হেন মনোরম।

দীপা, তুমি দীপ নিয়ে চল মোর আগে
দীপ্ত অনুরাগে,—
বেদনা রাঙিয়া উঠি' আনন্দের ফাগে
চেতনায় চিত্ত যেন জাগে;
তোমার গতির স্পর্শে মৃত্যুর নিকষ
উজলি' জাগুক উৎস—অ-মৃতের রস!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নবম পরিচ্ছেদ

মাতৃত্ব

সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন মধুর সম্পর্ক আর নাই। এমন সর্ব্বসন্তাপহারী, এমন শীতল, এমন প্রাণারাম সম্বন্ধ, এমন স্নেহ-ক্ষমাপরিপূর্ণ, এমন নিঃস্বার্থ, এমন প্রীতিকর বস্তু আর নাই। ইহার সবটাই দেওয়া—পাওয়ার কথা ইহার মধ্যে নাই। তাই আজ শ্রীভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া এত তৃপ্তি পাই। কারণ, মা যে আমার সব শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা মুছাইয়া দেন। সব অপরাধ বিনা প্রশ্নে ক্ষমা করেন। অযাচিত স্নেহ দিয়া, আমার ক্ষোভ, আমার ক্ষত, আমার দোষ, আমার ত্রুটি, মুছাইয়া দিয়া আদরে ভরিয়া দেন। মানুষ আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সদ্‌গুণের আদর করিতেছে, চিরকাল করিয়াছে, এই মাতৃত্বেই তাহার মর্ত্ত বিকাশ পাওয়া যায়। এ জন্যই প্রকৃত সন্ন্যাসীরা মাতৃত্ব-গৌরবে ভূষিত না হওয়া পর্য্যন্ত নারীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। কারণ, মাতৃত্বে হৃদয় বিকশিত হয়; ময়লা-মাটী কাটিয়া যায়; ধৈর্য্য, ক্ষমা, বাৎসল্য, করুণা হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে। এই মাতৃত্বই সৃষ্টি করিয়া বিধাতা জগৎ পালন করিতেছেন। মাতৃত্ব-গুণেই আজ নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চে। ছেলের অত্যাচার, আবদার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, তাহাকে সম্পদে বিপদে রক্ষা করিয়া, শিক্ষা দিয়া, মাতৃত্ব আজ জননীরূপে, তীর্থরূপে, আশ্রয়রূপে, ত্রিতাপ-তাপিত জীবের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছেন। মা নহিলে এত দরদ কাহার—এত দয়া কাহার? বেশী বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাই মাতৃত্ব সম্বন্ধে সোজা কথা, সকলেই কম-বেশী ইহা বুঝেন। মাতৃভাবে সাধনার কথা বলা গেল না। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মাতা, পিতা অপেক্ষা পূজ্যা;—গর্ভধারণ-পোষণাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী। পিতা—স্বর্গ; জননী—স্বর্গাদপি গরীয়সী। এ হেন মাতৃত্বকেও অধুনা তথাকথিত কয়েক জন 'সবুজ' সাহিত্যিক কিরূপে তাঁহাদের উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে পৃথিবী রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আজ এই পরম পবিত্র মাতৃত্বকে কামিনীত্বের রূপান্তরভাবেই দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। বলা হয় যে, স্ত্রীত্ব হইতেই মাতৃত্ব তাহার গৌরব লাভ করিয়াছে। স্ত্রীত্ব বলাও বোধ হয় ঠিক হয় না; কারণ, বিবাহ-মন্ত্রের দাবী ত অনেক সময়েই অগ্রাহ্য। প্রণয়াসক্ত নর-নারীর দৈহিক মিলনেই মাতৃত্বের উৎপত্তি, তাই তাহার এত গৌরব। বিশেষ গৌরব এই জন্য যে, এই "সূর্য্যের আলোর মত সত্য"—যে সন্তান ধারণার প্রেরণা, তাহারই পূর্ণ বিকাশ, তাহারই মূর্ত্ত বিকাশ এই মাতৃত্বে। এই প্রেরণা বা প্রণয়ই মাতৃত্বের মূল বলিয়াই তাহার এত গরিমা, এত মহিমা। কিন্তু কামিনীত্ব যে সব গুণের বিকাশে আকার ধারণ করে, মাতৃত্ব তাহাদের বহু উপরেও অনেকগুলি গুণ, যাহা স্বাভাবিকই হউক বা শিক্ষার উৎকর্ষের ফলেই হউক, আহরণ করিয়া কার্য্যকরী হয়, বিকশিত হয়, সার্থক হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে কামিনীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বই শতাধিক মহিম-মণ্ডিত হওয়াই উচিত। ধ্রুব-সিদ্ধান্তবাদী অগস্ত্ কোঁৎ তৎপ্রবর্ত্তিত বিশ্বমানবাভিধেয় অভিনব ধর্ম্মের উপাসনাকাণ্ডে বলিয়াছেন—স্তনন্ধয় শিশুক্রোড়ে ঐ পঞ্চ-বিংশবর্ষীয়া জননীর মূর্ত্তিই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। উপাস্যের স্থান অধিকার করিতে আর কোন কিছু পারে—ইহা আমি কল্পনা করিতেও পারি না। কোঁতের এই Grand Etre আমাদেরই গণেশ-জননী!

ফলতঃ মাতৃত্ব হইতে কামিনীত্ব পৃথক্ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই সন্তানের অশেষ কল্যাণকর; হিন্দুর ছেলে চিরকাল সেই মাতৃত্বকেই ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে, অতি উচ্চ আসনে তাহার স্থান দিয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রীভগবতী—তাঁহাকেও এই মাতৃরূপে আবাহন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। সব জ্বালা জুড়াইতেছে। তাঁহার কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেছে, এবং নিজের জীবন যথার্থ সার্থকতায় পূর্ণ করিতেছে। তাই আগমনীর গানের পর আর কোন গানই জমে না, তায় মন মজে না। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নর মাতৃস্নেহ চাহে। মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা এই দান আমাদের আমরণ দিতেছেন। নর চিরজীবনই শিশুর মত, নারী চিরজীবনই মাতার ন্যায়, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই ভাবটি তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টিতে সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন। পরিচিত, এমন কি, অপরিচিত নরও নারীর কাছে এই মাতৃত্ব পায়, কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিকের নির্দ্দয় বিশ্লেষণের আঘাতে যেটুকু মাধুর্য্য জীবনে আমরা এত দিন আহরণ করিতেছিলাম, তাহা নিষ্পেষিত, দলিত এবং অবশেষে তাড়িত হইতে বসিয়াছে। মাতৃত্ব এবং কামিনীত্ব এক করিবার বীভৎস চীৎকারে বৈজ্ঞানিকের দল আজ এই জগৎটাকে একটা বৃহৎ পশুশালা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই পশুত্বের তাণ্ডব-নৃত্য ইহারা সর্ব্বত্র দেখিতে চাহে, কাযেই অন্য বিষয়ে ইহারা বধির অন্ধ, ইহাই তাহাদের কায। ফ্রয়েড আজ এক জন জগদ্‌বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিতান্ত শিশুকালেও যে শিশু তাহার হাত-পায়ের আঙ্গুল চুষে এবং তাহাতে তৃপ্তি পায়, এই তৃপ্তির মূলে যৌন সম্বন্ধজ্ঞাপক ভাব নিহিত আছে। সন্তান যে মাতাকে স্নেহ করে, তাহার মূলেও এই কারণ, সাধারণতঃ পুত্র মাতার প্রতি

এবং কন্যা পিতার প্রতি অধিক আসক্ত হয়। মাতা সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া তৃপ্তি পান, এই ভাব তাহার মধ্যে আছে বলিয়া ; কারণ, স্তন নারীর যৌন সম্বন্ধসূচক একটি প্রধান অঙ্গ। সমস্ত বৃত্তিকে এইভাবে ইতর করিয়া, অথবা ইতর সুন্দর পৃথক্-ভেদ উঠাইয়া দিয়া ইঁহারা জ্ঞানবিকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরই শিষ্যগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, যেমন Tuny, Moll প্রভৃতি। কি আর বলা যাইবে ? এইরূপে সব একাকার করিবার চেষ্টাতে বিজ্ঞানের গৌরব বাড়িতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে কতটা উৎপাত সৃষ্টি করে, সেটাও কি ভাবিবার বিষয় নহে ? বৈজ্ঞানিক কি অভ্রান্ত ?—মানব-জীবনে পণ্ডিতের অতি বুদ্ধিকে রুসো উপহাস করিয়াছেন।*

বৈজ্ঞানিক নিজেই মানেন যে, তিনি অভ্রান্ত নহেন, পাহাড়-পর্ব্বত-প্রমাণ ভুল তিনি অনেক করিয়াছেন, তবে এত জোর ডাক-হাঁক কেন ? মুখরোচক কথা পাইলেই শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব জগৎ তাহাতে মাতিয়া উঠে। ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার শেষ বিচার পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ নাই। "নীতিবাদ ক্ষণস্থায়ী পদার্থ-মধ্যে" এ কথা তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানের শিক্ষাও কি অনেক ক্ষেত্রে তাহাই নহে ? যদি ইহাই ঠিক হয়, তবে জগৎ আজ কথায় কথায় ফ্রয়েড বলিতে অজ্ঞান কেন ? আমাদের পাশ্চাত্য গুরুগণ এইভাবে পিতামাতার একদেশব্যাপী দোষ দেখাইয়া, অপর দিক্‌টাকে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত রাখিয়া, অথবা তাহার উল্লেখমাত্রও না করিয়া, বেচারী পিতামাতার প্রতি কত বড় অবিচার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের প্রিয় শিষ্যগণও কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন না ? আজকাল অনেক পিতামাতা সন্তানের জন্যই শুধু মিলিত হন না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনম্" এ দিন আর নাই। তাঁহারা ইতরবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সন্তানের জন্ম দেন। নিজের তৃপ্তি এবং সমাজের শাসনভয়েই সন্তান পালন করেন। সন্তানকে স্নেহ করেন সুখ পান বলিয়া, সন্তানের সুখের জন্য নহে। আমাদের গুরুদের কৃপায়, আর আমরা অতি অসাধারণ শিষ্য বলিয়া, এই সব মত আজ দেশময় রাষ্ট্র। বাপ-মা যে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগে সেবা, পালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য দিতেছেন ; অশেষ ভয়-ভাবনা, অশেষ আশা-উৎসাহ, অশেষ উৎপীড়ন, দৈহিক মানসিক, উৎকট ক্লেশ সন্তানের জন্য সহ্য করেন, তাহার সার্থকতা কি সন্তান মানুষ হওয়া নহে ? কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি কি মানুষ হওয়ার চিহ্ন ? আজ হাটে বাজারে আমরা বলিয়া বেড়াই যে, "সত্য" কথাটা বলা চাই, তা সে যতই অপ্রিয় হউক। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি সত্যের বাহিরে ? ছেলে-মেয়ে বাপ-মার শুধু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ (সন্তানের পক্ষে) পশুত্বই দেখিবে, আর জীবনব্যাপী স্বার্থত্যাগ, স্নেহ, মমতা, দশ মাস জঠরে ধারণ, প্রসবকষ্ট, বুকের রক্ত দিয়া তাহার প্রাণরক্ষা এ-সব উড়াইয়া দিবে ? কেন, ইহারা কি মিথ্যা ? যদি তাহাই মনে হয়, তবে যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের "সত্য"ই "মিথ্যা"। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রকার অতি সামান্য দেশব্যাপী অথবা আংশিক সত্যের উপর অযথা জোর দেওয়াতে সমস্ত জিনিষটার একদেশমাত্র দেখান হইয়াছে। ইহাকেই কেহ কেহ গায়ের জোর বা মিথ্যা বা অর্দ্ধ-সত্যকে পূর্ণ-সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা বলেন। সকল জিনিষেরই দুইটা দিক্ আছে। আমরা যাহা যাহা বলিতেছি, তাহারও। এ জন্যই চার্ব্বাক-মতের প্রচলন। চারুবাক্, অর্থাৎ যাহা মুখরোচক কথা, তাহা স্বভাবতঃই সকলের প্রিয়। আবার আজকাল দেখিতে পাই যে, স্পষ্ট ভাষায় দোষ দেওয়া সভ্যতাবিরুদ্ধ। কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় খর্ব্ব করিবার চেষ্টা স্পষ্ট ভাষার অপেক্ষা অনেক প্রবল। কারণ, অজ্ঞাত বা অস্পষ্টের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী। এই আধ-পরিস্ফুট প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত একটা মাদকতা সৃষ্টি করিয়া বড় বেশী কায করে, যাহা স্পষ্ট ভাব ভাষা পারে না। এ জন্যই অসুন্দর জিনিসকে ঠাট, ঠমক, ভাব, রস, গন্ধ, ভাষার দ্বারা সাজাইয়া দেখাইলে যথার্থ সুন্দর অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়, মনোরঞ্জন করে, একটা সহানুভূতি সৃষ্টি করে, যাহা সুন্দর সহজে পারে না। ফলে সুন্দরকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার বিকাশ এবং পরিণতির পথ রুদ্ধ করা হয়। আমাদের পল্লবগ্রাহিতা দোষে ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। First Things First বা sense of proportion অর্থাৎ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার প্রাধান্য হওয়াই কল্যাণকর। কোন্‌টি প্রধান, তাহা বিচার করা কঠিন। ভাবের এবং বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে তাহা ধার্য্য হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, মনুষ্যমাত্রই নিজের হিতাহিত-জ্ঞান হইতে কম-বেশী ইহা বুঝিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কায করি। ইহার ফলে আজ সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, প্রকৃত গুণের পরিবর্ত্তে অর্থের সম্মান বেশী। মেকি ঝুটারই আদর বেশী। সাধু আজ মাথা লুকাইয়াছে বা কোণঠেসা হইয়া পড়িয়া আছে। দাম্ভিকতা, গলাবাজি আজ জয়যুক্ত। কল্যাণ কি ? তাহার মর্য্যাদা কোথায় ? যাহা আপাততঃ রুচিকর, তাহাই কল্যাণ বলিয়া বিবেচিত ! তাহারই আজ গৌরব সর্ব্বত্র। ধৈর্য্য, সংযম নির্ব্বাসিত করিয়া জীবনযাপন করার ফলেই আজ প্রেম কাম একই বলিয়া গণ্য। সংযম অপকারী, গায়ের জোরই সর্ব্বত্র প্রধান দাবী, সতীত্ব মিথ্যা কপটতা, মাতৃত্ব কামিনীত্বের গৌরবেই গরবিণী, অর্থই মূলাধার, আধিপত্য প্রভুত্বই জগতের কাম্য ; ধর্ম্ম মানি না, ভগবান্ যদিই বা দয়া করিয়া মানি, তবে তিনি আমার বাগানের মালী, সমাজ আমার ইচ্ছাধীন, সমস্ত একাকার করিতে চাই। ছোট বড় মানি না কতক্ষণ, যতক্ষণ আমার স্বার্থ বা দাবীতে আঘাত না পড়ে। স্বার্থই সব। যুক্তি স্বপক্ষ-প্রতিপাদন জন্য।

একখানি পুস্তকে দেখি যে, নায়ক একটি রমণীর সহিত সামান্য দিনের আলাপের পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে। হঠাৎ রমণী নায়কের কাছে স্পষ্ট ভাষায় মাতৃত্ব ভিক্ষা করিল এবং তাহা পূর্ণও হইল। এই প্রকারের ঘটনা সাহিত্যমধ্যে এত বেশী যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু নারীর এই মাতৃত্বের বুভুক্ষাভাব আসে কোথা হইতে, তাহারই বিষয়ে দুই একটি কথা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। মাতৃত্ব-বুভুক্ষার অর্থ যে কামনা চরিতার্থ করাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি

* মানুষের মতি-গতি বাঁকা পথে বটে, কিন্তু যদি সে দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত হইয়া জন্মিত, তবে তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইত।

যে, কামিনীত্ব হইতে মাতৃত্ব আসিলেও এই দুইটার স্বর্গ-মর্ত্ত প্রভেদ। এইখানেই নবীন-প্রাচীনে বিরোধ। নারীর সন্তান-বুভুক্ষা তাহার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা তাহার অস্থিমজ্জাগত। ইহার জননী হইবার প্রেরণা সারা জীবন-ব্যাপী। মোট কথায় বাৎসল্য, স্নেহ, প্রণয়, ভালবাসা জীবনের যতখানি স্থান নারীর অধিকার করিয়া আছে, নরের ততটা নহে। "আমায় কেহ স্নেহ করে না, ভালবাসে না" এটা নারীর পক্ষে নরের অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টকর। মান, প্রতিপত্তি, বিদ্যা, সম্পদ, অর্থ, যশ নারীর যতই আয়ত্ত হউক না কেন, তাহার কিছুতেই জীবনের বুভুক্ষা যাইবে না—যতক্ষণ না সে প্রণয়, সেবা, মাতৃত্ব ইত্যাদি দিবার আধার পাইবে। ইহাতে আমাদের সমাজে যে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে (Compulsory) কেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই নারীর মাতৃত্ব-বুভুক্ষার দৃষ্টান্ত সভ্য জগতে অনেক পাওয়া যায়, আবার উপন্যাসেও তাহার যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। আবার স্নেহ, সেবা, যত্ন, ভালবাসা পাওয়া অপেক্ষা দেওয়াই তাহার স্বাভাবিক। ইহাই নারীর প্রাণের কথা। আমাকে কেহ ভালবাসুক, স্নেহ করুক, আমিও ততোহধিক তাহাকে ভালবাসিব, তাহাকে যত্ন করিব, ইহাই তাহার বুভুক্ষা। যে দেশে বিবাহ করার প্রথা আমাদের দেশের মত নহে, অর্থাৎ যে দেশে নারী ইচ্ছা করিলে বিবাহ না করিতেও পারে, সেখানেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করে। অন্তরায় যতই হউক, এই সহজ বৃদ্ধির প্রেরণাকে সে কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াও সে এ ক্ষোভ মিটাইতে চাহে।

দশম পরিচ্ছেদ

ভূমা সুখ

"বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং" এই বিশ্ব দর্পণে দৃশ্য নগরের তুল্য। শঙ্করাচার্য্য ইহা বলেন। Our life is a sleep and a forgetting (—Wordsworth) জীবন, নিদ্রা ও বিস্মৃতি। সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে মন। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় মনের অনুভব-সীমায় আসে মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি মনের দ্বার-স্বরূপ। ভাব এবং অনুভূতিসমষ্টি লইয়াই সাধন (J. S. Mill, Analysis of the Human mind p, 52)। এই অনুভূতি এবং ভাব ইন্দ্রিয় দ্বারা আয়ত্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের অতীত। "অজ্ঞান" করা হইলেও মানুষের চেতনা সব যায় না। সুষুপ্ত অবস্থার মত অনুভূতি থাকে। শরীরের চালক বা রাজা মন। তবে মনটা বাদ দিয়া শুধু শরীরকেই এত প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস কেন? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, মানুষ—যাহা তাহার নিকট অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অননুভূত, অলব্ধ অথবা কতকটাও অজ্ঞাত অদৃষ্ট ইত্যাদি, তাহারই জন্য বিশেষ ব্যস্ত। ইহার কারণ, যাহাই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, তাহাই অসীম। এই অসীমকে সসীম মানুষ প্রতিনিয়ত তাহার সত্তা দিয়া অন্বেষণ করিতেছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে, জাগ্রতে শয়নে, ঘরে বাহিরে সসীমের অসীম হইবার উদ্যম। ইহাই "সোঽহং" বা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের "স" এবং "অহং" অথবা "তৎ" এবং "ত্বম্" এই দুইএর পরস্পরের মিলনেচ্ছা। স্বরূপে জীব এবং ব্রহ্ম একই। মায়া-আবরণের মধ্যে পড়িয়াই এই ব্যবধানরূপ জগৎ (অর্থাৎ নাম ও রূপ) মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। জীবাত্মার ("অহং" বা "ত্বম্") মায়িক আবরণ ভেদ করিয়া পরমাত্মার সহিত ("স" বা "তৎ") একত্বস্থাপনের ইহা অবিরাম প্রয়াস। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি এই "অক্লান্ত উদ্যম" জলে, স্থলে, আকাশে, ভূচরে, খেচরে, জলচরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিতে পান। ইহারই তাড়নায় সক্রেতিস্ এক দিন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "Know thyself" আত্মতত্ত্ব অবগত হও, আর সবই আপনা হইতেই জানা হইবে। ইহারই ফলে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিকের উদ্ভব। এই অসীমের সসীমকে পূর্ণ করিবার অথবা সসীমের পূর্ণ হইয়া অসীমত্ব লাভ করিবার অহরহঃ প্রেরণা হইতেই ধর্ম্ম, সাধনা, বৈরাগ্য, প্রেম, সংযম সব সৃষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সমন্বয় ইহারই জন্য। সসীমের উৎকৃষ্টতম সার্থকতা (Summun Bonum) এই অসীমত্বে। ইহারই একটু ছায়ামাত্র লইয়া এবং তাহাকেই "সৌখীন সাজে সাজাইয়া" আজ রূপজ মোহ কামজ ভালবাসার এত ছড়াছড়ি, সকল বিষয়েই তাহার প্রাধান্য দেখাইবার প্রয়াস। "সূর্য্যের আলোর মত সত্য" যে রূপ এবং প্রণয়, এই সসীমের অসীম হইবার আকর্ষণ তাহা অপেক্ষা সত্য,—স্বয়ং শ্রীভগবান্ যতটা সত্য, ইহা তাহারই মত সত্য। যাহাকে "উৎকৃষ্টতর সার্থকতা" বলা হয়, তাহা কাম নহে—প্রেম, এই প্রেমই সসীমকে অসীমের সঙ্গে এক করিতে পারে। শ্রীভগবান্ জীব-হৃদয়ে কাম, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, প্রেরণা, গতি এই সমস্ত উপায় দিয়া সসীমের যে অসীমকে অনুসন্ধান—তাহাকে সজীব, সচল রাখিতেছেন। অবিরাম তাই মানুষ কামনা-আশা-প্রেরিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অসীমে মিলিতে পারে। ইহা ঠেকাইয়া রাখিবার সাধ্য কাহারও নাই। ভক্তচূড়ামণি তুলসী-দাস তাই বলিয়াছেন—

রাম ভজন বিনু মিটহি ন কামা।

আমরা যাহাই কিছু করি, তাহার কিছুই নষ্ট হয় না। কিছুই বৃথায় যায় না। একটা নিশ্বাসও বৃথা যায় না। *

আর্য্য ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন যে, মানুষ চায় একমাত্র সুখ। যে কাযই মানুষ করুক, তাহার লক্ষ্য একমাত্র আনন্দেরই দিকে। শুধু সুখ নহে—ভূমা সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ। ইহা চায় বটে, কিন্তু ইহা সে সাধারণতঃ কদাচ পায় না। কারণ, অজ্ঞান হইয়া সে প্রকৃত পথ ধরিতে না পারায় ঝুটা সুখ—যাহাকে "সুখগন্ধি দুঃখ" বলা হয়, তাহাকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করে এবং তাহাকেই ভূমাতে পরিণত করিতে চাহে।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

ইহা শ্রুতিবাক্য। অল্পে সুখ নাই—নিরবচ্ছিন্ন না হইলে সুখ হয় না।

* The air is one vast library on whose pages are for ever written all that man has ever said or woman whispered—Religion of Geology P. 252.

অজ্ঞানপ্রসূত বুদ্ধি, মানুষকে যে পথে প্রকৃত ভূমা সুখ মিলিবে, তাহার সন্ধান না দিয়া বিপরীত পথেই চালাইতেছে। কাযেই তাহার দুঃখের অবধি নাই। ইন্দ্রিয়জ সুখ সীমাবদ্ধ, কারণ, ইন্দ্রিয় সীমাবদ্ধ। ফলে মানুষ বিকারগ্রস্ত, শক্তিহীন, অবসন্ন। জগতের যত দুঃখ এই কারণে। এই অনন্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই আমাদের ঋষিরা এত নিয়ম-কানুন করিয়া এত অভ্যাস বৈরাগ্য আনিয়াছেন। উদ্দেশ্য, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তি অথবা ত্রিবিধ তাপের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। যেটুকু সুখের ছায়া আমরা এত যত্ন পরিশ্রম করিয়া আহরণ করি, তাহাও ত কোনমতে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ইহারই জন্য সাধনা, একাগ্রতা। অন্তর্ম্মুখী না হইলে চিত্ত কখন ভূমা সুখ আস্বাদন করিতে পারে না; যথা—

নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু শক্তং
নান্তর্মুখং ভবতি তান্ প্রবিহায় তস্য।
কান্তর্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমস্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

আমার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়সমূহে আসক্ত। বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ইহারা কখন অন্তর্ম্মুখী হয় না। ইন্দ্রিয় অন্তর্ম্মুখী না হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয় অন্তর্ম্মুখী হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথও আজ এই "ভূমা" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন; কারণ, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এ ছাড়া অন্য পথ আর নাই।

যদি ইহাই ঠিক হয় যে, ভূমা ভিন্ন সুখ নাই, যদি ইহাই যথার্থ হয় যে, সুখই মানুষের কাম্য, যদি ইহাই সত্য হয় যে, ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফিরাইয়া অতীন্দ্রিয়ে না পৌঁছিলে ভূমা সুখ মিলে না, তবে কোন্ পথ অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত? দেহাত্ম-বাদী যাহারা, যাহারা শিশ্ন এবং উদরসর্ব্বস্ব, তাহারা কি কদাচ "ভূমা"র সন্ধান পাইবে? না—আজ যে পথ তাহারা নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছে এবং উন্মত্ত হইয়া যাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহা তাহাদের ভূমার পথের বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছে? আজ প্রতীচ্যের দেখাদেখি এ দেশের নারীও বলিতেছেন যে, "আমরা নারী—আমরা দেবী নহি, আমরা দেবী হইতেও চাহি না, দেবীর সম্মানও চাহি না, দেবীর দাবী আমরা করি না।" বেশ কথা। কিন্তু পশু এবং দেবীভাব মিলিয়াই না নর বা নারী-ভাব? ইহার অধিক দেবী বা দেব, নারী বা নর কেহই নহেন। পশু এবং দেবতার মাঝেই মানুষ। তবে নর-নারী কি শুধু পশুই? তাহাদের কি কোন কালেই একটা দেবীভাব নাই? উৎকর্ষ, শিক্ষা, আদর্শ, জ্ঞান, প্রেরণা, অবস্থা ইত্যাদি অভাবে সেই দেবীভাবটা আজ জড় মূকবৎ অসাড় নিস্পন্দ হইয়াছে বলিয়াই কি সে দিক্‌টা বাদ দিতে হইবে বা অগ্রাহ্য করিতে হইবে? যেমন পশুভাবটাকে "সূর্য্যের আলোর মত সত্য" বলা হয়, তাহাকে বাদ দেওয়া চলে না, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, ঠিক সেইরূপেই এই দেবীভাবও সত্য, তাহাকেও বাদ দেওয়া বা ঠেকাইয়া রাখা চলে না। একটাকে সর্ব্বথা প্রশ্রয় দিবার চেষ্টায় অন্যটাকে ক্ষত বা ক্ষুণ্ণ করা "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে"র সমূহ হানিকর। দুইটা আধ মিলিয়া তবে পূর্ণ এক হয়। যেমন সকলেই জানেন যে, ইতর ভাবগুলা কি ভীষণ জোর-জবরদস্তি করে, তেমনই দেবীভাবও ছাড়িয়া কথা কহে না। তবে পশুভাব পশুরই মত অবিচার অত্যাচার, গায়ের জোর করিয়া দেবীভাবকে পরাস্ত করিতে চাহে, আর দেবীভাব শান্ত-ভাবে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহে। পশুত্ব করিয়া করিয়া তাহার প্রাধান্য মানিয়া মানিয়া যদি দেবীভাবের অস্তিত্বও বিশ্বাস না হয়, সেটা পশুরই পাশবিক প্রাবল্যে। জোর-জুলুম করে বলিয়া কত লোককে আমরা গালিগালাজ নিন্দা করি, কিন্তু এই পশুবৃত্তির জোর-জুলুম যাহা প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে অবিরাম চলিয়াছে, তাহার অতি ক্ষীণ প্রতিবাদও করা হয় কৈ? তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা কৈ? আসল কথা এই যে, এই জোর-জুলুমটাও প্রীতিকর মনে হয়, তাহার উন্মাদনা শক্তি-টাও বেশ আনন্দদায়ক মনে হয় বলিয়া তাহার সহিত একটা আপোষ করিয়া নতমস্তকে আহ্লাদের সহিত তাহার দাসত্ব মাথা পাতিয়া লইয়াছি। কাযেই প্রতীকার বা প্রতিবাদ দূরে থাকুক, ইহার আধিপত্যই কাম্য হইয়াছে। বেচারা দেবীভাব কিন্তু এই জোর-জুলুমের তাড়নায় অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়া অধো-বদনে বসিয়া কেবল কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু জোর-জুলুম কম পাইলেই নিজের দুঃখটি লইয়া অতি বিনীতভাবে মন বুদ্ধির দরবারে উপস্থিত হন এবং কখন রোগ, শোক, দারিদ্র্য, মনস্তাপ, অনুতাপ, বৈরাগ্য, বিরক্তি, অতৃপ্তি, অশান্তি, মানসিক বিকার, খেদ, করুণা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শান্তি, প্রেম, ভিক্ষা প্রভৃতি সহস্র কারণে সুযোগ পাইয়া আসিয়া অনবরত চেতনা সঞ্চার করিয়া দিতেছেন যে, দেবী এখনও মরে নাই! সে আছে! পশুভাবের সহস্র প্রকারে হানা, হুমকি, হুঙ্কার, ধর-পাকড়, লাঠালাঠি সত্ত্বেও তিনি মরেন নাই, কখনও মরিবেন না। যত উপেক্ষা অনাদরই তাহাকে তুমি কর না, তিনি অতি সকরুণ দৃষ্টিতে তোমায় দেখেন, করুণায় তাঁর চক্ষুতে জল আসে। তোমার পরিণাম ভাবিয়া তিনি কত সাবধান, কত সতর্ক করিয়া দেন, কত অনুনয়-বিনয় করেন, তোমার ভ্রম নিরাস করিয়া তিনি নিজের বক্ষে তোমায় সন্তানের ন্যায় স্থান দিতে চাহেন। তুমি এত শত চেষ্টায়ও যদি না মান, অশেষ ধৈর্য্য ধরিয়াও তিনি যদি তোমার মতি-গতি ফিরাইতে না পারেন, শতবার সদ্বুদ্ধি দিয়াও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তবে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই, তোমারই ভালর জন্য, তোমাকে সাজা দিয়া তোমার চৈতন্য উৎপাদন করেন! তিনি একবার না হয় দশবার সাজা দিয় তোমায় সোজা করিবেনই। শয়তানকে মানুষ-হৃদয়ে রাজত্ব করিতে চিরকাল তিনি কখনই দিবেন না; কালবশে তাঁহার অভ্যুদয় হইবেই—দুই দিন পরেই হউক বা দশ বৎসর বাদেই হউক। ইহা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, সংসারে নিজ নিজ ইচ্ছামত কার বেশী হওয়া সম্ভব নহে। হতাশা সকলকেই কম-বেশী সহ্য করিতে হয়। দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সতী ভূমা সুখ আনিয়া দেয়, তাই ইহার অবতারণা।

[ক্রমশঃ।

শ্রী—

নীলকর জে, পি, ওয়াইজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। একে একে বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তরগুলি তাহাদিগের নবাগত অতিথি 'নীল'কে যেন পরম সমাদরে বক্ষে ধারণ করিতে লাগিল। তখন সবেমাত্র কোম্পানী বাহাদুর দেশ-শাসনের বন্দোবস্তটি এক রকম গোঁজামিল দিয়া সমাধা করিয়াছেন। তখনও দেশের ভিতর প্রকৃতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই,—"যা'র লাঠি তা'র মাটী"—এই প্রবাদবাক্যটির সত্যতা দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। মুসলমানের আমল শেষ হইয়া কোম্পানী-রাজত্বের সূত্রপাত হইল। জমীদার-শ্রেণীর ভিতর একটা ওলট-পালট হইয়া গেল,—অনেক প্রাচীন ভূম্যধিকারী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন অনেক ভুঁই-ফোঁড় জমীদার-বংশের আবির্ভাব হইল। কোম্পানী বাহাদুর শুধু দেশের জমীর বন্দোবস্তটি শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—বরং তাঁহাদের নবাধিকৃত অনেক বড় বড় সহরে কুঠী খুলিয়া বাঙ্গালার বস্ত্র ও রেশম-শিল্পের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া স্বদেশের বণিক্-কুলের ধন-বৃদ্ধির পথটি সুগম করিতে লাগিলেন।

এই সময় ইংরাজ বণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি একটি নূতন ব্যবসায়ের উপর পড়িল। দলে দলে ইংরাজরা আসিয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে নীলের কুঠী খুলিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পসময়ের ভিতর কৃষ্ণনগর, যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ইত্যাদি জেলার উর্ব্বর চরভূমিগুলি নীলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলাদ্বয়ের ভিতর Watson Company ধনগৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উক্ত কোম্পানীর মফঃস্বল ম্যানেজার ছিলেন তদানীন্তন নীলকর-মহলে সুপরিচিত Mr. R. J Larmour। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম,—যেন একটি ছোটখাটো "Despotic Chief"—এককালে তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত 'শ্যামচাঁদ' * ওরফে 'রামকান্ত'র ঘন ঘন মধুর বর্ষণটি কত নীলকুঠীর অবরুদ্ধ প্রাঙ্গণকে অশ্রুধারায় প্লাবিত করিয়াছে! এই বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়গণ নরঘাতী অনেক বাষ্প ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন;—কিন্তু 'শ্যামচাঁদে'র পরিকল্পয়িতা Mr. Larmourএর প্রদত্ত এই নামটির উপর যেন দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার ছাপটি সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে!

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট Sir Ashly Eden ছোটলাট হইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন বারাসত জেলার 'কালারুয়া' * ও 'তারাগুণী' † মহকুমাদ্বয়ের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই জেলাটি তখন নদীয়ার কমিশনারের অধীন ছিল। Mr. Eden উক্ত মহকুমাদ্বয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে, নীলকর Mr. Larmour বলপ্রয়োগ করিয়া প্রজাদিগকে নীল চাষ করিতে বাধ্য করিতেছেন। ইহা রোধ করিবার জন্য তিনি একটি হুকুম জারি করিলেন যে, কোনও নীলকর জোর করিয়া প্রজাকে তাহার নিজের জমীর ভিতর নীল চাষ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না। এই আদেশটি প্রচারিত হইবামাত্র নীলকর-মহলে একটা বিষম চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। অগৌণে Mr. Larmour নদীয়ার তদানীন্তন কমিশনার Mr. C. Groteকে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করিলেন,—ফলে Mr. Eden তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর তিরস্কার লাভ করিলেন সত্য; কিন্তু ইহাতে তিনি অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া বরং কার্য্যতঃ কমিশনারের আদেশটি অমান্য করিয়া স্বকীয় মতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার জন্য কমিশনার Groteএর সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে একটি তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ছোটলাট Sir John Peter Grant প্রজাদিগের পক্ষে

---

* Mr. Eden said.—"It consisted of a stick with a leather attached, and was called "Shamchand" or "Ramkanta." The authorship of this has been ascribed by some to Mr. Larmour.

"এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠীতে এক রকম হইত না। কুঠীবিশেষে এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজীর দয়ার তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটা লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোনও স্থানে হাতার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েকছড়া চর্ম্মের রজ্জু বাঁধা থাকিত। * * * * * * * শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিগো কমিশন সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।"

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্র—১২৯৩)

* Kaloroo-ah.

† Tarragooney.

অনুকূল—Mr. Edenএর মতটি গ্রহণ করিলেন। * ইহা হইতে নীলকরদিগের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা যে কতদূর ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কালক্রমে বাঙ্গালার উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলির উপর নীলকরের সতৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। যে জমীতে ধান ভাল জন্মে, আবার সেই জমীতে নীল ভাল জন্মিত। শুধু তাহাই নহে, নীল ও ধানের চাষ এক সময়ে পড়িত। বাঙ্গালার কৃষককুল ধান ফেলিয়া তাহার জমীতে নীল চাষ করিতে চাহিত না, কেন না, ইহাই তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পুঁজি। "নবজীবন" মাসিকপত্রে † জনৈক লেখক নীলের চাষের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "সাহেবরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার দর ছিল না। সাহেবরা যে এক দর স্থির করিয়া রাখিয়া দিলেন, সেই হারে চিরকাল ধরিয়া, জন্মা-অজন্মার তারতম্য বিবেচনা না করিয়া প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামত স্বীকৃত হয় নাই, সাহেবদিগের ইচ্ছামত স্থির হইয়াছিল এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমী সকলে নীলকররা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না। * * *

* * * * *

দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কর্ত্তন করিতে হয়; কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া তাহা কুঠীতে দাখিল না করিলে, কুঠীর লোক প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি-বোধ হইত এবং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত।"

মফঃস্বলের কুঠী পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে নীলকরগণ উপলব্ধি করিলেন যে, প্রজাদিগকে তাহাদিগের উৎকৃষ্ট জমীতে নীল রোপণ করাইতে বাধ্য করিতে হইলে বাঙ্গালী জমীদারের অখণ্ড আধিপত্য ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপটি সর্ব্বাগ্রে আয়ত্ত করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জমীদারী-স্বত্বলাভ করিবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু জমীদারী ত যখন-তখন মেলে না, সেই জন্য তাঁহারা স্ব স্ব কুঠীর সন্নিহিত ভূমিগুলির দেশীয় ভূস্বামিগণের নিকট হইতে অগ্নিমূল্যে ইজারা-পত্তনাদি স্বত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কৃষককুল কুঠীর নাগপাশে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িল। প্রজাদিগকে তাহাদিগের ভাল জমীগুলিতে নীল বপন করিবার জন্য টাকা দাদন করা হইতে লাগিল। নীলকররা যে ভাবে নীলের গাছের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহাতে দাদনের টাকা পরিশোধ হইত না, বরং এই ঋণ বংশানুক্রমিকভাবে চলিতে থাকিত, অথচ তাহাদের অন্নের গ্রাসের শেষ সংস্থানটি অগ্রেই নীলকরের হাতের মুঠার ভিতর চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। নিঃসহায় কৃষককুল উপলব্ধি করিল যে, সত্যই ত 'নীল' তাহাদের শত্রু—সেই জন্য স্বেচ্ছায় ইহাকে তাহারা আলিঙ্গন করিতে চাহিল না, ফলে 'শ্যামচাঁদে'র ভীষণ ঘন ঘন হুঙ্কারে নীলকরের কুঠীর প্রাঙ্গণগুলি হতভাগ্য প্রজাদিগের করুণ অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশকে যেন কম্পিত করিতে লাগিল!—হতভাগ্যগণ নীরবে শেষ অশ্রুটি বর্ষণ করিতে লাগিল,—কারণ, রাজদ্বারে নীলকরের অনুমতি ভিন্ন প্রতীকার-প্রার্থনা করা কার্যটি ছিল একেবারে অসাধ্য। নীলকরের অত্যাচার চরমে কতদূর দাঁড়াইয়াছিল, তাহা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত গ্রাম্য-ছড়াটি * ব্যক্ত করিতেছে—

"জমিনের শত্রু নীল,
কর্ম্মের শত্রু ঢিল,
তেম্নি জগতের শত্রু পাদ্রী হিল।"

নীলকরগণ যখন এই দেশে প্রথম নীলের চাষ প্রচলন করেন, তখন তাঁহারা নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতার ভাবটি বেশ সুস্পষ্টভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন,—এই সুযোগে কৃষককুলের একটু আশ্রয়ের স্থল ছিল; কিন্তু প্রায় ১৮৪৫ খৃঃ তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি 'Indigo Planters Association' নামক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশটিকে নিজেদের ভিতর বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব স্বত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রজার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না, পরন্তু নীলকরগণ তাঁহাদিগের সাধারণ স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন,—দরিদ্র প্রজার কথা বলিবার জন্য কেহ রহিল না! দেশের প্রজাসাধারণ নীলকরগণের সহিত তদানীন্তন সরকার বাহাদুরের সাহচর্য্যের সাক্ষাৎ আভাসটি মনে পোষণ করিতে লাগিল। এদিকে বাঙ্গালার তখনকার ছোট লাট Sir Frederic Halliday কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ জেলার নামজাদা নীলকরদিগকে ১৮৫৭ খৃঃএর ১লা আগষ্ট তারিখে Assistant Magistrateএর পদে ভূষিত করিয়া প্রজাদিগের ধারণাটি আরও বদ্ধমূল করিয়া দিলেন।

---

* ছোটলাট Sir John Peter Grantকে লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন "Harkaru" নামক সাময়িক পত্রে "Punch" শীর্ষক কবিতায় তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—

"Governor Grant is a terrible man,
As he reigns in Alipore Hall;
A compound of Ghengis and Kublai Khan,
Tamerlane, Nadir and all,
Says T, P,
Grant Sez he
Drive me the planters into the sea"

† সে কালের 'দারোগার কাহিনী' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

* "The enemy of the soil is indigo;
The enemy of labour is idleness,
So the enemy of caste is Padri Hill"

Repeated by the Rev. S. T. Hill of the London Missionary Society while giving evidence before rhe Indigo Commission of 1860,

"কুঠীর এক কামরায় প্রকাশ্যভাবে এই সকল আজখোদ কাছারী হইত। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আমলা, হাকিম ও দর্শকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাছারী বসিত ও ভাঙ্গিত। কুঠীর সাহেব বিচারক,—কুঠীর দেওয়ান গোমস্তা—আদালতের পেস্কার প্রভৃতির স্থায় আমলা আর প্রত্যেক মোকদ্দমার পৃথক্ নথী লিখিত ও পঠিত হইত। দোষী ব্যক্তিকে কেবল অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, এমন নহে,—শারীরিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই সকল কাছারীর আনুষঙ্গিক কুঠীতে গারদ এবং জেলখানা ছিল এবং তাহাতে নীলকরের হুকুমমত দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে কয়েদ থাকিতে হইত। দরিদ্র প্রজা—যাহার নিকট (টাকা ?) আদায় হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহাদের প্রতি শারীরিক শাস্তির হুকুম হইত। নীলকরের আদালতে শাস্তির জন্য নূতন যন্ত্র সৃষ্টও হইয়াছিল এবং কোনও কুঠীতে শ্যামচাদ কি রামচাদ (রামকান্ত ?) নামক যন্ত্রের উল্লেখ করা হইত। বিচারক হুকুম দেওয়ার সময় এইরূপ উক্তি করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেন, "অমুক আসামী তাঁহার অপরাধের জন্য দশ কি বিশ ঘা শ্যামচাঁদ কি * রামচাঁদ খায়"। নীলকরের কয়েদখানায় হতভাগ্য কারারুদ্ধদিগের আহার ইত্যাদি কুঠীর দেওয়ান ইত্যাদি কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিত। কাযেই ইহাদিগকে অনেক সময় অনাহারী থাকিতে হইত এবং বায়ু-সেবন ভিন্ন ইহাদের অন্য কিছু সহজলভ্য ছিল না। হতভাগ্যদিগের আত্মীয়-বান্ধবরা সময় সময় ইহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য পুলিস কি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিতেন। রাজপুরুষের চোখে ধূলি দিবার জন্য ইহাদিগকে রাত্রিকালে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে স্থানান্তরিত করা হইত। এই ভাবে ঘন ঘন স্থানপরিবর্ত্তন ও কুঠীর পাইক ইত্যাদির সহিত সময়-অসময়ে নৈশ ভ্রমণের দরুণ ইহারা আহার করা দূরে থাকুক, একটু নিশ্বাস ফেলিবারও সামান্য অবকাশটুকু পাইত কি না সন্দেহ।

সাধারণতঃ নীলকরদিগের প্রতি আমরা একটা বিশেষ অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগকে যতটা দোষী বলিয়া মনে করি, ততটা তাঁহারা বাস্তবিক অপরাধী ছিলেন না। নীলকরগণ এই দেশের লোকের নিকট যে ভাবে ঘৃণিত হইয়াছেন, তাহার কারণটি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের নামে অনুষ্ঠিত অত্যাচারগুলির জন্য দায়ী একমাত্র দেওয়ান, গোমস্তা ইত্যাদি দেশীয় কর্ম্মচারিগণ। সত্য কথা বলিতে গেলে নীলকররা আমাদের সমাজ ও এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই সুযোগে কুঠীর দেওয়ান-গোমস্তা ইত্যাদি 'সাহেবের' নামে অকথ্য জঘন্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান করাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে 'সাহেবের' অনুমোদনটি লাভ করিয়া সমস্ত দোষের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়াছে। নীলকরের দেওয়ান, গোমস্তা চাকরীগুলি অতি লোভের সামগ্রী ছিল। কারণ, এই দুইটি চাকরী করিয়া অনেকে বিস্তর অর্থ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। দেশের সকল শ্রেণীর লোক—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি—অপরিমিত লাভের আশায় এই দিকে আকৃষ্ট হইত। এই সমস্ত গোমস্তা-দেওয়ানদিগের ক্ষমতা যেমন ছিল অসাধারণ, আবার ইহার অপব্যবহারও ইহাদিগের মত, মানুষ কখনও করিতে পারে নাই। ইহাদের ছিল একমাত্র ধ্যান—নীলকরের অর্থাগমের পথটি সুগম করিয়া তাঁহার প্রভুত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অর্থ-অর্জ্জনের প্রসারটি বর্দ্ধিত করা। সময় সময় দেওয়ান-গোমস্তাদিগের অত্যাচার-কাহিনী 'সাহেবের' কর্ণগোচর হইলে 'prestige'এর দোহাই দিয়া ইহারা অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতেন এবং 'সাহেবকে' বুঝাইতেন যে, কুঠীর মর্য্যাদা ও সুনাম অটুটভাবে রক্ষা করিতে হইলে রাইয়তের প্রতি এই প্রকার কড়া শাসন ও আনুষঙ্গিক অত্যাচার একান্ত সঙ্গত। সুতরাং 'সাহেবরা' ইহাদিগের কার্য্যে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতেন না।

নীলকরদিগের প্রতাপ যখন বাঙ্গালার ভিতর চরমে পৌছিয়া তাহার শ্যামল অঞ্চলটিকে ছক-কাটা সতরঞ্চের মত নীল-কুঠী দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে, যখন শ্যামচাদের সুতীব্র প্রয়োগের ব্যবস্থাটি নিরীহ কৃষককুলের পক্ষে বাধ্যতা সম্পাদনের একমাত্র অস্ত্র নিরূপিত হইয়াছে,—তখন বাঙ্গালার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে একটি ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই ভাগ্যধর পুরুষটির নাম Mr. J. P. Wise। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Scotland-এর অন্তর্পাতী Hillbank নামক পল্লীর একটি সম্ভ্রান্ত বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি সৈনিক জীবন পছন্দ করিতেন। সেই জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই ইংলণ্ডের সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি একটি পদ লাভ করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার ভাইটির ভাগ্যে তাহা জুটিল না। তিনি অম্লানবদনে তাঁহার পদটি বড় ভাইকে দিয়া নিজের জন্য আবার একটি খুঁজিলেন,—কিন্তু এইবার তিনি বিফল-মনোরথ হইলেন। তৎপরে তিনি সুদূর ভারতকে স্বকীয় ভাবী কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া ১৮২৩ খৃ. ১৮ই ফেব্রুয়ারী 'Lady Campbell' নামক পালের জাহাজে Portsmouth বন্দর হইতে ভারতের দিকে রওনা হইলেন। পথে বাতাসের অবস্থা ভাল ছিল না,—সেই জন্য তাঁহার কলিকাতা পৌছিতে সুদীর্ঘ ছয় মাস লাগিয়াছিল।

এই Wise পরিবারটি পূর্ব্ববাঙ্গালায় অপরিচিত নহে। শিক্ষা, দীক্ষা, ধনগৌরব, পদমর্য্যাদা ও দানশীলতা ইহাদের এক সময়ে যথেষ্ট ছিল। ইহার বড় ভাই Dr. T. A. Wise ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৬ পর্য্যন্ত একাধারে ঢাকার Civil Surgeon ও নব-গঠিত ঢাকা কলেজের * অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ পর্য্যন্ত হুগলী কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। তিনি এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং

* নবজীবন—(১২৯৩)

* In 1841, the School was raised to the position of a College and the foundation of the present building was completed in 1846—

(Hunter's Statistical Account of Bengal)

তাঁহার স্বাধীন গবেষণা-মূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি তাৎকালিক বঙ্গীয় Asiatic Societyর Journalএর গৌরবের বিষয় ছিল। ইঁহার একটি প্রবন্ধ,—"An experimental inquiry into the means employed by the natives of Bengal for making ice." উপরি-উক্ত Societyর Journalএর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য একটি * নিবন্ধ,—"The peculiarities and uses of pillar towers of British Island"—তদানীন্তন সুধীসমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তিনি ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপর তিন খণ্ডে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন,—ইহা আজিও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুধু ইতিহাসচর্চ্চায় নহে,—সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার একটা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এখনও ঢাকার অনেক বৃদ্ধের মুখে তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা শুনা যায়। Dr. T. A. Wiseএর পুত্রটিও পিতার ন্যায় একাধারে চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার রচিত—Notes on Sonargaon † এবং Bara Bhuia of Bengal ‡—এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ দুইটি এখনও ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী।

Mr. Wise কলিকাতা পৌঁছিয়া ঢাকা নগরীকে তাঁহার ভাবী কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিলেন। তখন ঢাকাই মসলিন য়ুরোপের সৌখীন ললনাদিগের অঙ্গাভরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাঁহাদিগের কোমল অঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। এই মসলিন ভারতের গৌরবের জিনিষ। সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত মিশরীয় সমাধিমন্দির হইতে আবিষ্কৃত মৃত দেহটি না কি ভারতীয় মসলিনে আবৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। Wise যখন ঢাকা আসিলেন, তখন নীল ও কুসুমফুলের ব্যবসায়গুলি বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীলের চাষটি ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিং জেলায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং অনেক ইংরাজ, পর্ত্তুগিজ ও আর্ম্মেনিয়ান বণিক্ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকেরই সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। অনেকেই এই দেশ হইতে সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেকেরই কুঠীগুলি প্রায় ১৮৩৫ খৃঃ § Wiseএর হস্তগত হয়।

নীলের চাষ ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮০৩ খৃঃ ঢাকা জেলার ভিতর দুইটি ক্ষুদ্র নীল-কুঠীর সৃষ্টির কথা শুনা যায়। ইহার পর বান্ধনগর, সিরাজাবাদ, ইছাপুর ও সাভারে নীলকুঠী স্থাপিত হইল এবং এই ব্যবসায়টি অল্পকালের ভিতর বিদেশী বণিক্‌দিগের পক্ষে লাভজনক হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে নীলের চাষটি ঢাকা জেলার ভিতর এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিল যে, ১৮৩৩ খৃঃ কুঠীর সংখ্যা একত্রিশটি * হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে শুধু ঢাকা জেলার ভিতর গড়পড়তায় প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ হাজার মণ নীল প্রস্তুত হইত। প্রতি বৎসর এই নীল-চাষের improvementএর দরুণ নীলকরদিগকে বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। Wiseএর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় যতগুলি নামজাদা নীল ও কুসুমফুলের কুঠী ছিল;—তন্মধ্যে Dr. Lamb, Mr. Robert Daucat ও East Bengal Indigo Companyর কুঠীগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ছিল।

Wise সাহেব তাঁহার ব্যবসায়-জীবনের প্রথম সময় Dr. Lambএর সহকারিরূপে কুঠীর কার্য্যে যোগদান করিয়া নীলের ব্যবসায়ের গূঢ় মর্ম্মটি সম্যক্ অবগত হইলেন। তৎপরে তিনি নীলকর Mr George D Glassএর সহিত মিলিত হইয়া "Glass and Wise Company" নামক একটি যৌথ-কারবার সৃষ্টি করিলেন। উক্ত কোম্পানী কতকগুলি নীলকুঠী ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ ব্যবসায়টি বেশ জোরের সহিত চালাইয়াছিল, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। Glass এবং Wise সাময়িক ক্ষতিকে তুচ্ছ করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। পরিশেষে ভাগ্য তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন এবং অচিরে তাঁহাদিগের প্রচুর অর্থাগম হইল।

Glassএর শুধু এই যৌথ-ব্যবসায়টি আরম্ভ করিবার উপযোগী কতকটা মূলধন ছিল,—কিন্তু Wiseএর তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ ব্যবসায়বুদ্ধি ইহাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। Glass, Wiseএর শক্তির পরিচয় পাইয়া কারবারের পরিচালনভার তাঁহার (Wiseএর) উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা শুধু কুঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই,—বরং ভূমি-সংক্রান্ত ইজারা, পত্তনি ইত্যাদি নানাবিধ স্বত্ব বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। Glass যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন Wise ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। Glassএর মৃত্যুর পর Glass and Wise Company উঠিয়া গেল।

Glassএর মৃত্যুর পর তিনি Trusteeদিগের হস্তে মহাজনদের সমস্ত প্রাপ্য টাকা অর্পণ করিয়া কারবারটির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইলেন। ক্রমশঃ নীলকর Wise ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা জেলা সমূহে কুঠী স্থাপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জমীদারী স্বত্ব ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সময় কুসুম-ফুলের ব্যবসায়ের দিকেও তাঁহার কতকটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশঃ বড় বড় জমীদারদিগকে তাঁহাদিগের সম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া বিস্তর টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইতে লাগিল। এই প্রকারে Wise নানা রকমে এই দেশের লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে 'চ[illegible]' ব্যবসায়ের দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িল এবং অগৌণে ক[illegible]

---

* J. A. S. B. Vol XXXIII,

† J. A. S. B —XLIII

‡ J. A. S. B —XLIV,

§ Most of the factories now held by Mr. Wise belonged to a Dr. Lamb, but the present owner has possessed them for the last forty years,

(Hunter's Statistical Account of Bengal)

* Vide Dr Taylor's Topography of Dacca.

জেলায় একটি চা-বাগান খোলা হইল। প্রথম বাগানটি কোন লাভে দাঁড়াইল না;—সুতরাং কাছাড় ছাড়িয়া তিনি আসামের ভিতর কয়েকটি বাগান খুলিয়া অপেক্ষাকৃত লাভবান্ হইলেন।

তাঁহার স্বাধীন কর্ম্মজীবনের প্রথম তিনটি বৎসর নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইল। অবশেষে তাঁহার অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরতা তাঁহাকে পুরস্কার দান করিল এবং কারবারটিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া তিনি অচিরে কমলার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

এই সময় তদানীন্তন প্রসিদ্ধ নীলকর Dr Lamb স্বীয় কারবারে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া Wiseএর নিকট তাঁহার কুঠীগুলি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এই প্রকারে Dr. Lamb-এর যাবতীয় সম্পত্তি Wiseএর হস্তগত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে যে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই না কি কোন সময়ে Lambএর একটি কুঠী ছিল। ক্রমশঃ অন্যান্য নীলকরগণের সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে আসিয়া পড়িল। ঢাকা দেওয়ানী আদালতের নিকট Robert Doucatএর বারো বিঘা-পরিমিত এক খণ্ড ভূমি ছিল, তাহাও Wise ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে তাঁহার কুঠীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শুধু ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় সংখ্যায় ৪২টি দাঁড়াইল। বরিশালের ভিতর রাইন্দা নামক স্থানে তাঁহার একটি বড় নারিকেলের বাগান ছিল। সেইখানে নারিকেল-রজ্জু প্রস্তুতের একটি কারখানা করিলেন।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় Wiseএর সহিত অন্যান্য নীলকরগণ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং নীল প্রস্তুতের ব্যয়ও পড়িত অন্যান্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম;—সেই জন্য তাঁহার যথেষ্ট আয় হইত। তাঁহার নীল প্রস্তুতের ব্যয়টি নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া Dr Hunter বলেন—

মিঃ ওয়াইজের ব্যয় সম্বন্ধে কোন হিসাব দিবার উপায় নাই। কারণ, এই ভদ্রলোক খুব বড় জমীদার ছিলেন। এজন্য তিনি স্বল্পব্যয়ে শ্রমিক নিযুক্ত করিতে পারিতেন। নীল-চাষের জমীর সংলগ্ন তাঁহার অধীন ক্ষেত্রগুলি অল্প হারে প্রজাদিগকে বিলি করিয়া দিতেন। এজন্য তাহারা তাঁহার সাহায্য করিত। বিশেষতঃ অধিকাংশ শ্রমিকই তাঁহার প্রজা ছিল।

Wiseএর প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে তাঁহার রাজ্যের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদটির মর্য্যাদা অতি যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বেশী দিন এই পদে থাকিতে পারিলেন না,—কারণ, তাঁহার উপস্থিতির অভাবে স্বীয় কারবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার উপক্রম হইল। তজ্জন্য এই পদটি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত মনোযোগটি নিজের ব্যবসায়ের উপর অর্পণ করিলেন। এইক্ষণ হইতে ঢাকা ও ময়মনসিং জেলার জমীদারশ্রেণী তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভিতর অনেকে বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনেকে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবার জন্য স্ব স্ব জমীদারীর কিয়দংশ পত্তনী ইত্যাদি স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে ময়মনসিংহ জেলার বেগমবাড়ী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত চরগুলি ক্রমশঃ তাঁহার হস্তগত হইল।

কালক্রমে Wise হোসেনসাহী পরগণার তদানীন্তন আর্ম্মেনীয়ান জমীদার খাজে আরাতুনের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে সমগ্র পরগণার ।৵০ আনা অংশ ক্রয় করিয়া জমীদার পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন। এই ক্রয়ের উদ্দেশ্যটি ছিল শুধু ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্ত্তী চরগুলি হস্তগত করিয়া নীল চাষ করা। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, নীল এবং কুসুমফুল চরভূমিতেই ভাল জন্মে। নীলকর Wise এখন শুধু নীলকর বলিয়া পরিচিত হইলেন না,—দেশের ভিতর এক জন প্রকাণ্ড জমীদার হইলেন। কুঠীয়াল ও জমীদারী,—এই দুইটি শক্তি তাঁহার ভিতর একত্র সমাবিষ্ট হইবার দরুণ তাঁহার নীলের কুঠীগুলি ক্রমশঃ তাঁহাকে বিপুল অর্থদান করিতে লাগিল। তাঁহার প্রতাপ এত দৃঢ় হইল যে, তাঁহার নামে লোক দোহাই পাড়িতে লাগিল, সাধারণ লোকের ভিতর একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিল যে, Wiseএর মাটীর উপর বাঘ, কুমীর একঘাটে জলপান করিতে বাধ্য। Wise এখন জমীদারী লাভ করিয়া শত শত লোকের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা হইলেন।

তাঁহার বিশাল সম্পত্তি পরিচালন করিবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি * তাঁহার অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে Sir Jhon Wemyes (Bart)এর নামটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ দলে দলে 'সাহেবের' অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শত শত প্রজার দণ্ড-মণ্ডের কর্ত্তা নীলকর Wise এখন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় পদোচিত গুরুত্ব ও প্রতাপ দেশীয়দিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার জন্য বাঙ্গালী জমীদারদিগের চাল-চলন অনুকরণ করিলেন। শত শত অস্ত্রধারী পাইক, লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা তাঁহার আদেশ তামিল করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। বাহিরের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি সমস্তই হইল,—একটিও বাদ পড়িল না। কিন্তু দেশীয় জমীদারগণ তাঁহার সৌভাগ্য-সোপানে দ্রুত আরোহণটি ঈর্ষ্যার চোখে দেখিতে লাগিল,—তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সমূলে উচ্ছেদসাধনই হইল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। শীঘ্রই দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের

---

(১) মিঃ আর, জি, কার্ণেজী
(২) " জি. এন্, রেলী
(৩) " ডি, ডিলন
(৪) " আলেকজাণ্ডার টম্‌স্
(৫) সার জন উইমেস্
(৬) মিঃ জে, জে, গ্রে
(৭) মিঃ ফোর্ড
(৮) মিঃ টি, টি, ক্যালানস্
(৯) " হেনরী ক্লার্ক
(১০) মিঃ বার্ণার্ড ফেলান্
(১১) শ্রীযুক্ত আনন্দ রায়; ঢাকা

সহিত ওয়াইজের সাক্ষাৎভাবে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী সালটিয়া-নিবাসী ৺ভোলানাথ ঢাকলাদার ও ভাওয়ালের জমীদার রাজা কালীনারায়ণ রায়।

অনেক ছোটখাটো যুদ্ধ ও মোকর্দ্দমার পর Wiseএর জয়লাভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নীলকর Wise স্বীয় ব্যবসায়ের খাতিরে অত্যাচার অবিচার যে কস্মিনকালেও করেন নাই, তাহা একবারে বলা যায় না,—কিন্তু অন্যান্য নীলকরের মত একবারে হৃদয়হীন ছিলেন না। অত্যাচারের অপবাদটির কবল হইতে দেশীয় জমীদারগণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ময়মনসিংহের একটি জমীদারের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি—"এই সময়ে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগণার জমীদার স্বর্গীয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগণায় প্রবেশ করিয়া ঐ পরগণার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধন ও প্রাণ তাঁহার অত্যাচারে নষ্ট হইয়া * যায়।" "ময়মনসিংহের ইতিহাস-প্রণেতা তাঁহার ইতিহাসে Wiseএর শুধু একটি ✢ অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, নীলকর ও জমীদার,—উভয় শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য অতীতে অনেকে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

Wiseএর অত্যাচারী বলিয়া যতটা প্রবাদ ছিল,—তাঁহার দানশীলতার খ্যাতি ছিল তদপেক্ষা বেশী। কথিত আছে যে, দান করিবার সময় তিনি নিজেকে ভুলিয়া যাইতেন,—প্রজাদিগের উন্নতিবিধান তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার নিকট গতিবিধি করিবার জন্য প্রজার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। সাধারণ মজুর হইতে দেওয়ান পর্য্যন্ত উচ্চকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সঙ্গে যখন তখন সাক্ষাৎ করিতে পারিত। প্রজাদিগের সুবিধার জন্য নিম্ন নিরিখে তাহাদিগের নিকট জমী পত্তন করিতেন;—ইহাতে তাহাদিগের ভিতর কোনও অসন্তুষ্টির ভাব দেখা দিত না। ‡ তাঁহার চরিত্রে একটি বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য। তাঁহার প্রজা কি কর্ম্মচারীর উপর কেহ হস্ত উত্তোলন করিলে তাঁহার সমস্ত রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া অপরাধীকে কখনও একবারে নিষ্কৃতি দেয় নাই।

Wiseএর আশ্রিতবাৎসল্যের কথাটি উল্লেখ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে তাঁহার আশ্রিত দেওয়ান, গোমস্তা, প্রজা ইত্যাদির বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে মুক্ত হস্তে রাশি রাশি অর্থদান। তাঁহার অন্যতম দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ রায় ঢাকা জেলার চিনিসপুরের বিখ্যাত বগলা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

Wise এখন সৌভাগ্যের চরম সীমায় আরোহণ করিলেন,—তাঁহার প্রভাব পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভিতর সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, অর্থ, পদ, মর্য্যাদা তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল,—এখন তিনি কমলার বরপুত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। এখন তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির কথাটি মনে পড়িল। অগৌণে তিনি Irelandএর Cork নগরে একটি সুরম্য বিরাট্ প্রাসাদ (Castle) নির্ম্মাণ করাইয়া নামকরণ করিলেন—Rostellan Castle এবং এই স্থানে জীবনের সায়াহ্নটি যাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে Wiseএর স্মৃতিটি এখনও ঢাকা হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—তাঁহার অধিকৃত গৃহটি আজিও '*Wise House*' নাম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতিটি বহন করিতেছে। তাঁহার পরম মিত্র * হোসেনসাহী পরগণার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম জমীদার নন্দলাল মুন্সীর উত্তরাধিকারিগণ এই বাড়ীটির বর্ত্তমান মালিক।

বাঙ্গালার ছোট লাট Hallidayএর সময় হইতে নীলকরগণের ক্ষমতা চরম সীমায় দাঁড়ায়। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর, যশোহর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ইহাদিগের অত্যাচারে প্রজাকুল জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া অনেকে প্রাণ হারাইতে লাগিল,—শত শত লোক "কুঠী কুঠী চালান" হইয়া নিরুদ্দেশ হইতে লাগিল, এই পাপের স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য অতি অল্প লোকই অগ্রসর হইতে সাহস করিল। যাহারা করিল, তাহারা নিরুদ্দিষ্ট হইয়া নীলের চুল্লীর ভিতর আহুতি দিল নিজেদের প্রাণ। দেশের এই দুর্দ্দিনে প্রাণকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল বাঙ্গালার একটি অখ্যাত পল্লীর শুধু একটি নগণ্য ভূম্যধিকারী—হাঁসখালি গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদার। এই মহাপ্রাণ বাঙ্গালার সুসন্তানটি তাঁহার প্রজাদিগকে লইয়া নীলকরের অবৈধ কার্য্যে বাধাপ্রদান করিত, অবশেষে হঠাৎ এক দিন নীলকুঠীর একটা ভীমদর্শন হস্তী অস্ত্রধারী লোক সহ গোবিন্দপুরে ✢ উপস্থিত হইল, দরিদ্র গ্রামবাসিগণের যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, এবং গোপাল আহত হইয়া ধৃত হইল, তাহাকে আর দেখা গেল না! "তাহার মৃত দেহ তাহার বন্ধু-বান্ধবের হস্তে পড়িতে না পারে, সেই জন্য নীলের গিঠির দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলা হয়!" ‡

গোপালের শোচনীয় মৃত্যুটি বাঙ্গালার দুর্ব্বল কৃষককুলের অন্তরে যেন আগুন ঢালিয়া দিল, বাঙ্গালার হাটে মাঠে ঘাটে সহস্র কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—"মোরা আর নীল করবো না,"—এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে নীলকরের বিপুল অভিযান ব্যর্থ হইতে লাগিল। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র নীলকরগণ যথেচ্ছাচারিতার স্রোত

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাস) (৺কেদারনাথ মজুমদার)

✢ যোলহাসিয়া কুঠীর অধ্যক্ষ দেবু মালির বাড়ী লুঠ করেন ও তাহার ভাই লেভুকে ধরিয়া লইয়া ঢাকার অন্তর্গত একডালার কুঠিতে চালান করেন।—Babu Ramsanker Sen's letter, dated 8. 2. 62

(ময়মনসিংহের ইতিহাস)

‡ "He also lets his fields in the neighbourhood of indigo lands at low rents in order to ensure the cultivators acting with him."

(W. W. Hunter)

* ময়মনসিংহের একটি সুবৃহৎ পরগণা।

✢ নদীয়া বিভাগের একটি পল্লীগ্রাম!

‡ নবজীবন—১২৯৩

প্রবাহিত করিল! "১৮৪৩ সন কাগমারীর * নীলকুঠীর অধ্যক্ষ কিং কতকগুলি প্রজাকে আবদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে নীলের দাদনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায়, এক জন প্রজার মাথা মুড়াইয়া তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলবীজ বুনিয়া দেওয়া হয় ও অপর এক জনকে বৃহৎ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীযোগে বেলকুচির † কুঠীতে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েক জন এই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া নীলের দাদন লইয়া পরিত্রাণ লাভ করে। যথাসময়ে প্রজাগণ গোলোকনাথ রায়ের ‡ নিকট কিং 'সাহেবের' অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করাইলে, গোলোকনাথ সদলবলে কিং 'সাহেবের' কুঠী আক্রমণ করেন ও কিং 'সাহেবকে' গোপন করিয়া রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়।

এ দিকে কিং সাহেব ও গোলোকনাথ কাহারও তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট গোলোকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাবনার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও মালদহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন। গোলোকনাথকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। বহুদিন পর পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করিলেন।" § এই ভাবে নীলকর ও প্রজাসাধারণের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। ১৮৪৯ খৃঃ এপ্রিল ও নভেম্বর মাসে প্রজাদিগের ভিতর নীলকরদিগের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল। এই সময় নদীয়া জেলার চৌগাছানিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস,—এই দুইটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালার সুসন্তান নীলকরদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আত্মরক্ষার্থ বাখরগঞ্জ জেলা হইতে কতিপয় দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়াল আমদানী করিলেন। ইঁহারা দুই জনই পূর্ব্বে নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু বিবেক ও মনুষ্যত্বের আহ্বানে তাঁহাদের অন্তরের মানুষটি গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল—অসহায় প্রজাদিগের ও দেশের দুঃখ মোচন করিবার জন্য। তাঁহারা আজ তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহাদিগকে প্রায় ১৭ হাজার টাকা নীলকরদিগের বিরুদ্ধে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কোম্পানী বাহাদুর নীলকরদিগের সুবিধার জন্য একটা বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। নীলকরদের সহিত চুক্তিবদ্ধ প্রজাদিগকে নীল বপন করিতে হইবে, নচেৎ কারারুদ্ধ হইতে হইবে, এই আইনটি ১৮৬০ খৃঃ বিধিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রজাদিগের শক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

যখন বাঙ্গালার পশ্চিম অঞ্চলটি নীলের আন্দোলনে আলোড়িত হইতেছিল, তখন পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে প্রজাদিগের ভিতর একটি বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। নদীয়া, কৃষ্ণনগর, যশোহর, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে নীলের জন্য যে প্রজার অসংখ্য অমানুষিক নৃশংসতার কথা শুনা যায়, Wiseএর কর্ম্মক্ষেত্র ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলায় সেই প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও সংখ্যায় ছিল অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই বিরাট আন্দোলনে দেশের প্রাণের ভিতর একটা তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। নীল-বিদ্রোহিগণ দলে দলে কারাগার বরণ করিতে লাগিল,—তাহাদের প্রতিজ্ঞা—"মোরা নীল করবো না"—অটল রহিল, একটু নড়িল না! এই সময় Sir John Peter Grant এই আন্দোলনটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বলেন,—" I do not know whether it even fell to the lot of an Indian Officer to steam for fourteen hours through a continuous double street of suppliant for justice; all were most respectful and orderly but also were plainly in earnest It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children, has no deep meaning."

অবশেষে প্রজার সাহস ও ধৈর্য্য জয়যুক্ত হইল, নীলের ব্যবসায়টি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গরা এই দেশ হইতে নীলের জাল গুটাইতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে অতি অল্পকালের ভিতর বাঙ্গালার নীলকুঠীগুলি শৃগাল ইত্যাদি জন্তুর আবাসস্থল হইতে লাগিল।

Wise সাহেব এই দেশে ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ছিলেন। প্রিয় জন্মভূমির আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, তদনুসারে ১৮৬৭ খৃঃ তিনি তাঁহার সাধের "Rostellan Castle"এ জীবনের শেষ দিনগুলি যাপন করিবার জন্য তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত কর্ম্মভূমি পূর্ব্ববাঙ্গালাকে পরিত্যাগ করিয়া Irelandএর দিকে যাত্রা করিলেন।

স্বদেশযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নীলকুঠী ও জমীদারীর পরিচালনভার একটি সুযোগ্য * ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। ১৮৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার নীলের কারবারটি ছিল। যে দিন এই কারবারটি বন্ধ করা হইল, সেই দিন দলে দলে কুঠীর লোক আসিয়া ম্যানেজার 'সাহেবকে' ব্যবসায়টি পুনরায় খুলিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কিন্তু যখন ইহা নিষ্ফল হইল, তখন তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। তাঁহার পূর্ব্ববাঙ্গালার কতিপয় সম্পত্তি ১৮৭০ খৃঃ বিক্রীত হইল। ১৮৯৭ খৃঃ ৩রা জুলাই তিনি Irelandএর Cork নগরে তাঁহার সাধের "Rostellan Castle" নামক ভবনে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি চরমপত্র দ্বারা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র Dr. Wiseকে Residuary legatee এবং ভাগিনেয় Mr. Thomsকে ভারতবর্ষে অর্জ্জিত যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র Executor নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

* ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল উপবিভাগের অন্তঃপাতী একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান।

† বর্ত্তমানে ইহা পাবনা জেলার একটি গ্রাম।

‡ সন্তোষের প্রাতঃস্মরণীয়া ভূম্যধিকারিণী জাহ্নবী চৌধুরাণীর স্বামী (?)।

§ ময়মনসিংহের ইতিহাস।

(৺কেদারনাথ মজুমদার)

* Mr. J. J. Gray.

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাঙ্গালার জমীদারী ৫০ লক্ষ টাকা এবং Scotland ও Irelandএর সম্পত্তি যথাক্রমে—৬৫ হাজার ও ১৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইল। *

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী,
বি, এ, এম, আর, এ, এস (লণ্ডন)।

বাঙ্গালী ও ওড়িয়া

বাঙ্গালী ও ওড়িয়ার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ—এত নিবিড়ভাবে জড়িত—এত ঐতিহাসিক ঘটনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে, এই দুইটি বাহ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও বোধ হয়, একই জাতির দুই মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ একটা দেশের ইতিহাস, একটা জাতির প্রাণ-প্রবাহ। মনুসংহিতায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধ একসঙ্গে অপাংক্তেয় হইয়াছিল।

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥"

কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, গঞ্জাম রাজ-মহেন্দ্রপুর ও তেলেগু প্রদেশ লইয়া কলিঙ্গপ্রদেশ অভিহিত হইত। যাহা হউক, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজা অশোক ভীষণ যুদ্ধের পর কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, ঐ মহাসমরে এত অধিকসংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছিল যে, রাজা অশোক জীবনে আর যুদ্ধ করেন নাই। এই কলিঙ্গবিজয়ের পরেই রাজা অশোক ভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীর মতে রাজা চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোকে পরিণত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার নানা স্থানে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৎসরাধিক পূর্ব্বে প্রাচীন ঐতিহাসিক-কীর্ত্তি-সংগ্রাহক পুরীর শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায় অশোকের অনুশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন উড়িষ্যার নদীতীরে, গিরি-গুহায় বৌদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধকীর্ত্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে। তেলেগু দেশের তুলনায় উড়িষ্যায় অশোকের কীর্ত্তি এত বেশী যে, অশোকের প্রভাবকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে উৎকলকে কলিঙ্গ নামে অভিহিত করা সমীচীন হইবে। অতি প্রাচীনকালে কলিঙ্গদেশ বহু বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ এবং তেলেগু-উত্তরাংশ কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।

উড়িষ্যা আমাদের এত নিকট যে, আমরা পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ন্যায় উড়িষ্যাবাসীকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছি। ছোট ছোট ছেলেরা সে দিনও বলিয়াছে—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু,
লাফ দিয়ে গাছে চড়ে ল্যাজ নাই কিন্তু।"

সুতরাং বাঙ্গাল ও উড়িয়াতে বাঙ্গালী বিশেষ প্রভেদ দেখিত না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের সঙ্গে বাঙ্গালী একসঙ্গে বাঙ্গাল ও ওড়িয়ার নাম করিয়াছে, জাতির মত ব্যবহার—ঈর্ষ্যায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়াছে। কিন্তু ওড়িয়া "বিশ্বনাথের" 'সাহিত্যদর্পণ' বাঙ্গালীর অলঙ্কারশাস্ত্র—গৌরবের সামগ্রী। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শচীমাতার আদেশে নীলাচলে বাস করেন। কারণ, নদীয়া ও নীলাচলে সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিতেছে। কান্যকুব্জ হইতে যেমন বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ আসিয়াছিলেন—উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ ও করণেরা তেমন কান্যকুব্জকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের আদি-বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আহার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, পর্ব্ব-উৎসবে বাঙ্গালী ও ওড়িয়ায় বেশ সাদৃশ্য আছে। ভাষার শব্দে পরস্পরের বেশ আদান-প্রদান ছিল। উড়িষ্যার গণ্ডগ্রামে বা পল্লীগ্রামে বাঙ্গালা কাশীরাম দাসের মহাভারত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত হয়। অবশ্য ওড়িয়া সরল দাসের মহাভারত উড়িষ্যায় বিশেষ প্রচলিত। বাঙ্গালা দেশেও সরল দাসের মহাভারত এক সময়ে চলিত ছিল। জগন্নাথ দাসের "ভাগবত" হিন্দুস্থানের "তুলসীদাসে"র রামায়ণের মত আদৃত হয়—শুধু আদৃত নহে, পূজিতও হয়। প্রায় গ্রামে "ভাগবত গদি" ও "ভাগবত-ঘর" বিদ্যমান আছে। এই জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং ইঁহাকে তিনি "অতি বড়" আখ্যা দান করেন। এই "অতি বড় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত" ওড়িয়া জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোক। প্রায় প্রত্যেকের কণ্ঠে "তুলসীর মালা"। গৌর নিত্যানন্দ অনেক ওড়িয়ার ইষ্ট, কিন্তু "গৌড়ীয় সম্প্রদায়" হইতে ইঁহারা বিভিন্ন। শ্রীশ্রীচরণদাস রাধারমণ দাস তাঁহার অনুচর রামদাস বাবাজী গৌড়ীয় মতকে উড়িষ্যায় প্রচলিত করিয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্বে "শ্যামানন্দের" প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হইত এবং হাজার হাজার ওড়িয়া শ্যামানন্দ-শিষ্য ও শাখাভুক্ত। অদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ শাখাভুক্ত কতকগুলি বৈষ্ণব-বংশ উড়িষ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "জগন্নাথ দাস" ও "ওড়িয়া মঠ" উড়িষ্যার নিজস্ব। বৌদ্ধযুগের "কাহ্নুর চর্য্যাপদ" লইয়া বর্ত্তমান সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভিন্নমত। শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন,—ইহা ওড়িয়া ভাষায় রচিত। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন,—ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা। বাঙ্গালা প্রাকৃত মাগধীর নামান্তর—ওড়িয়া ওড্র মাগধীর সন্তান। বাঙ্গালা ও ওড়িয়ার মূল মাগধী। বাঙ্গালায় যেমন "চৌতিশা" প্রচলিত আছে, ওড়িয়া ভাষায় তেমনি "চৌতিশা" চলিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ওড়িয়া সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত। শুধু ওড়িয়া সাহিত্য কেন, ভারতবর্ষের সমগ্র প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা ইহা বলা যায়।

বাঙ্গালী ও ওড়িয়া অনেক দিন একান্নভুক্ত পরিবারের মত ছিল। সুবে বিহার বাঙ্গালা উড়িষ্যা হইতে সম্প্রতি বাঙ্গাল দেশ রাজাদেশে পৃথক্ হইয়াছে, কিন্তু বিহার অপেক্ষা বাঙ্গালা সহিত ওড়িয়ার নাড়ীর টান বেশী।

দুঃখের বিষয়, অনেক বাঙ্গালী—অনেক ওড়িয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন না। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ "উড়িষ্যার চিত্রে" অতি সামান্যভাবে ওড়িয়ার গ্রাম্য ...

---

* J. P. Wiseএর বিবরণটি শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল, মহাশয় কৃত—The Indigo Planter Mr. Wise নামক পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত।

আঁকিয়াছেন। সম্প্রতি কটকের প্রসিদ্ধ এডভোকেট পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় "উড়িষ্যার কথা" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল, শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার যথার্থ ইতিহাস একখানি আছে কি না সন্দেহ করি। যে কয়খানি ইতিহাস দেখিয়াছি, সেগুলি প্রায়ই বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিয়া লিখিত। উড়িষ্যাবাসী কোন দেশীয় ঐতিহাসিকের দ্বারা লিখিত না হইলে উড়িষ্যার প্রকৃত ইতিহাস বাহির হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তাই আমি উড়িষ্যার অধিবাসীদিগের সাহায্যে উড়িষ্যার একখানি খাঁটি ইতিহাস প্রণয়নের জন্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সতীন্দ্র বাবুর "উড়িষ্যার কথা" প্রকাশ হইবার পর দেখিলাম যে, ইনিই সেই ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত। তাহা দেখিয়া আমি আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। গ্রন্থখানির নাম বিষয়-সূচক 'উড়িষ্যার কথা' হইলেও আমি ইহাকে উড়িষ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া মনে করি।" কিন্তু ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে, ইহা পড়িয়া কৌতূহল বৃদ্ধি হয় ছাড়া তৃপ্তি হয় না। পরলোকগত সুহৃদ্বর সুপণ্ডিত এঞ্জিনিয়ার মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্পের উপর একটি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনুজতুল্য সুহৃদ্বর শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বসুর প্রণীত "কণারকের ইতিহাস" উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের বুলি আওড়ান নহে—সম্পূর্ণ খাঁটি স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা চিরকাল উড়িষ্যার প্রাচীন ঐতিহাসিক শিল্পের প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী ও ওড়িয়ার কি সম্বন্ধ, তাহার উল্লেখ নাই। সতীন্দ্র বাবু তাঁহার "উড়িষ্যার কথায়" "উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ" পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, "উড়িষ্যায় বহু বাঙ্গালীর বাস। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় বাস করিতেন।" তাঁহার মতে (১) "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় পুরীতে বাস করিতেন, সে সময়ে বহু বাঙ্গালী যাত্রী প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শনে আসিতেন। তাঁহারাই স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। (২) কোন কোন পাঠান শাসনকর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যাবাসী সতীন্দ্র বাবু বলেন, "ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জাতি দেখা যায়। কায়স্থ, তিলি, তাম্বুলী, নাপিত, সুবর্ণবণিক্ ও অন্যান্য নবশাখ জাতি বহু পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার অভ্যন্তরে জমী-জমা লইয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। যে সকল কায়স্থ বা অন্যান্য জাতি উড়িষ্যায় বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের গুরু বা পুরোহিত তাঁহাদিগের সহিত আসেন নাই। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সুদূর উড়িষ্যাবাসী শিষ্যের গৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন।"

এই সকল ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী "ভাষা হিসাবে প্রায় সকলেই বাঙ্গালাভাষী; তবে দুই এক স্থানে নাপিত, তিলি ও সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে।" উড়িষ্যায় প্রাচীন প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে ওড়িয়া জাতি "ক্যারা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আমরাও ওড়িয়া জাতিকে "উড়ে" বলিয়া ডাকি। তাহা ছাড়া ওড়িয়া বাঙ্গালীর সঙ্কর-সন্তানরাও একটি বিশেষ সঙ্কর জাতি হইয়াও আছে। সতীন বাবু বাঙ্গালী বসবাসের যে দুইটি কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুমান-মাত্র। বিশেষ ঐতিহাসিক গবেষণা হয় নাই। বাঙ্গালী "জয়দেব" কেন্দুবিল্ব হইতে উড়িষ্যাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি ওড়িয়া ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ওড়িষ্যার হাটে মাঠে ঘাটে গীত হয় কেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, "সার্ব্বভৌম" ও "কাশীমিশ্র" নবদ্বীপ হইতে আসিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং "রাজগুরু" "রাজপণ্ডিত"-রূপে তাঁহারা পুরীধামে বাস করিতেন। এইগুলি শ্রীচৈতন্য-প্রভাবের পূর্ব্বেও দৃষ্ট হয়। নদীয়া ও নীলাচলে সর্ব্বদা লোক-যাতায়াত আছে বলিয়া শচীমাতা মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসের পর পুরীধামে বাস করিতে বলিলেন। কেন না, তাহা হইলে শচীমাতা মহাপ্রভুর খবরাখবর সর্ব্বদা পাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালায় নবম দশম শতাব্দীর ভাস্কর ও প্রস্তর-শিল্পের সহিত উড়িষ্যার ভাস্কর ও প্রস্তর-শিল্পের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, ইহা বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকদের মত। সুতরাং মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বে যে ওড়িয়া ও বাঙ্গালীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিতে হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থকে মূল ধরিয়া অনেকে ঐতিহাসিক তথ্য নিবদ্ধ করেন। ইহাতে যে ইতিহাসকে কতদূর বিকৃত করা হয়, বলা যায় না। আমরা সামান্য পরিশ্রম করিলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বুঝিতে পারি, যে কোন বিদেশীর তাহা বুঝিতে বহু বর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইবে। ভারতবাসীর যে বিশেষ বিশেষত্ব আছে, তাহা বিদেশীরা বুঝিতে পারিবে না। এ ক্ষেত্রে আমরা কি বাঙ্গালী কি ওড়িয়া যুবকদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি—তাঁহারা ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কুসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প হউন। ওড়িয়া ও বাঙ্গালীর অতীত কাহিনী গৌরবমণ্ডিত। পূর্ব্ব-পুরুষদের গৌরব-কীর্ত্তি উদ্ধার করিতে কাহার হৃদয় না আনন্দে পূর্ণ হয়?

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পদসংগ্রহ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুপ্রসিদ্ধ সার এডোয়ার্ড গেট রুদ্রসিংহ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

রুদ্রসিংহ বর্ণজ্ঞানশূন্য হইলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিকল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল। আহোম রাজগণের মধ্যে রুদ্রসিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইরূপ মত অনেকে পোষণ করেন। তিনি

নামড়ং প্রভৃতি নদীর উপর ইষ্টকরচিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জয়সাগরে বিরাট দীর্ঘিকাসমূহ ও মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তির পরিচায়ক। রঙ্গনাথ, খড়িকাটিয়া প্রভৃতি স্থানের দীর্ঘিকা খনন ও মন্দির নির্ম্মাণ করার ফলে তিনি পার্ব্বত্য জাতিসমূহের শ্রদ্ধা ও বশ্যতার অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। তিব্বতের সহিত এতদঞ্চলের বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্বন্ধ তাঁহার চেষ্টার ফলেই স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বজগণের নীতি পরিহার করিয়া রুদ্রসিংহ ভারতবর্ষের সমসাময়িক বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক রীতিনীতিগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যেগুলি স্বরাজ্যের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বহু শিল্পী আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য বহুবিধ বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ-ছাত্রকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া তথায় বিদ্যার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শিবসাগর জরীপ তাঁহার রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। রুদ্রসিংহ স্বয়ং জরীপ এবং সেটেলমেণ্টের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

এ উক্তির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সার এডোয়ার্ডের রুদ্রসিংহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত উক্তিই সত্য, কেবল রুদ্রসিংহ বর্ণজ্ঞানহীন ছিলেন, এই কথাটি সত্য নহে। রুদ্রসিংহ মোটেই নিরক্ষর ছিলেন না; তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয়ই জানিতেন। তিনি অনেক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের কয়েকটি আমাদের পুথিতে আছে। এগুলি পরে উদ্ধৃত করা হইবে। তাঁহার আদেশে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার সভাসদগণ কর্তৃক ভাষায় অনূদিত হয়। দ্বিজবর ধরণীশূর কবিচক্রবর্ত্তী কর্তৃক জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ * তাহাদের অন্যতম। অনুবাদের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,—

হেন কৃষ্ণপদ-পঙ্কজর মধুকর।
পৃথিবী পালিলা রুদ্রসিংহ নরেশ্বর॥
* * *
হেন নৃপতির আজ্ঞা শিরোগত করি।
কৃষ্ণপদ পঙ্কজক হৃদয়ত ধরি॥
নিগদতি দ্বিজবর শূন্য সভাসদ।
নিবন্ধ করিলো গীতগোবিন্দর পদ॥

পুনরায় অন্যত্র,—

গুণর মন্দির পরম রুচির
রুদ্রসিংহ মহামতি।
দুর্জ্জন-শমন সভার রঞ্জন
অনাথ সবার গতি॥
* * *
হেন নরপতি দিলা অনুমতি
হ'তো পদ নিবন্ধনে।
তান আজ্ঞা-বাণি শিরোগত মানি
রচিলো পদ যতনে॥

রুদ্রসিংহের পুত্রসংখ্যা পাঁচটি; প্রথমা মহিষীর গর্ভে শিবসিংহ ও প্রমত্তসিংহ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাণীর গর্ভে যথাক্রমে বর্জ্জন, রাজেশ্বর সিংহ ও লক্ষ্মীসিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

রুদ্রসিংহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসিংহ সিংহাসন আরোহণ করেন (১৭১৪ খৃঃ)। পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে তিনি শান্তিপুরে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। কামাখ্যাধামের দেবীর পূজা-অর্চ্চনাদির ভার গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি তথায় তাঁহার বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, শিবসিংহ গুরুকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। আজিও কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের বংশধরগণ আসামে পর্ব্বতীয়া গোসাই নামে পরিচিত ও আসামের শাক্ত সম্প্রদায় এখনও তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ১৭১৪ হইতে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবসিংহ নিজে রাজ্য চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যভার তাঁহার প্রথমা মহিষী প্রমথেশ্বরীর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭২৪ হইতে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয় বৎসরের মুদ্রা প্রমথেশ্বরীর নামে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে প্রথমা মহিষী 'বড় রাজা' নামে অভিহিত হইতেন। প্রথমা মহিষীর মৃত্যুর পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত শিবসিংহ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আবার ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে উহা দ্বিতীয়া মহিষী অম্বিকা দেবীর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৩২ হইতে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রা অম্বিকা দেবীর নামে অঙ্কিত। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা দেবীর মৃত্যুর পর ১৭৩৬—৩৮ পর্য্যন্ত শিবসিংহ পুনরায় রাজ্য নিজ হস্তে লন। ১৭৩৮ হইতে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য তৃতীয়া মহিষী সর্ব্বেশ্বরীর হাতে যায়। এই কয় বৎসর রাণী সর্ব্বেশ্বরীর নামেই মুদ্রা অঙ্কিত হয়।

শিবসিংহের রাজত্বকাল বেশ শান্তিতে কাটিয়াছিল, কেবল ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে একবার ডফলা জাতি বিদ্রোহ করে, কিন্তু উহারা অতি সহজেই দমিত হয়।

শিবসিংহ ধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অনেক মন্দির, সরোবর ও রাজপথাদি নির্ম্মাণ করান।

গৌহাটী জনার্দ্দন-মন্দির (১৭২০ খৃঃ), শুক্লেশ্বর-মন্দির (১৭২০ খৃঃ), উগ্রতারা-মন্দির (১৭২০ খৃঃ), উমানন্দ-মন্দির (১৭২০), খারিজা বরগুীর চণ্ডিকা-মন্দির (১৭২৫ খৃঃ), মাদারটোলার গোপেশ্বর-মন্দির (১৭২৫ খৃঃ) এবং উত্তর-গৌহাটীর অশ্বক্রান্ত মন্দির (১৭২১ খৃঃ) ও রুদ্রেশ্বর-মন্দির, উত্তরসঙ্গ রঙ্গেশ্বর মৌজায়—অগ্নিবাণেশ্বর-মন্দির (১৭৩০ খৃঃ), ভৃঙ্গেশ্বর মন্দির (১৭৩০ খৃঃ), ধারেশ্বর-মন্দির (১৭৩০ খৃঃ) ও সিদ্ধেশ্বর-মন্দির—রাজা শিবসিংহের আদেশে নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ১মা মহিষী প্রমথেশ্বরী কর্তৃক শিবসাগরের নিকটে নাংতিদোল মৌজায়—গৌরীশঙ্করদোল, শিবদোল ও দেবীদোল মন্দিরত্রয় (১৭২৭ খৃঃ); দ্বিতীয়া মহিষী অম্বিকা দেবী কর্তৃক শিবসাগর নগরে শিবদোল, বিষ্ণুদোল ও দেবীদোল (১৭৩৪ খৃঃ) মন্দিরত্রয় এবং শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার চতুর্থা মহিষী—(পরবর্ত্তী রাজা লক্ষ্মীসিংহের মাতা) কর্তৃক নাংতিদোল মৌজায়—বগীদোল (১৭৬৯ খৃঃ) ও শিবসাগরে ঈশানেশ্বর শিবের মন্দির (১৭৬৯ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। (Assam Gazeteer 1906) সার এডোয়ার্ড গেটের ইতিহাসে (পৃঃ ১৮৪) শিবসিংহকে এক

---

* এই গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

জন পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের পদ-গ্রন্থেও তাহার একটি পদ আছে। তাঁহার রচিত অন্য পদ আমি দেখি নাই। রাজা শিবসিংহও পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার প্রথমা মহিষীর আদেশে কবিচক্রবর্ত্তী ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ অনুবাদ করেন। (১)

হেন শিবসিংহ রাজা প্রথম-ঈশ্বরী।
মনুষ লোকত জেন শিব মহেশ্বরী॥
তাঁহান আদেশ-মালা শিরোগত করি।
কবিরাজ চক্রবর্ত্তী মতি অনুসরি॥
পুরাণর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
কৃষ্ণখণ্ড জন্ম তাতে পরম প্রধান॥
* * * *
তথাপি তো পদবন্ধে দেশভাষা ধবি।
মতি অনুসারে বিরোচিলো জন্ম করি॥

'আনন্দলহরী' (২) রচয়িতা কবি অনন্তাচার্য্যও শিবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তদীয় গ্রন্থে রুদ্রসিংহ-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর নগরের বর্ণনা, রাজা শিবসিংহ ও তদীয় প্রথমা রাণী প্রমথেশ্বরীর গুণগান ও রাজার অন্যান্য সভাসদদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

সৌমার পীঠর সম পীঠ নাহি আন।
সততে থাকন্ত যথা ভবানী-ঈশান॥
সেই পীঠমধ্যে আছে পুরী নানা খান।
কেহো নহে রঙ্গপুর নগরী সমান॥
* * *
এহি দেব সকলে স্বকীয় অস্ত্র ধরি।
দুই (৩) নৃপতির রক্ষা করে যত্ন করি॥
বশিষ্ঠ জাহ্নবী জিতো পুরীর উওরে।
জলদুর্গরূপে বহি থাকে নিরন্তরে॥
পশ্চিমতো নামডাঙ্গ (৪) জলের গহন।
সর্ব্বকালে বহে যায় নাহি বিরামন॥
ডিম্বাবতী দক্ষিণে * * পূর্ব্বভাগে।
এই জলগড় বিধি সৃজিয়াছা আগে॥
* * *
সেহি সে নগরী * * অমরাবতী।
তাতে শিবসিংহ ভৈলা দুতি (২য়) সুরপতি॥
* * *
প্রমথেশ্বরী সে ভৈলা পাটেশ্বরী।
রূপে গুণে কৈতো যার নাহি সরিবরি॥
* * *

প্রতাপে কালিকা জেন ক্ষমাত ধরণী।
পতিব্রতা ধর্ম্মে জেন রামর রমণী॥
* * *
জার গুণ গণে তুষ্ট হৈয়া নরপতি।
ছত্র সিংহাসন দিয়া পাতিল নৃপতি॥
বড়জনা রাজা হেন প্রখ্যাত জগতি।
* * *
তান উপাসক আছে অনেক ব্রাহ্মণ।
বৃহস্পতি সম অতি পণ্ডিত গহন॥
তা সভার সঙ্গে থাকি মুঞি আকিঞ্চন।
রাজা দুজনার হিত বাঞ্ছো প্রতিদিন॥
* * *
অনন্ত আচার্য্য ভবে এডি আন বাণি।
নিরন্তরে বোলো নরে শঙ্কর ভবানী॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজা রুদ্রসিংহ, শিবসিংহ ও তদীয় মহিষীরা আহোম হইলেও হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। আসামের প্রধান মন্দির ও সরোবরগুলি প্রায় সমস্তই তাঁহাদের আদেশে নির্ম্মিত। তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে গুরু আনাইয়া দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নগরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাঙ্গালী বিদ্বান্ পণ্ডিত আনাইয়া বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক পুরাণাদি ভাষায় অনূদিত করাইয়াছেন। এই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য রাজাদের সহিত সাহিত্য-চর্চ্চায় আনন্দে দিনযাপন করিতেন। এই সংস্রবে যে বর্ত্তমান পুথির ন্যায় একখানি পদাবলী সঙ্কলিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রমুখ কয়েক জন কবি ব্যতীত অন্য সকলেরই নাম অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব। তাহাতে মনে হয়, অবশিষ্ট কবিগণ সেই সময়ে আহোম রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন বা ঐ কবিগণের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

বিস্মৃতিগর্ভ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নে আপাততঃ সংগৃহীত সমস্ত পদই যথাযথভাবে প্রদত্ত হইল। পদগুলি যথাসম্ভব যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং ভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

কবি গোপালচন্দ্র অধ্যায় ৪। পদ ৪২

রাগ সারেঙ্গ

রুদ্রসিংহ মনুজ রুদ্র অবতারি
হেতু যবন দণ্ড সঙ্গে সৈন্য প্রচণ্ড
সমরে সত্বর শুভকারী।
গজবাজি বাদ্যভণ্ড অনুপম প্রতাপখণ্ড
ছত্রদণ্ড বর স্থির।
নররূপে নরেশ্বর ধর্ম্মরূপ কলেবর
বীররূপ বিজয় শরীর।
প্রচুর জলদঠাম পুত্রদ্বয় * অনুপাম
মূরতি মধুর মনোহারী।

---

(১) (২) পুথি দুইখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব।

(৩) রাজা শিবসিংহ ও রাণী প্রমথেশ্বরী, রাণী প্রমথেশ্বরীকে বড় রাজা বলা হইত।

(৪) বাঙ্গালী ঘনশ্যাম কর্ত্তৃক ইহার উপর সেতু নির্ম্মিত হয়।

See Gait's History of Assam, p. 183, 2nd Edition.

* রুদ্রসিংহের পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। অনুমান হয়, এই কবিতা রচনাকালে তাঁহার দুই পুত্রমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অপর পুত্রগণ তখনও জন্মায় নাই। সুতরাং এই কবিতার রচনাকাল রুদ্রসিংহের রাজত্বের প্রথমভাগে অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে।

বচন অমৃত বাণি বিকসিত সৌদামিনী
চাহিলেন চমকে রূপ হেরি।
তনু অতি নিরমল রূপ রঙ্গ টল টল
সামরাজে সতত বিহারি।
নিরখিতে সদানন্দ গাবে গোপালচন্দ্র
শান্ত সুজন হিতকারী॥

রাজা রুদ্রসিংহ। অ ৯। প ৪।

মাই মোহে রাখিয়া চরণতলে।
অন্তকালে গতি তব পদবজমূলে॥
পূজা স্তুতিতে দেবি আইলা মোর ঘরে।
কি দিয়া তুষিব গোসানি চরণ তোরে॥
হুয়োক প্রসন্ন মাতা দেহ পদ-চায়া।
ইবার তরাও মোকে দেবী মহামায়া॥
নিজ গুণে তুষ্ট হুয়া * * দাসর।
মিনতি করত রুদ্রসিংহ নৃপবর॥

অ৯।প৫।

এ হরি চরণে রাখিও তোরে।
তব ভয় দূর করি তারিয়োক্ মোরে॥
লোভে মোহে কাম ক্রোধে বৈরিগণ সঙ্গে।
বিষয় গরল বিষ ভখিলো রঙ্গে॥
হামো মায়াপাশে বন্দী এড়াইতে না পারি।
ছেদিয়ো সংসার-বন্ধ রাখিও মুরারি॥
কি কাম করিলো হেলে আন বিগড়াইলো।
তয়ু নাম মু সুমরি আপুনি নশিলো॥
পতিতর বন্ধু কৃপা করিয়োক জানি।
নৃপ রুদ্রসিংহ বোলে রাখিয়ো সারেঙ্গ পাণি॥

অ৯।প৬।

'মিলনি কানুর কোলে।
ধনি রাধে
চাচর চিকুর বিরচিত মৈ
দেখি অলিকুল ভুলে॥
রসেব আবেশে নানা আভরণ
শরীর অধিক সাজে।
কামের কামান জিনি ভ্রুব যুগ
কপালে সিন্দুর রাজে।
রাধা সে রঙ্গিণী সুরতরঙ্গিণি
বদন চন্দ্রর কান্তি।
রসে ডগমগ গমন গম্ভীর
চলিবে নানান ভঙ্গি॥
শ্যাম অঙ্গ মাঝে বহি রূপ রাজে
ঘনের মাঝে দামিনী।
বদনে বদন করিয়া চুম্বন
ভুলিল রাধিকা বাণি॥
বাহু বাহু মেলি করে নানা কেলি
রাই শ্যাম রঙ্গ মনে।
রুদ্রসিংহ কয় মনে হেন লয়—
রাধার কানু পরাণে।

অ৯।প৭।

ঈষৎ হসিতা বদন রচিতা
কনক কমল কান্তি।
দেখি মনোহর রাতুল অধর
দশন মুকুতা পান্তি।
ধনি রাধে রূপ লাবণি।
বেশ বনাবৃত মদন মোহিনি।
মণি মুকুতাগণ করি আভরণ
নীল বস্ত্র অঙ্গে পৈরে।
সিথে ত সিন্দুর দেখিব রুচির
নয়নে অঞ্জন ধরে॥
রতি-রস আশে মনত হরিষে
গমন গম্ভীর অতি।
রাধিকার রূপ বোলয় অনুপ
রুদ্রসিংহ মহীপতি॥

অ১০।৫১

আইল রে গৌরী প্রসন্ন মন।
পূর্ণিমার শশী সম জলজ বদন॥
শিরত কিরীটী শোভে গায়ে অমূল্য বসন।
কর্ণে কুণ্ডল শোভে কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ॥
দশ ভুজে দশ অস্ত্র ধরিচা সঘন।
কটিত কিঙ্কিণী রাজে নূপুর চরণে॥
রূপের উপমা দিতে পারে কোন জনে।
নমি গৌরি পায়ে রুদ্রসিংহ নৃপে ভনে॥

অ১০।৫২

চললি নায়রি ভবানি মায়ি।
শঙ্কিত মনে সে আগু পাছু ধাই॥
চন্দিকি উপরে চান্দ বিবাজে।
রবি কিরণ নিখুত চান্দহি সাজে॥
আতপে তাপিত পিরীত আতি।
তচু নিবারণ চান্দহি ছাতি॥
রুদ্রসিংহ নৃপ মিনতি বোলে।
সকলে ভরষা সো পদতলে॥

রাজা রুদ্রসিংহ

জগদনুকূলং করধৃতশূলং
ভস্মবিভূষিতগাত্রং।
প্রমথ বিহারং ভুজগমুহারং
হৈমবতীরতিপাত্রং॥
নিরুপমবেশং নমতি মহীশং
নৃপতিরখিল-কৃত-সেবং।
রুচিরচরিত্রং পরমপবিত্রং
রুদ্রসিংহ ইষ্টদেবং॥

রাজা শিবসিংহ অ৫।৯৮

শারদ-পূর্ণিমা হিমকরবদনী।
চঞ্চল নীল নলিনীদল নয়নী॥

চঞ্চললোচনে কাজর রঙ্গি।
ভাঁয়ু কামান কুটিলতর ভঙ্গি।
প্রাতরুদিত রবি সিন্দুর কান্তি।
সজল মুকুতা ফল দশন পান্তি॥
সজল জলদ ইব কুন্তল জালে।
পরিমলে শোভিত মালতী মালে॥
মৃগমদ কুঙ্কুম চর্চ্চিত দেহা।
তরল ঘনান্তর দামিনী রেহা॥
শ্রীফল বিফলিত কুচ যুগ * লসে।
মত্ত দ্বিরদ গতি অতি শয় অলসে॥
রাজা শিবসিংহ ইহ রসভণিতং।
রমণি শিরোমণি রাধা চরিতং॥
দ্বিজবর ধরণীসুর কবিরাজ চক্রবর্ত্তী (১)

(১) বর্ত্তমান পদগ্রন্থে এই কবির ৬৬টি পদ আছে। ইনি রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহ উভয় রাজার রাজত্বকালেই তাঁহাদের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইনি রুদ্রসিংহের আদেশে গীতগোবিন্দের অনুবাদ ও শিবসিংহের আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুবাদ করেন। ইঁহার পদাবলীর বিষয় নানাবিধ। সংস্কৃতে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহার সংস্কৃত পদগুলি পড়িয়া অনেক সময় ভ্রম হয়,সেগুলি জয়দেবের না অপর কাহারও। সঙ্গীত ও অভিনয়কার্য্যেও ইঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। ইঁহার শুভঙ্কর নামক জনৈক শিষ্য স্বরচিত হস্তমুক্তাবলী নামক গ্রন্থে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। হস্তমুক্তাবলী হস্তভঙ্গী-বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সেই সময়ে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়। গ্রন্থকার নিজেই উহার অনুবাদ করেন। সানুবাদ এই গ্রন্থের এক খণ্ড গৌহাটী কমিশনর অফিসে ছিল। আমরা উহার প্রকাশের অনুমতি চাহিয়া পাই নাই। এখনাও আউনিয়াটি সত্রের গোস্বামীদের সম্পত্তি। এই গ্রন্থের একখানি অনুলিপি নেপাল রাজলাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। রাঘব নামক অপর এক জন কবি হস্তভঙ্গীবিষয়ক হস্তরত্নাবলী নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শুভঙ্করের হস্তমুক্তাবলী হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাঘবো হস্তরত্নাবলীর এক অনুলিপি ইংলণ্ডে Oxford Bodlian Libraryতে রক্ষিত হইয়াছে (Oxf 201 b)। শুভঙ্কর স্বীয় হস্তমুক্তাবলী গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কবিচক্রবর্ত্তী নামক বিখ্যাত কবির নিকট কবিতা রচনা, সঙ্গীত ও নৃত্যাদিতে নিপুণ হইয়াছিলেন।

অ৯।প৩।

* * *

বীর মাঝে গণি নৃপ চূড়ামণি, শিবসিংহ আদেশিত
শিবপদ মনে কবিরাজে ভণে এছ পশুপ গীত॥

অ৯।প৮

মরকত দল নীল শরীরং।
মুণিজনমানস * * *
সখি হে মামবলোকয় নন্দকিশোরং॥
বদন বিকাশিত-মদনবিকারং।
হৃদয়নিহিত বর মৌক্তিকহারং॥
রুচিকর-ভূষণ-ভূষিতশরীরং
চরণজনিত-জনপাবননীরং॥
দ্বিজবর কবিবর গান মুদারং।
ভণত বুধাভব—সাগরপারং॥

অ৯।প৯

কুচযুগ কনক কলসভর-নমিতে।
তনুরুচি বিহসিত শঙ্কর দয়িতে॥
রাধিকে নাশয় কামজ তাপময়ে।
ভাবয়ত তব মুখ মধু বিমলং।
কথমপি * * * ॥
মধুরিপু নির্ম্মিত পল্লব শয়নং।
অধিবস শশিমুখী সুন্দর চরণং॥
শ্রীকবিরাজ ভণিতমতিরুচিরং।
জনয়তু রসিক মুদা মুহু সুচিরং॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

দ্বিজবর ধরণীসুর কবিরাজ চক্রবর্ত্তীর প্রকৃত কি নাম ছিল, জানিবার উপায় নাই; কারণ, তাঁহার পদে নানা স্থানে নানা নামে তিনি নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন, যথা:—ধরণী সুর, ধরণী বিবুধ কবিরাজ,ক্ষিতিসুর, ভূসুর, দ্বিজ কবিরাজ, শ্রীকবিরাজ, দ্বিজবর, দ্বিজবর কবিরাজ, কবি চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্র দ্বিজ এবং কবিরাজ (একই পদে) দ্বিজ কবিচন্দ্র, ধরণী কবিরাজ, কবি ইত্যাদি। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার বাঙ্গালা কবিতা হইতেই বুঝা যায়

পবিত্র ও শিশুমূর্ত্তি যেন ফুল-কলি,
আধ আধ সুধামাখা মধুর বচন;
চলিবারে পদে পদে পড়ে টলি টলি,—
হাসিতে চাঁদিমা ঝরে, নয়নে স্বপন।

ক্ষণে ক্ষণে হাসে-কাঁদে তুলি কলরব,
কভু রহে চুপ-চাপ কভু বা বাচাল;
লণ্ড-ভণ্ড করে কভু গৃহ-দ্রব্য সব,—
মনে হয় পাগল কি দুরন্ত মাতাল!

ওর মাঝে হয় ত বা রয়েছে গোপন
ভবিষ্যের কবি, যোগী, গায়ক, ভাস্কর,
দার্শনিক, চিত্রকর, সুধী, মহাজন,
কপট, লম্পট, শঠ, দস্যু কি তস্কর।

সম্ভ্রমে সভয়ে তাই চাহি ওর পানে,
কত শঙ্কা কত আশা জাগে মোর প্রাণে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পথের স্মৃতি

[উপন্যাস]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন হইতে আমাদের দুই জনের বাঙ্গালা স্কুল যাইবার কথা ছিল, কিন্তু আমরা আসিলাম রায়পুকুর, আমার মাতুলালয়।

এই আসাটা একবারেই আকস্মিক। হঠাৎ সকাল-বেলায় কাপড়, গামছা হাতে করিয়া খিড়কীর পুকুর-ঘাটে যাইতে যাইতে মা কহিলেন,--"গুলি নিয়ে বেরুচ্ছ কোথায়? কোথাও আজ আর যেও না, খাওয়া-দাওয়ার পরই আজ সব আমরা রায়পুকুর যাব।"

এই রায়পুকুরের কেবল নামই এত দিন শুনিয়া আসিয়াছি এবং এই পর্য্যন্ত জানি যে, সেখানে আমার মামার বাড়ী। কিন্তু সে যে কোথায়, কেমন এবং সেখানে আমার মামাদের কে কে আছেন, সে সব কিছুই জানিতাম না। কারণ, শিশু অবস্থায় মায়ের সঙ্গে হয় ত বা সেখানে গিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর হইতে কখনও সেখানে যাই নাই। মা মাঝে মাঝে যাইতেন বটে, কিন্তু সে শুধু দুই এক দিনের জন্য এবং একেলা; কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে, মায়ের সঙ্গে ঠাকুমা সেখানে আমায় কখনও যাইতে দিতেন না। সুতরাং মামার বাড়ীর সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না। তবে জানিতাম যে, সেখানে রেলে করিয়া যাইতে হয়, নদী আছে, নদীতে নৌকা চাপিয়া যাওয়া যায়, অনেক খেজুরগাছ আছে, এই শীতকালে খুব খেজুর-রস পাওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই মা যখন কহিলেন--রায়পুকুর যাইতে হইবে--তখন নিরতিশয় আনন্দ ও উৎসাহে মনটা ভরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে কে যাব মা?" উত্তরে মা কহিলেন, "আর কেউ নয় শুধু তুমি আর বিনু!" শুনিয়া বুকটা একেবারে নাচিয়া উঠিল। বিনুদাও যাবে! মনে হইল, সেইখানে সেই গুলির থলে হাতে, বুকের সঙ্গে সঙ্গে দেহখানাকেও একবার নাচাইয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া লই, কারণ, এত সুখ যে ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেরও অতীত। তা ছাড়া, মা, বিনুদা আর আমি, বাবাও নয়, জ্যেঠামশায়ও নয়, ঠাকুমাও নয়। একবারে নিষ্কণ্টকে রায়পুকুর অভিযান ও অবস্থিতি! ছুটিয়া বিনুদাকে খবরটা দিতে যাইতেছিলাম, পিছন হইতে ঠাকুমার গলা পাইলাম,-- "২৪ ঘণ্টা যেন হৈ হৈ ক'রে সেখানে দিন কাটিও না। বই-সেলেট, খাতা-পত্তর বেঁধে নিয়ে যাবে। সকাল-বিকেল হাতের লেখা ভাল ক'রে লিখবে। নিমাই গাঙ্গুলী বিদ্যে তেমন কিছুই শেখে নি, কিন্তু লিখে লিখে হাতের লেখা এমন পাকিয়েছিল যে, আজ যে আফিসেই যাচ্ছে, সেইখানেই সাহেবের নজরে প'ড়ে যাচ্ছে। বিদ্যে যতই শেখ না কেন, হাতের লেখা ভাল না হ'লে আর সাহেবের চাকরী পাবে না।"

সেকালে সেই ছোটবেলায় ঠাকুমার কাবুলিওয়ালার তাগাদায় এই হাতের লেখার উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না; ফলে হাতের লেখাটা আমাদের খুবই ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎকালে, ঠাকুমার 'সাহেবের চাকরী' করিবার যে দুই পাঁচ বৎসর সৌভাগ্য হইয়াছিল, সেই অল্পসময়েই বুঝিয়াছিলাম যে, ও জিনিষটা একবারেই লোকসানের সামিল হইয়া গিয়াছে সব চেয়ে মূল্যবান্ ব'লে ঠাকুমা যাহার জন্য দিবারাত্র আমাদের ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিলাম যে, এক কড়া কাণা কড়িও মূল্য তাহার নাই। মূল্য যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা হাতের লেখার জন্য নহে, তাহা অ[illegible] জিনিষের। শুধু হাতের লেখা ভাল--এমন যে কয় [illegible] আমাদের আফিসে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা সকলেই মাসি[illegible] পনের টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ পর্য্য[illegible]

টাকা প্রাপ্তির জন্য চাকুরী-সমুদ্রের গভীর অতলে পড়িয়া মাসের পর মাস হাবুডুবু খাইতেন। আমার ঠিক উপরে যে দুই জন যথাক্রমে আড়াই শত এবং পৌণে চারি শত টাকা মাস মাস পকেট ভরিয়া লইয়া যাইতেন, তাঁহাদের হাতের লেখা এমন জঘন্য ছিল যে, তাহা আর বলিবার নহে। ঠাকুমার সেই নিমাই গাঙ্গুলী সে লেখা দেখিলে বোধ হয় আঁৎকাইয়া উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। কিন্তু সকলের মাথার উপর যিনি তাঁহার তের শত টাকার চেয়ারখানি পাতিয়া বসিয়াছিলেন, আফিসের সেই বড়সাহেব এ বিষয়ে আর সকলকে একবারেই হারাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। তাঁহার লেখা পড়িবার অভ্যাস যাহাদের ছিল, তাহারা ভিন্ন সে দেবাক্ষর অন্য কেহ যদি পড়িবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে শীত-কালেও তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিবার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকিত। অনেক দিন দেখিয়াছি, নিজের লেখা কোন কারণে পুনরায় পড়িতে গিয়া সাহেবকে বিষম নাস্তা-নাবুদ হইতে হইতেছে। 'কোন্ লিখা হৈ' বলিয়া তখন নিজেকেই মনে মনে কটু ভাষায় কোন রকম বিশ্রী গালি দিয়া উঠিতেন কি না, জানি না, তবে ক্রমেই মুখ লাল হইয়া উঠিত এবং কখনও কখনও কাগজখানাকে ক্রোধে হাতের মধ্যে পাকাইয়া 'ওয়েষ্ট পেপার ব্যাস্কেটে'র মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আবার কাগজ-কলম লইয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতে বসিতেন। কিন্তু ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে একটু রসের সৃষ্টিও হইয়া যাইত। এমনই এক দিনের একটা ব্যাপার আজ পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই।

নন্দীমশায় ছিলেন 'পোরমিট্'-সরকার, অর্থাৎ 'জেটি'র গুদাম-সরকার। বছর চৌদ্দ আগে সতের টাকায় ঢুকিয়া তখন তিনি একুশ টাকা বেতন ভোগ করিতেছিলেন। সে-দিন ছিল বর্ষাকালের এক ঘন-মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দিন। সকাল হইতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছিল। সাহেব সে দিন আফিসে আসিয়াই খুব তাড়াতাড়ি কি একখানা চিঠি লিখিয়া 'কপিয়িং ক্লার্ক' অক্রূর বাবুর কাছে কপি করিবার জন্য পাঠাইয়া শুনিলেন যে, তখনও তিনি আসেন নাই। সাহেব একটু চটিয়া গেলেন, কারণ, প্রায়ই অক্রূর বাবুর এই রকম 'লেট' হইত। সাহেব তখন নন্দীমশায়কে কোথায় পাঠাবার জন্য খোঁজ করিলেন, কিন্তু নন্দীমশায়ও তখনও পর্য্যন্ত গর-হাজির। সাহেব গেলেন বিষম রাগিয়া। তখন গজ-গজ করিতে করিতে আমার ঘরে আসিয়া কহিলেন যে, অক্রূর বাবু আর নন্দী-মশায়ের যেন পাঁচ টাকা করিয়া 'ফাইন' করা হয়। হুকুম ত সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তের শত টাকার সাহেব—এটা আর ভাবিয়া দেখিলেন না যে, অক্রূর বাবুর পঞ্চাশ টাকার মধ্যে না হয় পাঁচ টাকা 'ফাইন' দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নন্দীমশায়ের এক কুড়ি একের পাঁচ টাকা যাইলে, তাঁহার পক্ষে কি দাঁড়াইবে! এই কথাই সাহেবকে বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় নন্দী-মশায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির,—সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার কাদা মাখা, কাপড়-চোপড় জলে একবারে ভিজিয়া গিয়াছে, মাথার চুলে ও মুখে, মুছিয়া ফেলা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কাদার দাগ লাগিয়া রহিয়াছে,সাহেবের সম্মুখে আসিয়া,সেলাম করিয়া নন্দীমশায় কহিল,—"Little late Sir, Excuse Sir."

সাহেব মুহূর্ত্তকাল নন্দীমশায়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, -"No excuse, you must be fined today for your late." বলিয়া সাহেব চলিয়া যাইতেছিলেন, নন্দীমশায় আর একবার সেলাম করিয়া কহিলেন,—"What doing Sir? from night অনবরত rain and rain, Roads filled-up with water, no tram, no share-horse carriage, running running come লাল-দিঘী পর্য্যন্ত and then leg slipped and falling down একবারে চিৎপটাং on the road."

নন্দীমশায়ের বিদ্যা 8th class পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে অনর্গল এইরূপ ইংরাজী বলিতে তাঁহার বাধিত না। সাহেব বাঙ্গালা ভালরূপই বুঝিতেন এবং বলিতেও পারিতেন, তাই নন্দীমশায়ের এই অদ্ভুত ইংরাজী ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত বুলি বুঝিতে তাঁহার কোথাও অসুবিধা ঘটিত না এবং এই জন্যই, মুখে তিনি নন্দীমশায়কে যাহাই বলুন না, অন্তরে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া নন্দীমশায় পুনরায় কহিলেন,—"This fine excuse Sir, Pardom Sir, আর কখনো যদি late be, you fine, you beat, এমন কি you গলা-ধাক্কা giving drive out. You father and you mother, this time excuse Sir."

সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম যে, আমারই মত অতি কষ্টে সাহেব হাসি চাপিয়া আছেন। খানিকক্ষণ সেই

অবস্থায় সাহেব নন্দীমশায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"All right, Nandi, if you can make a copy of this, you may be excused. Go and make a copy of this" বলিয়া সাহেব তাঁহার হস্তস্থিত সেই draft চিঠিখানি নন্দীমশায়ের হাতে দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। নন্দীমশায় লেখাপড়ার ধার তত না ধারিলেও, তাঁহার হাতের লেখাটি ছিল খুব সুন্দর। সাহেবের draftখানি হাতে করিয়া তিনি তাঁহার টেবলের ধারে যাইয়া বসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই সাহেবের ঘর হইতে তাঁহার উচ্চ হাসির রোল শুনিতে পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাপরাসী আসিয়া কহিল, সাহেব ডাকিতেছেন। সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, নন্দীমশায় টেবলের সম্মুখে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন আর সাহেব নন্দীমশায়ের লিখিত তাঁহার সেই চিঠির কপিখানি হাতে লইয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছেন। ব্যাপার হইয়াছে এই যে, সাহেব এক স্থলে লিখিয়াছিলেন, "The will and it's codisil are ready and they will be forwarded very soon."—নন্দীমশায় ইহা ঠিক পড়িতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—"The wife's hydrocele are bloody and they will be bombarded at noon." তখন আমিও আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। সাহেব হাসিতে হাসিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—Nundi, you must be rewarded for your strange discovery—The wife's Hydrocele" আমি হাসিতে হাসিতে নন্দীমশায়কে টানিয়া লইয়া আমার ঘরে গিয়া বলিলাম,—"এ করেছেন কি? Codisilকে একেবারে Hydrocele? আজ কি মাথার কিছু বেঠিক ঘটেছে নন্দীমশায়?"

নন্দীমশায় কহিলেন,—"জানি না, ভাই! এ সব কি আমাদের কায, চিঠি-পত্র কপি করা? আর, কি ছাই হাতের লেখা, তাও জান; ও কি সহজে কেউ পড়তে পারে—না বুঝতে পারে?"

যাহা হউক, নন্দীমশায়ের এই Hydroceleই সে-দিন তাঁহার অশেষ মঙ্গল ঘটাইয়াছিল, সে-দিনকার জরিমানা ত তাঁহার মাফ হইলই, তা'র ওপর নগদ দশ টাকা বকসিস্ এবং পরের মাস হইতে এক টাকা করিয়া বেতন-বৃদ্ধি।

তখনকার সাহেব-সুবোই ছিল এই রকম,—এই রকম আমোদপ্রিয়, এই রকম নিরহঙ্কার, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত এই রকম মিশুক ও তাহাদের প্রতি এই রকম সদয় এই রকম ভদ্র,—আর এখন——; কিন্তু কোন্ কথা বলিতে যাইয়া কোন্ কথায় আসিয়া পড়িতেছি?—যাক্।

ঠাকুমার তাগাদায় তখনই খাতা-পত্র বই-সেলেট ঠিক করিয়া বাঁধিয়া লইতে মনোযোগী হইলাম। দপ্তর ত বড়, তার আবার ঠিক করা। একখানা খাতা, গোটা দুই তিন সরের কলম, একখানা সেলেট আর একখানা বই।

তখন আমাদের একখানা মাত্র বই পড়া হইত, সেই একখানি বইয়ের মধ্যেই সব থাকিত। তাহাতেই বর্ণপরিচয়ের অ আ ই ঈ, A. B. C. D, ধারাপাত, শুভঙ্করী, তাহাতেই পত্র লিখিবার আদর্শ, জমীদারী, মহাজনী, তাহাতেই পুরাণ, কাব্য, তত্ত্বোপদেশ, এমন কি, চাণক্যের রাজনীতি পর্য্যন্ত সকলই ছিল। সর্ব্বজ্ঞানে দীপস্বরূপ এই বহিখানির নাম জ্ঞানদীপিকা। দেশী মোটা কাগজে বটতলার ছাপাই এবং দেশী তুলট্ পিজবোর্ডের অপরূপ বাঁধাই, মূল্য দশ পয়সা। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার ন্যায় এই পুস্তকখানি নিশ্চয় পড়িয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কাহারও সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

বোম্বাই প্রদেশের এক শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কথা শুনিয়াছি, তাহাদের নাম 'চৌ-চৌ'-ওয়ালা। তাহাদের মস্তকের চ্যাঙ্গারির মধ্যে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল রকম জিনিষই থাকে। সূচ, সুতা, বোতাম, সেফটীপিন, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, বই, খাতা, কলম, সাবান, সেণ্ট, পাউডার হইতে আরম্ভ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ, বিসকুট, মিষ্টান্ন, ছাতা, ছড়ি, আলপিন, পেরেক, হুক্, জামা, জুতা, জুয়েলারী এবং কিস্মিস্, মনেক্কা, জর্দ্দালু, খোবানি, - এমন কি, ঝুনা নারিকেল, তেঁতুল, মধু পর্য্যন্ত সকল রকম দ্রব্যই থাকিত। তাহাদের এই চ্যাঙ্গারিখানির নামই 'চৌ-চৌ'। আমাদের এই 'জ্ঞানদীপিকা' ছিল ঠিক যেন বোম্বাইয়ের সেই 'চৌ-চৌ'। তাই, কত কাল চলিয়া গিয়াছে, তবু আজও এই 'চৌ-চৌ' বহিখানির কথা ভুলিতে পারি নাই। তাহার সেই 'পত্র লিখিবার ধারা'—আজ্ঞাকারী শ্রীনটবর দে সবিনয় নমস্কার নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী নিয়ত শ্রীশ্রী... প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে অত্রানন্দ পরং,—সেই টাকা

খত—লিখিতং শ্রীরামকুমার বিশ্বাস কস্য কর্জ্জপত্রমিদং, সেই 'গঙ্গার বন্দনা', সেই 'সান্দীপনি মুনির পাঠশালা', সেই 'দাতা-কর্ণ', আর 'গুরু-দক্ষিণা'র সেই—

"বন্দ প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি।
যার পদ সেবেন কমলা সরস্বতী॥
ব্রহ্মার জনম হৈল নাভি-শতদলে।
বিষ্ণুর উৎপত্তি হৈল চরণ-কমলে॥"

এ সব আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। Ransom-এর History of England পড়িয়াছি মনে করিতে হয়, Bain-এর Grammar কিম্বা Rowe সাহেবের Hint-এর কথা আর কিছু দিন পরে হয় ত ভুলিয়াই যাইব, কিন্তু এই চৌ-চৌ– জ্ঞান-দীপিকার কথা অক্ষয় অমর হইয়া, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন তাহার পরতে পরতে গাথা থাকিবে। প্রত্যহ ছুটীর সময় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া 'জ্ঞান-দীপিকা' হইতে সকলের সেই মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি—

"মাতার সমান নাই —শরীর পোষিকা।
ভার্য্যার সমান নাই— শরীর-তোষিকা॥
বিদ্যার সমান নাই— শরীর-ভূষিকা।
চিন্তার সমান নাই শরীর-শোষিকা॥"

এবং তার পরই আজকালকার Kindergarten-এর old edition সেই বাড়ী যা'বার গান

"বেলা গেল এস ভাই পড়া হ'ল বাড়ী যাই।
সারি সারি সবে যাব, কোন দিকে নাহি চাব॥"

এ আর জীবনে ভুলিব কি করিয়া!

দুইখানি পত্রের আদর্শ ছাড়া, পণ্ডিত মহাশয় প্রায় সারা বইখানিই আমাদের পড়াইয়াছিলেন। সেই আদর্শ-পত্র দুইখানি তিনিও আমাদের পড়াইতেন না, আমরাও পড়িয়া তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন অর্থ যদি বা বুঝিতে পারি, কিন্তু একটিবার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পত্র দুইখানি পড়িতে হইলে ক্লান্ত হইয়া পড়ি। তখন এতবার সেই পত্র দুইখানি পড়িয়াছি যে, তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং তখনও যেমন তাহা কণ্ঠস্থ ছিল, এখনও এই জীবনের অপরাহ্নে ঠিক তেমনই কণ্ঠস্থ আছে, মায় তাহার শিরোনামাটি পর্য্যন্ত। বাল্যের সে স্মরণশক্তি এমনই প্রবল যে, কত কাল কাটিয়া গিয়াছে, তবু তাহার আকার ইকারটুকু পর্য্যন্ত আজ কিছুই ভুলি নাই, সে কালের মত ঠিকই আজ তাহা তেমনই মনে আছে। তাহা এই:—

"স্বামীকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার আদর্শ

শ্রীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল-যাপন করিতেছেন, সেকালে এ দাসীর কালরূপলগ্নে পাদ-ক্ষেপণ করিয়াছেন, সে কালহরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কাল-প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয়কালের সাধনের ধন আদরামৃত তৃতীয়কালের কালানু-সারে কালকূট দোষ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে, আগতকাল আগতপ্রায়, এইরূপে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধোগত প্রায় হইয়াছে; অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচরযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন ইতি। ২৫ চৈত্র।

শিরোনামা

ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কতৃক ভবার্ণবানাধিক
শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য
পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

স্ত্রীকে পত্র লিখিবার আদর্শ

পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরবর্তী নবসিত কলেবর রাঙ্গা সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ। ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর-কমলাঙ্কিত কমলপত্র পঠিত অত্র শুভবিশেষ। বহুদিবসা-বধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস-প্রবাস নিরাশ তাহাতে কর্ম্ম-কাল বিনাশ অতিরিক্ত উত্যক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি, অতএব মম নয়ন প্রার্থনা করে যে, সর্ব্বদা একতাপূর্ব্বক অর্পণ সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধু-মাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়, প্রয়াসা মীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, ধনোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃকা দুঃখিতা, এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছি ইতি—

শিরোনামা—
গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা
শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী।
সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।”

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ হেন ‘জ্ঞানদীপিকা’র রচয়িতার নাম গ্রন্থে প্রকাশ নাই; তাহা থাকিলে এখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আসিতাম। তবে যেটুকু সাধ্যের ভিতরে, সেটুকু করিলাম, অর্থাৎ এই অত্যদ্ভুত আদর্শ রচনাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইলাম। এবং আরও সুখের বিষয় যে, আমার বহু পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ লেখকও ইহার গুণমুগ্ধ হইয়া ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পর আমার আর কিছু না লিখিলেও চলিত, কিন্তু ইহা এতই আমার প্রিয় দ্রব্য যে, কিছু লিখিবার লোভ আমি কোনমতেই আর ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, যুগান্তর পরে সম্প্রতি আবার এই ‘জ্ঞানদীপিকার’ দর্শন পাইয়াছি এবং শুধু দর্শনই নয়, ইহার এক খণ্ডের অধিকারীও হইয়াছি। কয়েক মাস হইল, এক বটতলার পুস্তকবিক্রেতা ‘হকারে’র কাছে হঠাৎ এক দিন ইহার দর্শনলাভ, সঙ্গে সঙ্গেই ধারণ এবং গ্রহণ। খুলিয়া দেখি, সেই জিনিষই বটে—সেই সবই, তবে বাহ্য আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবঘনশ্যামল রূপ, বিংশ শতাব্দীতে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও দশ পয়সা হইতে ছয় পয়সায় নামিয়াছে। এই ছয় পয়সার ‘জ্ঞানদীপিকা’-খানি সে-দিন আমি বুকে করিয়া আনিলাম এবং ছয়টি অর্দ্ধ-মুদ্রা ব্যয়ে তাহাকে আমি মরক্কো চামড়ায় স্বর্ণাঙ্কিত করিয়া বাঁধাইয়া আজ বহুমূল্য সম্পত্তিজ্ঞানে সযত্নে রাখিয়াছি।

ঠাকুমার কথায় এ হেন ‘জ্ঞানদীপিকা’, খাতা ও সেলেটের সঙ্গে দপ্তরে বাঁধিয়া ফেলিলাম এবং মামার বাড়ী আসিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমরা রায়পুকুর আসিয়াছি। এখানে আসিবার পর হইতেই বিমুদার দর্শন পাওয়া দুর্লভ হইয়া উঠিল। হঠাৎ প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে বিমুদা এক নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইয়া পড়িল, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ঘুমাইতে লাগিল। এত ঘুমাইতে লাগিল যে, সে যুগের কুম্ভকর্ণ যদি বিমুদা’কে তাঁহার আমলে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি বিমুদা’কে তাঁহার এক জন ‘এসিসট্যাণ্ট’ করিয়া লইবার পক্ষে বোধ হয় কোন অমত করিতেন না।

তখনকার দিনের একতালা বাড়ী। দোতালার ছাদের উপর ছিল শুধু ছোট্ট একটি ‘চিলে-কুঠুরী।’ আসিয়াই বিমুদা সেই ‘চিলের কুঠুরী’ দখল করিয়া লইল এবং চব্বিশ ঘণ্টা সেই ঘরে খিল লাগাইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে, অকাতরে এবং নির্ব্বিবাদে ঘুমাইতে লাগিল।

তখন বিমুদা’র চব্বিশ ঘণ্টার ‘রুটিন’ ছিল এইরূপ,—বেলা ৯টার সময় নিদ্রা এবং শয্যাত্যাগ। ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে স্নানাগার ইত্যাদি সমাধা। ১১টা হইতে ৫টা- ‘চিল-কুঠরীতে’ গভীর নিদ্রা। ৫টা হইতে ৬টা- নিদ্রাত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ। তাহার পর ৬টা হইতে পরদিন বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আবার নিদ্রা, মধ্যে কেবল রাত্রি ৮টা কি ৮৷৷০টার সময় ৩০ মিনিটের জন্য আহার। সুতরাং বিমুদা’র দর্শন দেবদর্শনের মতই সকলের কাছে সুদুর্লভ হইয়া উঠিল। দাদামশাই বলিলেন, “ও শালাকে ‘নোণা’ লেগেছে, ‘নোণা’-ভূতে পেয়েছে, ওকে আর কিছু খেতে না দিয়ে খালি থোড় সেদ্ধ ক’রে খাওয়া।”

মা এক দিন রামচরণ চাকরকে কহিলেন, “দিয়ে আয় ত, রামুদা’, ওর ‘ঘুঘুর বাসা’ পুড়িয়ে! মুখপোড়া ছেলের এ হ’ল কি চব্বিশ ঘণ্টা খালি ঘুম! দিয়ে আয় ‘চিল-কুঠুরী’তে তালা লাগিয়ে।” বিমুদা’ কিন্তু অচল—অটল তা’র নিত্য-কর্ম্মের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হইল না, নি... সমভাবেই চলিতে লাগিল। তখন মা এক দিন সত্য সত্য ‘চিলের কুঠুরী’ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তালা-চাবি লই... উপরে গেলেন এবং খানিক পরেই বিমুদা’কে লক্ষ্য করি... উচ্চকণ্ঠে বিষম বকাবকি করিতে লাগিলেন। বকাবকি... মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহি... উপরে গেলাম। যাইয়া দেখি, মা জানালার উপরকা... কাঠের তাক্ হইতে আঁচলা আঁচলা করিয়া উই-মাটী আনি... ছাতের এক ধারে জমা করিয়াছেন, আর সেই উই-মা... সঙ্গে উইয়ে-খাওয়া একগাদা কাগজ টুকরা টুকরা ... মিশাইয়া রহিয়াছে। বুঝিতে আর বাকী রহিল না। বিমু...

পড়িবার নাম করিয়া তাহার বই-খাতার দপ্তর উপরে আনিয়া কাঠের সেই তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পর তাহাতে আর মোটেই হস্তস্পর্শ ঘটে নাই; সুতরাং রায়-পুকুরের উই সুন্দর সুযোগ ও অবসর পাইয়া সেগুলির প্রতি নির্ব্বিবাদে সদ্ব্যবহার করিয়াছে!

মা বিষম রাগিয়া গিয়া বিনুদা'কে বকিতে লাগিলেন,—"হতভাগা কোথাকার! জানিস্, এ হ'ল রুইএর দেশ, একটুও তোর হুঁস্-পবন নেই! লেখা গেল, পড়া গেল, দিন-রাত খালি প'ড়ে প'ড়ে ঘুম!"

বিনুদা'কে কিন্তু বলিহারি! এমন ব্যাপারেও কিন্তু শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠে নাই, তখনও কাত হইয়া শুইয়া মুখ বাড়াইয়া ছাতের উপর তাহার দপ্তরের দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। মায়ের কথায় তেমনই শুইয়া শুইয়াই কহিল—"তুমি বেশী বোকো না খুড়ীমা। রুই ধরবে, তা' আমি কি করবো? এই শীতকালেও তোমাদের দেশে যে এত রুই, তা' আমি কি ক'রে জান্‌বো?"

"ওরে বাঁদর, এখানে যে ভীষণ রুই! শীতকাল বলেই ত শুধু তোর দপ্তরে ধরেছিল, নইলে"

"নইলে, কি খুড়ীমা?"

"নইলে, বর্ষাকাল হ'লে, তুই যে রকম প'ড়ে প'ড়ে ঘুমচ্চিস্, তোকেই এত দিন রুই ধ'রে কুরে কুরে খেয়ে ফেল্‌তো!"

"হ্যাঁ, ফেল্‌তো!"

"হ্যাঁ ফেল্‌তো কি রে? সেবার ক্ষিরী নাপতিনীর জ্বর হয়ে একটি দিন ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল, সন্ধ্যের আগে গিয়ে দেখি, তা'র আধখানা পিঠ একেবারে রুই লেগে ছেকে ধরেছে!"

"আর সে তবুও দিব্যি ঘুমুচ্চে?"

"জ্বরে ত'ার কি আর জ্ঞান ছিল! সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। আমি গিয়ে তবে ত তাকে—"

"বাবা! জ্যান্ত মানুষকে রুইয়ে ধরে! ধন্যি দেশ খুড়ীমা তোমাদের!" বলিয়া বিনুদা লাফাইয়া উঠিয়া ঘর হইতে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"কাল থেকে মাইরি বলচি খুড়ীমা, কিছুতেই আর শোব না।"

মা 'চিলের কুঠুরী'তে তালা লাগাইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

আমি বিনুদা'কে কহিলাম,—"চল, বিলের পুকুরে মাছ ধরতে যাই,—যা'বে? এখন আর কি করবে? ঘুমুতে ত আর পাচ্ছ না!" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, এই কয় দিনে বিনুদা'র শরীরের কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনটা ভালর দিকেই। বিনুদা'র শরীরে মাংস লাগিয়াছে, মুখখানা ঘোরালো হইয়াছে, হাত-পা-গুলা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং গায়ের রং আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বিনুদা' যেন দুই চারি মাস বৈদ্যনাথ, মধুপুর কি দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া আসিয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ও শরীর-তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে, বিনুদা'র সাংঘাতিক ঘুমের সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ আছে কি না, হয় ত বলিতে পারিতাম। মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, কি ক'রে অত ক'রে ঘুমুতে পারতে বল ত?"

"পারতে কি রে? এখন কি পারি না না কি? পাল্লা দিয়ে ঘুমুতে পারিস্ আমার সঙ্গে? আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘণ্টা দুই কেবল খাবার-দাবার জন্যে বাদ দিয়ে বাইশ ঘণ্টা আমি ঘুমুবো; পারবি আমার সঙ্গে?"

"ঘুমে পারব না, কিন্তু মাছ ধরাতে নিশ্চয় তোমায় হারিয়ে দোব। কাল বিলের পুকুর থেকে কতগুলো মাছ ধরিছি, জান? সাতাশটা পুঁটি আর চার চারটে ল্যাটা,—মাইরি বলছি!"

বিনুদা' কহিল,—"ছিপ আছে?"

আমি বলিলাম,- "আছে।"

তখন ছিপ লইয়া দু'জনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিনুদা' কহিল,- "মাকাল ঠাকুরের নাম ক'রে বেরো, নইলে মাছের নামে অষ্টরম্ভা হবে।"

গ্রামের প্রান্তভাগে বিলের পুকুর। সিদ্ধেশ্বরীতলা ছাড়াইয়া মাঝের পাড়া ঢুকিতেই পথের ধারে বামা ময়রার দোকানের দিকে চাহিয়া বিনুদা' কহিল,—"ওরে, এখানেও খাঁ-সাহেব!" দেখিলাম, দীর্ঘে-প্রস্থে ৫ হাত ও ২৷৷০ হাত মাপের এক বিরাট্‌কায় কাবুলী, বামাচরণের স্বল্পালোক-বিশিষ্ট দোকান-ঘরখানিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাবুলী দেখিলেই বিনুদা' তাহার সহিত আলাপ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। একবার তাহার ঢিলা আস্তানায় হাত দিবে, একবার লাঠিগাছটি ধরিবে, একবার পাগড়ীর দিকে চাহিবে, একবার তাহার জুতা

দেখিবে, তার পর হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে,—"কেয়া হায় তোমরা ঝুলিয়ামে ?"

এ কাবুলীটির পিঠে কোন ঝুলি-ঝালা ছিল না। তখনকার দিনে কম্বল-আলোয়ান বিক্রয় করা তাহারা সুরু করে নাই— বিশেষ পাড়াগাঁয়ে। তবে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে কেন যে এই কাবুলীটির সে সময় আবির্ভাব হইয়াছিল, বলিতে পারি না।

সারাদিন ঘুরিয়া শ্রান্তিতে সম্ভবতঃ তাহার তৃষ্ণা পাইয়াছিল, তাই চারিটি পয়সা হাতে করিয়া বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কোন 'মিঠাই' আছে কি না। বামাচরণ কহিল, "হায়, মিঠা হায়, মুড়কী নতুন গুড়ের খুব ভাল হায়, বাতাসাও হায়,—লেগা ?"

হায়, কাবুলী, তোমার মাথায় বাজ পড়ুক! কোথায় আফগানিস্থানের আঙ্গুর, বেদানা, আখরোট, পেস্তা, খোবানি, কিস্‌মিস্, আর কোথায় বাঙ্গালার মুড়ি-মুড়কি, খৈ বাতাসা, গুড়-ছাতু! এ দুর্ভোগ কেন তোমার ? কাবুল-কান্দাহার-হিরাটের পাহাড়-পর্ব্বত বাগ-বাগিচা ছাড়িয়া বাঙ্গালার এ ধানক্ষেতের জলায় কি তোমার সাজে!

কাবুলী জিজ্ঞাসা করিল,— "লাড্ডু হায় ?"

বামাচরণ কাবুলীর মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"লাড্ডু নেই হায়, তবে খুব ভাল খাস্তা-কা গজা হায়,—লেগা ?" বলিয়া শালপাতার একটি ঠোঙ্গায় চারিখানি গজা বাহির করিয়া আনিয়া কাবুলীওয়ালার হাতে দিল।

কাবুলী কহিল,—"পানি ?"

পানিও এক ঘটী বামাচরণ ভিতর হইতে আনিয়া দিল।

একটি প্রকাণ্ড কুকুর, কাবুলীর হাতের ঠোঙ্গার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া পাশে দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতেছিল। কাবুলী তাহাকে লাঠীর একটা ঠেলা দিয়া, জলের ঘটী ও গজার ঠোঙ্গা হাতে লইয়া সম্মুখস্থ আতাগাছের তলায় গিয়া বসিল।

এখন বামাচরণের এই খাস্তার গজা সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। এই গজা বামাচরণ বৎসরে একবার মাত্র— আষাঢ় মাসে রথের সময় প্রস্তুত করিত। রথের বাজারে গজা বিক্রয় হইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, বামাচরণ তাহা ৺দুর্গাপূজার সময় আর একবার রসে ভিজাইয়া থালা সাজাইয়া বিক্রয় করিত। তাহার পরও যদি সে গজার কি ছিটছাট পড়িয়া থাকিত, বামাচরণ তাহার দ্বারা চৈত্রমা[স] গাজনের মেলার খরিদ্দার বিদায় করিত। সুতরাং, আষাঢ়[ে]র সেই গজা, মাঘের শেষে একখানি মুখে করিয়া কাবু[লী] পুঙ্গবকে মহা সঙ্কটাবস্থায় পড়িতে হইল। তাহাকে চিবাই[তে] গিয়া তাহার মুখ-চোখ ভীষণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সেই দার[ুণ] শীতেও তাহার ঢিলা আলখেল্লার ভিতরটা বোধ হয় ঘা[মে] ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু তবুও বামাচরণের সেই খাস্তার গজ[ার] একটি টুক্‌রাও সে তাহার সেই কাবুলী-দাতে ভাঙ্গি[তে] পারিল না। তখন রাগে বিড়-বিড় করিতে করিতে সম্ভবতঃ বামাচরণকে গালি দিতে দিতে গজার ঠোঙ্গা সে[ই]খানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

কুকুরটি তখন পর্য্যন্ত একধারে দাঁড়াইয়া একটু প্র[সাদ] বা তদভাবে অন্ততঃ প্রসাদাধার ঠোঙ্গাখানি পাইবার লো[ভে] ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছিল। এক্ষণে হঠা[ৎ] একেবারে ঠোঙ্গাশুদ্ধ সমস্ত প্রসাদ সামনে পাই[য়া] আনন্দে অধীর হইয়া সেগুলি দখল করিল, কি[ন্তু] তাহারও অবস্থা কাবুলীর মতই হইল, অর্থাৎ প্রায় মি[নিট] পাঁচ সাত ধরিয়া বসিয়া, শুইয়া, চিৎ হইয়া, কাৎ হইয়া, এ[ক]বার এ-কষে একবার ও-কষে ফেলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করি[য়াও] কিন্তু না ভাঙ্গিল বামাচরণের খাস্তার গজা, না ভা[ঙ্গিল] কুকুরের দাঁত। অবশেষে বিশেষরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সারমে[য়] প্রবর স্থানত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ' চলিয়া যাইতে যাইতে এই ভাবিয়া বোধ হয় আবার ফি[রি]ল যে, লেহন দ্বারা যদি কিছু সেই খাস্তার রসাস্বাদন করি[তে] পারে। সুতরাং আবার ফিরিয়া আসিয়া একখানি গ[জা] লইয়া সে চাটিতে সুরু করিল। কিন্তু পাথর চাটিয়াও হয়[ত] তাহার রস বাহির করা সম্ভব হইত, বামাচরণের সে গ[জা] চাটিয়া রস বাহির করিতে যাওয়া যে কি বিড়ম্বনা, ত[াহা] শুধু বামাচরণই জানিত। যাহা হউক, গজার আ[শায়] একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া মন্থরগতিতে কুকুরটি চলিয়া গে[ল]।

আতাগাছের ডালে বসিয়া আর একটি প্রাণী সতৃষ্ণ ন[য়নে] এ যাবৎ নীচের দিকে চাহিয়া ছিল, এইবার সেই কাক-উড়িয়া আসিয়া গজার কাছে বসিল এবং মিনিট ব[হু] ধরিয়া অনবরত চঞ্চু দ্বারা ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া ি[কছু] সুবিধা করিতে না পারিয়া কা-কা করিতে করিতে উ[ড়িয়া]

গেল। কাবুলী, কুকুর ও কাক, ককারান্ত নামের এই শক্তিশালী জীব তিনটিকে পরাজয় করিয়া বামাচরণের খাস্তার গজা অক্ষয় অব্যয় হইয়া সেই আতা-তলায় সগর্ব্বে পড়িয়া রহিল,—আমরা ছিপ হাতে করিয়া বিলের পুকুরের দিকে চলিলাম।

বড়শীতে টোপ গাঁথিতে গাঁথিতে বিলের পুকুরে ত আসিলাম, কিন্তু মাছ ধরা আর হইল না। পুকুর-পাড়ে আসিয়া দেখি, সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জনশূন্য ঘাটের উপর বসিয়া ভট্টাচার্য্যিদের বৌ অজস্রধারে কাঁদিতেছে। শূন্য পিতলের ঘড়াটি তাহার একপাশে কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল বলিয়া বৌটি আমাদের আগমন একেবারেই লক্ষ্য করিতে পারিল না, যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

বিনুদা' আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—"কে বল্ দেখি?"

আমি চুপি চুপি কহিলাম,—"ভট্টাচায্যিদের বৌ।"

বিনুদা' কহিল, "আমাদের মামী হয়, খুড়ীমা ব'লে দিয়েছে। এমন ক'রে কেন কাঁদচে বল দেখি?"

"কি জানি।"

মামাদের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া পা বাড়াইলেই ভট্টাচায্যিদের একেবারে উঠানে পা পড়ে। এক কালে হয় ত স্থানটা আমাদের মত তাহাদেরও খিড়কী ছিল, কিন্তু চারিদিককার মাটীর পাঁচীল ধূলিসাৎ হইয়া গিয়া এখন তাহা তাহাদের উঠানেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

বৌটি বিধবা। বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর। ঘরে শাশুড়ী ভিন্ন আর কেহই নাই।

বিনুদা' একেবারে তাহার সম্মুখে যাইয়া কহিল,—"মামীমা, কাঁদছ কেন?"

চমকিয়া উঠিয়া বৌটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া কহিল,—"বড্ড অসুখ কচ্চে, তাই কাঁদছি বাবা! তোমরা বুঝি মাছ ধরতে এসেছ?"

"হ্যাঁ মামীমা। কি অসুখ কচ্চে তোমার?"

"খাবার জল নিতে এসেছিলুম, জলশুদ্ধ ঘড়াটা তুলতে গিয়ে বুকের ভেতর বড্ড একটা ব্যথা আটকে গেল, তাই কলসীটাকে ফেলে রেখে বুকে হাত দিয়ে—"

বালক হইলেও, মামীমার এই কথার ভিতর যে কোন সত্যই ছিল না, তা' ভালরূপই বুঝিলাম। মনে মনে কহিলাম, "মামী গো! বড্ড ব্যথাটা আটকে গেল, তাই কলসীটাকে ফেলে রেখে বুকে হাত দিয়ে? সকাল থেকেই যে শাশুড়ীর বকুনি খাচ্ছিলে আর রান্নাঘরে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলে, তখনও কি 'ঘড়াটা তুলতে গিয়ে'? রোজই যে চোখের জলে ভাসতে হয় তোমাকে, রোজই কি ঐ ঘড়ার ব্যথা তোমার বুকে আটকায়? সত্যিকারের বেদনা তোমার কোথায় আর কিসের, সে যে আমাদের আর জানতে বাকি নেই মামীমা! মা-দিদিমার কাছ থেকে সে যে দু'বেলা শুনতে পাই, তা আর তুমি কোন্ ছলে লুকোবে বল?" প্রকাশ্যে কহিলাম,—"মামীমা, এই দুপুরবেলায় জল নিতে এত দূর এসেছ?"

মামীমা কহিল,—"জল যে একেবারেই নেই। আমি না এলে আর কে আসবে বাবা?"

"কেন, দিদিমা?"

অর্থাৎ মামীমার শাশুড়ীর কথা বলিলাম।

মামীমা কহিল,—"সে বুড়ো মানুষ, এত দূর এসে কি জল নিয়ে যেতে পারে?"

"কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর রোজ যে কুলীনপাড়া—রাণাপাড়ায় বেড়াতে যায়, সে ত বিলের পুকুরের চেয়ে, মামীমা, আরও দূর! তা', তোমার এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়?"

"না বাবা, একবার ত খাব, এত সকালে খেয়ে কি করব মাণিক? তোমরা মাছ ধরবে না?"

"ধরব মামীমা। সারাদিন ত রান্নাবান্না কাযকর্ম্ম নিয়ে তোমাকে থাকতে হয়, সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী আস না কেন মামীমা,—আসবে?"

"কি ক'রে যা'ব মাণিক?"

"কেন, তখন আর তোমার কায কি?"

"রাত্রে যে মায়ের জলখাবারের জন্যে পরটা তরকারী কত্তে হয়।"

"ও! তা, হ্যাঁ মামীমা, খালি মায়েরই জন্যে? তোমার জন্যে নয়?"

"তোমরা বোধ হয় এখন এখানে থাকবে,—না বাবা?"

বিনুদা' কহিল,—"হ্যাঁ মামীমা, থাকব। কিন্তু দিদিমা বুড়ী যেন যমের বাড়ী যায়!"

"কা'র কথা বলছিস্ রে ?"

"তোমার শাশুড়ী।"

"কেন বল্ ত ?"

"হ্যাঁ,- সে এক্ষণি ম'রে যা'ক।"

আমি কহিলাম,—"জলে নেমে দূরে থেকে ভাল জল তুলে এনে দোব মামীমা ?"

"না ধন, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি ঘড়া ভ'রে জল আনতে পার কখন ?" বলিয়া মামীমা উঠিয়া ঘড়াটি লইয়া জলে নামিল।

বিনুদা কহিল,-- "আয়, যাই, আর মাছ ধরব না।"

আমারও মাছ ধরিতে কেমন আর ইচ্ছা হইল না।

দুই জনে ছিপ গুটাইতে গুটাইতে ফিরিলাম।

রাণাপাড়ার পথ ঘুরিয়া আসিতে আসিতে থিয়েটারের আক্ড়াঘরের সামনে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আক্ড়াঘরে তখন মহলা চলিতেছিল, কারণ, দোলের সময় নূতন বই হইবে। দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, গ্রামে বহুকাল পূর্ব্বে সখের যাত্রার দল ছিল। সে সব উঠিয়া বন্ধ হইয়া গিয়া তাহারই সাজ-সরঞ্জাম যাহা ছিল, তাহাই অধিকার করিয়া যুবকের দল নূতন করিয়া এই থিয়েটার বসাইয়াছিল। সে যুগের সেই যাত্রাদলের অধিকাংশই এখন গত হইয়াছে, সামান্য দুই চারি জন এখনও আছে। শুনিয়াছি, তাহাতে দাদামশাইও ছিলেন, তিনি তবলা বাজাইতেন। 'মেঘনাদ-বধ' পালা হইত। তখনকার দিনে রায়পুকুরের 'মেঘনাদ-বধ' পালার নাম তল্লাটের মধ্যে না কি ঢি-ঢি পড়িয়া গিয়াছিল। এই সাবেক দল এগার বৎসর ধরিয়া এই 'মেঘনাদ-বধ' সমানে করিয়া আসিয়াছিলেন এবং আরও এগার বৎসর হয় ত এই 'বধ' করিতেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের মেঘনাদের সঙ্গে যিনি রাম সাজিতেন, তাঁহার সঙ্গে এক বিঘা তিন ছটাক জমী লইয়া এমন মামলা বাধিয়া গেল যে, যাত্রার মিথ্যা যুদ্ধ হইতে হইতে দু'জনের মধ্যে তখন সত্যই এক মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইল এবং সে যুদ্ধে, হয় রামের অথবা মেঘনাদের পরাজয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাদলেরও পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, আরও এক জন যে এই সময় গোলযোগ ঘটাইয়াছিল, তাহার নাম বরদা ঘটক। তিনি হনুমান্ সাজিতেন। তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন পাত্রী সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া হনুমান্ সাজিবার পর, বাঁকুড়া জেলা হইতে তাঁহার পাত্রী জুটিল এবং অষ্টমবর্ষীয়া সেই বধূকে ঘরে আনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বরদা ঘটক একেবারেই বেঁকিয়া বসিলেন যে, তিনি আর কিছুতেই হনুমান্ সাজিবেন না। এই সব নানা গোলযোগে তখনকার সেই যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার পর বহু বৎসর বাদে থিয়েটারের দলের এই নূতন সৃষ্টি।

এই নূতন দলের সৃষ্টিকর্ত্তা - ভুবনদা',— সম্পর্কে আমার দাদামশাই, মামাদের বাড়ীর গায়েই বাড়ী। ভুবনদা' সংসারে নিছক একা। এক সময়ে তাঁহার সকলই ছিল, কিন্তু একবার তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার মা, বোন্, স্ত্রী, কন্যা, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলেই মারা যায়। সে সময় ভুবনদা' পাগলের মত হইয়া গিয়া সংসার ছাড়িয়া হরিদ্বার না কোথায় ঐ দিকে বিবাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। বৎসর দুই তিন পরে কোন সাধুর উপদেশে ভুবনদা' আবার গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু পূর্ব্ব-স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লইয়া ভুবনদা' ফিরিয়া আসিল। সে যেন পূর্ব্বের সেই ভুবনদা' মরিয়া গিয়া এক নূতন ভুবনদা' ফিরিয়া আসিল।

তখন হইতে ভুবনদা' সদানন্দ। মুখে সর্ব্বদাই তাঁহার হাসি, রসিকতা, প্রফুল্লভাব। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই দিনরাত থাকিত। তখন হইতেই সকলের সব কাযে ভুবনদা' অগ্রণী। বিয়ে-বাড়ীতে ভুবনদা', শ্রাদ্ধের আসরে ভুবনদা', রোগে-শোকে আপদে-বিপদে ভুবনদা'। ধনীর সুখে-দুঃখে ভুবনদা', দরিদ্রের হাসি-কান্নাতেও ভুবনদা'। বামুন-কায়েতের ঘরেও ভুবনদা', চাষা-ভুষোর ঘরেও ভুবনদা', হিঁদুর ঘরেও ভুবনদা', মুসলমানের ঘরেও ভুবনদা'। মোট কথা, ভুবনদা' না হইলে কাহারও আনন্দ যেমন সম্পূর্ণ হইত না, আবার ভুবনদা'র অভাবে কাহারও দুঃখ-শোকের অন্ত হইত না। মায়ের নিকট বসিয়া বসিয়া ভুবনদা'র সম্বন্ধে কত কথাই যে শুনিয়াছি।

যাহা হউক, আক্ড়াঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিলাম, ভুবনদা'কে দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানে ভুবনদা' আছে কি না, তাহা চোখ দিয়া দেখিবারও দরকার হইত না, কাণ থাকিলেই ভুবনদা'র অবস্থিতি জানিতে পারা যাইত।

দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে ভিতর হইতে কে এক জন কহিল, "ছেলে দু'টি কে বল ত?" আর এক জন মুখ বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া কহিল, "আমাদের ঘোষাল মশাইয়ের নাতি হে, আর ওটি হচ্ছে ওর খুড়তুতো না জাটতুতো ভাই। ওরা যে আজ ক'দিন হ'ল এখানে এসেছে।" তখন তিন চারি জন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "খোকারা, এস বাবা, ভেতরে এসে বোসো।" এক জন কহিল, "এস ভায়ারা, গান-টান জান ত? আমার সখী সেজে নাচতে হবে। কালীঘাটের ছেলে, দেখা যাবে, এইবার সখা হারে কি সখী হারে!"

বিনুদা' চুপি চুপি কহিল, "আয় না, ভেতরে গিয়ে বসি।"

আমি কহিলাম, "না ভাই, বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।"

"হোক্ গে। এখন বাড়ী গিয়ে আর করবি কি? এখন বাড়ী গেলেই কিন্তু আমার ঘুম পাবে, আয় না, খানিকটা শুনে যাই।" বলিয়া জোর করিয়া আমার হাত ধরিয়া বিনুদা' ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

তখন পুরা-দস্তরই আক্‌ড়াই চলিতেছিল, কিন্তু কিসের যে পালাটা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলাম না। অথবা তখন হয় ত বুঝিয়া থাকিব, এখন লিখিতে বসিয়া সে কথা আর মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু পালা যাহাই হউক, তাহাতে না ছিল 'ভীম', না ছিল 'যুদ্ধ'। বোধ হয় 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' কি 'চৈতন্যলীলা' কি 'সীতার বনবাস' এই রকমের একটা কিছু। মোট কথা, আমার তা মোটেই ভাল লাগিল না।

কালীঘাটে কত যাত্রা, কত থিয়েটার আমরা শুনিয়াছি, সব স্থলেই অয়েল ক্লথ মোড়া কাপড়ের গদা ঘাড়ে ভীম থাকিতই। আর যুদ্ধের ত কথাই ছিল না। হয়, তীর-ধনুক লইয়া, নয় ত বা তলোয়ার লইয়া সে কি ভীষণ যুদ্ধই হইত! সমস্ত আসরটাকে একেবারে কাঁপাইয়া দিত; তাহার পর চূড়ান্ত হইয়া যাইত—গদা ঘাড়ে, রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে হুঙ্কারনাদ ছাড়িয়া ভীমের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। কতবার, রাত দশটায় যাত্রা সুরু শুনিয়া বেলা পাঁচটার সময় গিয়া আসরে যায়গা দখল করিয়া বসিয়াছি। তাহার পর হুড়াহুড়ি গোলমাল করিতে করিতে কখন্ কোন্ অবসরে সেই আসরের ঠেলা-ঠেলির মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি এবং কখন্ যে রাজা আসিয়াছে, রাণী আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছে, 'চ্যাঁ-ভ্যাঁ'র পাল আসিয়া সঙ্গীতের ভীষণ আলাপ করিয়া গিয়াছে, আর রাশীকৃত পাকা চুল-দাড়ি-গোঁফের মধ্য হইতে ছাই-মাখান সাদা সাদা চোখ বাহির করিয়া কোন্ ফাঁকে নারদ কমণ্ডলু হাতে আসিয়া অনবরত ডা'ন হাত নাড়িতে নাড়িতে রাজাকে সদুপদেশ দান করিয়া গিয়াছে, সে সব কিছুই জানিতে পারিতাম না। তার পর হঠাৎ এক সময়ে ভীমের ভীষণ গর্জ্জনে ঘুম হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেই দেখিতাম—ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তীর-ধনু, গদা-তলোয়ার মিলিয়া মহামারী যুদ্ধ! অত যে ঘুম, যেন দেশছাড়া হইয়া যাইত, আর সেই ঠেলাঠেলির মধ্যে চেপ্টা হইয়া গিয়া অসীম উৎসাহের সহিত, অপলক চোখে হাঁ করিয়া তাহা দেখিতাম। তাহার পর যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরদিন বাড়ী আসিয়া যখন ভীমের কথা আর যুদ্ধের কথা বলিতাম, তখন ঠাকুমা হয় ত জিজ্ঞাসা করিত, "কিসের পালা হ'ল রে?" বলিতাম, "সীতার বনবাস" কি "দক্ষযজ্ঞ"; বিনুদা' কহিত, "না—না, ভারি ত জানিস্—'অক্রুর-সংবাদ'।" ঠাকুমা বলিত, "অক্রুর-সংবাদ! তা'তে আবার যুদ্ধ কোথায়—ভীম কোথায়?" বিনুদা' বলিয়া উঠিত, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি ত ভারি জান! ভীম আছে।"

'অক্রুর-সংবাদে' 'সীতার বনবাসে' বা 'দক্ষযজ্ঞে' ভীম থাকুক বা নাই থাকুক, যুদ্ধ হউক বা নাই হউক, ইহাদের পালায় কিন্তু দেখিলাম যে, সে সবের বালাই একেবারেই নাই। সুতরাং মোটেই তাহা ভাল লাগিল না। তবুও প্রায় ঘণ্টা-দুই সেখানে বসিয়া থাকিবার পর বাড়ী ফিরিবার জন্য যখন আমরা উঠিলাম, তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শীতের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

সদর দিয়া বাড়ী ঢুকিলে পাছে দাদামশাইয়ের চোখে পড়ি, সেই ভয়ে ঘুরিয়া খিড়কী দিয়া ঢুকিতে গেলাম। খিড়কীর দুয়ারের কাছে আসিয়া দেখি যে, সেই অন্ধকারের মধ্যে খিড়কীর দরজায় পিঠ দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত মামী-মা একলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

জার্ম্মাণীতে বাঙ্গালী রাসায়নিক

আজ ৭।৮ মাসকাল হইল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের সুযোগ্য অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায় Ghosh Travelling Fellowship লইয়া য়ুরোপ মহাদেশের ও ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রসায়নাগারগুলি পরিদর্শন করিতে ও তথাকার খ্যাতনামা অধ্যাপকসমূহের সহিত গবেষণা-সংক্রান্ত আলোচনা করিতে গমন করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর বের্ণ (Bern) নগরে, অধ্যাপক এফ্রায়েম (Ephraim)এর গবেষণাগারে ইনি ৪।৫ মাসকাল অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন প্রধানতঃ যে বিষয়ে গবেষণাকার্য্যে এখানে নিযুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক এফ্রায়েম আজকাল সেই বিষয়ের গবেষণা-কার্য্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং তাঁহার গবেষণাগারে শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন যে অভ্যর্থনা ও সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার গবেষণাগুলি কত উচ্চাঙ্গের। অধ্যাপক এফ্রায়েম তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু ও সহাধ্যায়িরূপে গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন যত দিন তাঁহার পরীক্ষাগারে ছিলেন, তত দিন তাঁহার সহকারী ও শিষ্যবর্গ তাঁহার যখন যে যন্ত্রপাতি ও রসায়ন দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছে, কোনও মূল্যাদি না লইয়া তখনই তাহা সরবরাহ করিয়াছেন; এমন কি, ইঁহারা স্বহস্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন; বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জনের যাহাতে কখনও কোনও কাযে অসুবিধা না হয়, সে দিকে সততই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। অধ্যাপক এফ্রায়েম-এর এই শিষ্য ও সহকর্ম্মিগণ কেহই সামান্য ব্যক্তি নহেন; ইঁহারা প্রত্যেকেই পি, এইচ, ডি (P H D) উপাধিধারী এবং বিজ্ঞানের এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক এফ্রায়েম সম্প্রতি Chemische Valeuz Und Bindugslehre নামক একখানি গবেষণা-সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে পরমাণুর গঠন ও যৌগিক শক্তি (Atomic Structure and Vabuvcy) সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত তিনি নিজে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ যে কায করিয়াছেন, তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন য়ুরোপযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া ১৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। অধ্যাপক এফ্রায়েম স্বরচিত এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জনকে উপহার প্রদানকালে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলেন যে, তাঁহার গবেষণাগুলি আর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হইলে এগুলি অতি সমাদরে তাঁহার পুস্তকে স্থানলাভ করিয়া তাঁহার পুস্তকের সার্থকতা বর্দ্ধন করিত। যাহা হউক, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে এই গবেষণাগুলি অবশ্যই সংযোজিত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায়

বের্ণ-এ অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন তথায় যে সকল নূতন বিষয়ে গবেষণা হইতেছে, তাহা আয়ত্ত করেন এবং অধ্যাপক এফ্রায়েমের সহিত সে বিষয়ে মস্তিষ্ক নিয়োজিত করেন। রঞ্জনরশ্মি (x-ray) রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্য দিয়া চালিত হইলে উহার যে বিকিরণ হয়, (x-ray spectrum), তাহাও তিনি এই বিজ্ঞানাগারে থাকিয়া আয়ত্ত করেন।

ইংলণ্ডের ন্যায় জার্ম্মাণী কিংবা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয়দের বিজেতা বিজিত সম্পর্ক নাই; কাযেই এই সকল স্থানে ভারতীয় জ্ঞানিগণের প্রতি স্বভাবজাত কোনও বিপরীত ভাব নাই এবং প্রকৃত জ্ঞানী লোক মাত্রেই এই সকল স্থানে সম্মানলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন যখন বের্ণ নগর পরিত্যাগ করেন, তখন রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য অধ্যাপক এফ্রায়েম, তদীয় পত্নী এবং তাঁহার সমস্ত শিষ্য ও সহযোগী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন এবং সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকেই তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন; পরিশেষে সকলের একই সঙ্গে একটি ফটোচিত্র তুলিয়া লওয়া হয়।

বের্ণ পরিত্যাগ করিয়া তিনি জুরিক নগরে যান; সম্প্রতি সেখান হইতে মুনিক নগরে গিয়াছেন। এই সব স্থানেও অধ্যাপকগণ তাঁহার গবেষণা-প্রসূত তথ্যসমূহ আলোচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে যোগ্য সমাদর করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি লণ্ডন মহানগরে যাইবেন এবং সেখানে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য নগরে প্রসিদ্ধ রসায়নাগারগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ও তত্তৎস্থানীয় অধ্যাপকগণের সহিত গবেষণা-সংক্রান্ত আলোচনা করিবেন।

জার্ম্মাণীর মত বিজ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রভূমিতে আমাদেরই এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপকের এরূপ সম্বর্দ্ধনা বাস্তবিকই আমাদের গৌরবের বিষয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গবেষণা-কাযে আমরাও একেবারে হীন নহি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এস, সি।

ডুবুরীর বিপদ

মিঃ ব্যারী ওডেল মার্কিণ ডুবুরী। যে সকল সাধারণ ডুবুরী সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা সংগ্রহ করে, তিনি সেই শ্রেণীর ডুবুরী নহেন; সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে সেই জাহাজে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উদ্ধার করাই তাঁহার কায। এই কার্য্যে একবার তিনি কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই নিম্নে প্রকাশিত হইল। ডুবুরীদের জীবন বিপৎসঙ্কুল; কিন্তু মিঃ ওডেলের ন্যায় বিপন্ন হইয়া অতি অল্পসংখ্যক ডুবুরীকেই বাঁচিতে দেখা যায়। "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?"—ওডেলের জীবন-রক্ষার কাহিনী এই প্রবচনের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

মিঃ ওডেল লিখিয়াছেন, "গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে ডুবুরী ও সন্তরণকারীদের যে সকল শত্রু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে হাঙ্গরের মত মহাশত্রু আর কিছুই নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ঝাঁক হাঙ্গরই মৃত্যুকবল হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। হাঙ্গরের দ্বারা আর কখন কোন ডুবুরীর প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে—এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত, এবং আমার বিশ্বাস, আর কোন ডুবুরী এরূপ অভিজ্ঞতা কোন দিন লাভ করিতে পারে নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমি ইউনাইটেড ষ্টেটসের নৌ-বিভাগে ডুবুরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। আমাকে গভীর সমুদ্রে ডুবুরীর কায করিতে হইত। সেই সময় আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ম্যানিলায় কায করিতেছিলাম। কিন্তু ডুবুরীগিরিতে আমি পারদর্শিতা লাভ করিলেও গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনের উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই; এই জন্য ঐরূপ সুযোগের আশায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। অবশেষে হঠাৎ একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। দক্ষিণ-ফিলিপাইনে 'আলবানী' নামক একখানি বে-সরকারী জাহাজের নাবিকের দলে যোগদানের জন্য আহূত হওয়ায়, আমি আগ্রহভরে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সেখানে আমি ডুবুরীগিরি করিবার ভার পাইলাম।

'আলবানী' জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বলিলেন, "দেখ ওডেল, স্প্যানিস্-আমেরিকান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু কাল পূর্ব্বে 'ডনা অল্টুরিয়স্' নামক একখানি স্প্যানিস্ জাহাজ বোহেলের উপকূলে ডুবিয়া গিয়াছিল। দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জে সে সময় অনেক স্প্যানিস্ সৈন্য ছিল, তাহাদের বেতন দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ঐ জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। জাহাজখানি জলমগ্ন হওয়ায় টাকাগুলি সেই জাহাজেই রহিয়া গিয়াছে। স্প্যানিস্ গবর্ণমেণ্ট সেই সময় জাহাজ হইতে টাকাগুলি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে নাই; এবং তাহার পর ইউনাইটেড ষ্টেটস স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দ্বীপগুলির অধিকারী হইলেও, জাহাজখানি কোথায় ডুবিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারে নাই। এত দিন পরে নিমজ্জিত জাহাজখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জাহাজ হইতে মালপত্র উত্তোলন করাই আমাদের জাহাজের বিশিষ্টতা বলিয়া 'ডনা অল্টুরিয়স্' হইতে সেই টাকাগুলি উত্তোলনের ভার পাইয়াছি। তুমি পাকা ডুবুরী, এ জন্য এই কার্য্যে তোমার সহযোগিতা প্রার্থনীয়। তুমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে কি?"

আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, নিশ্চয়ই পারিব।"

কাপ্তেন প্রকাশ্যভাবেই ঐ কথাগুলি আমাকে বলিয়াছিলেন, সুতরাং 'আলবানী' জাহাজের নাবিকরা সকলেই তাহা শুনিতে পাইল। এই সংবাদে নাবিকগুলা আনন্দে উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল; তখন তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? বস্তুতঃ জলেই হোক্, আর স্থলেই হোক্, গুপ্তধনের অস্তিত্বের সংবাদ পাইলেই লোকের বুকের রক্ত যেন নাচিয়া উঠে! বিশেষতঃ এইরূপ নিয়ম আছে যে, যদি কোন জাহাজ ধনরত্নাদিসহ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় এবং কোন জাহাজ তাহা তুলিবার ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই সকল ধনরত্ন উত্তোলিত হইবার পর সেই জাহাজের প্রত্যেক নাবিক যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করে এবং আমরা ডুবুরীরাও নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর 'বোনাস্' পাইয়া থাকি।

আমরা বোহেল উপকূলে যাত্রা করিলাম; পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা হাগনা ও ডুয়েরো নামক ক্ষুদ্র গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে নঙ্গর করিলাম। সমুদ্রগর্ভস্থ যে প্রবাল-স্তরে অপয়া 'ডনা অল্টুরিয়স্' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,

আমরা সেই স্থানটি বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিলাম বটে, কিন্তু সেই স্থানে জাহাজের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিয়া জাহাজখানি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমিই আদিষ্ট হইলাম।

আমি ডুবুরীর পরিচ্ছদে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া জাহাজখানি আবিষ্কার করিলাম; তাহা একখানি ক্ষুদ্র যুদ্ধ-জাহাজ। তাহা প্রবালস্তর হইতে গড়াইয়া ৬০ হাত জলের নীচে বসিয়া গিয়াছিল এবং সমুদ্রজাত শৈবাল-রাশিতে তাহা এরূপ আচ্ছাদিত হইয়াছিল যে, প্রথম দৃষ্টিতে আমার ধারণা হইল, তাহা কোন মগ্ন শৈলের একটি চূড়া মাত্র, জাহাজ নহে।

যাহা হউক, সতর্কভাবে চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম; জিনিষটা জাহাজই বটে! আমি যখন সেই জাহাজের চারিদিকে ঘুরিয়া জাহাজখানি পরীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় প্রকাণ্ড এক ঝাঁক 'বাছড়-মাছ' (ব্যাট্ ফিস্) দেখিয়া আমার চুই চক্ষু কপালে উঠিল! তাহাদের কতকগুলি সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাস্তরে বুক পাতিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া ছিল, আর কতকগুলি জাহাজের চতুর্দ্দিকে সাঁতার দিতেছিল। কি বিকাটাকার তাহাদের দেহ! এক একটির ওজন বারো চৌদ্দ মণের কম বলিয়া মনে হইল না। তাহাদের পিঠে যে 'পাখনা' আছে, তাহার সাহায্যে তাহারা এরূপ প্রচণ্ডবেগে জলের ভিতর বিচরণ করে যে, মনে হয় যেন উড়িয়া চলিয়াছে! তাহাদের মুখে টিয়াপাখীর চঞ্চুর মত ওষ্ঠ, অত্যন্ত কঠিন। এই ওষ্ঠ দ্বারা তাহারা শিকার ধরিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তাহার পর ইচ্ছানুসারে ভোজন করে। আমি এই 'বাছড়-মাছ' পূর্ব্বেও চুই একটি দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এই বিশাল-কায় জলচর প্রাণীর এত বড় ঝাঁক আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই!

এ স্থলে এ কথারও উল্লেখ বাহুল্য যে, গ্রীষ্ম-মণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই সকল সমুদ্রে ভীষণ-দর্শন নর-ভুক্ হাঙ্গরের সংখ্যাও অল্প নহে; কিন্তু ডুবুরীর কার্য্যে বহুবার আমাকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে হইয়াছে বলিয়া তাহাদের সহিত আমার পরিচয় ছিল। হাঙ্গরগুলার প্রকৃতি অত্যন্ত ভয়াবহ, তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক লোমাঞ্চকর কাহিনীও আমরা পাঠ করিয়াছি; কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, যদি কোন ডুবুরী সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিয়া, হাঙ্গর দেখিয়া একটুও নড়া-চড় না করে, এক স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে হাঙ্গর তাহার অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হইলেও তাহাকে আক্রমণ করে না; বরং তাহার আকার-প্রকার দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করে। কারণ, হাঙ্গর এক পক্ষে যেরূপ ভয়াবহ প্রাণী, ডুবুরীর পরিচ্ছদটাও হাঙ্গরের পক্ষে তদপেক্ষা অল্প ভয়াবহ নহে। বস্তুতঃ, ডুবুরীকে যখন সমুদ্রগর্ভে নামাইয়া দেওয়া হয়, বা সে সমুদ্রগর্ভ হইতে উপরে উঠিতে থাকে কিংবা সমুদ্রগর্ভে নামিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সেই সময়েই হাঙ্গর কর্ত্তৃক তাহার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। আমি জলের ভিতর হাঙ্গর দেখিবামাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, হাত-পা নাড়িলাম না। হাঙ্গরটা আমার কাছে আসিয়া কয়েক মিনিট ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিল, তাহার পর দূরে চলিয়া গেল; আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না।

'ডনা অল্টুরিয়স্' জাহাজখানি জলের ভিতর কাত হইয়া পড়িয়া ছিল। আমি তাহার আগাগোড়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম—ডিনামাইটের সাহায্যে তাহার দারুময় ডেকের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে জাহাজের কামরায় প্রবেশ করা অসাধ্য হইবে। আমার ধারণা হইল—সেই জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের কামরার ভিতর লোহার সিন্দুক আছে; সেই সিন্দুকেই টাকাগুলি রাখা হইয়াছিল। এই অনুমানে নির্ভর করিয়া আমি স্থির করিলাম—যদি জাহাজের সেই অংশের খানিকটা ডিনামাইটে উড়াইয়া দিয়া একটা বৃহৎ 'ফুকর' করিতে পারা যায়—তাহা হইলে 'আলবানী' জাহাজের বাষ্পচালিত কপি-কলের সাহায্যে সেই সিন্দুক উপরে লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে না।

এইরূপ স্থির করিয়া সে দিন আমি সমুদ্রগর্ভ হইতে উপরে উঠিলাম। পরদিন প্রভাতে আমি পুনর্ব্বার জলে নামিয়া সেই জাহাজে ডিনামাইট প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলাম। 'আলবানী' জাহাজের ডেক হইতেই ডিনামাইট বিস্ফুরিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আমি ডিনামাইটের আ[illegible] একটি বৈদ্যুতিক তার সংযোজিত করিয়া জাহাজ [illegible] একটু দূরে আসিলাম; তাহার পর আমাকে ঊর্দ্ধে তুলি[illegible] জন্য ইঙ্গিত করিতে উদ্যত হইয়াছি—ঠিক সেই সময় এ[illegible]

ঝাঁক হাঙ্গরকে আমার কাছে আসিতে দেখিলাম। আমার আর নড়া-চড়া করা হইল না ; আমি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি আমি সে সময় আমাকে টানিয়া তুলিবার জন্য ইঙ্গিত করিতাম, তাহা হইলে আমি অর্দ্ধ-পথ উঠিতে না উঠিতে হাঙ্গরগুলা আমাকে আক্রমণ করিত।

যাহা হউক, এই 'সামুদ্রিক ব্যাঘ্র'গুলি দূরে প্রস্থান করিলে আমাকে টানিয়া তুলিবার জন্য আমার সহযোগিগণকে ইঙ্গিত করিলাম। তাহারা আমার ইঙ্গিত অনুসারে আমাকে টানিয়া তুলিতে লাগিল ; আমি সমুদ্রগর্ভ হইতে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উর্দ্ধে উঠিয়াছি—সেই সময় একটা বিশালকায় 'বাদুড়মাছ' আমার মাথার ঠিক উপরেই ভাসমান দেখিলাম ; আমি তখন তাহার পেটের তলায় ঝুলিতেছি !—মাছটা (?) মুহূর্ত্তমধ্যে ঠুলী করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল, এবং তাহার সুপ্রশস্ত পক্ষপুটে আমাকে আচ্ছাদিত করিল। তখন আমার মনে হইল—আমি গিয়াছি, আর আমার উদ্ধার নাই।

আমার অবস্থা তখন কিরূপ সঙ্কটজনক, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায় পাইব ? আমাকে টানিয়া তুলিতে আমার সহযোগিবর্গকে নিষেধ করিলাম ; কারণ, মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমাকে টানিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেই সেই দড়া এবং বায়ু-নল পনের মণ ভারী প্রকাণ্ডকায় বাদুড়মাছের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার ফল কিরূপ হইবে—তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

আমি দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার সমুদ্রগর্ভে নামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলাম। তাহারা পুনর্ব্বার আমাকে নামাইতে লাগিল। আমি বাদুড়মাছের চঞ্চুপুটে আবদ্ধ হইয়া সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলাম। কোন্ উপন্যাসের কাহিনী ইহা অপেক্ষা অধিকতর লোমাঞ্চকর ?

সেই বাদুড়মাছের দেহ এরূপ বৃহৎ যে, কোন বাজ-পক্ষীর চঞ্চুপুটে আবদ্ধ হইলে ক্ষুদ্র ফড়িঙের অবস্থা যেরূপ হয়, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইল ! আমার দেহ তাহার অধরোষ্ঠের চাপে ক্রমশঃ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। সেই চাপ দুঃসহ ; আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। আমার মনে হইল, আমার অস্থি-পঞ্জর সেই ভীষণ চাপে মট্-মট্ শব্দ করিতেছে ! এই বিপদের উপর আমার আর একটি আশঙ্কাও প্রবল হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার সহযোগীদের যদি মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ হয়—আমি কোন রকম বিপদে পড়িয়াছি—তাহা হইলে আমার ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা আমাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া তুলিবে। তাহার ফলে রজ্জু ছিঁড়িয়া যাইবে এবং সেই ভীষণ প্রাণীর কবল হইতে আমার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিবে না। আমার মৃত্যু অনিবার্য্য !

আমি অধীর, অস্থির হইয়া উঠিলাম এবং তাহার মুখ-বিবর হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু যতই আমি নড়াচড়া করিতে লাগিলাম, মাছটা আমাকে নির্জীব করিবার জন্য ততই জোরে চাপ দিতে লাগিল। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার দক্ষিণ হস্তখানি তাহার চঞ্চুপুট হইতে বাহির করিয়া লইতে সমর্থ হইলাম ; তখন সেই হাত দিয়া অতি কষ্টে আমার কোমরবন্ধ হইতে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি বাহির করিলাম। ছোরাখানি খাপ হইতে টানিয়া বাহির করিতে অধিক সময় না লাগিলেও সেই সময়টুকু অনন্তকালের মত দীর্ঘ মনে হইল ! ছোরাখানি বাহির করিয়াই মাছটার চুয়ালে দুই তিনবার খোঁচা মারিলাম ; কিন্তু কায়দামত আঘাত করিতে না পারায় সেই খোঁচা তেমন গভীর হইল না। শরীরে ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, মাছটা সেই খোঁচায় বোধ হয় ততটুকু যন্ত্রণাও অনুভব করিল না।

কিন্তু সেই সামান্য খোঁচাতেই একটা কায হইল ; মাছটার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। ছোরার আঘাতে সেই রাক্ষসটা ক্রুদ্ধ হইয়া জলরাশি আলোড়িত করিতে লাগিল এবং আমাকে মুখের ভিতর সাপটাইয়া ধরিয়া আরও অধিক জোরে চাপ দিতে আরম্ভ করিল। সেই দারুণ পেষণে আমার প্রাণ বাহির হয় আর কি ! আমি জীবনের আশা পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলাম, আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় দেখিতে পাইলাম না ; বুঝিলাম, দুই এক মিনিটের মধ্যেই আমাকে তাহার উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিতে হইবে ; আমার আসন্নকাল সমুপস্থিত !

আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, সেই সময় সেই প্রকাণ্ড বাদুড়মাছটাকে কে যেন ছোঁ মারিয়া চক্ষুর নিমেষে

দূরে টানিয়া লইয়া গেল! সেই আকস্মিক আকর্ষণে আমি তাহার ওষ্ঠপুট হইতে স্খলিত হইলাম। আমার মনে হইল, যেন কোন দৈত্যের প্রচণ্ড বাহুতাড়নে, বাত্যাচালিত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় সে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল! আমি স্তম্ভিত-হৃদয়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আমি জাহাজের পাশে দাঁড়াইয়া কিছু কাল পূর্ব্বে হাঙ্গরের যে ঝাঁক আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম—তাহারা সেই বাদুড়মাছটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। এক টুকরা হাড়ের জন্য কুকুরগুলার মধ্যে যে রকম কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়, ঠিক সেই অবস্থা।

বাদুড়মাছের কবলে ডুবুরী

হাঙ্গরগুলার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমি বাদুড়মাছটার চুয়ালে ছোরার আঘাত করিয়াছিলাম; আঘাত সামান্য হইলেও তাহাতে রক্তপাত হইয়াছিল। হাঙ্গরগুলা সেই রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাছটাকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ঠিক যে সময়ে আমি বাদুড়-মাছের উদরে প্রবেশোদ্যত হইয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তে হাঙ্গরগুলা তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া আমার প্রাণ-রক্ষা করিল। বাদুড়-মাছটা হাঙ্গরের ঝাঁক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু সে একাকী কি করিবে? কয়েক মিনিটের মধ্যে মাছের রক্তে সমুদ্রের জল বহুদূর পর্য্যন্ত লোহিতাভ হইল।

যখন তাহাদের যুদ্ধ চলিতে-ছিল, তখন আমার প্রতি তাহা-দের লক্ষ্য ছিল না; তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে কিছু দূরে প্রস্থান করিবামাত্র আমার সহ-যোগিগণকে ইঙ্গিত করিলাম; তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে উপরে তুলিয়া ফেলিল।

এইরূপে আমি মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম। কিন্তু প্রাণভয়ে আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিলাম না। পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সমুদ্র-গর্ভে নামিয়া আমার অবশিষ্ট কায শেষ করিলাম। ডিনামাইট বিস্ফুরিত হওয়ায় জাহাজের যে অংশ উড়িয়া গিয়াছিল, সেই 'ফুকর' দিয়া জাহাজে প্রবেশ করিলাম, এবং লোহার সিন্দুকটি 'আলবানী' জাহাজের কপি-কলের শিকলে বাঁধিয়া দিলাম। কয়েক মিনিট পরে সেই সিন্দুক আলবানী জাহাজের ডেকের উপর উত্তোলিত হইলে তাহা খুলিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একটিও স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা দেখিতে পাইলাম না আমাদের সকল শ্রম বিফল হইল; কারণ, স্প্যানিস্ সৈন্যগণের জন্য ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে নোট প্রেরিত হইয়াছিল সিন্দুকটি দীর্ঘকাল জলের ভিতর থাকায় নোটগুলি জলে গলিয়া গিয়াছিল; তাহাদের চিহ্নমাত্র ছিল না।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অভিভাষণ *

সাহিত্য-সম্মেলন কিছু কাল হইতে বাঙ্গালী জাতির—শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের চিত্তক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই বাঙ্গালার বাহিরেও যেখানে দুই দশ জন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা দেবী ভারতীর পূজার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিক্ষিত মানুষ সাহিত্যকে বাদ দিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না, এ কথাটা অত্যন্ত সত্য। সাহিত্যই জাতির পরিচয়, সভ্যতার দ্যোতক। যাহার কোন সাহিত্য নাই, সে সভ্য সমাজে কোন পরিচয় দিতে পারে না, জগতে—এই বিরাট বিশ্বে তাহার জীবন-ধারণের স্থান থাকিলেও সভ্য মানব-সমাজে তাহার জন্য কোন আসনই নির্দ্দিষ্ট নাই।

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ আবহমানকাল হইতে নানা প্রকার আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়েও সমগ্র সভ্য সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ বহু ভাবে, বহু প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণভাবে প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকের যে বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার আছে, আমি সাহিত্যের সেই অংশ লইয়া আপনাদের কাছে আমার ব্যক্তিগত মর্ম্মকথা নিবেদন করিতেছি। য়ুরোপীয় সাহিত্যিক ধুরন্ধর অথবা ভারতীয় কিম্বা অন্য স্থানের মনস্বী সাহিত্যরসিকদিগের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না।

আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধেই আমি এ ক্ষেত্রে গুটিকয়েক কথা বলিবার প্রার্থনা করি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য তাহার আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী, ধর্ম্ম প্রভৃতিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই বৈশিষ্ট্যই সেই জাতির পরিচয়, আর সেই পরিচয় তাহার সাহিত্যেই আত্মপ্রকাশ করে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায়, বাঙ্গালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা হয় ত আপনারা অস্বীকার করিবেন না। এই বৈশিষ্ট্যই তাহার প্রাণ। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রাণধারা বিদ্যমান আছে বলিয়া উহা জগতের সাহিত্যের মধ্যে স্বতন্ত্র আসন লাভের যোগ্য। আপনারা বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই অবগত আছেন, পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার এই প্রাণধারা বা বৈশিষ্ট্য লইয়া অনেক কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এই প্রাণধারার পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়? বিরাট সহরে নিশ্চয়ই নহে। পল্লীর প্রাঙ্গণে—ক্ষুদ্রতম গ্রামের কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। বাঙ্গালী—শুধু আধুনিক যুগে নহে, বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যসাধনা করিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব কবিদিগের যুগকে সাহিত্যসাধনার অন্যতম গৌরবময় যুগ বলিয়া প্রত্যেক সাহিত্য-রসিকই স্বীকার করিবেন। তাহারও পূর্ব্বে এবং পরে বাঙ্গালী কবি, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন উপলক্ষে বাঙ্গালীর প্রাণধারাকে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, রূপ দিয়াছেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই সকল কবির গান, ছড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালী-জীবনের জাহ্নবী, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণী-সঙ্গমের পবিত্র, অনবদ্য মধুর প্রাণের প্রবাহধারা শত শতাব্দী ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে। এইখানেই বাঙ্গালীর সুস্পষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।

এই প্রাণধারা সম্বন্ধে সমালোচক তাঁহার রুচি অনুযায়ী যথেচ্ছ সমালোচনা করিতে পারেন—অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্তির কোন কথা বলিবার নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য, বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে এই সকল সাহিত্য হইতেই তাহা পাওয়া যাইবে। অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ।

ঢাকা বাঙ্গালা দেশের একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী-জীবনের অনেক হাস্য, করুণ, বিয়োগান্ত ঘটনার অভিনয় এই প্রদেশের নানা স্থানে—সহরে ও পল্লীতে, প্রান্তরে, নদীতীরে সর্ব্বত্র অভিনীত হইয়া গিয়াছে। যেখানে সভ্য মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, তথায় মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে নানাপ্রকার ঘটনার সমাবেশ সম্ভবপর। মানুষের আহার, নিদ্রা ও মৃত্যুর অবকাশে অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে, ঘটা সম্ভবপর—শুধু সম্ভবপর নহে, অনিবার্য্য। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে—গৃহ-কোণে, নদীতীরে, পল্লী-প্রাঙ্গণে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ-সংক্রান্ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, আত্মবিস্মৃত জাতির দৃষ্টির সম্মুখে তাহা ধরা পড়ে না। কিন্তু সে সকল ঘটনার স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। বাতাসে, আকাশেও চিরদিনের জন্য তাহার প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

বাঙ্গালার কবি, কথা-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পশ্চিম দিগ্বলয় হইতে দৃষ্টি ও মন ফিরাইয়া লইয়া প্রাচীর উদয়শিখরের দিকে দৃষ্টি ও চিত্ত যদি নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার পল্লীপ্রাঙ্গণে সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি রচনার বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সেই সকল উপাদানের সমবায়ে যে কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস রচিত হইবে, তাহাই বাঙ্গালীর প্রাণধারায় পরিপুষ্ট বলিয়া বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে সম্মান প্রাপ্ত হইবে। যে সকল সাহিত্যিক এ পর্য্যন্ত এই মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বাঙ্গালা সাহিত্যকে অমরতা-দানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। উত্তরকালে যাঁহারা যথার্থ সাহিত্য রচনা করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই যথার্থ সার্থকতা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

বিশ্বসাহিত্য বলিতে আমি এইমাত্র বুঝি, যে সাহিত্যে প্রাণ-বস্তু আছে, চিরন্তন মানবের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ প্রভৃতি বিদ্যমান, মানব-মনোবৃত্তি সুস্থ, সবল ও কৃত্রিমতাবর্জ্জিত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে—চিরন্তন মানবের চরিত্রগত রসলীলা অকৃত্রিম মাধুর্য্য-স্রোতে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অনন্তকালের জন্য সমাদৃত হইবে! কোন একটা জাতির বৈশিষ্ট্য যদি সেই রসপ্রকাশের অবকাশে ব্যক্ত হয়, পরিপুষ্টভাবে, পূর্ণতররূপে রচিত সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে, তবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তাহার আসন চিরভাস্বর প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকিবে।

---

* মাণিকগঞ্জ-বলিসার সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

কি উদ্ভিদ্‌জগতে, কি প্রাণিজগতে সর্ব্বত্রই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। এক জাতীয় একটি বৃক্ষের সহিত সেই জাতীয় অপর বৃক্ষের আকারগত ও প্রকৃতিগত কি বিভিন্নতা আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেও সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায়। প্রাণিজগতেও—ইতর উচ্চ সর্ব্বশ্রেণীর জীবের মধ্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-জাতির—একটা মানুষের সহিত অপর মানুষের আকারগত ও প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই বিরাট বিশ্বে দুই জন একই প্রকারের মনুষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে কি? সুতরাং বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টির বিচিত্র লীলা। যখন এই বৈশিষ্ট্য অন্তর্হিত হইবে, তখনই মহাপ্রলয় হইবে। বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি, উহার অভাবই প্রলয় বা ধ্বংস।

বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর এই বিশিষ্টতা যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি সমাদৃত থাকিবে। যে দিন এই জাতি তাহার নিজস্ব ভাবধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া অপর কোনও প্রভাবে আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিবে, সেই দিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। বাঙ্গালী রাষ্ট্রনৈতিক, বাঙ্গালী দার্শনিক, বাঙ্গালী সমাজ-তাত্ত্বিক, বাঙ্গালী কবি, কথা-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতিকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আপনারা বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজধানী হইতে বহু শত ক্রোশ দূরে সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। বাঙ্গালার অতীত যুগের রাজধানী আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে। এই বিশাল পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীর সান্নিধ্যে যমুনা ও পদ্মার গর্ভে কত গ্রাম ও পল্লী অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, আবার কত জনপদ শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা মায়ের রূপ ধরিয়া সলিলগর্ভ হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, ঐতিহাসিক যদি তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারেন, তাহাতে বাঙ্গালী জাতি কি অপূর্ব্ব সম্পদ্ লাভ করিবে না? সত্য বটে, ঢাকার ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু জাতির অভাবের তুলনায়, প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা কতটুকু? কবি, কথা-সাহিত্যিক বস্তুর অভাবে, উপকরণের অভাবে যখন সাগরপারে মুখ ফিরাইয়া বস্তুর সন্ধান করিতে থাকেন, তখন দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

একবার কিশোর বয়সে কোনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিকের রচনায় পড়িয়াছিলাম,—"পাঠক! যদি তোমায় হৃদয় বা অনুভূতি-শক্তি থাকে, প্রত্যেক বিষয়েই তুমি গল্পের সন্ধান লাভ করিবে।" কথাটা সেই বয়সেই হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছিল। কবি উপাদানের অভাবে কাব্য রচনা করিতে পারেন না, শুধু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, যখন এই অভিযোগ শুনিতে পাই, তখন মনে হয়, হায় বঙ্গজননি! হায় বাঙ্গালী ভাই! তোমার পল্লীপ্রাঙ্গণে, কুটীরে, কান্তারে কোটি কোটি উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তোমার বুকের উপর দিয়া হে বঙ্গজননি! শত শত নদ-নদীর প্রবাহে কত কাব্য, কত কাহিনীর স্মৃতি বহিয়া চলিয়াছে, আজ বাঙ্গালীর উপাদানের অভাব? কথা-সাহিত্যিক কেন ফরাসী, রুসিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মেণী, গ্রীস বা রোমের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে? তাহার এই বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র গল্পের উপাদান কি নাই? হৃদয় দিয়া অনুসন্ধান কর, গল্পের, কথা-সাহিত্যের, কাব্য ইতিহাসের উপকরণের অভাব হইবে না।

কিন্তু বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাব অধুনা আমাদের মনের উপর অন্ততঃ আংশিকভাবেও জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে—আংশিকভাবে আমাদের চিত্ত বহিঃপ্রভাবে মোহগ্রস্ত। সেই মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় দিয়া, বাঙ্গালীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ঐতিহ্যের সন্ধান লইতে হইবে, একান্তমনে আপনার বৈশিষ্ট্যের ধারাকে সর্ব্বপ্রকার বাধাবন্ধ হইতে মুক্ত করিতে হইবে, তবেই বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক, বাঙ্গালী চিত্রশিল্পী যথার্থ বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর চিত্ত ও রূপ তুলিকার স্পর্শে চিত্র করিয়া ধন্য হইবেন, অপরকেও ধন্য করিবেন। বিশ্বের সাহিত্য-দরবার তখন শ্রদ্ধানতশিরে বাঙ্গালী জাতির সমগ্র সাহিত্যকে অভিনন্দিত করিবে।

পুরাতন সাহিত্য, নূতন সাহিত্য লইয়া কিছু কাল হইতে সাহিত্যিরসিকগণের মধ্যে একটা বিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে। এই বিতণ্ডা, এই মতবাদের সংঘর্ষ প্রাণশক্তির লক্ষণ হইলেও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার। এ বিষয়ে পণ্ডিত-সম্প্রদায় নানা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের নূতনত্ব বা পুরাতনত্ব সম্বন্ধে এই নগণ্য সেবকের ধারণাটা আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। সাহিত্য কি নূতন হইতে পারে? পুরাতনের অপবাদ কি সাহিত্যকে প্রদান করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয় না? যাহা মানব-মনের চিরন্তন ধারাকে ব্যক্ত করে, যাহার পুণ্যপ্রবাহ-ধারা অনাদি মানবের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া অনন্তকালের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, তাহাকে নূতন অথবা পুরাতন সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলে সাহিত্যকে অপমান করা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাহিত্য পুরাতনও নহে, নূতনও নহে, তাহা চিরন্তন—শাশ্বত।

তবে এই সাহিত্যের প্রকাশধারা যুগে যুগে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ লইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রাণশক্তি অপরিবর্ত্তনীয়। সত্য যেমন স্বপ্রকাশ, কোনও যুগে কোনও প্রকারে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না; সূর্য্য অনাদিকাল হইতে এই বিশ্বে জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন নাই, সাহিত্যও ঠিক তেমনই, তাহা সত্য, শিব, সুন্দরের মহিমায় পবিত্র, সমুজ্জ্বল এবং মনোহর।

আপনারা বেদী রচনা করিয়া এই গ্রামে সাহিত্য-সংসদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যৌবনের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রবীণতার গাম্ভীর্য্য ও দূরদর্শিতা লইয়া বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিবার জন্য সাহিত্যের মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে থাকুন। যৌবন স্রষ্টা—বয়সের দ্বারা যৌবনকে পরিমাপ করা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বৎসরে কি কালের মাপ?" কথাটা অমোঘ সত্য। এক জন বিশ বৎসরের যুবক দেহ ও মনে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধের দেহে যৌবনের শক্তি, মনে তারুণ্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ মানুষের সৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ, ততদিন সে যুবা—বৎসরের মাপ তাহার

মনের উপর কোন বিশেষ্ প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। আপনারা কি পলিতকেশ, গলিতদন্ত পুরুষ দেখেন নাই, যাঁহার অন্তর চির-যৌবনের শক্তি, উত্তেজনা ও উৎসাহ নবীন-বয়স্ক পুরুষকেও লজ্জা দেয়? যখনই মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার মৃত্যু ঘটে, দৈহিক মৃত্যু না হইলেও তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। সুতরাং এখানে বয়স-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কেহ নিরুৎসাহ হইবেন না। যতক্ষণ মন বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত বা জরাগ্রস্ত না হইবে, ততক্ষণ সৃষ্টির আনন্দ সাহিত্যক্ষেত্রে অব্যাহত থাকিবে।

সহরের বক্ষোদেশ প্রমথিত করিয়া কর্ম্মের রথচক্র ঘর্ঘর রবে অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে, বিভিন্ন বিষয়ের আন্দোলন, আলোচনা, অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জনের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চিত্তস্থির করিয়া সাহিত্যরচনায় অবহিত হইতে দেয় না। সে অবকাশ পল্লীমাতার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। জননীর শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায় হৃদয় মুগ্ধ, অভিভূত, পরিতৃপ্ত হয়; বৃক্ষলতার নব কিসলয়ে কল্পনার রূপরেখা দেখা যায়, নদীর কলতানে বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কবির মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—বাঙ্গালার পল্লীকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

গ্রাম যেমন নগরকে বস্তুতান্ত্রিক সম্পদ্ দান করে, পল্লী-সাহিত্য তেমনই জাতির সাহিত্যকে সর্ব্বাবয়বপূর্ণ করিয়া তুলে। আধুনিক নগরগুলি যেমনভাবে গ্রামগুলিকে রিক্ত করিয়া ঐশ্বর্য্য-মহিমায় দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে, সাহিত্যও যদি শুধু নাগরিক সভ্যতার মোহে আত্ম-হত্যা করে—পল্লী-সাহিত্যকে বাদ দিয়া শুধু নাগরিক সাহিত্যে পর্য্যবসিত হইতে চাহে, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের পরিণাম শোচনীয় হইবে বলিয়াই মনে হয়। আপনাদের এ অঞ্চলে কি "ময়নামতীর" গানের মত কোন অকৃত্রিম সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না? নিশ্চয়ই আছে, শুধু হৃদয়বান্ সাধকের প্রাণপাত চেষ্টার উপর তাহার আবিষ্কার নির্ভর করিতেছে।

আজ কল্পনার উন্মাদনাবশে দেখিতে পাইতেছি, আপনাদের পল্লী-প্রান্তর, নদী, কানন, কুটীর-প্রাঙ্গণ হইতে কত অশরীরী আত্মা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাহিনী ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ আধার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে। তাহাদের কাহিনীর মধ্যে কত দীর্ঘশ্বাস, তপ্ত অশ্রু পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। শুধু অতীত নহে—বর্ত্তমানও সকলকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে, অনুসন্ধান কর, সাহিত্যরচনার অপূর্ব্ব উপাদান মিলিবে—বাঙ্গালার পল্লীর মণি-কোঠায় নানারত্ন-পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব দ্যুতিমান রত্নহার নির্ম্মিত হইতে পারে—বাহিরে, পরের ঘরে ঋণ গ্রহণের জন্য ধাবিত হইবার প্রয়োজন নাই।

আমি কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেছি, আপনাদের এই পাঠাগারে বসিয়া উত্তরকালের সাহিত্যিক মাতৃভাষার ভাণ্ডারে বিবিধ অর্ঘ্যরাজি প্রেরণ করিতেছেন। পাঠাগার শুধু পাঠস্পৃহা-তৃপ্তির জন্য নহে, উহার সাহায্যে মানুষ গড়িতে পারা যায়। সেই মানুষ অবশ্যই এখান হইতে গড়িয়া উঠিবে।

সারা জীবন ধরিয়া কথা-সাহিত্যের রসবস্তুর সন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছি। সেই সুদীর্ঘকালের চেষ্টার মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝিয়াছি, আত্মবিশ্লেষণ না করিলে যেমন আপনাকে বুঝা যায় না, তেমনই যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার ভাবধারাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোন রসবস্তুই যথার্থভাবে সৃষ্টি করা যায় না। এই আত্মবিশ্লেষণ, ভাবধারার সন্ধানলাভ প্রভৃত সাধনসাপেক্ষ। স্বল্পায়াসে, স্বল্পশ্রমে তাহা কখনই হইতে পারে না।

যাঁহারা এখন তরুণ—বয়স বাদ দিয়া অন্তরের তারুণ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিতেছি—তাঁহারা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ অবশ্যই করিবেন। এই পাঠাগারের সাহায্যে আত্মবিশ্লেষণ এবং জাতীয় ভাবধারাকে আয়ত্ত করিবার সুবিধা তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন। তাহার পর, কে বলিতে পারে, উত্তরকালে এক জন বঙ্কিম, এক জন মাইকেল, নবীন, হেম, রবীন্দ্রনাথের মত যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি এই অঞ্চল হইতে আবির্ভূত হইবেন না?

পৃথিবীতে দুঃখের সীমা নাই, বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভাব নাই—দুঃখবাদই সমগ্র বিশ্বের বুধমণ্ডলীকে বিশ্বলীলার রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রাখিয়াছে; কিন্তু তথাপি বলিব, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে দুঃখবাদের সমর্থক নহি। আমাদের এই দেশ, আমাদের এই জাতি, আমাদের সাহিত্য নৈরাশ্যের অন্ধকার-সমুদ্রে কখনই আত্মহত্যা করিতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। এই দেশ, এই জাতি, এই সাহিত্য কালে অপূর্ব্ব শক্তি, অপূর্ব্ব দীপ্তি, অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য লাভ করিয়া বিশ্বের দরবারে জয়-মাল্য লাভ করিবে। সেই আশায় বাঁচিয়া থাকিব, সেই আশায় বারংবার এই বাঙ্গালা মায়ের কোলেই জন্মগ্রহণ করিব।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

অমৃত

কারণ যাহাই হউক, স্বামী রাজেন্দ্র ও স্ত্রী সন্ধ্যারাণীর মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। প্রকাণ্ড অট্টালিকার বাহিরের অংশের নীচের তলায় রাজেন্দ্র থাকিত—সেখানেই তাহার আহার, বিরাম, নিদ্রা সবই হইত। পাচক, ভৃত্য ও সবই তাহার পৃথক্, ভুলিয়াও অন্তঃপুরের দিকে কোন দিন সে যাইত না। পাচিকা ও পরিচারিকাপরিবৃতা সন্ধ্যারাণী দিন-রাত্রি আপনার নির্দ্দিষ্ট অন্তঃপুরেই থাকিত। ব্রত, পূজা, দানধ্যানাদি লইয়াই তাহার দিন কাটিত। বাহিরের দিকে সে কখন ফিরিয়াও চাহিত না।

সংসারে মা নাই যে, পুত্র ও পুত্রবধূর মনোমালিন্য দূর করিয়া দেন।

রাজেন্দ্র বিটপীগ্রামের জমীদার—বার্ষিক আয় ৩৫।৩৬ হাজার টাকার কম নহে। বয়স ত্রিশের বেশী নহে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্ ও সুপুরুষ।

সন্ধ্যারাণীও যুবতী ও সুন্দরী—বয়স বৎসর ২৩ হইবে।

তথাপি দুই জনের মধ্যে এই বিপুল ব্যবধান।

যেখানে ক্রোধ বা কলহ ঘটিয়া থাকে, সেখানে তাহার নিষ্পত্তির একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত কেহ কলহ দেখে নাই। একটা উচ্চ বাক্যের প্রয়োগও শুনে নাই।

অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর মধ্যে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ ছিল। সেটি তাহাদের ৬।৭ বৎসরবয়স্ক পুত্র—নাম অমৃত। সে যেন অমৃতধারার মতই দুই প্রান্তস্থিত দুইটি মরু-হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরের পর যখন কাছারীর সব কায মিটিয়া যাইত, ভৃত্যগণেরও যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সময় আসিত, উপর-তলায় লোকচলাচল মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া একবারে বন্ধ হইত, রাজেন্দ্র স্নানাহার শেষ করিয়া আপনার বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া থাকিত, ঘড়ীতে কাঁটায় কাঁটায় যখন ২টা বাজিত—প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে একটি সুন্দর বালক ধীর-পদে রাজেন্দ্রের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিত। আকাশে অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ের মত অমৃতের আবির্ভাবে রাজেন্দ্রে মুখে একটিবার হাসি ফুটিয়া উঠিত। নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বই, শ্লেট ও পেন্সিল লইয়া বালক পিতার সম্মুখে বসিয় পাঠাভ্যাস করিত। রাজেন্দ্র তাহাকে পড়াইত, কত কথ জিজ্ঞাসা করিত, কত আদর করিত। দুই ঘণ্টা সম যেন নিমেষে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত।

আবার কাছারীর সময় হইত, দ্বিতলের ছাদ ও গৃহগুলি পরিচারক ও পরিচারিকার পদশব্দে আবার মুখরিত হইতে থাকিত। ঘড়ীতে কাঁটায় কাঁটায় ৪টা বাজিত। বাল পিতার অনুমতি লইয়া বই, শ্লেট ইত্যাদি যথাস্থানে তুলি রাখিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইত।

রাজেন্দ্র পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি সব নীচের ধাপে দাঁড়াইত।

বালক বলিত, "বাবা, যাই।"

আকাশে অকস্মাৎ সূর্য্যাস্তের মত বালকের গম রাজেন্দ্রের মুখে আবার একটিবার হাসি ফুটিয়া উঠিত বালক সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই দেখিত, অদূরে ব স্নেহ ও নয়নে প্রতীক্ষা লইয়া মা দাঁড়াইয়া। ছুটিয়া মা কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। মাতা ও পুত্রের পদশব্দ ধী ধীরে অন্তঃপুরের মাঝে মিলাইয়া যাইত, আর রাজেন্দ্র মৃ পদক্ষেপে আপনার কক্ষে ফিরিত।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। সমস্ত দিনে মধ্যে পুত্র একটিবারমাত্র অন্তঃপুরের স্পর্শ ও বার্ত্তা বাহি বহিয়া আনে ও বাহিরের বার্ত্তা ও স্পর্শ অন্তঃপুরের ম লইয়া যায়। দুই জনের কাহারও মুখে এ সম্বন্ধে এ কথাও ফুটে না, কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে হয় ত সে দুই জনেই অনুভব করে এবং ঐটুকু দুই জনেই হয় ত স আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে। এই প্রতীক্ষা শুধু পুত্রের জন্যই, না, আর কোন চিন্তা বা ভাব ইহার স মিশানো আছে, দুই জনের এক জনও তাহা ভা অবকাশ পায় না, হয় ত বা ভাবিতে চাহেও না।

প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু কাটিয়া যাইতেই দুই জন সিঁড়ির দুই প্রান্তের কাছাকাছি এমন যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইত যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইত না। নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু ত্যাগ করিয়া দুই জনের এক জনও এতটুকু অগ্রসর হইত না। দুই জনেই অনুভব করিত, অপর প্রান্তে অপর এক জন ক্ষণেকের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার এখনই চলিয়া যাইবে।

কেন ইহাদের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ ঘটিল, এ কথা কেহ জানে না; জানিবার উপায় বা চেষ্টা করিবার দুঃসাহস কাহারও নাই। কিন্তু অনেকে জানে, চিরকাল এমন ছিল না। এমন দিনও ছিল, যে দিন কাছারীর সময়টুকু বাদে সমস্ত সময় রাজেন্দ্রের অন্তঃপুরেই কাটিয়া যাইত। কোন দিন দৈবাৎ অন্তঃপুরে ফিরিতে একটু বিলম্ব হইলে দুইখানি কোমল চঞ্চল চরণস্পর্শে অন্তঃপুরের পথ বার বার মুখর হইয়া উঠিত।

সে দিন আর এ দিন! কিন্তু এ কথার কেহ একটা উল্লেখও করে না।

২

সন্ধ্যারাণী কলিকাতার এক শিক্ষকের কন্যা। পিতা সন্ধ্যার জন্য যৌতুকের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ভগবান্ তাহাকে প্রচুর রূপ ও গুণের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রের বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে জানিয়া সন্ধ্যার পিতা তাহার সহিত দেখা করেন ও বলেন, তাঁহার উপযুক্ত যৌতুক দিবার সঙ্গতি নাই; কিন্তু তাঁহার কন্যার দেহ ও মন দুই সুন্দর এবং শিক্ষাও সে যথাসম্ভব পাইয়াছে। রাজেন্দ্র সন্ধ্যাকে দেখিতে যায়, দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও বিনা পণে সন্ধ্যাকে বিবাহ করে।

বিবাহের পর দুইটি বৎসর সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। সে অনাবিল আনন্দের স্মৃতি এখনও দুই জনের মনের কোণে অঙ্কিত আছে। আনন্দ বুঝি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে দিন রাজেন্দ্র শুনিল যে, সন্ধ্যা সন্তান-সম্ভাবিতা।

ঠিক এই সময়ে সন্ধ্যার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। জেলা কোর্টে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়া রাজেন্দ্র অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার এক বন্ধু মণিলালের সাক্ষাৎ পায়। মণিলাল ব্যারিষ্টার, কোন মামলা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। কলেজে দুই জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিল; তার পর কখন্ যে সে বিলাত যায়, সে সংবাদ রাজেন্দ্র অবগত ছিল না।

রাজেন্দ্র বন্ধুকে ছাড়িল না। এক রাত্রির জন্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিল। সন্ধ্যাকে দেখিয়া মণিলাল চমকিত হইল; কিন্তু তখন কিছু বলিল না। আহারাদির পর দুই বন্ধু এক কক্ষে শয়নের জন্য বহির্বাটীতে গেল। সেখানে মণিলাল সন্ধ্যার মত সুন্দরী ও শিক্ষিতা স্ত্রীলাভের জন্য রাজেন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়া বলিল যে, তাহাদের বন্ধুত্ব এবার হইতে আরও গভীর হইল,—কারণ, সন্ধ্যা তাহারও পুরাতন বন্ধু এবং রাজেন্দ্র যদি কিছু মনে না করে, তাহা হইলে সে বলে যে, সন্ধ্যা এক সময়ে তাহার বাগ্‌দত্তা ছিল; যে কোন কারণেই হউক, বিবাহ হওয়াটা সম্ভব হয় নাই। মণিলাল ইহাও জানাইল যে, সন্ধ্যার পত্র লেখার ক্ষমতা অসাধারণ, যেমন তাহার হস্তাক্ষর, তেমনই তাহার রচনা। পরিশেষে সে উদারতা দেখাইয়া ইহাও স্বীকার করিল যে, ছোটখাটো ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে সন্ধ্যাকে রমণীরত্ন বলা যায়। গোলাপে কণ্টক আছে, তা বলিয়া গোলাপ কে পরিত্যাগ করে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দুই বন্ধুর কাহারও সে রাত্রিতে নয়নে নিদ্রা আসিল না। অথচ ধরা পড়িবার ভয়ে দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। প্রভাতে উঠিয়া মণিলাল কলিকাতা চলিয়া গেল। রাজেন্দ্র গম্ভীরমুখে অন্তঃপুরে গিয়া সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"যে কাল আসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জানিতে?"

এই প্রশ্নই সন্ধ্যা সারারাত্রি আশঙ্কা করিতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"তুমি ওকে কখন চিঠি লিখেছিলে?"

"হ্যাঁ, লিখেছিলাম; কিন্তু তার বিশেষ একটা কারণ ছিল, সেটাও তোমার শোনা দরকার—"

সন্ধ্যা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, রাজেন্দ্র তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "যা জেনেছি, তাই যথেষ্ট—আর কিছু জানার আমার প্রয়োজন নেই। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না—এ কথা আমি অনেক দিন থেকে জানি। কিন্তু তোমার বাবা যে এ রকম প্রবঞ্চনা করবেন, এ আমি ভাবিনি।"

পিতৃনিন্দায় সন্ধ্যা অধীর হইয়া উঠিল। সক্রোধে বলিল, "প্রবঞ্চনা কাকে বলে, বাবা তা জানেন না। তিনি যে কত মহৎ ও পবিত্র, তার ধারণা করবার ক্ষমতাও তোমার নেই।"

রাজেন্দ্র একেই ক্রুদ্ধ ছিল; ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আজ থেকে তুমি সেই পবিত্র স্থানে বাস কর গে। এ অপবিত্র স্থানে আর তোমাকে শোভা পায় না।"

সন্ধ্যার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। কিন্তু লজ্জায় সে অশ্রুরোধ করিল। এত প্রেমের এই পরিণতি! এই ভালবাসা—যাহা একটা ফুৎকারের বেগ সহিতে পারিল না। ছি!

সে শুধু বলিল, "বেশ, আমাকে রেখে এস।"

সেই দিনই রাজেন্দ্র সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যাকে রাখিয়া আসিল।

সরল বিপত্নীক শিক্ষক প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ বুঝিলেন, কোথাও একটু গোলমাল ঘটিয়াছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা তিনি সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার নামে এক শত টাকার একটা মণিঅর্ডার আসিল। সন্ধ্যা পিতাকে বলিল, "বাবা, এটা ফেরত দিন; টাকায় আমাদের দরকার নেই।"

টাকা ফেরত গেল।

পিত্রালয়ে আসিয়া ৪ মাস পরে সন্ধ্যা একটি পুত্র প্রসব করিল। রাজেন্দ্রের কাছে সে সংবাদ দেওয়া হইল।

আরও কয়েক মাস পরে রাজেন্দ্র একখানি পত্রে মণিলাল-সংক্রান্ত সব কথা জানিতে পারিল। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল:—

"আমি আপনার বন্ধু মণিলালের ছোট ভাই। দাদা ও আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যকবোধে ২।১টি কথা বলিব।

আমার দাদার মুখেই শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কয়েকটি কুৎসিত ও মিথ্যা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছেন এবং আশা করিতেছিলেন, শীঘ্রই ইহার সুফল ফলিবে।

সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, মিথ্যা কথার ফল অতি শীঘ্রই ফলিয়াছিল। আপনি অকারণে ও বিনা দোষে আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যে বিষয় লইয়া আপনাদের মধ্যে এই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, আপনাকে জানাইতেছি।

আমার দাদার সহিত সন্ধ্যা দেবীর বিবাহ স্থির হয়। সন্ধ্যা দেবীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া দাদা নিজে হইতে বিবাহের প্রস্তাব করেন। বিবাহ স্থির হইবার কিছু দিন পরে দাদা অর্থের লোভে ও পরের পয়সায় বিলাতে যাইবার মোহে এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করেন ও বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। দেশে আসিবার কয়েক মাস পরে দাদার পত্নীবিয়োগ হয়। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি নির্লজ্জভাবে সন্ধ্যা দেবীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লেখেন। পত্রের উত্তরে সন্ধ্যা দেবী আমার দাদাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রমাণস্বরূপ সন্ধ্যা দেবীর সে পত্রখানিও একটু অবৈধ উপায়ে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইলাম।

সন্ধ্যা দেবীর সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম বলিয়া পাছে আপনি আমার উপর কোন সন্দেহ করেন, সে জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, তাঁহাকে আমি মায়ের মত মনে করি।

পাছে আমাকে নিছক্ মিথ্যাবাদী মনে করেন, সে জন্য নিবেদন করিতেছি যে, আমি সিটি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। আমার ঠিকানা উপরে দিলাম। আমার বক্তব্যে যদি আপনার কোন সন্দেহ হয়, আমাকে পত্র দিলেই আমি আপনার সে সন্দেহ সত্বর ও সর্ব্বতোভাবে দূর করিব।

আমার অনধিকারচর্চ্চার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অনুগত

কৃষ্ণলাল।"

সন্ধ্যার পত্রে এইটুকু লেখা ছিল;—

"আপনার বিবাহের নির্লজ্জ প্রস্তাব পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। আপনার স্ত্রী মরিয়া বাঁচিয়াছেন। আপনার স্ত্রী হইবার দুর্ভাগ্যের আগে আমিও যেন মরিয়া বাঁচি। আর কখন যেন পত্র দিবেন না বা বাবাকে বিরক্ত করিবেন না।

সন্ধ্যা।"

এই দুইখানি পত্র পড়িয়া রাজেন্দ্রের কোনই সন্দেহ

রহিল না যে, সন্ধ্যা নির্দ্দোষ। কিন্তু এত দিনকার অদর্শন ও অবিচারে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিয়া সন্ধ্যাকে আনিতে রাজেন্দ্রের সাহসে কুলাইতেছিল না। এই ভাবে আরও বৎসরখানেক কাটিয়া গেল।

এক দিন রাজেন্দ্র সন্ধ্যার এক পত্র পাইল। সন্ধ্যা লিখিয়াছিল,—

"খোকার বয়স দেড় বৎসর হইতে চলিল। তাহার নাম রাখিয়াছি 'অমৃত।' বাবা বলিয়াছেন যে, অমৃত রাজার ঘরে জন্মিয়াছে—দরিদ্র মাতামহের ঘরে তাহাকে আর শোভা পায় না। সে জন্য আগামী সোমবারে বাবা আমাদের লইয়া যাইবেন।

তুমি আমাকে বিনা দোষে ত্যাগ করিয়াছ, আমি তাহার প্রতিবাদ করি নাই। স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার হইতে অবিচার করিয়া তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ, আমি মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি। আজীবন সহ্য করিয়াই রহিতাম, যদি না ভগবান্ খোকা-ধনকে দিতেন। তাহার মুখ চাহিয়া তুমি তাড়াইয়া দিলেও আবার যাচিয়া তোমার কাছে যাইতেছি।

তবে আমি যাইতেছি বলিয়া তুমি ভয় পাইও না। আমি অন্তঃপুরের এক কোণে তোমার চোখের আড়ালে রহিয়া তোমার পুত্রকে মানুষ করিয়া দিব। আহ্বান করিয়া তোমাকে বিপন্ন করিব না। যে ব্যবধান তুমি চাহিয়াছিলে, এক বাড়ীতে থাকিয়াও সে ব্যবধান আমি অক্ষুণ্ণ রাখিব। পরিত্যক্তা—সন্ধ্যা।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে পিতার সহিত সপুত্র সন্ধ্যা আসিল ও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার পিতা সেই দিনই ফিরিয়া গেলেন।

সেই হইতে পিতামাতার বিপুল ব্যবধানের মধ্যে অমৃত বড় হইতে লাগিল। দুই জনেই অন্তরে অন্তরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কবে এক জন অপরকে ডাকিবে। কিন্তু কোন দিন কেহই কাহাকেও ডাকিল না—এক জন লজ্জায়, অপরে অভিমানে।

৩

এক দিন বেলা ২টা বাজিয়া গেল। অমৃত আসিল না। অলক্ষ্যে সিঁড়ির দুই প্রান্তে দুই জন দাঁড়াইয়া ক্ষণেকের জন্যও পরস্পরের অনুভব করিবার সুযোগটুকু পাইল না।

রুদ্ধ কক্ষে রাজেন্দ্র বহুক্ষণ পাদচারণা করিয়া বেড়াইল, কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অমৃতের দেখা নাই।

অপরাহ্ণ আসিল, কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিল। রাজেন্দ্রের অন্তর-বাহির আজ অন্ধকার। কেহ আসিয়া সংবাদ পর্য্যন্ত দিল না—কেন আজ অমৃত আসিল না। নিজে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবে? কিন্তু এত কাল পরে আর কেন?

সারারাত্রি রাজেন্দ্র জাগিয়া কাটাইল। কেহ কি ডাকিবে না? কেহ কি আসিবে না? কেহ কি বলিবে না—কেন অমৃত আসিল না—কবে সে আসিবে? রাত্রি প্রভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আসিল, অমৃত অত্যন্ত অসুস্থ, ডাক্তার ডাকিতে হইবে।

এতক্ষণে রাজেন্দ্র খুঁজিয়া পাইল, কেন অমৃত আসে নাই। কর্ম্মচারীরাই ডাক্তার ডাকিয়া আনে। অন্য কেহ গেলে যদি ডাক্তার আসিতে একটু দেরী করে? রাজেন্দ্র ভাবিল, তাহার চেয়ে সে নিজেই যাইবে। ডাক্তার তাহার সতীর্থ; তাহার কাছে কর্ম্মচারী না পাঠাইয়া স্বয়ং যাইলে কোন দোষ নাই।

গাড়ী প্রস্তুত হইতেই রাজেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বাহির হইল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল ও বৃদ্ধ দেওয়ানের সহিত অন্তঃপুরে গেল। রাজেন্দ্র তাহাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। তাহার মন ছুটিল অন্তঃপুরের পরিত্যক্ত কক্ষে, দেহ পড়িয়া রহিল বাহিরে। সিঁড়ির সম্মুখের পথটায় রাজেন্দ্র বহুক্ষণ ধরিয়া পাদচারণা করিতে লাগিল। ডাক্তার তখনও ফিরিল না। এক দিনের মধ্যে অমৃতের কি এমন রোগ হইল, যাহার জন্য ডাক্তারের এতক্ষণ দেরী হইতেছে? অপেক্ষা করিয়া করিয়া রাজেন্দ্র আপনার কক্ষে গিয়া বসিল; আবার উঠিল, আবার বসিল; কক্ষমধ্যে আবার পাদচারণা করিতে লাগিল। এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার সেই কক্ষে ফিরিল। এই এক ঘণ্টা সময় রাজেন্দ্রের কাছে এক বৎসর মনে হইতেছিল।

ডাক্তার রাজেন্দ্রের বাল্যবন্ধু। রাজেন্দ্র কেন যে অন্তঃপুরে যায় না, তাহার সমস্ত কারণ না জানিলেও খানিকটা একমাত্র সেই জানিত।

ডাক্তার ফিরিতে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসুভাবে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"ব'স।"

রাজেন্দ্র ও সন্ধ্যা দুই জনেই অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল ও পুত্রের শয্যাপার্শ্বে দুই ধারে দুই জন বসিল।

ডাক্তার আপনি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অমৃতকে খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে আর একবার বলিয়া গেল—"অমৃত আপনাদের একমাত্র বংশধর—আপনাদের কুলের প্রদীপ, এ কথা যেন আর আপনাদের মনে করিয়ে না দিতে হয়।"

দুই জনেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

অমৃত এক একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছিল। পিতা-মাতা উভয়কে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আনন্দের সহিত আবার চক্ষু মুদিতেছিল।

সন্ধ্যার পর অমৃত যেন অর্দ্ধেক নিদ্রা ও অর্দ্ধেক অজ্ঞান-তার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাত্রিতে নিদ্রা ও অজ্ঞানতার মাঝামাঝি অবস্থায় অমৃত কথা কহিল—"বাবা, একবারটি সিঁড়িতে উঠে আসুন। আমাকে বাড়ীর ভিতর একটিবার পৌঁছে দিন। মা কত খুসী হবেন। আপনি সিঁড়ির দিকে কতক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থাকেন, একটিবার উপরে কেন উঠেন না?"

কথা কয়টা বলিয়া অমৃত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

গভীর রাত্রিতে বালক আর একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কথা কহিল, "বাবাও আমাকে তোমার মত ভালবাসেন। বাবার কাছ থেকে ফিরে এলে, তুমি যেমন চুমু খাও, তোমার কাছ থেকে বাবার কাছে গেলে বাবাও তেমনই আমায় চুমু খান, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন।"

"আচ্ছা মা, তুমি রোজ বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে কাঁদ কেন? বাবাকে ডেকে পাঠালেই ত হয়। বাবা ত নীচেই থাকেন।"

রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে স্বাভাবিকভাবে চাহিল ও কথা কহিল। পিতামাতাকে একত্র দেখিয়া এক অপরিসীম আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র ও সন্ধ্যা দুই জনে অমৃতের দুইখানি হাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "আজ অমৃতের অর্দ্ধেক রোগ ক'মে গেছে। তবে বিপদ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।"

ডাক্তার আর খানিক বসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় লইল।

সন্ধ্যা পুত্রের ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এবার সেরে যাবে, বাবা!"

অমৃত ডাকিল—"বাবা!"

রাজেন্দ্র পুত্রের বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"আর ভয় নেই, বাবা।"

অমৃত আবার ডাকিল—"বাবা!"

রাজেন্দ্র বলিল—"কি বাবা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমৃত বলিল, "সেরে গেলে আপনি চ'লে যাবেন না?"

রাজেন্দ্র বলিল—"যাব না।"

অমৃত তখন ডাকিল—"মা?"

সন্ধ্যা বলিল—"কেন বাবা?"

অমৃত মিনতি করিয়া বলিল—"তুমি বাবাকে আর যেতে দিও না।"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলিল—"দেব না।"

পিতা মাতা উভয়েরই নিকট হইতে আশ্বাসবাক্য শুনিয়া অমৃতের মুখ-চোখ অপরিসীম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুই জনের গায়ে দুইখানি হাত রাখিয়া সে তৃপ্তির সহিত নিশ্চিন্ত-চিত্তে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র সন্ধ্যার পানে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"আমি আর একা বাইরে থাকতে পারছিনে। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে তোমার কাছে আবার আমাকে আশ্রয় দাও।"

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়া বহু দিনকার সঞ্চিত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মুখে কোন উত্তর আসিল না।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

"তিব্বত

বহুদিন হইতে হৃদয়ে তিব্বত-ভ্রমণের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। আলমোড়া হইতে মানসসরোবর হইয়া কৈলাস তীর্থ দর্শন করিবার বাসনা আমার বরাবরই ছিল। দার্জ্জিলিং হইতে নাম্চী, টিমি, সং দিয়া গংটক ; গংটক হইতে ডিকৃচু, সিঙ্গিক, টুং লাচুং এবং ইয়ামাথাং যাইয়া তথা হইতে তুষারাবৃত ডঙ্কিয়ালা পার হইয়া, সিকিম ছাড়িয়া ক্যাম্পাজং হইয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া গ্যাংটসী পর্য্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। কৈলাস পরিভ্রমণ করিতে হিন্দু যাত্রীদের কোনও পাশ লাগে না, কিন্তু উপরি-উক্ত পথে গ্যাংটসী পর্য্যন্ত যাইতে হইলে পাশের আবশ্যক হয় কি না, তাহা জানিবার জন্য কলিকাতার পুলিস-কমিশনারের উপদেশানুসারে আমি সিকিমের পলিটিক্যাল অফিসার লেপ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এফ, এম্, বেলীর নিকট পত্র লিখিলাম। পত্রোত্তরে তিনি লিখিয়া জানাইলেন যে, আমার নির্দ্দিষ্ট পথে আমি তিব্বতে যাইতে পারিব না। তিব্বতের মধ্যে গ্যাংটসী পর্য্যন্ত যাইতে আমার কোন বাধা নাই। তবে আমাকে বাণিজ্য-পথ দিয়া গ্যাংটসী যাইতে হইবে, বাণিজ্য-পথ ছাড়িয়া আমি অন্য পথে যাইতে পারিব না। কাযেই দার্জ্জিলিং হইতে গংটক পৌছিয়া তথা হইতে ইয়ামাথাং দেখিয়া পুনরায় গংটকে ফিরিয়া নাথুলা কিংবা জেলাপেলার উপর দিয়া তিব্বতে উপনীত হইয়া বাণিজ্য-পথে চুম্বি উপত্যকা দিয়া গ্যাংটসী পর্য্যন্ত যাইব স্থির করিলাম। পলিটিক্যাল অফিসারের পত্র পাইয়া তিব্বত যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

আমার সঙ্গে ফরিদপুর জেলার ঢেউখালি গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বুধী বাহাদুর নামক এক জন নেপালী দ্বারবান্ ও মুঙ্গের জেলার সিমুলতলা-নিবাসী গৌরদাস নামক এক ভৃত্য যাইতে সম্মত হইল। ভৃত্য ও দ্বারবানের জন্য "বর্ষাতী," মোটা পশমী গেঞ্জী, সার্ট, পশমী কোট এবং আলষ্টার, প্যাণ্ট, মোজা, পট্টি, জুতা ও মাথার জন্য ব্লাক্লাভা ক্যাপ, টুপী ইত্যাদি কিনিতে হইল। আমাদের দুই জন বাঙ্গালীর জন্য উপযুক্ত শীতবস্ত্র লইলাম। কলিকাতার শীতের সময় ব্যবহারোপযোগী শীতবস্ত্র তথায় শীত-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; সুতরাং টুইডের এবং পট্টির মোটা শীতবস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইলাম। দার্জ্জিলিং হইতে চুম্বি উপত্যকা পর্য্যন্ত পথে ঝড়বৃষ্টি হয়। কাযেই সঙ্গে ভাল "বর্ষাতী"র জামা, টুপী এবং বরফের উপর দিয়া যাইবার উপযোগী বর্ষাতী জুতা লইলাম। তিব্বত খুব ঠাণ্ডা দেশ এবং সেখানে খুব বাতাস বলিয়া চামড়ার রোমাবৃত দস্তানা ও টুপী এবং মুখ ও চক্ষু ঢাকার জন্য উলের Blacklava cap সঙ্গে লইলাম। এমন কি, আমাদের বিছানা ও সুটকেস ইত্যাদি এবং খাদ্যসামগ্রী বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ষাতী ক্যানভাসের ঢাকনী তৈয়ার করাইয়া লইলাম। পাহাড়ে উঠিবার উপযোগী নীচে লোহার মোড়া ও চোকা, কয়েকখানা বড় বড় লাঠিও সঙ্গে লইলাম। শীতপ্রধান দেশে লেপ ও তোষক বড় ঠাণ্ডা লাগে এবং তাহাতে শীত-নিবারণ হয় না, কাযেই রাত্রিতে ব্যবহারের জন্য কয়েকখানা কম্বল সঙ্গে লইলাম। রাস্তার জন্য সঙ্গে কিছু ঔষধও লইবার ব্যবস্থা করিলাম। বিশেষতঃ চোট লাগিলে যে সমস্ত ঔষধের দরকার হয়, তাহা কিছু বেশী পরিমাণ লইলাম। ঔষধের সঙ্গে এক পাঁইট ব্রাণ্ডির বোতল লইলাম। সৌভাগ্য যে, ব্রাণ্ডি সঙ্গে লইয়াছিলাম ; কারণ, সঙ্গী দরোয়ান যখন শীতে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহাকে ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়াছিলাম। এই একবার ব্যতীত আর ব্রাণ্ডির বোতল খুলিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই।

ইংরাজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ ১লা মে, বাঙ্গালা ১৩৩৪ সন ১৮ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং পৌছিলাম।

কিন্তু সেখানে যাত্রাপথের বাংলো সকলের পাশ পাইতে ও কুলী, ঘোড়া ও ডাণ্ডীর জোগাড় করিতে বহু বিলম্ব হওয়ায় ৮ই মে তারিখে আমরা তিব্বত রওনা হইবার দিন স্থির করিলাম। সিকিমের বাংলোর পাশ দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনারের নিকট পাওয়া যায়। কিন্তু তিব্বতের বাংলোর পাশ গণ্টকের পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট হইতে লইতে হয়। ইয়ামাথাং পর্য্যন্ত যাওয়ার বাংলোর পাশ ডেপুটী কমিশনার আফিস হইতে লওয়া হইল এবং গণ্টক হইতে গ্যাণ্টসী পর্য্যন্ত যাওয়ার পাশের জন্য পলিটিক্যাল অফিসারের আফিসে পত্র লেখা হইল। ইতিমধ্যে গ্যাণ্টসীর বৃটিশ ট্রেড এজেণ্ট মিঃ হপকিনসন্ মহোদয়ের সহিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ডেপুটী কমিশনারের আফিসে দেখা হইল। তিনিও ঐ ৮ই মে তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে রওনা হইয়া নাম্চী, টিমি, সং দিয়া গণ্টক যাইবেন। তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "আমরা একসঙ্গেই যাইব। আপনি মিঃ রায়কে বলিবেন যে, তাঁহার কোনও অসুবিধা হইবে না। আমার সময় থাকিলে মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইহা বলিতাম।" সে যাহা হউক, আমি ৮ই মে তারিখে যাইবার জন্য সমস্ত ডাক-বাংলোর পাশ লইলাম এবং ইয়ামাথাং গিয়া তথা হইতে পুনরায় গণ্টকে ফিরিয়া আসিবার জন্য সমস্ত বাংলোর পাশ ডেপুটী কমিশনারের আফিস হইতে লইলাম। গণ্টক হইতে নাথুলার উপর দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল এবং তদনুসারে নাথুলার নীচে দক্ষিণ পারে অবস্থিত কার্পোনাং বাংলো পর্য্যন্ত পাশ লইলাম। আমাদের এক মাসের উপযোগী চাউল, আটা, ডাল, আলু, মসলা, চিনি,ঘৃত, চা ও কোকো, রাত্রিতে জ্বালাইবার জন্য কেরোসিন তৈল এবং মোমবাতি লইলাম। ইয়ামাথাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া গণ্টকে এক দিন অপেক্ষা করিয়া তিব্বত যাইবার পূর্ব্বে গণ্টক হইতে আহারীয় সামগ্রী পুনঃ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়ার বাসনা রহিল।

সঙ্গে যে সমস্ত উপকরণ লওয়া হইল, তাহাতে বহু কুলীর প্রয়োজন। আমাকে বহন করিবার জন্য একখানা ডাণ্ডী ও ৬ জন ডাণ্ডীবাহক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এবং দ্বারবান্ ও চাকর, প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া ঘোড়া ঠিক করা হইল। আমাদের খাদ্যসামগ্রী, বিছানা-পত্র ও পাকের সরঞ্জাম ইত্যাদি বহনের জন্য মোট ১২ জন কুলী স্থির করা হইল। ডাণ্ডী-বেহারাদের জিনিষ বহন করার জন্য দুই জন কুলী এবং ঘোড়ার দানা বহন করিতে এক জন কুলী লওয়া হইল। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা সর্ব্বদা রাস্তায় প্রয়োজন হইবে, এই কারণে কিছু অতিরিক্ত মজুরী দিয়া দুইটি ক্যামেরা লওয়ার জন্য এক জন কুলী স্থির করা হইল। ব্যারোমেটার, থার্ম্মোমিটার বা তাপমান-যন্ত্র, দূরবীণ ও কম্পাস সঙ্গে লওয়া হইল।

৮ই মে তারিখের প্রাতঃকালে বেলা ৮টার সময় আমাদের রওনা হইবার কথা ছিল। তদনুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহু-পূর্ব্বেই বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে ৪॥০টার সময় স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য ও আহার ৭॥০টার মধ্যে সমাপন করিয়া লইলাম। তৎপরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এ দিকে কুলীরা আসিলে তাহাদিগকে মোটগুলি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। ৩০ সেরের উপর বোঝা কোন কুলীকে দেওয়া হইল না। আমরা সকালে ৮টার সময় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দার্জ্জিলিঙের ম্যাক্‌লস্ বাংলো হইতে পদব্রজে রওনা হইলাম। ডাণ্ডী, ঘোড়া এবং ক্যামেরার কুলী আমাদের অনুসরণ করিল।

লেবং হইতে আমি ডাণ্ডীতে চড়িলাম এবং শ্রীযুক্ত সতীশ ভট্টাচার্য্য ও দারোয়ান ঘোড়ায় চড়িল, গৌরদাস ভৃত্য হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। ক্যামেরাসহ কুলীকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিলাম। এইরূপে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের গা দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া বাদামটন গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানে আমি ডাণ্ডী হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম।

বাদামটন একটি ছোট পল্লী। এখানে যাত্রীদের থাকিবার জন্য একটি ডাকবাংলো আছে। গ্রামে ৪।৫ ঘর বসতি, দুইখানা দোকান, তাহাতে চা, রুটী, রান্নাকরা মাংস, ডিম ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভুটিয়া যাত্রিগণ এই সকল দোকানে আহার করে। এই সকল পাহাড়ে ঝরণার অভাব নাই। গ্রামের লোক ঝরণার জল ব্যবহার করে। শীতের তাড়নায় ইহারা মাসে মাত্র ২।৪ দিন স্নান করে। স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, হাটে-বাজারে যায়। বাদামটনে বহু কমলালেবুর গাছ। কমলাগাছে ফুল ফুটিয়াছে। বাদামটন আড়াই হাজার ফুট উচ্চ। আমরা ৭ হাজার ফুট উচু হইতে নামিয়া আসায় আমাদের পরিহিত শীতবস্ত্রে গরম

বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা আরও নীচে গেলে শীতের স্থান হইতে আসায় অসহ্য গরম বোধ করিতে লাগিলাম। নীচের দিকে যাইতে যাইতে দুই দিকে শাল-গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমরা রঙ্গীত নদীর পারে মজিটার গ্রামের তারের পুলের নিকট পৌছিলাম। মজিটার ১ হাজার ফুট উচ্চ এবং উত্তাপ ৮০ ডিগ্রীর উপর। এখানে আমরা শীতের কোট খুলিয়া ফেলিলাম। শুধু গেঞ্জী ও খাকীর

বিদেশী লোক ঐ পুলের উপর দিয়া সিকিম রাজ্যে না যাইতে পারে, তজ্জন্য এই পুলিস পাহারা দেয়। উত্তর পারে মজিটারের বাজারে উপস্থিত হইলে সিকিম রাজার পুলিস আমাদের পাস আছে কি না এবং আমাদের নাম, ধাম, জাতি, কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি জানিবার জন্য একখানা ছাপান form বহি দিল। আমরা ঐ form পূরণ করিয়া দিলাম।
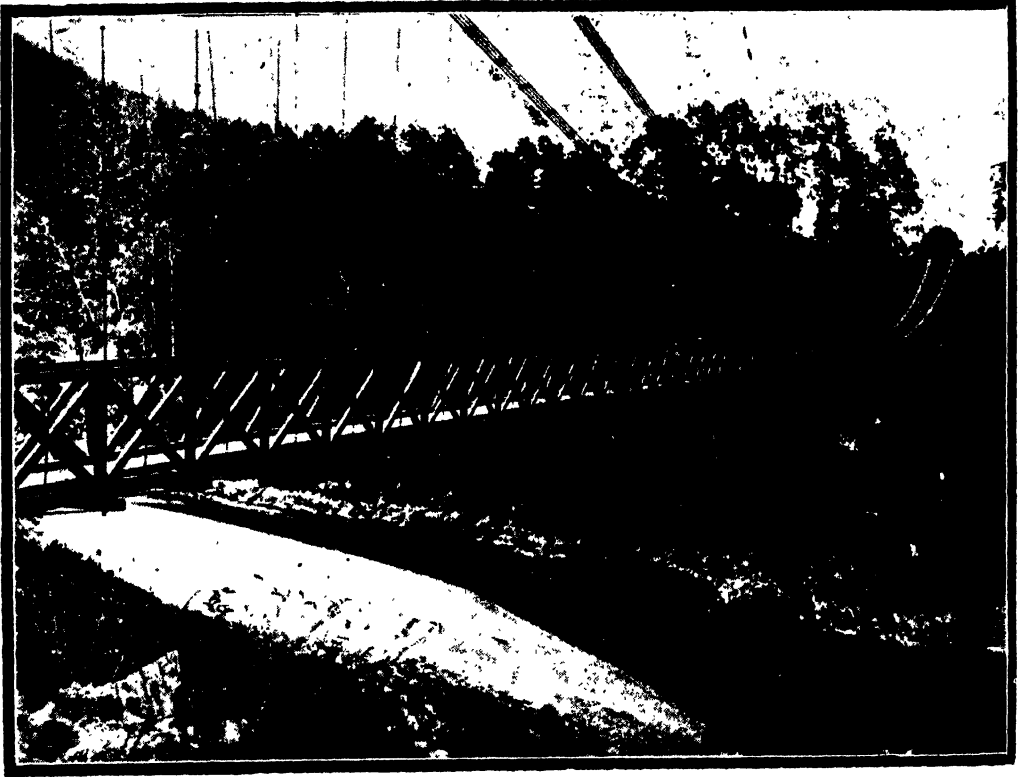
মজিটারের তারের পুল

সার্টেও কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ফটোগ্রাফের ক্যামেরা-সহ কুলী আসিলে মজিটারের তারের পুলের ফটোগ্রাফ লইলাম। তারের পুলের উপর দিয়া রঙ্গীত নদীর অপর পারে যাইয়া মজিটারের বাজারে পড়িলাম। রঙ্গীত নদীর দক্ষিণ পার ইংরাজ রাজ্যের সীমা, উত্তর পার হইতে সিকিম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। মজিটারে রঙ্গীত নদীর দক্ষিণ পারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কয়েক জন পুলিস সর্ব্বদা পাহারা দেয়। অপর পারে সিকিম রাজ্য দিয়া কোনও সন্দেহজনক লোক ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে কিম্বা কোনও

মজিটারের বাজার উত্তর-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। বাজারটি বেশ বড়। তথায় কয়েক ঘর মাড়োয়ারী ও বেহারী লোকের দোকান ও গোলা এবং নেপালী ও ভুটিয়াদের কয়েকখানি দোকান আছে। বাজারে ২৫।৩০ খানা দোকান-ঘর। ইহার মধ্যে চা, রুটী ও মাংসের ২।৩ খানা দোকান আছে। প্রত্যেক বাজারে ঐ দেশীয় মদ (চোং) এবং মহুয়ার মদ পাওয়া যায়। বাজারের উত্তর সীমায় সিকিম Police outpost, বাজার সপ্তাহে এক দিন হয়। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাজার থাকে। পাহাড়ের উপরে ভুটিয়া বসতি,

মধ্যে মধ্যে নেপালী বসতি এবং পাহাড়ের পাদদেশে নেপালী অধিবাসিগণের অধিক ও মধ্যে মধ্যে দুই চারি ঘর লেপচার বসতি। ভুটিয়ারা গরম যায়গায় থাকে না। নেপালীরা খুব ঠাণ্ডা যায়গায় থাকে না। নেপালী অধিবাসিগণ পাহাড়ের নিম্নদেশে বাস করিয়া ধান্য তরি-তরকারী ইত্যাদি চাষ করে। নেপালীরা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া চাষ করে। লেপচারা প্রায়ই পাহাড়ের পাদদেশে অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলের মধ্যে বসতি করে। জঙ্গলের গাছ, গরাণ, লতাপাতা, পরগাছা, ফুল, ফল-মূল তাহাদের বড় প্রিয়। তাহারা ফলমূলের ব্যবহারও জানে। ভুটিয়াগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু নেপালী অধিবাসিগণ হিন্দু। নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহারা সকলেই ভূতের পূজা করে। বাজারের দিন প্রাতঃকাল হইতেই ভুটিয়া, লেপচা এবং নেপালীগণ, বিশেষতঃ নেপালী নারী ঝাঁকা বেসাতি-পূর্ণ করিয়া, একটি রজ্জু ঝাঁকার চারিদিকে দিয়া কপালে রজ্জুটি আট্‌কাইয়া ঝাঁকাটি পৃষ্ঠে ফেলিয়া গ্রাম হইতে দলে দলে হাসি-গল্প করিতে করিতে বাজারে যায়। সমস্ত দিন বেসাতি করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া যায়। বাজারে দেশী মদ চোং প্রায়ই ভুটিয়া দোকানে এবং মহুয়ার মদ বেহারী দোকানে পাওয়া যায়।

আমরা মজিটারের বাজারের মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাজার ছাড়িয়া আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে শাল, আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে। পাহাড়ের নিম্নদিকের বাঁশ খুব মোটা। প্রায় ৩ হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত কথিত বৃক্ষ সকল অন্যান্য বৃক্ষের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৫ হাজার ফুটের উপরে বাঁশ সরু হইয়াছে। শাল, আমলকী ইত্যাদির পরিবর্ত্তে সরলাদি অন্যান্য বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এমন কি, ঢেঁকিলতা পর্য্যন্ত ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই স্থানে দার্জ্জিলিংয়ের মত তত বৃষ্টি হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাহাড়ের উপরে ঠাণ্ডা স্থানে ভুটিয়ারা বাস করে। ইহারা শীতের শস্য আলু, যব, গম, এবং শাক-শবজী, কফি, কড়াইশুঁটী ইত্যাদি পাহাড়ের গায়ে চাষ করে, পাহাড়ের গায়ে গরু-মেষ চরায়। ইহাদের ঘর-বাড়ী ইত্যাদি কাঠের পাটাতন করা। ঘরে টিনের বা খোলার বা কাঠের ছাউনী। চাষীদের ঘর অধিকাংশ একতলা, আবার কোন কোনটি দোতলা। গ্রামে ঘর-বাড়ী প্রায়ই চাষের ক্ষেত্রের মধ্যে, আবার কোথাও বা ৫।৭ ঘর গৃহস্থ এক স্থানে বাস করে। আমরা কখনও গ্রামের মধ্য দিয়া, কখনও পার্শ্ব দিয়া চলিলাম। ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে আমরা প্রায় ছয় ঘটিকার সময় ১৭ মাইল রাস্তায় আসিয়া নামচীর বাংলোয় উপস্থিত হইলাম।

নাম্‌চী ৫ হাজার ফুট উচ্চ। নামচীর ডাক-বাংলো পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। ডাক-বাংলোয় দুইটি শয়ন-ঘরে চারি খানা খাট। একটি আহারের ঘর। বাংলোর সন্নিকটে আর একটু উপরে কয়েকখানা গৃহ আছে। তাহাতে কয়েক ঘর ভুটিয়া চাষী বাস করে। ঘরের সম্মুখে এবং পশ্চাতে চাষের ক্ষেত্র। বৈশাখ মাসে শীতের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে, সকলেই চাষের জন্য ব্যস্ত। বাংলোর দক্ষিণে কিছু দুর অগ্রসর হইলে নাম্‌চীর কাজীর অর্থাৎ ভুটিয়া জমীদারের বাড়ী। ইহার সন্নিকটে পশ্চিমে নাম্‌চীর বাজার। বাজারটি বেশ বড়। বাজারে মজিটারের বাজারের ন্যায় চায়ের দোকান, মদের দোকান এবং গোলাগঞ্জ। বাজার সপ্তাহে এক দিন বসে।

দার্জ্জিলিং হইতে আমরা সকলেই শীতবস্ত্র পরিয়া আসিয়াছিলাম, মজিটার গরম স্থান, তাহার উপর দ্বিপ্রহরের সময়ে শীতবস্ত্রে আমাদের খুব কষ্ট বোধ হইয়াছিল। উপরে উঠিতে উঠিতে আমাদের ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় আমরা পুনরায় শীতবস্ত্র গায়ে দিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম। নামচীর ডাক-বাংলো বাজার হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত। আমাদের খাদ্যসামগ্রী ও বিছানাপত্র লইয়া কুলীগণ তখনও পৌঁছে নাই। সুতরাং নামচীর বাজার হইতে কিছু আটা, ডাল ও তরকারী ক্রয় করিয়া রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রত্যেক বাংলোতেই ইংরাজী প্রথায় পাক করিবার সরঞ্জাম আছে। আমাদের আহার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কুলীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

৯ই মে।—প্রভাতে ৫টার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। বাংলো হইতে বাহির হইতে প্রথমেই শুভ্র তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নীচে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যে তরুগুল্মলতামণ্ডিত পর্ব্বত এবং উপরে হিমালয়ের গৌরব তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাদির শৃঙ্গসমূহ যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ

করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে! বাস্তবিক ঐ প্রাকৃতিক শোভা দেখিলে সংসারের সকল সুখ-দুঃখ ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলই পুনঃ পুনঃ মনে উদয় হয়। প্রাকৃতিক শোভা অধিকক্ষণ দেখিবার আমাদের সময় ছিল না। শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে আহার করিয়া বেলা ৯টার সময় আমরা নামচী হইতে টিমির দিকে রওনা হইলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমরা টিমির একটি শ্মশানে উপস্থিত হইলাম। তথায় দুইটি পাষাণনির্ম্মিত বেদী দেখিতে পাইলাম। রাস্তার ধারে বসিবার জন্য টুল আছে। স্থানটি প্রায় ৬ হাজার ফুট উচ্চ। এতক্ষণ আমরা উত্তর-পূর্ব্বদিকে যাইতেছিলাম। এখানে কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া আমরা পুনঃ জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের ধার দিয়া আর ১৫।২০ মিনিটে প্রায় ৫ শত ফুট উপরে উঠিলাম। তৎপরে পাহাড়ের ধার দিয়া কখনও উপরে কখনও নীচে যাইতে যাইতে আমরা জয়বারি নামক একটি ছোট গ্রামে উপস্থিত হইয়া কাঁচা মটর ক্রয় করিবার নিমিত্ত কিছু সময় অপেক্ষা করিলাম। ১৪ পয়সা করিয়া সের দরে ✓২ সের মটরশুঁটী খরিদ করা হইল। নামচী, টিমি,—এই সকল যায়গা হইতে দার্জ্জিলিংএ কাঁচা মটর রপ্তানী হয়। এই স্থানের মটর খুব উৎকৃষ্ট।

জয়বারি একখানি ছোট গ্রাম। গ্রামে ৫।৭ ঘর চাষী লোকের বাস। ক্ষেত্রে যব, গম, ভুট্টা, কফি, মটর, শিম, গাজর ইত্যাদির চাষ হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ক্ষেত্রে কায করে।

বেলা ১২টার পর ডেমথাঙ্গ পৌছিলাম। ডেমথাঙ্গ গ্রামে থান ২০ ঘর রাস্তার পারে অবস্থিত। এখানে পথিকদের জন্য রাস্তার ধারে চা-রুটীর দোকান আছে। ঐ গ্রামে একখানা মদের দোকানও আছে।

এখানে একটি ছোট ফাঁড়ি আছে। এক জন হাওলদার, এক জন নায়েক এবং ছয় জন পুলিস এখানে থাকে। পুলিস ছাপান ফরমের একখানা বই আমাদের নিকট আনিল। আমি তাহাতে আমাদের নাম, ধাম, গন্তব্য পথ এবং কি উদ্দেশে যাইতেছি ইত্যাদি ঘর পূরণ করিয়া দিলাম। এই স্থানটি ৭ হাজার ফুট উচ্চ এবং এখানে দিবা দ্বি-প্রহরের সময় ৬৫ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিলাম। এখানে কুলীরা কিছু চা ও রুটী খাইল।

আমরা এই স্থান হইতে জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়া পার্ব্বত্য শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বামদিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া কখন কখন উপত্যকাস্থিত পার্ব্বত্য নদী এবং তাহার দুই ধারে শস্য-শ্যামলা উপত্যকাভূমির শোভা দেখিতে পাইলাম। অপর পার্শ্বে অভ্রভেদী চূড়াসকল আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। আবার কোথাও বা জঙ্গলের জন্য রাস্তা ভিন্ন দুই পার্শ্বে আর কিছুই দেখা যায় না। রাস্তায় অনেক জাতীয় ফুল দেখা গেল, কিন্তু কোন ফল দেখিতে পাইলাম না। কখন কখন হঠাৎ কুয়াসা আমাদের দৃষ্টিপথ একবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় টিমি নামক বাংলোয় পৌছিলাম।

টিমি ৫ হাজার ফুট উচ্চ। বাংলোটিতে ২টি ঘর এবং ৪ খানা শয়নের খাট। টিমির বাংলোয় পৌছিয়া দেখিলাম, সিকিম রাজ্যের খাজনা বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী বাংলোর একটি কক্ষ দখল করিয়া আছেন। সুতরাং অপর কক্ষে আমরা দুই জনে থাকিবার ও শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। টিমিতে পূর্ব্বে একটি খৃষ্টান মিশন ছিল। তাহা এখন পরিত্যক্ত, কিন্তু ঘর-দরজা বর্ত্তমান আছে। সেই-খানে কতক কৃষকের বাস আছে। পাহাড়ের গায়ে মাঠে গম, যব ও ধান্য এবং শাক-সব্জীর চাষ হয়। পাহাড়ের নিম্নদিকে পাদদেশে ধান্যও চাষ হয়। ঘর একতলা কি দোতলা, প্রায়ই খড়ের, মধ্যে মধ্যে টীনের ছাউনী। কৃষকদের সকলেই কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কেহই দিনে ঘরে থাকে না। দিনের বেলা তাহারা চাষ করিতে, জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে, গরু চরাইতে বা ঘাস কাটিতে বাহির হইয়া যায়। আমরা টিমি পৌছিবার পর ঝড়-বৃষ্টি আসিল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাহাড়ের পাদদেশে গরম যায়গায় নেপালী অধিবাসিগণ ক্ষেত্রে চাষ করে এবং বাস করে। সিকিমে বিস্তর নেপালী আসিয়া চাষ আদি করিয়া বাস করিয়া থাকে। তাহারা অধিক সংখ্যায় পাহাড়ের উপত্যকায় এবং কতক উপরে থাকে। নেপালীরা হিন্দু এবং ভুটিয়ারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। নেপালী হিন্দুগণ মাংসাদি ভোজন করে, কিন্তু গো-মাংস খায় না। ভুটিয়াগণ সকল প্রকার মাংসই খায়।

সিকিমের সমস্ত স্থানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় সিকিমের নারীরা ঘরে অবরুদ্ধ থাকে না। নেপালী নারীরা কাপড় পরিধান করে ও গায় জামা দেয়, এবং একখানি করিয়া ওড়না ব্যবহার করে। স্ত্রীলোক হাতে, নাকে, কাণে এবং গলায় অলঙ্কার পরে। পুরুষরা পা পর্য্যন্ত পা-জামা এবং গায়ে কুর্ত্তা দেয় ও মাথায় টুপী দেয়। পুরুষরা সময় সময় কাপড়ও পরে। ভুটিয়াদের পোষাক নেপালী পোষাক হইতে বিভিন্ন। ভুটিয়া স্ত্রীলোক হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা জামা পরিধান করে, জামার সম্মুখে মধ্যস্থলে বোতাম নাই, দুই দিকে দুইটি পাট চলিয়া গিয়া এক পার্শ্বে বন্ধন করা হয়। জামাটি লম্বা, হাতকাটা—তাহাদের হাত খোলা থাকে, তাহারা জামার উপর ছোট শালের রুমালের ন্যায় একখানা গরম কাপড় দিয়া শীতের সময় মস্তক আবরণ করে এবং শরীরের উপরিভাগে চাদরের ন্যায় ব্যবহার করে। জামার উপরে সম্মুখে এবং পশ্চাতে শক্ত ফিতা দিয়া দুই টুকরা মোটা গরম কাপড় কোমর হইতে ঝুলাইয়া দেয়। এই জামার উপর সময় সময় কোমর পর্য্যন্ত জামা গায়ে দেয়। ইহারা শীতের সময় অনেকে গৃহ-প্রস্তুত উলের জুতা জানুর কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত পায় দেয়। কাণে, গলায়, হাতে অলঙ্কার পরে। ভুটিয়া পুরুষগণ পা-জামা পরে। গায়ে স্ত্রীলোকের মত লম্বা জামা। স্ত্রীলোকের জামায় হাতা থাকে না। পুরুষের জামার হাতা খুব লম্বা। জামার হাতা সম্পূর্ণ হাত ভিতরে দিয়াও অর্দ্ধ হস্ত-পরিমাণ বেশী থাকে। মাথায় 'সাহেবী' বা চায়নিজ ফেল্ট্ হেট দেয়। পায়ে জুতা পরে।

১০ই মে। প্রভাতে আমরা সকালে স্নানাহার করিয়া ৯।১৫ সময় রওনা হইলাম। টিমির বাংলো হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়া ক্রমে নীচের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা কখনও জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের গা' দিয়া, কখনও বা চাষীর জমীর উপর দিয়া চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের গায়ে ঝরণা হইতে ক্ষেত্রের মধ্যে ছোট নালা কাটিয়া জল আনিয়া ধানের চাষের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ক্ষেত্রে যব, গম, ধান্য, মাখই, কপি, মটর, শিম ইত্যাদি চাষ হয়। প্রায় ৬ মাইল নীচের দিকে যাইয়া তিস্তা নদীর পারে ১২ শত ফুট উচ্চে সীরানী নামক গ্রামের অপর পারে পৌঁছিলাম। তথাকার তারের ঝোলান পুলটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নদী পারাপারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। তথায় পুনঃ সেতু নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিস্তা নদী পারাপারের জন্য একখানা ডোঙ্গার বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানের লোক নৌকা চালাইতে পটু নহে। তাহাতে নদীর স্রোতঃ অত্যন্ত প্রবল, তদুপরি মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথর। যে স্থানে নদীর স্রোতঃ অপেক্ষাকৃত কম এবং জলের উপর পাথর নাই, এমন এক স্থানে ডোঙ্গা করিয়া নদী পারাপারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পুল হইতে প্রায় ½ মাইল পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া, উঁচু-নীচু পাথরের উপর দিয়া, কখনও উঠিয়া, কখনও নামিয়া, কদর্য্য রাস্তায় যাইয়া ডোঙ্গা পারাপারের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। আমরা ডোঙ্গা দ্বারা তিস্তানদী পার হইলাম। নদী পার হইয়া একটু উপরে উঠিতে চা, রুটী, মাখৈর খৈ, ছোলাভাজা, চিঁড়া ইত্যাদির একখানা দোকান আমাদের রাস্তার ধারে দেখিলাম। এই দোকানের আর একটু উপরে পরিত্যক্ত জীর্ণ একটি ডাক-বাংলো আছে। ডাক-বাংলোয় এখন কোনও আস্‌বাব নাই, শুধু ঘর পড়িয়া আছে, কাযেই যাত্রিগণের থাকিবার সুবিধা নাই। রাস্তায় যাইতে যাইতে পাহাড়ের ধারে নেপালী বস্তি দেখিতে পাইলাম। তাহারা লঙ্কা, বেগুন, কুমড়া, লাউ, শিম, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্র চাষ করিতেছে। বাড়ীতে একখানা কি দুইখানা ঘর—সম্মুখে প্রাঙ্গণ। ঘরের চারিদিকে কিছু পরিষ্কার যায়গা। ইহারা পাহাড়ের ঝরণা হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করে। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা উপরে উঠিয়া পাহাড়ের এক সমতল ভূমিতে এক ভুটিয়া বস্তি দেখিতে পাইলাম। ভুটিয়া চাষীদের ঘরও তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। ঘরের অদূরে দুই একটি করিয়া বাঁশঝাড় প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। ক্ষেত্রে তরকারী এবং শস্য চাষ হয়। এক এক যায়গায় বহু কমলালেবুর গাছ আছে। কমলালেবু-গাছে ফুল ফুটিয়াছে এবং কোন কোন গাছে কমলালেবুর কুঁড়ি ধরিয়াছে।

ইহার পর প্রায় ৩ ঘণ্টা পথ চলার পরে বেলা ৪টার সময় সং (Song) বাজারের মধ্য দিয়া সং নামক গ্রামের ডাক-বাংলোয় পৌঁছিলাম। সং বাজারে কয়েকখানা স্থায়ী দোকান-ঘর এবং কতকগুলি খালি ছোট ঘর আছে। অদ্য হাট-বার নহে, কাযেই বাজারে বেশী লোক-জন নাই। বাজারের সম্মুখে রাস্তায় কতকগুলি ভুটিয়া বালক-বালিকা খেলা

করিতেছে এবং কতকগুলি ভুটিয়া দর্শক রহিয়াছে। তাহারা খেলার মধ্যে সময় সময় চীৎকার ও বিকট হাস্য করিতেছে। তাহারা খেলায় ভারী মত্ত। উহাদের হাসি ও চীৎকার শুনিলে উহাদের ঐ সময় খেলা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। "Loud laugh speaks the vacant mind."

সং ডাক-বাংলো পূর্ব্বমুখে অবস্থিত, বাংলোর পূর্ব্বদিকে একটি খোলা বারান্দায় কয়েকটি পরগাছা (orchid) ঝোলান। বারান্দার উপরে কয়েকটি টবে Zerenium এবং Frusia ফুলের গাছ। বারান্দার সম্মুখে গোলাপ ও অন্যান্য গাছ ঘাসের জমীর মধ্যে লাগান।

সং গ্রামে এক জন কাজী আছেন। ভুটিয়া জমীদার বা তালুকদারকে সিকিমে কাজী বলে এবং নেপালী জমীদারকে ঠিকাদার বলে। অনেক বেলা আছে বলিয়া জমীদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার বাসনায় তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলাম। জমীদার বাড়ী নাই। তাঁহার পুত্র ও জামাতা বাড়ী আছেন। জামাতা মহাশয় আমাদিগকে যাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে আমি ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দরোয়ানকে সঙ্গে লইয়া জমীদার মহাশয়ের বাটী রওনা হইলাম। বাজার ও রাস্তা হইতে প্রায় ২০০।২৫০ ফুট উচ্চে তাঁহার বাটী অবস্থিত। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া জমীদারের জামাতা অনেক নীচে নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি সুশ্রী, বলিষ্ঠ পুরুষ—পরিধানে ভুটিয়া পোষাক, টুপী দ্বারা মস্তকাবৃত এবং চোখে চশমা। তিনি বাড়ীর সম্মুখে একখানা দোতলা টীনের ঘরে আমাদিগকে বসাইলেন এবং প্রথমেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য Chong (সে দেশীয় মদ) আনিতে চাকরকে হুকুম দিলেন। আমরা চোং খাই না বলাতে তিনি উহা আনিতে নিষেধ করিয়া কিছু ফল আনিতে বলিলেন। ভৃত্য প্লেটে করিয়া কয়েকটি কবরী কলা আনিল। কলা ভিন্ন সিকিমে এই সময় অন্য কোন ফল পাওয়া যায় না। সেখানে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা গৃহস্থের আদব-কায়দা ও গৃহের ব্যবস্থাদি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। জামতাবাবু তাহাতে উত্তর করিলেন,—"এই গৃহ আমার নহে, আমার শ্বশুরের বাড়ী, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনাদিগকে ইহা দেখান আমার উচিত নহে; কারণ, শ্বশুর মহাশয় ইহা পছন্দ না করিতে পারেন।" এই কথার পর আমরা উঠিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলাম। ভদ্রলোকটি বহু দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। ইতিমধ্যে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে আমার পা পিছলাইয়া যাইতেছিল। আমরা আস্তে আস্তে বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। এ স্থানটি (Song) ৪ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

ভিক্ষা ও দীক্ষা

ভিক্ষা শুধু দাও নাই—শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে দাতা,
বিনিময়ে কি পেয়েছ জান তুমি—জানেন বিধাতা।
সামান্য ভিক্ষার সঙ্গে কি পেয়েছি কেমনে বুঝাই?
ভিক্ষা নিতে এসে আমি মনুষ্যত্ব পুন ফিরে পাই।

তুচ্ছ এ দেহের লাভ। নাশে কণ্ঠ জঠরের দাহ,
অনায়াসে কাননের ফল-মূল, নদীর প্রবাহ।
তার কথা বলি নাই—কহিতেছি মনের বারতা
তারে জাগাইয়া দাতা জাগাইলে এ কি অপূর্ব্বতা?

বিনিময়ে দেই কিছু সাধ যায় পাই না সন্ধান
সাধনায় দাতা হই কাহারেও করি ভিক্ষা দান।
আপনা হইতে দৃষ্টি দিশেহারা ঊর্দ্ধপানে ধায়,
নিরুপায়, স্মরি তাঁয় দাতা তব ইষ্ট কামনায়।

ভুলেও স্মরি না যাঁরে দুষি যারে অবিচারী বলি।
তাঁরি পানে এ বিদ্রোহী চিত্ত মোর হয় কৃতাঞ্জলি।
মাঝে মাঝে তাঁর কথা সেই হ'তে উঠে মনে জাগি।
ভিক্ষা সাথে দীক্ষা দিলে বলি নাই অনুপ্রাস লাগি।

শ্রীকালিদাস রায়
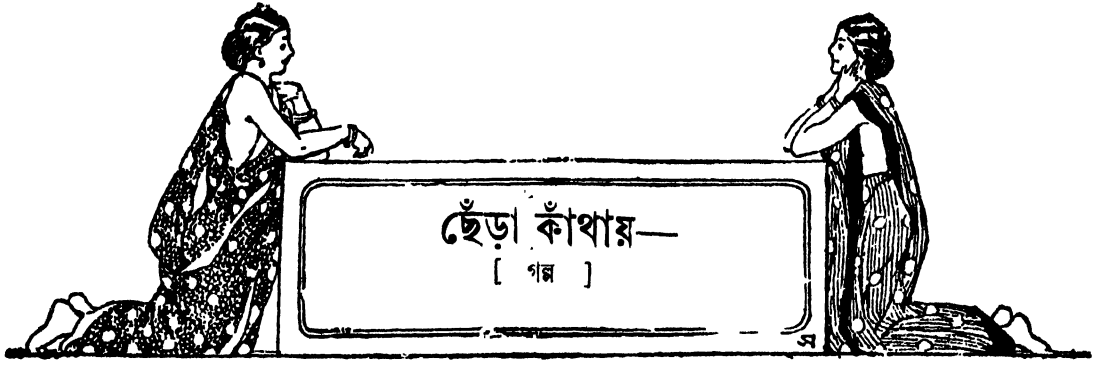
মাসের শেষ দিন। হাতে টাকা নাই—ঘরেও চাল নাই, তাই রামতারণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। এই ঘরখানাকে রামতারণ বাহিরের লোকের কাছে 'বৈঠকখানা' বলিয়া অহঙ্কার করিত। আসলে কিন্তু ইহা ছিল শয়নের ঘর—যদিও বাহিরের দিকে ইহার একটা দ্বার ছিল। এই ঘরের পার্শ্বে ছোট একটা ঘর, মধ্যে একটি দ্বার। এই ঘরে শয্যাদি অর্থাৎ তালি দেওয়া ওয়াড়হীন বালিস, ছেঁড়া কাঁথা, তাহাতে আবার রাত্রিকালে শিশু পুত্রের দুই চারিবার অত্যাচার—শুকাইবার স্থান নাই, কাযেই কাচাও হয় না, সুতরাং সদ্‌গন্ধে ভরপুর! একটা বড় চতুষ্কোণ পদার্থের মধ্যে তুলা জমাট বাঁধা—সেইটির পূর্ব্ব-পরিচয় না কি লেপ ছিল, উহাতেও তালি দেওয়া—ওয়াড় ছেঁড়া, ইত্যাদি। রাত্রিকালে কর্ত্তার মুণ্ডপাত করিতে করিতে গৃহিণী সেইগুলি তথাকথিত বাহিরের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ছেলে-মেয়ে লইয়া শয়ন করেন, পার্শ্বের কুঠুরীতে রামতারণ বড় ছেলেটিকে লইয়া কোনমতে মাথা গুঁজিয়া থাকে।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা আসিয়া বলিল, "বাবা, নুনেকে দিয়ে এক পয়সার চিনি আনিয়ে নাও। মা চা আনছে।"

রামতারণ বলিল, "মা, তোমার গর্ভধারিণী ত জানেন, আমি কাল থেকে স্বদেশী হয়েছি, সুতরাং বিলিতী চিনি খাব না। একটু গুড় দিয়ে চা আনতে বল।"

"বলি, চিনির বদলে না হয় গুড় দিয়ে চা খেলে, কিন্তু দুধ না হ'লে কি এ ছাই মুখে রুচবে? গয়লা ত কাল বিকেল থেকে দুধ বন্ধ করেছে।" বলিয়া গৃহিণী সাঁড়াশী দিয়া ধরা একটা কাঁসার বাটী রামতারণের সম্মুখে রাখিলেন।

"দুধ দিয়ে চা খেলে অম্বল হয়, এটা অনেক ডাক্তারের মত। সে মত এত দিন অগ্রাহ্য করেছি, আর নয়—আজ থেকে সে মতটাকে মেনে নিলুম।"

"তা ও ছাই না গিল্‌লেই যখন তোমার চলবে না, তখন মেনে ত নিতেই হবে। কিন্তু ছোট ছেলেটার ত চল্‌বে না।" বলিয়া মেয়েকে বলিলেন, "যা না মেনী, এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস, ওদিকে ভাতের জল ফুটে গেল; চালগুলো ধুয়ে ঢেলে দি গে যা।"

তাহার পর রামতারণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলি, দুধের কি হবে? গয়লা ত টাকা না পেলে দুধ দেবে না। ঘরে চাল নেই, ওবেলা হয় কি না হয়। কেরাসিন তেল-ওয়ালা সতেরো বোতলের দাম পাবে—"

"দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটা একটা ক'রে মীমাংসা হ'ক। তোমার এক নং অভিযোগ—দুধ—হুঁ, আচ্ছা, দাঁড়াও না, লর্ড আরউইন যখন সার্টিফিকেশনের জোরে পাবলিক সেফটি বিল পাশ করেছে, তখন এইবার গয়লা—মুদী—সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।"

"কাকে জব্দ করবে, দাদা?" বলিয়া ভবতোষ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গরম চায়ে চুমুক দিয়া "উঃ" বলিয়া রামতারণ বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "পাবলিক সেফটি বিলের জোরে গয়লা, মুদী-টুদিকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।"

ভবতোষ বলিল, "কি রকম? তার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কি?"

"কেন, আমরা কি পাবলিক নই? আমাদের নিরাপদ করতে হ'লে দুধ, চাল-টাল সবই ত চাই—তা পয়সা দি আর না দি।"

ভবতোষ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "শুনছ ঠাকুরপো, তোমার দাদার কথা! উনি সব জব্দ ক'রে দেবেন!"

রামতারণ উৎসাহের সহিত চা গিলিতে লাগিল।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, "মেনীর বিয়ের কি ঠিক করলে?"

রামতারণ বিপন্নদৃষ্টিতে ভবতোষের দিকে চাহিল। ভাবটা যেন, ও কথা তুলে 'অনলে ইন্ধন' দিচ্ছ কেন?

ভবতোষ কিন্তু সে দিক্ দিয়াও গেল না। বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?"

রামতারণ গম্ভীরভাবে বলিল, "সর্দ্দার-বিলটা পাশ হ'ল ব'লে, তা হ'লে আর ষোল বছরের আগে ত' বিয়ে দিতে হবে না। তখন ভাবা যাবে।"

ভবতোষ বলিল, "তুমি বল কি দাদা! এতে ত সমাজের—দেশের ক্ষতি হবে।"

"দুত্তোর দেশ! আগে নিজে বাঁচি, তবে ত দেশ! এখন দু'টি হাজার টাকা অন্ততঃ চাই,—বলে ঘরে —"

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "এক মুঠো চাল নেই, তা দু' হাজার—বল না, চুপ করলে যে?"

রামতারণ বলিল, "দেখ, তোমার তামাসা হয় ত ভবতোষ সত্যি ব'লে মনে করবে।"

"আমি কি মিছে বলছি না কি? চাল ত পরের কথা, ঠাকুরপো দেখতে পাচ্ছে না, চিনির বদলে গুড় দিয়ে চা চলেছে—তাতে এক ফোঁটা দুধও নেই?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! উনি আজ আমার উপর এক হাত নিচ্ছেন! আসলে কথা হচ্ছে কি জান ভবতোষ, কাল পার্কে লেক্চার শুনতে গিয়ে বিলিতী জিনিষের ওপর অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে, তাই চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আর ডাক্তাররা বলে, দুধ দিয়ে চা খেলে অম্বল হয়।" বলিয়া গৃহিণীকে বলিল, "দেখ, ঘরের কথা নিয়ে ঠাট্টা করলে বাইরের লোক মনে করে, বুঝি সত্যিই বলছে। নইলে গয়লা দুধ—"

"দেয়নি ব'লে কি শুধু চা খাচ্ছি, তা নয়; কেমন? এই ত বলতে চাচ্ছিলে?"

রামতারণ চটিয়া উঠিয়া কি একটা বলিতে যাইবে, এমন সময় ভবতোষ বেগতিক দেখিয়া উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "লটারীর টিকিট এবারও একখানা তোমার জন্য রাখব কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করতেই এসেছিলুম। কি বল, দাদা?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। কাল মাইনে পেয়েই তোমাকে টাকা দেব, তুমি আমার জন্যে একখানা কিনে দিও।"

"আচ্ছা" বলিয়া ভবতোষ সরিয়া পড়িল।

গৃহিণী বলিলেন, "এই যে বছর বছর বাঁদরামীতে দশটা ক'রে টাকা নষ্ট কর, এতে লাভ কি?"

"লাভ—আমার দশটা হাত বেরুবে আর পাঁচটা মুখ হবে, অইতে সেই টাকাগুলো আমি খাব।"

"ওরে বাস্ রে, উনি লটারীর টাকা পাবেন, তবে আমাদের দুঃখু ঘুচবে। খুব বাহাদুর!"

"তুমি যা-ই বল, আমার কিন্তু যত চেষ্টা সবই তোমাদের জন্যে। নইলে আমি যা রোজগার করি, তাতে একটা লোকের রাজার হালে চলে। তোমাদের সুখে রাখবার জন্যেই ত এত কষ্ট কচ্ছি।" বলিয়া রামতারণ উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথার ফলে গৃহিণীর মুখে সহানুভূতির চিহ্ন প্রকট হয় কি না, দেখিবার জন্য আড়চোখে গৃহিণীর দিকে চাহিতেও ভুলিল না।

গৃহিণী কিন্তু 'কাবির' ধার দিয়াও গেলেন না, তিনি বলিলেন, "তোমাদের! 'তোমরা'টা কে শুনি? তোমারই ত ছেলে-মেয়ে। আমিই বরং তোমাদের জন্যে এখানে জলে পুড়ে মরছি। পিসীমার বাড়ী গিয়ে কত সুখে থাকতে পারি। তোমাদের—"

* * * *

মাস কয়েক পরের কথা। আজ লটারীর ফল বাহির হইবে। রামতারণ তথাকথিত বৈঠকখানায় বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। উৎকণ্ঠায় তাহার মাথা টিপ-টিপ এবং বুকের ভিতর কি এক রকম করিতেছিল। বোধ হয়, গাটা একটু গরমও হইয়াছিল। সম্মুখে পাঁজী খোলা, তাহার বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের রাশিফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু এরূপ উৎকণ্ঠা ত এই নূতন নহে—ইহা ত প্রতি বৎসরই হইয়া আসিতেছে; তবে এবার একটু কথা আছে। সে দিন জ্যোতির্জ্জলধি মহাশয় গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন টিকিট কেনা হয়, তখন তোমার শুভগ্রহ সকল তুঙ্গী হওয়ায় ফললাভই সূচিত হইতেছে, অধিকন্তু লটারীর দিন তিনি মাত্র ১২ টাকা দক্ষিণা লইয়া স্বয়ং 'বগলামুখীপ্রয়োগ' করিয়াছেন—অবশ্য সর্ত্ত আছে যে, প্রথম প্রাইজ প্রাপ্ত হইলে ১০ হাজার, দ্বিতীয়ে ৫ হাজার ইত্যাদি যথাক্রমে তিনি দক্ষিণা

লইবেন। তার পর এবার বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বৃশ্চিকরাশির রাজ্যলাভ—পঞ্জিকাতে লেখা আছে, রামতারণেরও বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বৃশ্চিকরাশি। আরও আশার কথা এই যে, কয় দিন ধরিয়া রামতারণের ডান চক্ষুটা যেন একটু একটু নাচিতেছে।

"বলি, পাঁজি-পুথি নিয়ে ব'সে আছ যে? গণক্কার হবে না কি? বলে—'স্মৃতি-ভট্টি পুড়িয়ে খেয়ে কপাল-দোষে গণক্কার'! তা এটা আর বাকি থাকে কেন? সবই ত হয়েছে।"

"তুমি ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু যখন 'ফাষ্ট প্রাইজ' পাব, তখন দেখবে, এই তুমিই কত 'মিষ্টভাষিণী' হবে।"

"পাবে! এখনই তুমি লটারীর টাকা পাবে!"

"পাব কি, পেয়েছি বল্লেই হয়। এই দেখ পাঁজিতে লিখছে, বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বৃশ্চিকরাশির রাজ্যলাভ। তা আমাদের মতন লোকের ১০।১২ লাখ টাকা রাজ্যলাভ ছাড়া আর কি?"

"তবে আর কি, এইবার আমি রাজরাণী হইছি! একেই বলে পুরুষ! ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন!"

"তুমি বিশ্বাস করছ না? দেখ, এর ওপর জ্যোতির্জ্জলধি মশাই নিজে 'বগলামুখী প্রয়োগ' করেছেন; আরও আমার ডান চোখটা ক' দিন থেকে নাচছে।"

"তা নাচুক! এখন 'কল্পলোক' ছেড়ে একবার এই 'মাটীর পিরথিমী'তে নেমে ঘরের কথায় মন দাও দেখি। বাড়ীওয়ালা এসেছিল, বলে কাল ভাড়ার টাকা না দিলে তার চলবে না। কাল তাকে দিতেই হবে।"

"কি তুমি তুচ্ছ সাড়ে ষোল টাকার কথা বলছ। কাল আমি রাজা—রাজা! তুমি কি মনে করেছ, কাল সে পায়ে ধ'রে সাধলেও এ বাড়ীতে আমরা থাকব? সামনের ওই ফটকওয়ালা বাড়ীখানা বিক্রী আছে, ঐ বাড়ীখানা কিনে কাল এমন সময় আমরা ঐখানে বাস করব। সেই যে ঘরখানার তুমি সুখ্যাতি করেছিলে সেই যে আমাদের দেশের জমীদারের মেয়ের বিয়ের সময় তাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন—সেই সময়—সেইখানা তোমার শোবার ঘর—"

"নাঃ! ডাক্তার ডাকতে হ'ল দেখছি। মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

"আমার মাথা খারাপ? আমার মাথার লোক চিরকাল হিংসে ক'রে এল, আমার মাথা খারাপ?"

"তা তোমার মাথা খারাপ না হয়ে থাকে, না হয়েছে। এখন টাকার কি হবে বল? মাইনের টাকার অর্দ্ধেকের ওপর ত' লটারী লটারী ক'রে উড়িয়ে দিলে, আবার আপিস কামাই ক'রে ব'সে আছ। নইলে দরোয়ানের কাছ থেকে গোটা কতক টাকা ধার ক'রে আনলে যা হোক ক'রে সামলান যেত।"

"আজকের দিনটা সবুর কর গিন্নি, আজকের দিনটা সবুর কর। আজই লটারীর খবর পাব—খবর পাব মানে, নিশ্চয়ই জিত খবর পাব, তার প্রমাণ ত' তোমায় দিয়েছি।"

"এই রইল তোমার ছেলে-পুলে—আমি আমার পিসীমার বাড়ী চললুম।" বলিয়া গৃহিণী সরোষে গৃহত্যাগ করিলেন। রামতারণ পঞ্জিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় ভবতোষ "দাদা দাদা" বলিয়া মহোৎসাহে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমি তখনই বলেছিলুম, তোমারই জিত হবে। পাঁচ জনে পেছনে লাগলে কি হবে!"

রামতারণ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আমারই জিত হয়েছে—আমারই জিত হয়েছে!"

"হ্যাঁ, তোমারই জিত হয়েছে; আমার কথা কি মিথ্যা হয়?'

"গিন্নি, গিন্নি, শুনে যাও, আমাকে তুমি পাগল বলছিলে, এখন দেখ, আমি পাগল, না—তুমি পাগল!"

বড় মেয়ে মেনী আসিয়া জানাইয়া গেল, "মা ছুনেকে নিয়ে কোথায় গিয়েছে।"

"তা যাক্, কাল তাকে আমি সন্তুষ্ট করবই। পয়সার কষ্টেই সে ঐ রকম খিটখিটে হয়েছে, নইলে সে ত' ওরকম ছিল না। বলছিল, পিসীর বাড়ী যাবে, তা যাক; কালই তাকে নিয়ে আসব। জান্লে ভবতোষ, তোমার বৌদিদিকে এখন ঐ রকম দেখছ, কিন্তু ও যে আমাকে কত ভালবাসে, সে ত' আমি জানি। সেকালের সে সব কথা—কি বলব, তুমি ছোট ভাইয়ের মত, তোমাকে সে সব বলতে পারিনে ত'। যাক্, তুমি কখন্ খবর পেলে?"

"টিফিনের সময় বড় সাহেবের ঘরে যেতেই তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন।"

"আফিসের লোক সব কি বলছে ?"

"তোমার বিপক্ষরা একটু মন-মরা হয়েছে। আর সকলে বেশ খুসীই হয়েছে। তারা বলছে, রামদা'কে ব'ল, আমাদের খাওয়াতে হবে।"

"খাওয়াবই ত', খাওয়াব না ? কালিয়া-পোলাও ক'রে খাওয়াব।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমি চল্লুম।"

"শোন—শোন, তা হ'লে টাকাটা কি কাল পাব ?"

"কাল পাবে কি রকম ?"

"তবে কবে পাব ?"

"কেন, মাইনের দিন পাবে। ন্যাকা হচ্ছ কেন ?"

"মাইনের দিন কি ? এ টাকার সঙ্গে মাইনের সম্বন্ধটা কি ?"

"তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"তুমিই যে কি বলছ ছাই, তাও ত' আমি বুঝতে পাচ্ছি নে। এ টাকা আমার হাতে এলে কি আমি চাকরী করব ? আমিও তখন ৭০ টাকার চাকর রাখব।"

"তুমি কি বলছ ?—এ টাকা—এ টাকা বলছ কি ?"

"কেন, লটারীর টাকা ?"

"ওঃ, তুমি লটারীর টাকার কথা বলছ ? আমি বলছি তোমার মাইনে বাড়ার কথা। তোমার ৫ টাকা মাইনে বেড়েছে, তাই ত' তোমাকে তাড়াতাড়ি খবর দিতে এলুম।"

"ওঃ" বলিয়া রামতারণ সেইখানেই শুইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। অপ্রতিভ ভবতোষ পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামতারণ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "লটারীর টাকা কে পেলে ?"

"টাঙ্গামাইকার কে এক জন।"

"হুঁ" বলিয়া রামতারণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভবতোষের দিকে বিপন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, এখন গোটাকতক টাকায় কি করি ? গোটাকতক টাকা না হ'লে যে আমি কাল দাঁড়াতে পারব না। উপায় কি ?"

ভবতোষ একটু ভাবিয়া বলিল, "একটা উপায় আছে।"

রামতারণ উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি ?"

"আফগান ব্যাঙ্ক।"

"আফগান ব্যাঙ্ক কি ?"

"কাবলীওয়ালা।"

"ও বাবা, তার চেয়ে আফিসের দরোয়ান ভাল।"

"তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন, দাদা ? জান ত' আমার অবস্থা ততোঽধিক। আচ্ছা, আসি দাদা।" বলিয়া ভবতোষ প্রস্থান করিল।

রামতারণ মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "আমার শরীরটা বড় খারাপ, আমাকে আজ যেন কেউ না বিরক্ত করে।" বলিয়া শুইয়া পড়িল।

* * * * *

"তখন তুমি মিছে কথা বললে কেন, ভবতোষ ?"

"কি জান দাদা, এত বড় সুসংবাদটা হঠাৎ শুনলে পাছে তোমার 'সক' লাগে, সেই জন্যে বড় সাহেবের কথামত মিছে কথা বলেছিলুম।"

"'সক' লাগবে কেন ?"

"কেন, সেই এক বেয়ারার টাকা পাওয়ার কথা শোন নি ? সায়েব তাকে চাবুক মেরে তবে টাকার কথা বলেছিল।"

"তা ঠিক, ঠিক ; ভবতোষ, তোমাকেও ভাই আমি বঞ্চিত করব না, মাথা গোঁজবার মত ছোট একখানা বাড়ী তোমাকে কিনে দেব, আর বৌমাকে গা-সাজানো মত গয়নাও দেব।"

"সে দাদা তোমার দয়া। তুমি আমায় বরাবরই ভালবাস।"

"তা হ'লে আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। এই চেকখানা দিলেই ত আমাকে টাকা দেবে ?"

"নিশ্চয়। তার পর তোমার ইচ্ছে হয়, ঐ টাকা তুমি আবার সেই ব্যাঙ্কেই জমা রাখতে পারবে।"

"তা ত' রাখবই। নইলে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ঘরে নিয়ে এসে কি একটা বিপদ ঘাড়ে করব। যে মোটর-ডাকাতের উৎপাত! কিন্তু একটা মুস্কিল এই যে, আমার সইটা ঠিক একরকম হয় না।"

"তার জন্যে ভাবনা কি ? এখন ঘণ্টা খানেক ঘরে ব'সে সইটা মক্স ক'রে নাও। তার পর সেখানে যে রকম সই করবে, আর একটা কাগজে সেই রকম সই ক'রে বাড়ী নিয়ে আসবে। চেক লেখবার সময় সেইটে দেখে চেক লিখবে।"

"ঠিক বলেছ ভাই। আমি এখন সইটা মক্স করি। কিন্তু দেখো ভাই, টাকা পাওয়ার কথাটা যেন তোমার বৌদিদি এখন না টের পায়। অবিশ্যি তারই সব আর তার বরাতেই টাকা পাওয়া। তবে কথা কি জান, আমি তাকে একটু—কি বলে এই 'রোমান্স' করাতে চাই।"

"সে কথা আর তোমাকে বলতে হবে না। বৌদিদি কোথায়, তাঁকে ত দেখছিনে।"

"তিনি তাঁর পিসীর বাড়ী গিয়েছেন। আচ্ছা, তোমার আফিসের বেলা হ'ল। তা হ'লে তুমি যাও। আমি ত আর গোলামখানায় যাব না।" বলিয়া রামতারণ একটু বিজ্ঞের মত হাসিল।

"আচ্ছা" বলিয়া ভবতোষ চলিয়া গেল। রামতারণ বসিয়া স্বাক্ষর মক্স করিতে মনোযোগ দিল। এই সময় মেনী আসিয়া বলিল, "বাবা, ভাত হয়েছে, খাবে না?"

"চাল ত ছিল না মা, ভাত হ'ল কি ক'রে?"

"টেঁপীদের কাছ থেকে দু'খুঁচি চাল ধার ক'রে এনেছি। বলেছি, ও বেলা দেব।"

"ও বেলা তুমি তাদের দু'মণ চাল দিও। হাসছিস যে? ভাবছিস, তোর বাপের মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তা নয়, সেই লটারীর টাকা আমি পেয়েছি—প্রায় বারো ল-ক্ষ! মহাভারতে পড়েছ ত' মা, শ্রীবৎস রাজার পোড়া শোল জলে পালাবার পর তবে তাঁর শনি ছেড়েছিল। আজ আমারও তেমনই পরের বাড়ী থেকে চাল ধার করার পর তবে শনি কেটেছে।"

"তবে এখনই মাকে নিয়ে এস না, বাবা, মা কত খুসী হবে।"

"দাঁড়া না পাগলী, তাকে একেবারে হকচকিয়ে দেব। তোমার হাতের ঐ গালার চুড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেল মা—আচ্ছা, এ বেলা থাক। ও বেলা একটা ভাল জুয়েলারী দোকানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে যে গয়না তোমার ইচ্ছা হয়, তাই কিনে দেব। এখন চল, কষ্টের ভাত খাওয়া ইহ-জীবনের মত শেষ করি।"

আহারান্তে রামতারণ চেকখানি কাপড়ের খুঁটে দুইটি গিরো দিয়া বাঁধিয়া কোঁচার খুঁটে গুঁজিয়া, ভীষণ রৌদ্রের মধ্য দিয়া দেড় মাইল হাঁটিয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিল—হাঁটিয়া পথ চলা এই শেষ! আসবার সময় ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে—না, একেবারে রোলস রইস মোটর কিনে—যা হয় একটা করা যাবে।

ব্যাঙ্কের কাউণ্টারের ধারে দাঁড়াইয়া রামতারণ সাবধানে কাপড়ের খুঁট হইতে চেকখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে কাউণ্টারের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিল। বাবুটি তখন অনুচ্চস্বরে শিসের সুরে পিলু রাগিণী ভাঁজিতেছিলেন এবং খাতার পাতা উল্টাইতেছিলেন। রামতারণ মিনিট দুই দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "মশাই, এই চেকখানা—"

বক্রদৃষ্টিতে রামতারণের দিকে চাহিয়া বাবুটি বলিল, "সবাই এখানে এসে একেবারে নবাব ব'নে যান। দু'মিনিট তর সয় না—যেন লাখো টাকার চেক!"

"চটেন কেন মশাই, দেখুন নাই চেকখানা!"

"জ্বালালে" বলিয়া বাবু চেক্‌খানি লইয়া তাহার অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তার পর একবার পূর্ণ-দৃষ্টিতে রামতারণের দিকে চাহিয়াই চেকখানি লইয়া দ্রুতপদে বড় সাহেবের কামরার দিকে চলিয়া গেল। রামতারণ একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিটখানেক পরে স্বয়ং বড় সাহেব আসিয়া তাহার সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া শুভ ইচ্ছা জানাইলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের কামরার দিকে চলিয়া গেলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া মহাসমাদরে রামতারণকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিলেন এবং কি উপায়ে এই টাকাটা তাঁহারই ব্যাঙ্কে পুনরায় জমা থাকে, বোধ হয়, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিয়া বলিলেন, "বাবু, সব টাকা কি তুমি বাড়ীতেই রাখবে, না—ব্যাঙ্কে রাখবে?"

রামতারণ বলিল, "ব্যাঙ্কেই রাখব হুজুর। বাড়ী ত আমার নেই,—তবে বাড়ী একটা কিনব বটে, তা সব টাকায় ত নয়।"

সাহেব। হ্যাঁ, তোমরা বাড়ীটাই ভাল বোঝ। কিন্তু আমার মনে হয়, বাড়ী কিনে যে টাকাটা আবদ্ধ হয়, সেই টাকার সুদে বাড়ী ভাড়া দিয়েও লাভ থাকে।

রাম। তা বটে, হুজুর, কিন্তু আমাদের দেশের পদ্ধতি—বিশেষ আমার স্ত্রীর—

সাহেব। না না, আমি বাড়ী কিনতে বারণ করছিনে। ও একটা অর্থনীতির কথা মাত্র।

'সাহেব' বোধ হয় ভাবিলেন, সব টাকাটা আটকাইবার

চেষ্টা বৃথা ; ইহারা বাড়ী করিয়াই টাকা নষ্ট করে। তাই ইহাদের এই দুর্দশা! তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কত টাকা নগদ নেবে?"

রামতারণ মনে মনে হিসাব করিল—মুদী—গোয়ালা ইত্যাদি, তা ছাড়া মেয়ের আপাততঃ কিছু গহনা—খুচরা খরচ—প্রকাশ্যে বলিল, "হাজার খানেক হলেই চলবে।"

ভাবে বোধ হইল, সাহেব বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে খুসীও হইলেন। বলিলেন, "তা হ'লে কি বাকি টাকাটা ফিক্সট ডিপজিট ক'রে দেব?"

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিল, "ফিক্সট ডিপজিট করলে কাল যদি আমার টাকার দরকার হয়, তা হ'লে ত টাকা পাব না।"

সাহেব। তা পেতে পার, আমরা ধার দেব।

রামতারণের হঠাৎ বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে বিনীতভাবে বলিল, "না হুজুর, তার দরকার নেই। ৮ লক্ষ টাকা ফিক্সট্ ডিপজিট রেখে বাকি টাকা কারেণ্ট একাউণ্টে থাক।"

বোধ হইল, সাহেব কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন, "কিন্তু বাবু, তোমাকে সনাক্ত করবার জন্য এক জন আমাদের জানাশোনা লোক চাই। এটা আমাদের দস্তুর।"

রামতারণ বলিল, "আমাদের বড় সাহেব যদি সনাক্ত করেন, তা হ'লে হবে?"

"তুমি কোথায় কায কর?"

"ড্রামণ্ড কোম্পানীর আফিসে।"

"নিশ্চয়ই হবে। আমরা তাঁদেরও এক জন ব্যাঙ্কার।"

"কিন্তু হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে। একবার সব টাকাগুলো আমার হাতে দিতে হবে। আমি টাকাগুলো হাতে ক'রে জন্ম সার্থক করব। তার পর সব ডিপজিট দিয়ে হাজার খানেক টাকা নিয়ে চ'লে যাব।"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ—বেশ, এ ত' আনন্দের কথা। আমি এই টাকা তোমার হাতে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করব।"

তার পর যথারীতি টেলিফোন হইল—ড্রামণ্ড কোম্পানীর বড় সাহেব আসিল—রামতারণকে অভিনন্দিত করিল—রামতারণ স্বাক্ষর করিল, অবশ্য আর একটি অনুরূপ স্বাক্ষর লইতে ভুলিল না। তার পর নগদ হাজার টাকা ও চেক-বহি লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পরিশ্রম ও উত্তেজনার ফলে রামতারণের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, তাই সে প্রথমে একটা পাণের দোকানে যাইয়া এক গেলাস বরফ দেওয়া আইসক্রিম সোডা এক নিশ্বাসে পান করিয়া "আঃ' বলিয়া একটা আরামসূচক শব্দ করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই পাণওয়ালার আরসীতে নিজের মূর্ত্তিটি চোখে পড়িল। খোঁচা খোঁচা দাড়ী ও রুক্ষ চুল দেখিয়া তাহার নিজেরই নিজের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। ভাবিল, এখন নাপিত কোথা পাই; তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, লালবাজারের কাছে 'হেয়ার কাটারে'র দোকান আছে। তখনই একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া সোফারকে লালবাজারে যাইবার আদেশ করিল, ট্যাক্সিতে বসিয়া নিজের ছেঁড়া জুতা, তালি দেওয়া কোট, মলিন বস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সে মতলব স্থির করিয়া ফেলিল।

চুল ছাঁটা ও দাড়ি কামান হইলে 'কাটার' যখন জিজ্ঞাসা করিল যে, টেরি কাটিয়া দিব কি? তখন রামতারণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, চুলটা ভাল ক'রে আঁচড়ে দাও, আর দেখ, গোঁফটার দরকার নেই, ওটা কামিয়েই দাও।" রামতারণ আজকালকার অনেক বড়লোককে গোঁফ কামাইতে ও খদ্দর পরিতে দেখিয়াছে। এ ঢংটা তাহার মন্দ লাগিত না—সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের পোষাক সম্বন্ধেও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া রামতারণ আবার একখানা ট্যাক্সি লইল। তার পর ভাল এক জোড়া জুতা, খদ্দরের কাপড়, চাদর, ঢিলা হাত পাঞ্জাবী কিনিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিল, এখন কাপড় ছাড়িই বা কোথায় আর ময়লা কাপড়গুলা ফেলিই বা কোথায়। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সামনের এক ডায়িং এণ্ড ক্লিনিংএর দোকান দেখিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তথায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ময়লা বস্ত্রাদি কাচিতে দিল। তাহারা নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, মধুসূদন হালদার ১৭৷৫৷১এ [illegible] সুরের গলি। মনে মনে বলিল, কাপড় জামা ছাড়ার দাম তোকে ঐ ছেঁড়া কাপড়-জামা দিয়েই শোধ ক'রে দিলু[illegible]। এগুলো তোর আলমারীর শোভাবর্দ্ধন করুক। ছেঁড়া জুতা জোড়াটার ত ট্যাক্সিতেই গতি করেছি।

এইরূপে ভদ্রলোক সাজিয়া সে মনে করিল, এইবার একখানা মোটর গাড়ী কেনা যাক; কিন্তু রাখব কোথায়?

এখনই যদি গ্যারেজ ভাড়া না পাওয়া যায়, তা হ'লে কি হবে? আচ্ছা, শুনেছি, গাড়ীওয়ালারাও দু'চার দিন গাড়ী রাখে, তার মধ্যে আর গ্যারেজ পাওয়া যাবে না? দেখাই যাক। ট্যাক্সিতে উঠিয়া কোন বড় মোটরকারওয়ালার দোকানে লইয়া যাইতে সোফারকে আদেশ করিল। যাইতে যাইতে আবার ভাবনা হইল, ড্রাইভার কোথায় পাইব। নাঃ, এ ত বড় ফ্যাসাদ হ'ল! এক দিনে কিছুই হয় না দেখছি। ভাবিতে ভাবিতেই ট্যাক্সি এক বড় মোটরকারের দোকানের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। রামতারণ ধীরগম্ভীরভাবে দোকানে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে কর্ম্মনিরত একটি বাঙ্গালী যুবককে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি একখানা ভাল মোটর কিনব; কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে গোটা-কতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

যুবকটি আগ্রহের সহিত বলিল, "বলুন। আপনি কি আজই মোটর কিনবেন?"

রাম। ইচ্ছে ত সেই রকমই।

যুবক। কিন্তু আজই কি পাবেন? গাড়ী রেডি করা আছে কি না, ঠিক বলতে পাচ্ছিনে।

রাম। তবেই ত!

যুবক। তবে একখানা বেশী দামের গাড়ী রেডি আছে; সেখানাকে দু'চার দিন বাদে ডিলিভারি দেবার কথা।

রাম। তবে সেখানাই আমাকে ক'রে দাও। আমি তোমাকে কিছু দেব অখন।

যুবক। কিন্তু তার দাম যে বড্ড বেশী!

রাম। কত দাম?

যুবক। সাড়ে সতর হাজার টাকা!

রাম। তা হ'ক।

যুবক বিস্মিতদৃষ্টিতে রামতারণের দিকে চাহিল।

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি আজ গাড়ী কিনি, তা হ'লে ড্রাইভার এক জন এখানে পাওয়া যাবে না?"

যুবক। তা আমি এক জন ভাল ড্রাইভার আপনাকে আজই দেব।

রাম। আর একটা কথা, আমার গ্যারেজ নেই, যদিই আজ গ্যারেজ ভাড়া না পাই, তা হ'লে দু'চার দিন তোমাদের আফিসে গাড়ীখানা রাখবার বন্দোবস্ত হ'তে পারে না?

যুবক। সে সব আমি ঠিক ক'রে দেব অখন। কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে।

রাম। বল।

যুবক। আপনি সাহেবকে বলবেন, আমিই আপনাকে নিয়ে এসেছি। তা হ'লে আমি—

রাম। তা হবে হে, তা হবে। তার জন্য আর কি।

মহোৎসাহে যুবক রামতারণকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের কামরার দিকে চলিল।

তাহার পর যথারীতি গাড়ী দেখা হইল এবং রামতারণের নামে গাড়ী বিক্রয় হইল। তবে প্রথমটা চেক দেওয়া লইয়া একটু গোল হইল, কিন্তু তখনই চেক লইয়া রামতারণের ব্যাঙ্কে লোক যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, চেক ঠিক, তবে সে দিন টাকা পাওয়া যাইবে না; কারণ, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

যুবক তাহার কথামত সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিল। কেবল রামতারণ যে তাহাকে 'কিছু' দিবে বলিয়াছিল, তাহা আর সে দিল না। যুবকও সে বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিল না; কারণ, তাহার 'ক্লায়েণ্ট' বলিয়া রামতারণ পরিচয় দেওয়ায় সে আশাতীত 'ব্রোকারেজ' পাইবে। সাহেবী ফার্ম্মে কর্ম্মচারীদেরও দালালী দিবার ব্যবস্থা থাকে।

তাহার পর নিজের মোটরে উঠিয়া রামতারণ বাসার দিকে চলিল। যাইতে যাইতে ভাবিল, মুদী বেটাকে তার পাওনা টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে তবে বাসায় যাব। বেটার ভারি ঝাঁজ! তেত্রিশ টাকা সাড়ে এগার আনা পাবে ব'লে বেটা আজ সকালে আড়াই সের চাল ধার দিলে না! বেটার টাকাগুলো ফেলে দিয়ে ব'লে যাব যে, এখন থেকে মাসে আমার দু'শো টাকার জিনিষ দরকার হবে, কিন্তু তোর দোকান থেকে নেব না। নচ্ছার বেটা! আর যে সব লোক দু'দশ টাকা পাবে ব'লে মুখনাড়া দেয়, তাদেরও এবার দেখে নেব। সপ্তায় একবার ক'রে পার্টি দেব, কিন্তু সেই বেটাদের বাদে আর সব বেটাদের 'ইনভাইট' ক'রে খাওয়াব। ভারি টাকা পাবে! থাক বেটারা! দেখে নেব!

বাসার সামনে মোটর দাঁড়াইল। রামতারণ নামিয়াই দেখিল, পাড়ার বিস্তর লোক সেখানে জমা হইয়াছে। আর বাড়ীওয়ালা হাতমুখ নাড়িয়া বলিতেছে, "তোমরা সব পাগল হয়েছ! রামতারণ চক্কোত্তি টাকা পেয়েছে! ও সব ছেঁদো

কথা শোন কেন? আজ আমার ভাড়ার টাকা না পেলে ওর জিনিষ-পত্তর টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ওকে তাড়িয়ে তবে আমার কায!"

রামতারণ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কত টাকা তোমার পাওনা হে, যে, অত লম্ফ-ঝম্প করছ?"

ইহার পূর্ব্বে রামতারণ, বাড়ীওয়ালা ছোট জাত হইলেও কখন তাহাকে 'তুমি' বলিতে সাহস পায় নাই।

"এই দেখুন না মশাই, রামতারণ চক্কোত্তির কাছে দু' মাসের—" ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই বাড়ীওয়ালা থতমত খাইয়া গেল। নবভাবে সজ্জিত রামতারণকে সে এক জন অপর ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া 'থতমত খাইয়া' গিয়াছিল।

রামতারণ তাহার দিকে চারখানা দশ টাকার নোট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই তোমার দু' মাসের ভাড়া তেত্রিশ টাকা নাও, আর বাকি টাকা ক'টা তোমাকে বখসিস্ করলুম।" বলিয়া পাঞ্জাবীর বাঁ হাতের কাপড়টা একটু সরাইয়া রিষ্ট ওয়াচটা একবার দেখিয়া লইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিতে ভুলিয়াছি, সে সোনার 'বগলস' শুদ্ধ একটা দামী রিষ্ট ওয়াচ আসিবার সময় কিনিয়াছিল।

সকলে সেই দামী মোটরখানার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিয়াই রামতারণ ডাকিল, "ও মা মেনু, কোথায় তুমি?"

"এই যে বাবা" বলিয়া মেনী আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া "হাঁ" করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামতারণ বলিল, "কি রে, তুইও চিনতে পারছিস নি!" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তুমি গোঁফটা কেটে ফেল্লে কেন, বাবা?"

"আর ভাল দেখায় না মা, তাই ফেলে দিয়েছি। চল মা, আমরা এইবার এখান থেকে যাব।"

"কোথায় যাব, বাবা?"

"এই দেখ না কোথায় যাই। মুনে কোথায়?"

"সে ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আবদার নিয়েছিল, আমি বললুম, বাবা এক্ষুণি আসবে। এলেই তোকে এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবে। তাই শুনে সে বাড়ীওয়ালার ছেলের সঙ্গে খেলা করছে। আমি ডাকছি।"

মুনেকে আর ডাকিতে হইল না, বাবা বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়াই মুড়ির পয়সার জন্য তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই দেখিল, তাহার বাবার বদলে আর এক জন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রামতারণ বলিল, "মুনে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? ওঃ, তুইও চিনতে পারিস নি?"

তখন মুনে বাবাকে চিনিতে পারিয়া অভিমানভরে বলিল, "তোমার এত ভাল কাপড়-জুতো হয়েছে—আমার কিচ্ছুই নেই।"

"এখনই দিচ্ছি বাবা; ঐ যে বাইরে একটা চকচকে মোটর-গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ মোটরের কাছে গিয়ে যে লোকটা মোটরে ব'সে আছে, তাকে বল, বাবু বল্লে, গাড়ীতে যা জিনিষ-পত্তর আছে, সে সব নিয়ে এস।"

"যদি বকে?"

"কে বকবে?"

"কেন, যার গাড়ী।"

"ও ত, তোমার গাড়ী।"

"যাঃ!"

"হ্যাঁ, তোমার গাড়ী। তুমি গিয়েই দেখ।"

মুনে তখন সাহসে নির্ভর করিয়া ড্রাইভারকে তাহার বাপের আদেশ জানাইল। ড্রাইভার একটা কাপড়ের বাণ্ডিল, জুতার বাক্স, খাবারের চেঙ্গারি প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল। রামতারণ তাহাকে বলিল, "কেশব, তুমি গাড়ী ঘুরিয়ে রাখ। আমরা এখখুনি যাচ্ছি।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

তখন রামতারণ খাবারের চেঙ্গারি খুলিয়া ভাল ভাল খাবার বাহির করিয়া তিন জনে খাইল। তার পর মেয়েকে বলিল, "মা, ঐ পুঁটলিটা খুলে জামা-কাপড় বা'র ক'রে নিজে পর, আর মুনেকেও পরিয়ে দাও।"

কাপড়-জামা পরা হইলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব যে ঠিক গায়ের মত; তুমি কি ক'রে ঠিক করলে বাবা?"

রামতারণ বলিল, "আমি যাবার সময় মাপ নিয়ে গিয়েছিলুম। ঐ জুতোর বাক্স দু'টো খোল, ওতে দু'জোড়া জুতো আছে; এক জোড়া তোমার—এক জোড়া মুনের। ৩-৩

পায়ে ঠিক হবে, ওর মাপও নিয়ে গিয়েছিলুম কি না। তোমার অনেক দিন থেকে জুতো পরবার সাধ মা, এদ্দিন ত পারি নি, আজ কিনে এনেছি।"

সুসজ্জিত পুত্র-কন্যা লইয়া বাহির হইবার সময় মেয়ে বলিল, "বাবা, ঘরে চাবি দি, নইলে চোরে সব নিয়ে যাবে যে!"

"যাক্ গে, এ সব জিনিষে আমাদের কোন দরকার নেই। ভাল ভাল বিছানা-পত্তর সব কিনে নেব।"

মেয়ে দুঃখিতস্বরে বলিল, "কিছুই নেবে না?"

"না রে, পাগ্‌লী, কিছুই নয়।"

"মা যদি বকে?"

রামতারণ কিছু ভীত হইল। পরে বলিল, "দূর, এ সব বদ্ জিনিষের ওপর সে ভারি চটা, জানিস্ নি? নতুন সব ভাল ভাল জিনিষ পেলে সে কিছু বলবে না।"

ঘরের বাহির হইয়া রামতারণ দেখিল, তখনও পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। রামতারণকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। রামতারণ বাড়ীওয়ালাকে বলিল, "ঘরে যে সব জিনিষ-পত্তর আছে, সব তোমাকে দিয়ে গেলুম হে।"

বাড়ীওয়ালা বলিল, "বাবু"—এত কাল সে "চক্কোত্তি মশাই বলিয়া ডাকিত।—"বাবু, এ গরীবদের মনে রাখবেন।"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়" বলিয়া রামতারণ পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া মোটরে উঠিয়া এক বিখ্যাত হিন্দু বোর্ডিংএর দিকে যাইবার জন্য সোফারকে আদেশ করিল। বোর্ডিংএ পৌঁছাইয়া সে একা 'ফ্যামিলি কোয়ার্টার' ভাড়া করিল এবং প্রথম শ্রেণীর আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিল।

পরদিন প্রভাতে রামতারণ ভবতোষকে ডাকাইয়া তাহার পূর্ব্ব-বাসার সামনের ফটকওয়ালা বাড়ীখানা কিনিবার জন্য তাহাকে দালাল নিযুক্ত করিয়া চিঠি দিল। ভবতোষ মাঝে মাঝে যে দালালী করিত, তাহা রামতারণের জানা ছিল। রামতারণ মনে মনে বলিল, তখন ঝোঁকের মাথায় তোমাকে কিছু দিব বলিয়াছিলাম, তা এই দালালীতেই সেটা শোধ করিয়া দিব। প্রকাশ্যে বলিল, "আজই যাতে বাড়ীখানা কেনা হয়, তার চেষ্টা কর।"

ভবতোষ বলিল, "তা হয়ে যাবে'খন।

রামতারণ বলিল, "কিন্তু তাড়াতাড়িতে না ঠকি; কোনও গলদ বেরুবে না ত?

ভবতোষ বলিল, "না দাদা, তোমার সে ভয় নেই। ঐ বাড়ীখানার বিক্রী কবলার 'ড্রাফট' পর্য্যন্ত হয়ে আছে, আর রেজেষ্ট্রী আফিসে 'সার্চ্চও' হয়ে গিয়েছে—কোনও গলদ নেই। আপনাদের দেশের জমীদার মেয়ের বিয়ের সময় এসে ঐ বাড়ীতে ছিলেন, সে ত আপনি জানেন,—তাঁরই জন্য সব ঠিক-ঠাক হয়ে আছে। কেবল বায়না হয় নি; কারণ, তিনি বলেন, বায়না আর কি হবে, একেবারে রেজেষ্টারী করেই নেব। তা আপনি ভাগ্যবান্—তার জন্যে বাড়া ভাত আপনার পেটেই যাক, কিন্তু দাদা—"

রামতারণ বলিল, "তা হবে হে—তা হবে। তার জন্যে আর ভাবনা কি, আমি তোমাকে খুসী করব।"

সেই দিনই এক লক্ষ তেইশ হাজার টাকা দিয়া সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত সেই ফটকওয়ালা বাড়ীখানা কেনা হইল এবং দাস-দাসী নিযুক্ত হইল। তাহার পর রামতারণ স্ত্রীকে আনিবার জন্য তাহার পিস্‌শ্বশুরের বাড়ীর দিকে রওনা হইল; বলা বাহুল্য, ছেলে, মেয়ে ও খানসামা রামদীন সঙ্গে চলিল।

হর্ণ দিতে দিতে একটা বাঁক ফিরিয়া যখন রামতারণের বৃহৎ মোটরখানা তাহার পিস্‌শ্বশুরের খোলার চালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন রামতারণের ছোট ছেলে ছুনে দিগম্বর-মূর্ত্তিতে ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। সোফার দরজা খুলিয়া দিতেই মেনী নামিয়াই তাহাকে কোলে করিতে যাইতেছিল, সেই সময় বড় ছেলে মুনে বলিয়া উঠিল, "দিদি, ওই ধুলো শুদ্ধু ওকে কোলে করলে তোমার কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যাবে। মা এমনি বকবে—"

ভয় পাইয়া মেনী ছুনের হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল—এমন সময় রামতারণের পিস্‌শ্বশুর বাহিরে কাহার মোটর দাঁড়াইল দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন; রামতারণ প্রণাম করিতেই তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। যাহাকে প্রথম দেখিয়া তাহার নিজের ছেলে-মেয়েরই ভ্রম হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া পিস্‌শ্বশুর যে চিনিতে পারিবেন না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিল মুনে; সে বলিল, "বাবা যে, দাদু! তুমি চিনতে পারছ না?"

তখন পিসশ্বশুর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, হতভাগা জামাতার যে এত ঐশ্বর্য্য—এটা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধনীর সম্মান করিতেও ভুলিলেন না। "এস এস বাবাজী" বলিয়া সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অথচ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেও বোধ হয় তিনি বাবাজীর পিতৃপুরুষের যে সব খাদ্যের ব্যবস্থা দিতেছিলেন, তাহা উহ্য থাকাই ভাল!

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই রামতারণ বলিল, "কি গো মশাই, আমার মাথা খারাপ, না?"

গৃহিণী বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

রামতারণ বলিল, "কি গো, বাকি্য নেই যে!" তার পর গৃহিণীর ছিন্ন মলিন বস্ত্র ও চটাওঠা শাঁখার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, "ও হো হো! ওরে মেনী, সুট্‌কেসটা আনিস্ নি? শীগ্‌গির রামদীনকে আনতে বল।" তার পর গৃহিণীকে বলিল, "ও কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল—ও যেন আমার চোখে বিঁধছে।"

খানসামা রামদীন সুটকেস আনিয়া খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রামতারণ বলিল, "এইবার কাপড় ছেড়ে এই গয়নাগুলো থেকে যা ইচ্ছে হয়, পর; তার পর নিজের মনের মত সব গয়না গড়িয়ে নিও।"

প্রসন্ন-হাস্যে গৃহিণী বলিলেন, "সে যা হয় হবে।" তাহার পর গৃহান্তর হইতে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গৃহিণী প্রত্যাগমন করিলে রামতারণ তাহার সুবেশা রত্নালঙ্কার-ভূষিতা স্ত্রীর দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাঁহার সুগৌর—সুগোল—সুন্দর হাতে চুড়ীগুলি কি চমৎকারই মানাইয়াছে! রামতারণ বলিল, "তোমাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে! যেন—"

"পদ্মশ্রী ব'লে মনে হচ্ছে, না?"

"কি যে বল, তার ঠিক নেই। আচ্ছা, এখন যদি জরীর আঁচলা দেওয়া নীলাম্বরী কাপড় পর, তা হ'লে কি লোকে কিছু মনে করবে?"

"আজ বাদে কাল জামাই হবে, সেটা কি ভাল!" ভাবে বোধ হইল, গৃহিণীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাই আছে!

"ওগো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, তোমাকে ত' 'পেন্নাম' করা হয় নি!" বলিয়া গৃহিণী প্রণাম করিতে যাইতেই রামতারণ তাঁহার হাত দুইটা ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, "কেমন, মনে আছে, আমি বলেছিলুম, 'এই তুমিই কত মিষ্টভাষিণী হবে'?"

গৃহিণী "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ" বলিয়া মধুর হাস্য করিলেন।

রামতারণ বলিল, "সেই ফটকওয়ালা বাড়ীখানা কিনেছি—অবশ্য তোমারই নামে—সেই যে বাড়ীখানা তোমার মনের মত। এখন চল, গৃহপ্রবেশ করা যাক।"

বাটীর সম্মুখে আসিয়া সোফার হর্ণ দিতেই দরোয়ান ফটক খুলিয়া দিল। মোটর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়াইতেই দাস-দাসীরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গৃহিণীকে সম্বর্দ্ধনা করিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী মোটর হইতে নামিয়া হেলিতে দুলিতে গল্প করিতে করিতে উপরের হল-ঘরে গিয়া পৌঁছিলেন। কর্ত্তা একটা সোফায় বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন। পরে তথা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় হল-ঘরে প্রবেশ করিতেই বামন ঠাকুর গরম গরম লুচী, মিষ্টি প্রভৃতি আনিয়া জলযোগ করিতে দিল। রামতারণ জলযোগ করিয়া একটা দামী সিগার মুখে দিয়া সেই সোফার উপরেই চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময়ে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর তাহার কাণে প্রবেশ করিল, "শুয়ে রয়েছ? চাল নেই যে! বলি শুনছ?"

একটা প্রবল ঝাঁকানীতে রামতারণ চক্ষু চাহিতেই স্ত্রীর চিরপরিচিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল এবং তাঁহার চির রুক্ষস্বর কাণে প্রবেশ করিল—"কাল রাত্তির থেকে ছেলেপিলে সব উপোস ক'রে রয়েছে যে! ধন্যি পুরুষ যা হোক!"

সদ্যোনিদ্রোত্থিত রামতারণ পত্নীর ক্রোধদীপ্ত মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

জমীদার বাবু—

গরিব প্রজার রক্তে উদর-ভাণ্ডার।
পূর্ণ করি পুণ্যশ্লোক বসি জমীদার॥

প্রার্থিগণ আসি দয়া তাঁর কাছে চায়।
"পাষাণে কর্দ্দমো নাস্তি" জানে না কো হায়॥

. বড়বাবু—

ধন্য বড়বাবু, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
যোড় হাতে সবে চায় প্রসাদ তোমার॥

ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার বাবুর ডাক আর যশ মান।
বড় বেশি, স্নানাহারে সময় না পান॥
বুকে যন্ত্র দিয়া, নাড়ী টিপিয়া রোগীর।
ডেকে কন, শীঘ্র জিহ্বা করহ বাহির॥

জামাই বাবু—

শ্যালীগণ-মধ্যে বসি নূতন জামাই।
ভক্তগণ-মধ্যে যেন নদের নিমাই॥

দারোগা বাবু-

বুল্‌ডগের ভঙ্গী দেখি মুখে দারোগার।
নির্দ্দোষ নিজেরে দোষ করয়ে স্বীকার॥

কাপ্তেন বাবু—

কাপ্তেন বাবুর স্ফূর্ত্তি পর্ব্বত-প্রমাণ।
"পিও সুধা, পিও সুধা, পিও মেরি জান

ছোকরা বাবু—

কেঁদো না ভারতমাতা, মুছ আঁখি-ধার
ছোকরা বাবু হ'তে হবে তোমার উদ্ধার

খোকা বাবু—

খোকা বাবু যা ধরিবে তখনি তা চাই।
ভৃত্যকে সাজিতে ঘোড়া হইয়াছে তাই ॥
পিঠে চড়িয়াছে খোকা নাহি তায় দুখ।
দুঃখ বড়—খোকা বাবু লাগায় চাবুক ॥

সুরাজাত ইন্ধন

সুরার আবিষ্কার যে কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। ঐতিহাসিক যুগের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই মানব-সমাজে কোন না কোন প্রকার আসবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতেও সুরার ব্যবহার খুব প্রাচীন। বেদে গাঁজান ও পরিস্রুত (Fermented and Distilled) উভয় প্রকার সুরার উল্লেখ আছে। কিন্তু অতীত যুগসমূহে সুরা প্রধানতঃ মাদক দ্রব্য অথবা ঔষধ বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বিগত শতাব্দী হইতেই সুরার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানাবিধ রাসায়নিক শিল্পে এবং ততোধিক মাত্রায় জ্বালানির জন্য সুরার চাহিদা শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে যে সুরা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ বলোৎপাদন সুরা অর্থাৎ Power alcohol বলে।

জগতের নানা স্থানে কয়লার খনির অভাব না থাকিলেও কয়লা অফুরন্ত নহে; বস্তুতঃ কত দিন পর্য্যন্ত কয়লা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন। কয়লার ন্যায় কয়লাজাত তরল ইন্ধনের ভবিষ্যৎও সীমাবদ্ধ। কেরোসিন ও তৎশ্রেণীর খনিজ তৈল সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান জগতের অসীম প্রকার কল ও যন্ত্রাদি, যে সমুদয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে, সে সমুদয় ইন্ধন অভাব হইলে অচল হইয়া পড়িবে। আধুনিক কলকব্জার যুগের স্থায়ী উন্নতি বিরাট পরিমাণে ইন্ধন সংগ্রহ এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রতীচ্যের অনেক মনস্বী ব্যক্তিই এই গুরু সমস্যা-সমাধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

উদ্ভিজ্জ ইন্ধন

সূর্য্যই তেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার; ইহা অবিরত তেজ বিকিরণ করিতেছে! যে সমস্ত পদার্থ সূর্য্য হইতে তেজ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, তৎসমুদয়ই আবার অন্য সময়ে তেজ ও শক্তি প্রদানে সমর্থ। সূর্য্যের তেজ প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিদে সঞ্চিত থাকে। কয়লা (fossilised) উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্যই কয়লা হইতে তরল এবং কঠিন উভয় প্রকার ইন্ধন পাওয়া যায়। মৃত ও প্রস্তরীভূত উদ্ভিদকে যেরূপ কল চালাইবার শক্তি প্রদানকল্পে নিয়োগ করা যায়, জীবিত উদ্ভিদকেও সেই উদ্দেশ্যে চালাইতে পারা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলে উদ্ভিদ যত শীঘ্র বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই উদ্ভিদের সংখ্যা ও পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহাই ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রধান শক্তি উৎপাদনকেন্দ্রস্বরূপ পরিগণিত হয়। অধিকন্তু উদ্ভিদ অফুরন্ত, সুতরাং উদ্ভিদ হইতে চিরকালই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

উদ্ভিদের ইন্ধনরূপে ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু দুই এক প্রকার কল ব্যতীত অন্য কলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাঠ জ্বালাইতে পারা যায় না। কল চালাইবার উপযোগী উদ্ভিজ্জ ইন্ধন উৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের উপাদানসমূহকে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। কাষ্ঠকে শুষ্ক প্রথায় চোলাই করিলে অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত কয়লা ও কাষ্ঠে সুরা পাওয়া যায়। উভয়ই ইন্ধনরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কাষ্ঠসারকেও (Cellulose) সাক্ষাৎরূপে সুরায় পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর। ইহার জন্য কয়েক বৎসরাবধি বহু চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এমন কোন প্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই, যদ্দ্বারা কাষ্ঠসার হইতে প্রস্তুত সুরা ইন্ধনরূপে সাধারণ সুরার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত শ্বেতসার এবং শর্করাপ্রধান উদ্ভিদ্-সমূহ সাধারণতঃ সুরা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং তদ্রূপ সুরাই বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সুসভ্য দেশ-সমূহে কলের ইন্ধন যোগাইতেছে।

সুরা প্রস্তুতের কাঁচা মাল

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে বহু পুরাকাল হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ সুরা উৎপাদনোপযোগী উদ্ভিদের ভারতে অভাব নাই। বৃক্ষের বীজ, ফুল, রস হইতে সুরা প্রস্তুত হয়। সুরা-প্রস্তুতপ্রণালী-বর্ণনা এ স্থলে অনাবশ্যক। বিভিন্ন অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত ভারতীয় উদ্ভিদ্গুলি সুরা উৎপাদনের জন্য প্রয়োগ করা হয়,—কাণ্ড-জাত রস—ইক্ষু, তাল, খেজুর, মুর্গা, সাগু বৃক্ষ ও নারিকেল; ফল—ভুট্টা, চাউল, জোয়ার, হিজলী বাদাম, গড়গড়ি, মাণ্ডুয়া, কালজাম, তুঁত ও আঙ্গুর; ফুল—মহুয়া ও কদম্ব; অন্তর্ভৌম কাণ্ড—আলু, রাঙ্গা আলু ও সিমুল আলু। এই সমুদয়ের মধ্যে চাউল এবং ইক্ষু অন্যতম কাঁচা মাল। পৃথিবীর যে স্থানেই ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ হয়, সেই স্থানেই চিটা অথবা মাৎ গুড় হইতে অল্পবিস্তর পরিমাণে আসব প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রম্ ইক্ষুজাত সুরাবিশেষ; এবং সাজাহানপুরের রোজা কারখানাই রম্ প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। ভারতে ইক্ষুচাষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও কিউবাই শর্করা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। উক্ত দেশে বিরাট শর্করা-কারখানাসমূহ বিদ্যমান; এই সমুদয় কারখানা-সংলগ্ন ৩৭টি সুরা চোলাইর কারখানা আছে। কারখানা সমূহের পরিসর, ইহা বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উহাদিগের জন্য আড়াই কোটি ডলার (১ ডলার কিঞ্চিদধিক ৩৲) মূলধন

নিয়োজিত হইয়াছে এবং কারখানাগুলিতে অন্যূন ৩ হাজার লোক কাষ করে। এই সমস্ত কারখানা হইতে বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি লিটার (২ লিটার কিঞ্চিদধিক ১ সের) সুরা প্রস্তুত হয়; তাহার মধ্যে কিছু কম ২ কোটি লিটার মোটর স্পিরিটে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইহাতেও মোটর চালাইবার ইন্ধনের সংকুলান হয় না। এতদ্ভিন্ন মার্কিণে প্রভূত পরিমাণে গ্যাসোলিন নামক ইন্ধন চিনির কারখানার পরিত্যক্ত রস (Black strap molasses) হইতে প্রস্তুত হয়। উহার উৎপাদনের পরিমাণ বাৎসরিক ৫ শত কোটি গালনের (১ গ্যালন ৫ সের) কম নহে। সাড়ে সাতাইশ মণ দানাদার চিনি প্রস্তুত করিলে প্রায় ৫ মণ চিটা অবশিষ্ট থাকে। চিটার দরও খুব সস্তা নহে, তবুও সুরা উৎপাদনের জন্য চিটার চাহিদার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, ভারতে চিটার সদ্ব্যবহার অতি সামান্য পরিমাণেই হইতেছে। অবশ্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর গুড়ও এতদ্দেশে খাদ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অপরিষ্কৃত কাল চিটা সুরা প্রস্তুতে নিয়োগই অধিকতর লাভকর।

মহুয়া-সুরা

সুরা উৎপাদনের কাঁচা মালের প্রাধান্য হিসাবে ইক্ষুর পরে মহুয়ার উল্লেখ করিতে পারা যায়। মহুয়া ক্ষেত্রজ ফসল নহে; ইহাকে বরং আরণ্য ফসল বলিতে পারা যায়; মহুয়া অনেক স্থলে রোপণ করাও হয়। দুই জাতীয় মহুয়া সুরা উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। তন্মধ্যে একটি Bassia latifolia—ইহা শিবালিক পর্ব্বতমালা, রোহিলখণ্ড, উত্তর-অযোধ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্য-ভারত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-কানাড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; অন্যটির স্থানীয় নাম, ইলিপী—Bassia longifolia; দক্ষিণ-ভারতে ইহা মহুয়ার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং বন্য ব্যতীত ইহার কর্ষিত গাছও যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গরীব লোকের পক্ষে মহুয়া মূল্যবান্ বৃক্ষ; ইহা হইতে একাধারে খাদ্য, জ্বালানি এবং নানাবিধ কার্য্যোপযোগী কাষ্ঠ পাওয়া যায়। সেই জন্য মহুয়া গাছ কেহ নষ্ট করে না, বরং সাধ্যমত ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। মহুয়া হইতে সাধারণতঃ যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহা দুর্গন্ধযুক্ত এবং তাহা হইতে অনেকের হয় ত ধারণা হইতে পারে যে, উত্তম সুরা উৎপাদনের পক্ষে মহুয়া অনুপযোগী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরিস্রুত উগ্র মহুয়া-সুরা কঠিন পটাসসহ উত্তাপে রাখিয়া পরে আবার চোলাই করিলে যে সুরা পাওয়া যায়, তাহা বর্ণ ও গন্ধহীন। বস্তুতঃ কিছু দিবস পূর্ব্বে এইরূপ কোন প্রথায় বিশুদ্ধ মহুয়া-সুরা প্রস্তুতের এক ব্যক্তি পেটেণ্টও লইয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে ঠিক বলিতে পারা যায় না, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত পেটেণ্ট প্রথায় সুরা উৎপাদন অনুমোদন করেন নাই। সর্ব্বদিক্ হইতে বিবেচনা করিতে গেলে মহুয়ার মত সুরা উৎপাদনোপযোগী গাছ কিন্তু বিরল। ইহার ফুলে শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ শর্করা আছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, গাছ যত উচ্চ প্রদেশে জন্মায়, তাহাতে শর্করার অংশ তত অধিক থাকে এবং ঠিক ঝরিয়া পড়ার পূর্ব্বেই ফুলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়। এক একটি গাছ বৎসরে আড়াই হইতে সাড়ে তিন মণ পর্য্যন্ত পুষ্প প্রসব করে এবং সাড়ে সাতাইশ মণ শুষ্ক ফুল হইতে অন্ততঃ সওয়া এগার মণ শতকরা ৯৫ ভাগ সুরাসারযুক্ত আসব প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মহুয়া-ফুল হইতে সুরা প্রস্তুতের আরও একটি সুবিধা এই যে, ইহার ফুলেই এক প্রকার স্বাভাবিক অভিষব (east) আছে। সুরোৎসেচন ক্রিয়ার জন্য আর স্বতন্ত্র অভিষব যোগ করা আবশ্যক হয় না। ফলতঃ ইক্ষু, যব, আলু ইত্যাদি হইতে হন্দর (১ মণ ১৪ সের) প্রতি মাত্র সাড়ে সাতাইশ সের স্পিরিট পাওয়া যায়; তাহার স্থলে মহুয়া-ফুল হইতে সাড়ে সাঁইত্রিশ সের পর্য্যন্ত স্পিরিট পাওয়া গিয়াছে, এরূপ পরীক্ষারও বিবরণ রহিয়াছে। মহুয়া খাদ্য উদ্দেশ্যে অবশ্য সাধারণ কর্ত্তৃক খুব মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহাও সত্য যে, যে সমুদয় স্থলে মহুয়া বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তথায় গরীব লোক মহুয়া ফুল দৈনন্দিন আহার্য্যরূপে ব্যবহার করে। তথাপি অনেক পরিমাণ মহুয়া-ফুল যে নষ্ট হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া বৃক্ষ এত প্রচুর যে, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অভাব মোচন করিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত ফুল থাকে। বৃহৎ সুরার কারখানায় সেগুলির অনায়াসে সদ্ব্যবহার হইতে পারে। সুখের বিষয় যে, কিছু দিবসাবধি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে মহুয়া হইতে ইন্ধন-সুরা প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে এবং তৎসংক্রান্ত পরীক্ষাদিও সফলতা লাভ করিয়াছে। আশা করা যায় যে, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য এতদ্দেশে মোটর ও অন্য প্রকার কল চালাইবার উপযুক্ত সুরা উৎপাদনে অনেকে অগ্রণী হইবেন।

গোলপাতা

মহুয়ার ন্যায় গোলপাতার প্রসার বহু বিস্তৃত নহে। ভারতে প্রধানতঃ ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী আর্দ্র জমীতে—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম ও আন্দামান দ্বীপে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা সমুদ্রের কূল অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা হইতে সামান্যই আয় হয়। গৃহাদি আচ্ছাদনের জন্য ইহার পাতার এবং সুন্দরী কাঠ অথবা জাল ভাসাইবার জন্য পত্র-বৃন্তের অল্পাধিক ব্যবহার আছে; পাতা হইতে এক প্রকার মোটা মাদুরও প্রস্তুত হয়, কিন্তু রসের কোনরূপ ব্যবহারই হয় না। ইহার শক্ত, স্থূল, পীতাভ, হরিদ্বর্ণ পত্রগুচ্ছযুক্ত, ভূমিশায়ী কাণ্ড দেখিয়া লোক সহজে ধারণা করিতে পারে না যে, ইহাও তাল-নারিকেল জাতীয় উদ্ভিদ; কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাহাই এবং ইহা হইতেও তাল-খেজুরের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে রস পাওয়া যায়। রসের জন্য গোলপাতার গাছ কচিৎ দাগ দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা গোলপাতার ব্যবহারিক মূল্য না বুঝিলেও অন্য দেশের লোক এ সম্বন্ধে খুবই জাগ্রত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে গোলপাতার সুরা কি কাল হইতে প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা ফিলিপাইনের একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হইয়াছে। এক্ষণে ফিলিপাইনে বৎসরে অন্যূন ৪ লক্ষ মণ গোলপাতা-সুরা প্রস্তুত হইতেছে এবং প্রতি বৎসর উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুরোৎপাদনকল্পে গোলপাতা যে কিরূপ উপযোগী এবং ইহার ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ যে

কত উজ্জ্বল, তাহা ফিলিপাইন দ্বীপের গোলপাতা-সুরা-শিল্প-সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

এক একটি গোলপাতা-গাছ হইতে বৎসরে তিন মাস রস পাওয়া যায়; রসের পরিমাণ প্রায় ১ মণ এবং উহাতে শতকরা ১৫ ভাগ শর্করা আছে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১ বিঘা-পরিমিত জমীতে উৎপন্ন গোলপাতা-গাছ হইতে ১২৷৹ মণ শর্করা কিম্বা তাহার স্থলে প্রায় ৮ মণ শতকরা ৯৫ ভাগ সুরাসারযুক্ত আসব পাওয়া যায়। ৩ শত মণ সুরা উৎপাদনকারী একটি কারখানা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিঘা পরিসর একটি গোলপাতা-ক্ষেত্র লইয়া চলিতে পারে। দূর হইতে কারখানায় রস আসিতে প্রথমতঃ কিছু রস টকিয়া নষ্ট হইয়া যাইত; এখন কিন্তু সালফিউরাস অম্ল (Sulphurous acid) সাহায্যে রস অবিকৃত অবস্থায় কারখানায় আসিয়া পৌঁছে। অতি সামান্য রসই অপচয় হইয়া থাকে। গোলপাতা সম্বন্ধে এইমাত্র অসুবিধা যে, ইহার ঘন-সম্বদ্ধ জঙ্গল প্রায়ই পাওয়া যায় না; গাছগুলি বিচ্ছিন্নভাবে জন্মাইয়া থাকে। অন্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহে চারাগাছ রোপণ করিয়া এই অসুবিধাও অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছে। ফলতঃ গোলপাতা আপাততঃ যে সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তৎসমুদয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সুন্দরবনের অসংখ্য গোলপাতা-গাছ লইয়া একটি বৃহৎ সুরাশিল্পের প্রতিষ্ঠান হওয়া খুবই সম্ভবপর।

সুন্দরবনের আর একটি গাছেরও সুরোৎপাদনোপযোগিতা সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা গেঙ্গোয়া; গোলপাতার ন্যায় ইহাও সমুদ্র-উপকূলে সুলভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ফলিত রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার হেমেন্দ্রকুমার সেন গেঙ্গোয়া গাছের গুঁড়া হইতে সুরা-প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করিতেছেন। ব্যবসায়িক হিসাবে পরীক্ষা এখনও সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও কালক্রমে তাহা হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আহার্য্য-উদ্ভিদ

আহার্য্য-উদ্ভিদ হইতে সুরা উৎপাদন অনেকে অসমীচীন মনে করেন। যেখানে বাস্তবিকই সুরা প্রস্তুতের জন্য আহার্য্য দ্রব্যের অনাটন পড়ে, সেখানে অবশ্য তাহা ঠিক। কিন্তু খাদ্য শস্যের উৎপাদন এত অধিক হইতে পারে যে, উদ্বৃত্তাংশ সুরা প্রস্তুতে নিয়োগ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। চাউল তাহার উদাহরণ। বহু পুরাকাল হইতে বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মে চাউল হইতে সুরা উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে চাউলের কখন অসদ্ভাব হয় নাই। আমাদের দেশে চাউলের ন্যায় পাশ্চাত্য দেশে গোল আলুও একটি প্রধান আহার্য্য। আজকাল গোল আলু হইতেও প্রভূত পরিমাণে সুরা উৎপাদিত হইতেছে। রাঙ্গা আলুও খুব পুষ্টিকর খাদ্য। মার্কিণে ইহা যেরূপ খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, সুরা উৎপাদনেও সেইরূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আমেরিকায় বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণ রাঙ্গা আলু জন্মে; তাহা হইতে অন্যূন সওয়া এক মণ শতকরা ৯৫ ভাগ সুরাসারযুক্ত আসব পাওয়া যায়। সিমুল আলুর (Cassava) চাষ এতদ্দেশে অনেক স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সামান্য চাষে ইহার যথেষ্ট ফল হয় এবং ইহা অনাবৃষ্টিসহ ফসল। ইহা হইতেও রাঙ্গা আলুর ন্যায় সুরা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুর্গা ও মনসাসিজ

আনারসের ন্যায় আকৃতি অথচ স্থূলতর পত্রবিশিষ্ট মুর্গা গাছ অনেকে সম্ভবতঃ রেল লাইনের ধারে, বিশেষতঃ কঙ্করময় অনুর্ব্বর স্থানে দেখিয়া থাকিবেন। ইহার ৭।৮ হাত উচ্চ পুষ্পদণ্ড স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা হইতে ইহা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। এখন মুর্গা গাছ সমতল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধুর ও অনুর্ব্বর জমীতেও ইহা জন্মিয়া থাকে। শিশাল শণ (Sisal hemp) এই জাতীয় গাছ; ইহার তন্তু হইতে দড়ি-দড়া, মাদুর, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুর্গার আদিম বাসস্থান মেক্সিকো দেশে। মুর্গা হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়; ভারতেও যে তাহা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যে সময়ে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, সে সময়ে গাছে প্রচুর পরিমাণে রস জমিয়া থাকে। তাল-খেজুরের রসের ন্যায় এই রস হইতেও একপ্রকার তাড়ি হয়। মেক্সিকোবাসিগণের উহা জাতীয় পানীয়। রস সংগ্রহের জন্য পুষ্পদণ্ড ৩।৪ ফুট রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগ কাটিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে দণ্ডের মধ্যস্থলের শাঁস চাঁচিয়া বাহির করিয়া লইলে একটি গর্ত্ত হইয়া থাকে। উক্ত গর্ত্তে প্রত্যহ রস জমে; লবণ-সাহায্যেও রস বাহির করিয়া লইয়া একটি বড় পাত্রে জমা করা হয়। প্রত্যহ রসের পরিমাণ দেড় সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। পুষ্পদণ্ডের ভিতর হইতে চাঁচিয়া যে পিণ্ড (pulp) বাহির হয়, তাহা অতঃপর রসের সহিত মিশ্রিত করিলে কিছু সময় পরে রস গাঁজিয়া উঠে। উহাই তাড়ি। উহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই তত ভাল নহে। কিন্তু উহা চোলাই করিয়া যে হুইস্কি শ্রেণীর সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাকে অনায়াসে কল চালাইবার স্পিরিটে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। পশ্চিম-বঙ্গে অনেক স্থলে জলাভাবে বহু পরিমাণ জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে সকল স্থলে মুর্গা উৎপাদন দ্বারা তন্তু ও সুরা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

মুর্গার ন্যায় মনসাসিজও আমেরিকা হইতে আমদানী; কিন্তু ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন জাতীয় সিজের বহু বিস্তৃত জঙ্গল আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাও অনুর্ব্বর উচ্চ জমীর গাছ। ইহার ফল হইতে সুরা প্রস্তুত সম্বন্ধে কতিপয় পরীক্ষা হইয়াছে; তৎসমুদয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিঘা প্রতি ৮০ মণ ফল হইলে তাহা হইতে সাড়ে চারি মণ সুরা পাওয়া যাইতে পারে। একটু সারযুক্ত জমী ও সামান্য জল হইলেই এইরূপ ফলন সহজেই হইতে পারে।

এতদ্দেশ কল-কব্জার ব্যবহারে ততদূর অগ্রসর না হইলেও বর্ত্তমান যুগে ঐ সমুদয়ের ত্বরিত বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; এক মোটর-গাড়ীর সংখ্যা প্রতি বৎসর কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিলেই হাওয়া কোন্ দিক চলিয়াছে, সহজে বুঝিতে পারা যায়। নানা প্রকার কারখানা-শিল্পের উন্নতির সহিত তরল ইন্ধন,

ব্যবহারোপযোগী কল প্রভৃতিও বহু সংখ্যায় আবশ্যক। অন্য দিকে গন্ধদ্রব্য, বার্ণিস, ঔষধ প্রস্তুত ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্প সস্তা সুরার উপর নির্ভর করে। শিল্পে প্রয়োগের উপযুক্ত সুরা (industrial alcohol) উৎপাদনকল্পে এখনও তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। ইহার জন্য কতিপয় শিল্প যে নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং সমশ্রেণীর বিদেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইন্ধনার্থ অথবা শিল্পে ব্যবহৃত সুরা উৎপাদন যে সামান্য ব্যাপার নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে দ্রব্যের কাটতি দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা দেশমধ্যে উৎপাদন করা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। তরল ইন্ধনের আমদানী যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতের প্রচুর অর্থ বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের হস্তগত হইবে। অথচ দেশে উৎকৃষ্ট সুরা উৎপাদনোপযোগী কারখানা স্থাপিত হইলে শুধুই বিলাতী আমদানী বন্ধ হইবে, তাহা নহে, অনেক লোকের অন্নসংস্থানেরও একটা ব্যবস্থা হইবে। আম'দের দেশের ধনিগণের এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

আয় ফিরে সে কাল !

১

আয় ফিরে সে কাল !
ভাবছি তোরে একা বসি' এ বাদল নিশিতে।
দেখছি তোরে সুমধুর ! মনের আরসিতে ॥
হঠাৎ কবে উল্কা-সম এসে দেখা দিয়ে—
কোন্ অজানা দেশে পুন লুকালি তুই গিয়ে ॥
ঝড়ের মত মেতে এসে মাতিয়ে প্রাণ মোর,
কোথায় গেলি রেখে শুধু স্মৃতির রেখা তোর ?
ওরে মধুর, ওরে মোহন, ওরে নবীন সাথী।
খুঁজছি তোরে সারা জগৎ করি পাতি পাতি ॥
একবার এসে দাঁড়া দেখি আমার আঁধার ঘরে,
আগের মত বুক্ ফুলিয়ে তোর সে প্রদীপ ধরে',
জ্বাল্ রে আমার চারিদিকে আবার আগুন জ্বাল্,—
আয় ফিরে সে কাল !

২

আয় ফিরে সে কাল !
আয় রে চলি' উড়িয়ে ধূলি কাঁপিয়ে বসুন্ধরা।
তেম্নি করে' রঙ্গ-ভরে চোখে তড়িৎ ভরা ॥
নবোৎসাহ—নব আশায় উজলি দশ দিক্।
নবীন সাজে সেজে আবার আয় রে প্রাণাধিক !
এখনো ত হয়নি' সারা,—বাকি অনেক কাষ।
কর্‌বো বলে' করিনি' যা' ধর্‌বো সে সব আজ ॥
বেলা ক্রমে আসছে পড়ে'—আসছে আঁধার নামি।
মরা গাঙের তির্‌তিরে স্রোত যায় বুঝি রে থামি ॥
এক নিমিষের তরে যদি এখনো দিস্ দেখা।
পড়তে যদি এখনো দিস্ সেই জ্বলন্ত লেখা,—
চোখে মুখে কপালে তোর দেখেছি যা আগে,—
দেখবি তখন,—উঠবো ঝেড়ে নবীন অনুরাগে ॥
আয় রে আমার হৃৎকালিন্দী-আনন্দ-দুলাল !
আয় ফিরে সে কাল !

৩

আয় ফিরে সে কাল !
কত হেলায়—উপেক্ষায়—অনাদরের ধূলি,
অকাতরে দিয়েছি তোর মাথায় কত তুলি ॥
হাসিমুখে সকলি তুই নিতিস্ মাথা পেতে।
তাড়িয়ে দিলেও ফিরে ফিরে চাইতে যেতে যেতে ॥
তখন তোরে চিনি নি রে,—বুঝিনি' তুই কে,
বুঝিনি' তুই কেন ঘুরিস্ আমার চারিদিকে।
ওরে আমার কিশোর সখা—দুরন্ত পাগল !
কোথায় ফিরে পাবো তোরে,—কোথায় গেলে বল্ ?
নয়ন ক্রমে দীপ্তিহীন জীবন ক্রমে ক্ষীণ,
যাদুঘরের যাদু ধীরে হ'চ্ছে ক্রমে লীন।
এখনো তুই যদি ফিরে দিস্ রে এসে সাড়া।
মরণশয্যা ছাড়ি' পুন উঠবো দিয়ে ঝাড়া ॥
অন্ধপুরী উজল পুন কর্‌বো অবহেলে।
সাত রাজত্ব ছাড়তে পারি মাণিক তোরে পেলে ॥
আয় রে নব-উদ্দীপনার জেলে সে মশাল।
আয় ফিরে সে কাল !

৪

আয় ফিরে সে কাল !
জীর্ণ-শীর্ণ অন্ধ-জরা আতুর পরাণীর—
অসাড়দেহে নবীন প্রাণের সাড়া দে' অধীর !
ওরে চপল ! তোরি মতন্ চপল চপলায়—
ক্ষেপিয়ে দে রে ক্ষেপিয়ে দে রে—শ্মশান বাংলায় ॥
পুরাতনের পূতিগন্ধি পচা ঘরের কোণে
লুকিয়ে যারা,—আন্ রে ক্ষিপ্ত ! আন্ রে তাদের টেনে !
তোর তড়িতের সঞ্জীবনী লতার পরশনে
জাগবে তারা, উঠবে তারা, ছুটবে সবল মনে ॥
ভাটার টানে কালসাগরে যাচ্ছে যারা ধেয়ে।
ফির্‌বে তারা তোর পরশন-জোয়ার পুন পেয়ে ॥
ওরে নবীন, পরশমণি বারেক স্পর্শ ক'রে—
দে রে দুঃখী বঙ্গবাসি-হৃদয় সোনায় ভ'রে ॥
সজীব ক'রে তোল রে লখিন্দরের এ কঙ্কাল।
আয় ফিরে সে কাল ॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
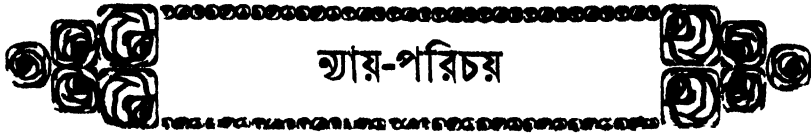
গৌতমমতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, সুখ যেমন পুরুষার্থ, তদ্রূপ দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষার্থ। পুরুষ বা জীব যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকে বলে পুরুষার্থ। তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিকে জীব স্বতঃই প্রার্থনা করে, এ জন্য ঐ উভয়কে বলা হইয়াছে, 'স্বতঃ পুরুষার্থ।' কিন্তু যদি সুখসম্বন্ধশূন্য কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে আদ্যন্তে দুঃখানুবিদ্ধ সুখও কেন পুরুষার্থ হইয়াছে? যে সুখের পূর্ব্বে ও পরে নানা দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী, তাহাও ত পুরুষার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে যাহা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহাও সুখ-সম্বন্ধশূন্য হইলেও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু উহাই পর-পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার্য্য। যদি বল, ঐরূপ মুক্তি হইলে তখন কোন সুখ-ভোগ হইবে না, এইরূপ জ্ঞান উক্তরূপ মুক্তিবিষয়ে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায়, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও বলিতে পার না। কারণ, অনেক স্থলে কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই যে সুখলিপ্সা বশতঃই সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে সর্ব্বত্রই সুখকেই স্বতঃ পুরুষার্থ বলা যায়। দুঃখনিবৃত্তিও যে স্বতঃ পুরুষার্থ, ইহা কেন স্বীকৃত হইয়াছে? পরন্তু যাঁহারা প্রকৃত মোক্ষাধিকারী, তাঁহারা সুখমাত্রকেই দুঃখানুবিদ্ধ ও অনিত্য বুঝিয়া কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রবিহিত উপায়ের অনুষ্ঠান করেন। অতএব সুখমাত্রলিপ্সু যে সমস্ত অবি-বেকী, বহুতর দুঃখানুবিদ্ধ সুখের জন্যও "শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাস্যতি" (১) অর্থাৎ তোমার জন্য আমার মস্তক যায় যাইবে, জনকাত্মজা সীতার জন্য স্বয়ং দশাননও তাঁহার দশবদন ছিন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ কুবুদ্ধিপ্রভাবে পর-দারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং "বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন—" এইরূপ শ্লোক (১) পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারীই নহে। কিন্তু যাহারা বিবেকী, তাঁহারা বুঝেন যে, এই সংসারকান্তারে দুঃখ-দুর্দ্দিনই অসংখ্য, তাহাতে সুখ-খদ্যোত অতি অল্প, অতএব এই সাংসারিক সুখ কুপিত সর্পের ফণামণ্ডলের ছায়ার তুল্য। যাঁহারা এইরূপ বুঝিয়া একেবারে সুখকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মুক্তিতে অধিকারী।(২)

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার সুপ্রাচীন ভগবান্ বাৎস্যায়ন বিচারপূর্ব্বক পরমত-খণ্ডন দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত আত্মার নিত্য সুখের অভিব্যক্তি হয়, ইহা বলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তমত প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, মুক্তিকালে আত্মার নিত্য সুখের অনুভব স্বীকার করিলে সেই অনুভবও কি সেই সুখের ন্যায় নিত্য! অথবা অনিত্য? ইহা বলা আবশ্যক। কিন্তু উহা নিত্যও বলা যাইবে না— অনিত্যও বলা যাইবে না। কারণ, ঐ নিত্য সুখের অনু-ভবকেও নিত্য বলিলে মুক্ত পুরুষের ন্যায় সংসারী পুরুষেও

(১) গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উদ্ধৃত "শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাস্যতি", এই বাক্য কোন প্রাচীন শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ। ঐ শ্লোকের দ্বারা পরদারপ্রবৃত্ত কামার্ত্ত পুরুষের প্রিয়তমার প্রতি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

"যুষ্মংকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি! শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাস্যতি।
লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি।"

(১) এই শ্লোকটিও প্রসিদ্ধ আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করায় উহাও প্রাচীন শ্লোক বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন যে, বরং আমি বৃন্দাবনে শৃগাল হইব; কিন্তু আমি বৈশেষিক দর্শনোক্ত মুক্তি কখনও প্রার্থনা করি না। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঐ স্থলে "পর-দারাদিষু প্রবর্ত্তমানা বরং বৃন্দাবনে রম্যে ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ—" এইরূপ বলিয়া যেন তৎকালীন কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি কটাক্ষ সূচনা করিয়াছেন।

(২) তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবো বহুতরদুঃখানু-বিদ্ধমপি সুখমুদ্দিশ্য "শিরো মদীয়ং যদি যাস্যতী"তি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা "বরং বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ। যে চ বিবেকিনোঽস্মিন্ সংসার-কান্তারে কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি, কিয়তী বা সুখখদ্যোতিকেতি কুপিতফণিফণামণ্ডলচ্ছায়া-প্রতিম-মিদমিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তেঽত্রাধিকারিণঃ। —ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

উহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকায় ঐ অংশে মুক্ত ও সংসারীর বিশেষ থাকে না। পরন্তু উহা স্বীকার করিলে সংসারী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখভোগকালে ঐ নিত্যসুখের অনুভবও আছে, ইহা তাহারা কেন বুঝে না? সকল জীবই সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগকালেও নিত্য-সুখের অনুভব-বিশিষ্ট হইলে সেই নিত্য-সুখের অনুভবকেও তখন বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহা কেহই বুঝে না। আর যদি ঐ নিত্য-সুখের অনুভবকে অনিত্য বলা যায়, তাহা হইলে উহার উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু মুক্তিকালে মুক্ত পুরুষের ধর্ম্ম এবং শরীরাদি না থাকায় কারণের অভাবে নিত্য-সুখের অনুভবও জন্মিতে পারে না। যোগ-সমাধিজাত ধর্ম্মবিশেষকে উহার উৎপাদক বলিলে ঐ ধর্ম্মের যখন বিনাশ হইবে,—তখন নিমিত্তের অভাবে নিত্য-সুখের অনুভবেরও নিবৃত্তি হইবে। সুতরাং তখন আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইবে না। যোগ-সমাধিজাত ধর্ম্মের কখনও ক্ষয় হয় না, উহা চিরস্থায়ী, সুতরাং উহার ফল নিত্য-সুখানুভবও চির-স্থায়ী, কখনও উহার নিবৃত্তি হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ধর্ম্ম কখনও অবিনাশী হইতে পারে না। ধর্ম্মের ফল-সমাপ্তি হইলে, তখন ধর্ম্মেরও ক্ষয় হয়। কারণ, উৎপন্নভাব পদার্থমাত্রই বিনাশী। সুতরাং নিত্য-সুখের অনুভব উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিলে ঐ অনুভবও অবশ্য কখনও বিনষ্ট হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উহাকে মুক্তি বলা যায় না। কারণ, যাহা কোনকালে বিনষ্ট হইবে, তাহা মুক্তি হইতে পারে না। ফল কথা, নিত্য-সুখের অনুভব যখন নিত্যও বলা যায় না, অনিত্যও বলা যায় না, তখন উহা কোন প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব উক্ত বিষয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য প্রমাণরূপে বলা হয়, তাহাতে "সুখ" শব্দ ও "আনন্দ" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। আত্যন্তিক দুঃখাভাবই উহার লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে। দুঃখাভাব অর্থেও লোকে "সুখ" শব্দ ও "আনন্দ" শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়। বাৎস্যায়ন সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের যদি নিত্য-সুখভোগের কামনা থাকে, তাহা হইলে তখন তাঁহাকে মুক্ত বলা যায় না। কারণ, কামনা বন্ধন বলিয়াই সর্ব্বসিদ্ধ। কামনারূপ বন্ধন থাকিলে তাহাকে কেহ মুক্ত বলেন না। সুতরাং তখন তাহার কোন কামনাই থাকে না, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তখন তাঁহার নিত্য সুখভোগ না হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? তাঁহার যখন আর কখনও পুনর্জ্জন্ম হইবে না, তখন তাঁহার নিত্য-সুখভোগ হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই তাঁহার মুক্তিলাভে কোন সংশয় হইতে পারে না।

কিন্তু শৈব-সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা যে বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই বাৎস্যায়নের খণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত মতকে গৌতমের মত বলিয়াই সমর্থন করিতেন, ইহাও বাৎস্যায়নের উক্তরূপ বিচা-রের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ বাৎস্যায়নের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য "ন্যায়সার" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষের যে নিত্যসুখের উপভোগ হয়, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। (১)। সুতরাং কোনরূপেই উহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে যে, "সুখ" শব্দ ও "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার মুখ্য অর্থে কোন বাধক না থাকায় লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণের কোন হেতুই নাই। মুক্তপুরুষের যে নিত্যসুখের অনুভব, তাহাও নিত্য। কিন্তু যেমন আমাদিগের চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং দৃশ্যঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিলেও ঐ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে সেখানে ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ জন্মে না, কিন্তু ঐ ব্যবধান অপসৃত হইলে তখনই ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ জন্মে, তদ্রূপ আত্মাতে নিত্যসুখ এবং উহার নিত্য অনুভব সতত বিদ্যমান থাকিলেও সংসারকালে পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐ উভয়ের বিষয়-বিষয়িভাব-সম্বন্ধ জন্মে না, কিন্তু মুক্তিকালে সমস্ত প্রতিবন্ধক সর্ব্বথা বিনষ্ট হওয়ায় তখন ঐ উভয়ের সম্বন্ধ জন্মে এবং ঐ সম্বন্ধ উৎপন্ন ভাব পদার্থ হইলেও কখনও উহার বিনাশ হয় না। কারণ, উহার বিনাশের কোন কারণ নাই। যেমন ধ্বংসপদার্থ উৎপন্ন হইলেও উহার ধ্বংসের কোন কারণ না থাকাতেই কখনই ঐ ধ্বংসের ধ্বংস জন্মে না, তদ্রূপ, পূর্ব্বোক্ত নিত্যসুখও উহার নিত্য অনুভবের যে সম্বন্ধ, উহা উৎপন্ন হইলেও উহার ধ্বংসের

১। কুতো মুক্তস্য সুখোপভোগ ইতি চেৎ? আগমাৎ, উক্তং হি—

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
তঞ্চ মোক্ষং বিজানীয়াদ্ দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।

তথা—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে"। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।—"ন্যায়সার" (আগম-পরিচ্ছেদ)।

কোন কারণ না থাকায় কখনও উহার ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং ঐ নিত্যসুখ নিত্য-সংবেদ্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। ঐ নিত্য-সংবেদ্য নিত্যসুখ-বিশিষ্ট যে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি (১)। ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রথমে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, এই মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরে তাঁহার উক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। টীকাকার জয়সিংহ সূরি সেখানে ভাসর্ব্বজ্ঞের পূর্ব্বোক্ত মতকে কণাদ সম্প্রদায়ের মত বলিয়া শেষোক্ত মতকে নৈয়ায়িকনায়ক-দিগের প্রকৃষ্ট মত বলিয়াছেন।

ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র প্রধান টীকাকার ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ যে পরিপূর্ণ সূক্ষ্মবিচার দ্বারা বিশেষরূপে উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ, তাঁহার "ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে গৌতমের মতে যে মুক্তিকালে নিত্যসুখের অনুভূতি থাকে, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভূষণ মুক্তিকালে নিত্যসুখের অনুভব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন (২)। অর্থাৎ গৌতমের মতে মুক্তিকালে যে নিত্যসুখের অনুভূতি থাকে, ইহা কেবল আমারই কল্পনা নহে। শৈবসম্প্রদায়ের মহানৈয়ায়িক ভূষণ ও বিশেষরূপে উক্তমত সমর্থন করিয়াছেন। বেঙ্কটনাথ ভাসর্ব্বজ্ঞের মত না বলিয়া ভূষণের মতের উল্লেখ করায় ভূষণ যে স্পষ্টভাবে গৌতমের মত বলিয়াও উক্ত মতের বিশেষরূপে সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভূষণের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

পরন্তু "সংক্ষেপ—শঙ্করজয়" গ্রন্থে মাধবাচার্য্য দুইটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক গর্ব্বের সহিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে (৩) যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তাহা হইলে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গৌতমসম্মত মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল, নচেৎ সর্ব্বজ্ঞতা-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। তদুত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত বিনাশ হইলে আকাশের ন্যায় স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু গৌতমের মতে ঐরূপ অবস্থায় আনন্দানুভূতিও থাকে। মাধবাচার্য্যের এই কথা অমূলক হইতে পারে না। "সর্ব্ব-দর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ" গ্রন্থেও মুক্তি বিষয়ে গৌতম ও কণাদের ঐরূপ মতভেদ বর্ণিত হইয়াছে (১)। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যেরও বহু পূর্ব্ব হইতেই যে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ কণাদ-সম্মত মুক্তি হইতে গৌতম-সম্মত মুক্তির উক্তরূপ বিশেষ সমর্থন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে মুক্তিবিষয়ে উক্তরূপ গৌতম-মতই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের কোন নৈয়ায়িকই শঙ্করাচার্য্যকে উক্তরূপ প্রশ্ন করায় সর্ব্বজ্ঞ শঙ্করা-চার্য্য তাঁহাদিগের মতানুসারেই উক্তরূপ উত্তর দিয়া তাঁহার নিকটে নিজের সর্ব্বজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সকল সম্প্রদায়ের মত না জানিলেও তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত মতের প্রতিবাদ করায় তাঁহার সময়েও উক্তরূপ মতের প্রতিষ্ঠা ছিল, এ বিষয়েও সংশয় নাই। কিন্তু ভাসর্ব্বজ্ঞের উদ্ধৃত "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে" এবং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের জয়সিংহ সূরির ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, ভাসর্ব্বজ্ঞের মতে পরমাত্মা ব্রহ্মের যে আনন্দ স্বরূপ, তাহাও মুক্তিকালে অনুভূত হয়।

পরন্তু বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এবং বৈশেষিকা-চার্য্যগণ মুক্তপুরুষের নিত্যসুখের অনুভূতি অস্বীকার করিলেও উদয়নাচার্য্যের "আত্ম-তত্ত্ব-বিবেকে"র টীকায় নবদ্বীপের নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই মতের সমর্থনপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়া

(১) তস্মাৎ কৃতকত্বেঽপি সুখসংবেদনসম্বন্ধস্য বিনাশকারণা-ভাবান্নিত্যত্বং স্থিতম্। তৎসিদ্ধমেতন্নিত্যসংবেদ্যম্। অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি। —ন্যায়সারের শেষ।

(২) অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখ-সংবেদন-সিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা।—"ন্যায়পরিশুদ্ধি" কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরীজ ১৭শ পৃষ্ঠা।

(৩) "তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্ব্বঃ কণাদ পক্ষাচ্চরণাক্ষ পক্ষে। মুক্তের্ব্বিশেষঃ বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ,
নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্বে"।

অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ।
—সংক্ষেপ শঙ্করজয় ১৬ অঃ ৬৮।৬৯

(১) নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্।
বৈশেষিকোক্ত-মোক্ষাত্তু সুখলেশবিবর্জ্জিতাৎ।
ইত্যাদি সর্ব্বদর্শন-সিদ্ধান্তসংগ্রহ। ষষ্ঠ প্রকরণ নৈয়ায়িকপক্ষ।

বলাই কহিল—উপহার ?

চন্দর কহিল—এই কুন্তলীনরা যেমন গল্পের বই দেয়। তা, গল্পের বইয়ের উপর কোনো উপহার ছাড়া যায় যদি··· ?

বলাই কহিল,—ক্ষেপেছো! যারা বই পড়ে, তারা কখনো পয়সা খরচ ক'রে তেল কিনবে ? স্বপ্নেও ভেবো না।

চন্দর কহিল,—বই আমি দেবো না। তার বদলে ধরো···খদ্দর কাপড়, কি গান্ধি-মার্কা সিগারেট, নয় দেশবন্ধু-মার্কা এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি···স্বদেশীয়ানার এই হুজুগে বিকোয় কেমন, দেখবো। তা, আমার একটি পার্টনার আছে···তার বাড়ী থেকেই আসছিলুম···মানে, সে কিছু টাকা দিতে চায়···তা, তোমায় কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবো··· ? তোমার বাসা কোথায় ?

বলাই কহিল—একটু আগে···ঐ মোহনবাগানে।

চন্দর কহিল—তা, তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তোমায় বলি···একটা কিছু উপহার বাতলাতে পারো—স্বদেশী কর্পোরেশনে কাজ করো···স্বদেশী কাউন্সিলার কাকেও ব'লে কয়ে যদি ঐ বড় বড় স্বরাজিষ্টদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে দিতে পারো···

বলাই কহিল—ক্ষেপেচো! আমরা চুণোপুঁটি—সামান্য চাকরি করি···ও সব অগাধ জলের রুই-কাৎলার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, বলো···?

চন্দর কহিল—তোমার বাড়ীটা দেখে আসি, একবার··· এই কাছেই তো প্রায় আসি···কতকাল পরে দেখা হলো। কি বলো···?

বলাই কহিল—এসো···

দু'জনে কথা কহিতে কহিতে মোহনবাগানের একটা গলির মধ্যে আসিল। গলির মধ্যে একটা বাড়ী দেখাইয়া বলাই কহিল—এই আমার বাড়ী।

বাড়ীর দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বলাই কড়া নাড়িতে একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মেয়েটি ডাগর—বয়স তেরো পার হইয়াছে,—সুন্দরী। তার হাতে ছিল হারিকেন লণ্ঠন। দ্বার খুলিয়া মেয়েটি কহিল—তোমার এত দেরী হলো কেন, বাবা ?

বাবা ওরফে বলাই চক্রবর্ত্তী কহিল—পথে জল দাঁড়িয়েছিল, মা—ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছলো···তাই। তা, তোমার ঠাকুরমার এই ছানাটুকু নিয়ে যাও···লণ্ঠনটা রাখো···আমরা বাইরের ঘরে ব'সে একটু কথাবার্ত্তা কবো।

দ্বার হইতে উঠিয়া একটু সরু পথ—তারি ডানদিকে বাহিরের ঘর। মেয়েটি ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল, এবং তক্তাপোষের উপর লণ্ঠন রাখিয়া বাপের হাত হইতে ছানার ঠোঙা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বলাই ডাকিল—এসো চন্দর, একটু ব'সে যাও···এক পেয়ালা চা···

চন্দর হাসিল। হাসিয়া কহিল—তা, এই বর্ষায় মন্দ হবে না···

চন্দর বাহিরের ঘরের তক্তাপোষে বসিল। বলাই ডাকিল—মনটু-মা···

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—যাই বাবা।

পরক্ষণে সেই মেয়েটি আসিয়া দাঁড়াইল। বলাই কহিল—হাত ধোবার জল একটু দিয়ে যাও মা···আর দু' পেয়ালা চায়ের জোগাড় করতে হবে।

মনটু-মা কহিল—তুমি জামাটামা ছাড়বে না ? হাত-পা ধোবে না ?

বলাই কহিল—এইখানেই ছাড়ি। তুমি মা, চায়ের জোগাড় করো শীগ্‌গির···ইনি আবার চ'লে যাবেন কি না···

—দেখচি। বলিয়া মনু চলিয়া গেল।

চন্দর কহিল—ইটি বড় মেয়ে··· ?

বলাই কহিল—হ্যাঁ ভাই।

চন্দর কহিল—খাসা মেয়ে···যেন লক্ষ্মী! বাঃ! তা, এ মেয়ের বিয়ের জন্যেও ভাবনা!

বলাই কহিল—মেয়ে খাসা হলেই তো দায় চোকে না,—তার পিছনে একটা ব্যাঙ্ক চাই যে···

চন্দর বলিল—দেশের চারিদিকে খদ্দর পরাবার ধুম্ই বেধেচে···এ দিকে কোনো স্বরাজিষ্টের খেয়ালও নেই! আরে দাদা, অন্নদায় আর কন্যাদায়—এ দুটো দায় ঘোচাও তো বাপু···ম্যাখো, আমরা তোমাদের মোটর ঠেলতে দেশশুদ্ধ বাঙালী কাঁধ দিতে ছুটি কি না! হুঁঃ—রাজ্যের সভাসমিতি হচ্ছে···বুলির বুকনি শুনলে ত আর আমাদের পেট ভরবে না!···আমাদের এ মাথাগুলোই কি কম··· ? গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছ কি বাড়ে ? তেমনি এ বুদ্ধির গোড়ায় চাই অন্ন···তার অভাবেই না বুদ্ধিতে ঘুণ ধরে গেল. গজাতে পেলে কৈ ?···

দুই বন্ধুতে সুখ-দুঃখের বহু আলোচনা হইল। চা আসিল, এবং যথাসময়ে পেয়ালা নিঃশেষ হইল; এবং পাশের বাড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ১০টা বাজিতেছে শুনিয়া চন্দর কহিল—রাত হয়ে গেছে, আজ উঠি! আর এক দিন দেখা করবো, পরামর্শ আছে কিছু…হাজার হোক্ বাল্যবন্ধু! তোমার আমার মধ্যে পরস্পরে যতখানি দরদ থাকবে, এমন কি আর নতুন কারো সঙ্গে হবে!

মনটু-মা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, হাতের ডিপায় পাণ। একটা পাণ লইয়া মুখে দিয়া চন্দর কহিল—আসি মা? খাসা চা হয়েছিল। তুমি তৈরী করেছিলে? খাসা…বাঃ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দি আইডিয়া

পরের দিন সকালে কলতলার ফাটা চাতালটায় বলাই বিলাতী মাটী টিপিয়া দাগরাজি করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল—বলাই বাড়ী আছো?

বলাই কহিল—কে?

বাহির হইতে জবাব আসিল,—আমি চন্দর।

চন্দর! এই সকালেই আবার!

বলাই একটু বিস্মিত হইল। সে ডাকিল,—ওরে মনটু, মা…

মনটু কহিল—কি বাবা?

বলাই কহিল—বাইরে সেই কালকের বাবুটি এসেচেন। বাইরের ঘরটা খুলে দিয়ে আয়—ওঁকে বসতে বল্, আমি এখনি যাচ্ছি।

মনটু চাবি লইয়া বাহিরের দিকে চলিল। বলাই তাড়াতাড়ি ফাটা চাতালে সিমেণ্ট ঢালিয়া ভাঙ্গা কর্ণিক দিয়া সেই সিমেণ্ট টানিয়া দিল এবং চীৎকার করিয়া কহিল—ওগো, শুনচো?

ওগো তখন দোতলায় ছেলেদের খাবার দিতেছিলেন। তিনি কহিলেন,—কি শুনবো?

বলাই কহিল—এখানটায় আজ এবেলায় আর জল ঢেলো না কেউ, একটু সরে নাওয়া-টাওয়া করো, না হলে সিমেণ্ট ধুয়ে যাবে…বুঝলে?

উপরতলা হইতে জবাব আসিল—বুঝেচি। কাযের ছিরি ছাখো না…এই ভোরে দাগরাজি হলো! সকলে চান-টান সেরে নিলে করলে হতো না? যা ধরবে, তাই…ইত্যাদি

ওগোর কথা একবার সুরু হইলে সহজে থামিতে চায় না…এবং লক্ষ্মীছাড়া মাসিক কাগজগুলার মূঢ় সমালোচনার মত সে কথা চিরদিনই বলাইয়ের কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে সুর তুলিয়া চলে। বলাই তা জানে, এবং আরো জানে, ও কথার প্রতিবাদ করিতে যাওয়ার মানে ওদিককার কথার যোগসূত্র রচা, কাযেই সে কর্ণিক রাখিয়া হাত ধুইয়া নিঃশব্দে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে চন্দর তখন মনটুর সঙ্গে আলাপ করিতেছিল।…তোমার নাম শ্রীমতী প্রতিমা দেবী? বাঃ! বীণাপাণি স্কুলে ফোর্থ ক্লাশ অবধি পড়েচো? বাঃ! তা স্কুল ছাড়লে কেন?

মনটু এ কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই বলাই আসিয়া উপস্থিত। সে কহিল—আর পারা গেল না। মনে ইচ্ছার প্রসার ছিল খুবই। তা অবস্থার চাপে…আর বলো কেন? ও যা খাসা সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করতে পারে, বড় বড় পণ্ডিতরা তার সিকির সিকিও পারে না। বলো তো মা, সেই গঙ্গার স্তোত্রটুকু।

মনটু সলজ্জ ভঙ্গীতে বাপের দিকে চাহিল। চন্দর কহিল—বলো, লজ্জা কি!

বলাই কহিল—বিদ্যার পরীক্ষায় লজ্জা হতেই পারে না।

মনটু আবার বাপের পানে চাহিল, তার পর সুমিষ্ট সুরে আবৃত্তি করিল—

> দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
> ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
> শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে
> মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥……

আবৃত্তি-শেষে চন্দর কহিল—বাঃ খাসা! তোমার মেয়েটির সবই খাসা, বলাই। এখন একটি খাসা ঘরে খাসা পাত্র পেলে মা-লক্ষ্মীর জীবনটুকু খাসা কেটে যায়! তা এবার তোমার ছুটী মা লক্ষ্মি! কাল রাত্রের মত চা চাই। সেই চায়ের লোভেই এসেচি এই সকালে…বুঝেচো? বলিয়া চন্দর হা-হা করিয়া হাস্য করিল।

মনটু হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চন্দর চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া একবার কড়িকাঠের

গিয়াছেন (১)। তিনি সেখানে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সংসারী জীবাত্মাতেও যে নিত্যসুখ চিরবিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে উক্ত শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু সংসারকালে উহা বিদ্যমান থাকিলেও পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ উহার অনুভব হয় না। অথবা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই উহার অনুভবের কারণ। সুতরাং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মিলেই তজ্জন্য জীবাত্মাতে ঐ চিরবিদ্যমান নিত্যসুখের অভিব্যক্তি বা সাক্ষাৎকার জন্মে। যদি বল, "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই (ছান্দোগ্য) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি হইলে তখন প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ কিছুই থাকে না, ইহা কথিত হওয়ায় মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখানুভূতি শ্রুতি-বিরুদ্ধ, কিন্তু ইহা বলা যায় না। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করে না, এই কথার দ্বারা মুক্ত-পুরুষে তখন কোন সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয় না, ইহাই কথিত হইয়াছে, উহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং উহার দ্বারা তাঁহার নিত্যসুখসম্বন্ধের অভাব প্রতিপন্ন হয় না।

ফল কথা, মুক্তিকালে যে মুক্ত আত্মার নিত্য সুখের অনুভূতিও থাকে, কখনই ঐ অনুভূতির বিনাশ হয় না, ইহাও

(১) অপরে তু নিত্যসুখাভিব্যক্তির্মুক্তিঃ। ন চ সংসারিণাং নিত্যসুখে মানাভাবঃ, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত"মিতি শ্রুতেরেব বিদ্যমানত্বাৎ। পবমাত্মনো বন্ধবন্মোক্ষস্যাপ্যভাবাৎ···সংসারিতাদশায়াং সতোঽপ্যানন্দস্যাসংকল্পত্বাৎ। সদপি যোগ্যঃ কথং তদানীং ন গৃহ্যতে ইতি চেদন্যথানুপপত্ত্যা দুরিতস্য প্রতিবন্ধকত্বকল্পনাৎ। গৃহ্যতে তু তত্ত্বজ্ঞানেনাহত্য ভোগদ্বারা বা দুরিতস্য বিনাশে। অস্তু বা তত্ত্বজ্ঞানমেব তৎসাক্ষাৎকারস্য কারণং···"অশরীরং বাবসন্ত"মিত্যাদি শ্রুতেশ্চ অশরীরস্য সুখং দুঃখঞ্চ নোৎপদ্যতে, নিত্যসুখসম্বন্ধস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাদিতি প্রাহুঃ।—"আত্মতত্ত্ব-বিবেকের" রঘুনাথ শিরোমণিকৃত টীকার শেষভাগ।

সুপ্রাচীন মত। বাৎস্যায়নের সময় হইতে প্রচলিত এবং তাঁহার ব্যাখ্যাত—ন্যায়সূত্রে উক্ত মতের কোনরূপ প্রকাশ না থাকিলেও—শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ যে পূর্ব্বকালে উহা ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মত বলিয়াই সমর্থন করিতেন, ইহাও—আমরা বুঝিতে পারি এবং নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উক্ত মতের প্রকাশ করিলেও তিনিও অন্যভাবে উক্ত মতের সমর্থনপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যই উক্ত মতের বিরোধী। প্রশস্তপাদভাষ্যে যে আত্মদর্শন জন্য সুখের উল্লেখ আছে, উহা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল। জীবন্মুক্তাবস্থায় উহার উৎপত্তি হইলেও সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগের পরে কারণের অভাবে সেই সুখ আর জন্মিতে পারে না। সুতরাং তখন তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকে না, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের চির-প্রচলিত সিদ্ধান্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদের "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্য উক্ত মতে,—প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি অনেক মীমাংসাচার্য্যও উক্ত শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া--মুক্তপুরুষের সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকে না, এই মতের বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কখনও জড়ভাব অসম্ভব হইলেও মুক্তিকালে সুখভোগও কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্ত মতেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহে। কিন্তু চৈতন্য নামক গুণের আশ্রয়। জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য। জীবাত্মার সহিত তাহার শরীরমধ্যগত মনের বিলক্ষণ সংযোগাদি কারণ উপস্থিত হইলে তখন সেই জীবাত্মাতে চৈতন্যরূপ বিশেষ গুণ জন্মে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

কন্যাদায়ের প্রতিকার

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যবন্ধু

খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথের জল কতক সরিয়াছে এবং ট্রাম আবার চলিতে সুরু করিয়াছে। রাত প্রায় আটটা বাজে। আধ পোয়া ছানা কিনিয়া একটা ঠোঙ্গায় ভরিয়া বলাই চক্রবর্ত্তী হাতীবাগানের বাজার হইতে বাহির হইবামাত্র চলন্ত এক পথিক কহিল,—বলাই যে··· তার পর···?

বলাই চাহিয়া দেখে, পথিক তার বাল্যবন্ধু চন্দর। সে কহিল—এই ভাই বাড়ী যাচ্ছি।

চন্দর কহিল—হাতে কি ও?

বলাই কহিল—বলো কেন! বাড়ীতে বিধবা পিসি আছেন, আজ দশমী···একটু ছানা তাঁর জন্যে···

চন্দর কহিল—কি করচো এখন?

বলাই কহিল—কর্পোরেশনে কেরাণী-গিরি। হাড় পিষে গেল, ঘরে এত বড় মেয়ে···বিয়ে দিতে হবে! অথচ কোথা থেকে কি দিয়ে যে দি! এই এতখানি পথ হেঁটেই ফিরি··· যে ক'টা পয়সা তবু বাচে!

চন্দর কহিল—কন্যাদায়ে বিব্রত তা হলে,—বলো?

বলাই কহিল—দায় চারিদিকেই—তবে উপস্থিত কন্যাদায়ের বেদনাটাই টনটনিয়ে উঠেছে! বাড়ীতে এতগুলো মুখ···কি দিয়ে রোজ ভরাই—তা ভগবানই জানেন।···তা, তোমার খবর?

চন্দর কহিল—আমার? ব্যবসা! তা সব দিকেই আগুন লেগেছে কি না! মাথা ঘামিয়েই মরছি শুধু···

বলাই কহিল—কেন, তোমার কথা শুনেছিলুম···কি সব তেল-টেল বার করেছো। চালান যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে··· তোমার তো ভালোই চলছে···

চন্দর কহিল—চলছিল মন্দ নয়···তা, এক ফ্যাসাদ বেধেছে!

বলাই কহিল—ফ্যাসাদ?

চন্দর কহিল—অর্থাৎ আমি তো প্রথমে বটকৃষ্ণ পালের দোকানে ঢুকেছিলুম···সেখানে থাকতেই নানা ওষুধ-বিষুধের recipe পাই। একটা তেল বার করি···তা, জানো তো, কুন্তলীন-ফুন্তলীনগুলো এক রকম কেমন চ'লে গেছে, এখন নতুন কোনো তেল বার করলে—তা সে যত ভালোই হোক, খদ্দেরে নিতে চায় না! তাই আমি ওই সব জানা তেলের খালি শিশি জোগাড় ক'রে আমার তৈরি তেল সেই সব শিশিতে ভরে মফঃস্বলে চালান দিচ্ছিলুম···

বাধা দিয়া বলাই কহিল—তেল জাল করছিলে?

চন্দর কহিল—লোকে তাই বলবে, কিন্তু আমার তেলে কোনো ভেজাল জিনিষ ছিল না। তবে না কি বাজারে নতুন তেল দাঁড় করানো শক্ত, কাজেই ঐ সব নামেই ওই রকম শিশি ভরে সে তেল মফঃস্বলে পাঠাচ্ছিলুম···চলছিল বেশ···মাঝে থেকে কটা জাল তেলের মামলা বেধে ভয় হয়ে গেল···এ বয়সে কি জেল খাটবো! তাই থামা দিচ্ছি···

বলাই কহিল—তোমার তেল আলাদা নামেই চালাও না কেন!

চন্দর কহিল,—চালাতে গেলে চলবে না, ভাই···যত ভালোই সে তেল হোক। লোকে ঐ নামজাদা তেলই চক্ষু মুদে কিনবে, তবু নতুন তেল তাদের চেয়ে ভালো হলেও পরখ করবে না···তাই একটা মতলব ঠাওরাচ্ছিলুম···একটা কিছু উপহার-টুপহার ছেড়ে যদি···

দিকে তাকাইল, পরে ঘরের চারিধারে দেওয়ালের পানে, তার পর একবার কাসিয়া ডাকিল,—বলাই…

বলাই কহিল—কেন ?

চন্দর কহিল—কাল দু'জনে কথা হচ্ছিল না ? আমার ঐ তেলের কথা, আর তোমার কন্যাদায় ?

বলাই কহিল—হাঁ।

চন্দর কহিল—রাতে বাড়ী ফিরে অনেক কথাই ভেবেচি আমি। বলছিলুম না, ব্যবসার ক্ষেত্রে যত ভালো জিনিষই তুমি মাথা খাটিয়ে বার করো, এ বিজ্ঞাপনের যুগে তাকে রীতিমত ঢাক বাজিয়ে চালাবার চেষ্টা করা চাই ?

বলাই কহিল—তা ত চাই। দ্যাখো না, বিলিতী ব্যবসাদারদের কাণ্ড ! ঐ লিপ্টনের চা, এক মাত্র ভালো চা বলে বাজারে চলছিল, তার পর এলো ব্রুকবণ্ডের চা…কি বিজ্ঞাপনটাই জাহির করলে ! তার পর ঐ সিগারেট…কাঁচি, মে-ফেয়ার, ট্যাটলার, গোল্ড ফ্লেক, পাশিং শো…ওঃ, রোজ রোজ এক একটা নতুন কোম্পানি নতুন সিগারেট আমদানি করচে।…আর বাক্সর সঙ্গে কুপন…এত কুপন যে দেবে, সে পাবে মোটর গাড়ী, এত যে দেবে, সে পাবে বাইসিক্ল…

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া চন্দর কহিল,—এই, এই…আমি ঠিক এই কুপনের কথাই পাড়ছিলুম…তা দ্যাখো, এ কথা মানো কি না, ও তোমার পলিটিক্সেই বলো, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বলো, ইংরাজ আমাদের গুরু…

বলাই কহিল—নিশ্চয়। স্বরাজিষ্ট কর্পোরেশনে চাকরি করি বলে কি এতবড় সত্যকে অস্বীকার করতে পারি ?

চন্দর কহিল—আরে ! তোমার স্বরাজিষ্ট কথাটাও তো ইংরেজী…

বলাই কহিল—নিশ্চয় ! অমৃত বোসের সেই কি একটা ফার্সে আছে না—সাহেবঞ্চ বাঙালীঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।

তর্কস্থলে অকস্মাৎ উত্তেজনা জাগিলে বলাইয়ের কোটেশনে ছোট-বড় ভুল ঘটিয়া থাকে—এটা তার স্বভাব। কাযেই তার এ উপমার বিরুদ্ধে কোনো কথা না তুলিয়া চন্দর কহিল—কে জানে, কাল হয় তো এক নতুন সিগারেট কোম্পানি এসে বিজ্ঞাপন দেবে, আমাদের সিগারেটের পাঁচ হাজার কুপন দিলে একটি মেম-বউ দেবো…সে-কালের রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব না কি দেওয়া চলে না…

বলাইয়ের উত্তেজনা তখনও প্রবল ছিল। সে কহিল,—দেওয়া চলে না কি ! সে ওরা মনে করলেই দিতে পারে। ফস্ করে বলতে পারে, পাঁচ হাজার কুপন যে দেবে, সে হবে রায় বাহাদুর, যে দেবে পঞ্চাশ হাজার কুপন, সে হবে 'স্যার'। রাজার জাত…মনে করলে সা' খুশী বর দিতে পারে শুধু ওরাই। দ্যাখো না, কাগজে ওদের গাল দিয়ে আর কিছু না হোক, আমাদের মত ক্ষুদ্দুর কেরাণীদের উন্নতির দফা রফা করে দিলে ! সেদিন এক সাহেবের কাছে তার অফিসের হেড ক্লার্ক বলেছিল—স্যার, আমার কিছু মাহিনা বাড়িয়ে দিতে হবে—মস্ত সংসার—না হলে কি করে চালাই ? তা সাহেব হেসে জবাব দিলে—Go to your Swaraj, Babu…দ্যাখো তো…

চন্দর কহিল,—যাক, ও-কথা রাখো। ও পলিটিক্স আমার মাথায় আসে না ভাই, ওর কিছু বুঝিও না। তা' আমি যা বলছিলুম।

বলাই কহিল,—হাঁ বলো ; কিন্তু তার আগে আমি দেখি, চায়ের কতদূর।

চন্দর কহিল,—ও কিছু ভাবতে হবে না। মা-লক্ষ্মীর হাতে চা-জোগানোর ভার যখন, তখন নিশ্চিন্ত থাকো।

বলাই কহিল,—তা ঠিক। আমার এ ভাঙা ঘরে ও মেয়ে কেন যে জন্মালো—তাই ভাবি ! লক্ষ্মীছাড়া বরকর্ত্তাগুলো ছেলের বিয়ে দিতে বসে মেয়ের আগে যৌতুক খোঁজে কি কারণে যে, তাও বুঝি না ! কাঠ-কাঠরা কি জড়োয়ার গহনার চেয়ে আমার মেয়ের দাম কম কিসে !

চন্দর কহিল—সে কথা আর বলতে ! তা শোনো আমার কথা…আমার এই তেলটার নাম দিয়েছি 'কমলা' কেশতৈল। এ তেলে ভেজাল নাই মোটে—বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় মতে তৈরী, আর গন্ধ চমৎকার। দাম এক টাকা মাত্র…শিশি বড়, সাইজ কুন্তলীনের মতন। তবে আমি বিশ্বকবির প্রশংসাপত্র আঁটতে পারবো না তো। গরীব মানুষ, সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে পৌঁছুবার পাশ্‌পোর্টের অভাব। কাযেই ঐ বিলিতী সিগারেটের কুপনের অনুকরণে এ তেলটা বাজারে চালাতে চাই। একবার চালাতে পারলে আমার এ তেল নিজের জোরে চলে যাবে—এ বিশ্বাস আমার খুব আছে। তা এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই আমি…

বলাই চমকিয়া উঠিল। তার সাহায্য! সে কি সাহায্য করিবে? ছাপোষা মানুষ, দিন আনিয়া খায়। ডাহিনে রাখিতে বাঁয়ে কুলায় না—সে করিবে সাহায্য! বলাই কহিল, —কিন্তু আমার অবস্থা তো তুমি বুঝচো…

চন্দর হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তা বুঝচি বলেই না তোমার দোরে হাত পেতেচি। তুমি ছাড়া এ সাহায্য আমায় আর কেউ করতে পারবে না, বন্ধু।

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বলাই চন্দরের পানে চাহিল। চন্দর কহিল—এক ঢিলে দু'পাখী মারার কথা চলিত আছে। আমি এক ঢিলে বহু পাখী মারতে চাই…প্রথমতঃ আমাদের সমাজ, দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্বরাজী ভ্রাতৃবৃন্দ, তৃতীয়তঃ…

তার কথা শেষ হইল না। মনটু চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকিল, তক্তাপোষের উপর পেয়ালা দুটি রাখিয়া কহিল, —বাবা, হালুয়া তৈরী করে দেবে?

চন্দর কহিল—না মা-লক্ষ্মি! এই চা-ই প্রচুর হবে। হালুয়ার দরকার নেই—তুমি বরং আমায় আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যাও…

মনটু চলিয়া গেল। চন্দর কহিল, —তোমার এই মা-লক্ষ্মীটি আমায় কি inspiration দিয়েচেন, তাই বলচি। হ্যাঁ—আমি ভেবেচি, এক লাখ শিশি ছাড়বো, তার সঙ্গে এক লাখ কুপন। এই সব কুপনের নম্বর নিয়ে লটারী করবো…করে একটা বিশেষ তারিখে drawing হবে। সেই drawing-এ যে নম্বর উঠবে অর্থাৎ winning number যার, সে পাবে একটি সুশ্রী তরুণী বধূ, আর তার সঙ্গে যৌতুক—পুরী কিম্বা রাঁচির মত জায়গায় এক বিঘা জমি, আর সে জমির উপর প্রশস্ত বাংলো আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা। উকীল-বাড়ী advice নেবো—এর মধ্যে জুচ্চুরি বা বাজে কথা নেই। মস্ত এক স্বরাজিষ্ট রাজী হয়েচেন, তাঁর নামে ফতোয়া জাহির হবে। অবিশ্বাসের কিছু থাকবে না এতে। কেন থাকবে? এক লাখ শিশি বেচে আমি পাবো লাখ টাকা। তা থেকে নগদ পাঁচ হাজার, মায় জমি ও বাড়ীর দাম পনেরো হাজার—সব শুদ্ধ বিশ হাজার বাদ দাও…বাকী থাকে আশি হাজার টাকা। আমার খরচপত্র? থোক্ ধরো পনেরো হাজার টাকা…বাকী পঁয়ষট্টি হাজার টাকা নেট্ লাভ। এই টাকাটা তোমার সঙ্গে আধাআধি বখরা…ভাখো, রাজী?

বলাইয়ের চোখের সামনে দুনিয়াটা অকস্মাৎ গোলার মত পাক্ খাইয়া ঘুরিয়া উঠিল। আধা বখরা! কেন, সে কি করিয়াছে? না দিয়াছে তেলের recipe, না জোগাইয়াছে শিশি! তবে?

চন্দর হাসিল, হাসিয়া কহিল—তোমার তো কন্যাদায়… মা-লক্ষ্মীর ছবি দেবো কুপনে। শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা…মা-লক্ষ্মীর বিবাহও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ যৌতুক, অর্থাৎ…

বলাই কহিল—বুঝেচি। যার কুপন জিতবে, সে বিবাহ করবে মনটুকে…

চন্দর কহিল,—হাঁ।

বলাই কহিল,—বলো কি! সে যদি জাতে মুসলমান হয়? পার্শী হয়? মাদ্রাজী হয়?

চন্দর কহিল,—ঐখানেই একটা গোল বাধচে!…তা, তুমি তো গোঁড়া নও?

বলাই কহিল,—মানে?

চন্দর কহিল,—অসবর্ণ বিয়ে তো লোকে দিচ্ছে। বাঙ্গালীর ছেলের সঙ্গে পাঞ্জাবী মেয়ের বিয়েও তো হচ্ছে… মানে, civil marriage—সে বিবাহও সিদ্ধ।

বলাই কহিল,—বলো কি হে! আমার আরও ছেলে মেয়ে রয়েচে—তাদের বেলায়…

চন্দর কহিল—তার জন্যে তোমায় সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকা সেয়ার দিচ্ছি…

বলাই কহিল,—না ভাই। তবে ব্রাহ্মণ বা পাল্টা ঘর পেলে আমার এ কুপনের বিয়েয় অমত নেই।

চন্দর কহিল,—সমাজের ভয় করচো! কিন্তু সমাজ তোমার এ দায়ে কি করচে? এ সমাজের মুখ তুমিই বা চাইবে কেন!

বলাই কহিল,—আরে ভাই, একটি মাত্র সন্তান হলে চাইতুম না। বাকীগুলি নিয়ে যে ফ্যাসাদে পড়বো। বাড়ীতে মেয়েরা যে বিদ্রোহ তুলবে।

চন্দর কহিল,—বেশ, ব্রাহ্মণ আর পাল্টা ঘর হলে তোমার আপত্তি হবে না তো? তা হলে তাই হবে। যার কুপন জিতবে, সে যদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর তোমার পাল্টা ঘর হয়, তা হলে তোমার সঙ্গে এই সর্ত্ত পাকা থাকবে—অবশ্য দস্তুরমত দলিল লেখাপড়া করে কায হবে। আর যদি মাদ্রাজী-ফাদ্রাজীতে কুপন জেতে, তা হলে দোশ্‌রা তেমন পাত্রী দেখে দেবো।

এ কন্যাদায়গ্রস্তের দেশে মেয়ে পাওয়া বোধ হয় শক্ত হবে না—কি বলো ?

বলাই কহিল,—সে কথা ঠিক।

চন্দর কহিল,—Just taking a chance—দেখতে তোমার আপত্তি আছে ?

বলাই কহিল,—কিছুমাত্র না। আমার মেয়েকে যদি নাও, তা হলে আমার সাড়ে বত্রিশ হাজার পাকা তো ?

চন্দর কহিল,—নিশ্চয় !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দূর হোক্ সমাজ !

চার পাঁচ দিন পরের কথা। ঘটকী এক সম্বন্ধ আনিয়াছিল। কাছেই শিকদারবাগানে এক উকীলের ছেলে। ছেলেটি ভালো। দেশের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাই বি, এ'র পড়া ছাড়িয়া সে সারা দেশবাসী যাহাতে বিদেশী কোম্পানিতে জীবন বীমা করিয়া তাদের টাকায় ওয়ারীশদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ভন্ সিম্পশন্স্ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্টগিরিতে ঢুকিয়াছে। বাপ এবার কৌন্সিলের মেম্বর হইতে দাঁড়াইবেন। পাত্রী দেখিয়া তাঁদের পছন্দ হইল। গণ-পণ ? পাত্রের পিতা বলিলেন,—সেটা আর কি বলবো ? যা উচিত মনে করবেন, এ কালে—

বলাই আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—তবু একটা বোঝা-পড়া থাকা ভালো। আপনি কি রকম আশা করচেন, তার একটা আঁচ···

বরকর্ত্তা কহিলেন,—আচ্ছা, সেটা খবর পাবেন···

তখন এই পর্য্যন্ত। অফিসে যাইবার সময় নীচে ঘটকীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। বলাই নামিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল,—কি খপর গো ?

ঘটকী একমুখ হাসিয়া কহিল,—ভালোই···বাবুরা বল্লেন, এ কালে যা দস্তর···মানে, নগদ হাজার-এক টাকা দিলেই হবে ; তা ছাড়া খাট-বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, বুক-কেশ ; ঘড়ী, চেন, আংটী, বেনারসী জোড়, আর মেয়ের গহনা সোনার তত না হোক্, জড়োয়া চুড়ি, মুক্তোর কলার, মুক্তোর নেকলেশ; এই···

বলাই চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল ; কহিল,—থামো ! ঐ বেটে বক্কেশ্বর উকীল—কোর্টে যান হেঁটে—ট্রামের পয়সা জোটে না—মুখে বলেন, স্বাস্থ্যের জন্য গাড়ীচড়া বারণ ! আর ঐ ছেলে···বাড়ী তো দেখেছি, খাট-বিছানা রাখবে কোথায় ? নগদ হাজার টাকা—জড়োয়া গহনা ! সেই গহনা গায়ে দিয়ে হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলবে মেয়ে ? তুমি বলো গে ঘটকী, হবে না। ও-ছেলের বাপের আস্পর্দ্ধার কথা শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে ! খাট-বিছানা ! খাট কখনো চোখে দেখেচেন··· একখানা তক্তাপোষ চাইতেন তো বুঝতুম !

ঘটকী কহিল,—তা গাল দাও কেন বাছা ! না দেবে, না দেবে—আর তাও বলে যাচ্ছি, এর কমে মেয়ে পার হয় না আজকাল ! ঘটকী গৃহিণীর পানে তাকাইল, কহিল,—তুমিই বলো মা···

গৃহিণী কহিলেন,—ওঁর মাথা খারাপ হয়েচে···শোনো কেন !

ঘটকী কহিল,—তা হলে হবে না ? জবাব দিই গে···কি বলো গো ? ওদের ভাবনা কি ! ঐ কাঁশারিপাড়ার গাঙ্গুলিরা দশ হাজার নিয়ে সাধাসাধি করচে···তা বল্লে, এ কাছে-পিঠে, আর মেয়েটি পছন্দ হয়েছিল নাকি খুব···

বলাই কহিল,—কাছে-পিঠে ! বড় সুবিধে হতো না ? বৌ নিয়ে যেতে গাড়ী-ভাড়া লাগতো না···হাঁটিয়ে নিয়ে যেতো···কেমন ?

গৃহিণী কহিল,—তুমি থামো। আপিস যাচ্ছ যাও, আমি কথা কচ্ছি। একটা দাম তারা দিয়েচে, তার দর দস্তর আছে তো ?

ঘটকী কহিল,—এই, এই—একটা তরকারী কিনতে গেলেও যে দরদস্তর করতে হয়, আর এ মেয়ের বিয়ে···

বলাই কহিল,—না, না, না, আমি বিয়ে দেবো না ও সব ঘরে···আমি ঐ কুপনে মেয়ের বিয়ে দেবো। চন্দর ঠিক বলেচে—সিভিল ম্যারেজ আইনের চোখে সিদ্ধ···all right···

গৃহিণী কহিলেন,—যা বলেচো ! শাস্তর ঠেলে—সমাজ ঠেলে···

বলাই কহিল,—চুলোয় যাক্ সমাজ আর শাস্তর। মেয়ের ভালো দেখতে হবে, নিজেকেও বেঁচে থাকতে হবে গো মেয়ের বিয়ে দিয়ে ! তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি আজই চন্দরকে কথা দিয়ে আসবো আপিসের ফেরত

তার সঙ্গে দেখা করে। তুমি যাও ঘটকী-ঠাকরুণ—আমি ও-ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবো না।

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বলাই অফিসে চলিয়া গেল।

* * * *

সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধুতে কথা পাকা হইয়া গেল। চন্দর এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া কহিল—,এই হলো নিয়ম—ছাপতে দিচ্ছি…তা হলে তোমার মেয়ের ফটো একটা চাই…শুধু মুখের ব্লক করিয়ে দেবো ওই সঙ্গে। তা ছাড়া এতে দেশের লোকের কাছে একটা দরদও পাবো…বলবে, কন্যাদায়ে প্রাণ কেঁদেচে।

বলাই চন্দরের পানে চাহিল। চন্দর কহিল,—মানে, এই অনুষ্ঠানপত্র লিখেচি, ভাখো…

"হে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন পিতাগণ, আর ভাবনার কারণ নাই। সুশ্রী কন্যার বিবাহ-চিন্তায় কাতর জর্জ্জরিত হইবার হেতু নাই। মা ভৈঃ! দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায়—কন্যাদায়। সেই কন্যাদায়ের প্রতিকার-কল্পে আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি—আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত 'কমলা' কেশ-তৈলের প্রতি শিশির সঙ্গে নম্বরযুক্ত কুপন থাকিবে। ক্রেতারা এই কুপন সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র কাগজে নাম, ঠিকানা লিখিয়া আমাদের কাছে পাঠাইবেন। আগামী বর্ষের শুভ ১লা বৈশাখ তারিখে সমস্ত কুপন-নম্বর লইয়া আমরা লটারী করিব। তাহাতে অধ্যক্ষতা করিবেন স্বনামধন্য দেশের কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়। যাঁর কুপন-নম্বর উঠিবে, তিনি পাইবেন একটি সুশ্রী তরুণী বধূ [বিধবা কন্যা নয়]; ও সেই সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও রাঁচিতে এক বিঘা জমি, এবং সেই জমির উপর প্রকাণ্ড পাকা বাংলা। ক্রেতারা একাধিক কুপন পাঠাইতে পারেন। তবে প্রাইজ ঐ একটিমাত্র। যদি কুপন-জেতা হিন্দুকন্যা বিবাহ করিতে অসম্মত থাকেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুমোদিত কন্যা আমরা সংগ্রহ করিয়া দিব; না পারিলে খেসারৎ-স্বরূপ দশ হাজার টাকা দিব। সে জন্য যৌতুক বাদ পড়িবে না। কোনো মহিলা যদি কুপন জেতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনোমত পাত্র গ্রহণ করিতে আমরা দায়ী রহিলাম। বিশেষ বিবরণের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। চার পয়সা নগদ কিম্বা চার পয়সার টিকিট পাঠাইলে সে পুস্তিকা পাইবেন। দেশের কন্যাদায়, গৃহদায় ও অন্নদায়—এই ত্রিবিধ দায় মোচনের জন্য আমাদের এই বিরাট অনুষ্ঠান। দরদী দেশবাসীকে উদার হৃদয়ে এ অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে নগদ এক টাকা মূল্যে এক শিশি মাত্র 'কমলা' কেশ-তৈল কিনিবার অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, আমাদের এ অনুরোধ অরণ্যে-চীৎকার-তুল্য অসার প্রতীত হইবে না। ইতি

শ্রীচন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
৮৭ নম্বর বকু বাবুর্চ্চির লেন,
ইটালী—কলিকাতা।

বলাই পড়িল। তার পড়া শেষ হইলে চন্দর কহিল,—তুমি তা হলে সিভিল ম্যারেজেও রাজী?

বলাই কহিল,—রাজী।

চন্দর কহিল,—সমাজ?

বলাই কহিল,—দূর হোক্ সমাজ! সমাজ আমার কি করেচে যে আমি তার মুখ চাইবো?

চন্দর কহিল,—অন্য ছেলেমেয়ে?

বলাই কহিল,—ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে। আগে এ কাঁটা তো তুলি, বুকে দিবারাত্র খচ্-খচ্ করচে!

চন্দর কহিল,—অল্ রাইট্…আমাদের দলিল কালই তা হলে লেখাপড়া শেষ করিয়ে রেজেষ্ট্রী করাবো।…

বলাই কহিল,—তাই—শুভস্য শীঘ্রং।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুপনের বর

দেশে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। এক পয়সার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলা খোরাক পাইয়া পরমায়ু বাড়াইয়া ফেলিল।—চন্দরের এই অনুষ্ঠানের কৃপায় বহু বেকার বেচারা নূতন কাগজ

খুলিল এবং অন্নের সংস্থান করিয়া দেওয়ায় চন্দরকে তারা কলমের খোঁচায় দেবতা বানাইয়া আকাশে ঠেলিয়া তুলিল। যে-সব কাগজ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠেলা পাইয়া আক্রোশে ফুলিয়া কলমের পর কলম জুড়িয়া চন্দরকে দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিল। মাঝে হইতে কৌতুকে-কৌতূহলে পড়িয়া সর্ব্বলোক এক টাকা মাত্র ব্যয়ে 'কমলা' কেশতৈল কিনিয়া আগামী বর্ষের শুভ ১লা বৈশাখ তারিখটির প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় টেলিফোনে ও বৈঠকখানায় যার-তার কৌতূহল-প্রশ্নের জ্বালায় বিব্রত হইয়া এক দিন পঞ্জাব মেলে চড়িয়া ভারত-প্রদক্ষিণে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাত্রাকালে গৃহে বলিয়া গেলেন, তাঁর ঠিকানার কোন সন্ধান যেন কাহাকেও না দেওয়া হয়—তা সে যত অন্তরঙ্গ আত্মীয় বা বন্ধু হোক।

বলাই ?...মন্ত্রগুপ্তি বলিয়া একটা কথা আছে রাজনীতিতে। সে বিষয়ে যদি কোন পরীক্ষা লওয়া হইত, তাহা হইলে বলাই ফুল-নম্বর পাইত ; কারণ, এই 'কমলা' কেশতৈল ও এই সুবিরাট অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার এত বড় যোগ রহিয়াছে, এ সংবাদ তার গৃহিণীও কোনো দিন আভাসে পান্ নাই। আশ্চর্য্যভাবে কথাটা সে সকলের কাছে গোপন রাখিয়াছিল।

অবশেষে চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই শুভ ১লা বৈশাখ তারিখ আসিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইল। হালখাতার নিমন্ত্রণের কথা ভুলিয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলা সেদিনও 'কমলার' কুপনের কথায় তাদের কলম ভরাইয়া দিয়াছে। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্রকে ঘটক সাজাইয়া বাংলা নববর্ষে কার্টুন করিয়া তারা কাগজের কাটতি বাড়াইবার সাধু সঙ্কল্পটুকুও ভোলে নাই!

কথায় বলে, পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা! সে বাধা ঠেলিয়া চন্দরের দু'লাখের উপর তেলের শিশি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বলাই শুভ ১লা বৈশাখ তারিখে সকালে উঠিয়া ছেলেদের এক্সারসাইজ বুকের একটা পাতা ছিঁড়িয়া সেই কাগজে লাল কালিতে ১০৮ বার দুর্গা-নাম লিখিল। সিভিল ম্যারেজের যত দোহাই মানুক, শ্রীদুর্গাকে সে এক নিমেষের জন্যও মন হইতে এত কাল ঠেলিয়া রাখে নাই; সর্ব্বক্ষণ ভক্তি-ভরে স্মরণ করিয়া আসিয়াছে। চন্দরও তাকে আশা দিয়াছে—দু'লাখ শিশিতে তার প্রাপ্য হইবে পঁয়ষট্টি হাজার। তামাসার কথা নয়! ডার্বির টিকিটের চেয়েও সুনিশ্চিত! শুধু সময়ের অপেক্ষা!

সন্ধ্যার সময় নির্ম্মলচন্দ্রের ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীর সম্মুখে কি ভিড়! পুলিশ ডাকিয়া দেউড়ি-রক্ষা চলিতেছে। রাত্রি আটটায় লটারীর কুপন উঠিবে। বাহিরে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা কুঞ্চিত দৃষ্টিতে উদগ্র কৌতূহলে দাঁড়াইয়া—ষ্টেটস্ম্যান হইতেও রিপোর্টার আসিয়াছে। ইংলিশম্যানের ঘোষাল শ্রীরামপুরে ফেরা স্থগিত রাখিয়াছে, এসোসিয়েটেড প্রেসের নেউগী গলায় চাদরের ফের্তা জড়াইয়া ভিড়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সওয়ার পুলিস তাড়া দিয়া ভিড় ঠেলিয়া পথ করিতেছে, তবে ট্রাম, বাস্ চলিতে পারিতেছে! দেশবন্ধুর সমাধি-যাত্রার দিনেও নির্ম্মলচন্দ্রের বাড়ীর দ্বারে বুঝি এমন ভিড় জমে নাই!

যথাসময়ে কুপন তোলা হইল, নম্বর ৫৭৩২৫। নাম? মোটা খাতা খুলিয়া চন্দর পড়িল, শ্রীমধুসূদন শাহা-বণিক্য, সাং কশাইটুলী, ঢাকা।

বলাইয়ের প্রদীপ্ত চক্ষু ম্লান হইল। ঘরের বিজলী বাতির ঝাড়ে কে যেন পিচকারী করিয়া কালো কালি লেপিয়া দিল!

চন্দরের ঠেলা খাইয়া বলাই কহিল,—কি?

চন্দর কহিল,—শেষে শাহা-বণিক্য! উপায়?

বলাই কহিল,—কুছ-পরোয়া নেই! শাহা-বণিক্য শাহা-বণিক্যই সই।

চন্দর কহিল,—বাড়ীতে?

বলাই কহিল,—জানতে দেবো না। বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তা ছাড়া আমি সমাজদ্রোহী। কিসের সমাজ...কার সমাজ! আমি সমাজ মানি না!

বলাইয়ের স্বর উত্তেজিত। নির্ম্মলচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া চন্দর কহিল,—আজ তা হলে আসি। বণিক্যকে চিঠি লিখি। এ-বিবাহে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে...

নির্ম্মলচন্দ্র কহিলেন,—সময় থাকতে খপর দেবেন... থাকবো।...

পরের দিন কাগজে কাগজে খবর রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই বড় বড় হরফে নাম ছাপিয়া দিয়াছে। সকলেই প্রশ্ন তুলিয়াছে, পাত্রীটি কে? কার কন্যা? কোথায় থাকে?

চন্দরের উকীল বলিয়া দিলেন, এ প্রশ্নের জবাব দিবার দায় চন্দরের কিছুমাত্র নাই!

মধুসূদনকে কলিকাতায় আসিবার জন্য চিঠি লেখা হইল। মধুসূদন শাহা-বণিক্য যথাসময়ে একটি গ্যানি-ব্যাগ হাতে চন্দরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। ব্যাগের সঙ্গে একটি ছোট হুঁকা বাঁধা। মধুসূদনের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে; গলায় তুলসীর মালা, রং আবলুশ কাঠের মত কালো। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরতি, বিশ্রী মূর্ত্তি! বলাই তাকে দেখিয়া প্রথমে শিহরিল, পরে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মধুসূদন কহিল,—পোলার রকম ইনি কান্দান ক্যান্?

চন্দর কহিল,—ওঁর একটি সম্বন্ধী মারা গেছেন, চেহারা হুবহু আপনার মত ছিল···আপনাকে দেখে তাঁর কথা মনে পড়চে কি না, তাই···

মধুসূদন কহিল,—অঃ! তা মেয়্যা ছ্যাহাবার কি করচেন্?

চন্দর কহিল,—কন্যাকে আপনিই বিবাহ করবেন না কি?

মধুসূদন গেঁজিয়া হইতে কুপন বাহির করিয়া কহিল,—লম্বর ছ্যাহেন···পাচ সাত তিন দুই পাচ···আমার লম্বর··· বিয়্যা করমু না ক্যান্?

চন্দর কহিল,—আপনার কি বিবাহ হয়নি এত দিন?

মধুসূদন জানাইল, হইয়াছিল, টিঁকে নাই। বাড়ীতে এক-রাশ ছেলে-মেয়ে দিবা-রাত্রি কলহ-কলরব, তায় ব্যবসা মন্দা···তাই বুড়া বয়সে শান্তির প্রত্যাশায় একটি সুন্দরী অল্পবয়স্কা পাত্রীর সে সন্ধান করিতেছিল, এমন সময় 'বসুমতী' কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক শিশি 'কমলা' ক্রয় করে; এবং কুপনে তারই নম্বর যখন উঠিয়াছে···ইত্যাদি···

চন্দর তাকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করিয়া বহু মিষ্ট মধুর বচনে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। তখন সে তাকে ভয় দেখাইয়া কহিল,—এ মেয়ে ইংরাজী জানে, জুতা পায়ে দেয়, গান গায়, চা খায়, এম্পায়ারে নাচিতে যায়···

মধুসূদন কহিলেন,—মুটির পান্না, কও?

চন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—তা···

ঝাঁজালো স্বরে বলাই কহিল,—নটীর কন্যা···

মধুসূদন জানাইল, পাত্রী নটী হইলেও সে বিবাহে রাজী আছে—সে আর এ বয়সে সমাজের ভয় রাখে না! তা ছাড়া এত বয়সে যখন বিবাহ করিতেছে, তখন ভদ্রঘরের··· ইত্যাদি···

মধুসূদনের মন্তব্য শুনিয়া বলাই ও চন্দরের দুই চক্ষু কপালে উঠিবার জো! না, এ বুড়া কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নয়!

মধুসূদন সকালে উঠিয়া স্নানের উদ্যোগে গেল। গঙ্গার দেশে আসিয়াছে—গঙ্গাস্নান করিবে না? চন্দর একজন লোক সঙ্গে দিল।

বলাই কাল হইতে চন্দরের গৃহে বাসা লইয়াছে। এ মুখে মনটু-মা'র সামনে গিয়া দাঁড়াইবে কি বলিয়া! বিশেষ বরের এই মূর্ত্তি দেখিয়া!

বলাই ডাকিল,—চন্দর···

চন্দর কহিল,—দাঁড়াও···এক ফন্দী করচি। তুমি তো পঁয়ষট্টি হাজার টাকার মালিক। ভালো পাত্র এনে দিচ্ছি— একে যৌতুক-সমেত ওদিকে ঐ···চন্দর একটা কদর্য্য পাড়ার নাম করিল।

বলাই শিহরিয়া উঠিল—খবর্দ্দার! অতদূর নয়···শেষে জেলে যাবে! একটা কেশ আমি জানি···

চন্দর কহিল,—বেশ, তবু ফন্দী একটা করবোই। বুড়ো ব্যাটা—বৃষকাঠ—বলে, মুটী হলেও বিয়েয় আপত্তি নেই! দেখাচ্ছি মজা···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌবন-লাভের দাওয়াই

অফিসের মায়া ত্যাগ করা গেল না। বলাই বিমর্ষ মলিন মুখে অফিসে আসিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। বড়বাবু কহিলেন,—ব্যাপার কি হে, বলাই?

বলাইয়ের অন্তরাত্মা কান্নায় ডুকরিয়া উঠিল। তার চোখে জল ঝরিল। বড়বাবু কহিলেন,—কাঁদচো যে ··

বলাই সব কথা বড়বাবুকে খুলিয়া বলিল।

বড়বাবু কহিলেন,—একটি সুপাত্র আছে। এম-এ-পাশ, বিয়ে করবে না বলেছিল—বাপের ধনুর্ভঙ্গ-পণের ব্যবস্থা ছিল বলে। তা বাপ ঢিট হয়েচে ছেলের মার কান্নার তাড়নায়···

বলাই বলিল,—আর এ লোকটা?

বড়বাবু কহিলেন,—টাকা পেলেও যাবে না?

বলাই কহিল,—না। অনেক বুঝিয়েচি, ভয় অবধি দেখিয়েচি…

বড়বাবু কহিলেন,—দেখি ভেবে।…

বৈকালে চন্দরের সঙ্গে দেখা। চন্দর কহিল,—দিনস্থির হয়েচে বিয়ের। ১৫ই বৈশাখ—গোধূলি-লগ্নে। ওকে বলেচি অন্য বাসা দেখতে। সেখান থেকে বিয়ে করতে যাবে,—সম্প্রদান প্রভৃতি হবে হিন্দু-মতে—পরের দিন বিয়ে রেজেষ্ট্রী করে এসে কুশণ্ডিকা…বলেচি, হাজার হোক্, আমরা হিন্দু তো…

বলাই কহিল,—মেয়ে দেখতে চায় নি?

চন্দর কহিল,—চেয়েছিল। আমি বলেচি, কায নেই সে হাঙ্গামায়। তোমার চেহারা দেখলে ভড়কে যাবে। তা ছাড়া মেয়ের বয়স হয়েচে…নাবালিকা নয়। সে যদি বলে, বিয়ে করবো না—আইন তার দিকে হবে।

ঠিক কথা!

আইনের উল্লেখে বলাই যেন আঁধারে আলোর রশ্মি দেখিল। তবে তো উপায় আছে! চন্দরকে কহিল,—তা হলে উপায় আছে চন্দর?

চন্দর কহিল,—আছে। আইন বাঁচিয়ে সেই উপায় করবো, ফন্দী ঠিক করে রেখেচি…এই ছাখো লেখাপড়া…

একটা কাগজ চন্দর বলাইয়ের হাতে দিল। বলাই পড়িল—

১৫ই বৈশাখ তারিখে সন্ধ্যা ৬৷০টায় আমি কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করিতে ৮৭নং বকু বাবুর্চ্চির লেনে হাজির হইব। যদি কোন কারণে অপারগ হই, তাহা হইলে উক্ত কন্যাকে বিবাহের সর্ব্ব দাবী আর যৌতুকাদি বিষয়ের সকল দাবী হইতে বঞ্চিত হইব। এতদর্থে সুস্থচিত্তে সরলমনে বিনানুরোধে এই অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

শ্রীমধুসূদন শাহা বণিক্য
সাং কশাগটুলি, ঢাকা।

বলাই কহিল,—আইন মোতাবেক হবে তো?

চন্দর কহিল,—নিশ্চয়। হিন্দু আইনে বলে, বিবাহ হয়ে গেলে তার আর নড়চড় নেই…ও যদি গরহাজির হয় তো আমাদের বিরুদ্ধে কেশ করতে পারবে না। যে মেয়ের চেহারা দেওয়া হয়েচে তেলের সঙ্গে, তার সঙ্গেই বিয়ে দেবার কথা। অন্য মেয়েকে ও দাবী করতে পারবে না।

বলাই কহিল,—তার পর আমার মেয়ে?

চন্দর কহিল,—সে পাত্র আমি ঠিক করবো…তোমার বাড়ীতেই বিয়ের আয়োজন করো…

বলাই কহিল,—তার পর এদিকে?

চন্দর কহিল,—এখানে সে ও-রাত্রে আসবেই না।

বলাই কহিল,—তার মানে?

চন্দর কহিল,—বন্দোবস্ত যা হয়েচে, তা একদম পাকা! বুড়ো ব্যাটার বিয়ের সখ হয়েচে—না? সখ মেটাচ্ছি।

বলাই বড়বাবুর কাছে ছুটিল। বড়বাবু পাত্রের বাড়ী তাকে লইয়া চলিলেন। পাত্র বাড়ী ছিল, দেখা হইল। পাত্রটি ভালো…বলাই তাকে একান্তে ডাকিয়া কহিল,—কিন্তু একটু মুস্কিল আছে বাবা…

পাত্রের নাম সন্তোষ। বেশ ফুট্‌ফুটে ছোকরা, বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রদীপ্ত দুই চোখ। সন্তোষ কহিল,—আশু বাবুর মুখে শুনেচি সব।

আশু বাবু বলাইয়ের অফিসের বড়বাবু। বলাই কহিল,—সব জানো, তা হলে?

সন্তোষ কহিল,—জানি। শুধু চন্দর বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন…

বলাই কহিল,—দেবো, কালই আমি তাকে এখানে আনবো।

তাই হইল। সন্তোষের এক বন্ধু সুকুমার মাসিকে গল্প লেখে। প্লটগুলির গাঁথুনি বেশ সুচতুর। সে কহিল,—আমি বুড়ো বরকে আনন্দ দেবো!…সকলে নিশ্চিন্ত থাকো…

১৫ই বৈশাখ বুড়া মধুসূদন নগদ টাকা খরচ করিয়া সাবান কিনিল, জামা-কাপড় কিনিল, পাম্প-শু কিনিল; নাপিত ডাকিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইল। দুপুরবেলায় সুকুমার আসিয়া কহিল,—আজ যে আইবুড়ো ভাত। পাঁচরকম ভালো জিনিষ খেতে হয়—তা মেয়ে ইংরিজি মেজাজের কি না! আপনি একটু কাঁটা-চামচ ধরতে শিখুন…

মধুসূদন কহিল,—হঃ!

ট্যাক্সিতে করিয়া মধুসূদনকে লইয়া সুকুমার প্রথমে গেল হোটেলে, তার পর চিড়িয়াখানায়, তার পর ইডেন গার্ডেনে, সেখান হইতে এক বন্ধুর গৃহে। চা আসিল, সঙ্গে আরও কত কি। সেখানে আলোচনা চলিতেছিল—মানুষের বয়স কমানো যায় কি করিয়া, তা লইয়া। এক জন সাহেব-বেশী

যুবা কহিল,—এমন ইঞ্জেক্‌সন্‌ আছে, যাতে বার্দ্ধক্য দূর হয়…

সুকুমার কহিল,—বলো কি! তা মধুসূদন বাবু দেখবেন? তরুণী স্ত্রীর অপছন্দর কোনো কারণ থাকে না তা হলে…

মধুসূদন কহিল,—হুঃ!

সুকুমার কহিল,—আজ যদি ইনি ওষুধ ব্যবহার করেন?

ডাক্তার কহিল,—তা হলে কাল সকালেই রূপান্তর সুরু হবে!

মধুসূদন কহিল,—বটে! আমি যদি ঔষধি লই?

ডাক্তার কহিল,—হবে।

ইঞ্জেক্‌সন্‌ দেওয়া হইল। তার পর মধুসূদন চলিল বাসায় ঢাকা-পটীতে।

সুকুমার কহিল,—চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নিন—আমি আস্‌চি…

মধুসূদন বিছানায় বসিল—ঘুম আসিতেছিল। ঐ বাবুটি তো লইতে আসিবেন! মধুসূদন শুইল। শুইবামাত্র নিদ্রা…মরফিয়া তার কায সুরু করিয়া দিয়াছে।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রৌদ্রের আলো ফুটিয়াছে। আজ ১৬ই বৈশাখ—না, ও জ্যোৎস্নার আলো? মধুসূদন চোখ রগড়াইয়া বাহিরে ছোটবারান্দায় আসিল। না, এ রৌদ্রই! ১৫ই বৈশাখ না? নামিয়া পথে আসিতে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী মিলিল। সেটায় চড়িয়া সে আসিয়া হাজির হইল চন্দরের বাসায়। চন্দর বাসায় নাই। মধুসূদন বসিয়া রহিল।

বেলা বারোটা। চন্দর আসিল। মধুসূদন ডাকিল, —মুশয়…

চন্দর ধমক দিয়া উঠিল,—জোচ্চোর বুড়ো, কোথায় পালিয়ে বসেছিলে? এ তোমার কশাইবাজার পেয়েচো, বটে! তোমায় পুলিশে দেবো…বিয়ে কর্‌বে বলে কথা দিয়ে এমন জুচ্চুরি? দেখাচ্ছি মজা!

মধুসূদন কহিল,—আরে, গোসা করেন ক্যান্‌?

চন্দর কহিল,—গোসা! গোসা দেখাচ্ছি! জোচ্চোর, তুমি শাহা-বণিক্য? কথনই নও—তুমি ম্যাথর-মুর্দ্দাফরাস…

মধুসূদন কহিল,—গাল স্থান ক্যান্‌ মুশয়?

চন্দর কহিল,—ভারী রাগ হচ্ছে আমার। এই বেলা সরে পড়ো, না হলে পুলিশ ডাকবো। বিয়ে-ভাঙ্গা! জানো, তাতে তিন বছর জেল হয়।

মধুসূদন সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইল, কহিল,—অঃ!

চন্দর কহিল,—আবার অঃ! র, তবে দেখাচ্ছি। বিনোদ, পুলিশ ডাকো তো…জোচ্চোর ব্যাটা এসেচে। যদি লিখে দাও যে, নিজের ইচ্ছায় বিয়ের দাবী-টাবী সব তুলে নিয়েচো, তবেই ছাড়বো, না হলে…

মধুসূদন কহিল,—চুপ স্থান,যাতেছি। ল্যাখবো না ক্যান্‌? যা চ্যান্‌ লেখাই স্থান্‌। লিখ্যায়ে ছাড়ি স্থান্‌।

দাবীত্যাগ লিখিয়া পড়িয়া মধুসূদন ধীরে ধীরে বিদায় লইল। চন্দর উচ্চহাস্যে ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

ও-দিকে বলাইয়ের গৃহে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, কুশণ্ডিকা এখানেই সারা হইবে। সন্তোষের মা নাই। এত দ্রুত বিবাহ হওয়ার জন্য তার ভগ্নীরাও শ্বশুরালয় হইতে কেহ আসিয়া পৌছায় নাই—সেখানে কে করে, কে দেখে, তাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি *

(বন্ধু-বিয়োগে)

[ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের তিরোভাবে]

ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের সহিত আমি জীবনব্যাপী বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। তিনি আমার সহপাঠী, সমব্যবসায়ী এবং নানা অনুষ্ঠানে আমার সহকর্ম্মী ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে এবং "মানুষ" হিসাবে তাঁহাকে জানিবার আমার যথেষ্ট অবসর ঘটিয়াছিল। তাঁহার জীবনে অনেক বিষয় শিখিবার আছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কবি গাহিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে
সর্ব্বজন।"

ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ
জন্ম—৮ই ভাদ্র, ১২৬৫ সাল। মৃত্যু—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল

ডাক্তার বিপিনবাবুর সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার জনহিতব্রতে উৎসৃষ্ট সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন, তাঁহার উন্নত ও পবিত্র চরিত্র, তাঁহার মধুর স্বভাব এবং তাঁহার অকপট সৌজন্যগুণে তিনি তাঁহার বেষ্টনীর মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের মনোমন্দিরে আজীবন পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার তিরোভাবের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত লোক সেই নিত্যপূজা বন্ধ করিবে না।

পরমবৈষ্ণব ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সাফল্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন :—

"তুলসী যব জগ্‌মে আয়া জগ্‌ হাসে তোম্‌ রোয়।
এ্যসা করনি কর্‌ চলো তোম্‌ হাসো জগ্‌ রোয়॥"

ইহার ভাবার্থ এই :—তুমি যখন মাতৃগর্ভ হইতে এই রোগ-শোক-জরা-মরণ-প্রপীড়িত জগতে ভূমিষ্ঠ হইলে, তখন তোমার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া কেবল একমাত্র তুমিই কাঁদিয়াছিলে, তোমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অপর সকলেই তোমার আগমনে উৎফুল্লচিত্ত হইয়া তোমাকে অভিনন্দন করিয়াছিল। হে দুর্ল্লভ-মনুষ্য-জন্মের অধিকারী জীব, তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব জীবনের এরূপ সদ্ব্যবহার করিও যে, যখন তোমার শেষ দিন উপস্থিত হইবে, তখন যেন সমস্ত জগৎ তোমার গুণ ও কর্ম্ম স্মরণ করিয়া তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, আর তুমি যেন তোমার জীবনের পূর্ণতা ও সাফল্য উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে ভব-জলধির পারে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামে জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামসুখ লাভ করিবার জন্য গমন করিতে পার।

ডাক্তার বিপিনবাবুর জীবনে ভক্তকবির এই মহদ্বাণী পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

বিপিন বাবুর তিরোভাবের দিন যে করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, তাহার চিত্র চিরদি-

* ১৯২৯, ৮ই জুন তারিখে শ্যামবাজার, এ, ভি, স্কুলে আহূত শোকসভায় পঠিত।

উজ্জ্বলবর্ণে আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। আজিও কলিকাতা সহরে কত শত ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইতেও অধিকতর "আপনার জন" বিপিন বাবুকে হারাইয়া আকুল হৃদয়ে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এখনও কত অসহায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার মৃত্যুতে "পিতৃহীন হইলাম" বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। কত শত দারিদ্র্য-প্রপীড়িত নর-নারী "চিকিৎসার জন্য আর কাহার কাছে দাঁড়াইব, কে দয়া করিয়া বিনা ভিজিটে সুচিকিৎসা দ্বারা ও মিষ্ট কথায় আমাদের রোগ-যন্ত্রণা দূর করিয়া দিবে এবং আমাদের প্রিয়জনকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে", ইহা মনে করিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে। যে দিন তাঁহার পবিত্র দেহ সংকারের জন্য শ্মশান-ঘাটে নীত হইয়াছিল, সে দিন পথে ঘাটে কত লোককে তাঁহার গুণ ও তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, "তাঁহার মৃত্যুর অগ্রে আমাদের মৃত্যু হইল না কেন", বার বার এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া, তাঁহার প্রতি তাহাদের হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি। তখন মনে হইয়াছিল যে, বিপিন বাবুর মৃত্যুর মত মৃত্যু বাঞ্ছনীয়; নিতান্ত সৌভাগ্যবান ও পুণ্যবান্ না হইলে কোন মানুষ এরূপ মরণের অধিকারী হইতে পারে না। ডাক্তার বিপিন বাবু তাঁহার জীবন-যাত্রার পথে যেরূপ সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, মরণেও তাঁহার পুণ্যাত্মা জয়মাল্য শিরে ধারণ করিয়া অনন্তধামের যাত্রিরূপে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি জীবনে ও মরণে ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা বিপিন বাবুর শেষ রোগশয্যার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তিনি রোগের প্রারম্ভ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এতদিনে তাঁহার ইহজীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, জীবনের পরপারে যাইবার জন্য তাঁহার ডাক আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ চিকিৎসক-বন্ধু-মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায়, ঔষধ বা পথ্যাদি প্রয়োগে অথবা আত্মীয়-স্বজনের প্রাণপাত সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা এ যাত্রায় কোন শুভ ফললাভ হইবে না। এই জন্যই তিনি কোন ঔষধ বা পথ্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা নিতান্ত অনিচ্ছা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন। এবারে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি স্থির জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণকে ইঙ্গিতে, কার্য্যে ও স্পষ্ট কথায় অনেক বার তাঁহার ধারণা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহার দেহে মৃত্যুর ছায়া পতিত হইলেও উহা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অন্তরে কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে নাই। তিনি প্রথম হইতেই মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং যথাসময়ে মৃত্যুকে অতি নিকট-আত্মীয়ের ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা, মৃত্যুর কঠোরতা, মৃত্যুর অনিশ্চিততা, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভীত, ত্রস্ত বা ব্যথিত করিতে পারে নাই। প্রকৃত ভক্ত ও সাধকের ন্যায় তিনি তাঁহার সারা-জীবন ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য-সাধনার্থে নিয়োগ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপনান্তে তিনি প্রকৃত সাধকের ন্যায় ভববন্ধনের মুক্তিদাতা মৃত্যুকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া, যেখানে রোগ শোক জরা মরণ নাই, যেখানে কেবল ভূমানন্দ ও চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে, সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত অনন্তধামে গমন করিয়া তাঁহার চির-বাঞ্ছিতের সামীপ্য, সাযুজ্য ও সালোক্য উপভোগ করিতেছেন। সাধু পুরুষ কিরূপে নির্ভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তাহা তিনি মরণ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন রোগের অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তিনি কচিৎ তাহা মুখে প্রকাশ করিতেন। তিনি দিবা রাত্রি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এবং মুখ বুজিয়া নীরবে শুইয়া থাকিতেন, কাহারও সহিত প্রায় বাক্যালাপ করিতেন না। আমাদের সকলেরই মনে হইত যে, তিনি যেন সর্ব্বদা ঘুমাইতেছেন। ঔষধ ও পথ্য দিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিলে তিনি অনেক সময়ে মুখে কিছু না বলিয়া কেবল হাত নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতেন। আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি তাঁহার সময় আগত জানিতে পারিয়া নিদ্রা-চ্ছলে তাঁহার ইষ্টদেবের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং কোন সূত্রে কাহারও দ্বারা সেই তন্ময়তা হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিতেন না। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন একনিষ্ঠ, ভক্ত, গৃহী শিষ্য ছিলেন। ঠাকুরের বিবিধ গভীর জ্ঞানপ্রসূত সরল উপদেশ তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে গভীর রেখায় অঙ্কিত ছিল। ঠাকুর সর্ব্বদা বলিতেন, "মৃত্যুর সময় যে ব্যক্তি যে ভাবনা করে, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।" আমরা এখন

বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহার গুরুদেবের এই উপদেশ অনুসারে রোগশয্যায় ইষ্টদেবের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা বিপিন বাবুর মনে শেষ-মুহূর্ত্তে স্থান পায় নাই। ব্রহ্মে সমর্পিত তাঁহার আত্মা যে অতি উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন এবং কেবল এই কারণেই তাঁহার বিচ্ছেদজনিত কঠোর ক্লেশ ভোগ করিয়াও আমরা তাঁহার উন্নত পারলৌকিক জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়া এই গভীর দুঃখের মধ্যে মনে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায় ৫ম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঠিক এই কথারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

"অন্তকালে চ মামেবং স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়॥"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"অন্তকালে যেই জন দেহমুক্ত হয়
মোরে স্মরি, আমারে সে পায় নিঃসংশয়॥"

আমরা বাল্যকালে "মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি" নামক কবিতায় পাঠ করিয়াছি :—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" ইত্যাদি।

এবং জগদ্বিখ্যাত স্কট্লণ্ডের কবি সার্ ওয়াল্টার্ স্কটের মৃত্যুশয্যার গৌরবমণ্ডিত নির্ভীক উক্তি—"See how a Christian dies"—তাঁহার জীবনীতে পাঠ করিয়াছিলাম। পরম হিন্দু, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও সাধুজীবন বিপিন বাবুকে শান্তচিত্তে নির্ভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিপিন বাবু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট হুগলীর অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত ঘোষ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ২৩শে মে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ৯ মাস হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার আঁটপুরের বাড়ীর পূজার দালানে একখানি পাল্কির মধ্যে বসিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের "আশ্বিনে ঝড়ের" তাণ্ডব নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রথমে ব্যবসা ও পরে চাকরী করিতেন। যদিও তাঁহার উপার্জ্জন অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রীতি, উদারতা ও সেবার ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটায় তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যবসা-স্থান ছিল। তখন আঁটপুর হইতে যে কেহ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিত, তাহাদের সকলকেই পূর্ণ বাবুর বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইত এবং তিনি অতি যত্নের সহিত তাহাদের সেবা করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির চেষ্টা করিতেন। স্বগ্রামবাসিগণের প্রতি পিতার এই প্রীতি ও সেবার ভাব পুত্র বিপিন বাবুতে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। বিপিন বাবু তাঁহার উন্নত অবস্থার সময়ে তাঁহার গ্রামবাসিগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় গ্রামস্থ মিড্ল্ ইংলিস্ স্কুলটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করিতেছে। তিনি এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ উপলক্ষে ২ হাজার টাকা এবং স্থায়ী তহবিলে ৪ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষকদিগের বেতনাদি ব্যয়সঙ্কুলনার্থে এই বিদ্যালয়ে তিনি মাসিক ৫৫৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিতেন। যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে স্কুলটি অর্থসাহায্যে বঞ্চিত না হয়, তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ৺শশীভূষণ ঘোষ মহাশয় গ্রামে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। বিপিন বাবু সেই সংস্কৃত টোলটির রক্ষার জন্য বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি তথায় একটি এণ্টিম্যালেরিয়াল্ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর শাখা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই সমিতির কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। দেশে প্রতি বৎসর তাঁহার বাড়ীতে ৺শারদীয়া পূজা হইত। তিনি সপরিবারে পূজা উপলক্ষে দেশে যাইয়া পূজা-বাটীতে নিকট-আত্মীয়ের মত সমস্ত গ্রামবাসীদিগের সমাদর, যত্ন ও সেবা করিতেন এবং সকল সময়েই গ্রামবাসীদিগের পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ সকল বিষয়েরই সঠিক সংবাদ লইয়া সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। আজকাল দেশের বাসস্থানের প্রতি অনেকেরই আকর্ষণ বা অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহাই আমাদের পল্লীগ্রামগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ

বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মনের ভাব ও ব্যবহার আধুনিক চিন্তার ধারা ও অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। জন্মস্থানের প্রতি তিনি চিরদিন হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন।

আঁটপুরের পাঠশালায় বিপিন বাবুর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি উক্ত গ্রামস্থিত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা জোড়াসাঁকোর নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুরের ব্রাঞ্চ স্কুল্ হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখনকার জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিউসন্ (এখনকার Scottish Churches College) নামক কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে এফ্-এ পাশ করিয়া (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) মেডিকাল্ কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি আজন্ম ক্ষীণদেহ থাকিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। তবে বাল্যকালে একবার বসন্তরোগে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল এবং সে সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। তখন তাঁহার মাতা তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যাকে লইয়া মহাপ্রাণ দেবর ৺গুরুচরণ ঘোষ মহাশয়ের আশ্রয়ে বৃন্দাবন বসাকের লেনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য ৺গুরুচরণ ঘোষের পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল একমাত্র কন্যা ছিল। ৺গুরুচরণ ঘোষ এক জন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অতি সদাশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বেঙ্গল্ হাইড্রলিক্ প্রেসের ম্যানেজ্যার্ ছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিনি পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যাগণকে নিজ গৃহে রাখিয়া সন্তানরূপে প্রতিপালন এবং তাহাদের সুশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে উপযুক্ত পাত্রী ও পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। বিপিন বাবু তাঁহার স্নেহময় খুল্লতাতের এই গভীর স্নেহ ও দয়ার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই নিজেকে তাঁহার খুল্লতাত ও তাঁহার পরিজনবর্গের সেবায় কায়মনোবাক্যে নিয়োগ করিতেন।

যখন তাঁহার সাংঘাতিক বসন্তরোগ হইয়াছিল, তখন তাঁহার মাতৃসমা খুল্লতাত-পত্নী দিবারাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার খুল্লতাত-পত্নী ও তাঁহার এক ভগিনী আঁটপুরে যাইয়া অকস্মাৎ কলেরা-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন আঁটপুরে রেলপথ ছিল না। আত্মীয়-স্বজনগণ কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যখন রাত্রে আঁটপুরে পৌছিলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নীত হইয়াছে। বালক বিপিন এই ঘটনায় অত্যন্ত শোকার্ত্ত ও বিচলিত হইয়াছিলেন এবং সুচিকিৎসার অভাবে তাঁহার খুল্লতাত-পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় এই সময় হইতেই, ভবিষ্যতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, এই সঙ্কল্প তিনি তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়াছিলেন।

বিপিন বাবু মেডিক্যাল কলেজের এক জন মেধাবী, যশস্বী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া পদক, পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র (Honours Cartificate) লাভ করিয়াছিলেন :—

(১) রসায়ন-বিজ্ঞান (Chemistry)…ম্যাক্‌নামারা-পদক।
(২) শারীর-বিজ্ঞান (Physiology)…১ম প্রশংসাপত্র।
(৩) ঐ (প্রাকৃটিকাল্)…অণুবীক্ষণ যন্ত্র।
(৪) ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia Madica) ৩য় প্রশংসাপত্র।
(৫) প্যাথলজি (Pathology)…১ম প্রশংসাপত্র!
(৬) ধাত্রী-বিদ্যা (Midwifery)…৩য় প্রশংসাপত্র।
(৭) চিকিৎসা-তত্ত্ব (Medicine)…২য় প্রশংসাপত্র।
(৮) অস্ত্রচিকিৎসা ক্লিনিকাল্ (Clinical Surgery)… সার্জ্জিকাল্ পকেট কেস্ (Surgical pocket case)
(৯) দন্ত-চিকিৎসা (Dentistry)…এক সেট্ টুথ ফর্সেপ্স (A set of Tooth forceps)।

তিনি পুস্তক অধ্যয়ন অপেক্ষা হাঁসপাতালে রোগ-পরীক্ষার কার্য্যে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এই সু-অভ্যাসের জন্য তিনি রোগনির্ণয়-ব্যাপারে এবং উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক সহপাঠিগণ অপেক্ষা ছাত্রাবস্থাতেই সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপকগণের প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাঁসপাতাল দেখিবার নির্দ্দিষ্ট সময় প্রাতঃকাল হইলেও তিনি প্রত্যহ বৈকালে, লেক্‌চার

শেষ হইবার পর, হাঁসপাতালে যাইয়া তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রোগীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নূতন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিসাধন করিতেন। তাঁহার এই অধ্যবসায়, উৎসাহ, জ্ঞানপিপাসা ও পরিশ্রমের জন্য মেডিক্যাল্ কলেজের তখনকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকনেল্ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিয়া রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক গুরু বিষয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিতেন। ডাক্তার ম্যাকনেলের ওয়ার্ডের যাবতীয় রোগীর মূত্র-পরীক্ষার ভার ডাক্তার বিপিন বাবুর উপর অর্পিত ছিল। তিনি অতি প্রত্যূষে হাঁসপাতালে যাইয়া সে দিন যে যে রোগীর মূত্র-পরীক্ষার আবশ্যক, তাহা তিনি অগ্রে সম্পন্ন করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার ম্যাকনেল যথাসময়ে আসিয়া রোগীদিগকে পরীক্ষা করিয়া, বিপিন বাবুর মূত্র-পরীক্ষার ফল দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। এই সময়ে তিনি বিপিন বাবুকে একটি নূতন গবেষণা-কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। মূত্রের সহিত আমাদের দেহের মধ্য দিয়া ইউরিয়া (Urea) নামক এক প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। এই পদার্থই য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় লোকের মূত্রে বিভিন্ন পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে কেহ কোন বিশেষ পরীক্ষা করেন নাই। ডাক্তার ম্যাকনেলের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে, মাংসভোজী য়ুরোপীয় অপেক্ষা প্রায় নিরামিষভোজী ভারতবাসীর মূত্রে ইউরিয়া অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে থাকা উচিত। তিনি এই পরীক্ষার ভার প্রিয় ছাত্র বিপিন বাবুর উপর অর্পণ করেন এবং বিপিন বাবু প্রশংসনীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত এই গবেষণা-কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, মাংসভোজী ইয়োরোপীয়দিগের মূত্রে গড়ে শতকরা ২½ ভাগ ইউরিয়া থাকে এবং নিরামিষাশী ভারতবাসীর মূত্রে গড়ে শতকরা ১ ভাগের অধিক ইউরিয়া থাকে না। ডাক্তার ম্যাকনেল্ বিপিন বাবুর এই গবেষণা-কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং ছাত্র-জীবনের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ ছিল। ছাত্র-জীবনে বিপিন বাবুর এই গবেষণা-কার্য্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারী চাকরী লইয়া কিছু দিনের জন্য বিহার প্রদেশে গমন করেন। চিকিৎসায় কৃতিত্ব দেখাইয়া উক্ত প্রদেশে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতে চাহিলে তিনি তথায় যাইতে অস্বীকার করেন এবং গভর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা সহরের উত্তর-প্রান্তে ও কাশীপুরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অযাচিতভাবে কত অর্থ, যশ ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার প্রতি সাধারণের কিরূপ গভীর অচল অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন, সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার যেটুকু বিশেষত্ব ছিল, সংক্ষেপে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বিপিন বাবু এক জন প্রাচীন প্রথায় বিশ্বাসী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত, খ্যাতনামা, সর্ব্বজনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে গেলে মানুষের যে তিনটি গুণের বিশেষ প্রয়োজন---যথা, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক, প্রশস্ত-হৃদয় এবং সরস-রসনা---প্রকৃতিদেবী বিপিন বাবুকে এই তিনটি গুণে ভূষিত করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্যপ্রকাশ করেন নাই। রোগনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অমূল্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রোগ-নির্ণয় হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে নানা নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তিনি এই প্রথাগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে উহাদিগের সাহায্য লইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তবে তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সুচিকিৎসকের, রোগের লক্ষণ দেখিয়াই রোগ-নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া উচিত। লক্ষণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কতকগুলি বাহিরের পরীক্ষা দ্বারা রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে চিকিৎসকের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য করা হয় না এবং রোগনির্ণয় সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। উদাহরণ স্থলে তিনি বলিতেন যে, যক্ষ্মা-রোগের বিবিধ লক্ষণ ও রোগীর ফুসফুস্ পরীক্ষা করিয়া অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসকের প্রকৃত রোগনির্ণয়ে সমর্থ হওয়া উচিত; রোগীর কফ বা নূতন

আলোকরশ্মিসংযোগে তাহার ফুস্‌ফুস পরীক্ষা অথবা টিউবার্কুলিন্ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সুচিকিৎসকের উচিত নহে। প্রত্যেক রোগীর রোগের লক্ষণ দেখিয়া রোগনির্ণয় করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও মানসিক শক্তি সমাহিত করিতেন। এই সুঅভ্যাসের ফলে তিনি কতকগুলি রোগে (বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্‌ঘটিত এবং জ্বরাদি রোগে) কলিকাতার সুবিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধেও তিনি প্রাচীন মতাবলম্বী ছিলেন। প্রাচীন প্রথামত অনেক স্থলেই তিনি মুখ দিয়া ঔষধ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে "ফোঁড়া-ফুঁড়ির" বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। আজকাল "সিরাম্," "ভ্যাক্‌সিন্" প্রভৃতি বাক্টেরিয়াজাত নানা ঔষধ রোগনির্ণয়, রোগপ্রতিষেধ এবং রোগ-আরোগ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি যে এই সকল ঔষধ একেবারেই ব্যবহার করিতেন না, তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে ঐ সকলগুলিই তিনি যথা সময়ে ও যথা-স্থানে প্রয়োগ করিতেন, তবে এই সকল অত্যন্ত শক্তিশালী ঔষধ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া রুটীন্ (Routine) হিসাবে তিনি কখন ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, এই সকল শক্তিশালী ঔষধ শরীরের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, তাহা এখনও কাহারও ভালরূপে জানা নাই, সুতরাং উহাদিগকে সংযত ভাবে ব্যবহার করাই উচিত। এই সকল নূতন ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহার না করিয়াও তাঁহার চিকিৎসার ফল অতি উৎকৃষ্ট ছিল। আমরা জানি যে, তাঁহার শান্ত ধীর চিকিৎসার গুণে কঠিন রোগে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তিই আরোগ্যলাভ করিত।

চিকিৎসায় তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার "হাত-যশ"ও সেইরূপ ছিল। তাঁহার সুচিকিৎসার প্রতি লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তিনি রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিলেই রোগীর আত্মীয়-স্বজনের সকল ভাবনা দূর হইয়া যাইত এবং রোগী তাঁহাকে দেখিলেই মনে করিত যে, তাহার অর্দ্ধেক ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে। মনের প্রফুল্লতা রোগ আরোগ্য হইবার যে একটি প্রধান ঔষধ, ইহা চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিপিন বাবুর আগমনে এবং তাঁহার হাসি-তামাসা "ফষ্টি-নষ্টিতে" রোগীর চিত্তের অবসাদ ও নৈরাশ্য একেবারেই দূর হইয়া যাইত। বিপিন বাবুর সরস ব্যবহার, রোগীর তাঁহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাঁহার প্রদত্ত ঔষধের ফলে রোগের যন্ত্রণা সত্বর উপশমিত হইয়া রোগী শীঘ্র আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইত। অনেক স্থানেই তাঁহাকে পাইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন আর কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিতেন না। আমি এ স্থলে যাহা বলিলাম, তাহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে।

বিপিন বাবু এ কালের লোক হইলেও তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন কালের আদর্শ হিন্দুগৃহস্থ ছিলেন। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, বন্ধু, প্রতিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য তিনি আমাদের প্রাচীন সমাজের আদর্শ অনুসরণ করিতেন এবং ইহাই তাঁহার পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। সংসারে অনেক শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহাকে প্রপীড়িত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা এবং তাঁহার মধুর প্রকৃতি এক দিনের জন্যও কোনরূপ অশান্তি বা বিপৎপাতে তাঁহার চিত্তকে অবসন্ন হইতে দেয় নাই। কি সুখ, কি দুঃখ, এই উভয়কেই তিনি ভগবানের দান বলিয়া শান্তচিত্তে বিশ্বাসী-হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন ; ইহার জন্য কখনও তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য বা চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। তিনি এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং সম্পন্ন হিন্দুগৃহস্থের যে সকল আস্‌বাবের অবশ্য প্রয়োজন, তাহার কোনটিরই তাঁহার অপ্রতুল ছিল না। তাঁহার ক্ষেত্রে শস্য ছিল, তাঁহার গোলায় ধান ছিল, তাঁহার বাগানে বিবিধ ফল ও তরকারী উৎপন্ন হইত, তাঁহার পুকুরে মাছ ছিল, গোশালায় গরু ছিল এবং মোটার থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্বশালায় একটি অশ্ব যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে দেখিয়াছি। দেশের বাটীতে দুর্গোৎসব হইত, ঘাটশিলায় তাঁহার বিশ্রাম-ভবন ছিল এবং হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৺কাশীধামে শেষ-জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য সংকল্প করিয়া মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তথায় একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ-কার্য্যে

স্বামী বিবেকানন্দ

হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও অনেক বিষয়ে তিনি উদারমত পোষণ করিতেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী-গণকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখাইয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি দৌহিত্রী মেট্রিক্ পাস করিয়া এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণ ইংরাজী স্কুলের উচ্চ-শ্রেণী-ভুক্ত ছিল এবং এখন একটি দৌহিত্রী মেট্রিকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি সবিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহী ছিলেন।

বিপিন বাবু এক জন প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত অতিশয় উদার ছিল। এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন পরম ভক্ত গৃহী শিষ্য ছিলেন এবং ধর্ম্মবিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেন। স্বধর্ম্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকল ধর্ম্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তিনি রাম-কৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের পরম বন্ধু ছিলেন এবং মিশনের এক জন অকপট হিতকারী বন্ধু, কর্ম্মী ও সহায়ক ছিলেন। পরমহংস দেবের প্রিয়শিষ্য প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী বেলুড় মঠের স্বর্গীয় প্রেমানন্দ স্বামী তাঁহার এক জন অতি নিকট-আত্মীয় ছিলেন। ইনি সাধারণের নিকট "বাবুরাম মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু তাঁহার সন্ন্যাসপ্রেমের সার্থক নামকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভগবদ্প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং প্রেমানন্দে তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকিত।

চিকিৎসক হিসাবে মিশন্ বিপিন বাবুর নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। মিশনভুক্ত যে কোন ব্যক্তির অসুখ হইলে তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিতেন। বেলুড় মঠের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে তিনি এক জন প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। মঠের যাবতীয় উৎসব ও

স্বামী প্রেমানন্দ

বেলুড় মঠ

ষ্ঠানে তিনি যোগদান এবং যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করি-ন। তাঁহার মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মিশন এক জন অকপট ঙ্কাক্ষী বন্ধু হারাইয়াছেন।

বিপিন বাবু ধর্ম্মভাবের প্রেরণা লইয়া জীবনের সকল য্য সম্পাদন করিতেন। ইহারই জন্য তিনি পার্থিব নে এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পোষিত ধর্ম্মভাবের সহিত তাঁহার কৃত কার্য্যের কখন থাও অমিল দেখা যাইত না। ধর্ম্মভাব কেবল ভাবেই র নিকট পরিণতি লাভ করে নাই, তিনি ঐ ভাব র সাংসারিক জীবনের সকল কার্য্যেই প্রতিফলিত তে চেষ্টা করিতেন এবং এ বিষয়ে তিনি সবিশেষ কৃত-হইয়াছিলেন। এই উচ্চ ধর্ম্মভাবই তাঁহার জীবনের লার মূলে অবস্থিত ছিল এবং ইহারই জন্য তিনি াকে অত সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়া-ন।

বিপিন বাবুর আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ শাদা-ধরণের ছিল। তিনি অতি পরিমিতভোজী এবং চিত খাদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব-দিগের বাটীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিলেও কদাচ তথায় আহার সম্পন্ন করিতেন। নিজ বাটীতে ভোজ্যের কিয়দংশ ছোট ছোট নাতি-নাতনীদিগকে না দিয়া তিনি কখন কিছু খাইতেন না। এক বেলা চা পান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; গরম দুধে চা দিয়া তিনি প্রাতে উহা পান করিতেন। গুড়গুড়িতে তামাক টানা তাঁহার একটি অতি প্রিয় অভ্যাস ছিল। তামাক ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে তিনি উৎকৃষ্ট বিচারক ছিলেন। তাঁহাকে রোগীর বাটীতে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে হইলে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিলেই রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মনোরথ সিদ্ধ হইত।

ছাত্রজীবনে এবং চাকরীর সময়ে আমরা তাঁহাকে পেন্‌টুলেন্‌-চাপকান্ পরিতে দেখিয়াছি। উত্তরকালে তিনি কিছু দিন পেন্‌টুলেন্ ও পার্শি কোট ব্যবহার করিতেন। ইদানীন্তন বহুদিন তিনি ধুতি ও লম্বা কোট পরিতেন এবং "পাকান" উড়ানি তাঁহার গলদেশে লম্বমান থাকিত। শীত-কালে তিনি শাল বা আলোয়ান ব্যবহার করিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমি তাঁহাকে

সামান্ত ময়লা কাপড় পরিতে কখন দেখি নাই। আগে কলিকাতায় বড় ডাক্তারদিগের মধ্যে স্বর্গত মহেন্দ্রলাল সরকারকেই আমরা ধুতি পরিতে দেখিয়াছি। ইদানীং ডাক্তার বিপিন বাবু কলিকাতার "ধুতিপরা" বড় ডাক্তার ছিলেন।

বিপিন বাবুরা তিন ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গণেশচন্দ্র ঘোষ চাকরী করিতেন এবং শেষ জীবনে কাশীধামে বাস করিয়া তথায় দেহরক্ষা করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শশিভূষণ ঘোষ পাট ও দড়ির ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক দিন বিপিন বাবু ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা এক সংসারে ছিলেন। তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। বিপিন বাবু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পি এণ্ড ও কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট্ ষ্টোর্ কীপার্ খিদিরপুর নিবাসী গিরিশচন্দ্র দেবের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তাঁহার মধ্যমা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করিয়াছিল। তাঁহার দুই কন্যা বাল-বিধবা; উভয়েই সন্তানবতী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা চিকিৎসক; ইনি ভবানীপুরে চিকিৎসা করেন। কনিষ্ঠ জামাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক; ইনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ উপাধিধারী এবং ময়াট্ মেডালিষ্ট্। জ্ঞানোপার্জ্জন উপলক্ষে ইনি সম্প্রতি আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। বিপিন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র কনট্রাক্টারের কায করেন, মধ্যম-পুত্র ঘাটশিলায় আবাদের তত্ত্বাবধান করেন, কনিষ্ঠ পুত্র মেডিক্যাল কলেজের **sixth year**এর ছাত্র। বিপিন বাবু তাঁহার বিধবা পত্নী, তিন পুত্র ও চারি কন্যাকে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট তাঁহাদের এই ঘোর বিপদে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচুনিলাল বসু

ডাক্তার বিপিন বাবু কলিকাতায় নানা সৎকার্য্যের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। আমাদের এই বিদ্যালয়ের তিনি একজন হিতকামী বন্ধু, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি কলিকাতা অনাথ আশ্রমের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য, কলিকাতা এণ্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর এক জন ডিরেক্টর্ এবং কলিকাতা মেডিক্যাল্ ক্লাবের এক জন সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রামস্থ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ সভার সভাপতি, শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট্ সোসাইটী ও বিবেকানন্দ সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং ব্রিটিশ মেডিকাল এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন এসোসিয়েশনের সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা ব্লাইণ্ড্ স্কুল, গোবিন্দকুমার হোম্ প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ-সাহায্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে কলিকাতার অনেকগুলি কল্যাণপ্রদ প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং অনেক দরিদ্র কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি, অনেকানেক অসহায়া বিধবা রমণী ও বহু অনাথ বালক-বালিকা নিরাশ্রয় হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে চিকিৎসক হিসাবে এবং অন্য সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

আজ আমরা তাঁহার উন্নত আদর্শ ও পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য এই মহতী সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি। স্থায়িভাবে তাঁহার মর্য্যাদার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করাও আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য আপনাদিগের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া আমার এই বহু ত্রুটিপূর্ণ বক্তব্যের উপসংহার করিলাম।

শ্রীচুনিলাল বসু।
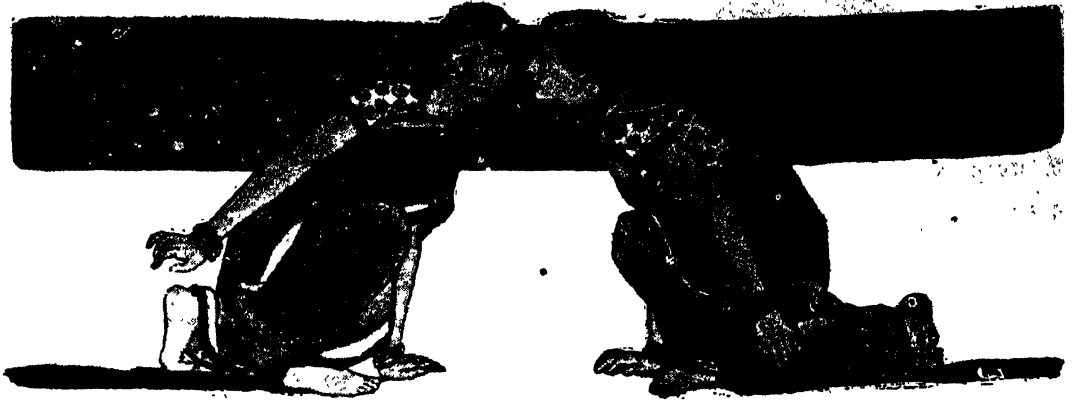
সোনার পাহাড়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

পাগলা ছুতোরের কাণ্ড দেখিয়া আমরা এরূপ আতঙ্ক-বিহ্বল হইলাম যে, কয়েক মিনিট আমাদের চলৎশক্তি রহিত হইল; হাত-পা নাড়িবারও সামর্থ্য রহিল না। আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল; কিন্তু সেই সময় মুহূর্ত্তের জন্যও আমার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রান্তর-প্রান্তবাসী গ্রাম্য পুরোহিত, সোনার পাহাড়ে আসিবার জন্য আমাদিগকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া, যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইবার চেষ্টায় আমাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ আমাদের কোন্ কাযে লাগিবে?---তখন তাঁহার এই উপদেশে কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আজ তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম। ধর্ম্মাত্মা পাদরীর কথা সত্য বলিয়াই ধারণা হইল। আজ আমরা সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছি! কিন্তু এই বিপুল স্বর্ণরাশি আমাদের অনাহারজনিত মৃত্যুতে বাধা দিতে পারিবে না; পাগলা ছুতোরটা ঐ যে পাহাড়ের উর্দ্ধদেশে লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের উপর গুলী বর্ষণ করিতেছে, এই সুবর্ণ-রাশির সেই সকল গুলী ব্যর্থ করিবারও শক্তি নাই।

কিন্তু তখন এই সকল তত্ত্ব-কথার আলোচনার সময় ছিল না। আমার আহত সঙ্গীদিগের উদ্ধার করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে হইল। আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "বন্ধুগণ, আমাদের আহত সঙ্গীদিগকে অবিলম্বে নিরাপদ্ স্থানে সরাইতে না পারিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে উহারা মারা পড়িবে।

আমার কথা শুনিয়া অন্যান্য সহযোগী সকলেই আমার সঙ্গে দ্রুতবেগে আহত সঙ্গীদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দুই জনের মৃত্যু হইয়াছিল, আর দুই জনেরও জীবনের আশা ছিল না, মৃত্যুর অন্ধকার তাহাদের চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিয়াছিল; তাহাদেরও আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা মৃতপ্রায় সঙ্গিদ্বয়কে ধরাধরি করিয়া পাগলা ছুতোরের বন্দুকের পাল্লার বাহিরে লইয়া চলিলাম; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাগলাটা বন্দুক তুলিয়া পুনর্ব্বার গুলী করিল। বন্দুকের গভীর নির্ঘোষে গিরিকন্দর প্রতিধ্বনিত হইল। আমার পশ্চাতে দুই জন কৃষ্ণাঙ্গ অনুচর এক জন আহত সঙ্গীকে বহন করিয়া আনিতেছিল, ছুতোরের গুলী তাহাদেরই এক জনের পঞ্জর ভেদ করিল। হতভাগ্য ভৃত্য আর্ত্তনাদ করিয়া সেই স্থানেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। তাহার উত্তপ্ত শোণিতে পীতবর্ণ স্বর্ণরাশি লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইল। হায় স্বর্ণের লোভ!

আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, কিরূপ ভীষণ!—আমরা এই সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের তিন জন বিশ্বস্ত অনুচর নিহত হইল, আর দুই জন মৃতপ্রায়! আমাদের এক জন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীও আহত হইয়াছিল! পাগলা ছুতোরটা সকল রকম সুযোগ

লাভ করিয়া আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া বসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমরা ক্রোধে ক্ষোভে অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। সে সত্যই আমাদিগকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল। বন্দুক, পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকাংশই সে কৌশলে হস্তগত করিয়াছিল; গুলী-বারুদের আধারও তাহার কাছেই ছিল, এবং সে আমাদের গাঁটরী, বস্তা প্রভৃতি একত্র স্তূপাকার করিয়া, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গুলী চালাইতেছিল; অথচ আমরা তাহার নিষ্ঠুরাচরণে বাধা দিব, তাহার উপায় ছিল না! তাহার বন্দুকের পাল্লার বাহিরে পলায়ন করাই তখন আমাদের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, আমাদিগকে অগত্যা এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইল।

আমরা আমাদের আহত সঙ্গিদ্বয়কে অবিলম্বে নিরাপদ্ স্থানে আনিয়া ফেলিলাম বটে; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হইল। আমাদের পাঁচ জন অনুচরের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। পাগলা ছুতোরটাকে গুলী করিয়া মারিতে না পারিলে আমাদের সকলেরই জীবন বিপন্ন হইবে বুঝিয়া আমি জীবিতাবশিষ্ট সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলাম। তাহারা সকলেই আমার মতের সমর্থন করিয়া বলিল, পাগলাটাকে গুলী করিয়া মারিতে না পারিলে আমাদের নিরাপদ্ হইবার আশা নাই। সুতরাং তাহাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা হইল। আমার ও স্মিথের হাতে এক একটি বন্দুক ছিল, তদ্ভিন্ন আমাদের এক জন অনুচরের নিকটেও একটি বন্দুক ছিল। অন্যান্য অনুচরের নিকট তরবারি, সঙ্গীন প্রভৃতি অস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু বন্দুকের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন উপযোগিতা ছিল না; বিশেষতঃ, আমাদের অনুচররা সম্মুখে বিপুল স্বর্ণ দেখিতে পাওয়ায় আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেগুলি কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া বাহির করাও কঠিন হইল। স্মিথ আহত হইলেও তাহার বন্দুক-ব্যবহারের শক্তি ছিল। সে স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি ও স্বল্পভাষী মানুষ; কিন্তু পাগলা ছুতোরের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতায় সে ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান হারাইয়াছিল। সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "আমাদের ঐ পাঁচ জন নিহত বন্ধুর আত্মা প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়াছে। পাগলাটা পাহাড়ের উচ্চতর অংশে উঠিয়া নিরাপদ্ হইয়াছে; কিন্তু উহাকে অবিলম্বে গুলী করিয়া মারিতে হইবে। চল, আমরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া উহার দিকে অগ্রসর হই; তাহা হইলে আমরা উহাকে কায়দা করিতে পারিব।"

ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া আমার ধারণা হইল। তদনুসারে আমরা বিভিন্ন দিক্ হইতে পর্ব্বতের সেই উচ্চ অংশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম। আমরা পাগলটার বন্দুকের পাল্লার ভিতর উপস্থিত হইলে সে মাথা তুলিয়া আমাদের অনুচরটাকে গুলী করিল। আমরাও তিন দিক্ হইতে একসঙ্গে তাহাকে গুলী করিলাম; কিন্তু আমাদের গুলী ব্যর্থ হইল, অথচ তাহার গুলীতে আমাদের অনুচরটা নিহত হইল। পাগলা ছুতোর আমাদের অনুচরগুলিকে হত্যা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক দেখিলাম। আমরা তাহার স্বদেশীয় সহযাত্রী বলিয়াই কি সে আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেছিল? আমার অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ছুতোরটা ক্ষেপিয়া উঠিলেও তাহার আত্মীয় পর-জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই। স্মিথ তাহার গুলীতে আহত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার সতর্কতার অভাবেই ঐরূপ হইয়াছিল।

আমি স্মিথকে বলিলাম, "আমাদের অনুচরবর্গের জীবন এ ভাবে বিপন্ন করা সঙ্গত হইবে না, স্মিথ! এই ব্যাপারে তাহাদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নাই; আমরা দুই জনেই ছুতোর বেটার মুণ্ডপাত করিতে পারিব। তুমি পূর্ব্বদিকে যাও, আমি পশ্চিমে থাকি, বিপরীত দিক্ হইতে উহাকে গুলী করিলে আমাদের এক জনের গুলীতে উহাকে পড়িতেই হইবে।"

স্মিথ বলিল, "এ ফন্দী ভাল বটে, কিন্তু আমরা উহাকে মারিব, কি ও আমাদের মারিবে—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমাদের অন্যান্য অনুচরকে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়া আমরা বিপরীত দিক্ হইতে পাগলটাকে আক্রমণ করিতে চলিলাম। সে পর্ব্বতের যতখানি উচ্চে ছিল, আমরাও ততদূর ঊর্দ্ধে উঠিলাম; সুতরাং আমরা তাহার সহিত সমান উচ্চ স্থানে দাঁড়াইলাম। সেই স্থান হইতে আমাদিগকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল, এবং সেই গাঁটরির আড়াল

আড়ালে লুকাইল। কিন্তু আমরা তাহাকে গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলাম। আমরা কয়েক গজ অগ্রসর হইবামাত্র পাগলার বন্দুকের মুখ হইতে ধূমানল নিঃসারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য স্মিথ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল! আহত দেহে তাহাকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। মিত্রহন্তা বিশ্বাসঘাতক উন্মাদকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সবেগে সম্মুখে ধাবিত হইলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার গুলী বর্ষণ করিল; একটা গুলী আমার মাথার উপর দিয়া এবং দ্বিতীয়টি আমার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; আমার দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। অতঃপর তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহার বন্দুকের গুলী ফুরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে পুনর্ব্বার বন্দুক 'গাদিবার' অবসর না পাওয়ায় তাহার আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে দূরে পলায়ন করিল। সেই সুযোগে আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলাম। আমার গুলী ব্যর্থ হইল না; পাগল দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

আমি দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সে তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল; কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞান ছিল। সে হাত দিয়া চক্ষু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর ক্ষীণ স্বরে বলিল, "এ সকল কি কাণ্ড ভাই! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?"

আমি কোন কথা বলিলাম না; আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ছুতোর চক্ষু মুদিয়া স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল। আমি তাহার পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহার 'নাড়ী' পাইলাম না। সে চক্ষু খুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু তখন কাচবৎ স্বচ্ছ, দৃষ্টি যেন বহুদূরে প্রসারিত। সে অস্ফুটস্বরে কি বলিল, তাহা শুনিবার জন্য তাহার মুখের কাছে মাথা নামাইলাম।

মরণাহত ছুতোর ক্ষীণস্বরে বলিল, "সোনা, রক্ত, রক্ত আর সোনা! কোন্‌টা কি, বুঝিতে পারিতেছি না। সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ভুল ধরিতে পারিতেছি না। রক্ত আর সোনা দুই-ই এক জিনিষ, কোন তফাৎ নাই। মানুষ সোনার জন্য তাহার পরম বন্ধুকে হত্যা করিতেছে। সোনাই জীবনের অভিশাপ। এই সোনাগুলা দারুণ অভিশাপে কলঙ্কিত, ইহা অস্পৃশ্য।"

সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহুমূলে ভর দিয়া মাথা তুলিল, কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। যে যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া আমার পাশে ঢলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল।

আমার মনে হইল, আমি যেন কি একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি! আমি সত্যই জাগিয়া আছি কি না, বুঝিবার জন্য উভয় করতলে চক্ষু মার্জ্জন করিলাম। বুঝিলাম, স্বপ্ন নহে, আমি জাগিয়া আছি, এবং সম্মুখে যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্য, নির্ম্মম সত্য। পাগল ছুতোর আমার বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়া আমার পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে, এবং আমার বন্ধু হতভাগ্য স্মিথ গিরি-শিখরের সানুদেশে দেহ প্রসারিত করিয়া সম্পূর্ণ নিস্তব্ধভাবে নিপতিত। ছুতোরের গুলীতে তাহারও মৃত্যু হইয়াছিল।

কি ভীষণ হৃদয়-বিদারক শোচনীয় দৃশ্য! কত অল্পসময়ে এবং কিরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল!—আমরা যে কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ স্বর্ণ-সংগ্রহের আশায় এই সোনার পাহাড়ে যাত্রা করিয়াছিলাম—সেই দলের একমাত্র আমিই জীবিত রহিলাম এবং যে বারো জন দেশীয় অনুচর আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল পাঁচ জনমাত্র এখন জীবিত আছে। হতাশভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার মস্তিষ্ক যেন অসার হইল, আমি হতবুদ্ধি হইলাম, আমার মোহ উপস্থিত হইল। আমার চতুর্দ্দিকে বিপুল স্বর্ণের রাশি রাশি পীতবর্ণ স্তূপ মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত দেখিলাম, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে দুর্জ্জয় লোভে আমার হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল, সেই লোভ মুহূর্ত্তমধ্যে আমার হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইল। সেই স্বর্ণরাশির প্রতি ঘৃণা ও বিরাগে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি উদাসীন দৃষ্টিতে স্বর্ণপূর্ণ উপত্যকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ধর্ম্মাত্মা পাদরী আমাদিগকে সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। এই স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিতে আসিয়া যদি জীবনই গেল—তাহা হইলে ইহা আমাদের কোন্ কাযে লাগিবে?

যাহা হউক, কিছু কাল পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম,

[illegible] করিয়া হতাবশিষ্ট সঙ্গিগণের সহিত পরা- [illegible] লাগিলাম। পরামর্শে স্থির হইল—যে অশ্বতর- [illegible] পিঠে আমাদের রসদের বোঝা ছিল, সেইগুলিকে [illegible] খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; কারণ, সেগুলিকে না পাইলে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় ছিল না। আমরা সকলেই সেইগুলিকে ধরিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহাদের সন্ধান পাইলাম না। তখন আমরা হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম—অনাহারে মৃত্যুই আমাদের পরিণাম! আমরা জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম।

যাহা হউক, তখনও আমাদের একটি কর্ত্তব্য অসম্পন্ন ছিল। আমাদের শত্রুর এবং বন্ধুগণের মৃতদেহ তখন পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে পড়িয়া ছিল। সেগুলি সমাহিত না করিয়া আমরা সেই অভিশপ্ত স্বর্ণভূমি ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমরা বিশ্বাসঘাতক ছুতোরের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া সেই পাহাড়ের উচ্চতর অংশে প্রোথিত করিলাম, এবং স্মিথকে সেই উপত্যকার স্বর্ণ-স্তূপের ভিতর সমাহিত করিলাম। তাহার পর অঞ্জলির পর অঞ্জলি ভরিয়া স্বর্ণরেণু তুলিয়া, যখন তাহার রক্তরাগ-বিরহিত পাণ্ডুর মুখখানি ঢাকিয়া দিলাম, তখন আর আমি অশ্রুরোধ করিতে পারিলাম না, আমি শোকাকুলা ব্যথিতা বালিকার ন্যায় অধীরভাবে রোদন করিলাম। তাহার কত কথাই আমার মনে পড়িল! হায়! কে জানিত, এ ভাবে এখানে তাহাকে রাখিয়া যাইব? কি কুক্ষণেই আমরা পিটার ডনকুমের ভেলা দেখিয়া সোনার লোভে উন্মত্ত হইয়াছিলাম!

অতঃপর আমাদের মৃত পরিচারকবর্গকে কিছু দূরে সমাহিত করিয়া সেই স্বর্ণ-ভূমিতেই তাম্বু খাটাইয়া সেখানে রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিলাম। কতকগুলি শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাম্বুর সম্মুখে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিলাম। কিন্তু আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। আমাদের সকল আশা, সকল কামনার শ্মশানে বসিয়া ব্যাকুলভাবে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমাদের দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়িল, উৎসাহ-উদ্যমের চিহ্নমাত্র রহিল না। আমার মনের সেই শোচনীয় অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই। বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টে সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছি; এখানে আসিয়া আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহা চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম; আমার স্বদেশীয় সঙ্গীরা সকলেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে, কয়েক জন কৃষ্ণাঙ্গ অনুচর সঙ্গে লইয়া আমি এখানে পড়িয়া আছি; এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে পুনর্ব্বার কত বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা অনুমান করাও আমার অসাধ্য। হয় ত দুর্গম অরণ্যমধ্যে আমরা সকলেই মরিয়া পড়িয়া থাকিব; দুস্তর পথ ও পথের অগণ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতটে উপস্থিত হওয়া হয় ত আমাদের অসাধ্য হইবে; তখন এই বিপুল স্বর্ণরাশি কোথায় থাকিবে? ইহা আমাদের কোন্ কাযে লাগিবে?—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সেই সকল স্বর্ণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই আমার ধারণা হইল, এবং সুবিশাল স্বর্ণ-স্তূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আমার ঘৃণা হইল। এই স্বর্ণরাশির পরিবর্ত্তে যদি আমার বন্ধুগণকে জীবিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আর কিছুই চাহিতাম না, কিন্তু তাহা ত হইবার নহে।

সারা রাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আমি অধীর হইলাম। সেখানে বিলম্ব করিয়াই বা ফল কি? আমি প্রচুর স্বর্ণ সঙ্গে লইব, তাহারও উপায় ছিল না; কারণ, দুইটি অশ্বতরমাত্র আমার সম্বল। সেই দুর্গম পথে তাহারা অধিক স্বর্ণের ভার বহন করিতে পারিবে না বুঝিয়া আমি স্বল্প-পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করিলাম, এবং আমার অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহা বস্তায় পুরিয়া অশ্বতর দুইটির পিঠে তুলিয়া দিলাম। তাহার পর যে পরিমাণ স্বর্ণ আমরা স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারি, তাহা বস্তাবন্দী করিয়া কাঁধে লইয়া অপ্রসন্নমনে শোণিতরঞ্জিত সোনার পাহাড় ত্যাগ করিলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

আমরা স্বর্ণভূমি ত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, সেই সোনার উপত্যকাকে 'মরণ উপত্যকা' নামে অভিহিত করিলে অসঙ্গত হইত না। প্রথম তিন দিনের

পথ আমরা বহু কষ্টে অতিক্রম করিলাম ; চতুর্থ দিন একটি সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদিগকে অগত্যা সেই জলার ভিতর নামিতে হইল, কারণ, তাহা পার হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। সদলে জলা পার হইবার সময় একটি অশ্বতর সোনার বস্তা সহ কর্দ্দম-রাশিতে প্রোথিত হইল। আমরা তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু সেই গভীর কর্দ্দমের ভিতর হইতে তাহাকে এক ইঞ্চিও সরাইতে পারিলাম না। সে ধীরে ধীরে পাঁকের ভিতর তলাইয়া গেল ; তাহার পৃষ্ঠস্থিত স্বর্ণ-পূর্ণ বস্তা দুইটিও সেই সঙ্গে অদৃশ্য হইল !—তাহার পরদিন আমাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইল। একটি অশ্বতরের পিঠে যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহাই পরিমিত পরিমাণে আহার করিয়া এই কয় দিন কাটাইলাম, পঞ্চম দিন তাহার এক বিন্দুও অবশিষ্ট রহিল না। অগত্যা আমরা একটি অরণ্যে তাম্বু খাটাইয়া আগুন জ্বালিলাম, তাহার পর অবশিষ্ট অশ্বতরকে একটি গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া, একটি অনুচরকে তাহার পাহারায় রাখিলাম, এবং অন্য চারি জন অনুচরের সহিত শিকারের সন্ধানে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের আশা ছিল, যদি হরিণ, খরগোস কিংবা পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব।

আমরা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শিকারের সন্ধানে কয়েক ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইলাম। আমার সঙ্গীরা আমার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেল ; অবশেষে দীর্ঘকাল পরে সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কিছু কিছু শিকার সংগ্রহ করিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু এক জন অনুচর আর ফিরিল না। ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত হইল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাইলাম না। উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সেই স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। কোন দিকে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ; সে কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হইল, তাহাও জানিতে পারিলাম না। আমার সন্দেহ হইল—হয় তাহাকে বিশালকায় 'বোয়া' সর্পে গ্রাস করিয়াছে, না হয় কোন শ্বাপদ জন্তু তাহাকে হত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, যদি সে জীবিত থাকে, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের নিকট প্রত্যাগমন করে, এই আশায় আমরা সে দিন সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলাম। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না। অগত্যা পরদিন প্রত্যূষে পুনর্ব্বার যাত্রারম্ভ করিলাম। এই কয়েক দিনের মধ্যেই আমি একটি অশ্বতর এবং একটি অনুচরকে হারাইলাম। আমার মন অধিকতর নিরাশায় পূর্ণ হইল। আমাদের এই যাত্রার পরিণাম কি, কে জানে ?

সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমরা সেই সঙ্কটসঙ্কুল পথে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু আমরা এরূপ হতাশ হইয়াছিলাম যে, পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। কেবল আহারের সময় আমরা দুই একটি কথা বলিতাম। পথে চলিবার সময় খাদ্যাভাবে আর কষ্ট পাইতে হয় নাই ; আমরা যে সকল প্রাণী শিকার করিতাম, তাহা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত। আমার অনুচররা সুদক্ষ শিকারী, তাহাদিগকে কোন দিন শূন্য হস্তে ফিরিতে দেখি নাই।

কিছু দিন পরে আমি মৃদু জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। একে দেহ-মন অবসন্ন, তাহার উপর জ্বর ! আমি ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলাম। আমার আশঙ্কা হইল, আর হয় ত দীর্ঘকাল চলিতে পারিব না। আমার অস্থি-কঙ্কাল এই অরণ্যেই পড়িয়া থাকিবে। মনে হইল, আমার অন্তিমকালের আর অধিক বিলম্ব নাই। সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা আমার নয়নে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহা কি মহানিদ্রারই সূচনা ? মৃত্যুকে পরিচিত বন্ধু মনে হইল। তখন আর ভয় ছিল না। সকল আশা ত্যাগ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চলিতে লাগিলাম।

দেহের ও মনের অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইলেও আমরা প্রত্যহ যত দূর যাইব, তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম, কোন কারণে তাহার পরিমাণ অল্প হইত না।

সোনার পাহাড় পরিত্যাগের পর তৃতীয় সপ্তাহে আমরা অরণ্যের এক স্থানে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যসমাগমের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম ; মনে হইল, অল্পকাল পূর্ব্বে এক দল লোক সেখানে তাম্বু খাটাইয়া রাত্রিবাস করিয়াছিল ; কতকগুলি ছাই পড়িয়া ছিল ; তাহা স্পর্শ করিয়া বিস্মিত হইলাম, তাহাতে তখনও উত্তাপ ছিল ! মনে হইল, কাঠের আগুন অল্পকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এই গভীর অরণ্যে কাহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল ? তাহারা তখনও যে অধিক

রে যাইতে পারে নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। তাহারা শত্রু কি মিত্র, তাহাও অনুমান করিতে পারিলাম না। মনে হইল,তাহারা মিত্র হইতেও পারে। আমি আমার সহচরবর্গকে তাহাদের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলাম।

আমরা সেই দলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, আমরা যে দিক্ হইতে আসিয়াছি—তাহারা সেই দিকেই গিয়াছে। তবে কি আর কোন দল স্বর্ণের সন্ধানে সোনার পাহাড়ে যাত্রা করিয়াছে? তাহাদের পরিণাম আমাদের মত শোচনীয় হইতে পারে ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম; আমরা তাহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে চলিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর অরণ্যের এক স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং কিছু দূরে একটি তাম্বু দেখিতে পাইলাম। তাম্বুর সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছিল। সেই তাম্বুতে কিরূপ লোক বাস করিতেছে, তাহারা শত্রু বা মিত্র—এই সকল সন্ধান জানিবার জন্য গোপনে তাম্বুর ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে আমি অভিভূত হইলাম। আগুনের আলোকে সেই তাম্বুর ভিতর আমার প্রিয় বন্ধু বার্ণিকে গান করিতে ও নসিস্কাকে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলাম। তাহাদের সঙ্গে ছয় জন কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য ছিল; তাহারা তাম্বুর বাহিরে বিশ্রাম করিতেছিল।

বার্ণি ও নসিস্কার সহিত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার মনে কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। সেই গভীর অরণ্যে তাহাদের সহিত আমার মিলনের আশা ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বরের বিচিত্র বিধানে অসম্ভবও সম্ভবপর হইল। বার্ণি সুস্থ হইয়া আমাদের নিকট হইতে সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু আমরা তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে পারি নাই, এ জন্য সে তাহার অঙ্গীকার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট আমাদের বিপদের কথা বলিলাম। তাহারা উভয়েই স্তম্ভিতভাবে সকল কথা শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইল। কয়েক মিনিট পরে বার্ণি মন সংযত করিয়া বলিল, "ফেল্জি, আমি তোমার নিকট আমার প্রিয়তমা পত্নী মিসেস্ নসিস্কা বার্ণি ফেগানকে এখনও পরিচিত করি নাই; হাঁ, তোমার কথা শুনিয়া এতই বিচলিত হইয়াছিলাম যে, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

আমি এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া উভয়েরই করকম্পন করিলাম; তাহার পর বলিলাম, "তোমাদের বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল ভাই, আমাদের মধ্যে তোমরাই সুখী। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখময় হউক। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। ধর্ম্মাত্মা পাদরী মহাশয়ই কি নসিস্কাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন?"

বার্ণি বলিল, "হাঁ, তিনিই আমাদের বিবাহ দিয়াছেন। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদের বিবাহ হইয়াছে। আমাদের বিবাহ না দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বিবাহের পর আমরা মধুচন্দ্রমা যাপনের জন্য অরণ্য-যাত্রা করিয়াছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মধুচন্দ্র যাপনের জন্য অরণ্যযাত্রা! তোমাদের খেয়াল অদ্ভুত বটে!"—আমি আগ্রহভরে নসিস্কার মুখের দিকে চাহিলাম। তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সুন্দরী বলিয়া মনে হইল। নসিস্কা তাহার সরলহৃদয়, রূপবান্, আইরিস্ প্রণয়ীকে বিবাহ করিয়া কিরূপ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল, তাহা তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

আমাদের বিপদ্ ও দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহারা সোনার পাহাড়ে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। অতঃপর স্থির হইল, আমরা বোবোনাজা নদীর তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টানদের গ্রামে প্রত্যাগমন করিব। তদনুসারে পরদিন প্রভাতে সকলে পশ্চিমদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। বার্ণি ও নসিস্কাকে পাইয়া আমার মনের ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইল। আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু আমার সঙ্গিগণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আমরা নির্ব্বিঘ্নেই সেই খৃষ্টান পল্লীতে উপস্থিত হইলাম, পথিমধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। ধর্ম্মাত্মা পাদরী আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি বার্ণিকে ও নসিস্কাকে আমাদের অনুসন্ধানে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াই আমাদের অনুসরণে যাত্রা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের কেহই তাঁহার আশ্রমে

প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহাদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। পাদরী মহাশয়ের দৈববাণী প্রায় সফল হইয়াছিল। সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইবার পর কি ভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া পাদরী মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন; বলিলেন—পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আমি মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছি। পরমেশ্বর আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তিনি গ্রামবাসীদের সকলকে ডাকিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন করিলেন।

আমি পাদরী মহাশয়ের আশ্রমে ছয় মাস বাস করিলাম। ক্রমশঃ আমার শরীর সুস্থ হইল, দেহেও বল পাইলাম। গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ বার্ণি ও নসিস্কার স্নেহ-যত্নে আমার দিনগুলি সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটিতে লাগিল। এই ছয় মাস আমি যেরূপ সুখে ছিলাম, সেরূপ সুখ ও শান্তি আমি জীবনে আর কখন উপভোগ করি নাই; কিন্তু তথাপি স্বদেশের জন্য আমার প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল। অবশেষে এক দিন এক দল বণিক্‌কে সেই গ্রামের ভিতর দিয়া সমুদ্র-তটের দিকে যাইতে দেখিয়া আমি তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বার্ণি ও নসিস্কাকেও সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিলাম; আমি যে পরিমাণ স্বর্ণ সোনার পাহাড় হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ তাহাদিগকে দান করিতে চাহিলাম, এবং বলিলাম, দেশে প্রত্যাগমন করিলে সেই স্বর্ণেই তাহাদের অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটিবে, তাহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইবে না। কিন্তু তাহারা সেই অভিশপ্ত স্বর্ণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল, জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই আশ্রমেই অতিবাহিত করিবে। অগত্যা আমি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে তাহাদের নিকট বিদায় লইলাম। চির-জীবনের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল। প্রিয়জনের নিকট অন্তিম বিদায়-গ্রহণ যে কি কষ্টকর, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম, এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া বণিক্‌দলের সহিত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে যে পরিমাণ স্বর্ণ ছিল, তাহাতেই আমার অবশিষ্ট জীবন কাটিবে, আমাকে অভাবের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিলেও আমি যে জীবনে আর কখন শান্তিলাভ করিতে পারিব, সে আশা ছিল না। আমার পরিশ্রম ও ক্ষতির তুলনায় সেই স্বর্ণরাশি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু আমি সঙ্কল্প করিলাম, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আমি একটি কোম্পানী গঠন করিব, এবং বহু লোকজন ও যানবাহন সঙ্গে লইয়া আর একবার সোনার পাহাড়ে ফিরিয়া আসিব। বলা বাহুল্য, আমি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আমরা একরূপ সঙ্কল্প করি, ভগবানের বিধান অন্যরূপ হয়।

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা গুয়াকুইলে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে আমি একখানি জাহাজ পাইলাম; তাহা সদাগরী-জাহাজ, পণ্যদ্রব্য লইয়া দক্ষিণাঞ্চলে যাইতেছিল। আমি একখানি টিকিট কিনিয়া সেই জাহাজের আরোহী হইলাম। নির্দ্দিষ্ট বন্দরে উপস্থিত হইয়া আমি সানফ্রানসিস্কোতে যাত্রা করিলাম, কারণ, হতভাগ্য পিটার ডনকুমের অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই আমার মনে হইল। তাহার নোট-বহিতে সে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমি কোন দিন ভুলিতে পারি নাই। সানফ্রানসিস্কোবাসিনী মেরী এলেন ফ্রিম্যাণ্টলকে সে যে পত্রখানি দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেই পত্র তখন পর্য্যন্ত আমার কাছেই ছিল।

পিটার ডনকুম, মেরী এলেন ফ্রিম্যাণ্টলের জন্য স্বর্ণপূর্ণ যে বাক্সটি রাখিয়াছিল, সেই স্বর্ণ গবর্ণমেণ্টের লোকরা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। তামাকের বাক্সে সোনার যে দলাগুলি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আমার সঙ্গীরা আত্মসাৎ করিয়া তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু বহুবার নানাভাবে বিপন্ন হইলেও ডনকুমের পত্রখানি আমি সাবধানে রাখিয়াছিলাম। শুধু হাতে মিস্ ফ্রিম্যাণ্টলের সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত হইবে না ভাবিয়া আমি কিঞ্চিৎ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া কয়েকটি উপহার-দ্রব্য ক্রয় করিলাম, এবং একটি সুদৃশ্য বাক্সে কিছু সোনা লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিলাম। স্থির করিলাম, তাহাকে বলিব, পিটার ডনকুমই এই সকল উপহার তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আশা করি, পরমেশ্বর আমার এই প্রতারণা মার্জ্জনা করিবেন।

৪৮ নং—ষ্ট্রীটে মেরী এলেন ফ্রিম্যাণ্টল বাস

করিতেছিল ; তাহার ঠিকানা পিটার ডনকুমের 'নোট-বহিতে' লিখিত ছিল, সুতরাং সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইল না। মিস্‌ ফ্রিম্যান্‌টলকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ, তাহার মত নিখুঁত সুন্দরী আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, এবং তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী আমি জীবনে দেখি নাই। সেই রূপবতী তরুণী পিটারের প্রণয়িনী, ইহা তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বহুদিন হইতে পিটারের কোন সংবাদ না পাওয়ায় সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। আমি সত্য কথা গোপন করিতে পারিলাম না। পিটারের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। সেই শোক সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিলাম, এবং স্বর্ণ-পুর্ণ বাক্সটি ও পত্রখানি তাহাকে প্রদান করিয়া বলিলাম, পিটারের অভিপ্রায় অনুসারেই সেগুলি তাহার জন্য লইয়া আসিয়াছি। আমি প্রশান্ত মহাসাগরে ভেলার উপর পিটারের মৃতদেহ দেখিবার পর যাহা যাহা করিয়াছিলাম, এবং যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বলিলাম।

সে দিন আমি মিস্‌ ফ্রিম্যাণ্টলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে বাধা নাই—সেই রূপসী যুবতীকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, এবং যদি তাহার প্রণয়ভাজন হইতে পারি, এই আশায় কিছু দিন সেই নগরে বাস করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে দেখা করিতাম, এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল ; তখন এক দিন আমি সাহস করিয়া তাহাকে প্রেম-নিবেদন করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া মিস্‌ ফ্রিম্যাণ্টল কয়েক মিনিট পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া আমাকে বলিল—যদি পৃথিবীতে কোন লোককে বিবাহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমাকেই সে বিবাহ করিত, আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিত না ; কিন্তু সে পিটারকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, জীবনে মরণে সে পিটারেরই প্রণয়িনী। সে পিটারের প্রেমের অমর্য্যাদা করিতে পারিবে না, যত দিন বাঁচিবে, পিটারের স্মৃতিই তাহার একমাত্র সম্বল। সে বিবাহ করিবে না, পিটারের বিশ্বাস-হন্ত্রী হইবে না।

যে দেশে বিবাহিতা নারী স্বামীর সহিত মনান্তর হইলে আদালতের সাহায্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে, যে দেশের বিধবারা পরলোকগত পতির সমাধির মৃত্তিকা শুষ্ক হইবার পুর্ব্বেই অন্য পুরুষকে ভজনা করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, সেই দেশে মিস্‌ ফ্রিম্যাণ্টলের ন্যায় তরুণী তাহার প্রণয়ীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও তাহাকেই স্বামী মনে করিয়া তাহার চিন্তায় সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিবে, পৃথিবীতে এরূপ দেবীর অস্তিত্ব আছে—ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল। সতীত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ জগতে দুর্লভ। আমি তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, এবং ফলপুষ্প-ভূষিতা বৈচিত্র্যময়ী বসুন্ধরা এক নিমেষে আমার নিকট মরুবৎ প্রতীয়মান হইল। অতঃপর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো আমার অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইল, সেখানে আর এক দিনও আমার বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার মনে হইল, যদি আমি সোনার পাহাড়ে প্রাণত্যাগ করিতাম, এবং আমার মৃতদেহ সেই নিভৃত উপত্যকায় আমার সহচরগণের মৃতদেহের পার্শ্বে সমাহিত হইত, তাহা হইলে আমাকে এত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত না, এ ভাবে আমাকে হতাশ জীবনের ভার বহন করিতে হইত না, কিন্তু বিধাতা এই হতভাগ্যকে সেই সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন ; এখন আর কোন্‌ আশায় এই দুর্ব্বহ জীবনের ভার বহন করিব? আমি ব্যথিত হৃদয়ে সান্‌ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করিলাম, লণ্ডনগামী একখানি জাহাজে চাপিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। এই স্থানেই আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শেষ করিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাপ্ত।

দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র

আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন (২৭শে জুন, ১৮২৯ খৃঃ), বাঙ্গালায় তখন জন্ কোম্পানীর আমল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রভাব। দুরন্ত রাজ্যলিপ্সায় সমগ্র ভারত ছিল এই অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসিকগণের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। তখনও জাতির আত্মচৈতন্য উদ্বোধিত হয় নাই। যে কয় জন শিক্ষিত বাঙ্গালী দিনের পর দিন ইঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার-উৎপীড়নকাহিনী বিবৃত করিয়া সেই সুপ্ত চৈতন্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—গিরিশ তাঁহাদের অন্যতম। সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া এই দুর্জ্জয় দুঃসাহসিকতা যে তাঁহার বিপুল স্বার্থ-ত্যাগ, সহৃদয় সহানুভূতি, অতি উদার স্বজাতিপ্রীতি, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"The Literary Chronicle" নামক পত্রিকায় The East India Company's Policy শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "Had Lord Hardinge been a little longer in India he must have discovered that it is only the fear of the British bayonet that has hitherto restrained all hostile intentions on the part of the native powers ; remove that, and the rule of the Ferangees will ere long be overturned. The English, notwithstanding all their forbearance in respect of religious opinions, have totally failed to secure the hearts of their subjects and of their native allies and tributaries. * * * * They are now regarded as a set of interlopers, dreaded for their power but hated for their pride. These are bold truths and may be disrelishable to many, but it is nevertheless our duty as public Journalists to undeceive the public, and to advise the Government on its weak points." তখন গিরিশের বয়স বিংশতি বর্ষমাত্র।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—(তরুণ বয়সে)

এই কর্ম্মবীর যে ঘোষ-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদি বাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত মনসা-পোতা, গিরিশচন্দ্রের পিতামহ কাশীনাথই প্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন—সম্ভবতঃ ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য। কলিকাতা তখন উদীয়মান সহর, বর্দ্ধমান নগরী—ব্রিটিশ রাজের রাজধানী। দেব-দ্বিজে দৃঢ়-ভক্তি-পরায়ণ, উদারচেতা, সরল, সত্যনিষ্ঠ, দানশীল, আশ্রিত-পালক কাশীনাথের জীবনে সৌভাগ্যের জোয়ার বহিল। কিন্তু হায় রে চঞ্চলা কমলার কৃপা! এই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষের শেষ জীবনে ভাটার টানে সমস্তই ভাসিয়া গেল—অবশিষ্ট রহিল কেবল তাঁহার রাজপ্রাসাদসদৃশ বাস্ত-ভিটা আর তাঁহার অপরিসীম ভগবদ্ভক্তি ও অনন্যনির্ভরশীলতা।

এই খাঁটি মানুষটি ছিলেন গিরিশ-চন্দ্রের জীবনের আদর্শ। তরঙ্গ-ভঙ্গচপল, অনিশ্চিত ঐশ্বর্য্যের অসারতা এবং অচলা ভগবদ্ভক্তির সারবত্তা পিতামহ-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াই গিরিশচন্দ্র শেষ জীবনে বলিয়াছিলেন—

"The God of Heaven protects him however, and that is a species of security of which mere religionists and worldlings cannot and do not know the practical and permanent value."

গিরিশচন্দ্রের জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে গৌরমোহন আঢ্য কর্ত্তৃক 'Oriental Seminary' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের সুশীতল ছায়াতলে গিরিশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি। সে সময় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হার্ম্যান্ জেফ্রয় (Herman Geoffroy)। যাহাতে তাঁহার ছাত্রগণ ইংরাজী রচনায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে এবং তাহাদের বক্তৃতা-শক্তির বিকাশ হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ও যত্ন ছিল। তৎকালে প্রচলিত ইংরাজী নাটকনিচয় শক্তিশালী অভিনেতার ন্যায় আবৃত্তি

দম্পতির উত্তরকালে এই বাল্যপরিণয় পরম সুখ-সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছিল। কোন্নগর-নিবাসী স্বনামখ্যাত শিবচন্দ্র দেব পরে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন।

বিবাহের অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের পাঠ্যজীবন শেষ ও কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ এবং তাহাও পঞ্চদশ মুদ্রায় সুরু ও সার্দ্ধত্রিশতে শেষ। চাকরীতে গিরিশচন্দ্র বিশেষরূপে অর্থোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। লাভ করিয়াছিলেন কেবল কর্ত্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা, সহকর্ম্মীদিগের সম্ভ্রম ও সাধারণতঃ খ্যাতি, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা। আর লাভ করিয়াছিলেন একটি অমূল্য রত্ন—স্বনামখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌহৃদ্য।

গিরিশচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনী সাধারণে যখন প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—(পরিণত বয়সে)

করিয়া জেফ্রয় সুকুমারমতি ছাত্রগণকে নাটক পাঠে উৎসাহী ও অনুরাগী করিতেন। গিরিশ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির বিকাশ হইয়াছিল জেফ্রয়ের শিক্ষায় এবং তাঁহার রচনা-শক্তির মূল প্রস্রবণ—Modern British Drama.

কিন্তু প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রতিভা সত্ত্বেও গিরিশ কখন তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার স্বাভাবিক অনাসক্তি। দ্বিতীয়, বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁহার পাঠে আলস্য। ক্রমে পরীক্ষার সময় সন্নিকট হইলে তিনি দ্বিগুণ উদ্যমে পাঠ্য পুস্তক সকল আয়ত্ত করিতেন। এই সময় গিরিশচন্দ্রের অনুপম বুদ্ধিবৃত্তি ও অসাধারণ স্মরণশক্তি তাঁহার সহায় হইত।

তাৎকালিক সামাজিক প্রথা অনুসারে যৌবনের প্রারম্ভেই শিবচন্দ্র দেবের কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের পরিণয় হয়। তখন গিরিশের বয়স পঞ্চদশ এবং কন্যার বয়ঃক্রম নয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহধর্ম্মিণী কৈলাসকামিনী

অতঃপর গিরিশের মধ্যম সহোদর শ্রীনাথ "বেঙ্গল্ রেকর্ডার" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, গিরিশ ছিলেন এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক। পত্রিকাখানি কশাইটোলা হইতে প্রকাশিত হইত এবং যে দিন প্রকাশিত হইত, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রিতে নিশাভাগ অতিক্রম করিয়া দুই সহোদর প্রেস্ হইতে বাটী ফিরিতেন। সে সময় কলিকাতার ঐ বিভাগে গোরা নাবিকগণ পথিকদিগের উপর বিষম উপদ্রব-অত্যাচার করিত। তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য শ্রীনাথ ও গিরিশ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন। গোরা-নাবিকের ভাণ করিয়া দুই ভাই ইংরাজী সারি গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী আসিতেন। তাহাতে এক রাত্রিতে এক গোরা এক অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করিয়া বসিল—What ship do you belong to, boys? "তোমরা কোন্ জাহাজের ভায়া?" কোন উত্তর না দিয়া দুই ভাই-ই দীর্ঘপদ সঞ্চালন করিলেন।

এই পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রাদি লিখিতেন। ক্রমে 'বেঙ্গল্ রেকর্ডার' পত্রিকার অকাল-মৃত্যুতে গিরিশের সম্পাদনায় একখানি অভিনব সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইল—The Hindoo Patriot.

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ
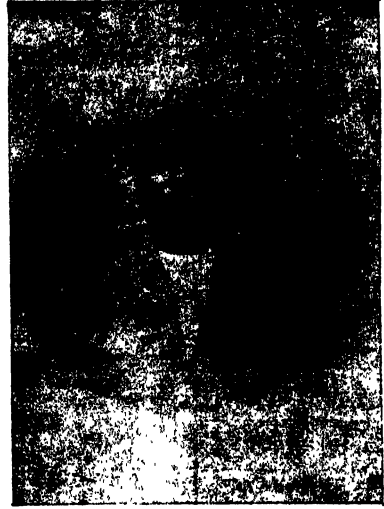
শ্রীনাথ ঘোষ

ঘটনাচক্রে ছাপার অক্ষরসহ একটি মুদ্রাযন্ত্র বড়বাজার-নিবাসী মধুসূদন রায় নামক কোন ব্যক্তির আয়ত্তে আসায় তিনি শ্রীনাথ, গিরিশ এবং ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর ক্ষেত্রচন্দ্রের নিকট একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। ক্ষেত্র পত্রের নামকরণ করিলেন—'হিন্দু পেট্রিয়ট'. এবং গিরিশচন্দ্র হইলেন তাহার সম্পাদক। ৬ই জানুয়ারী, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই সাপ্তাহিক যাঁহার যশ ও প্রতিষ্ঠার মূল, সেই হরিশচন্দ্রের সহিত প্রথমে ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। গিরিশই ছিলেন ইহার সর্ব্বেসর্ব্বা।

১৮৫৩ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র সগৌরবে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার সহকর্ম্মী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেট্রিয়টের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ পরলোকগমন করিলে গিরিশ কয়েক মাসের জন্য পুনরায় এই পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "The Calcutta Monthly Review" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ইহাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহসংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের সতীর্থ কৈলাসচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন,—

"His articles on race antipathy and race antagonism were most telling, and such was the indignation of the English press upon him that a member of it seriously proposed to give him a sound thrashing, perhaps in ignorance of the fact that the man was full six feet high with a proportionate breadth of stature and firmness of limbs."

হিন্দু পেট্রিয়টের পর গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। এই পত্রিকার লক্ষ্য রায়তদিগের স্বার্থ-সমর্থন—"All that we can say is, that the Bengalee—that shall be our cognomen, and we hope to confound Macaulay and his mimics—will stand in nobody's way, but with unflinching honesty, without party bias or foul-mouthed petulance, defend Truth and Justice wherever these may be, and faithfully and fearlessly represent the *Ryut* to the *Ruler* and the *Ruler* to the *Ryut.*"

কৈলাশচন্দ্র বসু

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র Dalhousie Institute সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সে সময় এ বিশিষ্ট সম্মান অন্য কেহ লাভ করেন নাই। Bethune (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সোসাইটীরও সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে British Indian Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশ তাহাতে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত বহু রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সভা-সমিতির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র জাতির জাতীয়তা রক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও উন্নতির বিরোধী ছিলেন না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন "Government School of Art" প্রতিষ্ঠা করিবার জল্পনা-কল্পনা হয়, গিরিশ তখন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"We are fully alive to the great fact that the Hindoos, in order to regain their rightful position amongst the peoples of the world, must be less a nation of dreamers and more a nation of practical men; we are painfully cognizant of the meaningless aversion to independent labour with which the middling classes of our community are grievously possesed. * * * * but while we have no sympathy with those who are the uncompromising advocates of a levelling system, we must admit that the almost religious abhorrence with which a high caste Hindoo looks down upon the calling of the artizan is calculated to produce effects injurious to the real interest of the country."
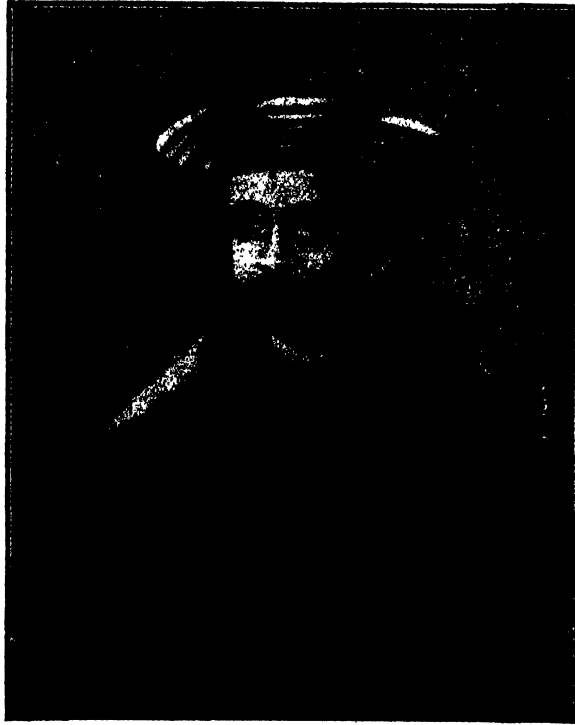
কিন্তু ছায়ালোকে মানবের ভাগ্য চির-বৈচিত্র্যময়। বাহিরে যখন যশ ও প্রতিষ্ঠা গিরিশচন্দ্রকে অতুল গৌরবদান করিতেছে, সেই সময় গৃহবিচ্ছেদে তাঁহার জীবন নিরতিশয়

বিষময় হইয়া উঠিল। এই পারিবারিক সংঘর্ষ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের ফলে গৃহমেধী গিরিশচন্দ্র বেলুড়ে তাঁহার উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গলীর ছাপাখানাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বেলুড় Anglo-Vernacular স্কুলে সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও হাওড়া সরকারী জেলা স্কুল কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু হাওড়া Canning Institute নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিশ্রামের অবসর ত দূরের কথা, স্বচ্ছন্দ তৃপ্তির সহিত আহার করিবারও সময় থাকিত না।

সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীন মত প্রকাশে নির্ভীকতা গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। যে সময় উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন স্যর সিসিল বীডন্ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা এবং গিরিশচন্দ্র এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজ-কর্ম্মচারী। উক্ত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রাজসরকার প্রথমে উপেক্ষা, দীর্ঘসূত্রতা ও
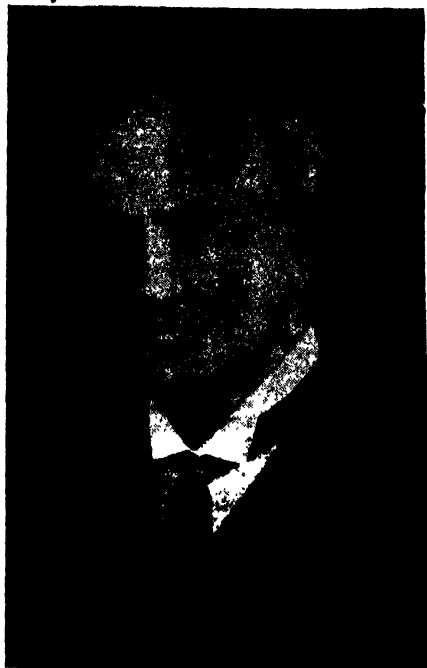
স্যর সিসিল বীডন

[illegible] present condition
especially, your constant [illegible]
connexion with us is [illegible]
needed to keep her mind
proper state - and all
her well-being, if [illegible] else,
should induce you to follow my
advice. We are all quite well
now. [illegible] child has thank
God perfectly recovered. Mrs
[illegible] is quite hale & hearty.
And so are [illegible] & [illegible]
These latter are in [illegible]
still. Anxiously expecting
your reply. Yours most affly
[illegible] Ghose

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরাজী হস্তাক্ষর

ঔদাস্য প্রদর্শন করায় গিরিশচন্দ্র যে নির্ভীক ও সহৃদয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য—

"Calcutta, taking the evening air in luxurious carriage or sitting down to dine on well fatted mutton and turkey, repairing in crowds to the opera or helping the partners at the Exchange to retire on princely competencies after a few year's crying up and knocking down of extravagant trinkets, presents a contrast to mud villages in which hundreds are lying dead in heaps, murdered by the cruel indifference of their fellowmen, wanting the crumbs and the leavings from which even the domestic

animals of the rich turn with loathing—the fearful significance of which we know it is impossible to impress upon the fortunate, but which those who have once learnt distress cannot regard without a shudder. At this solemn moment, when hunger stalks in a land renowned for plenty and remains unappeased except by crunching the bones of its victims, the question is protuded upon us, what are the men of abundant resources, of splendid idleness, of luxurious ease, doing to deserve their good fortune. * * The Government specially labors under a responsibility which the active public opinion of Europe will not long suffer it to evade."

রাজকর্ম্মচারী হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"All civilized governments ought to bear in mind that their power is merely derivative and that because a member of the general policy consents for the benefit as well of himself as that of the public to accept service under the state, he does not thereby forfeit the title of a free-born citizen to give expression to his opinions regarding measures to which he may take objection. On the contrary, his official experience should peculiarly qualify him for leading the public mind into the correct channel of thought, and to a government that builds not its power on the complement of bayonets at its service, but on the reverence and affection of its grateful subjects, such discussion is fraught with manifold advantages. But Evil seeks darkness and the East India Company is certainly not in a position to bear the light."

শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়

যে সময় দেশীয় বিচারকদিগের দ্বারা য়ুরোপীয়গণের বিচার সম্বন্ধে ইংরাজ-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে সময় গিরিশ লিখিয়াছিলেন -

"The higher blood rebels against such a sacrilege and the Imperial Government whose principal support is the Land Revenue must insult the population at large by making a pariah distinction in its legislation. * * * *

গিরিশচন্দ্রের নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্ব তাঁহার রচিত প্রবন্ধনিচয়ের ছত্রে-ছত্রে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সে সময় জাতীয় এমন কোন হিতকর অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত নহে। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অক্লান্ত-কর্ম্মীর শরীর ও স্বাস্থ্য ছিল লৌহ-কঠিন। কিন্তু লোহাতেও মরিচা ধরে, গিরিশচন্দ্রের অটুট স্বাস্থ্যও ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বরে টাইফয়েড জ্বরে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, অবিন্, কাল আমি দেহত্যাগ করব। পরদিন, ২০শে সেপ্টেম্বর এই পুরুষ-প্রবরের বিশাল হৃদয় স্পন্দহীন হইল।

গিরিশচন্দ্র পরলোকগত হইলে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি লিখিয়াছিলেন—

—"A great Indian but a geographical mistake!"

আয়ত-ললাট, আয়ত-চক্ষু, দীর্ঘ-দেহ, প্রশস্ত-বক্ষ গিরিশচন্দ্রের কোথাও ক্ষুদ্রতা ছিল না। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল না হইলেও কর্ম্মবহুল। জাতির কল্যাণ-চিন্তাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

যাঁহারা সংবাদ-পত্র সম্পাদন করেন, সাময়িক-প্রসঙ্গের আলোচনাতেই তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সে প্রসঙ্গ বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে উচ্চ-ধ্যান, উচ্চ-কল্পনা ও চিরাদরণীয়, চিরস্মরণীয় উচ্চ প্রসঙ্গ আলোচনার অধিকারী নহেন, এ ধারণা ভুল। পরন্তু জাতির হিতার্থে সেরূপ প্রচেষ্টার বর্জ্জন ইঁহাদের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ।

বিধাতার ইচ্ছায় এবং সময়ের প্রভাবে জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশয় এখন ভিন্ন খাদে প্রবাহিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র আমাদের পক্ষে এখন অতীতের গৌরব এবং সেই জন্যই চিরস্মরণীয়। যে জাতির অতীতের আভিজাত্য নাই বা অনাগতের কল্পনা-সম্পদ্ নাই, কেবলমাত্র বর্ত্তমানই যাহার জীবন, তাহার অস্তিত্ব উল্কার দীপ্তির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাই আজ তাঁহার শতবার্ষিকী-স্মৃতি-বাসরে জাতীয়তার অগ্রদূত, স্বার্থত্যাগী, সহৃদয় সহানুভূতিসম্পন্ন, মহাপ্রাণ, মহদুদার গিরিশচন্দ্রকে সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। বিধাতার বরে জাতির স্মৃতি-সরোবরে এই সহস্রকর্ম্মী সহস্রদল-কমল চিরপ্রফুল্ল থাকিয়া সৌরভ ও গৌরব বিকীর্ণ করুক!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

মেনকা দর্শনে বিশ্বামিত্র

যৌবনের চপলতা দিয়ে
ভাঙিলে সাধনা মোর যদি,
হে অনিন্দ্যসুন্দরী মোর
কেন যাও?—এস, কি বা ক্ষতি।

ব্রহ্মণ্যের তেজোলাভ আশে
বসে' আছি যুগান্তর ধরে',
জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি এলে দ্বারে
যৌবনের সুধা-পাত্র করে।

ব্রহ্মত্ব সে পা'ক অমরতা
কণ্টকে ফুটুক মোর ফুল—
উচ্ছ্বসিত কামনার নদী,
তুমি এস শষ্পশ্যাম-কূল

বনানীর শ্যামচ্ছায়াতলে—
হেথা নেই নিখিলের আঁখি!
তুমি আর আমি দুই জন—
দুঁহুপানে শুধু চেয়ে থাকি।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

সাহিত্য ও সমাজ

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে মাঝে মাঝে যুব-সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। তরুণ-সঙ্ঘ, সবুজ-সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা নামে এই শ্রেণীর সম্মেলন অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল সম্মেলনে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে, এ জন্য এই শ্রেণীর সম্মেলনের সার্থকতা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইহাদের মারফতে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জীবন-স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়; জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই ভাবের সজীবতা যতই পরিলক্ষিত হয়, ততই মঙ্গল।

দেশের তরুণ সম্প্রদায়—ইহার মধ্যে আমরা তরুণী-দিগকেও ধরিয়া লইতেছি—দেশের ভবিষ্যৎ গৃহস্থ ও গৃহিণী হইবেন, সুতরাং দেশের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়ে তাঁহারা এখন হইতে যতই চিন্তা করিবেন, ততই তাঁহাদের ভবিষ্যতের জীবনকে সহজ ও আয়ত্তাধীন করিতে ও সমাজের উপযোগী করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু দুঃখের কথা, কোন কোন সম্মেলনে 'সবুজ', 'তরুণ' বা 'বর্ত্তমানের' প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শন করা হয়, অতীতের প্রতি তেমনই বিরাগ ও অশ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া তুলা হয়। প্রাচীনের যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে হইবে, সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে,—এই ভাবের আলোচনা প্রায়ই যেন ফুটিয়া উঠে। তরুণ বা সবুজ সাহিত্যের মধ্য দিয়াও এই ভাবটি ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। এই মনোবৃত্তির সীমারেখা কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। একটা বাঁধাধরা নিয়ম বা আচার-ব্যবহার অথবা চিন্তা বা রচনার ধারা এই শ্রেণীর ভাবুকরা মানিতে চাহেন না। সমাজেই কি, ধর্ম্মেই কি, অথবা সাহিত্য রাজনীতিতেই কি,—'একটা নূতন কিছু করার' প্রবৃত্তিটা যেন তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে। নূতনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যাহা কিছু পুরাতন, তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তিটা যেন বিকট দৈত্য-দানার মত দীর্ঘ আকার ধারণ করিয়া তরুণ সমাজের একাংশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পরিতাপের কথা, এই বিকৃত মনোবৃত্তিরূপ ধ্বংসানলে সমাজের উচ্চস্থানীয় কোন কোন প্রাচীনও ইন্ধন আহরণ করিয়া দিতেছেন। সমাজ ইহার ফলে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে করা নিতান্ত দোষের কথা নহে।

কোন একটা জাতির জীবনের গতি, প্রকৃতি ও চিন্তার ধারা তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া থাকে। সাহিত্য যে রস সৃষ্টি করে, তাহার মধ্য দিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরকে খুঁজিয়া পাওয়াই সাহিত্যের সার্থকতা বলিয়া এ যাবৎ সকল দেশের সভ্য-সমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কোন দেশের কোন সভ্য ও উন্নত সমাজ সাহিত্যে বীভৎস রস-সঞ্চার করাকে জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

অধুনা আমাদের কোন কোন যুব-সম্মেলনের সাহিত্যের মধ্য দিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরকে খুঁজিয়া পাইবার বিকৃত পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। সত্য, সুন্দর ও শিবের নামে বীভৎস নগ্ন সত্যের আশ্রয়ে রস-বিকাশের চেষ্টা করা হইতেছে। কেবল সম্মেলনে নহে, অন্যত্রও সাহিত্যের মারফতে এই বিকৃত রসসঞ্চারের প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। সভ্য ও উন্নত সমাজের পুষ্টি ও পরিণতির পক্ষে এই রস যে আদৌ স্বাস্থ্যকর নহে, আপাতমনোরম হইলেও—ইহাতে নূতনত্বের নয়নমনোমুগ্ধকর জলুষ থাকিলেও যে ইহার পরিণাম শুভ নহে, তাহা সময় থাকিতে উপলব্ধি না করিলে সমাজের ধ্বংস যে অনিবার্য্য হইবে, তাহা কয় জন চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন?

সভ্যতা, শালীনতা বা ভব্যতার অর্থ কি? স্বভাবের বা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করার নামই সভ্যতা। আফ্রিকা বা দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণকে আমরা অসভ্য নামে অভিহিত করি। কেন? তাহার কারণ এই যে, তাহারা এখনও প্রকৃতির অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদের নগ্নাবস্থায় অবস্থান, আম-মাংস ভোজন, গুহামধ্যে কালহরণ, নরমাংসলোলুপতা তাহাদের অসভ্যতার পরিচায়ক। ইহাকে প্রকৃতির 'নগ্ন অবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু সভ্য জাতি বলিয়া অভিহিত মানুষ বস্ত্রাদি দ্বারা নগ্নতা আবরণ করিয়া লজ্জা নিবারণ করে—শ্লীলতা ও শালীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করে, রন্ধনাদির দ্বারা আহার প্রস্তুত করিয়া উদরস্থ করে, সৌধ-কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া

সূর্য্যাতপ ও ঝড়বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে, এবং নানারূপ আইন-কানুন সৃষ্টি করিয়া আপনার সমাজমধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম সংরক্ষণ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাহারা পদে পদে নগ্ন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহারই নাম সভ্যতা। সুতরাং বন্ধন বা বেড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া—প্রকৃতির নগ্নতার অনুসরণ করা হইতে পারে, অথবা 'আর্ট' হইতে পারে, কিন্তু উহা সভ্যতা নহে

সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ প্রকৃতির নগ্নতার অনুসরণ করিয়াই আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখন কোন বিষয়ে বন্ধন বা সংযম ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষ যতই 'সভ্য' ও 'উন্নত' হইতে লাগিল, ততই বন্ধন ও সংযমের বেড়া নির্ম্মিত হইতে লাগিল। হয় ত ইহাতে স্বাধীন জীবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির অভাব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের শৃঙ্খলা ও বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এ বিষয়ে ত্যাগস্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইল। বহুকালের ত্যাগস্বীকারের ফলে বর্ত্তমান 'সভ্য' ও 'উন্নত' মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদিও চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্য এতকালের গড়া এই প্রাচীন সমাজ ও সাহিত্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, প্রকৃতির প্রথম নগ্নাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে? ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, কোন কিছু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সম্পূর্ণ নূতন এ জগতে কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। সে সৃষ্টি এক ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। এ জগতে নূতন যাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রাচীনের বা অতীতের ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সমাজ ও সাহিত্য গড়িয়া তুলার কথা বাতুলতা মাত্র। প্রাচীনের মধ্যে যে সংযম ও বন্ধনের বেড়া দিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ উত্থিত হউক, প্রাচীনকে এড়াইয়া নূতন সমাজ গড়িবার কোন উপায়ই নাই। জাতির যে ভাবধারা বা বৈশিষ্ট্য আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন, তাহার বিনাশ নাই। তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ না করিয়া নূতনভাবে সমাজ সাহিত্য আদি গড়িয়া তুলিবার কল্পনা আকাশকুসুমেই পরিণত হইবে তবে বন্ধন ও সংযমের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধঘোষণার কথা স্বতন্ত্র।

এই ভাবের বিদ্রোহ এখন কোন কোন যুব-সম্মেলনের অধিবেশনে ও তথা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বৈঠকে ও সাহিত্যিক তরুণ সম্মেলনের বৈঠকে এই বিদ্রোহের পরিচয় সভাপতির অভিভাষণে পাওয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, যেখানে যাহা কিছু বন্ধন আছে—যাহা সমাজকে পঙ্গু ও জড় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দাও,—ইহাই ছিল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভাঙ্গনে গুরু পুরোহিত আদিও বাদ পড়েন নাই। বন্ধনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ কেবল বাহিরে নহে, সংক্রামক রোগরূপে আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। তাহারও পরিচয়ের অভাব নাই। যশোহর—কালিয়া গ্রামে এক যুব-সম্মেলনের আয়োজনের কথা শুনা গিয়াছিল। সেই সম্মেলনের নারী-শাখায় কোন এক বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা 'সতীত্ব'-শীর্ষক সন্দর্ভ পাঠ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। একখানি মুদ্রিত প্রবন্ধও আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। সন্দর্ভলেখিক লিখিয়াছেন—"আমি নির্ম্মম একনিষ্ঠবাদী সতীত্বের বিনাশযজ্ঞে ব্রতী।" তাঁহার মতে "উন্নত-হৃদয়া তেজস্বিনী রমণীই সতী। এই সতীত্বে স্বামী থাকা বা না থাকা ব দু'দশ গণ্ডা স্বামি-বাহুল্যেও কিছু আসে যায় না।" এতদ্ব্যতীত আরও অভিমতের অভিব্যক্তি আছে :—

"স্বামি-সংখ্যার একত্বেই যেখানে সতীত্বের অর্থ শেষ সেইখানেই এই প্রবন্ধের সূচনা। যে একনিষ্ঠ সতীত্বের আসরে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী কল্কে পান না, আমি সেই নির্ম্মম একনিষ্ঠবাদী সতীত্বের বিনাশযজ্ঞে ব্রতী।

"যৌন সম্বন্ধে মানুষ সেখানে বিচারবুদ্ধির বেড়া পাকে আট-ঘাট বেধে দিয়েছে, প্রকৃতির রাজ্যে সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। প্রকৃতির সন্তান পশুরা নিজে আইন গড়ে না, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। সেখানে সতীগিরির বালাই নেই। একমাত্র একেরই ভোগ্য, এ সঙ্কীর্ণতা প্রকৃতির নিয়মে নেই।

"প্রকৃত বিধির ব্যভিচার করেছে মানুষ সতীত্বের বিধি গ'ড়ে। তারি ফলে আজ সমাজের গাময় দুষ্ট ব্রণ

কুষ্ঠব্যাধি।...সতীত্বের শক্তিশেলে আত্মাশক্তির জাতি নিষ্প্রভ, জড় পদার্থ; এরই নাগপাশের বন্ধনে নারী আজ পঙ্গু, অবলা।

"বাঁধাবাঁধির মধ্যে প্রেম নেই। বাধ্যবাধকতা দেনা-পাওনার সম্বন্ধের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অভিনয়ের ব্যবসা চলে বটে, প্রেম চলে না। বৈষ্ণব কবিরা সে কথা বেশ মুখ ফুটে বলেছেন।

"বেদব্যাসের মত পণ্ডিত, যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক, কর্ণার্জ্জুনের মত বীর সতীত্বের আঁস্তাকুড়ে জন্মে না।

"সতীত্বের জগদ্দল পাষাণ চেপেছে সমাজের বুকে, এ চাপনে সমাজের আজ নাভিশ্বাস উপস্থিত।...বহু দিনের পচা এই গলিত প্রথার শবকে অবিলম্বে দাহ করতে হবে।

"যে বাসনাই যার হৃদয়ে যখন জাগে, তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত।

"বৈচিত্র্যই জীবনের স্বাদ।

"হে বাংলার তরুণীগণ! তোমাদের পুষ্পিত জীবন যৌবন কি এক জনেরই ভোগে ফুরিয়ে দেবে? এ সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, তোমাদের জন্য নয়।"

এখন কথা, ইহা যথার্থই কোন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের বঙ্গনারীর রচনা কি না। অধুনা অনেক পুরুষ নারীর নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রচনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের কোন নারী এরূপ সাহিত্য রচনা করিতে পারেন—অথবা এরূপ অস্বাভাবিক বিকৃত কল্পনা করিতে পারেন, ইহা ত ধারণাও করিতে পারা যায় না। তাই মনে হয়, হয় ত কোনও আধুনিক 'সবুজ-বিকারগ্রস্ত' পুরুষ গুপ্ত নামে অথবা কোনও সমাজ-পরিত্যক্তা নির্লজ্জা কামুকী রমণী ভদ্রমহিলার নামে এই সন্দর্ভ চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু সে যাহাই হউক, এই ভাবের কল্পনা বা চিন্তার উৎসই বা কোথায়? আমাদের রস-সাহিত্যে ত নাই-ই, প্রতীচ্যেও আছে বলিয়া শুনি নাই। তবে অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর লেখক নারীর সতীত্ব অপেক্ষা তাহার মনুষ্যত্বকে উচ্চ স্থান প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের এই শিক্ষা-প্রচারেরই কি এই ফল?

রচনায় "প্রকৃতির রাজ্যে অবাধ স্বাধীনতা"র কথা আছে। এ স্বাধীনতার স্বরূপ কি? সভ্য, উন্নত সমাজে স্বাধীনতার যে অর্থ স্বাভাবিক, সে অর্থে এই 'স্বাধীনতা' কথা ত ব্যবহৃত হয় নাই। এ স্বাধীনতার অর্থ কি, তাহা রচনাকার স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রকৃতির সন্তান পশুরা নিজে আইন গড়ে না, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে।" তবেই এই স্বাধীনতা "পশুর স্বাধীনতা", অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার ও সংযমহীনতা। সেখানে যে "সতীগিরির বালাই" থাকে না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তাই রচনাকারের মতে নারী "একেরই ভোগ্য" হইতে পারে না, উহাতে সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। তাই তিনি "বৈচিত্র্যেই জীবনের স্বাদ" পাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, "যে বাসনা যখন যার হৃদয়ে জাগে, তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত", অর্থাৎ যথা ইচ্ছা চরিয়া খাও, মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, কন্যাত্ব, ভগিনীত্ব, কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, ঐ সকল সম্বন্ধ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া যে যাহাকে পার পশুর মত টানিয়া লও। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এ চিন্তা করিতে জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঘৃণায়, আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। রচনাকার বাঙ্গালার তরুণীগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের "পুষ্পিত জীবন-যৌবন এক জনেরই ভোগে ফুরিয়ে দিতে" নিষেধ করিয়াছেন। এ কল্পনা পশুশাস্ত্রেই ফুটিতে পারে, অন্যত্র নহে!

আমাদের দেশে কথাসাহিত্যে নারীর স্বাধীন মনোবৃত্তি স্ফুরণের উপযোগী করিয়া নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন প্রথমে রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অধুনা অনেক খ্যাত ও অখ্যাতনামা লেখক কথা-সাহিত্যে যশঃ অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কোনও রচনায় এই পশু-স্বাধীনতা অনুমোদন করেন নাই, বরং তদ্বিপরীত তীব্র প্রতিবাদোক্তি করিয়াছেন। কোন 'সবুজ'-লেখকের এক রচনা উপলক্ষ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অভ্যস্ত পৌনঃপুন[illegible] আছে—বুঝতে পারি সেখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনাসক্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই বা তা প্রবল ন[illegible] এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষ[illegible] যেমন সংযম আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও তাই।

"আমাদের সাহিত্যে বারে বারে কেবলি দুর্ব্বল [illegible] মুমূর্ষুদের লালায়িত লালসার অতি বর্ণনায় আমরা মানুষে[illegible] যে মূর্ত্তি দেখি, সেটা বীভৎস—তার আনুষঙ্গিকভাবে প্রব[illegible]

প্রবৃত্তিশালী চিত্তের প্রচণ্ডতা দেখিতে পাইনে ব'লে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়।"

এই 'স্বাধীনতা' কামনার মূলেও আছে 'মিথুনাসক্তি' অর্থাৎ পশু-প্রবৃত্তি। ইহার সম্পর্কে রচনা বীভৎস, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার নামে এই 'মিথুনাসক্তি' অথবা 'ছাগবৃত্তির' প্রচারে আমাদের সাহিত্য কলুষিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই সাহিত্যের প্রভাব আমাদের পবিত্র অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বহু গৃহে সর্ব্বনাশের সূত্রপাতের উপক্রম করিতেছে। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে আমাদের সমাজের শৃঙ্খলা অদূর-ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

রচনাকার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণব কবিরা সে কথা বেশ মুখ ফুটে বলেছেন।" ভাবনা যাদৃশী যস্ত! রচনাকার প্রেমের কথা পাড়িয়া বৈষ্ণব-কবিদের টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান-গবেষণা ছাগ-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ করিলেই সমীচীন হইত, আবার বেচারা বৈষ্ণব-কবিদের টানাটানি কেন? বিড়ম্বনা আর কি! রচনাকার তাঁহার মন-গড়া 'প্রেম' কথাটার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বুঝাইয়াছেন যে, "বাধ্য-বাধকতা দেনা-পাওনার সম্বন্ধের মধ্যে স্বামি-স্ত্রী অভিনয়ের ব্যবসা চলে বটে, প্রেম চলে না।" তাঁহার 'প্রেম' বৈষ্ণব কবিরা বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহেন, বৈষ্ণব কবিদের 'পরকীয়া প্রেম'ই তাঁহার মন-গড়া প্রেম! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা তাঁহার মত ছাগ-সাহিত্যপ্রচারকেরই মুখে শোভা পায়।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডিদাসকে উচ্চাসন দিতে বোধ হয় রচনাকার কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। আমি সেই চণ্ডিদাসের 'পরকীয়া প্রেম' সম্বন্ধে দুই চারিটি উক্তি ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। চণ্ডিদাসের 'রজকিনী-প্রেমের' কথা ও 'রজকিনী রামীর' কথা বোধ হয় তিনি জানেন। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে অষ্ট-জাতীয়া কন্যাকে শক্তি বলিয়া পূজা করা যায়,—

"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা।
বেশ্যা নাপিতকন্যা চ রজকী নর্ত্তকী তথা॥"

চণ্ডিদাস ইহার মধ্যে রজকীকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। চণ্ডিদাসের উপর তৎকালীন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আবশ্যক হইলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইবে। পরম বৈষ্ণব চণ্ডিদাস কিশোরী ভজনার্থ তন্ত্রোক্ত 'রজকিনী'কে পূজা করিয়াছিলেন। সেই প্রেম পরকীয়া প্রেম। কিন্তু তাহার স্বরূপ কি? সে প্রেম—"নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়!"

চণ্ডিদাসের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ দেশে বিলক্ষণই ছিল। সে বৌদ্ধধর্ম্ম তখন তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সে ক্রিয়াকাণ্ডও বিকৃত, তন্ত্রের পবিত্র ক্রিয়া-কাণ্ডের ভাণ অনুকরণ মাত্র। ইহারই বিরুদ্ধে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। চণ্ডিদাস তাহার এক-জন ব্যাখ্যাতা ছিলেন। চণ্ডিদাস বিপথগামী নরনারীকে সাবধান করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"ব্যভিচারী হইলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি-দিনে,
সহজ পাইবে তবে॥"

অন্যত্র চণ্ডিদাস লিখিয়াছিলেন,—

"সহজ সহজ, সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চাঁদের কাছে, অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃতেতে, বিমল এ রাতে
কে বুঝিবে মরম তার॥"

এ কি 'পীরিতি', তাহা 'ছাগ-সাহিত্যকারের' বুঝিবার সাধ্য নাই, এ পরকীয়া প্রেমের মর্ম্ম বুঝিবার মত তাঁহার সাধনা নাই। চণ্ডিদাসের 'পরকীয়া প্রেম' অপূর্ব্ব, তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিলে মানুষ অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। চণ্ডিদাস এই পরকীয়া প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—

"কামের স্বরূপ, নাহিক ইহাতে
রাগের স্বরূপ হয়।
একান্ত করিঞা, প্রকৃতি হইঞা
মানুষ জন্মাবেশ হয়॥

নিষ্কামী হইয়া, রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে, দেহ রতিশূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে॥"

পাঠক ছাগ-সাহিত্যের "দু'দশ গণ্ডা" পরকীয় 'প্রেমের' সহিত বৈষ্ণব কবির এই পরকীয়া প্রেমের তুলনা করুন, তাহা হইলেই বুঝিবেন, প্রভেদ কি, আর প্রভেদ কোথায়। রচনাকার যে 'পরকীয়া প্রেমের' আমদানী করিয়া "সতীত্বের বিনাশযজ্ঞে ব্রতী" হইতে চাহিয়াছেন, সেই যজ্ঞে ব্রতী অনেক নারীকে সন্ধ্যার পর সহরের রাজপথে ও মফঃস্বলের হাটবাজারে সাজিয়া গুজিয়া দাঁড়াইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের স্থান গৃহস্থ সমাজের বাহিরে। সুতরাং সেই অপরূপ যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য বাঙ্গালার তরুণীগণকে আহ্বান করিয়া তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

আসল কথা, অধুনা বিদেশী রস-সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণপ্রবৃত্তি আমাদের দেশে এই ভাবের বিকৃত সাহিত্য ও চিন্তাধারা আমদানী করিয়াছে। যাঁহারা বিদেশী রস-সাহিত্যের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন, প্রতীচ্যে এই রস-সঞ্চারের চেষ্টার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন নৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টাও আছে। গ্রাণ্ট অ্যালেনের "বৃটিশ বারবেরিয়ান" নামক উপন্যাসে মানুষের প্রকৃতিগত মনোবৃত্তির একটা দিকের নগ্ন চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে দেখান হইয়াছে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতী নর-নারীর যৌন সম্বন্ধ কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে। উপন্যাসকার তাঁহার নায়ক ও নায়িকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, অনাগত যুগের নায়ক তাঁহার নায়িকাকে (অপরের বিবাহিতা) বুঝাইবেন,—"বিবাহ মানুষের মন-গড়া বন্ধন মাত্র, উহার সহিত নীতি বা ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। বিবাহিত নর-নারীর মধ্যে যদি স্বাভাবিক আকর্ষণের অভাব থাকে, তাহা হইলে নর-নারী স্বভাবের বিরুদ্ধে সেই কৃত্রিম বন্ধন মানিতে বাধ্য নহে, তাহারা তাহাদের মনের মত নর-নারী বাছিয়া লইয়া তাহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দে ঘটাইতে পারে। ইহাতে পাপ বা অপরাধ কিছুই থাকিবে না। সমাজের প্রতিও এ বিষয়ে নর-নারীর কোন দায়িত্ব নাই। মন লইয়াই কথা, দেহটা কিছুই নহে।"

গ্রাণ্ট অ্যালেন তাঁহার দেশের নর-নারীর সভ্যতার পথে 'দ্রুত উন্নতির' বহর দেখিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সমাজের নর-নারীর যৌন সম্বন্ধের ব্যাপারে কি ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার সমাজকে দেখাইয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ অবস্থার সহিত তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না।

বিখ্যাত মার্কিণ মনস্তত্ত্ববিদ্ রবার্ট ডবলিউ চেম্বার্স তাঁহার "কমন ল" নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চিত্রে দেখাইয়াছেন, উচ্চ-শিক্ষিত নরনারী পরস্পর রূপে গুণে আকৃষ্ট হইলে পর সংযম বা সামাজিক শাসন না মানিলে কোনওরূপ সামাজিক বন্ধন ব্যতীত পরস্পর যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইতে পারে,—পারাই স্বাভাবিক। যখন তাঁহার নায়ক, নায়িকা শিক্ষিতা ভ্যালেরি ওয়েষ্টের নিকটে এইরূপ বাধাহীন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব করিল, তখন নায়িকা সম্মতি দান করিল, তখনই দেহদানের জন্য প্রস্তুত হইল, বলিল,—"যখন মনে আমাদের যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তখন দেহে সেই সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা কি আছে?" কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে নায়ক স্বয়ং বিবেকের তাড়নায় পিছাইয়া গেল। উপন্যাসকার উপসংহারে বুঝাইয়াছেন,—মানুষের সমাজ একটা 'কমন ল' বা সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলে; না চলিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। মানুষ প্রবৃত্তিবশে স্বাধীনতার অধিকার পরিচালনা করিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। এই হেতু স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারকে বুঝায় না। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিয়া যে স্বাধীনতা, সেই সেই স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। সুতরাং 'সকল বন্ধন' ভাঙ্গিয়া ফেলার নামই স্বাধীনতা নহে, উহা কোন সভ্য উন্নত সমাজের অনুমোদিত নহে। সংযমহীন, বাধাহীন মনোবৃত্তি, সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে স্বাধীনতার পর্য্যায়ভুক্ত নহে, উহা স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। এই হেতু সমাজের সাধারণ আইন বা নিয়মের অধীন বিবাহবন্ধনের সংযম নর-নারীকে মানিতেই হইবে, অন্যথা সমাজ টিকিতে পারে না। ইহাই 'কমন ল' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য।

"ভিক্টোরিয়া ক্রসের' উপন্যাসের সহিত অনেকে পরিচিত আছেন। তাঁহার "চেটাইওয়ালা" প্রমুখ গ্রন্থে তিনি বৃটিশ সেনানীর যুবতী কন্যার সীমান্তের পাঠানের সুগঠিত সুন্দর

দেহের প্রতি লালসার আকর্ষণের চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র নগ্ন, বাধাহীন, সংযমহীন। কিন্তু তিনি একটা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই ভাবের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। প্রাচ্যের পুরুষ যতই সুগঠিত, সুন্দর ও লোভনীয় হউক, তাহার মনের ভাবধারার সহিত—তাহার শিক্ষা-দীক্ষার সহিত, তাহার আচার-ব্যবহারের সহিত প্রতীচ্যের শিক্ষিতা যুবতীর যে মনের মিল হইতে পারে না, উপন্যাসের পরিণাম-চিত্র দেখাইয়া গ্রন্থরচয়িত্রী তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল জঘন্য লালসাবৃত্তির উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনা করেন নাই।

য়ুরোপের কণ্টিনেণ্ট্যাল সাহিত্য হইতেও এই ভাবের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। অধুনা ফ্রয়েড এ দেশের এক শ্রেণীর তরুণ সাহিত্যিকের উপাস্য দেবতা। কিন্তু ফ্রয়েডের 'মাতা ও শিশু সন্তানের' অথবা 'পিতা ও শিশু কন্যার' মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কি অদ্ভুত! তিনি ইহার মধ্যেও যৌন-সম্বন্ধজ্ঞাপক ভাব খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইহা কি হৃৎকারজনক নহে? বাহুল্য ভয়ে আপাততঃ এই স্থানে এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইল। মোটের উপর বলা যায়, প্রতীচ্যের সাহিত্য-রসের গতি, প্রকৃতি বা ধারা মানুষের প্রকৃতির নগ্নমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াও তাহার মধ্য দিয়া চিরন্তন একটা সামাজিক সংযমের বা আইন ও নিয়মের গণ্ডী মানিয়া চলিতেছে।

আমাদের অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী সমাজে এই রসধারা পান করিয়া এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও ভাবুক অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অজীর্ণসঞ্জাত উদ্গারের দুর্গন্ধে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রের মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা স্বভাব-চিত্রমাত্রকেই আর্ট বলিয়া মনে করেন, আর তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নর-নারীর স্বাভাবিক নগ্ন মূর্ত্তি সভ্যতা ও সংযমের আবরণ না দিয়া প্রবৃত্তিমত অঙ্কিত করিতে গিয়া অক্ষমতাজনিত ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আপনাদিগকেও পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নকলের আমদানীতে আসলটাকে আচ্ছন্ন করিয়া সাহিত্যামোদীকে অযথা কষ্ট দিতেছেন; অথচ এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছেন,—মৃতকল্পা বাঙ্গালা ভাষাকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করাইয়া পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন! কিন্তু সে সুধা যে কদর্য্য সুরার নামান্তর, তাহা বুঝিবারও বুঝি তাঁহাদের সামর্থ্য নাই।

কিন্তু তাঁহারা না বুঝুন—এ দেশে তাঁহাদের স্তাবকেরও অভাব হইবে না, এ কথাও সত্য—তথাপি অধুনা এ দেশের অনেক পাঠক এই দুষ্পাচ্য সুরার হৃৎকারজনক বীভৎসতা ও জঘন্যতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বাধীনতার নামে তাঁহারা যে যথেচ্ছাচার-মন্ত্রের পূজারীরূপে বাণীর পবিত্র মন্দির কলুষিত উপচারে ভরাইয়া দিতেছেন, উহার পূতিগন্ধ বাঙ্গালীর পুণ্য পবিত্র অন্তঃপুরের দ্বারে পৌঁছিয়া মাতৃজাতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী নূতনের আগমনে প্রথমটা হকচকাইয়া গেলেও পরে পাপের বীভৎস নগ্নচিত্র দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠিতেছেন। আজকাল কর্ণওয়ালিস ও কলেজ ষ্ট্রীটের রোয়াকে রোয়াকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাশি রাশি বাঁধান গল্পের কেতাব ছড়ান থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝুড়ি ঝুড়ি পাক্ষিক বা মাসিক অথবা অন্যান্য সাময়িক পত্র দিন দিন গজাইয়া উঠিতেছে। ইহাদের অনেকের মারফতে এই বিচিত্র হৃৎকারজনক সাহিত্য রস-সাহিত্যের নামে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এখন বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের কুললক্ষ্মীরা ভয়ে সকল পত্রের মোড়ক খুলিতে সাহসী হন না,—কি জানি কোথাও যদি এই বিচিত্র 'স্বাধীন মনস্তত্ত্বে'র বিকাশ থাকে!

শালীনতা ও শ্লীলতার একটা সীমারেখা আছে, আদিযুগে না হইলেও সমাজ-সৃষ্টির পর হইতে জগতের সাহিত্যে ও সমাজে ছিল। প্রাচীন যুগের মহা মহা কবির কাব্যে বা রস-সাহিত্যেও শালীনতা বা শ্লীলতার সীমা যে কোন যুগে অতিক্রান্ত হয় নাই, এমন কথা বলিতেছি না। বরং সেক্সপীয়র কালিদাসের মত জগদ্বরেণ্য মহাকবিদের গ্রন্থেও তাহার পরিচয়ের অভাব নাই, কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু যে, উহা সত্ত্বেও তাঁহাদের রস-সাহিত্য আজিও জগতের পূজা পাইয়া আসিতেছে। Venus and Adonis, Rape of Lucrece, ঋতুসংহার, মেঘদূত আদি অমর গ্রন্থে শ্লীলতার সীমা বহু স্থলে অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সেই রস কোথাও 'গাঁজিয়া' যায় নাই। তাহাতে কোথাও বীভৎস রসের নগ্নচিত্র নাই। তাহাতে রস-সাহিত্যের নগ্নচিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোথাও বীভৎস পাপের জঘন্য

চিত্র মনকে পীড়িত ও ভারাক্রান্ত করে না, সমাজে শৃঙ্খলা ও সংযম ভঙ্গের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে না।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর অতুলনীয় রচনার সাহায্যে প্রফুল্ল বা শান্তির চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল পুরুষের মত মল্লবেশে ভবানী পাঠকের শিষ্যারূপে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল, শান্তি পুরুষের মত— বীরনারীর মত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ইংরাজ-সেনানীকে ফেলিয়া দিয়া বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উভয়েই সদ্গুরুর সংস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে গীতার কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়া কঠোর সংযমে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। শান্তিও সত্যানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া সংযমের অপূর্ব্ব মহিমা বুঝিয়াছিল। তাই তাহাদের পুরুষোচিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় নাই, তাহা সংযত ও অপূর্ব্ব শোভামণ্ডিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-চরিত্রে পাপের নগ্নচিত্র দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করাই তাঁহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য। তাঁহার নগ্নচিত্র মনকে পীড়িত ও ভারাক্রান্ত করে না, উহা মনে অপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করে।

বর্ত্তমান 'স্বাধীন মনস্তত্ত্ববিকাশের' লীলাক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে কেহ কেহ ক্রোধ ও ঘৃণাভরে 'ছাগ-সাহিত্য' বা 'কামায়ন'-সাহিত্য নামে অভিহিত করিতেছেন। উহা ছাগ-সাহিত্য হউক বা না হউক, উহা যে আমাদের বাঙ্গালীর পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশলাভের যোগ্য নহে, ইহা নিশ্চিত। কেন না, উহার বিষময় ফলেই যে উপরে উক্ত প্রবন্ধ যশোর কালিয়ায় পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। এই বিষম সাহিত্যের প্রভাব অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বনাশকর ধীরসঞ্চারী বিষের ন্যায় 'তরুণ-সমাজ'-শরীরে বিসর্পিত হইতেছে। অনেকে এ জন্য ইহার সর্ব্বনাশ-কারিতার বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার প্রভাব অমোঘ,—ইহার প্রভাব হইতে তরুণ-সমাজ নিষ্কৃতি পাইতেছে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শের প্রভাব হইতে দূরে হোষ্টেলে মেসে অবস্থিত অথবা অসতর্ক অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকিয়া নিষিদ্ধ না হইয়া নিশ্চিন্ত তরুণ-তরুণী এই বিষ নিত্য গলাধঃকরণ করিতেছে আর তাহাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। কোমল-মতি তরুণ-তরুণীর মানসিক বৃত্তি অতি নরম ছাঁচে ঢালা, উহাতে যে কোনও আপাতমনোরম সর্ব্বনাশকর প্রভাবের ছাপ অঙ্কিত হয়, তাহা ইহজীবনের জন্য দাগ রাখিয়া যায়। তাই তাহারই প্রভাবে আজকাল এই ভাবের রচনা বহু তরুণ-তরুণীর মানসক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং অবিচারিত-চিত্তে নানা সাময়িক পত্রে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আরও পরিতাপের কথা, এখনকার এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণীর মধ্যে পাপচিত্র অঙ্কিত করিবার বাহাদুরীর একটা প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা চলিতেছে, আর কোন কোন পত্র সেই বাহাদুরীর অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতেছে।

অবস্থা যে এইরূপ ভীষণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দেখিতে পাওয়া যায়, এত দিনে যে সকল পত্র শক্তিশালী ও প্রতিভাশালী বলিয়া সমাজে আদৃত ছিল, এই বিষের প্রভাব তাহাদেরও কাহারও কাহারও মধ্যে বিসর্পিত হইয়াছে, তাহারাও আপাতলোভের আশায় গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। আমি এ কথা বলিয়া অনেকের বিরাগভাজন হইব, এ কথা জানি, কিন্তু তাহা হইলেও সমাজের দুষ্টব্রণ দেখাইয়া দিবার কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারি না। আমাদের মত পরিণত-বয়স্ক দুই, চারি জন পুরুষ যে সমাজ ও সাহিত্যের এই সর্ব্বনাশের সূচনা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে, দেখিতেছি, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের কুললক্ষ্মীগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই শ্রেণীর রচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। এমনও অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, যে সাহিত্যে ভ্রাতা-ভগিনীর, বিমাতা ও কিশোর সপত্নী-পুত্রের—এমন কি, জননী ও শিশু-পুত্রের স্বর্গীয় সম্বন্ধ বিজাতীয় বিকৃত নারকীয় ভাবের অবতারণায় পঙ্কিল ও কলুষিত হয়, সে সাহিত্য পুড়াইয়া কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কোনও এক লেখিকা কিছু দিন পূর্ব্বে পত্রান্তরে এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,—

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আজকাল কয়েক জন তরুণ লেখক অত্যন্ত হীন ও ঘৃণিত উপায়ে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যকে কলুষিত—বিষদুষ্ট ক'রে তুলেছেন। তাঁদের অনেকেরই শক্তি ও প্রতিভা আছে; কিন্তু কতকগুলো কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল কুৎসিত গল্প লিখে তাঁরা তাঁদের শক্তির অপব্যয় করছেন। রচনার ভেতর একঘেয়ে শুধু

অস্বাস্থ্যকর নির্লজ্জ প্রেমের কাহিনী আর পঙ্গু ভাবের বিকৃত অসংযম ভিন্ন আর কিছুই পাঠকের চোখে পড়ে না।

* * * *

"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্য্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না।' * * * * কয়েক জন তরুণ লেখকের লেখায় নরনারীর এই দুর্দ্দান্ত মাংস-লোলুপতা এবং পাপ-পঙ্কিল লালসা বা ইন্দ্রিয়বিকারের বীভৎস ছবি এমনই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, দেখলে বিস্ময়ে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়।

* * * *

"নির্লজ্জ ব্যভিচারপূর্ণ আধুনিক কথা-সাহিত্যের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে হতাশ হয়ে পড়ি। বঙ্গ-জননীর আশার প্রদীপ এই তরুণদলের লেখনী থেকে কামনার যে নগ্ন বীভৎসতা—বুভুক্ষু লালসার যে হীন লোলুপতার চিত্র আজ ফুটে উঠেছে, তা দেখে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নত হয়ে আসে। ছিঃ ছিঃ!"

কত দুঃখে মাতৃজাতির অন্তরের অন্তস্তল হইতে এই 'ছিঃ ছিঃ' বহির্গত হইয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর তথাকথিত 'আর্ট' ও 'মনস্তত্ত্ব'-বিশ্লেষকরা বুঝিতে না পারিলেও বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ নিশ্চিতই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন। সেই সমাজ যদি প্রাণহীন জড়ে পরিণত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ রোগের প্রতীকারের ব্যবস্থা হইতেও বিলম্ব হইবে না। আমরা জানি, ইতিমধ্যেই বহু তরুণ লেখক সাহিত্য ও সমাজে এই অনাচার ও অসংযম আনয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। আশা আছে, তাঁহা-দের সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে এই শ্রেণীর রচনার বহুল প্রচারে অবশ্যই বাধা পড়িবে। 'রুচিবায়ু-গ্রস্তের' আক্রোশ বলিয়া এই প্রতিবাদকে এখন আর উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

"হে গুরু ! তোমারে প্রণাম করি"

হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!
তোমার শিক্ষা, তোমার দীক্ষা, তব তিতিক্ষা চিত্তে স্মরি!

শিখায়েছো তুমি প্রেমের মহিমা,
সীমার মাঝারে কোথা সে অসীমা!
তোমার ত্যাগের বিপুল গরিমা
গৌরবে আমি নিয়েছি বরি!
এনেছো আমারে নূতন জগতে জীবনের পথে হাতটি ধরি।
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

হেথা নাহি কোনো কামনা তরল,
বাসনার বিষ, লালসা গরল,
এ জগৎ যেন শান্ত সরল!
সব সন্তাপ গিয়েছে সরি;
সকল দুঃখ, দৈন্য, অভাব, দেবতা আমার লয়েছো হরি!
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

তোমার কৃপায় লভিয়াছি প্রেম
কাম-ক্লেদ-হীন নিকষিত হেম
প্রণয়-তপের প্রার্থিত ক্ষেম
দিয়েছো এ নব ভুবনে ভরি!
হীন-কলঙ্ক, কুৎসা, গ্লানির মিথ্যাকে আমি আর কি ডরি?
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

আজি মনে হয় এ জগৎ মায়া!
অরূপের রূপে ডুবে গেছে ছায়া;
ওগো সুন্দর! তুচ্ছ এ কায়া
স্বপনের মত গিয়েছে ঝরি!
অন্তরে মোর এ কি অনন্ত আনন্দ আজি উথলে মরি!
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

বন্ধু গো! মোর জীবনে আসিয়া
সকল তিমির দিয়েছো নাশিয়া!
অমৃত-সাগরে চলেছে ভাসিয়া
আজিকে আমার মরণ-তরী!
তোমার আসন চিরতরে প্রিয়, বিছায়েছো মোর মানসোপরি
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

স্বরাজী রাজনীতি

বড়লাট লর্ড আরউইন স্বৈরাচার-সম্মত ক্ষমতার বলে ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে কংগ্রেসের মনোনীত পরিষদ্-সদস্যগণ যে তাহাতে অপমানিত মনে করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এমন অপমান পদে পদে তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে। তাঁহাদের একাধিক বার কাউন্সিল পরিষদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাতে (Walk out) ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি এ যাবৎ তাঁহাদের কাউন্সিলের মোহ ঘুচে নাই। কাউন্সিলকামী কংগ্রেস-সদস্যরা এই 'চলিয়া আসা' নীতি অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একবারে কাউন্সিল ত্যাগ করেন নাই। এবারও বোধ হয় এইরূপ একটা নাট্যাভিনয় করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির মুখপাত্রস্বরূপ স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কাউন্সিল এসেমব্লি বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত কংগ্রেস-মনোনীত কাউন্সিল-সদস্যগণকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন,—যত দিন কংগ্রেস এই আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তত দিন এই আদেশ সকলকে পালন করিতে হইবে, এই কথা জানাইয়াছিলেন।

সকলেই বুঝিয়াছিল, এ আদেশে আন্তরিকতা নাই। আন্তরিকতা থাকিলে 'যত দিন কংগ্রেসের আদেশ থাকিবে' এই বাঁচিবার পথটুকু রাখা হইত না,—একবারেই কাউন্সিল এসেমব্লি বর্জ্জনের আদেশ দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা এক পক্ষে যেমন সরকারকে আপনাদের অসন্তোষের কথা জানান হইল, তেমনই অপর পক্ষে কাউন্সিলত্যাগী অসহযোগীদিগকেও সন্তুষ্ট করা হইল। যেন দুই নৌকায় পা রাখিয়া ভারতের রাজনীতির সাগর পার হইবার চেষ্টা করা হইল! ইহা দ্বারা জাতির শক্তি বৃদ্ধি ত হইলই না, প্রতিপক্ষকেও আঘাতের মত আঘাত করা হইল না। দুই দিক্ বজায় রাখিয়া কায করাই যেন স্বরাজী রাজনীতির 'জান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাহোরের 'পিপল' পত্র এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। এই পত্র লিখিয়াছেন,—"যদি কাউন্সিল বর্জ্জনই করিতে চাও, তবে আবার আগামী নির্ব্বাচনের কথা (পণ্ডিত মতিলালের বিবরণে আছে) তুলিতেছ কেন? ৭ বৎসরের ভূয়োদর্শনও কি যথেষ্ট হয় নাই? স্বরাজীদের প্রথমে মূলনীতি ছিল, কাউন্সিল এসেমব্লির 'অবসান' করা। এখন সেই নীতিই আবার নূতন করিয়া 'কাউন্সিল বর্জ্জন করিবার' কথায় পাড়া হইতেছে। অথচ এ বর্জ্জনের পশ্চাতেও আবার 'আগামী নির্ব্বাচনের' কথা আছে!" এই স্বরাজী রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিবার সাধ্য কাহার আছে?

ফলে বহু স্থানের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উত্থিতও হইয়াছে। স্বরাজী কাউন্সিল সদস্যদেরই মধ্যে কেহ কেহ এই আদেশের পরেও কাউন্সিলের কমিটী-মিটিংএ উপস্থিত হইয়াছেন, এসেমব্লির সাব-কমিটীর রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন ও এমন অনেক কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে কংগ্রেসের এই আদেশ পূর্ণরূপে অমান্য করা হইয়াছে। বাঙ্গালার কংগ্রেসের মনোনীত কাউন্সিল সদস্যদের পক্ষ হইতে অন্ততঃ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনকাল পর্য্যন্ত এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইবার অনুরোধ আসিয়াছে, পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ সুবিধাবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! কোন কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কাউন্সিল-সদস্য কংগ্রেসের নামে সদস্যগিরির পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের বাহির হইতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার ভয় দেখাইয়াছেন। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির এই আদেশ রদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মাদ্রাজ বিভাগের বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী ডাক্তার বরদরাজালু নাইডু কাউন্সিলকামী দল ছাড়িয়া দিয়া এক নূতন দল গঠন করিবার ভয় দেখাইয়াছেন এবং মন্ত্রিত্ব-প্রমুখ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবার পক্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস মনোনীত কাউন্সিল-সদস্যরা মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবেন বলিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকে জানাইয়াছেন। এইরূপে চারিদিক্ হইতেই এই থিয়েটারী অভিনয়ের বিপক্ষে বিদ্রোহধ্বজা উত্থিত হইয়াছে। ইহা স্বরাজী নীতির অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গালার কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষেও স্বরাজী নীতির চমৎকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে কংগ্রেস পক্ষের জয় হইয়াছে, ইহাতে দেশবাসিমাত্রেই আনন্দি[illegible] ইহা দ্বারা সরকারকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশের লো[illegible] মন্ত্রিমণ্ডল বা দ্বৈতশাসন চাহে না, পরন্তু সাইমন কমিশ[illegible] সিদ্ধান্তের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। সুতরাং কংগ্রে[illegible] নামে স্বরাজ্যদল যে এই জয়লাভ করিয়াছেন, ইহার [illegible] দেশবাসী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু কো[illegible] কোন ক্ষেত্রে যে ভাবে ও যে উপায়ে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ [illegible] হইয়াছে, তাহা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। দুই এক[illegible] পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে। বীরভূম অ-মুসলমান [illegible] হইতে গত বার অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বা[illegible] হইয়াছিলেন। এবার তিনিই আবার ঐ কেন্দ্র হইতে নির্ব্বা[illegible] হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল যে ভাবে [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রজা[illegible]

সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকের মতবিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার বিপক্ষে যাঁহাকে দাঁড় করান হইয়াছিল, জনমতের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বে সরকার পক্ষে তিনি ঝুঁকিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জিতেন্দ্রলাল কংগ্রেসের সদস্য, সুতরাং তাঁহাকে মনোনীত না করিবার কোন যুক্তি ছিল না। তিনি স্বরাজী-দলকর্ত্তাদিগের অন্ধ স্তাবক না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কংগ্রেস-সদস্য বলিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না ত? তবে তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা হইল না কেন? ২৪ পরগণা উত্তর পল্লী-কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কংগ্রেস-সদস্য এবং স্বরাজ্য-দলভুক্ত; তিনি কলিকাতা করপোরেশনের স্বরাজী কাউন্সিলার এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর ন্যায় তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সুনাম আছে। অথচ স্বরাজ্য দল কি জানি কি কারণে তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া এমন এক জনকে সমর্থন করিয়াছিলেন, যিনি পূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডল সমর্থন করিয়াছিলেন! এই স্বরাজী রাজনীতিলীলার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবে কে? যাহা হউক, দেশবাসী এই স্বরাজী অনাচারের সমর্থন করে নাই, তাহারা সনৎকুমারকেই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিয়াছে। আর এক পল্লীকেন্দ্রের নির্ব্বাচন-ব্যাপারে অতি চমৎকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যাঁহাকে মনোনীত করেন, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী তাঁহাকে মনোনীত না করিয়া তাঁহাদের নিজের মনঃপূত এক জন পদপ্রার্থীকে মনোনীত করেন! ফলে তাঁহারই জয় হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্বরাজ্য দলের কংগ্রেস-কর্ত্তৃত্বের শৃঙ্খলা রক্ষার চমৎকার নমুনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

মার্কিণ দেশে রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবার মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়া অপমানিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মার্কিণদেশীয় সেক্রেটারী ক্রুদ্ধ ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল। এ দেশের কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সে দেশের আইন-কানুন অনুসারে সীমান্তের কর্ম্মচারীরা যে সকল প্রশ্ন সকলকেই করিয়া থাকে, প্রথামত রবীন্দ্রনাথকেও করিয়াছিল; ইহাতে অন্যায় কিছুই করা হয় নাই, কবিকে কোনও অপমানও করা হয় নাই; তিনি অনর্থক অভিমান ও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করেন নাই, অথবা স্বয়ং অপমানিত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন নাই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের এমনই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার প্রবৃত্তি এবং সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের মহিমা!

"ট্রান্স-প্যাসিফিক" নামক সংবাদপত্রে এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের মার্কিণ-ভ্রমণের সেই অধ্যায়ের কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রের প্রতিনিধির মারফতে সম্প্রতি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

মুখবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সীমান্ত সহর সিয়াটলে মার্কিণ ইমিগ্রেশান ইনস্পেক্টর যে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি মার্কিণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই, অথবা মার্কিণ জাতির বিরুদ্ধেও তাঁহার কোনও অভিযোগের কারণ নাই। কেবল মার্কিণের পশ্চিম-সীমান্তে সমস্ত এসিয়াবাসীর প্রতি এক শ্রেণীর মার্কিণ ইমিগ্রেশান কর্ম্মচারী অভদ্রোচিত ব্যবহার করে এবং অপমানকর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে—এই অপমান তাঁহার বুকের উপর জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাই পশ্চিম-মার্কিণ রাজ্যের আকাশ-বাতাস যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই জন্যই তাঁহাকে মার্কিণ রাজ্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নতুবা মার্কিণ যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত তিনি মার্কিণ মনীষিগণের সাদর আহ্বান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আহ্বান তিনি অভিমানভরে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করেন নাই। মার্কিণ দেশে তাঁহার অনেক বন্ধু আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার গুণের আদর করেন। বহু মার্কিণের সহিত তাঁহার ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। পূর্ব্বেও তিনি মার্কিণ দেশে আমন্ত্রিত ও সহরে মফঃস্বলে যথা তথা অভ্যর্থিত হইয়াছেন,—অন্ততঃ মার্কিণ পূর্ব্বাঞ্চলের (নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরের) লোক তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান সেই সময়ে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মার্কিণ জাতিকে তিনি নবীন, উৎসাহী, মহৎ জাতি বলিয়াই জানেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের কোন কারণ নাই। কেবল তাঁহাদের দেশের আইন অনুসারে এসিয়াবাসিমাত্রেই সে দেশে পদার্পণ করিলে অপমানিত হয়—নিকৃষ্ট জাতির মত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, এই অপমান তাঁহার বুকে শেলের মত বাজিয়াছিল বলিয়াই তিনি মার্কিণ দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—নিজের অপমানের জন্য নহে, সমগ্র জাতির অপমানের জন্য।

ইহাতে ত রবীন্দ্রনাথের মহত্বই প্রকাশ পাইতেছে। এমন দেশপ্রেমিক কে আছেন, যিনি স্বজাতি, স্বধর্ম্মী, স্বদেশীয়ের বিদেশে অপমানের কথা শুনিলে অন্তরে ক্রোধ ও অভিমান পোষণ না করেন? যে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে", যিনি বাঙ্গালা মায়ের চরণে মস্তক নত করিয়া বলিয়াছেন—'বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জল, ধন্য হউক, ধন্য হউক, হে ভগবান্!'—সেই রবীন্দ্রনাথ বিদেশে দেশমাতার অপমান কিরূপে সহ্য করিবেন?

সিয়াটলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—"কানাডায় পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সেখানে আরও কিছু দিন থাকিয়া বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রতিশ্রুতিও ত পালন করিতে হইবে! তাই দুঃখিতচিত্তে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া সিয়াটলের পথ দিয়া মার্কিণ রাজ্যে প্রবেশ করি। স্থানীয় ইমিগ্রেশান ইনস্পেক্টর তাঁহার আফিসে আমার কাগজ-পত্র দাখিল করিতে

হুকুম দেন। সেখানে গিয়া আমাকে আধ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হয়। পার্শ্বের কক্ষে তিনি কোন শ্বেতাঙ্গী মহিলার সহিত হাসি-তামাসা ও গল্প-গুজব করিতেছিলেন, আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। তিনি যেন আমার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন! কিয়ৎকাল পরে দ্বারদেশে আসিয়া তিনি আমাকে দেখিলেন। কিন্তু তখনও আমাকে না ডাকিয়া আর এক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার পর আমাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। আহ্বানকালে তিনি আমাকে একটি কথাও বলিলেন না বা কোনও ভদ্রতাব্যঞ্জক ইঙ্গিতও করিলেন না, কেবল একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন!

"তাহার পর সেই কর্ম্মচারী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ দেশে আপনি কত দিন আইন অনুসারে থাকিতে পাইবেন, তাহা জানেন কি? সে সম্বন্ধে বাঁধাবাধি কি নিয়ম আছে, তাহা আপনি জানেন কি? এ দেশে আপনি কত দিন থাকিবেন? এ দেশ ত্যাগ করিবার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যে জামিনের টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে, তাহা আপনি দিতে প্রস্তুত আছেন ত? থাকিবার ওয়াদামত সময় উত্তীর্ণ হইলে কি দণ্ড দিতে হয়, তাহা আপনি জানেন ত?' প্রশ্নগুলির ভঙ্গীতে আমার অত্যন্ত অপমানবোধ হইল—আমার নিজের জন্য নহে, আমার দেশীয় এসিয়াবাসীর জন্য! আমি ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপের সর্ব্বত্র এবং মার্কিণ দেশেও পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছি, এমন ব্যবহার কখনও প্রাপ্ত হই নাই। হয় ত নূতন আইনে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তখন মার্কিণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিলাম। তবে পাছে এই বিষয় লইয়া একটা হৈ-চৈ হয়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ ঐ দেশ ত্যাগ করিলাম না, লসএঞ্জেলস্ সহরে বক্তৃতা করিলাম।

"কিন্তু তখনও আমার মন স্থির হয় নাই। কেবল মনে হইতে লাগিল,—এসিয়াবাসীর অপমানের কথা। এ দেশের লোক এসিয়াবাসীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে এবং এসিয়াবাসীর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করে,—এই অপমানকর চিন্তা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিল! আমি এই জাতির দয়ার মুখ চাহিয়া সে দেশে থাকিতে এক দণ্ডও ইচ্ছা করিলাম না। এসিয়াবাসী বলিয়া আমার এই অপমান, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিযোগের বা অনুযোগের কারণ ছিল না, কিন্তু সমগ্র এসিয়াবাসীর প্রতিনিধিরূপে আমার পক্ষে এই অপমান অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইল। সেই দিনই ঐ দেশ ত্যাগ করিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান্ কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক যে কোনও দেশের গৌরব। ইমার্সন ও কার্লাইল যাঁহাদিগকে Hero বা Representative men আখ্যা দিয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে যুগমানব বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। এই শ্রেণীর মানুষ কোন দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের, বিশ্বমানবের সম্পত্তি। বাল্মীকি, হোমর, ব্যাস, ভার্জ্জিল,সেক্সপীয়ার, কালিদাস, আলেকজাণ্ডার, অশোক, শিবাজী, নেপোলিয়ান, চাণক্য,ম্যাকিয়াভেলি জগতে এক এক বিষয়ে নূতন ভাবধারা আনিয়া যুগমানব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকল জাতির, সকল দেশের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নহেন, সমগ্র জগতের। তাঁহারও ন্যায় মনীষীর এই অপমান কেন,—কেবল তাঁহার বর্ণগুণে নহে কি? প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যগর্ব্বী শ্বেতাঙ্গ জাতি আজ ধনৈশ্বর্য্যমদে ও বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়াই কি প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না? এই প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ভেদাভেদ থাকিতে জগতে শান্তিবৈঠক ও জাতিসঙ্ঘের বৈঠক বসান প্রহসনমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এ কথাটা আজ না হউক, পরে প্রতীচ্যকে বুঝিতেই হইবে।

বড়লাটের বাণী

ছুটী লইয়া বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড আরউইন শিমলার চেমসফোর্ড ক্লাবের ভোজসভায় কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন। কথাগুলি প্রধানতঃ ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

লর্ড আরউইনের বক্তৃতার মূলতঃ দুইটি দিক্ লক্ষ্য করা যায়,—(১) এক দিকে তিনি পার্লামেণ্টের দয়াদত্ত শাসন-সংস্কারের সাফল্য-সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতে শান্তির বাতাস বহাইতে চাহিয়াছেন এবং সেই জন্য ভারতবাসীকে নানা স্তোকবাক্য দিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; (২) অপর দিকে তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত রুদ্রনীতির সমর্থনের জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এতদুভয় উদ্দেশ্যই যে বিফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলশেভিক বিতাড়ন অর্ডিনান্স ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির আইন,—এই দুইটি রুদ্রনীতিমূলক আইনের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা ব্যবস্থা-পরিষদের তর্কবিতর্ককালে সরকার পক্ষের যুক্তির চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র, উহার উত্তর জাতীয় পক্ষ সেই সময়েই দিয়াছিলেন। সুতরাং উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তবে প্রথম দফা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যেখানে একটা জাতির রাজনীতির অবস্থার সম্পর্কে জীবন-মরণের খেলা হইতেছে, সেখানে কেবল মুখের মিষ্ট কথায় কোন কায হয় বলিয়া আমরা মনে করি না, সেখানে কেবল অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই,—সেখানে চাই খাঁটি কাযের কথা হইতেছে, কেবল ভারতের জন্মগত অধিকার স্বীকার বা অস্বীকার করা লইয়া নহে, উহা স্বীকার করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব সেই স্বীকারোক্তিকে কার্য্যে পরিণত করা। লর্ড আরউইনের কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি যে ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবাসী তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা চাহে, তাঁহাকে আরও উর্দ্ধে উঠিতে, যথার্থ ভারতের দাবীর কথা [illegible] করিয়া উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে। লর্ড আরউইন বলিয়াছেন, তিনি বিলাতে গিয়া ভারতের সকল দলের অভিমত পার্লামেণ্টকে ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু কেবল তাহা করিলে ত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করা হইল না। তিনি জানেন, ভারতের অধিকাংশ লোক প্রকৃত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিতেছে, সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া

সাম্রাজ্যের নাগরিকের সমান অধিকারের জন্ম অভিমত জানাইতেছে, তাহারা নিজ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্ম সমানের আসনে বসিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইতে চাহিতেছে, কাহারও দানের প্রতীক্ষা করিতেছে না। লর্ড আরউইন যদি যথার্থ শান্তির বাতাস বহাইবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে এই দাবীর কথা বুঝাইয়া লেবার গভর্ণমেণ্টকে আপোষ-মীমাংসায় সম্মত করাইতেন, অন্যথা পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তিনি এখনও পার্লামেণ্ট ও সাইমন কমিশনকে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পদে বসাইয়া ভারতবাসীকে তাঁহাদের সহিত 'সহযোগ' করিতে মিষ্ট কথায় উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে যে তিনি ভারতবাসীকে 'নিকৃষ্টের' আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহাও তিনি মনে মনে নিশ্চিতই বুঝিয়াছেন। নিকৃষ্টে-প্রকৃষ্টে যে সহযোগ হয় না, তাহা ভারতবাসী কতবার বলিবে ?

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি নির্ণয়ের সময়ে সকল পক্ষেরই অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। বিলাতের ও ভারতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মনীষীরা পরস্পর সাহায্যদান করিয়া ও সাহচর্য্য করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কমিশন বসাইবার সময়ে ভারতীয় মনীষিগণের সাহচর্য্য ও সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই কেন ? তাহার পর কমিশনেই বা ভারতের মনীষিগণের মধ্যে বাছিয়া কাহাকেও লওয়া হয় নাই কেন ? পরে ভারতবাসীর সাইমন কমিশন বর্জ্জনের ফলে যখন নায়ার সেণ্ট্রাল কমিটীর নিয়োগ হইয়াছিল, তখনই বা তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট আসন দেওয়া হইয়াছিল কেন ? এখনও বিলাতে সেই কমিটীকে নিকৃষ্ট আসন দেওয়া হইতেছে কেন ? ইহা ত ছিদ্রান্বেষী ভারতীয় রাজনীতিচর্চ্চাকারীর কথা নহে, স্বয়ং কমিটীর চেয়ারম্যান সার শঙ্করণ নায়ারের স্বমুখের কথা। অবশ্য শ্রমিক সরকারের পক্ষ হইতে সরকারীভাবে নায়ার কমিটীকে ভোজ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা ও আদরও করা হইয়াছে, এ কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু আসল কাযের বেলা সাইমন কমিশনের নিকট সেণ্ট্রাল কমিটী কি ব্যবহার পাইয়াছেন ? সার শঙ্করণ নায়ার কোন এক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন, "সাইমন কমিশন কি ভাবে রিপোর্ট গঠন করিবেন, তাহা তাঁহার কমিটীকে জানান নাই, জানাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও বোধ হয় মনে করেন নাই। এমন কি, বিলাতে কোন্ কোন্ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইবে, তাহাও তাঁহার কমিটী শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়া আফিস, ওয়ার আফিস ও অন্যান্য কয়টা আফিসের প্রতিনিধিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু এই সকল প্রতিনিধি কে বা কাহারা, তাহা তাঁহাদিগকে জানান হয় নাই। পরন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।"

দেখুন একবার কেমন সমানে সমানের ব্যবহার! ইহার উপরেও আবার সোনায় সোহাগা আছে। যে সাংবাদিককে সার শঙ্করণ মনের দুঃখের কথা জানাইয়াছিলেন, তিনি সার জন সাইমনকে সার শঙ্করণের কথা জানাইয়া সে সম্বন্ধে তাহার জবাব কি আছে, জানিতে চাহিয়াছিলেন। সার জন তাহার উত্তরে তাঁহার সেক্রেটারীর মারফতে জানাইয়াছেন, "এ বিষয়ে তাঁহার কোন জবাব নাই!" চূড়ান্ত নহে কি ? অথচ মজা এই যে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যখন সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন শ্রমিক দলপতি (তখন গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ দলের দলপতি) মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড, বলডুইন গবর্ণমেণ্টকে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন :—

"আমি শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইনকে একাধিকবার জানাইয়াছি যে, সাইমন কমিশন সম্বন্ধে তাঁহার গভর্ণমেণ্টের ঘোষণায় যদি এমন কথা থাকে, যাহাতে বুঝা যায়, সাইমন কমিশন ও সেণ্ট্রাল কমিটীর মধ্যে পদমর্য্যাদার তারতম্য থাকিবে এবং উহার ফলে একটি অপরটির সমান আসন না পাইয়া মাত্র সাক্ষিরূপে বিবেচিত হইবে, তাহা হইলে এখনই সেই কথা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতীয় কমিটী একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং সাইমন কমিশনকে মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাঙ্গ করিবেন,—এমন ত কথা ছিল না। সুতরাং এ ধারণা আমরা যেন আদৌ অন্তরে পোষণ না করি, সাইমন কমিশনের সদস্যরাও যেন এ ধারণা পোষণ না করেন। আমাদের সাইমন কমিশন রিপোর্ট পরীক্ষা ও আলোচনা করিবেন, আর ভারতের কমিটীর সদস্যরা তাঁহাদিগকে সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা যেন না হয়। কমিশন কমিটীকে একত্র বসিতে আহ্বান করিয়া অধিবেশনকালে টেবলের অপর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে বসিতে দিয়া রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন, ইহাও যেন না হয়। ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের কমিশন ভারতে গিয়া ভারতীয় সেণ্ট্রাল কমিটীর সহিত সমানে সমানের আসনে বসিয়া তাঁহাদের বিবরণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত মতের আদান-প্রদান করিবেন, তাঁহাদের সহিত চুক্তি করিবার চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সহযোগী ও সহকর্ম্মী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া উৎকৃষ্ট রিপোর্ট রচনার চেষ্টা করিবেন।"

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ম্যাকডোনাল্ড ও বর্ত্তমানের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের মধ্যে কথার কত প্রভেদ, যেন আকাশ-পাতাল! অথচ লর্ড আরউইন এই গভর্ণমেণ্ট ও সাইমন কমিশনের সহিত পূর্ণান্তঃকরণে সহযোগ করিয়া ভারতবাসিগণকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিতে উপদেশ দিতেছেন! এমন 'অধিকার' দিবার প্রতিশ্রুতি কতবার দেওয়া হইয়াছে! কিন্তু কোন্টা পালিত হইয়াছে ? কেবল স্তোকবাক্য আর কথার সহানুভূতিতে চিঁড়া ভিজিবে না,—প্রকৃত কাযে প্রতিশ্রুতি-পালনের প্রয়াস প্রদর্শন করা চাই।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

কম্যুনিষ্ট বিতাড়ন অর্ডিনান্স ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে নানা জটিল আলোচনা উত্থিত হইয়াছে। প্রথমেই মামলার আসামীদের প্রতি ব্যবহারের কথা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ হইতেছে।

আসামীরা চোর-ডাকাত নহে, ভদ্র, শিক্ষিত, রাজনীতিক অপরাধে অভিযুক্ত; তাহাদের বিপক্ষে অপরাধ এখনও প্রমাণিত হয় নাই, অথচ তাহাদের প্রতি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে না। মীরাটের মত ভীষণ গ্রীষ্মমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্থানে জেলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, জেলের কদর্য্য আহার দেওয়া হইতেছে, উকীলের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করা হইতেছে,—ইত্যাদি অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করা হইতেছে। এ সকলের ঠিক সদুত্তর পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বেই যখন ফরিয়াদী পক্ষ সাক্ষ্য যোগাড় করিতে না পারিয়া ক্রমাগত সময় চাহিয়া মামলা বার বার মুলতুবী রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখনও এমনই অভিযোগ আপত্তি উঠিয়াছিল। সে আপত্তিরও সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। এই সকল কারণে জনসাধারণের এই মামলা সম্পর্কে যে একটা চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মিষ্টার হাচিন্সন,—মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী

তাহার পর অর্থ-ব্যয়ের কথা। সরকারের এডভোকেট জেনারল, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার প্রভৃতি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মাহিনার লোক থাকিতেও এক কোটি টাকা মঞ্জুরী করিয়া মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস প্রমুখ ব্যারিষ্টার উকীলকে নিযুক্ত করা কেন হইয়াছে, লোক তাহাও জানিতে চাহিয়াছে। তাহাদের সেই কৌতূহল-নিবৃত্তির কোন চেষ্টা হয় নাই।

আর একটা ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমানে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। লেবার গভর্ণমেণ্ট শাসনপাটে বসিবার পর রুসিয়ার কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ব্বের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ ঝালাইয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে লোক বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। যে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদসাধনে জগন্ময় ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহার সহিত বন্ধুত্বের সন্ধি,—এ কিরূপ রাজনীতি? যদি তাহাই হয়, তবে মীরাটে এতবড় একটা কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইবার প্রয়োজন কি? লেবার পার্টির মুখপত্র 'ডেলি হেরাল্ড' মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের গভর্ণমেণ্টকে এই ভাবের পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি মীরাটের মামলা উঠাইয়া লইতে বলিয়াছেন। এরূপ করিলে রুসিয়ার কম্যুনিষ্ট (সোভিয়েট) গভর্ণমেণ্টও সন্তুষ্ট হইবে, ভারতবাসীকেও দেখান হইবে যে, লেবার গভর্ণমেণ্ট অতীত বিস্মৃত হইয়া নূতন করিয়া ভারতবাসীর সহিত বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন। অবশ্য এ যাবৎ তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হয় নাই।

অপর দিক্ দিয়া কঠোর শাসনপন্থী দলের মুখপত্র 'মর্ণিং পোষ্ট' পরামর্শ দিতেছেন, মীরাটের মামলার সিদ্ধান্ত-ফল না দেখিয়া যেন রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের সহিত সন্ধি করা না হয়।

ফল কথা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাটা নানারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অনেক জটিল আইনের কূট তর্কও উঠিয়াছে। মামলার আসামীপক্ষ ও তাঁহাদের উকীল-ব্যারিষ্টার বলিতেছেন, স্বয়ং বড়লাট সিমলার চেমস্ফোর্ড ক্লাবের বক্তৃতায় এই মামলা সম্পর্কে এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা আদালতের অবমাননা অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। বড়লাট লর্ড আরউইন সেই বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"তাঁহার সম্মুখে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আসামীরা দেশের আইন লঙ্ঘন করিয়াছে।" আসামীপক্ষের উকীলরা বলিতেছেন, মামলা যখন বিচারাধীন, তখন এমন অভিমত প্রকাশ করার ফলে হয় ত এসেসররা প্রভাবান্বিত হইবে

মিঃ মজঃফর আহমদ,—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত

পারেন। বিচারক বলিয়াছেন, না, ইহাতে আদালত অবমাননা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'ইভনিং নিউজ', 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে আসামীদের পক্ষ-সমর্থনে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, আসামীপক্ষের উকীলরা এমন অভিযোগ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের কলওয়ালা সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ মোডি এই দুই পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, ইহা ঘোর আপত্তিকর। সরকার পক্ষের কৌঁসিলি মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস মামলার উদ্বোধন বক্তৃতা যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাও আসামী-পক্ষের উকীলরা আপত্তিকর বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।

এইরূপ নানা জটিল প্রশ্নের উদয় হইতেছে। এই মামলা স্থানান্তরিত করিবারও চেষ্টা চলিতেছে। মীরাটের মত ক্ষুদ্র স্থানে মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করার অনেক অসুবিধা আছে, ইহা দেখান হইতেছে। অথচ মামলা কিছু দিন মুলতুবী রাখা হইয়াছে। এমন মামলার ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন উহা যে কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র কাহিনী-রূপে পঠিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আলীপুর বোমা মামলার মতই ক্রমশঃ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠিতেছে।

মিঃ ফিলিপ স্প্র্যাট,—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ

গত ১২ই জুন ব্যবস্থা-পরিষদের বোমার মামলার রায় বাহির হইয়াছে। আসামী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীরা তরুণ, এই কমনীয় বয়সেই কি হেতু বিপথে চালিত হইয়া গুরুদণ্ড বহন করিল, ইহা ভাবিয়া অন্তরা সত্য সত্যই দুঃখভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু আমরা যাহাই অনুভব করি, তাহারা হাসিমুখে মাথা পাতিয়া দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের দীর্ঘ বিবরণে তাহারা তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, পরন্তু কেন অপরাধ করিয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছে। তাহারা উহাতে বলিয়াছে,—"মানব-জীবনের মর্য্যাদা আমরা বুঝি এবং যথাসাধ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করি। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। কাহাকেও আহত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অসহায় মূক শ্রমিকদের উপর শোষকের অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেই আমরা বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। বধির সাম্রাজ্যবাদীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।" বিচারক এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট

বটুকেশ্বর দত্ত ভগৎ সিং

হন নাই। তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হত্যা বা গুরু আঘাতের চেষ্টার অপরাধে তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিয়াছেন। শুনা গিয়াছে, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে।

বাঙ্গালার শিক্ষা

বঙ্গের শিক্ষা-নিয়ামকের (Director of Public Instructiou) ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষার উন্নতির সম্বন্ধে আদৌ আশান্বিত হইতে পারা যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষালয়-সমূহের (হাই ও মিডল্ ইংলিশ ও মিডল্ ভার্ণাকুলার) সামান্ত কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু রিপোর্টেই প্রকাশ, প্রাইভেট স্কুলসমূহের শিক্ষকদিগের বেতন যৎসামান্ত, পরন্তু শিক্ষকরা বহু স্থলে যোগ্যতাহীন। ইহার ফল কি হইতে পারে, সহজেই অনুমেয়। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, মাধ্যমিক শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে কতকটা উপকার হইতে পারে। কিন্তু বোর্ড-প্রতিষ্ঠার কি উপকার হইবে, বুঝা যায় না। শিক্ষা-বিভাগের অর্থের অনাটন কিসে মিটিবে? সরকার যদি এই বিভাগে অধিক অর্থ নিয়োজিত করিয়া বে-সরকারী স্কুলসমূহকে সাহায্যদান করিতে পারেন, তবেই এই সমস্তার সমাধান হইবে, অন্তথা নহে। কিন্তু সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বাবদে এবং ইস্পাতের কাঠাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সরকারের তহবিলের অধিকাংশ অর্থই ত ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে!

তবে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু উন্নতি হইয়াছে, রিপোর্টে ইহা জানা যায়। এক বৎসরে প্রাথমিক স্কুল-সমূহের ও মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-বিভাগে ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৭ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা আশার কথা বটে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। বঙ্গে ইহাই প্রথম চেষ্টা। শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু শিক্ষা এই দরিদ্র দেশে অবৈতনিক হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। উচ্চশিক্ষায় ক্রমশঃ যে সর্ব্বনাশকর অর্থ-ব্যয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া দিন দিন দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় দিন দিনই বেতন ও অন্তান্ত বাবদে শোষণ বৃদ্ধি হইতেছে। সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইলে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কলিকাতা করপোরেশনও তাঁহাদের হদ্দার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা যথাসম্ভব অবৈতনিক করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বাঙ্গালার অন্তান্ত মিউনিসিপ্যালিটীও চট্টগ্রামের পন্থা অনুসরণ করিলে দেশের অজ্ঞতা দূর হইবার সম্ভাবনা হইবে। একটা বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের লক্ষ্য করিবার আছে। রিপোর্টে প্রকাশ, আর্টস ও প্রোফেসানাল কালেজ-সমূহে সমগ্র ছাত্রের সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ১৩·৭ ও ১৪·৮ জনের অধিক নহে। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? মুসলমান ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি অবস্থা এমন কেন? মুসলমান নেতৃবর্গের এ বিষয়ে আশু দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

ভারতীয়া শিক্ষার্থিনীর কৃতিত্ব

এ বৎসর ইন্দোর খৃষ্টান কলেজ হইতে কুমারী শান্তাবাই বি, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি হোলকার দরবারের শিক্ষা-নিয়ামক ডাক্তার ভি, সুকথঙ্কর মহাশয়ের কন্তা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ পরীক্ষায় পরলোকগত আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী শ্রীমতী রমা বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় শ্রীমতী ভক্তি অধিকারী প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী আশা পূর্ব্বে এম, এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহারা অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।

ভারতীয়া নারী কর্ম্মী

শ্রীমতী স্বর্ণদেবী (সান্নো দেবী) পঞ্জাব জালন্ধরের কন্তা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত যে কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনেক পুরুষেরও অনুকরণীয়। তিনি এই উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ

শ্রীমতী সান্নো দেবী

করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প, ১ লক্ষ অ[illegible] সংগ্রহ করা। এ যাবৎ তিনি ইহার একার্দ্ধ সংগ্রহ করিতে সম[illegible] হইয়াছেন। অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা[illegible] শীঘ্রই যাত্রা করিবেন।

মতের ডিগবাজী

এ দেশের ইংরাজ বণিকদের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া সমিতি আছে, ইহার নাম Chamber of Commerce. ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই সমিতিসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান (Associated Chamber of Commerce) সাইমন কমিশনের সকাশে একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহাদের অধিকাংশ, পুলিস বা শান্তি ও শৃঙ্খলা বিভাগের কর্ত্তৃত্ব মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন বলিয়াছিলেন যে, যদি দেশের লোককে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে এই কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আজ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সেই সম্মিলিত ইংরাজ বণিকসভার অধিকাংশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"The Majority view is now quite definitley opposed to the transfer of the control of Police Administration to our elected Minister, responsible to the Legislature."

এই Majorityর মধ্যে আছেন, বোম্বাই, করাচী, পঞ্জাব, আপার ইণ্ডিয়া, বর্ম্মা ও অন্যান্য ৬টি ক্ষুদ্র চেম্বার। বাঙ্গালার চেম্বার বলিয়াছেন, "Unless the responsibility for the maintenace of order, is transferred to the charge of a Minister, provincial autonomy cannot have a proper chance of fulfilment," অথচ বেঙ্গল চেম্বার ইহাও বলিয়াছেন যে, "We would not transfer the subject to the Provincial Legislature until the latter showed signs of stability," অর্থাৎ তাঁহারা একূল ওকূল দুই কূলই বজায় রাখিতে চাহেন। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত নূতন গভর্ণমেণ্ট সুযোগ না পাইলে কিরূপে তাঁহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন, তাহা ত বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, মাদ্রাজ চেম্বার একবারে পুরাপুরি এই দায়িত্ব মন্ত্রীর হস্তে দিতে চাহেন। Majority পক্ষ হইতে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, এখন যাঁহাদের হস্তে পুলিসের অর্থাৎ শান্তি-শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, এ ব্যবস্থার ওলট-পালট করিতে গেলেই অব্যবস্থা দেখা দিবে। যুক্তি অতি চমৎকার! সত্যই কি যোগ্যতার সহিত এই বিভাগের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে? তবে পুলিসকে দেখিলে জনসাধারণ 'শতহস্তেন বাজিনা' নীতি অথবা 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' নীতি অনুসরণ করিয়া দূরে পলায়ন করে কেন? অন্যান্য সভ্য দেশের পুলিসের মত এ দেশের পুলিস জনসাধারণের বন্ধু ও রক্ষকরূপে সকল সময়ে বিবেচিত হয় না কেন? পুলিসে জনসাধারণে মিলামিশার ভাব নাই কেন? জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া সকল সভ্য দেশের পুলিস কায করে। এ দেশে তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন? এ দেশের পুলিসের অস্ত্র প্রধানতঃ সদ্ভাব ও সহানুভূতি নহে, ভয়-প্রদর্শন ও জবরদস্তি, লোকের মনে এই ধারণা হয় কেন? সুতরাং এ দেশে যাঁহাদের হস্তে পুলিসের ভার ন্যস্ত, তাঁহারা যোগ্যতার সহিত দায়িত্ব পালন করিতেছেন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। তবে অন্য হস্তে সেই ভার বা দায়িত্ব অর্পণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

স্বার্থই সর্ব্বস্ব

এ দেশের 'মূক জনসাধারণ' অসহায়, তাহাদিগকে তাহাদের কথা-সর্ব্বস্ব রাজনীতিচর্চ্চাকারী দেশবাসীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে কেবল ইংরাজের 'মা-বাপ' শাসন এবং বিদেশী বণিকের বন্ধুতা—এ দেশের বিদেশী ব্যবসায়ী বণিকরা এই কথাটা অনুক্ষণ জগতে ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে বাঙ্গালার দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তখন সেই মা-বাপ শাসন হইতে বহুগুণ অধিক সাহায্য দান করিয়াছিল, শিক্ষিত রাজনীতি-চর্চ্চাকারী দেশবাসী, এ কথা নিরপেক্ষমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আর বিদেশী বণিকের বন্ধুতা যে সে সময়ে অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহাও সকলে জানে। এবারও আসাম ও কুমিল্লা-ত্রিপুরার বন্যায় বিপন্ন জনগণের সাহায্যে বিদেশী বণিকরা কেমন 'মূক জনসাধারণের' বন্ধু, তাহার প্রমাণ পাইতে কষ্ট পাইতে হয় নাই। বিপন্নগণের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর, অজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিক মুসলমান, অথচ কষ্ট-বিপদ্ সহ্য করিয়া তাহাদিগকে অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিতেছে শিক্ষিত রাজনীতিচর্চ্চাকারী ভারতবাসী! সুতরাং প্রকৃত কাযের সময় কাহারা জনসাধারণের বন্ধু, তাহার প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হয় না।

বিদেশী বণিকরা কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ প্রান্তগামী খাল খনন করাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। ইহাতে গৌরীসেনের টাকা জলের মত ব্যয় হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, খাল খনন করা চাই-ই, কেন না, তাহা হইলে নদীপথে বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীদের আয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে। দেশের লোক বলিতেছে, উহা চাই না, অনর্থক সরকারী তহবিলের এত টাকা ব্যয় করিয়া কোন লাভ নাই, পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথই যথেষ্ট, তাহার উপর পদ্মা, মেঘনা আদি নদীপথের ষ্টীমার আছে। কিন্তু সে কথা শুনে কে? এ দিকে ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত যে রেলপথ নির্ম্মিত হইবার কথা হইয়াছে, বিদেশী বণিকরা তাহার বিপক্ষে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া আন্দোলনের ঝড় তুলিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে (বোধ হয়) পূর্ব্ববঙ্গ নদীপথের বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীরা প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে! ইহা ছাড়া অন্য কারণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ দেশের লোক এই রেল চাহিতেছে। সুতরাং এই বণিকরা জনসাধারণের কিরূপ বন্ধু, ইহা হইতেই জানা যায়।

আসল কথা, তাঁহারা আর কাহারও বন্ধু নহেন, বন্ধু নিজের 'বাণিজ্যগত স্বার্থের।'

সহরের স্বাস্থ্য

সম্প্রতি "কলিকাতা গেজেটে" বঙ্গীয় ধূম উৎপাত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জানা যায়, সহরে প্রতি বৎসরে ৮ হাজার লোক শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহা কি সর্ব্বনাশা কথা নহে? একে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, প্লেগ, তাহার উপর এই নূতন উপসর্গ, মানুষ যায় কোথা? সে দিন রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাকালে বাঙ্গালা স্বাস্থ্য বিভাগের ভূতপূর্ব্ব চিফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্র্যানবি উইলিয়ামস্ অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"It can only be considered that, as regards any improvement in the. health of the inhabitants of this Empire, the results of British administration have been to a great extent a failure and it must be regretfully admitted that there has been no advance in India in this respect comparable with the reduction in mortality and disease which has been so remarkable during recent years in Great Britain and other civilized countries." এইটুকু পাঠ করিলেই মনে হয়, ইহা কোনও অসন্তুষ্ট চরমপন্থী ভারতীয় রাজনীতিকের অভিমত। কি সর্ব্বনাশ! এই ভারত সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে বৃটিশ শাসন বহুল পরিমাণে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, পরন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য সভ্যদেশে অধুনা যে ভাবে মৃত্যুর ও রোগের হার কমান হইয়াছে, ভারতের তাহার সহিত তুলনা করা যায় না। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের বড় ইংরাজ চাকুরিয়া (অধুনা অবসরপ্রাপ্ত)—তাঁহার মুখে এই স্বীকারোক্তি পাঠ করিয়াই জানা যায়, এ দেশে রোগভোগে জনসাধারণ দিন দিন কিরূপ অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তিনি ত ঐ বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"যে জাতি ম্যালেরিয়ার জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, হুকওয়ারম্ পোকায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, অপরিচ্ছন্নতা ও জনতা করিয়া বসবাস করা জনিত রোগে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাদের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য ও শক্তি কোথা হইতে আসিবে?"

এই চিত্র ত বহুকাল যাবৎ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তবে এত দিন উহা ভারতীয় রাজনীতিকের বক্তৃতার বিষয় ছিল। এখন বেণ্টলি, রস, উইলিয়ামস্ প্রমুখ স্বাস্থ্যবিৎ সরকারী কর্ম্মচারীদের নিজ মুখের স্বীকারোক্তিতে কথাটার মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। নিবার্য্য রোগে বঙ্গদেশে কত লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী স্বাস্থ্য-রিপোর্টে লিখিত কলেরা, বসন্ত ও অন্যান্য রোগের মৃত্যু-সংখ্যার হার হইতে জানা যায়। উহা এইরূপ:—

খৃষ্টাব্দ	কলেরা	বসন্ত	কালাজ্বর
১৯২৬	৫৯১০৬	২৫৫৫৮	১৪২৭৫
১৯২৭	১১৮৩৭৭	৪২৫১৪	১১৮৫৫

এ সকল রোগের প্রতীকারের উপায় আছে। কিন্তু সরকারী তহবিলে অর্থাভাব! রোগ প্রতীকার হইবে কিরূপে? এ দেশের শিশুমৃত্যু কিরূপ ভয়াবহ, তাহাও দেখুন:—১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১ বৎসরের কম বয়সের শিশু মরিয়াছিল ২৫১১৮৪টি, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মরিয়াছে ২২৯০৭৮টি! এই শিশুমৃত্যুও কি কমান যায় না? অন্যান্য সভ্যদেশে এরূপ হইলে জনসাধারণ কি করিত?

যাউক সে কথা, এই যে ধূমদৈত্য নামক নূতন উপসর্গ উপস্থিত, ইহার হস্ত হইতে নিস্তারের কি উপায়বিধান করা হইতেছে? গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতির চুল্লী তৈয়ার বা চিমনী রন্ধনাগারে খাটান প্রভৃতি নানা পরামর্শের কথা শুনা যাইতেছে কিন্তু উহাতে মনে হয়, ইহা বিদেশী পণ্য-ব্যবসায়ীর মাল কাটাইবার ফন্দীও হইতে পারে। আমাদের দরিদ্র দেশে সকল বিলাসিতার আমদানী সহজসাধ্য নহে। তবে গ্যাস বিদ্যুৎ কোম্পানীরা যদি একচেটিয়া অধিকারের দাবী কিছু সংযত করিয়া কম দরে মাল সরবরাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আর সহর হইতে কল ও চিমনী দূরে সরাইলেও অনেক সুবিধা হইতে পারে। গৃহস্থের ঘরে ঘরে কাঠ ও ঘুঁটের পুনঃপ্রবর্ত্তন এ কালে সম্ভব নহে, পাথুরিয়া কয়লা যাহাতে পুড়াইয়া (কাঁচা কয়লা ভেজাল না দিয়া) কোক করিয়া গৃহস্থ-গৃহে সরবরাহ করা হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু ধূম ছাড়াও ত শত্রু আছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল কিসে নিবারিত হইবে? করপোরেশন আছেন, ফুড ইন্‌স্পেক্টর আছেন, আদালত আছেন,—আছেন সব। কিন্তু কায ত কিছুই হয় না। এক উপায়ে তদারকে অসাধুতা দূর করা যাইতে পারে। প্রতি মাসে ইন্‌স্পেক্টরদের এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডে বদলী করিলে দোকানদারদের সহিত অসাধু ইন্‌স্পেক্টরের কায়েমী বন্দোবস্ত করায় বাধা পড়ে। ইহা ছাড়া আরও একটি উপায় আছে। অসাধু দোকানদার ও বিক্রেতাদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা। ইহা ছাড়া আর উপায় নাই।

গঙ্গা অপবিত্র করার জন্য সহরের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এ দিকেও কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। একেই ত কলের সেপটিক ট্যাঙ্কের উৎপাত, তাহার উপর জাহাজ নৌকার নাবিক ও মাঝি-মাল্লার উৎপাত। শেষোক্ত উৎপাত পোর্ট-পুলিসের কড়াকড়ি পাহারা এবং সজাগ শাসন দ্বারা নিবারিত হইতে পারে।

স্মৃতির পূজা

কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসেবিগণের উদ্যোগে এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের আত্মনিয়োগে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার উদ্দেশে সপ্তম বার্ষিক "বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনের" অধিবেশন আষাঢ় মাসে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রসরাজ অমৃতলাল বসু এই সাহিত্য-সম্মেলনের পৌরোহিত্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একনিষ্ঠ দেশ-প্রেমিক ছিলেন, দেশবাসীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধের প্রেরণা যাঁহাদের চেষ্টায় উদ্ভূত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। আত্মবিস্মৃত জাতিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া এমনভাবে দেশপ্রেম শিক্ষা আর কেহ দিতে পারে নাই। শুধু সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর পূজ্য নহেন, বাঙ্গালীর প্রাণে আত্মচেতনা-সঞ্চারের জন্যও তিনি জাতির নিকট নমস্য। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা ক[illegible] ধন্য। কাঁঠালপাড়ার শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী প্র[illegible] সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-রসিকগণ "বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনের" প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

আদালত-গৃহে রেডিও যন্ত্র

সিন্‌সিনেটীর আদালত-গৃহে রেডিও মাইক্রোফোণযন্ত্র ও "লাউড স্পীকার" সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সাক্ষীর কণ্ঠস্বর যাহাতে

আদালত-গৃহে রেডিও যন্ত্র

জুরীরা স্পষ্টরূপে শুনিতে পান, সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা। লাউড স্পীকার ঘরের প্রাচীরে বিলম্বিত; উহার মুখ জুরীদিগের দিকে প্রস্তুত। মাইক্রোফোন্ যন্ত্রটি, যেখানে সাক্ষী দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিবে, সেই দিকে অবস্থিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের হংস

নেভাডার কোন পর্ব্বত-গুহায় একটি হাঁসের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা ৩ হাজার বৎসরের পুরাতন। সে যুগে এই হাঁসের মূর্ত্তির সাহায্যে মানুষ জীয়ন্ত হাঁস শিকার করিত। যেখানে এই হংস-মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সন্নিকটে প্রাচীন যুগের বর্শাফলক, ঝুড়ির ভগ্নাংশ এবং রন্ধনের উপযোগী তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে জাতি সে যুগে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিত, তাহাদের বংশ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শিকারী-হংসমূর্ত্তি

রাজপথে আলোকপ্রহরী

মানুষের কায কমাইয়া ক্রমেই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষকে ক্রমেই বাদ দেওয়া হইতেছে। মার্কিণ দেশে এই যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতেছে। সম্প্রতি রাজপথে যান-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে মানুষের সাহায্য যাহাতে প্রয়োজন না হয়, তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন চৌমাথার উপর একটি আলোকস্তম্ভ রাখিলে পুলিস-প্রহরীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়
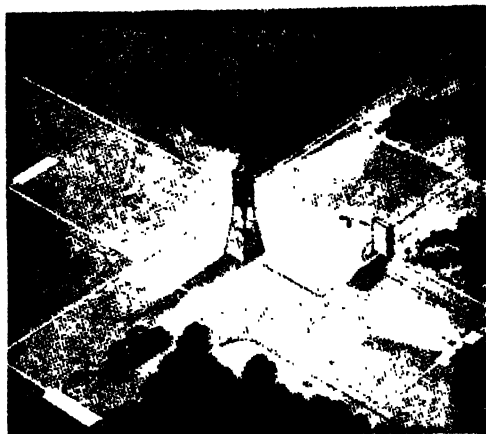
রাজপথে আলোক-প্রহরী

না। পথের উপর তারের নমনীয় শাখা বা 'সুইচ' এমন ভাবে ফেলিয়া রাখা হয় যে, সহসা তাহার স্বরূপ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই তার বা সুইচের উপর দিয়া কোন গাড়ী চলিবার সময় একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোকস্তম্ভের ভিতর আলোক জ্বলিয়া উঠে। চিত্রে বর্ণিত চৌরাস্তার দুই দিক্ হইতে দুইখানি মোটর গাড়ী আসিতেছে। তারের উপর আসিবামাত্র আলোকস্তম্ভে গাড়ীর অভিমুখে সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিবে। গাড়ীগুলি যে দিক্ হইতে আসিতেছে—তাহার বিপরীত দিকে আলোকস্তম্ভে লাল আলো জ্বলিয়া উঠিয়া অপর দিকের যানগুলিকে থামাইয়া দিবার সঙ্কেত বিজ্ঞাপিত করিবে। সবুজ আলো নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকিবে। তার পরই উহা

রক্তবর্ণ আলোকে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। বিপরীত দিকে তখন সবুজ আলো জলিয়া উঠিবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে —এই ভাবে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

এক আনায় রেডিও শ্রবণ

লণ্ডনের অনেক হোটেলে আমাদের দেশের এক আনা মূল্যের অর্থ ব্যয় করিলে স্ব স্ব ঘরে বসিয়া রেডিও-যন্ত্রে সঙ্গীত প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়। রেডিও-যন্ত্রের সংলগ্ন ছিদ্রপথে উক্ত মুদ্রাটি প্রেরণ করিলেই ৫ মিনিট ধরিয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতা বা গান শ্রুতি-গোচর হইবে। হোটেলে ৩ শত ব্যক্তির শুনিবার উপযোগী 'হেড পিন্' আছে।

এক আনায় রেডিও শ্রবণ

মোটরচালিত পুলিস-দুর্গ

ভারতবর্ষের সামরিক ও পুলিস বিভাগে ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি একপ্রকার বর্ম্মাবৃত মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মোটর-চালিত পুলিস-দুর্গে সংবাদ আদান-প্রদান উভয়বিধ কার্য্যোপযোগী রেডিওযন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এই রেডিওযন্ত্র বহুদূরের সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণের উপযোগী। চলমান দুর্গ যখন দ্রুতবেগে ধাবিত হইবে, তখনও রেডিও যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইবে না, এমন ব্যবস্থা উহাতে আছে।
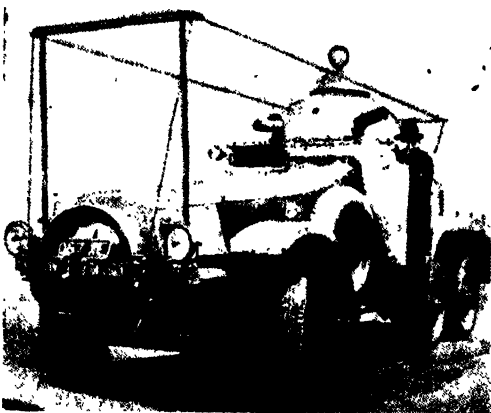
মোটরচালিত পুলিস-দুর্গ

সন্তরণের সুবিধা

জনৈক ইংরাজ-সন্তরণকারী, শিক্ষার্থীদিগকে সন্তরণকালে জলের উপর ভাসিয়া থাকিবার সুবিধার জন্য এক প্রকার বায়ুপূর্ণ 'প্যাড' ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। এই প্যাড তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত। হাতের কনুই-এর নিম্নে ঐ বায়ুপূর্ণ 'প্যাড' বাঁধিয়া দিলে, সন্তরণ-কালে কোনও অসুবিধাই হয় না; বরং সন্তরণ-শিক্ষায় বিশেষ সুবিধাই হইয়া থাকে। এই প্যাড যতক্ষণ বায়ুপূর্ণ থাকে, সন্তরণকারীর সে পর্য্যন্ত কখনই জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। এই প্যাড স্বল্পায়াসে বাঁধা ও খোলা যায়।

কনুই-সংলগ্ন বায়ুপূর্ণ 'প্যাড'

বিচিত্র বেহালা

কেণ্টাকী অঞ্চলের জনৈক নিপুণ শিল্পী ৫ হাজার দীপশলাকা লইয়া এক বিচিত্র বেহালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এমন অপূর্ব্ব বেহালা জগতে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। দীপ-শলাকা এমন কৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, সহজ দৃষ্টিতে মনে হয় একখানি অবিচ্ছিন্ন কাষ্ঠের সাহায্যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বেহালা হইতে অতি মধুর স্বর-লহরী উত্থিত হইয়া থাকে। বেহালা-নির্ম্মাতা এক বৎসর পরিশ্রমের ফলে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দীপশলাকা-নির্ম্মিত বেহালা

দ্বি-মস্তক-বিশিষ্ট শিশু

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর সন্নিহিত স্থানে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় একটি দ্বি-মূর্ত্তিবিশিষ্ট সন্তান প্রসূত হইতে দেখিয়া তাহার

দ্বি-মস্তক-বিশিষ্ট শিশু

আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন। শিশুটি অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। শিশুর পশ্চাতে লাঙ্গুলাকৃতি পাঁচ ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ মাংসপিণ্ড ছিল। এই অদ্ভুতদর্শন নবজাত শিশুর চিত্র প্রদত্ত হইল।

'ব্যাটারী'-চালিত ত্রিচক্র যান

এক প্রকার দ্রুতগামী ত্রিচক্র যান বাজারে বাহির হইয়াছে। এই যান ঘণ্টায় ১৮ হইতে ২৫ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। ব্যাটারী একবার ভরিয়া লইলে ১২৫ মাইল পর্য্যন্ত ত্রিচক্র যান অনায়াসে চলিতে পারে। রোগীদিগের পক্ষে এই গাড়ী চড়িবার বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, এই ত্রিচক্র যানকে সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

ব্যাটারী-চালিত ত্রিচক্র যান

বিদ্যুৎচালিত আগ্নেয়াস্ত্র

জনৈক অষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক ক্ষিপ্র গুলী-নিক্ষেপকারী এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বিদ্যুতের দ্বারা চালিত এবং এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে গুলী নিক্ষেপ করিতে পারে। এই শ্রেণীর অন্য যে বন্দুক আছে, তাহা হইতে এক সেকেণ্ডের এক দশমাংশ সময়ে গুলী নির্গত হইয়া থাকে। সম্প্রতি অষ্ট্রীয় সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎচালিত আগ্নেয়াস্ত্র

বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা

সমুদ্রতীরের যে সকল স্থানে নারী-সন্তরণকারীদিগের জন্য বেশ-পরিবর্ত্তন করিবার গৃহ নাই, তথায় তাঁহারা স্ব স্ব বস্ত্র-গৃহ সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকেন। জনৈক ইংরাজ এই বস্ত্র-পরিবর্ত্তন-গৃহের উদ্ভাবনকারী। পিপার আকারে বস্ত্র-নির্ম্মিত কক্ষটি ভাঁজ করিয়া রাখা যায়। ইহার উচ্চতা নারীর স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত। এই কক্ষের আয়তন এরূপ যে, তন্মধ্যে অবস্থিত নারী অনায়াসে বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

নারীর বস্ত্র-পরিবর্ত্তন-কক্ষ

মন্ত্রিরক্ষার জন্য ভোট দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোন মতেই নিন্দা করিতে পারা যায় না। কারণ, তাঁহারা দ্বৈতশাসনের সমর্থক না হইলেও শাসনযন্ত্র অচল করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস, মন্ত্রিনিয়োগে বাধা দিলেই সরকার এই দ্বৈতশাসন রহিত করিয়া দেশের লোককে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিবেন না। এবারকার শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় হয় ত দ্বৈত-শাসন রহিত হইতে পারে। দুই বা তিন জন মন্ত্রী হয় ত শাসন-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেই বা আমাদের দেশের লোকের বিশেষ কি লাভ হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। যদি জনসাধারণের প্রতিনিধি সদস্যগণের ভোটে মন্ত্রীরা নির্ব্বাচিত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অবশ্য কিছু সুবিধা হইতে পারে, কোন কোন স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি মন্ত্রী হইতে পারেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে আভূমিনত হইয়া সেলাম করিয়া বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতন লইবার জন্য মেরুদণ্ডহীন লোক মন্ত্রী হইতে না-ও পারেন। অবশ্য নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্যে যদি মেরুদণ্ডবিহীন লোক অধিক থাকেন, তাহা হইলে যে অনেক সময় মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিরাও ভোটের জোরে মন্ত্রিত্ব পাইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যত দিন দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের প্রকৃত হিত বুঝিয়া দৃঢ়চেতা এবং দেশের ও জাতির হিতসাধনে ঐকান্তিকভাবে রত ব্যক্তিদিগকে ভোট দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবিষ্ট না করাইতেছেন, তত দিন নির্ব্বাচন দ্বারাও যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে বসাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে না।

কিন্তু কেবল স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চরিত্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মন্ত্রীর আসন প্রদান করিলেই যে আমাদের চতুর্ব্বর্গলাভ হইবে, আমার তাহা মনে হয় না। কারণ, যিনিই মন্ত্রী হউন না কেন, তিনি যদি অধীনস্থ বিভাগে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু মন্ত্রী নির্ব্বাচিত অথবা শাসন-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইলেই যে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। সরকারী কোষ হইতে মন্ত্রীরা তাঁহাদের বিভাগের জন্য যত দিন না আবশ্যক অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন, তত দিন আমাদের জাতীয় হিত-কর বিষয়গুলির কোনমতেই উন্নতি সাধিত হইতেছে না। যত দিন আমরা আমাদের জাতীয় হিতকর বিভাগগুলির উন্নতি-সাধন করিতে না পারিতেছি, তত দিন আমরা স্বরাজলাভের পথে কখনই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না। সুতরাং আসল কথা—অর্থ চাই। আর চাই একতা। যে ক্ষেত্রে এ বিস্তীর্ণ দেশের লোক একমত হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের শাসকবর্গ আপনাদের জিদ কখনই বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন না। কেবল মন্ত্রিনির্ব্বাচনে বাধা দিলেই যে এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হইবে, ইহা কোনমতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। সরকারের বা বৃটিশ জাতির যদি ভারত-বাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন—পূর্ণ মাত্রায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার একেবারেই ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন কোন ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিনিয়োগে সমর্থ হইলেন না বলিয়াই এই বিশাল লাভজনক রাজ্যপাট ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা মনে করা নিতান্তই হাস্যজনক। নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে এমন কথা কেহ মনে করিতে পারেন না।

তবে এ কথা সত্য যে, বৃটিশ জাতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সমস্ত সভ্যজাতির সমক্ষে ভারতবাসীদিগকে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, প্রকাশ্যে, পৃথিবীর লোকলোচনসমক্ষে তাঁহারা সহজে ও সহসা সেই প্রতিশ্রুতির অপহ্নব করিতে চাহিবেন না। তাঁহাদের যতদূর সাধ্য উহার বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইবেন। আমাদের ঐখানেই একটু জোর আছে। কিন্তু সে জোর বড় অধিক নহে—অতি সামান্য। তাহার কারণ, যুরোপীয় কূট রাজ-নীতিতে (ডিপ্লোম্যাসীতে) নৈতিক চিন্তা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় না। নীতিজ্ঞান ইহার ত্রিসীমানায় পদন্যাস করিতে সমর্থ নহে। প্রতারণাই ইহার মূলমন্ত্র। ইহা আমার নিজ কথা নহে। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অনেক লেখক ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি বিখ্যাত ধর্ম্মনীতি-সম্পর্কিত লেখক অধ্যাপক কার্ভেথ রীডের (Carveth Read) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। তিনি তাঁহার 'নৈসর্গিক ও সামাজিক নীতিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

Diplomacy, therefore, must often be embarassing, and the popular belief is that as an art, it consists entirely in skilful deception, and can be no further truthful than may seem necessary to make falsehood credible. For my own part, I find it impossible to believe this of our own diplomatists; although in the opinion of foreigners 'our diplomacy is (so they say) signally perfidious. But studying the diplomacy of some other nations, I am forced to judge that deceipt is the essence of it."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—"অতএব কূট রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিড়ম্বনাজনক হইবেই। সাধারণের বিশ্বাস, বুদ্ধির কৌশল হিসাবে ইহা পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতার সহিত প্রতারণার দ্বারা গঠিত; মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিবার জন্য যতটুকু সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিক মাত্রায় সত্যাশ্রয়ী হইতে পারে না। আমার মতে আমি আমাদের (বৃটিশ জাতির) কূট রাজনীতিকদিগকে ঐরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না বটে, তাহা হইলেও বিদেশীদিগের মতে আমাদের কূট রাজনীতি (তাঁহারাই ঐ কথা বলেন) পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ। কিন্তু অন্য কতকগুলি জাতির কূট রাজনীতি-কৌশল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি যে, প্রতারণাই কূট রাজনীতির মূল তত্ত্ব।" অধ্যাপক রীড স্বদেশ-প্রেমিক। প্রেম কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া তোলে। * কারণ, প্রেম ত চোখে দেখে না।

* Love looks not with the eyes, but with the mind
And therefore is winged cupid painted blind.
Shakespere. A midsummer nights dream.

সে প্রেমের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে। অধ্যাপক রীড স্বদেশ-প্রেমিক, তাই তিনি তাঁহার স্বদেশী কূট রাজনীতিকদিগকে প্রতারণাপরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া উঠিতেই পারেন নাই। কিন্তু বিদেশীরা, অর্থাৎ যাঁহাদের উপর বৃটিশ কূটনীতি প্রযুক্ত হয়, তাঁহারা যে উহা একেবারেই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বলিয়া থাকেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এই কথাটা হয় ত একটু অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উপর যখন বৃটিশ রাজনীতি অহরহ প্রযুক্ত হইতেছে, তখন আমাদের দেশের লোক যে সহজে উহার স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং উহার মূলতত্ত্ব লইয়া আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। য়ুরোপের সকল দেশের কূট রাজনীতি যদি প্রতারণাময় হয়, তাহা হইলে বৃটিশ কূট রাজনীতি নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে বোধ হয়, কাহারও বিলম্ব ঘটিতে পারে না।

ডিপ্লোম্যাসির একটা উৎকট কৌশল হইতেছে, ছদ্মবাক্য বা ছেঁদো কথা (masked words); এই ছেঁদো কথার মর্ম্ম বুঝাই অত্যন্ত কঠিন। য়ুরোপীয় ডিপ্লোমেসী ও সাম্রাজ্যবাদ এই সকল কূট কথায় পূর্ণ। ইহার প্রভাব অতি ভয়ঙ্কর। উহাতে কূট রাজনীতিকের ভাষা সাধারণের নিকট অতিশয় দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলে। ইংলণ্ডের স্বনামধন্য রাজনীতিক বার্কিন বলিয়াছেন :—

There never were creatures of prey so mischievous, never diplomatists so cunning, never poisons so deadly as these masked words; they are the unjust stewards of all mens ideas," etc.

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—"এই সকল ছেঁদো কথা যেরূপ ক্ষতিকর, চাতুরীপূর্ণ এবং সাংঘাতিক, সেরূপ ক্ষতিজনক কোন শ্বাপদে নাই, সেরূপ চাতুরী কোন কূট রাজনীতিকে নাই এবং সেরূপ সাংঘাতিকতা কোন বিষে বিদ্যমান নাই। এই সকল ছদ্মবাক্য মানুষের মনোভাবের ন্যায়সঙ্গত অর্থ বা ধারণা প্রকাশ করে না।" যে সকল কথা রাজনীতিকরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অর্থ ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে বিলাতের মন্ত্রী ভারতবাসীদিগকে যে অধিকার দানের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও ঐরূপ ছেঁদো কথায় পূর্ণ। তাঁহারা যদি এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেন যে, তাঁহারা কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করিবেন, তাহা হইলে উহা স্পষ্ট বুঝা যাইত, ইহার একটা আদর্শ থাকিত। আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম যে, বৃটিশ জাতি আমাদিগকে কতটুকু স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ কোন সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীকে Responsible Government বা Right of Self-determination দিবেন। এই দুইটি কথার কোন কথাই সুস্পষ্ট নহে। আমরা Responsible Government অর্থে 'দায়িত্ব-পূর্ণ শাসনপদ্ধতি' শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে শাসনপদ্ধতিতে শাসকবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধি সভার নিকট তাঁহাদের কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু সেই জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা বা ব্যবস্থা-পরিষদে যদি পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকারী না হয়েন, তাহা হইলেই সমস্তই বৃথা হইল। যদি বড়লাট বা ভারত-সচিব অথবা বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার উপর এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলেই এই দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালী সফল হইতে পারে না। সেই জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছিলেন যে, Responsible Government বলিলে যে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বুঝাইবে, তাহা নহে। উহা তাহা অপেক্ষা কতকটা হীন হইতেও পারে। পার্লামেণ্ট ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার কোন প্রতিশ্রুতিই করেন নাই। সুতরাং ইহাতে ছেঁদো কথার সুবিধা কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। Self-determination শব্দটিও অনেকটা ঐরূপ অস্পষ্ট। উহাতে আপনারাই আপনাদের ব্যবস্থা করিবার ভাব সূচিত হয়। উভয় কথার ব্যাপক অর্থ ধরিলে পূর্ণ মাত্রায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই বুঝায় সত্য,—কিন্তু শাসকবর্গ সুবিধা পাইয়া উহার অর্থ যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করিতে চাহিতেছেন। ভারতবাসীরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। কাযেই বৃটিশ মন্ত্রীর প্রযুক্ত "দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালীর" সীমা কত দূর, এবং তাঁহারা ঠিক কিরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ছেঁদো কথা ব্যবহারে প্রবল পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা চাহি পূর্ণ মাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসন। আমরা ছেঁদো কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। আমাদের ভারতীয় রাজপুরুষমাত্রই (কেবল সম্রাটের প্রতিনিধি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ভিন্ন) জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। আভ্যন্তরীণ শাসন-সম্পর্কিত সকল ব্যাপারই ব্যবস্থা-পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শুল্ক এবং বাণিজ্য বিভাগেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। সুতরাং তোমরা যতই ছেঁদো কথা বল না কেন, আমরা তাহাতে ভুলিব না। তবে সমর-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ এবং অন্য দুই চারিটি বিভাগ ভারত সরকারের হস্তে থাকিতে পারে। এ সব বিষয় পরস্পর তুল্যভাবে বসিয়া আলোচনার দ্বারা স্থির হইতে পারে। নেহেরু রিপোর্ট এ বিষয়ে পথি-প্রদর্শক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দ্বৈত-শাসনকে বিসর্জ্জন করিতেই হইবে।

প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদিগকে সাক্ষিগোপাল করিয়া রাখিলে চলিবে না। প্রাদেশিক শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারে খাস বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় এইরূপ দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিতে পারে না। ইহাই যে বাঙ্গালার দাবী, ইহা এবারকার এই নির্ব্বাচনে অনেকটা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে স্বরাজী দল এবং মুসলমানদিগের বঙ্গীয় লীগের অন্তর্ভুক্ত লোক অধিক সংখ্যায় সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনীতিক দলাদলি ঠিক সমান নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে রাজনীতিকগণ চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—মধ্যপন্থী বা উদারনীতিক, স্বরাজপন্থী, পূর্ণ অসহযোগী এবং স্বাধীন বা স্বতন্ত্র দল। মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ মোটামুটি ৪টি দল বিদ্যমান। যথা—(১) বঙ্গীয় মোস্লেম লীগ বা সঙ্ঘ; (২) মুসলমান ব্যবস্থাপক সমিতি; (৩) সম্পূর্ণ অসহযোগী এবং (৪) মুসলমান স্বতন্ত্র দল। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন রাজনীতিক বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট মত আছে, মুসলমানদিগের মধ্যে সেরূপ কোন রাজনীতিমূলক মূলমন্ত্র অনুস্যূত মত আছে, এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণ অসহযোগী আছেন, তাঁহাদের রাজনীতিক মূলমন্ত্র হিন্দু পূর্ণ অসহযোগীদিগেরই অনুরূপ। তবে ইহারা রাজনীতিক কোন ব্যাপারেই প্রকট হইতে চাহেন না। এইরূপ রাজনীতিক মতাবলম্বী কত লোক আছেন, তাহা বুঝা কঠিন। তবে কথাবার্ত্তায় ও আচরণে এরূপ লোকের অস্তিত্ব বুঝা যায়। বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির (বেঙ্গল মোস্লেম লীগের) মত কতকটা কংগ্রেসী হিন্দুদিগের অনুরূপ। তবে উভয় দল যে সকল সময় একমত হইয়া কায করিতে পারেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহারা ইদানীং তাঁহাদের মতের কিছু পরিবর্ত্তনও করিতেছেন। হিন্দু স্বরাজীদিগের রাজনীতিক মূলমন্ত্রের সহিত ইহাদের রাজনীতিক মূলমন্ত্র সম্পূর্ণ অভিন্ন, ইহা মনে করিতে পারা যায় না। তবে স্বরাজী দলের সহিত কতকগুলি বিষয়ে ইহাদের মতের সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দ্বৈতশাসনের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। মুসলমানদিগের তৃতীয় দল মোস্লেম লেজিসলেটার্স এসোসিয়েশনভুক্ত। এই দলই এবার অধিক সংখ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাদের রাজনীতিক কোন মূলমন্ত্র আছে কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ইহাদের কার্য্যের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহারা বর্ত্তমান ব্যুরোক্র্যাটিক শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী এবং আপনাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণের এবং সম্প্রসারণের জন্য ব্যস্ত। ইহারা হিন্দুর সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে সম্মত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সকলের মনেই যে এই ভাব, তাহা বলা যাইতে পারে না। চতুর্থ দল স্বাধীন মুসলমান। হিন্দুদিগের স্বাধীন দল যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত নহেন, মুসলমানদিগের স্বাধীন দলও কোন নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত নহেন।

গত ২রা এবং ৩রা জুন এই নূতন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভ্যগণের শপথ-গ্রহণ, গভর্ণরের বক্তৃতা এবং সভার প্রেসিডেণ্ট ও ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নিয়োগই এই কমিটীর প্রধান কায ছিল। বাঙ্গালার গবর্ণর সার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে এই কয়টি কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে :—

(১) গভর্ণরের মতে মন্ত্রীদিগের হস্ত দিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলি পরিচালিত করা কর্ত্তব্য; ইহাতে সাধারণের সুবিধা হইবে। পূর্ব্ব কাউন্সিলে তিনি স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি বঙ্গবাসীর হিতার্থ পূর্ব্ব কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া এই নূতন কাউন্সিল গঠিত করিয়াছেন।

(২) বর্ত্তমান কাউন্সিল প্রায় পূর্ব্ব কাউন্সিলেরই অনুরূপ হইয়াছে। তবে এই নূতন নির্ব্বাচিত কাউন্সিল যে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করিবার অনুকূলে মত দিবেন, এ বিষয়ে তিনি একেবারেই আশাশূন্য হয়েন নাই।

(৩) যাঁহাদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গের নিকট হইতে আশানুরূপ সমর্থন পাইবেন, ইহার নিশ্চিত লক্ষণ গভর্ণর যতক্ষণ না পাইতেছেন, ততক্ষণ কোন মন্ত্রিনিয়োগ করা তিনি সমীচীন মনে করেন না।

সার ষ্ট্যানলী জ্যাক্সনের এই কথাগুলির কোনটিই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট আপন আপন কৃত কর্ম্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য মন্ত্রীর হস্তে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনভার দেওয়া যে কর্ত্তব্য, তাহা অস্বীকার করা নিতান্তই মূর্খতার কার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া একটা অযোগ্য জীবকে যদি হাত-পা বাঁধিয়া মন্ত্রীর আসনে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার হস্তে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পর্য্যবেক্ষণভার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেই যে বঙ্গবাসীর পক্ষে চতুর্ব্বর্গলাভ হইবে, ইহা মনে করা বিষম ভুল। মন্ত্রিত্বকে সফল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির জন্য আবশ্যক এবং প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা করা না হয়, তাহা হইলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে আনিয়া মন্ত্রীর আসনে বসাইয়া দিলেও তাহাতে কোনরূপ সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে না। স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগের কার্য্যগুলি প্রায় এক শতাব্দব্যাপী ঔদাসীন্যের ফলে যেরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর উহার জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে কোন লাভ হইবে না, কেবল অকারণ অর্থনাশ হইবে। রাজপথ এবং রেলপথ নির্ম্মাণ-পদ্ধতির দোষে দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণে বাঙ্গালার নদীপথগুলি জলসম্পদে বঞ্চিত হইয়া হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে, দেশে যুগপৎ দারিদ্র্য ও বিলাস-বৃদ্ধি হেতু লোক আর বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন করিতে পারিতেছে না, তাহার ফলে দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে মৃত্যুর হার জন্মের হারকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং বাঙ্গালার এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে লোক আসিয়া বসবাস করিতেছে, সেই জন্য প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা যাইতেছে না, নতুবা মৃত্যুর হার এবং ব্যাধির তাণ্ডব যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অর্দ্ধবঙ্গ এত দিন বিস্তীর্ণ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে বহু কোটি টাকার প্রয়োজন। শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সকল দিকেই এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এদেশবাসী লোকদিগকে অর্থশূন্য মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলে কি তাহাদিগকে উপহাস করা হয় না? যাঁহারা মন্ত্রীর উর্দ্দী পরিয়াই আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারা আপনাদের [illegible] অযোগ্যতা এবং উৎকট অহম্মুখতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার উপর যদি প্রাদেশিক [illegible] কর্ত্তা বাহাদুর যোগ্য ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া নিরাপদ মন্ত্রীকে

(Safe man) মন্ত্রিত্ব প্রদানের জন্ম লোলুপ হয়েন, তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা হয়; ব্যুরোক্রেশী মন্ত্রীকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া আপনাদের মতলবমত শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়েন। আস্তাবলের বানর যেমন আস্তাবলের পশুর 'আলাই-বালাই' বহন করিবার জন্ম আস্তাবলে উপস্থিত থাকে, হস্তান্তরিত বিভাগের যত দোষ ও ক্রটি ঘটিবে, তাহার নিন্দা এবং কলঙ্কের পশরা মাথায় করিয়া বহিবার জন্ম যদি এদেশবাসী লোকদিগকে মন্ত্রিপদ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে কোন আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কি ঐ পদ গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হইতে পারেন ? আসল কথা, পর্য্যাপ্ত অর্থ-শূন্য মন্ত্রিপদ নিতান্তই উপহাসাস্পদ। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, এই দরিদ্র দেশের অভাব-পীড়িত লোকদিগকে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকার লোভ দেখাইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ করিলেই যে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির কার্য্য সুপরিচালিত হইবে, অথবা স্বৈরিতার পরিবর্ত্তে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। বরং খাসে যদি ঐ বিভাগগুলি চালান হয়, তাহা হইলে ৩ জন মন্ত্রীর বেতন বাবদ যে বার্ষিক ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, সেই অর্থ জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয় করিলে কতকটা সুবিধা হইতে পারে।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই মন্ত্রিপদ ভাঙ্গিয়া দিলেও কোন লাভ হইবে না,—ক্ষতিও হইবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্ত্রি-মনোনয়নে বাধা জন্মাইলেই যে সরকার ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবেন, ইহা বাতুল ভিন্ন অন্য কেহই স্বীকার করিতে পারে না। বরং ইহা রহিত করিলে এই একটু লাভ আছে যে, লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে ঐ লোভনীয় পদ অপসারিত হইলে বাঙ্গালীরা পরস্পর ব্যক্তিগতভাবে এবং সাম্প্রদায়িকভাবে ঐ পদের জন্য আঁচড়া-আঁচড়ি ও কামড়া-কামড়ি করিতে পারিবে না। দরিদ্র দেশবাসীর বিবাদের একটা কারণ অপগত হইবে। যদি জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতা দেখিয়া এ পদ প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে হয় ত এ দোষ ঘটিত না। এই হিসাবে যেমন একটু লাভ আছে, অন্য হিসাবে সেইরূপ একটু ক্ষতিও আছে। যোগ্যব্যক্তিকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলে, তিনি হয় ত দেশের জাতীয় কল্যাণকর কার্য্যে যে সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন, মন্ত্রী না থাকিলে তাহাও হইবে না। এই ক্ষতি-লাভ খতাইয়া দেখিলে লাভ বা ক্ষতি বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সার ষ্ট্যানলী জ্যাকসনের দ্বিতীয় কথা,—বর্ত্তমান কাউন্সিল যে স্থায়ী মন্ত্রি-মনোনয়ন করা অসম্ভব হইবে, ইহা তিনি মনে করেন না। তিনি যখন নিজ-মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কাউন্সিল পূর্ব্ব-কাউন্সিলের অনুরূপই হইয়াছে, বরং স্বরাজী দলের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে, তখন তাঁহার মনে এই ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল কেন ? সরকারী সদস্য, সরকারের মনোনীত সদস্য এবং য়ুরোপীয় সদস্য সকলেই ত সরকারের পক্ষে আছেন; অবশিষ্ট সদস্যদিগের মধ্যে কেবল হিন্দু এবং মুসলমান নির্ব্বাচিত সদস্যগণ থাকিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে স্বরাজী সংখ্যাই বরং অধিক। অন্য সকলেই যে যোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রিপদ না পাইলে তাঁহাদের সমর্থন করিবেন, এমন কোন কথা নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে, মুসলমান সদস্যদিগের দিক্ হইতেই তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। শুনিতেছি, মুসলমানদিগের মধ্য হইতে দুই জনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে। কথা কি সত্য ? যদি কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই দুইটি ব্যাপার একত্র করিলে লোক কি বুঝিবে ? সার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

কল্পনা

ইন্দুকলার চুম্বরাগে রঞ্জিত মেঘ কুন্তলে
কোন্ রূপসীর রূপের হাসি আভূমিব্যোম উজ্জ্বলে !
ওই ছায়াপথ নীহারিকা
কার সে রূপের জ্যোতির শিখা
উড়ায় কে সে রূপতরঙ্গ সুনীল লীলা-অঞ্চলে—
মন্দাকিনীর বক্ষে সে কার ঊর্ম্মি-নূপুর চঞ্চলে !

সে বুঝি কোন্ লাস্যময়ী শিল্পকলা-রঙ্গিণী,
সঙ্গিহারা নির্জ্জনতার বিজন মনঃ-সঙ্গিনী !
বাক্‌মুখরা, নীরব ভাষায়
অনেক কথাই ক'হে যে যায়
মরুর বুকেও কুসুম ফুটায়—বিরস-হৃদি-রঞ্জিনী
কতই আঁকে নূতন ছবি স্বরগ-শোভা-গঞ্জিনী !

যাদুকরীর যাদুর কাঠি হস্তে দিবা-শর্ব্বরী
স্বর্গ নরক বেড়ায় ঘুরে মায়াবনের অপ্সরী।
ভবিষ্য ভূত বর্ত্তমানে
ফুটায় এনে পরশদানে—
আশার বাণী শুনায় কাণে, শূন্যমনার মন-ভরি
তড়িদ্গতি বেড়ায় ছুটি তড়িৎসম সঞ্চরি।

কল্পবালা সে বুঝি তার নাম কুহকী কল্পনা,
জীবন ঘেরা দুঃখ ও সুখ সব তাহারি জল্পনা !
কুহকে তার দেবোদ্যানে
দৈত্য ফিরে পুলক-প্রাণে,—
মর্ত্তবাসের কষ্ট স্মরি' মূর্চ্ছে ত্রিদিব-অঙ্গনা—
বাসর-বাতি নিবায় হেসে বিষাদ-স্মৃতি তন্মনা !

ইঙ্গিতে তার সৃষ্টি হাসে কল্পলোকের অঙ্গনে,
রূপ ধরে সে শিল্পী কবির তুলির মোহন স্পর্শনে !
নিদ্রাসখী স্বপনবালা
পার্শ্বে বসি সাজায় ডালা ;—
রঙ্গি ওঠে বিশ্ব আঁখি মোহের পরশ অঞ্জনে—
নুয়ে আসে চিত্তভুবন অলক্ষ্যে তার বন্দনে !

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল বি, এ।

পরলোকে দ্বারবঙ্গাধিপ

গত ২০শে আষাঢ় প্রভাতে দ্বারবঙ্গাধিপ মহারাজাধিরাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু-ভারতের পরম হিতৈষী লক্ষ্মীর বরপুত্র মহারাজাধিরাজের বিয়োগে আজ সমগ্র হিন্দু-সমাজ ব্যথিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাঁহার নিকট নানা উপায়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র ভারত ক্ষতিগ্রস্ত অনুভব করিতেছে সন্দেহ নাই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকযাত্রা করিলে মহারাজ রমেশ্বর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালার সহিত বিহারের তখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর বিহার-মিথিলার নরপতি হইলেও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সহিত যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন, মহারাজাধিরাজ রমেশ্বরও সেই সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীরই ভোটের আধিক্যে বড়লাটের পুরাতন ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার ভ্রাতার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জমীদারদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের সভাপতির পদেও তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার ফলে দ্বারবঙ্গের রাজকোষ অর্থে পূর্ণ হইয়াছিল, প্রজাগণও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্ভিসে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং পর পর এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে এই অভিজ্ঞতা স্বরাজ্য-শাসনে তাঁহার পরম সহায় হইয়াছিল।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ

মহারাজ রমেশ্বর হৃদয়বান্ ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লেডী-ডাফরিণ জেনানা হাঁসপাতালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ-সংক্রান্ত শিক্ষালয়ে, মহাকালী পাঠশালায়, টোল চতুষ্পাঠী আদি প্রতিষ্ঠা ও পালনে তাঁহার মুক্তহস্তে দান উল্লেখযোগ্য।

মহারাজ রমেশ্বর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী হিন্দুর পরম বন্ধু ও সহায় ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল ও হিন্দু-মহাসভা আজ কাণ্ডারিহীন তরণীর অবস্থা প্রাপ্ত হইল, বহু টোল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও ছাত্র সহায়হীন হইল, ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন আদি প্রতিষ্ঠানগুলি পৃষ্ঠপোষক-শূন্য হইল। মহারাজ রমেশ্বর অন্যদিকে অপর ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়েও সাহায্য দান করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমান মিলনের সভায় যোগদান করিয়াছেন। কলিকাতার টাউনহলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি মহারাজ রমেশ্বরের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিক তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন। 'বসুমতী'র প্রতি মহারাজের বিশেষ অনুরাগ ছিল।

তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালা বিহার, কেবল বাঙ্গালা বিহার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজ তাঁহার অভাবে যে ক্ষতি অনুভব করিতেছে, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার আশা নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক, ইহাই কামনা।

পরলোকে ব্যোমকেশ

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী গত ২২শে জুন তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে নাম, যশ ও অর্থ উপার্জ্জনে সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্যোমকেশ তাহার মধ্যে অন্যতম; বস্তুতঃ এক সময়ে মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী বলিলে এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীব ব্যারিষ্টারকেই বুঝাইত। ডবলিউ, সি, বোনার্জ্জী; এস. পি, সিন্‌হা; মনোমোহন, লালমোহন; সি, আর, দাশ প্রমুখ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারকুলধুরন্ধরগণের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বি, চক্রবর্ত্তীর নাম চিরদিন বিজড়িত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জেলা যশোহরের চন্দ্রপ্রতাপ গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র। ৭ বৎসর বয়সে ব্যোমকেশ শান্তিপুরে এক হাই-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীরামপুরের স্কুল। সেখান হইতে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। শৈশব হইতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এম, এ পরীক্ষাতেও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি নানা কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গিলক্রিষ্টের কৃষিবৃত্তি (১০ হাজার টাকা) লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে প্রথমে তিনি ডাক্তারী এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ও পরে ব্যারিষ্টারীতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১ শত পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করেন।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদানের পর হইতে তাঁহার ভাগ্য-সূর্য্য ভাস্বর প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার সমসাময়িক। তিনি দেওয়ানী মামলায় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিলেও কখনও কখনও ফৌজদারী মামলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বন্দে মাতরম্' রাজদ্রোহ মামলায় শ্রীঅরবিন্দকে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্যোমকেশ জীবনে অনেক কার্য্যই করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারশাস্ত্রে ও অধ্যাপনাকার্য্যেই তাঁহার কৃতিত্ব পর্য্যবসিত হয় নাই, দেশ ও জন-সেবা কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। কেবল কংগ্রেস নহে, পরন্তু বহু ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমাবধি প্রচার করিয়াছিলেন যে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি না হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। তাঁহারই উদ্যোগে বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, হিন্দুস্থান ইনসিউরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনপন্থী মডারেটদিগের অন্যতম ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। সেই হেতু তিনি সকল বিষয়ে যথারীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। ফলে যাহাদের উপর তিনি বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিলেন. তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে তাঁহারই স্বহস্ত-গঠিত কোন কোন প্রতিষ্ঠান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল—বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির দুর্নামে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। এই সকল আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের উপর মনও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে হাজারিবাগে তাঁহার স্মৃতিবিচ্যুতি ঘটিতে আরম্ভ করে। তাহার পর হইতেই তাঁহার প্রায় উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ হইয়াছিল।

যাহাই হউক, তিনি যে এক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী সমাজে তাঁহার স্থান পূর্ণ হইতে বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। আজ সে জন্য আমরা তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ললিতমোহনের লোকান্তর

বাঙ্গালার বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশকর্ম্মী ললিতমোহন ঘোষাল গত ২০শে আষাঢ় পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার এই দেহান্তরের সংবাদ অতর্কিতভাবে সহরে প্রচারিত হইয়াছিল। মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তিনি কাশী হইতে কলিকাতায় আগমন করিবার পর বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও চিত্ত-প্রফুল্লতা উপভোগ করিতে দেখিয়াছি। শেষ জীবনে তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বাম্বাৎ-সরিক স্মৃতিবাসরে কবির স্মৃতিপূজার জন্য বক্তৃতা করিতে আসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমরা তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি আমাদের পরম

হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। কাশী হইতে আসিবার পর তিনি 'মাসিক বসুমতীতে' কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না!

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি স্বর্গীয় দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; কোন কোন স্থানে তাঁহাকে হিন্দী ভাষাতেও বক্তৃতা করিতে শুনা গিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা অনেক সময় প্রাণস্পর্শিনী হইত। অনেক সময়ে তিনি স্বদেশ-সেবায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। সে সময়ে সংসার বা পুত্র-পরিবারের কথা তাঁহার মনে থাকিত না। তিনি জীবনে যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই দুঃখ অভাবেও কষ্ট পাইয়াছেন। কিন্তু কখনও ভগ্নমনোরথ বা আগ্রহ-উৎসাহশূন্য হন নাই। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, আর সেই ভক্তিবলেই তিনি বহু বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কায়মনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কর্ম্মে বহুদিন আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 'যদি হবে ভদ্দর, পর তবে খদ্দর', বোধ হয়, তিনিই প্রথম এই কথাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুবক্তার অভাব বাঙ্গালা দেশে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

ললিতমোহন ঘোষাল

রচয়িত্রীর পরলোক

বিগত ২৪শে জুন সোমবার অপরাহ্ণে জনসমাজে সুপরিচিতা লেখিকা মোক্ষদা দেবী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভাগলপুরের বিখ্যাত সরকারী উকীল পরলোকগত ষষ্ঠীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। মোক্ষদা দেবী সমাজসংস্কারে সমগ্র জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগলপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য রচনা করিয়াও তিনি বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন। দেশভ্রমণে তাঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল। ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা অত্যন্ত অধিক ছিল। আতিথেয়তার জন্য মোক্ষদা দেবী যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত তিনখানি গ্রন্থ পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। "বন-প্রসূন" রচনা করিয়া সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। মোক্ষদা দেবীর রচিত "সফল স্বপ্ন" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি রসিক পাঠক-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। বার্দ্ধক্যের জরা তাঁহার দেহে দেখা দিলেও অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি "কল্যাণ-প্রদীপ" রচনা করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। ৮১ বৎসর বয়সে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। দুই পুত্র এবং অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রীকে রাখিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পারের পথে

যে দিন গেয়ে চল্‌লো বেয়ে সে তরণী,
সে দিন ধরি' অনুসরি'—সে সরণী,
নয়ন-মণি অন্ধ আজ,
ব্যর্থ গণি' বন্ধ কায,
কোথায় কোণে সঙ্গোপনে সুখর ণি,
রাখলে তা'রে বারে বারে ? সুবরণি,—হে ধরণি !
সাঙ্গ করি' এবার তরী ভেসেছে যে !
এ কি ! এ কি ! আজ, সে দেখি এসেছে যে !
তাহার গানে, আলোক-বাণে,
না আর আনে—পুলক প্রাণে,

অরূপ কাল আজ এ ভাল বেসেছে যে !
ওপার হ'তে ভাগ্যাহতে—হেসেছে যে, নেশেছে যে
আর না চাই, আর না চাই, এবার যাই ;
কি প্রয়োজন, এ আয়োজন, সেবার ছাই !
ফাগুন কালে, আগুন জ্বালে—
যে জন ভালে ; সে জন ঢালে—
আষাঢ়-শেষে আবার হেসে, যে ভার ভাই,
ফেরার মুখে, সে হার বুকে নেবার নাই—
শক্তি হায় !
দেবার নাই—ভক্তি তায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

অমৃতলালের মহাপ্রয়াণ

অশ্রু-অর্ঘ্য

বাঙ্গালী জাতির বড় দুর্ভাগ্য—হাস্যরসের অনাবিল অফুরন্ত প্রবাহ দৈন্য-ব্যথিত বাঙ্গালার মরুহৃদয়ে সহসা বিলীন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গজননীর চির-শ্যামায়মান কবি-কুঞ্জের আর একটি অনুপম বাঁশরী-রেশ চিরতরে নীরব হইয়াছে। নাট্যসম্রাট্—রস-সাহিত্যের অবতার—পরিহাস-বিদ্রূপ-কৌতুক-রঙ্গের অনন্ত প্রস্রবণ—সর্ব্বজন-চিত্ত-প্রমোদন নাট্যলীলার অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুনিপুণ চিত্রকর—দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক—প্রতিভা ও মনীষার বরপুত্র—রসরাজ অমৃতলাল বসু গত ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্নে মরজগতের সাহিত্য-লীলার অবসানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সুরসিক-কুলচূড়ামণি অমৃতলাল চিরদিন সুস্থশরীরের ও সদা-প্রফুল্ল মনের গর্ব্ব করিতেন—প্রবীণ বয়সেও তিনি নবযৌবনের অদম্য কর্ম্মোৎসাহের একটা মূর্ত্তবিকাশ ছিলেন। কত বড় মহাপ্রাণের অধিকারী হইলে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা চিরদিন উপেক্ষা করিয়া—এমন ভাবে সকল অবস্থায়—সকল সময়—সকল বৈঠকে মজলিসে সম্মেলনে এমন অফুরন্ত হাস্য-রঙ্গের ফোয়ারা অনায়াসে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়, তাহা কেবল তাঁহাকে দেখিয়াই উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল। মৃত্যুর নির্ম্মম স্পর্শে সেই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-সম-কোমলহৃদয় স্তব্ধ হইল—বঙ্গ-সাহিত্যের হাস্যরঙ্গের সর্ব্বজন-সম্মোহন উৎসমূল সংরুদ্ধ হইল! চিকিৎসা-বিভ্রাটে তাঁহার মৃত্যু যেমন শোচনীয়—তেমনি অতর্কিত। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণ-জ্ঞানে গীতা শ্রবণ করিয়াছেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ্রীচরণধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তিনি সংসারের মায়াডোর ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে আমরা প্রিয়-আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। বেদনা-কাতর লেখনী আজ শোকস্তব্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে সম্পূর্ণ অক্ষম।

'অমৃত-মদিরার' কবি অমৃতলাল

রসরাজ অমৃতলাল বাঙ্গালার রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—প্রাণশক্তি-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অবদান-মাধুর্য্যে বাঙ্গালা সাহিত্য চিরসমুজ্জ্বল। তাঁহার প্রতিভা-গোমুখী-প্রপাত হইতে যে অনাবিল হাস্য-রসের পবিত্র গঙ্গোত্রীধারা নিঃসৃত হইয়া নৈরাশ্য-লাঞ্ছিত বাঙ্গালীকে বহুদিন ধরিয়া আনন্দরসে ভাসাইয়াছে—কর্ম্মশ্রান্ত, চিন্তাবিরক্ত জীবন-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত দেশবাসীর অবসাদ দৈন্য নৈরাশ্য বিস্মৃত করিয়া হাস্যবিদ্রূপের কৌতুক-যৌতুকের অমৃতমদিরায় উদ্দীপিত প্রবোধিত করিয়াছে, পরতন্ত্রের ক্রীতদাস জাতির পক্ষে তাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। সে আনন্দ-প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনি শিক্ষার—সংস্কারের অন্তঃসলিলা প্রবাহ জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে সুসঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অবদান-প্রভাবে জাতি উপকৃত।

হাসির বিদ্যুদ্-বিকাশ জাতির প্রাণশক্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। বিশ্বগুরু স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন—হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?'—যে জগতে জন্মিয়াই কাঁদিতে হয়—কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবনের অবসান হয়,—সেই যন্ত্রণাময় সংসারে যিনি দুঃখ বিস্মৃত করিয়া আনন্দদান করিতে পারেন, তিনি শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ—তাঁহার প্রতিভা জাতির আদরণীয়—বরণীয়—নমস্য। অমৃতলাল দীর্ঘজীবনের সাধনায় বাঙ্গালী সংসারের তিন পুরুষকে সমভাবে হাসাইয়া—আনন্দ দান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের অক্ষয় আধারে সেই চিরদীপ্ত—রসলিপ্ত আনন্দধারা চিরসঞ্চিত আছে। যুগে যুগে আগত দেশবাসী সেই সর্ব্বজন-চিত্ত-সম্মোহন আনন্দ-রসের সহিত সুপরিচিত হইয়া—সে আনন্দ-মাধুরী উপভোগ করিয়া আত্মহারা হইতে পারিবে।

হাস্যকৌতুকের অমল ধবল পুণ্যজ্যোৎস্নার পুলক-শিহরণে সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া, নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক অমৃতলাল চিরজীবন বিদ্রূপ-কটাক্ষের শিহরণে—সমাজ-শিক্ষার মর্ম্মস্পর্শী শ্লেষ-ইঙ্গিতে—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ভ্রান্ত সংস্কার চূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কৌতুক-রঙ্গের অফুরন্ত 'লাফিং গ্যাসের' সহিত শ্লেষ-বিছুটীর কুটকুটি—বিদ্রূপ-বেতের সুজ্বালার সুমধুর সম্মেলনে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাময় রস-রচনায়—প্রমোদ-প্রস্রবণ প্রহসনরাজির অভিনয়-প্রভাবে—পাশ্চাত্য শিক্ষা-গর্ব্বিত সম্প্রদায় আনন্দ-প্রবাহের ভিতর মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গ-পরিহাসে চিরদিন আত্মস্থ—সন্ত্রস্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছেন—ভবিষ্যতেও পাইবেন। অমৃতলালের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রস-সাহিত্য অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট—গ্রাম্য ভাষার আধিক্যে ভারাক্রান্ত। নূতনত্বের চির-উপাসক অমৃতলাল সে পথ পরিহার করিয়া—নির্ম্মল হাস্যোজ্জ্বল পরিহাস-রঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৈভব সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য অমৃতলাল

অমৃতলাল অমর নাট্যকবি। কিন্তু কবি অমৃতলাল চিরদিন সারস্বত-কুঞ্জের প্রাচীন কাব্যঝঙ্কারের অনুসরণ করিয়াছেন। কবিতা-রচনায় তিনি বাঙ্গালীর গৌরব কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের সাধনার চিরদিন অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। সে কাব্য বাঙ্গালার কাব্য—মরমের সুরে সংগঠিত খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণের কবিতা। তিনি শেলী-বায়রণের অনুকরণে কঙ্কণী কবির কম-কর ঝঙ্কৃত ক্লারিওনেটে প্রমদা-রঞ্জন রাগিণীর আলাপনে দিগন্ত মুখরিত করেন নাই। তাঁহার কাব্যসাধনায় তাই মোহনীয়া বাঁশরীর সুস্বর লহরীতে বাঙ্গালার কবিতা কুঞ্জ চিরঝঙ্কৃত। যে কবিতার সম্মোহন আলাপন কাণের ভিতর দিয়া সত্যই মরমে পশিয়া মনঃ-প্রাণ আকুল করে, তিনি সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী কাব্যরসের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশভক্ত অমৃতলাল বাঙ্গালাকে আত্মনিবেদন করিয়া ভালবাসিতেন—বাঙ্গালীকে প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ করিতেন। বাঙ্গালার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, প্রাচুর্য্য, তাহা তাঁহার মানসে নয়নে চিন্তায় অনুভূতিতে দিব্যসুন্দর-অনিন্দ্যসুন্দর। বাঙ্গালাকে বিস্মৃত হইয়া—বাঙ্গালী জাতিকে উপেক্ষা করিয়া সমগ্র ভারত-প্রেমে কি তদপেক্ষা বৃহত্তম উদার নীতি অবলম্বনের জন্য সমগ্র বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা হইবার মত মনোবল বা চিত্তবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি মনে প্রাণে চরিত্রে ব্যবহারে খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। প্রাচীন সমাজ সংস্কার, হিন্দুত্ব গৌরব তিনি সমাজরক্ষার জন্য—জা[illegible]

মজঃফরপুরের বিহার-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি রসরাজ অমৃতলাল ও কর্ম্মসচিবগণ

মজঃফরপুর বিহার-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি চির-নবীন অমৃতলাল—স্বেচ্ছাসেবকগণসহ

আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয়—অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম জ্ঞানে সম্মান করিতেন। এ জন্ত তিনি সমাজ-সংস্কারের—ধর্ম্ম-বিদ্রোহের কোন আন্দোলনকে—বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না—অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তীব্র কশাঘাত করিয়া প্রহসন বা প্রবন্ধ-গল্প লিখিতেন। কিন্তু তাঁহার সে চাবুক হাস্যরসে রঞ্জিত—যেমন জ্বালাময়, তেমনই মিষ্ট ও শিষ্ট। তাঁহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সুচিন্তিত যে সকল প্রবন্ধে

নিজে যেমন অনুভব করিতেন—তেমনই তাঁহার দেশবাসিগণকেও বুঝাইতে চাহিতেন।

খাঁটী বাঙ্গালীর আদর্শ পরিচ্ছদ তিনি চিরদিন ব্যবহার করিতেন। আজানুলম্বিত সাদা চোগা-চাপকান—সাদা মোজা—উন্নত-গ্রীবা-বিলম্বিত শুভ্র-কুঞ্চিত কেশরাশি তাঁহার অঙ্গশোভার সৌষ্ঠব ছিল। কোন দিন কোন কারণেই সে কেশ-বেশের পরিবর্ত্তন—অপরিচ্ছন্নতা কেহ দেখেন নাই।

স্বদেশ ও স্বজাতি-হিত-ব্রত অমৃতলাল স্বরাজের লুব্ধ
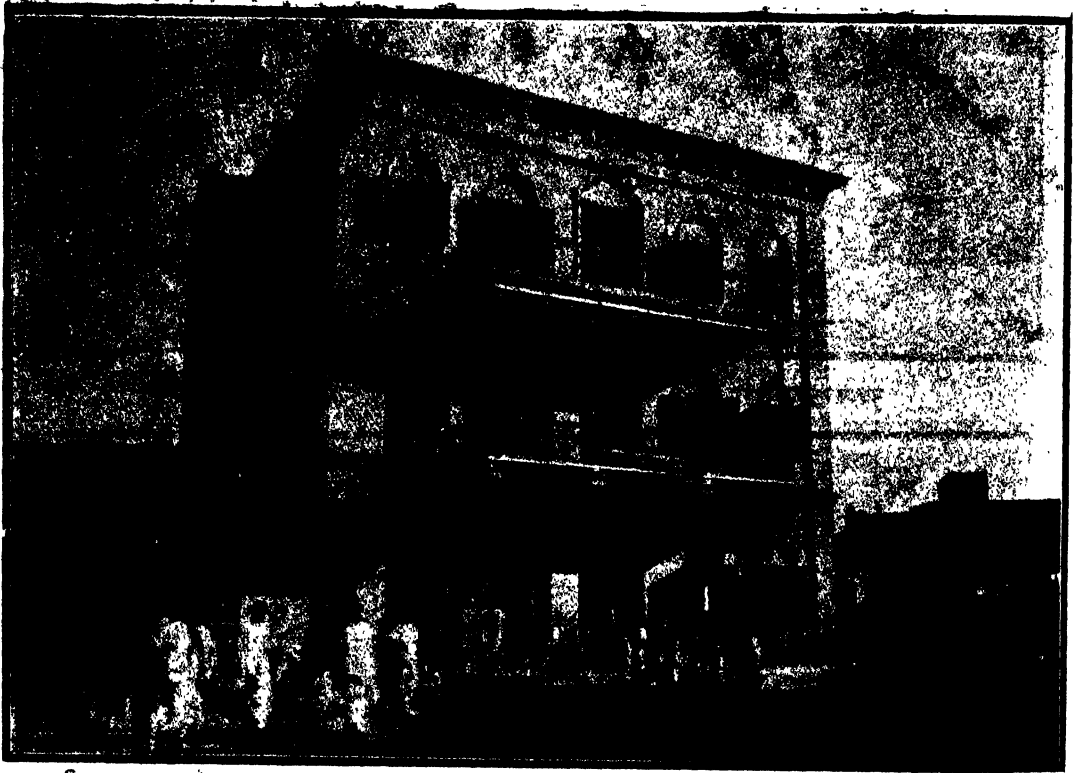
মনীষী অমৃতলালের শেষ জীবনের সাধনাকেন্দ্র শ্যামবাজার ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্মুখের দৃশ্য

গল্পে তিনি 'বসুমতীকে' অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, সেগুলি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ প্রসঙ্গের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

অমৃতলাল—বাবু ছিলেন। বিলাসী বাবু নহেন—শিষ্ট—সভ্য—বিশিষ্ট—সম্ভ্রান্ত—সৌখীন বাবু। বাবু যখন ইংরাজ-প্রদত্ত কেরাণীর সম্ভাষণের গৌরব লাভ করে নাই—ইংরাজ যখন বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য 'বাবু' নামে সম্মান দিতেন—সেই যুগের বাবু তিনি। সে বাবুর সম্মান তিনি

আশ্বাস দিতে ব্যস্ত ছিলেন না। আমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার মোহনীয় প্রভাবে দিন দিন আত্মবিস্মৃত হইতেছি, বিদেশীর সব ভাল মজ্জাগত ধারণায়—চিন্তায়—স্বপ্নে—সাধনায়—স্বদেশসেবায়—এমন কি, স্বরাজলাভ করিবার আন্দোলন-পদ্ধতিতেও বিদেশীর অন্ধ-অনুকরণই যে আমাদের একমাত্র সাধনা হইবে, ইহা তিনি কোন দিন কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে ক্রমে ক্রমে আমাদের জীবন-আদর্শ—সংসার-ধর্ম

—কর্ম্মসাধনা—সমাজের সভ্য-শক্তি—সমস্তই নিয়ন্ত্রিত—বিপর্য্যস্ত করিতেছে,—আমাদের চিন্তা, সাধনা, অনুভূতি, কল্পনা পর্য্যন্ত ইংরাজের ব্যর্থ অনুকরণে সংক্রামিত হইতেছে,—দেশের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত—মর্ম্মাহত ছিলেন। স্বাধীনতা—স্বদেশসেবার অর্থে তিনি বুঝিতেন—জাতীয় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা—আত্মবিশ্বাসের নির্ভরতা—সমাজের স্বাধীনতা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠা—স্বাবলম্বন—পরানুগ্রহ অসহিষ্ণুতা—পরতন্ত্রের অনুসরণ পরিহার। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এখনও যেটুকু স্বাধীনতা আমরা উপভোগ করিতেছি, তাহা বিসর্জন দিয়া ইংরাজের দয়াদত্ত দানলাভের আশায় স্বরাজ-ভিখারী হইতে তিনি বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালী বলিয়া নিজে গর্ব্ব অনুভব করিতেন—বাঙ্গালীকে খাঁটী বাঙ্গালীর আদর্শ—স্বাধীন শান্তিময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুপ্রাণিত
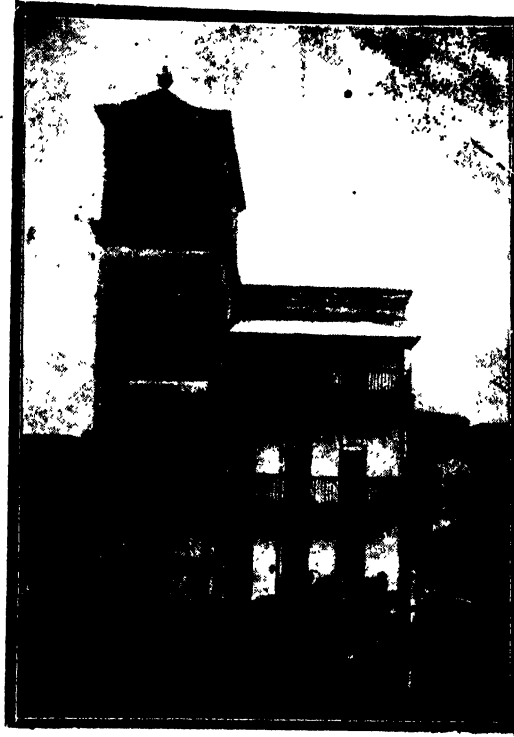
ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভিতরের দৃশ্য

উদ্বোধিত করিতেন। বাঙ্গালীর জীবনের—সমাজের—জাতিগত স্বাধীনতায় তাহার জন্মগত অধিকার প্রবর্ত্তিত হউক, ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বঙ্গবিভাগের সময়—যখন সমস্ত বঙ্গ ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতিয়া মা'র পূজায় জীবন পণ করিতেছিল—যখন বাঙ্গালী ধ্যানে, জ্ঞানে, অন্তরে, বাহিরে চিন্ময়ী জননীর রূপ দেদীপ্যমান দেখিতেছিল—বাঙ্গালার মরা গাঙ্গে যখন ভাবের বন্যা ছুটিয়া বদ্ধপ্রবাহের যুগ-যুগ-সঞ্চিত শৈবালদল ভাসাইয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া মুক্তিসঙ্গমে ছুটিতেছিল—তখন মাতৃমন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক অমৃতলাল সেই মুক্তিতরঙ্গে ঝম্প দিয়া মাতৃমূর্ত্তি উদ্ধারসাধনের জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মিরূপে সভা-সমিতি-বয়কট-প্রচারকার্য্যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

অমৃতচক্রের বৈঠকে সপরিবারে রসরাজ

নাট্য-সম্রাট অমৃতলাল বঙ্গনাট্যশালার

প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। যাঁহাদের প্রাণপাত সমবেত চেষ্টা—সাধনায় কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে চারিটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাট্যামোদী সুধীজনবৃন্দ ও সৌখীন সমাজের চিত্তবিনোদন করিতেছে—নাট্য-মহাকবি অমৃতলাল তাঁহাদেরই এক জন প্রধানতম উৎসাহী কর্ম্মী। নাট্যজগৎ এ জন্য অমৃতলালের সাধনার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে কতটা ঋণী, তাহার আনুপূর্ব্বিক আলোচনার স্থানাভাব। অমৃতলাল থিয়েটার সূচনার

উত্তম ছিল না কিছু বিলাতী আদর্শ।
প্রতিভা-প্রতিমা-পদে শিক্ষা-পরামর্শ॥
এইরূপে যুবা-ক'টি সহায়বিহীন।
মাটী হয়ে খাটিয়াছি কত নিশিদিন॥
হেলায় হাসিয়ে ছেড়ে ধন-পদ-লোভ।
শিক্ষিত স্বাধীন পেশা ত্যজি বিনা ক্ষোভ॥
তবে বঙ্গে নাট্যশালা হয়েছে স্থাপন।
অলিগলি দেখ এবে যার বিজ্ঞাপন॥
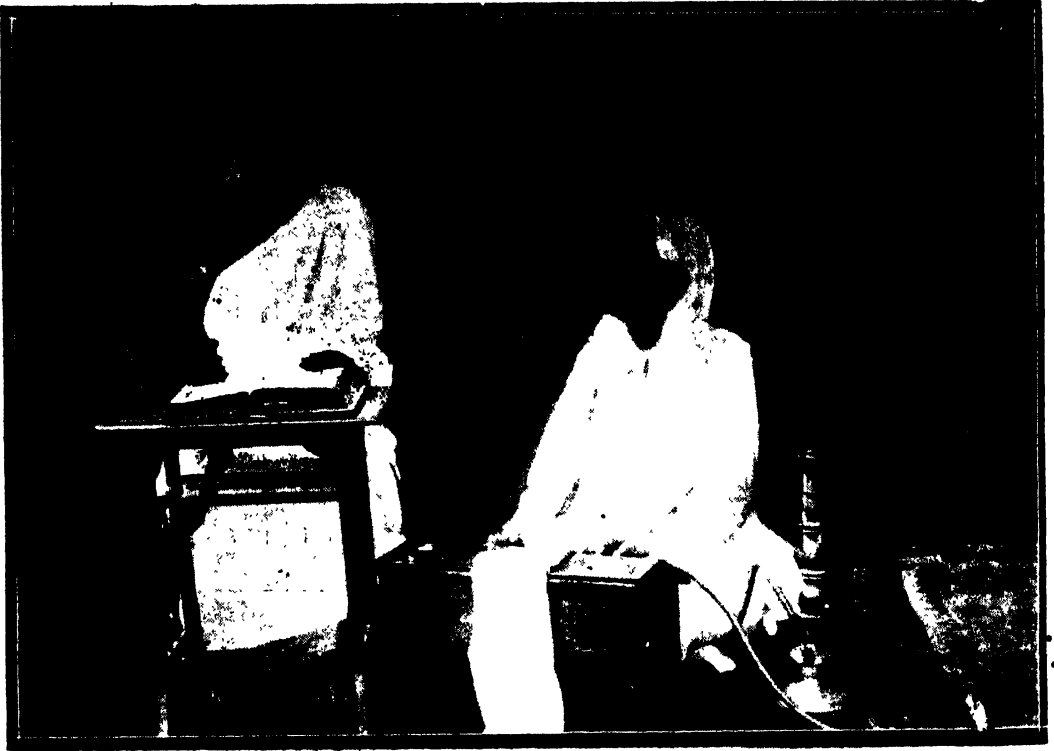
যাজ্ঞসেনী রচনায় সমাহিত সাধকশ্রেষ্ঠ অমৃতলাল—মহাভারত হস্তে তদীয় সহধর্ম্মিণী

যে সংক্ষেপ কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নিজপরিবারমাঝে বিরক্তিকারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা-নিন্দার ভাজন॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাসি।
সরে' গেছে বাল্যসখা তাচ্ছীল্য প্রকাশি॥
রাজার সাহায্য নাই নাহি নিজধন।
মূলধন মনোবল শরীর-পাতন॥

আজি পঞ্চ রঙ্গালয় কলিকাতাধামে।
বিচিত্র বাহারে শোভে বড় বড় নামে॥"

* * * *

"গেছে দীন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট্ পুত্র ঘরে দুধ নাই॥
একটি কাঠের কপি এক আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে সুবর্ণের তুল্য॥

তথাপি নগেন মতি বেল ধর্ম্মদাস।
অর্দ্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেত্রু সে গোপালদাস॥'
শিবু যদু অবিনাশ কিরণের সাথে।
জীবন্ত জাগিয়ে রবে ইতিহাস-পাতে॥
ভুবন-ভবন ছিল গ্রেট ন্যাশনাল।
গঙ্গা'পরি হর্ম্ম্যে তাঁর হ'ত রিহার্শ্যাল॥"

নাট্যামোদী সুধীজন-সমাজ এই সামান্য অংশ হইতেই বুঝিবেন—থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে—রাস্তায় প্লাকার্ড মারা হইতে আরম্ভ করিয়া—সামান্য সিন টাঙ্গাইবার কপীদড়ি কিনিবার অর্থেরও অভাবে—বিনা মূলধনে—কেমন করিয়া উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মশক্তির সহায়তায় কয়েকটি যুবক প্রথম টিকিট বিক্রয় না করিয়াও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর আজ তাঁহাদেরই সেই অক্লান্ত সাধনার ফলে প্রাসাদোপম সৌধে চারিটি নাট্যশালা

কবিবরের পৌত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী (ডালিয়া)

সাণ্ডেল-দালানে উচ্চ পড়-পড় কড়ি।
ঝুল ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ-আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে॥
সেকালে ছিল না বেশী কুলী কি চাকর।
যারা ছিল কাযে যেতে একা পেত ডর॥
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্লাকার্ড ম'য়েতে উঠে' 'ভুনিবাবু' মারে॥
এখন হুকুমে কার্য্য হয় সমাধান।
বেহারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান॥"

* * * *

"মর্ম্মের কবিতা গাঁথি মর্ম্মর পাষাণে।
সাজিয়ে সোনার চূড়া উজ্জ্বল রসানে॥
গড়ুক কৌশলী শিল্পী নব নাট্যশালা।
সৌদামিনী লক্ষ দীপে করুক্ তা আলা॥
র‍্যাফেল্-লাঞ্ছিত তুলি লিখে দিক্ পট।
লীলায় ভুলাক্ লোকে দিব্য নটী-নট॥

কবিবরের পঞ্চম পৌত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা (ড্রেজী) ও তাঁহার স্বামী কাপ্তেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস দত্ত (এম, এ)

"খদ্দরতে শুদ্ধ যথা মোটর বাহন,
ড্রেজী ফুলে পূজা তথা হবে নারায়ণ।"

কবিবরের প্রীতি-উপহার।

প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতেছে। সূচনায় যুগে যাঁহারা অভিনয় ও থিয়েটারের সম্পর্কে থাকিতেন, সাধারণে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র নাট্যকবি অমৃতলালের সম্ভ্রম ও প্রতিভাপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাই অভিনেতৃ-সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। আজ যে শিক্ষিত, ভদ্র-সম্প্রদায় সম্মানের সহিত অভিনয়-কার্য্য করিতেছেন—থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহার প্রথম ও প্রধান কারণ, অমৃতলালের ব্যক্তিত্ব—ভদ্রতা—শিক্ষা—প্রতিভা—সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে অব্যাজে বিচরণ নহে কি?

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অমৃত-নির্ঝর অমৃতলালের সর্ব্বজন-সম্মোহন নাটক—বিশেষতঃ প্রহসনে নাট্য-জগৎ চিরজ্যোতির্ম্ময়। সেই সর্ব্বজন-আমোদিনী প্রতিভার নূতন পরিচয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। বিদ্রূপের চাবুকের ভিতর মিঠেকড়া রঙ্গ—বুকুনীদার চাটনীর সহিত কাতুকুতুর অপূর্ব্ব সমন্বয় এ পর্য্যন্ত অন্যের লেখনীতে প্রসূত হওয়া সম্ভব হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে রস-সাহিত্যের সৃষ্টির ও পুষ্টির যে ক্ষতি হইল, বহু যুগযুগান্তরেও তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভুল ইংরাজীর আবৃত্তি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে—অনুকৃতি-বিদ্রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনিই প্রথম—বোধ হয়, তিনিই শেষ।

লাট দরবারের বেশে সজ্জিত বাবু অমৃতলাল

অভিনয়-নৈপুণ্যে—অভিনয়ের উৎকর্ষতা-বিধানে—আকৃতি-পরিবর্ত্তনের চমৎকারিত্বে নটগুরু অমৃতলাল অদ্বিতীয়। পরিহাস-রঙ্গ-কৌতুকের অভিনয়ে তাঁহার সমকক্ষ অভিনেতা এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই। বীর—করুণ—মধুর—চক্রান্তকারী—সাহেবের অভিব্যক্তিত্বেও তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অভিনেতা ছিলেন। যে কোন যোগ্যতম অভিনেতা যে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলে দর্শকগণের তাঁহাকে চিনিয়া লইতে বিলম্বের অবকাশ হয় না। কিন্তু কলাকুশলী অমৃতলালকে—আকৃতি, ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন-নৈপুণ্যে তাঁহার পরম আত্মীয়ও কোন দিন চিনিতে পারিতেন না। তাঁহার আত্ম-সংগোপন-নৈপুণ্য এত চমৎকার—বিশেষত্বপূর্ণ ছিল। অভিনয় শিক্ষা দিবার বৈচিত্র্যে—নাট্যশালা-নিয়ন্ত্রণে নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। কোন বিশিষ্ট ভূমিকার একটানা ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া নানা ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শনের নানা ভঙ্গিমা—নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ভাববৈচিত্র্যের বিভিন্ন বিকাশের উৎকর্ষতাসাধন প্রভৃতি তাঁহারই পরিকল্পনা। বিগত ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবারে রোগে আক্রান্ত হইয়াও তিনি ম্যাডান কোম্পানীর বায়স্কোপের ফিলিমে বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় শিক্ষা দিবার জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার শেষ নাট্যসাধনা।

জেলেপাড়ার সংএর ছড়ায় বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা—সামাজিক-বিভ্রাট লইয়া যে সকল অতুলনীয় চিত্র সমাজতত্ত্বজ্ঞ কবিবর অমৃতলাল কবিতায় সু-অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—তাহাও সাহিত্যের আসরে চিরস্থায়ী হইয়া
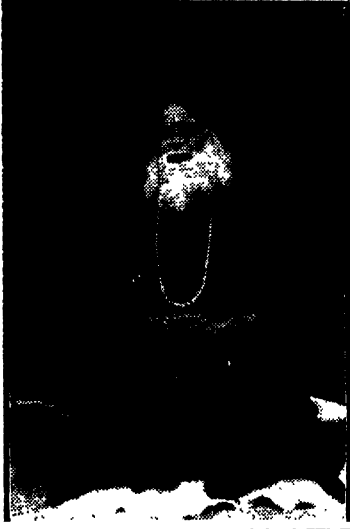
বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল

থাকিবে। তিনি শেষজীবনে শ্যামবাজারে পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা স্কুলটিকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়া—নিজে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া—সুকুমার শিশুগণের শিক্ষায়—চারিত্র্যগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ উন্নতি-বিধান তাঁহার শেষ জীবনের সাধনা হইয়াছিল। শিশু-শিক্ষা-কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের কতটা পঙ্গু করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অমৃতলাল শিক্ষা-বিভাগের নীতি-পদ্ধতি— পাঠ্য-গ্রন্থরাজির সমালোচনায় বিশেষ যত্নবান্—সর্ব্বদা তন্ময় ছিলেন। এই বিদ্যালয়েই তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষ—সাহিত্যসাধনার কুঞ্জ—রোগশয্যা—'অমৃতচক্রের' বৈঠকে পরিণত হইয়াছিল। বহু সাহিত্যিক শিক্ষিত যুবক, বিশিষ্ট সম্প্রদায় তাঁহার হাস্যরস-মদির রসা-লাপ—নানা সুচিন্তাপূর্ণ আলোচনা—পরামর্শ লইবার জন্য সন্ধ্যার পর এই মজলিসে সমবেত হইতেন। যিনি এক দিন যাইতেন, তিনিই তাঁহার বাক্যের মোহিনী শক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট হইতেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল—তিনি কাশীতে কিছু দিন চিকিৎসা কার্য্যও করিয়াছিলেন।

স্নেহের প্রস্রবণ অমৃতলাল বসুমতীকে—বসুমতীর কর্ম্মিগণকে—বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথকে—বর্ত্তমান অধিকারীকে চিরদিন পুত্র-পৌত্রপ্রতিম স্নেহ-ভালবাসায় বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি—সৌভ্রাতৃপ্রেম অসাধারণ। এমন সহৃদয় বন্ধু—এমন অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি অনুরাগ—এমন আন্তরিক ভালবাসার আধার জীবনে আর দেখিব কি? বসুমতীর সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির সহিত তাঁহার মধুর হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভক্তিমান অমৃত-লাল—দেবদেবীর—পুণ্য-স্মৃতি-মন্দিরের সম্মুখীন হইলেই বাক্যস্রোত রুদ্ধ করিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া প্রণত হই-তেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার সম-করুণা ছিল—তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থীকে কোন দিন ফিরিতে দেখি নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ সজ্ঞানে কথা কহিয়া—চিকিৎসকগণের সহিত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করিয়া—সদাপ্রফুল্ল-মুখে প্রিয়জনগণের নিকট হইতে অমৃতলাল চিরবিদায় লইয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের—সাহিত্য-সাধনার অবসানে চিরবাঞ্ছিত শান্তি লাভ করিয়াছেন। এমন শান্তিপূর্ণভাবে রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিতে দেখিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছেন। কিন্তু

ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষরূপে যুবক অমৃতলাল

তিনি যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত ছিলেন—করুণাবতার ঠাকুরকে যে তিনি চর্ম্মচক্ষে থিয়েটারে, দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন—ঠাকুর যে তাঁহাকে নিজহস্তে প্রসাদ দিয়াছিলেন—তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে? যাঁহার হৃদয় শান্তিপূর্ণ—যিনি পরমানন্দলাভে আত্মহারা—ঠাকুরের শ্রীচরণারবিন্দে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল—মৃত্যু-বিভীষিকা কি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? মৃত্যুই যে তাঁহার চির-বাঞ্ছিত মিলনের একমাত্র পথ। হৃদয় অশান্ত—তাই আমরা তাঁহার শোকে অধীর—মুহ্যমান। ভগবান্ তাঁহার বিয়োগে শোকাচ্ছন্ন পরিবারবর্গকে শান্তি প্রদান করুন।
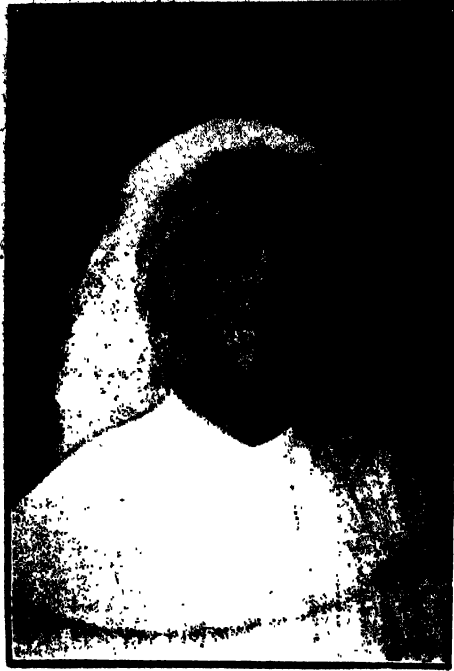
ব্যাপিকা বিদায় রচনাকালে রঙ্গ-সম্রাট্ অমৃতলাল

জীবন যায়—কিন্তু কর্ম্ম থাকে, অমৃতলাল আসিয়াছিলেন—সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের সাধনায় বাঙ্গালীকে যথেষ্ট চিন্তা করিবার—আনন্দ করিবার প্রচুর সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা আর তাঁহার সেই সদা-হাস্য-রঞ্জিত—সরল সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইব না সত্য—কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম আছে—আদর্শ আছে—সাহিত্য আছে—সাহিত্যের আধারে মনীষা ও প্রতিভার পর্য্যাপ্ত দান সুসঞ্চিত আছে। তাঁহার মত করিয়া বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসিয়া—বাঙ্গালী জাতিকে স্নেহ করিয়া জীবন ও সাধনা ধন্য করি। তাঁহার কর্ম্মস্মৃতির সাধনা-দীপ্তির অত্যুজ্জ্বল আলোকের সহিত সুপরিচিত—সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে সান্ত্বনার অবসর পাই। ইহাই অমৃতলালের সাধনার—প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতা—প্রকৃষ্ট পরিণতি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অমৃত-প্রয়াণে

অভিনেতা তুমি জানিত সকলে ওগো নট-রস-রাজ,
অভিনয়-শেষ দৃশ্যটি তাই দেখায়ে গেলে কি আজ?
চিরকাল ধরি বিলায়ে বিলায়ে রসের অমৃত-ধার,
শেষে দিয়ে গেলে কি গরল-জ্বালা—নহে ত এ জুড়াবার!
অথবা নিঠুর সত্যের বাণী শুনাইলে সুগভীর,—
'অমৃতে' কাহারো নাহি অধিকার এই মর ধরণীর!
বঙ্গের এই কঙ্কাল-ময় স্মৃতির শ্মশানে বসি,
তোমারেই আজি মনে পড়ে যে গো প্রাণ শুধু উঠে শ্বসি'!
তুমি ছিলে না ত নটরাজ শুধু রঙ্গ-মঞ্চ মাঝ,
বঙ্গ-ভারতী-কুঞ্জের ছিলে মধুময়—পিকরাজ!
কণ্ঠ-বীণায় না জাগিতে সুর তুমি ধরেছিলে তান,
শেষ সুরটুকু ঢালিয়া দিয়েছ জড়েতে জাগায়ে প্রাণ!
দীপকের সাথে মল্লার, সে কি তীব্র মধুর হায়—
তুষার জলেছে, পাষাণ কেঁদেছে সে সুরের মহিমায়!
হাস্যের সাথে বিদ্রূপ-কশা করি এত মনোহর,—
তোমা সম আর কে বেঁধেছে কবে ওগো সুর-যাদুকর!

অপ্রিয় কত সত্যেরে তুমি দিয়েছ মধুর বেশ,
কটু-ঔষধে পায় নাই রোগী, কটুতার কোন লেশ!
পল্লীর প্রিয়-সন্তান, তবু সহরে বদ্ধ রহি,
সমাজের ছবি তুলিকার মুখে কেমনে এনেছ বহি'!
সে সুখের কথা বেদনার রূপে আজি যে আনিছে টানি,
সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-দীপ্ত তোমার আননখানি!
তোমারে দেখি যে রস-রসিকের হাসিভরা মণ্ডলে,
দর্শনে কভু, বিজ্ঞানে কভু—সমাজপতির দলে!
তোমারে দেখি যে রাজনীতিকের কূটসমস্যা মাঝ,
ভক্তের বেশে সাধন-নিরত দেখি যে ভক্তরাজ!
অমৃতের কথা শুনেছিল ধরা, পারনিক' স্বাদ তার,
তাই বুঝি এসে পিয়াইয়া গেলে অমৃত-মদিরা-ধার।
দেবতাবৃন্দে বঞ্চিয়া তুমি এসেছিলে ধরামাঝ,
দেব-উপভোগ—দেবতারা তাই ফিরায়ে নিল কি আজ?
ভবরঙ্গের অমৃতাভিনয় আজিকে করিয়া শেষ—
কোন্ সে রঙ্গমঞ্চে আবার চলিলে পরিতে বেশ?

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

মেঘদূত *

(সমালোচনা)

মেঘদূত! নামেই কি মোহ! রবীন্দ্রনাথের সেই অমর ছত্রগুলি বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে ঝকিয়া ওঠে!

···সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা—
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন!
দেখা দিল চারিদিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বসভা মাঝে
তোমার বিরহ-বীণা সকরুণ বাজে!

• মেঘদূত কবি-কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য। অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে মেঘদূত খণ্ড-কাব্য বলিয়াই কথিত হইতেছিল, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অকুতোভয়ে প্রচার করিলেন, না, মেঘদূত খণ্ড-কাব্য নয়—মহাকাব্য। সত্যই তাই। বিচিত্র স্বচ্ছন্দ শ্লোকগুলি এমন একটি পরিপূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে, যা শুধু মহাকাব্যেই পাই। কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবও ভূমিকায় বলিয়াছেন,—আকারে ক্ষুদ্র হলেও অপ্রমেয় কাব্য-সৌন্দর্য্যে মেঘদূত কালিদাসের এক বিরাট রচনা।

পাণ্ডিত্যের এ সব তর্কাতর্কি পণ্ডিত-সভার জন্য মুলতুবি রাখিয়া দেখা যাক, নরেন্দ্র দেবের এই কাব্যানুবাদ কেমন হইয়াছে।

অনুবাদের সার্থকতা ঘটে তখনি, যখন দেখি মূলের ভাব অনুবাদে যথাযথ বজায় আছে এবং সে ভাব বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, মূলকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় সৌন্দর্য্যে অনুবাদ যখন ফুটিয়া উঠে, তখনি সে অনুবাদ সার্থক হয়! দেখা যাক, এ সত্যের প্রমাণ নরেন্দ্র দেবের অনুবাদে আমরা পাই কি না।

নরেন্দ্র দেব কবি—সে পরিচয় তাঁর ওমরখৈয়মের অনুবাদে পাইয়াছি। তিনি দরদী—সে পরিচয়ও পাইয়াছি তাঁর রচিত 'বসুধারা' কাব্যে। দরদ এবং কবিত্ব এ দুয়ের একটির অভাবে ছন্দোবদ্ধ কোনো রচনাই সজীব হয় না। নরেন্দ্র দেবের দরদ আছে, কবিত্ব আছে। সুতরাং তাঁর রচনায় প্রাণ আছে। সে প্রাণের পরিচয় মেঘদূতেও পাইয়াছি।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে···। ১লা আষাঢ়—এ তারিখটুকু ভারতের আকাশে সোনার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—মেঘদূত ১লা আষাঢ় তারিখটিকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, বিশ্বের সাহিত্য-ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই!

কিন্তু এ-সবও অবান্তর কথা। তবু 'মেঘদূত' নামটির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমর স্তুতি-ছত্রগুলি মনে স্বতই জাগিয়া ওঠে···কবি নরেন্দ্র দেবও ভূমিকায় সে ছত্রগুলি স্মরণ করিয়াছেন।···

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনারে অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

ইহাই মেঘদূতের key-note,

···সে দিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব বরষার।···
······কতকাল ধরে'
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত, বহু দীর্ঘ, লুপ্ত-তারাশশি
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন···
....
অন্ধকারে রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত, গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশান্তরে······

* মেঘদূত। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চার টাকা মাত্র।

মেঘদূতের এই খানেই অভিনবত্ব। যক্ষ মেঘকে দৌত্যে পাঠাইল অলকায়। মেঘ কি করিয়া পথ চিনিবে, কি করিয়া যক্ষের প্রিয়াকে চিনিবে? যক্ষ পথ বলিতে লাগিল। প্রথমে মেঘকে নানা মিষ্ট মধুর বচনে আপ্যায়িত করা চাই, নহিলে সে কেন কথা শুনিবে? তার কি দায়! আপ্যায়িত করার পর যক্ষ কহিল,—

সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥

নরেন্দ্র দেব এই ছত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন,—

আমার কুশলবার্ত্তা নিয়া প্রিয়ার পাশে যাও গো তুমি;
যাও গো যেথায় হেম-অলকায় যক্ষেশ্বরের আবাস-ভূমি;
যাহার প্রাসাদ-উদ্যানেতে মহেশ্বরের বাসস্থল,
চন্দ্রচূড়ের চাঁদের আলোয় হর্ম্ম্যরাজি সমুজ্জ্বল!

তার পর পথের হদিশ—কিন্তু তার পূর্ব্বে প্রলোভনের ইঙ্গিত। তোমার পথ নীরস হইবে না—পথে আরাম ও নয়নের আনন্দ মিলবে প্রচুর; নহিলে মেঘ এত কষ্ট যদি না সহে!— যক্ষ লোভ দেখাইল,—

ত্বামবরূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক-বনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।

নরেন্দ্র দেব এ ছত্রের অনুবাদ করিয়াছেন,—

তোমায় দেখে ঘোমটা খুলে
সরিয়ে মাথার ঝাপ্‌টা-চুলে
চাইবে হেসে মুখটি তুলে
বিরহিণীর দল।

দূর-প্রবাসী পরাণ-বঁধুর
প্রত্যাগমের লগ্ন মধুর
বুঝবে তারা—নয় বেশী দূর,
আশায় সচঞ্চল!

এ কথা মনে জাগিতেই যক্ষের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। মেঘ দেখিয়া দূর-প্রবাসীদের প্রিয়ারা আশায় সচঞ্চল হইয়া উঠিবে। কেন?

দেখলে যারে মর্ম্মে জাগে
সঙ্গ প্রিয়ার সবার আগে…
……………………
বক্ষ-লীনা যাদের প্রিয়া,
তাদেরও হয় উদাস হিয়া
দেখলে এ মেঘ নীল-আকাশে!
…কণ্ঠ-আলিঙ্গনের লোভে
চিত্ত উতল কার না হয়?…

সেই মেঘ…তাকে দেখিয়া যক্ষ ভাবিয়া আকুল—

আমায় ছেড়ে বিধুর-হিয়া
কেমন করে বাঁচবে প্রিয়া?

যাক, এ সব অতি-বেদনার্ত্ত মনের শঙ্কা-বেদনা। এর আর বিরাম নাই। তুমি যাও মেঘ অলকায়…ঐ ছাখো পথ,— অভ্রভেদী আম্রকূট!…কেমন আম্রকূট?—না, পরিণত-ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ, নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ—

তখন পাকা আমের বনে
উজল কাঁচা সোনার আভা…

পাকা আমের সোনা-রঙে রঙীন আম্রকূটের শির! আম্রকূটের পর নীচে পাহাড়…রাশি রাশি কদম্ব-ফুলে ছাওয়া; তার পর উজ্জয়িনী…

সেখানে প্রাসাদ-শিরে
ভুলো না ভ্রমিতে ধীরে
পুরনারী সেথা যারা
চকিত-নয়না তারা।
বিজলী চমকে চোখে,
আঁখি-ঠারে মরে লোকে!
সে লোচন-ফুলবাণ
যদি নাহি বিঁধে প্রাণ,
জনম-জীবন তবে
সবই সখা বৃথা হবে!

এই পথের বর্ণনা মেঘদূতে যে সুমধুর বৈচিত্র্য ফুটাইয়াছে, তার তুলনা বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যে মেলে কি না সন্দেহ! ছবির পর ছবির বাহার! শুধু তাই নয়—সেই সঙ্গে মন… নিপুণ ইঙ্গিতও প্রচুর; ঘর-সংসারের ছোট-খাটো…

প্রণয়-লীলার অতি নিগূঢ় ভঙ্গী, ব্যথা-হর্ষের পরিচয়—তারো অভাব নাই!

কিন্তু আমরা মেঘদূত কাব্যের সমালোচনা করিতে বসি নাই। নরেন্দ্র দেবের ছন্দানুবাদে মেঘদূতের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় কতখানি ফুটিয়াছে, তা লক্ষ্য করাই আমাদের কায।

অসঙ্কোচে একটা কথা বলিতে পারি, নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ যতখানি অনবদ্য, সুস্পষ্ট ও ভাবানুযায়ী হইয়াছে, তেমন অনুবাদ বাঙলায় আর নাই।

কালিদাসের মেঘদূত আগাগোড়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। নরেন্দ্র দেব একই ছন্দে অনুবাদ করেন নাই। তিনি বহু বিচিত্র ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন—যেখানে যে ছন্দ মানায়, সেখানে তেমনি ছন্দ! ইহাতে তাঁর বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাই প্রচুর। এই ছন্দ-বৈচিত্র্যের গুণে তাঁর অনুবাদ আগাগোড়া বেশ সজীব সলীল হইয়াছে—কোথাও একঘেয়ে সুর তোলে নাই। মেঘের বুক বহিয়া স্বচ্ছন্দ তরঙ্গভঙ্গে পাঠকের মনকে একেবারে হিমগিরি-শৃঙ্গ হইতে অলকায় যক্ষের গৃহে লইয়া যায়। গতি কোথাও বাধে না। এইখানেই নরেন্দ্র দেবের কৃতিত্ব ফুটিয়াছে অসাধারণ সুন্দর।... এ জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে সাধুবাদ করি।

তার পর অনুবাদের প্রাঞ্জলতা। অনুবাদ এমন সুস্পষ্ট, সহজ হইয়াছে যে, অল্প-শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ গ্রন্থ-পাঠে মেঘদূতের অনুপম সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইবেন। দু চারিটি দৃষ্টান্তের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষু খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ—

চাঁদের আলো বাসতো ভালো
চক্ষে সে যে স্বপ্ন আনে।
বক্ষে জাগে স্নেহের আবেশ
দৃষ্টি মেলি যাহার পানে।
সেই শশধর বাতায়নের
সামনে এসে যখন হাসে,
চোখ ঢেকে সে মুখ ফিরে নেয়
অশ্রুজলে গণ্ড ভাসে!
সজল মেঘের কাজল ছায়ায়
বাদল বেলার আঁধার মাঝে
আধ-ফোটা সে আধকে ঢাকা
স্থলকমলের তুল্য রাজে!

আর একটি দৃষ্টান্ত দিব—

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি॥

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ—

কহিও তারে দয়িত তব
বলেছে কথা গুপ্ত,
একদা মম কণ্ঠ বেড়ি
শয়নে ছিলে সুপ্ত,
সহসা জাগি উঠিলে কাঁদি
বহিল ধারা চক্ষে,
শুধালো সখা—কী ব্যথা তব?
আদরে টানি বক্ষে!
বুকের হাসি চাপিয়া মুখে'
কহিলে তুমি রঙ্গে—
স্বপনে হেরি খেলিছ তুমি
অপর নারী সঙ্গে।

দৃষ্টান্তগুলির কোনটিই বাছিয়া উদ্ধৃত করি নাই—এমনি সামনে যেটি চোখে পড়িয়াছে, উদ্ধৃত করিয়াছি!

এ অনুবাদখানি পড়িয়া মোটামুটি বলিতে পারি—নরেন্দ্র দেব মেঘদূতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য চমৎকার বজায় রাখিয়াছেন। তাঁর অনুবাদে কবিত্ব আছে—প্রাণ আছে। অনুবাদটুকু বাঙলা হইয়াছে—সংস্কৃত কথাই বেমালুম বজায় রাখিয়া ফাঁকির বিন্দুমাত্র চেষ্টা এ ছন্দানুবাদ গ্রন্থের কোথাও নাই। তার

উপর অনুবাদ হইয়াছে খুব সহজ, সরল এবং সুস্পষ্ট ! সুবিধার খাতিরে মূলের বিশিষ্ট ভাবকে নরেন্দ্র দেব কোথাও হত্যা করেন নাই বা মূল ভাবকে কোথাও এতটুকু বিরোধী করিয়া তোলেন নাই। গ্রন্থখানির গোড়ার ভূমিকাটুকু কাব্যের সরস আলোচনায় চমৎকার ; গ্রন্থ-শেষে ইঙ্গিতে যে ভৌগোলিক নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেটুকু উপভোগ্য ; এবং পরিশিষ্টে মেঘদূতের মূল শ্লোকগুলির সন্নিবেশ অতিশয় লোভনীয় হইয়াছে।

তার পর গ্রন্থের ছাপা ও বহিরবয়ব। প্রকাশক মহাশয়কে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। এমন মনোজ্ঞ কলেবরে বাঙলায় এর পূর্ব্বে অপর কোনো গ্রন্থ কখনো বাহির হয় নাই। ওমরখৈয়মের উপর টেক্কা দিয়াছে এই মেঘদূত। মোটা এ্যান্টিকে দু'তিন রঙের কালিতে নূতন অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা ; প্রতি পৃষ্ঠায় কাব্যছত্রগুলির পরিচায়ক চিত্রাবলী সূক্ষ্ম কারিগরির গুণে আর্টিষ্টিক। তা ছাড়া খুব দামী এবং সম্পূর্ণ অভিনব আর্ট কাগজে ছাপা বহু রঙে রঙীন অসংখ্য ছবি। ছবিগুলি প্রখ্যাত আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত চারু রায়, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী ও জ্ঞানদাকান্ত দাশকে দিয়া এই গ্রন্থের জন্যই বিশেষ করিয়া আঁকানো হইয়াছে। ছবিগুলির পরিকল্পনা চমৎকার ; ছবিগুলি সেই প্রাচীন যুগের আম্রকূট, উজ্জয়িনী, শিপ্রাতীর, গম্ভীরা চর্ম্মণ্বতী নদী-তীরস্থ বনভূমি ও অলকাকে চোখের সামনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে ! উজ্জয়িনীর পুরললনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত-নয়নের বিলোল অপাঙ্গটুকুও ছবির বুকে আশ্চর্য্য জীবন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যক্ষপ্রিয়ার বিরহ-ব্যথাতুর চিত্তটুকু চিত্রশিল্পীর তুলির স্পর্শে অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ পাইয়াছে !

মেঘদূতের এ সংস্করণখানি সকল দিক্ দিয়া বাঙলা সাহিত্যের মাথার মণি হইয়াছে। বাঙালী গরীব জানি, বাঙালী কাব্যের পিপাসায় আর্ত্ত তাও জানি। তাই আশা আছে, চারিটি মাত্র টাকা খরচ করিয়া বাঙালী এ বইখানি সংগ্রহ করিবেন। দুর্দ্দিনের বহু বেদনা, সংসারের অভাব-অভিযোগের বহু যাতনা, এ বই পড়িয়া, এ বই দেখিয়া বাঙালী অনেকখানি ভুলিতে পারিবেন, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মধুর হাসি তার দিক সে উপহার যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
মাধবী ফুটে যায় হাসিতে তারেই আঁখিজল সাজে গো। —রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ] [শিল্পী— শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।

ভক্তসাধক অমৃতলালের শেষ জীবনের সাধনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা

মা

তুমি পূর্ণ পবিত্রতা, সধবা কুমারী-ব্রতা,
তাপিতের ত্রাতারূপা প্রকৃতি পরমা।
কৃতযুগে বেদমাতা, ব্রহ্মার মানস-জাতা,
সাবিত্রী গায়ত্রী কর্ত্রী সবিতা সুষমা॥
ত্রেতাতে তুমি মা সীতা, দ্বাপরে জীবন্ত গীতা,
বুদ্ধযুগে শুদ্ধা বুদ্ধি মোক্ষদা নির্ব্বাণ।
পুরাণে মা পুরাতনী, নিত্যা সত্য সনাতনী,
ভক্তি-গঙ্গা-তরঙ্গিণী প্রতিমানির্ম্মাণ॥
তুমি রূপে জগদ্ধাত্রী, দশভুজা পূজাপাত্রী,
শ্যামা রমা সরস্বতী অন্নদা রাধিকা।
নাম ধরি বিষ্ণুপ্রিয়া, চৈতন্য উদয়ে ক্রিয়া,
অন্তরে অন্তরে রহি স্বতন্ত্র সাধিকা॥
রামকৃষ্ণ-লীলারঙ্গে, মাতৃ-মূর্ত্তি পূত অঙ্গে,
এলে সঙ্গে হেরি বঙ্গ বদ্ধ অন্ধকূপে।
ভাবে স্বামী সুবিভোর, "আনন্দরূপিণী মোর",
বলিয়া পূজেন জায়া ষোড়শী স্বরূপে॥
শক্তির সঞ্চার করি, অলক্ষ্যে লেখনী ধরি,
লেখালে লীলার গীতি কত ভক্তজনে।
স্তব-স্তুতি পুঁথি নয়, হৃদয় এ কথা কয়,
প্রত্যক্ষ পেয়েছে সাক্ষ্য কুপুত্র রচনে॥
নহে কি সে মূর্খ নট, শূন্য শিরে জ্ঞান-ঘট,
ঘটনা রটনা পারে করিতে খেলায়।

আগে মনে জাগে নাই, কি লিখেছি ভুলে যাই,
কলম তবে কে মা গো চালায় হেলায় ॥
সত্তর হয়েছি পার, পঞ্চবর্ষ পরে আর,
ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে হা-হা করে মন।
কার্য্য আজো চায় ধরা, তাই নাই দেহে জরা,
প্রভাবে অভাব সদা করে জ্বালাতন ॥
আলস্য পরশ্ব রাত্রে, শয্যায় শোয়ায় গাত্রে,
মন কিন্তু মন দিল ভাবনা-পূজায়।
নিদ্রা-ও সাধনা চায়, মরাতে ধরাতে পায়,
মরণে আরাম আছে প্রত্যহ বুঝায় ॥
উঠে বসি বিছানায়, স্বপ্ন-পুষ্প-রচনায়,
ক্রমে ক্রমে হোলো গত ত্রিযামা রজনী।
চিন্‌তে পারিনি আগে, নিশীথ চিন্তার যাগে,
শ্রীকান্ত-মূর্ত্তিতে জাগে চিন্তা-চূড়ামণি ॥
এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে, কামারপুকুর পুরে,
কি জানি কিসের ঘ্রাণে প্রাণ গেল লোভে।
কুটীর খড়ের চালা, বাটীর সে ঢেঁকিশালা,
আঁধারে হেরিল আলো শিশু শশী শোভে ॥
আদেশ শুনিল কাণ, রসনায় এল গান,
জন্মতিথি-ব্রত-কথা সূচনার সুরে।
নাহি ছিল নিদ্রাবেশ, জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ,
এমনি সহজ সেই জগতের গুরু রে ॥
তিনি মা চৈতন্য-দাতা, শক্তিময়ী তুমি মাতা,
পাঁকে পোরা হৃদি-সরে ফোটাও কমল।
চর্ম্ম-চক্ষে মর্ম্মঘাতী, দেখি ফাঁকি মাতামাতি,
দেখাও সূতিকা-চিত্র পূত সুবিমল ॥
শিশুরে ঈশ্বর-জ্ঞান, কর মা দীনেরে দান,
শুদ্ধা ভক্তি দিয়ে কর মুক্ত রুদ্ধ মন।
কু-চিন্তা কর মা দূর, হোক হৃদি শান্তিপুর,
শুনাও সুতের কাণে বীণার বাদন ॥
দাও দাসে ভাব-ভাষা, ভগবানে ভালবাসা,
কল্পনা-কুসুমে দেহ ঐশিক সৌরভ।
অক্ষরেতে মূর্ত্তিমতী, হও মাতা সরস্বতী,
সদাই শুনুক লোকে গদাই-গৌরব ॥

মঙ্গল-বোধন

জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-সিদ্ধিদাতা।
ধর্ম্মরথে কর্ম্ম-পথে গতির বিধাতা ॥
কি কারণে নরদেহ করিয়া ধারণ।
আসিলে করিতে হেথা কি ব্যথা-বারণ ॥
অনুরক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্য পুণ্যবান্।
রাম দত্ত তাঁর তত্ত্ব করেছে বাখান ॥
জয়যুক্ত নিত্যমুক্ত ভক্ত অবতার।
বীরেন্দ্র বিবেকানন্দ মুখেতে প্রচার ॥
কিমাশ্চর্য্য খৃষ্ট-রাজ্য বলে জয় জয়।
বেদান্ত-ব্যাখ্যায় শুনি ধর্ম্ম-সমন্বয় ॥
জিজ্ঞাসে বিলেতে যত শ্বেত নারী নর।
নূতন এ তত্ত্ব কোথা পেলে সাধুবর ?
স্বামীজী বলেন সবে আমি কি বা জানি।
আদিষ্ট হইয়া কহি রামকৃষ্ণ-বাণী ॥
গ্রন্থজ্ঞানশূন্য দ্বিজ চিন্তাচূড়ামণি।
তিনি ব্রহ্ম তিনি শব্দ আমি প্রতিধ্বনি ॥
রামকৃষ্ণ মম ইষ্ট রামকৃষ্ণ জ্ঞান।
দিয়াছি নরেন্দ্র নাম শ্রীচরণে দান ॥
তিনি যা লেখান লিখি যা বলান বলি।
প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে হাত ধ'রে চলি ॥
অভেদানন্দাদি অন্য গুরুবন্ধু সঙ্গে।
ভাসান শক্তির দেশ ভক্তির তরঙ্গে ॥
আনন্দে সারদানন্দ লীলার প্রসঙ্গে।
সাধনার সমাচার দিয়াছেন বঙ্গে ॥
"রামকৃষ্ণ-কথামৃত" বারি যে তৃষ্ণার।
অক্ষরে অক্ষয় রাখে মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
ঘরে ঘরে নর-নারী পড়িবে আশায়।
অক্ষয় পয়ার রচে সরল ভাষায় ॥
ব্রহ্মানন্দ শিবানন্দ প্রেমানন্দ আদি।
সবার চরণে শির নত রাখি সাধি ॥
ত্যক্ত জনে ভক্তি দিতে সবে শক্তিমান।
ধনী যথা দীনে পারে দিতে ধনদান ॥
দেহ দেহ দেহ মোরে দেহ সে বিশ্বাস।
যাঁর বলে প্রাণে পেলে প্রেমের উচ্ছ্বাস ॥

উদ্দীপ্ত যৌবনকাল বিদ্যা-অভিমান।
আশার নেশায় মন মাতালসমান ॥
আশ্বাস দিতেছে মনে প্রত্যেক নিশ্বাস।
কামিনী কাঞ্চন স্বপ্নে স্বজিত উল্লাস ॥
জীবন-বসন্তে জাগে কামনা অনন্ত।
সংসারে ভোগের সুখ সুযোগে সাজন্ত ॥
যে বিশ্বাসে আত্মশক্তি করিয়া আয়ত্ত।
ভগবদ্ভক্তির ভাবে হইলে উন্মত্ত ॥
দৃঢ় করি ধরি করে শ্রীগুরু-চরণ।
মানব-মঙ্গলব্রত করিলে গ্রহণ ॥
অহেতু দয়ার দীক্ষা পেলে যাঁর ঠাঁই।
সে বিশ্বাস দাসে দাও তাঁহারি দোহাই ॥
চাই চাই চাই করি পাই শুধু ছাই।
খেয়ালে শালের লোভে জালেতে জড়াই ॥
রচিব ঈশ্বর-ভাষ্য বিশ্বাসের বলে।
প্রাণের প্রহরী রহ ভকত সকলে ॥

বন্দনা

রামকৃষ্ণ মিষ্টনাম, কর কণ্ঠ অবিরাম,
করুণা-মাখানো মূর্ত্তি স্মর সদা মন।
ঘন উচ্চ উচ্চারণ, ক্রমে স্থির ক'রে মন,
সত্তার চৈতন্য করে শব্দে জাগরণ ॥
আদিতে উপাধিময়, ধ্যানে প্রাণে পরিচয়,
দিব্যজ্ঞানে সন্নিধানে দেখে ভাগ্যবান্।
অর্জ্জিত না ছিল পুণ্য, মরু-হৃদি গুরুশূন্য,
কারুণ্য-কানন কাছে অরণ্য সমান ॥
জনমে যৌতুক-রঙ্গ, মুখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ,
কপি সম করিয়াছি মাত্র উপহাস।
ভুজঙ্গ গরল ঢালে, কণ্ঠে ধর সেই কালে,
এমনি ঈশ্বর-বৃত্তি ওহে কৃত্তিবাস ॥
চরণে বাজিলে বাণ, প্রণাম করহ জ্ঞান,
কি ক্ষমা কি দয়া পিতা ব্যথিতে তারিতে।
আসিয়াছ কতবার, কর্ণে গেছে সমাচার,
দৃষ্টিপথ ছেড়ে গেছি দুষ্টামি সারিতে ॥

ভক্তিতেজে তপ্তরক্ত, গিরিশ আসক্ত ভক্ত,
কভু না বিরক্ত লতে প্রভুপদপ্রান্তে।
নাট্যগুরু ছদ্মবেশে যেতে পাদপদ্মদেশে,
গুরুরূপে উপদেশ দিয়াছেন ভ্রান্তে ॥
বিদ্রূপের অবসান, আসিয়াছে অভিমান,
নহি আমি তীর্থযাত্রী পুত্র যে পিতার।
ধরিয়া প্রাণের কাণ, যে দিন দেবেন টান,
মাথা নত ক'রে সব শ্রীচরণে তাঁর ॥
হে গিরিশ ভক্তবীর, চরণে লুটায় শির,
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্ঘ্য করিছে প্রদান।
নাট্য-রবি কবি বিশ্বে, স্নেহের অনুজ শিষ্যে,
রামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে দেওয়াইলে স্থান ॥
চুকেছে ভোজন-পালা, শূন্য-স্থালী পাকশালা,
অনাহারে আমি আর মিত্র এক অন্য।
ব্যস্ত সে গিরিশ ঘোষ, পাছে করি আপশোষ,
পাতের প্রসাদ আসে শ্রীমুখের অন্ন ॥
প্রসাদ প্রকারে পায়, নিবেদিত প্রতিমায়,
মুখে তুলি ভক্তপ্রাণে আনন্দ বিশেষ।
অহেতু কৃপার দান, অন্নপূর্ণা মা যোগান,
চেতন-বিগ্রহগ্রাহ্য ভুক্ত অবশেষ ॥
দেখেনি এ দীন-নেত্র, পুণ্যতীর্থ পুরীক্ষেত্র,
তার তরে নাহি মনে আর কোন কষ্ট।
নিজে প্রভু জগন্নাথ, চক্ষু-অগ্রে সু-সাক্ষাৎ,
প্রসাদ-মাহাত্ম্য দেন বুঝাইয়া স্পষ্ট ॥
সাগরে যেমন জল, কমলে কোমল-দল,
স্বরূপে স্বরাট্ তথা দয়া মূর্ত্তিমান।

* * * * *

সে দয়ার আবির্ভাব, নরদেহে সু-প্রভাব,
ঘুচাতে অভেদ-মন্ত্রে ধর্ম্মে ভেদবুদ্ধি।
রামকৃষ্ণ নাম ধরি, শান্তি দেন ভ্রান্তি হরি,
সৎ অর্থে পথ বলি লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি ॥
অপূর্ব্ব সে জন্মকথা, ভাষায় রচিয়া লতা,
বাসনা ফোটাতে তায় অমৃতের ফুল।
কর দেব শক্তিদান, ভক্তি-সিক্ত হোক্ গান,
প্রচারিতে ব্রতকথা অমৃত আকুল ॥

কথারম্ভ

তীর্থ—কামারপুকুর

উত্তর-পশ্চিম ভাগ হুগলী জেলায়।
বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান যেখানে মেলায় ॥
ত্রিকোণমণ্ডলে আছে গ্রাম তিনখানি।
এত পাশাপাশি যেন এক ব'লে জানি ॥
শ্রীপুর মুকুন্দপুর কামারপুকুর।
জমীদার সুখলাল গোঁসাই ঠাকুর ॥
সেকালে সকল গ্রাম ছিল সুখকর।
সচ্ছলে স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্যে আনন্দ-আকর ॥
ধান্যের প্রাধান্য ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর আবাস।
গোচরে বাছুর গরু সুখে খায় ঘাস ॥
ডোবা দীঘি সরোবর বহে নদী খাল।
আম জাম আদি বৃক্ষ নারিকেল তাল ॥
দেউল মন্দির মঞ্চ দেউড়ী দালান।
ভেঙ্গে প'ড়ে আছে দেখে হয় অনুমান ॥
কামারপুকুর গ্রাম ছিল এককালে।
লক্ষ্মীমন্ত বসবাসে বেশ ভাল হালে ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁতি কুমার কামার।
ঘরে ঘরে সবাকার ধানের খামার ॥
কৈবর্ত্ত আপন অর্থে সুখে বর্ত্তমান।
চাষা ব'লে নাহি টুটে সদ্গোপের মান ॥
চাঁড়ালে বাড়ায় সবে ব'লে নমঃশূদ্র।
পণ্ডিত উপাধি পেয়ে ডোম নহে ক্ষুদ্র ॥
বণিক গোয়ালা কলু রজক ধীবর।
বিবিধ যাজকে যায় যজমানের ঘর ॥
পাতে ভাতে জাতিভেদ নহে কভু আঁতে।
স্যাঙাৎ পাতায় দ্বিজ অন্ত্যজের সাথে ॥
খাদকের অধিষ্ঠান মোদকে প্রমাণ।
কামারপুকুরে ছিল জিলাপীর মান ॥
মিঠাই ও নবাতের সুখ্যাতি ঘটনা।
ঘটার সমাজ বটে করয়ে রটনা ॥
গ্রামে গ্রামে ছিল তবে ভাল কারিগর।
কুলীরূপে আজ তারা কলের চাকর ॥
বিড়ি মুখে গুঁজে দিয়ে কেড়ে নিয়ে হুঁকো।
স্বদেশী হয়নি যবে দেশ পোড়ামুখো ॥

কামারপুকুরে হোতো কি সুন্দর নলচে।
অভাবে যাহার আজো প্রাণ মোর জ্বলছে ॥
গড়-গড় ডাকে নল টেনে দিলে দম।
কোথা লাগে তার কাছে তোর সা-রে-গ-ম ॥
ঘরে ঘরে চর্কা ঘোরে সুতা সুতো কাটে।
গামছা কাপড় বুনে তাঁতি যায় হাটে ॥
সিহর বদনগঞ্জ তারা-হাট আদি।
সহরে কাপড় বেচে নিয়ে যেত চাঁদি ॥
বিষ্ণু চাপড়ী বুন্তো এগ্নি শ্রেষ্ঠ কাপড়।
কলকাতাতে দাম জোড়া পিছু চাপড় ॥
কলসী তিজেল সরা কুমোরের সজ্জা।
শুমোরে বিকায়ে দিত বিদেশীরে লজ্জা ॥
চেঙ্গারি ধুচুনি কুলো চেটাই মাদুর।
কেনায় বেচায় দুঃখু দু'পক্ষের দূর ॥
খ্যাতি-তৃষ্ণা ছিল বটে ধর্ম্মে কিন্তু নিষ্ঠা।
ঠাকুর-বাড়ীতে অন্ন পুকুর প্রতিষ্ঠা ॥
মাণিক বামুন-ঘরে ছিল কিছু ধন।
গ্রামের লোকেরে দিল আমের কানন ॥
বিনি দামে মিঠে আম খেয়ে তাজা তাজা।
আজো শুনি লোকে বলে সে মাণিক রাজা ॥
সরকারী রাজাগিরি দরেদরখাস্ত।
হরঘড়ি ডরে মরে কখন্ বর্খাস্ত ॥
স্বভাবের শান্তি-কুঞ্জ সন্তোষের জয়।
সখ্যভাবে ঐক্য সবে লক্ষ্মীর আলয় ॥
তৃণের কুটীরতলে সুখ লুটাপুটি।
অতিথি আইলে অন্ন পায় দুই মুটি ॥
অন্ন-দান সম নহে অন্য কোনো দান।
হাস্‌পাতালে যশ্-মাতালে দানে খোঁজে মান।
বিলাতী ঔষধ অস্ত্র বস্ত্র বিছানায়।
দানের প্রস্থান, রোগী পথ্য নাহি পায় ॥
পালিয়া অবশ্য পোষ্য বিশ্ববিদ্যালয়।
চিরারাধ্যা শুদ্ধি বুদ্ধি করিতেছে লয় ॥
বৃক্ষের রোপণে হয় ছায়া ফল-দান।
সরোবর প্রতিষ্ঠায় গ্রামে স্নান পান ॥
কামিনী কলস-কাঁখে যায় শেষবেলা।
বসাতে পুকুর-ঘাটে মিলনের মেলা ॥

স্থলে জন্মে ফল শস্য জলে জন্মে মৎস্য।
খাবে সুখে নর-নারী পক্ষী গাভী বৎস॥
অতিথি বা ধর্ম্মশালা পথিকের তরে।
শিরে ছাত কোলে পাত বিশ্রাম বিতরে॥
বলদ-গাভীর তরে গোচারণ মাঠ।
বুনো গিয়ে বন হ'তে কেটে আনে কাঠ॥
গ্রামে গ্রামে সরকার—পাঠশালা খোলা।
লেখা-পড়া অঙ্ক শেখে কৃষকের পোলা॥
পুরাণের পাঠ দেন গণ্য মান্য লোক।
পায় তাতে সাধারণে জ্ঞানের আলোক॥
যাত্রাগানে কি আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা।
ভিখারীর দ্বারে তাই দীন পায় ভিক্ষা॥
পল্লীর সমাজ-মাঝে হ'লে কোনো দোষ।
বিচার বিধান করে চট্টো দত্ত ঘোষ॥
এমনি সুন্দর গ্রাম কামারপুকুর।
যথায় লবেন জন্ম আপনি ঠাকুর॥
ধনে অন্ধ রামানন্দ করে অত্যাচার।
দ্বিজ ক্ষুদিরাম ত্যজে পূর্ব্বাবাস তাঁর॥
সুখলাল সনে ছিল, আগে হ'তে সখ্য।
কামারপুকুরে বাস তাই তাঁর লক্ষ্য॥
দুই পুত্র রিক্তমান আর এক কন্যা।
গৃহিণী যে চন্দ্রমণি এই দেখে ধন্যা॥
ভিটা-ভূমি কৈল গ্রাস রামানন্দ রায়।
পুত্র-পরিবার লয়ে দ্বিজ দুঃখ পায়॥
ইথি-উথি পথি-বীথি ঘুরে হয়রাণ।
দাতা-পাশে নত মাথা ত্যাজ্য তাই দান॥
এক দিন গ্রামান্তরে প্রান্তরের পার।
উদ্‌ভ্রান্ত আবেশবশে গতি হয় তাঁর॥
মধ্যাহ্নে নিরন্নমুখে ফিরিবার কালে।
শ্রান্ত দেহ দ্বিজবর বৃক্ষমূলে ঢালে॥
দরিদ্রের বন্ধু নিদ্রা আর্দ্র চক্ষু ঝাঁপে।
ক্ষণ শান্তি পান ভদ্র রৌদ্র-চিন্তা-তাপে॥
স্বপ্ননেত্রে ধান্যক্ষেত্র করেন প্রত্যক্ষ।
তথা হ'তে আসে কেবা কারে ক'রে লক্ষ্য॥
শিয়রে দাঁড়াল শিশু গৌরব-আধার।
অঙ্গের সৌরভভরে পূরে চারিধার॥

দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম বালকের বেশ।
জরির পাছুড়ি গাত্রে চূড়া বাঁধা কেশ॥
সোনার দানাতে চূড়া করে ঝল-মল।
ললাটে টিকলি টিকা চোখেতে কাজল॥
নাসায় নোলক দোলে ঝলে গজমতি।
কুণ্ডল-মণ্ডলে কর্ণ শোভাপূর্ণ অতি॥
কণ্ঠে দোলে কণ্ঠমালা সোনার হাঁসুলী।
নূপুর চরণপুরে পশ্চিমা পাসুলী॥
কটিতে কাঞ্চন-পাটা হেম-নিমফল।
জলধর-বর-অঙ্গ রক্তপদ-তল॥
বামকরে ধনু ধরে দক্ষে লক্ষ্যি বাণ।
তোতো-তোতো কহে কথা শিশুর সমান॥
বহি যায় সুধাধারা নারায়ণ-মুখে।
বলে রাম ক্ষুদিরাম শুয়ে শুনে সুখে॥
"অইখানে প'ড়ে প'ড়ে লুটাই ধুলায়।
কেহ নাহি লয়ে গায়ে হাতটি বুলায়॥
রাম রাম বল তুমি সকালে বিকালে।
কেন তবে কোলে তুলে লও না ছাবালে॥
ধান-ক্ষেতে প'ড়ে আছি খেতে নাহি পাই
স'বে কেন অনাহার তোমারে শুধাই॥"
ক্ষুধায় কাতর রাম হৃদয় গলায়।
নিদ্রিত ব্রাহ্মণে যেন স্বপন বলায়॥
"রাজপুত্র তুমি রাম দ্বিজ-দুঃখী আমি।
তোমারে কি খেতে দিব জগতের স্বামী॥
মনে ভয় পাছে হয় সেবা-অপরাধ।
তিলেক ত্রুটিতে যাব নরকে অগাধ॥"
বালক বলিছে যেন দ্বিজ শুনে কানে।
স্বর অতি মধুময় অভয় প্রদানে॥
"পিতা ব'লে ডাকিয়াছি নিজে ক'রে সাধ।
কভু আমি নাহি লব তব অপরাধ॥
যদুপতি খেলে খুদ বিদুরের ঘরে।
কেন চা'বে রঘুপতি অন্ন দুধে-সরে॥
যা জোটে বাপের ঘরে ছেলে খাবে তাই।
অন্যায় আব্দারে দোষ মা-বাপের ঠাঁই॥"
নীরব হইল স্থান নিদ্রা হ'ল ভঙ্গ।
কাঁপে বিপ্র থর থর ঘামে ভেজা অঙ্গ॥

উঠে তবে ধীরে ধীরে ক্ষেতবাগে নড়ে।
দেখেন অদ্ভুত লীলা শিলা এক প'ড়ে ॥
শিলা হেরে মর আঁখি রাম দেখে হিয়া।
করে ধনু ধ'রে নাচে তাথিয়া তাথিয়া ॥
জনম সফল হ'ল ভাবে মনে মন।
যতনে তুলিয়া লন শিলা-নারায়ণ ॥
আনন্দে আপীড় দেহ হৃদে দৃঢ় নিষ্ঠা।
স্বগৃহে বিগ্রহ লয়ে করেন প্রতিষ্ঠা ॥

রঘুবীরের স্তব

জয় রাম   জয় রাম   জয় রাম   নমস্তে।
শ্যামতনু   ধৃতধনু   রঘু-জনু   নমস্তে ॥
বিষ্ণু-অংশ   সূর্য্যবংশ   নরহংস   নমস্তে।
রূপে ইন্দু   কৃপাসিন্ধু   কপিবন্ধু   নমস্তে ॥
বাচে চটু   বনে বটু   রণে পটু   নমস্তে।
দাশরথি   সীতাপতি   ভবগতি   নমস্তে ॥
বনচারী   রাবণারি   দুঃখহারি   নমস্তে।
ভক্তি-ভক্ত   ভক্তাসক্ত   ত্যাগে ব্যক্ত   নমস্তে ॥
সত্যনিষ্ঠ   নিত্য ইষ্ট-   হৃদে তিষ্ঠ   নমস্তে।
চিরারাধ্য   সদাসাধ্য   পাদপদ্মে   নমস্তে ॥
সিংহাসনে   মহাবনে   রক্ষো-রণে   নমস্তে।
নরোত্তমে   মনোরমে   সমদমে   নমস্তে ॥
নেত্রপত্র   কৃপা যত্র   স্নেহসত্রে   নমস্তে।
হনু-সেব   নরদেব   জিষ্ণু এব   নমস্তে ॥

নামামৃত-পানে প্রীত যে অমৃতলাল।
রামোদয় তিথি হয় তার বয়ঃকাল ॥
সে সম্বন্ধে প্রেমানন্দে ছন্দোবন্ধে বন্দন।
যোড়হস্তে নতমস্তে ন্যস্তে বসু-নন্দন ॥

শ্রীক্ষুদিরামের গয়াগমন ও দিব্যদর্শনলাভ

এইরূপে যায় দিন, পূজাকার্য্যে যাজ্য তিন,
রঘুবীর রামেশ্বর শুভদা শীতলা।
গৃহে নাহি ধন-রোগ, দেহ-মনে সুখযোগ,
ক্ষুধার তাড়না আর না করে উতলা ॥
হিন্দুর গৃহস্থ-ঘরে, পরিবারমধ্যে ধ'রে,
বাস্তদেবে সেবে ভেবে সুশীল সন্তান।
না(ও)য়ারে খা(ও)য়ায়ে তাঁরে, ভোগ দিয়া তুষ্ট করে,
অচিন্ত্য সন্তোষ-সুখ গৃহিণীরা পান ॥
শিলা কি পিতল নয়, সেটি শুধু মনোময়,
ক্ষুধা পায় নিদ্রা যায় দুঃখে দুঃখী সদা।
কি খাবে স্বপনে বলে, অভিমান বেলা হ'লে,
আলো ক'রে রহে ঘর বরদ বরদা ॥
আত্মার আনন্দ ঝরে, প্রতিমাদি সৃষ্টি করে,
কি তার এ কবিতার বুঝে সেই জন।
আপন প্রাণের টানে, ছবিতে যে প্রাণ আনে,
ভালবাসা করে ভোগ রূপ-রূপান্তরে।
পিতা মাতা সখা সখী, পতি পত্নী চকাচকী,
পুত্র কন্যা প্রভু ভাবে রসায় অন্তরে ॥
এ বিশ্বের রাজা নয়, প্রসাদী উপাধিময়,
নিতে ঢেলে দিতে জেলে যণ্ড দণ্ডধর।
নিশ্বাসেতে বিশ্বেশ্বর, ঘন দলে অনশ্বর,
সূর্য্যকরে বায়ুভরে ব্যোমে দামোদর ॥
ভিন্নাকারে একাকার, সে কারণে নিরাকার,
এ নয়ন মন কিন্তু তা'তে তৃপ্ত নয়।
ঘন ক'রে তাই শূন্য. রচনা করি যে চিহ্ন,
ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন যথা যে সময় ॥
যে আসে আকুল ডাকে, হৃদয়-মাঝারে থাকে,
ঘটে পটে প্রবেশিতে কিবা বাধা তাঁর।
ভক্ত-মনে উদ্দীপন, আদ্যে পদ্যে প্রয়োজন,
মূর্ত্তিতে কি স্তব-গীতে সে পন্থ প্রচার ॥
ভাবের আনন্দ-ঘরে, লুকোচুরি নাহি ক'রে,
খ'টি' ক'রে থাক ধ'রে অভীষ্টে আপন।
যেই ভাবে ক্ষুদিরাম, হৃদে জপি রাম নাম,
রঘুবীরে ভক্তি-নীরে রেখেছে গোপন ॥
সে ভাবে স্বভাব দিশি, ধৌত মন দিবানিশি,
নগ্নপদে জীর্ণ ছদে ঋষি অভিধান।
পায়েতে পথের ধূলি, লোকে লয় শিরে তুলি,
কোথা কে কুবের ধনে পায় এ সন্ধান ॥
ইন্দ্রাণী যে চন্দ্রমণি, করুণা স্নেহের খনি,
জননী সবার তিনি গাঁ-খানি সংসার।
যার ঘোঁটা ঠেকে দায়, ডাক দিলে মা'কে পায়,
খা(ও)য়াতে শোয়াতে নিতে পোয়াতির ভার ॥

গাঁ-টি জোড়া ছেলে-মেয়ে, দরদে আদর পেয়ে,
খেয়ে যেত তাঁর বাড়ী যখন তখন।
যত করে আবদার, মুখে নাই দাব তাঁর,
পেতো ছেলে মুড়ি-গুড় কখন মাখন॥
দিতে যার আছে চাড়, শূন্য নয় তার ভাঁড়,
কিছু বাড় চাল তা'র আছেই ভাঁড়ারে।
দোয়ারে দাঁড়ালে যেই, বলে আজ দিতে নেই,
তার ঘরে কথা নেই "নেই নেই" ছাড়া রে॥
ঠাকুরঘরের ভোগ, ভিখারীর জলযোগ,
জোগাড় বিহানে চাই গিন্নী-বান্নি জানে।

* * * * *

আরন্ধের কচুশাক, পোষেতে পিঠের জাঁক,
অঘ্রাণে নবান্ন-গন্ধে চন্দ্রমণি-ঘরে।
পড়শীরা পাতে পাত, বাদ নেই কোনো জাত,
হরিলুটে ছেলে জুটে উঠানে না ধরে॥
মধুর কথার ফাঁদে, কাঙাল জাঙাল বাঁধে,
ঝিঙে ভেজে বলে না যে ভেজেছি পটল।

* * *

সবে মানে দেখি তার সাহস অটল॥
স্নেহের সাধনাবলে, চন্দ্রা-হৃদি-পদ্মদলে,
উথলে উঠিল ক্রমে পূর্ণ মাতৃভাব।
ছুটিল স্নেহের বন্যা, সারা গ্রাম পুত্র-কন্যা,
ধন্যা তিনি ক'রে এই ভালবাসা লাভ॥
কে খেলে কে অনাহার, সব যেন তাঁর ভার,
পাড়া ঘুরে বার বার তত্ত্ব লন তার।
উপবাসী যারে দেখে, নিজ অন্ন দেন ডেকে,
চিঁড়ে মুড়ি মুখে দিয়ে দিন কাটে মা'র॥
রঘুবীর শিলাবর, বাণলিঙ্গ রামেশ্বর,
শীতলা পুতলী আর দূরে দূরে নয়।
মন পুরো পরিষ্কার, ভয়ে ভয়ে নমস্কার,
নাহি আর যোড় হাতে মুখের বিনয়॥
গর্ভের সন্তানে, দেবে, কিছু নাহি ভিন্ন ভেবে,
ঠাকুরঘরের সেবা করে চন্দ্রমণি।
রঘু যে রামকুমার, বাণলিঙ্গ রামেশ্বর,
শীতলা সমান ভাবে কন্যা কাত্যায়নী॥

নহে বরদাতা ইষ্ট, তিলেক ত্রুটিতে রুষ্ট,
আরতি পূজার তরে মিছে মন্ত্র ঝাড়া।
একেবারে দেহময়, কথা শোনে কথা কয়,
কখনো বা শিষ্ট-শান্ত কখনো বেয়াড়া॥
শুন গো গৃহস্থগণ, এই ভাবে গড় মন,
একেবারে নারায়ণে কর গো আপন।
দেখ তাঁরে দিয়ে রূপ, ভাবিয়ে ভবের ভূপ,
পেতে দাও বসিবারে হৃদি-সিংহাসন॥
সত্য ডাকো বাবা বোলে, মা বোলে বোসো গে কোলে,
ছেলে-মেয়ে মনে ক'রে নাওয়াও খাওয়াও।
প্রেমে না থাকিলে খাদ, লও স্বামি-সুখাস্বাদ,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে চোখেতে চাওয়াও॥
ঘুমুতে ঘুমুতে জেগে, চন্দ্রাদেবী যেতো বেগে,
দেখিতে ঠাকুর ক'টি কেমন ঘুমায়।
ভয় হোতো ভাবনায়, পাছে মশা লাগে গায়,
এমনি আপন সে গো ভাবিত ভূমায়॥
হুতাশে পড়শী কয়, এ কথা তো ভাল নয়,
লেগেছে বাতাস বুঝি ব্রাহ্মণীর গায়।
এ বয়সে এত ছিরি, কোথা থেকে এল ফিরি,
উচক্কা উচক্কা মন ইতি-উতি চায়॥
এক দিন পতিপাশে, বসি দেবী ভয়ে ভাষে,
এ কি দশা এ বয়সে হোলো গো আমার।
তুমি সেই গয়া যেতে, শেষে শুয়ে এক রেতে,
অধর্য্য হইনু দেখে আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
দুয়ারেতে খিল আঁটা, কা'র এ বুকের পাটা,
শুয়ে আছে সুপুরুষ মোর বিছানায়।
ছাঁৎ ক'রে ওঠে গা'টা সমস্ত শরীরে কাঁটা,
চোখ বুজে চেয়ে দেখি খাড়া হয়ে ঠায়॥
তেমনি দুয়ার বন্ধ, মানুষের নাই গন্ধ,
ধূপের সুগন্ধে শুধু আনন্দের ঢেউ।
আর দিন মনে পড়ে, দিব্যি এক হাঁসে চ'ড়ে,
রোদে ঘুরে মুখখানি রাঙা যেন কেউ॥
দেখে মনে হোলো মায়া, বলি তাহে অই ছায়া,
নেমে এসে বোসো হেথা হাঁসের ঠাকুর।
ঘরে দু'টি পান্তা আছে, খেয়ে-দেয়ে যেও পাছে,
হেসে সে মিলালো কিসে, বুক গুর-গুর॥

আশ্চর্য্য সবার চেয়ে, বলি খুলে লাজ খেয়ে,
দাঁড়ায়ে পাড়ার অই শিবের তলায়।
ধনি সাথে কথা কই, মনে নেই এই বই,
হঠাৎ হোলেম আমি ভীতু উতলায়॥
ফিরে দেখি এ কি ভালো, মন্দিরে সিন্দূরে আলো,
বাবার অঙ্গেতে যেন জ্যোতি বিভূতির!
সে জ্যোতি বাতাসে ছুলে, আসে ভেসে ঢেউ তুলে,
হেরে ডরে হোলো মোর শরীর অথির॥
কামার-ঝিয়েরে ডেকে, থামকা থমকে থেকে,
বোধ হোলো করে যেন উদরে প্রবেশ।
চক্ষে দেখি লক্ষ তারা, পড়িনু চৈতন্যহারা,
মনে নেই কতক্ষণ ছিল এ আবেশ॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, ও চরণ তীর্থভূমি,
সতীর সুহৃদ্ গতি পতি এ ধরায়।
জ্ঞান যদি কিছু তথ্য, আমারে বুঝাও সত্য,
দেব কিবা উপদেব ভয়েতে ভরায়॥

শুনে বার্ত্তা, ভাবে ভর্ত্তা, ঘোচে কর্ত্তা অভিমান।
শ্রাদ্ধ-রাত্রে, গয়াক্ষেত্রে, স্বপ্ননেত্রে বিগ্যমান॥
কমকান্ত, শ্যামশান্ত, ভ্রান্তিধ্বান্ত বিনাশন।
সুধাধর, গদাধর, পদ্ম-পর দরশন॥
পীতবাসে, মিষ্টহাসে, স্পষ্টভাষে প্রত্যাদেশ।
সুপ্রত্যক্ষ, কর লক্ষ্য, হিরণ্যাক্ষ হৃষীকেশ॥
পুত্রভাবে, মোরে পাবে, দুঃখ যাবে দ্বিজবর।
শুদ্ধ শয্যা, কার্য্যে আর্য্যা, তব ভার্য্যা ধৈর্য্য ধর॥
পর-দুঃখী, পূত কুক্ষি, সতী লক্ষ্মী চন্দ্রমণি।
রাম সেবে, কৃষ্ণ ভেবে, হবে এবে মা জননী॥
আজি ঐক্য, দেববাক্য, পত্নী পক্ষ সাক্ষ্য সনে।
জাগে ভয়, ভক্তি বয়, হর্ষোদয় দ্বিজ-মনে॥
কহে ধীরে, ব্রাহ্মণীরে, অশ্রুনীরে বুক ভাসে।
দিব্যদান, এ সন্তান, ভগবান্ গর্ভবাসে॥
অযোধ্যায়, মথুরায়, ধরি কায় যে উদয়।
সে অচ্যুত, গুণযুত, তব সুত পুনঃ হয়॥
ধর্ম্মে ধৈর্য্যে, ব্রহ্মচর্য্যে, এ ঐশ্বর্য্যে স্নেহে রক্ষ।
এই শুদ্ধি, এই সিদ্ধি, এই ঋদ্ধি এই মোক্ষ॥

কম্পিত দম্পতি-হৃদি সম্ভ্রমে বিস্ময়ে।
অন্ধ-মনে বাধে দ্বন্দ্ব সন্দেহে প্রত্যয়ে॥

যুগলে চলেন ত্রস্ত বস্ত্র দিয়া গলে।
নিবেদিতে শুভবার্ত্তা রঘু-পদতলে॥
প্রণমি, চমকি চেয়ে দিব্য দরশন।
চর্ম্মচক্ষে ধর্ম্মমর্ম্ম স্পষ্ট পরশন॥
নাহি ঘট নাহি শিলা লীলা চমৎকার।
এক দেহে রামকৃষ্ণ মূর্ত্ত অবতার॥
নবদূর্ব্বা হরিদাভা অর্দ্ধ অঙ্গ শোভে।
তমালপর্ণের বর্ণে অর্দ্ধ মন লোভে॥
শিরোপা আরোপ বামে দক্ষে শিখিপাখা
এক চক্ষে লক্ষ্য স্থির অন্য আঁখি বাঁকা॥
শ্রীমুখমণ্ডল খণ্ডে ভূপাল গোপাল।
এক ধারে দেখে যেই করেছে কপাল॥
বাম বক্ষে মণি-মুক্তা কিরণ ঠিকরে।
দক্ষিণে বনজ ফুল শোভে থরে থরে॥
এক করে ধনু ধরে অন্য করে বাঁশী।
সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গ তোলে করুণার রাশি॥
তাপিত-তারণ যুগল চরণ-তটে।
সুরাসুর মুনিঋষি নর-নারী লোটে॥
কোথায় গিয়াছে স্তব কোথা বা প্রণাম।
ইষ্ট-স্নেহে মোহাবিষ্ট দু'টি দেহধাম॥
নিরোধ ইন্দ্রিয়বৃন্দ আনন্দ-সমাধি।
দম্পতির ভাবে নাই জীবের উপাধি॥
স্মরি গুরু গিরিশের পদ-অরবিন্দ।
সভায় অমৃত গাঁথে এ গীতগোবিন্দ॥

আবির্ভাব

তোমার জনম-কথা করিয়া শ্রবণ।
মানসে উচ্ছ্বাসে যেই ভাব-প্রস্রবণ॥
আনন্দ-আননা দেবী জননী সারদা।
করে ধ'রে লেখাবেন যেটুকু বরদা॥
সেই কয় ছত্র মাত্র র'চে দিব পদ্যে।
ততোধিক কিছু নাই এ দাসের সাধ্যে॥
দিন যায় পক্ষ যায় ক্রমে যায় মাস।
আসন্ন প্রসব-চিহ্ন দেহে সুপ্রকাশ॥
গতি অতি সুমন্থর অঙ্গেতে অলস।
স্নেহ-ক্ষীর-ভারে পূর্ণ হৃদয়-কলস॥

ভোগ রাঁধে আর কাঁদে দেবী চন্দ্রমণি।
কার হাতে খাবে ভাবে মোর রঘুমণি॥
ভাঙ খায় ভালবাসে দুধ রামেশ্বর।
যত্ন ক'রে এক দিন কে পাড়াবে সর॥
শীতলা উতলা মেয়ে বড় অভিমান।
সময়ে খা(ও)য়াবে কেবা কে করাবে স্নান॥
প্রবোধ-বচনে পতি বুঝান জায়ায়।
যার কাজ সেই করে ভুলিছ মায়ায়॥
আজিকার মত তুমি রেঁধে দাও ভোগ।
কালি হ'তে হয়ে যাবে অন্য যোগাযোগ॥
ধনমণি কামারিণী সব কাজে শক্ত।
বিশেষতঃ তোমার সে অতিশয় ভক্ত॥
তারে ডেকে বোলে দেব শুতে হেথা রাতে।
সামালিবে সেই হোলে ব্যথা অকস্মাতে॥
কামারের ঝি রে অ বেটী কামারের ঝি।
পা দু'খানা দে রে আমি সেই পায়ে লুটি॥
সেই পায়ে লুটি আর ভাবি ভাগ্যবান্।
ভগবান্ নিজে দেন তোরে যোগ্য মান॥
জাতাজাত ভাত পাত চটিতে বিচার।
মন্দিরে ব্রাহ্মণ সেই শুদ্ধ মন যার॥
চণ্ডাল গুহকে দেন রামচন্দ্র কোল।
গোয়ালার গোঠে গিয়ে কৃষ্ণ ঘোঁটে ঘোল॥
যবনে আপন জ্ঞান করেন নিমাই।
নীচে উচ্চ করে হরি জগত-গোঁসাই॥
সৃষ্টির ইষ্টেরে তুমি করাবে ভূমিষ্ঠ।
এ শিরে চরণ রাখি ক্ষণ তরে তিষ্ঠ॥

সাঙ্গ বঙ্গে শীত-যাগ, মিলোলো মাঘের দাগ,
নব অনুরাগে হাসি আসিল ফাগুন।
দখিণা পবন ঘ্রাণে, নবীন ভুবন প্রাণে,
বসন্ত সান্ত্বনা আনে জীবন্ত দ্বিগুণ॥
সজিনাফুলের থোবা; শিমুলে আমূল শোভা,
মালঞ্চে প্রফুল্ল জবা করবী বকুল।
এই মাসে তিত মিঠে, নিমেতে হেমের ছিটে,
ভিটের উঠানে ফোটে কৃষ্ণকলি ফুল॥
আমের মুকুল ধরে, ইক্ষুরস বাসে ভরে,
নেবুতে নূতন পাতা, কচি কচি ফল।
শসায় হাসায় ভুঁই; কাঁকুড় ফুটিয়া থুই,
নিটোল পটোল-ঝোল জিভে আসে জল॥
আঙিনাতে মনোহারী, সোনার মন্দির সারি,
ধানের মরাই রূপে করে ঝলমল।
গৃহস্থের বাস্তু গণ্য, সঞ্চিত সুখের অন্ন,
লক্ষ্মী-পদতলে যেন স্বর্ণ-শত-দল॥
কোয়েল-দোয়েল-কুল, ঝাঁকে ঝাঁকে বুল্-বুল্,
পাপিয়া-শালিখ-টিয়া-ফিঙা-টুনটুনি।
পাথার ঝলক ঝাঁকে, মধুর মধুর ডাকে,
মউমাছি-ভোমরার শুনি গুন্-গুনি॥
বসন্ত-বাতাস লাগে, যোগিনী-নাগিনী-যাগে,
হেমন্তের অন্তে তার সমাধি যে ভঙ্গ।
মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ভজে পুজে ভুজে যষ্টি,
প্রতিবেশিভাবে বঙ্গ নাগ-বাঘ সঙ্গ॥
হেন ফুল্ল পল্লীগ্রাম, বঙ্গজনপ্রাণারাম,
উদয় সদয় ঋতু ধরিত্রী অমল।
ফাগুন ছ'দিন গণে, রবি রহে কুম্ভ সনে,
জাতক-পাতকহারী দয়ালু সবল॥
অসিত পক্ষের শেষ, চাঁদের দ্বিতীয়া বেশ,
বসেছে তারার হাট ধরা আলো-করা।
ভুমেতে ঘুমের ঘোর এখনো হয় নি ভোর,
জাগিছে যামিনী শ্যামা নীলাম্বরী পরা॥
বুধের বাসর যায়, লক্ষ্মীবার অপেক্ষায়,
তন্দ্রা ত্যাগে চন্দ্রমণি জাগে বেদনায়।
সতত সজাগ ধনি, আসন্ন প্রসব গণি,
কেশবে এ ভবে আনে ক্ষিপ্র শুশ্রূষায়॥
ধরি দেহ থিরে থিরে, শুতাইয়ে প্রসূতিরে,
প্রভাতের অতিথিরে দেখিতে না পায়।
ঝটিতি প্রদীপ হাতে, খোঁজে ধনি নবজাতে,
কোণেতে উনুন ছিল সেই বাগে যায়॥
সে উনুনে বাসি ছাই, তা'র মাঝে দেখে ধাই,
ভস্ম-মাখা প'ড়ে আছে ন্যাংটা ভোলানাথ।

* * * *

ছ'পলের ছেলে যেন, ছ'মাসের বাছা হেন,
'থ' হয়ে রহিয়া ক্ষণ কোলে তোলে ধনি।

যশোমতী-কোলে হায়, দোলে যেন পুনরায়,
ভূতলে অতুল শোভা গোকুলের মণি ॥
সেবারে গোয়ালাঘর, কামারপুকুরে ভর,
এবারে ঠাকুর করে জন্মি ঢেঁকিশালে।
বিশ্বকর্ম্মা ধর নাম, তুমি সর্ব্বকর্ম্মধাম,
অতন্দ্র তোমার কর্ম্ম অর্জ্জুনে শেখালে ॥
কর্ম্মফল কুড়াইতে, জীব-জ্বালা জুড়াইতে,
বারে বারে দেহাধারে এস নারায়ণ।
নর-গোত্রে হয় ধর্ম্ম, লোকহিত মাত্র কর্ম্ম,
রটায়ে ইহার মর্ম্ম ফুটাও নয়ন ॥
এ কানন রচে কালী, নর-নারী সাজে মালী,
প্রভু নিজে বনমালী ফল অধিকারী।
যে মালী না গুঁজে রেখে, ফল দেয় তাঁরে ডেকে,
পড়ে না কর্ম্মের পাকে সেই আজ্ঞাকারী ॥
গৃহস্থের বাস্তুভূমে, কাল যে কাটায় ঘুমে,
যমে তা'রে ধরে ত্বরা, ঘর জ্ব'লে যায়।
জীবনধারণ জন্য, প্রয়োজন নিত্য অন্ন,
ধান ভেনে ঢেঁকি, লোকে সে অন্ন যোগায় ॥
পুণ্যবস্ত ঢেঁকিশালে, লক্ষ্মী নিজে ধান্য ঢালে,
রান্নাঘরে অন্নপূর্ণো উনুনের ধারে।
যে সংসারে চর্কা ঢেঁকি, সেখানে চলে না মেকি,
ভাঁড়ারে পাড়ার সুখ, ভিখারী দুয়ারে ॥
শাশুড়ী ঝিউড়ি বউ, বুকে সুখ মুখে মউ,
ঢেঁকি পাড়ে হাঁড়ি নাড়ে চরকা ঘুরোয়।
তার বাড়ী বস্তি মানা, গা'য়ে উঠে সোনাদানা,
স্বামীর সোহাগ পায় কপাল ফিরোয় ॥
অলস বিলাস আসি, শাক্তদেশে শক্তি নাশি',
বিষয়-আসক্তি পৃথ্বী করিছে শাসন।
ধ্যান জ্ঞান গ্রন্থপৃষ্ঠা, স্বার্থ তরে অর্থ-তৃষ্ণা,
নিষ্ঠা নাই চেষ্টা নাই, ইষ্ট অন্বেষণ ॥
তর্কে কথা কাটাকাটি, ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি,
মত নিয়ে পথ নিয়ে সতত লড়াই।
নাহি প্রেম নাহি ভক্তি, খোঁজে খালি রক্তারক্তি,
আদি ছেড়ে উপাধি বা বিধির বড়াই ॥
পুত্র-কন্যা করে পাপ, জ্বালায় পোড়ায় তাপ,
বাজে তা বাপের প্রাণে করুণা-আধার।

বিশ্বরাজরাজেশ্বর, ধ'রে নরকলেবর,
আসেন ধরাতে তাই ঘুচাতে আঁধার ॥
কভু জন্ম রাজাগারে, কভু রুদ্ধ কারাগারে,
কর্ম্ম শুদ্ধ ঢেঁকিশালে এবার উদয়।
ঢেঁকির মুখেতে ছিন্ন, তুষ হ'তে চা'ল ভিন্ন,
খোসোন্মুক্ত ভক্তি-শস্য দেবে দয়াময় ॥
বঙ্গের উনুনে ছাই, দেখিয়া দুর্দ্দশা তাই,
সে ছাই গদাই ধেয়ে মাখে নিজ অঙ্গে।
কর্ম্ম-ধর্ম্মী কর্ম্মকার, বুঝি বা ঝিয়ারী তার,
কোলে তুলে নিতে পেলে তাই লীলারঙ্গে ॥
ছ' পলের ছেলে যেন, ছ' মাসের ছেলে হেন,
আঁতুড়ে-ও অতি বড় গূঢ় বিশ্বম্ভর।
শিশুমুখে দিতে মধু, দেখা দিল উষা-বধূ,
অরুণ ভূষায় হোলো রক্তিম অম্বর ॥
এত ভোরে বাজে শাঁক, বুঝিল মঙ্গল-ডাক,
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়শীরা দেখা দিল আসি।
বিধবা বেণের মেয়ে, প্রসন্ন আসিল ধেয়ে,
সঙ্গে এল গঙ্গামণি মঙ্গলার মাসী ॥
রমণী বাম্‌নী জয়া, দাক্ষায়ণী লক্ষ্মী দয়া,
মায়াবতী ক্ষেতি নিতি পুণি মনোরমা।
খসা-খোঁপা দল্‌মল্‌, ঝন্‌ঝন্‌ বাজে মল,
বিমলা কমলা এল ক্ষীরো নিরুপমা ॥
আঁটিতে আঁটিতে কসি, ঝটিতি আসিল ষশি,
মিসি মুখে সুখী আসে কলসী-কাঁকালে ॥

* * *

আঁচলেতে জল-পান মুখে এক থাবা।
পুঁটি লুটি জটি এল হরি হেরো হাবা ॥
চক্ষু মেলে দেখে ছেলে কোরে নিরীক্ষণ।
গিন্নীরা বলেন পুণ্যে সব সুলক্ষণ ॥
অদূরে বধূর দল কলকল রবে।
ছাঁয়ের মঙ্গল মাগে মায়ের গৌরবে ॥
হায় রে সে গ্রাম কোথা সরল স্বভাব।
দলাদলি ভুলে সেই গলাগলি ভাব ॥
বামুন জ্যাঠার ব্যাটা (হয়) বেণে-বাড়ী ঘটা।
কলুমাসী খুশী দেখে দুলে-বো'র ছটা ॥

দিয়েছে শাঁখের ডাক গাঁটিকে জানান্।
বেলা না বাড়িতে লোক জুটিল নানান্॥
সব কর্ম্ম ফেলে আসে ধর্ম্মদাস লাহা।
গোবর্দ্ধন ধোপা আসে জনার্দ্দন শাহা॥
শঙ্কর নাপিত আসে কিঙ্কর ঘোষাল।
দধি হাতে যাদু গোপ ছাড়িয়ে গো-পাল॥
আনন্দেতে বিষ্ণানন্দ বন্ধ কোরে টোল।
মুচিপাড়া নাচিয়ে দে ডেকে আনে ঢোল॥
সুন্দুরে সে বাজুন্দুরে নিয়ে নিজ দল।
গোকুল ভাবিয়ে করে বাকুল দগল॥
"দেখা গো মা যশোমতী তোর নীলমণি।"
গান ধরে এই বোলে ঢোলে তালে ধ্বনি॥
বাজনা বেজেছে গাঁয়ে পাঠশাল ছুটী।
নেচে বাঁচে পোড়োগুলো হেসে লুটোপুটি॥
টাকাটা সিকিটা পেয়ে দুয়ানি আধুলি।
বাঁশী কাঁসি মিলে বাজে তাল রাখে ঢুলী॥
পায় কড়ি খই-মুড়ি পুরানো কাপড়।
"দে দই দে দই" গানে বাঁধাই রগড়॥
পাঁচ দিন নাচগান বাজনা প্রভাতে।
কীর্ত্তন মৃদঙ্গ-রঙ্গ প্রতি সন্ধ্যা-রাতে॥
ষষ্ঠ দিনে হৃষ্ট মনে মিষ্ট বিতরণ।
ষেঠেরা পূজার আজি হয় আয়োজন॥

শ্রীশ্রীষেঠেরাপূজা

ছ'দিনে ষেঠেরা-পূজা ব্যাটার কল্যাণে।
ব্রাহ্মণে সম্মান দিতে মাল্য আদি আনে॥
পিতৃদেব তুষ্ট-মন পূজি রঘুবীর।
প্রতিবেশী নারী করে মায়েরে অস্থির॥
যথারীতি হোল তবে গ্রাম্য-আয়োজন।
ষষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা যারে অগ্রে প্রয়োজন॥
তৈজস চন্দনমাল্যে ব্রাহ্মণ-বন্দন।
সবে বলে ভাগ্যধর হউক নন্দন॥
মধ্যরাত্রি গত হয় নিদ্রিতা প্রসূতি।
প্রবেশে সূতিকা-ঘরে বিভুর বিভূতি॥
পোয়াতিরে তাপ দিতে কাঠের আগুন।
আগুনে করেছে ঘর গরম দ্বিগুণ॥

তাপ-ঝালে এককালে গৃহস্থের ঝির।
খট্‌খটে হোয়ে যেত প্রসূত শরীর॥
শ্লেষ্মাযুক্ত রক্ত এবে করিতে গরম।
নবীনা সেবন করে পানীয় পরম॥
শিশি শিশি ফাঁসী আসে খালি খোলো ছিপি।
এও জেনো কর্ম্মফল এও বিধি-লিপি॥
তন্দ্রাগতা চন্দ্রাদেবী, ধনি ঘুমে ঘোর।
মিটমিট জ্বলে দীপ প্রবেশে কে চোর॥
অগোচরে এই চোর ভাগ্য ভাঙ্গে গড়ে।
কোঠা-বাড়ী টোটে কারো সোনা মোড়ে খড়ে।
ইনি দেন পুত্র কোলে ইনি নেন কেড়ে।
এঁরি হাতে ভাঙে শাঁখা, শাড়ী রাঙা-পেড়ে॥
বিধাতা তুমিই দাতা তুমিই ডাকাত।
তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত॥
কলম চালাতে যদি জাতকের ভালে।
আজি রাতে পার তবে বুঝিব সকালে॥
সোনার পুতুলী শিশু হৃষ্ট-পুষ্ট কায়।
কোলের গরমে খোকা আরামে ঘুমায়॥
অভ্যাসে বিশ্বাস লিপি লিখিবে সোজায়।
খোকা বুঝি বোকা কোরে ডাকায় রোজায়॥
পলক-বিহীন নেত্রে জাতকে নেহারে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া কিছু বুঝিবারে নারে॥
শিশুরে হেরিয়া হন বিধাতা বিপন্ন।
জীবে-শিবে মেশা এক চিন্ময় চৈতন্য॥
ভাগ্যলিপি লিখিবারে মুছেন কপাল।
খল্‌খল্ হাসে পাশে ব্রজের গোপাল॥
হাস্যধ্বনি শুনি গুণী চারিভিতে চান।
শ্যাম আড়ে রাম নড়ে দেখিবারে পান॥
ভৌতিক ভাবিয়া ধাতা কালি নিয়ে থাকে।
অবাক্ হইয়া বুকে "কালী কালী" ডাকে॥
"কালী" নাম যেতে কানে শিশু জ্ঞানহারা।
শঙ্কায় ওঙ্কার জপে বিধি বলে তারা॥
তারা নামে ধারা বহে শিশুর নয়নে।
তোলে যেন ডানি হাত রহিয়া শয়নে॥
করতলে পদ্মদল হেরি মনে হয়।
বিধিরে দিতেছে বুঝি এ নিধি অভয়॥

দক্ষিণে ফিরালে শির শ্যামারূপ ধরে।
উত্তরে সম্বরে পুনঃ ধাতা হেরে হরে॥
পূর্ব্বেতে অপূর্ব্ব রূপ শ্যাম নটবর।
পশ্চিমে অসীম শোভা শ্রীরাম গোচর॥
সর্ব্বদেবসমন্বিত উন্নত আধার।
বিধাতা বুঝেন ভবে নব অবতার॥
ঈষৎ হাসেন বিধি নিজে অপ্রতিভ।
ধরায় জ্বলিল হেরি মঙ্গল-প্রদীপ॥
আনন্দে বিহ্বল আত্মা মুখে জয় জয়।
ভারতে হইল পুনঃ নব অভ্যুদয়॥
তুমি কর্ম্ম কর্ম্ম-স্রষ্টা কর্ম্মের আশ্রয়।
কর্ম্মের নিয়ন্তা ধর্ম্ম তুমি গুণত্রয়॥
জীবের যা পাপ-পুণ্য আদি কর্ম্মফল।
তোমাতে অর্পিত হোলে দেহ পদতল॥
সর্ব্বদেব সর্ব্বভাব তোমাতে প্রকাশ।
বিলাতে অভেদ-জ্ঞান এসেছ শ্রীবাস॥
তোমারি সন্তান নর জগত জুড়িয়া।
বুদ্ধি-দোষে ধর্ম্ম-দ্বেষে জ্বলিছে পুড়িয়া॥
যত মত তত পথ লক্ষ্য এক স্থান।
আসিলে সমাজে দিতে সহজ এ জ্ঞান॥
বাক্যই তোমার বেদ, বেদে তা প্রমাণ।
দূরে দেবে বিদ্যাগর্ব্ব তর্ক অভিমান॥
প্রণতি তোমার পদে মঙ্গল-নিদান।
আজ্ঞা দেহ বিধিরূপে করি এ বিধান॥
দেখিলাম রামকৃষ্ণ তোমাতে উভয়।
রামকৃষ্ণ নাম দিবে জীবেরে অভয়॥
পরমা প্রকৃতি মাতা জগত-ঈশ্বরী।
না রবেন বহু দিন সন্তানে বিস্মরি॥
"রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়া"।
কর্ত্তা কাছে কর্ম্মস্থলে আসিবেন ক্রিয়া॥
কবে বা কোথায় মাতা রবে অবতরি।
আপনি জানহ তুমি সে কথা শ্রীহরি॥
রেথ পায় নিশি যায় এখন বিদায়।
বোলে বিধি অন্তর্ধান শিশুটি ঘুমায়॥
নটের ষেঠেরা-গীতে যেবা ত্রুটি হয়।
ভক্ত-মুখে উক্ত হোক জয় জয় জয়॥

আটকৌড়ি

আট দিনে আটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো।
হুড়ো-হুড়ি গোল, পোয়াতির কোল আলো॥
গাঁয়ের ছেলের পাল উঠোনেতে জড়।
পিটিতে পিটিতে কুলো কচ্ছে মজা বড়॥
আটভাজা ভেজে দেছে পাঁচ এয়ো জুটে।
আঁচড়-কামড় তা' কোঁচড়ে নিতে লুটে॥
ছড়াছড়ি খই-মুড়ি কড়ি কি পয়সা।
নেতা কুড়ো ক্ষেতা কুড়ো কুড়ো রে মনসা॥
আনন্দ-মন্দিরে ছিল চাঁচের আগড়।
বাঙলায় ছিল তায় রঙিলা রগড়॥
সোনার কুলুপ-চাবি সুখের কপাটে।
হাসির ভাসান বঙ্গে মশান সুনাটে॥
পড়শীর সুখে সুখী পড়শী সম্বন্ধে।
বঁড়শী বিন্ধয়ে এবে বন্ধুর আনন্দে॥
চাটুর্য্যেরে পূজ্য ভাবে কামারপুকুর।
চন্দ্রমণি সনে তিনি জীয়ন্ত ঠাকুর॥
দেবদেবী বটে তবু রোগে করে সেবা।
এ হেন ঠাকুরে ভালবাসে নাহি কেবা॥
প্রসূতির পথ্য নিত্য আনে সত্যবতী।
নেড়ি আনে চিঁড়ে ভেজে ঝাল-নাড়ু মতি॥
সদ্য গব্যঘৃত আনে কৃত্তিকা বোষ্টুমী।
রোহিণী দুষ্টুমি ক'রে বোলে আজ অষ্টুমী॥
অষ্টুমীতে ঘৃত খেলে কষ্ট পায় ধাই।
ধনির 'সে' ছিল এঁর ঠাকুরজামাই॥
পল্লীর মল্লিকা-ফুল যৌবন-যৌতুকে।
সেবিকা সংসারধর্ম্মে রসিকা কৌতুকে॥
পাকশালে পরিপাটী কাঠি দেয় ডালে।
বাসরে হাসিয়া ঢলে গানে মধু ঢালে॥
সরিষার তেলে চুল ঝোলে জানু-মূলে।
বেসনে ঘষিলে কেশ ঢেউ তোলে ফুলে॥
হলুদ দুধের সরে কচি কচি মুখ।
গতরেতে পাছু নয় তাই উঁচু বুক॥
অধরে মাধুরীমাখা মুড়ি খেয়ে হেসে।
কাঁকাল করেছে সরু কলসীর ঠেসে॥

এলো-চুলে ঢেঁকি তুলে চরণের চাপে।
চলনে দোলন আসে ললন-কলাপে ॥
মানানো মণিকানন হেলে হার ছন্দে।
সীঁথিতে সিন্দুর্‌বিন্দু সিন্দুজ মণিবন্ধে ॥
চাহনি তরল করে সরসীর জল।
কোমল বিমল মন পরশি কমল ॥
কোয়েল দোয়েল স্বরে ভরে দুটি কান।
কথা কয় মনে হয় গীতের সমান ॥
পল্লীর কাননে ফোটে হেন বনফুল।
বাগানে বাহার নয় এর সমতুল ॥
এ ফুল পূজায় চলে কুলজা সাজায়।
মাথা নত কোরে দেয় লজ্জায় রাজায় ॥
এই ফুলদল মিলি মনোলোভা গন্ধে।
প্রসূতিরে নিতি নিতি ভাসায় আনন্দে ॥
আঁতুড় উঠিল শেষ একুশ দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা মিষ্ট ভুজা বাঁটিয়া রভসে ॥
গয়াক্ষেত্রে স্বপ্ন-রাত্র স্মরি ক্ষুদিরাম।
গদাই বলিয়া ডেকে রাখে পুত্র-নাম ॥
গোকুলে কানাই ছিলে নদেতে নিমাই।
কামারপুকুরে নাম হইল গদাই ॥
জনম সফল হোলো অমৃতের অগ্ন।
নরলীলারম্ভ-ছলে রচি এই পদ্য ॥

শিশু গদাই

সেকালে স্বজন ছিল সত্য অন্তরঙ্গ।
এক পরিবারে যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ॥
বাহ্য শোভা নহে তত্ত্ব সংসারে সাহায্য।
গ্রহণীয় গৃহকার্য্যে ব্যাভারে আহার্য্য ॥
ফিরে লও ইট-কাঠ দেরাজ সিন্দুক।
রঙিন সিপাই দোরে সঙিন্ বন্দুক ॥
ফিরে লও ধন-গর্ব্ব কাগজের গাদি।
চাঁদি জমা রাজকোষে রসিদ ইসাদি ॥
কাজ নাই গাড়ী-ঘোড়া খোঁড়ার মোটর।
চাকুরীতে খোঁটা বাঁধা কোঠার কোটর ॥

নগরের প্রেমশূন্য বসতি ঘুচাও।
সঙ সাজা রঙ মাজা মুখটি মুছাও ॥
যত আনি তত নাই খালি চাই চাই।
খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি নাই মেটে না ত খাঁই ॥
প্রশংসার লোভে এই জিঘাংসার পূজা।
বন্ধ কর নিরানন্দ দেবী দশভুজা ॥
আমার সবুজ গ্রাম ফিরায়ে আবার।
দাও মা আমারে দু'টি শ্রমের খাবার ॥
দাও মা উলুর চালা শক্ত তক্তপোষ।
জীর্ণ করি' যব-চূর্ণ পূর্ণ পরিতোষ ॥
আবার সে ক্ষেতে যেতে কৃষাণের সঙ্গে।
নেচে যেন ওঠে মন হর্ষের তরঙ্গে ॥
গাছে হাত দিলে যেন মিলে দুটো ফল।
রান্নার আনাজে ভরে গিন্নীর আঁচল ॥
মরাই দেখি মা যেন লক্ষ্মীর মন্দির।
সুপত্র গোয়াল-গাত্রে স্বাস্থ্যের সন্ধির ॥
পুকুরেতে আঁশ ভাসে পাড়ে বাঁশ-ঝাড়।
ঘরেতে রক্ষিত ইক্ষু খেজুরের খাঁড় ॥
প্রতিবেশী প্রয়োজনে হাত দিলে গাছে।
ঠ্যাঙ্গা ধোরে তাড়া কোরে ছেলেরা না নাচে
অতিথি-কুটুম্ব দেখে দোর নহে বন্ধ।
মেয়েদের মুখে যেন দেখি মা আনন্দ ॥
চাহি না ঐশ্বর্য্য ধন মোগল রাজার।
হোগ্‌লার কুঁড়ে হোক্ আনন্দবাজার ॥
বাড়ীতে পীঁড়িতে বর, পাড়া পড়ে ঝেঁকে।
খুকীর অসুখ হোলে উঁকি মেরে ছাখে ॥
ভাগ্যমানী চন্দ্রমণি আজি যে আনন্দে।
সে আনন্দ হোক্ পুনঃ জীবনের গন্ধে ॥
খোকাকে মাথাতে তিতু তেল আনে প'ড়ে।
রোদেতে পোয়াতে ছাতু পীঁড়ি দেয় গ'ড়ে ॥
জোলাদের ভোলা দেছে দড়ী বুনে দোলা।
পাখী দেছে মালী-বউ রঙ কোরে শোলা ॥
তিনখানি কাঁথা দেছে তিনটি পড়শী।
বালিস বানিয়ে আনে বেণেনী ষোড়শী ॥
খাটো-খোটো মশারিটি সুসারের তরে।
পীয়ারি তৈয়ার করে বোসে বোসে ঘরে ॥

বলাই দোকান থেকে দিয়েছে দোলাই।
রাম রাম বোলে কয় দাম নিতে নাই॥
মুচিমাসী হেসে দেছে খেলেনার ঢোল।
কাহন বাহন গাঁয়ে পেতে আছে কোল॥
সোনার পুতুলী শিশু আছে কত ঘরে।
তাদেরো আদর হয় গাঁয়ের ভিতরে॥
এ কি শিশু জন্ম নিল দীন দ্বিজবাসে।
প্রাণ ধোরে টান দিয়ে নিকটে নি' আসে॥
প্রসন্ন ধনীর কন্যা মান্যা সব ঠাঁই।
নিতি নিতি আসে রামা নাহিক কামাই॥
সুধাইলে চন্দ্রমণি, বলে হাসি হাসি।
জাদু জানে ছেলে তোর গলে দেছে ফাঁসী॥
সে কি চায় গয়া কাশী পুরী বৃন্দাবন।
এ ফাঁসী কোরেছে যারে আনন্দে মগন॥
প্রণাম সে গ্রামবাসি-পদ-অরবিন্দে।
হাড়ী-মুচি-ডোমে নমি হয় হবে নিন্দে॥
যেই পুণ্যে ধন্য তবে কামারপুকুর।
ভাগ্যফলে হোলে তথা পথের কুকুর॥
পশুজন্ম হোতো বোধ কাম্য দেবতার।
উচ্ছিষ্টে হইত মিষ্ট স্বোয়াদ সুধার॥
পোড়ে পোড়ে জুড়াতাম হেরে মুখ-চাঁদা।
রাজার রেজাই ছেড়ে ঠাঁই ছাইগাদা॥
বোঝাতেম সোজাসুজি কোরে ঘেউ ঘেউ।
কুকুরের বুকে ওঠে পুকুরের ঢেউ॥
অধম কুকুর হোতে পরিচয় নর।
শ্রদ্ধাশুদ্ধি-হীন পশু বুদ্ধিতে বানর॥
শুদ্ধা ভক্তি দেহ হৃদে অটল বিশ্বাস।
রামকৃষ্ণ বোলে ফেলি অন্তিম-নিশ্বাস॥

বাল্যখেলা

ঘুমায় মায়ের কোলে, দড়ীর দোলায় দোলে,
বাপের বুকের তাপ জুড়ায় গদাই।
ছোট ছুটি হাত তুলে, উঠানে টলিয়া বুলে,
আধ-আধ মিঠা বোলে হাসে সে সদাই॥
অঙ্গছাঁদে চাঁদ-গলা, দিনে দিনে বাড়ে কলা,
খেলাচ্ছলে লীলারঙ্গ জন-মনোহর।
পঞ্চমীর সুধাকর, সদানন্দ গদাধর,
শিশুরা সাজায় তাঁরে রাজ রাজেশ্বর॥
সত্ত তুলে পদ্মপত্র, কেহ শিরে ধরে ছত্র,
বন-ঝাউ এনে কেউ চামর ঢুলায়।
সাথীরা কৌতুক-কাজে, ভরত-লক্ষ্মণ সাজে,
হনুমান্ অনুমানে লুটায় ধুলায়॥
কোনো দিন কুতূহলে, ছুটে সবে গোঠে চলে,
ধড়া কোরে ধুতি পোরে সাজিয়ে রাখাল।
গদাই ধায় যে আগে, ভিতে তনু অনুরাগে,
চূড়ায় দোলায় ফুল হেলায় কাঁকাল॥
হাতে মুখে মারে থাবা, গাল বাজে আবা-আবা,
মণ্ডলী করিয়া নাচে কর-ধরাধরি।
আর সে গদাই নাই, নাচে নাচে রে কানাই,
তালি বাজে করতলে 'রাধে-রাধে' করি॥
বুঝি বা রচেছে মন, আবার সে বৃন্দাবন,
শ্রীদাম সুদাম সাথে গোঠে গোচারণ।
তপন-তনয়া-তটে, নীপমূলে বংশীবটে,
মধুর অধরপুটে বাঁশরী-ধারণ॥
এ কালে লীলার ছন্দে, প্রেম নয় গোপী-গন্ধে,
আনন্দ-দায়িনী নারী জননী এবার।
নহে কুঞ্জে অভিসার, শ্যামার চরণ সার,
মালতীর মালা নয় আদর জবার॥
জয় রাধে, রাধে রাধে, রসনা ভাষে না সাধে,
নয়নে শ্রাবণধারা মা মা মা মা রবে।
শুনি শ্যামা-নামগান, পুলকে পুরিবে কান,
বাহ্যজ্ঞান হারা হবে নবলীলা ভবে॥
যুগে যুগে প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন,
ভজন পূজন ভিন্ন লীলায় লীলায়।
কভু ধনুর্ধারী বীর, বিরাজ সরযূতীর,
পতিতা-তারণ দিয়ে চরণ শিলায়॥
যমুনা-পুলিনে পুন, বাঁশরী-বাজন শুন,
গোপী-প্রেমে উতরোল গোলোকবিহারী।
জ্ঞানপথ শাস্ত্র শুদ্ধ, রাজভোগ ত্যজি বুদ্ধ,
অহিংসা-বারণ হরি নয়নে নেহারি॥

বৌদ্ধ নষ্ট বুদ্ধিভ্রমে, আস্তিকতা অস্ত ক্রমে,
প্রকাশ শঙ্কররূপে সঙ্কটে তারিতে।
শিব শিব শিব নাম, ধরে পুনঃ ধরাধাম,
সন্ন্যাস-আশ্রম সৃষ্টি অনিষ্ট বারিতে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে, প্রেমে নাম বিলাবারে,
ভাসে আঁখি জলধারে দ্বারে দ্বারে কাঁদে।
এক অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ, সুস্পষ্ট নয়নে দৃষ্ট,
ধন্য হেরি লোকারণ্য শ্রীচৈতন্যচাঁদে ॥
গ্রন্থ-গত বিদ্যাগর্ব্ব, এবার করিতে খর্ব্ব,
উদ্ভব অপূর্ব্ব নব ভাবের আধার।
অরুচি অক্ষরে শিক্ষা, চক্ষের স্বাক্ষরে দীক্ষা,
তিতিক্ষা মতের দ্বন্দ্বে বাক্য সুধাধার ॥
ভাবে মাত্র রাখ শুচি, যার যাহা অভিরুচি,
সেই নামে একেশ্বরে কর উপাসনা।
তিনি ব্রহ্ম নিরাকার, শিব-শিরে জটাভার,
তিনি রাম তিনি শ্যাম কেশরি-আসনা ॥
তিনি আল্লা তিনি যীশু, নন্দের নন্দন শিশু,
কংসের সংহারে বীর কুঞ্জে বংশীধর।
দানব-দলনী কালী, বৃন্দাবনে বনমালী,
পিতা মাতা সখা স্বামী তিনি নারী নর ॥
সহজ মানুষ-বেশ, সহজ এ উপদেশ,
সহজ সকল কার্য্য ব্যাভার আচার।
বিভূতিবিহীন বাহ্য, অন্তরে শান্তির রাজ্য,
শৈশব হইতে সুরু সত্যের বিচার ॥
নরলীলা অভিনয়, করিবেন জ্ঞানময়,
হাতেখড়ি পাততাড়ি বাল্যে প্রয়োজন।
কিসে কিবা হয় দোষ, কিসে বা সন্তোষ রোষ,
ভাল-মন্দ আচরণ সুধায় কারণ ॥
কেবল শুনিয়া কানে, বিধি বাধা নাহি মানে,
প্রাণে না পৌঁছিলে কথা শুনে না বারণ।
যে ঘাটে মেয়েরা নায়, সেথায় ছেলেরা যায়,
জলে উলে হুড়োহুড়ি সাঁতার খেলায় ॥
সন্তান-সমান খেলে, তবু তারা ব্যাটাছেলে,
পরিতে ছাড়িতে শাড়ী নারী লজ্জা পায়।
প্রাচীনা পড়শীগণ, তাড়া দিয়ে হেঁকে কন,
এ ঘাটে ছোঁড়ারা কেন আসিস্ পোড়াতে ॥

কত দোষ না জানিস্, কিছু দেখি না মানিস্,
বড়-ই দুষ্টুমি বাড়ে দেখি যে গোড়াতে ॥
ভয়ে ভয়ে অন্য ছেলে, ভিন্ন ঘাটে গিয়ে খেলে,
ধমকে খামকা কিন্তু গদাই না ছাড়ে।
মনে মনে ইচ্ছা বাড়ে, লুকায়ে পুকুর-পাড়ে,
দেখে নেব কি বা ঘটে থেকে আড়ে আড়ে ॥
শুকদেব সম মন, এ বালক নারায়ণ,
নর-নারী-ভেদ-বুদ্ধি শুদ্ধ চিত্তে নাই।
হৃদে নাহি কোনো সন্দ, চোখে নাহি বিঁধে মন্দ,
মেয়েদের এ প্রবন্ধ মিথ্যা ভাবে তাই ॥
ঘটেছে বা কি বালাই, ভয়েতে তো না পালাই,
ভুলায়ে ওগুলো করে আসিতে বারণ।
জননী বৃত্তান্ত শুনি, লোক-লজ্জা-ভয় গুণি,
নিভৃতে ডাকিয়া পুত্রে বুঝান কারণ ॥
স্নেহে শিরে রেখে কর, বলে শোন গদাধর,
তোর দেহে বটে কোন ঘটে না অনিষ্ট।
কিন্তু যারা করে স্নান, তাঁরা এতে লজ্জা পান,
নারী-অপমান নহে আচরণ শিষ্ট ॥
আমি তোর মা যেমন, মেয়ে মাত্র যে তেমন,
সকল রমণী জেনো মায়ের সমান।
বলেন বদন চুমি, সবার সন্তান তুমি,
মেয়েদের অপমানে মা'র অপমান ॥
উপদেশ মাতৃদত্ত, সহজে বুঝায় তত্ত্ব,
সুপথ্য-সমান জ্ঞান প্রবেশে শ্রবণে।
তদবধি গদাধারী, মাতৃভাবে হেরে নারী,
আজীবন ব্রহ্মচারী এ ভাবপ্রবণে ॥
আবাল্য সারল্য সার, ভাবময় অবতার,
শৈশবে ভাবের ভরে হৃদি যায় গ'লে।
আকাশে বকের ঝাঁক, দেখে শিশু হয় তাক,
সহজ স্বাধীন ভাসে জলধর-তলে ॥
পাইয়া মুক্তির ঘ্রাণ, উড়ে যায় নিজপ্রা[illegible]
অজ্ঞান লুটায় মাঠে হাসি সুধাধরে।
গ্রাম্য মাসী পিসী দিদি, বলে কি করিল বি[illegible],
সযতনে কোলে তুলে ফিরে আনে ঘরে ॥
তারা বলে ডাকো রোজা, এ ভূত নহে তো সো[illegible],
বাছারে করেছে ভর আচম্‌কা বাতাসে।

সৃষ্টি যাঁর পঞ্চভূত, তাঁরে ধরে কোন্ ভূত,
অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবি মনে মনে হাসে ॥

বাল্যশিক্ষা

পূজা-কার্য্য-অবকাশে, পুত্রেরে বসায়ে পাশে,
যতনে শিখান পিতা বংশ-পরিচয় ।
পিতৃ-মাতৃকুলাগত, গুরুজন-নাম যত,
পূর্ব্বেতে কোথায় কার আছিল আলয় ॥
শিক্ষা দেন সদাচার, ব্রাহ্মণের ব্যবহার,
বিনয়ে সর্ব্বত্র জয় বুঝান বালকে ।
জগদ্ধিতায় সংস্কার, নারায়ণে নমস্কার,
করে লোকে অই বাক্যে জ্ঞানের আলোকে ॥
পরহিত-পরায়ণ, সে ব্রাহ্মণ নারায়ণ,
জাগালে মানব-মনে জাগে নারায়ণ ।
বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থে, ত্রাণ যেই করে আর্ত্তে,
ব্যর্থ নহে হয় তার মানব-জীবন ॥
মুখে মুখে শুনে রব, শিখে শিশু কত স্তব,
কত স্তুতি কত শ্লোক ধ্যান বা প্রণাম ।
কাশীদাস কৃত্তিবাস, অভ্যাসে শ্রীমুখে বাস,
যাত্রাগান শুনে পালা বলে অবিরাম ॥
দেখিয়া এ মেধা-শক্তি, পুণ্য বাণীপানে ভক্তি,
সুপণ্ডিত হবে পুত্র, পিতৃ-মনে আশ ।
শুভ তিথি করি ধার্য্য, সারি হাতে-খড়ি কার্য্য,
পাঠাইলা পাঠশালে যদু-গুরু-পাশ ॥
চূড়াবাঁধা ঘন কেশ, ধরিয়া পড়ুয়া-বেশ,
কাঁকে রাখে পাততাড়ি হাতেতে দোয়াত ।
কোঁচড়েতে জলপান, গদাই লিখিতে যান,
সঙ্গে সঙ্গে চলে দলে কতই স্যাঙাত ॥
লিখেন বানান ফলা, আঙ্ক আঙ্ক নিয়ে শলা,
লিখিলেন ডাক-বলা দাঁড়াইয়ে সারে ।
কড়াঙ্কে বাধায় গোল, গণ্ডাকেতে ধরে চোল,
আম্‌তা আম্‌তা করে নাম্‌তার ধারে ॥
মনে-মনে ভাবে ছেলে, কি হবে এ পড়া পেলে,
চাল-কলা বাঁধা হন্দ হিসাব শিখিয়ে ।
মিছা এই পাঠ পড়া, বাসনা দুরাশা গড়া,
চাই না এমন বিদ্যা এ মন বিকিয়ে ॥
প্রহ্লাদ আহ্লাদে গলে, ভিজে দুটি আঁখি জলে,
যে বিদ্যা শিখিল ভাবি কৃষ্ণ-পদতল ।
যে বিদ্যায় জন্মে জ্ঞান, বৃথা ধন-অভিমান,
কাঞ্চন-সঞ্চয়ে সুখে বঞ্চনা কেবল ॥
খন্তায়ে পুঁথির পৃষ্ঠা, বাড়ে মাত্র অর্থ-তৃষ্ণা,
লোভে আসে হিংসা দ্বেষ ক্ষোভের আকর ।
প্রভুভাবে করে নৃত্য, আদেশ বহিছে ভৃত্য,
ভুলে যায় ভৃত্য-পালে হইয়া চাকর ॥
নিজ হোতে ধনবান্, দেখে বুকে বিঁধে বাণ,
যত বাড়ে পরিমাণ ততই অভাব ।
যে বিদ্যা করিলে লাভ, জাগে মনে উচ্চ ভাব,
তুচ্ছ জ্ঞান হয় চক্ষে নৃপতি নবাব ॥
সে বিদ্যার সংখ্যা "এক", "এক" বলে চেয়ে দ্যাখ,
কোটি কোটি কোটি রূপে "একেরই" বিকাশ ।
একে মাত্র রেখে চোখ, সংসারে চলিলে লোক,
সে "এক" করিবে ভাবে অভাব বিনাশ ॥
জীব-জন্মে এই দেহ, মায়ার আধার গেহ,
বিষয়-বাষ্পেতে খেলে আলেয়ার আলো ।
ঈশ্বরের অবতার, দেহে নহে মায়াপার,
বাহ্য কার্য্যে চেনা তাঁরে নাহি যায় ভালো ॥
অন্তর তথাপি দীপ্ত, বিষয়ে না হয় লিপ্ত,
বিশ্বের মঙ্গল-দীপ মাটীর আধারে ।
শৈশবেতে সে আলোকে, আপনারে দেখে চোখে,
মাঝে মাঝে চেনো চেনো করে বারে-বারে ॥
বুঝেন আনন্দময়, আনন্দ বন্ধনে নয়,
লৌকিক এ বিদ্যা শুধু অবিদ্যা-বন্ধন ।
কলে চলে এই শিক্ষা, ফল, ছলে অন্ন ভিক্ষা,
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য্যে রন্ধন ॥
যথায় আনন্দ পান, গদাই সন্ধানে যান,
দেখেন আনন্দ-ভরা বিশ্বের রচন ।
কি আনন্দ নীলাম্বরে, শুভ্র অভ্রে সুধাকরে,
আনন্দ নক্ষত্র-ক্ষেত্র জগত-লোচন ॥
আনন্দ বাতাসে বয়, আনন্দ কাননময়,
আনন্দে সরসী-জল করে ঢল-ঢল ।

তাতে খেলে মীনচয়, হেলা-ফুল ফুটে রয়,
শরতে মরত আলো করে শতদল ॥
আনন্দে পতঙ্গ ওড়ে, পাখী গায় ঝাড়ে-ঝোঁড়ে,
ফল-ফুল-গন্ধে কিবা আনন্দ-বিহার।
আনন্দে বিজলী ঝলে, হরষে বরষা-জলে,
আনন্দে ঝরিয়া পড়ে নিশির নীহার ॥
আনন্দে কৃষক মাঠে, দলে-দলে ধান কাটে,
আনন্দে গা-চাটাচাটি করে বৎস-গাভী।
জগতে নূতন লাট, আপন রচনা পাঠ,
আনন্দে করেন ঘুরে নিজে পদ্মনাভি ॥
যিনি বিশ্ব-শিল্পকর, তিনি যান শিল্পি-ঘর,
প্রতিমা পুতুল পট শিখেন গড়িতে।
যাত্রা শুনে সাধ হয়, অনুরাগে অভিনয়,
মন শুধু নাহি লয় বাঁধা-ধরা পড়িতে ॥
আপনার শিক্ষা নাই, শিশুরে শিখাতে চাই,
পর-বাক্য চুরি করি গুরু অভিমান।
কেবল শিখেছি বাক্য, কিছুই করিনি লক্ষ্য,
চক্ষে বক্ষে ঐক্য নয় অক্ষরেতে জ্ঞান ॥
বই পোড়ে হয়ে গণ্য, বোলে দিই তন্ন তন্ন,
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্নার কৌশল।
আপনি উনুন জেলে, হাঁড়ি কেঁড়ে চাল ঢেলে,
হাতে কোরে ভাতে-ভাত রাঁধিনি আসল ॥
সৃষ্ট যাঁর এই দেহ, আলো করিবারে গেহ,
জ্ঞানের প্রদীপ জেলে রেখেছেন তিনি।
প্রত্যক্ষ চক্ষের পর, স্পষ্ট তাঁর হস্তাক্ষর,
নিরীক্ষণ করিলেই নিতে পারি চিনি ॥
দেখ বুঝে পরিষ্কার, যত কিছু আবিষ্কার,
কার মনে জাগায়েছে পুঁথি-গত বিদ্যা।
ঢেঁকি কুলো থেকে কল, বাষ্প কি বিজলী বল,
শিখায়ে দেছেন সে প্রকৃতি সর্ব্বসিদ্ধা ॥
সকল গ্রন্থের আর্য্য, মানব-মানস কার্য্য,
চরিত্র-বৈচিত্র্য গড়া অবস্থার ভেদে।
এই নর-নারায়ণ, কেন সাধু চোর হন,
চিন্তায় সিদ্ধান্ত নহে বিজ্ঞানে কি বেদে ॥
অবিদ্যারে বিদ্যা বলি, দম্ভে দাপে দলাদলি,
আপনারে স্বামী জ্ঞানে "আমি-বুদ্ধি" সৃষ্টি।
না বুঝিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব, কামনা-নেশায় মত্ত,
জগতের পতি পায় নাহি যায় দৃষ্টি ॥
এ জগত বিদ্যালয়, গুরু বিভু জ্ঞানময়,
নিলে তাঁর পদাশ্রয় পাই দিব্যজ্ঞান।
গ্রন্থ-গত গদ্য পদ্য, সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ,
নদী কি বারিধি যথা আছে পরিমাণ ॥
অনন্ত নির্ঝরপ্রায়, জ্ঞান-ধারা বহে ধায়,
লুটে সেই লোটে যেই গিরিধারি-পায়।
এই মন ক'রে যোগ, করে যে ঈশ্বর ভোগ,
ভাস্বর জ্ঞানের নেত্র তার খুলে যায় ॥
সূর্য্যস্তোত্র কবি গায়, কি কবিতা সবিতায়,
চন্দ্র আদি গ্রহ তারা কাব্যগাথা যাঁর।
সে কবির দয়া হ'লে, অক্ষরান্ধ ছন্দ বলে,
রসনায় গলে তার শব্দ-সুধা-ধার ॥
শিল্পের কৌশলে যিনি, আকর্ষণ মন্ত্রে জিনি,
ব্রহ্মাণ্ড রাখেন শূন্যে করি দুল্যমান।
তিনি না প্রেরণা দিলে, কার সাধ্য এ অখিলে,
আবিষ্কার করে কল পড়িয়া বিজ্ঞান ॥
চিত্রকর লিখে পট, অভিনয় ক'রে নট,
নৃত্য গীত বাদ্য সাধ্য করে কলাবান্।
আঁকে যেই রামধনু, বিশ্বরূপ যাঁর তনু,
সেই বেণুধর জানি সবে বিদ্যমান ॥
বাল্যের চাপল্য-মাঝে, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য রাজে,
কাজে কিম্বা সাজে বুঝি বৈরাগ্য-বিকাশ।
আপন আপন ভাবে, ভিন্ন জনে ভিন্ন ভাবে,
কারো চোখে অপরূপ কাহারো তরাস ॥

তত্ত্বলাভ

কামারপুকুর হ'তে দণ্ডড়ের দূর।
বাঁধা পথ সেথা যেতে জগন্নাথপুর ॥
সতত সন্ন্যাসী সাধু সে সরণী ধ'রে।
শ্রীধাম তীর্থেতে যান দরশন তরে ॥
মহাপ্রাণ লাহাগণ সে রাহার পরে।
বিশ্রাম-আশ্রম রচে অতিথির তরে ॥

গদাই সদাই চায় সাধুসন্ত-সঙ্গ।
অন্তরে তাঁদের শিশু জানে অন্তরঙ্গ॥
শুনিলে সাধুর মেলা অতিথিশালায়।
খেলা ফেলে ভোলা ছেলে সেথায় পালায়॥

অন্ন অন্ন কোরে ভিক্ষা বিদ্যার চরম।
গরম কাঞ্চন-সন্ধি না চিনে পরম॥
না প'ড়ে এ বিদ্যা পায় শৃগাল-কুকুর।
তাদেরো আবাস আছে আহার প্রচুর॥

দেবকান্ত শান্ত শিশু
আনন্দ-আধার।
আধ-আধ মধু ভাষ
বটু ব্যবহার॥
তীর্থে তীর্থে সন্ন্যাসীরা
করে পর্য্যটন।
গিরি নদী বনে হেরে
বিচিত্র ঘটন॥
বালক পুলকে শোনে
তার বিবরণ।
কোথায় কেমন লোক
কিবা আচরণ॥
দুগ্ধের দুলাল শোনে
মুগ্ধ হয়ে বোসে।
উন্নতি কি গুণে কোথা
পতন কি দোষে॥
পুরাণের গল্প শোনে
শ্লোক দোঁহাবলী।
শ্রুতিমাত্র স্মৃতিগত
শ্রীমুখে কাকলী॥
সুধাইলে সূক্ষ্মতত্ত্ব
ধর্ম্মের বিজ্ঞানে।
বিস্ময়ে সাধুরা চান
শিশু-মুখ-পানে॥
কেহ কেহ ভাবে শিশু
নহে সাধারণ।
"কারণ" জিজ্ঞাসে নিজে
জগত-কারণ॥
সত্যের সন্ধানে মন
বন্ধনে বিরাগ।
জন্ম-জন্ম করিয়াছে
যেন যোগ-যাগ॥

কুকুর করয়ে যদি
চাকুরী স্বীকার।
প্রভু-প্রেমে গলে তার
দোলে হেম-হার॥

প্রভুর দুয়ারে এসে
দাঁড়াইলে কেউ।
প্রভুত্ব জানায় সে-ও
কোরে ঘেউ ঘেউ॥

ঈশ্বরের অভিরূপ
এই নরকায়।
কামিনী-কাঞ্চন-লোভে
কাদায় লুটায়॥

জগত-পিতার সাথে
যাহার সংযোগ।
মর্ম্ম ফাটে দেখি তার
ঘটে চর্ম্মরোগ॥

রাজধর্ম্ম শিখে রাম
বসি বনবাসে।
বীরকর্ম্মে কপি-সঙ্গ
রাবণ-বিনাশে॥

কৃষ্ণের আরম্ভ বিদ্যা
গোচারণ মাঠে।
প্রেমের প্রথম পাঠ
যমুনার ঘাটে॥

সিদ্ধার্থ অরণ্যে যান
জ্ঞান-অন্বেষণে।
করেন বুদ্ধত্বলাভ
দৈন্যের আসনে॥

মাতৃমূর্ত্তি

চিন্তা করি ত্যাগপন্থী শান্ত সাধুগণ।
শুনান জ্ঞানের কথা হয়ে একমন॥
আঙ্ক আঙ্ক নিয়ে গুরু থাক এক কোণে।
তোমার নামতা রাখ রাম তা কি শোনে॥
যে দক্ষপ্রত্যক্ষ শিক্ষা লন গদাধর।
কবে পাবে ধরাধামে সে শিক্ষা আদর॥
মাংসপিণ্ডমধ্যে জ্বলে ক্ষুধা অগ্নিকুণ্ড।
লালায়িত লেলিহান সদা লোভ-শুণ্ড॥

জীষাস্ জগত-পূজ্য না পড়িয়া বই।
"বিশ্বাস" "আশ্বাস" দুই ক্রসে লেখা সই॥
চৈতন্য করিয়া লাভ শ্রীশচী-নন্দন।
ভাগীরথী-জলে দেন ফেলে ব্যাকরণ॥
জগতের জ্ঞান-গুরু আচার্য্য সকল।
পুরাতন জ্ঞান কিনে করেনি নকল॥
প্রেরণা পেয়েছে প্রাণে, নহে গ্রন্থ-পাঠে।
আবিষ্কার-কর্ত্তা সব বিজ্ঞানের রাঠে॥

অমৃত-স্মৃতি

সপ্তসপ্ততি বর্ষ বয়সে বসুবংশের প্রতিষ্ঠা, রঙ্গভূমির গৌরব, বঙ্গমাতার বিশিষ্ট সম্পদ, সুরসিক, সহৃদয় অমৃতলাল অমৃতলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। মনে পড়িতেছে, এই সে দিন লেখককে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার আমার আর কিছু দিন বাঁচা দরকার। বাঁচিবার বাসনা তাঁহার ছিল। কিন্তু মৃত্যুভীত তিনি ছিলেন না। যে ভাবে ব্যঙ্গ-রঙ্গের সহিত হাসিমুখে তিনি মহাপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। চরম সময়েও সেই সুরসিক অমৃতলাল, কিন্তু অভিনেতা নয়। কোন যুবকের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া কয়েক ব্যক্তি বলিতেছিলেন, বড় আক্ষেপের বিষয়। অমৃতলাল বলিলেন, আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু কার পক্ষে? রসরাজের মৃত্যুতে আজ তাঁহারই উক্তি স্মরণ হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু কার? তাঁর না আমাদের?

শ্রদ্ধেয় গুপ্তকবি এবং ইন্দ্রনাথের পর পথিভ্রষ্ট সমাজের উপর এরূপ তীব্র অথচ বিদ্বেষবিহীন কশা-প্রয়োগ করিতে অমৃতলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা ক্ষত-স্থানের উপর তিনি এরূপ নিপুণভাবে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতেন যে, তাহাতে আদৌ অস্বস্তি বা যন্ত্রণা হইত না। যে আসরে দেখিয়াছি, হাসির লহরে লোক লুটোপুটি খাইতেছে, সেইখানেই চোখে পড়িয়াছে, গুড়্‌গুড়ি বা গড়গড়ার নল হাতে রসরাজ বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপলক্ষও সেই আসরে বসিয়া (কাষ্ঠ হাসি নয়) প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে। এ যেন হাসিতে হাসিতে শর-সন্ধান এবং প্রসন্নচিত্তে স্মিতমুখে শিকারের আত্মদান। অমৃতলাল হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন এবং কিছু দিন চিকিৎসাও করিয়াছিলেন। এ চিকিৎসায় ত অস্ত্রচালনা নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি সমাজের বিস্ফোটকে তীক্ষ্ণধার শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছেন।

যাজ্ঞসেনীর অমর নাট্যকার অমৃতলাল

রসরাজের রস-রচনা বিচারের সময় এ নহে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার ইহাই উপযুক্ত কাল। আমার সে অভিজ্ঞতাও সামান্য। কেন না, তাঁহার সহিত পরিচয় দীর্ঘকালের হইলেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ খুব কমই হইয়াছে। বোধ হয়, পনের কুড়ি বারের বেশী নহে। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার উদার সহৃদয়তা ও অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি।

অমৃতলাল চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের মজলিসী লোকের একটি উচ্চতম আদর্শ চিরাস্তহিত হইল! ইংরাজীতে যাহাকে রেপার্টি (Repartee) বলে, তাহার প্রতিশব্দ বাঙ্গালাভাষায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সরস প্রত্যুত্তর-প্রদান এই শব্দটির লক্ষ্য। রসরাজের দক্ষতা ছিল ইহাতে অসীম। "তিল-তর্পণ" পঞ্চরং অভিনীত হইবার পর গিরিশচন্দ্র এক দিন হাসিতে হাসিতে রসরাজকে প্রশ্ন করেন, ক্যাঁচা, ভুনি (তাঁহার প্রসিদ্ধ ডাকনাম), তুই বিষ ছড়াতে পারিস, কেমন?

অমৃতলাল উত্তর দিলেন, মশাই, আমি বিষ কোথায় পাব? আপনার কাছ থেকে ধার ক'রে একটু আধটু ছড়াই।

কোন সময় কোন এক ব্যক্তি একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া ছাপিতে দিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রকে দেখাইতে আসেন। গিরিশ অপেরাখানি শুনিয়া বলিলেন, তুমি এতে সখী রাখ নি, নাচ হবে কেমন ক'রে?

অমৃতলাল তখন উপস্থিত ছিলেন। বলিলেন, নাচ হবে, মশাই!

কেমন ক'রে? সখী নেই, সখীর গান নেই।

অমৃত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তা না থাক্! যখন ছাপাখানার বিল্ আসবে, ওর বাপ ধেই ধেই ক'রে নাচবে।

এ সকল অনেক পূর্ব্বের কথা। বয়সের সঙ্গে তাঁহার রস যেমন গাঢ়, তেমনি মিষ্ট হইয়াছিল।

আমার অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া একথা-সেকথায় অমৃতলাল প্রশ্ন করিলেন, তুমি একাদশী কর?

আমি জানিতাম, অমৃতলাল এক জন বিশিষ্ট ভোজন-বিলাসী ছিলেন। উত্তর দিলাম, আমি করি না। আপনি করেন না কি?

হাঁ।

উপবাস?

ঝাঁপড়দহ 'ষষ্ঠীসদনে' মহাপূজায় অমৃতলাল (১৩৩২)

হাঁ।

বরাবর?

না। প্রথম প্রথম দু'একখানা লুচি খেতুম। ক্রমে দেখ্‌লুম, একাদশী লুচি-দশীতে দাঁড়িয়েছে। তখন থেকে দিনে আর কিছু খাই নি।

আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে। গিরিশচন্দ্রের "রাবণবধ" নাটকের প্রুফ আসিয়াছে। প্রথমেই 'গ্রেট' অক্ষরে ছাপা "রাবণবধ", নীচে "পাইকা" টাইপে "না ক"। "ট"—অক্ষরটি মুদ্রাযন্ত্র বেমালুম হজম করিয়াছে।

এ দিকে যে ব্যক্তি প্রুফ আনিয়াছিল, সে তাড়া করিতেছে, বাবু, থোড়া জল্‌দি দেখ্ দিজিয়ে।

অমৃতলাল বলিলেন, দাঁড়া বেটা, আগে তোর "নাক" কাটি।

অমৃতলাল হিন্দু ছিলেন। নৈষ্ঠিক না হইলেও প্রগাঢ় হিন্দুভাবাপন্ন। ভাণ, সাহেবিয়ানা ও কৃত্রিমতার উপর চির-বিরূপ। এই জন্য তিনি এই সকলের উপর তাঁহার

অক্ষুরন্ত তূণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত বাণ বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

রসরাজ একাধারে রচয়িতা ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার উচ্চারণে অতি সামান্য জড়তা ছিল। কিন্তু অভিনয়-চাতুর্য্যে তাহা ঢাকা পড়িত। লেখক যে যে ভূমিকায় তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছে, তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বেল্লিক-বাজারে "দোকড়ি সেন" ও অমৃতলালের খাসদখলে "নিতাই"এর ভূমিকাই উৎকৃষ্ট। বিশেষ "দোকড়ির" ভূমিকায় তাঁহার সাজ, স্বর, উক্তি, ভঙ্গী অনমুকরণীয়।

যতদূর স্মরণ হয়, দীনবন্ধুর "নীলদর্পণে" সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় রসরাজ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (ন্যাশন্যাল্ থিয়েটারে) প্রথম অবতীর্ণ হন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সৈরিন্ধ্রীকে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে হইবে। নারীসুলভ ক্রন্দন—শিক্ষাগুরু অর্দ্ধেন্দু। সে মড়া কান্নায় পাড়ায় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবে ভাবিয়া গুরু-শিষ্য উভয়েই স্থির করিলেন, বাগবাজারে নবীন সরকারের গলিতে একখানা পোড়ো বাড়ী আছে, সেইখানেই মহলা দেওয়া যাইবে। সেইরূপই হইল। স্তব্ধ রাত্রিতে এক দিন সহসা তথায় বামাকণ্ঠে উচ্চক্রন্দন-রোল উঠিল। অর্দ্ধেন্দুর চিরদিনের স্বভাব—যতক্ষণ না ভূমিকার শিক্ষা নিখুঁত হইত, ততক্ষণ ছাড়িতেন না। তিন-চারি দিন গত হইলে পাড়ায়, রাষ্ট্র হইল, ঐ পোড়ো বাড়ীতে দুইটি আশ্রয়-ভ্রষ্ট পেত্নী বাসা বাঁধিয়াছে! এত দিন ত এ উপদ্রব ছিল না! সন্ধ্যার পর আর কে সে দিক্ মাড়ায়, সে পথে চলে!

রসরাজের নাটক-প্রহসনরাজি প্রথম যে সালে অভিনীত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে যে সকল নাটকের যে যে ভূমিকায় প্রথম যে সালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

থিয়েটার	নাটক ও প্রহসন	ভূমিকা	খৃষ্টাব্দ
ন্যাশান্যাল—	নীলদর্পণ	সৈরিন্ধ্রী	১৮৭২
"	নবীনতপস্বিনী	বিজয়	১৮৭৩
"	নয়শো রূপেয়া	রঞ্জন	"
"	ভারতমাতা	ভারত-সন্তান	"
"	কৃষ্ণকুমারী	মদনিকা	"
"	কমলে কামিনী	বকেশ্বর	"
গ্রেট ন্যাশান্যাল্	কাম্যকানন	নায়ক	"
"	মোহান্তের অনুতাপ	এলোকেশীর বাপ	১৮৭৪
"	মৃণালিনী	দিগ্বিজয়	"
"	হীরকচূর্ণ (রসরাজ)	মিষ্টার স্কোবল্	১৮৭৫
"	চোরের উপর বাটপাড়ি (রসরাজ)	কর্ত্তা	"
"	কনক-পদ্ম	দুষ্মন্ত	"

থিয়েটার	নাটক ও প্রহসন	ভূমিকা	
গ্রেট ন্যাসান্যাল	সরোজিনী	বিজয়	১৮৭৫
"	সুরেন্দ্র-বিনোদিনী	ম্যাজিষ্ট্রেট	"
ন্যাশান্যাল	হামির	জাল (মন্ত্রী)	১৮৮০
"	আনন্দ রহো	মানসিংহ	১৮৮১
"	রাবণবধ	বিভীষণ	"
"	তিলতর্পণ (রসরাজ)	বাপ্পারাও	"
"	রামের বনবাস	ভরত	১৮৮২
"	সীতাহরণ	সুগ্রীব	"
"	ডিস্‌মিস্ (রসরাজ)	কৃষ্ণনাথ বাবু	"
ষ্টার	দক্ষযজ্ঞ	দধিচি	১৮৮৩
"	ধ্রুব-চরিত্র	বিদূষক	"
"	নল-দময়ন্তী	"	"
"	চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে (রসরাজ)	অনিশ্চিত	"
"	শ্রীবৎস-চিন্তা	বাতুল	১৮৮৪
"	চৈতন্যলীলা	প্রতিবেশী	"
"	বিবাহ-বিভ্রাট (রসরাজ)	মিষ্টার সিং	"
"	বুদ্ধদেবচরিত	শিষ্য ও গণক	১৮৮৫
"	বেল্লিক-বাজার	দোকড়ি সেন	১৮৮৬
"	রূপ-সনাতন	সুবুদ্ধি	১৮৮৭
"	নসীরাম	নসীরাম	১৮৮৮
"	প্রফুল্ল	রমেশ	১৮৮৯
"	তাজ্জব-ব্যাপার (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না	১৮৯০
"	চণ্ড	পূর্ণরাম ভাট	"
"	বাঙ্গারাম (রসরাজ)	কোন ভূমিকা ছিল না	"
"	তরুবালা (রসরাজ)	বেহারী খুড়ো	"
"	সম্মতি-সঙ্কট (রসরাজ)	কোন ভূমিকা ছিল না	১৮৯১
"	নরমেধ যজ্ঞ	মহানন্দ	"
"	বিদ্যাসাগর-বিলাপ (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না	"
"	রাজাবাহাদুর (রসরাজ)	মিষ্টার ফিস্	"
"	কালাপাণি (রসরাজ)	ভূমিকা নাই	১৮৯২
"	বিজয়-বসন্ত (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না	১৮৯[illegible]
"	বাবু (রসরাজ)	মামা	১৮৯[illegible]
"	চন্দ্রশেখর (রসরাজ)	বিভিন্ন ভূমিকায়	"
"	একাকার (রসরাজ)	"	"
"	রাজসিংহ (রসরাজ)	"	১৮৯৬
"	বৌমা (রসরাজ)	"	১৮৯৭
"	গ্রাম্য-বিভ্রাট (রসরাজ)	"	"
"	হরিশ্চন্দ্র (রসরাজ)	বিশ্বামিত্র	১৮৯৮
"	সাবাস আটাস (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না	১[illegible]
"	যাদুকরী (রসরাজ)	"	"
"	আদর্শ বন্ধু (রসরাজ)	"	১৯০০
"	কৃপণের ধন (রসরাজ)	"	"
"	অবতার (রসরাজ)	"	"
"	নব-জীবন (রসরাজ)	"	১৯০২
"	বাহবা বাতিক (রসরাজ)	"	১৯০৪
"	রাণা প্রতাপ	শক্তসিংহ	১৯০[illegible]

থিয়েটার	নাটক ও প্রহসন	ভূমিকা	খৃষ্টাব্দ
ষ্টার	সাবাস বাঙ্গালী (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না।	১৯০৫
"	খাসদখল (রসরাজ)	নিতাই	১৯১২
মিনার্ভা	নবযৌবন (রসরাজ)	বসন্তকুমার	১৯১৩
ষ্টার	ক্ষত্রবীর	ধৃতরাষ্ট্র	১৯১৪
"	বিরাজ বৌ	যদু	১৯১৮
মিনার্ভা	ব্যাপিকা-বিদায় (রসরাজ)	ভূমিকা ছিল না	১৯২৬
"	বন্দে মাতনম্ (রসরাজ)	"	"
ম্যাডাম থিয়েটার	কৃষ্ণকান্তের উইল (ছায়াচিত্র)	কৃষ্ণকান্ত	১৯২৬
মিত্র থিয়েটার	" (রসরাজ)	"	১৯২৬
মিনার্ভা	যাজ্ঞসেনী (রসরাজ)		১৯২৮
ম্যাডাম	বিবাহ-বিভ্রাট (রসরাজ) (ছায়াচিত্র)	গোপীনাথ	১৯২৯

"যাজ্ঞসেনী" রচনার কিঞ্চদধিক এক বৎসর পরে অমৃতলাল তাঁহার জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছেন।

হাস্যরস-রসিক হইলেও করুণ-রসে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। "সরলা", "চন্দ্রশেখর" প্রভৃতিতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর উপর যিনি রঙ্গালয়ে প্রভুত্ব করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির পরিমাপ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

সামাজিকতায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না! রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়।

রঙ্গালয় ও বিদ্যালয় উভয়ই লোক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। উভয় ক্ষেত্রেই অমৃতলাল শক্তিশালী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব এক দিকে যেমন রঙ্গমঞ্চে, অন্য দিকে তেমনি শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলে আত্মপরিচয় প্রদান করে। আজ যে এই বিদ্যালয় সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাঁহারই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও উদ্যমে। নিত্য সকালে ও বৈকালে এই বিদ্যালয়ই ছিল তাঁহার ভক্ত ও সুহৃদবৃন্দের সম্মিলন-স্থল।

উদার সহানুভূতি-সম্পন্ন অমৃতলাল কখন শ্লেষে, কখন পরিহাসে, কখন রঙ্গ-ব্যঙ্গে, কখন বিদ্রূপে রঙ্গালয় হইতে পথিভ্রষ্ট সমাজকে তাড়না করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কল্যাণ-কামনায়। তাঁহার হাতে শাণিত শর, অন্তরে বেদনা। এ যেন মুখে ভ্রূকুটি, চোখে জল।

রসরাজ লোকান্তরিত হইয়াছেন। সে তুষার-ধবল কেশ-কিরীট-মণ্ডিত উন্নত শির লক্ষজন-মাঝে আর লক্ষ্য হইবে না! সভায় সুহৃদ-সম্মিলনে আর তাঁহার সরল বাক্য শুনিতে পাইব না! চিরদিন রঙ্গ-রসে মাতাইয়া হাসাইয়া চরমে তিনি যে মর্ম্মভেদী হাহাকার তুলিয়া গেলেন, তাহাও তাঁহার হাস্য-রস-রচনার ন্যায় বিপুল ও বিশাল। শোক যায়, স্মৃতি থাকে। রসরাজের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, আছে কেবল তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি। বঙ্গবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে সে স্মৃতি সমাদরে পূজা লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য

আষাঢ় গগন ঘেরিল আঁধারে
ছাইল বঙ্গে বিষাদ-রোল,
চলে গেল এক সন্তান কৃতী
বঙ্গমাতার ত্যজিয়া কোল,
বঙ্গবাণীর ভক্ত সাধক
বঙ্গমাতার রত্নহার,
চ'লে গেল শেল হেনে সে যে আজ
ব্যথিত বক্ষে বঙ্গ মার।
সাত কোটি মার সন্তান-মাঝে
যাহারা জগতে শ্রেষ্ঠ মণি,
তারি মাঝে এক, "অমৃতলাল" যে
নাট্যাচার্য্য রসের খনি,
নট নাট্যকার খ্যাতি ছিল তার,
হাস্যরসিক সাহিত্যিক,
ছিল সদালাপী খাঁটী বাঙ্গালী সে
মূর্ত্ত বিগত যুগ-প্রতীক।

দুঃখ পেত তাই বাঙ্গালীর দুঃখে
গৌরবে হত মুখোজ্জ্বল,
প্রাণে প্রাণে তারে টানিত সদাই
বঙ্গপল্লী সুশ্যামল।
বিদেশীর অনুকরণের মোহ
ব্যথিত করিত তাহার প্রাণ,
দেশের সবারে বলিত চিনিতে
দেশের রত্ন দেশের ধান।
নাই আজি সেই দরদী বাঙ্গালী
নাই সে প্রবীণ রসিকরাজ,
সাধন-অন্তে লভিয়াছে স্থান
বাণী সন্তানগণের মাঝ।
থামিল হাস্যরসের উৎস
বঙ্গ-সাহিত্য-গগন হ'তে,
ঝলিল অস্ত-রবির দীপ্তি
অমরায় তাঁর যাত্রা-পথে।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ।

অমৃতলোকে অমৃতলাল *

এই ত সে দিন আজও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই, এই বিদ্যালয়ে আমরা 'অমৃতচক্রে' অমৃতলালের সপ্তসপ্ততিতম জন্মোৎসব করিয়াছি। সে দিন অমৃতলাল বলিয়াছিলেন, "এত দিন পরে আমার ৭৬ বৎসর বয়স হইতে আমার তরুণ বন্ধুরা কেন যে আমার জন্মোৎসব করতে আরম্ভ করেছে, তার একটা কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। যারা আমাকে ভালবাসে, তারা অনেক দিন থেকেই আমি মরলে একটা শোক-সভা করবো ব'লে স্থির ক'রে রেখেছে, অনেকে হয় ত শোকোচ্ছ্বাস লিখেও রেখেছে, আমার ৬০ বৎসর বয়স থেকে তারা ভাবছে, বুড়ো কবে মরবে। কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর অপেক্ষা ক'রেও তারা যখন দেখলে যে, আমি মরলাম না, তখন তারা আর থাকতে না পেরে আমার জন্মোৎসব করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।" সে দিন আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, সত্য সত্যই এত শীঘ্র আমাদিগকে শোক-সভার আয়োজন করিতে হইবে।

অমৃতচক্রে সচিব শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল

অমৃতলাল বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এক জন প্রতিভাশালী নট ও নাট্যকার, এক জন দরদী সমাজ-সংস্কারক, এক জন শক্তিমান্ সর্ব্বজনপ্রিয় বক্তা—এ কথা অনেকেই জানেন এবং এ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অমৃতলালের বহুমুখী প্রতিভা আরও কত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা

অমৃতলাল এক জন খুব বড় Educationist ছিলেন। রঙ্গালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই এই অতি পুরাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাল্যে তিনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে কিছু দিনের জন্য অবৈতনিকভাবে এখানে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন—এই সময়ে তাঁহার এক জন ছাত্র ছিলেন স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আর এক জন ছাত্র রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণিলাল বসু। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি এই শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন, পরে ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ঐ স্কুলের (তখন নাম ছিল শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল) সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই অমৃতলাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, বিদ্যালয়ের গচ্ছিত অর্থ ছাড়া আরও অর্থ সংগ্রহ করিয়া, প্রায় ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের উত্তর দিকের ত্রিতল অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করেন। এই সময় স্বর্গীয় পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক অমৃতলালের প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন। কিন্তু ইহাতে অমৃতলালের তৃপ্তি হইল না। এই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার জন্য অমৃতলালের হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু না আছে স্থান, না আছে অর্থ। অমৃতলাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রায় ৬১ হাজার টাকা সাহায্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সাধের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য স্থান সংগ্রহ করেন এবং এই প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে বাড়ীটা সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। উত্তর-কলিকাতায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব ছিল, তবুও অমৃতলালের উপর শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে, উত্তর-কলিকাতায় একটি আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা

* ৫ই শ্রাবণ শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের শোক-সভায় পঠিত।

অমৃতলালের হস্তে ৬১ হাজার টাকা দান করেন। অমৃতলাল জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। এই শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলটি অমৃতলালের একটা মস্ত বড় কীর্ত্তি। শেষ-জীবনে ইহাই ছিল অমৃতলালের কর্ম্মস্থল। এই স্থানটি যেন অমৃতলালের মানসপুত্র ছিল এবং এই বিদ্যালয়টি তাঁহার গর্ব্বের বস্তুও ছিল, কারণ, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটার মিঃ Hornell স্কুল পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"This is probably the last school which I shall visit in Bengal. I am glad to think that it is the school to which my old friend, Babu Amrita Lal Bose, has devoted so much labour and love. I congratulate Amrita Babu on the splendid new building which is now completed." তার পর প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর Mr. Gunn লিখিয়া গিয়াছেন,—"It is a great pleasure to me to see a High School in Calcutta so well-housed."

অমৃতলাল নামে স্কুলের 'সেক্রেটারী' ছিলেন না। প্রায় প্রতিদিন তিনি স্কুলে আসিতেন। কোন দিন স্কুলের কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে তিনি নিজে ক্লাশে গিয়া পড়াই-তেন। তিনি যেদিন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়া ইংরাজী কবিতা পড়াইতেন, সে দিন ছাত্ররা তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত, তিনি সত্য সত্যই ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

শিক্ষক-সুহৃদ্ অমৃতলাল

অমৃতলালের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু Oriental Seminaryর এক জন প্রথিতনামা শিক্ষক ছিলেন। অমৃতলাল বলিতেন,—"শিক্ষকের বংশে আমার জন্ম, সেই জন্য শিক্ষ-কের নিন্দা ও অপমান দেখিলে আমার কষ্ট হয়।" ইদানীং শিক্ষকের আদর্শ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং বার বার বলিতেন, এই ত সে দিনও আমাদের দেশে রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত শিক্ষক জন্মিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন বঙ্গের বড় দুর্ভাগ্য যে, প্রকৃত উচ্চমনা শিক্ষক বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে! মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'দৈনিক বসুমতী'তে তিনি বঙ্গীয় শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা অতি করুণভাবে অশ্রুসিক্ত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বার বার বলিতেন, বঙ্গের শিক্ষকগণের স্থান বর্ত্তমানে সমাজে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার জন্য শিক্ষকরাই দায়ী।

শিক্ষানীতিজ্ঞ অমৃতলাল

বর্ত্তমান নীরস শিক্ষাপ্রণালী যাহা ছাত্রদের মনে শুধু ভীতির সঞ্চার করে, অমৃতলাল তাহার পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না। Rousseau, Pestalozzi, Froebeel প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিজ্ঞ পণ্ডিতরা যাহা বলিয়া গিয়া-ছেন, শিক্ষানীতির সম্বন্ধে অমৃতলালেরও সেইরূপ অভিমত ছিল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন—'Education should be made as pleasant to children as play.' 'Instruction should be made as pleasant to children as swimming to fish and flying to birds.' আমাদের অমৃতলালও বলিতেন—ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন তাহারা খেলা করার মত আনন্দ পায়। তাহার একমাত্র উপায় শিক্ষকের মধ্যে রসের অবতারণা করা। রসের ভিতর দিয়া শিক্ষা প্রদান না করিতে পারিলে ছাত্রদের মন হইতে ভীতি দূর করা যাইবে না। বর্ত্তমানের Text Book Committeeর অনু-মোদিত পাঠ্যপুস্তকগুলির উপর অমৃতলালের কোনই আস্থা ছিল না। তিনি বলিতেন, "তোমাদের দেশে এত বড় বড় সাহিত্যযুবরাজ, সাহিত্যসম্রাট্, সাহিত্যকেসর রহিয়াছেন—কৈ, একখানা Gulliver's Travelsএর মত বইও ত তাঁরা লিখতে পারলেন না! ছেলেরা যে পাঠ্যপুস্তকের নীচে নভেল রাখিয়া পড়ে, তার কারণ, বর্ত্তমানের পাঠ্য পুস্তকগুলি তাদের রসের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে না।"

হাস্যরসিক লোকশিক্ষক অমৃতলাল

অমৃতলাল দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন, সেই হাসির সঙ্গে কাঁদাইয়াছেন এবং ভাবাইয়াছেন। এই হিসাবে অমৃতলাল এক জন লোকশিক্ষক ছিলেন। সমাজের যেখানেই অনাচার, অত্যাচার, কপটতা, ভাণ দেখিয়াছেন,

সেইখানেই অমৃতলাল তাঁহার নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে তাহার চিত্র ফুটাইয়াছেন এবং অনাবিল হাস্য-কৌতুকের প্রবল অথচ সুস্নিগ্ধ রশ্মিপাতে সেই সব গ্লানি আন্তরিক সমবেদনার সহিত লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া সমাজকে যেন হাসাইয়াছেন। তাঁহার প্রহসনে ভণ্ড সংস্কারক, স্বার্থান্বেষণকারী স্বদেশসেবক, নকলপ্রিয় বাবু, তথাকথিত শিক্ষিতা বা উল্টা শিক্ষিতা নারী প্রভৃতির প্রতি যে ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে,

রসরাজের তৃতীয় পুত্র ৺শশিভূষণ বসু (ছায়াচিত্রাভিনয়ে)

তাহা সমাজের পক্ষে চিন্তা করিবার বিষয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও মহৎ।

তাঁহার 'বাবু' প্রহসনে যখন ভণ্ড স্বদেশহিতৈষী ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল——পরে মিষ্টার এস্, কে, ভ্যাটাভ্যাল—বলিতেছে, 'দেশ-হিতৈষিতার জন্য কি কি দরকার জান না—তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষ প্রতীকার করতে যাব, ইণ্টারে গেলে আমায় কে চিনবে? ফাষ্টক্লাশে যাবার আসবার টিকিট কর, আর আমি কেলনারের হোটেলে খাব, এক জন ফিরিঙ্গি রিপোর্টার নিয়ে যেতে হবে। এক দল কনসার্ট নিয়ে যেতে পার ত' ভাল হয়—' তখন আমরা হাসি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, এমন ভণ্ড ত' আমাদের সমাজে বিরল নহে।

'বৌমা' নাটকে শাশুড়ী তাঁহার 'ঘরের লক্ষ্মী' বৌমাকে একবার হেঁসেলে যাইতে বলিলে বৌমা যখন বলে, "সমস্ত বই আপনার সামনে খুলে দিচ্ছি, দেখে বলুন, তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কে কবে হেঁসেলে গিয়েছিল? তিলোত্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, কুন্দ, সূর্য্যমুখী—ইহারা কে কবে হেঁসেলে গিয়েছিল?" তখন তাহার অতিরিক্ত নভেল পড়ার ফল দেখিয়া হাসি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, এরূপ 'বৌমা' ত আমাদের সমাজে বিরল নহে।

রসরাজের দৌহিত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে

অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাস দখল', 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি প্রত্যেক প্রহসন হইতে এইরূপ ব্যঙ্গের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বস্তুতঃ সমাজের, ধর্ম্মের, মানবচরিত্রের কোন কপটতা, কোন অনাচার অত্যাচার অমৃতলালের চক্ষু এড়ায় নাই এবং অপর কোন নাট্যকার অমৃতলালের ন্যায় হাসির সহিত এমন শিক্ষা দিতে সমর্থ হন নাই; সেই জন্য তাঁহার প্রহসনগুলি 'হাস্য-অমৃতের সিন্ধু।'

ধর্ম্মজীবনে অমৃতলাল

ঈশ্বরে অমৃতলালের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, 'যখনই আমি বিপদে পড়িয়াছি, তখনই ভগবানের হাতখানি

দেখিতে পাইয়াছি।' সেবার তিনি ময়মনসিংহে এক সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সেখানে যাইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'আমি যাব ময়মনসিংহে সভাপতিত্ব করতে, কিন্তু ময়মনসিংহের সম্বন্ধে যে কিছুই জানি না, বুড়ো বয়সে কি অপদস্থ হব?' এইরূপ চিন্তার পর হঠাৎ পরদিনই তিনি দেখেন যে, তাঁহার টেবলের উপর একখানি ময়মনসিংহের ইতিহাস। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার এক বন্ধু বইখানি আনিয়াছেন। তাঁহাকে অমৃতলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই বইখানা এনেছিলে কেন?' তিনি বলিলেন,—"এমনি, বাড়ীতে ছিল, পড়বো ব'লে নিয়ে এলাম।" অমৃতলাল বলিতেন, এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেকবার ঘটিয়াছে। অমৃতলাল ভগবান্ রামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি এক জন সাধক ছিলেন। কত দিন দেখা গিয়াছে, রাত্রি ১০টার পর 'মজলিস' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন একাকী অমৃতলাল স্তিমিত-নেত্রে ধ্যানমগ্ন, আবার কোন দিন হয় ত সন্ধ্যার সময় স্কুলবাড়ীর প্রশস্ত ছাদের উপর অমৃতলাল একাকী বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেছেন। অমৃতলালের মৃত্যুও ধার্ম্মিক-বাঞ্ছিত মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাজল লইয়া আচমন করিয়া গীতা শুনিতে শুনিতে অমৃতলাল বলেন, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।' তার পর অমৃতলাল ভগবানের নাম স্মরণ করিতে থাকেন, কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এরূপ সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে মৃত্যু অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। এ যেন সাধকের দেহত্যাগ।

বেশভূষায় অমৃতলাল

অমৃতলাল তাঁহার শুভ্র কেশের সহিত মিলাইয়া শুভ্র বেশ পরিধান করিতেন। তাঁহার পোষাকের একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি যে দিন কোন সভায় যাইতেন, তাঁর চুলগুলির এমন বাহার করিয়া আসিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে, আজ কোথাও সভা আছে। অমৃতলাল যে পোষাকে সভায় যাইতেন, সেই পোষাক পরাইয়াই আমরা তাঁহার মৃতদেহকে স্কন্ধে লইয়া জাহ্নবীর তীরে সব শেষ করিয়া আসিয়াছি। অনেকে বলিতেন, তিনি ঘোর বিলাসী ছিলেন, কিন্তু ঠিক বিলাসী বলিতে যাহা বুঝায়, অমৃতলাল সেরূপ ছিলেন না। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসিতেন। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—Cleanliness is next to godliness. অমৃতলাল তাহা বিশ্বাস করিতেন এবং আমাদিগকে বলিতেন, 'যখন মনটা খারাপ বোধ হবে, মনে হচ্ছে কিছুই ভাল লাগছে না, তখনই ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে ফেলে একখানা পরিষ্কার কাপড় প'রে ফেলবে। ধোপাবাড়ী থেকে যদি ভাড়া ক'রে আনতে হয়, তাও ভাল, তবু ময়লা কাপড় তখনই ছেড়ে ফেলবে।'

রসালাপী অমৃতলাল

অমৃতলাল প্রতিদিন বৈকালে ৫টা হইতে রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলে বসিতেন। এইখানে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ হইতে যুবক পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের লোকের সমাগম হইত। এই মজলিস হইতেই আমাদের 'অমৃত-চক্রে'র উৎপত্তি। যাঁহারা একবার অমৃতলালের রসালাপামৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে আলাপ কত মধুর। সারা দিনের কর্ম্মক্লান্তির পরে একবার অমৃতলালের নিকট বসিলে মনে হইত, তাঁর আলাপ কি 'মিষ্টি'—তাঁরই কথায় বলতে ইচ্ছা হয়—'সে যেন জষ্টিমাসের দুপুরবেলার বিষ্টি।'

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।
(সচিব—অমৃত-চক্র)

কবি অমৃতলাল

চিরনিত্য ঋষি তুমি স্মৃতিটুকু দিয়া
মরণে অমর হয়ে গিয়াছ চলিয়া
আসন তোমার আজি হৃদয়-মাঝারে
আত্মা তব স্নাত হয় মৌন আঁখি-ধারে।

গেছে দেহ আছে নাম কণ্ঠে কণ্ঠে বাণী
মানব পুজিবে নিত্য স্মৃতি-পথে আনি
তুমি গুরু মতিমান্ তোমার চরণ
ব্যথিত অশ্রুর সাথে করুক বরণ।

শ্রীস্মরজিৎকুমার মৌলিক।

অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং

দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মড়কের লীলাক্ষেত্র অনশনক্লিষ্ট বিষাদময় বঙ্গভূমিতে যিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল শুধু রস—শুধু হাসি বিলাইয়াছেন, সেই সার্থকনামা অমৃতলাল আর ইহ-জগতে নাই।

তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হয় সন ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে। দেখিতে দেখিতে সে আজ ১৬ বৎসর হইয়া গেল। এই ১৬ বৎসর ধরিয়া তিনি আমাকে যে স্নেহ, যে ভাল-বাসা অবিশ্রান্তভাবে দান করিয়াছেন, তাহার স্মরণ-মাত্রে হৃদয় বিগলিত, চক্ষু আর্দ্র হয়।

অমৃতলালের সহিত আমার পরিচয় জেলেপাড়ার সং লইয়া। বহু বৎসর বন্ধ থাকার পর ১৩২১ সালে জেলেপাড়ার সং লোক-সমাজে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ঐ বৎসর সংএর ছড়া ও গানগুলি সবই ছিল পুরাতন। নূতন ছড়া ও গান লিখাইবার সাহস ও উৎসাহ তখন উদ্যোক্তৃগণের ছিল না; কারণ, সেবার সেই প্রথম সং বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে—অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, হয় ত শোভাযাত্রা বাহির করিতে সরকারের অনুমতি পাওয়া যাইবে না। উদ্যোক্তৃগণের বিশেষ চেষ্টার পর যখন কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন, তখন নূতন ছড়া, গান বাঁধাইয়া, তাহার আখড়া দিয়া তৈয়ারী হইবার সময় আর ছিল না। সেবার আমরা কোনরূপে "নমঃ নমঃ" করিয়া বাহির হইলাম।

পথে আসিয়া দেখিলাম, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ যত দিন সং বন্ধ ছিল) মানুষের যে রুচি, যে রসানুরাগ ছিল, এখন আর তাহা নাই। দর্শকগণ—ইঁহাদের সংখ্যা পূর্ব্বের শত গুণ—আবৃত্ত ছড়াগুলিকে বেশ প্রাণে প্রাণে উপভোগ করিতেছেন না; বরং অনেকে সেগুলিকে সুরুচিসঙ্গত নয় বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন। আর আমাদের দৃষ্টি ও মন সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ করিল সহস্র সহস্র হিন্দু-কুললক্ষ্মী মাতৃগণের সমাবেশ। পূর্ব্বে সংএর শোভাযাত্রা যে সকল পল্লী দিয়া যাইত, তাহার অধিকাংশেই দেহজীবিনী-গণের বাস ছিল। দর্শকগণের অনেকেই সপারিষদ প্রণয়িনী-গণ সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া সংএর গান ও ছড়া শুনিয়া যে আমোদ পাইতেন, তাহার প্রতিদানে তাঁহারা আমোদ-দাতৃকে দু'এক বোতল দেশী বা বিলাতী কারণ-দানে পুরস্কৃত করিতেন। অভিনেতৃ-গণেরও সেই প্রসাদী কারণ পান অকারণ যাইত না। সে মত্ততার বশে তাহারা সময় সময় এমন ভাব-ভঙ্গী বা ভাষা প্রয়োগ করিত, যাহা সুষ্ঠুও নয়—সুরুচিসঙ্গতও নয়। আমাদের এই নব অভিযান অনেকটা সেই প্রথামত হইবে বলিয়াই ধারণা ছিল; কিন্তু পথে আসিয়া আমাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। আমরা দেখিলাম, দর্শকগণ শিষ্ট, সভ্য ও মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন; উপরন্তু অসংখ্য পুরস্ত্রী মহিলার উৎসুক সলজ্জ দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িয়াছে।

রসরাজের ৪র্থ পৌত্রী 'লিলি'

পর-বৎসর যাহাতে সংএর পুরান পোষাক ছাড়াইয়া তাহাকে নূতন সাজে সাজান যায়, তাহার অমার্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল ভাব ঘুচাইয়া তাহাকে সভ্য-ভব্য করা যায়, সেই বিষয়ে উদ্যোক্তৃগণ যত্নবান্ হইলেন। "কাহার নিকট হইতে নূতন ছড়া পাওয়া যাইবে" কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের ইহা বিশেষ

ভাবনার বিষয় হইল। সে দীনবন্ধু মিত্র, সে রূপচাঁদ পক্ষী, সে গুরুদাসবাবু প্রভৃতি মহাত্মগণ আর নাই! নূতন ছড়া কে বাঁধিয়া দিবে! আমি বলিলাম অমৃতবাবু। সকলের মুখে উল্লাসের রেখা দেখা দিল—সকলেই আশার আভাষে পুলকিত হইলেন। সকলেই জানিতেন, অমৃতলালের ন্যায় সুরসিক, পুরাতনের উপাসক, প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, বাঙ্গালার পর্ব্বে গর্ব্ব-অনুভবকারী প্রবীণ সাহিত্যিক আর বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় নাই। অমৃতলাল বয়সের হিসাবে ও লোকদৃষ্টিতে বৃদ্ধ হইলেও, তাঁহার পৌত্রতুল্য আমার অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় তরুণরসে ভরা—তিনি ছিলেন চিরনবীন,—চিরকিশোর!

জেলেপাড়ার সং যে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে আবার আনন্দের রস-প্রবাহে সম্মোহিত করিবে, ইহাই বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত ছিল—সেই জন্যই রসরাজের নামটি তিনি আমার মুখ দিয়া সহসা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩২২ সালের চৈত্র মাসে অমৃতলালের সহিত আমার

নাট্যাচার্য্যের প্রপৌত্রী

রসরাজের মধ্যমা পৌত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

আমি অমৃতলালের নাম করিয়াছি, সে জন্য তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও সংসম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভারের গৌরব আমার উপর ন্যস্ত হইল। কর্ম্মকর্ত্তৃগণের মধ্যে আমি ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ—কিন্তু কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কাহার অনুপ্রেরণায় যে আমার মুখ হইতে সহসা রজত-ধবলকেশ বৃদ্ধ অমৃতলালের নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তখন বুঝি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম, প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তিনি তখন থিয়েটারের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা আমরা জানিতাম না। থিয়েটারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না বুঝিয়া ষ্টার থিয়েটারের এক জন অভিনেতার নিকট হইতে তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া—অক্লান্তকর্ম্মী পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে লইয়া পরদিন বৈকাল ৩টার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলাম।

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে শ্যামবাজারের মোড় হইতে শোভাবাজারের মোড় পর্য্যন্ত কয়েকবার ঘুরিয়াও সেই অদ্ভুত ঠিকানার কোন সন্ধান পাইলাম না। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় পূর্ণবাবু অমৃতবাবুর বাড়ী বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অনেকে ঠিকানা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আশান্বিত হৃদয়ে রসরাজের বাড়ীতে পৌঁছিয়া যখন তাঁহার উপরের বসিবার ঘরে উপনীত হইলাম, তখন চৈত্রের দীপ্ত রৌদ্রে পূর্ণবাবুর মুখ লালবর্ণ ও আমার মুখ ভায়লেটবর্ণে বিবর্ণ হইয়াছে। রসরাজ তখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—তাঁহার পৌত্রী তাঁহার শুভ্রকুঞ্চিত কেশরাশির প্রসাধন করিতেছেন—তিনি আলবোলায় সুখ-টান দিতেছেন।

আমাদের ঘর্ম্মাক্ত দেহ, শুষ্ক মুখ, উৎকণ্ঠিত চক্ষু দেখিয়া তিনি কিছু চঞ্চল হইলেন। আমাদের এরূপ অবস্থার কারণ তাঁহার বাড়ী খুঁজিয়া না পাওয়া—এ সংবাদটি যখন তিনি শুনিলেন, তখন সমবেদনার স্বরে বলিলেন,"কেন, আমার বাড়ী খুঁজে পাওয়া ত বিশেষ কথা নয়, বোধ হয়, অনেকেই ঠিকানা জানেন।" আমি বলিলাম—"আমাদের দুর্ভাগ্য, আমি ঠিকানা পাইয়াছিলাম '৯ নম্বর' 'মৈত্রের লেন', কিন্তু এখন দেখিতেছি, '৯'এর দুই (৯।২) 'নম্বর' 'রামচন্দ্র মৈত্রের লেন।' তাই এত ঘুরিতে হইয়াছে।" তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"এ অদ্ভুত ঠিকানা কে দিলে ?" আমি বলিলাম, "আপনাদের থিয়েটারের এ্যক্টার অমুক বাবু।" রসরাজ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁর সহজাত কৌতুকপ্রবাহের উৎস খুলিয়া বলিলেন—"ও, থিয়েটারের এ্যক্টার কি না—তাই অর্দ্ধেক মুখস্থ করেছে, বাকী অর্দ্ধেক 'প্রম্পটারের হাতে !'

আমরা শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলাম ; কোথায় গেল আমাদের পথশ্রম—কোথায় গেল রৌদ্র-তাপ—পিপাসা—ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ ! রসার্ণবের রসবিন্দু-পানে আমাদের যেন নূতন প্রাণ সঞ্জীবিত হইল।

তাহার পর তাঁহার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, পরামর্শ, উপদেশ, রচনা ও তত্ত্বাবধান-নৈপুণ্যে এখনকার দিনে জেলেপাড়ার সং যে স্তরে উঠিয়াছে, তাহা সুধীবৃন্দের অবিদিত নাই। আপামরসাধারণকে আনন্দদান করিয়া এই একদা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত অনুষ্ঠানটি এখন পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-নির্ধন, রসিক-অরসিক, নরনারী সকলেরই আদরণীয়—উপভোগ্য। শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন ইহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

অমৃতলালের মনীষা ও প্রতিভার নিকট জেলেপাড়ার সং যত ঋণী, তদপেক্ষা অনেক অধিক ঋণী তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা ও মহানুভবতার নিকট। তিনি যে সকল সরস রচনার দ্বারা আমাদের ছড়ার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন,অন্যত্র তাঁহার সে সকল রচনা স্ফূর্ত্তি পাইবার অবকাশ যথেষ্ট হইত। উপরন্তু জেলেপাড়ার সংএর ছড়া রচনার পূর্ব্বেই তিনি যে রসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শক্তির যথেষ্ট নিদর্শন। সংএর ছড়া বাঁধা তাঁহার তত বড় কায নয়, যত বড় কায ইহাকে তাঁহার প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসা। তিনি সং সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে কতবার বলিয়াছেন—ছোট, মন্দ, অশ্লীল প্রভৃতি বলিয়া আমরা আমাদের কত জিনিষই না হারাইয়াছি ও হারাইতে বসিয়াছি। ছোটকে বড়, মন্দকে ভাল, অশ্লীলকে শ্লীল করিয়া লইতে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক জিনিষ নিজস্ব থাকিয়া যায় এবং জগতের দৃষ্টিতে আমরা এত ক্ষুদ্র—এত হেয় হই না। তিনি বলিতেন গুলীডাণ্ডাকে" মার্জ্জিত করিয়া ইংরাজ 'ক্রিকেট' খেলার প্রচলন করিয়া National Game বলিয়া গৌরব করে ; আর আমরা 'ছোট লোকের খেলা' 'দুলে বাগ্দীর কায' বলিয়া 'হাডুডুডু', 'মুন ধাপসা' প্রভৃতিকে ঘরের বাহির করিয়া ফুট বলের মাঠে লাথি চালানর ইতরমি কস্ত করি !" তিনিই বুঝাইয়াছিলেন, সং ছোট নয়, হীন নয়, অশ্লীল নয়। সকল দেশে সকল সময়ই কোন-না-কোনরূপে সং লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। তবে বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি অশিক্ষিত, অমার্জ্জিতরুচি লোকের হস্তে পড়িয়া এবং সঙ্গে শিক্ষিত সুধীগণের সহানুভূতি না পাইয়া সং দিন দিন অবনত হইতেছিল। তাই হৃদয়বান্, প্রতিভাবান্, শক্তিমান্ পুরুষসিংহ অমৃতলাল জেলেপাড়ার সংকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়া, তাহার দৈন্য-মালিন্য ঘুচাইয়া, সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানটিকে এত উন্নত করিতেছিলেন।

এই বাঙ্গালার পুরাতনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধাই ৭০ বৎসর-বয়স্ক চিরনবীন অমৃতলালকে হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের সেনাপতিত্ব করিতে আনিয়াছিল। পুরাতনের পুনরাবির্ভাব দেখাইবার জন্যই তিনি সন্ধ্যাতে

"কাঁসারীপাড়ার" পক্ষে লেখনী ধরিয়া দীর্ঘ ২২ ঘণ্টাকাল যোগাসনে বসিয়া পূর্ণসমাহিত হইয়া শোভাবাজার রাজবাটীতে হাফ আখড়াইএর গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, কবির লড়াই, পাঁচালী, হাফ আখড়াই, বাউলের গান, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন সম্পদ্। আধুনিকগণের উপেক্ষা ও অবজ্ঞায় সেগুলি পরিত্যক্ত হইলেও আবার তাহাদের আবির্ভাব প্রয়োজন, নতুবা বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করিবার কি দেখাইবে?

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি! বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য—বাঙ্গালী তাঁহাকে হারাইয়াছে! আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সজীব, সরস ও সর্ব্বজনপ্রিয় রাখিতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভিন্নরূপে আমাদের মধ্যে আসিবে। কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে সিংহাসন তিনি শূন্য করিয়া গেলেন, কোন যুগে তাহা পূর্ণ হইবার আশা বাঙ্গালা দেশ করিতে পারে কি?

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

অমৃত-বিয়োগে

বুক ভেঙ্গে ওঠে হাহাকার, ছোটে
বঙ্গবাণীর আঁখির ধার,
'খাস-দখলে'র দখলী স্বত্ব
বিচার করিতে কে বল আর?
ওগো 'বাবু' তব বিয়োগ-ব্যথায়
আকাশ-বাতাস করে হায় হায়!
'একাকার' আজি সব একাকার
বাধা দেবে স্রোতে কে বলো তার?

'সাবাস আটাশ!' প্রশংসা তরে
ভাষা শোনাবার বল না কেউ,
উচ্ছল প্রাণ চঞ্চল আজি
বলবান্ হায়! কালের ঢেউ,
স্বর্গ-পথের পথিক তোমায়
আর কোন কথা শোনাতে না চাই,
গমনের পথ পিছল কারতে
ঢালিতে চাহি না নয়নাসার!

আগুসরি নিতে ঐ ছায়াপথে
অপেখি রয়েছে গিরীশ ঘোষ,
অমৃত মিত্র পুলকে মাতাল
পার্শ্বে নেহারি অমৃত বোস,
শুধু কাঁদে ধরা আষাঢ়-ধারায়
আমরা গুমরি বুকেরি ব্যথায়
অগ্রজ ধরো অনুজ কবির
শেষের অর্ঘ্য অশ্রু-হার।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

অমৃত-স্মৃতি

অমৃতবাবুর এক শোকসভায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন,—বসু মহাশয়ের 'অমৃত-মদিরা'র তিনি নিজের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অনেকেই রুচি-বিকার বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু কিরণবাবু ঐ কবিতাগুলি সে ভাবে পড়েন নাই; তিনি মনে করেন, ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাতে মানুষ অকপট হয়; সংসারের পোনের আনা লোকই নিজের কথা বলিতে যাইয়া অনেকটা নহে—উহা সাধুর নগ্নতা—তাহা পেনালকোডের গণ্ডী এড়াইয়া গিয়াছে।

অমৃত-মদিরার রুচি সেইরূপ কি না, এবং কিরণবাবুর কথায় সকলে সায় দিবেন কি না, জানি না। কিন্তু শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পূর্ব্বে যখন অমৃত-মদিরা প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমি হয় ত বা একটু বেশী রুচিবাগীশ ছিলাম;—তখন আমি ঐ কাব্যখানি খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখি

যৌবনে রসরাজ অমৃতলাল, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺অমৃতলাল মিত্র, ৺পাঁচকড়ি মিত্র ও
নাট্যাচার্য্যের প্রিয়তম কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অসিভূষণ বসু (শৈশবে)

ঢাকা চাপা দিয়া থাকেন। এমন কয় জন লোক আছেন, যাঁহারা নিজের জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া যে সমস্ত কার্য্য তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশ্য-ভাবে দিবালোকে আনিতে সাহসী হন? সাধু-জীবন না হইলে মানুষ তেমন অকপট হইতে পারেন না, জাবালি যে বহুচর্য্যা দ্বারা সত্যকামের মত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা জাবালিই বলিতে পারিয়াছিলেন, অপর কোন্ রমণী এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত? 'অমৃত-মদিরায়' সেই প্রকার সাধুজনোচিত স্বীকারোক্তি আছে—উহা রুচি-বিকৃত নাই। তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক এবং 'ভারতীর' সম্পাদিকা ছিলেন সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন বোলপুরে, এবং সরলা দেবী তাঁহার নানা প্রকার সভা-সমিতি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। উভয় পত্রিকারই সম্পাদনের অনেকটা কায আমাকে করিতে হইত। যখন অমৃত-মদিরা 'ভারতীর' সম্পাদিকার নিকট প্রেরিত হয়, তখন আমি শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইচ্ছা করেন, এই পুস্তকের একটা যথাযথ সমালোচনা আমি করিব? যদি 'ভারতীতে' আমার

সমালোচনা বাহির হয়, তবে অমৃতবাবুর সঙ্গে আপনার সৌহার্দ্দ্য নষ্ট হইতে পারে।" সরলা দেবী বলিলেন, "আপনি নির্ভয়ে সমালোচনা করুন—আমার সঙ্গে কাহার সৌহার্দ্দ্য থাকে না থাকে—তাহার জন্য ভাবনা করিবার দরকার আপনার নাই! যাহা সত্য, তাহাই পত্রিকাখানির অস্তিত্বের ভিত্তি হওয়া উচিত—অন্য কিছু নহে।"

অমৃত-মদিরার আমি একটি দীর্ঘ প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলাম—তাহার উপসংহারে লিখিয়াছিলাম—অমৃত-মদিরায় অমৃত পাইলাম না, মদিরা পাইয়াছি। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে যখন আমি অমৃতলালের সাহচর্য্যে আসিলাম—তখন বুঝিলাম, অমৃতবাবুর চরিত্র শুধুই অমৃত-ময়—তাহাতে মদিরার লেশমাত্র নাই।

আমার সমালোচনাটি যে দিন 'ভারতীতে' প্রকাশিত হইল, তাহার পরদিনই অমৃতবাবু আমাকে একখানি "অমৃত-মদিরা" উপহার পাঠাইয়া দিলেন—সেই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে অমৃতবাবু লিখিয়াছিলেন, "সাহিত্য-বীর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে উপহার দিলাম।"

আমি ১৮৯৭ সনে কলিকাতায় আসিয়া ক্রমাগত বাস করিতেছি। কিন্তু তাহার প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৫ সনে একবার আসিয়াছিলাম—তখন আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় আমি ষ্টার থিয়েটারে প্রথম "বিবাহ-বিভ্রাটের" অভিনয় দেখি। তার পর অমৃতবাবুর আরও কয়েকখানি ব্যঙ্গ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, সেগুলি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু দশ জনের মধ্যে বসিয়া আমিও সেই সকল নাট্য-চরিত্রদের কথার কৌতুক-রসটাই বেশী অনুভব করিয়াছি; নায়ক-নায়িকাদের কথা তুলিয়া দশ জনের সঙ্গে হাসিয়া পরিতৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু তখনও বুঝি নাই—এই সকল নাটিকা রহস্যের ছদ্মবেশে আসিয়া লোকশিক্ষার সহায় হইয়াছে, তখনও বুঝি নাই—এই হাসি-ঠাট্টার অন্তরালে একটা নিবিড় করুণ রস রহিয়াছে—তখনও বুঝি নাই—অমৃতবাবুর বিদ্রূপ মর্ম্মন্তুদ দুঃখের অভিব্যক্তি।

তখন পর্য্যন্ত মনে হইয়াছিল—অমৃতবাবু বিদ্রূপ-রসের কবি—উচ্চাঙ্গের ভাঁড় ভিন্ন কিছুই নহেন।

কিন্তু যখন কৈশোর অতিক্রম করিলাম, সাহিত্যরসের উপলব্ধি আরও একটু গাঢ়তর হইল, তখন এই বিদ্রূপ-রসের কবিকে লোক-শিক্ষকের সিংহাসনে বসাইতে কোন দ্বিধা বোধ না করিয়া তাঁহাকে সমাজ-গুরু বলিয়া নমস্কার করিলাম।

অমৃত বাবুর মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার যৌবন-কালে এ দেশে শিক্ষা-দীক্ষা কেমন চলিতেছিল, সেই প্রসঙ্গে কহিলেন, "আমাদের সময়ে কোন ইংরেজীনবীশ যদি বাঙ্গালার পরীক্ষায় ফেল হইত, তবে তারা "কিসে ফেল হইলে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বুক ঠুকিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিত, "বাঙ্গালায়," তাহার শ্রোতৃবর্গ এই উত্তর শুনিয়া বাঙ্গালার এই সুপুত্রটিকে ধিক্কার না দিয়া তাঁহার অকৃত-কার্য্যতায় গৌরব অনুভব করিতেন।...অমৃতবাবু বলিলেন—"আমাদের সময় বাঙ্গালা সাহিত্য বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইত, কিন্তু তাহার মর্য্যাদা এইরূপ ছিল!"

শুধু মাতৃভাষা নহে,—দেশের সমস্ত জিনিষের প্রতিই তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিদ্বিষ্ট ছিলেন। দেশের ঠাকুর কুকুরের মূল্য পাইতেন এবং বিদেশের কুকুর দেশের ঠাকুরের সম্মানের দাবী করিতেন। এ দিকে সেক্স-পীয়র, মিল্টনের নামে যাঁহারা ঝম্প দিয়া ঘাড় নাড়িয়া দাঁড়াইতেন—আমাদের দেশীয় কবিগণকে তাঁহারা নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় দিবা-রাত্র বংশীধারীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ কথা থাকিত, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস কচিৎ তিলক-লাঞ্ছিত বৈরাগীর ঝুলির বিবরে, কচিৎ বা সভয়ে বটতলার ছিন্নাঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। গৃহের অন্নপূর্ণারা—যাঁহারা সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা অশিক্ষিত ও মূর্খ বলিয়া নিন্দিতা হইতেন, সুরা-পায়িনী, চরিত্রহীনা বিদেশী নারীর কথা-বার্ত্তা ও চা'ল-চলনের রুচি সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণীয় বলিয়া মনে হইত। যে দেশের ব্রাহ্মণকুলে কপিল, কণাদ, বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-তপস্যা যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব কবিত্ব ও নিবৃত্তিমূলক সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া এখনও সভ্যজগতের প্রণম্য হইয়া আছে, সেই ব্রাহ্মণজাতিকে নিন্দা করিয়া ধিক্কার দেওয়াই হিন্দুস্কুলের কৃতী ছাত্রদের—ডিরোজিও ও রিচার্ড-সনের প্রিয় শিষ্যদিগের একটা প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে সে দেশে ও এ দেশে স্বর্গমর্ত্ত্যের

ব্যবধান—সে দেশের রাজনৈতিক নেতা গ্যারিবাল্ডী, ম্যাটসিনি, ক্রমওয়েল ; একালে গ্ল্যাডষ্টোন, ডি, ভেলেরো—ইঁহাদের বক্তৃতা অগ্নিগর্ভ, ইঁহাদের প্রতি কথার পশ্চাতে জাতীয় যুগ-যুগান্তরের তপস্যা ও প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল। বারুদের ঘরে দীপশলাকার ন্যায় এই নেতাদের কথা তাঁহাদের দেশকে জ্বালাইয়া তুলিবার শক্তি রাখে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক পাণ্ডাগণ তখন শিখিয়াছিলেন সেই বিদেশী নেতৃবর্গের মত শব্দচ্ছটা ও বাক্য-পল্লবের ছড়াছড়ি করিতে। তাঁহারা কি ভঙ্গীতে দাঁড়াইতেন, কি কি ইডিয়ম্ প্রয়োগ করিতেন, তাহাই তাঁহাদের অনুকরণীয় ছিল। বার্ক এবং গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতার শব্দ মুখস্থ করিয়া ইঁহারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন। তাঁহারা দেশ উদ্ধারের কামনা করিতেন না, টাউন হলে শ্রোতৃবৃন্দের করতালি পাইলেই খুসী হইতেন, বক্তৃতামঞ্চে একটা পুষ্পমাল্য পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু যে দিন সত্য সত্যই সাহিত্যের আসর ছাড়িয়া রাজনীতি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাধনাক্ষেত্রে—কর্ম্মভূমিতে অগ্রসর হইল, তখন পুষ্পশয্যা কণ্টকশয্যায় পরিণত হইল, সেই সকল রাজনৈতিকগণের অবশিষ্ট কয়েকটি প্রাণী এই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন।

আমরা সকল বিষয়েই ইংরাজের নকল করিতেছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয়, ইংরাজ আমাদিগকে গ্রহণ করিল না। আমরা ধড়া-চূড়া পড়িলাম, নেকটাই গলায় বাঁধিলাম, ট্রাউজার, সক্ কিছুরই অভাব হইল না ; এমন কি, মহিলাদের কপালের উল্কি প্লিষ্টার দিয়া তুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের "নীলাম্বরী" ছাড়াইয়া গাউন পরাইলাম, আল্‌তা ধুইয়া মুছিয়া হাই সোল সু পরাইলাম, তার পর কালো রঙ্গের উপর ক্রমাগত সাবান মাখিয়া ইংরাজী বুলি বকিতে বকিতে সাধনাটা যথাসম্ভব সফলতার দিকে অগ্রসর করাইয়া দিলাম। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে। ময়ূরপুচ্ছপরিহিত কাককে ময়ূরেরা নিজের দলে ঢুকিতে দিল না। পুরোহিতকে তাড়াইয়া, শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিয়া—এমন কি, পিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া চট্টোপাধ্যায়কে "চাটারিয়া"—দত্তকে'ডাট' চক্রবর্ত্তীকে 'চকোটি,' পালকে 'পল', বিশ্বাসকে "ভিসোয়াস্", বসুকে "ভাসু" প্রভৃতি বিকৃত নামে অভিহিত করিয়া—এক কথায় একবারে সর্ব্বস্ব-সমেত আমরা নীলাম হইয়া গিয়াও যখন বিদেশীর মন পাইলাম না, তখন দায় পড়িয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। সে আর একটা অধ্যায়ের কথা।

অমৃতলাল যখন তরুণ যুবক, তখন দেশের ছিল এই অবস্থা। আমরা নিজেকে সত্য সত্য ভুলিয়া গিয়া পরের রূপে নিজেকে পরিচিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। উহা একটা অভিনয় মাত্র। বারাঙ্গনা যেরূপ সীতা-সাবিত্রীর ভূমিকা লইয়া বাহির হয়, গ্রাম্যবীর রামকুমার দে যেরূপ গাণ্ডীব ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের ভূমিকা অভিনয় করে, আমরা তাহাই করিতেছিলাম এবং ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমরা কি ?

তখন জাতির ঘোর তন্দ্রার অবস্থা। আমরা যাহা নই, স্বপ্নঘোরে নিজেদের তাহাই মনে করিতেছিলাম। এই স্বপ্ন-রজনীর অবসান হইবার তখন কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না। এই ঘোর নিদ্রিতের রাজ্যে দুই এক জন মানুষ জাগিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের এই বিমূঢ়তা—এই ঘোর তন্দ্রা—যাহা রাক্ষসীর ন্যায় দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ করিয়া দিতেছিল, দেশের এই অবস্থা দেখিয়া দারুণ ক্ষোভ অনুভব করিতেছিলেন। এই জাগ্রত অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে অমৃতলালের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহা ঘুম ভাঙ্গাইবার কাঠি,—অজ্ঞান-তিমির নষ্ট করিবার জন্য—জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য দীপ-শলাকা।

শত শত বাগ্মী বক্তৃতায় যে কথা বুঝাইতে পারিতেন না;—অমৃতবাবু নাটক লিখিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন না। চোখে মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা টানিয়া, মহা জ্ঞানাভিমানীর ভাণ গ্রহণপূর্ব্বক একটা উঁচু যায়গায় বসিয়া গুরুর আসনের দাবী করিলেন না,—কিন্তু যাহারা প্রতি পদে ভুল করিতেছিল, অথচ নিজেদের খুব বাহাদুর মনে করিয়া এই দেশটাকে একটা মস্ত বড় জঞ্জাল ভাবিয়া পরকীয় অনুকরণ দ্বারা স্বীয় সমাজকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছিল,—সেই সকল প্রাজ্ঞন্মন্য অজ্ঞদিগের, অসার ও মূর্খ ভণ্ডদের যথাযথ ছবি আঁকিয়া—অমৃতবাবু সেই সকল চিত্রের এমন সকল স্থানে আলোকরেখা সম্পাত করিলেন—যাহাতে দেশের আপামরসাধারণ এই অবস্থাকারীদিগকে সহজেই চিনিয়া ফেলিল এবং তাহাদের প্রকৃত রূপ দেখিয়া

হাসিয়া খুন হইল, তখন হঠকারীদের সমস্ত অকার্য্য দিবালোকে ধরা পড়িয়া গেল। তাঁহার সমস্ত ব্যঙ্গ নাটিকায় ছত্রে ছত্রে হাসির সুর—কিন্তু উহা শুধুই দন্তরুচিকৌমুদীর বিকাশ নহে—কতখানি ব্যথার ব্যথী হইয়া অমৃতবাবু ছবিগুলি আঁকিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই ধীরভাবে পুস্তকগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অমৃতবাবু এই ভাবে সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, মার্কা-মারা দেশ-হিতৈষী বা সমাজ-সংস্কারকরা তাহা পারেন নাই। তিনি হাসির গুরু, রসের গুরু—কিন্তু ইহা তাঁহার একটা দিক্ মাত্র, তিনি স্বদেশ ও স্ব-সমাজের হিতকার্য্যেও গুরুর স্থানের দাবী করিবেন।
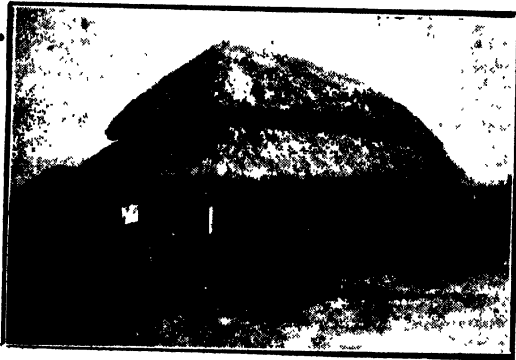
রসরাজের গিধনীর বিরামকুঞ্জ—বহির্ভাগের দৃশ্য

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ভবানীপুরে আহূত শোক-সভায় অমৃতবাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন—তাহার দুই একটির উল্লেখ করিব। সচরাচর ব্যঙ্গ ছবিতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতকটা অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া দেওয়া হয়—সেই অস্বাভাবিকত্ব কতকটা গণ্ডীর মধ্যে থাকে—তাহা এতটা অস্বাভাবিক হয় না, যাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে বিলম্ব হয়, অথচ তাহার যে অঙ্গটার প্রতি লোকচক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করার দরকার হয়,—ব্যঙ্গ-রসিক চিত্রকর সেই অঙ্গটাকে 'একটু অতিকায় করিয়া দেখান—ইহা ব্যঙ্গ রসের আর্ট। 'পাঞ্চ্' প্রভৃতি পত্রিকায় বড় বড় লোকের এইরূপ ছবি দেওয়া হয়, কাহারও বামন-দেহ—মুণ্ডটি প্রকাণ্ড, কাহারও ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে একটা বৃহৎ নাক, কাহারও ছোট পা দুটির উপরে লম্বোদর। ব্যঙ্গকাব্য বা নাটকেও লোকচরিত্রের দোষগুলিকে সেইরূপ একটু বাড়াইয়া দেখাইতে হয়—নতুবা সেই দোষ সাধারণের দৃষ্টিতে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। অমৃতবাবুর ব্যঙ্গ নাট্যে সমাজে তৎকালে প্রচলিত দোষগুলির কতকটা অতিরঞ্জন আছে—এই অতিরঞ্জন ব্যঙ্গরসের আর্ট। ইহা কম-বেশী করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না,—একটা গণ্ডীর মধ্যে এই অতিরঞ্জনটা আবদ্ধ রাখিতে হয়। অমৃতবাবু শিল্পীর মতন এই নাট্যকলা জানিতেন। তিনি সমাজের দোষগুলি ততটা বাড়াইয়া দেখাইয়াছেন, যাহাতে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে—আর একটু বাড়াইলে হয় ত তাহা আরব্য উপন্যাসের মত নিছক কল্পনার লীলা হইয়া পড়িত—

রসরাজের গিধনীর বিরামকুঞ্জ—ভিতরের দৃশ্য

আর একটু কমাইলে হয় ত তাহা সাধারণের চোখেই পড়িত না। তিনি যে চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন—তাহা যথাযথ ও সমাজ-শিক্ষার উৎকৃষ্ট সহায় হইয়াছে।

অমৃতবাবুর ব্যঙ্গ হাসিতে ভরা,—রৌদ্র-ভরা একখানি শরৎ-মেঘের মত, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা তীব্রতা নাই। বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন—অমৃতবাবুর লেখায় কামুকতা ছিল না। কামুক ব্যক্তি কবি, শিল্পী বা চিত্রকর হইবার অযোগ্য, এমন কি, কামুক আদিরসের ছবি আঁকিতে গেলেও অকৃতকার্য্য হয়। যে নদীতে নিজে ডুবিয়া আছে—সে নদীর মূর্ত্তি দেখিতে বা উপভোগ করিতে অক্ষম, ডাঙ্গায় যে থাকে, সে উহা ভালরূপ দেখিতে পায়। অমৃতবাবু যদি ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি হলাহলের মত বিদ্বিষ্টভাব পোষণ করিতেন, তবে তিনি সমাজের দোষ এমনভাবে দেখিতে বা দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহার

নাম ছিল অমৃত, চরিত্র ছিল অমৃত—তাহাতে বিদ্বেষ থাকিতে পারিত না। তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসার উর্দ্ধে ছিলেন, এই জন্য নিষ্কামভাবে মুক্ত দৃষ্টিতে সমাজের রূপ তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়াছিল—এই জন্য তিনি সমাজের এরূপ নিখুঁৎ ছবি আঁকিতে পারিয়াছিলেন এবং এই জন্য তাঁহার লেখায় জনসাধারণের এত উপকার হইয়াছিল।

এই সকল কথা ঠিক এইভাবে বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন কি না, মনে নাই, তবে আমার যতটুকু স্মরণে আছে—এবং সেই হট্টগোলের মত যতটুকু বুঝিয়াছিলাম—তাহা লিখিলাম। হয় ত সব কথা তিনি ঠিক এমনভাবে বলেন নাই।

বায়রণ কবি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতার এক একটি ছত্রে দশ দশটি শত্রুর সৃষ্টি হইত। অমৃতবাবুর লেখা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এত হাসি, ঠাট্টা ও বিদ্রূপের মধ্যেও তাঁহার রচনায় এক অনাবিল সহৃদয়তার সুর বিদ্যমান ছিল—যে সমাজকে তিনি গালি দিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার লেখা উপভোগ করিয়াছেন। এমন কাহাকেও ত দেখিলাম না, যিনি অমৃতবাবুর লেখা পড়িয়া বা তাঁহার নাট্যাভিনয় দেখিয়া তাঁহার প্রতি চটিয়া গিয়াছেন। অনেককে তিনি সৎপথে আনিয়াছেন, তাঁহার ব্যঙ্গ অনেকের মোহ ও মত্ততা ঘুচাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তিনি কাণ মলিয়া সংশোধন করেন নাই—যাঁহারা নিজের দোষ বুঝিতেন না, অমৃতবাবুর আঁকা ছবিতে তাঁহারা নিজেদের প্রতিকৃতি দেখিয়া—তাঁহারা যে এত কুৎসিত ও উদ্ভট, তাহা বুঝিয়া একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। অমৃতবাবু অঙ্গুলীসঙ্কেত করিয়া আমাদের প্রকৃত পথ কি—তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, যাঁহারা বিপথে চলিতেছিলেন, যাঁহারা পথিভ্রষ্ট—তাঁহারা অমৃতবাবুর লেখার গুণে পথের সন্ধান পাইয়া শোধরাইয়া গিয়াছেন।

অমৃতবাবুর কবিতা ও গল্প-লেখায় এমন একটা মোহিনী শক্তি ও বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা নেশার মত পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলে, এ জন্য তাঁহার অনেক কথা লোকের মুখে মুখে চলিত হইয়া গিয়াছে;—তিনি রঙ্গমঞ্চে স্বয়ং অভিনয় করার সময় সেই সকল কথা এমন হাব-ভাব ও যথাযথ ভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি করিতেন—যাহাতে তাঁহার ভূমিকা-গুলি একবারে জীবন্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু অমৃতবাবু যেমন নাট্যকার, যেমন কবি ও নটরাজ—তেমনই বাগ্মী ছিলেন।

বস্তুতঃ তাহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা ভুলিবেন না। আমরা ত সভাস্থলে কত মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছি। ইদানীন্তন কালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দীপনাময় সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জলদনির্ঘোষ ও শব্দচ্ছটা, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের ধীর-গম্ভীর শব্দ-বিন্যাস ও কথা সাজাইবার কৌশল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটুল ও মধুর ছন্দের বাক্য-প্রবাহ—এমন বহুলোকের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু অমৃতবাবুর জন্য সভাস্থলে একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাঁহার কথাগুলি ছিল অম্লমধুর; কিন্তু তাহা শুধু চাটনির মত ছিল না,—তাঁহার কথায় পর্য্যাপ্ত রসিকতা থাকিত, কিন্তু সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত বাচালতা নহে,—তাঁহার বক্তৃতা ছিল হিতগর্ভ। তাঁহার বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল লোক-শিক্ষা। বড় বড় বাগ্মীর বাক্য-পল্লব ও আড়ম্বরময়ী ভাষা—অমৃতবাবুর বক্তৃতার পর বিফল হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাঙ্গা আসর জোড়া দিতে পারিতেন, এবং তাঁহার বক্তৃতার পর আর কেহ আসর জমাইতে পারিত না। যেমন কীর্ত্তনের পর আর কথকতা জমে না, অমৃতবাবুর বক্তৃতার পর ভাল-ভাল বক্তার কথা আর জমিত না।

আমাদের সমাজকে তিনি যে ভাবে চিনিয়াছিলেন, অতি অল্পলোকেরই এ সমাজের সহিত তেমন পরিচয় ছিল। যখন দেশে ষোল আনা বিলাতী অনুকরণ—তখন তিনি খাঁটি বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। বৃথা শিক্ষাভিমানীর ভুল বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণবৃত্তি তাঁহাকে এতটুকু স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেশের যাহা ভাল, তাহা তোমরা কাচের টুকরা মনে করিয়া ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলে—অমৃতবাবু সেইগুলির কোন্‌টি হীরা, কোন্‌টি মতি, কোন্‌টি নীলা—তাহা জহুরীর মত চিনিয়া সেগুলির যথার্থ মূল্য দিতে পারিয়াছিলেন। এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ হিতকর নীতি ও উচ্চ লক্ষ্যের উপর স্থাপিত, তাহা তিনি সুস্পষ্ট অন্ত-র্দৃষ্টির সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অন্ধ গোঁড়ামীর পথে চলিয়া এই দেশের ধর্ম্ম ও সমাজকে সমর্থন করেন নাই। এই দেশের প্রাচীন সকল প্রতিষ্ঠানই তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশংসার্হ ছিল না। কি কি কারণে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহা এখনকার কালের উপযোগী কি না—এবং পরিবর্ত্তনাদি কি ভাবে কর

আবশ্যক—তাহা তিনি যতটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ততটা বিচক্ষণতার সহিত আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সমাজের গোঁড়া হইয়া "মমি" হইয়া পড়েন নাই। তিনি বৃদ্ধের ছদ্মবেশে ছিলেন চির-শিশু, যে বয়সে লোক প্রায় অর্দ্ধমৃত দশায় উপনীত হয়, সেই বয়সে তিনি ছিলেন অ—মৃত, চিরজীবন্ত চির স্ফূর্ত্তিমান, হাসির ফোয়ারা, আনন্দের পুতুল, নবজীবনের উৎস। এ জন্যই তাঁহার সঙ্গলাভ করাটা সকলেই সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। যেখানে তিনি যাইতেন, সেখানেই একটা হর্ষের সাড়া পড়িয়া যাইত। সেকালের কথা তিনি এমনই রসান দিয়া বলিতে পারিতেন যে,তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে বেলা কতটা হইল, কার্য্যাধিক্য সত্ত্বেও তাহা ভুলিয়া যাইতাম। তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশের একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে—যে যুগের লোকেরা উদরান্নের জন্য দাসত্বের আর্জ্জি মাথায় বাঁধিয়া পথে পথে পঙ্গপালের মত ঘুরিয়া বেড়াইত না, যে যুগে অতিথি পাইলে গৃহিণী নিজের অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা তাহাকে দিয়া স্বয়ং উপবাসে তৃপ্ত হইতেন, যে যুগে খোল-খঞ্জনী নূপুরের বাদ্যে-ভক্তির কথা বহিয়া আনিত ও প্রত্যেক হৃদয়ে সাড়া দিত, যে যুগে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা, ধূপ-ধুনা ও অগুরু-গন্ধে আমোদিত বায়ু ও পঞ্চপ্রদীপের আলো-উদ্ভাসিত বিগ্রহ, বঙ্গের মন্দিরগুলিকে অতুল্য শোভা-সম্পদ প্রদান করিত,যে যুগে বাঙ্গালার লাঠী লম্পট-দস্যুর ত্রাসস্বরূপ ছিল ও তেপান্তরের মাঠে রাখালের বাঁশীর করুণ সুর হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে 'ঘা' দিয়া বাজিয়া উঠিত, যে যুগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছায়ার ন্যায় জ্যেষ্ঠের অনুগামী ছিল, পিতৃ-শাসন দুর্লঙ্ঘ্য ছিল, এবং এক পরিবারে এক শত লোক বাস করিয়াও পারিবারিক শান্তির এমন একটা আদর্শ দেখাইত, যে শান্তি এখনকার স্বার্থ-পীড়িত ক্ষুদ্রচেতা নরনারীদিগের সম্মুখে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক মনে হয়—যে যুগে বাঙ্গালার গ্রামগুলি ধনধান্যে, স্বাস্থ্যে ও নির্ব্বিরোধ প্রীতিতে বৈকুণ্ঠের মত ছিল—যে যুগে তখনও শৌর্য্যবীর্য্যে প্রতাপ-প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণী দেশের গৌরবস্বরূপ ছিল, যে যুগে কৃষক যখন সোনার ফসল লইয়া অগ্রহায়ণের সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিত, যখন ঘরে ঘরে কত মহোৎসব-পার্ব্বণের তালিকা প্রস্তুত হইয়া যাইত—যখন প্রতি প্রভাতে কুন্দ মল্লিকা চাঁপা নাগেশ্বর দেবপূজার জন্য ফুটিত এবং তসর-পরিহিতা মহিলারা চন্দন-লাঞ্ছিত মূর্ত্তিতে ঘরে ঘরে দেবী-প্রতিমার মত বিরাজিত হইতেন—যখন দোলোৎসবে আবিরের ছটায় আকাশ-বাতাস রাঙ্গা হইয়া যাইত ও 'জীবন-সংগ্রাম' নামক একটা অদ্ভুত পদার্থ তথাকথিত নব্য-সভ্যতার মাথায় চাপিয়া এ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক ইহার শান্তি-সুখ-সৌভাগ্য হরণ করিয়া লইয়া যায় নাই—যে যুগে 'জীবন-রক্ষার যুদ্ধ' 'যোগ্য ব্যক্তিরাই বাঁচিয়া থাকিবে' এই সকল বিভীষিকাময়ী নীতি সমস্ত দেশকে ভীত-ত্রস্ত করিয়া তোলে নাই—সেই যুগ, সেই সোনার যুগে দেখিয়াছিলেন—সোনার মানুষ অমৃতলাল। এখন এই দুর্দ্দিনে যখন রূপ ও রসের কঙ্কালটা মাত্র পড়িয়া আছে, সেই প্রাচীন ভাবৈশ্বর্য্য সমস্তই অন্তর্হিত, যখন বিদেশী সভ্যতার দাবানলে প্রাচীন আদর্শ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে—এই দুর্দ্দিনে অমৃতলাল স্বীয় স্মৃতির ফলকে সেই প্রাচীন কথা গাঁথিয়া দ্বারে দ্বারে করুণ স্বরে তাহাই গাহিয়া ফিরিতেন।—তাঁহার সঙ্গে সেই যুগের স্মৃতি চলিয়া গেল—কারণ, যদিও তাঁহার অপেক্ষাও বৃদ্ধলোক এ দেশে আছেন, কিন্তু তাঁহার মতে প্রাচীন-সমাজের অনুরাগী পূর্ব্ব-যুগের রস-বোদ্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

মঙ্গলবারদিন বেলা ৩টার সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রবিবারদিন মৃত্যুর একটি দিন পূর্ব্বে,—৮টার সময় আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। শ্রীযুক্ত কবিরাজ ক্ষেত্র-কালী রায় মহাশয় অনেক দিন যাবৎ অমৃতবাবুর সহিত পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। রবিবারদিন সকালে উঠিয়া তিনি আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি, অমৃতবাবু অসুস্থ, এ অবস্থায় কোন নূতন বন্ধুর সহিত পরিচয়-স্থাপন সুবিধাজনক না হইতে পারে,—তথাপি যখন বড়বাজার হইতে এতটা দূর আসিয়াছেন, চলুন একবার দেখিয়া আসি।"

অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল,—অমৃতবাবু বাড়ী-পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন একটা বাড়ীতে আসিয়াছিলেন,—শ্যামবাজার ডাঃ আর, জি, কর মহাশয়ের বাড়ীর নিকটই এই বাড়ী, আমাদের চিনিয়া তথায় যাইতে একটু দেরী হইল, গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিয়া বাড়ীর একটি ছেলেকে কহিলাম—"তুমি গিয়ে বল, নূতন এক ভদ্রলোক এসেছেন,—

আজ তাঁর শরীর ভাল না থাকিলে সেই ভদ্রলোককে লইয়া আমি আর এক দিন আসিব।" কিন্তু আমরা তখনই আহূত হইলাম, দোতলার একখানি ঘরে একটা জাপানী মাছুরে তাকিয়া ঠেস দিয়া অমৃতবাবু কতকটা শায়িত, কতকটা উপবিষ্টভাবে একাকী ছিলেন—ডান দিকে খাটের উপর দিব্য ধব্‌ধবে বিছানা—বাঁ দিকে একটা টেবলে খানকয়েক বই,—আমাদিগকে দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শরীর কেমন আছে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহার রোগের একটা ইতিহাস দিলেন। ডাঃ বিপিন ঘোষের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে খাওয়া-দাওয়ায় কতকটা অত্যাচার হইয়াছিল—"আমি খুব নিয়ম মানিয়া চলি, কিন্তু ডাঃ ঘোষের ছেলেদের একান্ত আগ্রহে সে দিনটা ওজন রাখিতে পারিলাম না।" আমি বলিলাম,—"বুড়দের খাওয়া সম্বন্ধে যাঁরা অনুরোধ উপরোধ করেন, তাঁরা বুঝিতে পারেন না, ইহার ফল কতটা সঙ্গীন হইতে পারে। একে ত বুড়দের খাওয়ার লোভ স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে—এ বিষয়ে তাঁহারা কতকটা শিশুদের মত, তার উপর ধরাধরি করিলে —তাঁহারা সে অনুরোধ এড়াইতে পারেন না, হয় ত'— এড়াইতে চানও না। আমি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, কতবার যে ঐরূপ অনুরোধের ফলে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প'ড়ে গেছি, তার ঠিক নাই।" অমৃতবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু কখনই ঐরূপ কুকার্য্য করি না, সে দিনটা খাদ্যের বহর দেখিয়া লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই দিন অপরিমিত খাওয়ার ফলে ক্রমাগত বমির উদ্বেগ হইতে থাকে —তাহার এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে, প্রাণ যাওয়ার গতিক—তার পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও কতকটা উদ্বেগ ছিল। দুপ্রহরের পরে কতকটা সুস্থ বোধ করিলাম, কিন্তু ক্ষুধা খুব ভাল বোধ করি নাই (যদিও দুই দিন কোন খাদ্য স্পর্শ করি নাই)। কেহ কেহ বলিলেন, 'ঊর্দ্ধগবায়ু হয়ে বমি হয়েছিল, বিকেলবেলাটায় মাছের ঝোল দিয়ে দুটি ভাত খেলে পেটটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, একবারে কিছু না খাওয়াটাও ভাল নহে।' এই বুদ্ধি গ্রহণ ক'রে আমায় আবার বিপদে পড়্‌তে হ'ল। সে ভাত খেলাম না বিষ খেলাম! আবার ভয়ানক বমির উদ্বেগ উপস্থিত হ'ল। এই দুই দিন যে কি যন্ত্রণা গিয়েছে, তা' আর কি বল্‌ব। কাল বিকাল থেকে ভাল আছি, আজ বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছি—বিপদ কেটে গেছে!" তখন যে মৃত্যু তাঁহার ঘরের এক কোণে বিদ্রূপের সহিত দন্ত-রুচি বিকাশপূর্ব্বক উঁকি মারিয়া সেই কথা শুনিতেছিল, তাহা আমরা কেহ কল্পনা করিতে পারি নাই।

তার পর অমৃতবাবুর কথার ফোয়ারা ছুটিল; সেই উজ্জ্বল সরস পরিহাস-দীপ্ত গল্প করিবার অপূর্ব্ব কৌশল—যাহা শুনিতে শুনিতে প্রাতঃসূর্য্য কতবার হেলিয়া মধ্যাকাশে গিয়াছে, কতবার সন্ধ্যায় বসিয়া কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ উঠিতে দেখিয়া মনে হইয়াছে—ওঃ, এতটা রাত্রি হইয়া গেল! সেই আসন্নমৃত্যু লোকটি প্রফুল্লমুখে কথা কহিতে লাগিলেন —তাঁহার সময় বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষিত-সমাজে কতটা আদর ছিল, তৎসম্বন্ধে কৌতুকাবহ অনেক গল্প বলিলেন। তাঁহার "যাজ্ঞসেনী" নাটকের প্রসঙ্গ পাড়িলেন—বলিলেন—"নাটক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে যে বইখানি খুব ভাল দাঁড়াইবে, এ বিশ্বাস আমার কোন দিনই ছিল না। কিন্তু এই বইখানিতে আমার প্রাণের অনেক কথা আছে—যে সকল নীতি আমি আজীবন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এই নাটকখানির ভিত্তি সেই সকল নীতি। আমার বড় ইচ্ছা, এই বইখানি কলেজে পাঠ্য হয়—ছেলেরা জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে আমার মর্ম্মের কথা-গুলি জানিতে পারে। আপনাকে একখানি দিয়াছি—সেখানি কি আছে?" আমি বলিলাম,—"মেয়েদের কতটা আদরের, তাহা বুঝিতে পারেন—বই বাড়ীতে গেলে তাহা তাহাদের হস্তগত হয়—তখন উদ্ধার করা বড় শক্ত।" আর একখানি যাজ্ঞসেনী তিনি আমায় দিলেন, আমি বলিলাম, "এম, এ ক্লাসে আমরা প্রখ্যাতনামা নাট্যকারদের বই পড়াইয়া থাকি। রঙ্গমঞ্চের সাফল্যের কথায় আমরা ততটা পরিচালিত হই না। আপনি যখন পুস্তকখানির গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটা আস্থাপরায়ণ, তখন নিশ্চয়ই ইহার একটা সাহিত্যিক গরিমা আছে। আমরা বোধ হয় উহা এম, এ ক্লাসে পাঠ্য করিতে পারিব।" তার পর আমি বলিলাম, "আপনার মত লোক যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার নাটক সম্বন্ধে ধারাবাহিকক্রমে কয়েকটি বক্তৃতা দেন, তবে বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রদের পক্ষে বড়ই ভাল হয়। আপনার সম্মতি পাইলে সম্ভবতঃ আমি বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সেইরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন, "আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন আমি কিছুই

জানি না, আপনাদের যে সকল নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ও বলিবার কায়দা আপনাদের রেগুলেসনে স্থির করিয়া দিয়াছেন, সেই গণ্ডীর শাসন মানিয়া আমার চলা মুস্কিল হইবে।" আমি কহিলাম, "সেরূপ আইন-কানুন কিছুই নাই, বাঙ্গালা নাটকের স্রষ্টাদের মধ্যে আপনি অন্যতম, ইহার উৎপত্তি ও বিকাশ আপনার চোখের সামনে হইয়া গেছে, হামাগুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার যৌবনোদ্গম আপনি দেখিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আপনি সংশ্লিষ্ট, এই ইতিহাসটা ও ইহার দোষ-গুণ ও কি আদর্শ হওয়া উচিত, তাহা আপনার মনোরঞ্জনী ভাষায় বলিয়া গেলেই তাহা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হইবে।" তিনি আনন্দ সহকারে সম্মত হইলেন। হায় বিধাতা! অমৃতলালের অমৃতগর্ভ বঙ্গনাট্য-বিস্তার ইতিহাস আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিষ্ঠ হইবার সুযোগ—অবকাশ পাইল না।

সে দিন—তাঁহার সহিত দেখা-শুনার সেই শেষ দিনে আর যে কত কথা হইল, তাহা বলিবার স্থান এখানে নাই। ইদানীং তিনি কতকটা আর্থিক অভাবে পড়িয়াছিলেন। অতিশয় লজ্জা ও কুণ্ঠার সহিত তিনি সেই কথা আমাকে বলিলেন। সে সকল কথা শুনিয়া এই দুর্ভাগ্য দেশের সর্ব্ব-বিষয়ে বৃথা আস্ফালনের কথাই আমার মনে হইল। মৃত্যুর পর শত শত সংবাদপত্রের স্তম্ভে যাঁহার জন্য অবিরল অশ্রু পড়িবার মিথ্যা কথাটা খুব আড়ম্বরের সহিত ঘোষিত হয়, যাহার স্মৃতি-মন্দির কেন তাজমহলের মত জমকালো হইবে না, এই লইয়া আলোচনা হয় এবং তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের কাহারও অপেক্ষা এক রতি পরিমাণও কম নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক দিকে বক্তা, অপর দিকে লেখকরা ক্রমাগত সোর-গোল করিয়া থাকেন, সেই জগতের মধ্যমণিটি জীবিত অবস্থায় চারটি ভাত খাইয়া জীবিত আছেন কি না, তাহারও খোঁজ কেহ লয়েন না!

যাহা হউক, এ প্রসঙ্গ বাড়াইবার দরকার নাই। ক্ষেত্র-কালী কবিরাজ মহাশয় তাঁহার পকেট হইতে কয়েকটি ঔষধ অমৃত বাবুকে দিয়া বলিলেন, "এগুলি এখনই খাইবেন না, শরীর একটু ভাল হইলে রোজ ঔষধটা খাইলে আপনি ক্রমশঃ বল পাইবেন।" অমৃতবাবুর মিষ্ট আপ্যায়নে ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে ক্ষেত্রবাবু এরূপ প্রীত হইয়া আসিয়াছিলেন যে, ফিরিবার পথে আমাকে বলিলেন, "এরূপ লোকের সৌহার্দ্দ-লাভ করায় আজ আমি ধন্য হইলাম।"

বিদায় লইবার সময় অমৃতবাবু বলিলেন, "বিপদের দিনে কোথা হইতে জানি না, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়! সেই আমার পুত্রবিয়োগের সময় আপনি রোজ আসিয়া আমায় সান্ত্বনা দিয়া যাইতেন, সে কথা ভুলিব না। আজ আমি যখন একা একা অবসন্ন-দেহে একান্ত অস্থিরতা বোধ করিতেছিলাম, আপনি আসিয়া আমাকে অনেকটা স্ফূর্ত্তি দিয়ে গেলেন।"

তাহার পর ময়মনসিংহ গীতিকার অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন; প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া ছিলাম।

তাঁহার বয়স ৭৭।৭৮ হইয়াছিল, এ বয়সে মৃত্যু স্বাভা-বিক। কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বর্গারোহণটা আমাদিগের কাছে একটা মস্ত বড় আকস্মিক বিপদের মত আসিয়াছে। তিনি বৃদ্ধদের স্বকীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তরুণরা তাঁহাকে নিজদের এক জন মনে করিত। তিনি প্রাচীন হইয়াও পুরাতন হইয়া যান নাই। "এখন ত যাওয়ারই সময়" এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও মনে হয় নাই। তিনি যে আসন ছাড়িয়া গেলেন, তাহা পূর্ণ করিবে কে?—সে আসন চির-উজ্জ্বল, গৌরবদীপ্ত,—বঙ্গ-সাহিত্যের সম্রাটদের প্রতিভালাঞ্ছিত। যে আসন তাঁহার প্রাপ্য, সে আসনের যোগ্য আর কেহ নাই। তাঁহার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, আমরা কবি ও ঔপন্যাসিক পাইতে পারি, কিন্তু রসরাজকে আর কি ফিরিয়া পাইব না—সে আনন্দের অমৃত পরি-বেষণ আর কেহ করিতে পারিবেন না? ভারতীর যে অমৃত-ভাণ্ড তাঁহার হাতে ছিল, অমৃতলাল ভিন্ন সে ভাণ্ড আর কেহ পান নাই। তাই আমাদের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ তাঁহার শূন্য সিংহাসনের দিকে পড়িতেছে—এ ক্ষতি অপূরণীয় এবং এই মৃত্যু-স্মৃতি অসহনীয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অমৃতময় অমৃতলাল

হাসির অন্তরালে যে অশ্রুর সমুদ্র বহমান, এ কথা জানিয়াও মানিয়া না লওয়ার লোক এই দুনিয়ায় বড় বেশী দেখা যায় না। অমৃতলাল ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন—যিনি আজীবন দুঃখকেই দুঃখ দিয়া আসিয়াছেন; অসহায়ের মত অশ্রু-সায়রে নিমজ্জিত না হইয়া হাস্য-কৌতুকে জীবনের শেষ-দিনটি পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। বার্দ্ধক্যজড়িত, জরাজীর্ণ ভারতের বুকে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন!

তাই আজ ৭৭ বৎসরের এক বৃদ্ধের পরিণত মৃত্যুদিনেও আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না; বয়সের গণ্ডী-ভাঙা এক তরুণের শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি।

১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ রবিবার রামনবমীর দিন বেলা

ধলার জমীদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত রসরাজ—ঢাকায় গৃহীত ফটো হইতে

রসরাজই বটে! তাঁহার সারা অণু-পরমাণু ভরা শুধু রসামৃত। জরা-মরণভীত জাতির মলিন মুখে হাসি ফুটাইতে এক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া ত কৈ মনে পড়ে না!

তাঁহার চলায়-বলায়, ভাবে-ভঙ্গীতে সবুজের চির-সজীব ভাবটি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিত; মনে হইত,—বুঝি কোন স্বাধীন দেশের জীবন্ত মনীষী পথ ভুলিয়া পর-প্রপীড়িত,

১০টার সময় ৮৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে অমৃতলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বসু। কৈলাস বসু কিছুদিন ওরিয়াণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষকতা করিয়া পরে ব্যবসা দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের তিনি এক জন বিশিষ্ট শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ক্যাপ্টেন ডি, এল রিচার্ডসনের নিকট তিনি ইংরাজী-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা

থার,—রিচার্ডসনের ন্যায় সেক্সপিয়র-সাহিত্যে এতবড় পণ্ডিত অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আর কেহ আসেন নাই।

অমৃতলালেও পিতার গুণ বর্ত্তিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি অনন্যসাধারণ যত্নে ইংরাজী ও অন্যান্য সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। যিনি তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত আছেন, তিনিই জানেন, অমৃতলালের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার যুক্তি-তর্ক অখণ্ডনীয়, অনবদ্য! ইংরাজীরচনাগুলি ফিরিঙ্গী-ঘেঁসা নহে, খাস্-বিলাতী আমদানীর মত সুন্দর তেজোব্যঞ্জক! বিদ্যালয়ে কিছু দিন পাঠাভ্যাসের পর অমৃতলাল শ্যামবাজার বাঙ্গালা ইস্কুল, তার পর হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখানে দুই বৎসর পড়িয়া ওরিয়েণ্টেল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। এই সময় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। সে সময় বাল্যবিবাহের জোর মহলা চলিত, কাযেই অমৃতলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। শালিখার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লি হইতে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। কিন্তু জানি না, কি কারণে সেখানকার পাঠ সাঙ্গ করা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিন বৎসর পড়িয়াও তিনি এলোপ্যাথি লাইন ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য শ্রীশ্রীকাশীধামে সে সময়কার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লোকনাথ বাবুও কম্বুলিয়াটোলানিবাসী ছিলেন। তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে অমৃতলালের এ শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

কয় বৎসর হোমিওপ্যাথি শিক্ষার পর অমৃতলাল কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন চিকিৎসকতা করিয়াছিলেন। পরে, ডাক্তারী চাকরী লইয়াই পোর্ট ব্লেয়ারে যাত্রা করেন। ইতঃপূর্ব্বে মাত্র এক জন বাঙ্গালী পোর্ট ব্লেয়ারে পুলিস ইনস্পেক্টারের চাকরী লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অধুনা অভিনেতা শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহারই পুত্র!

খেয়ালী বিধাতা কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে সেখানে রাখেন নাই। তাঁহার অদৃষ্ট তাহা হইতে যোগ্যতর কার্য্যেই বাঁধিয়া [illegible] জানি না, কি শুভক্ষণে কম্বুলিয়াটোলা জিম্‌নাষ্টিক ক্লাবের উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি যুবককে লইয়া অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র ঘোষের নিকট একখানি ব্যঙ্গ-নাট্য লিখাইয়া লইতে যান :—তাহার পূর্ব্বেই কবি বলিয়া গিরিশচন্দ্রের নাম অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জহুরী জহর চিনিল। দুই জনের মধ্যে সে দিন যে হৃদয়-বিনিময় হইয়া গেল, তাহাতে বাঙ্গালার চির-মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়াছিল কি না, কে জানে! অদূর-ভবিষ্যতে কিন্তু বীণাপাণির স্মিত আননে গৌরব-তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা আজ বোধ হয় না বলিলেও চলিতে পারে!

বাহিরে বাহিরে থাকিলেও অমৃতলাল যখনই কলিকাতায় আসিতেন, গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে, গল্প-গুজব করিতে ভুলিতেন না। সেই সময় গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দু প্রমুখ অনেকেরই উদ্যোগে ৺দীনবন্ধু মিত্ররচিত সধবার একাদশী ও লীলাবতী নাটকের অভিনয় হয়। অমৃতলাল কিন্তু তাহাতে যোগ দেন নাই।

বিধাতা কল টিপিলেন। জানি না, কি সৌভাগ্যবলে অমৃতলাল বাহিরের বাস তুলিয়া দিয়া শালিখায় আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা সম্বন্ধে ভিন্নমত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েক জন সরিয়া গেলেন। একাগ্রকর্ম্মী অর্দ্ধেন্দু কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না, অমৃতলালকে ধরিয়া বসিলেন—সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অমৃতলালও কি খেয়ালে স্বীকৃত হইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষকতায় এবং অমৃতলালের যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, ১২৭৯ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার জোড়াসাঁকো ৺মধুসূদন সান্যালদের ঘড়ীওয়ালা বাড়ীতে 'ষ্টেজ' বাঁধিয়া সগৌরবে ন্যাশানাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণ' অভিনয় হইয়া গেল। নটনাথ প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! সকলে অমৃতলালের সে জীবন্ত অভিনয় প্রাণ ভরিয়া দেখিল, চিত্রার্পিত হইয়া শুনিল। দেখিতে দেখিতে অমৃতলালের নাম জনসমাজে প্রচার হইয়া গেল।

শুধু অভিনয় নহে, সকলের বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে ইহাও পড়িল যে, নিজে অমৃতলাল লালবাজারের পথে প্ল্যাকার্ড মারিতে সুরু করিয়াছেন। আবার কখন বা দেখিল—হ্যাণ্ডবিল হাতে সারা কলিকাতা সহরটা চষিয়া ফেলিতেও কার্পণ্য নাই। হাতে অর্থ নাই; কিন্তু সখ আছে, উত্তম

আছে। তাঁহারা দুই চারিটি বড়লোকের দ্বারস্থ হইলেন, অর্দ্ধচন্দ্রই সার হইল। আজকালের মত ভদ্র-মহিলার লীলায়িত ভঙ্গী, ছন্দোময় সারা অঙ্গের দোদুল নৃত্য ত দূরের কথা, তখনকার ভদ্র-সম্প্রদায় থিয়েটারের নামে নাক সিঁটকাইতেন! সমাজচ্যুত হইবার ভয়ও কম ছিল না!

ন্যাশানাল থিয়েটারের আয়ু কিন্তু অধিক দিন রহিল না! বর্ষার প্রাবল্যে ও অন্যান্য নানা অসুবিধার জন্য উহা এক দিন বন্ধ হইয়া গেল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ৺ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে এবং 'আগে চল,আগে চল'র অগ্রণী অমৃতলাল প্রভৃতির উদ্যোগে বিলাতী 'লুইস্' থিয়াটারের অনুকরণে গ্রেট্ ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তাহার আয়ুষ্কালও খুব বেশী দিন হইল না!

যাহা হউক, ঐকান্তিক চেষ্টা কখন বিফলে যায় না, যাইতে পারে না। ক্রমে ধীরে ধীরে অপ্রশস্ত পথ পরিসর প্রাপ্ত হইয়া উঠিল। সম্মুখের দুর্য্যোগময়ী—অমা-রাত্রির অবসানে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সফলতার অরুণালোক দেখা দিল।

১২৯০ সালের ৬ই শ্রাবণ অধুনা যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত, সেই স্থানে ষ্টার থিয়েটার নাম দিয়া একটি রঙ্গালয় খোলা হয়। অমৃতবাবু তাহাতেই অভিনয় করিতে থাকেন। পরে ১২৯৫, ১৩ই জ্যেষ্ঠ, ২৫ মে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাবু ও আর তিন জন অংশীদার মিলিয়া হাতিবাগানে ষ্টার থিয়েটার পাকা করিয়াই প্রতিষ্ঠা করেন এবং গিরিশচন্দ্রের নসিরাম নাটক লইয়া তাহার উদ্বোধন হয়। অমৃতবাবু নসিরামের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সমস্ত দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দেন।

সে যুগের নট-শিল্পীরা প্রকৃত সাধক ছিলেন। সাধারণকে অকৃত্রিম আনন্দদান তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ অমৃতলাল যখন যে ভূমিকায় অভিনয় করিতেন, একবারে সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতে এতটুকু কৃপণতা করিতেন না। শুনিয়াছি না কি সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকার নারীরোদন অংশটি আয়ত্ত করিতে অমৃতলালকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। একটি বসতিহীন বাড়ীতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চীৎকার করিয়া কাঁদিবার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নসিরাম, রমেশ, নিতাই, ঠাকুর্দ্দা, মিঃ কষ্টার, মিঃ সিং, মিঃ ক্লিস্, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতির অভিনয় চিরদিন নাট্য-সম্প্রদায়ের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

গভীরাত্মক অভিনয়ে তিনি যেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন 'সিরিওকমিক' অভিনয়েও তাঁহার শক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। হাস্য-কৌতুকের মধ্যে সামান্য অঙ্গ-ভঙ্গীতে তিনি যে গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন, অধুনা তাহা সুলভ নহে।

অমৃতলাল অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তাই তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাইত! থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইতে না হইতেই তিনি সারকুলার জারী করিলেন—থিয়েটারের ভিতর কেহ কোন স্ত্রীলোকের সহিত কোন কারণেই রহস্যালাপ করিতে পারিবে না। ইহা কর্ম্মক্ষেত্র, আড্ডাবাড়ী নহে, এ কথা যেন সকলের স্মরণে থাকে। বলা বাহুল্য, তাঁহার এরূপ কঠোর আদেশে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, অমৃতলালকে অনেকের বিরক্তিভাজনও যে না হইতে হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অমৃতলাল সে সমস্ত ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। শতমুখী চেষ্টায় নিজের সঙ্কল্প কার্য্যকর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি নিজমুখেই গিরিশচন্দ্র এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে যদি কোন মতানৈক্য হইত, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড ও শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দিরে কিছু দিন পূর্ব্বে যে রাত্রি সাড়ে এগারটা বারটার মধ্যে অভিনয় ভাঙ্গিবার বা একখানি করিয়া পুস্তক অভিনয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা নূতন নহে, বহুপুর্ব্বে ষ্টারই ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সেজন্য অমৃতলালকে কম কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। ভারে কাটা বাঙ্গালী ধারে কাটার ধার ধারে না। এখন যেমন একখানির পর একখানি করিয়া অতিরিক্ত নাটক অভিনয় করা হইতেছে, তাঁহাকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল, অবশ্য বহু অর্থ-ক্ষতি-স্বীকারের পর। সে সময় প্রেক্ষা-গৃহে ধূমপানের নিষেধ ছিল। আজকাল যেমন অডিটোরিয়মের পুরোভাগে বসিয়াই অনেক মহাপুরুষের দলকে টীকাটীপ্পনী কাটিতে দেখা যায়,তাঁহার আমলে সে উপায় ছিল না। কাহারও এতটুকু বেচাল দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিতেন, 'বাপু, এখানে ও-সব চলিবে না, এই নাও

তোমার টিকিটের মূল্য ফেরৎ, অন্যত্র স্থানের অভাব নাই, সেইখানেই যাও।' ব্যবসা করিতে বসিয়া এ ভাবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করার বুকের বল যে কত বড়, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

নাট্য-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট যত দিন ছিলেন, তাঁহার জীবনকালের অধিকাংশ সময়ই তিনি ষ্টারের সংস্রবে কাটাইয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে মাত্র কিছু দিনের জন্য মনোমোহন পাণ্ডের মনোমোহন থিয়েটারে নাট্যাচার্য্যরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। কম-বেশী ৫ বৎসর হইবে তিনি রঙ্গালয় হইতে একবারে বিদায় লইয়াছিলেন। থিয়েটারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ সে যুগে কেন, এ যুগেও কেহ নাই।

জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালভূষণা দে

ষ্টারের অধ্যক্ষতার কালেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাটক লেখার দিকে। সে সময় বাঙ্গালায় খুব বেশী নাট্যকারের আমদানী হয় নাই। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির পর গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অমৃতলালের ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে প্রথম রচনা প্রকাশ হইল,—'চোরের ওপর বাটপাড়ি'। ১৮৭৬, ১৭ই জুন তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইল—'হীরকচূর্ণ।'

অমৃতলালের সাহিত্য-জীবনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম জীবনে তরুবালা, বিজয়-বসন্ত, বাবু প্রভৃতি। মধ্য-জীবনে বহুদিন নীরব থাকিবার পর লিখিয়াছিলেন--খাস-দখল, নব-জীবন এবং জীবন-সায়াহ্নে লিখিয়া গিয়াছেন—ব্যাপিকা-বিদায়, দ্বন্দ্বে মাতনম্ ও যাজ্ঞসেনী।

প্রথমজীবনের লেখাই অবশ্য অধিক। সে সময় তিনি বহু নাটক, ব্যঙ্গ-কাব্য, সামাজিক নক্সা প্রভৃতি রচনা করিয়া সে যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ নামক তিনখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সামাজিক নাটক তরুবালা, বাঙ্গালার নিজস্ব ভাবধারায় মণ্ডিত। যিনি তরুবালা পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, কত বড় দরদ দিয়া অমৃতলাল এই বাঙ্গালার মাটীকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার ঠান্দি-চরিত্র শুধু সু-সৃষ্টি নহে, বাঙ্গালীর বুকের বল, আশা-আনন্দের এক-তারা যন্ত্র।

তাঁহার লিখিত বিবাহ-বিভ্রাট একখানি অতি সুন্দর সমাজ-চিত্র। সে সময় ইঙ্গ-বঙ্গের আচার-ব্যবহারে মর্ম্মাহত

অমৃতলাল যে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হীন পণ-প্রথার প্রতিও যে তীব্র কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কত তীব্র, কত মর্ম্মস্পর্শী। বঙ্গবাসীর ৺যোগীন বসুর কথাটা উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "বিবাহ-বিভ্রাটের তুলনা নাই, এর দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর ধারাপাত-বর্ণপরিচয়ের মত বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে এর অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।"

অমৃতবাবু-লিখিত আদর্শবন্ধু নামক আর একখানি নাটকের কথা ইদানীং হয় ত অনেকেই জানেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন পূর্ব্বে এই স্বরাজ আন্দোলনের বাষ্পও যখন দেখা যায় নাই, তখন তিনি প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্য দেখাইয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার ভিতর লেখকের চিন্তাশক্তির প্রখরতা, দূরদৃষ্টির অপ্রতিহত গতি, ভাবের গভীরতা, ভাষার অপূর্ব্ব দ্যোতনা দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।

যিনি অমৃতলালের বইগুলির সহিত পরিচিত, তিনিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, নীতি-কথা প্রচার করিবার ঢক্কানিনাদ না করিয়া তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত রচনার মধ্যেই জাতিকে জাগ্রত করিবার, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কি অদ্ভুত প্রচেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ব্যঙ্গ-রচনার মধ্যে যেমন মধু আছে, তেমনই হুলও কম নাই। এ জন্য অনেক সময় অনেকের নিকট স্বর্গগত লেখককে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই। রাজা-বাহাদুর লিখিবার পর কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে গুলী করিবার ভয়ও দেখাইতে ছাড়েন নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে তিনি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তিনিও সে রস না উপভোগ করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

অমৃতলালের শেষ দান যাজ্ঞসেনী, নাটক হিসাবে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে, বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদে প্রতিভা স্তিমিত হয় নাই।

'বসুমতী'র কল্যাণে অমৃতলালের শেষজীবনের অনেক লেখাই আমাদের পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তাঁহার লিখিত বহু রসাল এবং যুক্তিপূর্ণ সমাজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, সাময়িকী কবিতা, হামিদের হিম্মৎ ও যুবক-জীবন নামক উপন্যাস বহুদিন আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করিবে।

তাঁহার লিখিত অমৃতমদিরা নামক একখানি কবিতার পুস্তকও আছে। ছন্দো-বৈচিত্র্য, শব্দের ঝঙ্কনা না খুঁজিয়া যদি পড়া যায়, বাঙ্গালীর অনাড়ম্বর জীবনের চিত্রটি যে অতি সুন্দরভাবে তাহার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাতে ভুল নাই। ইহার মূল্যও ত কম নহে।

অমৃতলালের রচনা-সমালোচনার দিন আজ নহে। অদূর-ভবিষ্যতে হয় ত সে দিন আসিবে, যে দিন অমৃতলালের যথাযোগ্য সম্মান দিবার জন্য বাঙ্গালীকে বলিতে হইবে না। তবে একটা সুখের কথা, গিরিশচন্দ্র জীবদ্দশায় যে সম্মান যে সৌভাগ্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—অমৃতলালের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। দেশবাসী নিজ-কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে বহু দিন তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী মেডেল (বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান) সাহিত্য-সম্মেলন হইতে মূল সভাপতি-নির্ব্বাচন প্রভৃতি বহু সম্মানকর প্রতিষ্ঠানে অমৃত-বাবুকে মর্য্যাদা দিয়া দেশবাসী নিজ-কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কথাটা বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। সে যুগে গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারের লোক বলিয়া অনেকেই যথা যোগ্য সম্মানে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

কেশব সেন, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রভৃতির পর অমৃতলালের মত বক্তা বাঙ্গালায় আর জন্মায় নাই। তিনি তোড়যোড় করিয়া বক্তৃতা করি বার জন্য আসরে নামিতেন না। এক ছাঁদা কথা বিশ স্থানে বলিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। যত দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছি, ২।৩টি নূতন কথা না শিখিয়া ফিরিয়াছি বলিয়াও ত কৈ মনে পড়ে না। যতক্ষণ তিনি বক্তৃতা করিতেন, হাস্য-বঞ্চিত বাঙ্গালীর মুখে অবিরাম শুধু হাসি ফুটাইয়া যাইতেন। তিনি এত সরস করিয়া বলিতে পারিতেন যে, মৃতের শোক-সভায় গিয়াও বেশ একটু তৃপ্তি লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত।

সে যুগের সহিত অমৃতলাল যেন এ যুগের একটি যোগ-সূত্র গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত মজলিসি লোক বোধ করি আর মিলিবে না। কলিকাতার ভিতর তিন

যেন পল্লীর নির্ম্মল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া ছাড়িতেন। গল্প ও গুজবে, আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা খোঁজ রাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করেন, অমৃতবাবুর আপ্রাণ চেষ্টা না থাকিলে স্কুলের এতটা উন্নতি কোনমতেই সম্ভবপর হইত না। যখন যে কোন সময় যাই না কেন, দেখিয়াছি, গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া অমৃতবাবু বসিয়া আছেন, আর তাঁহার চারি দিকে বালকদল মিলিয়া লাফালাফি ছুটাছুটি লাগাইয়া দিয়াছে; ঠাকুরদাকে নিকটে পাইয়া নাতিদের যেন মহা উৎসব পড়িয়াছে। যখন স্কুল-বিল্ডিংটি প্রস্তুত হইতেছিল, তখন মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিতাম, একবারে সমগ্র অন্তর দিয়া অমৃতবাবু কার্য্যে লাগিয়া পড়িয়াছেন। কোন্‌খানে কি বসিলে মানাইবে, কোন্‌টি না হইলে চলিবে না, এই ভাবনাতেই তিনি বিভোর; যেন ভক্তের প্রাণপণ যত্নে মন্দির-প্রতিষ্ঠা চলিয়াছে।

এক সময় অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া বহু সভা-সমিতি করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের জন্য সঙ্গীতাচার্য্য ৺রামতারণ সান্যালের সহিত একটি স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়াও তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকার উপর চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে যুগে এরূপ ভাবে টাকা তোলা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। দেশবাসীর প্রাণে যে তাঁহার জন্য আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহার দ্বারাই তাহা প্রমাণ হয়।

রসরাজ অমৃতলাল সম্বন্ধে মাত্র আমার জীবনের একটি ঘটনা বলিয়াই আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বাল্যে স্নানার্থী হইয়া মেয়েদের সহিত এক দিন গঙ্গায় স্নানে গিয়াছিলাম। স্নান-শেষে তিনি তখন তীরে উঠিতেছিলেন, গলায় স্ফটিকের মালা, হাতে কমণ্ডলু। পাণ্ডার নিকট আসিয়া তাহাদের দেওয়া সযত্ন-লেপিত চন্দন ধারণ করিলেন। বালকের খেয়াল, আমি স্নান-সঙ্গিনীকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, 'ওঁর গলায় সাদা সাদা ও কি?'

সঙ্গিনীর নির্জ্জীব উত্তর কিন্তু আমায় মোটেই তৃপ্তি দিতে পারিল না। অধিকতর বায়না ধরিয়া বলিলাম, 'না, বল ও কি?'

তিনি হাসিলেন; তার পর অঙ্গুলি-হেলনে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'স্ফটিক কি বোঝ না, এ মিছরীর দানা বাবা, খাবে? কিন্তু দেখো, দাঁত ভেঙ্গে যায় না যেন। দৈত্যপুরী রূপর কাটি, সোনার কাটি ছুঁয়ে এ পাথর হয়ে গিয়েছে কি না!'

এক কথায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া লম্বা কেশ ঘাড়ে ফেলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। পার্শ্বের সব লোক একবাক্যে বলিল, 'হবে না কেন, রসরাজ অমৃতলাল ত।'

আজ সে অমৃতলাল অমৃতলোকে। গত ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৬ তাঁহার জড়দেহের শেষ হইয়াছে! আধি-ব্যাধি-জড়িত বাঙ্গালীর বুকে হাসির বান বহাইতে আর তাঁহার কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিবে না। তাই না অশ্রুর জয়গানে সারা দেশ আলোড়িত!

কিন্তু অমৃতলাল অমর! তাঁহার জরা নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, ধ্বংস নাই। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন তাঁহার দান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যত দিন রঙ্গমঞ্চ থাকিবে, তাঁহার রক্তঢালা পরিশ্রমেরই বিজয়পতাকা বিস্মৃতিকে ব্যঙ্গ করিবে। অমৃতলালের মৃত্যু কোথায়!

হিন্দু আমরা, নিজেদের আদর্শ মানি, পরজন্ম মানি, তাই এ শ্রাদ্ধ-বাসরে হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আসিয়াছি। হাসিতে পারিব না সত্য, কিন্তু কাঁদিয়াও তাঁহার নিকট অপরাধী হইতেও ত প্রাণ চাহে না। হে দেশ-প্রেমিক, ভিতর-বাহিরে কাঙ্গালিনী মায়ের অকৃত্রিম ভক্ত, ঘনঘটাচ্ছন্ন ভারতের বুকে আবার ফিরিয়া এস! আজ যে তোমার মত লোকের দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমৃতলালের স্মৃতি-তর্পণ

অমৃতলালের সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—যখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। আমার পিতৃদেব তখন, বর্ত্তমান ঝাঝা ষ্টেশন (তখন উহার নাম ছিল নওয়াডি) হইতে দুইটা ষ্টেশন উপরে, জামুই ষ্টেশনে এক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ছিলেন। কলিকাতায় আমাদের এক নিকট-আত্মীয় তখন মেট্রোপলিটন্ ইনষ্টিট্যুশনে (এখন যাহার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে) বি-এ ক্লাসের ছাত্র। তিনি কি একটা ছুটীতে, আমাদের নিকট বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতৃদেবকে বলেন, "একখানি নাটক বেরিয়েছে, তার নাম 'বিবাহ-বিভ্রাট'—ভারি চমৎকার বই হয়েছে।" বাবা তাঁহাকে বলেন, "তুমি কলকাতায় গিয়ে, সেই বই একখানি কিনে আমায় পাঠিয়ে দিও।" যথাসময়ে বাবার নামে বুকপোষ্ট আসিয়াছিল, এবং আমিই উহা খুলিয়াছিলাম। বেশ মনে পড়ে—চটি বই—গ্রে গ্র্যানিট্ রঙের কাগজের মলাট, তাহাও বেশ স্মরণ আছে—মূল্য চারি আনা। "বিবাহ-বিভ্রাট"এর রসগ্রহণ করিবার ক্ষমতা তখনও আমার জন্মে নাই, কিন্তু দেখিলাম, বাবা সেই বহি পড়িয়া এবং মাকে শুনাইয়া, হাসিয়া অস্থির, একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জামুই সহর মুঙ্গের জিলার একটা মহকুমা—জামুই ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। জামুই সহরে তখন অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেন। তখন "বেহার ফর্ দি বেহারীজ" ধুয়া উঠে নাই। হাকিম, উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কনট্রাকটার সবই বাঙ্গালী। রেলে যাতায়াতে এবং অন্যান্য কার্য্যে তাঁহারা ষ্টেশনে আসিতেন। কোনও বাঙ্গালী বন্ধু ষ্টেশনে আসিলেই বাবা উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহাকে "বিবাহ-বিভ্রাট"এর কথা বলিতেন। অনুরোধ করিতেন, "বইখানি পড়বেন। সে বই পড়লে মরা মানুষকেও হাসতে হবে।"

রসরাজের প্রথমা পৌত্রী ডালিয়া (সাবিত্রী)

আমি তখন জামালপুর স্কুলে পড়ি, ছুটীতে জামুইয়ে আসি। কয়েক মাস পরে, কোন্ এক ছুটীর সময় জামুইয়ে বসিয়া খবর পাওয়া গেল, জামালপুরের বাবুদের যে সখের থিয়েটার দল আছে, তাঁহারা অমুক রাত্রিতে "বীর-কলঙ্ক ও বিবাহ-বিভ্রাট" অভিনয় করিবেন। স্কুল খুলিতে তখনও ২।৪ দিন বাকী। "বিবাহ-বিভ্রাট" দেখিবার আশায় এক জন আত্মীয় ও এক জন বন্ধুসহ, পিতৃদেব আমাকে জামাল-পুরে রাখিতে চলিলেন। প্রেক্ষাগৃহে আমি অবশ্য আমার সহপাঠীদের সঙ্গেই বসিয়াছিলাম, এবং স্মরণ আছে, কোনও পাত্র কিংবা পাত্রী, কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি কি বলিবেন, তাহা উচ্চারণ করিয়া, সহপাঠীদের তাক্ লাগাইয়া দিতেছিলাম। যেমন, ঘটক বলিলেন, "আমি কুলাচার্য্য।" তৎক্ষণাৎ আমি নিম্নস্বরে বন্ধুগণকে বলিলাম, "কুলাচার্য্য না পাসাচার্য্য।" পরমুহূর্ত্তে, ষ্টেজে সেই ভদ্রলোক. যিনি টাকার তাগাদায় আসিয়াছিলেন, বলিলেন, "কুলাচার্য্য না পাসাচার্য্য।"—বিলাসিনী কারফর্ম্মা বলিলেন, "আপনি গড্ মানেন নাকি?" আমি পূর্ব্বেই বলিয়া দিলাম, "যে দি·

গ্যানট্ কিনেছি, সেই দিনই বুঝেছি গড্ নেই।"—পর-মুহূর্ত্তেই ষ্টেজে নন্দলাল বলিল, "যে দিন গ্যানট্ কিনেছি, সেই দিনই বুঝেছি গড্ নেই।"—ইত্যাদি। (পাঁচ বৎসর পরে নিজে যখন কলেজে প্রবেশ করিয়া ঐ বহি কিনিলাম, তখন জানিতে পারিলাম, গ্রন্থকারের নাম গ্যানট্ নহে, গ্যানো!)

গান আসিয়া সম-এ থামে। আশ্চর্য্যের কথা, ইহজীবনে অমৃতলালের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ, নাট্যমন্দিরে বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় উপলক্ষেই। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

অমৃতলালের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হইল, আমি যখন স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহযোগিরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদক হইলাম। আমি তখন গয়াতে প্র্যাকটিস করি,—প্রথম কয়েক মাস, মানসী বাহির হইবার ৫।৭ দিন পূর্ব্বে গয়া হইতে কলিকাতায় আসিতাম। অমৃতলাল তখন কম্বুলিয়াটোলায় ৮নং রামচাঁদ মৈত্রের লেনে বাস করিতেন। কলিকাতায় আসিয়া, "মানসী"তে লেখাইবার জন্য তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন, কয়েক সংখ্যা 'মানসীতে' তিনি লেখা দিয়াছিলেন। আমি বিবাহ-বিভ্রাটের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যখন বিবাহ-বিভ্রাট লিখেছিলাম, তখন দেশে হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালীর সংখ্যা দুই হাতের আঙুলে গণা যেত এবং তারা ছিল সবাই বিলেত-ফেরৎ। এখন ত বিলেত-ফেরৎ অবিলেত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেবে দেশ ছেয়ে গেছে। অবিলেত-ফেরৎই বেশী। এখন দেখবে, বেলা ৯টা ১০টার সময় বড় রাস্তার দু'ধারের গলি থেকে, পাণ চিবুতে চিবুতে বাঙ্গালী সাহেবরা বেরিয়ে ছুটে এসে ট্রাম ধরছে।" গয়ায় ফিরিয়া গিয়া, তাঁহাকে কিছু তামাক পাঠাইতে আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি গয়া হইতে তাঁহাকে এক কানেস্তারা গয়ার তামাক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

কলিকাতা আসিয়া আমি যখন স্থায়ী হইয়া বসিলাম, তখনও মাঝে মাঝে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। তাঁহার সৌজন্য, সহৃদয়তা, সরস বাক্যবিন্যাস আমায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। বহু বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন। কোথাও হঠাৎ সাক্ষাৎ হইলে, আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিতেন। এক দিন তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "বিলেত সম্বন্ধে ইংরেজি বাঙ্গলা কত বই পড়েছি, কিন্তু তোমার 'দেশী ও বিলাতী'র শেষ চারটি গল্পে বিলেতের ছবি আমার চোখে যেমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তেমন আর কোনও বইয়ে হয় নি।"—ইহার পর দীর্ঘকালের ব্যবধানে আরও দুই তিনবার তিনি আমায় এই কথাই বলিয়াছেন—পূর্ব্বেও যে বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় স্মরণ থাকিত না। অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমাকে কত লোক ত বই উপহার দেয়, তুমিও দাও। সবাইকার বই আমার ঘরে মজুদ আছে, কিন্তু তোমার বই একখানিও খুঁজে পাইনে। কে যে নিয়ে যায় জানিনে।"—আমি বিনীত হাস্যে উত্তর করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, আর এক সেট পাঠিয়ে দেবো।"—পাপ করিলাম—আত্মবিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ফেলিলাম;—আরও কত সময় কত কথা তিনি বলিয়াছেন, সে সব উল্লেখ করিয়া জ্ঞানকৃত পাপের বোঝা আর বাড়াইব না!

ইদানীং অমৃতলালের জন্মদিনে, "অমৃত-চক্র"এর সভ্যগণ তাঁহাকে লইয়া একটা উৎসব করিতেন। আমিও প্রতি বৎসর এই উৎসবে যোগদান করিতাম। তাঁহার শেষ জন্মদিন উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র যখন পাইলাম, তখন আমি রোগে শয্যাগত; যাইতে পারি নাই। পরে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার তুমি এলে না?" কেন আসিতে পারি নাই, তাহা নিবেদন করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তাই ত আমি বলি!—প্রভাত এল না কেন? আমার সঙ্গে সে কাশী মিত্তিরের ঘাট অবধি যাবে কথা রয়েছে—নিশ্চয়ই তার কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে, তাই আসতে পারে নি!"—তাঁহার শবানুগামী হইয়া আমার কাশী মিত্তিরের ঘাটে যাওয়ার কথা তখন আমি পরিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম—তখন কে জানিত যে, উহা এত শীঘ্র সত্য হইয়া দাঁড়াইবে!

বিগত ২০শে বৈশাখ, নাট্যমন্দিরে "বিবাহ-বিভ্রাট" অভিনয় করা হইবে স্থির হয়। আমি শিশিরকুমারকে বলি, "অমৃতবাবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা উচিত।" শিশিরকুমার উহা সাগ্রহে অনুমোদন করেন। অভিনয়ের দিন আমি নাট্যমন্দিরে গিয়া শুনিলাম, অমৃতবাবুকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠানো হইয়াছে। অমৃতবাবু পৌঁছিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি শিশিরকুমারের খাস কামরায় বসিয়া ছিলেন। শিশিরকুমার

বলিতেছিলেন, "আমার সাধ, আপনাতে আমাতে একসঙ্গে একবার নামবো। তরুবালা অভিনয় করবো,—আমি অখিল সাজবো, আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুর্দ্দা সেজে নামতে হবে।" অমৃতলাল বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একসঙ্গে নামবার সাধ আমারও অনেক দিন থেকে আছে,—আগে থাক্‌তে আমায় জানিও,—আমি নামবো বৈ কি!"—কিন্তু হায়, দুই জনের এই সাধ অপূর্ণ রাখিয়া, নিয়তি অমৃতলালকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

ঐ দিন ইহজীবনে অমৃতলালের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। 'ইহজীবনে' বলিলাম, কারণ, কাশী মিত্রের ঘাটে গিয়াও তাঁহার সহিত আমি দেখা করিয়াছিলাম।

সে দিন সন্ধ্যার পর বসিয়া আছি, বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, "অমৃত বোস মারা গেছেন। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়ে আসছিলাম, ষ্টার থিয়েটারের কাছে দেখি মহা ভীড়। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, অমৃত বোসকে নিয়ে যাচ্ছে।"—এ সংবাদে স্তম্ভিত হইলাম। কৈ, কবে তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, কিছু ত জানিতে পারি নাই! কিয়ৎক্ষণ পরে, আরও দুই জন বন্ধুর সমাগম হইল—'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী'-প্রণেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। উঁহারা বলিলেন, "চলুন, আমরা নিমতলার ঘাটে যাই। আমি বলিলাম, "নিমতলায় নয়, কাশী মিত্রের ঘাটে যেতে হবে।"—বলিয়া, সাশ্রুনয়নে, আমার প্রতি অমৃতলালের সেই নিদারুণ পরিহাস-বচনের উল্লেখ করিলাম।

আমরা চারি জনে, একখানা ট্যাক্সি লইয়া, কাশী মিত্রের ঘাটে গিয়া, অমৃতলোকপ্রস্থিত অমৃতলালের শেষ দর্শন লাভ করিয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলাম।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অমৃতলাল

হাসির চোখে আজকে কেন অশ্রু নেহারি—
কাঁদছে 'নিতাই' কাঁদছে 'মধু' কাঁদছে 'বেহারী'।
দোকড়ি আজ নত-নয়ন গীত যে গাহে না,
বিষণ্ণ সব—মুখ তুলে আর কেহই চাহে না।

হে দরদী কোবিদ কবি হেরব নাক আর
হাস্য দিয়ে ঢাকা তোমার তপ্ত আঁখি-ধার,
মনে প্রাণে হিন্দু তুমি নিপুণ নাটককার
বিদ্রূপেতে রুধ্‌লে তুমি নগ্ন অনাচার।

নীরব সমাজ-সংস্কারক নেইক ধমক্ ঠাট,
বই নহেক বোমা তোমার বিবাহ-বিভ্রাট।
ভণ্ডামিকে কশাঘাত কে করবে এমন আর—
সত্য কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি তোমার 'অবতার'!

দরাজ ছিল শ্যামল ছিল তোমার বুকের ভুঁই,
ফুটতো বেত আর বাঁশের পাশে জবা এবং যুঁই
রোষে তোমার ওষ্ঠ কাঁপে চক্ষে ঝরে জল,
পাণিফলের বনের পাশে পূজার শতদল।

এমন ক'রে এক-সাথেতে কান্না-হাসির ঢেউ
তোমার মত বহাতে যে পারবে না আর কেউ।
স্বদেশ-প্রেমিক, অকৃতজ্ঞ নয় বাঙ্গালী জাত
তোমার তরে সিক্ত আজি লক্ষ আঁখি-পাত।

হে রসরাজ অনুরাগী রসের ভিয়েনদার
রঙ্গ-রসের বঙ্গমঞ্চ আজকে আঁধিয়ার।
কেমন ক'রে তোমায় মোরা বলবো হে আজ মৃত
জীবন ধ'রে বিলাইলে কেবল যে অমৃত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অমৃত-প্রয়াণ

বাঙ্গালা তথা বাঙ্গালী জাতির বড় দুর্ভাগ্য, তাই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি দিক্‌পাল মায়ের কোল শূন্য করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। দেশের দুর্দ্দিনে যাঁহারা সকল আঘাত সহ্য করিবার জন্য বুক পাতিয়া দিতে পারিতেন, যাঁহারা মৃতকল্প জাতির কর্ণে সঞ্জীবনী মন্ত্র ঢালিয়া দিতে পারিতেন, যাঁহারা দুঃখ-যাতনা-পিষ্ট ভ্রাতা-ভগিনীর ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন, একে একে বাঙ্গালী তাঁহাদিগকে হারাইতেছে।

বঙ্গজননীর শ্যামায়মান কবিকুঞ্জের পরভৃত—রস-সাহিত্যের অবতার—নট-চূড়ামণি অমৃতলাল বসুকে সম্পূর্ণ অতর্কিতে কঠোর কাল আসিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়া বাঙ্গালীর হাসির উৎস শুকাইয়া দিল।

এ অভাব পূর্ণ হইবার নহে, হইবেও না। দেশবাসীর শুষ্ক প্রাণের বেদনা আপনার প্রাণে অনুভব করিয়া—তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার, তাহাদের চির-জ্বালাময় প্রাণে ক্ষণিক আনন্দ-প্রলেপ দিবার লোক আর মিলিবে কি? এ ক্ষতি যে জাতির পক্ষে কত বড়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

নাট্যাচার্য্যের প্রপৌত্রসহ পৌত্রী সুষমা

অমৃতলাল শ্যামবাজারের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারের সন্তান। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর অমৃতলালের অনুরাগ জন্মে। তাই তিনি কাশীগমন করিয়া তথাকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইহার পর পুনরায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া কিছু দিন চিকিৎসকের কার্য্য করেন এবং কয়েক বৎসর পরে চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিয়া পোর্ট-ব্লেয়ারে গমন করেন।

সেখানেও তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। পোর্ট-ব্লেয়ার হইতে ফিরিয়া তিনি সাহিত্য-সেবা ও নাটক অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এই সূত্রে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দু মুস্তফীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তিনি এই দুই নাট্য-সম্রাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অচিরে এক জন বিশিষ্ট নটরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' ছায়াচিত্রে 'কৃষ্ণকান্তের' ভূমিকার অভিনয় করিয়া শেষ-জীবনেও তিনি বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শুধু অভিনেতার কর্ত্তব্য পালন করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছিল—যেগুলির উচ্চ সৌধীন সৌধ আজও কলিকাতার বক্ষে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে—নাট্যকবি অমৃতলাল সেই প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। এখনও যে রঙ্গমঞ্চ নাট্যামোদিগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে—আজ যে শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায় সাধারণের নিকট অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে সসম্মানে অভিনয় করিতেছেন—আজ যে তাঁহারা সমাজবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন—তাহার প্রধান কারণ অমৃতলালের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা। সূচনার যুগে অভিনেতৃগণ সাধারণের দৃষ্টিতে হীন ও অবজ্ঞেয় ছিল, কিন্তু শিক্ষিত, শান্ত, সংযত অমৃতলাল

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়া সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অমৃতলালের বিয়োগে নাট্যজগৎ মহামূল্য কোহিনুর হারাইয়া ফেলিল—তাঁহার অভাব নাট্যজগতে প্রাচীনের সঙ্গে বর্ত্তমানের প্রীতিময় সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিল।

অমৃতলাল-রচিত বহু নাটক ও নাটিকা চিরদিনই আদরের সঙ্গে অভিনীত হইতেছে ও হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অমৃত-নির্ঝর—সর্ব্বজনমনোহর নাটক—বিশেষতঃ প্রহসন নাট্যজগতে চির-জ্যোতিষ্মান্ হইয়া বিরাজিত থাকিবে।

রস-পিপাসুদের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি কাঁঠালপাড়ায় 'বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনীতে' সভানায়করূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্মান অমৃতলালকে সাহিত্য-জগতে নিশ্চয়ই অমর করিয়া রাখিবে।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও অমৃতলালের স্থান খুব উচ্চে ছিল। সদা-প্রফুল্ল, সরল, খাঁটি বাঙ্গালী অমৃতলাল সমাজের যে কোন প্রকার কুসংস্কার লক্ষ্য করিতেন—যে কোন

বিলুপ্ত...
কথাবার্ত্তা...
কোন আন্দোলন...
মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি...
আঘাত করিতেন; কিন্তু সে
তেমনই আলাময়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন সমস্ত বঙ্গে একটা ... ছিল—যখন বাঙ্গালীর মরা প্রাণে দেশাত্মবোধের বন্যার সমস্ত আবিলতা দূর করিয়া দিয়াছিল, অমৃতলাল তখন নীরব ছিলেন না; সে প্রবাহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। হৃদয়-মন্দিরে দেশ-মাতৃকার চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীপদে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি দেশ-পূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মিরূপে দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। সে যুগে সভা-সমিতিতে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রোতার প্রাণে আশার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল এবং কর্ম্মীদের হৃদয়ে উৎসাহের উদ্দাম তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

আজ সেই অমৃতলাল আর আমাদের মধ্যে নাই। আজ সেই অমৃতের সন্তান, অমৃতের অবিনশ্বর আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন—আজ সেই নাট্যশালার সুনিপুণ চিত্রকর—বাণীর একনিষ্ঠ সাধক—প্রতিভা ও মনীষার বরপুত্র—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত মর-জগতের লীলা অবসান করিয়া চির-শান্তিময়, চির-ভূমাময় রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি এখনও সকলের হৃদয়ে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। সে স্মৃতি ত লোপ পাইবার নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে অমৃতলালের দান—বঙ্গীয় নাট্যকলায় তাঁহার কৃতিত্ব—একনিষ্ঠ দেশসেবা—বঙ্গবাসীর নিরানন্দময় জীবনে আনন্দের উচ্ছ্বাস আনয়নে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও উদ্যম চির-দিনই বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহাকে সদা জাগরূক রাখিবে।

শ্রীপঞ্চানন দত্ত।

বিবাহ-বিভ্রাটের নাট্যকার সমাজ-সংস্কারক অমৃতলাল

সুযোগ হইয়াছিল—অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল কি না, জানি না। তাই আমি সেই সম্পর্কে সামান্য দুই চারিটি কথা বলিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পাইব।

বাঙ্গালার অতুলনীয় রস-সাহিত্যিক অমৃতলালের প্রতিভা *সর্ব্বতোমুখী ছিল*, ইহা যেমন সত্য কথা, তেমনই তাঁহার জীবন অন্য মানুষের মত দোষে-গুণে জড়িত ছিল, এ কথাও সত্য। কিন্তু এই দোষে-গুণে জড়িত সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব এইটুকু ছিল যে, তাঁহার দোষের ভাগ গুণের তুলনায় এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, উহা সাহিত্যে আর্ষ প্রয়োগের ন্যায়ই মার্জ্জনীয়। তাঁহার অসংখ্য গুণরাশির মধ্যে একটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার ছিল, সেইটি তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম। এ দেশপ্রেমেরও একটু বিশেষত্ব ছিল। যে দেশপ্রেম ব্যাপকভাবে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, যাহার জন্য ফরাসী সৈন্য 'মার্সেল' সঙ্গীত শুনিলে অথবা মার্কিণ সৈন্য তারকা-লাঞ্ছিত পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইলে আপন-হারা—সর্ব্বস্ব-হারা কুলালচক্রের আকারে ঘর্ঘর-গর্জ্জনে প্রবহমানা উন্মাদিনী তটিনীর কূলপ্লাবী স্রোতোধারার মত ভীমা ভয়ঙ্করী ছিল না—এ কথা সত্য; তাহা গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় আর সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ডুবাইয়া দিত না, এ কথাও সত্য; কিন্তু তাহা *বড় মৃদু, বড় কোমল, বড় স্নিগ্ধ হইলেও বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড় মধুর! সে প্রেম বহির্জ্জগতের* বিরাট স্বদেশ সম্পর্কে বিকশিত হয় নাই, হইয়াছিল তাহা তাঁহার পিতৃ-পিতামহের অধ্যুষিত ক্ষুদ্র নিভৃত পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া!

যৌবনে যখন 'টেলিগ্রাফ' পত্র সম্পাদনের পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী' পত্রের সহযোগী সম্পাদকরূপে সম্পাদকীয় কক্ষে পরলোকগত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক বিহারীলাল সরকার ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তখন সেই কক্ষ বঙ্গের বহু খ্যাতনামা সাহিত্য-রথীর পদরেণু-পূত হইত। তন্মধ্যে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র বসু, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই সকল মনীষীর মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইত, সে সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার স্থানাভাব। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই সময় হইতেই স্বর্গীয় রসরাজ অমৃতলাল আমাদের স্নেহময় "দাদামশাই"এর পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং যখন সেই পরিচয় একই গ্রামবাসিত্বের পরিচয়ে পরিণত হইয়াছিল, তখন হইতে তিনি যথার্থ ই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃরূপে নানা বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছিলেন।

জেলা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার সদর বসিরহাট-সহর হইতে মাত্র এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী দণ্ডীরহাট ও ধলতিথা গ্রাম আমাদের পিতৃ-পিতামহের বহু প্রাচীন জন্মস্থান—ভাগীরথীতটবর্ত্তী মাইনগর হইতে তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। আমাদের দণ্ডীরহাট গ্রামের অতি সঙ্কীর্ণ খালের (ইছামতীর পূর্ব্বখাত) পরপারেই ধলতিথা, সেই স্থানেই অমৃতলালের পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি। এখনও সেই স্থানে তাঁহাদের প্রাচীন ভিটা বিদ্যমান, এখনও তথায় তাঁহাদের জ্ঞাতি বসুবংশ বসবাস করিতেছেন। অমৃতলাল বাণীর বরপুত্ররূপে জাতির শ্রদ্ধাপ্রীতির অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া যখন যশোমানের সুমেরু-শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন, তখনও কিন্তু তিনি এক নিমিষের নিমিত্ত তাঁহার পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি এই নিভৃত ধলতিথা পল্লীর আকর্ষণের মোহ ছেদন করিতে পারেন নাই। যখন তখন বলিতেন,—"ভায়া, আমাদের দেশের মত পাটালী গুড় কোথাও পাওয়া যায় না, আমাদের ইছামতীর মত মাছ ত কোথাও দেখি নাই, আমাদের অঞ্চলের সোনামুগ—আহা অমৃত!"

এই যে দেশজননী বলিয়া গর্ব্বানুভব করা, ইহা অমৃতলালে ব্যাপকভাবে বঙ্গজননীর প্রতি যতটা বিকশিত হইয়াছিল, ব্যষ্টিভাবে তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি তদপেক্ষা অনেক অধিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, ইহা আমি তাঁহার কথায় কাযে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে 'ভারতমাতাকে' বড় একটা চিনিতেন না, আমাদের শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা মায়ে'র সহিত তাঁহার অধিক পরিচয় ছিল; তিনি স্বজাতি বলিতে ভারতবাসীকে বড় বুঝিতেন না, বাঙ্গালীকেই বুঝিতেন। বাঙ্গালী কিসে বড় হইবে, বাঙ্গালী কিসে ভারতের শীর্ষস্থানীয় থাকিবে, বাঙ্গালী কিসে দেশ-বিদেশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির আদর্শ।

সামাজিক ক্ষেত্রেও অমৃতলালের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইত না, এখানেও গোষ্ঠী বা গণ্ডীই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি দেব-দ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন, প্রাচীনপন্থী বর্ণাশ্রমধর্ম্মী হিন্দুর মত ব্রাহ্মণকে বিশেষ সম্মান করিতেন ও প্রধান আসন প্রদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার 'বসু কায়স্থ' বলিয়া একটা আভিজাত্য গৌরব ছিল, উহা তাঁহার কথায় কার্য্যে ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি প্রায়ই পরিচিত কায়স্থকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—"কায়েতবাচ্ছা,তোর ভাবনা কি রে? কায়েত রমেশ মিত্তির প্রথম চিফজাষ্টিস হয়েছে, কায়েত রমেশ দত্ত প্রথম কমিশনার হয়েছে, কায়েত রাজেন্দ্রলাল মিত্তির সকলের বড় পণ্ডিত, কায়েত রাসবিহারী সেরা উকীল, কায়েত এস, পি, সিং সেরা ব্যারিষ্টার, কায়েত লালমোহন ঘোষ প্রধান বক্তা, কায়েত বিবেকানন্দ জগৎ জয় করেছে, কায়েত জগদ্বন্ধু ডাক্তার ডাক্তারের শ্রেষ্ঠ, কায়েত আচার্য্য জগদীশ আর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেরা বৈজ্ঞানিক" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই কায়স্থ বলিয়া গর্ব্বানুভবের আরও অনেক পরিচয় তাঁহার নিকট পাইয়াছি। যৌবনে আমাদের চুণাপুকুরে (অধুনা ডাক্তার জগবন্ধু লেন) একটি এমেচার থিয়েটার ছিল। সেই থিয়েটার অন্যান্য নাটকের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখর'ও অভিনয় করিয়াছিল। দাদামশাই সুবাদে নটরাজ অমৃতলাল উহার অভিনয় দেখিতে আসিয়া শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আজকাল অজ পাড়াগাঁয়েও এমেচার দলের ছড়াছড়ি; সকলেরই মুখে শুনতে পাই, তারা ষ্টারের চেয়েও প্লে ভাল করেছে। অথচ পাবলিক থিয়েটার প্লে না দেখালে যে আপনার মাথা হ'তে বার ক'রে কেউ থিয়েটারের অভিনয় ক'রে সফল হ'তে পারে, এ বিশ্বাস আমার নেই। লেখক লিখে যান, কিন্তু তাঁর রচনাকে মূর্ত্তি দেয় পাবলিক থিয়েটার। তাই দেখে এমেচাররা শিখে থাকে। তবুও বলে, পাবলিকের চেয়ে ভাল করেছে! বড়

জোর তারা বলতে পারে, অনুকরণটা খুব ভাল করেছে, এই মাত্র! তবে তোমাদের মধ্যে যিনি চন্দ্রশেখরের পার্ট করেছেন, তাঁর নাম সার্থক হয়েছে; তিনিও অমৃতবাবু, আমাদের ষ্টারের চন্দ্রশেখরও অমৃতবাবু; দু'জনেই দেখতে প্রায় একই রকম, আর দু'জনেই কায়স্থ! কায়স্থ বলেই অভিনয় এত ভাল হয়েছে।"

ভারতীয়ের মধ্যে যেমন তিনি কায়স্থকে ভালবাসিতেন, তেমনই ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাকে ভালবাসিতেন, আবার বাঙ্গালার মধ্যে তাঁহার পিতৃপিতামহের ধলতিথা গ্রামখানিকে ভালবাসিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "চল, একবার বাপপিতোমোর ভিটেটা দেখে আসি।"

অধিক দিনের কথা নহে, গত শীতকালেও তিনি বলিয়াছিলেন, "ভায়া, চল, এই গুডফ্রাইডেতে একবার দেশটা বেড়িয়ে আসি। দেখ, বেশী ভীড় করা হবে না, কেবল তুমি আর আমি, আর বড় জোর তোমার Cousin হরি (ডাক্তার জগবন্ধু বসুর পুত্র নগেন্দ্র—ডাকনাম হরি)। ঐ গোলমাল ঝামেলা চাই নে। সেই যে গেলেই পাঁচ জন এসে ধ'রে বসবে, মিটিং কর, বক্তৃতা দাও, ও সব হবে না। ও সব ঢের হয়ে গেছে। বসিরহাটে অমন দু'চারবার হয়ে গেছে। এবার চুপি চুপি, নিরিবিলি—আমার বাপপিতোমোর ভিটের ধূলো মাথায় দিয়ে আসবো গিয়ে—কেউ জানতে পারবে না।" কথাগুলা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল!

এমনই ছিল তাঁহার 'দেশের' প্রতি আন্তরিক টান! তিনি বিশ্বপ্রেম অথবা দেশপ্রেম যে বুঝিতেন না বা জানিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কাছে উহা হইতেও বড় ছিল কবির সেই অমর বাণী,—

> "ধেনু চরা তোমার মাঠে
> পারে যাবার খেয়াঘাটে
> সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
> তোমার পল্লী-বাটে"

সেই স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াশীতল ক্ষুদ্র পল্লীবাটখানিই তাঁহার অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু রসরাজের সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। সেই গুডফ্রাইডেতে তাঁহাকে বাঙ্গালা জননীর বড় পল্লীবাটে বড় সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইতে হইয়াছিল। 'পাবলিক ম্যান' হওয়ার, বড় সাহিত্যিক হওয়ার ইহাই দণ্ড!

অমৃতলাল একাধিক বার দণ্ডীরহাট ও ধলতিথার বসু-বংশের এবং বসিরহাট মহকুমার কৃতি সন্তানগণের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। তাহা না হউক, কিন্তু এই বিরাট্ পুরুষের মধ্যে পিতৃপিতামহের ক্ষুদ্র ধ্বংসোন্মুখ ভিটার প্রতি যে আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার করুণ স্মৃতি আমাদের মত দীনাতিদীন ভক্ত অনুরক্ত গুণমুগ্ধের মনে আমরণ শান্তিসুখ প্রদান করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বৃদ্ধ, নবীন যুবা, কৌতুক-সাগর,
বাগ্মিবর, নাট্যাচার্য্য, নট-চূড়ামণি,
দণ্ডিতে ভণ্ডেরে তুমি রচিলে বিস্তর
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাব্য অমৃতের খনি।

স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ওহে যাদুকর,
তব সিদ্ধ যাদুমন্ত্র-প্রভাব এমনি,
গুণে তার বঙ্গ ব্যাপি' বহু নারী নর
স্তব্ধ হয়ে ছিল যথা মন্ত্রমুগ্ধ ফণী।

সুদীর্ঘ জীবন তব কর্ম্মে নিরন্তর
ছিল ব্যস্ত—কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ বলি' তোমা গণি,
কোলে নিতে তাই তব শ্রান্ত কলেবর
আইলা প্রসারি' হস্ত জগত-জননী।

শুভ্র কেশে শুভ্র বেশে যাও, কবিবর,
বহে যথা শুভ্র স্বচ্ছ অমৃত-নির্ঝর।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু
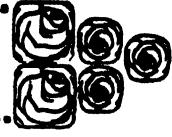
নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের প্রতিভা সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁহার প্রতিভা সমালোচনা করা বা তাঁহার জীবন-চরিত লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে এক বৎসর অমৃতলালের একটু সংস্পর্শে আসায় তাঁহার জীবন-চিত্রের যতটুকু অংশ আমার মনের উপর অঙ্কিত হইয়াছিল, ততটুকুমাত্রই আমি এই দুর্ব্বল লেখনী দ্বারা চিত্রিত করিব।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের ফলে এ দেশে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুত হৃদয়কৃষ্ণ দে এম, এ, মহাশয় ও এই দীন লেখক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করেন। পরে ঐ বৎসরের ৭ই মে স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয় ও কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে "সারস্বত বিদ্যালয়" নামে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কয়েক মাস পরে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এই সময় হইতেই আমরা অমৃতলালের একটু সংস্পর্শে আসি।

রসরাজের পিতা স্বনাম-ধন্য কৈলাসচন্দ্র বসু

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অমৃতলালের সহিত আমাদিগের প্রথম পরিচয় হয়। কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া-নিবাসী পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের এক জন সভ্য ছিলেন। এক দিন তাঁহার বাটী হইতে গৃহে ফিরিবার পথে সাহিত্য-সভার সভ্য ও ক্যাথিড্রাল মিসন্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখা হইবামাত্রই তিনি আমাকে স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমরা অমৃতলাল বোসের কাছে গেছলে? লোকটা একটা মানুষের মতন মানুষ। থিয়েটারেও রত্ন থাকে। লোকটাকে তোমাদের স্কুলের মেম্বর করলে ভাল হয়।" হৃদয়কৃষ্ণ বাবুকে লইয়া সেই দিবস রাত্রি আন্দাজ সাড়ে ৭টার সময় অমৃতবাবুর ভবনে উপস্থিত হইলাম।

নীচের তলা হইতে অমৃতবাবুকে আমাদিগের আগমন-বার্ত্তা জানান হইলে এক জন লোক আসিয়া আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল। একতলার ছাদের উপর একটি সামান্য তক্তপোষের উপর সতরঞ্চি বিছাইয়া দীর্ঘ-কুঞ্চিত শুভ্র কেশযুক্ত অমৃতবাবু বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি গুড়গুড়ি, নলটি তাঁহার ওষ্ঠাধরসংলগ্ন।

আমরা নিকটে যাইয়া নমস্কার করিলে তিনি আমাদিগকে তক্তপোষের উপর বসিতে বলিয়া তাঁহার নিকট যাইবার কারণ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমরা বিদ্যালয়ের সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের বিদ্যালয়ের এক জন সভ্য হইতে অনুরোধ করিলাম। ইহাতে তিনি বেশ সহজভাবে আমাদিগের বিদ্যালয়ের সভ্য হইতে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ-চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের এই হতভাগিনী বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার করা অতি কঠিন কার্য্য। অথচ এই শিক্ষা ব্যতীত এই হৃতগৌরব বঙ্গমাতার উদ্ধারসাধনও অসম্ভব। মনে আছে, ঐ রাত্রিতে

তিনি সতেজে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি কখনও বঙ্গমাতার দুঃখের অবসান হয়, তাহা হইলে তাঁহার দরিদ্র ও পদদলিত শ্রমজীবী সন্তানদিগের দ্বারাই উহা সম্ভবপর হইবে। এই কথাগুলি বলিবার সময়ে তাঁহার মুখে ও চক্ষুর্দ্বয়ে এমন একটা ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিয়াছিলাম, যাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই। কথাপ্রসঙ্গে য়ুরোপের অনেক সভ্যদেশের জনশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের নিকট তিনি অনেক কথা বলিয়া শেষে পুনরায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত না আমরা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ভালবাসিব ও তাহাদিগেরই মত হইয়া তাহাদিগেরই নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায়গুলির প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা জাগাইতে পারিব, তত দিন পর্য্যন্ত এই হতভাগিনী বঙ্গভূমির সুখরবি পুনরায় উদিত হইবে না।

অধ্যাপক বন্ধু তাঁহার ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন যে, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ১০টা। তখন আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইবার জন্য একটু ব্যস্ত হইলাম। অমৃতবাবু আমাদিগকে আর একটু বসিতে বলিয়া অনেক কথা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জন ভৃত্য দুইখানি মিষ্টান্নপরিপূর্ণ থালি আনিয়া আমাদিগের সম্মুখে রাখিলে পর অমৃতবাবু আমাদিগকে সস্নেহে বলিলেন, "দেখুন, আমাদের হিঁদুর বাড়ীর রীতিনীতিগুলো বড় ভাল" ইত্যাদি। আমার অধ্যাপক বন্ধু প্রথমে একটু লজ্জা করিতেছিলেন ; কিন্তু আমি অমৃতবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্ষুধার জ্বালায় খাবারগুলিকে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। অমৃতবাবুর কথা অফুরন্তভাবেই চলিতেছিল। ভৃত্য আসিয়া জল ও পাণ দিয়া গেল। আমরা জল পান করিলাম। এইবার একটু গোল বাধিল। আমার অধ্যাপক বন্ধু তাম্বুলপ্রিয় ছিলেন না ; কিন্তু আমিও তদ্রূপ হইলেও সম্মুখে পাইলে যে দুই একটি তাম্বুলকে ক্ষতবিক্ষত করিতাম না, এ কথা বলিতে পারি না। তবে, কি জানি, অমৃতবাবুর সম্মুখে তাম্বুলগুলি চর্ব্বণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কিন্তু শেষে রসরাজের রসিকতায় আমার "ভালছেলেগিরি" কোথায় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তখন একটি তাম্বুল গ্রহণ করিলাম। অমৃতলালের সমাজ "সেকেলে সমাজ", তাই তাঁহারই সমাজবন্ধনে আবদ্ধ ও মুগ্ধ হইয়া আমরা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও খাঁটি বাঙ্গালী হইতে পারিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা অমৃতবাবুর ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বাঁকুড়া জেলার ভূতপূর্ব্ব জেলা-জজ ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উকীল শ্রীযুত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগের এক জন সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি এক দিন হৃদয়কৃষ্ণবাবু ও আমাকে বলেন যে, আমাদিগের বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার এক জন স্থায়ী সভাপতির প্রয়োজন। হঠাৎ এক দিন অমৃতবাবুর বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেই দিন তিনি তাঁহার পুস্তকাগারে একখানি পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুন, কি খবর ?" আমি তাঁহাকে স্কুলের এক জন স্থায়ী সভাপতি-নির্ব্বাচনের কথা বলিলাম। পুস্তকখানি মুড়িয়া রাখিয়া আমাকে বলিলেন যে, "পতি শব্দ ভাল নহে, তবে গুরুমহাশয়ের হাঁকডাকে অনেক সময়ে অনেকটা কায হয় সত্য।" একটু সাহস পাইয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, এ সময়ে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাইলে ভাল হয়। তবে তিনি বড় বড় কাযে ব্যস্ত, রাজি হইবেন কি না সন্দেহ। রাজী হইলেও তাঁহার দ্বারা স্কুলের বিশেষ কিছু কায হইবে কি না, তাহাও অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অমৃতবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "হরিতে কিছু থাক্ আর না থাক্, বিপদের সময় 'হরি হরি' ব'লে ডাক্‌লেও মনে কিন্তু একটা আশা ও শক্তি আসে।"

পরদিন প্রাতঃকালে সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধ্যাপক হৃদয়কৃষ্ণবাবুকে আমি অমৃতবাবুর মত বলিলে পর তিনি আমাকে লইয়া বেঙ্গলী আফিসে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখা হইল না। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ তখন শিমুলতলায়।

পরামর্শ করিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। ৩।৪ দিনের মধ্যে শিমুলতলা হইতে উত্তর আসিল, সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি হইতে সম্মত আছেন। ইহারই দুই দিন পরে আমি সুরেন্দ্রনাথের পত্রখানি লইয়া দেখা করিতে যাইলে অমৃতবাবু আমাকে বলিলেন যে, এইবার আপনারা ভাল করিয়া কায করিবেন ; কেবল কালীর আঁক-কাটা কাগজখানাকে সার ভাবিবেন

না, উহার মধ্যে যতটা শক্তি আছে, ততটা শক্তি গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইবেন। তাঁহার এই সাবধান-বাণী যে এক দিন সত্যে পরিণত হইবে, তাহা তখন আমরা আদৌ ভাবি নাই। বাঙ্গালী-চরিত্রের দুর্ব্বলতা তাঁহার সূক্ষ্ম ও তীব্র দৃষ্টিকে বড় একটা এড়াইতে পারিত না। আজ সারস্বত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নাই। তাই আজ বুঝিতেছি যে, তাঁহার সাবধান-বাণীমত চলিলে আজ আমরা মাতৃসেবা-বিরত হইয়া কখনই প্রত্যবায়ভাগী হইতাম না!

এই সময়ে হৃদয়কৃষ্ণবাবু মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের যত্নে ভিক্টোরিয়া কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া কুচবিহারে যাত্রা করিলেন। তখন এক দিন পথিমধ্যে অমৃতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে হৃদয়কৃষ্ণবাবুর অভাব-জনিত নানাপ্রকার অসুবিধার কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সতেজে বলিলেন, "হৃদয়ে কৃষ্ণ থাক্‌লে কি কখন দুঃখ, অভাব থাকে?" যিনি ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভাবলে আপন গরিমাময়ী লেখনী দ্বারা এই বঙ্গদেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মহাত্মার ন্যায় বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তখন নিতান্ত যুবক; তাই তাঁহার ঐ মহামূল্যবান্ কথাটির প্রকৃত স্বরূপ আমার চঞ্চল চিত্তের উপর তখন প্রতিফলিত হয় নাই। সত্যই যাহারা পরের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের সে কার্য্য কিছুদিনের জন্য দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করত মেদিনী কম্পিত করিয়া শেষে এক মহানিষ্ক্রিয়তায় পরিণত হয়।

কলিকাতায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "ভারতীয় জাতীয় মহাসভা" বসিবার চারি দিন মাত্র বাকি ছিল। ঐ বৎসর কলিকাতায় এক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ভারতের নানা স্থান হইতে কলিকাতায় প্রতিনিধিরা ব্যতীত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরও সমাগম হইয়াছিল। এই হেতু বিতরণার্থ আমাদিগের বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানপত্র সেই সময় প্রকাশিত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইল। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে এরূপ একটা বিষয় লেখা বড় শক্ত। কাযেই কোন বন্ধুর দ্বারা উহা লিখাইয়া লইতে পারা গেল না। আমি তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পরক্ষণেই অমৃতবাবুর একটি কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িল। অমৃতবাবু এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ভাল কাযে একগুঁয়ে হওয়া ভাল, এরূপ একগুঁয়েদের অসুর হইতে দেবতারা পর্য্যন্ত ভয় করে। তাঁহার কথাটি মনে পড়ায় নিজেই অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ইংরাজীতে এক সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান-পত্রের খসড়া তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম।

পরদিন আমি অমৃতবাবুর সহিত দেখা করিয়া উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রের পাণ্ডুলিপিখানি তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি আমাকে বেশ ভৎর্সনা বাক্যে বসিলেন,—"এটার কি কামড়! মা'র দেওয়া ভাষায় মাকে ডাক্‌লে কি আপনাদের গলা ধরে?" আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। গত কল্যকার ঘটনা ও অদ্যকার ঘটনার মধ্যে কি ভীষণ পার্থক্য! যাহা হউক, অমৃতবাবু পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতে লাগিলেন এবং আমিও তাঁহাকে যৌবনসুলভ চপলতা হেতু বলিতে ছাড়িলাম না, "ইংরাজীতে লিখলে ভারতের সমস্ত লোকই স্কুলের কথা বুঝতে পার্‌বে। বাঙ্গালায় লিখলে ত ভারতের সব জাতীয় লোক বুঝতে পারবে না।" এই কথায় তিনি বেশ একটু ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা নিজের পাড়ার ভায়েদের ভাষায় তাদের লাঙ্গল-কাস্তের ভজন গেয়ে মা-লক্ষ্মীদের হাঁড়ী, ঢেঁকী বজায় রাখতে পারি না, আমরাই আবার বিকট গান, (Gun) রাণ (Run) শব্দ ক'রে ভূতের ভয় দেখিয়ে অন্য পাড়ায় বল্‌তে ছুটি, ওগো, ভয়ে পালিয়ো না, শোন, শোন, স্থির হও, নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।" আমি এই অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়া নিরুত্তর রহিলাম। মিনিট কয়েক পরে অমৃতবাবু পাণ্ডুলিপিতে লিখিত এই বিদ্যালয় কৃষকদিগের হস্তে লাঙ্গল ও তন্তুবায়দিগের হস্তে তাঁত দিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিবে—অংশটুকু পড়িয়াই উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, যদি সত্যই এই কথাটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একটা কাযের মত কায হয় বটে; কিন্তু আমরা কি তাহা সহজে পারিব? কি অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিকতা! এই স্বদেশ-প্রেমের ছবিখানি কাহার না হৃদয়ে ঝুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়? অমৃতলালের স্বদেশানুরাগ গভীর, শান্ত ও মর্ম্মভেদী! বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে দৃষ্টি আমাদিগের নাই। আমরা পরের চক্ষু দিয়া নিজের ভাষা, নিজের জ্ঞান, নিজের ধর্ম্ম, নিজের কর্ম্ম ও নিজের গৌরব দেখিয়া গর্ব্ব অনুভব

করিয়া থাকি। আমরা অন্ধ! যে দিন আমরা নিজ ভাষাকে আদর করিতে শিখিব ও যে দিন আমরা লাঙ্গলবাহী কৃষক ও তন্তুবায়দিগকে ভাই বলিতে শিখিব, সেই দিনই আমরা চক্ষুষ্মান্ হইব ও আমাদিগের সকল দুঃখের অবসান হইবে। পরের ভাষা দিয়া ও পরের ভাব লইয়া "অন্য পাড়ায়" "নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াবার চেষ্টা কর" বলিতে যাওয়া সত্যই ধৃষ্টতা। যখন কেহ নিজ ঘরে সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যশস্বী হয়েন, তখন তাঁহার নিজ যশই "অন্য পাড়ার" লোকদিগকে আহ্বান করে ও তাহাদিগকে কৃতী হইতে শিক্ষা দিয়া তাঁহার সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করে।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল রঙ্গমঞ্চ-কুহকের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার বৈশিষ্ট্যকে অপ্রতিহত রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল, ঈশ্বর তদুপযোগী ক্ষেত্র দিয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চ-আবরণটি ছিল বলিয়াই অমৃতলালের অভিনয়-সৌন্দর্য্য, গীত-মাধুর্য্য, সাহিত্যিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সামাজিকতা, সহৃদয়তা ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি অমৃতলালেরই হইতে পারিয়াছিল। ইহা ভাবিয়া দেখিলে সত্যই আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। যখনই এই বিস্ময় আমাদিগের মনে সঞ্চারিত হইবে, তখনই আমরা অমৃতলালের প্রকৃত স্বরূপকে দেখিতে সমর্থ হইব। আজ অমৃতলাল মহাপ্রস্থান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনের কখনই সমাপ্তি হইবে না; সুদূর-ভবিষ্যতে অমৃতলাল সকলের আরও আদরের সামগ্রী হইয়া যথার্থই এই নশ্বর পৃথিবীতে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মহাত্মার ন্যায় "অমৃত" হইয়াই থাকিবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

অমৃতলাল বসুর স্মৃতি-তর্পণ

নিরানন্দময় বাঙলা দেশের না জানি কি ভাগ্যবলে
অভাগ্য এই বঙ্গমাতার না জানি কি কর্ম্মফলে,
হাস্যরসিক পুরুষ-রতন লভেছিলে জন্ম তুমি
কৃতার্থ আজ লভিয়া তোমায় ক্ষুদ্র তব মাতৃভূমি।

আজীবন ধরি করিয়াছ তুমি বাণীর সাধনা নিত্য
সুচির হাস্যে কাল কাটায়েছ প্রফুল্ল ছিল চিত্ত।
বয়সের তুমি হও নাই বাধ্য তরুণের ছিলে সাথী
সরস মনের পরিয়ে দেছ যুবার আনন্দে মাতি'।

হাস নাই শুধু নিজে আজীবন হাসায়ে' গিয়াছ সবে
তোমার হাসির সুমধুর স্মৃতি চির-উজ্জ্বল রবে।
সমাজের তুমি ছিলে হিতকামী খ্যাতনামা সামাজিক
সমাজের যত দোষ অনাচার দেখা'য়েছ নির্ভীক।

তোমার কঠোর বিদ্রূপ-বাণী সুতীব্রকশার মত
গর্ব্বোদ্ধত স্বেচ্ছাচারীর করিয়াছে মাথা নত।
নাট্য-জগতে রাখিয়া গিয়াছ তোমার অমর কীর্ত্তি,
বহুকাল ধরি লোকের মনেতে দিয়াছ অগাধ তৃপ্তি।

বাঙ্গালীর তুমি চির-গৌরবের, প্রিয়তম বাঙ্গলার
তোমার বিহনে বাঙ্গলা জুড়ি' উঠিয়াছে হাহাকার।

কে শুনাবে আর জনে জনে ডাকি "বিবাহ-বিভ্রাট" কথা
"বিজয়-বসন্ত" করুণ কাহিনী "তরুবালা"-মর্ম্মব্যথা,
কার প্রহসন হাসির লহর ছুটাবে বঙ্গ-মাঝে
বঙ্গভাষাকে কে আর সাজা'বে নিতুই নূতন সাজে?

* * * *

আজি বরষায় বিরহ যে গেছে সারা জগতের বক্ষে
বিরাম-বিহীন ঝরিছে অশ্রু প্রকৃতি দেবীর চক্ষে
হে রসিক কবি! বুঝিয়াছ তুমি এই বিরহের অর্থ
অদৃশ্য আহ্বান তাই আজি তুমি হইতে দিলে না ব্যর্থ।

চলিয়া গিয়াছ ধরাধাম হ'তে অতি নির্ভুল তাহা
চির-অমরত্ব করিবে প্রকাশ রাখিয়া গিয়াছ যাহা।
হে অমৃতলাল, বঙ্গমাতার পরম স্নেহের দান
অসীম অনন্ত অমৃত লোকের পাও যেন সন্ধান।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে।

অমৃত-স্মৃতি

স্বর্গত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে নানাভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার বৈচিত্র্যময় কর্ম্মজীবন আমার হৃদয়ের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার সহিত আমার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধই আমাদের উভয়ের নিকট চিরদিন বড় আদরের বস্তু ছিল। তিনি লোকের নিকট এইভাবে আমার পরিচয় দিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। আমার বয়স যখন ১১।১২ বৎসর, সেই সময়ে আমি শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী হইতে তৎ-সংশ্লিষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া-ছিলাম। অমৃতবাবুর বয়স তখন ১৯।২০ বৎসর। কোন কারণে বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে অমৃতবাবু আসিয়া আমাদের ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি যে পাঠ দিতেন, তাহাতে আমরা সবিশেষ লাভবান্ হইতাম। তখন বোধ হয় অমৃতবাবু প্রথম নাট্যশালায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতে-ছেন। এই সময়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আরও দুই জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা কিছু দিন আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন নটকুলতিলক ৺অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তোফি এবং অপর ব্যক্তি ৺ধর্ম্মদাস সুর। ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইংরাজী কবিতা-পুস্তকে তিনি Old Englishঅক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। লেখাটি ঠিক ছাপার লেখার মত ছিল। এই পুস্তকখানি বহুদিন আমরা যত্নের সহিত আমাদের বাটীর পুস্তকালয়ে রক্ষা করিয়াছিলাম।

শিক্ষক অমৃতলাল

অমৃতবাবু এক সময়ে শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং কিছু দিন এই বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করেন। শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রথমতঃ "ছাত্রবৃত্তি" পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। পরে ইহা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার ছাত্রগণ বিভাগীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ৺পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় এই বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারই অধ্যাপনার গুণে বিদ্যালয় প্রতি বৎসর পরীক্ষায় এরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইত। কম্বুলিয়াটোলার মৈত্র-বংশ পুরুষানুক্রমে এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করি-তেন। বিদ্যালয়-পরিচালনা হিসাবে যাহা কিছু ক্ষতি হইত, তাহা তাঁহারা দিতেন এবং লাভের অংশও গ্রহণ করিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৺জগদ্বন্ধু মোদক ও ৺অমৃত-লাল বসুর চেষ্টায় এই বিদ্যা-লয়ের ভার একটি কমিটীর উপর ন্যস্ত হয় এবং বিদ্যা-লয়ের যাহা কিছু আয়, তাহা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে, ব্যক্তিগতভাবে কাহারও উহার উপর অধিকার থাকিবে না, ইহাই স্থির হয়। স্কুলের কয়েকজন পুরাতন ছাত্র লইয়া এই কমিটী গঠিত হয় এবং অমৃতবাবু ইহার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাকে সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মৈত্র-বংশের এক জন বংশধর তখনও জীবিত ছিলেন বলিয়া অমৃতবাবু স্বেচ্ছায় সম্পাদকের পদ তাঁহাকে প্রদান করেন। সহকারী সম্পাদক হইলেও তিনি প্রথম হইতেই সম্পাদকের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং কিছু দিন পরে স্থায়িভাবে সম্পাদকের

কার্য্য গ্রহণ করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে এই স্থানেই তাঁহার সহিত আমার দ্বিতীয় পরিচয়। আমি ১৯০৭ সাল হইতে আজি পর্য্যন্ত এই স্কুল কমিটীর সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং ২২ বৎসর কাল অমৃতবাবুর সহিত একযোগে এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়া আসিতেছি। পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক ও অমৃতবাবুর উদ্যোগে, যত্নে ও চেষ্টায় এই বিদ্যালয়টি মধ্য-ইংরাজী আদর্শ হইতে হাইস্কুলে

শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের শিক্ষকবৃন্দসহ রসরাজ

উন্নীত হইয়াছে এবং নিজস্ব ত্রিতল (দুইটি) আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জমী ক্রয় করিয়া প্রথম ত্রিতল গৃহ প্রস্তুত হইতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। স্কুলের আয়, পুরাতন ছাত্রবৃন্দ এবং বিদ্যালয়ের কতিপয় হিতকামী বন্ধুগণের অর্থসাহায্য দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং ইহার জন্য ৺জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই বাটী নির্ম্মাণের পর বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে পরিণত করিবার ইচ্ছা কমিটীর মনে উদয় হয় এবং এই প্রস্তাব লইয়া ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৺অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েক জন কমিটীর সভ্য তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ হর্ণেলের (Hornell) সহিত সাক্ষাৎ করেন। হর্ণেল্ ও তাঁহার সহকারী মিঃ ডন্ (Dunn) বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন এবং প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহারা অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া বাটী নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয় গভর্ণমেণ্ট হইতে দিবার প্রস্তাব করেন। এই সময়ে অমৃতবাবু বিদ্যালয়ের যে উপকার করিয়াছিলেন, বিদ্যালয় তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। হর্ণেল্ ও ডন্, দুজনেই অমৃতবাবুকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভিনেতা ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহারা তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। অমৃতবাবু তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, বিদ্যালয় প্রথম বাটী নির্ম্মাণের জন্য কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোনরূপে আর অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। গভর্ণমেণ্ট সমগ্র খরচ না দিলে উহাকে হাই স্কুলে পরিণত করিবার আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যকুশলতা

সম্বন্ধে মিঃ হর্ণেলের ধারণা অতি উচ্চ ছিল এবং ইহা হাই স্কুলে পরিণত হইলে সহরের এ অঞ্চলে বালকদিগের সুশিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা হইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বন্ধু অমৃতলালের, বালকদিগের সুশিক্ষা সম্বন্ধে ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। অমৃতবাবুর সনির্ব্বন্ধ আবেদন বিফল হইল না। তিনি নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য জায়গা খরিদ সমেত সমস্ত ব্যয় (৫৩৪৩৬৲) মঞ্জুর করিলেন। অমৃতবাবু ১২ হাজার টাকা বেশী ব্যয় হয়। কি করিয়া এই দেনা শোধ হইবে, ইহাই তাঁহার বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছিল। তখন মিঃ হর্ণেল্ হংকং চলিয়া গিয়াছেন, মিঃ ওটেন্ (Oaten) শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা। হুগলী কলেজ্ হইতে নদী পার হইবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া মিঃ ডনের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে, মিঃ ওটেন্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। মিঃ ওটেন্ আমাদের বিদ্যালয়ের ও অমৃতবাবুর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অমৃতবাবুর দেনা শোধের জন্য পুনরায় ৮ হাজার টাকা

শ্যামবজার ইংরাজী বিদ্যালয়—সম্মুখের দৃশ্য

স্বয়ং দিবারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া ত্রিতল নূতন বাটী নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিলেন। ইহাতে তিনি যে কত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, কত সময় ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই বাটীর প্রত্যেক ইটখানি তিনি নিজে দাঁড়াইয়া গাঁথাইয়াছিলেন, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

বিদ্যালয়ের সুবিধার জন্য তিনি নক্সার অতিরিক্ত দুই একটি ঘর তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। ইহার জন্য প্রায় এবং বিদ্যালয়ের আসবাব ক্রয় করিবার জন্য ৩ হাজার ২ ... ৯৭ টাকা মঞ্জুর করেন। বাকি টাকা অমৃতবাবু চাঁদা করিয়া তুলিয়া ঋণ ও চিন্তার দায় হইতে মুক্ত হন। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে ১ হাজার টাকা তুলিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত হইবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি হৃদয়ে কিরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, এই কার্য্য তাহার প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সময় হইতেই বিদ্যালয়ের বাটী তাঁহার আবাস-গৃহে পরিণত হইয়াছিল। আহার ও নিদ্রা ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় দৈনিক কার্য্য বিদ্যালয়-বাটীতেই সম্পন্ন হইত। গত কয়েক বৎসর-মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যাহা কিছু দান করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় তিনি এই বিদ্যালয়-বাটীতে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় ও মিলন এই বিদ্যালয়-বাটীতেই সম্পন্ন হইত। অপরাহ্ণ সাড়ে ৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবং রাস্তার ধারে তাঁহার বসিবার গৃহে একটি বৃহৎ মজলিস্ বসিত এবং তথায় নানা বিষয়ের আলোচনায় এবং নির্দ্দোষ রহস্যালাপে সমবেত সুধীবর্গের সময় অতি সুখে ও আনন্দে অতিবাহিত হইত। যিনি একবার অমৃতবাবুর মজলিসে যোগদান করিতেন, তিনি রসভোগের জন্য তথায় পুনরাগমনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এই মজলিসে "ছেলে বুড়ো" সকলেই যোগ দিতেন; অমৃতবাবুর নিকট সকলেরই সমান আদর ছিল। বয়স মিলাইয়া সকলের সহিত রঙ্গরস করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রঙ্গরসের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, উহা হাসির ফোয়ারা সৃজন করিলেও কখনও কুরুচিদুষ্ট ছিল না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সতীর পতি" নামক গ্রন্থে অমৃতবাবুর মজলিস্-গৃহে অবস্থান সম্বন্ধে যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, এ স্থানে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল—

—"কিয়দ্দূর আসিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডাহিন দিকে 'অ্যাংগ্লো ভার্ণাকুলার স্কুল্' গৃহ। রাস্তার (শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্) ধারের একটি কক্ষে খোলা জানালায় দেখিতে পাওয়া গেল, দীর্ঘ পক্ককেশ এক জন বৃদ্ধ, মেঝেয় ফরাস বিছানার উপর বসিয়া কি সব কাগজপত্র দেখিতেছেন। হীরালাল দাঁড়াইয়া সেই দিকে বিপিনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিল, 'ওহে, উনি কে জান?'

"বিপিনবাবু সে দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'অমৃত বোস না?'

"হীরালাল পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, 'হাঁ আমরা থিয়েটারের লোকেরা ওঁকে ভুনি বাবু বলি'।"

* * * *

"বিপিনবাবু হীরালালকে প্রায় হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

"প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন্মা অভিনেতা মহাশয় চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কোথা থেকে আসছেন আপনারা?'

"বিপিনবাবু সবিনয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, শেষে বলিলেন, 'আমরা দুজনেই নাট্যকলার কিছু কিছু চর্চ্চা ক'রে থাকি—আপনার অনেক বই, আমাদের কণ্ঠস্থ বল্লেই হয়। এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যাবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না।'

"'বটে! বটে! আসুন—আসুন—বসুন। কি সৌভাগ্য আমার'!"

"—নটচূড়ামণি মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইঁহাদিগকে বসাইলেন। কাগজপত্র যাহা তিনি দেখিতেছিলেন, এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ইঁহাদের সহিত সদালাপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সরল অমায়িকতা, সরল বাক্যবিন্যাস—সর্ব্বোপরি প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় বিপিনবাবুকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, শুধু নাটক বা থিয়েটারের বিষয় নহে—নানা বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যেমন সারগর্ভ ও সুচিন্তিত, তেমনই বিশুদ্ধ রসিকতায় ওতপ্রোত। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টাকাল কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, তাহার হদিশ পাওয়া গেল না।"—

অমৃতবাবুর মজলিসে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা উপরি-উক্ত চিত্রের সত্যতা ও মানুষটার স্বাভাবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ছাত্রদিগের শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। তাঁহার পিতা এক জন কৃতবিদ্য যশস্বী শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি এবং তিনি আজীবন এই সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার নিজ বিদ্যালয়ের প্রিয় ছাত্রগণের অধ্যাপনা-কার্য্যে সময়ে সময়ে তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যাইত এবং এই কার্য্যে তিনি সবিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেন।

যে সকল শিক্ষক "দিনগত পাপক্ষয়," এই বৃত্তির অনুশীলন করিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী আছেন, তিনি তাঁহাদিগকে অতিশয় অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেন। নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের ত্রুটি দেখিলেই ভৎ'সনা করিতেন, কার্য্যকুশলতা দেখিলে পিতার ন্যায় স্নেহ ও আদরে তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিতেন। কম মাহিনার দোহাই দিয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য অবহেলা করা তিনি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং এরূপ শিক্ষককে ছাত্রদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষক হিসাবে ৺জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল; তিনি তাঁহাকে শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। বোঝা-পরিমাণ পাঠ্যপুস্তকের উপর তিনি "হাড়ে চটা" ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সর্ব্বদা নিবদ্ধ না থাকিয়া, অন্যান্য উপায়ে যাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সর্ব্ববিধ সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং তদুপযোগী যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিতে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের বাটীতে একটি ক্ষুদ্র ফল ও ফুলের বাগান স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ছাত্রদিগকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণকে অভিনয় ও আবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া তাঁহার একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল এবং এই কর্ত্তব্য তিনি সর্ব্বদা অতি আনন্দের সহিত পালন করিতেন।

তিনি একাধারে রসজ্ঞ, রসগ্রাহী ও রসিক ছিলেন। কি কথোপকথনে, কি বক্তৃতায়, কি রচনায়, কি অভিনয়ে, এ যুগে তাঁহার ন্যায় হাস্যরসের অবতারণা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি নিজে রস যেমন বুঝিতেন, অপরকেও সেইরূপ রস সমজাইয়া দিতে পারিতেন। বাঙ্গালী এখন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, সে আর প্রাণ খুলিয়া কোন আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয় না, তাহাকে মন খুলিয়া হাসিতে আর দেখা যায় না। যে জাতির আমোদ-প্রমোদ হাসি-খুসী ফুরাইয়া যায়, তাহার জীবনীশক্তি নিতান্ত কম বুঝিতে হইবে। জগতে সে জাতির অস্তিত্ব শীঘ্র বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। অমৃতবাবু এই নির্জীব জাতির মধ্যে আবার প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রসামৃত আস্বাদন করিয়া জাতির মধ্যে জীবনের লক্ষণ আবার প্রকাশ পাইতেছিল। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সেই অফুরন্ত সঞ্জীবনী রস-স্রোতের উৎস অকালে শুষ্ক হইয়া গেল!

অমৃতবাবুকে বিচিত্রভাবে অভিনয় করিতে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তিনি যে কোন চরিত্র অভিনয় করুন না কেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব তখন সেই চরিত্রমধ্যে এরূপভাবে বিলীন হইয়া যাইত যে, তাঁহাকে নাটকাঙ্কিত চরিত্র হইতে বিভিন্ন করিতে কেহ সমর্থ হইত না।

শ্যামবাজার ইংরাজী বিদ্যালয়—ভিতরের দৃশ্য

গিরিশবাবুর "প্রফুল্ল" নামক নাটকে তিনি "রমেশ" সাজিতেন। যখন তাঁহাকে "রমেশের" চরিত্র অভিনয় করিতে দেখিতাম, তখন তিনি যে আমার গুরু, বন্ধু, আত্মীয় ও সহকর্ম্মী, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম; তখন তাঁহাকে মানব-দেহধারী একটা নৃশংস মহাপাতকী দানব বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। এই গুণেই তিনি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এক জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পদ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি একসময়ে "স্বদেশী" আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশ-প্রীতি চিরদিনই তিনি ভক্তিভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতেন। ভারতবর্ষ অপেক্ষা তিনি বঙ্গদেশকেই সমধিক প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতি তাঁহার হৃদয়ের প্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু "স্বদেশী" হইলেও রাজার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং যথাস্থানে ও যথাসময়ে তিনি রাজার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি ইংরাজ জাতির সদ্‌গুণাবলীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইহার জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে ইংরাজের প্রশংসা করিতেন।

তিনি সজ্জন, সহৃদয় ও উপকারী প্রতিবাসী ছিলেন। পল্লীর যাবতীয় হিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং করদাতৃগণের হিত-কামনায় তিনি অনেক সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন।

বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার দান অমূল্য ও অপূর্ব্ব। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেও প্রকৃষ্টভাবে এক জন পুষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গালা ব্যঙ্গকাব্যে তিনি যে ছাপ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না এবং তাহার সৌন্দর্য্য বাঙ্গালী চিরদিন আনন্দে উপভোগ করিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে এক সময়ে হিন্দু সমাজে যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি বিদ্রূপ ও শ্লেষের কশাঘাত দ্বারা, তাঁহার রচিত নাটিকা ও প্রহসনসমূহে, তাহার উচ্ছৃঙ্খল গতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে সফলকামও হইয়াছিলেন। বাহির হইতে দেখিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্থানে স্থানে তাঁহার বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তি প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং তাহাতে মনে হইতে পারে যে, সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি তিনি কতক পরিমাণে অযথা কটাক্ষপাত ও অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি হৃদয়ে বিরোধ বা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত "উদ্ভট কার্য্যকারী" ব্যক্তিকেই তিনি কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন; ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা হেতু কোন সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিনি এক জন ভক্ত শিষ্য ছিলেন; সকল ধর্ম্মের প্রতি তিনি হৃদয়ে উদার ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন এবং যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" ও "সাহিত্য-সভায়" তাঁহার সহিত বহুদিন একত্র কার্য্য করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং আজীবন ইহাদিগের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। স্বর্গত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি সাহিত্য-সভায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলাম এবং সেগুলি পরে সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার বক্তৃতাগুলি তাঁহাকে বিশেষভাবে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তিনিই এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিছু দিন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং অনেকানেক অধিবেশনে তাঁহার সুচিন্তিত সরস বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। এক সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল ও শাখা-সভাপতির কার্য্য তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ ও সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রকৃষ্ট দানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে দিন তাঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" প্রদান করিয়া উচ্চসম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পূজনীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থ এই স্বর্ণপদকের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

অমৃতবাবু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শোভাবাজার বেনোভোলেণ্ট সোসাইটী" নামক দাতব্য সভার এক জন অনুরাগী সভ্য এবং কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের কার্য্যের এক জন সহায়ক ছিলেন।

তাঁহার বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ একত্র হইয়া বিদ্যালয়ের বাটীতে একটি "অমৃতচক্র" রচনা করিয়াছেন।

ইঁহারা একত্র মিলিত হইয়া এবং অমৃতবাবুকে ঘেরিয়া এই "চক্রে" এত দিন নানা সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহাদিগের একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় ও পাঠাগার আছে; তাহা বিদ্যালয়েরই একটি গৃহে অবস্থিত। প্রতি বৎসর ইঁহারা অমৃতবাবুর জন্মদিবসে একটি মিলনোৎসবের আয়োজন করিতেন এবং অমৃতবাবুর বন্ধুমণ্ডলী ও অনেকানেক সাহিত্যিক ইহাতে যোগদান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

অমৃতবাবু "বাণী-মন্দিরের" কার্য্যের এক জন পরিদর্শক ছিলেন। দুই মাস পূর্ব্বে তিনি এই মন্দির-অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা-সম্মিলনে সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। অতি অল্পদিন হইল, তিনি কাঁঠালপাড়ায় "বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনের" সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালাদেশ এক জন স্বদেশভক্ত কৃতী সন্তান হারাইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষা এক জন সুরসিক প্রতিভাশালী লেখক এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চ এক জন সর্ব্বজনপ্রিয় সুদক্ষ অভিনেতা, অদ্বিতীয় প্রহসন-প্রণেতা ও নাট্যকার হারাইয়াছে; আমরা এক জন হিতকামী অকপট বন্ধু হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া এই স্থানে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীচুণিলাল বসু (ডাক্তার)।

অমৃত-লোকে অমৃত

১

এই ছিল, এই নাই, এ কি গো শুনিতে পাই,
অমৃত হইল মৃত, এ কি হলো হায়।
সত্য কভু মিথ্যা নয়, অজ্ঞাত এ বিপর্য্যয়,
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কেন শ্মশানে লুটায়!

২

জরা যারে নাহি পারে অবসন্ন করিবারে,
বার্দ্ধক্যেও নবযুবা ছিল যে ধরায়,
বৃদ্ধ-শিশু মহারথী, বাণী-ধ্যান-মগ্ন যতি,
আজন্ম কাটায় কাল ভারতী-সেবায়।

-

তা'রে লয়ে গেল কাল, বাঙ্গালীর দগ্ধ ভাল,
কে জানিত এত শীঘ্র হবে হেন শেষে!
শোক-তপ্ত যার চিত্তে পারে নাই নোয়াইতে,
কালে যে করিত হেলা, মুখে হাসি হেসে!

৪

কোথাকার সেই হাসি, শেফালিকা-পরকাশি,
কেহ কি বলিতে পার সন্ধান তাহার!
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা পবিত্রিয়া পৃথ্বী সারা,
রসরাজ-মুখে-বুকে হ'ল কি সঞ্চার!

৫

শ্বেতাব্জবাসিনী বাণী তনয়ে অভয় দানি'
বরপুত্র-হৃদাসনে হ'ল অধিষ্ঠান!
অন্তর বাহিরে আলো তাই তাঁর জলে ভালো
শুভ্র জ্যোতিঃ ভারতীর পাইয়া সন্ধান!

৬

শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ, মলিনতা নাহি লেশ
শুভ্র হাসি আনন্দের সৌরভ ছড়ায়!
সুধাময় রসালাপ নাশ করে মনস্তাপ,
জ্ঞানগর্ভ প্রবচন অমৃত বিলায়!

৭

সামাজিক দুরাচার, দুর্নীতির ব্যবহার,
অন্তর্দৃষ্টি করে তাঁর অন্তর চঞ্চল!
হয়ে বদ্ধ-পরিকর সাজিল সে নটবর,
লোক-শিক্ষা মূল-মন্ত্র করিয়া সম্বল।

৮

নিজ হিয়া জলে যার, দংশন কি সাজে তার,
অন্তরে কাঁদিয়া কবি, বাহিরে হাসায়;
সহৃদয় যে পাঠক পড়ে তার সে নাটক,
কবি-সনে ফেলে অশ্রু হৃদয়-জ্বালায়।

৯

লোকে হেরে অভিনয় কেবল আনন্দময়,
আনন্দে লুকান অশ্রু না পায় সন্ধান;
কত বড় কবি-প্রাণ বুঝে কার আছে জ্ঞান,
নিজে সঙ সেজে আঁকে সমাজ-বিজ্ঞান!

১০

ব্যঙ্গ-চিত্র শত শত এঁকেছে সে মহাব্রত,
রঙ্গ-ছলে দেখায়েছে বাস্তবের ছবি;
দেখিয়া না দেখ যদি, থাক মত্ত নিরবধি,
কেমনে বুঝিবে অন্ধ, কি দিয়াছে কবি?

১১

বাঙ্গালার পথে ঘাটে, পল্লীর সে মাঠে-বাটে,
সুসভ্য সে সহরের বৈঠকখানায়,
সমিতি ও সম্মেলনে, বক্তৃতার রণাঙ্গনে,
আফিস ও আদালতে আড্ডা ও আখড়ায় !

১২

নিবিষ্ট দর্শকমত ছাত্র অধ্যয়ন-রত,
মহাযোগী ধ্যান-রত সুধী বিজ্ঞবর ;
ছিল সে "অমৃতলাল", ভারতীর সে দুলাল,
আঁকিল অমূল্য চিত্র বর-চিত্রকর !

১৩

'হীরকের চূর্ণ' দিয়া সারদারে আরাধিয়া
প্রথম প্রকটে সুধী মাতৃ-ভাষ-সেবা !
'তিলেতে তর্পণ' করি 'ডিস্‌মিস্‌'-চিত্র ধরি',
'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' ছবি এঁকে দেয় যেবা !

১৪

'বিবাহ-বিভ্রাট' যার রহে চির-চমৎকার,
আধুনিক বাঙ্গালার অপরূপ ছবি ;
'তাজ্জব-ব্যাপার' যত, লেখনী আঁকিল তত,
নিতুই নূতন চিত্রে 'বাঞ্ছারাম'-কবি !

১৫

'রাজা বাহাদুর'-রঙ্গ মাতায় সারাটি বঙ্গ,
'কালাপানি' করে পার লেখনী যাহার !
'বৌমা' আর সেই 'বাবু' সমাজে করিল কাবু,
'গ্রাম্যেতে বিভ্রাট' আনি' করে 'একাকার' !

১৬

'সাবাস-আটাশ' পরে, 'যাদুকরী' খেলা করে,
অবতীর্ণ 'অবতার', 'কৃপণের ধন' !
'খাস দখলে'র সনে 'ব্যাপিকা-বিদায়' আনে,
'সাবাস-বাঙ্গালী' আর সে 'নব-জীবন !'

১৭

'বন্দে মাতনম্‌' চিত্র, যশ গায় শত্রু-মিত্র,
'কৌতুক-যৌতুক' কত দিয়াছে রসিক !
'সম্মতি-সঙ্কট' ছবি, 'বিলাপ' ক'রেছে কবি
'বৈজয়ন্ত-বাস' পাশে 'বাহবা-বাতিক' ।

১৮

চিত্রিল যে কুলবালা, অপরূপ 'তরুবালা'
করুণ বিষাদ ছবি 'বিজয়-বসন্ত' !
প্রকটে 'আদর্শ বন্ধু', উথলি' প্রেমের সিন্ধু,
সে 'নব-যৌবন' নাট্য করে প্রাণবন্ত !

১৯

'যাজ্ঞসেনী' বিরচিয়া, নাট্যে অবসর নিয়া,
প্রবন্ধ, নিবন্ধ শত প্রসবে লেখনী ;
অফুরন্ত সে ফোয়ারা, 'বসুমতী' মাতোয়ারা,
পাব কি আবার দেখা, ওহে গুণমণি !

২০

'বিদূষক', 'পূর্ণরাম', অপূর্ব্ব সে 'নসীরাম',
সাহেব 'ফষ্টর', 'ফিস্‌' কৌতুকে খেলালে ।
তুমি যা দেখালে নট, আছে হৃদে চিত্রপট,
মাতাল 'বিহারী খুড়া' কি হাসি হাসালে !

২১

যে নট 'রমেশ' সাজে, তারে কি 'নিতাই' সাজে,
বিপরীত হেন রস কে ফুটাতে পারে ?
কোথা 'মামা তিনকড়ি', কোথা 'কৃষ্ণকান্ত' মরি,
অমৃতই শুধু উঠে অমৃত-পাথারে !

২২

রচিয়াছ শত গান, ঢালিয়াছ নিজ প্রাণ,
গদ্য পদ্য সম তব চক্র অমৃতের !
'অমৃত-মদিরা' পিয়া চিত্রিল প্রমত্ত হিয়া
নিজের, পরের চিত্র, ব্যথা ব্যথিতের !

২৩

দিলে তুমি শত শত, মহিমা গাহিব কত,
অগণন শিষ্য তব আজি দেশময় !
শ্রদ্ধার লেখনী ল'য়ে, তব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে,
ভক্তি-ভরে সমস্বরে গাবে জয়, জয় !

২৪

আদরের 'পরিষদ্‌' ওহে নাট্য-বিশারদ
কত না প্রেমের দান দিলে রসরাজ !
সে প্রেম স্মরিয়া মনে, শ্রদ্ধাপূর্ণ অশ্রুসনে
ক্ষীণ-কণ্ঠে দীন কবি গায় স্তুতি আজ !

২৫

কর্ম্মময় সুজীবন করি দীর্ঘ পর্য্যটন,
জন-সেবা বহু মতে করিলে প্রবীণ ।
শিক্ষার বিস্তারে পণ, ছিল তব আজীবন,
কতমতে জ্ঞান দিলে আচার্য্য প্রাচীন !

২৬

সমাজ আদর্শ চিত্র ধরিলে হে দেশমিত্র,
আচার ও অনুষ্ঠানে আদর্শ বাঙ্গালী !
সনাতন ধর্ম্ম-ধারা পালিলে জীবন সারা,
মিশিলে সকল সনে ছেড়ে চতুরালী ।

২৭

মহাশক্তি-মহাধার, রামকৃষ্ণ-অবতার,
চরণে আশ্রয় তাঁর নিলে ভক্ত বীর !
অনুভবি' তাঁর শক্তি, করিলে অশেষ ভক্তি,
'বাল্যলীলা'-অর্ঘ্যে শেষে লুটাইলে শির !

২৮

যাও দেব অমরায়, চিরোজ্জ্বল অলকায়,
কবি-দেবদল সদা করে যথা বাস !
সারস্বত-বীণা ধ'রে গীর্ব্বাণীর সেবা করে,
অন্তিমে মিলিতে যথা বাঞ্ছা করে দাস ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ।

অমৃতলাল *

অমৃতলাল যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন, সে একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ,—বাঙ্গালার নব জাগরণের যুগ। পুরাতন বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তখন নূতন বাঙ্গালার সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে অতীত তাহার বহু শতাব্দীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, শিক্ষা-সংস্কার, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, মোহ ও মমতার পর্ব্বত-প্রমাণ ভার তাহার জরাগ্রস্ত ক্ষীণ স্কন্ধে চাপাইয়া, কম্পিত-বক্ষে স্খলিতচরণে বিদায় লইতেছে—আর অন্য দিকে বর্ত্তমানকে অবলম্বন করিয়া সগর্ব্ব-পাদক্ষেপে আসিতেছে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ—পশ্চিমের দিক্‌চক্ররেখা হইতে বহন করিয়া নূতন আলোক, অভিনব শিক্ষা, অভিনব সংস্কার, অভিনব প্রেরণা। ইহারই ফলে নানা বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা পাই—বাঙ্গালার আধুনিক নাটক ও বাঙ্গালার নব নাট্য-শালা। এই নবীন নাট্যশালার জন্মবিবরণ, তাহার ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির কথা আপনারা সকলেই জানেন। সুতরাং সে পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা পরীক্ষা করিবার ধৃষ্টতা করিব না। অমৃতলালের কথাপ্রসঙ্গে, বাঙ্গালা থিয়েটারে তাঁহার যে দান, সংক্ষেপে সেই কথাই বলিব।
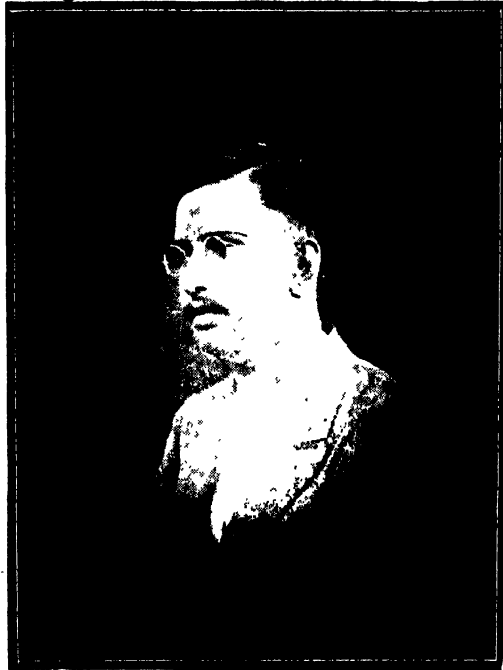
রসরাজের পুত্রের জামাতা শ্রীশরৎকুমার মিত্র

থিয়েটার যখন এ দেশে প্রথম খোলা হয়, (এখানে থিয়েটার অর্থে টিকিট বেচিয়া থিয়েটার), তখন তাহার অনুষ্ঠাতৃগণকে দেশের লোক যে খুব ভাল চোখে দেখিতেন, তাহা নহে। এমন কি, বাঙ্গালা দেশের নাট্য-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গিরিশচন্দ্র সান্যাল-বাড়ীর ন্যাসন্যাল থিয়েটারকে উপলক্ষ করিয়া যে বিদ্রূপাত্মক গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার!" ইত্যাদি। পরে যখন দ্বিতীয় উদ্যমে রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের জন্য স্থান-বিশেষ হইতে অভিনেত্রী লওয়ার প্রচলন হইল, তখন দেশের লোকের বিরাগ ও ঘৃণা চরমে উঠিল। বিশেষতঃ, Fashionable moralist যাহারা, তাঁহারা ত কালো কেশ পর্য্যন্ত দেখিবেন না বলিয়া মাথা মুড়াইলেন;—থিয়েটার শব্দটি পর্য্যন্ত তাঁহারা উচ্চারণ করিতে শিহরিয়া উঠিতেন। লোকেও পয়সা দিয়া থিয়েটার দেখিত বটে, কিন্তু যাহারা থিয়েটার করে, তাহাদিগকে "বখাটে" খেতাব দিয়া সমাজের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিত। সমাজের এই ব্যবহার দেখিয়া এবং ক্রমাগত উপেক্ষার বাণ সহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্রকেই আবার এক দিন আক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইয়াছিল—"লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।" মর্ম্মান্তিক অভিমানে গিরিশচন্দ্র

এক দিন এ কথাও লিখিয়াছিলেন—"ভদ্র-সমাজে আমার স্থান আছে কি না, জানি না—জানিতেও চাহি না।" অভিনেতাদের প্রতি দেশের লোকের মনোভাব যখন এমন, তখন নিন্দা-তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ করিয়া, ভবিষ্যৎ বিপৎসমূহের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া এই নগরীর যে কয় জন যুবক টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সাতান্ন বৎসর পরে তাঁহাদের হৃদয়ের দৃঢ়তা, লক্ষ্যের স্থিরতা, কার্য্যে নির্ভীকতা এবং ঘৃণা-লজ্জা

* ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অমৃতলালের শোক-সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ভয় বিসর্জ্জনের সামর্থ্য যে কতখানি ছিল, তাহা অনুমান করাও কঠিন। যাঁহারা এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসাই বা ছিল কতটুকু! উত্তরকালে থিয়েটারে এই বিজলী বাতীর চমক, এই দৃশ্য-পটের ঘটা, এই 'রুজ' 'কস্‌মেটিক' 'ক্রেপের' বাহার, এই 'সিল্ক' 'ভেলভেট' জরি-মুক্তার ছটা, এই বড় বড় পোষ্টার হ্যাণ্ডবিল প্ল্যাকার্ড ও তৎসংলগ্ন ঘন ঘন হাততালির আড়ম্বর-পূর্ণ বিজ্ঞাপন, এই booming, Freinds and patrons, এই লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা—আভাসে ইঙ্গিতে ধ্যানে বা চিন্তায় এই মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখার সুযোগ বা তাহার কল্পনা করিবার কোন সূক্ষ্ম কারণ তাঁহাদের ছিল না। লোকের বাড়ীর উঠান চাহিয়া লইয়া, দরমা-কানাতের বেড়া ঘিরিয়া, পর্দ্দা ও পাল টাঙ্গাইয়া, পায়া-ভাঙ্গা তক্ত-পোষের 'প্ল্যাটফরম' করিয়া, তামাক খাইবার কলিকা উল্টাইয়া তাহাতে বাতী বসাইয়া 'ফুট লাইট' জ্বালিয়া, প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উঠিয়াছিল দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" লইয়া; তাহার পর ক্রমে দেশ দেখিল, 'বেঙ্গল', 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' ও 'ষ্টার' প্রভৃতির নিজস্ব রঙ্গালয়। সমাজ মুখে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু অন্তরে থিয়েটারওয়ালাদের প্রতি পূর্ব্ববৎই মুখ ফিরাইয়া রহিল। আকারে-প্রকারে, আচরণে-ব্যবহারে দেখাইতে লাগিল, অভিনেতারা যেন ঠিক তাঁহাদের সমাবস্থাপন্ন নহে; যেন তাহারা কতকটা অপাংক্তেয়, একরকম একঘ'রে! অন্তরের কথা এইরূপ হইলেও, কিন্তু বাহিরের অবস্থা হইল ঠিক গ্রামের মেজখুড়োর দলকে একঘ'রে করিতে হইলে গ্রামশুদ্ধ সকলকেই যে এক-ঘ'রে হইয়া থাকিতে হয়! কারণ, গ্রামটাই যে মেজখুড়োকে লইয়া! যাঁহারা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে সমাজের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের, ঘরওয়ানা ঘরের ভদ্র ও শিক্ষিত বখাটে! তাঁহাদের অপাংক্তেয় বা একঘ'রে করে কে? ন্যাশানালে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, ধর্ম্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, (দুই চারি রাত্রি পরে) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধাগোবিন্দ কর (পরে কার্মাইকেল হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা দেশবরেণ্য ডাক্তার রাধামাধব কর, অবিনাশ কর, মতিলাল সুর, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতি, "বেঙ্গলে" শরৎচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রিয়নাথ বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; 'গ্রেট ন্যাসানালে' কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্র চৌধুরী, উপেন্দ্র-নাথ দাস (U. N. Das), রামতারণ সান্ন্যাল প্রভৃতি;—নামের তালিকা আর বাড়াইব না—রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের এই নাট্য-পূজারীর দল অভিনেতৃগণ যে কলিকাতার তথা বাঙ্গালার—রাজা, মহারাজা, জমীদার, মুৎসুদ্দী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, ধনী, ব্যবহারাজীবী প্রভৃতি সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় যাঁহারা—তাঁহাদেরই আত্মীয়, কুটুম্ব, বংশধর! ইঁহা-দিগকে প্রকাশ্যে অপাংক্তেয় করে কে? এইরূপে শত শত বাধাবিঘ্নকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, শত লাঞ্ছনা-ধিক্কারকে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, অর্থ বা স্বার্থকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, যাহারা কাদা মাখিয়া কাজলের ঘরে কলঙ্কের দাগকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলাদেশে এই নূতন থিয়েটারের পত্তন করিয়াছিলেন, অমৃতলাল মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তাঁহা-দের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন! এই দল অনাহারে অনাবরণে বাহিরের ঝড়-জলে বাদল সহিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কুড়ুল ঘাড়ে করিয়া গাছ কাটিয়া, কাঁটা সরাইয়া, বন-বাদাড় সাফ করিয়া নগর বসাইয়া গিয়াছেন, তাই বাঙ্গালার থিয়েটার নাট্যবাণীর পূজার নানা উপচার-সম্ভার লইয়া আজ জাতী-য়তার গান, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের গান, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের গান গাহিবার অবসর পাইয়াছে; তাই "অতি-হেনস্থার" থিয়েটারকেও আজ সমাজে একটা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কুণ্ঠা বা লজ্জা নাই!

কিন্তু এই যে থিয়েটারকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা, এই যে অপাংক্তেয় দলকে—কেবল নামে মাত্র পাংক্তেয় নয়—অপরিহার্য্যরূপে পাংক্তেয় করা—এই যে বাঙ্গালা দেশের থিয়েটারকে আভিজাত্যের গৌরবে ভূষিত করা—আজ এই অমৃতলালের শ্রাদ্ধবাসরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে যে, ইহার জন্য কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ সেই ২০ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুর শেষদিন ৭৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, একা অমৃতলাল যে উদ্যম, যে ত্যাগ-স্বীকার, যে অনন্যসাধারণ তপস্যা ও কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আর কোন সমকর্ম্মী নাট্যব্যব-সায়ী এ পর্য্যন্ত করেন নাই এবং অদূর-ভবিষ্যতে আর কোন ভাগ্যবান্ অভিনেতা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবেন কি না, তাহা

কল্পনার চক্ষুতেও দেখিতে পাই না! অমৃতলাল নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি মই ঘাড়ে করিয়া লালদীঘির মোড়ে প্ল্যাকার্ড মারিয়াছেন; আবার উত্তরকালে বাঙ্গালা সেই অমৃতলালকে দেখিয়াছে কেবল রঙ্গালয়ের রসরাজ ও নাট্যাচার্য্যরূপে নহে —দেখিয়াছে, বাঙ্গালার সকল গৌরবের কার্য্যে অমৃতলাল, সমাজের সকল সঙ্কটে অমৃতলাল, সকল সুখে দুঃখে ব্যথায় বেদনায় অমৃতলাল, তাহার সকল উৎসব ও নিরানন্দের ক্ষেত্রে অমৃতলালের সু-উচ্চ শুভ্রশির থিয়েটারেরই জয় ঘোষণা করিতেছে! গত ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যে এই নগরীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য সভাসমিতির অনুষ্ঠান দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—যাহাতে অমৃতলালকে বক্তার আসনে দেখি নাই। লাটদরবার হইতে গরীবের কুটীরে পর্য্যন্ত তাঁহার সমগতি ছিল। কোন সভায় বা কোন বক্তৃতামঞ্চে তাঁহাকে দেখিলে লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইত। আর কেবল কলিকাতায় কেন, বাঙ্গালা, বিহার, পশ্চিম—কোথায় না তাঁহাকে লইবার জন্য দেশের লোক ব্যগ্র হইত? এক কথায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালায় তিনি নাট্যবাণীর 'সভা-উজ্জ্বল পুং' ছিলেন!

কিন্তু কেবল থিয়েটারের বাড়ী থাকিলেই ত আর থিয়েটার হয় না; কেবল প্রতিভাবান্ অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকিলেও ত থিয়েটার হয় না। থিয়েটার গড়িয়া তুলে নাটক। অমৃতলাল প্রভৃতি দীনবন্ধুর নাটক লইয়াই ত থিয়েটার খুলিলেন; কিন্তু নূতন নূতন নাটক কৈ? থিয়েটার ত চলা চাই! কে তাহার জন্য নাটক লিখিবে? অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া, বাহির হইতে কোন সাধকের সাহায্য না পাইয়া, এই অভাব-মোচনের জন্যই বাণীর ঈপ্সিত বরপুত্র আচার্য্য, অভিনেতা ও নাট্যকার, মহাকবি গিরিশ-চন্দ্র পূজার বেদীতে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু কোন্ আচার-নিষ্ঠাভক্ত, কোন্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত গি।রশের উত্তর-সাধক হইলেন? রঙ্গালয়কে আর কে তেমন করিয়া ভালবাসে? অমৃতলাল! সুযোগ্য গুরুর সুযোগ্য শিষ্য! চব্বিশ বৎসর বয়সে অমৃতলাল রঙ্গালয়ের জন্য প্রথম প্রহসন লিখেন, এবং মৃত্যুর বৎসরাধিক পূর্ব্বেও তাঁহার শেষ নাটক বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দর্শক দেখিয়াছেন!

অর্দ্ধশতাব্দী কাল ব্যাপিয়া অমৃতলালের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনী যে রসধারা সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙ্গালার নাট্যশালার জীবনধারণে, তাহার দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি-সাধনে সত্যই যে তাহা অমৃতোপম, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। এ বিষয়েও তাঁহার নাম গিরিশচন্দ্রের পরেই উল্লেখযোগ্য। রঙ্গভূমিকে বাঁচাইবার জন্য, তাহাকে সভ্য-দেশের রঙ্গভূমির সহিত সমপর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অমৃতলালের গুরু গিরিশচন্দ্র এক দিনের জন্যও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, নিয়ত নিজের লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া বীরের ন্যায়, অক্ষুণ্ণ যশ, অপ্রতিহত প্রভাব, অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন;—অমৃতলালও এ বিষয়ে গিরিশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালার সৌভাগ্যবশতঃ অনেক প্রতিভাবান্ কৃতী লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাদিকে—উপন্যাসে, নবন্যাসে, গল্পে, খণ্ডকাব্যে, গীতিকাব্যে, কথা-সাহিত্যে, নানা রস-রচনায় বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট্ মন্দিরে সভ্য জাতির সাহিত্যের সহিত সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল নাট্যশালার জন্য নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল ভিন্ন এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর কেহ সাহস করেন নাই। এই অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনিয়া অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন, দুঃখিত হইবেন, কারণ, উত্তরকালে অনেকেই ত নাটক রচনা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। কথা ঠিক। কিন্তু তাঁহারা গিরিশচন্দ্র ও অমৃত-লালের মত প্রতিভা লইয়া, তাঁহাদের মত ব্রতধারী হইয়া, তাঁহাদের মত রঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়া নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কারণ, তাহাতে জগমী অনেক, বিপদ অনেক, শক্তিরও প্রয়োজন অসাধারণ! কারণ, নীলকণ্ঠ না হইয়া কে বিষ ধারণ করিয়া অমৃত বিলাইবে? নটনাথের বিশেষ আশীর্ব্বাদ না পাইলে কে নাট্যাচার্য্য হইবার সাহস রাখিবে? কেবল যে আমাদের দেশেই এই বিপদ, তাহা নহে, পূর্ব্ব, পশ্চিম—পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেরই কথা এই একসুরে বাধা। পশ্চিমের এক জন বিশ্ববরেণ্য প্রতিভাবান্ নাট্যকার এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"* * * The theatre must be loved for itself, perhaps with greater devotion than any other form of art. The true playwright must have passed his life in the theatre, he must have seen all the plays and all the actors within his reach and he must have acted himself. Remember that no small

ষ্টারথিয়েটারের দৃশ্য

লোকের উঠান চাহিয়া লইয়া থিয়েটার খুলিতে হইয়াছিল, তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন—এই অমৃতলাল—তাঁহার সহকর্ম্মীদের লইয়া নিজস্ব যে নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার মূলে যে অধ্যবসায়, যে ঐকান্তিকতা, যে দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতা ছিল, তাহা কেবলমাত্র অভিনেতা বা থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নহে, মেরুদণ্ডহীন ব্যবসায়বুদ্ধিশূন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই অনুকরণীয়। অমৃতলাল বাঙ্গালা দেশের থিয়েটারকে যে জাতে তুলিয়াছিলেন, তাহা কেবল বক্তৃতায় নহে, বাহিরের সঙ্গে মিশিয়া নহে—তিনি তাহাকে মর্য্যাদা দিয়াছিলেন নিজের পৌরুষত্বের বলে। তিনি সম্মান ভিক্ষা করেন নাই—সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন নিজের বিদ্যায়—নিজের সাধনায়—নিজের প্রতিভায়—আত্মমর্য্যাদার প্রভাবে। রঙ্গালয়ের প্রতি অমৃতলালের এ দান একটা বড় দান!

part of Shakespeare and Lope de Rueda and Moliere was the actor. To the playwright the world must be a vast stage, men and women must be tragic heroes and heroines or comedians in one immense farce. * * * ."

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের তুলনা নাই। তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কি ভাবে থিয়েটার চালাইতে হয়, অতীত ষ্টার থিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি নিজে তাঁহার সময়ে ষ্টারে কায করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির প্রতি এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহার-কৌশল আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ষ্টার থিয়েটারের কায চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক যেন ঘড়ীর কাঁটার তালে। আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, ঢক্কানিনাদ নাই, ধাপ্পা নাই, চাল নাই, হুজুগ নাই,—নিরুপদ্রবে, নীরবে যে যাহার কায করিয়া যাইতেছে। সব বিষয়েই এখানে একটা ধরাবাধা নিয়ম ছিল। একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এই ভাবে থিয়েটার চালাইয়া অমৃতলাল থিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন। এক দিন যাঁহাদিগকে

এইবার অমৃতলালের রসরচনার কথা অতি সংক্ষেপে উত্থাপন করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। অমৃতলাল নবজাগরণের যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই; কিম্বা এ কথাও বলা যাইতে পারে, তিনি অনেকটা পুরাতনপন্থীই ছিলেন। তাঁহার রচনায় আমরা ইহার পরিস্ফুট পরিচয় সর্ব্বত্রই পাই। তিনি আধুনিক হইয়াও, ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়াও, তাঁহার রসসৃষ্টিকে একেবারে বিলাতী ছাঁচে ঢালেন নাই। তিনি নূতনে পুরাতনে মিশাইয়া তাঁহার একটা নিজস্ব Style ও type সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, তিনি তাঁহার অনেক নাটক ও প্রহসনের গল্প ও অবদান য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ আকার দিয়াছেন এই দেশের উপযোগী করিয়া। যে ধারা ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তকে অতিক্রম করিয়া দীনবন্ধুতে সঞ্চারিত হইয়াছিল,

.বাঙ্গালার সেই নিজস্ব প্রিয় প্রাচীন অমৃতধারা অমৃতলালের রসরচনার মধ্যেই শেষ আশ্রয় লইয়াছে। অনেকের ধারণা, অমৃতলাল কেবল প্রহসনকার ছিলেন। কিন্তু না,—প্রহসনকার হইলেও তিনি ছিলেন নাট্যকার। কারণ, তাঁহার প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টি আছে, রসসৃষ্টি আছে, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আছে। অমৃতলাল বাঙ্গালার "মোলেয়ার"। গিরিশচন্দ্র যেমন সামাজিক সমস্যা লইয়া বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই সামাজিক সমস্যা লইয়াই অমৃতলাল তাঁহার প্রহসন লিখিয়াছেন, সমাজের দুর্ব্বলতা লইয়া ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের "বলিদান",—অমৃতলালের "বিবাহ-বিভ্রাট"। গিরিশচন্দ্রের "বিষাদ",—অমৃতলালের "তরুবালা"—প্রহসন নয়, কমেডি, কিন্তু প্রহসন-ঘেঁসা। গিরিশচন্দ্র "চিন্তামণি" "রঙ্গলাল" আঁকিয়াছেন,—অমৃতলাল আঁকিয়াছেন ভাক্ত চরিত্র "অবতার"। গিরিশচন্দ্রের "শাস্তি কি শান্তি",—অমৃতলালের "খাস-দখল"। গিরিশচন্দ্রের যে চরিত্র ফুটিয়াছে চোখের জলে, অমৃতলালের সেই চরিত্রই ফুটিয়াছে হাসি ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়া।

রস-সাহিত্যের দিক্ দিয়া অমৃতলাল রঙ্গমঞ্চকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই সৃষ্টি-চাতুর্য্যের জন্যই তিনি "রসরাজ" উপাধি পাইয়াছিলেন এবং এই উপাধি তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

অমৃতলালের সুদীর্ঘ কর্ম্মবহুল জীবন ও তাঁহার সাহিত্য আলোচনা করিবার অনেক কিছুই আছে। সে সব আলোচনার ভার অধিকারী সুধীবর্গের উপর দিয়া আমরা সংক্ষেপে মাত্র উত্থাপন করিলাম—তিনি নট ও নাট্যকাররূপে বাঙ্গালার নাট্যশালাকে কি দিয়াছেন। সামান্য নিশানধারী পদাতিক হইতে রণপণ্ডিত সেনাপতির তরবারি কি করিয়া দৃঢ়করে ধরিতে হয়—অমৃতলাল তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে দেশকে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। অমৃতলালের জীবনী—যাঁহাদিগকে নিজের ভাগ্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়—তাঁহাদিগের আদর্শস্থল—তা কি নাট্য-রঙ্গমঞ্চে, কি সংসার-রঙ্গমঞ্চে।

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুর সহিত আমার বহু পূর্ব্ব হইতে পরিচয়। সে প্রায় ৪০ বৎসরের কথা—তখন আমরা সখী-সমিতির সম্মেলনে 'মহিলা শিল্পমেলা' নামে একটি মেলা খুলি। কয়েক বর্ষকাল প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৩।৪ দিন ধরিয়া এই মেলা হইত এবং ইহার সহিত কেবলমাত্র মহিলাদিগের দ্বারা নাট্যাভিনয়ও হইত। সেই অভিনয়ে অমৃতবাবু আমাদের অনেক প্রকারে সাহায্য করিতেন। দৃশ্যপট সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, আমার একখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করা এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যের ভার তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে—তাঁহার সাহায্যে আমাদের অভিনয়কার্য্য বেশ সহজ-সাধ্য হইয়াছিল।

এই সূত্রে তাঁহাকে আমি সাহিত্যবন্ধুরূপে প্রাপ্ত হই। ক্রমে সেই বন্ধুতা আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষমতা কাহারও অবিদিত নাই কিন্তু তিনি যে কিরূপ অমায়িক ও সরল গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার বন্ধুরাই জানেন!

বালিগঞ্জে আসা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আর প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। মাসিকপত্রিকায় তাঁহার লেখা পড়িয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে হইয়াছে।

সহসা তাঁহার মৃত্যুসংবাদে আমি আত্মবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়াছি। কিন্তু মৃত্যুতেও তিনি আজ অমর। দেশের প্রত্যেক নর-নারীর গৃহে তাঁহার রচিত গ্রন্থ তাঁহাকে সজীব ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সেই অমর পুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরোত্থিত শোক-পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। তিনি অভিনন্দিত হউন।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

অমৃত-প্রয়াণ

১

সার্থক তব অমৃত নাম,
মরতের 'পরে অমৃত ছড়ায়ে চ'লে গেলে আজি অমৃতধাম।
এ নহে অমৃত-অমৃত-বিন্দু,
এ যে গো অমৃত-অমৃত-সিন্ধু,
বাঙ্গালীর চিত-দাবদাহ-মাঝে প্লাবন প্রাণাভিরাম!
সার্থক তব নাম।

২

অভূতপূর্ব্ব তোমার সবি,
সে কি গো মূরতি, সে কি কেশ-বেশ,
সে কি গো প্রতিভা-দীপ্ত রবি!
যেন গো তুষার-মৌলি-ধবল
হিমাচল চির-চারু-চঞ্চল,
আস্যে গোমুখী-ধারা উচ্ছল হাস্যোজ্জ্বল ছবি!
অদ্ভুত তব সবি।

৩

থেমে গেল আজি সে কলনাদ,
রঙ্গ-বঙ্গ-নিঝর-ভঙ্গ আর ভাঙিবে না প্রাণের বাঁধ,
ওরে আট কোটি ব্যাকুল চিত্ত,
হারালি আজি কি বিপুল বিত্ত,
শুকাইল আজি রস-সাহিত্য, কাঁদ্ তোরা শুধু কাঁদ্।
থেমে গেল কলনাদ।

৪

কাঁদো কাঁদো সারা নাট্যালয়,
অমৃত তোমারে অমরা করেছে, এ কথা ত কভু মিথ্যা নয়!
প্রণবের যথা পূত ওঁকার,
ত্রয়ে সমাবেশ আদি-ঝঙ্কার,
তেমনি অর্দ্ধ-ইন্দু, গিরিশ, অমৃতে সমন্বয়—
তবে না নাট্যালয়!

৫

নাই নাই নাই আজি সে তিন
তিনে-এক—আর—একে-তিনে
তারা একে একে হ'ল চির-বিলীন।
সেথা নাহি আর রঙ্গমঞ্চ,
নাহি অভিনয়-লীলা-প্রপঞ্চ
শ্রান্তি-বিহীন, ভ্রান্তি-বিহীন, শান্তি সীমাবিহীন—
একে মিলাইল তিন।

৬

এমন পাবে না পাবে না আর,
এ বুকে শোকের লৌহ-শকট দলিয়া গিয়াছে কতই বার।
তটিনী যেমন উপলে উপলে
বাধা পেয়ে ছুটে দ্বিগুণিত বলে,
তেমনি ছুটিল অমৃত-উৎস, ভাসাইল হাহাকার!
এমন কি পাবে আর!

৭

প্রবীণের মাঝে চির-নবীন,
মধু-মৃদঙ্গ-তাল-তরঙ্গে আর না বাজিবে রুদ্র-বীণ,
পলিত-কেশ ও গলিত-দন্ত,
তবু বিরাজিত চির-বসন্ত,
কি যাদু-পরশে তামসী নিশিতে জাগাত মধ্যদিন!
সে যে গো চির-নবীন।

৮

আজি হ'ল ওগো সকলি শেষ,
স্তব্ধ হইল বিনোদ বাঁশরী অমৃত-লহরী-সু-পরিবেষ।
রস-উদ্গারে ছিল না রে ঘুম,
আজি একেবারে নীরব নিঝুম,
দীরঘ দিনের জাগরণে গাঢ় সুপ্তির সন্দেশ!
এ ঘুমের নাহি শেষ!

৯

আজি এ শোকের কিনারা নাই,—
বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালী ছিল সে, ভা'য়ের মতন ছিল সে ভাই।
কোথা বিদ্রূপ-ভ্রূকুটি-বৃষ্টি,
কোথা শ্লেষ-ভরা সুদূর-দৃষ্টি,
কে দিবে ত্রস্তে বিকার-গ্রস্তে ভেষজ-ভরসা-ঠাঁই?
বুঝি বা কিনারা নাই!

১০

অথবা আছে গো, কিসের দুখ,—
অমৃতের কভু হয় কি মরণ?—অন্তরে চির সে জাগরূক।
সাহারার 'পরে ফোয়ারা ছুটায়ে,
ভাণ্ডার তার গিয়াছে লুটায়ে,
শেষ-দান তার 'অমৃত-মদিরা', 'কৌতুক-যৌতুক';—
দিয়ে গেছে সবটুক্।

১১

সত্য সত্য হে রসরাজ!
অক্ষয় মণি-মঞ্জুষা তব শূন্য কি হ'ল সহসা আজ?
সময়ে গিয়াছ, তবু হয় ভ্রম,
অসময়ে যেন প'ড়ে গেছে 'সম',
অকালে তোমায় নিয়ে গেল কাল, সহিল না কালব্যাজ।
ওগো নট-রসরাজ!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অমৃতলালের কথা অমৃত সমান

রসরাজ অমৃতলালের পরলোকগমনে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রের শিখিধ্বজ রথটি শূন্য হইয়া গেল। অমৃতলাল এক জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও সাহিত্যিক ছিলেন—শিল্প ও সাহিত্য তাঁহার দীর্ঘজীবনের উপজীবিকাও ছিল। অন্নের দায়েও তাঁহাকে শিল্প ও সাহিত্য ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয় নাই,—ব্রতভঙ্গ করিতে হয় নাই,—সরস্বতী ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয় নাই; তাহাতে তাঁহার জীবনের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু ছিল, তাহা নিঃশেষেই দান করিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে ও দেশের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

এ দেশে শিল্পী, রসিক, সাহিত্যিক, ভাবুক ও মনীষিগণ, সাহিত্য, শিল্প, চিন্তা-গৌরব বা ভাবুকতাকে জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ পা'ন না,—তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তিই অন্নার্জ্জনের জন্য স্থূল, নীরস, গদ্যাত্মক কর্ম্মের কারখানায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে দেশের রসপিপাসা বা জ্ঞান-ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁহারা যতটুকু দিতে পারেন, তাহার সবটুকু দেওয়ার অবসরই পা'ন না। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।" কাজেই শক্তির অপচয়ই হয়। এ বিষয়ে অমৃতলাল ভাগ্যবান্ ছিলেন। অবশ্য তাঁহার অপূর্ব্ব জনমনোরঞ্জনী শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহার জীবনে এই ভাগ্য ফুল হইতে ফলের মতই ফলিয়াছিল।

তার পরে একটা মস্ত কথা,—জীবনের আয়ুষ্কাল। দীর্ঘকাল বাঁচিতে না পাইলে এক জন সাধক কি করিয়া জীবনের গূঢ় মর্ম্ম—ভাণ্ডারের রস-সম্পদ বা জ্ঞানবৈভব নিঃশেষ করিয়া দিবেন?

সত্যেন্দ্রনাথকে অন্নের দায়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয় নাই। সাহিত্যকেও জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি ৪০ পূর্ণ না হইতেই, জীবনের ব্রত শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনপুটে যে শক্তি অন্তর্নিহিত ছিল, তাহার কতটুকুই বা আমরা আংশিক বিকাশের মধ্যে পাইলাম? তিনি তাঁহার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের ও গভীর রসপ্রস্রবণের কতটুকু আমাদিগকে দিতে পারিলেন? এই হিসাবেও অমৃতলাল সত্য-সত্যই ভাগ্যবান্।

রসরাজের মধ্যমপুত্র কেতনভূষণ

অমৃতলাল আজ ৭৭ বৎসর বয়সে জীবন-রঙ্গমঞ্চ হইতে মহানিষ্ক্রমণ করিলেন। যতটুকু তাঁহার দিবার ছিল, নিঃশেষ করিয়া তাহা দিয়াছেন। এ জীবনে যতটুকু ভোগ করিবার ছিল, ভোগ্য পাত্রের তলস্পর্শ করিয়াই তিনি তাহা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া যান নাই, দীর্ঘদিন রোগশয্যার সেবা গ্রহণ করিয়া কাহাকেও বিব্রত করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজে হাসিয়া ও সকলকে হাসাইয়া গিয়াছেন—শুভ্র হাস্যকে তিনি জীবনযাত্রার পাথেয়স্বরূপ করিতে পারিয়াছিলেন,—শুভ্র হাস্যমাধুর্য্য যেন তাঁহার শুভ্র তরঙ্গিত কুন্তলে লম্বিত হইয়া

পড়িয়াছিল, চারিপাশে সংরচিত অমৃতচক্রের ইষ্টগোষ্ঠীকে পরমানন্দ দান করিয়া গিয়াছেন। এই নিরানন্দ অভিশপ্ত বাঙ্গালী-জীবনে আর চাই কি? আমরা বলি, তাঁহার জন্য "মা শুচঃ।" শোভন-সুন্দর পরিসমাপ্তির তৃপ্তিতে যে গাঢ় ও গূঢ় আনন্দ—প্রয়াত জনের উদ্দেশে সেই শ্রদ্ধাময় আনন্দ অনুভব করাই আমাদের উচিত।

এ কথা বলা যত সহজ, কাযে তত সহজ হইয়া উঠে না। আমরা স্বার্থপর জীব,—তাঁহার জীবনের চরিতার্থতার কথা ভাবিবার আগেই নিজেদের অভাবের কথাটাই ভাবিতেছি। রসপিপাসা ত মিটিয়া নির্ব্বাণ পায় না—এই পিপাসা যত দিন থাকিবে, তত দিন কেবলই মনে হইবে, যে তুষ্টি ও তৃপ্তি দান করে, সে অমর হইয়া থাকুক। অসম্ভব আগ্রহ,—বাতুলের বাসনা,—তথাপি রসদাতা পাত্র নিঃশেষ করিয়া চলিয়া গেলেও ত বেদনাটা কম হয় না। আবাল্য যে বিরাট মহীরুহকে দেখিতেছি,—যাহার তলে খেলা করিতেছি—ছায়া সম্ভোগ করিতেছি,—ফল-ফুলের মাধুর্য্য ভোগ করিতেছি—এক দিন কালবৈশাখীর ঝড়ে যদি তাহা ভূমিসাৎ হয়, তাহা হইলে "প্রাচীন ও জীর্ণ হইয়া মহীরুহটির কাল পূর্ণ হইয়াছিল", এই কথাটি মনে করিলেই ত মন সান্ত্বনা পায় না। তার পর দৃষ্টি? একটা দিক্ ফাঁক করিয়া যে সে চলিয়া গেল—সে দিক্টা ত খাঁ-খাঁ করে—সেই সঙ্গে মনটাও খাঁ-খাঁই করিতে থাকে।

অমৃতলাল সার্থকনামা,—অন্বর্থনামা, জীবনে যিনি অমৃত দান করিয়া এবং মরণেও মৃত না হন, তিনি সার্থকনামা। মানুষ মরিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, যদি সে নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ জীবন্তদের বিলাইয়া যায়। অমৃতলাল বাঁচিয়াই আছেন—বাঁচিয়াই থাকিবেন, এটা একটা মামুলি বাঁধিগৎ মাত্র নহে। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ চিতায় পুড়ে নাই—তাহা কেবল তাঁহার সাহিত্যের মধ্যেও পুঞ্জীভূত হইয়া নাই—অনেকের জীবনেরই অঙ্গীভূত হইয়া, চিন্তা ও অনুভূতিতেই বাঁচিয়া আছে। রঙ্গমঞ্চের সম্পর্কে, সাহিত্য-সুবাদে, সভা-সমিতি-মজলিসের সম্পর্কে, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের আকর্ষণে যে কেহ তাঁহার কাছাকাছি আসিয়াছিল, সেই-ই তাঁহার জীবনের সারাংশের কিছু কিছু পাইয়া নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে আপন আপন জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে,—অমৃতলাল তাহাতেই বাঁচিয়া রহিবেন।

নাট্যকার হিসাবে অমৃতলালের পরিচয় দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সাহিত্যের যে ধারা সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য, সে ধারায় তিনি কি রসসম্পদ্ ঢালিয়াছেন, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার দরকার দেখি না। দেশশুদ্ধ লোক তাহা আপনাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মর্ম্মে মর্ম্মেই জানে। অমৃতলাল আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সহযোগী ও সুহৃৎ ছিলেন,—তিনি রঙ্গমঞ্চ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে গুরুর মত সম্মান করিতেন। অমৃতলালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এমনি প্রখর ছিল যে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কাছে কোন দিন তাহা ম্লান হইয়া যায় নাই।

আমি বলি, অমৃতলাল ছিলেন—গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক। অমৃতলালের নাটকগুলি পড়িলেই দেখা যাইবে, অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতেছেন,—গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি যে দিকে পড়িতেছে না—অমৃতলাল সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন—গিরিশচন্দ্র যে দিকে চলিতেছেন না, অমৃতলাল সেই দিকে নূতন পথ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য অমৃতলালের শক্তিকে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। অমৃতলালের এ কি অল্প কৃতিত্বের কথা যে, নাটকের আখ্যানবস্তু-নির্দ্দেশ, রস-নির্ব্বাচন, রচনাভঙ্গী, ভাষাবিন্যাস, রুচিপ্রবৃত্তি, সব দিকেই তিনি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অন্ততঃ একটা দিকের কথা ত খুব স্পষ্ট করিয়াই বলা যায়, গিরিশচন্দ্র ভার লইয়াছিলেন অশ্রুর,—অমৃতলাল ভার লইয়াছিলেন হাস্যের। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকলার মূলে ছিল—ধর্ম্ম ও নৈতিক আদর্শ। অমৃতলালের নাট্যকলার মূলে ছিল—প্রধানতঃ অহেতুক আনন্দ। তাই বলি, অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক। দুইয়ে মিলিয়াই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এই দ্বৈত মিলনেই আমাদের দেশের নাট্য-জগৎটির সৃষ্টি।

অমৃতলাল নিজে ছিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। অভিনয়-বিদ্যাতে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। সে জন্য তাঁহার নাট্যের শৃঙ্খলা, বিন্যাস ও রসরূপ নিখুঁত হইতে পারিয়াছে। নাট্যকার নিজে অভিনয়-বিদ্যাকুশল না হইলে, নাট্যরঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

সৌভাগ্যক্রমে অমৃতলাল কৈশোরকাল হইতে 'বখিয়া' গিয়াছিলেন। কৈশোরকাল হইতে অমৃতলাল যদি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ না করিতেন অর্থাৎ (তাঁহারই কথায়) ''বখিয়া' না যাইতেন, তাহা হইলে তিনি এক জন অধ্যাপক হইয়া, কোন্ দিন বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যাইতেন। সেক্সপীয়ার হইতে শরচ্চন্দ্র পর্য্যন্ত অনেকেই কোন-না-কোন দেশের সৌভাগ্যক্রমে কৈশোরেই 'বখিয়া' গিয়াছিলেন, তাই আমাদের রসপিপাসার একটা গতি হইয়াছে।

অমৃতলালকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাকরী গ্রহণ না করিয়াও অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। যে বিধি-বিধান লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাহা একবারে খণ্ডন করিবেন কি করিয়া? তাঁহাকে পাঠশালার বদলে, নাট্য-শালাতেই অভিনয়-বিদ্যার অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল—আজকালকার অধিকাংশ প্রবীণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যা। রঙ্গমঞ্চ-সম্পর্কে যাঁহারা আজ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কোন-না-কোন ভাবে তাঁহার কাছে ঋণী।

মজলিসে যখন অমৃতলাল বসিয়া কথা কহিয়াছেন, তখনও তিনি অধ্যাপক। যাঁহারা তাঁহার কাছাকাছি যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাহা শিখিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহিত্যের শ্রেণীতে ততটা শিক্ষা হয় কি না সন্দেহ।

অমৃতলাল এক জন সুকবি ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার 'কৌতুক'-'যৌতুক' ও 'অমৃত'-'মদিরা' নামক কাব্যগ্রন্থ দুইখানি পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার কবিত্বরস-মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। অমৃতলালের কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয়, অমৃতলাল যেন দীনবন্ধুর সমসাময়িক—ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এ দেশের কাব্য-জগতে যে একাধিকবার যুগবিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র প্রভাবসম্পাতের পরিচয় অমৃতলালের রচনায় পাওয়া যায় না, মাইকেল, হেম, নবীন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ—কাহারও রচনাভঙ্গীর বা রসসৃষ্টি-পদ্ধতির সঙ্গে অমৃতলালের সাম্য-মৈত্রী নাই। ইহার দুইটি কারণ—প্রথম কারণ, অমৃতলাল কৌতুক-কুতূহলী দৃষ্টিতেই জগৎটাকে দেখিয়াছেন, এই দৃষ্টিটি তাঁহার নিজস্ব। কৌতুক-রসকেই তিনি তাঁহার রচনায় প্রধান উপজীব্য-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যের বিষয়বস্তু খুঁজিতে গিয়া, যেখানে দেখিয়াছেন, ব্যঙ্গ-রসিকতা করিবার উপায় নাই, সেখানে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। অমৃতলাল 'দন্তরুচি-কৌমুদীর' কবি, তাই এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া কাহারও সহিত মৈত্রী নাই।

আর একটি কারণ, অমৃতলালের গোঁড়া বাঙ্গালিয়ানা। কাব্যসাহিত্যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা এ যুগে কেহই করেন না। কারণ, কবিরা জানেন, বর্ণে বর্ণে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা—রসসাহিত্যের একটা অঙ্গই নয়, ওটা একটা সাহিত্যিক সঙ্কীর্ণতা মাত্র। দোষই হউক, আর গুণই হউক, অমৃতলালের কাব্যদৃষ্টি খাঁটী বাঙ্গালীর ঘর-সংসার ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না। এই অপ্রশস্ত পরিসরের গণ্ডীতে সম্পূর্ণ নিজস্ব দেশী ভঙ্গীতে যতটুকু রসসৃষ্টি সম্ভব, সে বিষয়ে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এই গোঁড়া বাঙ্গালিয়ানার জন্যই তাঁহার রচনায় পাশ্চাত্যপ্রভাবপুষ্ট ৭০ বৎসরের কাব্য-সাহিত্যের কোন প্রভাবই দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই তাঁহাকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গের কবি গোবিন্দ দাসের রচনা-ভঙ্গীর সঙ্গে তাঁহার কিছু মিল দেখা যায়। কবি হিসাবে, অমৃতলালের প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে, কাব্যের নানা ধারার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অমৃতলালের নাম করিতেই হইবে।

যে দৃষ্টি ও যে ভঙ্গী লইয়া, অমৃতলাল কাব্য লিখিয়াছেন, ঠিক সেই দৃষ্টি ও সেই ভঙ্গী লইয়াই, কথা-সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। তাহাকে ঠিক তথাকথিত কথাসাহিত্য না বলিয়া খাঁটি বাঙ্গালীর সংসারের নিখুঁত চিত্র বলা যাইতে পারে। উপন্যাস বা গল্প নামের মর্য্যাদা যদি তাহাকে নাই দেওয়া হয়, তাহা যে একশ্রেণীর সরসমধুর সাহিত্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয়ে এক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাভঙ্গীর সহিত তাঁহার রসমাধুর্য্যময় রচনাভঙ্গীর সাদৃশ্য আছে।

অমৃতলালের প্রবন্ধগুলি বড়ই উপাদেয়। অমৃতলাল স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন, দেশে এত মতবাদের সৃষ্টি, পুষ্টি ও ধ্বংস হইতেছে, এত যে নব-নব রাজনীতিক ও সামাজিক আদর্শবাদের সংগ্রাম চলিতেছে, এত যে নূতন নূতন সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হইতেছে, কোনটিতে তিনি

নির্ব্বিচারে সায় দিয়া চলেন নাই। তিনি বাহিরের কোন আদর্শ বা মতের সহিত মিলাইবার জন্য আপন অন্তরকে প্রস্তুত করেন নাই। নিজে স্বাধীনভাবে যাহা চিন্তা করিতেন, তাহাই ব্যক্ত করিতেন। এ বিষয়েও তাঁহার গোঁড়া বাঙ্গালিয়ানা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি
রেখেছ বাঙ্গালী করি মানুষ করনি ॥—

এই কথাটিতে অমৃতলালের আপত্তি ছিল। তিনি বাঙ্গালীজাতিকে ছোট করিয়া দেখিতে পারিতেন না, এ বিষয়ে তিনি বঙ্কিমের অনুসারক। তিনি বলিতেন, মানুষের মনুষ্যত্ব-বিচারে যদি রণশৌর্য্যকেই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড ধরা না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালী জগৎসমাজে কিসে কম? বাঙ্গালী পুরুষের মনীষা ও বাঙ্গালী নারীর সহৃদয়তার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল।

বাঙ্গালীকে তিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী জাতি বলিয়াও স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, সুখের পরিমাণ,—অনুভূতির ঘনতায়, সৌভাগ্য-বিলাসের বাহাড়ম্বরে নহে। মানুষের জীবনের সুখের অধিকাংশই তাহার শান্তি-স্বস্তিময় পারিবারিক জীবনেই পরিচ্ছিন্ন। সন্তোষই সে সুখের বৃন্ত সুখের আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাব করিলে, দেখা যাইবে,—বাঙ্গালী একবারে হতভাগ্য নয়। এ বিষয়ে তিনি স্বর্গত সাহিত্য-রথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতানুসারী।

প্রবন্ধাকারে তিনি যাহা-কিছু লিখিতেন,তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিলে, পুঁথি বাড়িয়া যাইত। অনেক কিছু অনুকূলে প্রতিকূলে বলা যাইতে পারিত, তাঁহার মতামতকে যুক্তি দ্বারা হয়.ত খণ্ডন করাও যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার কোন উপায় ছিল না! তিনি ত যুক্তি-তর্ক দিয়া, প্রবন্ধ লিখিতেন না, কোন নজীর তুলিতেন না, আত্মমত-প্রতিষ্ঠার যতগুলি পদ্ধতি আছে, কোনটিই অনুসরণ করিতেন না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও বাঙ্গালী সমাজের চিরন্তন সংস্কারই তাঁহার প্রবন্ধের উপাদান ছিল। আর মনের আবেগে, সরস গদ্য-কাব্যের ভঙ্গীতে আপনার বক্তব্য Hall satiric half serious-ভাবে লিখিয়া যাইতেন। গড়গড়া টানা ও উচ্চহাস্যের ফাঁকে ফাঁকে যেন তাঁহার বক্তব্য-গুলিকে বলিয়া যাইতেন। তাহা লইয়া আর তর্ক-বিতর্ক কিরূপে চলিবে, উপভোগ করাই চলিত। মাঝে মাঝে তিনি প্রবন্ধ-রচনায় চিরন্তন রীতি যে অনুসরণ করিতেন না, তাহা নহে, উদাহরণ-স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর লিখিত 'বিসর্জ্জন' প্রবন্ধটির নাম করা যাইতে পারে।

বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অমৃতলাল

দেশের লোক অমৃতলালকে লেখার মধ্য দিয়া যতটা পাইয়াছে—তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী পাইয়াছে—তাঁহার সাহচর্য্যে—তাঁহার অমায়িক বিনয়-মধুর ব্যবহারে ও জ্ঞানগর্ভ রসঘন বাক্যালাপে।

অমৃতলাল ছিলেন—খাঁটী বাঙ্গালী ভাবের মজলিসী লোক। তিনি যে মজলিস অলঙ্কৃত করিতেন, তাহা গুলজার হইয়া উঠিত। যে সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিতেন—সে সভায় লোক ধরিত না—তাঁহার অভিভাষণ শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। সকল কথাই তিনি সরস করিয়া, কৌতুকোচ্ছল করিয়া বলিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সুচিন্তার অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। রসপিপাসু শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার অভিভাষণে বিমল আনন্দ লাভ করিত। অমৃতলাল বলিতেও পারিতেন অনর্গল,—আশ্চর্য্যের বিষয়—অনর্গল বাগ্‌জল্পনার একটানা স্রোতে, কৌতুকোচ্ছল ও রসফেনিল তরঙ্গের এক মুহূর্ত্তও অভাব ঘটিত না,—রসিকতার ভাণ্ডার তাঁহার এমনি অফুরন্ত ছিল। তাই বলিয়া, একই রসিকতা তিনি বারবার
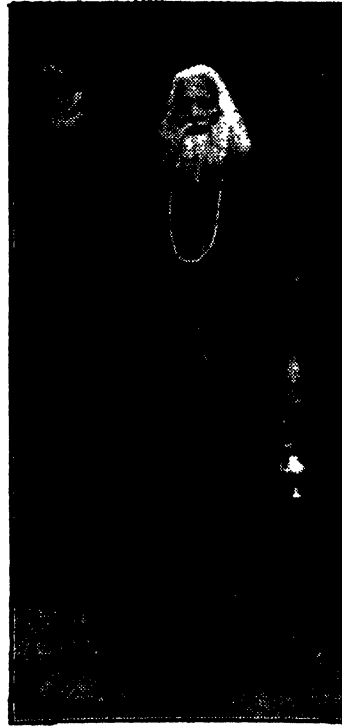
চালাইতেন না—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার নূতন-নূতন রসের কথা যোগাইত। তাই শ্রোতৃবৃন্দের কণ্ঠে একটি হাস্ততরঙ্গ না মিলাইতেই, আর একটি তরঙ্গের উত্থান হইত'—অর্থাৎ সমস্তক্ষণই শ্রোতাকে হাস্যোজ্জ্বল হইয়া থাকিতে হইত। এক কথায় আগাগোড়া মানুষটি ছিল—রসে ভরপুর।

সভার বেদীর উপর উচ্চাসন:অপেক্ষা, অমৃতলালকে মজলিসের ঢালা ফরাসে গড়গড়া হাতে বেশী মানাইত। যাঁহার রুচি,প্রবৃত্তি, সংস্কার,শিক্ষা, আচার-ব্যবহার সবই বাঙ্গালীরই নিজস্ব, তাঁহার চারিপাশের আবেষ্টনী (Back ground and atmosphere) ঠিক বাঙ্গালী ঢঙের হওয়াই শোভন। তাহা না হইলে, স্থানভ্রষ্ট দন্ত, কেশ, নখাদির মত খাঁটি বাঙ্গালী "নরটিও" শোভা পায় না। যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়া করিয়া বাঙ্গালা কাপড়-চোপড় পরেন, অথবা পাঁচ জনের খাতিরে বা চক্ষুলজ্জায় চেয়ার ছাড়িয়া, ফরাসে বসিয়া সকলকে ধন্য করেন, এই শ্রেণীর লোক অমৃতলালের মজলিসে থাকিলে, রসভঙ্গ হইয়া যাইত। গায়ে গা ঠেকাইয়া, ঘেঁষাঘেঁষি বসিতে যাঁহারা অস্বস্তি বোধ করেন না,—বরং তাহাতেই একটা অপূর্ব্ব বিমলানন্দ ও মৈত্রীসুখ ভোগ করেন,—হাসি পাইলে, পাশের লোকের গায়ে ঢলিয়া পড়েন —অন্য কেহ ঢলিয়া পড়িলে বিরক্ত হন না—এমন সব দিলদরিয়া লোক লইয়া, অমৃতলালের রসের মজলিস জমিত। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন—"বন্যেরা বনে, সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" আমাদের অমৃতলাল সুন্দর ছিলেন—প্রাণ খোলা খাঁটি বাঙ্গালী রসিক লোকদের মজলিসে।

রসালাপের মজলিস বলিয়া, কেহ যেন ভাঁড়ামীর আড্ডা মনে না করেন। সাহিত্য, শিল্প, রঙ্গমঞ্চ, বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ও দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির আলোচনা, যে ভাবে, যে ভাষায়, যে ভঙ্গীতে করিলে, বিষয়ান্তরের অমর্য্যাদা হয় না—অথচ শ্রোতার অন্তরে রস-কৌতুকের সৃষ্টি হয়,—রসরাজ সেইভাবে,—সেই ভাষাতেই মজলিসী আলোচনা করিতেন। দীনবন্ধুর শিষ্য ও পঞ্চানন্দের বন্ধু অমৃতলালের রসিকতা যে সব সময় খুব বেশী শাণিত বা মার্জ্জিত হইত—তাহা বলিয়া,—তাঁহার মর্য্যাদা বাড়াইতে গেলে, সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। যে প্রকৃতির রসিকতা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের অঙ্গীভূত, গোঁড়া বাঙ্গালী 'বসুজা' মহাশয় তাহাকে দূষণীয় মনে করিতেন না।

অমৃতলালের একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, সভাসমিতি-মজলিসে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেই পাওয়া যাইত—এ জন্য তাঁহাকে সাধাসাধি করিতে হইত না। ইদানীং আমরা লক্ষ্য করিতেছি—কয়েক জন প্রবীণ সাহিত্যিক সভাসমিতির পক্ষে তাঁহারই মত খুব সুলভ হইয়া পড়িয়াছেন—অনুরোধ করিলেই ইঁহারা সভামজলিস অলঙ্কৃত করেন। ইঁহারা দেশের লোকের সঙ্গে আগে কখনও মিশেন নাই;—যে কারণেই হউক, দেশের সকল প্রকার জনতাকে তাঁহারা বরাবর এড়াইয়া চলিতেন। শেষবয়সে ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মস্ত একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। অমৃতলালের কিন্তু কখনও এ ভুলটি হয় নাই।

প্রাণের অনুরাগেই, স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশেই (কোন প্রকার রাজনীতিক কারণে নহে) অমৃতলাল চিরদিন, জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছেন—সাহিত্যকতা অপেক্ষা ইঁহার কাছে সামাজিকতার মূল্যই ছিল বেশী। ইহার কারণও যে কিছু নাই, তাহা নহে।

অমৃতলাল বলিতেন—"সাহিত্য ও শিল্পের এমন একটা শাখা নিয়ে প্রথম যৌবন হ'তে কারবার সুরু ক'রেছিলাম - যে শাখাকে দেশের শিক্ষিত সমাজ অবহেলার চোখে দেখ্‌ত—তাই আমরা ছিলাম ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয়, থিয়েটারের লোক ব'লে আমাদের সঙ্গে কর্ত্তারা মিশ্‌তেন না। দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে যাঁরা মিশ্‌তেন, তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হয়েই পড়্‌তেন। ফলে, শিক্ষিত সমাজে মিশ্‌বার আগ্রহটা যৌবন হ'তেই মনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এখন আর সে দিন নাই—এখন নাট্যকলার মর্য্যাদা বেড়েছে—শিক্ষিত সমাজের সেরা লোকরাই আজ রঙ্গমঞ্চকে ধন্য করেছেন। এখন বড় উল্টা চাপ চল্‌ছে। আমরা যে লাঞ্ছনা ও গ্লানি ভোগ করেছি—যে নিন্দা-কলঙ্কের বোঝা বহেছি—লোকের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের অন্তরালে যে সাধনা করেছি—তা যে আজ সার্থক হয়েছে—দেখে গেলাম, এটাও জীবনে একটা মস্ত লাভ।" আমাদের পিতৃকল্প ব্যক্তিগণ, তরুণ অমৃতলালের সহিত না মিশিয়া ঠকিয়াছেন—আমরা কিন্তু ঠকি নাই। শুধু ঠকি নাই নয়, আমরা তাঁহাদের ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করিয়াছি—ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

যাঁহারা শিল্প বা সাহিত্যের অনুশীলন করেন—তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বাংশ সরস হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। শিল্প বা সাহিত্যের যে শাখা লইয়া গুণী সাধনা করেন, সে শাখায় পুষ্পিত যে বিশিষ্ট রসচাতুর্য্য ও চিত্তমাধুর্য্য, অন্ততঃ তাহাও গুণীর জীবনের সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত হইবে, সকলেই এ প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু গুণীদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে তাহা বড় দেখা যায় না। অমৃতলালের জীবনে এ বিষয়ে যাহা স্বাভাবিক, তাই লক্ষিত হইয়াছিল। অমৃতলাল প্রধানতঃ ছিলেন—নাট্যকার, নট-গুরু। নাট্যকলা ও অভিনয়বিদ্যা দুইটির মিলন-সামঞ্জস্য হইতে তিনি যে চরিত্রগত মাধুর্য্য ও সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তিতে—ভাষায়-ভূষায়, আচারে-আচরণে, রচনায়-রসনায় সঞ্চারিত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চ হইতে বাগ্‌ভঙ্গীর যে সৌষ্ঠবটি আহরণ করিয়াছিলেন—সে সৌষ্ঠব তাঁহার কণ্ঠের অঙ্গীভূত হইয়াছিল;—নাট্যরচনায় যে শৃঙ্খলাজ্ঞানটি অধিগত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আচার-আচরণগুলিকেও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; অভিনয়বিদ্যার অনুশীলনে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দের রসানুভূতির মনস্তত্ত্ব তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল; কি প্রকারের stimulusএর কি প্রকার response পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। তাঁহার এই জ্ঞান তাঁহার মজলিসী-জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

যে বিদ্যাকে তিনি জীবিকাস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তাহা চিরদিনই জনমনোরঞ্জনী—উল্লাস-সন্দীপনী—সে বিদ্যা তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিসর্পিত হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালী তাঁহাকে ভালবাসিয়া কাছে টানিয়াছিল, ভক্তি করিয়া দূরে সরাইয়া রাখে নাই। সর্ব্বোপরি শিল্পকলার অনুশীলনে তাঁহার মধ্যে যে প্রখর সৌন্দর্য্যানুভূতি সন্দীপিত হইয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার মনে নয়, দেহেও শোভন ভঙ্গী, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। জরা কেবলমাত্র তারুণ্যকে অপসারিত করে না, শ্রী-লালিত্যকেও অপসারিত করে। কিন্তু অমৃতলালের জরা তাঁহার তারুণ্যকে জয় করিতে পারে নাই, জরা তাঁহার চিত্তকে একবারেই অধিকার করিতে পারে নাই। মনে হয়, অমৃতলালের তারুণ্যই যেন জরার অভিনয় করিয়া গিয়াছে—অথবা জরাই যেন তারুণ্যের অভিনয় করিয়া গিয়াছে। আর জরার আক্রমণ সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গীন শ্রী-সৌষ্ঠব যতদূর সম্ভব, তাঁহার দেহে মনে আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

বার্দ্ধক্যেরও একটা নিজস্ব সৌষ্ঠব আছে। কিন্তু অমৃতলালের বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে সৌষ্ঠব, তাহা তারুণ্যেরই সৌষ্ঠব,—যেন জরার পিঞ্জরের মধ্যে বন্দী বসন্তের কলকণ্ঠ চিরতরুণ বিহঙ্গম। তাঁহার সরল মেরুদণ্ডাশ্রিত দীর্ঘাকার মূর্ত্তিতে,—প্রতিভাদীপ্ত ভাস্বর চক্ষুতে—কুঞ্চিত অংসলম্বিত শুভ্রকেশে, তারুণ্যেরই শ্রী,—সায়াহ্নের গিরিশৃঙ্গে শেষ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়—দীপ্যমান ছিল। শিল্প-সাহিত্যের অনুশীলন অমৃতলালের অবসর-বিনোদনের বিলাসমাত্রই ছিল না বলিয়া অর্থাৎ উহা তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত ছিল বলিয়াই এই সকল সম্ভব হইয়াছিল।

এ সংসারে বিনামূল্যে বিনা শুল্কে কিছুই পাওয়া যায় না। জীবদ্দশায় যে ব্যক্তি কোন আনন্দই দেয় না—মরিয়া সে ব্যথাও দেয় না। জীবনে যে জন আনন্দ দেয়, মরণে সে জনই দাগা দিয়া যায়—জীবনে যে যত হাসায়, মরণে সে তত কাঁদায়। যত হাসি, তত কান্না। অমৃতলাল জীবন ভরিয়া বাঙ্গালীকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছেন, যথেষ্ট হাসাইয়াছেন, বাঙ্গালী তাহার কোন মূল্য দেয় নাই—সবই দেনার খাতে লেখা ছিল। আজ দেনাশোধের দিন আসিয়াছে—বাঙ্গালী তাই আজি কাঁদিয়া অশ্রুমূল্যে দেনা শোধ দিতেছে। এ দেনা না শুধিয়া অব্যাহতি নাই—এ যে প্রকৃতির বিধান—মানব-জীবনের সত্যকার রঙ্গমঞ্চের এই রীতি,—কাঁদিয়া পরিসমাপ্তি। এ ত নাগরিক প্রমোদের রঙ্গমঞ্চ নহে যে, বিয়োগান্ত নাটকের পর প্রহসন দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফেরা যাইবে।

শ্রীকালিদাস রায়।

হাডুডুডু খেলায় অমৃতলাল

যিনি কম হইলেও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশকে হাসাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার মরা গাঙ্গে রসের বান প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাথার সমস্ত চুল পাকিয়া যাইলেও প্রাণে ছিল অফুরন্ত যৌবন—বাঙ্গালার কবি অমৃতলাল বাঙ্গালীকে প্রাণ ভরিয়া অমৃত বিলাইয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি রসরাজ। লোক জানে অমৃতলাল কবি, নাট্যকার, নট, রসিক, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, তিনি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেই জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যিনি সারাজীবন ধরিয়া আপন জীবন লইয়া কেবল খেলা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি রঙ্গালয়ে রঙ্গ করিতে করিতে যে হাডু-ডুডু খেলার মাঠে আসিয়া দাঁড়াইবেন, এ ত বিচিত্র নহে। কারণ, অমৃতলাল মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—রঙ্গা-লয় যেমন জাতির ভাবপ্রচা-রের প্রধান কেন্দ্র, তেমনই খেলার মাঠও জাতির মহা মিলনক্ষেত্র। বাঙ্গালার জাতীয় খেলাধূলার লাঞ্ছনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীর আদিমতম জাতীয় খেলা হাডুডুডুর পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আমা-দের সঙ্গে একযোগে যুবকের মত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। "খেলাধুলার জন্যেও যে আমরা ইংরাজের দরজায় ভিক্ষা করতে আরম্ভ করেছি" —এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া প্রাণে-প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল আমাদের হাডুডুডু খেলা প্রচার-আন্দোলনের প্রায় প্রথম হইতেই সহযোগিতা করিয়াছিলেন; এক দিন নহে—এমন কত দিন ধরিয়া হাডুডুডু খেলার বিশেষত্ব, কৌশল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া জাতীয় খেলায় গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। হাডুডুডু খেলার পুনঃ প্রচা-রের জন্য লিখিয়া ভাবিয়া নিজের স্কুলে আদর্শ দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। নিজের শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলে হাডুডুডু খেলার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন; ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে বঙ্গীয় হাডুডুডু প্রতিযোগিতা—"চারুচন্দ্র-স্মৃতিফলকের" ২য় বার্ষিক উৎসব সভার সভাপতি হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে জাতীয় খেলায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং "ছাত্র-সমিতির" সাহিত্য ও শিল্প বিভাগের স্থায়ী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমি এখন যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই তোমা-দের হাডুডুডু খেলা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছি। বুড়ো বয়সে এই আমার এক মস্ত কায হয়েছে।"

অমৃতলাল

আলোচনাপ্রসঙ্গে রস-রাজ অমৃতলাল এক দিন বলিয়াছিলেন, "যে দেশের দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক খেলার দেবতা, সে দেশের খেলা শুধু খেলা নয়, খেলা সে দেশে পূজা, খেলা সে দেশে সাধনা। বাঙ্গালী জাতিকে বাঙ্গালার খেলা খেলিতেই হইবে, নচেৎ বাঙ্গালীর জাতীয় বিশেষত্ব কোথায়?" তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সকল কথার ওপর কথা—প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব থাকবে না? খেতে হবে ইংরেজী কায়দায়, দাঁড়াতে হবে ইংরেজী কায়দায়, স্বদেশী হবে ইংরেজী কায়দায়, আবার খেলতেও হবে ইংরেজী কায়দায়? ব্যস, তাই কর, কিন্তু জাতীয়তা জাতীয়তা ব'লে মিছিমিছি চীৎকার ক'র না, আমাদের ছেলেবেলায়……ফাঁকার খেলার মধ্যে কপাটিটাই খুব বেশী চলতি ছিল। ঐ কপাটিকে কেউ কেউ হাডুডুডু বলে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ এই খেলায় সমানভাবে পরিচালিত হয়। একটু

ধুলোমাটী মাখা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, হার-জিতের আনন্দ এতে বিলক্ষণ আছে, আর একটি পয়সা খরচ নেই।"

নিজের হাতে তিনি নিম্নলিখিত আশীর্ব্বচনটি আমাকে প্রদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, নিজেও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

"শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

আজ ১৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩৩—শিবরাত্রি। এই পুণ্য-দিনে শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, আমার নির্ব্বাসিত বাল্যসখা 'হাড়ুডুডুকে' যে আবার নতুন কাপড়চোপড় পরিয়ে স্বগৃহে এনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা কচ্চো, তার জন্য প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করি। শ্রীঅমৃতলাল বসু।"

বাঙ্গালা দেশের অমর কবি অমৃতলাল এমনি করিয়াই বাঙ্গালীর জাতীয় খেলা হাড়ুডুডুর গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং আমাদের আন্দোলনে আশান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই উপেক্ষিত সেকালের বাঙ্গালার খেলা আবার কৌলীন্যের মর্য্যাদায় আদৃত হবে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ।

অমৃত-তর্পণ

ফুরাইল বাঙ্গালার হাসি, শুকাইল রস-প্রস্রবণ,
রসরাজ অস্তমিত আজ তমোরাশি গ্রাসিল ভুবন।
মলয় বিলয় চিরতরে মধুকর বিরত গুঞ্জনে,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের গীতি সাঙ্গ আজি বঙ্গ-উপবনে;
টুটে গেল সাধের স্বপন, ভেঙ্গে গেল আনন্দের হাট,
নির্ব্বাপিত প্রতিভার দীপ— নটগুরু রসের সম্রাট্।
অমৃতের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছন্দঃ— সদানন্দ, সৌম্য, শুভ্রবেশ,
বাঙ্গালার সে অমৃতলাল গেলা চলি লীলা করি শেষ!
কাঁদো তুমি হে বঙ্গ-জননী, কাঁদো গো বঙ্গের নরনারী,
অভাগা সমাজ কাঁদো আজ, কাঁদো যে বা হিন্দুনামধারী;
সাহিত্যিক নাট্যামোদী কাঁদো, সনাতনপন্থী কাঁদো খেদে,
স্বপক্ষ বিপক্ষ নিরপেক্ষ মিত্র শত্রু কাঁদো অবিভেদে।
আর না দেখিবে রঙ্গালয় অভিনব অভিনয়-রঙ্গ,
ভণ্ডের দণ্ডক চণ্ডরূপী সুজনের চির-অন্তরঙ্গ।
আর না পাইবে নবরস রসলিপ্সু বঙ্গের পাঠকে,
প্রবন্ধ কবিতা গল্প গান প্রহসন অপেরা নাটকে।
উচ্ছৃঙ্খলে শ্লেষের কশায় সত্য-পথে কে ফেরা'বে আর,
নিবারিবে কোন্ শক্তিধর একাকার—লিখি "একাকার"?
"বাবু"রে করিবে কাবু কেবা, "অবতারে" অবতার যত,
সমাজের "বিভ্রাট" ঘুচা'য়ে দিবে "নব জীবনের" ব্রত।
"কৃপণের ধন"-তৃষা হরি পণ-তৃষা বরের পিতার,
"তরুবালা" অখিলের পথ তরুণে দেখা'বে কেবা আর?
তাজ্জবী সে "তাজ্জব ব্যাপারে" সংস্কারকেরে করি যত,
"নিমায়ে"র অমিয় চরিতে চেতা'বে চরিত্রহীনে যত?
অমৃতের অমৃতীর পাকে অফুরন্ত যে অমৃত-ধারা,
দুঃখ-দৈন্য-দিগ্ধ বাঙ্গালীরে আনন্দে করিত আত্মহারা;
সংসারে সমাজে—সর্ব্বকাযে দেশাত্মবোধের প্রেরণায়,
কায়-মনঃ-প্রাণ ছিল যাঁর সমর্পিত জাতির সেবায়,—
ধরা ত্যজি সে মহামানব জীবনের কার্য্য অবসানে,
প্রস্থিত অমৃতলাল এবে অমরায় অমৃত সন্ধানে।
পরাধীন দীন দেশবাসী! কিছু যদি না থাকে সম্বল,
পুণ্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এসো আজি ঢালি আঁখিজল।

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ।

অমৃত-বিয়োগে

হে অমৃত! ছিলে তুমি অমৃতের খনি,
কথায় অমৃত ছিল, ছিল লেখনীতে,
তোমা' 'হারা হয়ে বঙ্গ, মণি-হারা ফণী
সম দুঃখে, ভাগ্যবশে, আঁখিনীরে তিতে।
কে তুলিবে আর হাস্য মাধুরী-ঝঙ্কার
বঙ্গ নাট্যশালে, যারে গড়িলে স্বকরে,
কে শাসিবে সমাজেরে তীব্র ব্যঙ্গ-স্বরে
রচি রম্য তুলা-হীন প্রহসন-হার।
নাট্যাচার্য্য সুরসিক বাগ্মী রসরাজ
শ্রেষ্ঠনট দয়াশীল সাধিয়াছ কায
দেশের দশের তুমি গড়ি বিদ্যালয়
শিক্ষা দানি' বালগণে, উদার হৃদয়।
বঙ্গ-প্রিয় বঙ্গ-ভক্ত করেছ প্রয়াণ
মহাতীর্থে, লভ শান্তি, গাই গুণগান॥

শ্রীগণপতি সরকার।

"অমৃত"-প্রয়াণে

সমুদ্র-মন্থন-সুধা দেবগণ মিলি,'
আকণ্ঠ করিয়া পান, মৃত্যু পায়ে দলি'
অমর হয়েছে তা'রা, শুনি শুধু কাণে,
পাইনি সে স্বাদ কভু, মোরা এ জীবনে;
কিন্তু হে অমৃতরাজ! হৃদয় মথিয়া
যে সুধা দিয়েছ আনি, বাঙ্গালীর হিয়া,
তৃপ্ত আজি, সিক্ত হবে যুগ-যুগান্তর,
বাঙ্গালী ভুলেছে মৃত্যু, হয়েছে অমর।
আজি তুমি আছ কোথা, কোন্ দেবলোকে,
মৃত্যু ভেবে মোরা সবে অশ্রুভরা চোখে,
হাহাকারে কেঁদে মরি গিয়াছি পাসরি
তুমি যে গো মৃত্যুঞ্জয়ী, অমৃত পূজারী।
সার্থক অমৃত নাম, চিরপ্রাণারাম,
ঊর্দ্ধলোকে আজি তুমি "অমৃত সন্তান,"

শ্রীমুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া (এম্-এ)।

নাট্যসম্রাট্ অমৃতলালের বংশ-তালিকা

১। দশরথ ২। কৃষ্ণ ৩। ভবনাথ ৪। হংস ৫। প্র মু শুক্তি (বাগাণ্ডাসমাজ) ৬। প্র মু রাম ৭। প্র মু সোম
৮। প্র মু বনমালী ৯। প্র মু প্রভাকর

১০। প্র মু অনন্ত
১১। প্র মু উৎসকার
১২। প্র মু বিশ্বেশ্বর
১৩। প্র মু শ্রীবর
১৪। প্র মু দেবরাজ
১৫। প্র মু পরমানন্দ
১৬। প্র মু জনানন্দ (জনার্দ্দন)
১৭। বা ক সত্যবান
১৮। বা ক রামকানাই
১৯। বা ক কমলনয়ন (সাং পাঞ্জিয়া, পরে ধলচিতে সঃ ডিঃ বসিরহাট)
২০। ম ২ রামগোপাল
২১। ম ২ রামকিশোর
২২। নন্দদুলাল

২৩। গঙ্গানারায়ণ (সাং শোভাবাজার) — রামধন ০ — রামপ্রসাদ

- গঙ্গানারায়ণ
  - ২৪। কৃষ্ণমোহন
  - ২৪। কালীকৃষ্ণ
    - ২৫। কৈলাস
      - ২৬। অমৃতলাল
        - ২৭। ক্ষেত্রভূষণ
          - ২৮। প্রীতি-ভূষণ
          - ২৮। নীতি-ভূষণ
          - ২৮। বলেন্দ্র
          - ২৮। পুরুষ-সিংহ
        - ২৭। কেতনভূষণ
          - মিহিরভূষণ
          - অনিলভূষণ
        - ২৭। শশিভূষণ
        - ২৭। অসিভূষণ
      - ২৬। ললিতমোহন
      - ২৬। যোগেন্দ্রনাথ ০
    - ২৫। হরিশচন্দ্র
      - ২৬। নগেন্দ্রনাথ
        - নন্দভূষণ
        - উপেন্দ্রভূষণ
        - ভুজেন্দ্রভূ

[১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৮ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৬ [৪র্থ সংখ্যা

বিলাতের স্মৃতি

১৮

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেচি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম, এত দূর থেকে তা আর সম্ভব হয় না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছিতে যে দীর্ঘ সময় যাবে, সেই সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি, আর যা বলি, তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায়। কেন না, আমরা ওদের এক ক'রে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আমরা ভাগ ক'রে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেন না, তখনকার মত ঘরের মধ্যেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোট ঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন, সে-ও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংযত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলাস্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্তা আছে, তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ ব'লে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশতঃ অংশমাত্রকে একান্ত ক'রে জানচি ব'লেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলচে, কা'ল সেখান্ থেকে আলো স'রে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্ব স'রে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি, মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে, সে বুঝি তার মাকে হারিয়েচে—এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে, আলোতেও

তার মা আছে, অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মত—আমরা বৃথা ভয়ে কাঁদি, জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে সত্যকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্ত্তিকে দেখ, সে মূর্ত্তি আনন্দমূর্ত্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ-রূপ কি কখনই টি'কে থাকৃতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেন না, এ কথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য্য কখনো নিভবে না। বিশ্বের মধ্যে মহাপ্রাণই হচ্চে অনির্ব্বাণ সত্য, সেই জন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিভলেও ভাবনা নেই। যা ও যা হাঁ, তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখচি, সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস কর, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর, কুয়াসাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয়বাণী ঘোষণা করচে, মৃত্যু কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করিতে পারচে না। মেঘ বারে বারে এসে সূর্য্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্চে, কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারচে না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্চে, কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন ক'রে বিলুপ্ত করতে পারবে না। অতএব মনকে শান্ত ক'রে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা কর, মৃত্যুকে না। যাকে ভালবেসেচ, যাকে সত্য ব'লে জেনেচ, সে মৃত্যুতেও সত্য আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩২৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাপ্ত

তোমারে

তোমারে খুঁজেছি আমি যুগ-যুগান্তর
হে চির-বন্ধন-হারা হে চির-বাঞ্ছিতা!
খুঁজিয়াছি কোথা নিত্য আনন্দ-নির্ঝর—
অকলঙ্ক প্রেমভক্তি আনন্দ-পালিতা!

যেখানে মোহের খেলা কাম ইন্দ্রজাল
তোমার আভাস আসে স্বপনে স্বপনে,
ব্যর্থ তপস্যার ক্লেশ গেছে দীর্ঘকাল
শ্রান্ত হিয়া কাঁদিয়াছে ভুবনে ভুবনে।

পঞ্চ-কাম পাশমুক্ত হৃদয় আমার
তোমারে পেয়েছি আজি অন্তরে বাহিরে।
উথলিছে কি অনন্ত সুধা-পারাবার
নিত্য জ্ঞান দিব্য জ্যোতিঃ এ চিত্ত-মন্দিরে।

অয়ি নিত্যা এ চিত্তের নিত্যানন্দমাঝে
তব প্রেমবাণী যেন গীতি সম বাজে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

পুরাণ-প্রসঙ্গ

২

পুরাণের রচয়িতা

এই পুরাণ পূর্ব্বে একই ছিল, পরে দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক অষ্টাদশ ভাগে উহা বিভক্ত হয়। এই বিভাগ-কর্ত্তাকেই রচয়িতা বলিলে দ্বৈপায়নকেই পুরাণ-সকলের রচয়িতা বলিতে হয়,আর যদি যে যে পুরাণের যাঁহারা বক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই রচয়িতা বলা না যায়, তবে তাহা প্রতি পুরাণ-ভেদে বহু। আমরা পুরাণ-সকলের বক্তাকে রচয়িতা বলি না। কাশীখণ্ডের "অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ" এই বাক্যানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেই পুরাণ-রচয়িতা বলি। তত্তৎ-পুরাণের বক্তৃগণ রচয়িতা নহেন, ঐ বক্তৃগণ যাঁহাদিগকে যে যে বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা জনসমাজে যেরূপেই হউক, প্রচারিত ছিল। উহাকে একত্রে গ্রথিত করিয়া ব্যাস পুরাণ রচনা করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মাই প্রথমে চতুষ্পাদ পুরাণ নির্ম্মাণ করেন, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ঐ চতুষ্পাদকে প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত ও উপসংহার বলিয়াছেন। পূর্ব্বে যে একই পুরাণ ছিল, সেই পুরাণই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পাঠে জানা যায়, ১৭শখানি মহাপুরাণ, উপপুরাণ ও ভারত বেদব্যাস রচনা করেন। মাত্র বিষ্ণুপুরাণ পরাশর-কৃত। অন্য যে যে ঋষি উপপুরাণ-কর্ত্তা ছিলেন, সেই উপপুরাণ-গুলিরও বেদব্যাসই শ্লোক-কর্ত্তা। অন্যান্য ঋষিগণমধ্যে কেহ বক্তা, কেহ বা লেখক মাত্র। (১)

পুরাণ পাঠের প্রণালী

পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা—এই দুই রকমে পুরাণের ব্যবহার দেখা যায়; পূর্ব্বে একমাত্র পুরাণ-ব্যাখ্যা ই হইত বলিয়া বোধ হয়। অষ্টভাগে বিভক্ত দিনের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনার কথা "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ' এই রঘুনন্দনধৃত সংহিতাকারের বাক্যই এবং কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে কথিত রাজাদের বিনয়নের জন্য পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শ্রবণবিধি দ্বারাও উহাই বুঝা যায়। "পশ্চিম-মিতিহাসশ্রবণে" অর্থশাস্ত্রে দিনের শেষার্দ্ধ যাপনের কথা আছে (১।৫)। উপনিষদাদিতে পুরাণকে বেদ বলায় পুরাণপাঠ পরবর্ত্তী কালে অভুক্তাবস্থায় ব্রাহ্মণ দ্বারা বিহিত হইয়াছে। উহার বিস্তৃত বিধান মৎস্যসূক্ত, বারাহীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের ৭১ অধ্যায়ে আছে। প্রথমে নারায়ণাদির নমস্কার করিয়া 'জয়' উচ্চারণ করিবে, ইহা প্রতিপুরাণের প্রথমেই আছে, জয়-পদের অর্থ ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মচারিখণ্ডে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, বিষ্ণুধর্ম্ম, শিবধর্ম্ম, সৌরধর্ম্ম, মানবধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাভারত, 'জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ, জয়ত্যনেন সংসারমিতি জয়ঃ।' আধারে পুস্তক রাখিয়া পাঠ করিবে, হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অল্প ফল হয়। নিজের লিখিত, মূর্খের লিখিত বা অব্রাহ্মণ-লিখিত পুস্তক পাঠ করিবে না। অধ্যায়মধ্যে বিশ্রাম করিবে না, করিলে ঐ অধ্যায় প্রথম হইতে পুনরায় পাঠ করিবে। ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-প্রস্তাবে প্রাতঃকালে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া পাঠক কুশ-হস্তে দেব-দ্বিজ-গুরুকে চিন্তা করিয়া ব্যাস ও শুকদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক অর্থবোধসহকারে পাঠ করিয়া শ্রবণ করা-ইবে। শ্রোতা প্রাঙ্মুখ হইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিবেন; এবং পূজাদিবিধান আছে। অভাবে তিনখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে হয়। বঙ্গদেশে এখনও এইরূপ ব্যবহার আছে—পাঠক, ধারক ও শ্রোতা থাকেন। এইরূপ পাঠ প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, দিনের ষষ্ঠ সপ্তম ভাগে উহার ব্যাখ্যা হয়, ইহার ব্রতীদিগের অবশ্য-পাল্য কতকগুলি নিয়মও আছে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ শব্দকল্পদ্রুমের 'পাঠ' ও 'পারায়ণ' শব্দে দ্রষ্টব্য।

পুরাণ-প্রচারক্রম

পুরাণসকল সঙ্কলন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস সূতজাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণকে প্রদান করেন। তাঁহার ৬ জন শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃত-ব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি, শাংশপায়ন

---

(১) আদৌ মহাভারতাখ্যং বেদব্যাসঃ করিষ্যতি।
তত্তো বিষ্ণুপুরাণস্ত কর্ত্তা ভাবী পরাশরঃ।
এবং মহাপুরাণানি ব্যাস একঃ করিষ্যতি।
কর্ত্তা চোপপুরাণানি ব্যাসোঽপ্যন্যোঽপি কেচন।
বেদব্যাসঃ শ্লোককর্ত্তা সর্ব্বেষামেব সর্ব্বতঃ।
লেখকঃ কোঽপি বক্তা চ কোঽপি চার্থনিরূপকঃ।
—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২১ অধ্যায়।

৪খানি সংহিতা রচনা করেন। মূল রোমহর্ষণসংহিতা। ইহার মধ্যে শাংশপায়ন-সংহিতা ভিন্ন প্রত্যেক সংহিতার ৪ হাজার করিয়া শ্লোক ছিল।

পূর্ব্বোক্ত কথাসকল বায়ু ৩১।৫৫—৬২, ব্রহ্মাণ্ড ২।৩৫—৬৩—৫৭, বিষ্ণু ৩।৬।১৭—১৯ শ্লোকে বিস্তৃত আছে।

এইরূপে মূল পুরাণ-সংহিতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া অষ্টাদশ পুরাণে পরিণত হয়।

পুরাণপাঠক সূতজাতির কথা

আমরা যাঁহাদের নিকটে এই পুরাণ প্রথম পাইয়াছিলাম, তাঁহারা সূতজাতি নামে খ্যাত। সূতজাতি দুই প্রকার ;—১ম বেণ-পুত্র পৃথুর যজ্ঞে রাজবংশের স্তুতিপাঠকরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইহাদিগকে মগধের পূর্ব্বাংশ অনূপ-নামক বাঙ্গালার অংশবিশেষ বাসের জন্য প্রদত্ত হয়। ২য় ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে প্রতিলোমজাত। ইহাদের মধ্যে প্রথমে জীবিকা ও কার্য্য পরস্পর পৃথক্ ছিল, কালক্রমে দুই এক হইয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত সূতজাতির কার্য্য ছিল—দেবতা, ঋষি, রাজা ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের বংশাবলীর কথা রক্ষা করা ও স্তুতিপাঠ। প্রতিলোমজ সূতজাতির সারথ্য ও হস্ত্যশ্বচরিতবিজ্ঞান এবং নিন্দিত-চিকিৎসা কার্য্য ছিল। ইহারা পূর্ব্বোক্ত সূতের সমানধর্ম্মা বলিয়া উহাদের কার্য্যও পাইয়াছিল। পৃথুর যজ্ঞে সূতোৎপত্তির কথা বায়ু, পদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, হরিবংশ, ব্রহ্ম, কূর্ম্ম, শিব, অগ্নি, ভাগবত পুরাণ ও মহাভারতে কথিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে সূতের ন্যায় মাগধ ও বন্দীর উৎপত্তি হয়। ইহাদের কার্য্য এইরূপ বর্ণিত আছে—সূত পৌরাণিক মাগধ-বংশশংসক ; বন্দী—স্তুতিপাঠক হরিবংশ ৭।৫—৯, মহাভারত কর্ণপর্ব্ব—১।১২।

অশ্বমেধপর্ব্বে—'অশ্ববিদ্যাবিদশ্চৈব সূতাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। বিরাটপর্ব্বে—অশ্বত্থামা কর্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, 'ভাবন্ত রথকারস্য ন ব্যবস্যন্তি পণ্ডিতাঃ" অর্থাৎ সারথির ভাব পণ্ডিতরা বোঝেন না। উহারা কালক্রমে দুই মিলিত হইয়া ইতিহাস-পুরাণ ধারণ করিত। (১)

সমাজে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে উঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া, পূর্ব্বতন মহাত্মগণের চরিত্রবর্ণন দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীর তৃপ্তিবিধান করিত। জনমেজয়ের যজ্ঞে এই কার্য্য ব্রাহ্মণ বৈশম্পায়ন করিয়াছিলেন। রোমহর্ষণের পর তাঁহার পুত্র ব্যতীত ৫ জন ব্রাহ্মণ এই সূতের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট সূতই বক্তা, ইনি ভাগবতে নিজেকে বিলোমজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং সূতকে ব্রাহ্মণের তুল্য বলা হইয়াছে। বলরাম তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে (১) নৈমিষারণ্যে গমনপূর্ব্বক সূতকে উচ্চাসনে দর্শন করিয়া ক্রোধে তাহাকে নিধন করেন। ঋষিগণ বলরামকে তাঁহার কৃত কার্য্য যে অন্যায় হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়া দেন এবং তজ্জন্য ঋষিদের আদেশমত কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন। (২)

সূতজাতির উত্তম কার্য্য ছিল এই বংশধারা বা পৌরাণিকতা, মধ্যম সারথ্য এবং চিকিৎসা অধম। অর্থশাস্ত্রে আছে—'পৌরাণিকশ্চ অন্যঃ সূতো মাগধশ্চ ব্রহ্মক্ষত্রাবিশেষতঃ" এই ব্রহ্মক্ষত্র পদের অনেকার্থ হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বুঝায়। ফল কথা, কৌটিল্য সূতকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, মহাভারতে সেরূপ বলা হয় নাই। অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮।৪৯ অধ্যায়ে বিলোমজাতির বর্ণনপ্রসঙ্গে সূতের কথা আছে।

---

(১) স্বধর্ম্ম এব সূতস্ত সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেজসাম্। বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্। ইতিহাস-পুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

বায়ু—১।৩১—৩২।

এষ ধর্ম্মস্তু সূতস্য সাদ্ভির্দৃষ্টঃ সনাতনঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেজসাম্॥
তদ্বংশধারণং কার্য্যং শ্রুতীনাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাসপুরাণেষু দৃষ্টা যে ব্রহ্মবাদিনঃ॥
যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিতঃ।
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মা প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষাত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যন্তু চিকিৎসিতম্॥

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড—১।২৭—২৮

(১) মহাভারতের অন্তর্গত বলদেবের তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়কে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণও অত্যাধুনিক বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি এইমাত্র বক্তব্য যে, এই তীর্থযাত্রাপ্রকরণ আধুনিক হইলেও মহাকবি কালিদাসের সময়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল, নতুবা কালিদাস কখনই মেঘদূতে "হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে" এই কথা লিখিতে পারিতেন না। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও বলদেবের তীর্থযাত্রার কথা বিস্তৃতভাবে আছে। এই পুরাণ যে অত্যন্ত প্রাচীন, ইহা আধুনিক শিক্ষিতগণও স্বীকার করেন।

(২) ভাগবত ১০ স্কন্ধ—৭৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণের পৌরাণিকতা

সূত-জাতির পরে ব্রাহ্মণগণ বেদের ন্যায় পুরাণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ চিরকালই জ্ঞানী ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানবজাতির আদর্শস্বরূপ। তাঁহাদের সময়ে পুরাণমধ্যে ঐ সকল জ্ঞানের কথা—ভক্তিতত্ত্ব ও মোক্ষোপায়-কথা স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া মিঃ পার্জিটারের বিশ্বাস।

আমরা এই যুক্তি সমীচীন মনে করি না। কারণ, মহাভারতে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গের কথা আছে, তদপেক্ষা অধিক কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই এবং মহাভারত রচনার পরও বহুকাল যাবৎ সূত-জাতির নিকটেই পুরাণ-ধারণের ভার ছিল। সেই সময়েও ঐ সকল ছিল না, এ কথা বলিবার কোন যুক্তি দেখা যায় না। বহু স্থানে এ কথা বলা আছে যে, বেদার্থ পুরাণে ও ভারতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বেদে ও ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে মুক্তিতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ছায়া পুরাণে থাকা অন্যায় নহে, বরং পুরাণের সর্ব্বজ্ঞতা-রক্ষার জন্য থাকাই প্রয়োজন। তবে সূত-জাতির বেদে অধিকার না থাকায় ঐ অংশ তাহারা জানিত না বা বলিত না; উহা ব্রাহ্মণগণ জানিতেন ও বলিতেন, ইহা অসম্ভব নহে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা বলিবার অনধিকারী, এই কথা মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত প্রজাগরপর্ব্বে আছে। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সার্ব্বণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত এই ছয় জন পৌরাণিক, এই কথা ভাগবতের ১২শ স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে আছে।

পুরাণের শ্রোতা ও অধিকার-বিচার

বেদ-শ্রবণের অনধিকারীই পুরাণ-শ্রবণের অধিকারী এবং তাহাদের জন্যই পুরাণ বিশেষভাবে লিখিত। স্ত্রী, শূদ্র ও [illegible] ব্রাহ্মণগণই পুরাণ-শ্রবণের প্রধান অধিকারী বলিয়া [illegible]র্ত্তিত হইয়াছেন। আচণ্ডাল সকলেই পুরাণ শ্রবণ করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নাই। পুরাণ [illegible]নিবার অধিকারী বলিয়া তাহারা স্বাহা-প্রণবযুক্ত [illegible] গ্রহণের অধিকারী নহে, উহা সেই সকল পুরাণে ও তন্ত্রের [illegible]ন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে [illegible]তারও এইরূপই হইয়া আসিতেছে। কোন কোন উগ্রকর্ম্মা সনাতন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, বর্ত্তমানে অনধিকারীকে ঐ প্রণবযুক্ত মন্ত্র দান করিয়া জগদ্গুরুর পদ দখল করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের গীতার 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং' এই মহাবাক্যটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল। পাঠকগণ! মনে করুন, উপনিষদে রথে বামনদর্শনকে আত্মদর্শনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আত্মা বামন, রথী, রথ শরীর, ইন্দ্রিয় অশ্ব, মন লাগাম বলা হইয়াছে। এই গভীর রহস্য উচ্চাধিকারীর, যদি ইহা সাধারণ্যে বলিয়া রথে জগন্নাথ-দর্শনকে উড়াইয়া দেওয়া যায়; তবে লক্ষ লক্ষ নিম্নাধিকারীর কি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়! তাহারা না পারে আত্মদর্শন বুঝিতে, না পারে রথে জগন্নাথদর্শনে যে মুক্তি হয়, ইহাতে বিশ্বাস করিতে। সুতরাং সকলের মধ্যেই অধিকারী বিচার করা আবশ্যক। কে কতটা বুঝিবার যোগ্য, তাহা বুঝিয়াই উপদেশ করা উচিত। দয়ার অবতার বুদ্ধদেব আচণ্ডালে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তদুপদেশগ্রহণে সমর্থ না হইয়া, বিভিন্নমতাবলম্বী হইয়া, কত বিশৃঙ্খলা সমাজে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকমাত্রের জানা আছে। শোকতাপক্লিষ্ট, অবিনীত, অশিক্ষিত রাজা হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই পুরাণ শ্রবণের অধিকারী।

পুরাণের লক্ষণ

বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, কূর্ম্ম প্রভৃতি বহু পুরাণে ও অমরকোষাদি অভিধানে পুরাণের পঞ্চলক্ষণই প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥' সর্গ—তত্ত্বসৃষ্টি, প্রতিসর্গ—মরীচি প্রভৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্টি বা প্রলয়, বংশ—দেবতা, ঋষি ও অমিততেজস্বী রাজগণের বংশ, মন্বন্তর—মনুর শাসনকাল দিব্য ৭১ যুগ, বংশানুচরিত—উক্তবংশ সংসৃষ্টগণের চরিত্র। এই ৫টি বিষয় পুরাণমধ্যে না থাকিলে পুরাণের স্বরূপাদি নির্ব্বাহই হইতে পারে না, আমরা পরে এই লক্ষণ মিলাইয়া বিস্তৃতভাবে দেখাইব। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মহাপুরাণের দশ লক্ষণ বর্ণিত আছে, যথা— সর্গ (১), বিসর্গ (২), বৃত্তি (৩), রক্ষা (৪), অন্তর (৫), বংশ (৬), বংশানুচরিত (৭), সংস্থা (৮), হেতু (৯), অপাশ্রয় (১০)।

সর্গ—বিশ্বের উৎপত্তি, বিসর্গ—অবান্তরসৃষ্টি, বৃত্তি—স্থিতি, রক্ষা—পালন, অন্তর—মন্বন্তর, (বংশ—বংশানুচরিত) সংস্থা—প্রলয়, হেতু—জীব-বাসনা, আশ্রয়। এই দশলক্ষণ

মহাপুরাণের, পঞ্চলক্ষণ উপপুরাণের এবং পূর্ব্বোক্ত ভাগবতের ১২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের—২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে। মৎস্য-পুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে ১০—৬৯ শ্লোকে পুরাণের মধ্যে যে ধর্ম্মজ্ঞান দেবতত্ত্ব প্রভৃতি থাকা দরকার, এই কথা বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণেও ১৮ পুরাণের কথা বলিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, নদ, নদী, যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, দান, বিশ্বাস, জ্ঞান ও পঞ্চদেবতার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। নারদীয় পুরাণে আছে—"প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণাদভবত্ততঃ" ইহা দ্বারাও নিখিল বিষয়ই যে পুরাণের অন্তর্গত হইবে, ইহা বুঝা যায়। পঞ্চলক্ষণই অধিকাংশ পুরাণে থাকায় উহাই পুরাণের লক্ষণ মানিয়া লইতে হইবে। ভাগবতোক্ত দশ লক্ষণ মাত্র ভাগবতেই প্রযোজ্য।

পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধে মতবাদ ও তৎখণ্ডন

প্রায় সকল পুরাণেই এই পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত বহু কথা আছে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, উহা লক্ষণের অতিরিক্ত কিম্বা উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। যদি অতিরিক্ত হয়, তবে পরবর্ত্তী কালে কোন স্বার্থবিশেষ সাধনের জন্য কাহারও দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে, এই কথাই আধুনিক সভ্যগণের মত। পার্জ্জিটারের বিশ্বাস যে, "ব্রাহ্মণগণ ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এবং অধিকাংশ লেখকই সহরে বাস না করিয়া অরণ্যে বাস করিতেন; স্থতরাং তাঁহাদের ঐ অংশে বিশেষ আস্থা ছিল না, এই জন্য তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইতিহাস লিখিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন" ইত্যাদি।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিতগণ মনে করেন যে, যাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষি, অভ্রান্ত। এখন-কার দিনে যেমন সামান্য একটু লেখাপড়া করিয়াই নিজের সামান্য জ্ঞান পল্লবিত করিয়া জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক যশস্বী হইবার জন্য অকিঞ্চিৎকর অতথ্যপূর্ণ বহুল গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে ও প্রকাশিত হইতেছে, পূর্ব্বে জনসমাজে অপরীক্ষিত কথা বা মত প্রচারিত হইত না। প্রচারিত হইলে সেই মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলে মত-প্রচারক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এই নিয়ম মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ছিল, ইহা বৈদেশিক ম্যাগাস্থানিস নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।...

যে ভ্রান্ত, সে কখনও পরের নির্ভুল জ্ঞান স্বীকার করিতে পারে না। আদর্শ না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। এ দেশের শিক্ষায় ও ব্যবহারে যেরূপ শ্রদ্ধা বিশ্বাস উদারতা আছে, তাহা অন্য দেশের শিক্ষায় ও ব্যবহারে নাই, সুতরাং তাহাদের এই সকল শঙ্কা-সমাধান এ দেশের লোকের রুচিপ্রদ নহে। তবে যাঁহারা তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত, তাঁহারা উহাতে মুগ্ধ স্তম্ভিত হইতে পারেন। যাঁহারা বর্ত্তমান কালেও আদর্শ সাধু—তৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যোগপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞতা, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি হয় এবং অলৌকিক শক্তি জন্মিতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে উপলভ্যমান মুদ্রিত পুরাণসকল যে অবি-কৃত, এ কথা বলা যায় না। আধুনিক মুদ্রিত পুরাণের কলেবর খণ্ডিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছে। নারদীয় পুরাণমধ্যে অষ্টাদশ পুরাণের যে সূচী আছে, তাহা উপলভ্যমান পুরাণসকলে নাই এবং তদতিরিক্ত কথা বহু আছে। পুরাণের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিকৃত করিবার জন্য দায়ী উহারা।

এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পুরাণসকল লইয়া পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিলে জনসমাজ অবিকৃত পুরাণ দেখিতে পারেন। কিন্তু আর অর্দ্ধ-শতাব্দীমধ্যে উদ্ধারের আশাও লুপ্ত হইবে, এই সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য ও বিধ্বস্ত হইতেছে।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণও পুরাণাদিতে প্রক্ষিপ্তাংশের আধিক্য মনে করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহার কিঞ্চিৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। এই বিষয় পরে আরও বিশদ-ভাবে পঞ্চলক্ষণ-পরিষ্কারে দেখান হইবে।

পুরাণে বর্ণিত কালত্রয়

পুরাণে ও ভারতে বর্ণিত বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎকাল কখন্ হইতে গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে পার্জ্জিটার বলেন, ভারত-যুদ্ধ হইতে ১ শতাব্দী পুরাণ সকলের বর্ত্তমান কাল, তৎপূর্ব্বসময় অতীত মধ্যে গণ্য এবং পরবর্ত্তী কালই ভবিষ্যৎকাল। পুরাণপাঠক-মাত্রকেই ভারতযুদ্ধ হইতে ১ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময় সম-কালীন বলিয়া নিজেকে ধরিয়া লইতে হইবে এবং তাহার পর কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উহা বিস্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে।...

কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে লইয়াই যখন ভবিষ্যপুরাণ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, তদবধিই ভবিষ্যকাল। লোকের চিত্তাকর্ষণের জন্য ও বক্তব্য বুঝাইবার জন্য সামান্য অতীত কালের কথা লেখা হইয়াছে এবং অন্যান্য পুরাণে ও ভারতে দেখা যায়, ভারতযুদ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের কথা সংক্ষেপে বলিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। জনমেজয়ের প্রপৌত্র অসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে বায়ু ও মৎস্যপুরাণ সঙ্কলন বা সমাজে প্রথম প্রচারিত হয়, উক্ত পুরাণদ্বয়ে অসীমকৃষ্ণের বংশধরগণ ভবিষ্যরাজগণমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই অসীমকৃষ্ণের সম-সাময়িক ছিলেন অযোধ্যার দিবাকর এবং মগধের সেনজিৎ। দিবাকর বৃহদ্বলের অধস্তন ৫ম, বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুহস্তে নিহত হয়েন। সেনজিতের ঊর্দ্ধতন ৭ম সহদেবও ভারতযুদ্ধে নিহত হয়েন। গরুড়পুরাণ জনমেজয়ের সময়ে সঙ্কলিত হইলেও অযোধ্যা ও মগধের রাজগণের নাম ভারতযুদ্ধের পর হইতেই দিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয়, ভারতযুদ্ধের ১ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরাণের বর্ত্তমান কাল, তাহার পূর্ব্ব অতীত ও পর ভবিষ্য ধরিলে কোনরূপ দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্য, বিষ্ণু, গরুড় ও ভাগবতে ভারতযুদ্ধের পর হইতে ভবিষ্যৎ এবং মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ১ শতাব্দী পর হইতে ভবিষ্যৎ কাল আরম্ভ হইয়াছে। এই সব পুরাণে ভবিষ্যাংশ দৈবজ্ঞের ন্যায় বলা হইয়াছে অথবা পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব ও উদয়নের কথা অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও এই আখ্যায়িকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ভারতযুদ্ধ খৃষ্টের ৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহাই পার্জিটারের মত।

মতবাদ-খণ্ডন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্ষ বিজ্ঞানবলে ঋষিগণ ভবিষ্যাংশ [illegible]য়াছেন। উহা পরে সন্নিবেশিত হয় নাই। তাহা হইলে [illegible]বর্ত্তী ঘটনা অত সংক্ষেপে লিখিত হইত না। বুদ্ধের কথা [illegible]ওপুরাণে সংক্ষেপে আছে, 'তস্মাৎ শাক্যঃ শাক্যাৎ [illegible]দনঃ তস্মাৎ রাতুলঃ' এই অংশে পরবর্ত্তী কালে কিছু [illegible]তি ঘটিয়াছে, উহার কারণ মুখে মুখে রাখায় এইরূপ [illegible]। উক্ত পাঠ এইরূপ হইবে,—"ততঃ শুদ্ধোদনঃ তস্মাৎ [illegible]লঃ।" পুরাণে ও ভারতে এইরূপ আরও ঘটিয়াছে,তাহার [illegible], বৌদ্ধ ও যবনবিপ্লবে বহু গ্রন্থ বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং উদয়নের কথা ছিল না, এ কথা বলা যায় না। মেঘদূতে কালিদাস 'প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাং' 'প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে' বলিয়াছেন। তিনি অপৌরাণিক কোন ঘটনাই লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অগ্নিপুরাণে ১৬শাধ্যায়ে বুদ্ধাবতারের কথা আছে, "অগ্নি বলিলেন, সম্প্রতি বুদ্ধাবতারের কথা বলিতেছি, ইত্যাদি; তখন মায়ামোহস্বরূপ ভগবান্ শুদ্ধোদন পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন, তিনি দৈত্য-প্রকৃতি মানবগণকে বেদধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া আর্হত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি।

পঞ্চলক্ষণাতিরিক্তাংশ প্রক্ষিপ্ত কি না?

পুরাণবর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশবিদ্যায় বর্ণিত সমস্ত বিষয়ই পুরাণে আছে, যাহা পরে বিস্তৃতভাবে দেখান হইবে। অথচ পুরাণকার পুরাণের লক্ষণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই পাঁচটির কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্দেশ করার পর অতিরিক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করার অভিপ্রায় কি? এই প্রশ্নে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ বলেন যে, পুরাণের অবশ্য-বর্ণিতব্য বংশ ও বংশানুচরিত পদে কয়েকটি বংশসম্ভূত ব্যক্তির নামসমূহ নহে, তাঁহাদের চরিত্র পূর্ণভাবে বলিতে হইলে যে যে বিষয় বলা প্রয়োজন, উহা সকলই পুরাণে কথিত হইয়াছে, এই জন্য এই অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বা তাঁহাদের শিষ্যগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, পুরাণ নামে প্রচলিত গ্রন্থসকলে লক্ষণাতিরিক্ত যে যে অংশ পাওয়া যায়, উহা পুরাণনির্ম্মাণের বহু পরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, স্ত্রী, শূদ্র ও মূর্খ ব্রাহ্মণগণের জন্য নিখিল বেদার্থ ও অঙ্গ উপাঙ্গ সকল বিষয়ই পূর্ব্বাবধি পুরাণে বর্ণিত ছিল। তাহার প্রধান বিষয় ছিল, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই পাঁচটি। পুরাণ দ্বারা একরূপ সর্ব্বজ্ঞতাই লাভ হইত, তার পর কালক্রমে বৌদ্ধ ও যবন-বিপ্লবে পুরাণসকল ও অন্যান্য গ্রন্থসকল বিধ্বস্ত, বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়েও পুরাণের যে কলেবর আমরা দেখিতে পাই, উহা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের ইচ্ছানুসারে অনেক বিকৃত করিয়াছে বা স্বরূপ প্রকাশ করিতে তাদৃশ প্রযত্ন করে নাই। অবশ্য সকল পুরাণের বা

সকল মুদ্রাকর সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য না হইলেও অধিকাংশ সম্বন্ধে বলা যায়, ইহা মহাপুরাণের প্রতি গ্রন্থ আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখান হইবে। বিকৃত অঙ্গ কিরূপ হইয়াছে, পাঠক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পুরাণ সকলে চারি বেদ, ষড়ঙ্গ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, কলাশাস্ত্র অল্পবিস্তরভাবে বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত ভূগোল, খগোল, তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বায়ুপুরাণ প্রক্রিয়া, উপোদ্ঘাত, অনুষঙ্গ ও উপসংহার, এই চারি পাদে বিভক্ত। মৎস্যপুরাণে পুরাণকার নিজেই বলিয়াছেন যে, সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিতের ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ইহার বিরুদ্ধের ফল বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ পুরাণের প্রথমে মনু মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে উৎপত্তি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভুবন-কোষ, দানধর্ম্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মহাপুরাণের দশ লক্ষণ ও উপপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বলা হইয়াছে। ফল কথা, পুরাণের পঞ্চলক্ষণ সকল পুরাণেই থাকিবে, প্রাসঙ্গিকরূপে যাহা বর্ণনার বিষয় আসিবে, তাহা বর্ণিত হইলে পুরাণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ইয়ন্তু সংহিতা ব্রাহ্মী চতুর্ব্বেদৈশ্চ সম্মিতা।
ভবন্তি ষট্‌সহস্রাণি শ্লোকানামত্র সংখ্যয়া॥
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ মুনীশ্বরাঃ।
মাহাত্ম্যমখিলং ব্রহ্ম জ্ঞায়তে পরমেশ্বরঃ॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥
ব্রাহ্মণাদ্যৈরিয়ং ধার্য্যা ধার্ম্মিকৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
তামহং বর্ণয়িষ্যামি ব্যাসেন কথিতাং পুরা॥"

ইহা দ্বারাও পুরাণকার নিজের বর্ণিতব্য বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, এক কথায় বলিতে গেলে যাহা পড়িলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, উহার নামই পুরাণ।

মৎস্যপুরাণে আছে যে,—

"পঞ্চাঙ্গানি পুরাণানি আখ্যানকমিতি স্মৃতম্।
সর্গশ্চ" ইত্যাদি।
"ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণাং মাহাত্ম্যং ভুবনস্য চ।
সসংহারপ্রদানাঞ্চ পুরাণে পঞ্চবর্ণকে॥
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈবাত্র বর্ণ্যতে।
সর্ব্বেষ্বেব পুরাণেষু তদ্বিরুদ্ধঞ্চ যৎ ফলম্॥"

যাহাই হউক, এ কথা ঠিক যে, পুরাণকার কোন মাদক-দ্রব্য সেবন করিয়া ঐ গ্রন্থসকল লিখেন নাই, যাহাতে ঐরূপ মোটা ভুল থাকিতে পারে। এই মহাপুরাণ আঠারখানি হইলেও বিভিন্ন পুরাণের মতে কোন্ ১৮খানি মহাপুরাণ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও আমরা মধুসূদন সরস্বতী 'প্রস্থানভেদত্রয়ে' যে ১৮খানির নাম করিয়াছেন, উহাকেই মহাপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন
(কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একলাটি মামীমাকে এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বিনুদা তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল,—"এমন ক'রে একলাটি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন মামীমা, কি হয়েছে?"

"কে? বিনু, পঞ্চু? তোরা একবারটি আয় না বাবা আমার সঙ্গে।" বলিয়া মামী-মা আমাদের লইয়া তাঁহার রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন!

রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, দাউ দাউ করিয়া উনান জ্বলিয়া যাইতেছে আর পিঁড়ের উপর খানকতক বেলা পরোটা পড়িয়া রহিয়াছে। মামীমা কহিলেন,—"বড্ড ভয় পেয়েছিলুম বাবা! পাঁদাড়ের দিকে, ঠিক ঐ জানালাটার নীচে, হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হ'ল, যেন—"

বিনুদা কহিল,—"দিদিমা বাড়ীতে নেই?"

"না। মা সেই দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ও-পাড়ায় বেড়াতে গেছেন, এখনো আসেন নি।"

"তাকে ভূতে খেয়েছে। না খেয়ে থাকে ত ঠিকই খাবে, সে আর আসবে না। তুমি ঘরে তালা লাগিয়ে চল মামীমা, আমাদের বাড়ী চল," বলিয়া বিনুদা দাঁড়াইয়া উঠিল।

মামীমা কহিলেন,—"না বাবা, তা কি আমার যাবার যো আছে? মা তা হ'লে কি আর রাখবেন; গাঙ্গুলীমশাই এসে ফিরে যাবেন, সে কি আর আমার হবার—

"গাঙ্গুলীমশাই কে, মামীমা?"

"গাঙ্গুলীমশাইকে তুই দেখিস্ নি? ও-পাড়ার সেই আশু-বিশুর ঠাকুদ্দাদা?"

"তা সে কেন আসবে, মামীমা?'

"তিনি আসেন।"

"রোজ আসেন? কেন মামীমা? তোমাদের কেউ হয় বুঝি?"

"হ্যাঁ রে, দু'খানা পরোটা খাবি দু'জনে? দোব?"

"না মামীমা, খাব না। কে হয় বল না? সে-ও বুঝি পরোটা খাবে, তাই এত বেশী ক'রে করেছ?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ রে, তোদের কালীঘাট যেতে সেই বোশেখ মাস, না? আচ্ছা, তোরা কাগজে ছোট ছোট ক'রে চিঠি লিখতে পারিস্?"

"পারি মামী-মা। যত ছোট চাও, তত ছোট ক'রে লিখে দিতে পারি। তোমায় লিখে দিতে হবে?"

"এখন না; যদি হয় বলব।"

আমি কহিলাম,—"আমাকে বোলো মামী-মা, বিনুদার চেয়ে আমি খুব ভাল লিখে দোব, মায়ের কত চিঠি আমি লিখে দি।"

মামীমা পরোটাগুলি ভাজিতে লাগিলেন।

বিনুদা কহিল,—"আচ্ছা, মামীমা, তুমি ভীমের বক্তৃতা শুনেছ?"

"শুনিছি কি না বলব এখন, আগে এই পরোটা দু'খানা খা দেখি" বলিয়া আমাদের হাতে গরম গরম দুইখানা করিয়া পরোটা আর খানিকটা করিয়া গুড় দিয়া মামী-মা আবার পরোটা ভাজিতে বসিলেন।

সেই সময় সদর-দরজা ঠেলিয়া কাসিতে কাসিতে কে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"বিধু!"

চুপি চুপি মামীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই বুঝি গাঙ্গুলীমশাই?"

মামীমা কহিলেন,—"হ্যাঁ।" তার পর বাহিরের দাওয়ায় যাইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু-গলায় বলিল,—"মা এখনো আসেন নি।"

"ও!" বলিয়া তখন সেই আশু-বিশুর ঠাকুরদাদা উত্তরের শোবার ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পর শোলা-চকমকি লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। আমরাও পরোটা খাইয়া হাত ধুইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিলাম।

দিদিমা, মা, মাসীমা তখন আগুনের মাল্‌সা মাঝে রাখিয়া, আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে গল্প করিতেছিলেন। পাছে মা বা দিদিমা আমাদের এত দেরীতে বাড়ী ফেরার জন্য কোন রকম বকাবকি করেন, সেই জন্য পদার্পণ করিয়াই বিনুদা অপূর্ব্ব ভঙ্গীর সহিত চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"খুড়ীমা, মামীমার কি হয়েছিল জান?"

"কি?"

"ভয় পেয়ে, একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে আমাদের খিড়কীর দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা এসে না পড়লেই হয় ত—"

দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া মা কহিলেন,—"গিন্নী বুঝি বেড়িয়ে এখনো ফেরেন নি?"

"জানি না মা, ওর কথা আর বলিস্ নি!"

"আহা, বৌটা কি ভাগ্যি নিয়েই ভারতে এসেছিল গো!"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আশু-বিশুর ঠাকুরদাদা ওদের কে হয়, দিদিমা?"

উত্তর আর এ কথার কেহই দিল না, শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তিন জনেই মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। মা কহিলেন,—"যা, তোরা পড়া-লেখা কর গে যা, তার পর খেতে দোবো।"

বিনুদা কহিল,—"আমি আর কি দিয়ে পড়া-লেখা করব খুড়ীমা? আমার ত—"

"ঐ পঞ্চুর বই ত আছে, এক বই দু'জনে পড়্ গে যা। আর সিলেট্‌খানা ত আর রুইয়ে খায় নি, তাইতে লিখ্ গে যা।"

মোটা সলিতা দেওয়া রেড়ীর তেলের প্রদীপ দাউ দাউ করিয়া ঘরের মধ্যে জ্বলিতেছিল। মেঝেয় একখানা কম্বল বিছাইয়া, দপ্তর পাড়িয়া, দুই জনে লেখা-পড়া করিতে বসিলাম। আমি বহি খুলিয়া বসিয়া বিনুদাকে কহিলাম,—"তুমি ততক্ষণ লেখ।"

মিনিট দশেক পরে, বিনুদা আমার হাত হইতে বহিখানি লইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল এবং তাহার সেলেট্‌খানি সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—"এই রকম ঘোড়া একটা আঁক দেখি, দেখ্‌বো কারটা ভাল হয়!"

তখন দুই জনে,—শুধু ঘোড়াই নয়,—ঘোড়া হইতে সুরু করিয়া, গাধা, বাঁদর, হাতী, মাছ, মানুষের মুণ্ড, গাছ, ফুল, পাহাড়, পর্ব্বত, থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ অনেক রকম পদার্থ আঁকা-আঁকি করিবার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সেলেটে ঘর আঁকিয়া 'চিকে-কাটাকাটি'—খেলা হইল এবং শেষে যখন ক্ষুধার একটু বেশী রকম উদ্রেক হইয়া উঠিল, তখন দপ্তর বাধিয়া ফেলিয়া দিদিমাকে চেঁচাইয়া বলিলাম,—"আমাদের পড়া-লেখা সব হয়ে গেল, খেতে দাও এইবার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্যদের অন্দরের উঠান পশ্চিমের দিকে যেখানটায় আসিয়া শেষ হইয়াছে, ঠিক সেইখান থেকেই মামাদের একখানা ঘরের দেওয়াল উঠিয়াছে। সেই ঘরখানাতেই মা, বিনুদা ও আমি শুইতাম। ঘরখানির পূবদিক্‌কার জানালা খুলিলেই ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর ভিতর সবটাই দেখা যাইত।

সকালে, একটু বেলা হইলে ঘুম হইতে উঠিয়া, রৌদ্র আসিবে বলিয়া, শীতে হি হি করিতে করিতে পূবদিকের সেই জানালাটি খুলিতেই দেখিলাম যে, মামীমা হয় ত রাত্ থাকিতে উঠিয়া যে ধান সিদ্ধ করিয়াছেন, এখন সেই রাশীকৃত ধান উঠানে শুকাইতে দিতেছেন আর দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী একখানা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাণ সাজিতে সাজিতে মামীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"আবাগীর বেটী, এত ভোলা-মন তোর কিসে যে হয় বল্‌তে পারিস্ আমাকে? পঁচিশ বছরের ধাড়ী! জানিস্ যে, সকালে উঠেই পাণ না খেলে সমস্ত দিন আমি সারা হয়ে যাব! রাত্তিরে তাড়াতাড়ি গিয়ে বিছানায় শুতে পারলে যেন হয়! তোর শোয়ার মুখে আগুন আর তোর মুখে আগুন!"

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া, মামীমা, ধানগুলিকে [illegible] দিয়া চারিদিকে নাড়িয়া দিতে দিতে কহিলেন,—"সকালের পাণ রোজই ত সেজে রাখি, খালি কাল রাত্রে ভুলে গেছি। বুকের ব্যথাটা কাল বড্ডই ধ'রে উঠলো, তাই——"

গর্জ্জন করিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—"বুকের ব্যথা ত নিত্যিই শুনি, কিন্তু যমও ত নেয় না, কবে যমের বাড়ী যাবি, কবে তোর বুকের ব্যথার শেষ হবে! [illegible] তা হ'লে সিদ্ধেশ্বরীর চার হাতে সন্দেশ দিয়ে আসি!" খা[illegible]

চুপ করিয়া থাকিয়া, রাজা পাণ একটা মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে পুনরায় কহিলেন,—"মিছরী ভিজিয়ে রেখেছ, না, তাও বুকের ব্যথার জন্যে ভুলে গিয়েছ, গো রাজনন্দিনি ?"

"ভুলি নি, রেখেছি।"

ভুঁলিঁনিঁ—রেঁখেঁছিঁ! ইচ্ছে করে, ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে মারি লাথি ঐ মুখে! কিচ্ছুটি বলবার যো নেই! বলিছি কি না, তাই মুখখানা অমনি তোলো হাঁড়ির মত হয়ে গেল! মানের মানিনী, দূর হ'—দূর হ'—যমের বাড়ী যা।"

"দূরই হব,—যমের বাড়ীই যাবো,—আর বড় বেশী দিন——"

ভীষণ ক্রোধে মুখ-চোখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া দাওয়া হইতে উঠানের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"দাঁড়া ত হাড়হাবাতী নচ্ছারণী, গুণছুঁচ দিয়ে তোর মুখ সেলাই ক'রে দিই। মুখে মুখে আবার চোপা করিস্! আস্পদ্দার সীমে-পরিসীমে নেই! ফের যদি কথার উত্তর করবি ত চিম্‌টে পুড়িয়ে ঠোঁট চেপে ধরবো!"

মামী-মার মুখ হইতে আর কোন কথাই বাহির হইল না। নীরবে পা দিয়া ভিজা ধানগুলিকে নাড়িয়া দিতে লাগিলেন আর টস্-টস্ করিয়া ফোঁটা কতক জল তাঁহার চোখের ভিতর হইতে পড়িয়া ধানের উপর সেই ভিজা জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল!

সমস্ত অন্তরটা দারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল; দোলাই-খানি গায়ে জড়াইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইলাম—এবং একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বামা-চরণের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দেখি, ভুবনদা দোকানের দাওয়ার উপর রৌদ্রে বসিয়া বিষম গল্প জমাইয়া ফেলিয়াছে। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল,—"কি হে নাতি, খেজুর রস-টস্ খেতে পাচ্ছ ত? চল, নদীর ধারে ভাঁড়ে প্যাঁকাটী লাগিয়ে রস খাওয়াব এখন।"

যে-কথার আলোচনা চলিতে চলিতে ভুবনদা আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথান্তরে আসিয়া পড়িল, সেই কথারই সূত্র ধরিয়া এক জন তামাক খাইতে খাইতে কহিল,—"যাই বল ভুবন খুড়ো, একেবারে অজ বোকাকান্ত হ'লেই ঐ রকম পকেট মারে! ব্যাটা ময়রা, জীবনে কখন ত কোলকাতায় যায় নি! গাড়ী-ঘোড়া আর বড় বড় বাড়ী দেখে কোথায় হয় ত হাঁ ক'রে ছিল দাঁড়িয়ে, আর সেই সময় দিয়েছে অমনি ঠিক ক'রে!"

আর এক জন ইহার সমর্থন করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, যা বলেছ নিবারণদা, ঐ রকম হাঁদাকান্ত না হ'লে আর কোলকাতায় পকেট মারতে পারে? কৈ, নিক দেখি আমাদের পকেট থেকে, তা হ'লে বুঝি যে কত বড় পকেট-কাটা। বছরের ভেতর তিনবার ত বড়বাজার ঘুরে আসতে হয়, একবারও ত দেখলুম না যে——"

বাধা দিয়া ভুবনদা কহিল,—"ওরে থাম্—থাম্—মাথা গরম করিস্ নি। ঘরে ব'সে সকলেই অমন জাঁক করে। এই শোন্ গর্দ্দভ। মণি ঘোষকে জানিস্ ত, কত বড় ঢুঁদে, কত বড় চালাক। ঐ তোর মত সে-ও জাঁক ক'রে করেছিল কি জানিস্। একটা অচল কাঁসার টাকা পকেটে রেখে সারাদিন বড়বাজারটা ঘুরে বেড়িয়েছিল। মৎলব ছিল যে, যেমন পকেটে হাত দেবে, আর অমনি ধ'রে ফেলবে। আর নেহাতই যদি ধরতে না পারে ত অচল টাকার ওপর দিয়েই যাবে। তাই দু'পা যায় আর পকেট টিপে দেখে যে, টাকাটা আছে কি না। এমনি হুঁসিয়ারীর সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরে,—সন্ধ্যার সময় একটা মোড়ের ধারে দাঁড়িয়ে বলছে—'এই ত, যেমন টাকা, তেমনিই রয়েছে, কৈ বাবা, নিতে ত পারলে না কেউ! আমার পকেট থেকে নেওয়া—এ বড় শক্ত চাঁদ!' যেমন বলা আর অমনি এক জন ফিট্‌বাবু-গোচের লোক তার সাম্‌নে এসে ব'লে গেল কি জানিস? বল্লে—'সাতবার সাত জনে টাকাটা তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অচল কাঁসার টাকা ব'লে সাতবারই আবার পকেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' মণি ঘোষের চোখ ত তখন কপালে উঠে গেল," বলিয়া ভুবনদা নিবারণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া উবু হইয়া বসিল।

আমি ভুবনদা'কে কহিলাম,—"কাল বিকেলে কোথায় ছিলেন বলুন ত? আপনাদের আখড়ায় গেলুম, কেমন সব শুনে এলুম।"

"ফাঁকি দিয়ে বিনা পয়সায় বুঝি সব শুনে ফেলেছ? কিন্তু তা ত চলবে না নাতি, দাদামশায়কে বল্‌বে যে, পঁচিশটি মুদ্রা দোলের চাঁদা দিতে হবে, নইলে—"

আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া টানিয়া বলিলাম,—"আপনি কি সাজেন বলুন না?"

"আমি? আমি তামাক সাজি—পাণ সাজি, আমাকে অনেক রকম সাজতে হয়, নাতি!"

কাঠের 'তাড়ু' দিয়া খোলার মধ্যে মুড়কী নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ বামাচরণ বলিয়া উঠিল,—"হাঁদাকান্ত আছি ত হাঁদাকান্ত আছি, তোমরা ত খুব চালাক?"

ভুবনদা তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল,—"তুই ব্যাটা বুঝি এখনও সেই কথাই ভাবছিস্?"

আমি পুনরায় ভুবনদা'র হাতখানাকে টানিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্যি ক'রে বলুন না—কি সাজেন?"

"আমার কি কিছু সাজলে চলে, নাতি? আমার কায কত! এই কাল লাটসাহেব ডেকে পাঠালে, তা একটিবার না গেলে ত ভাল দেখায় না, সুতরাং যেতেই হ'ল।"

আমি সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লাটসাহেব? কে লাটসাহেব, ভুবনদা?"

"লাটসাহেব জান না, নাতি? ছোটলাট হে!"

ঠিক এমনই—ঠিক এমনই। এ-সবের একবর্ণ মিথ্যাও যেমন নয়, তেমনই একটি বর্ণও ইহার ভুলিয়াও যাই নাই। কতদিনের এই সব পুরানো কথা, একটির পর একটি আজ হুবহু আপনা হইতেই মনের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ইহার কোন কথাই আজ বাড়াইয়াও বলিতেছি না, বানাইয়াও বলিতেছি না, তবে হয় ত একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইতেছে।

ভুবনদা কহিল,—"লাটসাহেব জান না, নাতি? ছোট-লাট হে!"

"লাটসাহেব তোমায় ডেকেছিল?"

"তবে আর বলছি কি, নাতি! কায কি আমার কম? এই এদের সব জিজ্ঞেস কর না। সে দিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ব'সে, বড্ডই ক্ষিধেটা পেয়েছে, ছুটি মুড়ি খাচ্ছি, হঠাৎ একে-বারে উজীরগড়ের রাজা এসে হাজির! সঙ্গে লোক-লস্কর, পা'ক-বরকন্দাজ, সেপাই-শান্ত্রী—একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার। মহা মুস্কিল! সেই রাতে আবার তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়—তাদের সব শোবার—"

বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বড়লাটের সঙ্গে তোমার ভাব আছে, ভুবনদা?"

"হায়—হায়—ভাব আছে কি না? একবার দেখতে পেলে কি আর আমার রক্ষে আছে! সেবার পুজোর সময় কাশী যাব, সব ঠিক্‌ঠাক, হঠাৎ বড়লাটের টেলিগ্রাফ:— 'ভুবন, তোমার ওখানে খেজুর-রস খেতে যাচ্ছি।' ঘুরে গেল আমার কাশী যাওয়া! একেবারে দলবল শুদ্ধ এসে হাজির! তিন দিন ধ'রে কত কথা, কত গল্প, কত আমোদ-আহ্লাদ! কি করি বল? খুবই প্রণয়; ভালবাসে, তবে ত সব আসে? বিলেতে একসঙ্গে এক কেলাসে সব পড়াশুনা করতুম কি না! 'শুভঙ্করী'তে ওরা আমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। সে সব কি আজকের কথা নাতি, সে হ'ল তোমার গিয়ে সেই ১৬৬১ সন।"

ভুবনদার হাত হইতে নিবারণ হুঁকাটি লইয়া দুই একটি টান দিয়া কহিল,—"আচ্ছা খুড়ো, শুনেছিলুম, হাইকোর্টের জজিয়তি তোমায় দেবার জন্যে না কি—"

"সে কথা আর বলিস নি নিবারণ। আমিও নোব না, ওরাও ছাড়বে না। আরে, জজিয়তি নিলে কি আমার চলে? মুখের খাতির আছে ব'লে কি ঐ অল্প মাইনেতে—"

এমন সময় সেখানে আর এক জনের আবির্ভাব হইল, তাহার নাম খুদিরাম; খুদিরাম মণ্ডল। জাতিতে কৈবর্ত্ত —চাষী। কিন্তু পাড়ার মধ্যে খুদিরামই সঙ্গতিশালী। থিয়েটারে সে মোটা টাকা চাঁদা দেয়।

খুদিরাম আসিয়া কহিল,—"খুড়োঠাকুর, আমার নামটা কেটে দিও। 'পেলে', আমি করব না, তবে চাঁদা যেমন দি, তাই দোব।" বলিয়া দাওয়ার উপর একধারে উবু হইয়া বসিল।

খুদিরাম যাত্রার পালাতে দূত সাজিত।

ভুবনদা কহিল,—"কেন, তোর আবার হ'ল কি?"

"না, ও পাট্ আমার দ্বারা হবে না। আমাকে শীগগিরই কোলকাতায় কালেজে গিয়ে চোখটা একবার পাশ ক'রে দেখিয়ে 'রেগজামিন্' করিয়ে আসতে হবে।"

"রেগজামিন্ করাবি এখন। সেই দোলের পর গেলেই ত চলবে।"

"না খুড়োঠাকুর, আমায় রব্যাহতি দাও। চাঁদা, না হয় আরও দুএক টাকা বেশী নিও, পাট্ কিন্তু আমার দ্বারা হবে না।"

"এই ক'টা দিন বাদে 'প্লে', আর এখন হঠাৎ—"

নিবারণ কহিল,—"হঠাৎই ওর হয়েছে। কাল ত তুমি 'মুদ্দো' নিয়ে ত্রিবেণী গিয়েছিলে, কাল ত আর আকড়ায় যাও নি, গেলে জানতে পারতে। অর্থাৎ—মোট কথা হচ্চে —খুদিরাম তোমার গিয়ে দূতের পার্ট করবে না, ওতে ভাল পোষাক পরতে পাবে না, বেশী বক্তৃতে নেই !"

খুদিরাম মাথা হেঁট করিয়া একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

ভুবনদা খুদিরামের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"আচ্ছা, কিসের পার্ট চাস্ তুই বল ? হ্যাঁ রে খুদে ?"

নিবারণ কহিল,—"ও একটা 'রয়েল পার্ট' চায়।"

ফোঁস্ করিয়া খুদিরাম বলিয়া উঠিল,—"অয়েল্ পার্টের কথা আমি বলিচি ?"

ভুবনদা কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, 'অয়েল্' গোছের পার্টই দেখে শুনে তোকে দেওয়া যাবে এখন। এই ব্যাপার ?"

খুদিরাম কহিল,—"অয়েল্ পাট কে চায় ? আমি ত- -"

ভুবনদা বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা—আচ্ছা, সকাল সকাল আকড়ায় যাস্—সব হবে'খন" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া ভুবনদা দাঁড়াইয়া উঠিল। খুদিরামের মুখখানা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পথে আসিতে আসিতে কহিলাম,—"এখন বাড়ী গিয়ে কি করবে ?"

"চান্-টান্ ক'রে পূজো-আচ্ছা করব ভাই।"

"রোজ অতক্ষণ ধ'রে যে পূজো কর, কি হয় তাতে ?"

"কিছুই হয় না, খালি একটু ভগবান্‌কে ডাকা হয়।"

"ভগবান্‌কে ডেকে কি হয় ?"

"হয় না কিছুই, তবু কেমন অভ্যেস্ হয়ে গেছে কি না, তাই না ডেকে পারি না।"

মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল,—"না রে ভাই, হয় অনেক। এত হয় যে, শেষকালে আর রাখবার যায়গা থাকে না রে ভাই—রাখবার যায়গা থাকে না।"

"কি রাখবার যায়গা থাকে না ?"

"ওরে ভাই, ছেলেমানুষ তুমি, এখন সব কথা কি বুঝতে পারবে, দাদু আমার ? বড় হও আগে, জ্ঞান হোক, তখন যদি বেঁচে থাকি, ভুবনদার কাছে এসো একবার, তখন ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে দেবো। অনেক বেলা হয়েছে, যাও দাদা, বাড়ী যাও।"

সত্যই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল। ভুবনদার হাত ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। সদর-দরজার কাছে আসিয়া দেখি, বিসুদা দাঁড়াইয়া আছে, হাতে একখানা খামে আঁটা চিঠি, কহিল,—"মামীমার চিঠি লিখে দিলুম, ডাকঘরে ফেলে দিতে যাচ্ছি।"

"মামী-মা লিখতে বললে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। কাঁদতে কাঁদতে কত কথা বল্লে, সব লিখে দিইছি।"

"কাকে লিখলে ?"

"ওঁর মামাকে। মামা ছাড়া ত কেউ আর নেই।"

"কি লিখলে ভাই ?"

"যেন মামীমার খুব অসুখ—শীগ্‌গির যেন একবার এখানে আসে, নইলে হয় ত মামীমা ম'রে গেলে আর দেখা হবে না, এই রকম সব।——যাই, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসি। চিঠির কথা যেন কেউ না জানতে পারে, বুঝিছিস ?" বলিয়া বিসুদা ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মামীমার মামার নিকট হইতে পত্রের কোন উত্তর আসিল না।

গাঙ্গুলীমশা'য়ের জ্বর হইয়াছে বলিয়া শাশুড়ী সকালে উঠিয়াই তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন, এত বেলাতেও এখনো বাড়ী আসেন নাই। সেদিন ছিল মামীমার একাদশী। খাওয়া-দাওয়ার কোন হাঙ্গামা ছিল না বলিয়া দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ী আসিয়া বসিয়াছিলেন। মা, দিদিমা, মাসীমাকে নিজের দুঃখের কত কথাই কহিতেছিলেন ! উঠিবার আগে কাঁদিতে কাঁদিতে যে কথাগুলি বলিয়া সে দিন মামীমা চলিয়া গেলেন, সেগুলি ফলার মত তখনও যেমন হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল, এখনো সেইরূপই বিঁধিয়া আছে। অথচ, এখন ত তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি, কিন্তু তখন কি-ই বা সে-কথার গভীরতা বুঝিয়াছিলাম ! অথচ ব্যথা যে বুকে খুবই বাজিয়াছিল, তাহাও সত্য।

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মামীমা কহিলেন, —"কি ভাগ্য নিয়েই যে জন্মেছিলুম, সারা জীবনটা আমার কাঁদতে কাঁদতেই গেল ! জগতে বাপ-মা যে কেমন, তা জানতে পাল্লুম না ! জ্ঞান হয়ে দেখলুম, মামা-মামীর

সংসারের একধারে একটুখানি যায়গা নিয়ে প'ড়ে আছি। সেই ছোটবেলা থেকেই কত খাটুনিই আমাকে দিয়ে তারা খাটিয়ে নিত আর সকলের পাত কুড়িয়ে ছু'বেলা ছু'মুটো ভাত দিত! সেই বয়স থেকেই, দিদি, বুকের মধ্যে আমার কান্নার সমুদ্দুর সৃষ্টি হয়েছিল!"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া, আবার কহিতে লাগিলেন,—"সেই যে আট বছর বয়সে হাত-পা বেঁধে এই রায়পুকুরের জলে তারা ভাসিয়ে দিয়ে গেল,তার পর এক বছরের ভিতরই যে আমার সব সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সে সব আর কোন খবরই নিলে না। আমি মরিচি কি বেঁচে আছি, তা'ও একবারটি এসে দেখে গেল না। চিঠি দিলে পর্য্যন্ত ছু'ছত্র লিখে তার জবাব দেয় না। কি আর বলবো দিদি! জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেল! জগতে এসে না হলুম মেয়ে, না হলুম মা, না হলুম স্ত্রী! আমার যে কি ছুঃখু—"

আর মামীমা বলিতে পারিলেন না, অজস্রধারে অশ্রু গড়াইয়া তাঁহার মুখ-চোখ বুকের কাপড় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দিদিমা কহিলেন,—"কেঁদো না বৌমা, কেঁদো না। সবই ত সহ্য কর মা! কেঁদে আর কি হবে বল?"

"হবার আর কিছু চাই না, খুড়ীমা। এইটুকু চেয়েছিলুম যে, যত দিন না মরণ আসে, স্বামী-শ্বশুরের ভিটেখানাতে যেন কোন রকমে প'ড়ে থাকতে পাই, কিন্তু তা'ও বুঝি আর পারি না! এই বয়সে আমার—"

মামীমার ছুই চক্ষু ভরিয়া আবার জল জমিয়া আসিল, কিন্তু তাঁহার শাশুড়ীর উচ্চ ডাকে তাহা আর গড়াইয়া পড়িবার অবকাশ পাইল না। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে মামীমা উঠিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ইচ্ছা হইল, মামীমার সঙ্গে যাই, কিন্তু গেলাম না।

খানিক পরে শোবার ঘরের পূবদিকের জানালার ধারে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া মামীমা দাঁড়াইয়া আছেন আর ঘরের মধ্যে এক পা চৌকাঠে এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী মামীমার দিকে ঠায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে,—মনে হইল, মদন-ভস্মের মত বুড়ী বুঝি মামীমাকে আজ ভস্ম করিবার আয়োজন করিতেছে।

প্রায় মিনিটখানেক এইরূপে মামীমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবার পর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী অস্বাভাবিক ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক'খানা ছিল?"

"দশখানা।"

"আর দুধ?"

"সব দুধটাই ত ক্ষীর ক'রে রেখে দিয়েছিলুম।"

চিবাইয়া চিবাইয়া শ্লেষের স্বরে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"রেখে দিয়ে তার পর পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি, এতে আর তুই কি করবি? তোর আর কি দোষ?"

"অত ভারি ঢাকা ঠেলে ফেলে যে খেয়ে যাবে, তা কি ক'রে জানবো, পরোটা, দুধ, সবই খেয়ে গেছে?"

একেবারে বারুদ জ্বলিয়া উঠার মত, চাপা গলায় গর্জ্জাইয়া উঠিয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"না লো,সব খেয়ে যাবে কেন? যেমন গুচিয়ে রেখে দিয়েছিলি, তেমনি আমার জন্যে থরে থরে সব সাজান রয়েচে," বলিয়া লাফাইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সেইখান হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া উচ্ছিষ্ট শূন্য থালা, বাটি, রেকাবী উঠানে ছুড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, "ওলো চোক্‌খাগী, দেখছিস্ ত লো—সবই রয়েচে! আজ মুড়ো খ্যাংরা মেরে তোকে আগা-পাশ-তলা ঝেঁটিয়ে আমি বিদেয় কর্ব্ব, তবে আমার নাম বিধু বাম্‌নী," বলিয়া তেম্‌নি ছুম্ ছুম্ করিয়া রণচণ্ডার মত নাচিতে নাচিতে উঠানে নামিয়া একগাছা ঝাঁটা লইয়া মামীমার দিকে ছুটিয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এ-বাড়ী ছুটিয়া আসিতে গিয়া দেখি যে, দালানের মধ্যে মা আমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন।

বুঝিলাম, মায়ের ফিট্ হইয়াছে। এ রকম তাঁহার মাঝে মাঝে হইত। খুব রাগ বা কষ্ট হইলে বা কাহারও কোন ছুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে, তাহাই মনের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে মায়ের ফিট্ হইয়া যাইত। মায়ের এই ফিট হওয়ার মধ্যে ভাবনার কিছুই ছিল না, ইহা এমনই আমাদের মধ্যে সাধারণ ঘটনা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিবার ব্যাপার যাহা, সেই কথাটাই দালানে মায়ের পাশে বসিয়া খালি খালি মনে পড়িতে লাগিল।

এখন তাই ভাবি যে, এ জিনিষটা এখনো যেমন আছে তখনো—সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তেমনই ছিল। এই রকম ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর অভাব আজিও যেমন নাই, কোন কালেই সেরূপ ছিল না। আদি কালে, দ্বাপর যুগে, আয়ান ঘোষের

বাটী থেকে সুরু করিয়া, কলির এই বিংশ শতাব্দীতেও ইহার অস্তিত্ব সমস্তাবেই আছে। যেখানে এই রকম শাশুড়ী নাই, সেখানে সেই রকম ননদ আছে। আর যেখানে সেই রকম ননদ নাই, সেখানে এই রকম শাশুড়ী আছে। আর যেখানে এ দুই-ই বর্ত্তমান, সেখানের ত কথাই নাই। বধূ সেখানে তাহার চিরকালের গলা আর দড়ি, বা আফিং বা কেরোসিন, যাহা হয় কিছু একটা আশ্রয় করিয়া নিস্তার পায়! আর যেখানে এ চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে সেই বধূ ধিক্কারে, অভিমানে, ক্রোধে, দুঃখে গণিকা-পল্লীর অধিবাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। হায়, আমাদের দেশ! হায়, আমাদের ঘরের শাশুড়ী-বউ!

পরদিন দুপুরবেলা আমাদের জানালার নীচে দাঁড়াইয়া মামীমা চুপি চুপি ডাকিলেন,—"পঙ্কু,একবার আসবি বাবা?"

তখনি ছুটিয়া গেলাম। মামীমা কহিলেন,—"একখানা আমায় চিঠি লিখে দিবি এখন?"

মামীমা সদর-দরজায় খিল দিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। গায়ের কাপড়ের ফাঁকে দেখিলাম, মাসীমার সর্ব্ব-অঙ্গে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্ত জমাট্ হইয়া যেন ঠেলিয়া উঠিয়াছে। কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, চিঠি লিখিতে বসিলাম।

একটি একটি করিয়া মামীমা যাহা যাহা বলিয়া দিলেন, সমস্তই লিখিলাম। তাহার মোট অর্থ এই যে, দোলের দিন পর্য্যন্ত পথ চাহিয়া থাকিব। সে দিনের দুপুরের গাড়ী পর্য্যন্ত দেখিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিব, দোলের শুভদিন আর কিছুতেই এড়াইয়া যাইতে দিব না। দোলের পর এলে আর আমাকে পাবেন না, তখন পাবেন আমাকে বিলের পুকুরের জলের মধ্যে।

মামী-মা কহিলেন,—"পয়সা দিই বাবা, চিঠিখানা রেজেষ্টারী ক'রে দিতে পারবি?"

"পারবো মামী-মা, কিন্তু সত্যি তুমি তা হ'লে ম'রে যাবে?"

"দূর বোকা ছেলে কোথাকার! সত্যিই কি আর ম'রে যাব?"

তখনি কাপড়ের ভিতর করিয়া চিঠিখানা লইয়া গিয়া ডাকঘরে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া আসিলাম।

গিয়াছে। কারণ, দোলের দিন থিয়েটার হইবে, *মধ্যে আর* কয়েকটা দিনমাত্র বাকী,পালাও প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, শুধু সেই খুদিরামকে লইয়াই একটু গোলযোগ বাধিয়াছে। তাহার সেই দূতের ভূমিকা অন্য এক জনকে দিয়া, তাহাকে 'সভাসদে'র যে পার্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহার মুখ দিয়া উচ্চারণ করাইতে, তাহার নিজেরও যেমন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, অন্য সকলেরও তেমনি হইতেছে। তবে আশার মধ্যে এই যে, খুদিরামের উৎসাহ ও চেষ্টা অপরিসীম।

কয় দিন গোলমালে কাটিয়া গেল। দোলের দিন সকালে উঠিয়াই বিমুদা বাঁশের এক অপূর্ব্ব পিচকারী বানাইয়া ফেলিল।

দিদিমা কহিলেন,—"পয়সা দোবো এখন দু'জনকে, ফাগ্‌ কিনে আনিস্।" তার পর চুপি চুপি কহিলেন,—"তোদের দাদামশায়ের গায়ে খুব ক'রে রং দিয়ে দিস্।"

খানিক পরে দাদামশাই ডাকিয়া কহিলেন,—"এই নাও হে কর্ত্তারা, তোমাদের দোলের পার্ব্বণী" বলিয়া দুই আনা করিয়া পয়সা দুই জনের হাতে দিয়া তিনিও চুপি চুপি কহিলেন,—"তোর দিদিমাকে আবিরে একেবারে চুবিয়ে দিবি, তা হ'লে আরও এক আনা ক'রে দু'জনকে দু' আনা দোবো।"

আমরা উভয়েরই পরামর্শমত কায করিলাম, অর্থাৎ আবির গুলিয়া দিদিমার গায়েও খুব দিলাম, দাদামশাইকেও তফাৎ হইতে পিচকারী দিয়া ভিজাইয়া দিলাম। অধিকন্তু, বিমুদা একটা আস্ত আলুর আধখানা কাটিয়া তাহাতে উল্টা করিয়া গাধা লিখিয়া, দাদামহাশয়ের জামা-কাপড়ের অষ্টে-পৃষ্ঠে সেই গাধার ছাপ মারিয়া দিয়া আসিল।

সে দিন আবার থিয়েটার। বেলা ১টা ১॥০টা পর্য্যন্ত আবির খেলিয়া দুই জনেই ভূত সাজিয়াছি। বিমুদা'কে কহিলাম,—"চল ভাই, ভাল ক'রে চান ক'রে এসে খেয়ে দেয়ে নিই।"

আহারাদির পর বাকী দিনটা সিদ্ধেশ্বরীতলায় থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা দেখিতেই কাটিয়া গেল। যাহারা রাত্রে

সাজিবে, কি উৎসাহেই যে তাহারা মাল্‌কোঁচা বাঁধিয়া খাটিতেছিল! সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ ও উৎসাহ দেখিলাম সেই 'সভাসদে'র—অর্থাৎ খুদিরামের।

হঠাৎ বিন্দুদা কহিল,—"ওরে, মামীমার পায়ে ফাগ দিয়ে পেন্নাম করা ত হয় নি।" আমি কহিলাম,—"না! চল যাই, ঠোঙ্গাতে এখনো অনেক ফাগ আছে।"

ফাগের ঠোঙ্গা হাতে লইয়া তখনি মামীমাদের বাড়ী আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, মামীমাকে দেখিতে পাইলাম না। ভট্টাচার্য্য-গিন্নী দাওয়ার একধারে বসিয়া চিরুণী দিয়া তাঁহার নেড়া মাথা পরিষ্কার করিতেছিলেন।

বিন্দুদার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দিদিমার পায়ে ফাগ দিয়ে পেন্নাম করবে?" বিন্দুদা কহিল,—"ছাই করবে।"

তখন ফাগের ঠোঙ্গাটি কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া, ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মামীমা কোথায়?"

মুখখানাকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"জানি না কোন্ চুলোয় গিয়েছেন! ঘণ্টা দুই হ'ল ত, বিবি কলসী নিয়ে বেরিয়েচেন, বোধ হয়, বিলের পুকুর কেটে জল আনচেন। এত লোকের ওলাউঠা হয়, আবাগীর বেটীর হয় না!"

দু'ঘণ্টা হ'ল বিলের পুকুরে মামীমা জল আনতে গেছেন, এখনো ফেরেন নি! হঠাৎ আমার মামীমার সেই চিঠির কথা মনে পড়িয়া গেল,—দোলের শুভদিন আর কিছুতেই এড়াইয়া যাইতে দিব না। সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! তখনি বিন্দুদা আর আমি ছুটিয়া বিলের পুকুরের ধারে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু মামীমা কোথায়! জনহীন ঘাটের একধারে একটা পিতলের কলসী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে! চতুর্দ্দিকে বিলের পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র পাইলাম না। বিহ্বলের মত মুখ হইতে শুধু বাহির হইল,—"বিন্দুদা!"

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুদা স্তম্ভিতের মত সেইখানে সেই কচুবনের মধ্যে বসিয়া পড়িল, আর আমি জেওলগাছের একটা ডাল ধরিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত সেই ফাগের ঠোঙ্গা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অপরাহ্নের আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ জমিয়া তখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছিল। প্রবল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেইভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, জানি না, একটা দমকা বাতাসের ঝাপট আসিয়া যখন হাতের ফাগের ঠোঙ্গাটি উড়াইয়া লইয়া গিয়া বিলের তরঙ্গমধ্যে নিক্ষেপ করিল, তখন আমার হুঁস্ হইল দেখিলাম, ফাগের ঠোঙ্গাটা জলের যেখানটায় গিয়া পড়িয়াছিল, সেখানকার জল ফাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তখন কিছু ভাবিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন মনে হয় যে, মামীমার পদতলে ফাগ লইয়া ভক্তির যে অঞ্জলি দিতে আসিয়াছিলাম, ভগবান্ আমাদের সেই ফাগের অঞ্জলি এমনি করিয়াই তাঁহার কাছে পৌছাইয়া দিলেন! তখন সেই ছেলে-বেলায় মনে যাহা হইয়াছিল, হয় ত তাহা বুঝি নাই, কিন্তু এখন হইলে, মামীমার সেই পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া বলি,—"মা গো আমার! জননী আমার! এ ভালই হোল—এ তোমার ভালই হোল! এ-ই তোমার দরকার ছিল। বিলের এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, শীতলতা ও গভীরতার মধ্যেই তুমি থাক মা,—এই তোমার স্থান!" তখন বোধ হয়, এক ফোঁটা জল চোখ দিয়া বাহির হয় নাই, আজ প্রৌঢ়বয়সে এই কাহিনী লিখিতে বসিয়া চোখে আর জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে বাড়ী ফিরিবার কথা মনে হইল। আর একবার বিলের জলের দিকে চাহিলাম, তাহা তেমনি তরঙ্গময়, সমস্ত স্থান তেমনি নির্জ্জন, তেমনি তখন প্রবলভাবে বাতাস বহিতেছে। মনে মনে বলিলাম,—"ভালই হোল!" সেই প্রবল বাতাসের ঝাপটাও যেন কাণে আসিয়া কহিল,—'ভালই হোল', তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছাড় খাইয়াও যেন বলিতে লাগিল—'ভালই হোল', অন্ধকারও যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ঝিঁঝিঁ পোকার ন্যায় কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—'ভালই হোল'—'ভালই হোল'।

[ক্রমশঃ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে কাইসারলিঙের 'য়ুরোপ'

১

ইহা সুবিদিত সত্য যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে য়ুরোপ ছিল, যুদ্ধের পর সে য়ুরোপ আর নাই। উহার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শুধু চেহারার যে পরিবর্ত্তন, তাহা মানচিত্রেরই হউক, বা মানুষের হালচালেরই হউক—তাহা মোটা ব্যাপার, সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে; কিন্তু যে মানসিক আবহাওয়ায় এই আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার বিচার করিতে হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। কেইসারলিঙ সেই দৃষ্টিতে য়ুরোপকে দেখিয়াছেন, তাহার মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার কথা, "প্রত্যেক মানুষেরই সমগ্র জাতির উপর রায় প্রকাশ করিবার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকার আছে।" (১)

অনেকে মনে করেন, য়ুরোপীয় ভূষণ্ডীকাকের রক্তপিপাসা এখনও মিটে নাই। তৎপ্রসঙ্গে কেইসারলিঙ বলিতেছেন, যদিও বিভিন্ন নেশনের আত্মগরিমা দিনে দিনে পরিপুষ্ট এবং আন্তর্জ্জাতিকতা পদে পদে অকৃতকার্য্য বা ব্যর্থ হইতেছে, তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর ঘটিবার নহে; কারণ, জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতিকতা এতদুভয়ের দোটানায় য়ুরোপের যে মন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মূলনীতি ইহা নহে যে, লড়াই করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে, তাহার মূলনীতি এই যে, পরস্পর দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। (২) অর্থাৎ একটা কুরুক্ষেত্র-সমর সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যে, য়ুরোপের নেশন-সমুদয় পঞ্চপাণ্ডবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মহাপ্রস্থানের জন্য পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিতেছে, তাহা নহে। দধীচির অস্থি যেমন দেবরাজের কঠিন বজ্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তেমনই প্রাগ্‌যুদ্ধ য়ুরোপের অস্থি হইতে স্থায়িতর, ঐক্যবদ্ধ, সুগঠিত য়ুরোপ গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য য়ুরোপের জন্য এমন আশা এসিয়াবাসীরা করে কি না, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। য়ুরোপ সম্বন্ধে তত্রত্য জনৈক মনীষী এবং মনস্বী কি কথা বলেন, অবহিতচিত্তে তাহা শোনা যাক্।

শুনিতে আপত্তি নাই। কিন্তু সে কথার ভাব জলের মত সোজা নহে যে, সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার চুম্বক দিতে গেলে লেখকের লেখনী অবলীলাক্রমে সে ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে, আর পাঠক বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিবে, "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।"

২

নব য়ুরোপের ঐক্য হইবে মানসিক বৈদগ্ধ্যের ঐক্য, দৈহিক রাষ্ট্রীয় একতা নহে। য়ুরোপের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হইবে না। আবার সেই মানসিক মিলনের সমাসেও না সমাহার না একশেষ, কোনরূপ দ্বন্দ্বসমাসও হইবে না, হইবে বহুব্রীহি সমাস। কেইসারলিঙের কল্পিত য়ুরোপ ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতিসমষ্টির ভালমন্দ গুণাগুণের মিশ্রণফল নহে। প্রতি জাতির বৈশিষ্ট্য-সমুদ্ভূত একটি পৃথক্ সত্তা, জাতি বা নেশনের শুধু নেশন হিসাবে কোন মূল্যও নাই, কোন দাবীদাওয়াও নাই। রাষ্ট্রগত নেশন ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির কাঠামো মাত্র। চালচিত্র যদি প্রতিমার স্থান গ্রহণ করে, তাহা হইলে আসল ও আনুষঙ্গিকে কোন প্রভেদ থাকে না। অতএব ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে গত এক শত বৎসর য়ুরোপ যে নেশনভাবে মস্‌গুল ছিল, সে ভাব ভুয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। ভাঙ্গা নেশন জোড়া দিয়া নব-য়ুরোপ গড়িয়া উঠিবে না। সমস্ত নেশন মিলিয়া আন্তর্জ্জাতিকতার খাতায় নাম সই করিয়াও যে সে য়ুরোপের সৃষ্টি হইবে না, জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিকতার ব্যর্থতাই তাহার প্রমাণ। তবে উপায়? কেইসারলিঙ বলিতেছেন, উপায় সীমার মধ্যে অসীমকে দেখার মত নেশনের মধ্যে থাকিয়াই জাতীয়তাকে অতিক্রম করা। এ উপায়ের নাম অতিজাতীয়তা (Supernationalism), যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা বলিতে পারি অতিপৌত্তলিক (Super-idolator)। এই পূর্ণ জাতীয়তায় কোন জাতিরই আত্মম্ভরিতা স্থান পাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই বৈশিষ্ট্য স্থান পাইবে।

৩

কেইসারলিঙের মতে ইংরাজের বৈশিষ্ট্য তাহার সামাজিকতা। ইংরাজের মন রাজনৈতিক মন। কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করা তাহার স্বভাব

(১) "Europe" p. 8
(২) "Europe" p. 349

নহে, প্রবৃত্তির বশে আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া চলাই তাহার স্বধর্ম্ম। আপোষে থাকিতে গেলে কাহাকেও আঘাত করা চলে না, তাই ইংরাজ তাহার অধীনস্থ জনকেও ব্যক্তিগত মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত। এই কারণেই ইংরাজ শাসনকার্য্যে পটু। কেইসারলিঙ বলিতেছেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে আমার আশঙ্কা হয়, যে ইংরাজ-জগতের বর্ণনা আমি করিয়াছি, তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ব্যষ্টির সম্পদ হিসাবে সে জগৎ এখনও বহু শতাব্দী বাঁচিয়া থাকিবে এবং থাকাই উচিত।" (১)

ফরাসীজাতির বৈশিষ্ট্য তাহার বৈদগ্ধ্য, বিশেষতঃ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। তাহার ভাবপ্রকাশ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র আলোর মত স্বচ্ছ। (২) ফরাসীজাতি একমাত্র সাহিত্যিক জাতি। (৩) ফরাসীদেশে সাহিত্যের যে বিশেষ স্থান আছে, আর কোথাও তাহা নাই। একমাত্র ফ্রান্সেই আজ প্রায় সাত শতাব্দী কাল লেখাও একটা আর্ট বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। উপরন্তু, ফরাসীজাতি রক্ষণশীল প্রাচীনের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। ফরাসীবিপ্লবে এ কথার অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। ফরাসীবিপ্লব বাহ্য পরিবর্ত্তনের নিদর্শন। সে সময়ে ফরাসী সমাজের যে ভাবসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বিপ্লব আবার রাজাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

জার্ম্মাণের মনোধর্ম্ম তাহার জ্ঞানস্পৃহা। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অপেক্ষা স্বর্গসম্বন্ধে আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার বেশী। অবশ্য সশরীরে স্বর্গে গেলেই হাতে হাতে স্বর্গের জ্ঞান জন্মাইতে পারে, কিন্তু জার্ম্মাণ তাহা চাহে না, বোধ হয়, পাণ্ডিত্যের মূল সূত্র এই যে, সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যত কম থাকে, পণ্ডিতীও তত বেশী হয়।

কেইসারলিঙ বলিতেছেন, জার্ম্মাণের সঙ্গে হিন্দুর এক স্থানে মিল আছে। উভয়েই অন্তর্ম্মুখী (introvert), উভয়েই চিন্তাপ্রবণ ; উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উভয়েরই প্রকৃতিবহির্ভূত। জার্ম্মাণীতে জাতিভেদ নাই, কিন্তু জীবনের সেই নির্দ্দিষ্ট কাঠামো—যাহার মধ্যে মানুষ বর্ণহিসাবে আর দশ জনের সমতুল্য থাকিয়াই নিজের ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের উৎকর্ষসাধন করে। প্রতি মানুষই কোন না কোন বিশেষ ছাঁচে ঢালা, উহাই তাহার বর্ণ ; আর এই ছাঁচের সংখ্যা অনন্ত নহে, নির্দ্দিষ্ট মাত্র। কাযেই নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কাঠামো হইলেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। (১)

স্পেনবাসীর বৈশিষ্ট্য তাহার প্রাণশক্তি। সে প্রাণশক্তি এতই প্রবল যে, জীবনকে সে যে ভাবে গ্রহণ করে, মৃত্যুকেও ঠিক সেই ভাবে মানিয়া লয়। জীবনকে সে ভালবাসে বলিয়াই জীবনের সাক্ষাৎ প্রতীক যে রক্ত, তাহাও সে ভালবাসে, সেই জন্যই ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই (Bull-fight) ও-দেশের চিরপুরাতন কৌতুক।

তার পর কেইসারলিঙ্‌ যাহা বলিতেছেন, তাহা শুনিয়া বাঙ্গালীর চমকিত হইয়া উঠিবার কথা। কেইসারলিঙ্‌ বলিতেছেন, স্পেনবাসীর চরিত্রে পুরুষোচিত সাহস ও রক্তপাতের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও নিষ্ঠুরতা নাই। রক্ত দেখার আনন্দ, এমন কি, রক্তপাতের আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ঠুরতা বলা দৈহিক ও নৈতিক কাপুরুষতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, জীবনকে স্বীকার করিলেই মৃত্যুকেও মানিয়া লইতে হইবে, আর এই স্বাধীনতার জগতে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকেও মানিতে হইবে। (২)

সমাজধর্ম্ম-নিরপেক্ষ তত্ত্বহিসাবে খাঁটি কথা বটে ! কিন্তু সুখের বিষয়, বাঙ্গালী তান্ত্রিক যুগ ছাড়াইয়া গিয়াছে। ঐ তন্ত্র এ দেশে প্রচলিত থাকিলে য়ুরোপীয়রাই তাহাকে বর্ব্বরতা আখ্যা দিত।

ইতালীয় সভ্যতা বহু প্রাচীন হইলেও তাহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। এ বিষয়ে চীন ও ভারতের সঙ্গে ইতালীর তুলনা করা যায়। ভাবী য়ুরোপকে ইতালী তাহার সনাতন পৌত্তলিকতা দিতে পারে (paganism)। কারণ, গত মহাযুদ্ধে খৃষ্টান অনুশাসন খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে এবং একমাত্র পৌত্তলিকই রাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্ম্মের গভীরতা দেখাইতে পারে। (৩)

এমনই ভাবে কেইসারলিঙ য়ুরোপের অন্যান্য দেশের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। বাদ শুধু রুসিয়া। রুসিয়া

(১) Europe p. 42.

(২) French expression is always and everywhere illuminatingly clear—p. 44.

(৩) They are the literary nation—p. 66.

(১) "Europe"—H. 103—104

(২) "Europe"—p. 79 (৩) pp. 171—173.

সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে তিনি দুই চারি কথা বলিয়াছেন, পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। কারণ, রুসিয়া ভূচিত্রে য়ুরোপের অন্তর্গত হইলেও ভাবচিত্রে এসিয়ায় উহার স্থান, এ কথা য়ুরোপীয়রা বলেন। প্রত্যুত্তরে এসিয়া যদি বলিয়া বসে, 'রুসিয়া আমার ব্যঙ্গচিত্র', তাহা হইলে রুসের অবস্থা দাঁড়ায় ত্রিশঙ্কুর মত।

পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন দেশের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্যে গঠিত য়ুরোপের পন্থানির্দ্দেশের প্রচেষ্টা কাইসারলিঙ্ করিয়াছেন। কাইসারলিঙের য়ুরোপ—মনোজগতের ভাবী য়ুরোপ। সে য়ুরোপের শিক্ষা বিবিধ হইলেও দীক্ষা হইবে এক,—যদি জনসাধারণ কাইসারলিঙের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে; যথা, কাইসারলিঙ্ পাঁতি দিয়াছেন; য়ুরোপের আর সব লোক যেন সুইডেনে বিবাহ করে। তাহারা করিবে কি করিবে না, তাহা কাইসারলিঙের হাতে নহে। সেই কারণেই এ নিবন্ধের প্রথম ভাগে কাইসারলিঙের য়ুরোপকে কল্পিত বলা হইয়াছে। দ্রষ্টা কাইসারলিঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন, কি ঘটিবে, তাহা কে বলিবে? সত্য সত্যই ভবিষ্যতে কি যে দাঁড়াইবে, তাহা য়ুরোপের ভাগ্যবিধাতা ছাড়া আর কে জানে? তাই কাইসারলিঙ্ এই বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, "পার্থিব লক্ষ্য সদাই অনিশ্চিত, মানুষের জড়তা ও নির্ব্বুদ্ধিতা অপরিসীম।......আমি শুধু দেখাইতে পারি, কি হইতে পারে, কি হইতে পারিত।" (১)

৪

য়ুরোপের কি হইবে না হইবে, সে ভাবনা য়ুরোপের। এ গ্রন্থে আমাদের প্রণিধানযোগ্য কিছু আছে কি না, সে বিচার আমাদের। রাষ্ট্রক্ষেত্রে খণ্ড ভারতকে অখণ্ড ভারতবর্ষে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই ইদানীং আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, এবং সেই কারণে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই অভেদবুদ্ধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রভেদে ধর্ম্মধৃতি এবং কর্ম্মবৃতি যে স্বতন্ত্র হইতে পারে, এ কথাটা নীচে পড়িতেছে।

(১) "Earthly goals are always uncertain.
"Infinite is human stupidity, human slothfulness......I could only show what could, what might be........"

Europe, p. 37.

কাইসারলিঙ্ প্রতি দেশের ভৌগোলিক আকৃতি ও জলবায়ুর প্রকৃতির উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছেন; এমন কি, তিনি এরূপ চরম মতেরও সমর্থন করিয়াছেন যে, আমেরিকায় যে জাতিই পুরুষানুক্রমে বাস করিবে, সেই-ই নিগ্রোর প্রকৃতি পাইবে।

কাইসারলিঙের গ্রন্থ মোটের উপর দার্শনিক গ্রন্থ। বিশেষ বিশেষ দেশ-সম্বন্ধে তথ্যগুলি এই গ্রন্থের গৌণ কথা। উক্ত গ্রন্থের মুখ্য কথা, সাধারণ তত্ত্বগুলি স্বতঃই অথবা ক্ষেত্রানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে সর্ব্বদেশের পক্ষে সত্য।

গত যুদ্ধের সঙ্গে গণতন্ত্রের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে; সংখ্যাধিক্য এখন আর মূল্যনির্ণয়ের মাপকাঠি হইতে পারে না। এখনকার মাপকাঠি উৎকর্ষ—অল্পসংখ্যকের হইলেও। ভোটের যুগে এ কথাগুলি মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিলে আমাদের ক্ষতি নাই। আমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরাধীনতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কি না, তৎসম্পর্কে স্বাধীন ইতালী সম্বন্ধে কাইসারলিঙের উক্তি বিবেচ্য। "য়ুরোপের মধ্যে ইতালীতেই মা ও শাশুড়ীর প্রতাপ অত্যধিক স্পষ্ট। চীন দেশের মত, য়ুরোপের শুধু এই দেশেই যুবতীরা আশা করিয়া থাকে, কবে বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের রাজত্ব আসিবে।"...ইতালীয় পরিবারে বিবাহ করার অর্থ—পরিবারস্থ সকলকে বিবাহ করা। এক এক ব্যক্তি লইয়া এক এক পরিবার-সৃষ্টির প্রথা ইতালীতে অজ্ঞাত। অথচ কেহ তাহাতে অসুবিধা বোধ করে না, দম্পতিমাত্রই এই সনাতন ব্যবস্থাই মানিয়া লয়। ইহার কারণ, ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ লোকদের বাহিরের নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির প্রয়োজন হয় না; প্রাচীন গ্রীকদের মত তাহারা সকলেই হাটের মাঝখানেই জন্মগ্রহণ করে, ফলে এক বাড়ীতে এক শত ইতালীয়ান যেরূপ পরস্পরের বাধা-সৃষ্টি না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারে, এক জন জার্ম্মাণ এবং তাহার প্রতিবেশী, যাহাদের পরস্পরে কালেভদ্রে দেখা হয়, তাহারা সেরূপ পারে না। এই নির্ঝঞ্ঝাট সামাজিক জীবন (প্রায়ই বকাবকি চটাচটি লাগিয়া থাকা সত্ত্বেও আমি ইহাকে নির্ঝঞ্ঝাট বলিতেছি, কারণ, ইতালীতে এ সকল ব্যাপারের কোন অর্থ নাই) জার্ম্মাণীতে এক সমস্যা এবং উচ্চ আদর্শস্থল, কিন্তু ইতালীতে উহা স্বাভাবিক ব্যাপার।

ইহা যারা বুঝা যায় যে, ভিত্তির গাঁথুনি খুব শক্ত, উহার তুলনা নাই। (১) অবশ্য, বাঙ্গালার অবস্থা এখন ইতালী কি জার্ম্মাণীর মত, ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা।

সুইডেনের লোকরা গুরুভোজনে দক্ষ, এই কথার অবতারণা করিয়া কাইসারলিঙ্ রহস্য করিয়াছেন যে, তাহাদের পাকস্থলী সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। আচার্য্য পি, সি, রায় বহুদিন হইতে বাঙ্গালী যুবককে মাড়োয়ারীর জীবন-প্রণালী অনুকরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। বাঙ্গালী যুবকরা বোধ হয় এই কারণেই মরুদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে নাই যে, তাহারা আচার্য্যের মত পেট-রোগা নহে। হিন্দুস্থানী-মাড়োয়ারী-বেষ্টিত বাঙ্গালার অবস্থা কি ইহুদী-পরিবৃত রুমানিয়ার মত নহে? কাইসারলিঙ্ বলিতেছেন, 'যখনই রুমানিয়া-বাসী এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাহারা নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া ইহুদীরা তাহাদের দেশ ছাইয়া ফেলিল, তখনই আমার গোগোল-রচিত এই গল্পটি মনে হয়; একদা এক ভয়ানক শীতের রাত্রিতে, শয়তান আসিয়া এক তুড়িতে ইহুদীদিগকে পগার পার করিয়া দিল। প্রথমটা ত দেশ জুড়িয়া ভারি আনন্দ। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতেই যখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন সমস্বরে রব উঠিল, ইহুদী না থাকিলে আমরা বাঁচি কেমন করিয়া? অবশেষে শয়তান সব ইহুদীকে ফিরাইয়া আনিল, দলের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।'

কাইসারলিঙ্ ভারত সম্বন্ধেও দুই এক কথা বিশেষণ হিসাবে আনুষঙ্গিকভাবে এখানে ওখানে বলিয়াছেন, যাহা সর্ব্বাংশে বিচারসহ নহে। নমুনা, যথা,—তুরাণীর সহিত অন্য উচ্চজাতির রক্তমিশ্রণের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন,—"প্রতীচ্যে আকবরের মত এক জন লোকও জন্মায় নাই। কারণ, আকবরের দেহে ছিল তৈমুরের ও রাজপুতের রক্ত।" (২) পুনরায় যথা,..."যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সমস্ত শ্রেষ্ঠজনই ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, ব্রাহ্মণ নহে।" (১) ইহা সর্ব্বাংশে সত্য কি না, রবিবাবু বলিতে পারেন।

এ নিবন্ধ "য়ুরোপ" গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদও নহে, ভাষ্যও নহে। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ। আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াই সমাপ্ত করা যাক্।

রাষ্ট্রগত অভেদবুদ্ধি জীবনের যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে, স্ত্রীপুরুষের অধিকার তন্মধ্যে একটি। বাহিরের পৌর জীবনেও পুরস্ত্রীর প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু সে প্রয়োজন মাতৃজাতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত নহে, য়ুরোপের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এ কথা গ্রহণ করিতে পারি।

কাইসারলিঙ্ স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা দার্শনিকের মুখোস খুলিয়া লইলে মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বের নারদ-পঞ্চচূড়া-সংবাদের কাছাকাছি যায়। মনে রাখিতে হইবে, "য়ুরোপ" ও মহাভারতাশ্রিত এই দুই সংবাদই দুই কুরুক্ষেত্রের পরের কথা। কিন্তু এ কথাও সর্ব্বকালে সত্য, যে সৃষ্টির বীজদান করে পুরুষ, সে বীজ পালন করে নারী, সেই তাহার সত্য কায। নতুবা, কেশদাম মেখলাস্পর্শী না হইয়া স্কন্ধস্পর্শী হইলেই, অথবা ইংলিস চ্যানেলের পরিবর্ত্তে মেঘনা নদী সন্তরণ করিয়া পার হইলেই স্ত্রীস্বাধীনতার গৌরব বাড়ে না। এ পর্য্যন্ত আমাদের যে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার বিফলতার অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও কি একটা কারণ নহে যে, দ্রষ্টা পুরুষ যে স্বপ্নের বীজ সৃষ্টি করিয়াছে, সে বীজ পালন করিতে কল্যাণী নারী ছিল না? মহীয়সী নারী ব্যতীত ক্ষণিকের স্বপ্নকে কে শাশ্বত করিয়া তুলিবে?

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করাই নামগানের একমাত্র উপায় নহে, অন্যতম পন্থা মাত্র।

গাছের শিকড় মাটীর নীচে থাকে বলিয়াই রস কম যোগায় না। সহধর্ম্মিণী সমধর্ম্মিণী হইলেই দ্বিত্বাকারে ধর্ম্মবুদ্ধি নাও হইতে পারে।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

(১) 150—151.

(২) "Europe"—p. 210.

(১) Robindranath Tagore recently pointed out—all the Greatest men were not Brahmins but Kshatriyas p. 188.

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা

[স্বাধীন ভারতে স্বরাজের রূপ কি হইবে, তাহা লইয়া আজকাল নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, নানা খস্‌ড়া রচিত হইতেছে। কেহ বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুসরণ করিতে চাহেন; কেহ চাহেন রুসিয়ার ন্যায় কম্যুনিজম্, কেহ চাহেন আমেরিকার ন্যায় ফেডারেশন্; কিন্তু ভারত যে একটা অতি পুরাতন দেশ, ভারতেও নিজস্ব রাষ্ট্রপ্রতিভা আছে, রাষ্ট্রগঠনের ধারা আছে, সে কথাটা কাহারও মনে উঠে না। ভারত যেন অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার ন্যায় একটা নূতন দেশ, এখানে কেহ কখনও রাজত্ব করে নাই, রাষ্ট্র পরিচালনা করে নাই, সাম্রাজ্য গঠন করে নাই! ভারতের সেই অতীত রাষ্ট্রনীতি এখনও ভারতবাসীর অবচেতনায় অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই তাহারা কোন প্রকার বিদেশী ধরণের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। নেহরু কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস যে ভারতের জন্য বিলাতের অনুকরণে পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্টের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশে কিছুতেই চলিবে না, এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমরা বলিতেছি না যে, প্রাচীন ভারতে যেমন রাষ্ট্রগঠন ও শাসনতন্ত্র ছিল, বর্ত্তমানে আবার ঠিক তাহাই স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু, সেই জাতীয় ধারার বিকাশ করিয়াই বর্ত্তমান কালোপযোগী রাষ্ট্রের সৃজন করিতে হইবে, কেবল এই ভাবেই ভারতের অতি জটিল রাষ্ট্রনীতিক সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনীতি কিরূপ ছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Arya পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের "A Defence of Indian Culture" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে অনুবাদিত হইয়াছে]।

মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশের জন্য যে সকল জিনিষ প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, চিন্তাশীলতা, নৈতিকতা, কলাবিদ্যা,—এই সকল বিষয়ে প্রাচীন ভারত যে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আর কোন তর্কের স্থান নাই, ভারতের বিরুদ্ধ সমালোচকরাও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই গৌরবময় ভারতীয় জীবনের যে সকল প্রমাণ ও নিদর্শন আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসন্দেহই জানা যায়, ভারতের সভ্যতা যে কেবল উচ্চ ছিল, তাহা নহে, জগতে যে পাঁচ ছয়টি উচ্চতম সভ্যতার ইতিহাস আজও পাওয়া যায়, ভারতীয় সভ্যতা তাহাদেরই অন্যতম। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিষয়সমূহে ভারতের উচ্চ কৃতিত্ব স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন যে, পার্থিব জীবনকে য়ুরোপ যেমন শক্ত, সমর্থ, উন্নতিশীলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত করিতে পারিয়াছে, ভারত তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতের মনীষিগণ সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ ও ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনার দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে ভারতের সভ্যতা কতক দূর বিকশিত হইয়া থামিয়া গিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহার মধ্যে নানা ত্রুটি ও গ্লানি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আজ বড়ই বেশী করিয়া বাজিতেছে; কারণ, বর্ত্তমান যুগের মানুষ, এমন কি, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মানুষও রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিকেই জীবনের মধ্যে প্রধান স্থান দিতেছে। আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষতার কেবল ততটুকুই আদর আছে, যতখানি তাহারা রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনের সাফল্যে সহায়তা করিতে পারে। প্রাচীন যুগের মানুষরা আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পকে যেমন একটা নিজস্ব মূল্য দিত এবং সেইগুলিকেই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া গণ্য করিত, বর্ত্তমান মানুষ তাহা করিতে চাহে না। যদিও এই বর্ত্তমান বৈষয়িক মনোভাব মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে নীচ ভোগপরায়ণ স্বার্থপর দ্বন্দ্বপ্রবণ করিয়া তুলিয়া সংসারে নানা দুঃখ ও অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপন্থী হইতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে এই সত্যটুকু রহিয়াছে যে, যদিও কোন সভ্যতার গুণ বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, মানুষের ভিতরটিকে উন্নত করিতে, তাহার মন ও আত্মাকে উন্নত করিতে তাহার ক্ষমতা কতদূর, তথাপি সে সভ্যতা পূর্ণ হয় না, যদি সে বাহ্য জীবনকেও সুষ্ঠুভাবে গঠিত করিয়া

ভিতরে ও বাহিরে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে। উন্নতি বলিতে ইহাই বুঝায়, শুধু উপরের জিনিষেরই উৎকর্ষ-সাধন করিলে চলিবে না, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজনীতিকেও এমন ভাবে শক্ত-সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে জাতি জীবন-সংগ্রামে টিকিতে পারে, কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে পূর্ণতার দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে, এবং বাহিরের জীবনে এমন সজীবতা ও সবলতা থাকে, যেন তাহার মধ্যে আত্মা ও মনের ক্রিয়া ক্রমশঃ উন্নত-ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। যে সভ্যতা এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না, তাহার আদর্শ বা কার্য্য-কারিতার দোষ ও ত্রুটি রহিয়াছে, সে সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না।

ভারতীয় সমাজের ভিতর ও বাহির যে সকল আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা ছিল অতি উচ্চ, সমাজ-শৃঙ্খলার ভিত্তি ছিল অতি সুদৃঢ়, ইহার মধ্যে যে তেজীয়ান্ প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিত, তাহাতে ছিল অসাধারণ সৃষ্টি-শক্তি ও ঐশ্বর্য্য; ভারত বাহিরের জীবনকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিল, তাহাতে হইয়াছিল প্রাচুর্য্য, বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সৌন্দর্য্য, উৎপাদন-শীলতা, গতি। ভারতের ইতিহাসে, শিল্প ও সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহার অবনতির যুগেও সেই অতীত মহত্ত্বের সমস্ত চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, ইহা বাহিরের জীবনকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাহার কারণ কি? এই অভিযোগকে যাঁহারা বাড়াইয়া দেখান, তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার অবনতি ও ধ্বংস দেখি-য়াই বিচার করেন এবং অবনতির যুগের লক্ষণগুলিই ভার-তীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদের অভিযোগের প্রধান কথা এই যে, ভারত কখনই স্বাধীন সমর্থ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই; চিরকাল ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন এবং তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসের বহুকালই ভারত পরাধীন; অতীতে তাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাহাই গুণ থাকুক, তাহা অচলায়তন হইয়া পড়ে, সময়ের প্রয়ো-জনের সহিত তাহা পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইতে পারে নাই, ফলে বর্ত্তমান যুগে আসিয়াছে—দারিদ্র্য ও নিষ্ফলতা; বংশমর্য্যাদানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ ভারতীয় সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহা জাতি-ভেদজর্জ্জরিত, নিষ্ঠুর অমানুষিক প্রথা সমূহে পরিপূর্ণ, অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ইহাকে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর উপায় নাই, ইহার স্থানে য়ুরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার স্বাধীনতা, দক্ষতা ও পূর্ণতার আম-দানী করিতে হইবে। এই সব ব্যাপারের প্রকৃত সত্য কি, তাহা পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন, তাহার পর ভারতীয় সভ্যতার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকের গুণাগুণ বিচার করিলেই চলিবে।

ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতে এবং তাহার প্রাচীন অতীত সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অক্ষমতা দেখাইয়াছে। বহুকাল এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ভারতে আদিম আর্য্য ও বৈদিক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যবস্থা হইতে একেবারে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার-পীড়িত সমাজ ব্যবস্থায় এবং স্বেচ্ছাচারী রাজ-তন্ত্রের অধীন রাষ্ট্রব্যবহার উপনীত হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে ভারতে এ যাবৎ এই দুইটি ব্যবস্থাই বাহাল আছে। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণা বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে যাহা বৈশ্য যুগ বলিয়া উক্ত, কলকারখানার বিস্তারে ধানের জন্য কাড়াকাড়ি এবং শ্রমিকের শোষণ চলিয়াছে এবং সাধারণ তন্ত্রের নামে পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট চলিয়াছে, ভারতের ইতিহাসে এই industrialism ও parliamentarismএর আবির্ভাব কখনও হয় নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু, যখন লোক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া না দেখিয়া য়ুরোপের এই দুইটি আদর্শের প্রশংসা করিত, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবহার চরম উৎকর্ষ বলিয়া মনে করিত, সে দিন আর নাই। ইহাদের দোষ-ত্রুটি এখন লোকলোচনে ধরা পড়িতেছে এবং ইহাদের মাপকাঠিতে কোন প্রাচ্য সভ্যতাকে পরিমাপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। য়ুরোপে প্রচলিত সাধারণ তন্ত্র ও পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্টের অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রাচীন ভারতেও ছিল, আমাদের দেশের কেহ কেহ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন, কিন্তু এরূপ চেষ্টা ভ্রান্ত। প্রাচীন ভারতে সাধারণ-তন্ত্রের একটা ভাব খুবই প্রবল ছিল, তাহা কতকটা পার্লা-মেণ্টারি অনুষ্ঠানের মতই মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা

ভারতের নিজস্ব এবং তাহা আদৌ বর্ত্তমান পার্লামেণ্টারিজ্‌ম্‌ বা সাধারণতন্ত্রের সদৃশ নহে। আর এই ভাবে যদি আমরা দেখি, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতবাসী সমাজের মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন য়ুরোপের সহিত তুলনা করিয়া সে ব্যবস্থার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝা যায় না।

প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং যাহা মানব-সমাজবিকাশের এক অবস্থায় সকল দেশের মানুষের মধ্যেই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই রাষ্ট্রতন্ত্রেরই একটা বিশেষ রূপ লইয়া ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস আরম্ভ হয়। কুল বা গোষ্ঠী লইয়াই এই তন্ত্র গঠিত ছিল এবং ইহার মূল ছিল কুল বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল মনুষ্যের মধ্যে সাম্য। প্রথমাবস্থায় কোন বিশেষ স্থানে এই কুল আবদ্ধ থাকিত না, তখনও স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যাইবার প্রবল আগ্রহ ছিল, এবং কোন স্থানে যে কুল বাস করিত, সেই কুলের নাম অনুসারেই সেই স্থানের নাম হইত, যেমন 'কুরুদেশ' বা শুধু 'কুরু', মালব দেশ বা শুধু মালব। যখন আর্য্যদের যাযাবর প্রবৃত্তি লোপ পায় এবং তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে, তখনও কুল বা গোষ্ঠীপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু তখন পল্লী-সমাজই হয় সেই রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল আকার বা কেন্দ্র। জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত অথবা যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অথবা যুদ্ধায়োজনের নিমিত্ত সভায় সমবেত হইত, সেই সভার নাম ছিল "বিশা।" এই সভাই ছিল জনসাধারণের সমবেত শক্তির প্রতীক এবং বহুকাল এই সভার ভিতর দিয়াই সম্প্রদায়ের সাধারণ জীবন পরিচালিত হইত। এই সভার শীর্ষস্থানীয় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন রাজা। যখন এই রাজার পদ পুরুষানুক্রমিক হয়, তখনও বহুকাল রাজার অভিষেকে জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাহাকে অনুমোদিত ও নির্ব্বাচিত হইতে হইত।* যজ্ঞরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং বাহ্যানুষ্ঠানের পশ্চাতে যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, এই ভাবেই মহান্‌ ব্রাহ্মণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম এই সকল পুরোহিত পুরুষানুক্রমিক ছিলেন না, তাঁহারা অন্যান্য বৃত্তিও অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহারা সাধারণ জীবনে জনসাধারণেরই অনুরূপ ছিলেন। এই যে সহজ স্বাধীন স্বাভাবিক সমাজতন্ত্র, ইহাই সমগ্র আর্য্য ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই আদিম সমাজতন্ত্রের পরবর্ত্তী বিকাশ কতক দূর পর্য্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়ই হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এখানে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে ভারতীয় সভ্যতার রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ধারা অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বংশানুক্রমনীতি অতি প্রাচীনকালেই ভারতে স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ উহা এমন প্রাধান্য লাভ করে যে, সর্ব্বত্র সকল সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের উহাই ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এক শক্তিশালী শাসক ও যোদ্ধৃ-শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, সমাজের অবশিষ্ট লোক ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষক-শ্রেণীতে বিভক্ত হয় এবং এক দাস বা সেবক-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ আর্য্যগণ যাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতেন, তাহারা ভৃত্য ও শ্রমিক হইত, তাহাদিগকে লইয়াই এই দাস-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীর মনের উপর বহু প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে। এই জন্যই সমাজের শীর্ষভাগে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা পুরোহিত, পণ্ডিত, আইন-কর্ত্তা, বেদবিৎ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য দেশেও এইরূপ শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় যেমন স্থায়ী, সুনির্দ্দিষ্ট, সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, এমনটি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবাসীর ন্যায় যে সকল দেশের লোকের মানসিক ভাব জটিল নানামুখী নহে, সেখানে এরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইলে, তাহারাই সমাজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িত। কিন্তু যদিও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তথাপি ভারতে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় কোন দিনই রাজশক্তিকে অধিকার করে নাই বা করিতে পারে নাই। রাজা ও জনসাধারণের পুরোহিত, গুরু,

* রামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে রাজা দশরথ জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিধিকর্তৃরূপে ব্রাহ্মণরা আশ্চর্য্য ক্ষমতা-বিস্তার করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রশাসনের ভার কার্য্যতঃ রাজা, ক্ষত্রিয় অভিজাতসম্প্রদায় এবং জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।

কিছু কাল এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ঋষি। উচ্চ অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ঋষি, যে কোন শ্রেণী হইতে তাঁহার আবির্ভাব হইত, কিন্তু তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক চরিত্রের গুণে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, রাজা তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সমাজের সেই অগঠিত অবস্থায় তিনি একাই সমাজের নূতন বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিকাশ করিতে সমর্থ হইতেন। ভারতীয় মনোবৃত্তির ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যে, সকল কার্য্যে, এমন কি, বাহ্যতম সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারেও ভারতবাসী আধ্যাত্মিক সার্থকতার দিকে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে, প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, অধ্যাত্ম-জীবন-বিকাশে উপযোগিতা কি, তাহা স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। জাতির মনের উপর এই স্থায়ী ছাপ ঋষিগণই দিয়া গিয়াছিলেন; ভার-তীয় সভ্যতা, ভারতবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনের ধারা যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জীবনের সকল কার্য্য, সকল চেষ্টার ভিতর দিয়া দিব্য অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ করাই যে ভারতীয় জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হইয়াছে, তাহার মূলই এই ঋষিরা। পরবর্ত্তী কালে আমরা দেখিতে পাই, স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণরা সমাজে তৎকালে প্রচলিত রীতি-নীতি সংগ্রহ করিয়া সেই সকলকে সেই প্রাচীন ঋষিদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন এবং এই ভাবে মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে পরে যে পরিবর্ত্তনই হউক, এই যে মূল বৈশিষ্ট্য ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা, ইহা চিরদিনই ভারতবাসীর জীবনে ইহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অবশেষে যখন উহা প্রাণহীন বিধিনিষেধ ও আচার-ব্যবহারে পরিণত হয়, তখনও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বদাই জীবন্ত-ভাবে পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া ভারতের সেই আদিম ব্যবস্থার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এই বিকাশের সাধারণ গতি হইয়াছে রাজতন্ত্রের দিকে, রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালনকার্য্য ক্রমশঃ জটিল হইয়াছে এবং কেন্দ্ররূপে রাজাই এই শাসনতন্ত্রের অধিপতি হইয়াছেন; রাষ্ট্রের এই রাজতন্ত্র কালক্রমে প্রচলিত এবং সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এক বিপরীত প্রচেষ্টা এই রাজ-তন্ত্রের বিস্তারকে বহু দিন বাধা দিয়া আটক করিয়া রাখিয়া ছিল, এবং এই প্রচেষ্টার ফলে নানা স্থানে নাগরিক বা প্রাদেশিক বা সঙ্ঘবদ্ধ সাধারণতন্ত্রের (Republics) আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল ক্ষেত্রে রাজা সাধ-রণতন্ত্রের বংশানুক্রমিক বা নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টরূপে পরিণত হয় অথবা কোথাও কোথাও রাজার অস্তিত্বই একে-বারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণের সভার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফলেই কোথাও কোথাও এই সব সাধারণ তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, আবার কোথাও বা প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সাধারণতন্ত্রের স্থাপনা করিয়া-ছিল, রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের ক্রমাগত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ও হইয়াছিল। ভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে সাধারণ-তন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত করিয়া শত শত বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সকল সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। সেইগুলি যে খুবই শক্তিশালী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের একটি কথা প্রচলিত আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, যত দিন সাধারণতন্ত্রের অনুষ্ঠান-গুলি ঠিকভাবে পরিচালিত হইবে, তত দিন এরূপ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও মগধ-রাজবংশের উদ্ধত সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিবে। এই মতের আরও সমর্থন পাওয়া যায়, ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থকারদের রচনায় তাঁহাদের মতে,—সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে রাজারা রাজনীতিক ও সামরিক ব্যাপারে যেমন সাহায্য পাইবেন, এমন আর অন্য কোথাও পাইবেন না; সাধারণতন্ত্রকে দমন করিবার উপায় যুদ্ধ নহে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়ার আশা অতি অল্প। তাহাদিগকে দমন করিতে হইলে কূট রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের রাষ্ট্র-তন্ত্রের ঐক্য ও দক্ষতা ভিতর হইতে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার নহে।

ভারতের এই সকল সাধারণতন্ত্র (Republics) বহু

প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তেজের সহিত পরিচালিত হইতেছিল। অতএব, গ্রীস্ দেশে যখন ক্ষণস্থায়ী বিব্রত সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতবর্ষে এই সকল সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং গ্রীসের সাধারণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত ভারতে বর্ত্তমান ছিল। ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী চপল অস্থিরমতি জাতি সকল অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয়গণ যে সুদৃঢ় ও স্থায়ী রাষ্ট্রগঠন-ব্যাপারে উন্নত ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের কোন কোন সাধারণতন্ত্র প্রাচীন রোম অপেক্ষা দীর্ঘকাল তেজের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা ভোগ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কারণ, তাহারা চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রবল-প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং খৃষ্টের মৃত্যুর পরে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহারা কেহই সাধারণতন্ত্র রোমের ন্যায় অপরকে আক্রমণ ও জয় করিবার শক্তির এবং বিস্তৃত-ভাবে সঙ্ঘগঠনের শক্তির অনুশীলন করে নাই; তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, স্বাধীনভাবে আপনাদের জীবন-বিকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আলেক্‌জান্দারের আক্রমণের পর ভারত সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল এবং তখন ঐ সাধারণতন্ত্রগুলি মিলনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। আপনাদের মধ্যে তাহারা শক্তি-মান ছিল, কিন্তু সমস্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। ছোট ছোট রাষ্ট্র মিলিয়া সমস্ত ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় সহজ-ব্যাপার নহে,—বস্তুতঃ প্রাচীনকালে জগতের কোথাও এরূপ চেষ্টা সফল হয় নাই, কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই দাঁড়াইতে পারে নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতবর্ষেও রাজতন্ত্রই ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অবশেষে অন্যান্য প্রকারের রাষ্ট্রতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ইতিহাস হইতে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়, তাহাদের কথা আমরা এখন জানিতে পারি কেবল প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে, গ্রীসদেশীয় পর্য্যটকদের বর্ণনা হইতে এবং সেই সকল সমসাময়িক গ্রন্থকারদের লেখা হইতে—যাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র রাজতন্ত্রস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

যদিও ভারতে রাজা ভগবানের প্রতিনিধি এবং ধর্ম্মের রক্ষকরূপে পরিগণিত হইতেন, রাজার পদ, সম্মান, শক্তি উচ্চশিখরে অবস্থিত ছিল, তথাপি মুসলমানদের ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, ভারতে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল না, রাজা ইচ্ছামত যাহা তাহা করিতে পারিতেন না। প্রাচীন পারস্যদেশে, মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ায়, অথবা রোমক সাম্রাজ্যে বা পরবর্ত্তী য়ুরোপে যে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, ভারতের রাজতন্ত্র ছিল তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পাঠান ও মোগলসম্রাট্‌গণ ভারতে যে রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করেন, ভারতীয় রাজতন্ত্রের সহিত তাহার কোনই সাদৃশ্য ছিল না। ভারতের রাজা দেশ-শাসন ও বিচারকার্য্যে সকলের উপরে ছিলেন, দেশের সমস্ত সামরিক শক্তি তাঁহার হস্তে ছিল, এবং তাঁহার মন্ত্রণাপরিষদের সহযোগিতায় তিনিই যুদ্ধ বা শান্তিস্থাপনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধেও তিনি সাধারণভাবে দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাহা ছাড়া তিনি যাহাতে তাঁহার ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিতে না পারেন, তাহারও নানা ব্যবস্থা ছিল এবং দেশের অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানও আপন আপন ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিত, রাজ্যশাসনব্যাপারে তাহাদেরও অনেক ক্ষমতা ছিল, তাহারা একরূপ রাজার সহিত সহযোগেই রাজকার্য্য, দেশশাসনকার্য্য পরিচালনা করিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে A limited or Constitutional monarch,—আইনের অধীন সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন রাজা, ভারতের রাজা বস্তুতঃ তাহাই ছিলেন; তবে ভারতে যে ভাবে constitution আইনানু-মোদিত শাসনতন্ত্র রক্ষিত হইত এবং রাজার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হইত, য়ুরোপের ইতিহাসে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং ভারতের রাজাকে রাজত্ব চালাইতে হইলে প্রজাগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর যতখানি নির্ভর করিতে হইত, মধ্যযুগে য়ুরোপীয় নৃপতিগণকে ততখানি নির্ভর করিতে হইত না।

রাজার উপরেও রাজা ছিল ধর্ম্ম। যে সব আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, বিচারগত, আচারগত রীতি-নীতি আইন-কানুন জাতির জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পরি-চালিত করিত, তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতে সাধারণভাবে

ধর্ম্ম বলা হয়। রাজা ছিলেন এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন। এই ধর্ম্মকে লোক অতি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিত এবং ইহার আধিপত্য নিত্য, সনাতন বলিয়া পরিগণিত হইত। মূলতঃ এই ধর্ম্মের কোনই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তবে সমাজের ক্রমবিকাশ ইহার রূপের বাহ্য আকারের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও স্বতঃই ভিতর হইতে স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। দেশভেদে, কুলভেদে যে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, তাহাও এই মূল ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। এই ধর্ম্মের উপর ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। ব্রাহ্মণরাও ছিলেন এই ধর্ম্মের শিক্ষক, প্রচারক। ধর্ম্মকে তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন মাত্র, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। ইচ্ছামত ধর্ম্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার তাঁহাদেরও ছিল না। তবে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার যখন তাঁহাদের ছিল, তখন তাঁহারা নিজস্ব ব্যাখ্যার দ্বারাই সমাজের নানা নূতন ভাব, নূতন চেষ্টার সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে পারিতেন। রাজা ছিলেন ধর্ম্মের কেবল রক্ষক, পরিচালক, ভৃত্য। তাঁহার উপর ভার ছিল, যেন লোক ধর্ম্ম মানিয়া চলে, কেহ কোনও অপরাধ না করে, যেন বিষম বিশৃঙ্খলা বা ধর্ম্মভঙ্গ না হয়। প্রথমে রাজাকে নিজেই সেই ধর্ম্ম মানিতে হইত, রাজা ব্যক্তিগতভাবে কিরূপ জীবন যাপন করিবেন এবং রাজপদ, রাজকার্য্যও কিরূপে পরিচালনা করিবেন, সে সম্বন্ধে ধর্ম্মের যাহা নির্দ্দেশ, রাজাকে কড়াকড়িভাবেই তাহা পালন করিতে হইত।

রাজশক্তির পক্ষে এই যে ধর্ম্মের আনুগত্য, ইহা কেবল একটা বাস্তববর্জ্জিত কাল্পনিক আদর্শমাত্র ছিল না, কেবল কথার কথা ছিল না। কারণ, সমস্ত সমাজ-জীবন বস্তুতঃ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইত। অতএব উহা ছিল জীবন্ত সত্য এবং সেই জন্যই রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব ছিল সমধিক। প্রথমতঃ আইন প্রণয়ন করিবার কোন শক্তি রাজার ছিল না; দেশশাসনকার্য্যে রাজা যে সব আদেশ ও অনুশাসন প্রচার করিতেন, সে সব দেশের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক রীতি-নীতিরই অনুযায়ী হইত,—এমন কি, এই সব আদেশপ্রচার-কার্য্যও রাজা একাকী করিতেন না। দেশের মধ্যে অন্যান্য এমন শক্তি ও অনুষ্ঠান ছিল, যাহারা রাজ্যশাসনব্যাপারে আদেশাদি প্রচার করিবার ক্ষমতায় রাজার সহিত অংশীদার ছিল—তাহা ছাড়া রাজা যে ভাবে দেশ শাসন করিতেন, ফলতঃ তাহা দেশবাসীর প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ইচ্ছা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি না, সব সময়েই রাজাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিতে হইত।

আধ্যাত্মিক সাধনা পূজা উপাসনা প্রভৃতি ব্যাপারে সাধারণকে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল; সাধারণতঃ এ সব ব্যাপারে রাজা কোন ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, প্রত্যেক নূতন বা বহুকালব্যাপী ধর্ম্মসম্প্রদায়—আপনার জীবন, আপনার অনুষ্ঠান আপনার মত করিয়া স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিত। তাহাদের নিজ নিজ গুরু ছিল, অধিপতি ছিল, আপন আপন ক্ষেত্রে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত চলিতে পারিত। State religion রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম বলিয়া কোন বিশেষ ধর্ম্মমত পরিগণিত হইত না। ধর্ম্মব্যাপারে রাজা জাতির অধিপতি ছিলেন না। এই বিষয়ে দেখা যায় যে, অশোক দেশের ধর্ম্মের উপরে রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্যান্য শক্তিশালী নরপতিগণও মাঝে মাঝে এইরূপ প্রবৃত্তি কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। কিন্তু, ধর্ম্মসম্বন্ধে অশোকের edicts বা ঘোষণাপত্র বলিয়া যেগুলি পরিচিত, সেগুলি ঠিক রাজাজ্ঞা নহে, কেবল রাজার মতপ্রকাশ মাত্র, লোককে তাহা যে গ্রহণ করিতেই হইবে, এরূপ আদেশ ছিল না। যদি কোন রাজা ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে হইত, অথবা পরামর্শের জন্য বিচার-সভা আহ্বান করিতে হইত [বৌদ্ধগণের প্রসিদ্ধ বিচারসভাসমূহ ইহার দৃষ্টান্ত], অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে তর্ক ও বিচারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত এবং যাহা সিদ্ধান্ত হইত, তাহাই গ্রহণ করা হইত। রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিশেষ মতবাদের পক্ষপাতী হইলে ঐ মতবাদের প্রচারে খুবই সুবিধা হইত বটে, কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁহাকে সকল প্রচলিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই সম্মান ও সমর্থন করিতে হইত এবং এ বিষয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকিতে হইত। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সম্রাট্‌গণ দুইটি বিরোধী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেই

সমর্থন করিয়াছিলেন। কখনও কখনও, বিশেষতঃ দক্ষিণ-দেশে, রাজা কর্তৃক ধর্ম্মব্যাপারে কম-বেশী অত্যাচার সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা অধর্ম্মের লক্ষণ, ব্যভিচার, সাময়িক তীব্র উত্তেজনার ফল, ইহা কখনই বহুদূরব্যাপী বা বহুকালস্থায়ী হয় নাই। সাধারণতঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহনীয়তা বা অত্যাচারের স্থান ছিল না, এবং কোনও রাজা বা রাষ্ট্র যে ইহা নীতিস্বরূপ অনুসরণ করিবে, ইহা ছিল কল্পনারও অতীত।

যেমন ধর্ম্মব্যাপারে, তেমনই সামাজিক ব্যাপারেও লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইত না। রাজা আইন করিয়া সমাজের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় না। যখন এরূপ হইয়াছে, তখন যাহাদের জন্য পরিবর্ত্তন—তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাদের মত লইয়াই করা হইয়াছে। বহুকাল বৌদ্ধ-প্রভাবে বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবার পর সেনরাজগণ যখন পুনরায় জাতিভেদের প্রবর্ত্তন করেন, তখন এই ভাবে লোকের সহিত পরামর্শ করিয়াই করিয়াছিলেন। সমাজের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ইচ্ছামত উপর হইতে করা হইত না, কিন্তু ভিতর হইতে স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইত; কুল বা বংশকে অথবা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে আপন আপন আচারের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ করিতে যে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল, প্রধানতঃ সেই স্বাধীনতার ফলে ভিতর হইতেই স্বাভাবিকভাবে সমাজের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইত।

রাজ্যশাসন-ব্যাপারেও এইরূপেই রাজার শক্তি জাতির সনাতন আদর্শের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান প্রধান রাজস্ব-ব্যাপারে রাজা এক নির্দ্দিষ্ট অংশের বেশী কর ধার্য্য করিতে পারিতেন না; অন্যান্য ব্যাপারে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানের মত লইয়াই রাজাকে কর নির্দ্ধারণ করিতে হইত এবং সকল সময়েই ইহা সাধারণ নীতি ছিল যে, রাজার যে দেশ শাসন করিবার অধিকার, তাহার ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণের সন্তোষ ও সম্মতি। রাজা নিজে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, দেশের দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডাদি দিবার সঙ্গত ব্যাপারে সকলের উপরে রাজারই আধিপত্য ছিল। তাঁহার বিচার-পতিরা বা আইনে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণরা আইনের যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, সেই নির্দ্ধারণ যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। মন্ত্রণাপরিষদে কেবল বিদেশীদের সহিত সম্পর্ক, সামরিক নীতি এবং যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন ব্যবস্থায় এবং বহু পরিচালনার কর্ম্মে রাজাই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের উপরে। যে সব শাসনকার্য্যের দ্বারা সমাজের সাধারণ কল্যাণ হয়,—যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও রক্ষণ এবং সামাজিক দুর্নীতি-নিবারণ,—এবং এইরূপ যে সব ব্যাপার রাজার দ্বারাই সুচারুভাবে পরি-চালিত হইতে পারে, সেই সব ব্যাপারে ইচ্ছামত সুব্যবস্থা করিবার তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে না যাইয়া তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ, কাহাকেও নিগ্রহ করিতে পারিতেন, তবে যাহাতে জনসাধারণের সাধারণ কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়, একান্তভাবে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাকে এই সব করিতে হইত।

অতএব, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজার খেয়াল বা অত্যাচারের কোন স্থান ছিল না; অন্যান্য অনেক দেশের ইতিহাসে রাজাদের যে পাশবিক নিষ্ঠুরতা, নৃশংস অত্যাচার সাধারণ ব্যাপার, ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। তথাপি রাজার পক্ষে ধর্ম্মের অব-মাননা করিয়া এবং রাজ্যশাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠা অসম্ভব ছিল না। তাই আইন-কর্ত্তৃ-গণ এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। রাজপদের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা সত্ত্বেও বিহিত হইয়াছিল যে, রাজা যখন যথাযথভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ না করিবে, তখন তাহাকে মান্য করিতে প্রজারা বাধ্য নহে। মনু এমন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, অন্যায়-পরায়ণ অত্যাচারী রাজাকে পাগ্‌লা কুকুরের ন্যায়ই হত্যা করা প্রজাগণের কর্ত্তব্য। চরমক্ষেত্রে এই যে রাজদ্রোহ—এমন কি, রাজ-হত্যারও বিধান মনুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থে বিহিত হই-য়াছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, রাজাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া এবং সকল অবস্থাতেই রাজার ভগবদ্দত্ত অধিকার স্বীকার করা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নীতির কোন বিধান নহে। এইরূপ বিদ্রোহের অধিকার প্রজারা যে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সাহিত্যে এবং ইতিহাসেও দেখিতে পাই। আর একপ্রকার অধিকতর নিরুপদ্রব এবং আরও অধিক প্রচলিত পন্থা ছিল,—রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভয়প্রদর্শন করা। অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারাই

অত্যাচারী রাজার সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়া আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দক্ষিণদেশে এক জন অপ্রিয় রাজাকে সাধারণে এইরূপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছিল; জনসাধারণের সভায় ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজাকে কেহ কোনরূপ সাহায্য করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। তবে আরও একটি প্রচলিত প্রতীকার ছিল,—মন্ত্রিগণের পরিষদ্‌ অথবা জনসাধারণের পরিষদ্‌ কর্তৃক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা। এইরূপে ভারতে যে রাজতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ ছিল সংযত, কার্য্যকুশল এবং কল্যাণকর। যে কার্য্যের ভার ইহার উপর অর্পিত ছিল, তাহা সুচারুভাবেই সম্পাদিত হইত এবং স্থায়িভাবে ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাই হউক, রাজতন্ত্র ছিল কেবল এক প্রকারের রাষ্ট্রতন্ত্র। ইহ লোকানুমোদিত ও প্রভাবসম্পন্ন ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে সাধারণতন্ত্রেরও অস্তিত্ব হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের রাজতন্ত্রই অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। আমরা যদি রাজতন্ত্রের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা মূলনীতি, উহা ধরিতে পারিব না। রাজতন্ত্রের পশ্চাতে ভিত্তিস্বরূপ কি ছিল, তাহার সন্ধান করিলেই ভারতের রাষ্ট্রগঠনের মূলস্বরূপ আমাদের গোচর হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

বর্ষা-রাতে

বর্ষা-রাতি—ঝরছে ধারা
লুপ্ত মেঘে চন্দ্র-তারা
দম্‌কা হাওয়া চম্‌কা লাগায়
ঘুমন্ত ফুলদলে
অন্ধকারের বন্ধ দ্বারের
অটুট অর্গলে।

কেয়ার ঝাড়ে দেয়ার ডাকে
গর্জ্জে ফণী পাতার ফাঁকে
মস্‌গুল ঐ কদম-কানন
মধুর পরিমলে
ঝম্‌-ঝমাঝম্‌ ঝরছে বারি
সুপ্ত ধরাতলে।

বাদল রাণীর হাসির ঝলক
উঠছে ফুটে ফেলতে পলক
অলক তাহার এলিয়ে গেছে
গগনমণ্ডলে,
ঝম্‌-ঝমাঝম্‌ ঝরছে ধারা
সুপ্ত ধরাতলে।

বরুণ দেবের নাচ-মহলে
হরদম্‌ আজ জলসা চলে
ঝুমুর ঝুমুর বাজছে ঘুঙুর
মেঘ-চাঁদোয়ার তলে,
ঝম্‌ ঝমাঝম্‌ ঝরছে ধারা
ধরার অঞ্চলে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নিষ্পত্তি

১

রামনগরের যদুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সকলেই বলিল—দেশের একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল।

জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনন্দন পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া অর্দ্ধরাত্রিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। সে রাত্রি ও তাহার পরদিন সে উঠিল না, কিছু খাইল না,—কাহারও সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত কহিল না। হরিনন্দনের জিদ্ সবাই জানিত; সে জন্য কেহ তাহাকে খাইবার বা উঠিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। কেবল তাহার মা সত্যবতী আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া এক গেলাস সরবৎ পান করাইয়া গেলেন।

তৃতীয় দিনে সত্যবতী আসিয়া ডাকিলেন—হরি, ওঠ্ বাবা; তুই হচ্ছিস্ সবার বড়, ছোটদের মুখের দিকে তুই না চাইলে কে চাইবে বল্? তোর কাকা তোকে কতবার ডাক্‌তে এসে ফিরে গেলেন। একবার উঠে বাইরে যা—সবাই মিলে একটা পরামর্শ ক'রে কিসে কি কত্তে হয়, ঠিক কর্। তিনটে দিন ত কেটে গেল—আর সাতটা দিন ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে, বাবা। যা হয় ক'রে শুদ্ধ্ ত হ'তে হবে।

হরি মায়ের কথা শুনিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু মেলিতে মায়ের বিধবা-মূর্ত্তি এই সর্ব্বপ্রথম দেখিয়া হরি বালকের মত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। শিশুকে যেমন শান্ত করে, সেইমত মা ২৪ বৎসরবয়স্ক পুত্রের পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন।

চক্ষু মুছিয়া হরি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া হরি দেখিল, তাহার কাকা রঘুনন্দন জ্ঞাতিবর্গবেষ্টিত হইয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছেন। উপবিষ্ট জ্ঞাতিগণের মধ্যে তাহার দূর-সম্পর্কের দাদামহাশয় বৃদ্ধ রমানাথ তাহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—এস ভাই, ব'স। শোক করা বৃথা, ভাই! এই দুনিয়ার নিয়ম। তা নইলে আমি যদুর চেয়ে পনেরো বছরের বড়—আমি পাকাচুল আর নড়া দাঁত নিয়ে তীরে ব'সে রইলাম, আর সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে গেল।

হরি আর একবার চোখ মুছিয়া রমানাথের পানে চাহিয়া বলিল—মা পাঠিয়ে দিলেন, শ্রাদ্ধাদি কি ভাবে করতে হবে, আপনারা পরামর্শ দিন।

তখন কেহ বলিল—দাদা আমাদের ইন্দ্রতুল্য ছিলেন; তাঁর শ্রাদ্ধে সমাজ করা উচিত। প্রধান প্রধান জায়গার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়ও একান্ত প্রয়োজন। বিদায়টাও এমন হওয়া চাই যে, কিছুকাল লোকের যেন মনে থাকে যে, হাঁ, একটা লোকের মত লোক গিয়েছে বটে।

এক জন আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল—তুমি ত উচিতের প্রকাণ্ড একটা ফর্দ্দ দিয়ে খালাস হ'লে। যার কর্‌তে হবে, সে নিজের বুকের জোর বুঝবে, তবে ত করবে। কথায় বলে—

আত্ম রেখে ধর্ম্ম,
তবে কর পিতৃলোকের কর্ম্ম।

শ্যামানাথ রমানাথের ছোট ভাই। সে একটু হিসাবী লোক, বাজে কথা বড় একটা কহে না। শ্যামানাথ বলিল—তোমরা ত নানা জনে নানা কথা বল্‌ছ ও বল্‌বে; তাতে ত কিছু কায হবে না। হরি ছেলেমানুষ, এতে আরও ভড়্‌কে যাবে। তার চেয়ে বৌমাকে এখানে একবার ডাকা হোক্। তিনি বুদ্ধিমতী—নিজের জোর বোঝেন, তাঁর সাম্‌নেই কথাবার্ত্তা হোক্।

এক জন সত্যবতীকে ডাকিতে গেল। স্বল্পাবগুণ্ঠনবতী সত্যবতী যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। এই প্রৌঢ়াবস্থায়ও তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে এক অনন্যসুলভ কমনীয়তা ও উদারতা বিরাজ করিত, যাহা দেখিবামাত্র সকলের চক্ষুই সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়িত। সকলেরই মনে হইল, সাবিত্রীর মত রূপবতী, গুণবতী ও সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্তা নারীকে কেন এই বৈধব্য ভোগ করিতে হইল! অনেকের

পড়িল। কাহারও কাহারও চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

এখনই হয় ত সহানুভূতির কথাবার্ত্তা উঠিয়া পড়িবে ও আসল কথা চাপা পড়িয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় শ্যামানাথ তাড়াতাড়ি বলিল—বৌমা এসেছেন, এবার কথা হোক্।

বলিয়া নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিল—তাঁর পদ-গৌরব বা মান-মর্য্যাদা হিসাবে ত যথেষ্টই করা উচিত; কিন্তু যে রকম খরচ তাঁর ছিল, তাতে যে বেশী কিছু রেখে যেতে পেরেছেন, তা ত মনে হয় না। এ দিকে ৩টি ভায়ের মধ্যে হরিই যা একটু বড় হয়েছে; আর দুটি ত এখনও পড়ছে—তাদেরও খরচ আছে।

শশাঙ্ক দূর-সম্পর্কে যদুনন্দনের খুড়তুত ভাই। সে বলিল—অত ভেবে চিন্তে বুঝে সুঝে তোমার আমার শ্রাদ্ধ করা যেতে পারে—যাদের বলে, টিকে ধরাতে জামিন লাগে। দাদার বেলায় সে কথা খাটে না। তিনি ছিলেন একটা দিক্‌পাল—সেটা ভুলে যেও না, খুড়ো। তিনি ত আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়া ছিলেন না। একেবারে কিছু রেখে যাননি—তাও নয়। রঘুকে যে কল্‌কাতায় কাপড়ের ব্যবসা ক'রে দিয়েছেন, তাতেও ত কম আয় নয়। নামে রঘুর হলেও দাদারই যে সে ব্যবসা, তা আর কে না জানে? হরিও ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেশ দুপয়সা রোজগার কর্‌ছে। এখন তাঁর উপযুক্ত কায না কর্‌লে লোকে বল্‌বে, রঘু আর হরির কাছে টাকারই আদর বেশী হ'ল; মানুষটা তাদের কাছে কিছুই নয়।

হরি এ কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাঁর যা উপযুক্ত, সে টাকা খরচ কর্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই।

শশাঙ্ক কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল—এই ত উপযুক্ত পুত্রের মত কথা বলেছ! এখন রঘুর মতটা জান্‌তে পারলেই আমরা একটা সাব্যস্ত করতে পারি।

রঘু একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—আমার কি মত জান্‌তে চান?

শশাঙ্ক একটু মুরুব্বীচালে বলিল—সাদা পথে এস, রঘু। দোকান থেকে শ্রাদ্ধের জন্য ক'হাজার টাকা দিতে পার বল?

রঘু রুষ্ট হইয়া বলিল—দোকান থেকে একটা পয়সাও এখন আমি দিতে পারি না।

শশাঙ্ক তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—তা হ'লে এখন না দিয়ে তুমি কিছু পরে দিতে পার?

রঘু আরও রাগিয়া গেল; বলিল—এখনও পারি না, পরেও পারি না। দোকান থেকে এর জন্য খরচ কর্‌তে আমি অক্ষম।

শশাঙ্ক রঘুকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দ পাইল। সে একটু বক্র হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ তুমি এমন অক্ষম হ'লে কেন শুন্‌তে পাই কি?

রঘু সে হাসি গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—আমার হাত একেবারে খালি। দোকান থেকে খরচ করা আমার সাধ্যাতীত।

শশাঙ্ক বলিল—তুমিই না গেল সপ্তাহে ৫ শত টাকা দাদাকে পাঠিয়েছিলে? আর দাদা মারা যেতেই তোমার হাত একেবারে খালি হয়ে গেল?

রঘু বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। হরি হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—তা হ'লে বাবার শ্রাদ্ধ এখন স্থগিদ থাক্‌বে, কাকা?

রঘু বিস্মিত হইয়া একবার হরির পানে চাহিল; তার পর দৃঢ়স্বরে বলিল,—না, স্থগিদ রাখার দরকার হবে না। দাদা ছেলেবেলায় আমাদের সকলের নামে পোষ্ট আফিসে কিছু কিছু জমা দিতেন। আমার নামে ৫ শত টাকা হয়েছে। সে টাকা আমি দিতে প্রস্তুত; তোমরাও তোমাদের টাকা থেকে কিছু কিছু দাও, দিয়ে এক হাজারের মধ্যে সারো।

শশাঙ্ক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—যদুনন্দন বাড়ুয্যের শ্রাদ্ধ এক হাজার টাকায়! বেশ বলেছ রঘু! উপযুক্ত ভাইয়ের মতই কথা বলেছ। তার চেয়ে সদ্য পিতৃহীন ভাইপোকে বালির পিণ্ড দেবার উপদেশ দিলে না কেন?

রঘু বলিল—সে রকম অবস্থা হ'লে আমি ও ব্যবস্থা দিতে ইতস্ততঃ কর্‌তাম না।

শশাঙ্ক হরির দিকে চাহিয়া বলিল—এখন শুন্‌লে ত কাকার কথা! কাকার কথামত বালির পিণ্ডের ব্যবস্থাই কর গে। কারও সঞ্চিত টাকায় ঘা লাগবে না।

'বালির পিণ্ড' কথাটার বার বার উল্লেখ করায় হরি বড়ই বিরক্ত হইতেছিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া হরি বলিল- বালির পিণ্ডের কথা তোমার মুখ দিয়ে বা'র করা উচিত হয়নি।

রঘু বালির পিণ্ডের কথা মোটেই বলে নাই। সে শুধু

বলিয়াছিল, অবস্থা সে রকম হ'লে সে বালির পিণ্ডের ব্যবস্থা দিতে ইতস্ততঃ কর্‌বে না। এই অপবাদে সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—আমার কি উচিত বা অনুচিত, সে তোমার চেয়ে আমি কম জানিনে, হরি। আমাকে তোমার সে শিক্ষা দিতে হবে না।

হরি ইহার উত্তরে উগ্রভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, সত্যবতী তাহাদের উভয়কে বাধা দিয়া বলিলেন—এ দুঃসময়ে তোমাদের বাদানুবাদ সাজে না। হরি, চুপ কর; ঠাকুরপো, তুমিও চুপ কর। তাঁর শ্রাদ্ধের জন্য আমাকে কারও দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে, এমন অবস্থায় তিনি আমাদের ফেলে যাননি। তবে কোথায় কি রেখে গিয়েছেন, তা এখনও জান্‌তে পারিনি। তোমরা সবাই সাহায্য কর্‌তে, সমারোহের সঙ্গে কায হ'ত। না কর, যেমন আমার সাধ্য, তেমনই কায সার্‌তে হবে। তার জন্য বিবাদ বা দুঃখ করার দরকার নেই। আমি জানি, তাঁর অনেক আত্মীয়কে তিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন; সব ক্ষেত্রে তার জন্য হ্যাণ্ড-নোটও রাখেননি। তাঁরা সবাই যদি সে টাকার কিয়দংশও এখন শোধ করেন, তা হলেও আমার অনেকটা সুবিধা হয়।

শ্যামানাথ বলিল—অতি উত্তম প্রস্তাব করেছেন, বৌমা। আমাকেই যদু এক সময়ে ৫ শত টাকা ধার দিয়েছিলেন। সব পারিনি, তার মধ্যে ২ শত টাকা সঙ্গে ক'রে এনেছি। হরি, এই নোট কখানা বৌমাকে দাও।

হরি তাহা লইয়া মায়ের হাতে দিল।

তখন অপর সকলে একে একে উঠিয়া পড়িল। কেহ বলিল, একটু কায আছে; কেহ বলিল, সময়ান্তরে আসিবে; কেহ বা বলিল—হ্যাঁ, এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

সকলে কিন্তু সরিয়া পড়িল।

টাকার কথা উঠিতে সকলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া হরি বিষম চটিয়া গেল। বলিল, এই সব অকৃতজ্ঞ লোকদের বাবা বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে গিয়েছিলেন ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছি। আরও অবাক্ হচ্ছি, কাকা, সবার সাম্‌নে তোমার এই রকম কথা বলায়।

রঘু বলিল—তোমার ব্যবহারেও তোমার তা হ'লে একটু অবাক্ হওয়া উচিত ছিল। তুমি টাকা না দিলে যদি দোষ না হয়, আমার দোকান থেকে দেবার কোন উপায় নেই বল্‌লে কেন দোষ হবে?

হরি, বলিল, 'আমার দোকান' না ব'লে, 'আমাদের দোকান' বল্‌লেই বোধ হয় কথাটা বেশী ঠিক হ'ত। বাবারও দোকানে বোধ হয় অংশ ছিল, এবং এখনও আছে। তুমি এমনি ভাবে উত্তর দিচ্ছ কাকা, যেন আমরা ভিক্ষা চাইছি। তা না ক'রে তুমি বরং হিসেব কর। যদি কিছু আমাদের পাওনা হয়, আমরা নেব, নইলে এক পয়সাও আমরা চাইনে।

হিসাবের কথায় রঘু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। তুমি আমার কাছে হিসাব চাও, হরি, এত স্পর্দ্ধা তোমার! হিসাব দিতে আমি বাধ্য নই। দোকান দাদা আমাকে ক'রে দিয়েছেন, দোকান আমার। তোমাদের জন্য তিনি কিছু রেখে গেলে তা তোমাদের হ'তে কোন বাধা নেই; আর আমার জন্য কিছু রেখে গেলে সেটা আমার হতেই যত দোষ? তিনি তোমাকে যেমন মানুষ করেছেন, আমাকেও তেমনি মানুষ করেছেন। তাঁর উপর তোমার যেমন দাবী আছে, আমারও তেমনি আছে। সে দাবী আমি ছাড়ব না।

হরি বলিল—সে দাবীর খুব মর্য্যাদা তুমি রাখলে, কাকা।

রঘু বলিল—তার বিচারক তুমি নও, হরি। এ সম্বন্ধে আমি আর একটা কথাও কইতে চাইনে। তোমার গুরু-লঘু-জ্ঞান নেই,—কথা কইবার উপযুক্ত তুমি নও।

হরিও একটা খুব কড়া কথা বলিতে যাইতেছিল, সত্যবতী উঠিয়া হরির হাত ধরিয়া বলিলেন—হরি, তোমার জীবনের সব চেয়ে দুঃসময় এই। এখন তোমাকে সব সহ্য ক'রে যেতে হবে। চল, ভিতরে চল। ঠাকুরপো, তুমিও যাও, মাথা ঠাণ্ডা কর গে।

বলিয়া সত্যবতী পুত্রের হাত ধরিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রঘু কিছুক্ষণ সেখানে মাথা নত করিয়া চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিতেই যদুনন্দনের চিত্রখানি চোখে পড়িল।

কিছুক্ষণ চিত্রের পানে চাহিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রঘু উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া অশ্রু বিন্দু বিন্দু করিয়া গৃহতলে ঝরিতে লাগিল।

নির্জ্জন কক্ষে একাকী কিছুক্ষণ কাঁদিয়া রঘু শান্ত হইল। তার পর চক্ষু মুছিয়া দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

২

যদুনন্দন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি রামনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে উঠিতে হইয়াছিল।

যদুনন্দন ১৩ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। রঘুনন্দনের বয়স তখন মাত্র ২ বৎসর। ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সংসারে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না; কাষেই রঘুর লালন-পালনের সমস্ত ভার যদুনন্দনের উপরেই পড়িয়াছিল।

বালক যদুনন্দন নিজে রাঁধিয়া শিশু ভ্রাতাকে খাওয়াইত। তার পর তাহাকে এক দয়াবতী বিধবা প্রতিবেশিনীর কাছে রাখিয়া স্কুলে পড়িতে যাইত। স্কুল হইতে আসিয়া আবার তাহাকে লইয়া আসিত, তাহাকে খাওয়াইত, ঘুম পাড়াইত, তার পর পড়িতে বসিত। পিতৃবিয়োগের মাস চারেক পরে যদুনন্দন এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও গ্রামের দুইচারিটি ছেলে পড়াইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা উপায় করিতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসর এই ভাবে চালাইয়া স্থানীয় হাই স্কুলে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই মাষ্টারী করিতে করিতে তিনি ক্রমে ক্রমে এফ এ, বি-এ, ও পরিশেষে বি-এল পাশ করিয়া উকীল হন।

রঘুনন্দনের ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে যদুনন্দন মাষ্টারী করিবার সময়ে তাহাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন ও তাহাকে অবসরমত পড়াইতেন। রঘু আর একটু বড় হইলে তাহাকে যদুনন্দন স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন; কিন্তু কিছুতেই লেখাপড়ার দিকে তাহার মন লওয়াইতে পারেন নাই। তাহার অনাবিষ্ট চিত্ত লেখাপড়ার দিকে কিছুতে আকৃষ্ট হইত না। যত দিন স্কুলে ছিল, রঘু একটি দিনের জন্য কাহারও কাছে আপনার কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই।

বি-এ পাশ করার পর ঐ স্কুলেই যখন তাঁহার ৫০৲ টাকা বেতন হয়, সে সময়ে যদুনন্দন বিবাহ করেন ও গৃহকর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি পান। রঘু সেই সময়ে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়।

হাতে কিছু টাকা জমিবার পর রঘুর জন্য সেই গ্রামেই যদুনন্দন স্বদেশী কাপড়ের একটি ছোট খাট দোকান খুলিয়া দেন। এইরূপে ব্যবসা সম্বন্ধে রঘুর কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিল। তার পর ওকালতী করিয়া অবস্থা ফিরিলে ৫ হাজার টাকা মূলধন দিয়া কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটের উপর রঘুকে একখানি স্বদেশী কাপড়ের দোকান করিয়া দেন ও তাহার বিবাহ দেন।

মাষ্টারী করিবার সময়েই যদুনন্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তার পর আরও দুই পুত্র জন্মে।

পাছে তাঁহার অবর্ত্তমানে ভ্রাতা ও পুত্রদের মধ্যে বনিবনাও না হয়, সে জন্য পূর্ব্ব হইতেই যদুনন্দন সকলের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভ্রাতার জন্য, প্রত্যেক পুত্রের জন্য পৃথক্ বাটী ও স্ত্রীর জন্য মাসিক অর্থপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে যদুনন্দন দার্জ্জিলিঙে তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রবাবুর কাছে মাসখানেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া যান। সেই উইল ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজপত্র সমস্ত যোগেন্দ্রবাবুর কাছেই আছে। তাঁহার কত টাকা, কাহাকে কত দিয়াছেন, কি কি সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, এ সম্বন্ধে ঠিক খবর কেহই জানিত না।

পরামর্শের পর রঘু আর ফিরিয়া অন্তঃপুরে আসিল না। কাহাকেও না বলিয়া একা কলিকাতা চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রিকালে রঘু যখন কলিকাতা হইতে ফিরিল, সত্যবতী তখনও জাগিয়া। রঘুর পদশব্দে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? ঠাকুরপো!

রঘু বলিল, হ্যাঁ, বৌদি।

কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় গিয়েছিলে?

কল্‌কাতা।

এক জন কাউকে ব'লে যেতে হয়। আমরা সেই দুপুর থেকে ভাবছি। যাও, ঘরে খাবার ঢাকা আছে; ছোটবৌও জেগে আছে, এই উঠে ঘরে গেল।

সত্যবতীর এখনকার কণ্ঠস্বরে অনেকখানি স্নেহ ছিল; তাহাতে প্রভাতের আঘাত যেন অনেকখানি ধুইয়া গেল।

হাত-পা ধুইয়া রঘু আপনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল ও আপনার শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পাশেই পৃথক্ শয্যায় তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী শুইয়া ছিল। উঠিয়া বসিয়া মন্দাকিনী বলিল—দিদি খাবার ঢেকে রেখে গিয়েছেন আর খেতে বলেছেন।

রঘু বলিল, আমার শরীর ভাল নেই—খাব না।

উভয়েই অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। ক্রমে রঘুর তন্দ্রা আসিল। হঠাৎ একবার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চাহিতে রঘু দেখিল, ঘর অন্ধকার; শুনিল, অতি মৃদুস্বরে কে কাঁদিতেছে।

রঘু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী কম্বলের উপর উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

নিঃশব্দে রঘু স্ত্রীর শিয়রে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?

মন্দাকিনী তবু কাঁদিতে লাগিল।

রঘু বলিল,—বল, কি হয়েছে?

মন্দাকিনী কান্না একটু বন্ধ করিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি অমন্ হ'লে কেন?

কেমন হ'লাম?

তুমি কেন বল্‌লে যে, বড় ঠাকুরের শ্রাদ্ধে একটা পয়সা দেবে না?

তাতে কি হয়েছে?

সবাই তোমার নিন্দা করছে। আমি দিদির দিকে মুখ তুলে চাইতে পারছি নে।

কেন, বৌদি কিছু বলেছেন?

না।

তবে আর তোমার কি? বাইরে বেরিও না। কারো কোন কথা শুন্‌তে পাবে না।

না—পাবে না! আজ দুপুরে কত জন এসে কত কথা ব'লে গেল। তুমি বাড়ী আসনি শুনে এক জন বল্‌লে, তার স্বামী বলেছে যে, তুমি তাড়াতাড়ি কল্‌কাতার দোকান সামলাতে ও টাকা সরাতে গেছ। আরও কত কি বলতে যাচ্ছিল; দিদি রাগ ক'রে তাদের চুপ করতে বল্লেন, তাই তারা চুপ করলে।

আচ্ছা, তোমার কি বিশ্বাস? তুমিও কি ভাব যে, আমি টাকার লোভে হরিদের ফাঁকি দেব?

আমি তা ভাবিনে।

তবে কেন কাঁদছিলে?

তোমার নিন্দা শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়, তাই। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি তুমি কল্‌কাতা চ'লে গিয়েছিলে কেন?

সে কথা পরে জানতে পারবে। এখন ঘুমোও।

তার পর দুই জনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন হইতে রঘুর বাহিরে আসা কঠিন হইয়া পড়িল। বাহিরে কাহারও সহিত দেখা হইবামাত্র সে ২।১টা কথা না শুনাইয়া ছাড়িল না। কেহ বলিল—হ্যাঁ হে রঘু, শেষটা এমন বিশ্বঘাতকী (বিশ্বাসঘাতকের) কায কর্‌লে? তোমাকে না যদুদা নিজহাতে মানুষ করেছিলেন?

কেহ বলিল—তা হিসাব দেখাতে তোমার আপত্তি কেন? উঠ্‌তি ব্যবসা, মাসে একটি হাজারের কম আয় নয়, আমরা সবাই জানি। আর ব্যবসা যদুর টাকায়, তাও আমাদের কাছে অজানা নয়। তখন এ ফাঁকি দেবার চেষ্টা কেন?

শুনিয়া রঘু বলিল—তবু চেষ্টা ক'রে দেখা ভাল, যদি পারা যায়। নিজের স্বার্থ কে আর না বোঝে বলুন?

শুনিয়া সকলের চক্ষু কপালে উঠিল। এক জন বলিল, বোঝে বটে, কিন্তু তোমার মত অত নয়।

রঘুর কথাটা আরও রঙ্গীন্ হইয়া চারিদিকে রাষ্ট হইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না।

অপরাহ্নে দার্জ্জিলিং হইতে যোগেন্দ্রবাবুর তার আসিল, আমি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন যাইব; পাঁচ শত টাকা পাঠাইলাম, ইহারই মধ্যে শ্রাদ্ধের সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। পত্র দিতেছি।

সত্যবতীর নামে ৫ শত টাকাও এই সঙ্গে আসিল।

পত্র আসিল ইহার দুই দিন পরে। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, যদুর যে উইল তাঁহার কাছে আছে, তাহাতে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আছে যে, ৫ শত টাকার বেশী কিছুতেই শ্রাদ্ধে খরচ করা হইবে না। উইলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথাও আছে; সে সব তিনি শ্রাদ্ধের পরদিন সকলকে জানাইবেন।

এ সংবাদ শুনিয়া আত্মীয়-বন্ধুরা অবাক্ হইয়া গেল। হাজার টাকা ত তবু ছিল ভাল; এ যে একবারে অর্দ্ধেক! যদু লোকটাই বা কি রকম? এত টাকা উপায় করিয়া শেষটা নিজের শ্রাদ্ধের জন্য রাখিল মাত্র পাঁচশ! আর সব রহিল লোহার সিন্দুকে তোলা!

কেহ বলিল—যদু নাস্তিক, ঘোর নাস্তিক।

কেহ বা বলিল—এ সব রঘুর কারসাজি। সে যে নিজে পাঁচশো টাকা দেবে বলেছিল, তাও আর দিতে হ'ল না।

তখন সকলে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিল, যদু ছিল নাস্তিক ও নির্ব্বোধ আর রঘু ঘোর স্বার্থপর পাষণ্ড।

সকলে শ্রাদ্ধের চেয়ে উইলে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

নানা জনে নানা কথা বলা সত্ত্বেও রঘুই সত্যবতীর আদেশ ও পরামর্শমত যোগাড়যন্ত্র সব করিল। হরিকে কিছুই করিতে দিল না।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন যোগেন্দ্রবাবু যথাসময়ে দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া পৌছিলেন।

পরদিন বিনাড়ম্বরে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। দিনে যথারীতি ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইল; রাত্রিতে দরিদ্র-ভোজন হইল। হরি ও রঘু নিজে অত্যন্ত বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র-দিগকে সমান যত্নে ও আদরে তুষ্ট করিল। প্রত্যেক দরিদ্রকে একখানি করিয়া বস্ত্র দেওয়া হইল।

৩

শ্রাদ্ধের পরদিনই প্রভাতে উইল শোনান হইবে। পাড়ার দুই চারি জন আত্মীয় ও বন্ধু, যদুবাবুর পুত্রগণ, সত্যবতী ও মন্দাকিনী সকলে বাহিরের সেই ঘরে সমবেত হইয়াছেন। সত্যবতী ব্যতীত সকলেই উৎকণ্ঠিত। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি উইলের মোটামুটি ব্যাপার জানেন।

কেবল রঘু এখনও আসে নাই, সে জন্য যোগেন্দ্র-বাবু রঘুর অপেক্ষা করিতেছেন। রঘুকে ডাকিবার জন্য কেহ যাইবে, এমন সময় কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া রঘু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রঘু বলিল—কাকাবাবু, আমার একটু দেরী হয়ে গেছে! কল্‌কাতা থেকে এই সব কাগজপত্র নিয়ে এইমাত্র এক জন কর্ম্মচারী এলো; এরই জন্য আমি একটু অপেক্ষা করছিলাম। আপনার উইল সুরু করবার আগে আমার একটা কথা শেষ করতে অনুমতি দিন।

যোগেন্দ্রবাবু অনুমতি দিলে রঘু বলিতে আরম্ভ করিল—কাকা, দাদার মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে এই ঘরে আমরা প্রায় এই ক'জনেই ব'সে ছিলাম। সে দিন পরামর্শ হচ্ছিল, শ্রাদ্ধে কত খরচ করা উচিত। আমি বলেছিলাম, এক হাজারের মধ্যেই শ্রাদ্ধ সারা উচিত এবং ছেলেবেলায় দাদা আমাদের জমাবার জন্য যে টাকা মাসে মাসে দিতেন, তার থেকেই ব্যবস্থা করা উচিত। সেই প্রসঙ্গে শশাঙ্কদাদা বলেন যে, কল্‌কাতার দোকানে ত যথেষ্ট আয়; সেই আয় থেকে শ্রাদ্ধ করলেই কোন অসুবিধা হবে না এবং যথেষ্ট খরচ করাও সহজ হবে। আমি তাঁকে বলি যে, ব্যবসা থেকে টাকা আমি দিতে পারব না এবং আমার হাতে দেবার মত টাকাও নেই।

শশাঙ্কদাদার ইঙ্গিতে হরি শেষে এমন বলে যে, আমি যেন দোকানের আয়ের হিসাব করি এবং হিসাবে যদি কিছু পাওনা হয়, তবেই সে টাকা নেবে, নইলে নয়। আর বলেছিল, আমি যেন মনে না করি যে, আমি তাকে ভিক্ষা দিচ্ছি।

অবশ্য এ রকম বচসার জন্য আমিও অনেক পরিমাণে দায়ী। হাতে টাকা থাক্‌তে আমি শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দিচ্ছি না, দাদার পয়সায় তৈরি দোকান আমি আত্মসাৎ কর্‌বার চেষ্টায় আছি, এ সব ইঙ্গিত আমি সহ্য কর্‌তে পারিনি। সব কথা এঁদের বুঝিয়ে না ব'লে আমি বলেছিলাম যে, শ্রাদ্ধে দোকান থেকে আমি এক পয়সাও দিতে পার্‌ব না। আর রাগ করেই বলেছিলাম যে, হিসাব আমি দেখাব না, দাদা দোকান আমাকে দিয়েছেন, দোকান আমার।

এ কথা বলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছিল, তা আমি স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু আপনি ত জানেন, কাকা, যে, দাদার দ্বারা আমি যে ভাবে লালিত-পালিত হয়েছি, তা'তে আমি যে হরির থেকে ভিন্ন বা তুলনায় আমার অধিকার হরির চেয়ে কম, এ সব শোনা, মনে করা বা স্বীকার করা আমার পক্ষে কত কঠিন। বাবার স্নেহ আমি পাইনি, মাকে মনেই পড়ে না; জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দাদাকে আর বৌদিদিকে জানি। তাঁদের কাছে যে আমি হরির চেয়ে পর, এ ভাবতে আমি পারিনি। দাদার মৃত্যুতে হরি শুধু পিতৃ-হীন হয়েছে, আমি একসঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হয়েছি। আমার সেই দুঃখের উপর এই অবিশ্বাস অসহ্য হয়েছিল। বৌদিদি এ সময়ে আমার পক্ষ হয়ে একটা কথাও বলেন নি, সে জন্য আমার দুঃখ আরও বেশী হয়েছিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রঘুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন—রঘু, তুমি শান্ত হয়ে সব কথা

ব'লে যাও। এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা যত্নর উইলে আছে।

সত্যবতীরও চক্ষু অনার্দ্র ছিল না, তিনি স্নেহকরুণাপূর্ণ-নয়নে রঘুর দিকে চাহিয়াছিলেন। হরির হৃদয়ও অনু-শোচনায় পূর্ণ হইতে লাগিল।

আবেগ সম্বরণ করিয়া রঘু পুনরায় বলিতে লাগিল—হিসাব দেব না মুখে বল্‌লেও সেই দিনই আমি কল্‌কাতা চ'লে যাই ও ব্যবসার আরম্ভ থেকে শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরি করতে ব'লে আসি। সেই হিসাব আর এদিক্‌কারের লভ্যাংশ সমস্ত আজ এসে পৌঁছেছে। দাদার আজ্ঞামত ব্যবসায়ে পুঁজি বাড়ানো ও আমার কল্‌-কাতার খরচ ছাড়া যা বেঁচেছে, সব দাদার হাতে বৎসরে দুবার ক'রে এনে দিইছি। ব্যবসা থেকে লাভ যা হয়েছে, তার একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি। গত ছ'মাস থেকে দাদার শরীর অসুস্থ। এই সময়ের লাভটা দাদার অনিচ্ছাতেও আমি তাঁর চিকিৎসার জন্য খরচ করেছি। কাকাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সবাই এ কথার সত্যতা জান্‌তে পারবেন।

এই বলিয়া রঘু হিসাবপত্রের কাগজগুলি ও পকেট হইতে বাহির করিয়া কয়েকখানি নোট যোগেন্দ্রের হাতে দিল।

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—রঘুর কথা সব সত্য। যদু যখন দার্জ্জিলিঙে আমার কাছে ছিল, সেই সময়েই দু'জন বড় ডাক্তার কল্‌কাতা থেকে ও নিজে খরচ ক'রে নিয়ে যায়। রঘুকে তোমরা ততখানি চেন নি, যতখানি যদু চিনেছিল।

তার পর যোগেন্দ্রবাবু উইলখানি বাহির করিয়া পাঠ পড়িলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

যদুনন্দনের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এক লক্ষ টাকার উপর। দশ হাজার টাকা মূল্যের এক একখানি নবনির্ম্মিত বাড়ী তাঁহার তিন পুত্র ও এক ভ্রাতা পাইবে। তাঁহার যে পৈতৃক বসতবাটী, তাহা তাঁহার স্ত্রীকে দেওয়া হইল। এই বাটীর উপর তাঁহার স্ত্রীর দান-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার রহিল। তাঁহার স্ত্রী ও তিন পুত্র প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করিয়া পাইবে। দশ হাজার টাকা স্থানীয় হাই স্কুলে দেওয়া হইবে ও দশ হাজার টাকা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে দেওয়া হইবে।

ইহা ছাড়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দনের জন্য তিনি কলিকাতায় একটি কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া দিয়াছেন। ইহা একা রঘুনন্দনের জন্যই তিনি খুলিয়াছিলেন। পাছে ভবিষ্যতে ইহা লইয়া আবার কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয়, সে জন্য তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যব-সায়ের উপর রঘুনন্দন ছাড়া আর কাহারও কোন দাবী-দাওয়া রহিবে না।

এ যাবৎ ব্যবসায় হইতে খরচ বাদে যাহা লাভ হইয়াছে, রঘুনন্দন সে সমস্ত অর্থ তাঁহারই কাছে রাখিয়াছে। তাহার পরিমাণ ২০ হাজার টাকা। এই অর্থ গচ্ছিত টাকা মনে করিয়াই তিনি তাহা রঘুনন্দনের জন্য রাখিয়াছেন। ইহা তাহাকেই দেওয়া হইবে।

তাঁহার কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধুকে তিনি যে টাকা ঋণ বলিয়া সাহায্যকল্পে দিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত টাকা তাঁহা-দেরই দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে যে-সব দলীলাদি আছে, সে সমস্ত তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

তাঁহার পত্নী ও দুইটি নাবালক পুত্রের শিক্ষা ও রক্ষণা-বেক্ষণের ভার ও তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য পূজার্চ্চ-নাদির ভার তাঁহার ভ্রাতার উপরেই দিয়া গেলেন।

উইলের এক্‌জিকিউটার তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু যোগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়ভ্রাতা রঘুনন্দন রহিলেন।

উইল পড়া শেষ হইলে সকলে দেখিল—রঘু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাঁদিতেছে। সত্যবতী সাশ্রুনেত্রে উঠিয়া রঘুর কাছে গিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন—ঠাকুরপো, চুপ কর ভাই, আমার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা ভুলে যাও।

রঘু ভ্রাতৃজায়ার চরণে নত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—আমি কখন দাদার কোন কাযে লাগিনি, তবু দাদা আমি মূর্খ ভেবে আমার জন্য এত ভেবে এত ক'রে গিয়েছেন।

যোগেন্দ্র রঘুকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—কাযে লাগবার সুযোগ ত তোমার দাদা তোমাকে যথেষ্ট দিয়ে গিয়েছেন।

হরিরও দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। সে উঠিয়া রঘুর পায়ে নত হইয়া বলিল—কাকা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মা ও ছোট ভাইদের ভার বাবা তোমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন, আমি নতজানু হয়ে আমার নিজের ভার তোমার হাতে দিচ্ছি। আমি বড় হয়েছি, সেই অপরাধে কি তুমি আমার ভার নেবে না?

রঘু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দুই হাতে হরিকে উঠাইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

যোগেন্দ্রবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—যদুর আত্মা এইবার তৃপ্ত হ'ল।

দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার দুই নয়নে ফুটিয়া উঠিল। সক-লের অসাক্ষাতে তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিয়া প্রসন্ননেত্রে দুই জনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

বরণীয় বাঙ্গালী-জীবন

একে ত বার বার অতিথি অভ্যাগত আশ্রিতের কৃতঘ্ন অত্যাচারে স্বাস্থ্য-প্রফুল্ল বাঙ্গালী-প্রাণ বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার ইংরাজী অক্ষরের খরতা ও রক্তাক্ত পাশ্চাত্য ইতিহাসের রাক্ষসী বুভুক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসীর মন এমন বিগড়াইয়া দিয়াছে যে, সে আজ শান্তি-সাধুতাকে কাপুরুষোচিত ভীরুতার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

যে মানব-দেহকে ঈশ্বর স্বীয় প্রতিচ্ছায়ার স্বরূপ অহিংস প্রেমের প্রতিমা করিয়া গড়িয়াছিলেন, পাপপুরুষের প্রেরণায় সেই মানব প্রেমের জগজ্জয়ী শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ইতর হিংস্র জন্তুর দন্ত-নখরাদি ধ্বংস-শক্তির আকর-জ্ঞানে ঐ সকলের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল।

বাঙ্গালী আজ দেখিতেছে, যে যে জাতিকে সে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া সম্মান করিতে শিক্ষিত হইয়াছে, সেই সকল জাতি মানবের অন্তরস্থ দেবভাবকে আলস্য ও ঔদাসীন্যের নামান্তরমাত্র ধার্য্য করিয়া জলে কুম্ভীর, আকাশে শকুনি,স্থলে ভল্লুক-শৃগাল-সর্পের শক্তি আশ্রয় করিয়া পরস্পরের ধ্বংসে আপনাকে বীরবংশ বলিয়া গর্ব্বের পরিচয় দিতেছে।

ব্রহ্মানন্দের মন্দাকিনী-ধারাপ্লুত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীত অপেক্ষা আজ রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীর' বাঙ্গালী-শ্রবণে অধিক আদরণীয়; দরাফ আলী খাঁর গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে না যাইয়া বাঙ্গালী আজ অধিক আগ্রহে নজরুলের বিদ্রোহের বহ্নিজ্বালায় ঝাঁপ দিতে চাহে।

সর্ব্বস্বত্যাগের পর শতশ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন যদি ইলেকসন্-রণে সেনাপতি-পদ গ্রহণ না করিয়া রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য গ্রামারণ্যে পরিব্রাজনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামের নিশান রাজপথপার্শ্বস্থ প্রাচীরে, পার্কের চত্বরে, হাঁসপাতালের চূড়ায় উড়িত না।

হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ভারতের প্রাচীন পবিত্র তীর্থভূমি-ধৌত মৃত্তিকা আনিয়া জাহ্নবী মাতা সাগর-মুখে যে বঙ্গদেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ জ্বালার উপর জ্বালা সহিয়া আজ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বীরপণা কেবলমাত্র বন্দুকের নলে, তলোয়ারের ফলকে, বিস্ফোরকের ফুৎকারে বা গ্যাসের বিষে মিশাইয়া থাকে না।

বিশ্বপ্রেমের যে অপরাজেয় মহান্ শক্তিতে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, খৃষ্ট ক্রুশের উপর বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন, দীনের দীন নবদ্বীপের নিমাই গণনায়করূপে পতিতকে উন্নত, পতিতাকে পরিশুদ্ধা করিয়া বঙ্গের সমাজমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন, পাশব-বল-দৃপ্ত সভ্যতা ভোগ-বিলাসবিরহিত সেই শক্তিকে প্রলাপোক্তি মাত্র মনে করে।

জার্ম্মাণবাহিনী-বিনাশী বেতনগ্রাহী পুরস্কারপ্রয়াসী পেশী-বলে বলীয়ান্ যখন অসি দুলাইয়া নগরে প্রবেশ করে, তখন ব্রিটন গান ধরে,"See the conquering hero comes" আর যখন উত্তপ্ত যৌবনে পাণ্ডিত্যমণ্ডিত শ্রীসম্পন্ন হইয়াও কামিনীকাঞ্চন-পদগৌরবপরিত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন, তখন আমরা গাহিয়াছিলাম---"সমর-বিজয়ী বীর ঐ প্রবেশে নগরে।"

রাজনৈতিক বা সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান আত্মদানের জন্য অগ্রসর, তাঁহাদের প্রাপ্য গৌরব খর্ব্ব করিবার ইচ্ছা আমার মনে তিলমাত্র নাই; তবে গর্ব্বে আমার বক্ষ আরও অধিক স্ফীত হইয়া উঠে,—যখন দেখি, বৈরাগ্যের বীরত্ব, মানব-প্রেমের মহত্ত্ব, আমার সাধের জন্মভূমি হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, ঐরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বীর এই ব্রিটিশ যুগেও বঙ্গে মাঝে মাঝে জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে।

রাধাগোবিন্দ রায় নামে ঐরূপ এক রাজশ্রী-শোভিত বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ বিরাজ করিতেন দিনাজপুরে। 'দিনাজপুরের রায় সাহেব' বলিয়াই লোক এক সময় তাঁহাকে জানিত। তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্রমাধুরী ও গৃহাশ্রমে ঋষিজনোচিত আচারের অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি কতবার তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইতে যাইবার বাসনা করিয়াছি, কিন্তু একে দিনাজপুর গমনের আমার কখনও কোন উপলক্ষ হয় নাই, তাহার উপর পাছে কেহ আমায় ভিখারী ভাবে, এই কারণে ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইতে আমার মনে আশৈশব একটা আশঙ্কা লুকাইয়া আছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে অকস্মাৎ এক দিন যখন তাঁহার দেহান্তের সংবাদ আমার শ্রবণে প্রবেশ করিল, তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠ কুমারকে এক বেদনা-কাতর পত্র লিখিলাম ও ঐ মহাত্মার উদ্দেশে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম।

জ্যেষ্ঠ কুমার অশেষ-কল্যাণীয় শ্রীমান্ শরদিন্দুনারায়ণ রায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ 'প্রাজ্ঞ' উপাধি-বিভূষিত। উক্ত শোচনীয় ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে দৈবযোগে তাঁহার গঙ্গা-তীরস্থ ত্রিবেণীর বাটীতে আমার এক রাত্রি একসঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। প্রবন্ধটি শেষ হইতে অল্প-মাত্রই অবশিষ্ট ছিল, যিনি আমার মুখে শুনিয়া লিখিয়া লইতেছিলেন, পরদিন শেষ করিবার জন্য তিনি সেই কাগজ-গুলি তাঁহার পকেটেই রাখেন। বন্ধুর বাটীর একটি নব-নিযুক্ত ভৃত্যের ঐ রাত্রেই হস্ত কণ্ডুয়ন-পীড়া উপস্থিত হয়; ভৃত্যটি উচ্চশিক্ষিত নহে, সুতরাং গৃহস্থের সিন্দুক-বাক্সাদিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমার বন্ধুর জামার কাপড়, জুতা আর সামান্য নগদ যাহা ছিল, তাহা লইয়াই স্বদেশ-প্রেমের মত্ততায় দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এ ভৃত্য পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই এক জন ভক্ত ছিল, তাই 'ভক্ত-চরিতের' আখ্যানটি আশীর্ব্বাদী-স্বরূপ তাহার অধিকারে গিয়া পড়ে।

'ভক্ত-জীবনী' নামে একখানি পুস্তিকা হঠাৎ আমার হস্তগত হওয়ায় মহাপুরুষের যথাসাধ্য নাম কীর্ত্তনের বলবতী ইচ্ছা আবার আমার অন্তরে জাগরিত হওয়ায় এই প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

ভক্তজীবনের পুণ্যকথা লোকের চির-পঠনীয়, ইহা পুরাতন হয় না, লৌকিক খ্যাতির কুসুমমালার ন্যায় ইহা বাসি হইয়া যায় না; মহাপুরুষের নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদের ন্যায় নিত্য স্মরণীয়, নিত্য সেবনীয়। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ মানব-চরিত্র কিরূপে গড়িয়া উঠে, তাহাই অনুশীলন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা জীবনচরিত পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্গাব্দ ১২৫৭ বা ইংরাজী ১৮৫০ সালে বঙ্গদেশের ইতি-হাসে একটি নূতন অধ্যায় লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণের মনে তাঁহাদিগের নিজধর্ম্মের প্রতি, অন্ততঃ ঐ ধর্ম্মান্তর্গত ক্রিয়া-পরিচালক পৌরোহিত্য-শক্তির উপর অনেকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। তাঁহারা যেন দেখিতেছেন যে, ভক্তি, নিষ্ঠা, মুক্তি প্রভৃতি জীবনের উচ্চতম ভাবের কথা, প্রয়োগে পরিত্যজ্য অর্থহীন শব্দমাত্রে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-তোষণ-পোষণক্ষম কতকগুলি ক্রিয়ার নাম দাঁড়াইয়াছে ধর্ম্মাচরণ। খৃষ্টান পাদ্রীদিগের বিকৃত ব্যাখ্যার জোয়ারে হিন্দুধর্ম্ম ভাসিয়া যাইত—যদি সেই সময়ের ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি ধর্ম্মপিপাসু লোককে উপ-নিষদের উপকূলে টানিয়া না তুলিত।

নব সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতা হইতে দিনাজপুর তখন বহুদূরে, মধ্যে নানা শঙ্কা-সঙ্কুল দুর্গম পথ; নবীন বাঙ্গালীর মানসিক বিপ্লবের পঙ্কিল প্লাবন তখনও তত দূর পৌঁছে নাই। এই দিনাজপুরই তাঁহার কর্ম্মজীবনের লীলাক্ষেত্র—যাঁহার সম্বন্ধে আমি এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যিনি রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় নামে লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রাম উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ঐ সমাজভুক্ত পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে যে শিশু ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই পরবর্ত্তী কালে দিনাজ-পুরের "রায় সাহেব" বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন।

জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল তিলক-কণ্ঠীতে লক্ষিত হইত না, গৃহাশ্রমেও তিনি বৈরাগ্যবান্ সাধুপুরুষ বলিয়া সকলের সম্মান ও ভক্তি আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন। তাঁহার স্বশ্রেণীভুক্ত দিনাজপুরের কমললোচন রায় মহাশয় ছিলেন দিনাজপুর রাজবংশের অপর শাখা-সম্ভূত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সদাশয় পুরুষ, কিন্তু তিনি সন্তানবিহীন অবস্থায় মনে মনে একান্ত দুঃখিত ছিলেন। জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার শিশু সন্তান উক্ত কমললোচন রায় মহাশয়কে দত্তকরূপে দান করেন।

দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রপালনে অক্ষম হইয়া অথবা অর্থ-লোভের মোহে যেমন কোন কোন পিতা ধনীর ঘরে আপন পুত্রকে ধরিয়া দেন, ঘোষ মহাশয় ধনবান্ না হইলেও পুত্র-পালনের উপযুক্ত স্বাচ্ছল্য তাঁহার সংসারে যথেষ্ট ছিল এবং পোষ্যভাবে তিনি আপন সন্তান বিলাইয়া দেন নাই, পুত্র-হীনকে পুত্র দান করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রের বিধানানুসারে সঙ্গে সঙ্গে একখানি সুবর্ণ-মোহরও গ্রহীতার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে যেমন কর্ম্মবীরের প্রয়োজন—তেমনই ধর্ম্ম-বীরেরও প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মের সত্তাই ধর্ম্ম। জগদীশ্বর রায় সাহেবকে সংসারে ধর্ম্মবীরের কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন

বলিয়াই তাঁহার জীবন-সঞ্চারের সময় হইতেই সুব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে ও তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর গর্ভে তিনি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রবাহিত হইবে যে ধারায়, জগচ্চন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা তাহার অনুকূল নহে। এ দিকে অপুত্রক ধনেশ্বর কমললোচন রায় মহাশয় তাঁহার প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠিত দেবসেবার ভার কাহার হস্তে দিয়া যাইবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল। অনায়াসলভ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ধনিসন্তান, বিশেষতঃ পোষ্যপুত্রগণ অধিকাংশ স্থলে চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। জগচ্চন্দ্রের মনে কমললোচন রায়কে পুত্রদানের প্রবৃত্তি দিয়া ঈশ্বর রাধাগোবিন্দকে তাঁহার সাধনার উপযুক্ত আসনে বসাইয়া দিলেন। কমলা দেবীর শ্রীচরণতলে বসিয়া ভোগ-বিলাসবিরহিত নির্লিপ্ত শক্তির বলে দীনের দুঃখবারণরূপ মহাসাধনায় নশ্বর মানব-জীবন তাঁহাকে যাপন করিতে হইবে, এই বিধাতার ইচ্ছা। নবলব্ধ বালককে পালক পিতা সত্যসত্যই অপত্যস্নেহের কোমলদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হইল; বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তিনি তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে কিঞ্চিৎ পার্শী ও ইংরাজী ভাষাও আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু টাকার পুঁটলী-বাঁধা বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য তিনি এ পৃথিবীতে আসেন নাই; অবিদ্যার মোহ দূর করিয়া যাঁহাকে পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পাশমুক্ত ও অনধীন হওয়া একান্ত আবশ্যক। বালকের যখন বয়স ১৫ বৎসর মাত্র, এই সময়ে ভগবান্ পিতা কমললোচনকে স্ববাসে আহ্বান করিয়া লইলেন।

ভাণ্ডারে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্যযুক্ত দেহে শান্ত সৌন্দর্য্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রলোভনের প্রাচুর্য্য অথচ শাসনের আসনে কোন অভিভাবক নাই, এই সঙ্কটসময়ে কিশোর কুমার বংশপরম্পরাগত প্রাচীন রায় সাহেব উপাধি-ভূষিত হইয়া নবীন যৌবনের পুষ্পতোরণসম্মুখে উপস্থিত। দেহাত্মবোধ-মুগ্ধ মানব-মন এ সময়ে এ অবস্থায় মহতী শক্তির সাহায্য ভিন্ন কখনই অবিচলিত থাকিতে পারে না এবং সেই শক্তির জন্মজন্মান্তরের সাধনাসম্ভূত একনিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণতা ভিন্ন 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞাদির' কোনরূপ আড়ম্বরই সঞ্চারিত হইতে পারে না।

জমীদারী সেরেস্তা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন যে, কর্ম্মচারিগণ আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই কিরূপে প্রজানির্য্যাতনে প্রভুর নাম কলঙ্কিত ও নিত্য মকর্দ্দমার ধুমধামে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর এমন এক নূতন শাসন-নীতির প্রয়োগ করিলেন যে, তাহারা একেবারে প্রভুর মঙ্গল-কামনার চরণতলে দাসখত লিখিয়া দিল।

স্থলবিশেষে দুরাচারী দুষ্টের দমন ধর্ম্মরাজ্যের পরিচালনেও প্রয়োজনীয় বিধি, অবতার পুরুষগণের জীবনী শ্রবণে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াও, তিনি প্রভুপদে আরোহণের পর হইতেই দুষ্কর্ম্মার দলন অপেক্ষা দুষ্কৃতির কারণ দূরীকরণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পিনাল্ কোড্ প্রণয়ন-কালে মেকলে ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, যতই কেন কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হউক না, শাসনদণ্ডের আঘাত যতই প্রচণ্ড হউক, সমাজে যত দিন অভাব-দারিদ্র্যাদির পীড়ন থাকিবে,চৌর্য্যাদি অপরাধ তত দিন বন্ধ হইবে না। সেরেস্তার কর্ম্মচারীদিগের বেতননির্দ্ধারণে রায় সাহেব উঁহাদিগের দক্ষতা ও কার্য্যের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া লইতেন, কাহার সংসারে কতগুলি অবশ্য-পোষ্য, এবং অনুসন্ধানে যদি বুঝিতেন, নির্দ্ধারিত বেতনে তাঁহার পরিবার-প্রতিপালন অসম্ভব, তখনই মাসহারা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত শত অপরাধে আপনাকে অপরাধী জানিয়া তিনি সতত আশাপূর্ণ প্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শান্তিলাভ করিতেন এবং বেত্র অপেক্ষা কৃপার নেত্রে ঐশিক মহিমা সমধিক সমুজ্জ্বল শক্তিমান্ বুঝিয়া কর্ম্মচারীদিগের গুরু অপরাধও ক্ষমা করিতেন। বৈষয়িক হিসাবে ইহাতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত; উপযুক্ত পুত্র ও হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের অনুযোগ সহ্য করিয়াও তিনি প্রকৃতিগত ক্ষমাবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

কর্ম্মচারিবৃন্দের আনন্দপ্রদ, উকীল-কুল প্রতিপালন-কুশল বাকী খাজনার নালিশ জমীদারী কার্য্যে একটি ঐশ্বর্য্য-প্রচারক বিজ্ঞাপন; কিন্তু রায় সাহেবের জমীদার নাম আদালতের নথীতে কদাচিৎ কখনও মাত্র লিপিবদ্ধ হইত। দরিদ্র, নিরক্ষর মোক্তার-মুহুরীর চাতুরী-জালজড়িত প্রজাও

মানব এবং মানব-মন যতই অন্ধকারাবৃত হউক না—কোন না কোনো কোণে দেবদীপের ম্লান শিখাও একটু প্রজ্বলিত থাকে; সুতরাং ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অতি দুষ্টকেও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া ফেলে। আট দশ বৎসরের বাকী খাজনা পড়িয়া থাকিলেও জমীদার নালিশে নির্য্যাতনে আদায় করিবার চেষ্টা করে না দেখিয়া রায় সাহেবের প্রজাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দ্বারে আসিয়া বাকী খাজনা পরিশোধ করিয়া যাইত।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, আমার প্রজারা বড় ভাল। তাহারা আমাকে পিতার ন্যায় ভালবাসে; এই ভালবাসার সাধনে তাঁহার বিবিধ জমীদারীর প্রজা এত বশে আসিয়াছিল যে, পাছে রায় সাহেব দুঃখিত হন, এই ভয়ে প্রজাগণ সততই সদাচারী হইবার প্রয়াস পাইত। প্রেমের শাসন—বড় শাসন; সে শাসন রৌদ্রের দারুন-শক্তিতে নাই, চূণের গুদামে নাই, জরীমানায় নাই, জেলখানায় নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়াও যদি কেহ রায় সাহেবকে বিষয়বুদ্ধিহীন কৃষ্ণনাম-রোগগ্রস্ত মূঢ় বলিতে চাও—বল।

আমাদের হিন্দু রাজগণ জানিতেন, রাজ্য ঈশ্বরের, তিনি তাহার চরণাশ্রিত কর্ম্মচারী মাত্র। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজগণ নিজে গদীতে বসেন না, গদীর পার্শ্বে উপবেশন করেন। এই জন্যই অদ্যাপি উদয়পুরের রাণার উপাধি "একলিঙ্গকা দেওয়ান;" জয়পুরের রাজার উপাধি "গোবিন্দজীকি কামদার।"

রায় সাহেব জানিতেন, তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি গৃহপ্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ জীউর, কিয়ৎকালের জন্য মাত্র তিনি তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত। রাধাগোবিন্দ জীউর অপর নাম দীনবন্ধু, সেই বন্ধুর সম্পত্তির অংশ দীনমাত্রেরই প্রাপ্য, সেই জন্য তিনি দয়াপরবশে দান করিতেন না; যাচক দ্বারে উপস্থিত হইলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য লইতে আসিয়াছে এবং এ আবেদন অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবিগণ সদাই অভাবগ্রস্ত, এ সত্য তিনি বিদিত ছিলেন, তাই অযাচিতভাবেও সময়ে সময়ে বিদ্যারণ্যচারিগণ তাঁহার নিকট আশাধিক সাহায্য মর্য্যাদা-সহ প্রাপ্ত হইতেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর অঞ্চলে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার অন্নপূর্ণার মন্দিরদ্বার দিবারাত্র উন্মুক্ত থাকিয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র নিরন্ন নরনারী, প্রাচীন, শিশুকে ভোজনানন্দ দান করিয়াছে, তাঁহার দানে মুগ্ধ হইয়া সেই সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন; কিন্তু তিনি কখনই এ উপাধি ব্যবহার করেন নাই, কুলাগত 'রায় সাহেব' নামেই লোক তাঁহাকে সম্বোধন করিত, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না।

হিন্দুমাত্রেই জনকঋষির নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। জনকঋষির ভাব এখনও ভারতের বক্ষ হইতে অপসৃত হয় নাই; লোকচক্ষুর গোচরে বা অগোচরে এই বঙ্গের যজ্ঞ-প্রাঙ্গণে এখনও জনকঋষি কোথাও কোথাও বিদ্যমান আছেন, সেই জনকঋষি দিনাজপুরে রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়ের দেহমধ্যে সাতাত্তর বৎসরকাল হোমগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া বিদ্যমান ছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটীতে, কৌন্সিলে বা ঐরূপ সভা-সমিতিতে রায় সাহেবের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল না; তাঁহার কার্য্যের প্রসার ছিল শ্রীকৃষ্ণের সংসারে, দীনের আশ্রমে। নিজ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে বর্ত্তমানে লোক দেশসেবা বলে, সে কার্য্যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেন নাই বটে, কিন্তু বহু গৃহতাড়িত নিপীড়িত দেশসেবকের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে তিনি উপবাস-ক্লেশ-মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়-কপাট উদ্ঘাটনের 'সিসেমমন্ত্র' ছিল 'অভাব'। শেষ বয়সে তাঁহার বহিশ্চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিশক্তি সমধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, সংসারী লোকের উচিত—দুই একটি সন্তান হইবার পরই ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় পতি-পত্নীতে সংসারে পৃথক্‌ভাবে বাস করা।

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ নিজ জীবনে এই মহান্ ভাবের সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন; দুইটি পুত্র হইবার পরই ২৭ বৎসরমাত্র বয়সে তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেন; সেই সময় হইতেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেন নাই।

মাৎসর্য্য তাঁহার সম্মুখে আসিতেই সাহস করিত না; শত-পরিজন-পরিবৃত হইয়াও তিনি শ্রান্ত অতিথিকে আদরে আসনে বসাইয়া ব্যজনকার্য্য নিজে নির্ব্বাহ করিতেন।

সেবাই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম, সেবাই ছিল তাঁহার কর্ম্ম, সেবাতেই তাঁহার দীনতা, সেবাতেই তাঁহার তেজোগৌরব। সেবার প্রেরণাতেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশসেবক লালমোহন ঘোষ তাঁহারই দিনাজপুরের বাটীতে দাঁড়াইয়া বহু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বর্জ্জননীতির প্রথম ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। দেশসেবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষী তাঁহার বাটীতে সম্মান্য অতিথিরূপে আদৃত হইয়াছেন।

একটা আদালতের পেয়াদা হইয়া সামান্য ব্যক্তি কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, আর যিনি আপনাকে ভগবানের স্বগণ ও সেবক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, ভয় কি তাঁহার হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইতে সাহস করে?

দিনাজপুরকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়া এই ঈশ্বরপরায়ণ দয়ার্দ্রহৃদয় দানবীর গত ১৩৩৩ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ দিবসে দেহরক্ষা করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

তাঁহার দুই কুমার সুবিদ্বান্, সৎকর্ম্মপন্থী ও পিতৃচরণানুগমনলোলুপ। আশা করি, যে রাধাগোবিন্দ নামের বলে তাঁহাদের পিতা এই সংসার-রণে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই ঐশ বল ইঁহাদিগেরও জীবন স্বাস্থ্যসুখপূর্ণ দীর্ঘ দিনে পরিণত ও দয়াধর্ম্মের আলোকে উদ্দীপ্ত করুন।

অমৃতলাল বসু।

নারীর অধিকার

পুরুষে পৌরুষ দিয়া সৃজিলেন বিধি,
গড়িলা আরেক ছাঁচে রমণীর হৃদি।
পুরুষ জীবন-রণে শোণিতাক্ত-দেহে
জুড়াইতে আসে শেষে রমণীর স্নেহে।

শক্তিরূপা যার হাতে সৃজন-প্রলয়,
পুরুষের ক্রীড়নক সে কি কভু হয়?
নিভৃত আলয়ে নারী শান্তি-দীপ জ্বালি,
মাতারূপে পত্নীরূপে স্নেহ-ধারা ঢালি,

জুড়ায় তাপিত প্রাণ প্রসন্ন অন্তরে—
সকল দুঃখের অংশ লয় স্নেহভরে।
কণামাত্র ক্ষোভ তার নাহি জাগে চিতে,
নিঃস্ব করি আপনারে দেয় বিশ্বহিতে।

বিশাল এ কর্ম্মভূমি আছে কায কত
বাছিয়া লইবে নারী তাহার যে ব্রত;
রমণী মায়ের জাতি থাক চিরদিন
মাতা হয়ে আপনার মাতৃত্বে বিলীন।

স্বাধীনতা নামে যদি স্বাতন্ত্র্য তাহার
হয় লুপ্ত, ক্ষুণ্ণ হবে তার অধিকার।
পুরুষের বাহুবলে নারী-মনোবল
না মিশিলে এ সংসার হইত অচল।

গুছাতে পরের ঘর নিজে নিঃস্ব হয়
ঘুচাতে পরের দুঃখ নিজে হয় ক্ষয়,
পশুরে মানুষ করে মানুষে দেবতা,
এ যদি অধীন? ধন্য সেই অধীনতা।

নারীর নারীত্ব এ যে জন্ম-অধিকার,
বিধির বিধান ভাঙ্গে হেন সাধ্য কার?
নারী ফোটে ধৈর্য্য ত্যাগ ক্ষমার মাঝারে,
স্নেহ প্রেম সেবা দয়া ফুটায় তাহারে।

পুরুষের সাথে যদি সম অধিকার
চায় নারী, হারাইবে প্রকৃতি তাহার।

শ্রীসরোজবাসিনী ব?
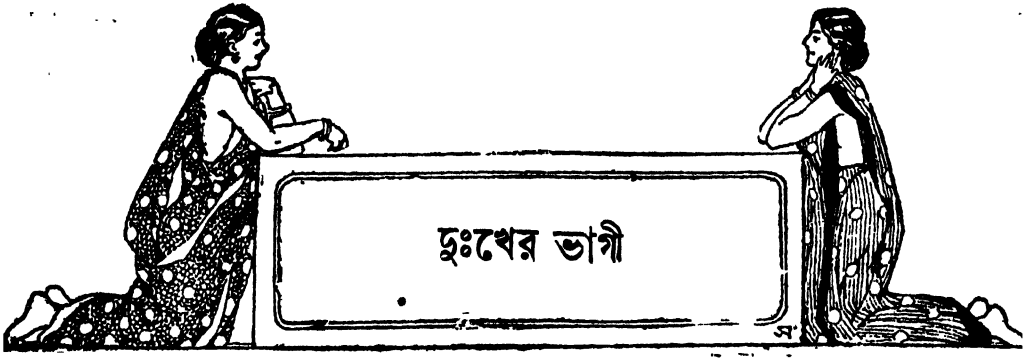
এক

অন্ধ, আতুর, কাণা-খোঁড়ার আজ বিরাট সম্মিলন। স্তন্যপায়ী শিশুকে লইয়া ভিখারিণী জননী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে। মা'র শীর্ণ দেহের রক্তটুকু সন্তান শুষিয়া লইতেছে। খোঁড়া দাঁড়াইয়া আছে (ক্রাচের) উপর ভর দিয়া, অন্ধের অবলম্বন তাহার হাতের ময়লা-মাখান যষ্টি।

সত্যই যাহারা দয়ার পাত্র, বলবান্ ভিক্ষুকদের ধাক্কা খাইয়া ভিক্ষা-যুদ্ধেও তাহারা পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে যত কোকেনখোর, গাঁজাখোর, মাতাল ও লম্পট ছিল, ভিক্ষুকের দলটাকে তাহারা অসম্ভবরূপে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষিতীশ-রঙ্গালয়ে আজ জমীদার পঞ্চাননবাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভিখারী-বিদায় হইবে। ফটকের সম্মুখে মোটা বাশ দিয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে। সেই বেড়ার ফাঁক দিয়া এক সময় একটির বেশী লোক প্রবেশ করা অসম্ভব। বেড়ার দুই ধারে দুই জন ভীমকায় দরোয়ান ভিক্ষুকদের স্বচ্ছন্দ-প্রবেশে বাধা জন্মাইয়া মানুষের কর্ত্তৃত্ব করার জন্মগত ইচ্ছাটাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে গোলমালটা আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল।

বলশালী ভিক্ষুকরা আতুরদিগকে পশ্চাতে ও পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া দরজার সম্মুখটা দখল করিয়া আছে। প্রবেশ-পথে তাহারাই প্রথম যাত্রী। এখানেও তাহারা জাতিভেদ ভুলিতে পারে নাই; কেহ কেহ দড়ির মত মোটা, ময়লা পৈতা দেখাইয়া চীৎকার করিতেছে—"বামুনকে আগে যেতে দাও—বামুনকে আগে যেতে দাও।" এক জন ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বামুনের গায়ে পা লাগালি বেটা শূদ্দুর; গোল্লায় যাবি।"

আর এক জন পশ্চাৎ হইতে বলিল—"বামনাই ফলাতে এসেছে! ভিখারীর আবার জাত কি? সবাই আমরা এক জাত।" চোখ লাল করিয়া ব্রাহ্মণটি পশ্চাতে তাকাইল; কিন্তু অপরাধীকে দেখিতে পাইল না।

কাণা, খোঁড়া প্রভৃতি দয়ার পাত্রগুলি দরজা হইতে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভিড় ঠেলিয়া যাইবার তাহাদের শক্তি নাই। পশ্চাৎ হইতে কেহ কেহ সম্মুখের ভিক্ষুকদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল—"এখানেও মারামারি, ধাক্কাধাক্কি। এমনই স্বভাব না হ'লে আর ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়?"

জীবন-সংগ্রামে যাহারা ব্যর্থ—যাহারা দুর্ব্বল, উচিত অনুচিতের মাপকাঠি তাহাদের এমন সূক্ষ্মই হইয়া থাকে। আবার দুঃখের সীমা পার হইলে তাহারাই ন্যায় অন্যায়ের নিয়মগুলিকে সর্ব্বাগ্রে ভুলিয়া যায়।

এক একটি করিয়া ভিক্ষুক প্রবেশ করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুগুলির মধ্যে কেহ কাঁদিয়া উঠিল, কেহ ঘুমাইয়া পড়িল, কেহ বা ধমক খাইয়া চুপ করিল। সকলেই ভিক্ষুক হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, কাহারও কাহারও সুদিনও ছিল। কষ্টটা তাহাদেরই বুকে বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। ধৈর্য্যও সকল মানুষের সমান নহে, তাই কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া চলিয়াও গিয়াছিল। তবে দানের পরিমাণ বেশী শুনিয়া খুব কম লোকই সে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল।

দয়াল রাস্তার অপর পারে ফুটপাথের উপর একটি গ্যাস-পোষ্টে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখে সে কিছু দেখিতে পায় না, বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। ভিড়ের জন্য সাহস করিয়া এক পা নড়ে নাই, কোনও ভিক্ষুককে রাস্তা পার করিয়া দিবার জন্য বলিতেও পারে নাই। সেখানে ভিড়ের পরিমাণ অনেকটা কম; গ্যাসপোষ্ট অবলম্বন করিয়া কোনও মতে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

আন্দাজ রাত্রি ৯টায় ভিড় অনেকটা কমিলে এক জন ভদ্রলোকের সাহায্যে দয়াল রাস্তাটা পার হইল। হাঁটুতে ও বুকে বাঁশের গুঁতা খাইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে যখন সে থিয়েটার-হলে কোনমতে প্রবেশ করিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া আসিয়াছে, পিপাসায় জিহ্বার শিরাগুলি সঙ্কুচিত হইতেছে। সে জিহ্বার সাহায্যে দুই কস সিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে জানিত, পিপাসায় মরিয়া গেলেও এখানে কেহ তাহাকে এক ফোঁটা জল দিবে না। ধনৈশ্বর্য্যের গরিমা, মহিমা দেখাইবার জন্য যাহারা দান করে, ভিখারীর পিপাসার কথা ভাবিয়া তাহার ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দয়াল অতিকষ্টে ঘরের এক কোণে বসিল। দুই এক জন সহানুভূতিহীন ভিক্ষুক তাহাকে বিপথে চালিত করিয়া, বৃথা কষ্ট দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। এতগুলি লোকের উষ্ণনিশ্বাসে, বিড়ির ধোঁয়ায়, পাণের পিক ও নিষ্ঠীবনে, বিশেষতঃ তাহাদের গালাগালি ও কদর্য্য বিশ্রম্ভালাপে সমগ্র রঙ্গালয়-গৃহটি মূর্ত্ত নরককুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

দরজাগুলি সব বন্ধ। উপরের খোলা জানালা দিয়া যে পরিমাণ বাতাস আসিতেছিল, তাহা এতগুলি লোকের পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। কেবল দুই পাশের দুইটি দরজায় ভিক্ষুক-বিদায় হইতেছিল। সেখানেও জোয়ান ভিক্ষুকের ঠেলাঠেলি—দরোয়ানের আস্ফালন।

ভিক্ষুক-বিদায়ের পালা শেষ হইতে রাত বেশী হইয়া গেল। অনেক শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরিণতবয়স্কের মধ্যেও ক্লান্ত ও দুর্ব্বল ভিক্ষুকরা ঝিমাইতেছিল। দাতার কর্ম্মচারীরা তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা।

দয়ালও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ক্লান্ত ব্যক্তির গাঢ় নিদ্রা হয় না। ঘুমের ঘোরে তাহার মনে হইতেছিল যে, জন্ম-জন্মান্তরেও সে ভিক্ষুক ছিল। সে বড় অসহায়। তাহার সম-শ্রেণীর মধ্যেও সকলের পশ্চাতে তাহার আসন ছিল। সে এমনই ভাগ্যহীন যে, ভিক্ষুকদের দয়ার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইত।

দুই

দয়ালের ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া গেল, রাত্রি তখন প্রভাত-প্রায়। জনমানবের সাড়া নাই। দুই একটা ইঁদুর মেঝের উপর দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। ভিক্ষুকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ছিল। ভুক্তাবশেষ উচ্ছিষ্ট লইয়া ইন্দুরদিগের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছিল।

রাত্রি-শেষের শীতল বাতাসে দয়ালের শীত-বোধ হইল; কিন্তু গায়ে দেওয়ার কিছু ছিল না। অনুভবশক্তির দ্বারা সে বুঝিল, বিরাট্ হল-ঘরে সে একা রহিয়াছে। তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহাকে সকলে ফেলিয়া গিয়াছে! চক্ষু নাই বলিয়াই তাহার এত দুর্গতি, এমন কষ্ট! সারাদিন ও রাত্রি সে কিছু খায় নাই। প্রভাতে তিনটি পয়সা ভিক্ষা জুটিয়াছিল। সে তাহা এক জন চলচ্ছক্তিহীন কুষ্ঠরোগীকে দিয়াছে। এখন ক্ষুধায় তাহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

* * *

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর লাঠি দিয়া চারিদিকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা, দরজার কাছে যাইয়া জোরে ডাকিবে। লাঠিখানা ঠন্ করিয়া একটা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির গায়ে ঠেকিল। এই মূর্ত্তির পশ্চাতে কোন রকমে কাত হইয়াছিল বলিয়া দাতার লোকরা তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

একটু অগ্রসর হইতেই একটা হোঁচট্ খাইয়া দয়াল মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার মাথা সিমেণ্টের তৈয়ারী একটি বেঞ্চের প্রান্তে আহত হইল। মাথা ফাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে দয়াল প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল, "কে আছ, আমায় রক্ষা কর। আমায় বাঁচাও।"

তাহার সে আর্ত্তনাদ কাহারও কাণে পৌঁছিল না। থিয়েটারের পরিশ্রান্ত দরোয়ানরা তাহাদের ঘরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তাহার ক্ষুধাখিন্ন কাতর কণ্ঠস্বর দেওয়ালের গায় প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন অসহায় অন্ধকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহার পিপাসা তখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আহত অন্ধের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। ডাকিবার শক্তি লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি অবশ হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়ের

অনুভূতি ভিতরে ভিতরে সজাগ থাকিলেও বাহ্যজগতের সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; সে সবই বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু কোন অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় সে মেঝের উপর পড়িয়া রহিল।

তিন

যখন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন কাচের ভিতর দিয়া দয়ালের গায়ে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দয়াল বুঝিল যে, বেলা অনেক হইয়াছে। রৌদ্রের তাপে বোধ হয় সে অনেকক্ষণ দগ্ধ হইয়াছিল। তাহার মনে হইল যে, শরীরের মধ্যে যেন পিঁপড়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। সে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা ঘুরিয়া যাওয়ায় দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে সে আবার বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ তাহার কাণে করুণ ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। যেন ঘরের মধ্যেই কেহ কাঁদিতেছে। গলার স্বর শিশুর কণ্ঠ-ধ্বনির মত কোমল। দয়ালের মনে হইল, তবে ত সে একা বন্ধ হইয়া পড়িয়া নাই! তাহারই মত অথবা তাহার অপেক্ষাও বেশী অসহায় আরও এক জনের গত রাত্রি কাটিয়াছে।

দয়াল ডাকিল, "কাঁদছ কে?" ক্রন্দনধ্বনি বন্ধ হইল। বৃদ্ধের কর্কশ কণ্ঠরব শুনিয়া শিশুটি বোধ হয় ভয় পাইয়াছিল। দয়াল তাই আর ডাকিল না। তাহারই মত আর এক জনের বিরক্তি বা ভয়ের কারণ হইতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল।

* * *

শিশুটি আবার কাঁদিয়া উঠিল। কান্নার স্বর চাপিবার চেষ্টা করার ফলে তাহার গলা দিয়া 'হিক্‌' 'হিক্‌' শব্দ বাহির হইতে লাগিল। দয়াল এবার ডাকিল না। ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, বসা অবস্থায় ঘষিতে ঘষিতে শিশুটির দিকে অগ্রসর হইল। তাহার হাত শিশুর দেহে লাগায় সে ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশুর শরীরে স্নেহ-মাখান হাত বুলাইতে বুলাইতে দয়াল বলিল, "ভয় নাই, কেঁদ না।" অনুমানে দয়াল বুঝিয়াছিল যে, শিশুটি ছয় সাত বৎসরের একটি বালিকা।

বালিকাটির কান্না বন্ধ হইল। দয়াল নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহাকে আদর করিতে লাগিল। এই আদরের স্পর্শে বালিকার মনে বোধ হয় একটু সাহস হইল। সে বলিল, "কিছু খেতে দাও, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" দয়াল বলিল, "নিশ্চয়ই দোবো দিদি,—আচ্ছা, তোমার নামটি কি ভাই?" বালিকা উত্তর করিল, "ফুলরাণী"। দয়াল হাসিয়া বলিল—"হ্যা ভাই ফুলরাণী, তুমি বুঝি খুব লক্ষী মেয়ে?" ফুলরাণী বলিল, "হ্যাঁ"।

দয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "আর খুব সুন্দর?" ফুলরাণী কোনও উত্তর করিল না। দয়াল বলিল, "হ্যাঁ ভাই ফুলরাণী, তুমি একটা কায করতে পারবে?" ফুলরাণী বলিল, "পারব।" দয়াল বলিল, "আমার হাতখানা ধর দেখি, ভাই!"

ফুলরাণী বলিল, "কোথায় তোমার হাত?" দয়াল হাত বাড়াইয়া বলিল—"এই যে।"

ফুলরাণী বলিল, "কৈ?" দয়াল বলিল, "কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?" ফুলরাণী বলিল, "না, আমার চোখ নেই।" উত্তর শুনিয়া দয়াল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুমিও তা হ'লে আমার মত অন্ধ।" ফুলরাণী কোনও উত্তর করিল না। দয়াল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

দয়াল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে এলে এখানে?" মেয়েটি বলিল, "ভণ্ডুলের সঙ্গে মা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

দয়াল জিজ্ঞাসা করিল—"ভণ্ডুল কে?"

ফুলরাণী বলিল, "ভণ্ডুলদা', ভণ্ডুলের মা'র ছেলে।"

দয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কোথায়?"

ফুলরাণী বলিল, "শুয়ে থাকে। উঠ্‌তে পারে না।"

দয়াল জিজ্ঞাসা করিল—"আর বাবা?"

ফুলরাণী বলিল,—"বাবা বাড়ীতে আসে না।"

দয়াল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভণ্ডুল তোমায় ফেলে গেল বুঝি?"

ফুলরাণী বলিল,—"সে ত বাইরে থেকে চ'লে গেছে।"

দয়াল বলিল,—"আর তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়লে?"

ফুলরাণী বলিল,—"হ্যাঁ।"

দয়াল তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল,—"চল, তোমায় খাবার দিচ্ছি।"

ফুলরাণী হাত পাতিয়া খাবার চাহিল। দয়াল বলিল,—"এখুনি পাবে।" তার পর তাহাকে কোলে তুলিয়া লাঠি দিয়া অনুভব করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

তাহার পায় কি একটা ঠেকিল। সেটাকে হাতে তুলিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টিপিয়া সে বুঝিল যে একখানা নিকেলের সিকি। দয়াল বলিল,—"পয়সা পেয়েছি ভাই খাবার কিন্‌বার।" খুকীটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটা দরজার কাছে যাইয়া লাঠি দিয়া দরজার উপর আঘাত করিতে করিতে দয়াল চীৎকার করিল, "দরজা খুলে দাও। কে আছ, দরজা খোল।"

ফুলরাণীও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল, "দরজা খোল। দরজা খোল।"

কিন্তু কেহ দরজা খুলিল না। থিয়েটারের দরোয়ান পঞ্চাননবাবুর বাড়ী বখশিস্ লইতে গিয়াছিল। রাস্তার দিকের ফটকও বন্ধ ছিল। যে দরজা হইতে তাহারা ডাকিতেছিল, রাস্তা হইতে তাহা কিছু দূরে। তাই কাহারও কাণে তাহাদের ব্যাকুল আহ্বান-ধ্বনি পৌঁছিল না।

কোনও উত্তর না পাইয়া দয়াল আরও জোরে দরজার গায় আঘাত করিতে লাগিল। ফুলরাণীরও গলার স্বর ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। বুভুক্ষা তাহাদের স্নায়ুতে বল-সঞ্চার করিতেছিল। বিফলতার বোঝা আরও বেশী ভারী করিবার জন্য দরিদ্রের শক্তি মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া উঠে। দয়াল ও ফুলরাণীরও ঠিক তাহাই হইল। দয়াল খুব জোরে দরজার উপর ঘা মারিতেছিল। ঝন্ ঝন্ করিয়া বাহিরের তালা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার শক্তি বজায় থাকিলে সে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত।

দরজা ভাঙ্গিল না। অন্ধ দুই জনের ডাকে বাহির হইতে কেহ সাড়া দিল না।

ফুলরাণী এবার কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াল নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে তখন ক্ষুৎপিপাসাকাতর বালিকার দুঃখের কথা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। গত কল্য দ্বিপ্রহরে বালিকার এক মুঠা জুটিয়াছিল কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হয় নাই। পিতৃ-পরিত্যক্তা সহায়হীনা অন্ধ বালিকার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। দুঃখিনীর মাতাও বাতব্যাধিগ্রস্তা, শয্যালীনা। মেয়েটির কান্না শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে দয়াল বলিতে লাগিল, "কাঁদিস নে, দিদি, কাঁদিস্ নে।"

সহানুভূতিতে তাহার হৃদয়ের বেদনা জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। মেয়েটির দুঃখ তাহার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফুলরাণীকে শান্ত করিবার ভাষা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল,—"কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া ফুলরাণী দয়ালের বুকে ঢলিয়া পড়িল। দয়াল অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল। স্নেহকোমল হস্তে তাহার কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলী-চালনা করিতে লাগিল। বালিকার কোমল ক্ষুদ্র অঙ্গুলীগুলি সে ধীরে ধীরে টিপিয়া দিল।

পাছে ফুলরাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে দয়াল দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে লাগিল। গায়ের উপরের মশা তাড়াইবার জন্যও সে হাত নাড়িল না।

ফুলরাণী ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া আপন মনে দয়াল বলিতেছিল,—"না—না।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল। ক্ষুধার তাড়নায়, তৃষ্ণার পীড়নে, ফুলরাণীর দুঃখে দয়ালের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহারও দেহ প্রাচীরগাত্রে এলাইয়া পড়িল।

থিয়েটারের সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া তখন কলি-কাতার জনপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। পঞ্চাননবাবুর বাটীর উচ্ছিষ্ট খাদ্যসম্ভারে পথের 'ডাষ্টবিন্' বোঝাই হইয়া ফুট-পাথ ও রাস্তার খানিকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (বি, এ,)

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।'

'এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের অর্থ, মহাভারতের অর্থের নিশ্চয়কারক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমস্ত বেদার্থে পরিবর্দ্ধিত, সমুদায় পুরাণমধ্যে সামবেদ তুল্য, সাক্ষাৎ ভগবৎকর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত, শত-বিচ্ছেদসংযুক্ত ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট।'

পরম দার্শনিক শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ষট্‌সন্দর্ভ-নামধেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন, এই যে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র-সমূহের অর্থ বলা হইল, ইহাতে বুঝিতে হইবে, শ্রীমদ্‌ভাগবতই বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত। 'পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্। পশ্চাদ্ বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতরূপমিতি।' যাহা পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে মনোমধ্যে আভির্ভূত হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার সংক্ষেপে সূত্ররূপে প্রকটিত হয়, পশ্চাৎ তাহাই আবার বিস্তীর্ণরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপে আভির্ভূত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন, এই নিমিত্তই বেদান্তের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতের মতই অপরাপর ভাষ্য অপেক্ষা আদরণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে কলিযুগে সকল লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতেই সম্প্রতি এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণরূপী সূর্য্যের উদয় হয়। সূর্য্যের যেরূপ বস্তু-প্রকাশনের ক্ষমতা রহিয়াছে, এই শাস্ত্রের দ্বারাও তদ্রূপ তত্ত্ব-বিনির্ণয় হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুকদেবের কৃপালুতা-জ্ঞাপন পুরঃসর সূত বলিতেছেন, 'যঃ স্বানুভাবমখিল-শ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্' ইত্যাদি। এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতকে চারিটি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত স্বানুভাব অর্থাৎ ইহার অসাধারণ প্রভাব, অখিল শ্রুতির সার, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় বা অনুপম, এবং অধ্যাত্মদীপ বা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশক। বাস্তবিক এই কথাগুলির দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতভাবে খ্যাপন করা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত এবম্প্রকার অধ্যাত্মদীপ বলিয়াই ইহা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম বা স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য। ইহা একাধারে ভক্তিরসের মাধুর্য্যে ও দার্শনিক তত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে পরিপ্লুত।

বেদের অন্ত বা অবসানভাগ বলিয়া উপনিষৎ-সমূহের নাম বেদান্ত, এবং তৎসমুদায়ের অর্থজ্ঞাপক বলিয়া ব্রহ্মসূত্রের অন্ত নাম বেদান্তদর্শন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা যায়, সাক্ষাৎ উপনিষৎ-সমূহই যেন এই গ্রন্থরূপে আভির্ভূত হইয়াছে। অনেক স্থলে উপনিষৎ-সমূহের বাক্যাবলী প্রায় অপরিবর্ত্তিতভাবেই রহিয়াছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হইলে হৃদয়-গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম-সমূহের ক্ষয় হয় :—'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই শ্লোকটি রহিয়াছে, কেবল শেষ পাদ পরিবর্ত্তিত,'দৃষ্ট এবাত্মনী-শ্বরে', অন্যত্র 'ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি', 'ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর' এই কথা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বলা হইতেছে :—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 'যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ।' • আবার, সেই পরব্রহ্মের ভয়েই বায়ু-সূর্য্য আদি সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। উপনিষৎ কহিতেছেন, 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 'যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ' ইত্যাদি। এবম্প্রকারে পরিদৃষ্ট হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই বেদান্তবাক্যের প্রতিধ্বনি, এবং এই কারণেই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকৃতপক্ষে 'পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্' অর্থাৎ বেদসমূহের তুল্য পুরাণ।

এক্ষণে দেখা যাউক, বেদান্তদর্শনের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের কীদৃশ তুলনা করা হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বেদান্তের চারিটি অধ্যায়; প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ রহিয়াছে। প্রথমাধ্যায়ে উপনিষদ্-বাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরোধ, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন, এবং চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরিবর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের প্রারম্ভে ভগবান্ বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে কহিতেছেন, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম,—'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' এ দিকে দেখা যাইতেছে, বেদান্তের এই সূত্রটি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে :—'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদি'ত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে, বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। শ্রীমদ্‌ভাগবতের

সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় স্কন্ধের দশমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, যাঁহা হইতে সৃষ্টি, লয় ও প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, তিনিই পরংব্রহ্ম পরমাত্মা। অন্যত্র, চতুর্থ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে, 'স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ। তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ।' ইত্যাদি। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইতেছে, যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া থাকেন; তাহাকে বেদান্তিগণ ব্রহ্ম বলেন, যোগিগণ পরমাত্মা বলেন, ভক্তগণ ভগবান্ বলেন। কেমন সুন্দর মীমাংসা! শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে এই শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছেন।

বেদান্তের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিরুদ্ধ মত-সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের অযৌক্তিকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যে যে কথিত হইয়াছে, অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও জগৎকর্ত্তা, বৈদান্তিকগণ বলিতেছেন, ইহাই হইল অযৌক্তিক কথা। পুরুষও স্বতন্ত্র, প্রকৃতিও স্বতন্ত্র; ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বহু অধ্যায় ব্যাপিয়া জননী দেবহূতির প্রতি সাংখ্যপ্রবর্ত্তক কপিলদেবের উপদেশ রহিয়াছে। এই অংশ অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতিকে পরমপুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিভাবে গ্রহণ করিলেই সাংখ্যের আর কোন অসঙ্গতি থাকে না। বাস্তবিকভাবে বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ সেই প্রকারেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। (প্রাগুক্ত স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য সম্পূর্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামী। তিনি দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, কর্দ্দম ঋষির পুত্র কপিলদেব সাংখ্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন; তাহা দুষ্ট ও অসমঞ্জস মত নহে, পরন্তু অন্য এক কপিলের প্রক্ষিপ্ত মত রহিয়াছে; তাহাও অসঙ্গত মত। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইতেছে, 'কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা' (তত্ত্বানাং সংখ্যাতা গণকঃ সাংখ্যপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ, শ্রীধরস্বামী) কর্দ্দম ও দেবহূতির পুত্র কপিলদেবই সাংখ্যপ্রবর্ত্তক।

বেদান্তের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনসমূহ ও চতুর্থাধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরিবর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগকেই ব্রহ্মাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভাগবত ভক্তিযোগেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নানা প্রসঙ্গেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তিযোগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধে ও একাদশ স্কন্ধে যথেষ্ট আলোচনা ও উপদেশ রহিয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ভক্তিযোগ বহুবিধ আছে; কিন্তু পুরুষোত্তমের প্রতি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি, তাহাকেই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। এই নির্গুণ ভক্তিযোগের এবম্প্রকার স্বভাব যে, ভগবদ্‌গুণ শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বগুহাশয় ভগবানে অবিচ্ছিন্ন মনোগতি ঘটিয়া থাকে; যেমন জলধিতে গঙ্গাজলের অবিচ্ছিন্ন গতি থাকে, তদ্রূপ। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ বাসুদেবে যদি ভক্তিযোগ প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও শুষ্ক তর্কাদির অগোচর যে অহৈতুক জ্ঞান, তাহা সঞ্জাত হইয়া থাকে:—'বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।' এ স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, 'অহৈতুকং জ্ঞানং' বলা হইল; শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, অহৈতুক অর্থে শুষ্ক তর্কাদির অগোচর এবং ঔপনিষদজ্ঞান, ইহাই বুঝিতে হইবে। এবম্বিধ যে জ্ঞানযোগ, তাহা কদাপি হেয় নহে। তদ্দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক একার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ।' নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং মন্নিষ্ঠ ভক্তিলক্ষণ দুইয়েরই একই প্রয়োজন; দুইয়েরই উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। এ স্থলে গীতার কথা মনে পড়ে,—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।' যাহা হউক, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উভয়ই ভগবচ্ছব্দলক্ষণ কি করিয়া হইল, ইহাই যদি বলা যায়, তদুত্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন,—যেমন একটি পদার্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে প্রতীত হইতে পারে, তদ্রূপ বিভিন্ন যোগের দ্বারা ভগবান্‌কে অবগত হইতে পারা যায়। ক্ষীর-বস্তু চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, জিহ্বার দ্বারা মধুর ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়; এই দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্যত্র আবার কর্ম্মযোগেরও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আলোচনা করিলে দেখা যায়, স্বর্গাদিলাভের নিমিত্ত নানা কর্ম্ম করিবার উপদেশ রহিয়াছে। ইহা কি সঙ্গত ও সমীচীন? একাদশ স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে বলা হইতেছে, ঐ যে স্বর্গাদির লোভপ্রদর্শন করিয়া কর্ম্মাচরণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, কর্ম্মমোক্ষ বা কর্ম্ম ত্যাগ করান। সে কেমন? যেমন পিতা শিশুকে খণ্ড-লড্ডুকাদির প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ পান করান, উদ্দেশ্য থাকে শিশুর আরোগ্য, তদ্রূপ স্বর্গাদিলাভের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম করান হয়, উদ্দেশ্য থাকে কর্ম্মমোক্ষ। পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইতেছে, কর্ম্মমোক্ষই যদি উদ্দেশ্য হয়, প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ করা হউক না কেন? কিন্তু অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এবম্প্রকারে দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ তিনেরই আলোচনা করা হইয়াছে, এবং ভক্তিযোগের যে উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহাও সর্ব্বত্রই উল্লিখিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনকে নানা ভাষ্যকার নানা প্রকারে দেখিয়াছেন। কেহ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন; কেহ দ্বৈতবাদ, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি মত স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব ভাষ্যকারমাত্রেই একান্ত অভেদবাদকে দূষণীয় বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা আদি শাস্ত্রের দ্বারাই তাঁহারা একান্ত অভেদবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। উপনিষৎ-সমূহে যেমন অভেদবাদের উপজীব্য এবং ভেদবাদের উপজীব্য দুই প্রকারের বাক্যই বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তদ্রূপ স্থানে স্থানে অভেদবাদের উপযোগী শ্লোক থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীভাগবত অভেদবাদমূলক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে:—'যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু। নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্।' বহ্নি এক বস্তু, কিন্তু তাহার অভিব্যঞ্জক দারুসমূহের মধ্যে নিহিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর এক বস্তু হইয়াও প্রাণিসমূহের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন।

অভেদবাদীরা যেমন বলেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' জীব ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে, ইহাও ত সেই কথাই হইল। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে এই সকল বাক্যের দ্বারা একান্ত অভেদবাদ সমর্থিত হয় না। বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণও বলিবেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' কারণ, জীব ব্রহ্মেরই শক্তি বা অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতেরও ইহাই মত। দশম স্কন্ধে বেদস্তুতি দ্রষ্টব্য,—'তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।' কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এবং শক্তি যোগই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধন, ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছু নহে। পরমার্থভূত বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অংশ জীব, শক্তি মায়া, এবং কার্য্য জগৎ। (১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২য় শ্লোকের শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য।) সেই পরমেশ্বর আত্মলীলায় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন; কিন্তু আসক্ত হয়েন না—'স এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে।' এই স্থানে গীতার কথা মনে পড়ে!—'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।' চরাচর ভূত সকল আমাতেই অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ঘটাদির কারণ-ভূত মৃত্তিকা যেমন স্বকার্য্য ঘটাদিতে ব্যাপ্ত থাকে, আমি জগতের কারণভূত হইলেও কিন্তু নিজকার্য্য চরাচরভূত সকলে লিপ্ত নহি। কারণ, আমি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ('আকাশবৎ অসঙ্গত্বাৎ', শ্রীধরস্বামী)।

বেদান্তদর্শনে যেমন ব্রহ্ম, মায়া, জীব ও ব্রহ্মাপ্তির সাধনের আলোচনা রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়ও তদ্রূপ এই চারিটি—পূর্ণ পুরুষ ভগবান্, তদধীনা মায়া, মায়ায় সম্মোহিত জীব এবং মায়া-দূরীকরণের উপায় ভক্তিযোগ। নিম্নোক্ত শ্লোক তিনটিতে ইহা স্পষ্টীকৃত। শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নানা পুরাণপ্রসঙ্গ প্রণয়ন করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না; এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশে ভগবদ্‌গুণবর্ণন-প্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়নের ইচ্ছা করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করত ধ্যানে বসিলেন। অনন্তর :—

'ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।'

'ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত সম্যক্‌প্রকারে সুস্থির হইলে পূর্ণ পুরুষকে এবং তদধীনা মায়াকে দর্শন করিলেন। যে মায়ায় সম্মোহিত জীব স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও দেখিতে পাইলেন। অপিচ, অধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তিযোগ করিলে অনর্থের উপশম হয়, তাহাও দেখিলেন। এই সকল অবলোকন করিয়া জ্ঞানহীন লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ শাশ্বত সংহিতা রচনা করিলেন।'

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র (এম্, এ)।

—

কাব্যে অশ্লীলতা

গত বৈশাখের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভঙ্গীতে বলিতে চাহিয়াছেন যে, কাব্যে অশ্লীলতা-দোষ দোষই নহে; সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যে উহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সাহিত্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি; উহা প্রকৃত-পক্ষে সমাজের স্বাস্থ্যের নামান্তর।

চৌধুরী মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়াও এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলেই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমাদের সামাজিক জীবনের ধারা পূর্ব্ব-অবস্থা হইতে অনেক পরিমাণে বদলাইয়াছে। কবি গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময়ে অথবা তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতে এ দেশে যে খেউড় ও তর্জ্জা গান হইত, তাহা প্রধানতঃ অশ্লীলতার জন্যই লোপ পাইতে বসিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় কি তাহার পুনরুদ্ধার দেখিলে সুখী হইবেন? প্রাচীন হিন্দু-সমাজের গৌরব আজ লুপ্ত; মানুষের স্বভাবধর্ম্ম বিকৃত; শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব নূতনতর! এ ক্ষেত্রে শুধু পূর্ব্ব-পুরুষের সাহিত্যিক রীতি অনুসরণ করিলেই কি বাঙ্গালা সাহিত্যের শীর্ণ খাতে মন্দাকিনী বহিয়া যাইবে?

মানিলাম না হয়, আদিরস উপভোগ করার মত সরল-প্রাণ হইতে পারিলে আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বৈ অকল্যাণ নাই। কিন্তু আদিরস ছাড়াও রস আছে ত? যদি থাকে, তবে সব কথাতেই সম্ভোগের অভিব্যক্তি এবং তাহারই সমর্থন কেন? সাহিত্য যদি জীবনের আলেখ্য হয়, তবে আধুনিক মৈথুনলীলার সাহিত্য কিসের সূচনা করে? সম্ভোগই কি তারুণ্যের একমাত্র জয়টীকা? জাতীয় জীবন যখন নিষ্পন্দ ও মৃতপ্রায়, তখন এপ্রকার সাহিত্য কি বিকারের পরিচয় নহে?

রবীন্দ্রনাথ কোন এক নবীন লেখকের উপন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা সাধারণভাবে সকল আধুনিক উপন্যাসের প্রতি প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "কোন কোন বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মৈথুনাসক্তি সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই বা তা প্রবল নয়, এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়ে যেমন সংযম আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও। ঘুরে ফিরে কেবলি একটা জিনিষকেই প্রকাশ করার দ্বারা দুর্ব্বলতাজনিত প্রমত্ততার প্রমাণ হয়—তাতে রচনার সামঞ্জস্য নষ্ট করে।

"......মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে...উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেছি। দেখে আমি এই মনে ক'রেই বিস্মিত হয়েছি যে, আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্য-জাগ্রত লালসা নেই। (পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে) আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়—তার প্রধান কারণ, মানুষের জীবন-ক্ষেত্রের বিচিত্র ব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই—সেই কারণে এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়। নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ

প্রাণশক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির যে সহজ উত্তাপ আছে, এদের তা নেই —এদের আধমরা দেহমনের এই একটিমাত্র উত্তেজনার উপকরণ আছে—আর কিছুতেই যেন এদের সম্পূর্ণ জাগাতে চায় না। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে যখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দাম বলিষ্ঠতার কোন পরিচয় পাইনে—সেই জন্য ওটাকে অশুচি রোগের মতই বোধ হয়। রোগ জিনিষটা দুর্ব্বল-চিত্তের পক্ষে সংক্রামক—বিকার-মাত্রই অবলীলাক্রমে শক্তিহীনকে জীর্ণ করে। এই কারণে উত্তর-য়ুরোপে দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা সহজেই সহ্য হয়, অর্থাৎ তাকে অতিক্রম ক'রেও তাদের মনুষ্যত্ব অবিচলিত থাকে। আমাদের ক্ষীণজীবীর দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌঁছায়—এই জন্য নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয়, আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত। অন্যান্য বিকার সম্বন্ধেও তাই। আমাদের সাহিত্যে বারে বারে কেবলি দুর্ব্বল রুগ্ন মুমূর্ষুদের লালায়িত লালসার অতিবর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্ত্তি দেখি, সেটা বীভৎস—তার আনুষঙ্গিকভাবে প্রবল প্রবৃত্তি-শালী চিত্তের প্রচণ্ডতা দেখতে পাইনে ব'লে' অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়। এ রকম রোগ-বিকারের বর্ণনাস্থান সাহিত্যে নয়, এটি ডাক্তারী শাস্ত্রে শোভা পায়।" (কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬)

ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং সমাজ,—এ তিনটি কি সত্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন? তিনেরই আশ্রয় যখন মানব-জীবন, তিনেরই লক্ষ্য যখন মানুষকে অব্যক্ত আনন্দের আস্বাদ দেওয়া, তখন তাহাদের ভিতর যোগসূত্র না থাকিবে কেন, ইহাই দুর্ব্বোধ্য। মানুষের প্রকৃতির প্রয়োজনে ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং সমাজের সৃষ্টি। মানুষের অন্তরাত্মা চায় আনন্দ, চায় রস। সেই আনন্দ যত সূক্ষ্ম, যত অতীন্দ্রিয় হয়, ততই উহা গাঢ় ও স্থায়ী হয়—রসের ঘনতা রসের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতেছে, নীচ প্রবৃত্তি দমিত হইয়া ক্রমশঃ মহৎ প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তির অবসর করিয়া দিতেছে। সভ্যতার ইহাই আদর্শ। ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং সমাজ—এই আদর্শ-সাধনার তিনটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। যে ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের সুন্দর মহৎ প্রবৃত্তিগুলির বিকাশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করে, সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে সমাজ মানুষের শারীর-বৃত্তি-গুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়া উচ্চতর, সূক্ষ্মতর চিত্তবৃত্তির উন্নতির বাধাগুলি অপসারণ করে, সেই সমাজ শ্রেষ্ঠ সমাজ, এবং যে সাহিত্য মানুষের প্রাণে সূক্ষ্মতম স্পন্দন জাগায়, স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুজগতের আভাসমাত্রও যাহাতে নাই বলিলে চলে, সেই সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই জন্যই আদিরসের সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নহে; জাতিবিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থই হইতেছে সেই সেই জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বেদ, বাইবেল, উপনিষদ সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সর্ব্বদেশের সাহিত্যের মুকুটমণি।

ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং সমাজ পরস্পরের সহযোগী। ইহাদের একে অপরের বাধক হইলে মানুষের জীবনে সেই দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। সমাজ আমাদের আজ ধর্ম্মের অনুগত নহে বলিয়াই দেশের জনশক্তি এমন দ্বিধাগ্রস্ত, লক্ষ্যহারা, পথভ্রষ্ট। তাই আজ জীবন আমাদের এমন অপুষ্ট ও মলিন। এ প্রকার ক্ষীণ জীবন হইতে রসবস্তুর সন্ধান মিলিতে পারে না। বিদেশ হইতে মাল-মসলা আনিয়া দেশীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। দেশীয় সাহিত্য পড়িতে হইলে দেশের জীবনধারার অনুরূপ রসসৃষ্টি করিতে হয়। যে রস জাতির সব চেয়ে অধিক প্রার্থিত, সর্ব্বাগ্রে তাহারই অন্বেষণ করা জাতীয় সাহিত্যের কায। প্রত্যেক মানুষের যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমনই বিশিষ্ট একটি অনু-ভূতির ভঙ্গী আছে; ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে তাহা হইতেছে—সংসারের সকল বিষয়ে ব্রহ্মের অনুশীলন করা। আমাদের জীবনের ভিত্তি তাই ব্রহ্মচর্য্যে। আজ ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া আমরা আদর্শকে ত্যাগ করিব কেন? যিনি সত্য এবং সুন্দর, তিনি মঙ্গল-বর্জ্জিত নহেন; মঙ্গলের মধ্যেই তাঁহার চিরন্তন প্রকাশ। এই কারণেই সমাজের, তথা মানুষের মঙ্গল প্রাচীনপন্থী হিন্দুর একান্ত কামনার বস্তু। মানুষের চরিত্র নীতিশাস্ত্র যত দিন না বদলাইতেছে, তত দিন হিন্দুর এই মঙ্গলকামনা এমনই সর্ব্ব-বিষয়ে অনুস্যূত হইয়া থাকিবে; শিল্পে, সাহিত্যে কলায় হিন্দু তত দিন কেবল কল্যাণকেই আবাহন করিবে।

শ্রীকমলকুমার সান্যাল।

সমুদ্র-যাত্রা *

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধশ্চ তথা মখঃ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।"

সমুদ্র-যাত্রাস্বীকার, স্নাতকদিগের সজল কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণকন্যা-বিবাহ, বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হইলে দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস-দান, বানপ্রস্থ আশ্রম, দত্তা কন্যার পুনর্বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য-পালন, নরমেধ-যজ্ঞ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান-গমন ও গোমেধ-যজ্ঞ—এই সকল কার্য্য পণ্ডিতরা কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

আদিত্যপুরাণের বচনও ইহারই অনুরূপ। কেবল 'সমুদ্র-যাত্রা-স্বীকারঃ' স্থলে তাহাতে "অব্ধিপ্রবেশো বিধিচোদিতঃ" (বিধিপূর্ব্বক সমুদ্রে প্রবেশ) আছে। অধিকন্তু "ভৃগ্বগ্নিপতনং চৈব, বৃদ্ধাদিমরণং তথা" ইত্যাদি—কতিপয় কার্য্যও নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং শেষে আছে—

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।"

---

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ "ব্রাহ্মণ-সম্মেলন" পত্রের ১২৫০ শক ভাদ্র সংখ্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ কারণে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে বাধা পাওয়ায় বসুমতীতে প্রকাশ করিলাম।

উদারস্বভাব পণ্ডিতরা সমাজ-রক্ষার জন্য কলির প্রারম্ভে এই সকল কার্য্য ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন। তাদৃশ সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রবর্ত্তিত নিয়মও বেদবাক্যবৎ প্রমাণ।

যাঁহারা ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য বেদবৎ প্রমাণ বলিয়াই পশ্চাৎ প্রণীত পূর্ব্বোক্ত উপপুরাণদ্বয়ে ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া উহাদের শাস্ত্রত্ব সাধিত হইয়াছে।

অনেকে বলেন—ঐ সকল বচন অমূলক। কিন্তু হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি সমস্ত নিবন্ধকাররাই ঐ সকল বচন ধরিয়াছেন এবং উহাদের প্রামাণ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। অমূলকই হউক, আর সমূলকই হউক, উহা যে সমাজ-রক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাতে সংশয় নাই। মনে করুন, বেদে যে গো-বধের উপদেশ আছে, তাহা কেবল গোমেধ-যজ্ঞ, মধুপর্ক ও শ্রাদ্ধ—এই তিনটি কার্য্যে; সর্ব্বত্র নহে। এই জন্যই বেদার্থোপনিবদ্ধা ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ।"

মধুপর্কে, যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধেই গবাদি পশুবধ করিবে; অন্যত্র নহে।

অন্যত্র করিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। মধুপর্কে আবার পশুবধের ইচ্ছাবিকল্প বেদেই দেখা যায়। যথা—"নামাংসো মধুপর্কঃ" মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না। পশুবধ না করিলে মাংসলাভ হইতে পারে না। আবার যাঁহাকে মধুপর্ক দিয়া মাংসের জন্য গাভী দেওয়া হয়, তাঁহার পাঠ্য মন্ত্রের মধ্যে আছে —"মা গা-মনাগা-মদিতিং বধিষ্ট" নিরপরাধা অবধ্যা গাভীকে বধ করিও না। "উৎসৃজ গামত্ত তৃণানি পিবতূদকম্" গাভীকে বন্ধনমুক্ত কর, সে ঘাস-জল খাউক।

সত্য হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত কালবশে লোকের স্বভাবাদির ক্রমশঃ অবনতি নিপুণ-দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, কলির মানবরা নিতান্ত লুব্ধ ও অসংযত হইবে; তাহারা কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়া যথেচ্ছ গো-বধ ও গোমাংস-ভক্ষণ করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অচিরে গোকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, ঘৃত-দুগ্ধের অভাব ও কৃষিকার্য্যের হানি ঘটিবে। এই সমস্ত ভাবিয়াই তাঁহারা, বেদ-বিহিত হইলেও, ঐ তিনটি কার্য্য কলিতে একবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। নিষেধ সত্ত্বেও এখন এত লোক গোমাংস খাইতেছে যে, তাহাদের জন্য হোটেলের ও কসাইখানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিষেধ না থাকিলে কি আর রক্ষা ছিল? অন্যান্য কার্য্য-নিষেধের মূলেও এইরূপ তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ সমস্ত নিষেধ মানিয়া হিন্দু-সমাজ এত কাল সুশৃঙ্খলায়ই চলিয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ বলেন—সমাজ-রক্ষার জন্য যখন সময়ে সময়ে শাস্ত্র-ব্যবস্থার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখা যায়, তখন দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় এখনও তাহা হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, এখনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক বটে; কিন্তু পরিবর্ত্তন করিবার শক্তিশালী সুযোগ্য লোক কৈ? যাঁহারা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিঃস্বার্থ-সমাজ-হিতৈষী, প্রতারণা-প্রবৃত্তিরহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ, স্বয়ং সদাচারসম্পন্ন জানিয়া সকলেই তাঁহাদিগের মত অবিচারে ও অবনতমস্তকে মানিয়া লইত। ইদানীন্তন ব্যবস্থাপক অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রায়ই সেরূপ প্রকৃতির নহেন বলিয়া কেহই তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না—তাঁহাদিগের মত মানিয়া চলিতে চাহেন না। গণ্যমান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক সময়ে বালিকা বিবাহেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া, ৪।৫ বৎসর পরে আবার যুবতী-বিবাহের সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। কেহ কেহ বা কায়স্থদিগকে কখনও শূদ্র, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বা চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত উৎকৃষ্ট মূলবর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন—ইত্যাদি। অধিকাংশ অধ্যাপকেরই এইরূপ অনবস্থিত ব্যবস্থা দেখিয়া অধ্যাপকমাত্রের প্রতিই লোকের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে—"চোরা গাইএর সঙ্গে কপিলা গাইও বাঁধা পড়িয়াছে।"

সমস্ত অধ্যাপক একযোগে শাস্ত্রতত্ত্ব ও সমাজের হিতাহিত আলোচনা করিয়া কোনও বিষয়ে একটা যে স্থিরসিদ্ধান্ত প্রচার করিবেন, সে আশা সুদূরপরাহত। তাঁহারা সকলেই চির-পোষিত স্ব স্ব মতের সমর্থনেই তৎপর। তদ্বিপরীত মত কেহ প্রকাশ করিলে চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হন। কাশীতে এই যে এত বহ্বাড়ম্বরে ব্রাহ্মণ-সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার ফলও "তথৈব চ" হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, শাস্ত্র ও সামাজিক অবস্থা, এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিদ্ধান্ত করিবার প্রস্তাব বিঘোষিত হইলেও মধ্যস্থগণ কেবল শাস্ত্র-দৃষ্টিতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। উভয়পক্ষের বিচারের পর মধ্যস্থগণ যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা যে উভয় পক্ষেরই অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাও নহে। বিপক্ষরা বিপক্ষই রহিয়া গিয়াছেন। যে সকল পূজ্যপাদ মঠাধীশ্বর সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়েরই শীর্ষস্থানীয় ও পরম মাননীয়। সমাজের সহিত তাঁহাদের সংস্রব নাই। তাঁহারা যে সকল মঠের অধীশ্বর-পদে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল মঠ সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই স্থাপিত। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ বা পরতঃ সে কার্য্যে কদাপি প্রবৃত্ত হন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক—তাহারা তাঁহাদিগকে কখনও চোখেও দেখে নাই; যাঁহারা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে সকলেই ১০।১২ দিন মাত্র তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাদের ঘোষণায় আস্থা-সম্পন্ন হইয়াছেন, ইহাও বোধ হয় না। তাঁহাদের প্রতি সকলের সমান শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলে এখনও—এই ৮।১০ মাসেও সমাজের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পরের বিরোধ থাকিত না।

যাঁহারা সমাজনেতা সাজিয়া সমাজ-সংস্কারে উদ্যুক্ত, তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাঁহারা শূদ্র, অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ীদিগকে প্রণবযুক্ত মন্ত্রদীক্ষা, বিধবা-বিবাহ, যুবতী-বিবাহ, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, নিকৃষ্টজাতিকে উৎকৃষ্ট জাতিতে উত্তোলন ইত্যাদিরূপ সমাজ-বিপ্লবকর ব্যাপারেই উন্মত্ত এবং ঐগুলিকে শাস্ত্রসম্মত সপ্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। কিন্তু বরপণ-গ্রহণাদি বহ্বনর্থকর অশাস্ত্রীয় প্রথার উচ্ছেদে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। তাঁহাদের কথা অপক্ব-বুদ্ধি, অপরিণামদর্শী, উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা মানিতে পারে, সাধারণে পারে না।

কেহ কেহ বলেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের যে ঝোঁক পড়িয়াছে, তাহার প্রতিকূলতায় মঙ্গল হইবে না। ইহা নিতান্ত

অবোধ ও অপরিণামদর্শীর কথা। তাহাতে বাধা না দিলে সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সেতুবন্ধনাদি দ্বারা নদীর প্রবল স্রোতঃসমূহ রোধ না করিলে দেশ প্লাবিত হয়—ভাসিয়া যায়। যে সমাজে সকলেই যথেচ্ছাচার করে, তাহাকে সমাজ (মনুষ্য-সমবায়) বলে না ; আকারব্যত্যয়ে তাহা সমাজ (পশু-সমবায়) হইয়া দাঁড়ায়।

এ অবস্থায়, সুদীর্ঘকাল যেরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, অগত্যা তদনুবর্ত্তী থাকাই সমাজের পরম শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি।

সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা বলিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই যে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কিরূপ সমুদ্র-যাত্রা, তাহাই আলোচনার বিষয়। সাধারণ সমুদ্র-যাত্রা হইলে, সে দিন পর্য্যন্ত—রেলপথ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু বিশিষ্ট হিন্দু সমুদ্রপথে পুরী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থে যাইতেন ; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব জয়পুরাধিপতি গুরু-পুরোহিত-সমভিব্যাহারে বিলাত গিয়া স্বধর্ম্ম-রক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে সমুদ্রযাত্রার জন্য তাঁহাদের কেহই প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই।

মনু চিকিৎসক, দেবল, সমুদ্রযায়ী, জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগকে দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই নিমন্ত্রণ বাদ না পড়ে, এই অভিপ্রায়ে যদি উক্ত পুরাণে কলিতে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে চিকিৎসা প্রভৃতিও নিষেধ করিতেন। কেবল সমুদ্র-যায়ীর প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া চিকিৎসকাদির প্রতি নিগ্রহ করিবার কারণ কি ?

বৌধায়ন বলিয়াছেন—

"অথ পতনীয়ানি—সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণস্য ন্যাসাপহরণং সর্ব্বপণ্যৈর্ব্যবহরণং ভূম্যনৃতং শূদ্রসেবা যশ্চ শূদ্রায়ামভিজায়তে তদপত্যঞ্চ ভবতি, তেষাং নির্দ্দেশঃ—চতুর্থকালমিতভোজনাঃ স্যুরপোঽভ্যুপেয়ুঃ সবনানুকল্পং স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ত এতে ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্তদপঘ্নন্তি পাপম্।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সমুদ্রগমন···শূদ্রসেবা প্রভৃতি পাতক ; তজ্জন্য ত্রৈবর্ষিক ব্রত কর্ত্তব্য।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে ব্রাহ্মণের শূদ্রসেবা-প্রায়শ্চিত্তে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ঐ বৌধায়নবচন ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"অস্য ত্রৈবর্ষিক ব্রতস্য চতুর্ব্বার্ষিক-প্রাজাপত্য-তুল্যত্বং দর্শিতং, তেন চিরকালাভ্যস্তশূদ্রসেবাবিষয়মিদম্।"

উক্ত বচনে শূদ্রসেবী ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বার্ষিক-প্রাজাপত্যতুল্য যে ত্রৈবর্ষিক ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা চিরকালাভ্যস্ত শূদ্রসেবা বিষয়েই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, মনু শূদ্রসেবী ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ বলিয়াছেন। যথা—

"নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়-মসত্যস্য চ ভাষণম্।"

নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধনপ্রতিগ্রহ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাবচন—ইহাদিগকে অপাত্রীকরণ পাপ বলে।

"সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।"
সঙ্করীকরণ ও অপাত্রীকরণ-পাপে চান্দ্রায়ণ করিবে।

চান্দ্রায়ণের অনুকল্প সাড়ে ২২ কাহন এবং চতুর্ব্বার্ষিক প্রাজাপত্যের অনুকল্প ৩ শত ৬০ কাহন উৎসর্গ। "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" এতদনুসারে মনুবচনের সহিত বিরোধ পরিহারের জন্য বৌধায়নবচনে চিরকালাভ্যস্ত শূদ্রসেবা বলিতে হইবে। উক্ত বৌধায়নবচনে ব্রাহ্মণের শূদ্রসেবা যদি চিরকালাভ্যস্ত ধরিতে হয়,তাহা হইলে তৎসাহচর্য্য হেতু সমুদ্রযানও সুতরাং চিরকালাভ্যস্তই ধরিতে হইবে। সমুদ্রযাত্রার জন্য মনু কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নাই। উক্ত মনুবচনে বাণিজ্য আছে, অতএব তাহার সহিত একবাক্যতায় বৌধায়ন-বচনস্থ সমুদ্রযানের অর্থ বাণিজ্যই বলিতে হইবে। বৌধায়নবচনে সাধারণ সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, বৃহন্নারদীয়ে কলিতে উহার নিষেধ করা অনাবশ্যক হয়। নিষিদ্ধের নিষেধ নিষ্প্রয়োজন।

বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ কলিবর্জ্জ্য বিষয়ে পরস্পর-সংবাদিই দেখা যাইতেছে। অতএব বৃহন্নারদীয়ে কেবল 'সমুদ্র-যাত্রা' না বলিয়া "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ" বলায় এবং আদিত্য-পুরাণে তৎপরিবর্ত্তে "অব্ধিপ্রবেশো বিধিচোদিতঃ" থাকায় এবং উহাদের সহিত মহাপ্রস্থানগমন, ভৃগ্বগ্নিপতন ও বৃদ্ধাদিমরণ উল্লিখিত হওয়ায়, মরণ-কামনায় বিধিবোধিত সমুদ্রযাত্রা বা সমুদ্র-প্রবেশ (তদুপলক্ষিত জলপ্রবেশমাত্র) যে কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। উদ্বাহতত্ত্বের টীকায় কাশিরাম বাচস্পতিও ঐ স্থলে লিখিয়াছেন—"মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রা-স্বীকারঃ।"

সমুদ্রযাত্রাদি দ্বারা মরণের বৈধাবৈধতা শুদ্ধিতত্ত্বে ও নির্ণয়-সিন্ধুতে এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে :—

"ব্যাপাদয়েদথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্ন্যুদকাদিভিঃ।
বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকম্।
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যং চাপ্যুদকাদিকম্।"

যে নিজে (ইচ্ছাপূর্ব্বক) অগ্নি, উদক প্রভৃতি দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ নাই এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিও নাই। কিন্তু প্রমাদবশতঃ (অনিচ্ছায়) ঐরূপে মৃত্যু হইলে তাহার (ত্রিরাত্র) অশৌচ লইবে এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিও করিবে।

"বৃদ্ধঃ শৌচস্মৃতেলুপ্তঃ প্রত্যাখ্যাতভিষক্‌ক্রিয়ঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু ভৃগ্বগ্ন্যনশনাদিভিঃ।
তস্য ত্রিরাত্রমাশৌচং দ্বিতীয়ে ত্বস্থিসঞ্চয়ঃ।
তৃতীয়ে তূদকং কৃত্বা চতুর্থে শ্রাদ্ধমাচরেৎ।"

(বৃদ্ধগার্গ্য)।

যাহার শৌচস্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে এবং বৈদ্যরা অনর্থকবোধে যাহাকে আর ঔষধ দিতে চাহেন না, এরূপ বৃদ্ধ ভৃগুপতন, অগ্নি-প্রবেশ, অনশন ও জল-প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করিবে। তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ, দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়, তৃতীয় দিনে তর্পণ ও চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ হইবে। (এরূপ স্থলে আত্মহত্যার পাতক হয় না)।

বৈধ আত্মহত্যার ফল,—

"জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী।
ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যং তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলম্।
অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ স গচ্ছেত্ত্ব ত্রিপিষ্টপম্।"
(নরসিংহপুরাণ)।

জলপ্রবেশে মরিলে আনন্দ-নামক স্বর্গে, বহ্নি-প্রবেশে মরিলে প্রমোদ-স্বর্গে, ভৃগুপতনে মরিলে সৌখ্য-স্বর্গে, যুদ্ধে মরিলে অতি-নির্ম্মল-স্বর্গে এবং অনশনে মরিলে ত্রিপিষ্টপ-স্বর্গে গমন করে।

"দুশ্চিকিৎস্যৈর্ম্মহারোগৈঃ পীড়িতস্তু পুমানপি।
প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং করোত্যনশনং তথা।
অগাধ জলরাশিং চ ভৃগোঃ পতনমেব চ।
গচ্ছেন্মহাপথং বাপি তুষারগিরিমাদরাৎ।
প্রয়াগবটশাখাগ্রাদ্ দেহত্যাগং করোতি চ।
স্বয়ং দেহবিনাশস্য কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ।
উত্তমান্ প্রাপ্ন য়াল্লোকান্ নাত্মঘাতী ভবেৎ ক্বচিৎ।
মহাপাপক্ষয়াৎ স্বর্গে দিব্যান্ ভোগান্ সমশ্নুতে।"
(আদিপুরাণ)।

দুশ্চিকিৎস্য মহারোগে (ও তদনুরূপ মহাশোকে) কাতর হইয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিবে, অথবা অনশন, অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন, হিমালয়ে মহাপ্রস্থান, প্রয়াগস্থ বট-শাখাগ্র হইতে দেহপাত করিবে। এরূপ করিলে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে, আত্মঘাতী হইবে না।

এইজন্যই স্বজনশোকে অভিভূত হইয়া পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের কৌশলে বশিষ্ঠের শতপুত্র নিহত হইলে তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া (মৃত্যু না হওয়ায়) একে একে ঐ সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যথা (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৭৬ ও ১৭৭ অধ্যায়)—

"বশিষ্ঠো ঘাতিতাঞ্জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রেণ তান্ সুতান্।
ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিরিব মেদিনীম্।"

বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের নিধনসাধন করিয়াছেন শুনিয়া বশিষ্ঠ মহাদ্রি যেমন ধরিত্রীকে ধারণ করে, সেইরূপ সেই শোক ধারণ করিলেন।

"চক্রে চাত্মবিনাশায় বুদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ।
ন ত্বেব কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাং বরঃ।"

তিনি মরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তথাপি বিশ্বামিত্রের বংশোচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

"স মেরুকূটাদাত্মানং মুমোচ ভগবানৃষিঃ।
গিরেস্তস্য শিলায়ান্তু তুলারাশাবিবাপতৎ।"

তিনি সুমেরুশৃঙ্গ হইতে ঝম্পপ্রদান করিলেন; কিন্তু তুলারাশির উপর যেমন পড়ে, সেইরূপে শিলাতলে পড়িলেন।

"ন মমার চ পাতেন স যদা তেন পাণ্ডব।
তদাগ্নিমিদ্ধং ভগবান্ সংবিবেশ মহাবনে।
তং তদা সুসমিদ্ধোঽপি ন দদাহ হুতাশনঃ।
দীপ্যমানোঽপ্যমিত্রঘ্ন শীতোঽগ্নিরভবত্তদা।"

ঐরূপ পতনেও যখন মৃত্যু হইল না, তখন তিনি প্রজ্বলিত দাবানলে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেই অগ্নি তখনই শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিল না।

"স সমুদ্রমভিপ্রেক্ষ্য শোকাবিষ্টো মহামুনিঃ।
বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুর্ব্বীং নিপপাত তদম্ভসি।
স সমুদ্রোর্ম্মিবেগেন স্থলে ন্যস্তো মহামুনিঃ।"

তিনি গলদেশে বৃহৎ শিলা বাঁধিয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গবেগে স্থলে উৎক্ষিপ্ত হইলেন।

"ন মমার যদা বিপ্রঃ কথঞ্চিৎ সংশিতব্রতঃ।
জগাম স ততঃ খিন্নঃ পুনরেবাশ্রমং প্রতি।
ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং রহিতং তৈঃ সুতৈর্ম্মুনিঃ।
নির্জ্জগাম সুদুঃখার্ত্তঃ পুনরপ্যাশ্রমাত্ততঃ।"

বার বার—তিনবারেও যখন কিছুতেই মৃত্যু হইল না, তখন তিনি বিষণ্ণচিত্তে পুনর্ব্বার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পুত্রবিরহিত সেই শূন্য আশ্রম দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না; আবার আশ্রম হইতে বাহির হইলেন।

"সোঽপশ্যৎ সরিতং পূর্ণাং প্রাবৃট্‌কালে নবাম্ভসা।
বৃক্ষান্ বহুবিধান্ পার্থ হরন্তীং তীরজান্ বহূন্।
অথ চিন্তাং সমাপেদে পুনঃ কৌরবনন্দন।
অম্ভস্যস্যা নিমজ্জেয়মিতি দুঃখসমন্বিতঃ।"

বর্ষাকালে নূতন জলে পরিপূর্ণ একটা নদী প্রবল স্রোতে দু'কূল ভাঙ্গিয়া বহিতেছে দেখিয়া মনে করিলেন—ইহার জলে মগ্ন হই।

"ততঃ পাশৈস্তদাত্মানং গাঢ়ং বদ্ধা মহামুনিঃ।
তস্যা জলে মহানদ্যা নিমমজ্জ সুদুঃখিতঃ।
অথ ছিত্ত্বা নদী পাশাংস্তস্যারিবলসূদন।
স্থলস্থং তমৃষিং কৃত্বা বিপাশং সমবাসৃজৎ।
উত্তরার ততঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ।
বিপাশেতি চ নামাস্যা নদ্যাশ্চক্রে মহানৃষিঃ।"

তার পর তিনি কতকগুলি লতাপাশে আপনাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন; কিন্তু নদী স্রোতোবেগে সেই সকল পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বিপাশ অবস্থায় তীরে তুলিয়া দিল। সেই জন্য ঋষি তাহার নাম রাখিলেন—বিপাশা।

"শোকবুদ্ধিং তদা চক্রে ন চৈকত্র ব্যতিষ্ঠত।
সোঽগচ্ছৎ পর্ব্বতাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
দৃষ্ট্বা স পুনরেবার্ষির্নদীং হৈমবতীং তদা।
চণ্ডগ্রাহবতীং ভীমাং তস্যাঃ স্রোতস্যথাপতৎ।
সা তমগ্নিসমং বিপ্রমনুচিন্ত্য সরিদ্বরা।
শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা।"

শোকার্ত্ত হইয়া তিনি একত্র থাকিতে না পারিয়া কত পর্ব্বতে, কত নদীতে ও কত সরোবরে গেলেন। অবশেষে প্রচণ্ড-কুম্ভীর-পরিপূর্ণ হিমালয়নিঃসৃত একটা ভীষণ নদী দেখিয়া তাহার স্রোতে পতিত হইলেন। অগ্নিবৎ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া সেই নদী ভয়ে শত দিকে বিদ্রুত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহার নাম হইল—শতদ্রু।

"ততঃ স্থলগতং দৃষ্ট্বা তত্রাপ্যাত্মানমাত্মনা।
মর্ত্তুং ন শক্যামীত্যুক্ত্বা পুনরেবাশ্রমং যযৌ।"

তখন আপনাকে স্থলস্থিত দেখিয়া 'মরিতে পারিলাম্ না' বলিয়া পুনর্ব্বার আশ্রমেই গেলেন।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমুদ্র-যাত্রাস্বীকারঃ বা অগ্নিপ্রবেশো বিধিচোদিতঃ, মহাপ্রস্থানগমনং, ভৃগ্বগ্নিপতনং ও বৃদ্ধাদিমরণং—ইহাদের দ্বারা ঐরূপ সর্ব্বপ্রকার বৈধ আত্মহত্যা কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বিদ্যার্জ্জনাদির জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গমন করেন, তাঁহাদের সমুদ্র-যাত্রার জন্য কোনও পাপ হয় না। পাপ হয়—দীর্ঘকাল ম্লেচ্ছান্নভোজন ও গোমাংসাদি ভক্ষণের জন্য। সজ্ঞানে অন্যূন ৪৮ বার ঐরূপ পাপ করিবার পর প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অধ্যাপক মহাশয়গণ সকলেই প্রায় অব্যবহার্য্যতারই পক্ষপাতী। তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষাদির জন্য বিলাত গিয়া ৩।৪ বৎসর বা ততোঽধিক কাল বাস করেন, তাঁহারা উপায়ান্তরাভাবে ম্লেচ্ছান্নাদি ভোজন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কেবল তাঁহাদের জন্যই ঐ কঠোর শাসন, না—সর্ব্বসাধারণের জন্য? শাস্ত্রের শাসন যে পক্ষপাতদূষিত নহে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যাঁহারা ঘরে বসিয়া, অত্যুপাদেয় বিবিধ খাদ্যসামগ্রী সত্ত্বেও, কেবল রসনাতৃপ্তি-সাধনের জন্য স্বেচ্ছাবশে, সজ্ঞানে, বাড়ীতে বাবুর্চ্চি রাখিয়া অথবা হোটেল হইতে আনাইয়া, ম্লেচ্ছান্নভোজন ও গোমাংসাদি ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সমাজ ও সমাজনেতা অধ্যাপক মহাশয়গণ এত কাল কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? যে সমাজে একবার অজ্ঞানে গোমাংস-রন্ধনের আঘ্রাণমাত্র করিয়া উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ব্রাহ্মণ "পিরালি" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন—সেই সমাজে ইদানীং সাক্ষাৎ ম্লেচ্ছান্ন-ভোজী ও গোমাংস-ভক্ষকরা যদি বিনা প্রায়শ্চিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ব্যবহার্য্য হইতে পারেন, তবে বিলাত-ফের্‌তারাই পারিবেন না কেন? যাঁহারা জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত "মহাসুকৃতি"বশে স্বল্পদিন বিলাতে থাকিয়া সাহেবত্ব বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হন, স্ব-সমাজে প্রবেশ করিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করেন—দাঁড়কাক হইয়াও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া সেই ময়ূরের দলেই মিশিয়া যান, তাঁহাদের জন্য কিছু বলিবার নাই; কিন্তু যাঁহারা অখাদ্য পরিত্যাগ করিয়া স্ব-সমাজে থাকিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? প্রার্থনা করি, সমাজ ও অধ্যাপকমণ্ডলী এ বিষয়ে সুবিচার করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

নব-আবিষ্কৃত প্রাচীন পদসংগ্রহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অ ১০।প৭।

প্রিয়সখি পাহি মামথ যাহি
সত্বরমানয় নন্দ-কিশোরম্।
শ্যামল রুচির কলেবর মানত
গোপ-যুবতি-মতি-চোরম্।
রুচির কুসুমচয় চারু-শিখণ্ডক
মণ্ডন বলয়িত-কেশম্।
হরিত বিমল পট শোভি কলেবর
মদনবিমোহন-বেশম্।
কনক-খচিত মণি মেখলা বেষ্টিত
কটিতট * * ।
স্থলজ কমলদল কান্তি-বিনিন্দক
পদতল * * ।
শ্রবণ স্থিত মণি কুণ্ডল মণ্ডিত
গণ্ড-যুগলমতিদীনাম্।
রসয়তি মধুনিশি মামনুকম্পয়
মনসিজ-সাগর-লীনাম্।
নয়ন কমল সব লোকয় মামক
মরুত-ঘন-রসধারম্।
ধরণী বিবুধ-কবি রাজ-কবি শৃণু
জন-ভবসাগর-পারম্।

অ ১০।প১৭।

সজল জলদ সম চারুশরীরে।
মা * নাশিত দিতিসুত * রে।
কালিকে কুরু * * * ।
সুরমুনি-বন্দিত চরণ-সরোজে।
রুচির নটন গতি বিলসদুরোজে।
কলিত-রুচির ভুজ-কঙ্কণ নাদে।
বিহিত দনুজ-যুবতিক বিষাদে।
নরশির-মালিনি শমন নিরোধে।
বিহিত সুসেবক সুবিমল বোধে॥
কলিত রুচির সুসিতায়ুধজালে।
শশধর-দলবর রাজিত ভালে।
ক্ষিতিসুর কবিবর ভণিতমুদারম্।
শৃণু নরবর সুখদং ভবসারম্।

অ ১০।প১৮।

তারিণি তারয় মামতিদীনম্।
তব পদ-বারিজ-সেবন-হীনম্।
দানব-দর্প-বিনাশিনি মায়ে।
হিমগিরিনন্দিনি শঙ্করজায়ে।
নাশিত-সেবক-জাল-বিষাদে।
সুর-নর-কিন্নর-বন্দিত-পাদে।
ভূষণ-ভূষিত ভাস্বর দেহে।
সকল মনোগত কামিত গেহে।
বিদলিত দর্পিত দানব-গর্ব্বে।
নিজ গুণরাশি রাসিকৃত সর্ব্বে।
দ্বিজবর-কবিবর গানমুদারম্।
জনয়তু রসিকমুদং ভবসারম্।

অ১০।প১৯।

তারয় তারিণী ভজনবিহীনম্।
চপল-বিষয়-সুখজাল-বিলীনম্।
দীনদয়াময়ি মামতিদীনম্।
কনক-যুবতি-মদ-মোহিত-চিত্তম্।
বিফল তরল সুখ নাশিত বিত্তম্।
তব শুচিগুণ-গাণ * বিরক্তম্।
সততমসেবিত মধুরিপু * ।
শ্রুতি-প্রতিপাদিত-ধর্ম্ম-বিহীনম্।
অতি জড়ধিয়-মিহ জলগতমীনম্।
সুরতটিনিতট-পটল-বিরক্তম্।
* পদ-যুগল-মুদ * সক্তম্।
শ্রীকবিরাজ ধরণীন্দ্র গীতম্।
ভণ ভব-মহিসি পদ-মুপনীতম্।

অ১০।প২১।

অভিনব ঘনরুচি নীল সুবেশম্।
রাধে চল সখি হরিমুপজাতম্।
অমর-নিকর-বর-সেবিত-পাদম্।
ব্রজজন * * * ।
মকরমনোহর-কুণ্ডল শোভম্।
ব্রজ-যুবতী-মুখ-পঙ্কজ-লোভম্।
কনক রুচির বর * দেহম্।
ভুবন-মনোহর গুণবান গেহম্।
হরিপদ কিঙ্কর কবিবর গীতম্।
সুখয়তু রসিকজনং শ্রুতি-পীতম্।

শিবস্তুতি

অ১১।প১২।

বৃষবর যানং কৃত বিষ-পানং
কণ্ঠবিভূষণ নীলম্।
হিমগিরি-ভাসং ললিত বিলাসং
সজ্জনরঞ্জন-শীলম্।
নিখিল-নিদানং কুশল-বিধানং
বিহিত-মদন-মদভঙ্গম্।
বিধৃত-পিনাকং সুকৃত বিপাকং
জটাপটল-গঙ্গম্।
অজিন-বিকাশং ভবভয়-নাশং
সদয়হৃদয়মবিকারম্।
কলিত কলাপং দিতিসুতকালং
সকল-চরাচরসারম্।
পরম বিশেষং সতত সুবেশং
স্মৃতি হর চরিত সমাজে।
অতিশয় যত্নং ত্রিভুবন রত্নং
নমত ভণতি কবিরাজে।

হরগৌরী-বর্ণনা

অ১১।প১৪।

হিমগিরি-শিখরে পিককৃত মুখরে
বিকশিত সুকুসুম জাতে।
নির্ঝর নির্ম্মল জলকণ-শীতল
শীতল কোমল বাতে।
বিহরতি চারু হরেণ সমংশা।
গিরিবর-তনয়া ললিতাবতংসা।
কাঞ্চন রোচন কলেবরাচল
কুন্তল ললিত কপোলা।
রতিরস সস্মিত মঞ্জুল বল্লভ
মুখ পরিচুম্বন লোলা।
বিচলদলককুল ভাসিত সুস্মিত
সুন্দর বদন সরোজা।
হরপরিরম্ভণ রভস সুপুলকিত
তনু রতি বিলস তুরোজা।
অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন
নয়ন যুগল বিলসন্তি।
পল্লব তল্পতলে মিলিতারতি
রভস রসেন বসন্তি।
কুরু * * * *
তব কৃত বিনয়বিশেষম্।
জন কামপূরণ কল্পতরুমিহ
রুদ্রসিংহ বসুধেশম্।
শ্রীকবিরাজ ধরণী- সুর নিগদতি
মুদয়তু রমণীয়ম্।
হর হৈমবতী রতিরস বর্ণন
গানমতিশয়কমনীয়ম্।

রুদ্রসিংহ-স্তুতি

অ১১।প২০।

অমল হৃদয়মিহ বৈষ্ণবজালম্।
সুললিত তনু মুখরিত-করতালম্।
নৃত্যতি গায়তি হরিগুণনামম্।
কলিতললিততম তুলসিমালম্।
চিন্তয়দচ্যুতমখিলসুপালম্।
হরি-রস-রভসসপুলকশরীরম্।
প্রেম-সজল-লোচনমতিধীরম্।
হরিপদ-বন্দন সুন্দর ভাবম্।
অমৃত মধুর মৃদু * ররাবম্।
মাধব নাম প্রতিরণিতেন।
পূরয়দিয়মিয়মতিললিতেন।
বিদধদাশীষং কৃতহরিসেব।
ভণমতি রুদ্রসিংহ নরদেব।
শ্রীকবিরাজ দ্বিজবর-রচিতম্।
সুখয়তু নিখিলমিদং হরিচরিতম্। [ক্রমশঃ।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

লক্ষ্য ভ্রষ্ট

১

দশ বৎসরের বালক তেজেশ সে দিন স্কুল হইতে আসিয়া গৃহকর্ম্মরতা জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—"স্বরাজ কি মা?"

এই আকস্মিক ও অসম্ভাবিত প্রশ্নে কর্ম্মরতা মায়ের প্রসন্ন চিত্ত সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি শাসনের রূঢ় স্বরে কহিলেন, "গোল্লায় যাবার পথ তৈরী হচ্ছে দেখছি। ও সব কুবুদ্ধি কে মাথায় ঢুকিয়ে দিলে?"

সামান্য একটা প্রশ্ন, বোধ হয় বালকোচিত কৌতূহল-নিবৃত্তির ক্ষণিক জিজ্ঞাসা মাত্র। তাহা যে এত ভয়ানক অপরাধে পরিপূর্ণ, তাহা বালকের সরল প্রাণে জাগিল না। সে জননীর ভ্রূকুটি-সমাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখপানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কেন মা! ইস্কুলে যে সবাই বলাবলি কচ্ছিল, স্বরাজ আসবে এক বছরের মধ্যে?"

মা রূঢ় স্বরে ধমক দিয়া কহিলেন, "আবার! বল্লুম না, ও সব কথা মুখেও আনবি না। উনি শুনতে পেলে হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করবেন। যেমন হতচ্ছাড়া ইস্কুল—তেমনি বিদ্‌কুটে কথাবার্ত্তা!"

তেজেশ ম্লানমুখে চলিয়া গেল। সে জানিত না, তাহার এই সরল প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মিলিবার স্থান এখানে নহে। 'রায় বাহাদুর' খেতাব-লোভী সরকারী আফিসের নামজাদা কর্ম্মচারী পিতা অত্যুগ্র রাজভক্তি অন্তরে বহিয়া ভবিষ্যতের বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন! সেখানে স্বরাজ কেন, দেশ-প্রীতির সামান্য উপচারটুকু দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা রচনা করিয়াছে। বেশী দিনের কথা নহে, তেজেশ-জননী উত্তর-বঙ্গ জল-প্লাবনে ভিক্ষারত বালকদিগকে একখানি অতি ছিন্ন পুরাতন বস্ত্র ও চারিটি পয়সা ভিক্ষা দিয়া কর্ত্তার কাছে যে কঠিন তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝিয়াছিলেন, ও সব স্বদেশী বাণী বা ভিক্ষা, নির্ব্বিঘ্ন সংসারের সুখ-শান্তি হরণ করিয়াই থাকে। উচ্চ মাহিনার তাবী 'রায় বাহাদুরের' শুধু সম্মানহানিকর বলিয়া নহে, সংসারের অর্থ-স্বাচ্ছল্য ও তদনুপাতে বসন-ভূষণের বিলাসবাহুল্যও হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে!

দুর্ভিক্ষ কিংবা যে কোন কারণেই হউক না কেন, মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীতের ধ্বনি ভাসিয়া আসিলেই এ বাড়ীর পার্শ্ব-পার্শ্বস্থ দরজাজানালাগুলি একসঙ্গে অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। কেহ খদ্দরের কাপড় পরিয়া আসিলে গৃহিণী যথাসম্ভব তাহার প্রশ্নের কম উত্তর দিতেন ও এই সব সৃষ্টিছাড়া লক্ষ্মীহীনোচিত ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিতেন। এমনই লৌহকঠিন আইন রচনা করিয়া স্বামী ও পত্নী স্বদেশীর সর্ব্বসম্পর্ক বর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, পুত্র-কন্যারা সে বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

নিষিদ্ধ ফলে মানুষের দুর্দ্দমনীয় লোভ হয় ত ভগবানের সৃষ্টি! বিধি-নিষেধের কঠিন শিলাতলে কোথায় যে মুক্তির স্বাধীন বীজটুকু সংগুপ্ত থাকে ও কালে উত্তপ্ত পাষাণের মরণ-ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করিয়া শ্যামল অঙ্কুরে পরিণত হয়, তাহার বিচিত্র বার্ত্তা সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন!

তেজেশ জননীর তিরস্কার লাভ করিয়া ছাদের এক নিরালা কোণে আসিয়া দেখিল, তাহার দিদি ও-বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। সে তেজেশের অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়, সুতরাং জ্ঞানও তাহার সেই অনুপাতে অতিরিক্ত এবং তাহার নিকট স্বরাজের অর্থ হয় ত অস্পষ্ট বা দোষাবহ নহে ভাবিয়া বালকের মনে লুপ্ত প্রশ্নের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দিদির নিকটে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই দিদি, বল্ দেখি, স্বরাজ মানে কি?"

দিদির নিকটও ঐ প্রশ্ন হেঁয়ালী ছাড়া আর কিছু নহে। জন্মাবধি এ বাড়ীতে ও নাম বা আলোচনা সে শুনে নাই। কাযেই হতবুদ্ধির মত খানিক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল, "এখন খেলা কর্ গে যা, শোবার সময় সে গল্প করবো'খন।"

পাছে অপর ছাদে আলাপরতা কালীতারা তাহার ঐ

অজ্ঞতা ধরিয়া ফেলিয়া বিদ্রূপ করে, সেই জন্যই সে তাড়াতাড়ি অবোধ ভাইটিকে মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিল। কিন্তু তাহার কথার ফাঁকে যে অজ্ঞতা আপনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও সেই কারণে কালীতারার অকস্মাৎ হাসির উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই।

কালীতারা স্নেহলতার সমবয়সী। তাহাদের বাড়ীতে খদ্দরের কাপড়ও আসে, চরকাও আসে এবং ওসব আলোচনাও যথেষ্ট হয়। সব কথা বুঝিতে না পারিলেও সে এটুকু বুঝিয়াছিল, স্বরাজের কথা কোন কাহিনী বা অলীক কল্পনা নহে। তাহাদেরই সুখ-সুবিধার জন্য এক মহান্ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা।

তাই স্নেহলতার কথায় গল্পের আভাস পাইয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও হরি! তবেই তুমি বলেছ ওকে। নিজেই যার জান না! সে বুঝি গল্প? ওরে খোকা, তোর দিদি কিছু জানে না, কিছু না। স্বরাজ মানে কি জানিস্, এই ধর চরকা কাটতে হবে, খদ্দর পরতে হবে, দেশের জন্য জেলখানায় যেতে হবে, তবে না স্বরাজ মিলবে? স্বরাজ হ'লে তখন দেখবি, আমাদের দুঃখু-কষ্ট কিচ্ছু থাকবে না।"

স্নেহ কালীতারার উপহাসে যথেষ্ট রাগিয়া গিয়াছিল। ভাইয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মুখ বাঁকাইয়া সে বলিল,—"মাথা হবে, মুণ্ডু হবে। জেলখানায় গেলে তবে স্বরাজ মিলবে! পোড়া কপাল অমন স্বরাজের! আয় ভাই, তোকে ওর চেয়ে ভা—ল স্বরাজের গপ্প বলবো, ও কিচ্ছু জানে না।"

সে দ্রুতপদে ভাইটিকে লইয়া নামিয়া গেল।

যাহা হউক, বাড়ীতে এ সমস্যার সমাধান না হইলেও স্কুলে ক্লাসের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত বালক অরুণের কাছে তেজেশ চুপি চুপি কথাটা পাড়িল। উত্তরে সে এইটুকু বুঝিল যে, দেশের সেবা করিয়া যে অধিকার অর্জ্জন করা যায়, তাহারই নাম স্বরাজ।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা কি, সে সম্বন্ধে বালক কেন, অনেক যুবা বা বৃদ্ধেরও কোন স্পষ্ট ধারণা নাই; সুতরাং অনাবশ্যক প্রশ্ন তাহার মনকে আর উৎপীড়িত করিল না। উৎফুল্ল অন্তরে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, "বন্দে মাতরম্।"

২

ছয় বৎসর পরে এক দিন তেজেশ অরুণকে বলিল, "ভাই, আমার ইচ্ছে করে ভলণ্টিয়ার হই, কিন্তু বাবা শুন্‌লে আস্ত রাখবেন না।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "তুচ্ছ বাবার ভয় করলে কোন কায হয় না। যদি সত্যিকার ইচ্ছে জেগে থাকে ত আমার সঙ্গে চল—নাম লিখিয়ে আসি।"

তেজেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "না ভাই, কায নেই—শুন্‌লে একটা কেলেঙ্কারী হবে।"

দুই দিন সে কংগ্রেস আফিসের দ্বারে গেল। দেখিল, কাতারে কাতারে যুবক, বালক আসিতেছে ও নাম লিখাইয়া হাসি-মুখে চলিয়া যাইতেছে। কি উজ্জ্বল উৎসাহ তাহাদের মুখে চোখে—কি হর্ষ-চঞ্চল গতিভঙ্গী তাহাদের লঘু পদক্ষেপে!

মুগ্ধ তেজেশ মনে মনে ইহাদের শুভ অদৃষ্টের সঙ্গে আপন দুরদৃষ্টের তুলনা করিল। পিতামাতার উপর একটা অহেতুক ক্রোধও আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু পরাধীন অন্তর শুধুই অন্নবস্ত্রের সমস্যাজাল পাতিয়া নহে, মনের সাহসটুকুও আশঙ্কার রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সংসারের বাহিরে যে অনন্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র, তাহার সঙ্গে সে পরিচিত নহে। আজন্মবর্দ্ধিত আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান সেখানে নাই—মধুর স্নেহপ্রীতির স্পর্শও হয় ত মিলে না। তবু কেন দুর্নিবার বাসনা উহারই ভ্রূকুটি-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে চাহিতেছে? যে হৃদয় তরুণের,—সে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি দেশমাতৃকার পূজা-বন্দনার অর্ঘ সাজাইয়া দিতে সতত উদ্গ্রীব; সে হৃদয় অহরহ বাধার উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস করে।

অবশেষে ঐকান্তিকী ইচ্ছারই জয় হইল। তৃতীয় দিন সে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লিখাইয়া নিশ্চিন্ত-মনে গৃহে ফিরিল।

ঠিক সাত দিন পরে—যে দিন সে চুপিসাড়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে কংগ্রেসমণ্ডপতলে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দিন সবিস্ময়ে দেখিল, নগরীর জন-কোলাহল বহু পশ্চাতে শ্রবণের অতীত হইয়া গিয়াছে ও মুক্ত নীল আকাশের বুকে অসংখ্য নক্ষত্র তাহাদের রহস্যময়

তীক্ষ্ণনয়নে সর্ব্বশঙ্কা হরণ করিয়া যেন অভয় ইঙ্গিত করিতেছে।

মাতার তিরস্কার, পিতার ভ্রূকুটি ও প্রহার কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে! শুধু শ্যামল দূর্ব্বাদলে—ঊর্দ্ধ নীলাকাশে মুক্তির প্রচুর সমীরণ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সে যেন আর পরনির্ভরশীল দুর্ব্বলপ্রাণ বাঙ্গালী তেজেশ নহে,—সে মুক্তির বার্ত্তাবহ—স্বাধীনতার প্রতীক—দেশমাতার স্নেহাঞ্চলঘেরা এক নির্ভীক সন্তান!

১৫ দিন এমন মধুর স্বপ্নে কাটিবার পর আবার এক দিন তেজেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই স্বপ্নঘোর গভীর বাস্তবের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে,—মন কুণ্ঠা ও আশঙ্কায় ভরিয়া উঠে।—ভাবে, তার পর?

নিঃশব্দে সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়িতে উঠিবে, এমন সময় রুদ্র কালান্তক রোষগম্ভীরমূর্ত্তি পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; মুখ তুলিয়া সে দিকে আর চাহিতে পারিল না।

পিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "আবার এখানে আসা হয়েছে কেন? সম্বন্ধ ত চুকিয়েই গিয়েছ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চকণ্ঠে দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "উস্কো নিকাল দেও!" তিনি ইহাও জানাইয়া দিলেন—পুত্রের মায়া তিনি জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তেজেশ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, পিতার পদতলে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে শুধু বলিল—"মাপ কর, বাবা!"

অবরুদ্ধ ক্রোধ প্রচণ্ডশব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। নির্ম্মম জনক পদাঘাতে তেজেশের দেহটাকে সিঁড়ি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"দূর হ কুলাঙ্গার! আজ থেকে আমি মনে করবো, আমার ছেলে নেই—আমি নিঃসন্তান।"

এই অতর্কিত আঘাতের জন্য তেজেশ প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্ত্তে সংজ্ঞা হারাইয়া সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। মাথা ফাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। তেজেশের মা ছুটিয়া আসিয়া নিথর দেহের পানে চাহিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে লোক জমিয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কর্ত্তা ক্ষণেক সেখানে দাঁড়াইয়া ধীরগম্ভীরপদে পুনরায় উপরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়াও দেখিলেন না, পুত্র মরিল কি বাঁচিয়া রহিল!

পাড়ার হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন—আর কালবিল না করিয়া পুত্রের শুভ পরিণয় দেওয়া হউক। উদ্বাহবন্ধ বাঁধা পড়িলে তাহার উৎকট স্বদেশিতা কাটিয়া যাইবে সংসারের মমতায় সে পিতৃভক্ত সন্তান হইয়া পিতামাতা সুখ-শান্তি দিবে।

যুক্তিটা মন্দ নহে। গৃহিণী ও কর্ত্তা একমত হই পাত্রীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন।

তখনও দুর্ব্বল তেজেশ স্বচ্ছন্দপদক্ষেপে বাড়ীর বাহি যাইতে পারে না। অধিক চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া উ চোখে অন্ধকার দেখে। প্রাণদণ্ডের আসামী যেমন হস্তপা বদ্ধাবস্থায় আপন চরম দণ্ডাদেশ শুনিয়া অন্তরে অন্ত শিহরিয়া উঠে ও পরক্ষণে একান্ত অসহায়ভাবে ঈশ্বরে ইচ্ছাতলে আপনাকে সঁপিয়া দেয়, তেজেশও তেমনই তাহা বিবাহের জল্পনা-কল্পনা শুনিয়া একই সঙ্গে দারুণ ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু ততোঽধিক নিরুপায়ভা ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের কবলে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া ভাবি মৃত্যু তাহার বিধিলিপি এবং সে মরণ যখন এমনই তি তিলে মনুষ্যত্বহারা শক্তিহারা দাস-জীবনের মধ্য দিয়া অগ্রস হইবেই, তখন আসুক সে—নিয়তির কঠোর বজ্রের ম তরুণ প্রাণের সর্ব্ববৃত্তির উপর প্রলয়ের অনল জ্বালাইয়া সে তারুণ্যের ভস্মস্তূপে সংসারের প্রতিষ্ঠা করিবে,—সংসা সাজিবে।

এক মধুর অপরাহ্নে শানাই বসন্ত-রাগিণীর ঝঙ্কা তুলিল,—আত্মীয়-কুটুম্বের কলহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয় উঠিল এবং ইহারই মধ্য দিয়া শত-সহস্র আশীর্ব্বা মাথায় বহিয়া তেজেশ সংসারীর শ্রেষ্ঠ কাম্যফল আহর চলিল।

উৎসব-আলোক ছায়াবাজীর মত একে একে মিলাইয় গেল—পড়িয়া রহিল তাহার রোদন-ক্ষুব্ধ অন্তরের মাঝে অতৃপ্ত—হা—হা ধ্বনি। আর রহিল বাহিরে এক মূর্ত্তিমতী রাগিণীর—একান্ত তালমানলয়হীন প্রতিধ্বনি!

ষোড়শ বর্ষের কৈশোর যৌবনের পদপ্রান্তে বসিয়া বসন্ত- আবাহন-স্তুতি গাহিল না,—রঙ্গীন জগতের কোন পরিচয়ই বহিয়া আনিল না।

৩

কিন্তু বেশী দিন আর এ ভাবে চলিল না। আবার এক বৈশাখের খর মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ অরুণের সঙ্গে তেজেশের দেখা হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে খদ্দর-ভূষণে অরুণের গৌরকান্তি যেন জ্যোতির্ম্ময়,—শ্রান্তির শ্রমবারি যেন তাহার কপোলে মুক্তা-বিন্দু রচনা করিতেছে—বলিষ্ঠ দেহের প্রত্যেক রেখা স্ফীত হইয়া একটা শক্তির মহিমায় প্রোজ্জ্বল।

বিস্মিত তেজেশ একবারমাত্র সে দিকে চাহিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল।

অরুণ তাহার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া হাসিয়া কহিল, "কি বন্ধু, একদম গুড্ বয়! বই হাতে গুটি-গুটি কলেজে চলেছ? শুনলুম বিয়েও হয়েছে, তা বেশ—বেশ, এক দিন খাইয়ে দিও হে।"

সহসা তেজেশের বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল—অরুণের হাত ধরিয়া সে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "ঠাট্টা করছো কেন, ভাই! আমি সত্যিই হতভাগা।"

বহুদিনের সঞ্চিত অবরুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না—অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অরুণ সবিস্ময়ে কহিল, "দূর! তুই এমন সেন্টিমেণ্ট্যাল—একেবারে কেঁদে ফেল্‌লি?"

তেজেশ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "কি জানি, ভাই! আমার শুধু কান্নাই আসে। এক দিন কংগ্রেস-নেতার শোভাযাত্রার উৎসব-আয়োজন ও জনসমারোহ দেখে এমনই ভাবের বশে কেঁদেছিলুম। ভেবেছিলুম, জাতির ভাগ্যে এমন মধুর স্বপ্ন বুঝি ভগবানেরই রচনা।"

বলিতে বলিতে তেজেশের ম্লান নয়ন দুইটি আবেগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে যেন সেই অদৃশ্য চিন্তা-রাজ্যের মধুর চিত্রটিকেই প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু আমার স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেছে। যদি সেই মাহেন্দ্রক্ষণই কোন দিন জাতির ভাগ্যে উদয় হয় ত ইতিহাসের অন্ধকারময় পৃষ্ঠায় থাকবে আমাদের কাহিনী।"

অরুণ আর থাকিতে পারিল না—উল্লাসে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল, "না ভাই, তোমার স্থান এ সবের বহু উর্দ্ধে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, ও হৃদয়ের অনির্ব্বাণ হোমানল উল্লাসে মনের সকল রন্ধ্রপথ অধিকার করেছে; সংসার, সমাজ, নীচতা অগ্রসর হলেই ভস্ম হয়ে যাবে। চল, আজ মীর্জ্জাপুর পার্কে মিটিং আছে।"

তেজেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "কিন্তু বিবাহিতের—"

অরুণ উচ্চহাসি হাসিয়া কহিল, "কে বিবাহিত নয়? বড় বড় নেতা—যাঁরা আজ জীবন পণ ক'রে এ যুদ্ধের বরণীয় পদ গ্রহণ করেছেন, সকলেই ত বিবাহিত। তাঁদের পত্নীরা আজ স্বামীর কর্ম্মসঙ্গিনী। শক্তি যদি না জাগেন ত সাধ্য কি পুরুষরা সাফল্যলাভ করে।"

সে দিন রাত্রিতে তেজেশ বাড়ী ফিরিল না। মাতা উদ্বিগ্ন-মুখে বারংবার কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া প্রভাতেই তিনি কর্ত্তার কাছে কাঁদিয়া জানাইলেন, ছেলে না ফিরিলে তিনি জলস্পর্শ করিবেন না।

কর্ত্তা গম্ভীরমুখে বাড়ীর বাহিরে গেলেন ও কতক্ষণ পরে একখানা খবরের কাগজ হাতে ততোঽধিক গম্ভীর-মুখে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণীর সম্মুখে কাগজখানা নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "নাও, আর কান্না কেন? গুণের ছেলে স্বদেশী কর্‌তে গিয়ে জেলে ঢুকেছেন! সেই কালেই না বলেছিলুম, ও আপদ্ থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল? এখন ভোগ কর—তার ফল!"

গৃহিণীর কণ্ঠ হইতে আর্ত্তনাদ বাহির হইল না, আড়ষ্ট নয়ন মেলিয়া তিনি সেই কাগজখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৪

দিনের সমষ্টিতে মাস ও মাসের সমষ্টি লইয়া বৎসর ঘুরিয়া গেল। কারারুদ্ধ তেজেশের কল্পনার সৌধ দিনে দিনে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

এক দিন সে জেলের সঙ্গী অরুণকে বলিল, "জানি না, কেন আজ বাড়ীর জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন করছে। বাইরে এসে বাড়ীর মায়া যেন ধীরে ধীরে আমায় গ্রাস করছে, আর বাড়ীতে থাকতে ভাবতুম, যেন জেলখানায় আছি। কেন এমন হয়, ভাই?"

অরুণ তাচ্ছীল্যভরে কহিল, "ও দুর্ব্বলতা!"

তেজেশ কহিল, "বোধ হয় তাই, কিন্তু সত্যি ক'রে বল দেখি ভাই, এমন ক'রে কারাবরণ ক'রে কত দিনে আমরা স্বরাজ পাব?"

অরুণ কহিল, "তা ছাড়া পথ কি? নিরুপদ্রব অসহযোগ ভিন্ন ভারতের মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নেই। জগৎ তার ক্ষাত্রশক্তিতে মদগর্ব্বিত হয়ে রক্তপাতের আয়োজন ক'রে এসেছে; ভারত তাকে শেখাবে, বিনা রক্তপাতে শস্ত্রহীন হয়ে দৃঢ়প্রাণ জাতিও স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে। এই ত আমাদের আদর্শ। বাহুবলের চেয়ে মনের বল অনেক উর্দ্ধে, এ শিক্ষা ভারতই জগৎকে দেবে।"

তেজেশ কহিল, "না ভাই, আমি অনেক দিন ধ'রে ব'সে ব'সে ভেবেছি, ও পথ আমাদের নয়।"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "তুই ভুলে যাচ্ছিস, তেজেশ যে, ভারত চিরকাল এই আদর্শই প্রচার ক'রে এসেছে। উগ্র য়ুরোপের বীজ এনে এই শান্ত-শীতল দেশে বুনলে যে ফসল হবে, তা মরু-মরীচিকার মত জাতির ভাগ্যে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। আমরা চাই শান্তি—আমাদের লক্ষ্য জীবনের পূর্ণতম বিকাশ। দুর্গম কান্তারে—গিরি-গুহায় যুগ-যুগান্তর ধ'রে আমাদের বরণীয় মুনি-ঋষিরা স্বাধীন অন্তরে যে অমৃতের আরাধনায় নশ্বর দেহ তপস্যায় ক্ষয় ক'রে গেছেন, তাঁদের সেই অমৃতবাণী অনুসরণ ক'রে ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য বিরাট্ প্রেমের সুবর্ণ-মন্দিরে আমাদিগকে পৌঁছিতে হবে।"

তেজেশ হাসিয়া কহিল, "ও কল্পনা। আমাদের মুক্তির কোন যুক্তিই ওর মধ্যে নেই।"

অরুণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "এরই মধ্যে আমাদের মুক্তি, জগতের মুক্তি। অন্তরে অন্তরে সমস্ত জাতিই এই মুক্তি কামনা করে। পরস্পরের শক্তি বাহিরে ও অন্তরে শুধু বিভীষিকা বিস্তার করে বৈ ত না। কিন্তু হিংসাশূন্য ভাল-বাসা অন্তরে অন্তরে উদ্বেগহীন মধুর হাস্যধারা ফুটিয়ে তুলে চিরসন্ধির প্রশান্ত তৃপ্তি কালের কষ্টিপাথরে লিখে রাখবে। সেই হবে প্রকৃত সন্ধি।"

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। অরুণের জলন্ত বাণী সেই ক্ষুদ্র অপরিসর কারাকক্ষে ধ্বনিত হইয়া তেজেশের অন্তরে যে তরঙ্গ তুলিল, তাহা এই ভারতেরই পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিল-সম্ভূত।

কিয়ৎক্ষণ পরে তেজেশ বলিল, "দেখ অরু,—আমার সাম্‌নে যেন একটা নূতন জগৎ খুলে গেছে। ত্যাগ, তপস্যা, শান্তি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা সে জগতের সম্পদ্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু, সবই যেন মায়াপ্রপঞ্চ।"

অরুণ কহিল, "ও বীজ সন্ন্যাসের। অলস জীবনের নিষ্ক্রিয় শান্তি—আমরা চাই না। আমরা চাই কর্ম্মময় জীবন —শুদ্ধ, শান্ত, নির্ম্মল। আমাদের জন্ম মাটীতে, কর্ম্ম মাটীতে। মাটীর তপস্যা ক'রে সুখ-দুঃখকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অন্তরে অন্তরে প্রেমের আলোয় ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা যে দীপ জ্বালাবো, তাতে দাহ থাকবে না, থাকবে শুধু আলো। আজ অতীত ভারতের সেই মহান্ বাণীই নিভৃত সবরমতীর আশ্রমপ্রান্তে সামগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। যে মহাত্মা এ বিশ্বকল্যাণের কালজয়ী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তাঁকে আমরা ঋষি কিংবা দেবতা ব'লে পূজা করবো না, তাঁকে পূজা করবো জগতের শ্রেষ্ঠ মানব ব'লে।"

তেজেশ বলিল, "তবে অসহযোগ ব্রত কেন? বিশ্বকে যদি ভাই ব'লে ভালোবাসতে পারি ত এ সব অধীন-পরাধীনের প্রশ্ন কেন? এ সব সম অসমের দ্বন্দ্ব কেন?"

অরুণ কহিল, "এই দ্বন্দ্বই যে কর্ম্মের নামান্তর। ভ্রূকুটিকে শাসন করতে হ'লে স্মিতহাস্য সব চেয়ে বেশী উপযোগী। রক্ত আঁখি রক্তপাতেরই সূচনা করে, কোনকালে শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এই অসহযোগরূপ মহান্ কর্ম্মে আমরা আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে জগতে জাতির আসন গ'ড়ে তুলবো। আমরা আত্মার বলে স্বাধীন হ'ব—হীন কলুষিত ষড়যন্ত্রে নয় বা পশুশক্তির হিংসা-দ্বেষে নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেছি, হয় ত ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন হবে না। যখন জয়ী হবার সমস্যা অন্তরে জাগে, তখন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রই আবিষ্কার ক'রে জাতির হাতে তুলে দেন। সেই ক্ষমাময় হিংসাশূন্য শ্রেষ্ঠ পবিত্র অস্ত্র—আজ আমাদের শস্ত্রগুরু আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সে অসহযোগ।"

তেজেশ শ্রদ্ধাভরে অরুণের তেজোদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিল, "এই সাধনাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক। আজ থেকে এই অহিংস ব্রতই গ্রহণ করলুম।"

৫

কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা তেজেশের এই বাসনাকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য যে মমতার দুঃখময় নিগড় রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ত সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

দীর্ঘ তিনটি বৎসর পরে বাড়ী আসিয়া তেজেশ দেখিল, শ্রীহীন গৃহে প্রবল অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পিতা অপূর্ণ 'রায় বাহাদুরী' লইয়া লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য-বৈভবও নিশাস্বপ্নের মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! বিধবা জননীর মর্ম্মভেদী হাহাকার ও অন্তরাল-স্থিত এক শীর্ণা নারীর অস্ফুট বিলাপ ছাড়া আর কিছুই শ্রবণগোচর হয় না!

মুক্তির মাঝেও এমন কঠোর শৃঙ্খল কোন্ বন্দীর জন্য? কোন্ নিষ্ঠুর উহা রচনা করিল?

মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সেই ত এলি! মাস কতক আগে যদি আসতিস ত হাতের আগুনটুকু পেতেন।"

তেজেশ ভাবিল, তাহার না আসার জন্য দায়ী কে? হিন্দুর ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া ত শাসনের বিধি নহে?

ক্রন্দনের প্রথম আবেগটা কাটিলে মা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "কি যে মতিচ্ছন্ন হয়েছিল—রায় বাহাদুরী পাবার জন্য! যেন উঠে প'ড়ে লাগলেন। জলের মত টাকা খরচ হয়ে গেল, শেষে দেনা করেও বড় বড় জজ-ম্যাজিষ্টরকে ভোজ দিয়েছিলেন।"

খানিক থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "তাই ত আজ আমাদের এই অবস্থা। বাড়ী বাঁধা—তারা দয়া ক'রে দু'দিন মাথা গুঁজে থাকতে দিয়েছে। কোন দিন এক মুঠো জোটে, কোন দিন তাও না।" আবার অশ্রুভারে তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল।

তেজেশ নিরুত্তরে সমস্ত শুনিয়া যাইতেছিল। উহা যেন আর এক পৃথক্ জগতের কাহিনী। এখানকার দুঃখ-কষ্ট নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু মর্ম্মভেদী। এ অনল-পরীক্ষাতেও মানুষ মরে;—কিন্তু সে মৃত্যু অক্ষয় জীবনের ভবিষ্যৎ সূচনা করে না। সে মৃত্যু যথার্থ অবসান—পঞ্চভূতের মায়াপ্রপঞ্চ, নশ্বর ধূলিকণায় চিরদিনের তরে বিলীন হইয়া যায়।

যন্ত্রচালিতের মত তেজেশ বলিয়া উঠিল,—"তুমি বারণ করনি কেন, মা?"

মা কহিলেন, "কাকে বারণ করবো বল?—তিনি ত সে মানুষই ছিলেন না। কেবল বলতেন—'কেন বাধা দাও, আমি কি কিছু বুঝি না? টাকাকড়ি সর্ব্বস্ব যায়—যাক্—যে ক্ষতি আমার হয়েছে, তা ফিরিয়ে পাব—যদি সরকারী সম্মানটা পাই!' উঃ, সেটুকুও যদি পেতেন! মরবার সময় কি ব'লে গেছেন জানিস্? 'তেজেশকে আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি,—যাতে তার আত্মতৃপ্তি, সেই পথেই সে চলুক, তাতে সে সুখী হবে। আমার মত আজীবন দুরাশা নিয়ে'—" কথা শেষ হইল না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগ রোধ করিতে তিনি মুখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন।

এতক্ষণে তেজেশের নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহারই স্নেহময় হতভাগ্য পিতা কি নিদারুণ দুঃখই না আজীবন ভোগ করিয়াছেন! শেষে মৃত্যুকালে সেই দুঃসহ দুঃখকেই সম্বল করিয়া পরলোক-প্রয়াণ করিলেন!

তেজেশ দেখিল, তাহারও সম্মুখে যে সঙ্কীর্ণ পথ পড়িয়া আছে, তাহাও এই দুঃখ-কষ্টের অন্ধকারে মসীময়। ওই কোটি-নিপীড়িত ভারগ্রস্ত ক্লান্ত চরণের চিহ্নে চিহ্ন মিলাইয়া তাহারও অগ্রগতি আরম্ভ হইয়াছে।

স্বরাজ, অসহযোগ, শান্তির প্রেমময় তরু আজ রুক্ষ জীবন-প্রান্তরে শুধু প্রাণধারণের, শুধু সংসারপ্রতিপালনের সমস্যা লইয়া ফলহীন শুষ্ক বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, অধে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে ঐ একই সমস্যা একই প্রশ্নে সমস্বরে চীৎকার তুলিয়াছে—কর্ম্মের আগে সংসারকে রক্ষা কর, জীবনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দাও, শুধু প্রাণধারণের বিড়ম্বনা লইয়া অনন্তকাল সমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাও।

পরদিন অরুণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবি ঠিক করলি?"

তেজেশ ম্লান হাসিয়া বলিল, "একমাত্র করণীয় কর্ম্ম সম্মুখে রয়েছে দেখছি, সে অন্ন-সমস্যার সমাধান। কাল থেকে চাকরীর যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপরিবারের ভরণ-পোষণে মনোযোগ দেব। বাঙ্গালার মাটীতে এই একই ফসল ফলে, অরুণ! এই একই সমস্যা সেখানে সর্ব্বকর্ম্মকে ছেয়ে ফেলেছে!"

অরুণ কহিল, "কিন্তু চাকরী কোথায় পাবি হঠাৎ? তার চেয়ে এক কায কর। কংগ্রেস অফিসে গিয়ে দূর-পল্লীর প্রচারকার্য্যের ভার চেয়ে নে—তোর খাওয়া-পরার ভাবনা ভাবতে হবে না।"

তেজেশ প্রশ্ন করিল, "আর পরিবার ?"

অরুণ কহিল, "সে যা হয় ক'রে চ'লে যাবে।"

তেজেশ কহিল, "না অরুণ, তা চলে না। অনেক সমস্যার সমাধান মনে মনে হয়, কূটতর্কের খণ্ডন যুক্তিজালে করা যায়; কিন্তু এ যে দেহধর্ম্মী, প্রত্যক্ষ। আমি স্থির করেছি পল্লীতেই ফিরে যাব, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য আমার এই সহরের ধূলিজঞ্জালেই বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছি।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, "এ ঘটনায় একটা মহৎ শিক্ষা আমার হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—দেশের নারীশক্তির জাগরণ না হ'লে যুগ যুগ ধ'রে আমরা পেছিয়েই থাক্‌বো। আজ যদি সে শিক্ষা-সম্পদ্ আমাদের থাকতো ত ঐ দুটি অসহায়া রমণী এমন ভারগ্রস্তের মত আমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উল্টে দিতেন না। ওঁরা শুধু নিজেদের জীবিকাসংস্থানই করতেন না, আমার পাশে দাঁড়িয়ে কর্ম্মে উৎসাহ দিতেন, প্রাণে শক্তি সঞ্চার করতেন।"

* * * *

বিদায়দিনে ষ্টীমার-ঘাটে অরুণ যখন আসিল, তখন ষ্টীমার বাঁশী বাজাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তেজেশ সম্মুখের রেলিঙে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ করি অরুণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। অরুণ সঙ্কেতে তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল। তেজেশ সে সঙ্কেতের প্রত্যুত্তর দিল। কিন্তু তেজেশের মুখ আজ বড় ম্লান, দৃষ্টি ব্যথাভরা—করসঙ্কেত প্রাণহীন। তীরে দাঁড়াইয়া অরুণ দেখিল, শত শত যাত্রীর মধ্যে ঐ একটিই জীবন্ত প্রাণী—শৃঙ্খলের পীড়নে ব্যথিত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে। বুঝি উহারই ঘন ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাসে গঠিত ধূম্রকুণ্ডলী ঊর্দ্ধ আকাশের স্বচ্ছ নীলিমাকে আবৃত করিতেছে। ধূম্রমণ্ডলের আরও ঊর্দ্ধে সূর্য্য তাই পাংশু-মলিন !

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

অভিশাপ

সাধনায় আমি পেয়েছিনু সখি সৌরভ-লাভে বর,—
রূপ—তাও যেন কিছু কিছু মোরে দেছিল প্রণয়-দেবতা;
ছিল যা তা ঢের সাজাতে এ রাতে সাধের বাসর-ঘর—
সবি মিছে হায়,—দেবতাই বুঝি জানে শুধু কেন তা !

উপরে ঝরিবে চাঁদের তারার কিরণ অলকানন্দা,
মৃদু মন্থর লুটাবে সমীর মদির সুরভি ভারে,—
আমি প্রেমালোকে তারি মাঝখানে ফুটিব রজনীগন্ধা,
নিশিভোরে হিয়া রিক্ত করিয়া দিয়ে যাব দেবতারে !

ছায়াপথে নামি আসিবে পরীরা শিশিরাঞ্চল উড়ায়ে
দূরে নীহারিকা স্তব্ধ—চাহিয়া রহিবে আকাশমাঝ;
ভুলে-যাওয়া আর মনে-পড়া যত গানগুলি সব কুড়ায়ে,
জাগিয়া উঠিবে চৌদিকে মোর শুভ-সঙ্গীত-সাঁঝ !

বল্ বল্ সখি—সত্যই সে কি সেই দেবতার বর
অথবা তাহার লীলা-কুহেলির ক্রূরতম উপহাস।
কেন সে আঁকিল মোহ অঞ্জন এ আঁখি-পাতার পর—
প্রভাতের রবি কেন দিল ঢেকে মেলি কুজ্ঝাটি-বাস ?

ঝঞ্ঝার দূত সন্ধ্যারই আগে করেছে নিমন্ত্রণ
মরণেরে আজি মধু-যৌবন-ফুল্ল বাসরে মোর;
মিলালো আঁধারে বাসর-বাতির মৃদু শিখা শিহরণ,
অধরের হাসি না ফুটিতে হায় ঝরিল নয়ন-লোর !

উন্মাদ হাওয়া দস্যুর মত লুটেছে হৃদয়খানি,
গানগুলি কোথা দিয়াছে উড়ায়ে ক্রূর নিশ্বাসে তার,
জলভরা মেঘ উপরে কত না করিয়াছে কানাকানি,
সৌরভটুকু ধুয়ে মুছে দেছে ঝরঝর জলধার।

কাল যদি সখি ফুটে তারা চাঁদ, ঝরে ধারা কিরণের
বাসর-শ্মশানে আসে যদি নেমে সুরতরুণীর দল—
বলিস তাদিগে,—সেই নেই শুধু, আছে স্মৃতি বিদায়ের
ভূমিতে লুটায় মৃত্যু-মলিন দুচারিটি তার দল !

দেবতা আমারে দিয়েছিল বর, বিনিময়ে তারে ডাকি—
—হোক্ সে দেবতা—যাবার সময় দিয়ে যাই অভিশাপ,
এমনি অন্ধ বিচারে তাহার অন্ধ হইবে আঁখি
কলঙ্করূপে হবে ভূষা তার প্রণয়ের যত পাপ !

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

খদির-শিল্প

এসিয়া-খণ্ডের দক্ষিণাংশে খদির সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। যে সমস্ত দেশে পানের প্রচলন আছে, সে সকল দেশে ত' খদির অবশ্য সকলেই খুব চেনে ; তদ্ভিন্ন কয়েক প্রকার শিল্প ও ঔষধার্থ ব্যবহারের জন্যও খদির অন্য দেশেও বিদিত। কিন্তু সকল প্রকার খদির এক গাছ হইতেই প্রস্তুত হয় না। ভারতের খদির Acacia Catechu Willd নামক গাছ হইতে পাওয়া যায় ; কোচিন, চীন, শ্যাম, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির খদির Uncaria Gambier Hunt নামক গুল্ম হইতে উৎপাদিত। শেষোক্তকে সাধারণতঃ পাপড়ি খয়ের বলা হয়। গুল্মের তরুণ শাখাগ্র ও পল্লব জলে কিছুক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া কাথ বাহির করিয়া, পরে উক্ত কাথকে আবার ঘনীভূত ও শুষ্ক করিলে পাপড়ি খয়ের পাওয়া যায়। পাপড়ি খয়ের সামান্য পরিমাণে ভারতে আমদানী হয় ও আবার রপ্তানীও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতীয় দ্রব্য নহে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার আলোচনা অনাবশ্যক। খদিরের ব্যবহার বহু পুরাকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদে কৃষ্ণ ও পাণ্ডু খদির উভয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খদিরের ইংরাজী প্রতিশব্দ ক্যাটেচু (Catechu), দাক্ষিণাত্যের কানাড়ীয় ভাষায় কাচু শব্দ হইতেই সম্ভবতঃ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে খদিরের প্রথম প্রচার হয় ; সে সময়ে ইহা জাপান দিয়া য়ুরোপে যাইত ; ভ্রমক্রমে অনেকে ইহাকে জাপানী মাটী-বিশেষ (Terra Japanica) বলিয়া মনে করিত ; কিছু দিবস পরে উক্ত ভ্রম সংশোধিত হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মালাবার ও সিংহল খদির রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র ছিল।

খদির-বৃক্ষ

খদির ভারত ও ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায়। ইহা মধ্যমাকারের তরু হইয়া থাকে। বাবলার ন্যায় ইহারও কাঁটা আছে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা পীতবর্ণ পুষ্প প্রসব করে। শুষ্ক কঙ্করময় স্থান ও নদীতীর উভয় প্রকার স্থানেই খয়ের-গাছ জন্মায় ; ভারতের সমতল ভূমি হইতে হিমালয়-গাত্রে ৩ হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত খদির-তরু দৃষ্ট হয় ; শাল, শিশু প্রভৃতির মিশ্র অরণ্যে ও নানাপ্রকার আশু পত্রপতনশীল (deciduous) বৃক্ষের জঙ্গলে খদির সুলভ। পশ্বাদি-চারণ অথবা জঙ্গল পোড়ানর জন্য ইহার তত ক্ষতি হয় না। বড় খয়ের-গাছের কাণ্ডের নিম্নভাগের বেড় ৩।০-৩।০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গৌণ আরণ্য ফসলের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে ; বিঘা প্রতি খয়ের-গাছ হইতে বৎসরে প্রায় দুই টাকা করিয়া লাভ হয়। খয়ের কাঠ খুব শক্ত ও ভারী ; ইহা উইপোকা কিম্বা সামুদ্রিক কীট দ্বারা আক্রান্ত হয় না। মোটা ধরণের গৃহ-সজ্জা, কৃষি-যন্ত্রাদি, চাউল প্রস্তুতের উদূখল, তৈল-প্রস্তুতের ঘানি, আকমাড়া কল ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার জন্য খদিরকাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ; তদ্ভিন্ন খয়েরকাঠের কয়লাও নানাস্থানে ইন্ধনের কার্য্য করে। খয়েরের আঠা বাবলা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ; সেই জন্য ইহার গঁদ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

ভারতে খদিরের তিনটি উপজাতি অথবা ভেদ দৃষ্ট হয় :—(১) Var. Catechu—ইহার সংখ্যা উত্তর-পশ্চিম-ভারতেই অধিক ; কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ইহা প্রসারিত ; পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের পশ্চিমাংশের খয়ের এই উপজাতি হইতে উৎপন্ন। (২) Var. Sundra—ইহা প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের এবং পশ্চিম-ভারতের গাছ ; মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের এবং কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানায় এই উপজাতিই অধিক জন্মায় ; ব্রহ্মদেশেও ইহার জঙ্গল আছে। সাধারণতঃ ইহাকে লাল খয়ের বলা হয়। (৩) Var. Catechuoides—ইহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি উপজাতির অন্তর্ব্বর্ত্তী ; বিহারের পূর্ব্বাংশ, বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ ভিন্ন অন্যত্র এই উপজাতি দৃষ্ট হয় না। খদিরের এই তিনটি উপজাতি উদ্ভিদতত্ত্বের হিসাবে পৃথক্, কিন্তু ইহাদের গুণাগুণের পার্থক্য আছে কি না, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

বিভিন্ন-প্রকার খদির

বাজারে নানাপ্রকার খয়ের দেখিতে পাওয়া যায় ; সাধারণ নাম এক হইলেও ইহাদের মধ্যে আকার, গঠন, বর্ণ, স্বাদ ও অন্যান্য গুণের অনেক পার্থক্য আছে। ইতিপূর্ব্বে যে পাপড়ী খয়েরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে ইংরাজীতে Pale Catechu বলা যায়। কিন্তু ভারতীয় খয়েরের মধ্যেও ঘন-বর্ণ (Dark) এবং পাণ্ডু (Pale) বর্ণযুক্ত দুই প্রকারের খয়ের রহিয়াছে। ইংরাজীতে এই দুই শ্রেণীর নাম যথাক্রমে Cutchu এবং Catechu। ঘন বর্ণযুক্ত খয়ের দেখিতে কৃষ্ণাভ পাটলবর্ণ ; সাধারণতঃ এই শ্রেণীর খয়ের প্রায় গোল, চেপ্টা, পাতলা অথবা চতুষ্কোণ মোটা মত আকারে বিক্রয় হয় ; এগুলিকে ভাঙ্গিলে ভিতরের অংশ চক্‌চকে ও নিরেট গোছের দেখায়, এ স্থলে ইহা কৃষ্ণ-খদির নামে অভিহিত হইল ; ইহা কয়েক প্রকার শিল্পে ও

চামড়ার কাযের জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, পাণ্ডু খয়েরের ব্যবহার ঔষধ ও পাণের মসলারূপে। ইহার গঠন ছিদ্রবহুল, সন্তর ও ইহা দেখিতে মৃত্তিকার ন্যায়। ভারতে পাণ্ডু খয়েরই অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয় শ্রেণীর খদিরের উৎপত্তির মোকাম হিসাবে উহাদের বিভিন্ন বাজার-নাম আছে, যথা—রেঙ্গুন, পেগু, জনকপুরী, কমাওনী, বা গুজরাটী ইত্যাদি। এগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং একই মোকামের খয়ের যে সকল সময় সমগুণ-বিশিষ্ট হয়, তাহাও নহে। তৎসমুদয়ের মধ্যেও ইতরবিশেষ থাকে।

হইয়া থাকে। কারখানা ঠিক হইলে খয়ের-গাছ কাটিতে আরম্ভ করা হয়। গাছ কাটিয়া গুঁড়ি হইতে তরুশাখা-প্রশাখাদি ছাঁটিয়া ফেলা হয়; কাণ্ডেরও বহির্ভাগের কাষ্ঠস্তর (Sap wood) বাদ দেওয়াও নিয়ম। ভিতরের সারকাষ্ঠ (Heart wood) তৎপরে পাতলা পাতলা ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া কয়েকটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া, প্রত্যেক পাত্রে প্রায় আধ মণ জল দিয়া উনুনে চড়াইয়া সিদ্ধ করা চলিতে থাকে। জল ফুটিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেলে পাত্র নামাইয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ২০।২৫টি পাত্রে প্রস্তুত ক্বাথ একটি বৃহৎ লৌহ-কটাহে ঢালিয়া

খদির-বৃক্ষের মিশ্র-জঙ্গল—সম্মুখে খদির ও শিশু—পশ্চাদ্‌ভাগে শাল

কৃষ্ণ-খদির

কৃষ্ণ-খদির প্রস্তুত সরকারী অথবা বে-সরকারী জঙ্গল-সমূহের অন্যতম শিল্প। কোন কোন স্থলে সরকার স্বয়ং ইহা প্রস্তুত করেন; কিন্তু অনেক স্থলে খয়ের-জঙ্গলের নির্দ্দিষ্ট অংশ খয়ের প্রস্তুতের জন্য কিছুদিনের (সাধারণতঃ চারি মাস) নিমিত্ত ঠিকা দেওয়া হয়। বর্ষারম্ভ হইতে শীতের শেষভাগ পর্য্যন্ত খদির-বনে কায হইয়া থাকে; অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাসই কিন্তু খদির প্রস্তুতকারিগণের মরসুম বলিতে পারা যায়। কাটিবার মত বৃক্ষ নির্ব্বাচনের পরই খদির-কারখানার জন্য অস্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণ প্রথম কার্য্য; তৎপরে কতিপয় ছোট উনুন ও একটি অথবা আবশ্যকমত ততোধিক বড় উনুন তৈয়ারী করা দরকার। খয়ের-গাছের অনাবশ্যক অংশই প্রধানতঃ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত

ফোটান তৎপরবর্ত্তী কার্য্য। ক্বাথ ফুটিয়া এরূপ অবস্থায় আসা দরকার যে, উহাকে ঠাণ্ডা করিলে জমিয়া যাইতে পারে। তখন কড়া অগ্নুত্তাপ হইতে সরাইয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা দ্বারা ক্রমাগত আলোড়ন করা হয়। কেহ কেহ আধ ঘণ্টা আলোড়নই যথেষ্ট মনে করেন; আবার কোন কোন স্থলে চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া এই কার্য্য চলিতে থাকে। পূর্ব্ব হইতে ইটের ফরমার ন্যায় এক বড় ছাঁচ-বিশিষ্ট ফরমার ভিতর দিকে এক স্তর পাতা সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। ঘনীভূত ক্বাথ প্রায় শীতল হইয়া আসিলে উক্ত ফর্ম্মার খোপে খোপে ঢালিয়া দিয়া ফর্ম্মা-গুলি রাত্রির মত যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরদিন ঐগুলিকে বাহির করিয়া আবশ্যকমত আকার অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি কটাহে প্রত্যেক মরসুমে (Season) ৬০।৭০ মণ খয়ের প্রস্তুত হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে কখনও কখনও দুইবার সিদ্ধ করা হয়, কিন্তু একবার সিদ্ধ করিলেই প্রায় সমস্ত সারাংশ বাহির হইয়া আসে। কোন কোন স্থলে গাছের কাণ্ড না কাটিয়া শুধু মোটা মোটা শাখা ছেদন করার প্রথা আছে; বলা বাহুল্য যে, সেরূপ স্থলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ আবশ্যক হয়। অল্প অথবা অধিকবয়স্ক গাছ হিসাবে খয়ের উৎপাদনের তারতম্য হয়। গড়-পড়তায় মাঝারি বয়সের গাছের ১ মণ কাঠ হইতে প্রায় ৫ সের খয়ের পাওয়া যায়। প্রচলিত খয়ের প্রস্তুতপ্রথা বহু প্রাচীন হইলেও ইহা অপচয়মূলক; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কাণ্ডের পাতলা টুক্‌রা অপেক্ষা যন্ত্র দ্বারা 'চোক্‌লা' (Shavings) তুলিয়া সহজে অধিক পরিমাণে সার নিষ্কাশন করা যায়। কাঠের পরিমাণের বিশগুণ জল না দিয়া, তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা আরও কম জল দিয়া ফুটাইলে একই কায হয়, এবং সাধারণতঃ যেরূপ ১২ ঘণ্টা কাল টুক্‌রা সিদ্ধ করা হয়, 'চোকলা' হইলে তাহা অনাবশ্যক; এক ঘণ্টা ফুটাইলেই উত্তম ক্বাথ প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন লৌহ-কটাহের পরিবর্ত্তে তাম্র-কটাহের চলন খুবই বাঞ্ছনীয়। তাহাতে খদিরের বর্ণ এক দিকে যেমন অনেক ভাল হয়, অন্য দিকে উহার উৎকর্ষতাও তেমনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ-খদিরের মূল উপাদান Catechu tannin; উহা ক্বাথে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে। Catechu tannin শীতল জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

পাণ্ডু-খদির

প্রকৃত পাণ্ডু-খদির বাজারে অধিক হইলেও, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কুমায়ুনের ও অযোধ্যার কয়েকটি স্থানের পাণ্ডু-খদির প্রসিদ্ধ। যে সকল খদির-বৃক্ষের অন্তঃকাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগযুক্ত, তৎসমুদয় হইতেই সমধিক পরিমাণে পাণ্ডু-খদির পাওয়া যায়। Catechu উপজাতীয় গাছেই এই-রূপ দাগ অধিক দেখা যায়; সেই জন্য সাধারণতঃ ব্রহ্ম-খদির অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম-ভারতের পাণ্ডু-খদিরকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়। কৃষ্ণ-খদিরে দানা নাই; পাণ্ডু-খদির কিন্তু দানাদার (Crystalline); ইহার প্রস্তুত-প্রণালীও কিছু বিভিন্ন। কাল-খয়ের তৈয়ারীর ন্যায় ইহার জন্যও কাঠের টুক্‌রা সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করা হয়। পরে ক্বাথের ভিতর এক একটি ক্ষুদ্র শাখা ডুবাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উহার গাত্রে পাণ্ডু-খয়ের দানা বাঁধিয়া জমিয়া যায়। তখন শাখাগুলি বাহির করিয়া লইয়া খয়ের চাঁছিয়া পৃথক্ করত গোল কিম্বা অনিয়মাকারে ছাঁচে রাখিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে। শুষ্ক হওয়ার পর পাণ্ডু-খয়ের ফিঁকে বর্ণের দেখায়। পাণ্ডু-খদিরের মূল উপাদান Catechin। কৃষ্ণ-খদিরে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ Catechix আছে। বিশেষভাবে পরিশোধিত হইলে ক্যাটেচিনের বর্ণ প্রায় বিলোপ পায়। উহা শ্বেত-খদির নামে পরিচিত। ক্যাটেচিন্ শীতল জলে দ্রবণীয় নহে; কিন্তু উষ্ণজলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবণীয়। উত্তর-ভারতে পাণ্ডু-খদিরের সাধারণ নাম কাথ অথবা কাথ্থা; অনেক স্থলে কৃষ্ণ-খদিরের সহিতই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কেতকী, মৃগনাভি ইত্যাদি দ্বারা সুরভিত পাণ্ডু-খদির প্রস্তুত হইত; এক্ষণে সেরূপ খদির প্রায় দেখা যায় না।

ব্যবহার ও গুণ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষ্ণ-খদিরের প্রধান ব্যবহার চামড়ার কাযের জন্য। তদুদ্দেশ্যে ইহা ভারতে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশেও চালান যায়। দাক্ষিণাত্যে যে নানাপ্রকার দ্রব্যের উপর গিল্‌টি করা হয়, দ্রব্যবিশেষের গাত্রে সেরূপ নক্সা করিতে হইলে প্রথমতঃ খদির দ্বারা জমী প্রস্তুত করা আবশ্যক। খদিরের আল্‌গা দ্রব্য জমাইবার ও ছিদ্র বন্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। সেই জন্য ইহা ছাদ পিটিবার মসলারূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধের সময় বিমানপোতের বিশেষ বিশেষ অংশ মেরামত করিবার জন্য একটি পেটেণ্ট দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া কোন কোম্পানী প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে প্রকাশ পায় যে, উক্ত দ্রাবণের মূল উপাদান কৃষ্ণ-খদির। প্রধানতঃ সঙ্কোচক-(astringent)রূপে পাণ্ডু-খদির ঔষধে ব্যবহৃত হয়। উদরাময়ে, মুখের ভিতরের ও দাঁতের মাড়ির ক্ষতে ও পুরাতন ঘায়ে খদিরের চূর্ণ, অরিষ্ট অথবা প্রলেপের ব্যবহার আছে। বিদেশে ভারতীয় পাণ্ডু-খদিরের প্রসার হ্রাসপ্রাপ্তির প্রধান কারণ কৃষ্ণ-খদিরের সহিত উহার সংমিশ্রণ। এক হিসাবে কৃষ্ণ ও পাণ্ডু-খদিরের গুণ পরস্পর-বিরোধী। কৃষ্ণ-খদিরে যদি ক্যাটেচিন্ না থাকে, তাহা হইলেই উহা উত্তম কসরূপে কার্য্য করে; অন্যদিকে পাণ্ডু-খদিরে যত অধিক পরিমাণে কৃষ্ণ-খদির সংমিশ্রিত থাকে, ততই উহা পানে খাওয়ার ও ঔষধার্থে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। খদির প্রস্তুত-প্রণালী এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, যাহাতে কৃষ্ণ ও পাণ্ডু-খদিরের সংমিশ্রণ না হয়। প্রচলিত প্রণালীর সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ কাষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ৪।৫ দিবস রাখিয়া দিলে পাণ্ডু-খদির দানা বাঁধিয়া নীচে জমিয়া যায়। তখন ক্বাথের সহিত আরও কিছু ঠাণ্ডা জলসংযোগ করিয়া ছাঁকিলে পাণ্ডু-খদিরের দানাগুলি পৃথক্ হইয়া যায়। তাহাকে চাপ দিয়া ও আবশ্যকমত আকারে কাটিয়া শুষ্ক করিলেই উৎকৃষ্ট পাণ্ডু-খদির প্রস্তুত হইল। অবশিষ্ট জলীয়াংশ কৃষ্ণ-খদির প্রস্তুতের চলিত প্রথায় কটাহে ফুটাইয়া ঘন করিলেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-খদির পাওয়া যাইবে। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় প্রকার খদিরই যেমন বিশুদ্ধ হইবে—তেমনই অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, বাজারে যে সকল খয়ের পানে খাওয়ার খয়ের বলিয়া সচরাচর বিক্রয় হয়, তৎসমুদয়ে কৃষ্ণ-খদির একমাত্র সংমিশ্রণ নহে। ধূলা-বালি ব্যতীত খড়ি ও সাবান-পাথরের (Soap-stone) গুঁড়া, কতিপয় জঙ্গলী কন্দের পালো এবং আঠাও ভেজাল দিয়া সস্তা-খয়ের প্রস্তুত হয়। এগুলি ঠিক বিষাক্ত দ্রব্য না হইলেও এরূপ খয়ের দ্বারা লোক যে প্রতারিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে, এরূপ অবৈধ সংমিশ্রণের উপর সম্প্রতি সামান্য পরিমাণে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

খদির-বৃক্ষজাত আর একটি দ্রব্যের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়

—উহা খীরশাল অর্থাৎ খদির-সার। কোন কোন খদির-বৃক্ষ খণ্ড করিবার সময় দেখা যায় যে, কাঠের ভিতর এক প্রকার শ্বেতাভ পিণ্ড নিহিত রহিয়াছে—ইহাই খীরশাল। কাঠুরিয়াগণ ইহা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। দেশীয় চিকিৎসায় বংশলোচনের ন্যায় এক সময় ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, কিন্তু এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহা কষায়-মিষ্ট-স্বাদ-যুক্ত, দানাদার এবং পাণ্ডু-খদিরের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট।

ব্যবসায়

ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে খদির-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, সে সমস্ত প্রদেশে অল্প-বিস্তর পরিমাণে খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোট কত পরিমাণ খদির যে ভারতে উৎপাদিত হয় এবং তন্মধ্যে দেশমধ্যে কাটতি ও বিদেশে চালানের পরিমাণ যে কত, তাহার সঠিক অঙ্কাদি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশেই উৎপাদনের মাত্রা সমধিক। বন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত অঙ্কাদি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্রহ্মদেশে দেড় লক্ষ, দাক্ষিণাত্যে ৫ শত, বোম্বায়ে ১ হাজার এবং বঙ্গ ও যুক্তপ্রদেশে ২০ হাজার হন্দর খদির প্রস্তুত হয়। কিন্তু শুধু কৃষ্ণ-খদিরের পক্ষে এই অঙ্ক প্রযোজ্য হইলেও ইহা কম বলিয়া বোধ হওয়ার কারণ আছে। কোন কোন বৎসরে, যথা ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে, শুধু রপ্তানীর পরিমাণই ১ লক্ষ ৪৫ হাজার হন্দরের কিছু উপর ছিল। ভারত-জাত-পাণ্ডুখদির প্রায়ই রপ্তানী হয় না; বিদেশ হইতে আমদানী পাণ্ডু-খয়েরই অতি সামান্য পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ বোধ হয় যে, উক্ত অঙ্কের মধ্যে পাণ্ডু-খদির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র পরিমাণে হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থের খদির প্রত্যহ আবশ্যক; তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিপুল-পরিমাণ পাণ্ডু-খদির প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদিত ও কাটতি হয়। খদিরের রপ্তানী আজকাল কমিয়া গিয়াছে; গড়ে প্রায় ৪০ হাজার হন্দর খদির বিদেশে যায়। আমদানী ও রপ্তানীর খদিরের মূল্য প্রায় সমান; ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার খদির রপ্তানী ও ১০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার খদির আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু আমদানী-রপ্তানীর খদির একই শ্রেণীর নহে; রপ্তানীর অধিকাংশ কৃষ্ণ এবং আমদানীর খদিরের অধিকাংশ পাণ্ডু-খদির; ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পাণে খাওয়ার খদির যে পরিমাণে ভারতে উৎপাদিত হয়, তাহাতে সংকুলান হয় না, বাহির হইতেও গাম্বীরজাত (Gambier) পাণ্ডু-খদির আমদানী করা আবশ্যক হয়। খদির প্রস্তুতপ্রণালীর উন্নতি-সাধনের অনেক অবসর আছে এবং ভারতে আরও অনেক অধিক পরিমাণে খদির উৎপাদিত হওয়া সম্ভবপর। খদির অরণ্যজাত ফসল এবং অধিকাংশ বৃহৎ খদির-জঙ্গলও সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে সরকারেরই এই কার্য্যে অবহিত হওয়া উচিত। বঙ্গদেশে জলপাইগুড়ি জিলায়, বিহারে মুঙ্গেরের সন্নিহিত কোন স্থানে এবং যুক্তপ্রদেশে উত্তর-অযোধ্যা ও কুমায়ুনে উন্নত প্রথায় খয়ের প্রস্তুতের এক একটি আদর্শ কারখানা খুলিলে বর্ত্তমান অপচয়মূলক প্রস্তুতপ্রণালী রহিত হইতে পারিবে এবং তৎসঙ্গে দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিশুদ্ধ খদিরের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অধিক অর্থাগম হইতে পারিবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

পাপিয়া

বেদন উঠে গভীর রাতের
মর্ম্ম ছাপিয়া
কাঁদছে কে ওই ঝোপের মাঝে
হায় রে পাপিয়া!

নিঝুম নিশি; মৌন সব
ঐ শুধু এক ব্যাকুল রব,
ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেছে
ভুবন ব্যাপিয়া।

তন্দ্রা নাহি চক্ষে মোর—
নিদ্রা নাহি রে
জাগ্‌ছে ক'টি শ্রান্ত তারা
ঘরের বাহিরে;

আঁধার-ভরা দিগন্তর
ব্যথিত মোর এ অন্তর
সহসা কে করুণ-সুরে
উঠলো গাহি রে?

রাত্রি-মায়ের দুলাল্ ও যে
ছোট্ট পাখীটি
অশ্রু-সজল ক'রল আজি
এ মোর আঁখিটি।

কি আকুতি হায় গো মরি,
নিবেদিছে আকুল করি',—
ফেলছে নীহার-অশ্রুবারি
তাই গো পাখীটি।

নয় গো পাখী—নয় গো পাখী
পাখী ও নয়—নয়,
স্তব্ধ-রাতে সদাই যেন—
আমার মনে লয়,—

বিভাবরী কাঁদছে বসি'
কৃষ্ণ চিকুর পড়ছে খসি'—
অশ্রুধারা নিত্য ভাসি'
যাচ্ছে জগৎময়!

শ্রীঅন্নদামোহন বাগচী।

২৩

সপ্তর্ষিমণ্ডলের কেহই মধুপুরের প্রভাতটা হাতছাড়া করতে চান না। কেহ রেখা-রসিক, কেহ কঠোর প্রাবন্ধিক, কেহ ভাব-কুশলী কাব্যিক, কেহ গবেষক, কেহ আবিষ্কারক, কেহ সঙ্গীত-কলালোচক, কেহ বৈরাগ্য-সাধক, এবং সকলেই আকণ্ঠ জল-হাওয়া-সেবক। প্রভাতটা সকলেরই প্রিয়, যে হেতু, সকলেরই ঠাণ্ডা মাথার কায। স্ব স্ব কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা থাকায় সকলেই প্রভাত সম্বন্ধে বেশ সজাগ। পাখীরা বাসা ছাড়বার পূর্ব্বেই,—কেহ ভাব, কেহ বিষয়, কেহ তত্ত্ব সংগ্রহে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ কিংশুক আজ কদিন—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি' সে আমার—কি আমার নয় ঠিক করতে না পেরে গা ঢেলে দিয়েছে। বাসার সংলগ্ন বাগানটির নিভৃত করবী-কুঞ্জে একখানি চেয়ার নিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে।

পাশের বাসায় জলযোগের নামে ঘন ঘন ঘৃত-যোগ চলায়, শুভ্রার সঙ্গে তার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। শুভ্রা আজ প্রাতেই এসে উপস্থিত। রক্ত ও শ্বেত করবী-কলিকার মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে কিংশুক আদর করছিল।

একখানা মোটর সামনের রাস্তা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি কাণে আসায় কিংশুক ছুটে গিয়ে দেখে, স্ত্রীলোকটি প'ড়ে গেছে,—কনুই কেটে রক্ত পড়ছে।

স্ত্রীলোকটি যুবতী, কিংশুক আবার ব্রহ্মচারী! সে অসহায়ের মত চারিদিক্ চাইতেই দেখে, পাশের বাগান থেকে ইরাণী ছুটে আসছে।

"তুলুন না—দেখছেন না—ও উঠতে পারছে না! ও যে আমাদের সুকিয়া," বলতে বলতে এসেই সুকিয়ার দুবগলে হাত দিয়ে তুলে বসালে।—"মোটর কি ওপর দিয়ে চ'লে গেল নাকি! কোথায় চোট পেয়েছিস?"

গাড়ীখানা বিষম বেগে আচমকা গা ঘেঁসে যাওয়ায় সুকিয়া ভয়েই প'ড়ে গিয়েছিল। হাঁটু আর কনুয়ে খুব লেগেছে; কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

"আপনি খুব ত!"

কিংশুক অপ্রতিভভাবে বললে—"স্ত্রীলোক—যুবতী…"

ধুলো মুছে দিতে দিতে ইরাণী সুকিয়ার উদ্দেশে বললে,—"আ মর ছুঁড়ী—স্ত্রীলোক আবার যুবতী দুই হয়ে মরেছ, বুড়ী হ'তে পার নি! মরবে যে কোন্ দিন!"

কিংশুকের প্রতি—"এখন কি করবেন—বড় রক্ত পড়ছে যে। আপনাদের ত ছুঁতে নিষেধ, বাবাকে ডাকি!"

"না, একলা কি না,…আপনি এসেছেন, এখন আর…"

"বুঝেছি, এখন জল কোথায় আছে বলুন ত—এরা সব কোথায়?"

"এরা কেউ নেই—সব বেড়াতে গেছেন। জল বারান্দা-তেই আছে—আমি আনছি।"

জল এনে কিংশুক নিজেই ক্ষতস্থানগুলি ধুতে ব'সে গেল। সুকিয়া তখনও কাঁদছে। সে হাঁটু ধুতে দেবে না।

"দে বহিন্—ওতে দোষ নেই—এর পর সাধুজীকে প্রণাম করলেই হবে। ব্রত ভঙ্গ করাচ্ছি, আমারও অপরাধ হচ্ছে।"

"আপনি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না;—ইস্—ক্ষত-স্থানগুলো যে ধুলোয় ভ'রে গেছে—! পথের ধুলো ক্ষতের পক্ষে বড় dangerous—একটু টিন্‌চার আইডিন…"

"সে এখন কোথায়…"

"আমার ট্রাঙ্ক খুললেই, ওষুধের বাক্সটা ওপরেই পাবেন,

দয়া ক'রে সেটা যদি"…বলেই চাবিটা ইরাণীর দিকে ফেলে দিলেন।

"ট্রাঙ্কে আপনার…"

"দয়া ক'রে ও সব আর বলবেন না—জগতে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই…"

কথাগুলি বলতে কিংশুকের মুখের ও কণ্ঠের সুস্পষ্ট দীনতা ইরাণীর রহস্যপ্রিয় স্বভাবটাকে সহসা যেন আঘাত ক'রে থামিয়ে দিলে। সে ব্যথিত-নেত্রে একবার কিংশুকের দিকে চেয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করতে দ্রুত চ'লে গেল। সমবেদনায় তরুণীর তরল হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, বারান্দা পার হয়েই চোখ মুছে ফেললে,—সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়লো।

ট্রাঙ্ক খুলতেই চোখের সামনে একটা অগোছের স্তূপ বেরিয়ে পড়লো—যেন ন্যাতা-ক্যাঁতার হাঁড়ি! যখন যা দরকার, টেনে হিঁচড়ে বার করা হয়েছে, আবার যেখানে সেখানে কোন প্রকারে গুঁজে রাখা হয়েছে,—কাপড়, জামা, এসেন্স, ব্রস, সোনার বোতাম—সবই। এক কোণে কতক-গুলো নোটেরও সেই অবস্থা—যেন বেণের দোকান থেকে শুপুরি কি খয়ের মুড়ে আনা হয়েছিল।

সে দিকে আর না চেয়ে ওষুধের বাক্সটা একধারে উঁচু হয়েছিল, সেটি বার ক'রে নিয়ে মেঝেয় রেখে ট্রাঙ্কে চাবি দেবার পর বাক্সটি তুলে নিতে গিয়ে দেখে—তার ওপরে একখানা চিঠি ছিল, তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করা হয়নি, সেখানাও বেরিয়ে এসেছে।

"থাক্ গে, আবার ট্রাঙ্ক খুলে তার মধ্যে রাখতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে, এখন ট্রাঙ্কের উপরেই থাক,—বাক্স রাখবার সময় ভেতরে রাখলেই হবে।"

হঠাৎ নজর প'ড়ে গেল, খামের ওপর—"শ্রীমতী ইরাণী দেবী" লেখা!

ইরাণী চম্‌কে গেল, শিউরেও উঠলো। ভাববার সময় ছিল না। সে-চিঠি বাইরে রাখাও চলে না। খামও বন্ধ করা নয়।

"আমারই নাম ত" বলে' বাম হস্তে খামখানি সাবধানে গোপন রেখে, ডান্ হাতে বাক্সটা নিয়ে এসে, "এই নিন্" ব'লে কিংশুকের সামনে ধ'রে দিলে,—ট্রাঙ্কের চাবিটিও ফিরিয়ে দিলে।

ট্রাঙ্কের ভেতরটার অবস্থা দেখে ইরাণীর ভেতরটায় যে ব্যথা বেজেছিল, নিজের নাম লেখা খাম দেখে সে-কথা আর মনে রইল না। সুকিয়ার আঘাত সম্বন্ধেও সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

সুবর্ণবাবু প্রাত্যহিক অভ্যাসমত বাইরে এসে ইরাণীকে বাগানে দেখতে না পেয়ে ভাবলেন—"আজ কি এখনও ওঠেনি,—অসুখ করলে না কি!" বারান্দায় না ব'সে বাগানে বেড়াতে লাগলেন।

দুটি মেয়েকেই সমান ভালবাসেন, দুটিই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু ইরাণী যেন তাঁর রক্ষক, সে সর্ব্বদাই বাপের পাশে থাকে। বাপের মৃদু স্বভাব যেখানে তাঁকে অনিচ্ছায় নীরবে কিছু সহ্য করায়,—সে অত্যাচার তার সহ্য হয় না। বাপ যেটা হেসে হজম করেন, তার ব্যথা সেখানে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এই সব কারণে তাকে বাপের অনেকখানি বলা চলে। মীরা পাঁচ দিন সামনে না এলে কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ হয় না, কিন্তু ইরাকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একবারও দেখতে না পেলে সুবর্ণবাবু চাঞ্চল্য গোপন করতে পারেন না। সুবর্ণবাবুর হৃদয়-কক্ষ থেকে ভালবাসাটা অসমভাবে তাঁর অজ্ঞাতে ইরা যদি একটু বেশী সরিয়ে নিয়ে থাকে, তার জন্য সুবর্ণবাবুকে অপরাধী করা যায় না।

তিনি বাগানে বেড়িয়ে যে ফুলের শোভা সুগন্ধ উপভোগ করছিলেন—এমন বোধ হয় না; দৃষ্টি তাঁর ভূমিসংলগ্ন; তিনি ইরার কথাই ভাবছিলেন। বালিকার পাত্র-নির্ব্বাচনে তাঁর অবস্থানুরূপ শিক্ষা-চরিত্র বাপ-মায়ের কাছে বড় জিনিষ হ'তে পারে, কিন্তু শিক্ষিতা তরুণীর মনের মূল্যও ত' কম নয়।

মীরার মৃদুকণ্ঠ তাঁকে সচকিত করে' দিলে—"ইরা গেল কোথায় বাবা? দেখ না, শুভ্রার গলায় কখন্ মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছে, কেমন মানিয়েছে। কত সকালে যে ওঠে!"

অন্য কোন কথাই তাঁর কাণে পৌছোয় নি, কেবল ব্যস্তভাবে বল্‌লেন—"সে বাড়ী নেই।"

—"ঐ যে ওই রাস্তার ধারে না?"—

"ওখানে কেনো!"

উভয়েই সেই দিকে চলিলেন।

* * *

ইরাণী মাঝে মাঝে নিজেদের বাসার দিকে লক্ষ্য রেখেছিল।

বাপকে আসতে দেখে বল্লে—"বাবা দিদি দু'জনেই আসছেন। ওঁরা এলেই আমি যাবো। একটা অপরাধ করেছি, ব'লে রাখি। ওষুধের বাক্সের ওপর আমার নামে একখানা চিঠি ছিলো—"

কিংশুকের মুখ শুকিয়ে গেল।—"সেখানা…"

"হ্যাঁ, আপনিই এসে গেছে, আমার হাতে রয়েছে।"

কাতরভাবে কিংশুক বল্লে—"ওখানা আমায় দিন, না হয় এখুনি ছিঁড়ে ফেলুন। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমার আপনার কেউ নেই, তাই আপনাকে…" আর বলতে পারলে না।

সে কাতরকণ্ঠে ইরাণীকে খুবই ব্যথা দিচ্ছিলো। সে একটু কল্পিত রোষে বল্লে, "ও-অপরাধ যেন আর করবেন না। আমার চিঠি আমি নিয়ে চল্লুম কিন্তু…"

"আমি বড় অসহায় ব'লে আপনার…"

"বাবা ত রয়েছেন…"

মায়ের উল্লেখটা আর এলো না,—আর কিছু বলাও হ'ল না। সুবর্ণবাবু ও মীরা এসে গেলেন।

সুকিয়ার অবস্থা দেখে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি?"

সুকিয়া ধীরে ধীরে উঠে পড়লো।

যতটুকু আবশ্যক, ইরাণী সব শুনিয়ে দিয়ে বললে, "কান্না শুনে আমি বাগান থেকে ছুটে এসেছিলুম, ভাগ্যে উনিও ছুটে আসেন, তাই, তা না ত"…ইত্যাদি।

"—আমি অনেকক্ষণ এসেছি, যাই, চা করি গে। আপনারা সুকিয়াকে নিয়ে আসুন, ও বোধ হয় এখন নিজেই আসতে পারবে, ওরও চা খাওয়া দরকার।"

২৪

ইরাণী দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো। কিংশুকের পত্রখানা তাকে নানা আশঙ্কায় ফেলে দিয়েছিল, কারণটা অজানা থাকলেও বুকটা দুর-দুর করছিল, অথচ দেখবার আগ্রহও দমন করতে পারছিল না। কম্পিত হস্তে খুলে ফেললে। কয়েক লাইন মাত্র, আবার প্রতি লাইনে দু' একটা কথা ঘন ক'রে কাটা। লেখা বেশ স্পষ্ট, কিন্তু মনের প্রবল আবেগে চোখে অস্পষ্ট ঠেকছিল। সবটা ভাল ক'রে বুঝতে পারলে না। দেখতে আরম্ভ ক'রে মুখে হাসির ভাব ফুটতে ফুটতে সহসা ম্লান হয়ে গেল, চোখে জল এসে সবটাই ঝাপসা ক'রে দিলে। তখন দ্বিতীয়বার আর দেখবার সাহস হ'ল না। তাড়াতাড়ি মুড়ে লুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলে। মন তা হ'তে দিলে না। মুহূর্ত্ত পরেই মুখ রক্তাভ —আর মাঝে মাঝে ধূপছায়া।

এঁরা সুকিয়াকে নিয়ে এসে গেলেন। ইরাণীর খোঁজ পড়লো—"মা, এই আর্ণিকার শিশিটে—রাখো, সুকিয়াকে এখন এক ফোঁটা আর সন্ধ্যে বেলায় এক ফোঁটা খাইও। দু আউন্স জলে ৫।৭ ফোঁটা ঢেলে ফর্শা নেকড়া তাইতে ভিজিয়ে ওর হাতে পায়ে বেঁধে দিও, এক দিনেই ব্যথা ম'রে যাবে।"

ইরা শিশি নিয়ে সুকিয়ার কাছে স'রে গেল।

মন্দাকিনী দেবী সব শুনে সর্ব্বাগ্রে মটরওয়ালাদের,—"পোড়ারমুখোরা পয়সার গরমে চোখে দেখতে পায় না," ইত্যাদি সভ্যভাষণে অভিনন্দিত ক'রে, কিংশুকের বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া ও মনুষ্যত্বের তারিফ নিয়ে পড়লেন,—"অ্যাঁ, আবার ডাক্তারীও জানেন,—আহা, এমন ছেলেকে দেখবার কেউ নেই! যাদের ক্ষ্যামতা আছে, তারাও দেখবে না, কাকে আর কি বোলবো। তাকে আনলে না কেনো, কেবল নিজেদেরটিই বোঝো, সে বুঝি চা খেতে জানে না," ইত্যাদি চলতে লাগলো।

সুবর্ণবাবু বললেন, "আমি বলেছিলুম গো……"

"তুমি বলেছিলে! এ ত কাণে শুনলেও বিশ্বাস হয় না। তা হ'লে আর আসত না!"

"বাসায় যে কেউ নেই, সব বেড়াতে বেরিয়েছেন, কি ক'রে আসবে?"

"কেনো, ওরই বুঝি বাসা চৌকি দেওয়া কায, আর বাবুরা সব হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন। তোমাদের জাতের ধর্ম্মই ওই,—ভালো মানুষকে পেলে পিষে ফ্যালো! ছেলেটির কি কোনো উপায় হবে না!"

ইরাণী ও-দালানে পেছন ফিরে ব'সে সুকিয়ার হাতে ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে দিচ্ছিল। পেছন ফিরেই বললে—"চায়ের সঙ্গে বুঝি আর কিছু খেতে হয় বাবা, জুটচেও মন্দ নয়, তাই দাঁড়িয়ে আছ। বাইরে গিয়ে একটু ব'স না বাবা। খবরের কাগজ দেখবে কখন্?"

মন্দাকিনী দেবী মীরাকে বললেন—"ঠাকরুণ এখনও চা খাননি বুঝি! ওঁকে ওইখানেই দিয়ে আয় ত মা,—বড় খাটচেন।"

ইরা ও-কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—"সুকিয়ারও চাই।"

সে ইচ্ছা করেই বিলম্ব করছিল, সুকিয়ার সঙ্গে মৃদু আলাপে মনটাকে ধাতে আনবার প্রয়াস পাচ্ছিল।

সাঁওতাল মেয়েরা স্বাভাবিকই রহস্যপ্রিয়—হাসি-তামাসা ভালবাসে। ইরাণী তাকে বলছিল—"খুব মেয়ে তুই, পড়বার বুঝি আর যায়গা ছিল না! বাবুর ঠিক ফটকের সামনেই বুঝি পড়তে হয়!"

ভাবটা বুঝতে সুকিয়ার বিলম্ব হ'ল না, সে হাসি-চোখে বললে—"প'ড়ে আর কি লাভটা হ'ল দিদি,—গরীবদের যা হয়, শুধু হাত পা কেটেই মলুম। এ ত তোমাদের পড়া নয়! আমি কি আগে জানতুম······"

"কি জানতিস্ নি?"

"তুমি ছুটে আসবে, তা কি জানি······"

"তাতে কমিটে কি হয়েছে? মন উঠেনি বুঝি······"

"কসুর মাপ কর বহিন্, তোকে এত লাগবে, তা জানতুম না।"

"দূর পোড়ারমুখী—আমায় লাগবে কেনো!" ইত্যাদি।

* * * *

ইরাণী জোর করেই আজ সুকিয়ার ভার নিলে, তাকে কিছু করতে দিলে না। কায-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাটা তার দরকারও ছিল।

সংযম অভ্যাস কোন দিনই তার আবশ্যকই হয়নি,—ধাতেও ছিল না! উদ্বেল হৃদয়—পত্রখানা ভাল ক'রে দেখবার আর বোঝবার জন্যে তাকে কেবলই ঠেলতে ছিল।

আহারান্তে সকলেই একটু বিশ্রাম করেন—কেউ একখানা মাসিক নিয়ে,কেউ বা উপন্যাস—যেহেতু, উহাই নিদ্রার অনুপান, পাতা না ওলটাতেই চোখের পাতা মুড়ে আসে।

'বসুমতীর' মধ্যে সাবধানে পত্রখানি নিয়ে ইরাণীও শয্যা নিলেন। পাঠিকাদের তন্দ্রাবেশ ক্রমে বইগুলিতে সংক্রামিত হতেই, তারাও ঢুলে—কেউ বুকে—কেউ পাশে পড়লো। কম্পিত বেগ-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে ইরাণীও সন্তর্পণে পত্রের মর্ম্মোদ্ধারে মন দিলে।

না আছে শ্রীদুর্গা না আছে ওঁ, না আছে স্থান, মাস, তারিখ। সরাসরি—

সবিনয়-নিবেদন,

আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন, জানি ভারি অপরাধ করছি, কিন্তু অনেক ইতস্ততঃ করেও আপনাকে আমার অবস্থা না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আপনাকেই জানাবার জন্যে মন এত চাইছে কেনো? আমার দৃঢ় ধারণা—আপনি আমার মনের অবস্থা না জেনেও যেন বুঝেছেন। আপনাকে অল্পই দেখেছি, আপনার কথা অল্পই শুনেছি, রহস্যের আবরণ তার মধ্যে থাকলেও—উপেক্ষা নেই। সুরে সমবেদনাই পেয়েছি। এমনটি আর কারো কাছে পাই নি।

আমি আপন-জন পাবার কাঙাল, তা আমার নেই। কেউ আপন বল্‌তে না থাক্‌লে কেমন কোরে থাকি? শুনেছি, ভগবান্ না কি আপন, তাই তাঁকে পাবার পথ খুঁজছিলুম। আপনার মধ্য দিয়া তাঁর সাড়া এলো, আমি আপন-জনের আস্বাদ পেলুম—যা কোনো দিন পাই নি, যা আমার অজানা ছিল, সে দিনের সে তুচ্ছ কথাটি বোধ হয় আপনার নিজেরই স্মরণ নেই; কিন্তু আমার সে যে অতি বড় দুর্ল্লভ প্রাপ্তি—আপনাকে সে কথা কি কোরে আজ বোঝাব।

আমার সামনে এখন দুটি পথ—সংসার, নয় সন্ন্যাস। বন্ধুহীন অসহায়ের সংসার—বিড়ম্বনা। আপনার হাতে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছি, আপনি আমার পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিন, আমি আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। শরণ নিলাম।

আমার আর কেউ থাকলে আপনাকে এ কষ্ট দিতাম না, এ অপরাধও করতাম না।

তার পর তিন লাইন এমন ভাবে কাটা যে পড়া যায় না। পরে অসহায় কিংশুক—

ইরাণীর হাত কাঁপছিল, তার অজ্ঞাতেই চোখের জল দু-ধার্ দে গড়িয়ে বালিস ভেজাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছিল, সেটা বোধ হয় অন্যের দুঃখে দরদ। কিন্তু—"কেনো, আমাকে জানিয়ে এ কষ্ট দেওয়া কেনো, আমি কি করতে পারি!"

সে সত্যই কেঁদে ফেললে। তার পর মুখটা সহসা গাঢ় উজ্জ্বল হয়েই রাঙা হয়ে উঠলো। পাশ ফিরে উপুড় হয়ে ক্ষণেক শুয়ে রইলো।

উপভোগ না বেদনাভোগ, অনুমান করা কঠিন। বেদনা হ'লেও, সে বেদনার মধ্যেও যে উপভোগ্য অনুকরণ থাকতে পারে, তা সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

শুয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। ধীরে ধীরে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে, মিনিটখানেক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে সহসা পত্রসহ "বসুমতী"খানা তুলে নিয়ে দ্রুত বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

সুবর্ণবাবু শুয়ে শুয়ে ইরাণীর কথাই ভাবছিলেন। কারণ, আহারের সময় মন্দাকিনী দেবী যথা-নিয়ম অতিষ্ঠ করতে ভোলেন নি। "কোন্ দিন কিংশুক হঠাৎ চ'লে যাবে, এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢোকে না? কি করলে ঢুকবে, তাই নয় আমাকে বলো!"

তিনি বলেন, "তুমি অত ব্যস্ত হয়েছ কেন, বছর দুই থাক্ না। ভগবানের হাতে একটু ছাড়ো না, তাঁকে একদম বাদ দিচ্ছ কেনো?"

"বটে! জুটবে একটা বাঙ্গারাম! যাক্, আমি যদি আর কথা কই…"

ইত্যাদি সদালাপের তাড়স সুবর্ণবাবু শুয়ে শুয়ে ভোগ করছিলেন।

অসময়ে ইরাণী আসায় উঠে পড়লেন। বললেন, "আজ শোওনি বুঝি, একটা ভাল কিছু আছে শুনতে হবে—না?"

পরে মুখের দিকে নজর পড়ায় ব্যস্ত হয়ে বললেন—"কি মা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে যে?"

"একটা ভারি অন্যাই ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছি বাবা! তখন তার ভালমন্দ বোঝবার সময়ও ছিল না কিন্তু।"

"বুড়োমানষী ত করনি, তা হ'লেই অন্যায় হ'ত…"

বাধা দিয়ে ম্লান হাসির সঙ্গে ইরাণী বললে—"না বাবা, অন্যাই হয়ে গেছে, তুমি সবটা শুনলে আমাকেই দুষবে।"

এই ব'লে ঘটনাটা বাপকে শুনিয়ে পত্রখানা পড়তে দিলে।

সুবর্ণবাবুকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললে—"তোমার যে দেখা চাই বাবা।"

"কেনো? নাই বা দেখলুম" ব'লে তিনি হাসলেন।

ইরাণীর রগে রং ধ'রে এলো, সে তাড়াতাড়ি বললে—"না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না,—আমি যে বুঝিনি।"

সুবর্ণবাবু পত্রখানি দুবার দেখলেন।

ফিকে হাসির পশ্চাতে চক্ষু যেন করুণায় কোমল হয়ে এল। একটি নিশ্বাস ফেলে—"পাগল ছেলে" ব'লে পত্রখানি ফিরিয়ে দিলেন।

"আমি কি করবো?"

"জবাব দেবে।"

ইরাণী নতমুখে বললে—"সে আমি পারব না বাবা!"

"সে কি মা, কিংশুকের মনের অবস্থাটা বুঝছ না। ও অবস্থায় সে যে নিজের মস্ত অনিষ্ট ক'রে বসতে পারে।"

"তা আমি কি করবো, আমাকে লেখা কেনো? যা ভালো হয়, তুমিই বুঝিয়ে দিও বাবা।"

"তা হয় না ইরা, সে তোমার কথাই চায়।"

"তবে কি লিখতে হবে, তুমি আমাকে লিখে দাও।"

"সেটা আমার কথা হবে এবং অন্যাইও হবে। সে ত কোন পণ্ডিতের উপদেশ খোঁজেনি। আমি বলছি—তুমি ঠিকটি বলতে পারবে, আর সেইটিই সে চেয়েছে।"

"তা হ'লে তোমাকে কিন্তু দেখে দিতে হবে।"

"না।"

"আমাকেই সকলে এ মুস্কিলে ফেলছো কেনো?"

"তুমি সকলের চেয়ে ভালো পারবে বোলে।"

"ছাই পারবো! এর পর যেনো……"

ইরাণী চ'লে যেতে যেতে ফিরে এসে বললে—"মাকে দিদিকে।……"

"না, কারুকে নয়।"

ইরাণী চ'লে গেল।

সুবর্ণবাবু হাত দুটি যোড় ক'রে ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করলেন। আর শুতে পারলেন না, বারান্দায় বেরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন! যেন একটু চঞ্চল, মাঝে মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়ান—দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

ইরাণী পাঁচখানা পত্র লিখলে, ছিঁড়লে—পছন্দ হ'ল না। প্রকৃতিকে জয় করা কঠিন—পত্রেও তা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায় এবং বেড়েই চলে। পাঠান্তে দেখে—যা বলবার কথা, তা বলা হয়নি। কিন্তু তা কি বলা যায়! অথচ সেইটাই ত বহন ক'রে তার প্রত্যেক রক্তবিন্দু আঙ্গুলের ডগায় ছুটে আসছে! শেষ লিখলে—

"শ্রীচরণেষু—

বোধ করি চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভুল-চুকে কা'র খামে কা'র পত্র রেখে থাকবেন। আপনি ব্রহ্মচারী, ডায়ারিতে

আপনার কঠোর সাধনার যে কয় দফা শুনেছি, তাতেই আমি গলবস্ত্র ও নত। আপনাকে সাধারণভাবে ভাবতে পারি না—শ্রদ্ধায় স্বামীজী সম্বোধনই এসেছিল।

একে স্ত্রীলোক, তায় ভাগ্যদোষে বৃদ্ধা নই। সুতরাং আমার সাহায্য বা সেবা গ্রহণ আপনার সম্ভবই নয়, বরং আপনার ধর্ম্মের অন্তরায়।

যাকেই লিখে থাকুন, পত্র পাঠান্তে আমার প্রাণ অসহ্য বেদনায় কাতর ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এত বড় কঠিন আঘাত পূর্ব্বে কখনও সে পায়নি।

আপনার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের হেরফেরে দেখুন, যে ভুল করেনি, সংসারই যার আশ্রয়, আপনি সাধু হয়ে কোন্ অপরাধে তার জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলেন। আপনার ত দুটো পথ রয়েছে, দুটোই সুপথ, একটা ধ'রে অন্যটায় যাওয়াই সহজ, বোধ হয় বিধানও তাই; কিন্তু আমার যে কোন পথই রইল না।

ব্যথিতার অপরাধ ক্ষমা ক'রে নমস্কার গ্রহণ করবেন।

কাতরা—

ইরাণী।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুর কুল-লক্ষ্মী

কোন্ স্বরগের
ফুলদল তুমি,
কোন্ বিধাতার সৃষ্টি;
কোন্ সে পূজায়
তোমার আরতি
সাধিতে সে কোন্ ইষ্টি?

কোন্ সে চাঁদের
কোমল কিরণ
কোন্ তারকার দীপ্তি;
ঘন মেঘে কোন্
বিজলীর খেলা,
কোন্ দধীচির অস্থি?

কোন্ সে হোমের
ইন্ধন তুমি,
কোন্ সে যাগের বলি,
কোন্ সে গোপন
সাধনাটি তুমি
সারাটি জীবন মিলি?

স্রষ্টার কোন্
লুকান হাসিটি,
নিখুঁত তাঁহার ছবি;
অযাচিত কোন্
স্নেহ ভালবাসা
করুণা-রূপিণী দেবী!

নয়নের কোণে
অভয় বাণীটি,
হৃদয়ে এ কোন্ শক্তি;
জগতের সেরা
লজ্জায় ঘেরা
হিন্দুর কুল-লক্ষ্মী!

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতি

১

থানার পেটা ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে ১২টা বেজে গেল।

সুহাসিনী তার স্বামীকে বল্লে, শুতে চলো, রাত হ'লো অনেক। আর কালকের দিনটি বই ত' নয়, তাও সন্ধ্যের পরেই ত' আবার উদ্যোগ করতে হবে।—তার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরোলো।

পরেশ কলকাতায় মার্চেণ্ট আপিসে খাজাঞ্চি, মাইনে পায় একশোটি টাকা। বাড়ীতে মা, ছোট ভাই, আর সুহাসিনী। এই একশ' টাকায় দু'যায়গায় খরচপত্র চালান দুষ্কর, তাই নিজে কোনও প্রকারে মেসে কাটায়, বাকী টাকা পাঠিয়ে দেয় মা'কে। এই রকম ব্যবস্থাই চ'লে আসছিল কয় বছর।

কিন্তু মানুষের হৃদয় ত' আর যন্ত্র নয়, তাই সুহাসিনী ইদানীং এই চিরন্তন ব্যবস্থায় গোলযোগ বাধাতে সুরু করেছে। স্বামী বছরে মাত্র তিনবার বাড়ী আসেন, বড়-দিন, গুডফ্রাইডে আর পূজোর ছুটীতে। এতে দৈনন্দিন গৃহকর্ম্ম বাধে না, হাঁড়ি যেমন চড়বার, তেমনিই চড়ে, চন্দ্র-সূর্য্যও নিয়মের ব্যত্যয় করেন না। কিন্তু নারী-জীবনের চূড়ান্ত ত ওইখানেই নয়! বুকের ভেতর যৌবনের যে এলো-মেলো হাওয়া বয়, বসন্তের যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য একেবারে কানায় কানায় ফুটে উঠল, তারা ত' মানতে চায় না। তারা ত' হাঁড়ি-কুঁড়ি, নিয়মিত ঘরকন্না, ও সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

সুতরাং কিছু দিন আগে থেকেই সুহাসিনী বলতে সুরু ক'রে দিয়েছিল যে, সে কলকাতায় গিয়ে পরেশের কাছে থাকবে। মেসের খাওয়া খেয়ে আপিসের দুরন্ত খাটুনি, মানুষ কত দিন আর বরদাস্ত করতে পারবে? এমনি তিলে তিলে নিজের শরীরকে নষ্ট করা সুহাসিনী আর কিছুতেই সহ্য করবে না।

পরেশের বুকটা আরামে ভ'রে উঠত। সে বুঝতে পারত, এই কথার ভেতর কত বড় অর্থ লুকানো আছে। সে বলত, এবার এসে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক ত', এমন ক'রে কত দিন চলবে?

কিন্তু বিদায়ের ক্ষণে অশ্রুধারায় ঝাপসা-চোখে তাকে এই প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রেখেই চ'লে যেতে হ'ত!

অর্থাৎ পরেশ বুঝত যে, এটা যতটা সহজ মনে হয়, কাযে তত সহজ নয়। একশো টাকায় কল্‌কাতায় চলা কঠিন,—যদিই বা চলে, ত' বাড়ী দেখে কে, আর মা'র মতামতও ত' বলা যায় না।

সুতরাং প্রতিবারেই ভবিষ্যতের ওপর কোনও একটা সু-ব্যবস্থার বরাত চাপিয়ে, পরেশ কোন রকমে বর্ত্তমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিত।

এবারও গুড্‌ফ্রাইডের চারটি দিন ছুটীর মধ্যে তিন দিন কাটল। কাল সন্ধ্যার পর কলকাতা যাত্রা করতে হবে, সুতরাং আসন্ন-বিরহ-শঙ্কাকুল দম্পতির আজ এইবারের মত শেষ মিলন-রাত্রি। কলকাতায় থাকার প্রসঙ্গ নিয়ে এই খোলা ছাদের ওপর যখন ১২টা রাত বেজে গেল, অথচ কিছুই স্থির হ'ল না, তখন সুহাসিনী তার স্বামীকে বোধ করি, অনুযোগের সুরে, অকারণ রাত জাগার কথাটা মনে করিয়ে দিলে।

শীত আর নেই, গরম পড়তে সুরু হয়েছে মাত্র। রাতে এই সময়টা যেমনি মনোরম, তেমনি চমৎকার দক্ষিণা হাওয়া দিচ্ছে। প্রকৃতির পরিপূর্ণ সাজ। পশ্চিমে ঢ'লে পড়া চাঁদ, পৃথিবীর ওপর কেমন একটা ফ্যাকাসে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে। সবটা চোখে দেখাও যায়, আবার দেখাও যায় না, যেন একটা অল্প-মনে-পড়া স্বপ্ন।

অস্পষ্ট আলোতে পরেশ সুহাসিনীর পরিপূর্ণ, নিটোল, যৌবন-সৌন্দর্য্যে টলমল, একখানি পদ্মেরই মত সুন্দর মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল। আসন্ন বিরহের বেদনা তারও অন্তস্তলকে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল।

সুহাসিনী পরেশের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, দেখছ কি অমন ক'রে?

পরেশ বল্লে, তোমাকে, সুহা!

সুহাসিনী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বল্লে, রাত ১২টার সময় আর আমার মুখ দেখে কি হবে বল? এত ক'রে বলছি, নিয়ে ত যেতে পারলে না!

পরেশ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, ওই একশোটি টাকা, তাইতে কি ক'রে কলকাতায় থেকে চলবে, তাই ত ভাবি, সুহা!

সুহাসিনী রাগ ক'রে বল্লে, তুমি ভাবতেই থাক। নিয়ে চলো দিকিনি, কেমন না চলে একশো টাকায় দেখি। ওপাড়ার গৌরী-ঠাকুরঝিদের আশী টাকায় চলছে, আর আমাদের চলবে না একশো টাকায়?

পরেশ বল্লে, বাড়ী ভাড়াই লাগবে ধরো অন্ততঃ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

সুহাসিনী বল্লে, লাগুক্ গে! তবুও চলবে · আমি ব'লে দিচ্ছি।

পরেশ চুপ ক'রে আবার ভাবতে লাগলো। কলকাতায় দুজনে একত্র থাকার কল্পনা যতই সুস্পষ্ট হ'তে লাগল, ততই তার মেসের জীবন ভয়াবহ ব'লে মনে হ'ল। বল্লে, আচ্ছা সুহা, কাল আমি মাকে ব'লে দেখবো, তিনি যদি রাজী হন, ত' বাড়ী-টাড়ী ঠিক ক'রে শীঘ্রই এক দিন এসে তোমাদের নিয়ে যাব।

সুহা বল্লে, আর যদি তিনি রাজী না হন?

পরেশ চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো। সুহা বল্লে, রাজী-টাজী জানিনে। যদি তুমি আমাকে না নিয়ে যাও, ত' ব'লে দিচ্ছি কিন্তু, এবার এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না। এমন ক'রে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

এমন সময় ঢং ক'রে একটা বাজলো। সুহা তাড়াতাড়ি উঠে বল্লে, দোহাই তোমার, রাতটা আর জেগে কাটিও না, শোবে চলো। পরের কথা পরে হবে।

পরদিন পরেশ খাচ্ছিল, মা সম্মুখে ব'সে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। পরেশ খেতে খেতে বল্লে, মা, বছরে ক'দিন বাড়ী এসে তোমাদের হাতের খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন অমৃত!

মা মাছি তাড়াতে তাড়াতে বল্লেন, বাছা রে! মেসের ভাত খেয়ে বাছার শরীরে আর কিছু নেই!

সুযোগ পেয়ে পরেশ বল্লে, তাই ত' মনে করছি যে, একটা ছোট-খাটো বাসা দেখে তোমাদের সব নিয়ে যাই।

মা হাতের পাখাটা জোরে জোরে বার দুই নেড়ে, দরজার দিকে মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বল্লেন, তা করতে পারলে ভালই হ'ত পরেশ, কিন্তু শ্বশুরের ভিটে, আমরা চ'লে গেলে কে দেখে বলো। আর ওই দু'বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমী, ও ত' একেবারে মরুভূমি হ'য়ে যাবে, বাবা। না বাবা, আমার যাওয়া চলবে না। তা ছাড়া ওই টাকাতে কি কলকাতায় কুলবে?

শুষ্ক হাসি দাঁতের মধ্যে টেনে পরেশ বল্লে, কিন্তু তোমার এমনি লক্ষ্মীর হাত মা যে, আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ওইতেই নিশ্চয়ই চলবে।

মা বল্লেন, তা যেন হ'ল, কিন্তু শ্বশুর-স্বামীর ভিটে ছেড়েই বা যাই কি ক'রে, আর ওই জমীটারই বা কি ব্যবস্থা হয়!

পরেশের আর কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। তবু সে উত্তর দিলে। বল্লে, জমীটা ত' ভাগে বন্দোবস্ত করলেই চলবে, আর বাড়ী? বাড়ী না হয় আমি এসে মাঝে মাঝে দেখে যাবো।

মা বল্লেন, তা কি হয় বাবা! তার চেয়ে বরং আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে না।

পরেশ হেসে বল্লে, তা হ'লে ত' কোনটারই সুবিধে হবে ব'লে মনে হয় না মা! খরচ-পত্র তাতে কিছুমাত্র কমবে না, তোমার শ্বশুরের ভিটেরও বিশেষ সুবিধে হবে না, আর ওই ব্রহ্মোত্তর ত অচিরেই ব্রহ্মডাঙ্গা হয়ে যাবে, মা।

উঠিস্‌নে উঠিস্‌নে পরেশ, দুধ আনছি যে,— মা'র মুখের কথা মুখেই রইল,—পরেশ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, পেট ভয়ানক ভ'রে গেছে।

বিদায়ের ক্ষণে ঠাকুর-ঘরে ঠাকুর প্রণাম ক'রে উঠতেই যে সজীব মূর্ত্তিটি তার পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াল, তার অশ্রু ভারাক্রান্ত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে পরেশের নিজের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সুহাসিনী আর্দ্রকণ্ঠে বল্লে, কিন্তু এবার পূজো পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি থাকছিনে এখানে, জেনে রেখো।

কি যে বলো,—ব'লে চোখের জল ঢাকতে ঢাকতে পরেশ বেরিয়ে গেল।

২

তার পর মাসখানেক কেটেছে; না কেটে উপায় নেই বলেই কেটেছে। আপিস যাওয়া আসা নিয়মিত, ঘড়ীর কাঁটার মত। ঘড়ীর কাঁটারই মত না আছে তাতে

"আমরা বাঙ্গলা গেয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলাতী বুলি;
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা',
আর মুটেদের ডাকি 'কুলি'।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ। [শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণ—না আছে আনন্দ। চলতে হয় তাই চলে,তার দমটাও পরেরই হাতে। তার পর একটা শঙ্কা কাঁটার মত পরেশের বুকে বিঁধে আছে,—সুহাসিনী এবার তাকে বারবার শাসন করেছে, পূজো পর্য্যন্ত সে কিছুতেই থাকবে না। কেন এমন ক'রে সে বল্লে, কেন এত ভয় দেখাল। সত্যি-ই কি—?

আপিসের কেদারার ওপর চুপ-চাপ ক'রে ব'সে পরেশ ভাবছিল সেই রাতটির কথা, যে দিন শুধু মুখের কথায় কথায় তারা রাত একটা বাজিয়ে দিয়েছিল। সেখানে আপিস ছিল না, লেজার ছিল না, হিসাব ছিল না, ছিল শুধু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য আর অভিমানিনীর—

পরেশ বাবু, আপনার একটা তার আছে।

তার?—

"তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত। অবিলম্বে এস।"

অক্ষরগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে পোকার মত যেন কাগজটাময় ঘুরে ফিরে বেড়াতো লাগলো। 'অত্যন্ত পীড়িত'। ঠিক মিলেছে ত! পূজো পর্য্যন্ত—হাঁ ঠিক!

ইঃ পরেশ বাবু, মুখটা আপনার ভারী ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে যে! কিসের তার?

পরেশ আফিস্-বন্ধু অনিলের কাছে তারটা ফেলে দিলে।

অনিল প'ড়ে বল্লে, ব'সে রয়েছেন যে! অত হতভম্ব হ'লে চলবে কেন? যান ছোট সাহেবের কাছে, একটা দরখাস্ত নিয়ে—বসুন, আমিই টাইপ ক'রে দিচ্ছি, দরখাস্তটা চটপট করুন। ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন?

দরখাস্ত টাইপ করা হ'ল; তাকে নিয়ে গেল পরেশ ছোট সাহেবের কাছে। ছোটসাহেব হলেন "প্রপার চ্যানেল।"

জন বুল নম্বর ওয়ান। কাগজের মত সাদা লালিমাহীন মুখ, বড় বড় দুই চোয়াল, লালচে চুল, হাতের কব্জি দুটো নৌকার দাঁড়ের মত, এই ছোট সাহেব, মিঃ স্মিথ।

ছোট সাহেব দরখাস্ত প'ড়ে মাথা নেড়ে বল্লে, এখন তোমাকে ছাড়া চলবে না, পরশুর আগে ত' নয়ই। না-মঞ্জুর।

পরেশ দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে,—সার—।

সাহেব চটে বল্লে—ক্লিয়ার আউট, ম্যান্!

পরেশ এসে নিজের টেবলের ওপর মুখ গুঁজে রৈল। শেষ দেখাও তা হ'লে হ'ল না!

অনিল বল্লে, পরেশ বাবু, দেখুন না চেষ্টা ক'রে বড় সাহেবের কাছে, সে লোকটার দয়াদাক্ষিণ্য আছে।

পরেশ বল্লে, ভয় করে। প্রপার চ্যানেল ত দিলে না।

অনিল বল্লে, দেখুন না একবার চেষ্টা করেই।

পরেশ তার সেই না-মঞ্জুর হওয়া দরখাস্ত নিয়ে গেল বড় সাহেবের কাছে।

চারিদিকে খসখসের পর্দ্দা—ভেতরে চলছে পাখা। টেবলের ওপর সবুজ ডোমের টেবল-ল্যাম্প; সাহেব একটা কি কাগজ দেখছিলেন।

সৌম্য মুখশ্রীতে বয়স সমুচিত গাম্ভীর্য্যের ছাপ দিয়েছে, চোখ উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, শান্ত।

পরেশকে দেখে বল্লেন, কে তুমি?

আমি খাজাঞ্চি।

কি চাও?

ছুটী।

সাহেবের ভ্রূ-কুঞ্চিত হ'ল। আপিসে কায কর, জান না, মিঃ স্মিথকে তোমার আবেদন করতে হবে? তুমি তার ডিরেক্টলি অধীন।

করেছিলাম।

ক'রেছিলে? কি হ'ল?

না-মঞ্জুর।

সাহেব চেয়ারের পিঠে ঠেস্ দিয়ে বল্লেন, তা হ'লে ত হয়েই গেছে। তাঁর হুকুম ত' সহজে আমি বদল করি না, আপিসের এ কায়দা নয়।

পরেশের দেহ কাঁপছিল। সে অস্পষ্টস্বরে বল্লে, কিন্তু ছুটীর ভারী দরকার।

সাহেব তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বল্লেন, বাবু, তোমাকে অসুস্থ বোধ হচ্ছে। কি হয়েছে তোমার?

চেয়ার দেখিয়ে বল্লেন, বসো।

পরেশ টেলিগ্রামখানা দিলে।

সাহেব সেখানা মন দিয়ে প'ড়ে বল্লেন, কতদূর তোমার বাড়ী?

এক রাত্রি ট্রেণের রাস্তা।

তোমাদের দেশে ভাল ডাক্তার আছে?

না।

সাহেব বল্লেন, তোমার স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসা করাও। বুঝেছ? ব্যারাম খুব শক্ত নিশ্চয়ই।

কলকাতায় বাড়ী নেই ত!

তুমি থাক কোথায়?

মেসে।

কেন?

বড় গরীব সাহেব।

সাহেব বল্লেন,—বাড়ীর বন্দোবস্ত আমি করছি। ব'লে বড়বাবুকে ডেকে পাঠালেন।

বড়বাবু এসে সুদীর্ঘ সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

সাহেব বল্লেন, বড়বাবু, তোমার বাড়ীর পাশেই তোমার একটা ছোট বাড়ী খালি আছে বলছিলে না? তাইতে একে থাকতে দেবে,অন্ততঃ যত দিন না এর স্ত্রী সেরে ওঠেন। তাঁর বড় অসুখ। দরকার হয় ত' আমি কলকাতাতে আনতে ব'লে দিয়েছি। বুঝলে?

বড়বাবু সেলাম ক'রে সম্মতি জানালে।—একেবারে সব যেন কালকের মধ্যে ঠিক থাকে বুঝেছ?

বড়বাবুর আবার সেলাম।

সাহেব পরেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ট্রেণ কখন্?

৬টায়—

ঘড়ির দিকে চেয়ে সাহেব বল্লেন, তা হ'লে ত' সময় বেশী নেই। তুমি যাও। আমি ছুটী মঞ্জুর করলাম।

ব'লে বড় বড় অক্ষরে নীল পেন্সিলে দরখাস্তর ওপর লিখে দিলেন—এর প্রয়োজন খুব। আমি ছুটী দিলাম।

বড়বাবুকে দরখাস্তটা দিয়ে বল্লেন, মিঃ স্মিথকে দিও। পরেশের দিকে চেয়ে বল্লেন, যাও, তোমার মঙ্গল কামনা করি।

পরেশ অভিভূতের মত চেয়ে ছিল! অভিভূতের মতই চ'লে গেল।

৩

অবশেষে সেই পূজোর আগেই সুহাসিনীকে গ্রাম ছাড়াতে হ'ল।

কারণ, তার পীড়া যে কি, তা গ্রামের ডাক্তাররা ঠাহর পর্য্যন্ত করতে পারলেন না।

জ্বর প্রবল, বুকে ব্যথা, হয় ত' বা নিউমোনিয়ার সম্ভাবনা, পেটের দিক্‌টাও সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হয় না,—সুতরাং আর এক দিনও বিলম্ব করা চললো না; কারণ, করলে আর নাড়াচাড়া করা অসম্ভব।

শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ ক'রে এবং আপাততঃ ব্রহ্মোত্তরের ভাগ্য ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে মাকেও আসতে হ'ল সঙ্গে।

তাঁরা এসে উঠলেন বড়বাবুর সেই ছোট ভাড়াটে বাড়ীতেই।

কলকাতায় আসার দিনটিতে সুহাসিনীকে যেন অনেকটা ভালই বোধ হ'ল। সে এক-আধবার পরেশকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও করেছিল, বলেছিল, এইবার ভাল হয়ে যাবো, কিন্তু আর আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

পরেশ আর্দ্র কণ্ঠে বল্লে, কখনই নয়।

কিন্তু তার পরদিন থেকে সেই যে সুহাসিনী অজ্ঞান হ'ল, সে জ্ঞান আর সহজে ফিরতে চায় না।

পনর দিন ধ'রে চললো যমে-মানুষের টানাটানি। সে যে কি টানাটানি, তা বুঝল পরেশ আর অন্তর্য্যামী।

অবশেষে পনর দিন পরে যখন অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রমের ফলে পরেশের দেহ স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্য-রাজ্যে বিচরণ করতে লাগলো, এবং যখন ওষুধ এবং ডাক্তারের দোহনে সে হয়ে গেল একেবারে রিক্ত, তখন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার এসে বল্লেন, পরেশবাবু, এর দেখছি নিশ্বাসের কষ্ট হয়েছে, এই ধাক্কাটা যদি সামলান যায়, তা হ'লে— সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে—কিন্তু আপাততঃ

পরেশ হাতযোড় ক'রে বল্লে, ডাক্তারবাবু, দোহাই আপনার, বাঁচান কোন রকম ক'রে—।

ডাক্তারবাবু বল্লেন, সে চেষ্টার ত' ত্রুটি হ'চ্ছে না; কিন্তু আপাততঃ খুব দামী আর উত্তেজক ওষুধ কতকগুলো চাই, একটা অক্সিজেনের চোং চাই,—ভাড়া পাবেন, আর চাই ডাক্তার রায়কে, আমার একলার আর সাহস হয় না। আমি ব'সে রইলুম, আপনি গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সব নিয়ে আসুন। মা, আপনি থাকুন এইখানেই।

কত টাকা নিয়ে বেরুলে হবে ডাক্তারবাবু, আমি ও দাম জানি না।

ডাক্তারবাবু বল্লেন, সবশুদ্ধ, আমার ফি, ডাক্তার রায়ের ফি নিয়ে শ'খানেকেই হবে।

শ'খানেক? তার কাছে একশ' পয়সাও যে নেই

অথচ এক দিকে একশ' টাকা—আর এক দিকে সুহাসিনীর জীবন! সুহাসিনীর জীবন?—তার মানে তার জীবন, তার চেয়ে বড়, ঢের বড়, সমস্ত জগতের সজীবতা, সমস্ত ভবিষ্যতের আশা—।

কিন্তু কোথায় পায় সে একশ' টাকা!

বড়বাবু, বড়বাবু!

কি হে পরেশ—ভায়া যে; কি খবর?

খবর দারুণ। একশো টাকা চাই যে বড়বাবু?

এ—ক—শো টাকা?

হাঁ, একশো টাকা; এক পয়সা কম হ'লে চলবে না। এই একশো টাকা আমার সুহাসিনীর জীবনের মূল্য বড়-বাবু। তা নইলে সে কিছুতেই বাঁচবে না! মনে করুন, এই একশো টাকার জন্যে আমাকে সব হারাতে হবে—এই একশো টাকার জন্যে! এক দিকে একশো টাকা, এক দিকে একটা অমূল্য জীবন। ডাক্তার ব'সে আছে; দয়া করুন বড়বাবু,—একশো টাকা! কত টাকা আছে আপনার!

এত টাকা কি করবে ডাক্তার?

সে অনেক আছে বড়বাবু, ওবুধ, ডাক্তার, অক্সিজেন, আরও বোধ হয় কত কি! সেথানে ফাঁকি চলবে না, প্রশ্ন চলবে না, তাদের হাতে জীবন—তারা ওই নিরিখ দিয়েছে। সময় যে নেই বড়বাবু!

একশো টাকা কোথায় পাব ভায়া? ছাঁপোষা মানুষ, কোথায় পাব টাকা?—আহা, তোমার বড় দুঃসময় যাচ্ছে ত' ভায়া! কি করবে? ভগবানের ওপর ভরসা রাখো, তিনিই উদ্ধার করবেন।

তা হ'লে টাকা?

টাকা ত' নেই ভায়া।

পরেশ যখন বড়বাবুর বাড়ী থেকে বেরোলো, তখন তার চেহারা যেন উন্মত্তের মত। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো উদ্‌ভ্রান্ত, চুল উস্কো-খুস্কো।

সে চীৎকার ক'রে বল্লে, ভগবান্, আমার আজ এই এত বড় প্রয়োজন, কেউ দেয় না, তুমি দাও আমায়, তুমি দাও!

বল্লে, মা বসুমতি, তুমি অগণ্য হীরা মণি, মুক্তার ভাণ্ডার, দাও আমাকে এই মরণ-বাঁচনের ক্ষণে!

তার ইচ্ছে করলো, সে দুই হাতে তার চুলগুলো ছিঁড়ে ধুলোয় লুটোপুটি খায়!

বল্লে, কেউ নেই, ভগবান্ নেই, মানুষ নেই,—না, কেউ না!

তখন তার পকেটে একগোছা চাবি ঝনঝন ক'রে উঠলো। মনে হ'ল, এই ত' সাড়া দিয়েছে, সয়তান!

সে চাবিটা মুঠোর ভেতর ধ'রে বল্লে—এই ঠিক। কেউ কোথাও নেই,—আমার সহায় হ'ল সয়তান।

তার খাজাঞ্চীখানার লোহার সিন্দুকের চাবি! বহু শত টাকা আছে সেই সিন্দুকে,—আর এরি একটা চাবিতে তার হাতে আসবে মুঠো মুঠো টাকা!

দারোয়ান বল্লে, খাজাঞ্চীবাবু যে! কেমন আছেন মাই—জী?

অনেকটা ভাল, রামকিষণ।

এত সন্ধ্যাবেলা যে!

একটু দরকার আছে, রামকিষণ, সেই যাবার দিন তাড়াতাড়িতে ভারী জরুরী একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছি, টেবলের দেরাজে। দাও দিকিনি ঘরের চাবিটা।

চাবি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

তার খানিক পরে লোহার সিন্দুক থেকে একশো টাকা নিয়ে বেরোলো।

ওবুধ, ডাক্তার, চোং নিয়ে যখন সে ফিরল, তখন ডাক্তার বল্লেন, বড় দেরী হয়ে গেল। যা হ'ক, এখনও সময় উত্তীর্ণ হয় নি। তাড়াতাড়ি দিনদিকিনি ওগুলো, আর আপনাকে মন স্থির ক'রে সাহায্যে লেগে যেতে হবে, নইলে বাঁচান শক্ত!

মন স্থিরই করেছি ত'!

৪

তার পর দিন আপিসে হুলস্থূল কাণ্ড! অস্থায়ী খাজাঞ্চী ক্যাস মেলাতে গিয়ে মেলাতে পারে না, এক শ' টাকার তফাৎ। কোথা গেল সে টাকা? চাবি ত' তার কাছে—। ঠিক, ঠিক, আর এক সেট্ ডুপ্লিকেট ত' আছে পরেশের কাছে, সে তাড়াতাড়িতে দেয় নি।

তখন জিজ্ঞাসা ক'রে বেরোলো দরওয়ানের কাছে যে, কাল সন্ধ্যায় পরেশ এসেছিল, আর সে ওই ঘরেই ঢুকেছিল।

বড় বাবু মিলিয়ে দিলেন। বল্লেন, ঠিক হয়েছে, সে সন্ধ্যার সময় হন্ত-দন্ত হয়ে আমার কাছে গিয়েছিল, বউ মরে মরে, ওষুধ-পত্তর ডাক্তারের জন্যে একশো টাকা না হ'লেই নয়। আমি ত তাড়িয়ে দিলাম, তার পর নিশ্চয় সেই পাজি নচ্ছারটার এই কায।

একেবারে মিলে গেছে। তখন সেই বাবুর দল নিরতিশয় উল্লাস সহকারে এই খবর দিলেন ছোট সাহেবকে।

দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে পাইপটা চেপে ধ'রে সাহেব বল্লেন, ব্লাডি! এখনই খবর দাও পুলিসকে—ইমিজিয়েটলি। তার নিজের অর্ডার বড় সাহেবকে দিয়ে নাকচ করানর ক্রোধে এখনও সে ফুলছিল।

পুলিসকে খবর দেওয়া হ'ল।

বড় সাহেব একটা জরুরী কাগজ অভিনিবেশ সহকারে দেখছিলেন, এমন সময়, বড় বাবু সেলাম ক'রে দাঁড়ালেন। মুখে একটা উৎকট ব্যগ্রতার চিহ্ন।

বড় সাহেব কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন, কি ব্যাপার?

পুলিসের ডেপুটি কমিশনার হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ডেপুটি কমিশনার? কেন?

তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে টেবলে একটা ধাক্কা মেরে বল্লেন, কে খবর দিয়েছিল, সব খুলে বল না!

বড় বাবু ত্রস্ত হয়ে বল্লেন, ব্যাপার গুরুতর। পরেশ এম্‌বেজল করেছে একশ টাকা।

সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বল্লেন, পরেশ? কেন, কি ক'রে জানলে? ব'লে তিনি আগ্রহাতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বড় বাবু চাপকানটা ঠিক ক'রে নিয়ে সোৎসাহে বল্লেন, জানা গেছে ঠিক ইওর অনার। কাল পরেশ সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে চাইতে এসেছিল একশো টাকা—

কেন?

তার স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ। ডাক্তার, ইন্‌জেক্‌সন, অক্সিজেন এই সবের জন্যে একশো টাকার দরকার, ভেরি প্রেসিং নিড, সার, তার স্ত্রী যায়, গাসপিং, শেষ অবস্থা। তাই আমার কাছে চাইতে এসেছিল—

তুমি দিলে—

না, ইওর অনার, পুওর ম্যান, কোথায় পাব?

পায়চারি করতে করতে সাহেব হঠাৎ থেমে বড় বাবুর দিকে তাঁর হাত প্রসারিত ক'রে বল্লেন, ব্রুট কোথাকার। তুমি পুওর? জানি না আমি—অধর্ম্মের টাকায় তোমার সমস্ত মোটা পেটটা ভরা! একটা লোকের স্ত্রী মরছে, তার শেষ মুহূর্ত্ত, গাসপিং—ব'লে সাহেব খানিকটা চুপ করলেন—মানুষের এর চেয়ে দুঃসময়—এর চেয়ে বড় প্রয়োজন হয় না, সেই সময় মাত্র একশো টাকা, তাও দিতে পারলে না। ব্রুট, ব্রুট! তার পর?

বড় বাবু কাঁপছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন, ইওর অনার, তার পর সে আপিসে আসে, দরওয়ানের কাছ থেকে অছিলা ক'রে ঘরের চাবি নেয়, সিন্দুকের চাবি তার কাছেই ছিল, আর স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, একশো টাকা সিন্দুক থেকে নিয়েছে।

পুলিসে খবর কে দিয়েছিল?

ছোট সাহেব।

কেন, তোমরা আমার মতামত না নিয়ে এ সব করো, কেন না জিজ্ঞাসা ক'রে পুলিসে খবর দিলে? আচ্ছা, কাল দেখব আমি—

ব'লে সাহেব যেন অবরুদ্ধ ক্রোধকে শান্ত করবার জন্যে পায়চারি ক'রে ক'রে বেড়াতে লাগলেন, আর বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগলো, জানোয়ার, সয়তান—।

খানিক পরে বল্লেন, ডাকো পুলিস সাহেবকে, ছোট সাহেবকে, and the whole host of them, ব'লে চেয়ারে বসলেন।

পুলিস সাহেব এলে তাঁকে করমর্দ্দন ক'রে বসালেন। বল্লেন, আপনার প্রয়োজন?

পুলিস সাহেব ছোট সাহেবকে দেখিয়ে বল্লেন, মিঃ স্মিথের চিঠি পেয়ে এসেছি এন্‌কোয়ারি করতে, একটা এমবেজেলমেণ্ট কেসে।

বড় সাহেব তার দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে বল্লেন, কোথায় সে কেস্‌, কে করলে?

পুলিস সাহেব বল্লেন, আপনার আপিসে।

ছোট সাহেব বল্লে, পরেশ খাজাঞ্চি এমবেজল করেছে একশো টাকা।

বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, সে টাকা কি খাজনায় কম পাওয়া গিয়েছে নাকি?

ছোট সাহেব বল্লে—হাঁ।

বড় সাহেব খানিকটা নিজের মাথায় টোকা মেরে ভেবে নিয়ে অল্প হেসে পুলিস সাহেবকে বল্লেন, মিছামিছি কষ্ট দিলে এরা আপনাকে। এমবেজল টেমবেজল কিছু নয়। পরেশ তার স্ত্রীর অসুখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে দিন পনের কুড়ি আগে ভারী তাড়াতাড়ি দেশে চ'লে যায়, তাড়াতাড়ি সে একশো টাকা জমা দিতে পারেনি,—আমার কাছে রেখে যায়। এ আমারই দোষ, আমারই ত্রুটি ডেপুটি সাহেব। ব'লে আপনার ক্যাস-বাক্স থেকে একশো টাকার নোট বার ক'রে বড় বাবুকে বল্লেন, এখনকার খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠাও, সে এটা খাজনায় জমা দিয়ে দিক্।

স্মিথ বল্লে—কিন্তু—

বড় সাহেব বল্লেন, আমি আমার ডিউটি জানি মিঃ স্মিথ, আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমার আপিসে, আমি চাইনে যে আমার কাযে কেউ বাধা দেয়, এবং ভবিষ্যতে আমার বিনা অনুমতিতে কেউ কোন বিষয়ে যদি আমার ওপর টেক্কা দিতে চায় ত' সে অন্যায় আমি বরদাস্ত করব না ব'লে রাখছি। আপনি যেতে পারেন।

তার পর পুলিস সাহেবের দিকে হস্ত প্রসারণ ক'রে বল্লেন, আপনাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্য—বড়ই দুঃখিত। আসলে আমারই ভুল—গুডমর্ণিং।

৮

সুহাসিনীর জ্বর আজ তিন দিন ছেড়েছে; অন্যান্য উপসর্গগুলোও নেই। শুধু দুর্ব্বলতা, কিন্তু সে এত বেশী যে, মনে হয় যেন, তার কোনও দিনই আর উঠে হেঁটে বেড়াবার শক্তি হবে না।

সকালবেলায় পূর্বদিকের খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক রৌদ্র ও অনেকখানি আলো এসে পড়েছিল সুহাসিনীর ঘরে। তার রোগ-পাণ্ডুর মুখের ওপর অকালের সেই আলো প'ড়ে যেন একটা আলো-ছায়ার কুহেলিকা সৃষ্টি করেছিল; যেন বর্ষার দিনে এলোমেলো রোদ ও বৃষ্টি।

পরেশ তাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে পাশে এসে বসল। সুহাসিনী তার দুটি রোগ-পরিম্লান চোখে পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনই নির্নিমেষে—যেমন ক'রে পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রী তার দীর্ঘযাত্রার পর চেয়ে থাকে অভীষ্ট দেবতার মুখের পানে।

তাকিয়ে থেকে থেকে সুহাসিনী বল্লে, কি কাণ্ডটাই করলে আমাকে বাঁচাবার জন্যে—কিন্তু কেন এত হাঙ্গাম করলে!

পরেশ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বল্লে,—জান না? দুষ্টু!

একটা অত্যন্ত করুণ হাসি হেসে, সুহা বল্লে, আর যদি না বাঁচতাম।

পরেশ চুপ ক'রে রইল, আস্তে আস্তে তার কপালের ওপর পড়া চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল।

সুহাসিনীর জীবন যখন ফিরিয়ে পেলে, তখন আর এক দিক্‌কার প্রবল ভাবনা পরেশের বুকে অহর্নিশি খোঁচা দিতে লাগল। আপিসে যে তার পর কি কাণ্ড হয়েছে, তা কিছুই জানে না। বড় বাবুর সঙ্গে তার পর আর দেখা হয় নি, ভয়ে সে দেখাও করতে পারেনি। তার ছুটীও ফুরিয়েছে, আজ কাযে ফিরতে হবে। সুহাসিনীর অসুখের জন্য তীব্র উত্তেজনা আর নেই, এখন তার মন ভ'রে রয়েছে আপিসের ব্যাপারের অত্যন্ত কঠিন সমস্যার আশঙ্কায়। জানা-জানি নিশ্চয়ই হয়েছে, শুধু তারা অপেক্ষা ক'রে আছে—ছুটীর শেষে তাদের শিকারের প্রতীক্ষায়।

শুধু তার আপিসে পা দেওয়া মাত্র বাকী, তার পরে সে যে কি হাঙ্গামা, কি কেলেঙ্কারী, তা মনে করতেও বুকের ভেতর শিউরে ওঠে! অথচ তার একটি কথাও তার ওপর একান্ত-নির্ভর-পরায়ণা এই রোগ-শয্যা-শায়িনীকে বলা চলবে না,—না, কিছুতেই নয়।

চাকুরী ত' যাবেই, হয় ত বা জেলেও যেতে হবে! তখন কি হবে,—কেমন ক'রে বাঁচবে এই ক্ষীণপ্রাণা লতাটি!

এই আশঙ্কা তার বুকের ভেতর তোলপাড় করতে লাগল, আর দুই ফোঁটা জল হঠাৎ চোখের প্রান্তে এসে পড়ল।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, সুহা, আজ আমাকে আপিস যেতে হবে।

মৃত্যুর দারুণ সম্ভাবনা এই কয়দিন এই দম্পতিকে যেন আরও নিকটবর্ত্তী ক'রে তুলেছিল, একটি মুহূর্ত্তও যেন চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা হয় না।

সুহাসিনী বল্লে, আরও দিন-কতক ছুটী নিলে হয় না? তোমার শরীরেও ত আর কিছু নেই!

পরেশ মাথা নেড়ে বল্লে, না, তা হয় না, কিছুতেই হয় না।

ব'লে খানিকটা থেমে, খপ্ ক'রে সুহাসিনীর ডান হাত ধ'রে বল্লে, আচ্ছা সুহা, ওরা যদি আর বাড়ী আসতে না দেয়, আপিসেই ধ'রে রেখে দেয়, তা হ'লে—

সুহাসিনীর দুই চোখে তীব্র শঙ্কা জেগে উঠল, বল্লে, ও সব কি অলুক্ষণে কথা! না, না, কেউ তোমাকে আর আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবে না,—ভগবানের এই ইচ্ছা,—বোঝনি?

বুঝেছি ব'লে পরেশ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, সুহা, আপিস যাবার সময় হয়ে এল।

আপিসে চোরের মত ঢুকে, পরেশ নিজের যায়গাটিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। যে তার কায অস্থায়িভাবে করছিল, সে স'রে গিয়ে তাকে যায়গা ছেড়ে দিলে।

ধপ্ ক'রে চেয়ারে ব'সে পরেশ ভাবতে লাগল, এই বুঝি এলো এক-রাশ পুলিসের দল, এই বুঝি এলো তার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। কাণের পাশ দুটো উত্তেজনায় যেন আগুনের মত হয়ে উঠল।

কিন্তু এলো না ত' কিছুই, এক ঘণ্টা কেটেও ত' গেল। হঠাৎ তার কাঁধের উপর দুটো হাতের স্পর্শ অনুভব ক'রে চমকে তাকিয়ে দেখলে অনিল। বুকটা ধড়াস ক'রে উঠে, শান্ত হ'তে চায় না।

অনিল বল্লে, পরেশ বাবু, বৌ-দিদির খবর ভাল?

স্বস্তি বোধ হ'ল। হেসে বল্লে, হাঁ ভাই, ভাল; উঃ! আশা কি আর ছিল?

তার পর তার হাত ধ'রে বলি বলি ক'রে খানিকটা অপেক্ষা ক'রে পরেশ জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্লে, হাঁ ভাই, আমার ছুটীতে কোনও গোলযোগ হয়েছিল?

ছোট সাহেবের ঘরের দিকে একবার চেয়ে পরেশের চেয়ারের হাতলের উপর কোনও রকম ক'রে আশ্রয় নিয়ে, অনিল বল্লে, হয়েছিল ব'লে হয়েছিল, সে তুমুল কাণ্ড!

পরেশ পাথরের মত পলক-হীন চোখে চেয়ে রৈল অনিলের মুখের পানে।

অনিল বল্লে, তুমুল ব'লে তুমুল! ছোট সাহেব, বড়বাবু এরা মিলে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে বল্লে কি না, আপনি একশো টাকা এম্‌বেজল করেছেন, ওটা খাজনায় শর্ট আছে, একেবারে পুলিসে খবর। আর ওই যে দরোয়ান, ওটিও বড় কম ঘুঘু নয়। ও বলে, আপনি সন্ধ্যার সময় এক দিন খাজনা-ঘরে ঢুকেছিলেন,—বড়বাবু বল্লেন, ঠিক তার আগে তাঁর কাছে একশো টাকা চাইতে গিয়ে আপনি পান নি, কেশ একেবারে ক্লিয়ার! এলো পুলিসের ডেপুটি-কমিশনার—ও কি, আপনার বসতে বুঝি অসুবিধে হচ্ছে—আচ্ছা, আমি উঠে দাঁড়াই বরং—

পরেশ কথা কইতে পারলে না, তাকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখলে।

তার পর সবাই বড় সাহেবের কাছে উপস্থিত। বড় সাহেব সব শুনে হেসে বল্লেন, ভুল হয়েছে, তাঁরি ভুল, আপনি যাবার দিন একশো টাকা ভুলে খাজনায় জমা করতে না পেরে তাড়াতাড়িতে তাঁর কাছে রেখে দিয়ে যান, সেটা তিনিই দিতে ভুলে গেছেন—

হাতল-দুটো শক্ত ক'রে ধ'রে পরেশ বল্লে,—বল্লেন,—বল্লেন, এই কথা বড় সাহেব আমাদের, বল্লেন—?

হাঁ, শুধু বলা? তখনি তাঁর ক্যাশ-বাক্স থেকে একশো টাকা বার ক'রে দিয়ে দিলেন—

দিয়ে দিলেন? বড় সাহেব? একশো টাকা দিয়ে দিলেন? সত্যি?

সত্যি না ত কি! এ কি বড় বাবু না ছোট সাহেব? হাঁ, একটা মানুষ বটে! এতটুকু অধর্ম্ম করতে জানে না। ইচ্ছা করলেই ত ওটা চেপে রেখে, বিপদে ফেলতে পারতেন! আর আপনারও ভুল বৈ কি, হ'ক না তাড়াতাড়ি,—

পরেশ বল্লে, ভুল, নিশ্চয়ই ভুল, হ'ক না তাড়াতাড়ি—ভুলই ত!

হাঁ, ওটা খাজনায় জমা করা উচিত ছিল। যাক্, ব্যাপার ত মিটে গেল, ডেপুটী-কমিশনার চ'লে গেলেন, আর ছোট সাহেবকে এমনি কড়কে নিলেন যে, বাছা-ধনের এতটুকু মুখ। তার আগে বড় বাবুকে এমনি ধাতানি দিয়েছে, যে সমস্ত দিনটা কেঁপে অস্থির! তার পরদিন সার্কুলার বেরোলো, বড় সাহেবকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কেউ কোন কায করতে পারবে না। হাঁ, মানুষ বটে।

পরেশ বলতে লাগল নিজের মনে মনে—মানুষ, মানুষ, দেবতা, দেবতা!

পরেশ একেবারে বড় সাহেবের পায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়ল।

সাহেব তাকে উঠিয়ে চেয়ারে বসাতে বসাতে বল্লেন, ওল্ড বয়,—একেবারে একটি আস্ত গর্দ্দভ! টাকার কথা আমাকে বল্লে না কেন?

পরেশ দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্লে, একেবারে শেষ অবস্থা স্যর—

সাহেব বল্লেন, জানি—সব কথাই জানি। চিয়ার অপ্ ওল্ড বয়, তুমি কিছু অন্যায় করো নি। অপরাধ সত্যি হয়, আর অপরাধের মিথ্যা মুখোস্ আছে,—যার তফাৎ সব লোকে ধরতে পারে না, নির্ব্বোধ আইনও পারে না। আমি পারি। আমি জানি যে, ওই একশ' টাকা নইলে তোমার জীবন মাটী হয়ে যেত, একটা লোকের বহুমূল্য প্রাণ খামখা নষ্ট হ'ত,—যা ঐ একশ' টাকা নেওয়ার চেয়ে সর্ব্বশক্তিমানের চোখে ঢের বেশী অপরাধ। কিন্তু তোমার অন্ততঃ তার পরদিন সকালেও আমাকে জানান উচিত ছিল। এইটেই তোমার মস্ত ভুল—

পরেশ মুখ ঢেকেই পুনরুক্তি করতে লাগল, ভুল, ভুল,—অপরাধ, অপরাধ—

সাহেব খানিকটা চুপ ক'রে রইলেন, তার পর টেবলে দুইবার টোকা মেরে বল্লেন, তোমার হাতে টাকা নেই ত', এখনও ত মাস শেষ হয় নি।

পরেশ চুপ ক'রে রৈল।

সাহেব একশো টাকার নোট বার ক'রে তার সামনে রেখে বল্লেন,—শুনেছি, তোমার স্ত্রী ভাল আছেন, কিন্তু ভারী দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতা রোগের চেয়ে কম সাংঘাতিক নয়, ভুল ক'রে ফেল না যেন। সেবা, শুশ্রূষা, ওষুধের জন্মে এখনও অনেক টাকা চাই। তারই জন্যে এই সামান্য কিছু নেও।

পরেশ নোট-টা সাহেবের দিকে সরিয়ে রেখে আবার অভিভূত হয়ে পড়ল

সাহেব বল্লেন, শোনো, ও টাকা তোমাকে নিতেই হবে। জানো পরেশ, বিশ বৎসর আগে, অর্থের অভাবে সমুচিত চিকিৎসা করতে পারিনি ব'লে, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে আমি হারিয়েছি। আমি জানি, আমি বুঝি,—আই ফীল্, আই ফীল্। আমি আমার চোখের সামনে তোমাকে সে অপরাধ করতে দেবো না। আমার প্রিয়তমা মেরী, টাকা ছিল না ব'লে তাকে হারিয়েছি। আজ তারই একটি ভগ্নীকে—সাহেব আর বল্‌তে পারলেন না, দুই হাত যোড় ক'রে মাথা নীচু ক'রে বোধ করি মৃত্যু-শয্যা-শায়িতা বিশ বৎসর আগেকার তাঁর প্রিয়তমার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ স্মরণ করতে লাগলেন। তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সাহেব ভারী গলায় বল্লেন, তারই জন্যে, তারই মুখ মনে ক'রে আমি সমস্ত ক্ষমা করেছি। পরেশ! ঐ টাকাটা অস্বীকার ক'রে, তুমি তার পবিত্র স্মৃতিকে অবহেলা করতে পারবে না,—না, কিছুতেই নয়। কেঁদো না—যাও, তোমার কাযে যাও।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ষার ব্যথা

বৃষ্টিধারার সেতার-তারে
কোন্ বেদনা বাজে—
ঢেউ লাগে তার আজ প্রবাসীর
উদাস হিয়ার মাঝে।
দৃষ্টি ভেজা দীন নয়নে
দাঁড়িয়ে অ দীপ বাতায়নে,
বুকের কাঁটার হৃদয়-কেয়া
কাহার পরশ যাচে—
কোন্ বেদনা বাজে!

বিরহ মোর কূল হারাল
মেঘের কালীদহে,
আমার ব্যাকুল শ্বাস লেগে যে
বাতাস কেঁদে বহে।
সেথায় প্রিয়া গ্রামের গৃহে
একলা বসে' দুয়ার দিয়ে,
লিখতে গিয়ে গোপন-লিপি
নয়ন মোছে হা' যে!—
কোন্ বেদনা বাজে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সুন্দরবনে শিকার

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

সুন্দরবনের মধ্যে হরিণ শিকার করিবার যতরূপ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সবই লিখিলাম। তাহার পর জীবন্ত হরিণ যাহারা ধরে, তাহারা জাল পাতিয়া শিকার করে। পাট পাকাইয়া তাহার দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করিয়া জাল প্রস্তুত করা হয়। এরূপ একটি জাল ৭০ কিম্বা ৮০ হাত লম্বা, ৬ কিম্বা ৭ হাত উচ্চ হইলেই চলিবে। একগাছি জাল প্রস্তুত করিতে বেশী সময়ের আবশ্যক হয় না। পনর কিম্বা ষোল দিন কার্য্য করিলে এরূপ একটি জাল প্রস্তুত হয়। জাল পাতিয়া হরিণ ধরিতে হইলে একটু নীচের দিকে যাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রায় সমুদ্রের দিকে যাইতে হইবে। কারণ, দেখা যায়, সুন্দরবন-জঙ্গলের উত্তরদিক্ হইতে নীচের দিকে হরিণের সংখ্যা বেশী। জাল পাতিয়া হরিণ ধরিতে হইলে সেই দিকেই সুবিধা। জাল খাটাইবার কৌশল পূর্ব্বে জানা আবশ্যক। কারণ, এই জাল এরূপভাবে খাটাইতে হয় যে, যে মুহূর্ত্তে ইহাতে হরিণ পড়ে, তখনই তাহারা জালের ভিতর জড়াইয়া যায়, ইহাতে একবারে ৭ কিম্বা ৮টি হরিণ জালে আবদ্ধ হইতে পারে।

প্রথমে দেখিতে হইবে, হরিণ কোথায় চরিতেছে। যদি দেখা গেল, নদীর ধারে ধান্যক্ষেত্রের উপর হরিণ চরিতেছে, তাহা হইলে সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া জঙ্গলে উঠিতে হইবে। এরূপ স্থান হইতে উঠিতে হইবে এবং এরূপভাবে উঠিতে হইবে যে, হরিণ যেন তাহা বুঝিতে না পারে। ডাঙ্গায় উঠিয়া খুব শীঘ্র দেখিয়া লইতে হইবে, হরিণের চলিবার রাস্তা কোন্ দিকে। তার পর সেই স্থানে জাল খাটাইতে হইবে। এই জাল খাটাইবার কিছু কৌশল আছে। হরিণ জালে পড়িবামাত্রই সেই জাল তাহাদের ঘাড়ে পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে তাহারা জড়াইয়া যাইবে, এমনভাবে জাল পাতিতে হইবে।

জালটিকে প্রথমতঃ তাহার দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী লম্বাভাবে খাটাইতে হইবে। তাহার পর জালের গোড়ার দিক্ এরূপভাবে শক্ত করিয়া খোঁটা পুতিয়া কিম্বা গাছের গোড়ার সহিত বাঁধিতে হইবে, যাহাতে গোড়ায় দিক্ না উঠিয়া পড়ে। উপরের দিক্ গাছের ডালের সহিত বাঁধিতে হয় কিম্বা খোঁটা পুতিয়া তাহার সহিত বাঁধিতে হয়। এমন কৌশলে বাঁধিতে হইবে যে, হরিণ জালে পড়িবামাত্র এই জাল তাহাদের উপর পতিত হইবে এবং তাহাতে তাহারা জড়াইয়া যাইবে।

এইরূপভাবে জাল পাতিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া তাহার পর যেখানে হরিণ আছে, সেখানে আসিয়া চারি দিক্ হইতে তাড়া দিতে হইবে। সেই সময় এমনভাবে লোক সাজাইয়া লইতে হইবে যে, হরিণ আর কোন দিকে না গিয়া সেই জালের অভিমুখে ধাবিত হয়। এই উপায়ে হরিণ ধরা পড়িবে। কারণ, হরিণের শৃঙ্গ জালে জড়াইয়া যায়। তখন সাবধানে তথায় যাইয়া তাহাদিগকে ধরিতে হইবে। কিন্তু শৃঙ্গী হরিণের কাছে সকল সময়ে যাওয়া নিরাপদ্ নহে। ইহাদিগকে জাল হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক হরিণের পা এবং মাথা একসঙ্গে করিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইবে, তাহার পর একটি একটি করিয়া হরিণ বাহির করা উচিত। নচেৎ একবারে জাল উঠাইলে হরিণ পলাইয়া যাইতে পারে, কিম্বা হরিণের পদপ্রহারে সাংঘাতিকভাবে আহত হইবার সম্ভাবনা। সময়ে সময়ে হরিণের পদপ্রহারে মৃত্যুও হইতে পারে। অনেক সময়ে এরূপভাবে হরিণ ধরিয়া জালের ভিতর থাকিতে থাকিতে তাহাদের পায়ের শির ছিন্ন করা হয়। তাহাতে আর হরিণ দাঁড়াইতে পারে না কিম্বা পলাইতে পারে না অথচ আহার পাইলে সেই হরিণ কিছু দিবস জীবিত থাকিতে পারে।

জালে হরিণ পড়িলে তাহাদের ভিতর যেগুলি বেশী বলবান বলিয়া বুঝা যাইবে, তাহাদিগকে বাঁধিবার সুবিধা হইতেছে না—হয় ত জালের ভিতর এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, জাল না খুলিলে তাহাদের বাহির করা যাইবে না, অথচ জাল খুলিলে তাহারা পলাইয়া যাইতে পারে; সেরূপ স্থলে আগে তাহাদের পশ্চাদ্দিকের পায়ের শির কাটিয়া দেওয়া সুবিধাজনক। অনেকে তাহাই করিয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে নৌকার খোলে ফেলিয়া রাখিলে চলে। সুন্দরবনের নিকটস্থ অনেক লোক এইরূপভাবে হরিণ শিকার করে। বিশেষতঃ যাহারা হরিণ মারিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি গ্রহণ না করে, তাহারাই এইরূপভাবে হরিণ শিকার করিয়া থাকে। ইহাতে শব্দ হয় না, মানুষের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। কারণ,—বিনা পাশে হরিণ শিকার করিলে জেল কিম্বা জরিমানা দুই হইতে পারে। সেই জন্য এইরূপভাবে হরিণ মারা খুব নিরাপদ্ বলিয়া অনেকে এইরূপভাবে হরিণ মারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জঙ্গলের ভিতর হরিণ আর ব্যাঘ্র ছাড়া আর কোন শিকারের প্রাণী নাই। বন্য শূকর আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শিকারীর বিশেষ লাভ নাই। কিন্তু সুন্দরবনের নদী অত্যন্ত হিংস্র-কুম্ভীরপূর্ণ। অরণ্যমধ্যে প্রায় এরূপ নদী নাই—যেখানে ভীষণপ্রকৃতি কুম্ভীরের সমাবেশ নাই। সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, কুম্ভীর কখনও নৌকার উপর হইতে মানুষ লইতে পারে না। অনেকে বলেন যে, কুম্ভীর নৌকা কখনও স্পর্শ করে না; কিন্তু তাহা ভুল। সুন্দরবনের কুম্ভীর নৌকা হইতে মানুষ গ্রাস করে। প্রতি বৎসর জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের দ্বারা যত লোক নিহত হয়, কুম্ভীরের দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী লোক ইহলোক ত্যাগ করে।

কুম্ভীরগণ এমন ধূর্ত্ত ও দুর্দ্দান্ত যে, নৌকার উপর হইতে নিদ্রিত লোককে মুখে করিয়া লইয়া যায়। প্রতি বৎসর এরূপে বহু লোক কুম্ভীরের গ্রাসে প্রাণ দেয়। জলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কিম্বা নৌকায় বসিয়া জলে পায়ের কাদা ধুইতেছে, এরূপ অবস্থায় কুম্ভীর প্রায় মানুষ ধরে। কিন্তু নৌকার উপর নিদ্রিত কিম্বা নৌকায় বসিয়া রহিয়াছে—এরূপ অবস্থায় কুম্ভীরের আক্রমণের সংখ্যা অনেক অধিক। কুম্ভীর এমন ভয়ানক জন্তু যে, জঙ্গলে উঠিয়া হরিণকে পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যায়। লেখক স্বয়ং এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কুম্ভীর এরূপ চতুর যে, ইহারা অনেক সময়ে ডাঙ্গায় উঠিয়া চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। এই সময় কোন হরিণ নিকটে আসিলে, সে তাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে আয়ত্ত

করিয়া ফেলে। কিম্বা নদীর নিকটে যদি কোন হরিণের গোঠ থাকে (হরিণ সকল চরা করিয়া আসিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করে, তাহাকে গোঠ কহে,) সেই গোঠের নিকট নিঃশব্দে যাইয়া শয়ন করিয়া থাকে। হরিণ তথায় আসিবামাত্র তাহাকে ধরিয়া জলে লইয়া যায়। ইহারা বন্য শূকরকেও ধরে। অনেক সময়ে বন্য শূকর নদীতীরবর্ত্তী কোন স্থানে হয় ত শয়ন করিয়া আছে, সেই সময় ধূর্ত্ত কুম্ভীর জল হইতে তাহা দেখিয়া খুব নিঃশব্দে ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং ধরিয়াই তাহাকে জলে লইয়া যায়। পৃথিবীতে ব্যাঘ্রের কবল হইতে অনেক সময়ে রক্ষা পাওয়া যায়; কিন্তু কুম্ভীরের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। লেখক সুন্দরবনের ভিতর শিকারীদের নিকট শুনিয়াছেন যে, ব্যাঘ্রকেও কুম্ভীরে আক্রমণ করে। অনেক শিকারী সেরূপ ঘটনা দেখিয়াছে; হয় ত অনেক সময়ে ব্যাঘ্র নদীর খালের ভিতর জলপান করিতে আগমন করে। সেই সময় কুম্ভীর তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

সুন্দরবনে শিকার করিতে যাইলে সর্ব্বদা কুম্ভীরের জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ রাত্রিকালে খোলা নৌকায় নিদ্রা যাওয়া কোনও রূপে বিধেয় নহে। সর্ব্বদা নৌকার ছইয়ের ভিতর নিদ্রা যাওয়া উচিত। নদীতে পা ধুইবার সময়ও বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। বিগত বর্ষে কয়ড়া লাটের চারি জন লোক জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। তাহারা বৈকালে জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল। জঙ্গলে যাহারা কাষ্ঠ বা গোলপাতা সংগ্রহ করিতে যায়, কিম্বা মধু ভাঙ্গিবার জন্য গমন করে, তাহারা সকালে উঠিয়া আহারাদি করিয়া বেলা ৯টা ১০টার সময়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং বেলা ৪টা বাজিলে জঙ্গল হইতে বাহির হয়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় কেহ অবস্থান করে না। উল্লিখিত চারি ব্যক্তির মধ্যে পর পর তিন জন পা ধুইয়া নৌকায় উঠিয়াছে, এক জন নৌকার প্রান্তে বসিয়া পা ধুইতেছে, ঠিক সেই অবসরে তাহাকে কুম্ভীরে ধরিয়া লইয়া গেল। এরূপ ঘটনা জঙ্গলের মধ্যে প্রায় সংঘটিত হইয়া থাকে। এ জন্য সর্ব্বদা কুম্ভীরের জন্য সাবধান থাকিতে হয়।

কুম্ভীর-শিকারও অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার। ইহার চামড়াও অত্যন্ত মূল্যবান্ বস্তু। বোধ হয়, যতরূপ জীবের চামড়া সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, কুম্ভীরের চামড়া সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। সেই জন্য কুম্ভীর-শিকার মানুষকে আনন্দ ও অর্থ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে। হরিণ যেরূপ নানা উপায়ে শিকার করা যায়, কুম্ভীর-শিকারেরও সেইরূপ নানা প্রণালী আছে। হরিণ শিকার করিতে যেরূপ কৌশল আবশ্যক হয়, কুম্ভীর শিকার করিতেও সেইরূপ কৌশলের প্রয়োজন।

শীতকালে সকালে যখন রৌদ্র উঠে, তখন প্রায় দেখা যায়, কুম্ভীরগণ নদীর চরে উঠিয়া শয়ন করিয়া থাকে। সেই সময় শিকারীরা নৌকা করিয়া যাইয়া দূর হইতে গুলী করে। ইহাতে অনেক সময়ে কুম্ভীর গুলী খাইয়া দমভরে জলে গিয়া পড়ে। তখন তাহাকে নদীতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে; কুম্ভীরকে গুলী করিয়া প্রায়ই যথাস্থানে রাখা যায় না। তবে যদি খুব ভাল রাইফেল বন্দুক হয়, তাহা হইলে কুম্ভীরের মস্তকে কিম্বা ঘাড়ে মারিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কুম্ভীরকে যথাস্থানে পাওয়া যাইতে পারে, নচেৎ নহে। সেই জন্য অনেকে বলে, কুম্ভীর মারিলে তাহাকে উঠান যায় না। কুম্ভীরকে বন্দুকের এক গুলীতে মারিতে হইলে, তাহার মস্তকে কিম্বা গ্রীবাদেশে অথবা সম্মুখের বগলের নীচে গুলী করা উচিত। বগলের নিম্নভাগে গুলী লাগিলে তাহার ফুস্‌ফুস্ বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন কুম্ভীরকে এক গুলীতে মারা অসম্ভব। এক গুলীতে তাহাকে মারা সম্ভব হইলেও তাহার দেহকে ডাঙ্গায় উঠান যায় না; কারণ, সে দমভরে জলে পড়িয়া এত দূরে চলিয়া যায় যে, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ শিকারীর পক্ষে ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। হয় ত পথে নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখা গেল যে, নদীর চড়ার উপর একটি কুম্ভীর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহাকে গুলী করা ছাড়া আর উপায় নাই, সেই সময় তাহার মস্তক, গ্রীবাদেশ কিম্বা বগলের নীচে—এইরূপ কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলী করা কর্ত্তব্য।

কুম্ভীর-শিকারের আরও অন্য উপায় আছে। অনেক সময়ে গুলীর দ্বারা যদি কুম্ভীর মারা অসম্ভব হয়, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এক বিঘত অর্থাৎ প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা একটি বঁড়শী প্রস্তুত করাইতে হইবে। উক্ত বঁড়শীর 'পান' যেন ভাল হয়। টানিলে সোজা হইয়া না যায় এবং তাহাতে তীক্ষ্ণতা অধিক থাকিবে। সেইরূপ বঁড়শীর গোড়ায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ কিম্বা সিকি ইঞ্চি পরিমাণ মোটা দুই শত হস্ত লম্বা শক্ত দড়ি বাঁধিতে হইবে। তৎপরে সেই বঁড়শীতে ছাগলের নাড়ী-ভুঁড়ি কিম্বা মৃত বিড়াল কিম্বা কুকুর দগ্ধ করিয়া তাহা ভাল করিয়া গাঁথিয়া, যে চড়ার নিকট কুম্ভীর প্রায় শয়ন করিয়া থাকে, তাহারই নিকট নদীতে ফেলিয়া রাখিতে হয়। দেখা যায়, কুম্ভীর আসিয়া সেই টোপ ধরে এবং তাহা গিলিলেই প্রায় সেই বঁড়শী তাহার গলায় কিম্বা মুখের ভিতর বিঁধিয়া যায়। কুম্ভীর যতই টানিতে থাকিবে, ততই উহা ভিতরে বিঁধিয়া যাইবে, তখন তীরস্থিত লোকগণ মাছ খেলাইবার ন্যায় ক্রমে ক্রমে টানিয়া তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ হইলে অনেক সময় নিকটে নৌকা রাখা আবশ্যক। যদি দেখা যায়, সূতায় অত্যন্ত টান পড়িতেছে, সূতা রাখা যাইতেছে না, তখন নৌকায় উঠিয়া পড়িয়া নৌকা লইয়া কিছু দূর যাইয়া তাহাকে লইয়া খেলাইয়া বেড়াইতে হইবে। তাহা হইলে সেই কুম্ভীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া তীরের নিকট আসিতে থাকিবে। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তীরে উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক।

ইহা ছাড়া আর অন্য প্রকারেও কুম্ভীর শিকার করা হয়। যদি দেখা যায়, নদীতে কুম্ভীর রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহাকে দেখা যায়, অথচ সেই কুম্ভীর চড়ায় বসিতেছে না, তখন উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, এইটি সর্ব্বদা লক্ষ্যের বিষয়, কুম্ভীর চৈত্রমাস হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস অবধি প্রায় কখনই তীরে উঠে না। নদীর জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, আর সেই সময় বেশী ক্ষুধার্ত্ত থাকে। শীতকালে কুম্ভীরের তেজ কিছু কম থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত বলশালী হয়। রৌদ্রের জন্যই হউক, আর যে কারণ বশতঃই হউক, সে সময় উহারা নদীর চড়ায় বসিয়া থাকে

না। সেই জন্য সেই সময় এবং শীতকালে যদিও চড়ায় উঠে বটে, কিন্তু হয় ত নিকটে যাইলে পলায়ন করে। সেরূপ স্থলে সেই কুম্ভীর শিকার করিতে হইলে "বঁড়শী হাঁটাইয়া" ধরিতে হয়। যেখানে কুম্ভীর চড়ায় উঠে কিম্বা ভাসিয়া বেড়ায়, সেখান হইতে কিছু দূরে, তিন চারিখানি নৌকা ছয় সাত হস্ত ব্যবধানে পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাসাইয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেক নৌকা হইতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীর বঁড়শীর নিম্নে প্রথমে তিন চারি হস্ত সরু দড়ি অর্থাৎ অর্দ্ধ ইঞ্চি কিম্বা সিকি ইঞ্চি মোটা দড়ি বাঁধিতে হইবে। তাহার পর তদপেক্ষা মোটা দড়ি বাঁধিয়া ক্রমশঃ 'কাছি' বা দড়ার সাহায্য লাভ করিতে হইবে।

এইরূপ তিন অথবা চারিটি কাছি-সংযুক্ত বঁড়শী প্রত্যেক নৌকা হইতে পৃথক্ পৃথক্ভাবে জলে ফেলিয়া দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হইবে। এইভাবে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলেই যথেষ্ট। এইরূপ গমনাগমনের ফলে বঁড়শী জলের অভ্যন্তরস্থ কুম্ভীরের গায়ে সংলগ্ন হয়। কুম্ভীর কখনই গভীর জলে থাকে না। বড় জোর আট দশ হাত জলের নীচে সন্তরণ করে। "বঁড়শী হাঁটান" প্রক্রিয়া কখনই নদীর মধ্যস্থানে কর্ত্তব্য নহে। তীর হইতে যত দূর পর্য্যন্ত আট দশ হস্ত পরিমাণ জল আছে, তত দূর পর্য্যন্ত জলের উপরিভাগে নৌকা চলাচল করিবে।

কুম্ভীরের গায়ে বঁড়শী লাগিবামাত্র একটু টান পড়িবে। উহাদের এমনই স্বভাব যে, কোন পদার্থ দেহে বিদ্ধ হইলেই উহারা পাক খাইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে ক্রমশঃ উক্ত রজ্জু বঁড়শীবিদ্ধ কুম্ভীরের গায়ে জড়াইতে আরম্ভ করে। সেই সময় নৌকার উপর হইতে দড়ি ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন। তবে এই সময় ইহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, কুম্ভীর কোন্ দিকে পাক খাইতেছে। তদনুসারে অন্য অন্য নৌকার আরোহীদিগকে ডাকিয়া লইয়া তাহাদের নৌকার বঁড়শীগুলিও জলে ফেলিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ, অধিকসংখ্যক বঁড়শীর রজ্জুতে কুম্ভীরকে জড়াইয়া লইতে পারিলে উহার মুক্তির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তৎপরে যখন দেখা যায় যে, কুম্ভীর দুই তিনটি বঁড়শীর দড়িতে জড়াইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমশঃ মোটা দড়ি তাহার দেহকে বেষ্টিত করিয়াছে, সেই সময় তাহাকে জড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর উঠাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। কুম্ভীরও সেই সময় টানে টানে জলের উপরে উঠিতে চেষ্টা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে কুম্ভীরও জলের উপর উঠিবে। এরূপ অবস্থায় যখন দেখা যাইবে যে, কুম্ভীর জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনই উপর হইতে সড়কী লইয়া তাহাকে গাঁথিয়া ফেলা সঙ্গত। তবে যদি তাহাকে জীয়ন্ত ধরা আবশ্যক বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে উপর হইতে প্রথমে একটি কাছী দিয়া তাহার বুকের নীচে বাঁধিয়া ফেলা আবশ্যক। তাহার পর তাহার মুখের উপর একটি ফাঁস গলাইয়া দিয়া তাহার মুখটি বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে তাহার শরীরের বলের অপচয় হয় না। সেই সময় নৌকাকে বাহিয়া তীরের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু তাহা ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে। কুম্ভীরের সম্মুখের দুইখানি পা, বলিদানের সময় ছাগলের পা যেরূপে পশ্চাদ্দিক্ করিয়া ধরা হয়, সেইরূপে বাঁধিতে হইবে। তখন কুম্ভীর আর জোর করিতে পারে না। তাহার পর তাহাকে বাঁধিয়া নৌকার পার্শ্বেই হউক, কিম্বা নৌকার উপরে উঠাইয়াই হউক তীরে লইয়া আসিতে হইবে। লেখক এইরূপে দুইটি কুম্ভীরকে ধরিতে দেখিয়াছেন।

তীরে আনিয়া কুম্ভীরকে জড়ান দড়ির পাক হইতে মুক্তি দিয়া যথেচ্ছভাবে বন্ধন করিয়া রাখা যায়। যাহাদের বন্দুক নাই, তাহারা প্রায় এইরূপে কুম্ভীর ধরিয়া থাকে। ১৩৩২ সালে ইছামতী নদীর তীরে কোন গ্রামে জেলেদের একটি বধূকে স্নান করিবার সময় কুম্ভীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে যখনই জেলেরা দেখিল, সেই কুম্ভীরকে গুলী করা যাইবে না (তাহাদের বন্দুক ছিল না), তখন তাহারা নৌকা লইয়া "বঁড়শী হাঁটাইতে" সুরু করিয়া দিল। তাহার পর কুম্ভীর সেইরূপে বঁড়শীতে জড়াইয়া যাইলে তাহাকে তীরে তুলিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল। কারণ, সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, কুম্ভীর কোন জীবকে ধরিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া রাখে, তাহার পর তাহা পচিয়া উঠিলে তাহাকে ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কুম্ভীর প্রায় যখনই যাহা ধরে, তখনই তাহা গ্রাস করিতে চেষ্টা করে, তবে তৎক্ষণাৎ যে খায় না—তাহা কেবল নিরিবিলি স্থানের অভাববশতঃ।

কুম্ভীর যখন কোন বৃহৎ জীবকে আহার করে, তখন তাহাকে জলের ভিতর কখনও খায় না। তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আহার করে এবং সেই ডাঙ্গাটা জনহীন স্থান হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, একটা কুম্ভীরের মুখ হইতে আর একটা কুম্ভীর খাদ্য-সামগ্রী কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। তখন কুম্ভীরে কুম্ভীরে বিষম যুদ্ধ লাগিয়া যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, দুইটা কুম্ভীরে যখন ঝগড়া করিতেছে, তখন অন্য একটা আসিয়া তাহার মুখের শিকার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, কুম্ভীরে মানুষ ধরিয়া লইয়া তাহার পর তিন ঘণ্টা বাদ তাহাকে খাইতে সুরু করিয়াছে। তবে ইহারা চর্ব্বণ করে না, গিলিয়া খায়। ইহাদের চোয়ালের অত্যন্ত জোর। শরীরের কোন স্থান ধরিয়া টান দিলে সেই স্থান একবারে ছিঁড়িয়া আসে, তাহার পরে তাহা গিলিয়া ফেলে। তবে এমন হয়, কুম্ভীর একবারে সেই জানোয়ারকে না খাইতে পারিলে কতক খাইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয়। আবার নিজের ইচ্ছামত ভক্ষণ করে, তাহাতেই সাধারণে মনে করে যে, কুম্ভীর এখন রাখিয়া দিল, তাহার পর পচিয়া যাইলে ইহাকে আহার করিবে, কিন্তু তাহা নহে।

তবে যদি দেখা যায়, কুম্ভীর কিছু মুখে করিয়া লইয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, নিরিবিলি স্থান কুম্ভীর তখনও পায় নাই, সেই জন্যই বেড়াইতেছে। কুম্ভীর যে ডাঙ্গায় উঠে, তাহা নদী হইতে ঢালু স্থান হওয়া চাই। নদী হইতে যে চর ঠিক্ ঢালু হইয়া নদীতে মিশিয়াছে, তাহাতেই কুম্ভীর বিশ্রাম করে। কিম্বা যে সকল ছোট খাল কোন বড় নদীতে পড়ে, তাহারই মুখে কুম্ভীরের বিশ্রামস্থান। মৎস্য খাইবার জন্য কুম্ভীর বেশী সময় খালের মোহনায় আসিয়া থাকে। সুন্দরবনের ভিতর কিম্বা কুম্ভীর-বহুল নদীতে ছোট খালের মুখে কদাচ জলে নামা উচিত নহে, সেই স্থানই কুম্ভীরের আড্ডা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চ[illegible]

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেবা ও দয়া

সেবা ও দয়া প্রভৃতি গুণও সতীত্বের প্রাণ। সেবা ভগবানের, সেবা মানুষের, সেবা জীবের। প্রথমে ভগবান্-সেবা, পরে ভগবান্ বোধে মানুষ বা জীব-সেবা,ইহাই প্রকৃত সেবা। ভগবান্-সেবা কিরূপ? একবার মীরা বাঈয়ের "যো কো চাকর রাখ জী" স্মরণ করুন। "তুমি আমায় চাকর রাখ! আমি তোমার চাকরী করিব। তুমি নর কি নারী, তাহা আমি জানি না। তুমি কখন পুরুষবেশে থাক, কখন বা প্রকৃতিবেশে; যখন যে বেশেই থাক, আমায় চাকর রাখ। যখন তুমি নারীবেশে থাকিবে, তখন আমি স্ত্রী হইয়াই তোমার দাসী। তুমি শয়ন করিবে, আমি শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি পূজা করিবে, আমি মন্দির মার্জ্জনা করিয়া দিব। তুমি সাজ-সজ্জা করিবে, স্বামীর জন্য আমি সাজ করিয়া দিব। তুমি ফুল ভালবাস, আমি ফুল তুলিয়া দিব, মালা গাঁথিয়া দিব, চন্দন, ধূপ, ধুনা আনিয়া দিব। তুমি ফুল-সাজে সাজিতে চাও, সাজাইয়া দিব, চন্দন মাখাইয়া অলকা-তিলকা কাটিয়া দিব। তুমি আহার করিবে, রন্ধন করিবে স্বামীকে খাওয়াইবার জন্য, আমি তাহার যোগাড় করিয়া দিব; আমি আসন আনিয়া দিব, স্নান করাইয়া দিব, সুবর্ণ-পাত্র আনিয়া দিব, তুমি আহার করাইয়া তাঁহার প্রসাদ লইও। আমি তোমার বাগান প্রস্তুত করিব। যখন ঘর্ম্মাক্ত হইবে, আমি তোমায় পাখা করিব; কখন উভয়কেই সেবা করিব। তুমি আমায় চাকর রাখ" (মনোনিবৃত্তি পৃঃ ৮০)। ইহা মানসপূজা। শঙ্করাচার্য্যও এই মানসপূজা দেখাইয়াছেন।

> "রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং
> নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
> জাতি-চম্পক-বিল্বপত্র-রচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা
> দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্। ইত্যাদি
> সৌবর্ণে মণিখণ্ডরত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
> ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পায়সম্।
> সাষ্টাঙ্গপ্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া
> সংকল্পেন সমর্পিতং তব বিভো! পূজাং গৃহাণ প্রভো!।"

আবার এই দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা করা হয় বলিয়াই তাহাকে শুচি রাখিতে হয়। কারণ, ইহা যে কৃষ্ণবিলাসেরই জন্য, মদনবিলাসের জন্য নহে। তাই দেহান্ত হইলেও বৈষ্ণব দেহ-সংকার করেন না, মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তাই রাধা সখীদের বলিতেন যে, মরণকালে আমার অঙ্গে কৃষ্ণনাম লিখিও, কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইও, দেহটি জলে ভাসাইয়া দিও না, বা পোড়াইয়া ফেলিও না, অতি যত্নে তমালের ডালে রাখিয়া দিও। এই সেবা, শ্রীভগবানের সেবা, দেহ দ্বারা করিতে হয় বলিয়াই তাহাকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়। কর্ণ বহু প্রকার কু-কথা শুনিয়া শুনিয়া অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অহরহঃ হরিনাম শুনাইয়া তাহাকে শুদ্ধ কর। এই জিহ্বা কুখাদ্য খাইয়া, কুবাক্য উচ্চারণ করিয়া করিয়া ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত পান করাইয়া, কৃষ্ণনাম জপ করাইয়া তাহাকে শুদ্ধ কর। তাই রসনাকে সম্বোধন করিয়া উক্তি—"বল রসনা হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, আমি বহুদিন তোমারে করেছি যতন।" এই ত্বক্ কত কুদ্রব্য স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে ভগবানের চরণে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া শুদ্ধ কর। এই নাসিকা কত কুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে। কৃষ্ণ-গন্ধ-সৌরভে সে মকরন্দে মত্ত মধুকরের মত "মধুমাতল ফিরে উড়ই না পার" হউক। চক্ষু কুৎসিতভাবে দেখিয়া দেখিয়া বিশেষভাবে ব্যভিচারী হইয়াছে। তাহাকে দেব-দেবীরূপ দর্শন করাও; সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভগবানের রূপ দর্শন করাইয়া—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" কর। ইহা করিলে তবে শ্রীভগবান্-সেবার অধিকারী হওয়া যায়।

আবার মানুষ বা জীব-সেবাও ভগবান্-সেবা—যদি নারায়ণ-বোধে করা হয়। এ দেশে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার কথা সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু দরিদ্রই হউন বা যিনিই হউন, তাঁহাকে নারায়ণ বোধে সেবা না করিলে, সেবকের মধ্যে অহংভাব আসিয়া সেবা-ভাব নষ্ট করিবার সম্ভাবনা। ইহাতে সেব্য এবং সেবক উভয়েরই ক্ষতি হইবার কথা। নারায়ণ-বোধে সেবা সহজ নহে। সাধনা বিনা ইহা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞান দ্বারা মনের প্রসার এবং তাহার সজীবতা ও সরসতা জন্য ভক্তিভাব না আনিলে এ কর্ম্ম ঠিক ঠিক হয় বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে, বাম হস্তকেও তাহা জানিতে দিও না। ঢাক বাজাইয়া নাম জাহির হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ নিজের বা পরের কায হয় না।

আজকাল সভ্য জগতে এই সেবাধর্ম্ম সর্ব্বত্রই দেখা যায়। জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মড়ক, সমাজ ও পল্লী-উন্নতিকল্পে মানুষ আজ অনেক উৎসাহ, অশেষ ক্লেশ, স্বার্থ-ত্যাগ করিতেছেন। এইটি মহাপ্রাণের সাড়া, এইটিই নবীনে প্রাচীনের একত্বের সন্ধিস্থল। ইহাই মানুষের মধ্যে দেবীর প্রেরণা। ইহা আছে বলিয়াই জগৎ উৎসন্ন যায় নাই। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক হেকেল বলেন—নীতিবাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য আত্মপ্রীতি এবং পরের প্রীতি। এই দুইয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করা। জগতে বাস করিতে গেলে মানুষকে তাহার নিজের সুখ-দুঃখ প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের মতই মনে করিতে

হইবে। তাহার ভাল হইলে নিজের ভাল হইল মনে করিতে হইবে। Modern science regards as the highest aim of all morality there—establishment of a sound harmony between self love and the love of one's neighbour...If man desire to have the advantage of living in an organised community, he has not only to consult his own fortune but that of his neighbour...He must realise that his neighbour's prosperity is his own prosperity and that his neighbour cannot suffer without his own injury (Riddle of the Uuiverse P. 357-8) আজ যে সমাজে নীচ জাতিকে আবার মানুষের পদবীতে স্থান দিবার চেষ্টা হইতেছে, শ্রমজীবীকে ভাল ভাল আহার,বাসস্থান দিবার চেষ্টা—এটা নবীনের কীর্ত্তিস্তম্ভ। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করা, পতিতাদের উদ্ধার করা ইত্যাদি ব্যাপারও এই মহৎ প্রেরণার অন্তর্গত। এই মনুষ্য-জাতির সেবা-ধর্ম্মের প্রেরণায় আজ বৈজ্ঞানিকগণ কেহ কেহ অসীম স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। পাস্তর (Pasteur) এবং তাঁহার শিষ্যগণ রোগের কারণনির্ণয় এবং তাহার প্রতীকার আবিষ্কার করিবার জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত দুর্গম স্থানেও গিয়াছেন এবং সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন। বিদ্যা, জ্ঞান, দারিদ্র্য, রোগ এই সকলের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। জ্ঞানের বা মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সমস্তই মানুষকে পশু হইতে অনেক দূরে আনিয়াছে, নচেৎ মানুষ যে পশুই অনেকটা। দেশের জন্য, দশের জন্য যিনি কাঁদিতে পারেন, তিনিই ত মানুষ, নচেৎ নিজের পয়সা বা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য ত সবাই কাঁদে। আপনার জন্য চেষ্টা, নিজের সন্তানাদির জন্য প্রাণপাত, কুকুর-শিয়ালেও করে, মানুষের চেয়ে অনেক সোজাভাবে করে, তবে তাদের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কি ? যিনি পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহারই জন্ম সার্থক। সেবা শুধু মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে, সর্ব্বজীবে হওয়া উচিত। শ্বেতাঙ্গরা ইতর জীবের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কাযেই জীবহিংসা তাহাদের দোষ বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর ছেলে সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন, এ কথা মানেন, তবে কোন্ হিসাবে জীব-হিংসা করেন ? প্রাচীনভাবে চালিত গৃহস্থমধ্যে এখনও পশু-সেবা গো-সেবা প্রচলিত। এখনও অনেক সংসারে অতিথি এবং গো-সেবা না করিয়া গৃহস্থ নিজে আহার করেন না। গৃহী মাত্রেরই পশু-যজ্ঞ প্রত্যহ করিবার বিধি, তাহার মধ্যে অতিথি এবং পশু-সেবা দুইটি।

এই সেবার দৃষ্টান্ত ঘরে, বাহিরে। এক দিকে যেমন ব্যাধি, শোক, যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা, অন্যদিকে জ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে চেষ্টা। সেবা বহুমুখী, কেহ বা শরীর দ্বারা সেবা করেন, কেহ বা উপদেশ, শিক্ষা, আদর্শ দিয়া সেবা করেন, যেমন সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি। কেহ বা নিজের জীবনে আদর্শমানুষ হইয়া জগতের সেবা করেন। ইঁহারা মানুষের গতি ঊর্দ্ধদিকে করিয়া দিয়া, শোকে ধৈর্য্য, হতাশে আশাবাণী দিয়া, দোষে ক্ষমা করিয়া, প্রকৃত অভ্যুদয় আনিয়া দেন। প্রকৃত ধার্ম্মিকরাই জগতে সকলের অপেক্ষা অধিক কল্যাণসাধন করেন। যে স্থলে প্রতীকার করিবার জন্য কাহারও সাধ্য নাই, সেইখানে ইঁহারাই একমাত্র গতি। * মনের রোগ, ভবরোগ, প্রতীকার তাঁহারাই করিতে পারেন, বিজ্ঞান এখানে মূক। "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।" এ ভবরোগে বৈদ্য স্বয়ং নারায়ণ।

সেবা এবং দয়া এক সূত্রে গ্রথিত। আবার সতীত্ব বিকশিত হয় এই দুইটি লইয়া অন্য বৃত্তির সংযোগে। সুতরাং এ দুইটি সতীত্বের প্রধান অঙ্গবিশেষ।

দয়ার ভিখারী কে নহে ? প্রাণে প্রাণে যিনিই নিজের অক্ষমতা বুঝিয়াছেন, নিজের অপকৃষ্ট বৃত্তির প্রাবল্যে অনুতপ্ত হইয়াছেন, নিজের দেবভাবের পরাজয় লক্ষ্য করিয়াছেন, নিজের ইষ্টকামনার অন্তরায়গুলিকে দূর করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও হতাশ হইয়াছেন, তিনি দয়ার ভিখারী হইবেনই। সুখ-সম্পদের কাঙ্গাল আমরা। পেটের দায়ে, অবস্থার দাসত্বে কাঙ্গাল আমরা। ভাব-ভক্তির কাঙ্গাল আমরা। স্বাস্থ্য-যৌবনের কাঙ্গাল আমরা, আমাদের কাঙ্গালত্বের শেষ নাই। কেহ বা দুটা মিষ্ট কথার কাঙ্গাল, কেহ ধন-দৌলত, কেহ ভালবাসা, কেহ পরের সুখ নিজের করিবার জন্য কাঙ্গাল। আমাদের এ হেংলা বৃত্তির আদি নাই, অন্ত নাই। সুতরাং আমাদের অকিঞ্চনত্বেরও, দয়া-প্রার্থনারও শেষ নাই। তবে কেহ বা ভিক্ষুকেরই মত দয়া চাহে, কেহ বা জোর করিয়া লাঠির আগায় তাহার ঈপ্সিত বস্তু আদায় করিতে চাহে। কিন্তু এই চাওয়ার শেষ নাই। এই জন্যই সৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করার শিক্ষা। নিজের উৎকৃষ্টতর গতিলাভ-বাসনায়, নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া তাই প্রার্থনা করা হয়,

"গণয়িতে দোষ-গুণ-লেশ না পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগবাহির নহি মুই ছার।"

হে প্রভো! যদি দোষগুণের বিচার কর, তবে আমার মধ্যে গুণের লেশ পাইবে না। তবে আমার কিসের দাবী ? শুধু-মাত্র তোমার দয়ার। তোমাকে লোক জগন্নাথ বলে এবং আমিও জগতের বাহিরে নহি, এইমাত্র আমার ভরসা। অথবা,

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়—
দেহি তুলসী-তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়।"

আমি বহুৎ বহুৎ মিনতি করিতেছি, তুলসী-তিল দিয়াছি, দেহ সমর্পণ করিয়াছি, আমায় দয়া করিয়া ছাড়িও না। ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলেন,—

"দয়া ধরমকি মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান।
তুলসী ন ছোড়িয়ে দয়া যব কণ্ঠাগত প্রাণ।
তুলসী জগমে আকর, করগে দোনো কাম্।
দেনেকো টুকরা ভালা, লেনেকো হরিনাম।"

এই দয়া চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্য দিয়াই জগৎ গত ... করিতেছে। কারণ, প্রকাশভাবে না চাহিলেও কমবেশী ...

* W. Trine. In Tune with the Infinite. p. 14...

পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একমুখী সাধনা, ধৈর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই যখন সকল ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করিতে হয়, তখন সেই উপায়গুলিই চাওয়া, দয়া ভিক্ষা করা, যিনি ঈপ্সিতকে দিবেন তাঁহার কাছে। তা তিনি ভগবান্‌ই হউন, মানুষই হউন, বা শক্তিই হউন। কোন কোন জিনিষ আবার যথার্থ পাওয়া হয় কথন্, না তাহা হারাইলেই। এই হারানর মধ্যে পাওয়াটাকেও সসীমের অসীমকে অনুসন্ধান বলা যায়। কারণ, হারাইলেই পদার্থ অসীমের মধ্যে গিয়া পড়ে, এবং তাহার প্রাপ্তি শান্তি-দায়ক হয়। এই চাওয়াই পাওয়াতে পৌঁছিলে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী তৃপ্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা বলা যায়। প্রথম একটিকে ধরিতে পারিলে সব ধরা হয়। "এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়।" দ্বিতীয় শমতা হইতে,

শান্তিঃ কুতো ভবেৎ সমতা ন চেৎ স্যাৎ

সমতা না হইলে শান্তি কোথা হইতে আসিবে ? এই শান্তির অর্থ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানুষের বৃত্তির পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপী উৎকর্ষ সমকালে সাধিত হইলে সুখ জন্মে। হামবোল্ড বলেন, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কি ? সম্পূর্ণ এবং যথোচিত সকল বৃত্তির উৎকর্ষ লাভই এই আদর্শ। The ultimate ideal of man consisted in the development, as harmonious as possible, of all his qualities, in there intirety. লিকীরও প্রায় এই মত (History of European Morals) প্লেটো, লুথার ফিট্‌কে এবং বঙ্কিমবাবুর অনুশীলনতত্ত্বও এই কথা বলেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও (Data of Ethics) এই কথা বলেন। জীবন সম্পূর্ণ হয় বলিয়াই এই মত প্রচলিত, অর্থাৎ সুখ পাওয়া যায় বলিয়াই—"Fulfil the ideal cycle of human life" (Metchnikoff. o.p. cit. 316-17)

যদি ইহাই জীবনের সুখ অর্জ্জনের উপায় ঠিক হয়, অর্থাৎ সমকালে সকল বৃত্তির সমুচিত উৎকর্ষসাধনই প্রকৃষ্ট পথ হয় সুখের জন্য, তবে যাহা বড় আছে, তাহাকে অর্চ্চনা করিলে, অথবা ছোট বৃত্তিগুলিকে বড়গুলির সমান না করিলে harmonious development হয় কি করিয়া ? ইহারই জন্ম না নীতিবাদ, শাস্ত্রবচন ইতরবৃত্তিগুলির প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া অন্য বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করেন ? ইহার উল্টাদিকে জগতের গতি দেখিয়া নবীনকে বিনীতভাবে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ইহার পরে অন্যকে দোষ দিলে চলিবে না, স্ব-কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, এটা যেন মনে থাকে—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপিদাতা—
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।

সুখ দুঃখ কেহ কাহাকেও দেয় না, পরে ইহা দিতেছে বলা এটা কুবুদ্ধির পরিচায়ক।

[ক্রমশঃ।

শ্রী—

বর্ষা এল বিপুল বেগে

বজ্রভেরী বাজিয়ে আবার বর্ষা এল বিপুল বেগে !
আষাঢ়ের ওই সারা আকাশ ভরলো কালো জমাট মেঘে !
তাল-তমালের উদাস পাতায়
বাউল বাতাস কি তান বাজায় !
নেতিয়ে পড়া কদম হঠাৎ জাগলো যে তা'র স্পর্শ লেগে !
মেঘের ধ্বজা উড়িয়ে রথে বর্ষা এল বিপুল বেগে !

বেণু-বনের শাখায় শাখায় জাগল মাতন ঝড়ের সাথে !
ছায়াতলের বিপুল বারি ব্যাকুল-ছোটার নেশায় মাতে !
গুরু গুরু দেয়ার ডাকে
ভেজা পাতায় কাঁপন লাগে !
কেয়া বঁধুর করুণ আঁখি সজল হ'ল অশ্রু মেখে !
ব্যর্থ বুকের বেদন নিয়ে বর্ষা এল বিপুল বেগে !

দিগ্‌বধূদের কাঁদন-রোলে বাতাস আজি উঠলো ভরি' !
এক নিমেষেই অতল কালোয় ভরলো তা'দের শ্বেত উত্তরী !
ধূসর ধরার শুষ্ক বুকে
শ্যামল বসন তুললে ও কে !
সবুজ রঙের সাড়ী দিয়ে অঙ্গ কে ওর ফেললে ঢেকে !
শ্যামলিমায় সাজিয়ে ধরা বর্ষা এল বিপুল বেগে !

শ্রীবিমল মিত্র।
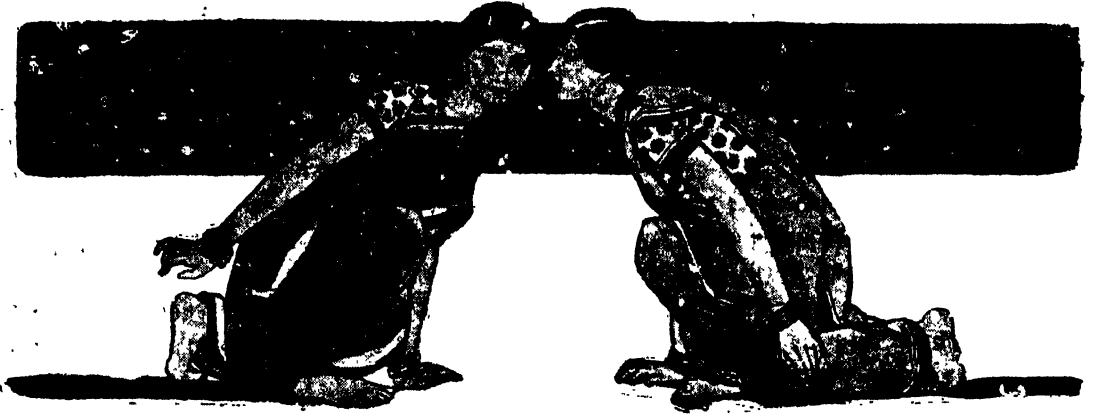
রহস্যের খাস-মহল

প্রথম প্রবাহ

পূর্ব্বকথা

ঘটনা রহস্য-সঙ্কুল, সেই রহস্য অতীব দুর্ভেদ্য।

আজ আমি আমার নিভৃত কক্ষে বসিয়া সেই বিস্ময়াবহ অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা আমার অভিজ্ঞতার ফল। এই অভিজ্ঞতা আমি অল্পদিন পূর্ব্বে লাভ করিয়াছি এবং মানুষ কিরূপ পিশাচ হইতে পারে, অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কি কৌশলে মানব-সমাজকে প্রতারিত করে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এই অদ্ভুত ঘটনা কেবল অতুলনীয় নহে, সংসারে ইহা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে এবং ইহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়!

কিন্তু এই বিস্ময়াবহ কাহিনী পাঠক-সমাজের গোচর করিবার পূর্ব্বে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। আমার নাম—সিডনে কোল্‌ফাক্স; আমার বয়স একত্রিশ বৎসর। আমি যে বণিক্-সমিতির কারবারের বখরাদার—লণ্ডনের মুরগেট ষ্ট্রীটে তাঁহাদের দোকান ও আফিস আছে; ম্যান্‌চেষ্টার ও বার্মিংহাম নগরে যে সকল পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়—তাহা আমরা আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অসভ্য আদিম অধিবাসীদের দেশে রপ্তানী করি। আমি এখনও বিবাহ করি নাই। ব্যবসায়-কার্য্যে অনেক সময় আমাকে দূরদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বটে; কিন্তু অবসরকালে আমি আমার জার্মিন ষ্ট্রীটের বাসায় বাস করি। আমার বাসাটি বেশ আরামদায়ক।

বৈষয়িক কার্য্যের জন্য আমাকে বহু দূরদেশে গমন করিতে হয়। কখন কঙ্গোতে, কখন আবিসিনিয়ায়, কখন মরক্কোতে, কখন বা ইকুয়েডর হইতে পেরু পর্য্যন্ত বহু দূরদেশে পরিভ্রমণ করি। কায শেষ হইলে লণ্ডনে ফিরিয়া আসি এবং আমার ন্যায় চিরকুমার বন্ধুগণের সহবাসে পাঁচ ছয় মাস বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটাইয়া থাকি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে নভেম্বর মাসে আমি সুদান বন্দর ও খার্‌তুম হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ আছে, এক দিন মধ্যাহ্নকালে আমার মুহুরীর সহিত জমা-খরচ মিলাইতে বসিয়া আমাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর এথেন্সের একটা ধূর্ত্ত গ্রীক আসিয়া আমার ঘাড়ে চাপিল। তাহার সঙ্গে কোন বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। দীর্ঘকাল ঘরের ভিতর বসিয়া তাহার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম; কিছু কাল খোলা বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আগ্রহ হওয়ায়, আমি পোষাক পরিয়া লাঠী লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া কোথায় চলিলাম—সে দিকে আমার লক্ষ্য রহিল না।

আমি পার্ক লেন অতিক্রম করিয়া অবশেষে হাইড পার্ক ও প্যাডিংটন ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর আমি একটি সুপ্রশস্ত নির্জ্জন পথে চলিতে লাগিলাম। পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা। শ্রেণীবদ্ধ আলোকস্তম্ভ-শিরে যে সকল দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাদের প্রভা গাঢ় কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া পীতবর্ণ দেখাইতেছিল।

কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, আমি তখন নানা চিন্তায় বিভোর।

দুই একখানি ট্যাক্সি আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না। পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া কে-ই বা পথ-চলতি গাড়ী লক্ষ্য করে? আমি চলিতে চলিতে একটি আলোকস্তম্ভের নীচে আসিলাম—সেই সময় আর একখানি ট্যাক্সি আমার পাশ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল। সহসা সেই ট্যাক্সিতে আমার দৃষ্টি পড়িল; সেই মুহূর্ত্তে ট্যাক্সির রুদ্ধ বাতায়নের আড়াল হইতে এক জন বৃদ্ধ আরোহী মুখ বাড়াইয়া পথের দিকে চাহিল। আমিও তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। লোকটির মুখে এরূপ বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আমি তাহার কথা বিস্মৃত হইলাম এবং অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, গ্রস্‌টার টেরেসে আসিয়া পড়িয়াছি; আমার দক্ষিণ পাশে বিসপ রোডের মোড়।

নভেম্বর মাসের নৈশ কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছিল; সেই নিবিড় কুজ্ঝটিকাবরণ ভেদ করিয়া দূরের বস্তু সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। আমি কুয়াসা ভেদ করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে চলিতেছিলাম; সহসা একটি বালিকার মৃদুমধুর কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। বালিকা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহাশয়, ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট কোন্ দিকে—দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিবেন কি?"

আমি একটু বিস্মিতভাবে বালিকার মুখের দিকে চাহিলাম। মুখখানি সুন্দর, স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছে মস্তক আচ্ছাদিত, মাথায় টুপি নাই। তাহার বয়স এগার বৎসরের অধিক মনে হইল না। পরিধানে ফিকা নীল রঙ্গের রেশমী পরিচ্ছদ। তাহার সাজ-পোষাক দেখিয়া অনুমান করিলাম, সে কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আমি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। তাহার সুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ শুভ্র রেশমী ফিতা দ্বারা আবদ্ধ। পায়ে সাদা রেশমী মোজা; ছাগচর্ম্ম-নির্ম্মিত জুতা-জোড়াও সাদা, কিন্তু তাহা কর্দ্দমাক্ত।

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কে তুমি?"

বালিকা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি? আমি জেসি।"

আমি বলিলাম, "জেসি কি?"

বালিকা—"জেসি মন্‌ক্রিফ।"

আমি কোমলস্বরে বলিলাম, "দেখ জেসি, এ রকম রাত্রে কোট না পরিয়া বাহিরে আসিয়া ভাল কর নাই। কাদা লাগিয়া তোমার জুতাও ভিজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। তোমার কি হইয়াছে? তুমি গিয়াছিলে কোথায়?"

জেসি বলিল, "পোরচেষ্টার টেরেসে আমার পিসীর বাড়ী কি না, সেখানে আজ রাত্রে খানার মজলীসে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে আরও দুইটি মেয়ে ছিল। মা গো! তারা কি দুষ্টু! তাদের সঙ্গে আমার ভাব না হওয়ায় আমি চলিয়া আসিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিব; কিন্তু কোথায় বাড়ী? কেবলই চলিতেছি, পথ আর ফুরায় না! ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট খুঁজিয়া পাইতেছি না; আমাকে আর কত দূর যাইতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তোমাদের বাড়ী ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে? বাড়ীর নম্বর কত?"

জেসি বলিল, "৪৫ নং বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তার নাম মিঃ কুপ। তিনি আমার কাকা। লোকে তাঁহাকে কুপার বলে, কিন্তু তাঁহার আসল নাম কুপ। এখন রাত্রি কত মহাশয়?"

আমি ঘড়ি দেখিয়া বলিলাম, "রাত্রি ১২টা বাজে!"

জেসি মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া কাকা বোধ হয় এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতেছেন; তাঁহার খুব ভাবনা হইয়াছে। রাত্রি ১০টার সময় স্মিথ আমাকে আনিতে যাইবে কথা ছিল। সে বোধ হয় আমাকে আনিতে গিয়া আমার দেখা পায় নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে কি তুমি কাহাকেও না জানাইয়া চুপে চুপে চলিয়া আসিয়াছ?"

জেসি মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি ভাবিয়াছিলাম, স্মিথ আমাকে লইতে আসিবার আগেই পথ চিনিয়া বাড়ী যাইতে পারিব। কিন্তু এই ঘন কুয়াসার জন্যই আমার পথ-ভুল হইয়াছে। এ রকম কুয়াসায় আমি পূর্ব্বে কোন দিন পথে বাহির হই নাই!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি ভয় পাইও না জেসি, আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিব। আমি ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট চিনি না বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা খুঁজিয়া বাহির

করিতে পারিব। বোধ হয়, আমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হইবে না।"

জেসি বলিল, "বোধ হয় না। অক্সফোর্ড স্কোয়ারের কাছেই ওয়েল্ডন ষ্ট্রীট।"

আমি বলিলাম, "বটে! অক্সফোর্ড স্কোয়ার ত আমি চিনি। এ পথে কোন ট্যাক্সি আসিলেই তোমাকে তাহাতে তুলিয়া লইয়া তোমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।"

আমার কথা শুনিয়া জেসির মুখ প্রফুল্ল হইল। রাত্রি-কালে সে পথ হারাইয়া ভীত হয় নাই; কিন্তু তাহাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া তাহার কাকা অত্যন্ত ব্যাকুল হইবেন বুঝিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারিলাম। তাহাকে বলিলাম, "তোমার কাকা মিঃ কুপ এতক্ষণ বোধ হয় পুলিসে খবর দিয়াছেন। পুলিস চারিদিকে তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।"

জেসি বলিল, "না, আমার ত তাহা মনে হয় না। কাকা পুলিসম্যানগুলার উপর চটা, তিনি সহজে তাহাদের সাহায্য চাহিবেন না।"

বিশপ রোডে উপস্থিত হইলে শীঘ্র ট্যাক্সি পাইব—এই আশায় জেসিকে সঙ্গে লইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি কি তোমার কাকার কাছে খুব বেশী দিন আছ?"

জেসি বলিল, "হাঁা, বাবার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার কাছেই আছি। দুই বৎসর আগে আমরা ফ্রান্সে ছিলাম।"

আমি—"ফ্রান্সের কোথায়?"

জেসি—"প্যারিসে। আপনি প্যারিস দেখিয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি কিছু দিন প্যারিসে ছিলাম। তুমি ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পার?"

জেসি মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল বলিতে পারি না। ফরাসী ভাষা আমার ভাল লাগে না। আমার ধাই-মা আমাকে তাহা শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা শিখি নাই। মিস্ বার্লো প্রত্যহ আমাকে পড়াইতে আসেন। আমি তাঁহাকে ভালবাসি; কিন্তু তিনি আমাকে ভয়ানক শক্ত শক্ত অঙ্ক দিয়া জ্বালাতন করিয়া মারেন!"

আমি তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে চলিতেছিলাম, অদূরে একখানি ট্যাক্সি দেখিয়া তাহা থামাইলাম, এবং জেসিকে লইয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিলাম। ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিলে জেসি বলিল, "আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, সে জন্য আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব জানি না। আপনি আমার কাকার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন কি? আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি বড়ই সুখী হইবেন। আপনি দয়া করিয়া আমাকে এ ভাবে সাহায্য না করিলে আমাকে হয় ত কাহারও দরজায় পড়িয়া থাকিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত।"

জেসি সাদা রেশমী দস্তানা-মণ্ডিত হাতখানি হঠাৎ ঊর্দ্ধে তুলিলে তাহার প্রকোষ্ঠে হীরকখচিত বলয় দেখিতে পাইলাম। তাহার মত বালিকার প্রকোষ্ঠে এরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার ধারণা হইল, সে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। আমি বিবাহ করি নাই, নারী-জাতির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবের গৃহে এই বয়সের বালক-বালিকাগণের অভাব নাই, তাহারা সকলেই আমার স্নেহের পাত্র। এই মেয়েটিকেও আমার বড় ভাল লাগিল।

জেসি আপন-মনেই অস্ফুটস্বরে বলিল, "যোয়ান সেখানে থাকিলে আমাকে এ রকম বিপদে পড়িতে হইত না; সে আমার সঙ্গেই চলিয়া আসিত।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম, "যোয়ান কে?"

জেসি বলিল, "যোয়ান আমার কাকার মেয়ে। সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তাহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর; আর সে এমন সুন্দরী! তাহার মত সুন্দরী পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে আজ রাত্রে তাহার নিমন্ত্রণ ছিল—সে সন্ধ্যার পর সেখানে যাইবে বলিয়াছিল। সে সেইখানেই গিয়াছে। আমার বয়স বেশী হইলে আমিও তাহার সঙ্গে যাইতে পাইতাম। যোয়ান আমাকে খুব ভালবাসে। এতক্ষণ হয় ত সে বাড়ী ফিরিয়াছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি একটি সুবৃহৎ সেকেলে ধরণের অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। জেসিকে লইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিলাম এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া দিয়া বিদায় করিলাম। জেসি তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, আমাকে ব্যগ্র-ভাবে বলিল, "এ কি? এ বাড়ী ত আমাদের নয়! কিন্তু আমরা কোথায় আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, পুনঃ কয়েক মিনিট চলিলেই আমাদের বাড়ী দেখিতে পাইব।

আমি তাহার কথা শুনিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু জেসি আমার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আর গাড়ী ডাকিতে হইবে না। এই বাড়ীর নাম 'ওয়েল্ডন ক্রেসেণ্ট।' ট্যাক্সিওয়ালা ভারি বোকা; বোকা না হইলে এ রকম ভুল করে?"

জেসি আমাকে সঙ্গে লইয়া কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন পথে নামিল। পথের ধারে একটি বাগান, বাগানের পর একটি গির্জ্জা। সেই গির্জ্জা অতিক্রম করিয়া পথের ধারে আর একখানি বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বৃহৎ অট্টালিকা, আধুনিক রুচি অনুসারে নির্ম্মিত। জেসি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তিনটি প্রশস্ত সোপান পার হইয়া সবুজ রঙ্গের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার মাথায় একটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। জেসি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে দরজার বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিল। তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্বারের বাহিরে আসিয়া জেসিকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি করিল এবং জেসিকে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিল।

আমি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিলাম। আমি এরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম যে, আমার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল। অবশ্য, আমার এই-রূপ ভাবান্তরের কারণ ছিল।

বৃদ্ধটি একবারও আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তাহার মস্তকের কেশগুলি শুভ্র, দীর্ঘ এবং পারিপাট্যহীন। তাহার দাড়িগুলি কোঁকড়ান। গোঁফ-দাড়িও পাকিয়া সাদা হইয়াছিল। কিন্তু দাঁতগুলি শক্ত, একটিও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। তাহার মুখের বর্ণ পীতাভ; গাল তুবড়াইয়া গিয়াছিল। কপালে শিরা দেখা যাইতেছিল। চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণ, আগ্রহপূর্ণ, যেন তাহা গভীর রহস্যের আধার! লোকটির দেহের দৃঢ়তা ও যৌবনসুলভ উৎসাহের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রৌঢ় বলিতে পারিতাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে বৃদ্ধ বলাই সঙ্গত হইয়াছে; কারণ, তাহার বয়স ৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। তাহার হাত দুইখানি শীর্ণ, শিরাবহুল, পীতাভ। দীর্ঘ নখগুলি সূচ্যগ্র করিয়া কাটা। ইহা বাঙ্গালী ও অন্য দুই একটি দেশের 'ফ্যাসান', কতকটা আমীরী ফ্যাসান। কেবল সেই নখগুলি দেখিলেই বলিতে পারিতাম —লোকটি বিদেশী। কিন্তু তাহার ইংরাজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ, তাহাতে কোন রকম টান ছিল না। তেমন নিখুঁত উচ্চারণ কোন বিদেশীর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার ট্রাউজারের হাঁটু পর্য্যন্ত বোতাম-আঁটা। অঙ্গে কাল রঙ্গের ফ্রক-কোট।

লোকটি হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মহাশয়, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন; আপনি দয়া করিয়া জেসিকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন, এ জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রথমেই আমার উচিত ছিল। আপনি দয়া করিয়া একবার আমার ঘরের ভিতর আসিবেন কি? বাহিরে ভয়ানক ঠাণ্ডা। আমি কি এতই অমানুষ যে, আপনাকে দরজার বাহির হইতে বিদায় করিব? আসুন, ভিতরে আসুন।"

আমি নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; বৃদ্ধটিকে কি বলিব—তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না।—প্রায় ২০ মিনিট পূর্ব্বে এই লোকটিকেই ট্যাক্সির ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম! পথি-মধ্যে ইহারই সহিত আমার দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছিল। তখন আমার সন্দেহ হইয়াছিল—আমি তাহাকে চিনিতে পারিব—এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর মাথা টানিয়া লইয়াছিল। সে আমার দৃষ্টি পরিহার করিবারই চেষ্টা করিতেছিল। আর আমি দৈবক্রমে তাহারই গৃহদ্বারে উপস্থিত! সে মনের পূর্ব্বভাব গোপন করিয়া আমাকে তাহার 'খাস-মহলে' প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছে! তাহার এই আহ্বান কি আন্তরিক?—এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি?

কর্ত্তব্য যাহাই হউক, সে আমার মুখের উপর এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ-ভরা দৃষ্টির কি যেন প্রখর সম্মোহনী শক্তি ছিল, আমি সেই শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সেই মোহকরী শক্তি দ্বারা সে যেন আমাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কিরূপ শক্তি, তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না!

দ্বিতীয় প্রবাহ

সুন্দরী যোয়ান

আমাকে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া গৃহস্বামী বলিল, "আসুন, মুহূর্ত্তের জন্তও একবার ভিতরে আসুন।"

আমি ভাবিতে লাগিলাম---যাই কি না! মন অনেক সময় অমঙ্গলের আভাস পূর্ব্বেই জানিতে পারে। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হইল; তথাপি তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, গৃহস্বামী আমার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিল।

কক্ষটি সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত, চুরুটের উগ্র গন্ধে তাহার বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। মনে হইল—তাহা ভদ্রলোকের উপবেশন-কক্ষ নহে, কোন ব্যাঘ্রের গুহা!

জেসি আমার নিকট বিদায় লইয়া প্রৌঢ়া পরিচারিকা স্মিথের সহিত প্রস্থান করিল। গৃহস্বামী আমাকে বসাইয়া একটি চুরুট দিল এবং স্বয়ং একটি গ্রহণ করিল। তাহার পর আমাকে বলিল, "মেয়েটাকে আপনি কোথায় পাইয়াছিলেন—মিঃ—, ওহো! এখন পর্য্যন্ত আপনার নামটি শুনিতে পাই নাই যে! আমার নাম কুপ—কার্ল কুপ। নাম শুনিয়া আপনার ধারণা হইতে পারে, আমি ডচ; কিন্তু আমি ডচ নহি—যদিও আমার বাবা ডচ ছিলেন। এখানকার লোক আমার নাম দিয়াছে কুপার। হাঁ, তাহারা নামে আমাকে ইংরাজ করিয়া লইয়াছে।"

আমি তাহার হাতে আমার নামের কার্ডখানি দিয়া বলিলাম, "আমার নাম কোল্‌ফাক্স, সিডনে কোল্‌ফাক্স।"

কুপ বা 'কুপার' চুরুটে দুই একটা টান দিয়া বলিল, "আমার পাগলীটাকে আপনি কোথায় পাইলেন?"

জেসিকে কোথায় কি অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম—তাহা তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া কুপ হাসিয়া বলিল, "মেয়েটা গোল পাকাইয়া তুলিয়াছিল আর কি! উহার পিসীকে টেলিফোনে সংবাদ দিতে হইবে। আমি আমার দাসী স্মিথকে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম; সে শুনিয়া আসিল, জেসি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জেসি ঠিক তার মায়ের মতই একগুঁয়ে, খামখেয়ালী হইয়াছে। উহার জন্য আপনাকে এই রাত্রিকালে যথেষ্ট অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে; এ জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "ক্ষমাপ্রার্থনা কেন? আপনার ত কোন ত্রুটি হয় নাই!"

কুপ কোন কথা না বলিয়া সশব্দে করতালি দিল। মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া এক বিশালদেহ আরব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার অঙ্গে লাল রেশমের দীর্ঘ 'কাফতান', মাথায় ফেজ-ওয়ালা চূড়াকার টুপি; গালে তিনটি দাগ, নিউবিয়ানদের জাতিগত বিশেষত্বচিহ্ন।

চাকরটার পোষাকের পারিপাট্য দেখিলে মনে হয়---সে প্রাচ্যের কোন আমীর-পুত্র; কিন্তু তাহার হাতে দেখিলাম, একখানি গিল্টি করা 'ট্রে', তাহার উপর সুমিষ্ট আরবী কফিপূর্ণ দুইটি ক্ষুদ্র পেয়ালা। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাঠের পুতুলের মত আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখ-মুখ ভাব-সংস্পর্শরহিত। কিন্তু কুপের ইঙ্গিতমাত্র সে একটি পেয়ালা তুলিয়া আমার হাতে দিল; অন্যটি কুপ 'ট্রের' উপর হইতে স্বয়ং তুলিয়া লইল।

কফি পানের পর আমরা পেয়ালা দুইটি 'ট্রে'র উপর রাখিলে সেই ভীষণদর্শন আরবটা অঙ্গুলী দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিল—তাহার পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

আমি কুপকে বলিলাম, "আপনার এই আর্দ্দালীটা ত বেশ চমৎকার! কোথা হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিলেন?"

কুপ বলিল, "উহার নাম ইব্রাহিম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওয়াদী-হাল্‌ফা নামক স্থানে উহাকে পাইয়াছিলাম। লক্ষরের মিশন স্কুলে ইব্রাহিম কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখিয়াছিল। ছোকরা বেশ বুদ্ধিমান্, ফরাসী, জর্ম্মাণ ও ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে; খাসা কাযের লোক।"

আমি বলিলাম, "উহার গালের চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলাম, লোকটা নিউবিয়ান।"

কুপ বলিল, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন! আপনি কি কখন নিউবিয়ায় গিয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ; ব্যবসায়কর্ম্মোপলক্ষে আমাকে পাঁচ সাতবার খার্তুমে যাইতে হইয়াছিল।"

কুপ বলিল, "তাহা হইলে আপনি আরবগুলাকে জানেন! তাহাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী, তাহাদের উপর

নির্ভর করা যায় না; কিন্তু ইব্রাহিম মিশনে শিক্ষা পাইয়াছিল কি না, ও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র। উহার হাতে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।”

আমার ধারণা হইল—কুপ সাধারণ লোক নহে; তাহার এই ফেজ, কাফতান এবং লাল মরক্কো চামড়ার পাদুকাধারী আরব ভৃত্যও সাধারণ পরিচারক নহে। কুপ কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া পুনর্ব্বার করতালি দিল। সেই শব্দ শুনিয়া ইব্রাহিম সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল এবং অগ্নিকুণ্ডের আগুন উস্‌কাইয়া দিয়া, চেয়ারগুলি গুছাইয়া রাখিল। সোফার উপর লাল রেশমী ওয়াড়ের একটা বালিস ছিল; সে বালিসটি তুলিয়া ঝাড়িয়া রাখিল।

কুপ বলিল, “ইব্রাহিম, মিস্ যোয়ান বাড়ী ফিরিয়াছে?”

ইব্রাহিম বলিল, “হাঁ, হুজুর।”

কুপ বলিল, “তাহাকে জানাও, শুইবার পূর্ব্বে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়, আর স্মিথকে বল—পোরচেষ্টার টেরেসে টেলিফোন করিয়া জানাইতে হইবে—মিস্ জেসি নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিয়াছে।”—তাহার পর কুপ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তাহার কন্যা যোয়ান কোনও ভোজের মজলীসে যোগদান করিতে গিয়াছিল।—ইব্রাহিম উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে অভিবাদন করিল এবং নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একটি সুন্দরী তরুণী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে ফিকা নীল রঙ্গের একটি সুদৃশ্য ডিনার-গাউন। তাহার বয়স ১৮ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হইল না। তাহার অপরূপ রূপমাধুরী ও মুখের লাবণ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহার পর তাহার সহিত আমার পরিচয় হইলে, আমি উঠিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম।

তাহার নিখুঁত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল—সেরূপ সুন্দরী আমি আর কখন দেখি নাই। আমি প্রণয়ভাবাপন্ন অবিবাহিত যুবক; কিন্তু আমি অনেক রূপবতী কুমারী ও সুন্দরী মহিলার সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়াছি। তাহাদের কেহই এই মধুরহাসিনী তরুণীর ন্যায় আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার স্বর্ণাভ কেশদাম হইতে নীলবর্ণ সুগঠিত পাদুকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কোথাও সামান্য খুঁত দেখিতে পাইলাম না। তাহার আয়ত নেত্রের দৃষ্টি মধুর; চক্ষু-তারকা দুইটি গাঢ় নীলবর্ণ, বিকশিত পদ্মের ন্যায় তাহা মাধুর্য্যপূর্ণ। মুখখানি ক্ষুদ্র এবং সুগঠিত। উভয় গণ্ডে নব-যৌবনের ঢলঢল কান্তি পরিস্ফুট। তাহার নগ্ন বাহুদ্বয় শুভ্র এবং সুগোল। একখানি প্রকোষ্ঠে শ্বেত-কাঞ্চনের বলয় হীরকভূষিত। জেসির প্রকোষ্ঠেও ঠিক সেইরূপ বলয় ছিল। তরুণীর কেশপাশ গাঢ় বেগুনী রঙ্গের মকমলের একটি ফিতা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তরুণী একখানি চেয়ারে বসিয়া আমাকে বলিল, “মিঃ কোলফাক্স, জেসি আমাকে তাহার বিপদের কথা বলিয়াছে; হাঁ, একটু আগে তাহার সকল কথাই শুনিয়াছি। আপনি তাহাকে দয়া করিয়া এখানে আনিয়া দিয়া আমাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছেন। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় শয়ন করিতে গিয়াছে।”

কুপ হাসিয়া বলিল, “জেসির বাল্যজীবনের ইহাই প্রথম বিপদ্।”—সে তরুণীর মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিল। আমার ধারণা হইল, তাহার সেই দৃষ্টির কোন গোপনীয় অর্থ ছিল।

মুহূর্ত্ত পরেই তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার মুখভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম; তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল—কি এক দুশ্চিন্তায় সে অধীর হইয়াছে! কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। কুপের সেই রহস্যপূর্ণ চঞ্চল দৃষ্টিই কি ইহার কারণ?

বৃদ্ধ পুনর্ব্বার করতালি দিতেই তাহার বিশ্বস্ত অনুচর ইব্রাহিম সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ ইব্রাহিমকে বলিল, “মিস্ যোয়ানের জন্য এক পেয়ালা কফি।”

তরুণী সভয়ে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, “না বাবা, না। আমাকে মাফ্ কর, আমি উহা চাহি না।”

বৃদ্ধ কঠোর স্বরে বলিল, “হাঁ, একটু কফি তোমাকে খাইতেই হইবে; শয়নের পূর্ব্বে এক পেয়ালা কফি-পানে তোমার উপকারই হইবে।”

যোয়ানের মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইল। সে মাথা

নাড়িয়া বলিল, "না, না, উহাতে আমার কোন উপকার হইবে না। রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারিব না; আমাকে অনিদ্রায় কষ্ট পাইতে হইবে।"

কুপ দৃঢ়স্বরে বলিল, "যোয়ান, আমার অবাধ্য হইও না; তোমার জন্য আমি কফি আনিতে বলিয়াছি। তুমি জান—আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।"

কুপ কঠোর দৃষ্টিতে যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি স্থির, খলতাপূর্ণ, অতি ভীষণ! যোয়ান সেই দৃষ্টিতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল এবং কম্পিত দেহে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "বাবা, আমি—আমি সত্যই উহা চাহি না। আমি কফি না খাইলেই ভাল থাকি। কফি আমার সহ্য হয় না—তাহা ত তুমি জান।"

কুপ বলিল, "কিন্তু কখন কখন উহা তোমার দরকার হয়, সহ্যও হয়। আমাদের এই আগন্তুক বন্ধুটিও অল্পকাল পূর্ব্বে এক পেয়ালা পান করিয়াছেন।"—বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। সে হাসিতে যেন কি একটা রহস্য সংগুপ্ত ছিল।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া যোয়ান আতঙ্কে অভিভূত হইল,তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল! সে চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "মিঃ কোল্‌ফাক্স! আপনি? আপনি কি সত্যই কফি খাইয়াছেন? উঃ!"

বৃদ্ধ যোয়ানের মুখের দিকে এমন কটমট করিয়া চাহিল—যেন তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিবে! কিন্তু সেখানে কফি পান করিয়া কি অন্যায় করিয়াছি, বুঝিতে পারিলাম না। যোয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "হাঁ, সত্যই খাইয়াছি; তাহাতে ক্ষতি কি?"

যোয়ান আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, আমরা উভয়েই কফি খাইয়াছি। ইব্রাহিম চমৎকার কফি তৈয়ার করে। আপনি কি বলেন মিঃ কোল্‌ফাক্স!"

এবার বৃদ্ধের দৃষ্টি সদাশয়তাপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে হইল—তাহাতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সংগুপ্ত ছিল, শ্যামস্নিগ্ধ মেঘের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অতি তীব্র বিজলীর মত!

আমি বলিলাম, "আপনার কথা সত্য, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কফি আমি কখন পান করি নাই।"

কিন্তু আমার কথায় যোয়ানের আতঙ্ক যেন অধিকতর বর্দ্ধিত হইল; সে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সুনীল নেত্রের ব্যাকুল-বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম।

যোয়ান মনের কি একটা ভাব গোপন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সেই ভাব সে আর দমন করিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "ইব্রাহিম—সেই গম্ভীরপ্রকৃতি অল্পভাষী লোকটাকে আমি ঘৃণা—হাঁ অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

যোয়ানের পিতা বলিল, "ঘৃণা কর? কেন? তাহার অপরাধ কি? তাহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসী ভৃত্য পৃথিবীতে কয়টি পাওয়া যায়?"

যোয়ান অবজ্ঞাভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, আহতা ফণিনীর মত সতেজে মাথা তুলিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ? বিশ্বাসী?—হাঁ, তোমার সে বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে, কিন্তু—"

যোয়ানের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইব্রাহিম পূর্ব্বোক্ত ট্রের উপর কফির একটি ক্ষুদ্র পেয়ালা লইয়া আসিল; কফি সেই পেয়ালাটির কানায় কানায় পূর্ণ। ইব্রাহিম অভিবাদনের ভঙ্গীতে অঙ্গুলি দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া যোয়ানের সম্মুখে ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বাদামী রঙ্গের মুখ সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শবিহীন।

যোয়ান ইব্রাহিমকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঘৃণাভরে সরিয়া গেল; সে তাহার হাত হইতে কফির পেয়ালা গ্রহণ করিল না, তাহার মুখের দিকেও দৃষ্টিপাত করিল না। বৃদ্ধ তাহার কন্যার মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই কঠোর দৃষ্টিতে আদেশের ভাব পরিস্ফুট।

মুহূর্ত্ত পরে কুপ তাহার আরব ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "কফিটা টাট্‌কা তৈয়ারী করিয়াছ কি?"

ইব্রাহিম বলিল, "হাঁ হুজুর!"

যোয়ান উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি উহা চাহি না।" সে প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় ঠেস্ দিয়া বিমুখ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পিতা কন্যার অবাধ্যতার ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি! কফির পেয়ালা তুমি লইবে না?"

যোয়ান তাহার শুভ্র কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত পেয়ালাটি তুলিয়া লইল। তাহার হাতখানি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার চক্ষু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইল। তাহার রূপমাধুরী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল এবং আতঙ্কে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। তাহার পিতা এবং ভৃত্য ইব্রাহিম উভয়েই নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা যোয়ানের অসম্মতিতে তাহাকে কফি পান করাইবার জন্য এরূপ পীড়াপীড়ি করিতেছে কেন? নিশ্চয়ই তাহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে; কিন্তু স্নেহাস্পদা কন্যার বিরুদ্ধে কি পিতার কোন দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে? ইহা কি সম্ভবপর? ইহা কি সঙ্গত?—এ কি রহস্য? আমি বিষম ধাঁধায় পড়িয়া হতবুদ্ধি হইলাম। যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছে। সে কাতরদৃষ্টিতে যেন নীরবে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল; তাহার মিনতিভরা চক্ষু দেখিয়া আমার ধারণা হইল, কোন ভীষণ ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব গুপ্তকথা আমার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

যোয়ান কফির পেয়ালা হাতে লইয়াও তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল না; বিষপাত্র হাতে লইয়া লোক যেমন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহারও সেই ভাব দেখিতে পাইলাম! তাহার কফিপানের অনিচ্ছা দেখিয়া কুপ অসহিষ্ণুভাবে দৃঢ়স্বরে বলিল, "কেন বিলম্ব করিতেছ? কফিটুকু পান করিয়া পেয়ালাটা ইব্রাহিমকে ফিরাইয়া দাও, ও চলিয়া যাউক।"

ইব্রাহিম কফির পাত্রটি ফেরত লইবার জন্য নিস্তব্ধভাবে দাড়াইয়া ছিল।

যোয়ান মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি ইহা খাইব না। আমি নিশ্চয়ই ইহা মুখে তুলিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

তাহার পিতা সবেগে উঠিয়া দাড়াইল; ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল এবং চক্ষু হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইল। সে যোয়ানের সম্মুখে আসিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিতেছ? গতবারও আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, তাহার কি ফল হইয়াছিল—তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?"

যোয়ান আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার পিতার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিয়া পড়িল এবং কাতরস্বরে বলিল, "উঃ, ভয়ানক, ভয়ানক বাবা! দয়া কর, ক্ষমা কর। আমি পারিব না; ইহা আমাকে আর পান করিতে বলিও না।"

কুপ বলিল, "হাঁ, তোমাকে পান করিতেই হইবে; আমার আদেশ।"

আমি আর নির্ব্বাক্ থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না; যোয়ানের সেই যন্ত্রণা আমারও অসহ্য হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "মিঃ কুপ, আপনার কন্যার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ কি ভদ্রজনোচিত? উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কফি পান করিবার জন্য কেন উহাকে বাধ্য করিতেছেন? আপনার এই অশিষ্ট ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাজনক।"

কুপ সবেগে মাথা ঘুরাইয়া ক্রুদ্ধনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর বিকৃতস্বরে বলিল, "সে কথা শুনিয়া আপনার লাভ কি, মহাশয়! এই অবাধ্য মেয়েটাকে আমি শায়েস্তা করিতে চাই। আমার অবাধ্য হইলে কি শাস্তি পাইতে হয়, তাহা উহার অজ্ঞাত নহে।"

আমি বলিলাম, "বেশ কথা; কিন্তু ঐ কফিটুকু উহাকে পান করাইবার জন্য আপনার এরূপ আগ্রহের কারণ কি? আমার সম্মুখে আপনি এই যুবতীকে এভাবে উৎপীড়িত করিতে পারিবেন না, তা সে হউক না কেন আপনার কন্যা। আপনার এই পৈশাচিক আচরণ কোন ভদ্রলোকের সমর্থনযোগ্য নহে।"—আমি উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাড়াইলাম।

কুপ বলিল, "আমার পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আসা আপনার অনধিকারচর্চ্চা। এইরূপ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।"

নরপশু কুপ আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তাহার কন্যার স্কন্ধে সবেগে হাত চাপাইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "যোয়ান, আবার বলিতেছি—শীঘ্র উহা পান কর। আমার আদেশ পালন না করিলে এই ভদ্রলোকটির নিকট আমি সকল কথা প্রকাশ করিব। হাঁ, সে সকল কথা আমাকে বলিতেই হইবে।"

যুবতী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, কাতরস্বরে বলিল, "না, না, উহাকে কোন কথা বলিও না, বাবা! যদি বল, তাহা হইলে আমি—"

বাধা দিয়া কুপ বলিল, "তুমি আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়াছ, আর নয়। শীঘ্র উহা পান কর, ইব্রাহিমকে যাইতে দাও।"

আমি বলিলাম, "না, মিস্ যোয়ান ও কফি পান করিবে না। আপনার কোন দুরভিসন্ধি আছে। মিস্ যোয়ান, এ সকল কি ব্যাপার, আমার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।"

কুপ অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "বল, এই ভদ্রলোকটির নিকট সত্য কথা প্রকাশ কর। তাহা শুনিয়া উনি খুব আমোদ উপভোগ করিবেন।"

বৃদ্ধ তাহার কন্যার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং উভয় হস্ত তাহার কাঁধের উপর প্রসারিত করিয়া, গভীর উত্তেজনায় আঙ্গুলগুলি বাঁকাইয়া, অগ্নিময় চক্ষুতে এ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, আমার মনে হইল, এই বৃদ্ধ তরুণীর পিতা নহে, মানুষও নহে, সে হিংস্র ব্যাঘ্র, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

আমি বিচলিত স্বরে বলিলাম, "মিস্ যোয়ান, আমার নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিতে কি তোমার সাহস হইতেছে না? আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা করি; এমন কি কথা যে, আমার নিকটেও তাহা প্রকাশ করিতে তোমার আপত্তি হইতে পারে?"

যোয়ান উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "না, না। আমি তাহা বলিতে পারিব না। আপনি জানেন না, স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবেন না—উনি কি কথা বলিতে আদেশ করিতেছিলেন।"

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিল, "পান কর; শীঘ্র—এই মুহূর্ত্তে পান কর। নতুবা আমি নিজেই তাহা বলিয়া দিব। চুমুক দাও, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে আমি—"

আমি যোয়ানের হতাশ মুখচ্ছবি দেখিয়া, তাহার কাতরতা লক্ষ্য করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাহাকে বলিলাম, "না, তোমাকে উহা পান করিতে হইবে না; ঐ পেয়ালায় যাহাই থাক—আমাকে দাও।"—আমি তাহার দিকে হাত বাড়াইলাম।

যোয়ান আমার কথা শুনিয়া কি ভাবিল, জানি না; কিন্তু সে আতঙ্কবিহ্বল চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া হো-হো হী-হী শব্দে পাগলিনীর মত হাসিয়া উঠিল! তাহার সেই শুষ্ক অট্টহাসি শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম এবং স্তম্ভিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে সেই কফির পেয়ালায় ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া এক পেয়ালা কফি সমস্তই এক নিশ্বাসে পান করিল। তাহার পিতা মুহূর্ত্তমধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহার আদেশ পালিত হইল দেখিয়া সে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বিজয়ী বীরের মত আমার মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; কিন্তু তাহার আরব ভৃত্য ইব্রাহিমের মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম না! সে যোয়ানের প্রসারিত হস্ত হইতে কফির খালি পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে, সূত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। বুঝিলাম, আরবটার মনের ভাব গোপন করিবার শক্তি অসাধারণ!

যোয়ান কোন্ গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কফিটুকু পান করিয়া তাহার পিতার আদেশ পালন করিল, সেই কফি পান করিতে তাহার অসম্মতির কারণ কি, এবং তাহা পান করাইবার জন্য তাহার পিতাই বা কি জন্য তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি সেই কক্ষে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। সেই রুদ্ধ কক্ষে আমার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শিষ্য। উপনিষৎ পাঠে বুঝা যায়, মুক্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই নানাবিধ সংকল্পসিদ্ধি এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়। তদনুসারে বেদান্ত-দর্শনের শেষেও মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে ঐ সমস্ত সমর্থিত হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষের যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তিনি ব্রহ্মই হন, ইহাও উপনিষৎ পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, উপনিষদে আছে—"স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই হয়, উহাই তাঁহার মুক্তি, ইহা কিরূপে বলা যায়? উহা ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না।

গুরু। তুমি প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনানুসারেই মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছ, ইহা বুঝিতেছি; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধেই সংকল্পমাত্রে নানাবিধ সংকল্পসিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই মুক্তি নহে, ইহা বুঝা আবশ্যক। কারণ, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকেরও ধ্বংস হয়; সুতরাং যাঁহারা উপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোকেও মুক্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায় পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৮।১৬)। কিন্তু যে সমস্ত উপাসনাবিশেষের ফলে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তরূপে ক্রমশঃ মুক্তিই যাহার ফল, সেই সমস্ত উপাসনার দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। "ভগবদ্গীতা"র পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীও উক্তরূপ শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন (১)। উপনিষদে এবং স্মৃতিতেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে (১)। তদনুসারে বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও পূর্ব্বে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন (২)। তাই তিনি পরে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সেই সমস্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষকে মুক্ত বলিয়াই সমর্থন করিয়া শ্রুতি অনুসারে তাঁহাদিগের সংকল্পমাত্রে সংকল্প-সিদ্ধি ও নানাবিধ ঐশ্বর্য্যাদি সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহা-দিগের যে আর কখনও পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে—

"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে,
ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।"

কিন্তু সেই সমস্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকে অবস্থানের পরে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত সাযুজ্য-মুক্তি হইলেও যে পূর্ব্ববৎ নানাবিধ ঐশ্বর্য্যাদি বা কোন সুখ-ভোগ হয়, ইহা ত আর পরে—ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হয় নাই। পরন্তু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (৮।১২।১)। তাই যাঁহাদিগের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সাযুজ্য-মুক্তি হইলে তখন তাঁহার কোন প্রকার শরীর থাকে না, তখন হইতে সেই আত্মা অনন্তকাল অশরীর হইয়াই অবস্থান করেন, সুতরাং তখন আর তাঁহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাঁহাতে কখনও সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকে না—থাকিতেই পারে না,—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। উক্ত শ্রুতি-বাক্যে ক্লীবলিঙ্গ "প্রিয়" ও "অপ্রিয়" শব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখ। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মতে সাযুজ্যমুক্তি হইলেই তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকে না। আত্মদর্শন জন্য

---

(১) ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানামনুৎপন্নজ্ঞানানাম-বশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্ম-লোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। মামুপেত্য বর্ত্তমানাস্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেব—স্বামিটীকা।

(১) তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥
(মুণ্ডক-উপ—৩।২।৬)।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"
(আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির উদ্ধৃত স্মৃতিবচন)

(২) কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ॥
—স্মৃতেশ্চ॥ বেদান্ত-দর্শন ৪।৩।১০।১১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

জীবন্মুক্তাবস্থায় যে আত্যন্তিক সুখের অনুভব হয়, তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তি হইলে তখন উহারও অনুভব হয় না। "সালোক্য" ও "সামীপ্য" প্রভৃতি নামে অন্য যে সমস্ত মুক্তি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাতে সুখ-ভোগের জন্য বিষ্ণুলোক বা শিবলোকাদি স্থানে শরীর-বিশেষেরও লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত গৌণ মুক্তি, সাযুজ্য-মুক্তিই মুখ্য মুক্তি বা প্রকৃত মুক্তি। উহারই নাম নির্ব্বাণ-মুক্তি। ঐ মুক্তিতে কোন প্রকার দেহ না থাকায় উহাকে বিদেহ-মুক্তি এবং বিদেহ-কৈবল্যও বলা হইয়াছে। আমিও তোমাকে ঐ সাযুজ্য-মুক্তির কথাই বলিয়াছি। কারণ, ঐ মুক্তিই ন্যায়দর্শনের পরম প্রয়োজন। তাই মহর্ষি গৌতম উহারই পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ মুক্তির অবস্থাবিষয়ে কোন অংশে যে মতভেদও আছে, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের আরও নানা-রূপ ব্যাখ্যাভেদে উক্ত বিষয়ে কোন অংশে আরও অনেক মতভেদ হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে শরীরে আত্ম-বুদ্ধির নিবৃত্তিই অশরীরত্ব।

আর যে তুমি মুণ্ডক উপনিষদের "স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে মুক্ত পুরু-ষের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বলিয়াছ, উহা অদ্বৈত-মত। কারণ, অদ্বৈতমতে জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অভিন্ন। কিন্তু কণাদ ও গৌতম দ্বৈতমতের উপদেষ্টা। সুতরাং আমি তাঁহাদিগের দ্বৈতমতানুসারেই পূর্ব্বে ঐ সমস্ত কথা বলি-য়াছি। দ্বৈতমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ। ঐ উভয়ের ভেদ নিত্য। সুতরাং উক্ত মতে কোন জীবাত্মাই মুক্ত হইলেও ব্রহ্ম হইতে পারেন না। নিত্য ভেদের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু কোন জীবাত্মা মুক্ত হইলে তখন তিনি পরমাত্মা ব্রহ্মের সদৃশ হন। উক্ত মতে শ্রুতিতে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা উহাই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন প্রকৃত রাজার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বশতঃ সর্ব্ব-প্রধান রাজপুরুষকে রাজাই বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষেরও তখন ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যলাভ হয়, এই তাৎপর্য্যেই মুণ্ডক উপনিষদে পরে কথিত হইয়াছে "ব্রহ্মৈব ভবতি।" উক্ত শ্রুতিবাক্যের ঐরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ মুণ্ডক উপনিষদে পূর্ব্বে "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই বাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ যে পরব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য বা সাদৃশ্যই প্রাপ্ত হন, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্বৈতমতসমর্থনে দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের অন্যান্য কথা পরে বলিব এবং ক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে।

পরন্তু এখানে তোমার ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, অদ্বৈত-মতেও সাযুজ্য-মুক্তি বা বিদেহ-মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত পুরুষের কোন সুখভোগ হয় না। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নিত্য সুখস্বরূপ। মুক্ত পুরুষ নিত্য সুখস্বরূপ হইলেও তিনি সেই নিত্য সুখেরও ভোগ করেন না। কারণ, তখন তাঁহার অজ্ঞানকল্পিত জীবভাবের নিবৃত্তি হওয়ায় ভোক্তৃত্বও নিবৃত্ত হয়। তখন তাঁহার সম্বন্ধে ভোগ্য, ভোক্তা এবং ভোগের সাধন প্রভৃতি কিছুই থাকে না। পরন্তু অদ্বৈত-মতে জীবের ব্রহ্মভাব স্বতঃসিদ্ধই আছে। সুতরাং মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের ফল বা কার্য্য বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাননিবৃত্তিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ ফল এবং উহাই শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অজ্ঞাননিবৃত্তি ভিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তি কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। আচার্য্য শঙ্করও ইহাই বলিয়াছেন (১) সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির ফল আত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। কারণ, অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক জন্ম-মৃত্যু সম্ভব না হওয়ায় আর কখনও কোন প্রকার দুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং যে ভাবেই হউক, অদ্বৈতমতেও জন্ম-মৃত্যুর উচ্ছেদমূলক আত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য, সুতরাং উহাই চরম পুরুষার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মুমুক্ষু জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তি প্রার্থনা করেন। কারণ, এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। তাই "ঋগ্‌বেদ-সংহিতা"য় "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রেও মহেশ্বরের নিকটে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির প্রার্থনা-প্রকাশ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তির প্রার্থনাই প্রকাশিত হইয়াছে (২)।

---

(১) "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"।—মুণ্ডক উপ—১।৫। ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য ভেদোঽস্তি। অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরং।—শাঙ্করভাষ্য।

(২) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব

সায়ণাচার্য্যও উক্ত মন্ত্রের শেষোক্ত "অমৃত" শব্দের দ্বারা চরম সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন, "জন্ম-মৃত্যু জরা-দুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে" (গীতা—১৪।২০)। আবার বলিয়াছেন, "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ" (গীতা—১২।৭)। সুতরাং এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিই চরম পুরুষার্থ, ইহাই বুঝা যায়। "মুচ্" ধাতু-নিষ্পন্ন "মুক্তি" শব্দ দ্বারাও কোন বন্ধন হইতে মোচনই বুঝা যায়। তাই ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম মুক্তির লক্ষণ বলিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। গৌতমোক্ত ঐ লক্ষণ কোন মতেরই বিরুদ্ধ নহে। কারণ, সর্ব্বমতেই মুক্ত পুরুষের সংসারবন্ধন-মোচন হওয়ায় আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। নচেৎ আর কিছুতেই তাঁহার প্রকৃত মুক্তি হয় না।

শিষ্য। গৌতমের মতে ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির উপায় কি?

গুরু। "আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কোন বিষয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রাদ্ধোঽসি চেদুপনিষদং পৃচ্ছ॥" তদ্রূপ আমিও তোমাকে বলিতেছি যে, যদি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্তির উপায় কি, ইহা উপনিষদের নিকটে প্রশ্ন কর। তাহা করিলেই তুমি মুক্তির উপায় কি, তাহা জানিতে পারিবে। আর যেরূপ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যপূত জিজ্ঞাসার ফলে তাহা বুঝা যায়, তাহাও তুমি উপনিষদের নিকটেই জানিতে পারিবে। সে কিরূপ? তাহা বলিতেছি, শুন—

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীর ন্যায় বিষয়জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উৎকট বৈরাগ্য বশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষী হইয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমি এই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করি। অর্থাৎ যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তাহা তোমাদিগের উভয়কে বিভাগ করিয়া দিয়া আমি চলিয়া যাই। তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন যে, ভগবন্! যদি এই পৃথিবী ধনপূর্ণা হয়, তাহা হইলে আমি কি মুক্তিলাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, তাহা পারিবে না—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন।" ধনের দ্বারা কিন্তু মুক্তিলাভের আশাই নাই। তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—যাহার দ্বারা আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব না, তাহার দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা মুক্তির উপায় বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে প্রথমে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সংসারে পত্নীর নিজের কামের জন্যই পতি তাহার প্রিয় হন, পতির কামের জন্য পতি তাঁহার প্রিয় হন না, ইত্যাদি কথা বলিয়া সংসারে নিজের আত্মাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাহার কামের জন্যই অন্য সকল তাহার প্রিয় হয়, সুতরাং আত্মার স্বরূপজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কামমুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

—বৃহদারণ্যক—৪।৩।৫

অর্থাৎ মুক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে আত্মা দ্রষ্টব্য—আত্মার দর্শন কর্ত্তব্য—আত্মার দর্শনই মুক্তির উপায়। তজ্জন্য আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। অর্থাৎ—যথাক্রমে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ঐ আত্ম-দর্শনের উপায়। যোগশাস্ত্রের সাহায্যে চরম সমাধিরূপ নিদিধ্যাসনের পরে মুমুক্ষুর আত্ম-দর্শন হয়। আত্ম-দর্শন হইলে তখন আত্ম-বিষয়ে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞান বা অহঙ্কারের নিবৃত্তি হওয়ায় তখন

বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৭ম মণ্ডল, ৫ম অষ্টক, চতুর্থ অঃ ৫৯ সূক্ত ১২শ মন্ত্র।

ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামম্বকং পিতরং যজামহে ইতি শিষ্যসমাহিতো বশিষ্ঠো ব্রবীতি। কিং বিশিষ্টমিত্যত আহ—"সুগন্ধিম্" প্রসারিতকীর্ত্তিম্। পুনঃ কিং বিশিষ্টম্? "পুষ্টিবর্দ্ধনম্" জগদ্বীজমুরুশক্তিমিত্যর্থঃ, উপাসকস্য বর্দ্ধনম্ অণিমাদিশক্তিবর্দ্ধনম্। অতস্তৎপ্রসাদাদেব মৃত্যোর্ম্মরণাৎ সংসারাদ্বা মুক্ষীয়ং মোচয়। যথা বন্ধনাদুর্ব্বারুকং কর্কটীফলং মুচ্যতে, তদ্বন্মরণাৎ সংসারাদ্বা মোচয়। কিং মর্য্যাদীকৃত্য? "আমৃতাৎ" সাযুজ্যমোক্ষপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।—সায়ণভাষ্য।

আর তন্মূলক কোন কামেরই উদ্ভব হয় না। সুতরাং তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। বস্তুতঃ জীবের নিজের আত্ম-বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানই তাহার সংসার বা শরীরাদি পরিগ্রহের মূল। কারণ, নিজের শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান বা অহঙ্কারবশতঃই মানব রাগ-দ্বেষাদি দোষের বশবর্ত্তী হইয়া অনাদিকাল হইতে নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া নানাবিধ অসংখ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছে এবং তাহার ফলভোগের জন্যই নানাস্থানে নানারূপ জন্মলাভ করিয়া নানাবিধ অসংখ্য দুঃখভোগ করিতেছে। নিত্য আত্মার নিজ কর্ম্মফলে কোন স্থানে অভিনব শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধই তাহার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ জন্ম হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঐ জন্মের উচ্ছেদ ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। ঐ জন্মের কারণের উচ্ছেদ ব্যতীতও জন্মের উচ্ছেদ হইতে পারে না। কিন্তু, যে রাগ-দ্বেষাদি দোষবশতঃ মানবের শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে,—সেই সমস্ত দোষের কারণ যে তাহার নিজ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান বা অহঙ্কার, তাহার উচ্ছেদ বা নিবৃত্তি ব্যতীত তাহার সেই সমস্ত দোষের কখনই নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং জন্মের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মেরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না। অতএব সেই মিথ্যাজ্ঞান বা অহঙ্কারের নিবৃত্তির জন্য আত্মার দর্শন কর্ত্তব্য। আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দর্শন হইলে তখন আর তাঁহার নিজ শরীরাদিতে পূর্ব্ববৎ আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার জন্মে না। সুতরাং পূর্ব্ববৎ আর কোন বিষয়েই তাঁহার রাগ-দ্বেষাদি জন্মে না। তখন হইতে আর কোন বস্তুই তাঁহার নিজের কামের জন্য প্রিয় হয় না। তখন তিনি সর্ব্বথা কামমুক্ত হওয়ায় কোন শুভাশুভ কর্ম্মেও তাঁহার পূর্ব্ববৎ প্রবৃত্তি জন্মে না। তিনি কোন শুভাশুভ কর্ম্ম করিলেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার না থাকায় সেই কর্ম্ম জন্য কোন ধর্ম্মাধর্ম্মও জন্মে না। পরন্তু তাঁহার আত্মদর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই বিধ্বস্ত করে। সুতরাং ঐ সমস্ত কর্ম্ম আর কোন ফলোৎপাদনেই সমর্থ হয় না। তাই শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (গীতা ৪।৩৭)। উক্ত ভগবদ্‌বাক্যে সর্ব্বকর্ম্ম বলিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার শঙ্কর প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও তদ্দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। ভোগ ব্যতীত কাহারই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না।

শিষ্য। "প্রারব্ধ কর্ম্ম", এই নাম কেন হইয়াছে এবং ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এ বিষয়ে প্রমাণ কি?

গুরু। পুণ্যও পাপজনক শুভাশুভ কর্ম্মের ন্যায়—তজ্জন্য যে পুণ্য ও পাপ বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে, তাহাও শাস্ত্রে কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উহা "সঞ্চিত" "ক্রিয়মাণ" এবং "প্রারব্ধ" এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মোৎপন্ন যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলারম্ভ হয় নাই, যাহা পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিতই আছে, তাহার নাম "সঞ্চিত" কর্ম্ম এবং ইহজন্মে ক্রিয়মাণ শুভাশুভ কর্ম্ম-জন্য যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহার ফলারম্ভ হয় নাই, তাহার নাম "ক্রিয়মাণ" কর্ম্ম। কিন্তু পূর্ব্বজন্ম-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মোৎপন্ন যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রারব্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের নাম "প্রারব্ধ" কর্ম্ম। যেমন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মজন্য যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে জীবের কোন শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। কারণ, উহার ফল বা কার্য্য প্রারব্ধ হইয়াছে। ঐ তাৎপর্য্যেই উহার "প্রারব্ধ কর্ম্ম", এইরূপ নাম হইয়াছে। শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও "আরব্ধকার্য্য" শব্দের দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। বেদান্তসূত্রেও "অনারব্ধ কার্য্য" এই শব্দ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। যে সমস্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কার্য্য অর্থাৎ ফল আরব্ধ হয় নাই, তাহাকে বলা হইয়াছে "অনারব্ধ কার্য্য।" সুতরাং যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, তাহাকে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "আরব্ধকার্য্য।" উহারই প্রসিদ্ধ নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

অর্থাৎ শুভাশুভ প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলেরই অবশ্য ভোগ্য। ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে"র প্রকৃতিখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের শেষে

উক্ত প্রসিদ্ধ বচনটি দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র, ব্যোমশিবাচার্য্য এবং রামানুজ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণও উক্ত বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি কেহ কেহ উক্ত বচনের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেও ভোগ ব্যতীত যে কাহারই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহাই বহুসম্মত প্রাচীন সিদ্ধান্ত। কারণ—আত্মদর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও সেই আত্মদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জীবিত থাকায় তাঁহার সেই দেহজনক প্রারব্ধ কর্ম্ম যে তখনও বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ তাঁহার জীবনধারণই সম্ভব হয় না। অতএব তিনি তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই জীবিত থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে (১)। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণের সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ ভোগের দ্বারাই তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন (২)। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও সেখানে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা জীবন্মুক্তি সমর্থন করিয়া—উক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। "ভামতী" টীকাকার—বাচস্পতি মিশ্র সেখানে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, হিরণ্যগর্ভ, মনু ও উদ্দালক প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তত্ত্বদর্শী এবং মহাকল্প, কল্প ও মন্বন্তরাদি কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে শ্রুত হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হইলে তাঁহাদিগের ঐরূপ সুদীর্ঘজীবিতা সম্ভবই হয় না। তাঁহারা যে তত্ত্বজ্ঞ নহেন, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন, ইহা অশ্রদ্ধেয়। অতএব শাস্ত্রানুসারে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, তত্ত্বদর্শন হইলেও সেই তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাণমুক্তিলাভে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের প্রতীক্ষা আছে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তখন দেহনাশের পরে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। বস্তুতঃ তত্ত্ব-দর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণই প্রথমে আত্ম-তত্ত্বের উপদেষ্টা। তাঁহারাই প্রথম শাস্ত্রবক্তা। আর কেহই প্রথমে শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কেহই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত না থাকিলে শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ-পরম্পরার প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। অতএব এখনও যে অনেক তত্ত্বদর্শী মুনি জীবিত আছেন এবং সময়ে শ্রীভগবানের প্রেরণায় তাঁহারাই আবার উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ করিবেন—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেও ইহা কথিত হইয়াছে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য।

পরন্তু যে সমস্ত তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শীঘ্রই দেহত্যাগের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যে যোগবলে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ অর্থাৎ নানা স্থানে বহু বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া যুগপৎ অবশিষ্ট সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করেন, ইহাও শাস্ত্র দ্বারা বুঝা যায়। যোগ-দর্শনেও (৪।৪) যোগীর কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের কথা আছে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্য কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ ভোগের জন্য যোগীর কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজন থাকে না। মূল কথা, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তদ্দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয় এবং পরে ভোগের দ্বারা সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই বর্ত্তমান জন্মের ধ্বংস হওয়ায় তখন তাঁহার সাযুজ্য-মুক্তি বা নির্ব্বাণ-মুক্তি হয়। উহাই পরা মুক্তি অর্থাৎ মুখ্য মুক্তি। মহর্ষি গোতম ঐ পরামুক্তির শাস্ত্র-যুক্তিসিদ্ধ ক্রমপ্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন :—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" এবং রাগদ্বেষাদি দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞান, ইহাদিগের উত্তর-উত্তরের নিবৃত্তি হইলে উহার অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থের নিবৃত্তি হওয়ায় নির্ব্বাণমুক্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। সেই দোষের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়।

---

(১) "দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ"—ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধ ২৮শ অঃ ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ"। "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"।—বেদান্তদর্শন ৪।১।১৫।১৯ সূত্র দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি গৌতম যে শুভাশুভ কর্ম্মকে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন, তজ্জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই এই সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হইলে আর শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে না, ইহাই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"র নিবৃত্তি। উহা হইলে জন্মের নিবৃত্তি হয়। কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত জন্ম হইতে পারে না। জন্মের নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। উহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং উহাই নির্ব্বাণমুক্তি।

গৌতমের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি-প্রযুক্ত রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি কথিত হওয়ায় ঐ সমস্ত দোষজনক মিথ্যাজ্ঞানই "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি কথিত হওয়ায় উহার বিপরীত জ্ঞানই যে তত্ত্ব-জ্ঞান এবং তাহাই ঐ মিথ্যাজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে, ইহাও সূচিত হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বত্র মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই উহার নিবর্ত্তক হইয়া থাকে এবং তাহাকেই তত্ত্ব-জ্ঞান বলে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমোক্ত আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশবিধ "প্রমেয়" পদার্থবিষয়েই নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া তাহার প্রত্যেকের বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই তত্ত্ব-জ্ঞান বলিয়াছেন। পরে তাহা বলিব। এখানে মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-বিষয়ে যে মিথ্যাজ্ঞান, অর্থাৎ নিজ শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ যে অহঙ্কার, তাহার নিবর্ত্তক তত্ত্ব-জ্ঞান কি, ইহাই তোমার বুঝা আবশ্যক। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যোক্ত আত্মদর্শনই সেই তত্ত্ব-জ্ঞান। কারণ, উহাই আত্ম-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মিথ্যা-জ্ঞানকে নিবৃত্ত করে। যেমন আলোক ব্যতীত কখনই অন্ধকারের নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ ঐ আত্ম-দর্শন ব্যতীত কখনই পূর্ব্বোক্তরূপ মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। উহার নিবৃত্তি ব্যতীতও কখনও কাহারও জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ,— যাহা বস্তুতঃ আত্মা নহে, সেই শরীরাদি পদার্থে আত্ম-বুদ্ধিরূপ যে মিথ্যা-জ্ঞান, তাহাই রাগ-দ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন করিয়া এবং তদ্দ্বারা শুভাশুভ-কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা জীবের জন্মের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মিথ্যা-জ্ঞানই জীবের সর্ব্বদুঃখের মূল। কূর্ম্ম-পুরাণের অন্তর্গত "ঈশ্বর-গীতা"তেও এই সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যে (১।৫৫) বিজ্ঞান-ভিক্ষুও "ঈশ্বরগীতা"র ঐ বচন (১) উদ্ধৃত করিয়া পরে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও নিজ মত-সমর্থনের জন্য "আচার্য্য-প্রণীত" বলিয়া সসম্মানে গৌতমের ঐ সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফল কথা, মুমুক্ষুর নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ-সাক্ষাৎকাররূপ যে আত্ম-দর্শন, উহাই তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়। সুতরাং উহাই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। তাই উহাই আমাদিগের সনাতনধর্ম্মের সারভূত চরম ও পরম ধর্ম্ম। তাই মহর্ষি যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্ম-দর্শনম্।"

শিষ্য। তবে কি গৌতমের মতে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার মুক্তিলাভে আবশ্যক নহে? ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ব্যতীতও কি কাহারও মুক্তি হইতে পারে?

গুরু। কিছুতেই পারে না। কারণ, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাশ্বতর উপ ৬।৮)। অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হইলে আর কোন উপায়েই মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দর্শন সম্ভব না হওয়ায় মুক্তি হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও—(৪।১।৫৯ সূত্রভাষ্যে) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত প্রসিদ্ধ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে বাৎস্যায়ন ও তন্মতানুবর্ত্তী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে—ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া তাঁহার মুক্তির কারণ হয়। অর্থাৎ উহা মুক্তির সাক্ষাৎকারণ নহে। কারণ, উহা পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। সুতরাং নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ যে তত্ত্ব-জ্ঞান, তাহাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিজ শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হওয়ায় উহাই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার উহারই কারণ। দ্বৈতমতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর বস্তুতঃ

---

(১) অনাত্মন্যাত্ম-বিজ্ঞানং তস্মাদ্দুঃখং তথেতরৎ।
রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ॥
কার্য্যো হ্যস্য ভবেদ্ দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ।
তদ্দোষাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ॥—ঈশ্বর-গীতা।

বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ভিন্ন পদার্থ এবং উহা উৎপন্ন হইলে পরে মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাই মুক্তির চরম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কিন্তু শৈব-সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ জীবাত্মা ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ স্বীকার করিয়াও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারকেই মুক্তির চরম কারণ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে মুক্তিলাভে প্রথমে নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু উহা মুক্তির সাক্ষাৎকারণ নহে। শিব সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম কারণ বা সাক্ষাৎকারণ। উক্ত মতে মহেশ্বর শিবই পরব্রহ্ম। তাই শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সারে" বলিয়াছেন—"তস্মাৎ শিবদর্শনাদেব মোক্ষ ইতি।" তিনিও উক্ত মত-সমর্থনে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "তমেব বিদিত্বা-ঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফল কথা—শৈব-সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ যে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারকেই মুক্তির চরম কারণ বলিতেন, ইহা আমরা ভাসর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের দ্বারাও উক্ত মতের সমর্থন করিতেন, ইহাও আমরা "মুক্তি-বাদ" গ্রন্থে নব্য-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের কথার দ্বারা বুঝিতে পারি। গদাধর উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াও কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের উহা মত নহে। উদয়নাচার্য্যেরও ঐরূপ মত নহে। তাঁহার মতেও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকারেরই অত্যাবশ্যক সহায়। মূল কথা, যে ভাবেই হউক, গৌতম ও কণাদের মতেও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। এখানে প্রথমে সংক্ষেপে উক্ত সিদ্ধান্ত এবং তদ্বিষয়ে সম্প্রদায়ভেদে মতভেদ বলিলাম। পরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য বলিব। ঈশ্বরের কথা আবার অনেকবার বলিতে হইবে। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

[ক্রমশঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

বাদল বঁধু

ঝুরে ঝুরে বাদল বঁধু
　　গাও রে করুণ সুর!
ভগ্ন যে আজ্ সুখের সেতার
　　ধূলায় ভরপুর!

এ-কূল ও-কূল দু-কূল ভরি
　　ব্যথার প্লাবন বহে।
সকল সজ্জা ডুব্‌লো কালো
　　দুখের কালিদহে॥

ভোরে এ মোর বাগান ভরে
　　ফুট্‌ল গো যে ফুল্,—
হায় সকালের অকাল ঝড়ে
　　হলো সে নির্ম্মূল!

রয়েছে যা ভাঙ্গা ছেঁড়া
　　শূন্য কানন জুড়ে!
বাজাও বঁধু বেদন্ বেহাগ্
　　তোমার ঝরা সুরে!

আজ্ কেন ভাই ভোম্‌রা এলে
　　শূন্য গোলাপ-বাগে?
গুল্‌বদন্ আর রাঙ্‌বে কি হায়
　　তেম্‌নি অনুরাগে?

হাত দিও না সমীর এ মোর
　　ছিন্ন লতিকায়!
একটু ছোঁয়া লাগ্‌লে সে আজ্
　　কাঁদ্‌বে বেদনায়!

শ্যামল সে রূপ ফুরিয়ে গেছে,
　　শুকিয়ে গেছে গাছ!
ফুলের হাসি সব নিভেছে,
　　কাঁদন-ভরা সাঁঝ!

কাজ কি তবে সুখের কথায়?—
　　তোমার ঝরা সুরে,
বিশ্ব-ভরা ব্যথার গান-ই
　　বাজুক্ হৃদয়-পুরে॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শরদিন্দু কলেজ ছাড়িয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পত্নীতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিল, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আপাততঃ অনেক ঘণ্টা ধরিয়া নিজেকে 'ডার্করুমে' বদ্ধ রাখিয়া সে তার তরুণী পত্নীর যে সকল আলোকচিত্র প্রস্তুত করিতেছিল, বাঙ্গালার যে কোন মাসিকের পক্ষেই তাহা লোভনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরদিন্দুর স্ত্রী প্রতিমার চেহারাখানি ছিপ্‌ছিপে পাতলা, গায়ের রং তার শরদিন্দুর মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ না হইলেও ময়লা নয়, মুখ, চোখ, নাক সবই ভাল, মোটের উপর একটি ডানা-কাটা পরী না হইলেও প্রতিমাকে সুন্দরী বলা চলিত। শরদিন্দুর বিবাহের সময় অন্ততঃ শ'খানেক মেয়ে দেখা হইয়াছিল, কোথাও কোষ্ঠীর অমিল, কোথাও পাওনা-গণ্ডার অত্যন্তাভাব, কোথাও মেয়ের রূপ, কোথাও বাপের কুল লইয়াই সে সব সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে প্রতিমাকে শরদিন্দুর মাতামহ নিজে পছন্দ করিয়া দৌহিত্রকে ক'নে দেখাইয়া তাহার মনে ধরিলে একেবারে পাত্রীপক্ষকে পাকা কথা দিয়া তার পর পাত্রপক্ষকে খবর দেন। বসন্তবাবু শ্বশুরকে ভয় করিয়া চলেন, পছন্দ হোক না হোক, শ্বশুরের বিরুদ্ধে কথা বলিবার ওঁর সাধ্য ছিল না, তিনি মেয়ের রংটা জমীদার-বাড়ীতে আর একটু উজ্জ্বল ইচ্ছা করিলেও মুখ ফুটিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বিন্দুবাসিনী বাপের ইচ্ছাকে দেবতার আদেশ গণ্য করিত, সে হৃষ্টচিত্তেই বধূ-বরণ করিল। বহুতর সুন্দরীর প্রার্থিত স্থান প্রতিমা আসিয়া দখল করিয়া লইল।

বিবাহের পর পরীক্ষায় ফেল করিয়া শরদিন্দু জিদ করিয়াই পড়া ছাড়িয়াছিল, এমন কি, মাতামহও তাহাকে আর পড়ায় সম্মত করিতে পারিলেন না, মাও না। মনের দুঃখ গভীরভাবে নিজের মনে চাপিয়াই বিন্দু ব্যথিত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অদৃষ্টকে মনে মনে সে ধিক্কার দিল, তার পর অদৃষ্টের সকল বিড়ম্বনাকেই সে যেমন করিয়া নীরবে সহিয়া লইয়াছিল, ইহাকেও ঠিক তেমনই করিয়াই আপনার ভিতরে গোপনে চাপিয়া রাখিল, বাহিরে কোন প্রকাশই দেখা গেল না, কেবল যত বড় ও ভাল সম্বন্ধই আসুক না কেন, কোনমতেই আর সে শশাঙ্কের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না। শশাঙ্কের নিজের মায়ের, এমন কি, তার বাপের আগ্রহসত্ত্বেও না। সরযুর ইচ্ছা ছিল, বিন্দুর বউটির মত তারও একটি বধূ আসে। শরদিন্দুর বধূ আসিয়া বাড়ীর অনেকখানি আদর-আপ্যায়ন ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, তার বধূটি আসিলে ইহার এই অপ্রতিদ্বন্দ্ব আধিপত্যটা কিছু খর্ব্ব হয়ও বটে, তা ছাড়া স্বাভাবিক মাতৃত্বের প্রেরণাতেও বটে, সে তার ছেলেটিকে একটু শীঘ্র শীঘ্র সংসারী করিতে চায়, কিন্তু এমন তার কপাল, নিজের ইচ্ছায় কোন কাযটাই তার করার উপায় ছিল না। একটি মেয়ে—তার বাপের দেশেরই এক জন মস্ত বড় ধনীর ঘরের কন্যা, যাদের বাড়ীকে তারা 'বাবুদের বাড়ী' বলিয়া সমীহ করিত, বড় ভোজের দিনে একটা নিমন্ত্রণ পাইলে আপ্যায়িত হইয়া যাইত, সেই ঘরের একটি মেয়ের জন্য সেই ঘরের লোকরাই তার কাছে কত বারই না আনাগোনা করিতে লাগিল, তারও একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, ঐ মেয়েটিকেই আনিয়া তার বাপের দেশে নিজের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু এম্‌নি পোড়া সতীন তার ঘরে—বিন্দু সমস্ত আবেদন এবং নিবেদন নীরব ঔদাস্যে শুনিয়া লইয়া ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে কেবলমাত্র প্রত্যুত্তর করিল, "এখন শশাঙ্কের বিয়ে দেব না।"

সরযূ মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে সে গর্জ্জিয়া বলিল, "ওঃ, দেবেন না, ছেলে যেন ওঁরই! না বইয়ে কানায়ের মা!"—প্রকাশ্যে ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সবিনয়ে এবং ভয়ে ভয়েই বলিল, "ওরা খুব মস্ত বড়লোক, আমাদের দেশের বাবু জমীদার, দেবেও খুব, মেয়েটিও দেখতে ভাল—দিলে হতো না?"

বিন্দু শুধু উত্তর করিল, "না।" এবং চলিয়া গেল।

সরযূ এবার বড় বেশী অপমানিত বোধ করিল। এখানে তার অবস্থা যেমনই হোক, নিজের বাপের বাড়ীর দেশে সবাই জানে, সে জমীদারের দ্বিতীয় স্ত্রী, সোহাগিনী সোরাণী। সেখানে যখন লোকে জানিবে যে, তার সংসারে, এমন কি, তার ছেলে-মেয়ের ভাল-মন্দর উপরেও তার কোন হাত নাই, তখন সে লজ্জাকে ঢাকা দিবে কি দিয়া? সে রাগ করিয়া মাথা-ধরার অছিলায় ভাত খাইল না, নিজের ঘরের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া খুব খানিক কাঁদিল। ঝি ভাত খাইতে ডাকিতে আসিলে, ভারি গলায় জবাব দিল, "আমার ক্ষিদে নেই, অসুখ করেছে, খাবো না।"

খানিক পরে "মা" বলিয়া ডাকিয়া শোভা আসিয়া মাথার শিয়রে দাঁড়াইল, "বড়মা বল্লেন, যেমন ক্ষিদে, ছুটি খেয়ে যাও, তিনি খেতে বসতে পারছেন না, ব'সে রয়েছেন।"

অন্য অন্য দিন সরযূ রাগ করিলেও এই হুকুম পাওয়া মাত্র উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে তার সাহসে কুলায় নাই, আজ কিন্তু সে চটিয়াছিল বড় বেশী, তাই ইহাতে না ভুলিয়া সে তার মুখাবরণের মধ্য হইতেই ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "রোগ হ'লেও তোমার বড়মা'র হুকুমে উঠে গিয়ে গিলতে হবে? আমার মাথা খ'সে পড়চে, আমি পারবো না খেতে, যাও, বল গে যাও—"

শোভা ভিতরের কথা জানিত না, সে তার মায়ের মুখে এমন তীব্র ভাষা শুনিয়া আস্তে আস্তে কাছে সরিয়া আসিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু সরযূ ইহাতে উল্টা বুঝিয়াই বিরক্ত হইয়া মেয়ের হাতটা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, ক্রন্দনরুদ্ধ এবং রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে তীক্ষ্ণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, গায়ে আমার জ্বর নেই যে গা খাবলে দেখতে এলে। যাও, চ'লে যাও—"

তার পর আবার বলিয়া উঠিল, "যাও, বড়মাকে সাতখানি ক'রে লাগিয়ে এস, তিনি এসে আমার ফাঁসীর হুকুম দিয়ে যান—"

বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল,—"সংসারে এত লোক মরে, আমার ত ছাই মরণও নেই। মার্কণ্ডের মতন অখণ্ড পরমাই নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি।"

তার পর ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শোভা অপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া গেল এবং যা যা ঘটিয়াছিল, বড়মাকে সমস্ত কথাই সে ফিরিয়া গিয়া বলিল। শুনিয়া বিন্দুবাসিনী ভাল-মন্দ কোন কথাই না বলিয়া বামুন ঠাকুরকে সরযূর ভাগের বাড়া ভাতের থালাটি উঠাইয়া দিয়া নিজে আহারে মনোনিবেশ করিলেন, শোভাকে বলিলেন, "তুই বই নিয়ে ব'সে একটু পড়্‌গে যা' শোভা, ক'দিন পরে চান' করেছিস্, ভিজে চুলগুলো নিয়ে এক্ষণই যেন ঘুমোস নি।"

শোভা তার দীর্ঘ কেশজাল সঘনে আন্দোলিত করিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঘুমুবো! যা তোমার আদুরে ছেলে ঘরে আছেন, তিনি কি না আমায় ঘুমুতে দেবেন, ঘুমিয়ে পড়লে বোধ হয় নাকে কাঠি দেবেন, না হয় চুলগুলো দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে দেবেন, যেমন উঠতে যাবো, অমনই টান পড়বে। আর সেই একবার মনে নেই বড়মা! ছোড়দা কি রকম ঘুমন্ত আমার এক গোছা চুল কেটে নিয়ে ঘোড়ার চাবুক তৈরি করেছিল! সেই থেকে ছুটীর দিনে আমি কি না কক্ষণো ঘুমুই।"—

বিন্দু শোভার কথায় ঈষৎ স্নেহ-স্নিগ্ধ মৃদুহাসি হাসিলেন, মুখে তার আদুরে ছেলের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই না বলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। বামুন ঠাকুর ঝালের মাছ আনিয়া তাঁর পাতে দিলে পরিবেশন-পাত্রের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "সব মাছগুলোই আমায় দিয়ে দিলে বিষ্ণুচরণ! ছোটমা'র জন্যে রাখলে না? এ'কি করলে?"

বামুনঠাকুর উত্তর করিল, "ছোট মা খাবেন না বল্লেন যে!"

বিন্দু কহিল, "তা হোক, ওবেলার জন্যে রাখতে হয়, এমন ডিমওলা কই মাছ সে যে বড্ড ভালবাসে, জানো ত!"

শোভা চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "একটা রেকাব এনে এই মাছটা তোর মা'র জন্যে ঢেকে রাখ ত মা, এ আমার মুখে রুচবে না। আর তুই এই ডিমটা খেয়ে যা।"

শোভা আপত্তি করিয়া বলিল, "আমি ত আমার মাছের ডিম খেয়েছি বড়মা, ওটা তুমি খেয়ে ফেলো, আমার পেটে আর যায়গা নেই।"

বিন্দু সরযূর জন্য বড় মাছটি তুলিয়া রাখিয়া নিজের মাছের ডিমটা লইয়া বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"তুই খেয়েছিস

কি না, তা ত আমি তোকে জিজ্ঞেস করি নি, শোভা! যা বলছি কর, নে, ব'স,—হাঁ কর দেখি, খাইয়ে দিই—"

শোভা বড়মা'র আদেশ পালন করিতে করিতে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল,—"বাবা রে বাবা! ওই জন্যেই ত তোমার খাবার সময় থাকতে মন যায় না, বড়মা! যা কিছু ভাল জিনিষ, সব আমাদেরই খাইয়ে রেবে, তা' যতই কেন ঠাসা থাক্ না। আচ্ছা বড়মা! তোমার কি কিছু ভাল জিনিষ খেতে নেই?"

বিন্দু শোভার মুখে আহার্য্য প্রদান করিয়া সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন,—"তোদের মুখ দিয়েই যে আমি খাই শোভা! এই বুড়ো জিভে কি আর অত মিষ্টি লাগে, যত তোদের কচি জিভে দিলে আনন্দ হয়? আশীর্ব্বাদ করি, তুইও এক দিন যেন এই রকম খাওয়ার সুখ পাস।"

শোভার চোখ বড়মা'র এই কথায় কেমন যেন ছল ছল করিয়া আসিল, সে হঠাৎ গম্ভীর নতমুখে বড়মা'র পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

আহারান্তে সরযূর দাসীকে ডাকাইয়া এক বাটী গরম দুধ, কিছু ফল-মূল এবং মিষ্টান্ন সরযূর জন্য পাঠাইয়া দিয়া বিন্দু নিজের ঘরে চলিয়া গেল, অভুক্তা সরযূর জন্য তার মনের মধ্যে ব্যথা জাগিলেও, উহার রোগের মূল কারণ জানা থাকায় নিজে সে তাহাকে দেখিতে গেল না; কারণ, উহার এই বাড়াবাড়ি হাঙ্গামায় মনে মনে বিন্দু বিরক্ত হইয়াছিল, হয় ত সামনে আসিলে এ লইয়া দু'চারটে কড়া কথাও বলিয়া ফেলা অসম্ভব নয়! কায কি?

দাসী আসিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিল,—"ছোটমা গো! বড়মা এই দুধ ফল-টল দিলে! বল্লেক, সারাদিন উপোসী থাকতে নেই, টুকচে ব্যাতে দেন।"

সরযূ তখন নীরবে কাঁদিতেছিল, সে জবাব দিল না। ঝি দু'চার বার ডাকাডাকি করিয়া তাহাকে নিদ্রিত বোধে সে সব ঢাকা দিয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে সরযূ স্বামীর ঘরে শয়ন করিতে গেল না। তার অসহায় ক্রোধটা পূর্ণমাত্রায় গিয়া পড়িয়াছিল তার স্বামীর উপরে। যদি তিনি তাহাকে এতটুকুও কর্তৃত্ব দিতে পারিবেন না, তবে অনর্থক বড় গিন্নীর বাঁদী বনাইবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন কেন?

গৃহস্বামীর গৃহের সহিত সারাদিন বড় একটা সম্পর্ক থাকে না, আহার, নিদ্রা, বাহিরের ঘরে পাশা-দাবা খেলা এবং বিশ্রাম এই করিতেই দিন কাটে, রাত্রিতে তাঁর সরযূর সঙ্গে দেখা হয়, সেই বিবাহের পর হইতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, বিন্দু আহারস্থলে উপস্থিত থাকে, বিশেষ প্রয়োজন ঘটিলে বৈঠকখানার লোক সরাইয়া দিয়া সেখানেও যায়। সবযূ স্বামী সম্বন্ধে আজও সেই নবোঢ়া। শয়ন করিতে আসিয়া আজ চিরনিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া বসন্তবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া বিন্দুর উদ্দেশ্যে আসিয়া ডাকিলেন,—

"বড় বৌ!"

বিন্দুবাসিনী ঝি-চাকরদের খাওয়ার যায়গায় দাঁড়াইয়া তাদের কার কি অভাব আছে, দেখা-শুনা করিতেছিলেন, এক পাশ হইতে শশাঙ্ক, অন্য দিক্ হইতে শোভা তাঁহাকে ঘরে গিয়া সে দিন তার বিছানায় শুইবার জন্য টানাটানি, এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করিতেছিল, কলহ ক্রমশঃ হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, এমন সময় ঐ অসময়োপযোগী ভাবে "বড়বৌ" আহ্বান কাণে আসিতেই শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল,—

"শোভা শুনছিস্? বাবা—"

শোভা শুনিতে পায় নাই, সে ভাইকে মিথ্যা বলিতেছে বোধে মুখ ভেঙ্গাইয়া জবাব দিল, "ঈস্! শোভা যেন কচি খুকী! তাই ভয় দেখাচ্চেন, বাবা! বাবা ত এখন ছোটমা'র ঘরে!"

শশাঙ্ক রুখিয়া বলিল, "এ মুখপুড়ী মেয়ে জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ায় দেখছো বড়মা! বাবা "বড়বৌ" ব'লে ডাকলেন, শুনতে পেলি না? কাণের মাথা খেয়েছিস্! তা হ'লে প্রবোধকে লেখ, শীগ্‌গির যেন তোর জন্যে কাণে দেবার একটা ইয়ার-ড্রাম কিনে পাঠায়।"

"দেখছো বড়মা! ছোড়দা কেবলই কেবলই আমার সঙ্গে,—সত্যি বড়মা!—বাবাই ত, তোমায় ডাকচেনই ত বটে!"

শোভা অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল এবং শশাঙ্ক—"বাবা আসচেন, পালাই বাবা!" বলিতে বলিতেই চম্পট দিল। বসন্তবাবুর ছেলেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শরদিন্দুই বাপের একটু আদুরে, ছোট দু'জন ছোটবেলা হইতেই বাপের সঙ্গকে অপছন্দ করে। তার হয় ত দুইটি কারণ হইতে পারে। এক

শরদিন্দুর আদর বেশী থাকায় নিজেদের খর্ব্ববোধ, আর একটি এবং এইটিই হয় ত প্রধান, তাদের বড়মা'র প্রতি প্রবল আকর্ষণ। বড়মা যে তাদের বাপের সঙ্গ এড়াইয়া থাকেন, শৈশব হইতেই সেটুকু তাদের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাই তাঁর সঙ্গে তারাও ঐ লোকটিকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিত।

বসন্তবাবু আসিয়াছিলেন দ্বিতীয়ার খোঁজে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে একটু বাধিল, কহিলেন, "রাত ত অনেক হয়েছে, তোমার এখনও কায চোকে নি?"

বিন্দু হরে চাকরটার পাতে একটু গুড়-তেঁতুল দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "এই এদের ক'টার খাওয়া চুকলেই চুকে যায়। তুই ও ভাত ক'টাতে একটুখানি দুধ নিবি রে পটলা?"

বসন্তবাবু একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁর বাড়ীর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের খাওয়া ও খাওয়ান দেখিলেন। বিন্দুবাসিনীর পূত সংযত অথচ সস্নেহ মূর্ত্তিখানি তাঁর বুকের মধ্যে অনেকবারের মতই আজও একটা আবেগের স্পন্দন আনিয়া দিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিঃশব্দেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে বিন্দুবাসিনী ডাকিয়া বলিল,—

"ছোট বৌটার অসুখ করেছে, তাকে একবার দেখে যেও দেখি। সমস্ত দিনটাতেই কিছু খেতে পারলে না।"

বসন্তকুমার প্রথমার চিন্তা ভুলিয়া দ্বিতীয়ার জন্য মনে মনে উদ্বেগ এবং আশঙ্কা অনুভব করিলেন। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ করেছে? কৈ,—ডাক্তার ডাকা হয়েছিল?"—

বিন্দু হাত ধুইতে ধুইতে সংক্ষেপে জবাব দিল,—

"হয় নি—"

তার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া বসন্তবাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তবে একটু ব্যস্তভাবেই সরযূর ঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

তীর্থ

কাশীর কৈবল্য-দাতা কাশীশ-করুণা,
বৃন্দাবনে রাধা-শ্যাম-লীলা-রাগ-রেখা,
নীলাচলে জগন্নাথ-জলজ্জ্যোতিঃ-কণা,
পূত-ভাবময়ী করে নর-ভাগ্য-লেখা।

হরিদ্বারে পুণ্য-তোয়া সুরধুনী-ধ্বনি,
প্রয়াগে পাতক-হরা ত্রিবেণী-সঙ্গম,
সজল-সরযূ-সুরে সীতার কাহিনী,
করে বটে পুণ্যময় নরের জনম।

কিন্তু মোর মৌন-তীর্থ রহে সঙ্গোপনে—
রূপময় নহে যার বাহ্য-ইতিহাস—
ভূষিত যাহার অঙ্গ দারিদ্র্য-চন্দনে—
ব্যজন করয়ে যারে দীরঘ-নিশ্বাস।

দীন-হীন প্রতিবাসী হাসি-অশ্রু দিয়া
আরতি করয়ে মোর তীর্থ-দেবতায়;
আমিও তাদের প্রীতি-প্রসূন তুলিয়া
অর্ঘ্য দান করি মোর দেবতার পায়।

কামনা সতত জাগে, এ তীর্থ-ধূলায়
অন্তিমে বিলীন যেন হয় এই কায়॥

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রচারকার্য্য

ভারতবাসী যাহাতে স্বরাজ লাভ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এখনও কিরূপ প্রচারকার্য্য চলিতেছে, তাহা হয় ত অনেকে জানেন না। ইহার অনেকগুলি দিক্ আছে :—(১) পুস্তক-পুস্তিকার প্রচারে, (২) সংবাদপত্রের মারফতে, (৩) বক্তৃতায়। মিস্ মেয়ো, সাইমন কমিশন প্রতিষ্ঠাকালে যে ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিল, এখন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠিক সেই ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং এ বিষয়ে অপরের সহোয্যও গ্রহণ করিতেছে। তাহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' ও 'স্লেভস্ অফ দি গডস্' নামক গ্রন্থদ্বয়ের কথা কেহ বোধ হয় ভুলেন নাই। সে সময়ে ইংলণ্ডে ও মার্কিণদেশে এই দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া মিস্ মেয়ো ভারতের নর্দামা ঘাঁটিয়াছিল; পরন্তু শেষোক্ত গল্পগ্রন্থ নাটকাকারে পরিণত করিয়া নানা স্থানে অভিনীত করাইয়াছিল। এখন তাহার এক সঙ্গী জুটিয়াছে। ইহার নাম শ্রীমতী উইলিয়াম ম্যাকনাইট। এই নারীটি কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিল। সে মার্কিণদেশে ফিরিয়া ভারতের বিষয়ে একবারে মস্ত অভিজ্ঞ বনিয়া গিয়াছে এবং লণ্ঠন-ছায়াচিত্রের সাহায্যে 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থখানা সেখানকার লোকচক্ষুতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার জার্ম্মাণীর বার্লিন সহরে 'মাদার ইণ্ডিয়া' জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এই প্রচারকার্য্যের পশ্চাতে মস্ত বড় একটা 'যোগাড়ের' পরিচয় আছে। এমন সমস্ত লোক এই ঘৃণিত প্রচারকার্য্যের পশ্চাতে লুকাইয়া কল টিপিতেছে, যাহাদের স্বার্থ ভারতে বিদেশীয়ের একচেটিয়া অধিকার-প্রতিপত্তি ও স্বার্থের অনুরূপ। ইহারা জগতের দরবারে এই উপায়ে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সে জন্য অজস্র অর্থব্যয়ও করিতেছে। এই অভাগাদের যদি ইহাতে ভারতের দু'পয়সা সংস্থান করার আরও কিছু কাল সুবিধা হয়, তাহাতে ভারত সন্তুষ্টই হইবে। ভারত ত বহু শত্রুকেও দুধ-কলা দিয়া পুষিতেছে!

আর এক শ্রেণীর প্রচারকার্য্য সংবাদপত্রের সাহায্যে চালান হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিলাতের 'টাইমস্' নামজাদা সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্র। সার মাইকেল ওডয়ার ভারতে তাঁহার শাসননীতির সম্পর্কে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর নামজাদা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এতদুভয়ের যোগাযোগে কি সুন্দর ভারত-দ্বেষমূলক প্রচারকার্য্য চলিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি এই সার মাইকেল ঐ পত্রে একখানি সময়োপযোগী পত্র লিখিয়াছেন। উহার মোট কথা এই,—"বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের যে গুণগুলি বিদ্যমান থাকা একবারে অপরিহার্য্য, বর্ত্তমান শ্রমিক সরকারের তাহা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেকের বিশেষ সন্দেহ আছে। গতবার শ্রমিক-সরকার যখন শাসন-পাটে বসিয়াছিলেন, তখন কিন্তু মিঃ টমাস উপনিবেশ ও অধীন রাজ্যগুলির শাসন-সম্বন্ধে চমৎকার কেরামতি দেখাইয়াছিলেন। এবার কি হয়, তাহাই ভাবনার কথা। সিংহলের ডনোমোর কমিটী, পূর্ব্ব-আফ্রিকার হিল্টন ইয়ং কমিটী এবং ভারতের সাইমন কমিশন,—এই তিনটির রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা দেখিয়াই তাঁহাদের যোগ্যতার বিচার করা সম্ভব হইবে। প্রত্যেকটিতেই বৃটিশ পার্লামেণ্টকে ঐ সকল দেশের ট্রাষ্টি ও শেষ-কর্ত্তৃপক্ষ বা ভাগ্যবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; সুতরাং শ্রমিক পার্লামেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কি ভাবে এই তিন রিপোর্টের সদ্ব্যবহার করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। এ সকল দেশের মধ্যে সিংহলের লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ জন এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকার লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৩২ জন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। তাহারা শৃঙ্খলাহীন, অনিয়ন্ত্রিত, একতাহীন; সুতরাং সংখ্যায় ক্ষুদ্র শিক্ষিত দেশীয় ও বিদেশীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাহারা নিজ স্বার্থ-রক্ষায় অসমর্থ। এজন্য ইহাদিগের স্বার্থরক্ষার দিকে পার্লামেণ্টের বিশেষ নজর রাখা উচিত। হিল্টন-ইয়ং রিপোর্টের ২৮০ পৃষ্ঠায় এ কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের সম্পর্কেও এ কথাটা বিশেষ খাটে। সেখানেও মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় (Brahmin Oligarchy) ৭ কোটি মুসলমান, ৬ কোটি অনুন্নত অস্পৃশ্য জাতি, ১ কোটি ২০ লক্ষ আদিমনিবাসী এবং সামান্য পার্শী ও বৃটেনের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহারাও কেনায়ার White Oligarchyর অনুরূপ। ইহাদিগের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে পার্লামেণ্টের খর নজর রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শেষোক্তদিগকে প্রথমোক্তদের অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ শক্তির প্রবল হস্ত সর্ব্বদা ভারতে সম্প্রসারিত থাকা উচিত। যত দিন না অন্যান্য সম্প্রদায় শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিখে, তত দিন বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় রাখা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথাটা যেন শ্রমিক পার্লামেণ্ট ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন।"

'টাইমস্' এই পত্রখানি সযতনে মুদ্রিত করিয়া লক্ষ লক্ষ পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন, কিন্তু মুন্সী ঈশ্বরশরণ ইহার উত্তরে যে পত্র ছাপাইতে পাঠাইয়াছিলেন, ন্যায়-বিচারের পরম পক্ষপাতী 'টাইমস্' তাহা মুদ্রিত করা দূরে থাকুক, তাহা কেন মুদ্রিত হইল না, তাহার কারণও প্রদর্শন করেন নাই! তাঁহার পত্র-প্রেরক সার মাইকেল কেমন সত্যবাদী এবং তাঁহার মারফতে তিনি কেমন সত্য কথা প্রচার করিতেছেন, তাহা 'ব্রাহ্মণ অলিগার্কি কথার' ব্যবহারেই জানা যায়। ভারতে যাহারা স্বরাজ দাবী

করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মুসলমান আছেন, পার্শী আছেন, অনুন্নত আছেন, অথচ কেবল ব্রাহ্মণরাই যত অপরাধে অপরাধী! আবার সার মাইকেল যাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গন্ধী আছেন, সি, আর, দাশ ছিলেন, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত আছেন, সুভাষ বসু আছেন। ইঁহাদের সকলেই কেমন 'ব্রাহ্মণ', তাহা যাহারা জানে, তাহারা এই গণ্ডমূর্খ লেখক ও তাহার বাহনু 'টাইমসের' কথায় কেবল হাসিবে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই ভাবেই প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

বক্তৃতার সাহায্যেও এই উদ্দেশ্য সাধন করা হইতেছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বিলাতে ও অন্যান্য প্রতীচ্য দেশে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে, অহরহ নানা স্থানে এইভাবে প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা লোকের মনের ভাব এত প্রভাবিত হইয়াছে যে, প্রায় সকলেরই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবাসী স্বরাজ পাইবার উপযুক্ত নহে, দিলেই ভারতে অরাজকতা উপস্থিত হইবে। তিনি বলেন, "ভারতের বিষয়ে বিলাতের সকল রাজনীতিক দলই একমত, সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নিকট কোন আশা করা মিথ্যা, এখন ভারতবাসীর নিজের চেষ্টা ছাড়া, নিজের একতা ছাড়া, আর কিছুতেই কাম্য ফললাভ হইবে না।"

ইংরাজ ও ভারতীয় লোকের দ্বারা এমন বক্তৃতা করান হইতেছে, যাহাতে ভারতবাসীকে বুঝান হইতেছে যে, শ্রমিক সরকারকে চটাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে, যাহা কিছু পাওয়া যাইবার আশা ছিল, তাহাও ঘুচিয়া যাইবে। বক্তারা বড় গলায় বুঝাইতে-ছেন, শ্রমিক সরকারকে কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার সুযোগই দাও, তবে ত তাঁহাদিগকে বিচার করিবে; তৎপরিবর্ত্তে ক্রমাগত তাঁহাদিগকেও রক্ষণশীলদিগের সহিত এক দলে ফেলিয়া কেবল নিজেদের অনিষ্টই করা হইতেছে, ইত্যাদি।

ইহাও এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রচারকার্য্য। ইহার এমনই প্রভাব যে,জাতীয় দলের বিখ্যাত নেতাই সে দিন বলিয়া ফেলিয়া-ছেন,—"আগামী বৎসরে শ্রমিক সরকার নিশ্চিতই জাতীয় দলের সহিত গোল বৈঠকে বসিয়া ভারতের শাসনপদ্ধতি নির্ণয় করি-বেন।" এ অদ্ভুত ধারণা কোথা হইতে আসিল? ইহা কি চতুর প্রস্তাবকদিগের সূক্ষ্ম প্রচারপদ্ধতির ফল নহে?

ভারতে নারী-চিকিৎসক

ভারতে নারী হাঁসপাতাল আদি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ও সেবা-বিদ্যায় এ দেশের নারীকে পারদর্শিনী করিবার চেষ্টা হই-তেছে। কলিকাতার লেডী ডাফরিণ জেনানা হাঁসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, দিল্লীর লেডী হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য নারী-চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার পর হইতে এ দেশে দেশীয় মহিলা চিকিৎসক ও নার্সের কথা শুনা যাইতেছে। অন্যথা তৎপূর্ব্বে নারীর সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষাবিধানের চেষ্টা এ দেশে বহু পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও এ দিকে জনসাধারণের দৃষ্টিপাত হয় নাই। এখনও যে বিশেষ কিছু হইয়াছে, তাহাও মনে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের উপযোগী এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এ দেশে নারী-চিকিৎসকের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্প্রতি ডাক্তার মার্গারেট ব্যালফুর ও মিস বুথ ইয়ং একখানি কেতাব লিখিয়া-ছেন। কেতাবখানি বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে শিক্ষিতা ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত (qualified) নারীর অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু এই ৬০ বৎসরে এ দিকে আশ্চর্য্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশে হাঁসপাতাল-সমূহে নার্স বা নারী-চিকিৎসক ছিল না। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১ শত ৮৩টা হাঁসপাতালে নারী কর্ম্মচারী দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে ৯৭টা হাঁসপাতালের কার্য্য মিশনারীরা চালাইয়া থাকে; ২৫টি হাঁসপাতালের নারী কর্ম্ম-চারীদিগকে Women's Medical Service হইতে লওয়া হইয়াছে, ৬২টা হাঁসপাতালে প্রাদেশিক সরকার-সমূহের, দেশীয় রাজ্য-সমূহের অথবা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ-সমূহের অধীনে অন্যান্য নারী-চিকিৎসা ও সেবা শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী-কর্ম্মচারীদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া জিলা ও মিউনিসিপ্যাল হাঁসপাতালসমূহে নারী এসিষ্টাণ্ট বা সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতীয় ও য়ুরোপীয় এবং য়ুরেশীয় নার্সগণকে এখন প্রায় সমস্ত বড় বড় সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়। লেডী ডাফরিণ তহবিল হইতে নানা হাঁসপাতালে নারীদিগকে রোগের পরিচর্য্যা, রোগীর সেবা, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখন এ দেশে একটি Women's Medical Service, একটি Association of Medical Women in India, নারী কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত দিল্লীর নারী-মেডিক্যাল কলেজ, ৪টি নারী মেডিক্যাল স্কুল এবং মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল সমিতি-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানে নারীর চিকিৎসা ও সেবা-বিদ্যায় অভ্যস্ত হইবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। এ সকল সদনুষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী যে খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি। ভারতে নারী-চিকিৎসক ও নার্সের যত প্রয়োজন, বোধ হয়, জগতে অন্যত্র কোথাও সেরূপ নাই। এ দেশের পুরাকালের ধাত্রী ও পিসীমা দিদিমারা নারী-রোগে ও ধাত্রী-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন,—কিতাবতী বিদ্যায় অভ্যস্ত না হইলেও বংশানুক্রমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেন, এ কথা সত্য। কিন্তু অধুনা তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা বাল্য-কালে এমন এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে জানিতাম, যিনি ছেলেমেয়ের হুপিংকাসি বা কণ্ঠনালীর দুরারোগ্য রোগে কেবলমাত্র দক্ষতা সহকারে কণ্ঠমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সর্দ্দি তুলিয়া দিতে পারিতেন, আর তাহাতে রোগী নিরাময় হইত। আবার শিশু-যকৃৎরোগে এমন এক তিক্ত পাচন প্রস্তুত করিতে পারিতেন, যাহা সেবন করাইয়া দিলে শতকরা এক শত শিশুই নিরাময় হইত। তাঁহার এই অব্যর্থ ঔষধ কলিকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

ডাক্তার জগবন্ধু বসু শিশুর রক্তরোগে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলেন। আবার ইহাও দেখিয়াছি, নিরক্ষর নিম্ন-শ্রেণীর ধাত্রী ও সূতিকাগারের পরিচারিকা এমন সব দুরূহ সূতিকাগার-সংক্রান্ত বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিত, যাহা এখনকার কালে অনেক অধিক অর্থব্যয় করিয়া করাইয়া লওয়া দুরূহ। কিন্তু অধুনা এ সব বিদ্যা লোপ পাইয়াছে বা পাইতেছে। এ দেশের লোকের স্বভাবই এই যে, কোন গুপ্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিলে চিতাশয্যা পর্য্যন্ত তাহা গোপন করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই তাহাদের মনে জাগিয়া উঠে; ইহা ছাড়া দৈবও বাকি কাযটুকু অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এখন এ বিদ্যার বংশানুক্রমিক প্রচারও বুঝি বিলুপ্ত হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা পল্লীর নিভৃত কোণে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

এই হেতু এখন চিকিৎসা ও সেবা-ব্যাপারে নারীর শিক্ষার বিস্তৃতি যতই হয়, ততই ভাল। দেশের বিস্তৃতি ও লোক-সংখ্যার অনুপাতে এখনও বহুসংখ্যক চিকিৎসা-সেবাভিজ্ঞা নারীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ দিকে সরকারের ও তথা দেশবাসীর দৃষ্টিপাত হওয়া আবশ্যক। এ দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে অকালমৃত্যু ও ভয়াবহ শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহা জানা থাকিলেও অন্যান্য অনেক কারণ যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অপরিচ্ছ ন্নতা, দারিদ্র্য, অনিষ্টকর সামাজিক আচার-ব্যবহার (যাহা শাস্ত্র বা দেশাচার দ্বারা সমর্থিত নহে), ভ্রান্ত ধারণা প্রভৃতি নানা কারণে এ দেশের নারীর রোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করা কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা-বিস্তারের ভার কেবল সরকারকে নহে, দেশের লোককেও লইতে হইবে। যাহাতে নারী এই বিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে নারীগণের চিকিৎসা-সেবা-বিধানে সমর্থ হন, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চীন-রুশ সমস্যা

মাঞ্চুরিয়ার রেলের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার সম্পর্কে চীনের জাতীয় সরকারের সহিত রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল এবং এক সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বিঘোষিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। রুসিয়ার সোভিয়েট সরকার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চীনদেশে কম্যুনিষ্ট মন্ত্র প্রচার করিয়া দেশের অনিষ্টসাধন করিতেছেন, নানকিংএর জাতীয় সরকার যদিও এই অভিযোগ আনয়ন করিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে রুসিয়ান্-দিগকে বিতাড়িত করিতেছিলেন অথবা চীনের অন্যত্র তাহাদিগকে ধরপাকড় করিয়া আটক করিতেছিলেন, তথাপি ইহা যে মনো-মালিন্যের মূল কারণ নহে, তাহা চীনের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসজ্ঞ-মাত্রেই বুঝিয়াছিলেন। কেন না, যে চীনের জাতীয় সরকারের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট জেনারল চিয়াং-কাইসেক প্রথমা-বধি ক্যাণ্টন হইতে হ্যাঙ্কো ও নানকিং পিকিংএর জয়যাত্রায় রুসিয়ানদের সাহায্য, পরামর্শ ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, হঠাৎ সেই চীন সেই রুসিয়ান সোভিয়েটের 'বড়যন্ত্রে' এত উষ্মা প্রকাশ করিতেছেন কেন, তাহা ত সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। রুসিয়াই শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে চীনের উপর সকল প্রকার অন্যায় দাবী-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া চীনকে 'সমান' বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিল, কেবল বিনিময়ে মাঞ্চুরিয়ার রেলে কিছু বিশেষ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার দাবী করিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়া রেল ধরিতে গেলে তাহাদেরই অর্থে তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত; সুতরাং উহার উপর কিছু অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব রুসিয়া দাবী করিতে পারে। সম্ভবত: ইহা লইয়াই উভয় পক্ষে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আরম্ভটা হইয়াছিল ঘোরাল, এখন বোধ হয়,মার্কিণ, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাঁচ জনের মধ্যস্থতায় এই বিরোধ মিটিয়া যাইবে। উভয় পক্ষই যুদ্ধে নারাজ—আপোষেই আগ্রহান্বিত। ইহা জগতের পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।

মিশর-সমস্যা

গত কনজারভেটিভ মন্ত্রিত্বকালে মিশরের জাতীয় দল প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশার নেতৃত্বে চাঁদে হাত বাড়াইতে গিয়া যে লর্ড লয়েডের বজ্রমুষ্টির আঘাতে নতমস্তক হইয়াছিল, সেই লর্ড লয়েড পদত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শ্রমিক-সরকার সেই পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে, এ জন্য পার্লামেণ্টে কনজারভেটিভ দলের বড় কর্ত্তা মিঃ বলডুইন হইতে আরম্ভ করিয়া চুনাপুটি পর্য্যন্ত অনেকেই শ্রমিক-সরকারের বৈদেশিক সচিব মিঃ হেণ্ডারসনকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণে জর্জ্জ-রিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল প্রশ্নোত্তরের মধ্য হইতে কয়টি কথা বেশ জানা গিয়াছে।

(১) শ্রমিক-সরকার লর্ড লয়েডকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন,

(২) তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কনজারভেটিভ সরকারের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেনের বৈদেশিক নীতিই অনুসরণ করিতেছেন,

(৩) মিশর সম্বন্ধে এযাবৎ অনুসৃত বৃটিশ-নীতির পরিবর্ত্তন হইবে না,

(৪) মিশর সম্বন্ধে যাহা করা হইবে, তাহা বিলাতের সকল দলকে জানাইয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া করা হইবে,

(৫) এ বিষয়ে বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহেরও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হইবে।

লর্ড লয়েড নামজাদা ঝুনো ব্যুরোক্রাট। বোম্বাইএর গভর্ণর সার জর্জ্জ লয়েডরূপে ভারতবাসীর নিকট তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার শাসনের 'No damned nonsense' নীতিও ভারতবাসীর নিকট সুবিদিত। এহেন জবরদস্ত বৃটিশ শাসক মিশরের বৃটিশ হাই কমিশনাররূপে কনজারভেটিভ মন্ত্রিত্বকালে যে সব খেলা খেলিয়াছিলেন,—মিশরবাসীরা অ্যাংলো মিশর সন্ধির সর্ত্তমত (মিশরকে 'স্বাধীনতা' দিবার কথা যাহাতে ছিল) যখন হাই-কমিশনারের পদ উঠাইয়া দিতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি ২ খানা

বড় বড় বৃটিশ রণপোত আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে আনাইবার ও যাহা কিছু শাসন-সংস্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহা কাড়িয়া লইবার ভয় দেখাইয়াছিলেন—এবং যে খেলার ফলে মিশরের নাহাস পাশার মন্ত্রিত্ব ও মিশর পার্লামেণ্ট খসিয়া যায় এবং মহম্মদ মামুদ পাশা মিশরের নিয়ামক (Director) নিযুক্ত হন,—সে সব খেলার কথা এখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এত দিনে মিশরের 'স্বাধীনতার' স্বরূপ বেশ্ বুঝা গেল। এই 'লয়েডী' স্বাধীনতা এমনই চমৎকার যে, ইহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্ত কেবল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রহিয়াছেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সাগর-পারের ভাই ব্রাদার ঔপনিবেশিক-দিগকেও ডাকা হইবে! আমাদের 'সাইমনি স্বাধীনতা' যাহা দিবার কথা হইতেছে, তাহাতেও বোধ হয় এই 'ভাই ব্রাদারদের' অনুজ্ঞার ছাপও আঁটিয়া দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, লোক প্রথমে মনে করিয়াছিল, বুঝি শ্রমিক সরকার সত্য সত্য অ্যাংলো-মিশর সন্ধিখানা ঝালাইয়া মিশরবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা (অবশ্য গলার বগলসরূপ ৪টি সর্ত্ত ছাড়া আর সকল বিষয়ে) দিবার কথা পাড়িয়াছিলেন, তাই ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্ত লর্ড লয়েড ক্ষেপিয়া উঠিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। এক দিন ভারতেও জবরদস্ত ব্যুরোক্রাট লর্ড কর্জ্জন এমনই ভাবে 'গোঁসা করিয়া' পদত্যাগ করিয়াছিলেন। উভয়েই এক শ্রেণীর লোক কি না! কিন্তু পরে বুঝা গেল, ব্যাপারটা আদৌ তাহা নহে। যদিও মিশরের জাতীয় দলের এক সংবাদ-পত্র বলিতেছে যে, মিশরের জাতীয় দলের সহিত বিলাতের কর্ত্তৃ-পক্ষের অ্যাংলো-মিশর সন্ধি ঝালাইয়া লইবার কথা স্থির হইয়া গিয়াছে ও মিশরবাসীরা উহার ফলে স্বাধীনতা পাইতেছে, তথাপি পার্লামেণ্টে শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ত্তাদের কথায় বুঝা যায়, এ যাবৎ অনুসৃত বৃটিশ নীতির বিপরীত কিছুই করা হইবে না, অর্থাৎ মিশরকে আকাশের চাঁদ দেওয়া হইবে না, তবে বগলস-আঁটা স্বাধীনতা মিশর যত চাহে, তত পাইবে।

মিশর সংবাদপত্র রটাইয়াছে যে,—নূতন বন্দোবস্তে (১) ইংরাজ সুয়েজ খালের কেন্দ্রে সৈন্য অপসারণ করিবে, (২) হাই কমিশনারের পদ উঠিয়া যাইবে, তৎপরিবর্ত্তে মিশরে বৃটিশ দূত থাকিবে, বিলাতে মিশরীয় দূত থাকিবে, (৩) বিদেশীদের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে বৃটিশ দূতাবাসের কর্ত্তৃত্ব উঠিয়া যাইবে, মিশরের সাধারণ আদালতে তাহাদের বিচার হইবে, (৪) সুদানে উভয় পক্ষের সম্মিলিত কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

এ জনরব সত্য বলিয়া মনে হয় না। এ যাবৎ (১) সুয়েজ খালের কর্ত্তৃত্ব, (২) সুদানের কর্ত্তৃত্ব, (৩) বিদেশীদের উপর কর্ত্তৃত্ব, (৪) হাই কমিশনারের কর্ত্তৃত্ব এবং (৫) মিশররক্ষার কর্ত্তৃত্ব বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে,—ইহাই বৃটিশ শক্তির অনুসৃত নীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রমিক সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ হেণ্ডার্সন সেই নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে কিরূপে পূর্ব্বোক্ত জনরব সত্য হইতে পারে? তাই মনে হয়, শ্রমিক সরকার যতটুকু বগলস-আঁটা স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতেই লর্ড লয়েড ক্ষেপিয়া উঠিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। এই 'ওডয়ার' প্রকৃতির শাসকদিগকে এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে দ্রষ্টব্য পদার্থরূপে রাখিয়া দিলে জগতের অনেক মঙ্গল হইতে পারে।

সামশুল হুদা খাঁ

কলিকাতার করিমবক্স ব্রাদারের সহকারী ম্যানেজার মিঃ সামশুল হুদা খাঁ, এম, এ বাঙ্গালা সরকারের বৃত্তি পাইয়া আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের কল-কৌশল এবং উহার সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। ইনি ঢাকা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশের সন্তান। ইহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। খেলা-ধুলা ও ব্যায়ামে ইহার বিশেষ অনুরাগ আছে। তিনি যথাক্রমে কুমারটুলী, মোহনবাগান ও ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাবের সদস্যরূপে ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কয়বার সিল্ড প্রতিযোগিতা খেলায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সরকারের বৃত্তি-লাভ করিয়া আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে বিদেশে প্রেরিত হইতেছেন। আমাদের বাঙ্গালী-মুসলমান সমাজের মধ্যে যতই শিক্ষার বিস্তার হয়, ততই আনন্দের কথা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই বাঙ্গালী যুবকের সাফল্য কামনা করি।

সামশুল হুদা খাঁ

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য-সমূহের সামন্ত-নৃপতিগণ ভবিষ্যৎ স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌম শক্তি বৃটিশ-রাজের সহিত প্রাচীন সন্ধিপত্রসমূহ ঝালাইয়া লইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ভারত-সরকারের অধীনে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার পরিচয় নাভা, ইন্দোর, ভরতপুর প্রভৃতি সামন্ত-রাজগণের সিংহাসনচ্যুতির ঘটনা হইতেই জানা যায়। পাতিয়ালার মহারাজার সম্বন্ধেও সম্প্রতি নানারূপ জনরব শুনা যাইতেছে। তাঁহাদের সার্ব্বভৌম রাজার দ্বারে যতখানি সম্মান, তাহার পরিচয় বহুক্ষেত্রেই পাওয়া

গিয়াছে। অথচ তাঁহারা দেশের লোকের সহিত মিলিয়া দেশের মুক্তিসাধনে সম্মত নহেন।

দেশীয় রাজ্য-সমূহের কোন কোন অংশে প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাও 'তরুণ রাজস্থান' পত্রে সুপ্রকাশ। সেখানে বেগারপ্রথা কিরূপ ভীষণ এবং ক্রীত-দাসত্বের নামান্তর উহাকে বলা যায় কি না, তাহাও নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। রাজপ্রাসাদের নানারূপ কাণ্ডকারখানার কথাও যাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাও চমৎকার। বোধ হয়, সামন্ত-নৃপতিরা মনে করেন, তাঁহাদের প্রজারা বাহিরের জাগরণের সংস্পর্শে আসে নাই, এখনও মধ্যযুগের মধ্যে বাস করিতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা যত দিন দূর না হইবে, তত দিন তাঁহারা প্রকৃত প্রজাপালক রাজা হইতে পারিবেন না, পরন্ত সমগ্র দেশের মুক্তির আন্দোলনের সংস্পর্শে না আসিলে আপনারাও কখনও মুক্তি পাইবেন না।

পাতিয়ালার মহারাজ

সম্প্রতি 'ইংলিশম্যান' পত্র নাভা ও পাতিয়ালা রাজ্যের সামন্ত-রাজাদের সম্পর্কে এক রহস্যময় মামলার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। মশুরীর সবজজ মিঃ মহম্মদ আলারির দায়রায় মামলাটি রুজু হইয়াছে। সিংহাসন-চ্যুত নাভার মহারাজা তাঁহার কন্যা পঞ্জাব-কলসিয়া রাজ্যের রাণী অমৃত কৌরের নামে ২১০ লক্ষ টাকা দাবী দিয়া নালিশ রুজু করিয়াছেন। এই মামলা সম্পর্কে নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাণীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার লোমহর্ষণ বিবরণ আদালতে দাখিল হইয়াছে। ইহার সহিত নাভার সিংহাসনচ্যুত মহারাজা, তাঁহার শ্বশুর, চিকিৎসকরা, ঢোলপুরের মহারাণী, পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতির নাম বিজড়িত আছে। মামলা বিচারাধীন, এ জন্য আমরা এ সম্বন্ধে এখন কোন মতামত প্রকাশ করিব না। তবে দেশীয় রাজ্য-সমূহের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-সাধনের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে এবং বৃটিশ-ভারতের প্রজার সহিত যে দেশীয় রাজ্যের প্রজার সংস্রব বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহা বলিতে বাধা হইতেছি। রহস্যজালে আচ্ছাদিত দেশীয় রাজ্যসমূহ যতই বৃটিশ-ভারতের প্রকাশ্য আলোকের মধ্যবর্ত্তী হইবে, ততই সেখানকার কুজ্ঝটিকা অপসৃত হইবে এবং তথাকার প্রজাবর্গ ততই দেশশাসনে বিস্তৃত অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

নাভার মহারাজ

বিদেশে ভারতীয়া নারী

বর্দ্ধমানের মহারাজ-কুমারী ললিতা রাণীর বিপক্ষে বিলাতে এক মামলার কথা দৈনিক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্রান্ত-বংশীয়া ভারতীয়া নারীরা বিদেশে এই শ্রেণীর প্রচারের যতই লক্ষ্য না হন, ভারতের সুনামের পক্ষে ততই মঙ্গল। একাধিক দেশীয় রাজন্য বিদেশে নানারূপে ভারতের নাম মসী-লিপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। তাহার কুফল সামান্য নহে। আমরা এই হেতু আমাদের সম্ভ্রান্ত-বংশের নর-নারীকে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

বর্দ্ধমানের রাজকন্যা

মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রী

রায় বাহাদুর পি, সি, বসু

রায় বাহাদুর পি, সি, বসু মধ্য-প্রদেশের শিক্ষা ও পূর্ত্ত-বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দ্বারবঙ্গাধিপ
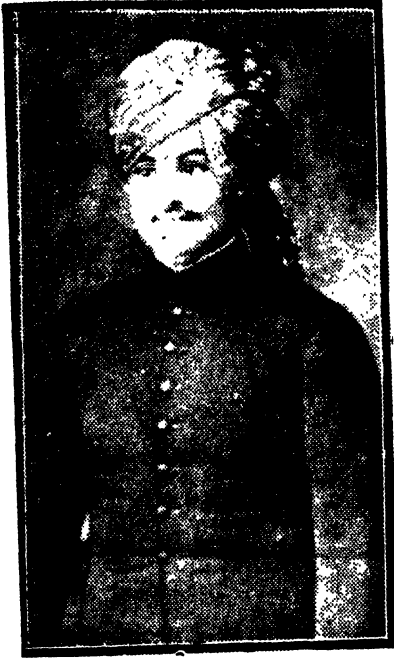
নূতন দ্বারবঙ্গাধিপ

মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ বাহাদুর। ইনি মহারাজাধিরাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুরের পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা প্রবীণ ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৪ঠা শ্রাবণ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে সময়ে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে দেশের ইতিহাস-রচনার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল, সেই যুগে যে কয়েক জন সাহিত্যসেবী দেশের ইতিহাস-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃভাষার চর্চ্চায় অবহিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ইতিহাসের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী তাঁহারও প্রাণে অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথ, রামপ্রাণ গুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় প্রেরণা দিয়াছিল। তিনি অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনায় সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য তাঁহার গবেষণার ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার রচিত "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস" বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। বহরমপুর কলেজে কালীপ্রসন্নবাবু দীর্ঘকাল ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "মাসিক বসুমতীকে" অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে আমরা প্রিয়জনবিরহের বেদনা অনুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট

মৌলভী রাজাজুর রহমান

মৌলভী রাজাজুর রহমান, এম, এ, বর্ত্তমান বাঙ্গালা কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার এই পদোন্নতিতে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

জাতীয় মুসলিম দল ও মিলনেচ্ছা

বোম্বাই বিভাগের মিঃ ব্রেলভি, মিঃ চাগলা, মিঃ আবেদ আলি জাফর ভাই এবং ডাক্তার আনসারি, ডাক্তার মহম্মদ আলাম, মওলানা জাফর আলি প্রমুখ গণ্যমান্য বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবর্গের উদ্যোগে বোম্বাই সহরে মুসলিম কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং তৎপরে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম নেতৃগণের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, একটি নিখিল-ভারত মুসলিম জাতীয় দলের সৃষ্টি করা হইবে। দেশবাসী ইহাতে পরমানন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কেন না, এই দলসৃষ্টির উদ্দেশ্য যে, হিন্দু-মুসলমানে একতা-প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি, ইহা বোম্বাই ও এলাহাবাদের মুসলিম সম্মেলনদ্বয়ের মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়। ইহার উপর আরও এক আনন্দের কথা এই যে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও একই উদ্দেশ্যে বোম্বাই সহরে মহাত্মা গন্ধীর সহিত মিঃ জিন্নার মিলন ঘটাইতেছেন। ইহাদের সকলেরই সাধু উদ্দেশ্য

সফল হউক, ইহাই কামনা। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমান-মিলনেই আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে।

প্রথম যখন বোম্বাইএ মুসলিম কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন মিঃ মহম্মদ ব্রেলভি স্পষ্টই মুসলমানগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মুসলমান আন্দোলনকারীর প্রচারকার্য্যের ফলে কংগ্রেস হইতে মুসলমানরা ক্রমশঃ সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। অথচ উহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, উহাতে সকল সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার আছে।

এই আন্দোলনকারীদের অগ্রণী কে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। গত লক্ষ্ণৌ সর্ব্বদল বৈঠকে বিরোধের পর সার মহম্মদ সফির দলে যোগ দিয়া যাঁহারা কংগ্রেসটিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, সেই আলি ভ্রাতৃদ্বয়ই যে মিঃ ব্রেলভির বক্তৃতার লক্ষ্যস্থল, তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। ইহারা দুই ভ্রাতা বোম্বাই ধর্ম্মঘটের তদন্ত কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া অযথা হিন্দু-সভাকে এবং কংগ্রেসকে গালি পাড়িয়াছেন এবং সমস্ত মুসলমানকে কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহরুর রিপোর্ট বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যখন কমিটীর সদস্ত দেওয়ান বাহাদুর জাভেরি মওলানা সৌকৎ আলিকে বলেন, "পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি তাঁহার এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, রফার দ্বার এখনও রুদ্ধ হয় নাই, নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে এখনও আপোষে কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। এ কথার উত্তরে আপনি কি বলিতে চাহেন?" অমনই 'বড় ভাই' তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিয়া বলেন, "পণ্ডিত মতিলাল যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন মূল্য নাই, উহা চোখে ধূলা দেওয়ারই সামিল। উহারা শীঘ্রই বুঝিবে যে, মুসলমানরা যাহা দাবী করিবে, উহাদিগকে তাহাই দিতে হইবে।"

এই মনোবৃত্তি লইয়া ইহারা দেশের মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব করিবেন? ছোট ভাই মিঃ মহম্মদ আলি সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া দিতে চাহেন, কিন্তু তথাপি সার মহম্মদ সফির দল ছাড়িতে চাহেন না, কংগ্রেসেও যোগ দিতে চাহেন না, 'মুসলমানের স্তায্য দাবী' বলিয়া চীৎকার করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র বুঝিবেন যে, ভারতের মুসলমান-সমাজ বর্ত্তমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝেন, অথবা কেহ কেহ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে দিন তাঁহারা সব কথা বুঝিবেন, সে দিন আলি ভাইরা সফির দলের সহিত মুসলমান পক্ষেরই প্রবল প্রতিবাদের বন্তায় ভাসিয়া যাইবেন। মুসলিম জাতীয় কংগ্রেস দল সেই পথ প্রস্তুত করিতেছেন। উহার আর বিলম্বও অধিক নাই। ডাক্তার আনসারি, মওলানা আজাদ, ডাক্তার মহম্মদ আলাম, মামুদাবাদের মহারাজা, মিঃ ব্রেলভি, মিঃ আবেদ আলি জাফর ভাই, মওলানা জাফর আলি, মওলানা আক্রাম খাঁ, মৌলভী মজিবর রহমান প্রমুখ কংগ্রেসের সমর্থক জাতীয় দলের নেতারা থাকিতে হিন্দু-মুসলমান একতা বিফল হইবে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

নারী মিউনিসিপ্যাল সদস্য

ডাক্তার দাহিগৌরী ত্রিবেদী

ডাক্তার দাহিগৌরী ত্রিবেদী বরোদা মিউনিসিপ্যালিটীর মনোনীত মহিলা সদস্ত। মিসেস পগার নাম্নী আর একটি মনোনীত সদস্ত মিউনিসিপ্যালিটীতে আছেন।

কাফ্রী কনভেনশান

জামেকা দ্বীপের রাজধানী কিংষ্টন সহরে জগতের কাফ্রী সম্প্রদায়ের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের ষড়্বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মানুষের জন্মগত অধিকার দাবী করা এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্ত। কাফ্রী কৃষ্ণাঙ্গ জাতির উপর শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্য-গর্ব্বীরা যে অত্যাচার করিয়াছে ও এখনও বহু স্থানে করিতেছে, তাহার তুলনা জগতে বিরল। এখনও মার্কিণ দেশের 'লিঞ্চ ল' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতীচ্যের শ্বেতজাতিরা—বিশেষতঃ ইংরাজ ও মার্কিণ জাতি তাহাদের জন্মভূমি গ্রাস করিয়াছে, বহুদিন তাহাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন কাফ্রীরা নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। তাহারাও জার্ম্মাণযুদ্ধের পর জগতের জাগরণে সাড়া দিয়াছে। ইহা কালের লক্ষণ। সাম্রাজ্যগর্ব্বী মদোদ্ধত জাতিদেরও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত Yellow Perilএর সঙ্গে সঙ্গে এইবার তাহাদের মুখে Black Perilএর চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৮ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৬ [৫ম সংখ্যা

সভ্যতার সোপানে—না জাহান্নামের পথে ?

বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা,—ধনে মানে শোভায় সৌন্দর্য্যে 'প্রাচ্যের লণ্ডন।' অভিজ্ঞ বিদেশী কথাটা শুনিলেই মনে করিবে, এই সৌধকিরীটিনী মহানগরী বুঝি বাঙ্গালীরই ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিদেশী পর্য্যটক মহানগরীতে পদার্পণ করিয়া যখন চৌরঙ্গী অথবা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আফিসের দিনে দিবালোকে অবিশ্রান্তগতিতে ধাবমান মোটরের গম্‌গমানি লক্ষ্য করেন, অথবা ভাগীরথীতটের জাহাজঘাটায় মাল নামান-উঠান পরিদর্শন করেন,—তখন তিনি হক্‌চকাইয়া যান, মনে ভাবেন, কি বিরাট্ ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান এই বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা, এখানে নিত্যই বাঙ্গালী কতই না টাকার ছিনিমিনি খেলিতেছে, বাঙ্গালী কতই না ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসায়ী জাতি!

কিন্তু যাঁহারা কলিকাতার নাড়ীনক্ষত্র অবগত আছেন, তাঁহারা বিদেশীর এই ধারণার কথায় নিশ্চিতই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই যে রয়্যাল একসচেঞ্জে, সেয়ার মার্কেটে, ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্স আফিসে, চৌরঙ্গী বড়বাজারে নিত্য লক্ষ লক্ষ টাকার লেন-দেন হইতেছে, ইহার কতটুকু অংশ বাঙ্গালীর? কলিকাতার মত বিরাট্ ব্যবসায়-কেন্দ্রে নিত্য ধনাগম হইতেছে, কলিকাতার কাষ্টম হাউস হইতে মাসে মাসে ক্রোর ক্রোর টাকার আমদানী-রপ্তানীর তালিকা প্রকাশিত হইতেছে,—এ কথা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালীর ইহার কয় সহস্রাংশের একাংশ নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করিবার আছে? যাহারা এই বিরাট্ টাকার ছিনিমিনি খেলিতেছে, তাহারা যে বাঙ্গালী নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা কাহারা? তাহারা প্রথমতঃ য়ুরোপীয় বণিক্, তাহার পর ভিনদেশী গুজরাটী, ভাটিয়া বা মাড়োয়ারী ধনী মহাজন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। পরলোকগত সার ডেভিড্ ইউল যখন তাঁহার কলিকাতার বিরাট্ ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন মোট ৩২ কোটি টাকা স্বদেশে সঙ্গে লইয়া যান।

যখন বড়বাজার, আলু-গুদাম, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ প্রভৃতি বড় বড় পল্লীর বিশাল সৌধশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত

করি, তখন ভাবি, এই পঞ্চতল ষট্‌তল সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি কাহার সম্পত্তি! আজ বাঙ্গালী তাহারই মাতৃভূমিতে বাস করিয়া নিঃস্ব কাঙ্গাল কেন? ভিন্নদেশী বা পরদেশীর তুলনায় সে আজ তাহারই রাজধানী কলিকাতার কোথায় কোন্ স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে! ভাবি, আর দুঃখে ক্ষোভে অন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কাহার দোষে, কোন্ পাপে বাঙ্গালীর আজ এই অধোগতি! আজ বাঙ্গালী সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কেবল ডাক্তার উকীল স্কুলমাষ্টার কেরাণীর জাতিতে পরিণত কেন? ইঁহাদের মধ্যে কাহারা দেশে ধনাগমে আত্মনিয়োগ করেন? এ সকলের 'পরগাছা' হইবার যোগ্যতা আছে বটে, দেশের ধন দেশেই লেন-দেন করিবার কেরামতি আছে বটে, কিন্তু পরের দেশের ধন আহরণ করিয়া জননী জন্মভূমির নিরাভরণা নাম ঘুচাইবার সাধ্য নাই। পরানুচিকীর্ষায় সিদ্ধহস্ত জাতি কেবল বিলাসিতার ও পরের ভাবধারার (রীতি-নীতি ইত্যাদির) আমদানী করিতে সুদক্ষ বটে, কিন্তু কিসে আপনার জাতিকে বড় করিতে হয়, সে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে একবারেই অনভ্যস্ত। বাঙ্গালীর মত আত্মবিস্মৃত ও আত্মহারা জাতি জগতে আর কোথাও আছে কি না জানি না!

গত ২৭শে জুলাই তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর আয় গড়পড়তা ৪০৲ টাকা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। পরন্ত সেই আয়ে বাঙ্গালী কিরূপে পরিবার প্রতিপালন ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহার একটি হৃদয়দ্রাবী তালিকা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত জাতি ধনাগমের পন্থা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে এই সামান্য আয়েরও অপব্যয় করিয়া নিত্য ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। নিত্য যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতে ইহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। এই সহরের বাঙ্গালী কেরাণী ও ছাত্র-সমাজ কিরূপে কত প্রকারে নিত্য অর্থের অপব্যয় করে, তাহা ট্রাম-বাসের অথবা সিনেমা-থিয়েটারের জনতা দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কলিকাতায় আসি, তখন যে অবস্থা এই সহরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহার চিত্র ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 'মাসিক বসুমতী' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন কলিকাতায় এত স্কুল-কলেজের সৃষ্টি হয় নাই। সেই হেতু ভবানীপুর, কালীঘাট অথবা বরানগর, কাশীপুর হইতে বহু ছাত্র নিমতলা ষ্ট্রীটে ডফ কালেজে অথবা হেদুয়ার মোড়ে জেনারল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে পদব্রজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত। বহু কেরাণীও ঐ সকল স্থান হইতে স্বচ্ছন্দচিত্তে চৌরঙ্গী বা লালদীঘির পার্শ্বে বিদেশীর সদাগরী আফিসে বা লাটদপ্তরে কায করিবার জন্য যাতায়াত করিত। এখন সর্ব্বত্র হয় ট্রাম, না হয় বাস, না হয় অন্ততঃ রিক্‌সা। আর বাঙ্গালী ছাত্র বা কেরাণীকে পায় কে? গলির মোড়ে দাঁড়াইলে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর হয় বাস না হয় ট্রাম—এ লোভ কি সম্বরণ করা যায়? এখন তাই তাহাদের এক মাইল হাঁটিয়া যাইবার কথা মনে হইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! ইহাতে কি তাহাদের নিত্য তিন আনা চারি আনা করিয়া অপব্যয় হয় না?

ইহার উপর তাহাদের সকলের মুখেই সিগারেট-বিড়ী লাগিয়াই আছে। কেহ এক প্যাকেট, কেহ বা দুই প্যাকেট নিত্য ফুঁকিয়া দেয়। প্যাকেটের মূল্য দুই আনা হইতে চারি পাঁচ আনা। ডাইং ক্লিনিংএ কাপড় কাচাইয়া লওয়াও আর এক রোগ। সাধারণ ধোপার কাপড় কাচায় কি তাহাদের মন উঠে না! এখানে আমি নিজের জীবন-যাপনের কথা কিছু বলিতেছি। আমি নিজে বাড়ীতে নিজের কাপড় সাবান দিয়া কাচিয়া থাকি। ধোপা বা ডাইং ক্লিনিং কোম্পানী যে ভাবে সোডা দিয়া সূত্রতন্তু-গুলিকে জরাজীর্ণ করিয়া ও পরে ভাঁটিতে দিয়া ও পাটে আছড়াইয়া 'অন্ত্রতন্ত্র' বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে তাহাদের পরমায়ু কত দিন বিস্তৃত হইতে পারে? সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে তাহারা পরিধেয় বস্ত্রাদির বিষয়েও অর্থের অপব্যয় করে। তাহার পর হেয়ার কাটিং সেলুন, হোটেল রেস্তোঁরা, চা-চপের দোকান, পান-লেমনেডের দোকান,—কত কি আছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না।

কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা বলিব? প্রতি শনি রবিবার ছাত্র ও কেরাণী বাবুদের সিনেমা দেখা চাই-ই! এখন বুঝিয়া দেখুন, এই সমস্ত অপব্যয় যোগান দিতে অভিভাবকগণকে কি বেগ পাইতে হয়; পরন্ত কেরাণী বাবুদের শিশু পুত্র-কন্যার দুগ্ধ যোগান দেওয়া দূরে থাকুক, সামান্য দুই চারি পয়সার শিশুখাদ্য যোগাইতে কি প্রাণান্ত পণ করিতে হয়!

আজকাল কলিকাতায় ছেলেকে পড়াইতে হইলে অভিভাবকগণকে গড়পড়তায় মাসে ৪০।৫০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইহা যোগান দিতে তাঁহাদিগকে কি প্রকার ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিতে হয়, তাহা কালেজের শ্রীমানরা ধারণা করিতে পারেন কি ? পরের টাকায় বাবুয়ানা কি প্রকার নীচাশয়তার পরিচায়ক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিখ্যাত ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগী বাল্যাবস্থায় তারের পিওন ছিলেন। তিনি পরে কৃতী হইয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে—বিশেষতঃ শিক্ষাদান-ব্যাপারে অন্যূন ১ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ, তখন তাঁহার প্রথম সপ্তাহের আয় সাড়ে তিন টাকা তিনি পিতার হস্তে আনিয়া দেন। তিনি সে সময়ে মনের মধ্যে কি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—"আমি ইহার পর কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু যখন আমার প্রথম রোজগারের টাকা পিতার হস্তে দিলাম, তখন আমার মনে যে অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ইহজীবনে কখনও করি নাই। কারণ, তখন আমি মনে এই গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম যে, আর আমি পিতামাতার গলগ্রহ বা ভারস্বরূপ নহি, আমি নিজের অন্ন নিজে উপার্জ্জন করিতেছি।" এমন কথা এখনকার-কালে আমাদের দেশে কয় জন ছেলে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিতে পারে ?

এই ছেলেরাই যখন কালেজ হইতে উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কঠোর সংসারক্ষেত্রের জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের মোহ ঘুচিয়া যায়। তখন আর প্রতি মাসে অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ মণিঅর্ডার যোগে সহরে প্রেরিত হয় না। তখন সামান্য একটি ৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য পরের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়া বেড়াইতে হয়। অথচ একটি ৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে ৫।৭ শত দরখাস্ত পেশ হয়! ইহা সত্ত্বেও বিবর্ণ মুখমণ্ডল, কোটরপ্রবিষ্ট চশমা-পরিহিত চক্ষু, ছাত্র বাবুদের হাল ফেসানে ছাঁটা চুলের নানা ঢঙ্গের টেরী, হস্তে রিষ্টওয়াচ, পরিধানে ম্যাঞ্চেষ্টারের আমদানী ফিনফিনে কাপড়-জামা, স্কন্ধে কৃত্রিম রেশমের চাদর ত ঘুচে না। সিগারেট এবং চা-চপের দোকানের চা'র কল্যাণে তাঁহাদের মুখের চোখের কালিমাও ত ঘুচিবার উপায় নাই। অপব্যয় দূর হইবারও ত কোন আশা দেখা যায় না!

আবার যখন দেখি, ফুটবল হকির মরশুমে খেলার ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া ট্রামে, বাসে চাপিয়া মাঠের দিকে ছাত্র ও কেরাণীর দল রুদ্ধশ্বাসে যাত্রা করেন এবং তথায় রুলের গুঁতা, ঘোড়ার লাথি ও লাল মুখের ধাক্কা খাইয়াও স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রফুল্লমনে ।০ আনা ৷৷০ আনা ফেলিয়া টিকিট সংগ্রহ করেন, তখন ভাবি, দেশের অবস্থা কি হইল? ৪০।৫০ হাজার বাঙ্গালীর কষ্টার্জ্জিত পয়সার সদ্গতি কোথায় হয়? ইহার অধিকাংশই কি য়ুরোপীয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহের করতলগত হইয়া বাকী সামান্য অংশ 'নেটিভের' চ্যারিটিতে ব্যয়িত হয় না? ইহার উপর ঘোড়দৌড়ের খেলায় কত দুঃস্থ বাঙ্গালী পরিবার যে উৎসন্নের পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করে কে? ইংরাজ প্রভুর এই ব্যাধির অনুকরণ না কি সভ্যতার মাপকাঠি বলিয়া অধুনা পরিগণিত!

এক দিকে এই অপব্যয়, অন্য দিকে কেবল বড় বড় ব্যবসায়ক্ষেত্রে নহে, সকল প্রকার জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে। কলিকাতার রাজপথে বাহির হইলে দেখিতে পাই, নিত্য নূতন অ-বাঙ্গালীর মুদীর দোকান, ময়রার দোকান, ফলফুলুরির দোকান গজাইয়া উঠিতেছে। বাজারে আলু-পটোল, তরি-তরকারি, চাউল-দাইল, মৎস্য-মাংসের ষ্টলও ক্রমশঃ অ-বাঙ্গালীর হস্তগত হইতেছে। গাড়োয়ান, মুটে-মজুর, রাজ-মিস্ত্রী, দপ্তরী, ছুতার মিস্ত্রী, এ সকল পেশা ত বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাসের বা জলের মিস্ত্রী বা বাগানের মালী কাহারা, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সহরের বড় বড় গোয়ালা সবই প্রায় পশ্চিমা, ইহারা অনায়াসে মাসিক ২ শত ২৷৷০ শত টাকা রোজগার করে! ফিরিওয়ালার শতকরা ৯৫ জনই অ-বাঙ্গালী।

অধুনা বাঙ্গালীর আর এক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। অধুনা যিনি মোটর না রাখেন, তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া গণ্য হন না। কিস্তীবন্দীর কৌশল করিয়া বিদেশী বণিক্ বাঙ্গালীর নিকট এই ব্যবসায় হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। হতশ্রী বাঙ্গালীর কি মোটর চড়া সভ্যতার পরিচায়ক? আমেরিকার হেনরী ফোর্ড মোটর-ব্যবসায়ে

বৎসরে ৩০।৪০ কোটি টাকা উপায় করেন। যখন কোন মার্কিণ দেশীয় লোক ফোর্ডের মোটর গাড়ী ক্রয় করেন, তখন তিনি ইহা বুঝিয়াই ক্রয় করেন যে, সেই টাকা তাঁহার দেশকে তিনি দান করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর কি ? আর এক কথা, য়ুরোপীয়রা মোটর চড়িয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, 'সময় বাঁচান'। মোটরে চড়িতে যে খরচ হয়, তাহার দশ গুণ তাঁহারা উপার্জ্জন করেন। আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের মোটর চড়ার অর্থ 'বড়মানুষী' দেখান বা বিলাসিতা চরিতার্থ করা! বাঙ্গালীর মোটর দিনের অধিক সময়ে গ্যারাজে বসিয়া থাকে, য়ুরোপীয় বা মাড়োয়ারী ভাটিয়ার মোটর কাকনাড়া বজবজ ছুটাছুটি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকার ছিনিমিনি খেলে। দুই চারি জন বড় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ডাক্তার না হয় দুই দশ হাজার উপার্জ্জন করেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখাদেখি অনেক Brief-less ব্যারিষ্টার বা ডাকহীন ডাক্তার যে মোটর চড়ার ফলে ঘরের কচি ছেলে-মেয়ের দুধ যোগাইতে পারেন না!

পূর্ব্বে ৵০ আনার দা-কাটা তামাক ও ৵০ আনার চিটে গুড়ে বাঙ্গালী গৃহস্থ এক মাসের শ্রান্তিবিনোদন করিতে পারিত; পরন্তু উহা দ্বারা হুঁকা বা গুড়গুড়ীতে ১০ জন ধূম-পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার উপর তামাকের 'নিকোটিন' বিষটুকু হুঁকা বা গুড়গুড়ির জলের সংস্রবে আসিয়া নষ্ট হয়।' সিগারেট বা চুরুটে তাহা হয় না। পরন্তু উহাতে পয়সা খরচ অনেক হয়। একটা সিগারেট ৫ জনের ভোগে লাগে না। এখন কিন্তু হুঁকা অসভ্যতার পরিচায়ক: এ জন্য বাঙ্গালীর কত পয়সার নিত্য অপব্যয় হইতেছে!

কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলি! দেশত্যাগী বাঙ্গালী জমীদাররা সহরের ভোগ-বিলাসে যে অর্থের শ্রাদ্ধ করেন, তাহা কি অপব্যয় নহে? রঘুবংশে আছে,—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" অর্থাৎ রঘুবংশের রাজাই প্রজার প্রকৃত লালন-পালন-কর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা পিতা-স্বরূপ, তাহার পিতা কেবল তাহাদের জন্মের হেতু মাত্র। জমীদারও যদি স্বগ্রামে বাস করিয়া প্রজার সুখ-দুঃখের অংশ-ভাক্ হন, তবেই গ্রামের নষ্টশ্রী ফিরিয়া আসে। সম্প্রতি কোন জমীদার ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া চৌরঙ্গীতে এক বিরাট্ সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং নির্ম্মাণের ভার দিয়া-ছেন এক য়ুরোপীয় কোম্পানীর হস্তে! হায় বাঙ্গালী, তোমায় কি বলিতে ইচ্ছা করে!

এইরূপে বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় অর্থার্জ্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের অকর্ম্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না অথচ অপব্যয় করিতে বাঙ্গালীর কোন কুণ্ঠাবোধ নাই। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, 'পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি যে তিমিরে!' বাঙ্গালীর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই; কবে হইবে, তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)

সাবিত্রী

তুমি নিত্য জ্যোতির্ম্ময়ী— তুমি জ্ঞান-গীতা
বিচিত্রা প্রকাশরূপা, বর্ণ-বিলাসিনী
আলাপিনী কলাপিনী—কমলবাসিনী
আনন্দকল্যাণী তুমি তুমি অনিন্দিতা

বিশ্বের সংবিৎ তুমি কলালক্ষ্মীরূপে
বিলাইছ সুধা লক্ষ তৃষা-শুষ্ক মুখে,
স্ফুরিতেছে প্রেমবেদ কোটি কোটি বুকে
কেহ মুক্ত যুক্ত কেহ মগ্ন কামকূপে।

মহারাত্রি মোহরাত্রি কালরাত্রি মাঝে,
নিত্য ব্রহ্মজ্যোতি শুদ্ধ চৈতন্য উজ্জ্বল,—
ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতা, দিব্য কাম্যফল
বিলাও তাপসগণে দেবতা-সমাজে।

চরণ-সরোজ স্বর্গে, স্তুতি ভক্তমুখে
সত্য-জ্ঞান, জ্যোতিঃ স্ফুরে মুকুটময়ুখে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

নবম পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের গোড়াতেই আমরা কালীঘাট ফিরিয়া আসিলাম। রায়পুকুর ম্যালেরিয়ার দেশ হইলেও শীতের সময়টা আমরা ছিলাম বলিয়া কিম্বা কি কারণে বলিতে পারি না, আমাদের ম্যালেরিয়া ত ধরেই নাই, উপরন্ত স্বাস্থ্যের আমাদের বেশ উন্নতিই হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ী হইতে বাড়ীর দরজায় না নামিতে নামিতেই ঠাকুমা গাড়ীর দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ইস্! ছেলেছুটোর চেহারায় যে আর কিছুই নেই! জানি যে, ম্যালোয়ারীর দেশ! যা'ক্, ভালয় ভালয় হাড় ক'খানা নিয়ে বাছারা যে ফিরে এসেছে, এই ঢের।"

দুই তিন দিন পরেই কিন্তু বাছাদের ঘাড়ে মা সরস্বতীর জোয়াল আবার ঝাঁকিয়া বসিল, অর্থাৎ একরাশ নূতন বইয়ের সঙ্গে রকমারি ধরণের তিন চারিখানি খাতা বাঁধিয়া বাঙ্গালা স্কুলে প্রত্যহ দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত হাজিরা দিতে হইতে লাগিল।

এখানে আসিয়া দেখিলাম, যেন এক নূতন ভাব। এখানকার তুলনায় হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালা আমাদের পক্ষে সহস্রগুণ ভাল ছিল। বাঙ্গালা স্কুলে আসিয়া, হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালায় যে কত মাধুর্য্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম; সে ছিল যেন ফাঁকা ময়দানের মধ্যে কঞ্চির বেড়া ঘেরা ছোট্ট একটি সুশীতল কুঞ্জবন, আর এ যেন ইটপাথরে গাঁথা, রেলিং ঘেরা, কোলাহলময় মস্ত এক চট্টমন্দির। এখানে সে হরিশী-ভাবের কণামাত্রও কোথাও কিছুই নাই, এখানে হেড মাষ্টার জনার্দ্দন সিমলায়ের জনার্দ্দনী-ভাবই সর্ব্বত্র বিরাজমান। এ সে অযোধ্যাও নহে, এখানে সে রামও নাই।

এ-হেন জনার্দ্দন সিম্‌লাইয়ের বাঙ্গালা স্কুলে চারিটি বৎসর আমাদের আসা-যাওয়া করিতে হইয়াছিল। বৎসর চারিটিই বটে, কিন্তু ইহার ভিতর কত রকমের কত ব্যাপারই যে ঘটিয়াছিল!

তখন প্রায় দুইটি বৎসর আমাদের এখানে কাটিয়া গিয়াছে। নূতনের উপর পুরাতনের ছাপ পড়িয়া আমরা তখন সুন্দররূপে দলে মিশিয়া গিয়া দশ জনের এক জন হইয়া উঠিয়াছি। মাসটা বোধ হয় আষাঢ় কি শ্রাবণ, অর্থাৎ ঘোর বর্ষার সময়। কয় দিন হইতেই অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। পথ-ঘাট জলে-কাদায় একাকার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, তাহার আর বিরাম নাই। এমনই দুর্য্যোগের মধ্যে এক দিন——কিন্তু থাক, 'এক দিনে'র আর আবশ্যক নাই। 'এক দিনে'র ভণিতা করিয়া যাহা আজ টানিয়া-বুনিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিতে যাইতেছি, কি তাহার দরকার? কত 'এক দিনে'র কথাই ত আজ একটির পর একটি করিয়া আসিয়া মনের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কিন্তু সবই যদি আজ কালি-কলমের মুখে টানিয়া আনি, সে ত তাহা হইলে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বকেও ছাপাইয়া উঠিবে, আর সে অষ্টাদশ পর্ব্বের সহিত বাহিরের কোন সংস্রবই নাই—তাহা নিছক নিজেদেরই কথা, সুতরাং তাহা পড়িবার ধৈর্য্যই বা কাহার, আর লিখিবার ধৈর্য্যই বা কোথায়? তবে,—স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া আয়োজন-আড়ম্বর করিয়া অতীতের কাহিনী আওড়াইবার বাহাদুরী যখন করিতে বসিয়াছি, তখন কিছু কিছু আমাকে বলিতেই হইবে, তাই মোটা-মোটা গোটাকতক কথা বলিয়া আমার আরব্ধ কাহিনীকে কোন রকমে শেষের দিকে আগাইয়া আনিয়া সমাপ্তির রেখা টানিয়া দেওয়াই ভাল।

চারি বৎসর বাঙ্গালা স্কুলে পড়িবার পর তথাকার সব কয়টি বিদ্যার ধাপ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জ্যেঠামহাশয় আমাদের বাঙ্গালা স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন এবং কি উপায়ে যে ইংরাজী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর স্থানে একবারে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তখন আমাদের যে বয়স হইয়াছিল, সে বয়সে আজকাল সকলে 'ম্যাট্রিক' পাশ করে, অর্থাৎ আমার বয়স তখন ষোল-সতের বৎসর হইয়াছিল। ক্লাসের মধ্যে

আমাদের চেয়ে অল্পবয়সের ছেলে, বোধ হয় দুই এক জনই মাত্র ছিল, আমাদের সমবয়সীই বেশী ছিল এবং আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বেশী এমন দুই এক জনেরও অভাব ছিল না। এই দুই এক জনকেও ঠিক ছেলে বলা চলে না; কারণ, তাহাদের দাড়ি ও-গোঁফের রেখা স্পষ্টই তখন দেখা দিয়াছিল। তাহার পর দুই বৎসর বাদে যখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম, তখন পাড়াগাঁ হইতে যে একটি ছেলে আসিয়া আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হইল, তাহার নাম জগন্নাথ কোলে। ছেলেটি ভর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার শিশু-পুত্রটির অসুখের জন্য ছেলেটিকে অর্থাৎ লোকটিকে প্রায়ই স্কুল কামাই করিতে হইত। শুনিয়াছি, জগন্নাথের সেই ছেলেটি না কি পাঠশালায় 'আঙ্ক' 'আঙ্ক' পড়িত। হয় ত তাহার ছেলেটির পাঠশালায় পড়ার এই কথাটির মূলে কোন সত্য ছিল না,—হয় ত ইহা ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের মিথ্যা রটনা মাত্র, কিন্তু এ কথা ঠিকই যে, আমাদের অঙ্কের মাষ্টার গুরুচরণ বাবু প্রায় প্রতিদিনই জগন্নাথকে ভুলক্রমে 'আপনি' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিতেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় বিনুদা' এক দিন এক মহাকাণ্ড ঘটাইয়া বসিল। তখন বৈশাখ মাস—প্রত্যহ মর্ণিং স্কুল হইতেছিল। এক দিন বছর সাতেক আগে পাঠশালায় আসিতে আসিতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিনুদা' যেমন বলিয়াছিল,—"আজ আর পাঠশালায় যাব না", সে দিনও তেমনই স্কুলের পথে আসিতে আসিতে অদূরে আমাদের সেই খাঁ-সাহেব কাবুলীওলাকে আসিতে দেখিয়া বিনুদা' কহিল,—"আজ আর স্কুলে যাব না।" তাহার পর পথের ধার হইতে ছোট ছোট অনেকগুলি ঢিল কুড়াইয়া কোর্টের পকেটে বোঝাই করিয়া কহিল,—"আয়, একটা মজা করা যাক।"

আমি কহিলাম,—"কি মজা?"

"এই দেখ্ না" বলিয়া রাস্তার ধারে সরকারদের পোড়ো বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল এবং কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় ফেটি দিয়া জড়াইয়া কহিল— "তুইও এই রকম ক'রে বাঁধ, নইলে বেটা সরকার চিন্‌তে পারবে।" এই বাড়ীটা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ তাহাতে বাস করিত না, বহুকাল হইতেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

খানিক পরেই আমাদের খাঁ-সাহেব তাহার মেওয়ার ঝুলি কাঁধে করিয়া সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেই বিনুদা' পিছন হইতে ধাঁ করিয়া তাহার পাগড়ীতে একটা ঢিল ছুড়িয়া মারিল। খাঁ-সাহেব চলিতে চলিতেই একবার চারিদিকে তাহার রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। দুই পা যাইতে না যাইতে আবার একটি ঢিল তাহার বামকর্ণমূলে যাইয়া সজোরে লাগিল। এবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সঙ্গে সঙ্গে একটি, দুইটি, তিনটি ঢিল তাহার বুকে, নাকের ডগায় ও কপালে যাইয়া পড়িল, অপরাধীকেও এবার সে সঙ্গে সঙ্গেই তেমনই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তখন হুঙ্কারনাদ ছাড়িতে ছাড়িতে বিনুদা'র দিকে সে ছুটিয়া আসিতেই, বিনুদা' গোটা চারি পাঁচ ঢিল একসঙ্গে তাহার ক্রোধোদ্দীপ্ত রক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়াই নিমেষে আমাকে টানিয়া লইয়া সরকারদের সদর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও সরকার-বাড়ীর সেই বিরাটকায় কবাটে তাহার লোহার খিল লাগাইয়া, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া একতালার ছাদের এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, যেখানে খাঁ-সাহেব রাস্তা হইতে তাহাকে দেখিতে পায়। তার পর এই ভীষণ যুদ্ধ! বিনুদা' উপর হইতে যত ঢিল ছোড়ে, খাঁ-সাহেবও রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তত ঢিল ছোড়ে! প্রভেদের মধ্যে এই যে, বিনুদা' স্থির, ধীর, ক্রোধশূন্য, অব্যর্থ-লক্ষ্য—আর খাঁ-সাহেব ভীষণরূপ অস্থির, ক্রোধোন্মত্ত, নৃত্যশীল, সুতরাং প্রতিপদেই ব্যর্থ-লক্ষ্য। শেষে, বিনুদা' ছোড়ে একটা ত, খাঁ-সাহেব ছোড়ে দশটা। মিনিট পাঁচ-সাত এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর খাঁ-সাহেবের রাস্তার ঢিল যখন ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, ক্রোধও তখন তাহার একবারে চরমে উঠিল এবং মত্ত-হস্তীর ন্যায় তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া সে লাফালাফি দাপাদাপির সহিত সমস্ত স্থানটা যেন একেবারে চষিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু রাস্তার ঢিল ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে; তখন ক্রোধান্ধ খাঁ-সাহেব হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া তাহার ঝুলি হইতেই আয়ুধ সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রথমে বেদানা, তাহার পর তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইলে, ক্রমাগত আখ্‌রোট্, বাদাম এবং অবশেষে আঙ্গুরের বাক্স ছুড়িয়া বিনুদা'কে মারিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। সব চেষ্টা—তাহার কারণ, বিনুদা' অভ্রান্তলক্ষ্যে একটা ঢিল

ছুড়িয়া, খাঁ-সাহেবের দিকে চাহিয়া অঙ্গ-ভঙ্গীসহ ভ্যাংচাইতে ভ্যাংচাইতে নৃত্য করে, আর যেই সে কিছু একটা হাতে লইয়া ছোড়ে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই বিনুদা' সিঁড়ির ছাতের আড়ালে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আর খাঁ-সাহেবের যত বেদানা, আখ্‌রোট্, আঙ্গুরের বাক্স পিছনের বাড়ীর দোতলার দেওয়ালে বাধিয়া সবই আবার ছাদে আসিয়া জমা হয়।

এইভাবে প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টার তুমুল যুদ্ধের ফলে খাঁ-সাহেবের সমস্ত মেওয়া তাহার সেই ঝুলির ভিতর হইতে দ্রুতগতিতে আসিয়া ছাদের উপর জমা হইয়া গেল।

রাস্তায় লোক জমিয়া গিয়াছিল অসংখ্য। সকলে মিলিয়া খাঁ-সাহেবকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কি শান্ত হইতে চাহে! আমার বোধ হয়, তখন সে যদি একবার বিনুদা'কে সামনে পাইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর মত নিশ্চয়ই বুকে চাপিয়া বিনুদা'কে চিরিয়া ফেলিত। যাহা হউক, আরও প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া বিফল আস্ফালনে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিবার পর খাঁ-সাহেব স্থানত্যাগ করিল এবং তাহার স্থানত্যাগ করিবার আরও ঘণ্টাখানেক পরে, ছাদ হইতে মেওয়াগুলি কুড়াইয়া কোঁচড় ভরিয়া আমরা সরকার-বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

গাঙ্গুলীপাড়া ঘুরিয়া বরাবর আমরা ঘোষেদের বাগানের পুকুরপাড়ে একটা নিরিবিলি যায়গায় আসিয়া বসিলাম। কাপড়ের পোঁটলা খুলিয়া দেখা হইল, তিন বাক্স আঙ্গুর, আটটি বেদানা ও গণ্ডা আষ্টেক আখরোট খাঁ সাহেব আমাদের জলযোগের জন্য ভেট দিয়াছে। আখরোটগুলি সেইখানে বসিয়া খাঁ-সাহেবের নাম করিতে করিতে খাওয়া হইল। আঙ্গুরের একটা বাক্স লইয়া খুলিতে যাইতেছিলাম, বিনুদা' কহিল—"ও আর খুলিস্ নি, ওগুলো থাক্, কাল স্কুলে নিয়ে গিয়ে কোলেকে দিতে হবে।"

"জগন্নাথকে?"

"হ্যাঁ। আহা, তার ছেলেটির অসুখ, ডাক্তারে বেদানার রস খাওয়াতে বলেছে, বেচারা পয়সা অভাবে খাওয়াতে পারে না।" খানিক থামিয়া বিনুদা' কহিল—"স্কুলের মাইনেই মাসের পড়েছে, দিতে পারে নি। দুটো টাকা ত তার জন্যে যোগাড় করিছি, কাল দিয়ে দোবো।"

"তুমি দেবে?"

"কি করি বল্? ছেলেটির অসুখ, তার ওপর কোলের বাপের অসুখ। ওর বাপ অসুখে না প'ড়ে থাকলে কি ওদের এমন টানাটানি হয়!"

"তা তুমি দু'টাকা কোত্থেকে যোগাড় করলে?"

"করিছি কোন রকমে" বলিয়া আঙ্গুরের বাক্স ও বেদানাগুলি লইয়া কাপড়ে আবার বাঁধিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ক'রে করলে, আমায় বলবে না? ঠাকুরমার কাছ থেকে?"

"ঠাকুমার কাছে ত চেয়েছিলুম, ঠাকুমা দিলেও না, উল্টে তার বাক্সটা বাবার ঘরে রেখেছে।"

"তবে?"

"কা'কেও বল্‌বি না বল্?"

"না।"

"দুটো ক'রে গরু ধ'রে রোজ টালীগঞ্জের 'পাউণ্ডে' দিয়ে আসি। তাইতেই চারদিনে দুটাকা পেয়েছি। কাল তিনটে গরু ধরেছিলুম। একলা কি তিনটেকে সাম্‌লে নিয়ে অতদূর যেতে পারি? তাও, সদর রাস্তা দিয়ে ত আর নিয়ে যেতে পারি না, কত ঘুরে তবে নিয়ে যেতে হয়। কালকের একটা গরু ছিল ভারি দুষ্ট, ব্যাটা এমনি আমাকে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়ে পালাল, যে————এই দেখ্ না, উরুতটা একেবারে কতখানি ছ'ড়ে গেছে" বলিয়া বিনুদা তাহার উরুতের ছড়া দাগটা কাপড় সরাইয়া দেখাইল।

বেলা প্রায় ১০টা হইয়াছিল। ঘাসের উপর হইতে বই ও খাতা তুলিয়া লইয়া বাটী আসিবার জন্য দুই জনে উঠিয়া পড়িলাম। পথে আসিতে আসিতে বিনুদাকে কহিলাম—"আচ্ছা, কাবলী ব্যাটা ত ভারি বোকা; আঙ্গুর বেদানা ছুড়ে কেউ কখন————"

"বোকা নয়, রেগে গেলে ওর মাথা ওই রকম বিগড়ে যায়, তখন আর ওর কোন জ্ঞান থাকে না। অন্য কোন কাবলী হ'লে কি আর বেদানা-আঙ্গুরের বাক্স ছুড়ে মারে। দাসু হালদার সে দিন ওর কথা সব বললে কি না, তাই ত জানতে পারলুম। ও অন্য কিছুতেই রাগবে না, ধ'রে মারলেও না, কিন্তু ওর ওই পাগড়ীতে ঢিল মেরেছ কি আর রক্ষে নেই।"

"যাই হোক, আমাদের চিনতে পারে নি ত? তা হলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ।"

"দূর বোকা, চিন্‌তে পারলে কি আর আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঐ রকম মারামারি করত? তা হ'লে তখনি এসে বাবাকে সব বল্‌তো।"

"কিন্তু আর কেউ যদি জ্যেঠামশাইকে ব'লে দেয়?"

"কে বলে বলুক না, তা হ'লে তাকে দেখে নেবো না একবার?"

কিন্তু যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই হইল। সকালের এই কথা কি করিয়া বৈকালে জ্যেঠামহাশয়ের কাণে গিয়া উঠিল। কিন্তু সে দিন এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের কিছুই বলিলেন না। অন্য দিন, কোন না কোন কাযে আমাদের সহিত যে দুই চারিটা কথা কহিতেন, সে দিন তাহাও কহিলেন না। পরদিন বেলা ১০টার সময় স্কুল হইতে আমরা বাটী ফিরিতেই তিনি আমাদের দুই জনকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন—"কোথায় গিয়েছিলে? স্কুলে? বিদ্যে শিখতে? বিদ্যে ত অনেক শেখা হয়েছে, আর দরকার কি?" ভূমিকার ভণিতা শুনিয়াই ত চক্ষুস্থির! এইবার কি কাণ্ডই বা করেন জ্যেঠামশাই! তাঁহার বেতের সরু ছড়িগাছটা কোথায়, মাথা হেঁট করিয়া আড়ে আড়ে চারিদিকে চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। আর আতঙ্কে বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, সেইরূপ ধীর-গম্ভীর গলায় কহিলেন, "বুড়ো ছেলেদের গায়ে হাত দিতে লজ্জা হয়—আর তার দরকারও নেই। সুতরাং মার-ধোর আমি করব না, তবে এ বাড়ীতে আর তোমাদের স্থান হবে না, খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে বিদেয় হয়ে চ'লে যাবে। দু'খানা ক'রে কাপড়, একখানা গামছা, আর একটা মাসের খোরাক দশটা ক'রে টাকা, সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে দু'জনে চেয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাবে। তার পর নিজেদের উপায় নিজেরা ক'রে নিও, যাও।" বলিয়া হাত ধরিয়া আমাদের ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কি ভয়ানক! এর চেয়ে দুই দশ ঘা বেত মারিলেও যে ছিল ভাল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বিনুদা'র মুখের দিকে চাহিয়া সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলিয়া উঠিল, এমন সাংঘাতিক সময়ও বিনুদা' তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে! এই ব্যাপারের পর আবার হাসি আসে? ছিঃ ছিঃ, ঘৃণায় লজ্জায় মন ভরিয়া উঠিল! শুধু বাড়ী হইতে দূর হইয়া চলিয়া যাইতে বলিলেও কোন কথা ছিল না, কিন্তু দুইখানা করিয়া কাপড়, একখানা গামছা আর দশটা করিয়া টাকা! মনে হইল, শুধু বাড়ী হইতে নহে, পৃথিবী হইতে দূর হইয়া যাওয়াই আমাদের ভাল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুমা আসিয়া জ্যেঠামশাইকে কহিলেন,—"হাঁ রে, ঐ অমন ক'রে ছেলেদের কখনও বলতে আছে? বাছারা আমার সমস্ত দিন যেন মন-মরা হয়ে রয়েছে!"

"বল্‌বে না ত কি? কাবলীর সঙ্গে মারামারি! সাহসের সীমে-পরিসীমে নেই!"

"হ্যাঁ, যা' কথা নয় তাই! ওরা হ'ল দুধের বাচ্ছা, ওরা গেল কাবলীর সঙ্গে মারামারি করতে? কোন্ মুখপোড়া তোকে লাগিয়েছে বল্ ত একবার?"

যাক্, এ ধাক্কাও আমাদের কাটিয়া গেল, কিন্তু বিনুদা' যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে ধাক্কার ত আর শেষ নাই! অথচ আমি কোন দোষের ভাগী না হইলেও শাস্তির ভাগী আমাকে হইতে হয়। দিন পাঁচ ছয় যাইতে না যাইতে বিনুদা' আবার এক নূতন কাণ্ড বাধা করিয়া বসিল, তাহার ফলে সেই ষোল-সতের বৎসরের জীবনের স্রোতটাই এক নূতন পথে ঘুরিয়া গেল।

সে দিন ছিল শুক্রবার। হেড মাষ্টারের অসুখ বলিয়া স্কুলে আসেন নাই এবং খবর দিয়াছেন যে, পরদিনও আসিবেন না। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে বিনুদা' সেই জগন্নাথ কোলেকে কহিল,—"ভাই খোকার বাবা, আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে।"

জগন্নাথ কহিল,—"দেখ, বিনু, ভাল হচ্ছে না কিন্তু।"

"রাগ করেন কেন মশাই? আপনার সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা না কইলে অমান্যি করার পাপ হবে যে!—এখন কথা হচ্ছে এই যে, কাল 'হোঁদল্-কুৎ-কুৎ' মহাশয় ন আগচ্ছং,—শুনেছ ত?"

"হ্যাঁ। আজও ত আসেন নি। জ্বর হয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। কালও আসবেন না, সুতরাং কাল ক্লাসটাকে 'একসেলেণ্ট' ক'রে লতা-পাতা ফুল দিয়ে—বুঝতে পেরেছ ত? and so, তোমাদের ওদিককার সব বাগান থেকে ফুল তুলে আনবার ভার তোমার ওপর।"

বেলা ১০টার সময় স্কুলের ছুটী হইয়া গেলে সকল ছেলে মিলিয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত পরামর্শ হইয়া গেল। পরদিন

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলাম যে, আমার উঠিবার বহু পূর্ব্বেই বিনুদা' স্কুলে চলিয়া গিয়াছে।

স্কুলে আসিয়া দেখি যে, লাল-নীল কাগজের মালা, নিশান, বাখারির 'আর্চ', লতা, ক্রোটন, ঝাউয়ের পাতা, আর হরেক রকমের ফুল দিয়া সাজাইয়া ক্লাসটিকে যেন যাত্রার আসরের মত করা হইয়াছে। সুদীর্ঘ টানা টেবলের স্থানে স্থানে ফুলের স্তবক, তাহারই মধ্যে মধ্যে এক পয়সা দামের লাল-নীল বাতি জ্বালাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই দশখানা ছোট সাইজের পিক্‌চারেরও অভাব ছিল না।

সেকেণ্ড ক্লাস ছিল দোতালার একবারে এক ধারে। সুতরাং রাত থাকিতে স্কুলে আসিয়া, দরজায় খিল লাগাইয়া সকলে যে এই সব কাণ্ড করিয়াছে, তাহা নীচে লাইব্রেরী হইতে মাষ্টাররাও কিছুই জানিতে পারেন নাই, অন্য ক্লাসের ছেলেরাও না।

স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িতেই বিনুদা কহিল, "খবরদার! যা বলা-ক'য়া আছে, কিছুতেই খিল খোলা না হয়!"

শুধু বিনুদা'কেই বা কি বলিব, ক্লাসের প্রায় সকল ছেলেই ছিল এক ছাঁচের—বিনুদা'র মতই গুণধর! তবে কেহ উনিশ, কেহ বা বিশ।

বিনুদার কথায় শিবু বলিয়া একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "খিল খোলা ত নয়ই, আর গুরুচরণ বাবু এলেই কিন্তু অম্‌নি পালা আরম্ভ।" দেখিলাম, তাহার হাতে গিরীশ ঘোষের একখানি 'বিল্বমঙ্গল' খোলা রহিয়াছে।

শনিবার দিন প্রথম ঘণ্টাতেই ছিল গুরুচরণ বাবুর 'জিওমেট্রী'। ঘণ্টা পড়িবার মিনিট দুই তিন পরেই তিনি আসিয়া দরজা ঠেলিলেন। অমনই সেই শিবু তাহার পালা আরম্ভ করিল,—"দেখে নেবো—দেখে নেবো! এত বড় আস্পর্দ্ধা! এক দণ্ড বিলম্ব হয়েছে বলে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল—এর তাৎপর্য্য ছিল।"

ওদিকে গুরুচরণ বাবু ক্রমাগত ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"ওরে, খিল্ দিয়িছিস্ কেন রে সব? খোল্ খোল্—দরজা খোল্।"

এ দিকে বিনুদা ও আর এক জন তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়া দিয়াছে,—

"বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, থাম্‌কা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে।"

খোকার বাবা তখন টেবল চাপড়াইয়া সঙ্গত জুড়িয়া দিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শিবুও আবার আরম্ভ করিল,—

"মিষ্টিমুখে বিদেয় নিয়ে এলেই হ'ত, বল্লেই হ'ত,—ভাই তোমারো পোষাল না, আমারও পোষাল না—"

গুরুচরণ বাবু মিনিট দুই তিন ডাকাডাকি করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বেচারা ছিলেন বড় ভালমানুষ। সেই জন্য ছেলেরা তাঁহাকে একবারেই মানিত না, বিশেষতঃ ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা। ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা, শুধু গুরুচরণ বাবুকে কেন, এক হেড মাষ্টার ছাড়া আর কোন মাষ্টারকেই তাহারা মানিত না। কি সাহসই যে তখনকার সেই সব ছেলের ছিল!

গুরুচরণ বাবু চলিয়া যাইবার মিনিট পাঁচেক পরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিনয় দত্ত আসিয়া বাজখাঁই আওয়াজে ধম্‌কাইতে ধম্‌কাইতে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কে-ই বা তাঁহার কথা শুনে! বিল্বমঙ্গল তখন রজ্জুভ্রমে সাপ ধরিয়া পাঁচীল ডিঙ্গাইতেছিল, অর্থাৎ টানা পাখার দড়ি ধরিয়া শিবু তখন ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। পায়ের শব্দে বুঝা গেল যে, বিনয় দত্তও রণে ভঙ্গ দিয়া অন্তর্ধান হইল। ইহারই দুই চারি মিনিট পরে সিঁড়িতে জুতার এক পরিচিত মস্‌মসানি শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং শিবু দড়ি ছিঁড়িয়া খোকার বাপের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হাতের দুই একটা ধাক্কায় দরজার খিল সশব্দে ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িতেই ঘরের মধ্যে একবারে সাক্ষাৎ যমের আবির্ভাব! পিছনে দরোয়ান, হাতে রেজেষ্টারী বহি। কাহাকেও কোন কথা নহে, কোন অনুযোগ নহে, কোন প্রশ্ন নহে,—হাতের রেজেষ্টারীখানি খুলিয়া হেড মাষ্টার, উপস্থিত সকলেরই নামের পাশে পেন্সিলের একটা করিয়া দাগ দিয়া ক্লাস হইতে একে একে সকলের নাম ডাকিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিবার মধ্যে অতি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু মাত্র বলিলেন,—"প্রত্যেকের ১০৲ টাকা করে 'ফাইন্'। ৭ দিনের মধ্যে 'ফাইন্' শুদ্ধ যে না আসবে,

সে যেন আর না আসে, বুঝবে যে তাকে Rusticated করা হয়েছে।”

হায়! হায়! কি অশুভক্ষণেই যে বিনুদার ভাই হইয়া জন্মিয়াছিলাম, দুর্ভোগের আর অন্ত নাই! এক বিপদ কাটে ত আর এক আসিয়া হাজির হয়! আজিকার এই খবর যদি জ্যেঠামহাশয়ের কাণে গিয়া পৌছায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আর রক্ষা থাকিবে না। এবার ঠাকুরমার ঠাকুরদাদা আসিলেও আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। কোন রকমে 'ফাইনটা' যোগাড় করিয়া যদি সোমবার দিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলেও না হয়——কিন্তু, দশ দশটা টাকাই বা পাই কোথায়? মনে হইল, জ্যেঠামহাশয়ের সে দিনের সেই এক মাসের খোরাকীর দশটা টাকা পাইয়া আজ যদি বাড়ী হইতে দূর হইতে পাই, তাহা হইলে অন্ততঃ 'ফাইন'টা দিয়া এখন ত বাচি, তার পর প্রত্যহই কালী-বাড়ীর প্রসাদ খাইয়া আর নাটমন্দিরের চাতালে শুইয়া মরি যদি ত তাহাতেও দুঃখ নাই!

কিন্তু দুর্ভাবনা যত আমারই, বিনুদা'র কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মের পাপ আমারই বেশী, নহিলে, যে এই অনাসৃষ্টির মূল, সে দিব্য নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার, আর আমার মাথায়ই বা চিন্তার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কেন? মনে মনে ঠিক করিলাম যে, এ ধাক্কা কাটিলে আর বিনুদা'র কোন সংস্রবেই থাকিব না। ভগবান্‌কে ডাকিলাম— "হে ভগবান্, যেন জ্যেঠামশায়ের কাণে এ সব না যায়!"

কিন্তু হায়-রে-হায়! ভাগ্য যাহার মন্দ, বর্ষাকালেও ভরানদী তাহার শুকাইয়া যায়, পূর্ণিমায়ও তাহার আকাশে চাঁদ উঠে না! ছয় দিনের দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া লোহার আঁচড়ে কপালে যা দাগিয়া দিয়া গিয়াছেন, এখন ভগবান্‌কে ডাকাডাকি করিয়া কি আর তাহার রদ্ হয়!

আমরা তখনও স্কুল হইতে বাড়ী ফিরি নাই, তাহার পূর্ব্বেই জ্যেঠামহাশয় সমস্ত ব্যাপারের আদি অন্ত জানিয়া শুনিয়া বসিয়া আছেন!

এই রকমই হয়। কু-টাই রটে, আর সে রটনা বাতাসের আগে এই রকম করিয়াই আসিয়া পড়ে। সু-টা কিন্তু কাহারও চোখে কাণে পৌছায় না—তাই চাপাই পড়ে। এই বোধ হয় বিধির বিধান, নহিলে, সাতকড়ি বাড়ুয্যের গরুকে লোক যে বিশ দিন ধরিয়া লইয়া গিয়া থানায় দিতে যায়, আমরা যে সেই বিশ দিনই কত ফিকির, মৎলব, ঝগড়া —গালাগালি—মারামারি করিয়া তাহার সেই গরুকে ছাড়াইয়া দিই, এ খবর বাড়ুয্যে মহাশয়ের কাণে এক দিনও যায় না,—বলিলে পরে বলে,—"তাই না কি?" আর, সে দিন—দিনের বেলা নহে—রাত্রিতে—কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, কত লুকাইয়া, সাবধান হইয়া তাহার খিড়কীর গাছ হইতে দুইটি এঁচোড় পাড়িয়া আনিয়াছি, আর অমনই বাঁড়ুয্যে মশাই খবরটি পাইয়াছেন। আশ্চর্য্য! কাযটা কু কি না, তাই সেই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যেই দেখিবার লোক ঠিক মোতায়েন ছিল! আর,—সব বিষয়েই কি এই একই নিয়ম! দেখিয়াছি ত, যে, কত দিন জরির পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে পাম্-সু পরিয়া, গাড়ী চড়িয়া বাবার সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়াছি, পথে যদি এক জনও চেনা লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, আর যে দিন ঝি-চাকরের অসুখ-বিসুখ হইলে, বাজার হইতে এক হাতে তরকারীর দশ-সেরী পোঁটলা আর এক হাতে মাছের খালুই ঝুলাইয়া, পথ ছাড়িয়া বে-পথ দিয়া আসিয়াছি, সে দিন সেই বে-পথেই কি রাজ্যের চেনা-লোক ঠিক হাজির! তাই বলিতেছিলাম যে, এই রকমই হয়।

যাহা হউক, খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিতে গিয়া যেমন ঠাকুমার মুখে শুনিলাম যে, জ্যেঠামহাশয় সবই জানিতে পারিয়াছেন ও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া আছেন, অমনই সেই অবস্থাতেই প্রত্যাবর্ত্তন এবং পলায়ন। কিন্তু পলায়নেই সব সময় ত আর রক্ষা পাওয়া যায় না; পলাইলে ধরিবার' লোকও থাকে। সুতরাং গ্রেপ্তার হইয়া সন্ধ্যার পর যখন উভয়ে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আনীত হইলাম, তখন—বিনুদা'র কথা আমি জানি না, রাগে আমি তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহি নাই—কিন্তু আমার অবস্থা ঠিকই যূপ-বদ্ধ ছাগের মত,—ঠিকই, ঠিকই, ঠিকই—তাহার আর কোন ভুল নাই। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় এ-দিনেও আমাদের কোন গালাগালি নহে, বকাবকি নহে, মার নহে, এক জোড়া কাপড় দিয়া বিদায় করা নহে; সে দিনের মত হাত ধরিয়া ঘরের বাহির করাটুকু পর্য্যন্ত আজ কিছুই করিলেন না। তবে যে শাস্তির ব্যবস্থা আজ তিনি করিলেন, তাহা চরম, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডেরই সমান। আমরা নির্ব্বাসিত হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পারমার্থিক রস

রস কি, তাহা বুঝাইবার জন্য অলঙ্কার-শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যবিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, সুতরাং রসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে অগ্রে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র কত কালের, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড়ই কঠিন। প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে ভারতের আদি নাট্যাচার্য্য ভরত-মুনির প্রণীত নাট্যসূত্রেই অলঙ্কার-শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ। কারণ, নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা এই রসতত্ত্ব-বিশ্লেষণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না; প্রতীচ্যদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে কিন্তু এই ভরত-মুনি খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ছিলেন; কিন্তু আমাদের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে ভরত-মুনি খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহাই হউক, রসশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভরত-মুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই নাট্যশাস্ত্রে রসলক্ষণ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী রসশাস্ত্রের আচার্য্যগণ তাহাই মানিয়া লইয়াছেন, কেহই তাহার বিরুদ্ধবাদী হয়েন নাই। তবে ভরত-মুনি-কৃত রসলক্ষণের ব্যাখ্যা সকলের একরূপ নহে, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদও ঘটিয়াছে; তাহার আলোচনা প্রকৃত স্থানে করা যাইবে।

প্রথমে ভরত-মুনির রসলক্ষণ কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাইতেছে।

সে লক্ষণটি এই—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।"

ইহার মোটামুটি তাৎপর্য্য এই—

বিভাব (কারণ), অনুভাব (কার্য্য) ও ব্যভিচারী (সহকারী) ভাবসমূহের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।

মোট কথা এই দাঁড়াইল যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সংযোগে যাহার নিষ্পত্তি হয়, তাহাই রস।

ইহা কিন্তু বড়ই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে, বিশেষ বিস্তারের আবশ্যকতা আছে। অনুকূল উদাহরণের সাহায্য না লইলে এই ভরত-মুনি-কৃত রসলক্ষণের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সেই জন্য এক্ষণে তাহার অনুসরণ করা যাইতেছে।

মনে কর, আমরা কোন নাট্যমন্দিরে রাম-সীতা-চরিত্রের অভিনয় দেখিবার জন্য কয়েক জন সমভাবাপন্ন বন্ধুর সহিত গমন করিয়াছি। আমাদের সম্মুখে দীপালোক-সমুদ্ভাসিত রঙ্গমঞ্চ—তখনও যবনিকা উত্তোলিত হয় নাই, একতানবাদ্য চলিতেছে। কিয়ৎকাল পরে বাদ্য বন্ধ হইল, যবনিকা উত্তোলিত হইল, এখন সকলের সমুৎসুক দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে যুগপৎ আকৃষ্ট হইল।

কি দেখিলাম? দেখিলাম, পঞ্চবটী—সম্মুখে প্রস্রবণ-গিরির পাদদেশে, বেতসলতা-কুঞ্জ শোভিত। উভয় তীর প্লাবিত করিয়া প্রখর-বেগশালিনী গোদাবরী কলকলনাদে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। জল-প্রবাহের ও পুলিনের সন্ধিক্ষেত্রে ঈষদুন্নত সমতল নীল-শিলাফলকের উপর শ্রীরামচন্দ্রের বেশে জটাবল্কলধারী কৌপীনবসন এক যুবা বসিয়া আছেন। শিলাফলকের এক কোণে সৌমিত্রি বিষণ্ণবদনে রামচন্দ্রের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ যে নিকটে আছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সে জ্ঞান নাই, উদাস লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে মৃদু পবনান্দোলিত গোদাবরীর লহরীমালার দিকে তিনি চাহিয়া আছেন। কিছু কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল, হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁহার হৃদয়পঞ্জরসমূহ বিদলিত করিয়া বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার অশ্রুপ্রবাহ নয়নদ্বয় হইতে প্রবল বেগে দরদরিতভাবে বহিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র বিরহদিগ্ধ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—

"কষ্টং কষ্টম্!

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে

বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।

জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ

প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

হায়, কি ভীষণ কষ্ট! দুর্ব্বিষহ উদ্বেগে হৃদয় যে দলিত হইতেছে, কিন্তু কৈ, একবারে ত বিদীর্ণ হয় না? অবসাদবিবশ দেহকে মোহ যেন জড়াইয়া ধরিতেছে, কিন্তু

চৈতন্য ত বিলুপ্ত হইতেছে না! অন্তরের নিদারুণ দাহে সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু, তবু ত তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে না! সকল মর্ম্মস্থানই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধি কঠোর প্রহার করিতেছেন, কিন্তু, হায়, পোড়া জীবন ত এখনও যাইতেছে না!

এই দৃশ্য দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় দর্শকগণের মানসিক অবস্থা তৎকালে কিরূপ হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্।

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অভীপ্সিত অভিনয় দেখিয়া এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য সুখ-বিশেষের অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই জানি। এই আকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয়ে জাগে না, সে থিয়েটারে যায় তামাসা দেখিবার জন্য, রসাস্বাদনের জন্য নহে। এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের যে সংস্কার-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ তাহাকেই বাসনা বা রতি প্রভৃতি ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহারই স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃকাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

রত্যাদিবাসনা না থাকিলে রসাস্বাদ হইতে পারে না, যে দর্শকগণ এই প্রকার বাসনারহিত, তাহারা রসাস্বাদ-বিষয়ে রঙ্গশালাস্থিত কাষ্ঠ, দেওয়াল বা প্রস্তরসদৃশ।

এই শ্লোকটিতে যে 'রত্যাদিবাসনা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার তৎপর্য্যার্থ কি, তাহাই অগ্রে দেখান যাইতেছে। আদি শব্দের দ্বারা কোন্ কোন্ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা পরে দেখাইব, এক্ষণে রতিশব্দের কিরূপ অর্থ অলঙ্কারশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই দেখা যাক্।

সাহিত্য-দর্পণকার বলিতেছেন—

"রতির্মনোঽনুকূলার্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।"

যাহা চিত্তের অনুকূল অর্থাৎ যাহাকে পাইলে মানুষ আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করে, সেই বস্তুতে মনের যে তন্ময়ীভাব বা আসক্তি, তাহারই নাম হইতেছে রতি।

এই রতিকে আলঙ্কারিকগণ ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভাব শব্দে যে কেবল রতিকে বুঝা যায়, তাহা নহে; হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম, এই আটটি মনোবৃত্তিও অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাব শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। হাস্য, শোক প্রভৃতি আটটি ভাবের কথা বিস্তৃতভাবে পরে বলা যাইবে। এখন রতি-ভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে, যাহাকে স্পর্শ করিলে, যাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলে বা যাহার আস্বাদন করিলে আমরা আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, এ সংসারে তাহাকেই আমরা সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করি। এ সংসারে একের নিকট যাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, অপরের নিকটও যে তাহাই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা নহে। রুচিভেদে, সংস্কারভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের তারতম্যে, অভ্যাসের বৈচিত্র্যে প্রত্যেক নরনারীর নিকট সৌন্দর্য্য স্বানুভবসম্বেদ্য, পৃথক্ ও অসাধারণ হইতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলে হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও উপরে যে সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আশা করি, কাহারও মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে হৃদয় অনুকূলভাবে যাহাকে চাহিয়া থাকে, তাহাই সুন্দর, ইহাই হইতেছে সর্ব্বসম্মত সুন্দরের লক্ষণ।

এই সুন্দরের প্রতি অন্তঃকরণের তন্ময়ীভাব বা অপরিবর্ত্তনশীল যে তীব্র আসক্তি, আলঙ্কারিকগণ তাহাকেই রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সংসারী ব্যক্তি-মাত্রেরই কোন না কোন প্রাপঞ্চিক বিষয়ে এইরূপ রতি বা আসক্তি বিদ্যমান আছে। এই আসক্তি বা রতি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় উল্লাসপ্রবণ—অচিরজাত শিশু হইতে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত জরাজীর্ণ আধিব্যাধিবিড়ম্বিত জীবন পর্য্যন্ত মানবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—মোহ, সুষুপ্তি, তীব্রতম দুঃখানুভূতি ও মৃত্যুদশায় ইহার প্রাকট্য অন্তর্হিত হয় মাত্র। কিন্তু ইহার আত্যন্তিক উচ্ছেদ কোন ব্যক্তির পক্ষে কি জীবনে—কোন অবস্থাতেই সংসারী জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে, ইহাই হইল হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। এই বিষয়-বিশেষে আসক্তি বা রতি কখনও প্রকট অবস্থায় থাকে, কখনও বা অপ্রকট অবস্থায় থাকে। প্রকট অবস্থায় যখন থাকে, তখনই ইহাকে মনোবৃত্তি বলা যায়, আর যখন অপ্রকট বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তখনই ইহাকে রতিবাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

নাট্যশালায় যে বিষয়টির অভিনয় হয়, তৎসংসৃষ্ট বস্তুনিবহের প্রতি যাহার হৃদয়ে এইরূপ রতিবাসনা বিদ্যমান থাকে এবং অল্পমাত্র উদ্দীপনের সাহায্যে সেই বাসনা প্রকটভাবকে প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদ্যবৃত্তি বা রতিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই নাট্যশালায় রসাস্বাদকারী সহৃদয় সভ্য হইবার অধিকারী হইয়া থাকে, যাঁহাদের এরূপ হয় না, তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—

"নিবাসনাস্তু রঙ্গান্তঃকাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ ॥"

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্। এই ভাবরূপা রতির যাহা বিষয়রূপ কারণ, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রে 'আলম্বন-বিভাব' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আর সেই রতিকে যাহা ক্রমবিকাশশীল বা উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, তাহার নাম উদ্দীপন-বিভাব। বিভাব বলিলে এইরূপ রতির দ্বিবিধ কারণকেই বুঝা যায়, সুতরাং ভরতসূত্রে যে বিভাব শব্দটি আছে, তাহার অর্থ এইরূপ আলম্বন ও উদ্দীপনরূপ দ্বিবিধ বিভাব। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যাহাকে আলম্বন বা বিষয় করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে রতি আবির্ভূত হয়, সেই আমাদের রতির আলম্বন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রের রতির আলম্বন শ্রীজানকী। মলয়-মারুত, জ্যোৎস্না, কুসুম-কানন, কোকিলরুত প্রভৃতিই উদ্দীপন-বিভাব বলিয়া পরিগণিত। অন্তঃকরণে এই রতি আলম্বন ও উদ্দীপনের দ্বারা প্রকটভাবকে লাভ করিলে শরীরে আমাদের যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই নাম অনুভাব। এই অনুভাব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম—সাত্ত্বিক বা স্বাভাবিক,—দ্বিতীয়—ইচ্ছাকৃত বা প্রযত্ন-সম্পাদ্য।

কাহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে সেই ভালবাসা বা রতি ক্রমে প্রগাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে। সময়বিশেষে উদ্দীপনের সমাবেশবশতঃ সেই ভালবাসা যখন উদ্দীপ্ত হইয়া অত্যন্ত তীব্রভাব বা প্রাবল্য লাভ করে, তখন সেই প্রেমিকের অন্তঃকরণ দ্রুতভাব বা তারল্য প্রাপ্ত হয়। এই চিত্তের দ্রবীভাব বা তারল্যকে আলঙ্কারিকগণ 'সত্ত্বোদ্রেক' বলিয়া থাকেন। হৃদয়ে এইরূপ সত্ত্বোদ্রেক বা দ্রবীভাব উৎপন্ন হইলে স্বভাববশতঃ আমাদের অনিচ্ছাকৃত যে সকল বিকার মানবদেহে উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। এই সাত্ত্বিক অনুভাব অষ্টবিধ হইয়া থাকে। তাই সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥"

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহে স্তব্ধীভাব বা স্ব স্ব ক্রিয়াকরণে অসামর্থ্য, স্বেদবারিবিনির্গম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, গাত্রসমূহে বিষমকম্প, দেহের স্বাভাবিক বর্ণের বিপর্য্যয়, নয়ন হইতে অশ্রুধারাপাত এবং মোহ অর্থাৎ চৈতন্যবিলয়, সাত্ত্বিকভাব এই আট প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়ে অনুরাগ উৎপন্ন হইলে যাহাতে অনুরাগ বা রতি হইয়াছে, তাহাকে তাহা জানাইবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনুরক্ত ব্যক্তি যে সকল ব্যাপার যত্নের সহিত করিয়া থাকে, তাহাই অসাত্ত্বিক বা প্রযত্নসম্পাদ্য অনুভাব। দূতী-প্রেষণ, প্রেমপত্র-রচনা, কটাক্ষ, ভ্রূনিক্ষেপ, সঙ্গীত ও হস্তাদিচালন দ্বারা আহ্বানাদিই এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুভাবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এখন ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব কাহাকে বলে, তাহাই দেখা যাক। পূর্ব্বে রতি প্রভৃতি যে নয়টি প্রধান ভাব বলা হইয়াছে, আলঙ্কারিকগণ সেই প্রধান ভাব বা মনোবৃত্তিকে স্থায়িভাব এই শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থায়িভাবের পরিপোষক অথবা অন্তরঙ্গ সহচর-স্বরূপ মনোবৃত্তিনিচয়কেই আলঙ্কারিকগণ ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব এই দ্বিবিধ নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অন্তঃকরণে ভালবাসা বা রতি সমুদ্ভূত হইলে সেই রতির বিষয়ীভূত বস্তুকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠার উদয় হয়, কেমনে তাহার সহিত মিলিত হইব, তাহার জন্য নিরন্তর চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিতে না পাইলে বিষাদ, দৈন্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থায়ী ভাবের সহচর বা পরিপোষক অস্থায়ী ভাব বা মনোবৃত্তিনিচয়কেই আলঙ্কারিকগণ ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ব্যভিচারী ভাব সর্ব্বসমেত তেত্রিশ প্রকার হইয়া থাকে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই সকলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইবে। এই প্রকার বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সংযোগে

রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহা নাট্যসূত্রকার ভরত-মুনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে রস কাহাকে বলে এবং তাহার নিষ্পত্তিই বা কিরূপ, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। ইহাই বুঝিবার জন্য পূর্ব্বে গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটীবনে শিলাফলকে সমুপবিষ্ট সৌমিত্রিসেবিত শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র উদাহৃত হইয়াছে—নাট্যশালার এইরূপ দৃশ্যে সহৃদয় দর্শকগণের রসাস্বাদন কি ভাবে হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ঐ দৃশ্যটি উদাহৃত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাক্, ঐ দৃশ্যের অন্তরে কোন্ অংশে কোন্ আলম্বন প্রভৃতি রসাস্বাদনের অনুকূল বস্তুনিচয় কি ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া পরে রস ও তাহার আস্বাদনের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝা যাইবে।

উক্ত দৃশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাদেবীর সহিত প্রথম বিরহের অবস্থা অভিনীত হইতেছে। এই অভিনয়দর্শনে সহৃদয় দর্শকগণ যে রসের আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহার নাম বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। সদ্যোজাত দুর্ব্বিষহ বিয়োগের বশে সংধুক্ষিত শ্রীরামচন্দ্রের জানকীবিষয়ক যে অনুরাগ বা রতি, তাহাই হইতেছে এ ক্ষেত্রে স্থায়ী ভাব—সেই স্থায়ী ভাবের আলম্বন-বিভাব হইতেছেন জানকী। মৃদু মারুতান্দোলনে চঞ্চল লহরীমালাসঙ্কুল গোদাবরী ও তদীয় তীরস্থিত স্নিগ্ধ-শ্যামল কোমল লতারাজি-বিরাজিত প্রশান্ত গম্ভীর বনরাজি প্রভৃতি সেই স্মৃতির উদ্দীপন-বিভাব, শ্রীরামচন্দ্রের নীলোৎ-পলনিভ বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে মুহুর্মুহুঃ উপচীয়মান অনিবার্য্য অশ্রুধারা প্রভৃতি ইহার সাত্ত্বিক অনুভাব, আর "দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং" এই প্রকার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কবিতাটিতে প্রকাশিত তৎকালে জানকী-বিরহে বিক্ষুব্ধ শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়গত ভাব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাসদৃশ তীব্র উদ্বেগে মোহ মরণাভিলাষ প্রভৃতি ভাবনিচয়ই ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। উক্ত স্থলে এই সকল আলম্বন-বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবনিচয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সহৃদয় দর্শকের মনোবৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া কি ভাবে রস-নিষ্পত্তি করিয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

রূপলক্ষ্মী

স্বপ্নপুর-নিবাসিনী ভাবৈশ্বর্য্যময়ী
বিদেহিনী চিরন্তনী অয়ি,
তোমারে ধরিতে নিত্য পাষাণে, ভাষায়,
সুরে, তুলিকায়,
করিতেছে মুগ্ধ নর কত আয়োজন,
তবু তুমি থাক সঙ্গোপন।

প্রতিদিন কার্য্য-অবসানে,
ব্যর্থ তার ব্যথা লয়ে প্রাণে,
চেয়ে দেখে হায়,—
তোমার স্বরূপজ্যোতি কোথায় মিলায়;
থাকে প'ড়ে ক্ষীণ ছায়া শুধু এক অপূর্ণ ইঙ্গিত
খণ্ড এক সুর শুধু নহে ত সঙ্গীত।

তবু আজীবন
করিতেছে তারা প্রাণপণ,
ধরিতে তোমারে
এ মর-সংসারে;—
ধরা তুমি দেবে এক দিন
শুধিবারে শিল্পীদের সাধনার ঋণ।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

পল্লী-ভ্রমণ

মহানাদ, দ্বারবাসিনী, কুচপালা, শাটীথান, মালিপাড়া ও সোনহাটী

দারুণ গ্রীষ্মে কয়েক দিন পল্লীমাতার স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়া-শীতল ক্রোড়ে ভ্রমণ করিয়া আসিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছিল। বন্ধুবর নারায়ণচন্দ্র যখন দুই দিনের জন্য পল্লী-ভ্রমণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তখন স্থির করিলাম, মহানাদ, দ্বারবাসিনী, শাটীথান প্রভৃতি হুগলী জেলার কয়েকটি পল্লীতে ভ্রমণ করিতে যাইব। গাড়ী, মোটর প্রভৃতি যান-বাহনহীন পল্লীর পথে ভ্রমণ যে সুখকর নহে, তাহা জানিতাম। কিন্তু হুগলী জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যথাসম্ভব রচনা করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিশেষতঃ হিল্লী-দিল্লীর মত দূরবর্ত্তী স্থানের ইতিহাস একাধিক রচিত হইয়াছে, কিন্তু ঘরের কাছে হিন্দু রাজ-বংশের ও হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত বাঙ্গালা মায়ের এই সমস্ত ধ্বংসপ্রায় স্থানের ইতিহাস কেহ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন নাই। সেই প্রাচীন স্মৃতির উদ্ধারসাধনও যে একটা পুণ্যকার্য্য, তাহা বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়াছিলাম।

তাই ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বন্ধুর সঙ্গে চন্দননগর রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে রহিলেন ডুপ্লে কলেজের শিক্ষক সুদক্ষ ফটোগ্রাফার সুরেন্দ্র বাবু।

সঙ্গে এবার আর প্রকাণ্ড সুটকেশ-বিছানার লগেজ নাই, শুধু হাতে ছড়িটি মাত্র সম্বল। সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে ক্যামেরা আর নারায়ণচন্দ্রের পল্লী-ভ্রমণের নূতন সাজ। নারায়ণচন্দ্রের হস্তে নবক্রীত চক্‌চকে 'আটাসে কেশের' মধ্যে রহিল,—হুগলী জেলা পুস্তকাগার সমিতি, চন্দননগর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি ও আমাদের স্বজাতীয় সভার প্রতিনিধিত্বের যাহা কিছু আছে।

শাটীথান গ্রামে আমার নিকটাত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সামন্ত মহাশয়ের বাটীকে কেন্দ্র করিয়া আমরা গ্রামগুলি দেখিব স্থির করিয়াছিলাম। সে জন্য দ্বারবাসিনীর টিকিট কিনিয়া বি, পি, লাইনের ছোট গাড়ীতে উঠিলাম। এ লাইনে সবই স্বদেশী, খাঁটী 'মেটো' স্বদেশী। গার্ড, ড্রাইভার হইতে আরম্ভ করিয়া টিকিটকলেক্টর, এমন কি, ষ্টেশনের বা লাইনের কুলী পর্য্যন্ত সবই প্রায় স্থানীয় লোক। গাড়ীর অবস্থা, চাল-চলন বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, আজও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উঠিয়াছিলাম থার্ড ক্লাশে, এ-পাশ ও-পাশের গাড়ীর নানা প্রকার গ্রাম্য কথোপকথন বেশ মনঃসংযোগ সহকারে শুনিতেছি, আর মাঝে মাঝে আচম্বিতে লাইনপার্শ্বস্থ আম, জাম প্রভৃতি তরুশাখার সংস্পর্শজনিত অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দে চমকাইতেছি। নারায়ণচন্দ্র গাড়ীতেই একে একে প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছিল। একটি মুসলমান মহানাদের কথা-প্রসঙ্গে বলিল, "সেখানে আর আছে কি বাবু যে দেখবে ?" উত্তরে নারায়ণ বলিল, "সেকালের পুরাতন বাড়ী-ঘর এই সব দেখবো।" বৃদ্ধ আমাদিগকে পুরাতন ভগ্ন বাড়ীর গ্রাহক অনুমান করিয়া বলিল,"ওঃ, বুঝিছি, ইট-কাটের লেগে যাচ্ছ, তা এখনও খুব পাবে।"

গাড়ী প্রায় মহানাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় ঘন-ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিল। সাধারণ নিয়ম, দূষণীয় বায়ু বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য ঘরের উপরে ফাঁক রাখা। এখানে দেখিলাম, গাড়ীর উভয় পার্শ্বের নিম্নের দিকে ফাঁক রাখা হইয়াছে। বিজ্ঞানের মতে বহির্বায়ু নিম্ন দিয়া প্রবেশ করে, বোধ হয়, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। এজন্য বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির সব জলটুকু সজোরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পরম আনন্দ দান করিল। ভদ্রতার খাতিরে এবং সুযোগের একান্তই অভাবে পা দুইখানি যথাস্থানেই রাখিয়া বিনামা জোড়াটি নিশ্চিন্ত হইয়াই ভিজাইয়া লইতে হইল। গাড়ী মহানাদ ষ্টেশন পার হইয়া গেল। দূর হইতে ব্রহ্মময়ী মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম।

প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামিল। আমরা গ্রামের মধ্যের পথ দিয়া শাটীথান অভিমুখে অগ্রসর হইলাম এবং বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমার পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ের আলয়ে পৌঁছিলাম। রাত্রিতে আহারান্তে মহানাদনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মহানাদের ইতিহাস'খানি পাঠ করিলাম। উহা হইতে জানিলাম, আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের আদি বাসস্থান মহানাদে পুরাতন পৈতৃক ভিটার অংশ এখনও দেখা যায়।

কুচপালা

প্রত্যূষে উঠিয়া কুচপালা যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। ইহা শাটীথান হইতে মাঠ ধরিয়া যাইলে কিছু কম দুই মাইল হইবে। নিদাঘের স্নিগ্ধ প্রাতঃকালে জনশূন্য প্রান্তর ও মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে বেশ ভালই লাগিতেছিল। যখন আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম, তখন প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল প্রভায় সবে মাত্র পূর্ব্বগগন আলোকিত হইয়াছে। এই গ্রামের তেমন কোন সমৃদ্ধির কথা না শুনিলেও এখানকার মোগল সাহেবের হাতিখানা, বুড়া দেওয়ানের আস্তানা প্রভৃতির কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, না জানি, প্রাচীন যুগের কতই না ধ্বংসাবশেষ এই গ্রামে দেখিতে পাইব! কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র গ্রাম বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহাও নহে। মাত্র এখানে ওখানে দুই দশখানি সামান্য পর্ণকুটীর, আর পুরাতনের মধ্যে বারো হাজারি মনসবদার মুসলমান নবাবের গোলাকৃতি হাতিশালার কিছু অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। আর পূর্ব্বোক্ত আস্তানার চিহ্ন বলিলেও ঠিক হয় না, তাহার জমীটা মাত্র পড়িয়া আছে, আর আছে নবাব-প্রাসাদের ধ্বংসের শেষস্মৃতি ইটকের স্তূপ। তবে মনে হয় যে, এক কালে এই স্থান ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধ নগর ছিল।

গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোক আছে বলিয়া শুনিলাম। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লোকের বাস আছে, জানি না। যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাহা মনে হইল না। এই গ্রামে তেলীর ভিটা ও রায়ের ভিটা নামে দুই খণ্ড জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এক কালে এই দুই বংশ বর্দ্ধিষ্ণু ও ক্রিয়া-কলাপ-শীল ছিল। এখন তাহাদের বাসভবনের কোন চিহ্নই আর দেখা যায় না। শুনিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কুম্ভকারদের দোল-দুর্গোৎসব হইত। এখানে যে নবাববংশ ছিল, তাহার শেষ নবাবের নাম তোরাব আলী খাঁ। আনুমানিক ১২৪০ সালে খাঁ সাহেবের মৃত্যু হয়। এখন আর এ বংশের কেহই নাই।

যতদূর বুঝা যায়, মুসলমানদের পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর, এ প্রদেশ মুসলমান অধিকারে আসিলে কোন ওমরাহ এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন এবং নবাব নামে পরিচিত হন। বারো-হাজারি কথাটি একটি খেতাব, কি বার হাজার টাকা তাঁহাদের বাৎসরিক খাজনা দিতে হইত, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ইহারা মোগল সাহেব নামেও অভিহিত হইতেন। রুদ্রাণীর কালী ও দ্বারবাসিনীর বিষহরী দেবীর সেবাদির জন্য ইহারা অনেক দেবত্র দিয়াছেন।

এখানে কোন প্রসিদ্ধ শিল্পী, লেখক বা গায়কাদির উদ্ভব হইয়াছিল কি না, অনুসন্ধানে তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলাম না, কেবল "বাউল-সঙ্গীত" গ্রন্থরচয়িতা রাজারাম যোগী নামক এক জন কবির কথা মাত্র জানিতে পারিলাম।

মহানাদ

কুচপালা হইতে মাঠের আইলের উপর দিয়া বরাবর দ্বার-বাসিনী ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলাম এবং যথাসময়ে মহানাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা পথ ছাড়িয়া মাঠ ধরিলাম। দূরে ব্রহ্মময়ীর সু-উচ্চ নবচূড় মন্দির বৃক্ষরাশি ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহারই সম্মুখে এক পার্শ্বে মহানাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোঠা-বাড়ী। সেখানে দুইটি ভদ্রলোক আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পরিচয়ে জানিলাম, এক জন গ্রন্থকার স্বয়ং, অপর ভদ্রলোক ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয়।
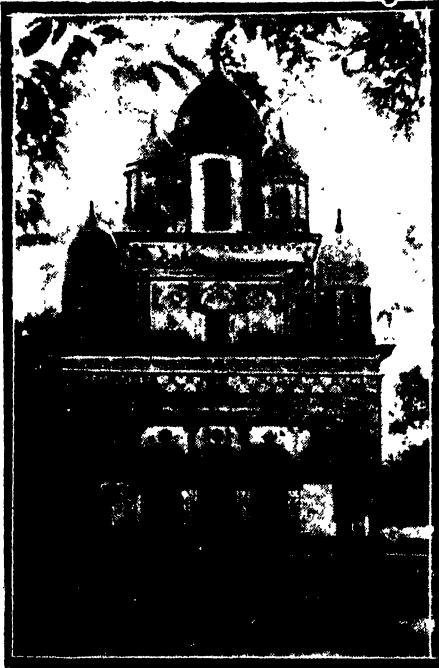
ব্রহ্মময়ী মন্দির—মহানাদ

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহানাদে বাসের কথা সম্বন্ধে প্রথমেই গ্রন্থকারের সহিত আলোচনা করিলাম। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর তিনি ও নিয়োগী মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া
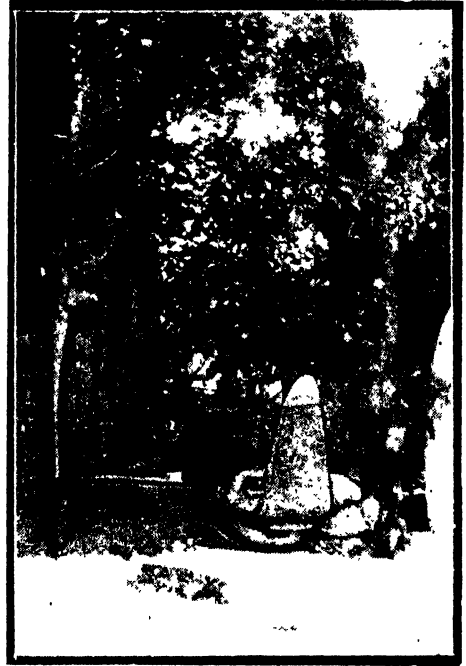
বামে ভৈরবমূর্ত্তি, দক্ষিণে মকরের মুখ—মহানাদ

প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ একে একে দেখাইতে লইয়া গেলেন।

নিয়োগীপাড়ার শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী মাতার মন্দিরটিই প্রথম দেখিলাম। ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা এই সুন্দর কারুকার্য্যখচিত নবচূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চন্দননগরের গোস্বামিঘাটে 'কনে বউয়ের মন্দির' এবং তেলিনীপাড়ার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির ভিন্ন এই শ্রেণীর মন্দির এই অঞ্চলে কোথাও দেখি নাই। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মময়ী কালিকামূর্ত্তি ভিন্ন পাঁচটি শিবলিঙ্গ এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীজনার্দ্দন এখানে বিরাজ করিতেছেন। দেবত্র সম্পত্তির আয় হইতে পূজাদির ব্যবস্থা আছে।

পথে জঙ্গলের মধ্যে চক্রবর্ত্তীদের চতুষ্কোণ দোলমন্দিরের ভগ্নাবশেষমাত্র দেখা যায়। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও রাজপ্রাসাদ সম এই অট্টালিকার কতকাংশ বর্ত্তমান ছিল এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহাসমারোহের সহিত এই স্থানে দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কলাপ হইত বলিয়া শুনিলাম। এখান হইতে অনতিদূরে

দক্ষিণপাড়াস্থিত 'গোঠেশ্বর' মহাদেবের বহু প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন অর্দ্ধাংশ দেখিলাম। ইহা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রাচীনতায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম, এইরূপ শুনিলাম। বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মহা ধূমধামের সহিত চড়ক উৎসব সম্পন্ন হইত।

গোঠেশ্বরনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—মহানাদ

ইহার পর গড়পাড়ায় বেণে রাজাদের দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত হাতিশালা দেখিলাম। কথিত আছে, সুবর্ণবণিক্‌-জাতীয় এক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। এখন সেখানে হাট হয়, তাহার উত্তর ও দক্ষিণের জমীতে রাজবাটী ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত 'ভাঙ্গাশান' এবং 'খিড়কী পুষ্করিণী' নামক জলাশয় দুইটি আজও বর্ত্তমান আছে। যতদূর জানা যায়, ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কলিকাতার পোস্তার রাজারা এই বংশসম্ভূত বলিয়া শুনা যায়। পথে বনসমাচ্ছন্ন ভূখণ্ডে কর মহাশয়দিগের ধ্বংস অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া, এমন লোক কমই আছেন—যাঁহারা একটা গভীর ব্যথা অনুভব না করেন। এখন এই সব ভাঙ্গা বাড়ীর কোন কোন অংশ এবং ইটের স্তূপগুলিই তাঁহাদের পূর্ব্বকালের অতুল বৈভবের কথা ঘোষণা করিতেছে।

তাম্বুলীকুলোদ্ভব এই করবংশ বিশেষ কীর্ত্তিমান্‌ বলিয়া এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বনমালী কর মহাশয় সপ্তগ্রাম হইতে মহানাদে আগমন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইতেই তাঁহাদের অতুল সৌভাগ্য-সম্পদ লাভ হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় সুবৃহৎ পুষ্করিণী, শিবমন্দির ও দেবালয়াদি আজিও ইঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কালের পরিহাসে করদের সেই বিরাট পরিবার ও বৈভবাদি আর নাই। এক্ষণে জমীদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ই এই সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ বংশের প্রধান ব্যক্তি। ইঁহার সহিত ইঁহাদের কাছারী-বাড়ীতে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। ইঁহার পত্নী স্বর্গীয়া সাবিত্রীসুন্দরীর নামে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ইনি একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুস্তকের সংখ্যা এখানে খুব বেশী না হইলেও দেখিলাম, এখানে কতিপয় অতি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক রক্ষিত আছে। করপাড়ায় যে অভ্রভেদী একচূড়াবিশিষ্ট সু-উচ্চ মন্দিরটি দূর হইতে দেখা যায়, ইহা করদের অন্যতম কীর্ত্তি। ইহাকে 'লালাজীউর মন্দির' বলিয়া থাকে। মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায়,

লালাজীউর মন্দির—মহানাদ (পশ্চাদ্দিক্‌)

১৭৭৩ শকাব্দায় ইহা নির্ম্মিত হয়। বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পে মন্দিরের অবস্থা ভয়াবহ হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এক্ষণে অন্যত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীধর, চন্দ্রশেখর, ভুবনেশ্বর ও আনন্দময়ী প্রভৃতিও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বেজপাড়ায় কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস আছে দেখিলাম। শেঠ-বংশের প্রাচীন ভিটা দেখিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। এখন এই সু-প্রাচীন সমৃদ্ধ বংশের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শেঠ ভিন্ন আর এখানে কেহ নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া শেঠদের পুরাতন ভিটার বিস্তৃত ভূখণ্ড ও পুষ্করিণী খনন করিতে প্রাচীনকালের ইষ্টকনির্ম্মিত যে ভিত্তি বাহির হইয়াছে, তাহা দেখাইলেন।

পথে মিশনারীদের দ্বারা নির্ম্মিত স্কুল-বাড়ীটি দেখিলাম। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মহানাদ যখন পতনের দিকে সবে মাত্র অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় "ফ্রী চার্চ্চ মিশন্‌"

নামক খৃষ্টান্ সম্প্রদায় এখানে আগমন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম খড়ের ঘরে তাঁহারা এণ্ট্রান্স্ স্কুল স্থাপন করেন। রেঃ এলেক্‌জেণ্ডার ডফ, রেঃ জগদীশ ভট্টাচার্য্য ও মিঃ থাইক্ এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। স্কুলের প্রথম এফ., সি, মিশন্ স্কুল এবং পরে ইউ, এফ., সি মিশন্ স্কুল নামকরণ হইলেও সাধারণ লোক ডফ্ সাহেবের বা জগদীশ বাবুর স্কুল বলিত। ১২৭১ সালের ঝড়ে স্কুলগৃহ ভূমিসাৎ হওয়ার স্বল্পদিন পরেই উহা উঠিয়া যায়। এই সময় কলিকাতার বার্ণ কোম্পানীর দ্বারা এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হয়। ইহার পর আর এখানে এণ্ট্রেন্স স্কুল হয় নাই। ললিতমোহন কর মহাশয়ের চেষ্টায় "হিন্দু স্কুল" নামে দুই তিন বৎসরের জন্ত আর একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একণে এই বাড়ীতে "বয়েজ্ স্কুল" নামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

মানত করে। এই ফকীর সাহেব সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা অতীব বিচিত্র। এখানে হিন্দু যোগী রাজার রাজত্বকালে অতি পবিত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জীয়ৎকুণ্ডের পবিত্রতা বিনষ্ট করা উপলক্ষ করিয়া আমরা কাজিমন ফকীরের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ বশিষ্ঠগঙ্গার পার্শ্বে বর্ত্তমানে যে ক্ষুদ্র ডোবাটি দেখা যায়, উহা জীয়ৎকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহা একটি দেবখাতকুণ্ড, বশিষ্ঠগঙ্গার সঙ্গে মাত্র একটি প্রাচীর ব্যবধান আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ইহাতে স্নান করাইলে মৃতব্যক্তি জীবন পাইত এবং আহত ও রুগ্নব্যক্তি সুস্থ হইত। পাণ্ডুয়া-বিজয়ী মুসলমানগণ মহানাদ আক্রমণ করিলে যখন তাঁহারা যুদ্ধে নিহত রাজার সৈন্তগণের এই কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তি-প্রভাবে পুনর্জীবন লাভের কথা জানিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত ফকীরের সাহায্যে গোমাংস
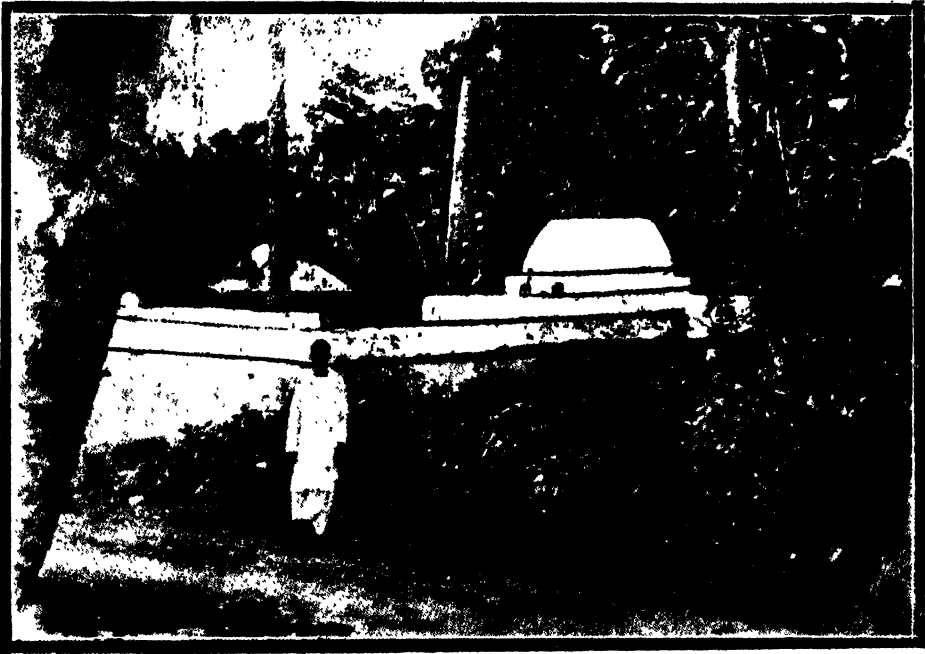
কাজিমন ফকীরের সমাধি—মহানাদ

খৃষ্টান মিশনারীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে কতিপয় হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পরশুপুরের পূর্ণচন্দ্র বসু প্রথম। পূর্ব্বোক্ত জগদীশ বাবু এক জন প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তৎকালীন যাবতীয় জনহিতকর কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহারই সময়ে এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, মেয়েদের স্কুল, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি হইয়াছিল। জগদীশ বাবুর চেষ্টায় সরসা পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, লোক সেটিকে 'জগদীশ বাবুর রাস্তা' বলে।

পথিপার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত একটি সমাধি। এটি কাজিমন ফকীরের সমাধি। এই সমাধিস্থান এ প্রদেশে অতি প্রসিদ্ধ। সত্যপীরের ন্তায় এখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সিন্নি দেয়,

নিক্ষেপে এই কুণ্ডের অপূর্ব্ব শক্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ফকীর হিন্দু-সন্ন্যাসিবেশে পীড়ার ভাণ করিয়া রাজার কাছে কাতর প্রার্থনা দ্বারা স্নানের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার কায শেষ করিয়া পলায়নকালে তাঁহাকে বধ করা হয়। পরে মুসলমান বিজয়ের পর তাহাদের দ্বারা এই বধ্য-স্থানেই তাঁহার দেহাবশেষের সমাধি দেওয়া হয়।

এই ফকীরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, এক সময় এক বিপন্ন পথিক ফকীরকে স্মরণ করিয়া দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা পান। সেই অবধি সাধারণের বিশ্বাস, তাঁহাকে স্মরণ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কাহারও কিছু হারাইলে কাজিমন সাহেবের সিন্নি মানিলেই তাহা পাওয়া যায়। তাঁহার কৃপা হইলে এইরূপ

আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। জীয়ৎকুণ্ডে এখন আর মরা মানুষ বাঁচে না। কিন্তু এখানে স্নানে এখনও মৃতবৎসা রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া লোক মনে করে। যে ব্যক্তি মুসলমানদিগকে এই শক্তিসম্পন্ন জলাশয়ের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি এক জন গোয়ালা, নাম নগরগুরু। এ সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন-প্রকারের গল্পও শুনা যায়। * পাণ্ডুয়া ও দ্বারবাসিনীতেও

নির্ব্বিকল্প-সমাধি—মহানাদ

এই প্রকার গুণসম্পন্ন দুইটি পুষ্করিণী আছে। কোন গ্রন্থকার মহানাদের বশিষ্ঠগঙ্গাকেই শক্তিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। † বশিষ্ঠগঙ্গাও একটি বিশেষ পবিত্র জলাশয় বলিয়া খ্যাত। এরূপ বড় পুষ্করিণী সচরাচর দেখা যায় না। জীয়ৎকুণ্ডের দক্ষিণদিকে 'নির্ব্বিকল্প-সমাধি' নামে একটি অনতিবৃহৎ সমাধি দেখিলাম। জনপ্রবাদ, এই সমাধিমধ্যে এক যোগী পুরুষ স্মরণাতীত কাল হইতে নির্ব্বিকল্প-সমাধি যোগে আছেন। সাধারণে উহাকে জীয়ন্ত-সমাধি বলিয়া থাকে। আমাদের গ্রন্থকার মহাশয় এটিকে মহানাদের বৌদ্ধ-বিহারে লোকান্তরিত তিব্বতের রাজা ভ্রিপ্পোংএর সমাধি বলিয়া মনে করেন।

এই সমাধির অনতিদূরেই জটেশ্বর মহাদেবের সু-সংস্কৃত উচ্চচূড়া-বিশিষ্ট মন্দির। গঠন কতকটা বৈদ্যনাথধামের মন্দিরের ন্যায়। সম্মুখে তরুচ্ছায়া-সমন্বিত নাটমন্দির। এই মন্দির বহু প্রাচীন, রাজা চন্দ্রকেতু দ্বারা নির্ম্মিত। এখানকার মোহান্তগণ 'যোগী রাজা' বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই মন্দিরটি এখনও পর্য্যন্ত এরূপ সু-সংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই মন্দিরের মধ্যে মহাকালের পূজা হইয়া থাকে এবং একখানি দারুময় সিংহাসনে বহুসংখ্যক শালগ্রামও রক্ষিত আছে। এই সব ভিন্ন মন্দিরের নিকটে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির, শিবমন্দির, নিম্ব, বট ও বিল্ব-তরুমূলে এবং বেদীর উপর কৃষ্ণপ্রস্তরময় বিষ্ণু, ভৈরবী ও

জটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির—মহানাদ

হরগৌরী প্রভৃতির অঙ্গহীন প্রাচীন মূর্ত্তিসকল রক্ষিত আছে, আর ভূমিতলে এক বিশাল গৌরীপীঠের অর্দ্ধাংশ পতিত রহিয়াছে। জানি না, শিবলিঙ্গটি কত বড় ছিল। ভারতের অনেক তীর্থে অনেক শিবলিঙ্গ দেখিয়াছি, কিন্তু এত বড় গৌরীপীঠ কোথাও দেখি নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে দশ ফুট। এখানকার মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশ বশিষ্ঠগঙ্গা ও অন্যান্য সরোবর হইতে পাওয়া

বিশাল গৌরীপট্ট—মহানাদ

* বশিষ্ঠগঙ্গা ও জরাফ খাঁ—পূর্ণিমা ১৩০৮ ও হুগলী।

† "বশিষ্ঠগঙ্গা ও জরাফ খাঁ,"
"মৃত্যুর পর" পূর্ণিমা ১৩০৮ সাল।
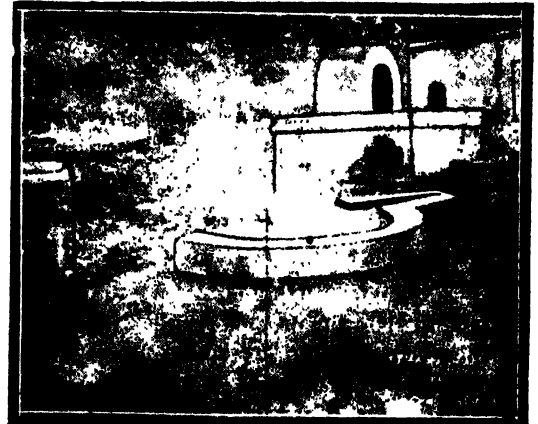
গিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন আরম্ভ হইয়া পক্ষাধিককাল এখানে একটি মেলা বসে। "মানাদের জাত" বলিয়া একটা কথা আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি; উহা এই মেলারই নামান্তর। মেলার সময় এই সব পতিত জমী দোকান-পসার ও লোকে ভরিয়া যায় এবং দূর হইতে সমাগত হাজার হাজার লোকের কলরবে এই জনহীন পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে।

এখান হইতে নগরপাড়ার মধ্যে রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদাদির স্থান অতি নিকটে অবস্থিত। ইহা সুবিখ্যাত জামাই-জাঙ্গাল নামক ত্রিবেণী হইতে মহানাদ (অধুনা ভাস্তাড়া) পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রবাদবিজড়িত পথের উপর অবস্থিত। জনশ্রুতি, ত্রিবেণীর রাজা ত্রিপুরার পুত্রের সঙ্গে রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যার বিবাহ হয়। চন্দ্রকেতু গোপনে কন্যা-জামাতার কথোপকথন হইতে জামাতার মুখে তাঁহার রাজ্যে 'ভাল রাস্তা নাই' এই কথা শুনিয়া এই রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কথিত আছে, এক রাত্রির মধ্যে চারি ক্রোশ দীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এরূপ উচ্চ ও প্রশস্ত পথ সে সময় এ অঞ্চলে আর কোথাও ছিল না। কেহ কেহ বলেন, দামোদরের বন্যা হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখান হইতে ভাস্তাড়া পর্য্যন্ত যে পথটি গিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, উহা এই পথেরই অংশ-বিশেষ; কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। উহা ভাস্তাড়ার ছবু সিংহ মহাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে পথের মধ্যে স্থানে স্থানে পাকাঘরের মেঝের অংশগুলি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পথ প্রাসাদের মধ্য দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বশিষ্ঠগঙ্গা—মহানাদ

এই পথের এক পার্শ্বে রাজার গড় ও অপর পার্শ্বের জঙ্গলময় স্থানটিকে ধনপোতা বা রাজ-কোষাগারের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মহারাজা চন্দ্রকেতু চতুর্দ্দিকে দুই মাইল পরিখা-বেষ্টিত স্থানে রাজপ্রাসাদমধ্যে বাস করিতেন। এখন এই স্থান একবারে জনশূন্য গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। দেখিবার মধ্যে আছে, ইষ্টকস্তূপ ও স্থানে স্থানে গড়ের চিহ্ন। এখনও লোক এই স্থানটাকে গড়পাড়া বলিয়া অভিহিত করে। রাজবাড়ী কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই, তবে জাততলায় বেদীর উপর একটি বৃহদাকার প্রস্তরময় মকরাকৃতি এবং সেইখানেই অন্যত্র রক্ষিত প্রস্তরের ভগ্নস্তম্ভের অংশবিশেষ (যাহা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাজবাড়ীর অংশ বলিয়াছেন) দেখিয়া মনে হয় যে, উহা যাহার অংশ, তাহা সত্যই রাজবাড়ীর মত বৃহৎ ও সুরম্য ছিল।
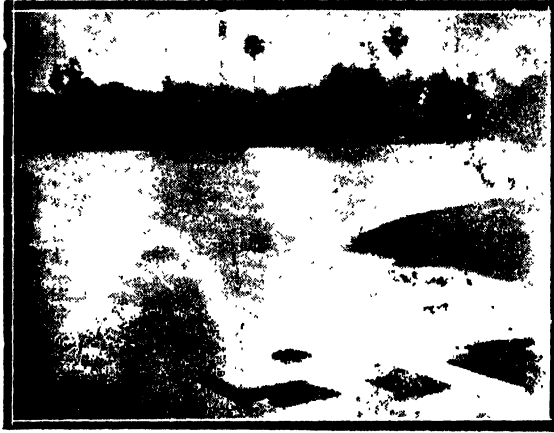
এই স্থানে পথের এক পার্শ্বে দুইখানি কৃষ্ণ-প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে দেখিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহাকে অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই পাথরকে এ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই, ইহা মৃত্তিকার ভিতর দিয়া কাশীর সঙ্গে সংযোজিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা একটি সুড়ঙ্গের দ্বারদেশ।

মহানাদ গ্রামে পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ এখনও বহু বৃহৎ জলাশয় আছে। বশিষ্ঠগঙ্গা ও জীয়ৎকুণ্ডের প্রসিদ্ধি ও পবিত্রতার কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই রাণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'দু সতীন,' 'খাঁ পুকুর' 'ভাঙ্গাশান,' 'সরকার পুকুর,' 'সুদর্শন দীঘি,' 'সিংহ পুকুর,' 'মায়া-দীঘি,' 'খেয়া-দীঘি,' 'ভদ্ররেণে,' 'মীরা-দীঘি' প্রভৃতি সরোবরগুলি উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, মহেন্দ্র খাঁ সিংহ প্রতিষ্ঠিত খাঁ পুকুরের তলদেশে সুরম্য মন্দির, রথ ও প্রভূত ধনরত্ন লুকান আছে। ইহার সম্বন্ধে আরও শুনা যায়, কাহারও কোন কার্য্য উপলক্ষে অনেক তৈজসপত্রাদি আবশ্যক হইলে এখানে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তৈল-হরিদ্রা রাখিয়া আসিলেই তাহা পাওয়া যাইত এবং কায শেষ হইলে প্রত্যর্পিত হইত। মুক্তকুণ্ড নামে জাততলার কাছে একটি দেবখাত কুণ্ড দেখিলাম, উহা খনন করিবার সময় একটি সুবৃহৎ প্রাচীর পাওয়া যায়। লোক অনুমান করে, উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অট্টালিকার প্রাচীর। খননের সময় চার বস্তা কড়ি, বড় বড় কাষ্ঠ ও কতকগুলি ভগ্ন দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অন্য কোন কোন পুষ্করিণী সম্বন্ধেও অনেক গল্প শুনা যায়। সময়াভাবে এই সব জলাশয়ের অনেকগুলিই আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

মহানাদে পুরাকালের নিদর্শনের কথা বলিতে এখানকার বহু দেব-দেবীর কথাও উল্লেখ করিতে হয়। নগরপাড়ার "জামাই জাঙ্গালের" চৌরাস্তার উপর অগ্নীশ্বর ও বিশালাক্ষী দেব-দেবী অতি প্রাচীন। শেষোক্ত দেবী-মন্দিরটি মুসলমানরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, উহা আর পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। গড়পাড়ার বুড়া শিবও অতি প্রাচীন, ইহা মুসলমান-যুগের অনেক পূর্ব্বে স্থাপিত। এখানে পূর্ব্বে প্রতি বৎসর গাজন হইত। একাত্রকাননে পূর্ব্বে অনেক শিবমন্দির ছিল। এখানে বাসুদেবের প্রস্তরময় আসনের সহিত একখানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল—"সিংহলরাজ চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক এই গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।" এ সব ভিন্ন অখিলেশ্বর, গৌরীশঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি আরও বহু দেবমন্দির আছে। মনে হয়, স্থানটি পূর্ব্বে শৈবপ্রধান ছিল।

হিন্দু দেব-দেবী ভিন্ন বৌদ্ধযুগের নিদর্শন ধর্ম্ম ঠাকুর জটেশ্বরনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এখন জেলেপাড়ায় এক জেলের বাড়ীতে আছেন। এখনও ধর্ম্মরাজের গাজন হইয়া থাকে।

মুসলমান পল্লীগুলিতে দরগা ও মসজিদগুলি এবং স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গহীন দেব-দেবী-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া, এক সময় যে এখানে মুসলমান-প্রভাব যথেষ্ট ছিল, তাহা জানা যায়।

মহানাদের সমৃদ্ধির সময়ে মহানাদ যে সব ব্যবসার জন্ত খ্যাত ছিল, তন্মধ্যে নীল, কাগজ ও চূণের কাযই প্রধান। এখানে নীলের চাষ যথেষ্ট ছিল, স্থানে স্থানে নীলের কারখানার বড় বড় চৌবাচ্ছাদি এখনও দেখা যায়। কাগজিপাড়ায় বহু দেশী কাগজের কারখানা ছিল। এখন সে স্থান অরণ্যময় হইয়া গিয়াছে, মাত্র দুই তিনটি লোক কাগজি-জাতিব অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

চন্দ্রদহ, দেউল-পোঁতা, সোঁতা, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতির মত দেখিবার স্থান আরও অনেক আছে এবং প্রবাদ-গল্পও অনেক আছে। ইতিহাস যে সব রাজার সন্ধান রাখে না, সেই সিংহ-বংশীয় রাজা এবং মহারাজা চন্দ্রকেতু ও তাঁহার বংশধর প্রভৃতি রাজাদের কত কাহিনী, মহানাদরাজ্যের কত ঐতিহাসিক কথা, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন, অতীতের বিজয়কাহিনী, কত কীর্ত্তি-কথা, কত উপাখ্যান, কত কিম্বদন্তী যে এখনও লোকমুখে শুনা যায়, তাহা বলা যায় না।

মহানাদ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই তিনটি গল্প প্রচলিত আছে।

এখানে মহাশঙ্খ-নাদ হইয়াছিল বলিয়া মহানাদ নাম হইয়াছে। রাজা মান্ধাতার সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মহানাদ নাম হইয়াছে, ইহাও এক মত: আবার কেহ কেহ বলেন, এখানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল, মহাধ্বনি রসাতলে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য এই নাম হইয়াছে। প্রথমটিই অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এই গ্রাম স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এক বটবৃক্ষে দুইটি ক্রোরপক্ষী বাস করিত। পক্ষিণী গর্ভবতী হইলে মহাশঙ্খের মাংস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্ত্রীর সাধ পূর্ণ করিবার জন্য পক্ষিবর মহাশঙ্খ শিকারে যাইয়া প্রাণ হারায়। পক্ষিণী যথাকালে দুইটি অণ্ড প্রসব করে। পরে শাবকদ্বয় বড় হইয়া মাতাকে খাওয়াইবার জন্য একটি দক্ষিণাবর্ত্ত মহাশঙ্খ আনিয়া বৃক্ষোপরি রাখে। পরে এক দিন নিশাকালে শূন্য শঙ্খমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। শঙ্খ আপনিই গভীর নিনাদে বাজিয়া উঠে। এই শঙ্খধ্বনি শুনিয়া দেবতাগণ উপস্থিত হইয়া রাত্রির মধ্যেই কাশী নির্ম্মাণ করা স্থির করেন। বিশ্বকর্ম্মা নগরনির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন, বশিষ্ঠদেব যোগবলে গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন ও অন্যান্য কুণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। অসুরগণ ইহাতে বাদ সাধিল। তাহারা পক্ষীর রূপ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিয়া উঠিল। সুতরাং নিশাবসান হইয়াছে ভাবিয়া দেবগণ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাশী নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল না। বশিষ্ঠগঙ্গা আর কুণ্ডগুলি রহিয়া গেলেন। আদি ও প্রাচীন দলিলাদিতে সেগুলিকে দেবখাত দ্বাদশকুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়। *

প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তি—মহানাদ

মালিপাড়া

প্রভাতে অন্ততঃ পক্ষে পাকা দশ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে একখানা গো-যানের ব্যবস্থা করা হইল। আমরা ৩টার সময় গাড়ীতে উঠিলাম।

মালপাড়া গ্রামের পুস্তকাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী ও স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহারা এখানকার অনেক কথা বলিলেন।

গোস্বামীদিগের প্রাধান্যহেতু এই গ্রামের নাম 'গোস্বামী মালিপাড়া' হইয়াছে। মালিপাড়া নামে অন্যত্র আর একটি স্থান আছে। সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও এই গ্রামের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের অংশ হইতে উদ্ভূত ভগবান্ খঞ্জনাচার্য্যের দ্বারা এখানকার গোস্বামি-বংশের প্রতিষ্ঠা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারের জন্য এ স্থানের প্রসিদ্ধি।

এখানে গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, শ্রীশ্রীমদন-গোপাল, বল্লভচাঁদ ও মদনমোহন, এই বিগ্রহচতুষ্টয়ই এখানকার মধ্যে যাহা কিছু দর্শনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিগ্রহ সকলের সেবার জন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই, শিষ্যগণের দ্বারাই সেবাদি চলিয়া থাকে।

নিকটবর্ত্তী অন্য সকল স্থানের তুলনায় এখানে জন-সংখ্যা কিছু বেশী, কিন্তু গ্রামের ভিতর সারি সারি ছোট-বড় অট্টালিকা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন একটি সাধারণ সহরের কোন একটি পল্লীতে এতগুলি এমন বড় বড় বাড়ী দেখা যায় না। গ্রামে একটি এম, ই স্কুল আছে ও একটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার আছে। সাহায্যাভাবে ইহাদের

---

* শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস" নামক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়ের মৌখিক গল্পই আমার প্রধান অবলম্বন।

অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু সখের থিয়েটার বা কনসার্ট পার্টির অভাব নাই!

এখানে এখন শ্রীযুক্ত নবচৈতন্য গোস্বামী মহাশয়ই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে প্রধান ব্যক্তি। এই গ্রামের গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ও উপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে "কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতা" এবং "আকর্ষণ" ও "জীবন-রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত জীবনকৃষ্ণ গোস্বামীও এক জন লেখক বলিয়া পরিচিত।

এখানে কোন শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় কি না, জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম—কিছুই হয় না। পূর্ব্বে কাগজিরা দেশী তুলোট কাগজ বহুল পরিমাণে তৈয়ার করিত, এখন সে সব কায আর নাই, মাত্র এক জন তৈয়ারী করে।

সেনহাটী

গো-যানে অনেক মাঠ পার হইয়া সেনেট (সেনহাটী) গ্রাম পাইলাম। এই গ্রামের কয়েকটি গৃহের মাটীর দেওয়াল এত মসৃণ ও এত সুন্দর যে, তাহা দেখিলে প্রশংসা করিতেই হয়। সাধারণ বালির কায করা দেওয়াল তেমন হয় না। কোন কোন মাটীর ঘরে বেশ কার্ণিশ—এমন কি, ফুলের কাযও দেখিলাম।

শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী—সেনহাটী

পল্লীর মধ্যে পথে দারুণ জলাভাবের লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশ পুষ্করিণীতে সামান্য জল আছে, তাহাও অপেয়। পথের পাশে কোন সদাশয়-প্রতিষ্ঠিত একটি কূপের সমীপে গ্রাম্য নারীরা যে ভাবে কলসী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা দেখিলে এখানকার জলের কষ্ট কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সেনহাটীর মহাজাগ্রতা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ও দেবী এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। মন্দিরগাত্রে ১২২৯ সাল লেখা আছে; কিন্তু গ্রামের প্রধানগণের নিকট হইতে শুনিলাম, উহা মন্দির-সংস্কারের সময় লিখিত হইয়াছে, দেবী-প্রতিষ্ঠা ইহার বহু পূর্ব্বে হইয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি সাধারণ মন্দির হইতে বিভিন্ন, কতকটা দোচালা ঘরের মত। দ্বিভুজা বিরাট মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, অক্ষি-যুগল সত্যই বিশাল। দক্ষিণে মহাদেব, বামে শ্রীরামচন্দ্র এবং পশ্চাতে ভূত-প্রেত। দ্বিতীয় স্তরে দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী-মূর্ত্তি, আর তৃতীয় স্তবকে দক্ষিণে গণপতি, বামে কার্ত্তিকেয়। মন্দির-সম্মুখে একটি অনুচ্চ স্তম্ভাকার স্থানের উপরের অংশ রক্তরঞ্জিত শুনিলাম, মা'র জন্য বলির ছাগাদির রক্ত এই স্থানে নিবেদিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের নিকটে একটি বেশ বড় পুষ্করিণী দেখিলাম। উহাকে পুরাণ পুকুর বলে। এই জলাশয়ের ভিতর হইতে মা তাঁহার 'শাঁখা-পরা' হাত তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। প্রবাদ, দেবী বিশালাক্ষী একটি মহিলার বেশে এক শাঁখারীর কাছে উপস্থিত হইয়া শাঁখা পরিতে চাহেন। শাঁখা পরা হইলে শাখারী মূল্য চাহিলে তিনি নিজেকে হালদারের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাদের নিকট পয়সা চাহিলেই পাওয়া যাইবে বলেন। শাঁখারী
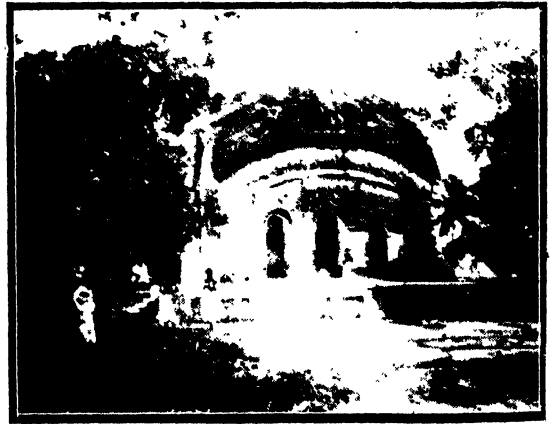
শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী মন্দির—সেনহাটী

হালদার মহাশয়দের কাছে মূল্য চাহিলে তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কোন ছেলে-মেয়ে নাই। সেই রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া হালদারদের দ্বারাই বিশালাক্ষী প্রতিষ্ঠিতা হন। বর্দ্ধমানের মহারাজা ও উত্তর-পাড়ার জমীদার মহাশয়রা দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া দেব-সম্পত্তির আয় হইতে সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। পূর্ব্বকালে দ্বারবাসিনী হইতে সেনহাটী পর্য্যন্ত কেদারমতী নামে যে নদী ছিল, এই দেবীমূর্ত্তি তাহাতে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

এই গ্রামে দেখিবার আর কিছুই নাই। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভিন্ন পাঠাগার, পুস্তকাগার বা শিক্ষাবিষয়ক আর কোন প্রতিষ্ঠান এখানে নাই। শিল্পের মধ্যে পিতলের কড়া, ঘুঙুর ও নূপুর এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। এ শিল্প এখানে বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে এবং পূর্ব্বে বিস্তর কাংস্যবণিক এ কাযে লিপ্ত থাকিত। এখনও প্রায় চল্লিশ ঘর লোক এই কাযের দ্বারা অন্নসংস্থান করিয়া থাকে। শুনিলাম, এই ঘুঙুরের ও নূপুরের কায না কি আর কোথাও নাই। এখানে এখন মোট ৭০।৮০ ঘর লোকের বাস, তন্মধ্যে কাংস্যবণিকই অধিক; ব্রাহ্মণ ৮।১০ ঘর, বাকি অন্য জাতি।

খ্যাতনামা লোকের মধ্যে "বঙ্গবাসীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস এই গ্রামে। "সঙ্গীত-তরঙ্গ," "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ," "দাশু রায়ের পাঁচালী," "শিবাজীর ভবানীপূজা," "নকুড় বাবু," "ভজহরি সর্দ্দার," "বঙ্গভাষার লেখক" তাঁহার রচিত। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমরা এই গ্রাম সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হইয়াছি।

দ্বারবাসিনী—মেঘসার

পূর্ব্বদিনেরই মত প্রত্যূষে উঠিয়া দ্বারবাসিনী দেখিতে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। সাটিথান হইতে দ্বারবাসিনী ষ্টেশন পার হইয়া বিষহরীতলা পর্য্যন্ত মাঠের পথ ধরিয়া চলিলাম। এই স্থানেই অধুনালুপ্ত কেদার-মর্ত্তী বা কেদারবাহিনী নদীর চিহ্ন দেখিলাম। শ্রীশ্রীবিষহরী মা এ প্রদেশের অতি জাগ্রতা দেবী। দেখিলাম, বেদীতে উপবিষ্টা মা'র সুঠাম দ্বিভুজা মূর্ত্তি, বর্ণ কতকটা কৃষ্ণাভ। বামে মহাদেব দাড়াইয়া আছেন। পূজারী শ্রীআশুতোষ গিরি গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মা'র প্রাচীনতা বা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, মন্দির দেড় শত বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেনেটের বিশালাক্ষী ও এখানকার বিষহরী দেবী দুই ভগিনী।

এই স্থান হইতে কিছু দূরে নীলের কারখানার ধ্বংসাবশেষ। লোহার পাটি লাগান হৌজগুলি ও ইষ্টকনির্ম্মিত চিমনীটি এখনও অভগ্ন অবস্থাতেই আছে, সর্ব্বশুদ্ধ দুই সারিতে ১৬টি চৌবাচ্চা আছে। স্থানীয় লোকরা ইহাকে যোল কুঠীও বলে। এখানে স্থানান্তরে আরও দুইটি ছোট ছোট কারখানার ভগ্নাবশেষ আছে।

মেঘসার গ্রাম ঠিক দ্বারবাসিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে, অথচ মহানাদের সীমারও বাহিরে অবস্থিত। বিষহরী মাতার পূজারীর নিকট হইতে সংগৃহীত নামের মধ্যে মেঘসারের শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষের নামটি পাইয়াছিলাম। বৃষ্টির সময় তাঁহার বাটীতে আশ্রয় পাইলাম। ঘোষজা মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের পল্লী ও দ্বারবাসিনীর সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ করিলাম। মহানাদের রাজা অর্দ্ধরেন্দ্রের পত্নী মেঘমালার ঋতুস্নানার্থ মেঘসার নামক সুবৃহৎ সরোবরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার নাম হয় মেঘ-সরোবর এবং তাহা হইতে ক্রমে মেঘসারে পরিণত হইয়াছে। এরূপ বিস্তৃত সরোবর সচরাচর দেখা যায় না। শুনিলাম, ইহার জলকর ৩ শত ৬০ বিঘা।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া এ বেলার মত আমাদের পল্লী-ভ্রমণের আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু যাওয়া চাই-ই। তাই ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই মাঠের মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যথাসময়ে সাটিথানে আমাদের বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য বড় গামলা—দেউলপাড়া

বাসায় কাগজ প্রস্তুত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সত্যই এক সময় দেউলপাড়া ও পাশের গ্রামগুলিতে বিস্তর দেশী কাগজ তৈয়ারী হইত এবং সেই সব কাগজই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিক্রীত হইত। এখন আর তাহার কিছুই নাই, এক জন মাত্র লোক আছে, তাহার নাম মসিবর আলী। সে কাগজ প্রস্তুত করে। তাহার বাড়ীর উঠানে দুই তিনটা প্রকাণ্ড গামলা ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। বর্ষার জন্য এখন কায বন্ধ আছে।

গ্রামে এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলে অর্দ্ধপ্রোথিত বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে শুনিলাম। মূর্ত্তিটির মালিক মল্লিক, ঘোষ প্রভৃতি গ্রামবাসীদের পুরোহিত শ্রীযুক্ত কেনারাম চক্রবর্ত্তী। তাঁহার নিকট মূর্ত্তিটি তুলিয়া লইয়া যাইবার অনুমতি লইয়া আমরা আহারান্তে সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন কতকগুলি লোক উপস্থিত ছিল; তন্মধ্যে দুই তিন জন সাঁওতাল কুলীও ছিল। আমাদিগকে তাহারা দেবতার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিয়া মূর্ত্তিটি তুলিয়া দিতে সম্মত হইল। একটু মাটী সরাইতেই দেখা গেল, দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি মোটা অশ্বত্থ-শিকড় অচ্ছেদ্যবন্ধনে মূর্ত্তিটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বহুক্ষণ যাবৎ অশ্বত্থ-মূল কর্ত্তন করিয়া মূর্ত্তি উত্তোলন করা হইল। মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, উচ্চে প্রায় সাড়ে ৩ ফুট, নাকমুখের কাছটা, নীচের হাত দুইটা, উভয় পার্শ্বের লক্ষ্মী ও সরস্বতী-মূর্ত্তি—স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। পদতলে কতিপয় ছোট ছোট মূর্ত্তি ছিল বেশ বুঝা গেল; কিন্তু তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল, কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট জানিলাম, প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ পার্শ্বস্থিত

পুষ্করিণী হইতে তুলিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন। একটি বৃদ্ধা বলিলেন, ত্রিশ সালের বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তিনি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। উহা দেখিয়া মনে হয়, উহা বহু পুরাতন এবং মুসলমান অত্যাচারেই উহার অঙ্গহীন অবস্থা ঘটিয়াছে।

সাটীথান গ্রামটিও প্রাচীন। সতীস্থান হইতে সাটীথান নাম হইয়াছে। গ্রামের প্রান্তবাহিনী অধুনালুপ্ত কেদারমতী নদীতীরে শ্মশানে পূর্ব্বকালে সতীদাহ হইত। এই স্থানে শেষ যে সতীর কথা জানা যায়, তাহা এখানকার চক্রবর্ত্তী ও ঘোষ-বংশীয়া দুইটি মহিলা। আজও এখানকার সেই শ্মশানভূমিকে লোক আগুনখাকীর মাঠ বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই গ্রামে ঘোষ, চক্রবর্ত্তী, মল্লিক প্রভৃতি কতিপয় বহু বর্দ্ধিষ্ণু বংশের বসতি ছিল, এবং গোপাদি বহু লোকের বাস ছিল। এখানে পূর্ব্বে লোক সম্ভ্রমের সহিত এখনও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ন্যায়রত্ন (চক্রবর্ত্তী), ভজকৃষ্ণ মল্লিক, গোকুলকৃষ্ণ ও লালচাঁদ ঘোষের নাম করেন। এখনও রামচরণ ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত অতি সুন্দর কারুকার্য্যময় পুরাতন শিবমন্দিরদ্বয়, তাঁহাদের পূজার দালান, মল্লিক মহাশয়দের বৃহৎ বৈঠকখানা বাটী প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য

ঘোষদের মন্দির—সাটীথান

দিতেছে। ঘোষেদের মন্দিরে এখন দেবসেবা নামে মাত্র হইয়া থাকে। লালচাঁদ ঘোষের উদ্যোগেই রুদ্রাণীর শ্রীশ্রীকালী ও দ্বারবাসিনীর শ্রীশ্রীবিষহরী প্রতিষ্ঠিত হন এবং কুচপালার মোগল সাহেব দেবসেবার জন্য দেবত্র দান করিয়া যান।

গ্রামের অবস্থা এখন অতি শোচনীয়। বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ষ্টেশনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দুই রাত্রি পল্লীবাসের পর দ্বারবাসিনী

শাটীথান হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এইখানে আমাদের মালপত্র রাখিয়া গ্রামমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। *

দ্বারবাসিনী

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এখানে সদ্গোপবংশীয় দ্বারপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান্ হিন্দু ছিলেন. এই কারণে বৌদ্ধপিতার বিরাগভাজন হওয়ায় এখানে আসিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। † তাঁহার নাম হইতেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। শুনা যায়, মুসলমানদের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহারা সপরিবারে পুড়িয়া মরেন। এই রাজার পরাজয় সম্বন্ধেও মহানাদের রাজার যুদ্ধে পরাজয়ের মত একটি গল্প আছে। এখানেও জীয়ৎকুণ্ড নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার জল-সেচনে

জীয়ৎকুণ্ড—দ্বারবাসিনী

* সাটীথানের অধিকাংশ কথাই শ্রীযুক্ত বেচারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

† হুগলী।

মৃতব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিত বলিয়া প্রবাদ যোগসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুর কৃপায় এই পুষ্করিণীর জলে মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি জন্মিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাণ্ডুয়া-বিজেতা সাহসুফি এখানে যুদ্ধকালে যবন সৈন্যের পতনজনিত যুদ্ধে জয়াশা না দেখিয়া অনুসন্ধানে এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন পুষ্করিণীর কথা অবগত হয়েন। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত এক মুসলমান ফকীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া স্নানের ছলে পুষ্করিণীতে গোমাংস নিক্ষেপ করায় ইহার দৈবশক্তি লোপ পায়। তাহারই ফলে তিনি যুদ্ধ-জয়ে সমর্থ হন। তখন হিন্দু রাজাকে নিধন করিয়া মুসলমানরা সিংহাসন লাভ করেন। তদবধি দ্বারবাসিনীর হিন্দু-রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও এতদঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, এই জলাশয়ে স্নান করিলে মৃতবৎসা-দোস দূর হয়। * বেণেপাড়ার মধ্যে এই পুষ্করিণীর অনতিদূরে ধনপোতা নামে একটি স্থান আছে। কথিত আছে, এই স্থানেই রাজার কোষাগার ছিল। ইহা এখন দত্তদের সম্পত্তি। শুনা যায়, এক সময় এই স্থান খনন করিয়া কতিপয় মুদ্রাপূর্ণ ঘড়া পাওয়া গিয়াছিল।

রাজবাড়ীর কোন চিহ্নই এখন আর দেখা যায় না। জলার কাছে বড় চিপি ও ছোট চিপি নামে দুইটি অনুচ্চ ভূমিখণ্ড দেখা যায়। এখানকার লোক এই স্থানটাকেই রাজপ্রাসাদ ও সভা-গৃহের স্থান বলিয়া অনুমান করেন। পূর্ব্বে স্থানটি অনেকটা উচ্চ ছিল, কুম্ভকাররা কাযের জন্য এখানকার মাটী লইয়া যাওয়ায় ক্রমে স্থানটি সমতল হইয়া আসিয়াছে। রাজার সাত রাণীর নামে ছোট ছোট যে সাতটি পুষ্করিণী এখনও দেখা যায়, উহা

বরাহমূর্ত্তি—দ্বারবাসিনী

অনেকে মহানাদ ও দ্বারবাসিনীর রাজা এক জনই ছিলেন এবং একটি জীয়ৎকুণ্ড ছিল মনে করেন। এ কথা সত্যও হইতে পারে।

অনতিদূরেই অবস্থিত। হাটতলার কাছে কাছারী-বাড়ীর পার্শ্বে এক বৃহৎ অশ্বত্থ-মূলে একটি পাষাণময় অভগ্ন বরাহমূর্ত্তি ও দুইটি অন্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। এগুলি খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বরাহমূর্ত্তিটি এখন ষষ্ঠীঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ১৮৯৪ খৃঃ রাধারমণ সেনের সম্পত্তি যাহা, কোয়া নামক জলাশয় হইতে উহা পাওয়া গিয়াছিল। রাজার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির বহু পরিচয় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কথা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এই নগর যে পূর্ব্বে পরিখা-বেষ্টিত ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

দ্বারপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত দ্বারিকাচণ্ডী নামে দেবী এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। * তাঁহার মন্দির বা দেবীমূর্ত্তির আর

বিষহরীর মন্দির—দ্বারবাসিনী

কোন চিহ্নই নাই। যে স্থানে এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে স্থানকে এখনও দ্বারিকাচণ্ডী বলে। লোকের বিশ্বাস, তথাকার জমীতে লাঙ্গল দেওয়া বা চাষ আবাদ করা যায় না এবং অনেকে বলেন, সময় সময় সে স্থান ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত হয় এবং তথা হইতে শঙ্খধ্বনি শুনা যায়। বীরভূমের মল্লার-পুরের নিকট এই দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া শুনিলাম।

এ গ্রামেও কুচপালার নবাব-বংশের এক নবাব ছিলেন, তাঁহাকেও লোক মোগল সাহেব বলিত। তাঁহার হাতিশালা, প্রাসাদ, দুর্গ, গঞ্জগিরি পুকুর প্রভৃতির চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

যে কয়টি পল্লী দেখিলাম, তাহা হইতে দ্বারবাসিনীর কিছু পার্থক্য আছে। এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা ৫।৬ হাজার, তন্মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা অর্দ্ধেক আন্দাজ। বেশী দিনের কথা নহে, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে লোকের বাস যথেষ্ট ছিল। ১৮৬৩ অব্দের ম্যালেরিয়া মড়কেই গ্রাম ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

এই পল্লীভ্রমণ বৃথা হইল বলিয়া মনে হয় নাই। অন্য লাভের মধ্যে প্রাচীন পাষাণ মূর্ত্তিটি পাওয়া ব্যতীত আর একটি বড় লাভ করিয়াছি,—সেটি আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের ভিটা-দর্শন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

* কেহ কেহ এই দেবীর নাম দ্বারবাসিনী বলিয়া থাকেন।
—হুগলী।

মানুষ না বাঘ ?

(সত্য ঘটনা)

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ-নগরের সেন্‌ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেশনটি সর্ব্বদা যাত্রিগণের কোলাহলে মুখরিত, কিন্তু প্রতিদিন অপরাহ্নে এই ষ্টেশনে যাত্রি-সংখ্যা এরূপ অধিক হইয়া থাকে যে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে ট্রেণের পর ট্রেণ ছাড়িবার প্রয়োজন হয়। কারণ, সেই সময়ে নানা শ্রেণীর লোক নগর হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া তাহাদের পল্লীভবনে প্রত্যাগমন করে। সহরতলীর যে সকল অধিবাসী পার্থ-নগরের বিভিন্ন আফিসে চাকরী করে, তাহারাও আফিসের ছুটীর পর এই সময় বাড়ী ফিরিয়া থাকে। তাহাদের উৎসাহ, প্রফুল্লতা, ব্যস্তভাব দেখিলে আনন্দ হয়। মনে হয়, ষ্টেশনটি উৎসব-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই সেন্‌ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেশনে এইরূপ দৃশ্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। সে দিনও অপরাহ্নে বহুসংখ্যক ট্রেণ যাতায়াত করিতে লাগিল। অপরাহ্ন ৩টা ২০ মিনিটের সময় পার্থের পূর্ব্ব-দিকস্থ সহরতলী মেল্যাণ্ডস হইতে একখানি ট্রেণ এই ষ্টেশনে আসিবার কথা। সুদীর্ঘ ট্রেণখানি ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। ট্রেণের ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান গাড়ীর ফুট-প্লেটের উপর দাঁড়াইয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত। অল্পকাল পরে ট্রেণ থামিল; কুলীরা মালের সন্ধানে আরোহীদের কামরার দিকে ছুটিল; আরোহীরা বিভিন্ন কামরা হইতে ব্যস্তভাবে নামিতে লাগিল।

একটি কামরা হইতে প্রায় পনেরো বৎসর বয়সের একটি বালক অবসন্ন-দেহে কম্পিত-পদে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া আসিল। তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, এবং আহত স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া তাহার কপাল, গাল, মুখ প্লাবিত করিতেছিল। তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট, তখন তাহার স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিবারও শক্তি ছিল না। সে যে কামরা হইতে নামিয়াছিল, সেই কামরায় প্রবেশ করিবার জন্য তাহার সম্মুখস্থ কয়েক জন লোককে অস্ফুট-স্বরে অনুরোধ করিল।

দুই জন লোক তৎক্ষণাৎ সেই কামরায় প্রবেশ করিল। কামরার ভিতর তাহারা যে দৃশ্য দেখিতে পাইল—তাহা অতি ভীষণ! তাহারা সেই দৃশ্য দেখিয়া দুই এক মিনিট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কামরার মেঝের উপর একটি যুবক মৃতপ্রায় পড়িয়া ছিল, এবং তাহার দেহ হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছিল। মেঝের স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া গিয়াছিল!

লোক দুইটি সেই যুবককে অতি ধীরে গদীর উপর তুলিল, তাহারা তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞান ছিল, সে অতি কষ্টে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ঐ ছেলেটিকে দেখিও।"—সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না; এই কথাটি বলিবার জন্যই যেন সে জীবিত ছিল।

এই যুবক পূর্ব্বোক্ত আহত বালকটিকে দেখাইয়াই এ কথা বলিল। বালকটির অবস্থা দেখিয়া দর্শকগণের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছিল; তাহাকে সাহায্য করিবার লোকের অভাব হইল না। সকলেই তাহার পরিচয় ও বিপদের কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইল। বালক সংক্ষেপে তাহার ও তাহার সঙ্গীর পরিচয় দিল। সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহার নাম ডগ্‌লাস্ ফাভাস্, এবং তাহার সঙ্গীর নাম জ্যাক গ্রেভিল। তাহারা উভয়েই ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মেল্যাণ্ডস্ শাখার কর্ম্মচারী। তাহারা সেই ট্রেণে মেল্যাণ্ডস্ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; তাহাদের সঙ্গে

ব্যাঙ্কের কিছু টাকা ছিল, এবং সেই টাকাগুলি তাহারা পার্থের সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার পাইয়াছিল। এই টাকাই তাহাদের বিপদের কারণ! তাহাদের এক জন সহযাত্রী গ্রেভিলকে গুলী করিয়া টাকার ব্যাগটি লইয়া ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছে।

বালক ইহার অধিক আর কোন কথা তখন বলিতে পারিল না। কয়েক মিনিট পরে তাহাকে ও তাহার মুমূর্ষু সঙ্গীকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইল।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ অদূরবর্ত্তী সেন্‌ট্রাল পুলিস ষ্টেশনে প্রেরিত হইলে এক দল ডিটেক্‌টিভ এই দুর্ব্বৃত্তের সন্ধানে বাহির হইল।

এক ঘণ্টার মধ্যে বালকটির মাথা ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। সে হাঁসপাতালের শয্যায় শয়ন করিয়া ডাক্তারের নিকট বলিল, "আমরা আজ বেলা ৩টার সময় মেল্যাণ্ডস্ ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটি ব্যাগ ছিল, তাহাতে ব্যাঙ্কের যে টাকা ছিল, তাহার পরিমাণ এক শত চুয়াত্তর পাউণ্ড এগার শিলিং। আমরা ষ্টেশনে আসিয়া যখন ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় হোপ নামক একটি লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমাদের ব্যাঙ্কের সহিত এই লোকটির কারবার করিবার কথা চলিতেছিল। ষ্টেশনে বসিয়া সে আমার সঙ্গী জ্যাক গ্রেভিলের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিলে আমরা যে কামরায় উঠিলাম, হোপও সেই কামরায় উঠিল। আরও দুই দিন বৈকালের ট্রেণে সে এই ভাবে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু সেই দুই দিনই আমাদের কামরায় অন্য আরোহী ছিল। আজ আমাদের কামরায় আমরা দুই জন ও হোপ ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না।

"হোপ সেই কামরায় গ্রেভিলের সম্মুখস্থ বেঞ্চির এক কোণে বসিয়াছিল। আমি কামরার অন্য প্রান্তে বসিয়াছিলাম। আমি জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলাম। হোপ এক মিনিটের জন্যও মুখ বন্ধ করে নাই, সে গ্রেভিলের কাণের কাছে 'বক্ বক্' করিয়া কি সব বলিতেছিল। এই ভাবে আমরা ইষ্ট পার্থ ষ্টেশন পার হইলাম। হোপ তখন গ্রেভিলকে এরোপ্লেনে উড়িতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল; সেই সময় সে হঠাৎ একটা পিস্তল বাহির করিয়া গ্রেভিলের বুকে গুলী মারিল! সে যে এই কার্য্য করিবে, তাহা পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে পারি নাই; এ সম্বন্ধে সে কোন কথা বলে নাই। গুলী খাইয়া গ্রেভিল চীৎকার করিয়া বলিল, 'উঃ, আমাকে গুলী করিয়াছে!' গ্রেভিল তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া হোপ পুনর্ব্বার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল। গ্রেভিল এবার গাড়ীর মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"গ্রেভিল মেঝের উপর পড়িলে হোপ আমার দিকে ফিরিয়া পিস্তল তুলিল; 'খট' করিয়া পিস্তলের ঘোড়া পড়িবার শব্দ শুনিলাম, কিন্তু পিস্তলের গুলী বাহির হইল না। তখন সে পিস্তলটা সোজা করিয়া ধরিয়া হাতের তলায় দুই-বার ঠুকিয়া লইল, তাহার পর পুনর্ব্বার আমাকে গুলী করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও গুলী বাহির হইল না। সে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিয়া আমি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম; কিন্তু তাহাকে কায়দা করিতে পারিলাম না; কারণ, সে আমার অপেক্ষা অনেক অধিক বলবান্। আমি তাহাকে আক্রমণ করিলে সে তাহার পিস্তলের গোড়া দিয়া আমার মাথায় হাতুড়ি ঠুকিতে লাগিল। আমি সেই আঘাতে জ্যাক গ্রেভিলের পাশে পড়িয়া গেলাম। সেই সময় ট্রেণও সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িল।

"কয়েক সেকেণ্ড পরে আমি একটু সামলাইয়া লইয়া চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, হোপ কামরার একটি দরজা অল্প খুলিয়া সেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে; সে সেখানে দাঁড়াইয়া ট্রেণ থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার হাতে আমাদের সেই ব্যাগটা দেখিতে পাইলাম। ট্রেণের গতি হ্রাস হইলে সে সেই দরজা দিয়া রেল-লাইনের উপর নামিয়া সরিয়া পড়িল।"

বালকের শয্যাপ্রান্তে কয়েক জন ডিটেক্‌টিভও উপস্থিত ছিল, তাহারা সকল কথা শুনিয়া সেই ভীষণপ্রকৃতি, শোণিত-লোলুপ রাক্ষসটাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

হাঁসপাতালে আসিবার অল্পকাল পরই হতভাগ্য জ্যাক গ্রেভিলের মৃত্যু হইল। দস্যু তাহার হৃৎপিণ্ডকে উদ্দেশ করিয়াই গুলী ছুড়িয়াছিল; কিন্তু তাহা প্রায় এক ইঞ্চি দূরে

বিদ্ধ হইয়াছিল। এ জন্য গুলী তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার মৃত্যু হয় নাই; আঘাতের পর প্রায় এক ঘণ্টা সে জীবিত ছিল। জ্যাক গ্রেভিল আদর্শচরিত্র যুবক, সহৃদয়, শিষ্ট, কর্ত্তব্য ও ব্যায়ামকুশল; তাহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া হত্যা করা হইল!

ডিটেক্‌টিভরা হাঁসপাতাল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ফাভাসকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহারা জানিতে চাহিয়াছিল, সে কি শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রি ৯টার সময় পার্থ ষ্টেশনে গিয়া ট্রান্স্ অষ্ট্রেলিয়ান ট্রেণে উঠিতে পারিবে? তাহাদের আততায়ী হোপকে সেই ট্রেণে দেখিতে পাওয়া যাইতেও পারে, দেখিলেই সে তাহাকে চিনিতে পারিবে। বালক এই প্রস্তাবে সম্মতি, এমন কি, ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। সে বলিল, তাহার সহযোগীর হত্যাকারীকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য সে সকল কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত আছে।

ইতিমধ্যে সেণ্ট্রাল পুলিস ষ্টেশনে পুলিসের অধ্যক্ষ কর্নেল তাঁহার সহকারিগণের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহারা কোন কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েকটি লোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন; তাহারা হত্যাকারীকে রেলওয়ের আঙ্গিনার ভিতর দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল। হত্যাকারী জ্যাক গ্রেভিলকে দুইবার গুলী মারিবার পর গ্রেভিল যখন পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় হত্যাকারী তাহার সোনার ঘড়ি-চেন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিলেও পলায়নকালে তাহার হাত হইতে তাহা খসিয়া পড়িয়াছিল; সেই ঘড়ি-চেনও ঐ লোকগুলি কুড়াইয়া লইয়াছিল।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া পুলিস সিদ্ধান্ত করিল, হত্যাকারী স্থানীয় লোক নহে, সে বাহিরের লোক। এই জন্য পুলিস স্থানীয় বদমায়েস ও দাগীদের ভিতর হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল না।

পার্থের ভিতর হইতে দস্যু-তস্করদের দূরদেশে পলায়নের তিনটি মাত্র পথ আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারযোগে পলায়নের একটি পথ; দ্বিতীয় ট্রান্স্ অষ্ট্রেলিয়ান ট্রেণ, তাহা সপ্তাহে তিন দিন পার্থ রেল ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার নিয়ম; তৃতীয় পথ দিয়া অশ্বে, মোটরকারে বা পদব্রজে ভিন্ন এলাকায় যাওয়া যায়।

পার্থ-নগরের বাহিরে বড় খড় কাঠের গোলা এবং গমের পালা আছে; অপরাধী স্থানীয় লোক হইলে ধরা পড়িবার ভয়ে সেখানে লুকাইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অপরাধী পূর্ব্বদেশ হইতে বা সমুদ্রপথে আসিয়া থাকিলে অর্থাৎ 'পরদেশী' হইলে, সেই সকল স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া পুলিসকে প্রতারিত করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে পারে না। বিদেশী অপরাধী পুলিসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া পুলিসের অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত করিলেন—হত্যাকারী সেই রাত্রিতেই এক্সপ্রেস ট্রেণে দূরদেশে পলায়নের চেষ্টা করিবে।

তদনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করা হইল; গী ও ব্লাইট নামক দুই জন ডিটেক্‌টিভকে আদেশ করা হইল, তাহারা আহত বালক ফাভাসকে সঙ্গে লইয়া ট্রান্স্ অষ্ট্রেলিয়ান ট্রেণে অপরাধীর সন্ধান করিতে যাইবে; এতদ্ভিন্ন আরও দুই জন ডিটেক্‌টিভ মোটরকারে ৬৬ মাইল দূরবর্ত্তী নর্দ্দাম নামক স্থানে প্রেরিত হইল। নর্দ্দাম ট্রান্স্ অষ্ট্রেলিয়ান রেলপথেরই একটি ষ্টেশন। তাহাদিগকে আদেশ করা হইল, তাহারা সেই ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেণের প্রতীক্ষা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের যে সহযোগিদ্বয় ট্রেণে যাইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। গ্রেভিলের হত্যাকারী সেই পথে এক্সপ্রেস ট্রেণে পলায়নের চেষ্টা করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এই ভাবে ফাঁদ পাতা হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাত্রি ৯টার সময় ট্রান্স্ অষ্ট্রেলিয়ান এক্সপ্রেস ট্রেণ পার্থ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করে। রাত্রি ৯টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আহত ফাভাসকে গোপনে ষ্টেশনে আনিয়া ট্রেণের একটি ঘুমাইবার কামরায় (স্লিপিং কম্পার্টমেণ্ট) লুকাইয়া রাখা হইল। দুই জন ডিটেক্‌টিভ অদূরে বসিয়া রহিল।

৯টার সময় ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে, সেই ডিটেক্‌টিভদ্বয় 'করিডরের' সাহায্যে সেই ট্রেণের প্রত্যেক কামরা পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপরাধীকে সনাক্ত করিবার জন্য ফাভাস তাহাদের সঙ্গে কামরায় কামরায় ঘুরিতে লাগিল। কয়েকখানি কামরা পরীক্ষা করিয়া তাহারা অপরাধীর সন্ধান না পাইলেও অবশেষে একটি

কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ফাভাস সভয়ে পশ্চাতে সরিয়া গেল এবং ডিটেক্‌টিভদ্বয়কে মৃদুস্বরে বলিল, "ঐ যে সে!"

ডিটেক্‌টিভরা কামরার বারান্দায় ফাভাসের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা সেই কামরার ভিতর মাথা বাড়াইয়া একটি যুবককে দেখিতে পাইল। যুবকটি রূপবান্, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল, বয়স কুড়ি বৎসর অতিক্রম করে নাই বলিয়াই তাহাদের মনে হইল। তাহার মুখাকৃতিতে রূঢ়তার চিহ্নমাত্র ছিল না। সে যে নিষ্ঠুর নরহন্তা, তাহার মুখ দেখিয়া এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইত না।

ডিটেক্‌টিভদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিল না, তাহাদের ব্যস্ততা প্রকাশেরও প্রয়োজন ছিল না। ফাভাস অপরাধীকে সনাক্ত করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার আততায়ী ও বন্ধুহন্তাকে সম্মুখে দেখিয়া এরূপ বিহ্বল হইল যে, ডিটেক্‌টিভরা সর্ব্বাগ্রে তাহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা আবশ্যক মনে করিল।

বারো মাইল দূরবর্ত্তী মিডল্যাণ্ড জংসন ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে আহত ফাভাসকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া শুশ্রূষা-কারিণীদের হস্তে অর্পণ করিল। তাহারা একখানি দ্রুতগামী মোটরকার লইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা ফাভাসকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পার্থের হাঁসপাতালে রাখিতে চলিল!

ট্রেণ পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলে ডিটেক্‌টিভদ্বয় হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সেই কামরার অন্যান্য আরোহী আতঙ্কাভিভূত না হয় বা তাহারা কোন প্রকার অসুবিধা বোধ না করে—সে দিকেও তাহাদের দৃষ্টি রহিল। ডিটেক্‌টিভ গী ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি তোমার ব্যাগটা লইয়া ধূমপানের কক্ষে চল, তোমার সঙ্গে আমাদের কয়েকটা কথা আছে।"

ডিটেক্‌টিভ গীর অনুরোধ শুনিয়া হত্যাকারীর মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না; আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইবে না বুঝিয়া সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদের সঙ্গে চলিল। অনন্তর তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহার নাম আয়ান রেণী। ডিটেক্‌টিভদ্বয় তাহার ব্যাগটি খুলিয়া অপহৃত অর্থরাশির প্রায় সমস্তই তাহার ভিতর দেখিতে পাইল; ব্যাগের ভিতর একটি পিস্তলও পাওয়া গেল। এইভাবে ধরা পড়িয়া সে অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ট্রেণ আরও ৫৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নর্দ্দাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে রেণীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়া একখানি মোটরকারে তুলিয়া দেওয়া হইল। সেই গাড়ীখানি তাহার জন্যই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। ডিটেকটিভরা তাহাকে লইয়া সেই গাড়ীতে পার্থ নগরে প্রত্যাগমন করিল এবং হত্যাকাণ্ডের পর বারো ঘণ্টার মধ্যেই সেন্‌ট্রাল পুলিস ষ্টেশনের গারদে তাহাকে আবদ্ধ করা হইল। সে হত্যাকাণ্ডের পর ট্রেণ হইতে নামিয়া যে স্থান দিয়া পলায়ন করিতেছিল, এই থানা হইতে সেই স্থানের দূরত্ব দুই শত গজের অধিক নহে। কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিবার জন্য পুলিসের কর্ম্মচারিগণকে এক শত ছত্রিশ মাইল পথ সেই রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু ডিটেক্‌টিভরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইল না; অতঃপর তাহার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তদন্ত আরম্ভ হইল। তাহারা তাহার অপরাধের যে প্রমাণ পাইল, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল—'হোপ' ওরফে রেণী পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প স্থির করিয়া হতভাগ্য জ্যাক গ্রেভিলকে হত্যা করিয়াছিল; যাহার যৎসামান্য দয়া বা মনুষ্যত্ব আছে, সে কোন মানুষকে সেভাবে হত্যা করিতে পারে না। হত্যাকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র-প্রকৃতি ও শোণিত-লোলুপ! এই জন্যই ব্যাঘ্রের সহিত তাহার তুলনা করা হইল।

রেণী সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে দুই বৎসর পূর্ব্বে মেল-বোর্ণে গমন করিয়াছিল। সেখানে সে দুই বৎসর বাস করিবার পর পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের চারি সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে সে সেখানে আসিয়াছিল। সে যে জাহাজে এই শেষোক্ত স্থানে আসিয়াছিল, সেই জাহাজের নাম 'কারুলা।' সাত দিন তাহাকে জাহাজে বাস করিতে হইয়াছিল; জাহাজে তাহার অমায়িক ভদ্র-ব্যবহারে তাহার সহযাত্রীরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সে অনেকেরই বন্ধুত্ব-লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

সেই জাহাজে যাঁহাদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল,

তাঁহাদের মধ্যে একটি মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম মিসেস্ ওল্ডস্। মিসেস্ ওল্ডস্ তাহার অসাধারণ গুণগ্রামে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 'কারুলা' জাহাজ ফ্রিম্যাণ্টল্ নগরে উপস্থিত হইলে, তিনি রেণীকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। মিঃ ওল্ডস্ পত্নীর অভিপ্রায় অনুসারে রেণীকে পার্থের সহরতলীস্থিত তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রেণী তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কয়েক দিন পরে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই স্থানে রেণী তাঁহাদের সহিত পিস্তল সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছিল।

মিঃ ওল্ডস্ এক সময়ে সমর-বিভাগে চাকরী করিতেন, এ জন্য তাঁহার গৃহে সৈন্যদের ব্যবহার-যোগ্য একটি পিস্তল ছিল। মিঃ ওল্ডস্ কথায় কথায় সেই পিস্তলটি রেণীকে দেখাইয়াছিলেন। রেণী পিস্তলটি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল—এক দিন সে সেই পিস্তলটি তাঁহার নিকট ধার লইবে। এক সপ্তাহ পরে রেণী মিঃ ওল্ডসের নিকট হইতে পিস্তলটি লইয়া যায়; তাঁহাকে বলে, তাঁহার একটি বন্ধু শিকারে যাইবে, সে তাহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

রেণীর এই বন্ধুটি কাল্পনিক ব্যক্তি নহে। সেই যুবক নরউড হোটেলে বাস করিত; রেণীও পার্থে উপস্থিত হইয়া সেই হোটেলে বাসা লইয়াছিল। রেণী যে পিস্তলটি মিঃ ওল্ডসের নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছিল—সেই পিস্তলটির একটা দোষ ছিল। দুইবার আওয়াজের পর তৃতীয়বার সহজে তাহার ভিতর হইতে গুলী বাহির হইত না, তাহা নলের ভিতর বাধিয়া থাকিত। মিঃ ওল্ডস্ পিস্তলের এই দোষের কথা তাহাকে বলিলে—সে বলিয়াছিল, "তাহা হউক, উহাতেই আমার কায চলিবে।" বস্তুতঃ সে যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে পিস্তল সংগ্রহ করা তাহার অসাধ্য—ইহা সে জানিত। রেণী ধনবানের সন্তান বলিয়া বন্ধু-সমাজে আত্ম-পরিচয় দিলেও তাহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, পিস্তল কিনিবার সামর্থ্যও ছিল না।

পিস্তলটি সংগ্রহ করিয়া রেণী ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত যুবক-দ্বয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের দৈনিক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

অতঃপর সে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মেল্যাণ্ডস্-শাখার আফিসে উপস্থিত হইয়া 'টি,এ, হোপ' নামে আত্ম-পরিচয় দিল এবং সেখানে জানাইল—মেলবোর্ণের ব্যাঙ্কে তাহার অনেক টাকা গচ্ছিত আছে, সেই টাকার হিসাব সে মেল্যাণ্ডসের শাখা-ব্যাঙ্কে বদল করিয়া লইবে। গ্রেভিল এই শাখা-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল। মিঃ হোপের ন্যায় ধনাঢ্য মক্কেলের খাতির করিবার জন্য স্বভাবতঃই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। হিসাব বদলীর ছল করিয়া সে মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্কে যাইত এবং গ্রেভিলকে নানা মিথ্যা কথায় মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাকে হত্যা করিয়া ব্যাঙ্কের অর্থাপহরণই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কয়েক দিন ব্যাঙ্কে উপস্থিত থাকিয়া রেণী জানিতে পারিল, গ্রেভিল দৈনিক আমদানী টাকা লইয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে পার্থের মূল ব্যাঙ্কে জমা দিতে যায়। তাহার সহকারী ফাভাস্‌কেও সে সঙ্গে লইয়া থাকে। রেণী গ্রেভিলকে হত্যা করিয়া ব্যাগ সহ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে, ট্রেণ কখন্ কোন্ ষ্টেশনে কতক্ষণ থামে, কোন্ স্থান হইতে পলায়ন করা সুবিধাজনক—এই সকল বিষয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু অপরাহ্ণের সেই ট্রেণ সকল ষ্টেশনেই থামিত, এবং যাত্রীরা ক্রমাগত উঠা-নামা করিত। রেণী অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিদ্বয়কে হত্যা করিয়া তাহাদের টাকার ব্যাগ লইয়া চম্পট দানের উপযুক্ত সুযোগ—ট্রেণ যখন ইষ্ট পার্থ ও সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইবে—সেই সময়।

রেলপথের এই অংশটিই সে কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল মনে করিয়াছিল। নগরোপকণ্ঠে রেলপথের দুই পাশে জনবহুল কারখানার সংখ্যা অল্প নহে, সেই পথে ট্রেণ অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য হয়, তাহার উপর বিভিন্ন 'লেভেল ক্রসিং' পার হইবার সময় স্থানে স্থানে ট্রেণ অত্যন্ত ধীরে চলিয়া থাকে; বিশেষতঃ, মুর ষ্ট্রীটের 'ক্রসিং' পার হইবার সময় 'লাইন ক্লিয়ারে'র সঙ্কেত লইবার জন্য তাহাকে এক মিনিট থামিতে হয়।

রেণীর বাসস্থান নরউড হোটেল 'মুর ষ্ট্রীট ক্রসিং'এর অদূরে অবস্থিত। রেণী মনে করিয়াছিল, ট্রেণ সেই 'ক্রসিং'এ দাঁড়াইবামাত্র সে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে হোটেলে উপস্থিত হইবে; তাহার পর ট্রেণ যখন ব্যাঙ্কের

নিহত কর্ম্মচারীর মৃত-দেহ লইয়া সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে প্রবেশ করিবে, তাহার পূর্ব্বেই সে হোটেলের ভোজনাগারে বসিয়া পানাহার আরম্ভ করিতে পারিবে; সুতরাং সেই স্থানে নামিয়া পড়িলে সে নির্ব্বিঘ্নে হোটেলে প্রবেশ করিতে পারিবে, এবং দুর্ঘটনার সময় সে হোটেলে ছিল—ইহার সাফাই সাক্ষী সংগ্রহ করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

কিন্তু একটা ভয়ের কথা ছিল। রেণী ভাবিয়াছিল—ট্রেণ হইতে তাহার নামিবার সময় কোন কামরার আরোহী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহাকে দেখিতে পারে, এবং তাহাকে চিনিয়া রাখিয়া পুলিসের সম্মুখে সনাক্ত করিতেও পারে। চতুর রেণী এই অসুবিধা নিরাকরণের জন্ম কালো রবারের একটা লম্বা ও আ-গড়া 'ম্যাকিন্‌টোস' পরিধান করিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ মতলব আঁটিয়াই সেই নর-পিশাচ এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে জানিত, ঐরূপ ম্যাকিন্‌টোসে দেহ আবৃত করিলে পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারিবে না।

যে দিন অপরাহ্ণে সে গ্রেভিলকে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেও দুই দিন সে গ্রেভিলের সহিত এক কামরায় উঠিয়াছিল, এবং গ্রেভিলের সহিত গল্প করিতে করিতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু সেই দুই দিনই অপরাহ্ণের সেই ট্রেণে অন্যান্য আরোহী থাকায় সে গ্রেভিল ও তাহার সঙ্গীকে গুলী করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু রেণী উপর্য্যুপরি দুই দিন বাধা পাইয়াও ভগ্নোৎসাহ হইল না; সে বাঘের মত সহিষ্ণুতা সহকারে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তৃতীয় দিন সুযোগ উপস্থিত হইল।

সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন। সে সময় বুঝিয়াই গ্রেভিলকে গুলী করিল; দুইবার গুলীর পর পিস্তল চলিল না দেখিয়া সে অধীরভাবে পিস্তলের উল্টা দিক্‌ দিয়া গ্রেভিলের সঙ্গী ডগলাস্‌ ফাভাসের মাথা ফাটাইয়া, গ্রেভিলের ঘড়ি-চেন ছিঁড়িয়া লইল, এবং টাকার ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া, সেই কামরার দ্বার খুলিয়া ট্রেণের গতি-হ্রাসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে জানিত, মুর ষ্ট্রীট ক্রসিংএর কাছে আসিয়া ট্রেণ থামিবে, এবং সেই সুযোগে সে নীচে লাফাইয়া পড়িবে।

কিন্তু সে দিন মুর ষ্ট্রীট ক্রসিংএ ট্রেণ থামিল না। সে দিন এঞ্জিনচালক ট্রেণ আনিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা এক মিনিট বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার উপর পূর্ব্ব হইতেই 'লাইন ক্লিয়ার' দেওয়া ছিল; সুতরাং রেণী সেখানে নামিতে পারিল না; ট্রেণ সবেগে ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল দেখিয়া কামরার দরজায় দাঁড়াইয়া সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; অবশেষে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রেল ষ্টেশনের আঙ্গিনার ভিতর আসিয়া গতি হ্রাস করিলে সেই স্থানে সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল এবং প্রায় কুড়ি জন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সম্মুখ দিয়া রেলের আঙ্গিনার ভিতর দৌড়াইতে লাগিল। প্রায় আধ মাইল দৌড়াইয়া সে রেলের আঙ্গিনা পার হইল। সে সম্মুখেই একটি ফটক দেখিতে পাইল, সেখানে তখন প্রহরী ছিল না। রেণী তাড়াতাড়ি সেই ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

এইভাবে তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলেও রেণী 'ঘাবড়াইল' না। সে অচঞ্চলভাবে তাহার হোটেলে ফিরিয়া আসিল; কেহই তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল না। সে চা পান করিয়া হোটেলের বিলিয়ার্ড টেবলে বিলিয়ার্ড খেলিতে আরম্ভ করিল। চমৎকার খেলিল! বিলিয়ার্ড বল লক্ষ্য করিয়া দণ্ডপ্রয়োগের সময় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হাত কাঁপিল না।

অতঃপর সে বন্ধুগণের নিকট বলিল, সেই রাত্রির এক্সপ্রেসেই সে পার্থ ত্যাগ করিবে। কিন্তু পার্থ হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে অতিরিক্ত চালাকি করিতে গিয়াই সে ফাঁদে পড়িল।

হত্যাকাণ্ডের অল্পকাল পরে সে জানিতে পারিল, তাহার কীর্ত্তিকাহিনী সম্বন্ধে নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিস চতুর্দ্দিকে খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছে। তখন তাহার মনে হইল, তাহার বন্ধুগণকে রেল ষ্টেশনে আহ্বান করিয়া একটু আড়ম্বরের সঙ্গেই তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে; তাহা হইলে পুলিস বুঝিবে, সে বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত লোক; সুতরাং তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে হোটেলের অধিকাংশ পরিচিত লোক সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, এমন কি, মিঃ ওল্ডস্‌ ও তাঁহার পত্নীকে তাঁহাদের সহরতলীর বাড়ীতে টেলিফোন করিয়া তাঁহাদিগকেও ষ্টেশনে

আসিয়া তাহাকে বিদায়দান করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারাও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

রেণীকে বিদায়দানের জন্য ষ্টেশনে মহা সমারোহ! সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ স্থূলকায় ভদ্রলোক সাধারণ পরিচ্ছদে সেই 'আনন্দ-বিদায়ে'র দলে প্রবেশ করিল এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখ দেখিতে লাগিল। রেণী তাহাকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভদ্রলোকটি কে?"

মিঃ ওল্ডস্ হাসিয়া বলিলেন, "ও ডিটেক্‌টিভ গী। এই ট্রেণের অন্য কোন আরোহীর সন্ধানে আসিয়াছে বোধ হয়।"

ডিটেক্‌টিভ গী জনতার ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইল, রেণী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত-মনে বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া ট্রেণের একটি কামরায় প্রবেশ করিল। তাহার পর সে কিরূপে ধরা পড়িল, পূর্ব্বেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। রেণী যদি ঐরূপ আড়ম্বর না করিয়া একাকী আসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে ট্রেণে উঠিত, তাহা হইলে সে হয় ত নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ অমোঘ!

বিচারে রেণীর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ১৯২৬ অব্দের ২রা আগষ্ট ফ্রিম্যাণ্টনের কারাগারে তাহার ফাঁসী হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অবেলায়

অস্ফুট কৌমারে,
মনে আছে—কত ভালো, কি যে ভালো লাগিত তাহারে!
খেলা খেলামাত্র নহে, ভালো লাগা আর তার খেলা—
দুয়ে এক সাথে মিশে' সুখ-স্বপ্ন-শৈশবের বেলা
কখন্ উঠিল ফুটি ধীরে ধীরে যৌবনের তীরে,—
আজিকে সে সব কথা অযাচিত মনে পড়ে ফিরে!
ভালো লাগা ভালো ক'রে না ফুটিতে ভালোবাসা মাঝে—
—সহসা সে খেলা ফেলি' যেতে হ'ল অপ্রার্থিত কাযে!

থেকে থেকে শুনি তা'র পরে কার ইতিবৃত্তকথা—
নির্ব্বাক্ বেদনাভরা অভিশপ্ত বিচিত্র বারতা;
ব্যথা তার দূর থেকে জলে-ভরা সেই দৃষ্টি ভরি'
এ পারে তাকায় যেন কবেকার কোন্ কথা স্মরি'!
যা-কিছু ধরিয়াছিল, জীবনের আশ্রয় করিয়া,
শুনিলাম, একে-একে তারে ফেলি' গিয়াছে সরিয়া,
সন্ধ্যার ছায়ার মত; জনশূন্য জীবনের ধারে
দুটি তট পূর্ণ ক'রে ভ'রে এল নিশীথ-আঁধারে!
সেথায় যায় কি শোনা ঝিল্লী-স্মৃতি অতীত কালের—
দুচারিটি রাঙ্গা সূতা—শতচ্ছিন্ন জীবন-জালের!

গিয়াছে যৌবন;
কায়া শুধু ছায়ামাত্র—কঙ্কালের দীর্ণ আবরণ
উপহাস করে আজি লাবণ্যের ললিত হিল্লোলে,
অতীতের স্বপ্ন বলি'—আসন্ন এ মরণের কোলে!
শুধু আছে সেই চক্ষু—দৃষ্টি যার যৌবন-অতীত,
কুলায় আশ্রয়-প্রার্থী—ক্ষুদ্র পাখী ঝঞ্ঝা-ঝড়ে ভীত।
পুষ্পগন্ধ সম যেন—কোথা হ'তে চকিত নিমেষে
ফিরায় শৈশব তীরে—ব্যথা পারে—পার হয়ে এসে!

আজ যদি বলি,
ওগো মোর স্বপ্নসখি—তোমারি লাগিয়া কৃতাঞ্জলি
বসিয়া রয়েছি আমি সেই একা, এই খেয়া-ঘাটে
সমাসন্ন সন্ধ্যাতীরে; এবারের অভিনয়-নাটে
হয়নি মোদের ঠাঁই; জীবনের যবনিকা-পারে
এসেছে যাত্রার ডাক, আজি ওই অন্ধ পারাবারে!
পার করো, পার করো ও আঁখির অমৃত আলোকে
হে মোর নিঃসঙ্গ সঙ্গী! এ ভিক্ষা কি অমরীর চোখে
ফিরিবে নিষ্ফল আজি ব্যর্থতার বিড়ম্বনা-মাঝে?
পার করো, পার করো—শোন ঐ শেষ ঘণ্টা বাজে॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব

মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের (২৪-৪১) আঠারটি অধ্যায় নিষ্কাশিত করিয়া যেমন ভগবদ্গীতা নামে পৃথক্ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ মার্কণ্ডেয়-পুরাণের (৭৪-৮৬) তেরটি অধ্যায় নিষ্কাশনপূর্ব্বক দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী নামে পৃথক্ গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আ-হিমাচল আ-কুমারিক সমগ্র ভারতে বহুকাল হইতে হিন্দুর গৃহে চণ্ডীপাঠের প্রচলন আছে। হিন্দুরা গীতার ন্যায় চণ্ডীকেও অতি পবিত্র গ্রন্থ মনে করেন। চণ্ডীদেবীর নিজ মুখের উক্তি—

> "তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
> শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥"

একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডী-শ্রবণের মত স্বস্ত্যয়ন আর নাই।

এই জন্যই গৃহস্থগণের নিকট গীতার অপেক্ষাও চণ্ডীর আদর ও সম্মান অধিক। গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং উহা মুক্তিকামী সন্ন্যাসীদিগেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। গৃহস্থমাত্রেই সকাম; চণ্ডীতে সকাম ও নিষ্কাম, দ্বিবিধ কর্ম্মই উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা গৃহী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লোকেরই আদরের বস্তু। চণ্ডীতেই আছে—দেবীর আরাধনা করিয়া সকাম সুরথ রাজা অপহৃত রাজ্য ও মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং নিষ্কাম সমাধি বৈশ্য মোক্ষসাধক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আগমে উক্ত হইয়াছে—

> "যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো
> যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
> শিবাপদাম্ভোজ-যুগার্চ্চকানাং
> ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥"

ভোগবাসনা থাকিলে মোক্ষ হয় না, এবং মোক্ষবাসনা থাকিলে ভোগও থাকে না। কিন্তু মঙ্গলদায়িনী ভগবতীর আরাধনায় ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত হইয়া থাকে।

আজকাল—কুম্ভকর্ণের জাগরণের ন্যায় এই জাগরণের যুগে আ-চণ্ডাল সকলেই যেমন দ্বি-জাতি হইতেছে (পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতি-সপিণ্ডগণের এক জাতি এবং নিজের নির্ব্বাচিত অন্য জাতি, এই দুই জাতি যাহার—এ অর্থেও দ্বি-জাতি হয়), সেইরূপ আ-বিপ্র-চণ্ডাল, আ-ধনি-দরিদ্র, আ-বাল-বৃদ্ধ-বনিতা—আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত—সকলেই নিষ্কাম হইয়াছেন (নির্ব্যূঢ় অর্থাৎ "কায়েমী" কাম যাহার—এ অর্থেও নিষ্কাম হয়); এই জন্যই চণ্ডীর অপেক্ষাও গীতার আদর (কি—অনাদর—জানি না) সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা যায়—অনেক ভিখারিণী সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া গীতাপাঠে নিরত। মেথর-মেথরাণীরা ময়লার টব মাথায় করিয়া গীতা পড়িতে পড়িতে পায়খানা সাফ করিতে চলিয়াছে—এ দৃশ্য দেখিবারও অধিক বিলম্ব নাই। এই কারণেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, গাড়ীতে বাড়ীতে, অলিতে গলিতে গীতাপুস্তকের ছড়াছড়ি। বহু লোক গীতা ছাপাইয়াও কুলাইতে পারিতেছেন না বলিয়া বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতেও সম্প্রতি একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দর পকেট গীতা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও জাতি চণ্ডীপুস্তক স্পর্শ করিতে এখনও সাহস করে না।

পরমেশ্বরী মহাশক্তির নাম—চণ্ডী, দুর্গা, উমা, কালী, মহামায়া ইত্যাদি। দেবীমাহাত্ম্যে সেই চণ্ডীরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া অভেদজ্ঞানে উহাকেও চণ্ডী বলে (আরও বিশদরূপে পরে বলিব)। প্রবৃত্তিমার্গেই চলুন, আর নিবৃত্তিমার্গেই থাকুন, সুদুর্গম ও বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া উভয়ত্রই উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। মহাশক্তির আরাধনা ভিন্ন উপযুক্ত শক্তিলাভ ঘটে না। এই কারণেই "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা।" রামচন্দ্রের দুর্জ্জয়-রাবণ-বধের শক্তিলাভ-কামনায় ব্রহ্মা দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। "শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে" ইন্দ্রও দুর্গাপূজা করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্" ব্রজকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে যাইবার পূর্ব্বে পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশে দুর্গাস্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দস্যুরাও ডাকাতি করিতে যাইবার আগে কালীপূজা করিয়া থাকে।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডক); জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরেরই মহাজ্যোতির অংশ যেমন ন্যূনাধিকরূপে সূর্য্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎ-নক্ষত্র-পাবকাদিতে বিদ্যমান, সেইরূপ "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" (চণ্ডী) সেই পরমেশ্বরের মহাশক্তির অংশও চরাচর-চেতন-অচেতন-উদ্ভিদ—সর্ব্বভূতেই যদিও অবস্থিত আছে, তথাপি সাধনা দ্বারা তাহার উন্মীলন ও উত্তেজন না করিলে সে শক্তি কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল হয় না। অগ্নির স্ফুলিঙ্গে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না;

ইন্ধনাদি প্রয়োগে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অরণিকাষ্ঠ-দ্বয়ে অগ্নির সত্তা থাকিলেও বিনা ঘর্ষণে তাহার উৎপত্তি হয় না।

"গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্।
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু।"

(যোঃ যাঃ)

দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত গাভীদিগের শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও, তাহাতে তাহাদের অঙ্গপুষ্টি হয় না। দুগ্ধ দুহিয়া, অম্লসংযোগে মন্থন করিয়া, ননী তুলিয়া, কড়ায় চাপাইয়া, জ্বাল দিয়া, ঘৃত প্রস্তুত করিলে, তবে তাহা তাহাদের ঔষধের কার্য্য করে। এই-রূপ, পরমেশ্বর আত্মা ও শক্তিরূপে মানবদিগের শরীরস্থিত হই-লেও উপাসনা ব্যতিরেকে তাহাদের হিতকর হন না।

এই জন্যই উপাসনার আবশ্যক। চণ্ডীর পাঠ বা শ্রবণই সেই মহাশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। চণ্ডীতে দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্ম্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।"

আমার এই মাহাত্ম্য যেখানে পঠিত বা শ্রুত হয়, সেখানে আমি উপস্থিত হই। সংবৎসর ধরিয়া দিনে ও রাত্রিতে—দুই বেলায়—উত্তম পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, পশুবলি, হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজনে আমার যেরূপ প্রীতি হয়, একবার-মাত্র এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে সেইরূপ প্রীতিই হইয়া থাকে।

এই সকল কারণেই গৃহীদিগের নিকট গীতার অপেক্ষাও চণ্ডীর আদর ও সম্মান অধিক। গীতার সহিত চণ্ডীর অনেকাংশে সামঞ্জস্যও দেখা যায়। যথা—

(গীতায়)

"অনেকবক্ত্রনয়ন-মনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।"
"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।"
"তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।"

(চণ্ডীতে)

"ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ।"
"স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্জ্যানিস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।"

(গীতায়)

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

(চণ্ডীতে)

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।"

(গীতায়)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্।"

(চণ্ডীতে)

"শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।"
"শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম।"

(গীতায়)

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"

(চণ্ডীতে)

"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।"

(গীতায়)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

(চণ্ডীতে)

মেধা ঋষি সুরথ ও সমাধিকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

(গীতায়)

৭০০ শ্লোক (অন্তিম শ্লোকের দ্বিরাবৃত্তিতে) আছে বলিয়া উহা সপ্তশতী নামে লোকে প্রসিদ্ধ। চণ্ডীও সপ্তশতী নামে নানা শাস্ত্রে কথিত। যথা—

"যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।"

(বারাহী-তন্ত্র)

"মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তঃ স্তবঃ সপ্তশতাভিধঃ।
স্তবস্য পঠনাত্তস্য সর্ব্ব-সৌখ্যং লভেদ্ ধ্রুবম্।"

(চিদম্বর-তন্ত্র)

"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।"

(চণ্ডী-কবচ)

"সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্।"

(অর্গল-স্তোত্র)

এই সপ্তশতী দুর্গা বা চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রকাশিকা বলিয়া ইহাকে দুর্গা-সপ্তশতী ও চণ্ডী-সপ্তশতীও বলে।

সর্ব্বত্রই গীতার সহিত তুলনা করিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, গীতার অনুকরণে চণ্ডী রচিত হইয়াছে। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত; আর চণ্ডী মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের অন্তর্গত। বেদব্যাস সপ্তদশ মহাপুরাণ রচনা করিয়া, পরে মহাভারত, তার পর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। অতএব অনুকরণের বিচার করিতে গেলে, চণ্ডীর অনুকরণে গীতার রচনা বলিতে হয়। বস্তুতঃ, অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায় শক্তি ও শক্তিমানে অভিন্ন বলিয়া, পরমেশ্বর ও তদীয় শক্তি, উভয়ের বর্ণনায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াই থাকে (বিশেষতঃ এক জনের লেখায়)। আর এক কথা—প্রোক্ত কারণে যে জাতিই হউন, যে উপাসকই হউন, যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, যাঁহারা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন প্রণালীতে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাদের শক্তির উপাসনাও করা হয়; এবং যাঁহারা শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও পরমেশ্বরের উপাসনা করা হইয়া থাকে—তা অস্বীকারই করুন, অমান্যই করুন বা দ্বেষবুদ্ধিই করুন।

প্রায় সকলেরই ধারণা—গীতার ন্যায় ৭০০ শ্লোক বা পদ্য আছে বলিয়া ইহার নাম সপ্তশতী। অথচ যাহাকে বাস্তবিক শ্লোক বলে, তাহাদের সংখ্যা গীতাতে ঠিক ৭০০ই আছে; কিন্তু চণ্ডীতে তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমষ্টিতে ৫৮৪ মাত্র। সুতরাং মার্কণ্ডেয় উবাচ, সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ইত্যাদি—গদ্য, অর্দ্ধশ্লোক, শ্লোকপাদ এবং শ্লোকার্দ্ধপাদে অঙ্ক বসাইয়া ৭০০ সংখ্যা পূর্ণ করা নিতান্ত "গোঁজা-মিল" বলিতে হয়। এই জন্য অনেকে অনেক পদ্য ও অর্দ্ধ-পদ্য চণ্ডীর মধ্যে বসাইয়াছেন। তাহাতেও ৭০০ সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় কেহ কেহ আরও শ্লোকের অনুসন্ধান করিতেছেন।

বস্তুতঃ, কেহ স্বেচ্ছায় ঐরূপ অঙ্কপাত করেন নাই। কাত্যায়নী-তন্ত্র, চিদম্বর-তন্ত্র, ডামর-তন্ত্র, রুদ্রযামল-তন্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারেই অঙ্কপাত করা হইয়াছে। অতএব প্রক্ষিপ্ত ও প্রক্ষেপ্স্যমান শ্লোক ও অর্দ্ধ-শ্লোকগুলি পাঠ করিলে, উক্ত তন্ত্রসমূহের বিরুদ্ধ হওয়ায়, চণ্ডীপাঠের বিকৃতিই ঘটিবে। প্রকৃতির হীনতা (ন্যূনতা) ও আধিক্য উভয়কেই বিকৃতি বলে। এই হেতু ব্যাকরণে বিকৃত অঙ্গে তৃতীয়া-বিধানের সূত্রে—অক্ষ্ণা কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ, পৃষ্ঠেন কুব্জঃ, মুখেন ত্রিলোচনঃ ইত্যাদি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

চণ্ডীতে যে সকল প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অর্দ্ধশ্লোক আছে, নাগোজী ভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ সেগুলি ধরেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহাদের উত্তরকালে ঐগুলি প্রবেশলাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী "আবাং জহি" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—ইহা অর্দ্ধশ্লোক। ইহার পূর্ব্বে "প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বম্ মৃত্যুরাবয়োঃ" এই হরিবংশীয় অর্দ্ধ-শ্লোক কেহ কেহ পাঠ করেন, তাহা উপেক্ষণীয়; যেহেতু, মূল সংহিতায় দেখা যায় না এবং টীকাকারগণও ব্যাখ্যা করেন নাই। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ লিখিয়াছেন। উক্ত তন্ত্রসমূহেও ঐ সকল শ্লোকের উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রসমূহে যে ৭০০ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা শ্লোক ধরিয়া নহে; মন্ত্র ধরিয়া। চণ্ডীতে ৭০০ মন্ত্র আছে বলিয়াই উহার নাম সপ্তশতী। পদ্যের ন্যায় মন্ত্রের অক্ষর-সংখ্যার কোনও নিয়ম নাই। মন্ত্রকোষ, মন্ত্রমহোদধি, তন্ত্রসার, ভৃগুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা ১ হইতে প্রায় ১৪০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। মন্ত্রসংখ্যা ধরিয়াই যে সপ্তশতী নাম হইয়াছে, তাহার প্রমাণ—

"তস্মিন্ দেব্যাঃ স্তবে পুণ্যে মন্ত্রাঃ সপ্তশতং প্রিয়ে।"

(চিদম্বর-তন্ত্র)

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এমন আশ্চর্য্য কৌশলে দেবীমাহাত্ম্য রচনা করিয়াছেন যে, উহার এক পক্ষে স্পষ্ট অর্থে উপাখ্যান, এবং পক্ষান্তরে গূঢ় অর্থে—তন্ত্র মন্ত্র—না হয় মন্ত্রোদ্ধার সূচিত হইয়াছে। মন্ত্র গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া সর্ব্বতন্ত্রেই প্রহেলিকার ন্যায় অস্পষ্টরূপে লিখিত দেখা যায়।

"মকারাদির্মকারান্তো মন্ত্রঃ পরমদুর্ল্লভঃ।
স্বসম্প্রদায়বিধিনা জ্ঞাতব্যো মম বল্লভে।"

(কাত্যায়নী-তন্ত্র)

প্রারম্ভে "মার্কণ্ডেয় উবাচ" ইহার আদিতে যে 'মা' আছে, তাহার আকার ছাড়াইয়া, তাহাতে উচ্চারণার্থ অকার যোগ করিলে 'ম' হয়; ঐ ম হইতে, অন্তে "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" ইহার নু পর্য্যন্ত মনু (মন্ত্র)।

কেহ কেহ—

"পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ।
সমাপয়েত্ তদন্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ।"

এই রুদ্রযামল-বচন অনুসারে, উক্ত কাত্যায়নী-তন্ত্রের বচনে 'মকারাদিঃ' স্থলে 'সকারাদিঃ' পাঠ করিয়া "সাবর্ণিঃ"র স হইতে "ভবিতা মনুঃ"র নু পর্য্যন্ত মন্ত্র বলেন, এবং পদ্ধতিকারগণও তদনুসারে সঙ্কল্পবাক্যে 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি' লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সমস্ত তন্ত্রেই যখন "মার্কণ্ডেয়াস্তথা পঞ্চ" "মার্কণ্ডেয়াস্তু মার্গণাঃ" ইত্যাদিরূপ উক্তি দ্বারা 'মার্কণ্ডেয় উবাচ'কে পাঁচবার ধরা হইয়াছে, তখন "মকারাদিঃ" পাঠই সঙ্গত ও সমীচীন। আদিস্থ 'মার্কণ্ডেয় উবাচ'টি সমগ্র চণ্ডীর প্রণবস্বরূপ; সুতরাং রুদ্রযামল অনুসারে 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি' বলিয়া সঙ্কল্প করিলেও, উহা অবশ্যপাঠ্য হওয়ায়, উহা হইতেই মন্ত্রসংখ্যা ধরিলে কোনও বিসংবাদ ঘটে না,—সর্ব্বতন্ত্রসমন্বয়ই হয়।

অক্ষমালা বলিতে যেমন সন্দংশ-ন্যায়ে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকা (বর্ণমালা) বুঝায়,—ব্যাকরণে হস্ ইত্যাদি সংজ্ঞায় যেমন "অ ই উ ঋ ৯ ক" ইত্যাদি সূত্রস্থ হ হইতে স পর্য্যন্ত ইত্যাদি আদিমধ্যান্তস্থিত সমস্ত বর্ণকেই বুঝায়, সেইরূপ মনু (ম-নু) সংজ্ঞায় চণ্ডীর আদিমধ্যান্তস্থিত সমস্ত প্রতীককেই (অংশ) বুঝাইয়া থাকে। মনু শব্দের অর্থও মন্ত্র। অতএব সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যই মন্ত্রময়।

"অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে ন হি ভেদঃ প্রজায়তে।"

(যামল)

তন্ত্রশাস্ত্রেও মন্ত্রেরই ধ্যান উক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে তত্ত-দেবতারই রূপ-বর্ণনা আছে। অতএব মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন বলিয়া দেবীমাহাত্ম্যকে চণ্ডী ও দুর্গাও বলে। এই জন্য দেবী-মাহাত্ম্যপাঠকে বাঙ্গালীরা চণ্ডীপাঠ বলেন, হিন্দুস্থানী প্রভৃতিরা দুর্গাপাঠ বলিয়া থাকেন।

১০। প্রতীকের মন্ত্রপক্ষে ব্যাখ্যা-প্রদর্শন এ প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া উহা অনধিকারী, অভক্ত ও অবিশ্বাসীর গোচর করাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তথাপি অধিকারী ভক্তগণের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য, দিগ্দর্শনরূপে, প্রথম মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে। মন্ত্রের বর্ণ-শক্তিতেই ফল ফলে। গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রসমূহের অর্থ কয় জন অবগত আছেন এবং অবগতির জন্য চেষ্টাই বা করেন? তথাপি সাধকদিগের পক্ষে ঐ সকল মন্ত্র সবিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। চণ্ডী যে মন্ত্রময়, এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে এবং সেই ধারণাতেই পাঠ বা শ্রবণ করিলে, বর্ণশক্তি দ্বারাই সকলে সম্যক্ ফললাভে সমর্থ হইবেন। বিষ্ণুসহস্র-নামের শাঙ্কর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—একই নাম অনেকবার উল্লিখিত হইলেও অর্থভেদে, এবং একই অর্থে বিভিন্ন নাম উক্ত হইলেও শব্দভেদে, পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটে না। চণ্ডীতেও সেইরূপ জানিতে হইবে। মন্ত্রব্যাখ্যা যথা—

"মার্কণ্ডেয় উবাচ"

পদচ্ছেদ—(১) মা-রৃ-ক্-অং; (২) ড-ঈ-যউ; (৩) বাচ।

(১) মা—লক্ষ্মী (অমর ও মেদিনী-কোষ)। লক্ষ্মীর নাম ও লক্ষ্মীবাচক বর্ণ ঈ (লক্ষ্মী-স্তোত্র ও একাক্ষর কোষ)। র্—স্বরূপ অর্থাৎ র বর্ণ। ক্—স্বরূপ অর্থাৎ ক বর্ণ। অং—অনুস্বার (অকার উচ্চারণার্থ—ব্যাকরণ)। অনুস্বারেরই রূপান্তর চন্দ্রবিন্দু (শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্যাকরণ; যথা—ওং ওঁ, হ্রীং হ্রীঁ ইত্যাদি)। ঐ চারিটি বর্ণ যোগ করিলে ক্রীঁ হয়। ইহা প্রথম চরিতের দেবতা মহাকালীর বীজ (তন্ত্র)।

(২) ড—বাড়বাগ্নি (মেদিনী)। অগ্নির বীজ ও বাচক র (ভূতশুদ্ধি, মেদিনী ও একাক্ষর কোষ)। ঈ—স্বরূপ অর্থাৎ ঈ বর্ণ। "মুখ-নাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" (পাণিনি ১।১।৮) সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে স্বরবর্ণ দ্বিবিধ (বৃত্তি)। এখানে সানুনাসিক ঈ অর্থাৎ ঈঁ। য-উ—স্বরবর্ণের পঞ্চম বর্ণ উ; অতএব উ বলিতে পঞ্চম, বা ৫ সংখ্যা (যেমন চন্দ্র ১, পক্ষ ২ ইত্যাদি)। সংখ্যাবাচক শব্দ কচিৎ পূরণবাচকও হয়। (যেমন ত্রিপিষ্টপ—তৃতীয় পিষ্টপ, ত্রিভাগ—তৃতীয় ভাগ, দশাংশ—দশম অংশ ইত্যাদি। (য-উ) য হইতে পঞ্চমবর্ণ শ। বর্ণের নিঃসন্দেহ বোধের জন্য সংহিতা বা সন্নিকর্ষের বিবক্ষা না করিলে সন্ধি হয় না (যেমন "অ ই উ ঋ ৯ ক"—ব্যাকরণ। ব্যঞ্জন-বর্ণের অকার উচ্চারণার্থ (ব্যাকরণ)। ঐ তিন বর্ণের যোগে শ্রীঁ। ইহা মধ্যম চরিতের দেবতা মহালক্ষ্মীর বীজ (তন্ত্র)।

বাচ—বাচ শব্দের অর্থ সরস্বতী (অমর)। বাগ্বীজ বা বাগ্ভব ঐঁ (তন্ত্র)। ইহা উত্তর চরিতের দেবতা মহাসরস্বতীর বীজ (তন্ত্র)।

মার্কং চ ডেয়উশ্চ বাক্ চ, তেষাং সমাহারঃ মার্কণ্ডেয় উবাচম্, তৎসম্বোধনে মার্কণ্ডেয় উবাচ—"বা স্বরযপেঽরষম্" অনুস্বারের স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ। পদমধ্যস্থিত যকারের উচ্চারণ য় (যাজ্ঞঃ শিক্ষা)। স্পষ্ট অর্থে 'মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ' এই দুই পদে সন্ধি করিলেও "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" বা "বর্ণানাং দ্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ" এই নিয়মে 'মার্কণ্ডেয়উবাচ' একসঙ্গে লেখাই শুদ্ধ। বিসর্গসন্ধি ও পদান্ত-য-ব-লোপের সন্ধিতে পদদ্বয়ের মধ্যে অবকাশ (Space) দেওয়া আধুনিক রীতি; প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে অবকাশ নাই। "চৈক্যাচ্চ-দযহোঽঃ" অ প্রত্যয়। "চৈকেক্যাবং ক্লীবম্" ক্লীবলিঙ্গ। "স্বদীভ্যাং ধ্যম্শসাদেৰ্লোপঃ" সি (সু) বিভক্তির লোপ। 'ত্বাং ধ্যায়েয়ম্' উহ্য।

অর্থ—হে মহাকালি, হে মহালক্ষ্মি, হে মহাসরস্বতি, তোমাদিগকে চিন্তা করি।

> "মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তং নিত্যং চণ্ডীস্তবং পঠেৎ।
> পুটিতং মূলমন্ত্রস্য জপেনাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্।
> শতমাদৌ শতঞ্চান্তে জপেন্মন্ত্রং নবার্ণকম্।
> চণ্ডী-সপ্তশতী মধ্যে সম্পুটোঽয়মুদাহৃতঃ।"
>
> (ডামর-তন্ত্র)

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত চণ্ডীস্তব প্রত্যহ পুটিত করিয়া পাঠ করিলে অভীষ্টলাভ হয়। চণ্ডীর নবার্ণ মূলমন্ত্র আদিতে ১০০ (১০৮) ও অন্তে ১০০ (১০৮) জপ করিয়া, মধ্যে চণ্ডীপাঠ করাকে পুটিত-চণ্ডীপাঠ বলে।

চণ্ডীর নবার্ণ মন্ত্র অনেকেই অবশ্য জানেন। সেই নবার্ণ উদ্ধার যাহাতে আছে এবং যাহা জগদ্বাসীদিগের মঙ্গলের জন্য দেবীর সম্মুখে দেবগণের প্রার্থনা-উক্তি, সেই শ্লোকটি বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যথা—

> "যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
> ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
> সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
> নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু।"
>
> শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

মহাভারত-যুদ্ধের সময়

ভাস্করাচার্য্যের মতে "নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলে-র্বৎসরাঃ", অর্থাৎ ৩১৭৯—৭৮=৩১০১ খৃষ্টপূর্ব্বে কল্যব্দ আরম্ভ। রাজাবলীমতে—৩০৪৪ কল্যব্দ গতে বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ৩০৪৪+৫৭=৩১০১ কল্যব্দ। মকরন্দ করও তাহাই বলিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতেও ৩১০১ খৃঃ পূঃ কল্যব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চালুক্য পুলকেশীর শিলাফলক অনুসারেও ৩১০১ খৃঃ পূর্ব্ব কল্যব্দ। আর্য্যভট্টের জন্ম-তারিখ হইতেও ৩১০১ খৃঃ পূর্ব্ব কল্যব্দ পাওয়া যায়। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৪ বৎসর গতে বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ৩০৪৪+৫৭=৩১০১ খৃঃ পূঃ কল্যব্দ। এই কল্যব্দকে কেহ কেহ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ৩১০১ খৃঃ পূর্ব্বে যে কলির প্রারম্ভ, তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা দেখাইব যে, এই কল্যব্দ ব্যতীত অপর একটি কল্যব্দের উল্লেখও আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আছে। এই দুইটি পৃথক্ কল্যব্দের দিকে দৃষ্টিপাত না করায় আমাদের মধ্যে কালনির্ণয়ে সময়ে সময়ে বড় গোলযোগ ঘটিয়াছে। শেষোক্ত কল্যব্দ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥"

—৪।২৪।৩৪ ; ৪।২৪।৪০

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে যে দিনে স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ে সেই দিনে কলি আগমন করিয়াছে। যত দিন বাসুদেব ইহ-জগতে ছিলেন, তত দিন আবির্ভূত হইতে পারে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই আছে (১২।২।২৯; ১২।২।৩৩)—ভাগবত বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেও এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (৩ অ ৪৫, ১৮।৬)। ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"প্রতিপন্নং কলিযুগম্", অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ। ব্রহ্মপুরাণে (২১২।৮৫) এবং কল্কিপুরাণেও (১।১৩) ঐ দিনই কলির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল উক্তির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

কোন্ সময় হইতে দ্বিতীয় কলিযুগ আরম্ভ, তাহাও বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে ;—

"তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশশতাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ, পরীক্ষিতের সময়ে প্রথম কলির ১২০০ বৎসর গত হইয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের সময় ৩১০১—১২০০= ১৯০১ খৃঃ পূঃ। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ঐক্য আছে (১২।২।৩১)। এক্ষণে দেখা যাউক, দ্বিতীয় কলির আবির্ভাব কোন্ বৎসরে হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ (৪।২৪।৩৭, ৩৮) এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনসংবাদ শুনিয়াই যুধিষ্ঠির সিংহাসন ত্যাগ করেন, এবং পরীক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। বিষ্ণুপুরাণে পরীক্ষিতের জন্মসময় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

এই শ্লোকের অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন—পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেককাল ১০১৫ বৎসর—অন্য কাহারও কাহারও মতে ১০৫০ বৎসর। কিন্তু ভাগবতে দৃষ্ট হয়, "এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্"—ইহারও অর্থ কেহ ১১১৫, কেহ ১৫১০, বৎসর করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থ ১৫১০ বৎসর হইবে—১০১৫, ১০৫০ অথবা ১১১৫ বৎসর হইতেই পারে না। প্রথমে অবধারণ করিতে হইবে, এই নন্দ কে? বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে যে সকল নৃপতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাপদ্মনন্দই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—বহু পুরাণেই তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রদ্যোতনবংশীয় নন্দিবর্দ্ধনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শিশুনাগ মগধ-সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ-বংশীয় নন্দিবর্দ্ধনের রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। মহানন্দীকে নিহত করিয়া মহাপদ্মনন্দ মগধের অধিপতি হন। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাপদ্মনন্দেরই উল্লেখ আছে। ইনি এবং তৎপরবর্ত্তী ৮ নন্দই নবনন্দ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং—"নন্দাভিষেচন" বলিতে মহাপদ্মনন্দকে বুঝাইতেছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মতভেদও প্রায় দৃষ্ট হয় না।

বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৩।২ শ্লোক হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সোমাপি প্রভৃতি মগধের বার্হদ্রথবংশীয় রাজগণ ১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগবতে সোমাপিকে মার্জ্জারি বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে প্রদ্যোতনের বংশীয়দিগের রাজত্বকাল ১৩৮ বৎসর, এবং শিশুনাগবংশের ৩৬২ বৎসর রাজত্বকাল কথিত হইয়াছে। ১০০০+১৩৮+৩৬২=১৫০০ বৎসর। অন্যান্য পুরাণগুলির সহিত বিষ্ণুপুরাণের সামান্য অনৈক্য এবং তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু সবিস্তারে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়, এবং তাহার আবশ্যকতাও আমরা দেখি না। ফলতঃ, ন্যূনাধিক ১৫০০ বৎসরই পাওয়া যায়। অতএব "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" যে লিপিকরপ্রমাদ, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। "শতং পঞ্চদশোত্তরম্ই" প্রকৃত পাঠ। ১০১৫, ১০৫০ কিম্বা ১১১৫ হইতেই পারে না—১৫০০ অথবা ১৫১০ বৎসর হইবে। শেষোক্ত সংখ্যাই ঠিক বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। তাহার কারণ, এই নন্দবংশের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর। নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করিয়া চাণক্য বা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ ৩২৭ খৃঃ পূঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৩২৭ খৃঃ পূঃ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক-কাল স্থির করিয়াছিলেন ; এক্ষণে কেহ কেহ ৩২৫ খৃঃ পূঃ অবধারণ করিয়াছেন। ১৫১০+১০০+৩২৭=১৯৩৭ বৎসর। মহাভারত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরীক্ষিৎ ৩৬ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করেন, এবং ভারত-যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান্ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন (মৌষল-পর্ব্ব এবং স্ত্রী-পর্ব্ব)। সোমাপিও পরীক্ষিতের সমকালীন। সুতরাং ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম এবং ১৯০১ খৃষ্ট-পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যাভিষেক দাঁড়াইতেছে। এই ১৯০১ খৃঃ-পূঃই দ্বিতীয় কল্যব্দের প্রারম্ভ। পূর্ব্বে এই ১৯০১ খৃঃ-পূর্ব্ব বৎসরের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। ভারত-যুদ্ধের কাল যে ১৯৩৭ খৃঃ-পূঃ, তাহা আলোচনালব্ধ সত্য, অনুমান নহে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু নন্দের অভিষেক-বৎসর তাঁহার মতে ১০১৫। চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ৩২৫ খৃঃ পূঃ তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং ১০১৫+১০০+৩২৫=১৪৪০ খৃঃ-পূঃ তাঁহার মতে পরীক্ষিতের জন্ম-বৎসর এবং ইহা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়। অনেক লেখককে আমরা এই মতের অনুবর্ত্তী দেখিতেছি। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি পুরাণের এবং অন্যান্য গ্রন্থের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেন নাই।

১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসে "প্রবাসী" পত্রিকায় "হাতি-গুম্ফা লিপি"টি আলোচিত হয়। ঐ লিপিটি ১৬৫ মৌর্য্য সম্বতে উৎকলরাজের ১৩ বর্ষ রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়। ৩২৭–১৬৫=১৬২ খৃঃ-পূঃ। ইহাতে ১৬৪ খৃঃ-পূঃ বৎসরে কেতুভদ্র রাজার ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত দারুমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ-লেখক কেতুভদ্র রাজাকে ভারত-যুদ্ধের সমকালীন ধরিয়া লইয়া ১৬৪+১৩০০=১৪৬৪ খৃঃ-পূঃ ভারত-যুদ্ধের কাল নির্ণয়

করিয়াছেন। কিন্তু কেতুভদ্র রাজার উল্লেখ আমরা কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তে আমরা আস্থাস্থাপন করিতে অক্ষম।

বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে জ্যোতিষের যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না; কারণ, জ্যোতিষে আমরা অনভিজ্ঞ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করিবেন। আমাদিগের অনেক গ্রন্থে ৩১০১ খৃঃ পূঃ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আদৌ সম্ভব নহে। ভারত-যুদ্ধাবসানে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ-ই তাঁহার অব্দ ধরিয়া লওয়া উচিত। যুধিষ্ঠিরের জন্ম ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্বের ১০।৮০ বৎসরের অধিক হইতেই পারে না। বরাহমিহির যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ "বৃহৎসংহিতা" রচনা করেন। ২৫২৬ – ১৯৩৭ = ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ। ইহাই সম্ভব। তিনি বিক্রমাদিত্যের এক জন সভাসদ্‌ ছিলেন। এই বিক্রমাদিত্য নৃপতির উল্লেখ "রাজতরঙ্গিণীতে" আছে। "অমরকোষ"-প্রণেতা অমরসিংহ বরাহমিহিরের সমকালীন। বিক্রম-সংবৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁহার উল্লেখ জৈন গ্রন্থাদিতে আছে। মহাকবি কালিদাস আমাদিগের বিবেচনায় বরাহমিহিরের সমকালীন, কিন্তু এক্ষণে অনেকে তাঁহাকে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লইয়া যাইতেছেন।

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"-রচয়িতা কালিদাস কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে তাঁহার ঐ গ্রন্থ লিখিতে উপক্রম করেন। ৩০৬৭ – ১৯০১ = ১১৬৬ খৃঃ, সুতরাং ইহাই উক্ত গ্রন্থ রচনার কাল। এখানে কলি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কলাব্দ বুঝাইতেছে। কালিদাস যে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা এখন কেহই অস্বীকার করেন না। উক্ত কলি ৩১০১ খৃঃ পূঃ হইতে পারে না, কারণ, ৩১০১ – ৩০৬৭ = ৩৪ খৃঃ পূঃ। ইহা গ্রন্থরচনা-কাল হওয়া অসম্ভব; উক্ত গ্রন্থে বিক্রমাব্দ, শালিবাহন শকাব্দ, বিজয়াভিনন্দন অব্দ, নাগার্জ্জুন অব্দ, বরাহমিহির এবং ৪৭৫ শকাব্দের উল্লেখ আছে।

পুলকেশীর শিলাফলকে ৩১০১ খৃঃ পূঃ ভারত-যুদ্ধের সময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

রাজতরঙ্গিণীতে ৩১০১ – ৬৫৩ = ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভকাল। তাহাও ভ্রমাত্মক।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে "আমাদের ইতিহাস" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে মহাভারত-যুদ্ধকাল ১৯০০ খৃঃ পূঃ অনুমান করিয়াছেন (সাঃ প, প, ১৩৩২, ৪ সং ১৯৮ পৃঃ) এই অনুমান আমাদের সিদ্ধান্তের অনেকটা নিকটবর্ত্তী।

মহাভারত-যুদ্ধ যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ইহার সময় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই, কেবল অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের মত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। পুরাণগুলিই আমাদের ইতিহাস। ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয় বটে, এবং সেইগুলির আলোচনা-কালে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। পরীক্ষিৎ-বংশ, জরাসন্ধ-বংশ, প্রদ্যোতন-বংশ, শিশুনাগ-বংশ, নন্দ-বংশ সম্বন্ধে পুরাণগুলির লিখিত বিবরণে ঐক্য রহিয়াছে—এগুলি কেন উপেক্ষা করা হইবে? এগুলিকে কল্পিত বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই এগুলি উড়াইয়া দিতে সাহসী হন নাই। পার্জ্জিটার সাহেব ত এগুলির প্রামাণিকতা স্বীকারই করিয়াছেন। প্রদ্যোতন-বংশ এবং তৎপরবর্ত্তী নৃপতিদিগের অনেক কথা বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশুনাগ-বংশ এবং তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের বিবরণ কতকটা হর্ষচরিতেও আছে।

সকল বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিলে ভারত-যুদ্ধের সময় ১৯৩৭ খৃঃ-পূঃ মানিয়া লইতেই হইবে। এত দীর্ঘকাল পরে আমরা পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ আছে দ্বৈপায়ন ব্যাসের সময়টি নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না করিলে আমাদের অনেক প্রাচীন গ্রন্থের কালনির্ণয় হইতেই পারে না এবং আমাদের শাস্ত্রগুলি যে কত প্রাচীন, তাহার প্রকৃত ধারণা হইতেই পারে না। আমাদের দাঁড়াইবার একটি স্থল চাই—তাহা হইলে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনার সম্যক্‌ আলোচনা এবং মীমাংসা হইতে পারে, নচেৎ অন্ধকারে ঢিল মারিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রলাপ-বাক্যগুলিও সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। আমাদিগের আক্ষেপের কারণ আছে কি না, একবার সকলকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রায় ২০০০ খৃঃ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ২০০০ + ১৯০০ = ৩৯০০, অর্থাৎ প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি বেদগুলি বিভাগ করেন, এবং তজ্জন্যই তিনি ব্যাস নামে পরিচিত। তিনি দ্বাপরযুগের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ত্রেতাযুগের প্রথম ও মধ্যভাগে দর্শন করেন। প্রায় একটি যুগ এবং আর একটি যুগের অর্দ্ধভাগ অতীত হওয়ার পর বর্ত্তমান বিভাগ সম্পন্ন হয়। যদি আমরা অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসরও ধরিয়া লই, তাহা হইলে ৪০০০ + ৩০০০ = ৭০০০ বৎসর হয় না কি? আরও দেখুন। বিষ্ণুপুরাণে (৩।৩।১৬৪) কথিত হইয়াছে যে, বেদব্যাসের পূর্ব্বে বেদ সপ্তবিংশতিবার বিভক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য পুরাণেও এই বিবরণ দৃষ্ট হয়। ২৭ বার বিভক্ত হইতে গেলে অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসর ধরিতে হইবে না কি? আমাদের পুরাণের এই কথাগুলি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ আছে কি? আমাদের দেশের লোক আমাদের দেশের কোন সংবাদ রাখে না—পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন, ইহা ভাবা কি সঙ্গত? বেদে অনেক নৃপতির এবং ঋষির উল্লেখ আছে, যাঁহাদের বিবরণ আমাদের পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে আছে—পুরাণের লিখিত বংশাবলী আলোচনা করিলে তাঁহাদের সময় ৭০০০, ৬৫০০ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না। বেদগুলি যে বহু প্রাচীন, তাহা অনুমান করার আরও কয়েকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে—এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা

আমরা পূর্ব্বে লিখিলাম, তাহাই নিশ্চিতাস্তঃকরণে ভাবিবার বিষয়। পণ্ডিত যাকোবীর মতে বেদের প্রাচীন মন্ত্রগুলি ৪০০০ খৃঃ পূঃ হইতে দৃষ্ট হয়, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মহামান্য তিলক ৬০০০ খৃঃ পূঃ অবধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় (ভারতবর্ষ, ১৩৩২, মাঘ, ২৫৮ পৃঃ) "বৈদিক সাহিত্যের কাল" প্রবন্ধে "তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না" ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তিনিও কথঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন—কিন্তু আমরা বলিতে চাহি যে, ৬ হাজার বৎসরের ন্যূন ত হইতেই পারে না—অন্ততঃ, আরও ১৫০০ বা ২ হাজার বৎসর পিছাইয়াও যাওয়া যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে পূর্ব্বতন বহু ঋষির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের নামের কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, যে বেদগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও অন্য বেদের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং আর্য্য সভ্যতা যে কত প্রাচীন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের কোন কোন গ্রন্থে অতি প্রাচীন বেদগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

মোহেঞ্জ দারো এবং হরপ্পা অঞ্চলে সম্বরদিগের যে কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ৫ হাজার খৃঃ পূর্ব্বের বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অবধারণ করিতেছেন, কিন্তু এই মীমাংসার মূলে কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। এই নিদর্শনগুলি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসরের অথবা খৃঃ পূঃ ৫৫০০, ৬০০০ বৎসরের হইতে পারে না, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আর্য্য সভ্যতা ৪০০০, ৪৫০০ খৃঃ পূঃ অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে না, ইহা যখন পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, তখন সম্বর সভ্যতা তাহা অপেক্ষা প্রাচীন প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য কি? সম্বরদিগের উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তে পাওয়া যায়—(ঋক্ ১।৫৪।৪; ১।৫১।৬, ২।১১।১৯।৭; ২।১২।১১; ২।১৪।৬ ইত্যাদি)। তাহারা যে সভ্যতায় উন্নত ছিল, তাহার প্রমাণও ঋগ্বেদে আছে (ঋক্ ৪।২৬।৩, ঋক্ ৫।২২।৬; ৬।৩১।৪; ২।১৪।৬; ৪।৩০।১৪; ৪।৩০।২০ ইত্যাদি)। তাহাদের "নব সাকং নবতীঃ" পুরের, "শতং পুরো" "শতং অশ্মন্ময়ীনা পুরং"এর উল্লেখ আছে। পুরাণে সম্বরদিগকে অসুর বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সম্বরদিগের সহিত আর্য্যদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্যগণ তাহাদিগের ধ্বংসসাধন করিতে পারেন নাই। তাহারা ভারতযুদ্ধের সময়েও সিন্ধু প্রদেশে বিদ্যমান ছিল—মহাভারতে তাহাদিগকে "সৌবীর" বলা হইয়াছে। তাহাদের ভাষাই শবর-ভাষা। তাহারা আলেকজাণ্ডারের সময়ও বিদ্যমান ছিল—তাহার পরেও ছিল—তাহারাই "চাবড়"। এই সম্বরদিগের এক শাখা পশ্চিমে চলিয়া যায়—তাহারাই সুমের। প্রবীণ পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের লিখিত ইতিহাস হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সুমের সভ্যতা প্রাচ্য ভারতীয় সভ্যতা হইতে প্রাচীন নহে, অর্থাৎ ভারতের সম্বররাই ৫ হাজার কি ৬ হাজার খৃঃ পূর্ব্বে পশ্চিমে গিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

মিসরের ইতিহাস-লেখকগণের অধিকাংশেরই মতে মিসর সভ্যতা ৫ হাজার খৃঃ পূর্ব্বের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। সুমের-সভ্যতা তাহা অপেক্ষা প্রাচীন, এবং তাহাও ভারতের সভ্যতা হইতে আমদানী। মিসরগণ যে ভারতসন্তান, তাহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। আসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, হিব্রু প্রভৃতি জাতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তাহারা অর্ব্বাচীন; ফলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, একমাত্র সম্বর জাতিই আর্য্যদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ।

ভারতের সম্বর জাতি একটি বলশালী জাতি ছিল, সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশের সম্বর-দিগের প্রতিবেশী অম্বর জাতি তাদৃশ শৌর্য্যসম্পন্ন ছিল না। তথাপি তাহারাও এক সময়ে রাঢ় প্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারাই Amorite।

ফ্রিজিয়ান নামে এক জাতির উল্লেখও পশ্চিম-এসিয়ায় পাওয়া যায়। তাহারা সম্ভবতঃ বেদের বৃজি জাতি। ইহারাও এক সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিল। 'প' 'ব' ঐ প্রদেশে 'ফ'-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 'প' 'ফ' 'ব' অক্ষরের একটি অপরটিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

আরও অন্যান্য জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহারা ভারত এবং ভারত-সীমান্ত হইতে ক্রমে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে; যেমন কালক (Kolkai) কালতোয় (Chaldea) প্রভৃতি। কালক, কালতোয় আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে যবন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এই সকল জাতি ভিন্ন বহু শক, নাগ এবং অসুর জাতির উল্লেখ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে, যাহারা ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কৃষ্ণ-সমুদ্র, কশ্যপ-সমুদ্র, পারস্য উপসাগর, লোহিত সমুদ্র এবং মেডিটারেনিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত সকল স্থানই অধিকার করিয়াছিল। তাহাদিগের ইতিহাস-উদ্ধার বহু শ্রমসাপেক্ষ। তাহারাও সভ্যতায় নিতান্ত হীন ছিল না। কিন্তু তাহাদের সভ্যতা ৩০০০, ৩৫০০ বৎসরের (খৃঃ পূঃ) অধিক প্রাচীন হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত সম্বর জাতি যতই সভ্য হউক, তাহারা যে বৈদিক আর্য্য জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য ছিল, তাহার প্রমাণ আমা-দিগের হস্তগত হইয়াছে কি? মোহেঞ্জ দারো এবং হরপ্পা অপেক্ষা প্রাচীনতর নিদর্শন কোথাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে কি? সভ্যতার পরিমাণ বিচার করিতে হইলে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে সম্বর জাতি যে আর্য্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার কি প্রমাণ আমরা পাইয়াছি? সমস্ত বেদগুলি এবং পুরাণগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য সভ্যতা অতি উচ্চ দরের ছিল, অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্বর জাতিকে তাহাদিগের নিম্নেই স্থান দিতে হইবে। ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদিগের অধিগত বেদ হইতেও প্রাচীনতর বেদ ছিল এবং আর্য্য-সভ্যতা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন। যত দিন না বলবত্তর প্রমাণ কেহ উপস্থিত করেন, তত দিন ভারতীয় আর্য্যগণ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। "নবযুগে" গত অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতই সভ্যতার আদি স্থান, কিন্তু তিনি আর্য্য কি অনার্য্যদিগকে "আদিগুরু" করিতে চাহেন, তাহা ভাল বুঝা

যায় না। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আর্য্যগণ যে ৫০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতে আসিয়াছিল, ইহা আনুমানিক সত্য নহে, প্রামাণিক সত্য", কিন্তু আমরা এরূপ কোন প্রমাণই পাই নাই। তিনি প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন, "যদি আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার দিকে বেশী করিয়া ভর দেই, তাহা হইলে আর আমাদিগকে পশ্চিমের সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকে অবাক্ করিয়া দিতে পারি।" শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুও "সাহেবদিগের" সকল কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। Slave mentality পরিহারের এই যে চেষ্টা হইতেছে, আমরা তাহা "জাগরণের" একটি লক্ষণ দেখিতেছি।

পাশ্চাত্যদিগের গ্রন্থে একটি Pre Aryan শব্দ দৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াও থাকেন, কিন্তু Aryan কত বৎসরের, তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে কি? আর্য্যদিগের অপেক্ষা প্রাচীন জাতির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা যাইতে পারে, এরূপ যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হওয়াব সংবাদ আমরা ত তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে পাই না, কেবল খাঁটি, নির্জ্জলা অনুমান দেখিতে পাই, শ্রীমুখের বাণী বলিয়া তাহাই কি গ্রহণ করিতে হইবে?

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগকে বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বপণ্ডিতগণ সংস্কৃতের আদর বুঝেন না, তাঁহারা সংস্কৃতকে অতি নিম্নস্থান দিয়াছেন এবং যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সংস্কৃত যে অল্পদিন পরে আমাদের নিকট গ্রীক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছি, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল)।

কবির পরিচয়

মহাকবি বিশাখদত্ত—এক জন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি রাজনীতিবিষয়ক 'মুদ্রা-রাক্ষস' নাটকখানি রচনা কবিয়া সংস্কৃত সাহিত্যিক সমাজে অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য কর্ত্তৃক নন্দগণের ধ্বংস এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ নীতিকৌশলে নন্দবংশের অতিশয় বিশ্বস্ত ও একান্ত অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসের বশীকরণ এবং চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে রাক্ষসকে আনয়ন—ইহাই এই নাটকের উপপাদ্য ঘটনা। মহাকবি বিশাখদত্তের সময় আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী—বৌদ্ধপ্রাধান্য—এবং বৌদ্ধনীতি অনুসারে অকুণ্ঠভাবে জীবনোৎসর্গের মহিমাময় দৃষ্টান্ত—সেই নাটকের প্রতি অঙ্গে বিকসিত। তাই মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন গৌরবের উচ্চ সীমায় উন্নীত হইয়া ত্যাগের মাহাত্ম্যে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, বিশাখদত্ত তখনকার লোক,—এবং এই মুদ্রারাক্ষস নাটকখানি সেই সময় রচিত হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ সম্বন্ধে তেলাঙ্গের "মুদ্রারাক্ষস" ও তাহার মুখবন্ধ পাঠ করুন—অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। আমরা ঐ নাটকের সারস্বরূপ শিক্ষণীয় সদুক্তি সমূহ এইখানে সন্নিবেশ করিলাম।

১। সৎক্ষেত্রে যত্ন সাফল্যমণ্ডিত হয়

এ সংসারে দেখা যায়, কাহারও চেষ্টা শীঘ্রই ফলবতী হয়, আবার কাহারও বা বহু আয়াসেও কোনই ফলোদয় দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ, ক্ষেত্রানুসারে যত্নের সফলতা বা বিফলতা হইয়া থাকে। সরকারী কলেজে প্রবেশ করিয়া কেহ বা দিন দিন গুণের উৎকর্ষ বাড়াইবার অবকাশ পাইতেছে—গাড়ী-ঘোড়া চড়িতেছে,—আবার তুল্যগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাইভেট কলেজে ঢুকিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারাদিন ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—গুণের উৎকর্ষ বাড়াইবে কখন্? ইহাকেই বলে, ক্ষেত্রানুসারে বিভিন্ন ফল। আবার দেখুন, শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকেই তুল্যভাবে শিক্ষা দিতেছেন, শিক্ষা-বিতরণ-বিষয়ে কোন প্রকারেই ইতর-বিশেষ করেন না। কিন্তু তাহারই মধ্যে এক জন ছাত্র রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বা ডক্টর হইল,—আর এক জনের বিদ্যাপ্রতিভা কোরক অবস্থাতেই রহিয়া গেল। ইহাকেই বলে ক্ষেত্রানুসারে বিভিন্ন ফল।—তাই কবি কহিতেছেন—

"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকারিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥"
(—১ অঙ্ক ৩ শ্লোক)

মূর্খ চাষী যদি ভাল ক্ষেতে চাষ আবাদ করিতে পায়,—তবে তাহার ঐ চাষ—দিন দিনই বাড়িতে থাকে। ধান্যের অঙ্কুর হইতে যে ঝাড় বাঁধে—তাহাতে বপনকারীর কোনই কৃতিত্ব নাই; তাহা ক্ষেত্রের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে। ক্ষেত্র যদি উত্তম হয়, তবে শস্যের অঙ্কুর শীঘ্র শীঘ্র ঝাড় বাঁধিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদনের যোগ্য হয়।—কিন্তু ক্ষেত্র মন্দ বা অনুর্ব্বর হইলে অঙ্কুর হইতে শীষ জন্মায় না,—জন্মিলেও মুসড়াইয়া যায়।

অতএব জীবনের পথে কর্ম্মের জন্য সুক্ষেত্র বাছিয়া লওয়া সকলেরই উচিত। নতুবা তুমি যত বড়ই কর্ম্মী হও—তোমার ক্ষেত্রনির্ব্বাচনের দোষে—বৈফল্য হেতু সারা জীবন আপশোষ করিতে হইবে। কথাই আছে—"অস্থানে পততামতীবমহতা-মেতাদৃশী দুর্গতিঃ।" অতি মহৎ ব্যক্তিও অস্থানে অর্থাৎ অযোগ্য ক্ষেত্রে পড়িয়া দুর্গতিভাজনই হইয়া থাকেন।

২। চাকরী—বড়ই ঝকমারী

চাকরীর মত হেয়—নিকৃষ্ট বৃত্তি আর দুনিয়ায় আছে কি না সন্দেহ। তাই আমাদের কল্যাণনিদান মহাপ্রাজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ ইহাকে "শ্ববৃত্তি" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এবং "ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন"—বলিয়া চাকুরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহাকবি বিশাখদত্তের অভিমত—রাজভৃত্য কঞ্চুকীর মুখে শুনুন—৩ অঙ্ক ১৪ শ্লোক—"কষ্টং খলু সেবা"—

"ভেতব্যং নৃপতেস্ততঃ সচিবতো রাজ্ঞস্ততো বল্লভাদ্
অন্যেভ্যশ্চ বসন্তি যেঽস্য ভবনে লব্ধপ্রসাদা বিটাঃ।

দৈন্যাদুন্মুখদর্শনাপলপনৈঃ পিণ্ডার্থমাযস্যতঃ
সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ ॥"

প্রথমতঃ যিনি প্রভু অর্থাৎ রাজা বা অন্য মনিব যিনিই হউন—তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, কখন্ কি ত্রুটি হয় ?—তাহার পর মন্ত্রী ও রাজার প্রিয়পাত্র যাহারা—তাহাদিগকেও ভয় করিতে হয়,—শুধু তাহাই নহে,—রাজভবনে প্রভুর অনুগ্রহপুষ্ট যে সকল মোসাহেব বাস করে—তাহাদিগকেও ভয় করিতে হয়। নন্দানুরক্ত মন্ত্রী 'রাক্ষস' বলিয়াছেন (৫ অঙ্ক ২০ শ্লোক)—

"ভৃত্যত্বে পরিভাবধামনি সতি স্নেহাৎ প্রভূণাং সতাম্।
পুত্রেভ্যঃ কৃতবেদিনাং কৃতধিয়াং তেষাং ন ভিন্না বয়ম্ ॥"

"ভৃত্য-ভাবটা খুব হীন অপমানাস্পদ হইলেও সহৃদয় গুণগ্রাহী প্রাজ্ঞ প্রভুর স্নেহ বশতঃ আমরা পুত্রনির্ব্বিশেষেই দৃষ্ট হইয়া থাকি।" তার পর 'পিণ্ড' বা অন্নের জন্য প্রভুর প্রসাদ লাভার্থ দৈন্য বা কাতরভাবে কাঁচু-মাচু দৃষ্টিতে তাকান এবং তাঁহার মন যোগাইবার জন্য তোষামোদসূচক নানারূপ বাক্যে আলাপ করিতে হয়। এক কথায় প্রভুর নিকট নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের আত্মাভিমান সমস্তই বলি দিতে হয়। এরূপ লাঘবস্বীকার আর কোনও বৃত্তিতে নাই। তাই এই লঘুত্বসম্পাদক সেবাবৃত্তিকে মনীষিগণ যথার্থই 'শ্ববৃত্তি' বলিয়া প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। কেন না, কুকুরও প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার মুখের দিকে ঐরূপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে ও নানারূপ 'কেঁউ মেউ' শব্দ করিয়া থাকে। তোষামোদসূচক বাক্যকে কবি কুকুরের ধ্বনির মত কহিয়াছেন ও উহাকে 'অপলপন' বলিয়াছেন।

(ক) আবার উচ্চপদস্থ ভৃত্যের কিরূপ লাঞ্ছনা, তাহা মহাকবি "বিশাখদত্ত" মন্ত্রী রাক্ষসের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অধিকারপদং নাম নির্দ্দোষস্যাপি পুরুষস্য মহদাশঙ্কাস্থানম্"—দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও খুব আশঙ্কার কারণ। কেন না—

"ভয়ং তাবৎ সেব্যাদভিনিবিশতে সেবকজনং
ততঃ প্রত্যাসন্নাদ্ভবতি হৃদয়ে চৈব নিহিতম্।
ততোঽধ্যারূঢ়ানাং পদমসুজনদ্বেষজননং
গতিঃ সোচ্ছ্রায়াণাং পতনমনুকূলং কলয়তি ॥"

(৫ অঙ্ক ১২ শ্লোক)

সেবক বা ভৃত্যের প্রথমতঃ প্রভু হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, অতঃপর প্রভুর পার্শ্বচর বা পারিষদ্গণ হইতে ভয় উহার হৃদয়ে নিহিত হইয়া থাকে। তার পর যদি প্রভুর অনুগ্রহে বড় পদ পাওয়াই যায়, সেই পদ অসৎ লোকের দ্বেষের কারণ হইয়া থাকে। তাহার সেই পদগৌরবই পতনের অনুকূল হইয়া থাকে। আমরা এ সম্বন্ধে লর্ড সিংহ মহাশয়ের নাম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতে পারি। তিনি চাকুরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাকুরী 'লাট পদ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এত বড় পদ—যাহা ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর, তাহা পাইয়াও তিনি শান্তি অনুভব করেন নাই—"অসুজন"গণের দ্বেষভাজন হইয়া ঐ পদ বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। চাকুরী যে ঝকমারী, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দৃষ্টান্ত হইতে পারে ?

৩। অর্থদাস, পরাধীন বা ভৃত্যজনের হিতাহিতবিবেকশূন্যতা

(৫ অঙ্ক ৪ শ্লোক)

"কুলে লজ্জায়াং চ স্বযশসি চ মানে চ বিমুখঃ
শরীরং বিক্রীয় ক্ষণিকমপি লোভাদ্ধনবতি।
তদাজ্ঞাং কুর্ব্বাণো হিতমহিতমিত্যেতদধুনা
বিচারাতিক্রান্তঃ কিমিতি পরতন্ত্রো বিমৃশতি ॥"

অর্থদাস পরাধীন ব্যক্তি নিজের বংশমর্য্যাদা, লজ্জা বা শালীনতা, যশ ও মান কিছুর দিকেই তাকায় না। লোভবশতঃ ধনবানের নিকট আত্মশরীর বিক্রয় করে এবং ধনবান্ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হিতাহিত-বিচারশূন্য হয়। এ অবস্থায় তাহার স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি লোপ পায়।

৪। সদ্ভৃত্যের স্বরূপবর্ণন

নন্দরাজগণের পুরাতন মন্ত্রী 'রাক্ষস' তাঁহাদের অতীব অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুর্দ্দিনে—তিনি তাঁহাদের পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বপক্ষে আনয়নার্থ চাণক্যের উদ্যমই মুদ্রারাক্ষস নাটকের প্রধান ঘটনা। চাণক্য মন্ত্রী রাক্ষসের একনিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রভুভক্তির উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেছেন।

(১ অঙ্ক ১৪ শ্লোক)

"ঐশ্বর্য্যাদনপেতমীশ্বরময়ং লোকাঽর্থতঃ সেবতে
তং গচ্ছন্ত্যনু যে বিপত্তিষু পুনস্তে তৎপ্রতিষ্ঠাশয়া।
ভর্ত্তুর্যে প্রলয়েঽপি পূর্ব্বসুকৃতাসঙ্গেন নিঃসঙ্গয়া
ভক্ত্যা কার্য্যধুরং বহন্তি বহবস্তে দুর্ল্লভাস্ত্বাদৃশাঃ ॥"

এ জগতে নিয়মই হইল যে, ঐশ্বর্য্যবান্ প্রভুকেই অধীনস্থ লোক—অর্থলোভে সেবা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যতক্ষণ অর্থের সরগরম—ততক্ষণই প্রভুভক্তি অটুট থাকে। [আমাদের বাঙ্গালা প্রবচনও এই—"সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।"] কিন্তু যাহারা প্রভুর অসময়েও—তাঁহার পুনরভ্যুদয়ের জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তন করে এবং তাঁহার বিপদ্ বা দৈন্যের দিনেও পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরক্তি বশতঃ প্রভুর পুনরুদ্ধারের জন্য কার্য্যভার অঙ্গীকার করেন—এমন ভৃত্য খুবই দুর্ল্লভ।

আমাদের দেশে প্রাচীন বনিয়াদী ঘরে এইরূপ দুই একটি পুরাতন—নিষ্কৃত্রিম—প্রভুভক্ত ভৃত্যের কথা আমরা গল্পপ্রসঙ্গে শুনিয়া থাকি। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী উপন্যাসের রঘুদাদার চরিত্র—আমাদিগের চিত্ত—সদ্ভৃত্যের মাহাত্ম্যে অবনমিত করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ ভৃত্য সংসারে বুঝি আর থাকে না। ইহা কতকটা প্রভুদিগের ব্যবহারদোষে—ও কতকটা কালের দুষ্টপ্রভাবে ঘটিতেছে—মনে হয়। প্রভুর পক্ষে ভৃত্যের প্রতি পুত্রনির্ব্বিশেষে ব্যবহার—যাহা মন্ত্রী রাক্ষস প্রভু নন্দনৃপতিগণের সম্বন্ধে গৌরব-সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন (৫ম ২০শ্লোঃ)—যাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই প্রসঙ্গত (২নং নীতির শেষাংশ) * উদ্ধৃত করিয়াছি—

* "ভৃত্যত্বে পরিভাবধামনি সতি স্নেহাৎ প্রভূণাং সতাম্।
পুত্রেভ্যঃ কৃতবেদিনাং কৃতধিয়াং তেষাং ন ভিন্না বয়ম্ ॥"

(৫ অঙ্ক ২০ শ্লোঃ)

ন কালে বিলুপ্ত হইয়াছে। -অনুরক্ত ভৃত্যেরও ক্রমশঃ

৫। ভৃত্যের গুণ—বুদ্ধি, বিক্রম ও প্রভুভক্তি—
এই তিনের সমবায়

মন্ত্রী রাক্ষসের প্রশংসাচ্ছলে চাণক্যের উক্তি (—১ অঙ্ক ১৫ শ্লোক)।

"অপ্রাজ্ঞেন চ কাতরেণ চ গুণঃ স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন কঃ
প্রজ্ঞাবিক্রমশালিনোঽপি হি ভবেৎ কিং ভক্তিহীনাৎ ফলম্।
প্রজ্ঞাবিক্রমভক্তয়ঃ সমুদিতা যেষাং গুণা ভূতয়ে
তে ভৃত্যা নৃপতেঃ কলত্রমিতরে সম্পৎসু চাপৎসু চ।"

বুদ্ধিহীন ও দুর্ব্বল অথচ ভক্তিযুক্ত বা অনুরক্ত ভৃত্যের গুণ কি? অর্থাৎ নির্বুদ্ধি ও বলহীন কাপুরুষ ভৃত্য—অনুরক্ত হইলেও সেরূপ ভৃত্য কোনই কাযের নহে। আবার বুদ্ধি ও বিক্রমশালী ভৃত্য যদি ভক্তিহীন হয়—সেরূপ ভৃত্যেই বা ফল কি? বুদ্ধি, শারীরিক বল এবং প্রভুভক্তি এই তিন কল্যাণকর গুণের একত্র সমাবেশ—যে সকল ভৃত্যে সকল সময়ে কি সম্পদে কি বিপদে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহারাই যথার্থ ভৃত্য। ইহার বিপরীত যাহারা—তাহারা পোষ্যমাত্র অর্থাৎ অন্নধ্বংস করিবার যম।

আশা করি, বৈষয়িক লোক ভৃত্য বা কর্ম্মচারী নিয়োগের সময়—এই তিনটি গুণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবেন। কবি বিশাখদত্ত নিজে রাজা ছিলেন, তাঁহার এই উপদেশ—তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ। সুতরাং এই উপদেশ অমূল্য।

৬। কর্ম্মী তিন প্রকার;—অধম, মধ্যম ও উত্তম

উত্তমকর্ম্মী:—উত্তমকর্ম্মী ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ করেন না।

"প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি।"
(২ অঙ্ক ১৭ শ্লোক)

অধম-কর্ম্মী—কায হাতে লইবার পূর্ব্বেই নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবে, এইরূপ আশঙ্কা কল্পনা করত 'কায কি বাপু অত হাঙ্গামায়' এই মনে করিয়া ঐ কায আরম্ভই করে না। আবার মধ্যম-কর্ম্মী—কায করিতে করিতে বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইলে আর ঐ কায করে না। কিন্তু উত্তম-কর্ম্মীরা কায আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইলেও ঐ কার্য্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে না। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত কর্ম্মবীর। আমরা পুরাণ ও ইতিহাসে প্রতি কর্ম্মবীরের চরিত্রেই সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন—ইহাই হইল প্রকৃত কর্ম্মীর মূলমন্ত্র। কালিদাস রঘুবংশীয় নৃপতিগণকে "আফলোদয়কর্ম্মণাম্" বলিয়া প্রকৃত কর্ম্মবীররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, তিনিও কার্য্য শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইবার লোক ছিলেন না। "ন গ্লানি র্ন চ কাতর্য্যং……কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ।" অর্থাৎ পবননন্দন ভীম—কার্য্য করিতে করিতে গ্লানি বা কাতরতা দ্বারা অভিভূত হইতেন না। ইংলণ্ডের ইতিহাসপ্রথিত বীর রবার্ট ব্রুসের (Robert Brucc A. D. 1305-1329) চরিত্র ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এই কর্ম্মবীর বারম্বার বিঘ্নবিহত হইয়াও পরিশেষে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং স্কটলণ্ডের স্বাধীন রাজা হইতে পারিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের পথ কুসুমাস্তরণের মত সুকোমল নহে। উহা বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু তাই বলিয়া বিঘ্নের ভয়ে—কর্ত্তব্য ত্যাগ করা উচিত নহে। দেশের তরুণগণ এই উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তমশ্রেণীর কর্ম্মী হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা। তবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

৬। (ক)। প্রকৃতির মধ্যে উত্তম-কর্ম্মীর দৃষ্টান্ত
অনন্তনাগ ও সূর্য্যদেব

"কিং শেষস্য ভরব্যথা ন বপুষি ক্ষ্মাং ন ক্ষিপত্যেষ যৎ
কিং বা নাস্তি পরিশ্রমো দিনপতেরাস্তে ন যন্নিশ্চলঃ।
কিন্ত্বঙ্গীকৃতমুৎসৃজন্ কৃপণবচ্ছ্লাঘ্যো জনো লজ্জতে
নির্ব্যূঢ়ং প্রতিপন্নবস্তুষু সতামেতদ্ধি গোত্রব্রতম্।
(২য় অঙ্ক ১৮ শ্লোক)

'শেষ' অর্থাৎ অনন্তনাগ—যিনি ফণার উপর পৃথিবীর ভার বহন করিবার ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছেন,—সেই ভূভার-বহন-হেতু তাঁহার কি ব্যথা বোধ হয় না যে, তিনি ঐ ভূভার নিক্ষেপ করেন না? অর্থাৎ ঐ ভূভার-জনিত ব্যথা অনুভব হইলেও উহা তাঁহার অঙ্গীকৃত কর্ত্তব্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন না। প্রকৃতির আর একটি জিনিষের দিকে তাকাইয়া দেখুন—দেব দিনকর যে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়াছেন,—ইহাতে কি তাঁহার পরিশ্রম হইতেছে না? পরিশ্রম হইলেও তাঁহার এই অবিরাম ভূ-প্রদক্ষিণ-ব্রত—কর্ত্তব্যবোধে পরিত্যাগ করিতেছেন না। এইরূপ যাহা কর্ত্তব্যরূপে একবার অঙ্গীকৃত হইয়াছে—এমন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে শ্লাঘ্য ব্যক্তিও অতি হীনজনের মত লজ্জাভাজন হইয়া থাকেন। অঙ্গীকৃত কর্ম্মের সমাপ্তিসাধনই সজ্জনগণের কুলধর্ম্ম। কালিদাসও কহিয়াছেন, (শকু, ৫ম অঙ্ক)

"ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ……"

অর্থাৎ সূর্য্য সেই একবারই তাঁহার রথে অশ্ব জুতিয়াছেন,—অশ্ব আর খুলিবার সময় হয় নাই, বায়ুও অবিরত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আর অনন্তনাগও সর্ব্বদা অক্লান্তভাবে ভূমির ভার বহন করিতেছেন।

এইরূপে প্রতি আদর্শ-কর্ম্মী নিরলসভাবে অবিরত কর্ম্ম করিবে। মহাকবি বিশাখদত্ত ও কালিদাসের এই বচন শ্রীভগবানের "কর্ম্মণৈব ভান্তি দেবাঃ পরত্র কর্ম্মণৈব প্রবতে মাতারিশ্বা।" ইত্যাদি ওজস্বিনী বাণীর প্রতিধ্বনি। আমার "গীতায় কর্ম্মবাদ" প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী কার্ত্তিক ১৩৩৪

সংখ্যায়) শ্রীভগবানের ঐ বাণী বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন।

৭। নিস্পৃহ ব্যক্তিগণ কাহারও তোয়াক্কা করেন না

পরাধীন অর্থদাস পুরুষ যেমন সততই মনিবের মন যোগাইয়া চলে, নানারূপ তোষামোদ-বাক্য কহিয়া থাকে, নিস্পৃহ ব্যক্তির কিন্তু সেইরূপ লাঘব স্বীকার করিতে হয় না। জগতে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে হইলে স্পৃহাশূন্য হওয়া প্রথম প্রয়োজন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য ছিলেন, কিন্তু তিনি নিস্পৃহ ছিলেন বলিয়া রাজাকে তোয়াক্কাই করিতেন না, রাজাই বরং তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিয়া চলিতেন। নিস্পৃহ তেজস্বী চাণক্য রাজাকে 'বৃষল' বলিয়া সম্বোধন করিলেও রাজা উচ্চ-বাচ্য করিতে পারিতেন না—মাথা পাতিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইতেন। প্রভুর নিকট নিজের তেজ বজায় রাখিয়া গুরুর মত সম্মান লাভ করিতে হইলে—চাণক্যের মতই নিস্পৃহ হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে কবির বাক্য শুনুন—(৩ অঙ্ক ১৬ শ্লোক)

"স্তবন্তি শ্রান্তাস্যাঃ ক্ষিতিপতিমভূতৈরপি গুণৈঃ
প্রবাচঃ কার্পণ্যাদ্ যদবিতথবাচোঽপি পুরুষঃ।
প্রভাবস্তৃষ্ণায়াঃ স খলু সকলঃ স্যাদিতরথা
নিরীহাণামীশস্তৃণমিব তিরস্কারবিষয়ঃ॥"

সত্যশীল ব্যক্তিও দৈন্যবশতঃ অর্থলোভে হীনজনের মত প্রভুকে তাঁহার যে সকল গুণ নাই—এমন গুণসমূহের উল্লেখ করিয়া মিথ্যা তোষামোদ করিয়া থাকে,—এই তোষামোদ করিবার সময় তাহাদের মুখের বাঁধন টুটিয়া যায় এবং তোষামোদ-বাক্যে মুখব্যথা হইলেও ক্ষান্ত হয় না। অর্থদাস পুরুষের অর্থ-লোভের এমনই প্রভাব। অপর দিকে নিস্পৃহ ব্যক্তি তোষামোদের ধার ধারেন না, বরঞ্চ প্রভুকে তৃণের মতই জ্ঞান করেন,—প্রভুর অন্যায় দেখিলে তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রভুও তাঁহার সেই তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন।

শূদ্র নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের অধীনে অমাত্য হইয়াও কিরূপে নিস্পৃহতাগুণে চাণক্য স্বীয় ব্রহ্মণ্যতেজঃ রক্ষা করিয়াছিলেন,—তাহা ব্রহ্মণ্যতেজের আস্ফালনকারিগণ শিক্ষা করুন। কেবল নিস্পৃহতার ভাণ দেখাইলেই ব্রহ্মতেজ বজায় করা যায় না। "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ"—এই মৌখিক নিস্পৃহতায় লোকের নিকট সম্মান পাওয়া যায় না।

৮। চাণক্যের নিস্পৃহতা ও ত্যাগের নিদর্শন

চাণক্য রাজাধিরাজমন্ত্রী,—অথচ তাঁহার বিভবের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার গৃহের বর্ণন শুনুন—(৩য় অঙ্ক ১৫ শ্লোক)

—"উপলশকলমেতদ্ভেদকং গোময়ানাং
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং স্তূপমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভি-
র্বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্।"

এইখানে হোমাগ্নি প্রজ্বালনার্থ ঘুঁটে ভাঙ্গিবার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে,—অপর স্থানে শিষ্য ব্রাহ্মণবালকগণ কর্তৃক আহৃত কুশ-সমূহের রাশি জড় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার গৃহটি হইতেছে—একখানি পুরাতন ভাঙ্গা কুটীর। উহার চালার উপর যজ্ঞিয় কাষ্ঠসমূহ শুকাইতেছে,—তাহার ভারে জীর্ণ চালাখানির 'ছেঁচ' ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।"

রাজাধিরাজ-মন্ত্রী হইয়াও চাণক্যের বিভব—তাঁহার এই গৃহের বর্ণন হইতেই অনুমেয়। কি ত্যাগীই তিনি ছিলেন! এই ত্যাগের মাহাত্ম্যেই তিনি প্রবল নন্দদিগকে উন্মূলিত করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের ব্রহ্মণ্যতেজের আস্ফালনকারীদিগের মত নাটকীয় ত্যাগের গলাবাজি তাঁহার ছিল না।

(অধ্যাপক) শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (এম, এ)।

নদীয়া ও যশোহরের গাজন-গীতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন রাজ-মালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বৌদ্ধ ভিত্তির উপরই বঙ্গদেশের হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে।" বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে প্রচলিত অনেক পূজা-পার্ব্বণ ও দেবদেবীর মধ্যে ইহার নিদর্শন আমরা পাইয়া থাকি। শিবের গাজন ইহাদের মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধ-সভ্যতা দেশবাসী সাধারণের হৃদয়ে এমনই ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী হিন্দু-নেতৃগণকে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময়ে—বৌদ্ধ ভিত্তির উপরই হিন্দুয়ানীর প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

শূন্যপুরাণোক্ত ধর্ম্মপূজা-উৎসবে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিবপূজা করিতেন, তবে এই শিবের স্থান ছিল বুদ্ধের অনেক নিম্নে। বৌদ্ধগণের কল্পিত শিব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন,—"বৌদ্ধযুগের শিব কৃষক-দিগের দেবতা। পরবর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্মের নেতৃগণ শিবের যে প্রশান্ত রজত-গিরি-সন্নিভ মূর্ত্তি ও সমাধির কল্পনা করিয়াছেন, বৌদ্ধযুগের শিবে তাহার কিছুই নাই। তিনি কৃষিকার্য্য করেন এবং গৃহে শিবানীর সহিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকের ন্যায় কলহ করেন।" (বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় ১ম ভাগ ১১১ পৃষ্ঠা) বৌদ্ধ প্লাবনের পর হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের কল্পিত শিবের সেই "রজত-গিরি-সন্নিভ" মূর্ত্তি তখন হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত পুথির পাতাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে; যে সকল গ্রাম্য কবি এই সকলের রচয়িতা, তাহাদের হৃদয়ে সেই কৃষক শিবের সিংহাসনই অটুট ও অক্ষয় হইয়া আছে। তাহারা এই শিবদুর্গাকে লইয়া, নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিতে পূর্ণ অনেক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।* এই হর-পার্ব্বতীর মধ্যে আমরা আদর্শ কৃষক-গৃহস্থকে, আদর্শ কৃষক-রমণীকে এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যকে পাইয়াছি। দীনেশ বাবুর "বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়" গ্রন্থে প্রদত্ত শিবের গান কয়টিও ঠিক এই ধরণের। এবারে প্রদত্ত "শিবের বিবাহের সম্বন্ধ" শীর্ষক গানে শিবের চিত্র বঙ্গ-পল্লীর আশু-অতীত দিনের সংসারের সুখ-দুঃখে উদাসীন, ধর্ম্মপ্রাণ, লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন নিজের যৎসামান্য অবস্থায় পরম সন্তুষ্ট অবস্থার চিত্র। গানটি আমাদের স্বদেশ-প্রেমিক গায়ক

মুকুন্দদাসের সেই—"এদের নেইকো তেমন কাপড়-চোপড়",
ছেঁড়া নেংটি ছেঁড়া চাদর,
তাতেই এরা এম্নি তুষ্ট, যেন সুখ-সাগরে ভাসা।" বর্ণনার প্রতীক একটি কৃষককে যেন স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীযুত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়—তাঁহার "বাঙ্গলার রূপ" পুস্তকের এক স্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী শুধু রাধা-কৃষ্ণের রূপে ফুটে নাই—শিব-পার্ব্বতীর রূপও বাঙ্গলা দেশ ধন্য করিয়াছে।" (১০৫ পৃষ্ঠা)

"ছালনাতলায় শিব" শীর্ষক গানে (শিবের পাগলামীটুকু বাদে) আমাদের দেশের বিবাহে স্ত্রী-আচার—বরের সহিত ঠাট্টা-তামাসা প্রভৃতির সহিত "ছালনাতলার" অবিকল একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"শঙ্খের জন্য ভগবতীর গোসা" গানে দেখা যায়, কৃষক প্রেমিক-প্রেমিকার দৈনন্দিন জীবনের প্রণয়-অভিনয়ের ছাপও এই হর-পার্ব্বতীতে পড়িয়াছে। কৃষক দরিদ্র, কিন্তু তাহার গৃহিণীকে শঙ্খ কিনিয়া না দিলেই নয়। গৃহিণী শঙ্খ না পাইলে কিছুতেই শুনিবে না। সে কলহ-কঠোর কণ্ঠে স্বামীকে তাহার কল্পিতা কোনও প্রণয়িনীর প্রেমসুখে মগ্ন থাকিবার ব্যবস্থা দিয়া পুত্রকন্যার সহিত পিতৃগৃহে চলিল। এখানে কৃষক-কবি, একটু নাটকের অবতারণা করিতেও ভুলেন নাই। গৃহিণী-রূপিণী চণ্ডীকে ফিরাইবার অন্য উপায় না দেখিয়া শেষে আপনাকেই শাঁখারী সাজিতে হইল। পক্ষান্তরে, শ্বশুরবাড়ী যাইবার আকাঙ্ক্ষাও মিটিল। অদ্ভুত শাঁখারীকে দেখিয়া সরোবরের তীরে যুবতীর দল গ্রাম্য-স্বভাবসুলভ আগ্রহে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং পরে রাজবাড়ীতে লইয়া গেল। বঙ্গ-পল্লী-লক্ষ্মীরা সবই স্বামীর জন্য হাসিমুখে সহ্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্তা; কিন্তু সময়বিশেষে স্বামীর নিকট তাঁহাদের অতি সামান্য সোহাগের আবদারটির অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে—অভিমানছলে স্বামীকে দণ্ডবিধান করিবার অভিপ্রায়ে, বঙ্কিমবাবুর "দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে" উল্লিখিত পিতৃগৃহে গমনরূপ দণ্ডবিশেষ প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আমাদের কুটীর-লক্ষ্মীগণের চরিত্রের এই দিক্‌টা কৃষক-কবির রচনার মধ্য দিয়া বেশ ফুটিয়াছে।

তার পর "শ্রীহরিমঙ্গল" শীর্ষক গানের কথা। বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-কুটীরের আড়ম্বরহীন সরল প্রাণগুলিকেও রাধা-কানুর পবিত্র প্রেম-রসে প্লাবিত করিয়াছিল। দিবসের কর্ম্ম-ক্লান্ত কৃষক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিয়া প্রাঙ্গণে মাদুর পাতিয়া—"নৌকা-বিলাস", "মানভঞ্জন," "দানলীলা" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পালা গাহিত। কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রাধা-কানুর প্রেম একটা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রেমের গভীর অর্থ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায়, তাহারা বৈষ্ণবগণ যে পূজার ডালা সাজাইয়া—ভগবানের নামে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে দুই একটি ফুল লইয়া, আপনাদের পার্থিব জীবনের মধুর রসে সিক্ত করিয়া প্রতিদিনের উপভোগ্য করিয়া লইল। গানটি পড়িলে মনে হয়,—রাধাকৃষ্ণ এই কৃষক-কবিদের কাছে কেবল স্বর্গের দেবতা হইয়া থাকিতে পারেন নাই, পরন্তু সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহাদের কুটীরে তাঁহাদিগকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে কৃষক যুবক-যুবতীর মান, অভিমান, সোহাগ ও প্রেম-কলহ ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের সেই,—

"বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশি-দিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নর-নারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি,
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতলে
যথাসাধ্য যে যাহার।"

বাণীর সার্থকতা আনয়ন করিয়াছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা অতি বাল্যকালে যখন "সাঁজুতি" ব্রত গ্রহণ করে, তখন হইতেই তাহারা প্রার্থনা করিতে শিখে—"অশথতলায় বসত করি। সতীন কেটে আল্‌তা পরি।" "গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল" গানটিতে সতীনে সতীনে অনর্থক কলহের একটা চিত্র অনেকখানি ফুটিয়াছে।

শিবের বিবাহের সম্বন্ধ

চলিল নারদ মুনি উঠিল বীণার ধ্বনি
ঢেঁকী-বাহনে করে গতি।
নাচিতে নাচিতে যায় সদা কৃষ্ণ-গুণ গায়
কৈলাস নগরে উপনীত॥
যখন বসিল হর হরষিত মুনিবর
লগ্ন-পত্র কেলা সমর্পণ।
(ও নারদ) কহ শুনি বিবাহের কথা ঘুচুক মনের ব্যথা
কোথা গিয়েছিলে তপোধন॥
তবে ঘটক নারদ কয় গিয়াছিলাম হিমালয়
শুন বলি বিবাহের কথা।
(অ) হেমন্ত নগরে ধন্যে হেমন্ত রাজার কন্যে
সম্বন্ধ করিয়া এলাম তথা॥
(মামা) কয় যদি এই বিয়ে বৃষ হাটে বেচ নিয়ে
টাকা-কড়ি লাগিবে বিস্তর।
ক্ষীরোদ গরোদ চেলি শাল পাট গঙ্গাজলি
চন্দ্রকণা পাটল তসর॥
শুনে বলে শূলপাণি শুন গো নারদমুনি
এত ধন পাব আমি কোথা।
অদ্যাবধি কিছু নাই নগরে মাগিয়া খাই
পুঁজি কেবল আছে ঝুলি কাঁথা।
বিভা যদি লেখা থাকে ঝুলি কাঁথা দিব তাকে
শিঙ্গে কেটে দিব ক'রে শাঁখা।
পরাব বাঘের ছাল গলে দিব হাড়মাল
ললাটেতে দিব ভস্ম-ফোঁটা॥
ঘটক বলে শুন কথা হাদে গো পাগলের ব্যাটা,
তবে কেন এত বাড়াবাড়ি।
বিবাহ করিবা ব'লে মোরে পাঠাইয়া দিলে
এখন বল কোথা পাব কড়ি॥

(অ) হিমালয়।

ছালনাতলায় শিব

শুন শুন সর্ব্বজন করি এক নিবেদন
শিবের বিয়ে শুন দিয়া মন।
শিঙ্গে ডুম্বুর লয়ে করে উঠিল বৃষের পরে
হিমালয়ে করিল গমন।
চলিল হেমন্ত-পুরী নন্দী-ভৃঙ্গী সঙ্গে করি
আগে আগে নারদ বাজায় বীণে।
বাদ্য শুনে যত নারী আইল হেমন্ত-পুরী
উলু দিল যত এয়োগণে।
ছালনাতলায় গিয়ে হর দাঁড়াইল দিগম্বর
দেখে সবে করে কানাকানি।
ছিঃ এমন মেয়ের এম্নি বর কোথা গেলে মেলে আর (অ)
এমন বর কে আনিল শুনি।
শিবকে ঘিরে এয়োগণে যুক্তি করে মনে মনে
কেহ কেহ আড়নয়নে চায়।
কেহ বলে বুড়োকালে বিয়ে ক'রে দিবি কারে
এমন সুন্দরী রসময়।
কেহ বলে তোর কি সাজে গৌরী দিলে সভার মাঝে
শুন বলি ওরে দুরাচার।
তুই ত যাবি যমের ঘরে বিয়ে ক'রে দিবি কারে
এমন সুন্দরী মনোহর।
শিব বলে ওগো ধনি তোমাদের পতি যিনি
তিনি আবার কেমন দুরাচার।
কেমন কঠিন হিয়ে এমন সুন্দরী থুয়ে
শান্ত হয়ে আছে নিজ ঘর।
শুনিয়ে হরের বাণী ঝাঁপিয়ে উঠে গিরি-রমণী
এক জনে শুনে উহার কথা।
(তোর) জটগুলি ছিঁড়ে দিব সিদ্ধির ঝুলি কেড়ে নিব
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিব কাঁথা।
শুনিয়ে রমণীর কথা খসাইয়া ঝুলি কাঁথা
ধর, নেও, ব'লে দেয় শিবরায়।
বাঘ-চর্ম্ম খুলে থুয়ে নাচেন উলঙ্গ হয়ে
লজ্জা পেয়ে এয়োরা পালায়।
মেনকা বলে ওগো দিদি আমার ভাগ্যের বিধি
মিলেছে জামাই অদ্ভুত।
বয়সের ত নেই তুলনা গাছ পাথর তাও মিলে না
সাক্ষাৎ যেন দেখতে যমের দূত।

শঙ্খের জন্য ভগবতীর গোসা (ই)

কৈলাসে পার্ব্বতী হর বসিয়া দুই জন।
পার্ব্বতী বলেন ও হর মোর নিবেদন।
পার্ব্বতী বলেন ও হর বলি গো তোমারে।
নগরে এসেছে শঙ্খ কিনে দাও আমারে।
অন্ন বিনে ছন্ন-ছাড়া শুকাইল মুখ।
হেন সময় শঙ্খ পরা তোমার বড় সুখ।
আমি শঙ্খ পরতে গেলে হরের মনে দুখ।
কুচনী পরিবে শঙ্খ সে বড় কৌতুক।
নায়েরেতে যাব আমি দুটি পুত্র লয়ে।
মনের সুখে থাক্ ভাঙ্গড় তোর কোচের মাথা খেয়ে।
(তখন) কার্ত্তিক কোলে গণেশ হাতে ত্রিপুরাসুন্দরী।
গোসা ক'রে যান চণ্ডী মাতা-পিতার বাড়ী।
পথে আছে বাঘ ভালুক ফিরে এসো ঘরে।
খাও তোমার দুই পুত্রের মাথা ভায়ের মাথার কিরে। (ঈ)
ভাই তুলে গাল দিলি রে ভাঙ্গড় আমার সাক্ষাতে।
খাও তোমার কুচনীর মাথা ব্যথা লাগে যাতে।
বাঘ আমার সিংহের আহার ময়ূরে খায় সাপ।
তোমার গৃহে থাকব না হর পেয়ে মনস্তাপ।
তখন হা চণ্ডী হা চণ্ডী ব'লে ডাকে ঘন ঘন।
হেন সময় ভৃঙ্গী এসে দিল দরশন।
ভৃঙ্গীকে দেখিয়া শিব কাঁদিল বিস্তর।
দুর্গা বিনে কৈলাস পুরী হ'ল অন্ধকার।
ভৃঙ্গী বলে ওগো শিব তোমার যেমন দশা।
শঙ্খ বিনে ভগবতীর না ঘুচিবে গোসা।
গঠিল দুই বাহু শঙ্খ অতি মনোহর।
সোনার বরণ শঙ্খ দেখিতে সুন্দর।
বাম স্কন্ধে শঙ্খের ঝুলি হাতে ক'রে নড়ি। (উ)
নগরে চলিল বুড়ো মুখে পাকা দাড়ী।
পথের মাঝে যারে দেখে জিজ্ঞাসে তাহারে।
কোন্ পথে যাব আমি হেমন্ত-নগরে।
হিমালয়ের যত নারী সরোবরে ছিল।
শাঁখারী বুড়োরে দেখে তারা তথাকারে এল।
পথের মাঝে শঙ্খ নিয়ে করছে নাড়া-চাড়া।
কেউ বলে চাঁদের শঙ্খ কেউ বলে তায় সোনা।
আহ্বান ক'রে ডাকছে সবে চল গো রাজার বাড়ী।
মোদের দয়াময়ী পরিবে শঙ্খ ত্রিপুরাসুন্দরী।
মাধবচন্দ্রের গুণের কথা কতই বলিব। (ঊ)
অধিক হয়েছে বেলা মুখে বল শিব।

শ্রীহরি-মঙ্গল *

সর্ব্বজয় মঙ্গল বন্দন বিনোদিনী রাই।
বৃন্দাবনে বন্দিব শিব ঠাকুর কানাই।
বৃন্দাবনের ঠাকুর কানাই শিঙ্গায় দিলেন সায়।
ওগো সব সখী থাকিতে রাধার উড়িল পরাণ।

(অ) "মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়ো পাগলে দিলে গৌরী হেন ঝি।"
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(ই) রাগ, অভিমান। শব্দটি পারসীক।

(ঈ) কিরে—প্রতিজ্ঞা, দিব্যি।

(উ) নড়ি—লাঠি।

(ঊ) মাধবচন্দ্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই।

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার

জল ভর সুন্দর রাধে বেজার কেন মন। (ক্ষ)
অঞ্চলে রেখেছ চেপে কত রাজার ধন।
আপনার রূপ হে কানাই আপনি রাখি চেপে। (১)
কোথাকার গোয়ালা রাখাল কে আনিল ডেকে।
কেহ ত ডাকে নি মোরে এসেছি আপনি।
তাতে কেন বেজার হলে রাধা বিনোদিনী।
বেজার কেন হব গো কানাই বেজার কেন হব।
বয়ে দুটি মন্দ কথা কার আগেতে কব।
পরের রমণী দেখে কানাই কেন ভোল।
আপন ধন ভেঙ্গে কানাই বিভা গিয়ে কর।
বিবাহ করিব রাধে বল্লে বটে রাই।
তোমার মত সুন্দর রাধে কোথা গেলে পাই।
আমার মত সুন্দর রাধা কানাই যদি চাও।
গলায় কলসী বেঁধে যমুনায় ঝাঁপ দাও। (এ)
কলসী কোথায় পাব গো রাই কোথায় পাব দড়ি।
তোমার গলার হার দাও আর খোঁপা-বাঁধা দড়ি।
বিনা টাকার হার গো কানাই লক্ষ টাকার রূপ।
কোন্ জন্মে দেখেছ কানাই এত টাকার মুখ। (ঐ)

"পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার" ভূমিকা অংশে এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রদত্ত "শ্রীহরি-মঙ্গল" শীর্ষক গান হইতে চারি লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গানটিকে তিনি 'দানলীলার' গান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গানটি কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে সন্দেহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, তিনি উহা কোনও গ্রন্থে পান নাই। এক দিন একটি বৈষ্ণব ভিক্ষুক তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে ঐ গানটি গাহিয়াছিল, তিনি তাহাকে ।/০ আনা দক্ষিণা দিয়া গানটি লিখিয়া লয়েন। দীনেশবাবু যে চারিটি লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ পাঠ আছে।

"আমার মত সুন্দর নারী কানাই যদি চাও।
গলায় কলসী বান্ধি যমুনায় ঝাঁপ দাও।
কলসী কোথায় পাব রাধে কোথায় পাব দড়ি।
তোমার গলার হার দাও আর খোঁপা-বান্ধা দড়ি।

(ক্ষ) ক্ষুন্ন—বিষন্ন।
(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ভূমিকা ৯১ পৃষ্ঠা)

(১) শ্রীরাধিকা তাঁহার রূপ ও যৌবন-চাঞ্চল্য নিজের মধ্যেই সংযত রাখিয়াছেন। যৌবন-সমাগমে আজ রাধার মনে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেও রং ধরিয়াছে, সে সৌন্দর্য্যাতিশয্যে তিনি নিজেই পুলকিত, কিন্তু তাহা যাচিয়া প্রকাশ করিতে নারাজ।

(এ) রাধা একটু রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "কানাই, তুমি আমাকে পাবে না। সুতরাং নিরাশায় দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা গলায় কলসী বাঁধিয়া যমুনায় ঝাঁপ দেওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

(ঐ) রসিক কানাই তদুত্তরে কলসী কেনার মূল্যের জন্য গলার হার চাহিয়া বসিলেন। রাধিকা তদুত্তরে বলিতেছেন, "এ হারের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু উহা আমার অঙ্গে থাকিয়া, আমার রূপকে বর্দ্ধিত করিতেছে—উহা আমারই রূপের অংশ, সে হিসাবে উহার দাম অনেক বেশী। "কোন জন্মে দেখেছ কানাই এত টাকার মুখ" আমার এত মূল্যবান্ মুখ দেখিতেছ, সেই তোমার সৌভাগ্য—আবার হার চাও কোন্ মুখে ?"

কালো না হইলে বুঝি আরো কত হ'ত।
সুন্দর হইলে পদ ভূমে না পড়িত।
কালো কালো কয়ো না লো গোয়ালার ঝি।
বিধাতা করেছে কাল আমি করিব কি।
এক কালো দোয়াতের কালি ভারত পুথি লেখে।
আর কালো চোখের মণি যাতে জগৎ দেখে।
কাল এ যমুনার জল সর্ব্বলোকে খায়।
কালো মেঘে জল হলে জগৎ জুড়ায়।
কালো তোমার আঁখি-তারা কালো মাথার কেশ।
কালোতে বাঁধিয়া খোঁপা ভুলাও কত দেশ।
বনে থাকে লাল কুঁচ রক্তের প্রায়।
এক বিন্দু কালো তাতে কিবা শোভা পায়।
মাঠে থাকে শোণের ফুল সোনা হেন জলে।
যে ফুলেতে মধু নাই রূপে কি গুণ করে।
শ্রীহরিমঙ্গলের কথা ভাগবতের ছায়া।
ভজিলে বিপদ নাস্তি শ্রীহরি করবেন দয়া।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, গাজনের শিব ঠাকুর কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। তাই—নিম্নোক্ত "ধানের পহর" গানে শিব-ঠাকুরকে নন্দীর সঙ্গে ক্ষেত্রে ধান্য চৌকী দিবার জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধানের পহর (ও)

এক দিনে শূলপাণি, নন্দীকে বলিছে বাণী,
শুন শুন ওহে নন্দিবর।
নন্দী আমার বচন শুন, বৃষটি সাজায়ে আন
যাব আমি ধান্যের পহর।
এতেক শুনিয়া নন্দী, শিবের চরণ বন্দি,
ঝাট করে বৃষের সাজন।
বৃষ সাজে কুতুহলে, ঘণ্টা যাগর গলে,
এনে দিল যথা ত্রিলোচন।
বৃষের সাজন দেখে, অন্তরে পরম সুখে,
বৃষেতে উঠিল শূলপাণি।
(শিব) মনে অতি ব্যস্ত হয়ে, অতি বেগে ধেয়ে গিয়ে,
ধান পাহারায় রহিল তখনি।
সঙ্গেতে চলিল নন্দী, সে জানে পথের সন্ধি,
পিছে পিছে যান মহেশ্বর।
বামেতে কুচনী-ধাম, দক্ষিণে নন্দীর গ্রাম
সম্মুখেতে বল্লভ মনোহর।
তথা যেয়ে দুই জনে, পরম সন্তোষ মনে,
ধান প্রহরে রহিল তথা।
ভবানী ভাবেন মনে, যাবে সে কমল-বনে,
মনেতে পড়িল রসের কথা।
(দেবী,) হয়ে বাগদীর মেয়ে, জাল সুতা কাঁধে লয়ে,
একাকিনী করিল গমন।
পরিধান ভগ্ন কানি, অতি বড় কাঙ্গালিনী,
তবু রূপে ভুবনমোহন। (অসমাপ্ত।)

(ও)—চৌকী দেওয়া।

গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল

শিব।—আমারে লয়ে বৃদ্ধকালে ফেলায়ে পর্ব্বতে।
কোন্ সুখে যাবে গৌরী মায়েরে দেখিতে।
বুড়ো একটা বৃষভ আছে বাঁধা আমার ঘরে।
ঘোড়া আট দশ গোবর-চোনা কে ফেলাবে তারে। (ঔ)
বাহির করিয়া বান্ধি সেই মহা ভার।
কোন্ সুখে যাবে গৌরী হেমন্তনগর।
দুর্গা।—কি করিবে বুড়ো বলদ বেচ লয়ে হাটে।
হস্তি-ঘোড়া এনে দিব তোমার নিকটে।
খাসা মখমল শাল ক্ষীরোদ তসর।
দিব্য বস্ত্র এনে দিব ত্যজ দিগম্বর।
শিব।—ও সকল সামগ্রী গৌরী নাহি প্রয়োজন।
গাঁজার গাছ এনো কিছু করিব ভক্ষণ।
ও সকল সামগ্রী গৌরী নাহি প্রয়োজন।
চেষ্টা ক'রে এনো কিছু ধুতরার বিছন। (অং)
ও সকল সামগ্রী গৌরী নাহি মোর সাধ।
ঝাঁপী পুরে এনো কিছু শ্রী-ফলের পাত।
আর একটা কথা গৌরী বেহায়া হয়ে বলি।
হাত দেড়েক তেনা এনো সিঙ্গাইব ঝুলি।
যাত্রা করিলেন দেবী দেবেরে বুঝায়ে।
হেন সময় গঙ্গাদেবী আইলেন ধেয়ে।
গঙ্গা বলে যুব-স্ত্রী যাও বাপ-মায়ের ঘরে।
বিধাতা বিমুখ হলে শয়তান কীলোয় ঘাড়ে। (ক)
বাপের বাড়ী যাচ্ছি গঙ্গা প্রভুকে বুঝায়ে।
তুমি এসে নিষেধ কর কিসের লাগিয়ে।
এক কূল গেল তোমার ভাঙিতে চুরিতে।
আর এক কূল গেল তোমার মরা পুড়াইতে।
মরার হাড়-গোড় কত ফুটে আছে গায়।
না জানিয়ে দেবলোক গঙ্গাজল খায়।
ধোপার কাপড় কাচে কুকুরে রাখে মুতি।
না জানিয়ে বলে লোক গঙ্গা বড় সতী।
আর সব যাক যেমন-তেমন অপর জাতি হাঁড়ি।
আশ্বিনে দুর্গাপূজা খাস গিয়ে তার বাড়ী।
মাধবচন্দ্রের গুণের কথা কতই বলিব।
অধিক হয়েছে বেলা মুখে বল শিব।

শিব-দুর্গার কোন্দল

নারদ বলে ওগো মামা কৈলাসেতে যাব।
দোঠকা লাগায়ে কিছু কোন্দল শুনিব।
তখন নারদ এসে যায় কত মিথ্যা কথা কয়ে।
মিথ্যা কথার কেচ্ছা করে দোঠকা লাগায়ে।
ও মামী, ভাল ভাল কোচের নারী বসাইয়ে বাঁয়।
হেসে হেসে মামা তাদের হাত বুলাচ্ছে গায়।
মুঠিতে যায় মাজা ধরা কাঁকালি ভাঙ্গে কেশ। *
(মামী,) সে বড় সুন্দরী কন্তে নবীন বয়েস।
মিথ্যা কথা লাগিয়ে নারদ গেল অন্তরে।
বৃষভ লইয়া শিব উপস্থিত দ্বারে।
আনা দিন আসরে বুড়ো থাপুড়-থুপুড় করে।
আজ কেন আসরে বুড়ো মাজা ধরে ধরে।
আজ কুচনীপাড়ায় মার খেয়েছ তা তো আমি জানি।
না হয় চন্দ্র সূর্য্য দুই দেবতা সাক্ষী ডেকে আনি।
কোন্ অভাগীর মেয়ে এসে মিথ্যা কথা কয়ে।
মিথ্যা কথার কেচ্ছা করে দোঠকা লাগায়ে।
পার্ব্বতী বলে ভাঙ্গড় বেয়ে থাক কোথা।
জটগুলা ছিঁড়িয়া দিব মুড়াইব মাথা।
কুচনীপাড়ায় যাইনি আমি গিইলাম অন্য কাজে।
অপযশের কপাল হলে সবাই তারে দোষে।
ভাং খাই, ধুতরা খাই, পরি কেঁদোর ছাল।
রূপ নাইকো গুণ নাইকো অপযশে কপাল।

গতবারে প্রদত্ত ছড়াগুলি যশোহর ঝিনাইদহার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামের চন্দ্রকান্ত বৈরাগীর নিকট হইতে ও বংকিরা গ্রামের ৺মদনমোহন বিগ্রহের সেবাইত শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। এবারে প্রদত্ত "শ্রীহরি-মঙ্গল", "শঙ্খের জন্য ভগবতীর গোসা" "গঙ্গা ও দুর্গার কোন্দল"প্রভৃতি গানগুলি পূর্ব্বোক্ত বংকিরা গ্রামের কানাইলাল কর্ম্মকারের নিকট হইতে সংগৃহীত। "শিবের বিবাহের সম্বন্ধ" ও "ছালনাতলায় শিব" শীর্ষক গান দুইটি ঝিনাইদহার অন্তর্গত পোতাহাটী গ্রামের শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে উক্ত গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাকে গাথা সংগ্রহে উৎসাহিত করিবার জন্য আমার পরমপূজনীয় ও পিতৃকল্প শিক্ষক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলরাম হাজরার দ্বারা নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার পোড়াদহ হইতে যে কয়টি গান সংগ্রহ করাইয়াছেন, তাহার মধ্যে এবারে মাত্র "ধানের পত্তর" গানটি দেওয়া হইল। কুষ্টিয়া উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় কুষ্টিয়া মহকুমার নানা স্থান হইতে গাথা-সংগ্রহ কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অজস্র বাধা-বিঘ্নের মধ্যে এই বিরক্তিকর কার্য্যে একাগ্রচিত্তে লাগিয়া থাকা একটা চপলমতি বালকের পক্ষে খুব কম কথা নহে। কান্তিভূষণ, তোমার নিকট এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহি না। কেন না, তোমার কাছে আমার এর চেয়ে অনেক বড় দাবী করিবার আছে। তবে লোক-লোচনের অন্তরালে বসিয়া এতাবৎ দীর্ঘকাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছ, সে জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই তুমি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(ঔ) বাঁশ হইতে নির্ম্মিত আবর্জ্জনা ফেলিবার পাত্রবিশেষ।
(অং) শস্যাদির বীজ।
(ক) কীল মারে।

* "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।"—কৃত্তিবাস।

ছবি

(গল্প)

১

অপ্রকাশ বলিল,—ছেলেমানুষের মত কাঁদতে বসলে তুমি! ছি, সুরো—

সুরো চোখের জল মুছিয়া কহিল,—না, কাঁদবে না! আমার বুঝি মন কেমন করবে না? একলাটি—বা রে!

অপ্রকাশ কহিল,—সাতটি দিন শুধু—এ সাত দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে! আমায় রোজ তুমি চিঠি লিখো—

সুরো কহিল,—আমি লিখতে পারবো না।

সুরো স্বামীর পানে চাহিল। অপ্রকাশের দুই চোখে হাসির ঝিলিক! সুরোর চোখে জল আবার উথলিয়া উঠিল।

সুরো এখানে চার মাস আসিয়াছে। অপ্রকাশ ল' পাশ করিয়া এ ক'মাস বাড়ীতে আছে। তরুণ বয়সের কাব্য-মাধুরী নিঃশেষে দু'জনে উপভোগ করিতেছিল। সে হাইকোর্টে ওকালতি করিবে-- শনদ বাহির হইয়াছে। তাই একবার গিয়া বাসার বন্দোবস্ত করা দরকার। তার পর কথা আছে, সস্ত্রীক সেই বাসায় গিয়া উঠিবে। বিধবা মা··· তিনি ঠাকুর ফেলিয়া, ঘর ফেলিয়া কি করিয়া এখন যান। তবে পরে যদি সুবিধা করিতে পারেন, যাইবেন। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তিনি তাদের বাসায় গিয়া দু-চারদিন থাকিয়া আসিবেন বৈ কি।

কাল সকালে অপ্রকাশ কলিকাতায় যাইবে। রাত্রিতে স্বামি-স্ত্রীতে বসিয়া সেই কথাই হইতেছিল।

সুরো বলিল,—সাত দিন কেন থাকবে তুমি? বাসা বুঝি এক দিনে দেখে ঠিক করা যায় না?

অপ্রকাশ কহিল,—শুধু বাড়ী ঠিক করাই নয় তো—টেবিল-চেয়ার কেনা, বই কেনা, সব গোছ-গাছ ক'রে নিতে হবে তো! তার পর তোমার জন্য একটি ঝীয়ের দরকার—তাও ঠিক ক'রে আসবো।

সুরো কহিল,—ঝীয়ের কোনো দরকার নেই।

অপ্রকাশ কহিল,—পাগল! তা কখনো হয়! আমি কোর্টে বেরিয়ে যাবো, তুমি একলা থাকবে?

সুরো কহিল,—একটা চাকরে খুব হবে। এখান থেকে নিমাই যাচ্ছে তো।

অপ্রকাশ কহিল,—তা হলেও ঝী দরকার। কথা কবার জন্য। লক্ষ্মীটি, আমার সুটকেশটা গুছিয়ে দাও—তোমার জন্যে "খুব" ভালো ভালো বই কিনে আনবো'খন।

সুরো কহিল,—আমার বই দরকার নেই। সুটকেশ গুছিয়ে রেখেচি।

অপ্রকাশ কহিল,—কি কি দিলে, দেখি, এসো—

অপ্রকাশ উঠিয়া সুটকেশ খুলিল। জামা, কাপড়, রুমাল, সাবান, সেভিং-কেশ, আয়না, চিরুণী, ব্রাশ, টুথ-পেষ্ট, টুথ-ব্রাশ মায় সেণ্ট—কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই! রবি বাবুর দু'খানা নূতন বই পর্য্যন্ত সুরো সুটকেশে পুরিয়া দিয়াছে।

অপ্রকাশ সাদরে সুরোর অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—গৃহলক্ষ্মী তো একেই বলে!

সুরো কহিল,—সারাদিন কি করবে? এই সাত দিন?

অপ্রকাশ কহিল,—কত ঘুরতে হবে, তার ঠিক আছে। প্রথমে একটা বাড়ী—যাঁর কাছে আর্টিকেল ছিলুম, তার বাড়ীর কাছে বাসা হলেই ভালো হয়, না হলে আমার সাধ বালিগঞ্জ এভেনিউয়ে থাকা—খাশা সব বাড়ী হয়েছে। সেখানে পথে তোমরা হেঁটে বেড়াও, কেউ কোনো কথা বলবে না, ভিড় নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কাছেই লেক্‌···এক-বারে স্বপ্নপুরী!

সুরো কহিল,—রোজই এমনি ঘুরবে? সব সময়েই?

অপ্রকাশ তার কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল,—পাগল! তার পর ফার্ণিচার কেনা, বই কেনা, [illegible] একটু গুছিয়ে রাখা, কোর্টের জন্য গাউন তৈরি করা—এ সব আছে তো।

সুরো কহিল,—রাত্রে তো দোকান খোলা থাকবে না ?

অপ্রকাশ পত্নীর পানে চাহিয়া কহিল, বন্ধুবান্ধব আছে, একটু লেখাশুনা করা আছে—দু'চারজন মুরুব্বি পাকড়াতে হবে, মক্কেল পাওয়া যায় যাতে ! তার পর রাত্রে তোমার কথা চিন্তা—

সুরো কহিল,—হ্যাঁ, আমায় মনে থাকবে, কি না ! অত কাযের ভিড়···

অপ্রকাশ কহিল,—তুমি ইলার কথার প্রতিধ্বনি তুলছো—রাজা-রাণীর ইলা—

টেবিলের উপর সুরোর সদ্য-তোলা ফটো পড়িয়া ছিল। অপ্রকাশ তা লক্ষ্য করিল, কহিল,—তোমার ঐ ফটোটি দাওনি যে ! এটি দাও, এর সঙ্গেই কথা কবো, একে কত আদর করবো !

সুরো কহিল,—যাও—ও ছবি নিতে হবে না। ছবিকে আদর করলে আমার দুঃখ ঘুচবে কি না···চোখে তার জল আসিল।

অপ্রকাশ কহিল,—দেবে না ছবি ?

সুরো হাসিয়া ছবিখানা লইয়া সুটকেশে রাখিল। অপ্রকাশ ছবিখানা তুলিয়া বুকে ছোঁয়াইল, তার পর গালে। চুম্বনের পর চুম্বনবর্ষণে ছবিখানাকে সে অভিষিঞ্চিত করিয়া তুলিল।

হাসিয়া সুরো কহিল,—খুব হয়েচে ! খুব হয়েচে ! আমার সামনে একটু নয় উচ্ছ্বাস কমই করলে ! আমার বুঝি হিংসে হয় না ?

হাসিয়া অপ্রকাশ কহিল,—হিংসে কেন ? এ কি তোমার সতীন ?

সুরো কহিল,—সতীন বৈ কি !

বটে ! বলিয়া অপ্রকাশ ছবি রাখিয়া সুরোকে বাহু-বন্ধনে বন্ধ করিল এবং তার লজ্জারক্তিম কপোলে, অধরে—

আনন্দের আতিশয্যে সুরো অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কহিল,—সাত দিন—অন্-এ-ক দিন, অত দেরী করো না—একটু শীগ্‌গির—

অপ্রকাশ কহিল,—তিন দিনে যদি কায শেষ হয় তো চার দিনের দিন ফিরে আসবো।

স্বামীর পানে চাহিয়া সুরো একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার দুই চোখ অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

২

আট দিনের দিন অপ্রকাশ বাড়ী ফিরিল। বাসা ঠিক হইয়াছে লেকের কাছে। ঝীও পাওয়া গিয়াছে—বাসায় জিনিষ-পত্র সাজানো। শুধু পাঁজি দেখিয়া ভালো দিন দেখিয়া যাত্রা করার ওয়াস্তা—

অপ্রকাশ জামা ছাড়িতেছিল। সুরো কহিল,—কটা ঘর ?

অপ্রকাশ কহিল,—দোতলায় তিনখানি, একতলায় তিনখানি, তা ছাড়া রান্না-ঘর আলাদা। দোতলায় বাথরুম আছে—একতলায়ও আছে। বেশ ফাঁকা ফর্দ্দা—দক্ষিণ খোলা। ইলেক্‌ট্রিক লাইট-ফ্যান—বাড়ীখানি নতুন একেবারে। একটু খালি জায়গা আছে, তাতে ফুলের চারা লাগাতে পারো।

সুরো কহিল,—সব ঘরই দক্ষিণ-খোলা ?

অপ্রকাশ কহিল,—না, দুটো।

সুরো কহিল,—তার একটা ঘর আমরা নেবো, আর একটা মা'র জন্য সাজিয়ে রাখবো। বাকিটায় কাপড়-চোপড় থাকবে। আলমারী কিনেচো ?

অপ্রকাশ কহিল—নিশ্চয় !

অপ্রকাশ খাটে বসিল। সুরো বাতাস করিতে করিতে বলিল,—এ ক'দিন কি করলে বলো ? কখন্ কি ?

অপ্রকাশ কহিল,—আগে তোমার রিপোর্ট দাও।

সুরো বলিল,—আমার যা নিত্য কায, সকালে উঠে কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে মা'র পূজার উদ্যোগ করা, তার পর রান্নার কুটনো কোটা—তার পর মা'র কাছে বসা—পাণ সাজা—নাওয়া-খাওয়া।

অপ্রকাশ কহিল,—দুপুর বেলায় ?

সুরো কহিল,—মা বলতেন, যাও বৌমা, একটু জিরোও গে। তখন ঘরে এসে তোমায় চিঠি লিখতুম—তার পর তোমার এই বালিশটিতে মাথা রেখে কত কি ভাবতুম—

অপ্রকাশ কহিল,—কি ভাবতে ?

সুরো কহিল,—বলো দিকিনি—

অপ্রকাশ কহিল,—বলবো ? সেই ছেলেটির কথা—না ? তোমার মামার বাড়ীর সামনে সেই মেশ—তোমরা বিকেলে ছাদে উঠলে সেই যে ছেলেটি দূরবীণ চোখে তোমাদের দেখতো—সেই বেচারীর করুণ মুখ ?

সুরো রাগিয়া উঠিল কহিল,—যাও···ও কি বদ ঠাট্টা !

অপ্রকাশ কহিল,—তুমি বলোনি তার কথা? বলোনি, যে বেচারী—

সুরো কহিল,—আমি বুঝি তাই বলেছি! আমি শুধু বলেছিলুম—বেচারী কি আশায় যে দূরবীণ চোখে চায়! কোথাকার কে—আস্পর্দ্ধা ঢ্যাখো না।

অপ্রকাশ কহিল,—ঐ…যাই হোক, তারি কথা ত ভাবতে, না?

সুরো কহিল,—বয়ে গেছে তার কথা ভাবতে!—কি দুঃখে ভাববো! সে আমার কে যে…

অপ্রকাশ কহিল,—তবে কার কথা ভাবতে?

সুরো কহিল,—সে এক জনের কথা। তার নাম তো বলবো না। না, কক্খনো না।

অপ্রকাশ কহিল,—আমি বুঝেছি…

সুরো কহিল,—কে? বলো তো মশাই?

অপ্রকাশ কহিল,—গাধার মত যার হাঁদা বুদ্ধি, হত-ভাগার মত চেহারা—তবে তার যে স্ত্রী আছে, সে একেবারে দুনিয়ার সেরা—রূপে যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি সরস্বতী!

সুবো কহিল,—যাও—দেখ্‌বে, আমি কি করতুম—

বলিয়া সে একটা খাতা আনিয়া অপ্রকাশের সামনে ফেলিয়া দিল। খাতা খুলিয়া অপ্রকাশ দেখে, এক জায়গায় লেখা আছে—

তুমি এখন কি করচো, বলবো! বাড়ী দেখচো—ও ঘরে ওইখানে একটা যে কৌচ পাতবো—এই কৌচে ব'সে দুটিতে ছুটীর দিনে দুপুর বেলায় 'বলাকা' পড়বো—কেমন?

অপ্রকাশ হাসি-মুখে সুরোর পানে চাহিল, সুরো মুখ বাঁকাইয়া আড় চোখে তাকে লক্ষ্য করিতেছিল, লজ্জায় তার মুখ ছল্-ছল্ করিতেছে!

অপ্রকাশ আর-একটা পাতা খুলিল,—সে পাতায় লেখা আছে—

বড্ড আমার মন কেমন করচে। দত্তদের বাগানের গাছে একটা পাখী এমন ডাকচে, মনে হচ্ছে, ওর সাথী যেন ওকে ছেড়ে কোথায় দূরে চ'লে গেছে। আজ চার দিন হলো। আরো এখনো তিন দিন। এ তিন দিন কেমন ক'রে কাটবে গো? কায নেই তোমার বাড়ী ঠিক ক'রে। তুমি এইখানে থেকে ওকালতি করো—এসো গো, চ'লে এসো, আমার কথা না হয় নাই ধরলে, মা'র জন্তও কি মন কেমন করে না? কেমন নিষ্ঠুর গা তুমি!

অপ্রকাশ ডাকিল—সুরো—

সুরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কি?

অপ্রকাশ কহিল,—ঠিক বলেচো—দরকার নেই ওকালতী ক'রে! পয়সার জন্যই তো ওকালতী? কিন্তু পয়সায় কি সুখ? এ মনে যে ভালোবাসা, যে প্রীতি আমার জন্য সঞ্চিত, তাই কি প্রচুর সম্পদ নয়?

সুরো কহিল,—যাক, তোমার কথা বলো। কাল সন্ধ্যার সময় কি করছিলে?

অপ্রকাশ কহিল,—কাল?—ও! কাল সত্য ধরেছিল, তার সঙ্গে থিয়েটারে গেছলুম, একটা অপেরা আর একটা ফার্শ ছিল। গানগুলো সত্যি বেশ লাগছিল। আর নাচ? ভারি আর্টিষ্টিক। কলকাতায় গেলে তোমায় এক দিন ও-অপেরাখানা দেখাবো।—চমৎকার!

সুরো একটা নিশ্বাস চাপিল—অতি কষ্টে। তার পর কহিল,—পরশু সন্ধ্যাবেলা?

অপ্রকাশ কহিল,—পরশু তো রবিবার গেছে? আঃ, বলো কেন? বেলা তিনটের সময় সুরেশের পাল্লায় পড়ে একটা ফিল্ম কোম্পানির ছবি তোলা দেখতে গেছলুম—একটা মস্ত শীন্ তোলা হলো। প্রায় পঁচিশ জন রাজপুত-নারী দুর্গ রক্ষা করচে সশস্ত্র… মোগলের আক্রমণের বিরুদ্ধে—কেল্লা যা বানিয়েছিল…স্রেফ বাঁশের থামে ছবি-আঁকা কাগজ সেঁটে…বেশ করেছিল!

সুরোর বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে কহিল—তরশু?

অপ্রকাশ কহিল—তার আগের দিন বিনয়ের বাড়ী খেতে হলো কি না! ছাড়লে না। তার বোন গান গাইলে—রবি বাবুর গান। খাশা গাইলে…বিশেষ সেই গানটা…আমায় একটুখানি বস্‌তে দিয়ো কাছে…রাত্রে কতক্ষণ অবধি তার রেশ আমার কাণে বাজছিল যে! ওর বোনকে যে গান শেখায়, কলকাতায় গেলে তোমায় তার ছাত্রী ক'রে দেবো।

সুরোর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল—তোমার কষ্ট হয়নি তা হলে তেমন?

অপ্রকাশ কহিল—না। ভারী আমোদে ছিলুম ক'দিন। যে দিন গেলুম, তার পরের দিনই এ বাড়ীর সন্ধান পাই গোলোকের কাছে। দেখে অমনি কথা পাকা ক'রে ফেললুম।

তার পর গোলোক এক কাঠওয়ালার কাছে নিয়ে গেল বৌবাজারে—ফার্ণিচার কিনলুম, কতক অর্ডার দিলুম—ব্যস,—ঝী তার দিদির জানা একটি ছিল! তার পর কটা দিন…এ বন্ধু নিমন্ত্রণ করে তো ও ছাড়ে না—গান-বাজনা, তাশ, বায়োস্কোপ, থিয়েটার…আজই কি ছাড়ছিল? তা, নেহাৎ কথা দিয়ে গেছি—আর এখান থেকে বেরুতে দেরী হবে—আমার উকিল-সাহেব তাড়া দিলেন, কাজেই…

ওঃ! তাই!…সুরোর চোখের পাতার পিছনে জল ঠেলিয়া আসিল।

অপ্রকাশ কহিল,—সুটকেশটা খোলো তো সুরো… এক টিন বিস্কুট আছে—বার ক'রে রাখো, চায়ের সঙ্গে চলবে'খন।

সুরো সুটকেশ খুলিল। কাপড়-চোপড় ঘাঁটা ছড়ানো—বিপর্য্যয় কাণ্ড! নাড়িয়া তুলিয়া গোছ-গাছ করিতে এক-বারে তলায় দেখে—খবরের কাগজে জড়ানো চটি জুতা জোড়ার তলায় কোণ-ভাঙ্গা তার সেই ফটোখানা…জুতা জোড়া যেন তাকে চাপিয়া হত্যা করিয়া ছাড়িয়াছে!

অপ্রকাশ কহিল,—ওটা কি, বলো তো?

সুরো কোনো কথা কহিল না, উপুড় হইয়া দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া সে বসিল। তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা নামিল।

অপ্রকাশ ঝুঁকিয়া দেখে, সুরোর ছবি।

বিদায়-বেলার কথাগুলা বিদ্যুতের মত মনে ফুটিয়া উঠিল। অপ্রভিতের মত সে স্তব্ধ রহিল।

বাহির হইতে মা ডাকিলেন,—বৌমা!

সুরো উঠিয়া চোখের জল মুছিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছবিখানা দু'টুকরা হইয়া মেঝেয় লুটাইল।

অপ্রকাশ তা দেখিল,—দেখিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বাহিরে বাগানের গাছে একটা পাখী ডাকিতেছিল, খাতায় যে পাখীর কথা সুরো লিখিয়াছে, বুঝি সেইটাই—নহিলে সুর—অপ্রকাশের কাণে সুর অমন করুণ ঠেকিবে কেন?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বংশীধ্বনি

(রাসারম্ভে)

বল দেখি কেন সজনি!
না হ'তে গভীর রজনী,
আজি মুরলীমোহন—মোহন-মুরলী-
ধ্বনিতে ভরিল ধরণী॥

ঐ সান্ধ্য শারদ গগনে
কুঙ্কুম নব রঞ্জনে,
দেখ উজ্জ্বল লালিমা পূরব দিশার
সুন্দর বিধুবদনে॥

ঐ নীল যমুনার লহরী তুলিয়া
চপল সমীর রহিয়া রহিয়া,
নাচায়ে ফুটায়ে কুসুমলতার
লুটিছে সুবাস চুমিয়া॥

সখি শোন শোন বাঁশী কি যেন গাহিছে
তাই শুনে প্রাণ মাতিয়া উঠিছে,
গতিহীন গান করিছে চঞ্চল
স্বভাবচপলে অচল করিছে॥

আবেগে আবেগে সখি শিহরিয়া
ঐ বহিল উজান তপন-তনয়া,
যেন পাগলিনী নেচে নেচে ধায়
তরল তরঙ্গ বাহু পসারিয়া॥

শিহরিছে গান শুনি গিরি গোবর্দ্ধন,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কুঞ্জে কুঞ্জে নাচে শিখিগণ,
মত্ত পিক হংস ভৃঙ্গ গায় মিলি সব বিহঙ্গ,
হরিণী নিমেষহীন, স্তব্ধ বৃন্দাবন।
বংশীগান সুধাসিন্ধু-মগ্ন ত্রিভুবন॥

ঐ বংশীগানে গলে শিলা নদী জ'মে যায়।
তরুলতা গুল্মরাজি রোমাঞ্চিত হয়;
শাখায় শাখায় পাখী অশ্রুভরা দুটি আঁখি
না জানি কি যেন হেরি স্তব্ধ হয়ে রয়,
আত্মারাম পূর্ণকাম মহাযোগী প্রায়॥

কর্ণরন্ধ্রে বংশীধ্বনি পশিল অন্তরে,
আকুলি বিকুলি প্রাণ ধৈর্য্য নাহি ধরে।
চল সখি ত্বরা করি ডাকে বংশী নাম ধরি
কেন আর লজ্জাভয়? কায কিবা ঘরে?
জনম সফল হবে হেরি বংশীধরে॥

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)

দুগ্ধের সদ্ব্যবহার

প্রাচীন ভারতে দুগ্ধ-সরবরাহের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং তজ্জন্য সাধারণের কোন অসুবিধা হইত কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ সে সময়ে দুগ্ধ-সমস্যা বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না। কারণ, তখন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই গো-পালন করিত এবং যে সকল লোককে বাজারের দুধের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহাদের সংখ্যা খুব কমই ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা ঠিক বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এখন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক ব্যক্তি সহরে আসিতেছে; বড় বড় কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠায় কতিপয় স্থান বহু জনাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলসমূহে শ্রমিক-বসতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এ সকল স্থানে দুগ্ধের চাহিদা যথেষ্ট; কিন্তু যাহারা দুগ্ধ ব্যবহার করে অথবা করিতে পারে, তাহাদের অধিকাংশেরই নিজের গরু নাই; সাধারণতঃ তাহারা বাজারের দুধের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এমন কি, পল্লীগ্রামেও অনেকে গো-পালন অপেক্ষা দুগ্ধ-ক্রয় সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে।

দুগ্ধ-ব্যবসায়ের অবস্থা

বঙ্গদেশের কথা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এতদ্দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ গরু আছে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানে গাভী প্রতি দুগ্ধ উৎপাদনের হার লিপিবদ্ধ হয় না; সুতরাং বাঙ্গালার গরুর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দুগ্ধ উৎপাদন যে কি পরিমাণ, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, এক এক জিলায়, যথা বীরভূম ও বাঁকুড়া, গাভী পাঁচ পোয়া বা দেড়সের দুধ দেয় মাত্র; উক্তরূপ স্থানে বলদের সহিত গাভীকেও চাষের কাযে লাগাইতে দেখা যায়। খুব ভাল দেশী গরুকেও দৈনিক ৪ সেরের অধিক দুধ দিতে প্রায় দেখা যায় না। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালায় গাভীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন সহরের নিকটবর্ত্তী দুই চারিটি গ্রামে দুগ্ধ উৎপাদন কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও দূর-পল্লীগ্রামে উহা যে কমিয়া গিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। দুগ্ধ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে দুধের দাম অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। সহরে ত যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় না; পল্লীগ্রামেও অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কিছু অধিক পরিমাণ দুধ আবশ্যক হইলে তাহা পাওয়া দুষ্কর।

সহরাঞ্চলে যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার গুণাগুণ বুঝিতে হইলে কলিকাতার বিষয়ই প্রথমে উল্লেখ করিতে পারা যায়। কলিকাতায় প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার মণ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। কয়েকটি কোম্পানী এবং একটি সমবায়-সমিতি দুগ্ধ-বিক্রয়ের কায করিয়া থাকেন; কিন্তু বেশীর ভাগ দুধই হিন্দুস্থানী ব্যবসায়িগণ বাড়ী বাড়ী যোগান দেয়। ইহারা বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশের লোক এবং কেবল দুধের কায করিবার জন্যই এতদ্দেশে আইসে। একত্র বহুসংখ্যক গো-পালন করিয়া দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ (Dairy Farming) এতদ্দেশে প্রায় নাই। গোয়ালারা কম স্থানেই ২০।২৫টির অধিক গরু রাখে; কৃষকগণ অথবা সামান্য অবস্থার গৃহস্থরা উপজীবিকার জন্য যে দুই একটি গরু রাখে, তাহা হইতেই বাজারের দুধ পাওয়া যায়। ফোড়েরা এইরূপ সামান্য সামান্য পরিমাণ দুধ সংগ্রহ ও একত্র করিয়া কলিকাতায় কোন মহাজন অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট চালান দেয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত দুগ্ধ হয় দুধের বাজারে কিম্বা সরবরাহকারিগণকে বিক্রয় করে। গোয়ালাগণও উক্তরূপে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনে। ক্ষুদ্র সরবরাহকারিগণ এই প্রকারে দুগ্ধ প্রাপ্ত

হইয়া সহরের গৃহস্থগণকে দেয়। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানী-সমূহেরও দুগ্ধ পাইবার উপায় ঐরূপ, যদিও কোন কোন স্থানে তাঁহাদের আপন আপন সংগ্রাহক আছে। দুগ্ধ সরবরাহের এই যে তিনটি স্তর, ইহার মধ্যে কোনটিতেই দুগ্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া ব্যবসায়ীরা ছাড়ে না; তাহার ফলে কলিকাতাবাসীরা সাধারণতঃ যে দুধ খায়, তাহাকে অর্দ্ধ-দুগ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি একটি কোম্পানী পাস্তরীকরণ (Pasteurisation) করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহা অবশ্য বিজ্ঞান-সম্মত সংরক্ষণের উৎকৃষ্ট প্রথা; কিন্তু যে অবস্থায় উক্ত প্রথা অবলম্বিত হয়, তাহাতে উহার কিছু মূল্য আছে কি না সন্দেহের বিষয়। দুগ্ধ-দোহন হইতে পাস্তরীকরণ যন্ত্রে দুধ পৌঁছাইতে প্রায় ৪ হইতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। বাঙ্গালার আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ুতে এই সময়ের মধ্যে দুগ্ধে অনিষ্টকারী জীবাণু জন্মিবার যথেষ্ট অবসর আছে এবং জন্মিয়াও থাকে। যে দুগ্ধ বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে পাস্তরপ্রথায় সংরক্ষণ করিলে ৫।৭ ঘণ্টা অর্থাৎ বিক্রয়ের সময় পর্য্যন্ত ভাল থাকিতে পারে মাত্র। কিন্তু সেরূপ দুধ গরম করিলে অনেক সময়েই কাটিয়া যায় এবং তাহাতে খাদ্য-প্রাণ (Vitamine) কমই থাকে। এতদ্ভিন্ন বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে সচরাচর পাস্তরীকৃত দুগ্ধে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায় এবং দুগ্ধের মেদোবিন্দুগুলিও কিয়ৎপরিমাণে উপরে ভাসিয়া উঠে। এই সমুদয় কারণে কতিপয় ব্যক্তির নিকট উক্তরূপ দুগ্ধ সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। পাস্তরীকরণ উত্তম প্রথা হইলেও এতদ্দ্বারা এতদ্দেশে এখনও খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ সমস্যার আংশিক সমাধানও হয় নাই। দুধের বাজারে এ পর্য্যন্ত ফোড়ে ও হিন্দুস্থানী ব্যবসায়িগণের পূর্ব্ববৎ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অপরাপর সহরের দুগ্ধ সরবরাহের অবস্থা সামান্য পৃথক্ হইলেও মোটের মাথায় কলিকাতারই অনুরূপ। খাঁটি দুধ সকল সহরেই দুর্লভ।

দুগ্ধের খাদ্য-মূল্য

সকলেই জানেন যে, দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য খুবই কম। মানব-দেহগঠনোপযোগী সমস্ত উপাদানই ইহাতে বিদ্যমান। জলমিশ্রিত দুগ্ধের প্রত্যেক এক শত ভাগে প্রায় ৪ ভাগ বসা, ৩ ভাগ প্রোটিন (কেসিন্ ও অ্যালবুমিন্), ৫ ভাগ শর্করা, ১ ভাগ লবণ ও ৮৭ ভাগ জল রহিয়াছে। বসা ও শর্করায় উত্তাপ ও শক্তি প্রদান করে, এবং প্রোটিন ও লবণ দ্বারা যথাক্রমে মাংস ও অস্থি গঠিত হয়। প্রাচীনকালে খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের উৎকর্ষতা লোক সম্যক্‌রূপে বুঝিত এবং আয়ুর্ব্বেদেও দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশেই পূর্ব্বে দুগ্ধ অপচয় হইত; ননী, মাখন ও পনির ব্যতীত অন্য কোন দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত না। কিন্তু এখন উক্ত দেশ-সমূহই দুগ্ধের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছে; পূর্ব্বোক্ত তিনটি দ্রব্য ব্যতীত ঘনীভূত দুগ্ধ (Condensed milk), মাঠা তোলা দুধ, ঘোল, সম্পূর্ণ দুগ্ধ-চূর্ণ, ঘোল-চূর্ণ ইত্যাদি নানা প্রকারে দুধের কোন অংশই বাদ দেওয়া যাইতেছে না। জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবহার করে, তদুদ্দেশ্যে বহুবিস্তৃত প্রচারকার্য্য চলিতেছে। দৈনন্দিন খাদ্যে দুগ্ধের মাত্রা বাড়াইয়া শক্তিশালী জাতি গঠন করাই উঁহাদিগের মূল লক্ষ্য। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি অন্যবিধ পুষ্টিকর নিত্য আহার্য্য থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গরা দুগ্ধ ব্যবহার-বৃদ্ধির জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ভারতে, যেখানে নিরামিষভোজীর সংখ্যা অত্যধিক, তথায় সেরূপ চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায় না। আজকাল কতিপয় ভারতীয় জাতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে হীন হইয়া পড়িয়াছে, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে এবং খাদ্যে উপযুক্ত উপাদানাভাব-জনিত রোগ (deficiency desease) বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলে নিত্য আহার্য্যের মধ্য হইতে দুগ্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে।

দুগ্ধ-সদ্ব্যবহার প্রণালী

সদ্য দোহন করা দুগ্ধ অনেকের ভাগ্যেই যোটে না। ইতি-পূর্ব্বে দুগ্ধ-সরবরাহের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় অল্লাধিক দূর পর্য্যন্ত হইতে স্বল্পসময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতিসম্মত উপায়ে দুগ্ধ আনয়ন করা ব্যতীত সহরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ-সরবরাহের অন্য পন্থা নাই। এতদ্দেশের জল-হাওয়ায় দুগ্ধ খুব সত্বরেই বিকৃত হইয়া যায়। পাস্তরীকরণ দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে পারা যায়; কিন্তু দুগ্ধের খাদ্য-মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে

হইলে দোহনের ২ ঘণ্টার মধ্যেই পাস্তুরীকরণ হওয়া আবশ্যক। আধুনিক পাস্তুরীকরণকালে নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে :—প্রথমতঃ দুগ্ধ ওজন হইয়া পরিষ্কার করিবার পাত্রে প্রবেশ করে; এই স্থলে দুগ্ধের সহিত যাহা কিছু ময়লা থাকে, সমস্তই পরিষ্কৃত হইয়া যায়; তৎপরে উহা উত্তাপ দিবার পাত্রে চালাইয়া দিয়া ১৪০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়; উত্তপ্ত দুগ্ধ অন্য পাত্রে গিয়া পড়ে এবং ঠিক ৩৪ মিনিট কাল সম উত্তাপেই থাকে; এই অবস্থায় দুগ্ধ ধীরে ধীরে নাড়িবার ব্যবস্থা আছে। ইহার পরেই দুগ্ধকে অন্য পাত্রে চালিত করিয়া প্রথমতঃ ঠাণ্ডা জল এবং অবশেষে বরফ তৈয়ারী করিবার উপযোগী লবণ, দ্রাবণ সাহায্যে ৪০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য, গরম ও ঠাণ্ডা করা—উভয় কার্য্য, বিভিন্ন পাত্রসংলগ্ন নলের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প অথবা শৈত্যজনক দ্রাবণ চালনা করিয়া সাধিত হইয়া থাকে। উক্ত কোন প্রকার দ্রব্যই দুগ্ধের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে না। দুগ্ধ খুব ঠাণ্ডা হইয়া গেলে সেই অবস্থায় পরিষ্কৃত পাত্রে বন্ধ করিয়া বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। উৎপাদনের স্থান হইতে অনেক দূরে দুধ বিক্রয় করিতে হইলে পাস্তুরীকরণ অবশ্যই উৎকৃষ্ট প্রথা; কিন্তু যে সমুদয় স্থানে কিছু অধিক পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়, সেই স্থানেই বরং ছোট পাস্তুরীকরণ কল বসান উচিত; তাহাতে অবিকৃত অবস্থায় অনেক দূর দুধ পাঠান যায়। পক্ষান্তরে, কলিকাতার ন্যায় স্থানে বড় কল বসাইয়া বহুদূর হইতে দুধ আনান অসমীচীন। তাহাতে দুধ খারাপ হইবার ভয় অনেক বেশী থাকে।

পল্লীগ্রামে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন প্রকার অম্ল অথবা ফটকিরী দিয়া ছানা কাটান হয়। শ্বেতাঙ্গরা যে পনির ব্যবহার করেন, উহাও ছানা-শ্রেণীয়, কিন্তু রেনেট্ (Rennet) নামক প্রাণীজ উৎসেচক সাহায্যে তাঁহারা দুধ কাটান। ছানার প্রথম উদ্ভাবন বঙ্গদেশেই হইয়াছিল; কাঁচা ছানা অপেক্ষা মিষ্টান্নের উপাদানরূপেই ছানার প্রচলন অধিক। দধির ব্যবহার আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে দধি হইতেই মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ঘৃতের চলন নাই—যদিও ঘৃতের ন্যায় কোন দুগ্ধজাত দ্রব্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ননী হইতেই প্রতীচ্যে মাখন প্রস্তুত হয়। ননী তুলিয়া লওয়া দুধকে সাধারণতঃ মাটা তোলা দুধ (Skim milk) ও দধি হইতে মাখন তুলিয়া লইবার পর অবশিষ্টাংশকে ঘোল (Butter milk) বলা হয়। সর কতকটা ননীর ন্যায় দ্রব্য, ইহাতে বসা ব্যতীত অ্যালবুমিনও আছে। ক্ষীর দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ ক্ষীর ও খোয়া ক্ষীরকে যথাক্রমে Condensed milk ও milk powder শ্রেণীর বলিতে পারা যায়; প্রভেদ এই যে, কলের সাহায্য ব্যতীত এইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করা যতদূর সম্ভবপর, ততদূর দেশীয় প্রথায় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই কয়েকটি উপায়েই আপাততঃ এতদ্দেশে দুগ্ধের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, দুগ্ধের প্রচলন বৃদ্ধি করিতে হইলে শুধু কাঁচা দুগ্ধ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইলেই চলিবে না, তৎসঙ্গে যাবতীয় দুগ্ধজাত দ্রব্যও সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হওয়া আবশ্যক।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি

পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল বহুবিধ উপায়ে দুগ্ধের সদ্ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন অনেক প্রকার সংরক্ষিত অথবা যৌগিক খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, দুগ্ধই যাহার মূল উপাদান। এ সকলের বিষয় বাদ দিয়া আমরা প্রধানতঃ দুইটি দুগ্ধজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিব :—ঘনীভূত দুগ্ধ ও দুগ্ধচূর্ণ। এতদুভয়ই উদ্বৃত্ত দুগ্ধ সদ্ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উপায় এবং আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী। ঘনীভূত দুগ্ধ সম্পূর্ণ (Whole) এবং মাটা তোলা, দুই প্রকার দুধ হইতেই প্রস্তুত হয়। কল-কব্জার উন্নতি সাধিত হইয়া এখন বায়ুহীন পাত্রেই (Vacuum Pan) সচরাচর ঘনীভূত দুগ্ধ তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। বাষ্পোত্তপ্ত স্বতন্ত্র নলসমূহ পাত্রের ভিতর থাকে; তদুপরিই দুধ গরম হইয়া ঘন হয়; নলগুলিতে এত অধিক তাপ জন্মান যাইতে পারে যে, প্রতিঘণ্টায়, কল হিসাবে, এক হইতে ১২ মণ জল দুধ হইতে বাহির করিয়া দিয়া দুধ ঘন করা সম্ভবপর। পাশ্চাত্য দেশের অনেক কারখানা সাড়ে ৪ হইতে ৫ ভাগ দুগ্ধ ঘন করিয়া ১ ভাগে পরিণত করেন; কিন্তু দুগ্ধের গুণ অব্যাহত রাখিয়া আরও অধিক মাত্রায় ঘন করা চলে। বায়ুহীন পাত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে ঘন করা হয় বলিয়া ঘনীভূত দুগ্ধের দ্রবণীয়তার কোন তারতম্য হয় না; এমন
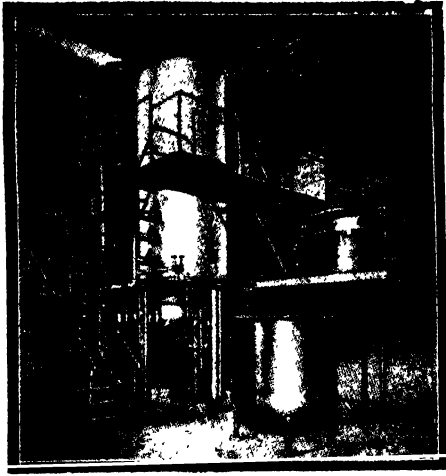
ঘনীভূত দুগ্ধ-প্রস্তুতের কল

কি, ঠাণ্ডা জলেও এইরূপ দুধ সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যায়। ভারতের স্থানে স্থানে ঘনীভূত দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। হিমালয়ের কতিপয় স্থানে, বিশেষতঃ কাশ্মীরে বসন্তকালে গুর্জ্জরগণ বড় বড় গো ও মেষ-পাল চরাইতে লইয়া যায়। ক্রেতা অভাবে অনেক সময় কাঁচা দুগ্ধ বিক্রয় হয় না; প্রাচীন প্রথায় অপকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত করিয়া ইহারা মহাজনগণের লোকের নিকট বিক্রয় করে; তাহাতে উহাদের বিশেষ লাভ হয় না এবং বিপুল-পরিমাণ দুগ্ধের অপচয় হয়। উক্তরূপ স্থানসমূহে দুগ্ধ-ঘনীভূতকরণ কল বসাইলে লাভ আছে—অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের ঘাস অথবা অন্যান্য খাদ্যের জন্য, কিম্বা স্থানীয় অবস্থার জন্য দুগ্ধে সামান্য অপ্রীতিকর স্বাদ ও গন্ধ জন্মিয়া থাকে; ঘনীভূত করিবার প্রক্রিয়ায় সেরূপ স্বাদ ও গন্ধ স্বতই বিনষ্ট হয়। এ স্থলে ঘনীভূত দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে যে কল আবশ্যক হয়, তাহার একটি চিত্র উপরে দেওয়া হইল।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঘনীভূত দুগ্ধের ন্যায় সমতল প্রদেশে নানা স্থানেই দুগ্ধ-চূর্ণ প্রস্তুতের সুযোগ হইতে পারে। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় চূর্ণ-দুগ্ধের ব্যবসায় শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এতদ্দেশে অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই দুধ খারাপ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থায় দুগ্ধ-চূর্ণ প্রস্তুত দুগ্ধ সদ্ব্যবহারের যে অন্যতম উপায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রতীচ্যের বাজারে পাঁচ প্রকার দুগ্ধ-চূর্ণের প্রচলন রহিয়াছে—সম্পূর্ণ, মাঠা তোলা, আধ-মাঠা তোলা, ননীপ্রধান দুধ (cream milk) এবং ঘোলচূর্ণ। ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটির পুষ্টিকর গুণ অবশ্য বিভিন্ন, কিন্তু সকলগুলিতেই মনুষ্যশরীর গঠনের উপাদানসমূহ অল্প-বিস্তর মাত্রায় বিদ্যমান। অপর প্রকারের চূর্ণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ দুগ্ধ ও ঘোল-চূর্ণ আমাদিগের দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা অনায়াসেই হইতে পারে। মাঠা তোলা দুধ ও ঘোলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত প্রকার দুগ্ধে কঠিন পদার্থসমূহ দ্রব অবস্থায় থাকে এবং শেষোক্ত কেবলমাত্র মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। উভয়ের এইরূপ প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য উহাদের চূর্ণ প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রথা অবলম্বিত হয়। সম্পূর্ণ অথবা মাঠা তোলা দুধের জন্য ফোয়ারা প্রথাই (Spray process) প্রশস্ত; পক্ষান্তরে, ঘোলচূর্ণের জন্য শুষ্ক রুল প্রথাই (Dry Roll process) উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত প্রথায় ঘোল চূর্ণ করিবার কলে দুইটি বড় বড় ফাঁপা রুল আছে,; দুইটি রুলের সন্ধিস্থলে ও উপরিভাগে উভয় প্রান্তে এক একটি ঘোল-ধারণের পাত্র অবস্থিত; পাত্র হইতে ঘোল আসিয়া রুলের উপর পড়িলেই উহা সমানভাবে প্রসারিত হইয়া পর্দ্দারূপে পরিণত হয়; উভয় রুলের মধ্যবর্ত্তী অন্তরাল কম বেশী করিয়া পর্দ্দা সরু মোটা করিতে পারা যায়। ৮০ পাউণ্ড বাষ্পচাপে রুলগুলি কার্য্য করিতে থাকে; রুলের মধ্যে ঘোল আসিলেই ঘোলের পর্দ্দা শুষ্ক হইয়া যায় এবং রুল-সংলগ্ন দুইখানি ছুরী উহাকে রুল হইতে বিচ্যুত করিয়া নিম্নস্থিত বাহকে (conveyor) ফেলিয়া দেয়। এই বাহক সামান্য দূরস্থিত উচ্চে অবস্থিত একটি আধারের (elevator) সহিত সংযুক্ত এবং তথায় পর্দ্দাগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। elevator হইতে পর্দ্দাগুলি আবার খণ্ড করিবার যন্ত্রে (Flaker) যায় এবং সেখানে সরু অথবা মোটা খণ্ড কিম্বা সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়; অতঃপর খণ্ড অথবা চূর্ণ টিন কিম্বা থলেবন্দি করা হইয়া থাকে। স্থূলতঃ ঘোলচূর্ণের কলে এইরূপেই কার্য্য হইয়া থাকে এবং কলও ছোট বড় ধরণের ৩।৪ প্রকারের রহিয়াছে। ঘোলচূর্ণ অবশ্য সম্পূর্ণ দুগ্ধ-চূর্ণের সমকক্ষ নহে, তথাপি ঘোলে শতকরা ৮ ভাগ কঠিন
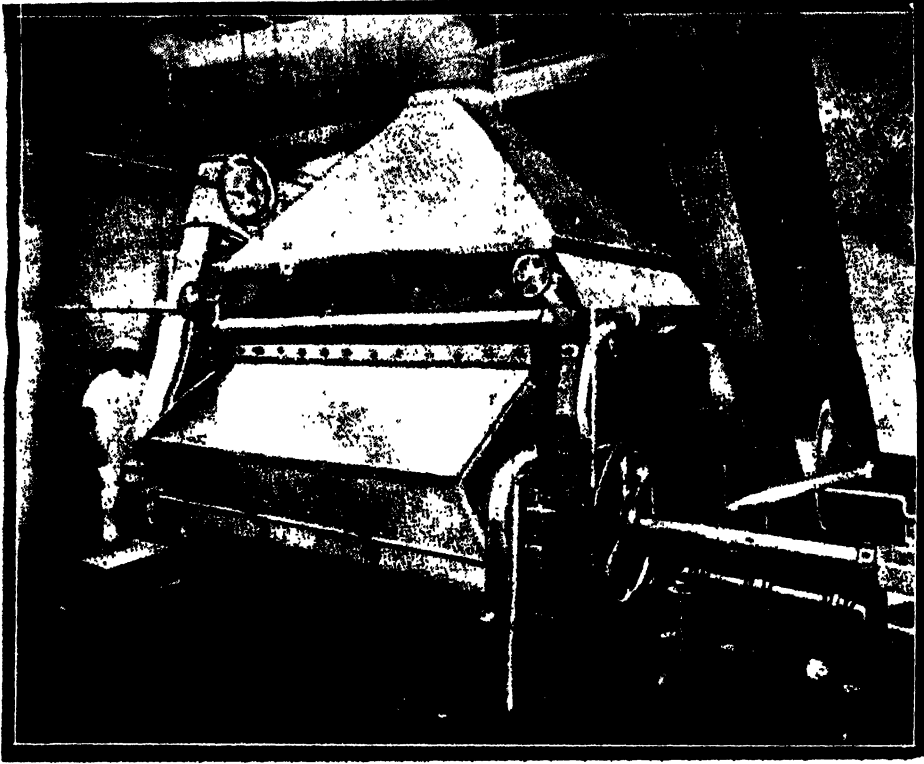
ঘোল-চূর্ণ প্রস্তুতের কল ; সম্মুখে স্তূপীকৃত দুগ্ধের একখানি পর্দ্দা দেখা যাইতেছে

পদার্থ আছে এবং ঘোলের পুষ্টিকর গুণ সম্পূর্ণ দুগ্ধের প্রায় ৭০ ভাগের সমতুল্য। ঘোলচূর্ণের প্রত্যেক শত ভাগে ৫১ ভাগ দুগ্ধশর্করা, ৩৮ ভাগ প্রোটিন এবং ৫ ভাগ লবণ বিদ্যমান, এগুলি সমস্তই সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অবয়ব গঠনের উপযোগী। এক মণ ঘোল হইতে প্রায় তিন সের ঘোলচূর্ণ প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মনুষ্য-খাদ্য ব্যতিরেকে মূল্যবান্ পশ্বাদিকেও ঘোলচূর্ণ খাইতে দেওয়া হয়।

দুগ্ধশিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতে দুগ্ধশিল্প এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া সংগঠন করিতে হইলে এক দিকে যেমন গোবংশের উন্নতিসাধন করা আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনই কাঁচা দুগ্ধ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বহু বিস্তৃত প্রচলনের প্রচেষ্টা হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এইরূপ কার্য্যে শ্রমবিভাগ ব্যতীত শৃঙ্খলা থাকে না এবং উন্নতিও হয় না। উৎকৃষ্ট-জাতীয় গো-প্রজনন দ্বারা দুগ্ধ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, ত্বরিত ও স্বাস্থ্যনীতিসম্মত উপায়ে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ, অতিরিক্ত পরিমাণ দুগ্ধ হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ইত্যাদি কার্য্য যদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে দুগ্ধশিল্পের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর। আমরা এ স্থলে ব্যবসায়ের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছি। জনসাধারণের জানা উচিত যে, ভারতে লক্ষ লক্ষ গরু থাকা সত্ত্বেও অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রতি বৎসর কোটি টাকার উপরও বিলাতী দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এতদ্দেশে আসিতেছে। আমাদিগের শিশু সন্তানগণ টিনের দুধে প্রতিপালিত হইতেছে। এরূপ অবস্থা অন্য কোন সভ্য দেশে বিরল। আপাততঃ যে পরিমাণ দুগ্ধ দেশে পাওয়া যায়, উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা তাহাকেই কেন্দ্রস্থলে সংগৃহীত করিতে পারিলে কাঁচা দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উভয়ই অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে কার্য্যসূচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমাজ, শরীর, মন এবং সতীত্ব।

পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, পৌরাণিক যুগে অসতীর প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল। তাহাদিগকে মানুষ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত এবং তাহাদের প্রতি দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। অসতী যে ছিল না, তাহা নহে। পক্ষান্তরে, সতীকে যথেষ্ট মর্য্যাদা এবং প্রাধান্য দেওয়া হইত। আজকালের সতী এবং তখনকার সতী ঠিক যে একই প্রকারের, তাহা না হইতেও পারে। নবীনপন্থীদের মতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সতীত্ব ছিল না। সভ্যতার উন্মেষের সহিত তাহার উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিণতি হইয়াছে। এ দেশে সতীত্বকে যত উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, অন্য কোথাও তাহা হয় কি না জানা নাই, তবে সহমরণপ্রথা এখনও অনেক দেশে আছে। উহা ১ শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ছিল। জোর করিয়া সহমৃতা করা মহাপাপ সন্দেহ নাই। কিন্তু যথার্থ প্রণয় যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নর বা নারী যাহাই হউন, তিনি স্বামী বা স্ত্রীর অভাব সহ্য করিতে পারেন না। বিধবা-বিবাহ রহিত করিয়া, সহমরণ প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু-সমাজ গায়ের জোরে স্ত্রীকে সতী করিত, এই অপবাদ সর্ব্বত্র শুনা যায়। আমরা সমাজের দোষ-গুণ আলোচনা ছাড়িয়া শুধু একদেশ দেখিয়া একটি কথা বলিব। স্ত্রীর অন্য সব পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে অনন্যগতি করিবার জন্যই বোধ হয় এত কড়া নিয়ম প্রচার হইয়াছিল। কাযেই বাধ্য হইয়াই হিন্দু-স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি আসক্ত হইতে হইত। কিন্তু অনন্যগতি না হইলে কি মানুষ বড় হয়, বড় প্রেরণা পায়, সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে? শ্রীভগবান্‌লাভ অনন্য-গতি ভিন্ন অন্য কাহারও হওয়া কি সম্ভব? এটা অবশ্য আদর্শের কথা। অত্যুচ্চ আদর্শ ভিন্ন কি কোন মহৎ কায হইতে পারে? আদর্শ মানে সকলেই যে তাহা হইতে পারে, তাহা নহে। এখন বা তখন প্রত্যেকেই আদর্শস্থানীয় হয় নাই বা হইতেছে না। তখন ভগবান্‌ই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল। কাযেই আদর্শ বড় হওয়াই স্বাভাবিক। আদর্শকে খর্ব্ব করিলে নিম্নগতি অবশ্যম্ভাবী। এটা কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা হইল না।' শুধু প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা গেল মাত্র।

উপস্থিত যুগে সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যেও কমবেশী সতীত্ব ধারণা আছে। তাহার কারণ, মানুষ আজিও পর্য্যন্ত ইহার পরিবর্ত্তে সব দিক্ বজায় রাখিয়া অন্য ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, সতীত্ব মোটামুটি আজও সমাজের মধ্যে, সংসারের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং স্থায়িত্ব রক্ষা করিতেছে এবং সতীত্বই অতি নিকৃষ্ট যৌন ব্যাপার-টাকেও মর্য্যাদা দিতেছে।

ভবিষ্যতে ইহার গতি কোন্ দিকে হইবে, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ঠিক বলা দুষ্কর। নবীনও এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে যদি আধুনিক সাহিত্যই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পাইয়া থাকেন, সাহিত্য, কবিত্ব-কলাই যদি ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন (শরৎবাবু সাহিত্যকে এই প্রাধান্য দিয়াছেন), তবে ইহা অনিবার্য্য যে, দুই দশ বৎসর পরেই হউক বা শতাব্দী বাদেই হউক, মানুষ আর প্রাচীনমতে ধর্ম্মভয়, নীতিবাদ একবারেই মানিবে না। সুতরাং সতীত্বের উপাদান এবং মূল্য সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গঠিত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহা দেখান যায় যে, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে ১ শত ৫০ লক্ষ নারীর বিবাহ হইবার উপায় নাই; কারণ, নরের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে। এক ফ্রান্সে প্রায় ২০ লক্ষ এইরূপ নারী আছে। ইহার প্রতীকারকল্পে এবং দেশে নরের সংখ্যা বৃদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া, প্রথমে ইহা স্থির হয় যে, বিদেশীয় লোকদের সহিত ইহাদের বিবাহ দাও, নচেৎ নরের বহু বিবাহ চালাও। উপস্থিত কিন্তু একাধিক নারীর সহিত বিবাহ আইন এবং সমাজ-বিরুদ্ধ। এই দুই সিদ্ধান্ত ফলদায়ক হইবে না বা লোকের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ বলিয়া এক নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ইঁহারা স্পষ্ট বলিতেছেন যে, "লোকের ইচ্ছানুসারে কায করিতে গেলে, সমাজ হইতে বিবাহ-প্রথা একবারে উঠাইয়া দেওয়াই এ গোলযোগের প্রতীকার। যে যাহার সহিত ইচ্ছা মিলিত হইয়া যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন করুক, রাজকোষ হইতে এই সন্তানদের পালন এবং শিক্ষার জন্য ব্যয়-নির্ব্বাহ করা হউক। মাতৃত্ব-গৌরবে মণ্ডিত হইলেই নারীর এই যথেচ্ছ মিলনের জন্য যে অমর্য্যাদা, তাহা অপসৃত হইবে।" এইরূপ নূতন নীতির প্রসারই আজকাল সর্ব্বত্র। দশ বিশ জন পুরুষের সহিত সম্পর্ক থাকুক, সন্তান হউক না হউক, সতী-অসতী-ভেদ আর রাখিব না, এই তাহাদের যুক্তি। যাহা আহার-নিদ্রার ন্যায় স্বাভাবিক, "সূর্য্যের আলোর মত যাহা সত্য," আহার-নিদ্রারই মত তাহা দোষশূন্য। আহার-নিদ্রার অপেক্ষাও তাহা প্রীতিকর। কুসংস্কার বা মূর্খতা-বশে যাহারা এটাকে 'গর্হিত বলেন, সেটা তাঁহাদের দৃষ্টির দোষ—মূর্খের যাহা হয়। আবার নীতিবাদীরা চোখ রাঙ্গা করিয়াই বা এত দিন কি ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন? দোষশূন্য বলিয়া যাহা প্রকাশ্যভাবে আহার-নিদ্রারই মত চলিতে পারিত, তাহার মধ্যে ভণ্ডামী, জুয়াচুরী জোর করিয়া, বাধ্য করিয়া আনা হইয়াছে। নর-নারীর অবাধ মিলন অপেক্ষা এই ভণ্ডামী জুয়াচুরী সহস্রগুণে বেশী দূষণীয় এবং দণ্ডার্হ। এ

সব শিক্ষাও এ দেশে প্রচণ্ডভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আজ যেখানে সেখানে ইহার দৃষ্টান্ত। অনেক সাহিত্য-কবিতা আজ এই শিক্ষায় ভরপূর। যে দেশের আদর্শ ছিল সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা, সতী; যে পূতদেশের প্রবাদবচন ছিল—"যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ" সতীকে দূরে দেখিয়া যমদূতও পলায়ন করে, সতীত্বের জন্য যে দেশ মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, আজ সে দেশের এ কিরূপ পরিবর্ত্তন? এই দূষিত বাতাস আজ কমবেশী সকলকেই আক্রমণ করিয়াছে, কাহারও নিস্তার আর নাই বলিয়াই মনে হয়। তাই হতাশ হইয়াই এই কথা বলিতে হয়—শ্রীভগবানের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে—"যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।"

কিন্তু তিনি ত মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কতক কতক শক্তি দিয়াছেন। "শৃঙ্খলমুক্ত চিন্তার" গতি ত এক দিন ভারত দেখাইয়াছিল। যখন বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি রচিত হইয়াছিল, তখন অবাধ স্বাধীন চিন্তার অপ্রতিহত গতির কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় না কি? তখন মানুষের মেধা অবাধ গতি লাভ করিয়া কোন্ ঊর্দ্ধপথে স্বর্গ রচনা করিতে পারে, তাহা ভারত দেখাইয়াছে। আজ এই "শৃঙ্খলমুক্ত" চিন্তা কিন্তু শিশ্ন এবং উদরের ব্যাপারমধ্যেই প্রধানতঃ "শৃঙ্খলাবদ্ধ।" এই পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাই তাহার মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচয়। কেন—"শৃঙ্খলমুক্ত" চিন্তাকে একবার দাও না ছাড়িয়া—একবার সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া চিন্তা করুক। এ ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া বিশ্বময় দৃষ্টি প্রসারিত করুক। সে দেখিবে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর অনেক জিনিষ করিবার, ভাবিবার আছে। দশের, দেশের, জগতের যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ এবং অভ্যুদয় হয়, তাহা অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। কি আর বলা যাইবে—

"চিত্তনামা নদী উভয়তো বাহিনী,
বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ।"

চিত্তনামক নদী উভয়কূলেই প্রবাহিত;—পাপ-দিকেও, কল্যাণ-দিকেও। যদি স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ মানুষ ধরিতে চাহে, তবে স্বয়ং ভগবান্ই তাহার কি করিবেন? আজ মায়ের ঘোরা মূর্ত্তিই সকলে দেখিতেছেন, কিন্তু মায়ের অঘোরা মূর্ত্তিও একটা আছে। আপাততঃ মধুরেই দৃষ্টি সংবদ্ধ, ভবিষ্যৎ আপন পথ দেখিয়া লইবে, ইহাই রহস্য।

নবীন যাহাই কেন বলুন না, আজও সতীত্বই সমাজের কেন্দ্রস্বরূপ। সতীত্ব যে যথার্থই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহার নিদর্শন এই যে, ইহা প্রায় সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইহা জগতেরও কেন্দ্রস্বরূপ। সতীত্ব এখনও প্রায় সর্ব্বদেশেই রহিয়াছে, ইতরবিশেষে। সতীত্বের উপর বিশ্বাস ও আস্থা-স্থাপন করিয়া সমাজ গঠিত হইয়াছে, রক্ষা হইতেছে এবং অবাধ গতিতে চলিতেছে। তাহার কারণ, অসতীর সন্তান জন্মিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার পিতৃ-নিরূপণ হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানের ভরণপোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার জন্য পিতাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং দায়ী। সুতরাং পিতৃ-নিরূপণ ভিন্ন সন্তানের বাঁচা, যথা উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ সম্ভবপর হয় না। যদিও পাশ্চাত্য দেশে জারজ সন্তানদের পালন, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য Foundling Hospital বা House আছে, তথাপি লোকসংখ্যা হিসাবে এ সব স্থানে এখনও অল্পসংখ্যক সন্তান প্রতিপালিত হয়। আজিও যাহাতে সন্তান যে সমস্ত গুণ অর্জ্জন করিলে, তাহার সমাজ, জাতি, দেশ বা জগতের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সাধিত করিবার শক্তি লাভ করিতে পারে, প্রধানতঃ পিতার সাহায্যে মাতা অথবা উভয়েই তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য দায়ী। রাষ্ট্রনীতি হিসাবে সন্তানই ভবিষ্যতের প্রজা (Citizen)। তাহার ভালমন্দ, শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্যের উপরে রাজ্যের, সমাজের, সংসারের এবং জগতের ভালমন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এত বড় গুরুভার তাহার জনক-জননীর হাতে। এমন অবস্থায় যে সন্তানের পিতৃ-নিরূপণ না হইল, অর্থাৎ যে অসতীর সন্তান, তাহার সব দায়িত্ব তাহার প্রসূতির উপর। কিন্তু স্ত্রী-জাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, এ জন্য নরের উপর তাহার অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। নারীর শারীরিক এবং প্রকৃতিগত কতক কারণে তাহার পক্ষে নরের সহিত সমভাবে জীবিকা অর্জ্জন সর্ব্বত্র সাধ্যায়ত্ত নহে। কাযেই পিতৃ-নিরূপণের উপর ভবিষ্যৎ জগতের ভাল-মন্দ অনেকটা নির্ভর করিতেছে এবং এই জন্যই সতীত্ব, সমাজ, সংসার, দেশ, এমন কি, জগৎকেও গঠন করিতেছে। সমাজ-প্রথাই নীতিবাদ শিক্ষা দেয়। মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করিতে শিখে সমাজ-শাসনের কাছে, Custom involves a moral rule···Scociety is the school in which men learn to distinguish between right and wrong—(Westermarck, Origin and development of the moral ideas p.p 386.40,5-22)।

অতএব ইহা দেখা গেল যে, সতীত্বই নীতির দ্বারা সংসার এবং সমাজকে রক্ষা করিয়া জগৎরক্ষার এবং পরিচালনের মূল কারণস্বরূপ। যে সমস্ত অতি ক্ষুদ্র সমাজে নারীর অনেক বিবাহ হয়, তথায় পিতার কার্য্য মাতুল করে। এ সব সমাজে লোক-সংখ্যা খুব কম। অন্য দিকে পতিতা বা ভ্রষ্টা নারীর সন্তান, সতী-সন্তানদের মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান, সম্মান প্রতিপত্তি অধিক ক্ষেত্রে পায় না। জনসাধারণ তাহাদিগকে অল্পবিস্তর হেয় জ্ঞান করে। অনেক স্থলে ইহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু tradition dies hard—সংস্কার সহজে যায় না। উদারনীতিবাদিগণ এখনও জগতে পতিতা বা ভ্রষ্টা নারীর সহিত সতীর একাসনে স্থান দিতে সর্ব্বত্র পারেন নাই এবং তাহাদের সন্তান এবং সতীর সন্তানকে একই ব্যবহার ধার্য্য করিতে পারেন নাই।

সমাজে পতিতাদিগের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা অনেকে স্বীকার করেন। কারণ, মানুষ যখন ইতরবৃত্তির দাস,তখন তাহার সেই বৃত্তির চরিতার্থতা সে যেরূপেই হউক সাধিত করি[illegible] পতিতারা এই দূষিত বাষ্প নির্গমের পথ Schopenhauer ইঁহাদের "human sacrifices to the altar of monogamy" (একপত্নীত্বের বেদীতে নরবলি) বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে দেখা গেল যে, সতীত্ব বিনা সংসার, সমাজ, দেশ [illegible] জগৎ ঠিক চলে না। আবার সেবা, দয়া, প্রেম, লজ্জা, [illegible]

সংযম, ধৈর্য্য, সরলতা, পবিত্রতা, মাতৃত্ব প্রভৃতি সতীত্বের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাহারাও সমাজ, সংসার, দেশ এবং জগতের রক্ষার ও অবাধগতির কারণ। যদি গৃহীর অপত্যাদি পোষ্যবর্গ, আত্মীয়-স্বজন রোগে-শোকে, বিপদে-সম্পদে, সেবা, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, সংযম, শিক্ষা প্রভৃতি না পান, মাতৃত্ব যদি আপনার সন্তানকে আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও রক্ষা না করেন, কল্যাণকর শিক্ষা না দেন, তবে সন্তান বা গৃহস্থ কেহ রক্ষা পায় না, স্বাস্থ্যবান্ হয় না, সৎশিক্ষা পায় না। সংসারের মধ্যে সব বিশৃঙ্খল হইয়া অচল হয়। ঘরে ঘরে এরূপ হইলে মানুষ শীঘ্র লোপ পায়। সুতরাং সতীত্ব জগৎ রক্ষা করিয়া, জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জগৎপালনের—বিশেষতঃ জগৎপরিচালনের কারণ। এই সতীত্বকে যতই শিথিল, যতই খর্ব্ব করা হইবে, ততই ঈর্ষ্যাবশতঃ এবং উপরি-উক্ত কারণে, লোকের মনে অশান্তি, দৈহিক অসংযম, কাযেই সর্ব্বত্র সমাজে ব্যভিচারবৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতে যাহা কিছু অভ্যুদয় এবং উন্নতি হইতেছে, তাহার গতিরোধ হইবে। যদি একই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় নারী অসতী হয়, তবে পৃথিবী অচল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ঈশ্বরপ্রেরিত বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ সমাজে এবং সৃষ্টির কল্যাণকামনায় সতীত্ব-বিধি আনিয়াছে। "The society in which its estimation sinks to a minimum is in the last stages of disintegralion (Ell. i. evi. 143) যে সমাজের বিচারে ইহা অতি নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা অধোগতির শেষ সীমায় আসিয়াছে।

আবার মনের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি মন সুস্থ থাকে, শরীরও অনেকটা সুস্থ থাকিবার কথা। শরীর সুস্থ থাকিলেই মন অনেকটা সুস্থ থাকে। রোগবৃদ্ধি হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীর চিত্তের উদ্বেগজনক চিন্তা এবং কার্য্য নিষেধ করেন। আবার অন্য দিকে সৎ বা অসৎ চিন্তা ও কর্ম্ম অনুসারে নর-নারীর দেহ গঠিত হয়। অর্থাৎ দেহের লাবণ্য, মুখ-চোখের ভাব, মানুষের কর্ম্ম বা চিন্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলবিদ্ধ। হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বতে তাঁহার জন্য ঔষধ আনিতে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, এক জন তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুন্দর, আয়ত-দেহ যুবাপুরুষ বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখটা শূকরাকৃতি। হনুমান্ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে তাপস! তোমার এরূপ অসামান্য সুন্দর দেহে এ শূকরমুখ কোথা হইতে আসিল?' উত্তরে তাপস বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে অনেক অতিথিসৎকার করিয়াছেন। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অনেক দীনদরিদ্রকে আহার করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্ম্মুখ ছিলেন, কটুভাষা ছাড়া, ভর্ৎসনা ছাড়া তিনি কথা কহিতে পারিতেন না। ফলে সুন্দর দেহ ও শূকরমুখ পাইয়াছেন। এরূপ পরিবর্ত্তন কই জন্মের অপেক্ষা রাখে না। এক জন্মেই অনেক সময় হয়।

সতীত্ব যে গৃহে অধিষ্ঠান করেন, তাহার মধ্যে সন্তোষ, পবিত্রতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ জগৎময় তাহা বিকীর্ণ করেন। এই শান্তি এবং মাধুর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তিনি নিজের শরীর এবং মন প্রফুল্ল এবং কান্তিময় করিতে পারেন। তিনি পরকে আপন করিতে পারেন। শুদ্ধাচারে সংযম-নিয়মের মধ্যে থাকিয়া, সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করত জগতে সুধাক্ষরণ করিতে পারগ হন। এই কারণেই নারী নর অপেক্ষা দীর্ঘজীবী (Metchinikoff op. cit)

এই পবিত্র শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জীবনের প্রভাব কতদূর, তাহা জানিতে আমরা ভালরূপেই পারি—যদি অসতীদের জীবনের সহিত তাঁহাদের জীবনের তুলনা করিয়া দেখি। পতিতাদের শরীর পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, গণোরিয়া, সিফিলিস, নিউরোসিস্, উন্মাদরোগ (ইহা সিফিলিস্ হইতেও জন্মে) প্রভৃতি অতিশয় কষ্টপ্রদ এবং দুরারোগ্য ব্যাধি তাহাদের অধিকাংশেরই হয়। প্রতিনিয়ত অনিয়ম অত্যাচার করিয়া তাহাদের প্রায়ই যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কর্কটী প্রভৃতি ভীষণ রোগ হয়। মনের নীচ প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদাই কুসঙ্গদোষে মনের উপর আধিপত্য করে। অশান্তিই জীবনের সহচর হয়। অনেক ক্ষেত্রে খুন বা আত্মহত্যা দ্বারা ইহাদের জীবন অবসান হয়।

পতিতাদের ছাড়িয়া দিলেও যাহারা ভ্রষ্টা অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ্যে দেহ-ব্যবসা করে না, তাহাদের সম্বন্ধেও ইহা দেখা যায় যে, গোপন আসক্তির তুল্য মাদকতা আর নাই। অন্য সভ্য দেশে এবং এখানেও ভ্রষ্টাচার অধিকাংশই গোপনে সাধিত হয়। এই মাদকতা অহোরাত্র মনের মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত তন্ময় করে, ইহাতে অহোরাত্র একটা শরীরের এবং মনের উপর টান (Tension) পড়ে। তাহাতে শরীর এবং মনের স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি ঘটাইয়া রোগ টানিয়া আনে। ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ প্রভৃতির অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রিয়া হওয়াতে ইহা শরীরের পক্ষে হানিকর হয়। কোর্টশিপ সময়েও জোর করিয়া সংযত হইতে গিয়া এবং দিন-রাত্রির টানাটানির মধ্যে থাকিয়া এইরূপ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। আবার দার্শনিক Rochefancauld বলেন, a woman may be content with one husband but seldom with one lover (Wise sayings of the Great and Good) অর্থাৎ নারী এক জন স্বামীতে তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু কদাচিৎ এক জন মাত্র প্রণয়-প্রার্থী পুরুষে তৃপ্ত হয়। বালির বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে আর রক্ষা করা যায় না। একবার অধোগতি হইলে ভ্রষ্টাও প্রায় প্রকাশ্যভাবে পতিতা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাহাদের অবস্থাও অনেক সময় পতিতাদেরই মত।

সতীর কিন্তু এ সব বালাই নাই। স্বামী মন্দ হইলেও তাহাকে বাঁচাইবার সাধ্য এবং অবকাশ সতীর আছে। যদি একান্তই না পারেন, তবে নিজেকেও বাঁচাইতে পারেন। জগতে সতীর পাষণ্ড স্বামী বিরল নহে। কিন্তু সতীর নিকট স্বামী—স্বামী। তিনি বলিতে পারেন

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

এত বড় idealism বা আদর্শবাদ না থাকিলে, আদর্শ এত বড় না হইলে কি সতী হওয়া অমনই মুখের কথা? আদর্শ খর্ব্ব করাই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা। আদর্শই মানুষকে উচ্চ প্রেরণা

দিতে সমর্থ। ভাব-মাধুর্য্যে না পৌঁছিলে (Sublimation) এ প্রেরণা আসে না। মানুষের এ ক্ষমতা আছে, এ কথা ফ্রয়েড পর্য্যন্ত তাঁহার Psychoanalysis পুস্তকে. স্বীকার করিয়াছেন। তাহা না হইলে কখন কেহ কি দারুকে মুরারি ভাবিতে পারে, বা শালগ্রামে বিষ্ণুপূজা করিতে পারে, না মৃন্ময়ীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া চিন্ময়ী করা সম্ভব হয় ?

আবার বৈজ্ঞানিকরা আর এক বিষম কথা আনিয়াছেন। Freud, Jung প্রভৃতি মহারথ বলেন, ঘরে ঘরে আজ সভ্যতার দৌলতে অবলাদের মধ্যে হিষ্টিরিয়া, নিউরোসিস্ প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার কারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, স্বাভাবিক বৃত্তির রোধ বা অসাফল্য। প্রকারান্তরে সতীত্বকেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা হয় এবং সাধ, আহ্লাদ, সোহাগ পূর্ণমাত্রায় না পাইলে এই সকল রোগ জন্মে, ইহা বলা হয়। কিন্তু অবৈধ উপায়ে ইহার প্রতীকার করার যুক্তি ভিন্ন অন্য প্রকারেও কি ইহার ব্যবস্থা হয় না ? ডারউইন মঙ্গল বা কল্যাণকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে উপায় দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক পূর্ণভাবে তেজোময় এবং স্বাস্থ্যবান্ হয় এবং তাহাদের সমস্ত বৃত্তি পূর্ণভাবে পরিণত অবস্থায় আসিতে পারে, তাহাই কল্যাণ। The means by which the greatest possible number of individuals can be reared in full vigour and health, with all their faculties perfect, under the conditions to which they are exposed (Descent of man vol 1 p, 98) যদি ইহাই ঠিক হয়, তবে কোন্ পথ শ্রেয়: ? নীতিবাদ উপেক্ষা করা না গ্রহণ করা ? যাহাকে আমরা নীতিবাদ বলি, তাহা সামাজিক বুদ্ধি এবং প্রথা হইতে জন্মে। ইহার প্রত্যবায়ে জাতি ধ্বংস হয়। নীতিবাদ বা সমাজ বাদ দিলে মানুষের সহিত পশুর কোন ভেদ নাই। এই জন্যই মানুষের উপর কতকগুলা সামাজিক বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। What we term the moral sense, arose from the social instincts and habits, which under pain of extinction, are developed in every society of men and animals—As man is essentially a social animal, and to be regarded apart from society, merely as a wild beast, it is plain that the needs of the community must impose on him certain restrictions and directions that will pass into a settled code of morals (Metchnikoff Nature of Man p. 107.) পাশ্চাত্যদের মুখ হইতেই সমাজ এবং নীতিবাদ বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হইল। ইহাতেও যদি কেহ সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা না মানিতে চাহেন, তবে আমরা নাচার। অবশ্য ইহার বিপক্ষ যুক্তিও তাঁহাদের কাছে আছে।

[ক্রমশঃ।

একাদশীর উপবাস !—

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
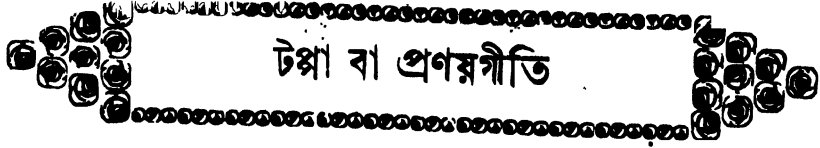
টপ্পা বা প্রণয়গীতি

নিধুবাবু ও গোপাল উড়ে

বিশিষ্ট নিয়ম-কানুন রক্ষা করিয়া ধ্রুপদ-সঙ্গীত গান করা হয়। খেয়াল গানে এই নিয়মের বন্ধন শিথিল দেখা যায়। ধ্রুপদ শব্দ ধ্রুবপদ শব্দের অপভ্রংশ; আর খেয়াল অর্থে যথেচ্ছচারিতা। অতঃপর টপ্পা গানের প্রারম্ভ। শোরী মিঞার* নামযুক্ত যে অনেকগুলি হিন্দী গান রহিয়াছে, সেই গীতিসমূহের রচয়িতা সুবিখ্যাত সঙ্গীতবিৎ গোলাম নবী টপ্পা গান শিষ্ট সমাজে প্রচলন করিয়াছেন, এই প্রকার প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। শোরী গোলাম নবীর প্রণয়িনী, এই হেতু কবি স্বরচিত গানগুলিতে তাঁর নাম দিয়াছেন।

প্রণয়-গানই টপ্পা গানের বিষয়। কিন্তু সমুদয় প্রণয়-গীতিই টপ্পা গান নহে। টপ্পা গান প্রায়শঃ মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি তালে এবং ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু, ভৈরবী, কাফি আদি স্বরে গীত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে নানাপ্রকার প্রণয়-গীতিকেই টপ্পা বলা হইয়া থাকে। টপ্পা-গান অল্প কথায় রচিত হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ভাবদ্যোতক ও হৃদয়গ্রাহী। ইহার কারণ হইতেছে, যে জিনিষ মরমের কথা ব্যক্ত করে, তাহা প্রাণের দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিবেই করিবে।

প্রণয়ের দুইটি দিক রহিয়াছে;—মিলন ও বিরহ। কতকগুলি প্রণয়-গীতি মিলনের সুখবার্ত্তা বহন করিয়া থাকে, আর কতকগুলি বিরহের রোদনে মুখরিত। কতকগুলি বা বিরহের মধ্যেও যে সুখের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তৎপ্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। টপ্পা বা প্রণয়-গীতির বিশেষত্ব এই, সেগুলি দুই এক কথাতেই ভালবাসার মর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া থাকে।

প্রেমিক-প্রেমিকা ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার প্রতিদান ঠিক-মত হইতেছে কি না, এই ভাবনায় ত তাহারা অধীর হয় না। কারণ,"প্রেমে কয় ভালবাসি, পরাবো না পরবো ফাঁসি," স্বইচ্ছায় এই ফাঁসি পরাটাই বুঝি প্রেমিক-প্রেমিকার একান্ত উদ্যম। প্রণয়ের পাত্র ভালবাসার প্রতিদান করে কি না, তদ্বিষয়ে ক্ষোভ নাই, নিজে ভালবাসিয়াই চরিতার্থ। কবি কেমন স্বল্প কথায় এবম্বিধ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"ভালবাসে কি না বাসে জানি না,
ভালবাসে যে সে জানে,
আমি ত ভাসি সুখেরি সাগরে তারি দরশনে।
একবার তারে হেরিলে নয়নে, চেয়ে থাকি আমি আকুল পরাণে,
মনে হয় তারে হৃদয়েতে রাখি দিবানিশি যতনে॥"

প্রেমিক কবি নিধুবাবু বলিতেছেন, তমসাচ্ছন্ন গৃহ দীপ বিনা যেমন আলোকিত হয় না, তদ্রূপ প্রণয় ব্যতীত কেহ সুখী হইতে পারে না;—'পিরীতি না জানে সখি, সে জন সুখী কেমনে, যেমন তিমিরালয় দেখ দীপবিহনে।' কিন্তু হৃদয়ে প্রণয়-রস সঞ্চার হইলে নিরন্তর যে ব্যথা পাইতে হয়, তাহা তিনি সর্ব্বত্রই বলিয়া গিয়াছেন;—

'এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে।
সুখ আশে ভাসে সদা দুখের সাগরে।'

আবার,—

'কেন পিরীতি করিলাম হায়।
পিরীতি করিয়া সখি এ কি হ'ল দায়।'

প্রণয়জনিত এই সব ক্লেশের কথা ভাবিতে গেলে স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাভেদে প্রণয়ের প্রকারভেদের বিষয় মনে আসে। যে স্থলে বিবাহিতা পত্নী প্রণয়ের পাত্রী, সেখানে নিরন্তরই অদর্শনের মর্ম্মন্তুদ ক্লেশ অনুভূত হইবার কারণ থাকে না। কিন্তু যদি কারও অবোধ হৃদয়ে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহাকে মর্ম্মজ্বালা অনুভব করিতে হয়। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানী কবি কহিবেন,—

'প্রেম পাব ব'লে লোক ব্যাভিচার সদা করে।
প্রতপ্ত মরুর মাঝে পাওয়া যায় কি সরোবরে?"

কিন্তু বাস্তব-জগতে বুঝি কোন এক রহস্যপ্রিয় দেবতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই অপ্রশংসনীয় প্রণয়ও জন্মাইতে দেখা যায়। নিধুবাবুর গানে অনেক এই জাতীয় প্রণয়ের বর্ণন রহিয়াছে।

চারি চক্ষুর মিলনের পরে সহসা যাহাকে চেনা নাই, তাহার প্রতি যদি হৃদয়ে অচ্ছেদ্য প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়া যায়, এতাদৃশ প্রণয়ের জন্য কাহারে দোষী বলিতে হইবে? নিধুবাবু বলিতেছেন, এ ক্ষেত্রে নয়নের কোন দোষ নাই; যত কিছু অপরাধ সবই মনের:—

"মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দোষ কেন?
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনোমিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন॥"

প্রণয় যে অতি লোভনীয় বস্তু, প্রণয়ের কবি নিধুবাবু সতত‌ই সে কথা বলিতেছেন—

"পিরীতি কি রীতি প্রাণ যে করেছে সে জানে,
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে।
পরম সুখের নিধি, পিরীতি সৃজিল বিধি,
জানিয়ে সুজনে, এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে॥"

কিন্তু পরক্ষণেই কবি নয়নাশ্রু ফেলিতেছেন,—

"এমন যে হবে প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥"

বিরহ-সন্তাপ প্রেমের চির-সহচর; কারণ, প্রেমিক-প্রেমিকার নিরন্তর অবিচ্ছেদ কি সম্ভবপর? নিধুবাবু বলিতেছেন,—

"পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে।
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন-বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই করে কি কখনে॥"

ক্ষণকালের অদর্শনও প্রেমিক-প্রেমিকার ক্লেশপ্রদ।

"নয়নে নয়নে রাখি,
(প্রাণ) বাসনা মনেতে অনিমিখ হয় আঁখি,
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী।
কি জানি অন্তর হও, ওই ভয় দেখি।"

বিধাতা যদি নয়নে নিমেষ না দিতেন, তা' হইলেই সুখের হইত! নিধুবাবুর এই গানটি পড়িবার সময় মনে পড়ে গোপী-গণের সেই আক্ষেপ ;—"জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্।"

নিধুবাবুর গানগুলির বিশেষত্ব এই যে, তিনি সরল ভাষায় স্বল্প কথায় গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

"কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে॥
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমেষ হেরিতে হেরিতে॥"

কবি যেন ফটোগ্রাফের দ্বারা একখানি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন! প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষার দ্বারা তিনি মধুর ভাব চিত্রিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই তাঁহার গানের এতাদৃশ মাধুর্য্য।

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, আপন জেনে॥
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিনে লবে শমনে।"

মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ!

প্রেমরাজ্যে বৈষ্ণব কবিগণের তুলিকায় চিত্রিত শ্রীমতীর প্রেম নিরুপম। নিধুবাবু-কৃত নায়িকার পক্ষের অনেক গান পাঠ করিবার সময় মনে হয়, সেগুলিও বুঝি শ্রীরাধার উক্তি।

'আমার কি হ'লো সই ওলো ধর ধর।
বিরহ-বাতাসে, সঘনে হুতাশে, অঙ্গ কাঁপে থর থর।'

এই গান শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইয়া দেয়!

'যাও তারে কহিও সখি আমারে কি ভুলিলে।
(হে) বিরহে তব প্রাণ-সংশয়, ভাসি আমি নয়ন-সলিলে।'

ইহা মাথুর গানের ভাবদ্যোতক।

'ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ, এত শঠতা কেন।'

গানটি পড়িবার সময় মনে হয়, খণ্ডিতা রাধিকা যেন বলিতে-ছেন,

"ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক।" চণ্ডীদাস।

তবে নিধুবাবু সাক্ষাৎ কৃষ্ণলীলা অবলম্বনপূর্ব্বকও কতিপয় গীতি রচনা করিয়াছেন। 'চল সখি যাই যমুনাতীরে ঘনবরণ ঘন উদয় মনে' ইত্যাদি।

যাহা হউক, প্রণয়ের বিবিধ অবস্থার পরিব্যঞ্জক এমনই বহু শত গান রচনা করিয়া প্রেমিক কবি নিধুবাবু সঙ্গীত-জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই সব গানকে নিধুবাবুর টপ্পা বলা হইয়া থাকে। টপ্পা ব্যতীত নিধুবাবুর কতিপয় শক্তি-বিষয়ক গানও রহিয়াছে। নিধুবাবুর পূর্ণ নাম বাবু রামনিধি গুপ্ত। ১১৪৮ সালে তিনি হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

হুগলী জেলার অধিবাসী শ্রীধর কথক মহাশয়ের রচিত প্রণয়-গীতিগুলি নিধুবাবুর টপ্পার অনুরূপ।

"বড় চতুরও হয় যদি কোন জন।
পিরীতি করিলে তার দিবানিশি জলে মন॥
পাইলে প্রেমেরি রস, সদা সে থাকে অবশ,
দূরে রেখে অপযশ, প্রেম করে আভরণ।"

ইহাও সেই পরকীয়া ভালবাসারই কথা। কথক মহাশয় গাহিয়াছেন ;—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেই জন্যে দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।"

কবি স্বল্প কথায় ভালবাসার স্বরূপ সুন্দর চিত্রিত করিয়া-ছেন। কথক মহাশয়-কৃত গানগুলি বাস্তবিকই অতি মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী।

আরও বহু কবি টপ্পা গান রচনা করিয়াছেন। কালী মির্জ্জা-রচিত প্রণয়-গীতিগুলি সুমধুর।

"চাহিয়ে চাঁদের পানে তোমারে হয় মনে।
তুল্য না হইলে দোঁহে তুলনা হবে কেমনে।
যদি সমতুল করি নয়নে,—
মৃগাঙ্ক হইয়ে শশী লুকায় তব বদনে।"

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।"

নিধুবাবুর এই কথাগুলির সহিত উপরি-উক্ত গানটি তুলনীয়। স্বনামধন্য রামদুলাল সরকার মহাশয়ের পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ আশুতোষ দেবের কৃত কতিপয় টপ্পাগান রহিয়াছে। গানগুলি হৃদয়স্পর্শী—

"মন যে মানে না নিষেধ।
আশা না পূরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ॥
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অধিক তার আছয়ে কি খেদ।"

যে সমুদয় প্রণয়গীতির বিষয় আলোচিত হইল, সেগুলি সাধারণতঃ প্রণয়ব্যাপার ও তাহার পরিণাম-ঘটিত সঙ্গীত। কোন নাটক বা বিশেষ কোন ঘটনাবলী আশ্রয় করিয়া তৎসমুদয় রচিত হয় নাই। কিন্তু গোপাল উড়ের টপ্পা গানগুলি কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে।

কলিকাতার প্রভূত বিভবশালী বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়ে এই সকল টপ্পা রচিত হইয়াছে। কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, ভৈরব হালদার প্রভৃতি বহু জনের কৃত মধুর গীতিসমূহ এই সকল টপ্পায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বীরনৃসিংহবাবু তাঁহার ভৃত্য গোপাল উড়েকে এই পালা দান করেন এবং সেই হইতে এই টপ্পাগুলি

গোপাল উড়ের টপ্পা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিচিত্র ব্যাপারাবলী টপ্পাগুলির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তযৌবনা শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র মহারাজ দুষ্মন্ত মুগ্ধ হইলেন; পিতৃ কর্তৃক দত্তা হইবার পূর্ব্বেই মুনিকন্যা দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পণ করিলেন। উভয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হইয়া গেল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা বিদ্যাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। সখীগণের সাহায্যে শকুন্তলার ন্যায় বিদ্যারও গোপনে পরিণয় হইল। ইহাই হইল গল্পের সারাংশ।

কবিবরের বিদ্যাসুন্দরে মালিনীর প্রগল্‌ভতা দেখিতে পাই।

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁতছোলা মাজাদোলা হাস্য অবিরাম॥"

মালিনীর উক্তি টপ্পাগানগুলিও তদনুযায়ী। মালিনীই নায়ক-নায়িকার মিলনের সহায়ভূত হইয়াছে। কখনও সুন্দরকে কহিতেছে,—

"ধরায় থেকে চন্দ্র ধরা, অধরাকে আচকা ধরা,
সে কি রে চাঁদ সহজ ধারা অমনি ধারা,
এনে গগনচন্দ্র হাতে দিব।"

আবার বিদ্যার সমক্ষে আশঙ্কাও করিতেছে,—

"প্রেম গোপনে না রয়,
গোপনেতে প্রেম ক'রে অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হয়।"

সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হন; সখীগণ চমকিত হইল।

"এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো,
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে॥"

টপ্পাতেও রহিয়াছে,—

"রমণী-সমাজমাঝে কে হে নাগর গুণমণি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর কিংবা কোন নৃপমণি॥"

যাহা হউক, সখীরাই প্রথমতঃ তাহার পরিচয় লইল, সখীগণের বাক্‌চাতুরীও টপ্পার মধ্যে বেশ রহিয়াছে।

অনন্তর গল্পের প্রধান নায়িকা বিদ্যার কথা,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥"

এমনই রূপবতী বিদ্যা গুণেও অতুলনীয়া এবং পরম বিদুষী। কিন্তু তাঁহার এক প্রতিজ্ঞা,—যে জন তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিবেন।

"সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥"

সুন্দরের সহসা আগমনে ও কথার ছটায় বিদ্যা লজ্জায় অধোমুখী।

"অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।"

টপ্পাগানেও সুন্দর বলিতেছে,—

"সখি তার কেন পণ করা,
যে জন লজ্জাভয়ে জেন্তে মরা।"

ভারতচন্দ্রের তুলিকায় বিদ্যার চিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। টপ্পাতেও সেই হাস্যময়ী অনুরাগিণী বিদ্যা।

সুন্দরের রূপে, গুণে ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিদ্যা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিল, সেই স্থলেই উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল।

"রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিল বরমালা॥"

অতঃপর তাহাদের হাস্য-পরিহাসে রহস্য-আমোদে সুখের সময় কাটিতেছে। এই সময়ের উপযোগী বিদ্যার উক্তি টপ্পা গানগুলিও সুমধুর।

প্রেমিক-প্রেমিকা মিলনের মুহূর্ত্তগুলি প্রেমে আত্মহারা হইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহাদের বিদায়ের মুহূর্ত্ত অশ্রুমুক্তায় সমুজ্জ্বল। সে চিত্রও মনোরম, সে যেন হরিষে বিষাদ। "Parting is such sweet sorrow"—Romeo and Juliet. উষাকালে সুন্দর বিদায় লইতেছে,—

"ঐ পোহাল রূপসি! নিশি,
মনোদুঃখ রৈল মনে বিদায় দাও এক্ষণে আসি।"

গোপাল উড়ের রস-সঙ্গীতসমূহ সুস্পষ্ট আদি-রসাত্মক। আদিরসের সাহিত্যমাত্রই কুরুচি-ভাবাপন্ন, এতাদৃশ অভিমত বোধ হয় সমীচীন নহে। অবশ্য কুৎসিত খেউড় আদি গান ভদ্রসমাজে কদাপি প্রচলিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ জাতীয় মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত রস-সঙ্গীত ও রস-সাহিত্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কোন ব্যক্তির মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয় ভাবাও যে প্রকার, জাতীয় মঙ্গল-অমঙ্গল আলোচনা করাও তদনুরূপ। কাহারও শুধু অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা থাকিলেই যথেষ্ট হয় না; পরন্তু তাহার অবসরসময়ে চিত্ত-বিনোদনের সুন্দর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় মঙ্গলের কথা ভাবিতে গেলেও উপলব্ধি হয়, অনাবিল রস-সঙ্গীত লোকের চিত্তে আনন্দের উদ্বোধন করিয়া দিয়া সমগ্র জাতির সুখ, স্বাস্থ্য, পরমায়ু বিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। বাস্তবিক, আনন্দমায়ুঃ এ কথা ধ্রুব সত্য।

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র (বেদান্তরত্ন, এম-এ)।

তিব্বত

১১ই মে আমরা সং হইতে গণ্টক পৌঁছিব। ইহা ১৪ মাইল ব্যবধান; গণ্টক সিকিমের রাজধানী। আমরা বেলা ৮৷১৫ সময় বাঙ্গালা হইতে যাত্রা করিলাম। পাহাড়ের

মাণ্টান গ্রাম

গায়ে মধ্যে মধ্যে চাষের জমী এবং জমীর এক প্রান্তে কি মধ্যে চাষীর খড়ের ঘর। ক্রমে আমরা মাণ্টান গ্রামের ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে অনেক চাষের জমী এবং কৃষকদের ঘর-বাড়ী আছে। রাস্তায় সুন্দর ফুল দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। এক স্থানে একটি ফুল তুলিতে গিয়া দেখিলাম, উহারই সন্নিকটে একটি সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সাপটির ফণা নাই, কিন্তু উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ হাত। আমি আত্মরক্ষার্থ লম্ফ দিয়া স্থানত্যাগ করিলাম।

আমরা পাহাড়ের ধার দিয়া একবার উপরে, একবার নীচে যাইতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে রামটক্ গোম্পা দেখা যাইতে লাগিল। গোম্পাটি আমাদের রাস্তায় পড়িবে, সুতরাং রামটক্ গোম্পা দেখিবার বাসনা হইল। আমরা উত্তরদিকে যাইতে যাইতে বেলা ১১টার সময় রামটক্ গোম্পার সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। যে রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, তাহার ডানদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে একটি ছোট রাস্তা দিয়া গোম্পায় চলিলাম। গোম্পার রাস্তায় বড় বড় সরল গাছ এবং দুই দিকে ফুলের গাছ; গোম্পাটি মধ্যস্থলে। গোম্পার পূর্ব্বদিকে একটি ঘাসের চটান। গোম্পার দক্ষিণে এক সারি ঘর ও উত্তরে কয়েকখানা ঘর। এই সকল ঘরে লামারা থাকেন। গোম্পায় ফুল এবং ফলের গাছ আছে। গোম্পার প্রধান লামা (বৌদ্ধধর্ম্মযাজক) তথায় উপস্থিত ছিলেন না। আমরা গোম্পার ভিতরে বহু লামাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের সহিত আমরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলাম। মন্দিরটি দুইতলা টীনের ঘর, চতুর্দ্দিকে পাথরের দেওয়াল। মন্দিরের ভিতরে কাঠের সুন্দর কারুকার্য্য আছে। আমরা মন্দিরের উপরের ঘর দেখিতে চাহিলাম; তদনুসারে একটি লামা আমাদিগকে একটি খাড়া সিঁড়ি দিয়া উপরে লইয়া গেল। তথায় দুইটি বড় ঘর ও একটি ছোট ঘর দেখিতে পাইলাম। একটি ঘরে লামাদের বাদ্যযন্ত্র ছিল। ৪।৫ হাত লম্বা শিঙ্গা এবং হাতোয়ালবিশিষ্ট ঢাক, ইহাই বাদ্যযন্ত্র। অপর ঘরে কতকগুলি মুখোস ও একটি কাঠের সিন্দুকের ভিতর কতকগুলি পরিচ্ছদ ও বড় বড় করতাল দেখিলাম। উহা তিব্বত-দেশীয়রা নাচের সময় ব্যবহার করে। মন্দিরের ভিতরের আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ছিল। জিজ্ঞাসা করায় লামারা তাহা লইতে নিষেধ করিল। কাযেই মন্দিরের বাহিরের আলোকচিত্র লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

এখান হইতে প্রায় ২ হাজার কি আড়াই হাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়া একটি ছোট গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটিতে চাষী লোকের বাস, তন্মধ্যে নেপালী অধিবাসী অধিক — ভুটীয়াও কিছু আছে। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী। এখানে অনেক কমলা লেবুর গাছ দেখিলাম। উহা ব্যতীত পেয়ারা, পেঁপে (পপিতা) ইত্যাদিও দেখিলাম। উপত্যকায় এবং পাহাড়ের গায়ে যে সকল ধান্য, মাধই, যব, গম ও নানারূপ শাক, সব্‌জী এবং ফলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা গণ্টকের বাজারে বিক্রয় করা হয়।

আরও নীচে নামিয়া একটি পুলের উপর দিয়া ছোট একটি

রামটক্ গোম্পা

পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া পুনরায় উপরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কতকদূর অগ্রসর হইবার পর আমরা তিস্তা হইতে রংপু দিয়া গংটক পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, ঐ পথে পড়িলাম। রাস্তার মধ্যে মধ্যে চাষীদের বাড়ী এবং রাস্তার উপরে দোকান-ঘর। ঐ সকল দোকানে চা, রুটী, মদ, চুরুট, দিয়াশলাই ইত্যাদি পাওয়া যায়।

আরও কতকদূর অগ্রসর হইবার পরে সিকিম পুলিস আমাদিগকে যাইতে বাধা দিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নিজ গংটক সহরে বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য ঐ সকল গ্রামের লোকদিগকে সহরে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। আমরা বলিলাম যে, "আমরা দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়াছি। আমরা গ্রামবাসী নহি।" পুলিস আমাদের কথা শুনিয়া আমাদিগকে যাইতে দিল। গ্রামবাসীদিগকে সহরে যাইতে না দেওয়ায় প্রায় ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাজারে কোন তরকারী কি ফল পাওয়া যায় নাই। বাজার একপ্রকার বন্ধ রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা তথা হইতে যাইতে যাইতে বেলা অপরাহ্ন সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় গংটক ডাক-বাংলোয় পৌছিলাম।

গংটক

গংটক সিকিম রাজ্যের রাজধানী, ইহা একটি ছোট সহর। প্রায় সকল বাড়ীই টিনের। আমরা বাজার বাম পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে রাখিয়া উপরদিকে উঠিয়া পাহাড়ের উপরে মহারাজার রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। পুরাতন রাজপ্রাসাদ তখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। এই স্থানে একটি নূতন প্রাসাদ হইবে। পুরাতন রাজপ্রাসাদের উত্তরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজের বসবাসের জন্য বাংলোর আকারে নূতন টিনের ঘর করা হইয়াছে। তাহার উত্তর-দিকে লোকজন থাকিবার জন্য কতকগুলি ঘর ও মটরগাড়ী রাখার স্থান আছে। বাটীর প্রাঙ্গণের বাহিরে পূর্ব্বদিকে অশ্বশালা। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে কাছারী এবং বালিকা-বিদ্যালয়।, প্রাসাদের উত্তরে একটি সুন্দর বাগান ও মাঠ এবং টেনিস খেলার স্থান। বাগানের মধ্যে রাজা সপ্তম

পুরাতন রাজপ্রাসাদ

এডোয়ার্ডের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি আছে। বাগান হইতে উত্তরদিকে যাইয়া আমরা ডাক-বাংলো পাইলাম। ডাক-বাংলোর উত্তরে "দিলখোসা" নামক মহারাজের উদ্যান-বাটিকা দ্রষ্টব্য পদার্থ। তাহার পর ডাক ও তার আফিস এবং তাহার উত্তরে রেসিডেন্সী। উহা দেখিতে সুন্দর; ইহার বাগানটি দেখিবার মত বটে। পূর্ব্বদিকে একটি পাহাড়ের উপরে গোম্পা এবং জেলখানা। এই পাহাড়ের নিম্নে জজ, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির বাসস্থান। গণ্টকের পথ-ঘাট সুন্দর। গণ্টক সহরে জলের কল আছে। উপরের পাহাড়ের একটি ঝরণা হইতে কলের জল আনয়ন করা হইয়াছে। 'সম্প্রতিক' নামক পার্ব্বত্য নদী হইতে 'শক্তি' গ্রহণ করিয়া বিজলী বাতি দ্বারা সহর আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমরা আসিবার পূর্ব্বেই ডাক-বাংলোর ৫খানি শয়ন-কক্ষ অপরের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই গিয়ান্‌সির বৃটিশ ট্রেড এজেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ঐ বাংলোয় অবস্থান করিতেছিলেন।

১২ই মে ভোর ৫টার সময় আমি ডাণ্ডিতে এবং অন্যান্য সকলে অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হইলাম। আকাশে রৌদ্র উঠিয়াছে। প্রথম তিন মাইল পাহাড়ের গায়ে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রাস্তা দিয়া উপত্যকা ঘুরিয়া উত্তরদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে যাইতে হইল। রাস্তাটি সুন্দর এবং সমতল। এই তিন মাইল মটর-গাড়ীও চলিতে পারে। রাস্তার ডানদিকে অভ্রভেদী পাহাড় এবং বামদিকে অতলস্পর্শী উপত্যকা। ডানদিকের পাহাড়ের উপরে নানারূপ বৃক্ষ এবং মধ্যে সুন্দর দুইটি ঝরণা পাহাড়ের অঙ্গ হইতে পথে পড়িয়া পুনরায় উপত্যকায় নিপতিত হইয়া গণ্টকের নীচের নদীতে মিশিয়াছে। রাস্তা হইতে বহু নিম্নে নদী লম্বা শ্বেতাম্বরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাস্তার বামে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে গণ্টক-মহারাজের পক্ষ হইতে বহু আখরোট গাছের চারা লাগান হইয়াছে। এক মাইল অগ্রসর হইলে একটি নেপালী বস্তি পাইলাম।

৩ মাইল পথ অগ্রসর হওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে একটি চটানে একখানা গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটি রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। গ্রামে ১৫খানা আন্দাজ ঘর। গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে দুইখানা চা, রুটী এবং দেশীয়
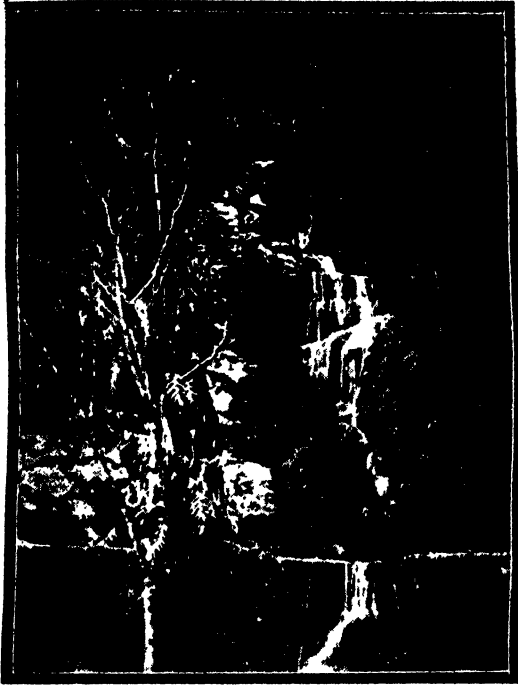
গণ্টক এবং ডিকচুর মধ্যবর্ত্তী ঝরণা

মদ, চোংএর দোকান। ইহা ব্যতীত একখানি বেহারী মহুয়া মদের দোকান আছে। কাষ্ঠের দোকানে জ্বালানী কাঠ ও তক্তা পাওয়া যায়। গ্রামে কয়েক ঘর চাষীর বাস আছে। গ্রামের বাসিন্দা ভুটিয়া ও নেপালী। পথের পশ্চিম পার্শ্বে ঘন জঙ্গলাবৃত অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা। পথের নিম্নে উপত্যকায় একটি ঝরণার মত ক্ষুদ্র নদী। উপত্যকার পূর্ব্বদিকে নিবিড় নীল অরণ্যানীশোভিত অভ্রভেদী তুষার-কিরীটী পর্ব্বতমালা। কি শোভা!

কিছু দূর অগ্রসর হইলে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টিবারি-স্ফীতা পার্ব্বত্য নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। তাহার শোভা অতুলনীয়। আর পর্ব্বতগাত্র ফার্ণ, পাম প্রভৃতি শ্যামল লতাপাতা ও নানা পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত—তন্মধ্য হইতে পক্ষিকূজন বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। বারিধারাস্ফীত শত শত গিরিনির্ঝর শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিতেছে এবং শতধারাপ্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া নিম্নস্থ গিরিনদীর অঙ্গপুষ্টি করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

স্বভাবের এই অতুলনীয় শোভা ডাণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উপভোগ করা অসম্ভব। তাই ডাণ্ডী হইতে অবতরণ করিলাম। কখনও বা পত্র-পুষ্প চয়ন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলাম; কখনও বা তোড়া বাঁধিয়া উহা সযত্নে ডাণ্ডীতে রাখিতে লাগিলাম; কখনও বা টুপীতে আঁটিয়া দিলাম। এইরূপে বৃষ্টিসত্ত্বেও আমরা মনের আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বকথিত জনমানবশূন্য জঙ্গলমধ্যস্থ পথ ধরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। যত নীচে অবতরণ করি, ততই যেন জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিম্নে জঙ্গল আরও ঘন-সন্নিবিষ্ট। উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বত গগন চুম্বন করিতেছে। পথে একটি পার্ব্বত্য ঝরণার উপরিস্থ সেতু পার হইতে হইল।

নিবিড় নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা ডিকচুর বাজারের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। ডিকচুর বাজারের নিকট উপস্থিত হইলে উত্তরদিকেও একটি অভ্রভেদী পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। এই উত্তরদিকের পাহাড়ের দক্ষিণ দিক্ দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে তিস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব-কথিত নদীটি দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া ডিকচু বাজারের নিম্নে তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বেলা ২॥ ঘটিকার সময়ে ডিকচু বাজারে উপস্থিত হইলাম। যে পার্ব্বত্য নদীর ধার দিয়া আমরা আসিয়াছিলাম, তাহাকে ডিকচু নদী বলে। বাজারে ৭।৮খানা দোকান-ঘর, তন্মধ্যে ৩খানা বেহারীদের দোকান। তাহারা চাউল, মসুরী ও অরহর ডাল, কিছু মসল্লা, হরিদ্রা, লবণ, কেরোসিন তৈল, কাপড় ইত্যাদি সামান্য পণ্য বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া রাখিয়াছে। বেহারীদের মহুয়ার তৈয়ারী মদের দোকান আছে; ইহা ব্যতীত ২।৩খানা ভুটীয়া দোকানও তথায় আছে। বাজারে এক জন ভুটীয়ার কয়েকটি ভারবাহী অশ্বতর ও দুইটি মনুষ্যবাহী অশ্ব ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারের উপরে ডিকচুর কাজী অর্থাৎ ভুটীয়া জমীদারের বাড়ী। তিনি ডিকচুতে না থাকিয়া প্রায়ই মগন নামক স্থানে থাকেন। মগন এই স্থান হইতে ২ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ এবং স্বাস্থ্যকর। ডিকচু মাত্র ২ হাজার ফুট উচ্চ। স্থানটি গরম এবং শুনিলাম, একটু অস্বাস্থ্যকর।

বেতের পুল

বাজার হইতে উত্তরদিকে নামিয়া তিস্তা নদীর উপর বেতের পুল দেখিতে গেলাম। লোক-পারাপারের সময় বেতের পুল ঝুলিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিস্তা নদীর উত্তর পারে অভ্রভেদী পাহাড়। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিক্ ভারী খাড়াই। পাহাড়ের উত্তর গায়ে ভুটীয়া-বস্তী আছে। ভুটীয়ারা এই বেতের পুলের উপর দিয়া নদী পার হইয়া ডিকচু বাজারে পণ্য বিক্রয় করিতে আসে। কিন্তু চোং এবং মদ খাওয়ার জন্যই উহাদিগকে অধিক সময় বাজারে আসিতে হয়। বাজার হইতে পূর্ব্বদিকে যাইয়া তারের সেতু দিয়া ডিকচু নদী পার হইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর পারে অবস্থিত ডিকচুর বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। ডিকচুর বাংলো দুই দিকে অভ্রভেদী পাহাড়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। এই উপত্যকাটি পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে চলিয়াছে। স্থানটি দেখিলে অনুমান হয়, যেন তিস্তা নদী পর্ব্বত কাটিয়া নিজের যাওয়ার পথ করিয়া লইয়াছে। ডিকচুর বাংলোর সম্মুখে একটি ছোট ফুলের বাগান। তাহাতে গরম ও শীতপ্রধান-দেশীয় উভয়বিধ ফুল দেখা গেল। শীতপ্রধান-দেশীয় ফুল অপেক্ষা গরম-দেশীয় ফুলই অধিক দেখিলাম। পরগাছা-ও (Orchid) অনেক। বড় বড় পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ঐ স্থানে বৃষ্টির আধিক্য দেখা যায়। এই স্থানে বিশেষ জেঁাকের ভয়। সাপের ভয়ও কম নহে। বাংলোটি জমী হইতে দুই হাত উচ্চে কাঠের পাটাতনের উপর অবস্থিত। বাংলোটিতে দুইটি শয়নঘর, মধ্যে একটি হল ও দুই দিকে দুইটি বারান্দা। উহা একবারে তিস্তা নদীর তটপ্রান্তে অবস্থিত। উত্তরদিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিস্তা নদীর দিকে চাহিলে ডাক-বাংলোখানা নদীস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়। বাংলোর অঙ্গনে রান্নাঘর, চাকরদের থাকিবার ঘর, আস্তাবল এবং কুলীদের থাকিবার ঘর আছে। রাস্তার অপর পারে একখানা ঘরে ৫।৬ জন কুলী থাকে। ইহারা যাত্রীদের প্রয়োজনমত তাহাদের মোট পরের ডাক-বাংলো পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। তাহাদিগকে প্রত্যেক বিশ্রামস্থান পর্য্যন্ত যাইতে ৷৷০ আনা করিয়া দিতে হয়। আমরা এই বাংলোয় রাত্রিবাস করিলাম

১৩ই মে বেলা প্রায় সাড়ে ৮টার সময় আমরা আবার যাত্রা করিলাম।

প্রথমে কতকদূর জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া কখনও নীচে কখনও উপরে চলিতে লাগিলাম। ডানদিকে জঙ্গলাবৃত অভ্রভেদী পাহাড়, মধ্যে রাস্তা এবং বামদিকে তিস্তা নদী তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিস্তা নদীর অপর পারে জঙ্গলাবৃত গগনস্পর্শী পাহাড়। জঙ্গলের ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে বহু পর্ব্বত-নির্ঝর গভীর গর্জ্জনে তিস্তাতে আসিয়া পড়িতেছে। এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড পাথর রাস্তার উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। উহা হইতে সর্ব্বদাই সামান্য জল রাস্তার আসিয়া পড়িতেছে ও যাত্রিগণকে ভিজাইয়া দিতেছে। এই স্থান অতিক্রান্ত হইবার পর অপ্রশস্ত উপত্যকা কিছু প্রশস্ত হইল, কিন্তু জঙ্গল সমভাবে রহিয়া গেল। এই স্থানে রাস্তার ধারে লেবুর গাছ দেখিয়া কয়েকটি লেবু আমরা ছিঁড়িয়া লইলাম। তথায় পেয়ারা গাছও আছে। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও খাওয়ার উপযোগী পেয়ারা পাইলাম না। রাস্তার দুই পার্শ্বে সিকিমের বন-বিভাগ হইতে পথ ছায়া-শীতল করিবার নিমিত্ত রবার ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। এই চটান ছাড়িয়া আমরা পুনরায় একটি তারের পুলের উপর দিয়া ঝরণা পার হইয়া অন্য একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। তখনও জনমানবশূন্য অরণ্যানী পথটিকে উভয় পার্শ্বে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

ডিকচু হইতে সাড়ে ৩ মাইল আসার পর এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় আমরা এক স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম যে, পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে ঝরণার জলস্রোতে ঐ পাহাড়ের কতকটা অংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে। এই স্থানটি বিপজ্জনক; কারণ, উপরের ঝরণার জলের সহিত পাহাড় ধ্বসিয়া এত পাথর নীচে গড়াইয়া আসিতেছে যে, তাহাতে সময় সময় লোক চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। উপরে অধিক বৃষ্টি হইলেই এইরূপ পাহাড় ধ্বসিয়া পাথর গড়াইয়া পড়ে। এই রাস্তাটি বিপজ্জনক বলিয়া সিকিম গভর্ণমেণ্ট হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া লোক যাতায়াতের জন্য একটি পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উপরের পথ দিয়া গেলে ১১।১২ মাইল রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হয়। আমরা সেই আশঙ্কাজনক পথ দিয়াই চলিলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে অনেক প্রকার গাছ, লতা ও বৃক্ষের ফুল দেখিলাম। আমরা নানারূপ ফুল ও পরগাছা আহরণ করিয়া ডাণ্ডীতে রাখিলাম। তিস্তা নদী বাম পার্শ্বে রাখিয়া আমরা তিস্তা নদীর পাড় ছাড়িয়া কিছু ভিতরের দিকে চলিলাম। উপত্যকার অরণ্যের ভিতরে মধ্যে মধ্যে চাষের ক্ষেত্র ও দুই একখানা ঘর দেখা গেল। এ স্থানে নেপালী নাই, প্রায়ই ভুটীয়া ও লেপচারা বাস করে। এখানে বিস্তর বড় এলাচের চাষ হয়। বড় এলাচের ক্ষেত্র আমাদের দেশীয় তারাবনের মত। কিন্তু পাতা ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। ক্রমে আমরা মগন নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম।

মগন একটি ছোট বাজার। তথায় একই ঘরে একটি ঔষধালয় ও একটি শাখা-ডাকঘর আছে। মগন যাইতে আমরা বহু বড় এলাচের চাষ দেখিলাম। এখানে ৫।৬ খানা দোকান-ঘর। এখানকার চারিদিকের পাহাড়ের

বালিকা কম্বল বুনিতেছে

উপরিভাগ তখনও তুষারাবৃত রহিয়াছে। স্থানটি বেশ মনোরম। পাহাড়ের উপরে ডিকচুর কাজীর একটি বাড়ী আছে। অদূরে একটি খৃষ্টান মিশন আছে। ঐ বাজারে দুই জন স্ত্রীলোককে কম্বল তৈয়ারী করিতে দেখিলাম। এক জনের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম।

সপ্তাহে এখানে মাত্র দুইবার ডাক যাওয়া-আসা করে। মগন হইতে আমরা আরও অগ্রসর হইয়া জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিস্তা নদীর তট ধরিয়া অগ্রসর হইয়া বেলা ৪টার সময় সিংগিক নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম।

এখানে পাহাড় জঙ্গলাবৃত এবং উচ্চ পাহাড় তুষারাবৃত। উপত্যকার মধ্য দিয়া তিস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই তুষারাবৃত পাহাড়। এখানে কোন দোকানপাট নাই এবং কিছুই পাওয়া যায় না। বাংলোয় দুইটি শয়ন-ঘর ও একটি বসিবার ঘর আছে। অদ্য আমরা মাত্র ১১ মাইল আসিয়াছি। এই স্থানটি ৪ হাজার ৬ শত ফুট উচ্চ। এখানে কয়েকটি পিচ্ ফলের গাছ দেখিতে পাইলাম। তাহাতে ফল ধরিয়াছে, কিন্তু পাকে নাই।

১ নং জলপ্রপাত

১৪ই মে আমাদিগকে মাত্র ৯ মাইল রাস্তা যাইতে হইবে। কাযেই আমাদের অদ্য রওনা হইবার বড় তাড়া নাই। যাহা হউক, বেলা সাড়ে ৯টার সময় আমরা রওনা হইলাম। রাস্তায় ৪টি সুন্দর জলপ্রপাত দেখা গেল। কিন্তু উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ এবং জোঁকের তাড়নায় ভাল ফটো লওয়া সম্ভব হইল না। রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলের ভিতর পদক্ষেপ করা একপ্রকার অসম্ভব। জঙ্গলে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ছোট ছোট জলৌকা আক্রমণ করে। এমন কি, বুটের ফিতার ছিদ্রের মধ্য দিয়া জুতার ভিতর জোঁক প্রবেশ করে। ফিরিবার সময় ডিকচু বাংলোয় সিকিমের বনবিভাগের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ভীম বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জোঁকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "রাস্তার ধারে ঝরণার পার্শ্বে চারাগাছ-আবৃত স্থানে আপনারা ছোট ছোট জোঁক দেখিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বড় বড় জোঁক দেখিতে পাইতেন। উহারা গাছের উপর হইতে মানুষ কিম্বা জন্তু দেখিলে তাহাদের গায়ের উপর পড়ে এবং পোষাকের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। অনেক সময় লতাপাতা হইতে আস্তে আস্তে

২ নং জলপ্রপাত

শরীরের উপর চড়িয়া বসে। এই হেতু এ দেশীয়রা উহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমস্ত শরীর এমন ভাবে আবৃত করে যে, কোন প্রকারে জোঁক যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। দেশীয়রা পায়ে মোজার সহিত কঠিন খাকী কাপড় জড়াইয়া লয়।"

আমরা বাংলো হইতে বাহির হইয়া কয়েকখানা ঘর দেখিলাম। তৎপর আমাদের সমস্ত পথটাই জনমানবশূন্য অরণ্যের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে হইল।

বেলা ৩টার সময় আমরা টুঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইলাম। রাস্তায় অনেক কলা-গাছ দেখিলাম এবং তাহাতে অনেক মোচা ধরিয়াছে দেখিলাম। স্থানটি জনমানবশূন্য। তিস্তা

নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে চাষের ক্ষেত্র এবং চাষীদের দুই একখানা বাড়ী দেখা গেল। বাড়ী
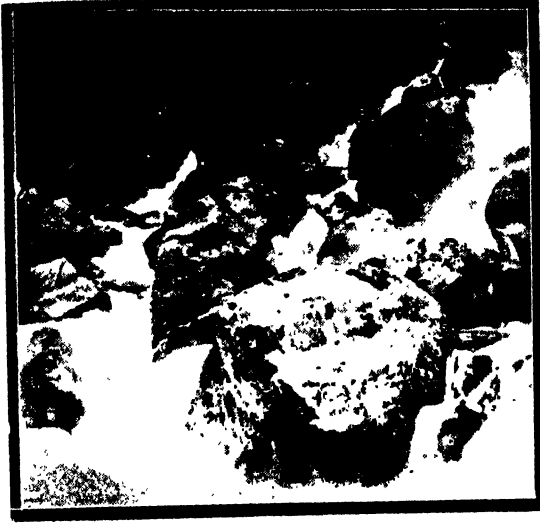
৩ নং জলপ্রপাত

হইতে পাহাড়ের গা দিয়া সূত্রের মত ছোট রাস্তাও দৃষ্টিগোচর হইল। গরু-রাখাল এবং মেষপালকের থাকিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে কোন কোন স্থানে পর্ণকুটীর আছে। জঙ্গলের ভিতর কোথাও কোথাও মোটা বেতও দেখিতে পাইলাম।

টুঙ্গ বাংলোর নীচে পশ্চিমেদিকে ও উত্তরদিকে নদী প্রবাহিত। নদীর উপরে আকাশভেদী পাহাড়, স্থানটি

৪ নং জলপ্রপাত

কিন্তু লোকালয়শূন্য। বাংলোয় দুইখানা শয়ন-ঘর, একখানা বসিবার হল এবং রন্ধনের ও কুলীদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে।   [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

সাঁঝের গান

থেমো না, থেমো নাক, আঘাত শত শত,
আবার বুকে মোর হেনো,
তোমার দেওয়া ব্যথা, গভীর হোক যত
সহিতে পারিব তা' জেনো!

না দিয়া ব্যথা, জ্বালা,—হয়ো না নিরদয়,
সহিবে অবহেলা,—করুণা নাহি সয়,
তোমার 'দয়া-বাণ', সে যে গো অপমান!
দু' হাতে,"ব্যথা-দান" এনো।

মরণ হেথা হায়! ফিরিছে পায় পায়,
তাহারি ব্যথা যদি সহিতে পারা যায়,
তোমার অকরুণ, শায়ক নিদারুণ—
সহিবে;—টেনো গুণ টেনো।

তোমারে ভালবেসে, পেয়েছি যে ইনাম!
জানি হে দিতে হবে চুকিয়ে তা'রি দাম;
আমার যত পুঁজি, লও হে,—দিনু খুঁজি'—
তুমি ত সে সবারে চেনো।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ।
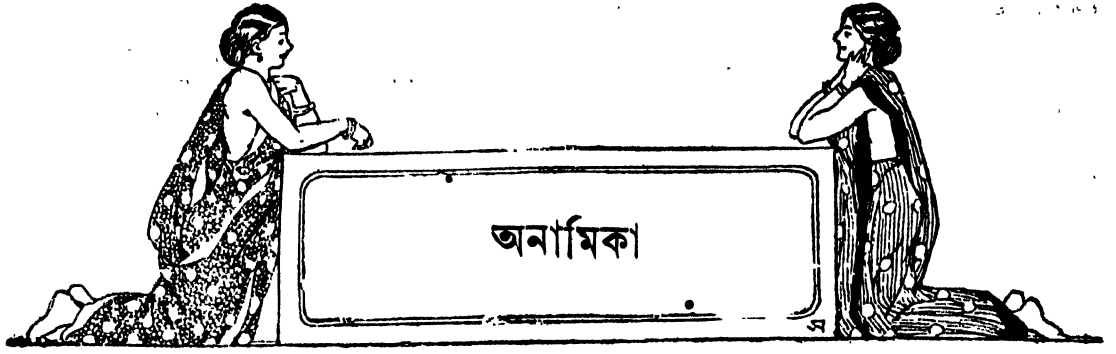
গৃহস্থালীতে অনেক গ্রহ আছে, মহাদেবের নজীর হইতে ধারাবাহিকভাবে বহুতর নজীর চলিয়া আসিয়াছে—ফুল বেঞ্চ কখনও বসে নাই, বসিবার সম্ভাবনাও নাই। ভগবানের সৃষ্টি যত দিন বজায় থাকিবে, আর স্ত্রী-পুরুষে যতই কম হউক, কিছু বিভেদ থাকিবে—তত দিন নানা রকমে গ্রহের উৎপাতও থাকিবে, তাহা না হইলে বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকাও সুখের হইবে না—মরিলেও মোক্ষলাভ হইবে না। গৃহস্থালীর প্রথম অধ্যায়—লজ্জানম্র নববধূ, আগাগোড়া কেবল মধু; দ্বিতীয় অধ্যায়—বন্যার মত পুত্রকন্যার আগমন; তৃতীয় অধ্যায়—এইখানেই যত গোল। শুনিতে পাই, মুরগী যত দিন ডিম পাড়ে, তত দিন বড় শান্তপ্রকৃতি থাকে; ডিম পাড়া বন্ধ হইবামাত্র রাত-দিন ক্ষুব্ধকণ্ঠের ঝঙ্কার আর চঞ্চুর ঘন ঘন আঘাত! অন্তরের গোপন কথা যদি সকলেই সাহস করিয়া লিখিতে পারিত, তাহা হইলে বীণার ঝঙ্কারে কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইত। আমি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, মা ভৈঃ বলিয়া সামান্য একটি ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করিব।

বালা পরায় কোনও বালাই নাই—মলের রুণুঝুনুতে পায়ে যে বেড়ী পড়ে, সুন্দরী ও অসুন্দরীরা তাহা ভুলিয়া যান। বালা পুংলিঙ্গে পরিণত হইয়া তাগারূপে পুরুষের উপরহাতে সংস্থিত হয়। মলের শব্দ কখনও মিষ্ট—আগমনকালে; কখনও নির্দ্দয় নির্ম্মম কাড়ার মত, যখন ননদিয়া শ্রবণ-গোচরে ক্রোশখানেক দূর হইতেও আসিয়া পড়ে, পরে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত গোল বাধায়। আংটী পুরুষের হাতে স্ত্রীমাধুর্য্যে, স্ত্রীর হাতে পৌরুষগর্ব্বে শোভা পায়। সুন্দরী সুন্দরীকে কখনও এই উপহার দেয় না—স্পর্শসুখ ইহাতে অনুভূত হয় না বলিয়া পুরুষই দিয়া থাকে। সুন্দরী চিরকালই অগ্রদানী। অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধ কি সম্পূর্ণ আঁচর পাতিয়া লয়—রাঙ্গা অধর, নয়ন কাল, তবে যে আগুন এ যুগলে জ্বলে, দুই ভালে তাহা অনির্ব্বাণ।

যাক বাজে কথা—একটি অঙ্গুরীয়ের কাহিনী বলি, তাহার ষোল আনাই সাঁচ্চা। গাছের আর পাতা নাই বলিলেই চলে। যে কটা আছে, রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে, আজ বাদে কাল ঝরিয়া পড়িবে। ডাল-পালা সব বক্রাকৃতি কুটিল, পথ ভুলিয়া বা সঙ্গী হারাইয়া কদাচ কখনও কোন বিহঙ্গ শুষ্ক ডালে যদি বা কখনও বসে,—সে যেমন, আমারও তাহাই। জ্ঞান এবং শ্মশ্রুর আবির্ভাবকাল হইতে এ অবধি কত সহস্রবার চমকিয়া উঠিয়াছি। ঐ বুঝি সে—ঐ তাহার কটির মধুর কিঙ্কিণীধ্বনি, অগ্রসর হইয়া দেখি, বামা ঝির হাত হইতে কাঁসার রেকাব পড়িয়া গিয়াছে। খন্ খন্ ঝণাৎকার দূর হইতে অত্যন্ত মোলায়েম বলিয়া মালুম হইয়াছে। দেওয়ালে ছায়া, পর্দ্দার গায়ে তরঙ্গ, ঐ বুঝি আসিল! তাহা নহে—'মেও' মহাশয় গবাক্ষ হইতে নিঃশব্দে লাফাইয়া পড়িয়া পর্দ্দার ঘেঁস দিয়া আপন মনে খাবার ঘরের দিকে চলিয়াছেন। ও ঢেউ যে কেন অযথা বারম্বার হৃদয়কে তোলপাড় করে!

সে দিন পোষ্ট-পাশেলে অস্পষ্ট দাসীর (অস্পষ্ট হইলেও আর সব আয়নার মত সুস্পষ্ট) হস্তাক্ষরে লিখিত ইনসিওর করা কৌটা খুলিয়া দেখি, সোনার বন্ধনে নয়নমুগ্ধকর (অন্যের হিসাবে) অপরূপ চুণি। ভুল করিয়া আসে নাই ত? আবার শিরোনামা পড়িলাম। কৌটার মধ্যে মেয়েলি হাতের লিপি—ন সম্বোধন ন চ ইতি প্রান্তে—কি বল ত?

"আমার হৃদয়ের এক বিন্দু রক্ত কাঞ্চনে সন্নিবেশ ক'রে তোমায় পাঠালুম।"

পোষ্ট আফিসের ছাপ সহরের সন্নিকট স্থানের—সহজে ধরা দিবার আশঙ্কায় একটু দূর হইতে নিক্ষেপ—যদিও

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ইনসিওরেন্স রসিদের পশ্চাৎ ধাবমানে আমিও কি সেই সু-করকমলে পৌঁছিব! কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কাহাকেই বা বলি, কাহারই বা পরামর্শ পাই! আবার মনে হইল রণজিৎ সিংহের কথা। বিদ্রোহী সিপাহীরা নেতার অনুসন্ধানে রণজিতের কাছে উপস্থিত; তিনি জরাজীর্ণ। বলিলেন, "আমার এই শেষ বয়সে তোরা এলি!" যোদ্ধার নয়নে সেই প্রথম বাষ্পের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। এ বিদ্রোহিণী আর দুই চারি দিন আগে কেন পাঠাইল না! জীবন ভরিয়া তাহাকে খোঁজ করিতাম, হয় ত তাহাকে পাইতাম। এখন যেন এ উপহার ঐ হৃদয়ের এক বিন্দু, ডালিমের দানার মত শোণিত স্বর্ণ-সিন্দুরের মত শেষাবস্থায় প্রয়োগ। সবুরে মেওয়া ফলে—বৃথা কথা, বৃথা চেষ্টা, বৃথা আশা, বৃথা এ লাভ। 'হৃন্মর্ম্মব্রণ ইব বেদনাং করোতি।' মনের বেদনা নানা কবির ভাষায় তিরোহিত হয় না—ইহা ত দুধও নহে, ঘোলও নহে, ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। 'অ্যাটাসে কেসের' এক কোণে রাখিয়া সে রাত্রি শয়নে স্বপনে মনোমোহনে এই সমস্যার কুলুপে কত রকম চাবি লাগাইলাম। কোনটাই লাগিল না। যেমন সমস্যা, তেমনই রহিল। "প্রভাত-বাতাহতকম্পিতাকৃতি কুমুদ্বতীর" ন্যায় স্বস্থানে বসিয়া কখনও একটু বেপথু—কখনও বা আত্মম্ভরিতায় একটু চটুল হাসির উদ্রেক—এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে, ঘোড়াও চড়লে না, চায়ের বাটি ঠাণ্ডা, বরফে ভেজান আম যেন ঝামা, ব্রিক উল্টো হয়ে বাতাসের খেলার পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কি হ'ল?"

শার্দ্দুল আক্রমণে যে ব্যক্তি অচলভাবে কতবার দাঁড়াইয়াছে, সেই মহাপুরুষ কি এখন কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে? না, কখনই নহে—প্রাণটি হাতে করিয়া চুণির আংটিটাই বাহির করিয়া—কাহিনীটি প্রকাশ করিলাম। গলা পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও দুই তিনবার কাসিয়া পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল, ইহা কি ভীরুতার চিহ্ন?

গৃহিণী বলিলেন, "সত্যি! তুমি ত একটি উড়নচড়ে, হয় ত হ্যামিলটন, নয় তারাচাঁদ কি অন্য কোন চাঁদ তোমাকে গছিয়েছে। গড়ানর উঞ্চতা এখনও যে রয়েছে—আমার কোন আঙ্গুলে হয় না—সুতরাং আমার জন্য নয়—যে রকম ঢেবা—এ ত পুরুষের কেঁদো আঙ্গুলের জন্যে—দেখি।"

আমার দক্ষিণ হস্তের কড়ি আঙ্গুলে পরাইয়া দিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "ঠিক মাপেরও দেখ্‌ছি। ছেলেপিলের বিষয় ত, ভাব না—বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে দেখ্‌ছি।"

পোষ্ট আফিসের টিকিট, ছাপ, নেকড়া, কৌটা বাহির করিয়া বলিলাম, "এই দেখ, সত্যি কি মিথ্যে।"

গৃহিণীর মুখ হইতে ধ্বনিত হইল, "পোড়ারমুখীটে কে রে—'হৃদয়ের এক বিন্দু রক্ত'—শক্তের হাতে বাছা পড়লে শত বিন্দুতেও ত্রাণ পেত না। ঘন ঘন আজকাল মফঃস্বলে কায—তোমার এ ব্যাপারে—লাজে ম'রে যাই কি রাগে জ্বলে উঠি জানিনে।"

গৃহিণী একবারে শতমুখী, যেন ছেলেবেলার সেই ঝামা ঝির সম্মার্জ্জনীগুচ্ছ!

বলিলাম, "আমার আর এখন কি আছে যে, কোন সুন্দরী আকৃষ্ট হবে—বা ম'রে যাবে—এত দিনে তোমারই মন পেলুম না!"

মুখচন্দ্রমা মেঘাবৃত কি না, ঠিক বুঝা গেল না; কিন্তু দন্তরুচি-কৌমুদীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, "উপায় হচ্ছে কেশাকর্ষণ। পুরুষরা ত এখন প্রায় নেড়া কামান করে—ধরবার কিছু থাকে না; আর ঐ ধেড়ে বুড়ী—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "কিশোরীও ত হ'তে পারে!"

উত্তর হইল, "যেই হোক্, কেশাকর্ষণ হচ্ছে সুপথে আনবার একমাত্র উপায়।"

রহস্য করিবার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য। বলিলাম, "শুনেছি, আকর্ষণ তিন প্রকার—চুম্বকাকর্ষণ—"

"রাখ তোমার ফাজলামি—আদৎ কথাটি কি?"

এমন সময় নারায়ণ সেকরা কতকগুলি গহনা লইয়া উপস্থিত। তাহার হাতে ব্যাগ, ফতুয়ার পকেটে নানা রকমের মালা, ব্রোচ ইত্যাদি।

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "ওহে নারায়ণ, দেখ ত এটা ঝুটা না খাঁটি—পায়রার রক্তের মত না কি ভাল চুণির রঙ, নয় ত ডালিমের কোয়ার মত, নারীর হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে কোন মিল আছে কি?"

শেষ ছত্রটা শুধু গৃহিণীর কর্ণগোচর হইল।

নারায়ণ সেকরা জহুরী লোক। সে বলিল, "তোফা জিনিষ—আজকাল বড়ই বিরল।"

বলিলাম, "ব্যাপারটাই বিরল—তোমার মা'র আঙুলের মাপ নিয়ে এটা ছোট ক'রে দিতে হবে—অচিরাৎ—ঢং বদলাবে না।"

মানবমনোবৃত্তির বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অভ্রান্ত।

গৃহিণীর আননের রেখাগুলি সহসা কোমল হইয়া আসিল। জনান্তিকে তিনি বলিলেন, "তোমার ঢং আজ পঁচিশ বৎসর দেখছি—আমাকে দিলে না কি?"

কণ্ঠস্বর অনুরূপ কোমল।

তেমনই ভাবে, নারায়ণ সেকরার অশ্রাব্যস্বরে বলিলাম, "Transfer of Property আংটার উপর দিয়ে গেলেই বাঁচি।"

উত্তর আসিল, "আমিও বাঁচি।"

শেষ কথা তাঁহারই রহিল। পৃথিবীর শেষ দিনে শেষ উক্তি হইবে স্ত্রীলোকের। কোন শতবর্ষীয়া আমসিরূপিণী নারী নগেন্দ্র-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তাস্ফালন করিয়া বলিবেন, "ভগবান্, দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করা যদি উপযুক্ত ব'লে মনে কর, পুরুষকে চতুষ্পদ বানিও, তা' হ'লে আর আংটী ধারণ ক'রে স্ত্রীজাতিকে পীড়ন করতে পারবে না।"

—কর্পূর।

নবীন সাহিত্যিক ও প্রবীণ সাহিত্যিকের দ্বন্দ্ব!

শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবাত্মার শ্রবণ ও মননের স্বরূপ ও প্রয়োজন

শিষ্য।—গৌতমের মতে আত্মার শ্রবণ ও মনন কিরূপে কর্ত্তব্য, আর উহার প্রয়োজনই বা কি? উহার দ্বারা ত কাহারও আত্মদর্শন জন্মে না।

গুরু।—শ্রুতি বলিয়াছেন, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অর্থাৎ আত্মদর্শনের জন্য প্রথমে আত্মার শ্রবণ, পরে তাহার মনন, পরে তাহার নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। সুতরাং আত্মার শ্রবণ ও মনন না করিলে নিদিধ্যাসনে অধিকারই হয় না। শ্রুতির বিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

গীতা। ১৬। ২৩।

বস্তুতঃ প্রথমে আত্মার শ্রবণ ও মনন না করিলে শ্রুতিবিহিত নিদিধ্যাসন করাই যায় না। কারণ, যেরূপে আত্মার শ্রবণ হইয়াছে, সেইরূপেই তাহার মনন করিয়া, পরে সেইরূপেই তাহার ধ্যানাদি করিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মার যে তত্ত্ব শ্রুত ও মত হইয়াছে, সেই তত্ত্বেরই ধ্যানাদি করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, আত্মার তত্ত্ব কি, ইহা প্রথমে শাস্ত্র হইতে শ্রবণ না করিলে তুমি কিরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিবে? তোমার নিজ-দেহে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তদনুসারে দেহই আত্মা, এইরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিলে কি প্রকৃত আত্মদর্শন হইবে? তাহা হইতে পারে না। সুতরাং আত্মতত্ত্বপ্রকাশক বেদাদি শাস্ত্র হইতেই প্রথমে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণ বলিতে এখানে কর্ণ দ্বারা কোন শব্দশ্রবণ নহে। বেদাদি শব্দপ্রমাণজন্য আত্মার স্বরূপবিষয়ক যথার্থ শাব্দবোধই আত্মার শ্রবণ। তাহাও প্রথমে শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুর উপদেশানুসারেই করিতে হইবে। নচেৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ভ্রম হইতে পারে।

যেমন পূর্ব্বকালে মনের আত্মত্ববাদী কোন ভ্রান্ত নাস্তিক শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও মনই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ দেহাত্মবাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও দেহই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও ইন্দ্রিয়বর্গই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐরূপ কোন বৌদ্ধ শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐরূপ কোন বৌদ্ধ শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও শূন্যই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। "বেদান্তসারে" সদানন্দ যোগীন্দ্রও এই সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন। *

কিন্তু উহার কোন মতই শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। শ্রুতিতে পূর্ব্বপক্ষরূপেও অনেক মতের প্রকাশ হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে নিম্নাধিকারীকে ক্রমশঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে অন্যরূপ উপদেশও করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে সেই সমস্ত অবলম্বন করিয়াই অনেক নাস্তিক নিজ বুদ্ধিমূলক কুতর্কের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নাস্তিকমতের বীজও শ্রুতিতেই আছে। কিন্তু শ্রুতির যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদাদি কোন শাস্ত্র দ্বারা সমস্ত অধিকারীরই প্রথমে সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে যে, আত্মার উৎপত্তি নাই,

---

*। অন্যস্তু চার্ব্বাকঃ, "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ"—(তৈত্তি-উপ দ্বিতীয়বল্লী তৃতীয় অনুবাক) ইত্যাদি শ্রুতের্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাদহং সংকল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি।

অন্যশ্চার্ব্বাকঃ, "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তি-উপ ২।১।১) ইতি শ্রুতের্গৌরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ দেহ আত্মেতি বদতি।

অপরশ্চার্ব্বাকঃ "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" (ছান্দোগ্য-উপ ৫।১।৭) ইত্যাদিশ্রুতেরিন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতি।

বৌদ্ধস্তু "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈত্তি ২।৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাদহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা, ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি।

অপরো বৌদ্ধঃ, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবাদহং সুষুপ্তৌ নাসমিত্যুত্থিতস্য স্বাভাব-পরামর্শ-বিষয়ানুভবাচ্চ শূন্যমাত্মেতি বদতি। বেদান্ত-সার

বিনাশ নাই ; আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য। কারণ, শ্রুতি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—

"ন জীবো ম্রিয়তে" (ছান্দোগ্য ৬।১১।৩) "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ"। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" (কঠ ২।১১।১৮)। উক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
গীতা ২।২০

আবার বলিয়াছেন—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"
গীতা ২।২৪

আত্মার কথনও উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই ; আত্মা শাশ্বত নিত্য, আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ; আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা অচল অর্থাৎ গতি-শূন্য এবং সনাতন।

এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য। কারণ, দেহাদি অচ্ছেদ্য অদাহ্য নহে, সর্ব্বব্যাপী নহে,—গতিহীন নহে। উক্তরূপে বিচার করিয়া শাস্ত্র দ্বারা আত্মার দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহা আত্মার শ্রবণ। সর্ব্বাগ্রে উহাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু উক্তরূপে আত্মার শ্রবণ করিলেও নিজ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। ভারতে অসংখ্য মানব আত্মার নিত্যত্ব শ্রবণ করিলেও এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ "ভগবদ্‌গীতা" পাঠ করিয়া আত্মা—অজর অমর শাশ্বত নিত্য, ইহা বুঝিলেও তাঁহাদিগেরও পূর্ব্ববৎ নিজশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইতেছে এবং তজ্জন্য কুসংস্কারের প্রভাবে তাঁহাদিগেরও পূর্ব্ববৎ নানাবিধ রাগদ্বেষাদির উদ্ভব হইতেছে, মৃত্যুভয়ও জন্মিতেছে। সুতরাং শাস্ত্র দ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য, এইরূপ শ্রবণ করিয়া পরে ঐ শ্রবণরূপ-জ্ঞানজন্য সংস্কারকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত উক্তরূপে আত্মার মনন কর্ত্তব্য। যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিবেচন বা অবধারণই আত্মার মনন। অনুমান-প্রমাণকেই যুক্তি বলে। মীমাংসকসম্মত "অর্থাপত্তি"রূপ যুক্তিও গৌতমের মতে—অনুমানবিশেষ। সুতরাং অনুমান-প্রমাণের দ্বারা—আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদি-সমষ্টিরূপও নহে এবং আত্মা নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহাই আত্মার মনন। পূর্ব্বোক্ত শ্রবণের পরে—উক্ত তত্ত্বের ধারণা বা ধ্যানই মনন নহে। কারণ, উহা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত। কিন্তু মননের পরেই নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে অনুমান-প্রমাণরূপ তর্কের দ্বারাই পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার মনন কর্ত্তব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের "মন্তব্যঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—"পশ্চান্মন্তব্য-স্তর্কতঃ"। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা আত্মা মন্তব্য। কঠোপনিষদে যে আত্মাকে "অতর্ক্য" বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—তাহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর বলিয়াছেন যে (১)—নিজ বুদ্ধিমূলক উহ-রূপ কেবল তর্কের দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। কারণ, কুতর্কের কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা নাই। বেদান্ত-দর্শনে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি (২।১।১১) সূত্রে বাদরায়ণও শাস্ত্রনিরপেক্ষ নিজ বুদ্ধিমূলক কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন, তিনি তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলেন নাই। কারণ, তাহা বলা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর সেখানে পরে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, তর্ক যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহাও যখন তর্ক দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তখন সেই তর্ককে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত তর্ক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কখনই বলা যায় না। বস্তুতঃ শাস্ত্রে অনুমান-প্রমাণও "তর্ক" নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার মননের জন্য ঐ অনুমান-প্রমাণরূপ তর্ক এবং তাহার সহকারী অন্যরূপ তর্কও অবশ্য গ্রাহ্য। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, (২) বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তার

---

(১) অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কুতর্কস্য প্রতিষ্ঠা ক্বচিদ্ বিদ্যতে। "নৈষা তর্কেণ" স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহমাত্রেণ। কঠ। ১ অঃ ২ বল্লী, ৮।৯ শাঙ্করভাষ্য।

(২) সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণ-দার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্য্যতে। শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি "শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইতি শ্রুতিঃ "পণ্ডিতো মেধাবী গান্ধারানেবোপসংপদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২) ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনো দর্শয়তি। শারীরক-ভাষ্য।

জন্য বেদান্তবাক্যের অবিরোধী অনুমান-প্রমাণও গ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের এই কথায় অনুমান-প্রমাণরূপ তর্ক দ্বারাই যে আত্মার মনন কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়। "ভামতী" টীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তির দ্বারা বিবেচনকেই মনন বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকভাষ্যে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য শঙ্করও পরে "ন্যায়াচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বসাধক "ন্যায়" অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায়-দর্শন অধ্যাত্ম অংশে মননশাস্ত্র। তাই তিনি ন্যায়-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রুতি-বিহিত পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মমননের জন্য অনুমান-প্রমাণরূপ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা মন নহে, সুতরাং আত্মা ঐ দেহাদি সমষ্টিরূপও নহে এবং আত্মা অনাদি, নিত্য, ইহা তিনি বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার কথিত ও সূচিত সেই সমস্ত যুক্তিও যথাসম্ভব বলিতেছি।

ইন্দ্রিয় আত্মা নহে

সুপ্রাচীনকালে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়াত্ম-বাদেরই প্রকাশ হইয়াছিল। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় উক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

"দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ"। ৩।১।১

অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা একই ব্যক্তির এক পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ায় আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, আমি কোন দ্রব্যকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার স্বাচপ্রত্যক্ষ করিলে পরে আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এই দ্রব্যকে দেখিয়াছি, সেই আমিই—ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্তস্থলে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় যথাক্রমে পূর্ব্বজাত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে; কিন্তু তদ্ভিন্ন কোন একটি পদার্থই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা। সুতরাং সেই পদার্থই আত্মা। কারণ, যে পদার্থ জ্ঞাতা অর্থাৎ আশ্রয়, তাহাই আত্মা।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞানের আশ্রয়কেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য। ঐ চৈতন্য থাকা কালেই জীবাত্মা চেতন। জীবাত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নহে। কিন্তু জন্যচৈতন্য অর্থাৎ জন্য-জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতা। "জ্ঞাতৃ" শব্দের দ্বারাও জ্ঞানের আশ্রয়ই বুঝা যায়। জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের কর্তৃত্ব। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিতে হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই দর্শনজ্ঞানের কর্ত্তা এবং ত্বগিন্দ্রিয়কেই স্বাচপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের কর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে পরে এক আমিই যে পূর্ব্বোক্ত উভয় জ্ঞানের কর্ত্তা, এইরূপ বোধ হইতে পারে না। ঐরূপ বোধ যে আমাদিগের ভ্রম, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। পরন্তু আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করিতেছি, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বাচ-প্রত্যক্ষ করিতেছি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে আমাদিগের যে ঐ সমস্ত জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্দ্বারাও বুঝা যায় যে, আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, করণ হইতে কর্ত্তা ভিন্ন পদার্থ। নচেৎ চক্ষু আমি দেখিতেছি, কর্ণ আমি শুনিতেছি, এইরূপে আমার দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না কেন? বিবক্ষা বশতঃ কখনও চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ হইলেও ঐরূপে কাহারও দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। আমি কাণ, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপে যে বোধ হয়, তদ্দ্বারাও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই যে আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, আমার চক্ষু কাণ বা অন্ধ, আমার কর্ণ বধির, এইরূপও বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার চক্ষু কাণ বা অন্ধ, এইরূপ অর্থেই সেই ব্যক্তিতে "কাণ" বা "অন্ধ" শব্দের প্রয়োগ এবং আমি কাণ বা অন্ধ এইরূপ বোধ হয়, ইহা বলা যায়। কাহারও নিজের আত্মাতেই কাণত্বাদির ভ্রমাত্মক বোধ হইলেও তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না।

কোন বহিরিন্দ্রিয়কেই যে আত্মা বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে মূল যুক্তি বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-নিয়ম আছে। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে গন্ধই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং রসই রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় এবং স্পর্শই ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়

এবং শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। পূর্ব্বোক্ত গন্ধাদি সমস্ত বিষয়ই কোন এক বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নহে। সুতরাং ঘ্রাণাদিসর্ব্বেন্দ্রিয় অথবা উহার মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয় সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যে আমি গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, সেই আমিই যে রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিতেছি, ইহা আমি মনের দ্বারাই বুঝিতেছি। সকলেরই উক্তরূপে ঐ সমস্ত জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তদ্দ্বারা কোন একই পদার্থ যে ঐ গন্ধাদি সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আত্মা যে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ই সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না।

মহর্ষি গোতম পরে আরও বলিয়াছেন,—

সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ৩।১।৭।

অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদি দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষুর দ্বারা কাহাকে দর্শন করে, তাহা হইলে পরে তাহার ঐ বাম চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেও দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও তাহাকে "সোঽয়ং" অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তি এই, এইরূপে দর্শন করে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে "প্রত্যভিজ্ঞা" বলে। কিন্তু উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির স্মরণ ব্যতীত ঐরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে সংস্কার ব্যতীতও তাহার স্মরণ হইতে পারে না। পূর্ব্বে কখনও সেই ব্যক্তির দর্শনরূপ অনুভব না জন্মিলেও তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা বলিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই বাম চক্ষুই তাহার সেই ব্যক্তির প্রথম দর্শনের কর্ত্তা আত্মা, ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহার সেই বাম চক্ষুতেই সেই দর্শনরূপ অনুভব জন্য সংস্কার জন্মিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত স্থলে তাহার সেই বাম চক্ষুই তাহাকে পূর্ব্বজাত সংস্কারবশতঃ স্মরণ করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু তাহাকে স্মরণ করিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু যখন তাহার সেই বাম চক্ষু বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তি দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিকে "সোঽয়ং"—এইরূপে প্রত্যক্ষ করে, তখন তাহার সেই বাম চক্ষু পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির দ্রষ্টা নহে, সুতরাং স্মর্ত্তাও নহে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, ইহাও স্বীকার্য্য।

যদি বলা যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ একই। একই চক্ষুরিন্দ্রিয় বাম ও দক্ষিণ চক্ষুর্গোলকে অবস্থিত থাকে। সুতরাং কাহারও বাম চক্ষুর বিনাশ হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিলেও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি উহা অস্বীকার করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় এক, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা গোতমের সূত্র দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও যাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়, যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা হইলে উহাই দ্রষ্টা বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু দ্রষ্টা বিনষ্ট হইলে তাহার দৃষ্টবস্তু আর কেহই স্মরণ করিতে পারে না। অতএব সেই ব্যক্তির অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই যে তখন তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ করে, ইহাও বলা যায় না। এইরূপ অন্য কোন ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও পরে তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু কাহারও কোন ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তি যে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করে, ইহা নির্বিবাদ সত্য। যিনি বৃদ্ধকালে অন্ধ হইয়াছেন, তিনিও তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট কত ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কত বার্ত্তা বলিতেছেন, কিন্তু বল দেখি, সেখানে তাঁহার ঐ স্মরণের কর্ত্তা কে? তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই দ্রষ্টা বলিলে, তাহাকেই ত সেখানে স্মরণের কর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব দর্শনাদি জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কারবশতঃ স্মরণের কর্ত্তা যে ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু উহা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য।

মহর্ষি গোতম উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে—পরে আরও বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ ৩।১।১২।

তাৎপর্য্য এই যে, কোন অম্লরসবিশিষ্ট ফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ হইলে তখন কাহারও রসনেন্দ্রিয়ের বিকার জন্মে

অর্থাৎ জিহ্বায় জলের আবির্ভাব হয়। কেন ঐরূপ হয়? উক্ত স্থলে কেন তাহার জিহ্বা জলার্দ্র হয়? ইহা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তখন তাহার সেই পূর্ব্বানুভূত অম্ল-রসের স্মরণ হওয়ায় তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষরূপ লোভ জন্মে। নচেৎ তাহার ঐরূপ হইতে পারে না। কারণ, যাহার তখন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ জন্মে না, তাহার সেই ফল দেখিলেও ঐরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু যাহার সেই ফলের রসাস্বাদে লোভ জন্মে, তাহার পূর্ব্বানুভূত তজ্জাতীয় রসের স্মরণ আবশ্যক। নচেৎ তাহার তদ্‌বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই অম্লরসের স্মরণকর্তা কে? ইহা বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সেখানে সেই অম্লরসের স্মরণ করে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় কখনও অম্লরসের অনুভব করে নাই। অম্লরস চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয়ই উক্ত স্থলে পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয় সেই ফলের রূপ দর্শনও করে নাই—গন্ধ গ্রহণও করে নাই; রূপ বা গন্ধ তাহার গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। কিন্তু যে ঐ অম্লফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করে, তাহারই সেখানে পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ হওয়ায় রসনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ বিকার হইতে পারে এবং কাহারও তাহা হইয়া থাকে। অন্যের ঐরূপ হয় না। অতএব প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত স্থলে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই সেই অম্লফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়। সেই পদার্থই আত্মা।

কেহ যদি বলেন যে, স্মরণীয় বিষয়েই স্মৃতি জন্মে। আত্মা স্মরণীয় বিষয় নহে। সুতরাং তাহাতে কোন স্মৃতি জন্মে না। অতএব স্মৃতির দ্বারা অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই উক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

তদাত্ম-গুণত্বসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ ॥ ৩।১।১৪

তাৎপর্য্য এই যে, স্মৃতি জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং উহা গুণ-পদার্থ। কিন্তু উহা আত্মার গুণ হইলেই উহার উপপত্তি হয়,—নচেৎ উহার উপপত্তিই হয় না। অর্থাৎ স্মৃতিরূপ গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য না থাকিলে স্মৃতি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু চিরস্থায়ী আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই স্মৃতির আশ্রয় বা আধার বলা যায় না। স্মরণীয় বিষয়কে স্মৃতির আধার বলা যায় না। কারণ, বিনষ্ট বিষয়েও স্মৃতি জন্মিতেছে। সুতরাং তাহা স্মৃতির আধার কিরূপে হইবে? যাহা বিনষ্ট, যাহা নাই, তাহা কখনই উহার আধার হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ই ভিন্ন ভিন্ন অনুভব জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির আধার হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস হইলেও তদ্দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয়ের স্মৃতি জন্মে। বিনষ্ট ইন্দ্রিয় কখনই সেই স্মৃতির আধার হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

দেহও আত্মা নহে

নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক বলিয়াছেন যে, দেহই স্মৃতির আধার। কারণ, দেহই আত্মা, দেহই স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, বাল্য যৌবনাদিভেদে দেহেরও ভেদ হয়। আমার বাল্যকালে যে শরীর ছিল, এই বৃদ্ধ-কালে সেই শরীর নাই। শরীরের পরিমাণভেদপ্রযুক্তও শরীরের ভেদ স্বীকার্য্য। সুতরাং অন্যান্য পরমাণুর সংযোগে আমার যে পৃথক্ শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রাচ্য-সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমি আমার বাল্যকালে দৃষ্ট কত বিষয় এখনও কেন স্মরণ করিতেছি? আমি কে? এই দেহই আমি হইলে বৃদ্ধকালীন এই দেহ কখনই তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ বাল্যকালে না থাকায় ইহা তখন সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে নাই। সুতরাং তজ্জন্য কোন সংস্কারও এই দেহে নাই। যদি বল যে, আমার বাল্যকালীন সেই শরীরে তৎকালে সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন জন্য যে সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহাই আমার এই দেহে সংক্রান্ত হওয়ায় তজ্জন্যই আমার এই ভিন্ন দেহরূপ আত্মাও সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের গতিক্রিয়া না থাকায় তাহার এক দেহ হইতে অন্য দেহে গতিবিশেষরূপ সংক্রম হইতে পারে না। আর তাহা হইলে মাতার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরেও মাতার শরীরস্থ সংস্কার সংক্রান্ত হয় না কেন? সেই

শিশু পরে তাহার মাতার অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করে না কেন? যদি বল, উপাদান-কারণ যে শরীর, তদ্‌গত সংস্কারই তাহার কার্য্যরূপ অন্য শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহাই নিয়ম। মাতার শরীর তাহার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরের উপাদান-কারণ নহে। কিন্তু ইহা বলিলে বাল্যকালীন শরীরস্থ সংস্কারও বৃদ্ধকালীন শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে না। কারণ, বাল্যকালীন সেই শরীর বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হওয়ায় তাহা কখনই বৃদ্ধকালীন শরীরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। যদি বল, বৃদ্ধকালীন শরীরে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপত্তিই হইয়া থাকে, উহাই সংস্কারের সংক্রম। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপাদক কারণ নাই। বৃদ্ধকালীন দেহ সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন না করায় তাহাতে তদ্বিষয়ে অন্য সংস্কারও জন্মিতে পারে না। যে যাহা কখনও অনুভব করে নাই, তাহাতে কোন কারণেই সে বিষয়ে সংস্কার জন্মে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। অতএব স্মৃতি দেহেরই গুণ, দেহই আত্মা, ইহাও কখনই বলা যায় না।

চৈতন্য বা জ্ঞান যে শরীরের বিশেষ গুণ নহে অর্থাৎ শরীরই জ্ঞাতা বা আত্মা নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

"যাবচ্ছরীরভাবিত্বাদ্রূপাদীনাম্"। (৩।২।৪৭)।

তাৎপর্য্য এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত শরীর বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ-গুলিও বিদ্যমান থাকে। অতএব জ্ঞান শরীরের বিশেষ গুণ হইলে উহাও রূপাদির ন্যায় শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু তাহা থাকে না। শরীর বিদ্যমান থাকিলেও অনেক সময়ে কোন জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং জ্ঞান শরীরের বিশেষ গুণ নহে। বলিতে পার যে, শরীরের সমস্ত বিশেষগুণই যে রূপাদির ন্যায় শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, এইরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই, শরীরের সমস্ত বিশেষগুণই ত একজাতীয় নহে। সুতরাং শরীরে অস্থায়ী বিশেষগুণও থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা বলিলেও জ্ঞান যে শরীরেরই বিশেষগুণ, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তাই মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

"শরীরব্যাপিত্বাৎ।" ৩।২।৫০।

অর্থাৎ জ্ঞান শরীরব্যাপী, শরীরের সর্ব্বাংশেই জ্ঞান জন্মে। অতএব জ্ঞান শরীরেরই বিশেষগুণ, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত অবয়বেই যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সেই সমস্ত অবয়বকেই জ্ঞানের আধার বলিলে প্রত্যেক শরীরেই ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্ঞাতা বা আত্মা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমার হস্তপদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, ইহা নিষ্প্রমাণ। পরন্তু এক আমিই যে আমার সমস্ত জ্ঞানের আধার আত্মা, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। কারণ, যে আমি হস্ত দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, সেই আমিই চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি, কর্ণ দ্বারা তোমার কথা শুনিতেছি, ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। প্রত্যেক শরীরেই যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কর্ত্তা বহু আত্মা, ইহা সকলেরই অনুভববিরুদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক শরীরেই বহু আত্মা স্বীকার করিলে সর্ব্বকার্য্যে সকলের ঐকমত্য কখনই সম্ভব না হওয়ায় কোন আত্মারই সর্ব্ব-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। পরন্তু অনেক সময়ে সকলের বৈমত্যমূলক বিরোধবশতঃ বহু অনর্থপাতেরও আপত্তি হয়। পরন্তু শরীরের প্রত্যেক অবয়বই জ্ঞাতা হইলে কোন ব্যক্তি যখন তোমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তখন তাহার সেই হস্তেই ত্বাচপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কার জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পরে কখনও সেই ব্যক্তির সেই হস্ত ছিন্ন হইলেও—সে ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে স্মরণ করে? তাহার সেই পূর্ব্বোৎপন্ন প্রত্যক্ষের কর্ত্তা সেই হস্ত ত তখন তাহার নাই। তাহার সেই হস্তস্থিত সেই সংস্কার যে, তাহার অন্য কোন অবয়বে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পরন্তু শরীরেই চৈতন্য বা জ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে সেই শরীর-নির্ব্বাহক মূল-পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মূল-পরমাণুতে চৈতন্য না থাকিলে তাহার কার্য্যরূপ শরীরে চৈতন্য জন্মিতে পারে না। কারণ, চৈতন্য বিশেষগুণ। উপাদানকারণে যে বিশেষগুণ থাকে, তাহাই তাহার কার্য্যদ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের সাক্ষাৎ উপাদান-কারণ হস্ত-পদাদির ন্যায় তাহার মূল-পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই মূল-পরমাণুতে কিরূপে চৈতন্য জন্মিবে? তাহার ত কোন কারণই নাই। পরন্তু পরমাণুতে চৈতন্য স্বীকার

করিলে ঘটপটাদি সমস্ত জড়বস্তুকেও চেতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকও তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং শরীরেই চৈতন্য জন্মে, শরীরই জ্ঞাতা আত্মা, ইহা কিছুতেই বলা যায় না।

নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থ মানেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় পরমাণু নাই; কিন্তু তিনি ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভূত স্বীকার করিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম অংশ অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। সেই সমস্ত সূক্ষ্ম অংশই তাঁহার মতে পরমাণু। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন গুড় ও তণ্ডুলে মাদকত্ব না থাকিলেও ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যে মাদকত্ব জন্মে, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম চতুর্ভূতে চৈতন্য না থাকিলেও তাহাদিগের বিলক্ষণ সংযোগে উৎপন্ন শরীরে চৈতন্য জন্মে। কিন্তু চার্ব্বাকের এই কথাও অগ্রাহ্য। কারণ, গুড় ও তণ্ডুলে একেবারেই মদশক্তি বা মাদকত্ব না থাকিলে ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মদ্যে কখনই মাদকত্ব জন্মিতে পারে না। তাহা হইলে যে কোন উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই মদ্যের ন্যায় মাদক কেন হয় না? এবং চার্ব্বাকের মতে ঘটপটাদি দ্রব্যেও প্রাণ ও চৈতন্য জন্মে না কেন? ফল কথা, চৈতন্য বা জ্ঞানকে শরীরের গুণ বলিতে হইলে শরীরের হস্তপদাদি প্রত্যেক অবয়ব এবং তাহার মূল পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না; সুতরাং স্মৃতি নামক জ্ঞান যে শরীরের গুণ, ইহাও বলা যায় না। পরন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপানাদিতে ইচ্ছার কারণ যে স্মৃতিবিশেষ, তাহা তাহার সেই শরীরে তখন জন্মিতে পারে না। কারণ, তৎপূর্ব্বে তাহার সেই শরীর কখনও স্তন্যপানাদিকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করে নাই। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফল কথা, দেহও আত্মা নহে।

মনও আত্মা নহে

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা চিরস্থায়ী মনের আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, মনেরই গুণ, মনই জ্ঞাতা, ইহা বলা যায়। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন—

জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। ৩।১।১৬।

তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা, তাহার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ আছে। নচেৎ তাহার কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞাতার সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও কোন করণ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহারই নাম মন। সুতরাং উহা জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। কারণ, কর্ত্তা ও করণ ভিন্ন পদার্থ। তবে যদি জ্ঞাতাকে মন বলিয়া উহার সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণ পৃথক্ কোন অন্তরিন্দ্রিয় অন্য নামে স্বীকার কর, তাহা হইলে নামভেদমাত্রই হইবে, পদার্থের কোন ভেদ হইবে না। কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগের কর্ত্তা এবং উহার করণ পৃথক্‌রূপে স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণরূপে যে অন্তরিন্দ্রিয় মন নামে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞাতা বলা যাইবে না। কারণ, উহা করণরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষেই করণ আছে, কিন্তু সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষে কোন করণ নাই। সুতরাং মনকে জ্ঞানের কর্ত্তাই বলিব। এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

"নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ"। (৩।১।১৭)।

তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, এইরূপ নিয়ম নিষ্প্রমাণ। পরন্তু আমাদিগের বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষেরও অবশ্য কোন করণ আছে, ইহাই অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। সেই করণই "মন" নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহাকে জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহা জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না। পরন্তু আমি চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন চক্ষুরাদি করণকে জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়, তদ্রূপ আমি মনের দ্বারা সুখবোধ করিতেছি, দুঃখবোধ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা মনকেও জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং মন জ্ঞাতা নহে অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে।

পরন্তু এখানে ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম

ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুখ-দুঃখাদি মনের গুণ বা ধর্ম্ম হইলে ঐ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্মপদার্থগত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। পরমাণুগত রূপাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ার জন্য-প্রত্যক্ষে মহৎ-পরিমাণ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মনে সেই মহৎ-পরিমাণ নাই। যদি বলা যায় যে, বাহ্যবিষয়ের জন্য-প্রত্যক্ষেই মহৎ-পরিমাণ কারণ, কিন্তু এইরূপ নিয়মেও কোন প্রমাণ নাই। মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত "নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ" এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন বুঝা যায়। পরন্তু অতি সূক্ষ্ম মন সর্ব্বদা শরীরের সর্ব্বত্র না থাকায় উহাকে জ্ঞাতা বলাই যায় না। কারণ, শরীরের সর্ব্বত্রই জ্ঞাতার জ্ঞান জন্মে। প্রবল শীতার্ত্ত ব্যক্তি সর্ব্ব-শরীরেই শীতানুভব করে। সুতরাং শরীরের সর্ব্বত্রই জ্ঞাতার সত্তা স্বীকার্য্য। আত্মা বহিরিন্দ্রিয় এবং দেহ ও মন হইতে ভিন্ন পদার্থ হইলে আত্মা যে দেহাদি-সমষ্টিরূপও হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। আত্মা অনাদি ও নিত্য, ইহা বুঝিলে আত্মা যে দেহাদিভিন্ন বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, ইহাও বুঝিতে পারিবে। অতঃপর আত্মার নিত্যত্বসাধক যুক্তি বলিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

বিপদে মা

ভাঙ্গন গাঙ্গের মাঝ্‌খানেতে
সাধের তরী বাধ্‌লো চরে,
দিনের আলোয় যেতে হবে
অনেক দূরে খেয়ার পারে।
নাইক দাঁড়ী নাইক মাঝি,
নায়ের মাঝে একাই আছি;
আকুল হয়ে ভাবছি শুধু,
কেমন ক'রে যাব পারে।
ওই নয়নের বহুদূরে—
তীরের পারে সবুজ রেখা,
আব্‌ছায়াতে গাছের আড়ে
দেবীর দেউল যাচ্ছে দেখা।
পিছনে তার বিরাট কাল
প্রলয়-মেঘে ঢাকল আলো,
বরষা এল মুষল ধারায়,
চিকুর হানে মাথার পরে।
বৃষ্টি সাথে কুজ্ঝটিকায়
উছ্‌লে এল নদীর বান,
মনে হ'ল এইবারে শেষ
নাই বুঝি আর পরিত্রাণ!
আতঙ্কে প্রাণ আকুল হ'ল
জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে,
নয়ন মুদে আবেগভরে
ডাকছি তাঁরে আপন মনে।

এমন সময় হঠাৎ যেন
প্রবল বেগে দম্‌কা হাওয়ায়,
ধাক্কা খেয়ে ভাস্‌লো তরী
স্রোতের সাথে চল্‌লো কোথায়!
চেতন-হারা স্তব্ধ পরাণ,
দণ্ড পলের নাই ঠিকানা,
কত সময় কেমন ক'রে
কেটেছে তার নাইক জানা।
স্বপন্‌-ঘোরে বাজ্‌ছে কাণে
শঙ্খ-নিনাদ আরতি-তান,
চুয়া-চন্দন-কুসুমবাসে
বিভোর যেন হতেছে প্রাণ।
ঐ কি মায়ের আঙ্গিনা হেরি
মুক্ত রয়েছে মন্দির-দ্বার,
ফুল-চন্দনে দেহ চর্চ্চিত
রাগ-রঞ্জিত চরণ তাঁর।
ঐ যে সাজান পূজা-সম্ভার,
ধূপের গন্ধে পূরিত ধরা,
জ্যোতি-মাঝারে ঐ যে মূরতি;
মুণ্ডমালিনী বরাভয়করা।
করুণাময়ী ত্রিতাপহারিণী,
এত দয়া যদি সন্তান 'পরে;
শান্ত শীতল পদচ্ছায়া হ'তে,
আর যেন মাতঃ রেখ না দূরে।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হৃদয়ের পিপাসা

মোহান্ত যে কামরায় গিয়া উঠিলেন, তাহাতে এক ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি বসিয়া ছিল, সে আর কেহ নহে, সে মোহান্তের মোসাহেব, নিত্য-সহচর, তাঁহার সর্ব্ববিধ কুকর্ম্মের সহায়, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুত মাণিকলাল ঘোষ। সেও কেদারেশ্বর হইতে নৈহাটি হইয়া মোহান্তেরই সঙ্গে আসিয়াছিল, রিজার্ভ কামরা খুঁজিয়া মালপত্র তাহাতে তুলিবার ভার তাহারই উপর ছিল। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, মোহান্ত মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় সে বসিয়াছিল।

মোহান্ত প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জিনিষপত্র সব উঠেছে ত? কিছু ফেলেটেলে আসনি?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে না, সব তুলেছি। গুণে নিয়ে তার পর কুলীদের বিদেয় করেছি।"

বেঞ্চির তলায়, বাক্সের উপর মোহান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সেই ইয়ে বাক্সটা ত দেখতে পাচ্ছিনে? ফেলে এলে না কি?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে না,—সেটা ঐ গোসলখানার ভিতর রেখেছি। আর যা হারাই, কিন্তু সে বাক্স কি হারাতে পারি হুজুর?"—বলিয়া মাণিক সবিনয়ে ঈষৎ হাস্য করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "গোটা কতক সোডা আর কিছু বরফ নিয়ে রাখতে বলেছিলাম যে, ভুলে গেছ বোধ হয়?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে না, তাও ভুলি নি। চার বোতল সোডা, এক সের বরফ নিয়ে রেখেছি। সে সবও ঐ গোসলখানায় আছে।"

"মোটে চার বোতল!"

"আজ্ঞে, সোডাওয়ালা এই ট্রেণেই আছে, হুকুম করলেই আবার দিয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, তা বটে।"—বলিয়া মোহান্ত গোসলখানার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন, সেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঠের বাক্সটি রহিয়াছে এবং তাহার কোলে, চারি বোতল সোডা শয়ন করিয়া আছে। কম্বল-আসনে জড়ানো বরফও রহিয়াছে।

মোহান্ত গোসলখানার দ্বারটি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বড় ভুল হয়ে গেল। দীনে বেটাকে এই কামরায় উঠতে বল্লেই হ'ত। আমারই না হয় মাথার ঠিক ছিল না, তোমার ত এ সব দেখা উচিত। এখন বিছানা-টিছানাগুলো খুলেই বা পেতে দেয় কে? পেগ-টেগই বা দেয় কে, তামাক-টামাক—"

মাণিক বাধা দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ওটা আমার ভুলই হয়ে গেছে, হুজুর। কিন্তু এও নিবেদন পাই, দীনে ব্যাটা না-ই রইল, এই মাণ্‌কে বেটা হাজির থাকতে হুজুরের কোনও কষ্ট হবে না।"—বলিয়া মোসাহেবোচিত বিনয়ের সহিত মাণিক দন্তবিকাশ করিল। তার পর বিছানার বাণ্ডিল খুলিতে উদ্যত হইল।

মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ওহে, রও রও। বিছানা পরে ক'রে দিও এখন। আগে একটা পেগ ঢালো দেখি।"

"বরফ দেবো কি?"

"খুব ছোট টুকরো।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া বিছানার বাণ্ডিল ছাড়িয়া মাণিক গোসলখানায় প্রবেশ করিল। বাক্স খুলিয়া বোতল বাহির করিয়া, সুরা ঢালিয়া আনিয়া মোহান্তের হাতে দিল।

মোহান্ত তিন চুমুক পান করিয়া বলিলেন, "কৈ, তুমি একটু নিলে না?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে, সে হবে এখন। আগে হুজুরের বিছানা ক'রে দিই, তামাক সাজি, হুজুর আরাম ক'রে বসুন, তার পর আমি প্রসাদ পাব এখন—হেঁ হেঁ।"

শয্যা প্রস্তুত করিয়া মাণিক বলিল, "বসুন হুজুর, আমি তামাকটা সেজে আনি।"

নিজ পরিচ্ছদের প্রতি চাহিয়া মোহান্ত বলিলেন, "তামাক সেজো এখন। এগুলো এবার ছেড়ে ফেলি, কি বল? সুট-কেশের চাবিটা দীনের কাছেই আছে বোধ হয়?"

"আজ্ঞে না হুজুর, চাবি আমি তার কাছ থেকে চেয়ে রেখেছি। আপনার কাপড় বের করি।"—বলিয়া মাণিক সুটকেশ খুলিয়া একখানি কোঁচান চুলপাড় ফরাসডাঙ্গার ধুতি, একটি সিল্কের গেঞ্জি এবং গিলা-করা একটি আদ্দির পঞ্জাবী বাহির করিল। মোহান্ত ইতিমধ্যে গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া, সাবান-জলে মুখ-হাত পরিষ্কার করিয়া আসিলেন। তখন মাণিক তাঁহার গেরুয়া আলখাল্লা, বহির্বাস প্রভৃতি ছাড়াইয়া লইয়া এই বস্ত্রগুলি তাঁহাকে পরাইয়া দিল। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া, মোহান্ত পুনরায় গোসলখানায় গিয়া উত্তমরূপে কেশ-সংস্কার করিলেন। তার পর মুখ ও হস্তদ্বয় উত্তমরূপে পাউডার-চর্চ্চিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাণিক তখন তাঁহার গেরুয়াগুলি গুছাইয়া বাক্স-জাত করিতেছিল। বিছানায় বসিয়া মোহান্ত বলিলেন, "এখন আমায় কেমন দেখাচ্চে বল দেখি?"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "নবীনো নাগরো নটবরশেখরোর মত দেখাচ্ছে।"

মোহান্ত বলিলেন, "রমণীমোহনোর মত দেখাচ্ছে না?"

মাণিক বলিল, "রমণী ত ছেলেমানুষ, রমণীর বাবা ও রূপ দেখলে মোহিত হয়ে যাবে, হুজুর। আমি তামাকটা সেজে আনি।"

মোহান্ত বলিলেন, "তামাক ত সাজবে। এ দিকে গেলাস যে খালি, তা হুঁস আছে?"

"ওঃ, তাই ত!"—বলিয়া মাণিক গ্লাস লইয়া গেল এবং পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিয়া, রূপার ফর্সি হস্তে আবার গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

তামাক সাজিয়া আনিয়া মোহান্তের হস্তে নল দিয়া মাঝের বেঞ্চখানিতে মাণিক উপবেশন করিল। মোহান্ত আদেশ করিলেন, "আর একটা গেলাস বের কর।"

বেঞ্চির তলায় বেতের বাক্স ছিল, উহা খুলিয়া মাণিক একটি গ্লাস বাহির করিল। "নাও, ধর।"—বলিয়া মোহান্ত নিজ গ্লাস হইতে খানিকটা "পানীয়" তাহার গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "প্রসাদ পাও।" মাণিক গ্লাসটি ভক্তিভাবে মস্তকে স্পর্শ করাইয়া এক নিশ্বাসে সমস্তটুকু পান করিয়া ফেলিল। গ্লাস রাখিয়া বলিল, "হুজুর, এখন সেই সব কথাগুলো স্থির ক'রে ফেল্লে ভাল হয়।"

"কোন্ কথাগুলো?"

"এই, কাশীতে পৌঁছে, কি-রকম কি-সব করা যাবে।"

মোহান্ত বলিলেন, "কাশীতে পৌঁছে আমি আর কেদারেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ নই—আমি উত্তরবঙ্গের জমীদার প্রমদারঞ্জন রায়।"

মাণিক বলিল, "জমীদার শুনলে কিঞ্চিৎ মোটা রকম প্রাপ্তির আশায় কাশীর পাণ্ডারা কিন্তু ভারী ঝামেলা বাধাবে, হুজুর। তার চেয়ে—"

"তার চেয়ে কি, বল!"

"যদি বলা যায়, হুজুর কলকেতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি, রায়। পাণ্ডারা মনে করবে, বিলাত-ফেরত, হয় ত খৃষ্টান,—আর তারা কাছেই ঘেঁসবে না।"

মোহান্ত বলিলেন, "কিন্তু এই পোষাকে ব্যারিষ্টার বল্লে কি চলবে?"

"খুব চলবে হুজুর! আজকাল স্বদেশীর যুগ কি না, হুজুর। বড় বড় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টাররা দিব্যি ধুতি-চাদর পোরে সভায় যাচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন। বাড়ীতেও ত কত ব্যারিষ্টারকে দেখেছি, হাইকোর্ট থেকে ফিরে এসে কোট-পাৎলুন ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পোরে ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন।"

মোহান্ত বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ, তবে আমি পি, রায় ব্যারিষ্টারই হলাম।"—বলিয়া তিনি ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। তার পর গ্লাসটি শেষ করিয়া বলিলেন, "এবার গাড়ী কোথায় দাঁড়াবে হে?"

খোলা টাইম টেবলখানি বেঞ্চির উপর উপুড় করা ছিল। মাণিক উহা তুলিয়া লইয়া বলিল, "বর্দ্ধমান।"

মোহান্ত বলিলেন, "বর্দ্ধমান? বড় ইষ্টিশান। একটু বেশীক্ষণ দাঁড়াবে বোধ হয়?"

মাণিক দেখিয়া বলিল, "কুড়ি মিনিট।"

"আচ্ছা, বর্দ্ধমানে আমি একবার নেমে প্লাটফর্ম্মে পাইচারি করবো। আর একটু ঢালো দেখি।"

মাণিক ক্ষিপ্রহস্তে আদেশ প্রতিপালন করিল। মোহান্ত কিঞ্চিৎ পান করিয়া গেলাস নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "বর্দ্ধমানে কেন একবার আমি নাম্‌বো, জান মাণিক?"—ও লাইনের গাড়ী হইতেই পেগ আরম্ভ হইয়াছিল। মোহান্তের বেশ নেশা হইয়াছে, কথা জড়াইয়া আসিয়াছে।

মাণিক বলিল, "না হুজুর, তা ত জানি নে।"

মোহান্ত কাতরভাবে বলিলেন, "তাকে আমি একটিবার দেখ্‌বো, মাণিক। ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে-কামরায় সে আছে। সেই গাড়ীর সামনে আমি একটু পায়চারি ক'রে বেড়াবো, সেই মুখখানি একবার দেখ্‌বো। কত দিন দেখি নি! প্রায় ছ'মাস হ'তে চল্ল মাণিক, তাকে আমি দেখি নি। একবার দেখ্‌বো,—একবার শুধু চোখের দেখা দেখ্‌বো।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু হুজুর, সে যদি আপনাকে দেখে চিনে ফেলে! ভয় পাবে হয় ত!"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্লাসের বাকী মদ্যটুকু নিঃশেষ করিয়া, অশ্রুগদ্‌গদ স্বরে মাতাল বলিল, "না মাণিক, আমার এ বেশে কখনোই আমাকে সে চিন্‌তে পারবে না। আমি দূর থেকে তাকে দেখবো—চন্দ্র যেমন কুমুদিনীকে দূর থেকে দেখে, সেই রকম আমি তাকে দেখ্‌বো। উঃ—দারুণ পিপাসা—দারুণ পিপাসা!"

মাণিক মিনতির স্বরে বলিল, "এখন আর খাবেন না হুজুর।"

মোহান্ত বলিলেন, "ধেৎ, আমি কি মদ চাচ্চি? সে পিপাসা নয় মাণিক; সে পিপাসা নয়! হৃদয়ের পিপাসা।"—বলিয়া মোহান্ত বক্ষে হস্তস্থাপন করিলেন।

মাণিক বলিল, "সে ত বুঝলাম হুজুর! সে আপনারই ত রইল, এখন শুধু চোখের দেখা দেখে ফল কি বলুন!"

মোহান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 'চন্দ্রশেখর' কোট করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী!"—বলিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।

মাণিক মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসী ত আমিই বটে!"

ট্রেণ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে লাগিল। মোহান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুলিতে লাগিলেন। মাণিক হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিল, "এখন নামবেন না হুজুর, আপনার পায়ে ধরি। আপনার পা টলছে, হয় ত প'ড়ে যাবেন। আমি তাকে এই কামরায় এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি স্থির হয়ে একটু বসুন, আমি নামি, নেমে তার ব্যবস্থা করি।"

মোহান্ত ধপাস করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দেখাবে?"

"দেখাব বৈ কি হুজুর। তবে একটু কৌশল কর্‌তে হবে।"

মোহান্ত সবলে মাণিকের হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি কৌশল ব'লে যাও।"

মাণিক বলিল, "প্রথমে অধরকে খুঁজে বের করবো। তাকে চুপি চুপি বলবো, মেয়ে-কামরায় গিয়ে তুমি হরিশের মাকে বল, 'আমাদের গ্রামের জমীদার মশায়ও এই ট্রেণে কাশী যাচ্ছেন। আমি নতুন বিয়ে করেছি শুনে তিনি ভারি খুসী হয়েছেন। তিনি আমায় বড্ড ভালবাসেন কি না! কনের মুখ দেখতে চাচ্ছেন। হরিশের মা, তুমি কনেকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।'—ওরা এলে, আপনি নবদুর্গার মুখ দেখবেন, দেখে, তাকে যা হোক কিছু মুখ-দেখানি দেবেন।"

মোহান্ত বলিলেন, "আমার এই হীরের আংটী আমি তাকে মুখ-দেখানি দেবো।"

"তাই দেবেন হুজুর, সে আর বড় কথা কি!—আপনি ততক্ষণ মাথায় কাণে খানিকটা বরফ-জল দিয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে এসে বসুন। আর, একটা চুরুট বের ক'রে দিই,—সেইটে ধরাবেন, নইলে হয় ত গন্ধ পেতে পারে।"—বলিয়া সেই বেতের বাক্স হইতে একটা চুরুট ও দেশলাই বাহির করিয়া বিছানার উপর রাখিল। তার পর গোসলখানায় গিয়া, খানিকটা বরফ কাটিয়া, উহা ধুইয়া, ওয়াশ-হ্যাণ্ড বেসিনে রাখিয়া, তাহা জলপূর্ণ করিল। তোয়ালে, চিরুণী, বুরুষ গোসলখানাতেই ছিল।

মাণিক ফিরিয়া আসিয়া মোহান্তকে গোসলখানায় লইয়া গেল। তাঁহার পঞ্জাবী খুলিয়া দিয়া, গলায় ও বুকে তোয়ালে জড়াইয়া বলিল, "এই বরফ-জল বেশ ক'রে থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে মাথায় দিন। কাণ দুটোও বেশ ক'রে ভিজিয়ে নেবেন। তার পর চুল-টুল আঁচড়ে, আপনি ফিরে চুরুট খেতে থাকুন।"

মোহান্ত মাথায় জল থাব্ড়াইতে থাবড়াইতে বলিলেন, "কত দেরী হবে তোমার ?"

মাণিক বলিল, "পাঁচ, সাত, বড় জোর দশ মিনিট ।"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মুখ দেখা।

মোহান্ত নিজস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, চুরুট ধরাইয়া, একদৃষ্টে প্ল্যাটফর্ম্মের পানে চাহিয়া রহিলেন। লোকের ভিড়ে আলোকের অল্পতা প্রযুক্ত, অধিক দূর অবধি তিনি দেখিতে পাইলেন না।

সীতাভোগ-মিহিদানাওয়ালা, সেকেণ্ড ক্লাসে বাঙ্গালী বাবু দেখিয়া তাহার ঠেলাগাড়ী দাঁড় করাইয়া হাঁকিল, "সীতাভোগ মিহিদানা চাই হুজুর !"

হঠাৎ মোহান্তের মনে হইল, নবদুর্গার মুখ দেখিয়া তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন উপহার দেওয়াও উচিত হইবে। দুই টাকার সীতাভোগ ও মিহিদানা কিনিয়া তিনি মাঝের বেঞ্চিখানার উপর রাখিলেন।

মিনিট দুই পরে মাণিক ঘোষ ফিরিয়া আসিল। বলিল, "ঠিক হয়ে গেছে, আসছে তারা। আমি গোসলখানায় লুকাই। আমায় দেখলে নিশ্চয়ই সে চিনে ফেল্‌বে—আমাকে সে কেদারেশ্বরে পঞ্চাশবার হুবহু এই বেশেই দেখেছে কি না !"—বলিয়া মাণিক গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

অগ্রে অগ্রে অধর, তার পশ্চাতে নবদুর্গা, তার পশ্চাতে হরিশের মা প্ল্যাটফর্ম্ম দিয়া আসিতেছিল। মোহান্তকে দেখিয়া অধর দাঁড়াইল। মোহান্ত নিজে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

অধর প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিল, কনেকে হাত ধরিয়া হরিশের মা গাড়ীতে উঠিল। নববধূর মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

হরিশের মা নবদুর্গাকে মোহান্তের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল, "মুখ দেখাও মা, ঘোমটা খোল।"

নববধূর মুখ দেখাইবার প্রক্রিয়া নবদুর্গা জানিত। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। হরিশের মা তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল।

মোহান্ত বলিলেন, "বাঃ—বেশ বউ হয়েছে তোমার অধর।"

এই কণ্ঠস্বর কর্ণে যাইবামাত্র নবদুর্গা চমকিয়া উঠিল। সে চক্ষু খুলিয়া মোহান্তের মুখের দিকে চাহিয়া, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "বাঃ, বেশ সুন্দরী বউ হয়েছে। এ মেয়ে ত রাজরাণী হবার যোগ্য !"

নবদুর্গা আবার শিহরিয়া, চক্ষু খুলিল ; এক নজর মাত্র মোহান্তের দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু বুজিল। "এ মেয়ে ত রাজরাণী হবার যোগ্য !"—ঠিক এই শব্দগুলি, এই কণ্ঠস্বরে, এই ভঙ্গিমায় নবদুর্গা কেদারেশ্বরেও শুনিয়াছিল—সে স্মৃতি তাহার জাগিয়া উঠিল।

মোহান্ত বলিলেন, "তোমার নামটি কি গা ?"

হরিশের মা বলিল, "বল, বল, তোমার নাম বল।"

কিন্তু নবদুর্গা তখন কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ হইতে কোনও শব্দ উচ্চারিত হইল না।

হরিশের মা তখন বলিল, "কনের নাম নবদুর্গা।"

মোহান্ত বলিলেন, "নবদুর্গা ?—বেশ বেশ, খাসা নাম। যেমন মেয়েটি—নামটিও তেমনি।"—বলিতে বলিতে নিজ অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তিনি বলিলেন, "নাও, ধর।"

নবদুর্গা আবার চক্ষু খুলিল, কিন্তু হাত পাতিল না। সে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। "নবদুর্গা ? বেশ বেশ, খাসা নাম। যেমন মেয়েটি, নামটিও তেমনি"—এই কথাগুলিও অবিকল সে কেদারেশ্বরের মোহান্ত-মুখে শুনিয়াছে স্মরণ হইল।

হরিশের মা নবদুর্গার অবস্থা দেখিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ কি না, ভয় পেয়েছে। আমার হাতে দিন।"

গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িল। মোহান্ত বলিলেন, "তোর হাতে দিয়ে কি হবে ? আমিই ওর আঙ্গুলে পরিয়ে দিই।"—বলিয়া তিনি খপ্ করিয়া নবদুর্গার হাতখানি ধরিয়া অঙ্গুরীয় তাহার মধ্যমা অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি উহা বড় হইল দেখিয়া বলিলেন, "আঙ্গুল মুঠো কর, খুব দামী আংটী, দেখো যেন প'ড়ে না যায়। যা হরিশের মা, কনেকে নিয়ে যা, গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই ঝি, এই মিষ্টিগুলো নিয়ে যা, বউ খাবে।"

হরিশের মা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। নবদুর্গাকে বলিল, "প্রণাম কর। ব্রাহ্মণ-জমীদার,—মস্ত লোক।"

কিন্তু নবদুর্গা প্রণাম করিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না।

মোহান্ত বলিলেন, "যা যা, নিয়ে যা, ছেলেমানুষ ভয় পেয়েছে। আমি অমনি আশীর্ব্বাদ করেছি—বেঁচে থাক, সুখে থাক, রাজরাণী হও।"

হরিশের মা তখন মিষ্টান্নগুলি উঠাইয়া কনেকে লইয়া নামিয়া গেল। অধর অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে মেয়ে-গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজ স্থানে গিয়া বসিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, বাঁশী বাজিল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

মাণিক গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দন্ত বাহির করিয়া বলিল, "হুজুর, দেখালাম ত? এখন বখ্‌শিসের হুকুম হোক্।"

মোহান্ত কিন্তু গম্ভীর হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "মাণিক, মনটা খারাপ হয়ে গেল।"

"কেন হুজুর?"

"সে তুমি বুঝবে না। একটা পেগ দাও।"

মোহান্ত গ্লাস হাতে হুইস্কি পান করিতে করিতে বাহিরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মাণিক শঙ্কিতভাবে মাঝে মাঝে তাঁহার মুখপানে চাহিতে লাগিল।

ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে-কামরায় নবদুর্গা তখন হরিশের মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "হ্যাঁ হরিশের মা, উনি কোথাকার জমীদার বল্লে?"

"আমাদের গাঁয়ের।"

"তোমাদের গাঁ কোথায়?"

"ফরিদপুর জেলায়।"

"কিন্তু গ্রামের নাম কি?"

হরিশের মা'কে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, গ্রামের নাম বলিতে হইবে কুণ্ডুপুকুর। কিন্তু নামটা সে ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল, "ডুমরাওন।"—ফল কথা, ফরিদপুর জেলার কুণ্ডুপুকুর ও আরা জেলার ডুমরাওন, এই অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের নিকট সমান অপরিচিতই ছিল। কিন্তু নবদুর্গা জানিত, তাহার বরের বাসস্থান বাঙ্গালা দেশে কুণ্ডুপুকুর গ্রাম ও তাঁহার কর্ম্মস্থান পশ্চিমে ডুমরাওন।

কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিশের মা ঘুমাইয়া পড়িল। একটা অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে নবদুর্গার বুকটি দুড়্‌দুড়্‌ করিতে লাগিল। সে স্থির করিল, ঘুমাইবে না, জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু গাড়ীর দোলানীতে নিজ সংকল্প সে রক্ষা করিতে পারিল না—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রামের বাদল

গাঁয়ের পথে বাদল—যেন
ফির্‌ছে নেয়ে গাঁয়ের নারী;
জলভরা মেঘ-কল্‌সী কাঁখে,
জলঝরা কেশ,—সজল সাড়ী।

সব্‌জে সাড়ীর পাড়-চোঁয়া জল
পথের ধূলা কর্‌ছে শ্যাওল,
চোখের কোণায় কাজল-আভাস,—
চোখের পাতা আব্‌ছা, ভারী!

গাঁয়ের বাদল—গাইছে যেন
'গর্‌বা' নেচে' গাঁয়ের নারী;
রিম্‌-ঝিমি-ঝিম্ ঘুঙুর বাজে,
ঘুর্‌ছে দ্রুত সারি-সারি।

দোদুল তালে আঁচল দুলে,
ওড়্‌না উঠে কেঁপে'—ফুলে,'
নাচের শ্রমে কপোল ঘামে—
আঁখির কাজল সঙ্গে তারি।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মধুমেহ

১

পূর্ব্বাভাস

মধুমেহ বা ডায়াবিটিজ্‌কে বাঙ্গালার নিজস্ব পীড়া বলিলে, বোধ হয় অন্যায় হয় না। জগতের অনেক স্থানেই এই ব্যারাম হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার প্রসার ও প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। এই ব্যারাম সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে এবং পল্লী-গ্রামের চিকিৎসকদিগের মধ্যে এমন সব ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে, যাহার জন্য, চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় পত্রস্থ না করিয়া, আমি সাধারণ-পাঠ্য মাসিক পত্রিকায় ইহাকে স্থান দিতে চাই। যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় সকল কথা বিবৃত করিব এবং যাহাতে সাধারণ গৃহস্থ ইহা পাঠ করিয়া ঐ ব্যারামকে দূরে পরিহার করিতে পারেন, এবং ভুক্তভোগীরা এই প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট উপায়ে সকল কথা বেশ তলাইয়া বুঝিয়া চলিয়া দীর্ঘায়ু হইতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইব।

প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি, ডায়াবিটিজ্‌ দুই রকমের—diabetes insipidus ও mellitus, অর্থাৎ প্রস্রাবে শর্করা-হীন ও শর্করাযুক্ত। সাধারণতঃ "ডায়াবিটিজ" কথাটি ব্যবহার করিলেই, diabetes mellitusকে (অর্থাৎ, শর্করা-যুক্তকেই) বুঝায়; কারণ, ঐটিই খুব সাধারণ। প্রথম জাতীয় ও দ্বিতীয় জাতীয় ডায়াবিটিজে প্রভেদ এই যে, ডায়াবিটিজ ইন্‌সিপিডাসে— প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে তাহাতে শর্করা আদৌ পাওয়া যায় না; এবং ডায়াবিটিজ মেলি-টাসে—প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে, প্রচুর পরিমাণে শর্করার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। *

যেহেতু প্রথমোক্ত (ডায়াবিটিজ ইন্‌সিপিডাস্‌) ব্যারামটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, উহার উল্লেখ আর করিব না। এখানে শেষোক্তটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রস্রাব-পরীক্ষায় শর্করা পাইলেই, তৎক্ষণাৎ ডায়াবিটিজ হইয়াছে, এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক; যেহেতু, এমন অনেক অবস্থা আছে, যাহাতে দৈবাৎ, বা মাঝে মাঝে, মূত্রে শর্করা দেখা দেয়—কিন্তু সে সমস্ত রোগীর দেহে ডায়াবিটিজের অপর লক্ষণ থাকে না। এই জাতীয় ব্যাধিকে গ্লাইকোসুরিয়া (glycosuria) বলে।

* ডায়াবিটিজ ইন্‌সিপিডাসের চিকিৎসার জন্য, "ইন্‌ফান্‌ডিন্‌" নামক ঔষধ অধস্ত্বাচিক উপায়ে সূচ দ্বারা প্রয়োগই যথেষ্ট।

মধু-তত্ত্ব

বাঙ্গালা ভাষায়-"মধু" বলিলে মৌমাছি কর্ত্তৃক আহৃত পুষ্পরসকে বুঝায়। ইংরাজীতে মধুকে honey বলে। "মিষ্টরস"কে ইংরাজীতে sweet বা সুগার বলে। বর্ত্তমান সময়ে, যত রকম মিষ্টরস পাওয়া যায়, তাহারা এই :—

(১) মধু (honey)

(২) গুড় (molasses)

(৩) মিছরি (sugar-candy)

(৪) চিনি (sugar)

"সুগার" বা চিনি কত রকমের, তাহা দেখুন :—

(ক) Cane sugar (কেন-সুগার)।—ইক্ষু, বীট, তাল, খেজুর প্রভৃতির রস জাল দিয়া প্রস্তুত হয়। এই জিনিসটি পেটের বালাই। এইটিই সাধারণ "চিনি।"

(খ) মল্ট (malt) সুগার।—কল (sprout) বাহির হইয়াছে—এমন শস্যকে উত্তাপ ও চাপ দিয়া প্রস্তুত হয়।

(গ) ডেক্‌সট্রোজ, গ্লুকোজ বা গ্রেপ-সুগার—পক্ক দ্রাক্ষার রস হইতে প্রস্তুত হয়। শ্বেতসারের সঙ্গে সালফিউ-রিক দ্রাবক মিশাইলেও ইহা প্রস্তুত হয়।

(ঘ) মিল্ক-সুগার বা দুগ্ধ-শর্করা—ইহা দুগ্ধের সঙ্গেই থাকে; এই জন্য, দুধকে ঘন করিলে, দুধের স্বাদ আপনা-আপনিই মিষ্ট হয়।

(ঙ) ফ্রাক্‌-টোজ—বা উপরে লিখিত ফল ব্যতীত ফল হইতে প্রাপ্ত চিনি।

দেহে চিনি আসে কোথা হইতে ?

যেমন, দ্বাদশটি স্বরবর্ণ ও ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের হরেক রকমের বিন্যাসফলে লক্ষ লক্ষ কথার সৃষ্টি হয়; সেইরূপ, জীব-জগতের একটি জিনিস রূপান্তরিত হইয়া, সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বাঞ্ছিত

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন নামক তিনটি অদৃশ্য পদার্থ হইতে গাছপালা সৃষ্ট হয়। ভোজনান্তে, সেই গাছ-পালা আমাদের দেহে মাংসে পরিণত হয়;—অর্থাৎ, উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিলে আমাদের পেশী দৃঢ় হয়। এই পেশীর সাহায্যে হাতুড়ি পিটিয়া আমরা লৌহকে গরম করিতে পারি। তাহা হইলেই লক্ষ্য কর,—বায়ুস্থ অদৃশ্য তিনটি বাষ্প হইতে উদ্ভিদ্; উদ্ভিদ্ হইতে পেশী; পেশী হইতে উত্তাপ;—কোথাকার জিনিস কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া কি কায করিতেছে!

তেমনই, কন্দ, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প—সবগুলিই দেখিতে রূপে, গন্ধে, স্বাদে বিভিন্ন হইলেও—প্রত্যেকটিই উদ্ভিদ্; এবং উদ্ভিদ্ বলিয়াই, তাহার মূল উপাদান—শ্বেতসার বা ষ্টার্চ। এরোরুট, শঠির পালো, পানিফলের পালো—এগুলি "খাঁটি" শ্বেতসারের দৃষ্টান্ত। যেমন অট্টালিকার মূল উপাদান ইষ্টক, তেমনই উদ্ভিদের মূল উপাদান—শ্বেতসার।

আমরা ভাত, আলু, পটোল, কাঁচাকলা, থোড়, এঁচড়, কপি, শাক, ডাঁটা, ফল, মূল যাহাই কেন খাই না, উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে প্রাপ্ত তৎসমস্ত খাদ্যই ষ্টার্চের বা শ্বেতসারের সমষ্টিমাত্র। দাঁতে কাটিয়া, চর্ব্বণ করিয়া আমরা তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করি; এবং পরিপাকক্রিয়ার ফলে—শ্বেতসার বা ষ্টার্চ প্রথমে মল্টোজে এবং পরে গ্লুকোজে পরিবর্ত্তিত হইয়া, রক্তে যাইয়া পড়ে। "শ্বেতসার" ভাল করিয়া জলে মিশে না, কিন্তু "চিনি" সুন্দররূপে মিশে। এই জন্য, যে কোনও রকম উদ্ভিদ্ (ষ্টার্চ) ভক্ষণ করি না, যতক্ষণ তাহা গ্লুকোজে পরিবর্ত্তিত না হয়, ততক্ষণ তাহা রক্তে মিশিতে পারে না—আমাদের দেহের পুষ্টিতে লাগে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, আধসের উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করাও যা—ছটাক দুই গ্লুকোজ খাওয়াও তাই। তরী-তরকারী খাইলেই, দেহের মধ্যে যাইয়া তাহারা চিনিতে (গ্লুকোজে) পরিণত হইবেই হইবে।

তার পর, মাংস, মাছ, ডিম, ছানা, ডাল ও ডালের তৈয়ারী খাদ্য; এবং ঘি, তৈল, মাখন, চর্ব্বি;—ইহাদের কোনটিই, সাধারণতঃ, পরিপাককালে সুস্থদেহে চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তির ডায়াবিটিজ ধরিয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসাদি অপর খাদ্যের এতটুকু মাত্রাধিক্য হইলেই, সেই বাড়্তি অংশ হইতে দেহের মধ্যে চিনি প্রস্তুত হয়! তাই লোকরা কথায় বলে, ডায়াবিটিজগ্রস্তরা যে জল পান করে, তাহাও পেটে যাইয়া চিনি হয়! এটা অত্যুক্তি, বলা বাহুল্য।

ডায়াবিটিজ-তত্ত্ব

আমরা যে যে খাদ্য খাই, তাহাদিগকে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) আমিষ-জাতীয় খাদ্য (প্রোটীন্)।—ডিমের শ্বেতাংশ, মাংস, মাছ, ছানা, পনির, ডাইল ও শুঁটি। (ডিমের শ্বেতাংশটি "খাঁটি" প্রোটীনের দৃষ্টান্ত)

(২) শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য।—চাউল, গম, জনার, ভুট্টা, যব, কোদো, মাড়ুয়া, কাংনি প্রভৃতি "শস্য"; অড়হর, ছোলা, মুগ, মটর, কলাই, মুসুরী, খেঁসারি প্রভৃতি "ডাল"; সীম, বরবটি, কলাই প্রভৃতি "শুঁটি"; আলু, বীট, গাজর, খাম-আলু, চুপড়ি আলু, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, শালগম, ওল, কচু, মানকচু, শঠী, এরোরুট, কেশুরাদানা প্রভৃতি "মূল"; পালম প্রভৃতি সকল রকমের "শাক" ও "ডাঁটা"; কলা, পেঁপে, আম প্রভৃতি "ফল"; বাদাম, পেস্তা, আখরোট, চীনা বাদাম প্রভৃতি যে "Nuts";—এ সমস্তই এই বিরাট্ "শ্বেতসার" পর্য্যায়ভুক্ত। তদ্ব্যতীত, যাহা কিছু মিষ্টরসযুক্ত অথবা মিষ্টরসে প্রস্তুত হয়, তাহাও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

(৩) স্নেহজাতীয় পদার্থ—মাখন, ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি।

(৪) ধাতুময় পদার্থ বা লবণ—যেমন পাতে খাইবার লবণ এবং শাকসব্জীর সঙ্গে ও মাংসাদির সঙ্গে চুণ-জাতীয় লবণ, লৌহ-ঘটিত লবণ, পটাশ, সোডা ইত্যাদি।

পৃথিবীর যে জাতীয় লোক যাহাই ভক্ষণ করুক না কেন, উপর্য্যুক্ত ৪ শ্রেণীর কিছু-না-কিছু সকলকেই খাইতে হয়। তাহার মধ্যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমিষ জাতীয় খাদ্যভোজী এবং বাঙ্গালীরা অত্যধিক মাত্রায় শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যভোজী (starch-eaters)।

যিনি যাহাই ভোজন করুন না কেন, ভোজনের

---

* ডায়াবিটিজগ্রস্তের দেহে কোন্ জাতীয় খাদ্য হইতে কতটা শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহার মাপ এই—

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের শতকরা			১০০ ভাগ	
আমিষ	"	"	"	৫৮ "
স্নেহ	"	"	"	১০ "

পরিমাণ তাঁহার (১) দেহের আয়তন, (২) কর্ম্মের পরিমাণ, (৩) দেশের আবহাওয়া ও (৪) স্বাস্থ্যের উপরে নির্ভর করে। অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের একটি বামন যে পরিমাণে খাইবে, দীর্ঘাকার ২৫ বৎসরের যুবক নিশ্চয়ই তাহা হইতে পরিমাণে বেশী খাইবে। যে ব্যক্তি অলসভাবে জীবন যাপন করে, তাহার কম খাওয়াই উচিত; এই জন্য, ধনীদের ক্ষুধা কম ও শ্রমজীবীদের ক্ষুধা প্রবল; কিন্তু ধনীরা নানারূপ মুখরোচক খাদ্য খাইয়া শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোজন করিয়া নানা রকম ব্যারামে পড়েন। তাহার পর, দেশের আবহাওয়ার কথা ধরা যাউক। ঠাণ্ডা দেশে ও শীতকালে, ক্ষুধা বাড়ে এবং সেই সময়ে প্রকৃতি দেবী ভারে ভারে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যন্ত গরমের দিনে ও গরম দেশে, খাইবার ইচ্ছা কমিয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম যে, দেহের আয়তন, কর্ম্ম ও আবহাওয়া বুঝিয়া খাইলে, শরীর দৃঢ়, কর্ম্মঠ, আলস্যহীন ও নীরোগ হয়; তাহারই নাম "স্বাস্থ্য"। যে পরিমাণে বা যে জাতীয় খাদ্য খাইলে শরীরের জড়তা বাড়ে, আলস্য আসে, নানা রকমের শারীরিক পীড়া উপস্থিত হয়, দেহ স্থূল হয়—সে খাদ্য খাওয়াই উচিত নহে।

উপরি-উক্ত চারি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আমরা যে যে খাদ্যই খাই না, তাহা পরিপাক হইয়া,—অর্থাৎ, রক্তের সঙ্গে সহজে মিশিতে পারে, এমন অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া,—দেহের পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু যদি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য নিত্য খাই, তবে তাহা আমার শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক হয়। নিত্য অতিরিক্ত খাদ্যকে পরিপাক করিবার ফলে, অজীর্ণব্যাধি ধরে; এই অজীর্ণব্যাধির ফলে, কেহ কৃশকায়, কেহ স্থূলকায় হইয়া পড়েন; কাহারও বাত, কাহারও হাঁপানির ব্যারাম ধরে; এবং কাহারও ডায়াবিটিজ ধরে। শ্বেতসার-বহুল অন্নভোজী আমরা; আমরা নিত্য বেশী খাইলে আমাদের রক্তে অত্যধিক মাত্রায় গ্লুকোজ যাইয়া পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান, রক্তে কোনও জিনিস এতটুকু বেশী হইলে, হয়, যকৃতে তাহার ধ্বংস-সাধন হয়; নতুবা প্রস্রাব হইয়া তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ভগবানের অনির্ব্বচনীয় দয়া যে, দুই দশ দিনের অত্যাচার শরীর অনায়াসেই সহ্য করে; কিন্তু যে অভ্যাসটা বহু কাল স্থায়ী হইয়া যায়, তাহার ফলটাও ক্রমশঃ স্থায়ী হয়। এই জন্য, যে অন্নভোজী বাঙ্গালী, নিজ দেহের আয়তন, কর্ম্মের পরিমাণ ও দেশের আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করিয়া, রসনা-লাম্পট্যে নিত্যই বিলাস করে, নিত্যই তাহার খাদ্য হইতে অতিমাত্রায় গ্লুকোজ রক্তে যাইয়া পড়ে ও তৎক্ষণাৎ প্রস্রাবের সঙ্গে তাহা বহিষ্কৃত হয়; কারণ, বাড়্তি গ্লুকোজটা পুষ্টিতে লাগে না বলিয়া, শরীরের পক্ষে বিজাতীয় দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইয়া, নিষ্কাশিত হয়।

আমাদের দেশের একটা প্রবাদ-বচন আছে যে, যাইবার সময়ে বানের জল ঘরের জল বাহির করিয়া লইয়া যায়। শরীরে যে বাড়্তি-গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবার সময়ে, তাহা অপরাপর শারীরিক ভাল জিনিসও বাহির করিয়া লইয়া যায়। অর্থাৎ, ভোজন-বিলাসের ফলে, শরীরের পোষণ না হইয়া ক্ষয়ই হইতে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে, ডায়াবিটিজ একটি ভীষণ "ক্ষয়ের" ব্যারাম (a form of phthisis or wasting)।

তাহা ছাড়া, নিত্য একটা শারীরিক যন্ত্রকে অতিমাত্রায় খাটাইলে, তাহার অবসাদ ও ক্ষয় আসে। আমরা যত কিছু শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য খাই না কেন, সে সকলের পরিপাকের ভার "প্যান্‌ক্রিয়াস্" বা "ক্লোম" নামক একটি পরিপাকযন্ত্রের উপরে ন্যস্ত। নিত্য অতিমাত্রায় শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য ভক্ষণের ফলে, এই ক্লোমযন্ত্রের অবসাদ ঘটে—শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ক্ষমতা ক্রমশঃই কমিয়া আসে; কাযেই, আহার কমাইলেও, পরে, ভুক্ত সবটুকু শ্বেতসার-খাদ্য হজম না হইয়া, তাহারও কিয়দংশ প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। একে যন্ত্রটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; তাহার উপরে নিত্য ক্ষয়ের জন্য শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; কাযেই, প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতম হইয়া পড়ে। আমার ধারণা, বাঙ্গালীর ডায়াবিটিজ ঐ প্যান্‌ক্রিয়াসের ক্লান্তির ফল—ধ্বংসের ফল নহে।

এই প্যান্‌ক্রিয়াসের কতকটা অংশের নাম—"আইল্যাণ্ডস্ অফ্ ল্যাংগারহ্যান্স।" এই শেষোক্ত অংশ হইতে, "ইন্‌সুলীন্" ঔষধ প্রস্তুত হয়। রক্তে যে পরিমাণে ইন্‌সুলীন্ প্যান্‌ক্রিয়াসের

এই অংশটুকু জোগাইতে পারে, * সেই পরিমাণে, প্যান্‌ক্রিয়াসও শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য পরিপাক করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে, ডায়াবিটিজগ্রস্তদের "প্যান্‌ক্রিয়াস্" শ্রান্ত হইয়া পড়ায়, খাদ্য কমাইলে (অর্থাৎ, প্যান্‌ক্রিয়াস্‌কে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কতকটা বিশ্রাম দিলে), অথবা ইন্‌সুলীন্ ইন্‌জেক্‌সন দিলে (অর্থাৎ, শ্রান্ত-প্যান্‌ক্রিয়াসের হইয়া কায করিয়া দিলে) তবে উপকার হয়। ডাক্তারি ভাষায় বলিতে গেলে, ইন্‌সুলীনের কায, শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য হইতে প্রস্তুত গ্লুকোজকে নষ্ট হইতে না দিয়া, তাহা হইতে শারীরিক উত্তাপ ও কর্ম্মশক্তি সংগ্রহ করা।

খাদ্য-রহস্য

পূর্ব্বে, খাদ্যের চারি শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছি; খাদ্য হইতে কর্ম্মশক্তি, দেহের উত্তাপরক্ষণ, রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা-লাভ প্রভৃতির কথাও বলিয়াছি; এবং আরও দেখাইয়াছি যে, শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইলে, তবে রক্তে মিশিতে পারে। আর একটি বড় কথারও উল্লেখ করিয়াছি—এক খাদ্য রূপান্তরিত হইয়া অন্য পদার্থে পরিণত হইতে পারে, যেমন অতিমাত্রায় মাংস বা ঘৃত ভোজন করিলে, দেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাংস বা ঘৃতের অংশ হইতেও "চিনি" তৈয়ারি হয়।

যেমন টাকা ও মোহর একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ—টাকার পরিবর্ত্তে মোহর পাওয়া যায় ও মোহরের পরিবর্ত্তে টাকা পাওয়া যায়—তেমনই, খাদ্য হিসাবে, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ এবং শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থও পরস্পর বিনিময়সাপেক্ষ। একপোয়া চাউলের অন্ন ভোজন না করিয়া, অর্দ্ধপোয়া চাউলের অন্ন ও আধ ছটাক ঘৃত ভোজনের সমান ফল। অথবা, সহ্য হইলে, এক ছটাক ঘৃত ও এক ছটাক চাউলের অন্ন ভোজন করা চলে। এ কথার অর্থ এই যে, ডায়াবিটিজে, শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের এতটুকু বাহুল্য ঘটিলেই প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়—শরীরের ক্ষয় হয়; এবং সুধু স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী খাওয়া যায় না; কাযেই, ডায়াবিটিজে ভাত কমাইয়া, তৎস্থানে ঘি-ভাত খাইলে, পুষ্টির সম্ভাবনা হয় এবং মূত্রে চিনির মাত্রা কমিয়া যাইতে পারে।

অক্সিজেন বাষ্প আশ্রয় করিয়া বাতি জ্বলে; অক্সিজেন কম পড়িলে আলো উজ্জ্বল থাকে না, ধোঁয়া হয়। তেমনই, যদি যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার ভোজন করা যায়, তবেই ঘৃত-ভোজনে উপকার; নতুবা শ্বেতসারের মাত্রা অতি-কম হইলেই, ঘৃত হইতে নানা জাতীয় অম্লরস দেহে উৎপন্ন হয় এবং সেই অম্লরস হইতে ডায়াবিটিক কোমা (বা অচৈতন্যা-বস্থা) আসে। অতএব, ডায়াবিটিজগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ আবশ্যক পরিমাণে শ্বেতসার খাদ্য খাইতে পান, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্য ভোজন করা যৌক্তিক। পরিপাক-ক্রিয়ার বিকৃতির ফলে, স্নেহজাতীয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত ডাই-অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড, অক্সিবিউটাইরিক্ অ্যাসিড, অ্যাসিটোন প্রভৃতি প্রস্রাবের উদ্রেক করে—তাই ডায়াবিটিজগ্রস্তের পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্য এত ভীতি-উৎপাদক।

ডায়াবিটিজগ্রস্তদের খাদ্য হইতে কতকগুলি বিষাক্ত অম্লরস প্রস্তুত হইয়া দেহকে বিপন্ন করিতে পারে বলিয়া, কোন্ কোন্ জাতীয় খাদ্যে তাঁহাদিগের অপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহা জানা থাকা প্রয়োজন। বিষাক্ত অম্লরসগুলিকে ডাক্তারি ভাষায় এক কথায় "কেটোন্" (Ketone) বলে। এই হিসাবে—

কেটোন্ পাওয়া যায়—স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে, এবং শতকরা ২ ভাগ আমিষ-জাতীয় খাদ্য হইতে।

কেটোন্ পাওয়া যায় না যে জাতীয় খাদ্য হইতে—শ্বেত-সার-জাতীয় খাদ্য এবং শতকরা ৫৮ ভাগ আমিষ-জাতীয় খাদ্য হইতে। পূর্ব্বের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব যাহার প্রস্রাবে অ্যাসিটোন্ বা ডাইঅ্যাসেটিক্ অ্যাসিড্ বাহির হইতেছে অথবা সামান্য কারণে হয়, তাহার পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্য একবারে বর্জ্জনীয় এবং আমিষ-জাতীয় খাদ্য সামান্য পরিমাণে খাওয়া চলিতে পারে। এই জন্য দুধের মাটা তুলিয়া, ছানাকে জলে ধুইয়া, তরকারী তেল-ঘিয়ে না সাঁৎলাইয়া খাইতে হয়। যাহার প্রস্রাবে এ সকল বাহির হয় না, তাহার পক্ষে এরূপ নিষেধ নাই। খুব স্থূলভাবে বলা যায় যে, ডায়াবিটিজগ্রস্ত রোগীর কর্ত্তব্য, নিত্য প্রস্রাবের প্রতিক্রিয়া বা reaction এক টুক্‌রা লাল লিট্‌মাস্ কাগজ দিয়া পরীক্ষা করা। যদি লাল কাগজ লালই

* "ভারতবর্ষ", ১৩৩২ সালের কার্ত্তিক মাসে মল্লিখিত "বাস্তব-উপন্যাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৮৪১ হইতে ৮৪৬)।

থাকিয়া যায় (অর্থাৎ, প্রস্রাবের প্রতিক্রিয়া যদি অম্লাক্ত হয়), তবে স্নেহজাতীয় পদার্থ না খাওয়াই ভাল। নতুবা ঘৃত ভোজনে লাভই আছে।

ব্যারামের আরম্ভে কর্ত্তব্য

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ডায়াবিটিজ হইলেই, ভাত ও আলু বন্ধ করিয়া, রুটি ও মাংস দুইবেলা খাওয়ান হইত। তাহাতে অনেক সময়ে বিপদ হইত। ডায়াবিটিজগ্রস্তদিগের ভাত বা আলু হঠাৎ বন্ধ করিতে নাই, ক্রমশঃ কমানই ভাল। স্থূলভাবে ডায়াবিটিজগ্রস্তদিগকে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে :—

(১) ব্যারাম ধরা পড়িবামাত্রেই, সাবধান হইবে। ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। লোকরা ডায়াবিটিজ হইতে মরে না—ইহার উপসর্গ হইতেই মরে,—যথা, কার্ব্বাঙ্কল, পচন (গ্যাংগ্রীন), ক্ষয়কাস (থাইসিস), ইত্যাদি। এই জন্য, কাস-রোগীর ত্রিসীমায় ডায়াবিটিজ-গ্রস্তদের যাইতে নাই।

(২) এই ব্যারামের প্রথমাবস্থায়- যথাসম্ভব শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন। খাদ্যের দোষে যত না হউক, তীব্র মানসিক কষ্ট বা দুশ্চিন্তা ডায়াবিটিজ আনিবার ও বাড়াইবার পক্ষে প্রধান সহায়। এই জন্য, "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের" মধ্যে এ ব্যারাম তত নাই—যত আছে, বর্ত্তমান কালে, ভাল-চালে চলিবার জন্য যে মধ্যবিত্ত দুর্ভাগ্য-ভদ্রলোকরা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তায় কাল হরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে!

(৩) ব্যারাম ধরা পড়িলে, অভ্যস্ত-খাদ্য তৎক্ষণাৎ না কমাইয়া, রোগীকে ২৪ ঘণ্টাকাল শোয়াইয়া রাখা দরকার। চব্বিশ ঘণ্টার পর হইতে, এক সপ্তাহকাল, প্রত্যহ তাঁহার দেহের ওজন, প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া খাদ্য বদলান চাই। এইগুলি করিয়া, চিকিৎসক দেখিবেন, কোন্ জাতীয়, কি কি খাদ্য, কতটা পরিমাণ খাইলে, রোগী দুর্ব্বলও হন না এবং তাঁহার দেহের উত্তাপও ঠিক্ বজায় থাকে। এই ভাবে রোগীর খাদ্যসহনক্ষমতার পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক রোগীর খাদ্যের নিরিখ বাঁধিয়া দিবেন। এই পরীক্ষার নাম—determination of metabolism. *

* মোটামুটি হিসাবে, বয়স, দেহের আয়তন ও ওজন এবং কি পরিমাণে কাযকর্ম্ম করিতে হয়, সেই সকল কথা ধরিয়া, আমাদের দেহের পক্ষে নিত্য কত উত্তাপ বা ক্যালোরি প্রয়োজন, তাহারও হিসাব রাখিতে হয়। সাধারণতঃ, প্রমাণ-আকৃতির প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য, শয্যাশায়ী অবস্থায় ১৮০০ ক্যালোরির আবশ্যক। বিশ্রামকালে, ২১০০; স্বল্প শ্রমের সময়ে ২৬০০ ও অতিমাত্রা শ্রমের সময়ে, ৩১০০ ক্যালোরির প্রয়োজন হয়। একসের জলের উত্তাপ এক ডিগ্রি বাড়াইবার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাই "ক্যালোরি"।

(৪) যদি উক্তরূপ করা সম্ভবপর না হয়, অথবা যদি উক্তরূপ করিয়াও রোগীর মূত্রে শর্করা বাহির হইতে থাকে, তবে রোগীকে "উপবাস" করাইতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডায়াবিটিজ্‌গ্রস্ত রোগীর পক্ষে "নির্জ্জলা" বা "দাঁড়া" উপবাস ঘোর অনিষ্টকর। এ উপবাসের অর্থ—এমন খাদ্য দেওয়া, যাহাতে সার খুব সামান্য থাকে, অথচ তখনকার মত রোগীর "পেটের খোলটা" বুজে; যেমন, শুধু জল, "সোডা-ওয়াটার", মাটাতোলা দৈয়ের ঘোল, শাকসব্জী সিদ্ধ করা ঝোল, ২।৪টা ডিম, চা, ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্‌কি ইত্যাদি। কোনটিতে কোনও রূপ মিষ্টরস থাকিবে না, তৈল ঘি থাকিবে না, তবে মসলা, লেবুর রস ও লবণ চলিতে পারে। এইভাবে ২।৪ দিন "উপবাস" করিলেই, মূত্র হইতে শর্করা একবারে চলিয়া যায়।

(৫) রোগীর প্রস্রাব শর্করা-মুক্ত হইলে, ক্রমশঃ তাহার খাদ্য বাড়াইতে হয়; মাছের ক্বাথ, মাংসের ব্রথ, শাকের ঝোল হইতে ক্রমশঃ আরও খাবার বাড়াইতে হয়, যাবৎ আবার তাঁহার প্রস্রাবে চিনি দেখা দেয়। এই যে বাড়ান-খাবার খাইয়া আবার শর্করা দেখা দিল—তাহার অপেক্ষা সব রকমের খাবার (বিশেষ করিয়া শ্বেতসার-জাতীয় খাবার) কিছু কমাইয়া, দেখিতে হইবে দুইটি জিনিস; যথা,—(ক) কম খাইয়া আর প্রস্রাবে চিনি বাহির হইতেছে কি না; এবং (খ) এই খাদ্য খাইয়া তাঁহার দেহের ওজন ও পুষ্টি ঠিক থাকিতেছে কি না। (উপর্য্যুক্ত (৩) প্যারা দেখুন)। যদি উভয়ই অনুকূল হয়—অর্থাৎ, এই পরিমাণ খাদ্য খাইয়া যদি প্রস্রাবে শর্করা না দেখা দেয় ও রোগীর ওজন ঠিক্ বজায় থাকে, তবে এই হারে রোগীকে খাইতে দিলে রোগী নিরাময় হয়।

(৬) কিন্তু যদি প্রস্রাবে শর্করা দেখা দেয় অথবা ঐ খাদ্য রোগীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয়, তবে ইন্‌সুলীন ইন্‌জেক্‌সন লইতে হয়।

কি খাইতে আছে বা নাই ?

এমন অনেক খাদ্য আছে, যাহা খাইলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা উৎপন্ন হয় ; আবার অন্য রকমের খাদ্য আছে, যাহা হইতে কম মাত্রায় শর্করা হয়। খাদ্যদ্রব্যকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায় যে, কোন্ কোন্ খাদ্যে শতকরা কতটা শ্বেতসার আছে। যাহাতে শ্বেতসারের পরিমাণ যত কম, সেইটাই ডায়াবিটিজগ্রস্তের পক্ষে তত নিরাপদ। দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৫ ভাগ মাত্র শ্বেতসার আছে—বাকীটা সবই ভূষিমাল (সিটা বা ছিব্ড়া বা সহজে হজম হয় না এমন জিনিস—সেলুলোজ)—এই জাতীয় শ্বেতসারই নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ভোজনবিলাসীদের ডায়াবিটিজ হয়—তাহাদের ক্ষুধা রাক্ষুসে, এবং তাহাদের পেটের খোলটাকে যা-তা ভূষিমাল ভিন্ন ভাল (পুষ্টিকর) জিনিস দিয়া ভরাইতে গেলেই প্রস্রাবে শর্করাধিক্য হয়। এই জন্য ইংরাজীতে যাহাকে **শতকরা ৫ ভাগ শ্বেতসার** (ফাইভ্—পারসেণ্ট ষ্টার্চ) বলে, সেই উদ্ভিদগুলির তালিকা দিয়া দিলাম ঃ—

পটোল	ফুলকপি	তেমাতি	কাঁচা পেঁয়াজ
ঝিঙে	লাউ	চালকুমড়া	রসুন
উচ্ছে	মোচা	শশা	তেঁতুল
চিচিংগা	থোড়	মূলা	পাতিলেবু
করোলা	বেগুন	মানকচু	কাগজীলেবু
স্কোয়াশ্	কাঁচাকলা	গাজর	গোঁড়ালেবু
ঢেঁড়স	কাঁচা পেঁপে	ওল	বরবটি
ফুটি	শাক (সকল রকমের)		সীম
পীচফল	গোলাপজাম		বাঁধা কপি
জামরুল	লিচু		জলপাই

যাঁহাদের প্রস্রাবে অতি সহজেই শর্করা বাহির হয় না, তাঁহারা অনায়াসে **শতকরা ১০ ভাগ শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য** (টেন্-পারসেণ্ট ভেজিটেব্ল্) খাইতে পারেন ; যথা—.

পাটনাই পেঁয়াজ	কমলালেবু	টেপারী
ব্যাঙের ছাতা	ডাব	আনারস
কাঁঠাল-বীচি	পাকা কলা	সীম
মটরশুঁটি	পেয়ারা	সাগু
বীট পালম	আপেল	কালোজাম
শাঁক আলু	বেদানা	কুমড়া
	আঙ্গুর	শুঁড়ি কচু

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত আরও ভাল, তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী যে যে উদ্ভিজ্জ ব্যবস্থেয়, তাহার তালিকা দিলাম।

শতকরা পনর ভাগ ষ্টার্চযুক্ত উদ্ভিজ্জ

আখরোট	খোবানি	সুজি	মটর
বাদাম	কিসমিস	কৃষ্ণমুগ	ছোলা ও ছাতু
পেস্তা	আম		অড়হর
আপেল		মাষকলাই	
পিয়াস		মসুর	খেঁসারি

শতকরা কুড়ি ভাগ ষ্টার্চযুক্ত উদ্ভিজ্জ

আলু	বার্লি	শঠী
রাঙ্গা আলু	আটা	এরোরুট
মটরশুঁটি	গম	পানিফলের পালো
	ময়দা	চাউল
ভুট্টা	খৈ	কলা
যবের ছাতু	বাজরা	খেজুর

শতকরা ত্রিশ ভাগ ষ্টার্চযুক্ত উদ্ভিজ্জ

মুড়ি	চাউল ভাজা	সোনামুগ

[ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (এল্, এম্, এস)।

অমৃতলাল বসু

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় একপুরুষে নয়, তিনি ছিলেন আমার মাতামহ ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু। কলিকাতায় নাট্যালয় প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যের এক জন অন্যতম উদ্যোগী নগেন বাঁড়ুয্যের নাম নাট্যজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট—সকলেরই পরিচিত।

আমার মাতামহালয় ছিল বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট, মায়ের পিতামহ সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত উকীল গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। দরিদ্র কুলীনসন্তান মাতুলালয় পাথুরিয়াঘাটায় থাকিয়া মাতুলপুত্র ৺অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (পরে জষ্টিস্) সহিত একত্র লেখা-পড়া শিখিয়া স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বহুল পরিমাণেই রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফলে তাঁর ছেলেরা বেশ নবাবী করিয়াই চলিতেন।

আমার বাবা বলিতেন, জগদ্ধাত্রী-পূজার এত ধূম আর কোথাও তিনি দেখেন নাই! শোভাবাজারের রাজাদের ঠাকুর আর ওঁদের ঠাকুর রেষারেষি করিয়া বাহির হইত, জিত থাকিত প্রায় এঁদের দিকেই। থিয়েটারের তখনকার দলটি ছিলেন এ বাড়ীর সংশ্লিষ্ট ও ঘনিষ্ট। মা'র মুখে শুনিয়াছি, এঁরাসকলেই প্রায় তাঁদের বাড়ীতেই আড্ডা জমাইয়া থাকিতেন। তার মধ্যে ইনি আবার প্রায় বেশীর ভাগই এ বাড়ীতে বাস করিতেন, তাই বাড়ীর লোকের মধ্যেরই এক জন হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আমার মায়ের ছেলে, আর আমার মাসীমার (সৌরীন্দ্রের মার) পোষ্যপুত্র!

আমি তাঁকে নেহাৎ ছোটবেলায় দেখিয়া থাকিলেও সে কথা আমার স্মরণ নাই। বহুকাল মাতামহালয়ে যাই নাই, তিনিও গত হইয়াছিলেন। বছর ১৪।১৫ বয়সে পূজার কিছু পূর্ব্বে বাবার হাবড়ার বাসায় মা'র সঙ্গে কয় দিনের জন্য গিয়াছি, মা'র সেজকাকা বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার কর্ণেল এইচ, সি ব্যানার্জ্জী (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) বহুদিন পরে সিলেট হইতে তাঁর কলিকাতা শ্যামবাজারের বাড়ীতে আসিয়াছেন, মাকে দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই মা'র আসা, কিন্তু আসিয়াই মা অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমাদের কয়েক দিন আর যাওয়া হইল না।

সেজ দাদাবাবু নিজে আসিয়া মা'র সঙ্গে আমাদেরও তাঁর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে ষ্টারে চন্দ্রশেখর দেখিতে গেলাম।

লরেন্স ফষ্টারের অভিনয়ে সেই আমি প্রথমবার তাঁকে দেখি। এর আগে কলিকাতার থিয়েটার কখন দেখি নাই। তার কারণ, আমার মাতামহালয় এবং পিতামহালয় ঠিক উল্টা ধরণেরই ছিল। এঁদের বাড়ী থিয়েটার, যাত্রা, গান, জাঁক-জমক যেমন লাগিয়াই থাকিত, আমাদের পিউরিটানিক বাড়ীতে ও সবের তেমনই প্রবেশ নিষেধ ছিল। ছোট ছেলেমেয়ে আমরা ওসবের ধার দিয়াও যাইতে পাইতাম না। বাড়ীতে নামজাদা ওস্তাদরা আসিতেন, ওস্তাদী গান হইত। ম্যাজিকওলা আসিত, ম্যাজিক দেখিয়াছি, বেদগান শুনিয়াছি। এক দিন দাদাবাবুর সঙ্গে গিয়া আধ ঘণ্টাটাকের জন্য কালকেতুর অভিনয়ে ইন্দ্রের শোকে, মরা নীলাম্বরকে শুদ্ধ উঠিয়া জুড়ির গানের সঙ্গে যোগ দিয়া ওরে পুত্র নীলাম্বর বলিয়া চীৎকার শব্দে গান গাহিতে শুনিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি বৎসরখানেকের মধ্যেই পাশের বাড়ীতে আমার বন্ধু শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর পিতৃগৃহে সখের দলের অভিনীত নরমেধ-যজ্ঞ দেখিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিয়াছি, আমার অভিজ্ঞতা তখন ওই পর্য্যন্ত।

ষ্টারের এই সুবিখ্যাত অভিনয় দেখিয়া অপরিচিত বিস্ময়-পুলকে মন যেন ভরিয়া উঠিল।

মাকে বলিলাম, "সাহেবের অভিনয় কিন্তু ও লোকটা বড্ড ভাল করেছে, না, মা?"

মা বলিলেন, "ও বোধ হচ্ছে যেন অমত্ত কাকা।"

"সে আবার কে মা?"

মা বলিলেন, "তরুবালা, বিবাহ-বিভ্রাট—এই সব যার লেখা রে!—"

এক জন লেখক আমাদের চোখে তখন এক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের চাইতে কম নয়। বিস্মিত হইলাম, মা'র কাকা ত বেশ লেখেন!

আমার মাতামহের লেখা "পারিজাত হরণ", "সতী কি কলঙ্কিনী" "গাইকোয়ার" প্রভৃতি পূর্ব্বকালে থিয়েটারে অভিনীত হইত। ইদানীং বইগুলি পড়া ছিল, তার গান আমাদের দুই একটা খুব ভাল লাগিত, সেই সব ভাবিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"হ্যাঁ মা! অম্রত বোস তোমার কাকা কি ক'রে হবেন? ওঁরা ত কায়স্থ?"

মা বলিলেন, "বাবার বন্ধু, আমাদের ছেলেবেলায় বড্ড ভাল-বাসতেন, সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী থাকতেন, তাই আমাদের নিজের কাকাই হয়ে গেছলেন।"

বিদায়কালে সেজদাদাবাবুর সঙ্গে অমৃতবাবু আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিলেন। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ—কথার শেষ হয় না। কত বিষয়েরই কত কথা! আমার অজানা বা নামজানা লোকেদের অতীত কথা সেই মধ্যরাত্রিতে দাঁড়াইয়া শোনা ভাল লাগিতেছিল না, মা'র অঞ্চলে ঈষৎ টান দিলাম। দেখিতে পাইলেন। বলিলেন,—

"কি গো নাতনী! তোমার কি একলারই মা না কি?—দখল করতে দিয়ে রেখেছি, তাই এত জোর দেখাচ্ছিস, না? মাকে জিজ্ঞেস কর ত ভাই, কার অধিকার আগে? হ্যাঁ মা! বল ত? না, হাসি না, বলতে হবে! ওর কাছে আমি হারবো না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমারই—"

সেই প্রথম পরিচয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেবটিকে মনে ধরলো? এই বুড় দাদাটিকে?"

আমি বলিলাম, "আমি সাহেব-ভক্ত নই, অভাব ছিল একটি দাদারই, দাদা পাওয়াকেই লাভ বোধ করছি।"

কয়দিন পরে বিবাহ-বিভ্রাট দেখিতে গিয়া বৌদিদিকে (তাঁহার স্ত্রী) দেখিলাম। মেয়েরাও আসিয়াছিল। সে

দিনও অভিনয়-শেষে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। আমার বাবার কথা আর বলিয়া শেষ হয় না!

অনেক দিন দেখা হয় নাই। বছর তের চৌদ্দ আগে কাশীতে আমাদের অসির বাড়ীতে এক দিন হঠাৎ আমার মা'র নাম ধরিয়া কে ডাকিল। আশ্চর্য্য হইয়া আমরা দেখিতে গেলাম।

আমার দুইটি উপযুক্ত ভাই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। মা বাবা শোকে মুহ্যমান হইয়া আছেন, যিনি আসিলেন, তিনিও দুইটি কন্যাহারা। অনেকক্ষণের অশ্রু-বিনিময়ের পর আহারাদি করিয়া বৈকালে ফিরিয়া গেলেন। দশাশ্বমেধের কাছে বাসা লইয়াছেন, কলিকাতায় ফেরার ইচ্ছা নাই, বৌদিদিও সঙ্গে।

প্রায়ই আসা-যাওয়া চলিত। আমার 'পোষ্যপুত্র' 'মন্ত্রশক্তি' ড্রামাটাইজ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, 'এ আমায় করতেই হবে।' আমার দিদির লেখা আমি থাকতে আর কেউ করবে, সে হ'তে পারে না,—(অবশ্য এটি ঘটিয়া উঠে নাই, এবং তিনি থাকিতে আর কেহও করেন নাই, তাঁর মৃত্যুর পর অন্যের দ্বারা হইবার উপক্রম হইয়াছে)।

আমার 'বিদ্যারণ্য' নাটকখানা সেই সময়ের লেখা, দেখাইলে বলিলেন, "পড় ত ভাই, শুয়ে শুয়ে শুনি।"

আগাগোড়া পড়িলাম, মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। শেষকালে বলিলেন,—

"দিদি! তোমার নাটকের ভাষা চমৎকার হয়েছে! ভাব ত ভালই,—কিন্তু ক'জন মহামহোপাধ্যায় দর্শক অভিনয় দেখতে আসবে? থিয়েটারের ঠিক উপযোগী হয় নি, ওকে ভেঙ্গেচুরে গড়তে পারলে তবেই চলবে। আচ্ছা, আমি একবার দেখবো, তুমি ওটা আমায় দিয়ে যাও।"

কম বয়সে নিজের লেখার উপর মমতা প্রায় সন্তানের মতই অসীম থাকে, উহার ছেলের গায়ে ছুরী চালানোর মতই এদের গায়েও অন্যের কলম চালানো পছন্দ হয় না, আমারও হয় নাই। আমি বলিলাম, "তা হ'লে এটা থাক্, আর একটা তখন লিখবো।"

• কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছিলাম, কিন্তু অভিনয়ের জন্য আর বলি নাই। তবে বিদ্যারণ্যই তাঁর আগ্রহে তাঁহাকে দিয়া আসিতে হইল।

আমার মাকে দেখিলে কি আনন্দই যে করিতেন, মনে হইত না যে, মা'র সত্যকার কাকা নন! এক দিন বলিলেন,—

"মা, তোমার বিয়ের দিন তোমার শ্বশুরের কাছে কি বকুনিই খেয়েছিলুম! উঃ, সে মনে করলেও আজও লজ্জায় ম'রে যাই। যেমন ধবলগিরির মতই রক্তাকল্লোজ্জ্বল মূর্ত্তি, আর তেমনই প্রদীপ্ত ভাস্করের মত তেজ!"

বকুনি খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া উত্তর দিলেন,—

"এই স্বভাবের দোষে! কথাবার্ত্তায় হয় ত একটু মত্ততা প্রকাশ হয়ে প'ড়ে থাকবে, কাছে এসে বল্লেন, 'দেখ বাপু! তোমার কথা শুনে তোমায় বেশ শিক্ষিত ছেলেই বোধ হইতেছিল, কিন্তু ছিঃ, এ রোগে ধরেছে কেন?' লজ্জায় ম'রে গেলুম মা! এক ছুটে পালিয়ে গেলুম।"

শিশুর মত সরলভাবে এমন করিয়া কয় জন বলিতে পারে? বাবার সঙ্গে নানা বিষয়েরই আলোচনা হইত। বাবা বলিতেন, লোকটিকে থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট ব'লে মনেই হ'তে পারে না। যেমনই ভদ্র, তেমনই পণ্ডিত। কথা কয়ে বড়ই সুখ হয়।"

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে কাশীবাস সঙ্কল্প ছাড়িয়া কলিকাতা ফিরিলেন, যাওয়ার পূর্ব্বদিনে আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন,—

"বিশ্বনাথ তাড়িয়ে দিলেন, দিদি! আবার ওই করতে চল্লুম! বড় সুখে ক'মাস ছিলুম। যাই হোক্, তোমায় আর ভুলতে পারবো না, একবার লিচু খেতে তোমার কাছে যেতেই হবে, কি বল? যাই যদি ত 'বুড়োটা' কোত্থেকে এল, ব'লে তাড়িয়ে দেবে না ত?"

নিমন্ত্রণ সাগ্রহেই করিলাম, এবং যথাকালে লিচুও পাঠাইয়া দিলাম। উত্তরে যে পত্র পাইয়াছিলাম, এখানে তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দিদি—

তোমার প্রথম পত্র পাই নাই, পরের খানি পাইয়াছি। ১ম খানি প্রাপ্তির সময়ে আমি অসুস্থ ছিলাম (স্নায়বীয় অবসাদে প্রায় ৩ সপ্তাহ) ২য় খানি লিচু আনিয়াছিল। মজঃফরপুরের কণ্টকিতকলেবর সুন্দরীরা ঝাঁপির অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকায় কিছু মলিন হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর বেশ সাদা, সরস ও সুমিষ্ট—আনন্দে খাইয়াছি ও বিলাইয়াছি।

আমার তৃতীয় পুত্রটি ১৩ দিন শয্যাগত * * * বিশ্বনাথ আমাকে আবার সংসারারণ্যে পাঠাইয়া এই বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন।

থিয়েটারের পক্ষে এটা বড় বদ সময়, তোমার বিদ্যারণ্যের পাণ্ডুলিপি আমি রাখিয়া দিয়াছি, সিজনে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিব, এখন দিলে ভাসিয়া যাইবে। * * আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। যে তস্কর আমার নাতিনীকে হরণ করিয়া দূরে মজফঃরপুরে রাখিয়া দিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তোমার মাকে তাঁর নাম কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, তাই পত্র বরাবর তোমার নামেই পাঠাইতে হইতেছে, কোন সময় সেই উকীল বাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিও। * * মানসীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত আমার পূর্ব্বস্মৃতি বাহির হইতেছে (বৈশাখ হইতে), তাহাতে নগেনের কথা থাকিবে, সুতরাং তোমার মাকে লিখিয়া যদি তার একখানা ফটো পাঠাইতে পার ত ব্লক করিয়া চিত্র প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার বুড়োদাদা।"

তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। বিগত ১৩৩৩ সালের ৪ঠা চৈত্র দোলের সময় মজঃফরপুর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে এখানে আসিলে আমার স্বামীর সহিত তাঁহার আলাপ এবং হৃদ্যতা জন্মে। এক জন বাহিরের সদালাপী ভদ্রলোকের মত নয়, দাদাশ্বশুরের সঙ্গে তাঁর নাত-জামাইয়ের যেমন হওয়া সম্ভবপর, তেমনই।

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নানা বিষয়, বিশেষতঃ সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা চলিত, মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বকথা, পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও আসিয়া পড়িত। সময় অল্প, উভয় পক্ষেই উঠিবার তাড়া থাকিত না।

অপর পাঁচ জনে কর্ত্তব্যের খাতির স্মরণ করাইয়া দিয়া বার বার তাগিদ দিলে তবেই উঠিয়া পড়িতে হইত।

প্রথম দেখা হইলে আমার পিতৃদেবের বিয়োগজন্ত সত্যকারের প্রাণের কান্নাই কাঁদিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন,—

"আমার সোনার প্রতিমা মায়ের যে আবার এমন মূর্ত্তিও আমায় বেঁচে থেকে দেখতে হবে, তা ত কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। মা'র দিকে আর আমি চাইতেও পারি না, অথচ সে বেশী দিন আমার কাছে না গেলেও প্রাণ ছটফট করে।"

বলিলেন, "তোমার বাবার মত লোক আমি দেখিনি। ভূদেব-তনয় কোন কোন বিষয়ে যেন তাঁর পিতাকেও অতিক্রম করে-ছিলেন! কি সারল্যে, কি মহত্বে, কি ত্যাগে, কি পাণ্ডিত্যে, কি উদারতায় ক'জন অমন জন্মায়! তোরা ত সার্থক হয়েছিস্ দিদি! আমিও তাঁকে আপনার বলতে পেরে নিজের জন্ম সফল বোধ করি।"

বাস্তবিকই তিনি আমাদের এতটাই আপন মনে করিতেন! এই উদারতার শিক্ষা, যে শিক্ষায় মানুষকে 'বসুধৈব কুটুম্বকং, শিখিতে শেখায়, সেই শিক্ষাই এ দেশের বিশেষত্ব ছিল, সে শিক্ষা এ কালে আর দেখিতে পাই না। এখন অমন করিয়া পরকে আপন করিতে কয় জন পারে? আপনাকে পর বরং সর্ব্বদাই করিতে দেখি।

মজঃফরপুর সম্মেলনের শেষ দিনে এখানকার কাঁঠিকুঠীর অধিকারী আমাদের সহিত আত্মীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতা হইতে আগত ভদ্রলোকদের তাঁর কুঠীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বেলা নয়টার সময় আমার স্বামী আসিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা এখানে খাবেন, জানো?"

আমি জানিতাম না, সেই দিন কাঁঠির নিমন্ত্রণ সারিয়া তাঁদের কলিকাতায় ফেরার কথা। সে কথা জানাইলে বলিলেন,—

"তিনি ত তা' বল্লেন না, ওদের বলেছিলেন, আমি যেতে পারবো না, আমার দিদির ওখানে খেতেই হবে, না হ'লে দুটো কথা কইবার সময় পাবো কখন্?"

তাড়াতাড়ি উদ্যোগ করিয়া ফেলিলাম। আহারে বসিয়া তৃপ্তির সীমা নাই!

"এমন মাছের রোষ্ট যে এখানে পাবো, তা ভাবিনি!—আচ্ছা দিদি! এর মধ্যে এত কি ক'রে হলো ভাই?"

অসি মামা (তাঁর ছেলে) বলিলেন, "তুমি যে এমন রাঁধতে পারো, তা' জানতুম না, আমি যার ভয়ে সে দিন তোমার বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেই আসিনি। আমি বলি, অত বই লেখ, না জানি কি রকমই বা হবে।"

অত্যন্ত রাগ করিলেন,। বলিলেন, "ওর মাকে অত দেখিস্, তবু তোর ভয় হলো!"

আমি বলিলাম, "এ যেন ভাল লাগছে না, এলেন ত দুদিন থেকে যান, গল্পসল্প একটু করি।"

অসি মামাকে বলিলেন, "ঐ শোন! তক্ষনি ত তোকে বল্লুম, আমার রিটার্ণ টিকিট কেন করলি, দিদি কি আমাকে ছাড়তে চাইবে। যা, তোরা ফিরে যা, আমি যাবো না।"

মামা বলিলেন, "টিকিটটা নষ্ট হবে?" উত্তর দিলেন, "হোক্ গে, যেমন তোদের বুদ্ধি! জানিস এখানে আমার দিদি আছে, এ কি অন্য যায়গার মত যে গেলুম আর চ'লে এলুম। আমারও এত শীঘ্র এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

শেষকালে অসুস্থতার দোহাই দিয়া অসি মামা অনেক করিয়া বুঝাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কথা রহিল, লিচু খাইতে আসিবেন। কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরেই আমি কেদার-বদরীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া লিচুর সময় কাটাইয়া ফেরায়, আসা আর ঘটে নাই।

ফিরিয়া গিয়া এই পত্রখানি লেখেন;—

"ভায়া—

ভাবছো, বুড়োটা কি নেমকহারাম, গাণ্ডে পিণ্ডে পাঁঠা-ভাত খেয়ে গেল আর বাড়ী ফিরে একটা ঢেকুর তুলেও খবরটা দিলে না। আদত কথা "How do you do" সম্বন্ধে আমি একেবারে সাহেব, কালা বাঙ্গালীর মত শরীর খারাপ "হেন হয়েছে তেন হয়েছে" বলতে আমার লজ্জা করে, কিন্তু এবার ফিরে এসে পূরো চব্বিশটি দিন গৃহরূপ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছতি হয়েছিল।

তোমাদের ভুলে যাবার যো আমার একবারেই নেই; তোমার শাশুড়ীর পিসীমা, তাঁর ৫ ভাই, পিসতুতো ভাই কালী দাদা আর আমাকে নিয়ে সাত ভাইকে এক-সঙ্গে বসিয়ে ভাইফোঁটা দিতেন।

আচ্ছা, অনুরূপা না অণুরূপা? * * * *

শরীরের জন্য আমার প্রাত্যহিক পড়াও প্রায় বন্ধ, লেখাও তদ্রূপ, তাই অণুর বই এখনো পড়তে পারিনি, শীগ্‌গির ধরবো।"

সেই বৎসর বিজয়ার পর লেখেন—

"* * * * আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিও—জাতে ব্রাহ্মণ না হলেও তোমার মায়ের পরিবারের স্নেহসম্পর্কের বন্ধনে এবং তোমার মা ও তোমাদের সবাইকার ভালবাসার জোরে এই সুদীর্ঘ জীবনের দাবীতে এ অধিকার আমার হয়েছে বলেই আমি মনে করি।"—

তাঁর স্ত্রীকে দিদিমা না বলিয়া আমরা বৌদিদি বলিতাম। আমাদের ছোটরা তাঁকে বলিত লেডী বোস।

গতবৎসর তিনি আমার মা'র কাছে কাশীতে আসিয়া মাস দুই ছিলেন। নিজের দুই মেয়েই গত হওয়ায় তাঁর উপর স্নেহটা প্রচুররূপেই পড়িয়াছিল। স্বামীর উপর রাগ অভিমান হইলেই বলেন, "আমি আমার মেয়ের কাছে চ'লে যাবো।" সেবার জিদ করিয়াই চলিয়া আসেন। ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না।—

তাঁকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার জন্ম রাম-নবমীর দিনে, তাই হয় ত রামের মতই আমিও আমার সীতাদেবীর মনে দুঃখ দিয়ে আসচি!"

উপমাটি কালিদাসের মত না হইলেও কবিত্বটি উপভোগ্য। আমাদের প্রতি তাঁর যে কতখানি ও কিরূপ অগাধ স্নেহ ছিল, সে কথা যাঁরা তাঁর নৈহাটীর ও মজঃফরপুরের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁরাই জানেন। আমি আর তার পরিমাপ বা পরিমাণ কিরূপে স্থির করিয়া জানাইব। বলিতে গেলে তাহার যেন সীমা ছিল না।

তাঁর একটা কি রচনায় (মাসিক বসুমতীতে) এক স্থানে দেখিলাম, "এ কি সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদা অনুরূপা"—না ঠিক এমনই কি একটা কথা লিখিয়াছেন ! রাগ করিলাম। লিখিলাম—

"মূর্ত্তিপূজা তোমারই সার্থক হয়েছে ! 'অণোরণীয়ান্'কে 'মহতো মহীয়ান্'রূপে এই যে দেখতে শিখেছ এবং তাঁকে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এটা কি তোমার মত সবাই অ্যাপ্রিসেয়েট করছে, তোমার আদুরে নাতনী তোমার চোখে সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদা হ'তে পারে—লোকে যে হাসবে !"—

উত্তর দিলেন, "দেবি প্রসীদ ! সহসা ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করলে হৃৎকম্পে এই বুড়ো দেহ কম্পিত হ'তে থাকে যে। হ্যাঁ ভাই, অত যে চটলি, তা আমার নিজের চোখ ছাড়া আমি পরের চোখ ধার পাই কোথায় বল ত? বলিস্ ত না হয় আমার নাতজামাইএর পদ্মচক্ষু দুটি একবারটি ধার চেয়ে নিয়ে তাই দিয়েই না হয় আমার স্নেহের প্রতিমাটিকে আরও ভাল ক'রে দেখি।"

লিখিবার কত আছে, বলিবার কত আছে, সব কথাই সাধারণের নয়,—বিশেষতঃ দাদা-নাতনীর স্নেহাভিব্যক্তি একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার—বিশেষতঃ বর্ত্তমানযুগে ! তথাপি পাঁচ জনে যখন আমাদের সম্পর্কের ও বন্ধনের সংবাদটা রাখেন ও ভাল করিয়া সেটা জানিতে ইচ্ছুক, তখন তাঁদেরও কিছু ভাগ করিয়া দিলাম। কিন্তু যেটা দেওয়া যায় না, জানানো যায় না—শুধু নিজের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে, সেটুকু আমার নিজস্বই রহিয়া গেল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
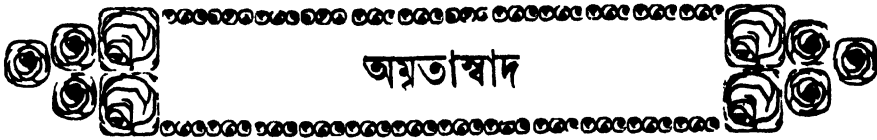
অমৃতাস্বাদ

রসরাজ অমৃতলাল বসু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার কোন দাবীই আমার নাই ; কারণ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেছিল আমার কয়েক দিন মাত্র। তখন আমি কাশীতে।

সে বোধ করি বারো বৎসর পূর্ব্বের কথা,—তিনি কাশীতে এসে কয়েক মাস কাটান,—শরীর ও মন তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না।

পূর্ব্বে তাঁকে যে দেখিনি, তা নয়,—সে দেখা রঙ্গমঞ্চে,—বিভিন্ন ভূমিকায়। তাতে ঠিক মানুষটিকে পাওয়া হয়নি, তাঁর অভিনয়-দক্ষতা ও রস-দাক্ষিণ্যই উপভোগ করা হয়েছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গের দেশব্যাপী বিক্ষোভের সময় তাঁকেও চঞ্চল করেছিল। স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে জন-সভায়, যাঁরা দেশের অবস্থা ও কর্ত্তব্য বুঝিয়ে বেড়াবার ভার নিয়েছিলেন, তিনিও তাঁদের মধ্যে এক জন না হয়ে থাকতে পারেন নি। তিনি আসছেন শুনে আলোমবাজারে বহু জনসমাগম হয়, আমিও উপস্থিত হই।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ধীর সুমিষ্ট কণ্ঠে দেশের অবস্থা ও দেশের লোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবার পর এই ধপ্‌ধপে লোকটির যুবা-কণ্ঠের আন্তরিক উচ্ছ্বাস—ভাষার সরস আচ্ছাদনে, সকলের অন্তরেই দারুণ অপমানের সাড়া জাগিয়ে প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ক'রে দিয়েছিল। কর্জ্জনের তর্জ্জন-গর্জ্জনসহ আমাদের বিসর্জ্জন-ব্যবস্থার একমাত্র জবাব যে বিলাতীবর্জ্জন এবং তাহাই যে তাহাকে পুনরর্জ্জনের একমাত্র উপায়, এই কথাটাই তাঁর শেষ কথা ছিল।

আমি কেবল লক্ষ্য করছিলুম তাঁর কথাগুলি। তারা যেন উৎস-মুখ হতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ;—চিন্তা-চেষ্টা-চর্চ্চার ধার ধারে না ! নিরর্থক প্রয়োগও নাই। হারের মাঝে মাঝে তারা যেন মূল্যবান্ মতির মত স্থান নিচ্ছে,—কাষের কথাটাকেও হাস্যজ্যোতি দিয়ে উজ্জ্বল ক'রে দিচ্ছে !

বুঝলুম—এ ক্ষমতা অমৃতবাবুর সহজ ও স্বাভাবিক। লিখতে ব'সে লোক শব্দ-চয়নের সময় পেতে পারে, কিন্তু জন-বহুল সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে তা সম্ভবই নয়।

তাঁর 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু' প্রভৃতি প্রহসনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, বক্তৃতার পরিচয় এই প্রথম পাই।

কথাবার্ত্তার পরিচয় কাশীতে।

যে তামাকের দোকানও করে, তারও একটা সুবিধে আছে (গর্ব্বও থাকতে পারে), অনেককেই তার কাছে যেতে হয়,—লোক নিজের গরজে দেখা দেয়—কথা কয়। সৌখীন নামী লোকেও।

আমার কোন সুযোগই ছিল না—গায় পড়া ছাড়া।

ইচ্ছা ছিল, কেন তা জানি না। বোধ হয় বড়র বা গুণীর আকর্ষণ। কিন্তু তফাৎ যে ঢের!

কাশী এসে—একান্তই ত ভাল,—আর কেন? ইচ্ছা তবু ছাড়ে না!

নিত্যই তাঁকে দেখতে পেতুম গঙ্গার ঘাটে, শীতলা-মন্দিরে, কালীতলায়—বন্দনাসহ ভক্তিনত হয়ে প্রণাম করতে। সিঁদুর-মাখানো গাছটি পর্য্যন্ত বাদ যেত না, সুতরাং বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাদির দর্শন-বন্দন যে নিত্যই ছিল, সেটা অনায়াসেই অনুমান ক'রে নেওয়া চলে।

রাজধানীর বাসিন্দে, বয়স হলেও বাবু লোক; সেকেলে সংস্কার আর পৈতৃক দেবতাদের আজো বিদায় করেন নি দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য হ'ত।

বৈকালে তাঁকে একলা দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে যেতে দেখে, এক দিন আর থাকতে পারলুম না। কাছাকাছি,—ক্রমে পাশাপাশি হয়ে, তখন আর কথা খুঁজে পাই না! সামলে ভেবে নেবার পথও নেই,—তিনি আমার দিকে চেয়ে ফেলেছেন। আমি—now or neverএর অবস্থায় প'ড়ে মূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম—"কাশী আপনার কেমন লাগছে?"

তিনিও ব'লে ফেললেন—"কাশী ত হিঁদুর মন্দ লাগবার যায়গা নয়।"

আমি বিপদে প'ড়ে বললুম—"তা হ'লে যে হিঁদুর ডেফিনেশন্ দরকার হয়।"

"হ্যাঁ—খুব সোজা। বে-গড়া হিঁদু বা প্রমোসন্ পাওয়া হিঁদুর কথা আমি বলিনি, বিশ্বাসী হিঁদুর কথাই বলেছি। আপনাকে যে চিনলুম না।"

"চেনবার বা চেনাবার মত কিছুই নেই। সে মুস্কিল আপনাদের,—সকলেই চেনে; সুতরাং কায না থাকলেও লোকে আত্মপ্রসাদ লাভের জন্যেও বিরক্ত করে। আমি তাদেরই এক জন।"

"বাঃ, আপনি ত বেশ জবাব দিয়েছেন! এখানে কি করা হয়?"

"কিছুই করি না—বাস করি মাত্র। কাশীখণ্ড—কিছু করবার পথেও কাঁটা দিয়ে রেখেছেন। অন্যত্রের পাপ কাশীতে ক্ষয় হয়, কিন্তু কাশীর পাপ না কি অক্ষয়, একেবারে চিতের চামড়া।"

তিনি আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,—এ দিকে নিত্য আসেন ত? আমি এই অহল্যাঘাটেই ঘণ্টা-খানেক বসি। এ আমার পুরানো যায়গা,—পূর্ব্বেও এসেছি।"

"তা আমি জানি।"

"কি ক'রে?"

"বিপিন গুপ্ত মশাই আপনার কাছে শুনে বোধ হয় যেন 'মানসীতে' লিখেছিলেন।"

"আপনার দেখছি এ সবও দেখা আছে! তবে যে বলছিলেন—কিছু করেন না।"

"ওটা—সময় কাটাবার জন্যে।"

ইত্যাদি অনেক কথার পর একত্রই ওঠা গেল। সে সব কথার মধ্যে তাঁর প্রশ্ন আর আমার উত্তরই বেশী।

তাঁর কথা লিখতে ব'সে নিজের কথাই বেড়ে যাচ্ছে এবং যাবেও। সেটা রীতিবিরুদ্ধ হলেও আমার উপায়ান্তর নাই। এক জন সুপরিচিত ও এক জন অপরিচিতের প্রথম পরিচয়ে জবাবদিহিটা অপরিচিতের ঘাড়েই পড়ে। শুনতে গিয়ে শোনাতেই হয় বেশী।

এক দিন তাঁর 'খাসদখল' নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই-খানাই তাঁর সে সময়ের শেষ রচনা। শরীর ভালো থাকছিল না, বললেন—"এবার ওই পর্য্যন্তই হ'ল।"

বললুম,—"আপনার কাছে যে একটা বড় পাওনা রয়েছে।"

তিনি আমার দিকে অবাক্ হয়ে চাইলেন। বললুম,—"আপনার জন্ম কর্ম্ম—রাজধানীর সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে; বনেদী বাবু থেকে মধ্যবিত্ত কেরাণী, কারবারী ইতর ভদ্র সবই দেখার মত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। ধর্ম্মে কর্ম্মে, সভ্যতায়, আচারে, বিচারে, ব্যবহারে, তাদেব বিবর্ত্তনগুলো আপনার চোখের উপরই ঘটেছে। এই ৫০।৬০ বছরের পাওনাটা যে পেতে ইচ্ছে হয়।"

"কেনো—কিছু কি দিইনি?"

"প্রহসনে অনেক ইঙ্গিত করেছেন বটে;—আপনার হাত থেকে দু'তিনখানা সামাজিক নাটক পেলে, বোধ হয় যেন খাঁটি জিনিষ পেতুম।"

"দেখ, এলিমেণ্ট (প্রকৃতি) অপরাজেয়, তাকে ঠেলে কিছু করতে গেলে ভেসে যেতে হয়। তাই ও চেষ্টা পাইনি।"

"কেন—তরুবালা……"

"লক্ষ্য ক'রে থাকবেন,তাতেও নিজের দিক্‌টাই বার বার ফুটতে চেয়েছে। যার যা আছে—সে তাই দিতে পারে। যা নেই—তা আমদানী ক'রে বাণীর ভাণ্ডার ভুষির আড়োৎ হয়ে দাঁড়াছে।"

"কিন্তু আপনার 'তরুবালায়' এমন সব lines আছে, যা অমূল্য।"

আক্ষেপের সুরে বললেন—"তা কয় জনই বা লক্ষ্য করে! আপনার দেখছি……"

"শুনেছি, আপনি ডিক্‌টেট ক'রে……"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন; তা না ত পেরে উঠি না,—মা ষষ্ঠী যে চৌষট্টিতে এনে ফেলেছেন!"

"তাতে, আজকাল যে আর্টের কথা উঠেছে, তার দিকে নজর থাকে কি?"

"ওটার মানে বুঝি না বলেই ও বালাই আমার নেই।"

তাঁকে বড় বড়রা অনেকেই চাইতেন, ঘিরেও থাকতেন। তাঁকে পেলেই মজলিস্ গুলজার, মানুষ আনন্দই চায়। তাই পাঁচ সাত দিন অন্তর সুবিধামত দেখা হয়ে যেত। সেটা তিনি বুঝতেন।

তিনি সকল মজলিস্‌কেই সহজে হাস্যমুখর ক'রে তুলতেন,—অথচ সকল কথাতেই চাবুক্ থাকতো,—সেটা হাসিমুখেই সকলে হজম কোরত। কষ ফেলে রসই উপভোগ করত। হাসির প্রচ্ছদের মধ্যে বলতে কিছুই বাকি রাখতেন না। দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া, আবার তাই দিয়েই খুসি ক'রে দেওয়া,—এ ক্ষমতা বড়ই বিরল। অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন,—তাঁর 'খাস দখল' যাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা, তার অভিনয় দেখতে তাঁরাই আসতেন বেশী এবং বার বার।

শুনেছি, সেকালে এরূপ সরস বক্তা রাজাদের বা বড় লোকদের সভায় থাকতেন—সমাদরও পেতেন। তাঁরা লেখক ছিলেন না,তাই আমরা তাঁদের দান থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

অধুনা সেরূপ লোক জন্মালেও ফোটবার অবকাশ নেই—জীবিকার চিন্তায় তাঁরা জেরবার। সব রস তাতেই শুকিয়ে যায়। তাই মনে হয়—রসরাজ আমাদের 'Lay of the last minstrel' শুনিয়ে এবং দিয়ে গেলেন।

রাজা বা ধনী অনেককে অনেক কিছু দিতে পারেন, কিন্তু লোকের হৃদয়ে আনন্দ আর মুখে হাসি দেবার লোক দুর্লভ। অমৃত বাবু সেই দুর্লভ লোকের মধ্যে বিশিষ্ট এক জন ছিলেন।

তাঁর তিরোধানে আমরা বাঙ্গালার রস-সাহিত্যের রসরাজ খোয়ালুম; উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আনন্দ-মুখর যোগসূত্র ছিন্ন হ'ল।

আমার সঙ্গে তাঁর যা একটু ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, তা আমার "কাশীর কিঞ্চিৎ" নিয়ে—শ'-পাঁচ আনার একখানি বন্ধনহীন চটি বই। লেখকের নামটা 'নন্দিশর্ম্মা' বলেই ছিল। তিনি এখন কাশীতে উপস্থিত, প্রথমেই তার একখানি তাঁকে উপহার দেই। তাঁর বড় ভালো লেগেছিল, তাই সে সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় আমাকে একখানি পত্র দেন। অনেক কথাই হয়, সে সব বাদ না দিলে 'বিজ্ঞাপন' হয়ে দাঁড়ায়। একটা কথার জন্যে উল্লেখ করতেই হ'ল—সেটা তাঁর 'অসত্যের' আতঙ্ক।

দু'দিন পরে দেখা হওয়ায় ব্যগ্রভাবে বললেন,—"আমি আপনাকে খুঁজছি, বাসা জান্‌লে গিয়ে পড়তুম। বই-খানায় নাম না দিয়ে আপনি আমাকে বড়ই বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সকলেই ঠাউরেছে—আমি লিখেছি। পরিচিত প্রবীণরা মৃদু হাস্যে আপ্যায়িত ক'রে বলছেন—"যা হোক্—কারুকে আর বাদ দেন নি, খুব ঠিক হয়েছে কিন্তু।" এতো বলচি—আমার লেখা নয়, কেউ বিশ্বাসই করেন না। পথে ঘাটে এ আমার একটা কায হয়ে দাঁড়িয়েছে! আপনি হাণ্ডবিলে নামটা প্রকাশ ক'রে দিন, না হয় অনুমতি দিন নামটা বলবার। কাশীতে মিথ্যাচার হ'তে রক্ষা করুন। জেনে শুনে নামটা না বলাও যে মিথ্যাচার। বইখানা ভারি একটা আন্দোলন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে দেখছি,—ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত আমার দিকে আঙ্গুল বাড়ায়। আপনার পাওনাটা আমি কেনো চুপ ক'রে চুরি করি।"

বললুম—"আমার ভাগ্যে একবার যদি অমৃত বাবু হওয়াই ঘটে, তা থেকেই বা আমাকে বঞ্চিত করা কেনো?"

তার পর লেখা নিয়ে আর আমি যে পূর্ব্বে বলেছিলুম কিছুই করি না—তাই নিয়ে অনেক কথা।

বললেন—"আজ আবার বড় বড়দের উপরোধ আছে, মুখুয্যে মশায়ের বৈঠকে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' নিজে প'ড়ে শোনাতে হবে। অনেক মিথ্যা অভিনয় করেছি,—এটা আর পারব না।"

শেষ রফা হ'ল,—"বিশেষ প্রয়োজনে নাম বলতে পারেন। আমাকে কেউ চিনবে না।"

কাশীতে মিথ্যাচারের ভয়ে তিনি এতই বিচলিত হয়েছিলেন।

গত বৎসর (বোধ করি আষাঢ় মাসে), আমি তাঁকে আমার 'কবলুতি' ব'লে বইখানি উৎসর্গ করি। পাঠান্তে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। তার মধ্যে 'পেনসনের পর' ব'লে চিত্রটি আর 'ছাতু, ব'লে রচনাটি তাঁর বড়ই ভালো লেগেছিল ;—শুনেছি, তিনি দশের কাছে ওই দুইটির প্রশংসা উচ্ছ্বসিতভাবেই করতেন। তাই থেকেই বুঝা যায়, তিনি মনে প্রাণে দেশকে কি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ওই দু'টি লেখার মধ্যে তিনি সমাজের দু' একটি প্রতীকারসাপেক্ষ বিষয়ে আমার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং তারাও তাঁর অনুমোদন পেয়েছিল। দেশের বা সমাজের দরকারি কথা তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না।

অসুস্থ হয়ে কয়েক দিন বাসায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। যিনি দেখতে যেতেন, দু'চার কথার পর বলতেন —"একটা গল্প বলুন শুনি।"

"আমরা কি গল্প বলবো" বললে বলতেন,—"যে কোনো গল্প—যা জানেন বলুন। ঠাকুমার কাছে গল্প শোনেননি ?" ঠিক্ যেন বালকের প্রার্থনা! ভাবতুম—এর মানে কি ? শেষ বুঝেছিলুম,—কারো কাছ থেকে যদি একটাও নেবার মত কিছু পান। মাথায় তাঁর সর্ব্বদাই নতুন কিছু সংগ্রহের প্রয়াস, ও মনে লাগে ত তা থেকে সরস কিছু গ'ড়ে সাহিত্যে রেখে যাবার প্রয়াস তাঁর থাকতো। পাকা সাহিত্যিকদের নেশার মধ্যে এও একটি। আশ্চর্য্য এই যে, ৬৪ বছর বয়সেও এ প্রযত্ন তাঁর ছিল। তার পরও অনেক লিখেছেন। মাথার এই খাটুনি ৭৭ বছরেও সমানই ছিল। মৃত্যুই বিরাম এনে দিলে।

প্রার্থনা করি, তাঁর আত্মা এখন শান্তিলাভ করুক।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চির-তরুণ অমৃতলালের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঋজুদেহ শুভ্র কেশ, প্রকৃত বাঙ্গালী বেশ,
চিরহাস্যময় আস্য—না হেরিব আর।
বয়সেতে বৃদ্ধ জানি, তেজেতে যুবক মানি,
সারল্যে হৃদয়ে তব শিশুর বাহার ॥
কর্ম্মে কভু নহে ক্লান্ত, পরিশ্রম অবিশ্রান্ত,
চিন্তার সাগরে তুমি মগ্ন অবিরাম।
হাস্য সাথে শিক্ষাদাতা, নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠাতা,
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ তব সাধনার ধাম ॥
হাস্যরসে রসরাজ, নাট্যাচার্য্য নটরাজ,
সুবাগ্মী পণ্ডিত খ্যাতি বঙ্গের সমাজে।
সুনিপুণ, পারদর্শী, অভিনেতা মর্ম্মস্পর্শী,
সামাজিক সভ্যতায় সুনাম বিরাজে ॥

চরিত্র-চাতুর্য্য জ্ঞানী, আদর্শ বাঙ্গালী ধ্যানী,
সমাজের শিক্ষাদাতা রঙ্গনাট্য-মাঝে।
চৈত্রশেষে 'চিত্র' তব, যে কথা কহিত নব,
এখনও তা' সবাকার মর্ম্মে মর্ম্মে বাজে ॥
বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে, সুরেন্দ্রনাথের সনে,
বঙ্গবাসী তোমারেও রেখেছে স্মরণ।
যবে বন্যা-জল আসি, পূর্ব্ববঙ্গ ফেলে গ্রাসি,
অর্থ-ভিক্ষা করিয়াছ নাশিতে মরণ ॥
আজি তব লীলা ক্ষান্ত, অমৃতের বর্ষণান্ত,
শুষ্ক হ'ল সুধাধারা ঝরি' অবিরাম।
আজি বঙ্গে 'হায়' 'হায়', অমৃতের মৃতকায়,
শ্মশান-ঈশ্বর-তীরে লভিল বিরাম ॥

শ্রীসুধাংশুকুমার সান্ন্যাল।

সংশোধন

জোড়াসাঁকো হাফ আখড়াই সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, রসরাজ অমৃতলাল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে সঙ্গীত-সংগ্রামে কাঁসারীপাড়ার হাফ আখড়াই সম্প্রদায়ের প্রশ্নের উত্তরদাতৃরূপে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করিয়া জোড়াসাঁকোর হাফ আখড়াই সম্প্রদায়ের পক্ষে সেনাপতিত্ব করিয়া অনন্য-সাধারণ কৃতিত্বপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে জন্য জোড়াসাঁকো সম্প্রদায় রসরাজের প্রতিভার নিকট চির-ঋণী। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিষ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল।

ফ্যারাওর ধনাগার

সিনাই মালভূমির সন্নিকটে পেট্রানগর ছিল। কথিত আছে, সুপ্রাচীনযুগে এখানে ফ্যারাও নৃপতিদিগের ধনাগার ছিল

ফ্যারাওর ধনাগার

গত শতাব্দীতে এই লুপ্ত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপত্যকা-ভূমিতে এই ধনাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই অট্টালিকায় প্রাচীন যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, খৃষ্টজন্মের কিছু পূর্ব্বে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রাদুর্ভাবকালে এইখানে আসিবার জন্য রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর এই পথ ও অট্টালিকা পরিত্যক্ত হয়।

বিচিত্র নৌকা

জোসেফ লেপিক্ নামক জনৈক ব্যক্তি মিচিগানস্থিত কোল্ড-ওয়াটার নামক স্থানে একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই নৌকা ২৬ ফুট দীর্ঘ। এই নৌকার সাহায্যে আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জার্ম্মাণীতে গমন করিতে সঙ্কল্প

বিচিত্র নৌকা

করিয়াছেন। মিচিগান হ্রদে নৌকার গতিবেগ প্রভৃতির পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। নৌকা-নির্ম্মাতার সহিত আরও ৪ জন সমুদ্র-যাত্রা করিবেন।

মোটর-চালিত 'রোলার'

ইংলণ্ডে সম্প্রতি মোটরচালিত 'রোলার' নির্ম্মিত হইয়াছে। রোলারের অভ্যন্তরে এঞ্জিনটি এমনভাবে অবস্থিত যে, রোলার যখন তাড়িত-শক্তির দ্বারা আবর্ত্তিত হয়, তখন এঞ্জিন সমভাবেই সংলগ্ন থাকে, জল-বায়ুর দ্বারা উহার কোনরূপ ক্ষতি হয় না। এই গুরু-ভার রোলার-পরিচালনে বিন্দুমাত্র

মোটর-চালিত 'রোলার'
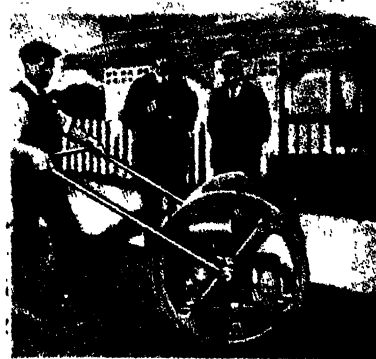
অসুবিধাও অনুভূত হয় না। ইচ্ছামত সকল দিকেই অনায়াসে রোলারটিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ৮ পাঁইট তৈল হইলেই সমস্ত দিন এই রোলার আবর্ত্তিত হইবে।

অভিনব যন্ত্র

জার্ম্মাণীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিবার ব্যবস্থা আছে ; একটি চক্রাকার আসনে কতিপয় ব্যক্তি
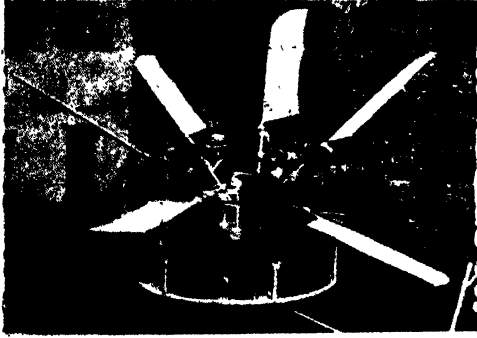
পক্ষযুক্ত আনন্দ-চক্র

উপবিষ্ট হইয়া কল চালাইয়া দিলেই আসনটি আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে একখানি করিয়া পাখা থাকে। বৈদ্যুতিক পাখাগুলি যেরূপভাবে নির্ম্মিত, এই পাখাগুলির আকার সেইরূপ। উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পাখা সঞ্চালিত করিতে থাকিলে সমগ্র আসনটি দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ইহাতে পাখীর ন্যায় উড্ডয়নের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

বিদ্যুৎ-পরিচালিত লাঙ্গল
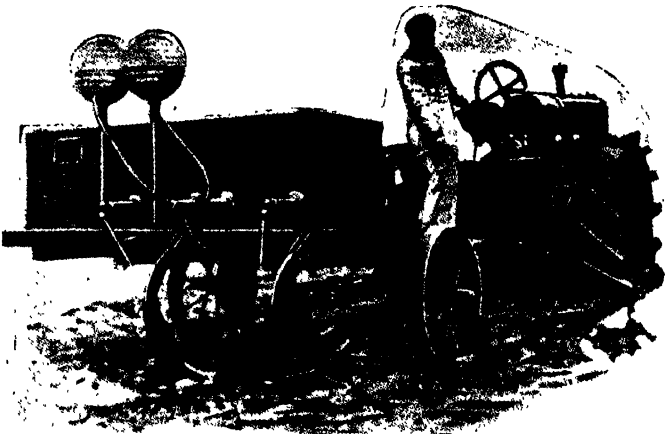
তাড়িতশক্তি-পরিচালিত লাঙ্গল

ইলিনয়ের কোন কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-পরিচালিত লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ-কার্য্য চলিতেছে। এ জন্য নূতন ধরণের লাঙ্গল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাড়িত-শক্তি দ্বারা পরিচালিত লাঙ্গলের দ্বারা কৃষিকার্য্য আরব্ধ হইলে মৃত্তিকাস্থিত দুষ্ট কীট-পতঙ্গাদি মরিয়া যায় এবং জমীর উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কৃত্রিম ফুসফুস্ ও কণ্ঠনালী

কৃত্রিম ফুসফুস্ ও কণ্ঠনালী

ফুসফুস্ ও কণ্ঠনালীর সাহায্যেই মানুষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। কৃত্রিম ফুসফুস্ ও কণ্ঠনালী সাহায্যেও স্বাভাবিক-ভাবে বাক্যালাপ করা যায়,ইহা সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের নল মুখে চাপিয়া ধরিয়া শব্দ উচ্চারণ করিলেই বক্তব্য কথাগুলি স্পষ্টভাবে এই কৃত্রিম ফুসফুস্ ও কণ্ঠনালীর মধ্য হইতে নির্গত হইতে থাকে।

ঘটিকা-যন্ত্রযুক্ত চৈনিক বর্ম্ম

চীনদেশে ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে সৈনিকের বর্ম্মে ঘটিকাযন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইত। নিউইয়র্কের কোনও ঘড়ী-নির্ম্মাতা এইরূপ একটি বর্ম্ম

ঘটিকা-যন্ত্রযুক্ত চৈনিক বর্ম্ম

সংগ্রহ করিয়াছে। বর্ম্মের মধ্যস্থলে একটি বিচিত্রদর্শন ঘটিকা-যন্ত্রের সমাবেশ আছে। ঘটিকায় এক হইতে দ্বাদশ সংখ্যা চীনা

দেবতার মূর্ত্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। যথা—আলোকের দেবতা, সূর্য্য-দেবতা ইত্যাদি। বর্ম্মের অভ্যন্তরে ঘটিকা-যন্ত্রের কল-কব্জাসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে।

জল-বিহার

অষ্ট্রীয়ায় জল-ক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন আছে। নৌকাকার জুতা পায় দিয়া নর-নারী দাঁড় লইয়া ড্যানিয়ুব নদ পারাপার হইয়া
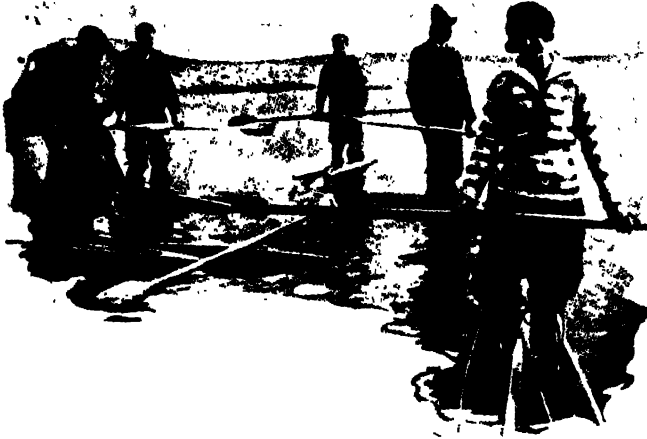
নৌকাকার জুতাসাহায্যে জলক্রীড়া

থাকে। এই জুতাগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, মানুষের ভারে উহা কখনই জলমগ্ন হয় না। এই জলক্রীড়ায় প্রচুর আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যে যত দ্রুত দাঁড় টানিতে পারে, সে তত শীঘ্র অগ্রসর হয়।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

রেডিও-তরঙ্গ যেভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, দৃষ্টিশক্তিও সেই তরঙ্গ-প্রবাহের ফলস্বরূপ, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিয়েনার জনৈক বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম চক্ষুর সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে সকল ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয়-সংক্রান্ত স্নায়ু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় নাই, তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। এই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাপ্রণালী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদিগের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে।

অন্ধের দৃষ্টিদান-প্রচেষ্টা

বিচিত্র ব্যবস্থা

মোটর-বিহারীরা তৈল ফুরাইলে কোনও তৈলাধারের নিকটে আসিয়া মোটরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ছিদ্রপথে মুদ্রা-নিক্ষেপে তৈলপ্রাপ্তি

সেই সময় যদি কোনও লোক তৈল সরবরাহের জন্য তৈলাধার-যন্ত্রের নিকট না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এ জন্য তৈলাধার-যন্ত্রে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রপথে অর্দ্ধ ডলার মুদ্রা নিক্ষেপ করিলেই আপনা হইতে তৈল উত্থিত হইবে। অবশ্য উক্ত মুদ্রার মূল্যের পরিমাণ তৈলই পাওয়া যাইবে। একখানা গাড়ীতে তৈল সংগৃহীত হইবার পরই উক্ত যন্ত্র আবার অন্য গাড়ীতে তৈল সরবরাহ করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একপায়া টেবল

একপায়া টেবল

চেয়ারে বসিয়া আহার, খেলা ও অধ্যয়নের সুবিধার জন্য একপায়া টেবল নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা চেয়ারের সম্মুখে চেয়ারের হাতলের সহিত সংলগ্ন করা যায়, এমনভাবে নির্ম্মিত। পীড়িত-দিগের পক্ষে এই টেবল বিশেষ সুবিধাজনক।

বিচিত্র পিস্তল

সমুদ্রবক্ষে কোনও জাহাজ বিপন্ন হইলে সেই বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্ত এক প্রকার পিস্তল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পিস্তল হইতে আকাশ-পথে উজ্জ্বল গুলী উত্থিত হইয়া থাকে। হাউই যেমন আকাশপথে উত্থিত হইয়া দীপ্তি বিকীর্ণ করে, এই পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত গুলীও সেইরূপ দীপ্তি-শালী হইয়া আকাশমার্গে বহু দূর উত্থিত হয়। তাহাতে সন্নিহিত অপর জাহাজ বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া সাহায্যার্থ তাহার সম্মুখীন হয়। লণ্ডন সহরে সম্প্রতি এই পিস্তলের পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পিস্তলটি আকারে বড় নহে।

বিচিত্র পিস্তল

টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতি

জার্ম্মাণীতে টেলিফোন যন্ত্রের এমন উন্নতি হইয়াছে যে, এক যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন কক্ষে অবস্থিত ব্যক্তির সহিত একসঙ্গে কথা বলা চলে।—কোনও আফিসের বড়কর্ত্তা যদি তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী-দিগের সহিত কোন বিষয়ের আলাপ করিতে চাহেন, তাহা হইলে নিজের ঘরে বসিয়াই টেলিফোন যন্ত্রযোগে অন্যত্র অবস্থিত সহ-কর্ম্মীদিগের সহিত সে কার্য্য অবাধে সম্পাদিত করিতে পারেন। এ জন্ত দুই শ্রেণীর যন্ত্র আছে। প্রধান কর্ত্তার ঘরে যে যন্ত্র থাকিবে, তাহাতে এমন কৌশল আছে যে, তিনি যখন 'রিসিভার'টি তুলিয়া লয়েন, অমনই একটা সংখ্যা বাতায়নে দেখিতে পাইবেন। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সহকর্ম্মীরা কখন তাঁহার সহিত কক্ষান্তরে অবস্থিত থাকিয়াও আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন। তখন তিনি আলোচ্য বিষয়ের কথা যন্ত্রযোগে বিবৃত করেন। তার পর কর্ত্তা যন্ত্র ধারণ করিবামাত্র কক্ষান্তরে অবস্থিত সহকর্ম্মীদিগের আলোচনার সমস্ত কথা শুনিতে পান। চিত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, একসঙ্গে কিরূপে কর্ত্তা সকলের সহিত আলোচনা করিতেছেন।
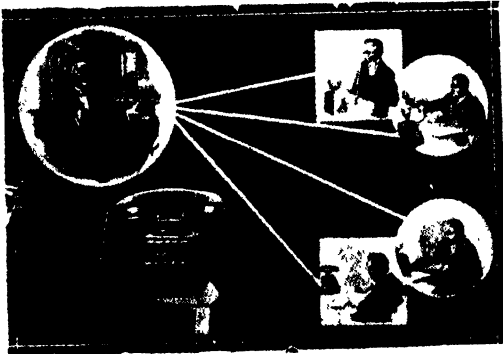
নূতন টেলিফোন যন্ত্র

কীটের উড্ডয়নশক্তি

কীট কত উচ্চে উড্ডীন হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা পরীক্ষিত হইতেছে। বোষ্টন সহরে স্তম্ভের ৫ শত ফুট উচ্চস্থানে আটা-সংযুক্ত ফ্রেমে আঁটা বস্ত্র ঝুলাইয়া রাখা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, কীট সেই উচ্চ স্থানেও অনায়াসে উড়িয়া আসে। বস্ত্র-সংলগ্ন আটায় তাহাদের দেহ জড়াইয়া যায়, সুতরাং আর নড়িতে পারে না। যাঁহারা কীট-পতঙ্গা-দির উড্ডয়নশক্তি পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, পতঙ্গরা বহির্ভাগে থাকিয়া চারিতল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে তাহারা আরও উর্দ্ধে উড়িতে পারে।

কীটের উড্ডয়ন-শক্তিপরীক্ষা

বিচিত্র মোটর-নৌকা
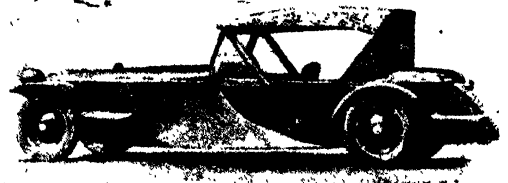
বিচিত্র নৌকা-গাড়ী

জল ও স্থলে সমভাবে পর্য্যটন করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং-চালিত নৌকা-মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে। যে ইস্পাতে কখনও মরিচা ধরে না, সেই শ্রেণীর ইস্পাত হইতে এই যান রচিত হইয়াছে। ইহার ওজন প্রায় ৩৯ মণ।

স্বখাত সলিলে

১

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুবিস্তৃত নন্দিগ্রামের অধিবাসিগণের 'সব-চিন্' ও তাহাদের পরিচিতনামা সমাজ-সংস্কারক হরি সাহেব ওরফে শ্রীযুক্ত হরিধন চক্রবর্ত্তী বারোয়ারীর বিশাল আসরে সার্ব্বজনীন বিরাট্ সভায় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—"আমাদের মুক্তিলাভের, স্বরাজলাভের, স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ জাতিভেদ-বর্জ্জন ;—সুতরাং এখন হইতে আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ ; জাতিভেদের বন্ধন আর আমাদের মধ্যে রহিল না ;—কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য,—পদ্মরাজ, বাগ্দী, নমঃশূদ্র প্রভৃতির শূদ্রত্বের অবসান হইল ;—আজ হইতে ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ !"

বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সভায় কি হর্ষোল্লাস, কি করতালির ছটা !—প্রায় পনের মিনিটকাল আর কোনও কথা সে সভায় শুনিতে পাওয়া গেল না,—শুধু চারিধারে চটাপট শব্দ ও বহুকণ্ঠোচ্চারিত অবোধ্য আনন্দারাব !

সে দিন সভাভঙ্গের পর সকলেরই মুখে হরি সাহেবের কথা ! তরুণসঙ্ঘের মত,—"হাঁ, হরিসাহেব আজকের সভার মুখ রেখেছেন বটে, খাঁটি কথা বলেছেন তিনি ! সেকেলে প্রেজুডিস্ আর চলছে না—টিকিওয়ালাদের মুখ একেবারে চূণের মত সাদা হয়ে গেছে, মুখে কথাটি আর নেই ।"

প্রবীণ-সঙ্ঘ বলেন,—

"যত সব নাড়াবুনে, সবাই হ'ল কীর্ত্তনে,
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে করতাল !"—

আবসুলা, সে-ও পাখী হয়ে উড়তে চায় ?—হরিসাহেব আসে সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাশ্রিত সমাজকে সংস্কার করতে ! আস্পর্দ্ধাও কম নয় ; আর আশ্চর্য্যের কথাও এই যে, সেই সভাস্থলেই কেউ তার কাণটি ধ'রে নাড়া দিয়ে বল্লে না—'বাপু হে, এ সব তোমার অনধিকারচর্চ্চা, তুমি মুখ সামলাও' ।"

সকল সমাজের সকল স্তরেই কথাটা বেশ ব্যাপকরূপেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। হালদারপাড়ার পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে স্নানার্থিনী মেয়েমহলের মধ্যেও আলোচনার অন্ত ছিল না। সিদ্ধেশ্বর পরামাণিকের পত্নী নিতম্বিনী, পল্লীর গণ্যমান্য শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় মহাদেব হালদারের বিধবা ভগিনীকে বলিতেছিল,—"হাঁ, দিদিঠাকরুণ, কি শুন্‌তে পাচ্ছি গো ? তোমরা বেরাহ্মণরা আমাদের সবাইকে নাকি জাতে তুলে নিচ্ছ ? ও মা, এ কি তাজ্জব কথা গো ?"

হালদার-ভগিনী কৃষ্ণকামিনীও সভার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিলেন,—"তাজ্জব ত বটেই, তা তোরাও এবার সবাইকে তাজ্জব করিয়ে দে না লো !—এত কাল আলতা-নরুণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে যেতিস ত, এখন থেকে তোরাও ব্রাহ্মণী হয়েছিস্ ; কাযেই হরি সাহেবের বউকে ব'লে পাঠা যে, সে এবার আলতা-নরুণ হাতে ক'রে নতুন বেরাহ্মণীদের সেবা করুক ।"

দন্তে জিহ্বা কাটিয়া নিতম্বিনী সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"ও মা, কি তুমি কইচ গো দিদিঠাকরুণ, এমন কথা মুখেও এনো না বাছা ! আমরা যেন ছেরকালটাই দেবতা-বেরাহ্মণের দাসী হয়েই থাকি ! আমরা বেরাহ্মণ হ'তে চাই না গো, দিদিঠাকরুণ ।"

গোবিন্দ পাত্রের মেয়ে সুধামুখী নিতম্বিনীর কথায় সায় দিয়ে বলিল,—"বামন হওয়া অমনি মুখের কথা কি না ! বলে, বিশ্বামিত্তির মুনি অত তপস্যা করেও বামন হ'তে পারে নি ! আমরা ত তাঁর চরণের ধুলো হবারও যোগ্য নই, আমরা হব বামুন ?"

কৃষ্ণকামিনী হাসিয়া বলিলেন,—"বামুনরা তোদের জাতে টানছে, তোরা যদি না যাস্, সে তোদেরই দুর্ভাগ্য বৈ আর কি ?"

সুধামুখীও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"ভগবান্ আমাদের যেটুকু ভাগ্য দিয়েছেন, তাই বজায় থাক দিদি ; তোমাদের জাতের ওপর উঠে আমরা ভাগ্যধরী হ'তে চাই না ।"

২

নন্দিগ্রামেরই এই অসমসাহসী সমাজ-সংস্কারক ও নামজাদা বক্তা হরি সাহেবের স্মরণীয় নামটি শুধু এই গ্রামখানির মধ্যে নহে, সমস্ত পরগণার মধ্যে নানাকারণে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিধন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কি জন্য যে 'হরি সাহেব' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহারও এক ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হরিধন চক্রবর্ত্তী যে দিন তাঁহার আবলুস-নিন্দিত অঙ্গে দুগ্ধফেননিভ কোট-পেনটুলেন চড়াইয়া সাহেবী কায়দায় কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ স্বদেশী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস উদ্ধার করিতে প্রথম অভিযান করিলেন, সেই দিনই সায়াহ্নে নন্দিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, গ্রামের সর্ব্বসাধারণ তাঁহার পোষাকের খাতিরে অথবা পদগৌরবের মাহাত্ম্যে নূতন নামকরণ করিয়াছে—হরি সাহেব! নামের এই নূতনত্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বোধ হয় সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন; কেন না, কেহ কখনও এ হেন অভিনব নামকরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও প্রতিবাদ করিতে দেখে নাই!

গ্রামের প্রবীণ-সমাজ প্রৌঢ় হরি সাহেবের প্রতি বরাবরই বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেও, তরুণ-সমাজ হরি সাহেবের সৎসাহস, বাগ্মিতা, দেশের যাবতীয় আড়ম্বরজনক কার্য্যে অগ্রবর্ত্তিতা, বিশেষতঃ জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের জন্য চাঁদা-সংগ্রহ-কার্য্যে হরি সাহেবের প্রচণ্ড উৎসাহ প্রভৃতি দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধিমান্ হরি সাহেবও বুঝিয়াছিলেন যে, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ গ্রাম্য-ভুষণ্ডী-সমাজকে খণ্ড খণ্ড করিবার যদি কখনও অবকাশ আসে, তাহা এই তরুণ-সম্প্রদায়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হইবে। কাযেই, তরুণ-সঙ্ঘের আহ্বান,—তাহাদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিমান্ হরি সাহেবের আন্তরিকতা ও কুটিল যুক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইবার অবকাশ পাইত। প্রয়োজন হইলে, হরি সাহেব সরল-প্রাণ তরুণ-সঙ্ঘের শিরোদেশে সুপক্ব কাঁঠাল দীর্ণ করিয়া তাহার রসাল অংশবিশেষ উপভোগপূর্ব্বক অসার ভুতড়িগুলি সঙ্ঘের উপর বিকীর্ণ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধির ফলে, তাঁহার বাগ্মিতার চটুলতায় এই তরুণ-সমাজ ক্রমশঃ তাঁহার মুষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল।

প্রবীণ-সমাজ হরি সাহেবের অভ্যুদয়কে শান্তিচ্ছায়াতলে সমাহিত গ্রামখানির উপর একটা উপদ্রবস্বরূপ গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রকাশ্যে হরি সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার সামর্থ্য বা বাসনা তাঁহাদের না থাকিলেও সুযোগ পাইলেই যে কোনও সূত্রে এই উদীয়মান সমাজ-সংস্কারককে আক্রমণ ও অপদস্থ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না।

সে দিন হরি সাহেব তাঁহার অনুগত তরুণ-সঙ্ঘের সহিত গ্রামমধ্যে চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। আসামের বন্যার ভীষণ প্লাবন হরি সাহেবের ন্যায় স্বদেশপ্রাণ মহাত্মার প্রাণের মধ্যেও সহানুভূতির প্লাবন ছুটাইয়াছিল, তাই তাহারই প্রেরণায় সদলবলে অর্থ-সংগ্রহের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। গ্রামের সমাজপতি মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের আটচালায় সমাজসেবকগণের বৈকালিক বৈঠক বসিয়াছিল। ঘন ঘন তাম্রকূট-সেবনের সহিত আমীর আমানুল্লার ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে গ্রামের খুঁটিনাটি নানা বিষয়েরই আলোচনায় সেই প্রবীণ-সঙ্ঘ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সদলবলে হরি সাহেব সেই আটচালার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রবীণ-সঙ্ঘ এই দলটিকে অকস্মাৎ তাঁহাদের আস্তানায় উপস্থিত দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও, গৃহস্বামী মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিরাচরিত প্রথায় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় বিরত হইলেন না। সমভিব্যাহারী তরুণদল সতরঞ্চির উপর উপবেশনে আহূত হইলেন। সাহেব-পরিচ্ছদধারী হরি সাহেবকে বসিতে দিবার মত কোনও আসন সেখানে না থাকায়, এক জন বুদ্ধিমান্ মজলিসী, ঝটিতি একটি ঝোড়া আনিয়া সতরঞ্চির এক পার্শ্বে পাতিয়া দিলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"সাহেবের সম্মান করবার মত কুরসি ত এখানে নেই, তা এতেই ব'সে পড় অগত্যা।"

সাহেবের এক অনুগত তরুণ তৎক্ষণাৎ গায়ের রেশমী চাদরখানি খুলিয়া সেই ঝোড়াটি মুড়িয়া দিল; হরি সাহেব গম্ভীরভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি মনে ক'রে হঠাৎ সদলবলে সাহেবের এখানে আগমন—তা বলতে আজ্ঞা হোক।"

হরি সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"দল দেখে বুঝতে পারছেন না ভটচায্যি মশাই! যেখানে দল, সেইখানেই দেহি দেহি রব; ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সদলে বেরিয়ে পড়েছি; ঐ ত দেখতে পাচ্ছি—'বসুমতী' খোলা প'ড়ে আছে। আসামের বন্যার বিপ্লব পড়েছেন নিশ্চয়?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"হুঁ, বুঝিছি এবার! তা' চার চারটে স্বদেশী কোম্পানীকে উদ্ধার ক'রে দিয়ে, সাহেব, বুঝি এবার আসামবাসীর উদ্ধারের জন্যে কোমর বেঁধেছ,—কেমন?"

হরি সাহেব ভট্টাচার্য্যের এ কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া একটু শ্লেষের সহিত বলিলেন,—"উদ্ধার আর করতে পারলুম কোথায়, ভট্‌চায্যি মশাই? চার চারটে কোম্পানী দেশের লোকের লাখ লাখ টাকা নিয়ে ডুবে আছে, চারটের পেছনে আমারও গেছে কম-সে কম চল্লিশ হাজার! এখন আপনি যদি সাহস ক'রে কোমর বাঁধেন, তা হ'লে না হয়, উদ্ধারের একবার চেষ্টা ক'রে দেখি!"

হরি সাহেবের কথায় সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইল! সকলেই শুনিয়াছিলেন, হরি সাহেবই বিবিধ বিধানে চেষ্টা-যত্ন দ্বারা সুকৌশলে চারিটি স্বদেশী কোম্পানীর অন্তর্জ্জলির ব্যবস্থা করিয়া, পরিণামে স্বয়ং বেশ শাঁসাল হইয়া স্বদেশ-উদ্ধারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! এক্ষণে তাঁহারই মুখে বিপরীত উক্তি শুনিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"আমি কোমর বাঁধব, তার মানে?"

হাসিয়া হরি সাহেব বলিলেন,—"মানে বুঝলেন না—আপনি এত বড় খবীস্ লোক হয়ে?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—"আমি খবীস্ লোক? তোমার চেয়েও? তুমি হরি সাহেব খবীস্ কে'উটের চেয়েও—"

"ভয়ঙ্কর! কি বলেন? তা যাই বলুন, আপনিই কথাটা তুলেছেন মনে রাখবেন; কাযেই জবাব না দিয়ে আমি যাই কোথায় বলুন? আপনি কোমর বাঁধেন যদি, অর্থাৎ ঐ ডুবো কোম্পানীর ভুঁড়ীওয়ালা ডাইরেক্টারদের সঙ্গে লড়বার জন্ম যদি টাকা ছাড়তে পারেন, আমি সমস্ত ডুবো টাকা ওদেরই ভুঁড়ির ভেতর থেকে টেনে বা'র করতে পারি, বুঝলেন? ওদের মৃত্যুবাণ সমস্তই আমার হাতে আছে!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপেক্ষার সুরে বলিলেন,—"আমরা হচ্ছি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরদারীতে আমাদের কি দরকার! তোমাদের এই সব কোম্পানীর মানেই হচ্ছে, 'যার ধন তার ধন নয়—নেপো মারে দই!' আমরা তোমাদের কোনও সংস্রবে থাকতে চাই না।"

হরি সাহেবের দলের এক তরুণ বলিয়া উঠিল,—"ও সব কোম্পানীর সংস্রবে না থাকাই ভাল; এখন আমরা আসামের যে জলপ্লাবনের সংস্রবে এসেছি, আপনি দয়া ক'রে তাতেই একটু মনোযোগ দিন, তা হলেই—"

মুখ বিকৃত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার উত্তর দিলেন,—"আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে আর কি! যে মহাপ্লাবন তোমরা এই নন্দিগ্রামে এনেছ, তারই ঠেলায় আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি; এর ওপর আর আসামের জলপ্লাবনের ঢেউ দেখান বৃথা!"

হরি সাহেব এবার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতাশক্তির আশ্রয় লইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি বলছেন কি ভট্‌চায্যি মশাই? আসামের এমন ভয়াবহ জলপ্রাবন—যার প্রচণ্ড নর্ত্তনে লক্ষ লক্ষ নগরবাসী গৃহহীন, সহস্র সহস্র নর-নারী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে, যার জন্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার উঠেছে—সর্ব্বত্র সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে; সদাশয় মহামান্য গভর্ণর থেকে বড় বড় রাজপুরুষ, রাজা, জমীদার, নবাব সবাই মুক্তহস্তে সাহায্য করছেন;—সিলেটের অত বড় বনেদী মানী রাজবংশের কুমার সকন্যা সস্ত্রীক থিয়েটারে নাটকের অভিনয় করেছেন—এই মহাবন্যায় সাহায্যের জন্য, আপনি তাকে বৃথা ব'লে ব্যঙ্গ করছেন? এই আমাদের দেশ, এই আমাদের দেশের প্রবীণ সমাজ! হা—অদৃষ্ট!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিষয়ী মানুষ, কাযেই হরি সাহেবের এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা তাঁহাকে কাবু করিতে পারিল না। তিনি উপেক্ষাভরেই বলিলেন,—"যে ধুরন্ধর চার চারটে স্বদেশী কোম্পানীকে পটল তোলাতে পারে, জলপ্লাবনের নামে লোকের রক্তের মত টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা তার পক্ষে একটুও আশ্চর্য্যের কথা নয়।

আমাদের যা করবার, আমরা নিজেরাই করব ; যা পারি—সরাসরি সেখানেই পাঠাব ।"

শ্লেষের সহিত হরি সাহেব বলিলেন, "এই আপনাদের স্বদেশভক্তি !" সঙ্গে সঙ্গে তরুণদল সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"সেম ! সেম ! সেম !"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্যপ্রদত্ত রূপাবাঁধা হুঁকায় নিবিষ্ট-মনে তাম্রকূট সেবনের স্বাদ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

হরি সাহেব সেই সুদৃশ্য রৌপ্যখচিত হুঁকাটির দিকে চাহিয়া বিজ্ঞের মত বলিলেন,—"প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তি আপনি, কিন্তু অহেতুক অপব্যয় কত আপনার দেখুন ত ! তুচ্ছ একটা হুঁকোর খোলের ওপর রূপোর নক্সা তুলে কতগুলো টাকা জলে ফেলেছেন ! এ টাকাগুলো যদি বন্যাপীড়িতদের দিতেন ত পঞ্চাশ জন লোকের এক দিনের অন্নসংস্থান হ'ত।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকার মুখে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "তা মিথ্যে নয় ; কিন্তু এটাও যে আমার একটা স্মরণীয় আসবাব, কাযেই একে ত বন্যার জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না, ভাই-সাহেব ? তুমি যেমন আমাদের গ্রামের মধ্যে একটা দর্শনীয় আসবাব, এটাও যে তাই হে ?"

হরি সাহেব কথাটার অর্থ ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে ভট্টাচার্য্যের পরিপক্ক সুগৌর মুখখানির উপর চাহিলেন,—ভট্টাচার্য্য সহাস্যে বলিলেন,—"এঁ্যাঃ ! কথাটা বুঝতে পারলে না, সাহেব ? আরে, এ হচ্ছে আমার ঘরের হরি সাহেব ? তুমি যেমন আবলুস চেহারার ওপর ধোপদোস্ত পেণ্টুলেন চড়িয়ে সাহেব সেজেছ, এও তেমনি কুচকুচে কালো খোলটির উপর রূপোর খোলস জড়িয়ে—বুঝেছ ?"

প্রবীণগণ সকলেই সমস্বরে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। নবীনগণও কষ্টে মুখ চাপিয়া হাসি সম্বরণ করিল। হরি সাহেবের মসীপ্রতিম কালো মুখখানি এবার কাজলের মত আরও গাঢ় হইয়া উঠিল।

সেই দিন হরি সাহেব প্রতিজ্ঞা করিলেন,—এই বুড়ো গোঁড়াদের বামনাইয়ের গর্ব্ব তিনি খর্ব্ব করিবেনই। এই সমাজকে তিনি এমন ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিবেন যে, বয়োবৃদ্ধগণ তাহা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিবে, তাহাদের গর্ব্ব-গৌরব সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

তাহার পরই, বারোয়ারী পূজার অবসানে, বিশাল আসরে হরি সাহেবের ধর্ম্মসভা ও সেই সভায় ব্রাহ্মণত্ব বিনাশ করিবার খরতর প্রস্তাব।

৩

হরি সাহেবের সমাজ-সংস্কারের রণভেরী যখন নন্দিগ্রাম সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন গ্রামের প্রবীণ সমাজের কর্ণধার মধুসূদন ভট্টাচার্য্য সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"তোমরা ভয় পেয়ো না, ব'সে ব'সে শুধু রগড় দেখে যাও, হরি সাহেবকে যদি আমি ওরই অস্ত্রে কাবু করতে না পারি—ওকে চোখের জলে নাকের জলে না ভাসাতে পারি, তা হ'লে আমি মধুসূদন ভট্টাচার্য্য নই।"

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য নন্দিগ্রামের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান যেমন সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত, তেমনই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সমাজের আর্ত্ত ও বিপন্নের সময়োচিত সহায়তা তাঁহার চরিত্রগত ধর্ম্ম ছিল ; জাতিগত সংকীর্ণতা তাঁহার মহত্বকে খর্ব্ব করিবার অবকাশ পায় নাই। পক্ষান্তরে, সমাজকে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, সমাজের দোষ, গুণ ও ত্রুটি কোথায়, সমাজের দুষ্ট ব্রণ উৎপাটন করিতে হইলে কি প্রকার কৌশলে অস্ত্রোপচার করিতে হয়, এ সমস্তই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধীত বিদ্যার মত আয়ত্ত ছিল। সামান্য একটি শ্রমজীবী হইতে ধনাঢ্য ভূস্বামী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ঘরের খবর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুবিদিত ছিল ; কাহার কৃতিত্ব কোথায় ও গলদ কোন্‌খানে, সে সন্ধানও তিনি রাখিতেন ; অথচ বাহিরে প্রকাশ পাইত, তিনি যেন নিতান্ত সরল ও সকল বিষয়ে উদাসীন ব্যক্তি।

বিভিন্ন স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে থাকিয়া, নাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনপূর্ব্বক কালক্রমে ধীরে ধীরে সুকৌশলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়া বুদ্ধিমান্ হরি সাহেব নানা প্রকারে তৎসম্বন্ধে নিজের অপরাধ প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস পাইলেও, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে প্রধান অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথায় আছে, অধর্ম্মের পয়সা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

হরি সাহেব নানা উপায়ে বহু অর্থ উপায় করিলেও তাহা অধিক দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। নানা অপব্যয়ে তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ ত নিঃশেষিত হইয়াছিলই, তদ্ভিন্ন ইদানীং আত্মসম্মান বজায়ের জন্য ঋণের অঙ্ক ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

পাছে ঋণের কথা রাষ্ট হইলে আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হয়, এই আশঙ্কায় হরি সাহেব স্বগ্রামে কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট ঋণী হইতে চাহিতেন না; সমাজে অখ্যাত, জাতিতে নিকৃষ্ট—এমন লোকের নিকটই তিনি ঋণ গ্রহণ করিতেন। উদ্দেশ্য, এই শ্রেণীর মহাজনরা হরি সাহেবের মত স্বনামধন্য মহাপুরুষকে কদাচ তাগাদায় বিব্রত ও লাঞ্ছিত করিতে সাহস পাইবে না।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের নিপুণ দৃষ্টি হরি সাহেবের এই দুর্ব্বলতার ত্রুটিও ধরিয়া ফেলিয়াছিল। নন্দিগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীপুরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সদাশিব সাঁতের সহিত হরি সাহেবের অর্থগত সম্প্রীতির কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবিদিত ছিল না।

এই সদাশিব সাঁৎ জাতিতে নমঃশূদ্র। সদাশিবের পিতা ধানের একটি ছোট গোলা রাখিয়া যায়। সদাশিব সেই গোলাকে পরগণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আড়তে পরিণত করিয়াছে। তাহার অর্থভাগ্য যেমন আদর্শস্থানীয়, সন্তানভাগ্যও তেমনই তাহার সমাজমধ্যে অতুলনীয়। পুত্র সত্যশরণ এবার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছে। হরি সাহেব তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন, সত্যশরণ বি, এ পাশ করিলে, লাট সাহেবের নিকট সুপারিস করিয়া তাহাকে হাকিম করিয়া দিবেন। এত বড় আশ্বাসের বিনিময়ে হরি সাহেব সে দিন সদাশিব সাঁতের নিকট ঋণের অঙ্ক আর এক প্রস্থ চড়াইয়া লইবার অবকাশটিও পরিত্যাগ করেন নাই।

'সবাই ব্রাহ্মণ—সবাই সমান'—এই আন্দোলন যখন হরি সাহেবের চেষ্টায় ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন এক দিন সায়াহ্নে মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কি এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সদাশিব সাঁৎকে তাঁহার ভবনে আহ্বান করিলেন।

অর্থশালী ব্যবসায়ী হইলেও, সদাশিব চিরদিন সদাশিবেরই মত সরল ও উল্লাসময় ছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও ছিল অসীম। সমাজপতি, ব্রাহ্মণ-সমাজের ভূষণ, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বান শুনিবামাত্র আড়তের কায-কর্ম্মের ভার কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত করিয়া সদাশিব শশব্যস্তে নন্দিগ্রামে রওনা হইল।

৪

মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের বুদ্ধি-কৌশলে অবিলম্বে গ্রামের তরুণ-সঙ্ঘ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক দল হরি সাহেবের প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া গেল। কেবল নিষ্কর্ম্মার দল তখনও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিল।

গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স ছিল। সুলভে গ্রামবাসিগণকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীই সরবরাহ করা এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল। মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের ইঙ্গিতে কো-অপারেটিভ ষ্টোরের কর্ণধাররা দেনা-পাওনার হিসাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! একা হরি সাহেবের নিকট সাত শ টাকার উপর পাওনা! সাহেব অনবরত জিনিষ লইয়াই চলিয়াছেন, বিনিময়ে কিছু দিবার নামটিও পর্য্যন্ত করেন নাই। এবার ষ্টোরের কর্ত্তারাও সামাজিক আন্দোলনে এমন মত্ত হইয়াছিলেন যে, হিসাব-পত্র দেখিবার অবকাশ তাঁহাদের ছিল না।

তাগাদার উপর তাগাদা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে একদা হরি সাহেবের ভবনে সমাগত বাহিরের দশ জন ভদ্রলোকের সমক্ষে এমনভাবে তাগাদাকারীরা সহসা উপস্থিত হইল যে, তাহাদিগকে দেখিবামাত্র তিন শত টাকার একখানি চেক লিখিয়া হরি সাহেব তৎকালে কোনরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার পর এক দিন পূর্ব্বাহ্নে গ্রামের তিন চারি জন ব্রাহ্মণ মাতব্বর হরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হরি সাহেব তখন তাঁহার সাহেবী কেতায় সজ্জিত বৈঠকখানায় আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। গ্রাম্য-মাতব্বরদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল; তাঁহার তীব্র কশাঘাতে কাতর হইয়া প্রতীকারের আশায় যে এই স্পর্দ্ধিত প্রবীণ সমাজ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। গম্ভীরভাবে তিনি তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসে বসুন।"

বৈঠকখানায় অনেকগুলি কেদারা ছিল, ব্রাহ্মণরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। হরি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি খবর?"

দলের এক জন বলিলেন, "খবর আর কি, তোমার প্রতাপে ত দেশে একাকার উপস্থিত! ব্রহ্মণ্যদেব ত পালাই পালাই ডাক ছেড়েছেন! ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণকে এ ভাবে হেয় করা কি উচিত হচ্ছে?"

হরি সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"কেন হবে না শুনি? সে যুগের স্বার্থপরতা আর ধাপ্পাবাজির দিন চ'লে গেছে! আমিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু স্বার্থপর নই; তাই আমার উদার মত প্রচার ক'রে সমাজকে আজ টলিয়ে দিয়েছি।"

মহাদেব হালদার বলিলেন, "একটা মিটমাট করলে হ'ত না, হরি সাহেব?"

হরি সাহেব বলিলেন,—"তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু সে পরামর্শ-সাপেক্ষ। মিটমাটের কথা শুধু আপনাদের নিয়ে হ'তে পারে না। আপনাদের সেই গোঁড়া দলপতি মধুসূদন ভট্‌চায্‌ যদি দাঁতে কুটো ক'রে এইখানে এসে মিটমাট করবার প্রার্থনা জানায়, তখন সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে; তার আগে নয়।"

ঠিক এই সময় সদাশিব সাঁৎ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিল,—"নমস্কার, চক্রবর্ত্তী ভায়া!"

সদাশিবকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া হরি সাহেব যেমন বিব্রত ও বিস্মিত হইলেন, তাহাকে এমন অসঙ্কোচে নমস্কার করিতে দেখিয়া তেমনই চমৎকৃত হইলেন! যে সদাশিবের সহিত পথে ঘাটে সহসা সাক্ষাৎ হইলে, সে তদ্দণ্ডে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইত, সেই-ই আজ তাঁহারই আবাসে আসিয়া সমবেত জনগণের সমক্ষে সমকক্ষের মত তাঁহাকে নমস্কার করিতে সাহস পাইল!

সদাশিব নমস্কার করিয়াই স্বচ্ছন্দে অগ্রবর্ত্তী হইয়া হরি সাহেবের পার্শ্ববর্ত্তী একখানি সুদৃশ্য গদীমোড়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

শুষ্ককণ্ঠে হরি সাহেব মুখে শুষ্ক হাসি খেলাইয়া বলিলেন,—"আরে এস; ভাল আছ ত সদাশিব? তোমার ছেলের খবর কি?"

সদাশিব বলিল,—"সেই জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি হে!"

বিস্ময়ে হরি সাহেবের মুখখানি ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত এই ব্যক্তির মুখে এ কি সম্ভাষণ! কিন্তু সে যে তাঁহার মহাজন,—কাযেই হরি সাহেবকে তৃণাদপি লঘু হইতে হইল। অবস্থা দেখিয়া প্রবীণগণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া লইলেন।

সদাশিব উৎসাহভরে হাসিয়া বলিল,—"শুনেছ হে চক্রবর্ত্তী, আমার সত্যশরণ বি, এ, পাশ করেছে?"

কষ্টে মুখে হাসি টানিয়া হরি সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"বটে? পাশ করেছে? বেশ, বেশ; তার কথা আমি ভুলিনি, সদাশিব; লাটসাহেব দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে নামলেই আমি তার একটা গতি ক'রে দেব।"

এই সময় সহসা বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ ষ্টোরের প্রায় পনের জন সভ্য বাহিরে দরদালানে ডাকাতের দলের মত হল্লা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়াই হরি সাহেবের শুষ্ক মুখখানি এবার ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার এতক্ষণে স্মরণ হইল, চেকের তিন শ টাকার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে মানরক্ষার জন্য চেক দিলেও, পরে সভ্যদের ধরিয়া একটা মিটমাট করিয়া লইবেন বা চেকের সময়টা বাড়াইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

দলের দুই জন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল,—"আপনার চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত হয়ে এসেছে, মশাই।"

হরি সাহেব বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "বল কি? ওঃ,—সিগনেচারের গোল হয়েছে বুঝি?"

অপর ব্যক্তি বলিল, "সিগনেচারের কোনও গোল হয় নি মশাই। আসল গোল হবার কারণ হচ্ছে এই, ব্যাঙ্কে আপনার এক পয়সাও জমা নেই;—উল্টে আপনি সাড়ে এগার শো টাকা ওভার ড্রাফ্‌ট ক'রে রেখেছেন, তারা বার বার তাগাদা ক'রে হয়রাণ হয়ে এবার তাদের এটর্ণীর হাতে কেস দিয়েছে। আমরা সমস্ত সন্ধান নিয়ে তবে এসেছি।"

হরি সাহেব উদাসভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, আজ আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে কি ব্যাপার জেনে আসছি; আমি ৩ এর

কিছুই শুনি নি হে! যা হোক, তোমরা সন্ধ্যার পর এসে টাকাটা নিয়ে যেও।"

ষ্টোরের সেক্রেটারী ঘনশ্যাম নন্দী আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের পেস্কার; তিনি এবার শ্লেষের সহিত বলিলেন, "সন্ধ্যার পর আমাদের আসতে হবে না, তার আগেই আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমন পাবেন। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকলে, পার্টিকে চেক দিলে, আর সেই চেক ফেরত এলে, তার পরিণাম কি হয়, তা আপনি এখনই বুঝে নেবেন। আপনি যদি এখনই চেকের টাকা মিটিয়ে না দেন, তা হ'লে অগত্যা আমাকে আজই এ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।"

সদাশিব হরি সাহেবের নিকট সংক্ষেপে ব্যাপারটি জানিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, নন্দী মশাই, এক কায করুন; সামান্য তিন শ' টাকার জন্য এত বড় মানী লোকটাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করবেন না,—মিটমাট ক'রে ফেলুন।"

নন্দী মশাই বলিলেন, "টাকা ভিন্ন মিটমাট হ'তে পারে না। সাত শ টাকার ওপর ওঁর কাছে পাওনা; মোটে তিন শ' টাকা দিলেন,—তারও এই অবস্থা,—দশ হাত জলে! কিন্তু আমরা এ উদ্ধার করবই।"

সদাশিব তখন বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে আর ওসব হাঙ্গামা-হুজ্জুত করবেন না, চক্রবর্ত্তী ভায়ার হাতে টাকা থাকলে তিনি কখনই এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতেন না; আপাততঃ চেকের টাকাটা আপনারা আমার কাছ থেকেই পাবেন,—আমি পরে চক্রবর্ত্তী ভায়ার কাছ থেকে নিয়ে নেব। আপনারা একটু বসুন, আমার দু'চারটে কথা আছে, তা শেষ করেই আমি উঠে পড়ছি। আপনারা যে কেউ আমার সঙ্গে যাবেন, আমি আড়তে গিয়ে টাকাটা দিয়ে দেব।"

নন্দী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ এ কথায় আশ্বস্ত হইয়া বাহিরের দরদালানে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। হরি সাহেব সকৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে সদাশিবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই তুমি আজ আমার বড় উপকার করলে, সদাশিব; আমি দু এক দিনের মধ্যেই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। এখন কি মনে ক'রে তোমার আসা হয়েছে, বল ত? কিছু গোপনীয় কথা আছে কি?"

সদাশিব বলিল, "কিছু না, কিছু না,—তোমার সঙ্গে কথা কইব, তাতে আবার সদর মফঃস্বল কি বল! হাঁ, এখন কথা হচ্ছে এই, তোমার না একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে? আমাকে বলেছিলে মনে হচ্ছে যেন!"

হরি সাহেব বলিলেন,—"আছে ত! মেয়েটা খুব বড় হয়ে পড়েছে। নানা যায়গায় কথাবার্ত্তাও চলছে, কিন্তু কিছুই এ পর্য্যন্ত ঠিক হয় নি। তোমার সন্ধানে ভাল পাত্র আছে না কি, সদাশিব?"

সদাশিব হাসিয়া বলিল,—"তা না হ'লে কি মনে ক'রে আর এখানে এসেছি বল? এখন মেয়েটিকে একবার চট ক'রে এনে দেখিয়ে দাও দেখি;—সাজাবার-গোছাবার দরকার নেই, মাকে আমি সাদাসিধেভাবেই দেখে যেতে চাই; একটু শীগ্‌গির কর ভাই; কেন না, ওঁরা আমার প্রতীক্ষায় টাকার জন্য ব'সে রয়েছেন।"

নিশ্চয়ই সদাশিব কোনও সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া হরি সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বৈঠকখানায় সত্বর কন্যাকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পরিচারিকার সহিত কন্যা বৈঠকখানায় আসিল। হরি সাহেব সস্নেহে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী আসনে বসাইলেন।

সদাশিব বলিলেন,—"মা'র আমার গঠন খুব ভাল, কিন্তু রংটি বড্‌ড কালো, তা তাতে আটকাবে না। মা'র বয়স কত?"

হরি সাহেব বলিলেন,—"চোদ্দয় পড়েছে, গড়নও একটু বাড়ন্ত। এখন পাত্রপক্ষের পরিচয়টা শুনি।"

সদাশিব বলিল,—"শোনাব বৈ কি; আমি যখন এ কাযে হাত দিয়েছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, মাকে আর এখানে আট্‌কে রেখে দরকার কি? হাঁ,—আসল কথা ভুলে যাচ্ছি যে! মাকে দেখতে এসেছি শুধু হাতে, কিছু ত আনতে পারি নি—"

হরি সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"আরে, তাতে কি হয়েছে? তুমি ত প্রায়ই কত কি পাঠিয়ে দাও, তোমাকে ত বারণ করেও পেরে উঠি না! তুমি যে আমাকে—"

সদাশিব কন্যার হাতখানি টানিয়া লইয়া একটি মোহর গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—"যাও মা, বাড়ীর ভেতর যাও।"

লজ্জাকম্পিত-চরণে কন্যা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাস্যে হরি সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"ও আবার কি হ'ল?"

হাসিয়া সদাশিব বলিল,—"কিছু না! শুধু হাতে কি পাত্রী দেখতে আছে?"

৫

কন্যা চলিয়া গেলে হরি সাহেব বলিলেন,—"কোথা থেকে সম্বন্ধটা এনেছ হে? ছেলে কি করে?"

সদাশিব বলিল, "ছেলে পড়ে; বি, এ পাশও করেছে; বাপের তিন চার লাখ টাকার সম্পত্তিও আছে।"

বিস্ময়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া হরি সাহেব বলিলেন,—"বল কি? তা খাঁই কি রকম? কি দিতে-থুতে হবে শুনি?"

সদাশিব বলিল,—"দিতে-থুতে কিছুই হবে না।"

সবিস্ময়ে হরি সাহেব বলিলেন,—"বি, এ পাশ ছেলে, বাপের অত সম্পত্তি,—তবু তাদের খাঁই নেই! বল কি? ঘর কেমন? ভাল ত?"

সদাশিব বলিল,—"ঘরের ভাল মন্দ জানবার দরকার ত আর নেই, হরি সাহেব! এখন পাঁজীটা আনাও, আমি দিন স্থির ক'রে যাই।"

"দিন স্থির করবে কেন মিছে? পাত্রপক্ষের পরিচয়ই এ পর্য্যন্ত পেলুম না!"

হাসিয়া সদাশিব বলিল,—"এত বড় বুদ্ধিমান্ হয়েও তুমি এখনও পাত্রপক্ষের পরিচয় পেলে না, বেয়াই?"

মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অস্ফুটস্বরে হরি সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"বেহাই!"

হাসিয়া সদাশিব বলিল,—হাঁ গো হাঁ,—এতে এতটা আশ্চর্য্য হবার কি আছে শুনি? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, পয়সায়, আমার ছেলে ত কোন দিকেই ছোট নয়?"

"তুমি কি আমাকে তোমার সমযোগ্য ভেবে এই ভাবে তামাসা করতে এসেছ?"

ঈষৎ হাসিয়া সদাশিব বলিল,—"তুমিই ত খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছ, ভাই! সমযোগ্য কি বলছ? তোমার সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্যও আমার মাসখানেক আগে ছিল না,—কিন্তু উদারতার অবতার তুমি—সে বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে—আমাকে জাতে তুলে নিয়েছ যে! তোমারই দয়ায় আমি এখন ব্রাহ্মণ। তাই না আজ তোমাকে সমযোগ্য ভেবে, তোমার মেয়েকে দেখতে এসেছি।—এখন পাঁজী আনাও।"

হরি সাহেব উদ্‌ভ্রান্তভাবে আরাম-কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে তখন বিষের জ্বালা জ্বলিতেছিল! দুই হস্তে শিরোদেশ চাপিয়া ধরিয়া উন্মত্তের মত হাসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হুঁ,—ঠিক হয়েছে! চমৎকার শাস্তি আমার হয়েছে! বুঝেছি,—সমস্ত বুঝেছি; চক্রান্ত,—চার ধার থেকে—সবাই এর মধ্যে! কিন্তু—কিন্তু—আমিও,—হাঁ, আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করেছ বটে—মোহর দিয়ে? তোমার নাকের ওপর তা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি, দাঁড়াও—"

গমনোন্মুখ হরি সাহেবকে বাধা দিয়া সদাশিব বলিল,—"শুধু ত মোহর ফিরিয়ে দিলে হবে না, বেহাই! ফিরিয়ে দিতে চাও ত সব ফিরিয়ে দাও,—ফিরিয়ে দেবার অনেক কিছুই আছে, তা জ্ঞান বোধ হয়?"

হরি সাহেব হতাশভাবে আরাম-কেদারায় আবার অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ঠিক এই সময় মধুসূদন ভট্টাচার্য্য সদলবলে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, —"ওহে হরি সাহেব! তোমার মেয়ের পাকা দেখা শুনে আমরা যে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি হে?"

সেই শ্লেষ-বিদ্রূপ-স্বরে আহত হইয়া সর্পদষ্টের মত হরি সাহেব শিহরিয়া উঠিয়া বসিলেন।

সদাশিব গলবস্ত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাদবন্দনা করিয়া বলিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর আমি পারি না, এবার আপনি হাল ধরুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"সে কি হে, হরি সাহেবের মেয়েকে দেখতে এসে, শেষে আমাকে দেখে একবারে থেই হারিয়ে ফেললে? ওহে হরি সাহেব, শেষে স্বখাত সলিলেই তলিয়ে গেলে, ভায়া?"

হরি সাহেব তখন সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—"আমাকে মার্জ্জনা করুন; আজ আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে; সত্যই আমি আজ স্বখাত সলিলে ডুবতে বসেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়!"

সদাশিব হরি সাহেবকে তুলিয়া, দুই হস্তে তাহার পদধূলি মস্তকে দিয়া ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে বলিল,—"আমাকে আপনি দয়া করুন, বাবাঠাকুর! আমি যা কিছু করেছি বা বলেছি—আমাদের দেশের শিবতুল্য এই ঠাকুরের শিক্ষায়! আর কখনও এমন অনাসৃষ্টির কাযে হাত দিয়ে আমাদের মাথা খেতে যাবেন না যেন! আমরা যেমন আছি—যেন তেমনই থাকি; এইভাবে থাকলে, আপনাদের দায়ে অদায়ে আমরা প্রাণ দিয়ে লাগতে পারি। এই সব অনাচারের জন্যেই ত আপনি ডুবতে বসেছেন; কিন্তু আমি বলছি, আপনি আমাদের ঐ শিবঠাকুরের কথা মত চলুন, আপনার সমস্ত ঝক্কি আমি মাথায় তুলে নিলুম, আপনার কোন ভয় নেই।"

বাহিরে তখন উচ্চকণ্ঠে সুর করিয়া তরুণসঙ্ঘ গাহিয়া উঠিল—"আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ আকাশের মনের কথা ঝর্ ঝর্ বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

বর্ষার স্বপ্ন—

বাদ্‌লা যখন প'ড়বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে—"

বাদল পথের যাত্রী—

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা,
হায় পথবাসী হায় গৃহহারা!

সৌখীন শিকার—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।

বর্ষার প্রেম-গুঞ্জন

শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তা'র,
তাতে আসে যাবে কিবা কা'র ?

কল্পনা রাজ্যে—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!

আনন্দের তুফান !-

'গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি—'

বর্ষা বিদায়—

"বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনে বিবাহ-বিধি সংস্কার

আমাদের দেশে আজকাল এক শ্রেণীর লোক আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বৃটিশ সরকার গঙ্গাসাগরে পুত্র-বিসর্জ্জন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা অন্যায় হয় নাই। গঙ্গাসাগরে পুত্র-বিসর্জ্জন হিন্দুর স্মৃতি এবং শ্রুতিসম্মত ব্যাপার নহে। মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক, বিষ্ণু, হারিত প্রভৃতি কোন স্মৃতিকারই গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, এমন কথা বলেন নাই। পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হইত না, তাঁহারা মানস করিতেন যে, যদি তাঁহাদের সন্তান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন করিবেন। ইহা অতি নিদারুণ সঙ্কল্প। এইরূপ 'মানস' করিবার পর যাহাদের সন্তান হইত, তাহারা প্রথম সন্তানটিকে সাত আট মাসের হইলে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ভাসাইয়া দিতেন। অন্য এক জন নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিত। জলে জননী সন্তানকে নিক্ষিপ্ত করিলে সেই ব্যক্তি সেই সন্তানটি ধরিয়া ফেলিত এবং তাহাকে জল হইতে তুলিয়া লইত। কিন্তু সেই খরস্রোতা নদীর সঙ্গমস্থলে অনেক সময় যে লোকটি ছেলে ধরিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত, সে উহাকে ধরিতে পারিত না। ছেলেটি মারা যাইত। এই প্রথা অত্যন্ত নৃশংস। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা নহে। উহা নিষিদ্ধ হওয়াতে আর কেহ গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন মানস করে না। সুতরাং কাহাকেও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। কাযেই ঐ নিষেধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। সরকার পতির চিতানলে সতীর দেহত্যাগ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সতীদাহ শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা সত্য। কিন্তু উহা নিত্য নহে অর্থাৎ উহার অকরণে প্রত্যবায় নাই, অধিকন্তু উহার অপব্যবহার হইত। কতকগুলি সতীনারী ইচ্ছা করিয়া পতির চিতানলে দেহত্যাগ করিতেন। বাঙ্গালার লেফটনাণ্ট গভর্ণর সার এফ, হ্যালিডে যখন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তথায় এক সতীদাহ হইতেছিল। তিনি, ডাক্তার ওয়াইজ, একজন খৃষ্টান মিশনরী এবং অন্য কয়েক জন লোক উহা দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সতীর মনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছিলেন যে, "আমি চিতার অতি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম; কিন্তু চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার পর (এই সজীব মহিলা তথায় থাকিলেও) আমি কোন শব্দ শুনি নাই, কোন কম্পন দেখি নাই, কেবলমাত্র একবার তাঁহার দেহের উপরিস্থিত তৃণগুচ্ছগুলি ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল।" * এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। নলডাঙ্গার রাজ-পরিবারে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। ২৪ পরগণা পানিহাটিতে ঐরূপ একটি সতী পতির চিতানলে দেহত্যাগ করে, ম্যাজিষ্ট্রেট শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু শুনা যায়, অনেক মহিলাকে তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদিগকে পতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত। তাহারা লোক-লজ্জা-ভয়ে সতী হইতে অসম্মত হইতে পারিত না। ইহা স্ত্রী-হত্যা এবং প্রকৃত নিয়মের ব্যাভিচার। সুতরাং উহা নিষিদ্ধ করা অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ যখন শাস্ত্রে উহার অনুকল্প ব্যবস্থা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন উহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। রামচন্দ্রের জননী কৌশল্যা, কেকয়ী প্রভৃতি চিতানলে দেহত্যাগ করেন নাই। তাই বলিয়া তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হয়েন নাই। সুতরাং, উহার যখন অপব্যবহার হইতেছিল, তখন উহা নিষেধ করা অন্যায় হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এখনও অনেক হিন্দু নারী পতির বিরহে পতিচিতা-শয্যায় দেহত্যাগ করিতে না পারিলেও অন্য উপায়ে দেহত্যাগ করে। উহা যে আত্মহত্যাজনিত মহাপাপ, তাহা তাহারা মানিতে চাহে না।

কিন্তু বিবাহ-সংস্কার ঐরূপ কাম্যকর্ম্ম নহে। উহা দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। হিন্দু যদি গভীর বৈরাগ্য বশতঃ গার্হস্থ্যধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করে, এবং সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেই হইবে। নতুবা হিন্দুর হিন্দুত্বই বিলুপ্ত হইবে। তাহার তপস্যা প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে। মহর্ষি রুচির উপাখ্যানে এই কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি রুচি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কঠোর তপশ্চরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু উগ্র তপস্যার দ্বারা তিনি কোনরূপ ফললাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি পিতৃ-ঋণ পরিশোধ না করিয়া, অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন না করিয়া তপশ্চরণ করিতেছ, সুতরাং তোমার সমস্ত তপস্যাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কারণ, বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল তপস্যা করিলেই তপস্যার ফললাভ সম্ভবে না। তদনুসারে মহর্ষি রুচি বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যকেও তাঁহার পিতৃগণ ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহ-সংস্কার একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। কেন হয়, তাহার কারণও এ স্থলে বলা আবশ্যক।

হিন্দু কৌলিক ধারায় বিশ্বাসী। হিন্দুর ধারণা, তাহার পিতৃ-পুরুষগণ সহস্র সহস্র পুরুষ ধরিয়া যে ধর্ম্মসাধনা করিয়া গিয়াছেন,—তাহার ফল তাঁহাদের অস্থি-মজ্জায় ও শুক্র-শোণিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে,—এবং বংশধারার প্রবাহে তাহা পরবর্ত্তী বংশধরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। অনুশীলনের অভাবে উহা সুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু একেবারে সহজে লুপ্ত হয় না। বংশধারা যদি অনাবিল থাকে, তাহা হইলে সেই

---

* Vide Bengal under the Lieutenant-Governors vol. I page 160—61.

পিতৃপুরুষের পুরুষপরম্পরাকৃত বিকশিত সাধনার শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না। সেই জন্য হিন্দু বংশধারাকে অনাবিল রাখিবার চেষ্টা করে। য়ুরোপে উইজ্‌ম্যান্‌, মেণ্ডেল, গ্যাল্টন প্রভৃতি এই বংশধারার সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিরা এই কৌলিক শক্তির সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা বংশধারা অনাবিল রাখিবার জন্য বড়ই কঠোর নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। যাহারা তুল্য সাধনা পথের সাধক, তাহাদের মধ্যেই বিবাহব্যবস্থা নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই জাতিভেদের উদ্ভব হইয়াছে। পাছে অতি ঘনিষ্ঠতার ফলে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সংমিশ্রণ ঘটে, তাহার জন্যই তাঁহারা শেষে এক জাতির সহিত অন্য জাতির ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিসংমিশ্রণকে কিরূপ ভীষণ অনিষ্টকর ব্যাপার মনে করিতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাহা অর্জ্জুনের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। যথা :—

হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম সকল নষ্ট হয়। কুলের ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। ১।৩৯

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের আধিক্য হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইয়া পড়েন। কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ১।৪০

কুলঘাতকদিগের এবং কুলের নরকপ্রাপ্তির জন্যই বর্ণসঙ্কর আবির্ভূত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করদিগের পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড-জলক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকেন। ১।৪২

কুলঘাতীদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা জাতি, ধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ১।৪৩

হে জনার্দ্দন মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে তাহাদের অনন্তকাল নরকবাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১।৪৪

অর্জ্জুনের এই উক্তি হইতে হিন্দুর বর্ণসঙ্কর ও জাতিসঙ্কর যাহাতে উৎপন্ন না হয়, সে জন্য যে বিশেষ সাবধানতা ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। স্ত্রীজাতি ব্যভিচারিণী হইলে এই বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির শঙ্কা সম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। যৌবন-বিবাহে নারী জাতির ব্যভিচারিণী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবেই। সেই জন্যই আর্য্যগণ ভারতে যৌবন-বিবাহ-রহিত করিয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। *

বাল্যবিবাহ দাম্পত্য-প্রণয় অতিশয় বৃদ্ধি করে, ইহা অধুনা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণও ভূয়োদর্শন দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত য়ুরোপেও বিরল নহে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। সেই ব্যাপার লইয়া তথায় তুমুল আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। ব্যাপারটি এইরূপ। তথায় ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের সহিত ঐরূপ বয়স্ক একটি যুবতীর প্রণয় জন্মে। যুবকটি সামান্য কার্য্য করিত, সম্ভবতঃ তাহার চাকরী যায়। যুবতীটি যুবকের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া যুবতীর আত্মীয় তাহাকে ঐ স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যখন এই তরুণ দম্পতি দেখিল যে, তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তখন উভয়ে যুক্তি করিয়া একদিন গভীর নিশীথে পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রেলের পাটিতে গলা দিয়া শুইয়াছিল। তাহাদের উপর দিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। প্রভাতে পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌ যখন কার্য্যস্থানে গমন করিতেছিল, তখন সে সভয়ে দেখিল যে, এই দম্পতির দেহ তখনও দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের উভয়ের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তাহারা আলিঙ্গন ছাড়ে নাই, ইহাতে তাহাদের প্রণয়ের দৃঢ়তাই সূচিত হইয়াছিল। এ সংবাদ বিলাতের 'ওভারল্যাণ্ড মেল' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাপারে বাল্যবিবাহে দাম্পত্য প্রণয় যে অত্যন্ত দৃঢ় হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাল্য-বিবাহে যে দাম্পত্য পবিত্রতা রক্ষিত হয়, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীমতী এলেন কী তাঁহার Love and marriage নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, বাল্যবিবাহ ব্যতীত প্রকৃত যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করা প্রায় সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে লোককে সংযত হইতে বলিলে তাহারা কখনই সেই সংযমের উপদেশ মানিতে চাহিবে না। * বলবান্‌ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে কর্ষণ করে, তখন সাধারণ লোককে উহারা যে সহজেই বিপথে লইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রবৃত্তির প্রথম আক্রমণ অতিশয় তীব্র হইয়া থাকে। অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে শৈশবকাল

---

* আমাদের সংস্কারকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, ভারতের একই জাতির মধ্যে যে নানা বর্ণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, আর্য্য এবং অনার্য্যগণের মধ্যে শোণিতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এ ধারণা অভ্রান্ত নহে। প্রখর সূর্য্যকিরণে গাত্রবর্ণ মলিন হইবেই। শ্বেতচর্ম্ম অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সূর্য্যতাপ আকর্ষণ করে। সেই অতিরিক্ত তাপ আকর্ষণ নিবারিত করিবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবের চর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ অনুরঞ্জক পদার্থ (pigment) উদ্ভূত হয়। সেই জন্য আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক গাত্রচর্ম্মকে বাদ দিয়া করোটির (cephelic index) গঠন দেখিয়া বংশধারা নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত মনে করিতেছেন।

* It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is almost impossible without eayly marriage; for simply to refer the young to abstinence as the true solution of the problem is, as we have already maintained, a crime against the young and against the race, a crime which makes the primitive force of nature, the fire of life, into a destructive element.—(Love and marriage by Allen Key Chap VIII p. 311.)

হইতে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে শিক্ষা না দিলে কখনই লোক উহার আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় না। আজকাল আমাদের দেশের যুবকদিগকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিতেছে, তাহা সমাজ-সংস্কারকগণ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অনেকে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে অনৈসর্গিক পথে লালসাতৃপ্তিসাধনে রত হইতেছে। সেই জন্য আমাদের যুবকমহলে শুক্রের পীড়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, বহুমূত্র, এমন কি ক্ষয়রোগ পর্য্যন্ত অতিশয় ব্যাপকভাবে দেখা দিতেছে। আমরা অনেক কবিরাজের ও ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা অনেক তরুণের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদের অভিভাবককে তাহাদিগকে বিবাহ দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিবাহ করিতে চাহে না। নারী জাতির উপর ইহাদের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে। অনেক স্থলে ইহা অনৈসর্গিক পথে প্রধাবিত হইবার ফল। এখন জিজ্ঞাস্য, যে অবস্থার ফলে কিশোরদিগের মধ্যে এই অনৈসর্গিক পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, সেই অবস্থার ফলে কিশোরীদিগের মধ্যে সেই পাপ প্রশ্রয় পাইবে না, ইহা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন কি? সমস্যাটি কিন্তু কঠিন।

বাল্য-বিবাহের দোষ যতই থাকুক, উহা যে দাম্পত্য প্রেমকে দৃঢ় করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দাম্পত্য-প্রেমই এই দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ দেশের লোককে যেরূপ ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতে যদি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় লোকের দাম্পত্যবন্ধন শিথিল হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ভারতবাসীকে অনেক ঘোর অসুবিধার মধ্যে বাস করিতে হয়। ইহার উপর যদি তাহা-দিগকে আবার গার্হস্থ্যসুখ হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে এ জাতির যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা অনেকে কল্পনাও করিতে পারিতেছেন না। প্রেমের বন্ধন দৃঢ় না হইলে পত্নী কখনই পতির সহিত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে সম্মত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ ঘটনা যে না ঘটিতেছে, তাহা নহে। আমরা এমন কথাও শুনিয়াছি যে, কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া থাকেন যে, "তুমি যদি আমাকে থিয়েটার বায়োস্কোপ না দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি যাহার সহিত ইচ্ছা তাহার সহিত থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিতে যাইব, তুমি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না, করিলেও তাহা শুনিব না। আমি তোমার পিণ্ড রাঁধিতে পারিব না,—তুমি আমাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য, আমি যেখানেই থাকি, সেইখানে থাকিয়া তোমার নিকট হইতে খোরপোষ আদায় করিব।" এই নারীটির একটু অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল এবং ইনি বালিকা-বিদ্যালয়ে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য ইহার স্বামী শেষটা দেশ-ত্যাগ করিয়াছেন। আজ কয়েক বৎসর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ চরম ব্যাপার অবশ্য অধিক এখনও ঘটে নাই; আর ঘটিলেও তাহা শুনা যায় না। অল্প দিন পূর্ব্বে এক শিক্ষিতা হিন্দু যুবতী স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে আবশ্যক সহানুভূতিলাভে সমর্থ হয়েন নাই বলিয়া মুসল-মানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আদালতে প্রকাশ করিয়াছেন। কোন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা তাঁহার বিবাহিতা স্বামীর সহিত বনিবনাও হইত না বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আসল কথা, বাল্যকালে বিবাহ না হইলে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয় না। যৌনলিপ্সা আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে নর-নারীর মধ্যে যে প্রণয়সাহচর্য্যাদির দ্বারা আত্ম-প্রকাশ করে, সেই প্রণয়ের বন্ধনই দৃঢ় হইয়া থাকে, ইহাই মনীষী-দিগের মত। আমাদিগের দেশের ঋষিরা ইহা বুঝিয়াই বোধ হয় ভারতে বাল্য-বিবাহের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য খণ্ডের অনেকে ইহা স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, বাল্যকালে নরনারীর মধ্যে যে প্রণয় গজাইয়া উঠে, তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। য়ুরোপে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছে। *

কিন্তু বাল্য-বিবাহের যে কোন দোষ নাই, তাহা বলা যায় না। জগতে কোন ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত ভাল অথবা নিখুঁত মন্দ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ব্যবস্থা যতই ভাল হউক, তাহার অপব্যবহার হইতে পারে। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে, তাহার যে অপব্যবহার হইতেছে না, আমি তাহা বলি না। আমাদের ৮ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালি-কার বিবাহ দিবার কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নাই। অথচ লোক ঐরূপ বিবাহ দিতেছে। ঐরূপ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ, হেমাদ্রি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিবও এই উক্তি করিয়াছেন। কুমারী পতির মর্য্যাদা জানে না, পতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বুঝে না, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ কিছুই বুঝে না, সেরূপ কন্যাকে পিতা কখনই বিবাহ দিবে না। সুতরাং এক বৎসর দুই বৎসর বা সাত আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া বিধেয় নহে। পিতা যদি আট নয় বৎসরের কন্যাকে ঐরূপ শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গৌরীদানের বা রোহিণীদানের

---

* The young know, if any can know, that no form of love is more beautiful than that in which two young find each other as early that they do not even know, when their feeling was born, and accompany each other through all their fortunes sometimes even to death, for now and then life vouchsafes this crowning fortune. Never do greater possibilities exist for the happiness of both the individuals and of the race than in a love which begins so early that the two can grow together in a common development, when they possess all the memories of youth as well as all the aims of the future in common; when the shadow of a third has never fallen across the path of either; when their children in turn dream of the great love they have seen radiating from their parents.—(Op Cit Page, 313.)

ফললাভের লোভ করিতে পারেন, অন্যথা তাঁহার শাস্ত্রবাক্য ও শিববাক্যলঙ্ঘন হেতু পাতিত্য জন্মিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাদের আস্থা আছে, যাহারা প্রকৃত শাস্ত্রবিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ হেমাদ্রি ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন :—

"কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥"

কুমারীকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে ধর্ম্মে এবং সুনীতিতে দৃঢ় আস্থাবতী করিবে। কারণ, যে কন্যা বিদ্যালাভ করে, সেই কন্যা দুইয়েরই (অর্থাৎ পতিকুলের ও পিতৃকুলের) কল্যাণদায়িনী হইয়া থাকে। ইহার পর হেমাদ্রি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ঋষিরা ইহাকেই সনাতন পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে কন্যাকে দশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ কোনমতেই দেওয়া যায় না। তবে এ কথাও সত্য যে, বর্ত্তমান কালে শিক্ষার যেরূপ দুর্গতি হইয়াছে, তাহাতে নারীদিগকে যে ধর্ম্মনীতিতে সুদৃঢ়ভাবে আসক্ত করা যাইবে, তাহা মনে হয় না। এ দেশের লোক নীতিধর্ম্মে (Ethical Religion) কখনই আস্থাবান্ হইবে না। যে নীতিধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অন্তস্তলে সূত্রাকারে নিহিত, তাহা উচ্চমনা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পালনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের মন তাহার উপর কদাচ আকৃষ্ট হয় নাই। সকল দেশেই দেখা যায় যে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মই (Revealed Religion) সাধারণকে ধর্ম্মনীতিকে সুদৃঢ় রাখিতে পারে। নীতিধর্ম্ম বা ethical religion অতি উচ্চমনা, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির পালনীয় হইতে পারে, সাধারণ লোকের মধ্যে উহা বিশেষ প্রভাবলাভ করিবে না। য়ুরোপে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের উপর অনাস্থা জন্মাইয়া লোককে নীতিধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার প্রচেষ্টা ফলে লোক ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। তথায় দেখা যায় যে, যাহারা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মে আস্থাবান্, তাহাদের অনেকটা ধর্ম্মে মতি আছে, যাহারা নীতিধর্ম্মের দোহাই দেয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্নবিস্তর প্রলোভনে নীতিধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। মুখে ধর্ম্ম স্বীকার করা ধার্ম্মিকতার নিদর্শন নহে, প্রবল প্রলোভনের হস্ত হইতে যে ধর্ম্মবিশ্বাস মানবসমাজকে রক্ষা করিতে পারে, সেই ধর্ম্মবিশ্বাসই প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস। সে হিসাবে মার্কিণ প্রভৃতি দেশ যেরূপ ধর্ম্মহীন, শিক্ষিত বঙ্গবাসীও ঠিক সেইরূপ ধর্ম্মহীন। মার্কিণ দেশের ধর্ম্মহীনতা সম্বন্ধে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, মার্কিণী মুখে যাহা বলুক, কাযে তাহারা অত্যন্ত ধর্ম্মহীন। * অবশ্য সকলেই যে ধর্ম্মহীন, এ কথা আমরা বলি না, কিন্তু অধিকাংশই যে ধর্ম্মহীন, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ মার্কিণ বা য়ুরোপের কতকগুলি ধর্ম্মহীন দেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মহীনতায় পশ্চাদ্পদ নহে। বরং অধিকতর অগ্রসর বলিয়া মনে হয়। আমরা যে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কোন কারবার চালাইতে পারি না, তাহার কারণ, আমাদের ধর্ম্মহীনতা। যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের ঘোর দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা নারীজাতিকে দিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ আরও দ্রুত সম্পাদিত হইবে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নাস্তিকতায় শিক্ষিত বঙ্গবাসী, বুঝি বা শিক্ষিত ভারতবাসী, মার্কিণীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর। তাঁহার কারণ, মার্কিণে যুবকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়,—তথায় শতকরা ৯০ জন ঈশ্বরে আস্থাবান্, শতকরা ৭৭ জন গীর্জ্জায় গমন করেন এবং শতকরা ৮৫ জন বিশুখৃষ্টের ঐশী-শক্তিতে বিশ্বাসী। মার্কিণের আদম সুমারের হিসাব হইতে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই শিক্ষিত সমাজের যদি কোন সন্ধান লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কয় জন আস্তিক পাওয়া যাইবে? আস্তিক লোকের সংখ্যা হয় ত কিছু থাকিতে পারে, শতকরা ৫০ জনও হইতে পারে, কিন্তু কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, ইংরাজী-শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করে, ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ইষ্টমন্ত্র জপ করে, এরূপ কয় জন আছে? আমাদের মনে হয়, শতকরা ৫ জন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেহ হয় ত গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করেন, কিন্তু সেরূপ ঐকান্তিকতার সহিত জপ করেন না; ইহার কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মহীন শিক্ষা। সে শিক্ষা নারীদিগকে প্রদান করিবার আমরা ঘোর বিরোধী। যে শিক্ষা মানুষকে ধর্ম্মে আস্থাবান্ করে, সেই শিক্ষাই নারীগণকে দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই উপলক্ষে আমি ধর্ম্মহীন শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বিলাতে বেকনের আমল হইতে বিজ্ঞানকে কার্য্যতঃ ধর্ম্মের আসন অপেক্ষা উন্নত আসনে উপবিষ্ট করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলে ত তথায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্ম-শিক্ষা দান এখনও একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই। তথায় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, এমন কি রয়্যাল সোসাইটীর সদস্যগণ, সভায় সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে প্রার্থনা-পাঠের সময় উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইন বা আইন বিদ্যালয়ের বেঞ্চার বা অন্যতম প্রবীণ সদস্য তাঁহাদের ভোজনকালে একটা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা (Benediction) পাঠ করিয়া থাকেন। তথাকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক প্রতিচালিত হইতেছে। আর আমাদের দেশে শিক্ষা সম্পূর্ণ ধর্ম্মহীন। মানুষের মধ্যে যে একটা ধর্ম্মভাব আছে, আমাদের দেশে উহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কয়েক শতাব্দ ধরিয়া যে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে, সেই ইংলণ্ড এখন ধর্ম্মশিক্ষা বর্জ্জন করিতে সম্মত নহেন। আর আমাদের দেশের শিক্ষা-মাত্রই ধর্ম্মহীন হইয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ অসংযত এবং দাম্ভিক হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এ দেশ হইতে বিলাতে কিছুকাল বসবাস করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, বিলাতের একটি শিশুর যে সংযম আছে, ভারতের

* The answers to the questionnaire do not prove the United States a christian or even a religious nation. Superstitious savages whose lives are absolutely regulated by their fears and faiths are far more religious. The test is one, not of profession but of results.—(Literary Digest 15th January, 1927.)

ইংরাজী-শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদিগের সে সংযম নাই। * শিক্ষার দোষই উহার প্রধান কারণ। যে দেশে শৈশব হইতে লোক সংযম শিক্ষা করে, সে দেশে যৌবন বিবাহ প্রবর্ত্তনের ফলে যদি ঘোর কুফল ফলিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের এই সংযম-হীন শিক্ষাপ্লাবিত দেশে ঐরূপ যৌবন-বিবাহের ফল কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা সকলের বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে কি ? উহার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিলেই আমাদের শাসকবর্গ এবং মিস্ মেয়োর দল বলিতে থাকিবেন যে, ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন লাভের যোগ্য নহে। সার জর্জ্জ বার্ডউড এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। † পাদটীকায় তাঁহার কথা উদ্ধৃত করা গেল।

* ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ২৫শে তারিখে লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে একটি সন্দর্ভে প্রবন্ধ পাঠক বলেন :—

The greatest function of education is self control—the control of the right limb, organ or faculty for a right purpose. If we take this standard, we find that an infant of England is more educated than a graduate of India. Often do I enjoy the intelligent but controlled glances of a baby lying in its mother's lap in an omnibus—'intelligent' because they show that it distenguishes and is interested in my colour, 'controlled' because there is a studied suppression of curiosity in order to be polite and considerate.

এই প্রবন্ধ পাঠক পাণ্ডত শ্যামশঙ্কর উহার কতকগুলি উদাহরণও দিয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

† Misfortunately whenever we have at-attempted to do so, we have too often done more evil than good—as in the destruction of the ediosyncratic handicraft arts of India, by the teaching of our English Schools of Art; and worst of all in the undermining of the religious beliefs of the Hindus through the etheistical, indeed the antiheistical, influences of our system of public instruction in India, Should we proceed further with this Anglicizing programme, and, in our ignorance of the true character of the aspirations of the Hindus, and meticulous subservience to homebred proselytizing philanthropists, foist on India any instalments of self government, after the model of our indigenous methods of party government' the end of all things will at once be at hand, alike for Muslims and Hindus of India, and for the United kingdom, as the titulary of the Indian Empire. That would probably to our own exceeding gain, but it would certainly be utter and irremediable ruination of India.—(Sva Page VIII by Sir George Birdwood.)

এই ধর্ম্মশিক্ষার ও দেশীয় ভাবে শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিই মনে প্রাণে একেবারে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ দেশের আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি কিছুরই মর্ম্ম বুঝেন না। সমস্তই বৈদেশিক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। শিক্ষালাভের প্রথম অবস্থা হইতে ইঁহারা কেবল তোতা পাখীর মত বিলাতী বুলি শিখিয়াছেন, বিলাতী সাহিত্য পড়িয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা দিনান্তে একবার গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ করেন না; নমাজ পড়েন না, গীর্জ্জায়ও যান না। ইঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি একেবারেই সঙ্কুচিত ও বিলুপ্তপ্রায়। ইঁহাদিগের নিকট হইতে হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার আশা করা পাষাণ পেষণ করিয়া জললাভের আশার ন্যায় নিষ্ফল। ইঁহারা মুখে যতই জাতীয়তার কথা বলুন, কাযে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকেই কেবল ইঁহারা একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পল্লবগ্রাহী মাত্র। এখন এইরূপ জাতিভ্রষ্ট সম্প্রদায় কর্তৃক নীয়মান হইলে দেশের যেরূপ দুর্গতি হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই হইতে বসিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন আর্য্যগণের প্রধান লক্ষ্য বংশধারার পবিত্রতা রক্ষা। সেই জন্য নারীগণ যাহাতে ব্যভিচারিণী না হইতে পারে, সে দিকে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যৌবন-বিবাহে ব্যভিচারের শঙ্কা থাকে বলিয়া তাঁহারা যৌবন-বিবাহ রহিত করিয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই বাল্যবিবাহের দুইটি স্তর আছে। একটি ধর্ম্ম্য-বিবাহ, আর একটি কাম্য-বিবাহ। কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে যে নারায়ণ এবং অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহ হয় তাহাই ধর্ম্ম্য-বিবাহ। এই ধর্ম্ম্য-বিবাহ হইবার পর পত্নী পতিকুলের ধর্ম্মকর্ম্ম-পালনের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। তিনি পতিকুলেরই ধর্ম্ম-কর্ম্মসাধন এবং অশৌচাদি পালন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকার্য্য হিসাবে তিনি তখন পতিকুলের, কিন্তু তখন পতির সহিত তাঁহার কাম্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রজস্বলা হইবার পর যখন কন্যার গর্ভাধান-সংস্কার সম্পাদিত হয়, তখন পতি কর্তৃক পত্নীর দেহভোগের অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে নহে। সেই জন্য এই গর্ভাধান কার্য্যকে "দ্বিতীয় বিবাহ" বলা হয়। এই ব্যবস্থা যে সুন্দর এবং সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধি বিরহিত এবং ব্যভিচারে বিতৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তিরা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কোন মানুষই কুসংস্কারের অতীত নহে। সকল মানুষই ভ্রান্ত সংস্কার দ্বারা অল্পাধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। বাল্যকালের শিক্ষা অনেক সময়ে মানুষের মনে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দিয়া থাকে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনা-সম্পর্কিত সন্দর্ভ পুস্তকে এইরূপ নানা জাতীয় কুসংস্কার (bias) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের

দেশের লোকও বাল্যে বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতির প্রতিকূলে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনে দেশীয় আচার-ব্যবহারের উপর এতই বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে যে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাতে অনেকের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

এ কথা সত্য যে, প্রকৃতি প্রজারক্ষার্থ নর-নারীর মধ্যে যে আসঙ্গলিপ্সা বিকশিত করিয়া দেন, তাহা হইতেই বিবাহ-ব্যবস্থা জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে নারী ও নরের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা প্রবল হয়, বিবাহকাল নির্ণয় করিতে হইলে তাহার বিচার করা আবশ্যক। জীবধর্ম্ম অনুসারে নারী ঋতুমতী হইলেই তাহার মনে সেই লিপ্সা প্রকাশ পায়। সমস্ত জীবজগং হইতেই এই তথ্য জানিতে পারা যায়। রজস্বলা হইবার পরই নারীজাতি নরকামা হইয়া থাকে। হ্যাভলক এলিস তাঁহার বিখ্যাত Studies in the psychology of sex নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নারীজাতির রজঃ-প্রবৃত্তি হইবার পরই তাহারা পুরুষসঙ্গমসমর্থা হইয়া থাকে।* কিন্তু বিবাহ কেবল যোগ্যতা দেখিলেই করিবে না। দাম্পত্য প্রণয় যাহাতে সুদৃঢ় হয়, তাহার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। মনোবিজ্ঞানবিৎ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, বাল্যে মনোবৃত্তির বিকাশকালে যে বন্ধুত্ব ও প্রণয় জন্মে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রগাঢ় হইয়া থাকে। এলেন কী তাঁহার Love and Marriage নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is almost impossible without early marriage. অর্থাৎ বাল্যবিবাহ ব্যতীত প্রকৃত যৌন পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব।

সেই হেতু বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার এবং গার্হস্থ্য জীবন সুখময় করিবার উদ্দেশ্যে আর্য্যগণ বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কন্যার রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে যখন অন্য পুরুষের ছায়া কন্যার চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত না হয়, সেই সময়ে বালিকার ধর্ম্ম-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে তাহার কাম্য বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যবস্থা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শুনিতেছি, সরকার এবার বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর করিতে কিছুতেই সম্মত নহেন। এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য সার চর্ল্জ বার্ড উড বলিয়াছেন, ইহার ফলে আমাদের (অর্থাৎ শাসক জাতির) পক্ষে হয় ত খুবই অধিক লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতের পক্ষে যে ক্ষতি হইবে, তাহা চরম এবং প্রতীকারের অতীত হইবে। এইবার বিলাতী আদর্শে সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার করিবার সূত্রপাত হইল। ইহার ফল কিরূপ হইবে, অচিরে ভারতবাসী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই মনোরাজ্য অধিকারের ফলে প্রাচীন ধর্ম্মগত সাধনা ও সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এবং সেই ধ্বংসস্তূপ হইতে কিরূপ 'ইণ্ডিয়ান নেশন' গজাইয়া উঠিবে, তাহা ভবিষ্যদ্বংশধরগণ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস, যদি আইন ব্যতিরেকে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে এত ক্ষতি হইত না,—আইন দ্বারা বল পূর্ব্বক এই ব্যবস্থার ফল অতি ভীষণ হইবে। এবারে আমরা সকল কথা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না, বারান্তরে অন্যান্য কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

* The age of sexual maturity which occurs much earlier, both physically as well as psychically and is determined in women by a precise biological event the completion of puberty on the onset of mensturation... it is recognised that a girl becomes sexually a woman at puberty, etc. (vol vi page 524—5.)

প্রতিহিংসা

কোন্ সে অতীত যুগে সমুদ্র-মন্থনে,
উঠেছিল সুধা-ভাণ্ড পুণ্য শুভক্ষণে!
মোহিনী-মূরতি হরি মোহের ছলনে,
কবে সে ভুলায়েছিল সুরাসুরগণে!

চক্রধারী ছলনায় অসুরে বঞ্চিয়া,
দেবমাঝে সব সুধা দেছিল বাঁটিয়া।
তুমি তা লভিলে রাহু দেবসনে বসি,
অমর হইয়া গেলে,—দেখিল তা শশী!

এই তার অপরাধ! আজো তাই তার
পিছে পিছে ছুটিতেছ রাক্ষস-আকার!
আজো তব দানবত্ব পারনি ভুলিতে,—
সুধা খেলে;—দেবত্ব ত পার নি লভিতে!
মুহূর্ত্তের ভুলে তার সারাটি জীবন
এমনি কি রোষানলে করিবে দহন?

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল বি, এ

রহস্যের খাসমহল

তৃতীয় প্রবাহ

দুর্ভেদ্য রহস্য

কুপের আরব ভৃত্য নিঃশব্দে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র যোয়ানের স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল। সে এত শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইল যে, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমার বিস্ময় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল।

যোয়ান তাহার চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া প্রশান্তভাবে হাসিতে লাগিল। তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার লজ্জা হইল; মনে হইল, তাহার বিপদের আশঙ্কায় আমার ঐরূপ বিচলিত হওয়া উচিত হয় নাই। কুপ তাহার চেয়ারে বসিয়া উদাসীনভাবে চুরুট টানিতে লাগিল; কিন্তু সে এক একবার বক্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল; যোয়ানের মুখের দিকেও সে দুই একবার দৃষ্টিপাত করিল। যোয়ানের আকস্মিক প্রশান্ত ভাব কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের প্রভাবের ফল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে যে কফি পান করিয়াছিল, তাহাতে কোন মাদক দ্রব্য মিশ্রিত ছিল কি না, তাহাও অনুমান করা আমার অসাধ্য।

সেই কফি আমিও পান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার কোন কুফল বুঝিতে পারি নাই। বৃদ্ধ কুপ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা হয় ত ভ্রমপূর্ণ। যোয়ান তাহার আদেশপালনে সম্মত না হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার সেই ক্রোধের মূলে কোন দুরভিসন্ধি ছিল, আমার এরূপ ধারণা করা হয় ত সঙ্গত হয় নাই।

আমি যোয়ানের নীল-নেত্রে যে আতঙ্ক পরিস্ফুট দেখিয়াছিলাম, তাহার চিহ্নমাত্র আর দেখিতে পাইলাম না। অল্পকাল পূর্ব্বে সে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া আমার সহিত গল্প করিতে লাগিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। বৃদ্ধ ধূমপান শেষ করিয়া আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল; সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতির আলোচনায় তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম, তথাপি আমার আশঙ্কা হইল—ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিয়াছি, এখানে আমার জীবন বিপন্ন হইবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও আমি নিরাপদে এই স্থান ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার এরূপ আশঙ্কার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কুপ বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল, আমি পৃথিবীর নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছি শুনিয়া সে আমাকে বলিল, "আপনার দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য আনন্দলাভ?"

আমি বলিলাম, "না, কেবল আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন দেশে গমন করি নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুরোধেই আমাকে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে হইয়াছে। আমি একটি কারবারের অংশীদার। আফ্রিকার ও দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে সকল পণ্য-দ্রব্যের যথেষ্ট 'কাটতি' আছে, তাহাদের দেশে সেই সকল দ্রব্য রপ্তানী করাই আমার কায।"

কুপ হাসিয়া বলিল, "বার্মিংহামে যে সকল মনোহারী জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহাই ঐ সকল দেশে রপ্তানী করাই আপনার কায? আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইতাম যে, প্রাচীন যুগের নানা কৌতুকাবহ দ্রব্যের অসার অনুকরণ,

—নানাপ্রকার সেকেলে অস্ত্র-শস্ত্র, মালা, কাঠের শিল্পদ্রব্য কি উপায়ে নিউবিয়ায় ও সুদানে ছড়াইয়া পড়িল? সেগুলি তবে ইংলণ্ড হইতেই রপ্তানী হইয়া থাকে?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, অধিকাংশই বটে; লক্সর, আছুয়ান, খারতুম প্রভৃতি স্থান হইতে ঐ ঝুটামালের কি পরিমাণ বরাত আসে, তাহা শুনিলে আপনি অধিকতর বিস্মিত হইবেন। নানা দেশ হইতে যে সকল লোক মিশরদেশে ভ্রমণ করিতে যায়, তাহারা বহু মূল্যে ঐ সকল খেলো জিনিষ কিনিয়া আনে; কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল সামগ্রী প্রাচীন যুগের গোরস্থান বা মন্দির প্রভৃতি হইতে স্থানীয় লোকেরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই তাহা সরবরাহ করিয়া থাকি। প্রাচীন যুগের মমির গলার মালা, অদ্ভুতাকৃতি তৈজসপত্রাদি আসলের অনুকরণে বার্মিংহাম প্রভৃতি নগরে নির্ম্মিত হয়; তাহা মিশরের অধিবাসীরা আমাদের নিকট ক্রয় করিয়া, তাহাদের দেশের প্রাচীন যুগের শিল্পদ্রব্য বলিয়া য়ুরোপীয়দের নিকট বহু মূল্যে বিক্রয় করে।”

কুপ আমার কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “হুম্! তাহা হইলে বলুন, আপনাদের এ জুয়াচুরীর ব্যবসা?”

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলাম, “না, আপনি ইহাকে জুয়াচুরীর ব্যবসা বলিতে পারেন না। আফ্রিকার বা দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা আমাদের নিকট ঐ সকল সামগ্রী না পাইলে তাহারা ব্যবসায় বন্ধ করিবে না; জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা তাহাদের অভাব পূর্ণ করিবে। আমাদের এই লাভের কারবারটি ধূর্ত্ত জার্ম্মাণদের হস্তগত হইবে; আমাদের দেশের একটি শিল্প বিলুপ্ত হইবে, এবং নিরুপায় বেকারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে। দেশের এইরূপ অর্থ-সঙ্কটের কে সমর্থন করিবে? বিশেষতঃ ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-শিল্প, লোহা-লক্কড়ের জিনিষ, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য দেশান্তরে পাঠাইয়া তাহাদের বিনিময়ে এ দেশে স্বর্ণ আনয়ন করা, যে ব্যক্তি অবৈধ বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবে, তাহাকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? কারণ, এ দেশের ইষ্টানিষ্ট তাহার বুঝিবার শক্তি নাই। আমরা এ দেশের কাচ রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে কাঞ্চন আমদানী করিতে পারি বলিয়াই জীবনের যুদ্ধে আমরা জয়ী হইয়াছি। ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্য আফ্রিকার দুর্গম প্রদেশেও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একবার আমি টিম্বকটুতে এক জন লোকের নিকট বালতির আকারবিশিষ্ট চর্ম্মনির্ম্মিত একটি আধার দেখিয়াছিলাম, তাহা রেশমী হ্যাটের আধার। তাহাতে লণ্ডনের কোন বিখ্যাত টুপিনির্ম্মাতার নাম মুদ্রিত ছিল। সেই লোকটি তাহার ব্যবহার জানিত না, সে তাহা আমার নিকট বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। ঐ জিনিষ সেখানে কিরূপে গেল বলিতে পারেন?”

কুপ মাথা নাড়িয়া বলিল, “কি জানি? ইংলণ্ডজাত পণ্যদ্রব্য আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাণিজ্য-জীবী ‘স্কটস্‌ম্যান’দেরই ইহা অধ্যবসায়ের ফল।”

যোয়ান তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। সে যে কফিটুকু পান করিয়াছিল, তাহা তাহার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, জানি না, কিন্তু আমার যেন সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিতেছিল, এবং মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া মাথার ভিতর ঝিম-ঝিম করিতেছিল। তাহা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইল।

কুপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মিঃ কোল্‌ফাক্স, আপনাদের ঐ ব্যবসায় সম্বন্ধে আমিও কোন কোন কথা জানি। সত্য কথা বলিতে কি, কোলম্যান ষ্ট্রীটের রাইভার কোম্পানীর আমি প্রধান অংশীদার। সুতরাং আপনার সহিত আজ আমার এ ভাবে সাক্ষাৎ হওয়া একটু বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?”

তাহার কথা শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। ব্যবসায় উপলক্ষে এই রাইভার কোম্পানীর সহিত আমারও কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। তাহাদের কারবার পৃথিবী-বিখ্যাত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দশ বারোটি স্থানে তাহাদের আফিস ও মালগুদাম আছে। অন্য কোন কোম্পানীর এরূপ বিস্তীর্ণ কারবার নাই।

আমি সরলভাবে বলিলাম, “আমি রাইভার কোম্পানীর পক্ষপাতী। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহারা আমাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাহারা কোন দিন অবৈধ উপায়ে বা ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের উদারতা ও সততা প্রশংসনীয়। তাহারা কখন কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।”

কুপ বলিল, "হাঁ, আমারও তাহা অজ্ঞাত নহে। আপনি রাইভার কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালীর সমর্থন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আমার যৌবনকালে আমি বাণিজ্য-ব্যবসায় উপলক্ষে প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি; তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আপনি সেই সময় বোধ হয় ইব্রাহিমকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন ?"

কুপ বলিল, "হাঁ, আপনার অনুমান সত্য।"

কুপ এই কথা বলিবার পূর্ব্বে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া আমি যোয়ানের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, সে নির্নিমেষ-নেত্রে শূন্যে চাহিয়া আছে, সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, দেহ মার্ব্বেল-মূর্ত্তির ন্যায় স্থির!

আমি লাফাইয়া উঠিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "আবার কি হইল ?"

কুপ বলিল, "ব্যস্ত হইবেন না, কিছুই হয় নাই। মধ্যে মধ্যে উহার ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে; কেহ উহার নিকটে না থাকিলে উহার প্রকৃতিস্থ হইতে বিলম্ব হয় না।"

যোয়ান নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টি কোমলতাবর্জ্জিত, কিন্তু তাহাতে আতঙ্ক পরিস্ফুট দেখিলাম। তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। বুঝিলাম, তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই; কিন্তু মনে হইল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, এই জন্য তাহার নড়িবার, এমন কি, কথা কহিবারও শক্তি নাই!

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "সেই কফিটুকু পান করিয়াই উহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে। তুমি—তুমি পিতা না পিশাচ ? কেন তুমি উহাকে তাহা পান করিতে বাধ্য করিলে ?"

কুপ আমার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "কারণ, মধ্যে মধ্যে উহার 'ফিট' হয়, তাহা নিবারণের জন্য কফির সঙ্গে উহাকে একটা ঔষধ পান করাইয়াছি। তাহার ফল শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে, উহার আড়ষ্টভাব এখনই কাটিয়া যাইবে।"

যোয়ানের একখানি হাত তাহার চেয়ারের হাতার উপর দিয়া আড়ষ্টভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, আমি ব্যগ্রভাবে সেই হাতখানি তুলিয়া ধরিলাম; কিন্তু তাহা স্পর্শ করিয়া আমার মন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আচ্ছন্ন হইল, তাহার সেই হাতখানি মৃত ব্যক্তির হাতের মত শীতল, আড়ষ্ট!

কুপ উঠিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত টেবলের উপর সংরক্ষিত একখানি ভস্মাধার তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সে সেই দিকে অগ্রসর হইবামাত্র যোয়ানও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার চক্ষুতে তখনও গভীর উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক পরিস্ফুট।

আমি তাহার শীতল ও আড়ষ্ট হাতখানি ধরিয়া রাখিয়া সহানুভূতিভরে বলিলাম, "মিস্ কুপার, তুমি অসুস্থ হইয়াছ; আমি তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি; বল, কিরূপে তোমাকে সাহায্য করিব ?"

আমি এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলাম না, তাহার ম্লান ওষ্ঠে বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে অতি ধীরে একবার মাথা নাড়িল, কিন্তু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। সাহায্যের প্রয়োজন নাই, না তাহাকে সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাহার উদ্দেশ্য কি ? কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল—তাহার হৃদয় গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

কুপ ভস্মাধারটি হাতে লইয়া তাহার চেয়ারে ফিরিয়া আসিল। তাহার অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "এই ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাজনক, পৈশাচিক।"

কুপ নির্ব্বিকারভাবে বলিল, "তোমার ঐ রকম বোধ হইতেছে না কি ? উঃ, কি উৎকট সহানুভূতি! কিন্তু তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। উহার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আমি চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ দিয়াছি। ও আমার মেয়ে, তুমি কি মনে কর, আমি উহাকে উহার অনিষ্টকর কোন জিনিষ খাওয়াইতে পারি ? কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া আমার মেয়ের প্রতি তোমার যে করুণার সীমা নাই, বন্ধু!"

তাহার এই তীব্র শ্লেষ মর্ম্মভেদী হইলেও আমি সক্রোধে বলিলাম, "হইতে পারে এই তরুণী তোমার কন্যা, কিন্তু তুমি উহাকে যে কফি পান করিতে বাধ্য করিয়াছ—তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না ? উহার

'আরণ্যক'

বসুমতী চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীযামিনীভূষণ চক্রবর্ত্তী

অবস্থা শোচনীয় অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছ না—উহার কথা কহিবার শক্তি নাই। যোয়ান হাত-পা পর্য্যন্ত নাড়িতে পারিতেছে না! অথচ উহার চেতনার কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই।"

কুপ অবিচলিত স্বরে বলিল, "সে কথা সত্য; কিন্তু আমি যদি উহাকে সেই ঔষধ পান না করাইতাম—তাহা হইলে উহার অন্তর্দ্দাহ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিত না। ঔষধ সেবন করিয়া উহার সকল চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে। ঐ দেখ, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, উহার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ না করিয়াও হাসিতেছে।"

কথাটা সত্য। আমি যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যে তাহার অধরোষ্ঠ অনুরঞ্জিত দেখিলাম। কিন্তু তাহার চক্ষুতে পলক নাই; সে নির্নিমেষ নেত্রে শূন্য দৃষ্টিতে কোন্ দিকে চাহিয়া ছিল—তাহা বোধ হয় তাহার বুঝিবার শক্তি ছিল না।

ঘন ঘন তাহার শ্বাস বহিতে লাগিল, মনে হইল, সে তখন হাঁপাইতেছিল। তাহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে সে নিস্পন্দ হইল, মৃতদেহের ন্যায় নিস্পন্দ!

কুপ তাহার সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখন কয়েক মিনিটের জন্য উহাকে এখানে একা থাকিতে দিলে উহার উপকার হইবে। স্বাভাবিক অবস্থা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।"

কুপ আমাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইল; কিন্তু আমি উঠিলাম না। এখানে আসিয়া যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই আমার স্মরণ হইল। এই বৃদ্ধের হৃদয়ে যৌবনের উৎসাহ বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার জীবন কি দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। কফি পান করিতে যোয়ানের অসম্মতির এবং সেই আরব ভৃত্যটার প্রতি তাহার সুস্পষ্ট ঘৃণার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই রহস্যভেদের জন্য আমার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। বিশেষতঃ যোয়ান কোন্ গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহাও জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছিল। যোয়ান প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত-পা নাড়িতে ও কথা কহিতে পারিলে প্রসন্ন-মনে সেই কক্ষত্যাগ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করা আমি সঙ্গত মনে করিলাম না।

কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; কুপ আমাকে স্থির-ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন অধীর হইয়া উঠিল, এবং সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। গৃহস্বামীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে উঠিতে হইল। ভবিষ্যতে আমি যোয়ানের নিকট তাহার গুপ্তকথা শুনিবার সুযোগ পাইতেও পারি ভাবিয়া কুপের অনুসরণ করিলাম। সে আমাকে লইয়া একটি হলে উপস্থিত হইল। সেখানে প্রবেশ করিবামাত্র গন্ধকের উগ্র গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সেই গন্ধে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, বমনোদ্রেক হইল, অবশেষে যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

কুপ আমার অস্বচ্ছন্দতা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "চিত্র-শিল্পে তোমার অনুরাগ আছে কি না, জানি না; কিন্তু উপর তলায় আমি কয়েকখানি চিত্রপট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। চিত্রগুলি একটু অসাধারণ, তাহা দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে।"

কুপের সংগৃহীত চিত্রগুলি দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল না হইলেও তাহার ইঙ্গিতে আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। দোতলার সিঁড়ির কাছে কুপের আরব ভৃত্য ইব্রাহিমকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমাদিগকে তাহার পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া সে নিঃশব্দে কুর্নিশ করিল। দোতলার সোপানশ্রেণী স্থূল তুর্কি গালিচা দ্বারা আচ্ছাদিত। আমরা তাহার উপর দিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দোতলায় উঠিলাম।

দোতলার একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—তাহা কুপের 'ড্রয়িং-রুম।' সেই কক্ষটি নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বহুমূল্য দুর্লভ আসবাব-পত্র ও মনোজ্ঞ শিল্পসম্ভার দ্বারা সুসজ্জিত। লণ্ডনের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহসজ্জা দেখিয়াছি; কিন্তু কুপের ড্রয়িং-রুমের সাজ-সজ্জা ও পারিপাট্য দেখিয়া আমাকে বিস্মিত হইতে হইল। ইহাতে তাহার ঐশ্বর্য্যের এবং সুরুচির পরিচয় পাইলাম। সেই কক্ষের এক প্রান্তে অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে আগুন জ্বলিতেছিল।

সেই অগ্নিকুণ্ডের অদূরে একখানি শুভ্রবর্ণ ভল্লুক চর্ম্ম প্রসারিত ছিল। কিন্তু সেই কক্ষের দেওয়ালে একখানিও চিত্রপট দেখিতে পাইলাম না।

আমাকে দেওয়ালের দিকে চাহিতে দেখিয়া কুপ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে বলিল, "আমি তোমাকে যে চিত্রগুলির কথা বলিয়াছি, তাহা এখানে নাই, তেতলায় আছে। সেখানে আলোকের সুব্যবস্থা আছে বলিয়া সেগুলি সেইখানে রাখিয়াছি।"

আরও কয়েকটি সোপান পার হইয়া আমরা তেতলায় উঠিলাম। আমরা একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কুপ সুইচ টিপিবামাত্র সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। বিদ্যুতালোকে আমি সেই কক্ষের দেওয়ালে প্রায় কুড়িখানি বৃহদাকার তৈলচিত্র দেখিতে পাইলাম। চিত্রগুলি নর-নারীর মূর্ত্তি, কিন্তু সেই সকল মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে মনুষ্যের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও মনোভাব এরূপ জীবন্তবৎ পরিস্ফুট দেখিলাম যে, এণ্টওয়ার্প নগরের উইয়ার্জ্জ যাদুঘরের চিত্রগুলির কথা তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল।

কয়েকখানি চিত্রে মনুষ্যের মৃত্যুযন্ত্রণা তাহাদের মুখে এ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। অন্য কয়েকখানি চিত্রে মনুষ্যের বিভিন্ন রিপুর উদ্দীপনা অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। আমার মনে হইল, চিত্রকর অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইলেও এই সমস্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় তাহার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না। বস্তুতঃ, সেই চিত্রগুলি অসামান্য প্রতিভার অপপ্রয়োগের ফল।

আমি চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কুপকে বলিলাম, "এই চিত্রগুলি সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়জনক, কিন্তু প্রত্যেক চিত্রেই ভীষণভাব পরিস্ফুট। চিত্রগুলি নিখুঁত, কিন্তু ইহা দেখিলে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পরিতৃপ্ত হয় না, হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে।"

কুপ বলিল, "হ্যাঁ, ঐখানেই এই সকল চিত্রের অঙ্কনকৌশলের সার্থকতা। মনুষ্যের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি, তাহার দুঃখ, দৈন্য, লোভ, ক্রোধ, আতঙ্ক প্রভৃতি তুলিকার রেখাপাতে নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলা, কলা-কৌশলের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। যে অসামান্য প্রতিভাবান্ চিত্রকর এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না; প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে টুলনের যে বাতুলাগারে চিত্রকর গুস্তাভ রেমিওর মৃত্যু হয়, সেই বাতুলাগারে কেবল অপরাধী বাতুলদিগকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। গুস্তাভ রেমিও তাহার সুন্দরী ও সুশীলা পত্নীকে মার্শেল নগরে লোমহর্ষণ উৎপীড়নের পর হত্যা করিয়াছিল। তাহার পত্নীর মৃত্যুযন্ত্রণা তাহার অঙ্কিত চিত্রপটে অমরতা লাভ করিয়াছে। তাহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সত্যই প্রশংসনীয়; জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"

আমার মনে হইল—সাহিত্যক্ষেত্রেও এইরূপ নরপশু আছে; তাহাদের প্রতিভা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহারা 'আর্টের' দোহাই দিয়া নরকের চিত্র অঙ্কিত করিতে ভালবাসে, এবং তাহাই তাহাদের শক্তির সাফল্য মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিলাম। তাহা একটি সুন্দরী যুবতীর মুখাবয়বের চিত্র। একটা নিগ্রোর পেশীপুষ্ট দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ হস্ত সেই সুন্দরীর কণ্ঠ দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল! সেই রমণীর শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল। যুবতীর আরক্তিম চক্ষু দুইটি তাহার অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল, যুবতীর মুখে কি ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা পরিস্ফুট! যেন সেই মূর্ত্তি ক্যাম্বিসের উপর হইতে দেহ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। সে যেন চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র নহে, রক্ত-মাংসের দেহধারিণী মৃত্যুকবলিতা নিগৃহীতা নারী!

সেই সময় হঠাৎ একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া কুপকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ বিদ্যুতের নীলাভ আলোকে পূর্ণ হইল। কিন্তু সেই বিজলীপ্রভা চকিতে অদৃশ্য হইল। এই দৃশ্য তিনবার দেখিতে পাইলাম এবং প্রত্যেকবার গভীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। কখন কখন জাহাজের উপর বে-তার টেলিগ্রামের কল হইতে সেইরূপ শব্দ নিঃসারিত হইতে শুনিয়াছি।

সেই যুবতীর আতঙ্কবিহ্বল যাতনাকাতর মুখের কি সম্মোহনী শক্তি ছিল, সেই শক্তিতে আমি আচ্ছন্ন হইলাম! কিন্তু আকস্মিক বিজলীস্ফুরণে আমি চকিত হইয়া কুপকে

কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, সে অদৃশ্য হইয়াছে!

রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মকমলের একখানি পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পর্দ্দাখানি সরাইয়া ফেলিলাম, তাহার পর দ্বারের হাতল ঘুরাইলাম, দ্বারের হাতল ধরিয়া টানাটানি করিলাম, কিন্তু দ্বার খুলিল না। তাহা বাহির হইতে বন্ধ করা হইয়াছিল।

ইহার অর্থ কি? আমি কি একটা উন্মাদ বর্ত্তৃক সেই কক্ষে আবদ্ধ হইলাম? আমার অবস্থা আতঙ্কজনক কি বিড়ম্বনাজনক, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমি পুনর্ব্বার সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেই চিত্রের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সভয়ে দেখিলাম, সেই উৎপীড়িতা মৃত্যুকবলিতা নারীর মুখ যোয়ানের মুখ এবং যে হাত দুইখানি তাহার কণ্ঠ নিপীড়িত করিতেছিল—তাহা কুপের আরব ভৃত্য ইব্রাহিমের হাত! তবে কি যোয়ান স্বয়ং এই ভীষণ চিত্রের আদর্শ হইয়াছিল? বিকৃতবুদ্ধি চিত্রকর মৃত্যুযন্ত্রণাজর্জ্জরিত মুখভাবের আদর্শ কোথায় পাইল?

আমি সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলাম, দ্বারে সবেগে ধাক্কা দিতে লাগিলাম। উচ্চৈঃস্বরে কুপকে আহ্বান করিলাম। কার্ল কুপ কি সত্যই উন্মাদ? ঐ সকল ভীষণ চিত্র কি তাহারই অঙ্কিত? সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে সেই কক্ষে আবদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল? আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই কক্ষ হইতে আমার পরিত্রাণের উপায় নাই। আমি দ্রুতবেগে একটি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সম্মুখস্থ লাল মকমলের পর্দ্দা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, কিন্তু সেই বাতায়নও খুলিতে পারিলাম না।

আমি খড়খড়ির পাখী তুলিয়া দূরে একটি উদ্যান দেখিতে পাইলাম, তাহার এক পাশে আলোকিত পথ; পাত্‌লা কুয়াসায় তাহা আচ্ছাদিত হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি যে গৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই গৃহের এবং তাহার পরবর্ত্তী অট্টালিকার মধ্যে একটি উচ্চ প্রাচীর ছিল, একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা সেই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; সেই প্রাচীরের পর তিনখানি বাড়ী পাশাপাশি সংস্থাপিত; কিন্তু আমি সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া সেই সকল অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগমাত্র দেখিতে পাইলাম।

আমি সেই পল্লীর কোন্ স্থানে আসিয়াছি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলেও কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ করিয়া স্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি জানালার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া সেই কক্ষস্থিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে গজদন্তনির্ম্মিত বোতামের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র হাতল দেখিয়া আমি তাহার উপর অঙ্গুলির চাপ দিলাম; হাতলটি তৎক্ষণাৎ বসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপগুলি নির্ব্বাপিত হওয়ায় অতঃপর আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু আমার অধিকতর বিস্ময়ের কারণ ছিল। আমি সেই হাতলে অঙ্গুলির চাপ দেওয়ামাত্র আমার তর্জ্জনীর অগ্রভাগে খোঁচা লাগিল। আঙ্গুলের ডগায় হঠাৎ পিন্ বিঁধিলে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, আমি সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। আমার অনুমান হইল—সেই হাতলটির মাথায় সূচিবৎ কোন সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ ঊর্দ্ধমুখে সংস্থাপিত ছিল। তাহাই সবেগে আমার অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হইল। আমি তাহার আঘাতে যে যন্ত্রণাবোধ করিলাম, তাহা সহজে নিবৃত্ত হইল না। সেই আঘাতে আমার সমস্ত হাতখানি টাটাইতে লাগিল, মনে হইল—আমার বাহুর শিরার ভিতর উত্তপ্ত গলিত ধাতু প্রবেশ করিয়াছে! আমার আঙ্গুলে কিরূপ কাঁটার খোঁচা লাগিল, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি সেই হাতলটি পুনর্ব্বার স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কয়েক মিনিট হাতড়াইয়াও তাহা স্পর্শ করিতে পারিলাম না। আমি দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত পুরিলাম; একটি পকেটে দেশলাইয়ের বাক্সটি পাইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে একটিও কাঠী ছিল না!

আমি নিরুপায় হইয়া অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই কক্ষের দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম; দেওয়ালের ছবিগুলির উপর আমার হাত পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোকের সুইচ স্পর্শ করিতে পারিলাম না। সেই সময় হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল!

আমি দেওয়ালে হাত রাখিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিবার সময় দেওয়ালের ছবিগুলির উপর আমার হাত পড়িতেছিল, এ কথা বলিয়াছি। এরূপ একখানি ছবির উপর আমার হাত পড়িবামাত্র আমার হাতের চাপে ছবিখানি যে দণ্ডের উপর সংস্থাপিত ছিল, সেই দণ্ডের উপর হঠাৎ ঘুরিয়া দূরে সরিয়া গেল এবং ছবির পশ্চাৎস্থিত দেওয়ালের কিয়দংশও সেই সঙ্গে অপসারিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে হাত বাড়াইলাম, দেওয়াল স্পর্শ করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু সেই অন্ধকারে আমি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলাম, দেওয়ালের যে অংশ ছবির পশ্চাতে ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া সেখানে একটি গহ্বর বাহির হইয়াছে! সেই গহ্বরটি কোন গুপ্ত প্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বার বলিয়াই আমার অনুমান হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলাম, পা বাড়াইতেই একটি সোপানে আমার পা ঠেকিল। আমি সেই সোপানের সাহায্যে নীচে নামিতে লাগিলাম; কিন্তু অন্ধকারে দুই তিনটি সোপান অতিক্রম করিবামাত্র কি একটা জিনিষের উপর আমার পা পড়িল। জিনিষটি কি, তাহা অন্ধকারে দেখিতে না পাওয়ায় আমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহা স্পর্শ করিলাম। যে সামগ্রীতে আমার করস্পর্শ হইল, তাহা রেশম-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। আমার বিশ্বাস হইল, তাহা কোন রমণীর পরিচ্ছদ।

তখনই আমার মনে হইল—কেবল কি সেই পরিচ্ছদটিই সেখানে পড়িয়া আছে, না আরও কিছু আছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া উভয় হস্তে চারি দিক্ হাতড়াইতে লাগিলাম, এবং মুহূর্ত্ত পরে আমার মুখ হইতে আতঙ্কপূর্ণ বিহ্বল আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল, ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কারণ, যে কঠিন, শীতল, অদৃশ্য পদার্থে আমার করস্পর্শ হইল, তাহা কোন মৃত স্ত্রীলোকের মুখ, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না!

সেই মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় একটা অসহ্য হিল্লোল অনুভব করিলাম; তাহার প্রভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া গেল। তাহা আমাকে কিরূপ বিচলিত ও বিহ্বল করিল, ইহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। আমার মনে হইল, আমার মাথা পাতলা হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এবং আমার গলা হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত কে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে! আমি হাঁপাইয়া উঠিলাম। সেরূপ কষ্টদায়ক অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম!

আমি পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিলাম, এবং উভয় হস্তে মৃত রমণীর মস্তক পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; তাহার ললাট ও মুখের উপর হইতে আমার হাত দুইখানি তাহার গলায় নামিয়া আসিল। সেই সময় তাহার কণ্ঠ-বেষ্টিত কোন ধাতুময় সামগ্রী আমার হাতে ঠেকিল। আমি তাহা দুই হাতে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহা একগাছি সরু চেন; তাহার সঙ্গে একখানি কবচ সংযুক্ত ছিল।

আমি মৃত রমণীর কণ্ঠ হইতে তাহা উন্মোচিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেইরূপ চেষ্টা করিবার সময় এরূপ একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, যাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব।

আমি যে রহস্যের খাসমহলে প্রবেশ করিয়াছি, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কিন্তু অতঃপর যে সকল কাণ্ড ঘটিল, তাহা এরূপ বিস্ময়াবহ যে, পাঠক-পাঠিকাগণের তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে কি না, জানি না; তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আমার এই কাহিনী বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শেষ-বেশ

বেলা-শেষে পুষ্পোদ্যানে জল দেওয়া পর্ব্বটা সবে সমাপ্ত হইয়াছে।

বেহারা আসিয়া জানাইল,—'মায়ীজী!'

'মায়ীজী—'! অশোকের নারীশূন্য গৃহস্থালীতে কোন দিন কোন মায়ীজীর পদধূলি ত পড়িত না! তাই এই অপরিচিত শব্দটা তাহার মনের মাঝে শুধু একটা বিস্ময় বহন করিয়া আনিল; কিন্তু বেহারার হাতের কার্ডখানি গ্রহণান্তে উপরের কয়েকটি অক্ষর তাহার মনের মূল অবধি নাড়িয়া দিল এবং ইহারই বহিঃপ্রকাশস্বরূপ অশোকের সুগৌর ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত বাহিরের পড়ন্ত বেলার আলোর মত রক্তিম হইয়া উঠিল।

কার্ডখানিতে লেখা ছিল,—শ্রীঅমিতা বসুজায়া।

কার্ড-প্রেরিতাকে আনিবার সম্মতিটা শিরঃসঞ্চালনে জ্ঞাপন করিয়া অশোক আপন আসনে একটু নড়িয়া বসিল। দীর্ঘদিনের কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝে যে স্মৃতিটা অশোকের মানসপটে মলিন হইয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা এই অস্তমিত রবির রক্তচ্ছটার মাঝে, গন্ধভরা বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে কর্ম্মহীন এই অবসর-মুহূর্ত্তটিতে ক্ষুদ্র একখানি কার্ডের লেখায় বড় উজ্জ্বল হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

বেহারার পশ্চাতে অমিতা বসুজায়া আসিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া মৃদুহাস্যে কহিল,—'আমায় দেখে খুব অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন ত, অশোকদা!'

অশোক চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোনরূপ একটা প্রতি-নমস্কার না করিয়া সম্মুখের আসনটা অভ্যাগতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া শুধু কহিল,—'বসো।' একটু থমকিয়া ঈষৎ হাসি-মুখে সে কহিল, 'কোন কিছুতে অবাক্ হয়ে যাওয়া হচ্ছে বোকামীর লক্ষণ;—যখন সব কাযের তলা অনুসন্ধান কল্লে কারণ বা প্রয়োজন পাওয়া যায়। আর এখন তোমার সেই প্রয়োজনটাই জানবার অপেক্ষা কচ্ছি।'

অশোকের প্রদত্ত আসনখানিতে বসিবার সময় অমিতা কহিল,—'বসতে অনুরোধ কল্লেও বসাটা আমার ভাগ্যে বেশীক্ষণ হবে না। কারণ, অনেক যায়গায় আমায় ঘুরতে হবে।' তার পর হাসিয়া কহিল,—'আচ্ছা, প্রয়োজন ব্যতীত কি আমাকে আসতে নেই?'

একটা সদ্যোত্থিত নিশ্বাস বুকের মাঝে চাপিয়া অশোক কহিল,—'বেশীক্ষণ বসার কথা বলছ, আমি সে অনুরোধ তোমাকে করিনি। বোধ হয়, কোরবোও না। আর প্রয়োজন ব্যতীত আসার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? আমি বলি, না—তা আসতে নেই। আর কেন নেই, সে প্রশ্নটার উত্তর তুমি আপনার কাছ হতেই পাবে।'

অতর্কিত-চপেটাঘাত-প্রাপ্তিতে লোকের মুখ যেমন বিবর্ণ হয়, অমিতার সারা মুখখানি সহসা সেইরূপ বিবর্ণ হইয়া গেল। রোদনোন্মুখ শিশুর মত অপমানের তীব্র তাড়নায় তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া অমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

শান্তদৃষ্টিতে অমিতার পানে চাহিয়া জড়িমাহীন কণ্ঠে অশোক কহিল,—'আমার মনে হয় না, ক্ষণিকের খেয়ালে তুমি এখানে এসেছ। একটা খুব বড় প্রয়োজনই তোমাকে আমার কাছে এনেছে, কিন্তু সেটা তুমি ভুলে যাচ্ছ।'

অমিতা পরিত্যক্ত আসনখানিতে বসিয়া পড়িল,—উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল,—'অশোকদা, আমার ভুল হয়েছে, আবাল্যের গুরু আমার তুমি, তাই এমন ক'রে আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছ। জান ত আনন্দ জিনিষটা একা ভোগ করা যায় না, প্রিয়জনকে তার অংশ দিতে হয়। তাই দেবার প্রয়োজনই আজ তোমার কাছে আমাকে এনেছে।'

সন্ধ্যার আধা আলো আধা অন্ধকারে নির্জ্জনতাভরা এই মুহূর্ত্তে অতীতের একান্ত প্রিয় সম্বোধনটা অশোককে কেমন চঞ্চল করিয়া তুলিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—"দেবার কথা অনেকই হয়, দেওয়াই শুধু বাকী পড়ে।" অশোক থামিয়া গেল। এই কৌতুকালাপের অন্তরালে একটা নির্ম্মম সত্য যে উত্তোলিত খড়্গের মত দাঁড়াইয়া ছিল!

হাজার গুপ্ত হইলেও আহত স্থানে ঘা পড়িলেই একটা যন্ত্রণার সাড়া দেয়।

মেঘের ফাটল হইতে মলিন রৌদ্রের ক্ষণিক আত্ম-বিকাশটুকুর মত একটা দীপ্তিহীন হাসি অমিতার ওষ্ঠাধরে বারেক ভাসিয়া উঠিল,—সে কহিল,—'এই না দেওয়ার ত্রুটিটা, এইবার ক্ষালন হবে বোধ করি। না অশোকদা, ও তোমার কোন কথা শুনব না, আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন, তোমাকে যেতে হবে ভাই, তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে।' অমিতা আপন আয়ত নেত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টি অশোকের মুখের উপর ফেলিয়া ধরিয়াছিল।

স্বল্প দূরে দণ্ডায়মান অশোক অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল, 'চল অমিতা, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। সন্ধ্যা হ'ল।'

* * * *

নিমন্ত্রণ-গৃহে প্রথম পরিচয়ের পালাটা শেষ হইয়া রহস্যালাপ সুরু হইল, তাহারই এক ফাঁকে অমিতার স্বামী অশোককে হাসিতে হাসিতে কহিল,—'আমার স্ত্রীটা আপনার বড্ড বেশী ভক্ত; কেমন. নয় কি?' শুভেন্দু কৌতুকপূর্ণ নেত্রে অশোকের পানে চাহিল।

সহজকণ্ঠে অশোক কহিল,—'হ'তে পারে। আশ্চর্য্যের কিছু নেই। বাল্য হ'তে অনেকটা শিক্ষা সে আমার কাছে পেয়েছিল।'

শুভেন্দু হাসিয়া কহিল, 'শুধু শিক্ষা নয়, দীক্ষা অবধি হয়ে গেছে। আপনি যে তার আদর্শ। সেই সে কালে বৌদ্ধভিক্ষুণী যেমন রাজার গলায় মালা দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে আপনার দলে টেনে নিলে; রাজ-ঐশ্বর্য্য শুষ্ক মুখে শুধু চেয়ে রইল, রাজাকে আর তার বাঁধনটা দিতে পাল্লে না, এ যেন তেমনই হয়েছে। আমার অতীতটার সঙ্গে বর্ত্তমানটা বড় বেমানান, বড় খাপছাড়া। খেতাবধারী জমীদারের ছেলে আমি,—সাগরপারের মাটীতে শিক্ষা পেলুম, হঠাৎ অমিতা এসে এমনভাবে মোড় ঘুরিয়ে দিলে যে, অঙ্গে উঠল আমার খদ্দর।"

সভ্যতার খাতিরে শুভেন্দুর এতগুলা কথার পরিবর্ত্তে বৃহৎ না হউক, একটা ক্ষুদ্র উত্তরও অশোকের দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনের যে ভয়ানক অবস্থায় অত্যন্ত উচিত জানা সত্ত্বেও মানুষ তাহা করিতে পারে না, অশোকের মনের মাঝে সেই নিদারুণ মুহূর্ত্ত ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল। তাহার কর্ণ হইতে ললাট অবধি বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটিতেছিল।

শুভেন্দু ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, জানি না। অমিতা যে ইহার কিছুই লক্ষ্য করে নাই, সে যখন একমুখ হাসি লইয়া সন্তান দর্শন করিবার জন্য অশোককে আহ্বান করিল, তাহাতেই বেশ বুঝা গেল।

অমিতা আপনার কক্ষে অশোককে লইয়া গিয়া অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ-কোরকের মত শিশুকে দাসীর কোল হইতে লইয়া কহিল,—'দেখুন,—আমার খোকা।'

শিশুর মুখের পানে চাহিয়া অশোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার নিষ্পলক দৃষ্টির মাঝে শুধু একটা যন্ত্রণার কালো ছায়া গাঢ় হইয়া ফুটিয়া উঠিল,—মর্ম্মভেদী ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিতে চিরদিন ভাষা অক্ষম।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অমিতা কহিল,—'ও যেন তোমার মত—'

চমকিত হইয়া অশোক বাধা দিয়া কহিল,—'না! না! আশীর্ব্বাদ করি—হাঁ, আশীর্ব্বাদ করি, বরঞ্চ—আমার সঙ্গে ওর যা কিছু সাদৃশ্য আছে, সব যেন মুছে যায়।' অশোকের আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কণ্ঠ যেন তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

অমিতা নীরব। অশোকের একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতনের শব্দে সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন তাহার মুখের আলো নিবিয়া গিয়াছে!

একটা স্বর্ণমুদ্রা শিশুর দিকে বাড়াইয়া দিয়া জোরে একটু হাসিয়া অশোক কহিল, 'গরীব মামার যৎকিঞ্চিৎ—'

মুহূর্ত্তে অমিতা যেন অতীতে ফিরিয়া গেল—সেই স্বর, সেই চাহনি, সেই সম্বোধন। অশোকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—'অশোকদা! না। না ভাই, ও সবে দরকার নেই, শুধু তোমার পায়ের ধুলা দাও ওকে, ও যেন—'

অশোকও বুঝি মুহূর্ত্তে আপনাকে ভুলিয়া যাইত—যদি স্বর্গদূতের মত ক্ষুদ্র শিশুকে অমিতার কোলে না দেখিতে পাইত। তাহারও বুকের মাঝে যে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছিল!

অমিতার হাতের মধ্য হইতে আপনার হাতখানি মুক্ত করিয়া অশোক কহিল, 'চল্লুম।' অমিতার নামটা অবধি তাহার মুখে বাধিয়া গেল।

ক্ষীণহাস্যের সহিত অমিতা কহিল, 'চল্লুম নয়, আসি।

আবার আসবে ত, অশোকদা ?' অমিতার দৃষ্টির সহিত অশোকের দৃষ্টি মিলিল।

সহসা কঠিনকণ্ঠে অশোক কহিল, 'না, এই শেষ।'

* * * *

অশোকের নিয়মিত দিনগুলা নিয়মিতভাবেই কাটিতে লাগিল। খদ্দর-প্রতিষ্ঠান, বিলাতীবর্জ্জন, রসায়ন-চর্চ্চা, কোন কিছুতেই ত্রুটি লক্ষিত হইত না। শুধু গভীর নিশীথে যখন সে শয্যা গ্রহণ করিত, তখন তাহার যৌবনস্ফীত বক্ষে একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ভরিয়া উঠিত।

তাহার মনের মাঝে যে বৈরাগী অন্তর তাহাকে এত দিন একটা বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল, যৌবনের অরুণ-রাগরঞ্জিত দিনগুলি নিত্য নূতন কর্ম্মের আহ্বানে তাহাকে উৎসাহিত করিত, গভীর রাত্রিতে তাহারা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, সম্মুখে দাঁড়ায় একটা অতীতের স্মৃতি।

সাগরপারে সরস্বতীর পূজা সমাপ্ত করিয়া অশোক যখন স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন ছাত্রজীবনের কল্পনাকে সত্যে পরিণত করিবার কি বিপুল আগ্রহ না তাহার মধ্যে জাগিয়াছিল! বামনদেবের বিশ্বজোড়া ক্ষুদ্র পাখানির মত, তাহার অন্তরের ইচ্ছাশক্তি, কত বড় একটা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারই ফলে তাহার রসায়নাগার এত দ্রুত উন্নতিতে ভারতবিখ্যাত হইয়াছে,জগদ্‌বিখ্যাত হইবারও তাহার সম্ভাবনা আছে। এই অমোঘ শক্তির প্রভাবেই আজ তাহার প্রাণপ্রিয় শিষ্যবর্গ পৃথিবীর নানা স্থানে আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া আচার্য্যকে গৌরবান্বিত করিতেছে।

কোন কিছু একটা বড় দুঃখ না পাইলে একটা বড় সুখ যে আয়ত্তাধীন করা যায় না ; তাই প্রথম জীবনের অসহনীয় দুঃখটা আজ এমন করিয়া তাহাকে পৃথিবীর জ্ঞানের মন্দিরে, যশের মন্দিরে তুলিয়া ধরিল।

অশোকের বৈরাগী অন্তর তাহাকে একটা সংযমের মূর্ত্তি করিয়া গঠিত করিয়াছে। তাহার জীবনে নারীর স্থান নাই, এইটাই ছিল অশোকের অভ্রান্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই সে অমিতার নিমন্ত্রণ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিল।

অন্তরের কোণে যে তুচ্ছ বাসনা গোপনে বাসা বাঁধিয়াছিল, মুহূর্ত্তের ফাঁকে সে যে নিজেকে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইবে, ইহার কোন সংবাদই ত অশোক রাখিত না।

তাহার বৈরাগী অন্তর ছি ছি করিয়া উঠে। তবু! তবু! তাহার শিরোদেশের খোলা জানালার ঠাণ্ডা বাতাস আর মায়ের মতন স্নেহহাতে সকল ক্লান্তি মুছিয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে না। এখন সেই নিদ্রার সাধনায় কত বিনিদ্ররজনী কাটিয়া যায়। অসংখ্য নক্ষত্রভরা নীলাকাশের পানে বিশাল নেত্র দুইটি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে।

অশোকের মনে পড়িত ছাত্রজীবনের কথা,--অগ্নি-যুগের প্রবল আন্দোলনে সারাদেশ মাতিয়া উঠিয়াছে, সে রুদ্র নর্ত্তনতালে তাহারও হৃদয় নাচিয়া উঠিত—অশোক ছুটিয়া আসিত অমিতার কাছে। কেমন করিয়া শঙ্কাহারা মরণডঙ্কায় ঘা পড়িয়াছে, মহাকালের বিষাণ বাজিয়াছে, পঞ্চানন হইয়া সে তাহারই গল্প শুনাইত,—নিবিষ্টচিত্তে শ্রোতা উপসংহারে হাসিয়া বলিত,—'হুজুক কল্লতে যদি সব শক্তিটা ক্ষয় করবে, কায করবে কি দিয়ে? জান ত—অশোকদা, যে কুকুর বেশী ডাকে না, কামড়ায় সে নির্ঘাত।'

অশোক বলিত—'এই সব বড় বড় বক্তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও?'

অমনই প্রত্যুত্তর হইত—'কিছু না! আমি তাদের কিছু বলি না—বলি তোমাকে।'

—'আচ্ছা বেশ, তোমার প্ল্যানটা কি বল?'

অমিতা হাসিয়া বলিত,—'এখন নয়। যখন নামব, তখন বলব। তবে গলার জোর নয়, এটা ঠিক।'

অশোক কহিত, 'কিসের জোর তবে?'

অমিতা গম্ভীরভাবে বলিত, 'কাযের!'

সেই অমিতার সহিত চীনের প্রাচীরের মত একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যখন ভগবানের অভিপ্রেত হইল, তখন একটা নিকটবর্ত্তী কঠিন পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্যই কি না জানি না, তবে গভীর অধ্যয়নমধ্যে অশোক আপনাকে যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিয়াছিল, ইহা সত্য।

তাহার পর সম্মুখে যাহা আসিল, সে কর্ম্মজীবন। সে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়। সেখানে অমিতার নাম-গন্ধ অবধি কিছুই নাই।

আজ সকালে অমিতা ভৃত্যের হাতে পত্র দ্বারা শত অনুনয়ে অশোককে আহ্বান করিয়াছিল। অশোক অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই পত্রখানির প্রতি চাহিয়া রহিল ; সেই চির-পরিচিত হস্তাক্ষর যেন চোখের সম্মুখে একটা দুর্বোধ্য জাল

বুনিতেছিল। সহসা পত্রখানি শতচ্ছিন্ন করিয়া অশোক দুই ছত্র লিখিয়া পাঠাইল; 'সময় অল্প। দেখা করিতে অক্ষম।' একটা অতি সামান্য সৌজন্যও রাখিবার অশোকের ইচ্ছা হইল না। শুধু তাহার অবরুদ্ধ হৃদয়ের মাঝে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা জাগিতেছিল,—এই শেষ।

পত্রবাহক চলিয়া গেল। অশোক একটা আসনে হেলিয়া বসিল; মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তের হতাশাভরা দৃষ্টির সম্মুখে যেন পৃথিবীর রং বদলাইয়া গেল। দুষ্ট গ্রহের মত অমিতা ছুটিয়া আচম্বিতে তাহার মনের অনেক দিনের বাঁধনটিকে এমন আল্‌গা করিয়া দিল যে, তাহাকে কার্য্যকর করিতে অনেকটা শক্তির প্রয়োজন হইল; কিন্তু শক্তি কোথায়?

* * * *

—'আচ্ছা অমি, আমাদের খোকাকে ঠিক কার মত দেখতে হয়েছে?"

নীল উৎপল-নেত্র দুইটি ধীরে তুলিয়া অমিতা কহিল,—'কার মত?'

—'বলব? তোমার অশোকদার মত। নয় কি? চোখ দুটি ত ঠিক তোমার অশোকদার—তেমনই টানা, তেমনই ভাসা।'

অমিতার ইচ্ছা হইল, একবার জিজ্ঞাসা করে,—'কেন এমন হ'ল?'

'ও কি, কি ভাবতে বসলে? এটা হওয়া উচিত ছিল না। আমিও তাই বলি। কিন্তু জান ত, মায়েরা যত বেশী যার চিন্তা করে, গর্ভস্থ-শিশু—'

আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া অমিতা কি বলিতে গেল, বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সে মুখ নত করিল।

বিস্ময়ভরে শুভেন্দু কহিল,—'ও কি, কাঁদছ? কি হ'ল তোমার?'

কি যে ঠিক হইয়াছিল, তাহা অমিতাও নিজে জানিত না। একটা অদম্য রোদনের উচ্ছ্বাসকে সে কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। বাঁধনহারা নদীর জলের মত তাহার দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল।

ভীতকণ্ঠে শুভেন্দু কহিল, 'না অমিতা, তুমি বড় ছেলে-মানুষ! বড় দুর্ব্বল। খোকাকে দেখতে যদি তোমার অশোকদার মত হয়, তাতে এমন কি ক্ষতি হ'ল তোমার? শিশু—মা, বাপ, মামা, কাকা এমনি পরিজনের মত বেশী অংশ হয়। যাদের ভালবাসা যায়, সন্তান তাদের রূপ নিয়ে আসে।'

জড়িতকণ্ঠে অমিতা কহিল,—'আমি—?'

'তুমি কি অমিতা?' উজ্জ্বল চোখে শুভেন্দু পত্নীর পানে চাহিল।

'আমি—!' অমিতা মাথা নত করিল। ভূমিবদ্ধ দৃষ্টি অনেকক্ষণ পরে তুলিয়া যখন সে শুভেন্দুর পানে তাকাইল, দেখিল, শুভেন্দু আয়তনেত্রের তীব্র দৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

অমিতা সে দৃষ্টিকে সহিয়া জড়িমাহীন শান্তকণ্ঠে বলিল, —'অনেক দিন যা বলতে পারিনি, তাই বলছি।' অমিতা একটু থামিয়া আরম্ভ করিল,—"হাঁ, অশোকদাকে ছেলেবেলা হ'তে আমি ভালবাসতুম। মা'র মুখে শুনতুম, তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। কিন্তু আমাদের লজ্জা হত না, জ্ঞান হবার আগে হতে এ কথাটা শুনে আস্‌ছি। অশোকদাকে যখন তখন তিনি 'জামাইচাঁদ' ব'লে আদর করতেন। তবে অশোকদার অতিসুন্দর মূর্ত্তিখানার জন্য রহস্য ক'রে বলতেন, কি তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাঁকে জামাই করবার, তা জানি না। কেন না, তাদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থার আসমান জমী তফাৎ ছিল। গৌরীপুরের জমীদারীর ভাবী অধিকারিণীর, একতলা বাড়ীর গৃহস্থের বৌ হওয়া নাকি একটা উপহাস, এই কথা সকলে বলেছিল। তখন মা মারা গেছেন।

"মা'র মৃত্যুতে আমাদের গৃহস্থালীতে দাসীদের দল ছাড়া নারী বলতে আমি যখন একা, বাবা তখন আমাকে বোর্ডিংএ দিলেন; আর সেই হ'তে বাবা কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বাস করতে লাগলেন। প্রজারা 'রাজদর্শনে' বঞ্চিত হ'ল, কিন্তু অশোকদার মারফত তাদের কোন সংবাদে আমরা বঞ্চিত হইনি। তারা তাদের রাজার দয়া হারায়নি; অশোক-দা ছিল রাজার ডানহাত।

"তার পর অশোকদা একে একে সোনার মেডেলগুলা একচেটে ক'রে নিয়ে যখন পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাশ কল্লে, বাবা তখন বাল্যের জামাই হবার কথাটা পুনরুক্তি কল্লেন— অশোকদাও সাগ্রহে সম্মতি জানাল। কিন্তু অসম্মতি জানালেন তার মা।

"কলেজে পড়া মেয়ে নাকি তাঁর বৌ হ'লে ছেলেকে হারাবার সম্ভাবনা বেশী। এই অমূলক ভয়টাকে সমূলক ব'লে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। অশোকদা তখন বাবাকে নিজে এসে জানালে, এ বিয়ে হ'তে পারে না। বাবা অশোকদার স্বার্থের দিক্ দিয়ে বোঝাতে তাকে একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কি একটা কঠিন উত্তরে অশোকদা তাঁকে নির্ব্বাক্ ক'রে দিয়েছিল।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুভেন্দু এতক্ষণ অমিতার পানে চাহিয়া ছিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'তার পর?'

অমিতা ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"সে উত্তরটা যে কি, তা বাবা আমায় কোন দিন বলেন নি।"

"তার পর বাবা তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করেন। আমার বড় ভয় ছিল, বাবা না মনে করেন, অশোকদার জন্য তাঁর মেয়ে মনে কোন দুর্ব্বলতা পোষণ করে। সেটা বড় লজ্জার কথা। আমার বিশ্বাস, সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে বাপ-মা যত বেশী ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লাভ করেন, সন্তান তা পায় না। আবেগের দ্বারাই তারা পরিচালিত। বাবা বলেছিলেন, জীবনের পথে আমি বেশী সুখী সৌভাগ্য-বতী হব।"

শুভেন্দু কহিল,—'তোমার বাবার আশীর্ব্বাদ কি নিষ্ফল হয়েছে, অমিতা?'

স্বামীর দিকে তখন অমিতা যে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহাতে শুভেন্দু তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইতে দেখিল।

তাহার পর আবার ধীরে ধীরে অমিতা কহিল, "এখনও আমার সবখানি তোমায় বলা হয়নি। বিয়ের পর হতেই তাকে ভুলবার চেষ্টা করেছি এবং অনেক দিন আগেই সফল হয়েছি ব'লে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু তুমি আজ তাতে আঘাত করেছ, তার বিপরীত সাক্ষ্য তুমি তোমার নিজের ছেলের কাছ থেকে পেয়েছ, এইমাত্র সে কথা তোমার মুখ দিয়ে বার হয়েছে।"

এতক্ষণে শুভেন্দু হাসিল। বড় সুন্দর, বড় মধুর, সে হাসি অমিতার চোখে ঠেকিল। পত্নীর কাঁধের উপর ডান-হাতখানি রাখিয়া স্নেহভরে সে কহিল,—"তোমার বাবার আশীর্ব্বাদ যদি নিষ্ফল না হয়ে থাকে তোমার বিশ্বাস, তবে এ সব কথা কেন, অমি? এই এতখানি কথা—যা অকপটে তুমি আজ আমায় শোনালে, এ আমি অনেক আগে জেনেছি। যে দিন তোমার অশোকদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো, সেই দিন তোমাদের অতীতের সম্বন্ধটা ছবির মত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর এটুকুও জানি, কোন ময়লা তার মধ্যে নেই।"

একটু থামিয়া শুভেন্দু কহিল, "দাম্পত্য-জীবনের মূলধন এই বিশ্বাস,—একে হারালেই দেউলে হ'তে হয়। কিন্তু আমি জানি, আমার বিধিলিপি কোন দিন আমাকে দেউলে করতে পারবে না। আর এই ভালবাসার কোথাও ত কোন গ্লানির ছাপ দেখতে পেলুম না। এরি জন্য আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি।"

অমিতা কহিল—'শ্রদ্ধা কর?'

সুদৃঢ়কণ্ঠে শুভেন্দু কহিল,—'হ্যাঁ। সারা অন্তর দিয়ে স্ত্রী যখন স্বামীকে, স্বামী যখন স্ত্রীকে ভালবাসে, তখনই তারা পরস্পরের কাছে মনের কপাট খুলে দেয়। সঙ্কোচের আবরণে কোথাও এতটুকু বাধে না।' সহসা গভীর উচ্ছ্বাসে পত্নীকে বক্ষে বাঁধিয়া কহিল,—'যাকে ভালবাস, তাকে ভুলবার চেষ্টা করো না। ওই চেষ্টাই যে অহর্নিশি তার কথা মনে জাগিয়ে দেবে। ছোট বোনের দাবীতে দাদাকে তোমার পূজ্যপাদ অগ্রজের আসনখানা পেতে দাও, অমিতা।'

* * * * *

ল্যাবরেটরীর নানাপ্রকার গন্ধবাষ্প ছাড়িয়া অশোক যখন আপনার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিত, তখন স্কন্ধ-দেশে ভূতের মত একটা চিন্তা তাহাকে চাপিয়া ধরিত। মনে হইত, যদি অনুযোগভরা দুইটা ব্যথিত আঁখি তাহার উপর ক্ষণেক ন্যস্ত হইত! যদি কোন ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া তিরস্কারের দুইটি সামান্য বাণী তাহার উপর বর্ষিত হইত,—আঃ! তাহা হইলে—দীর্ঘদিন! দীর্ঘ দিন সে আদেশই করিয়া আসিল। পালনের আনন্দ কেমন করিয়া পাওয়া যায়? এই নিয়মিত জীবনযাত্রার গতিটা অন্ততঃ এক জনের আব্দারের খেয়ালে এক নিমিষের জন্য ওলোট-পালোট হইত, এমন কি ক্ষতি তাহা হইলে হইত?

আপনার অন্তরের এই দৈন্যের হাহাকারের জন্য অশোক নিজে যে কিছু কম বিস্মিত, তাহা নহে। এ কাঙ্গালপনা তাহার আসিল কোথা হইতে? তাহার মনে একটা অটুট

গর্ব্ব ছিল,—প্রথম জীবনের আশা-তৃষ্ণাভরা যৌবনের বাসনা-পুষ্পগুলিকে পরার্থপরতার যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া চিত্ত তাহার মহা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। তবে—তবে কি এ?

কিন্তু স্বাভাবিক আবেগ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহা দুই দিনের—চিরদিনের নহে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় চিত্ত যখন দুর্ব্বল হয়, অন্তর তখন একটুখানি আত্মীয়সঙ্গসুখের জন্য লালায়িত হয়।

এমনই ধারা এলোমেলো চিন্তারাশি লইয়া পড়ন্ত বেলার পলাতক রক্তলেখাগুলির প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া অশোক বসিয়াছিল। নেপালী 'বয়টা' আসিয়া জানাইল,—'মায়ীজী!'

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে অশোক পরিচারকের প্রতি চাহিল। এত বড় অবিশ্বাস্য এই কথাটা যে, অশোকের মনে হইল, তাহার ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই ভাবটা নিমেষের জন্য স্থায়ী হইতে পারিল না। পরিচিত নারীমূর্ত্তি কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিল,—"অশোকদা! ডুমুরের ফুল নাকি?"

তাড়িতাহতের মত অশোক মুহূর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কঠিনকণ্ঠে সে কহিল,—"মিসেস্ বোস, আমাকে ক্ষমা করবেন; আমি,—আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি"—অশোক থামিয়া গেল; আপনার সমস্ত শক্তি এক্ষণে নিয়োজিত করিয়া দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত বলিয়া গেল, "কোন দিন, কোন মহিলার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য রাখা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

মুহূর্ত্তে অমিতার সারামুখখানি নীল হইয়া আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল। চকিতে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিমুখে অমিতা কহিল, 'কেন তুমি বাঞ্ছনীয় মনে কর না, অশোকদা? এত দুর্ব্বলচিত্ত তোমাতে শোভা পায় না। আমি এতটুকু বেলা হ'তে তোমাকে জানি,—তোমার মন কত উন্নত, কত পবিত্র, কত সহিষ্ণু! আমার সেই আদর্শকে আমি কিছুতেই ছোট হ'তে দিতে পারি না, ভাই। তাই আজ ছোট বোনের দাবীতে তোমায় ডাকতে এসেছি,'দাদা!'

একটু থামিয়া কোলের শিশুকে দেখাইয়া অমিতা কহিল, 'অশোকদা, আমার স্বর্গবাসী মা-বাপের তুমি বড় স্নেহপাত্র ছিলে, তাই বোধ হয়, তোমার রূপ নিয়ে তাঁদের তৃপ্তিসাধন করতে খোকা আমার কোলে এসেছে?'

মুহূর্ত্তে অশোক যেন মুক্তি পাইল। অমিতার সন্তানের মুখে আপনার সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরমাঝে নিরন্তর যে ব্যথা বাজিতেছিল, অমিতার মুখের বাণী তাহার পরিসমাপ্তি করিল। ভুল! সম্পূর্ণ ভুল! অশোকের জন্য অমিতার চিত্ত কোন দুর্ব্বলতা পোষণ করে না!

বিশ্বের সকল আনন্দ যেন অশোককে ঘিরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। জীবনে এত তৃপ্তি বুঝি সে আর কোন দিন পায় নাই। তাহার হারানো অমিতা আজ ছোট বোনের দাবীতে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। জীবনের পথে অনুজার মত সে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে; সেও চির-স্নেহময় অগ্রজরূপে আপনার ভালবাসার ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিবে।

অন্তর যখন এতখানি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, বাহিরে অশোক যখন অন্যমনা হইয়া পড়িতেছিল, সহসা অমিতার কলঝঙ্কারে চমক ভাঙ্গিল। অমিতা পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—

"চল রে খোকা। আমরা চ'লে যাই। তোর মামা ভারী গুমুরে।" আঃ, এই কয়টি কথার মাঝে কত মধু সঞ্চিত ছিল! অশোকের বুভুক্ষু প্রাণমন যেন জুড়াইয়া গেল। স্নেহকম্পিত হস্ত ক্ষুদ্র শিশুকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—'মাপ কর, দিদি, অন্যায় হয়েছে।'

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

সুন্দরবনে শিকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুম্ভীর মারিবার অন্য উপায় "ভেলা ভাসান"। এই উপায়ে কুম্ভীর বর্ষাকালে কিম্বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মারিবার সুবিধা হয়। কারণ, সে সময়ে কুম্ভীর কখনও তীরে উঠে না, কেবল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তীরের নিকট যদি আসে, তাহা হইলে সর্ব্বশরীর জলে ডুবাইয়া নাক তুলিয়া ভাসিয়া থাকে। সেই সময় কুম্ভীরকে গুলী করিয়া মারা কিম্বা বঁড়শী হাটাইয়া প্রায় সুবিধা করা যায় না। "ভেলা ভাসান" কলই সুবিধাজনক। যখন দেখা যায়, কোন স্থানে নদীতে কুম্ভীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তখন কলা-গাছের একটি ছোট ভেলা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ভেলাটি দুই হস্ত কিম্বা তিন হস্তের বেশী লম্বা না হয় এবং তিনটি কলা-গাছ হইলেই যথেষ্ট।

ভেলার উপর হয় একটা জীবন্ত বিড়াল, ছাগলছানা কিম্বা কুকুরশাবক স্থাপন করিতে হইবে। তাহার গায় অর্থাৎ তাহার পৃষ্ঠের দুই ধারে দুইটি কুম্ভীর-ধরা বঁড়শী ভালো সুতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এই বঁড়শী আড়া-আড়িভাবে রাখা প্রয়োজন; কদাচ ঝুলাইয়া রাখা সঙ্গত নহে। সেই বঁড়শীর গায়ে পঞ্চাশ ষাট হস্ত দীর্ঘ মোটা দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়া উহার গোড়া ঐ ভেলার সহিত বেশ শক্ত করিয়া আবদ্ধ করিতে হইবে। যেন কোন প্রকারে ভেলা হইতে দড়ি খুলিয়া না যায়। কারণ, পরে ঐ ভেলাই ফাতনার কার্য্য করিবে।

তাহার পর জীবন্ত জীবটিকে ভেলার উপর উঠাইয়া এরূপে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, যেন সে কোন প্রকারে ভেলা হইতে জলে না পড়িয়া যায় কিম্বা পলাইয়া যাইতে না পারে। অথচ খুব শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধা উচিত নহে। অর্থাৎ টান মারা মাত্রই তাহার বন্ধন-দড়ি ছিঁড়িয়া যায়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক। তৎপরে সেই ভেলাটিকে নদীর মধ্যস্থানে কিম্বা নদীর যে কিনারার দিকে কুম্ভীরটি ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে, সেই দিকে নৌকায় করিয়া লইয়া গিয়া ভাসাইয়া দিবে। ভেলাটি যাহাতে স্রোতের বেগে ভাসিয়া না যায়, সেই জন্য লম্বা দড়ির দ্বারা নদীর দুই পার হইতে উহাকে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক।

তবে ইহার ভিতর একটু বিবেচনার প্রয়োজন। এক দিকে ছোট করিয়া টান রাখিয়া অন্যধারে বড় করিয়া দিলে চলিবে। ভেলার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া, উহার অন্ততঃ সিকি মাইল দূরে নদীর দুই দিকে নৌকার উপর লোক বসিয়া থাকিবে। ভেলা যেখানে ভাসিতে থাকিবে, তাহার সন্নিকটস্থ তীরভূমিতে এক জন লোক গুপ্তভাবে বসিয়া ভেলার উপর লক্ষ্য রাখিবে। কিছু কাল পরে দেখা যাইবে যে, কুম্ভীর ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ভেলার উপরিস্থিত জন্তুকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিমেষমধ্যে কুম্ভীর শিকারকে ধরিয়া টান দিয়াই জলের ভিতর লইয়া যায়। যে দীর্ঘ দড়ি ভেলার উপর রক্ষিত থাকে, কুম্ভীরের আকর্ষণে সেই দড়ি জলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। কুম্ভীর সেই জানোয়ারটিকে যেমন গিলিয়া ফেলে, অমনই বঁড়শীও তাহার মুখে বিঁধিয়া যায়। তখন কুম্ভীর সোজা ছুটিতে আরম্ভ করে, সেই কলা-গাছের ভেলাও ফাতনার স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে থাকে।

তখন চারিদিক্ হইতে লোক সকল নৌকাযোগে তাড়া করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে। ডাঙ্গার উপরে যাহারা থাকে, তাহারাও চীৎকার করিয়া বলিয়া দিতে থাকে, কুম্ভীর কোন্ দিকে ছুটিয়াছে। যে সকল নৌকা পাহারার কার্য্য নিযুক্ত থাকিবে, ইহাতে তাহারা সতর্ক হইতে পারে। কলাগাছের ভেলাটিকে ধরিবার জন্য সম্মুখের নৌকারোহীরা চেষ্টা করিবে। পশ্চাতের নৌকাও সেই সময় কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।

কলাগাছের ভেলা ধরিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া কুম্ভীরকে জলের উপর ভাসাইয়া ফেলা সঙ্গত। তাহার পর বল্লমের আঘাতে বিঁধিয়া ফেলিতে পারা যায়। কুম্ভীর অনেক সময় এই অবস্থায় তীরের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক যে, একবারে যেন কোন প্রকারে জোরে টান না দেওয়া হয়। তাহা হইলে বঁড়শী খুলিয়া যাওয়া সম্ভব। মাছ খেলাইবার ন্যায় তাহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিতে হইবে। তীরের নিকট আনিয়া আরও দুই একটি বল্লম মারা আবশ্যক। এইরূপে তাহাকে তীরে আনিয়া তাহার সম্বন্ধে যদৃচ্ছ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

১৩৩২ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইছামতী নদীতে এইরূপে একটি কুম্ভীর মারা হয়। ঐ সময় নদীতীরবর্ত্তী গোয়ালা কিম্বা নমঃশূদ্র-জাতীয় কোন গৃহস্থের বধূকে কুম্ভীরে ধরে। স্ত্রীলোকটি তখন প্রায় আসন্নপ্রসবা—দশমাস অন্তঃসত্ত্বা। সেই অবস্থায় উক্ত রমণী নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে তাহার এক আট নয় বৎসর-বয়স্কা কন্যাকে স্নান করাইয়া তাহাকে তীরে উঠাইয়া দিয়া পুনরায় রমণী কলসীতে যেমন জল ভরিয়া লইয়া উঠিবে, তখনই তাহাকে কুম্ভীর আসিয়া ধরে। কন্যার চীৎকারে যখন লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কুম্ভীর রমণীকে লইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পল্লীবাসীরা তাহার মৃতদেহ কাড়িয়া হইবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোনক্রমে সেই দিবস সন্ধ্যার মধ্যে সেই কুম্ভীর এক স্থানে বসিল না। ক্রমাগত তাহাকে মুখে করিয়া নদীতে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। লেখক স্বয়ং এবং অনেক লোক পাঁচ ছয়খানি নৌকা করিয়া ক্রমাগত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে কোনক্রমে স্থির করান গেল না।

তাহার পর অন্ধকার হইলে সকলে চলিয়া আসিল। পরদিবস সকালে পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। প্রায় বেলা ৯টার সময় দেখা গেল, সেখান হইতে কিছু দূরে নদীতীরে একটি ঝোপের পার্শ্বে মৃতদেহ লইয়া কুম্ভীর নিশ্চিন্তমনে আহার করিতেছে। তাহার একখানি পা খাইয়া ফেলিয়াছে। রমণীর গর্ভস্থ সন্তান মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে; তাহারও শরীরের

কতক কতক অংশ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাড়া দেওয়াতে কুম্ভীরটি জলে নামিয়া গেল। তখন সেই মৃতদেহ আনিয়া সংকারের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত কুম্ভীরকে কিছুতেই মারা গেল না। কারণ, সে সর্ব্বদা নদীতে সর্ব্বশরীর জলে ডুবাইয়া কেবল নাসিকা জলের উপর রাখিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

কুম্ভীর যদি একবার মনুষ্য শিকার করিতে পারে, তাহার পর সেই শিকার যদি তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে উন্মত্তের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সময় কুম্ভীরের যে উদ্দাম ও ভীষণ মূর্ত্তি হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে কখনই বুঝিতে পারিবে না। কুম্ভীর অত্যন্ত ধূর্ত্ত। নদীতে অনেক স্থানে স্নান করিবার জন্য ঘাট আছে। অনেক ঘাট বাঁশ দিয়া ঘেরা থাকে, আবার কোন কোন ঘাট খোলাও থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ঘাট বাঁশ দিয়া ঘেরা। কুম্ভীর আসিয়া অনেক সময় সেই ঘেরার নিকট এরূপ ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, তাহাকে কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে আসিয়া সে ওত পাতিয়া চুপ করিয়া থাকে, অনেক সময় লোক ঘেরার বাহিরে স্নান করিতে নামে। সেই সময় মুহূর্ত্তমধ্যে কুম্ভীর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। অনেক সময় ঘাটে হয় ত শ্রেণী-বদ্ধভাবে পাঁচ ছয়খানা নৌকা বাঁধা থাকে। কুম্ভীর এরূপ চতুর যে, সে নীরবে আসিয়া সেই নৌকার নিকট লুকাইয়া থাকে, তখন সর্ব্বশরীর জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখে, কেবল চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া থাকে। কোনক্রমেই ইহাকে দেখা যায় না। সেই সময় স্নানার্থী নর-নারী সেখানে কুম্ভীরের অস্তিত্ব নাই মনে করিয়া যেমন জলে স্নান করিতে নামে কিম্বা অল্প জলে নামিয়া নৌকা হইতে তীরে কিম্বা তীর হইতে নৌকায় গমনাগমন করে, সেই অবসরে তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে।

পূর্ব্বে যে কুম্ভীরটির কথা বলা হইয়াছে, শিকারভ্রষ্ট হওয়ায় সে সাত আট দিবস অতি ভীষণভাবে নদীতে বেড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে গুলী করিয়া মারিবার কোনরূপ উপায় করিতে পারা যায় নাই। তিন চারি দিবস পাঁচ ছয়টি বন্দুক লইয়া চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় গুলী করিয়া মারা অসম্ভব। সাত আট দিবস পরে কুম্ভীরটিকে আর দেখা যায় নাই। সকলে তখন মনে ভাবিল যে, বোধ হয়, কুম্ভীরটি এখান হইতে তাড়া খাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এই কয় দিবস কোন লোক নদীতে স্নান বা জল সংগ্রহের জন্য আসে নাই। কুম্ভীরকে না দেখিতে পাইয়া আবার লোক নদীতে আসিতে সুরু করিল। কিন্তু যে স্থানে সে সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়াছিল, সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অন্য এক স্থানে আবার আর একটি লোক কুম্ভীরের গ্রাসে পড়িল। এবার স্ত্রীলোক নহে—এবার সে একটি ২৬।২৭ বৎসর-বয়স্ক যুবককে শিকার করিল। যুবকটি তেল মাখিয়া স্নানার্থ নদীতে যাইতে উদ্যত হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারংবার তাহাকে নিষেধ করে। কিন্তু সে কাহারও নিষেধ না মানিয়া তাহার সাত আট বৎসর-বয়স্ক পুত্রকে স্কন্ধে করিয়া এবং একটি পিতলের কলসী লইয়া নদীতে স্নান করিতে রওনা হইল। সে নদীতে নামিয়া প্রথমে তাহার পুত্রকে স্নান করাইয়া যে মুহূর্ত্তে ডাঙ্গায় তুলিয়া দিবে, তখনই কুম্ভীর তাহাকে ধরিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার পুত্রকে ছুড়িয়া ডাঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। তখন তাহার পুত্র চীৎকার করিয়া উঠায় ক্রমে ক্রমে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া পৌঁছিল। তখন তাহাকে কুম্ভীর মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখা গেল। এ দিকে নৌকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে কিছু বিলম্ব হইল। সুতরাং তাহাকে কুম্ভীরের গ্রাস হইতে ছাড়াইতে পারা গেল না। এবারও তাহাকে সমস্ত দিবস ধরিয়া তাড়া দেওয়া হইল; কিন্তু তাহাকে মারিতে পারা গেল না। তখন এক বৃদ্ধ পাটনী-জাতীয় লোকের পরামর্শে সকলে নিঃশব্দে চারিদিকে লুকাইয়া রহিল।

বেলা প্রায় ১১টার সময় কুম্ভীর যুবককে ধরিয়াছিল। বেলা প্রায় চারিটার সময় দেখা গেল, কুম্ভীর তাহাকে লইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে এক স্থানে নদীর চরের উপর উঠাইল। যখন সেখানে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন যুবকের এক-খানি বাহু সে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দূর হইতে সেই কুম্ভীরকে গুলী করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় কুম্ভীর জলে লাফাইয়া পড়ে। মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু কুম্ভীরটি তখনও নদীতে অতি ভীষণভাবে বেড়াইতেছিল। গুলী করিয়া মারা অসম্ভব দেখিয়া বঁড়শী হাঁটাইয়া মারিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সে দিবস সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে ভেলা ভাসান হইল না। তৎপরদিবস সকালবেলা পুনরায় ভেলার ব্যবস্থা করা হইল। ভেলা করিয়া তাহাতে একটি ছাগল-বাচ্ছা আনিয়া বাঁধিয়া তাহার গায়ে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালীতে বঁড়শী বাঁধিয়া দেওয়া হইল। নদীতীরে বহু লোক থাকা সত্বেও কুম্ভীরটি অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া নদীতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা যাইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া সেই ভেলার উপরিস্থিত জন্তুটি ধরিয়া ফেলিল; তখন চারি দিক হইতে নৌকা লইয়া তাহাকে তাড়া করা হইল। কিন্তু কুম্ভীর তখন এরূপ বেগে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল যে, কিছুতেই সেই ভেলার কলা-গাছকে ধরা যায় না। বেলা প্রায় দুইটার সময় ভেলার কলা-গাছ ধরা গেল। কিন্তু কুম্ভীরটি এত বলবান্ যে, তাহাকে খেলাইয়া তীরের দিকে লইয়া যাওয়া কঠিন সমস্যা হইল। সে এরূপ বেগে চলিতে আরম্ভ করে যে, যে নৌকায় তাহাকে ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাকে ডুবাইবার উপক্রম করে। এরূপ স্থলে খুব জোর করিবারও উপায় নাই। কারণ, তাহা হইলে দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা।

মাঝে তাহার দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রমও হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেখা গেল, ক্রমে ক্রমে সেই কুম্ভীর নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সেইরূপ ভাবে আর সে নৌকাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না। তখন দড়ি গুটাইয়া ছোট করিতে আরম্ভ করা গেল, নৌকাটিকেও ক্রমে তীরের দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। বেলা প্রায় সাড়ে ৫টার সময় দেখা গেল, কুম্ভীরটি মৃতপ্রায় হইয়া তীরের দিকে আসিতেছে। অর্থাৎ তাহাকে তখন যে

দিকে টানা যাইতেছে, সে তখন প্রায় সেই দিকেই আসিতেছে. অবশ্য মাঝে মাঝে এক একবার জোর করিতেছিল, কিন্তু তাহাও ক্ষণস্থায়ী। তৎপরে তাহাকে যখন প্রায় তীরের নিকটে আনা হইয়াছে, তখন সে আপনা আপনি ভাসিয়া উঠিল। অমনই একটি বল্লমের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করা হইল এবং সেই সঙ্গে বাঁধিবার আয়োজন করা হইল। অনেকে তখন গুলী মারিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় তীরে উঠাইতে হইবে, ইহাই সকলে ইচ্ছা করিয়াছিল।

তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া টানিতে টানিতে তীরে উঠান হইল। পূর্ব্বে যে প্রণালীর উল্লেখ করা গিয়াছে. তদনুসারে তাহাকে মুখ বাঁধিয়া দেখা হইল। কিন্তু সমবেত ব্যক্তিগণ উক্ত কুম্ভীরের উপর একপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে,তাহাদের আক্রোশ হইতে তাহাকে রক্ষা করা কঠিন হইল।' প্রত্যেক লোকই দুই এক ঘা লাঠির আঘাত তাহার দেহে বর্ষণ করিল। এইরূপ অবস্থায় সেই কুম্ভীরটি আট দশ দিবস অবধি জীবিত ছিল। তাহার পর সে মরিয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পর কিছু দিন ইচ্ছামতী নদীর সেই স্থানের তীরবর্ত্তী লোক সকল নিশ্চিন্তভাবে যাপন করিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চ·।

শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, কাউন্সিলার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস গবেষণার জন্য ৭ই সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথের মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বল রত্ন মেধাবী প্রতিভাবান্ ছাত্রের শিক্ষা-সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমরা আনন্দ-গৌরব অনুভব করিতেছি। হীরেন্দ্রনাথ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তালতলা হাই স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। আই, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, লজিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া ডাফ বৃত্তি ও সারদাপ্রসাদ পুরস্কার এবং বি, এ, পরীক্ষায় ঈশান স্কলারসিপ লাভ করিয়া বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। এম, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান সগৌরবে অধিকার করিয়া স্বর্ণ-পদক পারিতোষিক লাভ করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের মাসিকপত্র হীরেন্দ্রনাথ সুযোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রিন্সিপ্যাল ষ্টারলিংএর বিশেষ প্রীতি অর্জ্জন করে। প্রিন্সিপাল ষ্টারলিং পত্রে লিখিয়াছেন ;—১৪ বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন, কিন্তু হীরেন্দ্রনাথের মত মেধাবী চরিত্রবান্ দ্বিতীয় ছাত্র দেখেন নাই। হীরেন্দ্রনাথ গত বর্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বাগ্মিতার প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের গৌরব সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথের শিক্ষার সাফল্যে প্রতিভার বিচিত্র বিকাশে বাঙ্গালার গৌরব অত্যুজ্জ্বল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায়োপবেশন

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সর্দ্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি মন্দ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া উহার প্রতীকার-কামনায় প্রায়োপবেশন করেন এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকগুলি রাজনীতিক বন্দী অনশনব্রত গ্রহণ করেন, ইহা সকলেরই বিদিত। রাজনীতিক বন্দীদের—বিশেষতঃ যাঁহারা হাজতে আছেন—যাঁহাদের বিপক্ষে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই, সেই হাজত-আসামীদের প্রতি এ দেশে যেরূপ কঠোর হৃদয়হীন ব্যবহার করা হয়, বোধ হয়, কোন সভ্য দেশেই তাহা হয় না। শুনা যায়, মার্কিণ ও অন্যান্য দেশে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থানুযায়ী আহার্য্য শয্যাদি দেওয়া হয়, নানা গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করিতে, ব্যায়াম করিতে, খেলা-ধূলা করিতে এবং যতদূর সম্ভব নানারূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে দেওয়া হয়। কেবল রাজনীতিক বন্দী নহে, সাধারণ দস্যু-তস্কর বন্দীকেও আজকাল ভাল ব্যবহার দেওয়া হয়, যাহাতে তাহার চরিত্র সংশোধিত হয় ও সে পরে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিয়া একটা পেশা অবলম্বন করিতে পারে, তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনও শুনা যায়, আজকাল মার্কিণ জেলে কয়েদীদিগকে চা, তামাক পর্য্যন্ত সেবন করিতে দেওয়া হয়, তাহাদের জন্য লাইব্রেরী, ডিবেটিং ক্লাব পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া হয়, আর শিক্ষাপ্রদ ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখান হয়। আমাদের দেশে সবই বিপরীত। যাহা প্রতীচ্য আমাদেরই দেশ হইতে বহু পূর্ব্বে আমদানী করিয়া স্বদেশে নিজস্বরূপে পরিণত করিয়াছে, তাহাই আবার নূতনরূপে অধিক মূল্যে আমাদের হস্তগত হয়। প্রতীচ্যে জেল-সংস্কার হইয়াছে, উহাতে এখন আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন। এখনও তাঁহাদের ব্যবস্থায় বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীর হাতে হাতকড়া পড়ে, প্রকাশ্য স্থানে দুই জন পাহারাওয়ালার মধ্যে তাহাকে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, সাধারণ কয়েদীর মত আহার্য্যাদি দেওয়া হয়, নির্জ্জন কক্ষে রাখা হয়, পরস্পর কথা কহিতে দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজনীতিক বন্দীরা অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ১৩ জন, মিয়ানওয়ালি জেলে ৯ জন, বোর্ষ্টেল সেণ্ট্রাল জেলে ৬ জন হাজত-আসামী বহুদিন যাবৎ এই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ভগৎ সিং ও বটুক দত্ত

যতীন্দ্রনাথ দাস

ন্যূনাধিক ৩ মাসকাল এবং অন্যান্য সকলে ন্যূনাধিক ২ মাসকাল এই ব্রত পালন করিতেছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা অনশনব্রত ভঙ্গ করিয়া দুগ্ধ পান্ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির অগ্রদূত কর্কের মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনীর মত একটা মূলনীতির পূজায় আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছিলেন, হঠাৎ তাঁহারা এত দিন পরে জীবন্মৃত অবস্থায় কেন ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাখা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। সরকার ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্য কতরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাঁহাদের আহার্য্য ও শয়নাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহারা সে ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের স্বাস্থ্য বা স্বার্থের জন্য দেহদান করিতেছেন না, তাঁহারা এ দেশের বিচারাধীন অথবা দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রতীকার-কামনায় ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যখন সরকার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শারীরিক অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, তখন বোধ হয় আর জনমত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রাজনীতিক বন্দীদের জেলবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক কমিটী নিযুক্ত করিলেন। এই কমিটীর সদস্যরা জেলের আইনের কড়াকড়ি অনেক শিথিল করিয়া দিবেন, এইরূপ একটা জনরব রটিয়াছে। সে যাহাই হউক, তাঁহারা জেলে গিয়া অনশনব্রতধারীদিগকে অনুরোধ করেন যে, অন্ততঃ যত দিন তাঁহাদের তদন্ত শেষ না হয়, তত দিন যেন তাঁহারা উপবাস না করেন। এ দিকে রাজবন্দী যতীন্দ্রনাথ দাসের (কলিকাতা দক্ষিণ কংগ্রেস কমিটীর) অবস্থা এমনই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাজবন্দীরা সে অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অনাহার ব্রত ভঙ্গ করিলেন। কিন্তু ইহা সাময়িক। জগতে তাঁহাদের এই মূল নীতির জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। শেষ সংবাদ, যতীন্দ্রনাথ ৬১ দিন উপবাসের পর গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টার পর ইহলোকের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ জীবনের মত মুক্তি পাইয়াছেন। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এ মরণে তিনি অমরত্ব লাভ করিলেন। পরার্থে এই আত্মদান তাঁহার দেশবাসী চিরদিন জাতির মুক্তির ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

এবার অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী মহাত্মা গন্ধীকে লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের সহিত একমত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মনের কথা তারযোগে মহাত্মা গন্ধীকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গন্ধীও তারে উত্তর দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট-পদ গ্রহণ করিবেন না; তাঁহার স্থলে যেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে নির্ব্বাচন করা হয়। মহাত্মার পরেই শ্রীযুক্ত পেটেল বেশী ভোট পাইয়াছিলেন, পণ্ডিত জহরলাল তাঁহারও নিম্নাসন পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা না করা অভ্যর্থনা সমিতির অধিকারভুক্ত নহে, সে ক্ষমতা একমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর। সুতরাং বুঝিতে হইবে, মহাত্মা এই অনুরোধ করিয়াছিলেন বন্ধুভাবে, সরকারীভাবে নহে।

অনেকে বলেন, মহাত্মা পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া গুরু দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার কয়টি কারণ তাঁহারা প্রদর্শন করেন।—

(১) স্বাধীনতা প্রস্তাবকারীরা কলিকাতা কংগ্রেসে যখন গোলযোগ আনয়ন করেন, তখন মহাত্মা গন্ধীর মধ্যস্থতায় উহা মিটিয়া গিয়াছিল এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে রফার প্রস্তাব গঠন করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবমত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটিশ সরকার যদি নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া এ দেশবাসীর সহিত রফা না করেন, তাহা হইলে ১লা জানুয়ারী হইতে মহাত্মা স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইবেন এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ স্থির আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে কংগ্রেস-তরণীর কর্ণধার হওয়া মহাত্মারই অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দায়িত্ব তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(২) পঞ্জাবে গৃহবিবাদ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। একেই ত মুসলমান এবং শিখরা কংগ্রেস হইতে একরূপ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার উপর অভ্যর্থনা সমিতির দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি লইয়া হিন্দুদের মধ্যেও বিষম ঘর ভাঙ্গা-ভাঙ্গি হইয়া গিয়াছে। ফলে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, এবার অভ্যর্থনা সমিতি কংগ্রেস অধিবেশন সফল করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ এ কথাটা ভাবিয়াও মহাত্মার প্রেসিডেণ্ট-পদ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কেন না, একমাত্র তিনিই ভারতে সর্ব্বজনমান্য; সুতরাং তাঁহার নামেও অনেকটা কায হইত; কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্যসাধনে অনেকে অগ্রসর হইত।

(৩) অধুনা কংগ্রেসে এক শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব ক্রমশঃ এমন প্রবল ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে যে, ভয় হয়, হয় ত অচির-ভবিষ্যতে তাহারাই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়া লইবে। আমাদের বাঙ্গালারই এক দল প্রবল চরমপন্থীর প্রভাব কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মীরা এড়াইতে পারিতেছেন না এবং সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কংগ্রেসকে অন্যায় ও অনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন অভিযোগও শুনা যাইতেছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মহাত্মা গন্ধীর মত প্রভাবসম্পন্ন সর্ব্বজনমান্য নেতার কি এই শ্রেণীর অপরিণামদর্শী দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ ক্ষমতাপ্রয়াসী কংগ্রেস-কর্ম্মীর হস্ত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে?

কথাটা মহাত্মা গন্ধী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার অসম্মতির দুইটি কারণ দিয়াছেন, এ কথা সত্য। কারণ দুইটি এই;—

(১) তাঁহার উৎসাহ উদ্যমের অভাব।

(২) বর্ত্তমান কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকের ভাবধারার সহিত তাঁহার আদৌ মিলের অভাব।

তিনি যাহাই বলুন, দেশের লোক কিন্তু এখনও তাঁহাতে যে উৎসাহ উদ্যম দেখে, তাহা অন্যে দুর্ল্লভ বলিয়া মানে। তাহার পর অনেক কংগ্রেস কর্ম্মীর কল্পনা ও চিন্তার সহিত তাঁহার যেমন

মিল নাই, তেমনই তদপেক্ষা বহু গুণ অধিক কংগ্রেস-কর্ম্মীর সহিত আছে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে লিবারল পত্র 'লীডার' এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র 'বোম্বাই টাইমস্' ও 'পাইওনিয়ার'-জাতীয় দলের পত্রসমূহের সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহাকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেন না, পরন্তু স্বরাজ্য দলের নেতা বর্ত্তমান কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেন না। সময়টা দেশের জাতীয় জীবনের পক্ষে মহা সন্ধিক্ষণ ও সঙ্কটসঙ্কুল। এই জন্যই এই অনুরোধ। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারিয়ার, শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ সকল দলের নেতারাও এই অনুরোধে যোগদান করিয়াছিলেন। তথাপি মহাত্মা গন্ধী পণ্ডিত মতিলালের তারের উত্তরে তাঁহার পদগ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহাই তাঁহার শেষ জবাব।

ইহার উপর কথা নাই। এখন নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটী কাহাকে মনোনীত করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। কিন্তু মহাত্মার ন্যায় পরিণামদর্শী অবস্থাভিজ্ঞ রফায় দক্ষ সর্ব্বজনপ্রিয় নেতার পরিবর্ত্তে যদি কোনও উত্তপ্তমস্তিষ্ক চরমপন্থী প্রেসিডেণ্টের পদে বৃত হন, তাহা হইলে তাহার পরিণাম-ফলের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ শান্তিপ্রয়াসী অহিংসামন্ত্রোপাসক নেতা রফার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক মাথা ঘামাইয়ছেন। এ যাবৎ তাঁহাদের অরণ্যে রোদনই সার হইয়াছে। এইবার সরকার আরও বড় সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, এইরূপই বিশ্বাস হয়।

সাম্প্রদায়িকতার লাভ-লোকসান

এখন মুসলমানদের মধ্যে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকরূপে এ দেশের রাজনীতিক আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা কংগ্রেস ছাড়িতেও প্রস্তুত, পরন্তু ভারতের মুক্তির পরিপন্থী সফির দলে যোগদান করিতে প্রস্তুত। অবশ্য খেলাফতের কার্য্য উদ্ধারের সময় তাঁহাদিগকে এই মূর্ত্তিতে দেখা যায় নাই। নেহরু রিপোর্টই যে তাঁহাদিগকে সুর বদলাইতে বাধ্য করিয়াছে, তাহা নহে, হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার সময় হইতে—কোহাট দিল্লীর দাঙ্গার সময় হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয়তার মঞ্চটিকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। এত দিন তাঁহারা ত সাম্প্রদায়িকতার পূজা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তারও আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু ফল কিছু তাহার পাইয়াছেন কি? তাঁহাদের স্বধর্ম্মী বহু ভারতবাসী তাঁহাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় বিরক্তি অনুভব করিয়া এক স্বতন্ত্র কংগ্রেস মুসলিম দল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মুসলমান তরুণগণকে দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অমঙ্গল হইতেও এইরূপে মঙ্গলের উদ্ভব হইয়াছে।

এ দিকে আলিভ্রাতৃদ্বয় বৃটিশ উপনিবেশে প্রবেশ করিতে গিয়া কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা নিশ্চিতই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। দক্ষিণ-আফরিকায় খিলাফতের চাঁদা সাধিবার উদ্দেশে তাঁহাদের এই যাত্রা কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই! সেখানকার ইমিগ্রেশান বিভাগের কর্ত্তারা তাঁহাদিগকে সে দেশে বিনা সর্ত্তে নামিতে দেন নাই। তাঁহারা বৃটিশ প্রজা, অথচ বৃটিশ উপনিবেশে বিনা সর্ত্তে তাঁহারা নামিতে পাইলেন না, ইহা কি সামান্য অপমানের কথা? এখানকার ভারতবন্ধু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশের শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের দেশে বিদেশীকে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে সর্ত্ত দিয়া থাকেন, সুতরাং আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিপক্ষে এই সর্ত্তদান নিয়মবিরুদ্ধ নহে। বহুৎ খুব! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতে যখন বিদেশীরা অবতরণ করে এবং তাহার পর একচেটিয়া অধিকার, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব উপভোগ করে, তখন কি তাহাদের অবতরণকালে এমন অপমানকর সর্ত্ত দেওয়া হয়? আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ভারতীয়, তাঁহাদের বর্ণ শ্বেত নহে, এই জন্যই কি এমন অপমানকর ব্যবস্থা হয় নাই? কেবল তাঁহাদের নহে, সমস্ত ভারতবাসীরই ইহাতে অপমান করা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবাসীকে এখনও এই অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, অথচ আলি-ভ্রাতৃদ্বয় এখনও চুল চিরিয়া স্বার্থ ভাগ করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব! ইহাতেও কি চৈতন্য হইবে না?

কৃষিতত্ত্ব

বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে বঙ্গদেশের কতকগুলি জেলার কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা হইতেছে। এই জন্য বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ এখন হইতে উদ্যোগ করিতেছেন। প্রথমে বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়া,—এই চারিটি জেলায় কার্য্যারম্ভ হইবে। তথ্যানুসন্ধানের জন্য কৃষি বিভাগের সহকারী নিয়ামক (ডিরেক্টর) মিঃ স্মিথ, এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ জে, এন, সরকার নিযুক্ত হইয়াছেন। কাযটা খুবই ভাল। যদি যথার্থই কৃষির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই সংকল্প করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। নতুবা কতকগুলি মোটা বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দিলে কোন ফল হইবে না। কোথায় কোন্ খাল নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়া কৃষির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কোথায় কোন্ জলার জলনিকাশের ব্যবস্থা করিলে আবাদ হয় ও তথায় সোনা ফলান যায়, কোথায় একটা ফসলের পরিবর্ত্তে একাধিক ফসল বৎসরে তুলিতে পারা যায় এবং কি উপায়ে উহা সম্ভবপর হয়, কোথায় জমীদাররা সরকারের সহিত একযোগে সাহায্যদান করিয়া কৃষকগণকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় Intensive culture করিয়া ফসল দ্বিগুণ এবং আকারে বৃহৎ ও অধিক ফলদায়ক করিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, কোথায় কৃষিজাত পণ্য হইতে বিদেশে রপ্তানীর উপযোগী মাল সংগ্রহ করা এবং প্রেরণ করা সম্ভব হইতে পারে, কোথায় কৃষক বৃষ্টির জলের মুখাপেক্ষা না করিয়াও সেচের খাল বিলের সুবিধা পাইয়া ফসল বুনিতে ও তুলিতে পারে,-কোথায় একাধিক অজন্মার পর কৃষকরা হাল-গোরু

বেচিয়া, বীজ-ধান্য বেচিয়া, কৃষি ছাড়িয়া ভিক্ষায় দিনাতিপাত করিতেছে অথবা অন্য পেশা ধরিয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে,—এইরূপ এবং অন্য নানারূপ ব্যাপারের দিকে তাঁহারা যদি নজর রাখিয়া তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে।

নারী রক্ষা

বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে নারীধর্ষক কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ধর্ষিতা নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু এবং ধর্ষণকারী পশু-প্রকৃতির গুণ্ডা অধিকাংশই মুসলমান,—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদালতে নারীধর্ষণের যে সমস্ত মামলা দায়ের হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। আদালতে সকল মামলা উঠে না। অনেক ক্ষেত্রে লোক-লজ্জার ভয়ে অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হইয়াও নারী অথবা নারীর অভিভাবকরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ধর্ষিতা নারী প্রায়ই হিন্দু এবং অত্যাচারী গুণ্ডা মুসলমান।

এ অবস্থার প্রতীকারের জন্য কলিকাতায় নারীরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট লেখালেখিও হইয়া থাকে। তথাপি এই ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়াই আছে। এ সম্বন্ধে প্রতীকারকল্পে সভা-সমিতির অধিবেশনও হইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার এলবাট হলে হিন্দু সভার অধিবেশনে নারী-রক্ষার কথা উঠিয়াছিল। এই সভার আবার প্রতিবাদ করিয়া এলবাট হলে পরে এক মুসলমান সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শেষোক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—"বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় নারী-নির্য্যাতনকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান জাতির ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর প্রকাশ্যভাবে যে আক্রমণ চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা।"

আসল ব্যাপার হইল গুণ্ডার হস্ত হইতে নারীরক্ষার চেষ্টা করা। সে মহৎ উদ্দেশ্য দূরে পড়িয়া থাকিল, ঝগড়া বাধিল, মুসলমানকে ও মুসলমান ধর্ম্মকে আক্রমণ করা লইয়া! ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। শুনা যায়, মুসলমানগণের প্রতিবাদ-সভায় কোন কোন মুসলমান বক্তা বলিয়াছিলেন,—"কোরাণের অবমাননা কোন মুসলমান-সভ্য করিবে না।" এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি? তবে কি পূর্ব্ববর্ত্তী সভায় কোরাণের অবমাননা করা হইয়াছিল? হিন্দু কোন ধর্ম্মকেই অশ্রদ্ধা করে না, তাহার ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বরং শ্রদ্ধা করিতেই পরামর্শ দেয়। সেই হিন্দু সভায় কোন বক্তা পবিত্র কোরাণের অবমাননা করিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যদি কেহ ভ্রমবশে কোরাণের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণের মনে ব্যথা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অতি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছেন বলিতে হইবে। এমন অপ্রাসঙ্গিক উক্তি কেন অকারণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সভার সভাপতি মহাশয়ই বলিতে পারেন। সভাপতি ছিলেন রামানন্দ বাবু। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ দেশহিতৈষী এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন-কামী এমন বক্তৃতায় বাধা দেন নাই, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

যাহা হউক, যদিই বা অনবধানতা বশতঃ এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে মুসলমানরা নিশ্চিতই দেশের মঙ্গল-কামনায় এক জনের অপরাধে সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইবেন না, এ আশা করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মুসলমান সভার সভাপতি মওলানা আক্রাম খাঁ নারীধর্ষণ সম্পর্কে কোরাণ হইতে অতি উচ্চাঙ্গের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোরাণ নারীধর্ষণকারীর সমুচিত দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—"নারী মানুষমাত্রেরই সম্মানের পাত্র। সকল সমাজেই সদাশয় মানুষের পার্শ্বে নরাকার পশুরাও স্থানলাভ করিয়া আসিতেছে। এই শ্রেণীর নররূপী শয়তানদিগের মধ্যে নারীর সম্মান বা সতীত্বের উপর যাহারা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারা মানুষ ত নহেই—মুসলমান ত দূরের কথা। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে এ হেন পাষণ্ডের একমাত্র দণ্ড,—প্রকাশ্য দিবালোকে জনসাধারণের সম্মুখে সহস্র সহস্র মনুষ্যের হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র-প্রস্তরের আঘাতে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া পিষিয়া ফেলা। সম্মতিক্রমে বা অসম্মতি-ক্রমে বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। যদি কেহ কোন নারীর চরিত্রের প্রতি অপবাদ দেয়, তবে তাহার প্রতি ৮০ কোড়া বা কশা-ঘাতের ব্যবস্থা এবং জীবনে কোন অবস্থায় তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া হুকুম।"

এমন চমৎকার আদেশ যে ধর্ম্মশাস্ত্রের, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা শুনিতে অভ্যস্ত হয় বলিয়াই পশুপ্রকৃতির মুসলমানরা নারীধর্ষণ করিয়া থাকে; ইহাই ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। মওলানা আক্রাম খাঁ এই শয়তানদিগকে মুসলমানই বলিতে চাহেন নাই। সুতরাং এইরূপ দুই চারি জন শয়তানের জন্য যদি ধর্ম্মভীরু মুসলমানদিগেরও তাহাদের সঙ্গে নাম গ্রথিত করিয়া কলঙ্ক রটিয়া থাকে, তবে তাহা নিবারণের উপায় করাও ত মওলানা সাহেবের মত মুসলমান নেতৃবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা যদি এত দিন এই উপদেশ মুদ্রিত করিয়া অজ্ঞ মুসলমানগণের মধ্যে প্রচার করিতেন, আর উহারা যদি বুঝিত যে, উহাদের শীর্ষস্থানীয়রা উহাদের এই ঘৃণিত কার্য্য ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা হইলে এত দিন ত বাঙ্গালা হইতে নারীধর্ষণ উঠিয়াই যাইত!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ মুসলমান জন-নায়করা এ যাবৎ এরূপ কিছুই করেন নাই। বরং হিন্দু সভায় নারী-ধর্ষণের কথা আলোচিত হইবার পর তাহার সমর্থন না করিয়া তাহার মধ্যে হিন্দুদিগের হীন রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের এবং মুসলমানের ও মুসলমানধর্ম্মের প্রতি বিষ উদ্গিরণের গন্ধ পাইয়াছেন!

তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "নারীরক্ষার নামে বর্ত্তমানে যে আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছে, তাঁহার ও তাহার নায়ক-গণের প্রতি কোনও দলের মুসলমানের একটুও আস্থা নাই। বরং সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, একটা রাজনৈতিক অভি-সন্ধিকে সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলনের কর্ত্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে মোসলেম নির্য্যাতনের একটা নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন মাত্র।" পুনশ্চ আর এক স্থানে মওলানা সাহেব বলিয়াছেন,—"গোরক্ষার নাম করিয়া দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থি

করা হয়, এবং কপট মনোভাবের জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। এই আন্দোলনের নায়করা গো-রক্ষার জন্য যতটা লালায়িত ছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন—গোরক্ষাকে উপলক্ষ করিয়া নিম্নস্তরের হিন্দুদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখিতে—তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের অস্ত্ররূপে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে।"

বোধ হয়, এই মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়াই বক্তার ন্যায় মুসলমান নেতারা নারীধর্ষণকে মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য জানিয়াও এত দিন উহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরব ছিলেন! অর্থাৎ কার্য্যটা গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও দুষ্ট হিন্দুরা যখন চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা আন্দোলন দ্বারা মুসলমানদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন উহাতে কথা না কহাই যুক্তিসঙ্গত—ইহাই মনে করিয়া কি তাঁহারা এত দিন অবাধে বিনা প্রতিবাদে নারীধর্ষণ-কার্য্য চালাইতে দিয়াছিলেন? বেশ, না হয় ধরাই গেল যে, হিন্দুরা বদমাস পাষণ্ড—মিথ্যা আন্দোলনের ধূয়া ধরিয়া মুসলমানের অনিষ্ট করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতেছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ধর্ষিতা নারীরা কি অপরাধ করিয়াছিল? তাহারা ত মওলানা সাহেবের নির্দ্দিষ্ট অপরাধের তালিকার মধ্যে—যথা রাজনৈতিক চক্রান্ত অথবা গোরক্ষার ছুতা করিয়া নিরীহ মুসলমান ধর্ষণের চেষ্টা করে নাই। তবে মওলানা সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মী মুসলমান নেতারা তাহাদের ধর্ষণের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়া এত দিন একটি কথাও বলেন নাই কেন? সেই নারীদের 'হিন্দু' নামে পরিচিত হওয়াই কি এই ঔদাসীন্যের কারণ?

তাহার পর মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, নারীরক্ষা সমিতির মধ্যে যাঁহারা প্রধান ও অগ্রণী সদস্য, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আছেন। তাঁহারা হিন্দু সভারও ধার ধারেন না বা গো-রক্ষার জন্য আন্দোলন করেন না। আর কৃষ্ণকুমার বাবু ত হিন্দুই নহেন, তিনি নিরীহ ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্ম। যোগেশ বাবু বা জে, চৌধুরীকেও বোধ হয় মওলানা সাহেব ঘোর চক্রান্তকারী হিন্দু বা ঘোর গোরক্ষাকারী বলিতে সাহস করিবেন না। তবে ইঁহাদের মত দুই জন বিশিষ্ট নেতা নারীরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন কেন? মুখে অর্গল রাখিয়া কথা কহা কি মওলানা সাহেবের উচিত ছিল না?

তাহার পর মওলানা আক্রাম খাঁ আরও কয়টি কথা বলিয়াছেন, যথা,—"যাহারা পরপুরুষের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে হিন্দুনারীই অত্যন্ত অধিক", "অনেক সময় নারীর ইচ্ছা, সম্মতি ও আগ্রহই এই ব্যাপারে পুরুষকে মহাপাতকের পথে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করিয়া থাকে।"

প্রথমতঃ আমরা মওলানা সাহেবেরই উদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ হইতেই দেখাইব যে, নারীর সম্মতি থাকুক বা নাই থাকুক, কোনও নারীর সতীত্ব-হানি করার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে পাষণ্ডকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা। সে ক্ষেত্রে তিনি কুলত্যাগিনী হিন্দু নারীর সংখ্যাধিক্যের এবং তাহার সম্মতি ও প্ররোচনার কথা তুলিয়া পাষণ্ড অত্যাচারীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কেন? এই প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির নিগূঢ় অর্থ কি?

তাহার পর তিনি নারীর 'ইচ্ছা ও সম্মতি'র কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার সহিত 'অনেক সময়' কথাটা যোগ করিয়া নারীজাতির চরিত্রের প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? ইহা কি নারীজাতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাসূচক অতি হীন ও ঘৃণ্য অভিমত নহে? এইরূপ ভাবের অভিমত প্রকাশ করিলে কি লম্পট পশুপ্রকৃতি গুণ্ডাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না?

মওলানা সাহেব বলিয়াছেন, "গত দুই দশ বৎসরের মধ্যে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং সে জন্য এইবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ আন্দোলনের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ যুক্তি-প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত কেহই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই।" শুনিয়াছি, মওলানা সাহেব দিন কয়েকের জন্য হজে গিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বহুদিন দেশছাড়া হইয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। যদি তাহাই হয়, যদি তিনি কামস্কাটকা হনলুলু হইতে বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই এ দেশের বহু সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকিবেন যে, এমন দিন যায় না, যে দিন বাঙ্গালায় একটা না একটা নারী ধর্ষিতা না হয়! বহু সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে তুমুল আন্দোলনও হইয়াছে। তথাপি কি তিনি এ সম্বন্ধে "বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ আন্দোলনের" উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

মওলানা সাহেব অভিযোগ করিয়াছেন, এই আন্দোলনে মুসলমানকে ডাকা হয় নাই,—"যাঁহারা নারীরক্ষার আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের গণ্ডীর মধ্যে মুসলমানের চিরস্থায়ী প্রবেশ নিষেধ। কাযেই স্বতঃপ্রবৃত্ত তাঁহাদের কাযে যোগদান করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব।" কেন? এ ব্যাপারেও কি নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আছে না কি? ইহা ত সামাজিক ভূরিভোজন নহে যে, গৃহস্বামী গললগ্নীকৃতবাসে বলিবেন, মহাশয়, সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগমন করত শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইবেন? ইহা ত সকলেরই কার্য্য, সকলেরই কর্ত্তব্য। আর হিন্দুরা যদি তাঁহাদিগকে না ডাকিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমান নারীরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না? তাঁহাদের ধর্ম্ম ত নারীধর্ষণকারীকে দণ্ড দিবার কথা নির্দ্দেশ করিতেছে!

বড়লাট ও প্রেসিডেণ্ট

ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট পেটেল এবং বড়লাট লর্ড আরউইনের অধিকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছিল, এত দিনে তাহার অবসান হইল। অনেকে বলিতেছেন, ইহাতে দুই পক্ষই মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু এক হিসাবে প্রেসিডেণ্ট পেটেলের জয় হইয়াছে। আমরা কিন্তু এই 'জয়ের' মূল্য বুঝিতে পারিলাম না।

অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ আছে যে, পরিষদের প্রেসিডেণ্ট পেটেল সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতাসাধক আইনের (Public safety Bill) অথবা বলশেভিক বিতাড়ন আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে পরিষদে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সরকার পক্ষের মনঃপূত

হয় নাই। প্রেসিডেণ্ট পেটেল বলিয়াছিলেন, যত দিন মীরাট বড়যন্ত্র মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তত দিন পরিষদে ঐ আইনের পাণ্ডুলিপির আলোচনা চলিতে পারে না। পরিষদের ২৩ (ক) নিয়ম অনুসারে আদালতের বিচারসাপেক্ষ কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারা যায় না। আবার পরিষদের আর এক নির্দ্দেশ [২৯ (খ)] এই যে, কোন সদস্য আদালতের বিচারাধীন কোন মামলার সম্পর্কে কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে পারিবেন না। প্রস্তাব এই আইনের আমলে আসে কি না, তাহা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন প্রেসিডেণ্ট। ইহাই পরিষদের আইন। পার্লামেণ্টেও ঠিক এই ভাবের আইন আছে। Parliamentary Practise সম্পর্ক গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। প্রেসিডেণ্ট পেটেল বলশেভিক বিতাড়ন বিল সম্পর্কে প্রস্তাব বন্ধ করিয়া দিয়া আইনসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন। অথচ বড়লাট ও সরকারী কর্ম্মচারীরা একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, প্রেসিডেণ্ট পেটেল অন্যায় ও বে-আইনী কায করিতেছেন!

যদি লর্ড আরউইন সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, প্রেসিডেণ্ট তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত ছিল, পরিষদের সম্মুখে এই ব্যাপার উপস্থিত করা। কেন না, প্রেসিডেণ্ট যদি পরিষদের ক্ষমতা নিজে বাজেয়াপ্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা পরিষদেরই আছে। কিন্তু লর্ড আরউইন তাহা না করিয়া নালিশ করিতে গেলেন ভারত-সচিবের কাছে! ইহাতে তিনি যে পরিষদের ক্ষুণ্ণ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, সেই পরিষদেরই অধিকার স্বীকার করিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে পরিষদকে অপমানই করিলেন। বড়লাট এ বিষয়ে আগাগোড়াই ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন। গত ১২ই এপ্রেল তারিখে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সম্মিলিত সভাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট পেটেল পরিষদের যে নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত। যদি তাহাই হয়, তবে নিয়ম পরিবর্ত্তনের কি প্রয়োজন ছিল? ব্যাখ্যা যে ভুল হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিলেই ত গোলযোগের অবসান হইত। নিয়ম যখন ঠিক আছে, তখন নিয়ম পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত সচিবের নিকট না দৌড়াইলেই চলিত। এই হেতু মনে হইতেছে, প্রেসিডেণ্ট পেটেল নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, নিয়মের সেরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিষদের নিয়ম পরিবর্ত্তন করাইয়া লওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক বিভাগের অধিকার, ক্ষমতা ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

যাহা হউক, লর্ড আরউইন ভারত-সচিবের মারফতে ব্যবস্থা-পরিষদের নিয়ম পরিবর্ত্তিত করাইয়া লইয়াছেন। নূতন নিয়মে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ১৫ কিংবা ১৭ সংখ্যক নিয়মের অভিপ্রায় যাহাই হউক, তাহা আমলে না আনিয়া নিয়ম এইরূপ করা হইল যে, ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপির আলোচনায় বাধা দিবার বা বিলম্ব করিবার কোন ক্ষমতাই প্রেসিডেণ্টের থাকিবে না। ইহা দ্বারা কি প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হয় নাই? একেই ত লর্ড আরউইন পরিষদকে অগ্রাহ্য করিয়া ভারত-সচিবের নিকট নালিশ করিয়া বিচারপ্রার্থী হইতে গিয়া পরিষদকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়াছেন, তাহার উপর পরিষদের প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতাও খর্ব্ব করিয়াছেন।

অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইতেছে দেখিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে এ বিষয়ে একটা তুমুল আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন চলিতেছিল, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট পেটেল তাঁহার সহিত বড়লাটের যে সকল পত্র আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহা ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনের দিনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায়, বড়লাটকে শ্রীযুক্ত পেটেল প্রথম যে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় উভয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রেসিডেণ্ট, তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। তিনি যদি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে পরিষদের সদস্যগণ তাঁহার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক মন্তব্য গ্রহণ করিবেন এবং তাহার ফলে প্রেসিডেণ্টকে পদত্যাগ করিতে হইবে।" লর্ড আরউইন ইহার উত্তরে বলেন যে, "তিনি প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশের উপর দোষারোপ করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্যপদ্ধতি পরিচালন সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা উচিত।"

অতি চমৎকার! এক মুখে লর্ড আরউইন বলিতেছেন, প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশই চূড়ান্ত, আবার অন্য মুখে বলিতেছেন, প্রেসিডেণ্ট ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট পেটেল কিন্তু এই উত্তরেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, তিনি এইখানেই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বলশেভিক বিতাড়ন বিল আর পরিষদে বর্ত্তমান অবস্থায় উত্থাপিত হইবে না এবং বড়লাট আরউইন প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন,—এইখানেই প্রেসিডেণ্ট পেটেলের জয়লাভ। তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড আরউইন যে পরিষদকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া—ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার মত—ভারত-সচিবের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন, ইহাতে কি পরিষদকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করা হইল না?

গৃহ-বিবাদ

গৃহ-বিবাদই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে দেখা যায়, এই গৃহ-বিবাদের ফলেই ভারতবর্ষ এ যাবৎ পরপদানত হইয়া রহিয়াছে। বহুকালের পরাধীনতার ফলে দাসমনোবৃত্তি লাভ করা স্বাভাবিক। তাহারই কি ইহা প্রকৃষ্ট লক্ষণ?

দেশে গৃহ-বিবাদের অসদ্ভাব নাই। হিন্দু-মুসলমানে, চরমপন্থীতে মধ্যপন্থীতে, সহযোগকামীতে অসহযোগীতে, স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে,—বিবাদ কোথায় নাই? তবু দেশের মধ্যে স্বরাজ্য-দল সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী বলিয়া তাহার প্রভাব ও

প্রতিপত্তি খুবই ছিল, কিন্তু বিধাতার কি অভিসম্পাত, এই দলের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, আমাদের এই বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিবলে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়া আছেন, থাকাই স্বাভাবিক। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে; কেন না, দেশের যে রাজনীতিক দল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ. তাহাদেরই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব করা সমীচীন।

কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারে জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের কার্য্যে অনেক বাধাবিঘ্ন ও গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সে সকল ব্যাপার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্কতা অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত করিলেই সর্ব্বনাশ—তখনই কর্ত্তৃপক্ষ ইঙ্গিতকারীদিগকে 'কংগ্রেসের শত্রু' বলিয়া ছাপ মারিয়া দিবেন। তাহারা যে কংগ্রেসের গলদ দূর করিয়া দেশের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিতেছে, এ কথা তাঁহারা একবার মনেও স্থান দেন না। তাঁহাদের এই মনোবৃত্তির মূলে কি আছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদল যে এক নহে, স্বরাজ্যদলের হস্তে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব আপাততঃ ন্যস্ত থাকিলেও কংগ্রেস যে স্বরাজ্যদলের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, উহাতে যে স্বরাজ্যদল ব্যতীত অন্য দেশকর্ম্মীর অধিকার আছে, এ কথাটা ক্ষণিক ক্ষমতার গর্ব্বে বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাই স্বরাজ্যদলের ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলেই সে কংগ্রেসদ্রোহী, দেশদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু এবার স্বরাজ্যদলের নেতার মুখ হইতেই স্বরাজ্যদলের স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় প্রকট হইয়াছে। হাওড়ায় বক্তৃতা করিবার কালে বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলিয়াছিলেন,—"The Congress authorities in Bengal were shamefully banning people from entering the Congress because they did not belong to a certain group or party."—অর্থাৎ "কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বা দলের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া বাঙ্গালার লোক বর্ত্তমান বাঙ্গালার কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কংগ্রেসে প্রবেশে লজ্জাজনকরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

কথাটা শুনিলেই মনে হয়, বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও অপমান ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালার কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় স্বরাজ্যদলীয় লোক। তাঁহাদের অনেক বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা কানাঘুষায় শুনা যাইত। কিন্তু স্বয়ং স্বরাজ্যদলপতির পক্ষ হইতে এমন স্পষ্টভাষায় যখন সেই কথাটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়িল। তাঁহার নিকট কড়া হুকুমে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল। ইহার পর উভয় পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কতিপয় পত্র ও পত্রোত্তর প্রকাশিত হইল। সে সকল পত্র দৈনিক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া আপনারাই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, দোষী-নির্দ্দোষ বাছিয়া লইবেন।

সে যাহা হয় হইবে, আমরা দোষী-নির্দ্দোষের বিচারে বসি নাই। আমাদের কথা কংগ্রেস লইয়া। দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় এ সব হইতেছে কি? কোথায় কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আগামী ইংরাজী বৎসরের মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা না করিয়া আপনা-আপনি কামড়া-কামড়ি করিয়া শক্তিক্ষয় করা হইতেছে। কি চমৎকার মানাইয়াছে এই গৃহবিবাদ—যেন ইহাতেই আমরা চতুর্ব্বর্গফললাভ করিব! হায়! থাকিলে ঘর পুড়িবার সময়ে কেহ ভ্রাতায় ভ্রাতায় এমন বিবাদ বাধায় না। আসল কথা, হাম-বড়া হইবার সাধ, 'আমার দ্বারা ভারত স্বাধীন না হইলে স্বাধীনতা চাই না' এই মনোভাব এবং একচেটিয়া ক্ষমতা উপভোগের আস্বাদ মানুষকে কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহা সাময়িক মাত্র। দেশের কাযে যখন সকলকেই প্রয়োজন, কাহাকেও রাখিয়া কাহাকেও বাছিয়া লইলে চলিবে না, তখন এই মনোমালিন্য নিশ্চিতই দূর হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ কংগ্রেসের অধিবেশনের আর বিলম্ব নাই। এ সময়ে কি আমাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য?

ছাত্র-চাঞ্চল্য

বর্ত্তমানে দেশের যত্রতত্র কথায় কথায় ধর্ম্মঘট দেখা দিতেছে। কলিকাতায় ছাত্র-সমাজও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেণ্ট জেভিয়ার, হিন্দু হোষ্টেল, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক কলেজের ছাত্রগণও ইহাদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই ভাবে শ্রমিকদেরও মধ্যে ধর্ম্মঘট হইতেছে। এ ধর্ম্মঘটের অর্থ বিদ্রোহ। কোন একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ধর্ম্মঘট। এ বিদ্রোহ ব্যষ্টিভাবে নহে, সমষ্টিভাবেই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের কোন না কোন অঙ্গের অসন্তোষ প্রকাশের নামই বিদ্রোহ।

দেশের লোক যখন ইহকাল, পরকাল, জন্মান্তর ও অদৃষ্টে আস্থাবান্ ছিল, তখন লোক আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সময়ের ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করিবার সময়ে ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস ভারতের সর্ব্বত্র যে Trade Guild বা পেশাভেদ অনুসারে জাতি ও শ্রেণী বিভাগের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় না যে, অসন্তোষ বা বিদ্রোহ জন্মিবার তখন কোন কারণ থাকিত। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন গোষ্ঠী অপেক্ষা ব্যষ্টির প্রভাবই সমধিক—মানুষের ব্যক্তিত্বই এখন সমধিক পূজা পাইতেছে। এখন মানুষের আত্মসম্মান রক্ষার দিকে দৃষ্টি সমধিক নিপতিত হইতেছে।

বর্ত্তমানের ছাত্র-সমাজও কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাই যেখানে ছাত্রগণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সেখানেই ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। হিন্দু হোষ্টেল, সেণ্ট জেভিয়ার অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের যত অপরাধই থাকুক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

যে, তাঁহাদের আত্মসম্মান আহত হইয়াছিল। সেণ্ট জেভিয়ারের ফিরিঙ্গী ছাত্ররা এবং মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্ররা তাঁহাদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে এ যাবৎ ত কোন উচ্চবাচ্যই শুনা যায় নাই। ফিরিঙ্গী ছাত্ররা তাঁহাদিগকে 'ড্যাম নিগার' অথবা 'ড্যাম সোয়াইন' বলিয়া যে গালি পাড়িয়াছিল এবং মারধর করিয়াছিল, তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। কর্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, অথবা দৃষ্টি পড়িলেও তাঁহারা সে বিষয়ে কোন প্রতীকারপন্থা অবলম্বন করেন নাই। ইহার কারণ কি? গোল ত এইখানেই।

কর্তৃপক্ষ যদি ভাবিয়া থাকেন, ইহা তুচ্ছ ব্যাপার, তাহা হইলে এই ব্যাপারে সহজে যবনিকাপাত হইবে না। তাঁহারা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকেই দণ্ড দিতে সমধিক আগ্রহান্বিত। বিশেষতঃ সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের পাদরী অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা ত এ বিষয়ে পরম তৎপর। কয় জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে গিয়া তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া হতাশ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায়, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা কিরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্যারো হোষ্টেলের ছাত্রগণের দণ্ডবিধানে আগ্রহান্বিত হইলেও এক বিষয়ে বিশেষ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ জন্ম তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। যে দিন প্রেসিডেন্সী কালেজের সম্মুখে পিকেটিং উপলক্ষে হাঙ্গামা হইয়াছিল, সেই দিন ঘটনাস্থলে পুলিস উপস্থিত হইলে তিনি পুলিসকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা এখানে কেন? তোমাদিগকে এখানে আসিতে কে বলিল? আমাদের ও ছাত্রদের মধ্যে হইতেছে বিবাদ, ইহার মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির আমি কোন প্রয়োজন দেখি না।" ইহাই ত বাঞ্ছনীয়। ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্বন্ধের মধ্যে পুলিসের বিভীষিকা আনয়ন করা কেন? প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো স্বয়ং আহত হইয়াও অসাধারণ ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া যে এই কথা দৃঢ়ভাবে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। অধ্যক্ষ রো, অধ্যাপক ম্যান, পার্শিভ্যাল, উইলসন, হল প্রভৃতি শিক্ষকরা কিরূপ ছাত্রবৎসল ছিলেন, এবং ছাত্রদের স্বার্থের জন্য কিরূপ সংগ্রাম করিতেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহারা ছেলেদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহাদের আমোদে প্রমোদে যোগদান করিতেন এবং সর্ব্বদা তাহাদের সহিত মিলামিশা করিতেন। কেবল লেখাপড়ার সম্পর্কই তখনকার কালে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ছিল না। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক হুইলার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড ফার্কার, রেভারেণ্ড বেগ, ফাদার লাফোঁ, ফাদার পাওয়ার, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন, অধ্যাপক পিয়ার্সন প্রমুখ শিক্ষক সম্প্রদায়ের নাম এখনও তখনকার কালের ছাত্ররা (এখন অনেকে বৃদ্ধ) শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এখন যেন ক্রমশঃ এই মধুর সম্বন্ধ অন্তর্হিত হইতেছে। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রমুখ দুই চারিজন শিক্ষকের কথা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ শিক্ষকই কেবল পাঠ বলিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য ছাত্রদের সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না।

যদি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় এই সম্বন্ধটি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কেবল পাশের পর পাশ করান শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, ছেলেদের চরিত্রগঠনই মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক যদি ছেলেদের সঙ্গে মিলামিশা না করেন, তাহাদের অতি আপনার জন বলিয়া মনে না করেন,—শিক্ষালয়েও যদি প্রেষ্টিজের প্রাধান্য দেন, তাহা হইলে কোন কালে এই মনোমালিন্য অন্তর্হিত হইবে না। হয় ত পাঁচ জন বাহিরের হিতৈষী লোকের মধ্যস্থতায় বর্ত্তমান গোলযোগের অবসান হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের মধুর সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করিতে হইলে ইহার অধিক আরও কিছু করা চাই।

দৃষ্টির গতি

দুই একটি ভারতবাসী বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, যেন তাঁহারা শ্রমিক সরকারকে উত্ত্যক্ত ও উদ্ব্যস্ত করিয়া না তুলেন; কেন না, সত্য-সত্যই এবার তাঁহারা ভারতের প্রতি সুবিচার করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, মাত্র উপযুক্ত অবসর ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

খোস খবরের ঝুটাও ভাল! যথার্থই যদি শ্রমিক সরকারের সুমতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলাত ও ভারত উভয়েরই মঙ্গল। কেন না, ইহা নিশ্চিত যে, ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষ থাকিতে—জগতের এক-পঞ্চমাংশ লোক দাসত্বের গুরুভারে অবসন্ন থাকিতে কোন দেশেরই স্বস্তি নাই। তাই মনে হয়, সত্যই যদি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেশের লোকের মরজি বুঝিয়া ধীরে-সুস্থে মিশরের মত ভারতের ব্যাপারেও উদারনীতি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যে ব্যাঘাৎ ঘটানয় কোন লাভ নাই, সার্থকতা ত নাই-ই। কিন্তু সত্যই কি ম্যাকডোনাল্ড গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টির গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?

অবশ্য মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের পূর্ব্বের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তিনি বস্তুতঃই ভারতের হিতৈষী, গণতন্ত্রের উপাসক এবং সকল জাতিরই মুক্তির প্রয়াসী। বহুকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার Awakening of India বা 'ভারতের জাগরণ' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—"দুই পুরুষ পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম যে, আমরা ভারতের এই জাগরণ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। আমরা ভারতকে জাগাইতে উৎসাহিত করিয়াছি, আমরা ভারতের এই জাগরণের জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু এখন যেমন ভারত জাগ্রত হইয়াছে, অমনই আমরা ভীত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই জাগরণের বিপক্ষে এখন গুপ্তচর লাগাইয়াছি, আমরা ইহার পুরোহিতদিগকে দ্বীপান্তরিত করিতেছি, আমরা এই আন্দোলন ব্যর্থ করিয়া দিবার নিমিত্ত নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছি।"

এই ম্যাকডোনাল্ড কি ডিপোর্টেশান ও অর্ডিন্যান্সের ম্যাকডোনাল্ড?—না, বর্ত্তমান লাহোর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ম্যাকডোনাল্ড? তবে একটা কথা, তাঁহার গভর্ণমেণ্ট যখন প্রথমবার শাসনপাটে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আদন

সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, টোরীদের ভয়ে তাঁহাদিগকে তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত। এবারও এখনও তাঁহারা ভয়ে ভয়ে চলিতেছেন, তাই এখনও তাঁহারা man on the spotএর উপর কলম ডালিতে সাহসী হন নাই। কেহ কেহ বলেন, সম্প্রতি ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ হেণ্ডার্সন মিশরের ব্যাপারে man on the spotএর আসন টলাইয়া দিয়াছেন, ইঁহাদের মতে ইহা বড় সহজ কথা নহে। মিশরের man on the spot অর্থাৎ বৃটিশ হাই কমিশনার লর্ড লয়েড কেওকেটা লোক নহেন। তিনিই বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব নামজাদা শাসক সার জর্জ্জ লয়েড। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার আর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় বোম্বাইবাসীরা বিলক্ষণই পাইয়াছে। ইনি একবারে ঝুনা ব্যুরোক্রাট, টোরীদের মনের মত রাজকর্ম্মচারী। ইনি no d—d nonsense নীতির উপাসক। এ হেন জবরদস্ত শাসককে মুখথাবা দেওয়ায় অনেক সাহস ও নৈতিক বলের অথবা মনোবলের প্রয়োজন। পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ উইলফ্রেড ওয়েলক "দি পিপল" পত্রে লিখিয়াছেন,—"শ্রমিক সরকার শাসনপাটে বসিবার পরই টোরী ব্যুরোক্রেশীর একটি বড় দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। টোরী (কন্জারভেটিব) সরকারের এক প্রধান অস্ত্র ছিল, সাম্রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তি। মিঃ হেণ্ডার্সন লর্ড লয়েডকে পদচ্যুত করার পর সেই মন্ত্রগুপ্তির দুর্গ ভঙ্গ হইয়াছে। মিঃ হেণ্ডার্সন কেন লর্ড লয়েডকে জবাব দিয়াছেন, তাহা পার্লামেণ্টে খুলিয়া বলিয়াছেন। ইহাতে টোরী (কনজারভেটিব) মহলে একবারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে,—'এ কি ভীষণ ব্যাপার! ঘরের মধ্যে যাহাই করি না, তাহা বলিয়া হাটে হাড়ী ভাঙ্গা? রাজ্য আর চলে না!' আমরা বলি, শ্রমিক সরকার এই কার্য্য দ্বারা সরলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সুশাসনে রাজ্য সচলই হইবে, বরং টোরী আমলের সন্দেহ অবিশ্বাস আদি অচলতার মূল উপাদানগুলি দূর হইবে।"

মিঃ ওয়েলক শ্রমিক সরকারের ভাবগতিক দেখিয়া শেষে বলিয়াছেন, "It may be taken as an indication that a bigger and broader policy is intended, and that a break in continiuty is desired, অর্থাৎ তাঁহারা যে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যশাসন-ব্যাপারে বৃহত্তর ও প্রশস্ততর নীতি অবলম্বন করিবেন এবং অতীতে অনুসৃত শাসননীতির নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করিয়া দিবেন, তাহারই ইহা পূর্ব্বসূচনা।" ইহা সাম্রাজ্যবাদিমাত্রেরই পক্ষে ভাল কথা।

কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা ভারতে যে শাসননীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে ত' ইহার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। এ দেশের 'পাইওনিয়ার' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র বলিতেছেন, 'ধৈর্য্যং রহু'! লাহোরের "সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট" নামক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি তারে তাঁহার পত্রকে জানাইয়াছেন,—

"পার্লামেণ্টের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইলেই শ্রমিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতের সম্বন্ধে এক ঘোষণা করিবেন। ঐ ঘোষণায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হইবে। শ্রমিক সরকার উহাতে 'দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের' ব্যাখ্যা করিবেন,—তাঁহাদের মতে উহাই ঔপনিবেশিক শাসন। ইহা ছাড়া প্রধান মন্ত্রী আপনার নামে বিস্তর নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া এক গোল টেবল-বৈঠকের অর্থাৎ পরামর্শ-সভার আয়োজন করিবেন। ঐ পরামর্শ-সভায় ভারতের ভবিষ্যৎ (শাসনপদ্ধতি) নির্ণীত হইবে।"

এই সকল কারণ দেখাইয়া অনেকে বলিতেছেন, বস্তুতঃ এই সময়ে শ্রমিক সরকারের ধ্যানভঙ্গ হইলে সব মাটী হইয়া যাইবে। আমরা কিন্তু ইহার সার্থকতা দেখি না। ভারতবর্ষ কাহারও দয়াদত্ত দান চাহিতেছে না। যাহা তাহার জন্মগত অধিকার, তাহাই সে দাবী করিতেছে। সুতরাং যদি শ্রমিক সরকার তাহার সেই দাবী স্বীকার করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর স্তুতি-নিন্দায় তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইবেন। আর ভারতবাসীর চীৎকারে যদি তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাহা হইলে অমন যোগে বসার কোন সার্থকতা নাই। আর একটা কথা, যদি শ্রমিক সরকার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাটিকেই ভারতের পক্ষে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর গোল-টেবলের প্রয়োজন কি? যদি তাঁহারা ইহাই স্বীকার করেন যে, বিলাতের লোক ও বিলাতের পার্লামেণ্টই ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা, তবে ঐ দুই বিধাতা হইতেই ত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে; তাহার উপর রাউণ্ড টেবল চাপাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতবাসী যদি কখনও নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, তখন গোল-টেবল কেন, বাঁকাটেরা কোন টেবলেরই দরকার হইবে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুসলিম নারী

আমরা হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালী, বঙ্গজননীর দুই সন্তান, এ কথাটা আমরা হিন্দু বাঙ্গালীরা যত অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করি, আমাদের মনে হয়, আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা তাহা করেন না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাবুক আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন—এমন কি, অনেকে লজ্জানুভব করেন অথবা ঘৃণা বোধ করেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় এই ভাবটা অনেক মুসলমানের রচনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে অথবা বাঙ্গালা ভাষাকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই, ইরাণ-তুরাণকে ও তথা আরবী-ফারসীকে আপনার হইতে আপনার বলিয়া মনে করিতে গর্ব্বানুভব করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যের কথা, এখন সেই ভাবটা আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকে বঙ্গজননীর ও বঙ্গভাষার সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালার মুসলিম অন্তঃপুরচারিকা গৃহলক্ষ্মীদিগের মধ্যেও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাদ্রমাসের 'সওগাদ' পত্রিকায় ইহার পরিচয় পাইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটিকে মহিলা-সংখ্যায় পরিণত করা হইয়াছে এবং ইহাকে বহু বিদুষী বাঙ্গালী মুসলিম কুললক্ষ্মীর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রচনাসম্ভারে

সজ্জিত করা হইয়াছে। আমরা উহার মধ্য হইতে শ্রীমতী নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক ইহা হইতে লেখিকার গভীর স্বদেশ ও মাতৃভাষা-প্রীতির পরিচয় পাইবেন—

"সাহিত্য বল্‌তে প্রথমতঃ আমার বাঙ্গালা সাহিত্যের কথাই মনে পড়ে। এ-কে আমাদের আঁকড়ে ধ'রে থাকতেই হবে।

"এই সাধনার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ এই ভাবটা আমাদের অন্তরে পোষণ করতে হবে যে—'বাঙ্গালী' শব্দের ওপর আমাদের প্রতিবাসী হিন্দুর যে পরিমাণ অধিকার, তার চেয়ে আমাদের দাবী অনেক বেশী। অর্থাৎ কিনা, প্রকৃত বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে, হিন্দুর চেয়ে আমরাই বরং দু'পা এগিয়ে যাব। আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে থাকা দরকার যে—ভারতের অর্দ্ধেক-সংখ্যক মোসলমান আমার এই বাঙ্গালা মায়েরই সন্তান।

"আমার অনেক মোসলেম ভ্রাতার নিজেদেরকে এখনও বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়ার ভ্রমটাই বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদের নগণ্যতার প্রধান কারণ। পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তর ধ'রে বাঙ্গালা দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস ক'রে, আজন্ম বাঙ্গালার ফলে আর জলে কলেবর বৃদ্ধি ক'রে, আর এই বাঙ্গালা ভাষাতেই সর্ব্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত ক'রেও যদি বাঙ্গালী না হয়ে আমরা অপর কোন একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তা হ'লে আমাদের ত আর কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চির-তমসাচ্ছন্ন গহ্বরমধ্যে পতনই অবশ্যম্ভাবী।

"আমাদের জন্মগত এই অধিকারে অনাস্থাই আমাদের সমাজকে এক রকম কোণঠাসা ক'রে রেখেছে, এ-কে গজাতে দিচ্ছে না। এখন আর বাঙ্গালা শিখবার ভয়ে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হ'লে চলবে না। বুক ঠুকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে এখন জোর গলায় বলতে হবে—আমি বাঙ্গালী, আর এই বাঙ্গালা সাহিত্যই আমার সাহিত্য।"

লেখিকার আদর্শ সফল হউক, বাঙ্গালার মুসলিম গৃহস্থের গৃহে গৃহে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর ও পুষ্টি হউক, ইহাই কামনা।

শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র দেব চৌধুরী

বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফল্য

শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র দেব চৌধুরী এম, টি—ইনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে 'প্রাথমিক বহু সাহিত্যে শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ তথ্য' সম্বন্ধে চারি বর্ষব্যাপী গবেষণার জন্য এম, টি—মাষ্টার অফ টিচিং উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রবোধ বাবুই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম এম, টি।

অধ্যাপক—শ্রীকালীপদ বসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-অধ্যাপক শ্রীযুত কালীপদ বসু জীব-রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য জার্ম্মাণীর ডিউস একাডেমী হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এই বৃত্তিলাভের জন্য ভারতবর্ষ, লণ্ডন, গ্লাসগো, জেডো, রিও-ডি-জেনেয়ো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু কৃতি ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। কালীপদ বাবুর গবেষণা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুত কালীপদ বসু
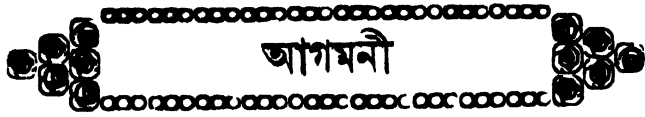
আগমনী

* মঙ্গল—একতালা।

হৃদয়-প্রদীপ জ্বালাইয়ে দিয়ে দীপ্ত করিব তোমার চরণ
শরত প্রভাত আলোকেরি মাঝে করিব তোমার মঙ্গল বোধন।
আকাশ তাহারি নীল আভরণে সাজায়েছে তব বিশ্ব-ভবন
সোনার বরণ ধানেরি ক্ষেত্র পাতিয়ে রেখেছে তোমারি আসন।
পুষ্পের যত সুরভি আহরি আনিছে বহিয়া মলয়-পবন
বিশ্ব-মাঝারে আগমনী গান গাহিছে হরষে যত জনগণ ॥

আস্থায়ী—

				১			২			৩		
	সা	সধা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মপা	মগা
	হৃ	দ০	য়	প্র	দী	প	জ্বা	লা	ই	য়ে	দি০	য়ে০
				১						৩		
	গা	মা	মা	ধা	ধা	ধা	পধা	ধর্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
	দী	০	প্ত	ক	রি	ব	তো০	মা০	র	চ	র	ণ
				১			২			৩		
	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্ঋা	র্সনা	না	না	ধা	ধা	ধপা	পা
	শ	র	ত	প্র	ভা	ত০	আ	লো	কে	রি	মা০	ঝে
	পা	পধা	ধা	ধা	পা	মা	মা	মপা	মা	গা	ঋসা	না
	ক	রি০	ব	তো	মা	র	ম	ঙ্গ০	ল	বো	ধ০	

অন্তরা—

	০			১			২			৩		
	মা	ধা	ধা	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্ঋা	র্সনা	র্সা	র্সা
(১)	আ	কা	শ	তা	হা	রি	নী	ল	আ	ভ০	র	ণে
(২)	পু	০	ষ্পে	র	য	ত	সু	র	ভি	আ০	হ	রি
	০			১			২			৩		
	র্সা	র্ঋা	র্মা	র্গা	র্ঋা	সা	র্সা	না	ধা	নধা	ধা	পা
(১)	সা	জা	য়ে	ছে	ত	ব	বি	০	শ্ব	ভ০	ব	ন
(২)	আ	নি	ছে	ব	হি	য়া	ম	ল	য়	প০	ব	ন
	০			১			২			৩		
	পা	ধা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	না	ধা	পা	পা
(১)	সো	না	র	ব	র	ণ	ধা	নে	রি	ক্ষে	০	ত্র
(২)	বি	০	শ্ব	মা	ঝা	রে	আ	গ	ম	নী	গা	ন
	০			১			২			৩		
	পা	পধা	পা	পা	মা	মা	মা	গমপা	মা	গা	ঋসা	না
(১)	পা	তি০	য়ে	রে	খে	ছে	তো	মা০০	রি	আ	স০	ন
(২)	গা	হি০	ছে	হ	র	ষে	য	ত০০	জ	ন	গ০	ণ

কথা, সুর ও স্বরলিপি—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এ)।

* 'ললিত' ও 'বিভাস' রাগিণীর সংযোগে 'মঙ্গল' রাগিণীর উৎপত্তি। ইহা সম্পূর্ণ জাতি, 'ঋ' কোমল, 'ম' বাদী, 'ধ' সংবাদী, প্রাতঃকালে গেয়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৬ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদীয়া

বোধনেরই আগে এসেছে জননী শারদ-শ্রীর মাঝে,
গগনে গহনে ভুবন আলোকি' রূপটি তাহার রাজে

মন্দির পানে চেয়ে—
কেন শুধু আছ ? মা যে আসিয়াছে সারা দেশখানি ছেয়ে।
হেরিছ না তাঁর আয়ুধোজ্জ্বল দশদিকে দশ পাণি ?
প্রাচীদিগন্তে হেরিছ না তাঁর হৈম-মুকুটখানি ?
উদ্ধত নদী, শান্ত স্বচ্ছ হ'লো কার ইঙ্গিতে ?
কোন্ কথা বন করিছে ঘোষণা কুলায়ের সঙ্গীতে ?
কোথা পেল তরু লাক্ষা-পরশ জবায় যা আছে ফুটে' ?
উত্তোলি গ্রীবা উত্তর হ'তে 'মরালেরা' কেন জুটে ?
কাশের কেশর দুলায় কেশরী কেন জয়-গৌরবে ?
কার অঞ্চল করে ঝল-মল তারকা-খচিত নভে ?

জননী আসেনি একা—
হেরি স্থলে জলে কমলে কমলে আরো কত পদরেখা।
এসেছেন বাণী সিত জ্যোৎস্নায় নভোহংসের পরে—
রমার আশিসে শ্যাম-সম্পদে গিরিপ্রান্তর ভরে।
রহি গণবাণী সিদ্ধি-সূচনা এসেছেন গণপতি।
বৈরীজয়ের আয়োজন করে ময়ূরকেতন রথী।
মা যদি আসে নি, বঙ্গজননী তেয়াগি গেরুয়া বাস
পট্টবসনে কেন হুলু দেয় প্রচারিয়া উল্লাস ?
গঙ্গার তীরে তীরে—
সেফালির লাজ ছড়ানো হেরিয়া বুঝেছি মা এল ফিরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

গয়ার বোধিদ্রুমের বিশাল স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল সমাধি ও ভাবনার প্রভাবে গৌতম-বুদ্ধ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—তাহা কি ভাবে, কিরূপ উপায়ে ও কীদৃশ সহকর্ম্মিগণের সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রচারিত হইয়া বিরাট্ বৌদ্ধধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধেই প্রমাণমূলক ঐতিহাসিক আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই নবোদ্ভাবিত সর্ব্বপ্রাণিহিতকর সদ্ধর্ম্মের প্রচার ও স্থাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৌতম-বুদ্ধ যে সকল বাধা এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনুশীলন এখন অল্প লোকেই করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে গেলে বর্ত্তমান সময়ে হীনযান ও মহাযান এই দুইটি সম্প্রদায়ের অবলম্বিত বিভিন্ন মত ও আচার-অনুষ্ঠানকেই লোক সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে, বাস্তবিকপক্ষে এই হীনযান ও মহাযানের প্রচারের পূর্ব্বে গৌতমবুদ্ধ ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে কি প্রকার মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান এখন কেহ বড় একটা করিতে চাহেন না, এই প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয় প্রধানভাবে আলোচিত হইবে।

নিরঞ্জনার তীরে বোধিদ্রুমের নিম্নে বসিয়া সমাধির প্রভাবে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথমেই বারাণসীর মৃগদাব অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা প্রচলিত সকল বৌদ্ধগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতে মহাবীরের সহিত বুদ্ধদেবের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাও প্রচলিত বৌদ্ধগ্রন্থে অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীরের ন্যায় জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে তিনি নিজের উপলব্ধ সত্যের সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা বুঝাইতে সমর্থ হয়েন নাই, ইহাও সকলে জানে। মৃগদাবে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পাঁচ জন সহকর্ম্মীকে দেখিতে পান। প্রথমে ঐ পাঁচ জন কর্ত্তৃক গুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া তিনি গৃহীত না হইলেও পরে তাঁহাদিগকে তিনি স্বমতে-আনয়নপূর্ব্বক শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাও প্রচলিত বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে Dialogues of the Buddha নামে ইংরাজী ভাষাতে যে পালিগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং Further Dialogues of Buddha এই নামে আর একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের ইংরাজী ভাষাতে যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দুইখানি গ্রন্থ এবং Kindred Sayings নামে আর একখানি বৌদ্ধ পালিগ্রন্থের যে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা দেখিলে কিন্তু মনে হয় যে, বারাণসীতে মৃগদাবে পাঁচ জন সহকর্ম্মীর সহিত বুদ্ধদেবের এই প্রকার মিলন এবং ঐ পাঁচ জনের বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব-গ্রহণ বিষয়ে যে সকল কথা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে এবং সত্য বলিয়া সাধারণে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, এই পাঁচ জন ভিক্ষুর সঙ্গে বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম দেখা বৈশালী নগরে হইয়াছিল, সাধারণের ধারণা কিন্তু ঐ পাঁচ জনকে প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। তিনি যখন প্রথম মৃগদাবে ধর্ম্মোপদেশ করেন, সে সময়ে অন্ততঃ দশ জন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোকও বিদ্যমান ছিলেন; তাহা ছাড়া বুদ্ধদেবের সেই প্রথম ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য বহু দেবযোনিও সে স্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। অন্যান্য পালিগ্রন্থে এরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ঐ পাঁচ জন শিষ্যের মধ্যে 'মহানাম' নামে প্রসিদ্ধ যে ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহার সহিত কিন্তু বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পর প্রথমসাক্ষাৎকার মৃগদাবে হয় নাই, কিন্তু বৈশালীতেই হইয়াছিল। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির সামঞ্জস্য কি হইতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বুদ্ধের প্রথম উপদেশ সম্বন্ধে, উপদেশস্থান ও উপদেষ্টব্য ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ও নবীন গ্রন্থের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইল। অনেক নূতন কথা—যাহা পরবর্ত্তী গ্রন্থে বুদ্ধবিষয়ে লিখিত হইয়াছে, যাহা প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহমধ্যে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত তাহার বিপরীত কথাই লিখিত হইয়াছে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—দ্বারা ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধদেব অনেক গল্প বর্ত্তমান সময়ে সত্য বা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলেও বস্তুতঃ তাহাতে সন্দেহ করিবার বহু বিদ্যমান আছে

ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধদেবের সহিত মিলিত হইয়া এ কার্য্যে আত্মনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে,এক্ষণে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে এক জনের নাম—"অন্নকৌণ্ডীন্য।"

প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেবের জন্মলাভের অব্যবহিত পরে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার দেহলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, তাহা রাজা শুদ্ধোদনকে বুঝাইবার জন্য যে কয় জন সাধু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই 'অন্নকৌণ্ডীন্য' তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। এই 'অন্নকৌণ্ডীন্য' যে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বুদ্ধদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি পার হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধদেবের সহিত মিলিত হইয়া নব-ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে অতি অল্পকালই সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, বুদ্ধদেবের সহিত মিলিত হইবার ৩ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই 'অন্নকৌণ্ডীন্যে'র চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা পালিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, বুদ্ধদেব ইঁহার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং ইঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতেন। 'অন্নকৌণ্ডীন্য' জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'কৌণ্ডীন্য' তাঁহার বংশগত উপাধি ছিল, অন্নই তাঁহার নাম ছিল। তিনি বেশী কথা কহিতেন না। বাদ-বিবাদবিষয়ে তাঁহার শক্তি অতি অল্পই ছিল। সে সময়ে 'সঞ্জয়' নামে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট তিনি অধ্যাত্মবিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে সঞ্জয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিরতিশয় ছিল। বুদ্ধদেবের সকল কথাই যে তিনি মানিয়া লইতেন, তাহাও নহে, অনেক বিষয়ে বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত। কিন্তু সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গিক বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তাহা অন্নকৌণ্ডীন্যের বড় ভাল লাগিত, এই সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা বস্তুতঃ লোকমধ্যে এই মার্গের অনুষ্ঠান ও প্রচার যাহাতে বিস্তৃতভাবে হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণ-মন দিয়া বুদ্ধদেবের সাহায্য করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যে নূতন সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা জগতের সকল প্রাণীর বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এই কার্য্যে সহায়তা লাভ করিতে হইলে স্বর্গীয় উন্নত জীবগণের সহিত পরামর্শ করা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময়ে তিনি ঐ সকল স্বর্গীয় মহাত্মগণের সহিত সমাহিত অবস্থায় অনেক আবশ্যক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং পরামর্শ লইতেন। এক কথায় বলিতে গেলে স্থূল দৃশ্যপ্রপঞ্চের মধ্যে বিচরণকারী মর্ত্ত্য জীব অপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে অন্যের অদৃশ্যভাবে বিচরণকারী দিব্য মহাপুরুষগণের সহিত পরামর্শ ও তাঁহাদের সাহায্যলাভ ব্যতীত এ সংসারে বিশ্বজনীন মঙ্গল কখনই সাধিত হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

বুদ্ধদেব তাঁহার এই বিশ্বাসের প্রতি কখনও নিজের কোন প্রকার অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি প্রদর্শন করেন নাই, এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পালি বিনয়পিঠকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নকৌণ্ডীন্যের মৃত্যুতে বুদ্ধদেব বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভাবে তাঁহার তৎকালীন যে ক্ষুদ্র সঙ্ঘ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের আর এক জন সহকর্ম্মী শিষ্যের নাম ছিল—'বপ্র' (পালি—বপ্প); এই 'বপ্র' বা 'বপ্প' বেশী দিন বুদ্ধদেবের সহকর্ম্মী হইয়া কার্য্য করেন নাই। তাহার কারণ, প্রথম অবস্থায় বুদ্ধদেবের উপদেশে নূতন ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে ইনি যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু মনে মনে ইনি সাংখ্যমতের উপরই অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং সেই জন্য বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সহিত অনেক সময়ে তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইত। কিছুকাল বুদ্ধদেবের অনুবর্ত্তন করিয়া 'বপ্প' শেষে বুদ্ধদেবের সঙ্ঘও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। বুদ্ধদেবের উপদেশে বা কার্য্যপ্রণালীতে কোন অলৌকিক অসাধারণ শক্তি আছে, এরূপ বিশ্বাস বপ্রের ছিল না। এইরূপ মতভেদনিবন্ধন বুদ্ধদেবের বপ্রের প্রতি সে প্রকার আসক্তি বা আস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'বপ্র' চলিয়া যাইলে বুদ্ধদেব দুঃখিত হয়েন নাই; প্রত্যুত অনেকটা তাঁহার পরিত্যাগনিবন্ধন শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন। বপ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বেদশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। প্রবাদ আছে যে, তিনি সমগ্র বেদ-সংহিতা পুস্তকের সাহায্য বিনাই আবৃত্তি করিতেন। আত্মবিষয়ে তিনি প্রাচীন বেদপন্থীদিগেরই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মতে

আত্মা দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, অবিনাশী ও বিভু। 'পুরুষ' 'আত্মা' এই সকল শব্দের ব্যবহার নূতন বৌদ্ধমতেই যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে বপ্রেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু বপ্র কেন—মহানাম নামে প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যও বপ্রেরই ন্যায় আত্মার নিত্যত্ব মত পোষণ করিতেন। বপ্রের সহিত বুদ্ধদেবের যে ছাড়াছাড়ি হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, 'বপ্র' আত্মাকে অপরিণামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে চৈতন্য স্বরূপ এবং প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধরহিত। দেশ-কাল বা সংস্কারের দ্বারা আত্মার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। তাহা কূটস্থ নিত্য। বুদ্ধদেব কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিতেন না; তাঁহার মতে মানবাত্মা পরিবর্ত্তনশীল এবং সেই পরিবর্ত্তন তাহার প্রতিক্ষণে হইয়া থাকে। নূতন নূতন অবস্থাপ্রাপ্তি যেমন দেহের ও মনের হইয়া থাকে, মানবাত্মারও সেইরূপ হইয়া থাকে। আর একটি বিষয়ে বুদ্ধদেবের সহিত বপ্রের বিলক্ষণ মতভেদ ছিল। বপ্র বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের কোন আবশ্যকতা আছে, ইহা মানিতেন না, স্ত্রীলোকদিগেরও বুদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ-অধিকার বপ্রের একান্ত অনভিমত ছিল। বুদ্ধদেব কিন্তু সঙ্ঘমধ্যে সন্ন্যাসীর প্রবেশ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তিনি স্বয়ং সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অপরাপর ভিক্ষুগণও তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণের বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশেও বুদ্ধদেবের কোন আপত্তি ছিল না। প্রত্যুত তিনি সঙ্ঘে স্ত্রীলোকগণের প্রবেশও একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

অনেকেরই বিশ্বাস, বুদ্ধদেব প্রথমতঃ বৌদ্ধসঙ্ঘমধ্যে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার প্রদান করিতে অভিলাষী ছিলেন না, পশ্চাৎ তাঁহার প্রিয় শিষ্য এবং নিকট-আত্মীয় আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি স্ত্রীলোকগণেরও সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাচীনতম পালিগ্রন্থ পাঠে কিন্তু ইহার বিপরীতই বুঝা যায়। বুদ্ধদেব স্ত্রী বা পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে অধিকার-তারতম্য যে হইতে পারে বা হওয়া উচিত, এ প্রকার ধারণা কখনও হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা এ সংসারে নিরন্তর ক্লেশভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের সেই অজ্ঞানপ্রসূত ক্লেশ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভের উপায় প্রদর্শন ও তাহার অনুষ্ঠান যাহাতে সংসারে অসঙ্কোচে সকলের পক্ষে সুগম হইতে পারে, তাহারই জন্য তিনি জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে স্ত্রী-পুরুষ বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিভেদ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রথম হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছিল। দুঃখ-নিবৃত্তির হেতুভূত জ্ঞানে সকল মানবের জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার আছে, এ পথে যাইতে পুরুষের যেমন অধিকার, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ অধিকার আছে, ইহা তিনি এই ভারতে প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে সঙ্ঘ গঠন ও সদ্ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রভূত সাক্ষ্য প্রাচীন পালিগ্রন্থ নিঃসংশয়ে প্রদান করিয়া থাকে।

বপ্রের সহিত এই সকল বিষয়ে মতভেদ হওয়া নিবন্ধন বুদ্ধদেব কিছু দিন দেখিয়া অবশেষে বুদ্ধসঙ্ঘ হইতে বপ্রকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।
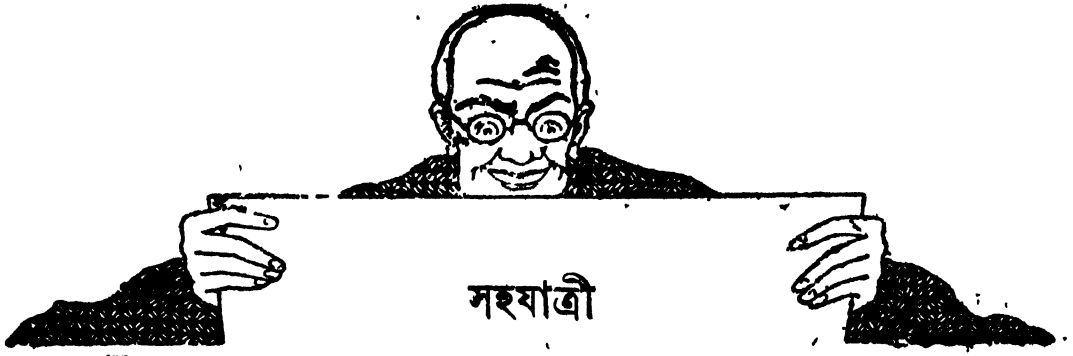
সহযাত্রী

সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেলের গাড়ীতে। ঘণ্টা তিনেক মাত্র তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা আমার জীবনে এমন অপূর্ব্ব তিন ঘণ্টা যে, তার স্মৃতি আমার মনে আজও জল্‌জল্‌ করছে। এক এক সময়ে মনে হয় যে, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার একটা কল্পনা মাত্র। আসলে তার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, কখনো কোনও কথাবার্ত্তা হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটি এতই অদ্ভুত যে, সেটিকে সত্য ঘটনা বলে' বিশ্বাস করবার পক্ষে আমার মনের ভিতরেই বাধা আছে। লোকে বলে, স্বপ্ন কখনো কখনো সত্য হয়; সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে সত্য আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এখন ঘটনা কি হয়েছিল, বলছি।

বছর পাঁচ ছয় আগে আমি একদিন রাত ১০টায় ঝাঝা থেকে একখানি জরুরী টেলিগ্রাম পাই যে, সেখানে আমার জনৈক আত্মীয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর যদি আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাহ'লে সেই রাত্রেই আমার রওনা হওয়া প্রয়োজন। আমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে' একখানি ঠিকা গাড়ীতে হাবড়ার দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে, মিনিট পাঁচেক পরেই একখানি গাড়ী ছাড়বে—যা'তে আমি ঝাঝা যেতে পারি। গাড়ীখানি অবশ্য slow-passenger এবং ছাড়ে অসময়ে, তবুও দেখি ট্রেণ একেবারে ভর্ত্তি, কোথায়ও ভাল করে' বসবার স্থান নেই, শোবার স্থান ত দূরের কথা। খালি ছিল শুধু একটি ফার্ষ্ট ক্লাস compartment। তাই আমি একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনে সেই গাড়ীতেই চড়ে' বসলুম। প্রথমে সে গাড়ীতে আমি একাই ছিলুম, মধ্যে কোন্ ষ্টেশনে মনে নেই, একটি বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোক আমার কামরায় এসে ঢুকলেন। তিনি এসেই আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। এ-কথা ও-কথা বলবার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বৌবাজারের কসাই-কালী ভদ্রকালী না দক্ষিণাকালী। আমি বল্লুম "জানিনে।" তিনি একটি বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানের মুখে এতাদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পরে বল্‌লেন যে, তিনি এ দেশে পূর্ব্বে engineer ছিলেন, এখন বিলেতে বসে' তন্ত্রশাস্ত্র চর্চ্চা করছেন, মাত্র সম্প্রতি বাঙ্গলায় ফিরে এসেছেন, নানারূপ কালীমূর্ত্তি দর্শন করবার জন্য। তারপর সমস্ত রাত ধরে' আমার কাছে কালীমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। সে রাত্তিরে মন আমার নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল, সুতরাং তাঁর একটি কথাও আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢোকেনি; নৈলে তাঁর কথা শুনে আমি কালীর বিষয়ে এমন একখানি treatise লিখতে পারতুম—যার প্রসাদে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে doctor উপাধি পেতুম। আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে' তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, এবং আমি সব কথা খুলে বল্লুম। শুনে তিনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌লেন—"তোমার আত্মীয় ভাল হয়ে গেছে।"

শেষ রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে চোখ খুলে দেখি, ট্রেণ আসানসোল ষ্টেশনে হাজির, এবং আমার সহযাত্রীটি অদৃশ্য হয়েছেন। কামরাটি খালি দেখে ভাবলুম যে, এই বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোকের বিষয় আমি ত স্বপ্ন দেখিনি? রাত্তিরের ব্যাপার সত্য কি স্বপ্ন, তা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি গাড়ী থেকে নেমে Refreshment Roomএ প্রবেশ করলুম, এক পেয়ালা চায়ের সাহায্যে চোখ থেকে ঘুমের ঘোর ছাড়াবার জন্য।

২

মিনিট দশেক পরে গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, সেখানে দুটি নূতন আরোহী বসে' আছেন। একজন পণ্টনি সাহেব,

আর একজন সাধু। সাহেবটির চেহারা ও বেশভূষা দেখে বুঝলুম, তিনি হয় একজন Colonel, নয় Major; আভিজাত্যের ছাপ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল। আমি গাড়ীতে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্তে উঠে পড়ে' আমার বসবার জন্য জায়গা করে দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ব'সে পড়লুম; কিন্তু আমার চোখ প'ড়ে রইল ঐ সাধুটিরই উপর। প্রথমেই নজরে পড়ল, তিনি একটি মহাপুরুষ না হন, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। তাঁর তুলনায় কর্ণেল সাহেবটি ছিলেন একটি ছোকরা মাত্র। স্বামীজী যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, তাঁর বুকের বেড় অন্ততঃ ৪৮ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থূল নন। এ শরীর যে কুস্তিগির পালোয়ানের, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। কুস্তিগির হলেও তাঁর চেহারাতে কিছুমাত্র চোয়াড়ে ভাব ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, অর্থাৎ তামাতে রূপোর খাদ দিলে এই উভয় ধাতু মিলে যে রঙের সৃষ্টি করে, সেই গোছের রঙ। তাঁর চোখের তারা দুটি ছিল ফিরোজার মত নীল ও নিরেট। এরকম নিষ্ঠুর চোখ আমি মানুষের মুখে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের রেশমের আলখাল্লা; মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়া পাগড়ী ও পায়ে পেশোয়ারী চাপ্লি। তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম, কারণ, পাঠান যে সাধু হয়, তা আমি জানতুম না; আর আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে, এ ব্যক্তি পাঠান না হয়ে যায় না। এঁর মুখে-চোখে একটা নির্ভীক বেপরোয়া ভাব ছিল—যা এ দেশের কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কারও মুখে সচরাচর দেখা যায় না।

আমি হাঁ করে' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে, স্বামীজী আমাকে বাঙ্গলায় বললেন—

"মশায় কি মনে করছেন যে, আমি ভুল করে' এ গাড়ীতে উঠেছি,—থার্ড ক্লাস ভেবে ফার্ষ্ট ক্লাসে ঢুকেছি? অত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আমি নই,—এই দেখুন আমার টিকিট।"

কথাটা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে বললুম—"না, তা কেন মনে করব? আজকাল অনেক সাধু-সন্ন্যাসীই ত দেখতে পাই ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাতায়াত করেন। এমন কি, কেউ কেউ একা একটি saloon অধিকার করে' বসে' থাকেন।"

এর উত্তর হ'ল একটি অট্টহাস্য। তারপর তিনি বললেন—"সে মশায় পরের পয়সায়। আমার মশায় এমন ভক্ত নেই—যাদের বিশ্বাস, আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলেই তারা স্বর্গে seat পাবে। গেরুয়া পরলেই যে পরের কাছে হাত পাততে হবে, বিধির এমন কোনো বিধান নেই।"

—তা অবশ্য।

—কে কি কাপড় পরে, তার থেকে যদি কে কি রকম লোক তা চেনা যেত, তাহ'লে ত আপনাকেও সাহেব বলে' মানতে হ'ত!

আমার পরণে ছিল ইংরাজী কাপড়, সুতরাং সন্ন্যাসী ঠাকুরের এ বিদ্রূপ আমাকে নীরবে সহ্য করতে হ'ল।

এর পরেই তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকবার পর, তিনি একদৃষ্টে কর্ণেল সাহেবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কর্ণেল সাহেবের কামান-প্রমাণ বন্দুকটির উপর। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে' উঠলেন—"May I have a look at your weapon, sir?"

কর্ণেল সাহেব উত্তর করলেন,—Certainly—here it is।" এই বলে' তিনি বন্দুকটি স্বামীজীর হাতে তুলে দিলেন। স্বামীজী "thank you" বলে' সেটি স্বকরতলগত করলেন। তারপর সেটি নেড়ে চেড়ে বললেন—"It's a Winchester repeater."

—That's right.

—Splendid weapon—but no use for us Shikaris.

—No, it's not a sporting gun.

—Would you care to have a look at my gun? I'm sure you will like it.

এই বলে' তিনি বেঞ্চের নীচে থেকে একটি বন্দুকের বাক্স টেনে নিয়ে, একটি রাইফেল বার করে', "Let me take out the balls" বলে', তার ভিতর থেকে দু'টি টোটা নিষ্কাষিত করে,' সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। সাহেব সে বন্দুকটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং দু-তিনবার মৃদুস্বরে বললেন—"It's a

beauty," তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"Did you get it in Calcutta ?"

—No, I brought it out from England.

—It must have cost you a pot of money.

—Two hundred and fifty pounds."

এর পর সাহেবে-স্বামীতে যে কথোপকথন হ'ল—তা আমার অবোধ্য। মনে আছে শুধু ছু-চারটি ইংরাজী কথা— যথা Twelve-bore, 465, Holland & Holland প্রভৃতি। আন্দাজ করলুম, এ সব হচ্ছে বন্দুক নামক বস্তুর নাম, ধাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি। তারপর সীতারামপুর ষ্টেশনে সাহেব নেমে গেলেন, এবং যাবার সময় স্বামীজীর করমর্দ্দন করে' বল্লেন, "Well, goodbye, glad to have met you"—স্বামীজীও উত্তর করলেন, "Au revoir."

আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে স্বামীজীর কথাবার্ত্তা শুনলুম, এবং তার থেকে এই সারসংগ্রহ করলুম যে, তিনি বাঙ্গালী, ইংরাজীশিক্ষিত, ধনী ও শীকারী। এরকম লোকের সাক্ষাৎ জীবনে একবার ছাড়া ছ'বার পথেঘাটে মেলে না।

এর পর স্বামীজী যে ব্যবহার করলেন, তা আমার আরও অদ্ভুত লাগল। সন্ন্যাসী হলেও দেখলুম তিনি আসন-সিদ্ধ যোগী নন। এমন ছট্‌ফটে লোক এ বয়সের লোকের ভিতর দেখা যায় না। পাঁচ মিনিট অন্তর তিনি এখান থেকে উঠে ওখানে বসতে লাগলেন, বিড়-বিড় করে' কি বকতে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে গাড়ীর ভিতরেই পায়চারি করতে লাগলেন। শুধু পাশ দিয়ে আর একখানি গাড়ী চলে' গেলে তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পাশের গাড়ীর যাত্রীদের অতি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আমরা তেড়ে চলেছি পশ্চিমমুখে, আর অপর গাড়ীগুলি তেড়ে চলেছে পূর্ব্বমুখে; পথমধ্যে উভয়ের মিলন হচ্ছে সেকেণ্ড খানিকের জন্য। এ অবস্থায় এক গাড়ীর লোক অপর গাড়ীর লোকদের কি লক্ষ্য করতে পারে, বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম এইমাত্র যে, নিজের গাড়ীর লোকের চাইতে অপর গাড়ীর লোক সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ঢের বেশি। কারণ, সীতারামপুরের পরে তিনি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নি। তাঁর এ ব্যবহার দেখে আমি যে আশ্চর্য্য হয়েছি, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ, তিনি হঠাৎ বলে' উঠলেন, "আপনি বোধ হয় জানতে চান যে, আমি পাশের চলন্ত ট্রেণে কি খুঁজছি? আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে বলছি, মন দিয়ে শুনুন।"

৩

আমার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমীদারী। আমার বাবার ছিল মস্ত জমীদারী; উত্তরাধিকারীস্বত্বে আমি এখন তার মালিক। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন নেহাৎ নাবালক। কাযেই Court of Wards সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে, আর আমার শিক্ষক হলেন একজন ইংরাজ ভদ্রলোক। তিনি এককালে ছিলেন কাপ্তেন। আমি কখনো স্কুল-কলেজে পড়িনি। আমি যা-কিছু শিখেছি, সে সবই তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কি শিখিয়েছেন জানেন?—ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুঁড়তে, ইংরাজীতে কথা কইতে। এ তিন বিষয়ে বাঙ্গলার জমীদারের ছেলের মধ্যে আমি বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার ইংরাজী কথা ত আপনি শুনেছেন? আর আমি যে কি রকম সওয়ার, তা জানে বাঙ্গলার পয়লা নম্বরের ঘোড়ারা। আর আমি একটা গণ্ডারকে পাঁচশ' ফিট দূর থেকে এক গুলিতে ধরাশায়ী করতে পারি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।—আমার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সংস্কৃতভাষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজাপাঠ, আর তন্ত্রমন্ত্র। জমীদারের ছেলের ধর্ম্মজ্ঞান থাকা নাকি নিতান্ত দরকার। তাই আমি একসঙ্গে ঘোর হিন্দু ও ঘোর সাহেব— একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়।

তবে এ বেশ কেন? আমি গেরুয়া পরেছি কাঞ্চনের অভাবে নয়, কামিনীর অভাবে। কথাটা শুনে বোধ হয় আপনি ভাবছেন যে, বড়মানুষের ছেলের আবার কামিনীর অভাব! আমি কিন্তু মশায় আর পাঁচজনের মত নই। টাকা থাকলেই যে বদ্‌খেয়ালী হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। জীবনে এক ফোঁটা মদও খাইনি, একটান তামাকও টানিনি, আর অদ্যাবধি নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিনি। আমি পর পর তিনটি বিবাহ করি, তিনটিই গত হয়েছে।

আমার প্রথম বিবাহ নাবালক অবস্থাতেই হয়, একটি

সমান ঘরের জমীদারের মেয়ের সঙ্গে। সে স্ত্রীটি ছিল— যেমন বড় জমীদারের মেয়ে হয়ে থাকে। তার ছিল কুল, শীল, তক্রা ; ছিল না শুধু রূপ আর বুদ্ধি। ছেলেবেলা থেকে দুধ খেয়ে খেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি নীলগাই। কিন্তু সে গাই কখনো বিয়োয় নি, এই যা রক্ষে।

দ্বিতীয়টি আমি নিজে দেখে বিয়ে করি। গেরস্তের মেয়ে। সে ছিল যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী—যাকে কথায় বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। জমীদারীর কাজকর্ম্ম সব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমি শুধু শিকার করেই বেড়াতুম। অমন মেয়ে বোধ হয় বাঙ্গলাদেশে লাখে একটি পাওয়া যায় না। রূপে তাকে অনেকে হয় ত টেক্কা দিতে পারে, কিন্তু গুণে নয়।

তার মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করি—স্ত্রীবিয়োগের এক মাসের মধ্যেই। এই তৃতীয় পক্ষই আমাকে এই বেশ ধরিয়েছে। এর থেকে মনে ভাববেন না যে, সে দেব্যা হয়ে আমার সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় 'এক সের আটা আওর আধা সের ঘিউ মিলা দে ভগবান' বলে' সকাল-সন্ধ্যে চীৎকার করে' বেড়াচ্ছি। ছেলেবেলায় একটি গান শুনেছিলুম—

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়,
কালো শশী যাবেন কাশী
ভস্মরাশি মেখে গায়।

শর্ম্মাও কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে' কাশী যাবার ছেলে নন। আমার তৃতীয় পক্ষ দেশছাড়া হয়েছেন বলে' আমিও দেশছাড়া হয়েছি। কথাটা একটু হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে, না ?—ব্যাপার কি হয়েছে আপনাকে বলছি। তা আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে আপনার খুসি। I don't care a rap for other people's opinion.

আমাদের বাড়ীর ভিতরের বাগানে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, মেয়েদের স্নানের জন্য। আমার তৃতীয়া স্ত্রী বিবাহের মাসকয়েক পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেখানে গা ধুতে যান, ও সেই পুকুরে ডুবে মারা যান। আমি অবশ্য তখন বাড়ী ছিলুম না, আসামে খেদা করতে গিয়েছিলুম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আমার কাছে পৌঁছতে প্রায় সাত দিন লাগে, আর আমি বাড়ী ফিরে এসে দেখি যে আমার স্ত্রী চলে' গিয়েছেন—তবে লোকান্তরে কি দেশান্তরে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারলুম না। এ সন্দেহের কারণ বলছি।

সে ছিল নিতান্ত গরিবের মেয়ে, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। স্বর্গের অপ্সরা ভুলে মর্ত্ত্যে এসে পড়েছিল। পয়সার অভাবে বাপ বহুকাল মেয়েটির বিয়ে দিতে পারেনি। আমি যখন এ বিবাহের প্রস্তাব করি, তখন তার বয়েস আঠারো। তার বাপ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে রাজরাণী হবে, এতেও আপত্তি! এরকম মুখছোপ্ খাওয়া আমার বংশের অভ্যাস নেই। আমি সেই হতভাগা ব্রাহ্মণকে বলে' পাঠালুম যে, যদি সে তার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হয় ত মেয়েটিকে জোর করে' কেড়ে নিয়ে আসব, আর তার ঘর-দোর হাতী দিয়ে ভাঙ্গিয়ে জলে ফেলে দেব। তখন সে ভয়ে মেয়ে তুলে নিয়ে এসে আমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করলে। দুদিন না যেতেই কাণাঘুষোয় শুনলুম যে, এ বিবাহে বাপের কোনো আপত্তি ছিল না—আপত্তি ছিল মেয়ের। আমারই এক ছোকরা আমলার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেও বিবাহ করবে না, এই পণ সে ধরে' বসেছিল। ছোকরাটি ছিল তার গাঁয়ের লোক, দেখতে সুপুরুষ, আর গাইতে বাজাতে ওস্তাদ। উপরন্তু তাকে সচ্চরিত্র বলে' জানতুম। বলা বাহুল্য, এ গুজব শোনবা মাত্র আমি ছোকরাটিকে আমার বাড়ী থেকে দূর করে' দিলুম। তার কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেলেন। সুতরাং আমার মনে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, সে মরেনি, —পালিয়েছে। সে যে কি প্রকৃতির মেয়ে ছিল, তা আমি বলতে পারিনে, কারণ, বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার ভাল করে' আলাপ-পরিচয় হয় নি। সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাকে ছুঁতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না। বহুমূল্য রত্ন বাক্সেই বন্ধ ছিল, হঠাৎ এক দিন অন্তর্ধান হ'ল। এই ঘটনা ঘটবার পর থেকেই আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। ওঃ, কি রূপ তার! তবে তার বিয়োগে যত না হ'ল দুঃখ, তার চাইতে বেশি হ'ল রাগ। সে বোঝেনি যে, স্বর্গের অপ্সরাও মর্ত্ত্যে এসে কেউটের লেজে পা দিতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সংসারে বীতরাগ হয়েই বুঝি আপনি কাষায়-বসন ধারণ করেছেন ?"

তিনি উত্তর করিলেন :—

সংসারে বীতরাগ হয়েছি বলে' আত্মহত্যা করবার ত কোন কারণ নেই। পৃথিবীতে দেদার বাঘ-ভালুক গুলি খাবার আশায় বসে' রয়েছে,তাদের বঞ্চিত করে' নিজে গুলি খেয়ে বসব কেন? তা ছাড়া,আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর ত আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম। আমার আত্মীয়স্বজন দেশময় আমার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করছিলেন; আমি নিঃসন্তান,আমাদের বংশরক্ষা ত হওয়া চাই। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল—যাতে করে' চতুর্থ পক্ষ আর এ যাত্রা করা হ'ল না।

আমি বাড়ী থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলুম। রাণাঘাট ষ্টেশনে একটি ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের গাড়ী পাশে এসে লাগতেই সে গাড়ীখানি ছেড়ে দিলে। দেখি, সে গাড়ীর একটি থার্ড ক্লাসের কম্পার্টমেণ্টে আমার সেই গুণধর আমলাটি বসে' রয়েছে,আর তার পাশে একটি অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী। সে যুবতীটি যে আমার তৃতীয়পক্ষ, তা বুঝতে আমার আর দেরী হ'ল না—যদিও তার মুখটি ভাল করে' দেখতে পাইনি। তবে instinct বলেও ত একটা জিনিষ আছে। সেই দিন থেকে আমি শুধু ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে বেড়াই—একদিন না একদিন তাদের ধরবই, এ লুকোচুরি খেলার একদিন সাঙ্গ হবেই। গেরুয়া ধারণের উদ্দেশ্য—যাতে করে' তারা আমাকে চিনতে না পারে। আর সঙ্গে যে এই বন্দুক নিয়ে বেড়াই, তার কারণ জানেন? এবার যেদিন ও দুজনের সাক্ষাৎ পাব, সেদিন এর দুটি গুলি দুজনের বুকের ভিতর বসে' যাবে। আমার স্ত্রী হরণ করে' নিয়ে যাবে, আর অক্ষত শরীরে হেসে খেলে বেড়াবে, এমন লোক এ দুনিয়ায় আজও জন্মায় নি। তারপর—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ—তার ক্রোড়ে আশ্রয় নেব।

এই কথা বলতে না বলতে ট্রেণ দেওঘর ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। পাশ দিয়ে একখানি ট্রেণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন, "এই যে, এই ট্রেণে তারা যাচ্ছে।" এই বলেই তিনি বন্দুক হাতে করে' তড়াক্ করে' প্লাট্ফর্ম্মে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর বন্দুকের ঘোড়া দুটি টানলেন। দুবার শুধু ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ হল'। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তার ভিতর টোটা নেই। তখন তিনি আল্খাল্লার বুকের পকেট থেকে দুটি টোটা বার করে' বন্দুকে পুরলেন,—ইতিমধ্যে সে ট্রেণখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের গাড়ীও ছেড়ে দিলে। সিতিকণ্ঠ বন্দুক হাতে দেওঘরের ষ্টেশনের প্লাট্ফর্ম্মেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর সিতিকণ্ঠকে জীবনে আর কখনো দেখিনি, নিজের গাড়ীতেও নয়, পাশের গাড়ীতেও নয়। আমি শুধু ভাবি, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর এখন কোথায়? হিমালয়ে না বিলেতে, জেলে না পাগ্‌লা-গারদে?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ভাত

চোখের জলে, বুকের তলে—
কঠিন শিলা যখন গলে,
তখন তবে অশেষ জ্বালা,
সবাই পালা, দারুণ জ্বলে'।

আলোকমাখা প্রভাত আজি,
এসেছে ভাই, নবীন সাজি'!
স্বপন করে পুলকরাজ—
বুকের মাঝে, স্বপন ফলে!

প্রাণের বনে সবাই থাকি,
পাপিয়া, পিক, মধুর ডাকি'—
উঠেছে তাই, পরাই "রাখি",
সবার হাতে প্রসূন-দলে!

বিষের পাশে ছড়ায় সুধা,
বিরাট দাতা জুড়ায় ক্ষুধা,
দোঁহায় বাঁধে একই সূতা—
দু'দিকে তা'র খেলার ছলে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

অভিভাষণ *

একটা মামুলী ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। সেইটা শেষ ক'রে আমার আজকের ইতিহাসটা ব'লে বিদায় নেব। এক বৎসর পর আবার আমার পুরানো বন্ধুদের—যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাঁদের দেখতে পাব মনে ক'রে পীড়িত শরীরেও চ'লে এলাম।

অভিনন্দন উপলক্ষ ক'রে আমার জন্মদিনে ছেলেরা আজ যা বল্লেন, তার সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লে শেষ করব। অনেক দিন পূর্ব্বে, বোধ হয়, আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণীতে'. তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ ক'রে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কি না? তার পর থেকে ২।১ জনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন থেকে নবীন সাহিত্য, যা আজ-কাল খবরের কাগজে, মাসিক-পত্রে ও নানা ভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি। আমার সমালোচনার হয় ত বিশেষ কোন মূল্য নেই, কারণ, আমি সমালোচনা করতেই পারি না। শুধু ভাল-মন্দ লাগার ভিতর দিয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারি।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিষটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্যে গড়ে তুলতে পারেন! আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এই দিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেছি। যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের মন অন্য রকম হয়ে গেছে। যৌবন জিনিষটা আমরা নিজেরা পেরিয়ে গেছি! তাই যৌবনের অনেক রচনা হয় ত আজ পড়তেও ভাল লাগে না, লিখতেও পারি না। এই জন্য মনে করি, বয়স যাদের কম, তাদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন। সাহিত্যের উন্নতি করবেন। বাঙ্গালা ভাষায় বড় জিনিষ লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস ব'লে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড

অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না। ২।৩ জন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটা করছ কেন? উত্তরে তাঁরা বল্লেন—এই জন্য করছি, আমাদের আর Scope নাই। আমরা যখন যা ভাবি, বা

---

* প্রেসিডেন্সী-কলেজে চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির সভ্যগণের অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর।

করি, যৌবনে যা প্রার্থনা করি, সে দিক থেকে রস-রচনা বা সাহিত্য-রচনায় উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই না—এই ব'লে তাঁরা দুঃখ করলেন। আমি তাঁদের বল্লাম—কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ—এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এ সব নিয়ে তোমরা কায কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল এক দিকে হ'লে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি, সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেহ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সে দিকে সত্য সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু অন্য জিনিষ তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশে কত রকম অভাব আছে—নানান দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার ক'রে চলেছ।

তার জবাব তাঁরা দিলেন, আমরা সাহিত্যিক মানুষ, সে সমস্ত সাহিত্যের দিক নয়। ওদিক দিয়ে আমরা পারি না, ইচ্ছাও করে না, অভিজ্ঞতাও নাই। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অনুযোগ করলেন—সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি, সেটা ভাল হচ্ছে না। আমি তাঁদের বলেছিলাম, হয় ত সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্র নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং ওদিকে যাওয়া আমি ক্ষতি মনে করি না। আমি যদি ওদিকে একবারে না যেতুম, তা হ'লে যত ক্ষতি হ'ত, গিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় তাকে ক্ষতি ব'লে মনে করি না। লাভ হউক, ক্ষতি হউক, আমার জীবন ত শেষ হয়ে এল। ছাই-ভস্ম যা হউক, কিছু লেখা রেখে গেছি। তোমরা সবেমাত্র আরম্ভ করেছ। এদিকটাকে অস্বীকার করো না। অন্যান্য দেশের যে ২।৪ খানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, এ জিনিষে তারা কখনও চোখ বুজে থাকেনি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেছে, অনেক শাস্তি ভোগ করেছে। তোমরা তাই কর না কেন? তারা তা করবে কি না, আমি জানি না।

এতগুলি তরুণ স্কুলের ছাত্র—যারা পড়ছে, সাহিত্য-চর্চা করছে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দায় বা ধাপে উঠছে, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া ক'রে বলছেন, তেমন ক'রে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয় ত তেমন ক'রে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হ'লে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলছি, কবিতার দিক থেকে নয়। এক দিকে চলেছে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এক বন্ধুর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয়, ২০।২৫ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বল্লেন—দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় ম'রে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয় ত মনে করে, এ সব জিনিষ আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা ও সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিষ আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়—তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেই জন্য সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়, আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন।

রাগের ওপর থেকে যে আমি বলছি, তা নয়। আমাকে যেন কেহ ভুল না করেন। ছেলেদের নূতন উৎসাহকে দমিয়ে দেবার ইচ্ছা ক'রে যে এটা বলছি, তাও নয়। অনেক-বার বলেছি, যৌবনের সাহিত্য আলাদা। সেটা ঠিক বুড়োদের মত হয় না। ১৭।১৮।১৯ বৎসর বয়সে আমি যা লিখেছি, আজ তা লিখতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না, চেষ্টা করলেও সেই ভাব আসে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে হয় ত

কিছু ভাল হ'তে পারে, কিন্তু ঠিক সে জিনিষটি যেন হ'তে চায় না। এই জন্য অনেকবার বলেছি, ছেলেদের সাহিত্য-সৃষ্টি বুড়োদের চোখ দিয়ে দেখলে চলবে না। সে বয়সের মধ্যে নিজকে ফেলে দেখা দরকার। আজ ৫৪ বৎসর বয়সে যা ভালবাসি, তার সঙ্গে মিলিয়ে হয় ত এঁদের লেখার অনেকখানি বুঝতে নাও পারি, মনে হ'তে পারে অপ্রয়োজনীয়,কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা প'ড়ে তাঁদের কিছু বল্‌বার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি —এ সব তাঁরা ভেবে দেখুন। তাঁদের লেখবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেছে, প্রকাশ করবার ভঙ্গী বাস্তবিক আমাকে মুগ্ধ করে। লেখবার ভঙ্গী ও ভাষার দিক থেকে অভিযোগ করবার কিছুই নাই। সে দিক থেকে আমি নালিশ করি নি। অন্য দিক থেকেই আমি বল্লাম। এটা আমার নিজের ভাল-মন্দ লাগার কথা নয়। তোমরা জানো, তরুণদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। তাদের সমস্ত চেষ্টায় আমি থাকি। এইমাত্র যুব-সমিতির মিটিং ক'রে এলাম। যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলছি —তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সে দিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করি নি, কোন দিন করব ব'লে মনেও করি না। সে দিন তাঁর কথা আমার অতটা না বল্লেও হয় ত হ'ত। কারণ, অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠছে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ, আক্রোশের থেকে করছেন বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, যেন তাঁরা বলছেন—বেশ করেছি, আরো করব। তোমরা বলছ, সে জন্য আরো বেশী ক'রে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সে দিকে যদি এই পরিমাণ সাহস দেখাতে তাঁরা পারতেন, তা হ'লে মনে করতাম,আর কিছু না থাক্, অন্ততঃ সত্যকার সাহস এঁদের আছে। অনেক সময় মনে হয়, জিদের জন্য করছে। এটাকে সাহস ব'লে মনে করি না। কিন্তু তা ত নয়, এ যেন "বে-পরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি" জান্‌নো।

তোমরা—যারা এখানে আছ, রাগ ক'রে আমার কথা নিও না। এ সব আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে যা ভাল বুঝেছি, তার থেকেই বলছি—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ, তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটু যায়গায় কোথাও কিছু হ'লে কিছু হ'ত না। এ ক্ষেত্রে তা একবারে নয়। এ কথার উত্তরে যদি তোমরা কেউ বলো—আমিও ত এটা লিখেছি, রবীন্দ্রনাথও অমন লিখেছেন—হ'তে পারে, আমরা লিখেছি। তাতে কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কায করছ।

স্নেহের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে এবং তরুণ সাহিত্যিকদের মঙ্গল ইচ্ছা ক'রে এ কথাগুলি বল্লাম। এই রকম সুবিধা ও অবসর কমই পাওয়া যায়। অনেকদিন ধ'রে বলব ব'লে মনে করেছিলাম। ভাল না লাগলেও কথা কয়টি ব'লে দিলাম।

আবার আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক বৎসর যদি বেঁচে থাকি, আবার আসব। না থাকি ত ভালই হয়। অনেক সময় মনে হয়, যাঁরা দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁরা বোধ হয় ভাল কায করেন না। শরীর যখন অপটু হয়ে পড়ে, তখন আর ইচ্ছা হয় না, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর জীর্ণ শরীর টেনে নিয়ে বেড়াই। দুঃখ-ভোগ যদি কপালে থাকে, আসছে বছর হয় ত আবার দেখা হবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পথের স্মৃতি

দশম পরিচ্ছেদ

আমাদের নির্ব্বাসন হইল শ্রীরামপুরে। বলিলাম বটে যে, নির্ব্বাসন হইল, কিন্তু ইহা নির্ব্বাসন কি মুক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; যেহেতু, এই শ্রীরামপুরই আমাদের আদি বাসভূমি। যে বাটীতে জ্যেঠামহাশয় আমাদের পাঠাইয়া দিলেন, সেই বাটীতেই আমার পিতা, পিতামহ জন্মিয়াছিলেন; আমার প্র-পিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই বাটীতেই জন্মিয়া তাঁহাদের সারা-জীবন সুখ-দুঃখের সঙ্গে কাটাইয়া আবার এই বাটীর আকাশেই তাঁহাদের শেষ নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই মহাতীর্থে আসা আমাদের নির্ব্বাসন অথবা আমাদের মুক্তি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

পিতামহরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ যখন শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে চলিয়া আসিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ পিতামহ যেন আরও বেশী করিয়া পিতৃপুরুষের ভিটাখানিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। এখন তিনি ত স্বর্গগত, কিন্তু তাঁহারই মত এখনও পর্য্যন্ত আমার বড় জ্যেঠা মহাশয় ও তাঁহার দুই পুত্র—আমার দুই দাদা—চিরকালের পৈতৃক ভিটাখানিকে তেমনই ভাবে রক্ষা করিয়া তাহার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার কোলের মধ্যে অসীম তৃপ্তিতে বাস করিয়া আসিতেছেন।

বড় জ্যেঠামহাশয় তখন 'পেন্‌সন্‌' ভোগ করিয়া অবসর-জীবন ভোগ করিতেছিলেন। বড় দাদা শ্রীরামপুর মডেল স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার। ছোট দাদা এফ, এ পাশ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাটীতেই বসিয়া ছিল। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে শুধু আমার দুই বৌদিদি। বড়দাদার কাছে থাকিলে লেখাপড়াও আমাদের ভাল হইবে এবং কালীঘাটের কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, এই উদ্দেশ্যেই জ্যেঠামহাশয় আমাদের শ্রীরামপুরে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কালীঘাটে থাকিয়া বিনুদা' যাহাও একটু পড়াশুনা করিত, শ্রীরামপুরে আসিবার পর হইতে তাহাও একবারে বন্ধ করিয়া দিল। এখানে আসিয়া বিনুদা' বেশ এক বড় আড্ডার আড্ডাধারী হইয়া উঠিল। আমি কিন্তু বাড়ী হইতে বড় একটা বাহিরই হইতাম না। পড়াশুনা করিয়া যেটুকু সময় থাকিত, সেটুকু ছোটদার বৈঠকখানাতেই আমার বেশ কাটিত।

ছোটদার ছোট্ট বৈঠকখানাটিও একটি ছোটখাট আড্ডা ছিল, তবে তাহা সাহিত্যিকের আড্ডা, যেহেতু, ছোটদা নিজে এক জন সাহিত্যিক ছিল। তখনকার অনেক কাগজেই ছোটদার লেখা কবিতা ও গল্প বাহির হইত।

ছোটদার সাহিত্যের আসরে থাকিতে থাকিতে, তাহাদের সাহিত্যের আলোচনা শুনিতে শুনিতে আমিও যে একটি ক্ষুদে-সাহিত্যিক হইয়া পড়িলাম, তাহা বলিলে নেহাৎ মিথ্যা বলা হয় না। যেহেতু, ছোটদার কাছে যতগুলি ছোট বড় পত্রিকা আসিত, তাহার সবগুলাই আমি আদ্যোপান্ত গিলিতাম। এ বিষয়ে স্বয়ং ছোটদারও নিকট হইতে খুব উৎসাহ পাইতাম। ছোটদা' বলিত,—"এখন থেকে একটু-আধটু লেখবার চেষ্টা কর্‌। সাহিত্যিকের আসন যেখানে, সেখানে এম, এ—বি, এ ও নাগাল পায় না। রাজা-জমীদারও তার কাছে পৌঁছুতে পারে না।"

আমার মনে পড়ে, ছয় মাস শ্রীরামপুর মডেল স্কুলে পড়িবার পর বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন বিনুদা' ও আমি দুই জনেই পরিপাটীরূপে ফেল্‌ হইয়া আর এক বছরের জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে থাকিবার 'এগ্রিমেণ্ট' করিলাম, সেই সময় স্কুলের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া লেখার সম্বন্ধে একটু বেশী উৎসাহিত হইয়া পড়িলাম এবং সেই উৎসাহের জোরে, বোধ হয়, দিন তিনেকের ভিতরই একটি ছোট গল্প ও 'প্রাণের ব্যথা' নামে একটি বড় কবিতা লিখিয়া 'অপ্রকাশ' কাগজে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—ডাকঘরের গোলযোগে তাহা পৌঁছায় নাই, পৌঁছাইলে তাহা 'অপ্রকাশে' প্রকাশ না হইয়া যাইত না।

প্রকাশ না হইলেও, গল্পের 'ফাইল' আর কবিতার খাতা আমার দিনদিনই বেশ ভারী হইয়াই উঠিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন এক মহা অশুভক্ষণে আমার সাহিত্য-সাধনা আরম্ভেই শেষ হইয়া গেল।

স্কুল সে দিন কিসের জন্য বন্ধ ছিল। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটদার বৈঠকখানায় টেবলের ধারে বসিয়া, দরজার দিকে পিঠ করিয়া, 'শেষ সাধ' নামে একটি কবিতা লিখিতেছিলাম। আমার সকল কবিতার মধ্যে এইটাই সব চেয়ে উৎরাইয়া গেল। কবিতাটি এতই চমৎকার হইয়া পড়িল যে, নিজের মনে বারবার তাহা পড়িয়া আমি নিজেই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সমস্তটা লেখা হইলে পর, গোড়া হইতে কবিতাটি আর একবার পড়িলাম :—

শেষ সাধ।

প্রাণপাখী যবে মোর—হে আমার প্রিয়া!
ছাড়িয়া এ সুবর্ণ-পিঞ্জর,
যা'বে উড়ে অসীম নীলিমা-মাঝে—মহা শূন্যপথে,
ফেলিও না অশ্রু ঝর্ ঝর্,
বদ্ধ রেখো অশ্রু-গঙ্গা বুকের ভিতর!

বিষাদ-কালিমা মাখি' কোন নর কোন নারী
সে সময় নাহি যেন আসে!
করুণ গীতের ধ্বনি—বিষাদের মর্ম্মন্তুদ বাণী
যেন নাহি কর্ণে মোর পশে!

তুমি শুধু দিও শিহরণ ঐ তব অঙ্গের পরশে!
হে অন্তরবাসিনী মোর, তুমি শুধু তুমি শুধু থেকো
মোর পাশে বসি একাকিনী।
কাণে কাণে কয়ো দুটি কথা—

চটাস্ চট্! হঠাৎ ধাঁ করিয়া আমার দুই কাণের উপর বিরাশী সিক্কার ওজনের এমন দুই প্রচণ্ড থাপ্পড় আসিয়া পড়িল যে, সমস্ত মাথাশুদ্ধ একবারে ঘুরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর সামনেকার সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়া চারিদিক্ গভীর অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্টই দেখিলাম, অন্তরের সমস্ত কবিতা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষা-ফুল আকারে অন্তর হইতে বাহির হইয়া সেই গাঢ় অন্ধকারে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। কাণে বোধ হয় তালা লাগিয়া গিয়াছিল, তাই জ্যেঠামহাশয়ের প্রথম কথা-গুলি কিছুই কাণের ভিতর প্রবেশ করে নাই; মিনিটখানেক পরে একটু যখন হুঁস্ হইল, তখন শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন,—"কালীঘাট থেকে এখানে পাঠালুম লেখাপড়া করতে, না, এগ্‌জামিনে ফেল্ হয়ে কবিতে লিখতে,—পাজী, শূওর, ষ্টিপুড্ গাধা! সেটা কোথায়? ডেকে আন্ তাকে শীগ্‌গির!" বলিয়া ঘাড়ে দুইটা রদ্দা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। আর কবিতার খাতাখানি লইয়া নির্দ্দয়-ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

বিষ খাইব কি শ্রীরামপুরের রেলের লাইনে মাথা দিয়া শুইব, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে বিনুদার সন্ধানে বাহির হইলাম।

বিনুদার আড্ডা ছিল অনুকূল মিত্তিরের 'জিমন্যাষ্টিকে'র আখড়ায়। সুতরাং সেই ঠিকানাতেই চলিলাম।

দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর দরজায় বিনুদা' এক জন ফেরীওয়ালার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কি আলাপ করিতেছে। শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটা বাগান, আর সেই বাগানটা পার হইলেই অনুকূল মিত্তিরের আখড়া। শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর পাশ দিয়াই ছিল আখড়ায় যাইবার পথ।

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিনুদা' ইঙ্গিতে আমায় আখ-ড়ায় যাইতে বলিল। ফেরীওয়ালা তখন তাহার মাথার হাঁড়ি দুইটি নামাইয়াছে; দেখিলাম, কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর সরপুরিয়া, বিনুদা' তাহার সহিত দর করিতে সুরু করিল। বুঝিলাম, বেচারার আজ কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং আর সেখানে না দাঁড়াইয়া এক পা এক পা করিয়া শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ী ঘুরিয়া, বাগান অতিক্রম করিয়া আখড়ায় আসিয়া পড়িলাম।

মিনিট দশেক পরেই বিনুদা' কৃষ্ণনগরওয়ালার সেই 'অরিজিন্যাল' হাঁড়ি দুইটি শুদ্ধই সমস্ত সরভাজা আর সর-পুরিয়া লইয়া হাজির। অনুকূল মিত্তির জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রে বিনু, ব্যাপার কি, চুং-ফাই না কি?"

কথার জবাব না দিয়া বিনুদা হাঁড়ি দুইটি তক্তাপোষের তলায় ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়া চাদরখানা টানিয়া দিল। অনুকূল মিত্তির জিজ্ঞাসা করিল,—"কি 'রকমটা হ'ল বল্ দেখি?"

"দেখলুম, লোকটা শ্রীরামপুরের নয়। বারো আনা ক'রে সের দর ঠিক হোল। তার পর, জানি যে, শ্যাম গোঁসাইও এখন ঘুমুচ্ছে আর বুড়ীও ঘুমুচ্ছে, সুরেশ ত দোকানে, সদর দরজাও খোলা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই সব অমনি ওজন করিয়ে ৩৵১৫ দাম ধার্য্য হ'ল। তার পর আর কি, সিন্-ফিন্-ক্র্যাং। বল্লুম, 'হাঁড়িশুদ্ধুই দাও, দামটা আর হাঁড়ি দুটো ফিরিয়ে এনে দিয়ে যাচ্ছি।' তার পর বরাবর বাড়ী ঢুকে, খিড়কী দিয়ে 'প'য়ে আকার!"

বিনুদার মুখের দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম,—"প'য়ে আকার ত দিলে, এ দিকে 'ক্ষ'য়ে একার যে এসে হাজির কালীঘাট থেকে; তোমায় ডাকচে, শীগ্‌গির চল।"

"সত্যি?" বলিয়া বিনুদা' আমার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল এবং তাহার পর প্যারী ঘোষের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া, কায়েতের ছেঁদায় আঙুল টিপিয়া, একান্তমনে তামাক টানিতে লাগিল।

কথাটা একটু অস্পষ্ট রহিয়া গেল, খুলিয়া বলা আবশ্যক।

আখড়ায় যাহারা যাহারা আসিত, কেহই তামাকের অপমান করিত না, কিন্তু হুঁকার ব্যবস্থা ছিল একটি। ঐ একটি হুঁকায়, অনুকূল মিস্তিরের অদ্ভুত বুদ্ধিবলে, ছেঁদা ছিল দুই দিকে দুইটি। একটি 'ক'-কারের, অপরটি 'ব'-কারের, অর্থাৎ ছোট ছেঁদাটি ছিল কায়স্থের এবং বড়টি ছিল ব্রাহ্মণের। কায়স্থ যখন খাইত, তখন ব্রাহ্মণকে টিপিয়া ধরিত, আর ব্রাহ্মণের বেলা, কায়স্থকে চাপিয়া ধরিয়া তবে খাইতে হইত। শূদ্রের বালাই আখড়ায় ছিল না, থাকিলেও নিশ্চয়ই আটকাইত না।

হুঁকায় দুই চারিটা টান দিয়া বিনুদা কহিল,—"কখন্ এসেচে র‍্যা, বাবা?" বলিয়া হুঁকাটি আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—"খা।"

"তামাক আমি খেয়েছি কখনো?"

"আমিও কি প্রথম যে দিন খেতে সুরু করি, তার আগে কোন দিন খেয়েছিলুম? নে—নে—পুড়ে যাচ্ছে!"

আমি বিনুদার হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া অনুকূল মিস্তিরের হাতে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিনুদা কহিল,— "সদর রাস্তা দিয়ে এখন যাওয়া চলবে না, বাজারের পথ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তুমি তাই যাও, আমি কিন্তু সরভাজাওয়ালার অবস্থা না দেখে যাব না।"

অনুকূল মিস্তিরের দিকে চাহিয়া বিনুদা' উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"ওগুলো থাকলো, সন্ধ্যার পর সিদ্ধি খেয়ে বেশ চলবে এখন।" বলিয়া বিনুদা চলিয়া গেল।

শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিলাম, পথে লোক জমিয়া গিয়াছে, আর শ্যাম গোঁসাই হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতেছে, –"আমার ছেলে এখন গিয়ে বাড়ীতেই নেই, আর তুই বেটা তবু বলবি যে, আমার ছেলে নিয়ে গেছে?"

"আরে মশাই, জলজ্যান্ত নিয়ে গেল, আর বলব না?"

"তবু বলবি, নিয়ে গেল? আরে সে এ সময় বাড়ীতেই থাকে না। সে রইল এখন দোকানে—আর সে কি না তোর——"

"আচ্ছা, আপনার ছেলের গায়ের রং কি রকম বলুন ত বাবু।"

"গায়ের রং? গায়ের রং ত ফর্সা।"

"আর বয়েস?"

"আরে, এ ব্যাটা কোথাকার রে? হাজারবার বলছি যে, আমার ছেলে কিছুতেই নয়, তবু তুই বেটা—"

"আচ্ছা, বয়স কত বলুনই না ঠাকুর।"

"এ ত মহা অধম্মের ভোগে পড়লুম দেখছি! আরে, বয়স তার আর কতই হবে, বছর কুড়ি কি বছর একুশ।"

"ঠিকই হয়েছে ঠাকুর মশাই। গরীবকে আর মারবেন না। হাঁড়ি দুটো আর দামটা দিয়ে দিন দয়া ক'রে। দাম হয়েচে ৩৵১৫। এগারটা পয়সা না হয় বাদ দিয়ে ঐ পুরো তিনটে টাকাই দিন। অনেক দূর থেকে ছিরামপুর আজ এসেছি কর্ত্তা, গরীবকে মারবেন না, দোহাই আপনার।"

পাছে হাসি আর আটকাইয়া রাখিতে না পারি, সে জন্য আর দাঁড়াইলাম না, এক পা এক পা করিয়া—চলিয়া আসিলাম। বাজারের মোড়ের কাছে আসিয়া দেখি, বিনুদা' আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

বাড়ী ঢুকিতেই ছোটদা কহিল,—"আজ ভারি বেঁচে গেলি বিনু। বড়কাকা যে রকম তোর ওপর আজ রেগে এসেছিলেন।"

"বাবা কোথায় ছোটদা?"

"এই চ'লে গেলেন। কি কায আছে, তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না" বলিয়া ছোটদা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। বিন্নুদা কহিল,—"আয়, আখড়ায় যাই, সেগুলো সব খেতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তোমরা খাও গে, ও পাপের জিনিষ আমি খাব না, আর তা' ছাড়া আমি এখন পড়বো।"

"আরে, পড়া ত চিরকালই রয়েছে, সে ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না! খেয়ে দেয়ে এসে যত পারিস পড়লেই ত হবে।"

"না, ভাই, অনেক পড়া আছে, আমি যাব না।"

"তুই দেখছি একেবারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর না হয়ে আর ছাড়বি না" বলিয়া বিন্নুদা' বাড়ী না ঢুকিয়াই আবার আখড়ার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ

একলাটি ছোট্‌দার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। মনটা আমার যে খুবই খারাপ ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহই ছিল না। কাণের উপর জ্যেঠামহাশয়ের থাপ্পড়ের ব্যথা অবশ্য তখন আর ছিল না, কিন্তু কবিতার খাতাখানির দুর্দশা, সে ত আর ভুলিবার নহে! ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, মনকে কত রকমে বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে লাগিলাম, কিন্তু কেবলই একটা খোঁচা আসিয়া অনবরত মনকে বিঁধিতে লাগিল।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, বাড়ীর ভিতর হইতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল, আমার মনের মধ্যেও যেন সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। আমার আর উঠিতেও ইচ্ছা হইল না, কোথাও যাইতেও ভাল লাগিল না। উঠিয়া আলোটা পর্য্যন্ত জ্বালিতেও পারিলাম না।

ছোট্‌দা বেড়াইয়া ফিরিল। বৈঠকখানায় পা দিয়াই কহিল,—"কি রে পঞ্চু, খাতাখানার জন্যে খুব কষ্ট হয়েছে, না? কি আর করবি বল্! সাহিত্য-কাননে ঢুকতে হ'লে অনেক কাঁটাই পায়ে বেঁধে, অনেক রকমের অনেক জ্বালাই সইতে হয়। তবুও ত সত্যিকারের লেখা এখনো লিখ্‌তে শিখিস্ নি,—নে, উঠে আলোটা জ্বাল্।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, গল্প-কবিতা এখন আর নয়, অন্ততঃ বছর দুই পরে যা হয় দেখা যাইবে। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখাই ভাল যে, দুই বৎসর পরে ত নয়-ই, জীবন-পথের শেষের দিকে আসিয়া আজ দাঁড়াইলেও, এ রোগ এ পর্য্যন্ত আমাতে আর পুনরাক্রমিত হয় নাই। ব্যাধির সুরুতেই ব্যাধির শেষ হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া খানিক পরে পড়িবার জন্য বই লইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, সদর খুলিয়া বিন্নুদা' হন্ হন্ করিয়া ছোট্‌দার বৈঠকখানার দিকেই আসিতেছে। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হয়েছে বিন্নুদা, —অমন ক'রে আসছ কেন?"

কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিন্নুদা' কহিল,—"অনুকূল মিত্তিরের বাপ হয়ে গেল, ছোট্‌দা! আমাকে শ্মশানে যেতে হবে, তাই বলতে এলুম। বৌদিদের ব'লে দিস্ পঞ্চু, আমি খাবও না আর বাড়ীও রাত্রে আসব না" বলিয়াই বিন্নুদা' যেমন আসিয়াছিল—তেমনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বিন্নুদা' চলিয়া যাইবার মিনিট দশ বারো পরে পাড়ার গোবিন্দ কবিরাজ উগ্রমূর্ত্তি হইয়া আসিয়া ছোটদার কাছে নালিশ করিল,—"তোমার বিন্নুর কাণ্ডটা একবার দেখলে সুরেন! আমি হ'লুম জাত্-কোব্‌রেজ, 'সূচিকা-ভরণ' কোথায় দিতে হয় না হয়, সে আমি বুঝবো, তুই আমার ওপর তম্বি চালিয়ে কায করাবি? আর তাই করিনি ব'লে ঘুসি পাকিয়ে মারতে এলি? একবার কর্ত্তার কাছে ব'লে যাই বিনের গুণাগুণটা! কর্ত্তা কোথায়, সুরেন?"

"বিনে ঘুসি তুলে আপনাকে মারতে এল, কোব্‌রেজ মশাই?"

"তবে আর বলছি কি ছাই! জগবন্ধু মিত্তিরের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন কি আর কোন ওষুধ-পত্তর খাটে। আর তোমার বিনে বলে কি না—সূচিকাভরণ দাও। আমি বললুম—তোরা আজকের ছোঁড়া, তোর কথা শুনে আমায় কায করতে হবে? রামরুদ্র গুপ্ত মড়াকে বড়ি খাওয়ালে মড়া উঠে বসতো, তার পৌত্র আমি,—আমি তোর কথা শুনে কায করব, তুই হলি একটা কচি ছেলে! সূচিকা-ভরণ কোথায় কায করবে? না—

'সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ'॥"

ছোট্‌দা কহিল,—"তা, এর জন্যে বিনে আপনাকে ঘুসি মারতে গেল, কোবরেজ মশাই ?"

চক্ষু কপালে তুলিয়া অপরূপ মুখভঙ্গীর সহিত গোবিন্দ কবিরাজ কহিল,—"মারতে গেল কি, সুরেন ?—আর একটু হ'লে ত মেরেই বসেছিল! আর ওর হাতের এক ঘুসি খেলে আমার নাক-মুখের হাড় কি আর—" তার পর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া কহিল,—"ঐই সে দিন 'জীবন-নাস্তিক' খেলতে খেলতে হাত ভেঙ্গে যে এলি, পনর দিন ধ'রে পুরো এক বোতল মাষ-তেল মালিস ক'রে আমিই সে ভাঙ্গা হাত দিলুম ভাল ক'রে—ধরতে গেলে ও ত আমারি দেওয়া হাত! আর আমারই সেই হাতে ঘুসি পাকিয়ে আজ কি না তুই আমাকেই মারতে এলি! এ কি কম দুঃখের কথা, সুরেন!"

যাহা হউক, গোবিন্দ কবিরাজের দুঃখের কথা শুনিবার অভ্যাস আমার খুবই ছিল, সুতরাং বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিবার অপেক্ষা অনুকূল মিত্তিরের বাবাকে একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল এবং ছোটদার অনুমতি লইয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথেই 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম যে, শব শ্মশানের পথেই লইয়া যাওয়া হইতেছে। বাড়ী না ফিরিয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্তই আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীরামপুরের এক প্রান্তে গঙ্গার ঠিক উপরেই শ্মশান। তখন গঙ্গায় পরিপূর্ণ জোয়ার, কানায় কানায় জল টল্ টল্ করিতেছিল। শিরীষ-গাছের আড়ালে শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় গঙ্গার একূল-ওকূল, জল-স্থল, শ্মশান ও শ্মশানের চারিদিক্ তখন একবারে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এক ধারে একটা চুলী হইতে কাহাদের একটা শ (শব) বোধ হয় অনেকক্ষণ হইতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তখন নিভিয়া আসিতেছিল। যাহাদের শ (শব), তাহারা শিরীষ-গাছের তলায় বসিয়া মদ খাইতে খাইতে কি লইয়া বিষম বকাবকি সুরু করিয়া দিয়াছিল।

সকলের দিকে পিছন করিয়া একটু দূরে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের নিম্নশ্রেণীর যুবতী চুলীর উপর কাঠ সাজাইয়া ছোট্ট একটি ছেলেকে শোয়াইয়া অগ্নি জ্বালিবার আয়োজন করিতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গী আর কেহই ছিল না, চারি পাঁচ বছরের সেই ছোট্ট ছেলেটিকে বোধ হয় সে একলাই বুকে করিয়া শ্মশানে আনিয়াছিল। বিনুদা' এক পা এক পা করিয়া তাহার কাছে গিয়া তাহার সঙ্গে কি দুই চারিটা কথা কহিল ও একখানি কাঠের চেলা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"পঞ্চু রে, ওদের ওই চুলী থেকে এই কাঠখানা ভাল ক'রে জ্বালিয়ে আনতে পারিস ? আহা, একলা মেয়েমানুষ, কিছুতেই চুলী জ্বালাতে পারলে না!" কাঠখানা হাতে লইয়া কহিলাম,—"অন্য চুলীর আগুন নিয়ে ত ধরাতে নেই। ছেলেটি ওর কে, বিনুদা' ?"

"ওরই ছেলে।"

"ওরই ছেলে! মা তার ছেলেকে নিজের হাতে পোড়াতে এনেছে!" হাতের কাঠ আমার হাতেই রহিল, আর দেহটা আমার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ হইয়া গেল!

"হ্যাঁ রে ভাই, ওরই ছেলে; মা'র অনুগ্রহ হয়েছিল, কেউ ছোঁয় নি; আহা!"

মুহূর্ত্ত পরে আমার কাঠের দেহে যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, যে স্থানে ইহার বাড়ী— সেখানে কি মানুষ নাই, সেখানের সকলেই কি পিশাচ ? আর তাহারা মানুষই যদি হয়, ত, তাহাদের মাথায় পড়বার জন্য আকাশে কি বিধাতার বাজ নাই ? বিনুদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা হয়ে কি ক'রে ও ছেলের মুখে—"

"আগুন দেবে বল্‌ছিস্ ? কি আর করবে বল্ ? মা হয়ে বুকে জড়িয়ে শ্মশানে ত ওকেই আনতে হয়েছে, চিতে সাজিয়ে তা'র ওপর শোয়াতেও হয়েছে, এখন যে কাযটুকু বাকী—সে আর কতটুকু ? একবার একটু আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে, ওই একরত্তি ছেলেটা পুড়ে ছাই হ'তে কতক্ষণই বা আর লাগবে!" বলিয়া বিনুদা' কাঠখানি আমার হাত হইতে লইয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল; আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। স্ত্রীলোকটিকে কহিলাম,—"তুমি বাড়ী যাও, যা করবার, আমরা করছি।"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"আমি যাব না।"

"তবে ঐ গঙ্গার কিনারায় ব'সে ব'সে গঙ্গা দেখ গে; এখান থেকে উঠে যাও, এ তোমায় দেখতে নেই।"

"এদ্দিন দেখে এখন দেখ্‌তে নেই ? এখনই ত দেখবো বাবু! কেমন ক'রে আগুন দিতে হয়, আপনারা আমায় ব'লে দাও না, বাবু!"

এ যেন কে কাহাকে পোড়াইতে আনিয়াছে এক বিন্দু অশ্রুও চোখ দিয়া গড়াইল না ; কখনও যে গড়াইয়াছিল, তাহারও কোন চিহ্ন নাই। বড় বড় শুষ্ক চক্ষু দুইটির স্থির চাহনি, অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে ত মুখে আগুন দিতে আছে ? বল না গো বাবু, আমি যে কিছু জানি না ;—বাবু গো !"

আমি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া সম্মুখস্থ গঙ্গার কিনারার দিকে টানিয়া লইয়া গেলাম ও সেইখানে একটা উঁচু ঢিবিতে ঘাসের উপর বসাইয়া দিয়া কহিলাম,—"নেহাৎই যদি ঘরে না যাও ত এইখানে তুমি ব'সে থাক।" তাহার পর চুলীর কাছে ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রজ্বলিত খড়ের আঁটি হাতে লইয়া, মন্ত্রের বদলে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমিই বালকটির মুখে আগুন দিয়া চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলাম। আমার হাতের অগ্নি পাইয়া, কোন্ পূর্ব্বজন্মের আমার সেই পরমাত্মীয়ের ক্ষুদ্র চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া উঁচু ঢিবির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি সেখানে নাই ; আমারই পিছনে দশ বারো হাত মাত্র দূরে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, যেন জ্বলন্ত চিতানলের সমস্ত শিখা তাহার চোখ দিয়া গিয়া তাহার বুকের মধ্যে সব জমা হইতেছে।

কতক্ষণই বা লাগিল ! ঘণ্টা দুইয়ের ভিতরেই সব শেষ ! ও-ধারে তখন অনুকূল মিত্তিরের বাপের চিতা সবে মাত্র ধরিয়া উঠিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এইবার কি করবে ?" উত্তরে সে ঐ প্রশ্নই আমাকে করিল,—"কি করবো ?"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"পলাশতলা।"

শ্রীরামপুর সহরের একটু দূরে গঙ্গার ধারে এক স্থানে কয়েক ঘর কৈবর্ত্তের বাস ছিল, সেই স্থানটাকে পলাশতলা কহিত। কহিলাম,—"রাত বেশী হয় নি, চল, তোমায় তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।" উত্তরে কোন কথাই সে কহিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, —"ঘরে যাবে না ?"

"না।"

"এইখানে থাকবে ?"

"এখানে ? না, এখানে আর থাকতে পারব না। কোথায় আমি যাব, বাবু ?" শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

কি বলিয়া আর ইহাকে সান্ত্বনা দিব ? দেবতার এই বিরাট প্রবঞ্চনার পর, তাহার জননী-হৃদয় কিছুতেই যে আর প্রবোধ মানিবে না, তাহা বুঝিবার মত বয়স আমার হইয়াছিল, তাই সে দিকে চেষ্টা না করিয়া কহিলাম,—"তবে, তুমি আমার সঙ্গে এস, দুজনে স্নান ক'রে চল আমাদেরই বাড়ী যাই।" সহসা সে একবার ফোঁপাইয়া উঠিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল। তার পর, নির্ব্বাপিত চুলীটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আমার পশ্চাদনুসরণ করিল। চন্দ্র তখন শিরীষ-গাছের অন্তরাল ছাড়িয়া মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল ; গঙ্গার জলে অল্প অল্প ভাটার টান্ সুরু হইয়াছিল। অনেক দূরে, গঙ্গাবক্ষে জেলেরা ভাটায় মাছ ধরিতেছিল। তাহাদেরই একখানি জেলে-ডিঙ্গী হইতে কেহ তখন গান ধরিল—

"হৃদয় ছিঁড়ে অক্ত-কমল
দিলেম আমি কালীর পূজায়,
তবুও যে গো সব্বোনাশী
(ও তার) অক্ত-আঁখি ঘুইরে বেড়ায়।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

১
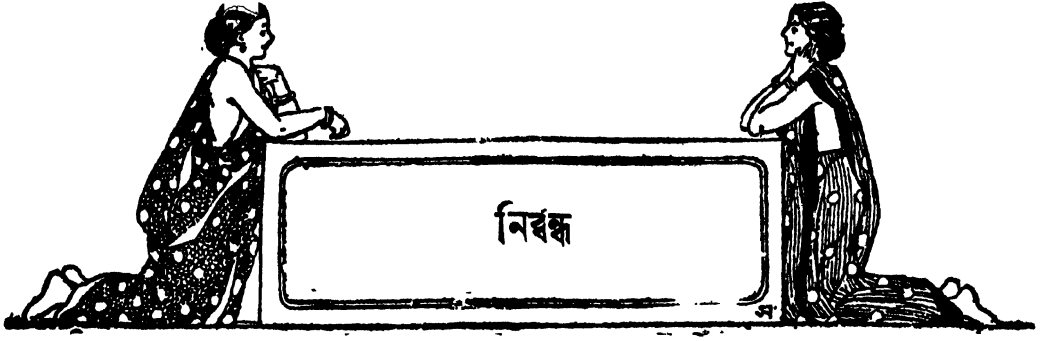
লাহোরের কেল্লা ও মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধির মধ্য দিয়া যে পথ সহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার এক পাশে একখানা পাল্কী। পাল্কীর দরজা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পাল্কী-বেহারারা মুসলমান, তাহারা পথের ধারে পাল্কী রাখিয়া নিকটস্থ বাদশাহী মসজিদে নমাজ পড়িতে গিয়াছে।

কেল্লার ভিতর হইতে এক জন গোরা বাহির হইয়া আসিয়া ছোট রাবী নদীর তীরের অভিমুখে যাইতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পথের ধারে একখানা পাল্কী, নিকটে লোকজন নাই। সে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পাল্কীর নিকটে গেল। পাল্কীর দরজা অল্প খোলা ছিল, গোরাকে আসিতে দেখিয়া, যে পাল্কীর ভিতর ছিল, সে ভিতর হইতে দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময় সহরের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিতেছিল। নবীন যুবা, দেখিতে সুপুরুষ, মাথায় পাগড়ী, গায় পাঞ্জাবী জামা, পরিধানে লুঙ্গী, পায় পাঞ্জাবী জুতা। আকৃতি খুব দীর্ঘ নহে, কিন্তু সর্বাঙ্গ সুগঠিত, বর্ণ গৌর। ধীরপদক্ষেপে আসিতেছিল, কিন্তু গোরাকে পাল্কীর নিকটে যাইতে দেখিয়া দ্রুতপদে সেই দিকে গেল।

পাল্কীর নিকটে উপস্থিত হইয়া গোরা দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল। যে পাল্কীতে ছিল, সে ভিতর হইতে দরজা চাপিয়া ধরিয়াছিল। গোরা বলপূর্ব্বক দরজা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। পাল্কীর ভিতর বুরকা দিয়া মুখ ঢাকা মহিলা। দরজা খুলিতেই সে ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

এমন সময় সেই যুবক আসিয়া গোরাকে ঠেলা দিয়া সরাইয়া দিল। রাগিয়া বলিল, উল্লু, হারামজাদা, স্ত্রীলোককে বেআবরু করিতেছিস্?

পাল্কীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। একবারে চাপিয়া নহে, মাঝে একটু ফাঁক রহিল।

গোরা দশাসই প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ জোয়ান, তাহার তুলনায় পাঞ্জাবী যুবা দেখিতে কিছুই নহে। গোরা বিস্মিত হইয়া একবার যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পরেই ব্লাডি সোয়াইন বলিয়া মারিল এক ঘুষি। ঘুষি মারিল যুবকের চোয়াল লক্ষ্য করিয়া। ঘুষি-বিস্তায় ইহার নাম নক্ আউট্ ব্লো, লাগিলে যুবক অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত।

ঘুষিটা লাগিল খুব জোরে বাতাসে আর সেই সঙ্গে গোরা চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। গোরা ঘুষি তুলিতেই মল্ল-বিস্তাকুশলী যুবক চকিতের মধ্যে তাহার পিছনে গিয়া তাহাকে তুলিয়া আছাড় দিল।

পাল্কীর ভিতর হইতে অতি মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। গোরা মাটী হইতে উঠিবার সময় সে হাসি শুনিতে পাইল, যুবক মৃদু হাসিয়া একবার পাল্কীর দিকে চাহিল। দরজার ফাঁক দিয়া কৌতুকপূর্ণ বড় বড় কালো চক্ষু দেখা যাইতেছিল।

ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ত গোরার রাগ হইয়াই ছিল, তাহার উপর রমণীর হাসি শুনিয়া সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যুবককে আবার আক্রমণ করিল। যুবক সতর্ক ছিল, গোরার পাশ কাটাইয়া, পাশ হইতে তাহার বাহু পিঠের দিকে মুচড়াইয়া, তাহার পায়ের ভিতর পা দিয়া আবার সজোরে তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। এবার গোরার হাতে ও পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল।

পাল্কী-বেহারারা নমাজ পড়িয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। পাল্কীর নিকটে গোরা ও পাঞ্জাবী যুবককে দেখিয়া তাহারা

ছুটিয়া আসিল। গোরা যুবককে তৃতীয়বার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল না, গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

বেহারাদের সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ লোক ছিল, বোধ হয় পুরাতন ভৃত্য। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছিল?

যুবক হাস্যমুখে বলিল, গোরা পাল্কীর দরজা খুলিতেছিল, আমি তাহাকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি।

পাল্কীর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ভিতর হইতে রমণী অতি মৃদুস্বরে বৃদ্ধকে ডাকিল, সে পাল্কীর পাশে গিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কি বলিতেছেন?

পূর্ব্বের মত মৃদুস্বরে পাল্কীর ভিতর হইতে রমণী কয়েকটা কথা বলিল, শুনিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া আসিয়া যুবককে কহিল, আপনি বিবির আবরুরক্ষা করিয়াছেন, এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। আপনি কি পাহালওয়ান?

যুবা হাসিয়া উঠিল, বলিল, না, আমি পাহালওয়ান নই, রাঁঝা পাহালওয়ানের কাছে অল্প-স্বল্প কুস্তি শিখিয়াছি। আমার এরূপ বেশ দেখিয়া তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি আখড়া হইতে আসিতেছি।

—রাঁঝা খুব বড় পাহালওয়ান, তাহার শাগরেদ হইয়া আপনি যে গোরাকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাতে বিচিত্র কি? আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কোন দোষ আছে?

—কিছু না। আমি নবীউল্লা খাঁর পুত্র।

বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, কহিল, আপনি খাঁ সাহেবের শাহজাদা? আপনাদের বংশ কে না জানে? আপনাদের সমান পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত খানদান কয়টা আছে?

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার সোয়ারি? তোমরা কোথায় যাইবে?

—আমরা বিদেশী, রাবীর ধারে বারাদরীর কাছে রংমহল ভাড়া করিয়া আছি।

—সে বাড়ী আমি দেখিয়াছি, সে ত অট্টালিকা।

পাল্কী হইতে আবার অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বৃদ্ধের ডাক পড়িল। সে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যদি কোন সময় বেড়াইতে বেড়াইতে ওদিকে যান, তাহা হইলে একবার আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

যুবক বলিল, সে ত বড় খুসীর কথা!

বেহারারা পাল্কী উঠাইল, বৃদ্ধ পাল্কীর আগে আগে চলিল, যুবক এক পাশে রহিল।

পাল্কীর দরজা অল্প খুলিল, মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া রমণী যুবকের দিকে চাহিল।

কোমল, সলজ্জ দৃষ্টি, ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের ন্যায় হাসি। যুবক মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিল, রমণীও গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করিল।

পাল্কী চলিয়া গেল। যুবা পথে দাঁড়াইয়া রহিল।

২

রাঁঝা পাহালওয়ানের সমকক্ষ কোন কুস্তিগীর ছিল না। বড় বড় সব পাহালওয়ান তাহার সঙ্গে কুস্তি করিয়া হারিয়া গিয়াছিল। রাঁঝার বয়স ৪৫ বৎসর হইবে, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ, পাহালওয়ানদের মত পেটমোটা স্থূলশরীর নহে, সুডৌল, নধর গঠন, অঙ্গের কোন স্থান কঠিন কিংবা কর্কশ দেখাইত না। কাপড়-চোপড় পরিয়া থাকিলে সাধারণ লোকের মত দেখাইত, অদ্বিতীয় বলবান্ মল্ল বলিয়া কাহারও মনে হইত না। সকল বিষয়ে তাহার সংযম ছিল, অতিরিক্ত আহার বা অন্য কোন দোষ ছিল না। কথাবার্ত্তায়, লোকের সঙ্গে ব্যবহারে বিনয়ী, নম্র, শান্ত। এই গুণে দেশ-বিদেশে তাহার যশ প্রথিত হইয়াছিল। কাছকোপীন আঁটিয়া যখন মল্লভূমিতে নামিত, সে সময় আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিত। চক্ষুতে সমরোল্লাসের জ্যোতি, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মসৃণ গৌরবর্ণ দেহ, অর্গলতুল্য বাহুযুগলে মাংসপেশী তরঙ্গায়িত হইত। রণদর্পে সিংহবিক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে আক্রমণ করিত।

রাঁঝার শিষ্যসংখ্যা বিস্তর, তাহাদের মধ্যে নবীউল্লা খাঁর পুত্র দাউদ তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। রাঁঝা তাহাকে বলিত, তুমি আমীর-বংশের সন্তান, পাহালওয়ানী করিতে পাইবে না। তোমাকে আমি যে রকম শিখাইয়াছি, তাহাতে বড় পাহালওয়ান হইতে পারিতে। আখড়ায় তোমার সমান আর কোন শাগরেদ নাই। তুমি হয় ত আর বেশী দিন এখানে আসিতে পারিবে না। কিন্তু ব্যায়ামের অভ্যাস ছাড়িও না, অল্প-স্বল্প কসরৎ সর্ব্বদা করিবে। ধনীদের মত অলস অথবা বিলাসী হইও না।

দাউদ বলিল, আপনার দোয়া থাকিলে আমার জীবন বৃথা যাইবে না। পাহালওয়ানী করিতে না পারি, পাহালওয়ানদের সহায়তা করিতে পারিব, বিলাসিতায় আমার কিছুমাত্র অভিরুচি নাই। আপনি শুধু আমার কুস্তির ওস্তাদ নন, আপনার কাছে আমি চরিত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছি।

—সেই আসল জিনিষ। গায়ের জোর বাঘ-সিংহেরও হয়। চরিত্রবলেই মানুষ মানুষ হয়।

দাউদ বাপের একমাত্র পুত্র-সন্তান, কাযেই বাড়ীতে সকলকার আদরে। কুস্তি শিক্ষা ধনি-সন্তানের উপযোগী নহে, কিন্তু দাউদের আগ্রহ দেখিয়া কেহ তাহাকে নিষেধ করিত না। তাহার পিতা রাঁঝাকে জানিতেন, দাউদ ষণ্ডা চোয়াড় যুবাদের সঙ্গে মিশিত না, তাহাও দেখিয়াছিলেন। দাউদ লেখাপড়াও ভাল করিত, হাফিজের দেওয়ান কণ্ঠস্থ, শাহনামা আগাগোড়া পড়িয়াছিল, নিজেও কখন কখন গজল লিখিত। তাহার নির্দ্দোষ স্বভাব বলিয়া তাহাকে শাসন করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

উক্ত ঘটনার পরদিবস দাউদ খাঁ যথাসময়ে রাঁঝার আখাড়ায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাঁঝা বলিল, তোমাকে কিছু বিমর্ষ দেখিতেছি, তোমার শরীর সুস্থ আছে ত?

দাউদ বলিল, আমি বেশ আছি, আমার কিছুই হয় নাই।

এই বলিয়া লেঙ্গট আঁটিয়া দাউদ আখড়ায় নামিল। প্রথমে অপর কয়েক জন শাগরেদের সঙ্গে কুস্তি করিয়া তাহাদিগকে হারাইল, তাহার পর রাঁঝা নিজে দাউদের সঙ্গে কুস্তি আরম্ভ করিল। দুই জনে প্রায় তুল্যবল, আখড়ার অপর লোকরা তাহাদের বল ও কৌশল উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কুস্তির পর গায়ের ধূলা উত্তমরূপে ঝাড়িয়া দুই জনে কাপড় পরিল। তখন রাঁঝা বলিল, চল, দাউদ, তোমার সঙ্গে একটু বেড়াইয়া আসি।

দাউদ কিছু বিস্মিত হইল; কেন না, সচরাচর রাঁঝা আখড়া হইতে বাড়ী যাইত, কোথাও ভ্রমণ করিতে যাইত না। পথে কিছু দূর গিয়া রাঁঝা বলিল, তোমার শরীর ভাল থাকিলেও তোমার মন ভাল নাই। তোমার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কুস্তির সময়ও তোমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়াছি। কি হইয়াছে?

রাঁঝার শিক্ষা ছিল যে, শিষ্য গুরুর নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। শাগরেদ ওস্তাদকে সকল কথা বলিবে, প্রয়োজনমত তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে। দাউদ সকল শিষ্যের অপেক্ষা রাঁঝার প্রিয়, রাঁঝাকে সে সমস্ত কথা বলিত। সে বুঝিয়াছিল, রাঁঝা কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, সে যথার্থই দাউদের হিত কামনা করে ও তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে লাভ আছে। দাউদ অকপটে ওস্তাদকে সকল কথা বলিল।

গোরার লাঞ্ছনার বিবরণ শুনিয়া রাঁঝা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, আমি দেখিতে পাইলাম না, ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে। ঘুষি আর কুস্তির লড়াই দেখিবার সামগ্রী। পাল্কীতে স্ত্রীলোকটি কে?

—তাহা আমি জানি না, চাকরের মুখে শুনিলাম, উহারা বিদেশী; অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছে।

—তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?

—পাল্কীর দরজা একটু খোলা ছিল, তাহাতে আমি দেখিয়াছি।

—রমণী তোমার বীরত্ব দেখিয়া তোমাকে দেখিতেছিল। সুন্দরী?

—হাঁ, সুন্দরী।

—তুমি তাহাদের বাড়ী যাইবে?

—যাইব ত বলিয়াছি, এখন ভাবিতেছি কি করিব।

—তাহাতে ক্ষতি কি? ভদ্র-ঘরের কন্যা হইলে দোষ কি? তবে মজনু আর লয়লার কাহিনী মনে আছে ত?

দাউদ কিছু লজ্জিত হইল, কহিল, সে নিজে বোধ হয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। আমার যাওয়া উচিত কি না, ঠিক করিতে পারিতেছি না।

রাঁঝা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে এ কথা বলিয়াছ?

—না, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিলাম।

—তুমি যুবা পুরুষ, এখন পর্য্যন্ত বিবাহ কর নাই। তোমার চরিত্র নির্ম্মল আমি জানি, ধনি-সন্তানের ন্যায় তুমি বিলাসপরায়ণ নও। যদি এই রমণী অবিবাহিতা, ভদ্রবংশজাতা হয়, তাহা হইলে উহার সহিত পরিচয় হইলে দোষের কিছু নাই। তাহার পর কি হইবে, সে পরের কথা।

সে দিন এই পর্য্যন্ত কথা রহিল। রাঁঝাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া দাউদ গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

ওস্তাদের কাছে দাউদ সকল কথা বলিয়াছিল কি? যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু মন খুলিয়া মনের কথা বলিতে পারিয়াছিল কি? সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার কি হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া বলিবে? ইতিপূর্ব্বে কখন তাহার এরূপ ত হয় নাই। যে সমাজে পর্দ্দা, অপরিচিত স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন, তাহাদের মধ্যে এরূপ ঘটনা বিরল। ঘটনা-চক্রেই রমণী দাউদের চক্ষুতে পড়িয়াছিল। গোয়া যদি পাল্কীর দরজা না খুলিত, তাহা হইলে দাউদ রমণীকে দেখিতেই পাইত না। এমন কি, যাইবার সময় সে মুখের আবরণ খুলিয়া দাউদকে না দেখিলে দাউদ তাহার মুখ দেখিতে পাইত না। রমণীর নয়নে কিছু কৌতূহল—কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। দাউদ সে সকল লক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সেই যে চকিতের মত একবারমাত্র দেখা, স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত তাহার মনে পড়িতেছিল। রমণী সুন্দরী, নব-যুবতী, কিন্তু তাহার মুখ দাউদ ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। মেঘের আড়াল হইতে বিদ্যুৎ যেমন একবার ক্ষণমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ দেখিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, শুধু সেই মুখখানি একবার তাহার দৃষ্টিপথে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই আবার অপসৃত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, আবছায়ার মত সেই মুখের প্রতিকৃতি তাহার স্মৃতিকে বিচলিত করিয়াছিল। রমণী একবার যে হাসিয়াছিল, তাহার সেই মধুর তরঙ্গিত কণ্ঠধ্বনি দাউদের প্রাণে মুরলীনিঃস্বনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। মনে মনে সেই মুখের চিত্র কল্পনা করিতে কিছু মনে পড়ে, কিছু পড়ে না। একবার সে মুখের ছবি মানস-চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার তখনই মিলাইয়া যায়। অতৃপ্তির আকুলতা কেমন করিয়া নিবারিত হইবে? শুধু আর একবার দেখা! একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলেই চক্ষুর পিপাসা মিটিবে, হৃদয়ের অশান্তি দূর হইবে, লালসার শান্তি হইবে। মনের এই আকাঙ্ক্ষা যে আত্মপ্রতারণা, দাউদের সে বিবেকশক্তি ছিল না। মোহের আবেশে অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

পরদিবস সায়ংকালে দাউদ আখড়ায় গেল না। উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রাবী নদী পার হইয়া রংমহলে উপনীত হইল। নূতন বৃহৎ বাড়ী, চারিধারে বাগান, শীতকালে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে, দেশী বিদেশী নানা জাতীয় ফুল, টবে নয়্যাস ফুল, বাড়ীর সম্মুখে ঘাসের উপর বাঁধান ফোয়ারা, গাছে হরিতাল ঘুঘু।

ফটক পার হইয়া বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাউদ ঘোড়া হইতে নামিল। সঙ্গে সহিস আসে নাই। দাউদ একটা গাছে ঘোড়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল, বলিল, আমি ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি ভিতরে যান।

হাতের চাবুক ভৃত্যকে দিয়া দাউদ সিঁড়ি উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পাল্কীর সঙ্গে যে লোককে দাউদ দেখিয়াছিল ও যাহার সহিত কিছু কথা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, সাহেব, আসুন আসুন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি কালই আসিবেন।

দাউদ কিছু সঙ্কোচের সহিত কহিল, কাল আসিতে পারি নাই। তোমরা ত এখানে কিছু দিন থাকিবে?

—হাঁ, জনাব। এ বাড়ী এক বৎসরের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে।

– এ যায়গাও খুব ভাল। নিকটেই দেখিবার মত জাহাঙ্গীর শাহের ও নূরজাহানের কবর আছে, নিরালা স্থান, এ দিকে লোকজনের অধিক ভীড় নাই।

—এ বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া ভাড়া করা হইয়াছে। সাহেবরা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

পুরাতন ভৃত্য, দাউদকে লইয়া গিয়া আর একটা ঘরে বসাইল। ঘরে উত্তম ফরাস পাতা, তাহার উপর বড় বড় তাকিয়া। দিব্য সাজান ঘর, দেয়ালে কাচের ফ্রেমে আঁটা সোনার অক্ষরে লেখা চারিদিকে কোরাণের বয়েৎ টাঙ্গানো রহিয়াছে।

দাউদ বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীর মালিক কোথায়?

ভৃত্য হাসিয়া কহিল, জনাবালি, মালিক ত কেহ নাই, মলকাকে আপনি সে দিন অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সঙ্গে কর্ম্মচারী আছে, সেই বিষয়-আশয় দেখে, হিসাব-পত্র রাখে, তাহাকে ডাকিয়া দিতেছি।

ভৃত্য চলিয়া গেল। দাউদ কিছু নিরাশ হইল। হয় ত তাহার মনে আশা ছিল যে, সেই ক্ষণদৃষ্টা সুন্দরীকে আবার দেখিতে পাইবে, হয় ত সে নিজে আসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে, কিংবা অন্তরাল হইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিবে। দাউদ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সেই ঘরে প্রবেশ করিবার কয়েকটি দরজা ছিল, দরজায় পর্দ্দা দেওয়া, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। একবার কি একটা পর্দ্দা ঈষৎ আন্দোলিত হইল, অলঙ্কারের মৃদু নিক্কণ শ্রুত হইল? না শুধ্ দাউদের কল্পনা, উৎকর্ণ শ্রবণের ভ্রম? দাউদ পর্দ্দার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এমন সময় কর্ম্মচারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

তাহার বয়স হইয়াছে, দাড়ী-গোঁফে পাক ধরিয়াছে, দোহারা শরীর, আকৃতি মধ্যবিধ, ঘরে প্রবেশ করিয়া, লম্বা সেলাম করিয়া কহিল, সলাম ওয়ালেকুম।

—ওয়ালেকুম সলাম।

—আপনার মেজাজ ভাল আছে?

— আপনাদের কৃপায় ভালই আছি।

—আপনার বীরত্বের কথা শুনিয়াছি। আপনার জন্য বিবি সাহেবের আবরু রক্ষা পাইয়াছিল।

—সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ইহা আমার সৌভাগ্য।

—আপনার বংশের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে। এখানে আমরা খাঁ সাহেবের নাম অনেক শুনিয়াছি। আপনার নাম শুনিবার সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

—আমার নাম দাউদ। আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার এই আমার প্রথম অবসর হইল।

—বিবি সাহেবের পূর্ব্ব-পুরুষরা ইরানবাসী। বড় খানদান, ওমরাহ শ্রেণী, বংশ পাঠান। বিবি সাহেবের প্রপিতামহের সহিত ইরানের শাহের বিবাদ হয়। সেই কারণে তিনি পারস্য দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া আসেন। ইঁহারা দক্ষিণ দেশে কোঙ্কনে বাস করেন। সঙ্গে অনেক অর্থ ও বিস্তর জহরাত আনিয়াছিলেন, তাহার কিছু বিক্রয় করিয়া অনেক জমী-জমা খরিদ করিয়া প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। বিবি সাহেবের পিতামহ নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সম্পত্তি আরও বাড়াইয়া যান। বিবি সাহেবের বাল্যকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, দুই বৎসর হইল পিতারও মৃত্যু হইয়াছে। এখন ইনি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। ইঁহার পিতৃব্য মক্কায় হজ্ করিতে গিয়া সেখানেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের পুরাতন কর্ম্মচারী, জমীদারী দেখাশুনার ভার আমার উপর।

দাউদ জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের এখানে আসিবার কারণ কি?

—সে বড় আপশোষের কথা। বিবি সাহেবের চাচা সাহেবের একমাত্র পুত্র-সন্তান। ইঁহার মাতা নাই। বয়সে বিবি সাহেবের অপেক্ষা তিন চার বৎসরের বড়, ইঁহারই সহিত বিবি সাহেবের বিবাহ স্থির ছিল, হঠাৎ ইনি উন্মাদ হইয়া যান। এখানে হাকিম নসিরুদ্দীন উন্মত্তের উত্তম চিকিৎসা করেন জানিতে পারিয়া নবাবজাদা ফিরোজ খাঁকে এখানে আনা হইয়াছে।

—তাহা হইলে বিবি সাহেব এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা? দাউদের মুখ দিয়া হঠাৎ এই প্রশ্ন বাহির হইল। এরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, সে কথা বিবেচনা করিবার অবকাশ রহিল না।

কর্ম্মচারী কহিল, কাযেই। একে এই দুশ্চিন্তা, তাহার উপর বিবি সাহেবের মাথার উপর কেহ নাই। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সমস্ত কাযকর্ম্ম নিজে দেখেন, দপ্তরে বসিয়া কাগজপত্র পড়েন, কিন্তু এখন সব ছাড়িয়া এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

—বিবি সাহেব ত পর্দ্দানশীন, তিনি দপ্তরে কেমন করিয়া বসেন?

কর্ম্মচারী হাসিল, বলিল, দক্ষিণদেশে পর্দ্দা নাই, ইঁহাদেরও গৃহে পর্দ্দার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে ইজার, পেশবাজ, বুরকা কিছুই নাই। বিবি সাহেব সাড়ী পরিয়া খোলা মোটরে বেড়াইতে যান। এখানে আসিয়া লোকনিন্দার আশঙ্কায় বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পর্দ্দায় রহিয়াছেন। পাছে আপনি তাঁহাকে প্রগল্‌ভা বিবেচনা করেন, এই কারণে তিনি এখন পর্য্যন্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; নহিলে তিনি নিজের মুখে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

দাউদ বাক্‌শূন্য। তাহার হৃদয় তাহার পঞ্জরাস্থিতে আঘাত করিতে লাগিল। মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টায় কিছু সামলাইয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল,

তিনি অকারণে আমাকে অপরাধী করিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার কৃপা এবং আমার পরম সৌভাগ্য।

এবার পর্দ্দার আড়ালে অলঙ্কার-শিঞ্জিতের শব্দ স্পষ্ট শুনা গেল। অল্পবয়স্কা দাসী রূপার পাত্রে ফল, মিষ্টান্ন, শরবত, পানের ডিবা আনিয়া দাউদের সম্মুখে রাখিল, কহিল, বিবি সাহেব আপনার জন্য এই সামান্য নাস্তা পাঠাইয়াছেন। তিনি আসিতেছেন।

৪

কর্ম্মচারী দাউদকে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেল। দাউদ সতৃষ্ণনয়নে যে দরজা দিয়া দাসী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দাসী হাস্যমুখে বলিল, আপনি কিছু খাইতেছেন না?

—এই যে খাইতেছি, বলিয়া দাউদ একটা আঙ্গুর তুলিয়া মুখে দিল।

এই সময় পর্দ্দা সরাইয়া রমণী ঘরে প্রবেশ করিল। দাউদ শশব্যস্তে উঠিয়া, মস্তক অবনত করিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। রমণী হাত তুলিয়া কহিল, তসলীম। আপনি উঠিলেন কেন? বসুন।

দাউদ বসিল। উঠিবার সময় একবার রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর চক্ষু নত করিয়া রহিল।

দাসী বাহির হইয়া যায় দেখিয়া রমণী কহিল, তুই এই-খানে থাক্।

দাউদকে কহিল, আপনি কিছু খান, তাহার পর কথা হইবে।

দাউদ কিছু ফল, মিঠাই ও সরবত খাইয়া, হাত ধুইয়া, হাত মুছিল।

রমণী কহিল, পাণ নিলেন না?

দাউদ একটা ছোট এলাচ তুলিয়া মুখে দিল, বলিল, আমি পাণ খাই না।

—পাহালওয়ানরা কি পান খায় না?

আর একবার নিমেষের জন্য নয়নে নয়নে মিলিল, দাউদ লজ্জিতভাবে কহিল, আমি পাহালওয়ানের শাগরেদ মাত্র, পাহালওয়ানের সম্মুখে কিছুই নই।

—গোরারও মনে কি তাহাই হইয়াছিল?

বীণাবিনিন্দিত কলকণ্ঠে রমণী হাসিয়া উঠিল। পাল্কীর ভিতর হইতে সেই হাসি দাউদের স্মরণ হইল। দুই জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সরলপ্রকৃতি বালক-বালিকার মত হাসিতে লাগিল।

রমণী কহিল, গোরা যখন পড়িয়া যায়, সেই সময়কার তাহার মুখের ভাব আমার কেবলই মনে পড়ে। মানুষ আকাশ হইতে পড়িলেও এত আশ্চর্য্যান্বিত হয় না। আপনাকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, এক ঘুষিতে আপনাকে গুঁড়া করিয়া দিবে।

—প্যাঁচের কাছে শুধু গায়ের জোর টিকে না।

—এ পর্য্যন্ত আপনার পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই! আমার নাম হনিফা।

—আমার নাম দাউদ, পাহালওয়ানি আমার পেশা নয়।

—আপনার বংশ-পরিচয় জানি। এরূপভাবে আপনার সহিত কথা কহিতেছি, আপনি নিশ্চিত আমাকে মুখরা মনে করিতেছেন।

দাউদ লজ্জায় অধোবদন হইল, কহিল, আপনি এমন কথা কেন বলিতেছেন? পর্দ্দার প্রথা ত সকল দেশে নাই।

—যে দেশে আমরা থাকি, সেখানে মোটেই নাই। কায কর্ম্ম উপলক্ষে আমাকে সকলের সঙ্গে কথা কহিতে হয়। স্ত্রীলোক হইলেই কি লুকাইয়া থাকিতে হইবে?

দাসী খাবারের পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল। হনিফা কহিল, এখনই ফিরিয়া আসিবি।

তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে দুই জনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। লজ্জা আসিয়া দুই জনের মুখ আঁটিয়া দিল। হনিফার চক্ষু অবনত, অঙ্গুলিতে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতেছিল। সেই অবসরে দাউদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার রূপরাশি দেখিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল। আবার যখন হনিফার চক্ষু উঠিল, তখন দাউদের দৃষ্টি আর এক দিকে, হনিফা তাহার মুখের অনিন্দ্য শ্রী, তাহার বক্ষের বিশালতা দেখিল। এইরূপে কয়েকবার চক্ষুর লুকাচুরী খেলা হইল, তাহার পর চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লৌহ টানে, সেইরূপ চক্ষুর প্রতি চক্ষু আকৃষ্ট হইল, মিলিল, স্থির হইল। চোখে চোখে কি যে কথা হইল, তাহা তাহারাই জানে, কিন্তু মুখে যে কথা বলিতে দিন ফুরাইয়া যায়, পলকের মধ্যে তাহা

হইয়া গেল। হনিফার গণ্ডস্থল হইতে কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, দাউদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপে গেল, দুই জনের কেহই দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, দুই জনের কাহারও মুখ ফুটিল না।

দাসী ফিরিয়া আসিল, উভয়ের দৃষ্টির টানা তার ছিঁড়িয়া গেল। দাউদ বলিল, আপনার উজীর সাহেব, আপনার ভাইয়ের পীড়ার কথা বলিতেছিলেন।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি। ফিরোজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কেমন, এখন ত একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

—হাকিম নসিরুদ্দীন দেখিয়াছেন?

—হাকিম সাহেব একবার আসিয়াছিলেন, আবার আসিবার কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন, দুই চার বার না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার কথার আভাসে বোধ হয়, আরোগ্য হইবার আশা নাই। তাঁহার অনুমান, বাল্যকাল হইতেই মস্তিষ্কের দোষ ছিল, এখন রোগে দাঁড়াইয়াছে।

—কিছু ঔষধ দিয়াছেন?

—দিয়াছেন। আগে একেবারেই নিদ্রা হইত না, ওষুধ খাইয়া নিদ্রা হইতেছে। তবে হাকিম সাহেবের একটা কথায় আমরা কিছু ভয় পাইয়াছি।

—কি?

—তিনি বলিয়াছেন, রোগের লক্ষণে তাঁহার বিবেচনা হয়, দৌরাত্ম্য বাড়িবে; সে জন্য অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে। দুই জন লোক আমরা সঙ্গে আনিয়াছি, তাহারাই ফিরোজকে সর্ব্বদা দেখে।

—দৌরাত্ম্যের লক্ষণ কিছু দেখা গিয়াছে?

—মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মারিতে যায়, এক দিন লাঠি দিয়া একটা রক্ষকের মাথায় মারিতে গিয়াছিল, দুই জনে মিলিয়া অনেক কষ্টে লাঠি কাড়িয়া লয়। উন্মত্তের বল জানেন ত?

—তাহা হইলে ত বাড়ীর সকলকেই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়?

—কতক কতক বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সর্ব্বদাই লোক থাকে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা দরজা খুলিয়া গিয়া এক জন যুবক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক দেখিতে সুপুরুষ হইলেও, কিন্তু তাহার কেশ বেশ অসংযত, ঘূর্ণিত শূন্য দৃষ্টি, রক্ত চক্ষু, মুখের বিকৃত ভঙ্গী ও হস্ত-পদের আক্ষেপে তাহাকে বিকট-মূর্ত্তি দেখাইতেছে। দাউদ দেখিয়াই বুঝিল, এ ব্যক্তি আর কেহ নহে, উন্মাদগ্রস্ত ফিরোজ।

যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাত দোলাইয়া হনিফার দিকে চাহিয়া বার বার বলিতে লাগিল, মস্তানা দিওয়ানা হুঁ ময়, ইস্‌ক কা মারা হুঁ ময়! ময় মস্ত পরেশান গিরফ্‌তার হুঁ!

হনিফা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসীর দিকে ফিরিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল, রক্ষকরা কোথায়?

দাসী পর্দ্দা তুলিয়া, মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, আবদুল্লা! আলিজান!

যুবক অগ্রসর হইয়া হনিফার সম্মুখে আসিল। হনিফা ভীত হইয়া পিছাইয়া দাউদের নিকট গেল।

দাউদও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফিরোজ হাত বাড়াইয়া হনিফার বস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সে হনিফা ও ফিরোজের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

অকস্মাৎ পাগলের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দাউদকে দেখিয়া বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিল, দুশমন, মেরা দুশমন! তাহার পরেই লম্ফ দিয়া দাউদের গলা টিপিয়া ধরিল।

হনিফা ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়াছিল, দাসী রক্ষকদের নাম করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

কুস্তির প্যাঁচ না জানিলে দাউদ বিপদে পড়িত। উন্মত্তের একে কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাহার উপর উন্মত্ততার অসীম বল। দাউদ একটা ঝটকা দিয়া নিজের গলা ছাড়াইয়া লইল, তাহার পর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ফিরোজের স্কন্ধ ধারণ করিয়া ঘুরাইয়া পিছন হইতে তাহার দুই হাত মুচড়াইয়া ধরিল। ফিরোজ ঘাড় ফিরাইয়া দাউদকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, লাথি পিছন দিকে মারিতে লাগিল, কিন্তু হাত ছাড়াইতে পারিল না। দাউদ তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া চাপিয়া তাহাকে বেকায়দায় ফেলিল।

রক্ষক দুই জন ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিয়াই ফিরোজকে দুই জনে দুই দিক্ হইতে ধরিল। দাউদ

তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ফিরোজ কেবল চীৎকার করিতে ছিল, দুশমনকো মারুঙ্গা, দুশমনকো মারুঙ্গা!

আর কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া হনিফা যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া রক্ষকদ্বয়কে বলিল, তোমরা নিজের কাযে এমন গাফিল হইলে চলিবে না।

এক জন বলিল, সাহেবা, নবাবজাদা নিজের ঘরে বসিয়াছিলেন, আমরা দরজার কাছে ছিলাম। ভিতর দিক্‌কার দরজা খুলিয়া কখন চলিয়া আসিয়াছেন, আমরা কিছু জানিতে পারি নাই।

—এখন হইতে তোমরা ঘরের ভিতর থাকিবে।

—যো হুকুম।

হনিফা বলিল, ফিরোজ!

পাগলের আবার অন্য ভাব হইল, হাত দিয়া চক্ষুর সম্মুখ হইতে কি যেন সরাইয়া দিয়া কহিল, কেন?

এখন বেশ শান্ত ভাব, বলপ্রকাশের কোন চেষ্টা নাই। হনিফা কহিল, তুমি গিয়া শান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে মোটরে করিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দিব।

—আচ্ছা, বলিয়া ফিরোজ রক্ষকদের সঙ্গে চলিয়া গেল। দরজার কাছে গিয়া, মুখ ফিরাইয়া দাউদকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বিড়বিড় করিয়া দুশমন বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

দাউদের পোষাক এক স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। হনিফা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়া ভাল করি নাই। আপনার কাপড় নষ্ট হইয়াছে, পাগল আপনাকে আঘাতও করিতে পারিত।

দাউদ বলিল, ও কথার উল্লেখ করিবেন না। আমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিলে আমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আদেশ করা হইবে।

হনিফা মৃদু মন্দ মধুর হাসি হাসিয়া দাউদের প্রতি কটাক্ষপাত করিল। দাউদের হৃদয়ে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল।

একটু পরে দাউদ উঠিল। হনিফা তাহার সঙ্গে দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত আসিল। কহিল, আমার বিশ্বাস, আমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আপনি আমাকে দেখা দেন।

দাউদ হনিফার মুখের দিকে চক্ষু তুলিল, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

হনিফা বলিল, প্রথম দিন আপনি আমাকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ আমাকে উন্মত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ফিরোজ যখন আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল, সে সময় তাঁহার অবস্থা বন্য পশুর ন্যায়।

দাউদ কহিল, সৌভাগ্য আমার একার, আমার জীবনে নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে।

বিদায়ের সময় হনিফা হাত বাড়াইয়া দিল। দাউদ সেই কুসুম-কোমল হাত নিজের হাতে লইল।

অল্পে অল্পে হাত উঠাইল, অল্পে অল্পে তাহার মাথা নত হইল, তাহার ওষ্ঠাধর হনিফার হস্তে স্পৃষ্ট হইল। হনিফার হাত কাঁপিল, দাউদের হাতের ভিতর রহিল।

যাইবার সময় দাউদ একবার মুখ ফিরাইল, আবার চারি চক্ষুর কোমল মিলন, চক্ষুর নিকট চক্ষুর বিদায়।

৫

সেই দিন হইতে দাউদের জীবন-স্রোত আর এক খাতে প্রবাহিত হইল। প্রেমের বন্যা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে একই মূর্ত্তি তাহার মানসদৃষ্টিতে সমুদিত হইত, একই নাম অনুক্ষণ তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কারিত, ধ্বনিত হইত। হনিফা, হনিফা, হনিফা! হনিফার মুখ সর্ব্বদা তাহার নয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, তাহার হৃদয়াকাশ আলোকিত করিত। হনিফার চক্ষুর জ্যোতিঃ তাহার মানসপথে বিচ্ছুরিত হইত। সেই কর-কমলের স্পর্শ স্মরণ করিয়া তাহার হস্ত কম্পিত হইত। এই অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় আকুলতা দাউদ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না, করিবার চেষ্টাও করিত না। সেই এক চিন্তাতেই তাহার অসীম আনন্দ, আবার সেই চিন্তাতেই অসহ্য যন্ত্রণা। আনন্দ স্মৃতিতে, যন্ত্রণা পুনরায় দর্শনের বিলম্বে। তাহার আত্মসংযম তিরোহিত হইয়া আসিতেছিল।

প্রতিদিন অপরাহ্ণ কালে দাউদ আখড়ায় যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইত, কিন্তু সেখানে যাওয়া হইত না। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চলিতে চলিতে রাবীর অভিমুখে চলিয়া যাইত, আবার পথে থমকিয়া দাঁড়াইত। কিসের ছলে নিত্য হনিফার বাড়ী যাইবে? হনিফা অসন্তুষ্ট না হইলেও তাহার গৃহে অপর লোকজন আছে. তাহারা কি মনে করিবে, কি

বলিবে? একবার ঘটনাক্রমে হনিফার যৎসামান্য উপকার করিয়াছিল বলিয়া কি দাউদ যখন-তখন তাহার গৃহে যাইতে পারে? আবার ভাবিত, হনিফা অপ্রসন্ন না হইলে আর কাহারও কথায় কি আসিয়া যায়? হনিফা স্পষ্টাক্ষরে দাউদকে আবার যাইতে বলে নাই সত্য, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কি আহ্বান ছিল না? বিদায়ের সময় হনিফা মুখে কিছু না বলিলেও চক্ষুর ভাষায় দাউদকে আবার আসিতে বলিয়াছিল।

কয়েক দিন দাউদ রংমহলে গেল না। এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তিন চার দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নের পর রাঁঝা দাউদকে দেখিতে আসিল। দাউদ অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল।

ঘরে বসিয়া রাঁঝা জিজ্ঞাসা করিল, কয়েক দিন তুমি আখড়ায় যাও নাই কেন? তোমার শরীর কি অসুস্থ?

—না, আমার কোন অসুখ করে নাই, আলস্যের কারণ কয় দিন যাইতে পারি নাই।

—সে কোন কাযের কথা নয়। তোমাকে অন্যমনস্ক দেখিতেছি। তুমি কি সেই রমণীর গৃহে গিয়াছিলে?

—এক দিন গিয়াছিলাম।

—তাহাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

—হইয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ দেশে বাস করে, সেখানে জেনানার পর্দ্দা নাই।

—বাড়ীতে আর কে আছে?

—লোক জন, কর্ম্মচারী আছে, বাপ মা নাই। সম্পত্তি তিনি নিজেই দেখেন। এক পাগল ভাই আছে, তাহারই চিকিৎসার জন্য উহারা এখানে আসিয়াছে।

—রমণীর প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে?

দাউদ কোন উত্তর করিল না, মস্তক অবনত করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাঁঝা বলিল, ইহাতে দোষের কিছু দেখি না। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা, অবস্থাপন্ন, তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হও, তাহা হইলে বিবাহে বাধা কি?

—পিতামাতার অনুমতি না হইলে কেমন করিয়া বিবাহ হইবে? রমণীর মনোভাবও আমি জানি না। তাহাকে দুইবার মাত্র দেখিয়াছি, বিবাহের প্রসঙ্গ কেমন করিয়া হইবে?

—তোমাদের দুই জনের মনের কথা পরস্পরের জানিতে কতক্ষণ? মনের মিল কুস্তির প্যাঁচের মতন, তড়ি-ঘড়ি বাঁধিয়া ফেলে। মনে মনে মনের ভাব তুমি কত দিন চাপিয়া রাখিবে? খোলাখুলি কথা কহিয়া ঠিক করিয়া ফেল। তোমার পিতামাতার আপত্তির কোন কারণ দেখি না। তুমি আজ সেখানে যাও, অবসর হয় কথা পাড়িবে; নহিলে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, রমণীর আর কোথাও বিবাহের কথা হইয়াছে কি না।

রাঁঝা দাউদকে উৎসাহিত করিয়া চলিয়া গেল। দাউদ নিজেই প্রতিদিন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, কেবল লজ্জার শাসনে আত্ম-নিবারণ করিত। ওস্তাদের পরামর্শ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ, বৈকালে সে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ঘোড়ায় চড়িল না, বাইসিকেল ছিল, তাহাতেই করিয়া চলিয়া গেল।

অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে, অস্তমান সূর্য্য মাঝে মাঝে মেঘের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। লাল মেঘের ছায়া রাবীর জলে পড়িয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার উপর সূর্য্যের আলোক চিক্‌মিক্ করিতেছে। রাবীর ধারে পঁহুছিয়া দাউদ দেখিল, সেই বিশালকায় গোরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদি সে আবার আক্রমণ করে, তাহা হইলে বাইসিকেলে থাকিলে দাউদের অসুবিধা, এই বিবেচনা করিয়া সে বাইসিকেল হইতে নামিল।

গোরা কটমট করিয়া দাউদের দিকে চাহিয়া রহিল, মারামারি করিবার উপক্রম করিল না। দাউদ তাহার নিকটে গিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

গোরা অবাক্ হইয়া গেল। নোটখানা উল্টাইয়া পাল্টা-ইয়া দেখিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি হইবে?

দাউদ হাসিয়া কহিল, ওখানা তোমার, বিয়ার পান করিও।

গোরার বিস্ময় তখনও অপনীত হয় নাই। নোটখানা আস্তে আস্তে পকেটে পুরিল। দাউদ আবার বাইসিকেলে উঠিল। তখন গোরা মনের আনন্দে গান ধরিল, হী ইজ এ জলি গুড ফেলো!

৬

রংমহলে উপনীত হইয়া দাউদ সিঁড়ির পাশে বাইসিকেল রাখিয়া বারান্দায় উঠিল। দেখিল, পাশের একটা ঘরের

জানালার পাখি খুলিয়া ফিরোজ তাহাকে দেখিতেছে। ফিরোজের ঘূর্ণিত লোহিত চক্ষু, মুখে পৈশাচিক ক্রোধের চিহ্ন। দাউদকে দেখিয়া বদ্ধমুষ্টি তুলিয়া তাহাকে শাসাইল। দাউদ কিছু না বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সেই পুরাতন ভৃত্য আসিয়া পূর্ব্বে দাউদকে যে ঘরে বসাইয়াছিল, সেই ঘরে লইয়া গেল। বলিল, আপনি বসুন, আমি খবর দিতেছি।

ভৃত্য চলিয়া যাইবার একটু পরেই দাসী আসিল। সে সেলাম করিয়া বলিল, বিবি সাহেব গোসল-খানায় আছেন, এখনি আসিতেছেন। আপনি অপরাধ লইবেন না।

দাউদ বলিল, আমি না হয় একটু অপেক্ষা করিলাম, তাহাতে কি হইয়াছে?

দাসী দাঁড়াইয়া রহিল। দাউদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, খাঁ সাহেব, আপনি এত দিন আসেন নাই কেন? আমরা কত কি ভাবিতেছিলাম। বিবি সাহেব মনে করিতে-ছিলেন, হয় ত সে দিন নবাবজাদার কাণ্ড দেখিয়া আপনি কিছু বিরক্ত হইয়াছেন, সেই কারণে আর আসেন নাই।

—পাগলের কাণ্ড দেখিয়া কে আবার কি মনে করে? আমি এমনি আসি নাই। আমার কি ঘন ঘন আসা উচিত? লোকে কি মনে করিবে?

—কে আবার কি মনে করিবে? আপনি আসিলে সকলেই খুসী হয়। সেখানে বিবি সাহেবের অনেক কায, তবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতেন। এখানে কায-কর্ম্ম কিছু নাই, বিবি সাহেব রোজ বেড়াইতেও যান না, আপনাকে তিনি যথেষ্ট খাতির করেন; আপনি আসিবেন, তাহাতে আবার কথা কি?

—আমাদের এখানে পর্দ্দা আছে কি না, তাই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগে।

দাসী থুঁতিতে আঙ্গুল দিয়া মাথা নাড়িয়া একবার হাসিল; বলিল, আপনার এখানে আসিতে কি লজ্জা-বোধ হয়?

দাউদও হাসিল, কহিল, লজ্জা কেন হইবে? তবে আমি ত অপরিচিত লোক বলিলেই হয়, বার বার আসিলে তোমরাই বিরক্ত হইতে পার।

—শেষে আমরাই অপরাধী হইলাম! আপনার এখানে আসিতে ইচ্ছা করে না?

—আমার রোজ আসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই কি করা উচিত?

—অন্যায় হইলে করা উচিত নয়, কিন্তু এখানে আসা কি আপনার অন্যায় মনে হয়?

—আমার কেন, অপর লোকের কথা ভাবিতেছি।

—অপর লোকের জন্য কিসের ভাবনা? আপনার দিল ও বিবি সাহেবের দিল রাজি হইলেই হইল।

দাউদের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল, এমন কথা শুনিলে বিবি সাহেব রাগ করিতে পারেন।

দাসী বলিল, আমি কি না জানিয়া বলিতেছি? আচ্ছা, খাঁ সাহেব, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না। আপনার কি শাদি হইয়াছে?

—না, ও কথা আমি কখন ভাবি না।

—আপনি এমন নওজোয়ান, এমন সুপুরুষ, আপনার বাড়ীতে ও কথা উঠে না?

—উঠিলেও আমি কাণে তুলি না। ও কথা ছাড়িয়া দাও।

দাসী দাউদের নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, বিবি সাহেবকে আপনার শাদি করিতে ইচ্ছা করে? যেমন খুবসুরত—তেমনি গুণবতী।

দাউদ বলিল, অমন কথা বলিতেছ কেন? নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশে কেন তাঁহার বিবাহ হইবে?

—নিজের দেশে একমাত্র পাত্র ত নবাবজাদা ফিরোজ। তিনি ত পাগল হইয়াছেন, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিন। বিবি সাহেব মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার মন আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আপনার পথ দেখেন। এখন আমি যাই, বিবি সাহেবের কাপড় বাহির করিয়া দিতে হইবে।

দাসী চলিয়া গেলে দাউদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দাসী কি তাহার সঙ্গে কৌতুক করিতেছিল, না সত্য কথা বলিতেছিল? নিজের মনোভাব দিয়া দাউদ হনিফার মনের ভাব কেমন করিয়া বুঝিবে? সে দিন হনিফার দৃষ্টিতে কি দেখা দিয়াছিল? অনুরাগের জ্যোতি—না শুধু কৃতজ্ঞতার ছায়া?

হনিফা ঘরে প্রবেশ করিতেই দাউদ উঠিয়া দাঁড়াইল। হনিফা বলিল, এত দিন আপনি আসেন নাই কেন? সে দিন ফিরোজের উৎপাতে আপনি বিরক্ত হন নাই ত?

দাসী হনিফার পিছনে আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

দাউদ বলিল, বিলক্ষণ! এমন কথা মনে করিবেন না। এখানে আসিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তবে সর্ব্বদা কি আমার আসা উচিত?

—কেন, তাহাতে কি দোষ আছে?

হনিফা দাউদের নিকটে আসিয়া, হাসিয়া বলিল, আমার রক্ষার ভার আপনার উপর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? এই কয় দিনের মধ্যে যদি আমার আর কোন বিপদ হইত?

হনিফা আসিয়া দাউদের সম্মুখে বসিল। তাহার কথা শুনিতে বিদ্রূপের মত, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যগ্রতার ভাবও মিশ্রিত ছিল। তাহার কথা শুনিয়া ও তাহাকে বসিতে দেখিয়া দাসী নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দাসী চলিয়া গেল—দাউদ দেখিতে পাইল। হনিফার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিবার অধিকার কি আমাকে অর্পণ করিবে?

এমন কথার কি অর্থ হইতে পারে? দাউদ হনিফাকে আপনি না বলিয়া তুমি বলিল কেন? হনিফাও ফিরিয়া দেখিল দাসী নাই, দরজা ভেজান রহিয়াছে। হনিফার চক্ষু কোমল হইয়া আসিল, কম্পিত স্বরে কহিল, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

দাউদ হনিফার হস্তধারণ করিল, কহিল, আমি তোমা-কেই প্রার্থনা করি। আমাকে বিবাহ করিবে?

—তোমাকে দেখিয়াই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু আমি বিদেশিনী, এখানে সকলের কাছে অপরিচিতা। তোমার পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, আমাদের বিবাহে সম্মত হইবেন কি না বলিতে পারি না। আমার কথা স্বতন্ত্র। আমাকে নিষেধ করিবার কেহ নাই।

—আমার পিতা মাতাও কোন আপত্তি করিবেন না। তাঁহারা আমার চরিত্র জানেন। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি কখন নারীর প্রেম জানিতাম না। এখন তুমি আমার শুধু চোখে নহে—আমার হৃদয়ে রহিয়াছ, তোমার দর্শন-লালসা আমাকে আকুল করিয়াছে।

—আমি প্রতিদিন তোমার পথ চাহিয়া থাকি। তোমাকে কয় বারই বা দেখিয়াছি, তবু মনে হয়, তুমি চির পরিচিত, চির প্রিয়। এতদিন আমার প্রাণ যেন নিদ্রিত ছিল, তোমাকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। যে দিকেই দেখি, তোমাকে দেখিতে পাই; তুমি যেন আমাকে ডাকিতেছ; সকল প্রকার আশঙ্কা হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছ।

দাউদ হনিফাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। হনিফার মস্তক দাউদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল।

এমন কতক্ষণ গেল। বসন্ত বাতাসের মর্ম্মরের ন্যায় দুই জনে মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল, প্রেমের পুরাতন বারতা, বার বার প্রিয় সম্বোধন, আবার নীরবে নয়নে নয়নে কথা। কতক্ষণ পরে হনিফা দাউদের বাহুবন্ধনমুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, অন্ধকার হইয়া আসিল, এতক্ষণ আমরা একা রহিয়াছি।

হনিফা কল টিপিয়া বিদ্যুতের আলোক জ্বালিয়া দিল। দাউদ কহিল, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিত থাকিবার কিছু আবশ্যক আছে?

হনিফা কহিল, আছে বৈ কি! আমি কি নির্লজ্জের ন্যায় অন্ধকারে পরপুরুষের সহিত বসিয়া গল্প করিব?

—পরই ত আপন হয়।

—সে পরের কথা, বলিয়া দরজা খুলিয়া হনিফা দাসীকে ডাকিল।

দাউদ বলিল, আমি এখন যাই।

হনিফা দাউদের হাত ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে আসিবে?

—যত শীঘ্র পারি।

—কত শীঘ্র?

—কাল।

দাসী আসিয়া দেখে, দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাউদ হনিফার হাত ছাড়িয়া দাসীর সঙ্গে বাহিরে আসিল। তাহাকে বলিল, একটা নূতন খবর হয় ত তোমার মনের মত হইবে। তোমার বিবি সাহেবকে আমি বিবাহ করিব।

দাসী মস্ত লম্বা সেলাম করিয়া কহিল, শাদি মোবারক! এ বড় খুশ খবর!

৭

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাউদ দেখিল, অন্ধকার হইয়াছে। সে বাইসিকেলের আলো জ্বালিয়া তাহাতে উঠিয়া ধীরে ধীরে ফটকের দিকে চলিল। পথে এক স্থানে বড় বড় গাছের

তলার অত্যন্ত অন্ধকার। দাউদ এক পাশ দিয়া আস্তে আস্তে বাইসিকেল চালাইতেছিল।

হঠাৎ পশ্চাতে বিকট চীৎকার শুনিয়া দাউদ বাইসিকেল হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল, ফিরোজ কোন রূপে প্রহরী দুই জনকে এড়াইয়া তাহার পিছনে আসিয়াছে। চীৎকার করিয়াই ফিরোজ দাউদকে আক্রমণ করিল। তাহার হাতে ছিল একটা ছুরী। যেমন ছুরী তুলিয়া সে দাউদের বক্ষে আঘাত করিবে, অমনি গাছের শিকড়ে পা লাগিয়া পড়িয়া গেল। পড়িবার সময় ছুরী দাউদের উরুস্থলে বিদ্ধ হইল। দাউদ ফিরোজের হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ক্ষতস্থান হইতে বেগে রক্ত ছুটিল।

রক্ষক দুই জন ফিরোজকে খুঁজিতেছিল, চীৎকার শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল। দাউদ রুমাল বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিতেছিল, রক্ষকদিগকে দেখিয়া বলিল, আমার পায় ছুরী মারিয়াছে, তোমরা ইহাকে সামলাও।

রক্ষকরা তখনি ফিরোজকে বাঁধিয়া ফেলিল। আহত হইয়া দাউদ মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল, রক্তস্রাবে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আবার যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখে, ঘরের ভিতর পালঙ্কে সে শয়ন করিয়া আছে, ক্ষতস্থান আঁটিয়া বাঁধা, শয্যার পাশে হনিফা, দাসী ও কর্ম্মচারী। হনিফা ও দাসীর নয়নে অশ্রু বহিতেছে। দাউদের মুখ কিছু ম্লান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্লেশের আর কোন চিহ্ন নাই। হাসিয়া কহিল, তোমরা কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে?

হনিফা অশ্রু সম্বরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া কহিল, আমার বাড়ীতে আসিয়া তোমার এইরূপ হইল! তোমার পিতা আসিলে তাঁহাকে আমরা কি বলিব?

—আমার পিতার আসিবার কি প্রয়োজন?

কর্ম্মচারী বলিল, আপনার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, এ সংবাদ কি তাঁহার নিকট গোপন করা যায়? তাঁহাকে ও ডাক্তারকে আনিবার জন্য মোটর পাঠান হইয়াছে, তাঁহারা এখনি আসিবেন।

দাউদ বলিল, সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, সে জন্য আপনারা এত চিন্তিত হইয়াছেন কেন? আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেই হইত, যাহা বলিবার আমি নিজেই বলিতাম।

—আপনাকে কি অচৈতন্য অবস্থায় পাঠাইয়া দেওয়া যায়?

—আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়া থাকিবে। রক্ত ছুটিলে ওরূপ হয়, কিন্তু ও কিছুই নয়। অমন চোট কত লাগিয়া থাকে।

কর্ম্মচারী বলিল, ডাক্তারের আসিবার সময় হইল, আমি তাঁহাদিগকে লইয়া আসি।

কর্ম্মচারী বাহিরে গেল। হনিফা দাউদের পাশে খাটে বসিল। তাহার চক্ষুতে কেবল অশ্রু পূরিয়া আসিতেছিল। বলিল, এমন জানিলে তোমাকে কখন এখানে আসিতে বলিতাম না। তোমার পিতা শুনিয়াই বা কি বলিবেন? তিনি আমাদিগকে তোমার শত্রু মনে করিবেন। তুমি সারিয়া উঠিয়া গৃহে যাও, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বিবাহের কথা স্বপ্নতুল্য হইল।

দাউদ হনিফার হাত ধরিল, হাসিয়া বলিল, স্বপ্ন সত্য হইবে। তুমি দেখিও হয় কি না।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। দাউদ বলিল, তোমরা পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াও, তাহা হইলেই সব দেখিতে শুনিতে পাইবে।

হনিফা ও দাসী ভিতরকার দরজার পর্দ্দার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

কর্ম্মচারীর পশ্চাতে নবীউল্লা খাঁ ও ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। নবীউল্লার বয়স হইয়াছে, কিন্তু অধিক বৃদ্ধ হন নাই। গম্ভীর মূর্ত্তি, শান্ত পুরুষ, এখন উদ্বেগে আননে চিন্তার চিহ্ন। গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, অন্য কোন কথা হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেব দেখুন।

ডাক্তারের সঙ্গে আর এক জন লোক আসিয়াছিল, সেও ব্যাগ হাতে করিয়া পিছনে পিছনে আসিল।

গরম জল, গামলা, বাসন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। ব্যাগ হইতে একটা স্পিরিটের আলো বাহির করিয়া, একটা বাটিতে কয়েকটা অস্ত্র ডাক্তারের লোক তপ্ত জলে ফুটাইতে আরম্ভ করিল।

বন্ধন খুলিয়া ডাক্তার ক্ষতস্থান দেখিলেন। তখনও অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে, বন্ধন খুলিয়া দেওয়াতে আবার বেগে রক্ত ছুটিল। কাটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঔষধ দিয়া ডাক্তার রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন, তাহার পর পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, শির কাটিয়া যায় নাই, হাড়েও লাগে নাই। ভাল করিয়া ধুইয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া কাটার মু

করিতে হইবে। কিছু বেশী লাগিবে, ঔষধ দিয়া রোগীকে অজ্ঞান করিলে যন্ত্রণা টের পাইবে না।

দাউদ বলিল, আমাকে অজ্ঞান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার যাহা করিবার হয় করুন।

—তুমি যাতনা সহ্য করিতে পারিবে?

—পারি কি না, আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

দাউদের পিতা কহিলেন, ও যেমন বলিতেছে, আপনি সেইরূপ করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।

ডাক্তার ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া, তাহার ভিতরে রবারের সরু নল দিয়া, ক্ষতমুখ সেলাই করিয়া, আঁটিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। দাউদ দুই একবার অল্প মুখ বিকৃত করিল, কিন্তু মুখে যন্ত্রণার কোন শব্দ করিল না। ডাক্তার তাহার হাতের মাংসপেশী টিপিয়া কহিলেন, তুমি খুব বাহাদুর! তুমি কি পাহালওয়ান না কি?

নবীউল্লা খাঁ কহিলেন, রাঁঝার আখাড়ায় কুস্তি শেখে।

—আমিও তাই ভাবিতেছিলাম যে, আঘাত সহ্য করা অভ্যাস না থাকিলে এমন নিশ্চিন্তভাবে অস্ত্র করাইতে পারে না! আর কোন ভাবনা নাই। পরশু ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বদলাইয়া দিব। দিন দশেকের মধ্যে সারিয়া যাইবে।

নবীউল্লা খাঁ বলিলেন, এখন তবে আমি উহাকে বাড়ী লইয়া যাই?

ডাক্তার বলিলেন, ইহাকে এখন কোনমতে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে আবার রক্ত ছুটিবার ও অন্য আশঙ্কা আছে। পাঁচ ছয় দিন বিছানা হইতে কোনমতে উঠিতে দেওয়া হইবে না।

—তাহা হইলে আমাকেও এখানে থাকিতে হইবে।

—আপনার থাকিবার কোন আবশ্যক নাই, আপনি দুই বেলা আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

—তাহাই হইবে।

ডাক্তারের সঙ্গে ঘরের বাহিরে গিয়া নবীউল্লা তাঁহার হাতে টাকা দিতে গেলেন, ডাক্তার কোনমতে টাকা লইলেন না। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে বলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার প্রাপ্য হনিফা বিবি চুকাইয়া দিবেন, তিনি যেন দাউদের পিতার নিকট কোনমতে টাকা গ্রহণ না করেন।

নবীউল্লা বলিলেন, এখন যদি না লয়েন, তাহা হইলে পরে আমাকে বিল পাঠাইবেন।

—সে পরে দেখা যাইবে।

ডাক্তার ফিরোজকে দেখিতে গেলেন। নবীউল্লা ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কাছে বসিলেন। বলিলেন, কর্ম্মচারীর মুখে আমি সকল কথা শুনিয়াছি। তুমি যে এখানে আসা-যাওয়া কর, আমরা ত তাহার কিছু জানিতাম না।

—এখানে ত আমি বেশী বার আসি নাই। পরে আপনাকে সকল কথা জানাইতাম।

—এখানে আসিবার কথা কাহাকেও বলিয়াছ?

—আজ্ঞা হাঁ, রাঁঝাকে বলিয়াছি।

—তাহার সঙ্গে তোমার সকল কথা হয় বটে! সে লোক ভাল।

—আমার ওস্তাদ। অমন সৎ লোক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

—যে তোমাকে ছুরী মারিয়াছিল, সে উন্মাদ পাগল। দেখিলাম, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

—অল্প দিন হইল উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই বিনা কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রহরীরা সতর্ক থাকিলেও কোথা হইতে একটা ছুরী আনিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

—পাগলের কারণ অকারণ বুঝিতে পারা যায় না। যে রমণী এই গৃহের কর্ত্রী, তাঁহার সহিত তাহার বিবাহের কথা ছিল না?

—এইরূপও শুনিয়াছি। কিন্তু উন্মাদ সারিবার আশা নাই। হাকিম নসিরুদ্দীন বিশেষ আশা দেন নাই।

নবীউল্লা দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দাউদের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গলা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রমণীকে দেখিয়াছ?

—দেখিয়াছি। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে থাকেন, সে দিকে পর্দা নাই।

দাড়ীর ভিতর অঙ্গুলি চলিতেছিল। নবীউল্লার দৃষ্টি দাউদের মুখের দিকে, আপনার মনে যেন বলিতে লাগিলেন, সুন্দরী, না? ইরানের সম্ভ্রান্ত বংশ, সম্পত্তিশালিনী, বুদ্ধিমতী। বয়স কত হইবে?

দাউদ একটু ভাবিয়া বলিল, ঠিক বলিতে পারি না। কুড়ি বৎসর হইতে পারে।

নবীউল্লা ও কথা ঘুরাইয়া দিলেন। বলিলেন, এখানে থাকিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না ত ?

—কিসের কষ্ট ? আমার উঠিতে নিষেধ, যেখানেই থাকি—পড়িয়া থাকিতে হইবে।

—আমি রাত্রে তোমার কাছে থাকিব ?

—আপনার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন, আপনার থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

—তবে আমি যাই। তোমার চাকরকে এখনি পাঠাইয়া দিতেছি। কাল ভোরে আসিব। তোমার মাও আসিবেন। তিনি কত কি ভাবিতেছেন। তাঁর আসা দরকার।

দাউদের অঙ্গে হাত বুলাইয়া নবীউল্লা খাঁ চলিয়া গেলেন।

৮

যেমন নবীউল্লা বাহির হইয়া গেলেন, অমনি হনিফা ও দাসী দাউদের ঘরে প্রবেশ করিল। হনিফা আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, তুমি বেশী কথা কহিও না, ডাক্তার কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। তুমি ত কেবল সকলের সঙ্গে কেবলি কথা কহিতেছ।

—বাপের সঙ্গে কথা কহিব না ? কাল আমার মা আসিবেন, জান ত ?

—জানি। জানিবার জন্যই ত পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তোমার বাবা আমার বয়স জানিতে চাহিলেন কেন ?

—আমিও সেই কথা ভাবিতেছি। হয় ত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন।

সম্বন্ধ ত ঠিক হইয়াছে।

—তাহা তিনি জানেন না, তবে তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে। কাল মা আসিয়া আমাকে দেখিবেন, তোমাকেও দেখিবেন ত ? তুমি এ দেশী কাপড় পরিয়া থাকিও।

—যো হুকুম। পেশগীর, বুরকা সব তৈরী আছে।

ডাক্তার দাউদের জন্য যে পথ্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইল। মুরগীর শুরুয়া, পাতলা শুকনা রুটি আর ফিরণী। আহার শেষ হইতে দাউদের ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। হনিফা তাহার সম্মুখে বাহির হইল না।

ভৃত্য আসিয়া বলিল, মিঞা সাহেব, বড়ি বিবি আপনাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি এখনি আসিতে চাহিতেছিলেন, বড়া মিঞা তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, আপনার তেমন কিছু লাগে নাই বলিয়া, থামাইয়া রাখিয়াছেন। বিবি সাহেব ভোরে আসিবেন।

—বেশ কথা। আমার সামান্য লাগিয়াছে, চিন্তার কোন কারণ নাই।

—রাত্রে আমি হুজুরের কাছে থাকি ?

—কোন আবশ্যক নাই। রাত্রে প্রয়োজন হইলে তোমাকে ডাকিব।

ভৃত্য বাহিরে অপর চাকরদের কাছে গেল। হনিফা আবার আসিয়া বলিল, প্রয়োজন হইলে আমাদেরও ডাকিবে।

—আচ্ছা।

হনিফা ও দাসী চলিয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে নবীউল্লা ও দাউদের মাতা আসিলেন। আঘাতের তাড়সে ও রক্তস্রাবে দাউদের ঈষৎ জ্বরভাব হইয়াছিল, মাতা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, বেটা, তোমার জ্বর হইয়াছে।

—ও কিছুই নয়, এখনি ছাড়িয়া যাইবে। তোমরা এত ভাবিতেছ কেন ? আমার এমন কিছুই হয় নাই, দু'চার দিনে সারিয়া যাইবে।

—তুমি এখানে আসিয়াছিলে কেন ? ছেলে দিব্য সুস্থ শরীর, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, কোথা হইতে একটা পাগল তাহাকে ছুরী মারিয়া বসিল।

নবীউল্লা বলিলেন, ও কথায় কায নাই। ইহাতে কাহারও অপরাধ নাই।

—তা ত বুঝিলাম, কিন্তু আমার ছেলে এখানে কত দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিবে ? বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি সর্ব্বদা উহার কাছে থাকিতে পারি।

—দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইবে। চিন্তার কোন কারণ নাই।

তাঁহারা কথা কহিতেছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সেলাম করিল, দাউদের মাতাকে কহিল, বেগম সাহেবা, একবার অন্দর-মহলে যাইবেন না ?

—যাইব বই কি, তোমার বিবি সাহেবের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি।

দাউদের মাতা দাসীর সঙ্গে ভিতরে গেলেন। পিতা-পুত্র কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে দাউদের মাতা ফিরিয়া আসিলেন। হর্ষোৎফুল্ল আনন, চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল। স্বামীকে কহিলেন, তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি এবেলা এখানেই থাকিব, সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাইব।

নবীউল্লা বলিলেন,—আহারাদির কি হইবে?

—ইহারা এখানে খাইতে না দেয়, উপবাসী থাকিব।

পর্দার পিছনে চাপা হাসির অল্প শব্দ শুনা গেল। নবী-উল্লা কিছু লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দাউদের মা বলিলেন, আমি এতক্ষণ হনিফার সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। খুব লজ্জাশীলা আর নরম প্রকৃতির মেয়ে। আর সুন্দরী ত বটেই, পরমা সুন্দরী। তোমার সঙ্গে কথা কহিল কেমন করিয়া?

—ওদের দেশে পর্দা নাই জান ত? তবে সে গোরাটা না আসিলে, আমার সঙ্গে আলাপ হইত না।

দাউদের মা হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, তুই ত কিছু বলিস্ নাই, হনিফার কাছে সব শুনিলাম। ছেলে আমার রুস্তম। আরও শুনিলাম, ফিরোজকে ডাক্তার পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে খুন করিবে; তাহাকে এখানে সামলান অসম্ভব। রোগ কিছুতেই সারিবে না।

—বড় আপশোষের কথা।

দাউদের মা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ছেলের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, তুমি এখানে হনিফাকে দেখিতে আসিতে, না?

দাউদ কোন উত্তর দিল না, মা'র হাত চাপিয়া ধরিল। মা মুচকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, হনিফাকে বিবাহ করিবে?

দাউদের চক্ষু অত্যন্ত কোমল হইয়া মা'র মুখের উপর পড়িল। কহিল, সেই কথা আমি তোমাকে বলিব ভাবি-তেছিলাম। আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

—বড় কঠিন পণ। তুমি গুণ্ডা পাহালওয়ান, হনিফা তোমাকে বিবাহ করিবে কেন?

—না করে ত আর কি করিব?

—নিজে সাজিতেছে

দাউদের মা উঠিয়া কস্ করিয়া পর্দা টানিয়া দিলেন। দাসী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছে, হনিফা পলায়ন করি-য়াছে।

দাসী দাউদের মা'র হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, বেগম সাহেবা, শাদি করিয়া দাও—শাদি করিয়া দাও! মিঞা সাহেব আর বিবি সাহেব দিবা-রাত্র পরস্পরের দর্শন-কামনা করে। তুমি এমন পুত্রবধূ পাইবে না, বিবি সাহেবও এমন শোহর পাইবে না।

—আর তুই দু' তরফ হইতে সোনার জেওয়র আর জরির পেশোয়াজ পাইবি, কেমন?

—তা ত পাইবই, আর আপনাদের দৌলতে আমার ভাবনা কিসের?

—আচ্ছা, তুই এইবার গোসলখানায় গরম জল দিতে বল, আমার স্নানের সময় হইয়াছে।

—আমি গিয়া এখনি সব ঠিক করিয়া রাখিতেছি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

দাউদের মা পুত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি সারিয়া উঠিলেই তোমার বিবাহ দিব। ডাক্তার অনুমতি দিলেই তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব, তাহার পর যত শীঘ্র হয় বিবাহ হইবে। কেমন, এখন তোমার মনের মত কথা হইয়াছে ত?

দাউদ মাতার হস্ত লইয়া নিজের মাথার উপর রাখিল, বলিল, তোমার দোয়া হইলেই আমার সুখ হইল।

দাউদের মা যখন স্নানাগারে গমন করিলেন, সেই অব-কাশে হনিফা দাউদের নিকটে আসিল। সঙ্গে দাসী ছিল না। দাউদ হনিফার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল, বলিল, মা কি বলিয়াছেন শুনিয়াছ?

—শুনিয়াছি, বলিয়া হনিফা দাউদের বক্ষে মুখ লুকাইল।

কিছু পরে দাউদ হনিফার মুখ তুলিয়া ধরিল। হনিফার চক্ষু আনন্দ-সলিলে ভাসিতেছে।

কেহ কোন কথা কহিল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
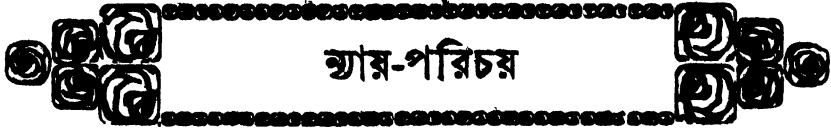
ন্যায়-পরিচয়

জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব্বজন্মের সাধক যুক্তি

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তির দ্বারা জীবাত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও জীবাত্মা যে নিত্য অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি নাই এবং বিনাশও নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম পরে জীবাত্মার নিত্যত্বসাধক যুক্তি প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-ভয়-শোকসম্প্রতিপত্তেঃ।"—৩।১।১৮

অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মা নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাহার ঐ হর্ষ, ভয় ও শোক পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর মুখে হাস্য দেখিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার হর্ষ জন্মিয়াছে এবং তাহার শরীরে কম্পবিশেষ দেখিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার ভয় জন্মিয়াছে এবং তাহার রোদন শুনিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার শোক জন্মিয়াছে। কারণ, তাহার হর্ষাদি ব্যতীত ঐরূপ হাস্যাদি জন্মিতে পারে না; কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্য জন্মে না। সুতরাং কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণের যথার্থ অনুমান হইয়া থাকে। অতএব নবজাত শিশুর ঈষৎ হাস্য দ্বারা তাহার কারণ হর্ষ অনুমিত হয় এবং তাহার রোদন দ্বারা তাহার কারণ শোকও অনুমিত হয়। তাহা হইলে তখন সেই নবজাত শিশুর যে কোন বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহাও অনুমিত হয়। কারণ, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে যে সুখ জন্মে, তাহার নাম হর্ষ এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা বিয়োগে যে দুঃখবিশেষ জন্মে, তাহার নাম শোক। সুতরাং কোন বিষয়ে একেবারেই অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কখনই কাহারও হর্ষ ও শোক জন্মিতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া না বুঝিলেও কাহারও সে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুতরাং নবজাত শিশুও যে, কোন বিষয়কে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া বুঝিয়াই তদ্বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেই বিষয়ের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অপ্রাপ্তি বা বিয়োগে দুঃখিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু নবজাত শিশু ইহজন্মে সেই বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া কিরূপে বুঝিবে? ইহজন্মে সেই বিষয়কে পূর্ব্বে কখনও ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব না করায় ইহজন্মে সে বিষয়ে তাহার ঐরূপ সংস্কারও ত জন্মে নাই। সুতরাং তাহার ঐরূপ স্মৃতিও জন্মিতে পারে না। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নবজাত শিশুর সেই আত্মা পূর্ব্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার ঐরূপ সংস্কার থাকায় ইহজন্মে সেই সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহার ঐরূপ স্মৃতি উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তাহার পূর্ব্বানুভূত তজ্জাতীয় বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা হইলে নবজাত শিশুর সেই আত্মা যে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে এবং সেই আত্মারই অভিনব শরীরাদিসম্বন্ধরূপ পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য।

দেহাত্মবাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, নবজাত শিশুর ঐ হাস্যাদি, তাহার হর্ষাদি জন্য নহে। কিন্তু যেমন সময়-বিশেষে পদ্মাদির বিকাশ ও সংকোচ প্রভৃতি বিকার জন্মে, তদ্রূপ নবজাত শিশুর হাস্যাদিও তাহার সেই দেহেরই বিকার বা অবস্থা-বিশেষ। পদ্মের বিকাশের ন্যায় নবজাত শিশুর মুখের বিকাশই তাহার হাস্য বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ পদ্মাদির মুদ্রণের ন্যায়ই কখনও তাহার মুখের মুদ্রণ হইয়া থাকে। এইরূপ কোন সময়ে তাহার কম্প বা রোদনাদিও তাহার দেহেরই বিকার-বিশেষ। মহর্ষি গৌতম পরে নাস্তিকের এই কথার উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন—

নোষ্ণশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাম্।

৩।১।২০।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য পদ্মাদির সংকোচ, বিকাশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিকার, তাহাও স্বাভাবিক নহে। তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে। উষ্ণ, শীত ও বর্ষাকাল প্রভৃতিই তাহার নিমিত্ত। কিন্তু নবজাত শিশুর ঐ হাস্য, কম্প ও রোদনের নিমিত্ত কি? ইহা

বলা আবশ্যক। পদ্মের ন্যায় সূর্য্যকিরণের সংযোগে ঐ শিশুর ত মুখ-বিকাশ হয় না এবং রাত্রিকালে পদ্মের ন্যায় ঐ শিশুর নিয়ত মুখমুদ্রণও হয় না। ঐ যে সূতিকা-গৃহে শিশু রোদন করিতেছে, আবার তখনই মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন্য পান করিয়া এবং তাঁহার স্নেহ-আদর বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছে, ইহার কি কোন কারণ নাই? অথবা উহা কি তাহার সেই জড় দেহেরই সাময়িক কোন অবস্থা মাত্র? তাহা হইলে দেহাত্মবাদী নাস্তিক যে তাহার নবজাত কুমারের মধুর হাস্য দেখিয়া হাস্য করিতেছেন এবং দুরদৃষ্টবশতঃ সেই স্নেহময় কুমারের মৃত্যু হইলে রোদন করিতেছেন, তাহাও তিনি তাহার দেহের বিকার মাত্র, ইহা কেন বলেন না? সেই স্থলে তাঁহার হর্ষ জন্য হাস্য এবং পরে শোক জন্য রোদন, ইহা ত তিনিও স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তে নবজাত শিশুর ঐ হাস্যও তাহার হর্ষ জন্য এবং তাহার রোদনও তাহার দুঃখ জন্য, ইহাই তাহার স্বীকার্য্য। আর যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই যেরূপ হাস্য ও রোদনের কারণরূপে হর্ষ ও শোক সর্ব্বসম্মত, নবজাত শিশুর পক্ষেও তাহাই স্বীকার না করিয়া অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব নবজাত শিশুর ঐ হাস্য ও রোদনের দ্বারা তাহার হর্ষ ও শোকের অনুমান হওয়ায় তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধ হয়।

এইরূপ নবজাত শিশুর ভয়ের দ্বারাও তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ইহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নবজাত শিশু কখনও মাতার ক্রোড় হইতে কিছু স্খলিত হইলেই তখনই রোদনপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে হস্তদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার বক্ষঃস্থ মঙ্গলসূত্র জড়াইয়া ধরে, ইহা দেখা যায়। কিন্তু কেন সে ঐরূপ করে? যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় নবজাত শিশুও পতনভয়ে ভীত হইয়া পতননিবারণের জন্য কেন ঐরূপ চেষ্টা করে? পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধ ব্যতীত তাহার তখন ভয়, দুঃখ এবং ঐরূপ চেষ্টা হইতেই পারে না। কারণ, সমস্ত প্রাণীই পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধ বশতঃই পতনভয়ে ভীত হয় এবং যথাশক্তি পতননিবারণের জন্য চেষ্টা করে, ইহা সত্য। যে প্রাণী কোন স্থান হইতে পতনকে তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝে না, সে কখনই সেই স্থান হইতে পতনভয়ে ভীত হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত-স্থলে নবজাত শিশুরও ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা মাতৃক্রোড় হইতে তাহার পতনভয় ও তজ্জন্য দুঃখ, অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তৎকালে পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধও তাহার অবশ্য জন্মে, ইহাও অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নবজাত শিশুর জন্মের পরে সর্ব্বপ্রথম যে পতনভয়, এবং পতননিবারণের জন্য যে ঐরূপ চেষ্টা, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে ত তাহার ঐ জন্মে কখনও পতন যে দুঃখের কারণ, ইহা অনুভব করে নাই। অতএব অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, তাহার দেহাদি ভিন্ন আত্মা আছে। সেই আত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবার পতনের পূর্ব্বাবস্থা ও তৎপরে পতনেরও অনুভব করিয়া উহা যে দুঃখের কারণ, ইহাও অনুভব করিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য সেই আত্মাতে ঐ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার আছে। ইহ-জন্মে পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই সংস্কার বশতঃই পতনের পূর্ব্বাবস্থা বুঝিয়া তদ্দ্বারা তাহার ভাবী পতনের অনুমান করিয়া তাহাও দুঃখজনক বলিয়া অনুমান করে। সুতরাং তখন সে পতনভয়ে ভীত হইয়া সেই পতননিবারণের জন্য ঐরূপ চেষ্টা করে। পতনের পূর্ব্বাবস্থা ও পতন—যাহা তাহার পূর্ব্বানুভূত, তাহার স্মৃতি ব্যতীত কখনই তাহার ঐরূপ ভয় জন্মিতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও তাহার সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি জন্মিতে পারে না। অতএব তাহার পূর্ব্বজন্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। আত্মার উৎপত্তি না থাকিলেও—কোন অভিনব শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধরূপ জন্ম আছে। অনাদিকাল হইতেই আত্মার ঐরূপ জন্ম স্বীকার্য্য হওয়ায় আত্মা নিত্য, ইহাও স্বীকার্য্য।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূত্রে আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধ করিতে নবজাত শিশুর যে ভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর মৃত্যুভয়ও আত্মার নিত্যত্বের সাধকরূপে গ্রাহ্য। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ মৃত্যুভয়কেই "অভিনিবেশ" নামক পঞ্চম ক্লেশ বলিয়াছেন এবং উহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, (১)

---

(১) স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ।—যোগদর্শন। ২।৯।

যিনি শাস্ত্র দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষেও ঐ অভিনিবেশ পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হয় এবং উহা স্বরসবাহী। অনাদিকাল হইতে জীবের পুনঃ পুনঃ মরণ-দুঃখের অনুভব জন্য তদ্বিষয়ে যে সমস্ত বাসনা বা সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহার নাম "স্বরস"। ঐ অনাদি সংস্কার বশতঃই সর্ব্বজীবের মরণভয় জন্মে। পতঞ্জলি পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, (২) পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাসনা বা সংস্কার অনাদি। কারণ, সর্ব্বজীবেরই 'আমি যেন না মরি, আমি যেন থাকি' এইরূপ কামনা সতত আছে। বস্তুতঃ সর্ব্বজীবেরই উক্তরূপ কামনাবশতঃ আত্মরক্ষার জন্য সতত যে অভিনিবেশ, তাহা মৃত্যু-ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহা সর্ব্বজীবেরই ক্লেশকর, এ জন্য যোগদর্শনে "ক্লেশ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ মৃত্যুভয়ও বিনা কারণে হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য-গণ যাহাই বলুন, বস্তুতঃ মরণভয় জীবের একটা স্বভাব বা তাহার মানসিক দৌর্ব্বল্যমাত্র বলা যায় না। তাই যোগদর্শনের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে,—সর্ব্ব-জীবেরই—আমি যেন না মরি, এইরূপ যে কামনা বা মরণভয়, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না,—তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে। কিন্তু উহার কারণ বিচার করিতে গেলে যাহার মৃত্যুভয় জন্মে, তাহার পূর্ব্বে কখনও মৃত্যু-যাতনার অনুভব ও তজ্জন্য সংস্কার অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, যে যাহাকে কখনও তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করে নাই, সে কখনও তাহা হইতে ভীত হয় না। ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ। সুতরাং সর্ব্বজীবই যে, পূর্ব্বে মৃত্যুর যাতনাময় পূর্ব্বাবস্থার অনুভব করিয়াছে, এবং তজ্জন্য তাহার আত্মাতে ঐরূপ সংস্কার আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই সময়ে সর্ব্বজীবেরই সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বানু-ভূত সেই অবস্থার অস্ফুট স্মৃতিবশতঃ মৃত্যুভয় জন্মে। কদাচিৎ কাহারও কোন সময়ে কোন কারণে সেই সংস্কার অভিভূত হইলেও সেই বদ্ধমূল অনাদি সংস্কার সহজে কাহা-রও একেবারে বিনষ্ট হয় না। আত্মহত্যাকারী ও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আবার মরণভয়ে ভীত হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে, ইহা সত্য। ফল কথা, সর্ব্বজীবের যে মৃত্যু-ভয়, তদ্দ্বারাও আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও নিত্যত্বসিদ্ধ হয়।

(২) তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ।—যোগদর্শন ।৪।১০।

যোগদর্শনের ভাষ্যে ব্যাসদেব বিশেষ করিয়া ঐ মৃত্যুভয়-কেই সমস্ত জীবের পূর্ব্বজন্মের সাধকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ ॥ ৩।১।২১ ॥

অর্থাৎ নবজাত শিশুর যে প্রথম স্তন্যপানে ইচ্ছা, উহা তাহার পূর্ব্বজন্মে আহারের অভ্যাসজনিত। সুতরাং সেই ইচ্ছাপ্রযুক্তও তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর সর্ব্ব প্রথম স্তন্যপানকালে তাহার দৈহিকক্রিয়া-বিশেষ-রূপ চেষ্টা দেখিয়া তাহার স্তন্যপানে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তির অনুমান হয়। কারণ, প্রবৃত্তি ব্যতীত চেষ্টা জন্মে না এবং তাহার ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা সে বিষয়ে তাহার ইচ্ছার অনুমান হয়। কারণ, ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না। এবং তাহার ঐ ইচ্ছার দ্বারা তাহার জ্ঞানের অনুমান হয়। কারণ, জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা জন্মে না। যে বিষয়ে 'ইহা আমার ইষ্টজনক' এইরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়ে তজ্জন্য ইচ্ছা জন্মে এবং তজ্জন্য সে বিষয়ে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই প্রবৃত্তি জন্যই সেই কার্য্যের অনু-কূল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টা জন্মে। পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্য-কারণভাব সর্ব্বজনসিদ্ধ। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইলে 'আহার আমার ইষ্টজনক' এইরূপ স্মৃতিবশতঃ আহারে অভিলাষী হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সকলেরই 'আহারের পূর্ব্বাভ্যাসজনিত সংস্কার' বশতঃই আহার যে, ক্ষুধার নিবর্ত্তক, এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহাও সর্ব্বজনসিদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ কার্য্যকারণ-ভাবানুসারে নবজাত শিশুরও যে সর্ব্বপ্রথম স্তন্যপানেচ্ছা, তাহার কারণরূপে তাহারও তখন 'আহার আমার ইষ্টজনক,' এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার সংস্কারও স্বীকার্য্য হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাহার পূর্ব্বানুভবও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বজন্মও স্বীকার্য্য। কারণ, ইহজন্মে পূর্ব্বে সে আর কখনও স্তন্যপান করে নাই, অন্য কিছুও আহার করে নাই। পূর্ব্বজন্মে তাহার অনুভূত স্তন্যপানাদি বিষয়ে সংস্কার থাকিলেই তাহার সাহায্যে ইহজন্মে

তজ্জাতীয় স্তন্যপানাদিকে সে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া অনুমান করিতে পারে। নচেৎ তাহাও পারে না। সুতরাং নবজাত শিশুর পূর্ব্বজন্মে আহারাভ্যাসজনিত সংস্কার অবশ্যই স্বীকার্য্য হওয়ায় তাহার পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীতও বস্তুশক্তি বশতঃ লৌহ অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকের) অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ নবজাত শিশুও মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে। পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত যে প্রবৃত্তিই হয় না, ইহা বলা যায় না। কারণ, অয়স্কান্তমণি নিকটে থাকিলে তাহাতে লৌহের প্রবৃত্তি হইতেছে। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন—

নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ ॥ ৩।১।২৩ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, লৌহে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি নাই। অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের যে গতি, তাহা প্রবৃত্তিজন্য চেষ্টারূপ ক্রিয়াও নহে, উহা ক্রিয়া মাত্র। সুতরাং নবজাত শিশুর প্রবৃত্তিজন্য চেষ্টা রূপ স্তন্যপানক্রিয়া লৌহের ক্রিয়ার তুল্য নহে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের গতিক্রিয়ারূপ যে প্রবৃত্তি, তাহার অবশ্য কোন নিয়ত কারণ আছে। নচেৎ লোষ্ট প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যও অয়স্কান্তের অভিমুখে কেন গমন করে না? আর সেই লৌহই বা অন্য পদার্থে কেন ঐরূপ গমন করে না? সুতরাং লৌহই যে অয়স্কান্তমণিরই অভিমুখে গমন করে, ইহাতে কোন নিয়ত কারণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐরূপ নবজাত শিশু যে, স্তন্যপানের জন্য মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে, ইহাতেও কোন নিয়ত কারণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে নবজাত শিশু যে আহারেচ্ছা বশতঃই মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ সেই আহারেচ্ছা জন্যই তাহার আহারে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং তজ্জন্যই তাহার দেহে ঐরূপ চেষ্টা জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। কারণ, আহারেচ্ছা ব্যতীত কখনও আহার বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। সেই প্রবৃত্তি ব্যতীতও আহারের জন্য ঐরূপ চেষ্টা জন্মে না। সর্ব্বলোকসিদ্ধ কারণ ত্যাগ করিয়া উক্ত বিষয়ে অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বস্তুতঃ নবজাত শিশুর মাতৃস্তনের অভিমুখে যে সাময়িক গতি, তাহা কখনই অয়স্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের গতির তুল্য বলা যায় না। কারণ, অয়স্কান্তমণির নিকটে লৌহ রাখিলে তখনই তাহা ঐ মণিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু মাতৃস্তনে নবজাত শিশুর মুখ সংলগ্ন করিয়া দিলেও অনেক সময়ে তাহার মুখে ক্রিয়া জন্মে না। অনেক শিশু প্রথমে স্তন্যপান করে না, করিতে পারে না—এ জন্য প্রথমে তাহার মুখের মধ্যে মধু দেওয়া হয়। শিশু সেই মধু লেহন করে এবং অনেক পরে স্তন্যপান করে, ইহাও বহু স্থলে দেখা যায়। সুতরাং যে সংস্কারবশতঃ নবজাত শিশু স্তন্যপানকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া স্মরণ করে, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ঐরূপ স্মরণ না হওয়ায় স্তন্যপানে ইচ্ছা জন্মে না, ইহাই স্বীকার্য্য। নচেৎ অয়স্কান্তমণির নিকটস্থ লৌহের ন্যায় মাতৃস্তনের নিকটস্থ শিশুর মুখ সর্ব্বত্র প্রথমেই কেন মাতৃস্তনে উপস্থিত হয় না? এবং ক্ষুধা না থাকিলেও তখনও কেন মাতৃস্তনে উপস্থিত হয় না? আর ঐ যে শিশু হামাগুড়ি দিয়া নিজের অভিলষিত দ্রব্য ধরিতে যাইতেছে —আবার বাধা পাইলে ঘুরিয়া অন্য দিকে আসিতেছে, স্বহস্তে অখাদ্য লইয়াও মুখে দিতেছে, —আবার উহা কাড়িয়া লইলে কান্দিয়া পড়িতেছে, এই সমস্তও কি সে ইহজন্মেই পূর্ব্বে কাহারও নিকটে শিখিয়াছে? অথবা ঐ সমস্ত তাহার জ্ঞানমূলক কোন কার্য্য নহে? কেবল দৈহিক ক্রিয়া মাত্র?—সত্যের অপলাপ করিয়া বুদ্ধিমান্ নাস্তিকও কিন্তু ইহা বলিতে পারেন না।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম নবজাত শিশুর "স্তন্যাভিলাষ" বলিয়া নবজাত মানব-শিশুর ন্যায় গো-মহিষাদি-বৎসেরও প্রথম স্তন্যপানেচ্ছা তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মের সাধক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অনেক গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহার গোশালায় গোবৎস প্রসূত হইয়া নিজেই দাঁড়াইয়া তাহার মাতার স্তন্যপান করিতেছে। তপোবনে ঋষিগণ দেখিয়াছেন—মৃগশিশু প্রসূত হইয়াই স্বয়ংই তাহার জননীর স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু ঐ গোবৎস প্রভৃতি

তখন কিরূপে মাতৃস্তন চিনিতে পারে? এবং সেই মাতৃস্তনে যে দুগ্ধ আছে, ও তাহাতে প্রতিঘাত করিলেই যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় এবং সেই দুগ্ধপান যে তাহার ক্ষুধার নিবর্ত্তক, ইহাই বা কিরূপে বুঝিতে পারে? ঐ স্থলে তাহার ঐ সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি ব্যতীত কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা ও তজ্জন্য প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ঐরূপ চেষ্টা হইতেই পারে না। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীতও তাহাদিগের ঐ বিষয়ে স্মৃতিরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব তাহাদিগের পূর্ব্বজন্ম স্বীকার্য্য হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। মৃগশিশু প্রসূত হইয়া স্বয়ংই তাহার জননীর স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও আত্মার চিরস্থায়িত্ব বা নিত্যত্ব বিষয়ে অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তি প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সরল ও সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন—

পূর্ব্বজন্মানুভূতার্থ-স্মরণাম্মৃগশাবকঃ।
জননী-স্তন্য-পানায় স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে॥
তস্মান্নিশ্চীয়তে স্থায়ীত্যাত্মা দেহান্তরেষ্বপি।
স্মৃতিং বিনা ন ঘটতে স্তন্যপানং শিশোর্যতঃ॥৭।৬।৭॥

আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম শেষে বলিয়াছেন—

বীত-রাগ-জন্মাদর্শনাৎ॥ ৩।১।২৪॥

তাৎপর্য্য এই যে, যাহার জন্মের পরে কখনও কোন বিষয়ে কিছু মাত্র রাগ বা অভিলাষ জন্মে না, যে সর্ব্বদা সর্ব্বথা বীতরাগ, এমন কোন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। সমস্ত প্রাণীই জন্মের পরে কখনও কোন না কোন বিষয়ে রাগবিশিষ্ট হয়, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সমস্ত প্রাণীরই শারীরিক ক্রিয়া বা চেষ্টার দ্বারা তাহাকে কোন বিষয়ে সরাগ বলিয়া অনুমিত হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়েও সমস্ত প্রাণীরই কখনও অবশ্য রাগ বা অভিলাষ অবশ্যই জন্মে, সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যেক জন্মের পূর্ব্বেই তাহার অন্য জন্ম স্বীকার্য্য; নচেৎ তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ রাগ জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বজাত সংস্কার ব্যতীত কখনই কোন বিষয়ে কাহারই রাগ বা অভিলাষ জন্মে না।

আত্মার উৎপত্তিবাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন ঘটাদি দ্রব্য রূপাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিষয়বিশেষে রাগবিশিষ্ট হইয়াই সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়। জীবের ঐ রাগ দ্বারা তাহার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাও জীবের সহিতই উৎপন্ন হয়। জীবের যাহা উৎপাদক, তাহাই জীবের ঐ রাগেরও উৎপাদক। মহর্ষি গৌতম পরে নাস্তিকের ঐ কথারও উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন—

ন সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্॥ ৩।১।২৬

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, জীবের যে রাগাদি, তাহা জীবের সংকল্পজন্য। সংকল্প ব্যতীত কোন জীবেরই কোন বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে না।

এখানে গৌতমোক্ত ঐ "সংকল্প" শব্দের অর্থ কি, তাহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। "সংকল্প" শব্দের আকাঙ্ক্ষা-বিশেষ অর্থই প্রসিদ্ধ। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে "নহ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন"—এই বাক্যে এবং চতুর্থ শ্লোকে "সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে"—এই বাক্যে পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ অর্থেই "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু পরে "সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ"—ইত্যাদি চতুর্বিংশ শ্লোকে কামকে যে সংকল্পজন্য বলা হইয়াছে—ঐ সংকল্প জীবের মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, উহা আকাঙ্ক্ষারূপ সংকল্প নহে, ইহাই বহুসম্মত। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ সংকল্পকেও আকাঙ্ক্ষা-বিশেষই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী উক্ত শ্লোকে ঐ সংকল্প কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলেও শাঙ্কর-মতের ব্যাখ্যাতা আনন্দগিরি উহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—"সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ"। অর্থাৎ যাহা শোভন বা সমীচীন নহে, তাহাতে সমীচীন বলিয়া যে অধ্যাস অর্থাৎ সম্যক্ কল্পনারূপ ভ্রম,—তাহাই উক্ত শ্লোকে "সংকল্প" শব্দের অর্থ। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপই বলিয়াছেন। ঐ সংকল্পই জীবের সমস্ত কামের মূল, তাই সমস্ত কামকেই বলা হইয়াছে "সংকল্প-প্রভব"।—

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও যে, উক্ত সূত্রে মোহবিশেষরূপ সংকল্পকেই জীবের রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহা পরে তাঁহার অন্য সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, তিনি পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ" ॥ ৪।১।৬ ॥ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে যে সংকল্প জীবের রাগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম রঞ্জনীয় সংকল্প, এবং যে সংকল্প দ্বেষ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কোপনীয় সংকল্প। ঐ দ্বিবিধ সংকল্পই জীবের সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা তাহার মোহভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু, জীবের ঐ রাগ বা দ্বেষের জনক যে মোহরূপ সংকল্প, তাহাও তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত জন্মে না। কারণ, যে জীব যে বিষয়কে পূর্ব্বে কখনও তাহার সুখের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহারই আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ জন্মে—এবং যে বিষয় পূর্ব্বে কখনও দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহারই দ্বেষ জন্মে; নচেৎ তাহা জন্মে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুস্মরণ জন্যই প্রথমে তজ্জাতীয় বিষয়ে রাগজনক বা দ্বেষজনক মোহবিশেষরূপ সংকল্প জন্মে এবং তজ্জন্যই সেই বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। অতএব জীবের জন্মের পরে সর্ব্বপ্রথমে যে রাগ জন্মে, তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপ সংকল্প ব্যতীত জন্মিতে পারে না। ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় কখনই জীবের জ্ঞানমূলক রাগ জন্মিতে পারে না। জীবের যৌবনাদি কালে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তিতে যেরূপ জ্ঞান কারণ বলিয়া সর্ব্বসিদ্ধ, জীবের সর্ব্বপ্রথম রাগের উৎপত্তিতেও সেইরূপ জ্ঞানই অবশ্য কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। অভিনব কোন কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। ফল কথা, জীবমাত্রেরই যখন জন্মের পরে বিষয়বিশেষে রাগ অবশ্যই জন্মে, এবং সেই বিষয়ে সংকল্প ব্যতীতও সেই রাগ জন্মিতে পারে না এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীতও সেই সংকল্প জন্মিতে পারে না, তখন জীবমাত্রই পূর্ব্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে সেইরূপে অনুভব করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাতে ঐরূপ সংস্কার বিদ্যমান থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তৎপূর্ব্বজন্মেও সেই জীবের বিষয়বিশেষে সর্ব্বপ্রথম রাগের কারণরূপে ঐরূপ সংকল্প এবং তাহার কারণরূপে তৎপূর্ব্বজন্মে অনুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুস্মরণও স্বীকার্য্য। অতএব উক্তরূপে সমস্ত জীবেরই অনাদি জন্মপ্রবাহ ও অনাদি সংস্কারপ্রবাহ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আত্মার সংস্কারপ্রবাহের অনাদিত্ব বশতঃ ঐ অনাদি সংস্কারপ্রবাহের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ, অনাদি ভাব-পদার্থের উৎপত্তি নাই ও বিনাশ নাই, ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। উক্তরূপে মহর্ষি গোতম শেষে "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" এই সূত্র দ্বারা আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আত্মার বিলক্ষণ শরীরাদি-সম্বন্ধরূপ জন্মপ্রবাহ অনাদি। সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি, ইহাই আমাদিগের বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (ঋগবেদসংহিতা ১০।১৯০।৩) বিধাতা যথাপূর্ব্ব চন্দ্রসূর্য্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা বলিলে অনাদিকাল হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, ইহা বুঝা যায়। যে সময়ে তিনি জগতের সংহার করেন, সেই সময়ে প্রলয় হয়। প্রলয়কালেও নিত্য অসংখ্য জীবাত্মা এবং তাহাতে উৎপন্ন অসংখ্য বিচিত্র সংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। তদনুসারে পুনঃসৃষ্টিতে সেই সমস্ত জীবাত্মার পুনর্ব্বার অভিনব শরীরাদিসম্বন্ধরূপ জন্ম হয়। প্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইবে, তাহারই আদি আছে। সেই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি; অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বেই কোনদিন অন্য সৃষ্টি হইয়াছে। যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কখনও সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি, এই বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন (১)। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" (গীতা ১৫।৩)

কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের জন্মপ্রবাহ অনাদি হইলেও

১। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।
উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।
বেদান্তদর্শন ২।১।৩৫।৩৬ সূত্র।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" (গীতা ১৫।৩) ইতি। পুরাণে চাতীতানাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্। শারীরকভাষ্য।

অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে অনন্ত জীব অনন্ত জন্মলাভ করিয়া অনন্ত বিচিত্র সংস্কার লাভ করিলেও সমস্ত জন্মেই সমস্ত প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয় না। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে যখন যেরূপ দেহ পরিগ্রহ করে, তখন ঐ কর্ম্মের বিপাক বশতঃ তাহার তদনুরূপ সংস্কারই উদ্‌বুদ্ধ হয়; অন্যান্য সংস্কার অভিভূত থাকে। কোন মানবাত্মা মানবজন্মের পরেই নিজ কর্ম্মানুসারে বানরদেহ বা গণ্ডারদেহ লাভ করিলে, তখন তাহার বহুজন্মের পূর্ব্বকালীন বানরজন্ম বা গণ্ডারজন্মে লব্ধ সংস্কারই উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং উষ্ট্রদেহ লাভ করিলে বহুজন্মের পূর্ব্বকালীন উষ্ট্রজন্মের সংস্কারই তখন উদ্‌বুদ্ধ হয়। সুতরাং তখন তাহার মনুষ্যোচিত রাগাদি জন্মে না। বৈশেষিক-দর্শনে মহর্ষি কণাদ, "জাতিবিশেষাচ্চ" (৬।২।১৩) এই সূত্রের দ্বারা জাতি বা জন্মবিশেষও যে ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে বিভিন্নরূপ রাগের হেতু হয়, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কণাদের এই সূত্রবাক্য উদ্‌ধৃত করিয়া ঐ "জাতিবিশেষ" শব্দের দ্বারা যে কর্ম্মজন্য যে জাতিবিশেষ বা জন্মবিশেষের লাভ হয়, সেই কর্ম্মবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই কর্ম্মবিশেষও তদনুরূপ রাগ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ সেই জন্মের জনক অদৃষ্টবিশেষই ঐ স্থলে বহুপূর্ব্বকালীন সেই জন্মের সেই সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করে। সুতরাং কোন আত্মা মানবজন্মের অব্যবহিত পরে উষ্ট্রজন্ম লাভ করিলে পরে তখন তাহার বিজাতীয় বহুজন্মব্যবহিত উষ্ট্রজন্মের সংস্কারই উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় আহারাদি বিষয়ে উষ্ট্রোচিত রাগই জন্মে, মনুষ্যোচিত রাগ জন্মে না। কারণ, তখন তাহার মনুষ্যজন্মের সংস্কার অভিভূত থাকে, উহার উদ্বোধ হয় না। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও এই শাস্ত্রযুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) সেখানে ভাষ্যকার ব্যাসদেব উক্ত সিদ্ধান্ত বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ "অদৃষ্টাচ্চ" (৬।২।১২) এই সূত্রের দ্বারা পরে আবার বিশেষ করিয়া জীবের অদৃষ্টবিশেষকেও কোন কোন স্থলে রাগ ও দ্বেষের অসাধারণ হেতু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদৃষ্টবিশেষ বশতঃ সময়বিশেষে কোন স্থলে অনেক জীবের অভিভূত অন্যরূপ সংস্কারও উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাও বুঝা যায় এবং ইহার অনেক উদাহরণও প্রদর্শন করা যায়। সে যাহা হউক, মূল কথা—জীবের প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের পরে তাহার বিষয়বিশেষ সংকল্প ও তন্মূলক রাগাদি জন্মিতেই পারে না। আর এই যে বানরশিশু প্রসূত হইয়াই বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে, কোন কোন পক্ষিশাবক ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই উড়িয়া যায়, গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই তাহার মাতার নিকট হইতে পলায়ন করে, ইহা তাহাদিগের সেই সেই প্রাক্তন জন্মের সংস্কার ব্যতীত উপপন্ন হয় না। গণ্ডারীর তীক্ষ্ণধার জিহ্বার দ্বারা গণ্ডারশিশুর প্রথম গাত্রলেহন বড় কষ্টকর। তাই গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই প্রাক্তন গণ্ডারজন্মের সেই সংস্কারবশতঃ তাহার মাতা কর্ত্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরতা স্মরণ করিয়া তখনই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্ম্ম কঠিন হইলে অনুসন্ধান করিয়া আবার তাহার মাতার নিকটে আসে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এইরূপ মানবের ন্যায় বহু পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবেরও নানা বিচিত্র কর্ম্ম বা বিচিত্র স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলে তাহাদিগের পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ জীবের নানারূপ স্বভাব বা বিচিত্র রুচিও কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। মস্তিষ্কের জড় উপাদান বা পিতামাতার স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উহার কোন সমাধানই করা যায় না। এ বিষয়ে পরে আবার বলিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

১। ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনানাং।

জাতি-দেশ-কালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। যোগদর্শন-কৈবল্যপাদ ৮ম ও ৯ম সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্তবাবু সরযুর ঘরে গিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা দেওয়া সরযু পড়িয়া আছে, আর দাসী পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া দুধের বাটী হাতে তাহাকে খোষামোদ করিতেছে। "ঢুককরে দুধরত্তি খেয়ে ন্যান না, ছোটমা! বড় মাঠাকরেণ বল্লেক রাত-উপুসী থাকৃতে নেই—"

বসন্তবাবু ঘরে ঢুকিতেই দাসী জিভ কাটিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল, দুধের বাটী মাটীতে নামাইয়া প্রণাম করিল, তারপর সরিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামী উদ্বিগ্নমুখে স্ত্রীর মাথার দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "ছোটবৌ!"

কোন সাড়া মিলিল না, কিন্তু খানিক পরেই অস্ফুট একটুখানি কান্নার মৃদু শব্দ তাঁর কাণে ঢুকিল। সরযূ নাকি দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও কোন দিনই বড় একটা মান-অভিমান বেশী করিতে ভরসা করে নাই, প্রথমাবধিই সে বাধ্য বিনীত, দুর্দ্দান্ত শাশুড়ীর হাতে, তার পর প্রতিপত্তি-শালিনী তেজস্বিনী সপত্নীর অধীনে শান্তস্বভাব বশে সে ভীরুভাবেই কাটাইয়াছে, আজ নিতান্ত অসময়ে তাহার এই মানের কান্নাকে তাই রোগযন্ত্রণা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিয়া লওয়া বসন্তবাবুর পক্ষেও সম্ভব হইল না। তিনি খাটের উপর বসিয়া সরযুর মুখাবরণ মোচনের চেষ্টা করিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—

"কেন, কেন কাঁদছো কেন? বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে? কোথায় লাগছে কি? ডাক্তার ডাকতে বলো নি কেন? অর্দ্ধেন্দুবাবুকে ডেকে পাঠাই? ঝি! সরকার মশাইকে গিয়ে বলো—"

সরযু প্রমাদ গণিয়া তাড়াতাড়ি তার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ফেলিল, মুখের ঢাকা কাপড় সে খুলিতে দিল না, চোখের জলে ভেজা চাদরটা মুখের উপর মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া; সে অশ্রু-গদগদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"আমার আবার ডাক্তার কেন? মরতে পেলেই জুড়িয়ে যাই, আমারও লাগে, সেই সঙ্গে সবারই হাড়ে বাতাস লাগে।" বলিয়াই দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

কিছু বিস্মিত হইয়া বসন্তবাবু কহিলেন, "এ কথা বল্ছো কেন, ছোটবৌ! ওঃ, বড়গিন্নি বুঝি ডাক্তার-বদ্যি ডাকান নি, তাই মনটা একটু চটেছে! তা' তাকে ডাকিয়ে বল্লে না কেন, তোমার কষ্ট বেশী হচ্ছে জানলে সে যে কিছু করতো না, তা' তো মনে হয় না!"—

শোভা আঁতুড়ে সরযূর যখন পিওরপার্লফিভার হইয়া জীবনসংশয় হয়, একবার খাওয়ার অনাচারে তার সিরিয়াস-টাইপের কলেরা হয়, ছোঁয়াচের ভয়ে তখন বসন্তবাবু তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠ মাড়ান নাই, কিন্তু কি সেবা ও কি চিকিৎসা বিন্দু তার করিয়া ও করাইয়াছিল, সে কথা বসন্তবাবুর মনে পড়িল। এমন কি, সংবাদ পাইয়া বিন্দুর বাবা কলিকাতা হইতে এক জন নামজাদা ভাল ডাক্তার লইয়া নিজে আসিয়াছিলেন।

এই সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে সরযুর কিন্তু উত্তপ্তচিত্ত শান্ত না হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, বড়গিন্নির আক্কেল, বিবেচনা ও বুদ্ধির তারিফ, আর তার সঙ্গে তুলনায় তার নির্বুদ্ধিতার খোঁটা সে এ বাড়ীতে ঢুকিয়া পর্য্যন্তই শুনিয়া আসিতেছে, সে শুনিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়া উঠার মত মনের অবস্থা তার আজ একবারেই ছিল না, সে সাপের মত ফোঁস্ করিয়া মাথা তুলিল, চিরদিনের সমস্ত সহিষ্ণুতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল,—

"না, বলি নি, বল্বার কিছু দরকার নেই, ডাক্তারে আমার করবে কি? চব্বিশ ঘণ্টা অপমানের আগুনে যে পুড়ে মরছে, ডাক্তারীতে তার কোন ওষুধ আছে যে সে আমায় খাইয়ে এর জ্বালা নিবৃত্তি করে দেবে।"

উত্তেজনার আবেগে সে গায়ে-মুখে ঢাকা দেওয়া চাদর ফেলিয়া দিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সমস্ত দিনের উপবাসে মুখ-চোখ তার বসিয়া গিয়াছে, সারাদিনের কান্নার

কান্নায় দুই চোখের কোল ফুলিয়া উঠিয়াছে, চোক দুইটা লাল হইয়া আছে।

সরযূর এমন মূর্ত্তি ও এ রকম ঝাঁজালো কথা বসন্তবাবুর শোনা অভ্যাস ছিল না, গালে চড় মারিলেও যারা 'রা' করে না, সরযূ ছিল তাদের মধ্যেই এক জন। বসন্তবাবুর ধারণা এই রকমই ছিল, তিনি তাকে সেই রকমই দেখিয়া আসিতেছেন। তাই তাকে আজ এতখানি উত্তেজিত আত্মবিস্মৃত দেখিয়া তিনি কিছু বেশী রকমই বিস্ময়ানুভব করিলেন।

সরযূর উত্তেজনারক্ত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া সাশ্চর্য্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপমান তোমার কে করলে, ছোটবৌ! এত সাহস কার হবে যে, তোমায় অপমান করবে?"

সরযূর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, কান্নায় তার গলা ধরিয়া যাইতেছিল, তথাপি রাগের জ্বালায় অভিমানের কান্নাকে চাপিয়া লইয়া, সে গুমরাইয়া কহিল, "সাহস যার আছে, অপমান করতে চিরদিন ধ'রে সেই করে। তা' আমার কায যা, সে ত অনেক দিনই চুকে গেছে, আর কেন আমি অনর্থক এ সংসারের ভার হ'য়ে আছি, আমায় একটু আফিম-টাফিম আনিয়ে দাও, খেয়ে আমি সকল জ্বালার শেষ করে ফেলি।"

বলিয়াই সরযূ এবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং শুনিয়াই বসন্তবাবুর দুর্ব্বলচিত্ত ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, সরযূর দাসী দুধের বাটী হাতে তখনও সেই রকম দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া তাঁর মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, দাসীকে ধমকাইয়া উঠিলেন, "তুই মাগী এখানে কি করছিস, বাটী রেখে দিয়ে চলে যা।"

তার পর দাসী বাহির হইয়া গেলে সরযূর কাছে সরিয়া আসিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "কি কুকথা মুখ দিয়ে বার করছো সরযূ! তুমি আমায় ফেলে গেলে এই বুড়ো বয়েসে আমার কি দশা হবে বল তো?" বলিয়া কোঁচার কাপড়ে তার মুখ মুছাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন।

সরযূ কিন্তু ইহাতে শান্ত হইল না, সে স্বামীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে কহিতে লাগিল, "তোমার আর ক্ষতি কিসের? বড় গিন্নী রয়েছেন, উনি বিদুষী, কর্ম্মিষ্ঠী, কত জানেন, কত শোনেন, আমি তো বোকা, মুখ্যু, আমি থেকেই কি, আর না থেকেই কি?"

বসন্তবাবু সরযূর মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া ফিরাইয়া একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বেল পাকলে কাকের কি? তিনি যা আছেন, সে তো আছেনই; বলি, আমার তাতে কি পেটটা ভরবে! রাত্রে যদি হার্টফেল হয়ে বিছানায় মরে থাকি, তিনি কি আমার মুখে জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাবেন? তাই তো বল্‌ছি ছোটবৌ! যতই যা হোক্, আমার কথাটা ভেবে দেখো, খাম্‌কা রাগের মাথায় একটা কিছু করে বসে, আমায় যেন অকূলে ভাসিও না।"

স্বামীর এই কথায় সরযূর মনটা একটু নরম হইয়া আসিল। ওই সর্ব্বনেশে 'হার্ট'-ফেলের কথাটায় তার গায়ে একটা কাঁটা দিল। সে স্বামীর কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে—"ছি, কি যে বলো;" বলিয়া তাঁর গায়ের উপর হাতটা রাখিল। তখন বসন্তবাবু দুধের বাটীটি তুলিয়া তার হাতে দিয়া বলিলেন, "তবে লক্ষ্মী হয়ে দুধ-টুকু খেয়ে নাও দেখি, তার পর ও-সব কথা হবে এখন।"

সরযূ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, সে নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিল।

সমস্ত শুনিয়া বসন্তবাবুর মুখ একটু গম্ভীর হইল। তিনি একটু ভারী গলায় উত্তর করিলেন, "এ তা' হ'লে বিন্দুরই দোষ! কেন, সে এমন করে শশীকে বিয়ে না দিয়ে আটকে রাখছে, সেই জানে! এ' তো খুব বড় সম্বন্ধ, এ ছাড়া তার উচিত নয়, আচ্ছা আমি কাল তাকে বুঝিয়ে বল্‌বো, আমি বল্লে, না বলতে পারবে না।"

সরযূ স্বামীর আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও পূর্ণ-রূপে সে বিশ্বস্ত হইতে পারিল না। অর্দ্ধ অবিশ্বাসে কহিল, "এখন তো বল্‌ছো, দিদির সামনে কিনা কথাটি কইতে ভরসা তোমার হবে! তা হলে আর আমার দুঃখ কি ছিল?"

বসন্তবাবু নিজেও বিন্দুর এতৎসম্বন্ধীয় একগুঁয়েমীতে মনে মনে কিছু বিরক্ত বোধ করিতেছিলেন। আজিকার এ বিবাহ-সম্বন্ধ তাঁর নিজের মনঃপূতই ছিল, তিনি কন্যাপক্ষকে জানিতেন, তাই অসন্তুষ্টভাবে জবাব দিলেন,—

"দেখ ছোটবৌ! তার'পরে একটা অন্যায় করা হয়ে গেছলো বলে, সহজে তাকে কোন কিছুতেই চটাই না, কিন্তু সে যদি তাই বলে মাথার উপর পা দিয়ে চলতে থাকে,

সেটাও কি সইতে হবে! আমি তো এ সম্বন্ধর কোন দোষ দেখছি নে। ছেলেও মস্ত ডাগর হয়ে উঠেছে, আর কেন দেরী করা! নাঃ, এ বড়গিন্নীর অন্যায় আবদার!"

এবার খুসী হইয়া সরযূ নিজেই নিজের আঁচলে মুখ চোক মুছিয়া ফেলিয়া এলোমেলো চুলগুলা গুছাইতে গুছাইতে প্রসন্ন-মুখে কহিল, "দেখ, যতই হোক্, আমারও তো মায়ের প্রাণ। ছেলেটা তো খারাপ হয়েও যেতে পারে।"

বসন্তবাবু সায় দিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা! সে তো যেতেই পারে। আচ্ছা দেখছি আমি, যাতে ওই মেয়ের সঙ্গেই শশের বিয়ে দিতে পারি, তাই করছি।"

সরযূ একবারে উৎফুল্ল স্মিতমুখে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "রাত হয়ে যাচ্ছে, চল তোমায় ঘুম পাড়িয়ে আসিগে, ঘুম চড়ে গেলে আবার সারা রাত্তির ঘুম হবে না।"

পরদিন আহারে বসিয়া বসন্তবাবু সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বিন্দুবাসিনীও সেটুকু বুঝিয়াছিল; তাই স্বামীকে বেশীক্ষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে না রাখিয়া, সে তাঁর প্রত্যাশিত অবসর আপনিই দান করিতে আসিল। শোভা বড়মার অনুজ্ঞামত প্রত্যহই বাপকে বাতাস করিতে আসে, তারও পিতৃসেবার এই একটিমাত্রই অবসর। অন্য সময়ে বড় হইয়া পর্য্যন্ত সে বাপের কাছে যাইবারই সুবিধা পায় নাই, চায়ও নাই, আজ বিন্দু আসিয়া শোভার হাত হইতে পাখা লইলেন, বলিলেন, "যা তো মা! বৌমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, একলা আছে, ওর কাছে একটু বসগে।"

শোভা বাঁচিয়া গেল। বাপের কাছে চুপচাপ সমীহর সহিত বসিয়া থাকা তার কাছে কিছুমাত্র আকর্ষণীয় নহে, বড়মার ভয়েই সে শুধু এইটুকু করে, নতুবা পিতৃভক্তির প্রাবল্যে নহে। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উঁহাদের মধ্যে উভয়তঃ আকর্ষণটা কমই। সে পাখা বড়মাকে দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং এক লাফে ঘরের বাহির হইয়া গিয়া ছুটিতে ছুটিতে প্রতিমার মহলে উপস্থিত হইল। প্রতিমা বিছানায় শুইয়া নভেল পড়িতেছিল, মেঝেয় বসিয়া তার অপুষ্ট রুগ্ন ছেলেকে ঝি ফিডিং,বটূলে অ্যালেনবেরির ফুড খাওয়াইতে ছিল, খাদ্য ফুরাইয়া গেলেও মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশু তার অতৃপ্ত স্তন্য-পিপাসা শুষ্ক নিঃসার চামড়ার 'টিটে' মিটাইতেছিল, কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। সে আসিয়া ঝিকে ধমক দিল, "তুলসীর মা! তোকে বড়মা খালি 'টিটে' চোসাতে বারণ করেছে, একটু মধু দিয়ে দিতে পারিস্ নে!"

প্রতিমার কাছে শুইয়া পড়িয়া সে তার হাতের বইখানা লইল। প্রতিমা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "দে ভাই ঠাকুরঝি, দে ভাই! ওটা শেষ হয়ে এসেছে, ভারি ইন্‌টারেস্‌টিং হয়ে উঠেছে রে, সত্যি, এ সময় নিস্ নি।"

শোভা বইখানার উপর চাপিয়া শুইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "ইস্লো! আমার চাইতে তোর ওই পচা পুরণো কতকেলে বই ইন্‌টারেস্‌টিং হলো! হলেই হলো অমনি! কখনো তা হ'তে পারে না! তুই কোন দিন দেখছি, আমার বড়দার চাইতে তরকারী-বাগানের ভুবন মালিটাকেই হয় তো ইন্‌টারেস্‌টিং দেখে ফেল্‌বি।"

"দূর, দূর পোড়ারমুখি! তুই বুঝি তাই দেখিস্?" এই বলিয়া প্রতিমা সকোপে ননদের পিঠে দুইটা কিল মারিল।

"বৌদি! এই তোর রোগ হয়েছে! বাব্বা, হাতের জোর তো কম নয়! আচ্ছা আয় তবে আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড় দেখি, পারিস্ কি না দেখা যাক্।"

দুইজনে হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল।

শোভা ঘর ছাড়িয়া যাইবামাত্রেই বসন্তবাবু মাছের মুড়ার উপাদেয় ভোজ্য ভোজনে ব্যাপৃত থাকিয়া, এক-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "শশীর জন্যে যে বিয়ের সম্বন্ধটা ওর মামাবাড়ীর ওখান থেকে এসেছে, সেটা তো খুব ভালই, তা দিলে দোষ কি? মেয়ে সুন্দর, দেবেও যথেষ্ট, ঘরটাও খুব বনেদি, এক দিন তো দিতেই হবে, হোক না।"

বিন্দু মনে মনে হাসিলেও মুখে গম্ভীর হইয়া রহিল, সংক্ষেপে সে শুধু উত্তর করিল, "এখন না।"

বসন্তবাবুর সাহস তাঁর মনের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তথাপি কিছু ভরসা সংগ্রহপূর্ব্বক ঈষৎ জোরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "ছেলে তো ছেলেমানুষ নয়, এখনই বা দিলে ক্ষতি কি? সব সময় কি এ রকম সম্বন্ধ পাওয়া যায়?" একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া যোগ করিয়া দিলেন, "শরতের যে বিয়ে শ্বশুর মশাইয়ের পছন্দে দেওয়া গেছে, এ তার চাইতে তো ভাল বই মন্দ নয়!"

বিন্দু এই খোঁচাটুকু বুঝিয়া ঈষৎ দৃষ্টিতে বারেকমাত্র স্বামীর মুখে চাহিয়া দেখিল। তার পর যথাপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে অনুত্তেজিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে শান্তকণ্ঠে কহিল, "বলেছি তো,

তার একজামিনের আগে আমি তার বিয়ে দোব না, তা' যত ভাল সম্বন্ধই হোক।" বিন্দুর স্বরের দৃঢ়তায় ও যুক্তির অটলতায় বসন্তবাবুর বলভরসা ফুরাইয়াই গেল। কিন্ত গত রাত্রিতে সরযূ যে ভয় তাঁহাকে দেখাইয়াছে, তাঁহার ভীরুচিত্ত তাহার সম্ভাবনায় ভয়ে এখনও সুস্থির হইতে পারে নাই, সরযূ নহিলেও যে তাঁর চলে না, সেটুকুও সেই সঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে। তাই কিছু বিরক্ত হইয়াই কহিলেন, "সব বিষয়েই এত জিদ ভাল নয়, বড়বৌ! ছোট-বৌএরও তো শশের উপর একটু দাবী আছে, ওর যখন অত সাধ, তখন তোমার সতীন ব'লেই যে সব তাতে বাধা দিতে হবে, এমনই কি? না—না অমত করো না, ঐখানেই ওর বিয়ে দাও। আমার খুব ইচ্ছা যে, এই মেয়ের সঙ্গেই হয়।"

বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আহার সমাধা করিতে লাগিলেন। বিন্দু এবারও মনে মনে হাসিল, বাহিরে তার মুখভাব এবারও বদল হইল না, কণ্ঠে শুধু ঈষৎ একটুখানি ব্যঙ্গাভাস প্রকাশ পাইল মাত্র। অনুত্তেজিত ধীরকণ্ঠে সে উত্তর দিল, "তা হ'লে তোমরা তাই দিও, আমার মত হবে না।"

বসন্তবাবু কঠিন-মুখে বলিয়া বসিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর কোন ভরসাই যেন আর বাকি রহিল না।

রাত্রিতে সরযূ আবার যখন কাঁদিয়া বলিল, "দেখলে! আমি তো বলেছিলুম!"

তখন তাঁর সুপ্ত সাহস পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। তিনি সরযূকে আদর করিয়া ভুলাইয়া কহিলেন, "দেখবো আবার কি? কালই আমি ওদের চিঠি লিখে দোব, পাকা-দেখার দিন স্থির করতে।" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

"পতন ও মূর্চ্ছা"

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
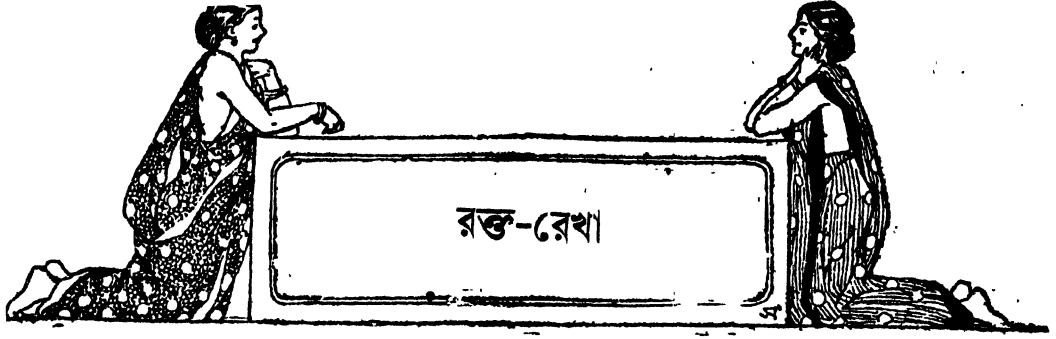
১

ফুটপাথের ভিখারীদের সম্মুখ দিয়া চলার সময়ে মাঝে মাঝে কি ভাবিয়া মিহির থামিত,—তার পর উজ্জ্বল চোখ দুইটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া বলিত,—"তোরা জানিস্ না? আমাকে যক্ষ্মায় কুরে কুরে নিচ্ছে—তাই ত আমার সব নিষ্প্রভ—মাত্র চোখ দুটি অস্বাভাবিক!"

তার পর আবার কি ভাবিয়া চুপ করিয়া যাইত। আবার সহসা জোর দিয়া বলিত, "এই দেখ না, আমার আঙুলের ডগা—এতটুকু রক্ত নাই—একেবারে সাদা—"

বলিতে বলিতে ক্রমেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। তার পর বলিত, "জানিস্ না—আমাদের বাঙ্গালা জাতটাকেও যক্ষ্মায় ধরেছে? চুষে চুষে সব রক্ত শুষে নিচ্ছে? সর্ব্ব অঙ্গ নিষ্প্রভ—মাত্র তার মস্তিষ্কটা উজ্জ্বল। মরণের দ্বারে এসেছে কি না? ঠিক আমার মত,—"

ভিখারীর দল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখে—অর্থ কিছু বুঝিতে পারে না। ভিখারীর সাথে এক বাবু কথা বলিতেছে—লোভে পড়িয়া চারি দিক হইতে অন্য ভিখারী ঝুঁকিয়া আসে, বুঝি বা কতই না পাইবে!

মিহির তাহার ক্ষীণ শ্বাসটাকে অস্বাভাবিক জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল। গল্‌গল্ করিয়া কতখানি রক্ত মুখ ছাপাইয়া বুকের উপর পড়িল, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। পৃথিবীটা এক নিমেষে অন্ধকারের ঘূর্ণীরথে দুলিতে লাগিল। কোন রকমে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি মরতে যাচ্ছি, এই যে রক্ত উঠেছে, এ আমার বুকের রক্ত—মরণের আগমনী।"

ভিখারীর দল ভয় খাইয়া পিছন ফিরিল।

"তোরা পালাচ্ছিস্ কেন? রক্ত দেখে? তোরাও ত বাঙ্গালার এক এক কণা বুকের রক্ত—তোরাও ত তার মরণের আগমনী।"

মরণ শব্দ শুনিয়াই ভিখারীর দল সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পুলিস আসিয়া বলিল, "এখানে হাল্লা করো কেন?"

মিহির তাহাকে ভালো করিয়া দেখিল—তার পর নিষ্প্রভ মুখখানিকে হাসির তরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "জানো না? এ যে যক্ষ্মার গন্ধ!" গল্‌গল্ করিয়া আর এক ঝলক রক্ত উঠিল—ভীত পুলিস অন্য দিকে সরিয়া গেল।

জামার হাত দিয়া রক্তের ধারা মুছিতে মুছিতে মিহির আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"বাবু একটা পয়সা দাও না? আমি যে আজ কিছু খাই নি!" ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা ছোট একটি ভিখারী বালক। যেমন সব পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহাদের দলেরই এক জন।

মুখ ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে মিহির বলিয়া উঠিল,—

"সারা বাঙ্গালা দেশটা খেয়েও তোদের পেটের জ্বালা মেটে নি? এত খেয়েছ যে, একটা দিন উপোস দিলেও কিছু হবে না।"

তার পর আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমি যদি নীরো হতাম ত একবার বাঙ্গালার বুকে আগুন লাগিয়ে দেখতাম—আগুনের শীষ কত দূর উঠে।"

বালকটি ইহা প্রত্যাশা করে নাই—ভিক্ষা চাহিলে কখনও সহজে মেলে—কখনও বা মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খোসামুদি করিতে হয়। অদ্ভুত ভঙ্গীর অর্থহীন কথা কোন দিন শোনার অভ্যাস নাই। আবার বলিল,

"বাবু, আজ যে আমি কিছু খাই নি—"

"কেই বা খেয়েছে? আমি খেয়েছি? আজ তিন দিন আমিও খাই নি।"

"বাবু দাও না একটা পয়সা?"

মিহির এবার রাগিয়াই উঠিল, তার পর কি ভাবিয়া সংযত-স্বরে বলিল, "খাস্ নি? মিছা বলছিস্। আচ্ছা চল, সুমুখের ঐ বাড়ী—এখানে ত আমার কাছে পয়সা নাই।" বালক দূরে যাইতে রাজী হইল না।

মিহির আপন মনে বলিল, "অলসতা—ঠিক ধরেছি। ভিক্ষা করতে পর্য্যন্ত অলসতা—সংশয়!" তখন বালকের দিকে ফিরিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, "জানিস্ না—এই অলসতায় আমার বুকে যক্ষ্মা ধরেছে—আরো কত সবার বুকে? না—তুই ছোট-মানুষ—তুই আর কি বুঝবি? চল, সত্যি পয়সা দেবো।"

* * * * *

বালককে লইয়া আধা আঁধার-গলির পথে স্যাঁৎসেঁতে একটা বাড়ীর সুমুখে উপস্থিত হইল। নিজের ঘরে ঢুকিতে মিহির বলিতে লাগিল, "ভয় নাই—আমার যক্ষ্মা কি না—তাই এ ঘরময় সব রক্তরেখা—লালে লাল। এ সব আমার নিজের বুকের রক্ত। দুর্গন্ধ পাচ্ছিস্? দুর্গন্ধ আবার কি? নিজের রক্তে কেউ কি আর গন্ধ পায়?"

বালক ভীত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

"তুই ভাবছিস্—আমি এত রক্ত কেন বের করেছি? রক্ত বাইরে এলেই লোকের মনে পড়ে তার রক্ত ছিল। তাজা হলে

কি আর জানতে পারে, শরীরের কোন ধমনীতে শোণিত বইছে ? অস্তিত্বের জ্ঞানই যে লুপ্ত থাকে।"

বালক সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "বাবু আমার পয়সার দরকার নেই, আমি চল্লুম।"

"এই আবার ভয় খেয়েছে—ভয় কি ? মরণ-পথের যাত্রীর আবার আঁধারে ভয় ? ভাবছিস্ আমার পয়সা নেই—এই আমি বাক্স খুলে দেখাচ্ছি কত পয়সা ?"

মিহির তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া পয়সা খুঁজিতে লাগিল—বিছানা-পত্র ওলট-পালট করিল, কিন্তু কোথাও একটা পয়সা পাওয়া গেল না।

"আচ্ছা চল—এখানে ত পয়সা নাই, আর এক জায়গায় দিচ্ছি !"

"বাবু আমাকে ছেড়ে দাও—আমার পয়সার দরকার নাই—"

"ছেড়ে আমি দিচ্ছি না—তোর পয়সা নিতেই হবে।"

বালককে লইয়া মিহির আবার পথ ধরিয়া চলিল।

* * ০ ০

একরাশি পঠিতব্য-অপঠিতব্য কাগজ-স্তূপের মধ্যে বসিয়া সম্পাদক লেখা খুঁজিতেছিলেন। অফুরন্ত উপলখণ্ডের মধ্যে যদি মাণিকের টুক্‌রা কুড়াইয়া পান, শুধু এই আশায়। ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজাও ইহা হইতে আরামের—ক্ষ্যাপাকে প্রত্যেক উপলখণ্ড লইয়া অতিরিক্ত বিবেচনা করিতে হয় না।

ভিখারী বালকটিকে দরজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মিহির ত্রস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"আমাকে দশটা টাকা দিন ত ?"

উল্লসিত কণ্ঠে সম্পাদক বলিলেন, "তাই ত—অনেক দিন যে দেখা নাই ? আপনি ত আর লেখা দিচ্ছেন না—এদ্দিন ছিলেন কোথা ? বসুন বসুন—"

"না বসার সময় নাই—আমার টাকার খুব দরকার।"

"কিন্তু আপনার হিসাব ত মিটিয়ে দিয়েছি—"

"আগাম দিন—কাল একটা লেখা পাঠিয়ে দেবো—"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন, ভুলবেন না ? এ মাসেই আপনার লেখা একটা বের করতে চাই।"

"ঠিক পাঠিয়ে দেবো—"

টাকা লইয়া মিহির বাহিরে আসিল।

রাস্তায় দাঁড়াইয়া বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তুই পয়সা চেয়েছিলি—কত পেলে তুই খুসী হবি ?"

"বাবু আমার পয়সার দরকার নাই—আমায় ছেড়ে দাও—"

"তা দিচ্ছি—কিন্তু কত নিবি ?"

"অনেক ঘুরিয়েছেন—এজন্য দু' আনা দিতে হবে।"

বালকটির হাতে দশটা টাকাই গুঁজিয়া দিয়া মিহির বলিল, "এ সব তোর—"

বালকের ইহা ধারণারই বাহিরে। এত টাকা একদিনের ভিক্ষায় পাওয়া ! অপ্রত্যাশিত আনন্দে বালকের মুখখানা উছলিয়া উঠিল।

মিহির ফিরিয়া বলিল—"একটুখানি দাঁড়া—তোকে একবার দেখে নিচ্ছি।—আশার অতিরিক্ত পেলে লোকের মুখখানা কত খুব উজ্জ্বল হয়।"

মিহির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বালকের মুখের প্রত্যেক রেখাক্ষ দেখিতে লাগিল—তারপর আপন মনে বলিল,—"আমি এরূপ ঠিক কল্পনায় দেখেছি—এর অনুভূতিও কত আনন্দের ? বাঙ্গালার মুখের রেখাক্ষ ঠিক এমনি করে ফুটে ওঠে ?" দ্রুতপদে মিহির অন্ধকার গলির মধ্যে লুকাইয়া গেল।

* * * * *

"যুগ-ধারায় চঞ্চল-তরঙ্গে পাদবিক্ষেপ ডষ্টয়ভেস্কির বৈশিষ্ট্য। ডষ্টয়ভেস্কি যেন শতাব্দীর প্রতীক—। শুধু তরঙ্গের উন্মত্ত কম্পন—! প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়াছে, আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে, উত্তর মিলিয়াছে ভালই,—না হইলে প্রশ্নগুলিই হিমালয়ের মত মানব-সমাজে দৃঢ়মূল হইয়াছে।

"যুগ-যুগান্ত প্রশ্নের সমাধান করুক।—টলষ্টয়, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমাপ্তি দেখিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—উত্তর তাঁহাদের চোখের সম্মুখে। ডষ্টয়ভেস্কির উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আর অন্য সব যুগ-যুগান্তের মানবের ভাবধারার ইতিহাস—"

মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মিহিরের মুখ দিয়া আবার এক ঝলক্ রক্ত উঠিল, হাতের কলম খসিয়া গেল। সারাটি রাত অচৈতন্যের মত সেই রক্তাপ্লুত শয্যাতেই কাটিয়া গেল, বাতিটা কখন নিবিয়া গিয়াছে, কে জানে !

সকাল বেলার তাজা রোদে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল,—সে বড় দুর্ব্বল, জীবনীশক্তি তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর শরীরটাকে বেশী দিন রাখা চলিবে না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ইচ্ছা হইল, পৃথিবীটাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। কত রূপে রসে গন্ধে আনন্দের ঝরণার ধারা—ইহার বুকের উপর ঝরিয়া পড়ে। লেখা আর হইল না।

* * * * *

২

সহরের কোলাহলে জীবনী-শক্তি অনুভূত হইতেছিল। মিহির আপনার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার সকল রস টানিয়া লইতেছিল। আর তাহার দিক জ্ঞান নাই। জীবনের আনন্দ—মরণের অবসাদ, জীবনের চঞ্চলতা—মরণের নির্জ্জীবতা ভুলিয়া এত মরণের মাঝেও কেমন নৃত্য-রঙ্গে ছুটিতেছে দুঃখ-দৈন্য-মরণ শুধু মানুষকেই কাতর করে, নির্ম্মম পৃথিবীর বুকে একটুও দীর্ঘশ্বাস বহায় না—।

"বাবু !"

সচকিতে মিহির চাহিয়া দেখিল, ছোট একটা অন্ধকার গলিমুখে সেই ভিখারী বালক—তাহার মুখেও জীবনের আনন্দ "বাবু, এখানেই আমাদের বাসা, দেখবেন কি ?"

উদ্দেশ্যহীন মিহির কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—

"আচ্ছা চল—"

অন্ধকার গলির মধ্যে ততোধিক অন্ধকার একটা জীর্ণ বাড়ীর মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল।

বাড়ী জীর্ণ, চূণকাম বোধ হয় সেই প্রথম নির্ম্মাণকালে হইয়াছিল—তার পর সময় আর এক পাল জীর্ণ-ভিখারী পরিবার বছরের পর বছর সেই বাড়ীটাকে আরও ছায়া-মলিন করিয়া দিয়াছে।

ছোট বাড়ী, এক রাশ লোক, এতটুকু আলোর পরশ। মানুষের ইচ্ছার কাছে সূর্য্যও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। ভিজে বদ্ধ বায়ু, আবর্জ্জনার স্তূপ—মানুষের পায়ের গন্ধ।

একটি একটি অধিবাসী—একটি একটি কঙ্কাল, শুধু চামড়া দিয়া ঢাকা। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুইটি চোখ। দৈন্য দারিদ্র্য জীর্ণতার মাঝে তাহাদের মস্তিষ্ক শুধু অস্বাভাবিক প্রখর হইয়াছে—আর তাহার পরিস্ফুরণ চোখ দুইটিতে। জীবন-যাত্রার বাহন শুধু মস্তিষ্ক, তা যত না কেন হীন খাতেই চালান যাউক—ছেলে বুড়া মেয়ে মরদ সব।

মিহির একটু সঙ্কুচিত হইল—মনে জাগিল, আমরা ভাবি এরা সমাজের কত শত্রু? কিন্তু তাই কি? সমাজই যে এদের একঘরে করিয়া আমাদের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে।

* * * * *

৩

বালককে ফিরিতে দেখিয়া তাহার মাতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'হতভাগা, কোন সকালে বেরোতে বলেছি এখনও—?' পুত্রের সঙ্গে এক আগন্তুক দেখিয়া মাতা থামিয়া গেল। বালকটি বলিল—"বাবু, এই আমাদের বাড়ী—এই আমার মা।" মিহির দেখিল—দুঃখ-দৈন্য-জরার প্রতিচ্ছবি। সাথে সাথে পঙ্গপালের মত অনেকগুলি ছেলে মেয়ে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা প্রায় সবই দিগম্বর—রুক্ষ চুলে, ক্ষীণ শরীরে ময়লার দুর্গন্ধ—পঞ্জরের হাড়গুলি বক্ষোচর্ম্ম ভেদ করিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠিতেছিল। মাংসশূন্য মুখের কাঠামোর মাত্র দুইটি করিয়া চোখ। সবচেয়ে বড় মেয়েটির পরণে কোন রকমে—একখানা কাপড়; বয়স তাহার ষোলও হইতে পারে, ছাব্বিশও হইতে পারে।

মাতা জিজ্ঞাসু-নেত্রে পুত্রের দিকে চাহিল—

"এই বাবুই কাল আমাকে দশটাকা ভিক্ষে দিয়েছিল।" মাতার মুখ প্রসন্ন হইল,—কাপড়খানা একটু সংযত করিয়া বলিল, "আপনারা বড়লোক, এখানে তো বসার কিছুই দিতে পারবো না, দেখছেনই ত সব—"

"থাক থাক, সেজন্য কিছু ভাবতে হবে না।" মিহির এক এক করিয়া সবার মুখ দেখিতে লাগিল।

মাতা বলিল, "আমরা কিন্তু এমনতর আগে ছিলাম না, ছোট বেলা ভাল কায়েতেরই মেয়ে ছিলাম।"

তারপর বিয়ের পর স্বামীর সেই চাকরী খোঁজার ইতিহাস, দুঃখ-দৈন্যের বিপক্ষে যুদ্ধ, উপজীবিকার অধঃস্তরে ভদ্রসন্তানের অবতরণ, মনোবৃত্তি নিম্নগতি, শেষ তাহার স্বামী আজ ভিক্ষুক বারমাস, আরও কত কি!

"কিন্তু বাবু আমরাও একদিন ভালই ছিলাম।"

মিহির স্তব্ধ হইয়া মাতার সুদীর্ঘ জীবনের দৈন্যের ইতিহাস শুনিল।

একটি বছর তিনের কঙ্কাল ছুটিয়া মায়ের কোলে উঠিল; খক করিয়া কাসিতে তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল। বাঁ হাত দিয়া রক্ত মুছিয়া, মাতা বলিল, "দেখুন বাবু, এই মেয়েটার বছরখানেক ধরে মুখ দে' রক্ত উঠছে। রোজ রাত্রেই গা্টা গরম হয়, ওষুদ ত আর দেওয়া চলে না।"

মিহির আপন মনে হাসিয়া উঠিল—"মরণ-পথের সঙ্গী।"

কঙ্কাল তৎক্ষণে মাতার দুগ্ধহীন লোলচর্ম্মাবশিষ্ট স্তনপান করিতে লাগিল।

বড় মেয়েটির দিকে চাহিয়া মিহির বলিল,—"এ মেয়েটি তোমারই ত?" মেয়েটি একটু ব্রীড়াময়ী; সঙ্কুচিত হইয়া আপনার ছিন্নবস্ত্রখণ্ড সংযত করিতে যাইতেছিল।

মিহির কি ভাবিয়া আপন মনে একটু হাসিল—বোধ হয় ভাবিল, হাজার কদাচারের মধ্যেও নারী কি করিয়া আপনার লজ্জা রাখিতে সচেষ্ট! নারী দেবী! মিহিরের চোখ উজ্জ্বল হইল, ব্রীড়া অরূপকেও কত সুন্দর করিয়া তুলে!

মাতা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিহিরকে লক্ষ্য করিতেছিল—তারপর একটু উদ্দেশ্য লইয়াই বলিল,—

"মেয়ের আমার একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু আমাদের ভিখিরিদের ত আর বিয়ে দেওয়া চলে না।"

তার পর একটু হাসিল।

মিহির সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "আমি ওর বয়সের কথা ভাবি নি।"

ঠিক এই সময় বছর চব্বিশের একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। অতিরিক্ত অত্যাচার তাহার মুখের উপর বেশ ছাপ মারিয়াছিল।

মিহির দেখিল, মেয়েটির চোখে একটা আতঙ্কের রেখা চকিতে খেলিয়া গেল।

যুবককে দেখিয়া মাতা বলিল, "আজ তুমি যাও—দেখছ না, এই বাবু এয়েছেন?"

যুবকের রক্তবর্ণ চোখ দুইটি জলিয়া উঠিল—জোর গলায় বলিয়া উঠিল, "বটে, আজ নতুন বাবু পেয়েছ? আর আমি যে এত টাকা তোর ঐ মেয়েটার পেছনে খরচ করলাম, তার বুঝি দাম নাই? আচ্ছা দেখছি, আর টাকার দরকার হয় কি না? তখন কিন্তু এ শর্ম্মারাম তোর মেয়ের কাছ দিয়েও ঘেঁসবে না।" যুবক হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল, মেয়েটি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

এই অপ্রত্যাশিত লজ্জাকর ব্যাপার মিহির পূর্ব্বে ভাবিতে পারে নাই, ইহার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। মরণ-পথের যাত্রী সে, এ সব হীন কল্পনা তাহার স্বপ্নেও জাগে নাই—

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মিহির সেখান হইতে বাহির হইল। দূর হইতে দেখিল, মেয়েটি আকুল আগ্রহে তাহার গতির ভঙ্গী দেখিতেছে। চোখে চোখ পড়াতে মেয়েটির চোখ দুটি নমিত হইল, চোখভরা তাহার অশ্রুরাশি।

* * * * *

মিহির আবার পথে বাহির হইল। আবার ভাবিতে লাগিল। সহরের কি আকর্ষণী শক্তি! সহরের নেশায় পতঙ্গের মত চারিদিক হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ছুটিয়া আসে—বদ্ধ আলো-হাওয়ায় আপনাকে সমাহিত করিতে। আপনাকে শুধু নহে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে। বছরের পর বছর, সতেজ শক্তিমান্ পুরুষ-সিংহ বাঙ্গালী,—ক্ষীণ তেজোহীন অলস, পঙ্গু, ধূর্ত্ত বাঙ্গালীতে

পরিণত হইতেছে! বংশানুক্রমিক এ রোগ বাড়িতেছে। বাঙ্গালার সময় বোধ হয় অস্তের মহাতিমিরে লয় হইতেছে।

বাঙ্গালীর পতনে পৃথিবীর অন্য দেশের বিশেষ কিছু যায় আসিবে না,·হয় ত তাহারা দূর হইতে একটু অনুকম্পার দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিবে, মাত্র এইটুকু। কত দেশে কত সভ্যতা লোপ পাইয়াছে, পৃথিবীর কি হইয়াছে? বাঙ্গালীর পতনে শুধু হত-ভাগ্য বাঙ্গালারই ক্ষতি।

ভদ্র-সন্তান ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, স্ত্রীপুত্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, কন্যা রূপজীবিনী হইয়াছে—কোন রকমে পেট চালাইতেছে। তথাপি কত ক্ষীণ তাহাদের দেহ! মিহি-রের এক একবার এই ভিখারী পরিবারের কথা মনে পড়িতে লাগিল। সে এক একবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। মেয়েটির কি অস্বাভাবিক করুণ দৃষ্টি! পেটের দায়ে তাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে হইতেছে।

হয় ত বা ইহারও সন্তান হইবে—একটি বছর-খানেকের অতিক্ষীণ শিশু। তৃষ্ণায়, বুভুক্ষায় এই জীর্ণ মাতার শুষ্ক-বুক-খানা চুষিয়া চুষিয়া ক্লান্তিভরে অবসাদে মায়েরই বুকখানায় ঢলিয়া পড়িবে, আর হয় ত দীর্ঘ পথশ্রান্ত রৌদ্রতপ্ত মাতা কোন গৃহের ছায়ায় বসিয়া এই চির অবসাদপ্রাপ্ত মহানিদ্রিত শিশুর মুখখানায় তাহার গভীর স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিবে—কি করুণ সুন্দর বীভৎস-দৃশ্য!

এ ত মিথ্যা কল্পনা নহে! বাঙ্গালার বুকের উপর এরূপ সহস্র সহস্র দৃশ্যের অভিনয় অনবরত চলিতেছে। আমরা একবার চাহিয়া দেখি, দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলি, আবার অন্য দিকে চলিয়া যাই।

"কে, মিহির?"

নিদ্রিত মিহির সচকিতে চাহিয়া দেখিল।

"আয়, এ যে আমাদের বাসা—"আয় না একবার?"

মিহির বন্ধুর গৃহে প্রবেশ করিল।

* * * * *

৪

মিহির একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল।

ছোট ঘরখানি চেয়ার সোফা কৌচে ঢাকা,আধুনিক চিনামাটীর বাসনে, কাচের ফুলদানিতে, বাঁধান হরিণের শিংএ, দার্জ্জিলিং-এর ছাগলের চামড়ায়, তক্ষশিলার প্রত্নতাত্ত্বিক পাথরে, ছোট ছোট টেবিল টিপয়ে ভারাক্রান্ত।

মিহির এই আসবাবপত্রের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া সন্তর্পণে চলাতেও একটি টিপয় গায়ের ধাক্কায় পড়িয়া গেল, কতগুলি কাচের বাসন চুরমার হইল। বন্ধুর মুখ একটু বিবর্ণ হইল। একটুমাত্র "ইস্" বলিয়া আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মিহির একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহার মনে তখন ভিখারী পরিবারের কথাই তোলা-পাড়া করিতেছিল।

বন্ধু তৎক্ষণ অনর্গল কি বলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ মিহিরের মনে হইল, ভারী গরম পড়িতেছে—চাহিয়া দেখিল, দরজায় একটু ফাঁক ভিন্ন সমস্ত দেওয়াল, জানালা রং-বেরংয়ের ছবি যা আচ্ছাদিত। নকল র‍্যাফেল এঞ্জেলো হইতে আধুনিক অ[illegible] বাবু চারুবাবু কেহ বাদ যান নাই।

মিহির উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালে টাঙ্গানো একখা[illegible] ছবির দিকে হস্ত প্রসারণ করিল। বন্ধু বলিল, "আহা, করো কি করো কি?" বন্ধুর কথায় কর্ণপাত না করিয়াই মিহির একখা[illegible] ছবি পাড়িয়া সুমুখের টেবলের উপর রাখিয়া দিল। এক ঝ[illegible] ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গরমটা একটু কমাইয়া দিল।

বন্ধু বলিয়া উঠিল, "তুই কি চিরকালটা এমনি থাকবি?"

মিহির একটু উত্তেজিত হইয়াই উত্তর দিল, "তোমরা আ[illegible] হাওয়াকে বন্ধ ক'রে এমন সাজানভাবে চিরকালটা ব[illegible] থাকবে? না হয় ঘণ্টাখানেক একটু হাওয়াই খাও।"

এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া বোধ হয় স্বেদ-সিক্ত ব[illegible] অতি মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এ[illegible] শীতল করিয়া দিয়াছিল, তাই বন্ধ আর ঝগড়া না করিয়া কা[illegible] টুক্‌রাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

"তার পর আজকাল কি করা হচ্ছে?" সেই মামুলী [illegible] ঘেয়ে প্রশ্ন! মিহির উত্তর দিল, "ক'রব আর কি? শরী[illegible] ভাল নয়, তাই কোন কাযই করি না। তুমি কি কচ্ছ?"

একঘেয়ে উত্তর, "কোন সদাগরী অফিসে পঞ্চাশ টাক[illegible] কেরাণীগিরী।"

"পঞ্চাশ টাকার মাইনে? অথচ—ঘরটা এত সব [illegible] সাজাও কোত্থেকে?"

"কি করবো ভাই, ভদ্রতা রাখতে হয়—আর সৌন্দ[illegible] জ্ঞান ত একটু থাকা ভাল—"

"বটে? সৌন্দর্য্যের জ্ঞানটা তো বেশ টন্‌টনে! এত[illegible] ছোট্ট ঘর আর এতগুলি আস্‌বাব?" মিহির এক দুই ক[illegible] আসবাবগুলি গণিতে লাগিল, তার পর হো হো করিয়া হা[illegible] উঠিল।

বন্ধু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তোর ত কস্মিন্‌কা[illegible] ও জ্ঞানটা আসে নি, চিরকালটাই সাদাসিদে চালাচ্ছিস্,—[illegible] কি বুঝবি।"

"হুঁ"। মিহির আর উত্তর করিল না।

০ ০ ০ ০

বন্ধু-পত্নী একটা ট্রেতে করিয়া চা' লইয়া গৃহে প্রবেশ ক[illegible] মিহিরকে দেখাইয়া বন্ধু, পত্নীর উদ্দেশে বলিল, "এই আ[illegible] কলেজ-দিনের বন্ধু মিহির।"

ট্রেখানা অতি সন্তর্পণে একটা টিপয়ের উপর রাখিয়া—হ[illegible] দুইখানি অর্দ্ধযুক্ত করিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া বন্ধু-প[illegible] অতি মিহি সুরে বলিলেন, "আমাদের আজ সুপ্রভাত, অ[illegible] দিন হ'তে আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু সাক্ষাতের সৌভা[illegible] হয় নি।"

ভদ্রঘরের বাঙ্গালী বধূকে এমন নিঃসঙ্কোচে আলাপ ক[illegible] দেখিয়া মিহির একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা তা[illegible] অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। তবে মিহির নিতান্ত সেকা[illegible] পক্ষপাতী ছিল না, বরং বন্ধু-পত্নীর ব্যবহারে একটু খুসী হই[illegible] বলিল,—

"এ দিক দে' যাচ্ছিলাম। ওর ত আর অনেক দিন খবর নাই।"

তার পর বন্ধু-পত্নীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে সহসা থামিয়া গেল।

মিহির বন্ধু-পত্নীর দিকে তাকাইল, দেখিল, অতিক্ষীণ তম্বুলতা সাটী ও ব্লাউসের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে! পাউডার ও পমেডের চাপে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-শ্রী অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সাড়ীর ভাঁজের রেখায় কোথাও ছন্দঃপতন হয় নাই, ক্রুপিন দিয়া সকলই ছন্দোবদ্ধ। কুঞ্চিত কেশদাম জার্মান ক্লিপে আঁটা, আবক্ষ-উন্মুক্ত ব্লাউসের উপর সরু প্লাটিনাম হার, বাম হস্তের মণিবন্ধে বহুমূল্য সোনার রিষ্টওয়াচ, দক্ষিণ হস্তে একগাছি হীরকখচিত সরু সোনার চুড়ী, পদদ্বয়ে ভেলভেটের নাগরা।

ঠিক যেন একখানা ছবি! আর সেই ছবির চারিদিকে ঘেরিয়া বার্গেমটের গন্ধ মন্দ-মধুর নৃত্য করিতেছে।

চা পান করিতে করিতে সুসজ্জিত মস্তকখানি হেলাইয়া হাতের ভিতরের সুগন্ধি রুমালখানি ঘুরাইয়া বন্ধুপত্নী থিয়েটারী ভঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছিলেন, অনেক কথা—বাঙ্গালা সাহিত্য-কথা, সাহিত্যের কবি হইতে আরম্ভ করিয়া থিয়েটারে প্লে কি রকম চলিতেছে, তাহার মধ্যে আর্ট আছে কি না? কে কি রকম এ্যাক্ট্ ইত্যাদি। পরে আসিল রেসকোর্সের কথা—কোন্ ঘোড়া কি রকম ছোটে? কোন্ সওয়ার ভাল? মিহির একটু পুলকিত হইয়াই শুনিয়া যাইতেছিল, ভাবিতেছিল, আজকাল বাঙ্গালীর মেয়ে কতখানি সভ্য ও উন্নত হইয়াছে!

"আচ্ছা মিহিরবাবু, চলুন না আজ একবার বিজুতে। আপনার বন্ধু বলেছিলেন, থিয়েটারের কথা; কিন্তু আমার মনে হয়, বায়াস্কোপটা আজ দেখা যাক্, কি বলেন?"

মিহির বন্ধুপত্নীর কথায় সম্মতি জানাইল, অসম্মতি জানাইবার বোধ হয় তাহার ক্ষমতা ছিল না।

উৎফুল্ল হইয়া বন্ধুপত্নী ড্রেস পরিবর্ত্তনের জন্য অন্দরে চলিয়া গেলেন।

সহসা মিহিরের মনের মধ্যে কি একটা খেয়াল জাগিল, বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বলেছিলে, তোমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা?"

"হাঁ, কেন?"

"তোমার বাবা বোধ হয় অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন?"

"বাবা টাকা রেখে যাবেন? বল কি? বরং কিছু ঋণই আছে।"

"তোমার গিন্নির বাবা বোধ হয় বড়লোক।"

"বড়লোক মোটেই নন্, বরং যাকে বলে গরীব, তা এ সব জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন?"

"কিছু নয়," বলিয়া মিহির চুপ করিয়া গেল। পরে সহসা বলিয়া উঠিল, "ত্যাখ, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে—চল না ভিতরে কিছু খেয়ে আসব, এমন শ্রীহস্তের তৈরী! নিশ্চয়ই অমৃত!"

বন্ধু একটু ইতস্ততঃ করিল।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মিহির বন্ধুর হাত ধরিয়া চলিল, "তা যা হোক, কিছু খেতে পেলেই হলো।"

'বন্ধু' অগত্যা আর আপত্তি না করিয়া মিহিরকে লইয়া ভিতরে ঢুকিল।

* * * * * *

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই আবার মিহিরের চক্ষুস্থির হইল।

বাহিরের অত জাঁকজমকের পর ভিতরের এরূপ দৈন্য মিহির আশা করে নাই। ভিতরে বাহিরে একসঙ্গে পাশাপাশি তাহার মনের মধ্যে ধাক্কা মারিতে লাগিল। আলো-হাওয়া-শূন্য একখানা ক্ষুদ্র কামরায়, অতি জীর্ণ শয্যা; একখানি পুরাতন র‍্যাকে খান কয়েক অর্দ্ধমলিন জীর্ণ বস্ত্র। গৃহ-কোণেই একটি ষ্টোভ, এ্যালুমিনিয়ামের কয়েকখানি বাসন। একটা ভাঙ্গা ট্রাঙ্কের মধ্য হইতে বাহির-সজ্জার একখানি দামী রেশমী সাড়ীর কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

বছর সাতেকের একটি ক্ষীণকায় খোকা গৃহ-কোণেই আপনমনে খানকয়েক বিস্কুট চিবাইতেছিল। মিহিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বন্ধুপত্নী একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি তখন একখানা পুরাতন আয়নার সম্মুখে আপনার কেশদাম বিন্যস্ত করিতেছিলেন, চর্ব্বণরত খোকাকে কোলে করিয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাচ্ছ খোকা?"

বুদ্ধিমান্ খোকা অমনই উত্তর করিল, "বিস্কুট খাচ্ছি, থিয়েটারে যাবো কি না, তাই খেয়ে নিচ্ছি! আর তো খাবার সময় হবে না।"

"কেন থিয়েটার থেকে এসে ভাত খাবে!"

"উঁহুঁ, আমরা ত রাত্রে কিছু খাই না।"

বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হইল।

"রাতে খাও না কি?"

"মা বল্লেন, রাতে খেলে থিয়েটার দেখা চলে না—পয়সা কোত্থেকে আসবে, তাই আমরা একবেলা খাই।"

"আর বিকেলে কি খাও?"

"আমি দুখানা বিস্কুট আর এক কাপ চা, বাবা মা দু'জনেই চা খেয়ে থাকেন। মা'র শরীর খারাপ কি না, তাই দুবেলা রান্না করা তাঁর সহ্য হয় না, আর পয়সাও ত চাই।" বন্ধু ও বন্ধুপত্নী তখন মনে করিতেছিলেন, ধরণী দ্বিধা হও!

কোল হইতে খোকাকে নামাইয়া দিয়া মিহির ফিরিল—বন্ধু একটু লজ্জাজড়িতস্বরে বলিল, "ও কি, ফিরছো কেন, খেয়ে দেয়ে বিজু দেখে তার পর যেও।"

অতি কষ্টে উদ্যত ক্রোধকে দমিত করিয়া কঠিন-কণ্ঠে মিহির বলিয়া উঠিল, "আমার ক্ষিধে নাই—থাকলেও তোমার ঘরের কিছুই গ্রহণ করব না, বিজু দেখার আমার সখ নাই।" তার পর ফিরিয়া চলিল। কয়েক পদ গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "আমি যদি আজ বাঙ্গালা দেশের মালিক হতাম, তা হ'লে তোমাদের মত লোককে কি করতাম জানো?"

"কি করতে?"

"করতাম? তোমাদের সব বন্দী ক'রে দাঁড় করাতাম—মেয়েমরদ সব। তারপর নিজ হাতে একটি একটি করিয়া গুলী ক'রে মারতাম। তোমাদের ও বসার ঘর পায়ের তলায় পিষে ফেলতাম।"

তার পর হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

৬

পরের দিন গোলদীঘির পাড় দিয়া মিহির তাহার ক্লান্ত চরণ দুইটি টানিয়া লইয়া বাসায় ফিরিতেছিল, গোলাপ ফুলের মত দুটি যমজ শিশুকে লইয়া ধাত্রী খেলা করিতেছিল। মানবের জীবন-পর্য্যায়ে যুগে যুগের একই নবীন ভূমিকা, অনাগতই আগতের নবরূপ লইয়া আসিতেছে। সৃষ্টির এইখানেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য! মিহির অপলকনেত্রে শিশু দুইটিকে দেখিতেছিল।

ধাত্রী বলিল, "ভারী লক্ষীছেলে, এরা আমার কাছেই থাকে—"

মাতৃত্বের অহঙ্কার—তাও কত উঁচু দরের!

"বয়স মোটে এই দেড়বছর।"

"দেড়বছর?" মিহির আপন মনে বলিল, "আমার যে দেড়মাস দেড়দিন আছে কি না সন্দেহ? এরা দেখতে খুব সুন্দর।"

ধাত্রী এবার উল্লসিত হইয়া বলিল, "এদের ঘরের সবাই সুন্দর, বাপ-মা ভাই-বোন।"

"সবই সুন্দর," নিম্নস্বরে মিহির বলিয়া চলিল, "পৃথিবীরও হয় ত সবই সুন্দর, যে যে রকম চোখে দেখে।"

* * * * *

তার পর সে তীব্রদৃষ্টিতে শিশু দুইটিকে দেখিতে লাগিল। ধাত্রী কি ভাবিয়া ছেলে দুইটিকে সরাইয়া লইল। আবার আপন-ভোলা মিহির নিরুদ্দেশে চলিতে লাগিল। এবার সে প্রকৃতির দিকে তাকাইল, প্রভাত-সূর্য্যের আভায় সকলের মুখ ঝলমল। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, হয় ত এই শেষ দেখা, এই অনুভূতিই যে মুহূর্ত্তে আনন্দের মাঝে নিরানন্দ আনিয়া দেয়।

মিহিরের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, তাহার কি সত্যসত্যই চলিয়া যাইতে হইবে? নির্ম্মম মৃত্যু কি দুয়ারে হানা দিয়াছে? একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া মিহির তাহার এই শেষ দিনের কথা ভাবিতে লাগিল।

* * * * *

পিছনে আবছায়ার মত কে আসিয়া দাঁড়াইল। মিহিরের ভ্রূক্ষেপ নাই, জীবনপথে সব সময়ে পিছনের দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক কাযই চলে না। আবার অনেক দুর্ঘটনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মিহির সম্মুখের দিকেই তাকাইয়া মানুষের কলরোল শুনিতেছিল। আবছায়ার মত কে আসিয়া পাশে বসিল, সন্তর্পণে একগাছা কাঁচি বাহির করিয়া মিহিরের পকেট কাটিল। খুট্ করিয়া একটুখানি শব্দ! নিমিষে মিহির সকলই বুঝিল। রক্তহীন শীর্ণ হাতখানি দিয়া আগন্তুকের হাতখানি চাপিয়া মিহির হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই একটা জিনিষ আমি কোন দিন ভোগ করি নি, তোমার এতখানি পরিশ্রম, সতর্কতা সব বিফলে গেলো। তুমি ত নিরেট বোকা হে! আমার পকেট কোন দিন টাকার মুখ দেখে নি।" তার পর একটুখানি থামিয়া সংযতস্বরে বলিল, "এতবড় বিফলতা হাতে হাতে ধরা। আচ্ছা দেখি তোমার মুখের রেখাক্ক কেমন হয়ে গেছে? আমি অপরাধীর দিকে চাই, মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে, সত্যিকার অপরাধীকে খুঁজে নেওয়া সংশয়ের হয়ে উঠেছে! তোমাকে ত ঠিক পেয়েছি—ইস্, তোমার নষ্ট চোখ-দুটি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! মুখ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল! ভেবেছ, আমি তোমায় ধরিয়ে দেবো না? নিজের মনকে এমনি ক'রে বদলে ফেলতে পারো, এও খুব আশ্চর্য্যের বিষয়, না?" তার পর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা যাও। তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি!" আগন্তুক আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

এই ঘটনাটা মিহির খুব আনন্দে অনুভব করিতে লাগিল। এত বড় একটা অভিজ্ঞতা লাভ করার বদলে যদি অপরাধীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা দোষের হইবে না। বিশেষ জীবনের আর কয়দিনই বা বাকী!

* * * * * *

ছেলেরা ছুটোছুটি করিয়া জলপোলো খেলিতেছিল, পূর্ণ স্বাস্থ্যের অপূর্ব্ব শ্রী তাহাদের শরীরে সঞ্চালিত হইতেছে! স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য যে এমন নিবিড়ভাবে একই আধারে আলিঙ্গন করে, মিহির এত দিন ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবিলে হয় ত তাহার যক্ষ্মাও হইত না।

এত দিন সে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে জগতের আনাচ-কানাচ পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছে, সকল প্রশ্নকে সকল দৃশ্যকে বিশ্লেষণ করিয়াছে, সকল চিন্তার ধ্যান করিয়াছে, কোথায় কোন্ যবনিকার অন্তরালে সৌন্দর্য্যের কোন্ রেখাপাত অলক্ষ্যে রহিয়াছে, তাহাই উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণান্ত করিয়াছে!

এবার সে সন্ধান পাইয়াছে—কিন্তু অতি বিলম্বে। অঙ্গ জিমন্যাষ্টিক করিয়া একটি কলেজের ছোকরা, বন্ধুদলের সহিত বলিতে বলিতে চলিতেছিল—"এই যে দেখছিস্ আমার কব্জী, সাতমণ বোঝা আমি অনায়াসে তুলতে পারি!"

মিহির ভয় খাইয়া শিহরিয়া উঠিল। এ কি তাহাকে উপহাস করার জন্য? সে যে সাতসেরও তাহার শীর্ণ হাত দিয়া তুলিতে পারে না! ছেলের দলের স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল হাসি তাহাকে আবার উপহাস করিয়া বলিল, "তার যক্ষ্মা হয়েছে বলে সে সহানুভূতির পাত্র নয়। জগৎ থাকবে, যার যক্ষ্মা, সেই শুধু মারা যায়, অন্যের কিছু আসে যায় না।"

মিহিরের মুখখানা বিকৃত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া ছেলেদের উদ্দেশে কি বলিতে যাইতেছিল। আবার ছেলের দলের সেই অপরূপ হাসি। মিহির ধৈর্য্যচ্যুত হইল, বলিয়া উঠিল—"আমি নিজের বোকামিতে সকল হারিয়েছি। স্বাস্থ্য, সম্পদ কিছুর দিকেই দৃষ্টি দেই নি। তা বলে এই মরণের দ্বারেও আমার এমন অপমান কচ্ছ?" তার পর নিজেই লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িল। এ কি, সে অনুকম্পা ভিক্ষা করিতেছে!

ছেলের দলের প্রাণখোলা সহজ হাসির স্বর দূর হইতে আবার ভাসিয়া আসিয়া মিহিরের কাণে পশিল।

মুখখানা বিকৃত করিয়া মিহির বলিল, "বটে? আমিও পৃথিবীকে ক্ষমা করবো না।"

* * * * * *

অন্যপারে একটা গোলমাল উঠিল।

ভীড়ের গোলমাল, বাহির হইতে কারণ উপলব্ধি করা দুরূহ। মিহির অগ্রসর হইল, মনটাকে যদি কিছুক্ষণ অন্য দিকে ফিরাইতে পারে।

দেখিল, সেই গাঁট-কাটাকে ঘেরিয়া জনতা অত্যন্ত কোলাহল করিতেছে।

সেই ছোট যমজ শিশুরই একটির গলা হইতে হার ছিঁড়িয়া লইতেছিল, কি ঐ রকমই একটা কিছু।

ক্রুদ্ধ জনতা তাহাকে ঘিরিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতেছিল। ইতিমধ্যেই পুলিস আসিয়াছে।

পুলিস জিজ্ঞাসা করিল, "কেহ আসামীকে চিনে কি?"

মিহির অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে চিনে।"

গাঁটকাটা একবার তীব্র দৃষ্টি মিহিরের দিকে ফিরাইল, তার পর সকরুণ চোখে বলিল, "সে ক্ষমা চাহে!"

মিহির তাহার চোখের ভাষা পড়িল, তথাপি জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও লোকটা গাঁটকাটা। ঘণ্টাখানেক আগেও তাহার পকেট কাটিয়াছে।"

এবার গাঁটকাটার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পুলিস আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

মিহির ভাবিল, সে ভাল করিয়াছে কি না, যে অপরাধ সে পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছে, তাহার প্রত্যাহার করাকে বিবেক কি বলে? বিশেষতঃ অন্ত লোকের বেলা; যাহাই হউক না কেন, মৃত্যুর দ্বারে যে পথিক আসিয়াছে, তাহার বিবেক কতখানি প্রশান্ত হওয়া দরকার! মিহির ভাবিতে লাগিল।

"বাবুজী!"

"কে রে? ও তুই?" সেই ছোকরা ভিখারী।

"বাবু, এবার আপনি দয়া করুন।"

"কেন, আর টাকা চাস্? টাকা ত আর নাই।"

"না বাবু, টাকা আমি চাই না।"

"তবে?"—

"এই এক্ষুণি আমার বাবাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেলো।" মিহির শিহরিয়া উঠিল। এ কি পেশা! বংশানুক্রমিক চৌর্য্য-বৃত্তি—ভিক্ষা-বৃত্তি! মিহির অর্থ বুঝিতে পারিল না।

"বাবু আপনি যদি সাক্ষী না দেন, ত বাবার বেশী সাজা হয় না।"

"তোর বাবার ত শাস্তি হওয়াই দরকার।"

ভিখারী বালক কাঁদিয়া ফেলিল, "বাবু, ও কথা বলবেন না। আমার অনেকগুলি ভাই-বোন।"

"চোরের শাস্তি হবে না, বলিস কি?"

"বাবু, আপনি দয়া করুন।—আপনি অন্ততঃ সাক্ষী দেবেন না বলুন।"

মিহির খানিকক্ষণ ভাবিল, তার পর বলিল, "বেশ, আমি আর সাক্ষী দেবো না। তা হ'লেও ত মামলা চালাতে হবে।"

উল্লসিত ভিখারী বালক বলিয়া উঠিল, "সে হবে বাবু।"

প্রশান্তচিত্তে মিহির চলিয়া যাইতেছিল। বালক একটু কি ভাবিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু!"

"কেন, আবার কেন?"

"বাবু, আপনার বড় দয়া।—আমার হাতে ত এখন বেশী টাকা নাই। সে দশ টাকা প্রায় ফুরিয়ে গেছে।"

মিহির ফিরিয়া বালকটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এতটুকু ছেলে ধূর্ত্তামীর কত উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে! সংযত স্বরে বলিল, "আচ্ছা চলো, টাকা দেবো।"

* * * * * *

সম্পাদক নিবিষ্টমনে একটার পর একটা লেখা দেখিয়া যাইতেছিলেন। কত কবি অকবি, তরুণ প্রবীণদের চিন্তাধারা, কতকের অর্থ আছে, কতকের অর্থ নাই। একঘেয়ে কায!

"কি লেখা এনেছেন? এ মাসেই দিতে হবে, আর ত দেরী করলে চলবে না?"

"লেখা আমি এখনি দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি আরও কিছু টাকা চাই।"

"মানে? এই সে দিন টাকা নিয়ে গেলেন আগাম। লেখা বোধ হয় এখনো হয় নি?"

"লেখা আমি আজই দেবো, তবে টাকা আমার কিছু এখনি চাই-ই।" একটু সন্দিগ্ধমনে সম্পাদক মিহিরের দিকে তাকাইলেন।

"অবিশ্বাস কচ্ছেন? আচ্ছা, লেখা আমি আগেই দিচ্ছি,—টাকাটা ঐ বালককে দেবেন; কয়েকটা কাগজ দিন আর নিরিবিলি ঐ পাশের কামরায় ঘণ্টা-খানেক সময় দিন।"

সম্পাদককে বলিবার অবসর না দিয়াই মিহির টেবলের উপর হইতে কাগজ লইয়া পাশের কামরায় প্রবেশ করিল।

তার পর আপন মনে লিখিতে লাগিল—তাহার সারা জীবনের অনুভূতি।

"ধ্বংসোন্মুখ জাতির মরণের আক্ষেপ তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অভিব্যক্ত হয়। যক্ষ্মার জাতিকে যে কখন চাপিয়া ধরে, কেহ জানিতে পারে না—যখন পারে, তখন আর সময় থাকে না।

"অন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া আসিলে শুধু মস্তিষ্কে কোন কায হইতে পারে না—জাতিকে ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হয়।

"মস্তিষ্ক রক্ষা করিতে হইলে মস্তিষ্কের খাদ্যের প্রয়োজন।

"বাঙ্গালীর অলসতা আসিয়াছে—অস্বাভাবিক বিলাসিতা আসিয়াছে—আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হইতেছে—বাঙ্গালী ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে।

তার পর লিখিয়া চলিল—"এখনও হয় ত সময় আছে—সকল বাঙ্গালীর মনে একই বাণী ধ্বনিয়া উঠুক, 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'—পতন হইয়াছে, আবার অভ্যুদয় হইবে।"

মিহির ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঙ্গালাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে—বাঙ্গালার মরণ আর্ত্তনাদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে—তাহার বাঙ্গালা—সোনার বাঙ্গালা?—মিহির আর ভাবিতে পারিল না, ঝিম্ করিয়া মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মুখ দিয়া আবার এক ঝলক শোণিত বাহির হইল। অসমাপ্ত লেখা রক্ত-রেখায় রঞ্জিত হইয়া গেল!

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে।

সম্পাদক মিহিরের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সভয়ে দেখিলেন,—চারিদিকে শোণিত-প্রবাহ, মাত্র মিহিরের শীর্ণ মুখখানার মধ্য হইতে অর্দ্ধোজ্জ্বল নয়ন দুইটি তাহার অন্তরের ভাবকে বিচ্ছুরিত করিতেছিল।

এক পশলা

(গল্প)

ছ'মাস রোগে ভুগিবার পর সারিয়া শরীরে একটু বল পাইতেই শ্রীশ গেল এলাহাবাদে হাওয়া বদলাইতে। এলগিন্ রোডে বন্ধু দীননাথের বাড়ী। দীননাথ এলাহাবাদের উকীল। তারি গৃহে গিয়া সে উঠিল।

পনেরো দিনে শরীর মজবুত হইয়া উঠিল। খুশি-মনে শ্রীশ বলিল—এবার দেশে ফেরা যাক্।

নূতন উকীল, মক্কেলের পয়সার সদ্য-স্বাদ পাইয়াছে, তাদের কথা মনে হইলেই বুক হু-হু করিয়া ওঠে—ভাবে, আর পাঁচটা উকীল বুঝি তাদের লুটিয়া লইল!

দীননাথ কহিল—এখনো দিন পনেরো ও কথা মুখে উচ্চারণ করো না! নিঝ্ঞাটে আরো কিছু দিন কাটিয়ে তবে···না হলে আবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

শ্রীশ কহিল—বেশ।

কোন কাজ ছিল না। সকালে দীননাথ মক্কেল লইয়া বসিত, শ্রীশ বেড়াইতে বাহির হইত। ঘুরিয়া এলাহাবাদের ম্যাপখানাই সে একেবারে রপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কোথায় কোন্ মাঠে কোন্ ফশল বোনা হইতেছে, কোন্ মাঠ খালি—অনায়াসে সে বলিয়া দিতে পারিত! বেড়ানো কি অল্প? পাঁচ-সাত মাইল—সে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার! শ্রীশ অবাক্ হইয়া ভাবিত, তার পা দুখানায় চলার এমন শক্তিও ছিল, অথচ কলিকাতায় মোটর ছাড়া চলিবার কথায় সে গলদঘর্ম্ম হইত! হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে বহুবাজারের মোড়ে যাইতেও গাড়ী চাই! ট্রাম—ট্রামই সই! শ্রীশ স্থির করিল, এবার কলিকাতায় ফিরিলে আর জবুথবু থাকা নয়—দু'বেলা টানা পাড়ি···

সে দিন ত্রিবেণী ঘুরিয়া দারাগঞ্জের দিক্ দিয়া সে ফিরিতেছিল। পথ যে খুব জানা, তা নয়। তবে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হোক পৌঁছাইলেই হইল! কোন রকম তাড়া যখন নাই!···

বেলা প্রায় দশটা বাজে। আষাঢ় মাস। দেশটা বাঙলা নয়—কাজেই আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। রৌদ্রের এমন তেজ যে, বাবু-লোক তাহাতে ঝল্‌সাইয়া ওঠে! শ্রীশ নাকি নূতন স্বাস্থ্যসঞ্চয় করিতেছে, তায় সম্প্রতি মনে একটা গর্ব্বও জন্মিয়াছে যে, হাঁটায় তাকে কাবু করিবে, এমন রৌদ্র এলাহাবাদে নাই, তাই······

দু'ধারে মাঠ। মাঝে মাঝে গরিবের বস্তী। শ্রীশ সেই পথে চলিতে চলিতে দেখে, এক প্রকাণ্ড বাদাম গাছের তলায় এক প্রৌঢ়া নারী বসিয়া ধুঁকিতেছেন। তাঁর পাশে একখানি গামছায় বাঁধা তরি-তরকারী। মোটটি নেহাৎ হাল্কা নয়! নারী বাঙালী। চেহারা দেখিলে ভদ্রঘরের বলিয়া মনে হয়, তবে সে-ঘর তেমন অবস্থাপন্ন নয়। অবস্থা ভালো হইলে কি আর এই রৌদ্রে একলা তরকারীর মোট বহিয়া পথে চলেন? এটা শ্রীশের অনুমান। নারী সধবা—তাঁর পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী, সীমন্তে সিন্দূরের উজ্জ্বল বিন্দু টক্‌টক্ করিতেছে।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইল। কাছাকাছি কোনো বাঙালীর বাড়ী দেখিয়াছে বলিয়া তার মনে হইল না। রমণীকে সে প্রশ্ন করিল,—আপনি এখানে এমন ব'সে কেন, মা?

বয়সে তরুণ হইলেও শ্রীশের এটুকু জ্ঞান ছিল যে, অপরিচিতা প্রৌঢ়াকে 'মা' বলিয়া না ডাকা সমীচীন হইবে না। এ-ডাক একেবারে তাঁর মর্ম্মে গিয়া পৌঁছিবে।

নারী কহিলেন,—বড্ড গরম লেগেচে, তাই।

শ্রীশ কহিল—একখানা এক্কা ডেকে দেবো? আপনার বাড়ী যাবেন?

নারী কহিলেন—না বাবা, এক্কায় চড়তে পারবো না। শেষে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবো কি?

শ্রীশ কহিল,—তা হ'লে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। এধারে ঘোড়ার গাড়ী মিলবে ব'লে মনে হয় না। আপনার বাড়ী কোন্ মহল্লায়?

নারী কহিলেন—নাম জানি না বাবা। এসেছিলুম

আরো কজনের সঙ্গে ত্রিবেণীতে। চান ক'রে বটুকনাথের মাথায় জল দিতে গিয়ে দেখি, দিব্যি তরকারী রয়েচে, টাট্‌কা আর বেশ সস্তাও। বাজার থেকে খোট্টা চাকরে যে তরকারী আনে—কোনো ছিরি-ছাঁদ থাকে না। তাই ভাবলুম, কিনে নিয়ে যাই। কিনে-কেটে এসে দেখি, সবাই চ'লে গেছে। কাকেও পেলুম না। তাই একলা ফিরছিলুম।

শ্রীশ কহিল—এ পথ আপনি চেনেন?

নারী কহিলেন—না, বাবা।

শ্রীশ কহিল—তা হ'লে যাবেন কি করে? মহল্লার নাম জানেন না! কার বাড়ী বলতে পারবেন? তা হ'লে নয় চেষ্টা ক'রে দেখি।

নারী কহিলেন—কার নামই বা করবো! যার বাড়ীতে এসে উঠেচি—না, তার নাম তো জানি না।

শ্রীশ কহিল—তা হ'লে আমি অপেক্ষা করি। আপনি জিরিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন···পথ আপনি হারিয়েচেন, দেখচি। রোদের এই ঝাঁজ—তায়···

নারী কহিলেন—জিরিয়েচি, বাবা···যেতে পারবো-খন। তবে আমার এই পুঁটলিটি যদি কেউ—

শ্রীশ কহিল—বেশ, ওটা আমার হাতে দিন্। পথে চল্‌তে যদি বাড়ী মেলে, ভালো—না হ'লে আমার ওখানেই চলুন। তার পর ··কারো নাম এখানে জানেন না?

নারী কহিলেন—না বাবা। আমরা এসেচি নৈহাটী থেকে। হুগলীর কাছে নৈহাটী, জানো? সেই নৈহাটী।

শ্রীশ কহিল—নৈহাটী জানি, আমার বাড়ী কলকাতায়। আসুন তা হ'লে···এই ছাতার মধ্যে। না হ'লে যে রোদ···

নারী একটু সলজ্জভাবে কহিলেন—মেয়েমানুষ ছাতা মাথায়···? না বাবা···

শ্রীশ কহিল—এখানে কে-বা বাঙালী আছে! ছেলের ছাতায় মা যাবেন,—

শ্রীশের কথাগুলা বড় মিষ্ট, প্রাণে দরদ আছে, মায়াও আছে বিলক্ষণ! নারী সে কথায় বিগলিত হইলেন। ভাবিলেন, ক্ষতি কি! যে-রৌদ্র···ছাতা নহিলে মাথা রাখাও দায়!

শ্রীশ তাঁর তরকারীর পুঁটলি হাতে লইল, লইয়া কহিল—আসুন তা হ'লে।

নারী ধীরে ধীরে শ্রীশের সঙ্গে চলিলেন।

২

অতি কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টা চলিবার পর ডান দিকে মস্ত ফটকওয়ালা পুরানো এক দোতলা বাড়ী। নারী কহিলেন—এই বাড়ী, বাবা।

শ্রীশ বাহির হইতে লক্ষ্য করিল, এ বাড়ীতে লোকজনের বাস আছে···? সামনের পথে অমন জঙ্গল—রেলিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে মাকড়সার প্রকাণ্ড জাল···একতলার ঐ বারান্দার দেওয়ালে সবুজ স্যাঁতানি···দেওয়ালের গা ফুঁড়িয়া ঐ সব চারা গাছ গজাইয়াছে! সবিস্ময়ে শ্রীশ বলিল—এই বাড়ী ··?

—হাঁ বাবা। বলিয়া নারী ফটকের পাশে উঁচু চাতালের উপর বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীশ কহিল—কষ্ট হচ্চে বড্ড? তা, আর এই একটুখানি···

নারী কোনো কথা না বলিয়া চক্ষু মুদিলেন। তাঁর মুখের গৌরবর্ণ পাকা সোনার মত লাল!

পুঁটলিটা সেই চাতালে রাখিয়া শ্রীশ ফটকে ঢুকিল, ঢুকিয়া ডাকিল,—বেয়ারা···বেয়ারা—

স্তব্ধ বাড়ী। কাহারো সাড়া নাই।

শ্রীশ দু'পা আরো অগ্রসর হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—বাড়ীতে কে আছেন?···

কোনো উত্তর নাই। শ্রীশ ফটকের পানে চাহিল—নারী ততক্ষণে কোনো মতে ঝুঁকিয়া নুইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ফটকের মধ্য দিয়া সামনের বারান্দায় উঠিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ দেখিল, দেখিয়া ভাবিল, সর্দ্দি-গর্ম্মিতে মারা যাইবেন না তো? বাড়ীর বাহিরে···? বাড়ীর লোক-জনই বা কেমন—ইনি ফিরিলেন না স্নান করিয়া, সে জন্য একটা উদ্বেগ বা আশঙ্কা? আশ্চর্য্য! আসিয়া সে প্রৌঢ়ার নাড়ী পরীক্ষা করিল। নাড়ীতে স্পন্দন আছে। রৌদ্রের ক্লান্তি···অভ্যাস নাই—পশ্চিমী রৌদ্র···তাই, বোধ হয়!

কিন্তু এভাবে উঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেই-বা চলিয়া যায় কি বলিয়া? সামনে একটা ঘরের দ্বার খোলা দেখিয়া সে সেই দ্বারপথে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ঘর দিয়া অন্দরের দালানে আসিয়া পৌঁছিল।···দালানের এক কোণে সিঁড়ি—দোতলায় উঠিয়াছে।

দাঁড়াইয়া শ্রীশ ডাকিল,—বেয়ারা…

দোতলায় পায়ের শব্দ শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর,—না, না, না…কখখনো শুনবো না আমি—ম'রে গেলেও না! তুমি যাও, বলচি…

স্বর তরুণী-কণ্ঠের। খুব ঝাঁজালো! শ্রীশ ভড়কাইয়া গেল। যে-ঘর দিয়া অন্দরে ঢুকিয়াছিল, আবার সে সেই ঘরে ফিরিল। ফিরিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল। একধারে বালতি। শ্রীশ লক্ষ্য করিয়া দেখে, বাল্‌তিতে জল আছে! আঃ!

বাল্‌তি তুলিয়া সে বাহিরের বারান্দায় আসিল। বাল্‌তি হইতে আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া প্রৌঢ়ার মাথায় মুখে দিল। নারী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—আঃ! তার পর তিনি চোখ চাহিলেন, চাহিয়া আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—একটু ভাল বোধ হচ্ছে, বাবা।

—দেখি, কাকেও পাই কি না—বলিয়া শ্রীশ আবার সেই ঘর দিয়া অন্দরে চলিল। কিসের ভয়? সে তো চোর নয়, বা কোন দুরভিসন্ধি লইয়াও আসে নাই!

দোতলায় আবার সেই স্বর—আর্ত্তনাদের মত!—ছাড়ো, ছাড়ো, বলচি! না হ'লে আমি এমন কামড়ে দেবো হাতে…চালাকি নয়।

এ কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠে আর্ত্ত রব—উঃ গেছি, গেছি…রাক্ষসী না কি, বাবা রে!…

ব্যাপার কি? শ্রীশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নীচে এই মূর্চ্ছাহতা প্রৌঢ়া—উপরে দোতলায় আবার ও কি নাটকের অভিনয় চলিয়াছে! দোতলায় সে যাইবে না কি? কোন নারীর উপর অত্যাচার চলিতেছে না তো?…এই নিঝুম বাড়ী…ওই আর্ত্তস্বর…! শ্রীশ যন্ত্র-চালিতের মত দোতলার সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা দ্রুত পদশব্দ…আতঙ্কে শিহরিয়া শ্রীশ দেখে, তরুণ-বয়সী এক ছোকরা সভয়ে ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিতেছে—খালি পা! সে আসিয়া চকিতের জন্য শ্রীশের পানে চাহিল, কহিল,—আমার কর্ম্ম নয়। বাপ্—যেন মানোয়ারী গোরা! কথাটা বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীশ বিস্ময়ে অবাক্, চেতনাহীন! তার চমক ভাঙ্গিল একটা রূঢ় আঘাতে। এক-পাটি পুরাণো ডার্ব্বি-শু উপর হইতে সবেগে আসিয়া তার মাথায় পড়িল।…সে ভয়ে হঠিয়া আসিল।…ভৌতিক ব্যাপার?…বোধ হয়, তাই! নহিলে পরক্ষণেই অমন নিঃসাড়, স্তব্ধ…

শ্রীশ নিশ্বাস রোধ করিয়া উৎকর্ণ দাঁড়াইয়া রহিল—কোনো সাড়া নাই। একটু পূর্ব্বে দোতলায় ঐ যে ঝাঁজালো স্বর ফুটিয়াছিল…? তার পর বাড়ীখানা এমন স্তব্ধ যে, সেই প্রবাদ-কথা মনে পড়িল—একটা পিন পড়িলে তার শব্দও বুঝি শুনা যাইবে!…

শ্রীশ ভাবিল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল?…কিন্তু না…ঐ যে জুতা পড়িয়া আছে—যার একটি ঘায়ে কপালের বাঁ দিক্‌টা এই মার্ব্বেলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে! সে-আঘাত প্রত্যক্ষ। স্বপ্নের আঘাতে কপাল ফোলে না!…শ্রীশ আবার ধীরে ধীরে বাহিরের সেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বারান্দায় প্রৌঢ়ার সঙ্গে সেই ছোকরা কথা কহিতেছিল। ছোকরা বলিতেছে—থিম্‌চেছে বৈ কি। এই যে, হাতে দাগ…রক্ত! এই দেখুন না…বাপ্ রে! মেয়ে তো নয়, খাণ্ডারী!

হাত খুলিয়া সে ক্ষতচিহ্ন দেখাইল।

প্রৌঢ়া কহিলেন,—তাই তো, তা কিছু দাও, বাবা…

ছোকরা কহিল—হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈ কি! এই পেকে ঘা হোক্—হাত পচে খসে যাক্! বেশ হবে'খন। বললুম, মেজ কাকাকে—যে ও-মেয়ের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কখনো? তোমরা পারলে না ও-মেয়েকে,—বোঝাবো আমি? আমি গিয়ে বলবো…তারা পারে, এসে বোঝাক্। আমার বয়ে গেছে আর চেষ্টা করতে। বাঘের সঙ্গে আমি লড়তে রাজী, তা ব'লে এই মেয়ের সঙ্গে? বাবা—!

ছোকরা বকিয়া চলিয়া গেল। শ্রীশ থ! প্রৌঢ়াকে কহিল,—ব্যাপার কি?

প্রৌঢ়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন—কে জানে, বাবা? মরি আমি এধারে নিজের জ্বালায়…ভাখো না কাণ্ড! আমার বোধ হয় বাড়ী ভুল হয়েচে—এদের তো জানি না!

তিনি আবার শুইয়া চক্ষু মুদিলেন। শ্রীশ ভাবিল, এখন কি করা যায়? বাড়ী ফিরিবে?' কিন্তু এখানে এই যে কাণ্ড চলিয়াছে…নেহাৎ তুচ্ছ করিবারও নয়! তার একটা কিনারা…

ফটকের সাম্‌নে একখানা এক্কা আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইতেই একজন লোক টক্ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে আসিয়া বারান্দায় উঠিল, শ্রীশকে কহিল,—কোথায় নীলা ?…

লোকটির বয়স আটত্রিশের কাছাকাছি। গোঁফে বেশ পাক্ ধরিয়াছে। দাড়ি দুই-চারি দিন কামানো হয় নাই—খোঁচার মত।

শ্রীশ লোকটির মুখের পানে চাহিল,…মনে মনে কি একটা অনুমান করিয়া কহিল—দোতলায়।

লোকটি কহিল—সুরথ চ'লে যাচ্ছে, দেখলুম—রাগে গোঁ হয়ে! কোনো কথাই বললে না। তা…

বলিয়া সে অন্দরে চলিল। শ্রীশ কি ভাবিয়া তার অনুসরণ করিল; কিন্তু সিঁড়ির নীচেই দাঁড়াইয়া পড়িল। দোতলায় উঠিতে আর ভরসা হইল না।…

উপরে আবার কথাবার্ত্তা…এই লোকটিই বুঝি! বলিল,—একটা কেলেঙ্কারী করতে চাস্! অবুঝ হোস্‌নে, মা, শোন্…

উত্তরে ঝঙ্কার উঠিল—সেই তরুণী, নিশ্চয়! সেই কণ্ঠ! —আবার এসেচো জ্বালাতে! দাদাকে আমি সাফ ব'লে দিছি—ম'রে গেলেও না।…

লোকটি কহিল—সকলকে পথে বসাবি?

তরুণী কহিল—বসুক পথে! আমি কি করবো! সকলকে বাঁচাতে আমি হাড়-কাঠে মাথা দিতে পারি না তা বলে!

লোকটি কহিল—হাড়কাঠে মাথা দেওয়া কি! কত পয়সা! জড়োয়া গহনায় তোর গা ভরিয়ে দেবে! যা চাইবি, তাই পাবি। রাজ্যেশ্বরী হবি।…

তরুণী জবাব দিল, তেমনি সঝঙ্কারে,—রাজ্য তুমি নাও গে। খবর্দ্দার, আমার কাছে ও-সব কথা বলো না আর। ঘেন্না হয় না এতটুকু? উনি আবার কাকা—কাকাগিরি ফলাতে এসেচেন!…যাও, চ'লে যাও এখনি!

তার পর ক্ষণিক স্তব্ধতা।

পুরুষ কথা কহিল, স্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া—বেশ মা, চলেই যাবো। তা তুমি একলা এ বাড়ীতে থাকবে? সে কি হয়? আমি এক্কা এনেচি। চলো, ঐ গাড়ী ক'রে বাড়ীতেই চলো।

—হাঁ, যাচ্ছি তাই! আর তোমরা আমায় ধ'রে…

—না, মা, না। তোমার যখন এমন অমত, তখন থাক্ গে বিয়ে!…

—আমি যাবো না।

—যাবে না? পুরুষের স্বর রাগে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। সে কহিল,—যাবে না? আচ্ছা, যেয়ো না…এইখানেই আমি সব ব্যবস্থা করবো। দোরে দরোয়ান রেখে দেবো। দেখি, তুমি কত বড় জাঁহাবাজ মেয়ে! লোকনাথ চক্রবর্ত্তী নিজেও আসচে। দু'হাজার নগদ দিয়েচে। গায়ে-হলুদের সব ঠিক, তত্ত্ব এসে হাজির—এক-বাড়ী লোক। হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে একেবারে। পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট করাবি! দেখি, গায়ের জোরে তুমি আঁটো কেমন…

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি। তরুণীর আর্ত্ত স্বর,—ও বাবা গো, খুন করলে গো…এবং পুরুষের তীব্র হুঙ্কার,—তবে রে মেয়ের নিকুচি করেচে! দু'পাতা বই প'ড়ে স্বাধীন হয়েচো! না? দেখাচ্ছি মজা…

না, এ তো ঠিক নয়। মেয়েটির দোষ যত থাক, তা বলিয়া এমন নির্ম্মম অত্যাচার…

শ্রীশ ছুটিয়া দোতলায় উঠিল। সামনে মস্ত বারান্দা। বাতির ঝাড় ঝুলিতেছে। কটা চেয়ার, টেবিল, সোফা… পুরানো, তবু এককালে সৌখীনতায় সৌষ্ঠবে এ গৃহ সুসজ্জিত রাখিয়াছিল। লোকটি সবলে দু'হাতের মধ্যে এক তরুণীকে বন্দী করিয়াছে…আর মুক্তির জন্য তরুণীর কি সংগ্রাম চলিয়াছে!…

শ্রীশকে দেখিয়া পুরুষটি কহিল—আপনি লোকনাথ বাবুর লোক? এই দেখুন মশায়, মেয়ের কীর্ত্তি! এমন একগুঁয়ে বেয়াড়া মেয়ে কখনো দেখেচেন? আপনি লোকনাথবাবুকে বলবেন, আমরা তাঁর দিকে সম্পূর্ণ সহায়… দেখচেন তো মেয়ের গোঁ…

তরুণী আপনাকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ও তীব্র স্বরে বকিতেছে,—খুন হবো আমি, রক্তগঙ্গা হবো। দেখি, কে বাধা দেয়! বিয়ে দেবেন জোর ক'রে একটা বুড়ো হতভাগার সঙ্গে! তার চেয়ে…অবশেষে সে পুরুষের হাতে সজোরে দংশন করিয়া দিল। পুরুষ আর্ত্তনাদ তুলিয়া সরিয়া গেল—মেয়েটিও অমনি ছুটিয়া এক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সশব্দে ভিতর হইতে খিল্ আঁটিয়া দিল। লোকটি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া সেই দ্বারের পানে চাহিয়া, তার পর আসিয়া

হাতের ক্ষত শ্রীশকে দেখাইল, দেখাইয়া কহিল—শয়তানী! দেখেছেন কাণ্ড?

শ্রীশ কহিল—ব্যাপার কি, বলুন তো···একটু আগে আর-এক পশলা হয়ে গেছে···

লোকটি কহিল—হয়ে গেছে? ঐ সুরথ···তাকেও এমনি···?

শ্রীশ কহিল—হ্যাঁ।

লোকটি কহিল—ব্যাপার এমন কিছু নয়। লোকনাথ-বাবুর লোক তো আপনি?

শ্রীশ কহিল—কে লোকনাথবাবু?

লোকটি কহিল—ঐ যে লায়াল রোডের কাছে থাকেন—লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। কাশীর মস্ত জমীদার। এই তো, এ-বাড়ীও তাঁর···

শ্রীশ কহিল,—তা, এ মেয়েটি এখানে একলা···?

লোকটি কহিল,—ইটি আমার ভাইঝি। মেয়ের বাপ পাগল···মা'র সামর্থ্য কি, বলুন? কন্যাদায়। তা, আমাদেরই দেখতে হবে তো। তাই এই পাত্র স্থির করেচি। একটি পয়-সাও দিতে হবে না—উল্টে পাঁচ হাজার টাকা মেয়ের বাপকে দিচ্ছে। দাদার আরো ছেলে-মেয়ে আছে—কম হিল্লে! তা মেয়ে তো এই! যাক্, এখন লোকনাথবাবুকে কি যে বলবো গিয়ে? এই গোধূলি-লগ্নে বিয়ে···গায়ে হলুদ এই বেলা বারোটার সময়। তা, মেয়ে এ-বাড়ীতে এসে যা ঢুকেচে, কিছুতেই বেরুবে না···

শ্রীশ কহিল—তা হঠাৎ এ খালি বাড়ীতে এসে মেয়ে ঢুকলো কি ক'রে···?

বাহিরে একটা কলরব শুনা গেল। লোকটি শ্রীশের কথার জবাব না দিয়া কহিল—দেখি,···বলিয়া সে হাতের পানে করুণ নয়নে চাহিয়া নামিয়া গেল। শ্রীশ নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

লোক-জন আসিয়া দোতলায় উঠিল। পুরুষ ও নারী। দলটি নেহাৎ ছোট নয়। তাদের মুখে-চোখে ভঙ্গীর কি বৈচিত্র্য! বায়োস্কোপের crowdএর দৃশ্য শ্রীশের মনে পড়িল। কারো দৃষ্টিতে বিরক্তি, কারো রাগের ঝাঁজ, কারো বা দৃষ্টি ম্লান, করুণ!···

তাদের সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল—কৈ? কোন্ ঘরে? আহ্লাদি পুতুল! রঙ্গ পেয়েচেন! পাগল বাপ ঘরে, আর মেয়ে দোতলায় সাপের নাচ নাচছেন···

দ্বারে দুম্-দুম করাঘাত, তিরস্কার-আস্ফালন···সেই সঙ্গে আদেশ,—খোল্, দরজা খোল্, বলচি···না হলে লাথি মেরে দোর ভাঙ্গবো···

ভিতর হইতে তীব্র স্বর—ভাঙ্গো—আমি খুল্‌বো না দরজা।···বেশী জ্বালাও তো আঁচলের ফাঁস গলায় জড়িয়ে এইখানে মরবো।

সকলে নিরুপায় হতাশভাবে শ্রীশের পানে চাহিল। শ্রীশের ভদ্র চেহারা, গম্ভীর ভাব···হতাশের দলে আশার আভাস জাগাইল।

শ্রীশ কহিল—এই রকম ক'রে আপনারা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

এক প্রৌঢ়া নারী, হাতে নূতন তাগা- তাগা জোড়া আঁটিয়া লইয়া কহিল,—ভাগ্যি, ভাগ্যি—ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি, তাই এমন বর পাওয়া গেছে। ঢং করচেন, ঢঙানি! এখন সকলের হাতে দড়ি দেবার মতলব! তখনি বলে-ছিলুম ওঁকে যে, এ বিয়ের কথায় তুমি থেকো না। তা শুনলেন না। বললেন, আহা, আমি না দেখলে কে দেখবে? এখন ছাখো। মেয়ে বেঁকে আছে কি রকম। আজ সন্ধ্যায় বিয়ে—মেয়ে বিইয়ে এখন বিয়ে দাও···

দলের মধ্য হইতে আর এক-জন নারী মিনতিপূর্ণ দুটি করুণ নেত্রের দৃষ্টি মেলিয়া প্রৌঢ়াকে কহিলেন—একটু চুপ করো মেজো বৌ—আমি দেখচি ভাই। তোমরা একটু সরো তো···বুঝিয়ে আমি রাজী করাচ্ছি।

এক-নম্বরের প্রৌঢ়াটি মেজ বৌ। শ্রীশ বুঝিল। সেই যে মেজ-কাকার কথা শুনিয়াছিল, ইনি তাঁরই সহধর্ম্মিণী। আর ঐ যে লোকটি···কাঁচা-পাকা গোঁফ, যুদ্ধ করিতেছিলেন, শেষে হাতে কামড়ের ঘা খাইয়াছেন, তিনিই পূজ্যপাদ মেজ কাকা!

মেজ বৌ বলিল,—এমনি ক'রে বোঝাতেই থাকবে কি সারা দিন? একটা মঙ্গলের কাজ, গায়ে হলুদ ছোঁয়ানো··· তা···জানি না বাবু, যা ভালো বোঝো, করো। বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, মেয়ের কুলোপানা চক্কর! থুবড়ি ধাড়ি মেয়ে··· বোঝে না কিছু যে তাকে আবার বোঝাতে হবে?

মিনতির দৃষ্টিতে দ্বিতীয় নারী আবার কহিলেন,—বুঝেছিল বেশ…এলোও তো মীরাট থেকে মেজ-ঠাকুরপোর চিঠি পেয়ে। বুঝেই এলো। তার পর কি যে হলো…

পুরুষের দল কহিল,—বোঝাক্-সোঝাক্—এসো, আমরা নীচে একটু দাঁড়াই…

মেজ বৌ কহিল—করো তোমরা রঙ্গ…মান্‌ তো তোমাদের যাবে না, সে যা যাবে, এঁর, আর সেই সঙ্গে আমারও…বলিতে বলিতে মেজ বৌ এবং সেই সঙ্গে সেনানীদল নীচে নামিয়া গেল। দোতলায় রহিলেন শুধু ওই দু'নম্বরের মহিলা!

শ্রীশও নামিয়া যাইতেছিল। তাকে কেহ নামিতে বলে নাই, তবু থাকাও ভালো দেখায় না!

দু'চার ধাপ সে নামিয়াছে, শুনিল, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া নারী কহিলেন,—মা, ও-মা নীলা, মা গো, দোরটা খোলো মা। আমি মা, ডাকচি। আর কেউ এখানে নেই। কথা শোন্ মা…

ইনি ওই মেয়েটির মা! বেশ শান্ত শ্রী…নম্র, করুণ, স্নিগ্ধ…মায়ের মূর্ত্তিই বটে! শ্রীশের বুকটা দুলিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মস্ত এক রহস্য আছে নিশ্চয়…নহিলে, ঐ রুদ্ররস এমন উথলিবে কেন, এক বিবাহের ব্যাপারে? বিশেষ যেখানে এমন অভাবনীয়ভাবে সে বিবাহ ঘটিতেছে! বর-পণ নাই, কন্যার পিতার ঐ অবস্থা—কন্যার পিতাকেই বর-পক্ষ নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতেছে! তার কৌতূহল তীব্র হইয়া উঠিল। শ্রীশ আর নামিল না, সিঁড়ির সেই ধাপেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মা আরো দু'চারবার মিনতি জানাইলেন। মেয়ে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া চারিধারে চাহিল, তার পর ঝাঁপাইয়া মা'র বুকে পড়িয়া মুখ গুঁজিল।

মা ডাকিলেন—নীলা, মা…মা'র স্বর বাষ্পার্দ্র।

মেয়ে কহিল—কেন, মা?

মা কহিলেন—কোনো উপায় যে নেই মা। কেন এমন করচিস্? তুই যে দুঃখীর ঘরে জন্মেচিস্ মা…এই বাঁদীর পেটে। কোথাও যে কেউ সহায় নেই…

মেয়ে কাঁদিয়া ডাকিল—মা…মুখে আর কোনো কথা ফুটিল না।

শ্রীশ চাহিয়া দেখে, চোখের জলে মেয়ের পাকা আপেলের মত দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এই নাটকের দর্শকমাত্র হইয়া সে আর থাকিতে পারিল না। ইহার পাত্র-পাত্রীদের দরদে সারা মন ভরিয়া উঠিল। সে আসিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল—আমার একটু নিবেদন আছে।…মানে…

মা ও মেয়ে দু'জনেই শ্রীশের পানে চাহিলেন। শ্রীশ কহিল—আমি কিছু জানি না, তবে একটু যা বুঝেচি, তা এই যে, এঁর বিবাহের সব আয়োজন স্থির হয়েচে, বিবাহ আজ রাত্রে, কিন্তু ইনি বেঁকে বসেচেন, এ-বিবাহে মত নেই। তাই না?

ঘাড় নাড়িয়া মা জানাইলেন, তাই। মেয়ের দুই চোখে তখনো অশ্রুর ঝর্ণা! গৌর বর্ণ, যৌবনের স্পর্শে নিটোল স্বাস্থ্যে সারা অবয়ব পূর্ণ—নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা যেন একখানি ছবি! চোখের জলে রূপসীর রূপশ্রী শিশিরে-ধোওয়া টাটকা ফুলের মত শতগুণ উছলিয়া উঠিয়াছে!

শ্রীশ কহিল—তার পর শুনচি, বরপক্ষ আপনাদের পাঁচ হাজার টাকা নগদ দেবে। তবু…?

মা মৃদুস্বরে কহিলেন,—বরের বয়স একটু বেশী হয়েচে, বাবা। তা ভেবেছিলুম, দূর হোক ছাই, সে দুঃখ ক'রে লাভ তো নেই! মহাদেবও যে বুড়ো। পয়সার বল যখন নেই, আর যাঁর মেয়ে তিনিও কাজের বার,—তখন পাঁচজনের দয়ায় যদি…

সমস্ত ব্যাপারখানা শ্রীশের চোখের সামনে ` ` করিয়া উঠিল। বুড়া বর, তাই…

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আইন পাশ করিয়া সে নূতন উকীল হইয়াছে…আইনের ধারাগুলা সরীসৃপের মত মাথায় কিল্‌বিল্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—মেয়ের আপনিই অভিভাবিকা।…আর মেয়ের বয়স…

এই অবধি বলিয়া সে থামিয়া গেল। মেয়েদের বয়স লইয়া পুরুষের কোনো কৌতূহলই সাজে না।…মা কিন্তু তাকে এ দায়ে বাঁচাইলেন, কহিলেন—তা, মেয়ের বয়স সতেরো চলছে, বাবা—লুকোবো না। মা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—পয়সা নেই। সময়ে বিয়ে দেবো কি দিয়ে?…এঁরা বলেন, মেয়ে তো তোমার কচি খুকী নয়, ডাগর,—বেমানান হবে না।

শ্রীশ কহিল,—আপনারা মীরাট থেকে এসেচেন, বললেন না?

মা কহিলেন—হাঁ, বাবা। সেখানেই একটু আস্তানা আছে। বড় ছেলেটি এখানে আমার মেজ ভাওরের কাছে থাকে। পড়াশুনা করছিল,—গেছে। এখানে রেলে যদি একটা চাকরি-বাকরি মেলে…

শ্রীশ কহিল—এ সম্বন্ধ স্থির করলে কে? আপনার ঐ মেজ ভাওর বুঝি?

মা কহিলেন—হ্যাঁ, বাবা!

শ্রীশ কহিল—বর-পক্ষ আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে, বলেচে?

মা কহিলেন—তা আমি জানি না বাবা। তবে বিয়ের সব খরচ দেবে, শুনেচি। আর দু'গুট্ গহনা…

মেয়ে চোখের জল মুছিয়া কহিল—ও টাকা ঐ কাকাই নেবেন। আজ আমায় ধমকাতে এসে প্রথম বললেন, দু' হাজার টাকা পেয়েচেন, আরো তিন হাজার টাকা পাবেন…

শ্রীশ কহিল—ওঃ! বুঝেচি। এ টাকাটা উনিই ট্যাঁকে গুঁজবেন—আপনাকে জানান্ নি!…এ মন্দ নয়। উনি ভাইঝিকে বেচ্ছেন…এ তো ভালো কথা নয়, মা…

মা'র চোখে অশ্রু ঝরিল। মা কহিলেন,—উপায় কি, বাবা? মেয়ে আমার লেখাপড়া জানে। তখন তো ওঁর মাথা খারাপ হয় নি। ডাক্তারী করছিলেন, দু' পয়সা রোজগার করতেন, মেয়েকে মেমেদের ইস্কুলে পড়িয়েছিলেন…

শ্রীশ কহিল—সব বুঝলুম। তা, এ বিয়ে কি রদ হয় না, মা?

মা সাশ্রুনয়নে কহিলেন,—কি ক'রে হবে, বাবা? এত খরচ-পত্তর…গায়ে হলুদের তত্ত্ব অবধি পাঠিয়েচে…

শ্রীশ কহিল—হুঁ।…তা এ তত্ত্ব কোথায় এলো?

মা কহিলেন—আমার মেজ ভাওরের বাড়ী…সে থাকে ওই ইষ্টিশানের কাছে। রেলে চাকরি করে কি না!…

শ্রীশ কহিল—আপনার মেয়ে সকালে এ বাড়ীতে একলা এলেন কি ক'রে—সে বাড়ী ছেড়ে?

মা কহিলেন—সকালে আমার দ্যাওরপো বললে, নীলা, তোর বাড়ী দেখেছিস…দারাগঞ্জে? খাসা বাড়ী, চ' দেখবি—ব'লে সে একটা গাড়ীতে ক'রে এখানে ওকে নিয়ে আসে। মেয়ে আর ফিরে যেতে চায় না। ভাওরপো গিয়ে বাড়ীতে খবর দিলে আমার বড় ছেলে সুরো এসেছিল ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যেতে…তার দেরী দেখে আমরা শেষে…

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এ-বাড়ীতে আসিয়া যেটুকু অভিনয় শ্রীশ দেখিয়াছে, এ পরিচয়ে সেটুকু সুস্পষ্ট আকারে প্রকাণ্ড একখানি নাটকের বেশে ফুটিয়া উঠিল—কোথাও তার এতটুকু ফাঁক রহিল না! এই মেজ ভাওরটি একখানি চীজ্—অক্ষম দাদার নিরুপায় পরিবারটির মস্ত দায় ঘুচাইবার অছিলায় বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছে! পাজী শয়তান! শ্রীশের রক্ত নাচিয়া উঠিল। আর কিছু না হোক্, এই শয়তানের ফন্দী সে যেমন করিয়া হোক্ ফাঁশাইবে! সে কহিল—কোনো ভয় করবেন না, মা। এ বিয়ে দেবেন না আপনি। ওঃ, মান যাবে ব'লে ঐ তাগা-পরা মেয়েটি চ্যাঁচাচ্ছিলেন! তাগাজোড়া নতুন…দেখলুম।

মেয়ে নীলা কহিল—হ্যাঁ, কাল গ'ড়ে এসেচে। এই তত্ত্বেই…

শ্রীশ কহিল—বুঝেচি। এমন শয়তানও আছে মা—নিজের ভাইঝির সর্ব্বনাশ ক'রে রাজ্যলাভ করতে চায়! এই বাড়ীখানা আপনার মেয়ের নামে লিখে দেবে…বটে? বুড়োকে আপনি দেখেচেন? মানে, এই যে বর…?

মা বলিলেন,—না বাবা। আমায় বলেচে, পাঁচ মাস হলো, তার বৌ মারা গেছে। জামাইয়ের এলাহাবাদে কি কারবার আছে, তা ছাড়া এল্গিন রোডে মস্ত বাড়ী…সেই বাড়ীতেই থাকেন।

শ্রীশ কহিল—আর-পক্ষের ছেলেমেয়ে…?

মা কহিলেন—ডাগর ছেলেমেয়ে আছে—নাতি-নাতনীও। তা বলচে—তাদের নাকি আলাদা ক'রে দেছে—যা কিছু আছে, সব আমার মেয়েরই হবে!…

শ্রীশ উত্তেজিত স্বরে কহিল—না, না, না। গহনা আর টাকাই তো সর্ব্বস্ব নয়! বিশেষ আপনার মেয়ে লেখাপড়া শিখেচেন…ওঁর মন এ বিবাহে বিদ্রোহী হবেই তো। যাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবো না—ভালোবাসা তো দূরের কথা, একটা লোভী বুড়ো—কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত, বেহায়া, নির্লজ্জ,…বাপের চেয়ে বয়সে বড়—সে হবে স্বামী, গুরু? না, এ হতেই পারে না!

ছল ছল চোখে মা কহিলেন,—কিন্তু আমি একা, সহায়-হীন। আর ওরা…

শ্রীশ কহিল,—কুচ্‌পরোয়া নেই। আমি আপনার সহায় আছি। আমি আইন জানি; উকীল। আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিদ ক'রে কোনো ব্যাটা আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না!…

কথাটা বলিয়া শ্রীশ কেমন অপ্রতিভ হইল। উত্তেজনার ঝোঁকে মা'র ভাশুরকে—ঐ পূজ্যপাদ মেজকাকাকে সে অভদ্র গালি দিয়া ফেলিয়াছে! সে নীলার দিকে চাহিল—এমনি…তার অশ্রু-মাখা চোখে একটু যেন খুশীর আভাস! শ্রীশের মনের ভার নামিল। সে ভাবিল, এ গালিটা নীলা উপভোগ করিয়াছে! যাক্‌…ভাবনা নাই!

শ্রীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল…যেন ছেলেমেয়েদের রূপকথার কোন্ মায়াবী যাদুকর…মনে মনে যেন মন্ত্র জপিতেছে…রাজ্যের অভিসন্ধি সে-মন্ত্রে আকাশ ফাঁড়িয়া, পাতাল ফুঁড়িয়া সদলে এখনি আসিয়া তার মনে উদয় হইয়া তাকে ঠিক পথে চালিত করিবে!…

শ্রীশের চেতনা ফিরিল মা'র আহ্বানে। মা বলিলেন—তা হ'লে এঁদের কি বলি, বাবা?

শ্রীশ কহিল—এঁদের? হ্যাঁ, বলুন সাদা কথা যে, মেয়ে রাজী হলো না এ বিয়েতে। মেয়ে ডাগর—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিবাহ দেওয়া বে-আইনী কাজ হবে!…

মা বলিলেন—আর ওই যে গায়ে হলুদ পাঠিয়েচে—হলুদ, তবে অত জিনিষপত্তর…?

শ্রীশ মা'র পানে চাহিল—খুব তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে। তাঁর মনে কোনো লোভ, কোনো আগ্রহ…? নারী তো; কে জানে!

শ্রীশ কহিল—আপনার কি মত আছে এ বিয়েয়?

মা কহিলেন—না বাবা। মনের কথা বলো যদি তো, মোটে না। আমায় যেন পাগল ক'রে তুলেচে! কি করচি, তার কিছু বুঝচি না!…তবে এ ছাড়া এ দায়ে উপায়ই বা আর কি আছে! কে করবে? আমি যেন অকূল সাগরে ভাসচি।

শ্রীশ কহিল—ভাববেন না। আপনার যদি মত না থাকে, তা হ'লে আর কোন দ্বিধা নয়। সটান্ তাই ব'লে দিন। তারপর গায়ে হলুদ, জিনিষপত্তর?…পূজ্যপাদ মেজকাকা মশায়ের যদি মেয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তার বিনিময়ে উনি রাজ্যলাভ করুন!…

মা কহিলেন—ওর তো বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নেই…

শ্রীশ কহিল—পাঁচ বছরের? চার বছরের? দেড় বছরের মেয়ে? তাও নেই?

মা কহিলেন—একটি মেয়ে আছে, তার বয়স…সে এই ছ'মাসের হয়েচে, বুঝি…

শ্রীশ কহিল—তার গায়ে হলুদ ছুঁইয়ে ছান্‌লাতলায় ছ্যাড্‌ড্যাং করে দিন্ তবে। আপনার সে-চিন্তার দরকার কি? যাঁরা এ সম্বন্ধ স্থির করেচেন, তাঁরা উপায় দেখুন…

মা অবাক্ হইলেন—এ ছেলে বলে কি? তার পরে তাঁর দশা? কি করিয়া মীরাটে ফিরিবেন?…মা কিছু বলিলেন না—দুই চোখে চারিধারে শুধু সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ দেখিলেন।

শ্রীশ কহিল,—আপনি মেয়ে নিয়ে মীরাট চ'লে যান। বলেন, আমি রেখে আসতে পারি। আমার তো কোন কাজ নেই। এখানে হাওয়া খেতে এসেচি—নিষ্কর্মা, হাওয়াই খাচ্ছি।

৪

আবার জুতার দুপ-দাপ্ শব্দ। সিঁড়ি বহিয়া ভিড় আবার ঠেলিয়া উপরে উঠিল।…মেজ ভাওর মশায় আসিয়া কহিলেন,—মত হলো বড় বৌ?

বড় বৌ হতাশ-চক্ষে স্নেহাস্পদ দেবরের পানে চাহিলেন, কহিলেন—না, ভাই।

মেজ ভাওর কহিলেন,—না ভাই তো বয়ে গেছে! সরো তুমি। একটা একরত্তি মেয়ের গোঁ এত বড় হবে যে… দাঁড়িয়ে গুষ্ঠীশুদ্ধ অপমান হবো? তা হয় না…

তাগা-পরা মেজ জা কহিলেন,—শুধু তাই! হাতে দড়ি পড়বে না? এই ছেরাদ্দের জোগাড়ের দরুণ নগদ টাকা গুণে দেছে না?…হাত পেতে নাও নি?

মেজ ভাওর কহিলেন—লোকনাথ বাবু নিজে এসেচেন, তাঁর ম্যানেজার, লোক-জন…

মেয়ে নীলা ছুটিয়া আবার সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বারে হুড়কো আঁটিয়া দিল।

ভিড় ঠেলিয়া—কৈ কোথায়? বলিয়া এক বৃদ্ধ সামনে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়ের মা মাথায় ঘোমটা টানিয়া একপাশে সরিয়া গেলেন, অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত ভাবে।

শ্রীশ দেখিল, আগন্তুকের চেহারা হুবহু সেই পুরানো সংস্করণ শিশুবোধকের পৃষ্ঠায় কাঠের ব্লকে ছাঁপা চাণক্য পণ্ডিতের মত! মাথায় মস্ত টাক, পিছনে কতকগুলা চুল, চুলের বর্ণ যেন সিরাজগঞ্জের দেশী পাট! চর্ম্ম লোল, বাঁটুল আকৃতি!...ইনিই লোকনাথ চক্রবর্ত্তী? এ বিবাহের বর?...

লোকনাথ মা'র সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল,— মা...

মা জড়োসড়ো—গায়ের কাপড় আরো একটু টানিয়া আপনাকে যথাসাধ্য ঢাকিলেন।

লোকনাথ কহিল,—আমি তেমন বুড়ো হইনি তো মা...কেন অমত করচেন?...মার চোখে ছেলে কি বুড়ো হয় কখনো? তা ছাড়া আপনার মেয়েকে না দেখেই পছন্দ করেচি, শুধু ছবি দেখে। রাজ্যেশ্বরী করবো আপনার কন্যাকে। বিষয়-সম্পত্তি আমার অল্প নয়। সে-সবের উনিই মালিক হবেন।

মা কোনো কথা বলিলেন না। শ্রীশ কহিল,—ওঁদের এ বিয়েতে মত নেই। মানে, ওঁদের সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয় নি যখন এ সম্বন্ধে...

মেজ ভাওর আগাইয়া আসিল, কহিল—আপনি কে মশায়, ওকালতি করতে দাঁড়ালেন?

শ্রীশ কহিল,—আমি উকীল।

মেজ ভাওর কহিল—এটা কাছারি নয়। কাছারি বন্ধ নেই তো। ওকালতি করতে হয়, সেখানে গিয়ে করুন।

শ্রীশ কহিল—এ মামলা কাছারিতে যখন গড়াবে, তখন তার ওকালতি কাছারিতে চল্‌বে। আপাততঃ ভালো কথায় বোঝাচ্ছি...

মেজ জা ফোঁশ্‌ করিয়া উঠিলেন, কহিলেন—ঢের দরদ দেখা গেছে! এ্যাদ্দিন দরদ-দেখানীরা কোথায় ছিলেন সব?

শ্রীশ কহিল—ঘটকালি করে নতুন তাগা তো হাতে পরতে পাইনি, দরদ কোথা থেকে হবে, বলুন?

কথাটা তপ্ত লোহার মত মেজ বৌয়ের গায়ে লাগিল। মেজ জা শাড়ীর ভাঁজ টানিয়া হাত ঢাকিয়া তাগাজোড়া গোপন করিলেন।

লোকনাথ কহিল—এ-সব কথা কেন তুল্‌চেন? শুভ-কর্ম্ম...একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উৎসব...এ সময়...

শ্রীশ কহিল—আপনার পক্ষে উৎসব বটে, কিন্তু অপর পক্ষ এটাকে ঠিক উৎসব ব'লে গ্রহণ করতে পারচে না তো।

লোকনাথ কহিল—কিন্তু মেয়ে যা বলবে, তাই তো শিরোধার্য্য করা চলে না। ছেলেমানুষ, তার কি বুদ্ধি-বিবেচনা যে...

শ্রীশ কহিল—তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা আপনাদের মত পক্ক-কেশদের চেয়ে বেশীই দেখচি।

মেজ ভাওর গোঁফ মুচড়াইয়া কহিলেন—ইনি আপনার পক্ষের লোক?

লোকনাথ নাকে চশমা টিপিয়া ধরিয়া শ্রীশকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—না। এঁকে কখনো দেখেচি বলে তো মনে পড়চে না।

মেজ ভাওর কহিল,—উনি তবে পথের লোক! এ বাড়ীর মধ্যে এলেন কি ক'রে? এ বে-আইনী।

শ্রীশ কহিল—আমায় আইন দেখিয়ো না। ওঃ, কুলধ্বজ কাকা! ভাইঝির বিয়ে দিয়ে ফাঁকতালে পাঁচ হাজার টাকা ট্যাঁকে পুরচেন...উনি এসেচেন আইন দেখাতে!...এ পাঁচ হাজারের জন্য গবর্ণমেণ্ট না অতিথশালায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাখে!...

মেজ ভাওরের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। পাঁচ হাজারের তিন হাজার এখনো লোকনাথের সিন্দুকে, তবে দু' হাজার তাঁর হাতে আসিয়াছে! সে দু' হাজার কি শেষে...? লোকনাথ কি ছাড়িয়া কথা কহিবে? নিজের কন্যারও বয়স এমন নয় যে...! রাগ ধরিল। ঐ ছেলেটা...হাবুল... বয়স তার তেরো বৎসর। ও যদি ছেলে না হইয়া মেয়ে হইত! খুকী এখন ছ' মাসের। লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর মত পাত্র প্রতি বৎসর কিছু বাজারে আসে না! হাজার বছরে একটা যদি...ওঃ, এই বাড়ীখানা, তার উপর গহনা, টাকা, শেয়ার, ডিবেঞ্চার...

মেজ ভাওরের চোখের সামনে হইতে লোকজন-গাড়ী-কলরব-ভরা এই এলাহাবাদ সহরটাই চকিতে সরিয়া সাহারা মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ মূর্ত্তি ধারণ করিল!...

এ বিবাহ না ঘটিলে রাজ্য না হোক্—ঐ পাঁচ হাজার... চারপ্রর সাথে মাঝে আরো কিছু না কোন্...

কিন্তু এ মেজাজে ফল হইবে না!...মেজ স্তাওর নরম হইয়া ভ্রাতৃজায়াকে বুঝাইলেন—তুমি এখানে থাকো বরং বড় বৌ...মেয়েকে ভুলিয়ে ওর মাথা ঠাণ্ডা করাও। এই তো স্বচক্ষে পাত্র দেখলে—কেমন শক্ত সমর্থ শরীর—এমন কি বুড়ো? তবে হলুদটা এখানে পাঠিয়ে দি,—মেয়ের কপালে ছুঁইয়ে দাও—একটা মাঙ্গলিক...কি বলেন আপনি লোকনাথবাবু?

লোকনাথ কহিল—তার পর মুস্কিল হয়েচে এই যে, আজকের লগ্নটি ছাড়লে ছ' মাস আর আমার অবকাশ ঘটবে না। এক হপ্তা পরেই আমায় গয়ায় যেতে হবে। জমী জরীপ হচ্ছে। ওখানে কটা তালুক আছে। তারপর গয়া হয়ে বেরিলি, বেরিলির পর আবার কাশী...কাশী থেকে জৌনপুর, প্রসাদগাঁও, ঝুলনচৌকি, সাতপুরা, গোমুণ্ডা...সেই আশ্বিন নাগাদ্ যদি ছুটী মেলে!...

মেজ স্তাওরের চোখের উপরে আবার সারা ইউ-পির ম্যাপখানা ভুলিয়া উঠিল। মেজ স্তাওর কহিলেন,—শুনচো বড় বৌ? ছি, তুমিও মেয়ের সঙ্গে অবুঝ হ'লে!...তোমার সুরথ, জবু, সিন্ধু—এদের শুদ্ধ কত বড় চিন্নে হয়ে যাবে, সে কথা ভেবে দেখচো না...?

লোকনাথ কহিল—ভালো কথায় না হয় যদি তো আমার ম্যানেজার থানায় খপর পাঠিয়েচে—পুলিস এলো ব'লে... শেষে কি পুলিস ডাকিয়ে বিয়ে করতে হবে! কি করবো? উপায় নেই। আমার যে আর অবকাশ মিলবে না। দেহাতে একলা কখনো যাইনি...পরিবার সঙ্গে গেছে বরাবর... আমার খাওয়া-দাওয়া—লোকজন দিয়ে তা হয় না বলেই না আবার এ বয়সে...

লোকনাথ আরো কি বলিতেছিল, তার কথা শেষ হইল না। ঝড়ের ঝাপ্টার মত এক জোয়ান ছোকরা আসিয়া উপস্থিত! সে কহিল—কৈ? কোথায় সে বুড়ো বর?

লোকনাথ চমকিয়া তার পানে চাহিল। সর্ব্বনাশ! এ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ। ভারী বদ্, বেয়াড়া মেজাজ—কারো তোয়াক্কা রাখে না!

ভোলানাথ কহিল—কি হচ্ছে? বিয়ে করতে বসেচো না কি আবার এইখানে?...

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভোলানাথের কথায় বেশ জোর আছে! ভোলানাথ কহিল,—আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনোরকম শত্রুতা করি নি তো, তবে, অহেতুক আমাদের সর্ব্বনাশ করেন কেন?...

মানুষ যত বড় পাষণ্ডই হোক, এ কথায় মন সঙ্কোচে একটু নুইয়া পড়ে। এটা হয় তো আদিম চক্ষুলজ্জা—ছুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার ফন্দী-ফিকিরের আগে এ চক্ষুলজ্জা মানুষকে অভিভূত করিয়া থাকে। মেজকাকামশায়ও একটু মুখ্ড়াইয়া গেলেন। লোকনাথ কহিল,—তুমি এ সময় কাশী থেকে হঠাৎ এলে যে?

ভোলানাথ বেশ সপ্রতিভভাবে জবাব দিল,—আপনার জালায়। আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়াও দায় হলো ক্রমে!...বলিয়াই সে সমবেত জনমণ্ডলীর পানে চাহিয়া কহিল,—আপনাদের সব কথা তা হ'লে খুলে বলতে হয়। ওঁর একবার মাথার ব্যামো হয়—জন্মের মত পাগল হবেন, এমন ভয় হয়েছিল। তা হলো না, ওঁর ভাগ্য। কিন্তু তার বদলে যা হলেন, আমরা-শুদ্ধ তাতে পাগল হয়ে বাস্ করচি।

সকৌতূহলে সকলে লোকনাথের পানে চাহিল।

ভোলানাথ কহিল,—ওঁর কেমন ধারণা হলো যে, ওঁকে যত্ন করবার কেউ নেই!...বছর চারেক আগে একবার কলকাতায় যান্, সেখানে গিয়ে চুপি চুপি একটি বিবাহ করে আসেন। তার পর আর-বছর কানপুরে এক ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার করেচেন। তাঁরা ছ'জনেই আমাদের ওখানে কাশীর বাড়ীতে বাস করচেন। দেখুন তো...বুড়ো বয়সে ছ'ছুটো মেয়ের সর্ব্বনাশ করা...

ভিড়ের মধ্য হইতে মেজ বৌ কথা কহিলেন, বলিলেন,—তোমাদের সর্ব্বনাশ, বলো। বিষয়ে ভাগীদার—

ভোলানাথ কহিল—তা তো বটেই! কে ভাগীদার সহ্য ক'রে, বলুন, অহেতুক? বিশেষ আমার মা-ঠাকরুণ এখনো জীবিত আছেন! ভাবুন তো, তাঁর মনের অবস্থা। এখানে আবার...

শ্রীশ কহিল—উনি যে বলেচেন, পাঁচ-ছ মাস হলো, ওঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েচে...

ভোলানাথ কহিল—পিতৃনিন্দা মহাপাপ। কাজেই কিছু বলতে পারবো না। এইটেই হলো ওঁর বাতিক!... আমরা চার ভাই, ছুই বোন—ছুই বোনেরই বিবাহ হয়েচে... তাদের তিন-চারটি ক'রে ছেলে-মেয়ে...বুঝুন তো...

মেজকাকামহাশয় কহিলেন—তা হ'লে আপনি বিবাহ

করুন। আমাদের এ ভাবে জাত নষ্ট করা? ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন বলেই না আমরা···ওঁর ম্যানেজারও তাতে সায় দিলে···

ভোলানাথ কহিল,—কে ম্যানেজার? ঐ খোট্টা গোপীচাঁদ? ও বেটা তো মোসাহেব। কাশীতে ঢোকবার ওর সাধ্য নেই। ওটা আমাদের শনি···

মস্ত ব্যাপার! শ্রীশ ভাবিতেছিল, কি সে নাটক ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিল! নাটকে বড় জোর পাঁচটা অঙ্ক···যত দৃশ্যই জুড়িয়া দাও, ওই পাঁচ অঙ্ক ছাড়াইয়া ছয়ে তার যাইবার উপায় নাই! আর এ যে সাত সর্গে মহাকাব্য রচিবার মত প্লট! নানা শাখা-প্রশাখায় যেন সেই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপ্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ!

শ্রীশ কহিল—কর্ত্তা যে পুলিশে অবধি খবর পাঠিয়েচেন।

ভোলানাথ কহিল—আসুক। তাদের সাহায্যে ওঁকে কাশী নিয়ে যাই! মাথা খারাপ হওয়া-ইস্তক আদালতে দরখাস্ত দিয়ে জজের হুকুমে আমরা ওঁর গার্জ্জেন নিযুক্ত হয়েচি। বিষয়-সম্পত্তি না হ'লে কোথায় কি ভাসিয়ে দিতেন···

মেজকাকা মহাশয় একটা শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন,—এ্যাঁ···সেই একটি শব্দে কতখানি নৈরাশ্য—শ্রীশ তাহা বুঝিল; বুঝিয়া হাসিল।

মেজকাকা বলিলেন—তা হ'লে আমাদের উপায় করে দিন, ভোলানাথবাবু। জ্ঞাতি-কুটুম্বে বাড়ী ভর্‌তি। আজ বিয়ে···

ভোলানাথ কহিল—খরচ করেচেন, তা আদায় হয়ে গেছে নিশ্চয়। না হ'লে আপনাকে দেখলে এমন মনে হয় না যে, খামোকা এই পাত্রে কন্যাদান করতে এগিয়ে এসেচেন!

শ্রীশ কহিল—কন্যা ওঁর নয়—ওঁর ভাইয়ের। এবং উনি স্বেচ্ছায় বিনানুরোধে গার্জ্জেনস্থলাভিষিক্ত হয়ে এই মহান্ ব্রতে···নগদ দু'হাজার অগ্রিম পেয়েচেন, শুনেচি।

ভোলানাথ কহিল—টাকাটা? এতগুলো টাকা নিশ্চয়ই খরচ করেন নি?

—সেগুলো···বটে? হ্যাঁ! এমনি কতক-গুলা অসম্বদ্ধ উক্তিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মেজকাকার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল; তার পর মেজকাকা সাক্ষী-সাবুদ, না, কি ডাকিবেন, এমনি বলিয়া সদর্পে নামিয়া গেলেন···বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাঁর প্রত্যাগমন আর ঘটিল না।

পুলিশ আসিল—কিন্তু ব্যাপার শুনিয়া নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া গেল। মেজ বৌও উহার মধ্যে এক সময়ে কখন্··· সেনানীদলও সেই সঙ্গে কর্পূরের মত উবিয়া গেল।

ভোলানাথ লোকনাথের হাত ধরিয়া তাঁকে লইয়া বিদায় হইল।

তখন মা ডাকিলেন—নীলা···

মেয়ে বাহিরে আসিল। মা শ্রীশের পানে চাহিলেন কহিলেন,—কি হবে বাবা? ও-বাড়ীতে এর পর আর···

শ্রীশ কহিল—না, আমিও নিষেধ করি।

মা কহিলেন—কিন্তু মীরাট যাবার পয়সাও···

নীলা কহিল—আমার এই চুড়ি দু'গাছার কত দাম হতে পারে? এ গিনি সোনার—গিল্টি নয়। দেখুন···বলিয়া চুড়ি খুলিয়া নিঃসঙ্কোচে সে শ্রীশের হাতে দিল।

শ্রীশ নীলার পানে চাহিল। আষাঢ়ের বৃষ্টি থামিলে বাঙলার আকাশ যেমন দীপ্তশ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে··· নীলার মুখে তেমনি দীপ্তি!

শ্রীশ কহিল—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। ও-চুড়ি বেচতে হবে না। আমি আপনাদের পৌঁছে দেবো। কিন্তু সুরথ আপনার ভাই তো?···কথাটা বলিয়া শ্রীশ নীলার পানে চাহিল।

নীলা কহিল—তার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! এমন নির্ব্বোধ···

শ্রীশ কহিল—আপনারা নীচে আসুন। আমি একখানা গাড়ী ডাকি···আমার সঙ্গেই যাবেন এখন। তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে আজই মীরাটে···

নীচে সেই প্রৌঢ়া? শ্রীশ আসিয়া সবিস্ময়ে দেখে, নাই!···কোথায় গেলেন?···

ফটকের কাছে সেই ছোকরা। এ সুরথ···নিশ্চয়। শ্রীশ কহিল—তোমার নাম সুরথ?

ঘাড় নাড়িয়া সে জানাইল, হ্যাঁ।

—এখানে দাঁড়িয়ে?

কাঁদ-কাঁদ মুখে সে কহিল,—মেজকাকা ব'লে গেছে, তার বাড়ীতে যদি ঢুকি তো জুতো মেরে সকলকে বার ক'রে

দেবেন। লোকনাথবাবুর ছেলে নালিশ ক'রে টাকা আদায় করবে, বলে গেছে।

—হুঁ! ব্যাপার তাহা হইলে এইখানেই না চুকিতে পারে!

শ্রীশ কহিল,—তুমি দাঁড়াও। তোমার মা, দিদি রইলেন। আমি গাড়ী ডেকে আনচি। খবর্দ্দার, কারো কথায় কারো সঙ্গে এখান থেকে নড়বে না!...

সুরথ কহিল,—না।

শ্রীশ গাড়ী করিয়া দীননাথের গৃহে ফিরিল। বেলা তখন প্রায় তিনটা। দীননাথ বাহিরের ঘরে ছিল। সে কহিল,—ব্যাপার কি? মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরলে অবশেষে?

শ্রীশ কহিল,—অনেক কথা আছে ভাই...আপাততঃ একটা টাকা দাও...গাড়ী ভাড়া। তা তুমি এর মধ্যে কোর্ট থেকে ফিরলে যে?...

দীননাথ কহিল—এক হাকিম মারা গেছেন ব'লে কোর্টের হাফ-হলিডে তাঁর অনারে।

—বটে! তা, অতিথ এনেচি বিস্তর।...

রাত্রে মীরাট যাইবে বলিয়া শ্রীশ বাহির হইতেছে, দীননাথ আসিয়া কাণে কাণে কহিল,—একেবারে সস্ত্রীক ফিরচো তা হ'লে?

শ্রীশ হাসিয়া জবাব দিল,—ধেৎ!

দীননাথ কহিল,—কেন! চিরকাল কি এমনি একলা থাকবে? যখন ঘটনাচক্র এমন দাঁড়ালো...উপন্যাসেও যে এমন হয় না হে। তাছাড়া খাশা হবে...a thing of beauty, শিক্ষিতা, বলো তো একটু ইঙ্গিত দি।

শ্রীশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ হবো কি?

দীননাথ কহিল—আমার গৃহিণী বলছিলেন, দ্যাখো, তোমার বন্ধু মীরাটেই বা থেকে যান্...

শ্রীশ কহিল,—ভবিতব্য...যদি তা ঘটে, আমি তাতে খুশীই হবো।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আগমনী

সিন্ধু—যৎ

জগত-জননি উমা এস আঁধার ভবনে,
দুখ তাপে মোরা সবে মরিয়া আছি জীবনে।
ছাড়ি কৈলাস-ভবন আলো কর এ ভুবন,
নিরখি তব চরণ সার্থ হয় জনগণে।
মরি কি অরূপ-রাশি লাজে মরে কোটি শশী,
শিব যোগাসনে বসি মগন তোমার ধ্যানে।
এ হেন রূপ তোমার বর্ণিবে সে সাধ্য কার,
তুমি যে শক্তি-আধার মানবে বুঝে কেমনে॥

	৩	০	১	২
ধা ধা	•পধা ণর্সা । ণা	ণা ধা ধা ।	পা । পা ।	। । মা মা ।
— গ	ত •• • জ	ন • নি •	উ • মা •	• • এ স

৩	০	১	২
রমা পধা মা পা	মা জ্ঞা জ্ঞা ।	'রা । রা ।	। । রা ণা
আঁ• •• • ধা	র • ভ •	ব • নে •	• • দু খ

৩ ০ ১ ২
ধা ধা । । | মা পধা ণর্সা ণধা | ণা ধা পা । | । । মা মা |
তা পে ০ ০ | মো রা০ ০০ ০০ | ০ স বে ০ | ০ ০ ম রি |

৩ ০ ১ ২
পধা ণা ধা পা | মা । জ্ঞা মা | জ্ঞা রা । । | । । |
য়া০ ০ ০ আ | ছি ০ জী ০ | ব নে ০ ০ | ০ ০ |

৩ ০ ১ ২
মা পা | না । না । | র্সা । র্সা । | না র্সা র্সা র্সা | । । ণা ণা |
(১) ছা ড়ি | কৈ ০ লা ০ | স ০ ভ ০ | ০ ০ ব ন | ০ ০ আ লো |
(২) ম রি | কি ০ অ ০ | রূ ০ প ০ | ০ ০ রা শি | ০ ০ লা জে |
(৩) এ হে | ন ০ রূ ০ | প ০ তো ০ | ০ ০ মা র | ০ ০ ব র্ণি |

৩ ০ ১ ২
ধা ধা । । | ধা পধা ণসা ণধা | ণা ধা পা । | । । |
(১) ক র ০ ০ | এ ভু০ ০০ ০০ | ০ ব ন ০ | ০ ০ |
(২) ম রে ০ ০ | কো টি০ ০০ ০০ | ০ ০ শ শী | ০ ০ |
(৩) বে সে ০ ০ | সা ধ্য০ ০০ ০০ | ০ ০ কা র | ০ ০ |

৩ ০ ১ ২
মা ধা | ধা । । ধা | মা পধা ণসা ণধা | না ধা পা । | । । মা মা |
(১) নি র | খি ০ ০ ত | ব চ০ ০০ ০০ | ০ র ণ ০ | ০ ০ সা র্থ |
(২) শি ব | বো ০ ০ গ্য | স নে০ ০০ ০০ | ০ ব সি ০ | ০ ০ ম গ |
(৩) তু মি | যে ০ ০ শ | ক্তি আ০ ০০ ০০ | ০ ধা র ০ | ০ ০ মা ন |

৩ ০ ১ ২
পধা ণা ধা পা | মা । জ্ঞা মা | গা রা । । | । । |
(১) হ০ ০ ০ য় | জ ০ ন ০ | গ ণে ০ ০ | ০ ০ |
(২) ন০ ০ ০ তো | মা ০ র ০ | ধ্যা নে ০ ০ | ০ ০ |
(৩) বে০ ০ ০ বু | ঝে ০ কে ০ | ম নে ০ ০ | ০ ০ |

২ ৩ ০
১ম তান—মরা মপা ধণা সর্রা | র্সণা ধর্সা ণধা পমা | পধা ণর্সা র্রর্সা ণধা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

১ ২
পমা পধা ণধা পমা | জ্ঞরা সরা
০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০

২ ৩ ০
২য় তান—র্রর্রা র্সণা ধণা র্সর্সা | ণধা পধা ণণা ধপা | মপা ধধা পমা জ্ঞরা
অ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২
সরা মপা ণধা পমা | জ্ঞরা সরা
০০ ০০

কথা, সুর ও স্বরলিপি—
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮
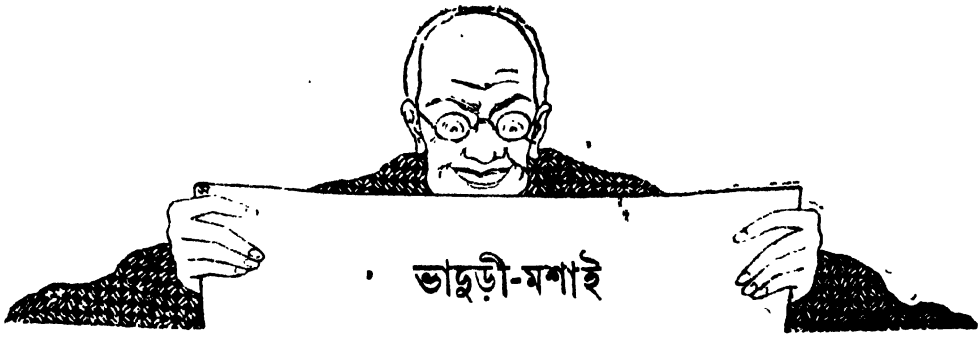
আজ সকালটা যেন মুখ-ভার ক'রে দেখা দিয়েছে,- মাথার ওপর মেঘ গুম্ হয়ে রয়েছে। অনেক সময় এরও একটা উপভোগ্য সৌন্দর্য্য থাকে। কিন্তু মাতঙ্গিনী আজ রঙ্গু ওঠে নি দেখে কেবলি আশ মিটিয়ে পাশ ফিরে ফিরে বেলা ক'রে ফেলেছেন। দেহের ভারটা দিন দিন দুষমনীই করছিল, তাই সমতল অবস্থায় থাকাটায় আরামও বোধ করতেন। ঘড়িতে টং টং ক'রে আটটা বাজায়, "গোবিন্দ গোবিন্দ" ব'লে, পাশ-বালিসটায় দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বস্‌বার সময় পটাস্ ক'রে একটা শব্দ হল--

--"ফাটলো বুঝি। ফাটবে না! ভাদ্দোর মাসে করা নেই ওই! ওঁর অমন লোহার খাটখানারই দু'দুটো পাত্ সে দিন পাশ ফিরতেই পট্-পট্ ছিঁড়ে গেলো। এত বলি মাড়োয়ারীর মরচে ধরা মাল---একটু সাবধান হয়ে পাশ ফিরো···

---"দুর্গা-দুর্গা, --সকাল-বেলা এ কি দুঃস্বপ্ন, --গোবিন্দ গোবিন্দ! নন্দা কি মরবে না!---স্বপ্নেও জ্বালাচ্ছে! তোর কি রে উনুন্-মুখো? বিষয়-সম্পত্তির কি হবে না হবে, সে আমি বুঝবো।"

চক্ষু বুজেই এই সব স্বগতোক্তি চল্‌ছিল। এ ত ভাল স্বপ্ন নয়---তায় সকালে দেখা! চোখ খুলে শুভ-সূচক কিছু দেখা দরকার।

বাগানের দিকের জানালার মাথায় মাড়োয়ারীর এক মাকোসার জালে পড়া গড়েশজী রাখা ছিল।—

মাতঙ্গিনী করযোড়ে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে—"দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে দাও প্রভু!" ব'লে জান্‌লা লক্ষ্য ক'রে চাইতেই নজরে পড়লো,—বারদিক থেকে একটা গাধা, জানালার ঘটার মুখে-রাখা স্থলপদ্ম দুটো তিন পো জিভ বার ক'রে টেনে নিচ্ছে!

-"দুর্গা-দুর্গা!" মাথা ঘুরে গেল।

তার পর থপ্ ক'রে নেমে রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় চীৎকার ক'রে ঝি চাকর মালী জড় ক'রে ফেল্‌লেন।

"বাবু-- কোথায়? এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন বুঝি! শরীরে ঘুণ না ধরিয়ে আর ছাড়বেন না! মাগী নিজস্ গদীর ওপর বিইয়েছিলো।--যা, তুলে দি গে যা। ওঁর মাড়োয়ারী মক্কেলের মাথায় মারি ঝাড়ু---চার পয়সামে এক চড়ুকে গণেশ রেখেছে খিলেনের খোপে---সিঁড়ি লাগিয়ে শুঁড় দেখতে হয়!"

মাতঙ্গিনীর মন মাথা দুই upset (ওলোটপালট)—হবারই কথা। একে দুঃস্বপ্ন- তায় দেবতার এই বদিয়াতী একেবারে গণেশের বদলে গাধা! এতে মাথার ঠিক রাখা, বেস্পতিরও অসাধ্য --পাদরীতে পারে না।

"দিন-রাত প'ড়ে থাকলে শাল কাঠেও খোতো ধরে। --উঠেছেন?" বলেই মাঝের দোরটা খুলে ফেল্‌লেন।

এ কি, শয্যা শূন্য! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বিছানা টিপে বালিসের আশে-পাশে উঁকি মেরে আলমারির পেছন, শেষ নদ্দামার ফোকর পর্য্যন্ত দেখে কর্কশ কণ্ঠে চাঁদনীকে (ঝি) বল্‌লেন—"মুইতে পার না---খেয়ে খেয়ে মুইতে পার না— খেয়ে খেয়ে কেবল মোটাচ্চ—খাটের নীচেটা একবার দেখ না।"

"কি খোয়া গিছে মা? চাবী?"

"তোমার মাথা—বাবু কোথায়?"

সে তাড়াতাড়ি খাটের নীচে ঢুকে দোয়ানী খোঁজার মত হাত বুলিয়ে খানিকটে হেসে নিলে।

মালী সভয়ে বল্‌লে—"বাবুকে তো লে গিয়া।"

"লে গিয়া! কে—কাঁহা?"—

"একঠো—আধা-বাবু"।

—"আধা বাবু! কি রকম দেখতে—মাথায় টাক আছে?"

সে মা-জীর মন রাখ্‌তে দু'দিক্ বজায় রেখে বললো, "হাঁ মা-জী, ওয়েসাই লাগে……"

চাঁদনী বললে—"বাবুর কথা? হাঁ গো মা; —ভাবচিস্ কেন, খুব জান্‌পছানের লোক—'দাদাভাই' ডাকে। কোথাকে চা-পিতে আর পদ্মফুল দেখাতে লি-গিছে।"

"মাথা খেয়েছে—মড়া এখানেও এসে জুটল। এ নন্দা ছাড়া আর কেউ নয়।—সকালের স্বপ্ন……আমাকে ব'লে গেল না পর্য্যন্ত!"

"এসেছিলো, তুই যে ঘুমিয়েছিলি। সে বাবুও বললে, পেন্নাম করা হ'ল না।"

"তার পেন্নামের মুখে আগুন!"

মাতঙ্গিনী অগাধ জলে প'ড়ে গেলেন!

"আজ কি মরে ঘুমিয়েছিলুম! 'পদ্মফুল দেখাতে' সে আবার কি? এই সময় নবনী আবার কলকেতায় গেলেন, তাঁর চুল ছাঁটানো চাই, জামা জুতো না হ'লে নয়! বাড়ীতে তাকে রেখেই নন্দা পোড়ারমুখো বেরিয়ে পড়েছে দেখছি।"

"এদের সঙ্গে ঠাকুরও গেছেন নাকি! সবাই মিলে কি একটা করছে না ত!"

মাতঙ্গিনীর মাথায় যেন আগুন ধ'রে গেলো। "যা—তোরা বেরো" ব'লে চাকর-দাসীকে বিদায় ক'রে, রোষে অভিমানে আবার গিয়ে বালিসে মুখ গুঁজে শয্যা নিলেন।

* * * *

কলকেতায় থাকতে মাতঙ্গিনী কলুটোলার ধনঞ্জয় গণৎকারকে গোপনে ডাকিয়ে এনে ঠিকুজি দেখিয়েছিলেন। তাতে তিনি বহু আশার কথা শোনান। শেষ মাথা চুলকে বলেন,"সবই ভালো, কেবল তুমি একটু সতর্ক থেকো মা। টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, নিজের হাতে রাখতে পারলে, যিনিই আসুন, তোমার হাত-তোলায় থাকবেন। শুক্র কিছু বক্র দেখছি, কিন্তু কেতু তোমার বশে, তোমাকে পায় কে! কুঁদের মুখে কারো বাঁক থাকবে না। তিনি এগুচ্ছেন, উভয়ে দর্শনে, গ্রহে গ্রহে ঘর্ষণে ও খোঁচটুকু ছুলে সাফ্ ক'রে দেবেন, কিছু ভেব না মা, সব ঠিক ক'রে দেবে, আর ত কেটে এসেছে, এই বছরটাই বখেড়ার বছর, আর ক'টা মাসই বা! আচ্ছা দাও ত মা, ১২টা টাকা, দেখি ধনঞ্জয় আচার্য্য গ্রহের গুমোর ভাঙ্গতে পারে কি না। অমন পাত্তুরে ঘাটা দ' হুঁঃ, সে কথা কে না জানে!"

এই ব'লে তিনি মাত্র ১২টি টাকা নিয়ে আর মোটা প্রণামীর আশ্বাস নিয়ে বিদায় হন।

মাতঙ্গিনী ঐ সব ভালো-মন্দে মিশিয়ে মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে পারতেন, যদি না দেখতে পেতেন নন্দা পা টিপে টিপে ধনঞ্জয়ের পেছু নিয়েছে।—

"ও অলুক্ষুণে আবার যায় কেন?"

সেই দিন থেকেই নন্দার উপর তাঁর সন্দেহ। পরে পষ্টা-পষ্টি বিষদৃষ্টিতে দাঁড়ায়।

প্রভাতের স্বপ্নটা তারিরই রিহার্সেল্ ছিল। অধিকন্তু বাবুকে মেয়ে দেখতে নিয়ে যাবার জন্যে নন্দা নাছোড়বান্দা—

তার ওপর আবার চাঁদনীর মুখে শোনা "পদ্মফুল" তাঁকে ব্যাকুল ক'রে দিয়েছে। একে স্ত্রীলোক, তায় নিজেরই বুদ্ধি-দোষে বাপের বাড়ীর একটি পাকা পিসী মাসী—কাকেও কাছে রাখেন নি!——তাই আজ এই বিদেশে একান্ত অসহায়ার মত হাত-পা ছেড়ে গদির ওপর গা ঢেলে দিয়েছেন। মনের কিন্তু কামাই নেই।

—"এই যে হবে না হবে না ক'রে লাহিড়ী মাসী ত বিয়াল্লিশ পেরিয়ে 'বেন' ধরলেন—সাতান্নয় বিধবা হয়ে না থামেন। বিধাতা বাদ সাধলেন—তাই

"নন্দা পোড়ারমুখোর তর সয় না কেন—সে কে? দিন-রাত লেগে থাকলে মুনি-ঋষিরও মন টলে—তায় পোড়া পুরুষের জাত—বয়সও বেশী নয়।—

—"ঠাকুর যা ব'লে আনলেন, তারও ত' কিছুই করছেন না। তিনিও কি ওদের সঙ্গে মিশলেন! আমি একা কত দিক্ সামলাই; এলুম এক কাযে, কোথা থেকে এক ডিপুটী একজোড়া ধেড়ে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাজির। নড়েও না—জাম হয়ে বসেছে! নবনী ছিল—যা দেখেছি আর যা ক'রে এসেছি—বড়টার জন্যে ভাবি না। উনিও রাজি, নবনীও চুল ছাঁটাতে ছুটেছে। কিন্তু আসল বিশল্যকরণীই যে রয়েছে। সেটিকে যে দেখলে আর তার কথা শুনলে…

—"তাই না কত ক'রে একটি দিনও বেরুতে দিই নি। আজ কেন মরতে যে সকালে উঠিনি!—কোত্থেকে পোড়ার-মুখো এসে······

—"সতীন নিয়ে ঘর!—ওরে বাবা,—কেরোসিনে যে পুড়ে মরতে পারবো না! ঠাকুর, আমার কি হবে, আমি যে আর ভাবতে পারি না,—অসহায়াকে রক্ষা করো ঠাকুর। তোমার কাছে নন্দা-ই কি এত বড় হ'ল ঠাকুর—আমি তার কি করেছি?"

মাতঙ্গিনী শয্যায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে দেবতার কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

২৬

বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ ভাদুড়ী মশাই ফিরলেন,—সঙ্গে নূতন আমদানী আগন্তুক এবং তারিণী। মোটর থেকে ভাদুড়ী মশাইকে unload (খালাস) করতে দু'জনকেই হাত লাগাতে হ'ল।

"কেমন দেখলেন বলুন?"

হাঁ ক'রে খানিকটে হাওয়া ছেড়ে, ভাদুড়ী মশাই বল্লেন, "রোসো।"

"বৌদির সামনে ত সব কথা হবে না।"

"রোসো।"

তারিণী বললে,—"একটু সামলাতে দিন, এসে পর্য্যন্ত এতটা কোনও দিন যান নি। চাঁদনী—পাখা"···

ভাদুড়ী মশাই বারান্দায় পৌঁছেই শালকাঠের স্থাবর চৌকীখানায় ব'সে পড়লেন।

"মধুপুরে ত লোক বেড়াতেই আসে"···

ভাদুড়ী মশাই একটু সামলেছিলেন, বল্লেন--"ব'সে থাকতে দেখলে না কি? জিওগ্রাফিখানা বলে না, পৃথিবী ঘুরচে--আবার অবিরাম, তার স্নানাহার নেই। কোথায় কোথায় নে' গে ফেলছে, তার খবর রাখো! এই বাঁশবেড়ে —এই বোগদাদ। তা না ত শুয়ে শুয়ে হাঁপাই কেন?" প্রভুরা metre বসিয়ে পয়সা আদায় করচেন না যে কেন —ভেবে পাই না—তেমন তেমন অর্থ-সচিব মিললে—এ নসিব আর বেশী দিন নয়।"

ভাদুড়ী মশায়ের মনটা আজ যেন বেশ হালকা, চোখে স্ফূর্ত্তির ফুর্ট—মাতঙ্গিনীর কথা মনেও নেই।

বল্লেন—"বাইরের হাওয়া গায়ে লেগে বেশ ভালই বোধ হচ্ছে,—যেন জড়তা কাটলো। দেখছি, সকাল বিকেল একটু বেড়ানই ভালো। বৈকালে······"

"চলুন না, মধুপুরটা একটু ঘুরে দেখা যাক, ইষ্টেসনের দিকেই যাওয়া যাবে'খন।

"রামঃ, কেবল চর্ব্বির চালান, আর মক্কার মোট। মধু-পুরে আবার ঘুরে দেখবার কি আছে? বরং সুবর্ণ বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে,—অমন লোক······"

"সেখানে ত যেতেই হবে, দু'দিনের বেশী ত থাকতে পারব না;—ওইখানেই ত আমাকে থাকতে হবে। তা না ত নন্দা দিদি কি রক্ষে রাখবেন। সুবর্ণ বাবু মাটীর মানুষ —তাঁকে সব কিছু বোঝান যায়। আর ইরাণীর বরাবরই আমার ওপর জোর,—দশ বছর পর্য্যন্ত আমার কাছেই মানুষ কি না; তাকে ক্ষুণ্ণ করা······"

"না গুপি, তা করতে আমি বলি না। ও মেয়েটিতে একটি অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করেছ? মুখখানি যেন হাসি দিয়ে গড়া,—না হাসলেও হাস্যময়ী। কথাগুলি কি সরস দেখেচ?"

"ওর প্রকৃতিই ওই······"

"না—না, তুমি বোঝ না, শুধু প্রকৃতি কেন,—আকৃতিও। 'লাবনী' কথাটা পড়াই ছিল, আজ চোখে দেখলুম,—বাঃ! আমার বল্‌বার মানে—অমনটি দেখতে পাওয়া যায় না,—একেবারে থাক্‌ছাড়া—না?"

"তাই ত ওর নাম দেওয়া হয় ইরাণী।"

—"খাসা নামও হয়েছে,—ইরাণ মেওয়ার রাজ্য—তাই কথাও অত মিষ্টি!"

* * * *

গোপীনাথ অল্পবয়সেই নামজাদা দালাল। কলের সায়েবদের কাছে বেশ প্রতিপত্তি। পাটের গাঁট পাচার করতে অমন ছুটি নেই। তাই সকলেই খোঁজে। পরিচিত আর বন্ধু-মহলে তাঁর নাম পেটো-ইলিস! মামলা-মকর্দ্দমা লেগেই থাকে, তাই ভাদুড়ী মশায়ের ভবনে হামেসা হাজির হতেন। ফলন্ত এবং শ্রীমন্ত মক্কেল—সুতরাং মাতঙ্গিনী দেবীকে বউদি বলবার এবং রসগোল্লা খাবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন।

গোপীনাথ যখন বললেন—"কৈ, বউদিকে দেখছি না, প্রণামটা করবো যে।"—

ভাদুড়ী সহসা চমকে উঠলেন—"তাই ত'—সত্যিই ত'। কোথায় তিনি। অ্যাঁ—ই কি অন্যাই—তুমি এসেছো, আসতে তাঁর বাধাটা কি ছিল? রোসো—দেখি।"

চৌকীখানায় দু'হাতের টিপুনি দিয়ে উঠে পড়লেন। বহুকালের শুকনো চকোর না হ'লে রস বেরিয়ে যেতো।

গোপীনাথ সিগারেট ধরালেন।

বারান্দার যেখানে ব'সে পড়েছিলেন, তার গায়েই ভাদুড়ী মশায়ের শয়নকক্ষ। মাতঙ্গিনী দেবী—সাড়া পেয়েই সেই কক্ষে পৌছেছিলেন। যা শুনছিলেন, তা মরমে না প'শে মগজ চষে ফেলছিল। রসসম্ভারে শ্রবণবিবর ভ'রে নিয়ে এইবার দ্রুত স'রে পড়লেন।

ভাদুড়ী মশাই তাঁকে পেলেন শয়ান অবস্থায় দেল-মুখো!

"এ কি, এখনো ঘুমুচ্ছ! কতবার এলুম, সকালবেলার কাঁচা ঘুমটো ভাঙাব না, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি; কেউ খোঁজই করে না।"

শয্যা-শায়িত নিস্পন্দ পাষাণবিগ্রহ থেকে একটি গভীর "হুঁ" মাত্র পাওয়া গেল।

"আর সকাল নেই মাতু, এখন ten কাল,—দশটা, দয়া ক'রে উঠে পড়। তোমার গুপী ঠাকুর-পো তোমাকে প্রণাম করবে ব'লে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে যে,—একবার এসে ফিরে গেছে।"

"ডাকতে কি হয়েছিল? আর এত প্রণামের ঘটাই বা কেন?—আসতে বল।"

"উঠবে না?"

"পারলে আর প'ড়ে থাকতুম কি! প'ড়ে প'ড়ে আর কবে ভাদুড়ী-বাড়ীর ভাত মিলেছে।"

ভাদুড়ী ভড়কে গেলেন। বুঝলেন—serious; বললেন—অতি মোলায়েম কণ্ঠে, "কি হয়েছে, বল না মাতু।"

সহসা মাতঙ্গিনী দেবীও অভিনব সুর ধরলেন—"মেয়েদের সব কথা ত তোমাদের শোনবার কথা নয়, আর শুনেই বা তুমি করবে কি? এই আড়াই মাস এসেছি বৈ ত নয়, কখনো ত' জানতুমও না……"

সলজ্জ মৃদু হাসিমিশ্রণে "বোধ হয়"—বলেই চক্ষু নত করলেন……"মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ে। আজ বড় বেড়েছে…"

পত্তন দেখে ভাদুড়ী মশাই বিষম সন্দেহে প'ড়ে গিয়েছিলেন এবং উত্তরোত্তর প্রলয়ের আশঙ্কাও আসছিল। এমন সময় মাতঙ্গিনী দেবী এক ক্রপেই গোলাম পেড়ে ফেললেন!

বহু-আকাঙ্ক্ষিত এত বড় সুসংবাদটা যেরূপ ভাবে গ্রহণ করা ভাদুড়ী মশায়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, ঠিক তা প্রকাশ পেলে না। শুনে তিনি যেন থমকে গেলেন। পরক্ষণেই ভুলটা শোধরাতে গিয়ে অতি বিজ্ঞের মত বললেন—"আমাদের কি তেমন ভাগ্য, মাতু, তুমি ভুল করচো না ত?" কথাগুলো বুদ্ধি থেকে বেরুল;—প্রাণ থেকে যেন বেরুল না।

ভাদুড়ী ভুল করলেও মাতঙ্গিনী ভুল করলেন না। তিনি মুখে হাসির আভা বজায় রেখে অভিমানের সুরে মাত্র বললেন—

"অতো জানি না।"

এতক্ষণে ভাদুড়ীর 'চৈতন্য হ'ল,' কি করছি! তিনি এবার নিজের ধাতে এসে হেসে বললেন—

"উঃ, তবে আজ আমাদের……তুমি প'ড়ে রয়েছ কি গো!"

"থামো—গোল কোর না এখন,—খবরদার, কেউ না শোনে। যাঁর কৃপা—তাঁকে আগে প্রণাম ক'রে আসা হোক।"

"ওরে বাবা, তাও ত বটে! হাঁ, দেবতা বটে—কাটামোতেই এত কৃপা! এই শালবনে গা-ঢাকা……"

মাতঙ্গিনী কঠোর-কণ্ঠে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন—"দেবতার সঙ্গে তামাসা নাকি, আমাদের হিঁদুর ঘর—একটুতে…"

দু' হাত তুলে মাথায় ঠেকালেন, ভাদুড়ী মশাইও গম্ভীর-ভাবে মাছি মারলেন।

—"গুপীকে ডেকে আন,—অনেকক্ষণ হয়ে গেল যে।"

"ওঃ, তাই ত" বলেই বিভ্রান্ত ভাদুড়ী মশাই নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁচলেন। তাঁর মাথাটা ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কাল যে জিনিষটা দুর্লভ ছিল, আজ সেটা ঘরে পেয়ে উপভোগের উৎসাহ এল না!

সকালবেলার মেঘলা আকাশটার মতই মুখখানা ক'রে—"কি অসুখ করেছে বউদি" ব'লে গুপী ঘরে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

"ভয় নেই—মেয়েমানুষ মরে না ঠাকুরপো" ব'লে ওঠবার চেষ্টা ক'রে মাথা তুলেই—"ঐ আবার" বলেই চোখ বুজলেন।

"উঠতে হবে না, উঠতে হবে না—আপনি শুয়েই থাকুন। তাই ত,—বেশী না হ'লে আর শুয়ে আছেন। তা হ'লে..."

"ও কিছু নয়. ক'দিন ধরেই টের পাচ্ছিলুম—আজ কিছু বেড়েছে দেখচি।"

"দাদাকে বলেন নি কেন বউদি?"

"আবার ওঁর মাথাটা ঘোরান কেন,—দেখচ ঐ ত কাহিল শরীর।—আমার একটু কিছু হ'লে যে ওঁর"...

শেষ কথা কয়টি বলবার সময় মাতঙ্গিনীর চোখে মেঘ-ঢাকা হাসির বিদ্যুৎ-রেখাটা গোপীনাথের উৎসাহকে উস্‌কে স্বভাবে এনে দিলে।

গুপীও ঈষৎ হাসিমিশ্রণে বললে—"তাই ত, দুজনেই যে বিষম কাহিল হয়ে পড়েছেন বউদি। মধুপুরের সব জল-হাওয়াটা আপনাদের ওপরেই ভর করেছে দেখচি। সত্বর কলকাতায় গিয়ে পড়াই যেন দরকার,—ডাক্তার-বদ্দির মাঝে থাকাই ভালো বোধ হয়।—"

ভাদুড়ী মশায়ের শয়নকক্ষে নজর পড়ায় সবিস্ময়ে—"খাটের পাশে ওগুলো কি ঝুলছে বউদি—দাদা ট্রাপিজ প্লেও চালাচ্চেন নাকি!"

"ও সব নবনীর ইঞ্জিনিয়ারী ঠাকুরপো; কাহিল ব'লে—ধরে ওঠবার-বসবার সুবিধে ক'রে দিয়েছে! ও কি, অবাক্ হয়ে গেলে যে ঠাকুরপো! মাথা ঘোরে কি সাধে, এতে আমার মাথা ঘুরবে না ত আর কোন্ হতভাগিনীর মাথা ঘুরবে বলো!"

সহসা একেবারে ninety-fiveএর নীচে স্বর নামিয়ে—"ভগবানের মনে কি আছে তা"...বলেই মুখ ফিরে চোখ মুছলেন।

অবস্থাটা গুপীর অন্তরটা স্পর্শ ক'রে সত্যই তাকে ব্যথা দিলে। মুখের উৎসাহ-উজ্জ্বল ভাবটা ফস্ ক'রে নিবে গেল। মাতঙ্গিনীর আশঙ্কা আর সন্দেহটা প্রাণ যেন সহজেই স্বীকার ক'রে নিলে। একটু অন্যমনস্কও ক'রে দিলে।—

"না বউদি, ও সব মিছে দুর্ভাবনা আনবেন না। ও—কি এমন হয়েছে, কলকাতায় তা বড় তা বড় দাদার দাদা ঢের রয়েছেন, দশ পনেরো বছর দেখে আসছি। সে আলাদা জিনিষ বউদি। এ হচ্ছে সহজ আর সাধারণ,—এক ম্যালেরিয়ায় কাটামো বার ক'রে দেয়। আপনি ও সব ভাববেন না।"

"ঠাকুরপো ওঁর ঠিকুজি দেখিয়ে মরেচি যে—এই বত্রিশে পড়েছেন—সাঁইত্রিশ বছরে আমার কপালে যে কি আছে, তা..."

আর বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

শুনে গুপী সন্দেহমুক্ত হয়ে সত্যের কোটায় পৌঁছে গেল। মুখে বললে—

"ছি বউদি, আপনি এত ছেলেমানুষ—ঠিকুজি বিশ্বাস করেন! বিশ্বাস আমিও করি, কিন্তু ও জিনিষটি কখন ঠিক্ হ'তে দেখলুম না। হবে কি ক'রে—ওর যে মুহূর্ত্ত ধ'রে কারবার। ঠিক সময়টি কেউ দিতে পারে না, আবার দুটো ঘড়িও এক হ'তে দেখি না—দু চার মিনিটের তফাৎ পাবেনই। ও একটা করাতে হয় তাই করা, ও সব মিছে ভাবনা ছেড়ে দিন।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক ঠাকুরপো।"

"তাই পড়ুক—আজ ত আর দুটো রসগোলা পড়বার"......

"সে কি কথা—ইনি গেলেন কোথা"?

"সকাল থেকে কেবল নাপতের খোঁজেই ত ছিলেন, এক জন এসেছে দেখছি বোধ হয়..."

মাতঙ্গিনী একটু মুখ মুচকে বললেন—"তা হোক, তুমি একটু কষ্ট কর ভাই।—ঐ আলমারিটে খুলে এনামেলের বড় বাটিটায় পাবে, আর ডিস্‌খানায় সর-ভাজাও আছে।"

গোপীনাথের ভোগ আরম্ভ হয়ে গেল।

—"আঃ—কিছু চিন্তা রাখবেন না বউদি, আপনার হাতের এ জিনিষ খেলে মানুষ অমর হয়। কাহিল মারবার এমন মেওয়া আর দ্বিতীয় নেই।"

"আরো দুটো নাও ঠাকুরপো, ঢের আছে; কে অত খাবে।—আর দেখো ভাই, অদৃষ্টে যা আছে, তা ত' হবেই, কিন্তু উনি যেন এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও না শুনতে পান। তাতে......"

"বাপ রে, সে বুদ্ধিটুকু রাখি বউদি। ও সব সাংঘাতিক

কথা মিছে হলেও—কায এগিয়ে দেয়। সে মহাপাতক কি শেষ আমাকেই……"

বর-কামানে হয়ে ভাদুড়ী মশাই ভিনোলিয়ার, ভুরভুরে গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ঘরে ঢুকলেন—

—"এ কি! কে দিলে?"

"বউদি তো ছাড়লেন না, আমাকেই কষ্ট ক'রে নিতে হ'ল"—

মাতঙ্গিনী বললেন, "আমি পারছি না, ওঁকেও কিছু দাও না ভাই।"

"না না—আমার কিছু চলবে না—কাল রাতের খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছিল যে। আমি ভাত খাব কি না, তাই ভাবছি।"

অর্থাৎ মন্দাকিনী দেবীর দেওয়া-মালপো তখন তাঁর আকণ্ঠ ঠাসা রয়েছে।

মাতঙ্গিনী দেবী সেটা চক্ষুতে না দেখলেও তাঁর পক্ষে অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন ছিল না। বললেন—"তা হ'লে নিজের শরীর বুঝে খেয়ো। লাইম-জুস দিয়ে বরং এক গেলাস সরবৎ খাও। গুপী ঠাকুরপো খাবেন ত—আমি চেষ্টা ক'রে দেখি। প'ড়ে থাকলে চলবে কেন?"

ভাদুড়ী মশাই বললেন—"তবে এতক্ষণ ছাই তোমাদের কি কথা হ'ল!—ওর যে এখানে ভগ্নীপতি, ভাগনীরা রয়েছেন। কালই যখন চ'লে যাবে, ও কি এখানে খেতে পারে? আমাকেও রাত্রে সেখানেই খাবার জন্যে জেদ্ রয়েছে"…

মাতঙ্গিনী দেবী মাত্র "বেশ ত" বলেই চুপ করলেন, তাঁর ওই "বেশ ত"টুকু গুপীর কানে ঠিক "বেশ ত"র মত লাগলো না। সে তাড়াতাড়ি বললে—"না দাদা। আজ বউদিকে এ অবস্থায় ছেড়ে আপনার কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। আমি বরং কাল থেকে যাবো।"

গুপীর বিজ্ঞতাটা ভাদুড়ীর ভাল লাগলো না, কিন্তু ওর ওপর কথাও চলে না।—নাপতে বেটাকে কাল পাওয়া যাবে কি না—তারও ঠিক্ নেই! বললেন—"তুমি যদি থেকে যাও ত তাই হবে, ভদ্রলোকদের অনুরোধ বলেই"……

দু'এক কথার পর গোপীনাথ "আচ্ছা, ও-বেলা আসব'খন, আপনি হঠাৎ যেন উঠতে যাবেন না বউদি" ব'লে বিদায় নিলে।

মনমরা ভাদুড়ী মশাই বিরক্তিটা চেপে মাতঙ্গিনী দেবীকে বললেন—"এখন কেমন বোধ করচ মাতু? পড়েছি বটে—প্রথম প্রথম ও রকম একটু-আদটু হয়, ও কিছু নয়।"

"না গো—ও সব তোমরা কি বুঝবে। এখানে কেউ নেই, আমার বড় ভয় হচ্ছে। গিন্নী-বান্নির মধ্যে এখানে এক ডিপুটী দিদি আছেন। একটু ভাল বোধ করলেই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।"

শুনে ভাদুড়ী মশায়ের মাথা ঘুরে গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

(অষ্টম গর্ভের সন্তান)

বহুদিন পূর্ব্বে জীবন-সংগ্রামের প্রথম সোপানে যখন পদার্পণ করিয়াছি, সেই সময়ে এক দিন এক জন সুপুরুষ বৃদ্ধ আমাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমার মানস অন্তঃপুরে তখন অনেক আশা, বহু আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন মুকুলিত হইতেছে। লালবাজার পুলিস আদালতে সামলা আঁটিয়া বিচরণ করিতেছিলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি উকীল?"

সবিনয়ে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন এমন প্রশ্ন অতি মুখরোচক ছিল। তখন এইরূপ প্রশ্ন কাহারও মুখে শুনিলে হৃদয় আশার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছি, সম্মুখে বৃহৎ পৃথিবীর বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র। নৈরাশ্যবিড়ম্বনা যৌবনের উদ্যমকে আঘাত করিতে পারে নাই। সার্থকতা, সাফল্যলাভের উত্তেজনা হৃদয়কে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছে। এখন এইরূপ প্রশ্ন কেহ করিলে তাহার উপর বিশেষ বিরক্ত হই ও মনে করি, কেন?—আমাকে দেখিয়া কি মনে হয় না যে, আমি এক জন উকীল? আর তুমি যদি আমাকে না-ই চেন, তবে তোমার সহিত আলাপ করিবারও আমার প্রবৃত্তি নাই।

বৃদ্ধের প্রশ্নে আমি আর্দ্র হইয়া গেলাম। মনে হইল, চোগাচাপকান ও সালের পাগড়ী ছাড়াও আমাতে এমন কিছু আছে, যাহাতে লোক আমাকে উকীল বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে। আমি তাঁহাকে পাকে-প্রকারে ভাব-ভঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় বুঝাইয়া দিলাম যে,আমি উকীল ত নিশ্চয়ই এবং এক জন বিশিষ্ট দরের উকীল। আমার হাতে কায দিলে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, সে কথাটাও ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকটি সুপুরুষ, বয়স ৬০ হইতে ৬৫র মধ্যে; তাঁহার সমগ্র আননে এমন চিহ্ন সুস্পষ্ট যে, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি জীবনে যেন অনেক দাগা পাইয়াছেন এবং শান্তির ভিখারী।

আগন্তুককে ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "মহাশয়! বসিবেন কি? কিন্তু তখনও আমি উকীল-লাইব্রেরীর মেম্বর নহি, অতএব বসিবার স্থান বিশেষ সঙ্কীর্ণ। বাহিরে একখানি বেঞ্চ ছিল। উহা সরকারী উকীল মিঃ হিউমএর ঘরের সম্মুখে রক্ষিত। কিন্তু মোকদ্দমায় যাহাদের কষ্ট এবং মোকদ্দমা পাইলে যাহাদের আনন্দ, এই উভয় শ্রেণীর লোক মিলিয়া তাহা পূর্ব্বেই দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। বেঞ্চে পাঁচ জন ব্যক্তির বসিবার স্থান, কিন্তু রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ন্যায় উহাতে পাঁচ জনের স্থলে আট জন বসিয়াছিল —"ন স্থানং তিল ধারয়েৎ।"

অবস্থা দেখিয়া আগন্তুক বলিলেন,—"মশায়! আপনি এক যায়গায় বসুন।" আমি তখন এরূপ ভাব দেখাইলাম যে, আমি কাযের লোক, আমার বসিবার অবকাশ নাই। আমার যে বসিবার যায়গা নাই, তাহা আমি তাঁহাকে জানিতে দিলাম না। আমি বলিলাম, "আসুন, আপনাতে আমাতে এই বারান্দায় বেড়াই; বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সমস্ত কথা শুনিব।"

আমরা উভয়ে পুরাতন আদালতের পূর্ব্ব-বারান্দায় বেড়াইতে লাগিলাম। আগন্তুক বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ। আমার আটটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল।" আমি বলিলাম, "আপনি আটটি সন্তানের পিতা? তবে ত আপনি বিশেষ ভাগ্যবান্ পুরুষ! খুব কম করিয়া ১২ হাজার টাকা গড়ে ধরিলে প্রায় লক্ষ টাকা আপনার কাছায় বাঁধা। তাহার উপর সহজভাবেই হউক,

কিম্বা অত্যাচারের কারণেই হউক, যদি অন্ততঃ চারিটি বউ মরে বা আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে আবার ৫০ হাজার টাকা। আপনি মশায় অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ।"

আগন্তুক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি অত্যন্ত আগাইয়া চলিয়াছেন। আমার সমস্ত কথা না শুনিয়া মনে মনে একটা ধারণা করিয়া লইতেছেন।" আমি বলিলাম, "আমি কোন ভুল ধারণা করি নাই, আমি অভ্রান্ত। আট আটটা ছেলে—আট বারং ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। আর গড়-পড়তা চারিটি ছেলের আর একবার করিয়া বিবাহ দিলে আরও ৫০ হাজার; মোটের উপর আপনি দেড় লাখ টাকার মালিক।"

আগন্তুক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ভগবান্ আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। একে একে আমার সাতটি পুত্রকে যমরাজ তাঁহার অধিকারে লইয়া গিয়াছেন, বাকি একটি! সদানন্দ আমার অন্ধের নড়ি, বংশের প্রদীপ, পূর্ব্ব-পুরুষকে জল দিবার একমাত্র অধিকারী, সদানন্দ শুধু বাঁচিয়া আছে। আর বাকি সাতটি—"

বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। আমি বিশেষ অনুতপ্ত হইলাম। ভাবিলাম, মানুষের এমন বিপদও হয়! তখন জানিতাম না যে, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে বিপদ্ ঘটে। তবে কম আর বেশী। যত বেশী দিন এ জগতে থাকা যায়, ততই দেখা যায় যে, বিপদের—শোকের আঘাত পায় নাই, এমন লোক জগতে অতি বিরল। প্রত্যেক মানুষেরই প্রথম প্রথম আঁকা-বাঁকা সকোণ ভাব থাকে। এ জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে যত সে বেশী আহত হয়, তাহার আঁকা-বাঁকা সকোণ ভাব একবারেই মসৃণ হইয়া আসে।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। —তাহার পরে বলিলাম, "মশাই, বিপদ্ সব মানুষেরই হয়, আপনারও হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ অধীর হইলে কোনও লাভ নাই।" আগন্তুক বলিলেন, "অধীর আমি একেবারেই হই নাই—আজ ১৪ বৎসর যাবৎ প্রথম সাত পুত্রের স্মৃতি মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছি। এখন শুধু ভাবিতেছি, কনিষ্ঠ পুত্রটি কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহার শরীর ভাল থাকিবে। এখন ইহাই আমার জীবনের একমাত্র চিন্তা। ব্রাহ্মণী এই কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়াই প্রাণধারণ করিতেছেন। সে তাঁহার নয়নের মণি, জীবনের উদ্দীপনী শক্তি, পৃথিবীর একমাত্র লক্ষ্য। পাঁচ মিনিট তাহাকে না দেখিলে, তিনি পৃথিবী শূন্য দেখেন, মাথা ঘুরিয়া যায়, ধরা শ্মশান বোধ হয়। সেই পুত্রটির বয়স এখন ১৮ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সে অতি দুর্বৃত্ত ও অতি পাপাচারী হইয়া পড়িয়াছে, গত চার পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহার উৎপাত বাড়িয়াছে।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তাহার পর চলিতে চলিতে বলিলেন, "প্রথম প্রথম তাহার নষ্টামীতে আমোদ পাইতাম। মনে করিতাম, তাহার ছেলেমানুষী, কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাহার নষ্টামী বাড়িতে লাগিল। ততই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, ভগবান্ আমাদের দু'জনের পাপের সাজারূপে এই পুত্রকে পাঠাইয়াছেন, উকীল বাবু!"

বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আমি নীরবে তাহার দিকে চাহিলাম। আত্মসংবরণ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "যত দূর মনে পড়ে, এ জীবনে কোনরূপ পাপকার্য্য করি নাই। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের শাস্তির জন্য ইহাকে সন্তানরূপে পাইয়াছি। আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণী এখনও পর্য্যন্ত বুঝেন নাই। তিনি সেই দুষ্ট পুত্রকে ভগবানের বিশিষ্ট দান বলিয়া মনে করেন। বলেন, তাহার নষ্টামী নহে, ছেলেমানুষী দুদিন বাদেই সব সারিয়া যাইবে। গৃহিণী না কি আমার পিসীমার মুখে শুনিয়াছেন যে, আমিও ছেলেবেলায় অতিশয় দুষ্ট ছিলাম, পরে কি ভাল হই নাই? আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, আমি এরূপ ছিলাম না। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণী ভুল বুঝিয়াছেন। অনেক মাতাও এরূপ ভুল বুঝিয়া থাকেন।"

বক্তা বলিলেন, "আপনি কি বিরক্ত হইতেছেন? আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আপনার মূল্যবান্ সময় হয় ত নষ্ট হইতেছে।"

আমি আগ্রহভরেই শুনিতেছিলাম। বলিলাম, "আপনি বলুন।"

তিনি বলিয়া চলিলেন, "প্রথম প্রথম সদানন্দ ছোট ছোট

নষ্টামী আরম্ভ করিল—অর্থাৎ পাড়ার ছেলে দেখিলেই—যদি সে শিষ্ট, শান্ত হয় এবং আমার পুত্র অপেক্ষা কম বলশালী হয়, তাহা হইলে তাহার মাথায় চাঁটি, অন্ততঃ টিপুনি, কাণমলা এবং ধাক্কা দেওয়া এই সব দুষ্টামীতে পাকিয়া উঠিল। উড়িয়া দেখিলেই তাহার টিকি কাটিবার জন্য তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত। মুটে মোট লইয়া যাইতেছে, তাহার কাপড়ের মধ্যে গরম মুগ ছড়াইয়া দিয়া আমোদ অনুভব করিত। তাহারা যে সব সময়ে তাহাকে ধরিতে পারিত তাহা নয়, কিন্তু তাহারা তাহা করিত না। কারণ, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহারা আমার পুত্রকে রেহাই দিত। ক্রমে সে আরও এক ধাপ উঠিল। মায়ের চুড়ি, কাণের বালা ইত্যাদি গহনা তাঁহার অসাক্ষাতে লইয়া বন্ধক দিয়া আমোদ করিতে লাগিল। খবর পাইয়া আমি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, 'ওগো, দেখ ত তোমার গহনা বাক্সের মধ্যে ঠিক আছে কি না?' ব্রাহ্মণী ত আমার কথায় চটিয়া লাল। বলিলেন, 'চাবি আমার কোমরে সকল সময়ে থাকে ও সকল সময় ব্যবহার করি, কেবলমাত্র দুপুরবেলা ঘণ্টাদুই ঘুমানোর সময় চাবি সম্বন্ধে অসাবধান হইয়া পড়ি। কিরূপে গহনা বাক্স হইতে যাইতে পারে?' আমার পীড়াপীড়ীতে এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যখন তিনি বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, কয়েকখানি গহনা নাই, তখন আমি তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম যে, তোমার কোমরে চাবি সর্ব্বদা থাকে, যাহা তুমি কখনও ভুলিয়া পরিত্যাগ কর না, তখন কিরূপ ভাবে বাক্সের ভিতর গহনা অদৃশ্য হইল?"

ব্রাহ্মণের মুখে যে মৃদু হাস্যরেখা দেখা গেল, তাহা কিরূপ মর্ম্মান্তিক এবং তাহা যে জমাট অশ্রুর অভিনব প্রকাশ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভাবিলাম, সংসারের নিত্য ঘটনা-স্রোতে এইরূপ তরঙ্গলীলা কি অভিনব? না, না, ইহা চিরপুরাতন সত্য—সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে এই-রূপ ব্যাপার অভিনীত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ ব্যাপারে উল্টা ফল হইল। ব্রাহ্মণী চটিয়া গেলেন, বলিলেন—"তোমার মতলবটা খুলিয়া বল দেখি, তুমি কি চাও? আমার সাতটি সন্তান গিয়াছে, তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে আমার অষ্টমটিকেও হারাইতে বসিয়াছি। তোমার মাসতুত ভাইয়ের ছেলেটি নামে বিনয়, কার্য্যে অত্যন্ত অবিনয়ী। আমার বিশ্বাস, এ সব কার্য্য তাহারই। আমার গর্ভজাত পুত্র এরূপ কখন করিতে পারে না। আমার শরীরে এখনও তর্কপঞ্চাননের রক্ত বিদ্যমান, সে রক্তে এরূপ কু-সন্তান জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভাবে ব্রাহ্মণী বিশেষ কোপান্বিত হইলেন আর বলিলেন—'যাও, তুমি থানায় গিয়া চুরির খবর দাও, তাহা হইলেই ইহার আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা জানা যাইবে।' আমি মশাই তাহা করিলাম না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, গরীব বিনয় এরূপ কার্য্য করে নাই। এ কার্য্য করিয়াছে আমার এই ভবিষ্যতের আশা, বংশের তিলক, অমঙ্গলের আশ্রয় সদানন্দ। কাযেই আমি থানায় খবর দিলাম না। তাহা হইলে কি হয়, ব্রাহ্মণী রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার চাকরকে দিয়া থানায় এই সোবে-চুরির খবর পৌঁছাইয়া দিলেন। ফলে প্রায় দেড়হাত লম্বা মোচধারী, শ্মশ্রুবিহীন হিন্দুস্থানী জমাদার আসিয়া উপস্থিত। আমি এই সবের কিছুই জানিতাম না। চাকরও থানায় যাইবার আগে আমাকে কিছুই বলিয়া যায় নাই। জমাদার আসিয়াই বলিল, 'হুজুর, সেলাম।' সে যে ভাবে 'হুজুর সেলাম' বলিল, আমি ত শুনিয়াই আঁতকাইয়া উঠিলাম। সে হুজুর শব্দটি প্রয়োগ করিল বটে, কিন্তু সেটি কমবেশী বিদ্রূপাত্মক। সে বলিল,'হুজুর, খবর মিলা যে, বিনয় বাবু বোলকে একঠো আদ্‌মি আপ্‌কা বাড়ীমে চুরি কিয়া।' আমি শুনিয়াই প্রমাদ গণিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান্, এ কি করিলে! গরীবের ছেলে, মা নেই, বাপ নেই, আমার আশ্রয়ে পাতের ভাত খাইয়া মানুষ হইতেছে। প্রত্যেক ভদ্র-পরিবারেই গালি খাইবার জন্য একটা লোক দরকার। বিনয় সেই গালি খাইবার জন্য আমার বাড়ীতে আছে। সে না থাকিলে আমার বাটীর অনেকেই পেট ফুলিয়া মরিয়া যাইত। বাড়ীতে গৃহিণী ব্যতীত আমার দুই জন শ্যালিকা এবং একটি শ্যালক-পুত্রও থাকিত।

"আমি মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, পৃথিবীর নিয়মই এই—যার মা নেই, বাপ নেই, অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃ ও অর্থহীন, সেই সংসারের জঞ্জাল। সে যতই ভাল হউক না কেন, সমস্ত অপকর্ম্মের অপবাদ তাহার মস্তকে অর্পিত হয়। তাহার কথাগুলা কর্কশ, তাহার চলা কদাকার, তাহার চেহারায় কোন মাধুর্য্য নাই, তাহার হাসিতে জ্যোৎস্নার আমেজ খেলে না, আর তাহার কান্না কুকুরের

ক্রন্দন-ধ্বনির অনুরূপ। পৃথিবীতে যাহা কিছু কদর্য্য ও অন্যায় আছে, সে সেই সকলের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু ভাবিয়া লাভ কি? আমি দেখিলাম যে, এই বিষয় লইয়া গৃহিণীর সহিত মতভেদ হইয়া নিজেকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজনটা কি? তখন আমি বুঝিলাম, পৃথিবীর কর্ম্মিপুরুষদিগের ন্যায় কিল খাইয়া কিল চুরি করা সমীচীন।

"এই বুঝিয়া জমাদার সাহেবের স্তুতিবাদ করিয়া এবং অনেক কষ্টে তাহাকে খুসি করিয়া ফিরাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, ভগবান্, আমার কপালে কিঞ্চিৎ অর্থকষ্ট লিখিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবে কিরূপে? আমি আসিয়া চোরের ন্যায় শয্যাগৃহে গেলাম, এবং সেখানে কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। যা হোক্, উকীলবাবু, অনেক কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। পরে এ রকম অনেকগুলি ছোটখাট চুরি হইয়া গেল, আমি সেগুলির বিষয় জানিয়াও জানিতাম না ও শুনিয়াও শুনিতাম না। কারণ, জানিয়া বিপদ্ আনার চেয়ে, না জানিয়া শান্তিতে থাকা অনেক সময় মঙ্গলদায়ক। কিন্তু এরূপ ভাবে ধামা চাপা দিয়া দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে আর কত কাল রাখা যায়? আমরা আমাদের পুত্রের সুখ্যাতি করিতাম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ছেলের অনেক গুণ, যাহা তাহার ছিল না, সেইগুলির অনেক স্তুতিবাদ করিতেন, আর আমি সেই সব অন্যায় স্তুতিবাদ শুনিয়াও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতাম না।

"প্রথমে সে নিজের বাড়ীতে চুরি করিতে আরম্ভ করিল, শেষে অপর বাড়ীতেও চুরি করিতে আরম্ভ করিল। অপর বাড়ীর লোকরা আমার স্ত্রীর ন্যায় এই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে অপত্য-স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিল না। ফলে অনেক স্থলে তাহার দুষ্কৃতের জন্য তাহাকে হাতে হাতে ফল দিয়া দূর করিয়া দিল। যেমন ধরা, অম্‌নি বিচার, অম্‌নি সাজা, আধ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ, খালি পুত্রের শরীরে তাহাদের বিচারের দাগ কিছু দিনের জন্য রহিয়া গেল। বাড়ীতে আসে, অধিকাংশ সময়ে আমার অসাক্ষাতে, আর গৃহিণী তাহাকে ষোড়শোপচারে খাওয়ান এবং প্রায় তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, আমি না থাকিলে তাঁর পুত্রের আরও অনেক অভাব মোচন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, ভগবানের নাম করিতে করিতে, আর ভগবানের নিন্দাবাদ করিতে করিতে এই পাঁচ সাত বৎসর কাটিয়া গেল।"

আমি বলিলাম, "আপনার পুত্রের বয়স বলিলেন প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না, মশাই, পৃথিবীতে অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু সব চেয়ে অন্যায় কায অনুপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দেওয়া, সেই পাপটি করি নাই। হিন্দুর ঘরে বিবাহের জন্য সুপাত্রীর অভাব কখন হয় না। কাযে আমার পুত্রের জন্য কখনও সুপাত্রীর অভাব হয় নাই। গৃহিণীর নির্ব্বন্ধতায় অনেক অপকর্ম্মে সহায়তা করিয়াছি কিন্তু সব চেয়ে বড় অপকর্ম্ম কুপুত্রের বিবাহ দেওয়া—তা আমি দিই নাই।

"আজ প্রায় দুহপ্তা হইল, পুত্র বাড়ী আসে নাই। প্রথম দুই এক দিন বিশেষরূপে খোঁজ করা হয় নাই। কিন্তু তার পর ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় ও নিজের অপত্যস্নেহের প্রেরণায় পুত্রের খবর লইতে লাগিলাম। শেষে খবর পাইলাম পুত্র বটতলা থানায় চোর অপবাদে ধৃত হইয়া হাজতে আছে। আগামী কল্য মামলার দিন। এই খবর আমি আজ পাইয়াছি, আর সেই খবর পাইয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি যদি আমার এই বিপদে কোন সাহায্য করিতে পারেন। দেখুন, উকীল বাবু, এরূপ সদাচারী পুত্রের যে পিতা তাহার বিপদ্ ত সর্ব্বসময়েই।—প্রত্যেক দিনে, প্রত্যেক প্রহরে, প্রত্যেক ঘণ্টায়, প্রত্যেক মিনিটে, প্রত্যেক সেকেণ্ডে। যে দিন এইরূপ পুত্রের জন্ম দিয়াছি, সেই দিন হইতেই বিপদ্‌কে বরণ করিয়াছি। সুপুত্রের পিতা হওয়া বড় কম ভাগ্যের কথা নয়। আর কুপুত্রের পিতা হওয়ার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর মানুষের হইতে পারে না।"

আমি তখন নূতন উকীল। মানুষের যে এইরূপ বিপদ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া একটু অধীর হইলাম। কথা-বার্ত্তা হইতে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কদাচারী বলিয়া বোধ হইল না। তবে কি কারণে তাঁহার এই ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, কি কারণে তাঁহার এই ঘোর মনস্তাপ? হঠাৎ মনে হইল, এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বজন্ম মানিতেই হয়। এ জন্মের না হইলেও পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতের জন্য এ জন্মে কষ্টভোগ করিতে হইতেছে।

চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বকথিত বেঞ্চখানি অনেকটা

খালি হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া লইয়া সেই আসনে বসিলাম। পকেট-বহি বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের নাম, তাঁহার পুত্রের নাম, ঠিকানা, যে থানার হদ্দায় বাস করেন, সে থানার নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলাম। শেষে আরও কয়েকটি কথা-বার্ত্তার পর আমার সর্ব্বপ্রধান বক্তব্য তাঁহাকে বলিলাম।

ব্রাহ্মণ ফি'য়ের টাকা কয়টি আমার হাতে দিলেন। আমিও ভগবানের নাম করিয়া চাপকানের পকেটে টাকা কয়টি রাখিলাম। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, বেলা তখন ৫টা। আসামীর সহিত দেখা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি হাকিমের এজলাস ঘরে গেলাম। কারণ, আদালতের নিয়ম, হাকিমের বিনা অনুমতিতে কোন উকীলই আসামীর সহিত দেখা করিতে পারিবে না। গিয়া দেখি, হাকিম উঠিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রলোককে বলিলাম, "আজ আর কিছু হইবে না, কা'ল আপনি ১০টার সময় আমার বাড়ীতে আসিবেন। আপনি নূতন লোক, আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমি আদালতে আসিব।" আমার এই সৌজন্য শুধু অনায়িকতা হিসাবে নহে, ইহার ভিতর স্বার্থের বজ্রমুষ্টি লুক্কায়িত ছিল। প্রথম, আদালতে আসার গাড়ী-খরচাটা মক্কেলের উপর দিয়াই যাইবে; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ একা আদালতে আসিলে দালাল ও অপরাপর উকীলদের হাত হইতে রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। কারণ, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, আদালতে একটি মক্কেল কিম্বা মক্কেল বলিয়া ভ্রম হয়, এমন কোন লোক আসিলে, মাঠে মৃত জীবজন্তুর মড়া পড়িলে শকুনিরা যেমন চারিধার হইতে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই একটি মক্কেল কিম্বা যাহাকে মক্কেল বলিয়া ভুল করা হয়, এমন একটি লোক আসিলে উকীল ও দালালরা তেমনই তাহাকে আসিয়া ছাঁকিয়া ধরে।

অনেক দিন পরে, যখন আমি দালালদের বা জুনিয়ার উকীলদের হদ্দা হইতে অনেক উপরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন একটি ভদ্র শ্বেতাঙ্গ আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের আদালত অতি ভয়ঙ্কর স্থান। কোন ভদ্র লোক এখানে অক্ষত দেহে প্রবেশ করিতেও পারে না, বাহিরে যাইতেও পারে না। গত মঙ্গলবার আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদালতে গিয়াছিলাম। অমনই ডজন দুই উকীল ও দালাল আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহারা সকলেই স্ব স্ব গুণগান করিতে লাগিল এবং তাহাদের মুরব্বী উকীলদিগের প্রশংসা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।"

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "সাহেব, আমি বিলাতের কথা জানি না, কিন্তু কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের আদালতে এরূপ দৃশ্য কিছুই নূতন নহে। এ সবও থাকিবে, অথচ ভাল উকিলও জন্মাইবে।"

পরদিবস ১০টার মধ্যে আমি ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া আদালতে পৌঁছিলাম। যতক্ষণ না হাকিম এজলাসে বসিলেন, ততক্ষণ পোকা-মাকড়টির আশায় বারান্দায় বেড়াইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া দিলাম, আমার একটি বড় মক্কেলের আসিবার কথা আছে, সেই জন্যই বারান্দায় পায়চারি করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে হাকিম এজলাসে বসিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া হাজত-ঘরের মধ্যে সদানন্দ চাটুয্যের সহিত দেখা করিবার হুকুম লইলাম। কলিকাতার পুলিস-আদালতের হাজত-ঘরগুলি অন্যান্য ফৌজদারী হাজত-ঘরের ন্যায় দেখিবার জিনিষ। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নানা রকমের লোক ইহার মধ্যে অবস্থান করে। দুই জন মুন্সী এবং দুই জন পুলিসের লোক। তদ্ব্যতীত আর যাহারা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাদের বিচারের দিন ধার্য্য আছে, সেই সব কয়েদী এবং বিচারফলে যাহাদের প্রতি দণ্ডাদেশ হইয়াছে—তাহারা, অথবা যাহাদের পুনরায় মোকদ্দমার দিন পড়িয়া গেল, সেই সব ব্যক্তি।

এই স্থানটি সাম্যবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে নৈকষ্য কুলীন, লম্বা শ্মশ্রুধারী, মাথায় সিন্দূরের তিলকশোভিত ব্রাহ্মণ, ধনী ও মধ্যবিত্তঘরের ভদ্রসন্তান, গরীব ও নীচ-জাতির ধুরন্ধররা উপস্থিত আছে। বাঙ্গালী, মুসলমান, পেশোয়ারী, চীনা, ইহুদী, পার্শি, কাবুলি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিকে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাহুতাশ করিতেছে, কেহ মনের আনন্দে গুণ-গুণ করিয়া গান করিতেছে, আর কেহ মৃতপ্রায়ভাবে ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছে। কোন কোন লোকের চক্ষু জবার ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ কেহ লজ্জাকে বিদায় দিয়া কঠোর দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে, কেহ বা নীরবে নয়নজলে সিক্ত হইতেছে।

জবরদস্ত লোকগুলি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, অপেক্ষাকৃত ভালমানুষগুলি ভূমিতলে উপবিষ্ট।

আমি গিয়া দেখিলাম, একটা লোক অশ্রুপাত করিতেছে। শুনিলাম, সে এই প্রথমবার গ্রেপ্তার হইয়াছে, অজুহাত, চুরি। অবিশ্রান্ত ক্রন্দনে তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল স্ফীত। পার্শ্বে এক জন পুরাতন হিন্দুস্থানী দাগী চোর নিকটে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিতেছে। শুনিলাম, সে তাহাকে বলিতেছে,—"কাহে তোম্ রোতা হায়। তুম পয়লা দফে আয়া, বহুত হোগা দু-মাহিনা মেয়াদ হোগা। হামরা যব্ পয়লা দফে ছ'মাহিনা জেল হুয়াথা, জেলখানাকা চার কোণামে চার দফে পিসাব করণে ছ'মাহিনা কাট গিয়া।" আর একটি পুরাতন চোর তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "বাবা, ভয় ত তা নয়। আমার যদি ছ'মাস জেল হয়, তা হ'লে আমারই কোনও বেটা আত্মীয়, যে অনেক দিন হ'তে আমার বউয়ের উপর নজর দিচ্ছে, এই সুযোগে সেটিকে নিয়ে স'রে পড়্‌বে।"

এই সময়ে আমি বেশ স্পষ্টস্বরে বলিলাম,—"সদানন্দ কার নাম?"

একটি ২০।২২ বৎসরের তরুণ যুবক উত্তর দিল—"আমার নাম।"

তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, কিছু দিন পূর্ব্বে সে গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিল। এখন সে কতকটা ধূসরবর্ণ ও সূর্য্যতাপক্লিষ্ট। তাহার যজ্ঞোপবীতটিও তাহার ব্রাহ্মণত্বের ন্যায় অতি মলিন। আমি বলিলাম, "ওহে সদানন্দ, তোমার তরফ থেকে আমি উকীল আসিয়াছি।" সে শুনিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"উকীল বাবু, আপনাকে আমার উকীল কে নিযুক্ত করিল?" আমি বলিলাম,—"তোমার পিতাঠাকুর।"

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বটে, বটে, সে বেটা আসিয়াছে? উকীলবাবু, তাহার উপর যে অত্যাচার ও কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য কখনও ভাবি নাই—সে আমার রক্ষার জন্য এখানে আসিবে। আমার জেল হইলেই তাহাদের কিছুদিনের জন্য শান্তি! এ আমার মাতাঠাকুরাণীর অনুরোধে ও নির্ব্বন্ধতায় এখানে আসিয়াছে। উকীলবাবু, এই অল্পবয়সে এমন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই। তবে এক এক সময় আমার পাপাচারে উত্যক্ত মাতার মলিন মুখ দেখিলে মনে হয় আমি কি অন্যায় কার্য্যই না করিতেছি! কিন্তু সে সব কথা থাক্, আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। আপনি ভদ্রলোক ও শিক্ষিত লোক, আপনি কিছু পান, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দেখুন, উকীলবাবু, ঐ বুড়ো বেটার যথেষ্ট টাকা আছে। আপনি যা ফি লইয়াছেন, তার চারগুণ লউন, তাহা হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন। আমার সাত ভাই মরিয়াছে, আমি অষ্টম গর্ভের সন্তান। আমি ব্যবহার না করিলে, উহার পয়সা কে ব্যবহার করিবে?"

আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, এরূপ নরকের কীটও মনুষ্যাকারে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায়!

যাহা হউক, সর্ব্বসমেত মোকদ্দমার পাঁচটি দিন পড়িল। আমি বেশী করিয়া ফি লইতে লাগিলাম। পঞ্চম দিবসে হাকিম তাহাকে চোর সাব্যস্ত করিয়া সাজা দিলেন। সাজা হইল—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা মতে। সাজা স্থগিত রাখিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের জন্য তাহাকে তাহার বাপের জামিনে ছাড়িয়া দিলেন, এই মামলার যতটুকু সুফল হইল, সেটুকু আমার ওকালতির দরুণ হয় নাই। আমার উপদেশানুসারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনেক কাকুতি-মিনতি ও অশ্রুপাতের জন্য হাকিম দয়া করিয়া এরূপ হুকুম দিয়াছিলেন।

ফৌজদারী আদালতের উকীল ও হাকিমরা কখন কখন দয়া করেন। কারণ, তাঁহারাও মানুষ। মানুষ যে অবস্থায় থাকুক, দয়ার হাত হইতে এড়াইতে পারে না। আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে—অষ্টম গর্ভের সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান্ ও কৃতী হয়, কিন্তু অনেক সময় ইহা প্রবাদরূপেই থাকিয়া যায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অষ্টম গর্ভের সন্তানও সময়ে সময়ে অতিশয় কদাচারী ও কূটনীতিসম্পন্ন হয়।

শ্রীতারকনাথ সাধু।

ডেভিল ম্যারেজ

আলোচনা হইতেছিল বালকের দুষ্টামি সম্বন্ধে। বৃদ্ধ বলিলেন, বালক বলেই অবহেলার পাত্র নয়। বরং সাপের চেয়ে সলুইএর বিষ উগ্র। আমি এক সয়তানের কথা জানি, যার নাম কর্‌লে পাড়া-শুদ্ধ লোকের দম্ বন্ধ হয়ে যেত; তখন তার বয়স মাত্র এগার বছর।

এখন যেমন পাড়ায় পাড়ায় স্কুল, তখন তেমনি পাঠশালা ছিল। সেখানে ছুটীর আগে কেবল নামতা, শটকে ঘোষাণো হ'ত না, গুরুমহাশয় প্রত্যেক ছাত্রকে পিতৃ-পিতামহ থেকে সাত-পুরুষের নাম, কৌলীন্য-লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্থ করাতেন। তা' ছাড়া কোন কোন গুরুমহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, সহবৎ-শিক্ষার উপর। সয়তানের গুরু-মহাশয় বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, যিনি যেমন আলাপ-আপ্যায়ন-আচরণ কর্‌বে, তার সঙ্গে তেমনি কর্‌তে হবে। আগে সহবৎ, তার পর শিক্ষা। ছাত্রদের মানুষ কর্‌বার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন, কিন্তু যে পারিশ্রমিক আদায় হ'ত, তা'তে তাঁর চল্‌ত না। বিস্তর চেষ্টার পর সাহায্যের জন্য তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে দরখাস্ত কর্‌লেন। তার পর পাঠশালা পরিদর্শন কর্‌বার জন্য একদিন এক Inspector এসে উপস্থিত। তাঁকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করবার জন্য, মশায়ের সে চেষ্টা-যত্ন দেখে কে! ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দুধ, মাছ, তরি-তরকারি, দই, মিষ্টি সংগ্রহ করা হ'ল। ইন্‌স্পেক্টর বাবুটি বয়সে বৃদ্ধ, জাতিতে গোয়ালা—মশায়ের স্বজাতি, আর যেমন ভোজন-প্রিয় তেমনি পটু। পরিপাটি এবং পর্য্যাপ্ত মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর যখনি তিনি নানা রাগ-রাগিণী-তাল-লয়-সংযুক্ত নাসিকা-ধ্বনিতে আপনার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি জ্ঞাপন কর্‌তে লাগলেন, মশায়ের মুখে তখন হাসি দেখা গেল। অতঃপর অপরাহ্নে পাঠশালা পরিদর্শন।
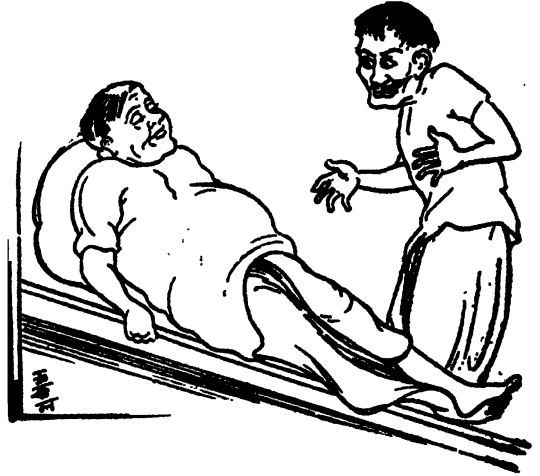
তিনি নানা রাগ-রাগিণী-তাল-লয় সংযুক্ত নাসিকা-ধ্বনিতে আপনার পরিপূর্ণ তৃপ্তি জ্ঞাপন করতে লাগলেন

পথে আস্‌তে আস্‌তে, মশায় আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে দিতে বল্‌লেন, আমি, মশায়, আগে সহবৎ শিক্ষা দি।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বল্‌লেন, ঠিক ঠিক! কিন্তু ঐ সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষাও দিতে হবে। তার পর রাজভক্তি।

মশায় বল্‌লেন, নিশ্চয়। কিন্তু সবই নির্ভর কর্‌ছে, আপনার অনুগ্রহের উপর। সরকার বাহাদুরের সাহায্য না পেলে কি এ সব কায চল্‌তে পারে? আপনিই কেন বলুন না? এই দেখুন, বছর ত শেষ হয়ে এল। এ বছর পাঁচটি ছেলে ছেড়েছে।

কেন ছাড়লে?

তাদের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে।

আর ভর্ত্তি হয় নি?

আজ তিন-চার দিন হ'ল ঐ ছেলেটি এসেছে, ব'লে মশায় সয়তানকে দেখিয়ে দিলেন।

.কিন্তু পাঠশালায় ভর্ত্তি হবার বয়সের চেয়ে এর একটু বেশি বয়স নয় কি ? তুমি কি পড়, খোকা ?

সয়তান বল্লে, দ্বিতীয় ভাগ। বলেই তৎক্ষণাৎ প্রতি প্রশ্ন করলে, তুমি কি পড় ?

ইন্‌স্পেক্টর একটু হেসে মশায়ের মুখপানে চাইলেন। তার পর সয়তানকে বল্লেন, আচ্ছা, বানান্ কর দেখি—শুশ্রূষা ?

সয়তান বল্লে, শু-শ্রূ আর ষা—শুশ্রূষা। তুমি বানান্ কর দেখি—শ্মশান ?

ইন্‌স্পেক্টরের মুখ ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বয়স কত ?

দশ বছর, দশমাস, দশ দিন। তোমার বয়স কত ?

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বল্লেন, হুঁ। তোমার নাম কি, ছোক্‌রা ?

সত্যেন।—লোকে বলে সয়তান। তোমার নাম কি ?

তুমি কার ছেলে হে ?

সয়তান উত্তর দিলে, মশায় বলে দিয়েছে, কারুর বাপ তুল্‌তে নেই।

ইন্‌স্পেক্টর আর একটি কথা কইলেন না। বজ্রবাহী মেঘের মত ভ্রুকুটি ক'রে সরাসরি ষ্টেশনে গিয়ে উঠলেন। মশায় পিছু পিছু গেলেন, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর আর ফিরেও চাইলেন না।

সারা পথ গজ্‌গজ্ করতে লাগলেন, সহবৎ শিক্ষা হচ্ছে! ওঁর মুণ্ডু হচ্ছে! গুষ্টীর পিণ্ডি হচ্ছে! মশায় যে দুটো কথা বল্‌বেন, তার ফুরসুৎ পেলেন না।

পাঠশালায় ফিরে এসেই মশায় বেতগাছটা তুলে নিয়ে সয়তানের কব্জির উপর একটি ঘা! চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। সয়তান ভ্রূক্ষেপও করলে না। হঠাৎ উঠে মশায়ের হাত থেকে বেতগাছটা টেনে নিয়ে তাঁর কব্জির উপর সজোরে পাল্‌টা ঘা! তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠল। মশায় হাত বুলুতে বুলুতে ছুটলেন, সয়তানের বাপের কাছে। সয়তানও পিছু পিছু গিয়ে হাজির।

মশায় কেঁদে ফেলে নালিস্ করলেন, দেখুন, আপনার পুত্রের কায!

সয়তানের বাপ বিস্মিত হয়ে বল্লেন, আমার ছেলের কায!
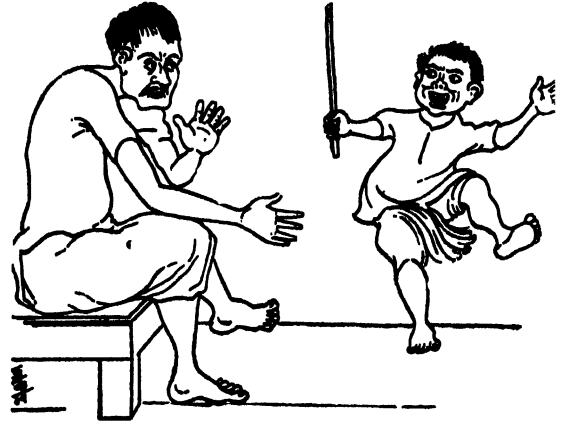
বেত গাছটা টেনে নিয়ে তাঁর কব্জির উপর সজোরে পাল্‌টা ঘা!

আজ্ঞে হাঁ! বিশ্বাস না করেন, পাঠশালের সং পোড়োরা সাক্ষ্য দেবে। আমি ডেকে আন্‌ছি।

কাউকে সাক্ষ্য ডাকতে হবে না। সত্যেন সয়তান বটে, কিন্তু সয়তানের প্রধান সয়তানী যে মিথ্যা কথা, তা ও প্রাণান্তে বল্‌বে না। যতই দোষ করুক, স্বীকার করবে, সে শিক্ষা আমি ওকে শিশুকাল থেকে দিয়েছি। কি রে, গুরুমশায়ের হাতে বেত মেরেছিস্ ?

হাঁ।

কেন ?

মশায় যে বলেছিল, যে যেমন করবে, তার সঙ্গে তেমনি করতে হবে।

তোকে কি উনি বেত মেরেছেন ?

এই দেখ না, রক্ত পড়ছে, ওঁর রক্ত-পড়া বাকি আছে।

মশায়ের ভয় হ'ল। এ যা ছেলে, গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে রক্তপাতের শোধ নিতে পারে! তিনি আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা ক'রে বল্লেন, মশায়, বুড়ো ইন্‌স্পেক্টর, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে,—তুমি কি পড় ?

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। সেও বানান্ জিজ্ঞাসা করলে, আমিও করলুম।

মশায়, নিশ্চয় সরকার থেকে মোটা সাহায্য পেতুম। খাইয়ে-দাইয়ে, খোসামোদ ক'রে অর্দ্ধেক কায ত ফতে করে এনেছিলুম! সব মাটী।

মশায়ের কান্নায় সদয় হয়ে সয়তানের বাপ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাসে কত হ'লে আপনার চলে ?

আজ্ঞে, আমরা গরীব লোক, গোটা দশেক টাকা আর খেতে পেলে একরকম চ'লে যায়।

আচ্ছা, আপনি এক কায করুন না কেন? আমার বাড়ীর দালানে পাঠশালা তুলে আনুন। যা আপনার দরকার, আমি দিব।

মশায় সভয়ে সয়তানের পানে চেয়ে বললেন, এঁকেও পড়াতে হবে ত?

দেখুন গুরুমশায়, দুষ্ট ঘোড়া সযুত করাই বাহাদুরি।

তা বটে,—তা বটে!

সয়তানের বাবা বললেন, কিন্তু, ছাত্রদের অমনি পড়াতে হবে।

মশায়ের সব আনন্দ যেন নিবে গেল! বললেন, অমনি?

আজ্ঞে হাঁ! পাড়ায় এমন গরিব আছে, যারা মাসে দু' আনা, চার আনাও দিতে পারে না।

মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, পূজায় সময় পার্ব্বণীটা-আসটা?

যদি কেউ স্বেচ্ছায় দেয়, নিতে পারেন। চাইবেন না।

মশায় একটু গাঁই-গুঁই ক'রে রাজি হলেন। মনকে সান্ত্বনা দিলেন, খেয়েই পুষিয়ে নেব।

সয়তানদের বাগানের একদিকে ছিল—এক মুসলমানের বাড়ী আর একদিকে ছিল এক মহন্তর আখড়া। এই মুসলমানরা অত্যন্ত গরিব, রঙ্গের কায করত। আর ঐ মহন্ত ছিলেন গোঁড়া বোষ্টম, গাঁজার যম। গুরু মহাশয় ছিলেন তাঁর প্রধান ভক্ত। অবশ্য গাঁজায় নয়। তিনি সয়তানদের বাড়ীতে আড্ডা গাড়াতে সেখানে মহন্ত বাবাজীর আনা-গোনা বেড়ে গেল।

বাবাজীর আখড়াটিও ছিল চমৎকার। চারদিকে তুলসীবন, সর্ব্বক্ষণ ধূঁয়ায় ধূঁয়াকার। তার মাঝখানে সর্ব্বাঙ্গে ছাপকাটা মহন্ত ব'সে থাকতেন, যেন চিতাবাঘ। তিনি পথে বেরুলেই পাড়ার ছেলেরা ফেউ ডাকত। ক্রমে মহন্ত নাম ঘুচে তাঁর নাম দাঁড়াল 'চিতেবাঘ।' কিন্তু সেই বাঘের ভিতর যে এত প্রেম জমাট বাঁধা থাকতে পারে, তাঁকে দেখলে তা' বুঝা যেত না। আম জরে, জাম জরে, লেবু জরে, আনারস জরে, মহন্ত, প্রেমে এমনি জরজর হয়ে উঠলেন যে, তাঁর জরাতিসার হয়ে গেল। সেই সময় প্রাণপাত ক'রে সেবা করেছিল—এক বিধবা গোয়ালিনী; সেরে উঠে কণ্ঠীবদল করে বাবাজী তাকেই সেবাদাসী করলেন। রাই (ঐ গোয়ালিনী) তার গাই-গরু নিয়ে মহন্তর আখড়ায় এসে উঠল। আর এই জীবগুলির সঙ্গে সঙ্গে এল একটি জীবন্ত উপদ্রব।

আমরা সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম—কি রকম, কি রকম?

বৃদ্ধ বলিলেন, রকম আর কি! যা চিরকাল হয়ে থাকে। তোমাদের ভিতর অনেক অবিবাহিত যুবক আছেন, তাঁদের হিতার্থেই কথাটা বলছি। অধিকাংশ স্থলেই আজকাল পাত্র-পাত্রী আপন আপন পছন্দমত নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু জেনে রেখো, গাছের ফল যত দিন গাছে থাকে, তত দিনই তার আকর্ষণ,আর সেটিকে আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ-চেষ্টা। তার পর পরস্পর পরীক্ষায় বুঝতে পারে, ফলটি টক্, মিষ্টি কি মাখাল। পুরুষমানুষ যখন শুনতে পায় যে, কঙ্কণের ঠুনঠান্ আওয়াজ কণ্ঠে উঠে ঝন্ ঝন্ ক'রে বাজছে, তখন সে বিহ্বল হয়ে ভাবে—এ স্বর, এ কোথা থেকে আমদানী করলে। মেয়েমানুষও ক্রমে বুঝতে পারে যে, তার পোষা পাখী দাঁড়ে ব'সে কেবল ছোলা খায় না, আর তার শেখানো বুলি বলে না। তার মাঝে মাঝে শিকল কাটবার চেষ্টাও আছে, আর এমন বিট্‌কেল চীৎকার করতে পারে যে, কানে আঙুল দিতে হয়! সায়েবরা অবস্থা বুঝেছেন, কিন্তু ব্যবস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না।

পাশ্চাত্য-সমাজে যে প্রথায় বিবাহ হয়, বোষ্টমদের কণ্ঠীবদল কতকটা সেই রকম। বিবাহের পর সায়েবদের যেমন কোর্টশিপের মাদকতা ছুটে যায়, মহন্তও তেমনি অচিরাৎ বুঝতে পারলেন যে,—যে দুগ্ধবতী গাভী অজস্র ননী-ছানা প্রসব ক'রে, তাঁর জরাতিসার-শীর্ণ দেহখানিকে ছোট-খাটো একটি গিরি-গোবর্দ্ধনে পরিণত করেছিল, কণ্ঠীবদলের কিছু দিন পরে সে অকস্মাৎ 'খেড়ো গাই' হয়ে গেল! ননী-ছানা-দধির আশা ত দূরের কথা, এখন তাঁর সাধের গোয়ালিনীর গোয়ালভরা গাইগুলিকে নিত্য খড়-খোল-ভুষি যোগাতে যোগাতে মহন্তর প্রাণান্ত। দুধ-ছানা মাখমের আর গিরি-গোবর্দ্ধন প্রস্তুত ত হয়ই না, প্রস্তুত হয় কেবল রজতগিরি, আর তার একটা নুড়িও তাঁর ভোগে আসে না। মহন্ত আর কি করবেন, নীরবে সহ্য করা বৈ উপায় নাই। একটা কথা বললে তার এমনি সুরে উত্তর আসে যে,

সঙ্কীর্ত্তনের চীৎকারে অভ্যস্ত কর্ণকুহরও আঙ্গুল দিয়ে রোধ করতে হয়। বাবাজী নিরাশ-নেত্রে নধর গাইগুলি দেখতেন, আর তাঁর নোলা দিয়ে জল ঝরত—অবশ্য গো-রসের লালসায়। ক্রমে তাঁর হতাশ দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল, সেই জীবন্ত উপদ্রব—গোয়ালিনীর ছোট বোন রসমঞ্জরীর উপর।

গোয়ালিনীর একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল, বেগার দিতে নয়—নিতে। বাবাজীর আখড়ায় যে সব ভক্তবৃন্দ আসত, গোয়ালিনী দেখলে তাদের তিনটি মাত্র কায—সঙ্কীর্ত্তনে ডাকাত-পড়া চীৎকার, গাঁজা-ওড়ানো আর মালপো-ঠোসা। গোয়ালিনী দুধের যোগানে তাদের সকলকে নিযুক্ত ক'রে দিলে, বাকি কেবল গুরুমহাশয়। এক দিন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলে, ও গরুটা কি করতে আসে?

গোয়ালিনীকে মহন্তর মুখ বলত 'গোপী,' কিন্তু তাঁর মন বলত—গাই। তা' এই গোয়ালিনীর দধি-দুগ্ধ স্মরণ করেই হোক বা মহাজনগণের নজীরে রাধারাণীর 'রাই' আখ্যার অনুকরণেই হোক্। এই গোপীর কণ্ঠস্বরে দশ-ছিলিম গাঁজার নেশা ছুটে যেতো। ভক্তবৃন্দ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, বাবাজী বোঝাতেন, ঠিক ব্রজের ভাব। আমাদের রাধারাণীরও ঠিক এমনি আওয়াজ ছিল।

গুরুমহাশয় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করতেন—রাধারাণীর?

নিশ্চয়—রাধারাণীর। নৈলে কার? মাখি ময়রাণীর? মশায়, বুঝতে পারছ না, কোন্ যুগে কথা কয়ে গেছেন, জোর আওয়াজ না হ'লে এখনও আমাদের কানে এসে পৌঁছয়? আহা, আহা, রাই হে! বলিতে বলিতে বাবাজী ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

তারপর একটু সাম্‌লে বল্‌লেন, কেমন হে, তোমরা শুনতে পাও না?

এক জন বলিল, পাই না! তবে কি সর্ব্বদাই শোনা যায়? নেশাটা যখন খুব জমে ওঠে—

বাবাজী বল্‌লেন, এই! নেশা! নেশা! কৃষ্ণপ্রেমের নেশা! মশায়, নেশা কখন করলেও না, নেশার ধাতও বুঝলে না! আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি, আমাদের বলাই গাঁজা খেতেন।

মশায় বল্‌লেন, মোহান্তজি, সে ত, শুনেছি, মহুয়ার মধু।

আরে মহুয়া যদি মধু হয়, তবে গাঁজাও ক্ষীরখণ্ড। মশায়, এক-আধ টান্ টানো! অমনই কি রাধারাণীর কথা শুনতে পাবে! তখন ধোঁয়ায় দেখবে নব-জলধর-পটল-বেগুন-সেগুন-শাল-তাল-তমাল-শ্যামমূর্ত্তি! আহা-হা, প্রভু হে! আবার ভেউ ভেউ।

কিন্তু সংশয়ীর মন, কিছুতেই বিশ্বাস করে না। গুরুমহাশয় বল্‌লেন, কিন্তু এ সব কথা কি পুরাণে লেখে?

লেখে না? নিশ্চয় লেখে! আর না লেখে সে দোষ আমার নয়—পুরাণের!

এ সব পূর্ব্বকথা। আজ গোপী যখন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলে, ও গরুটা কি করতে আসে? তখন সকাল থেকে অসংখ্য ছিলিমের পর ছিলিম চড়িয়ে বাবাজী সবেমাত্র আর একটি কল্‌কে হাতে নিয়েছেন। গাঁজাখোর পারতপক্ষে ধোঁয়া ছাড়ে না। মহন্ত দম মেরে গুম্ খেয়ে গেলেন।

ভাল গাঁজাখোরের পাল্লায় পড়েছি! বলি, ও গরুটা রোজ রোজ কি করতে আসে?

মহন্ত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিলেন, দুধ দুইতে।

গোপী দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল! তার পর বল্‌লে, মুখে আগুন! দুধ দোয়াচ্ছি!

বাবাজীর তখন চট্‌কা ভাঙল। তিনিও দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লেন, কোন্ গরুর কথা বলছ?

আমার মাথা! চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজা আর গাঁজা!

আহা রসময়ী গাই! তোমাকে দেখলে আমার বুকের ভিতর কৃষ্ণপ্রেম ঘাই দেয়! আমি খাব গাঁজা, আর তুমি খাবে খাজা! বেশ মজা হবে!

যে ভক্ত কল্‌কের প্রথম প্রসাদ পেয়েছিল, সে তখন ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লে, কিন্তু তিলে খাজা। এক কামড়ে দাঁত সাবাড়! আর বড় কামড়াতে হবে না!

মন্তব্যটা প্রকাশ করেই কিন্তু ভক্ত আপনার জিব কামড়ালে।

তুই বেরো পোড়ারমুখো! রোস্, তোর দাঁত সাবাড় করছি। বলে গোয়ালিনী নোড়া আন্‌তে ছুটল। কিন্তু এসে আর তাকে দেখতে পেলে না।

গ্রহের ফের! এই সময় গুরুমহাশয় এসে উপস্থিত। গোপী জিজ্ঞাসা করলে, দুধ দুইতে জানো?

মশায় একটু থমকে গিয়ে বল্‌লেন, দুধ দুইতে? কৈ, মনে ত হয় না।

গোয়ালার ছেলে দুধ দুইতে জানো না, খালি গরু চরাও বুঝি?

গরু চরাই কি?

তা' বৈ কি! ছেলে ল্যাথাও ত?

মশায় নিরুত্তর। গোপী বল্‌লে, শোন! তোমার মনিব-বাড়ীতে যে এক সের ক'রে দুধ যায়, সেটা তুমি নিয়ে যেয়ো।

সয়তানদের দুধ নেবার প্রয়োজন ছিল না। তবে মশায় অনেক ক'রে ধরাতে সেই ব্যবস্থা হয়েছিল। মশায় জান্‌তেন, গয়লানীর দুধে সাঁড়াসাঁড়ির বান ডাকে। তাঁর হাত দিয়ে মনিব-বাড়ীতে সে দুধ পৌছুলে তাঁকেই দায়ী হতে হবে। তিনি আম্‌তা আম্‌তা কর্‌তেই গোয়ালিনী মহন্তকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন, শুন্‌ছ গা! তোমার ঐ সব গেঁজেল্ ভক্ত কি এত সহজে রাজি হ'ত?

মহন্ত বল্‌লেন, তা হবে না! ভক্ত!

মশায় বল্‌লেন, কিসের ভক্ত? তার মানে? ভক্ত কিসের?

দুধের! বলেই মহন্ত দম্ মেরে ধোঁয়া গিলে গুম্!

মশায় দেখলেন, বাদানুবাদ মিছে! অগত্যা স্বীকার। মশায় দুধের ঘটীটি হাতে ক'রে নিত্য দুধ যোগান দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। সয়তানের বাপ ঐ দুধটুকু মশায়কেই খেতে দিতেন। কিন্তু শ্রেয়ঃকার্য্যে বহু বিঘ্ন। এক দিন একটু গোল বাধলো।

সয়তানদের বাড়ীর ও-পাশে যে মুসলমানদের কথা বলেছি, তাদের একটা লড়ায়ে মোরগ ছিল—মিয়াজান্। কুকুর-বেরাল যা পক্ষিজাতির স্বাভাবিক শত্রু, এই মিয়াজান্‌কে দেখে গাঁ ছেড়ে পালাত। ইনি পাড়াময় বেড়িয়ে বেড়াতেন যেন বাদসা! কিন্তু এর বিশেষ প্রিয়ভূমি ছিল মহন্ত বাবাজীর আখড়া। উদ্দাম ভাবাবেশে বাবাজী যখন চীৎকার ক'রে উঠতেন—প্রভু হে!—

মিয়াজান্ মট্‌কার উপর হ'তে যেন উত্তর দিত—কোঁ-কোর-কোঁ!

তার পর সঙ্কীর্ত্তনে সমের মুখে এর বিকট চীৎকার শুনে মনে হ'ত, এ কুক্কুট নয়—দানব!

সম্ভবতঃ গাঁজার ধোঁয়ায় আকৃষ্ট হ'য়ে মিয়াজান্ এক দিন দাওয়ার উপর নেমে এল। এই স্পর্দ্ধা দেখে আমাদের গোয়ালিনী একটা বাঁশ তুলে নিয়ে বল্‌লে, আজ ওটাকে মেরেই ফেল্‌ব। তাড়াহুড়োয় দাওয়ার সব জিনিস-পত্র ওলোট-পালট হ'তে লাগলো। সেই সঙ্গে গুরুমশায়ের দুধের ঘটিটিও গেল উল্টে। দাওয়ায় দুধ ঢেয়োঢেরী। গোপী সে দিকে একবার বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ফিরে দেখলে মিয়াজান্ চ'ড়ে বসেছে মহন্তর মাথার উপর! শুধু তাই

সে যেন দুই পাখা আস্ফালন ক'রে তালঠুকে বল্‌ছে--আইয়ে!

নয়। সে যেন দুই পাখা আস্ফালন ক'রে তালঠুকে বল্‌ছে—আইয়ে! এরূপ অবস্থায় লাঠি চালালে একেবারে ডবল খুন হয়! গোপী বাঁশটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দাওয়ায় পতিত দুধটা আঁচলে থুপিয়ে থুপিয়ে নিংড়ে নিংড়ে মশায়ের ঘটী ভর্ত্তি করতে আরম্ভ কর্‌লে।

মশায় দাঁড়িয়ে আগাগোড়া কাণ্ড সব দেখছিলেন। যা ছড়িয়ে যায়, তার সবটা আর কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। ঘটী কতকটা ভর্ত্তি হ'ল, বাদ-বাকিটুকু গোপী জল মেশালে। কিন্তু তাতেও দুধের ময়লা কাট্‌ল না। ঘটীটি হাতে তুলে দিতে মশায় বল্‌লেন, এ যে বেজায় ময়লা দুধ!

গোপী তার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত ক'রে বল্‌লে, হুঁ! তা কি হয়েছে?

মশায় জড়সড় হয়ে বল্‌লেন, হবে আর কি!' তবে কি না, সেখানে জিজ্ঞাসা করলে বল্‌ব কি?

তুমি না গোয়ালার পো?

মশায় ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

গোপী বল্‌লে, তবে?

তবে কি?

কি বল্‌বে, তাও আবার শেখাতে হবে? হা আমার পোড়াকপাল! বল্‌বে, কালো গাইয়ের দুধ।

মশায় অতি বিনীতভাবে বল্‌লেন, সে কথা কর্ত্তা-গিন্নীকে এক রকম ক'রে বোঝাতে পারব, কিন্তু সয়তান—

গোপী তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্‌লে, ঢের সয়তান দেখেছি! সেই ছোঁড়া ত? যে ঐ মোচরমান ছেলেটার সঙ্গে বেড়ায়?

মশায় এদিক্‌-ওদিক্‌ চাইতেই দেখলেন, সয়তান আর সেই মুসলমান-সন্তান হানিফ আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসছে! মশায়ের হাত থেকে দুধের ঘটী প'ড়ে গেল।

হানিফ সেই রং-ওয়ালা মুসলমানের ছেলে, সয়তানের চিরসাথী। এরা মিয়াজান্‌কে খুঁজতে এসেছিল।

গাঁজায় মেজাজ বেজায় ত্রিক্ষী হয়। সয়তান আর হানিফ আড়াল থেকে বেরিয়ে আখড়ায় ঢুক্‌তেই বাবাজী ব'লে উঠলেন, দেখ হান্‌ফে, তোর মোরগা আমার মাথায় চ'ড়ে বসেছে। তাড়াতে গেলেই ঠোক্‌রায়! এ কি আ-ময়দা মাঠ?

সয়তান বল্‌লে, বাবাজী, মিয়াজান্‌ তোমার কীর্ত্তন শুন্‌তে বড় ভালবাসে গো! নয় হান্‌ফে?

হানিফ বল্‌লে, তা আর কইতে দাদা-বাবু! কত তারিফ করে! নয় রে মিয়া?

মিয়া মহন্তর মাথার উপর ব'সে ঝিমুচ্ছিল। হানিফের প্রশ্নে চকিত হয়ে যেমন সে কোঁ-কোঁর-কোঁ ব'লে উড়ে আস্‌বে, অমনি তার তীক্ষ্ণ নখাঘাতে বাবাজীর মাথায় রক্তপাত হ'ল। কেবল তাই নয়। আস্‌বার সময় গোপীর মস্তকেও কোঁ-কোঁর-কোঁ ব'লে এক ঠোকর! গোপী চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, আমাকে বল্‌লে ঠোকর খা!

মশায় বল্‌লেন, ঠোকর-খা নয়—কোঁকর-কোঁ! কে সে কথা শুনে! উল্‌টে তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গোপী বল্‌লে, যত নষ্টের গোড়া ঐ গোয়ালার ভূত!

ঠোকর-খা যেমন কোঁকর-কোঁর—তেমনি ভূতও সম্ভবতঃ পুত-শব্দের অপভ্রংশ।

মহন্ত উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, শোন্‌ হান্‌ফে! তোর ঐ মোরগা যদি ফের এদিকে আসে, তা হ'লে তোর মুরগীর পালকে পাল আমি জবাই করব।

এক জন গাঁজা টিপতে টিপতে বল্‌লে, আঃ বাবাজী, কোথায় ছাগমাংস লাগে? কি বল্‌ব, প্রভু ওদের চারটে ক'রে ঠ্যাং দেন নি!

এক জন বল্‌লে,ছটা আট্‌টা দিলে আরও ভাল করতেন!

আর এক জন নেশায় বুঁদ হয়ে বসেছিল। তিনি ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন, প্রভুর অবিচার। কোন্‌ বেল্লিক এ কথা বলে! দিল্লি সহর দেখেছিস্‌! যেথানে মোগলাই পাগড়ী প'রে মোগলাই কাবাব খেতে হয়! দেখেছিস্‌! সেখানে গেলে দেখবি, মুরগীর শরীর নেই, খালি পাঁচ ছ'খানা ক'রে ঠ্যাং চরে বেড়াচ্ছে!

অপর গাঁজাখোর যিনি এক দিন মিয়াজানের ঠোকর খেয়েছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—ঠোঁট নেই?

একদম্‌ না। ঠোঁট, ডানা, পালক, কিছু নেই!

তা হ'লে খায় কেমন ক'রে?

ওঃ, আবার তর্ক ধর্‌লে! ও-সবে আমি নেই, বাবা! সে ঐ মশায়! আমি যা' স্বচক্ষে দেখেছি, তাই বল্‌ছি! খায় কেমন ক'রে! সে ভাবনা ত তোমার নয়, যিনি জীব দিয়েছেন—তাঁর!

ও-দিকে মহন্ত ততক্ষণ রাগে ফুলিতেছিলেন। বলিলেন, হান্‌ফে, সাবধান! আর তুমি ছোক্‌রা, হিন্দুর ছেলে মোচরমানের সঙ্গে বেড়াও! তোমার সয়তানী আমি এক দিন বা'র করব! সাবধান!

এ দিনের ব্যাপার এইখানেই শেষ, কিন্তু মশায় বুঝলেন যে, গোপীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করতে না পারলে আখড়ায় আসা-যাওয়া বিপদ্‌। কোন্‌ দিন ঝাঁটাগাছটা তার নির্দ্দিষ্ট আসন ছেড়ে তাঁর শরীরের মধ্যে এক পীঠস্থান আবিষ্কার ক'রে ফেলবে! কবে ছড়া হাঁ[illegible] হঠাৎ সদয় হয়ে, তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করবে, কি[illegible] জানা নাই।

এই দুই জনের ভিতর সাধারণ বন্ধন ছিল রন্ধন। গোপীর হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, সে আর ভুলতে পারবে না। বিশেষ ছ্যাঁচড়া। সে ছ্যাঁচড়া নয়—একেবারে ভক্তি-কাব্য!

এই ঘটনার অনতিপরে এক দিন সয়তানদের পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল। মশায় একটি মাছের প্রার্থী হলেন।

সয়তানের বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মাছ নিয়ে করবে কি? আখড়ায় দেবে বুঝি?

আজ্ঞে হাঁ।

মহন্ত মাছ খান?

আজ্ঞে না! তিনি আমিষ ছোঁন না।

তবে?

তিনি কেবল ঝোলটুকু খান।

ওঃ, মাছ আর সকলে খাবেন? ওরে দেত রে, সব চেয়ে বড় মাছটা।

একটা সের পোনের রুই আর সয়তানদের খিড়কীর বাগান থেকে একঝাড় পুঁইডাটা নিয়ে মশায় ছেঁচড়ার লোভে উপস্থিত হতেই বাবাজী বল্লেন, রোহিতমৎস্যের ঝোলে আয়ুর্বৃদ্ধি করে। খালি ঝোল—

তা হ'লে মাছগুলো যাবে কোথা?

বাবাজী ভক্তকে বল্লেন, মাছগুলো? সেগুলো গলে, নালে—ঝোলে—বুঝ্লে ভক্ত! আয়ুর্বৃদ্ধির্যশস্করঃ—

মশায় ভয়ে ভয়ে বল্লেন, ছেঁচ্ড়া?

বাবাজী বল্লেন, ছেঁচ্ড়া? ছেঁচ্ড়া লোকে খায়!

গোপী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আমি ছেঁচ্ড়া?

মহন্ত বুঝলেন, বেজায় বেসুর! বল্লেন, দেখছ হে, ঠিক ব্রজের ভাব! রাধারাণীর সঙ্গে প্রভুর নিত্য এই নিয়ে ঝগড়া! রাই বল্তেন, গোঁসাই, তোমার সব ভাল, কেবল বাঁশী ছেঁচ্ড়া! এই দু'জনে লেগে যেত আর কি! ক্রমে বাপন্ত-পিতন্ত-চোদ্দপুরুষান্ত হয়ে শেষ হাতাহাতি পর্য্যন্ত।

মশায় বল্লেন, এ কথা ভাগবতে লেখে?

ভাগবত! ভাগবত আবার গ্রন্থ? হরিবংশ পড়। বুঝলে মশায়, যে সে বাঁশ নয়—হরিবংশ! বংশ পুরাতন হলেই ঘুণ ধরে জান ত? সব পুরাণেই ঘুণ ধরেছে। কিন্তু হরিবংশ—বজ্র-বাঁশ—

এই সময় গাই আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, গরু, তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে বকাবকি করবে, না তোমার মনিব-বাড়ী থেকে ছোলার ডাল আন্‌বে?

মশায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেঁচ্ড়ায় কি ছোলার ডাল লাগবে?

আরে না—না! কাঁটা-পোঁটা-তেলে ছেঁচ্ড়া হবে আর মুড়োটার মুড়ি-ঘণ্ট।

এক জন নিরামিষাশী বল্লেন,তার চেয়ে মুড়োটায় কেন মোচার-ঘণ্ট হোক না।

গাই বল্লে, সে মাছের মুড়োয় নয়, তোমার মুড়োয়!

ইতিমধ্যে এক জন গাঁজা টিপতে টিপতে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল, প্রভুর কি অবিচার! মাছের পা দেন্ নি! দেছেন্ কি না দু'খানা পাখনা—তাতে না পারে উড়তে, না পারে চল্‌তে, আর তা না যায় খাওয়া! হায় হায়, পা থাক্‌লে তবু প্রভুর ভোগে লাগত!

একে মুড়িঘণ্টর ব্যবস্থায় বাবাজী বিষম চটে আছেন, ভক্তের মন্তব্য প্রকাশে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, কে বলে মাছের পা দরকার? মাছের আর কিছুই দরকার নয়, কেবল ঝোল। মৎস্যপুরাণ পড়, দেখবে মাছের ঝোলের সাগর! হাঁ,—ঐ একখানা পুরাণ!

কেন বরাহপুরাণ?

আরে সেটা হিন্দুর অখাদ্য। নিছক সায়েবদের জন্য লেখা। ওরা ওটার খুব ভক্ত কি না!

সায়েবদের জন্য! তবে হিঁদুরা পড়ে কেন?

গেরো! বেদব্যাস এক এক জাতের জন্য এক এক পুরাণ করেছেন। বামুনদের জন্য বামনপুরাণ। কুর্ম্মীদের জন্য কূর্ম্মপুরাণ।

বাবাজি, বেদব্যাস আমাদের জন্য কোন পুরাণ করেন নি?

কেন, কল্‌ক পুরাণ।

এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, মহন্তজী, ব্যাস তা হ'লে গাঁজা খেতেন?

মশায় আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বল্লেন, কে বলে?

আজকাল অনেকেই বলে।

ঠিক ত! সে দিন জনকন্ত বিদ্বান্ ছেলে এ কথা বল্‌ছিল।

অপর এক ভক্ত বল্‌লে, আর আমার ছেলে বেটা বলে, তোমার জন্যে আমার মাথা হেঁট হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বল্‌লে, তুমি গেঁজেল্। আমার আর সইল না। বল্‌লাম, বেটাচ্ছেলে, মশায়ের পাঠশালে প'ড়ে সহবৎ-শিক্ষা হচ্ছে! গুরুলঘু মানিস্ নি, আমায় বলিস গেঁজেল্! গেঁজেল্ তোর বাবা।

বেশ বলেছ, ব'লে মহা-আনন্দে ছিলিমের পর ছিলিম চড়িয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে আর এক ছিলিম টিপতে টিপতে ভক্তের দল গান ধরলে—

আকাশে উঠিল চাঁদ তৃণবতো হয়ে—

এ দিকে গো-রসে বঞ্চিত বাবাজী ক্রমে মোরিয়া হয়ে উঠলেন। গাই দই পাতে, মাখন তোলে, ছানা বসায়, ভাণ্ডারজাত করে, সব অর্থের জন্য। ওদিকে পরমার্থ যে পতি, তার পানে দৃষ্টি নাই। কি মোহ!

মহন্ত কোন কোন দিন ইঙ্গিতে প্রসঙ্গ তোলেন, গাই, এ শরীর ত তোমারি। তোমারি ননী-ছানা-দুধে তৈয়ারি। আহা, তোমার কি গড়নের বাহাদুরি!

ইসারা বুঝে গোয়ালিনী বলে, ওর ওপর আর বাহাদুরি করলে যে, ফেটে মরবে। অমনই ত মাছি পিছলে পড়ে!

বাবাজী ভাবেন, শরীর গোল্লায় যাক্, ফুটি-ফাটা হোক্! ঘামের বদলে গা দিয়ে ননী দরাবে তবে ত!

কোন দিন দোয়াল না এলে বাবাজী বলেন,ভাবছ কেন, গাই আমিই দুইব।

গোয়ালিনী মনে মনে হাসে। মুখে বলে, তা কি হয়! তা'হলে পাঁচ সেরের জায়গায় পাঁচ ছটাকও পাওয়া যাবে না।

কেন বল দিকি?

বাঁটে নতুন হাত পড়লেই দুধ চম্‌কে যাবে। এই ব'লে গাই ভাঁড় নিয়ে তাড়াতাড়ি গোয়ালে ঢোকে। ক্রমে বাবাজীকে ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়াতে দেখে গাই ভাঁড়ারে চাবি দিলে। মহন্ত মনকে বোঝালেন, ননী চুরিতে দোষ নাই। এ বিষয়ে প্রভু নিজেই নজীর। কিন্তু চাবি চুরি?

এক দিন রাত্রে হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ। চম্‌কে উঠে গোয়ালিনী চীৎকার করলে, কে রে?

ভাঁড়ারের ভিতর থেকে ভারি গলায় বিকৃত সুরে আওয়াজ এল, আমি প্রভু।

প্রভু কি?

তবে বেড়াল—ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও।

গোয়ালিনী মনে মনে হেসে বাঁশ নিয়ে এসে দেখলে শিকে থেকে দ'য়ের হাঁড়ী ভূমিসাৎ, আর মহন্তজী চৌকি ভেঙ্গে কুপোকাৎ—লম্বা জিব বার ক'রে ছড়ানো দই চক্ চক্ ক'রে চাটছেন। গাই প্রথমে আস্তে আস্তে এক ঘা' দিলে

লম্বা জিব বার ক'রে ছড়ানো দই চক্-চক্ করে চাটছেন

ম্যাও-চক্-চক্-চক্—

আর একটু জোরে দ্বিতীয় ঘা পড়িল।

ম্যাও-চক্-চক্-চক্—

গোয়ালিনী বুঝলে ছোট খাট ঘায় কিছু হবে না। প্রদীপটা রেখে দু'হাতে বাঁশটা সাপটে ধরতেই পিছন থেকে এক জন ধ'রে ফেল্‌লে। গাই পিছু পানে চাইতেই রসমঞ্জরী বললে, কি করিস, দিদি! মাথা ফেটে যাবে যে! আহা, কেষ্টর জীব!

গাই রেগে বল্‌লে, কেষ্টর জীব! আমার হাঁড়ী ফেটেছে, দেখতে পাচ্ছিস্ নি? মাথা ফেটে যাবে! পোড়ারমুখি, তোর এত টান কিসের লা?

ম্যাও-চক্-চক্! রসমঞ্জরী, আর একটু ধ'রে রাখ।— ম্যাও-চক্-চক্—বাকিটুকু চেটে নিই—ম্যাও-চক্-চক্—

শুন্‌ছিস্ বেড়াল কথা কয়!

ম্যাও-চক্-চক্-চক্—কেষ্টর বেড়াল!

কেষ্টর বেড়াল ত এখানে কেন? কেষ্ট পা'ক্ না। ব'লে গাই বাঁশ তুলতেই রসমঞ্জরী বল্‌লে, খেপলি না কি, দিদি! ও-যে বোনাই-বাবাজী। বোনাই-বাবাজী মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, এর শোধ এক দিন নিতে হবে।

এ পালা এইখানেই শেষ হ'ল। ভাঁড়ারের দোরে খুব মজবুত তালা পড়ল। কিন্তু তার চাবি যে ১২৪ ধারার আসামীর মত কোথায় গা-ঢাকা দিলে, তা সহস্রলোচন টিক্‌টিকিরও অগোচর। বিশেষ ক'রে রসমঞ্জরীর। কেন না, তার দিদির সন্দেহ, বোনাই-বাবাজীকে চাবি চুরি ক'রে দেওয়া তারই কাজ। গাই এদের তু'জনের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করলে।

সন্দেহটাও মিছে নয়, কিসে কি হয়, বলা যায় না। খড়-খোল-ভুষি-ঘাস—দুধে পরিণত হয়। দুধ—দই-ছানা-মাখনে রূপান্তরিত হয়। বাবাজীর স্বকীয়া-প্রেমও ক্রমে পরকীয়ায় সঞ্চালিত হ'ল। কিন্তু প্রেম যত সহজে হয়, কণ্ঠী-বদল ত তত সহজে হয় না। তবে চেষ্টা।

বাবাজী রসমঞ্জরীকে আড়ালে-আবডালে রসমুণ্ডি বল্‌তে আরম্ভ করলেন। গাই বল্‌লে, ও নাম যদি তুমি মুখে আন ত তোমারি এক দিন কি আমারি এক দিন।

মহন্ত মুণ্ডি বল্‌তে সুরু করলেন। রসে হাবুডুবু না খাক্, মিষ্টি ত বটে! অতঃপর মুণ্ডিকে শুনিয়ে শুনিয়ে মহন্তজী কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে দিলেন।

মশায়, কখন প্রেম করেছ?

কৈ, কবে? কোন্ শালা বলে?

গুরুমশায়ের এই অপ্রত্যাশিত উগ্র উত্তরে ভক্তের দল চমকে উঠল। এক জন বলেই ফেল্‌লে, নেশাটি জ'মে আস্‌ছিল বেশ পরিপাটি! ব্যস্, একদম্ মাটী! কর নি—কর নি, তার এত চটাচটি কি?

চটাচটির একটু কারণ ছিল। মঞ্জরী ফোট'-ফোট' হওয়া অবধি মশায় একটু বে-সামাল্ হয়ে পড়েছিলেন—আর সেটা উভয়তঃ। কেন না, কিছুদিন থেকে উভয় পক্ষই পরস্পরকে হাসি-কটাক্ষ বিতরণ করছিলেন, কিন্তু খুব গোপনে।

উভয় পক্ষই পরস্পরকে হাসি-কটাক্ষ বিতরণ করছিলেন,
কিন্তু খুব গোপনে!

সে কি মশায়! তুমি এমন সুপুরুষ! প্রেম কর নি? নিজে না কর, কখন করিয়েছ?

কি?

প্রেম হে! পুরুতগিরি কর নি?

তার মানে? এ কি শ্রাদ্ধ?

এই। পথে এস!

ভয়ে মশায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। মনে মনে তিনি যে রসমঞ্জরীর অনুরক্ত, এ কি বুঝতে পেরেছে?

ক্রমে অন্য ভক্তরা সব উঠে গেল। মশায় ব'সে রইলেন, একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে যাবেন না।

ভাবুক বাবাজী ব'লে উঠলেন, আহা, মুণ্ডি!

সরোষে সহসা মুণ্ডির প্রবেশ।

তোমার মুণ্ডু! খালি খালি মুণ্ডি-মুণ্ডি কর কেন, বল ত? দিদি রাগ করে।—বলেই চ'লে গেল।

বাবাজী বল্‌লেন, দেখলে?

আমি ও-দিকে চাই-ই নি, তার দেখব কি?

আহা, ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছে!

কেন?

প্রেমে।

কিসে বুঝলেন?

লক্ষণে।

তার মানে? কি লক্ষণ?

কটাক্ষ।

বাবাজী, ও-যে বিরূপাক্ষ! একেবারে মদন-ভস্ম।

শুধু ভস্ম! ওর পিণ্ডি চট্‌কাতে হবে। পিত্তি ছরকুটে যাবে, তবে ত?

মশায় শিউরে উঠলেন। বলে কি!, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কার?

বাবাজী বলিলেন, প্রেমের। রসমঞ্জরীরও বল্‌তে পার। রসমুণ্ডি আছে, রসপিণ্ডি হবে। মশায়, সেই পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে তোমায়।

আমায়! তার পর? গাইদিদির ঝাঁটা?

তুমি একবার দূতী হয়ে কণ্ঠী-বদলটা ক'রে দাও না।

আমি দূতী!

আচ্ছা, না হয় গোবিন্দ অধিকারী।

আমি মোচ মোড়াতে পারব না।

মোচ মোড়াতে হবে কেন?

তবে কি গুঁপো দূতী?

হ'লই বা। তোমাদের খিড়কির বাগানের একধারে ছুখানা ভাঙ্গা ঘর আছে না?

গরুড়—গরুড়! সাপের আড়ং ব'লে সে দিকে যে কেউ ঘেঁসে না।

প্রভু কালীয় দমন করেছিলেন।

করুন গে। সে ঘরে কি হবে?

একটি ঘরে মুণ্ডি গিয়ে থাকবে। আর একটি ঘরে বড় আখড়ার মহন্ত সদলবলে গিয়ে কণ্ঠীবদল করাবেন। গাই কি করবে? আমি বরবেশ ধরব সেই ঘরে গিয়ে। সে জান্‌তেও পারবে না।

যে যেমন বর্ব্বর, আপন কাজে তৎপর। এ ত গাঁজা খেয়ে ভোঁ'মেরে থাকে। এর পেটে এত সয়তানী! সয়তান! কিন্তু পোড়'র নামটা মনে তোতেই মশাই চম্‌কে উঠলেন।

বাড়ী গিয়ে সয়তানকে বল্‌তেই সে লাফিয়ে উঠল। মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্‌বি ত?

নিশ্চয়।

কি কোরে?

সে হবে। হানিফ আর আমি তু'জনে ভণ্ডুল করে দোব। কিন্তু মশায়, বাবাজীর সঙ্গে যে তোমার ভাব?

তা হোলই বা! তা ব'লে একটা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বে!

সয়তান মা'র কাছে সব কথা বল্‌লে। তিনি গুরু-মশায়কে ডেকে সব শুন্‌লেন। মশায় বল্‌লেন, আহা, আশ্রিতা!

তা বাছা, তুমিই কেন তাকে আশ্রয় দাও না।

মশায় বল্‌লেন, মা, আপনার আদেশ ত ঠেল্‌তে পারি নি। কিন্তু আমার বাড়ী-ঘর নেই।

মা বল্‌লেন, সে কি, বাবা! তোমার নেই, ঈশ্বর ইচ্ছে, আমার ত আছে। তুমি যেমন ছেলের মত আছ, রসিও তেমনি মেয়ের মতন থাকবে। তোমরা ত জাত-বোষ্টম্? বে'তে ত আপত্তি নেই? বুঝে দেখ, আজ যেন তুমি আট্‌কালে। তার পর?

সেধো, ভাত খাবি, না—হাত ধোব কোথা! মশায় বল্‌লেন, আপনি যা বল্‌বেন, তাই হবে।

তবে আমি সব ব্যবস্থা করি?

মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্।

পরদিন আখড়ায় যেতেই বাবাজী বল্‌লেন, প্রভু হে, তোমার ইচ্ছা! কাল গাই, মাসীর বাড়ী যাবে। কালই বিকেলে তুমি মুণ্ডীকে নিয়ে যেয়ো। আর সব আমি ঠিক করেছি।

বেশ কথা। তা-ই হোল। সয়তানদের বাড়ী এসে রসি মায়ের পা চেপে ধোরে কেঁদে বল্‌লে, ঐ গাঁজাখোর! নেশায় চোখ খুল্‌তে পারে না। পথ আট্‌কে দাঁড়িয়েছে ব'লে গাছকে ধাক্কা মারে।

বলিস্ কি, রসি?

হ্যাঁ মা। তুমি ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

ওঁকে? কাকে?

এরূপ অবস্থায় লজ্জায় লাল হওয়া একটা মামুলি প্রথা আছে। কিন্তু রসির আজ বড় বিপদ্। সে সময় নয়। বল্‌লে, মশায়কে।

মশায় ত তোকে—

রসমঞ্জরী আর কথাটা শেষ করতে দিলে না। ঘাড় নেড়ে হাঁ ব'লে কেঁদে ফেল্‌লে, মা, আমার কেউ নেই।

সে কি মা! হরি আছেন! তোর কোন ভয় নেই।

সময় সন্নিকট হোলে মা তাকে কনেচন্নন, চেলি, ফুলের মালা দিয়ে মনের মত কোরে সাজালেন। মুখখানি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন—এ কি সেই রসমঞ্জরী!

ও-দিকে নির্জ্জনে বাবাজীকে নিয়ে পড়ল সয়তান, হানিফ তার মাল-মসলা যুগিয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

সাজতে সাজতে মহন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হানফে চ'লে গেছে? তাড়িয়ে দিয়েছিস্?

সে কোন্‌কালে।

বেশ করেছিস্, বাবা! তোকে আমি এমন টান্ মারতে শেখাব যে, একটু কাসবি নি। একটি দম আর কলকেও দপ্। এক টান্ এক টান্ টানিস্ ত?

টানি বৈ কি, বাবাজি!

তোর হবে, হবে। আর কত দেরি? মাথায় ওটা কি জড়ালি?

ফুলের মালা। বুঝ্‌তে পারছ না?

পারছি বৈ কি? পাপড়িগুলো খ'সে গেছে বুঝি? ব'লে বাবাজী দড়ায় হাত বুলিয়ে দেখলেন।

খ'সে যাবে কেন? ও সব কুঁড়ি।

বেশ বেশ। যেমন রসের কুঁড়ি, তেমনি ফুলের কুঁড়ি। কেমন?

এ রসিকতা বোঝবার বয়স সয়তানের নয়। সে নিবিষ্ট-মনে সাজাতে লাগল। বল্‌লে, এইবার হয়েছে, বাবাজি! রসিকে একবার ডাকি। দেখে যাক। তুমি যেন হাত দিয়ো না। চন্দন কাঁচা আছে। মুছে যাবে।

যদি মশা কামড়ায়?

তবে আমি ব'সে ব'সে মশা তাড়াব?

না—না। তুই রসিকে ডাক। মশায়কেও নি'আয়। মদন-ভস্ম দেখে যাক্।

অতঃপর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সয়তান নিষ্ক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে দঙ্গল বেঁধে ভক্তগণের প্রবেশ।

প্রথম ভক্ত প্রবেশ ক'রেই বল্‌লে, বাপ্! পালা! পালা! পেয়ারা পেকেছে দেখে একটা পালের গোদা এসে বসেছে!

এক জন বল্‌লে, ইট ছুড়ে মার না। পালাবে।

তুই মার না। বেটা যেন জঙ্গীলাট! হুকুম চালাচ্ছে!

চতুর্থ বললে, ও নিশ্চয় বাবাজী। ডাক্‌লে, বাবাজি, বাবাজি!

সয়তান রসিকে আন্‌তে গেছে, আপাততঃ এদের তাড়া-বার মৎলবে বাবাজী একটু হুঙ্কার দিলেন। বাস্! সব ফাঁক্!

দূরে গিয়ে ভক্তের দল পরামর্শ করতে লাগল। স্থির হ'ল, নিশ্চয় বাবাজী। এক জন বল্‌লে, অমন ত্রৈলঙ্গী পেট এ মুল্লুক খুঁজে বার কর্ দিকি। দিশি-বিলিতি-খদ্দর-মিল কোন কাপড়েরই দরকার নেই—একদম বয়কট্! হাঁটুর ওপর নেমে এসে দাঁড়িয়েছে—যেন দেহ ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে!

বিবাগী হয়ে গেলে খাবে কি? মুখ দিয়ে ত ওলা চাই! কন্ধকাটা ত খেতে পারে না?

তোর কেমন স্বভাব খারাপ। সব কথায় তক্ক। গাঁজা-খোর কি না! এক কথা হয়ে গেল, তা নয়! খুঁত ধরতে এসেছে! আমি বল্‌ছি, ও নিশ্চয় বাবাজী।

বেশ! আপত্তি নেই। তাই সই। বাবাজী-বাবাজীই রাজি। কিন্তু জাম্বুবতীর মত ও নীল রং পেলে কোথা? আর ও হলদের ডোরাই বা কোথা থেকে এল?

ও অমন আসে। আমি বল্‌ছি, ও নিশ্চয় বাবাজী।

চল্ তবে, ফের ডাকা যাক্। যদি সাড়া না দেয় ত তোমারি এক দিন কি আমারই এক দিন! ফের তক্ক তুল্‌ব।

আর যদি তেমনি ক'রে দাঁত খিঁচিয়ে হুঙ্কার দেয়!

সোজা শুয়ে পড়্‌ব।

এমন সময় দূরে শাঁক বেজে উঠ্‌ল।

ঐ শোন্! সে আর কোথায় কণ্ঠী-বদল করছে।

বেশ করছে! এখন ডাক্‌বি কি না বল্?

দরজার কাছে এসে চোখ বুজে ভক্তরা আবার ডাক্‌লে, বাবাজী, যদি তুমি হও ত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এস। আওয়াজ ছেড় না কিন্তু—মূর্চ্ছো যাব। মাইরি বল্‌ছি।

ইত্যবসরে ক'নে সঙ্গে বড় মহন্তজীর প্রবেশ। সকলে একবাক্যে ব'লে উঠ্‌ল, বাঃ, বেশ ক'নে।

এক জন বল্‌লে, কিন্তু—

তার মুখ চেপে ধ'রে দ্বিতীয় ভক্ত বল্‌লে, ফের তক্ক! দেখুন মহন্ত বাবা, কনেকে বল্‌ছে—কিন্তু।

কিন্তু ছাড়বার নয়। বল্‌লে তুই কিন্তু ভাল ক'রে দেখ্ কিন্তু। ও কিন্তু রসি নয় বোধ হয়।

ঢের দেখেছি কিন্তু। ও কিন্তু রসি নিশ্চয়।

তা' হ'লে কিন্তু, বেজায় বেঁটে হয়ে গেছে কিন্তু—

কণ্ঠী-বদলের আগে কিন্তু অমন হয়ে থাকে কিন্তু। বাবাজীকে দেখ না কিন্তু—

ইতিমধ্যে রঙ্গমঞ্চে কিন্তু গাইয়ের প্রবেশ। সয়তানের সঙ্গে কিন্তু।

ক'নের মাথা ফাটাবার উদ্দেশে বাঁশ তুলেই গাই বল্‌লে, এ কে? তুই হান্‌ফে না?

তুই হান্‌ফে না?

হানিফ বড় মহন্তর হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল।

বেশ হয়েছে। মোচরমান—

বড় মহন্ত বল্‌লেন, অ্যাঁ—মোচরমান! তবে মোল্লা ডাক, নিকে দিক্।

গাই বললে, মোল্লা কি মহন্ত বাবা! তুমিও চোখের মাথা খেয়েছ? দেখ্‌ছ না, ও পুরুষ মানুষ।

ওঃ, পুরুষ মানুষ! তবে কাউকে ডেক' না জোড়-কলম বেঁধে আসুক—ডেভিল্ ম্যারেজ হ'ক্।

গাই বললে, ও মিন্‌ষে, চোখ চেয়ে দেখ্ না আমার পানে, দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা! কণ্ঠী-বদল করবে! একটু চক্ষু-লজ্জা নেই! ভাগ্যিস্ মাসীর বাড়ী থেকে এসে পড়েছিলুম! দেখ, দেখ্! চা, চা!

একটু হাঁ করলেন মাত্র

অনেক খোঁচা-খুঁচিতে বাবাজী কপাল সিঁটকে একটু হাঁ করলেন মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জাগরণ

জাগ, জাগ, জাগ সুপ্ত
জেগে ওঠ নব চেতনায়,
মুক্তি-পথ খুঁজে নিতে
ত্যজ সুপ্তি শক্তি-সাধনায়!
দুর্গতিহারিণী দুর্গা
ব্যথিতের শুনেছে আহ্বান,
মা এসেছে তাই আজ
করিবারে বরাভয় দান!

জাগ, জাগ, জেগে ওঠ
অচেতন থেকো নাক আর,
সাধনায় হে সাধক,
সিদ্ধিলাভ হইবে তোমার!
জপ জপ—মন্ত্রে তব
নবশক্তি উঠিবে জাগিয়া,
তুমিই তোমার পথ
সে শক্তিতে পাইবে খুঁজিয়া!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

১

"কাঁদছ কেন মিনু-দা, ছিঃ কাঁদে না,"—

প্রস্ফুটিত নবমল্লিকার মত ছোট মেয়েটি দুই হাতে বালকের আচ্ছাদিত চক্ষু হইতে হস্ত উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিল, বালক সজোরে তাহার হাত দুইটি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, যা, পোড়ারমুখী, তোর জন্যেই ত গাল খেলুম,—বাঁদরী কোথাকারের!" বালিকা তথাপি বালকের টোপরের মত একরাশি কুঞ্চিত কেশের উপর সযত্নে হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "ইস্, আমার জন্যে বুঝি? আমি কি করলুম তোমার?" তাহার ফুলের মত কচি হাত দুইখানি কাল চুলের উপর কি সুন্দরই মানাইয়াছিল।

বালক তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, বিশেষতঃ বালিকার স্নেহভরা মিষ্টমধুর কথায় তাহার কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বালিকা সোপানের উপর বসিয়া পড়িয়া আদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "চুপ কর না মিনু-দা, লক্ষ্মীটি! দেখ দেখি, আমারও কান্না পাচ্ছে!" বালিকার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছিল। কিছু পরেই সে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই তাহার মৃণালদার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া অজস্রধারে কাঁদিয়া ফেলিল।

উভয়ে প্রতিবেশী। বাজীৎপুরের জমীদার গোলোকনাথ মিত্রের প্রাসাদের পার্শ্বেই মৃণালদের ক্ষুদ্র একতল বাড়ী। মৃণালের পিতা হরিকিশোর দত্ত স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার। স্থানীয় জমীদারের পিতা ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক পক্ষ দরিদ্র ও অপর পক্ষ ধনী হইলেও উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বর্ত্তমান ছিল। বিশেষতঃ জমীদার-গৃহিনী জগত্তারিণী এই স্কুলমাষ্টারের কন্দর্পের মত সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে বড় ভালবাসিতেন, এই হেতু জমীদার বাবু মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন না হইলেও গৃহিনীর ভয়ে আদরের কন্যা উমারাণীকে দরিদ্র প্রতিবেশীর সন্তান মৃণালের সহিত মিশিতে ও খেলিতে দিতেন। নয় বৎসর বয়স হইতেই মৃণাল উমারাণীর সহিত খেলিয়া আসিতেছে, তখন উমারাণী মাত্র তিন বৎসরের। আর আজ পাঁচ বৎসর পরেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মৃণাল তাহাকে আপন সহোদরারই মত জ্ঞান করিত, আর উমারাণী 'মৃণাল-দা' বলিতে অজ্ঞান হইত। জগতে কোন কিছু পদার্থ যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বগুণোপেত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে উমার দৃষ্টিতে সেই পদার্থ ছিল তাহার মৃণাল-দা। তাহার নিকট মৃণাল-দার কথার মূল্য ছিল না; জগতে মৃণাল-দার মত কোন বিষয়ে কেহ কিছু বেশী জানিতে পারে,ইহা সম্ভব ছিল না; দৈহিক শক্তিতে মৃণাল-দার নিকট অগ্রসর হইতে পারে, এমন ছেলে তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে কেহ ছিল না।

এ সব গুণে গুণান্বিত মনে করিলেও উমারাণী তাহার মৃণাল-দাকে একটি বিষয়ে অতি শিশুর মত ব্যবহার করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইত। কোন বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গৃহে তিরস্কৃত হইলে তাহার মৃণাল-দা, শিশুর মত ক্রন্দন করিত, নতুবা একাকী নির্জ্জন স্থানে অতিবাহিত করিত। উমা কত দিন তাহাকে তিরস্কৃত হইয়া আসিয়া তাহাদের অন্দরের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে একাকী বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছে। আজও তথায় তাহাকে শিশুর মত ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সে যেমন অন্য দিন সান্ত্বনা দেয়, সেইরূপ দিতে বসিয়াছিল।

মৃণাল খুব খানিকটা কাঁদিবার পর শান্ত হইল, বলিল, "তোর ছবির বইটা ফিরিয়ে নিস্ উমি, ওটা আমি নেবো না।"

উমা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "দূর, তা নাকি হয়? ওটা যে তোমায় দিয়ে দিয়েছি মিনুদা, দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়। আমার অমন ঢের বই আছে!"

মৃণাল বলিল,"তা ত জানি রে, বাঁদরী। তা, বাবা আমায় গাল দিলে কেন? বল্লে, চোর, ছেলেমানুষের কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়েছে,—"

উমা উত্তেজিত হইয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, "ইস্, কিয়ে নিয়েছে! আমি বলে যার আপনি দিইছি—হুঁ! যাই দিকি জ্যেঠামণির কাছে—"

বাধা দিয়া হাত ধরিয়া বসাইয়া মৃণাল বলিল, "না, না, তুই যাস্ নি, বাবা আরও রেগে যাবে। মা যে বাবাকে ব'লে দিয়েছে রে!"

কিশোরের কোমল অন্তস্তল হইতে কত ব্যথার করুণ সুর ইহাতে বাজিয়া উঠিল, তাহা বালিকা হইলেও উমার বুঝিতে কষ্ট হইল না। সে তাহার গর্ভধারিণীর অপার অপরিমেয় স্নেহকরুণার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিত, তাহার মিনুদা'র বিমাতার ব্যবহার কি কঠিন, কি হৃদয়হীন! অনেক ক্ষেত্রে সে এই ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছে। এই জন্য মিনু-দার অসহায় অবস্থার প্রতি তাহার কোমল করুণ হৃদয়ের আকর্ষণ যে আরও স্বাভাবিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার জননীও এই জন্য এই মাতৃহীন বালককে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি দেখিতেন, এই বালকের সমবয়স্ক অন্যান্য বালক যেমন সহজ মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া খেলিয়া বেড়ায়, এই বালকে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, বয়সের অনুপাতে সে অসম্ভব গম্ভীর ছিল। তাহার বেশভূষায় পারিপাট্য বা আহার-বিহারে উৎসাহ আনন্দ ছিল না। অতীতযৌবন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ যেমন দিন অতিপাত করিতে হয় বলিয়া করিয়া যায়,—যেমন দিন দিন সুখ-সৌন্দর্য্য উপভোগ করার আগ্রহ তাহার কমিয়া যায়,—এই মাতৃহারা বালকেও তেমনই সেই আগ্রহের অভাব ছিল।

হঠাৎ উভয়ের চমক ভাঙ্গিল—বাগানের বেড়ার অপর পার্শ্বে রমণীকণ্ঠে বাজিয়া উঠিল,—"কি গো, নবাব-পুত্তুর! আজ কি আর কবরেজের বাড়ী যাওয়া-টাওয়া হবে না?—না ঐখেনে বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে গপ্প কল্লিই রোগের চিকিচ্ছে হবে? যাও, ডাকছে তোমাকে।"

মৃণাল এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না, হন হন করিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু বালিকা উমা রক্ত-আঁখি তুলিয়া অপলকনেত্রে মৃণালের বিমাতার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার স্ফীত নাসারন্ধ্র, রক্তনয়ন ও গর্ব্বোন্নত দৃষ্টি দেখিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা গৃহিণীও শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি সভয়ে দুই হস্ত পিছাইয়া গেলেন। গৃহে ফিরিবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন, "বাপ রে! একেবারে ফোঁস কেউটে যেন!"

২

ঘরের মধ্যে জীর্ণ তক্তাপোষের উপর রোগশয্যায় শুইয়া হরিকিশোর বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলীপর্ব্বে নাম জপ করিতেছিলেন—হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিবে, তিনি বুঝি নিদ্রাই যাইতেছেন। আজ ৭ দিন জ্বর, জ্বরটা বেয়াড়া, কবিরাজ বলিয়াছেন, পূর্ণ বিশ্রামই প্রধান ঔষধ।

মৃণাল এক পা এক পা করিয়া ভয়ে ভয়ে রোগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যেন সে কত অপরাধ করিয়াছে, যেন সে সেই হেতু বিচার-কক্ষে নীত হইতেছে। কক্ষের দিকে যতই সে অগ্রসর হয়, ততই তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হয়। পুত্র পিতার নিকট যাইতেছে—পিতা-পুত্রের মধুর সম্বন্ধ—অথচ তাহার এমন ভয় হয় কেন? ঐ ভয় নূতন নহে, ৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই সে পিতার সান্নিধ্যকে ভয় করিয়া আসিতেছে। পারতপক্ষে পিতার সম্মুখে যাইতে চাহে না। উহারই দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে মাত্র ২ বৎসরেরটি রাখিয়া তাহার জননী অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেই যে ৪ বৎসর বয়স হইতে তাহার পিতা আর একটি 'মা' আনিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার জীবনের সকল সুখ, সকল স্ফূর্ত্তি, সকল আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, সূর্য্যালোকিত সুন্দর জগৎ যেন তাহার কাছে নিভিয়া গিয়াছে! এত অল্প বয়সেই সে তদবধি আপনাতেই আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে, বাহিরের সঙ্গে তাহার যেন আর কোন সম্পর্ক নাই। তাহার এক নিশ্বাস ফেলিবার স্থান ছিল পার্শ্বের উমারাণীদের বাড়ী—থাক সে কথা।

"ডেকেছেন আমাকে?" মৃণাল পিতার সহিত অধিক কথা কহিত না। হরিকিশোর বাবু তদবস্থায় থাকিয়াই জবাব দিলেন, "হুঁ।"

পুত্র আজ যেন পিতাকে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল এবং শ্রান্ত ও অবসন্ন দেখিতেছিল। সে বস্তুতঃ ভীত হইয়াই বলিল, "শরীর খারাপ মনে করছেন কি? কবরেজ—"

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্। দরকার হ'লেই বলবো। দেখ, বিশেষ একটা দরকার আছে, বোস ঐ টুলটার ওপর। তোমার বয়স হ'ল কত?"

প্রশ্নে মৃণাল চমকিয়া উঠিল। এ কি প্রশ্ন?

হরিকিশোর বাবু কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হুঁ, চোদ্দ পার হবার আর মাস

তিন বাকি। এ বয়সে আমি সংসারে ঢুকেছি, রোজগার ক'রে নিজের লেখাপড়া চালিয়েছি।"

মৃণাল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, এ ভাবে ত তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয় না! শুনিল, পিতা বলিতেছেন, "দেখ, সকালে গাল দিইছি, ছবির বইটা চুরি করেছ ব'লে—না বোল না,—ওটা চুরি ছাড়া কিছু না। ছোট মেয়েকে ভুলিয়ে জিনিষ নেওয়াও যা, না ব'লে পরের জিনিষ নেওয়াও তা। চুরিটাকে আমি নরকের মত ঘৃণা করি,জান বোধ হয়। মিথ্যে কথা, চুরি, ঠকিয়ে নেওয়া,—এ সব কাযগুলোকে আমি বিষের মত এত দিন বর্জ্জন ক'রে এসেছি। কিন্তু কি তার ফল হোলো?"

হরিকিশোর হাঁপাইতে লাগিলেন, দুর্ব্বল শরীর, এতটা উত্তেজনা সহ্য হইল না। মৃণাল তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া বাতাস করিতে গেল, বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন, "থাক্। দরজাটায় খিল দিয়ে এস, তোমায় আমায় কিছু গোপন কথা আছে। ছেলেমানুষটি ত আর নও। হাঁ, দেখ, কি বলছিলুম? আমি সারা জীবনটা সত্য-পথে, ন্যায়ের পথে চ'লে এসেছি। পেট কেঁদেছে, তোমাদের মানুষ করতে নিজে কত উপোস দিয়েছি, কিন্তু কেউ বলতে পারে নাই, হরি দত্ত কখনও কাউকে একটি পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দিন ঘনিয়ে আসছে, দিব্য চোখে এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, ভুল—ভুল-পথে চ'লে এসেছি!"

হরিবাবু আবার হাঁপাইতে লাগিলেন। মৃণাল এইবার দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিল, "মাকে ডেকে দোবো?"

হরিকিশোর সঙ্কেতে নিষেধ করিলেন, কেবল বুঝাইয়া দিলেন, একটু অপেক্ষা করিতে—কথা কাহারও সাক্ষাতে হইবার নহে। মৃণাল কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল, হরিবাবু কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আবার বলিলেন,—"কবিরাজ যাই বলুক, এ যাত্রা আমি বাঁচবো না। এর পর তোমারই ঘাড়ে সব ভার পড়বে, তাই সময় থাকৃতে বুঝিয়ে যাচ্ছি। তোমার—"

মৃণাল আর থাকিতে পারিল না। পিতা-পুত্রে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় না হইলেও মৃণালের ভাবপ্রবণ মন কথাটা উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে বাষ্পাকুলিত নেত্রে ধরা-গলায় বলিল, "কেন বাবা, এ কথা বলছেন—"

বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন, "থাম। ও সব মেয়েলি কান্না-কান্না আমার ভাল লাগে না। যা বলছি, শুনে যাও, এর পর হয় ত সময় হবে না। সত্যপথে চ'লে কি ফল হ'ল? দেখছি, যারা চুরি বাটপাড়ি করে, বিধবার ফাঁকা টাকি দেয়, লুকিয়ে পাপ করে, বাইরে সাধু সেজে নাম কেনে,—তারাই গাড়ী ঘোড়া চড়ে, বাবুয়ানা করে, সুখে কাল কাটিয়ে যায়। কেতাবেই পড়ি, পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার আছে! সব মিথ্যে, সব জুয়োচুরি, কেবল লোক ভুলিয়ে রাখা! এত কাল সাধু-পথে চ'লে এসে কি করলুম? তোমাদের পথে বসিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের মাথা গোঁজবার স্থান থাকবে না—"

সত্য-সত্যই উত্তেজনাবশে এবার হরিকিশোর বাবু অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিলেন। মৃণাল ভয় পাইয়া বিমাতাকে ডাকিল। তাহারা শুশ্রূষা করায় হরিকিশোরের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তিনি চারিদিকে ফেল ফেল চাহিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ইঙ্গিতে পত্নীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। অল্পবয়স্কা হইলেও মৃণালের বিমাতা সংসারের গৃহিণী—স্বামীর উপর তাঁহার প্রভাব বড় অল্প ছিল না। তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কি রাজ্যির গুজুর গুজুর হচ্ছে ঘণ্টা-খানেক ধ'রে, দেখে আর বাঁচিনি!"

অনেক সময়ে গৃহিণীর এই ঝঙ্কারে কায হইত, কিন্তু আজ হইল না, কর্ত্তার মুখ-চক্ষুর ভাব দেখিয়া তাঁহার আর ঘরে থাকিতে সাহস হইল না। তিনি চলিয়া গেলে হরিবাবু ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, "যা বল্লুম শুনলে ত? যে কাযই কর, মনে রেখো, সাধুতায় পেট ভরে না। কাউকে বিশ্বেস করো না, কারুর পরামর্শ নিয়ো না। বড় জোর সাধু সেজে থাকবে। কিন্তু যদি জগতে উন্নতি করতে চাও, চুরি বাটপাড়ি, জাল জুয়োচুরি না করলে পারবে না।"—

"বাবা, একি বলছেন?—"

"শোন। যা বলছি, সব ঠিক। এই চাবির রিংটা নাও, ওপাশের দেরাজের টানাটা খুলে লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া কাগজ পাবে, ঐটে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখো। তারপর আমি চোখ বুজলে ভাল ক'রে প'ড়ে দেখো। স্কুলে দেখেছি, তুমিই ছেলেদের মধ্যে পড়ার কেতাব ছাড়া অনেক কেতাব প'ড়ে থাকো, বোঝা-সোজাও বেশী। কাযেই বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না। ঐটে

পড়লেই আমার সব কথা বুঝতে পারবে। যাও এবার, আর তোমায় আট্‌কে রাখব না। কিন্তু মনে রেখো, আমার শেষ কথা,—ঐ সাধু-টাধু কিছু না, সব ভণ্ডামী, সব ভণ্ডামী, আর ভণ্ডামী না করলে সুখে থাকতে পারা যায় না।"

সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ কিশোরের মনে তাহার পিতার সেই অন্তিম উপদেশ কোনও প্রভাব বিস্তার করিল কি ?

৩

তাহার পর এক দিন দত্তদের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল; হরিকিশোর বাবু মাষ্টারী হইতে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া কোন্ এক অজানা দেশের যাত্রী হইলেন,—সংসারে তাঁহার মুখ চাহিয়া কতগুলি প্রাণী বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনি ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না। প্রথম পক্ষের কিশোর পুত্র মৃণালকান্তি, দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী এবং তাঁহার দুইটি কন্যা,—সবগুলিই তাঁহার পোষ্য ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা করিবার অবসরও পাইলেন না।

আঘাতটা কিছু গুরু হইল—কিশোর মৃণালকান্তির। তাহার সহিত তাহার পিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি এই সংসারে সে তাহার পিতাকেই কতকটা আপনার বলিয়া জানিত, সুতরাং তাঁহার অভাবে সে যেন গৃহখানিকে বড়ই ফাঁকা দেখিতে লাগিল—সেখানে যেন তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই ; যাহারা আছে, তাহারা যেন তাহার অপরিচিত, এমনই তাহার মনে হইতে লাগিল, আর প্রাণটাও হু হু করিতে লাগিল। বস্তুতঃ যদি সেই সময়ে সে প্রতিবেশী মিত্র-পরিবারের স্নেহ ভালবাসা বা সান্ত্বনা না পাইত, তাহা হইলে সেই গৃহে বাস করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইত। একেই সে তাহার বয়সের অনুপাতে অসম্ভব গম্ভীর ও স্বল্পভাষী, তাহার উপর একমাত্র অবলম্বন পিতার অভাব,—গৃহে প্রাণ তাহার বস্তুতঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

এক দিন হঠাৎ সে একখানা পত্র পাইল। পত্রখানি আসিতেছে কলিকাতা হইতে, লেখক—কৃষ্ণকিশোর বাবু—তাহার খুল্লতাত। এই খুল্লতাতকে সে জীবনে কখনও দেখে নাই, পিতার মুখেও তাঁহার কথা কখনও শুনে নাই। কিন্তু পিতার দেহাবসানের পর সে যখন তাঁহার আদেশমত তাঁহার কাগজ-পত্র পাঠ করিয়াছিল, তখন তাহা হইতে খুল্লতাতের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা জানিতে পারিয়াছিল সে কথা পরে বলিতেছি।

খুল্লতাত পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠে মৃত্যুসংবাদ সবেমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই তিনি তাহা সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে আসিবেন, সে যেন কোন ভাবনা-চিন্তা ন করে।

সেই খুল্লতাত! তাহার পিতা যাঁহার সম্বন্ধে আ ভীষণ কথা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই খুল্লতাত! কিশো মৃণালের তাঁহার কথা চিন্তা করিতেই শরীর কণ্টকিত হই উঠিল, মুখে-চোখে কেমন একটা অস্বস্তি ও বিরক্তির ভ ফুটিয়া উঠিল। সে খুল্লতাতের চিঠিখানি লইয়া আপন ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ চিঠিখানা আব পাঠ করিল। তাহার পর সন্তর্পণে তাহার কেতাবের ড্র টানার মধ্য হইতে একতাড়া কাগজ-পত্র বাহির করি তাড়ার বাঁধন খুলিতে কতকগুলি পুরাতন জরাজীর্ণ পত্র দলীল অথবা দলীলের নকল বাহির হইয়া পড়িল। সেগু বোধ হয় সে দিবা-রাত্রিতে বিংশতি-বারেরও অধিক প করিয়াছে। তথাপি সে বাণ্ডিল খুলিয়া আবার সেইগু একে একে পাঠ করিল।

বয়সে কিশোর হইলেও দুঃখের পাঠশালায় তাহ হাতেখড়ি হইয়াছিল, এই হেতু সে অনেক প্রবীণ অভি মানুষ অপেক্ষা অল্প সময়ে সেই সকল রচনার মর্ম্ম গ্র করিতে সমর্থ হইল। সে যাহা বুঝিল, তাহার সংক্ষিপ্ত এইরূপ :—

এই গ্রাম হইতে মাত্র ১ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুপুরে তাহ পিতার পিতৃপিতামহের আদি বাসস্থান। সেইস্থানে তাঁহ মান্যগণ্য লোক ছিলেন। তাহার পিতামহের মৃত্যুর যখন তাহার পিতা ও খুল্লতাত কৃষ্ণকিশোর গ্রামের মাত মণ্ডল হইলেন, তখন একটা বিষয় লইয়া দুই ভ্রাতায় ম মালিন্য হইল। বিষয়টি সামান্য নহে। তাঁহাদের গ্রা এক বৃদ্ধা আত্মীয়া কাশীবাস করিতেন। তিনি ভ্রাতাকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার পরলোকগত স্বা

কতকটা জমী ঐ গ্রামে অনর্থক পড়িয়া আছে, তাঁহারা যেন উহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন, উহার জন্য তিনি লেখাপড়া করিয়া তাঁহা-দিগকে বিক্রয়ের ক্ষমতা দিতেছেন। হরিকিশোর সংসারের ধার ধারিতেন না, লেখাপড়ার চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন। কৃষ্ণকিশোর বিষয়ী লোক, কাযেই বিধবার জমী বিক্রয়ের ভার ভ্রাতা কৃষ্ণকিশোরের উপর ন্যস্ত করিয়া হরিকিশোর নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পর কি হইল, তাহার খোঁজও তিনি রাখিলেন না। ইহার পরে এক দিন কৃষ্ণকিশোর কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং সেখানে কাঠ ও কয়লার দোকান খুলিল; হরিকিশোর তখন বাজীৎপুরের মিত্রবাবুদের স্কুলে মাষ্টারী করিতেছেন। এক দিন হরি-কিশোর ভ্রাতার নিকট হইতে ৫ শত টাকার এক কেতা নোট পাইলেন। বিস্মিত হইয়া যখন তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন, তখন ভ্রাতার মুখেই শুনিলেন, ঐ টাকা তাঁহার ভাগে প্রাপ্য, উহা বিধবা আত্মীয়ার জমী-বিক্রয়ের দরুণ লাভের অংশ। হরিকিশোরের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করিয়া তিনি জানিলেন যে, কৃষ্ণকিশোর পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত ঐ জলা জমীটা রেল কোম্পানী কিনিয়া লইবে, ঐ স্থান দিয়া একটা নূতন শাখা লাইন যাইবে। তাই বিস্তর দর-কষাকষির পর সে ঐ জলা জমীটা ২ হাজার টাকায় রেল কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সে হাজার টাকা বিধবাকে দিয়াছে, বাকী হাজার টাকা তাহাদের দুই ভ্রাতার পারিশ্রমিকস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছে। ৫ শত তাহার নিজের, ৫ শত তাহার ভ্রাতার। কথাটা শুনিয়াই হরিকিশোর আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি পদাঘাতে নোটের তাড়া ফেলিয়া দিলেন, পরন্তু ভ্রাতা বুঝাইতে আসিলে তাহাকেও পদাঘাত করিয়া দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। ভ্রাতার অনেক অনুনয়েও হরিকিশোর কিছুতেই নরম হইলেন না—তিনি সেই টাকা গো-রক্ত বলিয়া স্পর্শও করিলেন না; পরন্তু সেই অবধি দুই ভ্রাতার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল। কৃষ্ণকিশোর অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিলেন, হরি-কিশোর বিধবাকে সমস্ত খুলিয়া লিখিয়া দেশের সম্পত্তির নিজের অংশ বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। শেষে ক্রেতাও জুটিল। হরিকিশোর মাটীর ঘরে তাঁহার ভিটার অংশ, বাগান, পুষ্করিণী ও ধান্যের জমী বিক্রয় করিয়া মাত্র হাজার টাকার কিছু বেশী পাইলেন, সেই হাজার টাকার কড়াক্রান্তি, মায় সুদ তিনি বিধবাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই 'ঋণ' পরিশোধ করিয়া তিনি বহু দিনের পরে রাত্রিতে নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত লিখিবার পর হরিকিশোর বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে এই জন্য স্বগ্রাম ছাড়িয়া জমীদারের দেওয়া ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া বাস করিতে হয়। তখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য, কেবল স্কুলের বেতন ৬০্টি টাকা মাসিক যা ভরসা! এ দিকে তপন পোষ্যের মধ্যে তাঁহার পত্নী ও পুত্র (মৃণাল)। ভ্রাতা ইহার পর বহুবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিলনের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তিনি জুয়াচোরের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া কখনও স্বীকার করেন নাই। এমন কি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার বিবাহের সময় স্বয়ং তাঁহাদের সকলকে লইয়া যাইতে আসিলেও তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। অগত্যা ভ্রাতা হতাশ হইয়া, তদবধি তাঁহার সহিত পত্রের আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু তিনি লোক-মুখে শুনিতে পাইতেন যে, তাঁহার ভ্রাতা দিন দিন উন্নতি করিতেছে, অর্থ, মান, যশঃ তাহার করায়ত্ত হইতেছে। সে প্রকাণ্ড কয়লার ব্যবসায় খুলিয়াছে, একাধিক কয়লার খনি কিনিয়াছে, লক্ষপতি হইয়াছে। সহরে তাহার প্রাসাদোপম অট্টালিকা উঠিয়াছে, মোটর, লোক-লস্কর কোন কিছুরই ত্রুটি নাই, এক কথায় সে কলি-কাতার মস্ত বড় লোকে পরিণত হইয়াছে।

তাই তিনি পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন, জুয়াচুরি এবং বিধবাকে বঞ্চিত করা যাহার উন্নতির ভিত্তি, সে যদি এমন সুখে-স্বচ্ছন্দে মান, যশঃ, প্রতিপত্তি উপভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সাধুতার প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম, সত্য, সাধুতা,—ও সব ফাঁকা কথা, উহার কোন মূল্য নাই।

তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তিনি ত সাধুতার পূজা করিয়া পুত্র-পরিবারকে পথে বসাইয়া যাইতেছেন। আজ মরিলে কা'ল তাঁহার পুত্র-পরিবারকে বাড়ীর মালিক হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে। এই ত সাধুতার পুরস্কার! পুত্র যেন তাঁহার মত ভ্রান্ত পথে চালিত না হয়। সে যেন

তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার খুল্লতাতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং তাহারই পরামর্শমত চলিয়া মানুষ হয়। দয়া-মায়া সাধুতা—সে যেন অন্তর হইতে দূর করিয়া দেয়। সে চারিদিকেই দেখিবে, যে যত সাধু সাজিয়া থাকে, সে ততই ভণ্ড, প্রতারক। সেও যেন কপটতা, শঠতা অবলম্বন করে। ইহাই তাহার পিতার অন্তিম উপদেশ।

সেই খুল্লতাত! উঃ, এমন লোক! অথচ খুল্লতাতের পত্রখানি কি মিষ্ট—কত স্নেহের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে উহাতে! তবে কি, তাহার পিতা মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য? এত খল, এত ভণ্ড হইতে পারে মানুষ?

মৃণালের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। সে শিশুকাল হইতে যে আদর্শে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার পরিমাপে এই চিঠির চিত্রের ত আদৌ সামঞ্জস্য-সাধন করা যায় না! এ কি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা! মৃণাল ছুটিয়া বাগানে বাহির হইল; ঘাসের উপর পড়িয়া ক্ষণেক মুখ গুঁজিয়া রহিল—তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইবার মত হইল—শেষে চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল।

মৃণাল উমারাণীকে খুঁজিয়া বাহির করিল—জগতে সেই অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাই তাহার একমাত্র মন্ত্রী, পরামর্শদাত্রী বন্ধু। মৃণালদা যাহা বলিত, তাহার উপর কথা কহা বা তাহার প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাব ছিল না, কারণ, মৃণালদা যাহা বলিবে, তাহা ত বেদবাক্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কথাটা তাহার প্রাণে যেন খাপ খাইল না। সেও অন্যায় পরামর্শ দিবে না, ইহা নিশ্চিত। সে বলিল, "না, না, মিনুদা। মা বলেন, মিথ্যে বল্‌লে ঈশ্বর রাগ করেন, পাপ ক'রে দেন।"

মৃণালের চৌদ্দ বৎসর বয়সের অগাধ জ্ঞানের অনুযায়ী সে এইটুকু বুঝিয়াছিল যে, এক জন ঈশ্বর আছেন, তিনি স্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের মত ভাল ছেলেকে প্রাইজ দেন, আর দুষ্ট ছেলেকে বেত মারেন। কাযেই উমার কথায় তাহার ভয় হইল, সে তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ঠিক বলেছিস উমি! বাবার ব্যায়রামে মাথা খারাপ হয়েছিল, না হ'লে—আচ্ছা, তবে কাকা গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াচ্ছে কেন?"

উমা মহা বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এ বোধ হয় জ্যেঠামণি ভুল শুনেছে, দুষ্ট লোকে কখনও গাড়ী চড়তে পায়? ঈশ্বর দেবে কেন তাকে? জান মিনুদা, মা বলেছিলেন, আমাদের মামার বাড়ীর দেশে বিশে কাওরা তার মা'র গায়ে লাথি মেরেছিল ব'লে একটা ষাঁড়ে তাকে তাড়া ক'রে গুঁতিয়ে পা চিরে দিয়েছিল, সে পাটা তার খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই হবে। কিন্তু বাবা লিখেছিলেন, কাকা বাইরে ভালমানুষ, ভেতরে দুষ্টু।"

"দুষ্টু হ'লে ঈশ্বর ধরিয়ে দেবেন।"

কথাটার এইরূপে সহজ মীমাংসা হইয়া গেল। তাহার পর উমা মৃণালের হাত ধরিয়া তাহার মুখের উপর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিতে যাই থাকুক, তুমি ভাল থাকবে ত মিনুদা? চিরকাল? হাঁ, মিনুদা, লক্ষ্মীটি! তুমি ভাল থেকো, নইলে ঈশ্বর ভালবাসবে না।"

মৃণাল বলিল, "ঐ, একবার যা কেবল তোকে ভুলিয়ে ছবির বই নিয়েছিলুম—"

তাহার মুখে কচি হাতখানা চাপা দিয়া উমা বলিল, "বা রে—সে বুঝি তুমি নিয়েছিলে? সে ত আমি তোমায় দিয়েছিলুম। বা রে!"

ভোঁ ভোঁ আওয়াজে বালক-বালিকা চমকিয়া উঠিল—একখানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী আসিয়া তাহাদের দ্বারে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে মোটরগাড়ী—ছেলের পাল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে, পল্লীবধূরা গৃহের বাহিরে আসিয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বিস্ময়ে পুলকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছে। কৃষক গৃহস্থ হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া গাড়ীর দিকে দেখিতেছে।

একটি বর্ষীয়ান্ পুরুষ ও একটি নারী গাড়ী হইতে নামিয়া মৃণালের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরুষের নগ্নপদ, গায়েও জামা নাই। মৃণালের বুকখানা গুরু-গুরু করিয়া উঠিল—কাকা ও কাকীমা নিশ্চিতই। ক্ষণপরেই তাহার ডাক পড়িল। কম্পিতচরণে মৃণাল তাহার গৃহের অন্দরে প্রবেশ করিল।

"তুমিই মৃণাল? বাঃ, বেশ!—আমি তোমার কাকা—কৃষ্ণকাকা, আর ইনি তোমার কাকীমা, বুঝেছো?" প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া মৃণাল তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিতে সাহসী হইল—দেখিল, শান্ত, সৌম্য, সরল মুখমণ্ডল। এমন লোক কি—

হঠাৎ দুইখানি বাহু তাহাকে ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল এবং বাহুর অধিকারিণী সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। এঁ্যা—এই কাকীমা? এমন সুন্দর, এমন কোমল, এমন দয়ামায়া-মাখা মুখখানি! হঠাৎ মৃণালের নয়ন দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। আর সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার কৃষ্ণকাকা সকলের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতেছেন। ভুল—বাবা ভুল বুঝেন নাই ত?

"আর দিন নেই—পরশু কামান," কৃষ্ণকিশোর বাবু কোনরূপ ভণিতা না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোমাদের এই গাঁয়ের জমীদার গোলোকবাবুর সঙ্গে লেখালিখি ক'রে শ্রাদ্ধের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ আমরা সহরেই ফিরে যাচ্ছি—সহর ত বেশী দূর নয়—তার পর কাযের দিন এসে সব সেরে আবার ফিরে যাব। তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে, কি বল?—তোমার মা কি বলেন?"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আহা, ও ছেলেমানুষ—ও সব কথা যাক, দিদির সঙ্গে আমি কথা কইব'খন। কেমন কায হবে, তাই বুঝিয়ে দাও না। আর ওকে ত নিয়ে যাবই আমরা,—কি বল বাবা?" তিনি আবার মৃণালকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মৃণাল মহা সমস্যায় পড়িল—এই বড়লোকদের বাসায়? তবে—তবে কাকীমা বড় ভাল!

সে দিন তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আবার শ্রাদ্ধের দিন আসিলেন। যেরূপ সমারোহে দরিদ্র মাষ্টার হরিকিশোরের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সেরূপ ঘটার শ্রাদ্ধ তদঞ্চলের লোক দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে না।

তাহার পর বিদায়ের পালা—মৃণালের কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল। মিনুদা তাহাদের ছাড়িয়া যাইবে শুনিয়া অবধি বালিকা উমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল, কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতামাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহাকে কত করিয়া বুঝান হইল যে, এখানে থাকিলে মিনুর লেখাপড়া হইবে না, কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না, কেবল বলে,—মিনুদার সঙ্গে সেও কলিকাতায় যাইবে। শেষে মৃণাল খেলার সাথীকে সঙ্গে লইয়া বাগানে গেল, সেখানে সে তাহাকে বুঝাইল, তাহার পিতার আদেশে সে বড়মানুষ হইতে কাকার সহিত কলিকাতায় যাইতেছে, বিশেষ সে আর এখন তাহার 'মা'র' সহিত একত্র বাস করিতে পারিবে না। তখন উমারাণীর কান্না থামিল—দুইখানি কচিহাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "কেন, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক না মিনুদা?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলী, তা না কি হয়? তুই আমাদের বাড়ী থাকবি? তোর মা তোকে থাকতে দেবে? তবে?"

কিন্তু মৃণাল যতই বুঝাইল, উমা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, মিনুদা কেন তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে পারে না!

সত্যই তাহার পর যে দিন বিদায়ের দিন আসিল, যখন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া মৃণাল তাহার খুল্লতাতের গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল, তখন উমারাণী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, মৃণালকেও তখন তাহার কাকীমা বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। যখন গাড়ী দূরের গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হইল, তখন উমারাণী উঠিয়া একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখে সবই যেন ঝাপসা দেখাইতে লাগিল!

৪

সাত বৎসর পরের কথা। মধুপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে অনেক যাত্রীর সঙ্গে একটি যুবক হাঁওড়ার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সঙ্গে লাগেজপত্র কিছুই নাই, মাত্র একটি সুটকেস ও একটি ছোট বেডিং। সে আপন মনে শিস্ দিতে দিতে প্ল্যাটফরমের উপর পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। অনেক নর-নারী যে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘোন্নত দেহের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। তাহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত। হাতের ছড়িটির দ্বারা সে মাঝে মাঝে নিজ জঙ্ঘার উপর মৃদু আঘাত করিতেছিল।

যুবক মৃণালকান্তি। সে ভাবিতেছিল অনেক কথা; গত সাত বৎসরের অতীত কথা। সে যেন একটা যুগ। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বাল্যের লীলাভূমি ত্যাগ করিয়া আসিতে তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে যে আঘাতের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণে বাজিয়াছিল উমার সহিত

ছাড়াছাড়ির আঘাত। প্রথম প্রথম কলিকাতায় আসিয়া সে সেই আঘাত ভুলিতে পারে নাই। এখনও সে এই সাঁওতাল পরগণার রেল-ষ্টেশনে পাদচারণা করিতে করিতে বাল্যের সেই সমস্ত স্মৃতির কথা ভাবিতেছিল, সেই স্মৃতির মধ্যে উমার কথাটাই ষোল আনা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল। আজ তাহার জীবনে সে কোথায়? সে যদি সান্নিধ্যে থাকিত, তাহা হইলে তাহার সমস্যার সমাধান কত সহজে হইয়া যাইত। মাত্র একটি বৎসর সে উমার সহিত চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করিয়াছে; উমার কাকের ছানা বকের ছানা হিজিবিজি হস্তাক্ষর—তাহার 'মিনুদা কেমন আছে' লেখাটুকুতেই ভর্ত্তি একখানা চিঠির কাগজ তাহার কাছে কি মিষ্টই না লাগিত! বস্! তাহার পর হইতেই উমার চিঠি বন্ধ! কাকাবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে, উমারা দেশ ছাড়িয়া পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সে-ও একবার দেশে যাইতে পারে নাই। তাহার বিমাতা কন্যা দুইটি সহ তাহাদের বিষ্ণুপুরের পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিতেছিলেন, এ কথা সে তাহার খুল্লতাতের মুখেই শুনিয়াছে। সেই ভদ্রাসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, এ কথাটা পূর্ব্বে তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু কিরূপে এখনও উহা তাহাদের রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিত না, কেহ তাহাকে সে কথা জানায় নাই।

যে বৎসরে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইল, সেই এক বৎসর তাহার জীবনটা বড় নিঃসঙ্গ—বড় ফাঁকা ফাঁকাই লাগিয়াছিল। তাহার কাকা ও কাকীমা তাহাকে পুত্রাধিক যত্ন আদর করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসন্তান থাকায় গৃহে তাহার খেলার সাথী মিলিত না; তাহার উপর শৈশব-সহচরী উমারাণীর অভাব! যদিও কিশোর বয়সেও মৃণাল-কান্তি পরিণতবয়স্কের মত গম্ভীর ও নির্জ্জনতাপ্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি বয়সোচিত একটা আসঙ্গলিপ্সা তাহাকে মাঝে মাঝে বড়ই মনঃপীড়া প্রদান করিত। তাহার ধনবান্ খুল্লতাত ও পরম স্নেহময়ী খুল্লতাতপত্নী তাহার সেই অভাব নানারূপে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। তবে তাঁহারা তাহাকে কখনও বিলাসিতা বা অতিরিক্ত বাবুয়ানায় অভ্যস্ত করিতেন না। দরিদ্র গৃহস্থ সন্তানের মত সে লালিত-পালিত হইত। গাড়ী-ঘোড়া লোক-লস্কর থাকিলেও সে তাহার ব্যবহারের সুযোগ অতি অল্পই পাইত। সেও এই ব্যবস্থায় পরম সন্তুষ্ট ছিল। কেন না, তাহার প্রকৃতিই ইহার বিরোধী ছিল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই তাহার খুল্লতাত তাহাকে তাঁহার গিরিডির কয়লার খনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে সংসারের কাযকর্ম্মে তাহার হাতে-খড়ি হইল—সে তাঁহার ফারমের আর পাঁচ জন কর্ম্মচারীর মত বেতনভুক্ হইয়া কয়লা-ব্যবসায়ের কাযে অভ্যস্ত হইতে লাগিল, আর আজ পাঁচ বৎসর পরে এক ম্যানেজার বাবু ছাড়া তাহার ন্যায় ঐ কাযে দক্ষ কর্ম্মচারী কৃষ্ণকিশোর বাবুর আর কেহ ছিল না, এ কথা সে স্বয়ং না জানিলেও স্বয়ং মালিক এবং তাঁহার ম্যানেজার বিলক্ষণ জানিতেন।

সম্প্রতি তাহার ১ শত টাকা বেতন হইয়াছে এবং মালিক তাহাকে মাঝে মাঝে অতি বিশ্বাসযোগ্য সমস্যামূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। এইরূপ একটি কাযের সম্বন্ধে উপদেশ দিবার নিমিত্তই তাহার কলিকাতায় ডাক পড়িয়াছে। কলিকাতায় কায না থাকিলেও তাহার যে মাঝে মাঝে ডাক পড়িত না, তাহা নহে, কেন না, তাহার জননীসমা স্নেহময়ী খুল্লতাত-পত্নী তাহাকে অন্ততঃ ২।১ বার মাঝে মাঝে না দেখিলে চঞ্চল হইয়া পড়িতেন, তখন হয় তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হইত, নতুবা তাঁহাকে লইয়া খুল্লতাতকে গিরিডি যাইতে হইত।

আজ মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় পাদচারণা করিতে করিতে মৃণালকান্তি এই সমস্যামূলক কাযটির কথা ভাবিতেছিল। আজ যদি তাহার শৈশব-সহচরী তাহার নিকটে থাকিত! বাল্যে সে কত সমস্যার সহজ সমাধান করিয়া দিয়াছে!

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, শেষ ঘণ্টার কিছু পরেই কলিকাতাযাত্রী গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে প্ল্যাটফরমের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী তখনও প্ল্যাটফরমের প্রান্তদেশের অভিমুখে মন্থর গতিতে চলিয়াছে, মৃণাল একখানি অপেক্ষাকৃত খালি মধ্যম শ্রেণীর কামরার সন্ধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এমন সময়ে যেন তাহার মনের বাসনার উত্তর দিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরায় দেখিতে উমার মত একটি কিশোরী ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সে দেখিতে পাইল। তাহার
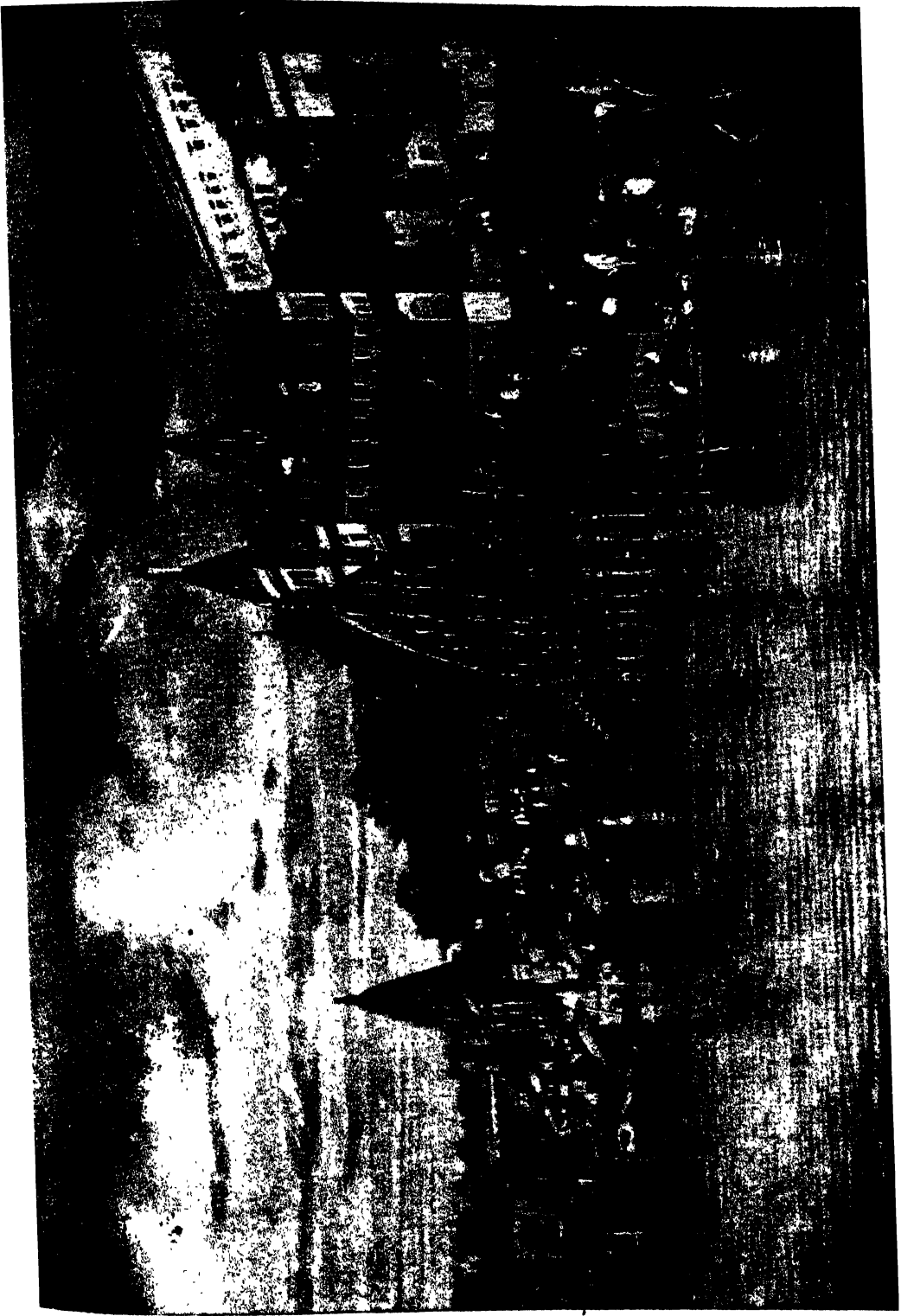
কাশীর ঘাটের দৃশ্য

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

বক্ষঃস্থলে কে যেন কয়েকটা হাতুড়ির ঘা বসাইয়া দিল,তাহার বুকখানা দুলিয়া উঠিল, সে বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে নিমেষমাত্র, গাড়ী বিদ্যুতের বেগে মূর্ত্তিখানিকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

মৃণাল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্ল্যাটফরমের প্রান্তদেশের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কুলীকে লইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া চাপিয়া বসিল। গাড়ী কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিল।

তখন মৃণালের মনের মধ্যে ভাবসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। কত দিন—কত দিন পরে এই দেখা—তাহার চক্ষু তাহাকে প্রতারিত করে নাই ত! সাত বৎসরে অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে—সেই বালিকা উমা আজ যেন স্বর্গের দেবীতে পরিণত। কিন্তু—কিন্তু তাহা হইলেও সেই তাহার শৈশব-সহচরী উমা—ইহাতে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ মুখ ত সে এক দিনও ভুলিতে পারে নাই—ইহা যে তাহার মনের পত্রাঙ্কে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে!

দেখা দেওয়া কি কর্ত্তব্য ছিল না? না, না, সে ধনী জমীদারের কন্যা। আর সে?—সে ত আত্মীয়ের বেতনভুক্ সামান্য কর্ম্মচারী, দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের পুত্র। যদি বাল্যের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার তাহাদের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে এত দিন, এই সুদীর্ঘকাল তাহারা তাহার কোনও সংস্রব রাখে নাই কেন? দূর হউক, এ সব দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি? সে পরান্নে পুষ্ট, পরের কায করিতে যাইতেছে, পরের কাযেই ডুবিয়া থাকিবে। কাঙ্গালের আবার রাজতক্তের স্বপ্ন কেন? একটিবার—মাত্র একটিবার দেখা করিতে, তাহার মুখের কথা শুনিতে দোষ কি? হাওড়ায় নামিয়া একবার দেখা করিতেই হইবে, তাহার পর আর না হয়—না, না, সে যদি ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লয়? যদি চিনিতে না পারে? যদি কথা কহিলেও কথার উত্তর না দেয়—না, না, তাহা হইলে সে অপমানে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। দূর হউক; আর না দেখিলেই হইবে।

সে বড় হইয়াছে, এত দিন হয় ত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে এখন পরস্ত্রী, কি সুবাদে সে তাহার সহিত দেখা করিবার সাহস করে? সে যে তাহাকে ছোট ভগিনীর অনাবিল পবিত্র স্নেহ এক দিন অকাতরে বিলাইয়াছে, এখন কি আর সে তাহা মনে রাখিয়াছে? না, দেখা না করাই ভাল। তাহার ঘনান্ধকার জীবনাকাশে এক মুহূর্ত্তের জন্য সে বিদ্যুদ্বিকাশের মত চমকিয়া চলিয়া গেল, এই সুখ-স্মৃতি তাহার হৃদয়ে প্রেরণারূপে বিরাজ করিবে।

* * * *

হাওড়া ষ্টেশনে সে নামিবা মাত্র তাহার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চুম্বকের মত উমার সান্নিধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল—দূর হইতে একবারমাত্র দৃষ্টি উন্নীত করিয়া তাহাকে দেখিতে সমর্থ হইল, তাহার পর দ্রুত দৃষ্টি অবনমিত করিয়া ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

আহার ও বিশ্রামান্তে পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "কেন আসতে লিখেছি জান, মিনু! উস্রী নদীর পারের জমীটা কেনাই ঠিক ক'রে ফেললুম, ওর সম্বন্ধে গোটাকতক দরকারী কথা আছে, চিঠি চালাচালিতে সব কথা ত হয় না। দেখ, খুলেই বলি। জমীটা বাগান-বাড়ী করব না, যদিও তোমায় ঘাটোয়ালের গোমস্তাকে তাই বলতে লিখেছিলুম। ও জমীটার ভেতরে কয়লায় বোঝাই—যা হোক ক'রে জেনেছি সে কথা। এখন গোমস্তা মতিলালটাকে সে কথা ভেঙ্গো না—কেবল কথাটা পেড়ো, সত্যিই কত টাকায় জমীটা ছাড়তে চায়।"

মৃণাল স্তম্ভিত হইল। ভাবিল, বাবা কি তবে ঠিকই লিখে গেছেন? না, তাই কি?

কৃষ্ণকিশোর বাবু বলিলেন, "কৈ, জবাব দিলে না যে কিছু?"

মৃণাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হাঁ, কি বলছিলেন, জমীটা? হাঁ, মতিলাল জমীটার জন্য চায় ২শ', আর সেলামী ৩শ', তার উপর তার নিজের জন্যে ৫০্—এই হ'লেই হবে—এ কথা ত আমি লিখেছিলুম।"

কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "হাঁ, তা লিখেছিলে বটে। কিন্তু কি জান, তাড়াতাড়ি কাযটা সেরে ফেলো—কি জানি, পাঁচ জনে কাণ-ভাঙ্গাভাঙ্গি করতেও পারে ত—আর একবার ওদের মনে সন্দেহ জাগলে কি আর রক্ষা আছে? কি ভাবছ, সওদাটা কি মন্দ হ'ল—"

মৃণাল বলিল, "না, তা হচ্ছে না, তবে—তবে—"

"তবে কি? তোমার এতে আপত্তির কিছু আছে না কি?"

"বলছিলুম কি, এতে ঘাটোয়ালকে ঠকান হচ্ছে না কি?"

কৃষ্ণকিশোর বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল। তিনি বিস্মিত হইয়া মৃণালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এতে ঠকান কি পেলে? তা'র জমীটা অনর্থক প'ড়ে রয়েছে—কেউ সে দেশে ওটাকে ৫০্ টাকা দিয়েও নেয় না। আমি তার চতুর্গুণ দাম দিয়ে নিচ্ছি—তবে ঠকান হবে কেন?"

মৃণাল আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না, না, ঠকান নয় বটে। বাবা ব'লে গিয়েছেন আমাকে,—বিষয়-সম্পত্তি করতে গেলে ও সব দেখলে চলে না।"

কৃষ্ণকিশোর বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, "কি বল্‌লে, দাদা ব'লে গিয়েছেন? দাদা—আমার শিবতুল্য দাদা?"

মৃণাল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার খুল্লতাতের চোখ দুইটি ছল-ছল করিতেছে, বুঝি জল নামিয়া আসে!

কৃষ্ণকিশোর বাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "যা বল্‌লে বল্‌লে মিনু,আর ও কথা মুখে এনো না। তুমি তোমার বাবাকে চিন্‌তে পার নি, আমি যতটা চিনে‌ছিলুম। হয় ত সংসারের দুঃখে জ্বালাতন হয়ে রাগের মাথায় তিনি ও কথা ব'লে থাকবেন; কিন্তু জেনে রেখো, অধর্ম্মের কখনও শেষ জয় হয় না।"

মৃণালের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। উঃ, ভিতর বাহির কত প্রভেদ! ইহাই কি ইহলোকে উন্নতির পথ?

কৃষ্ণকিশোর বাবু বলিলেন, "কথাটা বিশ্বাস হ'ল না? বাবা মিনু, এই বুড়োর কথা শোন, সাধুতাই উন্নতির সোপান—লোকের সঙ্গে কখনও মিথ্যা ব্যবহার করো না, লোককে কখনও ঠকিও না, আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা কখনও ভঙ্গ করো না, তা হ'লেই ব্যবসায়ে বড় হ'তে পারবে। যাক্, গিরিডি ফিরে গিয়েই আগে জমীটি বায়না ক'রে ফেলো আমার নামে—বুঝেছ, যেন আমার নামে ওটা বায়না করতে ভুলো না। এ টাকাটা সেখানকার আ.ফিসের ক্যাশ থেকে নিও না, আমি এখান থেকেই নগদ দিয়ে দেবো, বড় জরুরি, কালই রওনা হয়ো।"

মৃণাল বলিল, "কাকীমা বলছিলেন, কাল কোথায় তাঁ[কে] নিয়ে যেতে হবে?"

"ওহো, ভুলে গেছি বটে। দক্ষিণেশ্বর না কোথায় যাবা[র] কথা বলবেন তিনি তোমায়, একবার দেখা কোরো। কা[ল] আর হয়ে উঠবে না, পরশু গিরিডি যাত্রা কোরো, শু[ভ] কাযে বিলম্ব করতে নেই।"

মৃণাল অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে ভাবিল, শুভ কায হুঁ, শুভ কাযই বটে! পিতৃব্য যদি ইহাতে দোষ না দেখে[ন] তবে এ কাযে নামিতে তাহারই বা দোষ কি?

৮

গাড়ী টালার পুল ছাড়াইতেই খুড়ীমা বলিলেন, "ঐ যা কি হবে? বাবা, মিনু, গাড়ী ফিরুতে বল্। বল্, বল্ তোর জন্যে খাবারের টিফিন ক্যারিয়ারটা আনতে ভু[লে] গেলুম। মরণ!"

মৃণাল।—না, না, গাড়ী ফিরোয় না—ও সব হাঙ্গা[মা] করেছ কেন আবার? সেখানে যেন খাবার পাওয়া যা[য়] না! তোমার সব বাড়াবাড়ি!

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলা ছেলে! খাবা[র] পাওয়া যাবে না কেন, বাজারে খাবার! ও সব ছাই-পা[শ] নাকি খায়?"

মৃণাল হো হো হাসিয়া উঠিল, "ঘরে এলে ছেলেটিকে [ত] কি খাওয়াবে কি দাওয়াবে ভেবে পাও না—আর গিরিডি[তে] কি হয়? সেখানে যে চানা খেয়ে কত দিন কেটেছে আর ষ্টেশনে কি করি কলকাতা আসবার সময়?"

কাকীমা মুখখানি ম্লান করিয়া বলিলেন, "ও মা বাছা রে! এবার দেখি দিকি কেমন তোকে ঐ জঙ্গলে পাঠায়! ঢের হয়েছে চাকরীতে—"

মৃণাল হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "পেট চলবে কি হ'[লে] তা হ'লে ছেলের?"

কাকীমার মুখ গম্ভীর হইল। "তা যা হয় করিস বাপু, ডাব সন্দেশ ত পাওয়া যায়?"

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গাড়ী থামিলে মৃণাল [তাহা]র কাকীমাকে লইয়া নামিতেই দেখিল, সম্মুখে আর এ[ক]খান মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরের পার্শ্বে একটি পরি[চা]রিক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় [তাহা]

সহিত কাকীমার চোখে চোখে কি টেলিগ্রাম চলিয়া গেল। মৃণাল সম্মুখে গঙ্গার দিকে চাহিয়া ছিল, নহিলে দেখিতে পাইত, তাহার কাকীমাকে সেই পরিচারিকা—ইঙ্গিতে পঞ্চবটীর পশ্চাদ্দিক্‌টা দেখাইয়া দিতেছে।

তখনও মন্দির-দ্বার রুদ্ধ। নাটমন্দিরে এক অন্ধ ভিক্ষুক একতারা বাজাইয়া গান করিতেছিল, বহু যাত্রী তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গান শুনিতেছিল, কাকীমাও তাহাদের দলে যোগদান করিলেন। মৃণাল কিছুক্ষণ শোনার পর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কাকীমা বলিলেন, "যা না বাছা, একটু ঘুরে আয় না। বেটাছেলের কি এক বায়গায় ভাল লাগে! যা, পঞ্চবটীর দিক্‌টা ঘুরে আয় গে যা।"

ঘাটে কত যাত্রী উঠিতেছে নামিতেছে, দূরে কত নৌকা পাইল তুলিয়া চলিয়াছে। মৃণাল কিছুক্ষণ ঘাটে বসিয়া গঙ্গাস্রোতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার বাহিরের দৃষ্টি সে দিকে ছিল বটে, কিন্তু অন্তরে তাহার নরকের আগুন জ্বলিতেছিল। জগতে যাহারা বড়লোক হয়, তাহারাই যদি ঠকামি ও জুয়াচুরিকে বনিয়াদ করিয়া সমৃদ্ধির সৌধ নির্ম্মাণ করে, তবে সে-ই বা কেন সাধু থাকিয়া কষ্ট পায়? সুযোগ উপস্থিত, সে-ও এইবার উহার সদ্ব্যবহার করিবে,—অর্থ হস্তগত হইয়াছে, সে নিজের নামেই সম্পত্তি কিনিবে। একবার বড়লোক হইলে আর ভয় কি? তখন সবাই মান্য করিবে, তোষামোদ করিবে। দূর হউক চাকুরী—দূর হউক সাধুগিরি! চিরদিনই কি সে আত্মীয়ের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী থাকিবে?

মৃণাল অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আনমনে এক পা এক পা করিয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইল। সত্য না অসত্য—কোন্ পথ শ্রেয়ঃ? কে বলিয়া দিবে? কোথায় তাহার ধ্রুবতারা—অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দিবে?

অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হইল—সম্মুখে সে এ কি দেখিল? এ কি স্বপ্ন? উমা? তাহার শৈশব-সহচরী উমা? সমস্ত শরীরের রক্ত চন্‌চন্ করিয়া বহিয়া গেল—সমস্ত শরীর আনন্দ-শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। চারি চক্ষুর মিলন হইল।

কিছুক্ষণ উভয়ে অপলক নেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল—যেন তাঁহারা ছাড়া আর জগতে কেহ নাই। তাহার পর উভয়ে অপ্রতিভ হইয়া দৃষ্টি অবনত করিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র। উমা ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি? তুমি, মিনুদা?"

এতক্ষণে মৃণালও প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল—তাহার ধমনীতে রক্তের উদ্দাম নৃত্য সাঙ্গ হইয়াছিল। সেও কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে স্বপ্ন নয়,—সত্যিই তুমি উমা?"

অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে উমার মুখ-চক্ষু হাসিয়া উঠিল,—রুদ্ধ হৃদয়ের অর্গল মুক্ত করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে মৃণালকান্তিকে ভাসাইয়া দিল। সব কথা মৃণালের কর্ণে পশিল না, কেবল সে বুঝিল দুইটি কথা,—উমারা দর্জ্জীপাড়ায় আছে, আর সে তাহার চিঠি না পাইলেও তাহার কাকা ও কাকীমার কাছে শুনিয়াছে, সে পশ্চিমে আছে, চাকরী করিতেছে, তাহার কাকীমা ও কাকাবাবু তাহাকে কত ভালবাসেন!

মৃণাল তখন সত্যই স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল,—সেই সুধানিঃস্যন্দী সুর তাহার সমস্ত অন্তরটাকে ভরিয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা হইতেছিল, সে রাজ্য হইতে আর যেন ফিরিয়া না আসে। যাহা হয় একটা কথা না কহিলে নয়, তাই বলিল, "দর্জ্জীপাড়া থেকে আসছ বললে না? সেখানে কি তোমার শ্বশুরবাড়ী?"

"দূর—কি যে বলে!"—উমা আরক্ত মুখ কোথায় লুকাইবে, খুঁজিয়া পাইল না—চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বা রে! মা ওরা কোথায় গেল? বাঃ!"

"রাগ করলে উমা? আমার ভুল হয়েছে। এত দিন তোমার বিয়ে হয় নি—জান্‌বো কেমন ক'রে?"—মৃণাল উমার সীমন্তে সিন্দূররেখার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না।

উমা এক গা ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মৃণাল বলিল, "মাকে খুঁজছ, উমা? তাঁরা এসেছেন নাকি? চল, খুঁজে দিচ্ছি—"

মুখের কথা সাঙ্গ না হইতেই একটি বর্ষীয়সী মহিলা সঙ্গিনীগণ সঙ্গে হাসিমুখে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "এই যে উমি—বা রে, কোথায় ছিলি? এত খুঁজছি—ও মা, এ কে লো? এ্যাঁ—আমাদের মিনু না? এত বড় হয়েছে? ও মা, কোথা ছিলে এত দিন বাবা!"

মৃণাল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "চলুন নাটমন্দিরে—কাকীমা এয়েছেন, ওখানে গিয়েই সব শুনবেন।"

নাটমন্দিরে যাইতে হইল না—যাঁহার কথা হইল, তিনি

সেই দিকেই আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উমা বনকুরঙ্গীর মত ছুটিয়া গিয়া অভিমানের সুরে বলিল,—"হাঁ, কাকীমা, তুমি বড় দুষ্টু! মিনু-দার কথা কিছু বল নি ত। বা রে!"

কাকীমা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "কি বলবো আমার পাগলীটাকে—মিনু ত অমন যাওয়া আসা ক'রেই থাকে। আজ না হয় দেখা হয়ে গেছে। চল দিদি—মায়ের দরজা খুলেছে।" সকলে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সকলের পশ্চাতে মৃণাল। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তখনও সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল কি?

৬

গিরিডি ফিরিয়াই মৃণাল মতিলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সারা পথটা একটা কথা তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল—'মিথ্যে বল্‌লে ঈশ্বর রাগ করেন—পাপ ক'রে দেন'—বালিকার সেই কয়টি কথা তাহার মোহাচ্ছন্ন মনটাকে যেন জোর করিয়া ঝাঁকুনি দিয়া জাগাইয়া দিতেছিল। দক্ষিণেশ্বরে সে কিশোরী উমার মধ্যে যেন সেই বালিকাকে দেখিতে পাইয়াছিল—যেন সে তখনও বলিতেছে,—'মিথ্যা বল্‌লে ঈশ্বর পাপ ক'রে দেন।'

মতিলালের নিকট কথা পাড়িবামাত্র সে হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা মিনু বাবু, তোমার এতে লাভ কি? চিনির বলদ বৈ ত কিছু হ'তে পারলে না।" কথাটা বলিয়া মতিলাল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মৃণাল বিস্মিত হইল, বলিল,—"তার মানে?" উত্তরে মতিলাল যাহা বলিল, তাহাতে মৃণাল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে অনেকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দিল; অথচ সে যদি নিজের অন্তরের অন্তস্তলটা খুঁজিয়া দেখিত, তাহা হইলে বুঝিত, তাহার নিজের মন কয় দিন হইতে যাহা চাহিয়াছে, মতিলাল তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছে মাত্র।

মতিলাল কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবুজী, গোসা করেন কেন? আমার টাকা নিয়ে কথা—তা তোমার কাছেই কি বা তোমার কাকার কাছেই কি। তবে তোমার আগ্রহের কথাটা—"

মৃণাল আবার চটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সে বলিল, "আহা হা, চট কেন বাবু, না হয় নাই তোমার নামে কিনলে—তাতে আমাদের কি ব'য়ে গেল! তবে কি জান বাবু, এ রকম ক'রে দু'চার টুকরো জমী-জমা কিনতে কিনতে তোমার কাকাবাবু এত বড় হ'তে পেরেছে—"

মৃণাল ধমক দিয়া বলিল, "থাম তুমি মতিলাল—সে ভাবনা আমার। জমীটা লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছ কবে বল, আজই কাকাবাবুকে তার করতে হবে।"

মতিলাল হাসিয়া বলিল, "জমী বিক্রীই করবো না বাবুজী—তুমি লিখে দিতে পার তাঁকে।"

মৃণাল বিস্মিত হইয়া বলিল, "বিক্রী করবে না? তবে এত ঘোরাঘুরি করালে কেন?"

মতিলাল বলিল, "আমার ইচ্ছে!"

মৃণাল তাহাকে আবার কতকগুলা কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—সেই দিনই কলিকাতায় তার করিল, রাত্রি মেলে সে পুনরায় কলিকাতায় যাইতেছে—জরুরী কথা আছে।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে সে যখন কৃষ্ণকিশোর বাবুর প্রাসাদে পৌঁছিল, তখন সেখানে মস্ত ঘটা। মৃণাল বিস্মিত হইল, হঠাৎ কি এমন উৎসব?

পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "এই যে মিনু এসেছ। বেশ। বাড়ীতে একটু কায আছে, কথাবার্ত্তা পরে হবে, বড় ব্যস্ত আছি। স্নান-টান সেরে আমার ওপরে বসবার ঘরে একটু জিরিয়ে নাও গে—অনেক মেয়েছেলে এসেছেন, বাড়ীর ভেতরে যাওয়াই এখন মুস্কিল, একটু বাদেই ওপরে যাচ্ছি।"

মৃণাল বিস্মিত হইল। বাহিরের বৈঠকখানায় পাড়ার কয়েকটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন; সেখানে একখানি রোপ্যনির্ম্মিত রেকাবীতে ধান-দূর্ব্বা ও একটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাটিতে চন্দন রহিয়াছে। কাহারও বিবাহের আশীর্ব্বাদ হইতেছে না কি?

স্নান সমাপনান্তে মৃণাল ড্রেসিং-টেবলের টানা খুলিয়া চিরুণী ব্রাস বাহির করিতে গিয়া দেখিল, তন্মধ্যে একখানি ডায়েরী। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া লইতে গিয়া সে দেখিল, ডায়েরীখানার মধ্যের একখানা পাতা খোলা

অবস্থায় ভাঁজ করিয়া মোড়া রহিয়াছে। চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল খোলা পাতাখানার উপর—তাহার দুই তিন স্থানে লেখা তাহার নাম—মৃণালকান্তি!

কেশপ্রসাধন সমাপ্ত হইল না, অত্যুৎকট আগ্রহে মৃণাল ডায়েরীখানা তুলিয়া লইল—পিতৃব্যের ডায়েরী, তাহাতে তাঁহার স্বহস্তে লেখা তাহার নাম মৃণালকান্তি। কি এ?

মাত্র দুই চারি ছত্র পাঠ করিতেই মৃণাল তন্ময় হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যতই অগ্রসর হয়, ততই মনে বিস্ময়, হর্ষ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, আত্মগ্লানি, অনুতাপ—একের পর একটি করিয়া কত ভাবের উন্মেষ হয়! দুঃখের পাঠশালে পিতৃব্যের হাতেখড়ি, ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম, অর্থোন্নতির চেষ্টা। বিধবার সম্পত্তি বিক্রয়ের সুযোগ। অপরের নিকট যাহা সে পাইত, তাহার চতুর্গুণ মূল্য তাহাকে দিয়া দুই ভ্রাতার কিছু লাভের ব্যবস্থা। প্রাণের মত প্রিয় শিবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এ জন্য তাহাকে পদাঘাতে বিদায়-দান। জীবনে এই একটি ভুলের জন্য উভয় ভ্রাতার চিরবিচ্ছেদ এবং তাহার জন্য অনুতাপ ও চিরজীবন ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বিবাহ, জ্যেষ্ঠের সহিত মিলনের শেষ চেষ্টা. জ্যেষ্ঠের তখনও সাক্ষাতে অসম্মতি। ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও ব্যবসায়ে মন-প্রাণ অর্পণ। অসম্ভব দ্রুত উন্নতি। বিধবাকে চতুর্গুণ মূল্য পোষাইয়া দেওয়া এবং পরে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার ওয়ারিসেনগণকে সাহায্যদান। দেশের পৈতৃক ভদ্রাসন জ্যেষ্ঠের নামে ক্রয় করা। জ্যেষ্ঠ যে বিদ্যাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার বিস্তারকল্পে দরিদ্র অনাথগণকে সাহায্য দান। দরিদ্রদের জন্য হাসপাতাল ও অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থিগণের জন্য লাইব্রেরী ও স্কুলপ্রতিষ্ঠা। পুষ্করিণী দান, বৃক্ষরোপণ আদি সদনুষ্ঠান।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যু—তাঁহার শ্রাদ্ধশান্তি। তাঁহার বিধবা ও কন্যাদ্বয়ের নামে দেশের পৈতৃক ভদ্রাসন দান ও তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা। ভ্রাতুষ্পুত্রকে কলিকাতায় আনয়ন ও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা। নিজের মত তাহাকেও দুঃখের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া—সামান্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর মত তাহাকে নিয়োগ—তাহার কার্য্যদক্ষতা—তাহার কাকীমার অনুযোগসত্ত্বেও তাহাকে দরিদ্র অবস্থায় রাখা—কেবল 'মানুষ' গড়িয়া তুলিবার জন্য, নতুবা সে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সর্ব্বস্ব—সকল স্নেহাশীর্ব্বাদের অধিকারী—তাহার জন্য তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে জমীদার গোলোকনাথের কন্যাকে পাত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন!

মৃণালকে শেষ পরীক্ষা। মতিলালের সহিত ষড়্‌যন্ত্র। সে পরীক্ষাতেও মৃণাল উত্তীর্ণ। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতেছে, তাহার মাতৃসমা কাকীমাতা তাহার জন্য দুই বাহু প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই মা-লক্ষ্মী উমার জননীর নিকট উহাদের উভয়ের বাল্যপ্রণয়ের কথা জানিয়াছেন এবং এই সাত বৎসর উভয়কে তফাতে রাখিয়া উভয়ের মন পরীক্ষা অনেক খুঁটিনাটি কাযে জানিয়াছেন, মনে মনে উভয়ে উভয়কেই ভালবাসে। এই ষড়্‌যন্ত্রে তাঁহারও অংশ আছে। মা-লক্ষ্মী সত্যই তাঁহার মা-লক্ষ্মী, তিনি তাহাকে এখন মৃণালের অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। মৃণাল তাঁহাদের পুত্র—তাঁহাদের সর্ব্বস্বের মালিক—তাঁহাদের বংশধর—উত্তরাধিকারী। কল্য প্রত্যুষেই তাঁহারা তাহার আশীর্ব্বাদের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন—মৃণাল আসিলেই সেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে!

* * * * *

সমস্ত পৃথিবীটা মৃণালের সমক্ষে যেন ঘুরিতে লাগিল। এঁ্যা—এই তাহার খুল্লতাত! আর বিশ্বাসঘাতক অধম পাতকী সে—তাঁহাকে কি ভুলের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে! পিতা ত ভ্রান্ত ধারণা লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—সে কি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না—সারা জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিলেও কি তাহা সম্ভব হয় না?

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে দুইখানি কোমল হস্ত তাহার কুঞ্চিত কেশদামের মধ্য দিয়া সস্নেহে সঞ্চালিত হইল, তাহার কাকীমা বলিলেন, "উঠবি না বাছা মিনু? ঐ শোন শাঁখ বাজছে! চল্, চল্, সবাই অপেক্ষা করছে—তোর যে আজ আশীর্ব্বাদ!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

চলমান গৃহ

যাহারা বস্ত্রাবাস বা তাম্বুর বিরোধী, তাহাদের ব্যবহারের জন্য ভাঁজ-করা চলমান গৃহ উদ্ভাবিত হইয়াছে। স্বয়ং চালিত গাড়ীর উপর এই ভাঁজ-করা গৃহ স্থাপিত। ইহার যথার্থ আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পথ চলিবার সময় দৃষ্টিগোচর হইবে। অর্থাৎ এই গৃহ যখন ভাঁজ-করা অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হয়, সেই সময় ইহার আকার দেখিয়া বুঝা যায় না যে, উহা আয়তনে তিনগুণ বড় হইতে পারে। কিন্তু উহা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, তখন দেখা যায়, ঘরটি বিস্তৃত, উচ্চ এবং বাসোপযোগী। ঘরের মধ্যে গদী আঁটা বসিবার ও শয়নের আসন, আসবাবপত্র রাখিবার আধার, বস্ত্রাধার, রন্ধনের জন্য ষ্টোভ এবং ভোজনের উপযুক্ত তৈজসাদি সমস্তই ঘরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিন ব্যক্তির পক্ষে এই গৃহ বাসোপযোগী। দরজা ও জানালার ব্যবস্থাও ঘরে আছে।
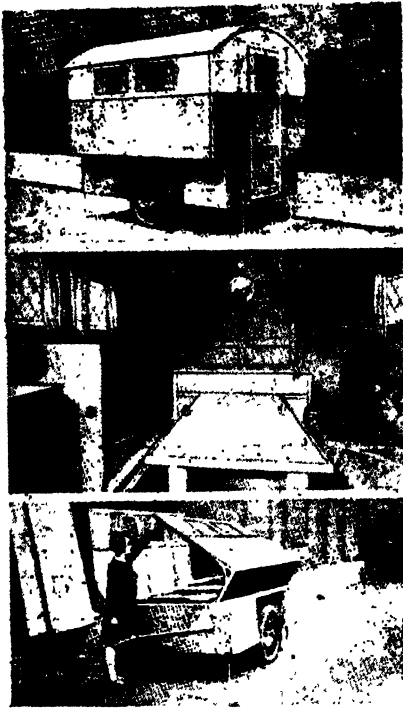
ভাঁজ-করা চলমান গৃহ

ক্যামেরার সাহায্যে অপরাধী গ্রেপ্তার

অগ্নিবার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্ত বড় বড় সহরে রাজপথে বিপদ্‌বার্ জ্ঞাপক স্তম্ভ থাকে। কিন্তু অনেক সময় দুষ্ট লোক মিথ্যা বিপ বার্ত্তা জ্ঞা করিয়া ম দেখি থাকে। নি ইয়র্ক সহ কর্ত্তৃপ অগ্নিবার্ত্ত জ্ঞাপ স্তম্ভের সহি ক্যামে বসাই প্রতীকারে ব্যব করিতেছেন
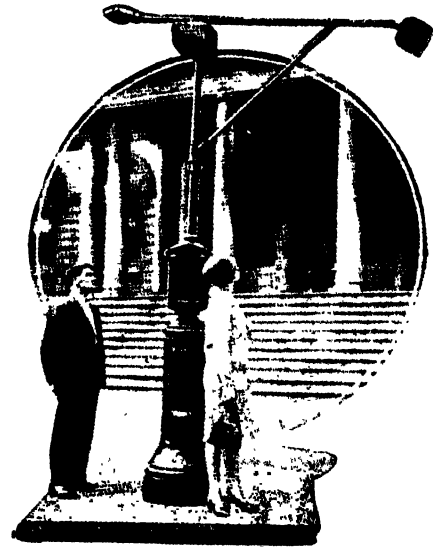
ক্যামেরা এমন ভা অবস্থিত কোন ব্যক্তি স্তম্ভে হস্তার্পণমাত্রেই ক্যামেরার লক্ষ্যের মধ্যে আসি এবং যন্ত্র ঘুরাইবামাত্রই ক্যামেরাতেও তাহার ছবি গৃহীত হইবে।

ক্যামেরাযোগে অপরাধী গ্রেপ্তার

শিকারের মোটর-গাড়ী

ভারতবর্ষের কোনও মহারাজা শিকারের উদ্দেশ্যে একখানি মোটর গাড়ী আনাইয়াছেন। যখনই তিনি শিকারে গমন করেন,
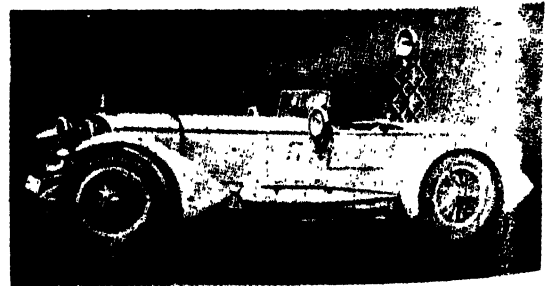
শিকারের মোটর-গাড়ী

এই মোটর-গাড়ী তিনি সঙ্গে লইয়া যান। এই মোটর-গাড়ীর চালকের বসিবার আসনের পশ্চাদ্ভাগে একটা অতিরিক্ত আলোক আছে। গাড়ীর সম্মুখভাগে ৪টি "সার্চ্চলাইট" এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, সেই উজ্জ্বল আলোকসাহায্যে ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য জীবের গোপন অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভাবে শার্দ্দূলবর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াও পড়ে।

সময় জ্ঞাপনের বিচিত্র ব্যবস্থা

জাপানে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় কামানের শব্দের দ্বারা প্রত্যহ নগরবাসীকে সময়-জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে টোকিও সহরে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। সম্প্রতি এক অত্যুচ্চ অট্টালিকার শীর্ষদেশে এক বিরাটকায় সঙ্গীত-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই যন্ত্র হইতে তীব্র ও দূরপ্রসারী ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নাগরিকদিগকে সময় ঘোষণা করিবে। জাপান সম্রাটের আদেশে কামান দাগিয়া সময়-জ্ঞাপনের প্রথা টোকিও সহরে রহিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা।
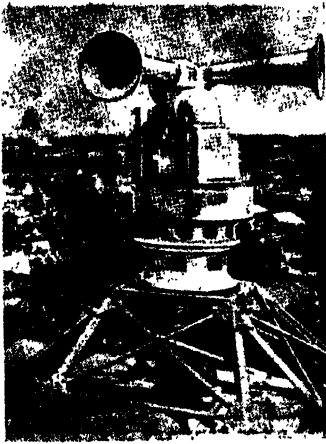
সঙ্গীতযন্ত্র-সাহায্যে সময়-ঘোষণা

স্কী-সংলগ্ন মোটর-দ্বিচক্রযান

আলাস্কায় এখন সারমেয়-দল আর স্কী-সংলগ্ন মোটর দ্বিচক্রযানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পারিতেছে না। তুষাররাশির উপর দিয়া কুকুরের সাহায্যে ডাকের চিঠিপত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করা হইত। অধুনা অনেক ক্ষেত্রে স্কী-সন্নিবিষ্ট মোটর-চালিত দ্বিচক্রযান সাহায্যে সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। কুকুরবাহিনী যে ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহে ডাক লইয়া যাইত, বর্ত্তমান প্রণালীতে তাঁহা দুই দিনে সমাপ্ত হইতেছে। স্কীগুলি এমন প্রকাণ্ড যে, দ্বিচক্রযান উল্টাইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং প্রচুর ভারবহনের উপযোগী। এই যানের সাহায্যে পীড়িতদিগকেও স্থানান্তরিত করার সুবিধা হইবে।

স্কী-সংলগ্ন মোটর-দ্বিচক্রযান

অভিনব ক্যামেরা

ঘোড়-দৌড় ও নানাবিধ ব্যায়ামের বা ক্রীড়ার আলোক-চিত্র গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কখন্ ঘোড়-দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া শেষ হইল, তাহার ঠিক সময়টিও যাহাতে বিবৃত করা যাইতে পারে, অধুনা সেরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে। ক্যামেরার সম্মুখভাগে একটি স্বচ্ছ ঘটিকাযন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। যে "প্লেট" দৃশ্যের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবে, উহা ঘটিকা-যন্ত্রের পরই রাখিবার ব্যবস্থা আছে। একটি 'লিভার' এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, উহা সরাইয়া দিবামাত্র ঘটিকাযন্ত্র চলিতে থাকে। ঘোড়-দৌড় আরম্ভ হইবামাত্র উক্ত 'লিভার' টিপিয়া দিতে হয়। দৌড়ের শেষ দৃশ্য গ্রহণ করিবার জন্য ক্যামেরার কাচ-গোলকের উপর আবরণ টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। অমনই ঘড়ীর ছবিও "নেগেটিভ" প্লেটের উপর পতিত হয়। তাহাতেই ঘোড়-দৌড়ের বাজির শেষ চিত্র এবং কখন্ অর্থাৎ ক'টা বাজিয়া কয় মিনিটে উহা সমাপ্ত হইল, তাহা সমগ্র ছবির সঙ্গে জানিতে পারা যায়।

ক্যামেরায় ঘোড়-দৌড়ের ছবি ও সময়ের আলোক-চিত্র

মোটর-চাকায় নূতন কৌতুক

মোটর-চাকায় জলক্রীড়া

মোটরগাড়ীর চাকার সাহায্যে জলক্রীড়ার নানাপ্রকার আমোদ অনুভব করা যায়। জলাশয়ের ধারে মঞ্চের উপর চাকা টানিয়া লইয়া উহার অভ্যন্তরে কোনও সন্তরণকারী দেহ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। তাহার পর উক্ত চাকা গড়াইয়া জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাতে সন্তরণকারীরা পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অগ্নিনির্ব্বাণের বিচিত্র ব্যবস্থা

আমেরিকার অনেক বড় বড় অট্টালিকায় অগ্নি-নির্ব্বাণের যন্ত্র রক্ষিত হয়। প্রাচীরগাত্রে এই যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। বাড়ীর কোথাও আগুন লাগিলে প্রাচীরস্থিত যন্ত্রের দ্বার খুলিয়া নল বাহির করিবা-মাত্র বাড়ীর সর্ব্বত্র অগ্নির সংবাদ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অট্টালিকার কোন্ অংশে আগুন লাগিয়াছে, তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।
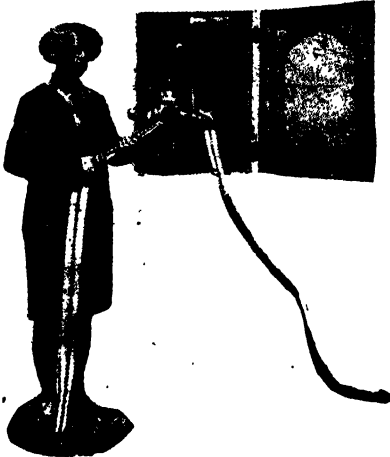
অগ্নিনির্ব্বাণের বিচিত্র ব্যবস্থা

সুতরাং অগ্নিনির্ব্বাণ-কার্য্যে যাহারা আইসে, তাহারা কাহাকেও প্রশ্ন না করিয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইতে পারে। প্রায় ৫০ ফুট 'হোস' বা নল টানিয়া বাহির করিবামাত্রই যন্ত্র ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। জলধারাও নলপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র যন্ত্রটির সম্যক্ ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে মাত্র ১০ সেকেণ্ড লাগে।

ধূম্র-যবনিকা

শত্রুর বিমানপোতের আকস্মিক আক্রমণ হইতে বড় বড় শ্রমশিল্পের কারখানা প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার ধূম্র-যবনিকা সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ধূম্র-যবনিকা এমনভাবে বিস্তৃত হইয়া বড় বড় ইমারত প্রভৃতি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে যে, বিমান হইতে অট্টালিকার স্থান নির্দ্দেশ আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

ধূম্র-যবনিকা উৎপাদক যন্ত্র

যাহাতে বড় বড় কারখানার মালিকগণ, অগ্নিনির্ব্বাণ যন্ত্রের মত, ধূম্র-যবনিকা-উৎপাদক যন্ত্র ক্রয় করিয়া কারখানায় ব্যবহার করেন, সে জন্য কর্তৃপক্ষগণকে উহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

বিমানবিহারীর বিচিত্র পরিচ্ছদ

বিমানপোতে সমুদ্রের উপর দিয়া গমনকালে যদি দুরদৃষ্টক্রমে জলের উপর পোতারোহীকে বাধ্য হইয়াই আশ্রয় লইতে হয়,

বিমানবিহারীর ভাসমান পরিচ্ছদ

তাহা হইলে তাঁহাকে তদবস্থায় জলের উপর ভাসাইয়া রাখিবার জন্য এক প্রকার পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছ

জলে ধারণ করিলে জলের উপর যে কোনও মানুষ একাদিক্রমে তিন বা ততোঽধিক দিবস নিরাপদে ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন। পরিচ্ছদমধ্যে পানীয় জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, সেইরূপ যন্ত্রও পরিচ্ছদে সংলগ্ন থাকে। তাহা ছাড়া পরিচ্ছদের সহিত একটি লোহিত পতাকা থাকে। জলের উপর এই পতাকা ঊর্দ্ধদিকে উড্ডীন হইতে থাকে। দূর হইতে কোনও পোত সেই পতাকা দেখিয়া বিমানারোহীকে উদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা।

অশ্বারোহণে অস্ত্রক্রীড়া

ইংরাজ অশ্বারোহী সেনাদলে অধুনা অস্ত্র-ক্রীড়ার নানাপ্রকার বিচিত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। অশ্বারোহণে বেড়া উল্লঙ্ঘন করিবার

অশ্বারোহণে লক্ষ্যভেদ

সময় তরবারির দ্বারা লক্ষ্যভেদের ক্রীড়া-প্রদর্শন তন্মধ্যে অন্যতম। এইরূপ ক্ষেত্রে অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়ের দক্ষতা তুল্য না হইলে কখনই সফলতা লাভ করা যায় না। যে মুহূর্ত্তে অশ্ব লম্ফ দিয়াছে, তখনই লক্ষ্যাভিমুখে তরবারি চালনা করিতে হইবে, নহিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। চিত্রে লিখিত অশ্বারোহী সৈনিক দক্ষতার সহিত এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। ভারতবর্ষে এমন দিন ছিল, যখন বহু অশ্বারোহী সৈনিক ইহার অপেক্ষাও দুঃসাধ্য ব্যাপারে অপূর্ব্ব নিপুণতা দেখাইতে পারিত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লৌহনারী

প্রাচীনকালে য়ুরোপে অপরাধীর প্রতি যে ভাবে দণ্ড প্রদত্ত হইত, তাহা আধুনিক সভ্য জগতে বর্ব্বরতার দ্যোতক বলিয়া পরিগণিত। ক্রজবারির ডিউক একবার লণ্ডন সহরে সে যুগের মারাত্মক যন্ত্রণাপ্রদায়ক কতিপয় যন্ত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীর নুরেনবার্গ সহরের রাজপ্রাসাদ হইতে তিনি

লৌহনারী

অনেকগুলি যন্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "লৌহনারী" যন্ত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। যন্ত্রের বহির্ভাগে একটি নারীমুণ্ড। যন্ত্রটির দুইটি কপাট। কপাটগুলি তীক্ষ্ণমুখ দৃঢ় লৌহশলাকা সংযুক্ত। অপরাধীকে এই নারীর আলিঙ্গনে নিক্ষেপ করিয়া যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত, তখন কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই লৌহনারীর মুক্তদ্বারদৃশ্য এখানে প্রদত্ত হইল।

লতাগুল্মের পিয়ানো

আমেরিকার জনৈক উদ্যানপাল ১০ বৎসর ধরিয়া প্রভূত যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করিবার পর বেড়ার লতাগুল্মের সাহায্যে একটি

লতাগুল্মের পিয়ানো
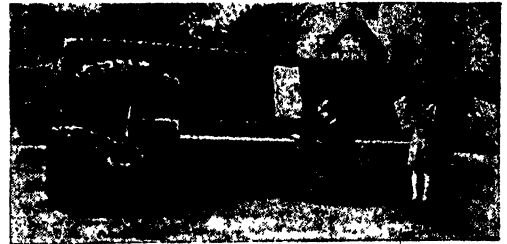
অতিকায় পিয়ানোর আকারবিশিষ্ট কুঞ্জ রচনা করিয়াছেন। এই লতাকুঞ্জ এমনই কৌশলসহকারে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র মনে হইবে, একটি বৃহৎ পিয়ানো যন্ত্র ক্ষেত্রমধ্যে কেহ যেন রাখিয়া দিয়াছে। এই কুঞ্জ-বিতানের পিয়ানো ২০ ফুট দীর্ঘ ও প্রায় ৬ ফুট উচ্চ। উহার পার্শ্বে একটি পিয়ানো-বেঞ্চ, আলোক ও চেয়ার আছে। এই লতাবিতানের পিয়ানো নির্ম্মাণে উদ্যানপাল যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর মধ্যে এমন কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া অভিজ্ঞগণ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

রহস্যের খাসমহল

চতুর্থ প্রবাহ

ভীষণ পরীক্ষা

মৃতা রমণীর কণ্ঠ হইতে আমি সেই হার উন্মোচিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় আমার মন অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অন্ধকারে সকল ব্যাপারই অলৌকিক রহস্যে আবৃত বলিয়া আমার ধারণা হইল। আমার বিশ্বাস হইল, কোন দুরভিসন্ধিতেই আমাকে সেখানে আবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে পিন ফুটিলেও ক্রমশঃ আমার সমস্ত হাতখানি আড়ষ্ট হইয়া হাতের যন্ত্রণাও অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি কোথায় আছি, তাহা স্থির করিবার জন্য চারিদিকে হাত বাড়াইলাম; কিন্তু কিছুই স্পর্শ করিতে পারিলাম না।

অতঃপর আমি চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠনালী হইতে শব্দ বাহির হইল না। আমার দুই হাতই আড়ষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দেহের উর্দ্ধাংশ জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িল; অথচ মনে হইল, আমার সর্ব্বশরীরে সূচি বিদ্ধ হইতেছে। আমার আঙ্গুলের ডগায় যে পিন বিঁধিয়াছিল, ইহা তাহারই ফল বলিয়া মনে হইল। আমি দুই হাতে পূর্ব্বোক্ত হার ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইতে অবশ হাত আর সরাইয়া লইতে পারিলাম না।

আমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিলাম, বিপুল চেষ্টায় শরীর একটু সোজা করিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ঘুরিয়া পড়িলাম; আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

তাহার অব্যবহিত পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিব না; কারণ, তখন আমার চেতনা ছিল না; তবে অল্পক্ষণ পরেই আমার চেতনাসঞ্চার হইয়াছিল। চেতনা লাভ করিয়া আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, যে কক্ষের দেওয়ালে পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলি দেখিয়াছিলাম, আমি সেই স্থানে নীত হইয়াছি। তখন সেই কক্ষে বিজলী-বাতি জ্বলিতেছিল। আমি একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম। দেখিলাম, সেই ভীষণাকৃতি নিউবিয়ানটা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটি আমার চক্ষুর উপর স্থাপিত ছিল, তাহার মস্তকটি আমার ললাটের সম্মুখে অবনত। তাহার চক্ষু দুইটি আরক্তিম। আমাকে চেতনালাভ করিতে দেখিয়াই সে আনন্দে হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

আমি কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম, তাহার ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিবারই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। আমি চেতনালাভ করিলেও দেহের কোন অঙ্গ নড়াইতে পারিলাম না। আড়ষ্টভাবে অবসন্নদেহে সেই চেয়ারেই বসিয়া রহিলাম।

আমার সন্দেহ হইল—আমার হৃদ্‌যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততালে চলিতে চলিতে তাহা হঠাৎ বন্ধ হইল; আশঙ্কা হইল, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে পুনর্ব্বার হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হইল, এবং আবার তাহা রহিত হইল। তখন আমার মনে হইল, বহু কষ্টভোগ করিয়া আমাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যুভয়ে আমি ব্যাকুল হইলাম। এ ভাবে আমার মরিতে ইচ্ছা ছিল না, এ কথা প্রকাশ করিতে আমি লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না।

ক্রমশঃ আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, এবং জিহ্বা অসাড় হইল। আমার কথা কহিবার শক্তি রহিল না, কণ্ঠনালী হইতে অস্ফুট বিকৃত শব্দমাত্র নিঃসারিত হইল। কিন্তু আমি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম, দুর্দ্দান্ত নিউবিয়ানটা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল—তখনও আমার এই জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই। আমার মনে হইতে-ছিল—যাহা কিছু দেখিতেছিলাম বা করিতেছিলাম—তাহা সমস্তই স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন নহে,সমস্তই সত্য,অতি কঠোর সত্য।

ঘটনাক্রমে আমি সেই কক্ষের গুপ্তরহস্য অবগত হইয়া-ছিলাম, এবং এই অভিজ্ঞতাই আমার মৃত্যুর কারণ, ইহা বুঝিতে পারায় আমার উৎসাহ এবং আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই কক্ষের প্রাচীরে যে সকল ছবি ঝুলিতে-ছিল, সেই সকল ভীষণদর্শন চিত্র আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের কোন্খানির পশ্চাতে সেই ভীষণ অপরাধের প্রমাণ সংগুপ্ত ছিল? হঠাৎ আরব-টার মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল, আমি ঘৃণাভরে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আমার অঙ্গুলি-স্পর্শে কোন্ চিত্রপটখানি স্থানচ্যুত হইয়াছিল? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার আমার হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইল। পুনর্ব্বার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যে পিন্‌টি আমার অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হইয়াছিল,তাহার ভিতর দিয়া এরূপ কি তীব্র বিষ আমার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?

ইব্রাহিম হঠাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই হাসি কি ভীষণ! যেন সে হাসি মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত নহে, তাহা পিশাচের অতি নির্ম্মম শুষ্ক হাসি। তাহার হাসিতে বিজয়গর্ব্ব পরিস্ফুট! মুহূর্ত্ত পরে আমার মনে হইল, আমার বাম ভাগে একখানি চিত্রপটের আড়ালে কেহ ব্যস্ত-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর আমি বুঝিতে পারিলাম, কার্ল কুপ আমার মৃত্যুযন্ত্রণা চিত্রপটে পরিস্ফুট করিবার জন্য আমারই চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল! সে কি এই উদ্দেশ্যেই আমাকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া আমার মৃত্যুযন্ত্রণা লক্ষ্য করিতেছিল? আমার দেহে কৌশলে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছিল? আমাকে এই ভাবে কারারুদ্ধ করিয়া সে আমার অপরিচিতা সেই নারীকে হত্যা করিয়াছিল, এবং আমি ঘটনাক্রমে তাহারই মস্তক ও কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া-ছিলাম। অল্পকাল পূর্ব্বে সেই নারীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া-ছিল, আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। তবে কি আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত?

আমি যেরূপ ফাঁদেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকি, আমি বুঝিতে পারিলাম, ইহা হইতে আমার পরিত্রাণ নাই। সেই ভীষণ-প্রকৃতি বৃদ্ধ আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; আমার মুখে যে মৃত্যুযন্ত্রণা পরিস্ফুট হইবে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার কক্ষস্থিত বাস্তব চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, এই উদ্দেশ্যেই সে আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তিলে তিলে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

সেই কক্ষের দেওয়ালে যে সকল চিত্র সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা কি আমার মত হতভাগ্যগণকে কারারুদ্ধ করিয়া এই ভাবেই সে অঙ্কিত করিয়াছিল? চিত্রপটে যাহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহারা কি সকলেই আমার মত তাহার ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল? সে সমাজের সকল স্তর হইতে সকল বয়সের নর-নারী সংগ্রহ করিয়া তাহার পৈশাচিক প্রতিভাকে তুলিকার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। বুঝিলাম, সেই কক্ষ সত্যই 'রহস্যের খাসমহল,' যে কক্ষে হতভাগ্য নর-নারীবর্গের যন্ত্রণা, আতঙ্ক ও মৃত্যু মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত ছিল।

পুনর্ব্বার আমার বক্ষের স্পন্দন রহিত হইল। আমি মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্ত আমার নিকট এক এক ঘণ্টা দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল; অবশেষে আমার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল। যে বিষ আমার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার ফলে আমার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অবশেষে আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। আমার হৃৎস্পন্দন আর ফিরিয়া আসিল না। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শ্বাস-গ্রহণের জন্য আমি মুখব্যাদান করিলাম। কিন্তু তখনও আমি জড়ের মত বসিয়া রহিলাম।

নিউবিয়ানটা আমার পাশে দাঁড়াইয়া উদাসীনভাবে আমার অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিল। মুহূর্ত্ত পরে সে এক খণ্ড স্পঞ্জ আমার নাকের উপর চাপিয়া ধরিল। সেই স্পঞ্জ এক প্রকার উগ্র গন্ধ আরোকে সিক্ত। আমি বাধ্য হইয়া দুই তিনবার তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিলাম।

প্রথমে মনে হইল, সুতীব্র গন্ধকের গন্ধে আবার শ্বাস রুদ্ধ হইবে। কিন্তু কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার আমার বক্ষের স্পন্দন আরম্ভ হইল, বুকে যেন একটু বল পাইলাম, এবং মরিতে মরিতে আর মরিলাম না, মৃত্যুকবল হইতে মুক্তি-লাভ করিলাম। জানি না, আর কোন মনুষ্যকে এরূপ কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে কি না!

সেই রাত্রিতে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা একে একে আমার মনে পড়িতে লাগিল। কুপ ট্যাক্সি হইতে মাথা বাহির করিয়া পথিমধ্যে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার পর কি ভাবে জেসির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, জেসির সহিত কুপের বাড়ীতে আসিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার গৃহে আমার প্রবেশ, যোয়ানের সহিত আমার পরিচয়, যোয়ানের প্রতি তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার—সকল কথাই ধীরে ধীরে আমার স্মরণ হইল।

ভাবিলাম—কফিটুকু যোয়ানকে কেন তাহার অনিচ্ছায় পান করিতে বাধ্য করা হইল? সেই কফিতে কিরূপ বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল? সে কি নীচের কক্ষে তখনও সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া ছিল? সেই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা তরুণী তাহার পিতার অপকর্ম্মের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছে। সেই সত্যপ্রকাশের ভয়ে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবসন্ন করা হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র কফির পেয়ালা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আজ রাত্রিতে আমাকেও এই ভাবে বিপন্ন হইতে হইবে। আমিও কফি পান করিয়াছি শুনিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, অবশেষে তাহার পিতা গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার ভয়প্রদর্শন করায় সে অগত্যা কফি পান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই গুপ্ত কথাটি কি?

যদিও আমি মাথা ঘুরাইতে পারিলাম না, তথাপি বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ কুপ তুলি ও রঙ্গ লইয়া তখনও চিত্রাঙ্কনে রত ছিল। মনুষ্যের যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্ত তাহার এরূপ আগ্রহের কারণ কি? এই প্রকার পৈশাচিক কার্য্যে কেন সে আনন্দলাভ করে? সে আমাকে বলিয়াছিল বটে, ঐ সকল চিত্র গুস্তে ও রামো নামক চিত্রকরের অঙ্কিত, কিন্তু তাহার এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে রাইমার ব্রাদার্সের কারবারের বখরাদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল, সে কথাও মিথ্যা। এ সকল মিথ্যাকথা বলিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল?

আমি আফ্রিকার বিপৎসঙ্কুল দুর্গমপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া কখন বিপন্ন হই নাই; কত অসভ্য বর্ব্বর জাতির অধিকারভুক্ত দেশের ভিতর দিয়া আমি নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, আর আজ লণ্ডনের একটি জনবহুল পল্লীতে এক জন বৃদ্ধের ঘরে প্রবেশ করিয়া এই ভাবে বিপন্ন হইলাম, ইহা কি বিস্ময়কর ঘটনা নহে?

সকল বিষয়ই আমি এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। কুপ বিশেষ কোন কারণে আমাকে শিকার করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল, আমি তাহার লক্ষ্য হইয়াছিলাম। সে জেসিকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সিতে বাড়ী আসিতেছিল; আমাকে দেখিয়া সে গ্রষ্টার প্লেসে জেসিকে নামাইয়া রাখিয়া বাড়ী আসিয়াছিল। আমি জেসিকে লইয়া যখন তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন সে তাহার ঘরে আমারই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, ধূর্ত্ত কুপ শিকার ধরিবার জন্ত পূর্ব্বে আরও কতবার এইরূপ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল! জেসি পূর্ব্বে আরও কতবার এই ভাবে লণ্ডনের রাজপথে পথ হারাইয়া নিরীহ পথিকের শরণাগত হইয়াছিল এবং সেই সকল পথিক সরলচিত্তে তাহাকে কুপের নিকট রাখিতে আসিয়া আমার মত ফাঁদে পড়িয়াছিল! তাহারা হয় ত এই ভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কুপের ষড়্‌যন্ত্র কি ভীষণ, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হয়। আমি সেই স্থানে বসিয়া গৃহপ্রাচীরস্থিত নর-নারী, বৃদ্ধ, যুবক, এমন কি, বালক-বালিকার চিত্রে তাহাদের অন্তিম যন্ত্রণার অঙ্কন-কৌশল লক্ষ্য করিয়া ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইলাম। প্রত্যেক চিত্রই কুপের দুষ্কার্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা আলোচনা করিলে হৃৎকম্প হয়। যদি এই সকল বিষয় জনসাধারণের কর্ণগোচর হয়—তাহা হইলে কি ভীষণ আন্দোলনই না আরম্ভ হইবে? লণ্ডনের ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সাহায্যে অনেক উৎকট অপরাধের মূল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধানও হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুপ্তরহস্ত এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, ইহা অত্যন্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

ইব্রাহিম আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মুখের উপর হইতে অপসারিত হয় নাই। কুপের চিত্রাঙ্কন শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হয়—তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য সে স্পঞ্জখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই আরকের তীব্র গন্ধ তখনও আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল। সেই গন্ধ দুঃসহ হইলেও তাহা আমার অবসাদ দূর করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ শান্তিদানে সমর্থ হইয়াছিল। সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য হইত।

কুপের পৈশাচিক কার্য্যে আমি ক্ষোভে, ঘৃণায়, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চক্ষু ভিন্ন আমার কোন অঙ্গ নড়াইবার শক্তি হইল না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়, যন্ত্রণাদায়ক ও ভীষণ অবস্থা আর কি হইতে পারে?

পুনর্ব্বার আমার বক্ষের স্পন্দন রহিত হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়া নিউবিয়ানটা পুনর্ব্বার আমার নাসিকায় সেই স্পঞ্জ টিপিয়া ধরিল। আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইলাম বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ যন্ত্রণাভোগ আমার অসহ্য মনে হইল। আমি তখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত। মুহূর্ত্ত পরে আমার মৃত্যু হইবে না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কিন্তু আমি সেই অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া কুপ ও ইব্রাহিম যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। লণ্ডনে যে এরূপ নরপিশাচের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? আমিও পূর্ব্বে ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

কোন অভিজ্ঞ লেখক লিখিয়াছেন—হিংস্র শ্বাপদ জন্তুপূর্ণ আফ্রিকার জঙ্গল রাত্রিকালের লণ্ডন অপেক্ষা অনেক অধিক নিরাপদ স্থান; এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, তাহা আমি সেই রাত্রিতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রাত্রিকালে লণ্ডনে কাহার কি বিপদ ঘটিবে, তাহা কেহই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও বুঝিতে পারে না।

কুপকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলাম; কি ভীষণ মূর্ত্তি! তাহার চক্ষুতারকা দুইটি অগ্নিগোলকের মত জলিতেছিল, সেই চক্ষুতে ক্ষিপ্ততার আভাস লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে তুলি হাতে লইয়াই—আমার সম্মুখ হইতে কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার মুখের ভঙ্গী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল; আমার যে যন্ত্রণা মুখে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহার নিখুঁত ছবি সে চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে উল্লাসভরে দুই তিনবার মাথা নড়িল।

আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না; আমার ইচ্ছা হইল, চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিব; কিন্তু হায়! আমার উঠিবার চেষ্টা বৃথা হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গ তখনও পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত রোগীর দেহের ন্যায় অসাড়। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃতদেহের ন্যায় শীতল।

কয়েক মিনিট পরে কুপ তাহার অঙ্কিত চিত্রপটের নিকট ফিরিয়া গেল, এবং ছবির দুই এক স্থানে তুলি বুলাইল। তাহার পর সে পুনর্ব্বার আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। এবার সে তুলি ও রঙ্গের পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া মৃদু অথচ সুদৃঢ় স্বরে তাহার ভৃত্য ইব্রাহিমকে বলিল, "আমার কায শেষ হইয়াছে। হাঁ, ঠিক সময়েই হাতের কায শেষ করিয়াছি। কাল আর দুই জনকে চাই।"

ইব্রাহিম বলিল, "আজ্ঞে, তাহাই হইবে।"

আমি কি বলিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু আমার মুখে কথা বাহির হইল না, সেই মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের স্পন্দন পুনর্ব্বার রহিত হইল। আমার আশা হইল, ইব্রাহিম পুনর্ব্বার আমার নাসিকায় সেই আরকসিক্ত স্পঞ্জ চাপিয়া ধরিবে, তাহার প্রভাবে আমার জীবনীশক্তি আবার ফিরিয়া পাইব।

আমি আশ্বস্তচিত্তে ইব্রাহিমের মুখের দিকে চাহিলাম; কিন্তু ইব্রাহিম স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; সে হাত তুলিল না। আমার আশা পূর্ণ হইল না।

কুপ নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, ইব্রাহিম নতমস্তকে তাহার অনুসরণ করিল। আমার দিকে তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। মুহূর্ত্ত পরে 'সুইচ' টিপিবার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহার পর সশব্দে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে একাকী বসিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই!

পঞ্চম প্রবাহ

অদ্ভুত ঘটনা

"মহাশয়, জাগুন, উঠিয়া বসুন। আপনি এখন কেমন আছেন?—কথাগুলি দূরাগত শব্দতরঙ্গের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; কিন্তু তখনও আমি সম্পূর্ণরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই, আমার চেতনা তখন সবে মাত্র ফিরিয়া আসিতেছিল।

আমি অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, একটি উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষে শায়িত আছি; সেই কক্ষের দেওয়ালগুলি চূণকাম করা, আলোক-সম্পাতে তাহা ঝক্‌মক্ করিতেছিল। আমার পাশে এক জন ডাক্তার শুভ্রবেশধারী; মাথার কাছে গোলাপী পরিচ্ছদধারিণী শুশ্রূষাকারিণী। সে সুন্দরী।

ডাক্তার আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। লোকটির বয়স অল্প; তাঁহার উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া লোকটি সদাশয় বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার পশ্চাতে এক জন আর্দ্দালী দণ্ডায়মান ছিল; দ্বারের নিকট এক জন পুলিস-ম্যানকেও দেখিতে পাইলাম। টুপিটা তাহার হাতে ছিল।

আমি অস্ফুটস্বরে ডাক্তারকে বলিলাম, "আমার কি হইয়াছে? আমি কোথায়?"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি চেয়ারিং ক্রশের হাস-পাতালে। আমরা আপনার চিকিৎসা করিতেছি। কিন্তু ব্যাপার কি? আপনি কেমন আছেন? সারারাত্রি স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইয়াছেন বুঝি?"

আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আজ রাত্রিতে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়, অতি ভীষণ!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, পেটে দুই এক গ্লাস বেশী পড়িলে অভিজ্ঞতাটা শোচনীয় হয় বটে।"

আমি বাদামী চামড়া-মোড়া কৌচের উপর দুই হাতের কনুইয়ের ভর দিয়া মাথা তুলিলাম, ডাক্তারকে বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য নহে, এক গ্লাসও আমার পেটে পড়ে নাই; তথাপি আমার এই অবস্থা। সকল কথা আমাকে খুলিয়া বলুন। আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?"

ডাক্তার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কনষ্টেবলটা বলিল, "সাভয় হোটেলের ঠিক সম্মুখে বাঁধের উপর আপনাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, মহাশয়!"

ডাক্তার বলিলেন, "ও আপনাকে মাতাল মনে করিয়াছিল।"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ, ঐ রকমই আমার মনে হইয়া-ছিল। সেখান হইতে একখান 'এম্বুলেন্সে' আপনাকে বো ষ্ট্রীটে লইয়া যাই; কিন্তু আপনার অবস্থা একটু খারাপ দেখিয়া আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিলাম।"

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি বেশ ভাল কায করিয়াছ কনষ্টেবল! উঁহাকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, নেশায় বেহুঁস হইয়াছেন, কিন্তু পরে আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম।"

আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "আমাকে বিষ দেওয়া হইয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "বিষ? কে কিরূপে আপনাকে বিষ দিল?"

আমি বলিলাম, "আমি একটু সুস্থ হইয়া সকল কথা বলিব। কিন্তু আমি বাঁধের উপর আসিয়াছিলাম কিরূপে, আমি যে বেজ ওয়াটারে গিয়াছিলাম।"

কনষ্টেবল বলিল, "সে কথা আমার জানা নাই, মহাশয়! রাত্রি চারিটা কুড়ি মিনিটের সময় আপনাকে ক্লিয়োপেট্রার নিডলের অদূরে দেখিতে পাই। আপনার চারি ধারে দাঁড়াইয়া কয়েকটা ভবঘুরে বেকার গোলমাল করিতেছিল, এই জন্য আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই দলের ভিতর একটা ছোকরা ছিল, তাহার নিকট শুনিলাম, কে নাকি আপনাকে মোটরকারে আনিয়া বাঁধের দেওয়ালের কাছে ফেলিয়া গিয়াছিল। আমি আপনাকে মাতাল মনে করিয়া তাহার কথা কানে তুলিলাম না। আশে-পাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে— তাহাদের কাছে কত মজার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "সেই ছোকরা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য মনে হইতেছে। বেজ ওয়াটারের একটা আতঙ্কজনক বাড়ী হইতে তুলিয়া আনিয়া কেহ নিশ্চয়ই আমাকে সেখানে ফেলিয়া দিয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি সেই ছোকরাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যায় করিয়াছ, কনষ্টেবল!"

তাহার পর তিনি ঔষধের গ্লাসে একটা আরক ঢালিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, "আপনি এই ঔষধটুকু পান করিলে অনেকটা সুস্থ হইবেন। আমার মনে হইতেছে, আপনি মনে কঠিন আঘাত পাইয়াছেন।"

ঔষধটুকু পান করিয়া আমি শয়ন করিলাম, তাহার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "আপনি বিশ্বাস করিবেন কি না, জানি না, কিন্তু সত্যই আমি বদমায়েসের হাতে পড়িয়াছিলাম। যে ছোক্‌রা আমাকে এখানে গাড়ী হইতে নামাইতে দেখিয়াছিল, তাহার সন্ধান হইলে সে গাড়ীখানির চেহারা, নম্বর প্রভৃতি বলিতে পারিত।"

ডাক্তার বলিলেন, "শোন কন্‌ষ্টেবল, এই ব্যাপারের অনুসন্ধান হওয়া উচিত, কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। তুমি যে লোকগুলিকে বাঁধের উপর জটলা করিতে দেখিয়াছিলে, তাহারা বোধ হয় এখনও সেখানে আছে। তুমি এখনই সেখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের দেখিতে পাইবে। কারণ, সেই সময়ের পর এখনও এক ঘণ্টা অতীত হয় নাই।"

আমি কন্‌ষ্টেবলকে বলিলাম, "হাঁ, তোমার যাওয়াই উচিত। আমি সকল কথা এখন বলিতে না পারিলেও একটা কথা শুনিয়া রাখ, আমি একটা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছি। সে অতি ভীষণ ব্যাপার।"

কন্‌ষ্টেবলের সঙ্গে ডাক্তারও উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হত্যাকাণ্ড!"

আমি বলিলাম, "হাঁ, হত্যাকাণ্ড। যে ছোকরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ী হইতে নামাইতে দেখিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পারিলে এই রহস্য ভেদ করা কঠিন হইবে না।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "হত্যাকাণ্ডটা কোথায় হইয়াছে? আপনি বলিলেন না—আপনি বেজ ওয়াটারে গিয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি সাক্ষীটাকে আগে খুঁজিয়া বাহির কর—তাহার পর আমি সকল কথাই বলিব। আর সময় নষ্ট করিও না। শীঘ্র যাও। লণ্ডনের পথে-ঘাটে যে সকল লোককে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়—তাহাদিগকে কিছু কাল পরে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখনও প্রভাত হয় নাই; কন্‌ষ্টেবল, তোমার তদন্তের উপর সকলই নির্ভর করিতেছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

কন্‌ষ্টেবল টুপীটা মাথায় দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। বাঁধের উপর সে যে যুবকটিকে দেখিয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল।

অতঃপর ডাক্তারের পরিচয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার হেন্‌সা। তিনি আমার হাতখানি তুলিয়া লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনি এখন কেমন বুঝিতেছেন—ঠিক বলুন।"—তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়াছিল, কিন্তু আমার বুদ্ধির কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সে সময় আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, কিরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। আমার বক্ষের স্পন্দন মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু পুনর্ব্বার হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হইল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হইল। সে যেন মৃত্যুর সহিত জীবনের যুদ্ধ, যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই—তথাপি মৃত্যু হইল না!"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি কথা কহিতে পারিলেন না, আপনার হাত-পা নড়াইবার শক্তি রহিল না। আপনার শরীর শীতল, কণ্ঠতালু শুষ্ক; কিন্তু আপনার চেতনার ব্যতিক্রম হইল না। আপনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন, এইরূপই ঘটিয়াছিল কি না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সকল লক্ষণই মিলিতেছে। কি জন্য আমার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বলিতে পারেন, ডাক্তার?"

ডাক্তার হেন্‌সা কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করিলেন, তাহার পর আমার চক্ষু, জিহ্বা, হাতের নখ প্রভৃতি পরীক্ষা করিলেন।

আমি ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তিনি উৎসাহভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুম্!" বুঝিলাম, তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইলেন না। আমাকে শুশ্রূষাকারিণীর জিম্মায় রাখিয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন।

শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "উনি এখনই ফিরিয়া আসিবেন, কোন কাযে ডিস্‌পেনসারীতে গিয়াছেন।"

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার

হাতে ইন্‌জেক্‌সনের পিচকিরি, তাহার ভিতর কোন রকম আরক ছিল। ডাক্তার আমার বাহুমূলে পিচকিরি বিদ্ধ করিয়া সেই আরক আমার শোণিতে সঞ্চালিত করিলেন। আমাকে বলিলেন, "ইহাতেই আপনি সুস্থ হইবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার কি বিশ্বাস, আমার দেহে বিষ-প্রয়োগ করা হইয়াছিল?"

ডাক্তার তাঁহার সাদা কোটের পকেটে দুই হাত পুরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আমার বিশ্বাস। আপনার দেহে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ভেরাট্রিণ, সিভেডিন এবং সিভাডিলাইন প্রভৃতির সংমিশ্রণে প্রস্তুত; তাহা দেহে প্রবিষ্ট হইলে ঐ সকল লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান থাকে, অথচ সর্ব্বাঙ্গ 'নুলো' হইয়া যায়, হাত-পা মুখ নাড়িবার শক্তি থাকে না। ইহার ফলে মৃত্যু হয়, কিন্তু সেরূপ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, মনে হয়, দেহের মাংসপেশীগুলি চূর্ণ হইতেছে, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে বলুন, আমি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি!"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, আপনি যে বাঁচিয়াছেন, ইহা অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। যদি ঐ বিষের প্রতিষেধক ব্যবহার করা না হইত, তাহা হইলে আপনার বাঁচিবার কোন আশা থাকিত না। কিন্তু উহার প্রতিষেধকের ব্যবহার-প্রণালীও অত্যন্ত কঠিন। এই সকল বিষের ব্যবহার অতি অল্প লোকেরই সুবিদিত; কে আপনার দেহে ঐ সকল দুর্লভ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, বলিবেন কি? ভৈষজ্য-তত্ত্বে তাহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ!"

আমি বলিলাম, "সে আমাকে যেরূপ কৌশলে বন্দী করিয়াছিল, সাধারণ দস্যু-তস্কররা সে কৌশলের সন্ধান জানে না। এমন কি, আমার একবারও সন্দেহ হয় নাই যে, সেইরূপ ভীষণপ্রকৃতি নরপ্রেতের ষড়্‌যন্ত্রজালে আমাকে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। তাহার চাতুর্য্যপূর্ণ ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হইবার নহে।"

আমি কি ভাবে কুপের গৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, এবং কিরূপ কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা ডাক্তারের নিকট প্রকাশ করিলাম।

ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী আমার অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এমন কি, দ্বারবান্‌টাও তাহা শুনিয়া বিস্ময়ে উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিল।

কিন্তু ডাক্তারের মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; এজন্য তাঁহাকে দোষী করিতে পারি না। সেই অসাধারণ ব্যাপারের কথা বিশ্বাস করা কঠিন—ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ ডাক্তার হেনসা তেমন কল্পনাপ্রবণ লোক ছিলেন না; আমার বিপদ-কাহিনী ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত, এই জন্যই তিনি বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা আমার বিকৃত কল্পনার ফল বলিয়াই মনে করিলেন। বিশেষতঃ আমি যখন তাঁহাকে কুপের ভীষণ-দর্শন চিত্রগুলির পরিচয় দিয়া, কি ভাবে আমার অঙ্গুলি একটি সম্মোমৃতা যুবতীর মুখমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম, তখন তিনি অবিশ্বাস-ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ কথা সত্য, না, তুমি একটা কাল্পনিক গল্প বলিয়া আমাকে আমোদিত করিবার চেষ্টা করিতেছ?—তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়?"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া মনে হইল, আমাকে তিনি একটা অপদার্থ ভবঘুরে বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছেন!

আমি বলিলাম, "আমার নাম সিড্‌নে কোলফাক্স। জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে আমার ঘর আছে।"

ডাক্তার ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "তোমারও ঘর আছে? সত্য না কি?"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "কেন ডাক্তার? আমার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি?"—ডাক্তারের কথা শুনিয়া আমার একটু রাগ হইয়াছিল।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি রাউটন হাউসের কোন নিরন্ন বেকার।—যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দুঃখিত; কিন্তু সত্যই কি আমার ভ্রম?"—ডাক্তার আমার পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, সে হাসি অশ্রদ্ধাপূর্ণ।

ডাক্তারের কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আমার পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, আমার মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ছিন্ন পরিচ্ছদে

আমার দেহ আবৃত রহিয়াছে। তাহা কোন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ নহে।

আমার পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া ডাক্তার হেনসা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে কি তুমি চোরের হাতে পড়িয়াছিলে ?"—কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের আভাস।

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইল না ? আপনি আমার বাসায় টেলিফোন করিলে আমার পরিচারক ডেভিসের নিকট উত্তর পাইবেন। দয়া করিয়া তাহাকে আমার একটা পোষাক আনিতে বলিবেন।"

আমি ডাক্তারকে আমার টেলিফোনের নম্বর দিলে দ্বারবান্ তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন, "মিঃ কোলফাক্স, আপনাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, এ জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে আপনার নিজের বাসা আছে, আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপনার পরিচ্ছদ ও আকার-প্রকার দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। একে আপনার ঐরূপ পরিচ্ছদ, তাহার উপর আপনাকে বাঁধের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল, সেই জন্য আপনাকে একটা ভবঘুরে, মাতাল, বেকার বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল ; আপনি চেতনা লাভ করিয়া যে অদ্ভুত কাহিনী বলিলেন, তাহাও বিশ্বাস করা কঠিন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সুতরাং আপনাকে গৃহহীন নিঃসম্বল বেকার বলিয়া সন্দেহ না হইবে কেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা সত্য ; কিন্তু আজ রাত্রিতে আমাকে যে কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, অন্য কেহ তাহা সহ্য করিতে পারিত কি না, জানি না। তবে আপনাকে আমার বিপদ-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিয়াছি। এখন একটা কথা বলিতে বাকি,—কে আমাকে মোটর-কারে বাঁধের উপর লইয়া গিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই পরিচয় জানা আবশ্যক।"

ডাক্তার বলিলেন, "সম্ভবতঃ সে আপনার উদ্ধারকর্ত্তা। কিন্তু তাহার সন্ধান হইবে কি ? সন্ধান না হইলেও যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আপনি উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সে বাড়ী দেখিলে কি চিনিতে পারিবেন না ?"

আমি বলিলাম, "আমি সেই বাড়ীর ঠিকানা জানি, তাহা ৩৫ নং ওয়েলড়ন ষ্ট্রীট।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা হইলে তদন্তের অসুবিধা হইবে না, আমরা পুলিস ডাকিয়া তাহাদের হস্তে তদন্তের ভার অর্পণ করিব। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টারকে ডাকাইয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিব কি ?"

আমি বলিলাম, "কিছু কাল অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। কন্‌ষ্টেবলটা কি করিয়া আসে, দেখা যাউক।"

বস্তুতঃ আমার ইচ্ছা হইতেছিল, আমি স্বয়ং এই ব্যাপারের তদন্ত করিব। আমার আশঙ্কা হইল, পুলিস যেরূপ দীর্ঘসূত্রী, তাহারা হয় ত কোন গলদ করিয়া বসিবে। ধূর্ত্ত বৃদ্ধ কার্ল কুপকে আমি স্বয়ং পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প হইল। আমি সুস্থ হইয়া স্বয়ং তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইব, এবং পুলিসের সাহায্যে খানাতল্লাস শেষ করিব। যোয়ানের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, আগে তাহাকে সেই দুর্দ্দান্ত নিউবিয়ানটার কবল হইতে উদ্ধার করিব, তার পর কুপকে ও তাহার ভৃত্য ইব্রাহিমকে বিচারকের হস্তে অর্পণ করিব। এই সকল কারণে আমি আগ্রহভরে সেই কন্‌ষ্টেবলের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছু কাল পরে দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ডেভিস্ আমার পরিচ্ছদ লইয়া হাসপাতালে যাত্রা করিয়াছে।—দ্বারবানের কথা শুনিয়া ডাক্তারের সকল সন্দেহ দূর হইল, তিনি পুনর্ব্বার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ডাক্তার আরও প্রায় ১৫ মিনিট আমার পাশে বসিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিলেন, ঔষধও পান করাইলেন। তাহার পর ডেভিস্ আমার পরিচ্ছদ লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আমাকে হাসপাতালের একটা সাধারণ কৌচে শায়িত দেখিয়া এবং আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইল ; অবশেষে অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিল, "আপনি এখানে ! ব্যাপার কি, মহাশয় ?"

আমি বলিলাম, "ও কিছুই নয়, ডেভিস্ ! আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছিলাম।"

ডেভিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "হঠাৎ অসুস্থ হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু আপনি ও রকম ছেঁড়া পোষাকে কেন ?"

আমি বলিলাম, "এই জন্যই ত তোমাকে নূতন এক সুট পোষাক লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিলাম।"

ডেভিস প্রভুভক্ত ভৃত্য; সে আমার সহিত বহুবার পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে পল্টনে চাকরী করিত, মিশর-যুদ্ধে, বুয়ার-যুদ্ধে, ভারতীয় সীমান্তযুদ্ধে সে উপস্থিত ছিল। লোকটি সাহসী, বিশ্বাসী এবং কর্ম্মঠ।

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"মিঃ কোল-ফাক্স অনেকটা ভাল আছেন, শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন।"

ডেভিস্ ডাক্তারকে বলিল, "কিন্তু উঁহার পরিচ্ছদের অবস্থা ওরূপ কেন? দেখিয়া মনে হয়, উনি একটা বেকার কুলী মজুর!"

আমি বলিলাম, "এক জন বন্ধু রহস্য করিয়া আমাকে এই বেশে সাজাইয়া দিয়াছে, ডেভিস্! ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

আমার কথা শুনিয়া সে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না।

অতঃপর আমি উঠিয়া বসিতে পারিলাম, শুশ্রূষাকারিণী আমাকে এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল, তাহা পান করিয়া আমি বেশ আরাম অনুভব করিলাম। আমি আগ্রহভরে কন্‌ষ্টেবলটার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আরও কয়েক মিনিট পরে কন্‌ষ্টেবল একটি দরিদ্র যুবককে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকটির পরিচ্ছদ জীর্ণ, মুখশ্রী মলিন, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে অনাহারে আছে। সে লণ্ডনের নিম্নশ্রেণীর বেকার শ্রমজীবী, ইহা তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষীটার দেখা পাইয়াছি।" তাহার পর সে সেই যুবককে বলিল, "তুমি কি জান, তাহা এই ভদ্রলোককে বল।"

আমি পূর্ব্বেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, এ জন্য সে প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিল না, তাহার পর আমার মুখের দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় চিনিতে পারিল। অবশেষে সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, আমি বাঁধের উপর বোধ হয় আপনাকেই পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, হাঁ, একখান ধূসরবর্ণ ঢাকা মোটরকারে আপনাকে পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের মত লইয়া আসা হইয়াছিল, দেখিয়া তাহা বড়ই মজার ব্যাপার বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। আমার সঙ্গী ডিকি, ডন প্রভৃতি বন্ধুদিগকে বলিলাম, ঐ গাড়ীওয়ালাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই জন্য আমরা একটু আড়ালে গিয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কয় জন আমাকে লইয়া আসিয়াছিল?"

আগন্তুক যুবক বলিল, "দুই জন মাত্র, তাহাদের এক জন যুবতী; এই জন্য আপনাকে গাড়ী হইতে নামাইতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তাহাদের এক জন যুবতী?"

যুবক বলিল, "হাঁ মহাশয়, গাড়ীখান চেয়ারিংক্রশ ব্রিজের দিক্ হইতে আসিয়া ক্লিয়োপেট্রার নিডলের কাছে হঠাৎ থামিল। যে লোকটা গাড়ী চালাইতেছিল, তাহার চেহারা দেখিয়া বিদেশী মনে হইল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিলে একটি সুন্দরী যুবতী বাহিরে আসিল। তাহার পরিচ্ছদ ফিকা নীলবর্ণ, 'ফর'-কোটে দেহ আবৃত। তাহারা দুজনে আপনাকে গাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। তাহারা আপনাকে তাড়াতাড়ি দেওয়ালের পাশে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর আমরা তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবামাত্র তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিছু কাল পরে এই কন্‌ষ্টেবল সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়া, বেহুঁস মাতাল মনে করিয়া আপনাকে গ্রেপ্তার করিল। আমরা তখন সেখানে ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "যে যুবতীটির কথা বলিলে, তাহার বয়স কত? দেখিতে কেমন?"

যুবক বলিল, "বয়স উনিশ কুড়ি বৎসর হইতে পারে। যুবতী পরমা সুন্দরী, তাহার মাথার চুলের উপর দিয়া বেগুণে রঙ্গের মকমলের একটি ফিতা বাঁধা ছিল।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সেই যুবতী যোয়ান ভিন্ন অন্য কেহ নহে; আমাকে মৃত মনে করিয়া সে আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া বাঁধের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল! হা অদৃষ্ট! এই প্রকার বিপজ্জনক দুঃসাহসের কার্য্যে কিরূপে তাহার প্রবৃত্তি হইল? সে কি স্বেচ্ছায় আমাকে সেই স্থানে বিসর্জ্জিত করিয়া গিয়াছিল? যোয়ান,—শান্ত, শিষ্ট, সরল-প্রকৃতি যোয়ানও আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিল? সে তাহার পিতার অনুষ্ঠিত অপকর্ম্ম ঢাকিবার জন্য আমার প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠুরাচরণে কুণ্ঠিত হইল না?—যুবকের কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না; তাহাকে বলিলাম, "তুমি সেই যুবতীকে ঠিক দেখিয়াছিলে কি?"

যুবক দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, নিজের চোখে। তা ছাড়া আমি আপনাকে আরও কোন কোন কথা বলিতে পারি, তাহা আপনার শুনিয়া রাখা উচিত।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

"তখনো ভালো মানুষ সেজে, বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে ক'সে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব,
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে ব'সে।"
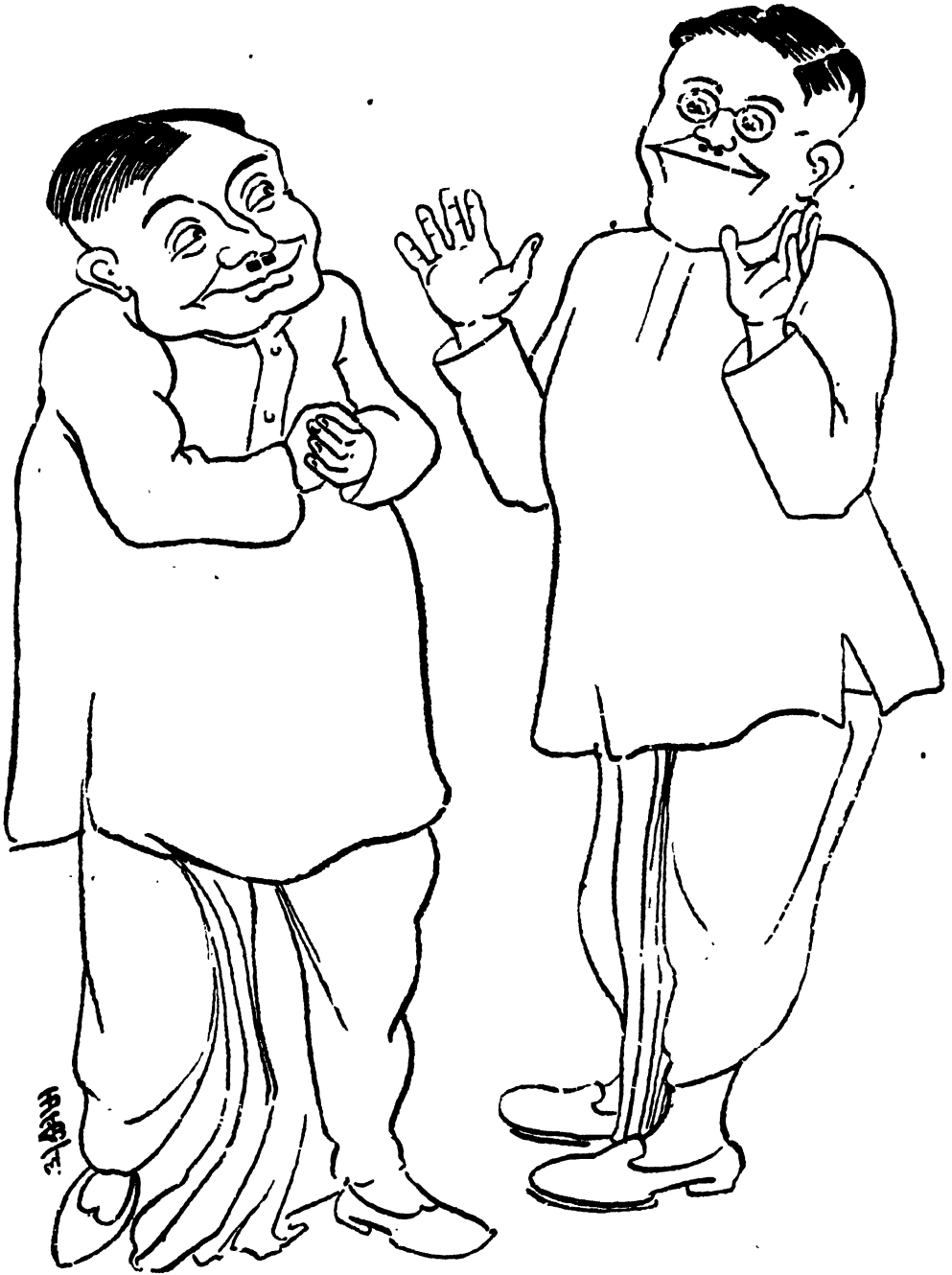
"ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ,
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হ'লেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান।"

"তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা-রসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান!"

"কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল্ তর্ক করে !"

"অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান,
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে ?"
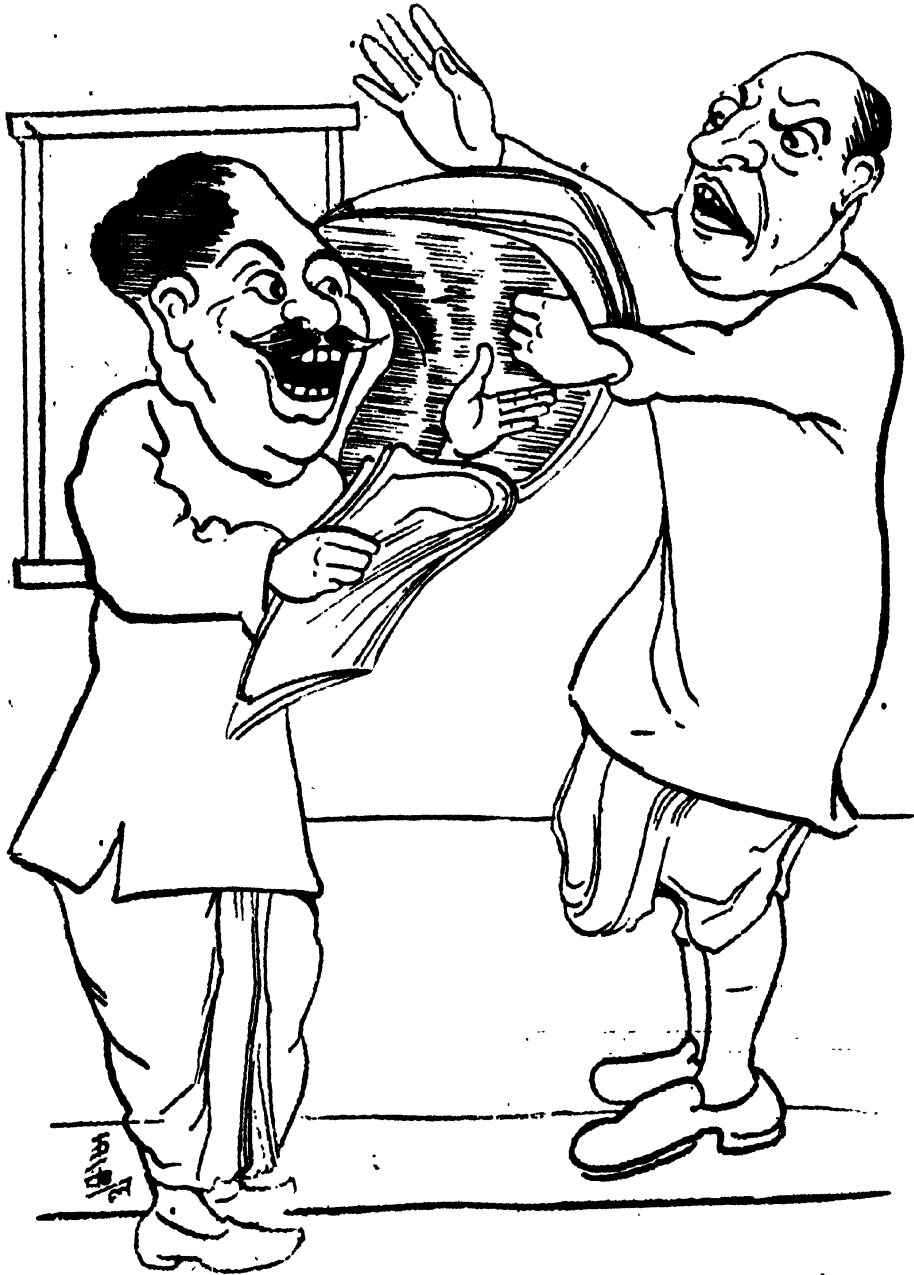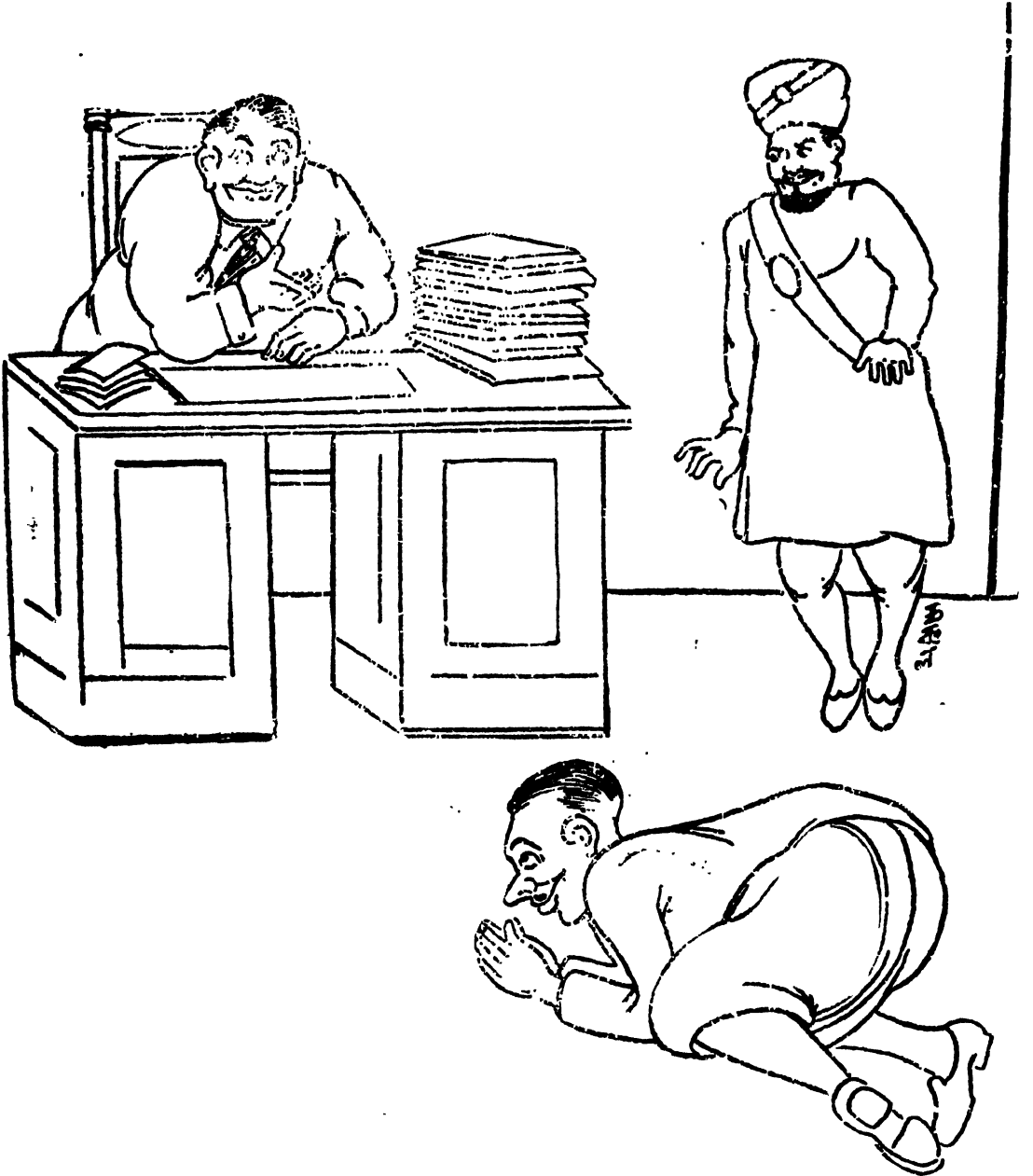
"দাস্তসুখে হাস্তমুখে, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল-কলেবর ।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি' ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর ।"

কথা—বিশ্বকবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] [চিত্র—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পিনালকোডে বিবাহবিধি

গতবারে "আইনে বিবাহবিধি-সংস্কার" শীর্ষক সন্দর্ভে আমি বলিয়াছিলাম, "আমাদের বিশ্বাস, যদি আইন ব্যতিরেকে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে এত ক্ষতি হইত না,—আইন দ্বারা বলপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার ফল অতি ভীষণ হইবে।" এই কথা আমি কেন বলিয়াছিলাম, তাহা জানিবার জন্ত কেহ কেহ আমাকে পত্রও লিখিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, আইনমাত্রেরই অপব্যবহার হইতে পারে, সেই অপব্যবহারে ক্ষতি হইবে, ইহা মনে করিয়াই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমার ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ঠিক ঐরূপ ছিল না। যাঁহারা সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, জীবধর্ম্মী পদার্থমাত্রেরই যেমন ক্রমবিকাশের একটা ধারা আছে, স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমতানতা রাখিয়া উহা যেমন ক্রমশঃ গজাইয়া উঠে, সামাজিক ব্যবস্থাগুলিও, সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা সেইরূপভাবে বাহ্য এবং আন্তর আবেষ্টনগুলির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, উহাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিয়া থাকে। তাহা না হইলে উহা কখনই স্থায়ী এবং হিতসাধক হইতে পারে না। বাহ্য এবং আন্তর আবেষ্টন কাহাকে বলে, এ স্থলে বোধ হয়, তাহা বলা নিতান্তই আবশ্যক হইবে। বাহ্য আবেষ্টন (external environments) অর্থে বাহ্য জগতের যে সকল ব্যাপার মানুষের বাহিরের এবং অন্তরের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তৃত করে, তাহাই বুঝিতে হইবে। যথা জলবায়ু, নৈসর্গিক অবস্থা, সমাজ-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। য়ুরোপীয়রা, বিশেষতঃ প্রাচীনপন্থী য়ুরোপীয়রা, উহাকেই আবেষ্টন বা প্রতিবেশ শক্তি (environments) বলেন। কিন্তু মানুষের বাহিরে যেমন কতকটা প্রতিবেশশক্তি বা আবেষ্টন আছে,—ভিতরেও সেইরূপ অতি প্রবল প্রতিবেশশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাও মানুষের কার্য্যপদ্ধতি এবং সামাজিক নিয়ম-কানুনের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। সেটি হইতেছে তাহার মনোভাব বা মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা কতকগুলি প্রভাবের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। যথা, কৌলিক শক্তি (heredity), শিক্ষা (education) এবং সাধনা (culture)। এই তিনের সমবায়জনিত ফলকে সভ্যতা (civilisation) বলা যাইতে পারে। এই আন্তরিক অবস্থাগুলিকে আমি এখানে আন্তর আবেষ্টন (internal environments) বলিলাম। এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্যগুলি সকলে সহজে যাহাতে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এইখানে আমি এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলাম।

মানুষের এই সকল রীতিনীতির এবং আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হয়, আমি তাহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিব। তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ কি ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহা অনেকে দেখিয়াছেন। এই শ্রেণীর গাছগুলি 'বাগুলা'র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। উহার বৃদ্ধি হয় ভিতর হইতে। গাছগুলি যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনই উহার উপরে নূতন বাগুলা গজাইতে থাকে। সেই বাগুলাগুলি পরিপুষ্ট হইলে নীচের বাগুলাগুলি আপনা আপনিই শুকাইয়া খসিয়া পড়ে। মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারগুলিও অনেকটা সেইরূপ। মনুষ্য-সমাজ সাকল্যে যেমন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই উহার শীর্ষদেশে, অর্থাৎ সমাজের উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে, নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়,—সেই আচার-ব্যবহার পাকাপাকি হইয়া গৃহীত হইলে তবে নিম্নস্তরের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতি ধীরে ধীরে আপনা হইতেই খসিয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কতকগুলি অত্যুৎসাহী লোক গাছগুলিকে অকালে কেয়ারী অর্থাৎ বাগুলাগুলিকে জোর করিয়া খসাইয়া দিয়া গাছগুলির প্রাণসংহার করিয়াছেন; যথাসময়ে সেগুলি ছাড়াইয়া দিলে বরং ভাল হয়। কিন্তু অসময়ে দিলেই সর্ব্বনাশ। মানুষের সামাজিক ব্যবস্থাগুলির পক্ষেও অনেকটা ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। বাহ্য এবং আন্তর প্রতিবেশ শক্তির প্রভাব প্রথমেই সমাজের উন্নত স্তরের মধ্যেই প্রকটিত হইতে থাকে। নারিকেল গাছের উপরে যেমন পাতা গজাইতে দেখিয়া লোক উহার বৃদ্ধির লক্ষণ বুঝিতে পারে,—সমাজের উচ্চস্তরে নূতন রীতি বা প্রথার আবির্ভাব সেইরূপ উহার অগ্রগতির (ভালর দিকেই হউক বা মন্দর দিকেই হউক) লক্ষণ প্রকটিত করে। এখানে বলা আবশ্যক যে, অন্য একটি নারিকেলগাছের কতকগুলি কচি পাতা যদি কোন একটি গাছে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কচি পাতাগুলি দেখিয়া দর্শকের মনে তাহা বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া ধারণা জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বৃদ্ধির লক্ষণ নহে। উহা দর্শকদিগকে প্রতারিত করিবার একটা উপায় মাত্র। রঙ্গমঞ্চেই উহা শোভা পায়, বাস্তব জগতে উহার স্থান নাই। সুতরাং বিদেশী জাতির কোন সামাজিক প্রথা মনোহর বলিয়া মনে হইলে তাহার মোহমুগ্ধ জন কয়েক ব্যক্তি যদি উহা আমাদের দেশে আমদানী করেন, তাহা হইলে তাহার ফল ঘোর অকল্যাণজনক এবং সমাজের বিনাশকর হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দণ্ডপ্রদ আইন করিয়া কোন বিধান সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলে জোর করিয়াই একটা নূতন প্রথা সমাজের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হয়। ইহা অতিশয় ক্ষতিকর না হইয়া পারে না। সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে, "যদি আইন ব্যতিরেকে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে এত ক্ষতি হইত না—আইন দ্বারা বলপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার ফল অতি ভীষণ হইবে।"

অনেকে বলিবেন, ইহা তুল্যতা (analogy) মাত্র, যুক্তিপ্রদর্শন (argument) নহে। ইহা তুল্যতা সত্য, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই তুল্যতা একই কার্য্য-কারণ-ধারা-সমুদ্ভূত। নারিকেল বৃক্ষের ভিতর যে বিকাশশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা বহিয়া কার্য্যপরম্পরার সৃষ্টি করিতেছে, সমাজ-শরীরেও সেই বিকাশশক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট ধারা বহিয়া বিকাশজনিত কার্য্যপরম্পরার সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং উভয়ের এই তুল্যতা সুদূরগামী। এইরূপ

তুল্যতা দেখিয়া জগতের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনুষ্য-সমাজের বিকাশধারার ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, বহু সমাজে লোকের সভ্যতাবিকাশের সহিত প্রাচীন রীতি পরিত্যক্ত এবং নূতন নীতি গৃহীত হইয়াছে। আইন করিয়া কখনই তাহা সম্পাদিত হয় নাই। রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার আন্তর ভাবের বাহ্য প্রতিফলন। সেই বাহ্য-প্রতিফলন যদি বাহ্য প্রতিবেশ শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে উহা উন্নতির কারণ না হইয়া ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং বিকাশটা স্বাভাবিকভাবে হইতে দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। জোর করিয়া উহা করা উচিত নহে। এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিব ইচ্ছা রহিল। সুতরাং বিদেশী ব্যবস্থা জোর করিয়া সমাজে প্রচলন করা এবং করিতে দেওয়া যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহার বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে। সে কারণ-গুলিও বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রত্যেক দেশের জনসমাজে যে সকল রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা তদ্দেশবাসী সামাজিক-দিগের বাহ্য এবং আন্তর আবেষ্টনের ফল। প্রত্যেক সামাজিক ও ধর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠানের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। বিস্মৃতির তমোময় বিবরে সম্পূর্ণরূপে বিলীন কোন অতীত যুগে এক একটা অতীত প্রথার বীজ অতি ক্ষুদ্র বটবীজের ন্যায় সমাজদেহে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার পর কত প্রকার আবেষ্টনের এবং অন্য কারণের প্রভাবে উহা বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সন্ধান করা এবং বিচার করা অতিশয় কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কোন একটা সামাজিক ও ধর্ম্ম্য ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কি, এবং উহা স্বরূপে অথবা বিকৃতরূপে বিরাজ করিতেছে কি না, তাহা বুঝিয়া তাহার প্রকৃত সংস্কার-সাধন করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। সেই জন্য কখনই জন কয়েক লোকের কথামতে বা বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া আচম্বিতে সমাজের একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন-সাধন ঘোর কালাপাহাড়ী কাণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। এরূপ করিয়া অনেক জাতি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে,অনেক জাতি মুমূর্ষু এবং বলবীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা এ কথা বুঝুন আর নাই বুঝুন, জার্ম্মাণীর এবং অষ্ট্রীয়ার মনীষীরা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং সমাজে যদি কোন কুরীতি প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা কোন সুপ্রথা বিকৃত হইয়া কুপ্রথারূপে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের কথা আলোচনা করিয়া ক্রমশ: জনমত গঠন করিয়া উহার উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য। কঠোর দণ্ডমূলক আইন রচনা করিয়া কখনই তাহার উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

পৃথিবীতে নানা দেশে যে অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত অনুমান হইতে কুফল ফলিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত একটু নিরপেক্ষভাবে এবং নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ নিরপেক্ষভাবে কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারে না। সকলেই না হউন, অন্ততঃ পৃথিবীর শতকরা ৯৯ জন লোক অন্তের বা নিজ পূর্ব্ব-গঠিত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, অনেক প্রতিভাশালী লোকই এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তথ্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া এমন একটা জগাখিচুড়ী পাকাইয়াছেন যে, তাহাই তাঁহাদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়াছে। মানুষ অনেক সময় তথ্যের সন্ধান করিয়া এক একটা বিষয়ের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার অন্তরের পূর্ব্বগঠিত সংস্কারের প্রভাব এতই অধিক হইয়া পড়ে যে, সে যে স্থলে কোন জাজ্বল্যমান তথ্যের সন্ধান না পায়, সে স্থলে সে নিজ কল্পনা-বিজৃম্ভিত মিথ্যাকে সত্য তথ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাহা হইতে তাহার সিদ্ধান্ত গঠিত করে। সে যে ইচ্ছা করিয়া তাহা করে, তাহা নহে; সে আপনারই অজ্ঞাতে তাহা করিয়া ফেলে। অধ্যাপক জেমস এণ্টনি ফ্রুড এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে ক্ষেত্রেই তিনি ইংরাজ জাতির ইতিহাসের কোন জটিল তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেইখানেই তিনি দেখিয়াছেন যে, তাঁহার নিজ এবং আধুনিক অন্য কোন ঐতিহাসিক লেখকের অনুমান সত্য বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালের অভি-জ্ঞতা দ্বারা অতীত কার্য্যের প্রেরণার বা অভিপ্রায়ের অনুমান করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। †

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অনেক সময় জাতীয় শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত এবং স্বাধীনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত বুদ্ধি যদি এই প্রকারে স্বদেশের ব্যাপার বুঝিতে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতি-বিভ্রান্ত বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা নিজ দেশের প্রাচীন রীতি-নীতির ও আচার-ব্যবহারের সন্ধান করিতে যাইবেন, তাঁহারাই যে অতি সাংঘাতিক ভুল করিয়া বসিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে? ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে আসিয়া এ দেশটি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাঁহারা যখন এ দেশে প্রথম আইসেন, তখন এ দেশের উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, বৈভব এবং বৈশিষ্ট্য দর্শনে তাঁহারা বিস্ময় মানিয়াছিলেন। আকবরের আমলে যে সকল য়ুরোপীয় এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, তত বড় বিশাল রাজ্য

---

*In perusing modern histories, the present writer has been struck dumb with wonder at the facility with which men will fill chasms in their information with conjecture; will guess at the motives which have prompted actions; will pass their censures as if all secrets of the past layout on an open scroll before him.—Essay on "Dissolution of the Monasteries."

† He is obliged to say for himself that, wherever he has been fortunate enough to discover authentic explanations of English historical difficulties, it is rare indeed that he has found any conjecture, either of his own or of any other modern writer, confirmed. The true motive has almost invariably been of a kind which no modern experience could have suggested.—"Ibid."

দুই শত বৎসর পরে অস্বামিক অবস্থায় পথিপার্শ্বে পতিত বহুমূল্য রত্নের ন্যায় য়ুরোপের এক ক্ষুদ্র দেশবাসীর হস্তগত হইবে। জাহাঙ্গীর এবং শাজাহানের আমলেও তাহা কেহ মনে করিতে পারেন নাই। এ কথা সত্য যে, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাইয়া ঔরঙ্গজেব বাদশাহই এই দেশের সর্ব্বশক্তি ক্ষয় করিয়াছেন। সেই ক্ষীণ অবস্থায় ঘোর অরাজকতা-বিড়ম্বিত ভারত বৃটিশ জাতির হস্তগত হয়। যাঁহাদের হাতে এই দেশ পতিত হইয়াছিল, তাঁহারা শাসক ছিলেন না—বণিক ছিলেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক বা আর্থিক বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুতরাং তাঁহারা কিসে এত বড় দেশকে আপনাদের মুঠার মধ্যে রাখিবেন, সেই চিন্তাই করিয়াছিলেন,—দেশের সভ্যতা বুঝিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির সভ্যতায় লালিত-পালিত এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়া বাস্তব ব্যাপার দর্শনে অভ্যস্ত বৃটিশ জাতি এই ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া উহার নানারূপ কুব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা স্বীয় দেশের অতীত অবদানের অভিপ্রায় বুঝিতে পদে পদে ভুল করিয়া বসেন, তাঁহারা যে এই সুদূর ভারতের সম্পূর্ণ ভিন্নভাবের সভ্যতাসঞ্জাত অতীত প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় যথাযথভাবে বুঝিতে সমর্থ হইবেন, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। কাযেই বৃটিশ জাতি ভারতীয় আচার-ব্যবহার রীতিনীতিগুলির যে বিশেষ নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

তাহার পর বৃটিশ জাতি তাঁহাদের শাসনাধীন ভারতবাসীর জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন,—তাহার দ্বারা তাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ধারা ও জাতীয় বুদ্ধিবিকাশের কোনরূপ সহায়তা করেন নাই। বরং ভারতবাসী যাহাতে বৃটিশ ভাবে প্রভাবিত ও মুগ্ধ হইয়া বৃটিশ জাতির অনুচিকীর্ষু হইয়া উঠে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ শাসকগণ যখন ভারতে শিক্ষাবিস্তার-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তখন ভারতবাসী যাহাতে রুচিতে, সিদ্ধান্তে, ধর্ম্মনীতিতে এবং বুদ্ধিতে ঠিক বৃটিশ জাতিরই অনুবর্ত্তী হইয়া উঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। * সেই শিক্ষার প্রভাবে ভারতবাসী স্বাধীনভাবে স্বীয় দেশের সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার বিচারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই এই ভারতীয় সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছে। ধর্ম্মই ইহার বনিয়াদ। আধুনিক ধর্ম্মহীন অথবা সার জর্জ্জ বার্ডউডের ভাষায় ধর্ম্মবিরোধী (antitheistic) শিক্ষার ফলে আমরা ধর্ম্মেই বিশ্বাস হারাইয়াছি। কাযেই আমরা আমাদের ধর্ম্মের, সভ্যতার এবং সেই সভ্যতাসঞ্জাত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির উপর পূর্ণমাত্রায় অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি। ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এখন তাহাদের দেশের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি বুঝিতে একেবারেই অসমর্থ। কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদের হস্তে যদি সমাজ-সংস্কারের ভার ন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে হিন্দুর সভ্যতা, সাধনা যদি লোপ পায়, তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। যে যাহা বুঝে না, তাহার হস্তে সেই বিষয়ের কোন ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার ভার দিলে তাহার ফল অনেক সময় বিপরীতই হইয়া থাকে।

মানুষ যদি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পূর্ব্বজগণের ধর্ম্ম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস হারায়, তাহা হইলে সে তাহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা বিকট বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে এবং তাহার হাতে যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের উপর ততদূর অত্যাচার এবং অনাচার করিবার চেষ্টা করে। কালাপাহাড় হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তিনি জনৈক সম্রান্ত মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। সেই জন্য তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের ও দেবদেবী-বিগ্রহাদির উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ নেপালের জনৈক রাজার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পরে বলিয়াছেন যে, লোক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মবিশ্বাসে (বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে) আস্থা হারাইলে সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মবিশ্বাসীর উপর ঘোর প্রতিহিংসাসাধন করে। * পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহা ভক্তির জিনিষ, তাহাতেই তাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এরূপ অবস্থায় যাহারা আত্ম

*We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern; a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.—Macaulay's Evidence before Parliamentary Committee.

When the Romans conquered a province, they forthwith set themselves to the task of Romanising it; that is they strove to create a taste for their more refined language and literature, and they aimed at turning the song and the romance and the history, the thought and the feeling and the fancy of the subjugated people into Roman channels which fed and augmented Roman interests. And has Rome not succeeded? Rev. Alexander Duff.

Sir Charles Trevelyan ও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। এ স্থলে আর তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

*This, ... exhibits in an extreme form the re-active antagonism usually accompanying abandonment of an old belief —an antagonism that is high in proportion as the previous submission has been profound. By stabling their horses in cathedrals and treating the sacred places and symbols with intentional insult the Puritans displayed this feeling in a marked manner; as again did the French revolutionist by pulling down sacristics and altar-

শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্মে ও প্রতিষ্ঠানে আস্থাহীন হইয়াছে,—তাহারা যে হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান-গুলিকে অবিচারিত ভাবে অবজ্ঞা করিবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের সময় *বিপ্লববাদীরা তাহাদের পূর্ব্বজগণের যাহা কিছু সম্মানের বস্তু ছিল, তাহারই অসমাননা করিয়া আপনাদের বুদ্ধিহীনতার এবং নৈতিক জ্ঞানের দীনতার পরিচয় দিয়াছিল। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের রোম্যান ক্যাথলিকদিগের উপর ঘোর অবিচার এবং অত্যাচার প্রভৃতি বহু ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে, ধর্মত্যাগী ও সমাজবিদ্রোহীরা তাহাদের পূর্ব্বজগণের এবং তাহাদের আপনাদের পরিত্যক্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ও সমাজের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আপনাদের পিতৃ-পিতামহের এবং নিজ বাল্যজীবনের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সমাজ-বিশ্বাসের উপর ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থার উপর অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। উহার যাহা কিছু ভাল, তাহাও যে উহারা মন্দ বলিয়া মনে করিবে,—ইহা প্রকৃতির বিকৃতি হইতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। তাহার উপর হিন্দু-ধর্ম্মের এবং হিন্দু সামাজিকগণের কতকগুলি অনন্তসাধারণ কার্য্য তাহাদিগের ধর্মত্যাগী ও আচারভ্রষ্টদিগের নিকট অত্যন্ত কঠোর ও অবমাননাজনক বলিয়া মনে হয়। হিন্দুরা আচারকে ধর্ম্ম বলিয়াই মানে। তাহারা মনে করে যে, সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা তাহাদের শ্রুতি এবং স্মৃতিতে যাহা সদাচার বলিয়া কথিত, তাহাই পরম ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে মান্ত,—যাহারা তাহা মানে না, তাহারা ধর্ম্মত্যাগী এবং সমাজদ্রোহী; সুতরাং সমাজ কর্ত্তৃক তাহারা বিষবৎ ত্যাজ্য। * এই অনুশাসন অনুসারে হিন্দুরা তাহাদের শাস্ত্রসঙ্গত আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে বর্জ্জিত করেন। দেশের জনসাধারণ ইহাদিগকে যে অন্তরের সহিত বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, তাহা নহে। সুতরাং

tables tearing mass books into cartridge papers, drinking brandies out of chalices, eating mackerel off petanas making mock ecclesiastical processions, and holding drunken revels in churches. .... the thowing off of the old form involves a replacing of the previous sympathy by more or less of antipathy. What before was revered as wholly true is now scorned as wholly false; and what was revered as valuable is now rejected as valueless.—The Study of Sociology. p. 302.

* যথা—"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।" মনু।

বেদ এবং স্মৃতি কর্ত্তৃক কথিত সদাচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অতএব আত্মবান্ দ্বিজগণ সদাই সদাচার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন।

অপিচ :—"আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্ম্মলক্ষণং"
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

ইহারা বলেন, সদাচার দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি এবং মনের মলিনতা হ্রাস পায়।

হিন্দু-সমাজ এই সকল আচারভ্রষ্ট লোকদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ইহাতেও আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের সমাজদ্রোহিতা বৃদ্ধি পায়।

বিবাহই সকল সমাজের প্রধান এবং আদি বন্ধন, এ কথা য়ুরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দু-সমাজের এই বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। হিন্দু-বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি সুন্দর এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। ইহাতে বাল্য এবং যৌবন বিবাহের অতি সুন্দর সমাবেশ বিদ্যমান। উভয় বিবাহের ভাল দিকটাই ইহাতে গৃহীত হইয়া থাকে। বাল্য-কালে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ না হইলে দম্পতির মধ্যে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা জন্মে না, এ কথা আমি গত ভাদ্রমাসের মাসিক বসু-মতীতে "আইনে বিবাহ-বিধি-সংস্কার"নামক সন্দর্ভে কিছু বলিয়াছি। পাশ্চাত্যখণ্ডের মানবজীবনের বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাল্যকালের সঞ্জাত প্রণয় (calf love) অনেক কবির, অনেক দার্শনিকের ও অনেক বৈজ্ঞানিকের সমস্ত জীবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, অনেকে তাঁহাদের বাল্যসহচরী আত্মীয়ার (cousin) প্রেমে পড়িয়াছিলেন। অনেকে বাল্যকালের প্রণয়িনীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন,—আবার অনেকে তাহা করিতে না পারিয়া সমস্ত জীবন হতাশের আক্ষেপে কাটাইয়াছেন। আমরা বড় বড় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনে ইহা দেখিতে পাই; কিন্তু এরূপ কত ঘটনা ঘটে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলও যে অনেক সময় বিষময় হয় না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। সেই হেতু আমাদের দেশের মনীষীরা বাল্য এবং যৌবন বিবাহের এক অপূর্ব্ব সম্মেলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষের পক্ষে কলিযুগে স্বল্প ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং যে সময়ে পুরুষ এবং নারীর মনে প্রণয়ি-প্রণয়িনী-রূপে অন্যের ছায়াপাত না হয়,—সেই সময়ে তাহাদিগকে ধর্ম্ম্য বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের দোষ পরিহার করিবার জন্য তাঁহারা পত্নী রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সঙ্গত হইতে বিশেষ-ভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যথা :—

"প্রাগ্ রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াৎ গত্বা পতত্যধঃ।
বৃথাকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।"
নির্ণয়সিন্ধুঃ গ্রন্থে যম।

অর্থাৎ রজোদর্শনের পূর্ব্বে পত্নীর সহবাস করিবে না। উহাতে ব্যর্থ শুক্রব্যয় হেতু ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া অধোগামী হইতে হয়। তাহার পর স্ত্রীর যখন নিয়মিত রজঃ-প্রবৃত্তি হয়, তখনই তাহার গর্ভাধান-সংস্কার করিয়া পতি-পত্নী-দেহভোগের অধিকার লাভ করেন। ইহা যে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সুন্দর বিবাহবিধি-সংস্কারের জন্য সমাজ-সংস্কারকগণ কেন এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তাঁহারা যে ভাবে আইন রচনা করিয়াছেন,—তাহাতে যেন তাঁহাদের প্রতিহিংসা-সাধনের প্রবৃত্তিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই আইনে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কেবল

আপনার পূর্ণ চৌদ্দ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবেন, সেই ব্যক্তিই যে কেবল সেই তথাকথিত অপরাধের জন্য ১ মাস কারাদণ্ড এবং এক সহস্র টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহা নহে, পরন্তু সেই বিবাহে পুরোহিত, নাপিত, বরযাত্র, বাজনদার সকলকেই ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে ঐরূপ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন। এরূপ ভীষণ আইন পৃথিবীর কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া কোন সংস্কারকই সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ দেন, তাহা হইলে পুরোহিত, ঘটক, বরযাত্র, বর প্রভৃতি তাহা জানিতে পারিবে কি করিয়া? তোমাদের দেশে এমন কোন বিজ্ঞান আছে কি, যদ্দ্বারা কোন কন্যা ১৩ বৎসর ৬ মাস কি পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর, তাহা ঠিক নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন? অনেক সময় পিতা-মাতারও ত কন্যার বয়স সম্বন্ধে ভুল ধারণা বা হিসাবে ভুল হইতে পারে। পুরোহিত প্রভৃতিই বা তাহা জানিতে পারিবে কিরূপে? সুতরাং এ ব্যাপারে যে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন নিরীহ ব্যক্তি দণ্ডিত হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিহারের বাঢ় সতী মামলায় এক জন আসামীর অপরাধ এই যে, সে মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি ও অন্যান্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে চিতায় অগ্নি সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই,—এবং সে শূদ্র সুতরাং ব্রাহ্মণের চিতায় তাহার অগ্নিসংযোগে অধিকার নাই,—ইহাই তাহার ঐ চিতায় অগ্নিপ্রদান করিতে অসম্মতির কারণ, এ কথা বলাতেও এবং তাহার সেই কথা আদালতে সপ্রমাণ হইলেও পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কোর্টনী টেরেল তাহাকে কিরূপ কঠোর দণ্ড দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা কন্যার বয়স ১৪ বৎসর পরিপূর্ণ অর্থাৎ ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবেন, তাঁহাদের ১ মাস কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। এই দরিদ্র দেশে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বড় সহজ কথা নহে। একে অর্থাভাবে লোক কন্যার বিবাহ দেওয়া অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছে, তাহার উপর যদি কন্যাকর্ত্তার এবং বরকর্ত্তার এইরূপ অর্থদণ্ড হয়, তাহা হইলে যে এই বাঙ্গালা দেশের লোক একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা দেখিয়া এই আইনটি যেন প্রতিহিংসামূলক বলিয়াই মনে হয়।

আইন ত হইল। কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে কি? আমি বারান্তরে সে কথার আলোচনা করিব। আমার বিশ্বাস, ইহাতে উপকার কিছুই হইবে না; অপকার যথেষ্টই হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

শ্রীদুর্গামূর্ত্তি

কে গর্জ্জিছে শ্রীদুর্গার বামপদতলে
ন্যস্ত করি পিঠ গর্ব্বে—দংশিল বৈরীরে,—
স্ফুরিত সৃক্কণী-দন্ত সরস রুধিরে,—
রসনা শুষিছে লোহ; প্রাণপণ বলে

অসুর উঠিতে চাহে—পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া
ধরিল চাপিয়া তারে, অতসী-বরণে,
শোণিমার আভা হাসে—বাজিল চরণে,
মণির মঞ্জীর—রণে অবিচল হিয়া,

দুর্দ্ধর্ষ অসুরনাশে, সহসা প্রকাশ
নব অষ্টভুজ মা'র নানা অস্ত্র সহ,
হৃদয় নির্ভিন্ন শূলে—আনন্দ-আবহ
উথলে দেবের প্রাণে, দৃপ্ত শৌর্য্যোচ্ছ্বাস

ভ্রূকুটী-কুটিল মুখে—ক্রূর নেত্রে জ্বালা,
অধর দংশনে রক্ত, স্থিরা নগ-বালা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মা

১

"জ্যেঠাইমা!"

অলস মধ্যাহ্নের উজ্জ্বলালোকে জ্যেঠাইমা একাগ্রমনে কি পড়িতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য, প্রসন্ন মুখশ্রীতে আনন্দের স্নিগ্ধ হাস্যরেখা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। স্বভাবসিদ্ধ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আয়, বাবা!"

দিনের মধ্যে অসংখ্যবার জ্যেঠাইমার কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া আসা বাল্যকালে আমার নিত্যকর্ম্মের অন্যতম ছিল, এ কথা কেহ বলিলে সত্যের অপলাপ নিশ্চয়ই হইবে না। পড়া জানিয়া লইবার জন্য বড়দা নিশীথচন্দ্রের সহায়তা আমার কাছে অপরিহার্য্য ছিল। রাঙ্গা দাদা আমার এক ক্লাশ উপরে পড়িত, কিন্তু সে আমার খেলার সাথী। মফঃস্বলের পল্লী অঞ্চলে আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসন। মা বাল্যকালেই আমাকে জ্যেঠাইমার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া অনিশ্চিত লোকে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাযেই রাঙ্গাদা বিকাশচন্দ্রের সঙ্গে জ্যেঠাইমার স্নেহ-ক্রোড় অধিকারের দাবী লইয়া পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিত, জ্যেঠাইমার স্নেহ ও আদরে তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিত না। শৈশব ও কৈশোর এমনই ভাবে জ্যেঠাইমার স্নেহচ্ছায়া-শীতল আশ্রয়ে যাপন করিয়া আমরা যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলাম।

মফঃস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতম বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা না থাকায় জ্যেঠাইমা দুই পুত্রকে লইয়া কলিকাতা শ্যামবাজারে বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন। বাবাও বাধ্য হইয়া কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরে আমাদের বাসা ছিল। কিন্তু প্রত্যহ জ্যেঠাইমাকে, বড়দা ও রাঙ্গাদাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। বড়দা বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। রাঙ্গাদা তখন আইন-কলেজে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। আমি বি, এ পরীক্ষা দিয়াছি, তখন দীর্ঘ অবকাশ।

জ্যেঠাইমা নিবিষ্টচিত্তে কি পড়িতেছিলেন, দেখিব আগ্রহ হইল। আমি জানিতাম, পড়াশুনার দি[illegible] জ্যেঠাইমার প্রচণ্ড অনুরাগ। তিনি কোন দেশ-প্রসি[illegible] সাহিত্যিকের কন্যা; তাঁহার নাম বাঙ্গালা দেশের কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অগোচর নাই; সুতরাং জ্যেঠাইমার পিত[illegible] নাম প্রকাশ না করাই সঙ্গত। পুরাণাদি জ্যেঠাইম[illegible] নখদর্পণে ছিল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ত কথাই নাই বাড়ী বসিয়া জ্যেঠাইমা কিছু কিছু ইংরাজীও শিখিয়[illegible] ছিলেন। বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য পড়িতে তাঁহাকে কোন দিন ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। বড়দা জননীর জন্য না[illegible] রকম গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ছোড়দাও এ বিষ[illegible] কম উৎসাহী ছিল না। বিশেষতঃ সে প্রায়ই কবি[illegible] লিখিত, এ জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাহার অকৃত্রি[illegible] অনুরাগ ছিল। "নব্যভারতে"—যখনকার কথা বলিতে[illegible] সে সময় বাঙ্গালা দেশে এত মাসিক পত্রের বাহুল্য ঘ[illegible] নাই—মাঝে মাঝে বিকাশদার লেখা বাহির হইত।

জ্যেঠাইমা আদর করিয়া পার্শ্বে বসাইতেই দেখিলা[illegible] "নব্যভারত"খানি খোলা রহিয়াছে। "মা" শীর্ষক কবিতা পড়িয়াই জ্যেঠাইমার আননে আনন্দজ্যোতিঃ উছলি উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিলাম। কবিতার রচয়িতা যে বিকাশ[illegible] তাহা কবিতার নিম্নের মুদ্রিত নাম হইতেই সুস্পষ্ট হইয়াছি[illegible]

অবশ্য জ্যেঠাইমার হৃদয়ে আনন্দ-রসের তরঙ্গ উঠিব যথেষ্ট কারণ ছিল। বিকাশদা মাতৃ-বন্দনায় যে ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা শুধু পবিত্র নহে, অনব[illegible] চমৎকার। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইলাম। বিকাশ[illegible] জননীকে কতখানি ভালবাসে, মাতার মুখে তৃপ্তি[illegible] হা[illegible] দেখিবার জন্য সন্তানের হৃদয়ে অনুক্ষণ কি প্রেরণা [illegible] বিকাশদা তাহা ভাষার লালিত্যে, শব্দের বিন্যাসে, ছন্দে ঝঙ্কারে নিপুণভাবেই প্রকাশ করিয়াছিল। সে [illegible] প্রকৃ[illegible] মাতৃভক্ত সন্তান, তাহা তাহার এই কবিতা পাঠ করি[illegible] সকলকেই অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। [illegible]

রচনায় এমন অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কোন্ জননীর হৃদয় গর্ব্বে, আনন্দে ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে?

"মা"!—

আমাদের আলোচনার মাঝখানে বড়দা এক মোট জিনিষ লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই মানুষটিকে আমি সত্যই ভক্তি করিতাম। এমন স্বল্পভাষী ও সদা-প্রফুল্ল মানুষ আমি কমই দেখিয়াছি। কোন বিষয়েই তাঁহাকে অধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখিতাম না। অথচ মনে হইত, এমন গভীর-হৃদয়, স্নেহময় মানুষের সংস্রবে আসিয়া যেন ধন্য হইয়াছি। বড়দা নিশীথচন্দ্র যেন অতলস্পর্শ সমুদ্র, অল্প বাতাসে তাহাতে তরঙ্গ উঠে না। সকল সময়েই প্রশান্ত, নিষ্কম্প, স্থির!

জ্যেঠাইমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বড়দার হাত হইতে বোঝাটা নামাইলেন।

উহার মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল না; কারণ, জানিতাম—বড়দা প্রত্যহই জ্যেঠাইমার মুখরোচক নানা প্রকার ফলমূল, তরিতরকারী নিজে কিনিয়া আনিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখি নাই।

বড়দা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাহারা কথা কহে কম, কিন্তু কায করে বেশী। এটর্ণীর আপিসে কায করিয়া বড়দা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে সংসার-প্রতিপালন হইলেও, তিনি অবকাশকালে প্রত্যহ কোনও সংবাদপত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন জানিতাম। তাহাতেও কিছু অর্থ ঘরে আসিত। সাহিত্যের ভক্ত হইলেও কোনও দিন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করিতে দেখি নাই।

বিকাশ-দা জ্যেঠাইমাকে বেশী ভালবাসে কি বড়দা জ্যেঠাইমার অধিক ভক্ত, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল; কারণ, বিকাশ-দা এই বয়সেও মা'র ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, নানা প্রকার গল্পগুজব করিয়া যে ভাবে সকল অবস্থায় জ্যেঠাইমাকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করিত, নিশীথ-দাকে খনও তাহা করিতে দেখি নাই। তবে মাতাকে আহার না করাইয়া বড়দা কোন দিনই আপিসে যাইতেন না। রাত্রিকালেও মাতার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার জলযোগ দেখিতেন। পীড়ার সময় নিশীথদার সেবানিপুণ হস্ত জননীর পরিচর্য্যায় কখনও ক্লান্ত হইতে দেখি নাই।

জ্যেঠাইমা "নব্যভারত"খানা বড়দার হাতে দিয়া বলিলেন, "বিকাশ লিখেছে।"

বড়দা নীরবে উহা পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বিকাশের মনের ছবি কাব্যে ফুটে উঠেছে।"

সে কথা ধ্রুব সত্য।

২

আইন-পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, বিকাশ-দা উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জব্বলপুরে হরবিলাস বাবু সদর-আলার কায করিতেন। তাঁহার একমাত্র সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার সহিত বিকাশ-দার বিবাহ কলিকাতা সহরেই নিষ্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ উপলক্ষে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত ত হইলামই—জ্যেঠাইমার আনন্দোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া ততোঽধিক সন্তোষ জন্মিল।

কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি জননীর একটা গোপন আকর্ষণ থাকে বলিয়া বিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কথাটা কতদূর সত্য, জানি না, তবে মাতৃভক্ত ছোটদার বধূকে পাইয়া জ্যেঠাইমা যে খুবই খুসী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইল।

বড়দার যত্ন ও চেষ্টার ফলেই বিকাশ-দার এক জন উচ্চ শ্রেণীর অভিভাবক হইলেন। রাজদ্বারে হরবিলাস বাবুর অবাধ গতি এবং রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহার যথেষ্ট খাতির ছিল। জীবন-সংগ্রামে বিকাশ-দাকে সম্ভবতঃ বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

বিকাশ-দার কবিতাচর্চ্চা তখনও প্রবল-বেগে চলিতেছিল। সুন্দরী তরুণী পত্নীর স্বামী হইয়াও তাহার রচনার বিষয়নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তন তখনও দেখা যায় নাই। মানুষের কর্ত্তব্য, সন্তানের দায়িত্ব কত গুরু, মানুষের আদর্শ ও লক্ষ্য কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত, বিকাশ-দার রচনায় তাহার অনবদ্য ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যাইত। জন্মভূমিকে ভক্তি করিবার একমাত্র সোপান জননী, তাঁহার তৃপ্তিসাধনে ভগবানের প্রীতি জন্মে, এইরূপ নানাপ্রকার

ভাবব্যঞ্জনায় বিকাশ-দার কবিতা সর্ব্বদা পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিত।

প্রায় সমবয়স্ক হইলেও বিকাশ-দার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। আমাদের বংশের এক জন যে এমন অনবদ্য কাব্য রচনা করিয়া পাঠকসমাজে সমাদৃত হইতেছে, এ জন্য আমি একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতাম। বিশেষতঃ আমার জননীরূপিণী, স্নেহময়ী জ্যেঠাইমার হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল, পুত্রকীর্ত্তি ও ভক্তির আতিশয্যবশতঃ সদাপ্রসন্ন, প্রভাত-পদ্মের বিকশিত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতে দেখিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিতাম।

সে দিন সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিস জমিয়া উঠিয়াছিল। রবিবারে নিশীথ-দা কোথাও যাইতেন না। ছুটীর দিন বলিয়া মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে লইয়া বিশ্রম্ভালাপে আনন্দ পাইতেন। আমি বুঝিতাম, এই দিনটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। বিকাশ দাও রবিবারটি অবসর-যাপনের জন্য রাখিয়া দিত। সে এখন আলিপুর জজ আদালতে নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া বাহির হইতেছিল বটে; কিন্তু অর্থ-লাভের বিশেষ সম্ভাবনা তখনও দেখা যায় নাই। বিকাশদার স্ত্রী তখন জব্বলপুরে।

জ্যেঠাইমা সে দিন আমাদের জন্য নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমন প্রায়ই হইত। সেগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছি, এমন সময় জ্যাঠাইমা কাছে আসিয়া বসিলেন।

"আজ বেহাইয়ের যে চিঠি পেয়েছি, তার কি ব্যবস্থা করা যায়, নিশি?"

বড়দা প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে, তাই হবে।"

বিকাশদা দেখিলাম, পাণের কৌটা হইতে একসঙ্গে গোটা দুই পাণ লইয়া মুখে ভরিয়া দিল।

ব্যাপার কিছুই আমার জানা ছিল না। বলিলাম, "কার চিঠি, বড়দা?"

বড়দা লণ্ঠনের পলিতাটি আর একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "বিকাশের শ্বশুর মশাই চিঠি লিখেছেন, বিকাশ যদি জব্বলপুরে যায়, অল্পদিনের মধ্যে একটা মুন্সেফী তার হ'তে পারে।"

পরানুগ্রহে জীবন-যাপন, অথবা দাসত্ব, বাল্যকাল হইতেই আমার আদর্শের বিরোধী ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মতপ্রকাশ হঠকারিতা বলিয়া আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলাম না।

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তা বিকাশের যদি ভাল হয়, সেটা করা উচিত নয় কি?"

বড়দা নির্ব্বিকার-চিত্তে বলিলেন, "নিশ্চয়ই। বড়-মানুষ শ্বশুর, তার উপর লোকবল আছে। তিনি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই হয় ত বিকাশ জজ হয়েও যেতে পারে। আমার খুব মত আছে।"

জ্যেঠাইমা কনিষ্ঠ সন্তানের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন "কি রে বিকাশ, তোর মত আছে ত?"

বিকাশদার সুগৌর আননে রক্তিমচ্ছটার বিকাশ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইল না। সে নত-নেত্রে বলিল, "তোমাদের যদি মত থাকে, তবে তাই হবে।"

জ্যেঠাইমা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতৃ হৃদয়ের রহস্য বুঝিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। কাহারও [illegible] আছে, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না।

আলোকরশ্মি জ্যেঠাইমার নির্ব্বাক্ আননে খেল করিতেছিল। নীরবে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম।

জানি না, উহা চাপা দীর্ঘশ্বাস কি না। জানি না, উহা মাতৃ-হৃদয়ের গভীর বেদনা অথবা আনন্দের প্রেরণায় বক্ষঃ পঞ্জরকে কম্পিত করিয়া বহির্গত হইল কি না। কি জ্যেঠাইমার নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত যে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিভ্রম নহে!

"তুমি জব্বলপুরেই যাও। তাঁর বড় সাধ ছিল, তাঁ কোন সন্তান দেশের হাকিম হয়। সে সুযোগ যখন এসেছে ছাড়া উচিত নয়, কি বল নিশি?"

নিশীথদা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সে কথা ত আমি আগেই বলেছি, মা।"

দেখিলাম, সকলেই প্রসন্ন-মনে সমস্যার মীমাংসা করি লইলেন। কিন্তু আমার হৃদয় ইহাতে সাড়া দিল না, তা গোপন করিব না। আমি জানিতাম, বিকাশদা বড়দা হৃদয়ের কতখানি অংশ জুড়িয়া আছে; আমি জানিতা বিকাশদাকে ছাড়িয়া থাকিতে জ্যেঠাইমার হৃদয়-[illegible] ছি প্রায় হইবে। আর বিকাশদা? কি জানি! [illegible] স্নেহময় ভ্রাতা ও পরম স্নেহময়ী জননীকে দীর্ঘ [illegible] দেখিয়া থাকিতে পারিবে?

মনের সংশয় প্রকাশ করা সঙ্গত নহে বলিয়া আমিও এ মীমাংসায় সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলাম।

৩

পিতাকে সংসারে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করিবার পর তিনি বৈতরিণীর পরপারে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইলেন! জ্যেঠাইমার স্নেহশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এই দুঃসহ শোকে আংশিক সান্ত্বনা মিলিল, অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যপালনেও তিনি সহায় হইলেন।

পিতা কিছু অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের ৬ মাস পরে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মদেশে অভিযান করিলাম। দাসত্ব করিব না সঙ্কল্পই ছিল। শুনিয়াছিলাম, নানাপ্রকার ব্যবসায়ের সুবিধা ও-দেশে আছে। বিশেষতঃ কাঠের কারবারে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

জ্যেঠাইমার চরণ-ধূলির সহিত জয়শ্রী-লাভের আশীর্ব্বাদ, বড়দার স্নেহালিঙ্গনের স্মৃতি লইয়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিলাম। বিকাশদা তখন জব্বলপুরে শ্বশুরভবনে।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর কাল বঙ্গদেশের শ্যামল প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইবার অবসর ঘটিল না।

জ্যেঠাইমা ও বড়দার পত্র নিয়মিত সময়ে পাইতাম। কুশলপ্রশ্ন ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সংবাদ দেওয়া বোধ হয় উভয়েরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পত্রে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব কখনও অনুভব করিতে পারি নাই।

বিকাশ-দা প্রথম প্রথম নিয়মিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখিত। কিন্তু ক্রমেই তাহা দুর্লভ হইয়া আসিতে লাগিল। এই পনেরো বৎসরের মধ্যে তাহার কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মুন্সেফী হইতে প্রথম শ্রেণীর সবজজের পদেও তাহার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছিল. সে সংবাদও জানিতাম। দীর্ঘকাল পরে কখনও সম্বলপুর, কখনও রায়পুর, কখনও বা অন্য কোন সহর হইতে মাঝে মাঝে দুই একখানা সংক্ষিপ্ত-পত্রও পাইতাম। কার্য্যের পেষণে তাহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই; এই সংবাদেই পত্রের অধিকাংশ কলেবর পূর্ণ থাকিত।

কাঠের ব্যবসায়ে জননী ইন্দিরার আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু জন্মভূমিতে ফিরিবার সুযোগ ঘটিল না। রেঙ্গুন-প্রবাসী, স্বজাতি ও স্বশ্রেণী কোন ভদ্র পরিবারের কন্যাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে জয়লাভ করিয়া যখন একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলাম, তখন দেখিলাম, যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, প্রৌঢ়ত্ব তাহার দাবী লইয়া দেখা দিতে আসিয়াছে।

শ্যামাঙ্গিনী জন্মভূমির ক্রোড় হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু জননীর মূর্ত্তিকে কখনও ভুলিতে পারি নাই। কেহ ভুলিতে পারে কি না, জানি না। এমন দুর্ভাগা যদি কেহ থাকে, তাহার জন্য দুঃখ হয়।

মাতৃভাষার সহিত যোগসূত্র অচ্ছেদ্য রাখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের গ্রাহক ছিলাম। অপ্রচুর অবসরের মধ্যেও তাহাদিগের প্রত্যেক পৃষ্ঠার মধ্যে আমার দেশ-জননীর সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতাম। বিকাশ-দার লেখা কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। মুন্সেফী পদ গ্রহণের পর সে যে কাব্যচর্চ্চা করিয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন সাময়িক পত্রাদিতে খুঁজিয়া পাই নাই। এ জন্য তাহাকে প্রথম প্রথম অনেক-বার পত্র লিখিয়াছিলাম। সে সকল পত্রের উত্তর কোনও-বার অত্যন্ত বিলম্বে পাইয়াছি, কখনও পাই নাই। কৈফিয়ৎ-স্বরূপ সে আমাকে জানাইয়াছিল যে, দাসত্বের পেষণে কাব্য-চর্চ্চার অবসর তাহার নাই। সে জন্য তাহার হৃদয়ে কোনও ব্যথা জন্মিয়াছিল কি না, পত্রে তাহার কোনও আভাস পাই নাই। তাহার জীবনযাত্রার পথে কোথাও কোন বিঘ্ন নাই, এই তত্ত্বটুকু সে পরিষ্কার করিয়া না লিখিলেও, তাহার পত্রের লেখা হইতে ব্যক্ত হইয়াছিল।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বিকাশ-দা সুখে থাকুক। জ্যেঠাইমা, বড়দাদা তৃপ্তিতে কালযাপন করুন। তাঁহা-দিগকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। এত দূর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে জ্যেঠাইমার চরণে আমার হৃদয়ের সশ্রদ্ধ নতি নীরবে প্রেরণ করিয়া থাকি।

জ্যেঠাইমা ইদানীং স্বয়ং আর আমাকে পত্র লিখিতেন না। বার্দ্ধক্যের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় পত্র লেখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বড়দা আমায় জানাইয়াছিলেন। শুধু প্রতি সপ্তাহে তাঁহারই সংক্ষিপ্ত পত্র আসিত। তাহাতেই আমার তৃপ্তি।

কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কত দিনে দেশে ফিরিতে পারিব—জানি না। ব্যবসায় যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে এক দিনের জন্যও স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। নহিলে একবার সকলকে দেখিয়া আসিতাম।

বড়দাকে কতবার লিখিয়াছি, জ্যেঠাইমাকে লইয়া যদি ব্রহ্মদেশে আসেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু আমার সে সাধ মিটে নাই। বড়দা লিখিয়াছিলেন, জ্যেঠাইমা গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কোথাও এক দিনের জন্যও যাইতে রাজি নহেন। বড়দা আসিতে পারিতেন; কিন্তু জ্যেঠাইমাকে ছাড়িয়া আসিবার সুবিধা তাঁহার হইবে না। বড়দার চরণ-ধূলার যোগ্য হইবার জন্য আমার পুত্র ও কন্যাকে উপদেশ দিতাম।

বিকাশ-দা উপযুক্ত পুত্র। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে জ্যেঠাইমাকে সুখী করিতে পারিতেছে ভাবিয়া মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিতাম। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিকাশ-দা আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। দুঃখ হইল, অর্থোপার্জ্জনের নেশায় অনেক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেছি না।

যৌতুক পাঠাইয়া দিয়া কাকার কর্ত্তব্য পালন করিলাম বটে; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পাইলাম না।

৪

জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে সত্যই এবার চলিয়াছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ২৫ বৎসর পরে আমার চিরারাধ্যা জন্মভূমির স্নেহ-শীতল বক্ষে ফিরিয়া চলিয়াছি। লেক্ রোডের ধারে এটর্ণীর সাহায্যে জমী ক্রয় করিয়া একটা নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। এই লেক্ রোডের সম্বন্ধে—কলিকাতা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল ভূখণ্ডে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বিচিত্র কীর্ত্তি এই 'লেক্' বা হ্রদের বিবরণ সংবাদপত্রের মারফতে পড়িয়াছিলাম।

দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মদেশবাসীর মধ্যে যাপন করিয়া ক্লান্তি আসিয়াছিল। আমার বাঙ্গালী—আমার বাঙ্গালাদেশ সহস্র দোষের আকর হইলেও, আমি সমগ্র প্রাণ দিয়া আমার জন্মভূমিকে, আমার স্বদেশবাসীকে ভালবাসি। কবি সমগ্র প্রাণ দিয়াই গাহিয়াছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি!" সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়-শতদলে জন্মভূমির বিচিত্র মূর্ত্তি অপূর্ব্ব রূপ গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সাগর-তরঙ্গে ষ্টীমার যখন দোল খাইতেছিল, তখনও আমি সুদূর বারি-বিস্তারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার জন্মভূমির তটরেখা দেখিবার আশায় ডেকে বসিয়াছিলাম। গৃহিণী ও পুত্র-কন্যাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। তাহারা কখনও পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমিকে দেখে নাই। তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দুঃখ রাখিব না।

ইন্দিরার অর্চ্চনায়, অর্থের উপাসনায়, তাহাদিগের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাকে কখনও শিথিল হইতে দিই নাই। বাঙ্গালী হইয়া যে বাঙ্গালা-মাকে ভুলিয়া থাকে, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

না, এখন হইতে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে দেশছাড়া করিব না। রেঙ্গুনের ব্যবসায়কে কলিকাতায় লইয়া আসা একান্ত দুর্ঘট নহে।

তৃতীয় দিবসে কলিকাতায় ষ্টীমার-ঘাটে জাহাজ নোঙ্গর করিল। বড়দা বা জ্যেঠাইমাকে বিস্মিত করিয়া দিব বলিয়াই তাঁহাদিগকে আমাদের আগমন-সংবাদ জানাই নাই। ঘাটে আমার এটর্ণীর নিযুক্ত লোক আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। নবনির্ম্মিত বাড়ীতে উঠিব না, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। গৃহপ্রবেশের সময় জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে প্রয়োজন।

এটর্ণীর লোক আমাদিগকে অন্য একটি বাসায় লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। দ্রব্যাদি ও পরিচারকদিগকে সেই বাসায় লইয়া যাইতে বলিয়া, আমি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলাম। বড়দার ওখানে গিয়া অগ্রে জ্যেঠাইমার পদধূলি লইব।

নির্দ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিল।

শতাব্দীর একপাদ কলিকাতায় অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে সহরে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান-গুলি চিনিবার উপায় নাই। বড়দা কলিকাতার দক্ষিণাংশে কালীঘাট অঞ্চলে কয়েক মাস পূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। স্থান চিনিয়া লইয়া বাড়ী নির্দ্দেশ করিতে কিছু সময় লাগিল।

একটি জীর্ণপ্রায় একতল অট্টালিকার সম্মুখে ট্যাক্সি থামিল। নূতন কিছু করার যুগে, চারিদিকে নূতন রাজপথ, নূতন ইমারত রচনার যুগে, মান্ধাতার আমলের ক্ষুদ্র একতল গৃহটি এখনও আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে বিস্ময় উপভোগ করিবার সময় তখন ছিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখের মুদীর দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বড়দা এই বাড়ীতেই আছেন বটে। ইতস্ততঃ না করিয়াই স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ছোট বাড়ী, দুইখানি কক্ষ। সম্মুখের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, "বড়দা!" সম্মুখে যিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে প্রথম দৃষ্টিপাতে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম।

হাঁ, আমার চিরপরিচিত বড়দাই তিনি; কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন!

চশমার মধ্য হইতে আমার দিকে মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে, বিলাস? তুই যে হঠাৎ?"

আমার পশ্চাতে একটু দূরে গৃহিণী পুত্র-কন্যাকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সে দিকে একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়াই বড়দা বলিয়া উঠিলেন, "সঙ্গে বৌমা?" বড়দা যেন অত্যন্ত চঞ্চল—অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পথ দেখাইয়া বলিলেন, "এস মা-লক্ষ্মি, ভিতরে এস।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অতীত যুগের কি একটা সম্পদ্ যেন আলাদীনের প্রদীপস্পর্শে দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! কি সে সম্পদ্!

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বড়দা ডাকিলেন, "মা, বিলাস এসেছে।"

শয্যার উপর জ্যেঠাইমার উপবিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলাম। তাঁহার সম্মুখভাগে দুই তিনটি বালিস পরস্পরের উপর রক্ষিত। জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা তাহার উপর ভর দিয়া আছেন।

সমস্ত অন্তর অজ্ঞাত বেদনায় যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। ঐ কি আমার সেই স্নেহময়ী, সহিষ্ণুতা ও মমতার আদর্শ-রূপিণী জ্যেঠাইমা? সেই তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ কোথায় গেল? বার্দ্ধক্যের প্রলেপে কি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তাঁহার স্নেহ-সুধা-স্নিগ্ধ আয়ত নেত্রযুগল হইতে অনুক্ষণ করুণার নির্ঝর গলিয়া পড়িতে দেখিতাম। আজ সে নেত্রযুগলের দীপ্ত তারকা এমন নিষ্প্রভ কেন? শুধু জরা সকল সুষমা হরণ করিয়া লইয়াছে?

আন্দোলিত হৃদয়কে যথাসাধ্য সংযত করিয়া জ্যেঠাইমার পদধূলি লইলাম। গৃহিণী পুত্র-কন্যাকে লইয়া জ্যেঠাইমার অপর পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। তাঁহার নত মস্তকে হাত রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত জ্যেঠাইমা নীরব হইয়া রহিলেন। বুঝিলাম, মাতৃ-হৃদয়ের আশীর্ব্বাণী ধীরে ধীরে গৃহিণীর মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। বার্দ্ধক্যশীর্ণ আননে এখনও অতীত যুগের প্রসন্নতা অন্তর্হিত হয় নাই। আশীর্ব্বাদলাভের সময় তাহা বুঝিলাম।

বাহিরে জ্যেঠাইমা ও বড়দার শরীরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আমাকে বিচলিত করিল। বড়বৌদির আকৃতিতেও সে আভাস পরিস্ফুট। কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে, ব্যবহারে দীর্ঘকালের, ২৫ বৎসরের ব্যবধানজনিত কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড়দা ও জ্যেঠাইমা উভয়েরই চোখে ছানি পড়িয়াছিল। বড়দার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়াছে; কিন্তু জ্যেঠাইমা উহা ফিরাইয়া পান নাই। বড়দা প্রায় তিন বৎসর বেকার বলিলেই হয়। দৃষ্টিশক্তির দোষে কায করিবার সুবিধা তাঁহার নাই। জ্যেঠাইমা ও বড়দার নিকট আর কোন কথা আদায় করা গেল না।

কিন্তু বড়বৌদিকে আমি অল্পে ছাড়িয়া দিলাম না। বাহিরের বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া আমার প্রশ্নবাণে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। স্পষ্টভাবে কোন কথা না বলিলেও ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল।

বিকাশ-দা এই ২৫ বৎসরের মধ্যে মাতার জন্য এক কপর্দ্দকও পাঠায় নাই। কন্যার বিবাহের সময় একবার-মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহা ছাড়া জননীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কখনও বিকাশ-দার তরফ হইতে আগ্রহ বা উদ্যোগ-আয়োজন কেহ দেখে নাই। শুধু তাহাই নহে—পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জননী বা জ্যেষ্ঠাগ্রজ পাঁচখানি পত্র পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

কবি কাব্য লেখেন—অনেক কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না,

প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু দুই একটা শব্দে, দুই চারিটি বাক্যের অন্তরাল হইতে অনেক তত্ত্ব, বহু অলিখিত ইতিহাস মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রসজ্ঞ পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

'বৌদিদির স্বল্প কথার অন্তরাল হইতে পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস বিরাট গ্রন্থের আকারে যেন লিপিবদ্ধ হইয়া উঠিল।

ক্ষুধার নিবৃত্তির প্রয়োজন। বড়দাকে বলিলাম, এই বেলা এখানেই আমরা আহার করিব। বাহিরে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল। জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই ট্যাক্সিতে একা চড়িয়া বসিলাম। বাজারের দিকে গাড়ী ছুটিল।

কেহ বলিয়া দেয় নাই; কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের কঠোর জীবন-সংগ্রামের অভ্রান্ত চিহ্ন আমার আরাধ্য জ্যেঠাইমাতা, বড়দাদা প্রভৃতির দেহ ও মনে কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, তাহা অনুমান করা কি কঠিন? হায়! বিকাশ-দা! এমন করিয়া সে যে আমার সমস্ত আদর্শকে চূর্ণ করিয়া দিবে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই!

কিন্তু আমার অপরাধেরই বা প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? কর্ত্তব্য কি আমারও ছিল না? লক্ষ টাকা যে কোনও দিন ব্যাঙ্ক হইতে যে ব্যক্তি বাহির করিতে পারে, তাহার জননীরূপিণী জ্যেঠাইমাতা ও জ্যেষ্ঠাগ্রজকে নিদারুণ অভাবের পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সে তাহার ধনভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিতে পারিত না? প্রতি মাসে দুই এক শত টাকা ব্যয় করা তাহার কাছে কত তুচ্ছ? না, না—এ বিস্মৃতির, এ উপেক্ষার মার্জ্জনা নাই।

দেড় সহস্র টাকা মাসিক উপার্জ্জনকারী বিচারকের জননী ও সহোদরকে অর্থসাহায্য করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া স্তোকবাক্যে আত্মপ্রতারণার কোন মূল্য নাই। কেহ আবেদন করিলে তবে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে? ইহা ত ভারতবর্ষের চিন্তাধারার অনুকূল নহে।

অনুশোচনায় সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। প্রায়শ্চিত্ত চাই—চাই!

৫

সপ্তমী-পূজার দিন নূতন বাড়ীতে জ্যেঠাইমাকে লইয়া প্রবেশ করিব, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার জননীর স্থান তিনিই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে আসিবার সময় একবারও কল্পনা করিতে পারি নাই, জ্যেঠাইমাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিব। শুধু বয়সের ধর্ম্মে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা ছাড়া তিনি যে শারীরিক ও মানসিক বেদনার যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছেন, ইহার আভাস পাইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে আমার বাসাবাড়ীতে আমি জ্যেঠাইমা ও বড়দা প্রভৃতিকে লইয়া গেলাম। তাঁহাদের কোন প্রকার আপত্তি শুনিলাম না। জ্যেঠাইমার শরীরে পদার্থ ছিল না। ডাক্তার রায় আমাকে গোপনে বলিয়াছিলেন, আর দীর্ঘকাল তাঁহাকে পৃথিবীতে ধরিয়া রাখা যাইবে না। বড় জোর মাসখানেক এই জরাজীর্ণ দেহকে কোনমতে চির-অবসানের প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

আপনাকে সংযত করিতে পারি নাই। সম্বলপুরে বিকাশদাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাইব না। যে জননীর সংবাদ লইবার অবকাশ পায় না, তাহার কাছে জ্ঞাতি ভ্রাতার আশা কতটুকু?

মনে হয়, কেন এমন হইল? মাতৃবন্দনায় যাহার লেখনী অনুক্ষণ পবিত্র হইত, মাতার কথা বলিবার সময় যাহার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইত, সে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর সেই জননীকে কেমন করিয়া ভুলিয়া রহিল? অর্থ-বৈভব ও পদমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার জননী ও সহোদরকে অনশন, পীড়া ও দুর্দ্দশার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই কেন?

গৃহপ্রবেশের উৎসবে জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একটা কর্ত্তব্য পালন করিলাম।

বিস্ময়স্তম্ভিত-হৃদয়ে বড়দার মাতৃসেবা দেখিতাম—দেখিয়া সহস্রবার তাঁহার চরণধূলি লইয়া পবিত্র, ধন্য হইবার বাসনা জন্মিত। মুখে শব্দ নাই, জীর্ণ দেহে ক্লান্তি নাই, নিশীথচন্দ্র সারারাত্রি মাতৃরোগ-শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত। সাবধানে ঔষধ-পথ্য সেবন করান, নির্ব্বিকার-চিত্তে মলমূত্র পরিষ্কারে অবহিত হওয়া, সহস্র উপায়ে পীড়িতার সুখ-বিধানের জন্য চেষ্টা—ধন্য জননি! এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে!

কিন্তু বিকাশ-দা !—সেও ত এই জননীরই মেদ-মজ্জা-রক্তধারার অধিকারী !

আশ্চর্য্য ! জননী একবারও এই পুত্রের সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন না ! নির্ব্বিকারচিত্ত বড়দার মুখে কনিষ্ঠ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নাই !

ক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িলে আমার মুখ হইতে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হইয়া পড়িত। জ্যেঠাইমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেন, "শক্তি থাকলে সে কি না ক'রে পারত, বাবা ! অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—আহা, বাছা আমার কুলিয়ে উঠতে পারে না !"

হায় ! স্নেহমুগ্ধা, মমতাময়ী, ক্ষমার আদর্শস্বরূপা মাতৃ-হৃদয় !

বড়দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাতায়নের ধারে দাঁড়াইতেন। চশমার মধ্য হইতে তাঁহার দীর্ঘায়ত নয়ন ছল-ছল করিয়া উঠিত, দেখিতাম।

লজ্জায় নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম।

সে দিন ভোরবেলা বাহির হইয়াই দেখিলাম, বড়দা পথের ধারে এক ব্যক্তির সহিত মৃদুস্বরে কি বলিতেছেন। আমাকে দেখিয়া লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বড়দা একটু কুণ্ঠিতভাবে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

মনটা যে কৌতূহলাক্রান্ত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিব না।

সন্ধ্যার পর বড়দা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "বিকাশ, আমার এই বই তিনখানার গতি ক'রে দিতে পারিস ?"

তাঁহার হাতে কয়েকখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।

"তোমার নিজের লেখা, বড়দা ?"

মৃদু হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

দেখিলাম, তিনখানিই উপন্যাস। বড়দা সারা জীবন ধরিয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন ?

"গ্রন্থস্বত্ব যদি বেচতে হয়, সেও ভাল। তোর ত—বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ আছে ; তাঁকে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু কি তোমার এমন প্রয়োজন, যাতে এখন গ্রন্থস্বত্ব বেচে ফেলবে ?"

বড়দা মাথা নত করিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ঋণী—শোধ দেবার অন্য উপায় নেই।"

প্রশ্নজালে বড়দাকে বিব্রত করিয়া তুলিলাম। বধূ ঠাকুরাণী এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িলেন। সরলা নারীর নিকট হইতে বাকী কথাটা জানিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। জননীর চিকিৎসার জন্য, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বহু অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছে।

"দাদা, আমি তোমার ভাই নই ? আমার দায় আমাকে উদ্ধার করিবার অনুমতি দাও।"

বড়দার চোখে কখনও অশ্রু দেখি নাই। আজ বন্যার ধারা প্রথম দেখিলাম।

* * * *

জ্যেঠাইমাকে রক্ষা করা বুঝি গেল না। উত্তর পাইবার মাশুলসহ জরুরী তার করিয়াছিলাম। বিকাশ-দা আসিল না, জবাব পাইলাম, "অসম্ভব। ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। দুঃখিত।" ম্যাজিষ্ট্রেট নহে, জেলার জজ, পূজার সময় দুই তিন দিনের জন্য পরলোকপথযাত্রিণী জননীকে শেষ দেখা করিবারও সময় পায় না !

ক্ষোভে, ধিক্কারে মনে হইল, ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, তন্মধ্যে এই মহালজ্জাকে সমাধিস্থ করি।

বড়দার শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখে পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। জ্যেঠাইমাকে এই নৃশংস সংবাদ কোনমতে জানাইতে পারা গেল না। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু অগ্রসর হইতেছিল ; দৃঢ়, অমোঘ গতির বেগ কে রুদ্ধ করিবে ?

"বিকাশ !"

জ্যেঠাইমার উচ্চারিত তিনটি অক্ষর তিনটি অগ্নি-গোলকের ন্যায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিল।

বড়দা জননীর শিরোদেশে বসিয়া সন্তর্পণে শুষ্ক কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিলেন। বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আসুক—শিক্ষা-দীক্ষায় যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার জীবনে বিজয়া-দশমীর প্রয়োজন আছে। জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রভাবে ঘরে ঘরে যে মিলনের দৃশ্য অভিনীত হয়, তাহার যথার্থ মর্ম্ম-কথা জানিবার প্রয়োজন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু যাহার কথা মনে করিয়া এই কথা ভাবিতেছিলাম, সে ত মধ্যপ্রদেশের বিচারাসনে বসিয়া ইহজগতের বস্তু-তান্ত্রিক সুখ-স্বপ্নে অচেতন হইয়া রহিয়াছে। মাতৃবন্দনার গান যে অঙ্গুলির চালনায় উত্থিত হইয়াছিল, সেই করাঙ্গুলি অনায়াসে শুধু দুঃখপ্রকাশ করিয়াই নিস্তব্ধ হইয়াছে ! মাতার অন্তিম আশীর্ব্বাদ তাহার সম্বিৎকে ফিরাইয়া আনিবে না কি ?

বহুদূর হইতে উৎসববাদ্যের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রতিশোধ

হতাশ

স্থির প্রতিজ্ঞা

রূপমুগ্ধ

অভিনেতা—শ্রীসুকুমার মিত্র।

ভয়ে স্তম্ভিত

আতঙ্ক

চিন্তায় তন্ময়

ঘৃণায় শিহরণ

অভিনেতা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহামায়ার খেলা

১

গৌরীপদ বাবু মফঃস্বলের এক জন বড় জমীদার। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, লেখাপড়া শিখিবার জন্ম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলজফীতে অনার পাইয়া বি, এ পাশ করার পর কলেজের সহিত সম্বন্ধও ঘুচিয়াছে। যে জন্ম কলিকাতায় আসা, তাহা শেষ হইলেও কলিকাতায় বাস শেষ হয় নাই, বরঞ্চ জমিয়া বসিয়াছে। বিধবা জননী যোগমায়া বড় বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী নারী। তিনি পুত্রের লেখাপড়া শেষ হইলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া, জমীদারীর কাযকর্ম্ম তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কাশীবাস করিতেছেন। কাশীতে সদাচার ও ধার্ম্মিকতার সহিত দিনযাপন করেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া কাশী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, "আমি আর দেশে ফিরিতে চাহি না। বধূমাতাকে লইয়া তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, আমাকে কাশী হইতে ফিরাইবার জন্ম কোন চেষ্টা করিও না। আমার জীবনের শেষ কয় দিন তোমাদের মঙ্গলকামনায় বিশ্বনাথের চরণ স্মরণ করিয়া কাটাইতে পারিলে আমার জন্মলাভ সার্থক বলিয়া বোধ করিব।"

আট বৎসর পূর্ব্বে যোগমায়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে সুশিক্ষিত সুচতুর গৌরীপদ বাবু উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে পৈতৃক জমীদারীর যথেষ্ট আয় বাড়াইয়াছেন। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মহেন্দ্রপ্রাসাদ তুল্য বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বৎসরের মধ্যে দুইবার তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করেন; একবার কাশীতে যাইয়া জননীর চরণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন, আর একবার সুদূর মফঃস্বলে জমীদারীর ও লেনদেনের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য মাসখানেক জন্মভূমিতে কাটাইয়া আসেন।

এইভাবে আট নয় বৎসর কাটিয়া যাইবার পর গৌরীপদ বাবুর মনে মনে সঙ্কল্প হইল যে, একবার মাতাঠাকুরাণীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন, কলিকাতার নূতন বাড়ী, নূতন বাগান, মোটরগাড়ী প্রভৃতি তাঁহাকে দেখাইয়া তাঁহার মনের সাধ মিটান। তাঁহার মনে আর একটা বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁহার সুন্দর সুকুমার শিশু-পুত্র ও কন্যাকে জননীর কোলে এ পর্য্যন্ত বসাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, জননী বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র, কন্তা বা গৃহিণীকে লইয়া কাশীতে আমার কাছে যাইও না, আমি সত্য সত্যই সংসারের মায়া কাটাইতে চাহি। কাশীতে বসিয়া তাহাদের মুখ দেখিয়া আবার সংসারে আকৃষ্ট হইবার প্রলোভন হয় ত আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। আমি বিশ্বনাথের সেবায় অপরাধিনী হইব।

গৌরীপদ বাবুর মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল, জ্ঞান হইবার পর কখনও জননীর আজ্ঞা, তিনি মনে মনেও লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু জননীকে কলিকাতার বাটীতে আনিবার জন্ম তাঁহার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিত, কাশীতে যাইয়া কয়েকবার যোগমায়ার নিকট এ প্রস্তাব তিনি যে না করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু জননীর ঔদাস্যপূর্ণ সস্মিত প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে আর বেশী কথা বলিবার অবসর দেয় নাই।

২

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকায় অবগাহনান্তে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে দর্শন ও পূজা শেষ করিয়া বেলা ২টার সময় যোগমায়া বাটীতে ফিরিলেন। বাটীখানি উত্তরবাহিনী গঙ্গার একেবারে তীরের উপর। দেখিতে ছোট হইলেও বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাটীখানি ত্রিতল, উপরে দুইখানি ঘর, একখানি ঠাকুরঘর, আর একখানি শুইবার ঘর, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্ষীয়সী ঝি শূন্য ফুলের সাজি হস্তে যোগমায়ার পশ্চাতে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—"মা, পিয়ন পত্রখানা এইখানে ফেলিয়া গিয়াছে। এ যে বাবুর পত্র" বলিয়া পত্রখানা উঠাইয়া লইল। যোগমায়া বলিলেন, "পত্রখানা এখন রাখিয়া দাও। আমি হবিষ্য করিয়া যখন বিশ্রাম করিব, তখন দিও, পড়িব।" বাটীতে লোকের মধ্যে আর দুই জন, এক জন যোগমায়ার সুদূর-সম্পর্কের বিধবা ভগিনী, কাশী আসিবার সময় তাহাকে তিনিই সঙ্গে করিয়া দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। আর এক জন ভৃত্য, সে-ও বাঙ্গালী। বাল্যকাল হইতেই সে এ সংসারে প্রবিষ্ট, বড় বিশ্বাসী ভৃত্য, বয়স তাহার পঞ্চাশেরও অধিক হইয়াছে।

যোগমায়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পূজার উপকরণ পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত ছিল। আসনে ধ্যান-মগ্ন-নেত্রে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেন। তাহার পর সেই ধ্যানকল্পিত দেবতা-মূর্ত্তিকে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হর্ষাশ্রু-সিক্ত-নয়নে বাহ্য উপকরণ পুষ্প, বিল্বপত্র ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিলেন, এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তাহার পর স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া ইষ্টদেবতার উদ্দেশে সমর্পণ পূর্ব্বক হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া যোগমায়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন; একখানি কুশাসনের উপর উপবেশন পূর্ব্বক সম্মুখে প্রবাহিত ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশিত করিলেন। জপমালা লইয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল, "মা, এই সেই চিঠিখানি।" "তাই ত, আমি ত ও কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম," এই বলিয়া চিঠিখানি হাতে করিয়া মনে মনে ভাবিলেন—'এ সব আর কেন, জপের

সাথী

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

বিয়, আচ্ছা দাও দেখি চশমাখানা।" এই বলিয়া চিঠিখানি উন্মুক্ত করিলেন, দাসী চশমা আনিয়া দিল, তাহা চোখে দিয়া তিনি চিঠিখানি পড়িলেন, একবার নহে—দুইবার, তিনবার চিঠিখানি পড়িবার পর তাঁহার একটা বড় দীর্ঘ নিশ্বাস যেন অন্তরপ্রদেশ শূন্য করিয়া বাহির হইল। দাসী দূরে দাঁড়াইয়া যোগমায়ার এই ভাবান্তর নিরীক্ষণ করিল; একটু ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা! এ কি বাবুর চিঠি? খবর ভাল ত?"

তাহার দিকে না চাহিয়াই যোগমায়া চিঠিখানি আবার পড়িলেন, পরে দাসী সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, খবর সবই ভাল, তুমি এখন একবার ঠাকুর মহাশয়ের বাসায় যাইয়া বল, তিনি যদি দয়া করিয়া সন্ধ্যার মধ্যে এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।" দাসী চলিয়া গেল, চিঠিখানা মুড়িয়া খামের মধ্যে রাখিয়া অস্ফুটস্বরে 'দয়াময় বিশ্বনাথ! এ আবার কি খেলা খেলিতে আরম্ভ করিলে!' এই বলিয়া জপের মালা হাতে করিয়া শূন্যনয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়া তিনি জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৃষ্টি স্থির হইল, হাতে মালা 'ঘোরা' বন্ধ হইল, যোগমায়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

৩

ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার দর্শন পাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার চরণের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থাপিত একখানি গালিচার ভাল আসনে যোগমায়া ঠাকুর মহাশয়কে বসাইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের নাম বামদেব ভট্টাচার্য্য। দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ, বয়স ষাট পার হইয়াছে, তাঁহার প্রশান্ত-গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিলে মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় প্রসন্ন হয়। মুখে হাসি সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, জপে-তপে-পাণ্ডিত্যে সাধু ও সরল ব্যবহারে বাঙ্গালীটোলার সকল বাঙ্গালী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট। তিনি কাশীতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। তীর্থে প্রতিগ্রহ তিনি করেন না, দেশে কিছু বিষয় আছে, পুত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শিষ্যসেবকও যথেষ্ট আছে। সুতরাং দেশ হইতে পুত্র যাহা পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই স্বচ্ছন্দভাবে তাঁহার কাশীবাস নির্ব্বাহ হয়।

গুরুদেব আসনে বসিলে যোগমায়া সেই পত্রখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং বলিলেন, "গৌরীপদর এই পত্রখানি আপনি পড়ুন, পড়িয়া কি উত্তর আমি দিব, তাহা বলুন।"

ঠাকুর মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"মা, কা'ল শেষরাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। বাবা যেন আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'গৌরীপদ! এখনও প্রতিমা আরম্ভ কর নি? আর ত বেশী দিন নাই, আমার পৈতৃক পূজা কতকাল হইতে হইতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তুমি কি সেই পূজা বন্ধ করিয়া দিলে? জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিমা আরম্ভ করিতে ভুলিও না। যদি তুমি আমার সাধের দুর্গাপূজা না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, আর আমি তোমার বাড়ীতে কখনও আসিব না।' স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাবার পর আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, আমি যখন বড় শিশু ছিলাম, বাবা যখন জীবিত ছিলেন, তখনকার আমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজার অস্পষ্ট চিত্র, এতকাল পরে, মা, আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই মা, তোমার আজ্ঞা লইয়া আমার এই কলিকাতার নূতন বাড়ীতে এ বৎসর দুর্গোৎসব করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু মা, তুমি যদি না এস, তাহা হইলে আমার দুর্গোৎসব হইবে কেমন করিয়া? তাই প্রার্থনা করিতেছি, মা, তুমি আমাকে এ বৎসর দুর্গোৎসব করিবার অনুমতি দাও, জন্মাষ্টমীর আর বিলম্ব নাই, শীঘ্র এ বিষয়ে তোমার কি আদেশ, তাহা জানাইবে। সুকুমার ও মলিনা ভাল আছে। আমাদের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবে এবং শীঘ্র পত্রের উত্তরে তুমি মা কেমন আছ, তাহা জানাইবে ইতি।

প্রণত দাসানুদাস
গৌরীপদ।"

ঠাকুর মহাশয় পত্র পড়িলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। যোগমায়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমার প্রতি কি আদেশ হয়, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি যে, এ জীবনে কাশী পরিত্যাগ করিব না, ইহা আপনিও জানেন, গৌরীও জানে। আশ্চর্য্যের কথা, গৌরীর পত্রে যে রাত্রি-শেষে তাহার ঐ স্বপ্ন দেখার কথা লিখিত হইয়াছে, সেই রাত্রিশেষে আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমার সেই পরিত্যক্ত স্বামিগৃহে পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব হইতেছে, কর্ত্তা নিজেই পূজা করিতেছেন, আর আমি পূজার উপকরণ সাজাইয়া দিতেছি, গৌরীপদ ও বৌমা গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া জগজ্জননী মহামায়ার স্তব করিতেছে। ভক্তির বিমল অশ্রুধারায় তাহাদের নয়ন ও বদনমণ্ডল সিক্ত হইয়াছে।

"এই স্বপ্ন দেখিয়া আর গৌরীপদর এই পত্র পাঠ করিয়া এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আমি বুঝিতেছি না; জানি না, বিশ্বনাথ কি খেলা করিতেছেন, এ কি হতভাগিনীকে কাশী হইতে তাড়াইবার বিচিত্র উপায়?"

এই বলিয়া যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুকাল চিন্তা করিয়া বামদেব ঠাকুর বলিলেন,—"দেখ মা, আমার মনে হয়, এ বৎসর গৌরীপদের দুর্গোৎসব করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমারও এই গৌরীপদের প্রথম দুর্গোৎসবে যাওয়া উচিত। ইহাতে শঙ্কার কারণ কি মা, দিন পনর হয় ত তোমাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে হইবে, আবার ফিরিয়া আসিবে।"

যোগমায়া বলিলেন,—"আপনার যদি ইহা মত হয়, তবে তাহাই হউক, কিন্তু আমি মনে করি, গৌরীপদর এই দুর্গোৎসব তাহার কলিকাতার বাড়ীতে না হইয়া আমার স্বামীর পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপেই হওয়া উচিত। কারণ, আমি স্বপ্নে ঐরূপই দেখিয়াছি। ইহাতে যদি আপনি সম্মতি দেন, তাহা হইলে তাহা আমি গৌরীপদকে জানাইতে পারি।" যোগমায়ার কথা শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "এ সিদ্ধান্ত মন্দ নহে, কিন্তু ইহাতে গৌরীপদ দুঃখিত হইবে, আমি জানি। কলিকাতায় নূতন বাড়ী করিয়া তোমাকে লইয়া গিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমার সম্মুখে তাহার সাক্ষাৎ চিন্ময়ী মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সাধ বহু দিন হইতেই তাহার মনে উদিত হইয়াছে, এই কারণে দেশে পূজা হইলে তাহার সে সাধে বাধা পড়িবে। যাহাই হউক, তুমি যাহা

মনে করিয়াছ, তাহাই হউক, গৌরীপদকে দেশে পূজা করিবার জন্ম পত্র দ্বারা তোমার অনুমতি জানাও। আমার সন্ধ্যার সময় হইয়াছে, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গুরুদেব গাত্রোত্থান করিলে যোগমায়া ভক্তিভাবে আবার তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে।"

৪

ভবানীপুরের বাড়ীতে যথাসময়ে যোগমায়া দেবীর পত্র পৌঁছিয়াছে। দোতলার একটি কক্ষে গৌরীপদ বসিয়া আছেন। নিকটে তাঁহার পত্নী সুশীলা দেবী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগমায়া দেবীর পত্র লইয়াই আলোচনা হইতেছে। সুশীলা বলিলেন, "আমার কিন্তু মনে হয়, দেশে যাইয়া এই বৎসরের পূজা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।" সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া গৌরীপদ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "অসম্ভব কেন, মা যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন যেমন করিয়াই হউক, আমাদের দেশে গিয়া পূজা করিতেই হইবে। খরচ বেশী হইবে, তাহার উপর সে দেশে ম্যালেরিয়া আছে, যাতায়াতের ক্লেশও যথেষ্ট আছে, ইহা আমি সবই জানি; কিন্তু মা'র যখন ইচ্ছা হইয়াছে, এতকাল পরে তিনি এই পূজার উদ্দেশেই দেশে আসিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আর আলোচনা করিয়া লাভ কি? আমি আজই ম্যানেজারকে পত্র লিখিতেছি, যেন সত্বর বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের আবশ্যক মেরামতকার্য্য যত শীঘ্র হয়, সারিয়া ফেলিতে হইবে। পুরোহিত ঠাকুরকে খবর দিয়া ঠিক করিতে হইবে এবং আগামী জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাকে আনাইয়া কুমোরকে ডাকাইয়া প্রতিমা আরম্ভ করা হউক।"

সুশীলা বলিলেন, "আমি এ সকলের জন্ম ভাবি না, যাতায়াতের ক্লেশও সহিতে পারিব, ম্যালেরিয়াকেও ভয় করি না; কিন্তু আমার বড় ভয় হয়, গ্রামের দলাদলিতে। মনে নাই কি! খোকার ভাত দিবার সময় কি গণ্ডগোলই উঠিয়াছিল। তুমিই বলিয়াছিলে, দেশে খোকার অন্নপ্রাশন দিতে আসিয়া কি ঝকমারী করিয়াছি, এমন কায আর করিব না। জানি না কেন, আমার কিন্তু দেশে যাইয়া পূজা করিতে কেমন একটা আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সকল কথা খুলিয়া তুমি মাকে আবার চিঠি লিখ, সেই পত্র পাইয়াও তিনি যদি দেশের বাড়ীতে পূজা করার মত করেন, তখন অগত্যা তাই করিতে হইবে।"

গৌরীপদ বলিলেন, "দেখ সুশীলা, আমার মাকে তুমি এখনও চিনিতে পার নাই। আমি যদি আবার তাঁহাকে এই সকল কথা লিখি, তাহাতে তিনি নিজ সঙ্কল্পের যে পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা অসম্ভব, হয় ত বিপরীত ফলই ফলিবে, কায কি ও পথে যাইয়া? মা যখন আদেশ করিয়াছেন, বাবাও এই অভিপ্রায় যখন প্রকাশ করিয়াছেন, আমি দেশেতেই পূজা করিব। মা আসিবেন, তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া আমি জগন্মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিব, এ সাধু কার্য্যে কোন ব্যাঘাতই হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি হয়, জগজ্জননী তাহার প্রতীকার করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। সুশীলা, তুমি প্রস্তুত হও। বৃথা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইও না। আমি আজই ম্যানেজারকে পত্র লিখিতেছি। তুমি বাধা দিও না। তোমার হাসিমুখ না দেখিয়া আমার কোন কার্য্য করিতে মন এগোয় না।"

স্বামীর এই কথা শুনিয়া সুশীলা দেবী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল। হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, এবার একটা নূতন খেলা খেলিবার তোমার ইচ্ছা হইয়াছে। সুতরাং আমার কি সাধ্য, কি শক্তি যে তাহার বিরোধ করিব? তাহাই হউক, তুমি ম্যানেজারকে পত্র লিখ।" প্রসন্ন-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে গৌরীপদ বাবু অফিস-ঘরে আসিয়া বসিলেন, এবং তখনই ক্ষিপ্রহস্তে সকল বিষয়ের কর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া ম্যানেজারকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, এবং তাহা তখনই পোষ্টাফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

৫

যশোর জেলার ইছামতীর তীরে লোকনাথপুর একখানি বড় গ্রাম। গৌরীপদ বাবুর পিতা লোকনাথ বাবুর নামে এ গ্রামের নাম হইয়াছে। লোকনাথ বাবু দরিদ্রের সন্তান হইয়াও নিজের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার প্রভাবে বিশাল জমীদারী অর্জ্জন করিয়া এই লোকনাথপুর গ্রামে তাঁহার বিরাট বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অবশ্য এই গ্রামেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। পুরুষানুক্রমে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসা করিতেন, যে চালা-ঘরের চণ্ডীমণ্ডপে শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ব হইতেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে নূতন করিয়া পাকা বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখে চতুর্দ্দিকে জোড়া থাম্বার উপর বিশাল ছাদের নীচে সুদৃঢ় সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে পূজার সময় ঐ সভামণ্ডপে কত যাত্রা, কত কীর্ত্তন, কত পাঁচালী হইয়া গিয়াছে। দাশু রায় গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী প্রভৃতি বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ সুকবিগণের রসভাবময় মধুর গান ঐ সভামণ্ডপে কত বার হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এখনও প্রসঙ্গ উঠিলে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকনাথ বাবুর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার সেই বড় ধুম-ধামের দুর্গোৎসব লোকনাথপুরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই দুর্গোৎসবের কথা স্মরণ করিয়া এখনও গ্রামের লোক দুঃখ প্রকাশ করে, লোকনাথ বাবুর উপযুক্ত পুত্র গৌরীপদ জমীদারীর অবস্থা আরও উন্নত করিয়াছেন, অর্থের অভাব নাই, লোক-জনেরও অভাব নাই, কেন যে তিনি গ্রামে আসিয়া দুর্গোৎসব করেন না এই কথা লইয়া প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় গ্রামের প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলনও হইয়া থাকে। অযাচিত হইয়া অনেক আত্মীয়-স্বজন, লোকের দ্বারাই হউক বা পত্রের দ্বারাই হউক, এই সকল আন্দোলনের কথা গৌরীপদকে জানাইয়াও থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ দেশে দুর্গোৎসব করিবার জন্ম ম্যানেজার নীলকণ্ঠ বাবুর নিকট জমীদার গৌরীপদ বাবুর পত্র আসিয়াছে শুধু তাহাই নহে, এই পূজা উপলক্ষে গৌরীপদ বাবুর ধর্ম্মশীলা জননীও আসিবেন, পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইবে। যাত্রা থিয়েটার, কীর্ত্তন আর তিন দিন ব্যাপিয়া জগদম্বার প্রসাদ অকাতরে অন্নের বিতরণ হইবে। এই সকল ব্যাপার হঠাৎ গ্রামের লোক শুনিল। সকলেই বিস্মিত হইল। অনেকেই বলিয়া বসিল

গৌরীপদ বাবুর এবার মতিবিপর্য্যয় হইয়াছে। সুতরাং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহাই হউক, গৌরীপদ বাবুর সঙ্কল্পিত দুর্গোৎসবের নামে সেই অবসাদগ্রস্ত নিষ্কর্ম্মা গ্রামবাসীদিগের মধ্যে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। দুর্গোৎসব লইয়া আলোচনা, আন্দোলন, তর্ক-বিতর্ক ও শেষে বচসা প্রভৃতিও আত্মীয়, অনাত্মীয় ও মধ্যস্থ জনতার মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিন মনিবের আদেশ অনুসারে নীলকণ্ঠ বাবু পুরোহিত কমলাকান্ত স্মৃতিভূষণকে ডাকাইয়া নদীয়া হইতে প্রসিদ্ধ কুম্ভকার আনাইয়া প্রতিমা আরম্ভও করাইলেন। গ্রামের বর্ষীয়সী আত্মীয়মহিলাগণের সাহায্যে ম্যানেজার নীলকণ্ঠ বাবু জগন্মাতার পূজার উপকরণ সামগ্রীসম্ভার যথাবিধি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র নিমন্ত্রিত, সমাগত, রবাহূত, উচ্চ, নীচ সকল নরনারীর ভূরি প্রসাদভোজনের আয়োজন বিরাটভাবে হইতে লাগিল। আনন্দময়ীর আগমনের পূর্ব্ব হইতে গ্রামে কেমন একটা সজীবতা ও আনন্দের সুন্দর ছবি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে উল্লসিত হইতে লাগিল।

৬

কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক যে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে কোন মঙ্গলকার্য্যই যে নির্ব্বিঘ্নে ঘটিবে, তাহা কি সম্ভবে। সাধে কি কবি বলিয়াছেন ?

"প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।"

লোকনাথপুরের জমীদার-বাড়ীতে নূতন দুর্গোৎসব-ব্যাপারেও সেইরূপ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামে এক জন নাপিত থাকিত, লোকটা খুব ধড়িবাজ, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ তাহার যজমান ছিল। জমীদারবাড়ীর পূজার উদ্যোগের অভূতপূর্ব্ব ধূমধাম দেখিয়া এক দিন সায়ংকালে সে গ্রামের এক বৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইল। অধ্যাপক মহাশয়ের নাম শূলপাণি ন্যায়ালঙ্কার। বাড়ীতেই তাঁহার চতুষ্পাঠী, তিন চার জন ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়াই তিনি ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াও থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত বঙ্গদেশে ত দূরের কথা, সমগ্র ভারতে কখনও হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও অতি বিরল, এখন ত কেহ নাই। লোকে বলে, তাঁহার বিদ্যা আজন্মসিদ্ধ, তিন চার জন বড় অধ্যাপকের অন্তেবাসিত্ব কিছু দিনের জন্য তাঁহার যে না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে পড়াইতে গিয়া ঐ সকল বড় বড় অধ্যাপকও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাযে কাযেই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কাহারও অধ্যাপনায় তুষ্ট না হইয়া অবশেষে ঘরে ফিরিয়া নিজের আজন্মসিদ্ধ বিদ্যার উপর চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিয়াছেন। ছাত্র পড়িবার সময় বুঝিতে না পারিয়া যদি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে কিছু প্রশ্ন করে, তাহা হইলে ছাত্রের বিপদের সীমা থাকে না, রাগিয়া উঠিয়া এমন তাড়া দেন যে, জীবনে আর কখনও সে ছাত্র তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। শুধু কি, শাস্ত্রেই অগাধ পাণ্ডিত্য! তাহা নহে, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কঠোর নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাঁহার আচার সবই শাস্ত্রসম্মত, কলিযুগের চারিদিকে কদাচারের বিস্তৃতি দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই চটিয়া লাল হইয়াই আছেন, স্বপাক আহার করা তাঁহার আজন্মসিদ্ধ। এমন কি, গৃহিণীর পাকও তিনি স্পর্শ করেন না। ইংরাজী পড়া-শুনাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করেন। বামুনের ছেলে চাকরী করিতেছে শুনিলে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে, অসদাচারী ব্যক্তিকে একঘরে করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত, ইত্যাদি গুণগণভূষিত কলিযুগের বৃহস্পতিকল্প ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সম্মুখে হাজির হইয়া সেই নরসুন্দর গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া এক লম্বা প্রণাম করিল। সে প্রণামের মাত্রা এতই দীর্ঘ যে, শেষে বাধ্য হইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "তাই ত গোবর্দ্ধন, আজ বড় ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম দেখিতেছি, ব্যাপারখানা কি রে ? ওঠ, যথেষ্ট হইয়াছে।" অনেক কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া ছলছলায়মান-নেত্রে গোবর্দ্ধন বলিল, "ঠাকুর, আপনি আছেন, তাই রক্ষা, যত দিন আপনি, তত দিনই আমাদের দেশে ধর্ম্ম থাকিবে।"

ঈষৎ হাসিয়া, গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু নেত্রদ্বয়ে তাকাইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"ওরে, ও সব ভূমিকা রেখে দে, ব্যাপারটা কি, খুলে বল্ দেখি!" গোবর্দ্ধন বলিল—"ঠাকুর, আমার সব কথাতেই আপনার কেমন একটা তাচ্ছীল্যের ভাব। ব্যাপার কি আপনি জানেন না! এই যে জমীদারবাড়ীর জাঁকজমকের পূজা আসিতেছে, কলিকাতায় বাস করিয়া জমীদার বাবু সাহেবিয়ানায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। শুনিতে পাই, তিনি না কি নূতন করিয়া সমাজ গড়িতে চাহেন। তিনি আসিয়া আমাদিগের গ্রামে দুর্গোৎসবের নামে কি যে একাকার করিবেন, তাহা ভাবিয়া আমি ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। গাঁয়ের লোকগুলো ত সব ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, বাবুর মতলব ত তাহারা কেহই বুঝিতেছে না। ঠাকুর, এ বিপদে রক্ষা করিতে আপনি ছাড়া আর কেহই নাই।"

নরসুন্দরের ভূমিকার আড়ম্বর দেখিয়া তাহার প্রকৃত মৎলবটা কি, তাহা বুঝিতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতের দেরী হয় না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওহে গোবর! ও সব ফাঁকা কথায় কিছু হইবে না। গৌরীপদ বাবুকে আমি বেশ চিনি, দেশের লোকও তাঁহাকে ভালবাসে, খাতির করে, অনেকে তাঁহার অনুগ্রহও প্রার্থনা করে। আমি শুনেছি, তোর না কি জমীদার-বাড়ীতে যাওয়ার পথ বন্ধ হইয়াছে, তোর অপরাধটা কি, বিনা কারণে গৌরীপদ বাবু তোমার বৃত্তিচ্ছেদ করিয়াছেন, এমন ত মনে হয় না।"

ন্যায়ালঙ্কারের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদভাবে গোবর্দ্ধন বলিল—"আমার অপরাধ কি হ'তে পারে ঠাকুর! আমার পৈতৃক বৃত্তি আমার পুরুষানুগত আচার আমি ছাড়িতে চাহি না —এই না আমার অপরাধ!" ভ্রূকুটী করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,"সে কি রে, খুলিয়াই বল্ না ব্যাপারখানা কি ?"

গোবর্দ্ধন বলিল—"ঠাকুর মহাশয়, চাঁড়াল চিরদিনই চাঁড়াল। লেখাপড়া করিলে বা টাকা রোজগার করিতে পারিলে চাঁড়াল

কি বামুন হয় ? আমার অপরাধ, বাবুর বাড়ীতে আমলাদিগের মধ্যে এক বি, এ পাশ করা নমঃশূদ্রকে ম্যানেজার বাবুর অনুরোধ শুনিয়াও আমি কামাই নাই। ম্যানেজার বাবু তাইতে বড় রাগিয়া গিয়া আমাকে বলেন যে, ঐ বি, এ পাশ করা নমঃশূদ্রকে তুই কামাইবি না কেন ? ও যদি আজ মুসলমান হয়, অথবা খৃষ্টান হয়, তখন ত উহাকে কামাইতে তোমার কোনও আপত্তি থাকিবে না। মুসলমানকে কামাইবে, খৃষ্টানকে কামাইবে, আর হিন্দু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নমঃশূদ্রকে কামাইবে না, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না।' দেখুন দেখি ঠাকুর মহাশয়, এ বিষয়ে আমার কি অপরাধ ? আমি কেমন করিয়া এ গর্হিত কার্য্য করিব ? আমার পিতা, আমার পিতামহ কখনই নমঃশূদ্রকে কামান নাই। তাদের পৃথক নাপিত আছে। তাদের কাছে সে কামায় না কেন ? মুসলমানকে খৃষ্টানকে আমার বাপ কামাইয়াছেন, আমার পিতামহ কামাইয়াছেন, কিন্তু নমঃশূদ্রকে তাঁহারা কেহই কামান নাই, আমি কেমন করিয়া কামাইব ? জমীদার-বাড়ীর চাকরীর অনুরোধে আমি কি আমার নাপিতের ধর্ম্ম নষ্ট করিব ? পৈতৃক আচার ছাড়িব ? এই কথাই স্পষ্ট করিয়া ম্যানেজার বাবুকে বলিয়াছিলাম, তাহারই ফল হইল আমার বৃত্তিচ্ছেদ। শুনিয়াছি, এই ব্যাপার শুনিয়া জমীদার বাবু ম্যানেজারকে খুব প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু কি তাই, তাঁহার মাহিনাও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এমন যাঁর পাপ-প্রবৃত্তি, তিনি আবার দুর্গোৎসব করিবেন, আর দেশশুদ্ধ লোক সেইখানে গিয়া পাত পাড়িবে। হা ভগবান্, ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল। এই ত সবে কলির সন্ধ্যা, জানি না, কালে কি হবে ! তাই ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, আপনি ইচ্ছা করিলে এখনই সব দিক রক্ষা হইতে পারে।"

গোবর্দ্ধনের এই কথা শুনিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় একটু গম্ভীর হইলেন, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, "গোবর্দ্ধন, বুঝিয়াছি, আচ্ছা, আমি আজকে ভাবিয়া দেখি, কাল বৈকালে তুমি আসিও, তখন যাহা করিতে হইবে, তাহা করিব। এখন যাও। আমার সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।"

যাবার সময় আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রসন্নমনে হাসিতে হাসিতে গোবর্দ্ধন বিদায় গ্রহণ করিল।

৭

আজ ষষ্ঠীর বোধন, কলিকাতা হইতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ গৌরীপদ বাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে কলিকাতার অনেকগুলি ভদ্রলোকও গ্রামে জমীদার-বাড়ীর পূজা দেখিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। কাশীধাম হইতে যোগমায়া দেবী আসিয়াছেন, আর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহার গুরুদেব রামদেব ভট্টাচার্য্য। আলোকমালায় সমুজ্জল বিশাল চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে চিদানন্দময়ী জগদম্বার সুগঠিত মৃন্ময়ী প্রতিমা অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যেন হাসিতেছেন। পুরোহিত কমলাকান্ত স্মৃতিভূষণ নূতন গরদের যোড় পরিধান করিয়া ঈশানকোণে মৃন্ময়ী বেদিকার উপর বিল্বশাখার অধোদেশে আম্রপল্লবাদি-শোভিত যুগ্মবস্ত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ তাম্র-ঘটের সম্মুখে বসিয়া মহামায়ার সায়ংকালীন উদ্বোধনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যোগমায়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া সাবধানভাবে পূজার উপকরণাদি আবশ্যকমত যোগাইতেছেন, বোধন-কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাং প্রভৃতি নিনাদের সহিত মিলিত হইয়া বাহিরের তোরণমঞ্চস্থিত শানাইয়ের উচ্চমধুর স্বরলহরী চারিদিকের গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, পূজার সম্মুখস্থ অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। সহাস্য-বদনে গৌরীপদ বা ম্যানেজারের সহিত কোথায় কোন্ কার্য্যে কি ত্রুটি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেরই মুখে হাসি, প্রীতি ও প্রসাদ—যেন সমবেত নরনারী উৎফুল্ল মুখমণ্ডলে নৃত্য করিতেছে। পুরোহিত দেবীর পূ সমাপন করিয়া বোধনের মন্ত্র পড়িতেছেন। ভক্তিভরে গদগদ কণ্ঠে তাঁহার মুখ হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারিত হই এক অপূর্ব্ব দিব্যভাবের সৃষ্টি করিতেছে। করযোড়ে তি পড়িতেছেন—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম বৈ।"

অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ রাবণে বধের জন্য এবং পিতৃসত্যপালনার্থ, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষণা মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ মর্য্যাদা-মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীরা চন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহের জন্য হে জগজ্জননি ! অকালে অর্থ মানবকল্পনায় সম্ভাবিত অভিলষিত কাল আসিবার পূ চতুরানন ব্রহ্মা তোমার বোধন করাইয়াছিলেন। আমি আজ তাই মা, এই শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ শান্তসুশীতল শার জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত আশ্বিন-শুক্ল-ষষ্ঠীর সায়াহ্নকালে তোমা জাগাইতেছি। আমার সর্ব্বশক্তিময়ী মা, জাগো।"

পুরোহিতের এই ভাবগম্ভীর-সময়োপযোগী অর্থপরিপূ মন্ত্রপাঠ শুনিয়া গৌরীপদ বাবুর নয়নে আপনা হইতেই অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল, প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, অস্ফুট-স্ব তাঁহার মুখ দিয়াও নির্গত হইল—"রাবণের অত্যাচারে দেশ যাইতে বসিয়াছে, ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র তোমার প্রিয়সন্তান তোমা মুখের দিকে চাহিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। এখনও কি মা জাগিবে না ? তুমি না জাগিলে তোমার এই দিশাহা অবসাদময় অকর্ম্মণ্য সন্তানবর্গের কি গতি হইবে মা !"

৮

বোধন শেষ হইবার পর আহারাদি করিয়া বিশ্রামের জ গৌরীপদ বাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সম ম্যানেজার বাবু খবর দিলেন যে, একটা বিশেষ কথা আছে এখনই বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ আবশ্যক।

এই কথা শুনিবামাত্র গৌরীপদ বাবু নীচে নামিয় আসিলেন, মায়ের তলায় বাবুর বসিবার ঘরে ম্যানেজা বসিয় ছিলেন, সেইখানে গৌরীপদ বাবু উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞা করিলেন, "নীলকণ্ঠ বাবু ! ব্যাপারখানা কি ?"

গম্ভীরভাবে গৌরীপদ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া নীলক বাবু বলিলেন—"ব্যাপার বড়ই। বিষম গ্রামে একটা বিলক

দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছে, ইহার নেতা হইয়াছেন—ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, যতদূর পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই গ্রামের কুলীনপাড়া ও শ্রোত্রিয়পাড়ার সকল ব্রাহ্মণই একমত হইয়াছেন যে, আপনার দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ কেহই গ্রহণ করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, গ্রামান্তরের কোন ব্রাহ্মণই আপনার বাড়ীতে প্রতিমা দর্শনেও আসিবেন না, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করা ত দূরের কথা।"

উদ্বিগ্নতার ও আশঙ্কার আবির্ভাবে গৌরীপদ বাবুর মুখের চেহারা অন্যরূপ হইল, ধীরভাবে তিনি বলিলেন, "নীলকণ্ঠ বাবু, আমার অপরাধ কি?"

"অপরাধ কি তাহা আমিও জানি না, তবে লোকমুখে শুনিতেছি যে, আপনি না কি চাঁড়ালের দলে গিয়াছেন, শুদ্ধি-আন্দোলনের পক্ষপাত করিয়া তাহাদিগকে অর্থসাহায্য দিয়া, তাহাদিগের সভায় মিশিয়া আপনি তাহাদের যাহাতে নাপিত-চল হয়, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার ফলে সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইতেছে, ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, জাতি গেল. এই সকল অনর্থের মূলকারণ হইয়াছেন আপনি, আপনাকে জব্দ করিবার জন্যএকঘরে করিবার জন্য—ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ঘন-ঘন সমাজপতিদিগের বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া নিজগৃহে নিভৃতে পরামর্শসভা করিতেছেন। অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, অদ্য বৈকালে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে সমাজপতিগণের সভায় এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে যে, লোকনাথপুরের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের কোন সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং তাহাদিগের সমভাবাপন্ন বৈদ্য বা কায়স্থ কেহই আপনার দুর্গোৎসবে যোগ দিবেন না; আপনার বাড়ীতে পদার্পণও করিবেন না। এইমাত্র এই খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাইবার জন্য আসিয়াছি, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন।"

নীলকণ্ঠ বাবুর এই কথা শুনিয়া গৌরীপদ বাবু কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিলেন, তাহার পর একটু হাসিলেন, বলিলেন,"এই ব্যাপার! ইহার জন্য ভাবনা কি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের গুণ ত আমার কিছু অবিদিত নাই। কি কর্ত্তব্য, তাহা এখন আমি কিছু বলিব না। আপনি নিশ্চিন্ত-মনে বিশ্রাম করুন, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কা'ল যা হয় করা যাইবে।"

গৌরীপদ বাবুর এই প্রকার নির্ভীক ভাব ও সাহসের কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠ বাবু একটু বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, বাবু কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের ভাব সব ভুলিয়া গিয়াছেন, যাহাই হউক, আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। দুঃখের বিষয়, বাবু তাহা বুঝিলেন না। "যে আজ্ঞা তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৯

নীলকণ্ঠ বাবুকে বিদায় দিয়া গৌরীপদ বাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "ওহে বলরাম, উপর হইতে আমার ছড়ি দাও, আর হ্যারিকেনটা লইয়া আইস।" তাড়াতাড়ি বলরাম উপর হইতে বাবুর ছড়ি ও হারিকেন লইয়া আসিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া ছড়িগাছটি হাতে ধরিয়া গৌরীপদ বাবু গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন, চণ্ডীমণ্ডপ পার হইলেন, বাহিরের বৃহৎ দীর্ঘিকার পাড় দিয়া নীরবে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইয়া বাগানের প্রান্তভাগে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং ধীরে ধীরে কবাটের কড়া নাড়িতে লাগিলেন। ভিতর হইতে শব্দ হইল—"কে গা এত রাত্রে কড়া নাড়িতেছে?" গৌরীপদ বাবু বলিলেন, "আমি গৌরীপদ, বিশেষ প্রয়োজন, একবার দোর খুলুন।" ভিতর হইতে খড়মের খট্-খট্ আওয়াজ কাণে গেল, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সম্মুখেই যোগমায়া দেবীর গুরু বামদেব ভট্টাচার্য্য। সাষ্টাঙ্গে প্রণি-পাতপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে গৌরীপদ বাবু বলিলেন, "এত রাত্রে আসি-য়াছি, জানি, ইহাতে আপনার ধ্যান-ধারণায় ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু আপদ বড় বালাই, আপনি ছাড়া বিপদে কে পরিত্রাণ করিতে পারে?"

হাসিয়া বামদেব বলিলেন, "বিপদের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন ছাড়া আর কেহ নাই। এস, ভিতরে এস।" এই বলিয়া তিনি গৌরীপদকে সঙ্গে লইয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে বলরাম লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

গুরুদেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া গৌরীপদ বাবু দেখিলেন, গৃহমধ্যে একখানি বড় ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়িয়া আছে; তাহার উপর কোনও উপধান নাই। একটি জলপূর্ণ কমণ্ডলু ব্যাঘ্রচর্ম্ম-শয্যার এক পার্শ্বে রহিয়াছে। গৃহের এক কোণে একটি প্রদীপ মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সমুদয় গৃহই যেন অনাঘ্রাতপূর্ব্ব দিব্যগন্ধে আমোদিত। গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গুরুদেব গৃহের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিলেন; ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর উপবেশন করিলেন। গৌরীপদ বাবু ভূমিতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে বসিলেন। অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত দুই জনে মৃদুস্বরে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাহার পর গুরুদেব বলিলেন, "গৌরীপদ, অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, নিশ্চিন্ত হও। ইহার প্রতিবিধান জগদম্বা শীঘ্রই করিবেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব, তুমি নিশ্চিন্ত হও। মনে রাখিও—মার্কণ্ডেয় মুনির কথা—

'যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ'।"

গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া, সে মুখের প্রশান্ত উদার ভাব বিলোকন করিয়া, গৌরীপদ বাবুর ক্ষুব্ধ হৃদয় যেন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইল। গুরুদেবের চরণে ভক্তিভরে দণ্ডবৎভাবে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

১০

গৌরীপদ বাবুর বাড়ীতে সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সকলেরই মুখে যেন একটা বিষাদের ভাব, সকলেরই নয়নে চিন্তার ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরোহিত আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন, তন্ত্রধারক পুথি ধরিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যেন মন্ত্র বাহির হইতেই চায়ঃ না। এই কয় দিন বাটী লোকে লোকারণ্য ছিল; আজ কিন্তু সে প্রাঙ্গণে লোকসমা-গম নাই, নিঃশব্দে বাটীর সকলেই সশঙ্ক-চিত্তে বিহিত কার্য্যই করিয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে কোনও শব্দ নাই। গুরুদেবের

শূন্য আসন পড়িয়া আছে, তিনি এখনও আসেন নাই। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দুইবার লোক গিয়াছিল, লোক ফিরিয়া আসিয়াছে—তিনি বাটীতে নাই; কোথায় গিয়াছেন, তাহাও কেহই জানে না, চিন্তাকুল-হৃদয়ে বিষণ্ণ-বদনে যোগমায়া দেবী-পূজার উদ্যোগ করিতেছেন। একখানি কুশাসনের উপর বসিয়া গৌরীপদ বাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ম্যানেজার নীলকণ্ঠ বাবু পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া গৌরীপদ বাবুর সহিত দুই একটি কথা কহিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছেন। গুরুদেবের অনুপস্থিতি নিবন্ধন সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। যত দূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রামের সকল ভদ্রলোক কূটবুদ্ধি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরামর্শে দলাদলিতে যোগ দিয়াছেন, গ্রামের কোন ভদ্র লোকই পূজা-বাড়ীতে আসিবেন না, ইহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের জন্য—আনন্দের জন্য গ্রামে দুর্গোৎসব করিতে আসিয়া এমন একটা অপমান বা এত বিড়ম্বনা সহিতে হইবে, ইহা অগ্রে জানিলে কে এমন কার্য্যে অগ্রসর হইত? সুশীলার মুখের দিকে তাকাইলে, সে যে এই কথাই ভাবিতেছে—তাহা বুঝিতে পারিয়া গৌরীপদ বাবু আপনা হইতেই মুখ অবনত করিতেছেন।

এ দিকে ত এই ব্যাপার, অন্য দিকে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটী লোকে লোকারণ্য, চৌধুরীপাড়ার মাতব্বর জগদ্‌বাবু, মুখুয্যেপাড়ার হরপ্রসাদ বাবু, বাঁড়ুয্যেপাড়ার হরি বাবু, চক্রবর্ত্তী-পাড়ার তারাপদ, বৈদ্যিকপাড়ার আশুতোষ বাবু প্রভৃতি গ্রামের দলপতিগণ মিলিয়াছেন। দলাদলির সাফল্যসম্ভাবনায় সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ধনী, সাহসী, উদার ও শিক্ষিত জমীদারকে জব্দ করিবার মাহেন্দ্রযোগ লাভ করিয়া সকলেই আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়াছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নেতৃবর্গের হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতা চলিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—"পাশ্চাত্য শিক্ষার অহঙ্কারে উন্মত্ত নাস্তিকগণের প্রভাব এখনও যে আমাদিগের গ্রামে প্রবেশ করে নাই, ইহা আপনাদিগেরই ধার্ম্মিকতা ও পিতৃ-পুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত সনাতন প্রথার প্রতি অসাধারণ পক্ষপাতিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহা দেখিয়া আমি যে কি আনন্দলাভ করিলাম, তাহা বুঝাইয়া বলিবার নহে। শাস্ত্রই বলিয়াছে—

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকান্।"

সঙ্গে সঙ্গে জগদ্‌বাবু প্রভৃতি বলিতেছেন, "আপনার ন্যায় মহর্ষি প্রতিম সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের নেতা আছেন, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের এই সমাজে কলির প্রবেশ হইবে না, এ বিশ্বাস আমাদিগের চিরদিনই আছে। আজ তাহা আরও দৃঢ় হইবে। জয় ব্রহ্মণ্যদেবের জয়, জয় বর্ণাশ্রমের জয়; গৌরীপদ বাবুর প্রজাপীড়নলব্ধ অর্থের আজ প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে, চাঁড়াল, মুচি, চামার ও ডোম প্রভৃতি দেবীর প্রসাদ খাইয়া তাহার জয়-ঘোষণা করিবে। লোকনাথ বাবুর উপযুক্ত পুত্রের ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

এইভাবে পরস্পরের প্রশংসাপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীর সভা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল, সেই কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত যুবক-কণ্ঠে সমুচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' এই জননীজয়-গীতির তুমুল শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এ আবার কি! এই বলিয়া সমাজপতিগণ মুখ-চাওয়া-চাই করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখা গেল, গ্রামের প্রায় সকল যুবক মিলিত হইয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। গ্রামে ত এত যুবক নাই! যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগের সংখ্যা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইল, অন্ততঃ দুই শত হইবে। সেই দলের সর্ব্বাগ্রে যে যুবক আসিতেছিল, তাহার নাম দিগ্‌বিজয় গোস্বামী, সে এই বৎসর এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। সে কলিকাতাতেই থাকিত, হঠাৎ এতগুলি যুবক লইয়া চীৎকার করিতে করিতে স্থিরগম্ভীর-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণ চিন্তাব্যাকুল হইল। এমন সময় দিগ্‌বিজয় গোস্বামী সেই সমাজপতিগণের সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল, সর্ব্বাগ্রে সভাপতি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে অন্য এক শত যুবক সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে উপস্থিত হইল। দিগ্‌বিজয় বিনীতভাবে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে ও সমবেত সমাজপতিগণকে নমস্কার করিল এবং নির্ভীকভাবে ধীরস্বরে বলিল, "পূজনীয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ। আপনাদিগের নিকট আমরা একটা বিনীত নিবেদন করিব, সেই জন্যই কলিকাতা হইতে ব্যস্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নবগঠিত যুবক-সঙ্ঘের নেতৃবর্গ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, আমাকেই প্রতিনিধি করিয়া তাঁহারা সকলে আপনাদিগের নিকট এই নিবেদন করিতেছেন যে, আপনারা যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, এখনও সময় আছে, তাহা পরিহার করুন। আপনারা নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা গৌরীপদ বাবুর সাধের দুর্গোৎসব পণ্ড করিবার জন্য যে ভীষণ দলাদলির অগ্নি জ্বালাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় এবং সনাতনধর্ম্ম-বিরোধী। আমরা আপনাদিগকে এখনও এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছি, যদি নিবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে ইহার যে বিষময় ফল হইবে—তাহার দায়িত্ব আপনাদেরই উপর রহিবে, গৌরীপদ বাবুর তাহাতে পূজা পণ্ড হইবে না। এখনও সময় আছে, আপনারা নিবৃত্ত হউন।"

দিগ্‌বিজয়ের এই কথা যেন প্রতপ্ত কটাহে তৈল বর্ষণের ন্যায় অকস্মাৎ সভামধ্যে ভীষণ বহ্নি জ্বালাইয়া দিল, ক্রোধে, অবমাননায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, অশিষ্ট বালক! কেমন করিয়া বৃদ্ধের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা এখনও শেখ নাই? লজ্জা হয় না? ধর্ম্মরক্ষার জন্য সমাজরক্ষার জন্য সমাজপতিগণ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সনাতন-ধর্ম্ম-বিরোধী, এই কথা মুখে আনিতে যে যুবকের লজ্জা বোধ হয় না, সে কুলাঙ্গার—সে ধর্ম্মদ্রোহী। যাও, এখান হইতে

বাহির হও। তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীর স্বরে ধীরভাবে দিগ্‌বিজয় বলিল, "ক্ষমা করিবেন, আপনারাই সমাজের মূলোচ্ছেদ করিতে দাঁড়াইয়াছেন। সমাজ কি ছিল, কি হইবে, সে জ্ঞান আপনাদিগের নাই। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের দাবানল জ্বালাইয়া আপনারা আপনাদিগের পিতৃপুরুষের সুখের—শান্তির—স্বচ্ছন্দতার সমাজকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানিয়া রাখুন, আপনাদিগের এ আস্ফালনে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। প্রত্যুত যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগের এই অজ্ঞান-কুসংস্কারজনিত দুর্ব্বৃত্ততা নিবারণ করিবই। সেই জন্যই আমরা সদলবলে এখানে আসিয়াছি। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হিতাহিতজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া প্রাচীনের দল যেখানে পাপকার্য্যকে ধর্ম্ম ভাবিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, সে স্থলে যুবকগণের কর্ত্তব্য, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা। আপনারা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, কি ভয়ানক অশান্তির বহ্নি এই দেশে উদ্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, দেশের শিক্ষিত স্বদেশ-প্রেমিক যুবকদল আজ জাগিয়াছে। আপনাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিন আসিয়াছে।"

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ব্যাপারটা কি, তাহা সর্ব্বাগ্রেই বুঝিতে পারিলেন। অদম্য ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, কিন্তু যুবকদলের অধ্যবসায়, সাহস ও কর্ম্মকুশলতার কথা ভাবিয়া তিনি অগত্যা অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবার সুযোগ অন্বেষণে তৎপর হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরভাবে দিগ‌বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু বুঝিলাম, তোমরা লায়েক হইয়াছ, স্বরাজ লাভের আর বিলম্ব নাই, কিন্তু আমরা যদি গ্রামের লোক কেহই গৌরীপদ বাবুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখি, তোমাদিগের কি সামর্থ্য আছে যে, আমাদিগকে আমাদের সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে?"

দিগ্‌বিজয় বলিল,—"আপনারা কে? কয় জন? এখানে যে কয় জন বৃদ্ধ আছেন, তাঁহারা গৌরীপদ বাবুর বাড়ীতে যদি নাই যান, কিন্তু মনে রাখিবেন, গ্রামের সকল যুবক সেখানে যাইবে, শুধু তাহাই নহে, বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরাও যাইবে, সে ব্যবস্থার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, গ্রামের কয়টা লোক আপনাদিগের কথা শুনে।"

এই কথা বলিয়া দিগ্‌বিজয় নিজের সহকর্ম্মীদের সহিত সে স্থান হইতে সরিয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বৃদ্ধ সমাজপতিগণ একে একে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, গৃহে আসিয়া সকলেই দেখিলেন, বাটীর গৃহিণী হইতে বালকবালিকা সকলেই গৌরীপদ বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁহাদের নিষেধ, গালাগালি ও ভীতি প্রদর্শন তাহারা সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সকলেরই মুখে এক কথা—আপনারা পাগল হইয়াছেন, ভীমরতি ধরিয়াছে, সমাজের কি করা উচিত বা নহে, তাহা আমরা ভাল বুঝি, সুতরাং আমরাই করিব।

কেমন করিয়া এত অল্পসময়ের মধ্যে গ্রামের সকল যুবক এক হইয়া এমন একটা বিরাট ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বসিল, সমাজপতি মহাশয়গণের মস্তকে তাহা কিছুতেই ঢুকিল না। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে আবশ্যকমত:কোথায় দুই জন,কোথায় চার জন স্বেচ্ছাসেবক যুবক পাহারা দিতেছে। বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাংশে ঐকমত্য, গৃহিণীগণও সাজগোজ করিতেছেন। বালকবালিকাদের সঙ্গে করিয়া গৌরীপদ বাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য যেন সকলেই ব্যস্ত। এ কি স্বপ্ন, না কল্পনা! গ্রাম শুদ্ধ কি পাগল হইল? কর্ত্তার কথা কেহ শুনে না, যাহা বলেন, সকলেই তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ব্রজধামে রাসপূর্ণিমার দিনে ব্রজকিশোরের বংশীরবে ব্রজাঙ্গনাকুল সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যেমন দলে দলে যমুনাপুলিনের দিকে যাত্রা করিয়াছিল—লোকনাথপুরেরও কোন্ বিচিত্র কুহকীর অস্ফুট আহ্বানে গ্রামবাসী তরুণবয়স্ক নর-নারীগণ সেইরূপ গৌরীপদ বাবুর গৃহের দিকে দলে দলে যাইতে প্রস্তুত হইল—তাহা কেহই জানে না, অথচ সকলেই যাইবার জন্য ব্যস্ত। বাধা দিতেছে না কেহই। আট দশ জন বৃদ্ধ সমাজপতি কিন্তু তাহাদের সে বাধা-স্রোতের আগে বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। এ রহস্য, এ বিচিত্র আয়োজনের গূঢ়তত্ত্ব কে উদ্ভাবন করিবে?

১২

দিবা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, মায়ের ভোগ-নিবেদন শেষ হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃদ্ধ জন কয়েক ব্যতিরিক্ত আর সকল নর-নারী ও বালক-বালিকার অতর্কিত আগমনে যোগমায়া দেবী, গৌরীপদ ও সুশীলার বিস্ময়সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সকলকে আদর করিয়া যত্নের সহিত আহ্বান ও আপ্যায়ন-ব্যাপারে তাঁহারা আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছেন। গ্রামের দলাদলির এই বিচিত্র সুখকর পরিণাম কেমন করিয়া হইল, কে করিল, তাহা বুঝিবার ও ভাবিবার অবকাশও কাহারও নাই। দলে দলে নিমন্ত্রিতবর্গ আসিতেছে, তাহাদিগকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থারও কোন ক্রটি হইতেছে না। অপরিচিত শত শত যুবক চির-পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছে। এমন সময় এক শত জন যুবকের সহিত দিগ্‌বিজয় পূজাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গৌরীপদ বাবু নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এ যে কলিকাতার তাঁহার বড় প্রিয় দিগ্‌বিজয়! বাল্যকাল হইতে তাহার পড়া-শুনার ভার তিনি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। নিখিল বঙ্গের নবগঠিত যুবকসঙ্ঘের সে প্রধান সম্পাদক, সে কেমন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, তাহা গৌরীপদ বাবু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সকল ব্যাপারের মূলে যে তাহারই অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা খেলা করিতেছে, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। প্রণত দিগ্‌বিজয়কে দুই হাতে জড়াইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুসিক্তনয়নে গৌরীপদ বাবু বলিলেন—"দিগ্‌বিজয়, ব্যাপারখানা কি? তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?" দিগ্‌বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে সকল কথা পরে শুনিবেন, এখন মায়ের পূজা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহারই ব্যবস্থা করুন, আমার সঙ্গে পাঁচ শত ভলান্টিয়ার আসিয়াছে, ভোর হইতে

এত বেলা পর্য্যন্ত তাহারা কাবই করিতেছে, তাহাদিগের খাওয়াইবার ব্যবস্থা অগ্রে করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে অন্ত কথাবার্ত্তার কোনও আবশ্যকতা নাই, কেবল একখানি পত্র আনিয়াছি, এইখানি পড়িলে আপনি সব বুঝিতে পারিবেন।"

তাড়াতাড়ি সেই পত্র উন্মোচন করিয়া গৌরীপদ বাবু পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পত্রখানা এই—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

পরমকল্যাণভাজনেষু শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু,

বৎস গৌরীপদ। আমি কাশীযাত্রা করিলাম। তুমি তোমার জননীর ইচ্ছানুসারে জগজ্জননী মহামায়ার পূজার আয়োজন করিয়াছিলে, সে আয়োজনে বিলক্ষণ বাধার সম্ভাবনা আছে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার জননীর সহিত লোকনাথপুরে আসিয়াছিলাম। লোকনাথপুরে তোমার শত্রুগণ মিলিত হইয়া, তোমাকে অপমানিত করিয়া, মহামায়ার পূজায় বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, এবং তাহার প্রতিবিধান কি করিতে হইবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় শিষ্য তোমার একান্ত আশ্রিত দিগ্‌বিজয়কে আমি কাশী হইতে এ সকল ব্যাপার জানাইয়াছিলাম এবং কি ভাবে ইহার প্রতীকার করিতে হইবে, তাহাও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়াছিলাম, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন তোমার কার্য্য—ভাল করিয়া প্রাণমন দিয়া জগদম্বার সেবার দ্বারা দেশের ও স্বজাতির সেবা কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হউক। তোমার জননী যোগমায়া দেবীকে ও তোমার পত্নী ও শিশু সন্তান দুটিকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি কাশী চলিলাম। পূজার অব্যবহিত পরে তোমার জননীকে কলিকাতার বাটী দেখাইয়া কাশী পাঠাইয়া দিও, দেরী করিও না, আমি পূজার এই শেষ কয়টা দিন তোমাদের সহিত একত্র মায়ের পূজা করিতে পারিলাম না বলিয়া তোমরা দুঃখিত হইও না, আমি কার্য্য চাহি, কিন্তু কার্য্যের সাফল্য নিবন্ধন উল্লাসের ভাগী হওয়া আমার স্বভাব নহে। আর অধিক কি লিখিব, নির্ব্বিঘ্নে পূজা সমাপ্তির সংবাদ বিসর্জ্জনের পর আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইও। ইতি

শুভানুধ্যায়িনঃ
শ্রীবামদেব শর্ম্মণঃ।

১৩

গৌরীবাবুর বড় সাধের দুর্গাপূজা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে, মহাষ্টমী ও মহানবমী পূজার দিনে মহামায়ার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ লাভে অগণিত ভক্ত নরনারী আত্মজীবন ধন্য করিয়াছে। যাত্রা, কীর্ত্তন, থিয়েটারের সমাবেশ প্রচুর পরিমাণে থাকায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জনসমূহ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়া জগজ্জননীর উল্লাসময় জয় জয় ধ্বনিতে লোকনাথপুরের গগন-পবন মুখরিত করিয়াছিল। দিগ্বিজয় গোস্বামীও স্বেচ্ছাসেবকগণের সাফল্যপূর্ণ ও প্রীতিমাখা ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজসেবী যুবকসঙ্ঘের প্রতি প্রীতিময় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিল। বিজয়া-দশমীর দিনে বিসর্জ্জনের মন্ত্র পড়িয়া প্রতিমাস্থ দেবতার বিসর্জ্জন করিয়া পুরোহিত মহাশয় জগদম্বার চরণোৎসৃষ্ট বিল্বপত্র হস্তে করিয়া যখন যোগমায়া দেবী ও সস্ত্রীক গৌরীপদ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাঁহার আনন্দবাষ্পসিক্ত মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রী দেখা দিল।

গৌরীপদ বাবুর দুর্গোৎসবে দেশহিতব্রত যুবকসঙ্ঘের স্বার্থগন্ধ-বিরহিত পুণ্যচেষ্টার মহনীয় আদর্শে লোকনাথপুরের হিন্দুসমাজ যেন নব জীবন লাভ করিল।

কেবল ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের ধর্ম্মান্ধ জীবনে এই দুর্গোৎসব একটা বিরাট অন্ধকারময় নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিল। তিনি বিজয়া-দশমীর দিনেই লোকনাথপুর গ্রাম চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

'যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

এই মহাজন-বচনের প্রামাণ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ পূর্ব্বক—উপযুক্ত সঙ্গী পাইবার আশায় কাশীধামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

দুঃখীর নিবেদন

দুখের আগুনে অনেক দহিলে—
সোনা হ'লে হ'ত খাঁটি ;
পোড়াইয়া আরো কঠিন করিলে
মাঠের উবর মাটী।
বাসনা এখনো হ'ল না বিমলা
বুকের কানাচে এখনো কি মলা,
কামনায় হিয়া উঠে ব্যাকুলিয়া—
ভু'লে কাঁটা-পথে হাঁটি।

দুখের দহনে কঠিন করেছ ;—
শোকের পেষণে পিষে'
দাও গো গুঁড়িয়ে—যদিই কোমল
হই অশ্রুতে মিশে'।'
নতুবা মাটীর কঠিন ঢেলা এ
রাখিলে চলায় পথেতে ফেলায়ে,
পথিকের পায় বাজি যদি, হায়,
ব্যথিত করিব পা'টি !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।
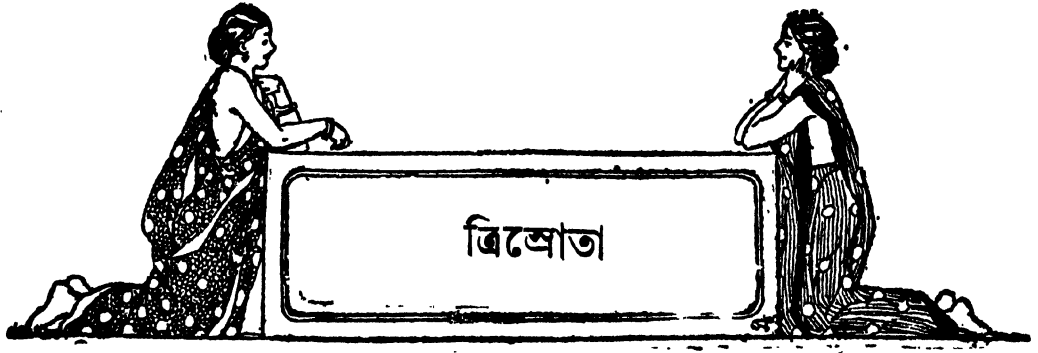
গেরোস্থালীর অনেক গেরো, এও তারি একটি। গেরো বাঁধবার দড়ি-সুতো চাই, আমার এই ভূমিকা সেই সুতো, যদি জট পড়া হয়, পাঠক ছাড়িয়ে নেবেন। এ গেরো ঘটেছিল নেহাৎ পাড়াগাঁয়ে—যদিও ভদ্রপল্লীতে। গ্রামের নামকরণ না করাই ভাল, কেন না, নাম যখন একটা আছে, তখন আর নতুনে দরকার কি? আর পুরাণটা বল্লে হয় ত চিনে ফেলবেন, তাতে গেরো বাড়বে বই কমবে না। তবে যাকে নিয়ে গেরোটা পড়ল, তার একটা নাম বলা দরকার। সে নাম যথার্থই হোক বা কাল্পনিকই হোক, তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। বনিয়াদ না হ'লে যেমন ঘর বাঁধা যায় না, তেমনি সংনাম মানুষ না হ'লে কাহিনী চলে না, তাকে ধরুন নীরি বলেই ডাকবেন, যদি মনে না ধরে—অভিরুচিমত অন্য নামও দিতে পারেন—খোস্‌নাম কি বদ্‌নাম করবেন, তাও আপনাদের হাতে। সংসারের নিয়ম কত সময় কত ভাবে ভঙ্গ হয়, কতক বা পুরাণ নজিরের মত বাতিল হয়ে যায়। এই ধরুন না একাল ও সেকালের কথা। প্রথম যখন মেয়েরা পাশ্চাত্য সেমিজ ধারণ করতে সুরু করলেন, তখন বুড়াবুড়ী-মহলে বড্ড টনক নড়েছিল—এ নবতন আচার তাঁদের কাছে ব্যভিচারের মতই দূষ্য বোধ হয়েছিল। ক্রমশঃ দেহের সঙ্গেও ব্যবধানটুকু না থাকাই নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রাচ্য মেয়েরা সেমিজ পরেছিলেন, এখন সেই দেশের বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীরা আবরণ যতদূর পারেন খাটো করছেন। আগে গুল্‌ফ-প্রদর্শন দোষের ছিল, অধুনা গুল্‌ফ অতিক্রম ক'রে জানু-সন্নিকটে উত্তোলন করেছেন। পাদপদ্মের মৃণাল সদৃশ গুল্‌ফাতীত প্রদেশের শোভা না কি পুরুষের মনোলোভা, তাই মুগ্ধ পুরুষকে লুব্ধ করাই যবনিকা অপসারণের উদ্দেশ্য। আগে ছিল আমাদের মেয়েদের কোমরে গোট চন্দ্রহার, তারি কঠিন শাসনে কটিস্থিত শাড়ী সরিত না, এখন তারা ত' গেছেই, আঁচলের খুঁটও চাবি-ছুট, তাই সরসর শব্দে স্কন্ধ ত্যাগ ক'রে অঞ্চল যদি ভূলুণ্ঠিত হয়, তবে তাঁদের জ্ঞান-গোচর হবার সম্ভাবনা কম। গ্রীক দেবতা জুপিটার—যিনি আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রের সামিল, তাঁর টিকী কি সহজে নড়েছিল? হিবি (Hebe) কুন্দেন্দু তুষার-ধবলা শুভ্র-বসনা শুভ্রদশনা দেবরাজের মুগ্ধ দৃষ্টিতে একেবারে তন্ময় (তবু ত' তিনি সহস্র আঁখি নয়, সবেমাত্র দুটি চক্ষু) তাই পরিচ্ছদ যে কখন্ তনুদেহ ত্যাগ ক'রে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করেছে, সে জ্ঞান রহিত। এ ত গেল প্রতীচ্যের কথা। আমাদের এই প্রাচ্য দেশে—লজ্জা-সরম প্রসঙ্গে, নিয়ম অনিয়ম ব্যাপারে রাইকিশোরীর যমুনায় জল আনতে যাওয়ার পরিচ্ছদটি আমাদের অভ্যস্ত। সে অধ্যায়—অনন্ত কলার নিত্য নবীন রঙ্গীন ছবি। নাইতে গেছেন নদীতে, সখীগণ সহ জলকেলি সমাধা ক'রে গভীর জল ছেড়ে প্রায় কূলের কাছে পৌঁছেছেন, সিক্ত নীলাম্বরীর আলিঙ্গনে অপরূপ অঙ্গশোভা প্রচ্ছন্ন না হয়ে আরও প্রকট, এমন সময় কোন্ কদমতলায় এতক্ষণ নিভৃতে গোপন থেকে শ্যাম রায়ের হঠাৎ আবির্ভাব। স্বাগত শ্যামকে দেখেও লজ্জানম্র রাধাও হিবির (Hebe) মত বিহ্বল—ইত্যবসরে মন্থর-গতিতে হাস্যমুখে কালার নেপথ্য-প্রয়াণ। মূর্চ্ছাভঙ্গে রাধিকার মনের হাসি কথার রাশিতে প্রকাশিত হ'ল। বল্লেন, "দেখো ত সখি, এ কি উপদ্রব, কাঁকে কলসী,—এক হাতে আঁচল, কতই বা সামলাই? ছি ছি, আর জল আনতে আসবো না, জল ত নয় জঞ্জাল।" সখী গদগদ হয়ে বল্লে, "জলে গা ডুবিয়ে ব'সে পড়লে না কেন?" পৃথিবীতে কি করলে কি হয়, কি না করলে কি হয় না, কোন্ কথাটি কইলে কি

হয় না, তা ভেবে সংসার চলে না, সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তা নয়—

'ভাল মন্দ শুধু
যে কথার কথা—
ভাবনা কেবলি
বাড়ায় ব্যথা'

বাজে কথা ছেড়ে, কাযের কথায় আসা ভাল; কেন না, নীরির জীবনেও নারীজনোচিত ঘটনার অঘটন অসম্ভব নয়।—নীরির বাসস্থান সেত নেহাৎ পাড়াগাঁ।

পাড়াগাঁ

কাছে দোকানঘর, ছোট ছোট চালা সব শূন্য। হাটের দিন সজাগ হয়, সোর গোল সুরু করে। গরু-ঘোষ কাঁধ হ'তে ভার নামিয়ে অদূরে ব'সে জাবর কাটছে। এতই গাছপালা যে, পবনদেবের গতিবিধি প্রায় বন্ধ। অতিষ্ঠ হয়ে কেউ বা গ্রামের বাহিরে ভয়ে ভয়ে ঘর বেঁধেছে। অদূরে

দুপুরে নিশ্চিন্ত হয়ে কাযকর্ম্ম সেরে লোকে অবসর খোঁজে, পথে লোক-চলাচল নেই বল্লেই চলে, বেড়ালটা প্রাচীরের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুম দেয়, সে ঘুম আর যেন মেটে না, পল্লীকুক্কুর যেখানেই একটু ঠাণ্ডা পায়, সেখানেই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে প'ড়ে থাকে। পাখী সব নীরব, কাকের কর্কশ কণ্ঠের অনাবশ্যক চীৎকারও স্থগিত। বড় বড় বট অশ্বত্থের

পূর্ব্বপ্রান্তে পরিপূর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিণী। সে পবিত্রতা, সে সৌন্দর্য্য নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীর মধ্যে এখনও অতুলনীয়। যজ্ঞোপবীতের মত ভারতবর্ষে প্রসারিত, হৃদয়কে পুণ্য জীবন-স্রোতে আপ্লুত ও শীতল ক'রে রেখেছে। তট হ'তে তটান্ত পর্য্যন্ত থই থই করছে। অশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রে মা গঙ্গা চলেছেন। স্তন্য-সুধার ভারে তরঙ্গ-বিপুল

মা গঙ্গার অশেষ আশীর্ব্বাদ

বক্ষ নিরন্তর স্পন্দিত; সে স্নেহের অতলতার পরিমাপ হয় না। এত যে অনিবার দান, তবু তার হ্রাস নাই, অপার উচ্ছ্বসিত ধারা অবিরাম গতিতে বিধি-নির্দ্দিষ্ট মিলন-পারাবারের উদ্দেশ্যে চলেছে। ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সবই অন্তরের অতলে আশ্রয় পেয়েছে। সকলেরই প্রতি সহানুভূতি। নতুন চাঁদের কাঞ্চনাভা ক্ষণিকের জন্য বিরহ-বিধুরার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে যেমন বলে, তার আগমনে তোমারও কপোলে রক্তিমা ফুটে উঠবে, তেমনি পরিপূর্ণা ভাগীরথীও মন্দমন্থর গতিতে বাঞ্ছিত-মিলন-যাত্রায় অগ্রসর হয়ে চলেছেন, আর আমাদের নীরিকেও যেন বলছেন, তোমারও দিন এল ব'লে।

নীরির ভরা যৌবন উথলে পড়েছে। গ্রীবা বঙ্কিম ক'রে বিহঙ্গ যখন নিজ সৌন্দর্য্য অবলোকন করে, তখন সে দৃশ্য মধুর ব'লে মনে হয়, দোষ আমরা দিইনে। বালিকা যদি তার কেশ-রাশির ভারে স্বচ্ছ চোখ আনমিত ক'রে যৌবন-স্রোত কখন্ অজ্ঞাতসারে তার দেহতট আচ্ছন্ন করেছে, দেখে সচকিত হয়, সুখের শিহরণ যদি জাগে, তবে এই রমণীয় রোমাঞ্চের জন্যে কে তাকে দোষ দেবে? এই ত সে দিন সে কুঁড়ি ছিল, বিয়ে তার হয়েছে চার বছর আগে। তখন চোখের চাহনি ছিল খোলা খোলা—সাদাসিধা। আজ সে চোখে গোধূলির স্বপ্নচ্ছায়া—তিমির-রাত্রির অপার রহস্য একাধারে স্থান পেয়েছে, তবু তার ছেলেমানুষী যায়নি। হাব-ভাব চলা-ফেরা সবই সেই পুরাণ ধরণের, তার মধ্যে লজ্জার ভাব একটু মিশে এসেছে এইমাত্র। নিজ ক্ষমতার কথা এখনও ভাবতে অক্ষম।

নীরি এলো চুলে ঝটকা নাড়া দিয়ে ছুটে পালাল

"ওরে নীরি, চুলগুলো কি একেবারে মাটী করবি? ভিজে যে একেবারে, যদি এলো রাখিস, গামছাখানা নীচে দে"—এই ত গেল দিদিমার ঝঙ্কার। নীরি ধান ঝাড়ার মত ক'রে এলো চুলে এক ঝটকা নাড়া দিয়ে ছুটে পালাল। গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামেই বড় হয়েছে, অনভ্যাসে মাথায় কাপড় প্রায় থাকে না, বিয়ে যে হয়েছে, তার সাক্ষী ললাটের বালার্ক সিন্দুর-ফোঁটা। কায না থাকলেই দিদির খোকাটিকে নিয়ে খেলা ক'রে বেড়ায়। দিদির বয়স অষ্টাদশ বর্ষদেশে, নয়—শেষে। এই তার প্রথম ছেলে, তাই বুঝি নিজে আদর করতে লজ্জা পায়। নীরির ত লাজ-লজ্জার বালাই নেই; সুস্থ সুন্দর হাবলা ছেলেটাকে নিয়ে কি যে সে করবে, ভেবে পায় না, 'সোহাগে ছানিয়া, আদরে মাখিয়া'—তাল পাকিয়ে তোলে।

বেলা তখন দুই প্রহর। আগেই বলেছি, গ্রাম তখন নিশুতি। শরৎকাল, শার-দীয় পূজার আর দেরী নেই। নীরির বর বিদেশে, পূজায় বাড়ী যাবে, তার পর আসরে। নীরির বাবা কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র থাকেন, মা সংসার দেখেন। দিদিমা দেখেন সবাইকে। এই পক্ষ কেটে গেলেই দেবীপক্ষ পড়বে। দিদিমা নীরিকে ডেকে বললেন, "ও নীরি, যা না দিদি, তর্কালঙ্কার মশায়ের কাছে হ'তে একাদশীটি কবে জেনে আয়। আজকাল কাশীর মতের চলন, এ মত সে মত অতশত বুঝি না, তর্কালঙ্কার মশায় পাঁজী দেখে দেবেন।"

তর্কালঙ্কার মশায় প্রাচীন, বিদ্বান্। বাঙ্গলার দূরদূরান্ত হ'তে অনেক যুবক তাঁর টোলে পড়তে আসত। তর্ক ছাড়া, আর সব বিষয়েই তারা পাকা হয়ে যেতো। ভিতর-বাড়ীতে কর্ত্তার শয়ন, বার-বাড়ীতে ছাত্রাবাস, দুধারে ছোট ছোট অতি পরিষ্কার নিকানো ঘর, মাঝ-বাড়ীর ভিতর যাবার

পথ ও দরজা প্রায়ই অবারিত। পণ্ডিত মশায় বাহিরেই থাকিতেন। ছাত্রদের পাঠ দিয়ে অবসরসময়ে নিজের মনে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, দর্শন, কাব্য স্বেচ্ছামত পড়তেন। টোলের ছেলেরা সবাই বাড়ী চ'লে গেছে, আছে একটি ব্রাহ্মণ যুবক। বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে, তারই উত্তরের প্রতীক্ষায় একাকী ব'সে ভাবছে—কবে সে লিপির উত্তর আসবে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান সুডৌল-দেহ, সুগৌর-বর্ণ, যজ্ঞোপবীতে সে কনকচম্পক-কান্তি আরও পরিস্ফুট। দেহখানি উড়ুনিতে আধঢাকা, ডান হাতে সূক্ষ্ম সোনার তাগা। বেশী বর্ণনা না করাই ভাল, কি জানি কার সঙ্গে মিলে যায়। তবে সত্যের অনুরোধে বলতে বাধ্য, ধুতি পরার পাকা কায়দা তারই জানা ছিল, উড়ানি ওড়াবার কৌশল—উত্তরীয়ের জড়িয়ে ধরা লতিয়ে পড়া প্রার্থনা কেমন ক'রে ব্যক্ত করতে হয়,—সে প্রকাশ-ভঙ্গীটি এ ব্রাহ্মণবটুর মত আজও কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি। গুরু আজ অন্তঃপুরে,—বহির্ব্বাটীতে ব'সে সে পুঁথি গোছাচ্ছে, মন বাড়ীমুখো, গত বৎসর বউকে দেখে এসেছিল,—কাঁচা বটে, কচিটি আর নেই। ফুলই হোক, ফলই হোক, দেরীতে যা ফোটে ও ফলে, সে সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। সন্ধ্যার মৌমাছিগুলো শুধু সাদা ফুলেই বসে, তারই গন্ধ ও মধুর মদিরায় মুগ্ধ হয়ে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু দিনের আলোতে রঙ্গীন ফুলের বাহার তার চোখ আর মন দুটিকেই টানে—সেটা কৌতূহল। ষট্‌পদের এই নিপট নিঠুর ব্যবহার কেন? এ ত অপমান করা, না না, অপমান নয়, প্রকৃতির নিয়ম—আদান-প্রদান। পরিমল গ্রহণ, রেণু বিতরণ, অপচয় প্রকৃতি ভালবাসে না, যখনকার যা নেওয়া দেওয়া, শেষ করলে অন্য ফুলের পালা আসে।

মলের ক্ষীণ একটু শব্দে যুবা উৎকর্ণ হয়েছে। ইত্যবসরে খোকাকে কোলে নিয়ে নীরি এসে উপস্থিত হ'ল, মৃদুকণ্ঠে ডাকলে—"দাদা মহাশয় বাড়ী আছেন?" তর্কালঙ্কার গ্রামের সকলেরই দাদামশায়। অপরিচিত যুবার মনের কথা কে জানে, যেন আপন অজ্ঞাতসারে দাদামশায়ের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে বল্লে, "কে গা তুমি?" নীরি বল্লে, "আমি নীরি, দিদিমা পাঠিয়েছেন, পাঁজি দেখে একাদশী কবে আর কতক্ষণ থাকবে, ব'লে দিন।" গৃহাভ্যন্তর হ'তে গম্ভীর স্বরে যুবা বল্লে, "এসো, ব'লে দিচ্ছি।"

আধ-ভেজানো দুয়ার সন্তর্পণে খুলে নীরি খোকাকে কোলে নিয়ে স্বল্পালোক ঘরের মধ্যে গেল, সে স্বচ্ছ অন্ধকারে দৃষ্টি অভ্যস্ত হ'তে অধিকক্ষণ লাগল না। নীরি গ্রীবা বঙ্কিম ক'রে দাদামশায়ের দিকে চাইবে;—খোকন ভাবলেন মাসী আদর করবেন—সে কলকণ্ঠে কাকলী ক'রে, ছোট দুটি হাতে মাসীর কুঞ্চিত-ঘন কেশগুচ্ছ সঙ্গিন-গ্রেপ্তার ক'রে জোরে চেপে ধরলে। অকস্মাৎ কেশাকর্ষণে বিহ্বল নীরির ঘোমটা খসে প'ড়ে, মেঘমুক্ত চাঁদের মত মধুর মুখখানি প্রকাশিত হ'ল। যুবকের অনিমেষ দৃষ্টি নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির—আলোকপাতে সে মুখ আরক্ত ক'রে তুল্লে। খোকার দৌরাত্ম্যে ঘোমটা গেল, আঁচল খসে পড়ল, আবার কি হয় ভয়ে নীরি অতি সত্বর ব্রাহ্মণ যুবাকে গ্রন্থসমুদ্রমন্থনে নিযুক্ত রেখে চম্পট দিলে। পুথির পত্রের কি দশা হ'ল, কে জানে?—পাঁজি দেখা আর হ'ল না সে দিন, এটা কিন্তু নিশ্চিত!

"কর্পূর"।

প্রমত্ত মর্ত্ত্যলোক

(রংদার ছবি)
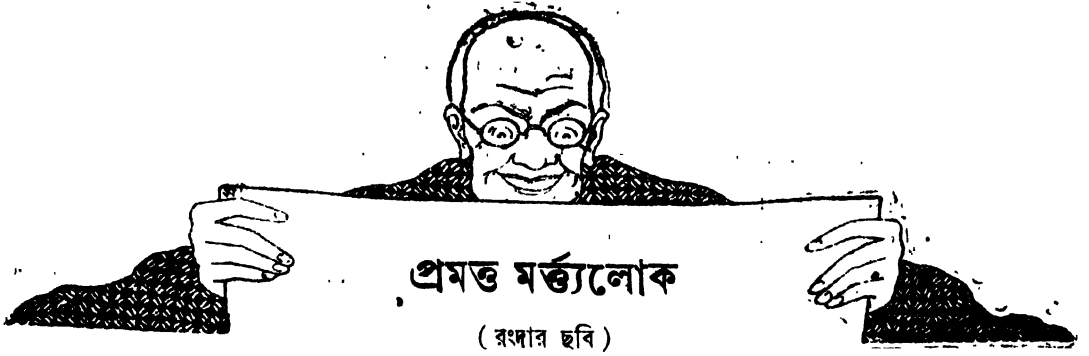
দেশের চারিদিকে জীবনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে। খেলার মাঠে, কলেজের ক্লাশে, বিবাহ-সভায়, টাউনহলে, —এক কথায় সর্ব্বত্র জীবনের স্পন্দন! এ স্পন্দন শুধুই যে বাঙ্গলা দেশে, তা নয়। যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন, মর্ত্ত্যলোকের কোথাও এ স্পন্দনের ব্যতিক্রম নাই।

বেতার অসাধ্যসাধন করিতেছে। Atmospheric electricityর লীলা-কৌশল বৈজ্ঞানিকের চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বেতার-বার্ত্তার কথা আজ শিশুরও অবিদিত নয়। ছেলেমেয়েদের মাসিকপত্র সংখ্যায় এত অধিক যে, মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের নামের সহিত বিজ্ঞানের নানা ফন্দী-ফিকিরের কথা আজ ছেলে-মেয়েদেরও কণ্ঠস্থ!

হঠাৎ একদিন বেতার-বাহিনীর মারফৎ মর্ত্ত্যলোকের এই স্পন্দন-বার্ত্তা স্বর্গলোকে প্রবেশ করিল। সেখানেও এখন আর সে মামুলি চাল নাই। ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্ট ফাঁদা হইয়াছে; মর্ত্ত্যলোকের বহু হোম্‌রা-চোম্‌রা পাণ্ডা সে কমিটিতে ঢুকিয়াছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণে সেখানে সেকেলে গলি-ঘুঁজি বুজাইয়া পর্দ্দা-পার্ক, ফর্দ্দা-পার্ক, বড় বড় রাস্তা, বাড়ী একেবারে বিরাট মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। তার উপর বহু দেশের বহু সম্পাদক সেখানে জমায়েৎ হইয়াছেন। খবরের কাগজের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ সেখানেও, এই খেয়োখেয়ি সেখানেও চলিয়াছে। এখানকার ক'জন ব্যস্তবাগীশ রিপোর্টার রাত জাগা ও অল্প বেতনের চাপে মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া স্বর্গলোকে গিয়াছে। মরিলেও স্বভাব যায় না, এবং ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—এই অমূল্য শাস্ত্র-বচনের জোরে তারা সেখানে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেছে নূতন খবরের জন্য। তাদের অনুগ্রহে কাজেই এ জীবন-স্পন্দনের বার্ত্তা সেখানেও পৌছিয়াছে। স্বর্গলোকে সে বার্ত্তা পৌছিবামাত্র সেখানকার সদ্য আন্‌কোরা দৈনিক 'হাওয়া'র টেলিগ্রাম-কলমে তাহা ছাপা হইয়া গেল, এবং পরের দিন সকালে পিতামহ ব্রহ্মার খাশ-কামরায়, বিষ্ণুর লাইব্রেরীর টেবিলে, পঞ্চাননের ডিষ্টিলারীতে, ইন্দ্রের নন্দনে 'হাওয়া' এ-বার্ত্তা রটাইয়া দিল।...

বৈকালের দিকে নন্দনের পশ্চিম কোণে পারিজাত-গ্রোভের ধারে বসিয়া কয়েক জন ছোকরা সখেদে আলোচনা জুড়িয়া ছিল। এরা সদ্য বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিয়াছে, এখনো স্বর্গলোকের জীবন-ধারায় তেমন অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। তারা বলিতেছিল, লোকে আরাম আর সুখের জন্যই স্বর্গ কামনা করে, কিন্তু এখানে ফূর্ত্তির তো কোনো আয়োজনই নাই! মামুলি একটা থিয়েটার চলিতেছে, তাহাতে সেই বুড়া ভরত-মুনির সেকেলে ঢঙের নাটক আর অভিনয়। বাঙ্গলায় এই অভিনয়ে কি প্যাঁচই না সব দেখিয়া আসিয়াছি! তার পর ঐ বুড়া উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা—ঠাকুরদা ব্রহ্মার যেমন নিজের বয়স সম্বন্ধে কোনো চেতনা নাই, তেমনি তিনি ভাবিয়াছেন, ইহারাও চিরযৌবনা! তাছাড়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা অপ্সরীরা—বেচারীদের যদি সুযোগ দেওয়া না হয় তো তাদের প্রতি অবিচারের আর সীমা থাকে না! এ বুড়াদের রাজ্য! মর্ত্ত্যলোকের কাশীধামে বুড়াদের প্রাধান্য কাটিয়া কচি-কাঁচার রাজ্য পত্তন হইয়াছে! আর স্বর্গ 'যা' ছিল, তাই রহিয়া গেল! তা কি দেশীপাড়া, কি বিলাতীপাড়া—কোনো তফাৎ নাই! তার পর সাহিত্য...তাহাতেও সেই মামুলি আদর্শ! মর্ত্ত্যলোকে রক্ত-মাংস লইয়া কি কারবার চলিয়াছে...এখানে তার চিহ্নও নাই! নিরামিষ সাহিত্য যে রক্ত একেবারে জল করিয়া দিবে! চাই উত্তেজনা, উদ্দীপনা, চাই আবেগ, চাই প্রাণ...

এ প্রাণের জোগান দিতে হইলে চাই সভা-সমিতি গড়িয়া বিরাট আন্দোলন। এখানে ও-পাটই নাই। অথচ বাঙ্গলা দেশে···প্রতি ব্যাপারে সভা! সেখানে জাতির মধ্যে কি প্রাণই না সাড়া দিয়া উঠিয়াছে! তরুণের দল সেখানে কতখানি শক্তিশালী!···যা মনে করে, তাই হয়! আর এখানে? বেচারা তরুণরা নেহাৎ কোণঠাশা হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়!

ছোকরার দল দেবতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া সভার প্রস্তাব পাড়িল। যে-সকল মহাপুরুষ বহুকালাবধি মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া কর্ম্মফলে স্বর্গলোকে আসিয়া মোটা পেন্সন খাইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁদের দ্বারেও তরুণের আহ্বান জাগিল। তাঁদের কাজের মধ্যে নন্দনের হাওয়ায় গা ঢালিয়া থাকা, কোনো দিন ব্রহ্মলোকে, কোনো দিন বা শিবলোকে তত্ত্বকথা শুনিয়া বেড়ানো— নয় তো বৈকুণ্ঠধামে নারদ ওস্তাদের গান শোনা এবং নিমন্ত্রণ পাইলে কোনো দিন বা ইন্দ্রালয়ে নাচ-গানের পার্টিতে একটু বসা!···মানুষের মন! তাঁরা বলিলেন, মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য—বেশ কথা!

তাঁদের কাছ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ছোকরারা প্রথমেই মহাসমারোহে সাহিত্য-সম্মেলনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বিশ্বসাহিত্য-সম্মেলন!···ভরত-মুনির সুপারিশ সংগ্রহ করিয়া নন্দন-পার্কে জমী পাওয়া গেল। তাঁবুর জন্য দেবী দ্রৌপদী ভাণ্ডারে-রক্ষিত সেই বস্ত্র জোগান দিলেন—এত দীর্ঘ বস্ত্র আর কাহারো ঘরে নাই! চাঁদ দিনের আলোর ভার লইলেন, সে সময়টা তাঁর ডিউটি নাই। সূর্য্য লইলেন রাতে আলো জোগাইবার ভার; কারণ, রাত্রে তিনি off-duty. নক্ষত্রেরা চাঁদোয়া সাজাইবেন, স্থির হইল। পবন কহিলেন,—হাওয়া আমি দিব—বিশুদ্ধ মলয়! বরুণ কহিলেন,—জল আমি যোগাইব!···

ছোকরারা গিয়া হাজির হইল বৈকুণ্ঠধামে। বিষ্ণু তখন নূতন-কেনা ওয়েলার জুটী কেমন ব্রেক্ হইয়াছে দেখিবার জন্য আস্তাবলে আসিয়াছিলেন। সনাতন ওয়েলারের মায়া তাঁর আর ঘুচিল না। চাঁদার খাতা তাঁর সামনে ধরিতে তিনি কহিলেন,—আমার বহু খরচ বাড়িয়া গিয়াছে, বাপু! মর্ত্ত্যে যে-খরচে আগে কায চলিত, এখন তার চতুর্গুণ ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। লোকগুলো সেখানে নিজেরা খাটিয়া রোজগার করিতে গররাজী···নানা ঢংয়ের বাতিক নিত্য দেখা দিতেছে—নানা ফন্দী আঁটিতেই সকলে ব্যস্ত, ষ্ট্রাইক্—রোজগারের দিকে মন নাই। কাযেই পালনের খরচ জোগান্ দিতে দিতে আমার ফতুর হইবার জো! কথায় কথায় চাঁদার ফণ্ড খুলিয়াও সেখানে অভাব কারো ঘোচে না। যত দায় পড়িয়াছে আমার ঘাড়ে! কাজেই আমার অবস্থা কাহিল! অমন ব্যাঙ্কটা···ওভারড্রাফ্‌টের কি দান সত্র···কত সুবিধাই ছিল, তা সে ব্যাঙ্কও তো সাফ। অতএব চাঁদা আমি দিতে পারিব না।

ছোকরারা কহিল,—তা না হয় না দিলেন, কিন্তু দেব, একটা বিষয় দেখিয়া প্রাণে অত্যন্ত বেদনা পাইতেছি। অভয় পাইলে শ্রীচরণে নিবেদন করি।···

বিষ্ণু কহিলেন,—কি! পথ খারাপ? না, কলে জল পাও না? না, মন্দাকিনীর বন্যাদায়? সে কাজের জন্য আমায় বিরক্ত করা কেন? আমি তো বাপু, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ছাড়িয়া দিয়াছি। এ বয়সে একটু আরাম কে না চায়? চিরকাল কি খাটুনিই খাটিয়াছি। কথায় কথায় অবতারী সাজ আঁটিয়া মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছি। তখন বয়স ছিল অল্প। এখন আর পারি না। নহিলে আজও বহু নালিশ আসে—দু-একটা সভার রেজলিউশন, সেই সঙ্গে দরখাস্ত—ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিতেছে প্রভু, একবার নামুন।···তা নামার আর শক্তি নাই। সুদর্শন চক্রটাও অব্যবহারে ভোঁতা হইয়া গেল। লোহাপটীতে পাঠাইব, ভাবিতেছি।···যা পাওয়া যায়!··· তা, তোমাদের নালিশ? মর্ত্ত্যলোক হইতে কৃতান্ত তো বহু দিগ্‌গজ এঞ্জিনিয়ার আনিয়াছে, চাঁদা-সংগ্রহে দক্ষ বহু ভারতসন্তানও হাজির—তাদের কাছে যাও···

ছোকরারা কহিল,—সে-সব ছোট ব্যাপারে আপনাকে ক্লেশ দিতে আসি নাই প্রভু!

—তবে?

ছোকরারা কহিল,—এই ঘোড়া-জীব বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে। এস, পি, সি, এ'র নিগ্রহ আছে—তার উপর এখন যে মোটর আর এরোপ্লেনে মর্ত্ত্যলোক ছাইয়া গেল, তারি একটা আপনার আনানো উচিত!···আপনি ত্রিলোকপতি

বিষ্ণু কহিলেন,—আগামী বছর দেখা যাইবে। God-less jute—সে টাকাটা আর বিদেশে গেল না। কি বাঁচিবে। তা, ভালো কোম্পানীর নাম জানো? সুবিধে দর চাই, বাপু, সেকণ্ড-হ্যাণ্ড হয়, হোক্।

ছোকরারা কহিল,—আজ্ঞে, সেটা খবর লইয়া বলিব। Insolvency court-এ কোন্ কোম্পানী schedule file করিল…পরেও সুবিধা হইবে। কিম্বা কোনো কাপ্তেন ঘাল্…খবর লইব।

বিষ্ণু কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়াছিলে?

ছোকরারা কহিল,—গিয়াছিলাম। তিনি এক নূতন নাটকের রিহার্শাল লইয়া মত্ত। বাড়ীতেও থাকেন না। হট্টশালার দিকে একটা ঘর লইয়াছেন, রিহার্শালের জন্য। তা ছাড়া তিনি থিয়েটারে বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁর এষ্টেট্ কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডসে গিয়াছে। ভাতা যা পান, তা তাঁর থিয়েটারেই…

বিষ্ণু কহিলেন,—ওঃ! এখনো এ বাতিক গেল না। এত দেনাতেও…বেচারী শচী! অদৃষ্টে কি আছে!

ঘুরিয়া কোনো দেবতার দ্বারেই চাঁদা মিলিল না। ছোকরারা তাঁদের ছাড়িয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল।

সভাপতি করা যায় কাহাকে? নানা দেশের নানা ভাষা…কোন্টা রাখিয়া কোন্টাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়? বহু আলোচনায় পিতামহ ব্রহ্মাকে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল। সাহিত্যের সন্ধান নাই রাখিলেন, পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান তো তাঁর আছে। তা ছাড়া সভাও মানাইবে। পাকা দাড়ির প্রাচুর্য্য, আর চমৎকার ভালোমানুষ লোক, নির্ব্বিরোধী…তা ছাড়া সাহিত্যে অগ্নিসংস্কার করিতে হইলে ব্রহ্মা-ভিন্ন তার যোগ্যপাত্রই বা কে! শাখা-ইংরাজী-সাহিত্যের সভাপতি হইলেন সেক্সপীয়র; সংস্কৃতে কবি কালিদাস; বাঙ্গলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্ব্বাচন করিতে বসিয়া মহা গণ্ডগোল বাধিল। ছোকরার দল সদ্য মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া আসিয়াছে! তারা জানে, বঙ্কিম সেখানে এখন একদম বাতিল। কিন্তু মুস্কিল বাধিল এই যে, যে-সব ধুরন্ধর সাহিত্যিক বঙ্কিমকে বাতিল করিয়াছে, তাদের অনেকেই এখনো মর্ত্ত্যলোকে পাঠক-পাঠিকাদের ভূত-ভবিষ্যৎ চর্ব্বণ করিতে মত্ত,—এখানে তাদের অতি প্রতিনিধি অল্প। ইহাদের দল স্বর্গলোকে তেমন শক্তিশালী নয়! অগত্যা বাতিল বঙ্কিমকে প্রেজাইডিং দিয়া খাড়া করা হইল।…

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে সম্মেলনের অধিবেশন হইল। সমারোহে সম্মেলনের কার্য্য নিষ্পন্নও হইল। শুধু শেষ দিনে ছোকরার দল কলরব তুলিয়া জানাইল, মর্ত্ত্যলোকে—বিশেষ বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। আদর্শ-সৃষ্টি একেবারেই ফাঁকি, আর্টহীন! রক্তমাংস লইয়া সেখানে সাহিত্যের কারবার চলিয়াছে। অতএব…

রক্ত চাই, রক্ত চাই-রবে দেবী বীণাপাণির জাল রেকর্ড বাজাইয়া তারা তাঁর নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি কাগজে আঁকিয়া তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়িয়া দিল।

ভীষণ কলরবের মধ্যে সভার কায কোনো রকমে শেষ হইলে সেক্সপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি প্যাণ্ডালের বাহিরে আসিয়া মন্দাকিনীর বাঁধা ঘাটে নানা আলোচনায় রত হইলেন।

কালিদাস কহিলেন—মর্ত্ত্যলোকে একবার বেড়াতে গেলে হয়! সাহিত্যের গতিও লক্ষ্য করা যায়। এরা যে অতখানি কলরব তুললে…আমাদের উচিত, কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলা। তা হ'লে বইগুলো একদম্ গুদামে পচে না, দু-চারখানা তবু বিক্রী হয়।

সেক্সপীয়র কহিলেন—একবার যাওয়া যাক। যত দিন বেঁচে ছিলুম,তত দিন কেউ বড় গ্রাহ্যও করেনি। এখন শুনছি, আমাদের স্মৃতির উৎসব চলেছে সেখানে। খুবই সমারোহ!

কালিদাস কহিলেন—যাওয়া যাক। কি বলো হে বঙ্কিম?

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—আমার প্রাণে আতঙ্ক বাজে। শুনছিলুম, আমার সে কাঁঠালপাড়ার বাড়ী নাকি রেল-লাইনে পড়বার কথা চলছে। তার উপর আমি ত বাতিল। শেষে কি অপমান বয়ে ফিরে আসবো!…

কালিদাস কহিলেন—ছোকরার দল চিরদিনই ফাজিল, অর্ব্বাচীন। তাদের কথায় টলবে কেন?…চলো, যাওয়া যাক। আহা, শ্যামা বসুন্ধরা…সেখানে এখন শরৎ-লক্ষ্মীর বিচিত্র গৃহিণীপনা…

'হাওয়া' কাগজে এ খবর রাষ্ট্র হইয়া গেল। ছোটবড় সাহিত্যিক অনেকেই আসিয়া জমিলেন। সকলেরই দারুণ উৎসাহ!…

পঞ্জিকা খুলিয়া শুভলগ্ন স্থির হইল, এবং অল্পস্বল্প লগেজ লইয়া সকলে স্বর্গলোক ছাড়িয়া একদিন মর্ত্ত্যলোকে যাত্রা করিলেন! একদল ছোকরাও সঙ্গ লইল—এরা মর্ত্ত্যলোকে সাহিত্যের বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইত, রামের কথা শ্যামকে বলিয়া, শ্যামের কথা যদুকে বলিয়া, কন্টিনেণ্টাল লেখকদের বইয়ের ভূমিকার বাঙ্গলা-তর্জ্জমা করিয়া, মাসিকে ভারী

পার্শ্বে জ্বালাইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের আসর গুলজার রাখিতে। তারা বলিল,—আমরা ভলাণ্টিয়ারী করিব… সঙ্গে লইয়া চলুন।

সকলে বলিলেন,—চলো।

বৈতরণীর ওপারে বহু বিচিত্র জলযান—জাহাজ, ভড় প্রভৃতি ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশে যাতায়াতের জন্ম হাজির। সকলে যথাযোগ্য জলযানে চড়িয়া নিজের নিজের দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২

ভারতের প্রান্তে যে জলযান আসিয়া থামিল, তাহাতে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ হইতে স্থরু করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, ছোকরা সাহিত্যিকের দল, এমন কি, সেকালের সেই বঙ্গদর্শন প্রেসের ও একালেরও বহু প্রিণ্টার, কম্পোজিটার প্রভৃতি আসিয়া মর্ত্যলোকে অবতরণ করিলেন।

তীরে বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট দেখিয়া সকলের চক্ষু-স্থির! কয় বছরে এমন পরিবর্ত্তন! চিনিয়া লওয়া দায়। জলযান-বন্দরে ঘাটের উপর পথের ধারে সাত-আটতলা বাড়ী, অসংখ্য। সেগুলা হোটেল। নানা ভাষায় যাত্রীদিগকে প্রলুব্ধ করিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা প্রগল্ভ প্রলোভন দেখাইয়া বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। কালিদাস কহিলেন,—কাণ্ড কাগজ আঁটা দেওয়ালে…ও কি লেখা হে?

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। এও যে নতুন ধরণের দেখছি। কি লেখা আছে?

খুব ছোট হরফে থিয়েটারের নাম, তার নীচেই তেমনি ছোট হরফে নাটকের নাম—বন্দিরা। তার নীচে অভিনেতা-মণ্ডলীর নাম এক হাত দীর্ঘ অক্ষরে ছাপা।…

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—আমাদের আমলে বইয়ের নামটাই মোটা হরফে ছাপা হতো। অভিনেতা আর অভিনেত্রীর নাম ছোট হরফে, তাও ভারী বাছা-বাছা নামগুলি মাত্র ছাপা হতো। এ দেখছি নাটকের নাম ছোট হরফে, আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম ইয়া মোটা হরফে! ইস্তক কে টিকিট বেচ্‌বে, তার নামও ছাপা! এ যে ভারী তাজ্জব কাণ্ড!…

একজন ছোকরা কহিল,—যারা টিকিট বেচে, তারা দু'দশ টাকা মাঝে মাঝে থিয়েটারওয়ালাকে ধার দেয় কি না! এ্যাক্ট করতে পারে না, অথচ নাম জাহিরের বাসনা আছে। তা ছাড়া পাশের জন্ম লোকে ওদের একটু উমেদারি করবে, সে গর্ব্বটুকুও…তাই ওদের নাম ছাপা হয়।

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—বটে!

তাঁরা সকলে পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পথে মোটর-লরির কি ভিড়!…পথ চলা দায়! বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—ঘোড়া নেই, এঞ্জিনের ধোঁয়া নেই, এ সব কি গাড়ী?

'লরি-বোঝাই গন্ধমাদন'

ছোকরা বলিয়া দিল—মোটর গাড়ী।

—কিসে চলছে?

—পেট্রোলে।

—পেট্রোল কি?

—তেলের মত পদার্থ। বি, ও, সির পেট্রোল, জানেন না? তাতে মোটর চলে!

একটা লরিতে গিব্বড় আকারের মোটা বই চলিয়াছে। বিজ্ঞাপন আঁটা—

পূজার গন্ধমাদন

—এ কি হে! গন্ধমাদন পর্ব্বত না?

মধুসূদন কহিলেন—হাঁ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল হলে সেই যে হনুমান্ বয়ে এনেছিল্।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—তা এত গন্ধমাদন এরা বয়ে বেড়াচ্ছে কেন? এরা জনে-জনে হনুমানও নয়, দেখছি। আর এত শক্তিশেল কার বুকেই বা বাজ্‌লো?

পাশের ছোকরা ভলান্টিয়ারটি কহিল,—এ গন্ধমাদন হলো মাসিক পত্র! এতে সব পাবেন—বিশল্যকরণীটুকু ছাড়া। সেটা হনুমান নাকি সে-যুগে নষ্ট করে ফেলেছে!

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—বটে! তা এত মোটা মাসিক পত্র?

ছোকরাটি কহিল,—আজ্ঞে, লোকের চিন্তা, জ্ঞান সবই এখন মুটিয়ে উঠেছে কত! কাজেই···

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—ও কি লেখা হে বিজ্ঞাপনে?···

লরি থামিয়াছিল, বহু যাত্রী দেখিয়া শিকারের লোভে।

গিরিশচন্দ্র পড়িলেন, বিজ্ঞাপনে লেখা আছে—

পূজার সংখ্যার বিশিষ্টতা.. এমন আর কোথাও নাই।

কবি কালিদাস-রচিত অপ্রকাশিত রচনা, "নব মেঘদূত"

বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা, "সুসংস্কৃত কৃষ্ণকান্তের উইল। নব্যা রোহিণী"

গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত নাটক—"জার্ম্মাণ যুদ্ধে কাইশার"

মাইকেলের অপ্রকাশিত কাব্য—"বারাঙ্গনা" (ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের তৃতীয় পর্ব্ব)...

কালিদাস সাশ্চর্য্যে কহিলেন—পড়ো তো হে একখানা নিয়ে! আমি আবার নব-মেঘদূত কি লিখে রেখে গেলুম!···

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—আর এ নব্যা রোহিণী পদার্থই বা কি?

মধুসূদন কহিলেন—আমার উপর এ কি ভীষণ অত্যাচার! ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা লিখেছি ব'লে শেষ বারাঙ্গনাও···

একখানা বই কেনা হইল। মই লাগাইয়া ড্রাইভার একখানা গন্ধমাদন পাড়িয়া দিল। দাম নগদ দশ টাকা মাত্র। পাতায় পাতায় ছবি। আর লেখার সীমা-পরিসীমা নাই!···

ফুটপাথের উপর বই খুলিয়া সকলে মিলিয়া পাতা উল্টাইলেন। একটা সার্জ্জেণ্ট আসিয়া কহিল—রাস্তাবন্দী··· হুঁশিয়ার!···

সকলে চমকিয়া উঠিলেন। ধরাধরি করিয়া বইখানা আনিয়া বৈতরণীর তীরে বালুকারাশির উপর ফেলিলেন, তার পরে পাতা উল্টাইয়া কালিদাস কহিলেন—নব-মেঘদূত কি লিখে রেখে গেছি, পড়ো তো আগে।

পড়া হইল। প্রথমেই সম্পাদকীয় টিপ্পনী।···

[বহু অধ্যবসায়ে বহু সন্ধানে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক-রচয়িতা উজ্জয়িনীর রাজ-কবি সেই কালিদাসের এই নব-মেঘদূত আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। পূজায় পাঠক-পাঠিকা-দিগকে উপহার দিতেছি। পড়িয়া তাঁরা বুঝিবেন, ভারতের কালিদাসকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সংজ্ঞায় অভিহিত করা অন্যায় হইবে কি না। আধুনিক সাহিত্য যে-বিষয় লইয়া আজ প্রমত্ত হইয়াছে, কালিদাস কবে তার প্রথম পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।···তাঁহার রচিত এই পশ্চিম মেঘ ও দক্ষিণ মেঘ তার প্রমাণ! ইতি গন্ধমাদন-সম্পাদক।]

তার পর কাব্য সুরু হইয়াছে—

"সাম্নের ভবনে ভবন-তনয়া

পশ্চিম-মেঘ

কশ্চিৎ ছাত্রস্তরুণবয়সো মেশ-গবাক্ষে বসিত্বা
সাম্‌নে গ্রন্থঃ খোলা সে, তবু তার ঘূর্ণিতশ্চক্ষুযুগ্মঃ
সাম্নের ভবনে ভবনং-তনয়া গাচ্ছে গান এক তরুণী—
স্নিগ্ধচ্ছবিটুকু আহা কিবা মরি, তোলে চন্মনানি প্রাণেষু ॥
তস্মিন্নস্তই বই-খাতা দূরে ফেলি করি হি ফুর্ত্তির্বথামি ;
নীত্বা বাঁশান্ ব্যবধান খান্-খান্ করি চ ফেলিয়া লোষ্ট্রং।
ফাল্গুনস্য প্রথম দিবসেই বিরহে ক্লিষ্টস্তরুণো
দীর্ঘশ্বাসেই জর-জর হবো কি রে ! পাবো না দৃষ্টিরপাঙ্গের ॥
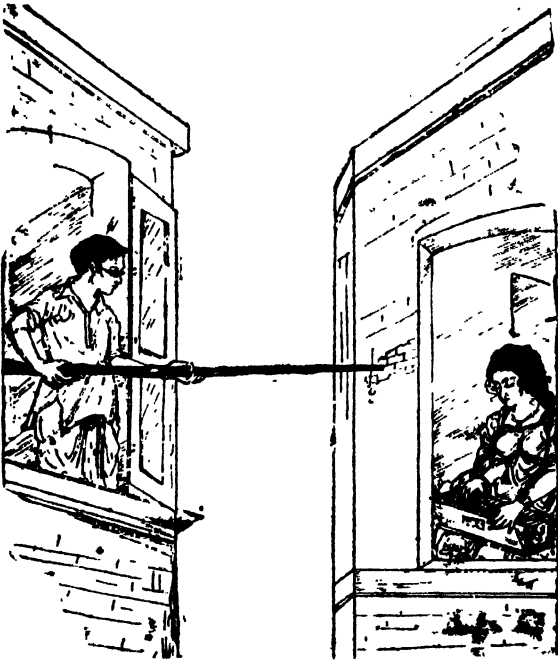
"নীত্বা বাঁশান্ ব্যবধান খান্-খান্···"

গানং শুনত্বা প্রাণে সখ হয় খুবি, ভাব যদি হয় একটুঃ,
কিন্তু দ্বারে দরোয়ানো বসে ভীম, মারিবে মুষ্টি-গুঁত্তাম্।
কাজে-কাজেই এক-আনা টিকিটেই চিঠি ভরি প্রেরি তস্যৈ ;
প্রাণেপ্রীতিভরা-প্রেমবচনং লিপি এক লিখে সে ফেললো ॥

* * * * *

দক্ষিণ-মেঘ

···নিঃসঙ্গা হায় খদ্দর-বসনে পিয়ানোধার-আসীনাং
টুং-টাং-টং-টং কি সে ধ্বন্যাত্বং ক্ষয়ে হেথা হয়ে যাই ঝামা।
ভাবি, যাই চলে ঐ কাশীং মক্কাং—ফিরে যদি নাহি চাও
কিঞ্চিৎ,
ভুয়োভুয়ো ভুয়ো কাণে বাজে, দেখি দুনিয়া লাট্টু ঘুরচে ॥

শ্যামালিখ্যাং রূপসীং তরুণীং ভাবি এ চিত্তে কতই কি—
যদি হায় পারতুম্, ও-চরণে পড়তুম, নাগরা তাও
নয় চাট্তুম।
মিথ্যেই দৈবের ঘরে বাস, রূপে ওই বিশ্বটা কম্পিত টল্‌মল্···
লুটে নিতে পাবো না কি দুঃখ এ, মিলনে ? সখি কুরু
বুক-দুরু শান্তম্ ॥

[কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই শ্লোকগুলির বাঙ্গলায়-রচা বিচক্ষণ বচন-বিন্যাসেই সে পরিচয় সুপরিস্ফুট। তর্ক ও যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। গন্ধমাদন-সং]

কালিদাসের জীর্ণ দেহ নব-মেঘদূত পাঠে রাগে খড়মড় করিয়া উঠিল। এ কি অত্যাচার ! বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি হাসিয়া খুন ! কালিদাসের মাথার শিখা সঘন আন্দোলিত হইল। তিনি কহিলেন—ও বই বন্ধ ক'রে দাও ! এ কি জুচ্চুরির ফন্দী ! তাছাড়া যা লিখবে, তাই কাব্য ! আর যে লিখবে, সে-ই দেখছি, একেবারে কবিশেখর কালিদাস !···নিপাত যাক সব !···

গিরিশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—এবার নব্যা রোহিণীকে দেখা যাক !

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—ভয়ে ভাবনায় আমার তো গা ছম্‌ছম্ করছে।

মাইকেল হাসিয়া কহিলেন—দুয়ো বঙ্কিম ! দেখো না পড়ে। ভয় কি ? তার পর আমার নামে যা আছে···

হাসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—তা বটে !

গিরিশচন্দ্র গন্ধমাদনের পাতা উল্টাইয়া কহিলেন—এই যে নব্যা রোহিণী। এতেও সম্পাদকের টিপ্পনী আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—সম্পাদক কি লিখচেন ?

গিরিশচন্দ্র পড়িলেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগে অচল, বাতিল এবং তিনি কাপুরুষ বলিয়া একদল সাহিত্য পঙ্গপাল বেজায় আন্দোলন সুরু করিয়াছে।"···

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—সাহিত্য-পঙ্গপাল ?···

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—হাঁ। মানে, তাদের দল এমন যে সাহিত্যের ক্ষেতে যত ফশল, তা সব ঢাকা পড়ে ক্ষেতে শুধু পঙ্গপালই নজরে ঠেকছে···

মাইকেল কহিলেন—তোমার ব্যাখ্যাটুকু বেশ !··· ফশলের উপর যেমন পঙ্গপাল পড়ে, এরাও তেমনি···! বেশ উপমাযুক্ত ব্যাখ্যা !···তারপর ?

গিরিশচন্দ্র পড়িলেন,—"কিন্তু এ সংবাদে বিচলিত হইয়া বঙ্কিম যুগোপযোগী অভিনব-প্রেম-রঙ্গে রঙীন্ রিভাইজ্‌ড্ কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করিয়া স্বর্গলোক হইতে বেতারে আমাদের তাহা পাঠাইয়াছেন। এই নব-সংস্করণে রোহিণীর তিনি যে রূপ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে ঝি-চরিত্র-চিত্রণ-পটু পটুয়ার দল ঝি ছাড়িয়া এখন অপর জীবের দ্বারে ছুটিবেন, নিঃসন্দেহ!"

... বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—বটে? বলে কি হে···ঝি···তার মানে···?

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—কেন, ঝিয়ের ছবি কি আপনি আঁকেন নি? মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।···হীরা দাসী···তার রোমান্সের কাছে পটলী, বামার মা, ক্ষ্যান্ত, ভূতোর পিসি, সাবিত্রী, চাঁপা?—এদের রোমান্স ছাই!···আপনার কৃষ্ণ-কান্তের উইলে ক্ষীরি দাসীরও প্রণয় ঘটেছিল হরে চাকরের সঙ্গে। তবে হাঁ, সে ঝিয়েদের নজর উঁচু ছিল না। বড় বড় বাবুদের দিকে চাইতো না, কিম্বা মেশের প্রেমিক-ছাত্রদের সঙ্গে তারা ফষ্টিনাষ্টি করতো না, বা তাদের গার্জ্জেন হয়ে জোর-গলায় হুকুম ছাড়তো না,—যাও কলেজে!···কালের গতি! Evolutionএর ফলে ঝি-জাতির সাহস বেড়েছে, বিস্তর উন্নতি হয়েচে। তবে হ্যাঁ, আপনিও খুঁত রেখে যান নি···ঐ হীরা দাসীটা দেবেন্দ্র দত্তর জন্য···

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—আঃ, ও কথা থাক্ এখন! নব্যা রোহিণী কি চীজ, পড়ো।

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—এই যে···

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"পরদিন প্রাতে রোহিণী রান্নাঘরে টুলে বসিয়া চা খাইতেছে, কোলের উপর আগুন-ছোটানো নূতন উপন্যাস 'গোলাপী নেশা' বইয়ের একখানা পাতা খোলা, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল তার আঁচলটা টানিয়া দিল। উদ্‌ভিন্ন যৌবনের লাবণ্য চকিতে অমনি ঝিকি-মিকি প্রকাশ হইয়া পড়িল। দুই চক্ষে বিদ্যুদ্দামতুল্য কটাক্ষ হানিয়া রোহিণী কহিল,—আঃ, যাও! করো কি! কথাটা বলিয়া রোহিণী হাসিল। রোহিণীর নবনীত-কোমল স্বর্ণকান্তি দেহের স্পর্শ অনুভবের জন্য হরলালের প্রাণ ক্ষেপিয়া উঠিল। সে একেবারে রোহিণীর পাশে বসিয়া তার অঙ্গে হস্তার্পণ করিল। ক্রমে সে ক্ষেপিয়া উঠিল।

রোহিণী কহিল,—কি চাও?

হরলাল কম্পিত হইল, তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিয়া কহিল,—তোমার ঐ পেয়ালার প্রসাদী চা।

রোহিণী চায়ের পেয়ালা হরলালের সামনে আগাইয়া দিল। তলায় চায়ের কটা পাতা আর এক-ছিটা তরল পদার্থ

···ঐ পেয়ালার প্রসাদী চা···

পড়িয়া ছিল। কোঁৎ করিয়া সেটুকু গলায় ঢালিয়া হরলাল আরামে কহিল,—আঃ! তার চক্ষু বুজিয়া আসিল। এক-মুহূর্ত্তে তার অতীত, ভবিষ্যৎ মুছিয়া গেল।

চেতনা ফিরিতে হরলাল কহিল,—উইল আনিয়াছ?

রোহিণী রাগে জ্বলিয়া উঠিল—একেবারে দাউ-দাউ করিয়া, জ্বলন্ত কুটীরের মত। তারপর কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—কাপুরুষ! নির্জ্জনে এমন রূপের রাশি দেখিয়াও উইলের কথা ভোলো নাই? প্রসাদী চা পাইবার যোগ্যতা নাই, তুমি আসিয়াছ ঢুলু-ঢুলু নেত্রে আমার কাছে? শীঘ্র যাও। নহিলে ঐ স্নানের জল গরম হইতেছে, দেখিতেছ?

ঐ ফুটন্ত জল তোমার গায়ে ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়াইয়া দিব।

বলিয়াই সে খোঁপাটা খুলিয়া ফেলিল, তারপর এলায়িত চুলের গোছা দুই হাতে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল,—ঝাঁটার কথা তুলিলাম না—সেটা অভদ্র, ইতর। কিন্তু আবার যদি উইলের কথা তোলো তো ঐ চ্যালাকাঠ লইয়া……

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে সে বিদায় লইল।

সে চলিয়া গেলে রোহিণী সেই রান্নাঘরের মেঝেয় শুইয়া পড়িয়া আকুল আর্ত্তস্বরে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এ যৌবন কেন দিয়াছিলে, ভগবান্? এই রূপ, এমন লাবণ্যের তীর-ধার…যদি না একটা তুচ্ছ পুরুষকে মৃগয়া করিতে পারিলাম! তার চোখে জল আসিতেছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—অসহ্য ইতরুমি! আধুনিক সাহিত্যের কি এই গতি? ছ্যা…

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—আর একটা পরিচ্ছেদ দেখা যাক…সেই নিশাকরের সঙ্গে দেখা……

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—আমার গা বমি-বমি করছে!…থাক্।

মধুসূদন কহিলেন,—এ তো এই! না জানি, আমার বারাঙ্গনা কাব্য কেমন হবে!…পড়ো হে গিরিশ…

গিরিশচন্দ্র পড়িতে লাগিলেন—

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশাকর ছিনা জোঁকের মত অন্ধকারে অঙ্গ ন্যাপ্‌টাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। That's গোবিন্দলাল chap…হাবাগোবা ছেলের মত ভালো মানুষ, ধূলা দেবার মত চোখ জোড়াও বটে! সে ভাবিল, তাই under his very nose রোহিণী যে বাহির হইয়া আসিবে, এ তো psychological সত্য। ক্রমে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে গা?

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল,—তুমি কে?

নিশাকর বলিল,—আমি রাসবিহারী।

রোহিণী কহিল,—আমি রাসবিহারীর রাস-বিহারিণী।

নিশাকর এ-কালের কাব্যরসে বঞ্চিত, পাটের কাজ করে। সে থমকিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি রোহিণী নও?

রোহিণী কহিল,—তাই গো, তাই। বলিয়াই অঞ্চলতল হইতে চক্ষের নিমেষে একটা থার্ম্মো-ফ্লাস্ক বাহির করিয়া কহিল,—নাও।

নিশাকর কহিল,—কি ও? চা?

রোহিণী কহিল,—না। white label…বরফ দেওয়া…একদম্ তৈরী।
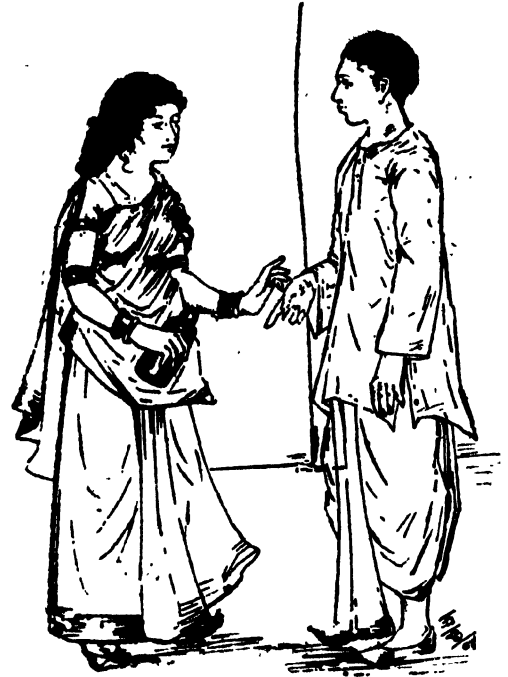
রোহিণী কহিল,—তাই গো, তাই…

নিশাকর কহিল,—দাও।…নিশাকর সেটুকু পান করিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া কহিল,—কি চাও রোহিণী?

রোহিণী কহিল,—একটা ট্যাক্সি। এ গাঁয়ের খাঁচা ভালো লাগে না। দু-চারখানা কাঁচাপাকা মুখও দেখিতে পাই না। অসহ্য হইয়াছে।

নিশাকর কহিল,—তার পর?

রোহিণী কহিল,—ষ্টেশনে চলো। সেখান হইতে কলিকাতা। কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়িয়া একেবারে বর্ম্মা। জাহাজে খুব ফুরসৎ পাওয়া যাইবে প্রাণের psychology আলোচনায়।

নিশাকর কহিল,—কিন্তু সামনে এই পাটের মরশুম্…

রোহিণী কহিল,—ধিক! চেয়ে দেখো দেখি আমার এই ফুটন্ত যৌবনের দিকে। এর কাছে পাট! লোভ হয় না? তোমার কোনো লোকসান নেই, আমার লাভ আছে। এমন যদি হয় যে নিজের কোনো অসুবিধে না করে তুমি অন্যকে একটু আনন্দ দিতে পারো তো তা থেকে বঞ্চিত করবার তোমার অধিকার নেই।"

এই অবধি পড়া হইবামাত্র একটি ছোকরা—সে বেচারা এ-কালের যত মাসিকের সম্পাদকদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিত কবিতা ছাপাইবার উদ্দেশ্যে; এমন সময় মোটরের ধাক্কায় হ্যারিসন রোডে পড়িয়া প্রাণ দেয়; দেবী সরস্বতী তার পকেটে কবিতা-লেখা নোটবুক দেখিয়া সহসা কেমন সদয় হইয়া তার অপঘাত-মৃত্যু-সত্ত্বেও তাকে স্বর্গলোকে যাইবার একটা ফ্রী থার্ড ক্লাশ সারভেণ্ট পাশ্ দিয়াছিলেন,—সেও কালিদাস প্রভৃতির সঙ্গে আসিয়াছিল ভলাণ্টিয়ারীর সাধু উদ্দেশ্য লইয়া। বাসনা, এই পর্য্যটনের একটা রিপোর্ট লিখিয়া কোনো মাসিকে ছাপাইয়া নাম কিনিবে! সে-ছোকরা চীৎকার করিয়া উঠিল—সম্পাদকের জুচ্চুরি। এ লেখাগুলো আমি পড়ে এসেছি, বোশেখ না জষ্টি মাসের একখানা কল্‌কাতার কাগজে। এর লেখার এখানটা, তার লেখার সেখানটা চুরি ক'রে কৃষ্ণকান্তর উইলের সঙ্গে জুড়ে দেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—এ-সব লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে? বেরোয়?

ছোকরা কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ। এরাই তো আধুনিক সাহিত্যের দিক্‌পাল। প্রাণের অনুভূতি থেকে সব লেখে, জীবনের যত প্রত্যক্ষ সত্য।...

মধুসূদন কহিলেন—বটে! এই সব পড়েই তুমি এ-বয়সে প্রাণ দেছ! আহা, কচি প্রাণ! এত ভারী psychologyর চাপ্ সহ্য করতে পারোনি আর কি!...

ছোকরা কহিল—আজ্ঞে না, আমি হার্টফেল হয়ে মারা যাইনি...মোটরের ধাক্কায় মরেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—যাক্, যাক্। পরের পরিচ্ছেদটা আছে হে, সেই রোহিণীর গুলি-মারা?...সে-ব্যাপার নিয়ে তো ওরা হুলস্থূল বাধিয়ে দেছে।...আমায় পেলে বুঝি গুলি করে! কি রাগ সব আমার উপর সেই জন্য! এসেছি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার গা ছমছম করছে। Literary murderটা শেষ আমার উপর দিয়েই না সুরু হয়! তা সে পরিচ্ছেদটা

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—এই যে...নবম পরিচ্ছেদ, না?... আছে, আছে। পড়ছি...

তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল,—রোহিণি...তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রোহিণী—কি?

গোবিন্দ—তুমি আমার কে?

রোহিণী—কেহ নহি। যত দিন বুকে রাখেন, তত দিন বুকের নিধি। নহিলে কেহ নই।

গোবিন্দ—বুকে নয়, মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম..."

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—এগুলো ঠিক আছে, একটু-আধটু অদল-বদল,—'পায়ের' জায়গায় 'বুকে'র, 'দাসী'র জায়গায় 'বুকের নিধি'...এই যা!

মাইকেল কহিলেন—গুলিমারার কি হলো?

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—এই যে পড়ি...

"রোহিণী বলিল,—মরিব না। মারিও না। বুকে না রাখো, বিদায় দাও...

গোবিন্দ। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর এক হাত ধরিয়া হ্যাঁচ্‌কা-টানে তাকে সিন্দুকের কাছে আনিল, বলিল,—সিন্দুক খোলো।

রোহিণী মন্ত্রচালিতের মত সিন্দুক খুলিল। গোবিন্দলাল একটানে অলঙ্কারের রাশি বাহির করিয়া কহিল,—ধরো!
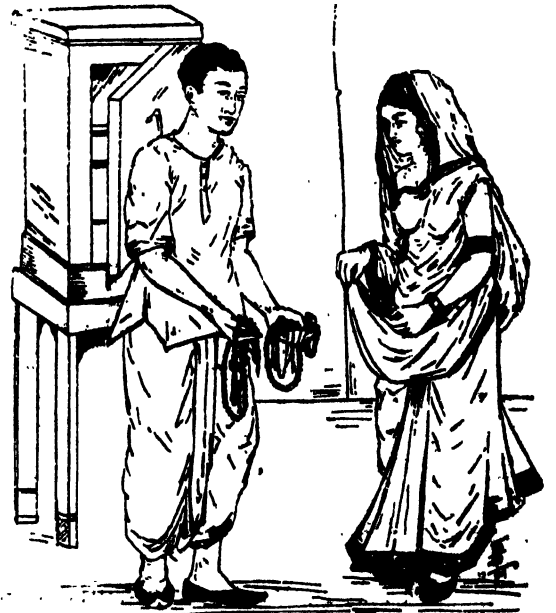
...অলঙ্কারের রাশি বাহির করিয়া কহিল,—ধরো!

তার পর রোহিণীর অঞ্চল টানিয়া বিছাইয়া সেই অঞ্চলে রাশি রাশি রত্নালঙ্কার—হীরার চুড়ি, ব্রেশলেট, মুক্তার কলার, নেক্‌লেস, হীরার দুল, রিষ্ট ওয়াচ, ব্যাঙ্গ্‌ল্‌, আংটি, জড়োয়ার ও সোনার দুই প্রস্থ অলঙ্কার ঢালিল; একটা থলি লইয়া গিনি, টাকা, নোট, শেয়ার, ডিবেঞ্চার—মায় গ্রামোফোনের রেকর্ডের লিষ্ট, স্যাকরার ফর্দ্দ…সব তাহাতে ঠাশিয়া দিল; পরে সেগুলা বাঁধিয়া রোহিণীর হাতে দিয়া, কহিল—ধরো রোহিণী।

রোহিণী তেমনি যন্ত্রচালিতের মত ধরিল। তার পর গোবিন্দলাল দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—আসুন।

নিশাকর আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। রোহিণীর হাত নিশাকরের হাতে রাখিয়া গোবিন্দলাল বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কহিল,—ধরো বন্ধু। এত দিন আমার ছিল। আজ তোমায় দিলাম। সুখী করো। প্রেমময়ী, প্রাণমনময়ী রোহিণী! সে যেন কোনো দুঃখ না পায়!…
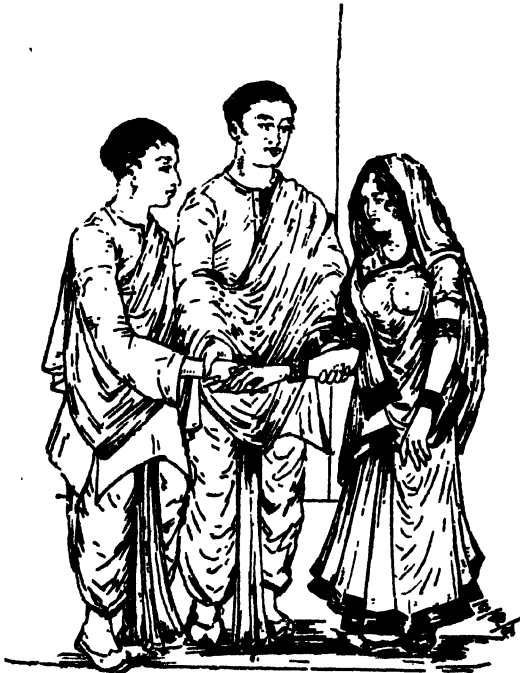
প্রেমময়ী, প্রাণমনময়ী রোহিণী! সে যেন কোন দুঃখ না পায়!

গোবিন্দলালের দুই চোখে তপ্ত অশ্রু…হিয়ার সমস্ত শোণিত যেন অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে!…

নিশাকর ও রোহিণীর চোখেও জল। তারা যুগপৎ প্রণত হইয়া গোবিন্দলালের চরণে পতিত হইল; সমস্বরে কহিল,—তুমি মহৎ! তুমি প্রেমিক! তুমি স্বর্গীয়!…

রোহিণীর হাত ধরিয়া নিশাকর চলিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দলাল গাঢ়স্বরে ডাকিল,—রোহিণী, দাঁড়াও। নিশাকরবাবু…

দুজনে দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল কহিল,—বিদায়-বেলায় একটু স্মৃতিমাত্র রোহিণী…

নিশাকর কহিল,—বেশ।

গোবিন্দলাল তখন আবেগে রোহিণীর কণ্ঠ জড়াইয়া তার লোভনীয় মুখে চুম্বন করিল।…

রোহিণীর সমস্ত শরীর-মন এমন একটা ক্লেদে ভরিয়া গেল যে সে আপনাকে অশুচি বোধ করিল। ছাড়া পাইয়া রোহিণী ছুটিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল, এবং আচমন করিয়া মালা হাতে বীজমন্ত্র জপ করিতে বসিল।

নিশাকর কহিল,—এসো রোহিণী। ট্যাক্সির মিটারে ভাড়া অনর্থক বাড়িতেছে।

—যাই। বলিয়া রোহিণী বিদায় চাহিল। গোবিন্দলালের পানে চাহিয়া কহিল,—আসি। বিদায় দাও।

দুই চোখে জল, গোবিন্দলাল কহিল,—এসো।

রোহিণী কহিল—তুমি একা এখানে থাকিও না।…যদি অসুখ করে, কে দেখিবে?

গোবিন্দলাল কহিল—ভয় নাই। এক রোহিণী গেল, আমি এখন লক্ষ রোহিণীর সন্ধানে কলিকাতায় যাইব! পরকীয়ায় যে একবার মজিয়াছে, সে কি আর ঘরে ফেরে, রোহিণী!"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এইখান থেকেই ফেরা যাক। যে-গন্ধমাদন দেখলুম, মর্ত্ত্যলোক এগুবার আর ভরসা হয় না।

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—মাইকেলের বারাঙ্গনা দেখুবেন…?

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—পড়ো…

গিরিশচন্দ্র পড়িলেন,—এক-নম্বর কবিতা হলো,—

আধুনিক কবি-চিত্তে······দানি' উদ্দীপনা"

"বৃথা তুমি ধনীপুত্র, ভ্রম মম দ্বারে।
বৃথা অশ্রুজল তব, ওতে নাহি ভুলি।
প্রেম চাহো, দিব প্রেম, দিব লুচি-পাঁটা,—
কিন্তু অগ্রে লয়ে এসো সেলামি চরণে।
ভুল ভুত আচরণ, ভুলে লোক যথা
আপিস, সাহেব—সব, ডার্বির টিকিট
কিনি। যতদিন টাকা, ততদিন আমি।
কাটো হ্যাণ্ডনোট, আনো টাকা,
ডাকো ট্যাক্সি—
ভুবন-ভুলানো হাসি এ-অধরে আঁকি,
যাবো লেকে, সিগারেট মুখে দিব জ্বালি···

মাইকেল দুই কাণে হাত চাপা দিয়া কহিলেন—থামো গিরিশ···এ যে একেবারে ভাবের মনুমেণ্ট! এবার তোমার 'কাইশার' নাটকের নমুনা দেখি একটু···

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—মাপ করবেন। আপনাদের নিয়েই যখন এই ব্যাপার, আর থিয়েটারের আবহাওয়ায় যখন আমার লেখা পরিবর্দ্ধিত, তখন, সে লেখা বোধ হয়···

দীনবন্ধু কহিলেন -দেখাই যাক্ না···

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—দীনবন্ধুর অপ্রকাশিত রচনা নেই?

মাইকেল কহিলেন—নিশ্চয় আছে! কিন্তু এ-সব রেখে ঐ, ঐ, ওটা কি লেখা হে? পড়ো তো গিরিশ···

গিরিশচন্দ্র গন্ধমাদনের পাতা উল্টাইতেছিলেন, কহিলেন,—একটা প্রবন্ধ···মর্কটেন্দ্র রায়ের লেখা। প্রবন্ধের নাম 'বঙ্কিমের মনস্তত্ব'।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—পড়ো তো। লেখার নমুনা দেখলুম, এবার নিজের মনস্তত্বের পরিচয়ও নি।···

গিরিশচন্দ্র পড়িলেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের psychology নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ বলচেন, মনস্তত্বে তাঁর মোটেই জ্ঞান ছিল না—তার পরিচয় পাই সূর্য্যমুখীর চরিত্র-চিত্রণে। সূর্য্যমুখী যে কুন্দর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দেওয়ালেন, সেটা স্বামীর

"আধুনিক-কবি-চিত্তে ভ্রমি দিবানিশি
দানি' উদ্দীপনা,—
কাব্যে-উপন্যাসে মোরে কি মাধুরী-আর্ট-ভোরে
আর্টিষ্ট দেখায় চিত্র···দেখে সর্ব্বজনা।
প্রেম কোথা থাকে যদি? এই চিত্তে নিরবধি,
সতীত্ব, মমতা, মায়া—সে যে একচেটে!
সুচিরযৌবনময়ী, রূপে ত্রিভুবন-জয়ী,
ঠমক, বিচিত্র ঠাট ভরা বুকে-পেটে।
নিঃস্বার্থ প্রেমিকা-চিত্ত, লুটি বেকুবের বিত্ত
আমি বারাঙ্গনা!"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—ছ'-নম্বরের কবিতা শুনুন,—

প্রতি ভালোবাসার জন্য নয়—নারী-চিত্তে প্রেমের অপমান অসহ্য বোধ হওয়ায় ক্রুর হিংসায়। এ অবধি বেশ বোঝা যায়। তার পরে ঐ সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্বে জ্ঞান ছিল না বলেই তিনি শুধু শুধু সূর্য্যমুখীকে দিয়ে গৃহত্যাগ করালেন। মনস্তত্ত্ববিদ হ'লে তিনি এই গৃহত্যাগের একটা উপলক্ষ রাখতেন। বাড়ীর কোনো তরুণ-বয়সী সরকার, নয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার দেবেন্দ্র দত্ত—এদের কারো সঙ্গে সূর্য্যমুখী যদি পালাতেন, তা হলে তাঁর

দেবেন্দ্র দত্তর বজরায় গৃহত্যাগিনী সূর্য্যমুখী

পালানোর একটা অর্থ বোধগম্য হতো।···বিশ্বকবিও বলেছেন,—

আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না কো অপমান···

এই তো modern নারীর উক্তি! বঙ্গ-সাহিত্যে এখন ভূরি-ভূরি নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। একখানা উপন্যাসে দেখছিলুম, স্বামী প্রাণান্ত-পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে আনচেন এবং সে-অর্থ স্ত্রীর বিলাসভূষণে ব্যয় করচেন। কিন্তু পাড়ার মেশের এক তরুণ ছাত্রের পায়ে স্ত্রী সে বিলাস-ভূষণ ঢেলে দিচ্ছেন, তরুণের সবুজ চিত্ত-আহরণের জন্য। স্বামী একদিন তা দেখতে পেয়ে তরুণের কাণ মলে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন। স্ত্রী তাতে বললেন,—খবর্দ্দার! তোমার হীরা-জহরৎ চুরি করেছি—সেজন্য তুমি পুলিশে দিতে পারো! তা বলে আমার নারীত্বের অপমান করবে চোখ রাঙ্গিয়ে? না—খবর্দ্দার!···এই তো নারীর psychology. সুতরাং যে-কথা হচ্ছিল, কোনো পুরুষ আশপাশ থেকে মুক্তির হাওয়া না জাগালে কোনো নারী গৃহত্যাগ করে না। গৃহত্যাগের পর তার একটা আশ্রয় তো চাই···নদীর ঘাটে একখানা বজরা, নয়তো বাগানের ঘর, নয়তো একটা রেল-ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমও। বিষবৃক্ষে তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ, psychologyটা বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন পড়া ছিল না। দোষ তাঁর নয়, যেহেতু তাঁর সময়ে আধুনিক সাহিত্য তৈরী হয়ে ওঠেনি—এবং psychologyর এত শস্তা notes-ও ছাপা হয় নি। কাজেই বেচারীকে ওদিক্‌টায় অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছে। তাছাড়া···"

বঙ্কিমচন্দ্র একটা হাই তুলিয়া কহিলেন—যে-পাতা খোলো, ঐ এক-ভাব!

মাইকেল কহিলেন—pyramid of psychology··· একজন আধুনিক কবির লেখা কবিতা নেই? পড়ো তো···মুখ বদলানো যাক।

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—এই যে···বগেন্দ্রনাথ যোমের লেখা "বঙ্কিম-তর্পণ" কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকীতে পড়া হয়েছিল। শুনুন···

সাহিত্যের সরোবরে আছে গেঁড়ি-গুগলি···
এ সাহিত্য ছোট···নয় বড় নদী হুগলি।
তবু সেই সরোবরে আছে সাপ-ব্যাঙ,
মাছ আছে চুণোপুঁটি, চিংড়ী ও চ্যাঙ।
তুমি হে বঙ্কিম ছিলে রাঘব-বোয়াল···
কাঁটা মেরে ভেঙ্গে দেছ জেলের চোয়াল!

মাইকেল কহিলেন,—থাক্···এই ক' লাইনেই পরিচয় পেয়েচি। এ বগেন্দ্র যোমটি কে?

সেই ছোকরা কহিল,—আজ্ঞে, ইনি আধুনিক নন তবে জন্ম-কবি। কেউ কেউ বলেন, হুয়েন্‌-থ্‌-সাঙের সময় থেকেই বাঙ্‌লা কবিতা লিখচেন। সুর আর ভাব আশ্চ মরণ মরে রইলো এঁর হাতে। এঁর পেশা কবিতা লেখ বাপ কিছু পয়সা রেখে গেছে, তাই কোন কাজ কর হয় না। ঘুমোয়, খায়, আর কবিতা লেখে। দেশে যা ঘটে, তার উপরই কবিতা লেখে। সেবার কলে পোকা হতে কবিতা লিখেছিল, 'জলে পোকা'। কতকগুলো লাইন আমার মুখস্থ আছে—

"দিনে দিনে হলো কি এ? জল আসে নলে···
কোথা থেকে পোকা এলো সে জলের কলে!

সরু সরু দেহ অতি, কিলিবিলি করে,

নাকে-মুখে ঢোকে যদি হেঁচে লোক মরে!…"

তা-ছাড়া যেখানে যে ব্যাপারে মিটিং হবে, সেই মিটিং-য়েই এই বগেন্দ্র যোম কবিতা পড়বে। তার কি মাধুরী! সেবার সহিস-কোচম্যানদের ধর্ম্মঘটের মিটিংয়ে কবিতা লিখে প'ড়েছিল। আমার মনে আছে·কটা লাইন। শুনবেন?

"বসে আছি কোচ্‌বাক্সে হাঁকাতেছি ঘোড়া,

দুরন্ত সে যত হোক্…মাহিনাটা থোড়া!

দানা দেয়, পানি দেয়, খড় আঁটি-বাঁধা

যে-সহিস চাট্‌ খেয়ে—তলব মোর আধা।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—থাক্! থাক্…

গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—আর একটি কবিতা পড়ি… আধুনিক-কবি ক্রিমীন্দ্র চিত্তিরের লেখা—

সাত বছরের ছেলে—

মন কিন্তু বেড়ে উঠিয়াছে উনবিংশ-বিংশ বর্ষ ঠেলে।

ছাদে গিয়ে ওঠে, হাতে আছে লাটাই আর ঘুড়ি…

এদিকে ছেলের মত,ওদিকে মনের বয়স কিন্তু বছর-কুড়ি।

ঘুড়ি ওড়ে…আড়চোখে চারিদিকে চায় সে সরেশ,

কোন্ ছাদে কে রূপসী এলো শুকাইতে কেশ?

চকিতে চপল চিত্ত, কিসের ঝঙ্কার?

ঐ-ছাদে হোথা ও যে চুড়ি বাজে কার!

ঠিন্ ঠিনা ঠিন্…ঠিন্-ঠিনি…

ও যে ওই রায়েদের মিনি…

আনমনে দ্যালে ঠেশ্‌ দিয়া ম্লান-মুখ, কার কথা ভাবে?

বয়সে ছত্রিশ, তবু যৌবন সাঁটিয়া আছে অঙ্গে-ভাবে-হাবে!

সাত বছরের ছেলে। ঘুড়ি তার গোঁত্তা খেয়ে পড়ে

ও-বাড়ীর জানালায়…ঠকা-ঠক্ মাথা ঠোকে

আকুল কি ভীম মনোঝড়ে!

শ্বাস ফেলে, শ্বাসে ঘুড়ি কাঁপে,

সুতা বহি বেদনার কাঁপ-এ

ফিরে আসে নদীর তরঙ্গ-সম নায়কের লাটাইয়ের ধারে।

নায়ক কম্পিত শির, টলমল দেহ, আচম্বিতে

প্রেমের কী ভারে!

চোখে-চোখে দেখা নাই…নিশ্বাস উচ্ছ্বসি ভেসে আসে

ঘুড়ির সূতার বহি…দু'জনার প্রাণ তপ্ত শ্বাসে!

কত বাড়ী, পথ, নালা, গোয়াল, চিমনি, আর

পাণের দোকান—

ট্রাম চলে, রিক্‌শা ঐ, মোটর-লরির ভিড়ে যায় বুঝি প্রাণ!

এ ভিড় তাদের চিত্তে পারে নাকো তুলিতেও এতটুকু সাড়া।

এ হেথায় ফেলে শ্বাস, ও হোথা লাটায়ে ধরে,

জানে না তা পাড়া।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—বাপ্, সকলেই যে **ultra-precocious** হয়ে পড়েচে বেজায়!…সামঞ্জস্য, **harmony**, এ-সব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে…

ছোকরা কহিল,—আজ্ঞে, **harmony** যে বছর-কতক হলো লরি চাপা প'ড়ে মারা গেছে…!

মাইকেল সবিস্ময়ে কহিলেন—এঁ্যা…?

হাসিয়া গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—ছোকরা বোধ হয় কোন্ হরিমোহন বাবু আর হারমনি—দুটোয় গোল করছে।…তরুণ সাহিত্যিক কি না! দেশী-বিলাতী এক দেখে!

সহসা দূরে কীর্ত্তনের রোল শুনা গেল।…সকলে সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

ছোকরা কহিল,—ও মেয়েদের কীর্ত্তন…

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—পথে বেরিয়েছে?

ছোকরা কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন মেয়েরাই ভলান্টিয়ারী করতে নামছেন কি না। চাঁদা-সংগ্রহে ওঁরাই কীর্ত্তনের দল বার করেন…নৈলে লোকে বড়-একটা…

কীর্ত্তনীয়ারা কাছে আসিল। রঙীন শিল্কের শাড়ী পরা এক-ঝাঁক মেয়ে…নিশান, ঝাণ্ডা, শিঙ্গা…কোন-বস্তুরই ত্রুটি নাই।

হুজুগ-প্রিয়ার দল

তারা গাহিতেছিল—

মোরা হুজুগ-প্রিয় !—মোদের হুজুগ দিয়ো…
(প্রভু), শুধু হুজুগই দিয়ো !…
কাজে না যদি দড়, কেন দেবো বা বর ?
হুজুগে বড়—তাই, তাই করিয়ো !
গৃহ ভাসিলে বাণে, কেহ মরিলে প্রাণে—
মোরা নৃত্যে-গানে রিহার্শালি হো !
যদি আসে গো মারী, মরে নর ও নারী…
ছুটি এম্পায়ারে, তার ষ্টেজে চড়ি গো !
হুজুগ-প্রিয়, মোরা হুজুগ-প্রিয় !
ত্যজ লজ্জা-লাজে, ভজ সজ্জা-সাজে—
এই পতাকা-তলে এসো ছাড়িয়া গৃহ !
দেশ দুঃখে দীন, টাকা তুচ্ছ, হীন !
ঘরে রেখো না কেহ, সব চাঁদাতে দিয়ো।

* * * * *

সহসা দূরে কে ডাকিল—ওহে বঙ্কিম…

বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়া দেখেন, কবি কালিদাস জলযানে গিয়া চড়িয়াছেন ; তিনিই ডাকিতেছেন। কালিদাস কহিলেন,—চলে এসো। এর পরে যাত্রা বদলে আর-এক সময় না হয় আসা যাবে।

গিরিশচন্দ্র কহিলেন—এ বইখানা ?

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—নিয়ে চলো। যখন নেহাৎ আধি-ভৌতিক আনন্দ উপভোগের বাসনা হবে, তখন নয় ওই বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে…

গিরিশচন্দ্র কুলি ডাকিলেন। পাঁচ-সাত জন ছুটিয়া আসিল। গিরিশচন্দ্র কহিলেন,—বইটা বয়ে নিয়ে চ'রে ঐ জলযানে।

সকলে জলযানে চলিলেন। কুলির দল গন্ধমাদন লইয়া চলিল। গিরিশচন্দ্র বলিলেন,—এতে বিজ্ঞাপনও যা আছে, মজার মজার…ওঃ—typical zoo-gardens. হরেক রকমের জান্তব লীলা…!

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন—বেশী তিক্ত একসঙ্গে গলায় ঢেলো না হে…অসুখ করবে। একে মর্ত্ত্যলোকের হাওয়া তায় অতি-আধুনিকের এই প্রমত্ত নেশা…!

সকলে জলযানের কেবিনে আসিয়া বসিলেন। তীর হইতে কীর্ত্তনীয়ার গান ভাসিয়া আসিতেছিল,—

মোরা হুজুগ-প্রিয়…
মোদের হুজুগ দিয়ো,
শুধু হুজুগই দিয়ো !…

শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা।

হুদ্দাদার *
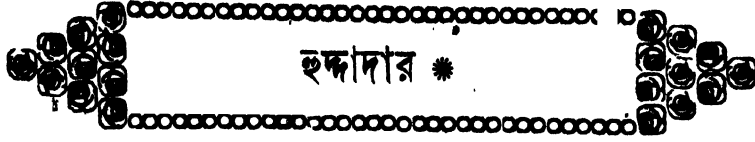
হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার খুরে নমস্কার ;
তোমার অসাধ্য কাজ
কি আছে বিশ্বের মাঝ,
তুমি যা'র ঘাড়ে চাপ,
তখন তারে চেপে রাখ,
ঘোরাও তারে নানা ঠাঁরে,
জীবন অতিষ্ঠ তার,
তোমার খুরে নমস্কার ॥

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
নানারূপে বেড়াও তুমি
নানা রঙ্গ সঙ্গে ক'রে
বন্ধু কভু, দন্দী কভু,
কভু কল্কিরূপ ধ'রে ।
ক'জন জগতে আছে
স্বরূপ সে চেনে তোমার,
তোমার পায়ে নমস্কার ।
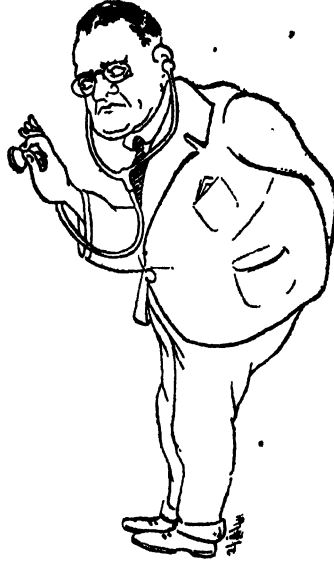
ডাক্তার

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
মটর, জুড়ি, বসতবাড়ী,
তোমার পায়ে সমর্পণ,
করে' যতই দিক না সে ফি,
ওঠে নাকো তোমার মন ;
ভাড়ার বাড়ী, মোটর গাড়ী,
রোগীই বহে সবের ভার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
তুমি যাবে সেয়ার হাটে,
ব্রিজ টেবলে বা ঘোড়ার রেসে,
এসেন্স আর চা, বিস্কুটে
ওড়াও কতই অনায়াসে ;
রোগিণীর সে হাতের শাঁখা,
লক্ষ্মীর টাকাও পায় না পার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
ডাক্তাররূপে যখন তুমি দাঁড়াও রোগীর সুমুখে,
চৌদ্দপুরুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত—সবারি হয় ভয় বুকে ;
মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, সঙ্গিনী তার
তোমায় করি নমস্কার

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
বাটীর মাষ্টারের রূপে
তুমি যখন পাও গো স্থান,
দুধের বাটি কচুরি চা,
গুড়গুড়িতে লাগাও টান,
খোঁজ নাই পড়ানোর সাথে,
কেবল কমমাজেতে সার,
তোমায় করি নমস্কার ॥

মাষ্টার

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার ।
পুরাকালে টোলের পণ্ডিত
তারা শিক্ষা দিত হিত,
খেতে দিত, পড়াইত,
এখন তাহার বিপরীত !
শিক্ষার নামে অষ্টরম্ভা
খালি খোঁজ মাসকাবার,
তোমার পায়ে নমস্কার ॥

* প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রায় শ্রীযুত তারকনাথ সাধু বাহাদুর একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন—ব্যঙ্গকাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যায় বসুমতীর পাঠকগণকে তাহারই কয়েকটি কবিতা তিনি উপহার দিয়াছেন। তাঁহার হুদ্দাদার কথার অর্থ—অধিকার—ইংরাজীতে Jurisdiction। হুদ্দার অধিকারী কি ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজকে নির্য্যাতন করেন—তাহা দেখানই কবির উদ্দেশ্য।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
হেলান দিয়ে চেয়ারে কে ?
প্রণাম তোমায় হে কৌন্সলী,
মক্কেলকে বসাও পথে—
সব সময়ে লম্বা বুলি।
নরসৃষ্টির বিষ্ণু তুমি,
কলির শ্রেষ্ঠ অবতার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

ব্যারিষ্টার

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
ফাঁসির হুকুম হ'লো তবু
তোমার মুখে মিষ্টি হাসি
আপিল আছে ভয় কি তোমার,
ফাঁসি বল্লেই হবে ফাঁসি ?
(তখন) কি করে, বেচারী
বেচে পরিবারের অলঙ্কার।
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
যত পার তর্ক কর
নাই দিক্ জজ তাতে কান,
ফিয়ের চোটে সর্ব্বস্বান্ত,
পার্টি কণ্ঠাগত প্রাণ,
তবু বল সাক্ষী আনো,
মামলা জেতার ভার আমার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
কলির গুরু অদ্ভুত জীব,
কে আছে আর তোমার সম,
তোমার কথা বলিতে চাই,
দয়া করে' আমায় ক্ষম ;
রাজার মত সদাই হুকুম,
নিজেই ভাব সর্ব্বসার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
জায়া পুত্র আছে সবই,
তবুও তুমি সন্ন্যাসী,
রূপার কমণ্ডলু তোমার
গায় শোভে বেনারসী,
সোনার চসমাটি চোখে,
এসেছেতে মাতোয়ার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

গুরু

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
শিষ্য বৃদ্ধি প্রধান কর্ম্ম,
প্রতিষ্ঠান প্রধান ধর্ম্ম,
ত্যাগের বৃদ্ধি করতে নার,
ভোগের বৃদ্ধি সারাৎসার,
ফিট ফাট সতত তুমি,
সেখন-ডালি চমৎকার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
মেয়ের শ্বশুর হে বৈবাহিক,
মালিক তুমি দুনিয়ার,
রাখলে তুমি রাখতে পার,
বাঁধলে নাহি রক্ষা আর ;
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ,
ভবনদীর কর্ণধার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

ছেলের বাপ

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কা
আসল সুদ আর সুদের সুদটি
দিব্যি হিসাব করে' নিল,
টাকার কাঁড়ি নাও তো গে
ছাড় না তার একটি তিল।
তোমার গুণে তুষ্ট সবাই,
দ্বীপান্ত তার পুরস্কার,
তোমার পায়ে নমস্কা

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্
অভাগা সব খাতকগুলোর
শালি-জমি বাস্তভিটে,
টাকার কাঁড়ি গয়না-গাঁ
সব ঢুকছে তোমার পে
যায় তবু লোক তোমার বাড়ী
যতই মার না পয়জার,'
তোমার পায়ে নম

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
ওখানে কে? উকীল-পুঙ্গব?
জাতি-বিরোধ বেড়াও খুঁজে,
কেবল ভাব লোক কি বোকা,
নিজের স্বার্থ চায় না নিজে,
ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান যা
চায় না সে চুল-চেরা বিচার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

উকীল

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার হুদ্দোয় প'ড়লে পরে
শোষণ কর সকল তার,
গাড়ী, জুড়ি, হর্ম্ম্য-ত্রিতল
সব চ'লে যায় চমৎকার,
জাতি-গর্ব্ব কর্ব্বে খর্ব্ব
সর্ব্ব নষ্ট আপনার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
হাল সময়ের পুরুত তুমি
ব্যস্ত সদাই নিজ কাজে,
পিতৃশ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীপূজা,
সবেই তোমার অংশ আছে,
তুমি কৃষ্ণ, তুমি ব্রহ্মা,
ঋষি, রাজা একাধার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
মোকদ্দমার সাক্ষী তুমি, জয়-পরাজয়, তোমার হাতে,
বাদী আর বিবাদী দাঁড়ায় তোমার কাছে কুটো দাঁতে;
ভাঙলে তুমি সবই মাটী, তোমার গুণের নাইকো পার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
আদালতের দালাল তুমি, বিবেকহীনের পরম সখা,
লোক-পতঙ্গ পড়লে হাতে পোড়াও তাদের দুটি পাখা,
অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে শোষণ কর সকল তার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
ঝোপ বুঝে কোপ মার তুমি জোরে চালাও কিস্তি,
দেশোদ্ধারক হয়ে পড়, সদাই বল স্বস্তি,
গুণ্ডা থেকে দেশোদ্ধারক এক লম্ফে সাগর পার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

পুরোহিত

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার তোমার পায়ে নমস্কার।
দেশের নেতা, দশের মাথা,
এ কি তোমার ব্যবহার,
স্মরণ কি হয় ভোটের সময়
ঘুরেছিলে প্রতিদ্বার
উঠলে বসলে সবার কথায়,
নাচলে বাঁদর নাচের সার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

নেতা

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার তোমার পায়ে নমস্কার।
কাউন্সিলেতে সভ্য এখন
তুমি এখন চিনবে কারে,
দায়ে প'ড়ে সন্ধ্যা সকাল
হাজির ছিলে সকল দ্বারে,
দিয়েছিলে যত আশা,
নাই কি মনে একটি তার,
তোমার পায়ে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার তোমার পায়ে নমস্কার।
যখন ছিলে ভোটের প্রার্থী,
ছিল না ত কোন লাজ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য পাপ যে,
তোমার কাছে সমান সাজ,
আশার মদে মত্ত হয়ে
সেজেছিলে দাস সবার
সবাই করে নমস্কার।

হুদ্দাদার, হুদ্দাদার, তোমার পায়ে নমস্কার।
সব কথাতেই রাজী তখন
সৌজন্যেতে পরাৎপর,
কার্য্যশেষে নূতন বেশে
ঢ়ুকছো এখন মিটিং-ঘর,
যত তুমি ভুগেছিলে
মনে রেখে হিসাব তার,
এখন লহ নমস্কার।

দিব্য দৃষ্টি

(গল্প)

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় একটি মেসের বাসায় আজ মহা উৎসব লাগিয়াছে। ব্যাপারটা এই—

সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াই পাস হইয়াছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞান বিভাগে সে একেবারে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম হইবার খবর যে দিন বাহির হইল, সে দিন ছিল বুধবার।

সুরেনের পিতা জীবিত নাই—দেশে, পাবনা জেলায় চৌরীপুর গ্রামে, তাহার জননী আছেন; সুরেনের পিতৃব্যের অভিভাবকতায় তিনি বাস করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নহে। তাই বি-এ পরীক্ষা কবে শেষ হইয়া গেলেও সুরেন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতেছে। সুরেনের বয়স ২৩ বৎসর, দিব্য সুশ্রী চেহারা, সদাই হাস্য-বদন। সুরেন আজিও অবিবাহিত।

তাহার পরবর্ত্তী শনিবারে মেস-বন্ধুগণ এক সান্ধ্য-ভোজের আয়োজন করিল। খরচটা অবশ্য সুরেনেরই। বাসার শরৎ বাবু, বিপিন বাবু, যোগেশ বাবু, উমাপদ বাবু, যতীন্দ্র বাবু, সতীশ বাবু, ললিত বাবু ত আছেনই। বাহির হইতে অতুল বাবু, কুমুদ বাবু ও কুঞ্জ বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ভোজন-শক্তি-বৃদ্ধিকল্পে সিদ্ধির আয়োজন হইয়াছিল। বাবুগণ সকলে একত্র হইলে, সিদ্ধি বিতরিত হইল। কেহ এক পাত্র, কেহ দুই পাত্র গ্রহণ করিলেন, মাত্র দুই জন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সিদ্ধি তাঁহাদের মোটেই সহ্য হয় না।

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর, গানবাজনা আরম্ভ হইল। হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সহযোগে দেড় কি দুই ঘণ্টা গান-বাজনার পর গায়ক ও বাদকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সিদ্ধির নেশা সকলেরই বেশ জমিয়া আসিয়াছে। আবার গল্পগুজব আরম্ভ হইল।

সতীশ বাবু এক কোণে বসিয়া সে দিন প্রভাতের সংবাদপত্রখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, একটা মজার খবর শুনেছ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কি? কি?"

"এই যে পড় না শুনি—অর্থাৎ শোন না, পড়ি।"—বলিয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

"মফঃস্বল-সংবাদ

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ছাত্রীর কৃতিত্ব। কৃষ্ণনগর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুন্দমালা দেবী বিগত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণনগর-বাসী সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এই উপলক্ষে রামজীবন বাবু সহরস্থ তাবৎ গণ্যমান্য লোককে আগামী শনিবারে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্থানীয় যুব-নাট্যসমিতি নিমন্ত্রিতগণের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ ঐ রজনীতে

রামজীবন বাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি-এল রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করিবেন।"

ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুররে—থ্রী চিয়াস ফর্ এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা মুণ্ডমালা!"

সুরেন বলিল, "মুণ্ডমালা নয় রে, কুন্দমালা। নামটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।"

অতুল বাবু নামক এক ভদ্রলোক দেওয়ালে হেলান দিয়া ঊর্দ্ধমুখে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

ললিত বলিল, "আহা, কি আর আশ্চর্য্য? বাঙ্গালীর মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হওয়া, আজকালকার দিনে মোটেই আর আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

অতুল বাবু বলিলেন, "সে জন্যে আশ্চর্য্য বলিনি হে!—আমি দিব্য দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা দেখতে পাচ্ছি—তা আশ্চর্য্য! অতীব আশ্চর্য্য!"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "দিব্য চক্ষে কি দেখছ অতুল, বলই না শুনি!"

অতুল বলিল, "এর ভিতরে প্রজাপতির হাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উমাপদ বলিল, "কিসের ভিতর?"

অতুল বলিল, "প্রথমতঃ দেখ, সুরেনও ফার্ষ্ট হয়েছে, কুন্দমালাও তাই।"

"দ্বিতীয়তঃ?"

"দ্বিতীয়তঃ, সুরেনের কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন আজ এখানে পটলডাঙ্গায়, কুন্দমালার কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন ঠিক আজই, ঠিক এই সময়েই, কৃষ্ণনগরে চলছে।"

"তৃতীয়তঃ?"

"তৃতীয়তঃ, সে কুমারী, আর আমাদের সুরেন্দ্র—কুমার।"

"তার পর?"

"এক জন চাটুয্যে, এক জন মুখুয্যে—করণীয় ঘর।"

"আর কিছু আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্ত্তে সুরেনের কাণের ভিতর দিয়া কুন্দমালা নামটি পশিল, অমনি আকুল করিল ওর প্রাণ! নামটি শুনেই ও বলেছে—খাসা মিষ্টি নামটি কিন্তু। —সুরেন, বলনি তুমি? এই একঘর লোক সাক্ষী আছে।"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিনি, তবে ঐ ভাবের কথা বলেছি বটে।"

অতুল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বিবাহ অনিবার্য্য।"

শরৎ বলিল, "কি হে সুরেন, তুমি কি বল? অনিবার্য্য না কি?"

সুরেন হাসিয়া বলিল, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটের কোনটাই ত মানুষের হাতে নয় ভাই। প্রজাপতির তাই যদি নির্ব্বন্ধ হয়, তবে আমায় পরতেই হবে মাথায় টোপর, পালাবো কোথা?"

ললিত বলিল, "কি ভয়ানক কথা! আমাদের মধ্যে যে এমন এক জন দিব্য দৃষ্টিওয়ালা মহাপুরুষ বিচরণ করছেন, তা আমরা কোন দিনই সন্দেহ করিনি! আচ্ছা অতুল বাবু, মেয়েটির বয়স কত হবে?"

অতুল বলিল, "সতেরো—সতেরো বছরে পড়েছে, এখনও পূর্ণ হয় নি।"

"আচ্ছা, তার চেহারাটা কি রকম, দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"আলবৎ পাচ্ছি।"

"কি রকম, বল না শুনি। কৃষ্ণা, না শ্যামা, না গৌরী?"

"গৌরী। নাম শুনেই বুঝতে পারছ না? কুন্দ ফুলের রঙ কি?"

উমাপদ বলিয়া উঠিল, "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা, অয়ি অনিন্দিতা।"

যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে অতুল, এই দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর মিল। সুরেন ভাই, সুরেন,—তোমার ভাবী প্রিয়ার একটা বন্দনা-গান গাও।"

কুঞ্জ গাহিয়া উঠিল—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল। হাসির হিল্লোল থামিলে যতীন বলিল, "যাই বল তাই বল ভাই, এতগুলো মিল কিন্তু আশ্চর্য্য বটে!"

অতুল যতীনের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে ভেঙ্গাইল—"দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান্ আর ড্রেম্ট্ আফ ইন ইওর ফিলাজাফি!"

ললিত বলিল, "সে যাক্—তুমি ব'লে যাও হে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতের বছর, গৌরবর্ণা,—আর কি কি সব বল দেখি।"

"সংক্ষেপেই বলি। মুখ, চোখ, চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই ভাল, তবে একটু ত্রুটি আছে। চোখের তারা দুটি মিশ কালো নয়, একটু ফিকে বাদামী রঙের। এই ত্রুটিটুকু ছাড়া, মেয়েটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলা যেতে পারে।"

সুরেন বলিল, "ওটা কি ত্রুটি না কি? আমি ত ওটা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলেই মনে করি।"

এই সময় খবর আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। যুবকগণ আনন্দ-কলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

২

পরদিন বিকালে ৫টার সময় যতীন বাবু কলতলায় স্নান করিতেছিলেন, দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাসায় প্রবেশ করিলেন। এক জন প্রবীণ-বয়স্ক, অন্য জন যুবা-পুরুষ। প্রবীণ ভদ্রলোক যতীন বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এ বাসায় সুরেন্দ্র বাবু ব'লে কেউ থাকেন কি? সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী।"

যতীন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"কৃষ্ণনগর থেকে।"

শুনিবামাত্র যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তর করিল, "সুরেন বাবু ত এখন বাসায় নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন্ ফিরবেন তিনি?"

"সন্ধ্যার আগেই আসবে বোধ হয়।"

"তাঁর ঘরে ব'সে আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি?"

"নিশ্চয়। তাঁর ঘর বোধ হয় তালাবন্ধ আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ডান হাতি প্রথম ঘরটা আমার। দয়া ক'রে সেখানে ব'সে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান সেরে আসছি।"

"আচ্ছা, থ্যাঙ্কস্"—বলিয়া বাবু দুই জন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া নিজ কক্ষে গিয়া দেখিল, বাবু দুইটি দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন। যতীন মাথায় শুষ্ক তোয়ালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আপনাদের এক এক পেয়ালা চা দিতে পারি কি?"

প্রবীণ বাবুটি বলিলেন, "দোকানের চা? না, থ্যাঙ্কস্।"

যতীন বলিল, "দোকানের চা নয়। ঐ যে ষ্টোভ রয়েছে, আমি নিজে তৈরী করবো।"

প্রবীণ ভদ্রলোক সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আবার কষ্ট করবেন আপনি?"

যতীন বলিল, "ষ্টোভ ত আমায় জ্বালতেই হবে। আমি একটু খাব কি না!"

বাবুটি বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে—"

যতীন ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, নিজ তক্তপোষের প্রান্তে আসিয়া বসিল। বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

"এখানে পড়াশুনো করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—সিটি কলেজে বি এ পড়ি। এবার ফোর্থ ইয়ার।"

"বাড়ী কোথায় আপনার?"

"আজ্ঞা, খুলনা জেলায়।"

"কোথায়?"

"মাধবপুর গ্রামে।" একটু থামিয়া, যতীন বলিল "যদি বেয়াদবি না মনে করেন, মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

"আমার নাম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় মুন্‌সেফের পেস্কার। এটি আমার ভাগনে নাম সুধীরকুমার মুখুয্যে। ইনি সম্প্রতি ওকালতী পাস ক'রে কৃষ্ণনগরেই প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছেন। এঁর পিতার নাম আপনি শুনে থাকবেন বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণনগরের খু নামজাদা উকীল, রামজীবন মুখুয্যে।"

গত কল্যকার আসরে, সংবাদপত্র হইতে পঠিত নাম যেন রামজীবন বলিয়াই যতীনের মনে হইল। সবিস্ময়ে বলিল, "রামজীবন? রামজীবন? আচ্ছা, তাঁরই মেয়ে এবার ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছেন?"

সঞ্জীব বাবু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কুন্দমালা—আমার ভাগ্‌নী।"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা রোমাঞ্চ বহিয়া গেল।

আশ্চর্য্য, অতুল বাবু কি তবে একটা ছদ্মবেশী যোগী না কি? মানুষের দিব্য দৃষ্টি সত্যই কি তবে থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম কি তবে নিতান্ত বুজরুকি নয়? সে মনে মনে বলিল, "নাঃ, সন্ধ্যে আহ্নিকটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি। কাল থেকে ফের সুরু করতে হবে!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন, জানতে পারি কি?"

সঞ্জীব বাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, তার পর বলিলেন, "আমরা শুনেছি, সুরেন বাবু এখনও অবিবাহিত। তাঁর পিতাও বর্ত্তমান নেই, নিজেই তিনি নিজের অভিভাবক। কোথাও তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে কি না, তিনি এখন বিবাহ করতে রাজি আছেন কি না, আপনি বলতে পারেন?"

যতীন বলিল, "আজ্ঞে না—তা—ঠিক জানিনে।"

চায়ের জল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যতীন তিন পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা-পান করিতে করিতে সঞ্জীব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন বাবু বি-এ ত পাস করলেন, এবার তিনি কি করবেন? আইনক্লাস জয়েন করবেন কি?

"না, উকীল হবার তার ইচ্ছে নেই। এইবার এম-এ পড়বে।"

"বাড়ীতে ওঁর কে আছে?"

"মা আছেন। কাকাটাকা কাকীটাকীও আছেন শুনেছি।"

"ক' ভাই ওঁরা?"

"ভাইটাই কিছু নেই। একটি বোন্ আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। যতীন বলিল, "এই বোধ হয় আসছে।"

সুরেন্দ্র, যতীনের ঘরের সামনে আসিবামাত্র যতীন বলিল, "ওহে, এ দিকে এস। এই ভদ্রলোক দু'টি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব'সে আছেন।"

সুরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া, আগন্তুকদ্বয়ের মুখপানে ফ্যাল-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সঞ্জীব বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবাজী, আমরা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছি, তোমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"ওঃ, আচ্ছা,—আমার ঘরে আসুন।"—বলিয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। আগন্তুকদ্বয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চা[ৎ] চলিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে বাবুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতীনে[র] ঘরের সামনে আসিয়া সঞ্জীব বাবু বলিলেন, "আজ আ[সি] তা হ'লে যতীন বাবু। আবার দেখা হবে, নমস্কার।"—যতী[ন] লক্ষ্য করিল, সঞ্জীব বাবুর মুখখানি হাসি হাসি। "আজ্ঞে আসুন, নমস্কার"—বলিয়া সে ইঁহাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্য[ন্ত] গেল। তার পর দ্রুতপদে সুরেনের ঘরে গিয়া দেখি[ল] সুরেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে বলিল, "ব্যাপার কি হে?"

সুরেন চমকিয়া উঠিয়া যতীনের মুখপানে চাহিল বলিল, "এঁরা কি জন্যে এসেছিলেন, তুমি জান যতীন?"

"স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করেছিলাম হে! উত্তর দেন নি, অ[ন্য] কথা পেড়ে আমার প্রশ্নকে চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু [কি] জন্যে এসেছিলেন, তা অনুমান করতে পারি। কুন্দমাল[ার] সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন ত?"

সুরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা, [ব]দেখি!"

"আশ্চর্য্য বৈ কি!"

"কিন্তু এর এক্সপ্ল্যানেশন কি?"

"আমি ত কিছুই খুঁজে পাই নে।—কি হ'ল, তাই ব[ল] রাজি হয়েছ?"

"হয়েছি। দেখ, যাই শুনলাম, উনি কৃষ্ণনগর থে[কে] এসেছেন, কুন্দমালার মামা, আমি যেন কি রকম হতভম্ব হ[য়ে] গেলাম। যা যা বল্লেন, তাতেই আমি হাঁ ব'লে গেলা[ম]। আসছে রবিবারে আমি কৃষ্ণনগর যাব মেয়ে দেখতে। [মে]য়ে দেখে আমার পছন্দ হ'লে, ওঁরা দেশে আমার কাকা মশাই[কে] চিঠি লিখবেন, পরে যা যা করতে হয়, সব করবেন। আ[ষাঢ়] মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান, কেন না, তার প[রে] মেয়ের যোড়া বছর পড়বে। আচ্ছা যতীন, এ[ক]টা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"কি?"

"ওর ভাইয়ের চোখের তারা? অতুল বাবু কুন্দ স[ম্বন্ধে] যা বলেছিলেন, এরও অবিকল তাই। চোখের [তারা] কালো নয়, ফিকে বাদামী রঙের।"

"না ভাই, আমি ত সেটা লক্ষ্য করিনি!"

"আমি করেছি। কিন্তু যা-ই বল যতীন, অতুল বাবুর কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

"ব্যাপার কি, অতুল বাবুকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না? এখন ত কোনও কায নেই, চল না যওয়া যাক্ তার বাসায়। একটু বেড়ানও হবে।"

সুরেন বলিল, "তাকে এখন কি বাসায় পাবে? সে ত আজ চল্ল রাইবেরেলী। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়েছে যে। এতক্ষণ বোধ হয় সে হাওড়া ষ্টেশনের পথে।"

৩

অবিলম্বে মেসের অন্যান্য লোকের মধ্যে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া সুরেনের ঘরে জটলা আরম্ভ করিল। যোগেশ বাবু বলিলেন, "অতুলটা কি কোনও সূত্রে জানতে পেরেছিল যে, কুন্দমালার মামা তোমাকে আজ দেখতে আসবেন? জেনে শুনে ঐ রকম চালাকি খেলে গেল না কি?"

শরৎ বলিল, "আমি ত' তার পাশেই ব'সে ছিলাম, কিন্তু সে সময় তার মুখ-চোখ দেখে ত ওরকম আমার মনে হয় নি ভাই! বিশেষ, সে ত নিজে কোনও কথাই তোলেনি,—হঠাৎ খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালে ত সতীশ!—সতীশ, তুমিই প'ড়ে শোনালে না?"

সতীশ বলিল, "হ্যাঁ, আমিই ত প'ড়ে শোনালাম। কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, হঠাৎ ঐ প্যারাটা আমার চোখে পড়লো। তারও ফার্ষ্ট হওয়ার জন্যে আনন্দ-ভোজ শনিবারেই হচ্ছে প'ড়ে আমার ভারি মজা লাগলো, তাই তোমাদের সেটা প'ড়ে শোনালাম।"

বিপিন বলিল, "হয় ওৎলোটা জানতো, নয়, সত্যিই তার একটা ক্ষমতা আছে—ওকেই ত ক্লেয়ারভয়েন্স বলে।"

উমাপদ বলিল, "যারা সাধনার খুব উচ্চ স্তরে উঠেছে, তাদের এ রকম ক্ষমতা জন্মে, তা স্বীকার করি। কিন্তু ওৎলোটা ত মহা নাস্তিক। মুসলমানের রান্না মুর্গী ভক্ষণ করে, ওর ওরকম ক্ষমতা থাকা আমি ত অসম্ভব বলেই মনে করি। নিশ্চয়ই সে জানতো।"

শরৎ বলিল, "জানতো কি না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে অবশ্য, কিন্তু কোন-কোনও মানুষের ওরকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে, সেটা আমি জানি। আমি যখন প্রথম বছর কলকাতায় আসি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা সার্কাসের দল এসেছিল খেলা দেখাতে। তখন বড়দিনের ছুটী। গড়ের মাঠে প্যাণ্ডাল খাটিয়ে তারা খেলা দেখাচ্ছিল। নানা রকম খেলা হবার পর, একটা খেলা দেখালে, তা একেবারে অদ্ভুত। এক ছুঁড়ী মেম, বয়স এই আঠারো উনিশ, সে এসে বল্লে 'দর্শকদের মধ্যে যে কাউকে আমি ছুঁয়েই, তার জন্মবার ব'লে দেবো। যদি আমার ভুল হয়, অনুগ্রহ ক'রে তিনি যেন বলেন।' এই ব'লে সে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এক এক জনকে ছোঁয়, আর এক একটা বারের নাম ব'লে যায়, যেমন—শনিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার—এই রকম। একটি লোকও বল্লে না যে, 'না, ঠিক হ'ল না, তোমার ভুল হয়েছে।' আমি তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলাম, খালি ভাবছি, আমার জন্মবার ত সোমবার, দেখি ঠিক বলে কি না। ঐ রকম বলতে বলতে তৃতীয় সারিতে এসে, ছুঁড়ী আমার দিকে চ'লে এল, আমাকে ছোঁবামাত্র বল্লে—সোমবার।"

অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ, বল কি? নিজে তুমি দেখেছ?"

শরৎ বলিল, "নিজে নয় ত কি প্রক্সিতে?—পাঁচটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমি ঐ তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। তার পর আরও মজা শোন। তৃতীয় সারি শেষ ক'রে ছুঁড়ী ফিরে গেল। তার পর বল্লে, 'প্রত্যেক লোককে ছুঁয়ে, কার পকেটে কি আছে, আমি তা ব'লে দিতে পারি।' এই ব'লে আবার প্রথম সারি থেকে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে ছোঁয় আর বলে—রুমাল, চাবি, পেন্সিল, নস্যির ডিপে ইত্যাদি। জনপ্রাণী কেউ প্রতিবাদ করলে না। আমার সারিতে এসে, আমায় ছুঁয়ে ছুঁড়ী বল্লে—ঐ সব রুমাল চাবি-টাবি—আর একটা জিনিষ, যা বয়স্ক পুরুষমানুষের পকেটে থাকা সম্ভব নয়,—ছেলেপিলের পকেটে থাকতে পারে। বল্লে, ভাঙ্গা বিস্কুট। আমি চমকে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ, ভাঙ্গা বিস্কুট রয়েছে আমার পকেটে—কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আমার নিজেরই তা মনে ছিল না। হয়েছিল কি জান? তার চার পাঁচ দিন আগে, সেই কোট গায়ে পায়ে হেঁটে আমি সহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। চাঁদনীতে এসে বড় ক্ষিদে পায়। চার পয়সার বিস্কুট কিনেছিলাম,

খানকতক খেয়েছিলাম, খান দুই পকেটে প'ড়ে ছিল।—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। কি বলতে চাও তোমরা? সে ছুঁড়ী ঋষি-তপস্বীও নয়, সাধনাও করে না, গরু-শূয়োর খায়, মদ খায়, এবং সম্ভবতঃ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। ও কি জান? কোন-কোনও লোকের ঐ রকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে,—তাকে ক্লেয়ারভয়েন্সই বল, আর দিব্য দৃষ্টিই বল, আর ছাই বল।"

বিপিন বলিল, "মাদ্রাজ অঞ্চলের গোবিন্দ চেট্টির কথা শুনেছ ত? এই ১৫।১৬ বছর আগেকার কথা। সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই তার কথা বেরুতো। তবে সে ভবিষ্যৎ বলতো না, বর্ত্তমান বলতো। মাদ্রাজে সে নিজের ঘরে ব'সে তোমায় ব'লে দেবে, দেশে তোমার মা সে সময় কি করছেন, বাবা কি করছেন, তোমার স্ত্রী কি করছেন, ইত্যাদি। কলকাতা থেকে কত লোক দেখতে গিয়েছিল। দেখে এসে তারা খবরের কাগজে চিঠি লিখেছিল। মনে আছে, আমার বাবা বলতেন, 'যদি আমার দেহটা ভাল থাকতো, আমিও যেতাম।' সেই গোবিন্দ চেট্টিও শুনেছিলাম বদ্ধ মাতাল।"

কুমুদবন্ধু থিওজফি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। সেও কয়েক জন মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিল। এইরূপ আলোচনায় রাত্রিভোজনের সময় সমাগত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে সুরেন্দ্র কয়েক জন মেসবন্ধু সহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেই খুসী। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল, কুন্দমালার চক্ষুতারকা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত কালো নহে, উহা ফিকা বাদামী রঙেরই বটে।

৪

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুন্দমালার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দেশ হইতে তাহার পিতৃব্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন সকলে সদলবলে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।

শুভদিনে কুন্দমালার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণনগরেই কুশণ্ডিকা-ক্রিয়া শেষ করাইয়া কাকা মহাশয় বরকনে লইয়া দেশে গেলেন, বরযাত্রীরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণের পর সুরেন্দ্র নববধূকে বলিল, "দেখ, আমাদের এ মিলন-ব্যাপারের সঙ্গে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জড়িত আছে।"

কুন্দ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা?"

সুরেন বলিল, "যখন তোমাতে আমাতে বিয়ের কোনও কথাই হয় নি, যখন তোমার মামা আমাকে দেখতেও যান নি, তখনই আমাদের এক বন্ধু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তোমাতে আমাতে বিয়ে অনিবার্য্য। আমার সে বন্ধুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতের সব ঘটনা তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান।"

কুন্দ বলিল, "বল কি? আমার নাম তোমার সে বন্ধু জানলেন কি ক'রে?"

পটলডাঙ্গার বাসায় এক মাস পূর্ব্বে শনিবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুরেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। 'কুন্দমালা' নামটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াও সুরেন যে মধুর মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

কুন্দ অবাক্ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সুরেনের কথা শেষ হইলে বলিল, "খুব আশ্চর্য্য ত! তোমার সে বন্ধু নিশ্চয়ই এক জন খুব ভাল গুরু পেয়েছেন, যোগসিদ্ধ বোধ হয়?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ছাই সিদ্ধ।"

"তবে? তিনি কি করেন?"

"এই, আমরা সকলেই যা করি। অন্নের জন্যে রাত জেগে বই মুখস্থ ক'রে এগ্‌জামিন পাশ করেছেন, তার পর চাকরীর উমেদারী।—ওটা কি জান? এক এক জন মানুষের ঐ রকম একটা ক্ষমতা জন্মে যায়—আপনি আপনি জন্মায়, তার জন্যে জপ-তপ সাধনা-টাধনা কিছুই করতে হয় না। ওকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্স—ক্লিয়ার ভিশন—দিব্য দৃষ্টি আর কি। আর, ওরকম ক্ষমতা যার আছে, তাকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্ট।"—মুরুব্বিয়ানা স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সুরেন গোবিন্দ চেট্টির ক্ষমতার কথা এবং অষ্ট্রেলিয়ান সার্কাস দলের সেই মেমের ক্ষমতার কথাও যথাশ্রুত বর্ণনা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কুন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মিনতির স্বরে বলিল, "হাঁগা, তুমি এবার যখন এখানে

আসবে, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস না। আমি তাঁকে দেখবো।"

সুরেন বলিল, "সে ত এখন কলকাতায় নেই। পাঞ্জাব গেছে চাকরী করতে। যে দিন সে ঐ সব কথা বল্লে, তার পরদিনই সে চ'লে গেছে। রাইবেরেলী হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী চাকরী নিয়ে সে গেছে।"

কুন্দ শুইয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কিঃ? রাইবেরেলী ইস্কুলের হেড মাষ্টার?"

সুরেন, কুন্দমালার এই হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ। কেন?"

"তোমার বন্ধুর নাম কি বল দেখি?"

"অতুল—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।"

"ও আমার পোড়াকপাল!"—বলিয়া কুন্দ মুখে হাত চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি আর থামে না।

"কেন? কেন? হাসছ কেন?"—বলিয়া সুরেনও উঠিয়া বসিয়া, কুন্দমালার মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া দিল।

আরও মিনিটখানেক হাসিয়া তার পর কুন্দ আত্মসম্বরণ করিতে পারিল। বলিল. "হাসছি কেন জান? তোমার সে বন্ধু-যোগীও নন, ঋষিও নন, গোবিন্দ চেট্টিও নন, ক্লেয়ার-ভয়াণ্টও নন। তিনি আমার অতুলদা। ঐ যে আমার মামা তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তিনি অতুলদার পিসে-মশাই। অতুল-দা ত কতবার এখানে এসেছেন। বাবা তাঁকে একটি ভাল পাশ-করা পাত্রের সন্ধান করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলেন, অতুলদাই ত বাবাকে তোমার কথা লেখেন। অতুলদা রাইবেরেলী চ'লে যাবেন বলেই দাদাকে নিয়ে মামা তাড়াতাড়ি ঐ দিন তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তোমাদের ভোজের সভায় ঐ ক্লেয়ারভয়েণ্টগিরি ফলাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, মামাবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ১০টার গাড়ীতে কলকাতা রওয়ানা হবেন। বাবা আগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে!"

"তোমায় সে দেখেছে?"

"হাজার দিন।"

সুরেন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন ব্যাপার? ভারি ঠকানটাই শালা আমাদের ঠকিয়েছিল ত! উঃ—আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দ্দা প'ড়ে গেল। আমায় এক গেলাস জল দাও।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
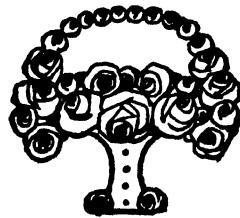
সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পদ্মা।

বসুমতী চিত্রবিভাগ]

[শিল্পাচার্য্য—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠ